

ভারতী বর্ষ- ৩৮

অঙ্ক- ২-২২

সচিত্র বাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—

শ্রীমণিলীল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসৌরীন্দ্রগোহন মুখোপাধ্যায়

(১৩২২ বৈশাখ হইতে আশ্বিন)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০ ন [ভারতী কার্যালয়, [বাষিক মূল্য ৩৬০
২২নং হুজিরা স্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩১২ সালের
বর্ণনাত্মক মূল্য
(ঐক্য—আশ্রয়)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অকুণ্ঠ (গল্প)	ত্রিগৌরীজমোহন মুখোপাধ্যায় দি-এল	৪২
অন্ধকারের কথা	ত্রিভোভাবাম শর্মা শাস্ত্রী এম-এ	৫২৭
অন্ধ (গল্প)	ত্রিবেণেজকুমার রায় গুপ্ত	১২০
অপূর্ণ কোটা (কবিতা)	ত্রিবেণেজনাথ সেন এম-এ	৫৮৪
অগ্নিধারক	ত্রিশরচ্চত্র ঘোষাল এম-এ	৪৫২
বিপ্লবের কথা (গল্প)	ত্ৰিমতী সুরেন্দ্রকুমারী দেবী	৩৫০
বোম্বার কথা	ত্ৰিমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৩
আধুনিক ভারত	ত্রিমোহনচন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩৫, ১৩৭
আর্যাবিশেষ আর অসম্ভব	ত্রিভুজচন্দ্র চক্রবর্তী এম-এ	৫৮০
আলো (কবিতা)	ত্রিবেণেজনারায়ণ বাগচী এম-এ	১৭০
উপনিষদের আর্যাবিশেষের কুরুগণের প্রমাণ	ত্রিগৌরীজমোহন চক্রবর্তী এম-এ	৩৭৫
অষ্টমার (গল্প)	ত্রিমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৩৬২
কবর-ই-নূরজাহান (কবিতা)	ত্রিগৌরীজমোহন চক্রবর্তী	৩৫৪
কবরের অন্ধকার	ত্রিগৌরীজমোহন চক্রবর্তী এম-এ	৩৬৬, ৪৪২
কাকরী-পঞ্চাশৎ (কবিতা)	ত্রিগৌরীজমোহন চক্রবর্তী	৫১০
কালো ঘন (গল্প)	ত্রিগৌরীজমোহন চক্রবর্তী এম-এ	৫২২
কালো জড়ি (গল্প)	ত্রিমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৫৩৮
কৃষ্ণজী-বচন	ত্রিমলকুমার কবিরাজ	৩১৮
কবির নামের প্রকৃত রহস্য	ত্রিগৌরীজমোহন চক্রবর্তী এম-এ	১৫৩
গাছী-পত্নির সখ্যতা	ত্ৰিমতী সুরেন্দ্রকুমারী দেবী	২০৭
স্বপ্নবন্দন	ত্রিবেণেজনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৪৭
গোয়েন্দা গ্রেপ্তার	ত্রিগৌরীজমোহন চক্রবর্তী বি, এ	১২২
চন্দন		
অমিরের পা কি স্থান?		১৮২
আলোক-চিত্রে ভারতের নকল		৩৫৫
আধুনিক অজ্ঞাচিত্রসমূহ অপরূপ		৪০৬
আলোক (কবিতা)	ত্রিগৌরীজমোহন চক্রবর্তী	৬০২
এমিল ভারদ্বাজ (সচিত্র)		৭৪
কলাবিশেষের আদর্শ (সচিত্র)		৪০৭
ছোট গল্প (সচিত্র)		৪৮৩
জাফানির তিন মহানব		৫২২
জাপানী বাজুক-চিত্র (সচিত্র)		৬৮৫
নব কলাবিশু (সচিত্র)		৬৮৫
নাট্যকারের জীবন		৫২০

বসন্ত

নৃত্য-কলায় গীতিকাব্য	১৮১
নৃত্য-কাব্যের কথা (সচিত্র)	৫১৩
পুস্তক ও ভ্রমশীল	৪১১
প্রত্নতত্ত্বের কুরুক্ষেত্র এবং দার্শন্য জাতি	২২২
প্রাচ্য চিত্রকলা (সচিত্র)	৪১০
প্রাচীন মিশর (সচিত্র)	৬২২
প্রেম-ধর্মে হিংসাবাদ	১৭২
ফ্রেডারিক নিট্শে	১৫৫
বই-পড়ার কথা	১৭৮
ভাষার টাউবের্টকর (সচিত্র)	
ভাল লেখার কাহিনী	
মহিব মাথা (সচিত্র)	
যুদ্ধের পরে জীবন ও সাহিত্য (সচিত্র)	
রাজভাস্কর টিফানসিওং (সচিত্র)	
রিমস গিল্ডার ঐশ্বর্য (সচিত্র)	
রিমসের মনির (সচিত্র)	৭২
রিকার্ড হক (সচিত্র)	১৮৫
কন-প্রতিভার নব-পরিচয়	২২১
শিওনডাল আশ্রিত	৭০
শিত্ত-শিক্ষা	৪২২
সাহসের জগৎ	১৮৩
হাথা-বড়ী (সচিত্র)	৬০৭
সৌন্দর্য-চর্চা (সচিত্র)	৪৮২
হুগোয় প্রণয়-দাহিনী (সচিত্র)	২৩৩
মুনোপের রাজনৈতিক গল্পচর	৪২৫

পৃষ্ঠা

১৮১

৫১৩

৪১১

২২২

৪১০

৬২২

১৭২

১৫৫

১৭৮

৭২

১৮৫

২২১

৭০

৪২২

১৮৩

৬০৭

৪৮২

২৩৩

৪২৫

শাশর লড়ী (গল্প)	
শগুন-মরণ (কবিতা)	
শাকুরি (গল্প)	
সুকসিমা ফকির	
তেহাই (নাটক)	
প্রনিয়ার শক্তিমান নগর (সচিত্র) ..	
প্রনিয়ার (কবিতা)	
সেবসর্গ ও সেবসর্গ	
দেড়ে টিকটিকি (কবিতা)	
দৈব-পরীক্ষা	
নবদর্শ (কবিতা)	
নবাব (উপজাতি)	

ক্রিয়োতিরজনাথ ঠাকুর	৫০১
ক্রিয়োতিরজনাথ ঠাকুর	৫২১
ক্রিয়োতিরজনাথ ঠাকুর	২১৭
ক্রিয়োতিরজনাথ ঠাকুর	৪২৮
ক্রিয়োতিরজনাথ ঠাকুর	২৫৫
ক্রিয়োতিরজনাথ ঠাকুর	৫৫১
ক্রিয়োতিরজনাথ ঠাকুর	৫৮৫
ক্রিয়োতিরজনাথ ঠাকুর	৩০২
ক্রিয়োতিরজনাথ ঠাকুর	৪২১
ক্রিয়োতিরজনাথ ঠাকুর	২০৮
ক্রিয়োতিরজনাথ ঠাকুর	৫
ক্রিয়োতিরজনাথ ঠাকুর	১৫৬

শালক (গল্প)

ক্রিয়োতিরজনাথ ঠাকুর সি, আর্ট, ই, ৩৪, ১৪৫, ২৩৩, ৩৩০, ৪২৫

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
পথে পথে	শ্রীমদ্বীজনাথ ঠাকুর সি, আঠি, ই	১২৫
শাগল ? (গল্প)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শুভ	১১
পাখী বলে চোপ গেল (কবিতা)	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল	৭২
পূর্ণ (গল্প)	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৫৭৩
ফেলু জামিন (গল্প)	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৩১০
বর্ষার অর্ধমণী (কবিতা)	শ্রীনগিনীনাথ দে	৩৭২
বলে নিমাই-বৈচিত্র	শ্রীগুণেন্দ্রনাথ বসু বি-এল	৪৬৫
বর্ষা নিশায় (কবিতা)	রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী	৪১০
বাতিদান (গল্প)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শুভ	৫২৩
বিভার সীমা (চিত্র)	শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী	৬২৩
বিদায় গ্রহণ	শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী	১
"বেঙ্গলী"	শ্রী	৫২২
দৈনিক সত্যতা	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মিত্র	৩৭৭
সুপগ্রহে আবাদিগের কুকবানের প্রমাণ	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্তী এম-এ	৫১৬
গিরতবধে অর্থনীতি অধ্যয়ন	অধ্যাপক রাসেল ও সমাধির	২৪৪
মুক্ত-সাহিত্য	শ্রীপ্রমোদনাথ রায়	৪০
মুক্তের দস্তব (গল্প)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শুভ	৩৮৫
মধীন্দ্রনাথের অস্বপ্নিনে (কবিতা)	শ্রীবিজয়চন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম-এ	২৬৭
মঞ্জি ভড়ং (গান)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	২০৪
কব-দস্তব পূর্ণাধ্যায়	শ্রীশীতলচন্দ্র মজুমদার বি-এল	২৬৮
মুণ্ডকাব্য-পরিচয়	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল	৩২৬
শরৎ (কবিতা)	শ্রীমদ্বীজনাথ দে	৪৬২
শত্রু (নাটিকা)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৫৪৫
শ্রীশ্রীটিকিমদল (কবিতা)	শ্রীনবকুমার কবিরাজ	৩১
সকল (কবিতা)	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল	৫৭০
সত্ত্ব ইন্দ্রের বিকাশ ও প্রচার , ...	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্তী এম-এ	৪৫
সমালোচনা	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ	২৩২
		৩২৫, ৪২২, ৫২০
সঙ্কায় (কবিতা)	শ্রীমদ্বীজনাথ ঠাকুর	৩২০
সাহিত্যিক ইত্যাহার	সম্পাদক	৬২০
সোভের কল (উপজ্ঞান)	শ্রীচাক্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ,	৮২, ১৬৩
		২৭৩, ৩৩৬, ৪৭৪, ৪৬৩
সাগর (কবিতা)	শ্রীবিজয়চন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম-এ	১৪
সাহিত্য সম্মিলন—		
অভিভাষণ	মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৯৭
ইতিহাস শাখার অভিভাষণ (সচিব)	অধ্যাপক যদুনাথ সরকার	১১০
দর্শন শাখার অভিভাষণ (সচিব)	শ্রীগুরু হীমেন্দ্রনাথ দত্ত	১৩১
বিজ্ঞান শাখার অভিভাষণ (সচিব)	অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়	১২৪
সাহিত্য শাখার অভিভাষণ (সচিব)	মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১১৩
স্বামী (গল্প)	শ্রীচৈঃ চন্দ্র বসু	১১০

চিত্র-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অবস্থা	৩০৪	প্রদর্শনী-মগরের নৈশ দৃশ্য	৪৪৬
অনেকের পথে	৪৮৪	প্রাচীন মিশরের সমাধি/ভবনের ছবি	৬০৪
অতিমহৎ-সজ্জার সারা বার্ণাভ	৫৮২, ৪২১	বন্দিনী মা	১৭৬
"অপ্যন্ত সাগরের উপর শান্ত শব্দ"	৬০২	বর্ষা (বহুবর্ণ)	৩২৫
সুখাতি (বহুবর্ণ)	...	বাঘী	৩০৪
ঐয়ুক্ত নন্দলাল বহু অঙ্কিত ...	৪২১	বিখ্যেমলাগ প্রদর্শনী ক্ষেত্র	৪৪৬
অশোকের রাষ্ট্র ও বোধিজ্ঞান (বহুবর্ণ)	...	বৃহৎ (বহুবর্ণ) —	...
ঐয়ুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	১৩৭	ঐয়ুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	২৩৩
এমিল ভ্যারংয়ের	...	ভরা সাক্ষাৎ —	...
একটি যুগের ছবি	৪১১	ঐয়ুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	৪৭১
কলঙ্কের বোঝা (বহুবর্ণ)	...	ভিক্টর হুগো	২২৪
ঐয়ুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	১	মরতোর মূলতানের সূর্য-বড়ি	৬০৮
কল্যাণবিশের আদর্শ	৪০৮, ৪০২	মলাক্ষেত্রে আশা	৪৪৭
কারাশ্রমের শক্তি	৪৬১	"মোনেমে তিরিচ্ছ গান, তুকেমে করিছে	...
কালার স্বপ্ন —	...	আলিঙ্গন সফেন চকল ম্যা, —	...
ঐয়ুক্ত রম্যদেবী অঙ্কিত	১৫	—ঐয়ুক্ত নন্দলাল বহু অঙ্কিত	২০৫
ক্রীড়ক	৪৮৬	বহুনাথ সরকার অধ্যাপক	১২১
চলি গো, চলি গো, বাই গো চলে—	...	যোগেন্দ্র হার বিভািনি ঐয়ুক্ত	১২৫
ঐয়ুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	৩৭৩	বাহুবল	৪৮৮
জুনিয়র ড্রইন্ড	২২৫	মগরজিনী	১৭৬
বিবসের মন্দির	৬০৬	মিসের মন্দির	৮০
উড্ডেটেকর কর্তৃক গঠিত তিনটি মূর্তি	৭৭	মিকার্ড হক	১৮৬
নরুকা চিত্রশোভা	৪১৪	প্রিয়ং পরার্থায় বিদগ্ধ বিদ্যাকৃষ্ণ	৩২২
নরকে পানীর সাদা	৩০৮	সদা —	...
প্রভোক্তা —	...	ঐয়ুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	২২৫
ঐয়ুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	...	সাধু রেখী ভূত তাড়াতৈতেছেন	৩০৮
প্রত্যাধর্ষন —	...	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বহানোপাধ্যায়	১১৫
ঐয়ুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	১৫	হরেন্দ্রনাথ বসু বেদান্তমত ঐয়ুক্ত ...	১৩২
প্রদর্শনী-মগরের গোবাবলী	৪৪২, ৫৬১		



ভারতী

৩৯শ বর্ষ]

বৈশাখ, ১৩২২

[১ম সংখ্যা]

বিদ্যায় গ্রহণ

পুৰাতন চিংহাষী নুহে অগচ তাহার
মৃত্যুও নাট। সে দর্শমান নুহেন। পিতা-
মাতা সন্তানে ভীষিত, পূর্বস্রোত পরদর্শী
স্রোতে প্রবাহিত, অতীত ভবিষ্যতে সন্নিবিষ্ট।
নৃত্যনে লীন হইতে না পারিলেই পুৰাতনের
প্রকৃত মৃত্যু।

পুৰাতনের প্রদান 'ধর্ম'। নৃত্যনকে
অগ্রগামী করা অর্থাৎ পথ দেখান, অগ্র
কথায় নৃত্যনকে গঠিত করিয়া তোলা।
ইহাতে যে সফলতা লাভ করে তাহার
জীবনই সার্থক। আমার বহুদিনব্যাপী
সাহিত্যসেবায় যদি এই উদ্দেশ্য কণকণ
পরিমাণেও সার্থক হইয়া থাকে তবেই
আমি ধিক্ত। কিন্তু বিচারের ভারও
নৃত্যনের হস্তে।

সংসারে কোন সংকলিত, কোন সাধনাই

প্রায় বাধাদিগ্ৰস্ত নহে। আমার পক্ষেও
ভারতীর সম্পাদন কাৰ্য্য নিকটকর্তব্য
পালন ছিল না। পত্রিকা সম্পাদনের অর্থট,
পাঁচশমকে লটকা পাঁচকনের চট্টা কাজ করা;
এই কাজের মধ্যে একটি দেয়া কাজ শ্রেষ্ঠ
লেনকদিগের দ্বারস্থ হওয়া, অর্থাৎ ভিক্ষা
করা। কোন পুণ্যপুণ্যের পক্ষে এ কাৰ্য্য
নিরূপ অসম্ভব তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।
ভারতীর সৌভাগ্য এই যে—এ বিষয়ে বিশেষ
ভাবে তাহাকে মনোযোগ প্রদান করিতে
চয় নাই। তবে একথা স্বীকার করিতেই
হইবে, যেখানে অকুণ্ঠিত প্রাণনার বড় আশ্রয়
করিয়া হাত পাতিয়াছে সেখানেও অধিকাংশ
সময় হতাশ্যের দাবী নিবাস ফেলিতে
হইয়াছে। অথবা আশাতীত স্থল হইতেও
বৃত্ত:প্রবৃত্ত সহায়তা লাভে ক্ষম্য কৃতজ্ঞতা-

পূর্ণ আশ্রয় হইয়া উঠিয়াছে! এটুকুশেই বৃদ্ধী জীবনের তোলপড়ে আশা নৈরাশ্রের পরিমাণ সমান থাকিয়া যায়।

অক্ষতহরীণ সাহিত্যের মধ্য দিয়া জ্ঞানের ক্ষেত্র ও মনের প্রসারতা বৃদ্ধি করাই ভারতীর প্রধানতম কর্তব্য ছিল; আর কাহ্নাসিক একটি কর্তব্য ছিল, নূতন লেখকদিগকে গড়িয়া তোলা। তপ্ত প্রতিভাকে সূটাইয়া তুলিতে ভারতী কোনদিন পরিশ্রমকাতর হয় নাই। যে লেখার মধ্যেই কোন একটু সার পদার্থ মিলিয়াছে তাহাই মার্জিত স্বগোষ্ঠিত আকারে ভারতীর পক্ষে স্থান সূচিত করিয়াছে।

যখন এই সম্পাদন ত্রুটি এংগ কবিগা-ছিল'ম তখন কল্যাণল লাভকতি গণনা করিয়া টহাতে প্রবৃত্ত হই নাই। কণ্ঠের আনন্দই কণ্ঠে উত্তেজিত উৎসাহিত করিয়া-ছিল। আর সে উৎসাহ উত্তেজনার দিন ফুটেয়া গিয়াছে। আজ আমি বৃদ্ধি একাশী, বড় অসহায়; আর প্রাণীয়াত দেহদন একান্তই নিবৃত্তিগোপ।

কিছু প্রবৃত্তিতে আনন্দ আছে নিবৃত্তিতে কি নাই? যেনেব, তৃপ্তি কি গ্রহণের তৃপ্তি হইতে অর? পুষার সাহায্য কি বিসর্জনেই ঘনীভূত নহে? বস্ত্ত: ত্যাগের সাধাই মুক্তির আনন্দ বিরাজিত। ত্রুটি গ্রহণ করিয়া আমি যে উদ্গাপনে অবসর পাইলাম ইহাই আমার কণ্ঠের প্রকৃত পুরস্কার।

বিষয়ের দিনে আজ আমার নগ্নন যদিও অসম্পূর্ণ কিন্তু জ্বর নিদ্রাম-নিশ্চিত প্রকৃত। সম্বন্ধানিতা ভারতীকে নবীনের উৎসাহ বুক, কার্যকর, বৈশাখী হুগে সমর্পণ পূর্বক আজ আমি মাতার ভাবই কৃতার্থ।

এই ত্রুটিধিক্তে এতদিন বাহারা আমাকে. বিদ্বৎসাহ সাহায্য করিয়াছেন, কর্তব্যবনের সেই সঙ্গার বহুদিনগকে. আর অবসর গ্রহণ কালে অতরের সহিত কৃতজ্ঞতা মন্থর জাগর করি।

“পত্রিকা” পাঠ্যত্রে পাঠকগণও সম্পাদকের সহিত পরিচিত। তাহারও আমায় কতিপাদন গ্রহণ করুন! ভারতীর প্রতি তাঁহারা যেরূপ প্রতিপূর্ণ অহুসারগ দেখাইয়াছেন ওজ্জ্বল আমি আপনাকে যথেষ্ট সম্মানিত জ্ঞান করি! তাঁহাদের প্রতি নিবেদন এই, সম্পাদক পদ ত্যাগ করিলাম বহিয়া কাকতীর সহিত আমার সখ্য একেবারেই যে ছিন্ন হইয়া গেল এমনটা যেন তাঁহারা মনে না করেন। লেখকরূপে ভারতীর পক্ষে তাঁহাদিগের সহিত মধ্যে মধ্যে আবার দেখা সাক্ষাৎ হইবার আশা রাখি। নবীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় আমার মেহতাপন আশীর্ষ;— তাঁহার প্রতি আশীর্বাদ এই, বিধাতা এ কার্যে তাঁহাকে কৃতকাৰ্য ও অগ্রগত করুন।

শ্রীযুক্তমারী দেবী

ভাষার কথা

পূজনীয় শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতীয় সম্পাদনভার আমার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার এগ্রেসের দান আমি পরম আনন্দ সহিত মাথায় তুলিয়া লইতেছি। এ ভার গ্রহণ করিবার যোগ্যতা আমার আছে কি না আমি না, কেবল এঁটুকু বলিতে পারি যে ভারতীয় গৌরব বাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তজ্জন্ত আমার মনপ্রাণ সর্বদা সজাগ রাখিতে চেষ্টা পাইব।

ভারতীয় গ্রাহক এবং অগ্রগ্রাহকসমূহ—
এতদিন বাহ্যিক ভারতীকে 'ঘেহ' এবং অগ্রকূল দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের সেই ঘেহ ও অগ্রকূল্য হইতে আমি বঞ্চিত হইব না—এই ভরসা ভারতীয় ভারগ্রহণ করিতে সাহসী হইরাছি। বঙ্গসাহিত্যের যে-সকল লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা প্রবীণ এবং উদারমান নবীন লেখক এতদিন ভারতীয় শ্রীসম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন তাবিধাতে তাঁহারা সে বিষয়ে কাণ্ডার্য প্রকাশ না করেন—ইহাই আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা। তাঁহাদের সাহায্য

এবং অগ্রগ্রহণের উপর ভরসা রাখিয়াই আমি কাঁধাক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছি।

একাল ধরিয়া ভারতীয় সেবা করিয়া পূজনীয় শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী আমার অবসর লইতেছেন। এ অবসর তাঁর উচিতমতো প্রাণ্য হইলেও তাঁহাকে বিদায় দিতে আমাদেব চিত্ত ব্যথিত ও কাতর হইয়া উঠিতেছে। 'আমাদেব দেশের মানিক সাহিত্যের এখনো এমন সমর আসে নাই যে তাঁহার মধ্যে এমন একজন নিপুণ সম্পাদককে এত অধ্যয়নে আমরা ছাড়িয়া দিতে পারি। তাঁহার এই অবসরগ্রহণে মানিক-সাহিত্য সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইল বলিয়া আমার বিশ্বাস। তবে আমার কথা এই যে, তিনি আশ্বাস দিয়াছেন, ভারতীয় সম্পাদন-ভার ত্যাগ করিলেও তিনি সাহিত্যসেবা এবং ভারতীয় সহিত তাঁহার সম্পর্ক একেবারে রহিত করিবেন না।

ভারতীয় সেবার তাঁহার বৈকল্প অদম্য উৎসাহ, অসীম আনন্দ, উদার নিষ্ঠা এবং

অল্পাত্ত পরিশ্রম দেখিয়াছি এমন কোথাও দেখি নাই। যখন তাঁহার কাছে গিয়াছি দেখিয়াছি পুস্তাকালয় মতো তিনি ভারতীয় পুস্তকাদি সাজাইতেছেন। বাংলা দেশের একজন মহিলার পক্ষে ভারতীয় মতো একখানা সুনির্মিত মাদিক-পত্রিকার পরিচালনা কিরূপ হ্রস্ব ব্যাপার তাহা যিনি-নিম্ন চক্ষে উহা না দেখিয়াছেন তিনি বুঝিতে পারিবেন না। এই হ্রস্বতার সহিত অতিদিন তাঁহাকে সংগ্রহ করিতে দেখিয়াছি; বিশদ আলোচনায় কখনো তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখি নাই। ভারতীয় কাগজে তাঁহার এমন একটু পরিপূর্ণ আনন্দ ছিল যাহার বলে তিনি সমস্ত বাধাবিঘ্ন এবং নৈসর্গিককে এলিয়া যাইতে পারিতেন।

সাহিত্য সাধনাই তাঁহার চির-জীবনের সাধনা—ইহা কাহারো অবদিত নাই। তাঁহার সে সাধনার কলসযন্ত্রে আলোচনা করার উপযুক্ত স্থান ও কাল ইহা নহে। তবে সকলে এ কথাই আমার স্মৃতিতে এক-মত হইবেন যে, তিনি বাংলা দেশের নারীজাতির মূখ উজ্জ্বল করিয়াছেন; এবং বিশ্বনাথসভার বাঙালী নারীকে বরেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের ধৌরব-আসন স্থাপিত করিয়াছেন।

বাংলার অনেক নবীন লেখক তাঁহার কাছে সনিবেশ করিয়া নবীন লেখকগণ বাহ্যতে নিবেদের গুড়িয়া কুলিতে পারে তাঁহার মত তাঁহার একটা আত্মরিক চোঁটা ছিল। এতটুকু লেখা বাঁহার ভালো দেখিয়াছেন তাহাকেই মুক্তকণ্ঠে উৎসাহ দিয়াছেন;—কেমন করিয়া তাঁহার লেখা প্রকাশযোগ্য হইবে তদ্ব্যক্ত বিধিযুক্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার এই অল্পগ্রহ অনেক নবীন লেখক ইহা দ্বারা কুলিতে পারিবেন না। আমিও সেই দলের একজন। তাঁহার নিকট হইতে সাহিত্য-সাধনার নানা বিষয়ে আশিষ এত উৎসাহ পাইয়াছি যে বলিয়া শেষ করিতে পারি না। এ অণু শুধু স্তম্ভিত্তা আমাঃই পরিবেশ করিবার নহে।

পরিণেবে একটা কথা বলিতে চাই। বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত আমার প্রথম বন্ধু ত্রিমুক্ত শেরীজামোহন মুখোপাধ্যায় আমার সহিত একযোগে ভারতীয় সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। বন্ধুত্বের নানা রূপে তিনি আমাকে পূর্ণ হইতেই আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, এখন আমার নূতন জগৎপাশে বদ্ধ করিলেন।

• শ্রীনিলাস গঙ্গোপাধ্যায়।

নববর্ষ

একতুমি নিত্য-নৃতন ! ত্রিদাশ-দীপ্ত সাজের অঁকে,—
 নিগিঘে গেছে কালের এবল্য বর্ষ দেখা লাগে লাগে ।
 চলছে ঘুরে স্ক্রুসুর পেছা, প্রাচীন তোমার দেগেনি কেউ ;
 স্রোতের উপর স্রোত চলছে, ঢেউ-এর উপর চলছে ঢেউ ।

জন্ম করা মুহূর্ত ফোটে বদ্বন্দ্বের তটে তটে,—
 তোমার দীপ্ত মূর্তি নিত্য বিবিস্ত সে গুচ্ছপটে ।
 বিশ্ব ভ্রাম্যে, বিশ্ব গড়ে, ফূর্ণ আশার প্রতি অগ্নি ;
 ঘোবনেতে ফুল তুমি, ফুবন-রসে দিক্ত তহু ।

লজ্বল তুমি অগণিত লক্ষ লক্ষ সাগর শিলা,
 এলে নখীন । ভবের তটে দাঁপতে মোদের মর্ত লীলা ।
 অর্ঘ্য দিয়ে সম্ভাষিতে অন্ধ আত্মর গবাই হাজির ;
 ওগো নৃতন ! লওগো তুলে ফুল ঊঁটি এই ভাঙা সাজির ।

কুখিরাক্ত ধরাধানি হিংসা বেবের বন্দে রণে,
 শান্ত্রিকলে অভিষিক্ত কর তুমি তত্তক্ষণে ।
 সাম্য মৈত্রী নব-নীতি আন তুমি তবে এবার ;
 করাও অভিনব শীলা বিশ্বব্যাপী নরসেবার ।

ঐবিলম্বচন্দ্র মহ্মদার ।

নবাব

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দশের একজন

সে মাসের অপরদ্বয়। অস্তগামী সূর্যের
মান কিরণ-রেখা ডিউক মোরার উপরকার
হালিবার ঘরের জানালায় সবুজ ভেলভেটের
পরদার উপর লুটাইয়া পড়িয়াছিল। চারিদিক
ক্লান্ত। হস্তিসভার সমস্তের দল আপনাদের
কাজ সারিয়া তখন বিদায় লইয়াছে।
পথে ডিউকের প্রাসাদের সম্মুখে, ডাক্তার
জেক্সনের গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল।

কাল হইতে ডিউকের শরীরটা খারাপ
যাইতেছে। আজ আহারের পর চইতে
আরও খারাপ বোধ হইতেছিল, তাই
পার্ল-ডাক্তার জেক্সনের তলব পড়িয়াছে।
ডিউকের কাল হইতে স্খা নাই, চোখে
মিত্রাও নাই—শরীরটা অত্যন্ত ভার বোধ
হইতেছিল।

জেক্সন ঠিক সময়ে আসিয়া উপস্থিত
হইল। ডিউকের খান-কামরায় বলিয়া
জেক্সন ভাবিতেছিল, “কি আবার নূতন
উপসর্গ ঘটিল যে হঠাৎ এই অবশ্যের ডাক
পড়িয়াছে! ডিউক চারি-পৃষ্ঠা-লেখা একখানা
চিঠি পড়িতে ছিলেন, সম্মুখে একজন
অনুচর চোখে অধীর আগ্রহ লইয়া
দাঁড়াইয়া ছিল। চিঠিখানা পড়িবার সময়
ডিউক নিজের মনেই অসংখ্য দুই-একটা
কি কথা বলিতেছিলেন—মধ্যে মধ্যে কলমটা
টানিয়া লইয়া চিঠির গারে দুই-চারিটা
আঁচড়ও টানিতেছিলেন। বাহিরে মর্শ্বের-মর্চা

কৃত্রিম নিখবের ভাঁগের উপর, সোমালোর
ঝাঁক মুহু আনন্দ-ধ্বনি তুলিয়া ঘুরিতেছিল;
এবং দূরে পুণের উপর বসিয়া কে
ক্রারিগোনেট বাজাইতেছিল, অপরাহ্নের মিষ্ট-
শ্রুতল রায়-তরঙ্গে তঁহারই উদাস পুর
ভাসিয়া আসিতেছিল।

ডিউক মোরা হঠাৎ চিঠিখানা টেরিলে
রাখিয়া অল্পচৈকে কহিলেন, “না, এ আজ
আর দেখা হবে না—ল্যাট্রিং। কার্ল নিরে”
এমো—আমার হাত-পাগুলো বড় ঠাণ্ডা
বোধ হচ্ছে। এই যে ডাক্তার, দেখ ত
—আমার হাত যেন হিম হয়ে রয়েছে,
ঠিক যেন বরফ-জলে হাত মুরেছি—। আজ
দু’দিন ধরে শরীরটা এমনি খারাপ রয়েছে!
অথচ, এমন গরম যাচ্ছে—নাঃ, কোথায়
যে গোল হল, কিছু বুঝতে পারছি না।”

ডাক্তার রোগীর নাকী পরীক্ষা করিয়া
বলিলেন, “হ—দেখলুম। একটা কথা,—
এই ভিতর কোন অত্যচার কিছু
হয়েছিল?”

ডাক্তারের মনে একটা সম্বন্ধ জাগিতে
ছিল, সঙ্গে সঙ্গে একটু সঁর্ব্বাও! • নূতন
সেই বন্ধুটির সহিত ডিউকের অন্তরঙ্গতা
ডাক্তার লক্ষ্য করিয়াছিল; কিন্তু সে
বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে শু ডাক্তার কোন
একটা ইঙ্গিত করিতে পারে না—তাই
আজ অসঙ্গ পাইয়া সেই বিষয়টার প্রতিই
মুহু ইঙ্গিত করিয়া ডাক্তার এই প্রশ্ন
করিল। প্রশ্ন করিয়া অধীর চোখে আগ্রহ

জরিয়া সে ডিউকের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

ডিউকের মুখে কোন ভাষাতর খটল না—জটাইটাও অকৃত্রিম রহিল। ডিউক বেশ শান্ত স্ববেই কহিলেন, “এটেই তোমার তুল, ডাক্তার। আমি এখন এত ঝাড়া নিরমে রয়েছি যে ছেলেরোলাতেও বেধি কঠি এমন ছিলুম না।”

ডাক্তারের মনের মধ্যে ঈর্ষাটা কীভাবে হইয়া উঠিল। ডাক্তার কহিল, “এই ত, তবে গোল হল কি করে?”

ডাক্তার বিচারবার আর এ কৌতূহলটাকে পরিত্যক্ত করিবার সুযোগ পাইল না—ইহার বেশী অগ্রসর হইবার সাহসও তাহারি ছিল না—এবং সে বিষয়ে অধিকার আছে কি না, সে-সম্বন্ধেও ডাক্তারের মনে বিলম্বসন্দেহ ছিল। ডাক্তার কি বলিবে তাহারি ঠিক করিতে পারিতেছে না, এমন সময় ডিউক কহিলেন, “শোন ডাক্তার, তবে যে তুমি কতগুলো আবল-তাবল হৈয়া বকবে, তার দরকার নেই—সে সব শুনেতে আর ভাল লাগে না, আমার। সাক্ষ্য দাও—এত ঠাণ্ডা আমি পোষ করছি কেন? কি এ? খুব অল্প কথার বুঝিয়ে দাও—”

ডাক্তার মুহূর্তের অল্প বিধায় পড়িল—তার পর কহিল, “শরীরে রক্ত নেই—তার উপর খাটুনি, মাথা-খামানো,—এই। এ ছাড়া আর ত কোন কারণ দেখছি না।”

“তাহলে এর প্রতিকার কি?”

“প্রতিকার, চূপ করে বসে পাকা—একদম জিরানো। কোন রকমে মাথা-খামানো নয়, কোনরকম খাটুনি নয়। তার উপর

বহিঃপ্রাণের অল্প কোথাও বেড়িয়ে আসতে পারেন—এই ধরুন, আনবোঁয়ে—কি—”

ডিউক ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, “খামো, খামো। বেড়াতে—গেলে এই কোমিলের মিউন তবে গে—না, না, সে ত হতেই পারে না—অসম্ভব।”

ডাক্তার কহিল, “কিন্তু মাথাটাকে একটু ছুটি না দিলে—”

ডাক্তারের কথা শেষ হইল না। এক জন ভূতা একখানা কার্ড আনিয়া ডিউকের হাতে দিল। ডিউকের চোখ দুটো অগিয়া উঠিল। ডাক্তার কথা বন্ধ করিয়া কার্ডখামার দিকে চাহিয়া দেখিল—পরিচিত নাম। ডিউক কার্ড রাখিয়া ভূতাকে বলিলেন, “আজ্ঞা, একটু বসতে শলা।” ভূতা বিদায় লইল; পরে ডাক্তারের পানে চাহিয়া তিনি কহিলেন, “আসল কথা কি জানো, ডাক্তার, যেমন কবেই হোক—অর্থাৎ বুঝেছি কি না—তোমার পাণের মায়াটা না হয় কিছু বাড়িয়ে দাও, যা দিচ্ছ, তাই ডবল দাও। মাথা থেকে মলুন আর কোন একটা ওষুধ বার কর। এই রবিবারটা আমার চাপা রাখো—বুঝতে পারছ, এই রবিবারটা আমার শরীর বেন খুব ভালো থাকে—।”

কেজিঙ্গ একবার কাশিয়া গলাটা সাক্ষ্য করিয়া লইয়া বলিল, “আপনাকে কিন্তু ভারী সাবধানে থাকতে হবে, ডিউক, বাহাওয়। আপনাব শরীর যা হয়েছিল, তাতে আমি আপনাকে খুব যে ভরসা দিতে পারি—এ পোষ হয় না। আপনাকে স্পষ্টই বলছি, জানবেন—আমার কর্তব্য বলেই এত স্পষ্ট করে বলছি—”

ডিউক হাসিয়া কহিলেন, “তোমার কর্তব্য-টর্তব্য ও-সব বাধা বুলি তুলে রাখো, ডাক্তার। আমি যাতে সুখে থাকি, যা কবে সুখ পাই, তাতে তুমি বাধা দিতে এসো না—এ প্রাণটুকু যেমন তাবেই জলে শেষ হোক না কেন, সব পেকে বন্ধিত করে রাখলে আমি আগেই এটুকু হুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেব। সব কেড়ে বেঁচে থাকার চেয়ে সব নিয়ে একটা ঝড় তুলে মরাও যে ঢেব তাগো বোধ হয়, আমার।”

বাহিরে একটা শব্দ হইল। ডিউক চাহিয়া দেখিলেন, ডচেন। হুন্দর কৃত্তিক কেশ-গজের মধ্যে হুন্দর মুখখানি লইয়া ডচেন্ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ডচেন্ ডাক্তারের ঘরে কহিলেন, “এ কি—এখনও ঘরের কোণে বসে রয়েছ! বেড়াতে বেরাও নি? এটী যে ডাক্তার জেক্স। ডাক্তার, আগনার যোগ্যকে বহুত—কিছুতেই ঠেকে পারা গেল না। এই দেখুন না, আগনাদের মানা সবেই উনি এমন বিকেল-বেলাটা বড় ঘরের কোণে বসে আছেন! কেবল কাজ, কাজ, কাজ! শরীর না থাকিলে, কাজ করবে কে?”

ডিউক উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, কহিলেন, “ঐ শোন, ডাক্তার।” পরে ডচেনের বিকে ফিরিয়া কহিলেন, “কিন্তু তুমি এখনও বড় বেড়াতে যাও নি যে!”

ডচেন্ কহিলেন, “আমি ত একলা যাব না। তোমার আজ সঙ্গে নিয়ে যাব। কাকা আমার এক-বাঁচো পানী পাঠিয়েছেন, তোমার বেগাব, এস। কত রক্ত-বেগের

পানী—ভোট ভোট চোখভলি! যেন কে একঝোড়া কবে’ কানো নুফা জঁটে দিয়েছে। ভারী হুন্দর, দেখবে এম।”

“চল” বলিয়া ডিউক উঠিয়া পাড়াইলেন, বাইবার সময় ডাক্তারকে বলিয়া গেলেন, “তুমি বসো, ডাক্তার—আমি এখনই আসছি।”

ডিউক চলিয়া গেল, জেক্সিস বলিয়া সমস্ত ঘরটার উপর একবার চোপ বুলাইয়া লইল। ডাক্তার মনের ভিতর হঠাৎ কিসেক একটা আঁলা ছুটিয়া বাহির হইতেছিল। সহসা ডিউকের চেয়ারের সম্মুখে তাঁবলের ড্রাবের উপর ডাক্তার নজর পড়িল। ড্রাবটা একটু খোলা রহিয়াছে এবং কলের মুখে রিতে কচা চাবিটা লাগানো—চাবিটা সোনার। ডিউকের এতখানি অসতর্কতার কারণ আর কিছুই নহে—শুধু একটা পরিত্রা অবেচনা মাত্র! জেক্সিসের মনে হইল, চাবিটা যেন চীৎকার করিয়া বলিতেছে, “ডাক্তার এমন সাহস হইবে যে আমার স্পর্শ করে!”

ডাক্তার এমন সাহস! হী, এত স্পর্ধা! সে সাহস জেক্সিসের বিলম্বন আছে! কিপের তর!

জেক্সিস ড্রাব টানিল। ভিতরে বিস্তর কাগজ-পত্র, কিন্তু সবার উপরে ঐ যে একখানা চিঠি, পাখে মোড়া—খামের গোড়াটা ছেঁড়া রহিয়াছে, ওটা—! খামের উপর বড় বড় পরিচিত অক্ষরে ডিউকের শিরোনামা লেখা। জেক্সিসের আগে কে যেন একটা তত্ত্ব লোহা ঠেকাইয়া দিল, প্রাণ ডাক্তার জগিয়া

উঠিল। চারিদিকে চাহিয়া কল্পিত হস্তে সে পায়খানা উঠাইয়া লইল। মাথ মনোর গায়ে তখনও একটা মিষ্ট গন্ধ মাথা রাহিয়াছে—চারিদিক ঘন হাজার ফুলের গন্ধে ভরিয়া উঠিল। বেঙ্কিম খামখানা হাতে লইয়া দেখিল, তপে সূর্য—তাহার সম্মুখে সত্যই তপে! তাই আনন্দে ফেলিসিয়া ডাক্তারকে এতখানি অবজ্ঞা দেখাইতেছে, তাই আন ডাক্তারের সহিত কথা কহিবুণ্ড ফেলিসিয়ার এতটুকু অবসর মিলে না। বটে! ভিতরে ভিতরে এতদূরনি তোমরা গড়িয়া ফুলিয়াছে! ফেলিসিয়া—রাক্ষসী!

বেঙ্কিমের আগে কে যেন বিধি চালিয়া দিল—সে বিধি সর্বত্র তাহার আলিয়া গেল। এই অপদার্থ ডিউক—এইটুকু বাহার প্রাণ নাই, মন নাই, ধর্মের গর্ভে ছুনিয়াকে যে আচ্ছন্ন করে না—নারী বাহার কাছে ভোগের, বিলাসের খেলনা মাত্র—দেই ডিউকের কোন তপে মুগ্ধ হইয়া ফেলিসিয়া এমন করিয়া আপনাকে তাহার হাতে জুলিয়া দিয়াছে! আর বেঙ্কিম—যে তাহার কষ্ট মরে—দেই বেঙ্কিমকে এমন নিষ্ঠুর উপেক্ষা করিয়া দিয়াছে, মড়াইয়াও তোমার কৃপা হইল না, ফেলিসিয়া! তাহার চেয়ে শূন্য শূন্য অযোগ্য টাকার-গড়া প্রাণহীন একটা পুতুলকে লইয়া, বেঙ্কিমের এক বড় প্রাণখানার পানে তুমি চাহিয়াও দেখিলে না! যে বেঙ্কিম তোমার মূখে এতটুকু হাসি দেখিতে পাইলে বর্তাইয়া যায়—দেই বেঙ্কিমকে পরণ করিয়াও একবার দেখিলে না, নারী! হার, রূপ, হার যৌবন, এত অন্ধ তুমি! এমনই সহস্র

চিন্তা শরের মত বেঙ্কিমের বুকে বিস্মিতে লাগিল। রাগে হিংসায় চোখ দুটো তাহার আলিয়া উঠিল, তবে সে চিন্তাখানা বাহির করিয়া পড়িতেও পারিল না।

না, জানি, চিন্তিতে কত কি সে লেখা দেখিলে! প্রাণের কত না লগিত কাকলী, মোহাগের কত না মধুর বচন, কত না মান, কত অভিমান। এমন সময় বাহিরে জুতার শব্দ হইল। বেঙ্কিম চোরের মত শিহরিয়া উঠিল! তাড়াতাড়ি চিঠি-সম্মত খামখানা ডায়েরি ফেলিয়া ডায়েরিটা সে ঠেলিয়া বন্ধ করিয়া দিল। এক আগন্তুক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বেঙ্কিম টেবিলের উপরকার ভোট ঘড়িটার উপর হস্তে নজর ফিরাইয়া কহিল, “নবাব বাহাদুর যে, আহুন। তারপর কি মনে করে?”

“ডিউক বাহাদুর কোথায় গেলেন—আমি বাইরে ছিলুম, আবার বলে গেলেন, এই ঘরে এসে অপেক্ষা করত—” কথা শেষ করিয়া নবাব গর্জিত শিরে ঘরের মধ্যে চারিদিকে একবার দেখিয়া লইলেন। খান-কাথরা! ডিউকের খান-কাথরা! এ ঘরে ডিউক তাহার কোন সাধারণ লজ্জাকর কখনও আনিয়া বসান না—এ ঘরে নবাব আন এই প্রথম আদিবার অধিকার পাইয়াছেন। কৃতার্থতার গৌরব-গর্বে নবাব উচ্ছলিত হইয়া উঠিলেন।

নবাবের উপর ডিউকের ইদানীং বখাবার একটা আন্তরিক টান পড়িয়াছিল। তাহার কারণও ছিল,—নবাবের মত এই সাহল ও ভাগ্য গড়িবার শক্তিকে বরাবরই তিনি

পছন্দ করিতেন। আরও বিশেষ পারির এই কাব্যোন্মাদিক সন্তোষ সন্দেহের পার্শ্বে নবাবের এই উগ্র প্রকৃতি, শক্ত-স্থূল সারল্য ও সৌন্দর্যীন শ্রদ্ধা ডিউককে একান্ত মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার উপর নবাব ভাল খেলিতে সিক্কহর—বাকী হারিয়াও দখিও জানেন না; ডিউকের ছবি চক্কেদের কিনিতেও অসম্মত আগ্রহাৎ—এই সব কারণেও নবাবের উপর ডিউকের ঘেহ জাগিয়াছিল। মাগাও পড়িল, যখন ডিউক দেখিলেন, এই নিরীহ নবাবের বিরুদ্ধে সমস্ত পারি একটা ভীষণ বিরোধ জাগাইয়া তুলিয়াছে, তাহাকে প্রতি পদে লাহিত করিবার জন্য দারুণ চক্রান্ত করিয়াছে। তাহাব সর্বত্র শ্রেষ্ঠিও তাহাকে রক্ষা করিতে কেহ দাঁড়ায় না! নবাব একা—কেহ তাহাব সহায় নাই। ডিউক যোগ্য অবস্থ এ চক্রান্তকারীর দলে যোগ দিলেন না।

দেখিয়া ও নবাব দুইজনেই ক্ষুব্ধ অপ্রতিভ হইলেন। কে কি কথা করিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া দুইজনেই বিশদে পড়িলেন। অল্পট আলাপ-পরিচয় আছে—চূপ করিয়া বসিয়া পাকাও ভাল দেখায় না। কাজেই দুইজনে নিতান্তই অব্যস্ত হই-একটা কথা কহিলেন মাত্র। পশ্চাতি উভয়ের মোহাদ্দাও হ্রাস পাইয়াছিল—জাহ্নলে জেহিসকে স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, বেখলিহাম আশ্রমে তিনি আর একটি পরসাদ দিবেন না। নবাব এখন হির করিতে পারিলেন না, তিনি আজ ডিউককে যে কথা বলিতে আসিয়াছেন,

সে কথাটা জেহিসের সম্মুখে তৌল্য লক্ক হইবে কি না! মেসেজার কান্ধখানা করত্বিন ধরিয়া তাহাকে যে বিস্তী পালি দিতে হুজ কহিয়াছে, ডিউক তাহা দেখিয়াছেন কি না এবং দেখিয়া থাকিলে নবাবের প্রতি ডিউকের ধারণার কিছু পরিবর্তন হইয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্যই নবাব আজ এখানে আসিয়াছেন। জানিবার প্রয়োজনও ছিল। কারণ নির্ধাচন-মহুরির সমাটা একেবারে আগর হইয়া উঠিয়াছে। সৈদিন যে অভিযান নবাবের অদৃষ্টে ঘটাইয়াছিল, তাহা পূর্ণ হইলেও নবাব আজ ডিউকের আশ্বাস-লাভের জন্য একান্ত উদ্ভীর্ণ হইয়াছিলেন।

এমন সময় ডিউক কল্লে প্রবেশ করিলেন, নবাবের পানে সম্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আত্মবিকার সহিত তাহার কর-বন্দন করিয়া কহিলেন, “জাহ্নলে, আমার ভয় হচ্ছে, পারি তোমার ঠিক উচিতমত আদর করছে না—দারুণ স্থগা আর জুংলা নিয়ে পারি আজ তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।”

নবাবের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, “কিন্তু বা বহুছে, সব মিথ্যা! আপনি যদি দেখতেন—”

“আমি জানি—আমি নতুন গালাগালটা পড়েছি।”

“আপনি কি ও-সব বিশ্বাস করেন? সেই কথাটাই আমি জানতে এসেছি। সে জানলে আমি ঠাণ্ডা হতে পারি—আমি তার প্রমাণও এনেছি, আজ।”

কিতার বাধা একটা কাগজের বাউল নলখের হাতে ছিল। কিতা খুলিয়া সেই

বাতিলাটা নবাব টেবিলের উপর ধরিলেন। ডিউক কহিলেন, “এ সব দলিল-প্রমাণের কোনই দরকার নেই, জাহ্নলে। আমি ও গালাগালের কথা বিশ্বাসও করি না। আমি বৃকতে পারছি, অপর কোন লোকের সঙ্গে তোমাকে ওয়া ভুল ককে জড়িয়ে দিচ্ছে।”

ডিউক হাসিলেন, হাসিয়া আবার বলিলেন, “এ-সব খপর রাখার দরকার আমার আছে, তাই গোজও নিজেছিলাম। তুমি নিশ্চিত থাকো। তোমার নির্দোষ, কারও সাধা নেই, বন্ধ করে। তার উপর একবার এটা কৌশলের মজুর হয়ে থাক না—”

জাহ্নলে আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাতিলেন। তিনি কহিলেন, “যদি আমার এ নির্দোষ ঘটে, তবে সে আপনার দয়্যতেই ঘটবে। আমার কিন্তু সব বিশ্বাস সবে থাকে। বিশেষ শত্রু, বল ক্রমেই বাড়ছে। তার উপর, লি মার্কীরই আমার সবচেয়ে রিপোর্ট দেবে।”

“লি মার্কীর! ঐ পাণ্ডাটা।”

“হ্যাঁ, লি মার্কীর—হেমারলিডের ডেলান বাগেগেন্স হেমারলিড, তু আগে-ওরই হাতে খেলার পুতুল ছিল। সে দুসলমান ছিল বলেই লি মার্কীর তাকে প্রকৃতভাবে বিবেচনা করতে পারেনি—নাহলে ওদের কথা টিউনিদের লোকের মুখে মুখে কিসত। লি মার্কীরের আগেই ত হেমারলিডের আজ এস কোর!”

“জাহ্নলে—”

নবাব কহিলেন, “এ কথা ডেলানার প্রয়োজনও ছিল না, আমার। এক হুতা

আগেই ত আমার নির্দোষ মজুর হবার কথা ছিল। কিন্তু ঐ লি মার্কীরের রিপোর্ট তোমাদের হস্তনি বলেই দিন পেছিয়ে গেল। প্রতি দুহুতেই এখন আমার ভয় বাড়ছে—আমার অগ্ন্যুত্তাপ ভাবুন, এতবার। আমার সমস্ত সম্পত্তি এই নির্দোষের উপর নির্ভর করছে। যে শুধু অপেক্ষা করে আছে, কি হয়! তাহলেই সে লুটেব উত্তোষ করে! টিউনিদের আমার আর আট লক্ষ টাকা পড়ে আছে—ডেপুটি হতে যদি না পারি ত বে তার সব হাত করবে। আমার তখন পথের ভিগিরী হতে হবে।”

কথা শেষ করিয়া নবাব ললাটের ঘর্ষ মুছিলেন। ডিউক কহিলেন, “ডেপুটি তোমার করবই, আমি। আমার চেষ্টায় বহুবৎ হয়, তার কোন ক্ষতি হবে না। আমি যদি সে সমস্ত যোগে ‘শয়ানগতও’ থাকি, তবুও আত্ম যেমন করে পারি, কৌশলের সে মিটিংয়ে যাবই। আমার মের্লে তোমার শত্রু-গণ অনেকটা মদে যাবে, জাহ্নলে, এ-তুমি নিশ্চয় জানো।”

নবাব এ কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন। তিনি কহিলেন, “ডিউক বহোজদের পরীক্ষা কি ভালো যাচ্ছে না?”

ডিউক হাসিয়া কহিলেন, “ডাক্তার ডেভিসকে এখন এখানে দেখছ, তখন তুমি বৃকতে পাচ্ছ না? কি বল, ডাক্তার নঃ, তবে অত্থ এমন কিছু নয়, শুধু কিছু কাহিল বলে নিকেকে মনে হচ্ছে। রক্ত নেই—তা ডাক্তার খানিকটা তাক রক্ত দেবে বলে ভরসা দিচ্ছে। কি বল ডাক্তার, বেবে তা?”

নবাব কহিলেন, “যদি আমার শরীর থেকে রক্ত দিলে আপনাদের কোন উপকার হয়—এমন কি আমার সব রক্ত নিজেও যদি আপনাকে—”

ডিউক নবাবের মুখের পানে চাহিলেন—সে মুখে অকপট আন্তরিকতা জন্ম জন্ম করিতেছিল। ডিউক তাহা দেখিয়া স্ত্রীত হইলেন, মুগ্ধ হইলেন। ডিউক কহিলেন, “তুমি যদি নেওড়া যেত, কাম্বলে, ত জননেরই ভাল হত। তুমি এই যে এসময় এতখানি উত্তেজিত হইতেছ, খানিকটা রক্ত দিলে তুমিও শান্ত হতে পারতে। কিন্তু সাবধান কাম্বলে—রাগের সময় চটু করে একটা বেকাস কিছু করে ফেলো না যেন। তারপর এখন ঐটেই চার। কিন্তু না, তোমার খুব সাবধান হতে হবে। তুমি এখন দেশের একজন—“পাব্লিকমান”! তোমার প্রতি অঙ্গ-ভঙ্গীটি অবধি লোকে এখন দূর থেকে লক্ষ্য করবে, তোমার চাইনিট অবধি তারা বাঁদ দেবে না। আর ঐ খপরের কাগজে গালি-গাল! খপরের কাগজ পড়ো না, একেবারে পড়ো না। যদি পড়ে নিজেই ঠিক রাখতে না পারো, ঢকন হও, তাহলে কাগজ পড়া বন্ধ করে দাও।” অসীমগুণে আচ্ছাদিত হইবে, দেখবে। জান, আমি কি করেছিলুম—ঐ কনকর্ড বলে লোকটাকে নিয়ে? সে স্ট্রীটগেটে বাজাত। দশ বছর আমার পিছনে তার সে বাঁশি নিয়ে সে বাজিয়ে বেড়িয়েছে। হাত নেই, দিন নেই, বাঁশির আওয়াজ। আলাতন হয়ে গেছলুম। তাকে বিদায় করবার জন্য তাকে কত টাকা দিয়েছি, ডরও দেখিয়েছি, কিন্তু কোন ফল হয়নি। পুলিশ?

তাতে উণ্টো উৎপত্তি হয়। শত্রুপক্ষ কাগজে অমনি বড় বড় প্যারা বাঁধ করতে থাকে। শেষে আমি একেবারে চূর্ণ হয়ে গেলুম। তার দিকে জ্ঞেপও নয়। বাজাক সে; যত শীঘ্র, ডেটাক সে!—আমি একটুকু টলব না—বাম্। শেষে তাকে পাত-তাড়ি শুটোতে হল। এই কাগজগুলাদের সঙ্গেও ঠিক সেই চাল ধর। বতকণ অবধি ওরা বুকবে, যে ওদের এই সব লক্ষ্যছাড়া বাহ্যিকভাবে তুমি কাতর চকন হচ্ছ, ততক্ষণ ওরা পিছনে যেউ যেউ করে মরবে, কিছুতে ছাড়বে না। তার পর তুমি আমার চাল ধর দেখি,—ওরা যখন বুকবে,—না, বত গালই—দি, লোকটা জ্ঞেপও করে না, তখন আপনা-আপনিই সব থেমে যাবে। যাক, এখন আমার এই কথা মনে চলে দেখ দেখি। তারপর—হী মনে আছে, কাল ফিনটের সময় কুমিটির মিটিং আছে? তাতে যোগে—নিশ্চয়।”

তারপর রেভিলেশন দিকে চাহিয়া ডিউক কহিলেন, “এখন ডাক্তার, তুমি শোন, আমার গুপ্তের ভাল রকম ব্যবস্থা করে দাও। বেশ শক্ত গোছ কিছু—”

রেভিলেশন সহসা চমকিয়া উঠিল—এতক্ষণ সে যেন কি স্বপ্ন দেখিতেছিল। রেভিলেশন কহিল, “হী আমি তাই ভাবছিলামও। বেশ দেখে শুনে নতুন একটা গুপ্তেরই ব্যবস্থা এবার করব।”

নবাব ও রেভিলেশন উভয়েই বিদায় গ্রহণ করিলে ডিউক ডরার পুলিশ ফেলিসিয়ার পত্র-খানা বাহির করিলেন। ডিউকের মুখে হাসি দেখা দিল। ডিউক আবার চিঠিখানা পড়িতে লাগিলেন।

পরদিন কমিটির মিটিং সারিগা নবাব বধন বাহিরে আসিলেন, তখন রোব গড়িয়া গিয়াছে। বাহিরে অস্তগামী সূর্যের স্পর্শস্থিতে চারিদিক রক্তিম। হঠাৎ রহিয়াছে—বেশ শান্ত শীতল বাতাস বহিতেছিল। নবাব গাড়ী ঘোড়া বিদায় করিয়া পদক্ষেপে চলিলেন। দুই-চারিটা পথ দাঁকিয়া পার্কের সম্মুখে আসিয়া নবাব তুলিলেন, ফিরিওয়াল হাঁকিতেছে, “মেনেজার। আর্ত্ত স্বাক্ষার মেনেজার।” নবাবকে দেখিয়া কাগজের প্রকাণ্ড বোঝা পিঠে ফেলিয়া ফিরিওয়াল তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিল, একখানা কাগজ আগাইয়া ধরিয়া কহিল, “আজকের মেনেজার, সাহেব—”

নবাব একবার ইতস্তত করিলেন, না, কিনিয়েন না। পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল, সে কি—তিনি না দেশের একজন। একটা ক্ষুদ্রলোকের ক্ষুদ্র কুৎসাকে এতখানি আশ্রয় করিয়া পক্ষে সঙ্গত নয়ত! এ দুর্বলতার উর্দ্ধে তাঁহাকে উঠিতেই হইবে। নবাব পক্ষা দিয়া একখানা কাগজ কিনিলেন। নিকটে পার্কের রেলিওর ধারে একখানা বেঞ্চ ছিল। সেই বেঞ্চে বসিয়া নবাব কাগজ খুলিলেন। প্রাপ্ত-পত্র-কলমে তাঁহার সমস্ত পড়িল। ঐ যে আবার নতুন গালি বাহির হইয়াছে। নবাবের বুকটা ধক্ করিয়া উঠিল। তিনি পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে রাগে তাঁহার সর্বাঙ্গ অগ্নিয়া উঠিল। হাত দুইটা পৈশাটিক জোখে নিষ্পিষ করিতে লাগিল। একবার,

—একবার পৈশাটিক যদি হাতের কাছে পাওয়া যায় ত—

নবাব চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। পথে অনেক লোক চলিয়াছে—সকলেই নিজেদের লইয়া গন্তব্য। নবাবের পানে চাহিবার কাহারও অবসর ছিল না। নবাব উগ্ৰিরা ধাক্কাটেলেন।

পার্কের চারিদিকে তখন অসংখ্য গাড়ী আসিয়া জমিতেছে—ভিক্টোরিয়া, আহাম-মুচ গতিতে চলিতেছে। ভিতরে আমোদীদের সম্মিত প্রলয় মুখ। নবাব ভাবিলেন, কি সুখী ইহারা! কি নিশ্চিন্ত আরামে সব গ্রীষ্মের এ মাপুরী উপভোগ করিতেছে! আহা!

নবাব একদিকে চলিতে লাগিলেন। ও কি! সম্মুখে একটা কেলিংগেটে এক তরুণী—রক্ত-করা বিকী মুখ, আর তাহারই পাশে ঐ যে মশাদ—মশাদ হৈত!

নবাব ছুটিয়া গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া ধাক্কাটেলেন, বহুগন্তের পরে হাঁকিলেন, “রোপো—”

নারীর হাতে ঘোড়ার রোপ ছিল। নারী সে হুকাবে স্তম্ভিত হইল। গাড়ী থামিয়া পড়িল। মশাদ কহিল, “চালাও।” নারী তখন আবার রোপ ধরিয়া টানিল। ঘোড়া চলিবার উপক্রম করিল। নবাব আসিয়া ঘোড়ার মুখ ধরিলেন। ঘোড়া পা তুলিয়া পিছু হটিবার চেষ্টা পাইল।

মশাদ দেখিল, ব্যাপার সহজ নহে; তাহার ভয় হইল। সে কহিল, “ও নবাব। চালাও তুমি—আমি বলছি। চালাও—”

রাশে আবার টান পড়িল। ঘোড়া কিন্তু অগ্রসর হয় না—নবাব তাঁহার সমস্ত শক্তি লইয়া ঘোড়ার মুখ ধরিয়া গাড়ী

কথিষাছেন। মশাদ' কহিল, "শাগণ্ড কৰিয়া নবাব হাঁকিলেন, "মাকেল, এবাৰ চাবুক—" নারী তখন বিধামাত্র না কৰিয়া ঘোড়ার ঘোঁৰ চাবুকটা লইয়া নবাবের মুখের উপর শপাৎ কৰিয়া এক বা বনাইয়া দিল। নবাবের মাথা হইতে টুপিটা ছিটকাইয়া পড়িয়া গেল। নবাব তখন শাগণ্ডের মত ক্ষেপিতা উঠিয়া ঘোড়াকে দুই হাতে পিছনে ঠেলিয়া ধরিলেন। গাড়ী উলটিয়া বাইবার মত হইল। পথে ভিড় জমিয়া গেল। নবাব তখন ঘোড়ার মুখ ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীর উপর উঠিলেন। নারী রান ছাড়িয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িল। নবাব তখন মশাদের মুখবানা কাগজে চাপিয়া ধরিয়া প্রবলভাবে তাহাকে নাক দিলেন। পরে হিচড়াইয়া টানিয়া তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও লাফাইয়া পড়িলেন। মশাদ' উঠবার চেষ্টা শাইতে ছিল—নবাব বাঘের মতই তাহার উপর ঝপাড়াইয়া পড়িলেন; অল্প কিল-চকু ধরিল, কৰিয়া শেষে পদাঘাতে তাহাকে দূর নির্দেশ কৰিয়া

কৰিয়া নবাব হাঁকিলেন, "মাকেল, এবাৰ তোমার আশ্চৰ্য্য শোধ চহেছে তু? মশাদ' কথা কহিতে পারিল না—ধূলায় গড়াইয়া পড়িল। নবাব তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া গাড়ীয়া উঠিলেন; নিখাদ সপোরে বহিতেছিল। একজন কনষ্টেবল আসিয়া নবাবের পার্শ্বে গাড়ীয়া। নবাব তাহার হাতে নিজের কার্ড দিয়া কহিলেন, "বাৰ্ড জাহে—কৰ্দিগার ডেপুটী।"

উপস্থিত জনসভ্য বিচলিত হইয়া উঠিল। ডেপুটী ডেপুটীক নহে তব, দেশের একজন! জনতার সে বিশ্বাসকে তুল-নিবৃত্তির এক তিলাঙ্কও মেনখানে অপেক্ষা না কৰিয়া নবাব ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইলেন। মশাদ' তখন গাৱের ধূলা ছাড়িয়া উঠিয়া সঙ্গিনীর সন্ধানে চোথ কৰিয়াই গাড়ীয়া। তাহার সর্বাত্মক ছড়িয়া গিয়াছে, নাক বিয়া গল্ গল্ কৰিয়া "রক্ত পড়িতেছে। পোষাক ছিড়িয়া কাপার গা ভরিয়া গিয়াছে। (ক্রন্দনঃ)

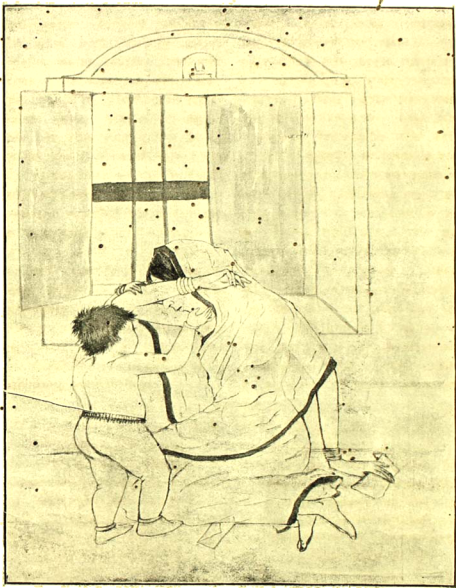
ঐশোৱাস্থযোজন-মুখোপাধায়ক।

মাগর

গগো অকুল অতল দ্বিভূত নীল দাগর-জল,
তোমার ঘনিতে আঁঠি নাই আঁঠি
নাহি চাহে আঁঠি মণি-রত্নগানী,
না করি গণনা জুটিলে কপালে অমিমা বা হলাহল।
আঁঠি কেবলি জীবন কেবলি জুলিষ,
বিবল রত্ননী কেবলি গলিষ,
অতল হইতে অতল তলাব, পাখনা কোথাও তল।
না হবে তপন, নাহি হবে শশী,
বিশ পড়িবে আঁঠি ধ'তে যদি,
তোমারি দ্বিভূত নীলিমা কেবল আঁঠি ধ'বে অচপল।
মাথার উপরে অগাধ সে হুঁহি,
সার খেব বোর জুনি হবে হুঁহি,

চরণের তলে ঘতনর চাই নীল জল নিরমল।
মনে তোমারি নীলিমা রাসিবে,
তব কলতান প্রবেশে ধারিবে,
তোমারি নীতল রত্নের শরণে তবু বোর চলল।
অকুলের পারে কি আছে কি জানি,
অতলের তলে কার পুরীখানি,
তার মাঝি বোর নারি জাগে প্রবে এক কথা হুতুল।
যখনি সে-ছি ওই হুতখানি
কাঁপ দিতে হবে এই শুধু আঁঠি,
ওই ভাবে বোরে আহুল তাহার হুলহুল কলকল।

ঐদিল্লেন্সনারায়ণ বাগচি।



কপির লুপ্ত
 ইরম দেবী অতিষ্ঠ তির হইতে

পাগল ?

(রূপ ঔপন্যাসিক লিওনিডাস আশ্রীত হইতে)

[১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বরে, ডাক্তার আন্টনী ইগনাটিভিচ কার্জেন্টেফ, একজন লোককে খুন করেন। এই অপরাধের বিবরণ ও তাহার পরের কতগুলি ঘটনা হইতে বুঝা গিয়াছিল যে, হত্যাকারীর মস্তিষ্ক অগ্রজ্ঞতিহ।

কার্জেন্টেফকে “এলিভায়েল মিনো-বিজ্ঞানমূলক চিকিৎসালয়ে” পরীক্ষার অগ্র প্রেরণ করা হয়। সেখানে কয়েকজন বহুদী মস্তিষ্কবিশেষজ্ঞ তাঁহাকে পরীক্ষার পরীক্ষা করেন।

হাটপাতালে একদানকাল কাটিয়া গেলে, ডাক্তার কার্জেন্টেফ উক্ত বিশেষজ্ঞদের হাতে আপনাদের নোটবহিখানিদেন। তাহাতে আসল ঘটনার কথাগুলি খুলিয়া লিখা ছিল। আমরা নীচে তাহার কয়েকস্থান তুলিয়া দিলাম।]

(১)

মহাশয়গণ,

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি সত্যগোপন করিয়া আসিতেছি বটে, কিন্তু এখন আমাকে বাধ্য হইয়া সব কথা খুলিয়া বলিতে হইল। যখন আপনারা সমস্ত ব্যাপারটা জানিতে পারিবেন, তখন বুঝিবেন যে, এ ব্যাপারটা ঘটনা সহজ বলিয়া মনে হইতেছে, আসলে এটি তত সহজ নয়।

আলেক্সিস,—যাকে আমি খুন করিগাছি, আমার বিভাগের সহপাঠী ছিল। সে

উকীল আর আমি ডাক্তার হইলেও, আমরা বরাবর একসঙ্গে পড়াশুনা করিয়া আসিয়াছি। আমি যে তাকে অপছন্দ করিতাম, তাও নয়। সে আমার দরদের দরদী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। কিন্তু তবু,—কেন জানি মী,—তার উপর আমার এতটুকু শ্রদ্ধা ছিল না। তাহার বিনোদ ও মধুর প্রকৃতি, তাহার লড়াইকণ ভাব ও করণা, তাহার নানাবিধের একত্রে মতামতের অল্প তাহাকে একটা শিশু বা রমণী বলিয়া মনে হইত। যে-সকল লোক তাহার মরমের মরমী ছিল, তাহার! সর্বদাই তাহার স্বভাবের অল্প বাধা পাঠত। কিন্তু সকলেই তাহাকে ভ্রম দিয়া ভালবাসিত। তাহার বৃত্তি, সে ‘কলা-কুশল’। তাই তাহার প্রতি-নিষ্ঠাতিকে কেহ আমোলে আনিত না। মানব-চরিত্র কি যুক্তিহীন!

সময়ে সময়ে আমিও সকলের ‘মোহে রায়’ দিয়া এই ‘কলা-কুশল’ বন্ধুটির ছোট-খাটো দোষগুলিকে গ্রাহ্যের ভিতর আনিতাম না। ‘ছোটখাটো দোষ’ বলিলাম এইজন্য যে, আলেক্সিস বৃহৎ কোন কিছুই উপস্থিত ছিল না। এমন কি,—সে বা দোষ করিত, —তাও ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ। আমার কথায় প্রমাণ বাক্য আমি তাহার সাহিত্য-সাধনার কথা তুলিতে পারি। যে-সকল মানদৃষ্টি সমালোচক চিরকাল ধরিয়া নূতন-কোন প্রতিভা আবিষ্কার করিবার দিকেরে আছে,

আলেক্সিসের তুচ্ছ রচনা হইতে তাহারও মত কিছু বাহির করিতে পারিত না। আলেক্সিসের মত, তাহার দেখাজে কোন একটা বিশেষ গুণ ছিল না।

আলেক্সিস বিবাহ করিয়াছিল। কিন্তু বিধবা হইয়া তাহার স্ত্রীর সকল রূপ-সৌন্দর্যই এখন মুছিয়া গিয়াছে। আগে যে তাকে দেখিডাডে, এখন সে তাকে আর চিনিতে পারিবে না। স্বামীকে সে বড় ভালবাসিত। স্বামী হারাইয়া তার কপোলের খোঁচা পীড়া আত্ম আর এখন নাই। অনেক দিন ধূলায় দস্তানার মত, তার মুখে এখন কৃকল-বেধা পড়িয়াছে। তবে, তার দেহ চোখ দুটি আগে যে চোখ সর্বদা হাসিত, এখন সে চোখ হাসি-খুসি লব ফুলিয়াছে। আমি সেদিন পুলিশ-কোটে তাকে একটু-বারের জন্য দেখিয়া তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্তনে একেবারে অধাক হইয়া গিয়া-ছিলাম। তার ভিতরে তখন এমন কোঁকড়া ছিল না যে, সে কুণ্ডল-নেয়ে আমার দিকে চাহিতে পারে। এখন সে অতীতের কড়াল আভাঙ্গা রমণী!

আলেক্সিসের স্ত্রী, নাম তাসিমানা। পাঁচবছর আগে আমি তাসিমানার কাছে বিবাহ-প্রস্তাব করিয়াছিলাম। একথা, আমি, তাসিমানা ও আলেক্সিস ছাড়া দুনিয়ার আর কেহ জানে না। কিন্তু তাসিমানা আমার প্রস্তাবে মত দেয় নাই।

আমার প্রস্তাবে তাসিমানা তখন হাসিয়াছিল। সে হাসি কি এখন তার মনে আছে? বোধ হয়—না। কারণ, তারপরে সে কতবার হাসিমুখ অবকাশ

পাইয়াছে। এত হাসির মাঝে পৌষিকার সে হাসি চাপা পড়িয়া গিয়াছে। একই, আপন্যুত তাহাকে মনে করিয়া দিবেন যে, “এই সেপ্টেম্বরে সে হাসিয়াছিল!” যদি সে অস্বীকার করে,—এবং সে অস্বীকার করিলেই-করিবে—তবে তাকে আবার মনে করাইয়া দিবেন যে, সে হাসিয়াছিল!

এবং আমি এমন সবল পুরুষ, যে আমি আর কখনও চোখের জল ফেলি নাই, সেই আমি তাহার সম্মুখে ঠাড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলাম। আমি স্ট্রেখিলাম, তাসিমানা তাহার ওষ্ঠ বংশন করিল। আমি তাহাকে জড়াইয়া ধরবার জন্য হাত দুটি বাড়াইয়া নিলাম। সে তাহার চোখ তুলিয়া চাছিল—সে চোখ দুটি হাসিগু উঠিল। আমার হৃদয় নিম্ন হইয়া আমার পড়িয়া গেল। সে হাসিতে লাগিল এবং অনেক—অনেকক্ষণ ধিয়া হাসিল। বতক্ষণ না তার সাধ মিটল, ততক্ষণ তার হাসিও পামিল না। অবশ্য, তারপরে সে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

“দয়া করে আমাকে মাপ কর।”—তার চোখ তখনও হাসিতেছিল।

আমি—এমনকি আমিও মুহু মুহু হাসিলাম। তাহার হাতের জন্য যদিও আমি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিতাম,—কিন্তু আমার সে মুহু হাতের জন্য আমাকে আমি কখনও ক্ষমা করিতে পারিব না!

এই সেপ্টেম্বর এই ঘটনা ঘটে। সহরের বড়ীতে তখন বেলা দুইটা। আমি

এখনও সেই একটাও ঘড়ীর বৃহৎ, কাগো কাটাছুটি পর্যন্ত চোখের সার্বনে পড়ে দেখিতে পাইতেছি—একটি কাটা উপর দিকে, আর একটি নীচের দিকে। আলেক্সিসও ঠিক ছুঁটার সময়ে খুম হয়। কোন ভীষণদৃষ্টির শোক এতই সাপুষ্ট হইতে অনেক ব্যাপারের সঙ্কেত পাইবেন।

আজ যে আমি পাগলা-গারদের আভি, তাহার একটি কারণ এই যে, আমার অপরাধের কোন উদ্দেশ্য পাওয়া যায় নাই। এতকণে কি আপনারা আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়াছেন? না—ইহা হিংসা নয়। আমার মত বুদ্ধিমান লোকী তুচ্ছ হিংসার জন্য কোন কাজ করে না।

প্রতিহিংসা? হাঁ, একটি পুরানো কথা দিয়া একটি নতুন ও অজানা ভাবে বনি কতকটা তবু *ছুটাইতে হয়, তবে 'প্রতিহিংসা' বলিলেও বলা যায়।

তাসিয়ানা দ্বিতীয়বার আমাকে ঠকাইল। সে কথা ডাণিলের আমার রাগ হয়। আলেক্সিসকে আমি খুব ভালরকমেই জানিতাম। আমি তাই ঠাওরাইয়াছিলুম যে, আলেক্সিসের সঙ্গে আমি যদি তাসিয়ানার বিবাহ দিতে পারি, তবে সে অভ্যস্ত অসুখী হইবে। আমাকে বিমুগ্ধ করিয়াছে বলিয়া তাসিয়ানা তখন অসুস্থাপন করিবে। এই কারণে আমি তাহাবিগকে বিবাহিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। তাহার তখনই পরস্পরকে ভালবাসিত। সুতরাং বিবাহ হইয়া গেল।

মৃত্যুর একমাসমাত্র আগে আলেক্সিস

একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিল, "তোমার জেজেই *আজ আমি এত সুখী। না তাসিয়ানা?" বলিয়া, সে তার দ্রৌ দিকে ফিরিল।

তাসিয়ানা আমার দিকে চাহিল। মৃদুরে বলিল, "হাঁ।" তার চোখগুলি হাসিয়া উঠিল। আমিও মৃদুহাস্য করিলাম। আলেক্সিসও হাসিল। তারপরে তাসিয়ানাকে আলিঙ্গন করিল। আমার হৃদয়ে তখন *লজ্জাস্রব কিছুই ছিল না।

আলেক্সিস বলিল, "তুমি কিছ হেরে গেছ বন্ধু, হেরে গেছ।"

এই "যে কোতুক—ইহা স্থানকালের *যেমন অল্পযোগী, তেমনি কোণলগ্ন। এই কোতুক তাহার জীবনকে মৃত্যুর দিকে এক সপ্তাহ অগ্রসর করিয়া দিল। কারণ, আমি তাহাকে ডিসেম্বার মাসের আঠারোই *তারিখের আগে মারিব না ঠিক করিয়াছিলাম।

*হাঁ, বিবাহ করিয়া তারা দুটিতে বড় হৃদে দিনযাপন করিতেছিল। বিশেষ, তাসিয়ানার আনন্দের মাত্রাটাই যেন বেশি ছিল। আলেক্সিস কিন্তু ততটা আবেগ-ডরে তাকে ভালবাসিত না। সে কোনরূপ গভীর স্নেহপ্রকাশে একেবারেই অপারগ ছিল। তার একমাত্র বাস্তবিক ছিল, সাহিত্য। তাই গইয়া সে জুনিয়া থাকিত। সংসারের দিকে কিরিয়ও চাহিত না। কিন্তু তাসিয়ানা। আমি বৈ আর কিছু সে জানিত না—সে একেবারে তৎসমর্পিত প্রাণ। আলেক্সিসের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। সে আরই অসুখ-বিস্ময়ে পড়িত। সে-সময়ে তাসিয়ানা

প্রাণপণে স্বামীসেবা করিয়া আপনাকে ধেন-
ধক্তভান করিত। কানন, রমণী যখন
ভালবাসে, তখন তাহার নিম্ন-সম্মুখ-
রূপে জুবিয়া যায়।

এমনি, প্রতিদিন আমি তার হাত-
রঞ্জিত মুখ দেখিতাম,—তাঁহা যৌবনপুষ্ট,
অবত্নশোভন, পরমহৃদয়! আমি দেখিতাম,
আর ভাবিতাম, “এর কারণ হইছে আমি!
মাদিক ফেলে সে কাঁচ পেয়েছে, এটা
তাকে বোঝাবার জন্যে তার সঙ্গে
আলেক্সিসের বিষে দিহেছি। কিন্তু সব
উল্টো হল—আমার ধূলো-মুটি তার কাছে
সোনা-মুটি হয়ে দাঁড়াল—যাকে সে ভাল-
বাস্ত, তাকেই সে পেয়েছে! চমৎকার!”

আলেক্সিসকে খুন করিবার মতলোব
আমার মাঝার কখন চুকিল, সে কথা
আমার মনে নাই। আহা! মনে হইত,
এ ইচ্ছা জন্মাবধি আমার সঙ্গে আছে।
তানিধানকে বাতনা দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য।
তাই আমি প্রথম-প্রথম এমন সব উপায়
খুঁজিতাম, যাতে বেচারী আলেক্সিস যতটা-
সম্ভব কম কষ্ট পাঠায় মরিতে পারে।
আমি লক্ষ্যবাহী-অনর্থক, নিষ্ঠুরতার বিরোধী।

নিজের জন্য আমার কোন ভয়-ভাবনা
ছিল না—এটা একটা মস্ত কথা। যে
বোঁধী, যে পুনী, তার কাছে পুণিশের
ভয়, বিপারকের ভয়, লেচের ভয়ই বড় ভয়
নয়! সকলের চেয়ে বড় ভয় তার নিজের
জন্ত, তার বিশেষ-বুদ্ধির বিক্রোহের জন্ত।
এ বিষয় নিশ্চয় আমি নাড়াচাড়া করিয়াছি।
পুনের পরে আমার মনের ভাবকে আমি
তর তর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

আমি বাতনা পাইয়াছি সত্য—জীবন
বাতনা! তেমন বাতনা পৃথিবীর আঁচ কেই
কখনও পায় নাই। আমার মাঝার চুল
সাধা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে হৃৎক
আশারী জিনিষ। একবারে আগাধা জিনিষ।
সে যে কি, তা-জানি না—একটা তরানক,
আনর্গতিরিক্ত, স্বাভাবিক অগচ অসম্ভব
কিছু। তবু—আমি বাতনা পাইয়াছি-বটে,
কিন্তু একটুও অচুতপ হই নাই।

২

আমাকে এখন এই সমস্ত সমাধান
করিতে হইবে, আলেক্সিসকে কি করিয়া খুন
করি? “আমি তানিধানকে জানাতে চাই
যে, তার স্বামীকে মারিয়াছি আমি। সেই
সঙ্গে আমি আইনের হাতও এড়াইতে চাই।
খুন করিয়া আমি ভেলে গেলে তানিধান
বড় সুনি হইবে। বিশেষ, (অজান্ত সকলের
মত) ভেলে পুটিয়া মরিবার জন্য আমার
কোনই আগ্রহ ছিল না। জীবনকে আমি
ভালবাসি,—অত্যন্ত।

আনাধার কাঁচের ভিতর দিয়া স্নান
কর রাঙা ঐষে নবীন রবিকর আসিতেছে,
আমি উহা দেখিতে ভালবাসি। নরম
বিছানায় উপরে আমি আমার শ্রান্ত তরুকে
বিছাইয়া দিতে ভালবাসি। বস্ত্র-বাতাসের
উক খাগকে আমি ভালবাসি, অন্তহরণের
মহিমময় শোভার ভিতরে আপনাকে আমি
জুয়াইয়া দিতে ভালবাসি, স্থিতিস্থিত চিত্ত-
কর্ষক পুস্তক পড়িতে আমি ভালবাসি।
আমি ভালবাসি—আপনাকে, আমার এই
মাংসপেশের চূড়তাকে, আমার এই নিখিল,
নিচুর্ণ চিন্তাধারাকে। আমি আমার

নিঃসঙ্গতাকে উপভোগ করিতে ভালবাসি—
আমি এই আশ্রয় গভীরতরুকে (এই
কৃষ্ণবর্ষ, বাহার তুটে মৃত্তিকের কলস
নৃত্য করে) কোন ক্ষেত্রহীন দূর্গে যে
স্পর্শ করিতে পারে না, আমি ইহা অশ্রুত
করিতে ভালবাসি। 'কীভাবে অবসাদ?
লোকে কেন যে একথা বলে, তা
কে-অন্যে।

আইন এড়ানো, আমার পক্ষে খুব সহজ।
লুকাইয়া লোক মারিবার হাঙ্গাম রকম
উপায় আছে। বিশেষ, তুমি রূপি, ডাক্তার
হও, তাহা হইলে ত' কথাই নাই।* আমিও
ডাক্তার। আমি অনেক কলী আটলাম।
একবার ডাবিলাম, আলেক্সান্ড্রাকে 'কোন
লুকানো অস্ত্রপে অস্ত্রী করিয়' মারিব।
কথাটা লইয়া অনেককণ নাড়াচাড়া করি-
লাম। কিন্তু তার অস্ত্রের সময়ে সেবা
করিয়াও তামিমানা ত' কতকটা স্ত্রী
হইতে পারে। না, তা হইবে না। আমি
তামিমানাকে অনাহিতে চাট,কে তার স্বামীকে
মারিয়াছে। এটা যে বিশেষ দরকার।

বুদ্ধিমানের পরমবস্ত্র—দৈব, আমার সহস্র
হইল। • খবরের কাগজে একদিন আমি
একটি ঘটনা পড়িলাম। কোন কারাবাসের
কেসিয়ার মৃগীরোগের ভাণ করে। সেই সময়ে
তার কাছ থেকে অকসেস টাকা হুরি
যায়। কিন্তু, আসলে টাকা হুরি করিয়া-
ছিল সে নিজেই। লোকটা কাপুরুষ।
কারণ, পরে সে আপনার ঘোষ মানিয়া-
ছিল। কিন্তু, এই দৈব ঘটনা আমাকে
শব্দ দেখাইল।

পাগল সাজিয়া আলেক্সান্ড্রাকে খুণ করিলে

কেনমন হয়? ঠিক কথা! আমি এক বৎসর
ধরিয়া "মনোবিজ্ঞান-সংক্ষেপ বস্ত" বই বাহির
হইয়াছিল, সমস্ত পড়িয়া ফেলিলাম।

বিশেষজ্ঞের মতে, উদ্ভাবন বংশাশ্রমিক।
আমার পিতা মনে অসন্তুষ্ট ছিলেন। আমার
এক খুড়া পাগল-গারবে মরেন। আমার
এক ভবী মৃগীরোগে মারা যায়।

দেখিলাম, পাগলামির অভিনয় করা
আমার পক্ষে কিছু শক্ত নয়। বই থেকে
আমি অনেক পাগলের লক্ষণ জানিয়া-
ছিলাম। এতলক আমি কাগজে লাগাইব।
আমি হুপটু অভিনেতার মত অভিনয়
করিব।

আমার মাথায় এক দুর্ভাবনা আসিল,
—কোন পাগলের মাথায় বাহা আসে না।
আমার এই পরীক্ষার ভীষণ বিপদের
কথা মনে হইল। আপনারা আমার
কথার মানে বুঝিতেছেন? পাগলামি,
আত্মব্রতের মত; তাহা নিরা খেলা করিলে
সঙ্গীনাশের ভয় আছে। ওয়ার ভিতবে
বাক্স পুরিয়া তুমি যদি তাতে আগুন দাও,
তাহা হইলে হুত তুমি নিরাপদে থাকিতেও
পার; কিন্তু উদ্ভাবন-ভীতির এককণাও যদি
তোমার মাথায় কোনগতিকে ঢুকিয়া পড়ে,
তবে তুমি একেবারেই পিগছ। আমি ইহা
জানিতাম! আমি ইহা জানিতাম! কিন্তু,
বিপদভরে কোন সাহসীর বুক মনে?

৩

সেদিনকার নিমন্ত্রণ-সভায় আমি বহু
পাগলের মত যে কেলেঙ্কারিটা করিয়া-
ছিলাম, তার কারণ আর বোধ করি,
খুনিয়া বলিতে হইবে না। কারণগামকের

বাড়ীতে আমার প্রথম পরীক্ষাটা আশাতীত-
রূপে সফল-হইয়াছিল।

তানিহানা ও আশেপাশে সেদিনকার আগুন
উপস্থিত ছিল না। আমি আগে থাকিতেই
আনিহান, তারা আসিবে না। তারা থাকিলে
আমি পাগলামি করিতাম না। কারণ,
তানিহানা হয়ত' তারা হইলে ভীত ও সন্দেহ
হইত। পৃথিবীতে যদি কেহ এমন লোক থাকে,
যে আমাকে চিনিয়াছে,—তবে সে তানিহানা।

ঠিক করিয়াছিলাম, খাইতে বসিয়া আমি
পাগলামি করিব—নিষিক্তেরা তখন সুরা
পানে উত্তেজিত থাকিবে। টেবিলের বে
বিকটার ল্যাম্প ছিল, সেদিকটার আমি
বসিলাম না। কারণ, সেদিকে গোলমাল
করিলে হঠাৎ একটা অঘটন হইয়া
আমার নিজেই পুড়িয়া বরিবার ভয় ছিল।

আমি পেট্রোলভিৎ নামে গিয়া বসিলাম।
এই মোটা ও ভুগিত জীবটাকে কিছু শিক্ষা
দি,—আমার বয়সের এমন একটা সুখ
ছিল। এ-লোকটা যখন খাইতে বসিত,
বিশেষ করিয়া তখনই সে বিবর্তিকর হইয়া
উঠিত। প্রথম যেদিন তাহাকে আহ্বান
করিতে গেলি, সেদিন আমার মনে হইয়াছিল
যে, ভোজন করিয়াও ব্যতিক্রমরূপে গণ্য
হইতে পারে।

প্রথমে আমি হাত ঘুরাইয়া পেট্রোলভিৎ
সঙ্গে উত্তেজিতভাবে কথা কহিতে কহিতে
পাগলামি সুর করিলাম। পেট্রোলভিৎ তার
ছোট্ট কুংকুতে চোখগুলো বড়টা-পারা-বার
ডাগর করিয়া অবাক হইয়া আমার দিকে
চাহিয়া রহিল। তারপরে আমি মুগ্ধিত
ও হতাশের মত ভাবধারণ করিলাম।

তৃতীয় প্যাভলোভনা, দিইবার আমাকে
দিজাগা করিলেন, “হাঁ আউসি, তোমার
কি হয়েছে? তুমি এমনখারা বিষয় হয়ে
আছ কেন?”

যখন সকলেব চোখ আমার উপরে
পড়িল, আমি তখন-একটু বিবাদের “হাসি
হাসিলাম।

“তোমার শরীর কি ভাল নেই?”

“না, বড় ভাল” বোধ করছি না।
আমার গা কেমন-কেমন করচে—মাথা
ঘুরচে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তোমরা কেউ
ব্যস্ত হবেন না। আমি এখন ভাল হয়ে
উঠব।”

কিন্তু, মাথা পেট্রোলভিৎ আমার কথার
তখন আশঙ্ক হইয়াছে বলিয়া মনে
হইল না। সে অত্যন্ত সন্দেহভাবে ও
অপছন্দের সহিত প্রবেশের এক-কোণ-দিয়া
যন-মন আমার দিকে তাকাইতে লাগিল।
একটু পরেই, যেমনি সে একান্ত পরি-
ভূষণের মত এক গেলান মগ-ঠেটের কাছে
তুলিয়া ধরিল, যেমনি আমি তার নাকের ঠিক
তুল্য থেকে ঘুসি মারিয়া গেলাসি চুম্বাদ
করিয়া দিলাম। তারপরে আমি মেঝের
উপরে সশব্দে আর এক ঘুসি মারিয়া
কাঁচের খালা ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। পাছে
কাঁচের টুকরা লাগিয়া আমার হাত কাটিয়া
যায়, সেই ভয়ে আমি সূর মুছবার
তোরাগেখানা আগে খালার উপরে রাখিয়া
ভাবে ঘুসি মারিয়াছিলাম। আমার এ
চালাকি কারুর নজরে চৈকিল না।

ভাঙ্গা কাঁচগুলো চারিদিকে ছিটকিয়া
পড়িল। পেট্রোলভিৎ মহা খাঙ্গা হইয়া,

ভয়ানক মত ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করিতে করিতে
বিষম জোঁলমাণ বাধাইয়া দিল। জীলোকেরা
সকল গলায় চাঁৎকার তুলক করিল। আমি
দাঁতে দাঁত লাগাইয়া মেঘ-ঢাকা চাদরখানা
সমস্ত বিনিময়ের সঙ্গে টান মারিয়া ফেলিয়া
দিলাম। সে এক মজার ব্যাপার—
একবারে প্রহসনের দৃশ্য!

সকলে আমাকে খিরিয়া দাঁড়াইল।
কেহ আমার হাত চাপিয়া ধরিল, কেহ
আমার অঙ্গ জল আনিয়া দিল, কেহ
আমাকে লইয়া গিয়া একখানা আমার
কেদারার বসাইয়া দিল। আমি চোখ
শাটাইয়া বাঘের মত গোঁ-গোঁ করিতে
লাগিলাম। লোকগুলো এতটা নির্ভয়
যে, আমার নাকামি তারা ঘোটে বুঝিতেই
পারিল না। আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল
যে, সেই বোকাগুলোই নাক খুঁদির ছোটে
খাওয়াইয়া দি! কিন্তু এ ক্লোন্তন আমি
সংবরণ করিলাম।

তারপর আমি ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ
হইতে লাগিলাম। প্রথমে আমি টানিয়া
টানিয়া নিঃশ্বাস ফেলিলাম, তারপর
দাঁত কিড়মিড় করিলাম, তারপরে অজ্ঞান
হইয়া গেলাম। সব-শেষে অস্পষ্টবরে দস্ত-
মাকি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আমি কোথায়?
কি হইতে?”

হাব্লা লোকগুলো আমার চালাকি টেন
পাইল না।

একমাস পরে, আমার দ্বিতীয় পাগলামির
অভিনয় হইল। এবারে আমি প্রস্তুত
ছিলাম না। কিন্তু কতকূল অবস্থা পাইয়া,

“সে হযোগ ছাড়িয়া দিয়া আমি বোকামি
করিলাম” না। সেদিন না বাঁ বটেছিল,
আমার মন টিক্কা মনে আছে।

সেদিনও আমি এক বস্তুর বাড়িতে
জম্জমাে আসনে বসিয়াছিলাম।

একবার লোক। বসিয়া বসিয়া সুগঠ
গল্পগল্প করিতেছে। চঠাৎ আমার মনটা
ফেন উদাল হইয়া গেল। আমার মনে
হইল, ছনিয়ায় আমি একা—আমি একা।
সকলের কাছে আমি অচেনা আগন্তুকমায়।
একটু আমি আপনার ভিতরে ভিরকালের
তরে বন্দী হইয়া আছি। তারপরে আমি
আমার চারিদিককার লোকগুলার উপরে
“অসন্তুষ্ট” হইয়া উঠিলাম। আমার মনে
ভয়ানক রাগ হইল। আমি মুঠা করিয়া
হাত ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে অস্ত্র ভাবায়
চোঁচাতে লাগিলাম। সকলের মুখে অতর্ক
চিহ্ন দেখিয়া আমার প্রাণমন খুঁসি হইয়া
উঠিল।

“চাঁৎকার করিয়া বলিলাম, “ওরে অগাধ
দল! ওরে আত্মতুটে, পাণী পত্তর দল।
ওরে কলকী সব। আমি তোদের ঘৃণা
করি। আমি তোদের ঘৃণা করি!”

আমি নির্দয়ভাবে “প্রথমে অতিথিদের,
তারপরে তাদের কোচম্যান ও ভৃত্যদের
উপরে কিল-চড়-খুঁসি চালাইতে লাগিলাম।
তাদের মুখের উপরে তারা যে কি,
স্পষ্টস্পষ্ট সব খুঁসিয়া বলিয়া আমার ভারি
আনন্দ হইল।

যে সভা বলে, সে কি পাগল?

সে রাতে একলা বাড়িতে ফিরিয়া সমস্ত
কথা মনে করিয়া আমি হাসিতে লাগিলাম।

আপনা-আপনি বলিলাম, “কি আশ্চর্য্য-অভিনেতা আমি।”

তারপরে আমি একখানা বই হাতে করিয়া নিছানাচ ভইয়া পড়িলাম। দেখানো কি বই? আমি গ্রন্থকারের নাম বলিতে পারি—ঈ দে বোঁপাসা। বোঁপাসার লেখা আমার বড় ভাল লাগে।

গল্প শেষ করিয়া, শিশুর মত নিশ্চিত ভাবে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। পাগলে কি বই পড়ে? বই পড়িয়া তারা কি আনন্দ পায়? পড়া শেষ হইলে তারা কি শিশুর মত ঘুমাইতে পারে?

পাগলে ঘুমার না। তারা কষ্ট পায়। মস্তিষ্কের ভিতরেই তাদের বত গোলগোগা হয়, তাদের মূহুর্তে সব গোলমেলে, কাপলা-কাপলা ও টলমলে। তারা চোচাইতে চায়, ঝাঁড়ুটাইতে চায়, হাত কামড়াইতে চায়। তারা চায় হাতপায়ে আঁতে আঁতে বামাঙক্তি দিতে চায় এবং তাৎপরে হঠাৎ লাকইয়া উঠিয়া চীৎকার করিতে চায়, “হঃ! হঃ!”

এবং তারা হাসিতে চায়। আবার চোচাইতে চায়। তাহারা গর্জন করিতে চায়,—হঃখিডের মত, হঃখিডের মত!

হাঁ,—হাঁ!

আমি শিশুর মত ঘুমাইয়া পড়িলাম।
“পাগলে কি ঘুমার?”

৪

আমার বিজ্ঞানবাদের পাগলামির পথে লোকে আমাকে ভয় করিতে আরম্ভ করিল। তারা আর আমাকে নিমন্ত্রণ করিত না। দৈবাৎ কোন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে,

সে কাঠহাসি হাসিয়া, অর্থহৃৎক বরে বিজ্ঞানী করিত, “কি বন্ধু, কেমন আছ?”

তখন অবস্থাটা এমন দাঁড়াইয়াছিল যে, আমি কোনরূপে অত্যাচার করিলে, সে মন্ত আমাকে কেহ বোঁধী করিত না। কিন্তু আমার স্মৃতিত ও ভবিষ্য পাণ হইতে নিষ্কর্তি পাইবার মন্ত সরকারি হুকুম পাইলে চেন্নু সুবিধা হইবে। অতএব, আমি, তখন সেই চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কোন ডাক্তারের অহুকুল অভিমত পাইলেই আমার চরিত্রা বাইবে। আমি সুযোগের অপেক্ষা রহিলাম।

বেশীদিন অপেক্ষা করিতে হইল না। তালিমান ও আলেক্সিসই সে সুবিধা করিয়া দিল।

ডাক্তারানা বলিল, “প্রিয় আন্টনি, আমি তোমাকে ডাক্তারের কাছে যেতে বলি।”

এর আগে তালিমান আমাকে কখনও “প্রিয়” ডাকে ডাকে নাই। এ-নেন অহুগ্রহ পাইবার মন্ত আমাকে আগে পাগল বলিতে হইরাছে।

“বেশ ত, আমি বাব অখন।”

তালিমান, আলেক্সিস ও আমি,—এই তিনজনই তখন পাঠগৃহে দাঁড়াইয়া ছিলাম। এই বরেই পরে হত্যার অভিনয় হইবে।

আলেক্সিস মুকুন্ডিআনা চালে কহিল, “হাঁ, তোমার আর কালবিলম্ব না করে ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। নইলে, তুমি যে কখন কি ফ্যাগান বাধিয়ে বসবে, তা ভগবানই জানেন।”

দোষ থেকে আপনাকে বাঁচাব রাখিবার

জন্ম আমি দুর্দশ ও বিনীত ঘরে কহিলাম,
“আমি আর এমন কি করতে পারি?”

“কে জানে তুমি কি কর্শে! হয় ত’
কোনদিন কার মাথাই তেবে ছাড়াই করে
দেবে।”

আমি টেবিলের উপর হঠাৎ একটা
খাতুনির্ঘাত তারি কাগজচাপা ছুটিয়া
লইলাম। একেবার আলেক্সিসের দিকে,
আর একবার কাগজচাপার দিকে “চাহিয়া
বলিলাম, “কার মাথা ভাঙ্গব বলচ’?
মাথা?”

“হ্যা, তা নহত’ আর কি! তুমি কোন
দিন হঠাৎ এই কাগজ-চাপাটার যত একটা
কিছু হাতে করে তুলে নেবে, আর কারও
তথনি ফর্সা হয়ে যাবে।”

ব্যাপারটা চিন্তাকরক হইয়া উঠিতেছে।
আমি এই কাগজ-চাপাটা দিয়েই যে-
মাথাটা ভাঙ্গব ঠিক করেছি, চূর্ণ হবার
আগে ঠিক সেই মাথার ভেতরেই ঠিক
সেই চিন্তাটাই ঢুকেচে! তথাপি, এমন
লোকও আছে, যে ভবিষ্যৎদৃষ্টিতে বিশ্বাস
করে না। কি ভ্রম!

অর্ধম বলিলাম, “এই কাগজ চাপাটা
দিয়ে মাংসে কারুর বেশী কিছু লাগবে না।”

“ক্যানো, তুমি কি বলতে চাও এটা খুব
হাস্যকর?” বলিয়া, আলেক্সিস আমার হাত
থেকে কাগজ চাপাটা নিয়া তার হাতল
ধরিয়া দু’একবার ছুটাইয়া দেখিল। তারপর
কহিল, “আচ্ছা, তুমি একবার পরীক্ষা করে
দেখ।”

আমি কহিলাম, “আমি বেশ ভাল করেই
দেখেছি।”

“না, না—একবার আপই না কেন!
তাহলেই তুমি বুঝতে পারবে।”

অগুপ্ত ভাবে, অথচ সুস্থহাসের সহিত
আমি তাব হাত থেকে সেই তারি কাগজ-
চাপাটা লইলাম। এমন সময়ে তানিগানা
আনিয়া বাধা দিল। কম্পান ওঠে, বিবর্ণ
মুখে সে প্রায় চীৎকার করিয়া বলিল,
“আলেক্সিস, থাম—থাম! ওসব করার কাজ
নেই!”

আলেক্সিস আশ্চর্য হইয়া বলিল,
“ক্যানো, হয়েছে কি?”

“তোমরা কি-সব ছাই কথা বলচ’?
ভান, ও-রকম ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না।”

তখন আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম।
কাগজ চাপাটা দেখানে ছিল, সেখানেই
আবার রাখিয়া দেওয়া হইল।

প্রকসর টি—র কাছে গেলাম।

তামি যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই
হইল। তিনি বোঝা নিলেন যে, আমাকে
বন্ধু করিতে পারেন, আমার এমন আত্মীয়
আছেন কিনা! তিনি উপদেশ দিলেন,
আমি যেন এখন চূর্ণচাপা বাড়ীতে বসিয়া
বিশ্রাম করি। আমি নিজে ডাক্তার বলিয়া,
অনেক যুক্তিতর্কের অস্তিত্ব করিয়া তাহার
সহিত তর্ক করিলাম। ফলে, আমার
পাগলামির বিষয়ে তাহার যেটুকু সন্দেহ
ছিল, তাহাও বুটিয়া গেল। তিনি বলিলেন,
আমার আর কোন আশা নাই—আমি
বন্ধপাগল। আমার উদ্বেজ দিক হইল।
সেই মুহূর্ত হইতে আলেক্সিসের জীবন
আমার মুঠার ভিতরে আসিল।

* আলেক্সিস নিজের স্বাস্থ্যক্ষয় প্রতি

অত্যন্ত অমনোযোগী ছিল। “তাসিগান” একদিন আমার কাছে আসিল। আমি আলেক্সিসের কুশল-সংবাদ প্রিজ্ঞাসা করিলাম জানিলাম, সে ভালই আছে। আমার দুঠার ভিতর হঠাৎ পাড়ে যম তাড়কে ছিনাইয়া লটরা যায়, আমার এই এক ভয় ছিল। তাসিগান বাহাতে সন্দেহ না করিতে পারে, সেইজন্য এ-সময়টা আমি খুব সহজ-ভাবে ব্যবহার করিলাম। আলেক্সিস বা তাসিগান,—কেহই আমার পাগলামির অভিন্নর দেখে নাই। আমি যে গাগল, একথা মনে করা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

তাসিগান বাইবার সময়ে বলিল, “আমাদের বাড়ীতে গিয়ে একবার দেখা করো।”

আমি বলিলাম, “সে ত আমি পাব না—ডাক্তারের নৈবেদ্যে!”

“বোকার মত কি তুমি বলচ! না, তুমি আসতে চাও। তোমার আর আমাদের বাড়ীতে তফাৎ কি? বিশেষ, আলেক্সিস তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তারি ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।”

কথা দিলাম, বাইব। আমি যে কথা রাখিব, “তাঁহাৎ” নিশ্চয়! কথা-রাখা সংকে এতটা নিঃসন্দেহ আমি এর আগে আর কখনও হয় নাই।

১১ই ডিসেম্বর, সন্ধ্যা পাঁচটার সময়ে আমি যখন আলেক্সিসের পাঠাগারে প্রবেশ করিলাম, তখন সেই কাগজচাপাটা ঠিক প্রস্থানেই ছিল। সেখানে আলেক্সিস ও তাসিগান—দুজনেই বসিয়া ছিল। আমাকে দেখিয়া তারা খুব খুশি হইল।

আলেক্সিস আমার হাত ধরিয়া বলিল, “তাসিগানের মূলে শুন্লাম, তুমি বেশ ভাল রকমেই সেবে উঠেচ। মইলে, আমি নিজেই তোমাকে দেখতে যেতাম। আজ আমার খিটেটোর যাব। তুমিও যাচ্ছো?”

তারপর আমরা পরস্পরকে মতিরা উঠিলাম। “আমি দিয়া ভাল-মালুমের মত পরিচয় তাহার কথা কহিতে লাগিলাম। কিন্তু কথা কহিতে কহিতে আমি বরাবর ঘড়ির চোঁট কাঁটাটির দিকে চাহিয়া ছিলাম। ঐ কাঁটা যখন ছ’য়ের, ঘরে ঠেকিবে, আমি তখন হত্যাকারী হইব!”

ছটা বাজিতে সাঁত মিনিট দেরি। আলেক্সিস, আলস্তভাবে সোফা ছাড়িয়া উঠিয়া গাড়াইল।

“আমি এখন কিরে আস্চি।” বলিতে বলিতে সে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

তাসিগানকে সঙ্গে চোখোচোখি হয়, এ আমার ইচ্ছা নহ। আমি জানিলাম কাছে গেলাম। পর্দা সরাইয়া দিয়া, বাহিরের দিকে তাকাইয়া গাড়াইয়া রহিলাম। আমি দেখিতে না পাইলেও বুঝিলাম যে, তাসিগান আমার পাশে আসিয়া গাড়াইয়াছে। আমি তার নিখোসের শব্দ শুনিলাম। এবং বুঝিলাম যে, সে জানিবার দিকে তাকাইয়া নাই—সে চাহিয়া আছে, আমার দিকেই! আমি তবু চুপ করিয়া রহিলাম। তাসিগান বলিল, “বাইরে বরফ কেমন চল্‌চক্‌ করছে!”

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

“আটনি!” আমাকে ডাকিয়াই সে পাড়িয়া গেল।

আমি তখনও ভুল।

সে কল্পিত্বের ডাকিল,
“চাউনি!”

আমি তার দিকে চাহিলাম।

সে টলিতে টলিতে পড়িয়া বীর-বাহু
হইল—যেন আমার চক্ষু হইতে একটা
ভীত তেজ তাহাকে ধাক্কা মারিয়াছে।
এমনি সময়ে আলেক্সিস যুগে ঢুকিল।
তাসিমানা এক লাফে তার বামের পাশে
গিয়া দাঁড়াইল।

অশ্রুটস্থরে সে বলিল, “আলেক্সিস!
আলেক্সিস! আউনি—”

“এক!”

হাতহীন মুখে এবং মনের আনন্দকে
ঢাকা দিবার ক্ষমতা আমার বরকে নীচু
করিয়া বলিলাম, “তাসিমানার বিশ্বাস হরণে
যে, এই জিনিষটা বিয়ে আমি তোমাকে
খুণ কর্তে চাই।”—বলিয়া, অত্যন্ত শান্ত
ভাবে, আমি লোভাহুজি টেবিলের কাছে
গিয়া কাগজচাপটা তুলিয়া নিলাম এবং
আলেক্সিসের নিকটস্থ হইলাম।

আলেক্সিস বিবর্ণ, নিম্পলকনেত্রে আমার
দিকে চাহিল। আমার কথাকে আবৃত্তি
করিয়া বলিল, “তাসিমানার বিশ্বাস—”

“হাঁ, তার বিশ্বাস হরণে!”

আন্তে আন্তে সহজ ভঙ্গীতে আমি আমার
হাত তুলিলাম,—সঙ্গে সঙ্গে আলেক্সিসও
তার হাত তুলিতে লাগিল। তখনও সে
আমার মুখের দিকে, তেমনি চাহিয়া আছে।
কঠিন কর্তে আমি বলিলাম, “নামাও
হাত।”

তার হাত অবশ্য হইয়া পড়িয়া গেল।

অপেক্ষাচোপে তখনও সে আমার দিকে
চাহিয়া ছিল। তার ওষ্ঠে কেবল একটা
পাণ্ডুর, “মনোহর” হাসির বেধা দেখা
যাটতেছিল। তাসিমানা কি বলিয়া আনন্দ
করিয়া উঠিল,—কিন্তু, তখন আর সমর
ছিল না! কাগজচাপার ভীষণ দিকটা দিয়া,
আলেক্সিসের চোখের উপরে নহে—তার
কৃকর কাছে, রক্ত বেদিয়া আমি আঘাত
করিলাম। ম্যাগ্নিট্রেট আমাকে বলিয়াছিলেন
যে, আমি তাহাকে অনেকবার আঘাত
করিয়াছি,—কারণ, তার মাথা ভাঙিয়া
ওঁড়া হইয়া গিয়াছিল। ইহা সত্য নহে।
আমি আলেক্সিসকে তিনবার আঘাত
করিয়াছি,—তিনবার মাত্র! প্রথম আঘাত
যখন সে দাঁড়াছিল, বাকী দুবার সে পড়িয়া
গেল পর মারিয়াছি।

একথা সত্য যে, আঘাত অতি সজোরে
হইয়াছিল। কিন্তু, তিনবারের বেশি মারি
নাই। সব কথা আমার বেশ মনে আছে।
আলেক্সিসকে আমি তিনবার মারিয়াছি।

(৫)

রাত্রির অন্ধকার ভ্রাতৃ-বন্ধকে অত্যন্ত
অভিভূত করে। এইজন্য, সে সময়ে এমন-
সব ভাবনা আমাদের মনে আসে, যাতে
আমরা ভয় পাই। যুগের পরে যখন রাত
আসিল, তখন আমার প্রাণমন স্বভাবতঃই
অসাধারণ উত্তেজনার বন্ধীভূত হইয়া পড়িল।
আমার অবস্থায় পড়িলে খুব বেশী আত্ম-
সংযম থাকা প্রকার; একটা লোক খুণ
করা ত বড় যে-সে কথা নয়!

কাপড়-চোপড় বদলাইয়া, পরিষ্কার-

পবিত্র হইয়া আমি চা-পান করিতে বসিলাম, আমার দাসী মেঝাকে ডাকিলাম। তার সঙ্গে আমি বরাবর সদয় ব্যবহার করিতাম। আমার পাগলামি কথা সে কিছু জানিত না। তবু সে,—কেন জানি না—আমাকে দৈনন্দিন ভর পাইল। আমার কাছে আসিতে চাহিল না।

আমি মনে মনে বলিলাম, “হু! তাহলে দেশটি আমার ভেতরে এমন-কিছু আছে, যা সাধারণের ভেতরে নেই—যার ক্ষেত্রে লোকে আমাকে দেখে ভয় পায়।”

পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া, আমি শুইয়া পড়িলাম। আমার তখন আদোপেই বই পড়িতে ইচ্ছা হইতেছিল না। আমার আত্ম দেহ তখন যেন ভাঙিয়া পড়িতেছিল। আপনাতঃ ভূমিকা অনুসরণে অভিনয় করিবার পর কেন অভিনেতার যেমন দশা হয়,—আমার দশাটাও তখন অনেকটা সেই রকম।

আমার চোখের পাতা তারি হইয়া আসিল। আমি গুমটিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে আমার মস্তিষ্কে এক নতুন ভাবনা আসিয়া জুটিল। আমার অজান্তে চিত্রার মত ইহাও পরিষ্কার, নিশ্চিত, সঙ্গল! এ চিত্রা ধীরে ধীরে আমার ভিতর ঢুকিল। সে যেন কোন লোকের মত বলিল :—

“থু! সম্ভব, ডাক্তার কার্জেন্টেফ সত্যই পাগল। তিনি পাগলামির অভিনয় করিতেছেন বলিয়া ভাবিতেছেন, কিন্তু আসলে তিনি নিজেই পাগল। এখনই তিনি পাগল।”

আমার মস্তিষ্কে এই চিত্রাটা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমি একটুই মস্তিষ্কে না পারিয়া হাসিতে লাগিলাম।

“তিনি পাগলামির অভিনয় করিতেছেন বলিয়া ভাবিতেছেন, কিন্তু তিনি সত্যই ‘পাগল’। এখন,—এই মুহূর্তেই তিনি পাগল।”

প্রথমে ভাবিলাম, আমার দাসী দৈর্য্য এই কথাগুলি বলিতেছে,—কারণ, আমি যেন একটা স্বপ্ন ভাবিতে পাইতেছিলাম; আর, সে স্বপ্ন, মেরিয়ার। তারপরে ভাবিলাম, সে স্বপ্ন আশেপাশের। হ্যাঁ, নিহত আশেপাশের। সেটা বুঝিলাম, না,—এ আমারই চিত্রা। কি ভয়ানক কল্পনা!

আমি মুঠা করিয়া আমার চুল চাপিয়া ধরিলাম—আমি লাকাইয়া উঠিলাম। ঘরের মাঝখানে গাড়াইয়া—কেন জানি না—আমি বলিলাম :—

“এটে—এমনখান! তাহলে সব শেষ। আমি যা ভয় করছিলাম, তাই হল। আমি এতবারে সীমার কাছে সাহস করে এগিয়ে গিয়েছিলাম,—এখন ভবিষ্যৎ আমাকে উদ্ভ্রান্ততা দান করতে চাইছে।”

আমাকে যখন প্রেস্তার করিতে আসিল, আমার অপর ভয়ানক ভয়ানক। আমার কাপড়চোপড় সব ছেঁড়াখোঁড়া; কিন্তু, ভয়ানক দোহাট, সেদিনকার মত সজ্জা-কাপড় যেমন অবহার ভিতরে কাটাইয়াও আমি যে পাগল হইয়া যাই নাই,—ইহাতেই কি আমার মস্তিষ্কের স্থিতি প্রমাণিত হইতেছে না? আমি সেদিন

কাপড়-চোপড় ছেঁড়া ও আহতগুলি ভান্না ছাড়া আর কোন অস্ত্রার কাজ করি নাই। কিন্তু, এই সঙ্গে তোমাদের আর একটা কথাও বলিয়া রাখি। সে রাত্রে আমাকে বে-রকম ঘাতনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, যদি কখনও তোমাদের কারকে সে-রকম ঘাতনা ভোগ করিতে হয়, তবে তোমাদের ঘরের আত্মাগুলিকে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়ো। ঢাকিয়া রাখিয়ো—ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখিয়ো!

তারপর, যতক্ষণ না পুলিশ আসিল, ততক্ষণপর্যন্ত আর কি হইয়াছিল, সে সব কথা আমার কিছুই মনে নাই। আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করিলাম, কটা বাজিয়াছে?

“বেলা ন’টা।”

আলেক্সিসের মৃত্যুর পরে যে সবে তিন ঘণ্টা কাটিয়াছে, একথা আমি সহজে বিশ্বাস করিতে পারিলাম নত।

কিন্তু, একটা ব্যাপার আমার বেশ মনে আছে। আমার সেই চিন্তা—কিংবা—সেই স্বর! অন্ততঃ,—দেটা মত।

“ডাক্তার কার্জেন্টবেক ভাবিয়াছেন যে, তিনি পাগলামির ভাণ করিয়াছেন। কিন্তু আসলে তিনি পাগল।”

আমি এইমাত্র আমার নাকী পরীক্ষা করিলাম,—একশো আশিবার কাঁপিল। সেই স্বরের স্মৃতি মনে হইবামাত্র আমার গুদর এইরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠে!

(৬)

মহাশয়গণ,

আপনারা সকলেই বৈজ্ঞানিক। অতএব, আপনাদের কাছেই আমি একটা উত্তর

চাই। আপনারা স্বাভাবিক পরিস্থিতির সঙ্গে একমত হইবেন না। কিন্তু আমি আপনাদের সকলকার কণ্ঠেই বিশ্বাস করিব। কেননা, আমার এটো আশ্রয় না, আপনারা আপনাদের মত প্রকাশ করুন। এখানে আমি আর একটি তুচ্ছ, কিন্তু চিত্তাকর্ষক ঘটনা বলিব। ইহাতে আপনাদের মতগঠনের সুবিধা হইতে পারিবে।

আমি এখন পাগল-গারদে। এক শত্রু প্রভাতে, এখানে একদিন আমার শুশ্রূষা-কারিণী খাতা হঠাৎ আমার কাছে থেকে সরিয়া গেল। তার ভাণ দেখিলে মনে হয়, সে ঘেন হঠাৎ কি-একটা অমান্য কারণে তর পাইয়াছে।

আমি তখন বিজ্ঞানীর উপর বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম, অতঃপর, কি করা যাই! তারপরে দেখিলাম, আমি এক অদ্ভুত “কাল” করিতে চাই। আমি,—ডঃ কার্জেন্টবেক—কুহুরেব মত চীৎকার করিতে চাই!

আমার সাধ হইতেছিল, কাপড়-আঁচা ছিঁড়িয়া ফেলিতে ও আপনাকে আপনি আঁচড়াইতে! আমার কলারের প্রথমটা আঁতে আঁতে আঁচুল হকাইয়া দিয়া তারপর হঠাৎ একটানে কলার থেকে নীচে পর্যন্ত পড়-পড় করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য আমার ইচ্ছা হইতেছিল! আমার বাসনা হইল,—আমি ডাক্তার কার্জেন্টবেক,—আমার বাসনা হইল, হাঁটু ও হাত পাতিয়া হামাগুড়ি দি!

চারিদিক তখন শুক। জানাণার সান্নিধ্যে জুবার-কণা অন্ধকৃ করিতেছিল।

অদূরেই আমার বাড়ী নীচের প্রাচীরের তল।

আমি অনৈক্যের ধারণা আমার কি কর্তব্য, তাহা ভাবিলাম। আমি যদি খেউ-খেউ করি, তবে একটা শেরগোল পড়িয়া যাইবে ও আমার দুর্গম রটেবে। যদি আমি জামা ছিঁড়ি, কাল সকলে তাহা টের পাইবে। আচ্ছা, তবে হুধু হামাগুড়িই দেওয়া থাক! তাহা হইলে, কেহ কিছু শুনিতে পাইবে না। আর সে সময়ে যদি কেহ আমার ঘরের ভিতর আসিয়া পড়ে, তবে বলিলেই চলিবে যে, আমার একটা স্বেচ্ছাম হারাইয়া গিয়াছে, আমি তাহাই খুজিতেছি।

ভাবপথে ভাবিলাম, “আচ্ছা, হুধুহুধু আমি হামাগুড়িই বা দিতে চাই কেন? তবে, লভ্যই কি আমি পাগল?”

তবে আমার গারে কাটা দিয়া উঠিল। আমার জোনে একটা আকস্মিক হৃদয় ব্যপন বশবতী হইয়া উঠিল যে, হা— একসঙ্গে আমি তিনটা কাজই করিব,— আমি খেউ-খেউ করিব, হামাগুড়ি দিব, আপনাকে-অপনি আচ্ছা হব। আমি জুড় হইয়া উঠিলাম। নিম্নে দিক্‌জাগা করিলাম, “তুমি হামাগুড়ি দিতে, চাও?”

কোন উত্তর নাই।

“তুমি হামাগুড়ি দিতে চাও?”

তখনও উত্তর নাই।

“নাও তবে হামাগুড়ি!”

জামার আত্মন উন্টাইয়া আমি ঠার হাত-পায়ে হামাগুড়ি, দিতে লাগিলাম। ঘরের আধপালা-দরাসর এমন হামাগুড়ি দিয়া আমি আমার ভ্রম বৃত্তিতে পাবিলাম। বৃত্তি, বৈশিষ্ট্য ছিলাম সেইখানেই বসিয়া। ‘আমি’ হামাগুড়ি লাগিলাম, হামাগুড়ি লাগিলাম, হামাগুড়ি লাগিলাম।

হঠাৎ আমার এমন নির্জুড়ির মত ইচ্ছা হইল কেন, আমি বসিয়া-বসিয়া তাহা বৃত্তিতে চেঁচাই করিলাম। আমার কণ্ঠ ‘পাগলামির কল্লনা হইতেই এই উদ্ভটের’ মত ইচ্ছার উদয় হইয়াছে। এ ইচ্ছা যেই পূর্ণ হইল, অমনি বৃত্তিলাম যে, আমি পাগল নৈ। আমি যে কারণ দেখাইলাম, তাহা অতি সরল ও বৃত্তিপূর্ণ। কিন্তু—

কিন্তু তবু আমি হামাগুড়ি দিয়াছি ত! আমি কি পাগলের মত আত্মপ্রবোধ দিতেছি, না, বিচার-বুদ্ধিমান হইয়াও পাগল হইতে বসিয়াছি? ..

মহাশয়গণ, আমাকে সাহায্য করুন। এই ভাব, এই নির্দিষ্ট সমস্তা পূরণ করুন। আপনাদের মত স্তম্ভিত হইয়া আমি অতি ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করিতেছি। বসুন— আমি কি? পাগল?

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার দাস।

শ্রীশ্রীটিকিগঙ্গল

[টিকিহুজিধেগতা৷ টিকি দাশো নুদিঃ । টিক্‌টিক্‌ ছন্দঃ । টিট্‌কাগ্যাং বিনিয়োগঃ]

মূল গায়েন । — •

ভো ভোঃ কারণ-মণিলে কুকুড়িকুড়ি

ডিধে যেমন হংস,

ছিল চটতন চুটকি আদিত

টিকি চণ্ড যার বংশ!

‘চট’ ‘চট’ করি আদিশ আদায়ে

ডাকিল সপ্ত ঋষি গো,

‘চটতন’ নাম হইল তাহাঁর

যে নামে ভরিল দিশি গো!

ব্রহ্মা কহিল। “টিকিরা থাকহ”

তাই তাহে “টিকি” কর,

মগত-আগুন-অগ্নার টিকি

টিকি সমান্ত নহ।

তবে দোকলা টিকির চাষ কর ভাই,

টিকি মূলে ঢাল ঠৈল,

যেতে ভরণার বিদা পরসার

টিকিট যে টিকি ঠৈল!

দোহার-কী-গোহার । —

এ-রি-হুম্! — তেরি না! —

টিকি রাখ! — দেবী না-আ-আ।

মূল গায়েন । —

আহা কারন!-বলি অত্নরে যার

গেমিক চইবে দেখা,

সেইজন জানে টিকির কদর,

সেই করে টিকি সেবা।

টিকি না রাখিলে গেমিকট হুহ না

শাস্ত্রে রুগেছে লেখা,

এমে হাবুজুব লোকে বলে “আহা

টিকিও না যার দেখা!”

টিকি বোমিরোরণ্ডী ছিল, বোমিরণ্যাধিক

ইথে নাই কোনো ভুল,

মগত-মহলে মাকোবা ঢুকিলে

বেরগেই টিকি মূল।

মোক ও কাম পূরা হ’বে, — হও

থরকাটা প্রেমটাধ,

টিকি রাখ! তোরি অন-দরমার

টিকির আভাল বাধ।

দোহার কী-গোহার । —

এ-রি-হুম্! — তেরি না! —

টিকি রাখ, — দেবী না-আ-আ!

মূল গায়েন । —

হাঁ হাঁ টিকির পাতাবে টিকিরা রগেছি

টিকিতেই বাধা নিখ,

• টিকি না থাকিলে হইত ছনিয়া

টিক্‌টিকি চেয়ে নিঃস!

টিকি যেই রাখে ধর্ম মোক

পার সেই হাতে চাতে,

দেখ বিপুল টিকির বহরে উড়িয়া

বৈধেছে অগরাথে!

* অঙ্গল মহলের অতর্গত রানটিকি পক্ষিতেবু ‘আঠারো কা’ নামক শুহা হইতে ঈশতোপ্রনাথ দত্ত কর্তৃক লক্ষিত এবং উক্ত ভক্তমহোদয়ের অনুবর্ত্তাশ্রমারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দোহার-কী-গোহার ।

এ-রি-হুম্!—তেরি না!—

টিকি হাথ!—দেহী না-আ-আ!

মূল গাহেন।—

ওগো টিকি রাখ যদি অর্থও পাবে

অর্থ ই যদি চাও,

চোবটি চান্ডা টিকিতে বাধিয়া

হাত নাড়া দিয়া যাও ।

টাকাটা সিকিটা নক্ষিণা পাবে

তজ্জী টিকির জোবে,

রাতেষ ফাউল্ পড়াই না হতে

ফেলিবৈ 'তজ্জী ক'রে ।

কহ— কুড়ি ধবে তুমি দুর্গা কিনিতে ?

বঁহস বখন কাঁটা ?—

অধম-তারণ টিকি রাখ মাখে

তর কি তোমার বাছা ?

ধর্ম নোক অর্থ ও কাম

সকলই টিকির ছাওটা ।

বেচাল ঘটলে টিকি বিনা আর

কে ধরে তখন মাওটা ?

দোহার-কী-গোহার ।—

এ-রি-হুম্!—তেরি না!—

টিকি রাখ!—দেহী না-আ-আ!

মূল গাহেন।—

ওগো শুধু 'এ' লেখ অর্থ হবে না

এলেক্‌টি পাও টিকি,

একের অর্থ হ'বে এক টাকা।

অঙ্কে এলেক্—টিকি ।

ওই

এলেক্-টিকির দোহাই না দিলে

তারের দর নক্স

এলেক্-টিকি তো দিয়া মান হে

টিকির বেলাই সম্ব ?

বৃক্ষেয় টিকি শিকড়,—সটিকি

ফ্রিগ্-বাছী খাও নক্স,

বৃক্ষেয় টিকি 'ট্যাঙ্কেট',—কোথি

নাই টিকি ছড়িক ।

'আমরা টিকির, টিকি আবারের'

চাল তেল টিকিমুলে,

কুর্জ টাকে যদি টিকি নেহাৎ খোচায়

(টিকি) বানাইন পরচুলে !

দোহার-কী-গোহার ।—

এ-রি-হুম্!—তেরি না!—

টিকি হাথ!—দেহী না-আ-আ!

মূল গাহেন।—

ধর্ম 'দেবতার টিকি ছিল কিনা ছিল

শাস্ত্রে লেখে না তাহা,

বিচারের সুখে অঙ্গ টানিলে

বাহিরিবে টিকি ডাহা ।

ব্রাহ্মার টিকি নাক্তির সুগাণ্ড,

তৃতীর চরণ বিজুহ,

মহেশের টিকি ঘটাকালে ঢাকা,

টিকি প্রতি শিব নির্ভর ।

গণেশদেবার শুভমরী-টিকি

বানার টিকিটা খাসা ;

আদি বৈষ্ণব গুরুড়ের টিকি

তার সে টিকল নাগা ।

স্বর্গোত্ত টিকি রাহুর মূর্তায়

রাহুর টিকি সে কোথা গো ?

বুঝি 'কাছর টিকিট অস্ত্র-শীলা
 বেন কল্লব সোঁতা গো !
 তবে দোকলা টিকির চাব কর তাই,
 টিকি কতু নয় তুচ্ছ,
 কাছর টিকি সে তুড়ীর চরণ
 হনু টিকি লৈ পুচ্ছ ।

দোহার-কী-গোহার ।—

এ-রি-হুম্ !—তেরি না !—
 টিকি রাখ !—দেবী না-আ-আ !

মূল গায়ের ।—

দেখ অঙ্গুরপূরের শুজাহরের
 টিকি ছিল তাই রক্ষে,
 নহিলে তাহারে বাগানো কটিন
 হ'ত কালিকার পক্ষে ।
 জাহুর হন টিকির বাহন
 হিলোক টিকি-ব্রত,
 টিকি আছে ব'লে ট্রামগাড়ী চলে
 নইলে অচল হ'ত ।

জড় • বিজ্ঞানে বাহা মাধ্যাকর্ষ
 টিকি সেই পুণিবীর,
 সেই • টিকিট ধরিয়া স্বর্গা তাহারে
 পুচ্ছে রেবেছে পিণ ।
 টিকির মূল্য বুঝিতে নারিস্
 এবে অতি অদ্ভুত,
 টিকি ধরি হার না থাকে মাপার
 কি ধরিবে যমদূত ?

দোহার-কী-গোহার ।—

এ-রি-হুম্ !—তেরি না !—
 টিকি রাখ —দেবী না-আ আ

‘মূল গায়ের’ ।—

আহা ! ‘টিকি-সে স্বর্ণ চতুর্দর্ভ’
 টিকি সে মোক্ষ কাম,
 ওচা মূর্গার মাগে-টিকি আছে ব'লে
 মানপাখী তার নাম ।
 রেজেরা এর ‘পিগ্-টেন’ বলে
 অহহ শূকর-পুচ্ছ,

তোমরা অর্থা মর্যাদা বেগো

টিকিরে ক'রো না তুচ্ছ । •

বানর টিকির গরিমা বোঝেনি
 রাপিমাছে টিকি পুচ্ছে,
 নয়ের মতন হ'তে সে পারেনি
 উত্তিতে পারেনি উচ্ছে ।

পুচ্ছেরে শিরোধার্য্য করেছি

মহৎ হ'য়েছি তাই,

ডাকইন ওই তব লিপিরা
 করিমাছে একরাই ।

ঐখন টিকি রেখে পায়া ভারি হ'ল ভারি
 আর কে মোদের পার চে,

দেখ নধে ও বানরে তলাৎ ঘা' শুধু
 টিকিরই মর্যাদায় হে !

মিলি' কলু তেলি এস ভিড় ঠেলি'
 (এই) টিকি মূলে ঢাল তৈল ;
 যেতে মশকীরে বগেতে টিকি
 রাখণের সিঁড়ি টেল ।

দোহার-কী-গোহার !

এ-রি-হুম্ !—তেরি না !—
 টিকি রাখ !—দেবী না-আ আ !

মূল গায়ের ।—

দেখ শ্রী শ্রী টিকির অপমান করি
 চীনের কি চর্গতি,

বুড়া বচনেতে আকিঁম তাজিল , কত
হ'ল তার সৌন্দর্যতি ।
টিকি গেল খোয়া রাজত্ব হল হোয়া
অবাকক হ'ল দেশ,
গোয়ারে মিলিয়া কবিল দেশ না
খোয়ারের একশেষ !
দেখ আকাশের টিকি বিহীন আর
পাতালের টিকি সর্প,
আর তোমরা ভেবেছ টিকি রাখিবে না
ভারি তোমাদের সর্প ।

দোহার-কী-গোহার ।—

এরি-হুম!—তেরি না!—
টিকি রাখ!—দেবী না-আ-আ !

টাক-অহরের কোণে তার টিকি
নাহি হয় ভিখোধান ।
টিকি-ঘোঁসা টাক সারিবে বেবাক
এ গান শুনিলে কানে,
টিকি-বর্জিত বুঝা টাকে চুল
গতাবে টিকি-হানে ।
টিকি-মঙ্গল গাহিবার কালে
যে ক'রে বাহির দখ,
দখ তাহার টিকিবে না,—টিক
বুড়াকালে হবে অশ্র ।

গুণা জনমে জনমে গোকা হবে গাঁতে
যুগে যুগে হবে শান্তি,
এই হাঙ্গির গুণীকামিতে হইবে
মাজ্জনা এর নাতি ।

মূল গায়েন ।—

গুণা বেই শোনে আর বে জন শোনা
টিকি-মঙ্গল-গান,

দোহার-কী-গোহার ।—

এরি-হুম!—তেরি না ।
টিকি রাখ!—দেবী না-আ-আ ।
ঐনবহুবার কবিরত ।

নালক

দেবল কবি যোগে বগেছিলেন । নালক
—সে একটি ছোটো ছেলে, কবির সেবা
করছিল । অন্ধকার বর্জ্যের বন, অন্ধকার বট
গাছের তলা, অন্ধকার এপার-গঙ্গা এপার-গঙ্গা,
নিশ্চিন্ত রাত্রে কালো আকাশে তাণ্ডা ফুটেছে,
বাতাস ঘূঁষরে আছে, জলে ঢেউ উঠছে না,
গাছে পাতা নড়ছে না ! এমন সময় অন্ধকারে
আলো ফুটে—মূল যেমন কোরে ফোটে,

চাঁদ যেমন কোরে ওঠে,—একটু একটু
আলো একটু সমস্ত পৃথিবী গুলে উঠলে,
—পল্লপাতায় জল যেমন জ্বলে থাকে—এদিক্
ওদিক্ পেনিক্, এদার ওদার পেদার ।
কবি চোখ মেলে চাইলেন, দেখলেন,
আকাশে এক আশ্চর্য আলো !—চাঁদের
আলো নয়, সূর্যের আলো নয়, সমস্ত আলো
মিশিরে এক আলোর আলো ! এমন আলো
কৈউ কখনো দেখেনি ! আকাশ জুড়ে কে যেন

সাত-রঙের স্বভাব উড়িয়ে দিয়েছে। কোন দেশের পৃথিবীতে নেমে আসবেন তাই কে যেন শূন্যের উপরে আকাশের একটি একটি ধাপে গিয়েছে!

সন্ন্যাসী আসন ছেড়ে উঠে পাড়ালেন, নালিককে বলেন—কপিলবাস্তবে বুদ্ধদেব কখন নেবেন, আমি তাঁর মর্শন করতে চলেছি, তুমি সাবধানে থেকো।

বনের মাঝ দিয়ে আকা-বাকা সর পথ, সন্ন্যাসী সেই পথে উত্তর-মুখে চলে গেলেন। নালিক চুপটি কোরে বটতলায় ধান চলে রেখেতে লাগলো—একটির পর একটি ছবি।

২

কপিলবাস্তব রাজবাড়ি। রাজবাড়ি মারাদেবী সোনার পালকে ঘুমিয়ে আছেন। ঘরের সামনে খোলা ছাদ, তার ওধারে বাগান, সহর, মন্দির, মঠ। আরো ওধায়ে—অনেক দূরে হিমালয় পর্বত—সাদা বরফ ঢাকা। আর সেই পাহাড়ের ওপারে আকাশ জুড়ে আশ্চর্য্য এক সাদা আলো; তার মাঝে সিঁহুরের টিপের মত সূর্য্য উঠছেন। রাজা শুদ্ধোদন এই আশ্চর্য্য আলোর দিকে চেয়ে আছেন, এমন সময় মারাদেবী ভেগে উঠে বলছেন—মহারাজ কি চমৎকার স্বপ্নই দেখলেন! এতটুকু একটি খেতহস্তী দ্বিতীয়র টিপের মতো বাকা বাকা কচি ছুটি পাত, সে কোন হিমালয়ের ওপার থেকে মেঘের উপর দিয়ে আমার কোলে নেমে এল, তারপর যে কোথায় গেল আর দেখতে পেলেন না! আহা, কপালে তার সিঁহুরের টিপের মত কেমন একটি টিপ ছিল।

রাজাবাণী স্বপ্নের কথা বলানলি করছেন ইতিমধ্যে সকাল হয়েছে, রাজবাড়ির সবংগানার বাণী বাজছে, রাত্তা দিয়ে লোকজন চলাফেরা করছে, মন্দির থেকে শাকবটোর শব্দ আসছে, অন্ধর-মহলে রাজদাসীরা সোনার কলসীতে মারাদেবীর চামের জল তুলে আনছে, মালিনীরা সোনার খালার পুঞ্জের ফুল গুছিয়ে রাখছে। রাণীর গোবা মউর ছপে এসে উড়ে বসলো, সোনার খাচার গুচ্ছারী খাণ্ডেরর জন্তে দাসীদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিলে, ভিপিও এসে, জয় রাণীনা!—বলে দরজার দাঁড়ালো। দেখতে দেখতে বেলা হল, রাজবাড়িতে রাণীর স্বপ্নের কথা নিয়ে সকলে বলাবলি কোরতে লাগলো।

৩

কপালে রক্ত-চন্দনের তিলক, মাথার মণিকের মুহুর্ত, পরনে লাল চৌলী, হকালে সূর্যের মতো রাজা শুদ্ধোদন রাজসিংহাসন আলো করে বসেছেন। পাশে মন্ত্রীপর, তার পাশে দণ্ডধর—সোনার ছড়ি হাতে, ওপাশে ছত্রধর—খেতহস্তর ফুলে, তার ওপাশে নগরপাল—ঢালখাড়া নিয়ে।

রাজার দুইদিকে দুই দলান, —একদিকে ব্রাহ্মণপণ্ডিত আর-এক দিকে দেশবিদেশের রাজা আর রাজপুত্র। রাজসভা ঘিরে দেশের প্রজা, তাদের ঘিরে বত হুকারী;—ঘোটা রাজবিশেষ লাগি আর কেবল লাল পাগড়ির চিড়।

রাজসভার ঠিক মাঝখানে লাল চাঁদোয়ার মীচে আটখানি রক্তকথনের আগন; তারি

উপরে রাজার আট গগংকাব পড়িতে পুঁ-
খুলে রাগির যথের কথ্য গগনী করিতে
বসেছেন। তাঁদের কার মাথার লাকা চুল;
কার মাথার টাক, কার বা খুঁটি বাধা,
কার বা কঁটা গোঁক। সকলের হাতে এক
এক শাবুক নতি। আট পণ্ডিত কেউ
কলমে লিখে, কেউ পড়িতে বেগে, রাগির
যথের বল শুনে বসেছেন—

—হৃৎ যথৈ রামচন্দ্রবতী পুত মহাতেজস্বী।

চন্দ্র তথা রূপবান গুণবান রাজাধিরাজ বীৰজীবী।

বেতহস্তীর যথৈ শাক্ত পতীর জগৎপুত্র এবম্

জীবের চঃখাবাবী মহাবাদিক ও মহাবুদ্ধ প্রবলাভ।

—এবার শিখর মহারাজ, এক মহাপুরুষ
এট শাক্যবংশে অবতীর্ণ হবেন। শাস্ত্রের
বচন মিথ্যা হয় না। আনন্দ কর।

চারিদিকে অমনি রস উঠলো আনন্দ কর,
আনন্দ কর! অঙ্গদান কর, বস্ত্রদান কর,
দীপদান, ধূপদান, কুমিদান, ত্রিদান কর।
ফিলিস্তানে রাজার যথৈ, প্রমোদ যথৈ,
চাটে মাঠে ঘাটে আনন্দের বাজনা শুনে
উঠলো, আকাশ আনন্দে হাসতে লাগলো,
বাতাস আনন্দে বহতে লাগলো। রাজপুত্রের
মাণিকের হুল রাজহস্তের হস্তের
আশোর, স্ত্রীর গলায় রাজার দেওয়া
কর্ডমালা, পণ্ডিতদের গায়ে রাগির দান
ভোটকণ্ডল, দানদাসী দানদঃখী ছেলে
হুড়োর মাথায় রাজবাড়ির লাল ঢেঁগী
আনন্দে হুলতে থাকলো।

৩

প্রকাণ্ড বাগান; বাগানের শেষ দেখা
যায় না, কেবলি গাছ, গাছের পর
গাছ, আর সবুজ ঘাস, জলের হাঁড়ো,

ঠাণ্ডা ছাণ্ডা, পানীদের গান আর ফুলের
গন্ধ। বাগানের মাঝে এক প্রকাণ্ড
পদ্মপুকুর। পদ্মপুকুরের ধারে আকাশপ্রমাণ
এক শাল গাছ; তার ডালে ডালে পাতার
পাতার ফুল ধরেছে; বনিনে বাতাসে সেই
ফুল, গাছের স্তম্ভের একটি বেষ্ট পাখরের
চৌকির উপরে উড়ে গড়ছে।

সূচী হোয়ে এল। সূচী বস পাড়ার
ঘেয়ে পদ্মপুকুরে গা ধুয়ে উঠে গেল।
উবু খুঁটি, গলায় কাঁটি, দুই কানে সোনার
মাণ্ডিক একদল মাদিমালিনী শুকনো পাতা
কাঁটি দিতে দিতে, ফুলের গাছে জল দিলে
দিতে, বৈশাখের বাগানের ফাল সেবে
চলে গেল;—সবুজ ঘাসে, পুকুর পাড়ে,
গাছের তলায়, কোনোখানে, কোনো কোণে
একটু ধুলো, একটি ফুটোও রেখে গেল না।

রাত অন্ধ,—বসন্তকালের পূর্ণিমার
রাত! পুন্ড্রিমে হৃৎ জুবেছেন, পূবে চাঁদ
উঠি-উঠি করছেন। পৃথিবীর একপাশে
সোনার শিখা, আর-একপাশে রূপার রেখা
দেখা যাচ্ছে। মাথার উপর নীল আকাশ
লক্ষকোটি তারার আর সজ্জিপুন্ড্রের শাঁখ
বন্টার ভেগে উঠছে। এমন সময় মাদিমালিনী
রূপার মাঝে বেরা সোনার পাখীতে সহচরী
সঙ্গে বাগান-খেজতে এলেন;—রাণীকে ঘিরে
রাজদাসী বস ফুলের পাখা, পানের বাটা
নিরে। প্রিয় সখীর হাতে হাত বেঁধে, ছারার
ছারার চলে ফিরে, রাণী এসে বাগানের
মাঝে প্রকাণ্ড দেই শালগাছের তলায়
পাড়াগেল—বা হাতখানি ফুলে ফুলে জুড়া
শালগাছের ডালে, ডাল হাতখানি কোমরে
রেখে।

অন্য দিন শেষ হলো, পাখীরা একবার কলরব করে উঠলো, বাতাসে, অনেক কুলের গন্ধ, আকাশে অনেক তারার আলো ছড়িয়ে পড়লো। 'পূর্ব পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হলেন—শালগাছটির উপরে যেন একটি সোনার ছাতা! ঠিক সেই সময় বৃদ্ধদেব জয় নিলেন—যেন একটি গোনার পুতুল, যেন চাঁপাফুলে ঘেরা পুতুলীতে যেন আর এক চাঁদ! চারিদিকে আলোর আলো হয়ে গেল;—কোনোখানে আর অন্ধকার রইল না, মায়ী মায়ের কোলে বৃদ্ধদেব দেখা দিলেন, পৃথিবীর বুক জুড়িয়ে বৃদ্ধদেব দেখা দিলেন,—যেন পদ্মফুলের উপর একটি ফোঁটা শিশির,—নির্মল স্বপ্নের এতটুকু। দেখতে দেখতে জীবনী বাগান লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠলো, পাত্র মিত্র অচিরে সত্যসন্দেহে রাজা শুকোদন রাজপুত্রকে দ্রেখতে এলেন, রাজদাসীরা মিলে 'নাথ' বাজাতে লাগলো, উলু দিতে থাকলো।

বর্ষ থেকে পূর্ণবৃষ্টি হচ্ছে, আকাশে কলষ মেঘে দেবতার হুন্সুতি বাজছে, মর্ত্যের ঘরে ঘরে শাঁপ বর্টা, পাভালের ডলে ডলে অগস্ত্য, অরুণ্ডা বেজে উঠছে। বৃদ্ধদেব ভিনলোক-ভোড়া তুঙ্গ আনন্দের মাঝখানে জয় নিয়ে পৃথিবীর উপরে প্রথম সাত পা চলে বাজেন! স্বপ্নের পা ছুঁনি যেখানে যেখানে পড়লো, সেখানে সেখানে অতল হুতল রসাতল ভেদ করে একটি একটি সোনার পদ্ম আনন্দের চরকার মত মাটির উপরে ফুটে উঠলো; আর বর্ষ থেকে সাতখানি মেঘ এসে সাত অক্সের জল সেই সেই সফতি

পদ্মের উপরে লাগলো!

* নালক আশ্চর্য হয়ে দেখছে, দেখ দানব মানবে মিলে সেই সাত-পদ্মের মাঝখানে বৃদ্ধদেবকে অভিষেক করছেন! এমন সময় নালকের মা এসে ডাকলেন—দেখি ছেলে স্বাধি এখানে নেই আর তুমি একা এই বনে বনে রয়েছো! না ঘুম, না খাওয়া, না লেখা পড়া,—কেবল চোপ ব্রজে ধ্যান করা হচ্ছে! এই পরেলে উনি আবার সরাসরি হয়েছেন! চল, বাড়ি চল।

মা নালকের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে, নালক মাটিতে লুটোপুট খেঁদে কান্ডে কান্ডে বলতে লাগলো—ছেড়ে দাও মা, তার পর কি হেঁচলো দেখি। একটি বার ছাড়ো। মাগো, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে! সবস্তু বন নালকের হৃদয়ে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল,—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে!

* আর ছেড়ে দে! একেবারে ঘরে এনে তুলি বন্ধ!

৫

নালককে তারা ঘোর কোরে গুরু-মশারের পাঠশালা দিয়েছে। সেখানে গুরু বলছেন—ওকাস অহং* তত্তে। নালক পড়ে থাকে—ভস্তে। গুরু বলছেন লেখ—অহংগং কহা সীলং দেখ বে ভস্তে। নালক বড় বড় কোরে ভালপাতার লিখে থাকে—সীলং দেখ যে ভস্তে। কিন্তু তার লেখাতেও মন নেই, পড়াতেও মন নেই। তার প্রাণ বর্ধনের বনে সেই বটতলার আর সেই কশিলাস্তর রাজধানীতে পড়ে আছে।

* পাঠশালায় খোঁড়া ঘরের জান্না দিয়ে

একটা তিত্তিড়ি গাছে, খানিকটা কাশ আর কাঁটাঘন এটটা বাগঝাড় আর—একটি পুঁইর দেখা যায়। চপুৰবেলা হুতুখানি রোম দেখানটার এসে পড়ে, একটা গা-খুঁটি কুণোপাখী স্থপ করে ডাঙে এসে বসে আর কুৎকুৎ কোরে ডাকতে থাকে কাঁটা গাছের ফুলের উপরে একটা কালো ভোমরা ভুন্-ভুন্ কোরে করে উড়ে বেড়ায়, এরবার জানলার কাছে আসে আগার উড়ে যায়, নালক সেইদিকে চোরে থাকে আর ডাঙে—আটা, ওদের মত যদি ডানা পেতেম তবে আর কি মা আমার ঘরে বন্ধ করে রাখতে পারতেন? এহদোড়ে বনে চলে যেতাম। এমন সময় গুফ গলে ওঠেন—গেথ্ রে লেপ! অমনি বনের পাখী উড়ে পালায়, তাল-পাতার উপরে আবার খন্ খন্ কোরে ছেলেদের কলম চলতে থাকে। নালক যে কি কষ্টে আছে তা সেই জানে! হাত চলছে না তবু পাতাড়ি-লেখা বন্ধ করবার জো নেই, কালী আঙ্গু তবু পড়ে ধোঁতে হবে—য র ল, ল ব ল—বাগলের দিনেও, গরমের দিনেও, সকালেও, ছপুয়েও।

নালক পাঠশালা থেকে মাঘের হাত ধোয়ে ঘবন বাড়ী ফেরে হরভর্তী শালগাছের উপরে তখন কালো মেঘ আঁধার করে আসে, মাঠের উপরে তালগাছগুলোর মাথা হুলিয়ে গুবে হাওয়া বইতে থাকে, বাগঝাড় কাকগুলো ভয়ে কা কা করে ডেকে ওঠে; নালক মনে মনে ভাবে আজ যদি এমন একটা বড় ওঠে যে আমাদের গ্রামখানা ঐ পাঠশালার খোড়ো চালুটাহুড় একে-বারে ভেঙে-চুরে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তবে

বনে গিয়ে আমাদের থাকতেই হয়, তখন আর আমাদের ঘরে বন্ধ করবার উপায় থাকে না। রাতেও বেলায় ঘরের বাইরে বাহান্ পন্ পন্ বইতে থাকে, বিছাতেও আলো পতাই কিছুমক্ চম্কাতে থাকে, নালক ততই মনে মনে ডাকতে থাকে—বড় আঙ্গু, আঙ্গু বৃষ্টি! মাটির দেওয়াল গলে থাক্, কপাটের খিল ভেঙে যাক্! কড়ও আসে, বৃষ্টিও নামে, চারিদিক জগে জগমগ হয়ে যায় কিন্তু হার কোনদিন কপাটও খোঁড়ো না, দেওয়ালও পড়ে না, যে বন্ধ সেই বন্ধ! পেলা মাঠ খোলা আকাশে, ঘেরা বর্জনের লেই তপোবনে নালক আর কেমন করে দিবে যাবে?—বেথানে পাখীরা আনন্দে উড়ে-বেড়ায়, হরিণ আনন্দে খেলে বেড়ায়, গাছের তলার মাঠেও বাতাসে বেথানে খোরে রাখবার কেউ নেই, ধরা দেবারও কেউ নেই;—সবাই ইচ্ছাযতো খেলে বেড়াচ্ছে, উড়ে বেড়াচ্ছে। স্বপ্নের আশাপথ চোরে, নালক দিন শুনছে, ওদিকে দেবল স্বপ্ন কপিলবাস্ত থেকে বৃদ্ধদের পদধ্বনি সজ্জায়ে মেখে, আনন্দে ছই হাত তুলে নাচতে নাচতে পপে আসছেন আত্ম গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে চলেছেন—“নমো নমো বৃদ্ধদিব্যাকরায়, নমো নমো গোতমভ্রম্মিণায়, নমো অনন্তগুণার্ণবায়, নমো শাক্যনন্দনারায়।”

শরৎকাল। আকাশে সোনার আলো। পথের দুইধারে মাঠে মাঠে সোনার ধান। লোকের মন আর ঘরে থাকতে চায় না। বাজারা খোড়া লাগিয়ে দিঘিলয়ে চলেছেন, এজারার মলে মলে ঘর ছেড়ে হাটে মাঠে বাটে কেউ পলর মাথায়, কেউ ধানক্ষেত নিড়াতে,

কেউবা সাত-সুদূর-তেরো-নদী-পারে বাণিজ্য-
স্বপ্নে চলেছে। বানের কোনো কাজ নেই
তারিও দল-বৈধে। অধির সঙ্গে সঙ্গে গান
গেয়ে চলেছে—“নমো নমো বুদ্ধদেবায়।”

সুখ্যাবেলা নীল আকাশে কোনখানে একটু
মেঘের লেশ নেই, চাঁদের। আলো আকাশ
থেকে পৃথিবী পর্যন্ত নেমে এসেছে, আবার
উপর, আকাশ-গগন। একটুকুরো আলোর
জালের মত উত্তর থেকে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত
দেখা দিয়েছে, দেবল অধি গ্রামের পূর্ণ দিয়ে
গেয়ে চলেছেন—“নমো নমো গোতমচন্দ্রায়।”
আমের কোলে ছেলে শুইছে—“নমো গোতম
চন্দ্রায়।”; ঘরের দাওয়ার গিঁড়িয়ে মা
শুইছেন—“নমো নমো”; বুদ্ধিদিবিসা-ঘরের
ভিতর থেকে শুইছেন—“নমো”; অমনিপতিনি
সবাইকে ডেকে বলছেন—“ওরে নোমো কর,
নোমো কর।” গ্রামের ঠাকুরপাড়ার পাঁচ
ঘণ্টা অধির গানের সঙ্গে একটানে বেজে
উঠেছে—নমো নমো নমো। আকাশে বাতাসে
লজ উঠেছে—নমো নমো নমো। রাত
বুধর জোর হয়ে এসেছে, শিশিরে জ্বরে
পদ্ম বখন বসেছে—নমো, চাঁদ পশ্চিম
হেলে আলছেন—নমো, সমস্ত লোকের আলো
পৃথিবীর মাটিতে লুটবে পড়ে বখন
বলছেন—নমো, সেই সময়ে ঘুম ভেঙে

নাশক উঠে বসেছে আর অমনি অধি এসে
দেখা দিচ্ছেন! আগু গুলে গেছে!
খেলো নরনার সোনার যৌব এতবারে
ঘরের ভিতর পর্যন্ত, এসে নাশকের মাথার
উপরে পড়েছে, নাশক উঠে অধিকে প্রণাম
করেছে আর অধি নাশককে আশীর্বাদ
করছেন—স্বামী হও, মুক্ত হও।

অধির হাত ধরে নাশক পলে এসে
গিঁড়িয়েছে, নাশকের মা দুই চোখে জাঁচল
দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অধিকে বলছেন—
নাশক ছাড়া আমার কেউ নেই, তাকে নিয়ে
বাবেন না।

অধি বলছেন—ভাখ কোরোনা, অধি
থেকে পরিত্রিৎ বৎসর পরে নাশককে ফিরে
পাবে। ভর কোরোনা; এস তোমার
নাশককে বুদ্ধদেবের পায়ে সঁপে দাও। অধি
মস্ত পড়তে থাকলেন আর নাশকের মা
ছেলের দুই হাত ধরে বসতে লাগলেন—

কৃষ্ণং হৃদিতং এতং পদং গহেহান অত্রিৎ

বুদ্ধ দেহং সবিমান আকাশেন পিপুরয়ে।—

—নির্মল আকাশের নীচে বুদ্ধদেবের পূজা
করি, হৃদয় আমার (নাশক) তুল তাকে
দিয়ে পূজা করি।

অধি নাশকের হাত ধরে বনের দিকে
চলে গেলেন।

(অবশ)

ঐশ্বর্যবীজনাথ ঠাকুর।

যুদ্ধ-সাহিত্য

যে যুরোপ যুদ্ধের প্রেমের ধর্মে দীক্ষিত
করিয়াছে, সেই যুরোপ আজ অদৃষ্টপূর্ণ
হত্যাকাণ্ডের পরিণত। তাহার শিল্প, তাহার
সাহিত্য, তাহার বিজ্ঞান ও দর্শন হইতে সেই
শ্রেয়ের যথুয় রাগিণীটি বাহিরা গিয়াছে,
'সমস্তই আজ হত্যার রক্ত আনন্দে এবং
বিভীষিকার পরিপূর্ণ। কলাবিন্দু ভাবের
কল্পনা তুলিয়া, কবি কবিতা-সাধনা তুলিয়া,
দার্শনিক জ্ঞানের ভাবনা তুলিয়া আধুনিক
জ্ঞানজ্যোতির শোণিত-পাণ্ডরে ভাসিয়া চলিয়া-
ছেন। একদা যে নগর শাস্ত্রী, এবং
সৌন্দর্য্যের ভরিয়া ছিল আজ তাহা নিরাট
মূল-তুণ্য মাত্র। শত্রুর আশ্রয় ধর্ম্ম-নিষ্ঠগণ
আজ হত্যাকারী নৈতৃত্বের আশ্রয়স্থান,
শিল্পবিহীন স্থাপত্য-ভাবের বিবিধ কারুকাষ
আজ পদদলিত ও মূলদগ্ধিত।

প্রাচীরের অসামরিক ব্যক্তিত্বও এখন
যুদ্ধের কথা ভিন্ন আর কিছু শুনিতে
চাহে না, আর কিছু পড়িতে চাহে না।
সেখানকার লেখকেরাও জনসাধারণের
মনের দুখা মিটাইতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত,
তাই আজ অল্পদিনের ভিতরেই যুরোপে
রীতিমত একটি যুদ্ধ সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে।
এই যুদ্ধসাহিত্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে
বর্তমান সময়-সূচনার পূর্বে হইতেই। আমরা
আনন্দকবোধে তথাকথিত সাহিত্যের কিছু
কিছু পরিচয় দিলাম।

জার্মেনীর বিখ-বিখ্যাত সাহিত্যিক-দৈনিক
জেনারেল ফ্রেডারিক ভন বার্গহার্ডি, তাহার
"Britain as Germany's Vassal" নামক

গ্রন্থকে যুরোপে জার্মেনীর অবস্থা ও কর্তব্য
সংক্ষেপে অনেক কথা সন্নিবিষ্টছেন। আমরা
তাহার স্থানবিশেষ উদ্ধার করিলাম।—

বার্গহার্ডি

১. "রোম-সম্রাজ্যে বাল্লরা প্রবৃত্ত করিয়াছে,
তাহার জাতি। প্রাচীন গল, স্পেন,
আফ্রিকা ও বসক্যান উপদ্বীপে এবং বিশেষ
করিয়া ইতালীতে তাহার দূর্ব্বার বহু প্রবাহের
মত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সত্য বটে,
তাহার যে সকল রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল,
সেগুলি বহুকালস্থায়ী হয় নাই; কারণ,
পৃথিবীর সেই প্রাচীন যুগের অপেক্ষাকৃত
সভ্য জাতিদের সংশ্রুতে আসিয়া, তাহার
আশ্রয়-দেয় চাবিধিক-বিশেষত্ব রক্ষা করিতে
অক্ষম হইয়াছিল। তথাপি তাহার শ্রান্ত
ও মরণোন্মুখ জাতিদের ধমনীতে এমন
মৃত্যু রক্ত-স্রোত প্রবাহিত করিতে
পারিয়াছিল যে, তাহার ফলে নব-শক্তিতে
উৎসাহিত এবং নব-বলে বলীমান একশ্রেণীর
মানব আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তখনকার
মৃত্যু জাতিদের ভিতরে, তাহারই অধিক
বলী, সম্মত ও সভ্যতার উন্নতিকারক
হইতে পারিয়াছিল,—যাহাদের ভিতরে
'জার্মেনিক' রক্ত অধিক পরিমাণে ছিল।
যুরোপের পশ্চিমভাগের জাতিরাই, এদিকে
অধান। কারণ, তাহাদের ভিতরে সকলের
চেয়ে বেশী জার্মান রক্ত আছে।

কিছু, যুরোপের পশ্চিমভাগে জার্মানরা
বর্ধনও প্রবল হইতে পারে নাই। তাই

সেপানকার্য বাসিল্লারাও প্রথমতঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত
গ্রীক-সভ্যতার মহিমা এবং তাহার পরে
ইসলামের বঙ্গমুষ্টি ভিতরে পড়িয়া,
অনন্ততার গভীর পক্ষে ভূমিগা সিদ্ধাছিল।

সভ্যতা ও মানবের উন্নতি-বিধান
পশ্চিম-ইউরোপই প্রধান হইল। সেখানে
দুইটি পরস্পর-বিশুদ্ধ জাতি গার্মানি-
করিল। প্রথম হইতেছে 'লাতিন' জাতি।
ইতালিয়ান, গল ও আঁইবেসিয়ান, জাতির
সহিত জার্মান জাতির মিলনে ইহার সৃষ্টি।
দ্বিতীয় হইতেছে, জার্মান জাতি। যে ধ্রুপদ
এই জাতি আপনাদের 'বিকৃত' রক্ষা
করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহা জার্মেনী
এবং ফ্রান্সেনিভি। নামে পরিচিত। অশ-
পরিবর্তনে এই জার্মান ও লাতিন জাতিদের
ভিতরে রাজনৈতিক এবং জাতীয় বিভেদের
স্থাপত্য হইল। জার্মানরা রোমানদের
মত একটি পৃথু-সাম্রাজ্য গঠন করিবার
চেষ্টা করিতে লাগিল। অতর্নিক বোম্বের
ধ্বংসাত্মক, ইতালীর শক্তিতে নির্ভর ও
রোম সহরকে কেন্দ্রস্থানীয় করিয়া এক
ঈশ্বরশাসিত ও আধ্যাত্মিক পৃথু-সাম্রাজ্য
স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলে,
জার্মানজাতির সহিত বোম্বের ধ্বংসাত্মকের
বিরোধ উপস্থিত হইল। এইরূপে পৃথিবীর
এক বিখ্যাত যুদ্ধের আরম্ভ। কিন্তু, সে
যুদ্ধ বরাবর একটানা চলিল না। কারণ,
আরম্ভেই জার্মেনী পরাজিত হইল। কিন্তু
সেই পরাজয়েই বিরোধ শেষ হইয়া গেল
না।"

"বার্ণহার্ডির কথা হইতে ইহাই বোঝা যায়
যে, সাম্রাজ্য-পৃথিবী শাসন করাই জার্মেনীর

অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। প্রথমবারের চেষ্টায়
তাহার 'সে আশা ফলশ্রুতি' হয় নাই।
বলিয়া, সম্ভ্রুতি সে দ্বিতীয়বার কাগ্যক্ষেত্রে
অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয়বারের
চেষ্টায় ভিতরে যে সহস্রগুণ অস্তিত
হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে জার্মেনীর-
দুর্ভাগ্যতার অনেক ইতিহাস আছে। সে
সময়টার জার্মেনী পৃথিবী-শাসনের স্বপ্ন না
বোঝিয়া জ্ঞান-শিক্ষানে মনোযোগী হইয়া-
ছিল। মধ্যযুগে 'ফ্রেডারিক দি গ্রেটের'
সময়ে জার্মেনী একবার কিছুদিনের জন্য
মাথা তুলিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে
নিশেষ কোন ফল হয় নাই। তাহার পর,
প্রথম নেপোলিয়ানের হাতে গোলাম বান্ধা
জার্মেনীর চোপ আবার খুলিয়া গেল।
তৎফলে, দ্বিতীয় নেপোলিয়ানকে পরাজিত
করিয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জার্মেনী পুনরায়
স্বাধীন প্রাধান্য হইয়া উঠিল। তাহার দ্বন্দ্ব
আবার নৃতন করিয়া পৃথিবী-শাসনের আশা
জাগ্রত হইল।

বার্ণহার্ডি বলিতেছেন :—“১৮৭০-১১
খৃষ্টাব্দের পূর্ব হইতে জার্মেনীর জন-সংখ্যা
আন্তর্জাতিক বাড়াইয়া আসিতেছে। জার্মেনীর
জনসংখ্যা ক্রিষ্টাব্দিক চতুর্দশশতাব্দীর ভিতরে
চারি কোটি হইতে সাড়ে ছয় কোটিতে
গড়াইয়াছে। অর্থাৎ জার্মেনীতে ফি বৎসরে
লোক বাড়িয়াছে প্রায় দশলক্ষ করিয়া।
অতর্নিকে, অর্থশাস্ত্রশাস্ত্রীয় এবং মানসিক
উন্নতিও যথেষ্ট হইয়াছে।

সংগতি জার্মেনী একটি প্রথম-শ্রেণীর
প্রশাসিত প্রধান রাজ্য হইয়া গড়াইয়াছে।
১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে জার্মেনীর বাণিজ্য-

নৌ-বহর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল না; কিন্তু আজ ঐ বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে জার্মেনী বিতরণস্থান অধিকার করিয়াছে। জার্মেনীর বৈদেশিক বাণিজ্য যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে। এক্ষেত্রেও সে বিতরণস্থানীয়া।

জার্মেনীর জনসংখ্যার অল্পপাতে, অথবা তাহার প্রাচ্যজন-হিসাবে তাহার ঔপনিবেশিক রাজ্যগুলিকে যথেষ্ট বলা চলে না। পরন্তু, ঔপনিবেশগুলির সহিত তাহার সংঘর্ষে তেমন দৃঢ় নহে,—যে-কোন-দৃষ্টান্তে, সে সংঘর্ষ-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে। জার্মেনীকে তখন একান্ত অসহায় হইয়া থাকিতে হইবে। আমরা যদি “ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং—এখন কি—যুক্ত বেংলিয়াদের ঔপনিবেশিক রাজ্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর ভাল ভাল দেশগুলি ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া জার্মেনীকে হান্দা-মাল দেওয়া হইয়াছে।

জার্মেনী এখনই তাহার ক্রম-বর্দ্ধমান প্রাচ্যগণের লক্ষ কোম দেশ দখল করিতে গিয়াছে, প্রথমই তাহাকে সমগ্র প্রবল পর্তুগালের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। হয় তাহাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, নয় তাহাকে Triple Ententeর ইচ্ছানুযায়ী থাকিতে হইবে। Triple Entente এখন সমগ্র পৃথিবীকে দাস করিতেছে। এবং ইংলণ্ড এখন উত্তর সার্কসার্কী।”

বাণবাণ্ডি যাগ বলিতেছেন, তাহার মায় মায় এই :—জার্মেনীর লোক এত বাড়িয়াছে যে তাহার স্বরাজ্যে আর কুলাইতেছে না।

অতএব রাজ্যবিস্তার করিতে হইবে। জার্মেনীর বাণিজ্য ক্রমেই বাড়িতেছে, তাহার জিনিষ বিক্রী করিবার ক্ষমতা নতুন আরগা চাই। অতএব রাজ্যবিস্তার করিতে হইবে। সমগ্র পৃথিবীকে আপনায় পরিণত করার চাপিয়া ধরাই তাহার সুখের স্বপ্ন। অতএব রাজ্যবিস্তার করিতে হইবে। “নিষ্পত্তি অথবা অধঃপতন”—ইহাই তাহার মূলমন্ত্র।

তন ভার গল্টজ্

জার্মেনীর সৈন্যপতি য়ারন তন ভার গল্টজ্ “Nation in Arms” নামে এক খনি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাহাতে যুক্তসংঘকে তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছেন, আমরা তাহার কয়েক আরগা তুলিয়া দিলাম :—

“যতকাল মানবজাতি ইহ-লৌকিক সম্পদলাভের জন্য চেষ্টা করিবে, যতকাল তাহার আপনাদের উত্তরাধিকারিগণের লক্ষ্য অবস্থান-কেন্দ্র-বিস্তৃতি, শান্তি এবং সম্মান লাভের চেষ্টা করিবে, যতকাল তাহার আপনাদের অতিদিনকার তুচ্ছ খুটি-নাটির সংকীর্ণতা পার হইয়া রাজনীতি এবং সভ্যতার যথার্থ আদর্শ অন্বেষণ করিবার জন্য আগ্রহ হইবে, ততকাল পৃথিবীতে যুদ্ধের সুদূর ব্যক্তিবেই ব্যক্তিবে। যুদ্ধে মানবজাতির উন্নতি কি অবনতি হইতেছে, এ কথা নিরা আলোচনা করিবার দরকার কি? হিশ বৎসরব্যাপী সময়ে জার্মেনী একবার অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। তাহার ভিতরে যেকোন নীতিব্রততা আঁসিয়াছিল,

তাহার কৃপনা মেলা ভার। আপার অস্ত্র
দিকে, • অবনতির এত নিম্নতরে নামির,
এসিগা যখন দাখীলতাগাভের জন্ত অস্ত্র-
ধারণ করিয়াছিল, সেই যুগকে আমরা
তাহার যশার্থ গৌরবের যুগ বলিয়া নির্দেশ
করি।

যুগযুগ এবং শেষ পরিণাম অর্জমাগে
যুদ্ধের নৈতিক ফল বিভিন্ন রূপধারণ করে।
ভগবান যাহা দেন, আমরা অবশ্য তাহাকে
লইব। তবে এটা ঠিক যে,—যুদ্ধ হইতেছে
মানবজাতির নিরতি,—জাতিসকলের অনিবার্য
অনুষ্ঠান। এবং পৃথিবীর নব্বয়গণের
অধিকারে অবিনশ্বর শান্তি কখনও থাকিতে
পারে না।

এ যুগে কেবল রাজারা যুদ্ধবিজ্ঞা
শিখিলেই চলিবে না। প্রজাদেরও যুদ্ধে
জ্ঞান থাকা চাই। কিরূপে অস্ত্র চালাইতে
হয়, শক্তির অধঃশীলন করিয়া কিরূপে তাহা
ব্যবহার করিতে হয় সে কথা সকলেরই জানিয়া
রাখা উচিত। পরন্তু, দেশের অস্ত্র বিরোধ
উল্লঙ্ঘিত হইলে, জাতিকে যে অগ্নিপরীক্ষা
দিতে হয়, তাহা সহ্য করিবার নিমিত্ত,
সকলকে • স্বয়ং পাষাণে পরিণত করিয়া,
প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

প্রশ্ন হয় যে :—“সাধারণ লোক যখন
স্বয়ং হইয়া বিপদে পড়ে এবং আপনাদে
স্বয়ং আপনি ডাকিয়া আনে, তখন তাহার
পক্ষে যুদ্ধ-শিক্ষা কি এতই আবশ্যকীয়?”—
নিশ্চয়ই!

যাহার ভিতরে সামরিক ভেদ আছে,
সে অযোগ্যের আহ্বান শুনিবামাত্র সকল
সঙ্ঘাত ভূমিয়া, সেনাপতির দত্তপ্রহরে

• ইতস্ততঃ কুঁবে না। কারণ, পরিণামে সে
অমূল্য পুংস্কার • পায়। তাহা! অমরতা!
• এই • যে • অমরতা,—এ কথাটির ভিতরে
একটা পরম সোভানীয় বোহিনী শক্তি
আছে। ভাগ্যবান সৈনিক তাহার নামকে
বিস্মৃতির অন্ধকার গুহা হইতে উদ্ধার করে।
ক্রৈতারিক ও নেশোলিগনের নাম ততদিন
থাকিলে, যতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব আছে।

“কিন্তু একজনকে অমর করিবার এক
সাধারণ জনগণের উপরে এমন কঠোর
পরীক্ষার পাব্য-ভার চাপানো কি উচিত?
একজন বিখ্যাত সেনাপতির গৌরব-রক্ষার
জন্য শত সহস্র মানব আপনাদের প্রাণ বলি
দেয়,—‘কি তাহাদের নাম করে? তাহারা
ত’ কোন পুংস্কার পাবে নাই।’—ইহা
যুগ-দৃষ্টি প্রজ্ঞার মত হইতে পারে, কিন্তু
এ ব্যাপারটাকে আমরা ভিন্ন চোখে দেখি।
‘যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি,—তাহারও সঙ্গ,
বিশ্বাসী ও সাহসী সহচরের দরকার।
তাহারও তাহার যশের অংশী হয়।

আলেকজান্দারের সঙ্গে গ্রেনিকাসে যাত্রা
করিয়াছিল, এমন কোন সৈনিক বর্তমান
যুগে যদি কবর হইতে গাত্ৰোত্থান করিয়া
আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত,—তাহা
হইলে আমরা তাহাকে সাধারণ সৈনিকের
মত দেখিব না,—কিন্তু এমন করনা করিয়া
যেন স্বয়ং আলেকজান্দারই আমাদের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া আছেন।”

গোয়েন্দা ডাঃ গ্রেন্ডস্

“প্রাচীন গুপ্ত-কার্য-বিভাগ” পৃথিবীর
সর্বত্র গোয়েন্দা ছড়াইয়া দিয়াছে। পৃথিবীর

কোথার রাজনৈতিক কি খটনা ঘটতেছে, অপরাধে, লেক্টেন্যান্ট কর্ণেল লিগলিটস্‌ জাহাজে জা'দানজাতির উপকার না অপকার হইতেছে ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য জা'দান গণমেট এই সকল ছয়বেশী গোয়েন্দাকে দেশবিদেশে প্রেরণ করেন। গোয়েন্দাদের ভিতরে জী-পুফ্‌স্‌ হই আছে। এমন কি, অনেক মদ্রাভবংগীর লোক, অনেক কাউন্ট ও কাউন্টেন্সও এই গোয়েন্দাদলহুত। ডাক্তার আদর্গার্ড কার্ল গ্রেন্স্‌ উক্ত গোয়েন্দাদলে কাজ করিয়া আজ বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার কার্যাবলীর কথা The Secrets of the German War Office নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ উপজ্ঞান অপেক্ষাও চিন্তাকর্ষক। আমরা তাঁহার ক্লাহিনীর অমরম পরিচয় দিলাম :—

“১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুন তারিখের সকালে সার্ডিমার রাজ্য, রাণী, মন্ত্রী ও রাজপরিষদবর্গ গুপ্তহত্যার চক্রান্তে নিহত হন। চক্রান্তকারীদের সর্দার কে-পা কাহারা, আমি তাহা জানিবার জন্য প্রেরিত হইলাম। আমাদের সন্বেহ কর্ণেল মাসিন ও বটমংখ্যক সৈন্যদলের জনকত উচ্চতন কর্মচারীর উপরে পড়িয়াছিল। এই সকল রাজহত্যা, রক্তের অর্থে পুষ্ট হইয়া, চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছিল। সার্ডিমার রাজ্য, অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বস্থাপন করিয়া প্রথিয়ার বিধনমতে পড়িয়াছিলেন।

আমি ছয়বেশী এক আসল বোল্ডার চাকের ভিতরে গিয়া পড়িলাম। এবং অবিলম্বেই আমার বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে পারিলাম। জাগ দস্তক লইয়া জয়ন করিবার

অপরাধে, লেক্টেন্যান্ট কর্ণেল লিগলিটস্‌ আমাকে প্রোত্তার করিলেন। সার্ডিমার ভিতরকার অস্বাভাবিক ভয়ানক। প্রোত্তার ও প্রাণদণ্ড তপনকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আমার কাছে কোন সুন্দেহ-জনক কাগজপত্র পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু “অস্বাভাবিক” গবমেণ্টের বিরোধী-পক্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট রাখাতে, আমাকে “কাউন্ট-মার্শেলে” বিচারার্থ প্রেরণ করা হইল।

একদল সৈন্য আসিয়া আমাকে কফি-খাওয়া হইতে প্রোত্তার করিয়া লইয়া গেল। পরদিন সকালে আমাকে কর্ণেলের গোপাল-পরা তিনজন লোকের সন্মুখে হাজির করা হইল। আমাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল না। আমি একেবারেই শুনিলাম,

“তোমাকে বিস্ত্রোহীদের সঙ্গে মিশিতে দেখা গিয়াছে। তুমি ভাল দস্তক ব্যবহার করিয়াছ। দুর্ঘাতের সময়ে তোমাকে স্তম্ভিত করিয়া দিরা হইবে।”

প্রথমটা আমি তাবিলাম, বোধ হয় আমার সঙ্গে ঠাট্টা করা হইতেছে। “ভিক্ত লোকগণের মুখের দিকে তাকাইয়া ঠাট্টার কোন খাঁচ দেখিতে পাইলাম না। তখন আপনাদের বিপদ বুঝিয়া এবং মনের উদ্বেগ মনেই চাপিয়া, আমি শান্তভাবে বলিলাম, “কাউন্ট বোলেরাচিৎক (সমস-সচিব) আপনারা জানিয়ে আছেন যে, কাউন্ট ওয়েরিংগ্রোড তাঁকে সেলাম দিয়েছেন।”

তাহারা অবাক হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল। তারপর, এক ব্যক্তি আমার উপরে অশ্রদ্ধা প্রশ্ন বৃষ্টি করিতে লাগিল। আমি সে-সকল প্রশ্নের কোন

জবাব না দিয়া হুধু কহিলান, “মশাউ, আমাকে যা বলবার আছে, তা বলোচি।”

আমাকে আবার কারাগারে পঠানো হইল। বেলারটার সময় আমার বিচার-কর্তাদের একজন আদিয়া আমাকে বলিল, “তোমার সংবাদ পাঠানো হইল নি। আমার সঙ্গীদের তা মত নয়। ঘোলেরাভিচর সন্দেহে আমার সবন্ধ আছে। যদি তুমি কারণ দেখাতে পার, তাহলে তোমার সংবাদ দেবার ভার আমি নেব।”

আমি তাহাকে কারণ দেখাইলাম। সে কিংবদন্তে, ব্যাকুলভাবে ঘর থেকে বাহির হইয়া গেল। ব্যাপারটা নিয়া আমি বড় বেশী মাথা ঘামাইগাম না। “কিন্তু আমায় সাড়ে সাতটার সময়ে যখন আমার কারাগারের দরজা খুলিয়া গেল এবং দুইজন রক্ষী সঙ্গীণ খাড়া করিয়া ঘরে ঢুকিয়া, আমাকে অনন—বেশানে অরও কয়েকজন সশস্ত্র লৈনিক আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল—লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল, তখন আমি চিন্তিত হইগাম। বুধিগাম, এই হট্টগোলের দিনে আমার সংবাদ যথাস্থানে পৌছার নাই। দুর্গের পশ্চিমে একটি পাহাড়ের দিকে তাহারা আমাকে লইয়া গেল।

একটি পুরানো পাথরের বাড়ীর কাছে আমার বখাভূমি নির্দিষ্ট হইল। একটা বেগানের পাশে গিয়া আমায় দাঁড়াইলান। প্রধান কর্মচারী একথানা দলিল বাহির করিয়া সার্ভিসান ডাবার পড়িতে আরম্ভ করিল। দলিলের ভূমিকাটা আমার কাছে অনাবস্তক দীর্ঘ বলিয়া মনে হইল।

দলিল-পড়া শেষ হইয়া গেলে আমি বলিলাম যে, আমি সার্কজাতীয় নই, অতএব দলিলের একবর্ণও বুঝিতে পারি না।

কর্মচারী ক্রিফৎ বিস্মিত হইয়া বলিল যে, সে আমাকে সার্ক বলিয়াই জানে।

আমি জোরালো আর্দ্রণ ও ফ্রেক ডাবার তাহাকে জানাইলান, এ ব্যাপারটার নিশ্চয়ই কোথাও গলদ হইয়াছে, এর জন্তে পরে তাহাদের যথেষ্ট বিশদভর আছে।

সে কিছু বিচলিত হইল বটে, কিন্তু বলিল, “আমি যে আদেশ পেয়েছি তা পালন করছি।”

আমি বলিলাম, “আমি মস্ত্রী ক’রে খবর পাঠিয়েচি।”

তাহারা আমাকে মাঝিবার জন্ত তেমন তাড়াহুড়া করিল না। পাঁচ মিনিট কাটিল। দশ মিনিট কাটিল। কর্মচারী বড়ী বাহির করিয়া দেখিল, আটটা বাজিতে আর পঁচিশমিনিট আছে। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনহইয়া আসিতেছে।

কর্মচারী বিরক্ত হইয়া বলিল, “আর ঘেরি ক’র্তে পারি না।”

একটা শোক জ্বাশিয়া আমাকে দেয়াল চেষ্টাইয়া দাঁড় করাইয়া দিল। তারপর সমাল দিয়া আমার চোখ বন্ধিতে আসিল। আমি বলিলাম আমার রুমালের দরকার নাই। তখনই হুহু দেওয়া হইল। বায়োটা বন্দুকের কুৎসিত কালো নাক আমার দিকে ফিরিল।

সে-সময়টা আমার মনের ভিতরে যেদগু উত্তেজনার উদগর হইয়াছিল, সে কথা বলিতে আমার স্থণা যোব হয়। তখন কিছুই

আমি পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছিলাম না। তবে একটা কথা আমার মনে স্পষ্ট মনে আছে। দ্বিতীয় সারির তৃতীয় লোকটা কিছু অসামান্যতার সহিত বস্তু ধরিয়াছিল। প্রথমটা সে আমার পেট ও বুকের মাঝামাঝি আয়তায় লক্ষ্য করিল; তাৎপর্য আমার নাকের পানে টিপ করিল,—সেটা আমি একেবারেই পছন্দ করিলাম না, বড়ই বিপজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আমার কতকগুলি এমনি দাঁড়াইয়াছিল। তা আমি জানি। তারপরে বা হইল, তা আমি ভুলি নাই। কিছুপূরে ছইজন কর্মচারীকে আসিতে দেখা গেল। তাহারা হাত নাড়িয়া স্বাতন্ত্র্যের কি বলিতেছিল। হঠাৎ অস্বেদ ঝড়না উঠিল।

তাহারা আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন আমাকে ভদ্রভাবে অভিবাদন করিয়া এক শাওর মত পান করিতে দিল। ইচ্ছা থাকিলেও, আমি তাহা পান করিলাম না। আমি বরাবর বুকের উপরে হাত রাখিয়া, দিখা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। একজনকে আমি বলিতে শুনিলাম, “লোকটা কাপুক্ষ্য নর।”

* * *

গোয়েন্দার, কার্যে, দারিদ্র্য বশে। কিন্তু কৃতকাৰ্য্য হইলে পুঁজুধারের পরিমাণটাও খুব বেশী। কৃতকাৰ্য্য না হইলে সাধারণ জাহিনী শাওর যায়। আমার গভর্মেন্টের কাজ করিলেও, বিশেষ পড়িলে আমাদিগকে গবর্নেন্ট কোনরকম সাহায্য করিতে অপারগ। বাহারা ঘটনাবলি জীবন ধাপন করিতে ভালবাসে, এ কাজটা তাহাদের ভাল লাগে। দুর্দশ-প্রকৃতি লোকের পক্ষে জীবিকান্বয় গোয়েন্দার কার্য গ্রহণ করা

* উচিত নয়। যে-দল জী বা পুষ্ক-গোয়েন্দা ছঃসাহসিক কার্য গ্রহণ করে, সময় সময় তাহারা জিজ্ঞাস্য কি সত্যকান কাহাকেও ভয় করে না। একটু-কোন খুঁজ হইলে বাধীনতা বা জীবনে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, এ ভাবনা কিছু যে-সে ভাবনা নয়। আমি এমন অনেক সাহসী লোককে জানি, বাহারা এই প্রবল উত্তমের চাপে একেবারে ভাবিয়া পড়িয়াছে। আমি এমন জন বাহো নর-নারীকে জানি, বাহারা শুদ্ধো বাজীর মত অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়াছে, ধরা পড়িয়াছে বা মরিয়াছে। তাহাদের এমন বিপদ অনেক সময়ে শত্রুর কবলে পড়িয়া হয় না। আমি চুটুটি দৃষ্টান্ত দিব;—একটি রমণীর ও আর একটি পুরুষের।

গুপ্তা জড়ার একজন মেয়ে-গোয়েন্দা। সে গোয়েন্দার তরফ হইতে ক্রমশঃ গোয়েন্দাগিরির কার্যে নিযুক্ত ছিল। কয়েক বৎসর আগে যুরোপীয় খবরের কাগজগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, ক্রিমিয়া-সীমান্তে ‘মেমেলের’র এক হোটেলের গুপ্তা জড়ার নামে এক রমণী আত্মহত্যা করিয়াছে। একটি রমণীর কেয়ার নক্সার লজ জড়ারকে পাঠানো হইয়াছিল। বালিনে বসিয়া কর্তৃপক্ষ টের পাইলেন যে, সে নক্সা পাইয়াছে। কিন্তু একজন রূপ কর্মচারীর প্রেসে পড়িয়া, নক্সাগুলি তাহাকে আবার সে জিজ্ঞাসা দিবার মতলোব আটিকেছে। অতএব, গুপ্তা জড়ার আত্মহত্যা করিল। অর্থাৎ—তাহাকে বিষ দিয়া হত্যা করা হইল।

লেক্টেন্যান্ট জন ব্যান্ট্রট, সৈন্যদল ছর্মডিয়া গোয়েন্দাগিরির কার্যে নিযুক্ত

হইরাছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হয়, বন্দুক্কে। বন্দুক্কে আত্মান করা হইল। গোয়েন্দা-
তিনি কুসিয়ান চরের সঙ্গে ভাব * করিয়া-
ছিলেন, এইরূপ মনেই করা হইয়াছিল;
—সন্দেহমাত্র! তাঁহাকে কয়েদ করা চণ্ডিগ
না,—কারণ, তিনি অনেক লোকনো * পর
জানিতেন। তিনি অসম্মতিক কর্তারী,
অতএব, আর্থান আইন অনুসারে তাঁহাকে.
দণ্ড দিতে হইলে, সাধারণ বিচারালয়ে সে
কাজ করিতে হইত। অতঃপর * ব্যাস্ট্রিককে

সর্টার প্রদান যে লোকটিকে. পাঠাইয়া-
ছিলেন, * ব্যাস্ট্রিক বন্দুক্কে তাঁহাকে নিহত
করিলেন। প্রথম লোকটি মারা যাইবামাত্র,
আর একজন লোক আসিল। দেবাবে
ব্যাস্ট্রিক নিজেই মরিলেন।”

আমরা ডাক্তার গ্রেভসের জগৎগ্রহী
ও চমকপ্রদ পুস্তক হইতে ভবিষ্যতে আরও
কয়েকটি খান উদ্ধার করিব।

শ্রী প্রসাদদাস দাস।

জুলবদন

[জুলবদন, ভারতের প্রথম মোগল বামশাহ বাঘের কথা। আকবর আনুগম্যের “আকবরনামা”
উপাদান-সংগ্রহের দ্বারা জুলবদনের সহস্রাব্দ গ্রহণ করেন। বাঘ ও হুমায়ূনের জীবনকালের আখ্যায়িকাও
জুলবদনের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল;—“হুমায়ুননামা” “ভায়াই জুলবদন। আনুগম্য, সম্রাট
কর্তৃক বাঘ ও হুমায়ূনের জীবন-চিত্র সংস্কারের আদেশ প্রচারের কথা (১) লিখিয়াছেন সত্য, তবে তাহা
জুলবদনের উপর ছিল কি না, তাহা সন্দেহে উল্লেখ করেন নাই। বাহা ইউক, “হুমায়ুননামা” ১৫৮৭
(১০০ হিঃ) বইকে লিখিত হয়। জুলবদনের “হুমায়ুননামা” দ্বারা আনুগম্যের নীতি; তবে তিনি যে বেগমের
পুত্রের সাহায্য লইয়াছিলেন, এ বিষয়ে এমন কোন সন্দেহ হইতে পারে।

যে সমস্ত ইংরাজ-ঐতিহাসিক ইমাম-আল-ই-ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাহারা জুলবদন যে এক
উপাধের প্রদত্ত লিখিয়াছেন, এ কথা কেহ কোথাও উল্লেখ করেন নাই। প্রকৃত-নাম-সংগ্রহের “আইন-ই-আকবরীতে”
জুলবদনদ্বারা বিশেষ লিখিত জানা যায় না। জুলবদনকে তিনি একত্রে (২) আকবরের বেগম বলিয়া
অসম্মিত করিয়াছেন। বাঘের “আজীবন-চিত্র”-সম্পাদক Erskine-দ্বারাও “হুমায়ুননামা” বেগম
নাই। জুলবদনদ্বারা কিছু বলিতে হইলে, “হুমায়ুন-নামা” এখন অবলম্বন।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম-রক্ষিত হস্তলিখিত “হুমায়ুন-নামা”খানি লক্ষ্য হইতে ১৫৮৮ খ্রীঃ অব্দে কর্ণেল জর্জ
উইলিয়াম হামিলটনের বিবরণ নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই “বহাউল-আব্বাসি ইংরাজী
অনুবাদ করিয়া বেন্ডারিঙ্গ-পত্নী আনাদের দ্বারা বাহা হইয়াছেন।

“হুমায়ুন-নামা” প্রথম-সংস্করণ বাঘের কথা। ইহার আবিষ্কারই জুলবদন, বাঘের আজীবন-চিত্র হইতে
প্রথম করিয়াছেন; কারণ শিতার মৃত্যু-কালে তাঁহার বয়স মাত্র ৮ বৎসর ছিল; কাজেই তাঁহার নিকট
হইতে বাঘের সম্বন্ধে কথাগুলি আবার জানিবার আশা করিতে পারি না। “হুমায়ুন-নামা” বাঘের পুত্র
কথা, বেগম ও আত্মীয় বর্গের বেশ একটা সঠিক বৃত্তান্ত আছে। দুইখণ্ড বিষয়, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের এই
পাণ্ডুলিপিখানি অসম্পূর্ণ—শেষের কয়েক পৃষ্ঠা ইহাতে নাই। হুমায়ূনের দ্বিতীয়বার ভারতবিজয়ের পূর্ণ পর্যায়
ইতিহাস ইহাতে আছে। এক্ষণে আমরা জুলবদনের জীবন-কাহিনী লিখিত করিব।]

(১) Akbar-nama—Bib. Indica. Vol. I, p. 29.30.

(২) Ain-i-Akbari—Blockmann, Vol. I, p. ৫৪

গুলদমন আত্মনিক ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কাবুলে ভগ্নগ্ৰহণ কৰেন। তাঁহাৰ সন্মতমতে বৰং সিদ্ধনৰী অতিক্ৰম কৰিবা হিন্দুৱান অৱ কৰিবাৰ চেষ্টাৰ বাণ্ড ছিলেন। গুলদমনেৰ মাতা—দিগদাৰ বেগম। গুলদমন তাঁকে আশ্ৰয় বগিবা ডাকিতেন। দিগদাৰেৰ গৰ্ভে ভগ্নগ্ৰহণ কৰেন—

১। গুলদাৰ

২। গুলচিবা

৩। আবুনসিৰ—ইতিহাসে ইনি হিন্দাল নামে অভিহিত।

৪। গুলদমন

৫। আলভাৰ

গুলদমন শৈশবে 'আবুনসিৰ' নিকট শিক্ষা-
প্রাপ্ত হন। যোগল-অন্তঃপুৰেৰ শিক্ষিতজীব
নামে আত্ম।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বাবৰ পৰিবারবৰ্গকে পুত্ৰ
কামৰূপেৰ হস্তে সমৰ্পণ কৰিবা সিদ্ধ অতিক্ৰম
কৰিবাৰ ভক্ত কাবুল ত্যাগ কৰেন। পিতাৰ
কাবুল ত্যাগ কৰিবাৰ অনতিতাল পূৰ্ণ হৈছেই
গুলদমন তাঁহাৰ বিমাতা হুমায়ুন-জাননী
মহমেদ হস্তে স্তম্ভ হন। অতি শৈশবেই
মহমেদ তিনটা পুত্ৰ ও এফটা কস্তাৰ যুত্ৰ হও-
য়াৰ তিনি গুলদমনেৰ লালনপালন ও
শিক্ষাৰ ভাৰ বহু গ্রহণ কৰেন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দেৰ ১২ই এপ্ৰিল বাবৰ
পৰিশপেৰ বৃদ্ধে ইত্ৰাচিম সোণীকে পৰা-
জিত কৰেন। পৰবৎসৰ (১৯২৭ খৃষ্টাব্দে
১০ই মাৰ্চ) তিনি পানৱেৰ (শিক্ষা)
বৃদ্ধে রাণা সৰ্গকে পৰাজিত কৰিবা নিৰা-
পদে হাজলাস্ত বৰেন।

কাবুল ত্যাগ কৰিবাৰ পৰ ইন বৎসৰ

পৰ্য্যন্ত তিনি পৰিবারবৰ্গেৰ সহিত একত্ৰ
থাকিবাৰ অবিধা পান নাই। একপে- (১৯২৮
খৃষ্টাব্দে) তাহাবৰ্গকে হিন্দুৱানে আদিবাৰ
আদেশ পাঠাইলেন, কিন্তু তাহাৰেৰ কাবুল
হইতে বাত্ৰা কৰিতে একটুকু বিলম্ব হইয়া-
ছিল। আলিগড়ৰ নিকট বাবৰেৰ শোক-
ভুনেৰ সহিত মহমেদ সাফাৎ হৰ এৰ
তাঁহাৰা সস্তাটেৰ নিৰোগাহুলাৰে বেগমকে
হৰ। সমাদৰে আশ্ৰয় আনজন কৰেন
(১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জুন)। শিশু
গুলদমন পে রাজে মহমেদ সহিত অগ্ৰাৰ
গমন কৰেন সাই। তিনি পৰদিন
দিবাভাগে বাত্ৰা কৰেন। পৰিমধ্যে সস্তাটেৰ
বলিকা মীৰ নিজামুদ্দিন আলি ও তাঁহাৰ
পত্নী মুলতানাম, কুলজলানীতে (আলিগড়)
গুলদমনকে বিশেষ আদৰ যত্ন কৰেন। গুলদমন
আগ্ৰাৰ আশিৰ পিতাৰ চৰণ বন্দনা কৰেন।

বহুদিন পৰে বাবৰ, পত্নী ও পুত্ৰকস্তাৰ
মুম * দেখিলেন। কিছুদিন পৰে তিনি
পৰিবারবৰ্গসহ ঢোলপুৰ ও শিক্ৰী বাত্ৰা কৰেন।
শিক্ৰীতে গুলদমনেৰ এক আকৰ্ষক বিলম্ব
সংঘটিত হৰ। মহম মদন আৰ্থনা বাপুতী
ও সস্তাট মদন অস্ততমা পত্নী বিবি সুবাসিকাব
সহিত আশাৰ কৰিতেছিলেন, এমন সময়
শিশুহলুৰ চাপলাবন্তঃ গুলদমন সুবাসিকাকে
বহুবাৰ তাঁহাৰ হাত ধৰিয়া টানিতে ক্ৰোধবোধ
কৰেন। বালিকাৰ আশ্ৰয়তপৰ্য্যে তাঁহাকে
ঐ কাৰ্য্য কৰিতে বাধা হইতে হইয়াছিল,
কিন্তু শাপিতা সুবাসিকাব বলপ্রযোগে গুল-
দমনেৰ হাতেৰ হাড় স্থানান্তৰিত হইয়া য়।
অতিক্ৰমেৰে তপে অঙ্গনিৰেৰ মথোই হাড়-
পুনৰাৰ বধাস্থানে স্তম্ভ হৰ। এই ঘটনাৰ

পর তাঁহার। সকলে আগ্রা প্রত্যাগমন করিল।

বাবরের অন্ত্যেষ্টবছদিন প্রথোগ, বটগা উঠে নাই। সুতরাং অবস্থানকালে হুমায়ুন পীড়িত হন। বাবর তাঁহাকে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে বলেন; কিন্তু পশ্চিমধ্যে তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পায়। কোনরূপ ঔষধে তুলনাত না হওয়ার, মৌলবীদের পরামর্শে কিছুশে বাবর পুত্রের পীড়া স্বীয় পরীরে সন্ধানিত করিয়া তাঁহাকে নিরাময় করেন, তাহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। ইহার অল্পদিন পরেই ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর বাবর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বাবরের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীশোক-বিহ্বলা মহম্মদ মৃত্যু হয়। গুলবদন তাঁহার মৃত্যুতে শোকাভিক্ততা হইয়া গিয়াছেন,—“নিম্নের পর দিন আমি আকামের (মহম) ওস্তা কর্তৃক করিত— শোকপ্রকাশ করিতাম ও শুকাইয়া যাইতাম। সন্ধ্যাট (হুমায়ুন) বহবার সাধনা করিবার ওস্তা-আমার নিকট আসিতেন। যখন আমার বয়স দুই বৎসর, তখন আকাম আমাকে স্বীয় সংসারে লইয়া গিয়া লালনপালন করেন— আমার ১০ বৎসর বয়সক্রমকালে তিনি আমা-রকে ফেলিয়া ইহলগ্ন হইতে নিদার লন।”

মহম্মদ মৃত্যুর পর গুলবদন আরও এক-বৎসর হুমায়ুনের স.সারে ছিলেন। পরে দিল্লীর স্বীয় কস্তা ও পুত্র হিন্দালের ভার স্বগ্রহ গ্রহণ করেন।

১৫৩৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে হুমায়ুন শেরশাহের নিকট চোলা নামক স্থানে পরাজিত হন হুমায়ুন পরাজিত হইয়া

কোনক্রমে আগ্রা ফিরিয়া আসেন; তপার গুলবদনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তখন “গুলবদনের বয়সক্রম সপ্তদশ। হুমায়ুন তাঁহাকে প্রথমে চিনিতে পারেন নাই; কারণ যখন তিনি ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে গোড়ো অভিযান করেন, সে সময়েও তিনি গুলবদনকে ‘তাক’ (টুপি) পরিতে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তিনি তাঁহাকে বিবাহিতা রমণীর চিত্র ‘লাচাক’ পরিতে দেখেন। ইহা হইতে আমরা বেশ বুদ্ধিতে পারিতেছি যে গুলবদন তখন বিবাহিতা। তবে কখন তিনি প্রথম বিবাহিতা হন, তাঁহার পুত্রের কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। হুমায়ুন গুলবদনকে বলিলেন,—“হায় গুলবদন! অধিকাংশ সময়ই আমি তোমার কথা ভাবিতাম। তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার আমার বড় ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ভাগ্যে যখন পরাজয় ঘটিল তখন তোমাকে বে সঙ্গে লইয়া আসি নাই, এইজন্য তগবানকে শত শত ধন্যবাদ দিগছি।” হায়! আকুইকাকে (হুমায়ুন-পত্নী হাজিবেগমের গর্ভজাত কস্তা) সঙ্গে লইয়া গিয়া ক্রি ভুলই করিয়াছি। যদিও সে শিত্র, তবুও তাহার অভাবে আমার প্রাণ কাতর হইতেছে।”

হুমায়ুন এই পরাজয়ের প্রতিশোধ বিচারিত্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কামরান আগ্রার অহুহ হইয়া পড়েন। আগ্রা তাঁহার ভাল লাগিল না। তাই তিনি লাহোরে ফিরিয়া গেলেন। লাহোরে পৌছিয়া তিনি হুমায়ুনকে বারংবার লিপিরা পাঠাইতে

লাগিলেন—“আমি বড় অসুস্থ, আমাকে দেখিবার কেষ্ট নাই; অতএব সৎস গুল-বদনকে পাঠাইয়া দিলে আমার। এত বখেট উপকার করা হইবে।” হমায়ুন গুল-বদনকে ঘাইতে বলিলেন। গুলবদনের কিন্তু কামরাণের নিকট ঘাইবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। হমায়ুন বৈষম্যের জ্ঞাত হইলে কি হয়, গুলবদন তাঁহাকে আপনায় সহোদর অথকাও অধিক ভালবাসিতেন। গুলবদন অতঃপর অসুস্থ হইয়া হমায়ুনকে বলিলেন,— “তাই। ইহা আমার কখনও ধারণা ছিল না যে, তুমি কোন কালে আমাকে তোমার গল হইতে বঞ্চিত করিবা। কামরাণের নিকট ঘাইতে বলিবে। আমি কখনও মাতা, ভগিনী বা আত্মীয়স্বজন—বাহাদুরের অঙ্কে প্রতিপালিতা হইয়াছি—তাঁহাদের ভাঙিয়া ফোথাও ঘাইতে পারিব না।” হমায়ুন তাঁহাকে বুঝাইলেন,—“ভগিনী। তোমার সাহচর্য্য ভাগ করা আমারও আরদা অতিক্রম নহে; তবে কামরাণ বিপন্ন—তার বার তোমাকে পাঠাইবার ক্ষমতা নাই। পত্র পাঠাইতেছে, আর আমিও বিপন্ন—সিংহাসন লইয়া বিশেষ চিন্তাঘট; এই বিপদ-সাগর হইতে উদ্ধার হইলেই পুনরায় আমি তোমাকে কামরাণের নিকট হইতে লইয়া আসিব।” অবশেষে হমায়ুনের অজুহাতে গুলবদন কামরাণের নিকট গমন করেন।

১৪৪০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কনৌজের যুদ্ধে হমায়ুনের আশা-ভরসা সমস্ত নির্মূল হইয়া যায়। তিনি পরিস্থিতিগতক আশ্রয় বিপন্ন হইতে সক্ষম করিবার ক্ষমতা অধিক

হিম্মতের উপর তাহাদিগকে লাহোর লইয়া ঘাইবার তাঁর প্রদান করেন। এই সময়ে, বিভীষিত হমায়ুন কয়েক বৎসর ধরিয়া মক্কায় মগ্ন হইয়া কতিপয় শিখর অজুহাত হইতে হানাতের পরিস্রবণ করিয়া যে কতদূর দূরীকৃত হইয়াছিলেন, ও কিরূপে মূলতানে শিবিরে দিল্লীর ও হিম্মতের নিকট হামিদাবাদ সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও বিবাহ হয় (১৪৪১ খৃষ্টাব্দ), ইতিহাস-পাঠকের তাহা অবিস্মৃত নাই।

জাগ্রতবিশ্রামে হমায়ুন জ্ঞাতদের নিকট কোনরূপ সাহায্য বা সহায়ত পান নাই। তিনি কাবুলের দিকে গমন করিবার চেষ্টা করিলে, কামরাণ বহু অগ্রিম কাবুলে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা তাঁহাকে বাধা দিয়াছিলেন; বাধা হইত, অনেক কষ্টের পর হমায়ুনই প্রথমে কাবুলে প্রবেশ করেন।

এই সময়ে গুলবদন কামরাণের সহিত কাবুলে গিয়াছিলেন কি না, গুলবদন কোথাও তাঁহার উল্লেখ করেন না; কিন্তু তিনি যে কাবুলে গিয়াছিলেন, পুনরুজ্জীবিত হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়।

গুলবদন কাবুলে তাঁহার পুত্রকল্পা লইয়া গ্রহকক্ষে দিনগুলি বেশ মনের আনন্দে যাপন করিতেছিলেন। তাঁহার কণ্ঠ পুত্রকল্পা ছিল, তাহা নিশ্চিত বলিবার উপায় নাই। তবে তিনি তাঁহার গ্রন্থে সদাৎ ইয়ার নামে এক পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। কামরাণ যদিও অপরাপর আত্মীয়দের উপর অসহ্যবাহার করিয়াছিলেন, কিন্তু গুলবদনের উপর কখন হিংসাভাব করেন নাই। তিনি গুলবদনকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন।

কামরাণ হিন্দালের হস্ত হইতে কামাচার কাছিয়া লইলে, হিন্দাল নববন্দী হইয়া কাবুলে বাতীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। সেই সময়ে (১৫৪৩ খৃষ্টাব্দ) গুলবদনের সহিত হিন্দালের একবার সাক্ষাৎ হয়।

কিছুদিন পরে হুমায়ুন পারস্ত হইতে শাহের দৈনন্দন লইয়া ভারতভিত্তিমুখে লুপ্ত-রাষ্ট্রের উদ্ধারের জন্য অভিযান করেন। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনি কামরাণের নিকট হইতে কাবুল অধিকার করিয়া লন। গুলবদন লিপিগ্রহণে,—“পাঁচ বৎসর দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে আবার আনন্দাশ্রিতা হুমায়ুনকে পাইয়া আনন্দ-নাগবে জাশিলার।” ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়, ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কামরাণের নিকটেই ছিলেন।

পরাজিত কামরাণ অগত্যা হুমায়ুনের বশতা স্বীকার করিলেন বটে; কিন্তু ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে যখন হুমায়ুন আশ্রায়ীর সহিত কাবুল ত্যাগ করিয়া বাদশাহানাভিমুখে অভিযান করেন, সেই অবসরে তিনি কাবুলে উপস্থিত হইয়া বিমাতা দিলদারের গৃহ দখল করেন ও তাঁহাকে অন্ত্র বাইতে বলেন। এই সময়েও কামরাণ গুলবদনের প্রতি কোনরূপ দুর্য্যবহার করেন নাই। তিনি গুলবদনকে বলেন—“তুমি এখানে অবস্থান কর,—মনে করিও ইহা তোমার আপনাত গৃহ।” উত্তরে গুলবদন বলিয়া-ছিলেন—“কেন আমি এখানে থাকিব? যেখানে আমার মা থাকিবেন আমিও সেখানে থাকিব।” তৎপরে কামরাণ স্বীয় সাহাব্যের জন্য গুলবদনকে স্বামী

পিতার খাঁকে পত্র লিখিতে অহরোধ করেন। গুলবদন তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, এ খাক্স তিনি স্বামীকে কোন পত্র লেখেন নাই; এক্ষণে যদি তিনি তাঁহাকে পত্র লেখেন, তাহা হইলে তাঁহার হত্যাকর না আনার দফন তিনি এই পত্রকে জালপত্র ভাঙিতে পারেন। আরও বলিলেন, “যদি যখন অন্ত্র অবস্থান করেন, তখন পুত্রের অবানীতে আমাকে পত্র লেখেন—বৎস পত্র লেখেন না।” গুলবদন কামরাণকেই পত্র লিখিতে বলিলেন। এই সময়ে গুলবদনের বয়স ২৫ বৎসর ছিল। কামরাণ অবিলম্বে ষোল্লিবেস্ত নিকট তাঁহার ভ্রাতা মেহেদীজুলতানকে পাঠাইলেন ও তাঁহাকে সম্মুখানে কাবুলে আসিবার জন্য অহরোধ করিলেন।

গুলবদন তিরমিদই হুমায়ুনকে প্রার্থনা সহিত জালবাসিতেন। তিনিও ইহার বহু পূর্বে বহবার স্বামীকে বলিয়াছিলেন—“তোমার অপরাধের ভাতারা কামরাণের স্বপক্ষে থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু, গুলবদন করুন, কামরাণের দলভূক্ত হইবার চিন্তা বৃথাকরেও হেঁদ তোমার মনে উদয় না হয়। সাবধান! সইয়দার! সাবধান! কখনও যেন সয়াদী হুমায়ুনের দল ত্যাগ করিও না।” স্বীয় মনোমধ্যে পক্ষী অহরোধ-বাণী জাগরক থাকায় তিনি কামরাণের নিকট গমন করেন নাই।

হুমায়ুন বশসংগ্রহ করিয়া পুনরায় কামরাণের হস্ত হইতে কাবুল উদ্ধার করেন। তীত কামরাণ হুমায়ুনের নিকট মার্জনা বিদ্যুৎ করিয়া ভবিষ্যতে তাঁহার সহায়তা

করিতে প্রতিশ্রুত হন। সরগজুর্ন হুমায়ুনও তাঁহাকে অতিরিক্ত ক্ষমা করিয়াছিলেন। এই সময়ে (১৫৬৮ খৃঃ) তলিকান নামক স্থানে হুমায়ুন,—হিম্মাল, আক্কাবী ও কামরাণের সহিত সৌভাত্য হারী করিবার জন্য এক মিলন-উৎসবের আয়োজন করেন। সম্রাট প্রতাপের বলেন—“লাহোরে গুলবদন গ্রামই বলিত ‘আমার বড় ইচ্ছা, আমি চারি সাত্যাকে একবার একত্রে দেখি,’ আজ আমরা প্রাতঃকাল হইতে সকলে একত্রে রহিয়াছি এবং ভগবান করুন আমরা দুটি দিনই দেখে এইরূপ আত্মীয়তা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিতে পারি।”

এই সময়ে বেগমদের আগ্রহাতিশয্যে হুমায়ুন,—গুলবদন, হাসিরা, মাচুচাক্ বেগম প্রভৃতিকে লইয়া হুগলী পার্শ্বভালতা “মিহান” দেখিবার জন্য কোইডামান্ উপত্যকার পদম করিয়াছিলেন। বসন্তকালে পার্শ্বতা প্রদেশে” মিহানের হুগলে চারিদিক আধোমিষ্ট হুইয়া উঠে। (১)

দুর্লভ কামরাণ হুমায়ুনের বিবর্তে অস্ত্র ধরিবার জন্য গোপনে পুনরায় সৈন্ত-সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। হুমায়ুন এই সংবাদে হিম্মালকে লইয়া তাঁহাকে দমন করিবার দামলে পুনরায় অভিযান করেন। কামরাণ ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে নবেম্বর রাজিযোগে “কিরবার নামক স্থানে হুমায়ুনের শিবির আক্রমণ করেন। হিম্মাল বীর প্রাণদান করিয়া হুমায়ুনের প্রাণরক্ষা করেন।

হিম্মালের এই আকস্মিক মৃত্যু গুলবদনের ছদ্মে শেলবিন্দু করিয়াছিল। তিনি

শোকাচ্ছাদে বলিয়াছিলেন,—“জানি না কোন্ নির্দয় নিষ্ঠুর এই নিরপরাধ যুৱককে তাহার ভগবান দিয়া হত্যা করিল। হায়! ভগবান যদি ইহাঙ্গ পরিকর্ত্তে আমাকে বা আমার পুত্র সদাং ইহাঙ্গ বা বাবী বিজিতকে লইতেন!”

ইহাঙ্গ পর কামরাণ নানাহানে পলায়ন করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি বন্দী হইয়া সম্রাটের নিকট আনীত হন। হিম্মালের মৃত্যু-বৃত্তান্ত ও আপনায় প্রতি হুগলবহারের প্রতিশোধ লুহা হুমায়ুনের ননোমধ্যে আগরক থাকিলেও তিনি কামরাণকে বন্দী রাখিবার পরামর্শ দেন, কিন্তু পার্শ্ববর্গের প্ররোচনার বীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি তাহাকে ক্ষম করিয়া দিবার আদেশ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঈশ্বরের বিবর্ত, ব্রিটিশ মিউজিয়াম-সম্বন্ধে এই “হুমায়ুন-নামা”-খানি হইতে গুলবদন সম্বন্ধে ইহাঙ্গ অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই।

১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর হুমায়ুন খিচোরবার হিম্মান অধিকার করিবার জন্য কাবুল ত্যাগ করেন ও ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই তিনি আপনাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। শেংমগুলের পাঠাগারের সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জাহাঙ্গীরী হুমায়ুন প্রাণত্যাগ করেন।

পিতার মৃত্যুর পর আকবর সম্রাটপদে অভিষিক্ত হন। এক বৎসর বরিয়া শত্রু-দিগকে পরাজিত করিয়া তিনি কাবুল হইতে পরিবারবর্গকে আনয়ন করেন।

১৫৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে সম্রাট-অননৌ হারিদাখান, গুলবদন সলিমা, হাজি ও গুলচিরা বেগম মানসকাটে রাজশিল্পিরে নিকট আসিয়া পৌছিলেন। আকবর আত্মীয়-স্বজনকে মুখমর্শনে আনন্দোৎসব হন। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহার সকলে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। ভারতে আগমন হইতে (১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে) তীর্থভ্রমণে বহির্গত হওয়া পর্যন্ত গুলবদনের কোন ঘটনা আমরা ইতিহাস সাহায্যে জানিতে পারি না।

• গুলবদন এক্ষণে ৫০ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি মুলশমান রমণীর পবিত্র হজরত পালনের জন্য মক্কা বাইতে সজ্জা করিলেন। আকবর পেশবে এই প্রস্তাবে আপত্তি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে তাঁহাকে সম্মতি দিতে হইয়াছিল। যে সমস্ত রমণী গুলবদনের সহিত তীর্থযাত্রা করেন, আবুলফজল তাহার একটা তালিকা দিয়াছেন। গুলবদনের সহিত বাহারা মক্কা গমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার আত্মীয়ের সংখ্যাই অধিক। আমরা নিম্নে কয়েকজনের নাম উদ্ধার করিয়া দিলাম :—

১। আকবর পত্নী সলিমা মুলতান বেগম

২। আত্মীয়, বিধবা-পত্নী মুলতানাম্

৩। কামরাণের দুইকস্তা—হাজি ও গুলজার বেগম

৪। উম্মু কুৎসন—গুলবদনের পৌত্রী

আকবর এই তীর্থযাত্রার দীর্ঘতম যাত্রা-কালেক্ষ হইতে প্রবান করেন। কয়েকজন বিশ্বস্ত আত্মীয় এই তীর্থযাত্রাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর কতেপুর শিকার হইতে যাত্রা করেন। আকবরের বিত্তীয় পুত্র মুরাদের উপর বেগমগণকে সম্রাট পর্য্যন্ত পৌছিয়া নিবার ভার প্রাপ্ত হয়; কিন্তু গুলবদন শিশু মুরাদকে নানাক্রমে বুঝাইয়া এই ভ্রমসাধ্য কার্য হইতে নিবৃত্ত করেন। যাত্রাগুলোর মধ্যে নানাক্রম বাধা বিপত্তি ঘটায় সমুদ্র-যাত্রা করিতে তাঁহাদের কিছু বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর তুরিখে তাঁহার যাত্রা করেন। আরবে পৌছিয়া (৪) গুলবদন তিন বৎসর অভিবাহিত করিয়াছিলেন এবং চারিবার ‘হজ’ করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। (৫)

১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে বনাইনীর বহু খাজা ইহাযার উপর বেগমগণকে ভারতে ফিরাইয়া আনিবার ভার অর্পিত হয়। ফিরিয়ার কালে তাঁহাদিগকে বড়ই নিশ্চয় হইতে হইয়াছিল। এডেনের নিকট তাঁহার পোত-ঘর হওয়ার ৭ মাস অতীত কষ্টে অভিবাহিত করিতে বাধা হন। অধিকন্তু তথাকার শাসনকর্তা তাঁহাদিগের সহিত

(৪) বনাইনী বলেন, তাঁহার ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে (১৬২২ হিঃ) আত্মা ত্যাগ করেন। সম্রাট তাঁহাদের এক বৎসর বিলম্ব হইয়াছিল। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে (১৬৩০ হিঃ) ৫ সাফার, অর্থাৎ অষ্টম মাস) তাঁহার মক্কা পৌছান।

Muntakhab-ut-Tawarikh—Al-Badaoni—W. H. Lowe, Vol. II. p. 216

(৫) লো সাহেব (Badaoni—Vol. II—217) বলেন, গুলবদন,—কারবেলা, কাস, মাদাম ও মক্কা এই চারি তীর্থস্থানে গমন করিয়াছিলেন।

ভাল ব্যবহার করেন নাই। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দক্ষিণ হইতে একখানি জাহাজ আসিতে দেখিয়া গুলবন্দ, তুগিভার ও খাঙ্গা সকলে পরামর্শ করিয়া একখানি নৌকা উহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। উক্ত জাহাজখানি বাহাজিন্দ খানজের (৬) ছিল;— তিনি মক্কা গাইতেছিলেন। বাহাজিন্দ বেগমদের নিকটে আসিয়া সমস্তই জানিলেন। ইহা হইতে আশঙ্ক্য ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে গুলবন্দ প্রভৃতির এডেনে থাকিবার সংবাদ পাইতেছি। সম্ভবতঃ বাহাজিন্দই বেগমদের ভ্রমতে কিরিবার লজ্জা জাহাজের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

কোন সময়ে বেগমেরা এডেন ত্যাগ করেন, অথবা, কখন তাঁহারা হুগাটে পৌছান, তাহা নির্দ্ধারিতরূপে বলিবার উপায় নাই। হুগাটে তখন অতিরিক্ত ভূটিপতন ও সম্রাটের কার্যে অবস্থার দ্রুত পুনরায় তাহাদের আগ্রাস আলিতে বিশেষ ঘটনাছিল। বাহাজিন্দে আসিয়ায় সুখে বেগমেরা আজমীরে চিত্রিত ফকীরদিগের পুণ্যলীলা দেখিতে গিয়াছিলেন। হুমায়ুন সেলিমও তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার লজ্জা আজমীরে উপস্থিত হন। সম্রাট খানওয়ার নামক স্থানে বেগমদের সহিত মিলিত হন। বদাউনীর মতে এক বৎসর গুলবন্দকে এডেনে থাকিতে হইয়াছিল।

তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে (১৯০ হিঃ) হিন্দুস্থানে পৌছান।

কতপূর্ব শিক্ত্রীকৃত পৌছিয়া গুলবন্দ দেখিলেন—বিশদরী পাদরী এতদ্রোহাভিত্তিকুমারি সুভাষকে প্রত্যাশ্রয় নানা নীতিকথা বুঝাইতেছেন। ইহাতে গুলবন্দ ও হামিদা বিব্রত হইয়া নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। (৭)

আগ্রাস উপনীত হইয়া গুলবন্দ প্রান্তক "হুমায়ুন-নামা" রচনা করেন। ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ বাহা দেখিয়াছেন ও বিশ্বস্তরূপে বাহা অবগত হইয়াছেন, তাহাই লিখিত করিয়াছেন, কিন্তু ইহাই তাহার প্রথম রচনা নহে। তিনি ইহা ব্যতীত বহু পায়ত্ত কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন। মীর মাদী দিরাঙ্গী "ভাঙ্গিমারাতুল-খাতীনে" তাহার একটি কবিতার এই দুইটা চরণ উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন :—

"হয় পরী কি ও বা আশক্ খুঁ ইয়ার নিত।

তু ইয়াবীল যবান্ কি হেচ অজ উমর বহ-খুঁ-দার নিত।"

অর্থঃ—

"প্রেমাস্পদেও প্রতি অনাসক্ত্য হে পরী!

তুমি বড়ই-মুর্থ—

"ভ্রুভাগিনী। নিশ্চয় জানিও সারাজীবনে

তুমি কখনও সুখী হইবে না।"

ইহার পর গুলবন্দনের জীবনে বাহা কিছু ঘটনাছিল, তাহা অতি সাদৃশ্য। আবুল-

(৬) বাহাজিন্দ গুলবন্দদের ভায় আকবরের আদেশে "হুমায়ুন-নামা" রচনা করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের মননশীল্য পরিদর্শক ছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট হুমায়ুন লখন্ধে বহু জাতীয় ঘটনা বাহাজিন্দের পৃষ্ঠক আছে।

(৭) Father Goldie's "First Christian Mission to the Great Mughal." (Dublin : Gill & Co. 1897)

ফজল গির্জায়েছেন—তাঁহার বয়সক্রম এখন ৭০ বৎসর; সেই সময়ে তাঁহার দৌহিত্র নহমদ-ইরান কোন অস্ত্রার কার্য করিয়া সস্ত্রাটের বিরাগভাজন হইলে বেগমের মধ্যস্থতায় তিনি নিষ্কৃতি লাভ করেন। হমাদানের জার আকবরও গুলবদনকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন ও ভক্তি করিতেন। বাদশাহ বহবার তাঁহাকে বহুশ্রী সম্বোধন উপহার দিয়াছিলেন। (৮) পরে গুলবদন ও সলিম কুমার সেলিমের হইয়া বাদশাহের নিকট মার্কানাতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সস্ত্রাট বর্ণনাই সম্বধানী, ত্যাগ করিয়া অস্ত্র শিবির সংস্থাপন করিতেন, তখনই বীর জমী হামিদাবাদ শিবিরের সন্নিকটে গুলবদনের তাঁর সন্নিকটে হইত।

গুলবদন বহু দিনখান করিয়া অক্ষর কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি মুকদ্দেস দরজা ও অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করিয়া ছিলেন।

এদিকে তাঁহার 'গণাদিন' কুরায়ে আনিল। ৮০ বৎসর বয়সক্রমকালে ১৬০৩

খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কয়েকদিনের অরে তিনি শয্যাগ্রহণ করেন।

হামিদা গুলবদনকে বড়ই প্রভাভক্তি করিতেন। গুলবদনের শেষ-সময় পর্যন্ত তিনি তাঁহার পাশে ছিলেন। হামিদা আদর করিয়া নানানীকে "জিউ" (অর্থাৎ কোঠা ভগিনী) বলিয়া ডাকিতেন। বহুদিন তিনি দেখিলেন—রোগিণীর চক্ষে স্রুতার করাল ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে, তখন তিনি একবার ঘেঁষাঘেঁষা ডাকিলেন,— 'জিউ' কোন উত্তর না পাইয়া পুনরায় ডাকিলেন,— 'গুলবদন'। মুহূর্ত্তে গুলবদন ঘরে ঘরে চকু উদ্বীলন করিয়া বহুদূরে গেলেন, "আমি মরিতেছি, তুমি চিরজীবনী হও।" তারপর সমস্ত নিশ্বাস।

আকবর পিতৃবসার মৃত্যুতে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রতি পক্ষান প্রদর্শনের জন্য যত তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া বহুদূর পর্যন্ত গইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার আস্ত্রার শাস্ত্রের জন্য বহু সংকার্যে অর্থব্যয় করেন।

ঐতিহাসিক বন্দোবস্তাধ্যায়

সন্তান ঈশ্বরের বিকাশ ও প্রচার

বেদ ও উপনিষদে নিগূর্ণ অমৈত ব্রহ্মতত্ত্বই প্রধানভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে, সন্তান ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই। বেদের বেদ-বাদের মধ্যে ঈশ্বরতত্ত্বের স্থান থাকিলেও বেদের দেবতা ব্রহ্ম-ভাবেরই দ্বারা অসু-

প্রাণিত। সুতরাং প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্বের বিকাশ, তত্ত্বে হইয়াছে বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

বেদোপনিষদের নিগূর্ণ ব্রহ্ম, জানীর্হই বোধগম্য ও সাধনীয়—ইহা সাধারণের

অনধিগম্য। সাধাবশেষে জ্ঞান ও সাধনাদি
জড়ই সত্ত্ব ঐশ্বরের বিকাশ। উক্তের সহিত
‘শিবের’ প্রত্যক্ষগোচর সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না।
এই জড়ই শিবের সাক্ষ্য নিরাসকরূপে
ঐশ্বরের অধীন হইয়াছে। তত্ত্ব নূতন
ভাবে এই বিশ্বনিয়ন্তা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে
বলিয়াই ইহার এই নাম হইয়াছে। ‘তত্ত্ব’
শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ ‘প্রধান’।
নূতন ঐশ্বরতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রোক্ষ
প্রাপ্ত হওয়াতেই ‘তত্ত্ব’ আপনায় প্রোক্ষ
বাচক এই নাম ধারণ করিয়াছে। এই
নাথের দ্বারা ‘তত্ত্ব’ বেদ হইতে আপনায়
‘বাহ্য্যাই’ প্রোক্ষাপন করিতেছে ‘বলিয়া মনে
করা যাইতে পারে।

‘তত্ত্ব’ শিবেরই উক্তি। হুতরাং শিবই
যে তত্ত্বের প্রধান দেবতা, তাহা বৃত্তিতে
পারা যাইতেছে। এই শিবই সত্ত্ব-ঐশ্বরের
প্রথম বিকাশ। শিবের ‘ঐশ্বর’ ‘ঐশ্ব’
‘ঐশান’ (১) প্রকৃতি মন্যসাধারণ নামেই
ইহার প্রমাণ বিভবান রহিতঃ।

সেদের দেবতার ঐশ্বরতত্ত্বের সূচনা দেখা
যায় বলিয়া আমরা পূর্বে বলিয়াছি। সেই
দেবতাব্যবস্থার পূর্ণ পরিণতি যেমন শিবে
হইয়াছে—এইভাবে ইহার ঐশ্বরতত্ত্বের পূর্ণ
পরিণতিও তাহাতেই হইয়াছে। তিনি যেমন
একদিকে ‘দেবদেব’ বা ‘মহাদেব’—তেমনিই
অপরদিকে ‘মহেশ’ বা ‘মহেশ্বর’।

শিবের ধ্যানমন্ত্র ও নমস্কার-মন্ত্রের
আলোচনা করিলে, বেদোপনিষদের ব্রহ্ম-
ভাবকে মূল করিয়াই যে তাঁহার ঐশ্বর-

তাবের বিকাশ হইয়াছে—তাঁহা পরিষ্কার
রূপেই বৃত্তিতে পারা যায়। এখানে আমরা
উক্ত মন্ত্র দুইটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

‘‘ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং ব্রহ্মতপসি নিমিত্তং।

তীক্ষ্ণপ্রোবতঃপং তদ্বাক্যমোক্ষসাধনং।

পরতপস্ব্যাকীতিহস্তং অগস্ত্যং।

প্রতীক্ষীতঃ সমস্তাংস্ততমমহর্ষিবর্ষাঃ

কৃতিঃবিমানা বিখ্যাতাঃ বিশ্ববীজং নিমিলিতম্

হং পঞ্চদশং ত্রিনেত্রীং’’

‘‘নমঃ শিবার শঙ্কর্য কার্যজহতেষু।

নিবেদ্যামি চাম্বানঃ ত্বং পতিঃ পরমেশ্বর’’।

ধ্যানমন্ত্রে ‘শিবাধ্য’ ‘বিশ্ববীজং’ স্বরূপে
শিব, ‘বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের’ অর্থেই মূলতত্ত্বপেই
বর্ণিত হইয়াছেন। নমস্কার-মন্ত্রে ‘কার্য-
জহতেষু’ বলিয়া উল্লিখিত হওয়ার তিনি
শিবের ‘আদি-কার্য’ রূপেই বর্ণিত হইয়া-
ছেন। এইগুলি যে ‘আদি-তত্ত্ব’রূপে তাঁহার
নির্ভরণ তাবেরই বর্ণনা তাহা অবশ্যই স্বীকার
করিতে হইবে। ধ্যানে তিনি ‘মহেশ’ ও
নমস্কার-মন্ত্রে ‘পরমেশ্বর’ নামে আখ্যাত
হওয়ার নির্ভরণ ঐশ্বর-তাবের কথা হইতেই
যে তাঁহার সত্ত্ব ঐশ্বর-তাবের বিকাশ
হইয়াছে এবং এই সত্ত্ব ঐশ্বর-তাব, যে চরম
ঐশ্বর-তাব, তাহা পরিষ্কারই বৃত্তিতে পারা
যাইতেছে। তদীয় ‘বিশ্বেশ্বর’, ‘বিশ্বাধ্য’
‘বিশ্বস্তর’ প্রকৃতি নামে সেই চরম ঐশ্বর-তাব
আগত স্পষ্টরূপে প্রকটিত।

উপরে শিবকে আমরা সত্ত্ব ঐশ্বরের
পূর্ণ বিকাশ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি
—একদিকে ঐশ্বরের সত্ত্ব সকলের পূর্ণ

(১) নতুন: পদগতি শিব: মূল: মহেশ্বর:।

ঐশ্বর: সর্ব ঐশান: পরতপস্ব্যাকীতিহস্ত: অগস্ত্য:

যে বর্ণনা পাওয়া যায়, উহা 'শম্মানীরঃ
সমস্তাংস্ততঃস্বীয়গণৈঃ' বলিয়া শিবের ধানে
শিবের যে বর্ণনা আমরা প্রাপ্ত হই, তাহাওই
ঐতিহ্যনি বলিয়া মনে হয়।

বাইবেল-ধর্মের আবর্ষে মহামুদীর ধর্ম
গঠিত। সুতরাং মহামুদীর ধর্মও যে
শিবের ঐশ্বর্যাদর্শই অল্পমত হইবে, তাহা
সহজতঃ অনুমিত হইতে পারে।

শিব ও দুর্গাই তত্ত্বের প্রধান দেবতা।
মহামুদীর ধর্মের পরমেশ্বরের 'অল্লাহ' নাম
যে দুর্গার নাম হইতেই গৃহীত, অনুসন্ধান
করিলে তাহার শিবের প্রমাণটী আমরা
পাইতে পারি। প্রসিদ্ধ ধর্মোক্তিদান-প্রণেতা
অধ্যাপক টিল্ প্রদর্শন করিয়াছেন যে,
আরবের প্রাথমিক ধর্মে দেবতার নাম
'অল্লাহ' ছিল। এই নাম ও আসিরীয় দেবতার
অল্লাহ নাম একই নাম।

"In Arabia her name, as Professor
Tiele shows, was Allah (৩) where she be-
came the lightmoon or the heavenly
ship of light. This is the same name
as that of the Assyrian goddess Allat,
meaning the unwearied one." The Ruling
Races of Prehistoric Times by J. F.
Hewitt Vol I. p 23.

দুর্গার এক নামও 'অল্লাহ' পাওয়া যায়।

তাহার ধানে তাহাকে "অর্ধেকপূজিতপেথরা"
বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং তিনি
"শক্তিধর্মপীঠী"। সুতরাং আরবদিগের
আদি দেবী 'অল্লাহ' যে "ভরুণক্ষীর চক্র-
ধর্মপীঠী" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং আসিরীয়
দেবী যে "মুশাতিস্তরপা" বলিয়া বর্ণিত
হইয়াছে—তাহাতে আমরা দুর্গারূপেরই
ঐতিহ্য দেখিতে পাইতেছি। বিশেষতঃ
'আশিরীয়' অহর নামেরই অপভ্রংশ বলিয়া
নির্দেশিত হইয়াছে। অথচ শিবদুর্গা অহর
দ্বিধর্ম পরম দেবতা বলিয়াই পরিচিত।
সুতরাং 'অল্লাহ' যে দুর্গার অল্লা নামেরই
অপভ্রংশ তাহাতে আরই সন্দেহ থাকিতেছে।

ইজিপ্টের 'ঈশ্বর' দেবতার নাম শিব
এবং দুর্গার ঈশা ও ঈশ নামের যোগদ্বারা
গঠিত বলিয়াই যোব হয়। কালীপুষ্টিতে
উভয়েরই সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যায়।
সু্য দেবতা ওদিসিসেও আমরা শিবের
সু্যবাহনেরই নির্দর্শন দেখিতে পাই।

এই প্রকারে শিব সগুণ ঐশ্বর্যতাবের
বিকাশের প্রমাণ যে কেবল ভারতীয়
ধর্মেই পাওয়া যায়, তাহা নহে, পরন্তু বাইবেল
কোরাণ ও হিন্দু প্রাধান আদিত্য ধর্মও
পাওয়া যায়।

ঐশ্বর্যচক্র চক্রবর্তী।

(৩) Tiele—Outline of the History of Ancient Religions Primitive Arabian Religion,
pp. 63-64.

অকুলে

(গর)

সেদিন কোটে পৌছিতেই স্থলীর সঙ্গে দেখা । স্থলী কহিল, “লাইব্রেরিতেই চলেছেন ত ! একটি মজ্জা এনেছি—এক খানা দরখাস্ত করতে হবে।”

“এস” বলিয়া অগ্রসর হইলাম । স্থলী আমার অনুসরণ করিল ।

লাইব্রেরীর সম্মুখেই “একটি” গ্রীলোক বসিয়া ছিল । স্থলী তাহাকে কহিল, “এস গো, উঠে এস ।” গ্রীলোকটি উঠিয়া আসিল ।

চেষ্টায় বসিয়া গ্রীলোকটির খানে চাহিলাম,—তাহার পরণে একখানি রঙ-করা মলিন বস্ত্র, দুখটোমটার ঈষৎ ঢাকা । গ্রীলোকটি স্থলী, বরষে কিশোরী ।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি তোমার নাম, বল ।”

স্থলী কহিল, “সারনা বাড়ী-উলির নামে নামিল । কাল রায়ে সে ওকে ধরেছে, ও ভেবে’গে ওর গহনা-পত্নর কেড়ে নিয়ে ওকে রাস্তার বার করে বেছে ।”

স্থলীকে চুপ করিতে বলিয়া গ্রীলোক-টিকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি—?” সে কোন কথা কহিল না । স্থলী কহিল, সে পতিতা । আজ দুই বৎসরমাত্র সে এ পথে পা দিরাছে ; নাহলে পূর্বে সে গৃহস্থ-ঘরেরই বধু ছিল ।

আমি স্থলীকে বাধা দিলাম, কহিলাম, “তুমি চুপ কর । ওর নামিল আমি ওর

মুখ থেকেই শুনেচি চাই । তুমি ততক্ষণ যাও, একখানা আট আনার ট্যান্স আর দরখাস্ত লেখবার কাগজ কিনে আনো । হ্যা, তাহলে আমার কোটা ?

স্থলী কহিল, “ও বড় গরম, মশার আগুন পুখো ফো দিতে পারবে না, একটু দখা করবেন ।”

তখন আমার জুনিয়ারির বগ ; ফোরের কোন নির্দিষ্ট মাত্রা ছিল না । আট হইতে শুরু করিয়া একটা টাকার হাত পাতিয়া লই । আমি কহিলাম, “চারটে টাকা চাই ।”

স্থলী কহিল, “তা দেবে’খন । তবে টাকারটা এখন হাতে নেই ! আমি এসে বিয়ে বাবু । আমি তার জামিনও রইলুম ।”

স্থলীর জামিন মঞ্জুর করিলাম । প্রায়ই সে চাই-চারিটা ‘কেন্’ আনিয়া দেয় ; ফোরের টাকার কখনও বাকী পড়িয়া থাকে না ।

আমি কহিলাম, “আজ্ঞা, তাহলে এর নামিলটা এখন শুনি ।”

স্থলী চলিয়া গেল । আমি গ্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তোমার নাম কি ?”

বেশ শান্ত নম্র স্বরেই সে কহিল, “সরমু—”

“নামিল তোমার সাধনা বাড়ী-উলির নামে ? তোমার গহনা-পত্নর কেড়ে নিয়েছে,

দিয়ে না—সেইগুলো তুমি উড়ার কবচে
চাও, কেমন ?”

সম্মু কহিল, “সে আর আমি চাই
না।”

— আমি কহিলাম, “তার ঘরের ভাড়া-
টাড়া কিছু ধারো ?”

সম্মু মুখেই সে কহিল, “না।”

আমি কহিলাম, “তবে কি ঘেরেছে
যে নাশি করিতে চাও ?”

সম্মু কহিল, “ঘেরেছে বাটে, কিন্তু
তার গুজ্ঞও আমি নাশি করতে চাই না।”

বিস্ময় হইলাম। ভাল আপন ! কহিলাম,
—“যে একটু কাঁপও ছিল—”এ মত, ও
নয়, তবে নাশিটা কিসের ? আদালতে
এসেছে কেন ?”

আমার সে যবে সম্মু কেমন দরিদ্র
পেল। আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম ;
একটু অশ্রুতিতও হইলাম। তখন তাড়াতাড়ি
বুঝাইতে বসিলাম। নিতের পকেট-পুস্তির
সম্ভাবনায় নহে ; মাহুদেব প্রতি মাহুদেব
যে একটা স্বাভাবিক সদাশুদ্ধতির টান আছে,
সেই টানে ! আমি কহিলাম, “তোমার
ঘেরেছে সে, তবে সে গহনা-পত্নরও কেড়ে
নিরেছে, অগত্যা তুমি গুজ্ঞ তুমি নাশি
করিতে চাও না ! তবে আমার কাছে
এসেছে কেন ? আমি তোমার কি সাহায্য
করিতে পারি, আর কি সাধাযাই বা চাও
তুমি ?”

সম্মু কিছুকণ চুপ করিয়া রহিল, পরে
মুখ টিপে টিপে কহিল, “আমার সে
স্তর দেখাচ্ছে, বলছে, মিথ্যা নাশি করে
সে আমার খেল বাটায়ে। তাই—”

অশীল কাগজ ও ট্যাম্প লাইগ
আসিল। সম্মুর মুখের কথা সুক্ষিণ
লাইগ সে কহিল, “সে সব গহনা-পত্নর
ও আর চায় না। আদালতে এসে বটা
করে সে মকদ্দমা চালাবার সামর্থ্যও হয়
নেই। বাড়ী-উলি মাগি ভারী পাখী।
সে শুকে লাগাচ্ছে, ওর ঘরে কোকেন
ফেলে শুকে ধরিয়ে দেবে, তবে দিচ্ছে করে
পুলিশে খপর দেবে, ও মদ বেচে, এই রকম
কোন ফাসায়ে বেগবে—বুকেছেন ? পাছে
শেষে সব কিছু করে, তাই তাই একটা
কৃতিকারি আশ্রয় করে দিন, মশাহা।”

ব্যাপারটা ভনের মতই সাক্ষর
ফেলিলাম। শতক গৃহমাগতম্ ! কহিলাম,
“তাই বল। বেশ, এখনই দরখাস্ত লিখে
ফেলছি। কিন্তু একটা কথা বল দেখি, আগে।
এম, সঙ্গে তোমার আলাপই বা হল কি
করে, আর কেনই বা তোমার কাশ মাঝে
এমন তাই ও পথে ভাঙিয়ে দিলে ? বল,
সব খুলে বল—সজ্জা করলে চলবে না।”

এত কথা জানিবার আমার প্রয়োজনও
ছিল না। তবে তাহার পরিচয়ে অশীল
যেটুকু ইঙ্গিত দিল, তাহা হইতেই আমার
মনে একটা কৌতূহল জাগিয়াছিল,—এই
হুজুগিনী নারীর অতীত ইতিহাস জানিবার
জন্য একটা অধীর আগ্রহ।

নারী বিধা করিতেছিল। অশীল কহিল,
“বল না, সব কথা খুলে। উকিলের কাছে,
ডাক্তারের কাছে কোন কথা লুপ্তানো
ঠিক নয়। বল সব। শুনে উনি বেশ
শুধিরে দরখাস্তখানা লিখে দেবেন’ধন।”

• সম্মু একবার আমার মুখের পানে

চাহিল—যেখ ডাঙর দুটি চোখে করুণ
কাতর ছুটি, দাফুল নিবেদনে ভরা !

তারপর সফোচ কাটাওয়া দে বলিতে
লাগিল :—

২

“আমার বাপের বাড়ী ছিল, পাড়া-
গাঁয়। তখন আমার বয়স ‘পাঁচ’
বৎসর, বাবার মৃত্যু হইল। মা আমাকে
লইয়া অকুল পাখারে পড়িলেন। বাপ
ছিলেন, গাঁয়ের বাড়ী কুলের মাঠের। বড়
বোনের বিবাহ দিতে ভিটাগানি ঈধা
ঝড়িয়াছিল—বাবার মৃত্যু হইলে ‘পাওনা-
দারেরা’ আগিয়া নাগিল করিয়া দৌ ভিটা
কাড়িয়া লইল। আমার লইয়া মা পথে
বসিলেন।

কলিকাতায় দূর-সম্পর্কে মার এক মাতুল
ছিলেন—তাহার স্ত্রীর শরীর ভাল ছিল
না, মাতুল চাকুরি করিয়া মাসে পঞ্চাশটি মুদ্রা
টাকা ঘরে আনিতে। স্ত্রীর অর্থ, অথচ
সঙ্কলতার অভাবে বামুন প্রাণিবারও
তাহার সামর্থ্য ছিল না, কাজেই মাকে তিনি
লইয়া গেলেন, রান্নিবার মজ। আমিও
অগত্যা পেশখানে আসিয়া পাইলাম। মা
রাখিতেন, বাড়িতে, আমি তাহার মাতুলের
ছেলেমেয়েদের সহিত খেলা করিতাম, গল্প
করিতাম, ক্রমে পড়া-শুনাও আর করিলাম।
তারপর পর চৌদ্দ বৎসর বয়সে আমার
বিবাহ হইল।

স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষ—প্রথম পক্ষের
ভিন্ন-চারিটি পুত্র-কন্যা ছিল; স্বতন্ত্র-শাস্ত্রীও
ছিলেন। আমার দেখিয়া পছন্দ করিয়া
একপেশানি টাকা মাত্র লইয়া পরগৃহ-

সাদিনী বিধবা মাকে তিনি কন্যাদার হইতে
মুক্ত করিলেন। এক পাটের অগ্নিসে স্বামী
কাজ করিতেন, বোজগার বেশই ছিল।

প্রথম বৎসরটা স্বামীর গৃহে মন্দ কাটিল
না। তাহার পুত্র-কন্যার যত্ন করিয়া, স্বতন্ত্র-
শাস্ত্রীর সেবা করিয়া সহজেই সকলের-
মন পাইলাম। কিন্তু অল্পষ্ট মন্দ—দে স্বখ
সহিবে কেন? এক বৎসর পরে স্বতন্ত্রের
মৃত্যু এবং আমাকেও রুদ্ধপার অসুস্থত
হইল। শাস্ত্রী কিছুই দেখিতেন না,
কাজেই সংসার এবং ছেলে-পিলে, সব দেখার
ভার পড়িল, আমার উপর। আমার
বয়স আর—সব নিকটিক সামলাইয়া উঠিতে
পারিতাম না। ছেলেগুলিও ছিল তেমনই,
কিছুতে সব মানিবে না। অনর্থক বাজে
আপার লইয়া তাহারা বিষম উৎপাত বাধিয়া
তুলিত—কাঁদিয়া, চীৎকার করিয়া বাড়ীতক
এলাককে পাগল করিয়া দিত। আমার
গায়ে হাত তুলিতেও তাহারা বিদ্যা করিত
না। কিন্তু তাহাতে আমি কোন দিনই
রাগ করি নাই।

শাস্ত্রীর কিন্তু অসহ বোধ হইল।
একে সত্ত্ব স্বামি-শোক, তাহার উপর পুত্রের
ইদানীংকার ব্যবহার—‘উতাকে’ নিত্যই
অভিষ্ট করিয়াতুলিল। আমার বিবাহের পূর্বেই
স্বামীর চরিত্র-দোষ ঘটিয়াছিল। মস্তপান ছিলই,
তাহার উপর বাহিরের দোষগুলিও বিশদ
বাড়িয়া গেল। স্বতন্ত্র বতদিন বাচিয়া ছিলেন,
ততদিন এস-সবগুলি তিনি সাধ্যপক্ষে গোপন
করিয়া চলিতেন। এখন আর সাধার উপর
কেহ নাই—কাজেই বাড়ীতে আলাও তাহার
বড়-একটা ঘটনা উঠিত না। যদি-বা আসিতেন,

সহজ অবস্থায় নহে। আসিয়া গালি-গালাজ ও অশ্লীল বাক্যেরও একশেষ করিছেন। একে পরস-কড়িতে টান ধরিয়াছে, তাহার উপর এই উপজব, শান্তকীর মত বাগ পড়িল, আমার উপর। কিন্তু আমি কি করিব? আমার কি শক্তি, কি সামর্থ্য আছে যে একটা বহু পুরুষের মতি ফিরাইব। একবার কথাটা পাড়িয়া ছিলাম। স্বামী লাখি মারিয়া উদ্দেশ্য মিলেন, গরিবের ঘরের এত স্পর্শ কেন! গৃহে তাহাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে, এই যথেষ্ট! ফেনে-ঘরের দাঙ্গা করিয়া, বাড়ীর কাজ মারিয়া ঘরের কোণে মুখ ভঁজিয়া সে দামী পড়িয়া থাকুক! ছোট মুখে বড় কথা ধার তিনি ধারিছেন না— স্পষ্টই বলিয়া দিলেন। সে উপদেশের পর আগার আমি কথা কহিব, এত সাহস আমার ছিল না।

শান্তকীর বিরক্তি বাড়িল। ছেলের রাগ আমার উপর বাড়িয়া পোটলা-পুটলি বাধিয়া একদিন তিনি বিদেশে এক আত্মীর বাড়ী চাফিয়া গেলেন। ঘরের কোণে কামিয়াই আমি পড়িয়া রহিলাম। ছেলে-মেয়ে আসিয়া উপজব জুড়িল, ভাত কৈ, খাবার কৈ— কোথা হইতে দিব? গৃহে একটা দারুণ রিক্ততা বিরাজ করিতে ছিল। পরস কোথায় পাইব যে, তাহাদের খাবার কিনিয়া দিব? এখানে মারাও হইল, আরা, ইহার বে শিশু, বড় অসহায়! কিন্তু উপায় ছিল না। ছেলে-মেয়েরা কাদিল, আমার গালি দিল, মারিল, আমি চুপ করিয়া কঠোর মত পড়িয়া রহিলাম। তারপর তাহার চলিয়া গেল। কোথায় গেল, জানি না।

দুইদিন পরে সন্ধ্যার সময় স্বামী আসিলেন—মত অবস্থা। আসিয়াই, তিনি হাঁকিলেন, “বাবী—”

আমি উদ্ভিলান, কাছে আসিলাম, বল-গীমছা আগাইয়া দিলাম! তিনি দেওয়াল ধরিয়া টাড়াইয়া রহিলেন, কহিলেন, “ছেলেগুলো মরেছে না কি? সাড়া পাচ্ছি না যে—!” তবু ভয়ে সব কথা আমি গুলিয়া বলিলাম! কথা সব শেষ করিবার পূর্বেই পারদার একাঙ লাগি পড়িল। দুই দিক্ত আবার নাট, পরারটাও বড় দুর্বল বোধ হইতেছিল, সে লাখি সহ্য করিতে না পারিয়া রকের উপর আমি পড়িয়া গেলাম। সন্ধ্যার সমস্ত আলো আমার চোখে নিরিয়া গেল। আমি চোখ বুজিলাম।

যখন চোখ খেলিলাম, মোৎবার ছোট রক তখন ভরিয়া গিয়াছে! মাথা তুলিয়া দেখি, এক ছোট্টা আমার পাশে বসিয়া আছে। “সে সারদা—”

আমি বাধা দিলাম, কহিলাম, “এই বাড়ী-উলি সারদা না কি?” সরস কহিল, “হী, এই বাড়ী-উলি সারদাই। সে আমার শওর-বাড়ীর কাছেই কোথা প্রাকিত— আরই আমার শান্তকীর কাছে আসিত, আনন্ডটা তরকারীটা মাগিয়া লইয়া ধাইত, আর সময়ে অসময়ে আমার কাছে বসিয়া সাধনা দিত, সহায়ত্বিত্তি আনাটত। সেদিন সন্ধ্যায় সে-ই আসিয়াছিল। আমি উদ্ভিলা বসিতে সারদা কহিল, “আবার কি সেই কাণ্ড না কি?” আমি মুদ হাসিলাম, এ ত আর নূতন কথা নয়! আমার অদৃষ্টের ভোগ এ, কে খতাইবে? সারদার

তীক্ষ্ণ চক্ষু যেন আমার মনের ভিতরটা শাতি-পাতি করিয়া দেখিয়া গইল।

‘সে কহিল, “আজ্ঞা, একেই বলে, বসন্ত ! নইলে এমন লক্ষী পিরতিবে তুমি—বড়শোকের সেরে পড়বার সামগ্রী—সোনা-রূপের গা অমনি কম্বল করবে, এই রূপে রাজার ঘর আলো করবে!” তা না, কোথাকার এক হস্তাঙ্গা বস্ত্রাটের হাতে পড়ে চিরটা কাল মার খেয়েই কাটিল!”

আমি কোন কথা বলিলাম না। আমার আগের মধ্যে যেন অশ্রুর সাগর উপস্থিত উঠিয়াছিল। ‘মার উপর’ হাঙ্গ * ধরিল। আমার মেয়ে-জন্মের কোন সাধ পূর্ণ হইতে দিল না। এমন করিয়াই আমার জীবনটাকে নষ্ট করিয়া দিল! যে স্বামীকে শত্রু দেবতা বলিয়া তাহার পূজা করিতে আদেশ দিরাছে, আমার কদৃষ্টে সেই স্বামী কি এ রাক্ষস মুর্খি ধরিয়া উদয় হইরাছে! রূপ-কথা শুনিয়াছিলাম, রাক্ষস রাজার মেয়েকে বন্দী করিয়া রাখিয়া ছিল। আমার সেদিন প্রথম মনে হইল, আমিই যেন সেই রাজার মেয়ে! কেন নই? এমন রূপ, এমন দেহ, এষ্ট যৌবন,—রাজার মেয়ের ইহার বেশী কি ছিল? এই রাক্ষসের শুণ্ড নিখালে এমনই তাৎপ্রে এসব শুকাইয়া ঘাইবে? ইহার কি কোন আতিকার নাই!

সামান্য নিম্নের মনেই বকিয়া চলিয়াছিল। একটা কথা আমার কানে গেল। সারদা বলিতেছিল, “ঐ ঘোষালদের নোটো। মাগো, যেন কালপেটা। অত টাকার উপর রাজত্ব করা কি মানার? যেমন রূপ, মুখের কথাও কি ছাট, তেমনি!

তা, তার বদ্বাটে হল কি না, অমন সোনার চাঁদ পেয়ালা, আর কুণ্ডলের ঐশ্বা! আর তোরা এই এত রূপ, এত শুণ্ড—হু’লেলা হু’মুঠো খেতেও পাননে, তার উপর এই হেনস্থা, এই মার খোর! এতেই ত বলি, মা, পোড়া বিধেই কি আছে—না, সে মরেছে!”

নাট, সতাই নাট, বিধাতা নাই! কে বলে, বিশ্বের মাথার উপর একজন ভগবান আছেন! আমি ত কিছুই চাহি নাই—শুধু একটু ঘেহ, একটু আরাম! এই স্বামীই—অথ তার নাই থাকিল,—যদি একটু হাসি-মুখে আমার সঙ্গে কথা কহিতেন, একটু মেহের চোখে-চাহিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে—

সারদা নিম্নের মনে তখনও বকিতেছিল। সে কহিল, “এখন কি করবে? ছেলেমেয়ে, শুলোকে ত তাদের মামা এসে নিরে গেছে—*সারা জুড়িয়েছে—এর ত এই দশা। উলোম বরে এমন শুমরে খেঁকি কি করবি, বল! তার চেয়ে চ’, তার মার কাছে তোকে রেখে আসিগে। মার বাছা, মার কাছে জুড়িরে বাচবি। নাহলে এই জন-হীন পুরীতে একলাটি থাকবি কি করে? বিশেষ তার এই বয়স, এই রূপ-নিম্নে—”

এ ছাৎখেও হাঙ্গ রূপ, আর বয়সের কথা! না, আমার পাগল করিয়া দিবে! জ্যোৎস্নার আলোর হাতখানার দিকে চাহিয়া দেখিলাম। মনে হইল, হাঁ, রূপ বটে! নখর নিটোল হাত! চাপার মত রঙ! সোনার চুড়ি কর গাছা আঁটখা বসিয়াছে, সবুজ কাচের চুড়িগুলোতেও কি চমৎকার মানাইয়াছে! কিন্তু হাঙ্গ, বাহার সজ্ঞ এ রূপ, সে তাহা

দেখিগ না। আমি না, বাচিব
কি লটকা'সে মজিগা আছে! মনের কথা
ভাড়িয়া দিও, এমন রূপও কি 'সে বড়িবে
শাইগছে? না, পাইবার আশা রাগে।

সেই রায়েট নিম্নে যে ভট্ট-চারখানা
গগনা-পত্র, কাপড়-চোপড় ছিল, পুঁটুলিতে
বাঁধিয়া সারসার সচিত্র ঘরের বাহির
হইলাম। সারসার কহিল, সে মার মাতুলের
বাড়ী চিনে—ঐ যে ও-পাড়ার। এখনই
সে আমার দেখানে পৌছাইয়া দিবে।
মার কোলে গিয়া আমি জুড়াইয়া বাঁচিব।

পথে বাহির হইলাম। নির্জন পথ।
সারা গারে কাটা দিগা উঠিল। পথে মৃত
চায়েও একটা লোক শুধু "কুলুপি বরফ"
হাঁকিয়া চলিয়াছিল। আমার পথে পথে
কেবলই বাঁধা হাইতেছিল। একটা খোয়ার
হাট লাগিল—বুড়া মাথুলের নগের কাছটা
ছিঁড়িয়া গেল—রগ, অর্থ ঝন্ ঝন্ করিয়া
উঠিল। প্রাণের মধ্যে যেন একটা বিজ্ঞানের
হলুকা ছুটয়া গেল—পা কাঁপিয়া উঠিয়া
উঠিল। আমি সংলে সারসার হাতটা
চাপিয়া ধরিলাম।

৩

"সেই চায়ে—কত পথ ঘুরিলাম, কত
যোড় বাঁকিলাম—কিন্তু একটুও জাতি বোধ
হয় নাই। কেবলই মনে হইতেছিল, এখনই
মাকে দেখিব—মার কোলে পড়িয়া মার
ঘেঁষে জুড়াইয়া বাঁচিব।

সহসা একপাশা একপাশা বাড়ীর
সম্মুখে দাঁড়াইয়া সারসার কহিল, "না বাছা,
রাতে কেমন দিনে-হারা হয়ে পড়েছি।
সে বাড়ী ঠিক ঠাহর করতে পারছি না।

বেশ মনে আছে, আমার মৃত্যু কলি
কিরেতে, লম্বা ধবধব করছে অমনি
বাড়ী—মা-লক্ষী যেন, দাঁতগুলি খেল
হাসছেন! তা রাতে আর কত ঘুরব, মল
বাড়ী—বিশেষ তোমার মত "অলক্ষীকে সঙ্গে
নিরে। শেষে, কি একটা হাঙ্গামে পড়ব?
তার চেয়ে আমার বাড়ীতে আজ থাকো।"
কাল দিনেও যেন তোমার মাকে সঙ্গে নিরে
"আমি এখন—তার পর মারে-কীয়ে একসঙ্গে
যেচো। কেমন?"

"আমি আপত্তি করিলাম। সারসার
বক্তব্যের জেরে বাড়াইয়া কহিল, "তার
উপর জরিন পাওয়া-নাওয়া নেই, আজ
রাতে বহু খেয়ে-খেয়ে আমার বাড়ীতেই
পড়ে থাকো—" সারসার ঘরের
কড়া নাড়িল। ভিতর হইতে এক তরুণী
আসিয়া ঘর গুলিয়া বসিল। আমরা ভিতরে
গেলাম। আমার ঘরে বসাইয়া হাত-পা
ধুইতে বলিয়া সারসার কোথার বাহির হইয়া
গেল। আমি হাত-পা ধুইলাম, কাপড়
কাচিলাম—তরুণী একপাশা বাড়ী দিল—
পরিসর ঘরে আসিয়া বসিলাম; তরুণীর
সহিত আলাপ করিলাম। পরিত্যক্ত জানিলাম,
সে সাংসার সম্পর্কে বোনঝি।

তাঁহার সহিত গল্প-সল্প করিতেছি, এমন
সময় সারসার একটা চেঁতা হাতত ফিরিয়া
আসিয়া কহিল, "নাও, এত রাতে আর
কোথায় কি পাব? বোকান থেকে
গরম লুচি মার আপু বদল কিনে আনলুম,
খেয়ে ফেলো, বাছা।" আমি কহিলাম,
"বোকানের তরকারীটা?"

সারসার কহিল, "সখা মাথুব—তোদের

আবার আঁত বাট বিচার কেন? তা-ছাড়া এ বাহিনীর মোকাম থেকে এনেছি।”

অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইতেছিল। সুচিন্তা মিশ্রের কুরিয়া এক ঘটি গল খাইয়া ছুড়াইয়া বাঁচিলাম। সারদা কহিল, “বন্দী, তোর ঘরে ওকে তেঁ—ছই, আর আমার কাছে তসখন।” পরে আমার দিকে ফিরিয়া কহিল, “বাও গেল, তরে পড়, বাছা,—কাল তোমার ব্যবস্থা করব।”

আমি গিরা বিছানার শুইয়া পড়িলাম। পরদিন সকালেই সারদা বাহির উঠিয়া গেল। “বিন্দু মুহ হাসিয়া কহিল, “তোমার মাকে আনতে গেছে।” সে হাসির অর্থ তখন বুঝি নাই—পরে বুঝিলাম।

সারাদিন সারদা ফিরিল না। আমার মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। খাঁচার পাখীর মতই সারাদিন ছুটফুট করিলাম। মনে একটা ভাবনাও হইল, কেন হার, -ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিলাম! যদি সারদা এখন মাকে খুঁজিয়া না পায়, তাহা হইলে কে আমার সব গেল! দাঁড়াইবার এতটুকু ঠাইও রহিল না যে!

সন্ধ্যার সময় বিন্দু খোঁপা বাধিল, সাবান দিয়া মুখ-হাত ধুইল, আমাকেও টানিয়া শাখার তেল ঢালিয়া খোঁপা বাধিয়া দিল। দীপের আলোক সারদার পথ চাহিয়া আমি পন্থা রহিলাম। অনেক কণ কাটিল। পরে বাহিরে কে ঘরে কড়া নাড়িল। বিন্দু গিরা ঘর খুলিচ্চা দিল। আমি উকি মারিয়া দেখি, সারদা ফিরিয়াছে, সঙ্গে একটি পুরুষ। আমি ধড়মড়িয়া উঠিয়া বিন্দুর ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। সারদা

পুরুষটিকে লইয়া সেই ঘরেরই দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, “সে কোথা গেল?”

বিন্দু কহিল, “ঘরে।”

সারদা আমার ঘরে আসিল, কহিল, “এই যে। দেখ দেখি, এ মাহুঘটিকে চিনতে পারো কি মা? কৈ গো বাবু, এদিকে এস না।” পুরুষটা গটান্ অমনি ঘরের মধ্যে আসিয়া চুকিল। তখন সারদা অতি ইতরের মত কি একটা কথা বলিল। শুনিয়া আমার নাথার মধ্যে রক্ত চেন্চেন্ করিয়া উঠিল। সন্ধ্যা কে ঘেন আগুন ধরাইয়া দিল। আমি ছই পা লিছাইয়া তক্তাপোষে বসিয়া পড়িলাম। সারদা বাহির হইতে শিকল টানিয়া ঘর বন্ধ করিয়া দিল। পুরুষটা তখন আমার দিকে আগাইয়া আসিল, তক্তাপোষের কাছে আসিয়া কহিল, “তোমার নামটা কি,—সবু?”

সে ডাকে ঘেন হারার গাজ হাঁকিয়া উঠিল। আমি চীৎকার করিয়া কহিলাম, “সরে ঘান, আপনি।”

পুরুষটা ভক্তকাইয়া সবিসা গেল। আমি উঠিয়া ঘরের দিকে চলিলাম। লোকটা তখন একটা তাহাশু করিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিল। সবলে আমি হাত ছিনাইয়া লইলাম—কতিন ঘরে কহিলাম, “পবরদার, আমার গারে হাত দেবেন না। তাহলে—”

“তাহলে কি, শুনি”—বলিয়া লোকটা হাসিয়া উঠিল। ছই চোখে আচন আগাইয়া আমি তখন তাহার পানে চাহিলাম—তখনও তাহার মুখে সে ছই হাসি শাসিয়া ছিল! সে আমার কাছে আসিল, আমার আঁচল ধরিয়া টানিল। আঁচল

ছাড়াইয়া সবেগে আমি ভারত উপর
ফাঁপাইয়া পড়িলাম; হুই হাতে অজস্র
কিন-চাপড় বর্ষণ করিলাম লোকটা এক-
কোণে সরিয়া গেল। আমি তখন সবলে ধারে
আসিয়া থাকা দিলাম—ধার ধরিয়া কত
মাড়িলাম। ধাব বন্ধ! আমার মনে চাইল,
পৃথিবীটা যেন ভূমিকম্পের বেগে সহসা প্রচণ্ড
হুলিয়া উঠিয়াছে—পারের তলার মেকেটা
যেন কোন্ পাতালে নামিয়া চলিয়াছে!
কেমন করিয়া ধাঁড়াইয়াছিলাম, জানি না।
ধারে সবলে থাকা দিতে লাগিলাম। সারদা
ধার চৈলিয়া পত্তর মতই আক্রোশে ধীরে
ঢুকল, আমাকে ধরিয়া হুই হাতে প্রবল-
ভাবে ফাঁকানি দিয়া গর্জন করিয়া উঠিল,
“মনে ঠাউরেছিন্ কি, বস্তু ত দেখি!
বর-দরজা সব ভেঙ্গে ফেলিবি না কি,
আমার?”

পৃথকটা ততক্ষণে উঠিয়া ধাঁড়াইয়াছিল।
তাহাকে অশদার্থ বলিয়া গালি দিয়া সারদা
তার দিকে আমার চৈলিয়া দিল। টাল
সামলাইতে পারিয়া আমি পড়িয়া
বাইতেছিলাম, লোকটা হুই হাতে ধরিয়া
ফেলিল। আমার মথার মধ্যে যেন
আগুন জলিয়া উঠিল। আমি তাহাকে
সবলে দংশন করিলাম। চীৎকার করিয়া
সে ভূমে লুটাইয়া পড়িল। তার পর
ছুটিয়া আমি বাহিরের দালানে আসিলাম
—দালানের ধার খোলা ছিল—সেই খোলা
ধার-পথে ছুটিয়া একেবারে পথে আসিয়া
পড়িলাম। পিছনে চাহিবার অবসর ছিল
না। হুই-চারিজন লোক নিজের মনে পথে
চলিয়াছে—আমার কেহ লক্ষ্যও করিল না।

আপাদ-মন্তক কাপড়ে ঢাকিয়া একটা বিকে
আমি চলিতে লাগিলাম।

কে যেন আমার উদ্ভাইয়া লইয়া চলিল।
এ-পথ? ত-পথ ঘুরিয়া দেখি, এ কি, এ
যে সেই পরিচিত ঘর—বামীর ঘর। গা-টা
নিহরিয়া উঠিল। কে আমার এখানে
লইয়া জ্বলিল? কে পথ দেখাইল? আনন্দে
আমার হুই চোপ জলেভরিয়া গেল। বাড়ীর
ধার খোলা ছিল। ধারের সম্মুখেই গাভীটা
ধাঁড়াইয়া ছিল—কোন্ করিয়া সে একটা
নিখাট ফেলিল। আমি উঠানে আসিয়া
পড়িলাম। উঠানের দাহিনেই খোলার ঘর।
এটাই ছিল, বাহিরের বৈঠকখানা। অক্ষকরে
বসিয়া কান্নার কথা কহিতেছিল—আমার
চোখে পড়িল, কলিকার আঙনটুকু। দেখিলে
না বাইরা উড়িয়া যেন আমি অক্ষরের ধারে
আসিয়া পৌছিলাম। চোকাটে পা বাধিয়া
গেল। একজন কহিল, “কে?” এ যে
পরিচিত স্বক! আমার বুকটা ছাঁৎ করিয়া
উঠিল। আমি ভিতরে হুকিয়া গেলাম—
একেবারে সেই অক্ষরের রকে আসিয়া বসিয়া
পড়িলাম। পা হুইটা তখন ধুলার তরা,
মাঝে মাঝে হুইতে পা পর্যন্ত ভিজিয়া
গিয়াছে।

বাহিরে একটা মহা-দোরগোল পড়িয়া
গেল। “কে ও—কে ঘর?” আমায় তখন
জান ছিল না। ক্রমে সে কোলাহল কাছে
আসিল। আমি হুই হাঁটুর মধ্যে মুখ
ভঁজিয়া বসিয়াছিলাম—চোখে একটা আলো
লাগিল। আমি মুখ তুলিলাম। চাহিয়া
দেখি, সম্মুখে—বামী, আমার ঘর!

বামী গর্জন করিয়া উঠিল,

থেকে আবার এখানে মরতে এলি? বেরো, বেরো! বলছি, এখানে থেকে।”

আমি কাদিয়া তাহার হুই পা ধক্কাইয়া ধরলাম; পায়ে মাথা ঘসিয়া, মুখ রগড়াইয়া কাদিতে লাগিলাম। পিঠে হুই-চারিটা লাথি পড়িল। সেদিকে “আমি ক্রন্দনও করিলাম না, শুধু কাতর হয়ে, কহিলাম, “ওগো, আমার সাথো, ঠাই দ্যও, ডাড়িয়ে দিয়ো না—” কঠিন গালি দিয়া বামী কহিল, “হবে না—তা কিছুতেই হবে না—একমাত্রির বেখানে কাটিয়ে এলি, সেইখানে ফিরে যা। এখানে তোর ঠাই নেই, ঠাই নেই।” কাদিয়া মিনতি করিয়া কত বুকাইলাম, ওগো, আমি নিষ্পাপ, নিরুদ্বন্দ্ব—আমার ঘরে ঠাই বিলে কোন ঘোব হইবে না, কোন পাণ নয়! শুধু দুহুঠের ভুলে একবার পথে বাহির হইয়াছিলাম—শুধু সেই লাগ —তাহার কি মার্জনা নাই? ওগো, মার্জনা কর, মার্জনা কর! নহিলে কোথায় লাড়াইব?

• কিন্তু হায়, বামীর মন কিছুতেই গলিল না। চুলের মুঠি ধরিয়া সেই রাজে আবার সে আবার পথে বাহির করিয়া দিল—দিয়া সপথে ঘর বন্ধ করিল। আমার মনে হইল, পুষাপ দিয়া কে ঘেন আমার সমস্ত পৃথিবীটাতে আড়াল তুলিয়া দিল। সব অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল।

সেই ঘরের গোড়ার পড়িয়া আমি মাথা খুঁড়িলাম—কত মিনতি করিলাম, কত কাদিলাম—যুক কাঠের ঘর টলিল না, হেলিলও না। কঠিন অবজ্ঞার নিশ্চল দ্বির চক্ষে শুধু সে চাহিয়া রহিল।

কে “আমিরা হাত ধরিয়া টানিল। ফিরিয়া দেখি, সারদা! আবার! সে দেখে কি মস্ত পড়িল—আমি উঠিয়া বাড়াইলাম। কোন কথা না বলিয়া আবার তাহারই সঙ্গে আসিলাম। আবার সেই ঘর—সেই গারব!

পতঙ্গকে বতই ফিরাও, আঙুন লক্ষ্য করিয়াই সে ছুটিবে। আমার মনে কি ছিল, আমি না, আবার আমি সারদার ঘরে আসিয়া উঠিলাম।

ঘরে আমার টানিয়া ফেলিয়া সারদা গাঙ্গির বস্তা ছুটাইয়া দিল। পাথরের মতট আমি পড়িয়া রহিলাম। এ ঘেন কে কাহাকে কি-সব বলিতেছে! আমার কোন হুঁসও ছিল না। পা হইতে মাথা পর্যন্ত কেবল থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

সারদা কথা শেষ করিয়া একটা লাথি মারিল। কিছু বলিলাম না। পদাহত কুকুরের মতই পড়িয়া রহিলাম। সারদা চলিয়া গেল—বাহির হইতে শিকলটা সে টানিয়া দিল।

তার পর কয়দিন ধরিয়া কি সে যুক চলিল। প্রাণটা ঘেন পতন হইয়া ছিঁড়িয়া বাইতেছিল। কখনও মনে হইত, আর পারি না, বাহা হই, হোক, —যে ঝড় আসে, আশুক—আর বাধা নয়! বাধা দিবার শক্তিও নাই! আবার মনে হইত, না, একবার সমস্ত তেজে অগ্নি উঠি! নারীর সকল শক্তি আগাইয়া তুলি! প্রাণপণ চেষ্টা করি! দেখি, কাহার সাধা, আমার ধরিয়া রাখে! কিন্তু বাইব কোথায়? কোথায় ঘর—? কোথায় ঠাই? কে আমার আশ্রয় দিয়া বাচাইবে?

সাত দিন অনাহারে পড়িয়া মরিলাম।
শরীর দুর্বল—মাথা ঝিম্-ঝিম্ করিতেছে—
কানের কাছে দিবাশ্রান্ত ঘন শব্দেয় ছড়ার
ছুটিয়াছে! আমার মনে হইল, আমি মরিল।
না খাইয়াই মরিব। মরিয়া ইহাঘের সব
দুঃখাশর আগুন খরাইয়া দিব—সব দুর্বাসহার,
সব অপমানের শেষ হইয়া যাইবে।

কিন্তু অদৃষ্টে বাহার নরকের দাহ, সে
মরিলে কি করিয়া! না খাইয়াও মরিলাম
না। একদিন মনে হইল, এই কাপড়ের
আঁচল গলার বাঁধিয়া সব শেষ করিয়া
দিই। গলার আঁচল জড়াইলাম, ফাঁস
করিলাম, টানিলামও। কেমন আতঙ্ক হইল,
আবার সে ফাঁস গুলিয়া ফেলিলাম—মুণ্ডিত
পারিলাম না। মরিবে এ পালের গুরা
বহিরা বেড়াইবে কে?

৪

“আকাশে সেদিন মেঘের বড় ঘন-ঘটা!
পেলা আনায়া দিগ্ধ অলো হাওয়া
হু-হু করিয়া ঘবে দুকিতেছিল। চোপ কর্ণেল
আকাশের পানে আঁবি চাহিয়া ছিল।
মেঘের পর মেঘ আসিয়া জমিতেছে—
আকাশটাব গার ‘ক’ ঘন গাঢ় কালো কালি
শেষিয়া দিতেছে—পৃথিবীর গার যেটুকু
আলো শেলিয়া বেড়াইতেছিল, সে আলোর
যেখটুকু এ কালির ঘন আব্বারে বৃষ্টি সব
মুছিয়া বার! আমার আঁপ ঘেন সে
আব্বারে হাঁপাইয়া উঠিল! এমন সময় সারদা
আসিল, স্বাক্ষর দিয়া কহিল, “কি গো ঠাকরপ,
কাল ত খুব ঘোড়-ঘোড় করালে। বলি,
এমন করে বর্ষা দিবে পড়ে থাকলে চলবে
না, কিন্তু বাছা। তাহলে শখ দেখ।”

এ-ও বলে, শখ দেখ! কোথায় কি শখ
দেখিল, আর? কখনও ঘরের বাহির হই
নাই। নারী-দম্প শইরাউতি, ঘরের মধ্যেই
চিরটে কাল সারা পৃথিবীকে বদাইয়া করনা
করিয়া, আসিয়াছি! আলালার-ধারে দাঁড়াইয়া,
ছায়ে দাঁড়াইয়া, বাহিরের যেটুকু দেখিতে
পাইতাম—যে ক্ষুদ্র গভীটুকু—সেটুকু ত
যুক্ত উপার আলোর উজ্জ্বলসেই তারা
দেখিতাম—ঘেমন নিরাশ, তেমনই উজ্জ্বল
আনিতাম না, সে ক্ষুদ্র গভীর বাহিরে এমন
নিঃস্রু বর্ষার জগৎ শুধু ধ্বংস আর ঈশ্বরের
সুখ! লইয়া দাক্ষ্য হুঁসিয়া বেড়াইতেছে! সে
গভীর বৃষ্টিবে আসিলেই,—সর্বনাশ।

সারদার কথা শুধু পাইয়া ছই চোখে
মিনতি করিয়া আমি তাহার পানে চাহিলাম।
সারদা কহিল, “কিছু মুখে-টুখে নেবে না কি?
এ ত ভাল আপদে পড়লুম, গা।” আমি
কোণ ঘরে কহিলাম, “সে সব কথা আর
আর্থ্য বলো না, সাদী, তোমার পায়ে
পড়ি—” আরও কি বলিতাম, জানি না।
সারদা বাধা দিয়া কহিল, “মুখে কিছু দাও
দেখি, বাছা। এমন করে কি মহাপ্রাণিকে
কষ্ট দিতে আছে? ছি—অবুঝ হইয়া না—”

পিপাসার আকর্ষণে করিয়া উঠিয়াছিল।
সারদাকে কহিলাম, “একটু জল দাও।”
সারদা কহিল, “খালি পেটে শুধু জলটা
খাবে? তা আচ্ছা,—এনে দি, খাও।
জিবটা গলাটা তবু তিচ্ছক। আজ সাত
দিন ত দাঁতে কুটেটি কাটনি।”

সারদা জল আনিয়া দিল—পান করি-
লাম। বুকটা ঘেন জলিয়া উঠিল। লবোরে
পাউটা ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম,

“এ আমার” কি খাওয়ালে, তুমি?” সারদা চাসিয়া উঠিল, কহিল, “তুখু জলটা খাবে— তাই একটু সরবৎ—”

আমি কহিলাম, “কি এ সরবৎ? আমার বুকের মধ্যে ফেল আত্মন জলে উঠছে—পুড়ে যাচ্ছে? এ আমার কি খাওয়ালে, তুমি? কি এ?” মাথাটা কেমন ঝিম-ঝিম করিতে লাগিল, বুমে চোখ চুলিয়া আসিল, আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

যখন চোখ চাচিলাম, বাহিরে তখন প্রলয়-কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। রক্ত জ্বালার বাহিরে অধীর বায়ু ভীম গর্জনে অট্টহাস্ত করিয়া নাচিয়া ফিরিতেছিল। মুহূর্ত্ত হাঁকিয়া বার উদ্ভাসের মত ছুটাছুটি করিতেছিল। আমি উঠিয়া জানালা খুলিয়া দিলাম। জলের ঝাট আসিয়া আমার একেবারে জিহাইয়া দিল। সমস্ত জ্বালা যেন সে ঈশতল স্পর্শে জুড়াইয়া গেল। ঠাণ্ডা জলো হাওয়ার মাঝার চূপ-এমাইয়া দিয়া বসিয়া আমি প্রলয়ের সে ভাবের নৃত্য দেখিতে লাগিলাম।

আবার সারদা আসিয়া দেখা দিল। সে কহিল, “তোমার জন্ত গরম লুচি তৈরী, এনে দি। খানকতক খাও। ছি মা, আমার কথা শোন দেখি,”

আমি আপত্তি করিলাম না—আপত্তি করিবার শক্তি ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। সারদা খাবারের থালা লইয়া আসিল। আমি খাইতে বসিলাম। সারদা বকিতে শুরু করিল, “আহা, তোমার জন্ত মরে শোকটা! সেদিন অত মার-ধোর করলে, উপদ্রব করলে, তবুও মুখে অষ্টগ্রহ

তোমারই কথা গেলে আছে! তারও এ ক’দিন খাওয়া-দাওয়া মুটে পেড়ে! অত টাকার মাহুদ—মনে করলে কত কাসাদ খাদ্যেতে পারত—ত’ কিছু নয়—! সে দিন থেকে তোমার নাম-জ্ঞান মার করে সে বলে আছে।” আমি কোন কথা কহিলাম না। খাওয়া শেষ হইলে সারদা উজ্জিষ্ট পাড়িয়া বিদায় লইল। আমিও তখন বাহিরের সে উদ্ভাস বাতাসে আমার মনের রান ছাড়িয়া দিয়া উদ্ভাস গতিতে চাসিয়া চলিলাম।

আমার ভালবাসে! কেন, ঘোর কি! আমার ত নারী-জগের কোন সাধ, কোন আশাই পূর্ণ হয় নাই। মনে কত-কি যে গড়িয়া আধিয়াছিল। একটা বর্ষের পত্তর হাতে পড়িয়া তাসের ঘরের মতই সে সব কোণার উড়িয়া পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল! নূতন করিয়া সে ঘরটাকে যদি আবার বাধিতে চাহি ত তাহাতে কি ক্ষতি! আমার মনের মধ্যে আগুন জ্বলিয়াছিল। দাঁট দাঁট করিয়া তাহার রক্ত শিখা শিরায় শিরায় নাচিয়া ছুটিয়াছিল। আমার ভিতর হইতে কে যেন গর্জনে করিয়া কহিতেছিল, এ আগুনে প্রলয়-বস্ত্র সাধিয়া তো! সমস্ত বিশ্ব আজ ভোরই-জ্বালা! এ-আগুনে জ্বলিয়া যাক! আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম। তাড়া-তাড়ি এলো চুলটা জুড়াইয়া লইয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম। নিকটেই কোথা প্রচণ্ড হুড়ারে বাজ পড়িল। সারদার জীর্ণ গৃহ সে পক্ষে অনুষ্ঠান করিয়া কাপিয়া উঠিল।

পিছনে কে ডাকিল, “সরবৎ—” চাহিয়া দেখি, সে রাত্রের পুরুষ-বেশী সেই পত্তটা। আমি, কিছু বলিলাম না। আমার মনে

হইল, বলিবার আঙ্গ কিছু নাই। এমন
গের নির্লজ্জ পুরুষের সঙ্গে কথা কহিতেও
স্বপ্না স্বপ্নিল।

তার পর এক-নিম্বাসে কল্পিত ঘরে
অনেক কথা সে বলিয়া গেল। উপজ্ঞানে
গমে কবিতার নাটকে যে কথা কতবার
পড়িয়াছি, বুঝিয়াও যে সব কথা বুঝিতে
পারি নাই—ছাত্রের মতই যে সব কথা শুনা
মন্দের উপর দিয়া ভাদিয়া সরিয়া যাইত—
হেঁয়ালির মতই সেই সব তুচ্ছোপ অর্থহীন
কথা! চুপ করিয়া সব আমি শুনিয়া গেলাম।
গা ছদ্ম-ছদ্ম করিতে লাগিল—এপ্রণে একটা
শিররণ ছুটিয়া গেল। লোকটা বকিয়া শেষে
কানিয়া আমার পায়ে আদিয়া মাথা লুটাইল।
আমি এক দৃষ্টে চোখিয়া রহিলাম। আমার
এই পশ্চের মত হৃদয়ের কোমল পায়ে কি এ
একটা কদর্য সামগ্রী পড়িয়া আছে।

আমার মনে হইতেছিল, বঙ্গ—এ ঘেন্ন
বঙ্গে কি-একটা সুর ভাদিয়া আসিতেছে!
আহা, সে সুর বড় কদর্য! সহসা কণ্ঠে
করম্পর্শ অসুস্তব করিয়া আমি চমকিয়া
উঠিলাম, সজোরে কহিলাম, “পরে যাও—”

সে সরিয়া গেল। তার পর বেগনার,
মিনতির কি সে কাতর অহুনের করিয়া
পড়িল। বাহিরে প্রাণেরে বিকট হুকার
—তাহার সে কাতর অহুনের মধ্যে কোথায়
জুড়িয়া গেল। পরে আমার সব গোল হইয়া
গেল। আমি মুগ্ধিত হইয়া পড়িলাম।

বখন জ্ঞান হইল, তখন বুঝিলাম, ভিতরটা
আমার এক-নিমেষে পাথর হইয়া গিয়াছে।
ছোট বে দীপটি জালিয়া নিজেস ছোট
ঘনটিকে আলো করিয়া রাখিয়াছিলাম,

নিজেরই অসতর্কতার সে দীপ * উল্টাইয়া
দিয়া ভিতরটাকে পুড়াইয়া একগায়ে ছাই
করিয়া ফেলিয়াছি! আমার ভিতরে যে
নারী তাহার সকল গর্ভ, সকল ঐশ্বর্য
লইয়া রাগীর সঙ্গে বসিয়াছিল, একদমে
তাহার সে সমস্ত ঐশ্বর্য কাড়িয়া লইয়া
—তাহাকে একান্তই রক্তা, পথের ভিখারিণী
করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। যে সমস্ত মার
কোণে সমস্ত আদরে বাড়িয়া উঠিয়াছিল,
সে সমস্ত বাসীর গৃহে সমস্ত আদরেও
মরে নাই, গলা-টিপিয়া সে সমস্তকে আমি
মারিয়া ফেলিয়াছি। মানুষ সমস্ত মরিয়াছে;
আম তীব্রের অন্ধ-কঙ্কাল পরিচা এ একটা
শ্রেতিনী আক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

* অশ্রুচোচনা হইল। মনের মধ্যে তীব্র
আক্রোশ জাগিল। ঘরের কোণে মাটির দীপ
জ্বলিতেছিল—তাহারই ক্রীণ আলোর
বেধিলাম, সেই নরপত্নী আমারই পাশে
পড়িয়া অথোরে ঘুমাইতেছে! একটা হাত
আমার গায়ে পড়িয়া আছে। অত্যন্ত কদর্য
দৃশ্য পদার্থের মতই হাতটা তাহার আঁঠুর
অঙ্গ হইতে সরাইয়া দিলাম। তখন বলিয়া
আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম।
সমস্ত পৃথিবীর উপর বিকট রাগ ধরিয়া
ছিল। মনে হইল, এমন একটা অভিশাপ
হদি দিতে পারি আর—এমন শাপ—
উঠুক, সামা বিশ্ব জালিয়া উঠুক। দেখানে বত
সর-নারী আছে, বর-বার সমাজ-স্রাব্য,
পাপ-পুণ্য, আমার এই অবহেলিত অপমানিত
নারীকেস অভিশাপে সে সমস্ত জালিয়া উঠুক
—সমস্ত পুড়িয়া ছাই হইয়া যাক। বাহিরে
ককড় লগে বাজ গর্জিয়া উঠিল। ক্রীণ

জানানার ফাটল দিয়া একটা আণোর ঢেউ ছুটিয়া ঘরে আসিয়া চকিতে নিবিয়া গেল। আঁধার মনে হইল, ঐ ২৫, বিশেষ এক কোণে আজন্ম তপে লাগিয়াছে। আমার অভিলাষ ফলিয়াছে। এখনই সাধা পূর্ণিমা ও অশ্বিনে অশিরা উঠিবে—পক্ষে সঙ্গে এই পত্নীও! আঃ, কি উল্লাস—কি আনন্দ! তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালা খুলিয়া দিলাম। কিন্তু কোথায় কি—। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার। আর কন্ম কন্ম করিয়া সুঘলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। হায়, নারীত! তাহার আঁধার অশ্রুমান। ও-সব কথাই কথা, পাগলেন রচা উপকথা।”

৫

সরযু বলিতে লাগিল, “তার পর পা ঘন একবার পিছলাইয়াছে, তখন এক ধাপ হইতে অত ধাপে গড়াইতে বিলম্ব হইল না। আমারও তাই ঘটিল। সারাদি তখন আমাকে আর বিলম্বকে আনিয়া একেবারে সংবেদন বৃদ্ধি আসিয়া বসিল। ক্রমে আমার মত দুর্ভাগিনী সে আরও জড়ো করিল। জ্বাংর আর তখন চেতনা ছিল না। কোথায় চলিয়াছি, কোথায় গিয়া এ বাজার শেষ হইবে, পরিণামে কি হইবে, সে সব ভাবিবার অবসরও ছিল না। সারাদিন গল্প-গুজব, হাসি-হাস্য ও নিস্তার কাটাইয়া শুষ্কায় সময় সাজিয়া জিজ্ঞাসা দোকানের পণ্যের মতই খরিদদারের মন কাড়িবার চেষ্টায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম। সারাদি দুই হাতে পয়সা স্তুতিতে লাগিল। এমনই ভাবে দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

ক্রমে আমার আক্রোশ জ্বলিল। এই বেহ দিয়া, মনঃ দিয়া, সর্ব্বদা দিয়া বৈ পয়সা উপার্জন করিতেছি, কিছুই তাহার ভোগে আসে না—আর একজন দিয়া আরামে সে সব কুড়াইয়া লয়! না, ইহা ঘটতে দিব না। এ পথে ঘনন আসিয়াছিই, তখন ভোগের পূর্ণ তৃপ্তি সাধিয়া লই! সারদাকে একদিন কথটা বলিলাম—গালি দিয়া। প্রথমে সে তাহা উড়াইয়া দিল। পরে আমি কাজেও ঘনন আমার দৃষ্টি হাড়ে হাড়ে তাহাকে জানাইয়া দিলাম, তখন সে আর কোন শাসন বাকী রাখিল না। অর কাড়িয়া, গ্রহণ করিয়া শোধ তুলিতে লাগিল। কাল রাত্রে দুর্ভাগ হইয়া গিয়াছে। মারিয়া সে আমার সব কাড়িয়া ছুর রাত্রেই পথে তাড়াইয়া দিয়াছে। শালাইয়াছে, যদি কখনও আমি গহনাপত্র জুয়াঘের চেষ্টা করি ত আমাকে সে সহজে ছাড়িবে না—বিখ্যা মামলা সাধাইয়া বেশ অর্থ উপার্জন আনিবে!

কাল সেই রাত্রে পূণে দাঁড়াইয়া আমার ঘোর ভাবিয়াছে। কাল বুঝিয়াছি, আমি কোথায় ছিলাম, কি ছিলাম, আর আর কি হইয়াছি! ঘরেই বাসন। একমাত্র স্থান, পর ছাড়িয়া তাহার পক্ষে বাহির হওয়ার মত পাপ আর কিছু নাই! ঘরের মধ্যে লাখি খাইয়া পড়িয়া মরতেও ঢের হুখ, ঢের গোরব ছিল! কিন্তু বাহিরের এ বাতাস,—না, অসহ্য এ! বাই হোক, আমি আমার গহন চাহি না, কিছু চাহি না—পাছে সে আবার কোন ক্যান্সাস বাধায়, ইহাই আমার ভয়। আপনি তাহারই একট

কিনারা করিয়া দিন। ভগবানঃ আপনার
ভাল করিবেন।”

আমি কেমন ভয়স্বভাবে সরসুর কাহিনী
তিনিয়া চলিয়াছিলাম। আমার মনে হইতে-
ছিল, এ ঘেন একটা রচা গল্প তুলিতেছি।
এ কি সত্য! নালিশ, মর্দুয়া, কাছারি,
হাকিম, কোন কথাই আমার মনে ছিল
না। শুধু কানের কাছে বাজিতেছিল, ছুটিলাম।

বেদনার, এক গভীর হ্র, —এক হুঁতুগিনী
নারীর করুণ আর্তনাদ! অশ্রুমানিত নারীত্বের
তীক্ষ্ণ-হাধাকার।

স্বপ্না বাহিরে কে হুঁকিল, —“কো-ই
নালিশওমালা—” আমার চমক ভাঙ্গিল।
তাড়াতাড়ি সরসুর দরখাত লিখিয়া তাহাতে,
তাঁহার হৃদি করাইয়া হাকিমের এলগানে
না। ছুটিলাম।

ঐশ্বরীস্রোতমোহন সুখোপাধ্যায়।

পাখী বলে চোখ গেল.

ককক রৌদ্র ঘতই কঁঝা, এমন খাসা নীলে মাঝা
আকাশখানার ছাউনি তলে, সবুজকুঞ্জের কোমল ভরুণ
পল্লবেতে আঁধি ঢেকে, হুরটি তুলে অতি করুণ,
পাখী বলে,—চোখ গেল।

বিশাপ-গাখার বন-দুতীর, নাড়ীগুলি অহুতীর
মোড়ড খেয়ে বৃক্ক ঢাংল অশ্রু-রক্ত ফোঁটা ফোঁটা ;
দগ্ধপিয়ে কঁপে ডক্কে হায় শিরা সজ মোটা।
পাখী বলে,—চোখ গেল।

পথের শানে চেরে বঁধুর চোপের কথটি, ঐতি-চতুর।
—গাইছ তুমি নিছক মধুর হুরটি ভেঁজে লতায় পাতায়।
অপার শায়ের পথটি চেরে, আমি কি গান গাইব গাখার ?
পাখী বলে,—চোখ গেল।

চোখের আশার নীচে অলে প্রগটা ; তা-ত কেউনা বলে।
মাটির কথাই ছুটুক গানে, বাঁটিটুক হুরে ঢেকে।
দগ্ধ-কপা বৃক্কে বঁধু, গাঃের পাখী ডেকে ডেকে।
পাখী বলে,—চোখ গেল

ঐবজ্রচন্দ্র মজুমদার

চয়ন

লিওনিডাস আগ্রীভ

কর্তমান যুগে, কব-সাহিত্যের দুইজন বিখ্যাত রচয়িতা আছেন। লিওনিডাস আগ্রীভ ও ম্যাক্সিম গোর্কি। এই দুই জনের ভিতরে, ম্যাক্সিম গোর্কির নাম এখন পৃথিবীর সর্বত্রই প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু, সমধিক শক্তিশালী হইয়াও, আগ্রীভের নাম এখনও দেশ-বিদেশে বিখ্যাত হইবার প্রয়োজনীয়তা বোধ হয় না।

ওরেল নামক স্থানে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে আগ্রীভ, এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যখন কলেজের ছাত্র, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। ফলে, তাঁহার পরিবারবর্গ দারিদ্র্য-পীড়িত হইয়া উঠেন। আগ্রীভ, অতি অল্প মাত্রায় মাটির করিয়া আপনার লেখা-পড়া ও পেট চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজেই আপনার তখনকার অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন :—“সেন্টপিটার্সবার্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কন-বৎসর, দাবিত্যের অন্ধকার যে কি জিনিষ, তাহা আমি ভাল করিয়াই টেন্স পাইয়াছিলাম। আমি সর্বদাই অধার্ত থাকিতাম এবং কখনও-কখনও আমার এমন সময়ও গিয়াছে, যখন আমি উপর-উপর হইদিন কিছুই খাইতে পাই নাই।”

তাঁহার প্রাথমিক সাহিত্য-সাধনা ফলশ্রুতি হয় নাই। পরন্তু, দারিদ্র্যের পাবাগ-তার

ক্রমে তাঁহার উপরে এতটা চাপিয়া পড়িল যে, কোনে তাঁহার দিকার জন্মিল। তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করিলেন। আগ্রীভ বলিতেছেন :—“১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে, আমি নিজের মাথা টিপ করিয়া রক্তপাতের ছুড়িয়া নিক্ষেপ হইয়াছিলাম। আমি আহত হইলাম বটে, কিন্তু মরলাম না। অযোগ্যলোক করিবার সময় আমি আমার সাহিত্য-সাধনার প্রতী হইলাম, কিন্তু, তাহাও নিক্ষেপ হইল। অবশ্য আমি চিকিৎসক করিতে ভালবাসিতাম। চিকিৎসক করিয়া আমি যাহা রোগগর করিতে লাগিলাম,—তাঁহা তবু মন্দের ভাল। আমি কখনোই মুক্তি-চিহ্ন আঁকিলাম। সেগুলির প্রত্যেকখানি পাঁড হইতে দশ কবলে বিক্রী হইল।”

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মস্কো নগরে আইন-ব্যবসা অবলম্বন করিলেন, কিন্তু ভাগ্যদেবী সেখানেও তাঁহার প্রতি নির্দয়তার পরিচয় দিলেন। তারপর, কিছুকাল পরিয়া তিনি খবরের কাগজের রিপোর্টারের কাজ করিতে লাগিলেন।

অবশেষে তাঁহার লেখার উপরে সম্পাদকের দরদ দৃষ্টি পড়িল। তিনি “Was He Mad?” নামক গল্প প্রকাশ করিলেন। এই গল্পপ্রকাশ হইতেই তাঁহার গ্রন্থকটের সমাপ্তি এবং যশের আরম্ভ।

* ভারতীয় বর্তমান সংখ্যায় এই গল্পটির অনুবাদ প্রকাশ করাইয়াছে।

উক্ত গল্পটি, "Problem 'Story'" কঠোরতার উহা এড্‌গার আলেন 'পো'র অনৈশ্বা কীম নহে। এই অল্পত গল্পটির লক্ষ্য পেন্টাটানার্গের মস্তিষ্ক-বিশেষজ্ঞগণ, একটি বিশেষ সত্যর অবিশেষণ করেন। গল্পের প্রধান নায়কের মানসিক অবস্থা লইয়া তাঁহাদের ভিতরে দীর্ঘকালব্যাপী

আলোচনা চলিয়াছিল। চিকিৎসক-সমাজের মধ্যে পরস্পরের মতামতে বিশেষ বিভেদ ছিল। অবশেষে, সাময়িক-পত্রাদিতেও ঐক্য আন্দোলনের ব্যুৎপত্তি হইল। ফলে, তাহা জার্মলেটের মানসিক 'অবস্থা' আলোচনার মত সর্বসাধারণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিল।

এমিল ভার্‌হারেণ্

যে বেলজিয়ম আর প্রভোচের কুরুক্ষেত্র পরিণত হইয়াছে, তাহার সম্মানগণ হুধু দেশতক, সাহসী ও মহাবীর নহে; পরন্তু, তাহাদের উপরে কাব্য-লক্ষীর ককণাও বড় অলম নয়। ভার্‌হারেণ্, রোদেনবাচ্, চার্লস জ্যান্ লাবার্গ, মরিস্ মেটারলিক ও গ্রিগোর লেরর প্রভৃতির মত প্রতিভাবানের কল্পকৃতি হইয়া বেলজিয়ম আর বিশ্বের দৃষ্টিপথে আনিয়া দাড়াইয়াছে। মেটারলিকের নাম পৃথিবীর কে না জানে? আধুনিক কাব্যের দাচ-কিছু হুমকান, দাচ-কিছু হুমকর, ভার্‌হারেণের কাব্যের ভিতরে তাহা প্রাধান্যলাভ করিয়াছে।

উপরে দাঁহার নাম করা গেল, তাহার সন্দেশে যেণ্টের College of Sainte-Marieতে শিক্ষিত হইয়াছেন। ভার্‌হারেণ্ ও রোদেনবাচ্, উক্ত বিদ্যালয়ে একই সময়ে পড়াভনা করিয়াছেন। অগ্রান্ত সকলে তাঁহাদের পর-বৃগের ভ্রাতা। ভার্‌হারেণের জন্ম হয় ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে। আন্ত-ওয়ার্পের পূর্বে, সেল্‌ড্ নদীর তীরবর্তী সেন্ট আম্যাণ্ড নামক গ্রাম তাহার জন্মস্থান

তিনি বৃহৎনৈম বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়া শেষ করিয়া ক্রিস্‌টাস্ নগরে কিছুদিন ওকালতি করিয়া-চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহার সেই আইনের মনোভূমি ভেদ করিয়া অবশেষে



এমিল ভার্‌হারেণ্

কবী-কমলের অমল শোভা ফুটিয়া উঠিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষের প্রতিভা যে কতটা উজ্জ্বল, তাহা লইয়া তাঁহার অনেক কবিতা, জাতি এবং বহু সমালোচক, অনেক সমান্তর একাংশ করিয়াছেন। অজ্ঞাত বিষয়ে কিছুকিছু থাকিলেও তাঁহারের সকলকেই একবারেই এ কথা স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, যাহারা এখন ফরাসী-ভাষায় ভাবপ্রকাশ করেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। একজন সমালোচক এই বলিয়া তাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি “অতীত ও বর্তমান কালের ভাব ফরাসী কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।” আর-একজন কহিয়াছেন যে, তিনি “আধুনিক মহাকাব্য-প্রণেতা কবির মধ্যে সর্বপ্রধান।”

এমন কি টর্স্টায় পর্ষদ,—তাঁহাকে মাতৃভাষা ভাষার অজ্ঞ উদ্যোগীদের দলে ফেলিয়া সাধারণের সমুখে হাত্যাপন করিবার সময়েও—“সম্মানিত নবীন কবি” বলিয়া তাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে বাণ্যকালে বাহ্যিকর ‘ফ্রেমিস’ মাঠ-মহাদুর্ভাগের ভিতরে জীবনযাপন করিয়াছিলেন; এবং একটা বলিষ্ঠ জাতির যে সকল গুণ থাকে তাহা তিনি জন্মকাল হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিও অজস্র একটা প্রবল আবেগে পূর্ণ ছিল। যৌবনে তিনি অমিতব্যয়ীর বাসনাকে সম্পূর্ণ বাদীয়া দিয়াছিলেন। তিনি সকল বিকেই নিজেকে একেবারে অলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিলেন,—সঙ্গীদের ভিতরে, পড়াশুনার ভিতরে, শিল্পের ভিতরে, এমন-কি ক্যান্ডিডা ও পুন-

মুস্তার ভিতরেও তাঁহার একটা উৎকট উজ্জ্বলতা ছিল। তাহার সেই ও মনের শক্তিকে তিনি একেবারে শেষদীর্ঘ পর্য্যন্ত টানিয়া না লইয়া গিয়া ছাড়িতে ন পারেন। তাঁহার এমন একটি আকর্ষণ ক্ষমতা ছিল যাহাতে তিনি চরম উজ্জ্বলতার সঞ্চিত মুহূর্তে নিজের বস্ত্রপের মধ্যে আবাস করিয়া আসিতে পারিতেন। আর তাঁহার ভিতরে সঙ্গীতের যে ঘরমিল পাওয়া যায় তাহা তিনি অনুভূতবে বা আকর্ষণিক ভাবে লাভ করেন নাই। পরন্তু, নিজের এই উজ্জ্বল জীবনের অপ্রিয়তা হইতেই তিনি সে পুস্তকাদি আদায় করিয়া লইয়াছেন।

উজ্জ্বলতা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া তিনি আপনার পারিবারিক-জীবনের প্রেক্ষাপটের ভিতরে মগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার দৃষ্টি আরও গভীর এবং

তাঁহার আদর্শ আরও উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের সর্বকালের ঐহিক ও নিম্নর আকাংক্ষাকে ভারতবর্ষে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—শতাব্দী-পরিবর্তনকালের যুগোপ, ভারতবর্ষের কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাহা আমাদের কাছে ও আমাদের যুগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেখাইয়াছে; তাহা জীবনের সকল অংগের সমগ্র পরিধিকে হৃদয়ভাষে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে; তাহা আমাদের যুগের একটি গীতকাব্যময় ‘বিশ্বকোষ’ রচনা করিয়াছে। দর্শন কখনও কখনও কবি করিতে পারে না বটে, কিন্তু কাব্যের ভিতরে দর্শন থাকিতে পারে। ভারতবর্ষের ভিতরেও তাহা আছে। আমরা কয়েকটি কারণে তুলিয়া দিই—

"জানি ও মন-কথার চেয়ে, ভালবাসা
চেয়ে ভালো। সব বিশ্বাস জানিবার
শৌভাগ্যের চেয়ে বিশ্বাসের কাছে
আত্মসমর্পণ করার বেশি দাম। কারণ,
সকলরকম জ্ঞানের মাঝে স্মৃতিরই
আছে, ব্যক্তিগত অভিমানের জায়গা আছে।
কিন্তু প্রেমের মাঝে সে-সব কিছু নাই।
আছে শুধু বিনয়—মহৎ বিনয়। অনেক
জিনিসের হৃদয়েই জ্ঞানকে একেবারে

খানিচা বাইরে ছেঁ, —অন্ধকারে তাহার
পথরোধ হয়। কিন্তু, প্রেম এবং জ্ঞানের
ভিতরে থাকিলে আমাদের মানস-অবস্থার
সীমারি নাগণ্যের বাধা পড়ে না। জ্ঞানের
সামুদ্রের দলজা বাব বক, "প্রেমের সামুদ্রিক
একেবারে মুক্ত। এমন-কি, বাহ্যিক, গেম-
"জগৎ তাহাও মহৎ হইয়া উঠে। এবং ক্ষুদ্রকে
আমরা মহৎ হইবার বত অবকাশ দিই,
"আমাদের জীবন ততই অলঙ্কৃত হইয়া উঠিবে।"

ভাস্কর টাউবেটস্কয়

শ্রীমন্ত পল টাউবেটস্কয়ের পিতা স্মৃতি
জাতীয় এবং তাঁহার মাতা আমেরিকান।
তিনি অতি সূক্ষ্মভাষ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ করিয়াও
শিখার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিল্প-বিদ্যালয়ে গমন
করেন। আপনায় প্রতিভাভর তিনি চিত্র
ও ভাস্কর্য, —এই উভয়বিধ কলাতেই
পারদর্শী হইয়া যুরোপের সর্বত্রই প্রসিদ্ধিলাভ
করিয়াছেন।

যদিও ভাস্কর্যের প্রতি তাঁহার অধিক
অভিলাষ, তথাপি তিনি যে-কয়পানি ছবি
আঁকিয়াছেন, তাহা প্রথমশ্রেণীর কলাবিশেষ
উপযুক্ত। চিত্রকলায় প্রতি তিনি যদি সেরা
মনোযোগ বিতেন, তাহাচলিলে অনায়াসেই
এ-যুগের সর্বাশ্রেষ্ঠ চিত্র-চিত্রকর সামুয়েলের
বিশ্বব্যাপী হইয়া দাঁড়াইতেন।

টাউবেটস্কয়ের চরিত্রগত মূর্তিগুলির
প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা একেবারে
জীবন্ত। তিনি মনিকলার নির্ধারিত
মৌলিক-মূর্তির একান্ত বিরোধী। "এ-রকম
করিতে হইবে, নহিলে যে-নিয়ম কাল-করা

হইবে" —এ-সব কথাতে তিনি কিছুতেই
আত্মত্যাগ করেন না। যেমন কথিত হইবে,—
যথার্থে প্রাণ-জিনিসটিকে ছুটাইতে পারিলেই
তিনি নিশ্চিত।

আধুনিক যুরোপের বহু বিখ্যাত প্রতি-
ভাষ্যকর নবন মূর্তি তাঁহার ভাস্কর্য-কলার
মর্দা আত্মপ্রকাশ করিয়া অবিনশ্বর হইয়া
উঠিয়াছে। তাঁহার করগতি টলটল, যোগী
ও আনাতোল গ্রাস প্রভৃতির মূর্তি, প্রস্তর-পটে
চিত্রকাল জীবন্ত থাকিয়া আমাদের
বংশধরগণকে আনন্দমান করিলে।

"The Moscow Academy of
Fine Art"-এর একজন প্রফেসরের
আবশ্যক হওয়ারে কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে
আহ্বান করেন। প্রথমটা তিনি এই অজ্ঞাত
মেখাইয়া নারাজ হন যে, —"যখন আমি নিজে
কখনো শিক্ষকের সাহায্য পাই নাই, তখন
আমি পরকে শিক্ষা দিবার কথা স্বপ্নেও
ভাবিতে পারি না।"

কিন্তু, পরে তিনি উক্ত শিল্পবিদ্যালয়ে



ডাউবটমকর কর্তৃক গঠিত তিনটি মূর্তি
 * উপরে—নর্তকী । মধ্যে—কাথিলোমূর্তি । নিচে—বার্গাডার প্রতিমূর্তি ।

কার্যগ্রহণ করিতে সম্মত হন। এষ্ট মত-
পরিণতিবশত কারণে তিনি নিজেই বলিয়া-
ছেন—“১৮৮৭ আমার মনে হইল যে, যুধা
আইনকাহনে ছেলেদের বাতাসিক ক্ষুধা মিট
হইয়া যায়। আমি চেষ্টা করিলে, হয়ত তাঁহা
নিবারণ করিতে পারি। শিল্পশিক্ষালায়ে গিয়া
আমি দেখিলাম, প্রাচীন মুষ্টি প্রকৃতিতে
শিল্পশালাটি এমন ভাঙ্গি হইয়া গিয়াছে যে,
ছাত্রদের আর নড়িবার-চড়িবার ফাঁকটুকুও
নাই। আমি তখন সে-সমস্ত সমাধার
ফেলিবার ইচ্ছা দিলাম। ছাত্রদের বলিলাম,
তাহারা যদি ক্ষমতার প্রকৃত সম্মানহার
করিতে চায়, তবে আদর্শের জন্য একে-
বারে যেন প্রকৃতির কাছে যায়। প্রাচীন

মুষ্টি-প্রকৃতির বদলে, তাহাদিগকে আমি
কৌশল আদর্শ দিলাম এবং তাহাদের
তাৎপৰ্য্য কথা নিয়া আর আমার মাপা
বাধাইলাম না।”

পরিণামটা খুব চমৎকার হইল। টাউ-
নেটবকর যখন প্রবেশের পরীক্ষা করেন,
তখন তাহার ছাত্রসংখ্যা ছিল, পঞ্চাশজন।
একবৎসর পরে দেখা গেল, ক্রমে তিনজন
মাত্র ছাত্র আছে।

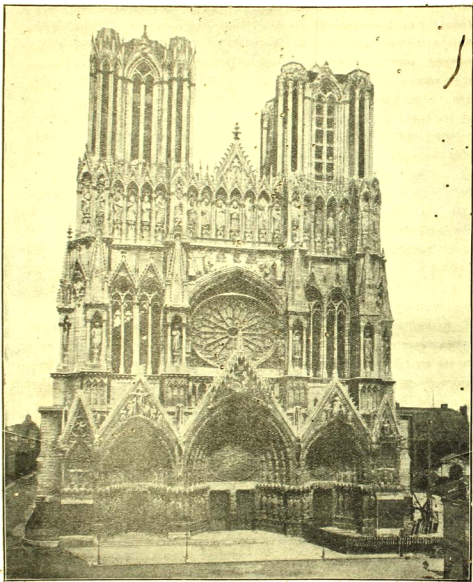
কিন্তু টাউনেটবকর চাহতে কিছুমাত্র
দুঃখিত না হইয়া, আমদানিই হইলেন।
কারণ, তিনি বুঝিলেন যে, নীচ-ভাগ গিয়া
কৌশলই অবশিষ্ট আছে।

রিম্‌সের মন্দির

রিম্‌সের মন্দির আজ ধ্বংসস্থাপে পরিণত।
যুরোপের মধ্যযুগের একটি অবিচল শিল্পের
নমুনা আজ ছত্রবেশী বর্ষারতীর কবলে পড়িয়া,
কামানের গোলায় খণ্ডবিখণ্ড এবং অগ্নিশিখার
অঙ্গারে পরিণত হইয়া গিয়াছে। অনেককে
বলিতে শুনা যায় যে, রিম্‌সের মন্দির আবার
মেরামত—এবং দরকার হয়ত, আবার নূতন
করিয়া গড়া হইবে। হইতে পারে তাহা সম্ভব।
কিন্তু, সে নূতন-গড়া মন্দির পুরাতনের একটি
হুগল নকল হইবে মাত্র। একালের কোন
মিস্ত্রী, সেই নব সংস্কারের ভিতরে পুরাতনের
প্রাণবন্তটিকে ফুটাইতে পারিবে না। মধ্যযুগ
যাহা দিতে পারিত, বিজ্ঞান যুগ তাহা দিতে
পারিবে না। পরন্তু, মধ্যযুগে আর আসিবে
না।

* এষ্ট মন্দিরের সঙ্গে ইতিহাসের অনেক
অভীত-কাহিনী লুপ্তভঙ্গুর মত জড়ান আছে।
করাস্ট-ইতিহাসের বহু বিচিত্র সমালোচ,
ইহার খিলান-করা ছাত্রের তলায় অভিনীত
হইয়াছিল। ফ্রান্সের রাজকন্যা ইহারই
ছাত্রতলে ঝড়াইয়া, মুকুটধারণ করিতেন।

অনেক সমালোচকের মতে, গোপিক
মন্দিরগুলির মধ্যে রিম্‌সের মন্দিরই সর্বশ্রেষ্ঠ।
রিম্‌সের কারুকাণ্ডের ভিতরে ত্রয়োদশ শতাব্দীর
পূর্ণ-বিকসিত রচনা-ভঙ্গী পাওয়া যায়।
মধ্যযুগের প্রধান গির্জাগুলি সব একই-রকম
দেখিতে। খৃষ্টির ধর্মমণ্ডলীর ক্রিষ্ণ-পদ্ধতি
অনুসারেই সেগুলি তৈয়ারি হইত। এ
হিসাবে রিম্‌সের মন্দিরের বিশেষ কোনও
নূতনত্ব নাই। কিন্তু, রিম্‌সের সঙ্গে অন্যান্য



•
রিসেমের মন্দির

মন্দিরগুলির তুলনা চলে না। কারণ, মধ্যযুগের অন্যান্য মন্দির শতাব্দীখানো পরিশ্রমের ফল। তাই তাহাদের ক্রমোন্নত বৈশিষ্ট্য মধ্যযুগের নানা রচনাতন্ত্রীর নীতি দেখা যায়। আকালকার মত, উক্ত মন্দিরগুলি কোন নির্দিষ্ট 'প্লানে' গঠিত হয় নাই। শিল্পীরাও, এই পরিবর্তনকে সুকায়ুত চেষ্টা করে নাই। কিন্তু, রিম্‌সের মন্দিরে একশ বিভিন্ন রচনা-তন্ত্রীর ছাপ পাওয়া যায় না।

রিম্‌সের মন্দির বরাবর অসমাপ্ত আছে। মধ্যযুগে ইহার রচনা-কার্য সমাপ্ত হইবার অবকাশ পায় নাই। বারো অসমাপ্ত ছিল, তাহা সমাপ্ত করিবার জন্য পরযুগে কোন চেষ্টাও হয় নাই। বেনীস ভাগ, ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে আন্তন লাগিরা, ইহার চূড়াগুলির উচ্চতা গোদব ধর্য করিয়াছিল।

ভাল লেখার কায়দা

গদ্য-রচনার কার-কোশলে ব্যালম্যাক্ আপেক্ষা ফ্রুবেয়ার বে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ব্যালম্যাক্ অত্যন্ত অমনোযোগী লেখক। তাহার গল্প একেবারেই ব্রহ্মী নহে। ভাষান্তরিত হইলেও তাহার রচনার ক্ষতি হয় না।

কিন্তু ফ্রুবেয়ার গল্পের মাঝে গীতধ্বনি ফুটাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। যেখানটিতে যেমন সাঝে, অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত তিনি ঠিক তেমনি শব্দটি বাছিয়া বসাইয়াছেন। পাঠকেরা শ্রবিত-ছুইতে পারিবেনা, এমন সুকানো ভাল-লব-ছন্দে তিনি তাহার গল্পের ছয় বাঁধিয়া দিতে চাভিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইরূপ বলা হইত যে, 'লজ হইবে কিছাপ? না, ছন্দ গল্পের মত।' কিন্তু, ফ্রুবেয়ার গল্পকে তখনই ছন্দের বলিয়া মানিতেন, যখন তাহা কবিতা না হইয়াও, ছন্দের গল্পের মত হইয়া উঠিত।

কবিতার মত গল্প রচনার জন্য তাহার যে চমৎকার পদ্ধতি ছিল, লেখকমাত্রেই

তাহার অনুসরণ করা উচিত। তিনি বাহা লিপিতে, আপনি উচ্চবরে তাহা পাঠ করিয়া আপনিই অনুভবন—কোথাও ছন্দভঙ্গ, কিংবা নীরস মানির সমাবেশ, কিংবা শব্দভাঙ্গা শব্দ ব্যাচত হইয়াছে কিনা!

"মোপাশা বলিয়াছেন, "ফ্রুবেয়ার, লেখা কাগজগুলি চোখের অধুপে দৃষ্টি-রেখায় জুলিয়া ধরিয়া, কহুবে তর দিয়া, আন্তে আন্তে ভীতুববে পড়িতে ছক করিতেন। তিনি কান পাতিয়া আপনার গল্পের ছন্দলীলা অনুভবন। পরস্পরের সহিত জড়িতধ্বনি বা এমন অস্ত-কোন খুঁজি তাহার কান এড়াইয়া গেল কিনা, তাহা বুঝিবার জন্য মাঝে মাঝে তিনি থামিয়া ঘাইতেন। অহুগ্রাস উঠাইয়া দিতেন। দীর্ঘ পংক্তির মধ্যে মধ্যে কমা বসাইতেন।"

ফ্রুবেয়ার নিজে বলিয়াছেন যে, "শাল-প্রাণের অহুগ্রাস হইতে পারিলে ব্যাকের সার্থকতা। বাক্যের দ্বারা তখনই ভাল, যখন তাহা চেষ্টাইয়া পড়িতে পারা

বার। খাপখাপে লেগা পদ ঐ পরীক্ষার টিকিতে পারে না; তোমার বুকে তাহা পাখরের মত চাপ দিবে, তোমার বৃক্কের স্পন্দনকে তাহা বাধা দিবে,—এবং, এইরূপে, তাহা প্রাণশীল হইয়া পড়িবে।”

সকল লোকেরই মনে রাখা দরকার যে,

যখন চোঁচাইয়া পড়া বার, ভাল গম্ভীর ভাবে উপভোগ করা বার। চার্ণস ল্যান্ডও বলিয়াছেন, “তুমি নিজেকে শ্রোতা রূপে কল্পনা করিয়া লইয়া, বাহ্যিক উচ্চ, তাহা আবৃত্তি করিয়া যাইবে।”

শ্রোতের মূল

(২৬)

কালীতারার খোঁকাকেও বাঁচাইয়া রাখা গেল না।

তাহার চিকিৎসা সেবা শুভ্রা ঔষধ পথ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবার অজ্ঞত করে দিন ধরিয়া বিপিনকে অষ্টগ্রহর মালতীর কাছে—কাছেই থাকিতে হইতেছিল। খোঁকা মারা গেলে মালতী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। বাড়ীতে কেহ তাহাকে একটি সাহসবাক্য বলিবে না জানিরা বিপিন মালতীর কাছেকাছে থাকিয়া বই ভোগাইয়া গল্প করিয়া তাহাকে সাহস দিবার চেষ্টা করিতেছিল।

গিগি বিপিনের এইসব অনাস্থি কাণে দেখিয়া একদিন হরিবিহারীকে বলিলেন—তুমি ত কিছু দেখবে শুনেবে না। বিপিন ত ছোট বোঁদর বোনটির কাছ-ছাড়া একদণ্ড হয় না; এখনো তার নিয়ে না দেখা ভালো হচ্ছে না।

হরিবিহারী একখানা চিঠি দেখাটরা বলিলেন—বিশ্বকর্ণোত্তর হরিশব্দে এই

চিঠি লিখেছেন; মাঝ মাঝেই ঘরের বিটম দিতে চান। সেই একটা দিন আছে, সেই দিনই বিয়ে হয়ে যাক, কি বল?

—হ্যাঁ, তা আর বলতে, শুভ কর্ণে আর বিলম্ব করা নয়। ভালো এক আপদ এসে জুটেছে বাড়ীতে।

* হরিবিহারী বলিলেন—কতবার ত বলছি দাও না ঐ আপদ যাঁড়ে মূলে পূব করে চুকিয়ে।

—বাগরে! তা কি হবার জো আছে, তা হলে ছেলেও দেশত্যাগী হবে।

—হ্যাঁ: অমন সব বেটাই দেশত্যাগী হয়।

—না না, তুমি বিপিনকে জান না। দুরন্ত একশত্রু। ওকে ঘেঁটরে কাজ নেই। গিগিরি বিয়েটা দিয়ে ফেল, তখন তার জিনিষ সে বুঝে নেবে এখন।

—একবার ডাকাও ত বিপিনকে, তাকে একবার সব বলি।

সেইখান দিয়া বিনোদ একটা গুরগোণ কৈলে করিয়া লাকাইতে লাকাইতে যাইতে

ছিল। গিরি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—
ওরে ও বিনো, তোর দাদাকে ডেকে দে ত।

বিনোদ খরগোশের মতন তিন লাফে
গিয়া বিপিনকে ডাকিয়া আনিল।

বিপিন আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কেহই
কোনো কথা বলিলেন না। অল্পক্ষণ
অপেক্ষা করিয়া বিপিন বলিল—আমাকে
কি ডেকেছিলেন।

তখন হরিবিহারী বলিলেন—হ্যাঁ,
বলছিলাম কি সমস্ত দিন বাড়ীর মধ্যে
বসে বসে কি ক'র, একটু আধটু জমি-
জমির কাজক'র দেখলেও ত হয়।

বিপিন বলিল—আপনি বললেই দেখতে
পারি। কিন্তু সে কি সুবিধা হইবে?
আমি কারো অজ্ঞার লজ্জা করে চলতে পারিব
না। আমার জমিদারীর ভার দিলে আমি
দেওয়ান থেকে মুছারী পর্যন্ত সব চোর-
ভুলোকে জঙ্গ করে তবে ছাড়ব। জমি-
শাসনের নামে যে গরীবের ওপর অত্যাচার
সে আমি কিছুতেই হাতে দেবো না।
এই সমস্ত ক'মতা আমার দিলে, আমি
জমিদারী হাতে নিতে পারি।

—সে পরে যখন যেমন হবে বোঝা
যাবে। এখন স্কুল ত কর। কাল থেকে
কাছারীতে বেণ্ড।

বিপিন বলিল—বে আচ্ছো।

বিপিন চলিয়া ঘাইতেছিল, হরিবিহারী
বলিলেন—ঝিহুকপোতার হরিশ্চবাবুর মেয়ের
সঙ্গে তোমার বিয়ের ঠিক করেছি। ২ই
মাঘ একটা দিন আছে, সেই দিনেই
বিয়ে হবে। তোমার কি চাই না-চাই
দেওয়ানজিকে একটা কর্দ করে দিয়ে।

বিপিন আশ্চর্য হইয়া বলিল—আমার
বিয়ে? এত শিগগির?

—হ্যাঁ! তাতে হয়েছে কি? তুমি এমন
ভাব দেখালে যেন তোমার কাঁশির প'র
শোনানো হল।

বিপিন বলিল—আমি ত এখন বিয়ে-
করতে পারব না।

—কেন? এর মধ্যে ক'টিন ব্যাশারটা
কি? পুরবাহুজমে পিখতকাঁওর লোক
যে কাছটা করে আসছে, তুমিই বা সেটা
পারবে না কেন? তোমার বিয়ে করতে
হবে।

—বিয়ে আমি করব, কিন্তু ঝিহুকপোতার

•

—কারণ?

—সে মেয়ে ত'নেছি বড় ছোট।

—আরে ও কি চিরকালই ঐ রকম
“ছোট পাকবে নাকি? ছোট মেয়েই বড়
হয়,” না, একেবারেই বড় মেয়েই মাতৃগর্ভ
থেকে জন্মিষ্ট হয়? আমি হরিশ বাবুকে
কথা দিয়েছি। তোমাকে তাঁর মেয়েকেই বিয়ে
করতে হবে।

বিপিন দৃঢ়বরে বলিল—আ আমি পারব
না।

বিপিনের একবার মনে হইল বলিয়া
ফেলে যে সে মালতীকে বিবাহ করিলে।
কিন্তু তাহার প্রতি মালতীর মনের ভাব
কি'রূপ, মালতী তাহাকে বিবাহ করিতে
রাজি হইবে কি না, তাহা ত ঘাটাই
করা হইল না। সুতরাং সে সমস্ত তাহার
দমন করিতে হইল এবং সেই সঙ্গে এ
সমস্ত তাহার মনে উঠিল যে শীঘ্রই

মালতীর অভিমত জানিয়া। লইতে হইবে। আর কোনো কথা না বলিয়া বিশিন সেখান হইতে প্রস্থান করিল। হরিবিহারী ও গিল্লি বিশিনের আচরণে অবাক হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কয়েক পরে গিল্লি বলিলেন—ও পাগলের কথা তুমি ভনো না, সব ঠিক করে কেলগে। অর্কমেরে ওকে বিয়ে করতে হবে।

হরিবিহারীর আহত অভিমান মনের মধ্যে গর্জন করিতেছিল। তিনি বলিলেন—হাঁ, যাট দেওয়ানসিকে বলিগে সব ঠিকঠাক করতে।

হরিবিহারী বহির্বাটীতে প্রস্থান করিলেন। অলক্ষণের মধ্যে দেশময় রাষ্ট্র হইয়া গেল এই নাব বিশিনের বিয়ে।

আর ত সময় নাই। বিয়ের আগেই তেঁদের ডাড়াডাড়া পড়িয়া গেল। কয় কাঠা চালের লাড়ু হইবে, কয় মণ হলুদ কোটা হইবে, কে পিড়িতে আলপনা দিবে, কে ছিরি গড়িবে, বিয়ের সময় কে কি লক্ষণ পাইবে, ইহারই আলোচনায় অন্তঃপুর সয়-গরম হইয়া উঠিল। গিল্লি চাংকার করিতে লাগিলেন—এই ডাক একবার জ্ববন সরকারকে, জিনিবের ফর্দ করে নিয়ে যাক। মটরা গরলায় বাড়ী দুখ দইয়ের বাগনা করে আনুক। বংশী বাড়ীতে কীর করবে। মাছ কোটবার জন্তে পাটমৌ-পাড়ার লোক ঠিক করে আনুক। বিদেশিয়া হাড়ীর বো বেন সময় দিন ধরে এই কদিন এইখানে হাজির থাকে। দাতা হাড়িকে পাতার কথা বলে যে। বেওয়ানসিকে বলে আর

মহলে মহলে পাতা, লকড়ি, ডালা, ইকরির চিঠি করে দেবে। আর দিন নেই যে, চটপট চটপট। বা বা সব, হাড়িরে হাঁ করে কি শুনছিস... কিন্তু বিয়ে নেবে কে? ভট্টাচার্য্য বট্টাচার্য্য বে একঘরে। ওকে বলতে হবে যদি এখন আতের ঘোঁট মিটাই ফেলতে পারেন। তিনি বিয়ে না দিলে মন খুঁতখুঁত করবে। যদি একাত্তাই না হয়, ডাটপাড়া থেকে পুত আনতে হবে। সেও ত আর সময় নেই, আগ-কাঠের মধ্যেই সব ঠিক করে ফেলতে হবে যে। আমি একা যে কদিক, দেখি তার ঠিক নেই! কেউ যে দেখে শুনে করে কয়েক মেরে তা ত হবে না, সবই আমার দেখতে হবে।... ও ভাই ছোট বো, তুমি তাই একটু দেখে শুনে করে করবে নেত্র, তোমার কি পরের মতন আড়ট হয়ে থাকলে মানায়? বাও বাও!... এমন দিনে কোথাকার একটা কুড়নে ছেলের শোকে মালতী ঘরে বন্ধ হয়ে রইল, সে বাইরের কাঙ্ক্ষাশ্রমে ত করতে পারত।...

গিল্লির বহুনির বিভ্রাম নাই, ব্যক্ততার অস্ত্র নাই। তিনি দিনের মধ্যে শাফাশবার ঠাকুরঘরে গিয়া গলবজ হইয়া ঠাকুরের দিকে গলাবজাবে চাহিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—হে ঠাকুর, শুভ কথটি জ্ঞাতা-ভালি করে দাও, তোমাকে দ্বতশরমার দেখো, হে নন্দীনাগদন, ডবল ভোগ দেখো।

সকল আনন্দ-কোলাহলের উপরে বিন্দু কোমল কণ্ঠের বাণি বড় উজ্জবে বাজিতেছিল—ওলে বলদার বিয়ে হবে লে,

বো আচেনে লে। টোল বাজেনে লে। মজা হবে, মজা হবে।

বিনোদ লাফাইতে লাফাইতে আগিয়া মনের হাত ধরিয়া খুলিয়া পড়িয়া বলিল—মা! নড়বার বিয়ে হচ্ছে, আমার কবে হবে?

গিরি হাসিয়া বলিলেন—এবার “তুই” মিডবর, হবি, তারপর দাদার মতন ডাগর হলে বর হবি।

বিনোদের আনন্দ উপচিয়া পড়িতে লাগিল। সে লাফাইয়া লাফাইয়া চীৎকার করিয়া “বেড়াইতে লাগিল—ওরে” আমি মিডবর হব রে, বোদিমিকে বিয়ে করতে যাব রে।

বিনি মুখ ফুলাইয়া গভীর ভাবে বলিল—আমালো বিয়ে হবে, বল আসবে ড্যাংড্যাংশো হেইও, ড্যাংড্যাংশো হেইও!

আজ সকলেই আনন্দ করিতেছে। কিন্তু বাহার বিবাহ তাহার মুখ বড় গভীর, বড় কালো, আবার মালের অস্বস্তির মতো। শুভবিবাহের আনন্দের তাহার মুখ এতটুকু হইয়া গিয়াছে। বিপিন পিতার নিকট হইতে চলিয়া আগিয়া লাইব্রেরীতে চলিয়া গেল, মালতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেও পারিল না। ইজি চেয়ারে শুইয়া হাতের কাছে যে একখানা বই পাইল তাহারই মধ্যস্থল খুলিয়া চোখের সম্মুখে ধরিল। সমস্ত বইয়ের পৃষ্ঠাগুলি তাহার নিজেরই মনেরই মতো কালো কালো দাগে ভরা, যেখানে কোনো মৃৎমালা, কোনো অর্থ দৈ খুঁজিয়া পাইল না। বইয়ের পাতার চোখ রাখিয়া এই দুর্দৈব হইতে নিভৃতশান্তির

নাম্যপ্রকার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু কোনোটাটাই তাহার সম্ভবপর বোধ হইতেছিল না। সে চিন্তা করিতে লাগিল—এখন কর্তব্য কি? জীবন-মরণের সমস্তা যখন উপস্থিত তখন লজ্জা করিলে ত আর চলিলে না, নিশ্চয় করিলেও চলিলে না। বলিতে হইবে মালতীকে—সে ভাড়া আমাকে রক্ষা করিবার কেহ নাই। সে যদি স্বীকৃত হয়, উত্তম। নয় ত? ভবিষ্যতের ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ আপনি করিয়া লইবে।... নবকিশোর যদি এখন থাকিত।... গিবি একখানা চিঠি, সে যদি আসিয়া কোনো সহপাঠ করিতে পারে।

বিশিন নবকিশোরকে চিঠি লিখিতে বলিল।

দাদাণ্ডার বির—এতবড় অর্থবরটা মালতীকে না সুনাইয়া মোহিনী কিছুতেই “হির হইতে পারিতেছিল না। আহা! সকলেই আনন্দ করিতেছে আর সেই বেচ্ছারী পনের একটা ছেলের শোকে এককোণে একলাটি পড়িয়া আছে, ইহা মোহিনীর স্বভাবসদর জনমে সহ্য হইতে ছিল না। সে ভাড়াভাড়ি মালতীর ঘরের কাছে আসিয়া একবার উকি মারিয়া দেখিল বিপিন আছে কিনা। যখন দেখিল বিপিন নাই তখন সে হাসিতে হাসিতে মালতীর ঘরের দ্বারদেশে হাত ছড়াইয়া চৌকাঠের ছদ্মকি ধরিয়া পাড়াইল।

মোহিনীর এই আনন্দাতিশয্য দেখিয়া মালতীর হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, মুখ শুকাইয়া গেল। মোহিনীর বিকম্পিত দন্ত-পংক্তির অন্তরালে কি বিষ অশেপা করিয়া

আছে পূজপুটতে মালতী তাহাই, খুঁজিতে লাগিল।

বোহিণী চোপা গলার বলিল—জেনছ, দিদিমণি, স্বথবর!

মালতী নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া ভয়কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—কি?

বোহিণী চোপ মিটমিট করিয়া ঝড় ঝুলাইয়া বলিল—দাদাবাবুর বিয়ে!

—মালতীর মূৰ একেবারে রক্তহীন শাদা মুক্যাবিবর্ণ হইয়া গেল। তথাপি চেষ্টা করিয়া হাসিয়া উৎসাহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—কবে রে? কোথায়?

—এই নউই। কিছুকপোতাঁর বমিদায়ের মেয়ের সঙ্গে। নেয়েট তোমার চেয়েও জুখরী! দাদাবাবুর খুব পছন্দ হয়েছে।

মালতী একথার কি উত্তর দিবে খুঁজিয়া পাঠেতেছিল না। এই আনন্দসংবাদে তাহার মন কেন যে ভাঙিয়া পড়িতেছিল, চোপ কাটিয়া কেন যে জল বাহির হইতে চাহিতেছিল তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। সে জোর করিয়া হাসিয়া বলিল—এমন আনন্দের দিনে আমিই শুধু আনন্দ করতে পারব না। বিধাতা আমার একলা থাকতেই পাঠিয়েছেন।

মালতীর গলা ধরিয়া আসিল। চোপ কাটিয়া জল পড়িবার উপক্রম করিতে লাগিল। তখন তাহার মনে হইতে লাগিল—খুব হোক বোহিণী এখন থেকে, আমি একটু কাঁদিয়া বাঁচি।

এমন সময় বিশিনের পদশব্দ শোনা গেল। বোহিণী উদ্ভবাসে পলায়ন করিল। মালতী চোপ মুছিয়া সংবৃত হইয়া বসিয়া

তাড়াতাড়ি একখানা বই খুলিয়া তাহারই উপর আঁকিয়া পড়িল।

বিশিন ঘরের মধ্যে আসিল। তবু মালতী মাথা তুলিল না। বিশিন ডাকিল—মালতী!

আর রোধ মানিল না। মালতী উজ্জ্বলিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বিশিন ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—মালতী তুমি কাঁদছ কেন?

একথার উত্তর সে কি দিবে? সে কাঁদে কেন সেই যে ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না।

বিশিন মনে করিল কেহ বোধ হয় মালতীকে কোনো কিছু কথা কহিয়াছে। তাহাই স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া সে বলিল—দেখ মালতী, তোমার যে লোকে বাক্য-বহুতা দেয় তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু এ নিবারণ করবার একটি মাত্র উপায় আছে। সে উপায় তোমারি হাতে।

মালতী অশ্রুপ্রাণের মধ্য দিয়া জিজ্ঞাসা পুটতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। বিশিন বলিতে লাগিল—আমি যা বলতে যাচ্ছি তা হরত আমার বলা উচিত হচ্ছে না, তবু না বলে থাকতে পারছিনে। যদি তোমার মনে হয় অজ্ঞান বলেছি, তবে আমার কথা কোরো, আর এ কথা যে আমি বলেছি তা তুমিও ভুলে যেও, আমিও ভুলে যাবার সঙ্গে প্রাণপণ চেষ্টা করব...

মালতী বুঝিতে পারিতেছিল না বিশিন এমনতর তুমিকা করিয়া কি বলিতে চাহিতেছে। সে আবার মাথা তুলিয়া বিশিনের মুখের দিকে চাহিল।

যখন আসল কথা বলিবার সময় আসিল তখন বিপিন খুঁচিয়া পাইতেছিল না কেনন করিয়া মালতীকে নিজের প্রণয় নিবেদন করিব। মালতীর কেনন যেন একটা দূরত্ব আছে তাহাকে কোনো কথা যেন অগোঁচোচে বলা চলে না, তাহাকে • প্রথম জিজ্ঞাসা করিতে যেন বাধে। বিপিন একটু ইতস্তত করিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—আমার বিয়ের কথা হচ্ছে.....

বলিয়াই বিপিন বুকিল কথাটা বড় যেমানন বলা হইল।

মালতীর বৃকে স্বাত করিয়া আঘাত লাগিল। সত্য হইয়া বলিল—তুনিছ।

বিপিন উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—জান কি মালতী, আমি কাকে আমার সহধর্মিণীর উপযুক্ত মনে করি ?

মালতীর নিবাস রুদ্ধ হইয়া বাইরাব উপক্রম হইল; ছদর বুকিয়া কাটিয়া পড়ে। সে স্বক . হইয়া বসিয়া রহিল। বিপিন কণেক ধামিয়া মালতীর কোনো উত্তর না পাইয়া বলিতে লাগিল—মালতী, তুমি কি আমার সহধর্মিণী হবে ?

মালতী নির্বাক নিমন্তল। বিপিন মালতীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সাহস ও আশা পাইয়া মালতীর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া মিনতির স্বরে বলিল—তবে মালতী, তুমি স্বীকার করছ ?

আশার, আনন্দের, প্রেরণার সমস্ত প্রথম স্পর্শে বিপিনের অন্তরের রক্তপ্রবাহ নেনচন করিয়া বহিতেছিল, মনের উত্তেজনায় যেন তাহার সমস্ত দেহের সজীব সজাগ হইয়া

মালতীর একটি স্বীকারবাণী শুনিবার তত্ত্ব একান্ত স্বাকুলতার উদ্বুপ হইয়া উঠিয়াছে। বিপিনের আবেগমত্ত পীড়নে মালতীর করণরব আলোচিত হইয়া ব্যপিত হইয়া উঠিল।

মালতী আশ্রয় আশ্রয় বিপিনের হাত হইতে নিজের হাত সরাইয়া লইয়া বলিল—না।

এই অপ্রত্যাশিত উত্তর শুনিয়া বিপিন তস্তিত অবাক হইয়া গেল। আজ এক নিমেষে একটি না তাহার এতদিনকার পলে পলে সঞ্চিত সমস্ত আশা ছারখার করিয়া দিয়া গেল।

বিপিন • অক্ষুণ্ণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—মালতী, আমার নিবেদনের নিম্পত্তি কি এই চূড়ান্ত, না, আর-একবার তেবে দেখবে ?

মালতীর বোধ হইতে লাগিল যেন • বিপিনের দৃষ্টি হইতে সক্রম পেননাভরা প্রণয় ক্ষরিত হইতেছে, যেন সে শুনিতে পাঠিতেছে বিপিনের কণ্ঠস্বরে তাহার অন্তরের অপ্রত্যাশিত গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে এবং সে যেন সর্বদা দিয়া তাহার আর্জ স্পর্শ অনুভব করিতেছে।

মালতী তাহার বড় স্বড় চোখ দুটি নীরব সাধনার ভরিয়া বিপিনের দিকে তুলিয়া ধরিয়া বলিল—আমি তেবেই বলেছি।

বিপিন আর কিছু বালবার পাইল না। হৃদনেই নিঃশব্দ। উভয়ের মধ্যে যে একটি নিম্নকতার পর্দা পড়িয়া গেল তাহা কেহই সরাইতে পারিতেছিল না। অনেকক্ষণ হৃদনেই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া বিপিন হঠাৎ উঠিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

বিপিন চলিয়া যাইবামাত্র মালতী বাণিন্দে মুখ শুষ্কিয়া শুইয়া পড়িয়া উচ্ছ্বাসিত হইয়া কাদিতে লাগিল। এমন সময় খুঁড়িমা সেখানে আসিয়া অথাক হইয়া গাড়াইয়া বহিলেন। দেখিয়া দেখিয়া বিরক্ত ও আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—মালতী, জ্বমন করে কাদচিস কেন? তুই ত' পেটে ধরিসনি, তবে তার জন্তে এত কান্নাকাতি কেন? তার সকলই কি বাড়াবাড়ি বাপু?

খুঁড়িমার সাড়া পাইয়া মালতী তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া বলিল, যেম এ ব্যক্তি এখনি ক্রন্দনে লুপ্ত হইতেছিল না। খুঁড়িয়া বলিলেন—কায়-না-কারি ছেলে, তাকে হুদিন একটু নেড়েছিস বৈ ত না, তার জন্তে এত কেন রে বাপু! বিপিনের বিধে, চ কালকর্ত্ত করবি, ঘরের কোণে বসে বসে আর রাতদিন কাঁতে হবে না।

মালতী চুপ করিয়া রহিল, তাহার নড়িবাক কোনো লক্ষণ না দেখিয়া বিরক্ত হইয়া খুঁড়িমা বলিলেন—জ্যালা একত্রে মেরে তুই, যা হোক! এমন মেরে আসি বাপের জন্মেও দেখিনি!

এই বলিয়া খুঁড়িমা চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাহার জনমে মালতীর হৃৎকের সমবেদনার আঘাতে যে হৃৎকের তন্ত্রী ঝড়ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে তাহারও চক্ষু দিয়া অশ্রু-ধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

(২৭)

এদিকে বপন এইরূপ কাগ্নাকাতি চলিতেছিল তখন বিপিন জ্ঞানমুখে দ্রুতপদ-ক্ষেপে নিবারণ মুখ্যের বাড়ীর উদ্দেশে যাইতেছিল।

নিবারণ মুখ্যের তখন চতীমত্রে ছেঁড়া মাদুরখানি পিছাইয়া অভিমুখিন একটু ছোট তাকিয়া কোণে করিয়া তাহারই উপর স্থিতিয়া তথাক যাইতেছিল এবং গোবর্দ্ধন নৃতন চিলিমে তামাক ঊঁরিতে ঊঁরিতে বসে-ছিল—হেঁ: তারি ত তোমার ক্যামতা! 'বিপিনে আর কিশরে আমাদের কি না কাল-টাই না করছে,—পথ চলতে গা ছমছম করে, 'তব হর কখন মাথাটা ঘরে শুড়িরে বা ক্যালে। বাপ! সেদিন কি বাঁচনটাই বেচে গেছে!

নিবারণ বলিল—গাড়া না, এর শোধ তুলস তটন আমার নাম নিবারণ মুখ্যের। ভটচাঁবিাদের একঘরে করেছি...

গোবর্দ্ধন বাধা দিয়া বলিল—হেঁ: তারি একঘরে করেছ! ভটচাঁবি আর কিশরে দিগ্নি জমিদারবাড়ী আনাগোনা করছে, এ আত্মার একঘরে কিসের?

নিবারণ বলিল—আহা গাড়ানা, সবুরে মেওয়া ফলে। বিপিনেটা হল জমিদারের ছেলে, ওকে কি সহজে দাবানো যাবে। আগে এই বিরটিতে ভাঙতি দেবো, শিক্ত-পালের দশা করে ছাড়ব। বাছাধিন বিধে করতে গিরে সেপথেন সে-মেঘের বিধে অস্ত্র আরগার হয়ে গেছে; আর অমনি মুখখানি আমসিপানা করে ফিরে আসতে হবে। আমি কিছুকপোতার হরিশবাবুকে চিঠি লিখব যে বিপিনের জাত নেই, ও মোছলমানের ছোঁরা মুরগী খায়; আরো দুটোরটে মূত্ৰাবণ আরকে মাতিরে ভেবে ঠিক করতে হবে, হরিশচাঁটুথো যে হিঁদ, এ শুনে সে ককখনো মেরে দেবে না। তারপর এই স্ত্রী ধরে ওকে

একঘরে করা সহজ হবে। তখন নাশ কিছু আর হৈলের সঙ্গে সুনামে ঠেগা হয়ে থাকবে না। সে ছেগেকে দূর কবে বেবে। এঁ-আমি ক'ব করব করব।

অমন সময় বিপিন প্রাঙ্গণে এসে পড়িল।

তাহাকে দেখিযামাত্রই নিবারণের শরীর এমন কম্পিত হইয়া উঠিল যে হৃৎকার আশ্রয় ছড়াইয়া পড়িল। গোবর্দ্ধন চকমকিতে ঘা দিতে গিয়া লোহা দিয়া নিজের হাতেই শূন্যের আঘাত করিয়া ফেলিল। তাহান্নেব, উভয়েরই মূখ চক্কাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। কেহ কোনো কথা না বলিয়া নিম্পন্দভাবে বসিয়া রহিল, আগুন পড়িয়া তাকিয়া মাহুৎ যে পুড়িতেছিল সে বিকেও কাহারো দৃষ্টি দিবার সাহসে জ্বলাইতেছিল না।

বিপিন তাহাদিগের ভাববিহ্বল ভাব লক্ষ্য না করিয়াই উচ্চসরে বলিল—মুখুযো বশাচ, আধাকে একঘরে করন, আমি মোহলমানের ছোঁয়া খাই, আপনারা যাকে ধর্য বলেন তার কিছুই আমি মানিনে।

বিপিন মালতীর নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অন্তরে যে আঘাত পাইয়াছিল, তাহার বেদনা সে কিছুতেই কাহারো কাছে প্রকাশ করিতে পারে না, এমন কি সে নিজের কাছে পর্বাচ প্রকাশ করিতে কুণ্ডা বোধ করিতেছিল; এবং তাহার চিত্ত আর-একটা নূতন আঘাত পাইয়া নিজেকে খেদনাথ প্রকাশ করিয়া ধরিবার লজ্জা ব্যাধ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই-লজ্জাই সে তাড়াতাড়ি নিবারণের কাছে আসিয়া এমন জোর করিয়া একঘরে হইবার লজ্জা ব্যাকুলতা প্রকাশ করিল। কিন্তু

নিবারণ, অতঃপর না বৃথিগা জেনে করিল, সর্পনাথ! ছোঁড়াটা নিশ্চয় তাহার সব কথা কুনিয়াছে। তথাপি সাহস করিয়া প্রকাশ্যে বলিল—হেঁহেঁহেঁহেঁ, তোমার কি একঘরে করতে পারি তারা? তোমানেব নিশ্চয় ত আমাদেব সমাজ! তা তা বৈদনকালে ওরকম একটু আধটু অনাচার লকণেরই ঘটে থাকে, সেটা—ওর নাম কি—বঃসের দোষ—বৃথলে কিনা ভায়া? ওটা বঃস হলো—বৃথলে কিনা—সেরে যাণে।

—কিছুতে সারবে না মুখুযো মশায়, সে আশা করছেন না। আর যৌনের ধর্ম বলে আমার রেহাই দিচ্ছেন, কিন্তু কিশোরের ত বার্জিকার লক্ষণ দেখা যায়নি। তাকে ত একঘরে করেছেন? আমাকেও করুন, দেখাই আপনায়।

—এঁ এঁ এঁ তা তা বৃথলে কিনা, তাতে আর তোমাতে কি সমান হল? হেঁ হেঁ সে হল—বৃথলে কিনা—খোলাকাটা বাঁহুনেব ছেলে, আর জুনি হলো—ওর নাম কি—রানরাজেশ্বর। তা তা—ওর নাম কি জুনি বদি বল, তা হলো উটচাখিরেব—বৃথলে কিনা—আজই আতে ভুগে নি।

—না না না, অমন কাজ করবেন না, মুখুযো মশায়। বেশ করেছেন একঘরে করেছেন। আপনাদের সঙ্গে এক বলে থাকার চেয়ে একঘরে হয়ে থাকা চের ভালো। দেখাই আপনায়, আমাকেও একঘরে করুন, বাবাকে বুঝিয়ে রাজি করুন—তিনি আমাকে বাড়ী থেকে দূর কবে তাড়িয়ে দিল। আর আমার এই বিগ্রেটা যাতে না হয় তার চেষ্টাও আপনাকে একটু করতে হবে। এই

হুটো কাঙ্ক্ষি আপনি অনাধানে কহুতে
পারবেন।

নিবারণ মনে মনে বলিল—এইরে সব
তুনেছে! প্রকৃত্তে বলিল—রামচন্দ্র!
রামচন্দ্র! শুভকর্মে হস্তাবক—বুঝলে কিনা—
আমি কি হতে পারি। ওর নাম কি—
তিনকাল গিরে এককালে ঠেকেছি, তোমরা
যতটা মনে কর আমি তত বড় পাণিষ্ঠ নই—
বুঝলে কি না ভায়া! আর আমার ক্ষমতাই
যা কি যে আমি তোমার বিধে বোধ করব।
রামচন্দ্র! রামচন্দ্র!

—আপনার ক্ষমতা খুব আছে মুখ্যো
মহার, খুব আছে। আপনি হস্ত কস্তরী-
মূগের মতো নিজের গুণ নিজে জানেন না,
কিন্তু আপনার মর্হিনা ত আমাদের কাছে
ছাপা নেই। আপনি একখানা চিঠি
লিখে দিলেই ত ভায়া পিছিয়ে যাবে।

—রামচন্দ্র! রামচন্দ্র! আমি তত বড়
পারিও নই—বুঝলে কিনা ভায়া। এও কি
একটা কথা হল? রামচন্দ্র! আমি এদিক
চিঠি লিবি, আর—বুঝলে কিনা—তার পরদিন
—ওর নাম কি—তোমার বাবার পেঠেল এসে
আমার ভিটেমাটি উদ্ধার করে দিবে বাক
আর কি! এত বড় বোকা নই আমি, বুঝলে
কিনা ভায়া!

—আহা! আপনি চিঠিতে নাম দেবেন
কেন? সেনামী চিঠি চালানোটাও ত আপনার
একেবারে অনভ্যাল নেহ।

—হেঁইহেঁই ওর নাম কি জান, ও সমস্ত
লোকের রচা কথা, কেউ ত কারো ভালো
বোধতে পারে না। বেনামী চিঠি। ভায়া,
স্বাঃ।

—তা, হলে আপনি আমাকে এই অল্প-
এটুকু করবেন না কিছুতেই।

নিবারণ মনে মনে বলিল—তুমি যখন এক
যাত্র হইছ তখন কিছুতেই একাকি আমার
করা হবে না। তোমার যখন ওখানে যাবে
করবার ইচ্ছে নেই তখন ঐখানেই তোমার
বিধে দিইছে তোমার নাকের জলে চোখের
জলে করব। কিন্তু স্বপ্নের মত জমিদারীটা
পাবে সেইটে বা অসহ্য। আজ্ঞা দেখা যাবে,
হরিশ্চন্দ্রবোধকে শ্রীযাপ্তুর নেওয়াতে পারি
কিনা। আমার ছোট ছেলেটাকে শ্রীযাপ্তুর
করে দিতে পারি তবে ঠিক রোগের মতন
ওষুধ হয়।

নিবারণকে নিরুত্তর দেখিয়া বিপিন
বিরক্ত হইয়া বলিল—ভাবছেন কি মুখ্যো
মহার! শেষের প্রাণীবধে লক্ষ্যে আস এই
মতন দেখছি।

নিবারণ বলিল—না ভায়া, এমন অধর্ম
এ বুড়ো বয়সে আমি হতে হবে না, তা তুমি
গালই দাও আর মন্দই বল—বুঝলে কিনা।

—আজ্ঞা, তবে বহুত। আমি অস্ত্র চেপ্তা
দেখিগে—বলিয়া বিপিন প্রস্থান করিল।

খানিকক্ষণ পিতাপুত্র উভয়েই আড়ট
নির্জাক হইয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ
ধরিয়া যখন আর বিপিনের কোনো স্যড়া-
শব্দ পাওয়া গেল না, তখন নিবারণ একটু
নড়িয়া বসিল, গোবর্দ্ধন একটু কাশিল।
নিবারণ হস্তক্ষেতের সহিত চাপা গলায়
বলিল—দেখ ত, দেখ ত, ছোঁড়াটা গেল
কি না।

গোবর্দ্ধন মাথা মাড়িতে মাড়িতে বলিল—
হ্যাঁ, আমি বাই আর আমার কঁাক করে

ধরক আর কি। তুমি উঠে গিয়ে দেখে এস না ?

—আরে না না, তার নেই, ও কিছু বলবে না; বলত ত এলেই ধমাবন্ধ লাগিয়ে দিত।

এ কথার বৌদ্ধিজ্ঞতা জনদ্রষ্টব্য করিয়া গোবর্দ্ধন আশ্রয় আশ্রয় উঠানে নামিয়া বেগিতে লাগিল বিপিন বটদ্বারে চলিয়া গিয়াছে। তখন পিতাকে হস্ত সঙ্কেতে বিপিনের দূরে গমন জানাইয়া বলিল—ওঃ চলে গেছে।

তখন নিবারণ সাহস সঞ্চয় করিয়া কোমরের কাপড় একটু কষিয়া উষ্ণিগা দাঁড়াইল। কাছাটা খুলিয়া গিয়াছিল, তুলিয়া পড়িল। তখন বাম পদের এক আঘাতে লম্বমান কাছাটিকে উৎক্লিপ্ত করিয়া ছই হাতে ধরিয়া লইল এবং বর্ণাশ্রমে ভুক্তিতে ভুক্তিতে উঠানে নামিয়া আসিল। যখন দেখিল বিপিন দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে তখন নিজের মনেই একান্তে চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিল—হঁ, এখন একবার হরিনিহারীর কাছে যেতে হচ্ছে। সে যেন আবাস্য হেলের আবাস্য শুনে থেকে না বসে।

তখন তাহার পুৰাতন বন্ধু আবদুল্লাহ স্রোতস্রা জ্যালাজেলে চাদরখানি কাঁধে ফেলিয়া, ধূকাকাকি চটখোড়া পায়ে দিয়া ও কালো চিরকুট গামোছা ও একগাছা বাঁশের লাঠি হাতে লইয়া নিবারণ বাজা করিল।

বাড়ীর বাহিরে নিবারণের কুঠা ছিল একটা আগড় মেঘামত করিতেছিল।

সে প্রভুকে দেখিয়া দস্তদিকান করিয়া বলিল—মুণ্ডো মশায়, কোথায় বাছ, দেখ ত ঠিক বামেছি কি না ?

নিবারণ তেল-বেতনে জলিয়া উষ্ণিগা দাঁতমুখ খিচাইয়া বলিল—পাজি বেটা, নজ্জার বেটা, শুভকাকো বাজি তুই পিছু ডাকিল। হারামজাদা, আজ তোমাই এক দিন কি আমারই এক দিন।

এই বলিয়া নিবারণ তাদ্ধা একরিয়া ছিরেকে মারিতে গেল। ভিবে দেহালের ধারে বসিয়া বেড়া বাধিতেছিল, পলায়নের উপায় না দেখিয়া আগড়খানা উচু করিয়া ধরিয়া জাহাৰ পাশে লুকাইল। নিবারণ আগ্রসর হঠাৎ তাহার লাঠি মধ্য ছিরেকে খোঁচা দিতে আরম্ভ করিল। হ একটা গোটা খাটয়াই ছিরে 'আউ' করিয়া আগড়খানা ছাড়িয়া দিল এবং সেই আগড় সম্বন্ধে নিবারণের কাছে গিয়া পড়িল। নিবারণ সে আঘাতের গুণ প্রস্তুত ছিল না, আগড়ের ধাক্কা একেবারে চিত্র হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল এবং আগড়খানা তাহার উপর চাপিয়া পড়িল। নিবারণ পড়িয়া পড়িয়া মগা চীৎকার সোরগোল আরম্ভ করিল, কিন্তু ছিরে প্রভুকে সাহায্য না করিয়া সেখান হইতে চোঁচা দৌড় দিল। সেই সময় হীরালাল খোবা সেইখান দিয়া যাঁতেছিল। সে মুণ্ডো মশারকে তদবস্থ দেখিয়া তাদ্ধাভক্তি কাপড়ের মোট ফেলিয়া আগড় তুলিয়া ধরিল। মুণ্ডো উষ্ণিগাই হীরালালের গালে এক চড়। হীরালাল খতমত খাইয়া আপনাব অজ্ঞাত অপবধ নির্দ্ধারণের গুণ মুণ্ডো মশার

মুখের দিকে চাটিল। সুখুযো আঁফালন করিয়া বলিল—বাটা খোবা, তোর এত বড় আশ্পর্শ তুই আমাকে ছুঁলি? আন্নি শুভকস্মে বাতা কসে বেরিগেছি তুই বেটা কোন্ আঙেলে আমার মুখ দেখালি!

হীরালাল অপ্রতিভ হইয়া অপরাধীর মতো হাতঝোড় করিয়া বসিতে লাগিল—আজ্ঞে আমি জানতাম না যে আপনি কোথায় যাচ্ছেন। তারলে কি কখনো আপনার সামনে আসি? বাট হয়েছে। সুখুযো মশাও, মাণ করুন।

নিবারণ অঙ্গের মূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল—যা বেটা যা। মাণ করলেমণ

হীরালাল যেন নিভুতি পাইয়া বাটিল। বাণবে! অথকোপ কি সামন্ত।

গোণমালা শুনিয়া গোবর্দ্ধন বাহির হইয়া আসিল। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বলিল—বাবা, একটু বসে যাও।

নিবারণ দেখানেনই একটু উবু চটগু বসিয়া তৎক্ষণাৎ দুর্গা দুর্গা শ্রীহরি শ্রীহরি বলিয়া উদ্ভিগ বাতা করিল।

বিশ্বিন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী হইতে ফিরিতেছে, পথে হীরালালের সহিত দেখা হইল। বিশ্বিন হাঁসিয়া বলিল—কি হীরে কাকা ভালো আছে? তোমার মুখ এমন শুকনো কেন?

হীরালাল তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া সমস্ত কথা বলিল। বিশ্বিন চক্কু অশ্রুস্রাব করিয়া বলিল—তোমার নিবারণ শুধুতধু নাওলে আর তুমি অমনি চুপটি করে ফবে এলে? তুমিও তাকে এক ড়ে কথিয়ে দিতে পারলে না?

হীরালাল কিত কাটিয়া বলিল—এঁজো অমন কথা বোলো না বাবা, আমার অপরাধ হবে, তিনি হল বেরাকোব! আর আমি নীচ জাত। পূর্ণরস্মে কত পাপ কহর একস্মে মরলা সাক কসে মরছি। আবার?

বিশ্বিন বলিল—এই ত তোমাদের ভুল হীরেকা। তাঁতের আবার উচু নীচ কি? কালেরই আবার ছোট বড় কি? তোমরা সব নিমেরা মাথা হেঁট করে কথাটি না বলে সৌকের লাখি ঝাঁটা খাবে ত নীচ হয়ে থাকলে না? একবার মাথা তুলে দাঁড়াও দেখি, অস্তায় সহ না করবার মতো বল একবার করে নাও দেখি, তখন দেখবে তোমরা নিবারণ গোবর্দ্ধন মতন বামুনের চেয়ে ভালো বই মন্দ নও। ব্রাহ্মণ ত ভট্টাচার্য্য ভাট্টা, তাঁর পায়ের তলায় সূটিয়ে থাকতে হয়। আর ওগুলো কি বামুন—ওগুলো চণ্ডালেরও অধম।...চল তুমি কিবে...আমি দাঁড়িয়ে থাকব আর তুমি নিবারণের চুনের টিক খেয়ে এক ড়ে কথিয়ে দেবে। আগড়চাপা পড়েছিল, তুমি তুলে উলুকার করলে, তার পুংস্কার হল কিনা গালাগালি আর ড়ে!...চল তুমি।

—না বাবা আমি বামুনের সঙ্গে কানিয়া করতে পারব না।—বলিয়া হীরা খোপা সেখান হইতে দৌড় দিল।

বিশ্বিন রাগে ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে যখন নিবারণের বাড়ীতে গেল, তখন বহু পুণ্যের ভোরে নিবারণ হরিবিহারীর ঠৈঠকখানায় গিয়া পৌঁছিয়াছে।

নিবারণকে সমাপ্ত দেখিয়া হরিবিহারী

গড়গড়ান নল, করাশের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—এস এস খুঁড়ো এস। এই আমি মনে করছিলাম তোমাকে ডেকে পাঠাই। তুমি বীচুগে অনেক দিন।

নিবারণ উদগীর্ণ ভাবে বলিল—আ বাপু, এ কলিকালে সংসারে বেঁচে হুখ নেই। বেঁচালে লোকে ভাত মানে না, ধর মাত্রো না, সেকালে কি থাকতে আছে।

হরিবিহারী হাসিয়া বলিলেন—না খেতেই যা করছ কি বল? মরেও ত নিজের নেই?—বমালয় আছে, বমবুত আছে, নরক আছে; তাই চেয়ে ভালো জমগায় ভালো লোকের হেফাজতে ত থাকা তোমার আমার ভাগ্যে হবে না। তারপর পুণর্জন্ম হলেও এই কলিকালেই ত জন্ম নিতে হবে। ফিবে অগ্নে যে ব্রাহ্মণ হব, এমন কি মাহুই যে হব, তারই না ঠিক কি? তার চেয়ে খুঁড়ো যে কটা দিন পারা যায় বেঁচে থাকাই ভালো, তাতে লাভ বৈ অলাভ নেই। এ জন্মটার সুখচাং ওরই মধ্যে একরকম গাম্ভীর হয়ে অভ্যাস চড়ে এসেছে, আমার নতুন জীবনে নতুন লাঠার কাজ কি?

নিবারণ দুঃস্বভাবিকাপ কবিতা বুলিল—হেইহেই বলেছ ভালো বাবাজী, বলেছ ভালো। হাজার হোক রান্নাবুড়ি কি না! তবে ওর নাম কি ধর্মের গ্রামি শুনেলে বড় মনকষ্ট হয়—বুঝলে কি না, তাইতে পেলে মরণের কথা বেরায়, নইলে বাঁচতে কার অপাধ বল। এই বেশ না এই অলক্ষণ আগে—ওর নাম কি—বিপিন ভায়া আমার বাড়ী গিয়ে—বুঝলে কি না—বড় গলা করে বলতে লাগলেন আমি

সুখি পাঠে, গুঁড় খাটে, মোছলমানের এঁটো পাঠে! রামচন্দ্র! রামচন্দ্র! এসব শুনে গেয়ে ঝর আসে কি না বল ত বাবাজী?

হরিবিহারী এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া পাটা প্রসন্ন করিলেন—কেন কেন? বিপিন আর চটাই তোমার বাড়ী গিছিল যে?

নিবারণ তুড়ি দিয়া চাট তুলিতে তুলিতে বলিল—আ চা চা হা—সে বাবাজী অনেক কথা, তাই বলতেই ত এসেছি। ভায়া আমার গিয়ে ধরে বসেছিলেন যে দাদা মশায়, আমি ত বাবাকে বলতে পারব না, আপনি একবার বাবাকে বলবেন এ বিয়েতে আমার মত নেই। আমি মালতীকে বিয়ে করণ ঠিক করেছি।—আমি বললাম, আরে পাগল, তাও কি কখনো হয়, সব ঠিক ঠাক, কষ্টা কথা নিচ্ছেন, এখন কি পাগলামি করতে আছে? তখন ভায়া রেখে চটেই বললেন আপনি একবার বাবাকে বলবেন ত, তারপর বাবা না পোনেন ত আমি দেখে নেব। যে বিয়েতে—ওর নাম কি—ব্রাহ্মণের স্ত্রীবস্ত্র পুরোহিত হবে না, ওর নাম কি নব্বিকশোর বরযাত্র ধাবে না, সে বিয়ে আমি কখনো করব না। আমি ঝিনোবর্ণোত্তর হরিশ বাবুকে খেনামি করে লিখে দেবো যে আমি গরু পাঠে, মুছলমানের এঁটো খাই!... বলে না পেতায় ধাবে বাবাজী, ভায়ার সে হুত্ব কি? এই মারে ত এট মারে। তখন—বুঝলে কি না—আনি বীকার করলুম যে তোমার বাবাকে বলব। তখন—ওর নাম কি—একটু ঠাণ্ডা হয়ে উটতায়িবেব পাড়ার দিকে চলে গেল। আমি জোড়াতাড়ি তোমার ধার দিতে

এসেছি, সাবধান, শুভকর্ষ পুণ্ড করে না দেয়। এব প্রত্যবে নিশ্চয় ঐ ডটগিয়ারদের টিপ আছে, আর ভায়ারও বেধি হয় মালতীর গুণর মন পেচেছে। বেখো বাগানী শেষ কালটার ঘেন তাকেই বিয়ে না করে ফেলে।

হরিবিহারী চিত্রিত হইয়া অস্তমনভভাবে বলিতে লাগিলেন—আমি যার তোমার ডেকে পাঠাচ্ছিলাম তোমায় বলব বলে ডে ডটগিয়ারদের কাছে তুলে নেওয়া থাক। কিন্তু এ যে একটা কেনন ঘটনা লাগতে। ঐ গোয়ারগোবিন্দ কিনোব টেঙা কি কাগুখানাই না করতে কিনিনকে নিয়ে। তারলে ডটগিয়ারী 'দেমন' আছে তেমনি থাক, কি বল?

—হ্যাঁ সে আর বলতে? এখন কি ওদের কাছে তুলতে আছে?

—কিন্তু পুস্তকের কি হবে?

—তার আর ভাবনা কি? ডটগিয়ার হাজার গজা পুস্তক গ্রন্থানো রয়েছে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ পেন বলেছ। তাহলে তুমিই যা হোক দেওয়ান'র সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিকঠাক করে দিও। খুঁড়ো।

—এ 'ভার' ঋত করে বলতে হবে কেন? এ ত আমাদেরই কণ্ডগ।

নির্কঙ্কটপ্রিয় হরিবিহারী নিজেই কোনো চেষ্টা করিতে হইবে না জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তারপর বলিলেন—কিন্তু এদিকে বিপিনকে কি করা যায়?

নিবারণ বলিল—বিপিনকে ডেকে তুমি খুব কড়া করে ধমকে দাও। ছোটগিয়ারী আর মালতীকে বাড়ী গেলে কোথাও সরিয়ে

ফেল। ছোটগিয়ারী টিপেই এই সব হচ্ছেন কিন্তু খবরদার বাগানী আমি যে তোমায় কিছু বলেছি তাঁ ঘেন সে টের না পাও, তাহলে আমার ধড়ে গ্রাণ থাকবে না। হতভাগ্য ছোটগিয়ারী বলে কি না যে, গোবিন্দ হবে বলে আমাদের কিছু বলে না। তা গরুও যা ত্রক্ষণও ত তাঁই, শাপ্পেই আছে গোত্রাক্ষণ-হিতার চ। কিন্তু গরুই যখন খেয়ে ফেলছে, তখন গৈা কয়েও ত এদের কাছে নিত্যর নেই। ঘোড়াই ক্রীবাগী আমাৰ নাম কোরো নান আর এক কাজ কর, আমায় ববং স্বিছুকপোতায পাঠিয়ে দাও, আমি সেখানে 'বলে' বলে গৈা দিকটা আগসাৰ এখন।

হবিবাহারী উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—এ অতি উত্তম পরামর্শ। তুমি দেওয়ানজির কাছে থেকে একশ টাকা নিয়ে কালই রওনা হয়ে যাও। দেওয়ানজিকে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।

হরিবিহারী একটু চিরকুট লিখিয়া দিলে 'হরি যে তোমারি টেঙ্কা' বলিয়া নিখাস ফেলিয়া নিবারণ এক টিলে অনেকগুলি পানী মারিয়া উৎফুল্ল মনে গ্রন্থান করিল।

নিবারণ চলিয়া গেলে হরিবিহারী বলিলেন—রামধন, যা ত একবার ছোট বাবুকে ডেকে জান ত।

রামধন বিপিনকে ডাকিয়া আনিল।

বিপিন ঘরে ছকিয়া বলিল—বাবা ডাকছেন?

—হ্যাঁ। এসব কি ছেলেমানুষী হচ্ছে, বিয়ে করব না, বিয়ে ভেঙে দেব, 'হান ত্যান?' এসব কি?



আত্মবৰ্জন
শ্ৰীমত্ৰ গগনেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ অঙ্কিত চিত্ৰ ২৫:৬

বিশ্বিন নীরব। হরিশ্চন্দ্রী বলিতে লাগিলেন—বাণের অপরূপ হয়ে বিরেটা করে এল, তার পর বা খুঁসি কোরে না, তাতে ত তোমার কেউ বারণ করণে না। একটু বিয়ে ত কর্তে হবে।

বিশ্বিন বলিল—এ খিয়ে আমি কি ছুতেই করতে পারব না।

হরিশ্চন্দ্রী ফুৎ চটরা বলিয়া উঠিলেন—তুমি ছোট নৌর বোনকি এক বিয়ে করাব জন্তে কেনেছিল। এ সমস্ত ছোট নৌর কারসারি! দিচ্ছি এখুঁসি ওদেউ বাড়ী থেকে খেদিয়ে.....

বিশ্বিন বলিল—আপনি খুঁড়িয়ার সর্ষষ কেড়ে নিরেছেন। আপনি তাঁদের স্রতি-

পালন করতে বাধা। আমি আপনাকে এ অস্ত্রায় কখনো করতে দেবো না। আপনি তাঁদের তাড়িয়ে দিলে আমাকেও আপনার বাড়ী ছেড়ে তাঁদের সঙ্গেই যেতে হবে।

হরিশ্চন্দ্রী একেবারে উদ্ভ্রান্ত হয়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—কী! আমার মূলের ওপর উত্তর। বা না তুই এক, আমার বাড়ী থেকে দূর চলে! আমার কী ভয় দেখাচ্ছিস! আজই দূর চলে যা!

আত্মমায়ী বিশ্বিনের চোপ ছগ-ছগ করিতে লাগিল। সে বাপস্বর্গ কণ্ঠে বলিল—আচ্ছা, তাই হবে।

চাক বকোপাধ্যায়।

সাহিত্য-সম্মিলন

[এবার বর্ধমানে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় ইন্দুজ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, অর্থাৎ ই মহাপদ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্মিলনকে চারি ভাগে বিভক্ত করা হয়—সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস। উক্ত চারি বিভাগে চারিজন সভাপতি ছিলেন। সম্মিলনের মূল অধিবেশনের সভাপতি মহাপদ্যের এবং শাখা বিভাগসমূহের সভাপতি মহাপদ্যের অন্তর্ভুক্ত সঙ্কল্প আকারে প্রকাশিত হইল।]

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বোধন

আমাদের বাঙ্গলার প্রাচীন গৌরবের কতকগুলি কথা লইয়া আলোচনা করিব।

পুরাণ কথা শুনিতে সকলেরই ভাল লাগে। সেই ভরসাতেই আমার এই সম্বোধনে আমি কেবল প্রাচীন গৌরবেরই আলোচনা করিব। কারণ, অতীত যুগে সকল সময়েই মধুর।

হস্ত-চিকিৎসা

খৃঃ পূর্ব ষষ্ঠ শতকে হাতী পোষা খুব চলিত হইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধদেবের এক হাতী ছিল। তাঁহার ভাই দেবদত্তেরও হাতী ছিল। উদয়ন ভাট্যার “নলাগিরি” নামে একটি প্রকাণ্ড হাতী ছিল। তাঁহার

নিজের ও চণ্ডপ্রজ্ঞোত্তর বড় বড় হাতীশালা ছিল, হাতী খরারও খুব ব্যবস্থা ছিল।

অঙ্গদেশের রাজা লোচনপদ বঙ্গদেশীরা স্থপরিচিত। তিনি বঙ্গদেশের সম্রাট ছিলেন। তাঁহার একবার সম্রাট হইল, 'হাতী আমার বাহন হইবে।' কিন্তু হাতী কেনন করিয়া বশ করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন না। খোজ করিবার জন্য অনেক লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাহার এক প্রকাত আশ্রমে উপস্থিত হইল। সে আশ্রম "শৈলবাসিনী", "পূণ্য" এবং সেখানে "লৌহিত্য" যাগবাতিযুগে বহিয়া যাউতেছে।" সেখানে তাহার অনেক হাতী দেখিতে পাইল এবং তাহাদের সঙ্গে একজন মুনিরও দেখিতে পাইল, দেখিাই তাহার। "কিন্তু যে, এই মুনিই হাতীর দল রক্ষা করেন। তাহার ক্রিয়া আসিয়া রাতাকে থবর দিল। রাজা হাতীর দলটী তাড়াইয়া দিয়া চম্পানগরে উপস্থিত হইলেন এক হাতীদের বাধিয়া রাখিয়া ও খাবার দিচ্চা নগরে প্রবেশ করিলেন। স্বর্ষি আসিয়া দেখিলেন, তাহার হাতীগুলি নাই। অনেক দিন খুঁজিয়া খুঁজিয়া শেষে চম্পানগরে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাহার হাতীগুলি সব চম্পানগরে বাধা আছে, তাহার। যোগ্য হইয়া গিয়াছে, তাহাদের গায়ে বা হইয়াছে, নানাক্রম যোগের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি অত্যাশ্চর্য লজ্জা, পাতা, নিকড়, মাকড় তুলিয়া আনিয়া দাতিয়া তাহাদের গায়ে ঢেলে দিতে লাগিলেন, হাতীরাও নানাক্রমে তাহার সেবা করিতে লাগিল। অনেক দিনের পর পরস্পর মিলনে, তাহার

ও তাহার হাতীদের মত আনন্দ। রাজা সব শুনিলেন,—তিনি কে, কি কৃত্যের আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। অনেক সাধাসাধনার পর মুনি আগুনায় পরিচয় দিলেন। "আমি হাতীদের সহিতই জুড়াই, তাহারাই আমার আত্মীয়, তাহারাই আমার স্বজন। আমার নাম পালকপা। আমি হাতীদের পালন করি, তাই আমার নাম পাল। আর কাণ্যগোজে আমার অন্য, সেই স্ত্রী আমার নাম কাণ্য। লোকে আমাকে পালকপা বলে। আমি হস্তি-চিকিৎসার বেশ নিপুণ হইয়াছি।" তাহার পর রাজা তাঁহাকে হাতীদের বিষয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তাহার উত্তরে তিনি হস্তীর আয়ুর্কেন্দ্রমাত্র ব্যাখ্যা করিলেন। তাহার শাঙ্গের নাম "হস্তায়ুর্কেন্দ্র" বা "পালকপা"। উহা প্রাচীন হস্তের আকারে দেখা। পালকপা বঙ্গদেশের লোক ছিলেন। লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রের দ্বারা, সমুদ্র ও হিমালয়ের মধ্যে তাহার কল্যাণ ও শিকার স্থান। যদিও অঙ্গরাজ্যে চম্পানগরে তাহার আয়ুর্কেন্দ্র দেখা ও প্রচার হয়, তিনি আসলে বঙ্গদেশেরই লোক। এই যে প্রকাত অজ্ঞ হস্তী, ইহাকে বশ করিয়া মানুষের কাজে লাগান, ইহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা—এ সমস্তই বাঙ্গলা দেশে হইয়াছিল।

সামান্যমুদ্রার দ্বারা "Sattira period" বলেন, সেই সময়েই পালকপা হস্ত রচনা করিয়াছিলেন। বিউদার সাহেব বলেন, কাণ্যপুত্র ও বোধানন যুগে পূর্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে হস্ত লিখিয়াছিলেন এবং তাহারও

আগে অন্তর্গত ও গোষ্ঠ্যের দ্বারা গঠিত হয়।
পালক্যুপ্যও সেই সময়েবই লোক বলিয়া
বোধ হয়।

যু: পূর্বে পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে বদি
বাল্লী দেশে হস্তি-চিকিৎসার এত উন্নতি
হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেটা বঙ্গদেশের
কম গৌরবের কথা নয়।

২। নানা ধর্ম-মত

পূর্বে অনেক জাতিগণ আভাস দিয়াছি
যে, বৈদ্য ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, ধর্ম
এবং যে সকল ধর্মকে "বৌদ্ধেরা" তৈরিক
মত বলিত, সে সকল ধর্মই বঙ্গ, মগধ ও
চের জাতির প্রাচীন ধর্ম, প্রাচীন আচার,
প্রাচীন ব্যবহার, প্রাচীন রীতি, প্রাচীন
নীতির উপরই স্থাপিত। আর্য জাতির
ধর্মের উপর উহা ততটা নির্ভর করে না।
এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা
বঙ্গদেশের কম গৌরবের কথা নয়। এক্ষণ
মনে করিবার অনেকগুলি কারণ আছে।
এই সকল ধর্মেরই উৎপত্তি পূর্ব-ভারতে
বঙ্গ, মগধ ও চের জাতির অধিকারের
মধ্যে, যে সকল দেশের সহিত আর্ধ্যগণের
যনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল—সে সকল দেশের
বাহিরে। এ সকল ধর্মই বৈরাগ্যের ধর্ম।
বৈদিক আর্ধ্যদের ধর্ম সম্পূর্ণরূপে গৃহস্থের
ধর্ম। অথচ বৈরাগ্যের নাম গম্ভীর নাই।
অজ্ঞাত যেনও বাগবজের কথাই অধিক,
সেও গৃহস্থেরই ধর্ম। স্মৃতিশাস্ত্রেও গৃহস্থের
ধর্মের কথা। কিন্তু আমরা যে সকল
ধর্মের কথা বলিতেছি, তাহাদের সকলেই
বলিতেছে গৃহস্থ-অগ্নির ত্যাগ কর। গৃহস্থ-

অগ্নির একটা গ্রন্থ গৃহস্থ অগ্নির ত্যাগ
করিয়া "বাহ্যতে" অগ্নি, লবণ—এই
ক্রিষ্টাপ নাশ হয় তাহারই দাবী করা।
এ সব ত গেল দর্শনের কথা, চিত্তা-শক্তির
কথা, সোপের কথা।

বাহিরের দিক হইতেও দেখিতে গেলে,
এই সকল ধর্মের ও আর্ধ্যগণের আচার-
ব্যবহারে মিল নাই।

তাহারা এত নূতন জিনিস কোথা হইতে
পাইল? এ সকল নূতন জিনিস যখন
আর্ধ্যদের মতের বিরোধী, তখন তাহারা
আর্ধ্যদের নিকট হইতে সে সব পায় নাই।
উত্তর হইতে তাহারা এই সব জিনিস
পাইতে পারে না, কেননা উত্তরে হিমালয়
পর্বত। হিমালয়ের উত্তর দেশের লোকের
সহিত তাহাদের যনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিতেই
পারে না। দক্ষিণ হইতেও ঐ সব জিনিস
আসিতে পারে না, কেননা দক্ষিণের সহিত
তাহাদের যে যনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাহার
কোন প্রমাণ নাই; এবং বিজাগিরি পার
হইয়া বাগ্মা অত্যন্ত কঠিন। স্ততরাং বাহ্য
কিছু উহারা পাইয়াছে, পূর্বাঞ্চল হইতেই
পাইয়াছে এবং পূর্বাঞ্চলেই আমরা এই
সকল নূতন জিনিস কতক কতক এখনও
দেখিতে পাই।

বৈদ্যদের শেষ ভীষ্মের মহাবীর পূর্বাঞ্চলেই
ভ্রমণ করিতেন। বীর বংশেরের পর তিনি
জ্ঞানলাভ করিয়া বৈশালিতে কিরীয়া
আসেন। তাহারও পূর্বে ভীষ্মের পার্শ্বনাথ
নানা দেশে ভ্রমণ করেন। তাহার ভ্রমণও
পূর্বাঞ্চলেই অধিক। শেষ জীবনে তিনি
সম্ভেতগিরিতে বাস করেন—সম্ভেতগিরি

প্রেমনাথ পাঠাড়। তাঁহারও পূর্বে যে ২২ জন ভাঁওকর ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সমেতগিরিতেই বাস করিতেন ও সেইখানেই দেহ দক্ষা করেন।

সাংখ্য-মত এই সকল ধর্মেরই আদি। সাংখ্যের দোষদোষিই জৈনেরা কেবলী চর্চাতে চাহিত—কৈবল্য চাহিত। নৌকেরা বলেন, তাঁহারা সাংখ্যকে ছাড়াই উদ্ভিগাছিলেন। কিন্তু সাংখ্য-মত আশা-মত নহে, উহার উৎপত্তি পূর্বদেশে। সাংখ্যকার কশিরের বাড়ী পুন্ড্রাঞ্চলে, পকশিখের বাড়ীও পুন্ড্রাঞ্চলে।

৩। রেসম

বাল্যের তৃতীয় গৌরব রেসমের কাণ্ড। টউয়ালীয়েণা চীন দেশ হইতে যেসময় পোকা আনিয়াছিলেন এবং অনেক শত বৎসর চেষ্টা করিয়া তাঁহারা যেসময়ের কারবার খুলিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের সাংসার চীনই রেসমের কথ্যস্থান, চীনেরাও তাহাই বলে। তাহারা বলে খৃষ্টের ২৩৪৪ বৎসর পূর্বে চীনের রাজ্য তুঁত গাছের চাপ আরম্ভ করেন।

কিন্তু আমরা চাপকোর অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাট, বাঙ্গলা দেশে খৃষ্টের তিন চারি শত বৎসর পূর্বে যেসময়ের চাপ খুব হইত। যেসময়ের খুব ভাল কাপড়ের নাম "পজোর্ব" অর্থাৎ পাতার পশম। পোকাতে পাতা খাটয়া যে পশম বাহির করে সেই পশমের কাপড়ের নাম "পজোর্ব"। সেই পজোর্ব তিন জরিগার হইত—মগধে, পৌত্তলদেশে ও সুবর্ণ-কুডো। এই সকলের মধ্যে সুবর্ণকুডোর "পজোর্ব" সকলের চেয়ে ভাল। ইহা হইতেই

কোমের বস্ত্র ও চীনভূমিকাত চীনের পট্ট-বস্ত্রেরও বাঁখা হইল।

মগধ—দ'কণ-বেহার আর পৌত্তল—যারেক্ত্র'ম। সুবর্ণকুডা কোথায়? প্রাচীন চীকাকার বলেন, সুবর্ণকুডা কামরূপের নিকট। কিন্তু কামরূপের নিকট যে যেসময় এখন "হুং" তাহা ভেবেও পাতার হয়। আম' বলি, সুবর্ণকুডোরই নাম শেবে. কর্ণ-সুবর্ণ হয়। কর্ণসুবর্ণও সুন্দারান ও রাজ-মহল লুটয়া। এখানকার মাটী পোঁতার মত রাজসু' বলিয়া, এ দেশকে কর্ণসুবর্ণ, কিরণ-সুবর্ণ বা সুবর্ণকুডা' বলিত। এখানে এখনও রেসমের চাপ হয় এবং এখানকার রেসম খুব ভাল। কোটিল্য যে ভাবে চীন দেশের পট্টবস্ত্রের উদ্ভেদ করিলেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি চীন দেশের রেসমী কাপড় অপেক্ষা বাঙ্গলার যেসমী কাপড় ভাল বলিয়া মনে করিতেন। রেসমী কাপড় যে চীন হইতে বাঙ্গলার আনিয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণই অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। চীনের যেসময় তুঁতগাছ হইতে হয়। বাঙ্গলার যেসময়ের তুঁতগাছের সচিৎ কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং বাঙ্গালী যে, যেসময়ের চাপ চীন হইতে পাটগাছে একথা বলিবার যো নাই। যেসময়ের চাপ অঙ্গল্যাতেও ছিল, চীনেও ছিল। সারতর্কবর্ষের অগ্রজ যে, যেসময়ের চাপ ছিল, একথা চাপকা বলেন না। তিনি বলেন, বাঙ্গলার ও মগধেই রেসমের চাপ ছিল। কামরূ, পৌত্তল ও বাঙ্গলার, সুবর্ণকুডাও বাঙ্গলার। যদি বাঙ্গালীরা সকলের আগে রেসমের চাপ আরম্ভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত তাঁহাদের পৌরষের

সীমাই নাই। যদি চীনেই সর্বপ্রথম উৎসার
চাষ আৰম্ভ হয়, তাহাণি বাঙ্গালীরা চীন
হইতে কিছু না শিখিয়াই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র
ভাবে যে বেশমের কাপড় আৰম্ভ করেন,
সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

৪। বাকলের কাপড়

বাঙ্গালার চতুর্থ গৌরব বাকলের কাপড়।
প্রথম অবস্থায় লোকে পাতা পরিমিত।
কটকের জঙ্গল-মহলে এখনও তা এক
আবগাধা। লোকে পাতা পরিমাণ থাকে,
তাহার পর লোকে বাকল পরিমিত; বাছের
ছাণ পিটীয়া কাপড়ের মত নরম করিয়া
লইত, তাহাই জড়োয়া লজ্জা নিবারণ
করিত এবং কাঁধের উপর একপাশি
ফেলিয়া উত্তরায় করিত। তাহার পর লোকে
আর বাকল পরিমিত না, বাকল হইতে সূতা
বাহির করিয়া কাপড় বুনিয়া লইত; বাকল
হইতে যে কাপড় হইত, তাহার নাম
“কোম” উৎকৃষ্ট কোমের নাম “ব্রুকল।”

কোটগোর অর্থশাস্ত্রের মতে বাঙ্গলাতেই
এই বাকলের কাপড় বুনা হইত। বঙ্গ
“ব্রুকল” হইত, উহা বেঁচে ও মিষ্ট, দেখিলেই
চক্ষু জড়াইয়া যায়। পোড়ে ও ব্রুকল
হইত, উহা প্রামাণ্য ও মণির মত উজ্জল।
স্বর্ণকুন্ডা যে ব্রুকল হইত, তাহার বর্ণ
হুণের মত এবং মণির মত উজ্জল।

৫। থিয়েটার

প্রাচীন বাঙ্গলার পঞ্চম গৌরব থিয়েটার।
থিয়েটারের সেকালের নাম “প্রেক্ষাগৃহ” বা
“পেক্ষা ঘর”।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের প্ৰবৃত্তির

অনুসারে নাটকের প্রবৃত্তি চারিরকম ছিল।
সেই চারিটি প্রবৃত্তির নাম—আবৃত্তি,
দাক্ষিণ্য, পাকালো ও ওডমাগদী।
দাক্ষিণ্যের লোকে নাটকে নৃত্য, গীত,
বাগ্য বেশী বেশী দেখিতে ভালবাসিত,
তাহারা অভিনয়ও ভালবাসিত, কিন্তু উহা
চুইর, মধুর ও ললিত হওয়া আবশ্যিক
ছিল। এতরূপ পূর্ণাকালের লোকেরও একটা
প্রবৃত্তি ছিল, তাহার নাম ওডমাগদী।
ওডমাগদী প্রবৃত্তি যে সকল দেশে প্রচলিত
ছিল, তাহার মধ্যে বঙ্গদেশ প্রধান। কারণ
বঙ্গদেশে হইতেই মলচ, মল, বর্ষক, ব্রজোত্তর,
ভার্য, মার্গব, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, পুলক,
বৈদেহ, তাঁম্রলিপ্তি প্রভৃতি দেশ নাটকের
প্রবৃত্তি প্রণয়ন করিত। এই নাটকের প্রবৃত্তি
এই যে, ইহার প্রহসন ভালবাসিত,
ছোট ছোট নাটক ভালবাসিত, পূর্ণরূপে
অশ্লীল্য ও মঙ্গলধ্বনি ভালবাসিত, বর্ণোপ-
কথন ভালবাসিত, আর সংস্কৃত পাঠ
ভালবাসিত; গ্রন্থ অভিনয় তাহাদের আদৌ
ভাল লাগিত না, পুরুষের অভিনয়েই তাহাদের
পছন্দ ছিল। তাহার নাটকে গান, বাজনা,
নাম—এ সব ভালবাসিত না।

বুটের উই শত বৎসর পূর্বেও যদি
বাঙ্গলার নাটকের একটা স্বতন্ত্র রীতি
চলিয়া থাকে, তবে তাহা বাঙ্গালীর কম
গৌরবের কথা নয়।

৬। নৌকা ও জাহাজ

বাঙ্গলার ষষ্ঠ পঞ্চম নদী আছে,
তাহাতে বাঙ্গালীরা যে অতি প্রাচীনকালেও
নৌকা গড়িত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই

নৌকাও, অনেকরূপ ছিল—দোণা, তুং, ডিগ্গি, ডেলা, নৌকা, বালাম, ছিপ, ময়ব-পখী ইত্যাদি। এ সকলই ছোট ছোট নৌকা সকল বেশেই আছে। বাঙ্গলার কিন্তু বড় জাহাজও ছিল।

বাঙ্গালী রাজা সিংহবাহু আপনার ভগিনীকে বিবাহ করিল। তাহার অনেক-ভগ্নি ছেলেপিলে হইল। বড় ছেলেব নাম হইল বিজয়। সে বড় দুবস্ত্র লোকের উপর বড় অত্যাচার করে। লোকে উত্তাজ হইয়া উঠিল, রাজাকে বলিল, “ভুলেটিকে মারিয়া ফেল।” রাজা ৭০০ অশ্বচরের সজ্জিত বিজয়কে এক, নৌকা করিয়া দিয়া সমুদ্রে পাঠাইয়া দিলেন। বিজয় ঘুরিতে ঘুরিতে লঙ্কায়গে আসিয়া নামিল।

৭০০ লোক যে নৌকার বাস—সে ত জাহাজ। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বাঙ্গলা দেশে ঐরূপ বড় বড় নৌকা প্রচলিত হইত। বিজয় সে জাহাজে লঙ্কা দাম, সে জাহাজের একখানি ছবি অমরক-গুহার মধ্যে আছে। তাহাতে মাস্তুল ছিল, পাল ছিল, ষ্টীজ এলিন হইবার আগে যে সব জিনিষ তাহাতে দরকার, সবই ছিল। অনেকে মনে করেন যে, এ সব কথা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু সেই ছবিটা ত এখনও আছে, তাহা ত অবিশ্বাস করা যায় না। সে ছবিও অল্প দিনের নয়, অন্তত ১৪০০ বৎসর হইয়া গিয়াছে। তখনও লোকে মনে করিত, বিজয় এই ভাবে ঐরূপ নৌকার লঙ্কায় নামিয়াছিলেন।

দশকুমারচরিত্র একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। উইলসন সাহেব মনে করেন যে, উহা

খৃষ্টের জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্বে লিখিত। অনেকে কিন্তু মনে করেন, উহা খৃষ্টের জন্মের পূর্বেই লেখা হইয়াছে। উহাতে তাম্রলিপ্তি নগরের বিবরণ আছে। সেখান হইতে অনেক শেঠ বঙ্গসাগরে বাইত।

খৃষ্টের জন্মের চারি শত বৎসর পূর্বে মৌর্য্যবংশ তাম্রলিপ্তি হইতে এক জাহাজে চড়িয়া চীনযাত্রা করিয়াছিলেন।

তাহার পরও তাম্রলিপ্তি হইতে চীন ও জাপানে কাহাজ বাইত শুনা যায়। ঐকমত্যের প্রাচীন যুগান্তে লেখা আছে যে, মগধ হইতে অনেকবার লোকে বাইয়া ব্রহ্মদেশ দখল করে ও তথায় দত্যতা দিবার করে। ভূমেল সাহেবের রিপোর্টে অকাল যে, পেগানে বহু পূর্বে মগধ হইতে লোকজন গিয়াছিল ও তথায় ভারতবর্ষের ধর্ম প্রচার করিয়াছিল।

কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গলার রাজারা নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন। পালরাজাদের যে যুদ্ধের জন্ত অনেক নৌকা থাকিত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। খলিলপুরে ধর্মপালের যে তাম্রলিপ্তি পাওয়া গিয়াছে; তাহাতে ধর্মপালের যুদ্ধের জন্ত অনেক নৌকা প্রস্তুত থাকিত, একথা স্পষ্ট লেখা আছে। রাধাপাল নৌকার দৈতু করিয়া গঙ্গা পার হইয়াছিলেন, একপা রামচরিতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে।

কিন্তু মনসা ও মঙ্গল-চণ্ডীর পুথিতেই আমরা বাঙ্গলা দেশের নৌকাযাত্রার খুব জাঁকিল খবর পাই,—চৌক, পোনেচ, খোল খানি কাহাজ একজন সমাগর একজন মাকীর অধীনে তালাইয়া লইয়া গঙ্গা বাহিয়া

সমুদ্র পড়িয়েছেন, সমুদ্র বাহিরা সিংহলে
 বাইতেন এবং তথা হইতেও ১৪১৫ দিন
 বাহিরা মধ্যসমুদ্রের মধ্যে নানা ষোল উপাধী
 বাণিজ্য করিতে বাইতেন। চাঁদসমাপ্তের
 প্রধান জাহাজের নাম মধুকর। কোন
 কোন পুথিতে লেখে যে, মধুকরের ১২০০
 শত গাড় ছিল। এট সফল নই লেখার
 পরও যখন কেদেররায় ও আত্মপাদিত্য
 খুব এসল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তাহা
 সর্বদাই নৌকা লইয়া যুক করিতেন, অনেক
 সময় দুব দুবান্তরও বাটতেন

৭। বৌদ্ধ শীলভদ্র

তীনে যত নৌক পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন,
 যুগে চুগে তাহাদের মধ্যে সকলেও চেষ্টে
 বড়। তাহারই শিষ্য-প্রশিষ্য এক সময়
 আপান, কোরিয়া, মঙ্গলিয়া ছাটয়া কেংগা-
 ছিল। যুগে চুগে নৌক ধর্ম ও বোধ
 শিপিবার অল্প ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন।
 তাহার পরতলে বসিয়া তিনি এত শাস্ত্র
 শিখিয়া ছিলেন, তিনি একজন বাঙ্গালী।
 ইহার নাম শীলভদ্র, সম্রটের এক রাজার
 ছেলে। যুগে চুগে তাকে দেবতার মত
 ভক্তি করিতেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন
 যে, নানা দেশে নানা ভরুর নিকট বৌদ্ধ-
 শাস্ত্রের ও বৌদ্ধধর্মের এত সকল অধ্যয়ন
 করিয়া, তাহার যে সকল সন্দেহ কিছুতেই
 মিটে নাট, শীলভদ্রের উপদেশে সেট সকল
 সন্দেহ মিটিয়া গিয়াছে। কাম্বোজের প্রধান
 প্রধান নৌক পণ্ডিত তাহার যে সমস্ত
 সময় দুব করিতে পারেন নাট, শীলভদ্র
 তাহা এক এক কথায় দুব করিয়া দিয়া-

ছিলেন। শীলভদ্র মধ্যম নৌক ছিলেন,
 কিন্তু নৌকদ্বিগের অত্যন্ত সম্প্রদায়ের সমস্ত
 এতই তাহার পড়া ছিল। তিনি ব্রাহ্মণদের
 সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পাণিনি
 তাহার বেশ অধ্যায় ছিল এবং সে সময়
 তাহার যে সকল টীকা-টিপ্পনী হইয়াছিল,
 তাহাও তিনি পড়াইতেন। ব্রাহ্মণের আদি
 এত যে বেশ, তাহাও তিনি যুগে চুগে
 পড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাহার মত সর্ব-
 শাস্ত্রবিদ্যার পণ্ডিত ভারতবর্ষেও আর
 দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

যুগে চুগে এক জাহাজের পলিতেছেন
 যে, শীলভদ্র দিয়া, বুদ্ধি, ধর্মোন্নয়ন, মিঠা
 প্রভৃতিতে প্রাচীন বৌদ্ধগণকে ছাড়াইয়া
 উঠিয়াছিলেন। তিনি মন কুড়িখানি পুস্তক
 লিখিয়াছিলেন। তিনি যে সকল টীকা-
 টিপ্পনী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি
 পরিষ্কার এবং তাহার ভাষা অতি সরল।

৮। নৌক লেখক শাস্ত্রিদেব

আমি মনে করি যে, যিনি বৌদ্ধধর্মের
 বহুতথ্যানি খুব চলিত পুথি লিখিয়া
 গিয়াছেন, সেই মহাত্মা শাস্ত্রিদেব বাঙ্গালী
 ছিলেন। কিন্তু তাহানাম আমায় বিবোধী।
 তিনি যখন, শাস্ত্রিদেবের বাড়ী সোরাট্টে
 ছিল। তাহার লীগাকের মগধের রাজধানী
 ও নালন্দা।

তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে করিবার
 কারণ আছে। নালন্দার তাহার একটি
 'হুট্টা' বা কুঁড়ে ঘর ছিল। লোকে
 দেখিত, তিনি যখন ভোজন করিতে
 বসিতেন, তাহার মুখ এসময় থাকিত; যখন-

মহন অধিতেন, তাহার মুখ এসে থাকিত ;
মহন কুটীতে বসিয়া থাকিতেন তখনও
তাঁহার মুখ এসে থাকিত ; সেইজন্য :—

“ভূম্মানোপিত্তভাবঃ

সুপ্তোপিত্তভাবঃ

কুটীং গতোপিত্তভাবঃ।”

এই জন্ত তাঁহার নাম হইয়াছিল “ভূম্মকু”।
তিনি যখন মগধের রাজধানীতে থাকিতেন,
তখন তিনি “রাউতর” কথা করিতেন।
এমন কহগুলি বাঙ্গলা গম পাচে, ঘাচায়
কণিতার লেখা আছে “রাউতু ভগুত কট,
ভূম্মকু ভগুত কট,” এখন এই রাউতু,
ভূম্মকু ও শাস্ত্রদেব একই ব্যক্তি কি না,
ইহা জাবাবর কথা। তখনই ঠিক, ইহাই
অধিক সম্ভব।

আরও এক কথা, শাস্ত্রদেব তিনখানি
পুস্তক লিখিয়াছেন :—

(১) স্মৃতি-সমুচ্চয়, (২) শিকা-সমুচ্চয়
ও (৩) বোধিচর্যাবতার। শেব দুইখানি
পাওয়া গিয়াছে ও তৃতীয় হইয়াছে। এগুলি
খানি এখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু
ভূম্মকুর নামে আমরা আর একখানি বই
পাওয়াছি, সেখানি ভূম্মকুর লেখা। উপরের
দুইখানির মত এইখানিও সংস্কৃত লেখা,
তবে মাঝে মাঝে বাঙ্গলা আছে। উপরের
দুইখানির মধ্যেও আমার শিকা-সমুচ্চয়ে
অনেক অংশ সংস্কৃত ছাড়া অপর আর
এক ভাষার লেখা।

বোধিচর্যাবতारे শাস্ত্রদেব দ্বার দ্বার
বিপক্ষদের একটি কথা বলিয়া গালি
দিয়াছেন। সে গা’লটি কিন্তু বাঙ্গলা
-ভাড়া আর কোথাও শুনি নাই—লে কথাটি

‘গুপ-বুদ্ধক’। আমাদের দেশে “দিনরাশি এই
গা’লটি শুনা যায়।

আরও কথা, একটি ভূম্মকুর
আছে :—

“আম ভূম্মকু তু ভেণি বাঙ্গলী।

নিম বীরণী চ’তালী নেলী।”

আম ভূম্মকু তুই সত্য সত্য বাঙ্গালী
হইয়াছিল হত্যা’দি।

এই সকল কারণে আমি শাস্ত্রদেবকে
জামাদের অষ্টম গৌরব মনে করি।

৯। নাথ-পন্থ

আমাদের দেশে এখন যে সব বোগীরা
আছেন, তাহাদের সকলেরই উপাধি নাথ।
তাঁহারা বলেন, “আমরা এদেশে রাজাদের
ওক ছিলাম, ত্রাকণেও আমাদের ওকগিরি
কাজিয়া লইয়াছি।” তাই এখন আবার
তাঁহারা পুঁতা লইয়া ত্রাকণ হইবার চেষ্টার
আছেন। নাথদের আচার-বাবহার কিছু
ত্রাকণদের মত নয়। এত জাত কোথা
হইতে আসিল, অনেক বৎসর ধরিয়া আম
অজ্ঞান করিতেছি। রথেন এমিটাটকু
সেগোচরীর জর্ণালের পুরান-পঁথারে ১৮শ
বৎসে হুঙ্গন সাহেবের মন্তব্যপ্রাথ প্রকৃতি
করেকজন নাথের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ
পড়িয়া আমার প্রথম ধারণা হয় যে নাথ-
পন্থ (Nathism) নামে এক প্রবল ধর্ম-
সম্প্রদায় বহু শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলার
এবং পূর্বাঞ্চলে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছে।

নাথেরা যে বাঙ্গলা দেশের বা পূর্বা-
ভারতের লোক, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ—মীন-
নাথের একটি পদ পাইয়াছি, সেটি ঐতি

বান্ধা। গোরক্ষনাথের শীলাক্ষেত্র বান্ধা-
তেই অধিক। তাঁহারই চোলা হাড়ি পা
আমাদের মরনাস্তীর গানের নাটক।
মীননাথ যখন তাঁহার নিজের ধর্ম কুণিমা
গিয়াছিলেন, গোরক্ষনাথই তখন তাঁহাকে
সে কথা মনে করাইয়া দেন। মংজ্ঞানাথকে
অনেক সময় মচ্ছন্ননাথ বলে, অর্থাৎ তিনি
শেষের ছেলে ছিলেন। এত পা বড় সত্য
হয়, তাহা হইলে তাঁহার বান্ধা বেশের
লোক হওয়াই সম্ভব।

ক্রমে নাথ-পন্থ পূব প্রবল হইয়া উঠিল
মোছো ও হিন্দু। মাণিক্যের উপাধি
করিত। মংজ্ঞানাথের গ্রন্থে বুদ্ধধর্মের
নাম গন্ধ না থাকিলেও, তিনিই এখন
নেপালী বুদ্ধদিগের প্রধান দেবতা। তাঁহার
রথযাত্রায় নেপালে যেমন ধুমধাম হইয়া
থাকে, এমন আর কোনও দেশের কোনও
যাত্রা হয় না। গোরক্ষনাথের উপর
নেপালী বৌদ্ধেরা সকলে খুসী না থাকিলেও
অনেক বৌদ্ধেরা এখনও তাঁহার পূজা করে,
ভিকৃতও তাঁহার পূজা হয়।

এই সকল কারণেই নাথ-পন্থকে আমি
বান্ধার প্রথম গৌরব বলিয়া মনে করি।

১০। দীপঙ্কর ত্রীজ্ঞান

বান্ধা দেশের দশম গৌরব দীপঙ্কর
ত্রীজ্ঞান। তাঁহার বিবাসপূর্ব্বকালে বিক্রমশীলপুর।
তিনি কিছু দূর বিক্রমশীলবিহারে আশ্রম
গ্রহণ করেন। সেখানে অল্প দিনের মধ্যেই
তিনি প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হন।
সে সময় মঠের অধ্যক্ষ তাঁহাকে সুবর্ণদীপে
প্রেরণ করেন। তিনি সুবর্ণদীপে বৌদ্ধ

ধর্ম সংস্কার করিয়া আসিচ্ছিলেন। তথা
হইতে ফিরিয়া আসিলে তিনি বিক্রমশীল-
বিহারের অধ্যক্ষ হন। তখন নালন্দার
চেরেও বিক্রমশীলের খ্যাতি-প্রতিপত্তি দৃশ্য
অধিক হইয়াছে।

দীপঙ্কর অনেক সময় ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত
ও অল্প বানানলম্বীদিগের সহিত বোরতর
বিহারে আবৃত হইতেন ও তাহাতে ভয়লাভ
করিতেন। এই সময় তিব্বত দেশে বৌদ্ধ
ধর্ম প্রায় লোপ হইয়া আসে ও বন্যপার
দল খুব প্রবল হইয়া উঠে, তাহাতে ভয়
পাইয়া তিব্বত দেশের রাজা বিক্রমশীল
বিহার হইতে দীপঙ্কর ত্রীজ্ঞানকে তিব্বতে
লইয়া যাইবার ক্ষমতা দূত প্রেরণ করেন।
দীপঙ্কর দুই একবার যাইতে অসম্মত হইলেও
বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া পরিশেষে তথায়
যাইতে স্বীকার করেন। পশ্চিম-তিব্বতে
বৈ সকল বিহারে তিনি বাস করিয়াছিলেন,
সে সকল বিহার এখনও শোকে অতি
পবিত্র বলিয়া মনে করে। অতিশয় যখন
তিব্বত দেশে যান, তখন তাঁহার বয়স ৭০
বৎসর। এক্ষণ বৃদ্ধ বয়সেও তিনি তিব্বতে
গিয়া অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন
এবং তথাকার অনেক লোককে বৌদ্ধধর্মে
দীক্ষিত করিয়াছিলেন। আজও সহস্র
সহস্র লোকে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা
করে। অনেকে মনে করেন, তিব্বতীয়-
দিগের যা কিছু বিজ্ঞা, বুদ্ধি, সভ্যতা—এ
সমুদায়ের মূল কারণ তিনিই।

১১। জগদল মহাবিহার ও বিভূতিচন্দ্র

রাইট সাহেব নেপাল হইতে কতকগুলি

পুণি কুড়াইয়া লইয়া গিয়া কেঁচিৎ ইউ-
নিভাসিতিকে দেন। তাহার মধ্যে শান্তি-
দেবের শিক্ষা-সমুচ্চর নামে একখানি পুঁথি
থাকে। পুঁথিখানি কাগজের, হাতের লেখা,
অধিকাংশই বাঙ্গলা। বেতল সাহেব যখন
এই পুঁথিগুলির ক্যাটালাগ করেন, তখন
তিনি বলেন যে, এ পুঁথিখানি গুপ্তের কয়েক
১৪শ বা ১৫শ বছর পুরে লেখা।

“পুঁথিখানির শেষে লেখা আছে :—
“সের ঘরোয়ঃ অবরমহাবানবারিনো জাগদল
পতিত-বিভূতিচন্দ্রস্য” ইত্যাদি।

বেতল সাহেব বলিয়াছেন, “মহাবান-পত্নী
জগদল পতিত বিভূতিচন্দ্র কে আমি জানি
না।” ১৯০৭ সালে আমি নেপালী গিয়া
করেকখানি পুঁথিতে জগদল-মহাবানহারের
নাম পাই; বিভূতিচন্দ্রেরও নাম পাই।
তিনি “অমৃতকর্ণিকা” নামে “নামসংগীতিব”
একখানি টীকা করেন, ঐ টীকা কালচক্র-
বানের মতে লিপিত হয়।

রামচন্দ্র কাব্য ছাপাইবার সময়
জানিতে পারি, রামপাল রামাতী নামে
যে নগর বসান, “জগদল মহাবিহার”
তাহারই কাছে ছিল। জগদলের গৌর
এখনও পাওয়া যায় নাই, পাওয়া কিন্তু
নিতান্ত দুরূহ। কারণ, মগধে যেমন
নাগদ্বী, পেশোরাতে যেমন কনিঙ্কবিহার,
কলম্বোতে যেমন দৌপগুপ্ত বিহার, সেইরূপ
বাঙ্গলার মহাবিহার জগদল।

এই বিহারে অনেক বড় বড় ভিক্ষু
থাকিতেন, তাহাদের মধ্যে বিভূতিচন্দ্রই
প্রধান। বিভূতিচন্দ্র অনেকগুলি সংস্কৃত
যৌক্ত গ্রন্থের টীকা-টীপনী লিখিয়া ছিলেন।

যখন তিব্বত বেগে এই সকল যৌক্ত গ্রন্থের
তর্জমা হইতেছে, তখন তিনি অনেক
পুস্তকের তর্জমার সাহায্য করিয়াছেন এবং
নিজেও ছই-চারিখানি পুস্তক তর্জমা করিয়া-
ছেন। জগদলের আর একজন মহাভিক্ষুর
নাম দানশীল।* তিনিও এইরূপ অনেক
পুস্তক তর্জমার সাহায্য করিয়াছেন। সুতরাং
তিব্বত-ওরাণারা যে এক সময় জগদল-
ভিক্ষুর উপর অনেকটা নির্ভর করিত,
সেটা বেশ বুঝা যায়।

সম্প্রতি শ্রীমান্ রামালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
যে একখানি কেশবের পুস্তক কিনিল
সাহিত্য-পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন,
‘সেগিয়াইট’ লামা বলেন, সে পুস্তকখানি
হাতের লেখা, কাঠের ছাপা নয়, ১২২৬
বৎসর পূর্বে পুস্তকখানি লেখা হয়, দানশীল
উহা তর্জমা করেন। এ দানশীল যদি
জগদলের দানশীল হন, তাহা হইলে জগদল
বিহারও পুরান, বিভূতিচন্দ্রও পুরান, আর
বেতল সাহেবের পুঁথিও, তিনি যে সময়
বলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আরও তিন চারি
শত বৎসর পুরান।

১২। সুইপাদ ও তাঁহার সিদ্ধাচার্য্যগণ

বাঙ্গলার অদ্বৈত গৌরব লুটনার ও তাঁহার
সিদ্ধাচার্য্যগণ। তিনি আদি-সিদ্ধাচার্য্য
ছিলেন। তাঁহার বাড়ী বাঙ্গলায় ছিল।
রাঢ়দেশে এখনও তাঁহার নামে পুজা হয়,
তাঁহার নামে পাঁটা ছাড়িয়া দেয়। ময়ূর-
ভঞ্জে ও তাঁহার পূজা হয়। তিব্বতীরা
তাঁহাকে সিদ্ধাচার্য্য বলিয়া পূজা করে।
কিন্তু অনেক বাঙ্গলা গান শিখিয়াছেন,

অনেক সংস্কৃত নৌক গ্রন্থের টীকা-টীপনীও লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি একটি সম্প্রদায়টো সৃষ্টি করিয়াছেন। সে সম্প্রদায় হয় সহজ-যান হইবে, না হয় সহজযানেরই কোন ভাগ হইবে। সিদ্ধার্থগণ এককালে বাঙ্গলার ৩৬ পূর্ব-ভাগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছিলেন।

সিদ্ধার্থগণের মধ্যে সুই, কুর্কী, বিষ্ণু, শুভ্রী, চাটিন, ভূমুক, কাল, কামলি, ডোবী, শান্তি, মহিতা, বীণা, সরস, শবর, আবদেব, টেটন, দারিক, স্মৃদে, ভাডক,—এই কল্পনায় “চর্যাপন” আ কীর্তনের গান পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল পদ মূলমামান-বিজয়ের পূর্বেই রচনা হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সহজিগামতে উহার সংস্কৃত টীকা করিতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও বহু সংখ্যক দোহাকোষ ছিল। ঐ সকল দোহাকোষেরও সংস্কৃত টীকা ছিল। অনেকগুলি দোহাগীতিকা ছিল, তাহারও সংস্কৃত টীকা ছিল। এই সমস্তেরই কুটীরা ভাষায় তর্জমা আছে। যে কল্পনায় সিদ্ধার্থগণের নাম কমিলাম, ইহাদের সকলেরই গ্রন্থ আছে, সমস্তই কুটীরা ভাষায় তর্জমা হইয়া গিয়াছে হস্তগত কুটীরা ভাষাগ্রন্থ, বিশেষ তেজুর গ্রন্থ খুলিলে যে শুধু বাঙ্গালীদের ধর্মমত পাওয়া যাইবে এমন নয়, বাঙ্গালী সাহিত্যেরও একটি ইতিহাস পাওয়া যাইবে।

১৩। ভাস্করের কাজ

বাঙ্গলার ত্রয়োদশ গৌরব ভাস্কর-শিল্প মহাধান হইতে বতই নূতন নূতন ধর্ম বাহির হইতে লাগিল, হিন্দুদের মধ্যেও বতই তন্ত্রের মত প্রবেশ করিতে লাগিল, ততই নূতন

নূতন দেবতা, নূতন নূতন বৃক, নূতন নূতন বোধগম্য-পূজা আরম্ভ হইল। এক এক দেবতারই নানা মূর্তি হইতে লাগিল, কখন ক্রোধমূর্তি, কখন শান্তমূর্তি, কখন কখনাধূর্তি—নানাক্রম মূর্তা বাহির হইতে লাগিল। সে সকল মূর্তার, সে সকল মূর্তির ও সে সকল দেবতার নাম অসংখ্য। বৌদ্ধদের এক সাধনমালায় ২৫৬ রূপ মূর্তির সাধনের কথা বলা আছে। তেজুর ১৭৯ নাটকীয় গ্রন্থ ৩৬ দেবতার সাধন আছে। নেপালের চিত্রকর জাতির লোকে এখনও এই সকল দেবতা মূর্তি আঁকিয়া দিতে পারে। বাঙ্গলার একজন আঁকী দিবার লোক কত ছিল বলা যায় না। পাথর তাঁচাণা মোনের মত ব্যবহার করিত। পাথর দিয়া যে তাঁচাণা কত রকম মূর্তি গড়িয়া দিত, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। এই মূর্তিব্যতার ইংরাজী নাম “Iconography”। সেদিন একজন গ্রন্থিক Iconographer এক সভায় বলিয়াছেন যে মূর্তিবিশ্বা শিখার একমাত্র জায়গা বাঙ্গলা। এখনও ভাস্করেরা নানাক্রম হুন্দর হুন্দর মূর্তি নির্মাণ করিয়া থাকে। রাইহাটের ভাস্করদের কথা ত সকলেই জানেন। চৈতন্যের সময়েও চমৎকার চমৎকার মূর্তি নির্মাণ হইত। পাল-রাজাদের সময়েই এই ভাস্করশিল্পের চরম উন্নতি হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সর্বত্রই এখনকার ভাস্করেরা কার্য্য করিত। শিল্পের এত উন্নতি আর সাধনার কল নয়। বাঙ্গালী এককালে সে সাধনা করিয়াছিল, তাহার ফলও পাইয়াছে। শুধু পাথরে নয়, পিতলে, তামার, রূপের,

সোণা, কুটখা হুতে—যাহাতেই বসি, মূর্তিগুলি
যেন সজীব।

চৈতন্তদেবের পর গন্যে বৈষ্ণবেরা
কাঠের ও মাটির মূর্তি তৈয়ার করিত।
মহাশক্তির দুই একটি কাঠের মূর্তি দেখিলে
সত্য সত্যই মনে হয়, মহাশক্তি কথা
কহিতেছেন, ঠোট ছুটি যেন নড়িতেছে।
চৈতন্তের কীৰ্ত্তনমূর্তি অনেকেই দেখিরাছেন,
কি সুন্দর! মাটির মূর্তিতে কৃষ্ণনগরের
সুন্দারেরা এখনও বোধ হয় ভারতে
অবিদ্য। একজন ইউরোপের ভ্রমাদ
কতকগুলি মাটির গড়া মূর্তি
দেখিরা বলিরাছিলেন, “ইহারা সত্য সত্যই
অনেক দিন ধরিয়া নাচুনের নির্মাণমণী
পর্যন্ত তলাইয়া দেখিরাছে ও বুঝিরাছে।”

১৪। বাঙ্গলায় সংস্কৃত

সুন্দরান-আক্রমণের পূর্বে বাঙ্গলায়
অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিত হইরাছিল।
তবেই একজন প্রণয় পণ্ডিত ছিলেন।
সংস্কৃত যাহা কিছু পড়িবার ছিল, তিনি
যেন সবই পড়িরাছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র
উহার প্রণয় লিখিরাছেন। সেই প্রণয়িতে
যাহা লেখা আছে, তাহা যদি চানিতাগের
একভাগও সত্য হয়, তাহা হইলেও ভগদেব
যে দেশে অধিরাছিলেন, সে দেশ খড়।
উহার কত পুস্তক ছিল, আমরা এখনও
জানিতে পারি নাই। তবে সাংবেদীনের
পদ্ধতি ছাড়া আরও উহার দশ বায়বানি
গ্রন্থ পাওয়া গিরাছে।

প্রথম বেদের ব্যাখ্যা বাঙ্গলাতেই হয়।
সায়ণাচার্যের দুই তিন শত বৎসর পূর্বে

হুগড়াচার্য্য এক নূতন ধরণের “বেদব্যাখ্যা”
লিখিত করেন। হুগড়ের পুস্তক এখনও পাওয়া
যায় নাই, কিন্তু উহার সম্প্রদায়ের পুস্তক
অনেকগুলি পাওয়া গিরাছে। হুগড়
উহার সম্প্রদায়ের, “ভগদেব” উহার
দায়ের। ইহারের ব্যাখ্যা বেশ পরিষ্কার ও
সুগম।

দর্শনশাস্ত্রে বৌদ্ধের সঙ্গে সর্গদ্বাই
উহারের বিচার করিতে হইত। সুতরাং
বাস্তববাদী ব্রাহ্মণ মাত্রেই দর্শনশাস্ত্রের কিছু
চর্চা রাখিতে হইত। বৌদ্ধের লেখা
প্রশংসারের টীকা এখন ভারতবর্ষে পুণ্য
প্রচলিত।

স্বতন্ত্রে গোড়ীর মতট একটি স্বতন্ত্র
ছিল। কানী, মিথিলা ও নেপাল দেশের
প্রাচীন স্বতন্ত্র নবকে অনেকবার গোড়ীর
মতের নাম করিরাছে। মতের টীকাকার
শ্রীমদ্ভগদেব স্বতন্ত্রমতের বলিরা এক
প্রকাণ্ড স্বতন্ত্র-নিবন্ধ লিখিরা গিরাছেন, তাহা
পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমরা উহার
যে পুথিবানি পাইরাছি, তাহা খৃঃ ১১৪৫
সালে লিখিত। দায়ভাগকার জীমুত-
বাহন, দিকন, শ্রীকর প্রভৃতি অনেক
স্বতন্ত্র-নিবন্ধকারের ও ভোয়াক, অজু, কট্ট
প্রভৃতি অনেক ভোয়াক-নিবন্ধকারের
নাম করিরা গিরাছেন। তিনি নিজে যাহা
করিরা তুলিরাছেন, সেই ত একটি অদ্ভুত
জিনিস। সম্প্রতি পূর্বে বঙ্গগত ছিল,
তিনি তাহাকে ব্যক্তিগত করিরা গিরাছেন,
এ কাজটি ত ভারতে আর কেহই করিতে
পারেন নাই। বাঙ্গালও ত নিজে লুপ্ত
বিরাট গ্রন্থ লিখিরা গিরাছেন, একখানি

দানদাগর ও আর একখানি অহুঃসাগর।
খ্রীষ্টাব্দাচার্যের তুষ্টির গ্রন্থও ত তুষ্টি ও
ও জ্যোতিষের একখানি ভাণ্ড বই।

১৫। বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ ও
রঘুনন্দন।

ধর্মের গৌরব, বিচার গৌরব ও শ্রমের
গৌরবে গৌরবাবিত হইয়া বৌদ্ধগণ ও হিন্দু-
গণ বাঙ্গলা দেশে বৃথেষ্ট বহুসংখ্যক বাস করিতে
ছিলেন। এমন সময় যের বক্তার প্রচার
আফগান দেশ হইতে মুসলমানেরা আসিয়া
উপস্থিত হইল। সে বক্তার রাজা-প্রজা,
বৌদ্ধ-হিন্দু, ব্রাহ্মণ-সচিব, জ্ঞান-মুক্তি, দুর্শন-
বিজ্ঞান--সব ভাসিয়া ভাসিয়া গেল।

লাভ হইল মঙ্গলবার, লাভ হইল
ভিক্তের, লাভ হইল পূর্ণ-উপবাসের, লাভ
হইল সিংহলের। তলোয়ারের মুখ চটতে
যাচাখা অব্যাহতি পাউনছিল, তাহার। ঐ
সকল দেশে গিয়া আশ্রয় লইল। তাহা-
দিগকে পাউরা ঐ সকল দেশ কৃতার্থ হইয়া
গেল; তাহাদের শিখা বৃদ্ধি হইল, ধর্ম বৃদ্ধি
হইল, জ্ঞান বৃদ্ধি হইল, শির বৃদ্ধি হইল;
অতি বাহা হইবার তাহা বাঙ্গলারই হইয়া
গেল।

দুই শত বৎসর পর্যন্ত বাঙ্গালীরা প্রাণের
ডগে অস্থির হইয়া আপন দেশে বাস করিতে
লাগিল। এই সময় দেশের কি অবস্থা
হইয়াছিল, কুলগ্রন্থই তাহার সাক্ষী। দুই
শত বৎসর নিরন্তর মারামারি কাটাকাটির
পর একবার একজন হিন্দু বাঙ্গলার রাজা
হইয়াছিলেন। অমনি আবার হিন্দুমাঝে
সংস্কৃত সাহিত্য, বাঙ্গলা সাহিত্য জাগিল।

উলিল। যে মহাপুরুষের একান্ত আগ্রহ,
একান্ত ব্রত ও দুর্দশিতার ফলে সংস্কৃত-
সাহিত্য আবার বাঁচিয়া উঠে, তাহার নাম
বৃহস্পতি, উপাধি রায়মুন্সি। তিনি নিজে
অনেক সংস্কৃত কাব্যের টাকা লিখিয়া এক-
খানি তুষ্টি-নিবন্ধ রচনা করিয়া, অমরকোষের
টাকা লিখিয়া, অনেক পণ্ডিতকে প্রতিপালন
করিয়া, আবার সংস্কৃত সাহিত্যের চর্কা
আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই কাণ্ডে তাহার
প্রধান সহায় ছিলেন শ্রীকর। ইনিও
বৃহস্পতির ছাত্র নানা গ্রন্থ রচনা করেন
এবং দুইজনে মিলিয়া অমরকোষের আর
একখানি টাকা লিখেন। শ্রীকরের পুত্র
শ্রীনাথ পুরা এক সেট নিবন্ধ সংগ্রহ করিয়া
আবার হিন্দুমাঝে বাঁধবার চেষ্টা করেন।
তিনি বিশেষরূপ কৃতকাণ্ড হইতে পারেন
নাই, কিন্তু তাহার শিষ্য রঘুনন্দন সমাজ
বাঁধিয়া দিয়া গেলেন। তাহার বাঁধা সমাজ
এখনও চলিতেছে। বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ
ও রঘুনন্দন আমাদের সমাজ বাঁধিয়া
দিয়াছেন বলিয়া আমরা আজও হিন্দু বলিয়া
পরিচয় দিতে পারিতেছি। ইহারা আমাদের
পূজ্য, নমস্ত এবং গৌরবের স্থল।

১৬। ছায়শাস্ত্র

মুসলমান-আক্রমণে অজ্ঞাত শাস্ত্রের জ্ঞাত,
দর্শনশাস্ত্রও লোপ হইয়াছিল। রাজা গণেশের
পর হইতে যে আবার সংস্কৃত চর্কা আরম্ভ
হইল, তাহার ফলে শাস্ত্রের চর্কা আরম্ভ
হইল। এই চারি শত বৎসরের মধ্যে
বাঙ্গলার ছায়শাস্ত্র ভারতবর্ষের ছড়িয়া
পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের যেখানেই শাস্ত্র,

দিন নৈমিত্তিক, তিনি কিছু না কিছু বাঙ্গলা কথা কহিতে পারেন। নব্বীশে না আশীশে তাঁহাদের চলে না। হুতরাং তাঁহাদের নব্বীশে আশীশেও হয়, বাঙ্গলা ভাষা শিখিতেও হয়। তাহাতে বাঙ্গালীর এই প্রাধান্য তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের পুণ্য ও মমতা। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান বাহুদেব সার্বভৌম। জাতিশাস্ত্রের গ্রন্থকারদিগের মধ্যে সকলের শেষ বিশ্বনাথ। তিনি কয়েকটি কারিকার মধ্যে জাতিশাস্ত্রের সমস্ত চক্রই সিদ্ধান্তের যোগ্য সমাবেশ করেন, তাহা দেখিয়া সকল দেশেরই লোক আশ্চর্য্য হইয়া যায়। এখনও তাঁহার তিন শত বৎসর পূর্ব হয় নাই, কিন্তু ভারতের সর্বত্রই তাঁহার কারিকা ও তাঁহার সিদ্ধান্তসুত্রাবলী চলিতেছে। বাঙ্গলার তাঁহার টীকাকার কেহ ভুলে নাই—তাঁহার টীকাকার একজন মারহাটি, তাঁহার নাম মহাদেব দিনকর। এখন বলিতে গেলে, ছই নৈমিত্তিকগণই এখনও ভারতে বাঙ্গলার নাম বজায় রাখিয়াছেন। কারণ, বাঙ্গলার আঠকে লজ্জা দেশের লোকের চিনিবার দরকার নাই, কিন্তু বাঙ্গলার নৈমিত্তিকদের না তিনিতে ভারতবর্ষে কাহারও চলে না।

চৈতন্য ও তাঁহার পরিকর

যেই মতগুলি যখন ক্রমে ক্রমে একে-বারে বিলুপ্ত হইয়া গেল, বিলুপ্তই বা বলি কেন, ধ্বংস হইয়া গেল, তখন যৌদ্ধধর্মের কি দশা হইল? মুসলমানেরা ঘোর করিয়া অনেক মুসলমান করিয়া ফেলিল। বিহারগুলি তখু যে ধ্বংস হইল এমন নহে,

সেখানে মুসলমান আদিয়া বসিল এবং তাহার অনায়াসেই চারি পাশের লোককে মুসলমান করিয়া ফেলিল। তাই আল বাঙ্গলার অর্ধেকের উপর মুসলমান।

বাকি বাহাবা ছিল, তাহারাই হিন্দু হইয়া গেল। তাহাদিগকে হিন্দু করিল কে? 'ব্রাহ্মণ্য'। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ত এ বিষয়ে কৃতিত্ব আছেই, সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই দল ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সহায় হইলেন। এক দলের নেতা চৈতন্য, অবৈত ও নিত্যানন্দ। আর এক দলের নেতা গোড়ী শঙ্কর, ত্রিপুরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ ও আগম-বাগীশ। একদল বৈষ্ণব, আর একদল শাক্ত।

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চৈতন্যদেব একটি প্রকাণ্ড সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলার বৈষ্ণবদিগের প্রধান কীর্ত্তি—কীর্ত্তনের পদ। যৌদ্ধদিগের চর্যাপদের অনুরূপে এই সকল পদাবলীর সৃষ্টি। পদাবলীর পদার্থ অসংখ্য। রাধামোহন দাস ৮০০৮০০ পদ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার দুই পুরুষ পরে বৈষ্ণবদাস ৩০০০ পদ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, এখনও সংগ্রহ করিলে ২০০০ হাজারেরও অধিক হইবে। তাহাদের মাধুর্য্যে, তাহার গানিত্যে, সুধের বৈচিত্র্যে এই সকল গান সকল সমাজেরই পদম আদরের জিনিস। এই সকল পদ গান করিবার লজ্জা নানাক্রম কীর্ত্তনের সৃষ্টি হইয়াছে। সেখানে যেমন বাঙ্গলার নাটকের একটা স্বতন্ত্র 'জবুতি' ছিল, এখনও কীর্ত্তনের সেইরূপ নানাক্রম 'প্রবুতি' হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুইটি প্রধান—মনোহরসাধী ও রেণেটি। ভক্তিমত্মকরে

লেখা আছে যে, খ্রীশ্বে যখন প্রথম কীর্তন হইল, তখন বর্ষ হইতে চৈত্র সপ্তমানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখনও বোধ হয় ভাল কীর্তন জমিলে সেখানে চৈত্র সপ্তমির আবির্ভূত হন। বাঙ্গলার কীর্তন একটা সত্য সত্যই উপভোগের জিনিস। তাহার অল্প চৈত্রমাসের ও তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট আমার সম্পূর্ণরূপে অগ্নী।

১৮। তাত্ত্বিকগণ

মূল তত্ত্ব বড় একটা পাওয়া যায় না, বাহা পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই সংগ্রহ। একজন তাত্ত্বিক পণ্ডিত ছই চী-খানি মূল তত্ত্ব ও বহুসংখ্যক সংগ্রহ একত্র করিলেন, আবার তাহার উপর নিম্নের একদানি সংগ্রহ বাহির করিলেন। তাঁহার দলে সেই সংগ্রহ চলিতে লাগিল। এইরূপে অনেক সংগ্রহ চলিয়া গিয়াছে।

বাঙ্গলার এই সকল সংগ্রহ-সম্পাদনের প্রথম ও প্রধান—গৌড়ীয় শব্দমালা। সংগ্রহকারেরা মূল তত্ত্ব অনেক পরিষ্কার করিয়া তুলিয়াছেন। মূল তত্ত্বে অনেক অজ্ঞান আছে, বাহা সত্য সমাজে বাহির করা চলে না। সংগ্রহকারেরা উহা মার্জিত করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু যে সকল মহা-পুরুষেরা এই লোকায়ত তত্ত্বশাস্ত্রকে মার্জিত করিয়া সত্য সমাজের উপযোগী করিয়া গিয়াছেন এবং এইরূপ করার অনেক লোক হিন্দু হইয়াছে ও হিন্দু হইয়া রহিয়াছে, তাহার। যে খুব দুঃসমী ও সমাজনীতিকুল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাহা হউক শব্দের পর ত্রিপুরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দ পূর্ব-বঙ্গ বৌদ্ধদিগকে হিন্দু করিয়া লইয়াছিলেন।

তাত্ত্বিক সংগ্রহকারেরা হস্তাবশিষ্ট বৌদ্ধ-গণকে নানা উপায়ে হিন্দু করিয়া লইয়াছেন, আপনার করিয়া লইয়াছেন, অত্যাং তাঁহার। বাঙ্গলা সমাজের দপটে উপকার করিয়া গিয়াছেন।

তাত্ত্বিক মহাশয়েরা বঙ্গ-সমাজের আন্ত-মস্তার প্রবেশ করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা ভাষার সাহিত্য তাহার সাক্ষী। তাহাদের দলে বাঙ্গলা বই প্রচুর না হইলেও যথেষ্ট আছে এবং সেগুলি বেশ ভাল। তাহাদের ক্রমান্বিতরক গানগুলি বাঙ্গলার একটি স্নায়বিক বিষয়। আজিও কেহ সংগ্রহ করে নাই, তাই তাহাদের সংখ্যা কম। বাঙ্গলা। রামপ্রসাদের গান কিনিয়া মোহিত হয় না এমন বাঙ্গালী কি কেই আছে? দেওয়ানজী মতালপুর ও কদলিকাশ্বের গান অনেক সময় শ্রবণের নিগূঢ় তত্ত্বগুলি বাড়াইয়া দেয়।

বাঙ্গালীরা জানে হিন্দু হইলেই, হয় তাহাকে বৈষ্ণব, না হয় শাক্ত হইতে হইবে। সেই জন্য বাহারা বৈষ্ণব নহে, তাহার। সকলেই শাক্ত, শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলেও শাক্ত। কিন্তু এই বলকে বৈষ্ণবের গান অপেক্ষা ক্রমান্বিতরক গানেই বেশী মাতাইয়া তুলে।

১৯। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ

এই যে এত বড় একটা অনার্য দেশ, এখানে বৌদ্ধ, জৈন এবং অস্ত্রান্ত্র ব্রাহ্মণ

ধর্মের এক প্রাচীণ ছিল, অর্থাৎ এখন
এ দেশে এখন, নৌক দেখিতেও পাওয়া
যায় না, তাহাদের কীর্তিকলাপ পর্যন্ত
লোকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে,—চারি-
দিকের নোকে জানে বাঙ্গলা হিন্দুধর্মের
ধর্ম—এটা কে করিয়া বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরাই
এই কাজটি করিয়াছেন। রাবণজিত্র
বিক্রমে অনবরত সংগ্রাম করিয়া বেশটাকে
হিন্দু করিয়া তুলা একটা প্রকাণ্ড বাণীর,
যত্নের ব্রাহ্মণেরা তাহা সূক্ষ্ম করিয়াছেন,
মুসলমানেরা প্রাচীন সমাজ, বিশেষ প্রাচীন
বৌদ্ধসমাজ, একেবারে ধ্বংস করিয়া দিলে,
তাহার পর ক্রমে ব্রাহ্মণেরা আবার
দীর্ঘে দীর্ঘে সেই সমাজ আবার গড়িয়া
তুলিলেন, তাহা-পূর্ণ পূর্ণ গোরবে অনেকটা
দেখাইয়াছি। শ্রুতি, দর্শন, বৈষ্ণবধর্ম, শাক্ত
ধর্ম তাহাদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল,
কিন্তু তাহাতেই ব্রাহ্মণেরা নিশ্চিত ছিলেন
না। তাহারা দেখিয়াছিলেন, দেশীয় ভাষার
ছড়া লিখিয়া, দেশীয় ভাষার গান গাইয়া
বৌদ্ধেরা কেমন বেশটাকে মাতাইয়া তুলিত।
অতঃপর বেশ মাতাইতে হইলে যে, মাতৃভাষা
জিয়া হয় না, এ তাহাদের বেশ জ্ঞান
হইয়াছিল। তাহি তাহারা প্রথম হইতেই
সামান্য, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি বাঙ্গলা
করা আরম্ভ করিয়া দেন।

বাঙালিকই শ্রুতি ও দর্শন অপেক্ষা

এই সকল বাঙ্গলা তর্জমার হিন্দু সমাজের
বন্ধন বেশ শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু
এ তর্জমার মূলে ব্রাহ্মণ।

কাশ্মির ও রাজা

পরে কিন্তু ব্রাহ্মণেরা এ বিষয়ে কার্যবদ্ধ
নিকট বংগে সাহায্য পাঠিয়াছিলেন। অগাধ-
খাঁ ক্রমবশত ও কাশ্মিরের মহাভারত
বাঙ্গালীকে অনেক বড় করিয়া দিয়াছে।
কাশ্মিরের আরও দুই ভাই গদাধর ও
কামদেব ভাল ভাল নই লিখিয়া গিয়াছেন।
সকলেরই উদ্দেশ্য সেই এক—বাঙ্গালী হিন্দু
হউক। কাশ্মিরের শুধু নই লিখিয়াই
সমাজের উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা
নহে। এ দেশের অনেক জমীদার তাহাদের
হাতে ছিল, জমিদারভাবের দেশের এবং
সমাজের বংগে উপকার করিয়া গিয়াছেন।
রাজা গণেশ ও তাহার সন্তানসন্ততি
বাঙ্গলার ইলতান না হইলে রাজমুহুর্ত বড়
কিছু করিতে পারিতেন না। হিমশ্রী ও
গোবর্ধন না থাকিলে চৈতন্য সম্প্রদায়
গড়িতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। বুদ্ধিমত্তা
না না থাকিলে নবযৌনের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-
সমাজকে অর্থের জগৎ বিস্তার কষ্টে পাঠে
হইত। এইরূপে কাশ্মির-ব্রাহ্মণে মিশিয়া
মুসলমানসমূহ বাঙ্গলার একটা প্রকাণ্ড
হিন্দুসমাজ গড়িয়া তুলিলেন।

সাহিত্য-শাখার সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বোধন

আমাদের পড়ের ও কাণের ইতিহাস অতি প্রাচীন, দীর্ঘবাহু বহুদূর দেখিতে পাইরাছিলেন, তাহা অশেষ আরও পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন। দীর্ঘবাহু মতে শৃঙ্গপূরণ সকলের চেয়ে পুরণ। কিন্তু সেও মুসলমান-আক্রমণের পরে লেখা। কারণ, উহাতে “নিরঞ্জনর উষা” নামে যে ছড়া আছে, তাহাতে মুসলমান-আক্রমণের বর্ণনা আছে। কিন্তু আমাদের দেশের নাব-পত্নের যোগীরা যুট্টের অষ্টম শতকে বাঙ্গলার ছড়া লিখিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ সিংহাচার্যেরাও সেই কালেরই লোক। তাঁহারা অনেক মোহা লিখিয়া গিয়াছেন, গীতিকা লিখিয়া গিয়াছেন, ছড়াও লিখিয়া গিয়াছেন। দোষগুণ বিচার করিতে খেলে বলিতে হয়, এ সকল ছড়া বা গীতিকা খুব উচ্চ অপেক্ষ না হইলেও রস ও ভাবে পরিপূর্ণ। সে রস ও সে ভাব এখনকার কলচির নহ, কিন্তু তথাপি বাঙ্গলার প্রাচীন কবি বলিয়া তাহার আদর আছে। উহাতে আমরা আমাদের ভাষা হাজার বৎসর পূর্বে কি অবস্থার ছিল, তাহা বেশ দেখিতে পাই।

মুসলমান-বিজয়ের পর যখন দেশে অনেকই মুসলমান হইয়া বাইতে লাগিলেন, তখন ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন ভাষার রাসায়ন, মহাভারত ও পুৰাণাদি না লিখিলে এ মুসলমানী শ্রোত মোধ করা বাইবে না। তাই তাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থ বাঙ্গলা

করিতে লাগিলেন। কাণের দোষগুণ সংক্ৰান্ত নাহা ছিল, বাঙ্গলাতেও তাহাই রহিল, বেশাব মধ্যে বাঙ্গালীর মনে ঘাটা লাগে, তাহাই উহাতে চুকাইয়া দিলেন। বাঙ্গালী হস্তরসে পটু, তাই উহাতে হাসির ভিন্ধি বেশী করিয়া আসিল। বাঙ্গালী কথাকাটাকাটি ভাগবাসে। উহাতে কথাকাটাকাটি বেশী আসিয়া ঢুকিল। এই জন্যই অঙ্গদ রায়দারে, লবকুশের যুদ্ধে কথাকাটাকাটি আসিল। বাঙ্গালী বড় ভক্ত, তাই রামায়ণে দুর্গাংশব আসিল। এইরূপে রাসায়ন, মহাভারত ও পুৰাণগুলি বাঙ্গালী আকারে, বাঙ্গলা ভাষায় বিরাজ করিতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ-ঠাকুরেরা মনসা, মঙ্গলচণ্ডীর গান আপনাদের মত করিয়া বাঙ্গলা করিয়া গাইলেন। অনেক ব্রাহ্মণ, পাকা বৌদ্ধ যে ধর্মঠাকুরের গান, তাহাও সংস্কৃত কাব্যের রসভাব দিয়া লিখিতে লাগিলেন।

এমন সময় চৈতন্য-দেবের আবির্ভাব হইল। কাব্য ও নাটকে “তাঁহার ধর্মের প্রাণ। অলঙ্কারের রস ও ভাবই তাঁহাদের দেবতা। নর রস, বিরাগিন ভাব ও আটটি সাতিক ভাব গুইয়াই তাঁহাদের কীর্তন। পদকর্তারা দেখিতেন এই এই ভাবের গান আছে, এই এই ভাবের গান নাই, সেইগুলি তাঁহারা জুড়িয়া দিতেন। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, এক গানে একজন যে ভাব দিয়া গিয়াছেন,

আর একজন তাড়িতে জন্তু ভাব লাগাইলেন। নানা ভাবে নানা রঙ্গের সঙ্কীর্ণতায় গান হইতে লাগিল। তাহার পর অনেক গান জমিয়া গেলে সংগ্রহ আরম্ভ হইল। সংগ্রহে পূর্ববাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিহর ও মিলন পর্য্যন্ত গানগুলি একটির পর একটি করিয়া সাজান হইল। অনেকগুলি সংগ্রহ হইলে শেষে একজন মহাকবি সেই গানগুলি ভাবিয়া একখানি মহাকাব্য রচনা করিলেন। বহুকাল পূর্বে যেমন কুশীলবের গানগুলি একত্র করিয়া বাঙ্গালী মুনি রামায়ণ করিয়াছিলেন, আমাদের মহাকবি রঘুনন্দন সেইরূপ সঙ্কীর্ণতায় পদ ভাবিয়া “রাধামাধবোদয়” নামে এক মহাকাব্য রচনা করিলেন। রঘুনন্দনের “রাধাবাসন” লোকে পড়ে, কিন্তু “রাধামাধবোদয়” লোকে বড় পড়ে না। কিন্তু সঙ্কীর্ণতায় সহিত যদি “রাধামাধবোদয়” পড়ে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, কনি কিক্রম অল্পত কারিকুরি করিয়া গিয়াছেন। আমার এক এক বার মনে হয়, রাধামাধবোদয়ই বৈষ্ণবধর্মের একখানা বড় মহাকাব্য।

বৈষ্ণবদের এই মহাকাব্যের পর আমরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কতগুলি বাঙ্গলা কাব্য দেখিতে পাই। সেগুলি ঠিক সংকৃত কাব্যের ছাঁচে ঢালা। এই সকল কাব্যের মধ্যে বিভাস্বরের গল্প প্রধান। গম্ভটী সোণা, উদ্যোতে ঘটনা অধিক নাই, কিন্তু সেই সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া রস, ভাব ও অলঙ্কারের ছড়াছড়ি করা হইয়াছে। ইংরাজী যুগের পূর্বে বাঙ্গালীর কাব্যের বিশেষত্ব এই যে, বাঙ্গালীরা একটি বিষয়

সইয়া অনেক কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। এক রামায়ণেই অনেক রূপ বাঙ্গলা আছে, মহাভারতেরও আছে। মঙ্গলচণ্ডী, মনসা ও ধর্মশাস্ত্রের গানের ত কথাই নাই। সত্যপীঠের পাঁচালী যে কত আছে, গণিতা ঠিক করা যায় না। সব বাড়ীতেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্যপীঠের গান আছে।

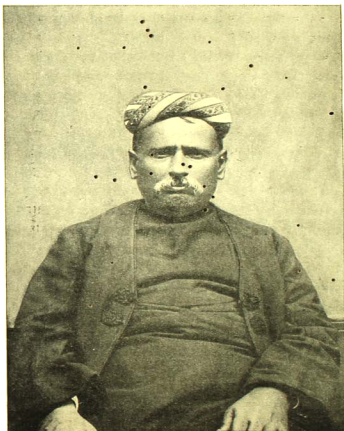
এরূপ এক শত বৎসর পূর্বে হইতে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, আমাদের কাব্যে ও গানে ইংরাজী ভাব আদির্য্য চুম্বিয়াছে। এই ইংরাজী ভাবের প্রধান মহাকাব্য “মের্বিনাদয়”। কাব্যের বিষয় আমাদের দেশের, কাব্যের নায়ক-নায়িকা আমাদের দেশের, রস ও ভাব অনেকটা আমাদের দেশের, কিন্তু আর সবই বিলাতী। মাইকেল মধুসূদন দত্ত নানা ভাবায় পণ্ডিত ছিলেন, নানা ভাবা হইতে উপমা সংগ্রহ করিয়াছেন, ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন ও সংকৃত কাঠামোর সেগুলি সব সাজাইয়াছেন। মহাকাব্যখানি ভালই হইয়াছে। কিন্তু ভিজ়াসা করি, তাহার পর আর এইরূপ মহাকাব্য হইল কই? যদি বল, মহাকাব্য কি রোজ রোজ হয়? হয় নাপ্রত্য, কিন্তু সে দিকে চোটা কট?

পদ্ম ও কাব্যের ইতিহাস খুব প্রাচীন হইলেও বাঙ্গলা নাটকের ইতিহাস তত প্রাচীন নয়। ছাপাখানা হইবার অনেক পরে নাটক আরম্ভ হয়। নাটকের মহা-রখিগণ একে একে অন্তর্গত হইয়াছেন। ধারার আছেন, গুহারার প্রাচীন হইয়াছেন। কিন্তু এখনও দেখিতেছি লোকে যেন বেশী দিন ভাবিয়া বই লিখিতে চান না।

নগেলেও দেউরূপ দেখিতে পাইতেছি।
বন্ধিবন্ধি হুই বৎসরের কমে একপানি নবেল
লিখিতেন না। কিন্তু এখন হু হু করিয়া
নবেল বাহির হইতেছে। এখানেও দেখিতে
পাই, চুটকীই অধিক। চুটকী যে মন্দ,
তাঁহা বলিতেছি না। অনেক চুটকী অতি
সুন্দর, বেশ মনে লাগে। অনেক সময়
চুটকীতে বেশ গুণপনাও প্রকাশ পায়।

কিন্তু ভাবি চুটকীই কি আমাদের যথাসর্ব্ব
হইবে। চুটকীর একটি গোষ আছে—
যখনকার তখনই, বেশী দিন পাকে না।
তাই চুটকীর চেয়ে কিছু বড় জিনিষ চাই।
সেই আকাজকাতেই এত কথা বলিতেছি।

বাঙ্গলায় রচনার বই বড় কম, নাই
বলিলেও হয়। যে কথানি সেকালে বই
আছে, প্রায়ই তর্জমা। বাঙ্গালী মানা



মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বিষয়ে তুর্বিয়া চিন্তিয়া হেম সাহেবের মত বা এডিলন সাহেবের মত রচনা লিখিতেছে—এ ত দেখা যায় না। বাহা কিছু আছে এক কমলাকান্তের মস্তুরে—অতুল্য, অমূল্য; আর ত দেখি না। আমাদের দেশের লোক এ পথটা কেন ছাড়িয়া দিতেছে, বুঝিতে পারি না।

জীবনচরিতে দিনকতক বালাগীরা খুব পটুতা দেখাইয়াছিল। কতকগুলি জীবন-চরিত বাস্তবিক মহামূল্য সম্বল হইয়া থাকিয়াছিল, কিন্তু আরও চাই। এখনও জীবনচরিত ঠিক জীবনচরিত হয় নাই। হু চারখানি জীবনচরিতে দেখিতে পাট, কেবল জীবনের ঘটনাগুলি পর পর সাজান আছে। কিন্তু তাহাকে জীবনচরিত বলে না। ঐ সাজান ঘটনাগুলির কাণ্যকারণ-ভাবগুলি সব দেখাইতে হইবে। সমাজটি বেশ করিয়া বুঝিতে হইবে। ইতিহাস ভাল করিয়া জানা চাই। তবে ত ভাল জীবনচরিত হইবে। একজন মাজুদেব জীবনচরিত দেখাইতে গিয়া তিনি ষত দিন বাঁচিয়াছিলেন, তত দিন তাহাখানি সমাজের, সাহিত্যের, ব্যবসায়ের, বাণিজ্যের কত পরিসরজন হইয়াছে—সেগুলি সব দেখান চাই। একদম দেখাইবার চেষ্টা অনেক বার হইয়াছে, বাহান্না চেষ্টা করিয়াছেন, তাহান্না বিশেষ প্রশংসার যোগ্য ও ধন্তবাদের পাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বন্ধিমদাবুর ভাল জীবনচরিত আজিও বাহির হইল না। বিনি ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের “আদিত্যবরুণ” ছিলেন, তাহার একখানি ভাল জীবনচরিত আজিও বাহির হইল না।

কাব্যের দোষগুণ-পরীক্ষা এখনও আরম্ভ হয় নাই বলিলেই হয়। বন্ধিমদাবুর তুর্বিয়া বাবু এ বিষয়ে দু চারটি রচনা লিখিয়া গিয়াছেন। সে রচনা কোন কাব্যের কোন বিশেষ অংশ ধরিয়া। পুরা কাব্যখানি পড়িয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয় করিয়া, তাহার দোষ-গুণ দেখান এখনও হয় নাই। বন্ধিমদাবুর নবাবের দোষগুণ-পরীক্ষা দুই তিনবার হইয়া গিয়াছে, তিনি বাঁচিয়া থাকিতেই দুই একবার হইয়া গিয়াছে। দুই একটা রচনা পড়িয়া তিনিও অত্যন্ত খুশী হইয়াছিলেন। মাইকেলের দোষগুণও অনেকে পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু সব কাব্য পড়িয়া মাইকেলের কবিতা বুঝাইবার চেষ্টা হয় নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গলার একটা মত অভাব আছে।

অনেকের সংস্কার বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতের বন্ধ। খ্রীষ্টীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সংস্কৃতকে বাঙ্গলা ভাষার ঠান্ডিদিগ বলিয়াছেন। আমি কিন্তু সংস্কৃতকে বাঙ্গলার অতি-অতি-অতি-অতি-অতি-অতিবৃদ্ধ প্রতিমত্বই বলি। পাণিনির সময় সংস্কৃতকে ভাষা বলিত অর্থাৎ পাণিনি যে সময় ব্যাকরণ লেখেন, তখন তাহার দেশে লোকে সংস্কৃত কথাবার্তা করিত। তাহার সময় আর এক ভাষা ছিল, তাহার নাম “ছন্দসু”—অর্থাৎ বেদের ভাষা। বেদের ভাষাটা তখন পুণ্য; আর উঠিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা চলিতেছে। পাণিনি কত দিনের লোক তাহা জানি না, তবে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পতনের যোগ হয়। তাহার আর দিন পর হইতেই ভাষা ভাঙিতে আরম্ভ করে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরই তাহার

চুলার ছাই কুড়াইয়া এক পাপরের পাত্রে রাখা হয়। তাহার গায়ে যে ভাসায় লেখা আছে, সে ভাষা সংস্কৃত নয়; তাহার সুকল শব্দই সংস্কৃত হইতে আগা, কিন্তু সে ভাষা সংস্কৃত হইতে অনেক উচ্চ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পরই অপেক্ষের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর ত্রিশভাষা; ইহার কতক সংস্কৃত ও কতক আর এক রকম। একটি বাক্যে দুই রকমই পাওয়া যায়। এ ভাষার বইও আছে, শিলালেখও আছে। তাহার পর হুগ ও খারকেন-নিগের শিলালেখের ভাষা। তারপর সাত-কর্ণিদের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর পালি ভাষা। তাহার পর নাটকের প্রাকৃত। সকল প্রাকৃতের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই। মগধীয় ও ওটমগধীয় সহিত আমাদের কিছু সম্পর্ক আছে। তাহার পর অনেক দিন কোন ধর্ম-পাণ্ডা ঘুর না। তাহার পর অষ্টম শতকের বাঙ্গলা। তাহার পর চণ্ডীদেবের বাঙ্গলা। তাহার পর নৈক্ষব কবিদের বাঙ্গলা। সব শেষে আমাদের বাঙ্গলা।

সুতরাং সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গলার সম্পর্ক অনেক দূর। সংস্কৃতের গতি এক-রূপ ছিল; এতদিনে বাঙ্গলার গতি আর একরূপ হইয়া গিয়াছে। এখন এই বাঙ্গলাকে সংস্কৃতের দিকে চালাইবার চেষ্টা, আর গঙ্গার স্রোতকে হিমালয়ের দিকে চালাইবার চেষ্টা একই রকম। সাত শত বৎসর মুসলমানের সহিত একত্র বাস করিয়া বাঙ্গলা মুসলমান হইতে অনেক জিনিস লইয়া ফেলিয়াছে। সে সব জিনিস

বাঙ্গলার চাঁড়ে মাসে জড়িত হইয়াছে। এখন তাহাকে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা—কিছুতেই সফল হইবে না। মুসলমানেরা বাঙ্গলা ভাষাকে বেধন বদলাইয়া দিয়াছে, ভারতবর্ষের আর কোন ভাষাকে সেজপ পারে নাই। আমাদের বাঙ্গলার বিভক্তি 'রা' ও 'দের' মুসলমানদের কাছ হইতে লওয়া। সে বিভক্তি তুমি ভাষা হইতে তাড়াইলে কি করিয়া? অথচ আমাদের পণ্ডিত লেখক মহাশয়েরা আপনপে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাহার মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিবেন না। যে সকল শব্দ একেবারে আপামর সাধারণের ভিতর চলিয়া গিয়াছে, লিখিবার সময় সেগুলি তাহার ব্যবহার করিবেন না। "কলম" মুসলমানী শব্দ, তাহার কলমের বদলে "লেখনি" শব্দ ব্যবহার করিবেন, অথচ "লেখনির" অর্থ—উদ্দেশের ভালপাতায় আঁটহু কাটবার লোহার খুঁজি, তাহাতে কালি লাগে না। "কলম" ও "লেখনি" দুটি একেবারে ভিন্ন জিনিস। "দোয়াত" মুসলমানী কথা। দোয়াত লেখা হইবে না "মত্ভাখর" লিখিতে হইবে। "পাট্টা" মুসলমানী কথা। পাট্টা লিখিবেন না, "ভোগবিধায়ক পত্র" লিখিবেন। "আদালত" লিখিবেন না, লিখিবেন—"বিচারালয়"। এইরূপে তাহার বাঙ্গলাকে শুদ্ধ বা মাজিত করিয়া লইতে চান। তাহাদের সে চেষ্টা কখনই সফল হইবার নয়।

আমার এক দল আছেন, তাহার চলিত কথা দেখিলেই নাক সিঁটকাইয়া উঠেন; বলেন—"ওটা ইতুরে কথা।"

উহার বহলে তাঁহার সংকৃত শব্দ ব্যবহার করিতে চান। আমি বলি, “সময় আর কাটে না”, তাঁহার বলেম, “কাটেনা, ছি! —ইতুরে কথা।” বলেন, “সময় কর্তন হয় না।” আমরা কথার বলি, “বাড়িরে শুঁছে লও।” তাঁহার বলেম, “ছি! ও ইতুরে কথা। পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত করিয়া লও।” আমরা বলি, “দল বাঁধিয়া কাজ করিতে হয়”, তাঁহার বলেম, “দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হয়।” আমরা কথার বলি, “এটা গালগল্প”, তাঁহার বলেম, “বকপোলকল্পিত।” আমরা বলি, “ভাগ্যচাকা খাইয়া গেল”, তাঁহার বলেম, “কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইল।” এইরূপে তাঁহার কতাবের ভাষাকে কথা কওয়ার ভাষা হইতে অনেক দূরে আনিয়া ফেলিয়াছেন। এখন ইংরাজী ও সংস্কৃত পড়িতে যত কষ্ট হয় তাঁহাদের সাধু ভাষা পড়িতেও তত কষ্ট হয়।

আর একদল আছেন, তাঁহার পড়িল ইংরাজী, ভাবেন ইংরাজীতে, লিখিতে চান বাঙ্গলা—সে এক রকম সাহেবী বাঙ্গলা হইয়া পড়ে।

মোট কথা দাঁড়াইতেছে এই যে বাঙ্গলা যখন একটা ভাল ভাষার মধ্যেই দাঁড়াইতেছে, তখন উহা কিছু পরিমাণে শিক্ষা কথা আবশ্যক। উহার একটা বস্ত্র বাকরণ আছে, বস্ত্র পদ-যোগনার প্রণালী আছে, পদ বাছিয়া লটবার প্রণালী আছে। সেগুলি নিপুণ হইয়া দেখায় দরকার, তবে ত বাঙ্গলা লেখক হইবে! নতিলে বাঙ্গলা আমার মাতৃভাষা, আমি বাহাই লিখিব

তাঁহাই বাঙ্গলা—এই বলিয়া রাশি রাশি ইংরাজী ও সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গলা *অক্ষরে লিখিয়া দিলে, তাহাকেও কি বাঙ্গলা বলিব? তাহা হইলে ত এটি খাসা বাঙ্গলা—

“আমি ল্যাণ্ডো গাড়ীতে ডাইভ করিতে করিতে হাওড়া টেনে পল্লিখা বেনারসের কল্লু বুক করিলাম। কাঠ রাসে গোরুর বার্থে চেকচান্ট ছিল না, আপার বার্থে বেডিংটা জ্রোড করিয়া একটু সর্ট ন্যাপ দিয়াই চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় হুইসিল দিয়া ট্রেন হাট করিল।” ইহাকে কি আপনারা বাঙ্গলা বলিবেন?

এখন বাঙ্গলাকে এই সংস্কৃত ও ইংরাজীর হাত হইতে মুক্ত করিয়া সহজ করা, মিষ্ট করা ও সরল করা আবশ্যক হইয়াছে। এতদিন পণ্ডিত মহাশয়েরা ইচ্ছা মত পারসী শব্দকে ডাড়াইয়া দিতে পারিয়াছেন, কারণ বাঙ্গলার মূলমানেটা বাঙ্গলা সাহিত্য লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। এখন তাঁহার বলিতেছেন, “চলিত মূলমালানী শব্দ তোমরা ডাড়াইবে কেন? ডাড়াইবার তোমাদের কি অধিকার আছে? যে সকল শব্দ তিন, চার, পাঁচ শত বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের ত ভাষার থাকিবার কারণেই বড় জঁম্মিয়া গিয়াছে। তোমরা যে বড় হইতে ডাড়াইবার কে?” শুধু যে এই কথা বলিয়া নিশ্চিত আছেন, তাহা নয়, তাঁহার আরও বলিতেছেন, তোমরা যদি মূলমালানী শব্দ ডাড়াইয়া বড় বড় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার কর, আর যদি বুদ্ধিতে আমাদের বেশী কষ্ট হয়, তবে আমরা বড় বড় পারসী শব্দ, আরবী শব্দ ব্যবহার

করিল; আমাদের ভাষা বতর করিয়া লইল—তোমাদের মুখাপেক্ষা করিল না।” হুতরাং ভাষার সমস্তটি এখন বড় কঠিন হইয়া গড়াইয়াছে। এ বিষয়ে নবাব আলি চৌধুরী মহাশয় “বাঙ্গলা ভাষার গতি” নামে টাকার যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, সেটি সকলেরই মন দিয়া দেখা উচিত। বাঙ্গলার যখন অর্ধেক মুসলমান, তখন তাহার যে হিন্দু বাহা বলিবে তাহাই করিবে—একপ আশা কর ঘর না। এখন উত্তরে দিল্লি বাঙ্গলা কি হইবে স্থির করিয়া লইয়া উচিত। উহার একটা ব্যাকরণ ও অভিধান স্থির করিয়া লওয়া উচিত। লেখকদিগের স্বেচ্ছাচারিতার উপর ভাষার উন্নতি আর নির্ভর করিতে পারে না। বহু দিন যাইতেছে কথটা ক্রমেই শক্ত হইয়া গড়াইতেছে। আমি বলি, বাহা চলতি, বাহা সকলে বুঝে— তাহাই চালাও; বাহা চলতি নয়, তাহাকে আমিও না। বাহা চলতি, তাহা ইংরাজী হউক, পারসী হউক, সংস্কৃত হউক— চলুক। তাহাকে বদলাইয়া শুদ্ধ সংস্কৃত করিবার দরকার নাই। “হেলুওথেকে” “লৌহবন্ধ” করিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। একজন সে দিন বড়রাত্রে “রাজমার্গ” ও নীল লইয়া বাওরাকে “বংশপরচালনা” লিখিয়া বড়ই বিশদ্রুত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। আর একজন যন্ত্র শব্দটাকে ইতুবে মনে করিয়া তাহার বদলে “বঙ্গ মহাশয়” লিখিয়া বিশদ্রুত হইয়াছিলেন। একপ করা বড়ই অজ্ঞ।

আমাকে সোজা পথে চালান উচিত, এই ড গেল এক কথা। তাহার পরে

আর একটা কথা আছে—এই আমার শেষ কথা, সেটা নূতন কথা গড়া। বাঙ্গলার সমগ্র এখন আর নিশ্চল নহে। যেভাবে বহু শত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, সেভাবে এখন আর কাটিতেছে না। নানা দেশ হইতে নানা ভাব আনিয়া বাঙ্গলার জুটিতেছে। যে সকল ভাব প্রকাশ করিবার কথা বাঙ্গলার নাই, তাহার চক্কর কথা গড়িতে হইতেছে। যাহাদের চলিত ভাষার কথা লইয়াই গোলাযোগ, নূতন ভাবে নূতন কথা গড়িতে তাহাদের আরও কষ্ট পাইতে হইবে, আরও বেগ পাইতে হইবে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি। পূর্বে দেশে “মিউজিয়ম” ছিল না, এখন হইয়াছে। মিউজিয়মকে কি বলিব? সংস্কৃত পণ্ডিত বলিলেন, “চিত্রশালিকা”। কথটা কেহ বুঝিলও না, মিউজিয়মের ভাবও উহাতে প্রকাশ হইল না। চিত্রশালিকা বলিলে ছবির ঘর বুঝি, হুতরাং মিউজিয়ম বুঝাইল না। এ জায়গায় “মিউজিয়ম” শব্দ লইতে দোষ কি? দেশের লোকে কিন্তু চট করিয়া উহার একটা নাম দিয়া বসিয়াছে। তাহার উহাকে “বাগ্নঘর” বলে। শ্রুত পশ্চিমে উহাকে “আগ্নবঘর” বলে। চিত্রশালিকার চেয়ে এ ছটা কথাই ভাল। উহার একটা চালাইলে দোষ কি? বাঙ্গলার আকাশে তাহা মাপিবার বস্ত্র ছিল না; যখন কলিকাতার সেই ঘর হইল, পণ্ডিত মহাশয়েরা তাহার তর্জমা করিলেন “পর্যবেক্ষণিকা”। কথটা একে ত চোখশালা, তাহাতে আগর কঠিন সংস্কৃত—শুদ্ধ কি না সে বিষয়েও সন্দেহ।

হিন্দুস্থানী, গাফোখানেরা অত নত বৃক্ষ না,
—তাহারা উহার নাম রাখিল “ভার-বৃক্ষ”,
যেটামুটি উহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিল,
কথাটি তুলিতেও মিটে। তবে উহা চালাইতে
যেব কি? এইরূপ অনেক নূতন, জিনিস,
নূতন ভাব নিত্যই আনিতেছে; তাহাদের
জন্ম কথা গড়া একটা বিষয় সমস্তা হইয়া
গাড়াইয়াছে। আমার বোধ হয়, বাঙ্গলা
হইতেই ঐ সমস্তার পূরণ হওয়া ভাল,
বাঙ্গলা কথা দিয়াই নূতন কথা গড়া
উচিত। নিত্যত না পারিলে, আসামী,
উড়িয়া ও হিন্দী খুঁরিয়া দেখা উচিত;
তাহাতেও না হইলে, যে ভাষার ভাণ,
সেই দেশের কথাতাই লওয়া উচিত।
আমরা শু ঠিককালই তাহাই করিয়া
আশিতেছি, নহিলে “বাঙালী লেবু”,
“মর্ত্তমান, কলা”, “চাণা কণা” কোথা হইতে
পাইলাম? সেতরূপ এখনও দেখা দানশায়,
সোজা কণার এই সকল নূতন জিনিসের
নাম দেওয়া ও নূতন ভাব প্রকাশ করিবার
চেষ্টা করা উচিত; নহিলে কতকগুলো
প্রাচীন্য কটুটে শব্দ ভেঁয়াব কবিয়া,
লইলৈ ভাষার সঙ্গে তাহা খাপ খাইবে না।
যে দিকেই হউক, তাহা লইয়া বেজ্ঞচারিতা
করাটা ঠিক নয়। ফরাসীরা যেমন একটা
একুডেমী করিয়া কোন্ কোন্ শব্দ ভাষার
চর্চাবে, কোন্ কোন্ শব্দ চলিবে না ঠিক
করিয়াছিলেন, আমাদেরও সেইরূপ একটি
করিয়া লওয়া উচিত; নহিলে কথার
সংখ্যায় আমাদের অভিজ্ঞান অত্যন্ত বাড়িয়া
যাইবে এবং কণার ভারে তাহা অতল
অগ্নে ভুবিয়া যাইবে।

ইতিহাস-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত যত্ননাথ সরকার মহাশয়ের অভিভাষণ

ইতিহাস-চর্চার বাহা শ্রেষ্ঠ পন্থা তাহা
বৈজ্ঞানিক পন্থা। বেশকালভেদে বা বিষয়ের
পার্থক্য অনুসারে এই পন্থাটি ভিন্ন হয় না,
কারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রের সকল বিভাগেই
ইহা সমান কার্যকর, এবং সর্ববিধ সত্যের
অন্বেষণে ইহা নিহিত রহিয়াছে। আমরা
যদি আত্মীয়তার অভিধানে মত্ত হইয়া,
এই প্রাণ নব্য ইউরোপীয়গণ অবলম্বন
করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে অবহেলা করি,
তবে আমাদেরই ক্ষতি হইবে। অগতঃ
অগ্রসর হইবে; শুধু আমরা মধ্যগুণে পড়িয়া
থাকিব; আমাদের রচিত ইতিহাস বিজ্ঞান-

বিক্ষত সূত্রায় অশুদ্ধ হইবে; এবং বিশেষতঃ
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যে ইতিহাস রচনা
করিয়া যাইতেছেন, তাহাই সত্যের বলে
বলীদান হইয়া কিছুদিন পরে আমাদের
প্রাচীন ধরণেই ঐতিহাসিক গুরুত্ব কখনো
পন্যস্ত করিবেই করিবে।

ঐতিহাসিকের কি উদ্দেশ্য তাহা বুঝিলে
ইতিহাস লিপিব্যাস শ্রেষ্ঠ প্রণালী জানিতে
পারা যায়। প্রকৃত ইতিহাস অত্যন্ত
জীবন্ত করিয়া চোখের সামনে উপস্থিত করে।

সত্যের সূত্র প্রস্তরময় ভিত্তির উপর
ইতিহাস গাড়াইয়া থাকে।

৩২৭ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।

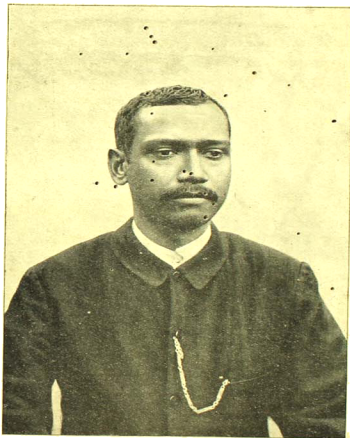
সাহিত্য-সন্নিধান

সত্য-নিষ্ঠারূপের প্রণালী কি ? সুদূরপ্রসারিত
নিষ্ঠার অন্তর্গত এই কার্যের উপযোগী করিয়া
তোলা।

সত্য প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক,
সাধারণের গৃহীত হউক আর প্রচলিত
নহে বিবেচনা হউক, তাঁহা ভাবিব না।
আমার অদেশ-গৌরবকে আঘাত করুক

আর না করুক, তাহাতে জ্বলিয়া
না। প্রমাণ না পাইলে কিছুই বিশ্বাস
করিব না।

আমাবিক ঘটনা হইতেই ইতিহাসের
আবৃত্তি। এষ্ট অল্প ইউরোপে ইতিহাস
রচনার এক ক্রমোন্নতির দ্বারা দেখিতে
পাই। জ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত



অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যত্ননাথ সরকার

পুৰাতন খণ্ড, পুৰাতন গ্রন্থ চেলিয়াস, সরাইয়া দেওরা হইতেছে। আইনের পুস্তকের অত ইতিহাসেরও ক্রমাগত নতন সংস্করণ ক্রমশঃ হইতেছে। পিতামহদের সময় হইতে আগত বিখ্যাতের মূল পরীক্ষা করিয়া, সেই পুৰাতন অট্টালিকাগুলি ক্রমাগত নির্ধনভাবে আকিঞ্চা ফেলিয়া তাহাদের স্থানে নতন নতন গৃহ রচিত হইতেছে।

সভ্যতা, সমাজ ও বিখ্যাতের বুদ্ধি ও পরিশ্রম ইতিহাসের বিষয়ের মধ্যে পড়ে। উভয় মানবের লিখিত সাক্ষ্য না পাইলেও মানবের হাতের কাজ কত, যুগ ধরিয়া পৃথিবীর নানা স্থানে সাক্ষ্য আছে। কিন্তু ইতিহাস বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুদ্ধি তাহার আরম্ভ প্রামাণিক ঘটনা হইতে। প্রমাণের অভাব সাক্ষ্য সংগ্রহ ও বিচার করা ইতিহাসিকের সর্বপ্রধান কাণ্ড। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের নানা প্রদেশে লিখিত আধুনিক ইতিহাস ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ পড়িয়া মনে হয় যে ইতিহাসের ক্ষেত্রে এ নিয়ম আমরা এখনও স্বীকার করি নাট।

সাক্ষ্য পাটলেটে আপনারা তিনটি প্রশ্ন করেন,—(১) সর্বাগ্রে কে এজাচার দিরাছে? সেই first information-এর নকলটা সংগ্রহ হইরাছে ত? পুলিশ ডায়েরীর গোপনীর নকল কি করিয়া পাওয়া যায়? (২) এট সাক্ষ্যটি ঘটনা জানিবার কি সুযোগ পাইয়াছিল? এ কি স্বচক্ষে দেখিয়াছে, না শরের কথা শুনিয়া বলিতেছে? (৩) যোদ্ধার কোন পক্ষের সহিত ইহার বার্ষ্য জড়িত আছে কি?

প্রত্যেক ইতিহাস লেখককেও পদে পদে এই প্রশ্ন তিনটি করিতে হয়। ঘটনা সম্বন্ধে যাহারা কিছু লিখিয়া গিয়াছে, তাহাদের নামের তালিকা প্রস্তুত, প্রতী বিভাগ, পরামর্শের উক্তির বিবরণসমূহ ও সমালোচনা করিয়া, তবে ইতিহাস লেখা আরম্ভ করা উচিত। প্রথমে এইরূপ তালিকা (critical bibliography) সংগ্রহ না করিয়া ঘটনার প্রবৃত্ত হওয়া যে মহা ভ্রম তাহা আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে বুঝি না।

বর্ণিত ঘটনার সর্বপ্রথম ও প্রাণী সাক্ষ্যের উক্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সমসাময়িক লেখক না থাকিলে, ঘটনাবলি অদূরবর্তী সাক্ষ্য পাওয়া যায় ততই ভাল। পুৰাতন বিবরণ সংক্ষিপ্ত বা কর্ণপতাবার লিখিত হইলেও, আধুনিক সময়ের সুদীর্ঘ ও স্থলিত বর্ণনার উপরে তাহাকে স্থান দিতে হইবে। আদি গ্রন্থ পাইলে অল্পাংশ ব্যবহার করা অস্বস্তিক।

আবার, সাক্ষ্যটি সভ্য জানিবার কতটুকু সুযোগ পাইয়াছিল, তাহা দেখা আবশ্যক।

আদি সাক্ষ্যের অস্থলকান করার বিলাতে ইতিহাসক্ষেত্রে কি রাষ্ট্রবিপ্লবের জার পরিবর্তন হইতেছে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। নেপোলিয়ন সম্বন্ধে তিরস্ক (Thiers) যে ইতিহাস লিখিয়া যান, এং যাহা আমাদের দেশে আদৃত হাটের নেপোলিয়ন-চরিত্রের মূল, তাহা নানা দেশের সরকারী কাগজ পত্র ও গোপনীর চিঠি অস্থলকানের ফলে এখন শিক্ষিত সমাজে কাব্য বলিয়া যুগের পরিচ্যুত হয়।

আমল' এবং বর্তমান পাকিস্তান অস্থানদের উপর নির্ভর করা যে কি ভুল তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছে। অ্যাণ্ট ডক্টর "মারাত্মকতার ইতিহাস" এক উপাদেশ এবং; অথচ ডক্টর সাহেবেব পণ্ডিত ভুল করার আফসোস বার দূতের নাম শিবাজীর দূতকে দেওয়া হইয়াছে। এটি নগণ্য বিষয় নহে; আফসোস বার দূত যদি শিবাজীর টাকা খাইয়া নিজ প্রভুকে বধ্যভূমিতে ফেলাইয়া আনিত তবে সে বিশ্বাসযোগ্য হইত; শিবাজীর দূতের পক্ষে এই কল্পিত নীতি-গর্হিত নহে।

যেখানে অস্থান ব্যবহার না করিলে চলে না, সেখানে সর্বশেষে রচিত অর্থশাস্ত্র সর্বোপেক্ষা বিস্তৃত অস্থানটি অবলম্বন করিতে হইবে।

কখন কখন বাধা হইয়া অস্থানদের অস্থান ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু কোটেশনের কোটেশন শুধু কোটেশন কেন ব্যবহার করিব? ইংরাজীতে একটি বড় কানের কথা আছে, "Always verify your references", অর্থাৎ যাহার সত্য উল্লেখ করিলে, তিনি ঠিক সেই কথা গুলি বলিয়াছেন কি না তাহা ভাল করিয়া দেখিবে। আমি যে পরের বচনটি তুলিয়া দিলাম, তাহা কাহার বচন এবং কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত তাহা নির্দেশ না করিলে সাহিত্যিক অসামুদ্রিক হয়, এবং ভ্রম সংশোধনও বাধা পড়ে।

ইতিহাস-লেখক বিদ্বত ও বিস্তৃত প্রমাণ-পত্র দিতে বাধ্য। ইতিহাস বর্জাইল অক্ষরের ফুটনোটে আবৃত হওয়া আবশ্যিক;

ইহা পাণ্ডিত্য ফলাফলের উপায় নহে; ইহা ন পাকিস্তানে এতদেব মূল্যহীন হয়। প্রত্যেক প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রতি পৃষ্ঠার পাদদেশে টাকা দিয়া তাহাতে প্রামাণিক গ্রন্থের নাম, সংস্করণ বা প্রকাশের বৎসর, পৃষ্ঠাঙ্ক প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উদ্ধৃত করিয়া উল্লেখ করা অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করেন।

এখন ইতিহাস রচনার আরও উচ্চতর সোপানে চড়া যাউক। ইতিহাস-লেখক ব্যক্তিগত ভ্রম সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন; একই ঘটনার উপর ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে আলোকপাত করিবেন। লক্ষ্যপূর্ণ ইহা বলিয়াছে, নিজস্ব উচ্চা বলিয়াছে, বিদেশী ভ্রমকারী একজন দেখিয়া গিয়াছে, বিদেশী কবি গ্রন্থ প্রামাণ্য দিয়াছে—এই সকল তথ্য একত্র করিয়া, তাহার মধ্যে কোন্ সাক্ষীটি বিশ্বাসযোগ্য এবং কতদূর পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য তাহা স্থির করিলে, তবে অতীত ঘটনার প্রকৃত রূপ জানা যায়। যদি ইতিহাসে কোন পক্ষ প্রথমে এক তর্ক ডিক্রী পান, তবে তাহা এক দিন আপসেট হইবেই হইবে, কারণ ভ্রমের জ্ঞানের আদালতে আপীল কখন ভ্রমহীন হোবে বারিত হয় না; শত শত বৎসর পরেও অজ্ঞান মতের বিরুদ্ধে নালিশ করা চলে; আপীলের চূড়ান্ত সীমা সত্য নির্ধারণ পর্যন্ত গিয়া তবে থামে।

ঘটনার সত্য নির্ধারণ করিয়াই ঐতিহাসিকের কার্য শেষ হইল না। অতীত যুগের বাহ্য অবস্থান, তাহার গায়ে চামড়াটি, চক্ষুর সমুখে সহজে আনা যায়; কিন্তু তাহার হৃদয়টি দেখাইতে না পারিলে

প্রকৃত ইতিহাস হয় না। শুধু রাজ্য রাজ্য পরিবর্তন, যুদ্ধ বিগ্রহ জইয়া ইতিহাস নষ্ট। ইতিহাস মর্শন নামের যোগ্য, কিন্তু পদে পদে দৃষ্টান্ত নজীর দেখাইয়া এই মর্শন লিপিতে হয়। দার্শনিক না হইলে প্রথম * শ্রেণীর ঐতিহাসিক হওয়া যায় না।

আমাদের সম্মিলন বঙ্গভাষা-ভাষীদিগের। হুতুরায় ঐতিহাসিক চর্চায় অত্যাধিক এছগুলি বাঙ্গলা আকারে সাধারণের হাতে দিতে না পারিলে আমাদের কঠোর উদ্দেশ্য হইবে। প্রাচীন লেখমালায় উদ্ধারণ হিন্দীতে প্রথমে একত্র ছাড়া হইয়াছে; বাঙ্গলায় চর মাই। (নব প্রকাশিত "গৌড়লেখমালা" আংশিক এবং।) ভিন্দেট স্থিৎ রচিত 'প্রাচীন ভারতের ইতিহাস এবং ম্যাকডনেলের সংকৃত সাহিত্যের ইতিহাস যে এ পর্যন্ত বাঙ্গলায় অমুদ্রিত করা হয় নাই, ইহা আমাদের মণ্ডলীর পক্ষে লজ্জার বিষয়। গুজরাতি, ভাষা বাঙ্গলায় চেয়ে কত কম লোক * বলে, অথচ গুজরাতি ভাষার লোকগণের আগ্রহ, সম্মিলিততা ও দূরদর্শিতার ফলে সর্ববিধ

বিভাগে পুস্তকের অমুদ্রণে গুজরাতি ছাইয়া গিয়াছে। আর আমরা, বহিঃ নবীজের মৌলিকতার গর্ভ করিয়া অলস হইয়া বসিয়া আছি! শৌকনিকার নিকে দৃষ্টি নাই।

ইতিহাস কবি্য নহে। চিত্তবিনোদক লিখিত আখ্যান অথবা শুভ গবেষণাই ইহার চরম-ফল নহে। অধ্যাপক সীলী স্বাম্বরকৃষ্ণ দেখাইয়াছেন রাষ্ট্রনেতার, সমাজনেতার পক্ষে ইতিহাস সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, পথ-প্রদর্শক মহাবিজ্ঞ। ইতিহাসের সাহায্যে অতীত কালের ব্রহ্মণ জানিয়া সেই জ্ঞান বর্তমানেরে প্রয়োগ করিতে হইবে। দূরদর্শী যুগে বা দেশে মানবজাতারা কি করিয়া উঠিলেন, কি কারণে পড়িলেন, রাজ্য সমাজ ধর্ম ক্রিকে গঠিত হইল, কি ক্ষত্র ভাঙ্গিল, সেই তথ্য বুঝিয়া আমাদের নিজের জীবন্ত সমাজের গতি ফিরাইতে হইবে। অতীত হইতে উদ্ধার করা সত্য ও দৃষ্টান্তের দীপশিখা আমাদেরই ভবিষ্যতের পথে রশ্মিপাত করিবে। ইহাই ইতিহাস চর্চার চরম লাভ।

বিজ্ঞান-সাধারণ সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের অভিনন্দন

বিজ্ঞান কি তাহা বুঝা বাউক। অমর-কোষের তীক্ষ্ণকার রসুনাথ বলেন, বিরূপং জ্ঞানং বিজ্ঞানং। বিভিন্ন রূপের যে জ্ঞান তাহা বিজ্ঞান। চিত্ত-ক্ষেত্রে বিভিন্ন মূর্তি, ব্যাকরণ-শাস্ত্রে শব্দের নানা রূপ প্রদর্শিত হয়। এই কারণে শিল্প ও ব্যাকরণ বিজ্ঞান।

কিন্তু এই অর্প আমাদের ভালোচা বিজ্ঞানের নহে। নানারূপে প্রকৃতি কার্য করিতে-ছেন; প্রকৃতির এই যে অগংখ্য রূপ, রূপ-পরিবর্তন-প্রকৃতি তাহার জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। ক্ষতি-রূপে ভোদ্য 'পকতৃত আবারের পাঁচ জানেজিরের বিষয়।

এই পাঁচকুত্তর জ্ঞান,—বিজ্ঞান, ভৌতিক
বিজ্ঞান ৬ প্রকৃতি বহুভেদবিশিষ্ট বিচিত্র।
ইহার উপাদান অঙ্ক কল্পিত হইয়াছে; শ্রুতি
অঙ্কে স্পষ্ট করিতেছে। এই অঙ্কশাস্ত্র-
ময়ী জ্ঞান বিজ্ঞান, অঙ্ক-বিজ্ঞান। আমরা
যে জাবাই দেখি, সেই একেরই জ্ঞান;
এই হেতু বিজ্ঞান সংজ্ঞা ধারা, প্রাকৃতিক,
ভৌতিক বা অঙ্ক-বিজ্ঞান বৃত্তি।

প্রকৃতি বেজাপূর্বক কিছুই এমন না;
সব বুদ্ধিবলে কাড়িয়া লইতে হয়। আমি
আচর্য্য বিনা পড়িয়া থাকি, প্রকৃতি বলেন
কর কি। কিন্তু এই পর্য্যন্ত। তারপর
আমাকে দেখিয়া তুমিও শিখিয়া গুহিয়া
লইতে হইবে। কোথায় কোন্ দেশে কোন্
গাছে হুমিষ্ট ফল থাকিয়াছে, তাহা আমাকে
পুত্রিয়া লইতে হইবে। তেমন ফল আমার

দেশে আমার গ্রামে
বাত্তীর কাছে ফলাইতে
পারি কি না, এই এষণা
আমিবে। এইরূপ এষণা
হইতে বিজ্ঞানের জন্ম।

কিন্তু এত চেঁচা
এত গবেষণা কাহার
নিমিত্ত? প্রকৃতি কার্য্য
কারণের চেতু; পুরুষ
অপ চেতনের চেতু। সেই
পুরুষের সেই আমার
নিমিত্ত, আমার বর্ত্তন
নিমিত্ত বিজ্ঞান। আমাকে
ছাড়িয়া বিজ্ঞান নহে।
আমার দোখাচিত্তা বিজ্ঞা-
নের কর্ত্তব্য না হইলে
বিজ্ঞানে কি ফল? অজি-
কার কালিকার আমি
নচে, এ গ্রামের লে
গ্রামের সনেরের বিনেশের
আমিবে সৌখ্য নহে,
মানবের সৌখ্য, বিজ্ঞানের
চিত্তা। ইহার দেশ
বিত্ত্বীর্ণ, কাল বিত্ত্বীর্ণ,



রাসনাহেব ঐযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি

পাত্র বিতরণ। এই হেতু বিজ্ঞানের সমাদর,
পূজা, বিজ্ঞানের মহত্ব।

দেশে বিজ্ঞানের স্থিতি

কি কারণে এদেশে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত
হইতেছে না, তাহার পর্যালোচনা আবশ্যিক
হইয়াছে। ডাঃ বহু কিংবা ডাঃ রায় কিংবা
তাঁহার ছাত্র চারিজন ভাগ্যবান ছাত্রের
দ্বারা দেশের দশা ফিরিতে পাবে না।
সকল বিষয়েই মধ্যম লইয়া দিচার করিতে
হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বিদ্যানে
ছাত্রের জ্ঞান পূর্ণাঙ্গের গাঢ় হইতেছে।
এখনও ইহার ফলভোগের সময় আসে নাই,
কিন্তু অধিক প্রত্যাশার হেতুও দেখিতেছি
না। অধিকাংশ বিজ্ঞানকর্মশালায় ছাত্রেরা
চর্কিত চর্কণ করে, যে বিষয়ের অধ্যাপনা
হইয়াছে, যাঁহা ছাত্রেরা গুলিয়াছে দেখিয়াছে,
তাঁহাওই পুনরাবৃত্তি করে। ইহাতে তাঁহাদের
হাত আসে, কিন্তু বুদ্ধি আসে না। তাঁদের
অনুকরণে দল হঠ, প্রকরণে হয় ভ্রা।
বলা বাহুল্য, প্রকরণের সঙ্গে সঙ্গে কর্ণে
অভ্যাস কহিতে পারে। কলেজে প্রথম
বর্ষ হইতে ছাত্রকে গবেষণায় প্রবৃত্ত করিতে
পারিলে তাঁহার কর্মশক্তি, আত্মপ্রত্যয় আছে,
শিক্ষার উৎসাহ হয়। কখনও কোন ছেলেকে
মনন করিতে যাঁত্র দেখিয়াছেন কি? দেশের
ছাত্রের ছেলে কি বাটালি করাত লইয়া
কিছুদিন হাত করে, না প্রথম হইতেই
ছোট ছোট কিন্তু প্রয়োজনীয় জব্য গড়ে,
কিংবা পিতার সাহায্য করে? চেষ্টা করিলে
আমিও পারি, আমিও সাহসী, এই প্রত্যয়
দৃঢ় হইলে আর কিছু দেখিতে হয় না।

অন্যতঃ জ্ঞানানুবেশনা, গবেষণার নামে ভয়
দুর্ভিগ্না যায়। অন্যত্র, কপাটা খুঁজা যত
সোকা, কদার মতন কাজ করা তত সোকা
নহে। তাঁরাপি এই আশঙ্কা ধরিয়া চলিতে
চলিতে উপাধি আর্জিতে পারিবে। আমরা
যে বিজ্ঞানের অন্বেষণ করিতেছি, তাঁহা
ধনীশীল ইংল্যান্ডের বিজ্ঞান। বিজ্ঞানশিক্ষা
ব্যয়সাধ্য; ইংল্যান্ডে ও আমেরিকায় যেখানে
ছাত্রের শিক্ষার সম্যক ব্যয়সাধ্য আছে, সেখানে
আবুও ব্যয়সাধ্য। অগতঃ আমরা সে দেশের
শিক্ষার সহিত এদেশের কৃত কর্মের তুলনা
করিতে ঘাই।

বিজ্ঞানার্থী ছাত্র নির্ধন, দেশও নির্ধন;
ধনীশীল বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত পারিতেছে না।
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যায়ের উদ্দেশ্য—ছাত্রকে
কেবল বিনয় ও জ্ঞানবান নহে। সে
উদ্দেশ্য হইলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রকে আরও
চটুতে শেষ পর্যন্ত একটি দুইটি বিষয়ে
আবদ্ধ রাখিতেন না, বিজ্ঞানের হৃদয় হৃদয়
বিষয় শিখিবার, মনে রাখিবার পরীক্ষা
করিতেন না। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রগণকে এক
এক বিষয়ে প্রাজ্ঞ করিতে অভিলাষী।
বিশ্রান্তে যাঁহা সম্ভাবিত হইয়াছে, এদেশেও
তাঁহা হইবে, এই আশা বিনোদী বিশ্ব-
বিদ্যালয় এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু
দেখা বাইতেছে, সে আশা সম্যক ফলবতী
হইতেছে না। সাধারণের নির্মিত বিশেষ দিগ্ভা
বিশেষ বিজ্ঞান অনাবশ্যক মনে হইতেছে।

মূর্ত্ত-বিজ্ঞান সাহায্যে আলি কালি কি
অভাবনীয় কাণ্ড সাধিত হইতেছে, তাঁহা
আমাদের অবদিত নাই। বিনোদী দীপ-
শলা হইতে তড়িৎদীপের উদ্ভাবনা পর্যন্ত

চিন্তা করিলেই মাথা ঘুরিয়া পড়ে। শর-
চিকিৎসক, বিবেক, প্রতিবেদে, অহুস্রী
দ্বন্দ্বের উপায়ে নূতন যুগ প্রবেশিত
হইয়াছে। বিলাতী মূর্ত্ত-বিজ্ঞান বিশেষতঃ
মূর্ত্ত-সংগ্ৰহ ও চিকিৎসা-বার্তার উন্নতি
নিমিত্ত বহু বহু লোক অগোরাগি পরিগ্রহ
করিতেছেন।

অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান হইতে মূর্ত্ত-বিজ্ঞানের
জন্ম। কিন্তু মূর্ত্ত-বিজ্ঞান হইয়াছে বলিয়া
অমূর্ত্ত বিজ্ঞানের প্রসার বাড়িয়াছে।
প্রকৃতির শক্তি কাড়িয়া লইতে হইলে শৈ-
বস্তির পরিচয় গ্রহণে চাই। গেলিও
লর্ডন জ্বলিতে দেখিয়া বোম্বকের বোম্বন্যুদ
আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানভিক্ষু
ছিলেন। তাহার আবিষ্কারে সংসারের কি
হিত হইবে, তাহা তিনি ভাবেন নাই।

বিজ্ঞান জন্ম গড়ে না, কলা গড়ে।
বিজ্ঞান কলা গড়িবার সন্ধান এলিয়া শেষে।
বিজ্ঞান জ্ঞান লইয়া মস্তকে, কলা-বিজ্ঞান
(কলার অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান) জ্ঞান ও
কর্মের যোগ ঘটায়। কৃষি চিকিৎসা
প্রকৃতির অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান বার্তা-বিজ্ঞান।
কলা বিজ্ঞান ও বার্তা-বিজ্ঞান মূর্ত্ত-বিজ্ঞান।
অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান বিতীর্ণ, অগত্যা-বাপী;
আকাশের, নাড়ী নকশা হইতে পাঠা-
লের নীচে কুম্ভ ছিল কি না তাহার
অহুস্রা কবে। এই বিশাল বিজ্ঞানের
মধ্যে দিশাহারা হইয়া পড়িতে হয়। এই
কারণে বিজ্ঞানের নানা শাখা-কলম।
ইহাদের মধ্যে ক্রিমি-বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক
বিজ্ঞান অন্য শাখারও উপকৃত। এই দুই
বিজ্ঞান অবিকাশ্য মূর্ত্ত-বিজ্ঞানের আদি।

মূর্ত্ত-বিজ্ঞান ক্ষুদ্র; আমাদের ভোমার ঘাহাতে
ভিত-হইতে পারিবে তাহার বিজ্ঞান।
এই কারণে, খণ্ডিত। কিন্তু অধিকারী
ভেদ তা আছে। যে জ্ঞান কেবল জ্ঞান
না পাওয়া কলমারক হয় এবং বাহ্য লাভ
করিতে ছাত্রের উৎসাহ হয়, তাহা মূর্ত্ত-
বিজ্ঞান হইক, কলা-বিজ্ঞান হইক, তাহা
হিতকর। বিশ্ববিজ্ঞানের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
মেডিকাল কলেজ, টিচার-ট্রেনিং কলেজ,
ল-কলেজ, এ সব কলেজের ছাত্রদিগের
জ্ঞান-ও বিনয় হয় না বলিতে পারি না।
ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকাল কলেজ ধকন।
এখানে বার্তার আবশ্যক নানা বিজ্ঞান
শেখানা হয়, সবই খণ্ডিত; মেডিকাল
কলেজে হৃদ দেহের রক্তা শু রক্ত দেহের
আরোগ্য এই দুই বিষয় লইয়াই বিশাল
বিজ্ঞান শেখানা হয়। কিন্তু এই দুই
কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্র ও অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান-
কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রের তুলনা কখন।
শেখোক্ত ছাত্র জীবন-সংগ্রামেব যোগ্য নহে।
বিশ বৎসরের যুবক বি, এ, বিদ্যালি পাশ
করিয়া খণ্ডিত জ্ঞানের কলে সংসার-ধর্মের
অনভিজ্ঞ থাকে।

অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান যিনি শিখিতে চান
শিশু, কিন্তু মূর্ত্ত-বিজ্ঞান শিখিবার আরোহণ
আবশ্যক। মূর্ত্ত-বিজ্ঞান দ্বারা অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান-
জাত বিনয় লাভ হইবে, দৌকিক জ্ঞান
হইবে, আর সেই জ্ঞান প্রকৃত হইবে।
ইহাতে পারগ ছাত্র হাকিম হইউন, উকিল
হইউন, এই দেশের সম্পর্কে থাকিবেন,
তাহার অধীত বিজ্ঞা প্রযোগের সুযোগ
পাইবেন, এবং যত করিলে মূর্ত্ত মার্গ ধরিয়া

অমূল্য অর্থে উপস্থিত হইতে পারিবে না।
কলে মেনে বিজ্ঞান-বিজ্ঞান হইবে। • এত
দিন অমূল্য-বিজ্ঞান শিক্ষার ফল দেখা গেল;
এখন মূল্য-বিজ্ঞান শিখিলে কি হয়, তাহাও
ত দেখা কর্তব্য।

যে বিজ্ঞানপ্রচাৰের তৃতীয় অঙ্গরাজ্য
বিদেশী ভাষার বিজ্ঞানশিক্ষা। এট বিদেশী
ভাষা, ইংরেজী ভাষা এত কঠিন যে, শৈশব
হইতে যৌবন পর্য্যন্ত দশ বার বৎসরের
যত্নে ও শ্রমে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান হইতে পারে।
মস্তিষ্কের শক্তি অসুস্থ নহে, আমাদেব
বয়সও নহে। এই ভাষা শিখিতে আমাদের
কত রক্ত জল হইতেছে, কত শক্তি তাপ
হইতেছে, তাহা চিত্রা করুন। অর্থাৎ এই
বিদেশী ভাষা-শিক্ষা আমাদের কাম্য নহে;
কাম্য বিজ্ঞান। কাম্যের চতুর্দিকের কট-
কের আকার ভেদ করিতেই শক্তি সামর্থ্য
ক্ষয় হইতেছে। ইহাও সত্য হইত; মার্জিত
ভাষার না শেখাতে বিদেশী বিজ্ঞান বিদেশী
পাঠ্য বাইতেছে। বিজ্ঞান বিষয়ে কিছু
বলিতে কিছু লিখিতে হইলে বিদেশী ভাষার
বলিতে লিখিতে হইতেছে; চিত্রা করিতে
হইলেও বিদেশী শব্দমুষ্টির উপাসনা করিতে
হইতেছে। জ্ঞান, অজ্ঞ সাধন জানা নাই।
কলে দাঁড়াইয়াছে, সভ্যসমিতি আপিস
আদালতে বাইতে হইলে গৃহবেশ ত্যাগ
করিয়া যেমন সভ্যবেশ পরিধান করি, এবং
সেখানে হইতে আসিয়াই সে বেশ ত্যাগে
স্বয়ং বোধ করি, আমাদেব পক্ষে বিজ্ঞানও
ভেদন হইয়াছে। উহা দেশের মানুষের
মিথিতেছে না, বাহিরে বাহিরে খোজা-
সুপারনের নিমিত্ত খাতিয়েছে। ইংরেজীতে

বিজ্ঞান, শিখিতে ছাত্রের যত বৎসর
লাগিতেছে, মাতৃভাষা শিখিলে অর্ধেক সময়
লাগিত না।

কৃষিকার্য্যে ব'রা বিজ্ঞান প্রচার

• কৃষিকার্য্যে যে বিজ্ঞান আবশ্যক, অথবা
কৃষিকার্য্যের অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান
নামা বাইতে পারে। ইহা মূল্য-বিজ্ঞান, এক
বস্তুর বিজ্ঞান নহে। উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ইহার
অমূল্য আকার। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানেও অপর
সমুদয় বিজ্ঞান আবশ্যক হয়। আকাশ
হইতে পাতালের স্থাবর অস্থাবর সকল
প্রাণী, কোন স্থলে গভীর কোন স্থলে
জাতের জ্ঞান আবশ্যক হয়। মৃত্তিকা-জল-
বায়ু ভৌতিক বিজ্ঞান, পতঙ্গাদি কীট
পতঙ্গের দ্বারা নির্ণয় প্রভৃতি হইতে উদ্ভিদ-
বিজ্ঞান পৃথক্ করিতে পারা যায় না।
বৃক্ষের জীবনধারণ, বর্জন, পোষণ, সন্তান-
জনন প্রভৃতি বায়বীয় ভৌতিক অর্থব্যয়
বলিয়া অজ্ঞাপি প্রমাণিত হয় নাই। বস্তুতঃ
যখনই জগৎময় বলি তখনই এক অজাত
অনির্দিষ্ট, বোধ হয় চির জজ্ঞেয়, সত্য অরণ
হয়। বাহ্য-প্রকৃতি অর্থাৎ ক্ষেত্র কোনক
কতদিকে নিয়মিত করিতেছে, তাহারই
মধ্যে কোন জগিতেছে বাড়িতেছে মরিতেছে,
কিছু রাগিয়াও বাইতেছে। ইহার তুলনার
তাহারই-বাজি কিছুই নয়। আচাৰ্য্য বহুর
জগৎবিখ্যাত আবিষ্কারে জগৎময় সত্য
উদ্ভিদের বিলক্ষণ সাক্ষ্য স্পষ্ট হইতেছে।
রাসায়নিকের গোটা দশ বার মূল পদার্থ
পাইলে এক একটা বৃক্ষ জীবিত বর্জিত

ফলগ্রহ হইতে পারে, কিন্তু রসায়নবিজ্ঞানের অভিরিঞ্চ কিছু আছে।

সেটা কি, কে জানে। কিন্তু ছানি সর্বপথী ও বটপত্র একক্ষেত্রে উপ হইলেও সর্বপ ও বটপত্র এক হয় না। কৃষক ভূগোলদর্শনে ভর করিয়া শক্তি জন্মাইতেছে, বীজ সংগ্রহ করিতেছে, মাটি পিঁচার করিতেছে, বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিতেছে, ক্ষেত্র বীজাঙ্কুরোৎপত্তির বোঝা করিতেছে, বৃক্ষের শক্তি বিনাশ করিতেছে, সবজাত বৃক্ষশিল্প শালন করিতেছে। মাটি জল বায়ু চর্চিকার তেজ অব্যাহত রাখিয়া ফলের প্রত্যাশা করিতেছে, একটা বীজ হইতে বহু পাইতেছে। বীজের সেটা কি শক্তি বাহ্যতে তাহা বহুধা বিভক্ত হইয়াও পূর্ণ থাকিতেছে? যে সর্বপ সে সর্বপ, যে বট সে বট থাকিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বহু হইতেছে। জীবন ত ভ্রাব্যগণ বলিতে পূর্ণা যার না। অগ্ৰচ সরিষা ফেতের দুইটি সরিষা গাছ অবিকল এক নহে, আম-বাগানের সব গাছের আম সমান বড়, সমান মিষ্ট নহে। তবে, বৃক্ষের আকার-প্রকার স্বভাব চরিত্র পরিবৃদ্ধিশীলও বটে। দেখিলে বোধ হয়, প্রকৃতি আভিভেদ করেন নাট, আমরা করিয়াছি। আমাদের স্বল্প জ্ঞানে ভেদাভেদ আসিয়াছে। বাহ্য বিজ্ঞান বলি, বিজ্ঞানের স্বয়ং বলি, তত্ত্ব বলি, তাহা মানুষের কল্পিত রচিত; প্রকৃতির তত্ত্ব আমরা জানিতে চাই, জানিতে পারিতেছি না।

কলোৎপত্তির পক্ষে বীজ প্রধান কি ক্ষেত্র প্রধান, তাহা লইয়া পূর্বকাল হইতে একাল পর্যন্ত বিতর্ক চলিতেছে

বৃক্ষের, ইহা ডাণ্ডালার দুপকলের বীজের স্বীকৃতি আছে, নাট-ও। ইহা নিত্যা দেখিতেছি। একের মধ্যে বহুরূপতার দৃষ্টান্ত কীবেই পাই। বগন ডাল হইতে গাছ হয়, এবং বহু বৃক্ষ বীজ বিনা অরণ্য হইয়া পড়ে, তখন বীজোৎপত্তির বিচিত্র ব্যবস্থা কেন হইয়াছে?

সম্বত্তঃ—কৃষিকর্ম দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়, বীজকর্ম ও ক্ষেত্রকর্ম। বীজকর্মে বীজ নির্মাণ, বগন, অঙ্কুরোৎপাদন, জাত বৃক্ষের পালন, এবং শেষে বীজ রক্ষণ। ক্ষেত্রকর্মে মাটির উৎপত্তি স্থিতি জলবায়ু ও বহিঃতত্ত্ব নির্মাণ, বৃক্ষের শক্তির বিনাশ প্রকৃতির নিরীকৃত কর্ম। ইহার এক এক কর্মে প্রচুর বিজ্ঞান আছে, অনেক গবেষণা করিবার আছে।

সম্বত্তঃ, কৃষি-বিজ্ঞান এত অজ্ঞাত যে ভূগোলদর্শন বাতীত কৃষি চলিতে পারে না। এই কারণ, জমি নতুন, বীজ নতুন হইলে অর্থাৎ ক্ষেত্র ও বীজ দুইই অজ্ঞাত হইলে জাতি কলও অজ্ঞাত থাকে। মৃতকুণ্ডে দুই চারিটা আখ গাছ বহু বর্ধিত ও পুষ্ট করিতে পারা যায়; কিন্তু বিতীর্ণ ক্ষেত্রে, এবং সেটা কালের কথা, কৃষকের বর্তমান সহায়-সম্পত্তি লইয়া পারা যায় কি না, সেটাই গুরুতর সমস্যা। সে সমস্যার পূরণ না হইলে কৃষি-বিজ্ঞান আর উদ্ভিদ-বিজ্ঞান আর এক থাকিয়া থাক, কৃষি-বাতী দাঁড়াইতে পারে না। দেশের কৃষক জানে, গোবর জমির “সার”, এ কারণ সারকুণ্ডে সারগাদা করিয়া রাখে। গোবরের উপাদান কি, তাহা জানে না; কিন্তু জানে কোন্ মাটিতে কোন্ ফসলের পক্ষে গোবর হিতকর, কিসের

পক্ষে খট্টা হিতকর। মাঠের মাটি পরীক্ষা করিয়া জানি, জমিতে নাইট্রোজেন ফসফরাস ও পটাশিয়ামের মাত্রা আশংকা করিবার কথা। সব মাটিতেই কিছু না কিছু আছে, কিন্তু একটার মাত্রার বৃদ্ধ-কম-ক্রিয়া আটকাইয়া যায়। নাইট্রোজেনের সম্ভাব্য কমাটিং হয়, এ বৎসর সম্ভাব্য চলেও পর বৎসর হয় না। কারণ বৃক্ষকে যে সোরা আকারে নাইট্রোজেন লটতে হয়, তাহা জলে দুইটা চলিয়া যায়, জমিতে থাকে না, এ কারণ কৃষক গোবর, গোমূত্র, অজ্ঞ পশুর নিষ্ঠা মুত্র চন্দ্র ও শূক চূর্ণ, গাছ-পাচা প্রভৃতি দ্বারা নাইট্রোজেন নিষ্কাশে করে। বরাহের বৃৎ-সংহিতায়, অগ্নিপুংবে গুরুনীতিতে বৃক্ষাশুর্গের আছে। পূর্ণকালে ত্র্যমুখ প্রচুর আশোচিত হইয়াছিল। আমাদের আশুর্গক্ষে যে ত্র্যমুখ বর্ণিত আছে, তাহা যে কত ভূগোলশাসনের ফল তাহা জানিলে এই বিজ্ঞানের দিনেও পূর্ণ-পিতামহদিগের প্রতি মন্তক আপন, নত হয়। ত্র্যমুখ জানিলে শৌকিক কাজ চলে বটে বিজ্ঞান এষণা তৃপ্ত হয় না।

কৃষিবার্তা পৃষ্ঠায় করিবার উদ্দেশ্য আছে। (১) দেখা যায় এই বার্তা ধরিয়া প্রকৃৎ বিজ্ঞানে প্রবেশ করিতে পারা যায়। যে সকল ছাত্র মূর্ত-বিজ্ঞান সহজ মনে করেন, তাহারা দেখিবেন কৃষিকর্মে এক এক বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গি অঙ্গাঙ্গ। (২) গবেষণা প্রাচুর্য করিবার পক্ষে কৃষি-বার্তাও অনেক উপায়। গবেষণা পক্ষের মূল্য নাকি গরু খোকা। গরু হারাইলে লোক খুজিতে বাহির হয়। কৃষি-বার্তার অসংখ্য গরু, মূলাশুর্গ গরু খুজিয়া আছে, যেগুলি পাইলে আমাদের বহু

মঙ্গল হইবে। চাণক্য নাকি বলিয়াছেন,— কৃষিযন্ত্র ন বাণিজ্য গণো যন্ত্র ন ধর্ম্মঃ। দারিদ্র্যং সত্যং তত্ত গৃহে তত্ত কুস্তোজনম্॥ আমাদের গৃহে যে কুস্তোজন হইতেছে, তাহা পল্লীতে প্রবেশ করিলেই প্রত্যক্ষ হয়।

এই যে অর্ডার-বোধ হইতে গবেষণা তাইই প্রকৃত; অজ্ঞের দেখাযেখি যাহা তাহা কৃত্রিম। আরও দেখিতেছি কৃষি ধরিয়া প্রায় বাবতীর বিজ্ঞান শিখাইতে পারা যায়। বিজ্ঞানের এমন শাখা মনে হইতেছে না যাহা ইহাতে কিছু না কিছু না লাগে। ইহাই ত প্রাচীনাধারণের অবশ্রব। বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব প্রচারিত হউক, পরিচিত কৃষি-বার্তার পৃষ্ঠায় প্রচারিত হউক। দেশের আপামর সাধারণে প্রচারিত হউক; পুস্তক দ্বারা চউক, কথা দ্বারা চউক। কিন্তু দেখিবেন যেন পুস্তক ও কথা দ্বারা পাঠক ও শ্রোতার মনে বিজ্ঞানের প্রতি আদর জন্মে। তাহাদের জ্ঞাত বিষয় লইয়া বিজ্ঞান প্রচার করিবেন; কেননা তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে। উহ উল্লেখ করিতে পারেন, কিন্তু তদু দ্বারা অজ্ঞতা ঢাকিতে চেষ্টা করিবেন না। পাঠক ও শ্রোতা হাজার বিষয়ে অজ্ঞ হউন, তাহারা মাহুয়, বুদ্ধিশালী মাহুয়, এ কথা কদাপি কুলিবেন না।

কিন্তু বিজ্ঞান প্রচারের কথা উঠিলেই ইহার তাহা পরিভাষার প্রশ্ন উপস্থিত হয়। গত বৎসর রামেন্দ্রবাবু এ বিষয়ে বলিয়াছেন। আমরাও মনে হয় আমরা পরিভাষা-দমত্ব দত্ত কঠিন মনে করি, বস্তুতঃ তত নহে। এ বিষয়ে ছুই চারি কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।

ব্যাকরণের শব্দের চারি প্রকৃতি না অর্থ ধরিয়া শব্দসমূহ চারি ভাষে বিভক্ত হইয়াছে। জাতি শব্দ, গুণ শব্দ, দ্রব্য বা সংজ্ঞা শব্দ, এবং ক্রিয়া শব্দ।—এই চতুর্বিধ শব্দের মধ্যে দ্রব্য শব্দ সম্বন্ধে সন্দেহ মনে হইয়াছে। কথাটা এই, অস্মিৎ, হাইড্রোজেন বলি, না অস্ত্র নামে বলিব? এক্ষণে বিতর্ক-ওঠে কেন, তাহা বুঝা কঠিন। গরকে গর বলিব, না অস্ত্র কিছু বলিব, এই বিতর্ক যেমন, অস্মিৎকে অস্মিৎ বলিব, না অস্ত্রমান বলিব, সে বিতর্কও তেমন। মৃতন দ্রব্য বাটার নিকট পাই, সে যে নাম বলে, সে নামেই তাহা পরিচিত হয়। সকল ভাষাতেই ইহা সাধারণ নিয়ম। ইয়ুরোপে বিজ্ঞানের অভ্যাস; আমরা সে বিজ্ঞান ইংরেজীতে শিখিতেছি। অধুনাঙ্গী নহে, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোক শিখিতেছে। সকল প্রদেশেই সহিত মিলিয়া ভারতবর্ষের নিমিত্ত সংজ্ঞা শব্দ নির্ণয় করিতে পারিলে অমৃতঃ কিছু সুবিধা হইত। কোন প্রদেশে অস্মিৎকে কি বলা হইতেছে তাহা জানা নাই। মনে রাখিতে হইবে, ভারতবর্ষে কেবল সংস্কৃতমূলক ভাষা নহে,

মুসলমানী ভাষা ও গ্রীক ভাষা, চলিত আছে। যদি বিভিন্ন প্রদেশে অস্মিৎকে বিভিন্ন নাম হয়, তাহা হইলে এক ইংরেজী নাম স্থানে পণ্ডিত নাম আসিয়া জুটিবে। যদি অধিকাংশ প্রদেশে অস্মিৎকে কিংবা ইহাব কিংবা রূপান্তরিত নাম চলে, তাহাতে আমাদের সকলের সুবিধা। প্রদেশভেদে বিভিন্ন নাম না হইলে মাতৃভাষা ছাড়িয়া ইংরেজী পড়িতে গেলে মৃতন নাম শিখিতে হয় না। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে বৈজ্ঞানিক নাম কিন্তু এক রহিয়াছে। যে নাম পূর্বে হুইতে প্রচলিত ছিল, সে নাম আছে, বৈজ্ঞানিক নামও আছে।

একটা কথা এই, কোন কোন ইংরেজী নাম আমাদের মূখে সহজে উচ্চারিত হয় না, আমাদের কানে ভাল শোনার না। বড় বড় শব্দ, সংস্কৃত শব্দ, ইংরেজী শব্দ, আরবী ফারসী শব্দ বাঙ্গলাতে কিছু কিছু বিকৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু বিকাবের হুত্র জ্ঞান আছে। সেই হুত্র ধরিয়া ইংরেজী নাম শব্দের কিছু পরিবর্তন করিয়া গইলে বাঙ্গলা ভাষার যজ্ঞে মিশিয়া যাইবে।

দর্শন-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের অভিভাষণ

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহার মর্ম এইরূপ—প্রথমেই তিনি দর্শন শব্দের নিরুক্ত নির্ণয়ের চেষ্টা পাইয়াছেন। মাধবাচার্য্য “সর্বদর্শনসংগ্রহে” পনেরোটি দর্শনের পরিচয় দিয়া প্রথমেই বলিয়াছেন, শাক্য

দর্শন সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের শিরোমণি। মাধবাচার্য্য যে এখানে পারিভাষিক অর্থে দর্শন শব্দের প্রয়োগ করিলেন, হীরেন্দ্রনাথ প্রাচীন শাস্ত্রাদির মধ্যে তাহার মূল অঙ্গমূল্য করিয়াছেন। আত্মজাতির আদিম গ্রন্থ বেদবেদাদির আলোচনা করিয়া তিনি

দেখাইয়াছেন, সেখানে 'দর্শন' শব্দের কোন পারিভাষিক অর্থ নাই—তথ্য 'দর্শন' শব্দের অর্থ 'মহাত্মা দর্শন' মাত্র। বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক বা উপনিষদেও এরূপ পারিভাষিক অর্থে 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ নাই। হজাকারের বেদদর্শন প্রচলিত আছে, তাহাতেও পারিভাষিক অর্থে 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ নাই—ব্রহ্মসূত্রে 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ আছে কিন্তু তাহাও Philosophy অর্থে নহে।

মহাপাচাগ্য যখন 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' রচনা করেন, তখন 'দর্শন' শব্দ দ্বিগুণে পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার পূর্ববর্তী সঙ্গীতদ্বয়সংগ্রহে (যাহা ত্রীশঙ্করাচার্যের নামে প্রচলিত) 'দর্শন' শব্দের Philosophy অর্থ বিদ্যুৎ। এই সংগ্রহ-গ্রন্থ ডাক্তার ত্রীশঙ্করাচার্যের বিরচিত কিনা, সে বিষয়ে সংশয় থাকিলেও শঙ্করাচার্যের সম্বন্ধে 'দর্শন' শব্দ যে পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হইত,

ইহা নিঃসংশয়। কারণ শঙ্করাচার্য হেদাঙ্ককে ঔপনিষদ দর্শন বলিয়াছেন।

২৩০০ বৎসর পূর্বে কোটিল্যের সময়েও 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায় না। কোটিল্য মহাভারতের সহিত পরিচিত ছিলেন; অথচ মহাভারতের শাস্ত্রপুর্বে দর্শন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। হীমেন্দ্রবাবু বগেন, মহাভারতের শাস্ত্রপুর্বে বয়ঃক্রম নির্ধারণ করা হইছে; সেইরূপ 'দর্শন' শব্দের এই প্রয়োগ সবেও কোনরূপ নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। সুতরাং 'দর্শন' শব্দের নির্ভুল নির্ধারণ করা যায় না।

প্রাচীন ভারতবর্ষে উপনিষদ শিষ্যকে দীক্ষা দিত। যে রহস্য উপদেশ



শ্রীমত্ হীমেন্দ্রনাথ বসু বেদান্তসংগ্রহ

দ্বিতেন, তাইকে প্রাচীনরা উপনিষদ বলিতেন। ঐ সকল রহস্য উপদেশ (জ্ঞান আদেশ) সংকল্প হইতে আসিয়াছে। ইহাদিগের সাধারণ নাম ছিল, উপনিষদ। 'উপনিষদ' শব্দের এই নিরুক্ত সঙ্গের কারণ নাই। কিন্তু 'দর্শন' শব্দের নিরুক্ত ভবসাক্ষর; সে অঙ্ককারে পূর্ণ নির্ণয় করিতে হইলে কল্পনাও আশ্রয় লইতে হয়।

প্রাচীনরা সত্যের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিতেন। সত্যের সার্বভৌমত্ব ভাবের দ্বারা ভাবাংশ যে দ্বিবি অহুত্বিত করিয়াছেন, সত্যের সার্বভৌমত্ব স্বকণের যে যুগ বীহার মানন দৃষ্টির গোচর হইয়াছে, তাহাই তাঁহার 'দর্শন'।

সত্য একরূপ। জ্ঞান বিজ্ঞানের উপরিতন যে প্রজ্ঞান, সত্য সেই প্রজ্ঞানরূপ। বাদী বিবাদী দর্শনদ্বয়ই সেই সত্যকে অনেকরূপে দর্শন করে। কিন্তু দর্শন অনেক হইলেও বাহ্য দৃষ্টি, বাহ্য সত্য, তাহা একই। তাহাই যদি হয় তবে দার্শনিকগণের এত বাদ-বিসম্বাদ কেন? সত্য সার্বভৌমত্ব; সত্যকে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে দেখা যায়। সকল বাদীরাই একথা স্বরণ রাখা উচিত। একেই বিনি ব্রহ্মকে প্রবদন করেন, বিনি নাজনক-বাদী—জ্ঞান নিশ্চয়ই অব্যবহৃত।

এই বিবাদী মতবাদের সমস্বয়সাধনের অভ্যাস উৎসাহ, ভগবদ্গীতা। গীতার আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, গীতা প্রচারের সময় ভারতবর্ষে যোগাভ্যাসের জ্ঞান চারিটি বিভিন্ন মার্গ প্রচারিত ছিল। সেই মার্গ চতুষ্টয়ের নাম যথাক্রমে—কর্মমার্গ, জ্ঞান-মার্গ, ধ্যানমার্গ ও ভক্তিমার্গ। গীতা ঐ সকল বিভিন্ন সাধনমার্গের অপূর্ণ সমস্বয় বিধান

করিয়াছেন। এই সমস্বয়বাদ গীতার নিজস্ব। গীতা-দেবদাহিয়াছেন যে, জীবের সম্পূর্ণ বিকাশের জ্ঞান কেবল কর্ম, কেবল জ্ঞান, কেবল ধ্যান, কেবল ভক্তি যোগেই নহে। জীবকে ত্রৈলোক্য বিকশিত করিতে হইলে, এ মার্গ-চতুষ্টয়কেই সম্পূর্ণ আশ্রয় করিতে হইবে। নতুবা আত্মার আংশিক, ঐকদৈশিক বিকাশমাত্র হইবে।

কেবল সাধনসাধন নহে, দার্শনিক বাদ বিবাদসংকেও গীতায় এই সময়ের ভাব অভ্যাস। তাহার ফলে সাংখ্য ও যোগ, বৈশিষ্ট্য ও অদ্বৈত, বিবর্ত ও পরিণাম—সত্য দৃষ্টির মিলন ক্রমে সমন্বিত হইয়া গীতা-রূপ কল্পকে পরিণত হইয়াছে।

তাহার পর ছৌরোহবাবু বলিয়াছেন, তত্ত্বদর্শনের কারণ বুদ্ধি "নচে—বোধি"। মার্জিত বুদ্ধি দ্বারা তত্ত্ববিচার নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু বোধি ভিন্ন তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয় না। উপনিষদ যথাক্রমে 'ব্রহ্ম', 'জগৎ', 'দেহ' আখ্যাদিয়াছেন, তাহাই 'বোধ'। পাশ্চাত্য দর্শন ইহাকে বলিয়াছেন, "Gemuth"—"It is the core of personality. There God and man initially meet," বুদ্ধির কোলাহল নিবৃত্ত না হইলে বোধের বাণী প্রতিগোচর হয় না।

সত্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জাতির জীবনে দুইটি যুগ পর্যায়ক্রমে জোড়া করে; এক বোধের যুগ, অপর বুদ্ধির যুগ। বোধের যুগে তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়, সত্যের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়, এবং বুদ্ধির যুগে তত্ত্বের বিচার হয়, সত্যের বিতর্ক হয়। বোধের যুগ অধির যুগ, বুদ্ধির যুগ ভাবাকারের যুগ। ভারতবর্ষে

বোধির, বৃগ অধিগিগের স'ত অধিত
হইলে তকবৃগের আরম্ভ হইত। সে
বৃগের এখনও অবসান হয় না। 'ভাষা,
যান্ত্রিক, টীকা, নিগদ, অল্পবল ইত্যাদি এই
বৃগের কীষ্টি। বিতরণ কিত প্রেচ নাই।
বিতরণ ছাড়িয়া আমাদিগকে সিদ্ধান্তের
দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। অতএবে ভেদ
না দেখিয়া ভেদে অভেদ দেখিতে চাইবে।

এদেশের দার্শনিক সমাজে জীবের
স্বরূপ লইয়া যথেষ্ট বাদ বিবাদ আছে।
জীব কি অণু না বিভূ? জীব কি ত্রকের
অংশ না ছায়া? জীব কি ত্রক হইতে
ভিন্ন না অভিন্ন? ইহা দর্শনের এক মূল
সমস্যা। এ বিষয়ে নানা মূনির নীনা মত।
বাদ বিবাদ বিচিহ্ন নহে। কিন্তু সমগ্র
দৃষ্টিতে দেখিলে ইহার সামঞ্জস্য বিধান
অসম্ভব নহে। গীতার মতে পূর্ব যিনি :—
ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও উত্তম পুরুষ।
উত্তম পুরুষ = পরমাত্মা। অক্ষর পুরুষ =
অধ্যাত্ম এবং ক্ষর পুরুষ = জীবাত্ম। উত্তম
পুরুষকে শাস্ত্রে চিদাকাশ বলে; অক্ষর পুরুষ
= চিদ্রাত, বাগকে কূটস্থ বলে; এবং ক্ষর
পুরুষ = চিদ্রাতাস। চিদাকাশ নিত, চিদ্রাত
যেন বিন্দু। এই ভাবে জীব ত্রকের অংশ।

ইহার পর হীরেন্দ্রবাবু দর্শনাগোচনার
প্রকার ও প্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন।
তিনি বলেন, বঙ্গদেশে সস্ত্রিতি যেভাবে
দর্শনাগোচনা হইতেছে তাহা সন্তোষজনক
নহে। একপক্ষে প্রাচ্যদর্শনের আগোচনা
হ্রদীভূত, অপর পক্ষে বিশ্ববিজ্ঞানের উপাধি-
ধারীগিগের মধ্যে পান্ডিত্যদর্শনের আগো-
চনাও অসামঞ্জস্য হইতেছে না। এ ক্ষেত্রে

সফলতা লাভ করিতে হইলে আমাদের একটি
প্রধান কার্য দার্শনিক পরিভাষাসংকলন।
বাংলা ভাষার দর্শনের পঠনপাঠন এবং
মৌলিক দর্শনচর্চা দেশ মধ্যে প্রচলিত
হইলে ভিন্ন ভিন্ন লেখক একই দার্শনিক
তত্ত্ব বুঝাইবার একত্র বিভিন্ন পরিভাষার
প্রয়োগ করিবেন। সেই সকল লেখক মধ্যে
যাহা যোগাত্মক, তাহা টি'কিয়া যাইবে।
এই সঙ্গে আমাদিগকে বহু আশাস ও
সম্মত বাদ করিয়া সংস্কৃত দর্শনসাহিত্যে
ঈশ্বর পারিতোষিক পদের হ্রদী সংকলন
করিতে হইবে।

পরিভাষা রচনা ও পদসূচী সংগ্রহ
ক'মেন্ট যথেষ্ট হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে
প্রাচ্য ও পান্ডিত্য প্রসিক দার্শনিক
গ্রন্থসমূহের অর্থ দর্শন করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে
ইন্দ্রিয়ের দর্শনশাস্ত্রেরও অর্থ দর্শন প্রয়োজন।
পান্ডিত্য ভাষার যেমন নানা প্রকারের
Philosophical Series প্রবর্তিত হইয়াছে
বঙ্গভাষাতেও সেইরূপ চাই। প্রাচ্য ও
পান্ডিত্য ভূমণ্ডলের প্রধান প্রধান দার্শনিকের
দার্শনিক মতের পরিচায়ক নিগদ এবং
দার্শনিক মতগণের ইতিহাস বঙ্গভাষার রচনা
করিবার বাবস্থা হোক। ভারতীয় ও
দুরোপীয় Logic Ethics ও Psychologyর
মার সঙ্কলন ও সমগ্র করিয়া এক এক
খানি উৎকৃষ্ট তর্কবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান ও কণ্ঠ-
বিজ্ঞান রচনা করিবার উত্তোষ করা হোক।

সস্ত্রিতি বঙ্গদেশে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের
ক্ষেত্রে যেমন মৌলিক অর্থসঙ্কলনসমিতি
গঠিত হইয়াছে, দর্শন ক্ষেত্রেও তেমনিই সমিতি
গঠিত হোক। ভারতীয় দর্শনের বিবিধ

মতাদেশের আদি এতদেব অমূল্যমান চণ্ডিক। সুতরাং, ভাষা প্রকৃতি নানা বিষয় লইয়া অমূল্যমান হোক! বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলন এই সকল গুরুতর অগত্যাগ্রস্ত কার্যের ভার গ্রহণ

করুন। এ সম্মিলন উৎসবক্ষেত্র নহে, কর্মক্ষেত্র। কর্মের সকলতার মণ্ডিত করিয়া সম্মিলনকে সার্থক ও সমৃদ্ধ করা আমাদের কর্তব্য।

আধুনিক ভারত

(পূর্বাহ্ন্যতি)

সেই একই সময়ে, ইংরাজ সরকার প্রথমে সংস্কৃত ফারসী ও আরবী ভাষার, পরে ইংরাজি ভাষার, পরিশেষে হিন্দী ভাষালাভামূল্য প্রভৃতি লোক প্রচলিত ভাষার শিক্ষাবিস্তার কথিতে লাগিলেন; মুসলমান ও হিন্দু এবং নীচবর্ণের সকল লোকই সকল ধাপের শিক্ষাই লাভ করিতে লাগিল। এই ক্ষেত্রে, লোকপ্রিয় লেখকেরা, বৈষ্ণব সংস্কার-দেয়া এবং মুসলমান অধিপত্তিমা, যে প্রিয় আরজ করিয়াছিলেন, ইংরাজ সেই প্রিয় সম্পূর্ণ করিলেন। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেশ্বরের মধ্যে প্রভেদ এই ছিল যে, ব্রাহ্মণ শিক্ষালাভ করিত ও ব্রাহ্মণেশ্বরের লোকদিগের শিক্ষা-লাভের অধিকার পর্বাভ ছিল না। এক্ষণে এই বৈষম্যের স্থিতিমাত্র অবশিষ্ট রহিল।

অন্যত্র, এই শিক্ষার সংস্থারসাধন বহু বৎসর সাপেক্ষ। কেবলমাত্র ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি, এই শিক্ষাদানের কতকগুলি মূলস্থান নির্ধারিত হয়:—গৌণশিক্ষা ইংরাজি ভাষায় দেওয়া হইবে, মুখাশিক্ষা লৌকিক ভাষায় দেওয়া হইবে। অন্যত্র, কৃষিকর্মীদের

অধিকাংশই প্রথমতঃ অনক্ষর এবং লোক-সংখ্যার মধ্যে কৃষিকর্মীদের সংখ্যা দশভাগের নয়-ভাগ। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালী যুবকেরা এই শিক্ষার সুযোগ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিল। ইংরাজি শিখিবার জন্য তাহারা যেন উন্নত হইয়া উঠিল। ১৮৩৮ অব্দে Sir Charles Trevelyan লিখিয়াছিলেন যে, “যুবকের কাঙ্গাল বাক-গুণ, গঙ্গাব নৌকাগুলিকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে।” ১৮৪৪ অব্দে স্কুলগ্রন্থ-সমিতি কর্তৃক ৩১,৫০০ ইংরাজি গ্রন্থ এবং ৫২ থানা মাত্র আখ্যুতি ও সংস্কৃত গ্রন্থ বিক্রীত হয়। (১)

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের আইন, ইংরাজি মুদ্রাব্যয়ের ও দেশীয় মুদ্রাব্যয়ের পুষ্টিসাধনে সাহায্য করিল। বঙ্গদেশে, কতকগুলি সাময়িক পত্রের খুব প্রভাব প্রতিপত্তি হইল; যথা ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত “সংবাদ প্রভাকর” ও ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্ত কর্তৃক পরিচালিত “অম্বোদিনি পত্রিকা।”

এই শিক্ষার আন্দোলন ছুটিতে কতকগুলি গুরুতর ফল প্রসূত হইল। ধর্ম-বিভাগে, রামা রামমোহন রায় একেশ্বরবাদ প্রচার

(১) ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে সরকারী কার্যকর্মে ফার্সিভাষার ব্যবহার রহিত হয়। আদালতে দেশের চলিত ভাষা ব্যবহৃত হইত।

করিলেন; হিন্দুদিগের অক্ষসংস্কারের বিক্ষেপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং ব্রাহ্মণ্যের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাষ্ট্রনীতি বিভাগে অনেকগুলি হিন্দু উপায় প্রতিষ্ঠানাদির দাবী করিল; এবং আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে, কতকগুলি যুবক লাভিভেদ প্রথা পরিত্যাগ করিল, যুরোপীয়দিগের স্তায় পরিচ্ছদ ধারণ করিল, গোমাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল, এবং স্ত্রীলোকদিগকে গৃহ হইতে বাহির করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল (কিন্তু উহার। এই প্রতিজ্ঞা যুবকমই পালন করিল!)।

১৮৫০—১৮৫০ পর্যন্ত, যে কেহ একটু লেখাপড়া জানিত, সেই বার্ষিক কিছু ইংরাজি ভাষাই ভাল বলিত। মধুহরন, যিনি ক্রিয়াকাল পরে বাঙ্গালার একজন বড় কবি হইরাছিলেন—তিনি এই ইংরাজি পড়তি রচনা করেন:—

"I sigh for Albion's distant shore
Its valleys green, its mountains high,
Though friends, relations I have none.
In that far clime: yet oh! I sigh
To cross the vast Atlantic wave,
For glory or a nameless grave."

দূর-খেতরীণ তরে, পড়ে মোর আকুল নিশ্বাস,
বেণা ছাদ উপত্যকা, উঠে গিরি ভেদিয়া আকাশ
নাহি সেথা আশ্রয়ন, তবু, লজ্জা অপার হলিবি
সাধ যায় লভিবারে যশ কিবা অনামা সমাধি ॥

যে দিগবিজয়ে সামরিক অভিযান ও রাষ্ট্র-নৈতিক বন্দোবস্ত হয় আরম্ভ এবং শিক্ষার পরিপূর্তি, যজ্ঞাযজ্ঞ ও গ্রন্থাদির উন্নতি সাধিত হয়, সেই বিজয়কাণ্ডে হুসম্পন্ন করিবার জন্য ইংরাজের। যুদ্ধিলেন, বড়বড় সরকারী-পূর্তকাণ্ডের অনুষ্ঠান

আবশ্যক। সহস্রাব্দ সাংগক্ষ পূর্তকণ্ডের অনুষ্ঠানে যখনপ্রথম হইবার ভয়ে কোম্পানী বহুকাল পর্যন্ত উঠতে হতক্ষণ করেন নাই। ভ্রমণের জন্য ভারতে ভাল রাস্তা ছিল না। বর্ষাকালে কেহ ভ্রমণে বাহির হইত না। গ্রীষ্মকালে লোকেরা মাঠ দিরা চলিত; যখন গরুরগাড়ীতে যখন পাখীতে, যখন অশ্বপুঠে, উষ্ট্রপুঠে বা হতিপুঠে যাতায়াত করিত। পক্ষান্তরে, Lord Dalhousie কতকগুলি রাস্তা নির্মাণ করাইলেন, ফৌজদারী নির্মাণ করাইলেন, বৈজ্ঞানিক তারের পথ প্রস্তুত করাইলেন, গ্রীষ্মের প্রথমভাগে যুদ্ধ বিজিত যুদ্ধসমূহ বাহ্যতে কৃত্রিমকণ্ডের জন্য কর্তৃত্ব হইতে পারে তক্ষণ খাল কাটাইলেন।

এই তৃতীয়যুগে ইংলণ্ড এই সমস্ত কার্য করিয়াছিলেন। এই যুগে ইংলণ্ড সমস্ত ভারতে প্রাদিক লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ যুদ্ধবলের প্রাদিক। ভারতের সমস্ত যজ্ঞ-রাস্তা বিজিত হইল। দ্বিতীয়তঃ শাসন কাণ্ডের প্রাদিক। কোম্পানীর অধীনস্থ সমস্ত রাজ্যে যুরোপীয় শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ভারতীয় রাজার। এই শাসন-প্রণালীর কতকগুলি মূলত্ব গ্রহণ করিল। তৃতীয়তঃ নৈতিক প্রভাবের প্রাদিক। শিক্ষার বিস্তার হইল, যজ্ঞাযজ্ঞ ও সাহিত্যের পরিপূর্তি হইল; শিক্ষিত হিন্দুর। ইংরাজিতে কথা কহা, ইংরাজি লেখা, ইংরাজি আচার ব্যবহার ও ইংরাজি নতায়ত গ্রহণ করা, সম্মানের বিষয় মনে করিতে লাগিল।

ঐজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা, ২২ দ্বিভা টট, কাতিক মাসে, ঐহবিৎসব যাত্রা যাত্রা মুক্তি শু ৩, মানি পার্কে, বালিগড় হইতে
ঐসতীলক্ষ্য যুগোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



অশোকের রাণী ও তাঁহার সন্তান বোধিসত্ত্ব
 ঐগুপ্ত অবনোদ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত
 এই চবির মালিক-ঐঐমতী ভগ্নপদ-সম্রাজ্ঞা মেদী ।

ভারতী

৩৯শ বর্ষ]

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২

[২য় সংখ্যা

আধুনিক ভারত .

(পুরস্কারস্বরূপ)

দ্বিতীয় যুগ

১৮৫৭-৫৮ অব্দের সিপাহী-বিদ্রোহ

এই সময় অহুষ্ঠান যতটি টেপনবার চটক না,—একটু যেন বেগ তাড়াতাড়ি, একটু যেন চটাই আবশ্য করা হইয়াছিল। এই সময় অহুষ্ঠান, ভারতীয় ও যুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে একটা মারাত্মক সংঘর্ষ আনিয়া উপস্থিত করিল। ভৌতিক ও নৈতিক বাধাসমূহ, এসিয়ার ক্রমবিকাশের প্রতিরোধ করায়, যুরোপ এই সময় বাধা সমূহ অপসারিত করা আবশ্যক মনে করিল। তাছাড়া, ভারতবাসীরা যুরোপের ব্যবহাওয়া, জমি, আচার ব্যবহারের ইতিহাস, বিশেষ-বিশেষ জ্ঞান ও ভক্তির বিনিম—এই সমস্তের প্রতি দৃঢ়রূপে আসক্ত ছিল। যুরোপীয় সভ্যতা আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে হইলেও, কত মতবিশ্বাস, কত আচার ব্যবহার উহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে ?

যে সকল সাফল্য কারণে এই সংঘর্ষ সমূহ উপস্থিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে নৈতিক কারণ, রাষ্ট্রিক কারণ ও আর্থিক কারণ—এই তিন ভেদের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক।

১

নৈতিক কারণ।—যুরোপের প্রভাবে ভারত-সমাজ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। ইংলণ্ডের উদারগণদ্বিগণের সমাজসংস্কার, কতকগুলি হিন্দু সান্নিধ্য গ্রহণ করায়, এই সকল সংস্কার-কার্য এই বিক্ষোভকে আরও বাড়াইয়া তুলিল। নিজস্ব প্রসার, বড় বড় পুস্তককর্ষ, যুরোপের সহিত বাণিজ্যবিত্ত্যাব—ইহাই গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারিত কার্যতালিকা ছিল। কোন কোন প্রদেশে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, শিক্ষিত যুবকেরা এই কার্যতালিকা উৎসাহের সহিত মাননে গ্রহণ করিল।

উদার পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠ করিতে লাগিল, বেলগাড়ী ও দাম্প-ভাটাজ ব্যবহার

করিতে লাগিল, ইংরাজী ব্যবসায়ী ক্রম
করিতে লাগিল, যুরোপীয়দিগের ভাষা আহার
করিতে লাগিল, যুরোপীয় পোষাক পরিতে
লাগিল। গভর্ণমেন্টের কাজ, ব্যাঙ্কের কাজ,
বণিক কোম্পানীদিগের কাজ পাইলার ভিত্তি
আপনাদিগের মধ্যে বিধারিবি হইতে
লাগিল। যুরোপে, এইরূপ আচরণ এক
সাধারণ যে উহা উল্লেখযোগ্য নহে। কিন্তু
ভাৰতে এইরূপ প্রত্যেক কার্য, বিশেষ
নিদর্শন বলিয়া উপলব্ধি হয়। গৃহের বন্ধন
ছিন্ন হইল :—পৈত্রিক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া
পুত্র দূরদেশে কোন কর্মে নিযুক্ত হইল।
আর সে, বংশোদ্ভূতক পরিচ্ছন্ন ধারণ করিল
না, এমন জিনিস আহার করিতে লাগিল যাহা
ভাৰতীয় পিতা ঈশন স্পর্শ করিত না, এমন
কাজ করিতে লাগিল যাহা তাহার পিতা
কখন করিত না, এমন বিষয় চিন্তা করিতে
লাগিল, যাহা চিন্তা করাও তাহার পিতা, পাপ
বলিয়া মনে করিত। আত ভাঙ্গিয়া গেল :—
যে লক্ষ সমাজের মধ্যে কোন নূতন কিনিব
স্থান ছিল না, সেই সমাজে নূতন নূতন কা-
কর্ম, নূতন নূতন ব্যবসায় প্রবেশ করিল। গবর্ণ-
মেন্টের কাজে হাউসওয়ারাদেবের কাজে, সকল
জাতের লোক আসিয়া একত্র মিলিত হইল ;
রেলগাড়িতে, বাষ্প-আধায়ে পরস্পরের সহিত
মেশামিশি হইতে লাগিল। নৌচু জাতের
লোকেরা ব্রাহ্মণদিগের সহিত একই পিচ্ছা
পাইতে লাগিল, ব্রাহ্মণদিগের সহিত
প্রতিযোগিতা করিতে লাগিল, পরীক্ষায়
ব্রাহ্মণদিগকে ছাড়িয়া উত্তীর্ণে লাগিল, এবং
তাহার পর গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধি হাকিম
হইয়া ব্রাহ্মণকে ছুঁম করিতে লাগিল।

ধর্মশাস্ত্রের আশঙ্কা হইল। নানাপ্রকারে
এই আশঙ্কার উত্থেক হইল। পাণ্ডিত্যবিক
বিদ্যাব্যবস্থা লঙ্ঘিত হইল। জাতিভেদের
নিয়ম লঙ্ঘিত হইল। এই সকল বিদ্যাব্যবস্থা
ও নিয়ম অতীব পবিত্র বলিয়া লোকের বিশ্বাস
ছিল। কেহ কেহ নিষিদ্ধ জিনিস আহার
করিয়া তাহার উজ্জিষ্ট নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণদের
গৃহে নিক্ষেপ করিত। আবার কেহ কেহ,
এরূপ যুরোপীয় ব্যবসায়ী ক্রম করিত,
যাহা অপরিচিত স্থানে, অপরিচিত উপাদানে
অপরিচিত লোকের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে।
আবার সাংস্কারভাবও ধর্মশাস্ত্রের আশঙ্কা
ছিল। গভর্ণমেন্ট, ইংরেজ-সমাজ, এবং
রামমোহন রায়ের ভাষ্য নব্য ধর্মশাস্ত্রাবাদের
সংস্কারকরণ, যুরোপীয় মিশনারিদিগের প্রতি
আকর্ষণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।
গভর্ণমেন্ট আরও কিছু বেশী করিলেন।
গভর্ণমেন্ট প্রত্যেক প্রচলিত কতকগুলি প্রথা
উঠাইয়া দিলেন। সতীদাহ উঠাইয়া দিলেন,
বধোৎসব উঠাইয়া দিলেন, ও বধোৎসব সমাজ-
দিগের কঠোর প্রাণশুদ্ধি রহিত করিলেন।
Lord Palmerston কোন এক বক্তৃতায়
এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

“মানবিক বিজ্ঞান অপেক্ষা আরও এক
মহত্তর ও উন্নততর জিনিস দান করিয়া অসংখ্য
ভারতবাসীদিগের হিতসাধন করা বোধ হয়
আমাদেরি কার্য ; কিন্তু এ কাজ কেবল
কালের সাহায্যে এবং লোকের ক্রমোন্নতির
সঙ্গে সঙ্গে সংসাধিত হইবে।” সংস্কারপ্র
সমূহ আর একটু অসংঘতভাবে এই মতই
সমর্থন করিতে লাগিল। ইহা হইতেই
মুসলমান ও হিন্দুদিগের ধারণা হইল যে,

ইংরেজ বলপূর্বক উৎসাহিতকৃত গৃহযুদ্ধে দীক্ষিত করিবার সংকল্প করিয়াছে। উৎসাহের উৎকট কল্পনা ইংরেজের বড়ৎস্রের একটা চিত্র মানস-পটে অঙ্কিত করিল।—সম্রাটের কানকর্ষ, মুরোণীরদিগের চাকুরী, বেলাগাভী, বাশ-জাহাজ, অস্পৃশ্য উপাদানে প্রস্তুত মুরোণীর প্রাণসামগ্রী—এ সমস্তই সংলগ্নত্ব দিব্যত ভারতবাসীদের অস্ত্র যেন চাঁদ পাতা হইয়াছে; বাহাতে তাহাদের ধ্বংসনাশ হয়, জাত যায়, তাহাদি এই সমস্ত আকর্ষণ হইয়াছে।

• • •

রাষ্ট্রিক কারণ।—পাঁচ বৎসরের মধ্যে Lord Dalhousie ১৫ লক্ষ Kilometre square ভূমি বরাণীকৃত করিয়াছিলেন। সিদ্ধ পদ্ধতি অবোধা। প্রকৃতি প্রদেয় ইংরেজের অধিকারকৃত হইলে, লোকের আশঙ্কা হইল বৃষ্টি ইংলণ্ড সমস্ত ভারতকে প্রসূ করিবে। এবং ব্রহ্মদেশ ও পেশোয়ারবিজয়ে এবং আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ করার লোকেরা ভাবিতে লাগিল, ইংলণ্ড এমন একটা বৃহৎ এশিরিক সাম্রাজ্য সৃষ্টি করিবার সক্ষম করিয়াছেন, বাহার অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া ভারত স্বকীয় শাসন-ব্যতন্ত্র্য হারাষ্টবে।

এই চিত্তচাকলা প্রথমে রাণাদিগের মধ্যে একাংশ পাইল। মোগলসম্রাটের অগ্ৰহা অনির্দিষ্ট ছিল। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা-দিগের উৎসীড়ন অন্ত্যচ্যুত হইতে সম্রাটকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, ইংরেজেরা বিলি অধিকার করিয়াছিল। ইংরেজেরা সম্রাটের

নামে রাজা শাসন করিতে লাগিল। সম্রাটের আধিকৃত অধিক্ত করিয়া নিজের মৃত্যু বাতির করিতে লাগিল। আরও কিছুকাল পরে, কোম্পানীর রাষ্ট্রনীতি বদলাইয়া গেল; কোম্পানী স্বয়ং ভারতের অধিপতি এইরূপ ঘোষণা করিলেন; উৎসাহের মৃত্যুর উপর ইংলণ্ডেরের ছবি মুদ্রিত হইল। তথাপি, তৈমুরের বংশধর তখনও স্বকীয় উপাধি, স্বকীয় অবদরসুতি, স্বকীয় প্রাসাদ বজায় রাখিয়াছিলেন। তখনও তাহাকে রাজোচিত সম্মান প্রদত্ত হইত। Lord Dalhousie চাহিয়াছিলেন, মোগল সম্রাটকে দিলি হইতে মূরে সরাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার উত্তরাধিকারকে সম্রাট উপাধি আর না দেওয়া হয়। একটা কিছু নিশ্চিত হইয়া করিতে না পারিয়া ডিরেক্টরগণ, সম্রাট বাহাদুর-শাহ অবহার কোন পরিবর্তন করিলেন না, তাহার একজন উত্তরাধিকারী স্বীকার করিলেন; কিন্তু মোগল-সম্রাট বাহাকে উত্তরাধিকারী করিতে চাহিলেন, তাহাকে তাহারা উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। উত্তরাধিকার পাইবা মাত্র ঐ উত্তরাধিকারকে দিলি ছাড়িয়া বাইতে হইবে, এইরূপ আদেশ হইল। কোম্পানীর এই আচরণ, মোগলসম্রাটকে ক্ষত্র করিয়া তুলিল, অবচ মোগল সম্রাটের প্রত্যাব অক্ষত রহিল।

পেশোয়ার উত্তরাধিকারী নানা-সাহেবের সহিত ব্যবহারেও কোম্পানী একই প্রকার অ-দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। (১) নানা

(১) নানা সাহেব নামে খ্যাত, হুন্দুগ ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দ্বিভাষী (১৮২৫-১৮২৮) তাহাকে দক্ষত পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৪০ অব্দে বাহাদুর মৃত্যু হয়।

সাহেব বকীর পর ও অবসর-বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন; কিন্তু তাহার উত্তরাধিকার বজায় রহিল। কানপুর ও লডৌ-এর মধ্যে অবস্থিত তাহার বিপ্লব-রাজ্য তিনি রাজার জায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ছোট বড় বড় ভারতীয় উপাধি, সম্মানের উপাধি ছিল। কিন্তু ছোট, বড় এক্সপ ৬০০ রান্না ছিল যাহা ১৫ লক্ষ Kelometre square জমির অধিকারী। লর্ড ড্যাংলহৌসি সন্তকপুত্রের উত্তরাধিকার রহিত করায়, ঐ আইনে এই সকল রান্না জীত হইয়া পড়িল। ঔরঙ্গপুরের অত্যাচার তাহাদের রান্না কোম্পানী বাজেরাথ করিলেন, এই আশঙ্কা হইল।

লর্ড ড্যাংলহৌসির রাষ্ট্রনীতি সশঙ্কে শুধু যে রান্নারাই প্রতিবাদ করিল তাহা নহে, রান্নাদিগের প্রজাবর্ণও স্বাধীনশাসন বজায় রাখিবার জন্য ইচ্ছুক ছিল। অযোগ্য নবাব মুসলমান হইলেও, নবাবের খেজাচাষিতা ছঃলহ হইলেও, নবাব সিংহাসনচ্যুত হওয়ায়, অযোগ্যবাসী হিন্দুরা ছঃখিত হইয়াছিল।

ভাড়াডা, কোম্পানীর শাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধে সমাজের প্রত্যেক স্রেষ্ঠ কতকগুলি বিশেষ-বিশেষ অভিযোগ ছিল। প্রভু হইতে বঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া মুসলমানদিগের কষ্ট হইয়াছিল। মুসলমানেরা ইংরাজ কর্ত্তারী-দিগকে,—বিশেষতঃ হিন্দুকর্ত্তারীদিগকে চক্ষে দেখিতে পারিত না। আগর নিজেও শিক্ষাগত করিবে না, সরকারী কাককর্মে প্রবেশ করিবে না, নতুন সন্তান সহিত বলিয়া চলিবে না। কোন প্রকার

রাজবস্ত্রে বাধিয়া উঠিলে, অথবা পারস্তের ঘাণ ভারত আক্রমণ হইলে তাহাবন্ধ হত আধিপত্য আগর তাহার ক্রিয়া পাইবে,— ইহাই তাহাদের একমাত্র আশা ছিল।

পক্ষান্তরে, শিক্ষিত হিন্দুরা—বিশেষত শিক্ষিত ব্যাকানী ও শিক্ষিত তামুলরা, সরকারী কাককর্ম পাইবার জন্য লাগতিত হইল। কিন্তু এই সকল কাক বৎসরাজ্য, উহাতে বেতন খাটুনি তদনুসঙ্গ লভ্য নাই। তাই তাহারা দাবী করিল যে, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের আইনের পাণ্ডুলিপি পুরাপুরি কার্যে পরিণত করা হয়; শাসন বিভাগের সকল পদের জন্য, এমন কি উচ্চতর পদের জন্য যেন ভারতবাসীরা ইংরাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার অধিকার লাভ করে।

ইংরাজের ভারত-অধিকারে এক প্রেক্ষাপট লোক বিশেষরূপে কষ্ট অনুভব করিয়াছিল। তাহারা সামন্ততন্ত্রাধীন অভিজাতবর্ণ—সেই সব আমীর, সেই সব মন-সব্দার, সেই সব হিন্দু ও মুসলমান জমিদার যাহারা নিজ অধিকারে, রান্নার জায় প্রজা-শাসন করিত এবং নিজ গিরি-দুর্গ সকলকে অনরোধ-মহৎ করিয়া রাখিত। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী অনেক সময় কুখ্যতি হইতেও তাহাদিগকে বঞ্চিত করিত। Lord Cornwallis বঙ্গদেশের জমিদারদিগকে কুখ্যতি বলিয়া বীকার করিয়া একটা মন্ত তুল করিয়াছেন,—ইহা কোম্পানী বৃত্তিতে পাহার, জমির স্বামীত্ব বৎ চারীদিগকে অর্পণ করিবার জন্য কোম্পানীর কর্ত্তারীদিগের একটা ফৌক হইল।

কিন্তু উত্তরবঙ্গশ্রমিকদের মনস্কাম্যের অবস্থা, ব্রাহ্মণী জমিদারের অবস্থা হইতে অনেকটা তফাৎ। মনস্কাম্যের কৃষামিত্য রহিত করা একটা বিপ্লবের সামিল। উত্তরবঙ্গের কৃষামিত্য রহিত করা আর কৃষি-বাজেয়াপ্ত করা—উহা একই কথা। যে প্রদেশে সম্প্রতি বিদ্রোহ হইয়াছিল সেই অধোখ্যায়, একটা অতীত গুরুতর প্রাণ উৎখাশিত হইল। এই রাজ্যের সামন্ত-শাসনতন্ত্র অক্ষত ছিল। ইংরেজ কর্তৃপক্ষী-গণ সকল অবস্থাতেই, তালুকদারদিগের বিরুদ্ধে রাজস্বদিগের পক্ষপন্থন করিতে লাগিলেন। তালুকদারদিগের বিশেষাধিকার হইতে, এমন কি কখন কখন তাহাদিগের সম্পত্তি হইতে তাহাদিগকে বিচ্যুত করা হইতে লাগিল।

তা ছাড়া, ভারতে নিযুক্ত সমস্ত ইংরেজ-কর্তৃপক্ষীরাই, কোম্পানীর বাণিজ্যিক প্রবণতা ও টোরািদিগের পুৰাতন মনোভাবটা বজায় রাখিয়াছিল। কেবল ইংলণ্ডের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ২৫ কোটি ভারতবাসীকে শাসন করিতে হইবে—ইহাই টোরািদিগের মূলমন্ত্র ছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তখনও উদারনীতির পক্ষপাতী ছিল। অনেক সময় গভর্ণর জেনেরাল ও কতকগুলি উচ্চপদের রাজপুরুষ উদারমতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু শাসনকার্য্যে, ধর্ম ও জাতিগত অঙ্গ-গাংড়ারের দ্বারা চিহ্নিত পুৰাতন প্রথাই কাৰ্য্যতঃ বলবৎ থাকিত।

• • •

আর্থিক কারণ।—অষ্টাদশ শতাব্দীতে,

লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী বিশেষবিশেষ ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা-নির্ভর করিত। কিন্তু ভারতীয় শ্রমশিল্পের যে অভ্যাস হইয়াছিল সে কৃত্রিম অভ্যাস। দৈনন্দিন জরসামান্য আপনআপন প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী নিজেই প্রস্তুত করিত। অস্তি-জাতবর্গ একমাত্র খরিদার হওয়ার কারিগরেরা অস্তিজাতবর্গের তৃত্য—ভাহার পর গোলাম হইয়া পড়িয়াছিল। কেবল মনস্কাম্যেরা ও বড় বড় দোকানদার মাল রপ্তানি করিয়া লাভ করিত। কার্পাস বস্ত্র ছাড়া তত্ত্বীয় আর সমস্ত দ্রব্যজাত বিলাস-সামগ্রী ছিল। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল সে অরাজকতার সময়, ভারতীয় শ্রমশিল্পের ধ্বংস আরম্ভ হয়, এবং ইংলণ্ডের প্রতি-যোগিতা সেই ধ্বংসকাণ্ডটাকে সম্পূর্ণ করিল। শুদ্ধশাসনের অধিকার সত্ত্বেও অসমানরূপে পরিপুষ্ট এই দুই দেশের মধ্যে বহুদিন ধরিয়া যুগান্ত চলিতে পারিল না। একদিকে, ইংলণ্ড অতীত স্বাধীন জাতি, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনশালী ও যশস্বির দ্বারা সুসম্পন্ন। অল্প দিকে, মোগলের কর-ভারে ও মনস্কাম্যদিগের অতিরিক্ত অর্থশোষনের ফলে দৈনন্দিনপ্রায় ভাঙত;—সেই ভারত, যেখানে শ্রমজীবীরা জাতিভেদের বন্ধনে আবদ্ধ;—ব্যবসায় পরি-বর্তন করা, এমন কি স্বকীয় ব্যবসায়ের যন্ত্রাদি পরিবর্তন করাও বাহ্যিক পক্ষে নিষিদ্ধ। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভারতীয় শ্রমশিল্প অস্তিত্ব হইল। নগরের লোকেরা কৃত্রিমপথে দরিদ্রতা আসিতে বাধ্য হইল। এবং পল্লীগাম

শোকাবশিষ্ট হওয়ার করিগরেরা অগত্যা নিরুচ্চ
ভূমিতে চাষ আরম্ভ করিল।

কৃষকদের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিয়া-
ছিল। বাহা ইউক, কোম্পানী উৎসাহের
দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন।
“সমস্ত ভূমিই সরকারের”—এই নীতি বজায়
রাখিয়াও কোম্পানী, বাস্তবপক্ষে কৃষক-
বিশৃঙ্খলিত ভূমির স্বামির প্রদান করিলেন;
কারণ কোম্পানী রাজস্ব ও ভূমি-কর এক
সাধন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কোন
কোন প্রদেশে কোম্পানী শুধু ষ্ট্রেটকে
বিক্রিত করিলেন না, স্বকীয় জম্মা অধিকার
হইতে মন্বদ্বারদিগকেও বিক্রিত করিলেন,
অত্যাচার হইলেও জমিদারেরা যে সকল
অধিকার বহুদিন হইতে ভোগ করিয়া
আসিতেছিল, কোম্পানী সেই সকল অধিকার
হইতে জমিদারদিগকেও বিক্রিত করিলেন।
Bernier বর্ণনা করিয়াছেন, ঔরংজেবের
আমলে, ভারতীয় কৃষকেরা গোলাঘের জার
জমির সহিত অব্যক্ত থাকিত। কোন
প্রকারে খাওয়াটা চলে, এই পরিমাণ
কসলের একটা অংশ, ভূস্বামী, কৃষককে
ছাড়িয়া দিত। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে, বোম্বাই-
অঞ্চলে, পঞ্জাবে, উত্তর পশ্চিমাকলের কোন
কোন অংশে কৃষকই ভূমির, স্বপুত্রের ও স্বকীয়
গোমহিবাধির মালিক ছিল। কৃষক কোন
কর দিত না, জমির খাজনা খুব কমই
ছিল।

১৬ বৎসরের মধ্যে, ইংল্যান্ডেরা এমন
এক আর্থিক ও সামাজিক বিপ্লব বাধাইলেন
যাহাতে কৃষকের লাভ হইল কিন্তু জারগীর-
দার অভিজাতবর্গের বিলক্ষণ ক্ষতি হইল।

যে আর্থিক ও সামাজিক বিপ্লব, ১৮৭০
খৃষ্টাব্দে জাপানকে হঠাৎ রূপান্তরিত করে,
ইংল্যান্ডকে তাহারই অধঃপতন।

উত্তর বিশ্বেই, প্রথমে কৃষকের অবস্থার
উন্নতি করিয়াছিল, কিন্তু পরে,—মনে হয়,
উত্তর দ্বারা উৎসাহের অবস্থা আরও খারাপ
হইয়াছিল। অল্প, অনুদান, লভ্যতাধারণ,
প্রাচ্যদেশের কৃষক, আধুনিক রাষ্ট্রের
নিয়মবদ্ধ কার্য-প্রণালীর সহিত কখনই
বিনিময় চলিতে পারে না। ধনবৃদ্ধির হিসাব
ধর্মিতে গেলে, এমিরিক অধিপতিদিগের
আদায়ের তুলনার, এখনকার ভূমি-কর
খুব বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু
পক্ষান্তরে দেখালে রাজকর রেয়াৎ
করা হইত, ছাড় দেওয়া হইত, এবং উহা
ক্রমাগত অনিয়মিতরূপে নির্ধারিত হইত।
এখনকার রাজকর স্থিরনির্দিষ্ট, একটা বিশেষ
সময়ে গৃহীতব্য করিতে হয়, এবং
কৃষকের যেকোন অবস্থাই ইউক, কসলের
মূল্য বাহাই ইউক, এই রাজকর কৃষককে
বুজুর আকারে দিতে হয়। অবশ্য প্রচুর
কসল উৎপন্ন হইলে, তাহা হইতে কিয়দংশ
কৃষকের সংরক্ষণ করিয়া রাখা কর্তব্য। কিন্তু
ভারতীয় কৃষকের মন নিত্যন্ত শিশুর মত
লঘু। তাহার অবস্থা একদম শোচনীয় যে,
খারাপ বৎসরে যুরোপীয় কৃষক যে অর্থ
ভোগ করে, ভারতীয় কৃষক খুব ভাল বৎসরেও
সে অর্থের সুখ দেখিতে পায় না। তাই
সে দিন-মজুরের মত দিন আনে, দিন
খায়; এবং হাল-তথা হইলে, খাজনা
পরিশোধ করিবার জন্য বাধ্য হইয়া টাকা
ধার করে। যে উত্তমর্ণ সংপাণনকারী সে

নির্দিষ্ট দিনে হুদের দাবী করে, নির্দিষ্ট সময়ে অসল টাকা ফিরিমা চাহে, এই সদত্ত সন্তেব দায় এড়াইবার জন্য কৃষক, কৃসীদজীবীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে; কৃসীদজীবী অতিরিক্ত পরিমাণ হুদ চাহে। কিন্তু হুদের জন্য তাগিদ করে না। তাই কৃষক আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইয়া, ভবিষ্যৎ জুগিয়া যায়। যেমন আপোনে, দেইরুপ আজকাল ভারতেও কৃসীদজীবীরই অধিকাংশ জমির স্বাধিকারী। কেবল, নিত্যব্যয়িতা ও ভবিষ্যৎদৃষ্টির শিক্ষা লাভ করিয়া এবং শিমা-সমিতি ও সহযোগিতার সমিতিসমূহ স্থাপন করিয়াই, প্রাচ্যদেশের কৃষকেরা আধুনিক সভ্যতার উপকার লাভ করিতে পারিবে। এক্ষণে তাহারা কেবল উহার কঠোরতারই পরিচয় পাইরাছে।

১৮৫৭ অব্দে ভারতের কৃষক, রাজাদের বাণ্যাবাদি নিয়মে আবদ্ধ হইয়া, কৃসীদজীবী মণ্ডলনের কবলে পতিত হইয়া, পে-কালের জন্য এই বলিষ্ঠা পরিতাপ করিতে লাগিল যে, তখন তাহারা ততটা পরিশ্রম করিতে হইত না, ততটা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি করিতে হইত না।

ভারত যে আর্থিক অশান্তি ভোগ করিতেছিল, এই সদত্তই তাহার কারণ।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সমস্ত যুরোপ যুদ্ধে নবসভ্যতার আবির্ভাবে দারুণ কষ্ট অহুত্ব করিয়াছিল, সেইরূপ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পর, দিগ্বিজয়, বাণিজ্যের প্রীতি, সহস্রা অন্ন কালের মধ্যেই টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ে নির্মাণ প্রভৃতি ব্যাণ্যারে ভারতের দারুণ কষ্ট অহুত্ব করিতে লাগিল। এখন যেমন এই সকল

ব্যাণ্যারে চীনদেশে মধ্যে মধ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হয়, তখন ভারতে দেইরুপ আতঙ্ক উপস্থিত হইরাছিল।

২

বিশেষতঃ সৈন্তমণ্ডলীর মধ্যে নানা প্রকার উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। তখন কোম্পানী, একটি সামরিক শক্তিরূপেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। ড্যালহৌসির যুদ্ধ বিগ্রহে সিপাহীরা অসহ্যারে মৃত হইয়া উঠিয়াছিল; সেই সব যুদ্ধের গোরা তাহারা আপনাদের উপরে আঘোপ করিতে লাগিল। যাহারা পাঁচ বৎসরের মধ্যে একটা সাম্রাজ্য জয় করিল, সেই সিপাহীদিগের মনোভাব পেশাদার সৈনিকের মনোভাব ছিল। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যেমন একদিকে তাহারা দানীদাওয়া করিতে লাগিল, আবার এই যুদ্ধজয়েই তাহারা ভীত হইয়া উঠিল। এই পেশাদার সৈন্ত যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল; তাহাদের প্রতিও কি বিজয়ের জয়-যাবহার করা হইবে না? যে বঙ্গ-সৈন্তের অধিকাংশ লোক অধোদা হইতে সংগৃহীত, অধোদাকে ইংরেজ-অধিকার-ভুক্ত করা তাহাদের অভিমত ছিল না। সিপাহীরা অগ্রাঙ্গ প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিকে বশীভূত করিবার জন্য ইংরেজকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক ছিল কিন্তু স্বজাতিকে বশীভূত করিবার জন্য সাহায্য করিতে ইচ্ছুক ছিল না। তাহাদের ধর্ম, তাহাদের জাত, তাহাদের প্রাণাদিও উচ্ছেদ করিবার জন্য তাহাদিগকে বাধ্য করা হইবে না কি? অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও রাজপুতই বঙ্গসৈন্তের অস্ত্রভুক্ত ছিল। এই সমস্ত কারণে তাহারা ভীত হইয়া

উত্তীর্ণ। উহাদিগকে ব্রহ্মদেশে পাঠান হইল ; কিন্তু হিন্দুধর্মে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ। উহাদিগকে নানা প্রকার পাক্তদানগ্রী, বুদ্ধোপকরণ, ও আসবাবপত্র দেওয়া হইয়াছিল। একটু কিছু ভুল করিলেই, তাহাদের জাতি বাইবার সম্ভাবনা; তাহা হইলে তাহারা ইংলোকে জাতীয়কৃত হইবে এবং পরলোকেও নরকস্থ হইবে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মৈত্রমণ্ডলী নৃতন এক প্রকার বন্দুক প্রাপ্ত হইল। গরু ও শূকরের চর্নির মাখানো এই বন্দুকের টোটা শুণা দমনদের কারখানা হইতে বাহির হয়। হিন্দুদিগের নিকট গরু মারামা এবং মুসলমানদিগের নিকট শূকরের মাংস অপ্স্রুত। সিপাহীরা এই ভুল ব্যুত্রে পারিল এবং প্রতিবাদ করিল। উহার বদলে অস্ত্র টোটা দেওয়া হইল। কিন্তু সিপাহীদিগের মন হইতে সন্দেহ দূর হইল না; সকল প্রমাণের বিরুদ্ধে উহারা বলিতে লাগিল, অপ্স্রুত সামগ্রীর দ্বারা ঐ টোটার কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে। নৃতন বন্দুক উহাদের হাতে দিবার অস্ত্র তখন উহাদের প্রতি কঠোর শাসন আবশ্যক হইল।

এইরূপ ভুল বুঝা তখন অপরিহার্য ছিল। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই দুই বিপ্লব সমাজের মধ্যে কখনই মিলন ঘটান বাইতে পারে না। তাহাড়া মৈত্রমণ্ডলীর গঠন-প্রণালীর দ্বারা এই আন্দোলনটা বেনীদীন টিকিয়া ছিল।

দেশীয় সৈন্তের সংখ্যা পূর্বই বেশী ছিল;

ইংরেজ-সৈন্ত ৫৫,৩২২; আর দেশীয় সৈন্ত ২৩৩,০০০।

মৈত্রমণ্ডলীর প্রণালীতেও একটু দোষ ছিল। সিপাহীরা সামরিক জাতিসমূহের অস্বভূত ছিল। কি হিন্দু, কি মুসলমান—উহারা স্বকীয় পুত্রদিগকে মৈত্রমণ্ডলী করিয়া অস্ত্র দাবী করিত। ঐ সকল সামরিক জাতির বহিষ্কৃত কোন, দোক, মৈত্রমণ্ডলী প্রবেশ করিতে সাহস করিত না; পাছে তাহারা সাধরে গৃহীত না হয়, ইহাই তাহাদের আশঙ্কা ছিল। স্বাধীনভাবে মৈত্র সংগ্রহের কাঙ্ক্ষা বাহারা অনন্তর করিয়া তুলিয়াছিল, সেই সিপাহীরা কোম্পানীকে কোন প্রকারে দক্ষা করিবে বলিয়া সংকল্প করিয়াছিল। কোম্পানীও তাহাদের মনে এই ভাবটি উদ্ভেদ করিবার অস্ত্র সর্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেন। এমন কোন বিশেষ অধিকার ছিল না বাহা কোম্পানী তাহাদিগকে প্রদান করেন নাই। এমন কোন অস্ত্রগ্রহ ছিল না বাহা তাহারা স্বকীয় ইংরেজ-মৈত্রাধ্যক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইত না। ইংরেজ মৈত্রাধ্যক্ষদিগেরও বিশ্বাস ছিল, সিপাহীরা তাহাদের একান্ত অস্বভূত। তাপাশি মৌখিক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সিপাহীরা তাহাদের নেতাদিগকে আবদো ভাল বাসিত না। জবাবার, হাবলদার প্রভৃতি দেশীয় মৈত্র-নাথকদিগকে ইংরেজ মৈত্রাধ্যক্ষের অধস্তা করিত। যে সকল ইংরেজ মৈত্রাধ্যক্ষ দেশীয় ভাষা ভাল জানিতেন, তাহারা মৈত্রিকবৃত্তি ছাড়িয়া শাসনবিভাগের কোন পদ গ্রহণ করিয়া স্বকীয় উন্নতির চেষ্টা করিতেন। সর্ভ

ডালহৌসি কর্তৃক যে সকল প্রদেয় বিজিত হইয়াছিল, সেই সকল প্রদেশের শাসনকার্য্য নির্বাহের জন্য কতকগুলি নতুন কর্মচারী আবশ্যক হইয়াছিল।

∴

এইরূপে, অশান্তির যে সকল কারণ রাষ্ট্রের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিল, তৎসমস্তই পুনর্বার শৈস্তমত্তগামী মধ্যে প্রকাশ পাইল। অনেকবার ভারতে সিপাহিবিদ্রোহ উপস্থিত

হয়। এই ভারতীয় শৈস্তমত্তকে দমন করা হইতে হইয়াছে, নয় ইংরেজ শৈস্তমত্তের দ্বারা উর্দূদিগকে একেবারে নিশ্চেষ্ট করা—এই দুয়ের মধ্যে একটা কথা আবশ্যক হইয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে, নিয়মশাসন ও যন্ত্রতার দ্বারা সমস্ত শৈস্তমত্তগামী হইতে অত্যাধিক হইয়াছিল। এই সময়ে শৈস্তমত্তগামী বিদ্রোহের পতাকা ধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। (১)

খ্রিষ্টোত্তরীয়শস্ত্রনাথ ঠাকুর।

∴

নালক

৬

আবার সেই বর্ধনের বন, সেই বট গাছের তলা! গাছের নীচে দেবল-অবি আর সম্যাসীর দল আগুনের চারিদিকে ঘিরে বসেছেন, আগুনের ভেঁজে সম্যাসীদের হাতের ত্রিশূল ঝক্-ঝক্ করছে। নিবিড় বন। চারিদিকে কাঁপল অন্ধকার, কিছু আর দেখা যায় না, কেবল গোছা গোছা অশথ-পাতার, মোটা মোটা গাছের শিকড়ে আর সম্যাসীদের জটীর, তপ্ত সোনার মত রক্তা আলো ঝিক্ ঝিক্ করছে—এবন বাগানের বিদ্যুৎ।

এই অন্ধকারে নালক চুপটি করে আবার ধ্যান করছে। মাথার উপরে

নীলাবরী আকাশ, বনের তলার দ্বির অন্ধকার। কোনো দিকে কোনো সাড়া নেই, কাণে মূগ্ধ কোনো কথা নেই; কেবল এক একবার দেবল-অবি বসুছেন—তারপরে? আর নালকের চোখের সামনে ছবি আসছে আর সে গেলে যাচ্ছে :—

হায়া শুদ্ধোদন, বৃদ্ধদেবকে কোলে নিয়ে হরিণের ছাল-চাকা গজদন্তের শিংহাসনে বসেছেন, রাজার দুই পাশে চার চার গণ্যকার, রাজার ঠিক সামনে কোমের আগুন, ওদিকে গোতমী মা, তাঁর চারিদিকে ধান-দুর্গা, শাঁক-বটী, ফুল-চন্দন, ধূপ-ধুনো।

পূজো

(২) সিপাহী-বিদ্রোহের তাকিকা নিয়ে দেওয়া বাইতেছে :—

কলোরে (মাসাজের এক প্রদেশ) (১৮৩৩)। ব্যারাকপুরে (লাট সাহেবের পল্লীনিবাস) (১৮২৩)। পট্টাব শৈস্তমত্তগামী দুই রেজিমেন্টে (১৮৪২)। যে দুর্গ, অদুতসরকে কখনো রাখে সেই গোবিন্দগড়ে (১৮৪০)। এক রেজিমেন্ট ব্রহ্মদেশে যাত্রা করিতে অধীকার করে (১৮৪২)। ইত্যাদি।

বল্ছেন—রাজপুত্রের নাম হলো কি ?
 জ্ঞানপেরা বল্ছেন—এই রাজকুমার চ'ত্রে
 পুথিবীর লোক বহু অর্থ, বহু সিদ্ধি
 লাভ করবে—সেইজন্য এর নাম রাইলো
 সিদ্ধার্থ। রাজা হলে এই রাজকুমার জীবনে
 সকল অর্থ আর রাজ্য না হলে বুদ্ধত্ব
 লাভ কোরে অগত্যা কৃতার্থ করবেন
 আর মরণের পরে নির্বাণ পেয়ে
 নিজেও চরিতার্থ হবেন—সেইজন্যে এর
 নাম হল সিদ্ধার্থ।

রাজা বল্ছেন, কুমার সিদ্ধার্থ রাজা হয়ে
 রাজত্ব করবেন, কি রাজ্য ছেড়ে বনে গিয়ে
 বৃদ্ধ পাবার জন্যে তপস্বী করবেন—সেই
 কথা আপনারা হির কোরে বলুন।

রাজার আট গণকর খড়ি পেতে গগনা
 কোরে বল্ছেন। প্রথম—শ্রীরাম অচাৰ্য্য,
 তিনি রাজাকে দুই আঙুল দেখিয়ে
 বল্ছেন—বহুরাজ, ইনি রাজাও হোতে
 পারেন, সন্ন্যাসীও হোতে পারেন, ঠিক
 বলা কঠিন, দুদিকেই সমান টান দেখছি।
 রামের ভাই লক্ষ্মণ অর্ধনি দুই চোখ বুজে
 বল্ছেন—দাদা বা বল্ছেন সেই ঠিক।
 অরুণজ দুই হাত ঘুরিয়ে বল্ছেন—
 হাঁও বটে, নাও বটে। ঐমতিন্ দুদিকেই
 বাড় নেড়ে বল্ছেন—আমায়ও ওই কথা।
 ভোজ দুই চোখ পাকুল কোরে বল্ছেন
 —এটাও দেখছি ওটাও দেখছি। শ্রদ্ধান্ত
 বল্ছেন ভাইনে বাঁয়ে বাড় নেড়ে
 —এদিকও দেখলম, ওদিকও দেখলম।
 হরভের ভাই অধাম দুই নাকে নজ
 টেনে বল্ছেন—দাদার দিক্‌টাই ঠিক
 দেখছি। কেবল সবার ছোট অঞ্চল নিজের

সকলের বড় কোত্তর এক আঙুল রাজার
 দিকে দেখিয়ে বল্ছেন—মহারাজ এদিক কি
 ওদিক, এটা কি ওটা নয়,—এই রাজকুমার
 বুদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোনো দিকেই
 যাবেন না হির নিষ্ঠুর। ইনি কিছুতেই ঘরে
 থাকবেন না। যেদিন এর চোখে এক
 অরাজকীয় বুদ্ধ মাহুব, ভোগশীর্ণ দুঃখী মাহুব,
 একটি মরা মাহুব, আর এক সন্ন্যাসী
 ভিক্ষারী পড়বে, সেদিন আপনার সোনার
 সংসার অন্ধকার কোরে কুমার সিদ্ধার্থ
 চলে যাবেন,—সোনার শিকল কেটে পাবী
 যেমন উড়ে যায়।

সন্ন্যাসীর বল হবার দিগে উঠে পাড়ালেন।
 নালক চোরে দেখে সকল হয়েছে।

৭

আর কিছু দেখা যায় না। সেদিন
 থেকে নালক যখন ঘান করে তখন
 দেখে স্বর্গের আলোয় আশ্বিনের মত অন্ধ
 বন্ধ করছে—আকাশের নীল ঢোকে, বাতাসের
 চলা বন্ধ করে—সোনার ইটে বাধানো
 প্রচণ্ড প্রকাণ্ড এক সোনার দেওয়াল।
 তার শেষ নাই, আরম্ভও দেখা যায় না।
 নালকের মন-পাবী উড়ে উড়ে চলে আর
 সেই দেওয়ালে বাধা পেয়ে কিয়ে কিয়ে
 আসে। এমনি করে দিনের পর দিন,
 মাসের পর মাস, বছরের পর বছর
 কাটিছে। সোনার দেওয়ালের ওপারে
 রয়েছেন সিদ্ধার্থ আর এশ্বরের রয়েছেন
 নালক ;—বেন খাচার পাবী আর বনের
 পাবী।

হেলে পাছে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায়
 সেই ভয়ে রাজা শুদ্ধোদন সোনার

যখন দিবে, হাসি আর ঝাঁপি, আঘোদ আর আঘোদেব, মায়া দিবে সিদ্ধার্থকে বন্ধ রেখেছেন—সোনার পাঁচা পানোটির মত। যখন গরমের দিনে ঘোলের তেজ বাড়ে, জল শুকিয়ে যায়, তখন বাতাসে চারিদিক যেন জ্বলতে থাকে; বর্ষার যখন নতুন মেঘ দেখা দেয়, জলের ধারার পুসিবি ভেঙ্গে যায়, নদীতে স্রোত বাড়ে; শরতে আকাশ যখন নীল হয়ে ওঠে, সাদা মেঘ পাঠলা হাওয়ায় উড়ে চলে, নদীর জল সরে গিয়ে বালির চড়া বেগে ওঠে; ঈতে যখন বরফে আর ক্রমাগত চারিদিকে ঢাকা পড়ে, পাতা খসে যায়, ফুল ঝরে যায়, আবাস বসন্তে যখন ফুলে ফুলে পৃথিবী ছেঁয়ে যায় গন্ধে আকাশ ভরে ওঠে, দখিনে বাতাসে চাঁদের আলোর পানীর গানে আনন্দ ফুটে ফুটে পড়তে থাকে—তখন ষাঁচের পাখীর মন যেমন কবে, সোনার বেগুলায়ে ঘেরা রাজমন্দিরে বুদ্ধদেবের মন তেমনি করে—এই সোনার ষাঁচা ভেঙে বাইরে আসতে। তিনি যেন শোনেন—সমস্ত জগৎ, সারা পৃথিবী গরমের দিনে বাদলা রাতে শরতের লক্ষ্যায় ঈতের লক্ষ্যায় বসন্তের পহরে পহরে কখনো কোকিলের হুহু কখনো বাতাসের হু হু কখনো বা বিষ্টির ঝর ঝর ঈতের খর খর পাতার মর্দর দিয়ে কঁপে কঁপে মিনতি করে তাঁকে ডাকছে—বাহিরে এল, বাহিরে এল, নিস্তার কর, নিস্তার কর, ত্রিভুবনে হুংখের আগুন জলছে, মরণের আগুন জলছে, শোকে ভাপে জীবন শুকিয়ে যাচ্ছে, দেখো চোখের জলে বুক ভেসে গেল, হুংখের বান মনের বাঁধ ধরিয়ে দিয়ে গেল,

আনন্দ,—সে তো আকাশের বিজ্ঞানের মত, এই আছে এই নেই, হুং—সে তো শরতের মেঘের মত, ভেসে যায়, থাকে না, জীবন—সে তো ঈতের শিশিরে শিউলি ফুলের মত ঝরে পড়ে, বসন্তকাল হুংখের কাল দে ত চিরদিন থাকে না; বাহিরে সারা পৃথিবীতে হুংখের আগুন মরণের চিত্তা দিনরাত্রি জলছে, সে আগুন, কে নেবার? পৃথিবী থেকে তরকে দূর করে এমন আর কে আছে—তুমি ছাড়া? মাটির আর ফুলে থেকে না, ফুলের ফাঁস ছিঁড়ে ফেল, বাহিরে এল,—নিস্তার কর! জীবকে অস্তর দাও!

নালকের আগ, সারা পৃথিবীর শোকে আগ, আকাশের আগ, পাতাসের আগ বুদ্ধদেবকে দেপবার জন্য আকুল-ব্যাকুল করেছে। তাদের মনের হুংখ কখন বিষ্টির মত ঝবে পড়ছে, কখন ঝড়ের মত এলে সোনার বেগুলায়ে দাক্তা দিচ্ছে। অলো হয়ে ডাকছে—এলো! অন্ধকার হয়ে বলছে—নিস্তার কর! রাজা হুং হয়ে ফুটে উঠছে, আবাস তুক্‌নো পাতা হয়ে ঝরে পড়ছে—সিদ্ধার্থের চারিদিকে চোখের সামনে জগৎ-সংসারের হাসি-কান্না জীবন-মরণ রাতে দিনে মাসে মাসে বছরে-বছরে নানা ভাবে নানা দিকে।

একদিন তিনি দেখেছেন—নীল আকাশের গায়ে পারিজাত ফুলের মাটির মত একদল হাঁস সারি বেঁধে উড়ে চলেছে—সে তাদের আনন্দ! হাজার হাজার ডানা একসঙ্গে তালে তালে উঠছে পড়ছে, একহুং হাজার হাঁস ডেকে চলেছে—চল, চল, চল, চল।

আকাশ তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়েছে।
 মেঘ চলছে সাঝা পাশ তুলে, বাতাস
 চলছে মেঘের পর মেঘ ঠেলে, পৃথিবী
 তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে। নদী
 চলছে সমুদ্রের দিকে, সমুদ্র আসছে
 নদীর দিকে—পাহাড় ভেঙে বালি ঠেলে।
 আনন্দে এত চলা এত বলা এত খেলার
 মাঝে কার হাতের তীর বিদ্যুতের মত
 গিয়ে একটি হাঁপের ডানায় বিধলো, অমনি
 যন্ত্রণার চীৎকারে দশদিক শিউরে উঠল।
 যন্ত্রের ছিটের সকল গা ভাসিয়ে দিয়ে
 ছিঁড়া মাংসের ফুলের মত তাঁর পারের
 কাছে লুটের পড়ল—তীরে বেঁধা রাজহংস!
 কোথায় গেল তার এত আনন্দ, সেই
 বাতাস দিয়ে ভৈসে চলা, নৌল আকাশে
 ডেকে চলা! এক-নিমেষে সুরিয়ে গেল
 পৃথিবীর সব আনন্দ, সব প্রাণ! আকাশ
 খালি হয়ে গেল, বাতাসের চলা বন্ধ
 হয়ে গেল; সব বলা সব চলা সব খেলা
 শেষ হয়ে গেল—একটি তীরের বা শেষে!
 কেবল দূর থেকে—অনেক দূর থেকে
 —সিঁড়ারের কানের কাছে, প্রাণের কাছে
 বাজতে লাগল—কান্না আর কান্না! বুক
 কেটে কান্না! থেকে থেকে কান্না, গুম্বরে
 গুম্বরে রয়ে রয়ে কান্না! দিনে রাত,
 বেতে আশ্রিত, চলতে ফিরতে স্রবের
 মাঝে শান্তির মাঝে কানে কর্ণে আঘাতে
 আত্মলাদে তিনি গুম্বরে থাকলেন—কান্না আর
 কান্না! অগ্ন-কোড়া কান্না! ছোট ছোট
 তাদের কান্না, বড় বড় তাদেরও কান্না।

দিনরাত্রি জমাপত বড়ুস্বস্তি অন্ধকারের
 পরে সেদিন মেঘ কেটে গিয়ে সকালের

আলো পূর্ণদিকে দেখা দিয়েছে, আকাশ আজ
 আনন্দে হাসছে, বাতাস আনন্দে সুইছে,
 মেঘের গায়ে গায়ে মধুশিলা আলো পড়েছে,
 বনে বনে পাখীর, প্রাণে প্রাণে চাখীর, ঘরে
 ঘরে ছেলেরা মেয়েরা আজ মধুমঙ্গল গান
 গাইছে। পূবের দরজার দাঁড়িয়ে সিঁদার
 দেখছেন, কান্না বেন কোথাও চাপ নেই,
 কান্না নেই! বস্তুর দেখা ঘর বস্ত্রখানি
 গোনা ঘর সবলি আনন্দ। বাঁঠের মাঝে
 আনন্দ, সবুজ হয়ে দেখা দিয়েছে; বনে
 উলবনে আনন্দ ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে; ঘরে
 ঘরে আনন্দ—ছেলেমেয়ের হাসিমুখে
 রঙিন কাপড়ে নতুন খেলনার ঝিক্‌ঝিক্‌
 করছে, মৃদুমৃদ বাজছে; আনন্দ—পুষ্পবৃষ্টি
 হয়ে ঝবে পড়ছে—সত্য থেকে পাতা থেকে;
 আনন্দ—সে সোনার ধূলা হয়ে উড়ে চলেছে
 পথে পথে—বেন আবার গেল।

সিঁড়ারের হনোরাথ সিঁড়ারের সোনার
 রথ আজ আনন্দের মাঝ দিয়ে
 পূবের পথ ঘরে সকালের আলোর
 দিকে অন্ধকারের শেষের দিকে এগিয়ে
 চলেছে—আন্তে আন্তে। মনে হচ্ছে—পৃথিবীতে
 আজ বেন হুঃখ নেই, শোক নেই, কান্না
 নেই;—রয়েছে কেবল আনন্দ, ঘূমের পরে
 আগে গঠার আনন্দ, অন্ধকারের পরে আলো
 পাওয়ার আনন্দ, ফুলের মত ফুটে গঠা,
 মাংসের মত ফুলে গঠা, গানে গানে বাস্তব
 তানে জেগে গঠার আনন্দ। পৃথিবীতে কিছু
 বেন আজ বড় পড়ছে না, কূলের মরছে
 না। এমন সময় সকালের এত আলো
 এত আনন্দ ঝড়ের মূখে বেন প্রাণীপের
 মত নিতিয়ে দিয়ে সিঁড়ারের রথের আগে

কে জানে কোথা থেকে এসে দাঁড়াল—
অস্ত্রহীন দস্ত্রহীন একটা বুড়ো দাছপা—লাঠিতে
ভর দিয়ে। তার গায়ে একটু বাগল নেই,
কেবল ক'খানা হাড়! বয়েসের ভারে সে
কুঁজে হয়ে পড়েছে, তার হাত কাঁপছে, পা
কাঁপছে, খাঁড় কাঁপছে, কথা বলতে কথাও
তার কঁপে যাচ্ছে। চোখে সে কিছু দেখতে
পাচ্ছে না, কানে সে কিছু শুনেতে পাচ্ছে
না;—কেবল দুখানা পোড়া কাঠের মত
গোঁগা হাত সামনে বাড়িয়ে সে আলোর দিক
থেকে অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছে—শুষ্টি
শুষ্টি, একা! তার শক্তি নেই সামর্থ্য নেই,
তার আনন্দ নেই আশ্রয় নেই, নেই তার
একটি আপনার লোক, নেই তার সংসারের
ছেলে মেয়ে বন্ধুস্বজন—সব মরে গেছে
সব করে গেছে—জীবনের সব রস রস তুকিয়ে
গেছে,—সব খেলা শেষ করে। আলো
তার চোখে এখন চুপ দেয়, সুর তার
কানে বেহরো বাজে, আনন্দ তার কাছ
নিরানন্দ ঠেকে। সে নিজের চারিদিকে
অনেকখানি অন্ধকার, অনেক চুপ শোক
অনেক আলা বজ্রা! শতকুটি কাঁবার মত
জড়িয়ে নিজে চলে যাচ্ছে—একা, একদিকে
—আনন্দ থেকে দূরে, আলো থেকে দূরে।
এগি তার কাছ থেকে দূরে পালাচ্ছে; গান
তার সাড়া পেয়ে চুপ হয়ে যাচ্ছে, জুগ
তার এলোমেলো আগছে না, জুঙ্গল তাকে
দেখে ভয়ে দ্বিধা! সকালের আলোর
উপরে কালো ছায়া ফেলে অদভের
বিকট হাসি হেসে পিশাচের মত সেই
মৃষ্টি দিচ্ছাখের সামনে পথ আগলে বসে—
আমাকে দেখ, আমি জরা, আমার হাতে

কাবো নিস্তার নেই,—আমি সব তুকিয়ে
দিই, সব খরিয়ে দিই, সব ভবে নিই, সব লুটে
নি। আমাকে চিনে ত্যাপ হে রাজহুমায়!
তোমাকেও আমার হাতে একদিন পড়তে
হবে—রাজপুরে গেলে তুমি জরায় হাত থেকে
নিস্তার পাবে না! মশদিকে সে একবার
বিকট হাসি হেসে চোরে দেখলে অমনি
আকাশের আলো পৃথিবীর সবুজ তার
দৃষ্টিতে একনিমেষে মুছে গেল, ক্ষেত জলে
গেল, নদী তুকিয়ে গেল;—নতুন বা
কিছু পুরানো হয়ে গেল, টাটকা বা কিছু
বাসি হয়ে গেল। সিদ্ধার্থ দেখলেন
পাশ্চাত্য ধর্মের পড়ছে গাছ তেও পড়ছে
সব ধুলো হয়ে যাচ্ছে সব ভাঁড়ো
হয়ে যাচ্ছে—তার মাথ দিয়ে চলে যাচ্ছে
সাদা চুল বাতাসে উড়িয়ে, ছেঁড়া কাঁথা
মাটিতে লুটিয়ে, পারে পারে শুষ্টি শুষ্টি
অস্ত্রহীন দস্ত্রহীন বিকটমৃষ্টি জরা—সংসারের
সব আলো নিভিয়ে দিয়ে সব আনন্দ
দুঃখের দিয়ে সব ভবে নিয়ে সব লুটে নিয়ে
একলা চাঁদে হাড় কঁঠাল বাড়িয়ে।

আর একদিন সে সিদ্ধার্থের মনোরথ
সিদ্ধার্থের সোনার রূপ বৃদ্ধ মন বাতাসে ধ্বজা
পতাকা উড়িয়ে দিয়ে কপিলবাস্তুর দক্ষিণ-
দুঃস্বপ্ন দিয়ে আত্তে আত্তে বাস হয়েছ। মলয়
বাতাস কত জ্বলের গছ, কত চন্দনবনের
শুভল পরশে ঠাণ্ডা হয়ে গায়ে লাগছে—
সব ত্যাপ সব আলা জুড়িয়ে দিয়ে। ফুল-
ফুটানো মধুর বাতাস, আগ-জুড়ানো মধিন
বাতাস। কত দূরের মাঠে মাঠে রাখাল
ছেলের বাঁশির সুর, কত দূরের বনে বনে
পাপিয়ার পিউ গান, সেই বাতাসে, তেলে

আসছে—কানের কাছে আগের কাছে, সগাই
বাবু ধরেছে সবাই গেয়ে চলেছে খোলা
হাওয়ার মাঝে তারার আলোর নীচে—হুয়ার
খুলে, ঘর ছেড়ে! আকাশের উপরে ঠাণ্ডা
নীল আলো, পৃথিবীর উপরে ঠাণ্ডা আলো,
ছায়া তার মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে মুহূর্ত
মগ্ন বাতাস—হুয় হুয়ে দখিন বাতাস—জলে
বলে বনে উপবনে ঘরে বাড়িঘে হুখে
পর্শ দিয়ে আনন্দের বাঁশ্রি বাকিয়ে। সে
বাতাসে আনন্দে বুক ধলে উঠছে, মনের
পাল ভরে উঠছে;—মনোরথ আর ভেলে
চলেছে নেচে চলেছে—দুখের গবে হুখের
ঘাটে, সারি-গানের তালে তালে হুখ-
সাগরের ধির জলে। স্বপ্নে হুলের মত শুক
ভারতী আকাশ থেকে চেয়ে রয়েছে—পৃথিবীর
দিকে। হুখের আলো ঘরে পড়েছে হুখের
বাতাস ধীরে বইছে—পূণে পশ্চিমে উত্তরে
দক্ষিণে। মনে হচ্ছে—আজ অল্প বেন
দূরে পালিয়েছে অপোহান্তি বেন কোথাও
নেই, জগৎসংসারে সবই বেন সগাই বেন
আগাবে রয়েছে হুখে রয়েছে শান্তিতে
রয়েছে। এমন সময় আলোর পর্দা সরিয়ে
দিয়ে হুখের স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে লিডারের
চোখের সামনে ভেঙ্গে উঠল—একটা পাভাশ
মুষ্টি—জের জর্জর রোগে কাতর। সে দাঁড়াতে
পাচ্ছে না—বুয়ে পড়ছে। সে চলেতে পাচ্ছে
না—ধুলোর উপরে কাবার উপরে শুয়ে
রয়েছে। কখনো সে শীতে কাপছে—কখনো
বা গানের আশায় সে জল জল করে
চীৎকার করছে। তার সমস্ত গানের রক্ত
তার চোখ দুটো দিয়ে ঠিক্কে পড়ছে। সেই
চোখের দৃষ্টিতে আকাশ আঙনের মত রঙা

হয়ে উঠেছে। সমস্ত গানের রক্ত জল হয়ে
তার কাগজের মত পাভাশ হিম, অন্ধ গেরে
ঝরে পড়ছে। তাকে ছুঁয়ে বাতাস বরফের
মত হিম হয়ে বাচ্ছে। সে নিখাস টানছে
যেন সমস্ত পৃথিবীর আগুকে শুঁষ নিতে
চাচ্ছে। সে নিখাস ছাড়ছে যেন নিজে
ঐশ্বর্য নিজে আলাবত্তা সারা সংসারে
ছড়িয়ে দিয়ে বাচ্ছে। সিদ্ধার্থ দেখলেন, সংসারের
আলো নিতে গেছে, বাতাস যবে গেছে,
সব কথা সব গান চূপ হয়ে গেছে। কেবল
ধূলোকাণা-মাখা জরের সেই পাভাশ
মুষ্টির বৃকের ভিতর থেকে একটা শব্দ
আসছে—কে বেন পাথরের দেওয়ালে হাতুড়ি
পিটুচ্ছে—ধব্ধ ধব্ধ! তারি তালে তালে
আকাশের সগ তারি একবার নিভছে
একবার আসছে; বাতাস একবার আসছে
একবার বাচ্ছে।

জের সেই জীবন মুষ্টি দেখে
লিডার বয়ে এনেছেন, রাজ-ঐক্যের মাঝে
ফিরে এসেছেন, হুখসাগরের ঘাটে ফিরে
এনেছেন, কিন্তু তখনও তিনি গুন্ডেন
বেন তাঁর বৃকের ভিতরে পাথরের পাঁজর
ধাক্কা দিয়ে শব্দ উঠছে—ধব্ধ ধব্ধ।

এবার পশ্চিমের হুয়ার দিয়ে অস্তাচলের
পথ দিয়ে পশ্চিম মুখে মনোরথ চলেছে—
সোণার রথ চলেছে, বেদিকে দিন শেষ
হচ্ছে, বেদিকে স্বর্গের আলো জ্বলে বাচ্ছে।
সেদিক থেকে সবাই মুখ ফিরিয়ে চলে
আসছে নিজের নিজের ঘরের দিকে। পানীরা
ফিরে আসছে কলরব করে নিজের বাসার,
গাছের ডালে, পাতার আড়ালে। গাই সব
ফিরে আসছে মাঠের ধার দিয়ে নদীর

পার দিবে নিজের নিজের গোষ্ঠে, খেজুলির
 পোনান পুঁলা মেখে। রাখাল-ছেলেমা ফিরে
 আসেছে গাঁয়ের পথে বৈশু বাড়িরে মাটির
 ঘরে মায়ের কোলে। সবাই ফিরে আসছে
 ভিন্ গাঁয়ের হাট ঘেরে "দূর পাটনে পিক-
 কিনির পরে। সবাই ঘরে আসছে—যারা
 দূরে ছিল তারা, যারা কাছে ছিল তাগাও।
 ঘরের মাথার আকাশ পিদিম, ঘরের ঘর
 নেই "হুতোম নেই তাদের আলো ঘরেছে।
 তুলসী তলার হুগুগা পিদিম—যারা কাছে ছিল
 কর্মে ছিল, পড়া পড়ছিল, খেলা খেলছিল,
 তাদের সঙ্গে আলো ঘরেছে। সবাই আজ
 মায়ের দুই চোখের মত অনিমিত্ত হুট
 আলোর দিকে চেয়ে চেয়ে ফিরে আসছে
 —মায়ের কোলে জাইবোনের পাশে, বন্ধ
 বাক্যের মাঝখানে। তিথারী যে সেও আজ
 মনের আনন্দে একতারার আগমনী বাড়িরে
 গেয়ে চলেছে "এল মা ওমা ঘরে এল মা।"
 মিলনের নীচ ঘরে ঘরে বেজে উঠেছে।
 আগমনীর হ্রস্ব, ফিরে আসার হ্রস্ব, বুকে
 এসে কাঁপিয়ে পড়ার হ্রস্ব, কোলে এসে
 গলা-ধরার হ্রস্ব, আকাশ দিয়ে ছুটে আসছে
 বাতাস দিয়ে শ্বুটে আসছে খোলা হুতোমের
 উকি মাংছে। খালি ঘরে লাড়া দিচ্ছে শূন্য
 গ্রাণ খালি বুক ভরে উঠেছে আজ ফিরে-পাওয়া
 হ্রস্ব, বুক-পাওয়া হ্রস্ব, ছায়াবিধি খুঁজে
 পাওয়া হ্রস্ব। সিদ্ধার্থ দেখছেন হ্রস্বের
 আজ কোথাও অভাব নেই, আনন্দের
 মাঝে এমন একটু ফাঁক নেই দেখান
 দিয়ে হুগু আজ আসতে পারে, ভরা নদীর মত
 ভরপুর আনন্দ, পূর্ণিবার চাঁদের মত পরি-
 পূর্ণ আনন্দ জগৎসংসার আগোর ভাসিয়ে

রপে ভবে দিয়েছে। আনন্দের বান এগেছে।
 আর তাকাতে কিছু শুকনো নেই, কোনো
 ঠাই খালি নেই। সিদ্ধার্থ দেখতে দেখতে
 চলেছেন, মিলনের আনন্দ। কাকে কাকে
 দলে দলে- আনন্দ আজ জোর করে
 দোর ঠেলে বুকে কাঁপিয়ে পড়ছে, গলা
 জড়িয়ে ধরছে;—কেউ আর কাউকে জুলে
 থাকছে না ছেড়ে থাকছে না ছেড়ে যাচ্ছে না
 ছেড়ে বিচ্ছেদ না! আনন্দ কার নেই,
 আনন্দ নেই কোনখানে! কে আজ
 হুগুগা হুগুগা, চোখের জল কে কেদেছে,
 মূগু শুকিয়ে কে বেড়াচ্ছে? যেন তাঁর
 কপাল উত্তর দিয়ে কোন্ এক ভাঙা
 মন্দিরের "কাটা কীলরে খণ্ খণ্
 করে তিনবার বা পড়ল—আছে—আছে
 হুগু আছে! অবনি সমস্ত সংসারের ঘুর
 যেন থাকে দিগে জাগিয়ে দিগে একটা বুলকাটা
 কারি উঠল—চায় চায় হাগ। আকাশ
 ফাটিয়ে গে কারা, বাতাস চিবে সে কারা
 বুকের ভিতরে বজ্রি নাড়ি ঘরে যেন
 টান্ দিতে থাকল—দেঁ কারা। সিদ্ধার্থ
 হ্রস্বের বদল থেকে যেন হঠাৎ জেগে উঠলেন।
 আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন, সব কটি
 তারার আলো যেন মরা-মাছের চোখের
 মত খোলা হয়ে গেছে। পৃথিবীর দিকে
 চেয়ে দেখলেন রাত আড়াই-পহরে জলে
 স্থলে পাণ্ডা কুরাশীর জাল পড়ে আসছে,
 কে যেন সাধা একখানা চাঁদের পৃথিবীর
 মূগু ঢেকে আত্তে আত্তে টেনে দিচ্ছে।
 ঘরে ঘরে যত পিদিম জলছিল সবগুলো
 জলতে নিভতে, নিভতে জলতে, হঠাৎ এক
 সময় মগ্ন করে নিভে গেল, আর জ্বলো না,

কোথায় আর আলো রইল না। কিছু
আব লাড়া দিচ্ছে না শব্দ করছে না—
আকাশের আখ্যানা জুড়ে জলে-তরা
কালো মেঘ, কানো-কানো ছায়া চোখের
পাতার মত স্তরে পড়ছে। চোখের জলের
মত বিটবিট এক একটা কোঁটা ঝরে পড়ছে,
—আকাশ থেকে পৃথিবীর উপর, তারি মাঝ
দিয়ে বুড়বেব দেখছেন মনে মনে লোক
চলেছে সাবা চানবে ঢাকা হাজার হাজার
মরা-মাহুদ কীবে নিয়ে কোলে করে
বুকে ধরে। তাবের পা মাটিতে পড়ছে
কিন্তু কোনো শব্দ করছে না, তাবের বুক
হুগে হুগে উঠছে বুকফাটা কান্নাদ, কিন্তু
কোন কথা তাবের মূণ দিয়ে বার হচ্ছে
না! নিদ্রা পায়—বেগিকে স্বর্গা ভোনে
বেগিকে আলো নেভে দিন কুরিয়ে যায়,
সেই বিকে দুই উদাস চোখ বেখে হনু
হনু করে তারা এগিরে চলেছে মহানন্দার
ঘাটের মুখে মুখে, দূরে দূরে, অনেক দূরে,
যর থেকে অনেক দূরে, বুকের কাছ
থেকে কোলের কাছ থেকে অনেক দূরে,
যরে আসা কিরে আসা বুকে আসা কোলে
আসার পথ থেকে অনেক দূরে—চলে
যাবার পথে ছেড়ে যাবার পথে কলে
যাবার কীদিয়ে যাবার পথে।

এপারে ওপারে মরণের কান্না আর
চিঠির আঙুন, মাঝ দিয়ে চলে যাবার

পথ—কঁধে চলে যাবার পথ, কীদিয়ে চলে
যাবার পথ। থেকে থেকে গরুর নিখালের
মত এক একটা দম্কা বাতাসে মাশি
মাশি ছাই উড়ে দেই মরণ-পথের বত
যাত্রীর, আশান-ঘাটের বত যাত্রীর মূণে
লাগছে, গোণে লাগছে! সিদ্ধার্থ দেখছেন,
ছাই উড়ে এসে মাথার চুল সাবা করে
বিচ্ছে, গায়ের বরণ পাড়াস করে
দিচ্ছে! ছাই উড়ছে—সব-আলানো সব-
প্রোড়ানো গবম ছাই! আঙুন নিভে
ছাই হয়ে উড়ে চলেছে, আলো নিভে ছাই
হয়ে উড়ে চলেছে, জীবন ছাই হয়ে উড়ছে
চলেছে, মরণ সেও ছাই হয়ে উড়ে
চলেছে। মূণ ছাই হয়ে উড়ে যাচ্ছে, চঃখু
ছাই হয়ে উড়ে যাচ্ছে, সংসারের বা কিছু
বত কিছু সব ছাই-ভস্ম হয়ে উড়ে চলেছে
—দূরে দূরে, মাথার উপরে ঘোণা আকাশ
দিয়ে পাড়াস একখানা মেঘের মত। তারি
তলায় বুড়বেব দেখলেন—মরা ছেলেকে
দুই হাতে তুলে ধরে এক মা একদৃষ্টিতে
তার দিকে চেয়ে আছেন;—বাতাস চারি-
দিকে কঁধে বেড়াচ্ছে হার হার হার রে
হার। সেদিন বরে এসে সিদ্ধার্থ দেখলেন
তার সোনার পুষ্পপাত্রে ফুটন্ত পদ্ম ফুলটির
জারগার রয়েছে—একমুঠো ছাই আর মরা-
মাহুদের আখপোড়া একখানা বুকের হাড়।

(জন্ম)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কক্সিয় নামের প্রকৃত রহস্য

কক্সিয় নামটি আমাদের নিকট^{*} বৈষ্ণব
সুপরিচিত ইহার অর্থ তেমন স্পষ্ট নহে।
সেই এক কক্সিয় নামের প্রকৃত রহস্য
উদ্ঘাটনের নিমিত্ত আমরা এইস্থলে আলো-
চনা প্রবৃত্ত হইতেছি।

কক্সিয় নামের সহিত আমরা বলবীর্যেরই
সাধারণতঃ সংযোগ দেখিতে পাই, কিন্তু
অনুসন্ধানের দ্বারা বলবীর্য অপেক্ষাও মূহুর্ত
কক্সিয় নামের সুস্থিত সংযুক্ত থাকার
প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হই।

ভারতীয় আর্থাভিগের জাতিভেদ উৎপত্তির
মূল রহস্য কৰ্ম বলিয়াই শাস্ত্র-নির্দেশ হইতে
জানিতে পারা যায় যথা “কৰ্মভির্জগতাং
গতঃ।” ইহা হইতেই অনেক ভারতীয়
জাতিভেদের অর্থ “কৰ্মবিতাগ” (distribu-
tion of work) করিয়া থাকেন। সুতরাং
কক্সিয় জাতির আদি পুরুষদিগের মধ্যে
প্রথম কৰ্মের ইতিহাস অনুসরণ করিলে
আমরা তাহাদিগের জাতীয় নাম সম্বন্ধে
জ্ঞাত্য লাভের আশা করিতে পারি।
এই একাধারে বৈষ্ণবধর্মের চর্চা ও অনুষ্ঠান
রূপ কৰ্ম দ্বারা, ব্রাহ্মণ জাতির নাম
বৈষ্ণব “ঐক” নামানুসারে “ব্রাহ্মণ” হইয়াছে।

বেদে আর্থাভিগের পুরোহিত ও রাজা
এই দুই একাধারে কার্যই বিশেষ ভাবে
লক্ষ্যের দেনা যায়। পুরোহিত বহুকার্য
ও ক্ষেত্র দ্বারা বহুমান রাজার হিতকামনা
করিতেছেন এবং বহুমান রাজা ব্যতীত

দ্বারা শত্রুর উপর বিজয়সাধন করিয়া
আর্থাভিগের বিস্তার করিতেছেন। ইহাতে
পুরোহিতের ক্ষেত্র বা ‘ব্রহ্ম’ হইতেই
পুরোহিতের সম্প্রদায় ‘ব্রাহ্মণ’ নামে আর্থা
ভিগের বহুত্ব শাখারূপে পরিগণিত হইতে
লাগিলেন। এই একাধারে পুরোহিত ও
রাজারূপে আর্থাভিগের মধ্যে প্রথম জাতি-
ভেদের সূচনা হইল।

পূর্বোক্তরূপে কার্যবিভাগ নির্দিষ্ট হওয়ার
পূর্বে যে স্ববিধে একাধারেই পুরোহিত ও
রাজা[†] ছিলেন তাহাই অনুমান করা বাইতে
পারে। মত, বিখ্যাত ঐচ্ছিক আদর্শ
এইরূপ অবস্থাই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে
পারি।

আদিতে একাধারে সম্মিলিত পুরোহিত
ও রাজার কর্তব্য ব্যবচ্ছেদের দ্বারা যে
পুরোহিত সম্প্রদায় ও রাজ সম্প্রদায়ের
উৎপত্তি হয় এবং ইহারাই যে ব্রাহ্মণ ও
কক্সিয় জাতির মূল আদর্শ, পাল্লাম্বা
পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তৎসম্বন্ধে পরিষ্কার
মতই প্রকাশ করিয়াছেন :—

“The king and “purohita,” originally
holders of a joint office,” stood apart
and separate in their functions both a
type of the class or caste division into
nobles and priests of those who held
power over the labouring Community”[†]
Literary History of India by R. W. Frazer
L. L. B.

* Frazer, “Golden Bough,” Vol. I P 224.

† Senart, Castes dans l’Inde,” p 149

“রাজ্য ও তাহার পুরোহিতের কর্তব্য” আদিত
সম্মিলিত ছিল—কিন্তু এক্ষণে ইহার পৃথক হইল
ও উভয়ই সমগ্র ও পুরোহিত শ্রেণী বা জাতির
আধার হইল। ইহার প্রমত্তাধিকারের উপর কর্তব্য
করিতে লাগিল।”

বলা বাহুল্য এখানে সমগ্র ও পুরোহিত
শ্রেণীর দ্বারা ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ উদ্ভিষ্ট
হইয়াছে এবং প্রমত্তাধিকারী শ্রেণী দ্বারা নৈশ্রম্যগণ
উদ্ভিষ্ট হইয়াছে।

ইহা হইতে রাজসম্প্রদায়কে যে ক্ষত্রিয়
জাতির প্রকৃত মূল তাহাষ্ট আত্মনা সিদ্ধান্ত
করিতে পারি। বেদের সুপ্রসিদ্ধ পুঁজব
মুক্তে যে ‘ক্ষত্রিয়’ শব্দেব পরিণীত “রাজ্য”
শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাও বিশেষ-
রূপে আনন্দেব বক্তব্যেরই সমর্থন করে।
‘রাজ্য’ শব্দটি ‘রাজন্’ শব্দের উত্তর ‘ব’
প্রত্যয় করিয়াই সিদ্ধ হয়। ইহার প্রকৃতি-
গত অর্থ ‘রাজার সম্ভূতি’, ‘সুতরাং’
‘রাজার জাতি’ ইহাষ্ট রাজ্য শব্দের অর্থ
হইতেছে। এষ্ট রাজার জাতি, বিশেষরূপে
বল বা ‘ক্ষত্রের’ অধিকারী বলিয়াই ‘ক্ষত্রিয়’
নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এষ্টরূপেই
‘রাজ্য’ ও ‘ক্ষত্রিয়’ একার্থবাচক হইয়াছে।

রাজ্য হইতেই যে ‘রাজ্য’রূপ ক্ষত্রিয়
জাতি-বাচক নামের উৎপত্তি হইয়াছে—
অপর্যায়ের একটী স্থল হইতে তাহার
বিশেষ প্রমাণই পাওয়া যায় যথা :—

“প্রিয়ঃ সাক্ষু বেবেসু সাক্ষু প্রিয়ঃ রাজস্ব সাক্ষু।

প্রিয়ঃ সাক্ষু পতন্ত উতপুত উত আবে।”

অপর্যায় বেদসংহিতা—১২ম অধ্যায় ৬২।০

এখানে দেখ যে “ব্রাহ্মণ” বুঝাইতেছে
তাঁহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং
উক্ত স্থানের অর্থবাদ এইরূপ হইবে :—

“ব্রাহ্মণদিগের প্রিয় করিবে, রাজাদিগের
প্রিয় করিবে। সুদৃষ্ট হইক আর আর্থাষ্ট
হইক অকলেবই প্রিয় দেখিবে।”

এখানে রাজ্য দ্বারা যে ক্ষত্রিয়ই উল্লিখিত
হইয়াছে তাহা স্পষ্টই অস্বীকৃত হয়।

কেবল বেদেই যে ক্ষত্রিয় বুঝাইতে
রাজ্য শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়
তাহা নহে; অজ্ঞ শাস্ত্রেও ক্ষত্রিয় বুঝাইতে
রাজ্য বা তদ্বর্ণক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়
যথা উপনয়ন-বিধানে :—

“গর্ভাষ্টমুৎসবে কৃক্লীত ব্রাহ্মণতোশবরনম্।

গর্ভাষ্টমুৎসবে ঋকঃ গর্ভাষ্টমুৎসবেবিশঃ”

“ব্রাহ্মণের উপনয়ন গর্ভ হইতে অষ্টম
বৎসরে সম্পাদন করিবে—রাজ্য বা ক্ষত্রিয়ের
গর্ভ হইতে একাদশ বৎসরে এবং বৈশ্বের
গর্ভ হইতে দ্বাদশ বৎসরে সম্পাদন করিবে।”

“যথাবিপ্রোদগম্যেব যাবদ্যযেব ভূমিণি।

বৈশ্বঃ পশুশবরনম্ পূজ্যো নাসেন তথ্যতি।”

“ব্রাহ্মণ দশদিনে অশৌচ হইতে শুদ্ধ
হয়—ভূমি বা ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিনে শুদ্ধ
হয় এবং বৈশ্ব পঞ্চদশ দিনে ও পূজ্য এক
মাসে শুদ্ধ হয়।”

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে রাজার বংশ
হইতেই যে ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি হইয়াছে
তাঁহা পরিষ্কার রূপেই বুঝিতে পারা
যাইতেছে।

ক্ষত্রিয় জাতির এই প্রকারে রাজার
সহিত আদিতের সম্বন্ধ হইতে ক্ষত্রিয় শব্দের
মূল ‘ক্ষত্র’ শব্দকে বিশেষ অর্থ বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত
হইতেই দেখা যায়। পূর্কের ‘বল’
অর্থের বশে, ‘ক্ষত্র’ শব্দে রক্ষা অর্থেরই
বিশেষ যোগ লক্ষিত হয়। শব্দকল্পদ্রমে

‘কৃত্তির’ শব্দ যেদ্রুপ ভাবে সাদিত ও ব্যাখ্যাসিদ্ধ হইয়াছে তাহাতে পুরোক্ত বক্তব্যেরই যথার্থ্য প্রতিপাদিত হইবে—
“কৃত্তি রক্ষতি জনান্, কৃত্ত: কথ্যমবৃত্তো
নোক্ত: ততঃস্বাস্থিস্থিত:। কৃত্ত এব কৃত্তিঃ
স্বার্থে ইতঃ।”

অধ্যাপক মেকডনেল (Macdonell) কৃত্ত সংস্কৃত ইংরেজী অভিধানে (Sanskrit English Dictionary) যে, ‘কৃত্ত’ শব্দ রাজ্য (dominion) ও ‘কৃত্তির’ শব্দ ‘রাজ্যকারী’ ও ‘রাজা’ (ruling, ruler) অর্থে ব্যাখ্যাত, যথা স্বায়—তাহাতেও ‘কৃত্ত’ শব্দ সহিত উল্লিখিত সংবরণ বা রক্ষা অর্থের বিশেষ সংযোগই প্রমাণিত হয়।

পাণ্ডিত্য পুস্তকসংগ্রহ পণ্ডিত বেলফোর (Balfour) ও ভদ্রী ‘ভারতকল্পদ্রুম’ (Cyclopaedia of India) নামক গ্রন্থে কৃত্তির শব্দের মূল ‘কৃত্ত’ শব্দ কেবল ‘রাজত্ব’ ও ‘রাজ্য’ অর্থ দেখিতে পাইয়াছেন তাহা নহে—কিন্তু এই ‘কৃত্ত’ শব্দ উক্ত উত্তর অর্থে বৈদিক সংস্কৃত বেদে ভাষ্য ও পারসীক শিলালিপিতে প্রযুক্ত হওয়ায় প্রমাণও তিনি পাইয়াছেন; যথা :—

“The word is an adjective from the ancient noun Kshatra, which, as meaning rule, dominion, occurs in all the three languages of the Veda, the Avesta, and the Persian inscriptions; originally it simply denoted possessed of authority and is so sometimes applied in the Veda even to the gods.” Cyclopaedia of India by Edward Balfour.

*এই (কৃত্তির) শব্দটী কৃত্তশব্দেরই

বিশেষরূপ। বেদ, আবেস্তা ও পারসীক শিলালিপি এই তিনের ভাষা দ্বিত্যেই রাজত্ব, রাজ্য অর্থে ইহার (কৃত্ত শব্দের) প্রয়োগ পাওয়া যায়। আদিতে ইহা কেবল শক্তির (বলের) লক্ষণরূপে অর্থ প্রকাশ করিত এবং এই অর্থে বেদে দেবতাদিগের সম্বন্ধে ইহা প্রযুক্ত হইয়াছে।

এখানে আমরা ‘কৃত্তির’ শব্দ গঠনের একটা সংক্ষিপ্ত টিটাসাই প্রাপ্ত হইতেছি এবং মূল বল হইতেই যে রাজত্ব ও রাজ্য অর্থের বিকাশ হইয়াছে—তাহা পরিষ্কার দেখিতে পাউতেছি।

‘কৃত্তির’ শব্দের মতো ‘রাজত্ব’ ও ‘রাজ্য’ অর্থের সম্প্রদেয় হইতে রাজন শব্দভাত ‘রাজত্ব’ শব্দ হইতে যে ইহার পুরোক্তার্থ গৃহীত হইয়াছে তাহা আমরা অসম্মান কুরিতে পারি। পুরোক্তসিদ্ধ সংস্কৃত ইংরেজী অভিধানে অধ্যাপক মেকডনেল কৃত্তির জাতির বাচক শব্দ সকলের মধ্যে রাজত্ব শব্দকেই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। ‘রাজত্ব’ শব্দের অর্থ বোদ্ধ-জাতীয় লোক বলিয়া শিদিয়া ইহার সম্বন্ধে বক্তব্য মতো তিনি এই শব্দ উক্ত জাতিব-প্রাচীনতম অভিধা এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যথা :—

“রাজত্ব man of the warrior caste (of which this is the oldest designation.)

ইহা হইতে রাজবংশ হইতেই যে কৃত্তির জাতির প্রথম উদ্ভব এবং রাজত্ব শব্দই যে কৃত্তির জাতিবাচক প্রথম শব্দ ইহা নিঃসন্দেহরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

সুতরাং কত্রির নামে যুদ্ধের উদ্ভাৱ
অপেক্ষা রক্ষার মহিমাময় ভাবই যে অদিক
একটি তথ্যই আমরা উপলব্ধি করিতে
পারিতেছি। কবিকুচুড়াণি কালিদাসও

কত্রির শব্দের এই মহিমাময় ভাবই তদীয়
অমর লেখনীতে কীৰ্ত্তন করিয়া গিয়াছেন :—
“কতং কৈল ত্রাচ ইত্যমর কবিতা শলো যুগেন্দরঃ ।”
ঐশ্বর্যপটঙ্গ চক্রবর্তী।

নবাব

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ফাগ

সেদিন রবিবার। ভোজের আগে
ভাল করিয়া না ফুটিতেই বৃদ্ধ জুজের
উল্লাস-সীংকারে সারা গৃহে একটা অনিশ্চয়ের
সাদা পড়িয়া গেল। “ও হেনরিতা, ওরে
ও এলিস্, আর, তোরা ঐগ্গির আর।
মারানের নাটক থিয়েটার-ওলার। নিজেছে।
আত্রে নিজে খপর দিতে এগেছে। ওঠ, ওঠ,
ওরে এদিকে আর।”

আত্রে কাল রাতেই এসংবাদ পাইয়াছিল।
হাতে। থিয়েটারের ম্যানেজার কাদিলাক
কাল তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিয়াছে,
নাটকখানি তাহাদের পছন্দ হইয়াছে; ঐশ্বর্যই
রিচার্জাল হুক হইবে এবং এক মাসের
মধ্যেই বাহাতে অভিনয় হয়, তাহারও
বন্দোবস্ত চলিতেছে। তাহার পর ঐইরনে
বসিয়া কতক্ষণ বসিয়া এই নাটক-অভি-
নয়েরই আলোচনা হইয়াছে। কি কি
দৃশ্যপট নুতন করিয়া আঁকিতে হইবে,
কাহাকে কি ভূমিকা দিলে ঠিক হয়, পোষাক-
পরিচ্ছদই বা কেমন ভৈর্য করানো
প্রয়োজন, এমনই সব প্রয়োজনীয় কথা।
তাহার পর থিয়েটার হইতে আত্রে যখন

গৃহে ফিরিল, তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া
গিয়াছে। কানেই এত বড় সুখপরটা জুজের
গৃহে আশ্বাসওড়া ঘণ্টে নাই। তবুও নিজের
বরে বাইবার সময় আত্রে জুজের ঘরে
কণ-পাতিয়া গিয়াছে, কেহ জাগিয়া আছে
কি না! কিন্তু সে গৃহে জাগরণের কোনই
সাদা পাওয়া যায় নাই। কেহ জাগিয়া
থাকিলে সেই রাতেই যে আত্রে এখনরটুকু
নিশ্চয় দিয়া ফেলিত, সে বিষয়ে ভিলমাত্র সন্দেহ
ছিল না। সারা রাটাই তাহার নিত্য
অধীনভাবে কাটিয়া গিয়াছে। কখন ভোজ
হইবে, কখন সে গিয়া দেহশীল জুজের
গৃহে এ সংবাদটুকু দিয়া হুকটা খালি
করিবে! রায়ে নিত্রাণ ভাল হয় নাই।
কেবলই সে ভাবিয়াছে, এ আনন্দ একা
আর ভোগ করা বাইতেছে না—এলিস,
আলিন, জুজ, সকলের মধ্যে বাঁটিয়া না
দিলেই নয়!

তাই সে প্রত্যবে যে যুদ্ধে ভুলিল,
নীচে জুজের গৃহের জানালা খোলা হইতেছে,
সেই যুদ্ধেই সে ছুটিয়া নীচে নামিয়া
আসিল। জুজ দাড়ি কানাইতেছিল। একটা
গাল সাক হইয়াছে, অপর গালে তখনও
সাবান লাগিয়া রহিয়াছে—এমন সময় আত্রে

আসিয়া তাহাকে অভিবাদন করিয়া পাড়া-
ইল। সুক, জুজ চমকিয়া উঠিল। এত
তোরে—আঁত্রে? তাই ত? কি মনে করিয়া
দে আসিয়া? কোন অশ্রুত করে নাই ত?
আঁত্রে কহিল, “না, না, অশ্রুত নয়।
আমার নাটকখানা থিয়েটারগলার নিম্নে,
মাসিগে—আর এক মাসের মধ্যেই, তার
নাটকখানায় দে করবে।” জুজ আনন্দে বেন
শিখিয়া উঠিল। এঁয়া, সত্য না কি!
চাঁকর করিয়া দে তখন মেরেদের ডাক দিল।

আঁত্রে এতখানি আনন্দের বখেউ
করণ ছিল। উপেক্ষিত যুবক নিভূতে
এককোণে পড়িয়া থাকিয়া আপনার আশ
চালিয়া এই নাটকখানি লিখিয়া শেষ করি-
য়াছে। সাহিত্যের নেশা ভূতের মতই তাহাকে
পাইয়া বসিয়াছিল। ইফারই জন্ত নিজের
মাকে অবধি সে ছাড়িয়া আসিয়াছে—ইফারই
জন্ত জেঙ্কিন্সের বিশাস-প্রচুর সুদ্রত-হৃদয়
গৃহ তাহার আজ আর স্থান নাই।
তক্ত যেমন সর্বভাগী হইয়া আপনার
দেবতার তপত্তা করে, তেমনই ভাবে আঁত্রে
এক কঠোর তপত্তায় আপনাকে মগ তন্ময়
রাখিয়াছিল। আজ মিলিয়াছে, শিখি
মিলিয়াছে—দেবীর প্রসাদ আজ সে লাভ
করিয়াছে। এইবার তাহার নাটকের
অভিনয় হইবে! পারিল লোক থিয়েটারে
আসিয়া লড়াই হইয়া তাহার পরিচর গ্রহণ
করিবে—সাগের থুগা কাড়িয়া সাগরে
তাহাকে অভিনন্দন করিবে! কিন্তু ওখুই
কি এ অভিনন্দনের জন্তই সে কাউর!
না—এ নাটক-অভিনয়ের অর্থ, তাহার
অবস্থার পরিবর্তন। চপলা লক্ষ্যে এবার

তাহার জীবন গৃহে আসিয়া দেখা দিগ্বন—
তাহার, সম্মিত মুখের হাসির ছটার
দারিত্র্যের আধারে বেরা বর আলোর
ভরিয়া উঠিবে। আর এলিস—তাহার
জীবনের ক্রান্তি, বাহার পানে চাহিয়া
শত বিপদেও আপনাকে সে অটল অচপল
রাখিয়াছে—সেই এলিসও এবার—

মেরেরা ছুটিয়া আসিল। আসিন
আসিয়া কহিল, “কি হয়েছে, বাবা, ডাকছ
কেমন? এই যে মাসিগে আঁত্রে—বগর
কি?” আলিনের শিখনে এলিসও আসিয়া
পাড়াইয়াছিল—অধরের কোণে মুহূ হাসির
রেশা, মরনে সরসের কম্পিত দৃষ্টি!

জুজ কহিল, “আঁত্রে নাটক বিস্তোহ
এবার থিয়েটারে দে হবে।”

আলিন কহিল, “বাবা,—তা আনন্দের
কি দিচ্ছেন, মাসিগে আঁত্রে? আমি
ত’পোড়া থেকেই বলছি, আপনার বই
থিয়েটার-গলার নেবেই—কেমন, বলিনি?”

আলিনকে মুহূবরে দৃষ্টবাদ দিয়া আঁত্রে
এলিসের পানে চকিতের মত একবার চাটিয়া
দেখিল। সে মুখ সরসে রক্তিম, মনন-
পন্নব সঘন কম্পিত, দৃষ্টি নত! আঁত্রে
নির্যার মধ্য দিয়া বিদ্রোহের একটা মুহূ
প্রাণ ছুটিয়া গেল। আঁত্রে জুজের পানে
কোনমতে চোখ তুলিয়া কহিল, “আপনার
সঙ্গে আর একটা কথা আছে, আমার—”

“গোপনীয়—?” জুজ কহিল, “তাই ত,
আমার যে ভাবিয়ে দিলে হে—” তাহার
পর আঁত্রে কাছ আসিয়া মুহূবরে জুজ
কহিল, “এদের যেতে বল।”

আঁত্রে কহিল, “লকলের

দরকাষ নেই। এলিস বোধ হয়, এর কিছু জানে। আলিন সঠিক না জানলেও কতক বোঝে। তবে এ—

জুজু কহিল, “বেশ, এলিস আর আলিন থাকুক। তোরা একবার যা ত মু—আবার ডাকলে আসিস।”

সকলে কলরব করিতে করিতে চলিয়া গেলে ঘর শুকু হইল। জুজু অধীর আশ্রয়ে আশ্রয় পানে চাহিয়া রহিল। আশ্রয়ে একবার চারিধারে চাহিয়া লইল—তারপর সে আপনাব মনের গোপন কথাটি আত্মবন-লক্ষিত আশ্রয় কথা জুজুর কাছে প্রকাশ করিল। আরোহন ঘৈষিরা এলিসের বুকটা ধক্ করিয়া উঠিল! বুঝি, সেই কথা! না, অর্ন্তঃ-তনিতা জুজু কি বলিলে,—কি মত দিবে? তাহার সারা অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। তবু সে তনিল, আশ্রয়ে আর জুজুর করুণার ভিখারী; তাহারই করুণার উপর আশ্রয়ের সব—সব নির্ভর করিতেছে। আর কিছু নহে, সে শুধু এলিসের পানিপ্রার্থী!

তনিতা জুজু উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, “এ কি সম্ভব! আরে মাঠার আশ্রয়ে—তাই ত, এ কথাটা বশেও বে কোনদিন ভাবতে পারিনি। এঁা!” কিন্তু না, বৃদ্ধ রহস্য করিতেছে। জুজু কহিল, “আশ্রয়ে, এ’ত খুব ভাল কথা! তোমার মত জানাই পাওয়া, বলতে কি,—এর কতকটা আভাব আমি আগেই পেরেছিলুম। তাহলে ত আমি ঠিকই যাঁচ করেছিলুম—অবশ্য অপরের কাছে এ-সবকে কিছু শুনেও ছিলুম—”

এলিসের মাথার ঘেন আকাশ ভাঙ্গিয়া

পড়িল। জুজু তাহা হইলে দশই জানে! ছি, কি লজ্জা! সেখানে গাড়াইয়া থাকিতেও তাহার লজ্জা হইতে লাগিল, অথচ চলিয়া যাইতেও শক্তি নাই। পা দুইটা সরিতে চাহে না! তবে ‘কথাটা জুজুকে বলিল কে? আলিন নয় ত!

“আলিন জানিয়া কহিল, “তাহলে আমি বলি। আমিই এ আভাবটুকু বাবার কাণে তুলেছিলাম। কেমন বাবা, নয় কি?” কথা শেষ করিয়া আলিন দুই হাতে এলিসকে গাড়াইয়া ধরিল। আলিনের বুকে মুখ লুকাইবার আশ্রয় পাইয়া এলিস বেশ বঠাইয়া গেল।

“তাহার পর জুজুর সহিত আশ্রয়ের আরও দুই-চারিটা কথা হইল। বিবাহের পর আশ্রয়েও এলিস উপরতগার ঐ ঘরটিতেই থাকিলে, এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইবে না। আশ্রয়ে ফটোগ্রাফির ব্যবসায় উঠাইয়া দিবে না—এবং ‘বিশ্রোহের’ অভিনয় হইতে বৈরুণ লাতের আশা সে করিতেছে, তাহার যদি ব্যতিক্রম না হয়, তাহা হইলে সে কার-বারটাকেও সে ঐ টাকার আরও বাড়াইয়া কেলিতে পারিবে। অর্থাৎ সংসার-সমুদ্রে তাহারের জটজনের জীবন-তরী দুইখানি দিয়া তাহার বাহিয়া যাইবে—এই প্রসঙ্গ বাহু ও অঙ্গুল লোভ-টুকু সহায় থাকিলে কোনই ভয় নাই!

জুজুর একটা ভাবনা হইল। সে কহিল, “কিন্তু তোমার মা-বাপ এ বিষয়ে মত দেবেন কি? ডাক্তার জেজিলের অত গম্ভীর, অমন মান-সম্মত!”

আশ্রয়ের লগাটেও চিন্তার একটা রেখা

জুটল। সে কহিল, “ওর কথা আর তুলবেন না, মশায়। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ন—আমি তাঁর কি ধার ধারি যে তাঁকে ভয় করে চলতে হবে?” তাহার পর একটু থামিয়া সে আমার বলিল, “তবে আমার মাণ তা মা আমার মাকে মাকে এখানে দেখতে আসেন—বদিও ডাক্তার ডেভিস তাঁকে এখানে আসতে মানা করেছে, তবুও মা সে মানা শোনেন নি। এলিসকে মা খুব পছন্দ করেন। আর আমার মা কেমন লোক, আপনিত দেখিবেন পরে। এলিসকে বরং দিক্কাসা করতে পারেন। তবে আমার এই বড় ঠাপ হয় যে, ঐ শিশুটো মার উপর এত অত্যাচার করে, আমি তাঁর কোন প্রতিকার করতে পারি না—” আত্মের মর্মেণ্ড ভিতর হইতে একটা তপ্ত দীর্ঘ বাস উদ্ভিগ—তাহার প্রাণের মধ্যে যে জ্বালা, তাহা সে-ই জানে। সে জ্বালা জুড়াইতে পারে, শুধু এলিসের ঐ হৃদয় মুখের দ্বিধা বাধী,—ঐ চপল নরনের সম্মিত চাহনিটুকু!

আলিন কহিল, “বাবা, আজ তাহলে এক কাজ করা যাক, এস। এঁর নতুন নাটকের খাতিরে আজ আমরা লণ্ডন-সম্প্রদে বেড়াতে যাই, চল। কি বল? এখানে চড়ি-জাতি করব। আপনি কি বলেন, মাসিমা আত্রে?”

হেনরিভা, ইয়া প্রভৃতিও ইতিমধ্যে আসিয়া জুটল। তাহার কহিল, “আমরাও বেড়াতে যাব, দিদি। ও বাবা—”

জুজ কহিল, “বেশ মা—সবাই যাবে। তাহলে, আলিন, চড়ি-জাতির গোছগাছ

করে নাও। আত্রে কোন অসুবিধা হবে না ত’?”

এলিসের সঙ্গীত চটবে। অসুবিধা। আত্রে কহিল, “কিছু না।”

জুজ কহিল, “তাহলে তুমি তৈরী হয়ে এস। আমরাও টিক হয়ে নি। তাঁর পর একসঙ্গে পেরিয়ে পড়ব—মোদ ওঠবার আগেই।”

আত্রে বিদায় লইল। ঘেরাও আপনা-দিগকে সজ্জিত করিয়া সমস্ত গুছাইয়া লইবার উত্তোগ করিতেছে, এমন সময় পল আসিয়া উপস্থিত হইল। জুজ কহিল, “তবেই হে! একটা হুপসর আছে—কাঙ্গালিকা আত্রে নটক অভিনয় করতে নিরুদ্বেহ।”

এ সংবাদ সকলের পূর্বে পলই প্রথম পাইয়াছে! এ বিষয়ে সে কি কম পশ্চন্ন করিয়াছে। কাঙ্গালিকাকে ধরিয়া পলই ত নাটকখানি আগাগোড়া পড়াইয়াছে। আবার পড়াইয়াই তাহাকে ছাড়িয়া দেয় নাই, অভিনয়-আয়োজনে অর্থ-সাহায্যও বিশেষরূপ করিবে বলিয়া আশা মিরাছে। তাই কাঙ্গালিক এই নতুন লেখকের প্রথম নাটক-অভিনয়ে এতখানি বাগতা ও উৎসাহ দেখাইতে উদ্ভত হইয়াছে!

কিন্তু এ কথা পল কাহারও কাছে তাকে নাই; এখানেও সে ভাবিল না। কাঙ্গালিকাকেও সে প্রতিশ্রুত করিয়া লইয়াছে, এ কথা যেন আর তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণে প্রবেশ না করে। তাই পল জুজের কথার সর্বাংশ বিশ্বাস মাত্র প্রকাশ করিয়া নতুন নাটক ও তাহার লেখকের গুণ কামনা

করিল। জ্বল করিল, “তুমি বসো, পল, আমি ছ-একটা কাজ দেয়ে নি। আদর! আমি আশ্রয় নতুন বইয়ের সম্বন্ধের জন্য লভ সম্পন্ন চড়ি-ভাতি কংতে চলেছি। আলিনের সাধ, নতুন নাটকের খাতির করা। আসলে কিন্তু অল্প কারণ আছে। আজ আশ্রয় আমার কাছে তার সঙ্গে এলিপের বিরোধ প্রস্তাব তুলেছিল—আমিও তাতে মত দিয়েছি। তা তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে কি, না, কোন সম্ভাবনা হবে?”

“সম্ভাবনা আর কি! বেশ, তাহলে আমিও যাব।” তাহার পর কিছুক্ষণ ধামিরা পল করিল, “তবে আমি শুধু বলতে এগেছিলাম, কিছু দিনের জন্য অপাতত: আমি টিউনিসে চলেছি,—”

জ্বল করিল, “টিউনিসে,—হঠাৎ?”

পল করিল, হাঁ, সে টিউনিসে চলিয়াছে। তাহাকে বাইতেই হইবে। নবাবকে এই ক্ষণাতঃ ব্যাধিগণের মুখের সম্মুখে রাখিয়াই তাহাকে বাইতে হইবে—উপায় নাই! না গেলে নয়! এখানে ডিউক যোরা আছেন, তিনি নবাবকে ইহাদের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবেন, এ কথা বিলক্ষণ আছে।

এমন সময় আলিন আসিয়া ডাকিল, “বাবা—” পরে পলকে দেখিয়া পরাক্রম সে ধামিরা পেল। জ্বল করিল, “কি মা? এই যে পলও আমাদের সঙ্গে যাবে, চড়ি-ভাতিতে যোগ দেবে,” আলিন কোন কথা বলিল না—তাহার মুখে যর ফুটিল না। পল তাহা লক্ষ্য করিয়া করিল, “আমার তোমাদের চড়ি ভাতির দলে নেমে, আলিন?”

আলিন কোনমতে করিল, “বেশ তা।”

জ্বল করিল, “পল টিউনিসে যাবে, আলিন। কতদিন বাবে যে ফিরবে—”

আলিনকে কে যেন অতিক্রান্ত নির্ভর আঘাত করিল। মনের সে বেদনা চাপিয়া আলিন একেবারে পনের পানে চাহিয়া রিভ্রাঙ্গা করিল, “টিউনিসে?”

পল করিল, “হাঁ, আলিন।”

আলিনের বকের মধ্যে কে যেন কাঁদিয়া উঠিল। টিউনিসে! তাহার অর্থ, কতদিনের অপেক্ষা! কতদিনের—!

জ্বল করিল, “হাঁ, ভাল কথা, তোমাদের টেরিটোরিয়েলের কি হল? কিসকার সে কারবার চলছে কেমন? এখনও যে নবাবের নাম দেখছি,—বোর্ডের চেয়ারম্যান আছেন। এই আলিবারা গুহা থেকে নবাবকে টেনে বার করতে পারছ না? বার করা ভারী দুশ্কার হয়ে পড়েছে, বোদা—”

“আমি বুকি, মাসিরো জ্বল। কিন্তু মান নিহে গুধান থেকে এখন বেরতে হলে ওতে অনেক টাকা লাগতে হয়—প্রায় তিন লাখ। অত টাকা এখন হাতেও নেই। টিউনিসে তাই আমি যাচ্ছি—টাকার জোগাড় করতে শুধু। বে ত সর্ব্বত্র গ্রাস করবার উত্তোষ করছে—দেখি, যদি তার গ্রাস থেকে কিছুও বার করে আনতে পারি। এখন তবু কিছু আমাদের ভরসা আছে—নাহলে পরে—”

বাধা দিয়া জ্বল করিল, “না, তাহলে তুমি যাও, ছ-একদিনের মধ্যেই বেরিয়ে পড়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, বলি তরে টাকা আনো—আর সেই টাকার

নবান বেচাৱাকে ঐ জোজোরদের আঁড়, পাগানেতিদের দল থেকে উদ্ধার কর। যোদ্ধা, আমি ভাবছি, হেয়ারলিও যে তোমাদের অমন পক্ষ, সে ওতে মুকিয়ে খামকতক পেঁরাব কিনলে না যে—?”

আলিন এবার কথা কহিল, গভীর স্বরে ডাকিল, “বাবা—”

“কেন মা?”

আলিন কহিল, “আজ সকালে আমাদের এই আনন্দের মাঝখানে ও লোকটার নাম আর এনে না, বাবা।”

“কি উত্তেজিতভাবে কহিল, “ঠিক বলেছিল মা। সে রাফেলটা,—তার কথা মনে হলে আমার ঘেন আর মোটেই জ্ঞান থাকে না। তগবান এতও সহিছেন ত! আশ্চর্য।”

সহরের শেষে নদীর বাসুদয় উপকূলে বড় বড় গাছের ছায়ায় ঢাকা বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এক ধারে গাড়ী চলিব পাকা রাস্তা। বেলা পড়িলে এই পথে ধনী ও দিলানীর শূকরের সমাবেহ লাগে—বলে বলে সব গাড়ী চড়িয়া এখানে বেড়াইতে আনে। পল এখানে ইতার পূর্বে আর কখনও অটল নাই।

একটা ঘোণের পাবে চড়ি-ভ্রান্তিৰ আবেগজন হইয়াছিল। সে আনন্দ শেষ করিয়া সকলে এই পথেই বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। পল ও আলিন সকলকে আগাইয়া আনিয়াছিল। এই নিচিহ্ন শোভার দুইজনকে প্রাণের মধ্যে কি এক অপূর্ণ পূরক মূরিরিয়া উঠিয়াছিল। এমন ক্ষণের স্বাদ

পল পূর্বে আর কখনও পায় নাই। এত সুখ পৃথিবীতে আছে, ইহা সে কখনও করিতে পারে নাই। আলিনের কোমল হাতখানি পলেব হাতে মালাব মত বিছাইয়া পড়িয়াছিল—মূলের মালাব মতই তেমনট মৃদু স্পর্শটুকু! দুইজনে ধীরপদে চারিধাবের বিচিত্র শোভার মধ্য দিয়া পথ চলিয়াছিল। জুজ, এলিও, অ্যেড্রে, হেনরিয়া প্রভৃতি লিঙ্কনে পড়িয়া রহিয়াছে। এত দীর্ঘ সময় পথে বেড়াইতে বেড়াইতে পলেব মনে হইল, তাহাদের সম্মুখে সংসারের দীর্ঘ পথটাও এমনট সময় পড়িয়া রহিয়াছে! কোথাও বাক নাই। সে পথে তাহারা দুইজনে এমনই শান্তি বৃক লইয়া, মিলনের নিবিড় বাহুপাশে পরস্পরকে এমনই বাঁধিয়া—দুইজনের প্রাণের সমস্ত প্রেমের ছায়ায় ঢাকা এমনই ভ্রামল সিঁধ পথে চলিয়া যাঁইবে! আলিনের বৃকের মধ্যে এক নৃতন রাগিণী সাড়া দিয়া উঠিয়াছিল—এক নৃতন আবেশ! তাহাব মন হইতে সকল দুর্ভাবনা আর দূৰ হইয়া গিয়াছিল।

সহসা চলিতে চলিতে দুইজনে দেখিল, ঘুরে ছায়া-মুষ্টির মত দুইজন অবাধোহী পাশাপাশি চলিয়াছে। ক্রমে সৃষ্টি একটু স্পষ্ট হইলে, উভয়েই বুঝিল, তাহাদের একজন পুরুষ অপরটি নারী। ঘোড়া দীর পদে চলিয়াছে। ক্রমে সৃষ্টি আরও স্পষ্টতর হইয়া উঠিল—অবাধোহী দুইজন ক্রমে আরও নিকটে অগ্রসর হইয়া গাছের অন্তরাল দিয়া প্রান্তর-মধ্যে প্রবেশ করিল—তখন তাহাদের আর চিনিতে বাকী রহিল না। পুরুষটি ডিউক বোরা, আর নারী ফেলিসিয়া।

পলের মাথার মধ্যে রক্ত চন্দন করিয়া উঠিল। সে আলিনকে মুহূর্তে ঘুরে জিজ্ঞাসা করিল, “চিনতে পারলে?”

আলিন চিনিয়াছে—তাহার সবুজ গ্রাণ স্নগড়ীয় লক্ষ্যে, লক্ষণ বেদনার তরিকা উঠিল। বাহ্যকে আমরা ভালবাসি, তাহাকে অজ্ঞার কিছু করিতে দেখিলে মনে যে ভাব হয়, আলিনেরও সেইরূপ হইল। সে শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কল্পিত কণ্ঠে কহিল, “বেচারী ফেলিসিয়া!”

ফেলিসিয়াকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইলেও কথাটা পলের মনে কাটার মতই বিধিল। এই ফেলিসিয়ার উপর কতখানি তাহার বিশ্বাস ছিল! সে বিশ্বাসে এত আশ্রয় লাগিয়াছে, আজ! তবুও এ বেদনার মধ্যে একটা আশার ইঙ্গাই ছিল যে দুর্ভাগিনী ফেলিসিয়ার রক্ত আলিনের নির্মল গ্রাণ এতখানি কাতর, পীড়িত! এ সমবেদনার পল আর আলিনের প্রাণের যে পটের পাইল, তাহাতে সে জুড়াইয়া গেল।

বেদনাময় এট তরু ভাগটা কাটাইবার অতিপ্রাণে পল নবাবের কথা ও সেই-প্রসঙ্গে তাহার নিজের টিউনিস বাইবার কথা পাড়িল। আলিন কহিল, “তুমি চিঠি লিখো কিন্তু, পল, বেশ বড় বড় চিঠি। যা দেখলে ভুলবে, সব খুলে লিখো। আমরা এখানে বসে তোমার চিঠি থেকে সে দেশের পরিচয় নেব। বাবাকেই কিন্তু চিঠি লিখো।”

এই সহকর্তার পল আর একটা গোপন বিষয়ের যথেষ্ট ইঙ্গিত পাইল। সে কথাটা স্পষ্ট করিয়া কোনদিন সে জানিতে

পারে নাই। আজ এ সহকর্তার আচোজন দেখিয়া তাহার অনেকখানি বিধা অনেকখানি সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। সে সাহস পাইয়া আলিনের হাতখানি নিজের হাতে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “আমি কি তাৎপর্য্য বুঝি, জানো, আলিন? আমার মনে বড় অশান্তি। তুমিই কিছু তা বুঝিতে পার। যদি তোমার দয়া হয়, যদি তুমি আমার তোমার দয়ার অবোধ্য না ভাব, আলিন—তাহলে আরও একটা কথা বলি, শোন। আমি একটা ঐকান্তর অন্তর্য্য করেছি। আমার বুক ভেঙ্গে যেত, কিন্তু একটা জিনিষ এ বুকটাকে ঠিক রেখেছে। সে কি জিনিষ, জানো—?”

পল বুকের পকেট হইতে ফ্রেন্সে বাধা ছোট একখানি ছবি বাহির করিল—পেন্সিলে আঁকা স্তম্ভর একখানি মুখের আভাষ! আলিন মুহূর্তে সে মুখ চিনিতে পারিল। তাহার চোখ জলে ভরিয়া আসিল। এ তাহারই মুখ! ফেলিসিয়া একদিন তাহাকে বসাইয়া পেন্সিল দিয়া আঁকিয়া লইয়া ছিল। আড়ম্বরহীন সারল্যে মণ্ডিত ছোট স্তম্ভর মুখখানি!

পল কহিল, “এ ছবি আমার—ফেলিসিয়া আমার দিগেছে। আজ আমি চলে যাবছি, তাই বলছি, এ ছবি কাছে রাখতে আমার বড় আশঙ্কা হয়, যদি নিজের হাতে এ ছবি আমার বুক তুমি তুলে দাও; অপরের কাছ থেকে এ ছবি পাবার কোন অধিকার নেই আমার। সে আমি চাই-ও না। নাও, আলিন—তোমার আজ এ ছবি আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি। তোমার অহুমতি না পেলে এ ছবি রাখবার অধিকার আমার থাকতেও পারে

না। যদি তুমি আমার চেয়ে বিয়াতর কোন বস্তুকে এ ছবি দিলে স্থনী হও, তাহলে এ ছবি তাকেই দিবে। আর, আর যদি তোমার মনে হয়—”

পল কথাটা শেব করিতে পারিল না। আলিনেরও সব কেমন গোল হটয়া যাউতেছিল। গেমির পানে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সে কহিল, “যদি আমার মনের কথা জানতে, পল—তাহলে এর উত্তরের দত্ত কখনই তোমার এমন ভাবে অপেক্ষা করিতে হত না। তুমি যদি আমার ভাল খেল খুক, যেমন তুমি বলচ, তাহলে আমিই বা তোমার না ভালবেলে থাকি কি করে, পল? তবে তুমি ত জান, আমি স্বাধীন নই—আমাকে আর একটা সংসার মথার করে থাকতে হয়েছে। দেখ, চেয়ে দেখ—”

পিছনে অদূরে জুল, এলিস, হেনরিতা আঙুলি আঁঙ্গা পৌছিয়াছিল। আলিন তাহাদের পানে লক্ষ্য করিল।

পল কহিল, “আমিও স্বাধীন

আমি।” তোমার মত আমারও শুভ কাল পড় দাখি আছে। তোমার সংসার থেকে আমি তোমার বিছাড় করতে চাই না, আলিন। তুমি যেমন আছ, তেমনই থেকে, তবে শুধু আমার—আমার—”

কৃতজ্ঞতার আলিনের প্রাণ তরিয় উঠিল। সে কহিল, “এঁা, এত দয়া! পল, আমি বড় ভাবনার পড়েছিলাম, সে ভাবনার হাত থেকে আজ তুমি আমার মুক্তি দিলে। তোমার আলিন তোমার কাছে আলিন, আর এ সংসারে সবার কথা—তাই থাকবে? তবে ও ছবি তোমার কাছেই রাখে—আমি নিজের হাতে তোমার দিচ্ছি। শুধু ছবি নয়—আমি নিজেকেও আজ তোমার দিবে দিলাম—যদি তুমি এ নিতে কোন আপত্তি না থাকে! নাও পল, আমার নাও। আমার সর্ব্ব, আমার প্রাণ, আমার মন, সব আজ থেকে তোমার—তোমারই শুধু।”

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবীজ্ঞানমোহন মুখোপাধ্যায়।

শ্রোতের ফুল

(২৮)

বিপিন পিতার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বরাবর লাইব্রেরীতে গেল। দেখিল সেখানে জুই হাঁটু হাত দিয়া অড়াইয়া বসিয়া বসিয়া নিধিরাম খুসাইতেছে। বিপিন আসিয়া বেদনা-কাতর কর্তে ডাকিল—নিধি।

নিধিরাম চমকিয়া জাগ্রত হইয়া বলিল—কেন ডাই?

বিপিন বলিল—আমি কলকাতার ঘাব আমার জিনিষপত্র জুড়িয়ে গে।

নিধিরাম বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া অস্তিত হইয়া গেল। সে কোনো কথা না

বলিয়া অস্ত্রে আছে ঘর ছুটে বাহির হইয়া
গেল। বিপিন আরাম-কেন্দ্রার্য্য জুরা
পড়িয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল।
সে কোথায় যাইবে, কি করিবে, কোথায় সে
একটু সাশ্রয় পাইবে? এই চিন্তার মধ্যে
সে বসি ছুটিতে লাগিল দেখিল ইহার তল
নাই, পায় নাই। তাহার পিতা খুড়িয়া ও
মালতীকে শুদ্ধ তাড়াইতে চাহিয়াছেন, শুধু
তাহারই ক্ষত। বিপিন ভাবিতেছিল সে
চলিয়া গেলে তাহারের বিপদ বাড়িয়া
যাইবে। অতএব তাহাকে ঘাইতেই হইবে।

নিধিরাম তাড়াডাকি গিয়া গির্জাকে
বলিল—মুনিবন্ধ্যা, ছোটাবাবু কি হয়েছে।
মুখ একবারে কালটবশাবীর মধ্যে আধার।
আমার স্ত্রী, নিধিমা আমি বলকাতার ঘাব
ক্রিয়পত্তর শুদ্ধি দে।

গিরি চিত্তিত হইয়া বলিলেন—কি হয়েছে
তুই কিছু জানিসনে?

—না। এখন রামধন এসে মহারাজের
কাছে ছোটাবাবুকে ডেকে নিয়ে গিচ্ছল। সেখান
থেকে দিগে এসেই আমার ঐ কথা বললে।

—ডাক দেখি একবার রামধনকে শুনি
কি হয়েছে।

নিধিরাম প্রাথমিক ডাকিয়া আনিল।
রামধন আসিয়া সমস্ত ঘটনা বিবেদন করিল।
তখন গিরি বলিলেন—আমি আর পারি না
বাপু। আমারই হাড় ভাঙা-ভাঙা করে
তুললে। কোথায় যেটার বিয়ে দিগে বরণ
করে যো ঘরে তুলব, না, বেটাই চললেন
বিবাহী হয়ে। কি কখনো মালতী ভিটের পা
দিগেছিল বে কোনো দিকে ভালাই নেই।
চ দেখি, বিপিন কোথায়।

গিরি লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়া ডাকি-
লেন—বাবা বিপিন।

বিপিন মাকে দেখিয়া উত্তরা দাঁড়াইতেই
তাহার ছই চোখ বিরা বড়বড় অশ্রুবিম্ব গড়াইয়া
পড়িতে লাগিল। গিরি তাহাকে কোলের
কাছে টানিয়া লইয়া বসিলেন। বিপিন মার
বুকে মুখ লুকাইয়া দারুণ অসুস্থমানে ও
হঃখে শিঙের মতো কাঁদিতে লাগিল। গিরিরও
‘অশ্রুধারা’ বিপিনের মাথার শুভাশুভার্থে
পরম সাশ্রয়রূপে অরিতা পড়িতে লাগিল।
কর্ণের ক্রন্দনের পর গিরি বলিলেন—বাবা
বিপিন, কি ছেলেরামুখী করছিস বাবা।
নিজেও কষ্ট পাচ্ছিস, সকলকেই কষ্ট দিচ্ছিস।
তুই-ও কখনো এমন ছিলেন।

• বিপিন বলিল—আর তোমাদের কষ্ট
দেখো না মা, আমি এইবার জন্মের মত
খাচ্ছি।

—বালাই বাট, বংশের মশাল তুই, তুই
কোথায় বাঁচি বাবা? সবসময় আগে তোকেই
যে আমি কোলে পেয়ে মা হয়েছিলাম;
সে কোল তুই ইচ্ছে করে বহুদূরে ছেড়ে
যেতে পারবি?

—কি করব মা, তোমার ছেড়ে আমি
কখনো বেশদিন কোথাও থাকিনি, তবু
থাকতে হবে। নিরস্ত্র আমার টানছে।
বুক ভেঙে বাবে, তবু আমার থাকতে হবে।

—ছি বাবা অমন কথা বলতে নেই।
আমার ছেড়ে তুই কোথায় বাবি?

—যেতেই হবে মা, বাবার হুকুম।
আর থেকেও ত কোনো লাভ নেই, আমি
ত পরে পরে তোমাদের আলাতন করছি।
আমি যে-মতই এবার বাড়ীতে এসেছি সে-

অবধি ত আমার ক্ষেত্রে তোমাদের স্থপ্ন নেই। আমার মত যখন তোমাদের মতের সঙ্গে শুধু বিরোধ বাধাতেই আছে, তখন আমার দূর হওয়াই ভালো।

—বাণাই বাণাই ঝাট ঝাট। শব্দ পূর হোক। অকল্যাণ দূর হোক। তুই চিরজীবী হয়ে আমার বিরক্ত কর—তাইতেই আমার আনন্দ, তাইতেই আমার স্থপ্ন।

“বিপিন এই মেহের কাছে” পরাজয় স্বীকার করিতেছিল। কিন্তু তখনি তাহার মনে পড়িল এবাড়ীতে মালতী আছে। তখন খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দৃঢ়বরে বলিল—না মা, এবাড়ীতে আমার আর থাকা হবে না, আমার অজ্ঞাত ঘেঁটেই হবে।

গিরি পুত্রের দৃঢ়তার শুদ্ধিত হইয়া বলিলেন—বিপিন, তোর মূখ চেয়েই আমি পুত্রশোক ভুলেছিলাম। আমি কীদলেই তুই কীদতিস নলে আমি প্রাণি পূলে কীদিনি। আমার কীদিয়ে যদি তুই যেতে পারিস, বা। তুই যেখানেই থাক আমার আশীর্বাদে তোর মঙ্গল হবে।...তোর যদি মন খারাপ হয়ে থাকে ত কিছুদিন না হয় অজ্ঞাতে গিয়ে থাক; কিন্তু এই পোষ মাসে বাড়ী থেকে কি বেরতে আছে? লোকের কুহুর শেরীল বাড়ীর বার করে না, খাঁটা কাড়ে না, আর তুই যেহেতু ছেলে বয়স ছেড়ে বাবি?

—মা, বে নিজেই অলক্ষণ তার আবার লক্ষণ করে ব্যস্তির দরকার কি? আমি আর থাকতে পারব না মা।

—যা খুশি কর। তুই আমার পেটের

ছেলে! ছেলে কখনো আমার এমন করে দুঃখ দিতে পারতিস নে—বলিয়া গিরি পরিপূর্ণ বেদনার চোখ মুছিতে মুছিতে প্রস্থান করিলেন। বিপিন একাকী বলিয়া অঙ্গ বিশর্জিত করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে বাড়ীময় মাটি হইয়া গিয়াছিল বিপিন বিভাঙিত হইয়া কলিকাতা বাইতেছে। পুরুজীগণ অজ্ঞাত আশঙ্কার অসমাপ্ত কর্তব্যে কলিয়া তত্ত্বিত হইয়া মূখ চাওয়াচাওয়ার করিতেছিল। গিরি যখন চোখ মুছিতে মুছিতে অলময়ে ঘরে গিয়া শয্যা আশ্রয় করিলেন, তখন খুড়িমা বিপিনের এবং বোহিণী মালতীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

খুড়িমা আলিয়া দেখিলেন বিপিন চুপ করিয়া গজোর হইয়া বলিয়া আছে—“খুড়িমা বলিলেন—বাবা বিপিন, আমাদের ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে বাবা?

১. বিপিন স্নান হাঙ্গি হাঙ্গিমা বলিল—এখানে আর থাকা পোষাল না খুড়িমা।

—পে কি বাবা? তোমার বাড়ী তোমার বয়স, তোমার পোষাল না, একি একটা কথা? তুমি গেলে আমার কার গরসার থাকব? আমাদের মতন হস্ত-ভাগিনীদের কথা একবার ভাবছ না বাবা?

—ভেবেছি খুড়িমা। আমি এসেই নানা গুণগোল বাধিয়ে ভুলেছি। আমি গেলেই সব আমার শান্ত হয়ে যাবে। যদি না হয় তবে তখন আমার কাছে বেগো। নিরাশ্রয় আমার আশ্রয় তোমাদের স্থপে না মাথুক শান্তিতে মাথবে।

—কিন্তু বাবা, আমি শুধু নিজের

স্বার্থে জেগে বলছিলেন। দিদির যে ভূমি-
অস্ত্র গ্রাণ! লম্বা এমন দেখিনি, দেখব
না!

—খুঁড়িমা, আমার মার মন কি আমি
জানি না। তবু যেতে হবে।

—থাকা কি এতই কঠিন বাবা?

—হ্যাঁ খুঁড়িমা। বাবা বলেছেন হয়
কিছুকপোতার বিয়ে করতে হবে, নয় এবাড়ী
থেকে যেতে হবে।

—কিছুকপোতার বিয়ে
এতই শক্ত বাবা?

—হ্যাঁ খুঁড়িমা। যে কাজে মন' ক্রম
হবে অগ্রসর না হয় সে' কাজ করতে
নেই। আমার বাপ মার জেদর জেগে
একটি শিশু বালিকার সর্বনাশ কববার
আমার কি অধিকার আছে?

—বড়ঠাকুরকে একটু বুঝিয়ে বল না,
তোমার পছন্দ-মত পাত্রী সন্ধান কখন।

বিনি হাসিয়া বলিল—সে হবার জো
নেই খুঁড়িমা। আমার যেমন পছন্দ আছে,
পাত্রীরও ত তেমনি একটা পছন্দ আছে।
আমি তাকে পছন্দ করলেই যে সে পছন্দ
করবে তার ত কোনো মানে নেই। কাজেই
ওদব চেষ্টা জানি ছেড়েই দিয়েছি।

খুঁড়িমা বলিলেন—যেহেতু হবার
পছন্দ অপছন্দ কি?

বিনি হাসিয়া বলিল—এই জেগেই
ত বরাবর আমার সঙ্গে বিরোধ বেধে
আসছে। তোমরা যেহেতু হবার
মানে কর না। কিন্তু তাদেরও ভালো
মন বিচার আছে, পছন্দ অপছন্দ আছে,
গ্রাণ আছে।

—কি জানি বাবা! তোমাদের মতন
ত আমার পণ্ডিত নই। যা ভালো বোঝ
কর।—বলিরা খুঁড়িমা—বিষয় মনে দীর্ঘনিশ্বাস
ফেলিয়া গ্রহণ করিলেন।

‘পাশের ঘরে’ বলিরা মালতী সব
তুলিতেছিল।

এমন সময় রোহিণী আসিয়া দাঁত
বাহির করিয়া চাপা গলার বলিল—‘দিদিমনি,
তুনেছ?’ দাদাবাবু কলকাতা চলে যাচ্ছে।

মালতী :তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের
দিকে চাহিয়া কটকটে বলিল—হ্যাঁ তুনেছি!
তা যাচ্ছেন ত আমার কি?

রোহিণী গালে হাত দিয়া জ্বাকামির
পরে বলিল—ওমা, এমন সুন্দর দাদাবাবু
আমাদের, বড়বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তাকে
তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

মালতী দৃঢ়স্বরে বলিল—না। তোমা-
দের দাদাবাবু, আমার কে? আমি তাকে
বেশিদিল দৈখেছি, না ভালো করে চিনি,
বে, আমার কষ্ট হবে? একটা মানুষ
কগড়া করে যাচ্ছে এই বলেই একটু যা
খাওয়া লাগছে।

রোহিণী একেবারে জ্বালা হইয়া
খুঁড়িমা পড়িল। সে বড় আশা করিয়া
আসিয়াছিল যে দেখিবে মালতী ফোঁস-
ফোঁস করিয়া কানিতেছে, কাটা কইমাছের
মতো অ-শেষ বেদনার ছটফট করিতেছে।
কিন্তু তারার কোনো লক্ষণ ত দেখিলই
না, অধিকন্তু তারার উদ্ভাভাব দেখিয়া
রোহিণীর এতকালের সব গোটা ধারণা-
গুলি যেন ওলটপালট হইয়া গেল। সে
নিবাত অপ্রসন্ন মনে গ্রহণ করিল।

পাশের ঘরে বসে বসেই মোটমাটির কথা হইতে লাগিল মালতীর মনের উপর ততই টান পড়িতে লাগিল। আজ সে পুনরায় নিজেকে নিরাশ্রয় মনে করিতে লাগিল। আজ যে আর কিছুতেই অত্র যোগ করিয়া রাখা যায় না। সে ক্রমশ আসন্নবর্ষের যেষ্টের মতন গভীর শমথমে হইয়া উঠিল। চড়াবোধে সেতারের মতো তারার সমস্ত ভাবের বেগনার অন্তরন করিয়া উঠিতে লাগিল, কথা বলিতে গলা কাঁপিয়া বাইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় যখন বিপিনের খাজার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল তখন আর সে নিজেকে সঞ্চরণ করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। অবশেষে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

সে বসেই চক্ষু মুছিয়া আশ্রয়সঞ্চরণ করিতে চেষ্টা করে অত্র ততই উজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।

সন্ধ্যার সময় রোহিণী ঘরে প্রদীপ দিতে আসিল। মালতী ভাড়াভাড়ি চোখ মুছিয়া, অধর সংশ্লিষ্ট করিয়া বাসিয়া রহিল। রোহিণী দেখিল মালতীর মুখগানি সন্ধ্যার পঙ্খের মতো আলোহিত। স্নানিমাধ করিয়া উঠিয়াছে; তাহার উপর প্রদীপের সোনাগি অস্তা যেন অস্ত্রপুর্ষের কঙ্কর্ণের মতো ছুড়াইয়া পড়িয়াছে। রোহিণীর নরন মুখ হইয়া চাহিয়া রহিল, প্রদীপ রাখিতে সে জ্বলিয়া গেল। খানিকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া তাহার অস্ত্যত করণা বোধ হইল, সে লাঞ্ছনার স্বরে বলিল — বিদিশি তুমি তেজনি, দাদাবাবুর হস্ত বাওয়া হবে না, রাণীমা রাজাবাবুকে বলতে গেছেন।

মালতী আর নিজেকে সঞ্চরণ করিয়া রাখিতে পারিল না। সে উজ্জ্বলিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রোহিণীর সঞ্চরণে তারার এই দুর্দলতা প্রকাশ হইয়া পড়িতে সে বসেই লজ্জা বোধ করিতে লাগিল ততই তাহার কান্না বোধ করা যায় হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল — গোড়ারদুখী তুমি বেরো আমার সামনে থেকে। আমাকে তুমি এমন ভাবে কেন আস্বাস, কেন দয়াস? আমি তোমার কি করেছি? আমি শুনেছি চাইনে চাইনে তোমার দাদাবাবুর কথা। আমার অপমান করিসনে! তোমার পারে পড়ি তুমি যা। তুমি যা!

রোহিণী অত্যন্ত হইয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া প্রদীপ রাখিয়া প্রদীপন করিল, সে বসিতেই পারিল না মালতীর প্রকাশ বাগদারের গর্গ কি? মালতীর এট কণ্ঠ দেখিয়া তাহার হাসা উঠে, না, রাগ করা উচিত, না, কাঁদাই উচিত! এমন রক্তময়ী ছটিলচরিত্র নারী যে সে বাপের জন্মেও দেখে নাই ইহা সে অকপটেই স্বীকার করিল এবং ইহা তাহার মরলতা ও সত্যবাদিতার একমাত্র নিদর্শন বলিয়া লক্ষ্য করিলেই তাহার কথার বেশ ভোনের সহিত সার দিল।

মালতী যখন শুনিয়া যে বিপিনের বাওয়া সঞ্চরণে প্রতিবন্ধক ঘটতেছে এবং সকলেই তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য অশেষবিধ চেষ্টা করিতেছে তখন তাহার অন্তরে একটি অস্বীকৃত আনন্দ উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এবং আনন্দ উল্লাসের অস্বত্ব যখন ক্রমশ অস্বীকার

করা অগস্ত্য হইল তখন সে গলাধ কাপড়
বিধা হাত কোড় কবির উর্দ্ধনেত্রে প্রার্থনা
করিতে লাগিল—হে ঠাকুর, তাঁর যেন
থাকা না হয়, তাঁর যেন থাকা না হয়।
তাঁর মনে বল দাও, তিনি যেন সকল
বাধা অতিক্রম করিতে পাবেন। আমার
কাছে থেকে তাঁকে দূরে নিয়ে যাও হে
ঠাকুর!

এমন সময় হরিবিহারীর
পশ্চাতে গিরির বাকমলের শব্দ
গেল।

গিরি পুত্রের নিকট পরাস্ত হইয়া
আমীর কাছে গিয়া কাঁদিল: পড়িয়াছিলেন।
তিনি আমাকে বলিলেন—আমার বিগিনকে
তুমি হাড়িরে দিচ্ছ, আমি এই শূণ্য
পুরীতে কি করে থাকব? আমাকে হুঙ্ক
পাঠিয়ে দাও।

হরিবিহারী বলিলেন আরে কেপঁছ
কেন? বিগিন যাবে কোথায়? কোথাও
যাবে না, তুমি নিশ্চিত হয়ে থাকবে।

গিরি বলিলেন—তার মোট-মাটির
বাধা হয়ে গেল, তুমি বলছ সে যাবে না!
তুমি নিষ্ঠুর পাবাণ নিশ্চিত থাকতে পার,
কিন্তু মাগের প্রাণ নিশ্চিত হবে কি করে?

হরিবিহারী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন
—চল, আমি এক কথা বিগিনের যাওয়া
বন্ধ করে দিচ্ছি। সে আর যাবার নামটি
করবে না।

গিরি আশ্বস্ত হইয়া আমীর সহিত
পুত্রের কক্ষবारे আসিলেন। তাঁহার দ্বন্দ্ব
আনন্দে আশার ফাটিল। পড়বার উপক্রম
করিতেছিল। পুত্র পিতার কথায় প্রতি-

নিবৃত্ত হইলে মাতা পুত্রকে কি কি স্নেহের
অনুরোধ করিবেন গিরি তাহাই উৎকর্ষ
মনে চিন্তা করিতেছিলেন।

হরিবিহারী বলিলেন—বিগিন, আমার
ওপর রাগ করে ত' চলে যাওয়া হচ্ছে,
কিন্তু আমার জিনিষগুলির প্রতি ত বেগে
অহিংস, দেখছি। যব সর্দারই ত বেধে
কড়ো কবেছ। আমার কোনো জিনিষ
তুমি নিয়ে যেতে পারবে না, বলে দিচ্ছি।

বিগিন অবাক হইয়া পিতার দিকে
চাহিয়া চাহিয়া বলিল—বেশ তাই হবে,
আমি এক কাপড়ের বাব।

হরিবিহারী মনে করিয়াছিলেন তাঁর
এই কমিদারী চালটি একেবারে অকাটা,
বিগিনকে জিনিষ লইয়া ঘাটেতে বারণ
করিলে বিগিন আর একপাও নড়িতে
পারবে না। কিন্তু বিগিনের বুদ্ধতা দেখিয়া
তাঁহার সে জুল একেবারে ভাঙিয়া গেল।
এর পর আর পুত্রকে ঘরে থাকিতে
অস্থির করাও চলে না। অতঃপর পুত্রের
নিকট সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া এবং
গৃহিণীর নিকট তিরস্কৃত হইবার কয়ে
হরিবিহারী সেখান হইতে বিনা বাক্যব্যয়ে
পলায়ন করিলেন।

গিরি ভাড়াভাড়ি দিয়া বিগিনের হাত
চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বিগিনও
কাঁদিতে লাগিল। অমেকক্ষণ অশ্রুধর্মের
পর গিরি বলিলেন—কর্তার মতিচ্ছন্ন
হয়েছে, কি বলেন কি করেন তাঁর ঠিক
নেই। ভাড়াভাড়ি এলেন, আমি মনে
করলাম সাপ্তান করতেই আসছেন। পোড়া
কপাল ঠর বৃদ্ধির!... মাথা খাস বাবা

রাগ করিলেন। ও তাঁর বাপট ত,
রাগের মাথাব যদি কিছু বলে থাকে ত
কিছু মনে করিল নে। ওর চরে আমি
তাঁর কাছে ঘাট মানছি।

বিপিন চৌধুরী বলিল—ওকি মা,
ওতে আমার অকল্যাণ হবে। বাবা
বলেছেন বলে আমি রাগ করছি নে;
কিন্তু মা এবাড়ীর কোনো জিনিষই আমি
আর ব্যবহার করতে পারব না। সেরে
দানে অযোগ্যকেও অধিকারী করে তুলে;
শিত বখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে অযোগ্য
অন্ধ, কিন্তু মায়ের অজ্ঞান দান ঘেঁহে
সহজ বলে তার নিতে লজা নেই; কিন্তু
কেউ যদি দেওয়ার অহঙ্কারেই দান করে
তবে সে দান মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে
তোলে—দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েরই।

—তা তুই ঠৈকৃৎ বিষয় ছেড়ে দিবি?

—হলই বা মা ঠৈকৃৎ? আর হলই
বা তা বিষয়? যেখানে সেরে সম্পর্ক
দেবাগাওনার ঈর্ষাখরচ কাটে সেখানে
বিষয় শিব হয়ে ওঠে। এ সম্পর্কিতে আমার
আর অধিকার নেই। আমার অংশ
আমি বিনিকে লেখাপড়া করে ছেড়ে
দেখে।

—হুঁ, বাবা, এসব কি পাগলামি
করছিস। বা তুই কিছুদিন পশ্চিমে বেড়িয়ে
আয়। পোষ মাল বলে আমি আর
আশঙ্কি করব না। তবে কি তুই কালই
যাবি? কি নিতে খুঁতে হবে বল জোগাড়
করে দি।

—কালই যাব মা, কিন্তু জোগাড়
কিছুই করতে হবে না। এক কাপড়েই

যাব আমি। এবাড়ীর কোনো জিনিষ
আমার অপ্সর।

—আবার পাগলামি হবে। আচ্ছা
তুই যাবের জিনিষ না নিস, আমার
জিনিষ ত নিতে পারিস। এসময় জিনিষ
আমি তোকে আমার জীধন থেকে দিয়েছি
মনে কর। আর তাঁরও ত নিজের
মৌতুক-পাওরা জমিদারি আছে।

—সে মা, আমি কিনোয়ের পাঠ-
খালার ক্ষেত্রে দান করে দিয়েছি।

—কি সর্বনাশ! তিন তিনখানা তালুক
পাঠখালার দান! বা খুঁসি তোম করবে
বা। তোকে অলক্ষীতে পেয়েছে, আমরা
কি করব আপনায় সর্বনাশ যদি তুই
আপনি ডেকে আনিস।

পুত্রের এতবড় অব্যবহারতার গির্গি
বিগ্গিত কুক কুক হইয়া হনহন করিয়া
দেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

নিধিরাম জিজ্ঞাসা করিল—কালই
যাওয়া ঠিক হল তাই?

বিপিন বলিল—হ্যাঁ নিধিমা।

নিধিরাম আবার পোটলাপুঁটলি বাঁধিতে
বাস্ত হইল। বিপিন বলিল—ওসব আর
তাঁর বাধাবাধি করতে হবে না নিধিমা;
আমায় কিছুই দরকার নেই।

নিধিরাম বোচকা বাঁধিতে বাঁধিতে
বলিল—তোমার না দরকার হতে পারে,
কিন্তু আমার ত হবে।

বিপিন বলিল—না না, তাঁর বেতে হবে
আমি একলাই যাব।

—আমার যেতে হবে কি হবে না, সেটা
তোমার চেরে আমি বেশি জানি। তোমাকে

এতবড়টা করলে কে? তোমার নিখিলা
যেদিন মরবে সেদিনই তোমার কাছ
ছাড়বে; তার আগে নয়।

বিপিন এই যেহেতু তুমার মেহের
দাবী অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া চূণ
করিয়া বসিয়া রহিল।

এমন সময় বিনি ঘরে আসিয়া বিপিনের
কোলে কাঁপাটখা পড়িয়া বসিল—বলদা,
মা বলদিল তুমি কলকাতার শানিরে দখল
মা কাঁদতে, আমি দোত দেবো না।

এই বলিয়া বিনি বিপিনের গলা
জড়াইয়া ধরিল। বিপিনও তাহাকে বুকে
চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। শিশু
বাহিরে দেখিয়া আসিয়াছে মা কাঁদিতেছে,
এখানে আসিয়া দেখিল দাদা কাঁদিতেছে,
সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অপরিস্রুত
বেদনায় ভঁরা করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।
বিপিন চোখ মুছিয়া তাহাকে সাবধন করিবার
লাগিল। নালিকা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে
কাঁদিতে তাহার বুকের উপর ঘুমাইয়া পড়িল।

পানের ঘরে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া
বসিয়া মালতী যখন শুনিল যে বিপিনের
বাগর্য্য হৃদিত হইল না, তখন দ্রুত ও
আনন্দের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় তাহার জগন
জড়িয়া পতন হইবার উপক্রম হইল।
সে সমস্ত রাত কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ মুখ
লাল করিয়া ফুলিল। এখন তাহার
কেবলই মনে চইতে লাগিল তাহার জন্মই
বিপিন দেবত্যাগী হইতেছে।

সমস্ত রাত্রি দুর্ভাবনায় জাগিয়া থাকিয়া
অতি প্রত্যুষে মালতী ঘর হইতে বাহিরে
আসিয়া গাড়াইল।

তখনো দেবকন্ডা উষা আসিয়া
আকাশের আঙ্গিনা হইতে সমস্ত রাতের
স্বপ্ন বাসি তাহার ফুল খাট দিয়া সোনার
ছড়া দেয় নাই। অনেকের পুত্র-পাড়ের
ধৌপুকার অশ্রু-গাছে সেবে মাত্র বুলবুল
হোয়েল জ্ঞান আসিয়া উঠিয়া স্বপ্নের কুণ্ডল।
প্রকৃতিকে জাগাইতেছিল; প্রকৃতি তখনো
কোমলার চান্দরে মুখ ঢাকা দিয়া নীরবে
ঘুমাইয়েছে; নীঘির শালা কলের ফটক
যেক্ষণ উপর লম্ব চরণ ফেলিয়া বাতাস তখনো
ভাঙিতে আরম্ভ করে নাই। স্তব্ধ
পুষ্করী যেমন বনদেশের নদীর মতো
পড়িয়া রহিয়াছে,—যদি সন্ধ্যার রঙের একপানি
প্রকৃত হইত তাহা। বেগুনী রঙের আকাশ
তখনো নিভার রঙে, তাহার প্রত্যাশন
নাড়ীর গতি গ্রহচারণার নদন করিতেছিল।
পশ্চিম দিগন্তে কমলা রঙের গাল মেলিয়া
চন্দ্র তখনো অস্ত সাগরে পাড়ি দিতেছিল।
কিন্তু তখনই বৃদ্ধ ভ্রমরী পুষ্করপাড়ের
বাগানে পুষ্পচরন করিতে করিতে মধু
উদাস স্বরে ভজন গাহিতেছিল।—

আর ইহার তুরেন বার ফুল!

পাত পাতের তুই রঙিলে,

তুই রঙিলে ফুল!

মালতী নিখাল রক্ত করিয়া শুনিতে
লাগিল, বিপিনও জাগ্রত হইয়া পানের ঘরে
যাত্রার উত্তোগ করিতেছে। মালতী একপা
একপা করিয়া বিপিনের ঘরের দিকে ঘরে
আর পাবে। অনেক ইতস্তত করিয়া মালতী
বিপিনের ঘরের দরজার সামনে গিয়া দ্বির
হইয়া গাড়াইল। বিপিন তাহাকে দেখিয়া
অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

মালতী লজ্জাকণ্ডিত কণ্ঠে বলিল—
আপনার যাওয়া কি একেবারে ঠিক ?

বিনিন গভীর ভাবে বলিল—হাঁ।

—কবে ফিরবেন ?

—এ বাড়ীতে আমি আমার কেরবার মো-
নেট। এট আমার অগত্যা-যাত্রা।

মালতী মাথা নীচু করিয়া মুহূর্তবে
বলিল—আমি আপনার সঙ্গে যাব।

বিনিন বিস্মিত হইয়া বলিল—তুমি
একাপায়ে যাবে মালতী ?

—বেথানে নিয়ে যাবেন।

বিনিন মালতীর দিকে চাহিয়া "অগ্রসর
হইয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল—
তবে কাল আমার অমন করে হুঃখ দিলে
কেন মালতী ?

। মালতী মুহূর্তবে বলিল—পাছে আপনারকে
আমার ক্ষেত্রে মা বাপকে ত্যাগ করতে হয়।

বিনিন বলিল—আজকে আমি সব ছেড়ে
তবে তোমার পেলাম। তোমার মূল্য
এতদিন আমি বুঝিনি।

মালতী নত হইয়া বিনিনকে প্রণাম
করিতে যাইতেছিল। বিনিন তাহাকে বাহ
বেইটেন তুলিয়া ধরিয়া ফুনের মধ্যে তাহার
মুখখানিতে চুৎনের পর চুৎন করিল। তখন
লজ্জা আসিয়া মালতীর চোপ ছুট চাপিয়া
ধরিল, যেন লজ্জাপতী লতা স্পর্শ পাইয়া
চলিয়া পড়িল, যেন মৃত্যুগর্ভে স্তম্ভিত
হইল, যেন অস্ত্রধারি শেখ ফিরগাট বৃকে
করিয়া কমলদল বন্ধ হইল। উভার অকরণাগ
তখন সমস্ত স্বরূপানিকে সর্ববিবাহের রক্তিম-
ক্ষৌদ্র রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল; মালতীর
হালিস মধ্যে সেই লালিমা বিনিনের অস্ত্র

বাহিরের মধ্যে সেই স্বরূপানিকে বিবাহের
রক্তে রাঙাইয়া তুলিয়া বিনিনের অনির্গতনীর
ভাবনার বাসনার সোনা মাখাইয়া দিতেছিল।

প্রথম-বেদনার তাড়নার উপবাটিকা হইয়া
আপনাকে দান করার লজ্জার মালতীর
চেতনা আকর হইয়া গিয়াছিল। তল্লভ
প্রাণিতকে পাইয়া বিনিনের আনন্দ তাগকে
বিসৃষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। হঠাৎ তাহাদের
হৃৎসর আবেগ ভাঙিয়া গেল—তাহারা দেখিল,
গিরি ও খুড়িমা আসিয়া দরজার সামনে
স্তম্ভিত হইয়া তাহাদের দিকে তাকাইয়া
দাঁড়াইয়া আছে।

বিনিন মালতীর হাত ধরিয়া তাহাদের
সম্মুখে প্রণাম করিল।

গিরি চীৎকার করিয়া বলিলেন—ছোট
বো, এমনি করেই কি শোধ তুলতে হয় ?

খুড়িমা মে কথায় কান না দিয়া
বিনিনকে কণ্ঠের সঙ্গে বলিলেন—বিনিন,
তোমার ওপরে আমার বড় বিশ্বাস ছিল।
তোমরা বাপে বেটার মিলে আমার ধন যান
ছ-ই নষ্ট করলে।

বিনিন বলিল—খুড়িমা, তুমি আমার ভুল
বুঝো না, মালতী আমার স্ত্রী, মালতীকে
আমি বিয়ে করব।

খুড়িমা গিরির দিকে ফিরিয়া বলিলেন—
দাদি, বড়ঠাকুরকে বলে আমার কাই
পাষ্টিরে দাও, আমি আর এ বাড়ীতে
থাকব না।

গিরি গাঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—
মনস্ত্যামনা সিদ্ধ হল, আর থাকবে কেন ?

দেখিতে দেখিতে বাড়ীর সকল লোক
আসিয়া সেখানে ভিড় জমাইয়া তুলিল।

হরিবিহারী ক্ষতপদে আসিয়া বলিলেন—
পাকী এসেছে তোমরা সব এখনি—দূর
হও। তোমরা ননে করেছ এমনি বড়বুজ
করে হরিবিহারী রায়কে জখ্য করবে ?
হরিবিহারী রায় জখ্য হবার পাত্র নর।
তোমরা শিগগির দূর হও।

সেই সময়ে প্রভু-পরিবারে বিপ্লবের সংবাদ
না আসিয়া বৃদ্ধ হুবেজি তুলসীদাসের সামান্য
পাঠ করিতেছিল—

প্রমুদিত পুনরনারী সব সজাহঁ জয়দলচাঁর।
এক প্রবিসহঁ এক নির্গমহঁ ভীর ভূদলবাহার॥
হরিবিহারী ক্ষতপদে সেখান হইতে
প্রস্থান করিলেন।

—মা, এ বাড়ীতে থাকার ঘেহাদ
ফুরিয়েছে— তবে আমরা বাই—বলিয়া
বিশি মালতীকে লইয়া গিরিকে আবার
প্রণাম করিল। পরে খুড়িমাও প্রণাম করিয়া
সরোজননে বলিলেন—দাদি, আমি জন্মের
মতো তোমার চরণে ভেড়ে যাচ্ছি, আমার
জন্তে তোমাকে অনেক দুঃখ ভোগ করতে
হবেছে; ভেনে হোক না ভেনে হোক,
ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তোমার কাছে
যে অপরাধ কবেছি তা মার্জনা করে
আমার বিদায় দাও।

গিরি দে কথার কোনো জবাব না দিয়া
অন্যত্রিকে ধসুটীজ্ঞারের মতো বাজিয়া বলিলেন
—আমার যে মর্জনাণ করে যাচ্ছে তারও ঘেন
ভাল না হয়, ইহপরকাল নষ্ট হয়। ভগবান
আছেন !

খুড়িমা বলিলেন—হাঁ দাদি ভগবান
আছেন। আমি যদি কখনো তোমার অনিষ্ট-
কামনা করে থাকি তবে আমার ইহকাল

ত নেই-ই, পরকালেও ঘেন অশেষ দুর্গতি
হয়,—এ কথা আমি তীর্থে যাত্রা করে
তীর্থের দিকে যুখ ফিরিয়ে বলছি, যা
বিবেচনা ঘেন আমার চরণে স্থান না ঘেন।
গিরি আর কোনো কথাই বলিলেন না।
পুত্রের আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় মাতার
চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল না, একটি নিবেদ
বাণীও উচ্চারিত হইল না—পুত্রের বারবার
বিত্রোহাচরণে মাতার মনও এমনি প্রতিহত
হইয়া উঠিয়াছিল। বিধবার বিয়ে! এত-
কড় অনাচার কেহ কখনো দেখে নাই শুনে
নাই।* আজ চোখের সামনে প্রত্যক্ষ দেখিয়া-
বাড়ী-মুখ সকলে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া
গিয়াছিল। এমন সময় বিনি আসিয়া
মালতীর হাত ধরিয়া তাহার কচি যুখ-
খানি তুলিয়া আশ্রয়ের সহিত জিজ্ঞাসা
করিল—মাতীদি, তোলা বিয়ে? বলবার
হুসে তুই ছুচুল-বাণী দাচ্ছিল? আমিও
তোলা ছুসে ছুচুলবাণী দাবো!—বলিয়া বাড়
কাত করিয়া সে মালতীর সম্মতির অপেক্ষা
করিতে লাগিল। মালতী তাহাকে কোলে
তুলিয়া অশ্রুসিক্ত চুপন করিল।

বিনোদ লাকাইতে লাকাইতে আসিয়া—
মালতীদি, তুমি আমার বোদি! আমি
নৌদির দিতব্য!—বলিয়া বলিয়া চীৎকার
করিতে করিতে মালতী ও বিশির্কে প্রদক্ষিণ
করিতে লাগিল।

হায়! শিবুরা জানে না যে এই বিবাহ
আনন্দের দ্বারা অভিনন্দিত নহে, ইহা দুঃখের
দ্বারা অভিশপ্ত। এ বিবাহে মঙ্গলশব্দ বাজিল
না, পুরাণনারী হুলুধনি করিয়া বহুবধকে
সম্বর্ধনা করিল না, কেহ আশীর্বাদ করিয়া

৩২শ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

বরষখুঁকে বরণ করিল না। কিন্তু তবু টহা
বিবাহ।

পান্ডার কাছে আসিয়া মালতী
বিনিকে নামাইয়া পাকীতে উঠিল। বিনিও
ছুটয়া পাকীতে চড়িতে ঘাইতেছিল, বোহিণী
ধরিয়া কোলে তুলিল। বিনোবকে হাবার
মা গ্রেপ্তার করিল। বিনি বিনোবদাসীদের
কোলে-বন্দী হইয়া মৃত্যু হইবার ভয় ছুটফট
করিতে করিতে চাঁৎকার করিতে লাগিল—
‘আমি যাব! আমি যাব! দাদার বুকে
দেখতে আমি যাব!’

পাকীতে মালতী ও গুঁড়িমা চড়িয়াছেন।
হাতীতে বিনি চড়িল; এমন সময় নব-
কিশোর আসিয়া চাশিচা বলিল—বাঁপিন
ঠিক সময়ে এসে জুটে গেছি।

তাঁহারা যাত্রা করিল। এই দুঃসহর সময়ে

পৌষাণ্ডে অকৃত্রিম অস্বস্তির তাহার। নাকী হইতে
বিদায় লইল, কিন্তু ইহাদের মূখের দিকে
চাহিয়া, না গৃহস্থের অকল্যাণের হয়ে কেহই
ইচ্ছানিগকে আহ্বান করিয়া ঘাইতেও অগ্রসর
করিল না। তাহারা শূন্য উদর ও ভরা
হৃৎ লইয়া যাত্রা করিল। তাহারা সকলেই
নির্দ্বন্দ্ব নিঃশঙ্ক। তখন সমস্ত প্রকৃতি মধ্যাহ্ন-
শ্রমে অন্ধ। শুধু বিনোব আর বিনির
তীক্ষ্ণ চাঁৎকারধ্বনি বিবাহ-উৎসবের
সানাইয়ের শব্দের মতো দূর হইতে ভাসিয়া
আসিতেছিল। ক্রমে তাহাও ক্ষীণ হইতে
ক্ষীণতর হইয়া স্বজন-সম্পর্কের ক্ষীণ স্মৃতির
মতো মিলাইয়া গেল। এখন বিনির ও
মালতী “ভাবিতেছিল—এই আমাদের বিবাহ।
কী ভবিষ্যৎ স্বরূপ এই উৎসব!

(ক্রমশঃ)

চাঁক লক্ষ্যোপাধায়।

আলো

এ আলো কোবার পোলে বহনি?
ময়নে বহনে ছুটে, শিরার শিরায় ছুটে,
অলকে অলকে দিন রজনী।
এ আলো কিসের আলো বহনি?

বোঁধেছি রবির আলো আকাশে,
কোথা তাহে ঢল ঢল এ ভাবনা হুকোমল
সে যে তীর উন্ন জ্যোতি বিকাশে।

লম্বীর তারার আলো আঁধারে সে লাগে ভালো
চোখে দেয় সুমঙ্গল লাগিয়ে
সকল ফুটারে তোলা এ যে নব দিব খোলা
সকল পরাণ দেয় আগিয়ে।

মনের পাতাল তলে সে প্রেমমাখিক আলো
তারি আলো ছুটে দিন রজনী।
এই সে প্রেমের আলো বহনি।

ঐতিহ্যের স্মরণে বাগী।

চয়ন

রাজ-ভাস্কর স্টিফ্যান্‌ সিভিং

স্টিফ্যান্‌ সিভিং যুবক মন,—ভাঁহাৎ বয়স এখন উন্নততর বয়স। ভাঁহাৎ জীবনযাপী লাবন্য এখন পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং, ভাঁহাকে লইয়া দু-চারিটা কথা বলিবারও সময় আদিয়াছে। World's Work-এ ভাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে; আহা! তার সার-সংকলন করিয়া দিলাম।

মরওয়ের ডোনথিম্‌ নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভাঁহার অদৃষ্টে কলাবিদের পক্ষে সুদূরত বিখ্যাতশিল্পের শিক্ষালয়ের অবকাশ ঘটিয়াছিল। কলাবিদেরা প্রায়ই আপনাদের প্রতিভাকে শিল্পকাল হইতেই কাজে লাগাইয়া দেন,—পুঁথিগত বিজ্ঞান দিকে ভাঁহাদের মন বড় একটা ঘাইতে চাহে না। কিন্তু সিভিং আগে জীবনের জ্ঞান এবং চরিত্র অহুশীলনের দিকে মনোযোগ দিয়া পরে শিল্পকলার চর্চা আরম্ভ করিয়া-ছিলেন।

ছাত্রজীবন বয়স বয়সে অবিকাশে শিল্পীরই জীবনের গতি বিরূপিত হইয়া যাও, শিল্প কলাতেও ভাঁহাদের হাত তখন নিপুণ হইয়া ওঠে, শিল্পক্ষেত্রে ভাঁহাদের মন্য করিবার সময় আর পাকে না। কিন্তু সিভিং, এই পরিণত বয়সেই, পাঠশালার পড়া সার করিয়া, শিল্পকলাকে আপন জীবনের সঙ্গীতবেশে গ্রহণ করেন।

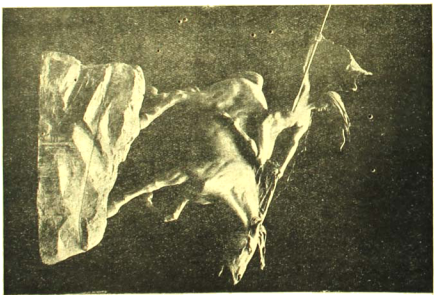
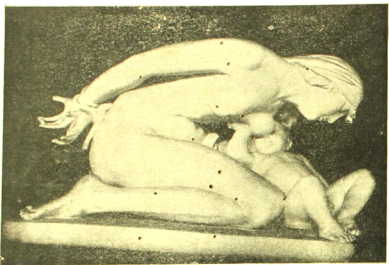
কিছুকাল তিনি নিজের ঘরে বসিয়াই শিল্পশিক্ষা করিতে লাগিলেন। ভাঁহার পর,

তিনি বার্লিনে গিয়া একজন ওস্তাদের ছাত্র হইলেন। এখানে ভাঁহার প্রতিভা এত দূর বিকশিত হইয়া উঠিল যে, ছয়মাস কাল শিল্পশিক্ষা শিক্ষা করিয়াই তিনি পাকা হইয়া উঠিলেন এবং নিজের শক্তি সম্বন্ধে ভাঁহার বিশ্বাস দৃঢ় হইল। তখন তিনি আপনার সম্মুখিতে আবার কিরিয়া আসিলেন।

ভাঁহার পর, তিনি দশবৎসর কাল ফ্রান্স ও ইতালী দেশের প্রাচীন শিল্প দেবতার জন্ত বিখ্যাত স্থানগুলিতে ভ্রমণ করিয়া আপনার কলাভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ করিয়া তুলিলেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কোপেনহেগেন নগরে কিরিয়া আসিলেন। তখন ভাঁহার বিকশিত প্রতিভার খ্যাতি শীঘ্রই দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। এখানে তিনি ডাঃ কাল' জ্যাকবসন নামে একজন কলারসজ্জ দানবানের সহিত পরিচিত হইলেন। সিভিং যে-সকল মূর্তি তৈয়ারি করিতেম, এই দানী বহু সেগুলি যথোপযুক্ত মূল্য দিয়া গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সহায় ও উৎসাহ দিতে লাগিলেন। সিভিংও ডেনমার্কই স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া গেলেন।

সিভিং এর আর্টের একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা অত্যন্ত যুগের অহুসারী হইয়াও নিম্নমান যুগের এবং কলাবিদের নিজস্ব বিশেষত্বের পরিচয় দিতে পারে। ঐক্য তাৎপর্যের অহুসরণ বা ভাঁহার



ভিতরে জীবনসকাব করা এ যুগে অসম্ভব। কারণ, তাহার মূলে যে প্রাণটি ছিল, এখন তাহা নাই। সিঙিংও সে ধার দিয়া যান নাই।

গ্রীক ভাস্করেরা 'মনে করিতেন' যে, মানবের সযোজক হইলেও প্রকৃতি সর্পাস-জন্মের, চির-নশ্বিতা, চিরস্থিতি; প্রকৃতিতে গুপ্ত নাই, প্রকাশ্য নাই, মুহূর্ত্ত নাই। গ্রীক ভাস্কর জীবন্তবৎ আকাশের মধ্যে এই 'জংলজরামৃত্যুহীন' জন্মের প্রকৃতিকে সূচুটিতে চাহিতেন। সেইজন্য, বাহ্যিকিচ্ছ কৃত্রিম, অস্থির, বিকৃতভাঙ্গ বা মূর্ত্তবৎ, তাহা গ্রীক আদর্শের পরিপন্থক ছিল।

কিন্তু এ যুগের লণিতকলা মানবতার ভিতরে, অপূর্ণতার ভিতরে, রহস্যের ভিতরে, গুপ্ত, মুহূর্ত্ত ও কুসংস্কারের ভিতরেও আয়ত্বকাশ করিতে চাহে। সিঙিং এই শ্রেণীর লণিতকলাকেই গ্রহণ করিয়াছেন।

সিঙিংয়ের বিখ্যাত মূর্ত্তি দুইটি মধ্য "অমভা মাতা" ও "বিপত্তীক"ই সর্বপ্রথমে নির্মিত। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বার্লিনের বিখ্যাত প্রদর্শনীতে তাহার "অমভা মাতা" এবং "মানব-মানব" নামক কারুকাণ্ডটির নমুনা সর্বসাধারণের সাগ্রহে দৃষ্ট আকর্ষণ করিয়াছিল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের প্যারী-প্রদর্শনীতে তাহার "বলিনী মাতা" প্রদর্শিত হইয়া Grand Prix পুরস্কার লাভ করে। তাহার "বলিনী মাতা" রোমক যুগের একটি সাধারণ 'ড্রাফেডী'কে মূর্ত্তিমান করিয়াছে। যুদ্ধে পরাজিত পুরুষেরা নিহত হইলে, তখন রমণী ও শিশুদের ধরিয়া দাসরূপে বিক্রী করা হইত। সিঙিংয়ের চিত্রবস্ত

এই—বিক্রীতা ও বলিনী মাতার ক্ষুণ্ণে তাহার শিশুপুত্র শায়িত। ছেলে মাথার স্তন চায়। কিন্তু মার হাত বাধা। ছেলের কাগর তাহার প্রাণ ফাটিয়া ঘাইতেছে, কিন্তু ছেলেকে তিনি আপনায় বৃক্কের ভিতরে টানিয়া লইতে পারিতেছেন না। তাই তিনি অতি কষ্টে সামনে হেঁট হইয়া, কোনরকমে ছেলের মূণের কাছে আপনায় বৃক্কি আগাইয়া দিতেছেন। জননীর মুখে একটি অসহায় কাতরতার ভাঙ্গ, কলাবির অতি নিপুণতার সহিত পরিমুদ্রিত করিয়াছেন।

ইহার পর সিঙিং "রণ-রঙ্গিণী" "জননী বহুমতী" ও "প্রতিভামহী" নামে তিনটি অতি চমৎকার মূর্ত্তি গঠন করেন। এই সময়েই তিনি স্থানিনেন্ডহার "রাগ-ভাস্কর"র গৌরব লাভ করিলেন।

রণ-রঙ্গিণী নামক অদ্বুত প্রাণ-মূর্ত্তিতে, "অচল পাখাণের মাঝে গতি বিরূপ ক্ষুটিয়াছে, তাহা শিরসসম্মুখ দেখিলেই বৃক্কিতে পারিবেন। বোড়াটি পাহাড়ের উপর হইতে সগর্বে ছুটিয়া নামিছে। আসিতেছে—মূর্ত্তির সর্গোজ—এমন কি,—তাহার দেহের প্রতি রেখাটি পর্যন্ত যেন নড়িতেছে! হঠাৎ দেখিলে মনে হইবে, এ যেন শব্দীরা বিহ্বল!—তেমনি চপল, তেমনি গতিময়! পাখাণের ভিতরে গতির এমন বিচিত্র লীলা সচরাচর চোখে পড়ে না।

সিঙিংয়ের "প্রতিভামহী"র মূর্ত্তিটি চমৎকার।

জীবনের সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ প্রায়,—সমুদ্রে অনন্ত রজনী ঘীরে ঘীরে ঘীরে ঘনাইয়া আসিতেছে। পৃথিবীর কর্তৃত্ব আর এখন

পৃথিবীতেই নারায়ণ রাধাবার, সময় মনকে চারিদিক হইতে টানিয়া আনিয়া আসিয়াছে। এই প্রান্ত অঞ্চল শান্ত বৃত্তার সেই পরমশুদ্ধের চরণে একাঞ্ছ কবিতা মুখের দিকে চাহিলে মনে হয়, অতীতের বলিতেছেন, “বেলা গেল” প্রভৃ! আমাকে চোমার কাছে ডাকিয়া নাও, ডাকিয়া নাও।”

বই-পড়ার কথা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতপূর্জ প্রেসিডেন্ট মিঃ থিয়োডোর রুজভেল্টের নাম, বেশ করি পাঠকদের কাছে অপরিচিত নহে। তাঁহার মত অনেক-বই-পড়া লোক। অল্প যুক্তবাক্যে মর,—পৃথিবীতেও খুব বেশী দেখা যায় না। সংগ্রহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা চইরাছিল, কখন, কেমন করিয়া, তিনি কি-কি বই পড়েন? মিঃ রুজভেল্ট উত্তরে যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা আমেরিকার The Ladies Home Journal-এর এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—

“যাঁহারা লব্ধ-সাহিত্যের স্তর, যাঁহারা কোন গভীর বিষয় পড়িতে ভালবাসেন না, যাঁহারা খালি ব্যঙ্গ ও খেলা লেখা নিয়া মাতিয়া থাকেন, তাঁহারা যথার্থ ভাল বই পড়িবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। যুগের পক্ষে দুর্জয়তঃ প্রারম্ভিক অক্ষমতা যেমন অজ্ঞার, মনের পক্ষেও যেমন মনসিক পবিত্র্যে অপাঙ্গতা থাকা উচিত নহে।

কোন পুরুষ বা স্ত্রী, যুগ বা যুবতী যদি ভাল পুস্তক উপভোগ করিবার প্রস্ত আপনার মনকে প্রস্তুত রাখিতে চান, তবে প্রথমে গিগন বা সেকলে বা এমন-কোন

শক্তিশালী লেখকের লেখা পড়িতে” স্তর করন; যতদিন না তাঁহাদের মনবোধ চর, ততদিন তাঁহারা উৎসাহের মচনাশাঠে যেন বিরত না হইন। এই পরীক্ষা পার হইতে পারিলেই, তাঁহারা আপনাদের উপযোগী সাংলো পুস্তক, আপনাদ্বাই বাছিয়া লইতে পারিবেন।

পাণ্ডার মত পড়াতেও রুচি একটা মত ব্যাপার। আমি ‘অমুক’ জিনিষটা খাইতে ভালবাসি, ‘অমুক’ জিনিষটা ভালবাসি না। এই ভাল বালা না বাপার উপরে কারর মের ঋণে, না। পড়াতেও এইরূপ। Guy Mannering, The Antiquary, Pendennis, Vanity Fair, Our Mutual Friend ও Pickwick Papers আমি বারংবার পড়িয়াছি। কিন্তু Fortunes of Nigel, Esmond ও Old Curiosity Shop-এর অধিকাংশ স্থান পড়িতে গিয়া আমাকে গলদ্বর্ষ হইতে হইয়াছে। প্রথম ছয়বানি বই-এর মত শেষের বই তিনবানিও যে খুব ভাল বই, তাতে আমার মনেই নাই। কোন কোন লোক হরত শেষের তিনবানিকেই বেশী ভাল বলিবেন; কিন্তু আমি যেমন ‘অমুক’ খাবার খাইতে ভালবাসি না, তেমনি ঐ বইগুলিকেও পছন্দ করি না।

কিন্তু আসলে বেগুলি সভ্যসভাই রক্ষা মাল, সে-গুলিকেও ভাল বলিলে ঠিক বলা হইবে না। Bel Ami নামক গেলো বইএর উপরে যদি কাহারাও ভক্তি থাকে, তবে তাঁহার সাধনান হওয়া উচিত। যদি কেহ Anna Karenina, War and Peace, Sebastopol ও The Cossacks কে অপছন্দ করিয়া Krentzer Sonata পছন্দ করেন, তবে অনেক খাতি ভিনিষ তাঁহার হাতছাড়া হইয়া যাইবে। এমন-কি তাঁহার পক্ষে টেলিগ্রাফ একেবারে ত্যাগ করাই উচিত। টেলিগ্রাফ একজন চিত্তগ্রাহী ও জন্মযোক্তক লেখক হইতে পারেন; কিন্তু নীতি-উপদেশকরূপে তাঁহাকে দেখাটা আদৌ নিরাপদ নহে।

কেবল আনন্দের জন্য বা-তা বাজে বই-পড়ার উৎসাহ কমাইতে হইবে। ছনিগ্রার বই আছে অগুণ্ঠিত—তার-মাঝেও কতকগুলি বইমাত্র পড়িয়া উঠিবার সুযোগ-পাওয়া যায়। পড়ুয়া নিজেদের কচিমত বই বাছিয়া লইয়া পড়িবেন। “অনুক এক-শো-খানা বই ভাল” বলিয়া অপর কোন লোক যদি পুস্তক-নির্বাচন করিয়া দেন, তবে সে নির্বাচন নিফল হইবে-ই-হইবে। একজন নির্বাচন কোন বিশেষ অবস্থার ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ফল-দায়ক হওয়া সম্ভব; কিন্তু ইহাতে সার্বজনীনতা নাই।”

প্রেম-ধর্মের হিংসাবাদ

আমেরিকার Everybody's Magazine-এ “When Christians Fight, Are They Christians” নামে একটি যুক্তিসঙ্গত নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে; তার সারমর্ম এই :—

পৃথিবীতে খৃষ্টের অহুসারী অনেক আছেন; কিন্তু, আমাদের ভিতরে ক্রীস্টান কে ?

খৃষ্টের আদেশে আছে যে, তোমার ডান গালে কেউ চড়ু মারিলে তুমি তখন তার সামনে বা গালটিও পাতিয়া দিবে। যদি কেউ তোমার জামাটি কাড়িয়া নিয়া যায়, তবে তুমি তাকে তোমার কাপড়-খানিও কাড়িয়া নিতে দিও। ‘প্রতিবেশীকে ভালবাসিবে ও শত্রুকে হুণা করিবে’—এ

কথা ভুল। তোমার যে শত্রু তাকেও ভালবাসিবে, তোমাকে যে অভিলাষ দিবে, তাকেও আশীর্বাদ করিবে, তোমাকে যে হুণার চকে দেখিবে, তার প্রতিও ভাল ব্যবহার করিবে।

এগুলি হইতেছে খৃষ্টধর্মের নিয়ম।

আজ খৃষ্টানে খৃষ্টানে যে মহাবুদ্ধি বাধিয়াছে, আজ খৃষ্টানকে মারিবার জন্য সৰ্বলোকে অখৃষ্টানকে আপন আপন দলে টানিতেছে, আজ যুরোপের শতকরা পঁচাত্তর জন বাসিন্দা খৃষ্টান হইয়াও যেরূপ হিংসার রক্তস্রোতে ঝাঁপটখা পড়িয়াছে, তাহা যদি খৃষ্টধর্মের আদি সাধুগণ দেখিতে পাঠিতেন, তবে হিংস সভ্যতার খৃষ্টান-ধর্মকে তাহারা কি ভাবিতেন ?

পৃথিবীতে খৃষ্টানের সংখ্যা ৫২,৪১,৫০,০০০ জন। যুরোপের কোন দেশে কত খৃষ্টান আছে, তাহারও তালিকা দিতেছি।

এই হিসাব ১৯০০ খৃষ্টাব্দের। গত কত বৎসরে যুরোপের লোকসংখ্যা অল্প কিছু বাড়িয়াছে। এই কোটি কোটি মানব, বাহ্যিক খৃষ্টের প্রেমের ধর্মে দীক্ষালাভ করিয়াছে, তাহাদের আর অধিকাংশই আর পরস্পরকে হত্যা করিবার জন্য তুলিয়াছে বা তুলিবার জন্য উত্তত হইয়া আছে।

কথা উঠিয়াছে এই যে, একালে ধর্ম-বিশ্বাসের মূল শিথিল হইয়াছে বলিয়াই এত দ্বন্দ্ব, এত অশান্তি ও এত সংকটাত্তর ভাবিতব্য দেখা যায়। যুরোপে খৃষ্টের প্রেম-ধর্মের ব্যর্থতার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া, অনেকে এই কথাটাই তুলিবেন—“যুরোপে খৃষ্টধর্মের আধিপত্য কম”; কিন্তু Religious Statistics হইতে একজন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, যুরোপে খৃষ্টধর্মের প্রভাব কমিয়াছে।

আমল কথা, যুরোপেই বল, বা অন্য কোথাও বল, আপনায় সুযোগ-সুবিধার

অন্ত মাত্ৰই যখন অপরের গলায় ছুরি বসাইবার চিকির করিয়াছে, খৃষ্টধর্ম ভগ্নন কিছুতেই মার্ত বজার রাখিতে পারে নাই। ইহার প্রমাণ আছে।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে লেপ্যান্টোর যুদ্ধে খৃষ্টানদের হাতে তুর্কীরা পরাজিত হওয়ার যুরোপের। আকাশে ইসলামের অঙ্কুশে উন্নয়ন হইবার আশা একরকম লুপ্ত হইয়া যায়। তাহার পর হইতে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে পরোপকারি বড় বড় যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, উহার ভিতর কেবল খৃষ্টান-খৃষ্টানে বিরামিহীত যুদ্ধ হইয়াছে। খৃষ্টানে-অখৃষ্টানে যুদ্ধ হইয়াছে—আটাইস বার। এবং অখৃষ্টানে-অখৃষ্টানে যুদ্ধ হইয়াছে, মার্ত পনেরো বার।

ইতিহাসের আরও প্রাচীন যুগের যবনিকা সন্ধানলে দেখা যায়, তখন অখৃষ্টান ও পৌত্তলিকেরাই যুদ্ধে মার্তিত বেনী, এবং খৃষ্টানেরা কম। কিন্তু খৃষ্টধর্মমূলক প্রভাব সত্তাবার উত্থানের পরে এখন দেখা দাইতেছে যে, অখৃষ্টান ও পৌত্তলিক অপেক্ষা খৃষ্টানেরই সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিক হইয়া গিয়াছে।

•	মোট জন সংখ্যা	খৃষ্টান	পারসেন্ট
যুক্তরাষ্ট্রের	৪,২২,০০০০	৪,২২,০০০০	৯৯.৪
ফ্রান্স	৩,২০,০০০০	৩,৮৮,০০০০	৯৯.৪
জার্মানী	৪,৬৪,০০০০	৪,৬৭,০০০০	৯৮.৭
বেলজিয়াম	৬৭,২০০০	৬৭,২০০০	৯৯.৯
অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী	৪,৭১,০০০০	৪,৪৩,০০০০	৯৩.০
ইটালী	৩,২৫,০০০০	৩,২৫,০০০০	৯০.০
রুশিয়া	১০,২৭,০০০০	১০,০২,০০০০	৯৭.৩
রুমেনিয়া	৬২,০০০০	৫৩,০০০০	৮৫.৩
বলকান রাজ্য	২০,০০০০	৮০,০০০০	৯২.২

জাশের্নোর বিষয় ধ্বংসাত্মক দার্শনিক "বৈজ্ঞানিক উপদেশ বিচাচ্ছেন, পৃথিবী
ফ্রেডারিক নিট্‌য়ে তাই বলিরাছেন — কখনই যেমন তাপে জীবনধারণ করে নাই।"

নৃত্য-কলায় গীতিকাব্য

লিডিয়ার কিতাবটু যুরোপের বিখ্যাত নর্তকী। অপূর্ণ নৃত্যকলাকুশল বলিয়া রূপ নর্তকীরা আজকাল অগতে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। লিডিয়ার রূপকাতীয়া। Nash's and Pall Mall Magazineএ সংশ্লিষ্ট লিডিয়ার আত্ম-উক্তি বাহির হইয়াছেন তাহার কতকংশ উদ্ধৃত হইল।

—রূপ নর্তকীরা আজকাল অজ্ঞাতীয় নর্তকীদের চেয়ে বেশী কলাকুশল। ইহাতে আমাদের অধিক শক্তি এবং অধিক নিপুণতা যে প্রমাণিত হয় তাহা নয়। শৈশব হইতেই সঙ্গী-প্রধান নৃত্যকলায় একাগ্র প্রাণে ত্রুতী হই বলিয়াই আমরা আর আর সকলকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারি। রঙ্গমঞ্চে এখন ইতালীয় পদ্ধতির চলন বড় বেশী। কিন্তু, আমরা সে পদ্ধতি উন্টাইয়া দিরাছি। ইতালীয় গীতিনাট্যের মত ইতালীয় নৃত্য-কলাতেও এখন কেবল কৃত্রিমতা ও বাধি গৎ দেখা যায়। গড়ন ও চেহারা ভাল হইলেই বেকোন রমণী ইতালীয় নৃত্যকলায় স্নানর্তকী বলিয়া নাম কিনিতে পারে। কারণ, তাহাতে কেবল বাহিরের চেহারাকেই প্রধান বলিয়া ধরা হয়। সেখানে আগে রূপ, পরে নাচ। আমাদের কাছে কিন্তু, —আগে, পরে নাই,—সবসময়েই নৃত্য-নিপুণতাই প্রধান বিচার্য।

নাচ আছে হ্রস্বকম। এক হচ্ছে

নাট্য-প্রধান। আনা প্যাভলোভা (পৃথিবীর ভিতরে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকাতীয়া নর্তকী) এই নৃত্যে নিপুণ। আর এক নৃত্য রঙ্গ-প্রধান—গীতি-কবিতার মত। এই শ্রেণীর নৃত্যে আমার কিঞ্চৎ দক্ষতা কমিয়াছে। অগস্ত, নাটকীয় নৃত্যের ভিতরে রঙ্গ-প্রধান নৃত্যকেও গণ্য করা যায়। দুই শ্রেণীর নৃত্যেরই মূলতত্ত্ব এক। দুইশ্রেণীর নটই আপনাকে সঙ্গীতের সঙ্গে অভ্যেদাভা জানিয়া নৃত্যরত হন। কিন্তু, তবু এই দুইজনের ভিতরে একটু বিভেদ আছে। কোন মধুর গীতিকাব্য একাকী কেহ গান করিলে যেমন শুনিতে হয়, রঙ্গ-প্রধান নৃত্য অনেকটা সেইরকম। বহুকণ্ঠে মহাকাব্য গীত হওয়ার সঙ্গে নাট্য-প্রধান নৃত্যের তুলনা হয়।

নির্দোষ নৃত্যের মনুনা কেবল কলিগ্রার পাওয়া বাইতে পারে। কেমন উপদাননে সেখানকার নটেরা প্রস্তুত, তাহা জানি বলিয়াই এক কথা বলিলাম। আমি অন্ত্যুক্তি করিতেছি না। কলিগ্রার সকল বড় মহররই নৃত্য-শিক্ষার জন্য গবর্নমেন্ট স্কুল আছে। ঐ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা ছয় কিংবা আট হাজারের কম হইবে না। পশ্চিম বংসর অন্তর, ঐ হাজার-হাজার ছাত্রের ভিতর হইতে বড়-জোর বাহো জন করিয়া যদি প্রথম শ্রেণীর নর্তক পাওয়া যায়,

তাহা হইলেই আশাতিরিক্ত ফল লাভ হইরাছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

ঐযুত নিকিনিগকো, এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নর্তক। সুখ ভাল কবিতার মত, তাঁহার নাচের কথাও অমরতা লাভ করিবে। তাঁহার নিখুত দৈহিক ভঙ্গীমধুর অভিনয়ে কাব্য-সংকেত ছুটিয়া ওঠে। সম্রাটের নানা রাগিনীর মধ্যে যেমন বিভিন্নতা থাকে, তাঁহার প্রত্যেক নাচের চিত্রেরও সেইরূপ বিভিন্নতা আছে—একটির সহিত অপরের মিল নাই এবং তাহার প্রত্যেকটিই নয়নমোহন, ছবির মত সুন্দর।

কসিয়ার গীত-বিশালগণের বিশেষত্ব এই যে, এখানে মনের ভিতর দিয়াই দেহকে নিকা দেওয়া হয় এবং সংসঙ্গ ও সং-আলোচনা আমাদেরকে সেই ভাবটির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিয়া দেয় বাহ্য গর্বে নৃত্যকলায় আমরা মূর্ত করিয়া ফুটাইয়া তুলি। সুতরাং একথা বলা বাহুল্য যে, শিক্ষাগণে আমরা এমন একটা অঙ্গলখন লাভ করি, বৃদ্ধ অর্থাৎ চর্ম্মণ বৎসর বয়সে, বাহার উপরে নির্ভর করিয়া আমরা সঙ্গমক হইতে বিদায় লইতে পারি।

আমাদের পা কি সুন্দর ?

মাগুয়ের পায়ের উপরে The Strand Magazine-এ একটি মনোজ্ঞ লিখিত বাহির হইয়াছে।

মাগুয়ের সুখের গড়ন যেমন, নানান ধানের, তার পায়ের গড়নও তেমনি। এটা বোধ হয়, আমাদের সকলের চোখে ঠেকে না।

পায়ের গড়ন সাধারণতঃ তিনরকম হয়। প্রথম শ্রেণীর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী অল্প সকল আঙ্গুলের চেয়ে লম্বা হয়। এ-রকম পায়ের 'কড়ে' আঙ্গুল থেকে 'বুড়ো' আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত একটি রেখা টানিলে রেখাটি ঠিক সোলা থাকে। অতএব, এ-শ্রেণীর পদকে সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট পদ বলা বাইতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পায়ের দ্বিতীয় অঙ্গুলীটি বৃদ্ধাঙ্গুলীর চেয়ে দীর্ঘ হয়। এ-রকম পায়ের আঙ্গুলের ডগা ধরিয়া রেখা টানিয়া গেলে তাহা সোলা থাকে না। অতএব এ-শ্রেণীর পদকে অ-সম-অঙ্গুল-

বিশিষ্ট পদ বলিতে পারি। তৃতীয় শ্রেণীর পায়ের প্রথম আঙ্গুল দুই এক রকমের হয়। অতএব, এ-রূপ পদকে আবার তুল্য-অঙ্গুল-বিশিষ্ট পদ বলিয়া ডাকিব।

যে-দশ জাতির দৃষ্ট অবিকৃত, তাহাদের এক এক জাতির পদ এক এক বিশেষ গড়ন পায়। সেই বিশেষ, নিজস্ব ভঙ্গীতি জাতীয় বিশেষত্বকে ফুটাইয়া তোলে। গীল ও কেট প্রভৃতি জাতীয় লোকদের সাধারণতঃ সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট পদ হয়। আফ্রিকার পাপুয়ান ও বোস্কুয়েন প্রভৃতি জাতির এবং প্রাচীন ও আধুনিক উল্লিপনিয়ানদের ভিতরে প্রধানতঃ অ-সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট পদ দেখা যায়। যুরোপের অনেক জাতির পায়ের গড়ন পাঁচমিশালী। তবে ইংরেজ এবং সম্ভ্রান্তঃ আর্দ্রাণ, ফ্রোক ও গ্রীক জাতীয় লোকের মধ্যে সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট পদই আচ্চার্য্য নজরে পড়ে।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইংরাজদের শতকরা উননব্বই জন পুরুষের ও এক-আশী জন স্ত্রীলোকের পদ সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট। বাদগাতী শতকরা এগারো জন পুরুষের ও উনিশ জন স্ত্রীলোকের পদ অ-সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট।

অপরিশুদ্ধ পদ নিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গর্তস্থ সন্ধান ও এক-বা দেড় বৎসর বয়সের শিশুর পা প্রায়ই অ-সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট। শিশুর যখন হাঁটতে শেখে, তখন তাহাদের জাতীয় বিশেষব্যবহৃত পদের আদর্শ ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে।

ভাল পায়ের গড়ন কি-রকম হওয়া উচিত, আমরা তাহা ঠিকমত জানি না। তাই আমাদের মনে কুসংস্কার আছে যে, শিশুদের পা ছাড়া আমাদের আর সকলকার পা কু-শ্রী; এবং স্ত্রী পা দেখা যুর কেবল গ্রীক ভাঙ্গা।

গ্রীক ভাঙ্গা, প্রস্তর-মূর্তি সকলের পদ সাধারণতঃ অ-সম অঙ্গুল-বিশিষ্ট। ইহাকে আদর্শ পদ বলা চলে না। গ্রীক ভাঙ্গার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকতেই আদর্শ পদ-সম্বন্ধে আমাদের মনে কুসংস্কার আসিয়াছে। ইজিপ্তিয়ান নিজে অ-সম অঙ্গুল-বিশিষ্ট পদ দেখা যায়। গ্রীক শিল্প তাহারই অনুকরণী। প্রাচীন গ্রীক শিল্পীগণ রজাতীয় দেব পদ-আদর্শকে শিল্পে তুলিয়াছেন না। একালের অনেক কলাবিদও এমন করেন। যেমন, সার্ব-কোপল "Sibylla Delphica" যেরূপ পা আঁকিয়াছেন তাহার আদর্শ কোন জাতির ভিতরে পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন গ্রীকদের পদ যে অ-সম অঙ্গুল-বিশিষ্ট ছিল, গ্রীক ভাঙ্গা দেখাইয়া তাহা প্রমাণিত করা চলে না। কারণ, ভাঙ্গার পায়ের আদর্শ আধুনিক গ্রীক জাতির মধ্যে নাই। আধুনিক গ্রীকদের পদ সম-অঙ্গুল-বিশিষ্ট।

“সাহসের জন্ম!”

রণক্ষেত্রে কোন সৈনিক অসাধারণ বীরত্ব ও সাহস দেখাইলে, পদক উপহার দিয়া তাহাকে সম্মানিত করা হয়। পৃথিবীর সকল স্বাধীন জাতির ভিতরে এই প্রথা প্রচলিত আছে।

ক্রিমিয়ান যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে আমাদের পরলোকগতা বগীয়া মহারানী, Victoria Crossএর প্রচলন করেন। সঙ্গত সম্মান হইয়া স্বদেশের অঙ্গুরাগ

ব্যক্ত কোন অসমসাহসিক কার্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে যে-কোন সৈনিক এই সম্মানের অধিকারী হয়। ইংরাজ-প্রজন্ম কাছে এবং চোখে বড় সম্মান আর নাট। যুদ্ধের নিকট হইতে ইংরাজেরা যে সকল কামান কাড়িয়া নেন, সেই কামানের খাতু গলাইয়া এই পদক প্রস্তুত হয়। পদকের অঙ্গুল দাম করে কখনো না। ইহার মূল্য অল্প বলিয়া ইহা অধঃহলার সামগ্রী নহে।

এই পদক তিনি পান, তিনি সেরকার হইলে বেড় শত টাকার বাৎসরিক বৃত্তিরও অধিকারী হন।

ইংল্যান্ডের আর একটি বিখ্যাত মেডেল আছে, তাহার নাম—The Distinguished Service Order। রাজা ভিক্টোরিয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ইহার সৃষ্টি করেন। সৈন্যবল ও নৌবাহিনীতে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্মচারীগণ যুদ্ধকালে কোন প্রশংসনীয় বা উল্লেখযোগ্য কার্য্য করিলে এই পদক লাভের অধিকারী হন।

ফরাসীদের চক্র প্রথম নেপোলিয়ন The Cross of the Order of the Legion of Honour নামক বিখ্যাত পদকের সৃষ্টি করেন। এ পদক কেবল যুদ্ধের মধ্যে বীরত্বের জন্য বা কেবল সৈনিকদিগের জন্য সৃষ্ট হয় নাই; যে-কোন অসামরিক বা বৈদেশিক ব্যক্তি বীরোচিত কার্য্য করিয়া এই পদক পাইতে পারেন।

ফ্রান্স নেপোলিয়ন Medaille Militaire নামক পদকের সৃষ্টি করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইলে যে-কোন সৈনিক ইহা পাইতে পারে। ইহা সামরিক পদক বলিয়া, সৈনিকদের কাছে The cross of the order of the Legion of Honour অপেক্ষাও ইহার অধিক আদর। কোন উচ্চপদস্থ সৈনিকের বৃক্কে এই পদক দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি ছিলেন এবং তিনি এমন কোন কার্য্যের অগ্রদূত করিয়াছেন যে, Legion of Honour তাহাকে উপযুক্ত মৌরব দান করিতে পারে না। গত সেপ্টেম্বর মাসে বেলজিয়ামের রাজা এই পদক পাইয়াছেন।

রুশ-রাজ্যে তিনি The Cross of the Russian Order of St. George নামক পদক পান, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের অধিকারী হন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথারাইন দি গ্রেট নিজে এই পদক পান। ক্রিমিয়ান ও ককেশাস যুদ্ধের পরে গ্রাড ডিউক, মাইকেল নিকোলেইভিচ এই পদকের নিয়ন্ত্রণের সম্মান লাভ করেন। বেড়শত বৎসরের ভিতরে কেবল চারিজন মাত্র রুশ-বীর, উচ্চ পদকের প্রথম শ্রেণীর সম্মান লাভ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, এই সম্মান কিরূপ চরম।

বেলজিয়ামে ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের জন্য The Order of Leopold নামক পদক দেওয়া হয়। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রথম প্রচলন হয়।

জাপানের সম্রাট বিমু তেলোর জুই হাজার পাঁচ শত পকার বৎসরের রাজ্য-ভিষেক উৎসবকে স্মরণীয় করিবার জন্য মিকাদো কর্তৃক পঁচিশ বৎসর আগে The Order of the Golden Kite নামক পদকের সৃষ্টি হয়। বিপক্ষের সম্মুখে বীরত্ব দেখাইতে পারিলে সৈন্যবল ও নৌ-বাহিনীর সকলেই এই সম্মানের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়। এই পদক অত্যন্ত চরম।

সান্তিয়ার লাহদের জন্য The Medal for Bravery দেওয়া হয়। ইহা সকল পদের কর্মচারীই পাইতে পারে। চল্লিশ বৎসর পূর্বে ইহার সৃষ্টি। এই পদকের সঙ্গে ভিক্টোরিয়া জন্মের মত কোন বৃত্তি নাই।

প্রশিয়ার Iron Cross ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজা তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ম দ্বিত্য কর্তৃক। জার্মানিতে সম্রাট হইতে ক্রমশঃ পর্য্যন্ত সকলেই এই পদক লাভ করিলে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন। কিন্তু বর্তমান জার্মানে সম্রাট, যেক্ষণ যুদ্ধভঙ্গে এই পদক ছড়াইতেছেন, তাহাতে মনে হয়, এই পদকের গৌরব শীঘ্রই একান্ত সাধারণ হইয়া পড়িবে।

জার্মানিতে ফ্রেডারিক দি গ্রেট কর্তৃক দ্বিত্য জার একটী গৌরবকর পদক আছে। তাহার নাম "Pour le Mérite"। ইহা কেবল নৌবিশাগ ও সৈন্যবিশাগে

নিযুক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণকেই হয়।

অষ্ট্রিয়ার বীরত্বের অস্ত্র The Grand Cross of Maria Theresa নামক পদক দেওয়া হয়। এই পদকের সঙ্গে বাৎসরিক অনেক টাকার পুঙ্খকার আছে। কোলিনের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রুসিয়ার সম্রাট ফ্রেডারিক দি গ্রেটকে পরাজিত করার অষ্ট্রিয়ার বীর সৈনিকগণকে সম্মানিত করিবার অস্ত্র ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী মেরিয়া থেরেসাকর্তৃক এই পদক প্রথম প্রচলিত হয়। গত আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত কেবল আটর জন অষ্ট্রিয়ান এই সম্মানের অধিকারী হইরাছেন।

শ্রী প্রসাদবাস মুখা।

রিকার্ডা হক

জার্মানীর লেখিকাগণের মধ্যে অমর্য্য ক্রাফা তাইবীরের নামই সমধিক শুনিতে পাই। কিন্তু সম্প্রতি এক নতুন মহিলা কবি, উপজাসিক ও নাট্যকার ইংবাদি সাহিত্যের আগরে পরিচিত হইরাছেন। তিনি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জার্মান উপজাস-রচয়িতা হের কেলারকেও পরাজিত করিয়াছেন। এই শক্তিশালিনী লেখিকার আসল নাম মিসেস মির্কিনী; কিন্তু তিনি সাধারণে রিকার্ডা হক বলিয়াই পরিচিত।

জার্মানীর প্রধান প্রধান সমালোচক ও সাহিত্য-সেবীগণের বিশ্বাস, তাহার মত লেখিকা এ পর্য্যন্ত জার্মানিতে অব হয় নাই।

রিকার্ডা হক ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ড্রান্সউইক

সহিবে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হুইমার-লাণ্ডে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তত্ৰত্য বিশ্ব বিদ্যালয় হইতে পি, এইচ, ডি উপাধি প্রাপ্ত হন। হুইমারলাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সকল মহিলা উক্ত উপাধি পাইরাছেন, রিকার্ডা হক তাহাদের অগ্রণী। তিনি যে কেবল পি, এইচ, ডি উপাধি পাইরাছিলেন, তাহা নহে, উক্ত উপাধির অস্ত্র তিনি যে প্রবন্ধ লিখিয়া ছিলেন তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে এতদূর মুগ্ধ করিয়াছিল, যে, তাহার উপাধির সঙ্গে "Magna cum laude", এই করেটী প্রসংশাশ্লোক কথা যোগ করিয়া দেন। এক্ষণ প্রসংসা অতি অল্প পুরুষেরই ভাগ্যে ঘটরাছে। বিদ্যাশিক্ষা শেষ

করিবার পর তিনি কিছুদিন জুটিচ গদ্যের সাধারণ পাঠাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন; তৎপরে ট্রাফেট, মিউনিখ, ব্রাণ্ডউইক, ভিনিস ও ফ্রোবেস প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন ধরিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি ইউরোপের দর্শন ও সাহিত্য জগৎ অধ্যয়ন করিতেন। মধ্যে মধ্যে কবিতাও লিখিতেন বটে, কিন্তু তখনও পর্যাপ্ত তাঁহার সাহিত্য সাধনা পূর্ণদস্তর অসম্ভব হয় নাই।

তিনিই অবস্থানকালে রিকার্ডা ডাবী পতির সাক্ষাৎলাভ করেন। পরে তাঁহার কল্পনামি ব্রাণ্ডউইকে আসিয়া তিনি তাঁহার সহিত বিবাহিত হন। এই বিবাহের মধ্যে একটি চমৎকার 'রোমান্স' আছে। রিকার্ডা হকের সমস্ত জীবনটাই একটা রোমান্স বলিলে অত্যাুক্তি হয় না; এই অল্প জীবনীতে তাঁহার নাম The living Romance বা জীবন 'রোমান্স'। সাম্প্রতিক, তাঁহার জীবনের মধ্যে এত অধিক স্বপ্ন রূপের ব্যাভ-প্রতি-মাত্র, এত অসংখ্য ভাবের সমাবেশ হইয়াছে যে, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। রিকার্ডা হক যে জীবনের সর্ব-শ্রেষ্ঠ 'রোমান্স' রচয়িত্রী—ইহাই তাঁহার অস্বতন্ত্র কারণ।

যোমিও সিন্দারীর সহিত তাঁহার প্রথম দেখা তিনিই। সে দিন ছিল পূর্ণিমার রাত্রি। রিকার্ডা হক তখন গণ্ডোলায় বসিয়া জলবিহার করিতেছিলেন। চারিদিকে অসংখ্য তরলী নাচিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদের আরোহী অগণ্য নরনারী আনন্দে বিভোর হইয়া গীত-বাঞ্চে চারিদিক



রিকার্ডা হক

ব্যবহৃত কল্পিতা তুলিতেছিল। মিস হকের কিন্তু সে দিকে হ'ল ছিল না, তিনি সেই পরিপূর্ণ ভোৎসার কবিতা রচনার বিভোর ছিলেন। হঠাৎ এক অতি কল্পনাময়ী বাশরী-তান তাঁহার জ্বরের সমস্ত ভাব-হিম্মোল একেবারে নিবৃত্ত করিয়া দিল। কবিতা লেখা বন্ধ হইয়া গেল, তিনি দেখিলেন, দূরে একখানি গণ্ডোলার একটীমাত্র সুন্দর বসিরা আপনায় বাশীর তানে আপনাই বিভোর হইয়া আছে। সে কি কল্পনাসাগরি! সমস্ত নৈশ আকাশ তারিরা যেন কোন্ চিরস্থায়ীতার গিনাইয়া বিনাটরা কারা আশের সমস্ত স্পন্দবদনকে কাণ্ডিত করিয়া তুলিতেছিল। সুবকের কোনও খেয়াল ছিল না, তাহার দৃষ্টি উদাস, ঘন-

কৃষ্ণ কেশ "আলুপালু।" তখন সেখানকার সমস্ত আনন্দ কমলোৎসব খামিরা গিয়াছিল, চকল নরনারী মত্তবৃত্তের মত নিশ্চল নিশ্চল ভাবে বসিয়াছিল। রিকার্ডা হক শৈশব হইতেই সঙ্গীত-শ্রদ্ধা, বাঁশীর সেই অপূর্ণ বন-গহরী তাঁহাকে মর্ত্যলোক হইতে যেন বহুদূরে টানিয়া লইয়া গেল। তাঁহার নোকা ঘরে ঘোঁষে নিজের খেয়াগে একিকে ওদিকৈ বহিয়া দিইতেছিল। কখন যে তাহা কেমন করিয়া যুবকের নোকায় নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই। তার পরে অতি নিকটে বাঁশীর সুর শুনিয়া তাঁহার চক্ষু ভাঙিতেই তিনি দেখিলেন, সম্মুখে নরবেশে যেন এক দেবকুমার বসিয়া আছেন! মনকৃত কুক্ষিত কেশ- ও চোখের তারা দেখিয়া চেনা গেল তিনি ইতালীয়। কেমন-একটা গভীর বিষাদের ছায়া, যুবকের চোখে দুইটি দিয়া যেন কুটিয়া বাহির হইতেছিল। বাঁশীর কঙ্গণ তানে যুবকের প্রাণের সমস্ত সঞ্চিত হাহাকার যেন গলিয়া বাহির হইতেছিল। রিকার্ডা হক মুহূর্ত্তপ্রাণে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে যুবকের দৃষ্টি তাঁহার উপরে পড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীর গান খামিরা গেল। রিকার্ডা হকের প্রতিভামণ্ডিত মুখখানির উপরে তাঁহার বেদনাভ্রত ছবির উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যকে অনির্বচনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। যুবকও দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। যুবতীর দিকে নিশ্চলক নেত্রে চাহিয়া যুবকও ভ্রমর হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সে আশ্চর্য-সংবরণ করিয়া অস্ত্র দিকে মুখ ফিরাইয়া

বাঁশীর পর্দাগুলি আবার টিপিতে লাগিল, কিন্তু বাঁশী আর বাজিল না।

যৌবনের স্বপ্নময় অতীতে রিকার্ডা এক চকলমতি জ্বরগ্রস্ত যুবককে ভালবাসিয়াছিলেন, কিন্তু সে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই। এই প্রতিভাশালিনী কুমারীর প্রাণের কামনাকে উপেক্ষা করিয়া সে কোনও ধনী মহিলার পাশিগ্রহণ করিয়াছিল। সে অবলোকা রিকার্ডার প্রাণকে এমন উদ্ভাস করিয়া তুলিয়াছিল যে, তিনি প্রতিভা করিয়াছিলেন যৌবনের আর কখনও কাহারও চরণে আশ্রয়সম্পর্ক করিবেন না। কিন্তু আশ্রয় সে প্রতিভা ভাগিয়া ঘাইবার মত হইল। তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়া নোকায় যুব ফিরাইয়া তৎক্ষণাত্ চলিয়া গেলেন। কিন্তু তবু মনের ঢাকলা দূর হইল না। কয়েকদিন দিবা-রাত্রি মনের মধ্যে একটা অস্ত্র ও সংগ্রাম চলিতে লাগিল। ছবর কিছুতেই বশ মানিতে চাহিতেছিল না। তাঁহার কঠোর শাসনে সে যেন জমরিয়া জমরিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল।

অনিদ্রার কবরাজি কাটিয়া গেল। তার পর, একদিন সকালে, পথে বাহির হইতেই তিনি দেখিলেন,—সম্মুখে সেই যুবক! তার কেশ তেমনি আলুপালু, তার বেশ তেমনি অসংযত, আর,—আর, তার হাতে সেই বাঁশীটি। যুবক তাঁহাকে দেখিয়া একটু হাসিল, কি বিষাদ-মাখা কখন সে হাসি! তাঁহার সমস্ত প্রাণটা তখন একেবারে বিদ্রোহী হইয়া সকল বাধা ভাঙিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। এই সময় হইতে প্রত্যাহ সেই রহস্যময় যুবক রোভ্র নাই, বৃষ্টি নাই, সমস্ত

দিন তাঁহার বাসস্থানের সমুদ্রে দাঁড়াইয়া বাণীটি হাতে করিয়া জানালায় দাঁড়িয়া দৃষ্টে চাহিয়া থাকিত, তিনি যখন বাতীর বাইতেন তখন দূরে দূরে থাকিয়া তাঁহার অনুগমন করিত, কিন্তু কোনও দিন জানালার চেষ্টা করিত না, কেবল দেখা হইলে একটু খানি বিবাদের মত হাঁসি হাঁসিত মাত। তাহার বকম বকম দেখিয়া পুলিসের লোক অনেকবার তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু তথাপি সে তাঁহার বাতির সমুখ চাইতে নড়ে নাট, যুঁহিয়া ফিরিয়া আসার সেইমানেই আগিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইহাতে হকের চিত্তেব অস্বাভাৱিতা কেননতব হইয়া উঠিত তাহার বর্ণনার আবশ্যক করে না। এই সময় তিনি যখনকে অঙ্গদিকে ফিরাইবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া যেন। ইহার পূর্বে তিনি যে কখনও গ্রন্থকর্তা হইবেন এ কথা অশ্রদ্ধাভাবেন নাট। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ একখানি নাটক—“ইভোল” (Evolution), ইতালীর ‘রেনেসাঁস’ যুগের কাহিনী। নাটকখানির মধ্যে তাঁহার প্রতিভার ছাপ যথেষ্ট থাকিলেও ইহা সেক্সপীয়ারের প্রভাব ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাট। সেইজন্য যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিলেও যুগী সমাজে বইখানি তেমন প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিল না। এই পাগল যুবক তখনও ঠিক তেমনই তাহাে প্রভাব তাঁহার জানালায় সমুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহাকেও যেন পাগল করিয়া তুলিত। তিনি তাঁহার জালায় অস্থির হইয়া অবশেষে তিনিস ত্যাগ করিয়া ফ্রোয়েন্সে আসিলেন। কিন্তু সেখানেও তাহার হাত এড়াইতে

পারিলেন না। ফ্রোয়েন্সে পৌঁছিবার পরদিনই উদ্ভিগা দেখিলেন, সেই যুবক যোটেলেসে বাগানে বসিয়া আপন মনে বাণীটিকে নাড়িয়া চাড়িয়া ঘুণাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়াট সে হাসিল,—সেই বিষাদের হাসি!

এই সময়ে তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক রচিত হয়। এইখানিই তাঁহার প্রথম উৎসাহ। ইহাতে তাঁহার জীবনের সেই বড় ও ভীষণ সংগ্রামের অনেক ছায়া পড়িয়াছিল। এই বইখানির নাম—“The Memories of Ludolf Urslev the Younger”

উপন্যাসের নায়ক লুডল্ফ্ উরস্লেভ জগৎ অভিজ্ঞতাবানোয়, এক্ষণে অদৃষ্টের পীড়নে নিপীড়িত। সে মুইজ্জারল্যান্ডের কারাগারে বন্দী হইয়া আপনায় চণ্ডময় জীবনের মর্ম্মস্থল কবল কাহিনী বর্ণনা করিতেছে। উপন্যাসেব অন্ততম চরিত্র এলবার্ট, গ্যালেন্ড মার্মা এক কুমারীকে ভালবাসে, কিন্তু ছটফটনে বিবাহ হইবার উপায় নাই। তাহাদের উভয়ের ভীষণ মানসিক সংগ্রাম-কাহিনীর ভিতরে আমরা লেখিকার নিজ জীবনের অনেকটা আভাস পাই। *

এই বইখানি প্রকাশিত হইতেই রিকার্ডা হকের নাম সমস্ত জগৎগীতে পরিগ্যাণ হইয়া গেল। তাঁহার সঙ্গীতময়ী ভাষা, বর্ণনীর কলা-নৈপুণ্য, নিখুঁত চরিত্র চিত্রণ, জটিল মনস্তত্ত্বের অপূর্ণ বিশ্লেষণ দেখিয়া সমালোচকগণ একবাক্যে তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ “রোমান্স” রচয়িতা বলিয়া পীকার করিয়া লইলেন। অবশ্য, তাঁহােব প্রথম পুস্তকে কেলাহের প্রভাব অনেক স্থানে দেখা যায়। তাঁহার

কারণ এই যে, তিনি কর্মণীর এই সাহিত্য-সম্রাটের পরম ভক্ত এবং সর্পদায়ী তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়া থাকেন।

ইতিমধ্যে সেই বংশীবাদক যুবকটির সহিত তাঁহার আলাপ হইয়া গিয়াছে। সে তাঁহার সহিত একই হোটেলে বাস করে। তিনি তাহাকে বহুদিন আপনার মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু নিজের সেই প্রতিজ্ঞা বহুতের অন্ত ও নিশ্চয় হন নাই। যুবকও এতাবৎ কাল তাঁহার সহিত অমুরাগের কোনও কথা কহে নাই।
 যে যেন খালি তাঁহার সঙ্গ পাইলেই খুসী হইত। সে অবসর পাইলে তাঁহার পাশে আসিয়া বসিত, সেই বিবাহময় হাসি হাসিত, এবং মধ্যে মধ্যে বাণী বাজাইত; কিন্তু অধিকাংশ সময়েই চুপটি করিয়া বসিয়া বাণী নাড়া-চাড়া করিত, কোনও কথা কহিত না।

প্রথম উপজ্ঞাসখানি প্রকাশিত হইবার পর তিনি আবার ভিনিসে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে একদিন সন্ধ্যার সময় গভোগার চালিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ তিনি জনৈক পড়িয়া গেলেন। তিনি সঁতার জামিতেন না, কাজেই তৎক্ষণাৎ তলারিয়া গেলেন। কিন্তু কোথা হইতে রোমিও সিকনী হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া তলে ঝপ্পপ্রদান করিয়া তাঁহার ভীষন রক্ষা করিল। জল হইতে উত্তিয়া পুনরায় তাঁহার জ্ঞানসঞ্চার হইলে তিনি যখন সমস্ত স্মরণিলেন, তখন আর প্রতিজ্ঞার কঠিন বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরে জগদ্বান ড্রাল-উইকে রোমিও সিকনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল।

রোমিও সিকনী বাণী লইয়াই মত্ত থাকিত, সে কাহারও সহিত মিশিত না, সমার-সভ্যতার কোনও দার ধারিত না, তাহার বেশভূষায় সামাজিক প্রথা বা পারিপাট্যের কোন চিহ্নই ছিল না। ছনিয়ার মধ্যে তাহার একমাত্র কার্য ছিল, বাণী বাজানো, সে কখনও আপনার বাণীটিকে কাছছাড়া করিত না, এই বাণীতেই শেষটা তাহার মৃত্যু হয়। রিকার্ডাকে সে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিত, তিনি কাছে আসিলে তাহার মুখ এমন একটা উজ্জলতার ভরিয়া উঠিত যে, তাহার বাস্তবিক হৃদয়ের মুখখানি আরও হৃদয়ের দেখাইত।

বিবাহের পর রিকার্ডা অনেক দিন অবধি কোনও উপজ্ঞাস লিখেন না, মধ্য মধ্যে ছোট গল্প ও কবিতা লিখিতেন।

তাঁহার কবিতাগুলির প্রতি অক্ষরে ঘের্নে তাঁহার পরিপূর্ণ হৃদয়ের সমস্ত প্রেম স্ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ছোট গল্পগুলিতে কল্পনা ও বাস্তব এমনই হৃদয়ভাবে পুরোভূত ও এতটুকু হৃদয়ের মধ্যে চরিত্রগুলি এমন নিখুঁতভাবে পরিচুট, যে তাহা পাঠকের একেবারে মুগ্ধ করিয়া দেয়। তাঁহার লিপি-কৌশল হৃদয়ের মধ্যে একটা অবাঞ্ছিত বেদনার সৃষ্টি করিয়া গল্পগুলিকে একেকবারে স্মৃতির মগ্নে গাথিয়া দিয়া যায়।

রিকার্ডা হকের ভাষা যেন সঙ্গীতের মত। তাঁহার গানের মধ্যে এমন একটা স্বভাব আছে যে, তাহা পড়িতে বসিলে কবিতার মত শুনার। মাম্ব-চরিত্রে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা। জটিল মনস্তত্ত্বের হৃদয় বিশ্লেষণে তাঁহার রচনা সকলকে একেবারে অভিভূত

করে। তাঁহার রচনার রাজার প্রাসাদ হইতে দরবারের কুটার পর্য্যন্ত, মোহন নগর হইতে নরকের বীভৎস পৃষ্ঠা অবধি এমনই নিদোষভাবে বর্ণিত যে, সমস্ত যেন একেবারে বাস্তব বলিয়া মনে হয়। রিকার্ড হকের আট কোথাও "Crude-ness" বলিয়া কোনও ক্রিতি নাই। এই সকল শক্তি তাহার প্রথম বইখানিতেই বেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু তাহার দ্বিতীয় পুস্তকে এই শক্তি যেন অধিকতর বিকসিত।

দ্বিতীয় পুস্তকখানির নাম, *From out the Street of Triumph*,—ইহা তাহার প্রথম পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবার আট বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক বন্দ লিপিত হইতেছিল, তখন রোমিও সিকানোর মৃত্যু হয়। প্রায়তনের মৃত্যুতে রিকার্ড যে ভীষণ আঘাত পাইয়াছিলেন তাহা পুস্তকের ছায়ে ছায়ে সূত্রিয়া উঠিয়াছে। একদিন ইতালীর সমুদ্রতীরে বসিয়া তিনি দিন্যন্তের নিসর্গ শোভা দর্শন করিতেছিলেন এবং রোমিও তাহার প্রাণে বসিয়া আগুন মনে বাধে বাজাইতেছিল। রোমিও যখনই বাঁধে বাজাইত, তখনই একেবারে মাতিয়া উঠিত। তখন তাহার বাহুজ্ঞান অগ্নি থাকিত না! সেদিনও সে এমনই বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল যে, উত্তেজনার বশে হঠাৎ তাহার রগের শিরা ছিঁড়িয়া গেল। জীবনপঞ্জির বৃক্কের উপরে তাহার অরণ্যহত লগাট এলাইয়া পড়িল। আকাশ-সমুদ্রের চুখন-রেখায় দিন্যন্তের সূর্য্য ডুবিয়া গেল। সেই সঙ্গে রোমিওর সৌন্দর্য্যবিলাসী প্রাণের শিখাটি নিবিয়া গেল।

প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হইতেই রিকার্ড হকের নাম দেশব্যাপী হইয়া গিয়াছিল। এখন দ্বিতীয় পুস্তক 'প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেশব্যাপী সমন্বয়িত হইয়া উঠিলেন। ইহার এক বৎসর পরেই রিকার্ডের তৃতীয় উপজ্ঞান, *"Vita Somnium Breve"* প্রকাশিত হয়। তার পরের বৎসর রিকার্ড হকের বীরত্ব ও যুদ্ধের বর্ণনাপূর্ণ উপজ্ঞান গুলি প্রকাশিত হয়। রিকার্ড হক যেমন প্রেম, দারিদ্র, তপ ও কষ্ট প্রভৃতির উপরই, অধিকাংশ পুস্তক লিখিয়াছেন, তেমনি বীরত্বের প্রতি শিওকাল হইতেই তাহার একটা আত্মবিক টান থাকতে তিনি এ সম্বন্ধেও কয়েকখানি উপজ্ঞানও লিখিয়াছেন। সে গুলিও তাহার গাঢ়ত্ব উপজ্ঞান-গুলির মত পাঠকদের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিয়াছিল। তাহার চতুর্থ পুস্তক *"Of Kings and Crowns"* প্রকাশিত হইবার পরেই দুই সম্বন্ধীয় প্রথম উপজ্ঞান, *"The Conquest of Rome"* প্রকাশিত হয়। তিনি ইতালীকে বিশেষ ভালবাসেন, এবং গ্যারিবল্ডীকে দেবতার মত ভক্তি করেন। এই পুস্তকে ইতালীর কথা এ গ্যারিবল্ডীর কীর্তি-কাহিনীই বর্ণিত হইয়াছে। গ্যারিবল্ডীর জীবন ও ইতালীর স্বাধীনতা লাভের কাহিনী তিনি যে তিনখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, *The Conquest of Rome* তাহার মধ্যে প্রথম। ইহা ছাড়া রিকার্ড হক জার্মানীয় যুদ্ধ সম্বন্ধেও উপজ্ঞান লিখিয়াছেন—তাহার নাম, *"The Great German War"* এই বইখানি একমুখে চিত্তকে উত্তেজিত ও মুগ্ধ করে। এই

সকল দেখিরা শুনিয়া অনেকেই প্রশ্ন করিতে-
ছেন যে, এখনকার এই মহাশিল্পবৈর
জনপ্রিয়দায়ক ঘটনাবলী কি তাঁহার কল্পনাকে
আকৃষ্টে করিতে পারিবে?

পাশ্চাত্য কল্পক্ষেত্রের সফলপ্রবাহ যে
তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে

তাঁহার বক্ষেই প্রমাণ আছে। এখন তাঁহার
বয়স পূর্ণ পকাশ বয়স। এই প্রাচীন
বয়সেও তিনি জর্দন হেডরুপ দলের স্ফুট
যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও আত্মের সেবা
করিতেছেন।

ঐনিশেচন্দ্র দত্ত।

অন্ধ

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

কি বল্‌চেন?—হাস্‌চি কেন? হাঃ—
হাস্‌চি কেন!—কে আনে! হয় ত' কঁপুঁত
পার্‌চি না বলেই হাস্‌চি! আমার বুকের
ভিতরে বাণির চড়া পড়ে গেছে কিনা!
সব জল শুকিয়ে গেছে গো, শুকিয়ে গেছে।
চোখ দিয়ে তাই আর জল আসে না। আমি
কান্নার বদলে তাই অধু হাস্‌চি আর হাস্‌চি!

—হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলুম। বাবা ত' কিছুতেই
আমার দিকে মূখ তুলে তাকাবেন না।
আমার হয়ে বল্‌তে গিয়ে উন্টে মা তাঁর
কাছে ধমক খেলেন।

বাবা বলেন, “পকাশ হাজার টাকা
আমি কখনো চোখেও দেখিনি। মেয়ে
অন্ধ, তা হেরেচে কি! এতগুলো টাকা কি
ছাড়া বার?”

মেয়ে চোখে দেখতে পার না, বাবাও
পকাশ হাজার টাকা কখনো চোখে দেখেন
নি। বিয়ে হলে মেয়ে যদিও চোখে
দেখতে পাবে না, কিন্তু বাবাত' এতগুলো
টাকা চোখে দেখতে পাবেন!—বাবা,

তাহলেই হল, তাহলেই হল! তাঁকে টাকা
আপনার জেতে আমাকে বিয়ে কর্তে হবে।

মা বড় অস্থির। প্রীলোক কিনা!
বলেন, “এবু ছেলেটার দিকেও ত' একবার
তাকাতে হয়!”

বাবা মেয়ে বলেন,
কেবলচেন, আগে তার
উচিত! জান পে অন্ধ!”

হাঃ হাঃ—বাবার কি ধর্মজ্ঞান! কিন্তু
বাবা আমার এ সহকৃপাটা ইচ্ছে করেই
বুলেন না যে, ভগবান যাকে মেয়েচেন,
হুমিয়ার আমি ছাড়া তার দিকে তাকাবার
জেতে আরও ঢের লোক আছে। এ
বাপলো যে দরবার ভরা! পকাশ হাজার
টাকা দিতে পারলে এখানে অন্ধ হলেও
বিয়ে বন্ধ থাকে না; বাঙ্গালী বরের বাপ
টাকা পেলে চিত্তা থেকেও মরা মেয়েকে
ছাঁদনাতলায় টেনে নিয়ে যেতে পারে!

বাবা আমার বলেন, “আমার যদি
বয়স থাকতো, এমতেকো তাহলে আমিই
বিয়ে—”

মা তাকাও! বাবা দিচ্ছে বসন্ত, “চুপ কর, চুপ কর! কি বলছ তুমি!”

বাবা ঠিকট বলছেন। তিনি যে পরম হিন্দু। ডবোলা সফাটিক করেন, মাখার টিকি, গলায় পৈতে রাখেন, ভগবান থাকে ঘেরেছেন তার দিকে তিনি তাকানেন না?

চাচা: !—

আমারও,—তাতে আপত্তি ছিল না।

ভাঃখের কথা, পঞ্চাশ হাজার টাকা চোখে জ্বাখার অবকাশ বাবা বেস্টদিন পেলেন না। মৃত্যু এসে আমার এই অক্ষয়ধুর মত বাবাকেও অন্ধ কবে অন্ধকারে নিয়ে গেল। জামিনা, ইহলোকের এই পঞ্চাশ হাজার টাকার আগোজ তিনি তাঁর বৈভবতার পরসার থেকে স্তব্ধ পাচ্ছেন কিনা।

চাচা: !—আর, আর—আমার এই হাসির লজ! এও-কি তাঁর কাছে? এ হাসির লজ কি তাঁর বুকের হাড়ে-চাড়ে, তাঁর পাতে-পাঁজরে গিয়ে বা মার্চে, মার্চে, মার্চে? আমি এটা জানতে চাই। কেউ বলতে পার?

বৎস! অন্ধ নয়। ভগবান তাকে অন্ধকারের মত কালো করে, আমার সুপের সামনে বিদ্যের পাত্র পূর্ণ করে রেখেছেন।

কিন্তু তাঁর মাস রাখলে কে? নামের এমন সার্থকতা আমি আর কখনো দেখিনি! আশ্চর্য! তাঁর সবস্তর রূপের অভাব, চোখের অভাব যেন এই মধুর, কোমল

অগচ্চ বিদ্যাবাখা শবের ভিতরে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল।

কিন্তু, সে অন্ধ। সে কালো। তাঁর দিকে চাইতে আমার ঘৃণা হোত; আমার রাগ হোত। আপনায় চির-অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়ে কেন সে আমার জীবনকেও অন্ধকার করে দিলে? কেন দিলে—কেন?

সে, বাড়ীর অন্ধ অন্ধ সকলকার পারের শবের ভিতর থেকে আমার পারের স্পষ্ট ঠিক চিনে নিতে পারত। এটা আমি লক্ষ্য করে দেখেছি। আমার পদশব্দ শুনেই সে মুখ তুলে উৎকর্ষ হয়ে থাকত। কিন্তু, আমি যে তাকে ঘৃণা করি, এটা সে বুঝতে পারত। কারণ, আমি তাঁর কাছে গেলে সে সরে যেত। নয়ত কেমন যেন লজস্ফু হয়ে অপরাধীর মত বসে থাকত। আর এক আশ্চর্যের কথা, আমার সঙ্গে এতদিন সে একটাও কথা বলে নি। এক অন্ধ, অন্ধকার মৌনের মত সে আমার জীবনের উপরে চেপে বসেছিল।

তাকে কথা কওবার জন্তে আমিও কিছু যাত্রা ছিলাম না। আমিও তাঁর সঙ্গে কথা কই নি।

এমনি ভাবে এক বছর গেল। এই এক বছর আমার কেউ কারও সঙ্গে এগটাও কথা কই নি। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন নীরবতা যে থাকতে পারে, আগে আমিও এ জ্ঞান ছিল না। ওঃ! তোমরা এ কল্পনা করতে পারবে না। এ নীরবতা অসহ—অসহ—অসহ!—হাঁ, অসহ বটে,

—তবু এ নীরবতা শুধু করবার সাচস
আমাদের কারুর ছিল না।

গ

আমি জীবনটাকে উপভোগ করছিলাম।
আমার যৌবনের তীব্রতায় অনেকখানি
ফাঁকু পেতে গিয়েছিল। ইচ্ছার পিঙ্ক
ধার পূর্ণ যৌবনের শুষ্ক রক্তধারা অপব্যয় হয়,
তার কুট সকলে বুঝতে পারতেন না।

বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন, কঠিনপন্থ কর।
লোহার সিঁড়িকে পঞ্চাশ হাজার টাকার
কোম্পানীর কাগজ মজুৎ বেখে, বুঝা
(অনিচ্ছাসহে কিনা, আমি না!) পরশোকে
প্রদান করেছিলেন।—কিন্তু হৃৎকের বিবরণ,
সিঁড়িকের চাবীটি তিনি টাকাকে করে নিয়ে
যেতে পারেন নি।

সেই পঞ্চাশ হাজার টাকার আমি
আমার জীবনের ফাঁকুটুকু ভরিয়ে তোলবার
চেষ্টা করলাম। প্রায়ই আমার বৈধিক্যবান
বাইজীর “হিলি-মিলি-পানিয়া”র সঙ্গে মদের
পিরালার ঠিনি-ঠিনি আর বেলে উঠতে
সুস্থ হোল। ফলে, আমার জীবনের
ফাঁকুটুকু যতই ভরে উঠতে লাগল,
বাবার লোহার সিঁড়িকও তখনে ততই খালি
হয়ে আসতে লাগল।

বেগুর চোখ ছিল না, কিন্তু কাণ
ছিল। সে কিছু দেখতে না পেলেও
শুনতে পেত সব। আমাকে যুখ ফুটে
কিছু না বললেও, তার মনে যে ঝড়
উঠেচে, এটা আমি তার মুখ দেখে বেশ
স্পষ্টই বুঝতে পারতাম। কিন্তু, বুঝেও
আমার প্রাণে দয়া হোত না,—যখন একটা
নিষ্ঠুর আনন্দের জাব জেগে উঠত।

রাত্রে আমি গ্রাধই বাড়ীতে থাকতাম
না। বাড়ীতে থাকলেও বেগুর কাছে
যেতাম না। তার প্রতি আমার ঘৃণা ও
রাগ ক্রমেই বেড়ে উঠছিল।

সেদিন হঠাৎ আমার আর হোল।
বাইজের ঘরে জরে কাঁপতে কাঁপতে আমি
অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তারপর, কখন যে
আমার প্রাণের ইয়ারেরা আমার কাছে
থাকাটা অনাবশ্যক মনে করে আস্তে আস্তে
সরে গড়েছিল, আর কখন যে চাকরেরা
আমাকে ধরাধরি করে অন্যরে শুইয়ে
দিয়ে এসেছিল, সে খেরাল আমার আদোপেই
ছিল না।

শুধু রাত্রে, ঘরের বড়ীটা হঠাৎ বেলে
উঠল। সেই শব্দে আমার জ্ঞান হোল।
আমি শুন্লাম একটা, দুটো, তিনটে,
চারটে! শেষ রাতের ধমুগমে নিশ্চয়তাকে
অকস্মাৎ জাগ্রত করে দিয়ে বড়ীটা
আবার খেদে গেল। কেবল, রজনীর
হৃৎপিণ্ডের শব্দের মত, সেই চির-জাগ্রত
বড়ীটা ক্রমাগত সুস্থবনে করতে লাগল
টুক-টুক-টুক!

মনে হোল, কে-যেন আমার গায়ে
হাত বুলিয়ে দিচ্ছে,—খুব আলুভাবে।
আমার মাথার ভিতরটা তখন অল-পুড়ে-
যেন থাক্ হয়ে যাচ্ছিল,—কে আমার
সেবা করতে সে কথা আমি বুঝতেও
পারিলাম না, বুঝবার চেষ্টাও করিলাম
না।

“বড় তেঁটা—একটু বল।”

আমার মুখের কাছে কে বলল, পেলাম
ধরলে।

জল পান করে আমি অনেকক্ষণ শুয়ে
রৈলাম। অন্ধকারে দেখতে পেলাম না,
—কিছু, কে আমাকে পানির বাতাল
করছিল।

•

হঠাৎ আমার কপালে দু কোটা জল
পড়ল। এ হিসেব জল? আবার,—এক,
দুই, তিন কোটা! এক কোটা আমার ঠোঁটে
পড়ল,—বুঝলাম, সে চোখের জল! এট
রাতে আমার পিররে বসে কীদে কে?

তখন, একজনকে মনে চোল। হ্যা,—
একজনকে! কিন্তু—কিন্তু, কের্ম কীদে
সে?

গীড়ার বোধ করি, মাছবের মনকে
পল্কা করে ফেলে। নইলে, ক-কোটা
অশ্রুজলে আমার অমন পাখরের মত মন
ভিজে নরম হয়ে গেল কেন?

আজ্ঞে আজ্ঞে ডাকলাম, “বেণু?”

উত্তর পেলাম না।

“বেণু?”

পাখার চাওয়া খেয়ে গেল।

“বেণু, কপা’কণ!”

অতি মুহূ—কল্লিত স্বরে উত্তর পেলাম,
“কি বাচ্চ?”

“তুমি কীদুচ কেন?”

“কীদি নি?”

“মিছে কপা বোল না?”

ভয়ে ভয়ে বাখো-বাখো গলার বেণু বললে,
“আর,—আর কীদুখ না?”

আমি চুপ করে রৈলাম। তখন কি

ভাবছিলাম, তা আর আমার মনে
নেই।

অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করলাম, “এত
রাত পূর্ণাত্ত তুমি বেগে আছ কেন?”

“তোমার যে অর হুঁয়েছে!”

“আমার অর, তাতে তোমার কি?”

উত্তর পেলাম না। তার বদলে আমার
কপালে আমার দু-কোটা জল পড়ল। সে
চোখে দুটি নেই, সে চোখেও বাখার অশ্রু
বাছে! ভগবান! দু-বিন্দু অশ্রু মনের
কল এমন করে খুলে বলতে পারে?

আমার মনটা কি-রকম হয়ে গেল,—
আমি দুহাত বাড়িয়ে বেগে আমার বুকের
উপরে টেনে নিলাম। তার মুখে আমার
মুখ রেখে চুপন করলাম। বেণু অশ্রুটপরে
কি বললে। তার সারা দেহ থু থু করে
একবার কঁপে উঠল। তার মাথাটি আমার
কাঁধের উপরে এলিয়ে পড়ল। তারপর,
প্রাণপণে আমার বুকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে
সে হির হয়ে পড়ে রৈল।

• • •

স্নানোপহার স্তব্ধ চিত্তা স্বপ্ন পূর্ব্বমেধে
জলে উঠল, তখন তার আলো শেগুৎকন্ধনেয়ে,
ভুজ দেহের উপরে এসে পড়ল।

অন্ধ বেণু—কালো বেণু।

তখনও সে আমার বুকের উপরে তেমনি
নিসাড় হয়ে পড়ে ছিল। ভোরের আধা
আলোর, আধা ছাটার বেণুর অন্ধ চোখ ও
কালো দেহের দিকে একবার চেয়ে দেখলাম।
তখন স্বপ্নে আগে কখন? তাকে দেখি-নি,
পরেও কখন? দেখবার সময় পাটনি।

তার চোখের পাতা দুটির উপরে আজ্ঞে

আন্তে হাত বুলিয়ে দিলাম। পদ্মপুটে বন্দী
বুড়িবিষ্মু নাড়া পেলে যেমন করে পড়ে, বেগুণ
চোখ থেকেও তেমনি ঝর-ঝর করে জ্বাবার
অশ্রু ঝরে পড়ল।

“বেগু!”

“ওগো

না!”

“কি করবে না?”

“আর কীদ্ব না!”

আমার অবস্থার কথা ভেদ করে
বলে উঠলুম—“না,—কীদ্ব তুমি। আমিও
কীদি।”

তারপর? তারপর আমার আর বসন্ত
রোগে পীড়াল। বসন্ত আমাকে শ্রানে
মারলে না, কিন্তু আমার চোখজুটো উপড়ে
নিরে গেছে।

বেগুর মত আমিও অন্ধ!

বেগুকে জীবনে সেই একবার মাত্র
দেখেছিলাম। তাকে দেখার আশা মিটল
কৈ? এই ঘন অন্ধকার তেলে তাঁর
একটা ছায়ামূর্তি বিভ্রান্তের মত এক
একবার চমকে ওঠে বটে, কিন্তু তাতে যে
তৃপ্তি হয়না গো, তৃপ্তি হয় না!

ঐহেমেন্ত্রকুমার রায়।

পথে পথে

নালাটি হচ্ছে মানুষের হাতে কাটা,
সুতরাং নালায় জল ঘোড়া পথটি বেরে
গাছের গোড়ায় বা ধানের ক্ষেতে এসে
পড়তে বাধ্য। কিন্তু নদী—যেটা স্রুটি হচ্ছে—
তার জন্তে কেউ পথ কেটে রাখবে না; সে
নিজের পথ নিজেই করে নেয়। দিনে দিনে
ভিলে ভিলে সে শক্তি সঞ্চয় করে স্বচ্ছন্দ
স্বাধীন গতিতে পথের বাধা অতিক্রম করে
ক্রমশঃ পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়।

স্বাধীন যে পথ, স্বাভাবিক যে পথ,
তাতে শ্রাণ আছে, বৈচিত্র্য আছে, শক্তি
আছে, গতি-বিস্তার ছন্দ আছে; আর
মানুষের হাতে-বাধা পথটিতে এ সকলের
একটাও নাই—স্থিতিতুচ্ছ ছাড়া। বাধা জল

সে এক জারগায় বাধা পোড়ে মরে; আর
পাথরের কোলে যে জলটুকুর স্রুটি—সে
বাধ ভেঙে জীবন-প্রবাহে ছই কূল ভাঙ্গিরে
দিয়ে চলে যায়।

কোন পথে যাবে—কোন পথে যাবে—
আমাদের পির কোন পথে যাবে? বাঁধের
পথে কি বাঁধ-ভাড়া স্বাভাবিক পথে?—এই
প্রশ্নই চারিদিকে শুনে পাচ্ছি। মহাজন-
দের পদাঙ্কচিহ্নিত বাধা পথটি আমাদের
চোখের সম্মুখে রয়েছে—এবং নীতি ও
শিল্প-শাস্ত্রের সাইনবোর্ডখানি সেই পথের
দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বসছে—‘নাগ্জেন
মার্গেন। মহাজনো যেন গন্তঃ স পথ্য’।

পথ এখন সম্মুখে পরিষ্কার পড়ে রয়েছে

তখন শিল্পটাকে এই পথেই চাওয়া—এই কথা হচ্ছে যারা প্রাচীন তাদের কথা, যারা পাণ্ডা তাদের কথা আর তাদের সঙ্গে যে স্বাক্ষরী দার-স্বাক্ষর যাকি দর্শনে বল বেঁধে যাচ্ছে-আমছে তাদের কথা । তাদের মধ্যে কেউ তোমাকে স্বাধীন পথে যথা-সুখে নিজের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে স্বাভাৱ্য করতে উপদেশ দেন না ।

তারা বলবে, পণ্ডিতদের অভিমত যে শিল্প, তাই শিল্প; এবং মহাসংহিতার মতো শিল্পসংহিতার বচনগুলোই পালন করে চলাই প্রসঙ্গ । পণ্ডিতেরা লিখছেন দেবতার ধ্যান, আর পণ্ডিতদের চেয়ে আত্মপে ধাতো শিল্পীগুলো সেই ধ্যানমুর্চ্ছিকল' মুটিয়ে তুলছে পাখানের অক্ষরে ;—এমন কি, লেখার ছাঁদটুকুর স্বচ্ছ ও শিল্পীর স্বাধীনতা নেই, পণ্ডিতের দেওয়া মান-পরিমাণের নাগ-পাশে শিল্পীর সমস্ত শক্তি এবং 'কৃতি' মুছাইত ! প্রাচীন ভারতের লক্ষ্যকোটি শিল্পী, যাদের প্রাণের অস্তাব ছিল না, পণ্ডিতদের অপেক্ষা স্কুলবার মনোবৃত্তি-সকলেরও অস্তাব ছিল না, তারা একাধারে একমনে বসে সুরু-নীতি ও মানসারের পুঁজির রোপণগণিত ও অগণিত সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাসকল পূর্ণ করছে এবং তারি ফলগুলি স্বশাকার করে দাখিরে যাচ্ছে—কখনো রাজমন্দিরের মতো, কখনো বা তেত্রিশ কোটি মুষ্টির বজ্র-সিংহাসনের মতো । এই মন্দিরে এই সিংহাসনে ভারত-শিল্পীরা তাদের প্রতিভাকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছে বলে তুল হু, কেন না, সিংহাসন কি মন্দির, যা-কিছু তারা গড়েছে, সে তাদের জগৎ-

দেবতার মন্দির, নিজেদের মনোমত করে গড়তে তাদের অহুমতি ছিল না । গড়েছে তারা অমূল্যমণি এবং হুকুমের চাকর, দেশের বিক্রমাদিত্যসকলের মন্দির—যারা প্রাচীনের ছায়াবেশে আভ্যন্তরীণ-বিক্রমে রাজত্ব করছে—আমাদের ধর্মের করে শিক্ষা দীক্ষার ।

প্রাচীন ভারতে শিল্পীও ছিল, শিল্পদামণ্ডীর আদর কতবার মাহুত ছিল । যদি কেবল এই চাই মাই থাকতো তবে আমাদের শিল্প হতো পরিপূর্ণ মুষ্টিতে ঘণাৎকরণে লেখা দিত—যেমন দেখা দিচ্ছে চৌম-শিল্প, জাপান-শিল্প । কিন্তু তা হয়নি । এই দুই জাতিকে দুই পারে চেপে ধাড়িয়ে আছে দেশি আর এক বলপান জাতি, বুক ফুলিয়ে যে বলছে, 'নাঞ্জন মার্গেন'—আমরা যে পথ বেঁধে দিলেম শিল্পের মন্দির এই পথই একমাত্র বাহনীর, তোমার নিজের যদি কোন বাহ্যিক কি বাহ্যিক থাকে থাক, আমরা যা চাই, যে রূপটা চাই, সেইটাই দাও ; তোমরা তো শিল্পী আর আমরা পণ্ডিত, আমরা কুলপুত্র, হুকুল থেকে জী-হস্তের মতো শিল্পশ্রমিকে আমরা জাতে তুলে তবেই দি' কৃতকৃতার্থ হবে । *

ভারতবর্ষে শিল্প, শিল্প-আচার্য্যগণের শাস্ত্রসংহিতার তুলসীমন্দির বাধা পড়ে কৃতকৃতার্থ হল কিনা সেটা তর্কের বিষয় কিন্তু এটা ঠিক যে, সেটা সম্পূর্ণ বাড়তে পারেনি । তাতে পাতাও ধরেছে, ফুলও ফটেছে কিন্তু মন্দির-বাধা পক্ষপাতি মতো সে যে কোনদিন অনেকখানি ছাড়া দেই নি বা দেশের অন্তরের অন্তরেও শিকড় গাড়ে নি একথা কে না স্বীকার করবে ?

জাপানের মাণীণ যে কোশলে তাম-
প্রমাণ গাছকে তিল-প্রমাণের 'ফুপ' বা
সামান-রূপে বর্জমান রাখে, আমাদের দেশের
শিল্পটাকে তেমনি কোশলেই আচার্য্য উপাচার্য্য
দেবতা উপদেবতা মিলে মুঠোম হাতের
• তুলসীমকে বাত্বকরের ক্ষুদ্রস্থরের আদ
গাছের মতো রেখে গেছেন। সেটাকে
অমরা শিল্পাচার্য্যের কণাবিত্যার প্রকৃষ্ট পরিচয়
লাভ করি; আর লাভ করি—শিল্পীর বাধী-
মতার উপরে শিল্পাচার্য্যগণের হস্তক্ষেপ কল্পার
অজ্ঞত একটি সুস্পষ্ট ইতিহাস!

পণ্ডিতগণের অভিমত ভারতশিল্পের এই
ধ্যানী মূর্তি, আচার-বিচার মান-পরিমাণের
বক্তৃত্ত্ব গগণ বেষ্টে জাত্যভিমানের গর্বে
যাই ক্ষীত হয়ে উঠে থাক-না কেন এবং
বহুই আমাদের গৌরবের সামগ্রী বলে
আমরা তাকে পূজা দিই-না-কেন, সেগুলো
যে আমাদের শিল্পের নিজস্ব নয়,—পণ্ডিতানাং
সর্ব্বশ, সেটা আমরা কিছুতে জুলুতে পারি
না। পণ্ডিতগণের দিক থেকে দেখতে গেলে
যেটা 'পণ্ডিতানাং মতম্' সেটারই ভরস্ব
অধিক; কিন্তু শিল্প এবং শিল্পীর দিক দিয়ে
দেখলে বলতেই হবে যে, শিল্পের পক্ষে
শিল্পীর অভিমত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে উচিত
এবং সেই পথই শ্রেষ্ঠপথ, যে পথ শিল্পের
জন্তে শিল্পী নিজে আবিস্কার করে।

"নাথিকান্না ন হীনান্না কর্তব্য দেবতা
কচ্ছিত"—এই বচনটি অঙ্করে অঙ্করে প্রাতি-
পালিত হয়ে শিল্প-দেবতা যে মূর্তিতে
আমাদের কাছে দেখা দিয়েছেন সে মূর্তি
দক্ষিণ দোকানের কাটা-ছাঁটা মানান-গই
কোট্টার মত দরবারি কিংবা পোষাকি;

—একবারেই আটপড়বে নয়। সে এক
জাতীয় শিল্প কিন্তু আমাদের জাতীয় শিল্প
নোলে সেটাকে ভ্রম করলে চলবে না।
কৃতদাসের কারুগুলোকে ভক্তের সেবার
মঞ্চে তুলনা করে যে ভুলটি করা হয়,
আমাদের আটকোটের ক্যাসন্টাকে মারের
হাতের কাপাখানি বলে ভুল করে যে
মূর্ত্যটা করা হয়, পণ্ডিতানাং মতম্ যেটা
সেটাকে শিল্পীরও অভিমত বলে ঠিক সেই
ভুল আমাদের করা হবে। পণ্ডিতেরা খুব
উচ্চভাষি হতে পারেন এবং তাঁদের অভিমত
শিল্পটাও খুব বড়-দরেরও হতে পারে
কিন্তু সে বা সে জাতীয় শিল্প এত বড়
নয় যে আমাদের বোলে, শিল্পীর নিজস্ব বোলে
পরিচয় দেওয়া চলে। প্রাচীন ভ্রমতে
পণ্ডিতেরা—আচার্য্যেরা ছিলেন সর্ব্বোদার
এবং তাঁদের বচনই ছিল সব। শিল্পটাও
উদ্দেশ্যই বচনগুলির তেত্রিশ-কোটি পাবার
মূর্তি,—তাই পায়ে শিল্পীর জ্বলন্ত দলিত করে
বহাভয়ের অভিনয় করছে। প্রাচীন ভারত
শিল্পে এই করণ রপটুকুই সত্যাকার, কেন
না এইটুকুর সঙ্গেই শিল্পীর প্রাণের ধ্বংস
ছিল; আর যে রসগুলো পাবারের ভাণে
ধরা যাচ্ছে সেগুলোর সঙ্গে শাস্ত্র-বচনের
যোগ, শাস্ত্রাঙ্গের যোগ,—যথার্থ রসের
উৎপত্তির যোগাযোগ দেখানো নাই। নদীর
সব জল—সমস্ত প্রবাহ একটিমাত্র গহুণে
বাধা পড়েছে, আর একূল ওহূল হুতূল
জুড়ে নদীর বৃকে বাণির চর ধু-ধু
করছে। প্রাচীনরা মিলে ভারতশিল্পের
উৎসর্গতার শক্তি হরণ করে নিয়ে, দিয়ে
গেলেন তাকে উন্নততার বিরাট অবকাশ।

আমরা যখন চলতে চাছি, পথ চাছি, তখন গোড়া-থেকেই প্রাচীনের এই ভৱনকর বোকাটাকে আমাদের কাঁধ থেকে নামাতে হবই হবে, গভূষের বাঁধ ভাঙতে হবে, প্রবোধতা বুকী ভেদ কবে, আমাদের আর-একগৰা আমাদের সেইখানে বেরিয়ে গাঁড়তে হবে যেখানে আমরা শিল্পী সম্পূর্ণ স্বাধীন, যেখানে আমাদের পুৰাতনটা আমাদের সাধা দেখে না, অস্তের নতুনটাও আমাদের ভুলিয়ে রাখতে পারবে না :—এক-কণার প্রাচ্য প্রবীণতার তৈলকটাহ এবং পাশ্চাত্য মতনতাব অতিকৃষ্ট এ দুই থেকেই দূরে এমন একমুখে আমাদের যুৱে গাঁড়তে হবে, যে-মুখে আমাদের চৌধৈৰ্য দৃষ্টি মনের প্রসার আনন্দের এবাহ অপ্রতিহত। নিজের মনের নবীনতা সজীবতা অক্ষয় রেখে চলাই হচ্ছে চলবার শ্রেষ্ঠ উপায় এবং নিজের জ্ঞানানুপা স্মৃতি-ভাংখ আলো আঁধারের তালে-তালে যেখান দিয়ে উঠে-পড়ে চলে যায় সেট পথই হচ্ছে আমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পথ। শাস্ত্রগড়া শিল্প মন, শিল্পীৰ মনগড়া শিল্পই হচ্ছে উত্তম শিল্প—একথা সম্ভাণ করতে আমরাই যে নতুন করে উদ্ভূত হয়েছি তা নয়, প্রাচীন কালেও শিল্পীরা প্রাচীনতার বোকা ব্যৱহার নামিয়েছেন এবং পণ্ডিতানাং মতম্‌ ঠেলে নিজের মতকেই প্রতিষ্ঠা দিতে চেষ্টা করেছেন। শিল্প-শাস্ত্রকার শুক্রাচার্য্য সেটাকে ‘একেবাং মতম্’ বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেও পারেন নি। এই যে ‘একেবাং মতম্’—যাৰ মূল মন্ত হচ্ছে ‘লয়ং যজ চ যন্ত হৃদং’ বা মনোমত পথে যাওয়া—তাকে ঠেলে

সাধা পণ্ডিতদের সাধা হয় নি, হবেও না। মনের সোনার কাঠি, শাস্ত্রকাণ্ডের কণোৰ কণ্টিকে অৱ করে প্রাচীনকালেও এতটা কাল কৰেছিল যে, পণ্ডিতকেও দেটার গজ দুই ছত্র মোক রচনা করতে হয়েচে এবং সেই মোকটাকে শিল্পশাস্ত্রেও ভিতরে স্থান দিতে হয়েছে।

জবন জবন, যে পথে গে চল সেইই পথ, যাকে সে চায় তাকেই পাওয়া, যা সে দেয় সেই মানই শিল্পে শ্রেষ্ঠমান। মন্দিরের বাহিরে যেখানে শিল্পীৰ আনন্দ, যুগ্ম বাহিরে মধ্য রাসলীলার উদ্ভূত হয়ে উঠেছে, সেইখানেই বখাৰ্ণ পথের সন্ধান আমরা পাবো, আর মন্দিরের ভিতরে—সেখানে মূৰ্ত্তিমান শাস্ত্র বৰাতরের অভিনয় দেখাচ্ছে, সেখানে অন্ধকারে প্রদীপের একটি আৰ্ত্ত ছাড়া অজ পথ পণ্ডিতেরা রাখেননি। “কহাি কবীর তেদেভে” ছাড়া, দিন রহ রাহ চলাই।—এ পথে চিরজুখী যানির বলবদাই ঘুরে মরে।

এই যে ‘পণ্ডিতানাং মতম্’ ঠেলে আমরা শিল্পীৰ মনোমত শিল্পকে বরণ করতে চাছি এর গজ বিজ্ঞদের কাছ থেকে, প্রাচীন দের কাছ থেকে, এবং দেখতে নবীন হলেও সমস্ত মনটি ঘাঘের জৱাৰ সাধা হয়ে গেছে—কোন মং যাতে নেই—এমন সব মানবকদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কথা শুনেতে হবে। সমস্তক, ত্রিভঙ্গ, অতিভঙ্গ, উচ্চভঙ্গ ইত্যাদিৰ একটিকেও পছন্দ না করে আমরা যে নিজেদের সবক ভঙ্গীতে বলতে চলতে এবং লিখতে চাই—এটা

ওদের প্রাণে দইবে না। আমরা যে গণপতির ভূঁড়টিতে তেল-সিঁহুর মাঝে ভূঁড়টির আধ্যাত্মিক অর্থের চিত্রা করতে বাস্তব নই, কিন্তু সেটাকে দিয়ে আকর্ষণীয় কাজ করিয়ে নিতে চাইছি এই সব হৈলেমানুসির জন্য, এই লজ্জার মতো মনোমত্ত পথে লতিয়ে ওঠার জন্য, এই আমাদের * টেরছা চোখের ইঙ্গিত, আভাস পণ্ডিতগণের উপরে নিক্ষেপ করার জন্য ওয়া আমাদের কিছুতে কমা কল্পবেন না। আমরা যে শাস্ত্রকারকে জ্ঞানি না, শাস্ত্রকে মানি না, চাইনা যে আমরা anatomical accuracy বা Law of perspective! আমরা আমাদের নিজস্বটা,—তা সে বস্তুটাই হোকনা—বিষয়মানবের পাদপীঠরূপ খুব একটা বড় এবং পণ্ডিতগণের অভিমত অগ্রগণ্য সবদিক হাঞ্জির না করে দিয়ে

এই ক্ষেত্রে প্রবোধে ফুটে উঠতে চাইছি, আনন্দের বীজ মুঠো মুঠো আবীরের মত যথা-তথা বিকীর্ণ করে মরতে চাইছি, আমরা বাবাকোদেব তুলসীমকে বাবুদের মধের মাগকে যে বাধা পড়তে চাইছি, এই যে আমাদের যা-তা নিয়ে আমরা যা-খুসি-তাই করতে চাইছি এর জন্য কথা আমাদের অনেক শুনতে হবে,—শিল্পচার-ভ্রষ্টতা, মূর্খতা ইত্যাদি অনেক কথার ইটু-পাটুকল এবং আরো কত কি তার ঠিকানা কি! কিন্তু আমরা যেন ভুলি না যে আমাদের প্রাণের একতারা প্রাণেশের চাতে মিলে তবেই তাতে নিত্যমূরের স্বভাবটি উঠবে, নইলে কেবলি ওস্তাদি হুকার। “প্রেম হৃদ তবী জব তাই, সন্তশোক কী হৃদ পূর্ণি আই।”—প্রেম বশন সীমাকে ভাগ করে তপন। সে সত্যলোকের সীমার আসে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গোয়েন্দা গ্রেভস্

“আত্মাণ-শুশ-কার্য-বিভাগের” বিখ্যাত গোয়েন্দা আমর্গার্ড কার্ল গ্রেভসের চমকপ্রদ শুশ কার্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ গত মাসের “ভারতীতে” দেওয়া হইয়াছে। এই সংখ্যার আমরা গ্রেভসের নবপ্রকাশিত পুস্তক হইতে তাঁহার আর একটি গোয়েন্দা-গিরির বিবরণ দিতেছি।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ফ্রান্সের উপনিবেশ মরক্কো লইয়া আত্মাণ ও

ফ্রান্সের মধ্যে মনোমানিষ্য এবং সেই সঙ্গে ইংলণ্ডেরও সহিত আত্মাণির যুদ্ধ-সম্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু কাইসার উইলিয়মের আদেশে এবং গোয়েন্দা গ্রেভসের কার্য-তৎপরতার কি করিয়া এষ্ট বিষয় যুদ্ধের আশঙ্কা দূর হইয়া যায়—এই প্রবন্ধটি তাহারই বিবরণ। গ্রেভস্ লিখিতেছেন :—

আজ করকদিন চইল বাগিনে আদি-যাছি। খাটিয়া খাটিয়া অনটা ও বাগ-বাগ হইয়া

উঠিয়াছে। এখন আর অল্প কোন বাককর্ম নথ—দিনকয়েক পূর্ণ ক্ষুধিত্তে আমোদ প্রমোদে কাটাওয়া ভারপ্রাপ্ত মনটাকে হালকা করিয়া ফেলিতে হইবে।

কিন্তু সেদিন একটা ভোজনালয়ে আহার করিয়া বাড়ীর সন্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে আমার 'বহা'টা তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিয়াই বলিল, "অনেকক্ষণ হ'ল টেলিফোনে আপনাদের ডাক পড়েছে—১১ নম্বর থেকে ক্রমাগত ডাক আসছে।"

১১ নম্বর! আমি চমকিয়া উঠিলাম—সে যে Foreign Office-এর টেলিফোন নম্বর! নিমেষে আমার মাথা হইতে আমোদ প্রমোদের স্মরণশক্তি কপূরের মত উবিয়া গেল—পৃথিবীর কোন অংশে আমাকে বাইতে হইবে, সেই চিন্তাই তখন আমার মনটাকে চকল করিয়া তুলিল। তখন ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাস—ইউরোপের রাজনৈতিক অস্থিরতায় বনমোহন—আর্মি ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ একেবারে আসন্ন; 'জনবুল'ও মিশেট হইয়া হাত-পা গুটাইয়া বলিয়া নাই। এদিকে আর্মিবিতেও মরক্কো লইয়া দিনরাত তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। চারিদিকে সকলেই যুদ্ধ দেখি বলিয়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় আমি Foreign Office-এর দিকে চলিলাম; সেখানে উপস্থিত চাইবামাত্র প্রিন্সিপাল-লিলের সভ্য কাউন্ট ওয়েডেলের সন্মুখে লইয়া গিয়া আমাকে হাতির করা হইল।

নমস্কারের পর কাউন্ট বলিলেন—"সাড়ে ১১ টার সময় তোমাকে আর একটা ঘরে

লইয়া যাওয়া হইবে—সেখানে তোমাকে যে সকল প্রশ্ন করা হইবে তুমি তাহার উত্তর দিবে,—কিন্তু সাবধান, নিজে যেন কোন প্রশ্ন করিয়া বসিওনা—এখন বুঝিতে পারিতেছ?"

"হ্যাঁ" বলিয়া আমি কাউন্টকে পুনর্বার নমস্কার করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই আর একটা লোকের সঙ্গে আমি নির্দিষ্ট গমনাগমন গার হইয়া এক সশস্ত্র প্রহরীসংকীর্ণ বৃহৎ অন্ধকার ভিতরে গিয়া দাঁড়াইলাম। ঘরটি 'জুইভা'গে বিভক্ত। তাহার একদিকটা উজ্জলভাবে আলোকিত,—আমরা সেই দিকেই দাঁড়াইয়াছিলাম। অন্ধদিকটা আর অন্ধকার। কেবল একটা লুকাও টেবিলের উপরে একটি দীপ মিটামিট করিয়া জ্বলিতেছিল মাত্র। আমার সম্মুখ টেবিলের দিকে চাহিল। এবং চাহিয়াই, সচকিত হইয়া যেন আশ্চর্য্য করিয়া সে জড়সড়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার এই আকস্মিক উত্তেজনার কোন সঙ্গত কারণ না পাইয়া আমিও কিরিয়া দেখিলাম। একি! সেই প্রকাণ্ড টেবিলের পিছনে স্থিতিত দীপালোকে স্বয়ং আশ্চর্য্য-সম্পন্ন বিতীর্ণ উইলহেল্ম গুজ হইয়া বলিয়া আছেন।

পাঁচমিনিট কাটিয়া গেল—তথাপি সেই নিঃশব্দ-গম্ভীর মুষ্টিটা একান্তচিন্তে ক্রমাগত কি লিখিয়া বাইতেছিল। আমোদের দিকে সম্রাট একবার কিরিয়াও চাহিলেন না। আমি ভীত নই। যে কাজ আমি করি, সে কাজে গোহার মত শক্তি বুকের দরকার। কিন্তু আমার জানু কড়া হইলেও, আজ "পৃথিবীর

এই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের নীরব অবস্থেলার
অনুখে এইরূপ একা, নিঃশব্দভাবে পাড়াইয়া
থাকিতে থাকিতে আমার মনেও কেমন
একটা অজানা ভরের সঞ্চার হইল।

চুপটি করিয়া পাড়াইয়া আছি। চঠাৎ
সম্রাট তাঁহার চেয়ারের উপরে ঘুবিয়া
বসিলেন এবং উল্লসিত কহিলেন, “আমি
গোস্তকে দেখতে চাই।”

আমার সঙ্গীকে বর থেকে সংবোধিত দেখিয়া
হইল। আমি একেবারে সম্রাটের সামনে গিয়া
পাড়াইলাম। যুরোপের এই যুদ্ধ-বিধাতার
এর আগে এত কাছে আমি আর
কখনও পাই নাই। তিনি যেন তখন
অত্যন্ত চিন্তাশ্রিত। তাঁহার দেহ বেশ
স্বাস্থ্যপূর্ণ হইলেও, তাঁহার ফটোব চেহারার
চেহেরা তাঁহাকে যেন বৃদ্ধ দেখাইতেছিল।
তাঁহার আকৃতির সহিত ফ্রেডারিক দি
গ্রেটের একটা আশ্চর্য্য সাদৃশ্য প্রাইলাম।
সম্রাটের বে চোখ আমি আজ দেখিলাম,
তাঁহার কোন ভঙ্গিরে আমি তাহা দেখি
নাই। সেই নীলাভ ধূসর চক্ষের নীতল
দৃষ্টিতে একটা গাভীরা, একটা জনসম্পর্কী
ভাব ছিল। লর্ড কিচেনারও লি হাং চাং
শ্রুতি বাহারী পৃথবী-শাসনে অগুট,
তাঁহাদেরও চোখ এই রকম।

ইতিমধ্যে সম্রাট মুখ তুলিয়া চাহিলেন
ও কিঞ্চিত কর্ণ ধরে আমাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন,—“এই বিভাগে তুমি কতদিন
হইল, কাজ করিতেছ ?

“আজ্ঞে, তিন মাসের।”

“তুমি “মরকো” জান ?”

“আজ্ঞে, হাঁ হজুর।”

“সপতন কতদিন ছিল ?”

“তিন মাসের।”

ইহার পর সম্রাট কাউন্ট ওয়েডেলের
দিকে তাকাইয়া বলিলেন—“স্বাভা একে
দিন্নাই কাজে চলিবে, চিঠিপত্র প্রস্তুত কর।”
সম্রাট তাঁহার স্বভাবগত আকস্মিকতার
সহিত চঠাৎ চেয়ারের পিছনে হেলিয়া
পড়িয়া আমার দিকে চাহিয়া আমার
বলিলেন—“কাজে যা লেখা আছে মুখস্থ
কর—অস্ত্রাশ্র চিঠিপত্র ছাড়া, এই মৌখিক
সংবাদটী তোমার যুদ্ধজাহাজ Pantherএর
ক্যাপ্টেনকে দিতে হইবে,” সম্রাট আমার
হাতে এক টুকু কাগজ দিলেন।

Panther—জাহাজের বিখ্যাত যুদ্ধ-
জাহাজ—স্পেনের উপকূলে অবস্থান করিতে
ছিল—এবং ঠিক ছিল, এই Panther
মরক্কোর গিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধবোধনা
করিবে।

আমি আর কোন কথা না বলিয়া
প্রাপণে সম্রাটের লিখিত আদেশ মুখস্থ
করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে সম্রাট বলিলেন—

“মুখস্থ হইয়াছে ?”

আমি বলিলাম—“হাঁ।”

সম্রাট তখন আমার হাত হইতে
কাগজখানি লইয়া দিন্নাপল্লীরে লিখায়
ধরিলেন; নিমেষের মধ্যে কাগজখানি পুড়িয়া
ছাই হইয়া গেল।

সম্রাটকে সমস্তার করিয়া আমি কাউন্ট
ওয়েডেলের কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম।
তিনি আমার হাতে শিলমোহর করা এক-
তাড়া কাগজ দিয়া বলিলেন, “এডম্, আজ

তুমি এক অতি ভক্তের ব্যাপারে হাত দিয়াছ। চারিদিকে এখন যুদ্ধের কিরণ বড়বড় চলিতেছে সে কথা বোধ করি তোমাকে আর বেশী বুঝাইতে হইবে না; যে কাগজ দিলাম, তা তুমি আস্তে কাঁচ বেলা ১২ টার সময় প্যারিস জাফ্রাণ রাজদূতকে দিবে। সেখান থেকে আবার অস্ত্র কাগজ বইরা মাদ্রিদে জাফ্রাণ রাজদূতকে দিতে হইবে—তারপর একেবারে বাসিলোনা;—বাসিলোনায় কিছুদূরে আমাদের যুদ্ধজাহাজ Panther আছে—জাহাজের কাপ্তেনকে সত্ৰাটের মৌখিক খবরটা দিবে। সেখান হইতে তোমাকে জিজ্ঞাসণটার দিয়া ইংরেজের নৌবক্তির খবর আনিতে হইবে। এখন তোমাকে টাকা পাঠাইয়া দিতেছি—মনে থাকে যেন, এ টাকা সত্ৰাট নিজে দিতেছেন—গভর্নমেন্টের তাহবিল হইতে দেওয়া হইতেছে না।”

আমি বাড়ীতে আসিয়া দেখি, আমার চালাক চাকরটী চুটপুট সব ঠিকঠাক করিয়া রাখিয়াছে—মেটসহর সমস্ত প্রান্তর; গাড়ীতে উঠিলেই হয়। সঙ্গে cayenne pepper-এর ভুঁড়া ও আর দুই একটি রাসায়নিক পদার্থ লইতেও কুলিলাম না। কারণ, বিপদে পড়িলে আমি কখনও শক্তল ব্যবহার করি না—লোকের চোখে-মুখে আচ্ছাদ্য করিয়া এই ভুঁড়া কাড়িয়া দিয়া লোককে মুহূর্তের মধ্যে অজ্ঞান করিয়া ফেলি।

আমি যে কামরায় উঠিলাম, সেই কামরায় একটা মহিলা ও দুইটা ভদ্রলোকও উঠিলেন। বসিয়া থাকিতে থাকিতে কিছুক্ষণ পরে মহিলাটী কাতর হয়ে ঠাণ্ডা আমাকে

বলিলেন যে, একজন ভদ্রলোক তাহাকে অনেকক্ষণ হইতে অপমান করিতেছে। মহিলাটির মান রক্ষা করিবার জন্য আমি তাহার ভিনিষপত্র আমার নিকটে লইয়া আসিলাম। কিন্তু ভদ্রলোকটী ঠাণ্ডা আমার কাছে আসিয়া বলিল, “কিহে বাপু, আমার জীর ভিনিষপত্র কার হকুমে তুমি সরিরে এনেছ?” মহিলাটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে চুটামির হাসি হাসিতেছে। আমার আর বুঝিতে পারি রহিল না যে, ইহারা বড়বড় করিয়া আমাকে বিপদে ফেলিবার মনোবোঝে আছে! হাইট! তবে কি ইতিমধ্যেই এরা আমার গুপ্তকার্যের খবর পাইয়াছে!

এমন সময়ে “গার্ড” আসিয়া উপস্থিত হইল। ভদ্রলোকটির কাছে সব কথা শুনিয়া সে আমাকে একটা কামরায় বন্দী করিয়া রক্ষণশীল এবং সিঁধা ভাবায় স্পষ্ট বুঝাইয়া দিল যে, পরবর্তী টেশনে পৌছিয়াই সে আমাকে টেশনমাষ্টারের হাতে সঁপিরা দিতে কিছুতেই কুলিবে না।

আমি ত’ মাথার হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। যেমন করিয়া হউক, আমাকে পারিতে গে পৌছিতেই হইবে! তারপর, l’anthier এর কাপ্তেনের নিকট সংগম না পাইয়া গেলে, যুদ্ধও অসম্ভব। পথে যদি পাঁচ ছয় ঘণ্টা বেশী হয়, তাহা হইলে যুদ্ধ বন্ধ করিবার আর কোন উপায় থাকিবে না।

টেন কোলনে আসিলে আমি টেশন মাষ্টারকে বলিলাম, “আমাকে আটক করিয়া রাখুন, তাতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু মনে থাকে যেন জাফ্রাণ গভর্নমেন্টের

কোন বিশেষ দরকারি রাজকার্যে আমি যাইতেছি—কতি হইলে আপনি দাও।”

টেননমাটার আমার কাগজপত্র দেখিয়া আমাকে মুক্তি দিলেন। পশ্চিমধ্যে আর কোন বিপদ হয় নাই। কিন্তু আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল যে, সেই লোক-গুলি কেমন করিয়া আমার গতিবিধির সন্ধান পাইয়াছিল!

যাহা হউক, প্যারি এবং মাস্ত্রিটের কার্য শেষ করিয়া আমি বাসিলেনার উপস্থিত হইলাম। তাহার পর অনেক কষ্টে Panther-এর কাপ্তেনের সহিত দেখা করিয়া তাহাকে সস্ত্রাটের আদেশ জানাইলাম। সে আদেশ এই:—“পাহার যখন মরক্কোর গমন করিবে, তখন যেন সে কোন কারণেই ইংরাজ কিম্বা ফ্রান্সের সহিত অসম্মতবাহার না করে। ইংরাজ কিম্বা ফরাসীরা অপমান করিলেও তাহাকে তাহা সহ্য করিয়া থাকিতে হইবে। কোনমতেই ‘পাহার’ যেন যুদ্ধবোধনা না করে।”

‘পাহার’ের কাপ্তেন এ আদেশ পাইয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন। কারণ, পূর্বের আদেশের সহিত বর্তমান আদেশের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আগে হুকুম ছিল যুদ্ধবোধনা করা, আর এখনকার হুকুম হইতেছে যুদ্ধ বামাইচা দেওয়া।

ইহার পরের ঘটনা ইতিহাস-পাঠকের জানা আছে। ৭ই জুলাই ‘পাহার’ মরক্কোর Agadir-এ আসিয়া উপস্থিত হইল। অমনি ইংলও ও ফ্রান্সে আগুন জলিয়া উঠিল

—আর্মাদির বিজ্ঞকে যুদ্ধবোধনা করিতেই হইবে। ‘পাহার’ের সমুখে একখানা ইংরাজ ও আর একখানা ফরাসী যুদ্ধজাহাজ আসিয়া তাহাকে আদেশ করিল, “এই মুহুর্তে ‘আগাডির’ ত্যাগ কর, নতুনা বল-প্রয়োগ করা হইবে।”

‘পাহার’ যদি তাহাদের হুকুম না মানিত! তাহা হইলে ‘আগাডির’-এ আগুন জ্বলিত, তাহা সমস্ত ইউরোপকে একেবারে ছারখার করিয়া ফেলিত। কিন্তু ‘পাহার’ ভালমাসুকের মত ‘আগাডির’ চাইতে তৎক্ষণাৎ বিদায়গ্রহণ করিল।

এই বিষয়ট যুদ্ধ বন্ধ করা আর্মাদি সস্ত্রাটের পক্ষে এক বহুদর্শিতার কার্য বলিতে হইবে। আর, এই গুরুতর কার্যের প্রধান সহায়ক ছিলাম আমি! সস্ত্রাট সম্মত করিয়াছিলেন যে, ফরাসীর সহিত ইংরাজেরা কেহা গুপ্ত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ আছে। কিন্তু, সেই সন্ধির বন্ধন কতটা দৃঢ়, এবং ফরাসীরা বিপদে পড়িলে ইংরাজেরা বাস্তবিকই তাহা-দিগকে একাক্ষতাবে সাহায্য করিবে কিনা, সে বিষয়েও বোধেই সন্দেহ ছিল। আর্মাদি-সস্ত্রাট মরক্কোতে ‘পাহার’কে পাঠাইয়া এক চালেই সমস্ত সম্মত উত্তর করিলেন। জানা গেল যে, ইংরাজেরা সভ্যসভ্যই ফরাসীদের সহিত লুকাইয়া সন্ধি করিয়াছেন। এবং ফরাসীরা বিপাকে পড়িলে ইংরাজেরা কায়-মনোবাক্যে সাহায্য করিতেও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন না।

ত্রিপ্রদীপচন্দ্র সরকার

রাজা ভড়ং

(স্বৰ্গ—“] a marvellous eastern king”).

পায়েতে লেপেটা, শিরেতে তাজ
অধুনা শ্রীশ্রী—শ্রীমহাবাহু—হম্!

রাজা ভড়ং!

গদি পাণ্ডুরাবদি খুণ কড়া
নিছি নিমহাতে—গড়গড়া—হম্!

রাজা ভড়ং!

মম কুল বৃদ্ধি বৃদ্ধকুল—
তাই তো গোলালো—নাটক কুল—হম্!

রাজা ভড়ং!

ঘোমটা-পুঁটুলি রাণীরা ঘোর
চলে দাপটিয়া হম্ হমর—হম্
রাজা ভড়ং!

বিষম-সমর-জবর-জং
ইদুর নড়িলে গা করে হম্—হম্!
রাজা ভড়ং!

তাকিরাটি ভাগি দরকারী
আমি চাঁড়লের তরকারী—হম
রাজা ভড়ং!

সকরে বধনি চলি স্বং
ফটফট কোটে পটকা চম্—চম্!
রাজা ভড়ং!

হাতী চ'ড়ে ফিরি পাট খাতির
আমাতে ছেলেরা বেখে হাতীর—চং
রাজা ভড়ং!

জললে থাকি জংলী নই
চাড়া লই করে দিতে না হই—গম্
রাজা ভড়ং!.

বাকিতে জানি মংল অং
• হাঁকাইতে আমি পারি গো টম্—টম্
রাজা ভড়ং!

দ্বিভে “কুড়ো বা লিভো” গো
হনর দেখাতে ইচ্ছে গো,—কম্?
রাজা ভড়ং!

ভূঁড়ি নিয়ে কিছু আছি কাবু
পাশ ফিরে শুভে যাব বাপু—দম্!
রাজা ভড়ং!

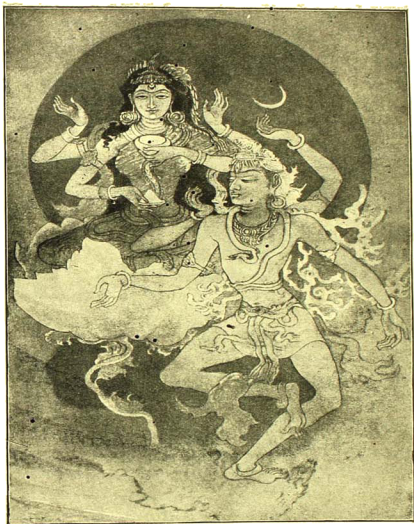
লপগনে কোনো প্রেতাঙ্গনেই
বাড়িরা চলেছি ওজনাই—হম্!
রাজা ভড়ং!

মির্জা ছাত্তে কচমকুট
শিরেতে মুরেঠা চরণে বুট—সং।
রাজা ভড়ং!

ভাংচতে ভুলে ছাড়িনি ভাং
না চ'লে চলেছি মোলা জাহান্—নম্
রাজা ভড়ং!

আমি বরং রাজা ভড়ং
ভাড়াটে ভড়ং ও ভাড়াতে ভম্
যদিচ খেতাবী প্রতাপী তৎপালি
বেশকই পোসাকী—রাজা ভড়ং!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।



—“সৌন্দর্যে বিরহে গান, শুভের করেছে আলিঙ্গন
সবের চকন নৃত্য,—” রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত চিত্র হইতে

গান্ধী-পত্নীর সম্বন্ধন

গান্ধীপত্নী শ্রীমুখা কস্তুরাবাই বেবীর সম্বন্ধনার
জন্ম ঘেরি কার্পেটার হলে বিপ্লব চেষ্টা মাসে বঙ্গবন্ধু-
গণের যে সভা হয়, সেই সভার সীমন্তী কাপড়িনী
গান্ধীলিঙ্গ ইংলণ্ডে অভিনন্দনের পর সীমন্তী বর্ণবাহিনী
দেবী নিম্নলিখিত অভিনন্দন পাঠ করিয়াছিলেন।—

বাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে, বাঁহার সম্বন্ধনার জন্ম
আজ এই নারীমণ্ডলী এখানে সমবেত, এই ভারত-
রমণী কস্তুরাবাই দেবী, গান্ধীজী ধর্মের একটু
জলন্ত জীবন্ত দুইটি; আন্তোৎসর্গের আদর্শে ইনি সমগ্র
জগতের বহুশ্রী। ইঁহাকে অভিনন্দনের সুযোগ
পাইয়া আজ আমরা আপনাবিন্দকে ধন্য জানি করিতেছি।

ইঁহার দ্বারা ভারতবাসীর শ্রীমুখা বোহনটায়
করনটায় গান্ধী, গান্ধী নামেই বিশ্ববিখ্যাত :

দক্ষিণ আফ্রিকায় বহুবারবাসীর সম্মান রক্ষা এবং
ভ্রাম্যসম্রত অধিকার সম্বন্ধ উৎসেজে ইনি বেকর
অসহ্য কষ্টগ্রহণ লোকান্তরে সহ্য করিয়াছেন, তাতা সেন
কল্যাণ-চিন্তায় অভিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়। অথচ
তাঁহার এক কণাও কমিত নহে, সকলি সত্য।

আপনারা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন,
দক্ষিণ আফ্রিকায় এক ভারত-সম্রাটের প্রজা হইয়াও,
জাতি-বিষেব এবং শাণা কালের পার্থক্যবিচারে
ভাষ্যবাসীর কষ্ট হ্রাসের লীমা ছিল না। সেখানে
বসবাসের জন্ম আফ্রিকানিবাসী ভারতসম্রাটকে
প্রতি পণ্ডে লাহিত অপমানিত হইতে হইত। গোরা
প্রজার প্রতি* সেখানে আইন আদালতের ব্যবস্থা
ছিল এক রকম, আর কালো ভারতবাসীর প্রতি
অন্ত রকম,—লগডুগাতাই তাঁহার গণকে ছিল বৈধ
ব্যবস্থা।

এই অবস্থার বিরুদ্ধে গান্ধী ধর্মবুদ্ধ গোবিন্দ
করিলেন। এ যুদ্ধে অস্ত্র নাই সস্ত্র নাই, বিকল্প
পক্ষের প্রতি জীতিপ্রবর্তন বা অত্যাচার নাই,—

ইহাতে বহু কষ্ট গ্রহণ কেবল নিব্বের। ‘আমি এই
অস্ত্রের আইন মতে চলিব না, আমারকে ভাবনা
নার ধর যাঁহা ইচ্ছা কর, তাপাশি এ অস্ত্রের আইন
মানিব না : আইন বল হোক এই আমার প্রার্থনা।—’
এই তাঁহার যুদ্ধের মূলমন্ত্র। ভারতবাসী অনেককেই
সেখানে তাঁহার পদ অনুসরণ করিল—তাঁহার শিষ্য
গ্রহণ করিল।—কতিপয় সম্রাটের বিদ্রোহে তাঁহার
এই মহৎ কার্যে সহায় হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে
পুণ্ড্রাশ্রয় পোলক মহোদয়ের সহিত আমরা
সংগঠিত। তিনি একাধিকবার এই বিষয়ে সম্রাট-
ভূতি লাভ উৎসেজে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন।
বঙ্গীয় গোবিন্দে গান্ধীকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া-
ছেন। গান্ধী গোবিন্দে প্রভৃতি মহারাষ্ট্র সম্রাটগণ
আন্তোৎসর্গের মহৎ ভারতের নীর্ঘস্থানীয়।

গোবিন্দে বলিয়া দিগাহেন, ‘বঙ্গদেশে যন্ত্র কেননা,
জগদীশ বহু, অমূল্যসম্রাট, রমণীসম্রাট ঠাকুর প্রভৃতি
বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।’ আমরা বলিব,
মহারাষ্ট্র যন্ত্র; কেননা গান্ধী, গোবিন্দে, ঠাকুর প্রভৃতি
মহারাষ্ট্রগণের অমূল্য সম্রাটগণ। ইঁহারা
আন্তোৎসর্গের সহিষ্ণু সমগ্র ভারতভূমিকে সমুদ্রল
করিয়াছেন। যেদিন যেদিন বঙ্গবালকগণ, বঙ্গপুত্র-
গণ, হত্যা-মন্ত্র ভুলিয়া, অত্যাচারের ত্যাগ করিয়া
গান্ধীর আদর্শে নির্ভীকভাবে মহিচ্ ধর্মব্রত অবলম্বন
করিয়াছে; সেইদিন বৃষ্টি বঙ্গদেশের কল্যাণার্থ
সত্যই আমাদের দিকট উন্মুক্ত।

গান্ধীর সাধনা প্রকৃতই কথিবনোচিত। তাঁহার
সংকল্পের ফলে অসংখ্য ভারতীয় কাম্যভ ভোগ
করিতে ইঁহাছে, বন্দীরূপে কাম্যভে ধাক্কা দেওয়ার
কাল পর্যন্ত করিতে ইঁহাছে। কিন্তু কোন কষ্টই
কোন অপমানই এই সাধনী পুরুষকে তাঁহার পুত্র
সংকল্পে তিলমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। গান্ধী-
এই ভারতবাসীর নিহত্যচার সাধনার ফলে অবশেষে

* হিন্দুগণে বৈশাখের সারভিতে ইঁহা একাংশের হুঁদা করিয়া উঠিতে পারি নাই।—ভাষ্য সং.

এখন আশিষ্ঠা-পূর্ণিমাকে অবকাশে, কামতবানীর অধিকার স্বীকারে বাধ্য হইয়াছে। যশেনবানীর হুণে হরণে তাঁহাদের হুণে কষ্টে আমি সার্থক; তাঁহাদের আত্মোৎসর্গে আমি সমগ্র ভারতের আন্দোলন করিব।

কিন্তু শাখীর সেই হুণের দিনে, অসম-সংকরে, সন্ধিহুতারে কে তখন তাঁহাকে মটল বণ্ণ দিগাহিলেন! অস্ত্রান্ত পরিপ্রদে তাঁহার সাধাণা করিয়া তাঁহার কর্তব্য সহজ-পালনীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন যিনি, তিনি কে? তিনি তাঁহার এই সাক্ষী পত্নী, স্বপ্ন হুণের, ঐত, সংকরের ভাণী, জীবনের অকৃত সহপাঠিত্রী, মহারমণ; কস্তুরাধাই। স্ত্রী যবি থানীর সমসাহন ও সংকারণের সহায় হন তবেই পুত্রের জীবন সর্গতোভাবে সার্থক হয়। শিকার অভাবে চরিত্রবলের অভাবে স্ত্রী কৃত সমর থানীর সহায় না হইয়া তাঁহার সমুদ্রইনে বাধাশ্রয়ান করেন—এ পুত্রের এগেণে জেন, সকল দেশেই বিজ্ঞান। ইন্দ্রী কস্তুরাধাই প্রযোগ্য থানীর প্রযোগ্য পত্নী। ইনি সেই জুহু অবশেষে নিরন্তর

অস্ত্রাচার কারাবাস লাভনা প্রতিটি সপ্ত করিয়াও যশেনবানীর হিতসাধনের থানীর সহিত কারমনে এক হইয়া কাম করিয়াছেন। এই সকল কণ্ঠস্বা নর নরী কোন দেশের বা কালের বিশেষ সম্পত্তি নহে, ইহারা মগংগৌরব। তবে ইহাবিগকে আত্মীয় জ্ঞানে দেখেথানী হুণ আদরও পৌরষ অহুতব করি। এই মহারমণ জীবনের অগ্রিমস্বীকার বেগুন অটল বৈধের সহিত কষ্টে হুণে, অস্ত্রাব-বৈধে আশনার মহত্ব রক্ষা করিয়া এসমর অস্ত্রকরণে থানীর অসুখর্তী হইয়া-ছেন তাহা পুরাতন দিনের গল্পের কথা নহে, আশিকার চিত্রের সত্য গটনা, সত্য চিত্র।

সেই মহিমময়ী ইনগেণে বুদ্ধ মতিহুতচিত্রে প্রজ্ঞা ও প্রীতিপূর্ণ জনমে কারবার অভিধানন করি।

যে বরনাতি, তোমার পুত্রকে আনাবিগকে অহু-প্রাণিত কর। তোমার অদর্শ মহিমার ভারতের প্রত্যেক গৃহ কুন্তর এবং উচ্চতর কর্তব্য পালনে সমুদ্বল হইয়া উঠুক।

দৈব-পরীক্ষা

ব্যবহার-শাস্ত্রই সত্যতার প্রধান পরি-মাণক। অপরাধ নিকপন করিয়া মোখীকে শাস্তিপ্রদানের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, যে সমাজে আছে, সেই সমাজের লোকের জীবন ও ধনসম্পত্তি নিরাপদ। এবং ঐতিক ও পারমিত্রিক উন্নতির প্রচুর অবসরও সেখানেই বর্তমান। কেবল তাহাই নহে, সমাজের অস্তিত্বও ঐ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। যদি সমাজে ব্যক্তিগণ অসঙ্গত উপায়ে পরস্পরের ধন প্রাণ নষ্ট করিতে চেষ্টা পায়, তবে অল্পকালের মধ্যেই সমাজগণীর জগৎ ও চূর্ণ হইয়া যায়। অতি প্রাচীন

কাল হইতেই মহুযাসমাজে বোধনিরূপণ করিয়া অপরাধীকে শাস্তি দিবার বহুবিধ নিয়ম প্রচলিত আছে। কিন্তু অনেক সময় বোধ নির্দেশ করা এত কঠিন হয় যে, মহুযাবুদ্ধি উহার মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারে না। এমন কি, অনেক বিষয়ে আধুনিক ব্যবহারবিদ মনীষীগণকেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া উঠিতে হয়; অতএব, যখন এতালের মত বিদ্বত ও নির্দোষ ব্যবহার-শাস্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই, অহুসঙ্গের বিষয়ের জটিলতা যখন সহজে লোকের বোধগম্য হইত না, তখন অপরাধী নির্ণয় যে কত দুষ্কর ছিল তাহা

সহজেই অহুসের। যে আতি এই বিষয়ে বহুদূর কৃতকার্য হইয়াছে, সত্যতার গৌরবলাভে তাহার ততই অধিকার।

প্রাচীন অনেক আতির মধ্যে অতিযুক্ত ব্যক্তির দোষগুণ পরীক্ষা করিবার কতকগুলি অদ্ভুত এবং অতিকঠোর নিয়ম প্রচলিত ছিল। বিচারকেরা যখন কোন মতেই অপরাধের সত্যাদতা নির্ণয় করিতে পারিতেন না, তখন উহার সীমাসার ভার দৈবসাহায্যের উপর ছাড়িয়া দিতেন। যদি অতিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ হত, তবে তাহাকে বিপদে ফেলিয়া দিলে দৈবই রক্ষা করিবে, নতুবা করিবে না—এই বিশ্বাসই তখন বিচারকার্য নিয়ন্ত্রিত করিত। এই শ্রেণীর অপরাধ-পরীক্ষাকে দৈবপরীক্ষা বলা যাইতে পারে। বোধ হয় তখন মানুষের এ জ্ঞান জন্মায় নাই যে প্রাকৃতিক নিয়মের কোথাও নড়চড় নাই। অগ্নির দাহিকাবলি, বিষ-প্রয়োগের শোচনীয় পরিণাম প্রভৃতি যে সকল নিয়ম আমরা এখন অসিদ্ধাৰ্য্য বলিয়া জানি, মানবসমাজের বাল্যকালে, এই নিয়মগুলি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ব্যর্থ হইতে পারে এই ধারণা প্রবল ছিল।

প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যেও দৈব-পরীক্ষা প্রচলিত ছিল, কেহ কেহ এমন অহুসান করেন। তাহার বলায় যে সফোক্লিসের (Sophocles) Antigone নামক গ্রন্থে উহার আভাস আছে। (Chamber's Encyclopædia.) প্রাচীন ইহুদিদিগের মধ্যেও যে দৈবপরীক্ষার বিশ্বাস ছিল তাহা বাইবেলের 'Number, V' অধ্যায়ে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐ স্থানে ব্যক্তিচারে অতিযুক্ত একজন গ্রীককে মন্ত্রপুত বলদান করিয়া নির্দেশ নির্দোষিতা সঙ্গমণ করিতে বলা হইয়াছে। Livingstone বলেন যে, আফ্রিকার নিগ্রোজাতির মধ্যে ঐরূপ এক নিয়ম প্রচলিত আছে। কোন নিগ্রো নির্দেশের পক্ষীয় সতীথে সন্নিহান হইলে, তাহাকে এক প্রকার ভেষজরস পান করিতে দেওয়া হয়। যে গ্রী দোষী, ঐ রস পান করিলে তাহার রক্তপান হইবে, যে নির্দোষ তাহার কোন অসিদ্ধ হইবে না। নিগ্রোদিগের ভিন্ন ভিন্ন শাখার ভিন্ন ভিন্ন রকমে ঐ প্রথা লক্ষিত হয়। এক শ্রেণীর লোকেরা কুকুট বা সারমেরকে ঐ রস পান ও তাহাকে বমন করাইয়া অপরাধী নির্ণয় করে। ইউরোপের মধ্যযুগে অনেক প্রকারের দৈব পরীক্ষা প্রচলিত ছিল। প্রথমতঃ অগ্নি পরীক্ষা। ইহা কৈনল মন্ত্রান্ত অভিজাতগণের প্রতি প্রযুক্ত হইত। সম্ভ্র-যুক্ত ব্যক্তিকে উত্তম অগ্নিবর্ণ লোহখণ্ড করতলে রাখিয়া কিরদূর অতিক্রম করিত হইত; অথবা উত্তম লাড়লেব ফলক কতকগুলি মাটিতে ফেলিয়া রাখিয়া অতিযুক্ত ব্যক্তির চক্ষুর উত্তমরূপে বাধিয়া উহার উপর দিয়া তাহাকে নগ্নপদে হাঁটিয়া যাইতে বলা হইত। তাহার পর তাহার হস্ত অথবা পদ বস্ত্রদ্বারা পৃচ্ছরূপে বাধিয়া তিনদিন পরে খোলা হইত। Hume বলেন যে, হাত পা বাধিয়া গুলমোহর করিয়া রাখা হইত (History of England vol 1, p 175)। অতঃপর বহুদূর যুগিলে বহি ক্ষত বা কোন পোড়ানাগ না দেখা যাইত তবে আসামী নির্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। কাহারও

এবং বলে নিশ্চিত হইলে অল্প যদি তাহাকে ভাসাইয়া না তোলে, তবে সে নির্দোষ জানিবে।” কিন্তু এই বিধান কেবল শূন্যের প্রতি প্রযুক্ত হইত। Vincent Smithএর মতে মহাসংহিতা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সংকলিত হইয়াছে। সুতরাং এই সময়েই যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞানদ্বারা হিতোপদেশে ধর্মবুদ্ধি ও পাপ হৃদয়ের গমেও আবির্ভাবিক উপায়ে ভার বিচার সম্পন্ন করিতে দেখা যায়। পাপবুদ্ধি ধন্যপহারক হ্রিয় করিবার জন্য অসংখ্য-সেবতাকে সাক্ষ্য মানিয়াছিল এবং রাজ-পুত্রেরা উহাতে বিশ্বাস করিয়া সেবতার বাণী শুনিবার জন্য অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন।

বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণের বিবরণ পাঠ করিলে দৈবপরীক্ষার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বেপাহিনিসের বিবরণে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই সত্য, কিন্তু তাহার পরে এই বিষয় বৈদেশিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এক গ্রীক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে ধর্মার্থপরীক্ষার জন্য এক ভ্রম আছে। উহার অল্প সর্বত্র জাহ্নবী পর্বাঙ্গ গভীর। বাকী এবং প্রতিবাদী উভয়েই বলে নাহিরা এপার হইতে ওপার পর্বাঙ্গ চলিয়া যায়। যে নির্দোষ তাহার জাহ্নবী উপর জল উঠে না, কিন্তু সে এক্ষত দোষী সে কিছুদূর গেলেই তাহার মাথা পর্বাঙ্গ জলে ডুবিয়া যায়। উক্ত গ্রন্থকার আরও বলেন যে, ভারতবর্ষে এক পর্বতের মধ্যে এক প্রকাণ্ড গহ্বর আছে। উহার

অভ্যন্তরে বানশব্দ উক্ত এক বেবদৃষ্টি আছে। ঐ মূর্খের অর্দ্ধভাগ স্রী ও অপার্দ্ধ পুরুষের মত। উহার পক্ষান্তে বহুদূর পর্বাঙ্গ অন্ধকারময় পথ। তাহার পর এক ঘর; তাহার মধ্যে দিরা নির্দল জল-ধারা প্রবাহিত হইতেছে। ঘাটার জাহ্নবীর পরীক্ষা করিতে আসে, তাহার মশাল লইয়া ঐ অন্ধকার পথ দিরা ঘর পর্বাঙ্গ অগ্রসর হয়। যে নিপাত্ত সে অন্যায়সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, আর যে শাস্ত্রী সে প্রবেশ করিতে উত্তত হইলেই ঘর আপনা-আপনি কড় হইয়া যায়। এই প্রকারে পাপ-পুণ্যের সীমানা হয় এবং অপরাধী ধরা পড়ে (McCrindle's Ancient India p. 173)। উক্ত গ্রন্থকার খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক বটে, কিন্তু তিনি যে গ্রন্থ হইতে আপনার উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন, উহা পূর্বে স্মৃতি হইয়াছিল।

সুহৃৎসুহৃৎ চারিপ্রকার দৈবপরীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম পরীক্ষার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বলির মধ্যে পুরিয়া একটি ভারি প্রস্তর-পাতের সহিত ঐ বলিটি দড়ি দিরা বাঁধিয়া গভীর জলে নিক্ষেপ করা হয়। যদি বলিটি ভাঙ্গে এবং পান্থর ডুবিয়া যায় তবে আসামী নিরপরাধ বলিয়া প্রমাণিত হইবে। যদি পান্থর ভাঙ্গে আর লোকটা ডুবিয়া যায়, তবে সে-ই দোষী।

দ্বিতীয়তঃ অগ্নিধারা পরীক্ষা। আসামীকে উত্তপ্ত লৌহাসনে বসান হইবে, উত্তপ্ত লৌহখণ্ড তাহার পায়ে এবং হাতের তলায় লাগাইয়া দেওয়া হইবে, অধিকন্তু তাহাকে নিম্বাধারা ঐ লৌহখণ্ড চাটিতে

হটবে, উহাতে যদি শরীরের কোন স্থানে কোন দাগ বা ক্ষত হয় তবে সে গোবী সত্যাত হটবে, নচেৎ নয়। অতিশুক্ল বাস্তব কথা হইলে একটি স্থলের কুড়ি অর্ঘ্যে নিষ্ক্ষেপ করিতে হইবে। যদি ঐরা কুটিরা স্থল হয়, তবে আসামী নির্দোষ। পুড়িয়া গেলে সে গোবী।

তৃতীয় পত্রিকা তুলানোর সহায়তার। আসামীকে একদিকে ও অপর দিকে একখণ্ড প্রস্তর দিয়া তুলানও সমান করিয়া ওজন করিলে যদি আসামী নির্দোষ হয় তবে তাহার দিক সুলিয়া গড়িবে, অর্থাৎ বিপরীত হইবে।

চতুর্থ উপায় বিশ্বপ্রত্যয়। একটি মেঘের দক্ষিণ উল্লভে ক্ষত করিয়া উহার মধো নানাবিধ বিষ ও আসামীর খাত্ত একত্র করিয়া মিলাইয়া রাখা হয়। যদি ঐ বাস্তব নিরপরাধ হয়, তবে ঐ মেঘের কোন অনিষ্ট হইবে না, নতুবা তাহার মৃত্যু হইবে। (Beal, Western Records, Vol. II)

এই বিংশ শতাব্দীতে আমাদের নিকট উল্লিখিত বিচার-প্রণালী অকৃত এবং বর্ষমোচিত সুলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর হিন্দুগণ এবং যুগ্মচর্য্যও নিজেও উহাতে অবিশ্বাসের কোন কারণ দেখিতে পারি নাই। কিন্তু, প্রাচীন সাম্রাজ্যদিগের মধ্যে অগ্নিশ্রীক্ষা ও তৎপ্রকার অস্ত্রাস্ত্র ব্যাপারে সম্রাট কামতাপালী ব্যক্তিকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য পুরোহিতগণ বৈষ্ণব নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করিতেন, সেইরূপ এদেশেও হইত কি না তাহা বিবেচনার বিষয়।

যুগ্মচর্য্যের চারিশত বৎসর পরে আর এক বিদেশের মধ্যে দৈনন্দিন পত্রিকা প্রবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। আগবেক্ষণী একাধিক শতাব্দীতে তারিতে আগমন করেন। তাহার ভ্রমণবৃত্তান্তের সপ্ততম অধ্যায়ে হয় প্রকার কঠোর পরীক্ষার বর্ণনা আছে। (Sachacc's Translation P 159.)

প্রথম উপায় এই। আসামীকে এক প্রকার বিষ পান করিতে দেওয়া হয়। তাহার কোন দোষ না থাকিলে, উহাতে অনিষ্ট হইবে না। আগবেক্ষণী বলেন, ঐ বিষের নাম "জাঙ্গ" এবং উহা প্রাণনাশক। নামসম্বন্ধে তাহার ভ্রম থাকিতে পারে, কিন্তু বিষের গুণবিষয়ে ভ্রম না হওয়াই সম্ভব।

দ্বিতীয় উপায় পূর্নকথিত জলে ডুবাইয়া মারাইয়া রাখার। আসামী কোন গভীর নদী অথবা স্থলের নিকট গিয়া জনকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, "হে জন, তুমি দেবতাদিগের অধিকারস্থ। গুপ্ত ও ব্যক্ত সকল বিষয় তুমি অবগত আছ। অতএব আমি নিষ্পাপ হইলে আমার জীবন রক্ষা করিও, আর দোষী হইলে আমাকে সংহার করিও।" অতঃপর পাঁচজন লোকে তাহাকে ধরিয়া সংলগ্ন জলমধ্যে নিষ্ক্ষেপ করিবে। পুণ্যবল থাকিলে তাহার রক্ষা, নচেৎ জল আর কোন কথা শুনিবে না।

এইরকম পরীক্ষার নিরপরাধ লোকে কি প্রকারে নিষ্কৃতি পাইত তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর; পক্ষান্তরে প্রকৃত অপরাধীর অব্যাহতি লাভের অভি সন্দেহ উপায় ছিল।

একটু সাহস দেখাইলেই কাগা দিচ্ছিল হইত। আলবেনস্কী অপরাধী সাব্যস্ত করিবার তৃতীয় উপায় এইরূপ বলিয়াছেন।

বাদী ও প্রতিবাদী উভয়কেই এক দেবমন্দিরে লইয়া যাওয়া হইত। প্রতিবাদী পূর্বদিক উপবাস করিয়া বাদীর সহিত দেবতার সম্মুখে দাঁড়াইত। তাহার পর পুরোহিত দেবমূর্তিকে মান করাইয়া সেই জন উভয়কে পান করিতে দিতেন। সে অপরাধী হইলে রক্তবমন হইত, নচেৎ কিছুই হইত না।

চতুর্থ পরীক্ষা অতি বিচিত্র। আসামীকে পাঁড়িপাল্লায় বসাইয়া ওজন করিবে। তারপর সে নামিয়া আসিয়া তেত্রিশকোটি দেবতার মধ্য হইতে যত জনের ইচ্ছা দোহাই দিবে এবং তাঁহাদের নাম একখণ্ড কাগজে লিখিয়া মাথায় বাধিবে। পুনরায় ওজন করিয়া যদি সে পূর্বাংশের ভারী হয়, তবে সসজ্জনে মুক্তিলাভ করিত তাহা না হইলে সে দোষী।

পঞ্চম পরীক্ষায় যে পড়িত তাহাকেই দাগী হইতে হইত। মাখন ও তিলের তৈল সমপরিমাণে লইয়া এক কটাহে রাখিয়া আগুনে হুটাইবে। পরে একটা টাট্টিকা পাতা উহাতে ফেলিয়া দিলে যদি দেখা যায় যে উহা তৎক্ষণাৎ তৈল মধ্যে পুড়িয়া গিয়াছে, তবে পরীক্ষার সময় হইয়াছে জানিবে এবং একখণ্ড স্বর্ণ উহাতে ফেলিয়া দিয়া আসামীকে হাত দিয়া তুলিতে বলিবে। হাত যদি পোড়ে তবে তাহাকে অপরাধের শাস্তিগ্রহণ করিতেই হইবে।

আলবেনস্কী যষ্ঠ পরীক্ষাকেই কঠোরতম বলিয়াছেন। একখণ্ড শোহকে এত উত্তপ্ত

করা হইবে যে, উহা প্রায় গলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে। তখন আসামীর হাতে কয়েকটা ধান রাখিয়া তত্ত্বপরি একটা বৃক্ষপত্র রাখিবে এবং তাহার উপরে ঐ অগ্নিবর্ণ শোহ স্থাপন করিবে। আসামী উহা লইয়া সাত পা চলিলে যদি তাহার হাতের কোন অঙ্গিনা দহু, তবে সে নিরপরাধ। এই পরীক্ষা মনুষ্যে বর্ণিত আছে। কিন্তু তখন শূত্রের জন্তই ইহায় ব্যবস্থা ছিল।

আবুলফরেলের মতে হিন্দুদিগের মধ্যে আট প্রকার দৈবপরীক্ষা প্রচলিত ছিল। (Gladwin's Ain-i-Akbari P. 740)। কাহারও কাহারও মতে বাদীই উক্ত পরীক্ষা দ্বারা নিজের অভিযোগের সত্যাসত্য নিরূপণ করিবে। প্রথম পরীক্ষা ব্রাহ্মণদিগের জন্য। আসামীকে তুলানিতে ওজন করিয়া নামাইয়া দিবে এবং কতিপয় ধর্ম্মগ্রন্থের সুল্পন করিয়া তাহাকে পুনরায় ওজন করিবে। যদি সে পূর্বাংশের হালকা হয় তবে সে নির্দোষ, আর যদি ভারী হয় অথবা তুলানও সমান থাকে, তবে সে-ই প্রকৃত অপরাধী।

দ্বিতীয় পরীক্ষা তপ্ত শৌহের, কিন্তু একটু নূতন রকমের। যোগ আবুল অন্তর রাখিয়া ৭টা বা ৯টা বৃত্ত মাটিতে অঙ্কিত করা হয়। বাহ্যকে পরীক্ষা করা হইবে সে স্নাত হইয়া আটারাহুটানাদি সমাধি করিলে তাহার দুই হাতের ভাল একত্র করিয়া ৭টা অথবা ৯টা রাখিয়া রেশম ঘাটা ভাল করিয়া হাতদুটি রাখিয়া দেওয়া হয়। সেই অবস্থায় সাড়ে তিন সের ওজনের অগ্নিবর্ণ শৌহখণ্ড হাতে লইয়া আসামী একে একে

ঐ দৃষ্টান্তটির মধ্য দিয়া হাঁটিয়া যাইবে। শেষবৃত্তে আসিলে লোহদণ্ড ফেলিয়া দিতে পারিবে, কিন্তু যদি সে কিছুদূর আসিয়াই ফেলিয়া দেয়, তবে আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। ইহাতে কোন অনিষ্ট না হইলে বিচারে তাহারই জয় হইল।

আবু-কজলের তৃতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে অনেকদূর বাসরুদ্ধ করিয়া রাগার অত্যাশ দরকার। যে এই পরীক্ষায় পড়িবে, তাহাকে পূর্বদিকে মূণ করিয়া নাকি পর্য্যন্ত গলে নামিয়া ডুব দিয়া থাকিতে হইবে। এদিকে এক ব্যক্তি ১০৬ আবুল দীর্ঘ এক ধমুকে তীর যোজনা করিয়া নিক্ষেপ করিবে এবং আর এক ব্যক্তি দুটিয়া গিয়া উহা লইয়া আসিবে। এই সময় পর্য্যন্ত যে ডুব দিয়া থাকিতে পারিবে, বিচারে তাহারই জয় লাভ হইবে। এই পরীক্ষা কেবল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান।

চতুর্থ পরীক্ষা বিষপ্রয়োগ, সূত্রেব প্রতি প্রয়োগ। ক্ষত্বিশেষে বিষের পরিমাণের ভারতম্য আছে। বিষের সহিত ত্রিশতম পরিমাণ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া আসামীকে দক্ষিণমুখে দাঁড় করাইয়া মস্তাদি উচ্চারণ করা হইলে অপর একব্যক্তি পূর্ব অথবা উত্তরমুখী হইয়া তাহাকে উহা খাওয়ারইয়া দিবে। দর্শকেরা পাঁচশতবার করতালি দিবার মধ্যে যদি বিষের কোন জিরা না হয় তবে আসামী মুক্তি পাইবে এবং বিষয় ঐবধ প্রয়োগ করা হইবে।

পঞ্চম উপায় দেবমূর্তির মানের জলপান।

চৌদ্দ দিনের মধ্যে কোন অপকার না হইলে আসামী নির্দোষ জানিবে।

ষষ্ঠ পরীক্ষা এই প্রকার। মাতীর পায়ে বাটী (বা আত) ধানের চাউল একরাতি রাগিয়া প্রত্যেকে মস্ত্রোচ্চারণ করিয়া অভ্যুত্থিত ব্যক্তিকে পূর্বমুখী করিয়া দাঁড় করাইয়া উহা খাওয়ারইয়া দিবে। পরে অথবা বা তুর্ক্ষপত্রে নিষ্কীন ফেলিলে যদি তাহাতে রক্ত দেখা যায়, অথবা যদি তাহার মূণ ফোলে কিংবা দেহাদি কাঁপে তবে প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়িয়াছে বলিয়া জানিবে। এখনও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এইপ্রকার চালপড়ার ব্যবহার সময় সময় দেখা যায়।

সপ্তম পরীক্ষা ফুটন্ত তৈল হইতে এক পণ্ড স্বর্ণ তুলিয়া লওয়া, আলবেরক্লী ও আবু-কজলের বর্ণনারই মত।

অষ্টম পরীক্ষা অতি সহজ। বাদী প্রতিবাদী উভয়ে দুইখানা রূপার বা সীসার পাতের উপর অথবা তুর্ক্ষপত্রে “ধর্ম” ও “অধর্ম” এই দুইটী লিখিয়া পূর্বে জল রাখা হয় নাই এমন একটি পাত্রে রাখিবে। তাহার পর বাহার ভাগে “ধর্ম” কথাটি উঠিল সেই জরী হইবে। এই প্রকার হুজিৎয়া দ্বারা ধর্মোদ্বর্ত নির্ণয় বিধিতেও প্রচলিত ছিল। George Eliot এর Silas Marner নামক উপন্যাসে তাহার প্রকাশ পাওয়া যায়।

মিল্‌ উপায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে বলিয়াছেন যে, নবপ্রকার দৈবপরীক্ষা হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তুলান্ড, অতিকুণ্ড, জলে নিমজ্জন, বিষপ্রয়োগ, দেবমূর্তির মানের জল, চালপড়া, ফুটন্ততৈল,

ভগ্নলোহ এবং ছইখানি ক্ষুদ্র. দেববিগ্রহ লইয়া পরীক্ষা কার্য সম্পন্ন হইত. (Mill's History of India p. 195)। অস্ত্র সব ভলিই আবুলফজলের বর্ণিত পরীক্ষার অনুরূপ; কেবল তিনটির বর্ণনা অস্ত্র রক্ষকের।

মিল-বর্ণিত অগ্নিপরীক্ষা এই প্রকার। নয় হস্ত দীর্ঘে, দুই বিঘত প্রস্থে এবং এক বিঘত গভীর এক গর্ত করিয়া উহা অগ্নিপূর্ণ করিবে। অতঃপর অভিমুক্ত ব্যক্তি নয়পদে ঐ অগ্নির উপর দিয়া হাঁটয়া যাইবে। ইহাতে তাহার কোন অশকার না হইলে সে নির্দোষ প্রতিপন্ন হইবে।

বিব-পরীক্ষা দুই প্রকার—এক আসানীকে বিব বাওয়ানো। অপর পরীক্ষার এগুটি বিবধর সর্পকে হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া একটা অল্পী বা মূত্রা উহাতে ফেলিয়া দিবে। আসানী যদি নির্জ্বলে হাঁড়ীর মধ্যে হইতে উঠা তুলিয়া লইতে পারে, তবে তাহার কোন দোষ নাই মনে করিতে হইবে।

শেষ পরীক্ষা দেবমূর্তি লইয়া। একটা রূপার ও আর একটা সীসার ছোট মূর্তি কোন গভীর শাক্রে রাখিবে; অথবা এবথও সাদা আর একথও কাল কাপড়ে দুইটা বিগ্রহ অঙ্কিত করিয়া গোবরে পুঁরিয়া হাঁড়ীর মধ্যে রাখিবে। যদি আসানী রোণামূর্তি বা খেত বস্ত্রখণ্ড সহজেই তুলিয়া লইতে পারে, তবে সে নিরপরাধ।

একপে দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে দৈবপরীক্ষা প্রচলিত ছিল। বৈদিক যুগে মাত্র এক

প্রকার; সময় সময় দুইপ্রকার, (তাহাও শূঙ্গের ক্ষত), কিন্তু ক্রমে সংখ্যা বর্ধিত হইয়া আট নয় প্রকার হইয়াছিল। ইহা ঘরা জ্যর বিচারের নামে যে কেবল নৃশংসতারই অঙ্কঠান হইত তাহা নহে, সময় সময় অতি বীভৎস ব্যাপারও উহার সহিত মিশ্রিত থাকিত। ডাঃ বুকানন নামক একজন ইংরাজ লর্ড ওয়েলেসলীর সময় দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করিতে করিতে ইহার এক দৃষ্টান্ত দেখিতে পান। তিনি বলেন যে, দক্ষিণাভ্যন্তর কোন কোন স্থানে যদি এক বর্ণের পুরুষ অস্ত্র বর্ণের স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিয়া পাপ গোপন করিত, তবে তাহার পরীক্ষার ক্ষত স্ত্রীলোকের শরীরে গলিত সীসা এবং পুরুষের শরীরে উত্তপ্ত লোহ অতি কুৎসিত উপায়ে প্রযুক্ত হইত। লোকের বিশ্বাস ছিল যে, নির্দোষ ব্যক্তির উগ্রতে কোন অনিষ্ট হইবে না। (Mill's History of India, p. 195, note.) মিল বিষয়ের বলবর্তী হইয়া এ কথা লিখেন নাই, ইহা সন্দেহ; তিনি বুকাননের পুস্তকের পত্রাঙ্ক উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন এবং সমালোচক ইইলসনও তাহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই।

ইউরোপে দৈব-পরীক্ষা বহু শতাব্দী উদ্ভিন্ন গিয়াছিল, এখানে তত শীঘ্র বার নাই। মুসলমান অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে উহা ক্রমে কমিয়া আসে এবং বোধ হয় ইংরাজ রাজত্বের পূর্বেই অনেকটা লোপ পাইয়াছিল। তবে স্থানে স্থানে পরেও লোকের উগ্রতে বৃদ্ধ বিশ্বাস ছিল। আজিও চালপড়া, বাটি চালান, হাতচালান, মলচালান প্রভৃতি

ব্যাখ্যার নিম্নলিখিত লোকের উপর প্রত্যাব
বিস্তার করিতেছে। মাহুকের মনে কুলংকার
বন্ধমূল হইলে সহজে তাহা উৎপাটিত হয় না।
তাহার উদাহরণরূপ বলিতে পারি যে,
অসভ্য ইংলণ্ডও নরহত্যা হইলে রক্তকণের
"মধ্যে মৃতদেহ স্পর্শ করিবার জন্য আনিও

বিস্তারমান আছে। স্পর্শ করিলে মৃতব্যক্তির
প্রতি কোন বিবেচনা নাই, ইহা অমানিত
হইবে। আততায়ীর স্পর্শ মৃতদেহের লক্ষণ
দেখিবার যুগ্ম ঘটনায়, এই প্রাচীন বিশ্বাসের
আভাস ঐ-প্রকার পাওয়া যায়।

ক্রীমেনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঠাকুরঝি

গল্প

নীলজা রামাবরে কোল সাঁওলাইতেছিল,
—শিবপ্রিয়া পা টিপিয়া অলক্ষ্যে আসিয়া
তাহার মুখে খানিকটা মোহনভোগ পুরিয়া
দিল। নীলজা বাড় ফিরাইয়া অহুযোগের
স্বরে কহিল, "ও কি ভাট, ঠাকুরঝি!"

শিবপ্রিয়া হাসিয়া কহিল, "কিছু মুখে
দাও দেখি। নিজে থেকে ত খাবার
কখনও ছুরসৎ দেখেন না!"

নীলজা হাত খুঁটয়া ধোয়া জল কড়া
ঢালিয়া সহিয়া আসিল, কহিল, "এই যে
কোণটা নারীরে বেখেই খেয়ে নিচ্ছি।"

"বাসি রুটি ত! সে আর তোমার
খেতে দিচ্ছি না। কেন বল তো,—আমি
খাব লুচি মোহনভোগ, আর তুমি বাড়ীর
বৌ, একটু বৌ, তুমি কতকগুলো বাসি
রুটি গিলবে! কেন? মার সঙ্গে এই
নিম্নে আজ খুব একচোট হয়ে গেছে,
আমার।"

নীলজা স্নান মেয়ে শিবপ্রিয়ার পানে
চাহিল। সে দৃষ্টিতে করুণ মিনতি যেন

করিয়া পড়িতেছিল। কেন, তুমি আমার
হইয়া অগড়া কর, তাই? সে তাল
সামলাইতে আমার যে প্রাণ বাহির হইয়া
যায়! শিবপ্রিয়া তাহা বুঝিত, তাই সে
কহিল, "আমি এবার তোমার সঙ্গে সঙ্গে
পাউব। দেখি, যা তোমার কেমন কিছু
বলে!"

নীলজা শিবপ্রিয়া উঠিল, কহিল, "না ভাট,
না ঠাকুরঝি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

শিবপ্রিয়া একদৃষ্টে নীলজার পানে চাহিয়া
রহিল। নীলজার স্তন্যর মুখে ঘামের বিন্দু
ছুটয়া উঠিয়াছে; কপালের উপর মুক্ত
কেশভঙ্গা সে ঘামে ভিজিয়া বলিয়া গিয়াছে;
আঙুলের তাগে মুখ তাহার রাঙা হইয়া
উঠিয়াছে! শিবপ্রিয়া কহিল, "আজ থেকে
আর একলা তোমার সঁাবতে দিচ্ছি না।
আমিও রামার যোগ দেব।" বলিয়া শিব
প্রিয়া উনানের দিকে অগ্রসর হইল।

নীলজা বাধা দিয়া কহিল, "না ভাট,
তোমার দহ হবে না; অস্থির করবে।"

শিবপ্রিয়া সঝোরে কহিল, “ওগো, না গো না, আমি যোয়ের পুতুল নই বে, অগুন-তাতে গলে বাব।”

নীরজা কহিল, “তুমি হুদিনের জন্তে এখানে কিরূতে এসেছ—”

শিবপ্রিয়া কোলের তাল করিয়া কহিল, “বটে, আমার বাপের বাড়ী আমি এসেছি, কুটুম! তাই আমি সিংহাসনে নিখা-রাস্তির বসে থাকব, কুটোটি অবধি নাড়তে পার না! ইস লো! না, আমার হাতের রান্না খেলে তোমাদের ক্ষতি হবে? ওগো, তোমার ঠাকুরজামাই অশান্তি খেলেন সে বোছনমান নয়—বুকেল?”

নীরজা জানিত, শিবপ্রিয়াকে ঠেকাইয়া রাখা দায়! সে বাহা ধরিলে, তাহা সে করিলেই। বিশেষ নীরজার কষ্ট এতটুকুও লাঘব করিবার জন্ত শিবপ্রিয়া মাঝের উগ্র রোবানল হাসিমুখে মাথার তুলিয়া লইতে পারে। বড়লোকের ঘরে সে পড়িয়াছে, —বাপের বাড়ী বড় একটা আসিবার তাহার হুবিধা ঘটে না। এক বৎসর পরে কয়দিনের কড়ারে এবার সে বাপের বাড়ী আসিবার অনুমতি পাইয়াছে। না মেরেকে পাইয়া কোণার রাখিবেন, কি তাহাকে পাঁচটা ভাল কিনিয়া খাওয়াইবেন, তাহা ভাবিয়া অধির আকুল হইয়া উঠিয়াছেন! পূর্বে যেখানে শুধু দেহ ছিল, এখন সেখানে মন ভোগাইবার পালা পড়িয়াছে। হোক পেটের দেহ, তবু সে আজ বড়লোকের ঘো! এই কথাটাই মায়ের মনে সকলের চেয়ে বেশী আগিতেছিল। তাই মা মেরের জন্ত অতিরিক্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

যেহে কিস্ত দেখিতে পাইল, তাহার আদরের ঘটায় বেচারী নীরজার পরিভ্রমের সীমা নাই। আবার শুধু তাহাই নহে। দুখ টিপিয়া এতখানি যে খাটিয়া সারা হইয়া বাইতেছে, তাহার উপর জুলুমেরও কি অভ আছে! আবার শুধুই জুলুম? শিবপ্রিয়া নারী—সে জানে, সংসারের কাজে নারী যতই খাটিয়া সারা হোক, না কেন, সে খাটুনি কিছুই তাহার গারে লাগে না, যদি এ সকল খাটুনির পিছনে আমার ভালবাসার জুড়াইবার একটা আশ্রয় থাকে! কিস্ত এ ক্ষেত্রে নীরজার ভাগ্যো তাহারও অভাব। এবল-প্রভাপ তাই তাহার দ্বীর ভালবাসার ধার মোটেই ধারিত না। ঘো বধন গভীর রাত্রে পরিভ্রমভুক্ত জুড়াইবার জন্ত ঘরের কোণে গিয়া আশ্রয় লয়, তাই শ্রীপতি তখন নীচ ও অল্পজ্ঞ আবাদ-প্রমোদের চেঁচায় বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়। মার সৈনিকে শাসন ত ঘোটেই নাই, বৎ তিনি ছেলেকে এ বিষয়ে একরূপ প্রেরণই দিয়া আসিতেছেন!

বহুদিন পরে তাইয়ের সংসারে আসিয়া এই শিল্পশূন্য ব্যাপার দেখিয়া শিবপ্রিয়ার চিত্ত অগ্নি উঠিল। সে ভাবিল, দুখ হোক, এখনই চলিয়া বাই! কিন্তু না, বেচারী নীরজা! নীরজার ঐতিহ্যগত সমতাই তাহাকে এখানে আটকাইয়া রাখিল। সে ভাবিল, নীরজার সবচেয়ে একটা কিছু ব্যবস্থা করিয়া তবে সে এখান হইতে নড়িবে! এমন লক্ষী ঘো—তাহার এমন চুর্দ্দশা! ঘরের লক্ষী যেখানে কাদিয়া দিন কাটার, সে সংসারের উজ্জ্বল হইতে কতকণ।

তাই নৌয়ের পক্ষ লইয়া মায়ের সহিত সে ঝগড়া শুরু করিল। 'আমি-গোভাগ্যের দুর্ভাগ্য বর্ষ তাহাকে বিপুল শক্তিশাবিনী করিয়া তুলিয়াছিল। মাকে সে স্পষ্টই বলিল, "তোমার আত্মসাতেই ত দাবার এতখানি বাড়ি হয়েছে।"

মা বলিলেন, "তা যা বল, বাপু, শ্রীপতি আমার ১৫-কালের ছেলের মত বেহায়া নয়—যে, বোকে মাথা তুলে নাচেবে।"

শিবপ্রিয়া মাগিয়া বলিল, "না, বোকে ছ'পায়ে খেঁৎলানোটাই ক্রারী পৌরবের লক্ষণ।"

মা বলিলেন, "বৌ বোট আছে, থাকে পরছে—বাস। আবার কি। কিসের তার আর অত্যাচার হইল, শুনি। মেয়েদের মত লোমামীর হাত ধরে গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে বেড়াবে না কি! না, পাঁচটা মজলিলে খেই খেই করে নাচতে ছুটবে?"

বৌ-সখতে মাতার এই আশ্চর্য ধারণার কথা শুনিয়া শিবপ্রিয়া অবাক হইয়া গেল, কিন্তু দমিল না। সে ভাবিল, কিছুতেই ছাড়ি হইবে না—এ গাকে তরী বখন ভাসাইয়াছে, "তখন নক্ষ করিয়া হাল ধরিয়া কুলে সে পৌছিবোই। তাইকেও একদিন কাছে পাইয়া সে বেশ চড়া রকমের দশটা কথা শুনাইয়া দিল। ফলে দাঁড়াইল এই যে, শ্রীপতি পূর্বে দুই বেল দুই মুঠা তোজন করিবার ক্ষমতা অল্পেরে আনিত্তেছিল, এখন শুয়ার কড়া কথা শুনার পর হইতে সে পূরে সে একাত্তই মন হইয়া উঠিল।

এই ঘটনার মায়ের বত রাগ পড়িল,

নীরজার উপর। সে-ই ত এ ব্যাপারের মূল। তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই ত শিবপ্রিয়া কঠিন বচনের ঢাকাপানি ঘুরাইয়া দিগছে। আর সেই ঢাকা তাহাকে ও শ্রীপতিকে মাড়াইয়া দিখিয়া সঙ্গের ছুটিরা চলিয়াছে। কতদিন পরে বেরে আসিল—কোথায় দুই দণ্ড তাহাকে কাছে রাখিয়া সুখ-দুঃখের দুইটা কথা কহিলেন, তাহার অবকালমাত্র না দিয়া যেখটা নৌয়ের সঙ্গে সঙ্গেই চকিবণ ঘটাই গুরিতেছে। পাঁচটা বাজে ছুটা পুঁজিয়া মার সঙ্গে কোঁদিল বাধাইতেছে। সুখ টিপিয়া থাকিলে কি হয়, নৌয়ের হাড়ে তেলুকি পেলো! তাই নৌয়ের উপর তাহার আক্রোশ সীমা ছাপাইয়া উঠিল। নৌকে অন্তরালে পাইলেই মনের আশার বেশ দুই-চারিটা ভিত্তি ছিটা তিনি তাহার উপর নিক্ষেপ করিতে তুলিলেন না।

নীরজা চোখের জল মুছিয়া ভাবিল, হায়, ঠাকুরঝি এ করিল কি। মধু পাইবার প্রত্যাশায় মধু-চক্ষে খোঁচা দিয়া মধু ত পাওয়া গেল না, এখন হুণের নিবে তাহার যে প্রাণ পাইবার জো হইয়াছে! মনে সুখ ত তাহার ছিলই না; স্বস্তি একটু ছিল। সে স্বস্তিটুকুও ঠাকুরঝি আজ দূর করিয়া দিতেছে। হায়, সে দুই দিনের লোক, দুই দিন পরেই দূরে চলিয়া যাইবে; কিন্তু সে বুঝিতেছে না, এ চটদিনে সংসারটার যে সূর্য্যবর্তের সৃষ্টি করিয়া গেল, সে সূর্য্যবর্তের মধ্যে পড়িয়া নীরজার পক্ষে টিকিয়া থাকা কতখানি কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।

মা পা টিপিয়া তথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।
যৌৱেন পানে রক্ত নৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া
কহিলেন, “ননৱের সঙ্গে গানে-গল্পে ঝোলটা
শেষ পুড়িয়ে ফেলা না যেন! কোণায় ও
ছ দিনের অল্প এল, বাপের বাড়ীতে জিকতে,
না, বিবা-রাস্তির ওকে ধরে ফুললোনো
হচ্ছে! শেষে রাস্তাঘরে এই উলোনোর
পানে আগুন-তাতে অবাধি ওকে টেনে
আনা হয়েছে!”

নীৰজা মাটির পানে চাহিয়া রহিল।
শিবপ্ৰিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল, “ও কেন
ডাকতে বাবে? আমি নিজে এগেছি। সকাল
থেকে মাল্লঘটা কিছু না খেয়ে রেখে সারা
হচ্ছে,—কি খেলে না খেলে, সেদিকে কানও
নয় নেই! তাই ওর মুখে ধোর করে
একটু মোহনভোগ পুরে দিলাম।”

মা বলিলেন, “বড়লোকের মেয়ের
মুখে বুকি কটা আর রোচে না!”

শিবপ্ৰিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, “মা—!”
সে স্বরে মা চমকিয়া ধামিয়া গেলেন। শিবপ্ৰিয়া
বলিল, “তুমি ওকে যা খুসী বক্তে
পারো, কেন না ও তোমার নো। এখন
ওকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছ। কিন্তু
তাই বলে ওর বাপের নামে খোঁটা দিয়ে
না। ও ভাল মানুষ, তাই চূপ করে গছ
করছে! আমার যদি কেউ এমনি করে আমার
মরা বাপের নামে খোঁটা দিত, তাহলে
আমি কি করতুম, জানো? নখে করে
তাকে ছিঁড়ে ফেলতুম—তা সে আমার
ঘত-বড় গুফলনই হোক না কেন! সোৱামী
হলেও তাকে আমি রেহাই দিতুম না।”

মেয়ের কথায় মা ভড়কাইয়া গেলেন।

শিবপ্ৰিয়ায় চোখ দুইটা আগুনের মত
জ্বলিতেছিল—রাগে সৰ্ব্বাপ ধ্বংস করিয়া
কপিতেছিল। মা বলিলেন, “এখন আর
বাপু—রাস্তাঘর থেকে চলে আর—তোমার
মাথা গরম হয়ে উঠেছে। এখনই আবার
ফিটু-টিট হয়ে পড়বে! কত করে ত ফিট-
বন্ধ হয়েছে। আর, চলে আর!” মা
মেয়ের হাত ধরিয়া মৃদু আকর্ষণ করিলেন।

শিবপ্ৰিয়া কহিল, “না, আমি বাব না।
ছপড়ো আমার। আমি আর রাখব—
নৌকে রাখতে দেব না। তুমি যাও।
আমার রাগিয়ে না, বলছি,—তাহলে অন্যর্থ
বাধবে।”

মা ভয়ে সরিয়া গেলেন। ঘাইবার সময়
যৌৱেন পানে যে নৃষ্টি হানিয়া গেলেন,
তাহাতে যেন আগুন ঠিকরিয়া বাহির
হইতেছিল।

নীৰজা কাঠের পুকুলের মতই নিস্পন্দ
দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার যেন চেতনা ছিল
না। চোখের সামনে এই যে ঘটনাটা
ঘটিয়া গেল, ইহা কি সত্য! যখন জান
হইল, তখন সে দেখে, শিবপ্ৰিয়া কোমরে
কাপড় জড়াইয়া কানি দিয়া কড়ার আঁটা
ধরিয়া উনান হইতে খোলের কড়া
নাঘাইতেছে। সে ছুটিয়া গিয়া ডাকিল,
“ঠাকুরঝি—”

শিবপ্ৰিয়া তখন একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া
গিয়াছে। সহজভাবেই সে বলিল, “সে ত
তাই, ঐ কাশিখানা—ঝোলটা তেলে
রাখি। কেমন, এই হয়েছে ত? আর
থাকলে খোল মরে একেবারে কাই হয়ে
যাবে, না?”

যন্ত্র-চালিতের মত নীরজা কাশি আগাইয়া দিল। শিবপ্রিয়া কাশিতে ঝোল ঢালিয়া রাখিয়া খুঁটি দিয়া কড়া চাটিয়া ফেলিল। পরে কড়ার জল ঢালিয়া তিঝা জাতা দিয়া কড়ার গা রগড়াইয়া জলটা বাহিরে নর্দমার দ্বারে ঢালিয়া আসিয়া কহিল, “এই কড়াতেই অম্বলটা চড়িয়ে দিও তাহলে। জুই তাই মশলাটা ঠিক করে দে। আমি ততক্ষণে চালতা কটা ছেঁচে নি।”

৩

কড়ারের তখনও কয়দিন বাকী ছিল, শিবপ্রিয়ার শাকুড়ী লিখিয়া পাঠাইলেন, হঠাৎ তাহার গৃহে তাহার এক দৌহিত্রের অসুস্থত্ব উপস্থিত; বীরেন বাইরা শিব-প্রিয়াকে লইয়া আসিলে। শিবপ্রিয়ার মনটা অস্থির হইয়া উঠিল। সে নীরজার পানে চাহিল। নীরজার মুখে-চোখে করুণ বেদনার একটা ছায়া পড়িয়াছিল। ঠাকুরকি চলিয়া যাইবে! হায়, মেহের দেওয়াল তুলিয়া এই যে কতিন বাক্য ও মিথ্যা ভিন্নত্বেরে হাত হইতে এতদিন তাহাকে সে আগুনিয়া রাখিয়াছিল—সে দেওয়াল ভাঙ্গিয়া সে চলিয়া গেলে বাহিরের রক্ত গর্জন নিমেষে যে তাহাকে বিগুণ প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করিবে। এখন সেগুলার আক্রোশ যে ভীষণতর হইবে, সে বিষয়ে সংশয়মাত্র ছিল না! তাহ, কেন সে আসিল,—কেন সে এমনভাবে খাটাইয়া শাকুড়ীর চিত্তের আগুনটাকে আরও গাঢ় তীব্র করিয়া দিল! এখন তাহার উপায়।

শিবপ্রিয়াও ঠিক এই কথাটা ভাবিতে ছিল। সে ভাবিল, রক্ত ভাব ধরিয়া সে

ভাল কবে নাই; শাস্তভাবে কথাগুলো পাড়িয়া শান্তি আনিবার চেষ্টা করিলে বোধ হয় কিছু ফল হইত। তাহার অল্পস্থিতিতে নীরজার অসহ্য ভাব কমনা করিয়া সে বাধিত হইয়া পড়িল। সে ভাবিল,—দাদাকে একবার পাইলে হয়, নহে কথায় তাহাকে সে একবার বুঝাইবে! কিন্তু ত্রীপতি আজ কয়দিন আর বাড়ীর চৌকট মাড়াইবারও অবকাশ পায় নাই!

কাশ সকালে বীরেন আসিয়া শিবপ্রিয়াকে লইয়া যাইবে। কড়া চলিয়া যাইবে, মা তাই পূর্ণরাজে তাহার স্নেহজনের জন্ত বিশেষ আয়োজন করিয়া ছিলেন। অনেক রাত্রে সংসারের লেঠা চুকাইয়া নীরজা যখন শুইতে আসিল, তখন তাহার মাথাটা খুঁই ধরিয়া উঠিয়াছে। শিবপ্রিয়া আসিয়া কহিল, “আজ আমি কোর কাছে শোব, তাই—” শিবপ্রিয়া ঘিছানায় পড়িয়া নীরজাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল। সে চমকিয়া উঠিল। এ কি, গা যে তাহার পুড়িয়া যাইতেছে। শিব-প্রিয়া বড়মড়িয়া উঠিয়া কহিল, “তোমার যে জ্বর হয়েছে, বো!” পরে তাহার কপালে হাত দিয়া কহিল, “নাঃ—বেশ জ্বর! গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে! আর এই জ্বরে আগুন-ভাতে সারাক্ষণ বসে সব করলি কর্মালি। তাই বুঝি আমাকে আজ ওখানে খেসতেও দিলেন? বললি, না জাট, কাল চলে যাবে, মার কাছে আজ থাকগে! আমিও যেমন নেকী, কিছু বুঝলুম না।”

শিবপ্রিয়া উঠিয়া মার ঘরে গেল, ডাকিল, “মা—”

মা তখন মনে মনে জ্বলিতেছিলেন।

আহারের এই এতখানি আয়োজন করা গেল, তা খিঁপতি ভাঙার কিছুই যুগে দিল না! সাধে কি শিবপ্রিয়া-এত কথা শুনাটো দেয়! কেন বাপু, তুই ঘরের ছেলে,—তোরা এ মাগ করিয়া বাহিরে পড়িয়া থাকা কেন! বৃষ্টি-হর্কের পর মাগটা পড়িল, বধূ উপর! সেই সর্বনাশীই ত বড় নষ্টের মূল! এমন বোকে বিদায় করিলেই না হাড় পাতাস লাগে!

যেহের ডাক শুনিয়া মা কহিলেন, “আর, শুনি আর!”

শিবপ্রিয়া কহিল, “শোবার কথা হচ্ছে না। ঘোরের খুব অর হচ্ছে! কাণকে এখনই একজন ডাক্তার ডাকতে পাঠাও।”

আবার সেই ঘোরের হইয়া ওকালতি! মা অঁগা উঠিয়া কহিলেন, “হাঁ, দেউড়ীতে আমার পাঁচটা পাইব-বরকন্দাজ বসে আছে—এই যে এতলা পাঠাই!”

শিবপ্রিয়া যুদ্ধে কঠিন হইয়া উঠিল। এই সে একটু পুঁকেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আর কঠিন হইবে না। কিন্তু উপায় নাই! সে কহিল, “আর তোমার ছেলের কি যেহের বহি অল্প করত—?”

সে কথার জবাব না দিয়া মা পাশ ফিরিয়া গুলিলেন, কহিলেন, “ও তোরা খুশী হই, করগে না, বাছা! সারাদিন পরে যুঁহে যে একটু আদাম পাব, তারও ভো নেই!”

শিবপ্রিয়া নিরাশ নিরুপায় ভিত্তে নীরজার ঘরে ফিরিয়া আসিল; বাক্স হইতে আড়-কণোনের শিপি বাহির করিয়া তাহাতে কদল ভিড়াইয়া নীরজার কপালে গটি আঁটাই দিল। সারা রাত্রি আশিষা বসিয়া সে নীরজার শুক্কা করিল। নীরজা কতবার কহিল, “ও

কি ভাট, ঠাকুরতি, অত কেন? আমি ত বেগ আছি, তুমি যুঁহাও—”

তোহের দিকে নীরজা ঘরের ঘোরে কেন্দ্র আকর হইয়া রহিল। শিবপ্রিয়া অস্থির হইয়া পড়িল। “এ বাড়ীতে কাহারও কাছে কোন সাহায্য পাঠবে না, সে। বীরেন আগিলে, বাহা হই একটা ব্যবস্থা করিতে পারিবে তাহিরা বীরেনের আশা-পথ চাহিয়াই সে নীরজার গারে মাথার হাত বুলাইতে লাগিল।

* সকালে মা আশিষা ঘরের ঘরে উকি পাড়িলেন। মা হাঁকিলেন, “এখনও সবাব-গুম্ভীর গুম্ভীর ভাঙল না! আজ বীরেন আসিছে, বাবার-মাঝারের একটু উৎসোগ-অপযোগ করতে হবে না?”

শিবপ্রিয়া কহিল, “তোমার ভয় নেই মা। এ বাড়ীতে সে অলগ্রহণও করবে না—সে ব্যবস্থা আমি করব’খন। তোমার কোন ভাবনা নেই, তুমি যুঁহাওগে বাও।”

যেহের মুখের কাছে মা ঠাড়াইতে পারিতেন না। অগত্যা তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

৪

বহানসরে বীরেন আসিয়া বহির্বাণে হাঁকিল, “বাবা—” শিবপ্রিয়া বীকে কহিল, “তোরা জামাইবাবু এসেছে রে। এইখানে ডেকে নিরে আর ত—”

বীরেন আসিলে শিবপ্রিয়া কহিল, “তোমার গাড়ী আছে, এখনই একজন ডাক্তার ডেকে আনো। ঘোরের কাল রাত্তির থেকে খুব অর!”

বীরেন আসিয়াই এ ভাব দেখিয়া কেন

ভক্তকাইয়া দেল। সে ভাড়াভাড়া ভাকার ভাকিতে ছুটিল।

ভাকার আশিরা যোগী বেথিয়া গুড়োর মুখে বলিলেন, “বড় সুবিধে মনে হচ্ছে না। টাইকয়েড হতে পারে নীলই আপকা হচ্ছে! আজ তিন-চারদিন থেকে বোম্বর হয় আরটা হয়েছে?” ভাকার সমস্ত দৃষ্টিতে বীরেনের পানে চাহিল।

শিবসিঁথার বুকটা তাঁৎ করিয়া উঠিল। বোম্বটার অন্তরাল হইতে মুহূর্তের সে কহিল, “কাল রাতে আমরা জ্বর জ্বানতে পেরেছি।”

স্নেসকপলন শিবসিঁথা জিভিটের টাকা পকেটে পুনিয়া ভাকার বিদায় গ্রহণ করিলে শিবসিঁথা কহিল, “আমার নিতে এসেছ, বুকি?”

বীরেন কহিল, “হী। সরেরে ছেলের ভাত হবে, কাল। মা লেখেন নি?”

শিবসিঁথা কহিল, “লিখেছেন, কিন্তু কি করে বাট, বল। আমি সেল বোটো পিনা চিকিৎসাতেই মারা যাবে। যা ওর বয়স-আতি! এ জানলে এ বাড়ীতে, আমি এয়ার পা দিই না।”

বীরেন কহিল, “তোমার খাওয়া কোথায়?”

শিবসিঁথা কিছু বলিতে পারিল না। বলিতে লজ্জা হইল যে, দাদার ভণের সীমা নাই! বারিদসৌভাগ্য পূর্ণ মজোর যে লাভ করিয়াছে, সে-ই জানে, এ কথা মুখে উচ্চারণ করিতেও কতখানি বাধে। অজুমান বীরেন ব্যাপার কতক বুঝিল। সে কহিল, “বাড়ীতে সে কিভাবে খখন?”

শিবসিঁথা কহিল, “সে-ই জানে। আর ক’দিন ত চুপের চিকিৎসা দেখতে পাচ্ছি না।

তা বাচ্চ, তুমি ত সব দেখলে। গিয়ে থাকে বলা। এ অবস্থার আমি কেমন করে বাই। ঠাকুরবিকেও গ্রহণ করতে পারব কবো। দেখে ত থাক! বলা, নেহাৎ নিরুপায়।”

বীরেন কহিল, “তা ত দেখছিই। এ অবস্থার যেমন করেই বা তোমার নিরে বাট! বেঁধা ভাকার ডাকা, হাসান পোহানো, তুমি এ সব পারবে কি? হোগটাও ত সহজ নয়, দিনেব তোমার পবীরে না যদি সহ হয়—”

শিবসিঁথা হাসিল, হাসিয়া কহিল, “সে ভাবনা তোমার নেই। তোমার আগার ফিরে যুগ দেখতে হবে না।”

বীরেন কহিল, “তা বুকি। কিন্তু সে কথা হচ্ছে না। তুমি বেয়েমাত্র, সাধলতে পারবে কেন? তার চেয়ে আমি গিয়ে বহু সনাতনকে পাঠিয়ে দি।”

শিবসিঁথা আশঙ্ক হইয়া কহিল, “তাহলে ত ভালই হয়। তবে এ হোগের বাড়ীতে তার খাওয়া-বাওয়া দেখবার সুবিধে হবে না কিন্তু!”

বীরেন কহিল, “সে সে করে নেবে’খন। সে ত আর এখানে ছুটুবিতে করতে আসছে না। আমি তার স্যাহাও করে দেব।”

শিবসিঁথা কহিল, “তাহলে তুমি যাও। গিয়ে যা দেখলে, থাকে বলা।”

বীরেন কহিল, “মার সঙ্গে একবার দেখা করে বাই।”

শিবসিঁথা কহিল, “দেখা করতে চাও, দেখা করলে। আমার আর কিসেরা না।”

বীরেন গিয়া শান্তদীর সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। শান্তদী আনন্দে সারা হইয়া উঠিলেন। বড়মুখ আনাই মা

বলিয়া ডাকিয়াছে, ইহাট বপেট! তাহার উপর আবার প্রণাম! শান্তি কল্লেন, "নাগা চাপিবে দি। হুটি খেয়ে যাও, বাবা।"

বৌয়েন কহিল, "না মা, তার জন্ত ভাববেন না। বৌ সাক্ষক, এসে ওবই হাতে" একদিন তখন খেয়ে যাব। আমার এখন ডের কাজ, পাড়াবার সময় নেই।"

বৌয়েন চলিয়া গেল। শান্তি বুঝিলেন, এ শিবপ্রিয়াই কাজ। সে ঈশ্বারাকে নিবেদন করিয়া দিয়াছে, এখানে আমার করিবার না। কিন্তু কেন এ নিবেদন? ইহাও মনেই বৌ! তিনি অস্তিত্ব চাইয়া উঠিলেন। এমন সর্বস্বান্তিকেও তিনি যবে আনিয়াছিলেন যে, মুহূর্ত্ত শান্তি নাই! ইহারই মন্ত ছেলে তাহার যব ছাড়িয়া গেল, মেয়ের মুখ সবাই অগ্রসর! শুধু অগ্রসর! মার উপর মেয়ের মন একেবারে তাহিয়া রহিয়াছে। তিনি হুঁসিয়া মনে মনে ভাবিলেন, বৌয়ের যদি এখন ঘটনাক্রমে একটা ভাল-মন্দ কিছু হইয়া যায়, তবেই মরণ! নিজের ছেলে ও মেয়েকে আমার তিনি ফিরাইয়া পাটবেন! আহা, তেমন দিন কি হইবে!

বিশ্বের ভগবান বুঝি এ প্রার্থনা শুনিয়া সে দিন শিবপ্রিয়া উঠিয়া ছিলেন।

৫

চারদিন স্বপ্ন-ভোগে পব সেদিন ভূপুর দেশার নীরজা চোব মেলিল, ডাকিল, "ঠাকুরঝি—"

তাহার বাত হুটি। শিবপ্রিয়ার কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল। স্নানাতন আশিয়া যবের বাহিবে ডাকিল, "বোমা—"

শিবপ্রিয়া কহিল, "কেন বাবা?"

"গোয়েটুকু এনেছি মা। খাওয়াতে পারবে?"

শিবপ্রিয়া উঠিয়া গিয়া কাপ লইয়া আসিল, নীরজাকে ডাকিল, "বো—"

নীরজা ঘোবে বৌের চোব মেলিয়া চাহিল, "কেন, ডাই?"

"এটুকু খেয়ে নাও—"

"আর. কেন, ঠাকুরঝি?" নীরজার চোখের কোলে অঙ্গর নিম্ন হুটিয়া উঠিল।

শিবপ্রিয়া আঁচল দিয়া সে অঙ্গ মুছিয়া গেল। তবে হেঁয়সের কাপ নীরজার মুখে ধরিয়া কহিল, "এটুকু খাও, ডাই।"

নীরজা আপত্তি না করিয়া পান করিল; কহিল, "ঠাকুরঝি, তোমার ডাই বড় কট হচ্ছে।"

শিবপ্রিয়া কহিল, "এখন সে কটটুকু সার্থক কর দেখি—"

নীরজা কিছু বলিল না, উদাল স্নান নেত্রে বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল। শিবপ্রিয়া তাহাকে বাতাল করিতেছিল। দৃষ্টি তাহার নীরজার মুখের পানে। যে মুখ এত চুখেও সর্বজন সে হাতময় দেখিত, সে মুখ আজ বাসি সুলের মতই শুক মলিন হইয়া গিয়াছে। তাহার কপালের উপর হুই-চারিগাছি কেশের গুচ্ছ উড়িয়া পড়িয়াছিল। রেশমের মতই কোমল কেশ! সেওলা হাত দিয়া লম্বাইয়া নীরজার মুখের কাছে মুখ আনিয়া শিবপ্রিয়া কহিল, "কি ভাবছ, বো?"

নীরজার চোব জলে তরিয়া ছিল; বাহিরের এই করুণ সমবেদন-মালা প্রস্রের যা খাইয়া মুহূর্ত্তে তাহা বরিয়া পড়িল। নীরজা সাক্ষিণে চোব মুছিয়া কহিল,



“ঠাকুরবাকি—” তাহার গলায় বর কীপিয়া ভানিয়া গেল।

শিবপ্রিয়া কহিল, “কি ভাবছ, বল।”

একটা তীব্র নিশ্বাস ফেলিয়া নীরঝা কহিল, “ঝাঝও বাড়ী আসেননি? আমার অজ্ঞে শেষ বাড়ী আসা ছেড়ে দিলেন?”

শিবপ্রিয়ায় বৃকের ভিতরে একটা তীব্র বেদনা ঠেলিয়া উঠিল। সে কহিল, “দাঁড়া, তোমার বুকি ভাগিা কিংবদন্তে। একটু আগে ঘেন দাঁহার গলায় সাড়া পেলুম।”

নীরঝাও সেই সাড়াই পাইয়া ছিল—তাই সে চোখ খুলিয়াছে!

শিবপ্রিয়া বাহিরে গেল। দালানে বসিয়া শ্রীপতি তেল মাখিতেছিল। মা নিকটে দাঁড়াইয়া। শিবপ্রিয়া গিয়া সহস্র বরে ডাকিল, “দাদা—”

শ্রীপতি ততীকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু গলায় বরে আখণ্ড হইল। সে কহিল, “কি বলছিল, শিবু?”

শিবপ্রিয়া কহিল, “তোমার চান হয়ে গেলে একবার এ ঘরে এনো। ঘোরের বড় অস্থখ—”

মা কহিলেন, “অস্থখ, তা ও গিয়ে কি করবে? ও কি ডাকার?”

শিবপ্রিয়া সে কথা কানে না তুলিয়াই কহিল, “তোমার একবার সে দেখতে চায়। যেহেদাহেদের মন, বোঝে না, কি করবে বল! তবে ভয় নেই, তোমাদের হাড়ে বাতাস লাগবে শীগ্গির—তারই সে বন্দোবস্ত করেছে, এবার।”

মা বলিলেন, “তোমার আঁচান্নাতেই ত

ওর এত বড় হয়েচে! নাহলে অস্থখের ভাণ করে এতখানি বটা বাপার!”

শিবপ্রিয়া কোন কথা বলিল না। তাহার মনের মধ্যে যে আগুন জ্বলিতেছিল, ইচ্ছা থাকিলে সে আগুনে এখনই সে সব পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু সে ইচ্ছাও আর আজ তাহার ছিল না। তাই সে আবার শ্রীপতিকে কহিল, “চেনি করে এসো একবার—লক্ষ্মী দাদা। নাহলে একটা মাহুকে চিরদিনের মনস্তাপ নিয়ে চলে যেতে হয়। তুমিও মাহুকের ত, এটুকু মনে রেখো।”

শিবপ্রিয়া চলিয়া গেল। বাইবার সময় কখন যে প্রচ্ছন্ন হৃৎকু সে শ্রীপতির মনে ছুটাইয়া দিয়া গেল, বহুক্ষণ ধরিয়াই তাহা শ্রীপতির মনে খচ্-খচ্ করিতে লাগিল। মল্ল সারিয়া সে আহায়ে বসিল। মা সম্মুখে বসিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। মা কহিলেন, “এবার শিবুকে পেলে এমন সোহাগ হয়েছে যে, দেখে আর বাঁচি না। যেহেটাকে একবারেই পর করে দিলে। ছেলের শোধ ঘরের উপর দিয়ে মিলে! কি অস্তত কণেই বে শিবু মা আমার এগার খণ্ডমবাড়ী থেকে পা বাড়িয়ে ছিল।”

আহার করিতে করিতে শ্রীপতি ভাবিল, আহার সারিয়া একবার সে নীরঝাকে দেখিয়া আসিবে। তবে দেখা করিয়া কি যে বলিবে, ইহাই মহা তাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বিধাতা তাহাকে সে দায় হইতে খুব রক্ষা করিলেন! আহার সারিয়া সে মুখ ধুইতেছে, এমন সময় সংবাদ আসিল, দ্বিতীয় বাবু গাড়ী গইয়া আসিয়া হাজির—

উঁহা'র বাগানে আজ মাছ ধরিবার ভারী
ঘটা! কাজেই আর বলা বা নীরজার মত
দেখা করা ঘটটা উঠিল না। ডিপা-স্তরা পান
পকেটে ফেলিয়া সাঁজিয়া সে বাতির চটয়া
গেল।

দাদার কাণ্ড দেখিয়া শিবপ্রিয়া ঘরের
মধ্যে গর্জাইতেছিল। এই তাইয়ের পেন্
নে! দিক তাহাকে!

মা আনিয়া ডাকিলেন, “শিব, খাবি আর।”

শিবপ্রিয়া বসটিয়া গেল। মনের ঝল
কতকটা সে এবার মিটাইতে পাইবে! - মার
উপর তর্জনি করিয়া সে কহিল, “আমার ভাত
একধাবে ঠেলে রেখে তুমি কুখা নিবৃত্তি কর
গে।, আমার লজ্জা এ-বাড়ীর কানেক্ত ভাবতে
হবে না।”

“পরের বোকে ঘরে মনে এ কি মাঝে
পড়লুম গা—” বলিতে বলিতে মা চলিয়া
গেলেন। উঁহা'র মনে চইল, বোটাকে
ধরিয়া হুই হাতে যদি তাহাকে একবার পিটিতে
পারিতেন, তবেই বুকি আগের এ জ্বালা
কতক জুড়াইত!

শান্তকী ও নন্দের কথা নীরজা
সকলই শুনিла। শান্তকী চলিয়া গেলে
শিবপ্রিয়াকে সে কহিল, “তুমি যাও ঠাকুরঝি,
খেরে নাওগে। আমি ত বেশ খাচ্ছি, এমন।
যাও তাই।”

শিবপ্রিয়া কিছু বলিল না। রাগে সে
কাঠি হইয়া বসিয়া রহিল। নীরজা আবার
কহিল, “যাও না তাই, খেয়ে এসোগে না—”

নীরজার মাগার আটলুবাগ চাপিয়া
শিবপ্রিয়া কহিল, “এ বাড়ীতে জলগ্রহণ
করতে বল, তুমি—?”

নীরজা এ কথার বড় আরাম বোধ
করিল না। সে কহিল, “যে কটা দিন আর
আছি তাই, একটু শান্তিতে কাটতে দাও।
আমাকে নিয়ে এ পেচাখেলি—”

শিবপ্রিয়া বুকিল, নীরজার আগের
কোন্থানটার কি বাধা থাকিতেছে। সে
কহিল, “তুই সেরে ওঠ তাই, প্রাতর্বাণ্যে
কামনা করছি, তুই সেরে ওঠ।” তার পর
আমি তোকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব।
দেখি, কে তাকে বাধা দেয়! যদি আজ
তোর মা বেঁচে থাকতেন ত যেমন করে
পারতুম, তোকে নিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে
তুলে দিয়ে নিশ্চিত হতুম—”

“তাঁর দাও তাই—আমার মার হাতেই
আমাকে তুলেদাও। আমারও আর সন্তান নেই।”

শিবপ্রিয়া দেখিল, এ কথাগুলো তোলা
ঠিক হয় নাই। রোগীর উত্তেজনা ইহাতে
বাড়িতে পায়। তাই সে কহিল, “তুমি
তা হলে চুপ করে শুয়ে থাকো। বরকের
বাগ মাগার চাপানো থাক—আমি চটু
করে মুখে কিছু দিয়ে আসিগে—”

“হা, তুমি যাও। এর মধ্যে আমি
মরে যাব না।” বলিয়া নীরজা হাসিল।
শিবপ্রিয়া চোপ চাহিয়া সে হাসি
দেখিল। তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল।
এ হাসি সেই বীণ নিবিবার পূর্বে
যেমন একবার মপু করিয়া অলিয়া উঠে,
তেমনিই যে। মনে মনে মা-কালীকে ডাকিয়া
নীরজার রোগ-পাড় মুখে সে একবার হাত
বুলাইল। এ স্পর্শে সব জ্বালা সব প্লানি
তোর মুছিয়া যাক। তারপর সে বস হইতে
বাহির হইয়া গেল।

সেদিন শেবরায়ে নীরজা কেমন অস্থির হইয়া পড়িল। চোখের চাহনিও কেমন এলো মেলো। বিছানার পড়িয়া সে ছট্লেফট করিতেছিল। ভিতর হইতে কেমন একটা “আলা হুট্টা বাহির হইতেছে। প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠে।

শিবপ্রিয়া তাহারই বালিশে মাথা রাখিয়া সবে-মাত্র একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কাতর কণ্ঠে নীরজা ডাকিল, “ঠাকুরস্বামী—”

শিবপ্রিয়া খড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। ঘরের কোণে বাতিটা অগ্নিয়া শেব হইয়া আসিয়াছে। সে ক্রীণ আলোকে শিবপ্রিয়া চাহিয়া দেখে, নীরজার মুখে কে যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে। বৃষ্টি এ মৃত্যুর করাল ছায়া। ভাড়াভাড়ি আর একটা বাতি জালিয়া সে ঘরের বাহিরে আসিল, ডাকিল, “সনাতন—”

সনাতন বাহিরের দালানে পড়িয়া একটু গড়াইয়া লইতেছিল; কহিল, “কেন মা?”

“শীগগির একবার ডাক্তার বাবুর কাছে যাও, তাঁকে ডেকে আনো, বাবা—অবস্থা ভাল বুঝছি না।” সনাতন উঠিয়া ডাক্তারের উদ্দেশ্যে ছুটিল।

শিবপ্রিয়া আসিয়া মালিশ, পথ্য প্রকৃতির নানা আয়োজন বাবাইয়া তুলিল। কিন্তু হার, নিবানো দীপে তৈল-দানে কি ফল। ভিতর হইতে পুড়িয়া জীবনটা ত তাহার পূর্ন হইতেই ছাই হইয়া গিয়াছে, বাহিরের কাঠামোটা কোনমতে খাড়া আছে বৈত না! আজ এ রোগের প্রবল ধাক্কা বৃষ্টি সে কাঠামো-খানাকেও আর বজায় রাখা যায় না। শিব-

প্রিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অসহায় দুর্বল নারী সে,—আহা কি সাধা যে ঘরের সঙ্গে যুক্ত করিয়া এই অগ্নিহেলিতা উপেক্ষিতা প্রাণটিকে তাহার প্রাণ হইতে সে ছিনাইয়া লয়!

সহসা রোগীর চোঁট নড়িল—ভিতর হইতে মিনতির সে যেন এক করুণ অশ্রুট আবেদন! নীরজার শুক গুঠে শিবপ্রিয়া এক চামচ বেনামার রস ঢালিয়া দিল—নীরজা সাগ্রহে তাহা পান করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তারপর ধীরে ধীরে অতি ধীরে সে চোখের পাতা মেলিল; দুই হাতে হাতড়াইয়া কিসের যেন সজ্ঞান করিল! হার রে, পাখের বে তাহার বহুকাল হারাইয়া গিয়াছে! কি সখল লইয়া এখন এ দীর্ঘ পথে সে যাত্রা করে!

শিবপ্রিয়া ঔষধ ঢালিয়া নীরজাকে পান করাইল। নীরজা কহিল, “আঃ—” পরে শিবপ্রিয়ার পানে হিরদৃষ্টিতে সে চাহিল। শিবপ্রিয়া অশ্রু করিয়া দুই হাতে তাহার মুখখানি ধরিয়া চুষন করিল, কহিল, “কি চাচ্ছ, বৌ?”

নীরজা কোন কথা বলিতে পারিল না—তাহার দুই চোখ বহিয়া শুধু স্বর স্বর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সারা জীবনের উপেক্ষার বেদনা আজ এ কাতর অশ্রুর মধ্য দিয়া অল্পস্রবণে ঝরিয়া পড়িয়াছে। শিবপ্রিয়া ভাবিল, হার যোন, এতদিন যদি নীরবে সব সহিয়া আসিলি,—আপনার তেজে এ উপেক্ষা গ্রাস্তও করিলি না, তবে এ নিদান-সময়ে কিসের গুপ্ত এ দুর্বলতা! সে দুর্বলতা আর কেনই বা দেখাদ। তোর পানে কেহই যখন চাহিয়া দেখিল না, তখন তুইই বা

কায়ার অল্প আঙ্গ এতখানি কাঠর
হইতেছিল!

ডাক্তার আসিয়া ইঞ্জেন্নন দিলেন—
কিছুকণ পরে বোণী ঘেন একটু শক্তি
পাইল। ডাক্তার বাহিরে বসিয়া রহিলেন—
শিবশ্রীরা ঠাণ্ডা হই পা জড়াইয়া
কাঁদিয়া কহিল, “আপনি আজ পরা করে থাকুন
—যত টাকা চান দেব—” তারপর সে
সনাতনকে কহিল, “তোমার ব্যবস্কে একবার
শুগুর ডেকে নিয়ে এসো, সনাতন। গাড়ী
করে ছুটে যাও। বলগে, বড় বিপদ এখানে!”
সনাতন বীরেনের উদ্দেশ্যে ছুটিল।

নীরজা আর একবার কথ্য কহিল,
“সুকুরি—”

শিবশ্রীরা বর্তাইয়া গেল। তবে এ খাজা
কাটিল, বৃষ্টি! সে কহিল, “বল, তোমার
যা কিছু বলবার আছে, সব খুলে বল। জ্যামি
এই তোকে আগলে বসে রইলুম। দেখি,
আমার কাছ থেকে কে আজ তোকে ছিনিয়ে
নেয়!”

সতীর মুখে তেজের একটা দৃষ্ট রেখা
হুটুগা উঠিল। একবার সে কোন্‌ বৃগে সতীর
মুখে এমনই তেজ দেখিয়া ঘরের প্রাণ কাঁপিয়া
উঠিয়াছিল! আজও এ ঘেন রাজেশ্রীরা
অগভীরী মূর্তিতে সে নীরজাকে চক্ষা করিবার
অল্প বুক দিয়া দাঁড়াইল। দুর্জয় তেজে
প্রাণ তাহার বলীমান হইয়া উঠিল। নীরজা
অতি-কষ্টে খামিয়া খামিয়া কহিল, “সতী-লক্ষ্মী
তুমি, আশীর্বাদ কর, কিরে জন্মে ঘেন তোমার
মত বরাত নিরে পৃথিবীতে আসি—এ বড়
কষ্ট! সওয়া খার না।”

হারগে, তবু সে লক্ষ্যই সহিয়া আসিয়াছে।

আর কাণ্ডও প্রাণ হইলে তবে বৃষ্টি ভাসিয়া
ঘাইত—কিন্তু এ নারীর প্রাণ, বড় কঠিন।
সকলই সহ, ভাসিতে আসে না।

কিন্তু তবুও রাহের একটা সীমা
আছে। নীরজার প্রাণ সে সীমার একেবারে
কিনারার আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকেও
আর দূরীয়া রাখা গেল না। সেদিন
লক্ষ্যার সম্বন্ধ ঘবে ঘরে যখন সাম্প্রতিক লক্ষ্য
বাগিয়া উঠিল, ঠিক দেই সময় তাহার
সকল অকল্যাণ হইতে নীরজা মুক্তি লাভ
করিল। সংসার তাহাকে বিদায় দিয়া
আধারে করিয়া গেল।

৭

শাওড়ী জামাতার কাছে মিনতি
জানাইয়া শিবশ্রীরাও আরও কয়দিন
আপনার গৃহে ধরিয়া রাখিল, কিন্তু না ও
মেয়ের মধ্যে কথা ছিল না। শত সাধ্য
সাধনা - কহিয়াও মেয়েকে না একটু জল
অবধি মুখে দেওয়াইতে পারিলেন না।
তাঁহার শুধন আপত্তা হইল, পরের মেয়ের
প্রতি যে পাণ করিয়াছেন, বৃষ্টি তাহারই
ফলে নিজের মেয়েটিকে আজ হারাইতে
হয়! তাই তিনি সনাতনকে কহিলেন,
“তুমি তাই বীরেনকে খবর দাও—সে
এসে ওকে নিয়ে যাক। না, হলে দেখছ
ত, ওকে বাচানো যাবে না।”

সনাতন অগত্যা বাহির হইবার উদ্দেশ্যে
করিতেছিল।

বহুদিন পরে ত্রীপতিও আজ ঘরে
কহিয়াছিল। বাড়ীতে পা দিয়াই সে বৃষ্টি,
সেখানে মস্ত একটা বিপদীয় কাণ্ড ঘটয়া
গিয়াছে। লক্ষ্য বাড়ীটা ঘেন আজ

তাহাকে গিলবার জন্য হাঁ করিয়া রহিয়াছে। নীরজার প্রতি তাহার একটা আন্তরিক টান না থাকিলেও বাড়ীটা আজ তাহার কাছে নিতান্তই মূল্যবোধ হইতে লাগিল। সব থাকিলেও যেন আজ কিছু নাই, এমনই ভাবনা। বাড়ীটার প্রত্যেক ইটক-পাণ্ডে, প্রত্যেক প্রত্যঙ্গটাকে অবধি লাগিয়া রহিয়াছে। বাড়ী যেন নিতান্তই অতিষ্ঠের স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চৌক, বাড়ীর প্রতি কোন দিনই তাহার মায় ছিল না—আজও নূতন করিয়া মায় পড়িল না। তলে আজ মায় কাছে এয়োজন ছিল; গোটাকরেক টাকা চাই—বাগানের আমোদে এনফার তাহারই উপর খরচের ভার পড়িয়াছে। না দিলে মান থাকে না। সেই টাকা কয়টা লইয়া কোনমতে এখন সরিয়া পড়িতে পারিলেই সে বাচিয়া যায়।

ভিতরে পা দিতেই মা ছেলেকে দেখিয়া শোকে জ্বলিয়া কানিয়া উঠিলেন। ছেলে আসিয়া মায় কাছে বসিল—মা তখন সপ্তমে হ্রস্ব চড়াইলেন! শিবপ্রিয়া ব্যাপার বুঝিবার জন্য সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মূখে আজ কোন কথা নাট, দৃষ্টি দ্বিগ, মুষ্টি কক্ষ। কে যেন পাথরে খোদা প্রাণহীন একটা পুতুলকে আনিয়া সেখানে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে! উৎপেক্ষিতা নীরজার স্থতির মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া উপস্থিত হইয়া সর্বভাগিনীর মতই একটা ভাব তাহার মুখে-চোখে আঁটিয়া গিয়াছে।

কানিতে কানিতে ইনাইয়া বিনাইয়া মা

কহিলেন, শূন্য গৃহ পাথরের মতই তাহার মুখে কসিতেছে! পুত্রের এ লক্ষ্যছাড়া মীন বেশও তিনি আর চক দেখিতে পারেন না। ও-পাড়ার পার্শ্বভী একটি ঘরের কথা বলিতেছিল—পুত্রের কোন আপত্তিই তিনি কানে তুলিবেন না।

শিবপ্রিয়া সাহ! অঙ্গ বহিরা বিদ্রোহের একটা ভীত দাহ ছুটিল। আপাদ-মস্তক, তাহার জলিয়া উঠিল। তবুও জীব গৃহের অধিবাসী খড় আসন্ন দেখিয়াও আকাশের পানে যেমন হতবুদ্ধিতাবে চাহিয়া থাকে, তেমনই ভাবে মা ও ভাইয়ের পানে সে চাহিয়া রহিল—চোখ তাহার পলক-হীন, অচঞ্চল।

শ্রীপতি বৃদ্ধি, টাকা আদায়ের চমৎকার সুযোগ মিলিয়াছে। নত মুখে গাঢ় হয়ে সে কহিল, “তোমার কথা কবে আমি ঠেলেছি ম—”

দুইখানা চকল মধ্যে ঠোকাঠুক হইলে অর্শনি যেমন গর্জিয়া উঠে, শিবপ্রিয়া ঠিক তেমনই ভাবে গর্জিয়া উঠিল। সে ডাকিল, “সনাতন—”

করদানের কড় বাণী নিমেষে যেন এক এল-হুকারে মুক্ত হইয়া গেল। মাতা-পুত্র উভয়েই সে স্ববে শিহরিয়া শিব-প্রিয়া পানে চাহিলেন।

সে স্ববে চমকিয়া প্রভু-গৃহ-গমনোত্তম সনাতন আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল—চাহিয়া দেখিল, মায় এক কি একরানিনী মুষ্টি! চোখে যেন এলয়ের আগুন জ্বলিতেছে।

শিবপ্রিয়া কহিল, “সনাতন, এখনই গাড়ী নিয়ে এসো। আমি চলে যাব,

এখনই। এ বাড়ীতে আর এক ঘুর্তও থাকতে চাই না। এ বাড়ীতে বসি আর কখনও জলগ্রহণ করি ও আমি বাপের বেণী নই।”

কথাটা বলিয়া বিদ্যাতের মতই সেখান হইতে সে সরিয়া গেল। যা ও শ্রীপতি বর্জ্যহেতর মত তত্ত্বিত হইয়া রহিলেন।
শ্রীমদ্রোহোহন সুশোণাখ্যায়।

সমালোচনা.

ভূপরিচয়। ঐহুত দেশালচর্য্য ভাৱ, এম-এ ও ঐহুত অমিতকুমার চর্য্যতী বি-এ অমিত। অকামক, ইতিহাস দেশ। এলাহাবাদ। ইতিহাস জেনে মুদ্রিত। মূল্য বায়ে আনা। ‘নিবেদনে’ লিখিত হইয়াছে, “বাহার্য্য ভাবতর্কণ্ড, ভূগোলে পাঠে সুমুগু করিয়া সমস্ত পৃথিবীর বিবরণ অধ্যয়ন করিবে এইরূপ পক্ষম ও বহু মানের আলকরণের জন্ত গন্তর্ঘ্যেট কর্তৃক নিব্দিষ্ট পতী অমুশারে এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ দেশ, পর্ব্বত, নদী প্রভৃতির নাম কঠর লক্ষিয়া ভাৱগণ সবধের অধ্যয়ন অধ্যয়ন করিয়া থাকে। এই গ্রন্থে কিরণগণমাণে কাৰ্য্য-কারণের নিচয় অমুসরণ করিয়া মহাদেশগুলির অবস্থান ভূপ্রকৃতি সমুদ্রোপস্থল প্রভৃতির আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাহাবেরই ফলে ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশে জলবায়ু, উষ্ণ ও শীত-মতর কি বৈচিত্র্য্য সাধিত হইয়াছে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।” আনন্ডা সানলে বালিতে পাঠি, প্রত্কারবহের সে চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি এমন নিপুণ সহজ ভাৱাভ, আনন্ডা নূতন ও সরল ভঙ্গীতে লিখিত হইয়াছে যে বিনা-আপত্তিতে, আপসা হইতেই ভাৱগণের এ গ্রন্থ-পাঠে কৌতুহল জন্মিবে। গ্রন্থখানিতে হৃদয়খল বৈজ্ঞানিকভাবে ভূপ্রকৃতির পরিচয় দেয়া হইয়াছে, ভৌতগাণীমর মত কতকগুলো উৎকট নাম মূদ্র করা হইয়া ভাৱগণকে কাতর ও পীড়িত করিবার পক্ষে ইচ্ছাতে

কোনই আয়োজন নাই। ভাৱগণের কল্পনা-শক্তি ভাৱত করিবার জন্ত বানান্বানের সরল ও ভবত্ৰাহী বর্ণনা এবং কৌতুহলকর কাহিনীসহ এ গ্রন্থে অচুর সমাবেশ আছে। ফলতঃ গ্রন্থখানি বাঙলা ভাৱায় ঐহুতাত-বিবকক গ্রন্থভাৱির আদর্শরূপ হইয়াছে, এ কথা অলঙ্কচে আনন্ডা বালিতে পাঠি। গ্রন্থের ভাণা কাগজ চমৎকার—এবং বর্ণিতোক্তক অসংখ্য চিত্রও ইচ্ছাতে লিখিত হইয়াছে। নানা দিক দিগাই গ্রন্থখানি নীরল বিভীষিকামর পাঠ্যমাত্র না হইয়া উপভোদের সাবদী হইয়া পীড়িত হইয়াছে। বাঙলায় ভাৱ-সম্পদাট এ গ্রন্থ-পাঠে আনন্ডের সহিত যে অচুর জ্ঞান লাভ করিবে, যে বিখ্যে তিলমাত্র সন্দেহ নাই।

কৈশোরক। রবি বক বিবচিত। দাসগুণ

এও কোং, অকামক, ১৯০০ নং বলেজ ষ্ট্রিট, কলিকাতা। ১৯১০। মূল্য দুই, আনা। এখানি কুর কবিতা-গ্রন্থ। কবিতাগুলি প্রায় অষ্টাদশ বৎসর পূর্বে সেক্ষের ছাত্রাবস্থাট লিখিত হইয়াছিল। পুস্তকনের প্রতি এ মনস্তা ত্যাগ কর্তৃকসেই বোধ হুহ জাল হইত। কবিতাগুলিতে কোন বিশেষ নাই।

প্রভাবতী। ঐতিহাসিক উপগদ্য। ঐহুত

আনন্ডেই বোধ বি-এ অমিত। ১৯১১ এ হামোহন বর্ডের হেন হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত ভবাবীপুর ডাঙরা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য সাত আনা। গ্রন্থখানিতে সাহিত্য-রসের নিত্যর অভাব।

কলিকাতা, ২৭ অক্টোবর ষ্ট্রিট, কাণ্ডিক প্রেসে, ঐহুতচরণ মাতা দাৱা মুদ্রিত ও ৩, সানি পাক, বাসিগুহ হইতে
ঐদীপচর্য্য সুশোণাখ্যায় ভাৱা প্রকাশিত।



बुद्ध
 श्री कृष्ण गणेशाय नमः

ভারতী

৩৯শ বর্ষ]

আগাঢ়, ১৩২২.

[৩য় সংখ্যা]

নালিক

আজ সে বরফের হাওয়া ছুরির মত
বুকে লাগছিল। ষ্ট্রিটের কুয়াশার চারিদিক
আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, পৃথিবীর উপরে
আর সূর্যের আলোও পড়ছেনা—তারার
আলোও আসছেনা,—দিন রাত্রি সমান
বোধ হচ্ছে। আপসা আলোতে সব রং
বোধ হচ্ছে যেন কালো আর সাদা,
সব জিনিস খোঁধ হচ্ছে যেন কতদূর থেকে
দেখছি—অপাষ্টে ধোঁয়া দিয়ে ঢাকা, শিশির
দিয়ে মোছা!

উত্তর মুখে খোলাদরকার পাড়িয়ে
সিদ্ধার্থ দেখছিলেন, পৃথিবীর সব সবুজ, সব
পাতা, সব ফুল বরফে আর কুয়াশার ঢাকা
পড়েছে, বরফের চাপনে পথঘাট উচুনীচু
ছোটবড় সব সমান হয়ে গেছে। আকাশ
দিয়ে আর একটি পানী উড়ে চলছেনা, গেয়ে
যাচ্ছে না; নাতাস দিয়ে আজ একটিও ফুলের
গন্ধ, একটুখানি সুগন্ধের পরশ কি আনন্দের

হাস ভেসে আসছেনা;—সাদা বরফে, হিম
কুয়াশায়, নিম্নম লীতে, সব চূর্ণ হয়ে গেছে,
হিম্বু হয়ে গেছে, পাষণ হয়ে গেছে;—পৃথিবী
যেন মূর্চ্ছা গেছে। সিদ্ধার্থ দিনের পর দিন
উত্তরেব চিম কুয়াশার সাধা বরফের মাঝে
পাড়িয়ে ভাবছিলেন—কুয়াশার জাল সরিয়ে
দিয়ে আলো কি আর আসবে না? বরফ
গলিয়ে ফুল ফুটিয়ে পৃথিবীকে রং'এ রং'এ
ভরে দিয়ে সাঁজিয়ে দিয়ে আনন্দ কি আর
দেখা দেবেনা? চারিদিক নিরন্তর ছিল।
সিদ্ধার্থ কান পেতে মন দিয়ে শুনছিলেন,
কোনো দিক থেকে কোনো শব্দ আসছিল
না। সেই না-বাঁজি-না-দিন, না-আলো-
না-অন্ধকারের মাঝে কোনো সাড়া মিলছিল
না। তিনি শুক্ন হয়ে পাড়িয়েছিলেন।
যত দূর দেখা যায় ততদূর তিনি দেখছিলেন
বরফের দেওয়াল আর কুয়াশার পর্দা, তারি
ভিতর দিয়ে লম্বা উঁকি মাঝে—সাদা চুল

নিরে; অর কাপছে—পাড়াশ ইথে শূঁতে
 চেয়ে; মরণ দেখা বাচ্ছে—বরফের মত
 হিম সাগা চান্দরে ঢাকা! অরনার নিম্নের
 ছাঁওখা দেখার মত, সাগা কাগজের উপরে
 নানা রকমের ছবি দেখার মত, সেই ঘন
 কুরাণার উপরে সেই জম্বাট বরফের দেওয়ালে
 সিদ্ধার্থ নিরেকের আর জগৎসংসারে সবাইকে
 বদখতে পাচ্ছেন—জম্বাটে, বুড়ো হতে, মরে
 যেতে; মহাভার তাঁদের সবাইকে তাড়িয়ে
 নিয়ে চলেছে রক্তমাখা ত্রিশূল হাতে! অর
 জবা আর মরা তিনটে শিকারী কুকুরের মত
 ছুটে চলেছে মহাভারের সঙ্গে সঙ্গে, ঘেঁটে নপে
 বা কিছু সব চিরে ফেলে, ছিঁড়ে ফেলে, টুকুরে
 ঝুঁকুরে করে। কিছু তাদের আগে দাঁড়াতে
 পারছেন, কেউ তাঁদের কাছে নিস্তার পাচ্ছে
 না! নদীতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ভরে নদী
 শুকিয়ে যাচ্ছে; পর্বতে এসে তারা ধাক্কা দিচ্ছে,
 পাথর চূর্ণ হয়ে মাটিতে মিশে যাচ্ছে। তারা
 মারের কোল থেকে ছেলেকে কেড়ে নিয়ে
 যাচ্ছে, ঘরের মাক থেকে ঘরের শোককে
 টেনে নিয়ে যাচ্ছে,—আগড় ভেঙে শিকল
 ছিঁড়ে। মহাভারের আগে রাণা-প্রজা ছোট-বড়
 সব উড়ে চলেছে—পুলার উপর দিয়ে শুকনো
 পাতার মত। সবাই কাপছে ভয়ে, সব ঘুরে
 পড়ছে ভয়ে। সব মরে যাচ্ছে, সব নিজে যাচ্ছে
 —ঝড়ের আগে বাতাসের ঘুঞ্জে আলোর মত।
 একদণ্ড কিছু হিম থাকতে পারছেন।
 আকাশ দিয়ে হাওয়াকার করে ছুটে আসছে
 ভয়, বাতাস দিয়ে মার-মার করে ছুটে আসছে
 ভয়।—জলে হলে ঘরে বাহিরে হানা দিচ্ছে
 ভয়—অরের ভয়, অরার ভয়, মরণের
 ভয়। কোথায় অরণ? কোথায় শান্তি?

কোথায় আরাম? সিদ্ধার্থ মনের ভিতর
 দেখছেন ভয়, গোপের উপর দেখছেন ভয়,
 মাগার উপর বজ্রাঘাতের মত ভেঙে চলেছে
 ভয়, পাথরের তলার ভূমিকম্পের মত পৃথিবী
 ধরে নাড়া দিচ্ছে ভয়, প্রকাণ্ড জালের মত
 চারিদিক ঘিরে নিরেছে ভয়। সারা সংসার তার
 'ভিতরে' আকুলি-ব্যাকুলি করছে, হাজার
 হাজার হাত ভরে আকাশ আঁকড়ে ধরতে
 চেষ্টা করছে, বাতাসে কেবলি শব্দ উঠছে—
 রক্কৈ কর! নিস্তার কর! কিন্তু কে রক্কৈ
 করবে? কে নিস্তার করবে? ভয়ের জাল যে
 সারা সংসারকে ঘিবে নিরেছে! এমন কে
 ভাঙে যার ভয় নেই, কে এমন যার ছাঃখ নেই,
 শোক নেই, এত শক্তি কার যে মহাভারের
 হাত থেকে জগৎ-সংসারকে উদ্ধার করে—
 এই অটুট মাহাশালি ছিঁড়ে? সিদ্ধার্থের কথার
 ঘেন উত্তর দিয়ে আকাশে বাতাসে জলে হলে
 পূবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে শব্দ উঠল—
 'বুদ্ধা মহাভিক্সা'—'মহাশক্তি বুদ্ধগণ'—
 'সদেবকম্প লোকস্প সদেব এতে পরান্না।'
 দাঁপা, নাথা, পতিষ্ঠা, চ তাবা লেনা চ শাস্তিনং।
 গতি, বুদ্ধ, মহাসুদাসা, সরণা চ হিতেসিনো ॥
 মহাশ্রভা, মহাতেজা, মহাপকা, মহাকলা।
 মহা কাহপিকা ধীবা সবকলানং সুধাবহা ॥

—বুদ্ধগণই ত্রিশোকের শোককে পরম পথে
 নিয়ে চলেন। মহাশ্রভ মহাতেজ মহাজ্ঞানী
 মহাবল ধীর করুণাময় বুদ্ধগণ সকলকেই অরণ
 ঘেন। জগতের হৈটবী ঊঁরা অকুলের কুল,
 অনাথের নাথ, সকলের নির্ভর, নিরাশ্রয়ের
 আশ্রয়, অগতির গতি, যার কেউ নাই তার
 বদ্ধ, যে হতান তার আশা, অশরণ যে তার
 শরণ।

দেখতে দেখতে সিদ্ধার্থের চোখের সামনে থেকে—যেনর উপর থেকে জগৎজোড়া মহা-ভয়ের ছবি আলোর আগে অন্ধকারের মত মিলিয়ে গেল। তিনি দেখলেন, আকাশের কুয়াশা আলো হয়ে পৃথিবীর উপর এসে পড়েছে। সেই আলোর বরফ গলে চলেছে—পৃথিবীকে সবুজে সবুজে পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে ভরে দিয়ে। সেই আলোতে আনন্দ আবার জগে উঠেছে। শাখীদের গানে গানে নদ উপবনে সেই আলো। ঘরের মন্ডকে হাসি হয়ে ফুটে উঠেছে সেই আলো। বাহিরে বাঁশী হয়ে বেজে উঠছে, অন্তরে হৃৎ হরে উথলে পড়েছে, শাস্তি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে—সেই আলো। ত্রিভুবন—বর্গ মর্ত পাতালে সেই আলো আনন্দের পথ খুলে দিয়েছে, শাস্তির সাতরঙের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। সেই আলোর পথ দিয়ে, সিদ্ধার্থ দেখলেন, চলেছেন এক ভিক্ষু,—যারা ভয় পেয়েছে তাদের অস্তর দিয়ে, যে হৃৎ পাচ্ছে তাকেই সান্ত্বনা দিয়ে—সুপ্তিমত্ত আনন্দের মত। তাঁর আগে আগে চলেছেন—বুদ্ধ যারা এসেছিলেন, তাঁর পিছে পিছে চলেছেন—বুদ্ধ যারা পরে আসবেন। সিদ্ধার্থ আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, যে-ভিক্ষু মাঝে চলেছেন সে তিনি নিজেই! তাঁর খালি পা, খোলা মাথা। তাঁর ভয় নেই, হৃৎ নেই, নোক নেই। সদানন্দ তিনি বরফের উপর দিয়ে কুয়াশার ভিতর দিয়ে আনন্দে চলেছেন, নির্ভরে চলেছেন—সবাইকে অস্তর দিয়ে, আনন্দ বিলিয়ে। মহাভয় তাঁর পায়ের কাছে ঝাঁপছে একটুখানি ছায়ায় মত! মায়াভাল ছিঁড়ে পড়েছে তাঁর পায়ের তলার—যেন খণ্ড খণ্ড মেঘ।

বেশন, আর দিন, সেদিনও তেমনি—রথ ফিরিয়ে সিদ্ধার্থ ঘরে এলেন বটে, কিন্তু সেইদিন থেকে মন তাঁর সে রাজমন্দিরে সেই মারা-আলে-ঘেরা সোনার-বগনে-ঘোড়া বরখানিতে আর বাধা রইল না। সে উমানী হয়ে চলে গেল,—ঘর ছেড়ে চলে গেল—কত অনামা নদীর ধারে ধারে, কত অজানা দেশের পথে পথে,—একা নির্ভর।

সন্ধ্যাতারার সঙ্গে সঙ্গে ফুটত ফুলের মত নতুন ছেলের কচি মুখ, নতুন মা করেছেন সিদ্ধার্থের রাণী যশোধরা—তাঁর স্নানর মুখের মধুর হাসি, লহরীদেয় আনন্দ গান, কপিলবাস্তুর ঘরে ঘরে সাত রঙের আলোয় মালা—কিছুতে আর সিদ্ধার্থের মনকে সংসারের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারলেন না;—সে রইল না—সে রইল না।

ছেলে হয়েছে; এবার সিদ্ধার্থ সংসার পেঁতে ঘরে রইলেন—এই ভেবে শুদ্ধোদন নতুন ছেলের নাম রাখলেন “রাহুল” কিন্তু সিদ্ধার্থের মন সংসারে রইল কই? রাহুল রইল, রইল রাহুলের মা যশোধরা, পড়ে রইল বরবাড়ি বজ্রবাক্য, আর সব আঁকড়ে পড়ে রইলেন রাজা শুদ্ধোদন, কেবল চলে গেলেন সিদ্ধার্থ,—তাঁর মন যে-দিকে গেছে।

সে দিন আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা। রাত তখন গভীর। রাজপুরে সগাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আলো নিবিয়ে গান ধারিয়ে সিদ্ধার্থ ডাকলেন,—ছন্দক, আমার ঘোড়ানি়ে এসো। সিদ্ধার্থের চরণের দাগ ছন্দক, কঠক ঘোড়াকে সোনার সাজ পরিয়ে অর্ধেক রাতে রাজপুরে নিয়ে এস। সিদ্ধার্থ সেই ঘোড়ার চড়ে চলে গেলেন অনামা নদীর পারে। পিছনে অন্ধকারে ক্রমে

মিলিয়ে গেল—কশিলবাস্তব রাজপুত্রী; সামনে দেখা গেল—পূর্ণিমার আলোর অলোম্বর পথ!

(৩)

ছন্দ্য চলছে কশিলবাস্তব দিকে, —সিদ্ধার্থের মাথার মুকুট, হাতের বাণ, গলার মালা, কানের কুণ্ডল আর সেই কণ্ঠক ঘোড়া নিয়ে। আর সিদ্ধার্থ চলেছেন পায়ে হেঁটে, নদী পার হয়ে, বনের দিকে তপস্যা করতে, —দুঃখের কোথা শেষ তাই জানতে।

ছোট নদী দেখতে একটুকু, নামটিও তার 'নমা,—'কেউ বলে অনামা, কেউ বলে অনোমা, কেউ বা ডাকে অনামা! সিদ্ধার্থ নদীর বে পাশ থেকে নামলেন সে পারের ভাঙন ভরী,—সেখানে ঘাট নেই, কেবল পাথর আর কীটা। আর যে পারে সিদ্ধার্থ উঠলেন সে পারে ঘাটের পথ ঢাল হয়ে একবারে জলের ধারে নেমে এসেছে; গাছে গাছে ছাওয়াবরা পথ। সবুজ বাস, বনের ফুল দিয়ে সাজানো বনপথ। এই দুই পারের মাঝে নমা নদীর জল, বাণি ধুয়ে ঝির-ঝির করে বহে চলেছে। একটা জেলে ছোট একখানি জাল নিয়ে মাছ ধরছে। সিদ্ধার্থ নিজের গায়ের সোনার চান্দর সেই জেলেকে দিয়ে তার ছেঁড়া কীবাখানি নিয়ে পোষে চলেছেন। নদী—সে বুঝে বুঝে চলেছে আম কীটালের বনের ধার দিয়ে ছোট ছোট পাহাড়ের গা ঘেঁসে—কখনো পূব মুখে কখনো দক্ষিণ মুখে। সিদ্ধার্থ চলেছেন সেই নদীর ধারে ধারে ছাওয়াবর ছাওয়াবর, মনের আনন্দে। এমন সে সবুজ ছাওয়া, এমন সে জলের বাতাস যে মনে হয় এইখানেই থাকি। কলে ভরা

পাতার ঢাকা ভাবি গাছ একেবারে নদীর উপর ঝুঁকে পড়েছে, তারি তলার কবিরের আশ্রয়। সেখানে সাত দিন সাত রাত্রি কাটিয়ে সিদ্ধার্থ বৈশাখি নগরে এলেন। সেখানে জটাধারী মহাপণ্ডিত আবাহা কালিম, নগরের বাইরে তিনশ চৌল নিয়ে আত্মনা পেতে বসেছেন। সিদ্ধার্থ তার কাছে শাস্ত্র পড়লেন, ধ্যান, আসন, যোগ-বাগ, মন্ত্র-তন্ত্র কতই শিখলেন কিন্তু ঋগ্বেদে কিলে জর করা যায় তার সন্ধান পেলেন না। তিনি আবার চলেই। চারিদিকে বিক্ষাটল পাহাড়; তার মাঝে 'রাজগেহ' নগর। মগধের রাজা বিবিসার সেখানে রাজত্ব করেন। সিদ্ধার্থ সেই নগরের ধারে রক্তগিরি পাহাড়ের একটি গুহার আশ্রয় নিলেন। তখন ভোর হয়ে আসছে, সিদ্ধার্থ পাহাড় থেকে নেমে নগরের পথে—ভিক্ষে দাঁড় বসে এসে দাঁড়ালেন। ঘুমন্ত নগর তখন সব বেগেগুচ্ছে—চোখ মেলেই দেখছে নবীন সন্ধ্যাসী! এত রূপ এমন করুণামাখা হাসি-মুখ, এমন আনন্দ দিয়ে গড়া সোনার শরীর, এমন শাস্ত ছুটি চোখ নিয়ে এমন করে এক হস্তে অন্তর দিয়ে অস্ত্র হাতে ভিক্ষে চেয়ে চরণের ধুলোর রাজপথ পবিত্র করে দিয়ে কেউতো কোনো দিন সে নগরে আসেনি। যারা চলেছিল, তাঁকে দেখে তারি কিরে আসছে; যারা ঘরে ছিল তারি তাঁকে দেখতে বাইরে আসছে; ছেলে খেলা ফলে তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে; মেয়েরা ঘোমটা খুলে তার দিকে চেয়ে আছে! তাঁকে দেখে কাক ভয় হচ্ছিল, লজ্জা করছিল। রাজা বিবিসার রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁকে দেখতে! ক'ণ সন্ধ্যাসী ভিক্ষা করতে

আসে কিছু এমনটিতো কেউ অংশে না। রাজপুত্রের এয়ার-পেকে-ওপার লোক পাড়িয়েছে—তাকে দেখতে, তাঁর হাতে ভিক্ষা দিতে। ধনী চাচ্ছে তাঁর শ্রুত করে তাঁকে ভিক্ষা দিতে, দোকানী চাচ্ছে দোকানে লুটেরে দিয়ে তাঁকে ভিক্ষা দিতে, পসারি চাচ্ছে পসরা খালি করে দিয়ে তাঁকে ভিক্ষা দিতে। যে' নিজেকে ভিক্ষারী সেও তাঁর ভিক্ষার স্রুতি শ্রুত করে তাঁকে বলছে,—ভিক্ষা নাও গো ভিক্ষা নাও! ভিক্ষার সিদ্ধার্থের হুই হাত ভরে গেছে কিছু ভিক্ষা দিয়ে তখনও লোকের মন ভরে নি! তারা মণিমুক্তা পোনাক্রপো মূলফল চাণ্ডাল স্বপাকারে এনে সিদ্ধার্থের পায়ে কাছ রাখছে, তারা নিষেধ মানবে না, মানা শুনবে না।

রাজা প্রজা ছোট বড় সকলের মনের সাধ পুরিয়ে সিদ্ধার্থ সেদিন রাজ-গেহের ঘরে ঘরে পথে পথে এমন করে ভিক্ষা নিলেন যে তেমন ভিক্ষা কেউ কোনো দিন দেবেও না, পাবেও না। এত যদি মুক্তা সোনা রূপো বসন ভূষণ সিদ্ধার্থের হুই হাত ছাপিয়ে রাজগেহের সাতার সাতার ছড়িয়ে পড়েছিল যে তত ঐশ্বর্য কোনো রাজা কোন দিন চোখেও দেখেনি। সিদ্ধার্থ নিজের কস্তে কেবল এক মুঠো ভিক্ষা ভাত রেখে সেই অতুল ঐশ্বর্য মগধের বত দীনদুঃখীকে বিতরণ করে চলে গেলেন।

‘উদরক’ পণ্ডিত সত্যনো চোলা নিয়ে গঙ্গানী-পাড়ার চৌপাটি খুলে বসেছেন। সিদ্ধার্থ সেখানে এসে পণ্ডিতের কাছে

শান্তর শিখরে লাগলেন। উদরকের মত পণ্ডিত, তখন তৃত্যরতে কেউ ছিল না। লোকে বোলতো। ব্যানদেবের মাথা আর গণেশের পেট—এট দুইটি এক হয়ে অবতার হয়েছেন উদরক শাস্ত্রী। সিদ্ধার্থ কিছুদিনেই সকল শাস্ত্রে অমিত্যর পণ্ডিত হয়ে উঠলেন, কোনো ধর্ম কোনো শাস্ত্র জানতে আর বাকি রইল না। শেষে একদিন তিনি গুরুকে প্রশ্ন করলেন—হুং যার কিনে? উদরক সিদ্ধার্থকে পরলেন—এস, তুমি আমি দুজনে একটা বড়গোছের চৌপাটি খুলে চারিদিকে সংবাদ পাঠাই, দেশ বিদেশ থেকে ছাত্র এসে জুটুক, বেশ অশ্লেনজনে দিন কাটবে। এই পেটই হচ্ছে হুংয়ের মূল, একে শাস্ত্র রাখ, দেখবে হুং শাস্ত্র তোমার ঐশীমানার আসনে না। উদরক শাস্ত্রীকে দূর থেকে নমস্কার করে সিদ্ধার্থ চৌপাটি থেকে বিদায় হলেন। দেখলেন, গ্রামের পথ দিয়ে উদরকের সাতশো চোলা ভাসে ভাসে মোতা নিয়ে আসছে—গুরু শেটটি শাস্ত্র রাখতে। সিদ্ধার্থ গ্রামের পথ ছেড়ে বনের ভিতর দিয়ে চললেন। এই বনের ভিতর কৌণ্ডিনের সঙ্গে সিদ্ধার্থের দেখা। টনিই একদিন শুকোদান রাজার সত্যর শুনে বলেছিলেন, সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই সংসার ছেড়ে বৃদ্ধ হবেন। কৌণ্ডিনের সঙ্গে আর চারজন ব্রাহ্মণের ছেলে ছিল। তাঁরা সবাই সিদ্ধার্থের শিষ্য হয়ে তাঁর সেবা করবার জন্য সন্ন্যাসী হয়ে কপিলাবাস্ত থেকে চলে এসেছেন।

অজ্ঞান নদীর তীরে উরাইল বন। সেইখানেই সিদ্ধার্থ গুণ্ডার বসলেন—

হুঃখের শেষ কোথা তাই জানতে। শান্ত্রে যেমন লিখেছে, শুকরা যেমন বলেছেন, তেমনি করে বছরের পর বছর ধরে সিদ্ধার্থ তপস্যা কলেন। কঠোর তপস্যা—ঘোরতর তপস্যা, —শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় বাধিলে অনশনে একাশনে এমন তপস্যা কেউ কখনো করেনি! কঠোর তপস্যায় তাঁর শরীর শুকিয়ে কাঠের মত হুয়ে গেল, গায়ে আর একবিন্দু রক্ত রইল না—সেখ বোকা যায় না আর তিনি বেঁচে আছেন কি না!

সিদ্ধার্থের কত শক্তি ছিল, কত রূপ ছিল, কত আনন্দ কত তেজ ছিল, ঘোরতর তপস্যায় সব একে একে নষ্ট হয়ে গেল। তাঁকে দেখলে মানুষ বলে আর চেনা যায় না;—যেন একটা শুকনো গাছের মত তিনি দাঁড়িয়ে আছেন! এমনি করে ছয় বছর কেটে গেছে। সে দিন নতুন বছর, বৈশাখ মাস, গাছে গাছে নতুন পাতা নতুন ফল নতুন ফুল। উরুইল বনে যত পানী যত প্রাণ্যপতি যত হরিণ যত মনুষ্য সব যেন আর কিসের আনন্দে ভ্রমে উঠেছে, ছুটে বেড়াচ্ছে, উড়ে উড়ে গেয়ে গেয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। সিদ্ধার্থের পাঁচ শিষ্য স্তন্যে পালেন খুব গভীর বনের ভিতরে যেন কে একজন একতারা ব্যাক্সি গান গাইছে। সারাবেলা বনে আজ অনেকদিন পরে শিষ্যরা দেখছেন সিদ্ধার্থের হির দুটি চোখের পাতা একটু একটু কাঁপছে,—যাতাসে যেন শুকনো ফুলের পাপড়ি। বেলা পড়ে এসেছে, গাছের কাঁক দিয়ে শেব-বেলার সিঁদুর-আলো নদীর বাট থেকে বনের পথ পর্যন্ত বিছিয়ে গেছে—সেজগা-বসনের মত।

একদল হরিণ বালির চড়ায় জল খেতে

নেমেছে, গাছের তলার একটা ময়ূর ঠাণ্ডা বাতাসে আপনার সব পালক ছড়িয়ে দিয়ে সন্ধ্যার আগে প্রাণ ভরে একবার নেচে নিজে, সেই সময় সিদ্ধার্থ চোখ মেলে চাইলেন,—দুঃখের পঁবে আজ প্রথম তিনি যোগাসন ছেড়ে নদীর দিকে চলেন। শিষ্যরা, দেখলেন, তাঁর শরীর এমন দুর্বল যে তিনি চলতে পারেন না। নদীর পারে একটা আমলকী গাছ জলের উপর ফুঁকে পড়েছিল, সিদ্ধার্থ তারি একটা ডাল ধরে আশ্রয় আশ্রয় ভ্রমে নামলেন। তাঁর পর অতি কষ্টে জল থেকে উঠে গোটাকরক আমলকী ডেঙে নিয়ে বনের দিকে চললেন আর অচেতন হয়ে নদীর ধারে পড়ে গেলেন। শিষ্যরা ছুটে এসে তাঁকে ধরাধরি করে আশ্রয়ে নিয়ে এল। অনেক বহুত সিদ্ধার্থ স্নান হয়ে উঠলেন। কুণ্ডিত প্রাণ কলেন—প্রভু, হুঃপের শেষ হয় কিংগে জানতে পারেন কি? সিদ্ধার্থ ঘাড় নেড়ে বলেন—“না”—“এখনো না”। অস্ত চার শিষ্য তাঁরা বলেন—“প্রভু, তবে আর একবার যোগাসনে বসুন, জানুতে চেষ্টা করুন, হুঃখের শেষ আছে কি না।”

সিদ্ধার্থ চুপ করে রইলেন। কিন্তু শিষ্যদের কথার উত্তর দিয়েই যেন একটা পাগলা বনের ভিতর থেকে একতারা ব্যাক্সি গয়ে উঠল—নায়ে! নায়ে! নাইয়ে নাই। কুণ্ডিয়া বলেন,—জানবার কি কোনো পথ নেই প্রভু? সিদ্ধার্থ বলেন—পথের সন্ধান এখনও পাইনি কিন্তু দেখ তাঁর আগেই এই শরীর দুর্বল হয়ে পড়ল, বৃথা যোগেবাগে নষ্ট হবার মত হল।

এখন এষ্ট শরীরে আবার বল ফিরিয়ে আনতে চলে, তবে যদি পথের সন্ধান করে ওঠা যায়। নিজেই মন দুর্বল শরীর নিয়ে কোনো কাজ সম্ভব। শরীরকে সবল রাখ, মনকে সতেজ রাখ। বিলাসীও চলে না উদাসীও হবে না, শরীর মনকে বেশি আরামও দেবে না বেশি কষ্টও সহ্যবে না। তবেই সেই সবল থাকবে কাজে লাগবে পথের সন্ধানে চলতে পারবে। একতারার তাঁর যেমন জোরে টেনে বাঁধলে ছিঁড়ে যায়, তেমনি বেশি কষ্ট দিলে শরীর মন কেঁড়ে পড়ে। যেমন তারকে একবার টিলে করে দিলে তাতে কোনো স্থরই বাজেনা তেমনি শরীর মনকে আরামে আলগে টিলে করে রাখলে সে নিকর্মা হয়ে থাকে। বৃথা যোগেযোগে শরীর মনকে নিজেই করে ও লাভ নেই, বৃথা আলগে বিলাসে তাতে নিকর্মা বসিয়ে মেগে ও লাভ নেই, —যাকের পথ ধরে চলাই ঠিক।

সে'দন থেকে শিখোরা দেখলেন, সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসীদের মত ছাইমাথা আসন বেঁধে বসে,

ন্যাস কৃত্তক তপ জপ ধুনি মুহুতি সব ছেড়ে দিয়ে আগেকার মত আবার গ্রামে গ্রামে ভিক্ষে করে দিন কাটাতে লাগলেন। কেউ নতুন কাগড় দিলে তিনি তাই পরেন, কেউ ভালো খাবার দিলে তিনি তাও খান। শিষ্যদের পেটা মনোমত হল না। তাদের বিশ্বাস যোগী হতে হলেই গরমের দিনে চারিদিকে আগুন আলিয়ে সীতের দিনে সারারাত জলে পড়ে কখনো উর্জবাহ হয়ে দুই হাত আকাশে তুলে কখনো হেঁটুধু হয়ে দুই পা গাছের ডালে বেঁধে থাকতে হয়। গ্রামে, দিনের মধ্যে একটি কুল, তার পর সারা দিনে একটি বেলপাতা, কবে এক কোঁটা জল তার পর তাও নহে। এমন করে যোগসাধন না করলে কোনো ফল পাওয়া যায় না। কাজেই সিদ্ধার্থকে একলা রেখে একদিন রাতে তারা কাশীর অশ্বিনত্তনের দিকে চলে গেল—সিদ্ধার্থের চেয়ে বড় জ্বরির সন্ধানে।

(ক্রমশঃ)

শ্রী অশ্বিনত্তন ঠাকুর।

আধুনিক ভারত

(পূর্বাভাস)

সিপাহী-বিদ্রোহ।

সংবাদপত্রাদিতে সমালোচিত জমিদার ঘটনাবলী, কপ কঠুক ভারত-আক্রমণের আশঙ্কা—লোকের মনকে আরও বিভ্রান্ত

করিয়া তুলিল। ইংলও এতদিন বাহুবলের সাহায্যে রাজত্ব করিতেছিলেন; ভারতবাসীরা মনে করিল এইবার ইংলওর সিংহাসন উলিয়াছে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের আরম্ভ হইতে, ইংরাজ

সেনা-নাথকেরা বেশ অহুতব করিতে লাগিল, সিপাহীরা তাহাদের আশ্রয়স্থল ঘাহিবে চলিলা বাইতেছে; প্রায় প্রত্যেক ছাউনীর মধ্যেই পুনঃপুনঃ অগ্নিসংহার হইতে লাগিল, গুরুতর অগ্নিধাতা লক্ষিত হইতে লাগিল। কতকগুলি রেলিমেণ্টকে বিহার দেওয়া হইল। ১০ই মে তারিখে মিণ্টা-ছাউনীর মধ্যে বিজোহানল জলিয়া উঠিল। কঠোর যত্নপ্রয়োগে সিপাহীরা ক্ষেপিয়া উঠিল। তিন ইংরেজ মেজিমেণ্টের সাহায্যে সেনাপতি, বিজোহানলকে দমন করিতে পারিতেন; কিন্তু সেনাপতির প্লেগম উন্নয়নীয় ছিল না। সিপাহীরা গ্লিট্রিতে উপনীত হইল এবং সেখানকার সিপাহীগণকে আগুন দলে টানিয়া লইল। মুসলমানগণকর্তৃক একান্তভাবে আহুত হইয়া, মৌলসম্মতিক্রমে হিন্দুগণকর্তৃক পরিপোষিত হইয়া, বিজোহানল ইংরেজগণকে লগাইতে বাধ্য করিল; পরে, আসাদে প্রবেশ করিয়া, পূর্বতন সমস্ত রাজ-অধিকার প্রত্যাগমনপূর্বক মোগল-সম্রাটকে দিল্লীর সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিল। অবশ্য এই অধিকারগুলি স্বাধীন অধিকার নহে; কেমনা, কিয়ৎকাল পরেই দেখিতে পাই, এই বৃহৎ সম্রাট ভাগ্যের দারুণ কণাধাতে অতিষ্ঠ হইয়া দেখা দাতা করিবার জন্য বৃথা অহুমতি চাহিতেছেন। তাই বিজোহানের প্রথম-কেন্দ্রস্থলটিতে আমরা একটি মুসলমানী আন্দোলন এবং একটি রাষ্ট্রীয় আন্দোলন দেখিতে পাই। বিজোহানল মোগল-সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে বলিয়া সমস্ত করিয়াছিল।

বিজোহানের দ্বিতীয় কেন্দ্রস্থল কানপুরের একটা রাষ্ট্রীয় আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল— কিন্তু ইহা হিন্দু-প্রধান। দিল্লীর ঘটনাবলী, সেখানকার সিপাহীদের মধ্যে বিজোহান উত্তেজিত করিল। তাহারা নানাসাধেবেক প্রদান বলিয়া বরণ করিল। পেশোয়ার উত্তরাধিকারীর পতাকাতে লগনের সমস্ত অধিবাসী-সমন্বিত হইল। একটা প্রচ্ছন্ন “গুপ্তপত্র” স্থানে আচ্ছন্ন হইয়া ইংরেজ অধিবাসীরা কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মুক্তাশ্রমে পতিত হইল।

বিজোহানের তৃতীয় কেন্দ্রস্থল অবোধা। স্কোম্পানী কর্তৃক স্বকীয় অধিকার হইতে বিচ্যুত হওয়ার সেখানকার তালুকদারেরা বিজোহান হইয়া উঠিল এবং স্বকীয় অধান পুরাতন প্রজাবলকে আগুন দলে টানিয়া আনিয়া। সমস্ত প্রদেশটা ইংলণ্ডের হস্ত-বিচ্যুত হইল। লক্ষ্মীর ইংরেজ দুর্গ-দৈত্য অবশ্য অবস্থার ছয়মাস ধারিয়া বিরাম-সহকারে আত্মরক্ষা করিল।

মধ্য-প্রদেশগুলি বিজোহানের চতুর্থ কেন্দ্রস্থল। দত্তক-পুত্র-গ্রহণসম্বন্ধে লর্ড ডালাহৌসির আইনের বিরুদ্ধে বহুল প্রতিবাদ সমুৎপত্ত হইল। বরখা হইতে বিচ্যুত হইয়া তদ্রূপবস্তুর ঝাঁপির রাষ্ট্র দৈত্য সংগ্রহ করিলেন এবং স্বকীয় সাহস ও মূঢ়তার পরিচয় দিলেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভারতের এইরূপ অবস্থা ছিল। তখন মনে হইয়াছিল, যেন ইংরেজ-শাসনের অস্তিম দশা উপস্থিত। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের বিজোহানল অত্র বিজোহান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথকভাবে ছিল। অবশ্য,

দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, ও কানপুরের অন্তর্গতী সমস্ত দেশটাই বিদ্রোহীদের দখলে আসিয়াছিল। রাজাদিগের অপকপাতিতা সত্ত্বেও, হোলকার ও সিদ্ধিয়ার সৈন্তমণ্ডলী বিদ্রোহীর ন্যে মিলিয়াছিল। বহুদেশ ও পল্লাবে, রাজ্য

ও বোম্বাই বিভাগে, বিদ্রোহের আশঙ্কা— বিশেষতঃ মিশর-বিদ্রোহের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল প্রক্ষেপ সৈন্ত-মণ্ডলী ও সাধারণ প্রজাবৃন্দ বিদ্রোহী হই নাই। ভারতের স্বাধীন রাজারা ইংলণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। যোগল সন্ন্যাসী, ও নান্যাসাধেবও অযোগ্যের মূলশমনদিগের সহিত মিলিবার জন্ত একটা গোষ্ঠাপড় করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। ভারতের সর্বত্রই অসন্তোষের একই ছেতু সমূহ হইতে বিদ্রোহ কিংবা বিদ্রোহের আশঙ্কা উৎপন্ন হইয়াছিল। কোথাও ভারতবাসীর আত্মরিক রাজতত্ত্ব প্রকাশ পায় নাই।

• • •

ইংল্যান্ডের এই রাজতত্ত্ব ভারতবাসীর মনে উদ্বেক করিতে পারেন নাই। বিদ্রোহী-দিগের অপকর্মে ক্রোধান্বিত হইয়া ইংল্যান্ডের অস্ত্র প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা করিল; দিল্লী জুমিলাৎ করিবে এইরূপ বলিতে লাগিল; গৃহান ছাড়া আর সকলকেই সমিষ্ট শ্রেণীভুক্ত করিবার জন্ত দাবী করিতে লাগিল। উজ্জয়িন্য রাজপুত্রগণা, বিশেষতঃ লর্ড-ক্যানিং মনের দৈহ্য কতকটা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। যাহারা সমস্ত দেশে আগমগুরুপ কঠোর দণ্ডনীতি প্রতিষ্ঠার দাবী করিতেছিল, যাহারা লর্ড

ক্যানিংকে হৃদয়লভিত বলিয়া বোঝায়ে রাখিতেছিল, যাহারা তাঁহাকে নানা প্রকারে অবমাননা করিতেছিল,—লর্ড ক্যানিংয়ের নামে লিখিত পত্রে তিনি তাহাদিগকে যৌর গভীরভাবে এই উত্তর দিয়াছিলেন :—

“মনে করন যদি, মুকুট আরও দীর্ঘকাল দাঁড়ি হইবে, অগোপ্য কিংবা অস্ত্রাস্ত্র বিদ্রোহী প্রবেশের ত্রিনীঘাতেও যদি আমরা পরানর্পণ করিতে আর না পারি, আমাদের বাহ্যিক দৃষ্টান্তে তখনও যদি লোকের অস্থিরতা থাকে—তাপি বড় বড় তিনটি প্রবেশের রাজতত্ত্ব বজায় রাখা, দুর্বলতা বিদ্রোহ গভীরনের উত্তি মনে কি? সমস্ত শ্রেণীর লোককে মর্জী বলিয়া, অসম্মান বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা—ইহা কি কখন সম্ভবপর? ইংল্যান্ডের বোম্বাই, উজ্জয়িন্য এই কথা আপনি গোবনা করুন, এই সমস্ত ব্যাপার আপনি খামাইয়া দিন। আর আমার কথা যদি বলেন,—যত দিন আমার বেহে প্রাণ থাকিবে,—যে নীতি আমরা অবলম্বন করিয়াছি তাহা ছাড়া অন্য নীতি আমি কখনই অনুমোদন করিব না। শুধু সমরোপযোগী ও আত্মবলম্বন বলিয়া নহে,—প্রব মনোভব ন্যায়ধর্মের অনুগত বলিয়াই আমি এই নীতি অবলম্বন করিয়াছি। আমি ফোখাবিট হইয়া প্রজ্ঞাপন করিতে চাহি না। আমি সুবিচার করিব, আমি অকাটা কঠোর ন্যায়ধর্মমুসারে সুবিচার করিব—আইন ও রাজতত্ত্ব বজায় রাখিবার সুবিচার করিব। কিন্তু আমার উপর যতদিন ভারত-শাসনের দায়িত্ব থাকিবে, ততদিন আমি কাহাকেও এমন একটি কামও করিতে দিব না, একটি কথাও উচ্চারণ করিতে দিব না যাহাতে ক্রোধের তাব প্রকাশ পায়, কিংবা সুবিবেচনা ও হঠকারিতা প্রকাশ পায়।”

লর্ড ক্যানিং যাহা বলিয়াছিলেন—বস্তুতই এই রাষ্ট্রনীতি জ্ঞানোন্মোচিত সর্বোৎকৃষ্ট রাষ্ট্রনীতি। এই মুক্ত জাতিসংঘর্ষজনিত যুদ্ধ নহে, এই বিদ্রোহ জনসাধারণের বিদ্রোহ নহে,—কেবল আত্মরিক নিপাহী-বিদ্রোহ

মাত্র। তাই পুণকভাবে এই সকল বিস্ত্রাহ দমন করা হইয়াছিল। ১৫ই জুলাই তারিখে কানপুর, ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লী, এবং ১৬ই নভেম্বর তারিখে লক্ষৌ পুনর্বার দখল করা হয়। অযোধ্যা ও মধ্য-ভারতের এদেশ সমূহে সম্পূর্ণরূপে শান্তি স্থাপন করিতে আর ছুই বৎসর লাগিয়াছিল। যদিও

সংগ্রামের আগ্রহ ও উত্তেজনা, কতকগুলি রাজপুরুষকে গর্হিত করণের আবেগে আনিয়া ফেলিয়াছিল—কিন্তু মোটের উপর ইংরেজ সরকার, যেমন দ্বিত্যচারিতা—তেননি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

১৮৫৭ অব্দের সিপাহী-বিস্ত্রাহ হইতে অনেকগুলি শিক্ষণাত হয়। (১)

(১) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিস্ত্রাহ।—লর্ড ড্যানফোর্থের পদত্যাগ (মার্চ ১৮৫৬)। লর্ড ক্যানিং ভারতের গভর্নর জেনারেল (১ আগষ্ট ১৮৫৫)। বর্ধে আগমন (২৬ জানুয়ারী ১৮৫৬)। কলিকাতার আগমন (২৬ ফেব্রুয়ারী)। আকালিদিবাদের সহিত সন্ধি স্থাপন (১৮৫৭-রু-এরাজে)। গারতের সহিত যুদ্ধ (১৮৫৭)। বন্ধুকের টোটার ব্যাপার। বারাকপুর ও মুর্শিবাবাদে আন্দোলন। (১৮৫৭-র-এরাজে)। অগ্রকপরে নতুন বিস্ত্রাহ (মার্চ)। মিউট-ভাইনীর সিপাহীরা বিস্ত্রাহী হয় (১০ মে, ১৮৫৭)। উদ্বাহা দিল্লী দখল করে, গুজর সিপাহীদিগকে বিস্ত্রাহে উত্তেজিত করে, বেগল-বাবলাকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করে (১১ মে)। পঞ্জাবের শাসনকর্তা সর-রন্-জেরন্স, পঞ্জাবের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করেন এবং নিখবিলের রাজত্বকি অস্ত্র রাখেন।

দিল্লী।—দিল্লীর সিপাহীবিস্ত্রাহ (১১ মে)। ইংরেজরা দিল্লী অবরোধ করে (৮ জুন)। পঞ্জাব হইতে দৈমন্ত লইয়া নিখলসেবর আগমন (আগষ্ট)। দিল্লী আক্রমণ (১৫ সেপ্টেম্বর)। দিল্লীর রাজপণে যুদ্ধ (১৫-২০ সেপ্টেম্বর)। হুদ-সু-কর্তৃক দিল্লীর রাজাধিপতির হত্যা। বাহাদুরকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তেজুনে চালান করা হইল—সেইখানেই বাহাদুর রত্না হয় (১৮৬২)

কানপুর।—সিপাহীবিগের মনুখান (৬ জুন)। নানাসাহেব (দুজু-গুহ) তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। ইংরেজরা (দ্রী, পুরুষ, শিশু) যে পরিবার মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল, সেই পরিবার অবরোধ। ২৭ জুনে ইংরেজরা নানা-সাহেবের সহিত সন্ধি করিল, এবং এলাহাবাদে যাত্রা করিবার জন্য গঙ্গার কৈকর আরোহণ করিল। সংখ্যার তাহারা ৪০০ জন। নানাসাহেব নবীতটে অবস্থিত সৈন্যের দ্বারা তাহাদের উপর তুলি গোলা বর্ষণ করিল; কেবল ৪ জন নায় বাঁচিয়া যায়। ১২৭ জন রক্তপী ও শিশুকে কারাবদ্ধ করা হয় এবং ভীষণ যন্ত্রণা আরোহ সহকারে ১৫ জুলাই তারিখে তাহাদিগকে হত্যা করা হয়। সেই দিনই জাতকালের নেতৃবাহিনী ইংরেজরা কানপুর দখল করে। অযোধ্যার বিস্ত্রাহীদের সহযোগে যুদ্ধ করিয়া নানাসাহেব ১৮৫৮ অক্টোবরে বেঙ্গলে পলায়ন করে।

লক্ষৌ।—অযোধ্যার Chief Commissioner, Sir Henry Lawrence সমস্ত দুর্বোপরি অধিবাসী-বিগকে লইয়া দুর্গ-পরিণত হেসিডেনসি-বিদ্যালে অগ্রেই আশ্রয় লইয়াছিলেন। ৪ জুলাই তারিখে, এক গুলির আঘাতে নিহত হন। Havelock ও Outram কর্তৃক লক্ষৌ মেসিডেনসির গ্রন্থ উদ্ধার। ইংরাজ আবার বিস্ত্রাহীপ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। সেনাপতি Sir Colin Campbell (পরে Lord Clyde) কর্তৃক বিস্ত্রাহ-উদ্ধার (১৬ নভেম্বর ১৮৫৭)। নানা সাহেবের সেনাপতি ডাউয়া-টোপির উপর বিজয় লাভ। নিশ্চিতভাবে লক্ষৌ অধিকার (মার্চ ১৮৫৮)। অযোধ্যার সম্পূর্ণরূপে শান্তি-স্থাপন (জানুয়ারী ১৮৫৮)।

দুই সভ্যতার সংঘর্ষ হইতে যে সংগ্রাম অবশ্যস্বাভাবিক, লর্ড জ্যানহোমো-কর্ভুক এই দৃষ্টিতে দৃষ্টিভঙ্গী-নীতি ও ভারতের আর্থিক ও বৈদেশিক উন্নতি-চেষ্টা, এই সংগ্রামকে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল—এই মাত্র। শুধু অগ্রসর করিয়া দেওয়া নহে, হয় তা বাড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু উৎসাহে ভারত 'জাইলও উভয়েরই' লাভ হইয়াছিল। এই 'শোণিত-মারী' সংগ্রাম না ঘটিলে, উভয়েই বধিরভাবে পরস্পরের বৈরসাধনে রত থাকিত, পরস্পরের হৃৎ-অভিযোগ। বৃষ্টিতে পারিত না। এই সিপাহী-বিদ্রোহ, ইংলণ্ডের নিকট ইংলণ্ডের দোষগুলি উদ্ঘাটিত করিল, ভারতের নিকট প্রতিরোধচেষ্টার ব্যর্থতা প্রকাশ করিয়া দিল। দে-ভারত-বিজয় যুরোপীয় সভ্যতা-কর্তৃক বিলম্ব ও যেন কতকটা অজ্ঞাতসারে সাধিত হইয়াছিল, সেই বিজয়-ব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত এই। সিপাহী-বিদ্রোহরূপ একটিমাত্র ঘটনা, একটভাবে দেখাইয়া দিল,—কতটা পথ অতিক্রম করা হইয়াছে, আরও কতটা পথ অতিক্রম করিতে হইবে।

কতকগুলি সাধারণ কারণ হইতে উৎপন্ন হইলেও ১৮৫৭ অব্দের সিপাহী-বিদ্রোহ আংশিক বিদ্রোহে পরিণত হয়। উহার মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সামাজিক বা রাজনৈতিক মতামতের

অস্তিত্ব ছিল না। যোগ্যতাবাদশাসকে ভারত-রাজ্য প্রত্যাশ করিবার গুহা দিল্লীর মুগ্ধমনানেরা কিছুই কবে নাই। অথবা কানপুরের হিন্দুরা, পেণ্ডোরাতে উহা প্রত্যাশ করিবার গুহা কোন চেষ্টা করে নাই। কাকেরদের বিদ্রোহে মুগ্ধমনানেরা ধর্মগুরু খোষণা করে নাই এবং ব্রাহ্মণেরাও সভ্য প্রথা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার গুহা, বা যুরোপীয় প্রথা গাভ মেন হইতে দহিকৃত করিবার গুহাও কোন দাবী করে নাই।

পূর্বে হইতে-বিজিত লোকদিগের মনোভাব যেক্ষণ হইয়া থাকে সেই মনোভাবের বশবর্তী হইয়া সাধারণ হিন্দুরা স্বভাবতই এই বিদ্রোহের প্রতি নিম্ন হইয়াছিল এবং কান্য-সিদ্ধি সম্বন্ধে নৃচ বিশ্বাস না থাকার, তাহার। ভবিষ্যতের গুহা কোন প্রকার মতলবও আঁটে নাই। পোণ্ডে ও আরম্ভে এখনও দাং টিকিয়া আছে—সেই রাষ্ট্র-সাধারণ প্রতিবাদ বা ধর্মসম্বন্ধীয় বিদ্রোহভাব সিপাহী-বিদ্রোহ নিমূর্ণিত হইবার পর, ভারত-হইতে একে-বারেই অস্তিত্ব হইল। ভারতে, সকল লোকেরই এইরূপ ধারণা হইল যে, হিন্দু-সভ্যতার অস্তিত্ব নশা উপস্থিত—এখন নব-যুগের হৃদে আত্মসমর্পণ করা ভিন্ন গতি নাই।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

মধ্যভারত-প্রদেশদ্বয়—ফারিস রাণী (২০ বৎসর বয়স) ও ডাভিরা টোপীর সহিত Sir Hugh Rose এর (পরে Lord Strathnairn) দ্বন্দ্ব বিব্রহ। ফারিস ও কাজী ইরাজের বৎসল মানিবার পর, মনে হইল যুদ্ধি মধ্যভারতে যুদ্ধের অবসান হইল, কিন্তু সেই সময়েই শিখরার সৈন্যসত্তা বিদ্রোহী হতে গোষ্ঠালিচর সমর্পণ করিল। পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নিজ মৈন্যের নেতী ফারিস রাণী নিহত হইলেন (জুন ১৮৫৮)। গোষ্ঠালিচর আধিকার (২০ জুন)। আরও দীর্ঘকাল ডাভিরা টোপীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলিয়াছিল। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে ডাভিরা-টোপী মৃত হয়, ১৮ এপ্রিলে তাহার কানী হয়।

ভারতবর্ষে অর্থনীতি-অধ্যয়ন

(অধ্যাপক রাসেন ও সগাক্সার লিখিত)

মনোবিজ্ঞান ও দর্শন ব্যতীত অল্প কোন ক্ষেত্রেই প্রাচীন ভারতবাসিগণ পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই; অথবা অর্থোৎপাদন বা মহুষ্যের আর্থিক উন্নতি-কামনায় সমরূপিতা করেন নাই, কেবল জনশ্রুতি ও প্রবাদ আবহমানকাল প্রচলিত হইয়া আগিতেছে। কিন্তু এ যে কেবল এক পক্ষেরই কথা, সংস্কৃত-সাহিত্য পাঠ করিলে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও নানাবিধ-অচুঞ্চলনের উৎকর্ষতার দৃষ্টে প্রমাণ বিস্তারিত আছে, সেই সকল পুস্তক পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন ভারতীয়গণ অর্থজীবির প্রকট উপায়-পথ্যালোচনাতেও বিরক্ত ছিলেন না এবং ইহাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে প্রাচীন পাটলিপুত্রে বা বর্তমান পাটনায় বিসময় বৎসর পূর্বে অর্থনীতি বিষয়ক পুস্তক-পাঠ শিক্ষার অঙ্গীভূত ছিল। চাণক্যের অর্থশাস্ত্র নামক শিক্ষাগ্রন্থ পুস্তক-পাঠে জানিতে পারা যায় যে, নারী চতুর্দিক্তার অংশভূত ছিল এবং উপবীতধারী ছাত্রগণ, অর্থশাস্ত্রবিৎ রাজকীয় কর্মচারীগণের নিকট এই অর্থীয় প্রয়োজনীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আদিষ্ট হইতেন।

প্রকৃতপক্ষে হিসাবে এই বিষয়টির আলোচনা আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; অথবা, রাজক্রেতৃবৃত্তী চন্দ্রগুপ্তের

কাল হইতে সমাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর রাজ-রাধেয়ব পক্ষ হর্জের সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষে অর্থনীতির ত্রিধাপ চর্চা হইয়াছে, তাহারও হিসাব দিতে আদি নাই। এখানে আমরা অর্থীতের দৃষ্টি জাগাইতে চাহি না—আমরা শুধু বর্তমান ও নিকটবর্তী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুই-চারিটা কথা বলিবার প্রয়াস পাইব। অবশ্য ইহা বলিলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, যে অর্থনীতির চর্চা বর্তমান ভারতে অত্যাবশ্যক বিষয় হইয়া গড়াইয়াছে ও আজিকালি বাহার চর্চাও হইতেছে, ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ নূতন নহে,—এবং আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে একদম চর্চায় নূতনত্ব কিছুই নাই। ইহা ভারতবাসীর নিজস্বই।

তবে, ইহাও সহজে গ্রহণীয় হইবে যে, চাণক্যের সময় যেক্ষণে ও যেভাবে অর্থনীতির আলোচনা হইত, এক্ষণে যেক্ষণে তাহা উহার আলোচনা করিলে সফল করিবে না। কারণ এ কথা বলাই বাহুল্য যে, চাণক্য ও তাহার সমসাময়িক, ব্যক্তিগণের সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা যেক্ষণ ছিল, বর্তমানে তাহার দৃষ্টে পরিবর্তন হইয়াছে এবং তাহার যেক্ষণ তাহা অর্থনীতি বা অর্থশাস্ত্রের আলোচনা করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, ঠিক যেক্ষণে তাহা আলোচনা বর্তমানকালে সম্ভবপরও নহে। বিশেষ বৎসরের কথা দূরে থাকুক, এক শত বৎসরের

কথা ধরিলেও দেখা যায় যে আলোচ্য বিষয় ও আলোচনার প্রথা—উভয়েই যথেষ্ট পরি-
বর্তন হইরাছে এবং বর্তমান সময়ে এট
পরিবর্তন আরও তীব্ররূপে হইতেছে। সার-
লোকগত জটিল রূপে ও সার খণ্ডের
* মরিসন এই বিষয়টি আমাদের সম্মুখরূপে
বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং যদিও এই- উভয়
লেখকের- সহিত আমাদের মতের সম্পূর্ণ
মিল হইবে না, তথাপি মোটের পর তাঁহার
যদি বলিয়াছেন, তাহা সকলকেই স্বীকার
করিয়া লইতে হইবে। ভারতবর্ষে অর্থ-
নীতির বিষয় ও আলোচনার প্রচারে এত
পরিবর্তন হইতেছে বলিয়াই এখানে অর্থ-
নীতির অধ্যয়নে অহুবিধা ভোগ করিতে হয়
ও সেইজন্যই ভারতীয় অর্থনীতিতে এমন
একটি বিশেষত্ব আছে, যাহা অপর দেশের
অর্থনীতিতে দেখা যায় না।

প্রতিবন্ধক

অর্থনীতির আলোচনায় প্রতিবন্ধক যে
যথেষ্ট আছে, তাহা সর্ববাদীসম্মত। বিশেষতঃ
ঔপনিষদিক ও কার্যাকরী বিভাগের সামঞ্জস্য
করা অনেক সময় অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। তাহার
উপর, অজ্ঞাত দেশে অর্থনীতির অনেকগুলি
স্থল যেভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে, ভারতবর্ষে
তাহা আদৌ পারে না। ইহাও কম
অহুবিধার কথা নহে। এই সকল অহুবিধা
খাকার জন্যই ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা
করিতে হইলে অত্যন্ত সাবধানে করিতে
হইবে। খুব কম বিজ্ঞানই অর্থনীতির দ্বারা
আমাদের কার্যাকরী শিখা দেয়, কিন্তু,
অসম্ভব ব্যক্তিগণের পক্ষে অর্থনীতির

আলোচনা করিতে যাওয়ার পদাঙ্কনের
সম্ভাবনাও তদ্রূপ অধিক। অর্থনীতির নাম
করিয়া অনেক সময় অনেক পাণ্ডিত্য প্রকাশ
করা হয়! হিতোপদেশে কথিত হইরাছে
যে ‘পল্লবগ্রাহিতা’র দ্বারা ভীষণ রোগ আর
নাই! অর্থনীতি সৰ্ব্বত্র ইহা বলা যাইতে পারে
যে একে একে পল্লবগ্রাহিতা অত্যন্ত সহজসাধ্য
এবং তদ্রূপ পথও অত্যন্ত নিপুণ-সমুপ। কিন্তু,
ইহা হইতে যেন কেহ মনে না করেন যে,
এজন্য এ শাস্ত্রের আলোচনা না করা হইয়াছে-
সঙ্গত। একমুখি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আদৌ
বাহ্যনীর নহে। যদিও অর্থনীতিতে ‘অল্প-
বিজ্ঞা ভয়ঙ্করী’ বটে, কিন্তু তাহা হইতে একমুখি
সিদ্ধান্ত কখনই সমীচীন হইবে না যে ইহা
হইতে দূরে থাকাই সঙ্গত। তৎপরিবর্তে,
অর্থনীতি সত্যিকার যত্নপূর্বক পাঠ করা এবং
আমাদের ক্ষমতানুযায়ী ইহার সম্যক আলো-
চনা করা কর্তব্য, এইরূপ সিদ্ধান্তই বাহ্যনীর।
অসম্পূর্ণ জ্ঞানের জন্য যে ব্যাঘাত হয়, তাহা
দূরীভূত করাই শ্রেয়ঃ।

এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যে সকল
প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে সংক্ষেপে
দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম—
শাস্ত্র-সংক্রান্ত ঘটনাবলী অত্যন্ত জটিল এবং
বিস্তারিত, ঐ সকল ঘটনা-সংক্রান্ত বিষয়ের
প্রতি লক্ষপাতিত্ববশতঃ উচিত সিদ্ধান্তে
উপনীত হওয়া যায় না। এখন প্রথমটির
বিষয় অগ্রে আলোচনা করা যাউক।

অর্থনীতি-সংক্রান্ত ঘটনাবলীর জটিলতা

প্রত্যেক সমাজেই অর্থোৎপাদনে ও
বন্টনে অনেকগুলি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়

এবং এই সকল প্রক্রিয়াগুলির সহিত উৎপাদন ও পণ্টনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। *দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন এক সমাজের যে কোন ব্যক্তির কথা আলোচনা করা যাউক। রাজা বা শ্রমী, কোঠাপতি বা দরিদ্র বৈ-কাহারও হোক, এক জনের জীবনের এক মাসের ঘটনা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। এই ব্যক্তি এক মাসে যাহা উপার্জন করে বা ব্যয় করে, তাহার প্রত্যেক কারণ পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এ পরীক্ষার আদি বা অন্ত নাই। অর্থনীতির হিসাবে সেই মাসে সেই ব্যক্তি অর্থোৎপাদনে ও বণ্টনের ক্ষেত্রে যে সকল প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণ করিয়া এবং যে যে কারণে সে সেই সকল প্রক্রিয়া অবলম্বন করে, তাহার বর্ণনা করিতে হইলে তাহার শিক্ষা, দীক্ষা, তাহার বংশাবলীর বিষয় ও আলোচনা করিতেই হইবে, তদ্ব্যতীত সে ব্যক্তি যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত, সে সমাজের রীতি-নীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েরই পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিতে হয়। তৎপরে, আরও কতকগুলি বাহ্যিক কারণ আছে। এ কারণগুলি প্রথম দৃষ্টিতে ভ্রমের বশিরা বোধ না হইলেও অর্থনীতির হিসাবে উহাদের যথেষ্ট মূল্য আছে। নমুনাকরণ, সেই ব্যক্তি বেহার প্রবেশের কোন স্থানে শ্রমাদি ক্রয় বা বিক্রয় করে। ভ্রমাদির ক্ষেত্রে সে যে মূল্য প্রদান করে বা বিনিময়ে সে যে ভ্রম লাভ করে, সেই ভ্রমের পরিমাণ জলবায়ুর দোষে (Climatic condition) ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন হইতে পারে। কুসিরা বা আমেরিকার ত কথাই নাই। ভ্রম প্রয়োজনীয়

দ্রব্যাদি যথা, পরিবেশের দ্রব্য বা কেমো-মিন উপাদানের ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিকে যে মূল্য প্রদান করিতে হয়, অনেকগুলি কারণে সেই মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে। ইংলণ্ডের মন্ত্রীপরিষতের বা আমেরিকার কর্পোরেশনের বাই-ল (Bye-law) পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই সকল ভ্রমের মূল্যের ভারতন্য হইতে পারে। অর্থাৎ, আমরা যে বিষয়টিকেই আলোচনা করি না কেন, তাহাতেই দেখিতে পাই যে বিভিন্ন শক্তি বিভিন্নভাবে কার্য করিতেছে এবং এই সকল কারণের প্রত্যেকটির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা কিছু সহজ ব্যাপার নহে।

এই প্রকার কতকগুলি কারণেই অনেক সময়ে কেহ কেহ অর্থনীতির পুণ্ডিত পদ্ধতিগুলি একেবারে পরিত্যাগ করিতে চাহেন। আমাদের মতে এক্ষণে করা কদাপি যুক্তি সম্ভব নহে। এই বিষয়টির আলোচনা আমরা পুনরায় যথাস্থানে করিব। বর্তমানে আমরা এইমাত্র বলিতে চাহি যে, কোন একটি স্থল বিষয়ের আলোচনা-করে প্রাসঙ্গিক অবস্থাগুলির কথা না ধরিয়া, সাধারণতঃ যে বিখ্যাত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন এবং সকল অবস্থাতেই একবিধ সমতার (Uniformity) কথা মনে করিয়া কার্য করেন, তাহা ঠিক নহে। পুণ্ডিত পদ্ধতি অনুসারে যে সকল অর্থনীতিবিদ পণ্ডিত-গণ স্থল বিষয়াদির আলোচনা করিয়া ভ্রমে পতিত হইতেন, তাহাদের সমালোচকগণও মধ্যে মধ্যে সেইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ সতর্কভাবে কোন বিষয় আলোচনা করার যেমন দোষ, অনিশ্চিত ও

নিখিলভাবে তাহার আলোচনাতেও ঠিক সেই দোষ ঘটয়া থাকে। সেখা পথে (Short cut) একদিকে সত্যাহুগন্ধান করিলে হয়ত কোন সত্যের আবিষ্কার করা যায় না, কিন্তু তাহা হইতে একপ অজুমানও সঙ্গত হইবে না যে অপরদিকে এইরূপ ভাবে সংক্ষেপে কার্য করিলেও তৎ আবিষ্কৃত হইবে এ। অগত অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই যে ঠিক এট প্রকার তর্কেরই আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সক্ষমতার নীতির স্বপক্ষে যে সকল কথা বলা হইয়া থাকে, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। একটা কথা শুনা যায় যে (Laissez Faire) ব্যক্তিগত স্বাভাবিক বর্তমান সময়ে আর প্রযুক্তা হইতে পারে না; যে সকল দ্বন্দ্ব মুক্তিধারা এই কথা ক্রমাগত করা হইত, সেগুলি এখনকার দিনে আর খাটে না সত্য, কিন্তু এইরূপ (Negative premises) বিরোধাত্মক প্রতীক্ষা হইতে (Negative conclusions) বিরোধাত্মক সিদ্ধান্ত মাত্রই পাওয়া যায়। অবাধ বাণিজ্যের গতি প্রতিষ্ঠিত করিবার স্বপক্ষে কোন মন্তব্য সন্দেহে ইহা, সহজেই বলা যাইতে পারে যে, পূর্কোক্ত মত আভিস্কার দিনে খাটে না বলিয়া ঐ মন্তব্যও প্রযুক্ত হইতে পারে না; কিন্তু ইহা বলা কোন ক্রমেই সঙ্গত হইবে না। স্থান ও সময় ও প্রাসঙ্গিক কারণাদির আলোচনা করিয়া তবে ইহার সন্দেহ কোনরূপে মতামত প্রকাশ করা সম্বোচন হইবে। কিন্তু তাহা না করিয়াই যে কোন-একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই আভি-কালিকার প্রথা গাড়াইগাছে।

পক্ষপাতিক্র দোষ

ঐতিহাসিকগণও ঘটনার আটপাতার বিহীন আমলে না আনিয়া কোনরূপ একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। আমরা পূর্কো যে ক্রমের কথা উল্লেখ করিয়াছি, এই প্রকার ক্রমকে তাহারই অন্তর্গত দ্বিতীয় প্রকারের ক্রম বলিয়া পক্ষপাতিক্রম দোষ বলিব। অর্থনীতির আলোচনায় সম্প্রাপ্ত বিবরণের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে; কেবল সত্যের চক্ষেই সকল বিষয় দেখিতে হইবে এবং প্রকৃত বৈজ্ঞানিক হিসাবেই, সকল বিষয়ের বিচার করিতে হইবে। এই বিষয়টি সচক্ষেই দৃষ্ট হয়, এবং এই বিষয়ে কিছু বলাও সহজ; কিন্তু এই বিষয়ে কার্য করাট প্রকৃত পক্ষে কঠিন।

প্রধানত অর্থনীতি-অধ্যয়নের যে প্রথম আকর্ষণ তাহা কেবল সিদ্ধান্ত-শিক্ষার খাতিরেই নহে। সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির সুখ-দুঃখের কারণ, বাহাতে মনুষ্যের উন্নতি বা অবনতি হয়, সেই সকল বিষয় অহুষ্ঠানের ক্রমই আমরা এই বিজ্ঞান শিখিতে আকৃষ্ট হই। এই সকল কারণ, অবস্থা ও শক্তি হইতে আমরা নিজেদের বিজিন্ন বা উদাসীন থাকিতে পারি না। উন্নতি ও অবনতি, সুখ ও দুঃখ এই দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি বা ক্রিয়া আমরা দেখিতেছি এবং উন্নতি ও সুখের প্রতি আমাদের যেরূপ আকর্ষণ, অবনতি ও দুঃখের প্রতিও আমাদের ঠিক ততৎপারিত্ব বিতৃষ্ণ। প্রথমেতাকে আমরা দ্রোণী এবং দ্বিতীয়কে দ্রুতীভূত করিতে প্রয়াস পাই এবং

তজ্জ্ঞ প্রকৃত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বারা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে, তাহা তাৎপর্য করিয়া উন্নতি ও জ্ঞানের আহুত্বলা মত পোষণ করি।

ইহাও স্মারক করিতে হইবে যে, বাস্তব জগতে অর্থনীতি সংক্রান্ত সম্প্রদায় বিষয়গুলি পূর্ণক করিয়া অল্প সকল প্রকার বিষয় হইতে তাহাদের বিচ্ছিন্ন করা সম্ভবপর নহে। যখনই আমরা অর্থনীতি সংক্রান্ত কোন বিষয় আলোচনা করিতে অগ্রসর হই, বা কাগোক্ষে অর্থনৈতিক তথ্য হইতে উদ্ধৃত শিক্ষামূল্যবাহী কোন পন্থা অবলম্বন করি, তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, এতদ্ব্যতীত অজ্ঞাত অনেকগুলি বিষয় আছে, যাহা আমরা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতি বিষয়ক প্রশ্নগুলি, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, ও ধর্মসংক্রান্ত প্রশ্নের সহিত ঘনিষ্ঠ সংঘর্ষে আবদ্ধ এবং তজ্জ্ঞ এই সকল বিষয়ই পরস্পর-দ্বিসাবে অঙ্গ-বিশ্তর জড়িত এবং এই জন্তই তত্ত্বসংক্রান্ত বা ব্যবহারিক কোন প্রশ্ন উঠিলে ইহার জটিলতাও বৃদ্ধি পায়। কখনও কখনও ইহা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাৱলম্বনকারীর নিকটে অপ্রাণান্তিক বলিয়া মনে হয়। এই সকল ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে গেলে, অনেক সময়ে আমাদের সাহায্য কিছু অস্পষ্ট হইতে পড়িতে পারে।

যতই আমরা এই প্রকার দৃষ্টি বিচার হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা পাটাই। বুদ্ধিভাবে আলোচনা করি, ততই এই সকল পক্ষপাতিত্ব-দোষ বৃদ্ধি পায়। যদি আমরা দৃষ্টি মূলতত্ত্বগুলি একেবারে পরিত্যাগ করি

এবং প্রত্যেক প্রাথমিক বিষয় বিচারের তত্ত্ব গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমাদের এক বিশদ হইতে অল্প বিপদে পড়িতে হইবে—সম্পূর্ণতা পরিত্যাগ করিলে জ্ঞান-সঙ্গতি এবং নিষ্কণ্টকতাও নষ্ট হইবে। তাহা হইলে তখন ইচ্ছা গম্ভীরা পণ হইতেও বিচ্যুত হইবে।^{*} যেখানে মননরঞ্জন হইতে পারে; কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্তের এক্ষণ ক্ষেত্রে^{*} নিষ্কণ্টকই যান্ত্রিকময় ঘটবে।

* অর্থনীতি বিষয়ক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে যে অনেক পক্ষপাতিত্ব-দোষ আমাদের পড়ে, সে সম্বন্ধে অধিক কথা নিম্নোক্তরূপে। এগুলি পরিত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক।

শিক্ষার পদ্ধতি

বিষয়ের জটিলতা উপলব্ধি করিয়া এবং আমাদের পক্ষপাতিত্বের কথা মনে করিলে অর্থনীতির আলোচনার দুইটা প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হইবে। এই সকল প্রতিবন্ধকের স্তর-স্তর হ্রাস হইতে পারে, কিন্তু ইহাদ্বয়কে একেবারে দূরীভূত করা সম্ভবপর নহে। এই জন্তই আমাদের প্রথম কর্তব্য হইতেছে এই বিষয় সম্পূর্ণরূপে অগ্রণ রাখি। —ইহাদের অস্তিত্ব মনে করি। অগ্রসর হওয়া। বিদ্যার কর্তব্য হইতেছে, এইগুলি অগ্রণ-পথে রাখি। এমন শিক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে এইগুলি অন্যভাবে আমাদের অভিজ্ঞান করিতে পারি।

অর্থনীতি শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমে বিকল্প শিক্ষা আবশ্যক—সেই প্রাথমিক শিক্ষার সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিতে চাহি না। ইতিহাস, ভূগোল এবং

বর্তমান ঘটনা লক্ষ্যে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা ব্যতীত অল্প বিশেষ কিছু শিক্ষার আবশ্যকতা নাই। এতদ্ব্যতীত অল্প একটি বিষয় আবশ্যক—যাহা মন-বুদ্ধি প্রয়োগ করে, তাহা অত্যাভ্যন্তরীণে সমীকরণ করা। কতকগুলি বিষয় বা তাত্ত্বিক বিষয়াদি এবং তাহাদের অর্থের প্রতি সম্যক ধৃষ্টি না রাখিয়া কণের মত সেগুলি আঙুলিতে পিঁকান পক্ষে তাহা অতীব হানিকর হইবে।

ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত আপত্তি

দ্বিতীয় দফার আপত্তিগুলি এই ক্ষেত্রে উঠিবে এবং এতে ফলেই সেগুলির বিচার করিতে হইবে। ইহা বলা যাইতে পারে যে, অত্যন্ত দেশের পক্ষে যাহা প্রযুক্ত হইতে পারে, ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা প্রযুক্ত হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ওয়াশিংটন বাজার হাঙ্গামা বলিয়াছেন, তাহারই প্রথমে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাজার হাঙ্গামা বলিয়াছেন যে, অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ অর্থনীতি-সম্বন্ধীয় যে সকল কথা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা সকল দেশের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে না—কেবল যে সকল দেশের সর্বস্বত্বকারে উন্নতি লাভ ঘটয়াছে সেই সকল দেশের প্রতিই ব্যবহৃত হইতে পারে। ইংলণ্ডের জায় যে দেশে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা প্রচলিত সেই দেশে একমুখী সম্ভবপর। সেই হিসাবে, ভারতবর্ষের প্রতি ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে না—কারণ ভারতবর্ষে অনেক স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব। ভারতবর্ষের শিল্পবিষয়ক গঠন সম্পূর্ণ

হইতে এখনও যথেষ্ট বিলম্ব রহিয়াছে এবং “অনেকে একপক্ষ বলেন যে, এতদেখে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাবও নাই এবং দেশাচারই সকল বিষয়ে প্রভাব প্রকাশ করে। ভারতীয় অর্থনীতির মূল্যায়ন পরলোকগত অস্টিন রানাডে বলিয়াছেন যে, “ভারতবর্ষে জাতি ও পরিবার সকল বিষয়েই আধিপত্য বিস্তার করে। স্বাধীন ও অসামান্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতি ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি, সামান্য কয়েকটি নির্ধারিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্তর দৃষ্ট হয় না। দেশাচার ও আইনেরই প্রভাব অধিক এবং যুক্তি অপেক্ষা গুদগোরবই অধিক নিষ্পত্তিকরণক্ষম হইয়া থাকে। মূলধন বা পরিচর-চলনশীল নহে এবং একস্থান হইতে অল্প স্থানেও পরিচালনা নহে। বেতন ও লাভ নির্ধারিত অবস্থার থাকে এবং ঘটনানুসারে তাহাদের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। যে সমান এইরূপে গঠিত, সে সমাজের অভিজ্ঞতাবলি স্বতঃস্ফূর্ত সভ্য বলিয়া কার্যকরী হইতে পারে না; অধিকন্তু, তাহারা তাহাদের প্রকৃত পথ হইতে অপসৃত হয়।”

উপর্যুক্ত মতামতগুলি যে বিচারশক্তি এবং বহুদর্শিতার উপরে ভিত্তি তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি ইহা বলিতে চাইবে যে অর্থনীতি বিষয়ক সাবৈক মতগুলি ভারতবর্ষের পক্ষে একেবারেই প্রযুক্ত হইতে পারে না এবং ভারতীয় অর্থনীতি সংক্রান্ত সম্প্রদায়িক গুলির আলোচনার জন্য সেই প্রাচীন মতগুলি অধ্যয়ন করা ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে কেবল পণ্ডিত্য মাত্র? আমরা এই প্রকার

সিদ্ধান্তের অল্পকূলে আদৌ মত দিতে পারি না—বরং এ প্রকার সিদ্ধান্তের ক্লামরা সম্পূর্ণ বিরোধী এবং আমাদের বিশ্বাস যে মহামতি রাণাডে যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনিও স্বীকার করিতেন যে, পূর্ববর্তী মহামতের পরিবর্তনের সময় এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে। সাংকেতিক মতের বর্তমান স্বপক্ষীয়গণ তাহাকে অনেক পরিমাণে নমনীয় করিয়াছে এবং “পূর্ব ও পশ্চিমের” পার্থক্যও অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষের উপযোগী পন্থা

ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী, তিনটী পন্থা বিবেচিত হইতে পারে।

(১) আমরা এরূপ ধরিয়া লইতে পারি যে, ভারতবর্ষের অবস্থা এমন নিরঙ্ক-বিরহিত যে সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ গুক্তিগুলির কোনই মূল্য নাই এবং তৎক্ষণাৎ অমাব্যবহিক পদ্ধতিগুলিতেই আমরা সীমাবদ্ধ থাকি। এরূপ ক্ষেত্রে আমরা ঘটনা-সংগ্রহ এবং তাগানের শ্রেণীবিভাগ করিব ও এই সকল ঘটনা যে সকল মত নির্দেশ অথবা সপ্রমাণ করে তাহাই মাত্র নির্ধারণ করিব। ভারতবর্ষের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে অর্থনীতির এইরূপ মানদণ্ড। সংগ্রহ ব্যতীত আমরা অল্প কিছুই করিতে পারি না। আমাদের শিক্ষার অনেক ক্ষেত্রে এই মত গ্রহণীয় হইতে পারে এবং সম্ভবতঃ এই পথে অগ্রসর হইয়া কাঁধা করিলে সুফলও ফলিতে পারে। তবে আমরা এরূপ বলি না যে অল্প পথে অগ্রসর হইলে ফল পাইব না।

(২) ইহা স্বীকার করা বাইতে পারে

যে, যদি আমরা হুজুর ও সমস্ত ক্রান্তান্ত করিতে চাই, তবে আমরা—ভারতবর্ষ ও ইউরোপ উত্তর স্থানেই—আমাদের সম্প্রদায় বিধগুণি সিদ্ধ করিবার অল্প পন্থা অবলম্বন করিতে পারি। তবে এ কথাও বলা বাইতে পারে যে, অবলম্বিত পন্থাগুলি দেশীয় চরিত্র আনুগত্য অর্থাৎ ভিন্ন-দেশীয় না হয়। ভারতবর্ষের অল্প অবলম্বিত পন্থাগুলি ভারতীয় অবস্থা হইতেই উদ্ভূত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ ইউরোপের অল্প যে পন্থা হওয়া উচিত, ভারতবর্ষের অল্প তাহা হইতে ভিন্ন পন্থাবলম্বন শ্রেয়। এরূপ কথা সরাসরি জ্ঞাবে গ্রহণ করা বাইতে পারে না। প্রস্তাবিত প্রণালী প্রত্যয়যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্বে ইহার একটা মন্তা উপস্থিত করা উচিত এবং সেই মন্তার নূতন মত ও স্বতঃসিদ্ধ বিধগুণির কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া অত্যাবশ্যক। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে এ পন্থা কেবল ভারতবর্ষের পক্ষেই প্রযুক্ত হইতে পারে, এরূপ অর্থনীতি প্রস্তাবিত হয় নাই।

(৩) তৃতীয় পন্থা এই যে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক মতের যতগুলি “ভারতবর্ষের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে, সেইগুলিই গ্রহণ করা। বর্তমানে কেহই এরূপ স্বীকার করিবেন না যে, অর্থনীতি-সংক্রান্ত সকল মতগুলি সকল দেশে এবং সকল সময়ে একই ভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। তবে, স্থলবিশেষে যে কতকগুলি মত প্রযুক্ত হইতে পারে ইহা স্বীকার করা যায় এবং এক দেশীয় এক সময়ের মত অল্প সময়ে কিয়দংশে নিষ্কর্যই প্রযুক্ত হইতে পারে।

যে সমস্ত প্রসঙ্গ আমরা উপরে উত্থাপন করিয়াছি তাহা সংখ্যায় অনেক এবং সেই সকলগুলিই সরাসরি ভাবে বিচার করা হইতে পারে না। অর্থনীতি বিবরণ মত জ্ঞানির বহু শাখা-প্রশাখা আছে। বিশেষতঃ, ভারতীয় ব্যবসায় ও শিল্প বহু বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। ইউরোপীয় মত ভারতীয় আচারের প্রতি প্রবেশ করিলে সহস্র সহস্র সমস্যার উৎপত্তি হয়। এবং শেখোক্তের মধ্যে হৃদয় এত অল্প সংখ্যক আছে যে প্রত্যেকটি নিজ নিজ পৃথক অবস্থানগারে বিচার করিতে হইবে। হৃদয়, কথা উত্তিরে যে ভারতবর্ষে ব্যবসায়-সংক্রান্ত বিশেষ্য অনেকগুলি বিষয়ই বৈদেশিক এবং তাহার প্রকৃত ভারতীয় অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত নহে। অবশ্য এ উক্তি কেবল সত্য নিহিত আছে; তবে এক্ষণ উক্তি অধিকতরই অতিরিক্ত। ভারতবর্ষে প্রচলিত বর্তমান ব্যবসায়িক পদ্ধতি বৈদেশিক হইলেও অল্প ভবিষ্যতে ইহাদের বৃদ্ধি অথবা ইতিমধ্যেই ইহা সকল দেশের উপর যে ফল উৎপাদন করিয়াছে, তাহা বিবেচনা করা কর্তব্য। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, পোষ্ট অফিস এবং সর্বোপরি শিক্ষা পুরাতন রক্ষণশীলতার বীধ ভাঙ্গিয়া বিরাছে এবং চির-প্রবাদভূত ভারতীয় গ্রাম-সমূহের বিচ্ছিন্নতাও ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইতেছে।

উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ

ভারতবর্ষে বর্তমানে বিশেষ আবশ্যক হইতেছে ছাত্র ও কাব্যের লোকের প্রাণী-বদ্ধ সহযোগিতা—উত্তরের একত্র সমাবেশ

ও কার্য না হইলে ফল পাওয়া দুষ্কর। ভারতীয় ব্যবহার বিশেষ পর্যালোচনা করিতে হইলে তিনটি কার্য অত্যাবশ্যক এবং এই তিনটিই মধ্যো বহুশক্তি ও কার্যোপযোগী জ্ঞান উপপত্তিক শিক্ষাপেচ্ছা অধিক মূল্যবান।

উপযুক্ত তিনটি বিষয় সম্বন্ধে আমাদের বহা বক্তব্য তাহা এই :—

(১) প্রথমে কার্য-ঘটনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ। বর্তমানে ইহাই সর্বপ্রধান কার্য বলিয়া আমাদের মনে হয় এবং ইহার ক্ষেত্রও অসংখ্য। সত্য বটে, অনেক প্রকার ঐতিহাসিক ও অজ্ঞাত বিশরণ কতক পরিমাণে প্রাণীশক্ত্যাবে আমাদের হস্ত-পত্তিত হইয়াছে। সেটেলমেন্ট রিপোর্ট, গেজেটের, কমিশনের রিপোর্ট এবং গবর্ণমেন্টের প্রকাশিত অজ্ঞাত কার্যে অনেক মূল্যবান বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। কিন্তু এক্ষণ সংবাদ বহুজাত্য তথ্যে পূর্ণ হইলেও কোন কার্য-বিশেষের অজ্ঞ সংগৃহীত হয় এবং কোন মত বিশেষের সাপেক্ষে কখনই প্রাধান্যতঃ উপস্থিত করা হয়। এই সকল সংবাদ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক এবং গবর্ণমেন্টের প্রয়োজনের অজ্ঞই সাধারণতঃ সংগৃহীত হয়। কিন্তু ইহাতে ইহার মূল্যের হ্রাস হয় না। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক সংগৃহীত হয় বলিয়া এই সকল সংবাদের মূল্য অধিক। ব্যক্তিগতভাবে লোকে যে সকল সংবাদ গ্রহণ করিতে পারে, গবর্ণমেন্টের তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে ও অধিকতর মূল্যবান সংবাদ গ্রহণ করিবার সুযোগ ও ক্ষমতা

রহিয়াছে এবং যখন এই সকল সংবাদ শাসন-সৌকর্য্যার্থে সংগৃহীত হয়, তখন সেগুলির সত্যতা সন্দেহ করিবার কোনই কারণ থাকে না। পক্ষান্তরে, এগুলি যে একেবারে ভ্রমপূর্ণ নহে তাহাও বলা যায় না এবং ইহাতে যে সকল ভ্রম থাকে তাহা ধারাবাহিক; ব্যক্তিগত অহুসন্ধানেই তাহার সংশোধন হইতে পারে। গবর্ণমেন্টের “রু” পুস্তকসমূহে যে উপাদান থাকে তাহা অত্যন্ত মূল্যবান এবং এই মূল্যবান উপাদানসমূহ সাধারণ ব্যক্তিগণের অধ্যয়নের বিষয়ীভূত হওয়া একান্ত আবশ্যিক; কিন্তু ইহার সহিত আরও যত্ন উপাদান একত্র করা প্রয়োজন। সকল সংবাদই ঘটনার উপর ভিত্তি হওয়া প্রয়োজনীয় এবং ভারতীয় অর্থনীতি-সংক্রান্ত ঘটনাগুলি যে গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন জীবন ও তৎসংক্রান্ত ঘটনার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, তাহা বেশ মনে রাখা উচিত। অবশ্য, একমাত্র গবর্ণমেন্টই এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ-সংক্রান্ত সকল বিষয়ে অহুসন্ধান করিতে পারেন; কিন্তু যে উপায়ে এ তথ্য সংগৃহীত হয়, তাহাতে জিজ্ঞাস্ত প্রশ্ন ও তাহার উত্তর কতকংশে সীমাবদ্ধ হয়। আমাদের মনে হয় যে, এই সকল সংবাদের মূল হইতেছে গ্রামা চৌকিদার। এ প্রকারে সংগৃহীত সংবাদ সংশোধিত হইলেও যে কতকংশে অসম্পূর্ণ থাকে তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা সম্পূর্ণ করিতে হইলে প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া ধীর ভাবে সংবাদ সংগ্রহ করা অতীব প্রয়োজনীয়।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় ঘটনা এত বিভিন্ন

প্রকারের যে, এই ভাবে অহুসন্ধান ভারতবর্ষের পক্ষে অত্যাশঙ্কক। সাধারণ ভাবে মত প্রকাশ অর্থাৎ এক গ্রামে বাহা ঘটতেছে, ভারতবর্ষের সকল গ্রামেই তাহা ঘটতেছে এরূপ ধারণা অত্যন্ত দুষ্টীয়। গ্রামের কথা দূরে থাকুক, এক প্রদেশের সহিতই অত্র প্রদেশের সামঞ্জস্য নাই।

আমাদের এই পাটনা কলেজে “চাণক্য সমিতি” নামক ছাত্রবিগের একটা সমিতি আছে। এই সমিতি-সম্বন্ধে আমরা বারাস্তরে আলোচনা করিব। আমরা উপরে যে প্রকার ঘটনা-অহুসন্ধানের কথা বুলিয়াছি, এই সমিতি কতক পরিমাণে সেইরূপ ঘটনা-নিচয়ের অহুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন। সমিতির সদস্যগণ প্রায় সকলেই বেহার-প্রদেশীয়; কিন্তু এক গ্রামের এক সমস্ত যে বিষয়ণ দাখিল করেন, অত্র গ্রামের অত্র সমস্তের সহিত সব স্থানে তাহার মিল হয় না। ইহা হইতে সহজেই প্রতীতমান হয় যে একস্থানের ঘটনার সহিত অত্র স্থানের ঘটনার সামঞ্জস্য নাই—বিস্তৃত বিষয়ণ জানিতে হইলে প্রত্যেক স্বতন্ত্র গ্রামের বিষয় সকল অহুসন্ধান করা কর্তব্য।

(২) বিত্তীয় কার্য হইতেছে যে যে সকল গ্রামাণ সংগৃহীত হইতেছে, তাহাদের পর্যালোচনা ও বিশিষ্ট বিশ্লেষণ। এরূপ কার্যে পারদর্শী হইতে হইলে অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে কতক উপপত্তিক শিক্ষা এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় অর্থনীতির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমাদের মতে প্রথম দফা বিত্তীয় দফা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান।

উপাদান-সংগ্রহের কার্য আরও অধিকদূর অগ্রসর হইলে এই কার্যের মূল্যও বৃদ্ধি পাইবে। তবে ইহা একবারে স্থগিত রাখিলে চলিবে না। উপাদান-সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ একত্রেই করিতে হইবে। এবং একটী হইতে অল্পটী পৃথকভাবে করিলে কার্যের ক্ষতি হইবে। বিশ্লেষণ ঐ তুলনা দ্বারা অধিরা যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি তাহা হইতে যে কেবল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিণ এমন নহে, ইহাও জানিতে পারিব যে কোন্ বিষয়ে আরও উপাদান সংগ্রহ করা আবশ্যিক এবং কি ভাবে প্রদত্ত করিলে উত্তম উপাদান সংগৃহীত হইতে পারিবে। পুনশ্চ, যদিও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতীয় অর্থনীতি এখনও ধারাবাহিক শিক্ষার উপযোগী হয় নাই, তাহা হইলেও ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে ইউরোপীয় মতামত ও বহুদর্শিতা ভারতীয় অনেক প্রশ্নের সমাধানের পথ প্রদত্ত করিয়াছে। ইহার সত্বে কোন প্রমাণ-আনয়নের আবশ্যিকতা নাই। যাহারা এ বিষয়ে অধিক জানিতে চান, তাহারাই মানিভের রচনাগুলি, অথবা স্তার থিওডোর মরিসনের পুস্তক পাঠ করিতে পারেন কিংবা ডাক্তার মার্শাল ইতিহাস করেন্দী কমিটিতে যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন তাহার আলোচনা করিবেন।

(৩) তৃতীয় কার্য হইতেছে কার্যোপযোগী ফল পর্যালোচনা করা। আমাদের মনে হয় যে প্রথমোক্ত দুই দফা এই শেষোক্ত দফারই অধীন। কেবল জ্ঞান লাভ করিতে আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়

না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা না বিশ্বাস করিতে পারি যে, এই জ্ঞানলাভ কার্যকরী, ভ্রম-সংশোধনে সক্ষম এবং উন্নতির সূত্র হইবে। কেহ কেহ এমন আছেন যাহারা মনে করেন যে এই বিশ্বাস কেবল ভ্রান্তি মাত্র। তাহারাই মনে করেন কার্যের অল্প ঔপন্যাসিক শিক্ষাও কোনই আবশ্যিকতা নাই—কেবল বহুদর্শিতারই প্রয়োজন। দৃষ্টান্তরূপে তাহারাই যে সকল কণ্ড শিক হয় নাই বা যে সকল সংস্কার বৃথা হইয়াছে তাহাই উল্লেখ করিবেন। কিন্তু, সূত্রের বিষয় এট, অল্পটিকের দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না। যৌথ মহাশয় কণা ধরুন। ইউরোপে এবং ভারতবর্ষে ইহার সফলতার কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে ইহার ফল সূত্রেরও অগোচর ছিল—অন্য কণা আশ সত্যে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য ইহার সফলতা যে কমলা ও বহুদর্শিতা উভয়ের সংমিশ্রণে হইয়াছে, তাহা বলা দ্বিভূতে পারে। কমলার যে কোনই আবশ্যিকতা নাই, এ কথা বলিতে পারা যায় না। এমন কি যিনি মুখে “কমলার আশ্রয় লইব না, কেবল কার্য করিব” বলেন, তিনিও কিছু না কিছু কমলার আশ্রয় লাভইয়া পাবেন না। কমলার উপরে কার্যকে প্রভু করিতে হইবে এবং প্রকৃত কাজের লোক হইতে হইলে কমলাকে হস্তগত করিতে হইবে। যে শিক্ষার কমলা ও বহুদর্শিতা সম্মিলিত হয়, সেই শিক্ষার ফলই প্রকৃত কার্যকরী হয়। একজন শিক্ষা হইলে দুই প্রকার ভ্রম হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়। এক প্রকার হইতেছে এক

দলের ভ্রম, বাঁহারা কেবল কার্য করিতেই উপদেশ দেন। অতঃপর হইতেই অপর দলের, বাঁহারা কেবল কলনার আশ্রয় গ্রহণ করেন, মনে করেন যে সকল জিনিষেরই একটা “রাজকৌর পদ্ম” আছে—যেমন স্বদেশী প্রতিজ্ঞা বা প্রকাশ্য সম্ভার “রেজলিউশন পাস” করিলেই অর্থনীতির উন্নতি হইতে দেবী লাগে না। একদল মনে করেন যে উৎসাহেই সব কাজ হয়, অপর দল মনে করেন যে গবর্ণমেন্টই সব করিবে। অর্থনীতিতে শিক্ষালাভ হইলে এই উভয় প্রকার ভ্রমই দূর হয়।

ভারতবর্ষে এক্ষণে কি কি সমস্তা উপস্থিত, তাহার এক ফর্দ দেওয়া অনেক সময় আবশ্যিক। ইহার মধ্যে কয়েকটা খুব বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই প্রসঙ্গে ছড়িক-সমস্তার উল্লেখ করা বাইতে পারে। ভূমির উন্নতি, জমিদার ও প্রজার সম্পর্কের উন্নতি, কার্যে অধিক মূলধন প্রয়োগ এই সকল গুলিও সমদিক উল্লেখযোগ্য।

আমরা এ পর্যন্ত বাহা বলিয়াছি তাহা ছাত্ররূপে বলিয়াছি এবং আমাদের এত কথা বলিবার সার্থকতা এই যে অর্থনীতি শিক্ষার দুইটা দিক—ঔপন্যাসিক ও কার্যকরী—আছে এবং এই শিক্ষাকে একত্রে কার্যে প্রযুক্ত করা বাইতে পারে। তিনদিক হইতে এই সকল সমস্তাগুলি বিবেচিত হইতে পারে এবং তিনপ্রকারের লোক ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট;—অর্থনীতি শিক্ষার ত্রী ছাত্র, কামের লোক এবং রাজকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ। কেহই ইহা অস্বীকার

করিবেন না যে এ-বাৎ পেশোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণই অধিক পরিমাণে কার্য করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদের স্তায় অধ্যয়নে ত্রী ছাত্রগণ ও কার্যকরী ব্যক্তিগণের য য দিকটার দৃষ্টিপাত করা উচিত। বলা বাহুল্য যে তিনদলের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যিক এবং একত্রে মিলিয়া কার্য করিলে যে প্রভূত ফললাভ হইবে তাহা স্থানান্তিত। যে সকল সমস্তা সমাধান করিতে হইবে তাহা অত্যন্ত হস্ত ও দ্রুত এবং সেই ক্ষণে ৫৬ দিক হইতে পারা যায় ততদিক হইতেই ইহার আলোচনা আগ্রহক। বাহাতে জ্ঞান ও প্ৰদর্শিতা যতখানি পাওয়া যায়—উভয়ই ইহার আলোচনার সাহায্য করিতে পারে তাহা কঠোর প্রয়োজন। ব্যক্তিগতভাবে কার্য করিয়া ইহার সমাধান করা অসাধ্য। সম্ভবতঃ এককল সমস্তার দুই-একটির কোন দিনই সমাধান হইবে না এবং সমবেত শক্তিতে অংশবিশেষমাত্র সমাধান হইতে পারে। তথাপি এক্ষণে ক্ষেত্রে সংঘটিত পরিপ্রসঙ্গ যে অত্যাশঙ্কক, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

আমাদের মনে হয় না যে, আমাদের পরমপ্রজ্ঞাভাজন রাজগোবিন্দর যে সেকেন্ড-বাক্য (watch word) ভারতবর্ষে আদিম উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাহা আর কোন দিকে এক্ষণে পরিহার্যভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। ভারতবর্ষে যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। তবিশ্যৎ সবচেয়ে কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিই তবিশ্যাদায়ী ওনাহিতে

পারেন না। তবে বর্তমান যে অতি উজ্জল, সার্বজনীন উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে
অতি আশা প্রদ, তাহা সকলেই বলিবেন। এবং তাহা হইতেই ভবিষ্যৎ অহুমিত হইতে
অগিচ, সকল দিকেই সকল একাধারে এক পারে।

তেহাই

(সাহিত্য-রসায়িত বাৰ্শনিক-মানদার নাট্যরঙ্গ)

নাটকীয় পাত্র-পাত্রী

আমি
মগজ
কাগজ
গজকাঠি
বগাঁও (এরকে জগরাজ,
ওরকে জগৎ-পিতামহ)
উড়ে পাভা
কামার
কুমার
দালাল
তাতি
ঢাকী
* টিকটিক

[দৃষ্ট—চুরোটার ধোঁয়া, চিম্নীর ধোঁয়া ও
চুলার ধোঁয়ার ত্রিবেণী-সঙ্গম]

আমি

দিনে আলো আছে, নিশীথে কালো আছে,
আসমানে ব্লু আছে, জমিনে সবুজ আছে,
আসামে কমলা আছে, হলুদে হলুদে আছে,
কীৰ্ত্তিবাসের রামারণে মীল আছে, ইউরোপে
ভালেই উত্তানে ভায়োলেট আছে, লক্ষার
ঝাল আছে আবার লাল আছে, কিন্তু

বেঙনি কই? সে যে স্বর্গে ছিল, স্বর্গের
রাজার ঝামছটকে সে যে হুনিবিড়
আলিঙ্গনে আনন্দ করিয়া বিরাজ করিতেছিল,
সে গেল কোথায়? সে যে স্বর্গের জিনিস,
মর্ত্যের পথে কোথায় পথহারো হইল? সে
কোথায় গেল? আমার বেঙনি কোথায়
গেল?

মগজ

জগতকে বিজ্ঞান কর দেখি, সে যোগ
হয় হিন্দু দিতে পারিবে। অনেক সময়ে
আমি যে-কথার জবাব দিতে পারি না
জনর অতি সহজেই তাহার একটা হেতু-
নেত্র করিয়া ফেলে। বলিতে কি স্বয়ং
জনস্বার্থের যাহা না জানেন জনর তাহাও
জানেন।

আমি

বটে বটে, আমি জনরকে ডাকিতেছি।
জনর! ও জনর! ও আমার জনরবন্ধু
জনর! জবাব দাও, বল আমার বেঙনি
কোথায়?

মগজ

রোস রোস আমি ভুল করিয়াছি।
তোমার হিন্দে জোঁগার নাতি জনরের আর

ভূমি সাড়া পাইবে না। বর্তমান জ্ঞান-গরিমান যুগে জনর বেচার। বহু:প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক লেজের মত খসি খসি হইয়া আছে। বেচার। বড় কাবু হইয়া মনস্ত্ববিদের হানপাতালে পড়িয়া অঙ্গার অচেতন অবস্থায় আছে। উহাকে ডাকিলেও সাড়া পাইবে না। এখন জনদের শূন্য জায়গাটতে 'খাসিকটা কাগজ পুরিচা রাখা হইয়াছে। কাগজ এখন জনদের একটিনি করিতেছে। স্বতবাং মগজ ও কাগজে মিলিয়া যে ছুড়ি হইয়াছে বর্তমান সভ্যতা সেট ছুড়ি হাঁকাটা মাছকে তাহার ঠাণ্ডিত অর্থাৎ ভূমি যাহাকে বেগুনি বলিলে, বোধ হয় তাহারই অভিনুখে লইয়া যাউতেছে।

আমি

এখন উগার? বেগুনির সন্ধান আমার কে বলিয়া দিবে।

মগজ

কাগজের কাছে জিজ্ঞাসা কর দেখি।

কাগজ

বেগুনি? বেগুনির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? এ ভারি কঠিন প্রশ্ন। বিশেষতঃ এই ত্রি-মৌলিক রাজ্যে। দেখ, আমি একজন উড়িষ্যাকে বেগুনি খাইতে দেখি-যাছি। উহার পেটের মধ্যে বেগুনি পাওয়া যাইতে পারে। আচ্ছা ভূমি এক কাজ কর। চট্ট করিয়া ঐ উড়ে পাণ্ডাটিকে ধরিয়া আন ত। উহার কাছে সমস্ত সমাচার পাওয়া যাইবে। আমি যদিও কাগজ অর্থাৎ সমাচার-পত্রিকা অর্থাৎ বর্তমান যুগের জনদের নাকী, তথাপি রিপোর্টার ভিন্ন আমার গতি নাই। ঐ উড়ে পাণ্ডার

বাক্য অতর্কে আমার রিপোর্টারের পত্র হইবে। ডাক, ডাক, ইহাকে ডাকিয়া অনি।

আমি

পাণ্ডা ঠাকুর! ও পাণ্ডা ঠাকুর! ও উড়ে!

উড়ে পাণ্ডা

আরে কীট কি এমত হইছে?

আমি

বলি, আমার বেগুনি কোথায়?

উড়ে পাণ্ডা

- কড়? বেগুনি? বেগুনির কথা শুইছ? সিনে আফ গুড়িয়া সন্স সোরিষ-ত্যাগের ভাষি কীরি বেস্ব দেই কীরি মলা কীরি কীরি কাড়ি রাত্তিকু খাইবিলে। বেগুনি আর কুখা?

আমি

হার মগজ! হার কাগজ! সর্বনাশ হইয়াছে। এই উড়িয়া আমার বেগুনির প্রাণ সংহার করিয়াছে। নববর্ষার রাম-বহুর একটা শুড় যখন একাগ্রভাবে ধরিতে যুগ জোন্ডাইয়া শিলীকু অর্থাৎ বেগুর ছাতা ভেদন করিতেছিল আমার বেগুনিও সেই সঙ্গে মর্ত্যে নামিয়াছিল, এবং নামিবার ক্রমে এক অজ্ঞাত আকর্ষণে বেগুন যুগের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই উড়ে বোধ হয় তাহাকে নামিতে দেখিয়াছিল এবং বেগুনের সঙ্গে সঙ্গারিত হইয়া একতৃত্ব হইতে—অভেদাভা হরিহর হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।—সবুর কলে যে যুহর্তে বেগুনি আমার সঙ্গার দেই



বুহুঠে এই হতভাগা উড়ে তাহাকে ভাঙিয়া
খাইয়াছে। হার বেগুনি আমার বেগুনি!

মগজ

তুমি কাগজের শরণাপন্ন হও। এ
বিষয়ে আন্দোলন হওয়া উচিত।

টিক্‌টিক

টিক্‌টিক! সাহিত্য-গঞ্জে Stroke-
Nuisance সম্বন্ধে যে আন্দোলন হইয়াছিল—
তাহার ফল কি হইল? টিক্‌ টিক্‌।

কাগজ

দেখ দেখ আন্দোলনের ফল কিরূপ
হইলে বলিতে পারি না, কারণ টিক্‌টিকি
ডাকিয়াছে।

আমি

আমি টিক্‌টিকি বিশ্বাস করি না। আমি
টিক্‌টিকি-নাস্তিক।

মগজ

বেদান্ত-বাদীরা জগদ্বাস্তবিক; কিন্তু তাতে
কি?—মাকড় মারিলে ধোকড় হয়। এদম
আমার খাস মহলে একজন বুড়া রাইয়ৎ
আছে। তাহার নাম সংস্কার। সে বলে
হাঁচি টিক্‌টিকি বাধা যে না মানে সে
গাথা। অনেকে বলেন, অমন কুপংস্কার-
পন্ন প্রজাতি চাল কাটিয়া উঠাইয়া দেওয়া
উচিত। কিন্তু ও তাড়াইশেও ধার না।
দিনের বেলা তাড়াইয়া দিলাম। রাত্রে
দেখি আগার সেই সব স্নান কাঁথা পাতিয়া
দিয়া আগার জমাইয়া বসিয়াছে। সদর
দরজা দিয়া বাহির করিয়া দিই, খিড়কীর
দরজা দিয়া একেবারে অন্যরে ঢুকিয়া বসে।
আর তা ছাড়া আদ্যকাল বড় একটা তাড়া
হড়াও করি না। কারণ, পণ্ডিতেরা, এমন

কি বড় বড় রাষ্ট্রদ্রোহ প্রযোজকেরা, বলিতে-
ছেন, লাহা আছে তাহাকে থাকিতে দাও।
প্রত্যেক জিনিসের অস্তিত্বের একটা ঐতি-
হাসিক কারণ আছে। প্রয়োজনীয়তা না
থাকিলে কেহ কখনও কোন দিন বিশেষ
কোন আচার বা সংস্কার বা আর কিছু
মানিয়া লইতে পাবে না। বিশেষ পুণ্যার্থের
সহিত আদ্যকাল এই প্রকার ধর্ম উদ্ভাসিত
হইতেছে। আমার তো Asphyxia হইবার
সোপান।

আমি

তা হউক। তোমাকে পরে আপীলে
বাঁচাইব। আমি নিজে এ কথা বিশ্বাস
করি। প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াই
আমাদের শরীর ইন্সট্রুমেন্টা ডেপু ডিসেন্টা
প্রক্রিয়াকে গ্রহণ করে। উদাহরণকে উদ্ভেদ
করিতে যাওয়ার মানে ইতিহাসের বিবৃদ্ধা-
চরণ করা, কেবল ভক্ত্যবতার পেট ভরানো।
এখন টিক্‌টিকির টিক্‌টিকের ভয়ে কাগজে
আন্দোলন ত বন্ধ করিলাম, কিন্তু বেগুনির
উদ্ধারের কি হইবে?

মগজ

দেখ, কাগজে যখন আন্দোলনে বাধা
পড়িল তখন এক কাজ কর। দেখিতেছি
এই ব্যক্তি উড়ে। উড়েবা জগদ্রাতের প্রজা,
জগদ্রাতকে খুঁই মানে। সুতরাং তুমি
জগদ্রাতের দবাবেরে নাগিল বন্ধ কর।

আমি

কিন্তু আমি ত জগদ্রাতকে মানি না।
আমি যে নেতি নেতি করিয়া বেদান্তের
সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি; জগদ্রাত
আমি মানি না।

अथर्व

জগন্নাথ যান না? অর্থাৎ বলীমায়ের
কনিষ্ঠ সন্তানটির কোঠে যে জগন্নাথ উঁহাকে
যান না। কিন্তু—

कायि

না না, আমি ঠিক ওরূপ বলিতে চাহি
নাই, বরং ঐক্য মানবীর সম্বন্ধে স্তম্ভিত
দিয়াই তো আমি জগন্নাথকে মানি। আমি
যে বৈষ্ণব Philosophy পড়িয়াছি। অক্ষয়-
মুষ্টি বর্গীর ক, আমাদের শাক্য মনের
অভীষ্ট। তাহাকে দাণ্ডা, চাটা, না-বলিলে
তাঁহায় উত্তরাধিকারী হইব কিরূপে। স্বর্গ-
রাজ্য পাইব কিরূপে। আমি জগন্নাথকে
মানি। তবে একবার তাঁহার কাছেই
অভিযোগ উপস্থিত করি। (করজোড়ে)
এত, জগন্নাথ। বামী।

উড়ে পা'তা

महेश्वर-पद-गा-आमो सुवह मेधं—

ਅਗਸਤ ੧੯

ମାଧବୀ ! ଆମର ଡାକିଲେ ?

अथि

আপনি আমার নাটকটি গিললেন ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

না না তুমি জ্বল তনিগাহ। আমি
তোমার নাপথী বলিয়াছি। তুমি এখন
আমার অগন্তের অবানী নাথ বলিয়াছ তখন
আমি তোমাকে নাপথী তো বলিই।
ইহাতে সম্পর্কবিহীন কিছুই বলা হয় নাই।
আমর যদি মাতৃনী পলিতাম তাহা হেই বা
কতি কি ? আমি অগৎ-পিতামহ, সূতভাণ্ড
জীব মাত্রই আমার মাতৃনী। কেন জান ?
আমি পুরুষোত্তম, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমিই এক-

যায় পুরুষ। অতঃপর জীবজাইহে আবার
নাতনী। প্রাণোক্তও নাতনী, পুরুষও নাতনী।
অগ্নি নাতনীরা ঘনন পিতামহদের প্রভু স্বর্গে
সকল করিবার মালিক, তখন নাতনী ও
নাপুত্রিক একই। তুমি বৈষ্ণব Philosophy
পাঠ কর নাট ?

अथ

পাঠ করি নাই? আমি পাঠ করি নাই? এখন কি এখ পূর্ণিতো আছে বালা আমি পাঠ করি নাই। কাগজে বাহা ছিল তা স্মরণই মগজে পুরিযাছি। তবুও আমার মগজে Tabula Rasa অর্থাৎ সূন্য। কাগজ। আর হৃদপিণ্ডের জাহাঙ্গীর ছাপার বাগলও গুঁজিয়াছি। অত্যধিক পড়া-তনার উর্দ্ধবাহুর বাহুর মত চর্চায় অত্যবে দলদলটা শুকাইয়া গিয়াছিল। পেটাকে বাতিল করিয়াছি। শূন্য স্থান কাগজে পূর্ণ করিয়াছি। কাগজে কাগজে কাগজী-নাশ হইয়াছি। আমি পড়ি নাই? কি বলিব আপনি জগৎ-পিতামহ, বুদ্ধ হইয়াছেন, নহিলে একবার দেখিতাম। এই যে নিম-কাঠের কুঁদো বসিয়া আছেন, আপনি যে আপনি নন্ তহা জানেন? আপনার কতটুকু অসিরিস, কতটুকু ইঙ্গ, কতটুকু জিহোভা, কতটুকু ওডিন, কতটুকু জ্ঞান, কতটুকু জুপিটার, কতটুকু শক্তি, কতটুকু চক্তি, কতটুকু কাঠ, কতটুকু তৈল, কতটুকু রঙ, কতটুকু রাইট তামা আমি সবটাই একটি বেঙ্গগলি Thesis এ Cosine Theta'র সাংকেতিক ভাষায় লিখিয়া আপনার জগদমন্দিরের পাথর-বিধানো প্রাঙ্গণে সজা আহ্বান করিয়া পাঠ করিয়া শুনাইতাম।

মুসলমান পণ্ডিতেরা কবি আমির-খস্রকে
 তুতী-ই-হিন্দু অর্থাৎ হিন্দুস্থানের তোতাখানী
 বলিয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দুস্থানের একমাত্র
 তোতাখানী যে আমি তাহা আমি
 আপনাকে প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা এই
 'দণ্ডেই বুঝাইয়া দিতে পারি।

জগদ্রাণ

আজ্ঞা বুঝাইয়া দাও। আমার পানাই
 পলাটেতে পারিবা না, কায়েই শুনিতে হইবে।

আমি

আমার বিস্তার অধিক পরিচয় আমি
 দিতে চাই না। আমি আপনার সম্বন্ধে
 যেটুকু তব, এহু কেতাবাদি হইতে সংগ্রহ
 করিয়া মগলের মধ্যে জগা-বিচুড়ি অর্থাৎ
 ভবদীর বিচুড়ি পাকাইয়াছি, শুধু তাহাই
 উদ্গিরণ করি, অবধারণ করুন। হে
 জগদ্রাণ! আদিত্যে আপনার বর্ণীর
 স্নতরাং আপনি জবরদস্ত জবরদুঃ, তৎপরে
 গ, অর্থাৎ আপনি গদাধর; আপনাকে
 নাগ বলা হইয়া থাকে, অথচ আপনি
 পিতামহ। এ ছইএর সম্বন্ধ কিরূপে হইতে
 পারে? প্রবণ করুন। হিন্দুর দেশে
 পিতামহেরা ঠাট্টা করিয়া নাত্নোদিগকে পত্নী-
 সম্বোধন করিয়া থাকেন। সেইরূপ আপনি
 পিতামহ হইয়াও নাপ। এইখানে আপনাকে ও
 আমাতে রসের সম্বন্ধ। আপনি সূক্তবাদীর
 সূক্ত। অজ্ঞেয়বাদীর X। সূক্তবাদীর
 সূক্তের সহিত অজ্ঞেয়বাদীর X জুড়িয়া
 মহাসম্বন্ধ করিয়া আমরা আপনার সৃষ্টির
 করুনা করিয়াছি। X-এর স্বন্ধে সূক্ত
 চাপাইলে ঠিক আপনার সৃষ্টিটি হয়। ঐ
 সূন্যের গর্ভে সব তব; ও রজ; ভণের

প্রতিবৃৎরূপ তিনটি বিন্দু বসাইয়া দিগেই
 আপনার ছই মের ও ঐ হাঁ উদ্ভাসিত
 হইয়া উঠে। সূন্যের ভিতর অর্থাৎ নিগুণের
 ভিতর ত্রিগুণের বিন্দুশাত হইয়াছে। কথার
 বলে নিগুণ পুরুষের তিনগুণ বাড়। এই
 সামান্য প্রবাদবাক্যের মধ্যে আর্গাভাতি
 গুঢ় ভাবে ভবদীর তবের অন্তরাগা
 করিয়াছেন। উহাতে আমাদের জ্ঞাতির
 আধ্যাত্মিক দোড়ধাপের পরিচয় বিস্তারমান।
 এক্ষণে আপনার বিষয়ে আমার বক্তব্য
 ইন্দিতে কিঞ্চিৎ বলিলাম। স্নতরাং আপনি
 আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমার
 অভিযোগ প্রবণ করুন। আপনার খাস-
 মহলের প্রজা বর্তমান উড়ে পাণ্ডা বগীর
 বেগুনিকে মর্ত্যে পাইয়া খাইয়া ফেলিয়াছে।
 ইহার শাস্তিবিধান করুন এবং অগত্যা
 যেমন ইচ্ছা বাতাপির পেট চিরিয়া বাহির
 হইয়াছিলেন, বিশ্বসংসারের চিরপ্রের বেগুনি
 রামবল্ল-রজিকা বেগুনিও সেইরূপ উড়িয়ার
 উপর চিবিয়া বাহির হইয়া পড়ুন।

জগদ্রাণ

কি ভয়ানক! ইহার শাস্তি ওগা
 উচিত। কিন্তু আমার তো হাত নাই।

আমি

হাঁ, তাই তো, আপনার যে হাত
 নাই।

উড়ে পাণ্ডা

হাত আছে, আনুড়—অ নাই।

আমি

চুপ্ রাও বেদানব। আমার মগজে
 অগবজ্জ এই হাত না থাকার বেশ একটি
 Philosophy গলাইয়া উঠিতেছিল। তোর

টীংকায়ে তাবৈষ ডিব একেবারে গাঁজিয়া
গেল। হতভাগা বদ্‌মায়েন্! বাজে অকিরা
আমার idea ওলট্ট পাগট্ট করিয়া দিতে
এলি। জািনিস্ তুই বেঙনি খাইয়াছিস্!

কাগজ

এ বিষয়ে কাগজে একটু লেখালেখি
হোক।

মগজ

কাগজ হতে মগজে ধার

মগজ হতে কাগজে,

গল্পকাহিনী গেল কোথায়

যদি হত সহজে।

গল্পকাহিনী

চৈতিও না, চৈতিও না। গল্পকাহিনী
কখনও গরহাজির হয় না। সম্ভ্রতি কিন্তু
একটু বাস্তব আছে। হোল, 'রোল। তিন
বাবোদে এক ইকি, উনচলিল ইকিতে
এক মিটার; কিন্তু ক মিটারে এক বোজন?
(চিন্তা) বাবোদর হিন্দু, ইকি ইংরেজি,
মিটার ফরাসী, আবোর বোজন হিন্দু।
গোড়ার বাবোদর শেষে বোজন। গোড়ার
হিন্দু চম্বেৎ হিন্দু। পাশ্চাত্যেরা কেবল
মাত্বে কটা ধাপ। হাঁ, পাশ্চাত্যেরা
শিল্পনে পড়িয়া আছে। থাকিবাই ত কথা।
পশ্চাতে অস্তি ইতি পাশ্চাত্য। নামেই
পরিচয়। হাঁ: তুমিও বেমন।

আমি

গল্পকাহিনী তুমি ঠিক বলিয়াছ। কিন্তু
হার, কিন্তু হার, জগৎ, জগৎ, জগৎ-
পিতামহ, আপনার হাত নাই। হার তলে
বিশ্বস্তি হইল কি করিয়া?

মগজ

হাঁ: এই না তোমার মগজের মধ্যে
এগুলি হাত না থাকার Philosophy তৈয়ারি
হইতেছিল।

আমি

হাঁ, হইতেছিল তো। কিন্তু এখন মনে
হইতেছে ধোঁয়া, ধোঁয়া, সব ধোঁয়া। স্বজন-
কাগা চলিতেছে। তবু সমস্তই যেন
ধোঁয়ার অবস্থার রহিয়াছে। সব যেন
নীহারিকা।

মগজ

নীহারিকা থেকেই ত বিশ্বের সৃষ্টি। এই
দেপ। ধোঁয়াতে তাবের ক্রমশ: জমাট চেহারা
কুটরা উঠিতেছে। আচ্ছা ধর, জগৎপিতামহের
হাত নাই। অর্থাৎ জগৎ-পিতামহের হাত
নাই; সেইজন্য তাঁহার কড়া জগৎ অর্থাৎ
পৃথিবীরও হাত নাই। পৃথিবী তাঁটার
মতন গোলাকার, সেইজন্য সূর্য গোলাকার,
চন্দ্র গোলাকার, গ্রহনক্ষত্রও সব গোলাকার।
যেন রাশি রাশি ধোঁয়া তালি গোল
পাকাইয়া রহিয়াছে।

আমি

জগৎ-পিতামহের যে হাত নাই তাহা
তো জগৎপিতামহের দেখিয়া স্পষ্ট নোকা
যাইতেছে। আর তাঁহার পূর কড়া চন্দ্র
সূর্য পৃথিবীও যে গোলাকার, ভূ-গোলে
তাঁহার প্রমাণ আছে দেখিয়াছি। কিন্তু
আমার জগৎ-পিতামহী কই? তিনি দেখিতে
কেনন? তাঁহার নাম কি?

কাগজ

আমার পুরানো File উন্টাইয়া
Domestic Occurrences এর স্তম্ভ খুঁজিয়া

দেখ। যদি বিবাহ হইয়া থাকে নিশ্চয়ই নাম পাইবে।

মগজ

তুমি ষাম বলিতেছি। আদিত্যে-সগৎ-
পিতামহ হাই তুলিয়াছিলেন।

আমি

বটে! কিন্তু কেন হাই তুলিয়াছিলেন?
হাই তুলিবার নিশ্চয়ই কারণ ছিল। সে
কারণ কি?

মগজ

কেন হাই তুলিলেন? হাই উঠিবার
কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ? নেহাৎ শুনিবে?
তিনি দিবা চক্ষু ভবিষ্যৎ-তোমার জ্বাৰী
শ্রবণ পাঠ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আমি

কি আনন্দ! কি আনন্দ! আমি ধন্ত!
আমি ধন্ত হইলাম! আমার জন্ম ধন্ত!
আমার শ্রবণ নিবন্ধ ধন্ত! তাহার পর?
তাহার পর?

মগজ

তাহার পর সেই হাই-হাওয়া কমিয়া
ধোঁরা হইল। সেই ধোঁরা জিহবারা হইল।
একটি ধারার নীহারিকার উৎপত্তি, একটি
ধারার চিত্তকুস্মাটিকার জন্ম এবং তৃতীয়
ধারার জগৎবিখ্যাত সাধনাসহায় শ্রীশ্রী
গজেকার আবির্ভাব। এই হইল হাই-এ-
আঙুরল্ অর্থাৎ আদিম হাই।

আমি

কি আনন্দ! কি আনন্দ! তাহার পর?

মগজ

তাহার পর চক্ষুণ ঘণ্টা আকাশ-মগ
ধূসরা ধূসরা স্নাত হইয়া স্বর্গা একদিন

পবনের গারে হাই তুলিয়া দিলেন। স্বর্গের
আর একটি নাম আদিম। ইহদী ধর্মশাস্ত্রে
আদিত্যকে আদম বলা হইয়াছে। এবং
হাই হইলেন শ্রীমতী হবা। ইহদী ধর্মশাস্ত্রের
কাহিনীটা একটু খাপছাড়া। আমি পূর্বাঙ্গের
বলিতেছি শ্রবণ কর। হাই Highly হোঁগাচে।
তাৎহাতে পবনেরও হাই উঠিতে লাগিল। সে
হলিতে তুলিতে পৃথিবীর গারের উপর
হাই ছাড়িয়া দিল। তাৎহাতে পৃথিবী বলিলেন
“তুমি এফি করিলে? আমার গা মাটি-মাটি
করিতেছে।” এইরূপে পৃথিবীতে মাটির সৃষ্টি
হইল এবং ঐ মাটি হইতে মটর, মর্কট, মনুষ্য
পক্ষী, এবং মনুষ্য জন্মিল।

আমি

কি আনন্দ! কি আনন্দ! আচ্ছা, সব
ত বুঝিলাম, কিন্তু হাই-হাওয়া হইতে সন্ধান
হইল কিরূপে তাহা তো বুঝিলাম না।

মগজ

পারিলে না? মুক্তোপাতির গাছ
দেখিয়াছ? উহার পাতার পাতার বহন
মুক্তোর মত কুঁড়ি ধরে তখন প্রত্যেক
পাতাটি মুক্তো-ঘেরা ইহারী-এর মতন
দেখায়। ঐসব কুঁড়িতে ফুল হয়। ঐ ফুলে
আবার সরিষার মত ছোট ছোট ফল হয়;
ঐ ফলের ভিতর বীজ থাকে; ঐ বীজেও
গাছ হয়।

আমি

উদ্ভিদবিশ্তার কেতাবে পড়িয়াছি বটে,
দেখি নাই।

মগজ

পাতার গারে ফুল ফল হইতে পারে, আর
হাইয়ের হাওয়ায় সন্ধান হইতে পারে না।

আমি

ঠিক বলিরাছ। এখন বুঝিলাম। পরিষ্কার
বুঝিলাম। কি আনন্দ! তাহার পর?

মগজ

তাহার পর? হাঁ হাঁ ভাল কথা মনে
পড়িল। বলিতে চুনিয়াছি যে জগৎ-
শিত্যমহের হাত না থাকার ভয় হাই হাতে
যে চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী সৃষ্ট হইল তাহাদেরও
হাত হইল না।

আমি

বেশ বুঝিলাম। কিন্তু পৃথিবীর, পুত্র
মানবের হাত হইল কেন?

কাগজ

হাতাহাতি করিবার জন্য।

মগজ

কেন তুমি বন্ধ করিতেছ? চুপ কর।
আমরা যাহাকে হাত মনে করি উহা ঠিক
হাত নয়। অজা-গল-স্তন যেমন স্তন নীর
সেইরূপ।

আমি

যদি মানুষের হাত অজা-গল-স্তনের মতন
হইবে তবে তিন হাতে চুই বাগ দিলে হাতে
এক থাকে কি করিয়া? আর ডাক্তারেরাই
না হাতে রাখিয়া চিকিৎসা করেন কি
করিয়া?

মগজ

তুমি ঠিক ধরিয়াছ। হাত না থাকিলে
হাতে রাখা অসম্ভব হটে। কিন্তু উহারও
প্রতীকার হইবে। ভবিষ্যতে হাত-বিবরক
আইন হইবে। যাহাকে ভোমরা এখন
হাতিয়ার-বিবরক আইন বলিয়া জান একজন
খ্রিস্ট-পুঙ্খ জখ্মীয়ে অবতীর্ণ হইয়া উহার

নুতন ব্যাখ্যা করিবেন। তখন মহা মাঝেই
বৈষ্ণব ভাবেই মশগুল হইয়া নিজ নিজ হাতকে
বেড়াই করিবেন। এবং জখ্মীনের এই
আদর্শ লক্ষ্য জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।
আকাশের পশ্চিম প্রান্তে সেই প্রেরিত-
পুঙ্খের শুদ্ধমাত্র মধ্যে মধ্যে পরিদৃষ্ট হইয়া
পাকে। - উঠাকে লোকে ধ্বংসেই বলিয়া
ভুল করে।

আমি

ওবে বেত্তনি কি চিরন্তনে বেহাত হইল?

মগজ

না না। তুমি এই উড়িয়ার সাহায্যে
বন্দেপে একটি উড়ের দোকান প্রতিষ্ঠা কর।
এইরূপ করিলে হাজার হাজার বেত্তনি
অচিরে তোমার হস্তমলকন্য হইবে। যাহা
স্বর্গে ছিল তাহা যুগপৎ স্বর্গে ও মর্ত্যে অধিষ্ঠান
করিবে। তখন রামধনুকের সেই বেত্তনি
আকাশের সুখ বেত্তনের ক্ষেত এবং উড়িয়ার
দোকান এই তিন স্থানে ত্রিমুখিতে একাধার
হইবে। ইহাকেই বলে True to the
kindred points of sky and shop।
তখন চন্দ্রের ত্রেকোণ এবং উড়িয়ার দোকান
একাকার ধারণ করিবে।

আমি

চমৎকার! চমৎকার! শূভবাণীর শূভ—
সকলে

আমি

জগৎ-শিত্যমহের হাত
একরকম—

গোল।

৩৯শ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

আমি

চক্ৰ, হুঁড়ি, ঐহ, নকর, হাঁড়ি, হুঁড়ি,
মালা—

আমি

জগৎ-পিতামহের কল্প। জগৎ * অর্থৎ
পৃথিবী—

আমি

আমরা মহামোহিত হইয়া অর্থৎ হাত-
বিষয়ক আইনের আমলে—

সকলে

আমি

তখন পাবলিক কাগজে মিটরা বাইবে—
সকলে

আমি

তখন Private মগজের বুড়ি বাইবে—
সকলে

আমি

তখন ভুলোকে গড়ের মাঠে মোহন-
বাগানের—

গেল।

আমি

ভোজন-লোকে দীক্ষা মরণের রসগোল্লার
মধ্যে—

আমি

বর্লোকের গোলকের Two thirds—
সকলে

আমি

তোমরা অনন্য রক্তপাণ্ডা যোগলদের
মতন তাল গোল পাকাটরা হট্টগোল গুণগোল
এবং সোরগোল করিতে থাক। আমি
তত্ত্বকণ একখানা খোল লইয়া আদি।

টিক্‌টিক্‌

টিক্‌ . টিক্‌। (বগত) বুদ্ধিবৃত্তির
গঙ্গাবাজার সময় হইরাছে।

গঙ্গকাঠি

টিক্‌টিক্‌ তোমার বাক্য সত্য হউক।
ইহা কাকতালীয়া কি না জানি না, কিন্তু তুমি
টিক্‌ সময়েই টিক্‌টিক্‌ বলিয়াছ। আমি
সাংখ্যের মত ইহা হুটের ভাষার তর্জমা
করিয়াছি। পাঁচজন জন করিয়া তাহার
মধ্যে ডুবুরী-ওলোহন হইয়া ছুঁ দিয়াছি।
মীমাংসা-দর্শনের মাংস ওজন করিয়াছি,
কিকিৎ ভোজনও করিয়াছি। বেদান্তের
দত্ত গুণিয়াছি, শ্রায়দর্শনের লাঞ্জ দর্শন
করিয়াছি। কিন্তু এ প্রকার দেখি নাই।
এ যে হাই Philosophy অর্থৎ জ্ঞান-দর্শন।
ইহাতে জগৎ-পিতামহ হইতে টিক্‌টিক্‌ পর্য্যন্ত
কাহারও হাই উঠিতে বাকী নাই। বিগত
অর্দ্ধবটোর মধ্যে বাহা দেখিলাম, বাহা শুনিলাম,
তাহার তুলনা নাই। ইহা রসে এবং কণ্ঠে,
মগজে এবং কাগজে সমান শোভা পাইতেছে।
ইহা অতুলনীর অবর্ণনীয় অভাবনীয়। হিন্দু

ভাষ্য

তোমার মরা হাড়ে এখনও কেমন ভেঁকি
খেলো তাহা দেখিলে ? নিত্য প্রভাত দধি
ইচ্ছা করিয়া দধীটির হাড়ে একবার ভেঁকি
খেলিয়াছিল। কিন্তু আবার দধি পান হ্রস্ব
করিয়াছে, অর্থাৎ পাকস্থলীর মাথার খোল
চালিতে শিথিয়াছে। সুতরাং হাড়ে যে
ভেঁকি খেলিবে তাহা অবশ্যস্বাভাবী। কিন্তু
'তুমি হাতী।' লোকে তোমার মরা বলে।
সে কথা স্বীকার করিলেও তোমার মূল্য
নাথ টাকা। জগৎ-পিতামহ একবার হাই
তুলিয়াছিলেন। সে একহারা হাই। তাহাতে
জগৎ জুড়িয়া কি কাণ্ডই না হইয়াছিল।
তাহার পর হৃদয় এবং পবন সুগম্য হাই
তুলিলেন। সে হাইল জোড়-হাই, অর্থাৎ
দো-হাই। আর অধুনা আৰ্য্য ইন্দ্রাযীর
ও ইউরোপীয় উভয় বিড়ি ও চিম্নীর ধোয়ার
ধূম্রোচন হইয়া জঘনীর যে প্রকাণ্ড হাই
উঠিয়াছে তাহাই হাইল—

সকলে

তে-হাই।

টিক্‌টিক্‌

কিক্‌ কিক্‌।

কলে ভাষি কারখানা,
তিন হুড়ি তার ব্যাখ্যান।

আমি।

কই ? তোমরা ভাল করিয়া সোরগোল
করিতেছ কই ? মগজে এখনো গোলমাল
বাধে নাই ? আমি যে পোল আনিলাম,
বাজাইব।

চাকী

আমি চাক আনিয়াছি, বাজাইব।

কামার

আমি হাতুড়ী আনিয়াছি, বাজাইব।

কুমার

'হ', 'হ', আমি হাড়ি বাজাইব।

দালাল।

আমি ওদল বুঝিনা। আমি কাজ বাজাইব।

জাতি

আমি বগল বাজাইব।

টিক্‌টিক্‌

ধিক্‌ ধিক্‌। তুমি কি হনুমান ? তুমি কি
হৃদয় ঠাকুরকে বগলে পুরিয়াছ ? যে বগল
বাজাইবে ? ধিক্‌ ধিক্‌।

সকলে (গীত)

লাক্‌ চড়া চড়্‌ লাক্‌ চড়া চড়্‌

গিঞ্জা গিঞ্জা।

নেই ধরাগর মোর বম্বার,

বিজ্ঞা কি কম ?

বাক্য বকম মগজ অখম

জাবনা কিবা,

সরগরমে সন্তান গরম

হর বুঝি বা।

আগমানে কি হাই উঠেছে

ভাইয়ে ও ভাই

সেই হাইএ ব্রজাও হল

কি হাই সোহাই।

হাই তুলেছে হুঁমি ঠাকুর

বল্‌ছি খাঁটি,

সেই হাইয়ে হার শিবশিবির গা

মাটি মাটি।

ভাতেই মাটির স্রষ্টা হল,—

নাইরে রেহাই,—

মাহুয হুন্ মর্কটাদি
বরণ সেহাই।
সেই মাহুযের মগলে আণ
উঠলো কি হাই
তিন তালে এক ফাঁক পেয়েছে
পড়ল তেহাই।
দোঁয়ার দোঁয়ার বকবজিরে
উঠল মগল—
বুড়ি গেল নজ্ গজিরে,—
বেজার হরজ।

হাই তুলে তাই হালকা হলাম ;
হাই কি সোঁতা ?
হাটেরে হাওয়ার বার উড়ে
জ্ঞানাত-বোঝা।
তিনটি হাইয়ে তিন ভুবনের
ব্যক্ত নিরম,
তোমার নেহাই আমার তেহাই
গিজবা গিজম।

(এই সময়ে পূজ পূজ সাঁজালের দোঁয়া
টুকিরা ববনিকার কাণ্ড হাসিল করিল।)
ঐনতোজনাথ দত্ত।

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে

কবিবর,

আজি তব শুভ জন্মদিনে
মনে হয় কতদিনে কি জীবন্ সকারিলে
জগৎ বাঁধিলে কোন্ অণে।
অজানা সে অচেনা সুদূর—
বুঝিলে কি তার ভাবা জানিলে কি তার আশা
সেখাও পশ্চিম তব হ্রস্ব।
আগন্তবা সুখা তুয়া নিরে
দাঁড়াল হ্রস্বরে এলে দীন অতিবির বেশে
ধন্ত হ'ল সুধাধারা গিরে।
অনাগত মহা ভবিষ্যৎ ;
তারো অন্ধ অন্ধকার শিহরিছে অনিবার
পশিছে তোমার জয়রথ।
মম্বারের মালায় মতন
কালে কালে দেশে দেশে তব গান ভালবেসে
প্রাণে প্রাণে রচিছে মিলন।

বিষের সে মহাধন্যভার
বাঁধিছে পরাণ মোর নহনে অরিছে লোর,
কিমে শুধি এ আনন্দ-বার ?
ওরে মুখ মুখ্ আঁখিজল,
দেখ্ শুধু ভাল ক'রে পরম বরম ভ'রে
আনন্দ রাখে কি ঢল ঢল ?
কি দিবি সে শোক আজি মিছে !
কবির অজস্র গান অকুরন্ত মহাপ্রাণ
রকে রকে চিত্ত কি তরিছে ?
দেওয়া। জ্বলে' বারে তার কথা,
নেওয়া কি হ'য়েছে শেষ ? নাহি কিরে দৈন্তলেন
কোনও খানে কোনও বা মিত্ততা ?
যতটুকু পেরেছিম্ নিতে
মিটেছে হিসাব তার কেটে গেছে ধন্যভার
অমর সে হ'বে চিতে চিতে।
আনন্দের এ মহা উৎসব ;
কেবা দাতা দীন আর দেওয়া নেওয়া একাকার
আনন্দে অসীম আজি সব।

২৫ বৈশাখ, ১৩২২। ঐষিকেন্দ্রনারায়ণ বাগচী

রুষ-সম্ভব পৰ্বাধায়

ধৃতরাষ্ট্রও নাই, সম্ভবও নাই,—কৌ-
লও নাই সংগম-দাতাও নাই; নহিলে
এই ইউরোপীয় মহাসমর-প্রসঙ্গে অনেক
শিথিলাব। অর্থাগির অতিবুদ্ধি এবং
অতিদর্প বিনাশেব অস্ত্র বাহারা ত্যক্ত-
কীর্ণিত, তাগাদেব মধো কষের সহিত
আমাদের পরিচয় অস্ত্র। মেড় শত বৎসর
পূর্বে ইউরোপীয়েরাই যখন কষরাজ্যকে
দুর্ভেদ্য বলিয়া মনে করিতেন, তখন আমা-
দের অজ্ঞতা তেমন মোদের বলিয়া বিচে-
চিত না হইতে পারে।

আমাদের প্রাচীন সত্যতার দিনে, গ্রীক
ইতিহাসে অনেক জাতির যথার্থ বিবরণ
লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু রুবিয়ার সুবন্ধে
কোন কথাই লিখিত হয় নাই। অপেক্ষা-
কৃত অর্জাটীন গ্রীক কবিরা রুবিয়ার প্রাচীন
অধিবাসীদিগের বর্ণনায় কবিত্বের রং ফলাইয়া
লিখিয়াছিলেন যে, উহার। নির্জীমোদী,
জলর, চিরকীবী জাতি, কেবল সরলভায়ে
প্রেম দিনিময় করিয়াই প্রকৃতির রাজ্যে
বিচরণ করে। পরে যখন রোমকেরা
কথকিং সকান লইয়াছিলেন; তখন গ্রীক
কবির কামনিক চিত্র উপহাসের সহিত
উপেক্ষিত হইয়াছিল। ল্যাটিন এবং ইতালীয়
সাহিত্যের বর্ণনা এই, যে রুবিয়াসীরা
বর্করের অধন, উহার। হিংস্র পশুর মত
নিষ্ঠুরভাবে নরহত্যা করে, পরিচ্ছন্নতা
কাহাকে বলে একেবারেই জানে না, যত্নর
সাধার খুলিতে জল পান করে, এবং বাহা

কিছু ভীষণ, বাহা কিছু ঘৃণা, তাহাই
তাহাদিগের অপের ভূষণ। প্রাচীন সময়ে
কথা আমরা জানি আর নাই জানি, এই
সকল বর্ণনা যে কল্পিত, এবং অতিরঞ্জিত,
তাহা সূতর বিদ্যার লভাবে কিরূপ পরিমাণে
ধরিতে পারা গিয়াছে।

রুবিয়ার জাতিত্বের অতি প্রাচীন
কথা পাঠকদের কৃপিকর হইবে না। এখন
রুবিয়ার বাহাদের প্রাচুর্য, কেবল তাহা-
দের প্রসঙ্গে বলিতে পারি, যে খ্রীষ্টীয় নবম
শতাব্দীতে, অর্থাৎ সীমাত হইতে বেরিয়াগ্
বা বেরাঙ্গিয়ান্ (Variags or Varang-
ians) নামক জাতি রুবিয়ার প্রবেশ করিয়া,
পূর্ব অধিবাসীদিগকে শাসনাধীনে রাখিয়া,
আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ
করিয়াছিল। বেরিয়াগেরা স্লাব্ (Slavs)
জাতির একটি শাখা, এবং সাক্সাং সুবন্ধে
রুস্ (Rus) নামক বংশ বা গোত্রের লোক।
ইহার। সর্গপ্রথম যখন ৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে রুরিক্
(Rurik) নামক মলপতির অধীনে রুবিয়ার
প্রবেশ করে; তখন নবগরড্ (Novgorod)
কিয়েব্ (Kiev) প্রভৃতি সমৃদ্ধ
নগরে পূর্ব অধিবাসীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের
রাজধানী স্থাপন করিয়াছিল। রুরিকের
রাজত্বের পর মশন শতাব্দীতে, অপ্রাপ্ত বয়স
আইগনের মাতা বীর রমণী ওলগা (Olga)
একটি ক্ষুদ্র বৈজ্ঞা যাত্রার পর, ক্রম-
সাগর পথে বেশ লুট করিতে গিয়া, কন-
স্তান্টিনোপলে খ্রীষ্টান্ ধর্মে দীক্ষিতা হইলেন;

এবং ধর্মদীক্ষার পরিচয়ে হেলেন্ নাম গ্রহণ করেন। ঋষিয়ার খৃষ্টিয়ান্ ধর্মের এই প্রপন যত্নপাত। প্রথমতঃ দেশের লোকে ঘাণ্ডরা খৃষ্টিয়ান্ হইতে চাহে নাই, বলগা (Volga) নদী তীরোদের শব্দরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই ভীষণ শিকার পরে, দেশের লোক দলে দলে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, ইতিহাস গ্রন্থিক চিচিঙ্গ গা ঋষিয়ার রাজ্যটিকে বিধ্বস্ত করিয়া, দেশটিকে আপনান্ন পদতলে আনিয়াছিল। চিচিঙ্গের পৌত্র বাটু গা স্টুট-তরাজ এবং নরহত্যার একশেষ করিয়া, যে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল; আড়াই শত বৎসর তাহা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ছিল। তাতারের অধীনতা এড়াইয়া, গা ঝাড়া দিয়া উঠিতে অনেক দিন লাগিয়াছিল। মোঙ্গল জাতির বিরুদ্ধে, গ্রীক এবং রোমানদিগের সাহায্যের প্রত্যাশায়, অলেক্সান্দার নেব্‌স্কি কনস্টান্টিনোপলে ধর্ম দীক্ষা এবং অভিষেক লইয়া, সীমার শব্দের অসুস্থরাজ্য আর শব্দে জুড়িত হইয়া আসিয়াছিলেন; (১২৪০) কিন্তু বাইজাণ্টাইন্ সাম্রাজ্য তখন উলমল করিতেছিল, আপনাকে না বাঁচাইয়া, পরকে সাহায্য দিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। তাই যুর বা তামারগেনের সময়ের পর, যখন আত্মবিস্রোহে তাতার রাজ্য ধ্বংস হইয়া পড়িয়াছিল, তখনই ঋষিয়ার মাথা তুলিবার অবকাশ পাইয়াছিল।

তৃতীয় আইবান্ বা আইবান্ দি গ্রেটকে, নতুন যুগের বা স্বাধীন ঋষিয়ার প্রথম নায়কতা বলা হইতে পারে। পঞ্চদশ শতাব্দীর

শীর শেষভাগ হইতে ঘোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত; এই রাজ্যের অকাতর পরিশ্রমে, বিক্ষিপ্ত এবং ক্ষয়বল মোঙ্গল সত্য ঋষিয়ার হইতে তাত্ত্বিত হইয়াছিল। রাজা আইবান্ কনস্টান্টিনোপলের এক গ্রীক রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং এই নব সৎস্র জ্ঞাপন করিবার জন্য রাজধন্য হি-শির একটি দৈগল পক্ষীর প্রতিক্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে রাজধন্য, সেন্ট জর্জ এবং ড্রেগন-মুক্তি লাভিত ছিল। আইবান্ দি গ্রেট ক্ষমতাশালী বড় রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু তখনও ঋষিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নৃপতিগণের স্বাভাব্য নষ্ট হয় নাই, এবং সমগ্র ঋষ রাজ্য সমষ্টির কারণে তিনি বিখ্যাত করেন নাই। তিনি যখন গ্রীক রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বেই কনস্টান্টিনোপলে খৃষ্টিয়ান রাজ্য শেষ হইয়া গিয়াছিল; এবং কনস্টান্টিনোপলে ওয়ানানের বিজয়ী পুত্র নব তুর্ক রাজ্যের রাজলক্ষীকে স্থাপন করিয়াছিলেন। গ্রীক ও রোমানদিগের সহিত যোগ দিয়া, তুর্ককে খর্ব করিবার অভিপ্রায়েই আইবান্ দি গ্রেট পতিত রাজ্যে বৈবাহিক সৎস্র স্থাপন করিয়াছিলেন।

মুসলমান জাতির প্রতি যে ঋষিয়ার ক্রোধ এবং বিবেচ সহজাত, তাহা যুক্তিতে পারি। ইহা ছাড়া অন্য কারণেও, যে কনস্টান্টিনোপল শাভের অন্য ঋষিয়ার চিরকালই উৎসাহ ছিল, তাহা এই মহাসময়ের সময়ে একটু বলিবার প্রয়োজন। ঠিক যে দিন যে যুদ্ধে, ঋষ রাজ্যের ক্ষয়দাতা

কবি, শোলাও এবং কান্দেখিমান্দ-
গ্রন্থ হইতে গিরা কবিগণ রাজ্যস্থাপন করিয়া-
ছিলেন; সেই দিনও কবি কনভাতি-
নোপলের কথা ভুলেন নাই। নূতন রাজ্য
স্থাপন করিয়াও পুঙ্খই তিনি দখলভূতি
করিবার সময়ে, কনভাতিনোপলের দিকে
লোমুশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কবি
৮৬২ খৃষ্টাব্দে নূতন রাজ্যস্থাপন করিয়া-
ছিলেন, আর ৮৬৪ খৃষ্টাব্দেই জলপথে
কনভাতিনোপল লুট করিতে অগ্রসর হইয়া-
ছিলেন। সমৃদ্ধি এবং সৌন্দর্যই কনভাতি-
নোপলের কাল হইরাছে।

কবি পিকল-মোরথ হইবার পরে,
১০৬ খৃষ্টাব্দে বাগক রাজা আইগবের মাতা
বীর নামী ওল্গা ক্রকমাগর-কুলে অনেক
নরহত্যা এবং লুণ্ঠনের পর কনভাতিনোপলে
উপস্থিত হইয়াছিলেন। কনভাতিনোপল লুট
করা অসম্ভব দেখিয়া, তিনি শাপের প্রার্থ-
নাকৃত করিয়া, খৃষ্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করিলেন;
এবং হেলেন নাম লইয়া বেশে ফিরিলেন।
কিন্তু ক্রিবিয়ার সময় লোমুশ দৃষ্টিতে নগরীর
দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন যে, একদিন
কি ঐ নগরীর অতুল সম্পদ তাহার ভোগে
আসিবে না? কনভাতিনোপল হইল কবি-
বার শুক পাট; কিন্তু কৃষিতত্ত্ব গুরু
ভাণ্ডার আশ্চর্য্য করা পাশ মনে করে
নাই। রাণী ওল্গা বা হেলেনের পুত্র
আইগর বয়ঃপ্রাপ্ত হইবামাত্রই বিপুল
আয়োজনে কনভাতিনোপল অধরোধ করিয়া-
ছিলেন। আইগর পরাক্রম হইবার পর
আবার ১৭২ খৃষ্টাব্দে বেস্লাব (Svatoslav)
গুরুপাট দখল করিতে ছুটিয়াছিলেন। বেস-

স্লাবের মৃত্যুর পর আর এক শত বৎসর
পর্যন্ত কবিরা আর কিছু করিয়া উঠিতে
পারে নাই। ইহার পবেই ক্রমাগত ২৪০

৩৬০ বৎসর কবিরা ঘোম্বল বিজ্ঞান
পদতলে দিন কাটাইতেছিল। কবিরা যখন
ইহার পর স্বাধীনতা লাভ করিল (১৩২২
—১৪০৪); তখন কনভাতিনোপলে তুরকের
রাজত্ব চলিতেছিল। কনভাতিনোপলের
লোভে বাহারা গুরু বন্ধে পরাধাত
করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাট, তাহার। যে
ঐ নগরীর মুগ্ধমান অধিকার সহিতে
পারিবে না, তাহা সহজেই কৃষিতে পারা
যায়।

১৪৪২ খৃষ্টাব্দে কবিগণ রাজ্য-সমষ্টির
প্রথম জারকপে চতুর্থ আইবান্দ যখন উন্নীত
হইলেন, তখনও কবিরা বড় দ্রব্ধ।
ডন্ এবং বলগার পথে খাল কাটরা,
তুরকের হুগুতান যখন বাগিছার পদ
গুলিলেন; তখনও তাহাকে কেহ বাধা
দিতে পারে নাই। সম্ভবশত শতাব্দীর
শেষভাগ পর্যন্ত, কবিগণ সীমান্তে ক্রক
মাগরকুল পর্যন্ত; তাহার আত্মীয়েরা অবল
ছিল।

কবিগণ আর পিটার ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে
আজব (Azov) অধিকার করিবার পর
বদেশের স্বাধীনতার মত ব্যত ছিলেন বলিয়া,
তুরকের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন
নাই। ইহার পর ১৭০০ খৃষ্টাব্দে, কবিরা
এবং তুরকের মধ্যে ঐশ বৎসরের সন্ধি
স্থাপিত হইয়াছিল। সে কালে কবিগণ
সন্ধি ছলনামাত্র ছিল। সন্ধি-সম্বন্ধে
১৭১০ খৃষ্টাব্দে পিটার মহোদয় তুরকের

বিক্রমে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়া, প্রথ (Pruth) নদীর তীরে পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার রাণী-বা কেরিগের কোণে ও অর্ধায়ে কোন রূপে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর, বিক্রোহের পর বিক্রোহ, এবং সন্ধির পর সন্ধি ক্রমাগতই চলিতেছিল। তুরসকে পূর্বে ইউরোপের সকল জাতিই ভয় করিত; কিন্তু ১৭২০ খৃষ্টাব্দের পর চার্লিসকে রাষ্ট্র হইয়া ছিল যে, তুরস্ক হীন বল হইয়া পড়িয়াছে, এবং যখন তখন তাহাকে বিপদগ্রস্ত করা যাইতে পারে। এই লজ্জাই রুশিয়া ক্রমাগত সকল সন্ধি উপেক্ষা করিয়া, বিনা কারণে তুরস্ককে বিক্রে অগ্রসর হইতেছিল। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে রুশিয়া যখন রণতরী লাণ্ডাইয়া তুরস্কের বিক্রে যুদ্ধবাত্তা করিয়াছিল, তখন রুশিয়ার রণপোতে অনেক ইংরেজ, চালক এবং কর্মচারীরূপে ছিলেন।

নবম শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত কব-রাজ্যের যে সংক্ষিপ্ত কথা বলিলাম, তাহার মধ্যে যথার্থ দোষের কাহিনী বড় অধিক নাই। প্রথম চার্লিস বৎসর ধরিয়া বর্সর রাজা সন্ধিবশের পর, তিনশত বৎসরের পরাধীনতার ইতিহাস পাই; এবং প্রথম হইতে এই ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দেখিয়া আসিতেছি যে, কেবল সমৃদ্ধি-পরিপূর্ণ নগর, রুশিয়া ক্রমাগত কনস্টান্টিনোপল-নাগের দস্ত ছটফট করিয়া আসিতেছে। রুশিয়ার জাতীর জীবনের যেন একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য, কনস্টান্টিনোপল লাভ। প্রথ

নদী তীরের কলক ফালনের লজ্জাই ১৭৬৬ এবং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধ-বাত্তা, অর্থাৎ ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার নদী হইয়া সন্ধি স্থাপন করিতে হইয়াছিল। কাঠাল যতই উচ্চ গাছে থাকুক; রুশিয়ার জার যীর শুষ্ক তৈলসিক্ত করিতে ছাড়েন নাই। রাজ-বংশের একটি সন্তানকে কনস্টান্টাইন্ (Constantine) নাম দেওয়া হইয়াছিল, এবং মস্কো নগরের নতুন নির্মিত রাজ প্রাসাদের একটি প্রবেশ-দ্বারের নাম রাখা হইয়াছিল—কনস্টান্টিনোপল প্রবেশের পথ।

ইহার পরবর্তী সময়ের ইতিহাস, রুশিয়ার আধুনিক ইতিহাস, এবং সেই ইতিহাসের সহিত সকলেই সুপরিচিত। অগণ-বিখ্যাত হুতুর নেপোলিয়ান সন্ধির ছল করিয়া; রুশিয়ার জারকে তুলাইয়া, রুশিয়ার সর্বনাশের চেষ্টা ছিলেন; কিন্তু উহা ব্যর্থ হইতে নাই। রুশিয়ার দুর্বলতা কোথা, নেপোলিয়ান তাহা জানিতেন; এবং সেই লজ্জাই তাহাকে তুরস্ক জয়ের লোভ দেখাইয়া, হীনবল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অশ্রাণিও অনেকবার ছলনাপূর্বক, তুরস্কের লোভ দেখাইয়া, রুশিয়ারে বাধা নাটাইয়াছে। কিন্তু উপস্থিত ইউরোপীয় সময়ে, রুশিয়া জার এবং সাধুতর পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতেছে; এবং সেই যুদ্ধে রুশিয়ার বীরদর্প এবং বীরতা দেখিয়া, এই সর্ব প্রথম আমরা রুশিয়ারে প্রশংসা করিতে বাধ্য হইতেছি। অশ্রাণি দ্বারা পরাজিত করিয়া, প্রকৃতই করাই সমবেত যুদ্ধমলের উদ্দেশ্য; সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে, রুশিয়া

তাহার চিরকালের আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করিলে, কিংবা সজ্জির নিয়মে অল্প কোন বাবদ্য হইবে; তাহা এখনও অজ্ঞাত।

উপস্থিত যুদ্ধের সময়ে বাহ্যে নিতান্ত জ্ঞাতবা, রুবিয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে তাহাই অতি সংক্ষেপে লিখিয়াছি। রুবিয়া এখন যুদ্ধ করিতেছে খাসা; কাজেই পাঠকেরা বিজ্ঞানসা করিতে পারেন,—এ দিকে তো বেশ, তবে লেখাপড়ায় কেমন? বিশেষ বুদ্ধিশূন্য অথচ ঐতিহাসিকেরা লিখিয়াছেন, যে রুবিয়ার পূর্ব উচ্চ শ্রেণীর অল্প জনকতক ভক্তলোক ছাড়া, বাকি সকল লোকেরা তাহা মূর্খ বলিলেও কতি হয় না। বের্লিন পরমা-কড়িওজালা ভক্তলোক ছাড়া কেহ লেখা-পড়াই জানে না। রুবিয়ার সমাজের নিম্নতরের লোকেরা যেমন বর্বর, আকাঠ স্বর্ণ—এমন আর পৃথিবীর কুত্রাপি দেখা যায় না। রুবিয়ার সৃষ্টি হইতে সম্ভবশ মতাকীর শেষ পর্যন্ত, লেখা-পড়ার এক রকম চর্চাই ছিল না। দেশের কলঙ্ক মোচনের জন্ত, পিটার দি গ্রেট ইউরোপের বড় বড় পণ্ডিত মালী আনাইচা ফরাসী ও অগ্ৰান সভ্যতার বড় বড় ফলস্ব গাজ, একেবারে রুবিয়ার মাটিতে পুঁতিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উহার ফল কি হইয়াছিল বলিতে হইবে না। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে মস্কো নগরে বিশ্ববিদ্যালয় বসিয়াছিল, কিন্তু সেই বিশ্ববিদ্যালয় অল্পসংখ্যক

ভক্ত লোকের শিক্ষার জন্তই আবদ্ধ আছিল। অধিকাংশ লোক নিম্ন শ্রেণী বা চাষাকৃষা বলি, রুবিয়ার তাহাদের নাম মোরজিক্ (Moujiks); বর্বর, মোরজিকের সহিত শিক্ষিতের প্রভেদ আকাশ-পাতাল।

একেই তো চিরকাল ঘুরার বন্ধ করিয়া এবং চৌধ বুদ্ধিমা, রুবিয়াবাসীরা ইউরোপের সভ্যতা এবং আলোক দেশে প্রবেশ করিতে দেয় নাই; তাহার উপর আগার কেহ লেখা পড়া শিখিয়া, নূতন ধর্মের মত প্রচার করিলেই, তাহাকে তাড়িত হইতে হয়। একজন রুবিয়া প্রেরিত ইতিহাস-লেখক দীর্ঘ নিম্নোক্ত ফেলিয়া লিখিয়াছেন—

The history of Russian thinkers is a long list of martyrs and a register of convicts. সাহিত্য-চর্চার যে ভাল লেখকটি নূতন ধর্মের কথা লেখেন, তাহাকেই নির্দোষিত হইতে হয় অথবা অল্প দণ্ড ভোগ করিতে হয়। টলষ্টয় প্রভৃতি জনকতক লোকের নাম বাদে, রুবিয়ার অশিক্ষিত লোকেরা হয় জিহবা, না হয় আরমানিয়ার; না হয় আর কোন রুবিয়াবাসী বিদেহী। বিজ্ঞানাদির চর্চা এতই কম হইয়াছে, যে রুবিয়াকে অসভ্য ইউরোপের একটা দেশ বলিয়া গণ্য করিতে হয়। সে বাহ্যেই হউক কারণেখ্যান প্রভৃ ইহার লক্ষিত হইতে

ঐতিহাসিক নজ্জদার।

শ্রোতের ফুল

(২৯)

রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া বিপিন খুড়িমাকে বলিল—খুড়িমা আমাদের সঙ্গে তুমিও কলকাতা চল। আমাদের বরকলা গছিরে আমাদের স্থিতি করে দিয়ে তারপর কান্দি য়েও।

খুড়িমা রুঢ় হবে বলিলেন—সংসারে আর আমি থাকছিনে। * কান্দি না গিরে আমি জলগ্রহণ করব না।

নবকিশোর বলিল—তবে খুড়িমা ওপারের প্লাটফর্মে চল; কান্দির গাড়ী আসবার সময় হয়েছে।

খুড়িমা উত্তীর্ণা ঝাড়াইলেন। বিপিন ও মালতী তাহাকে প্রণাম করিয়া পায়ে ধুলা মাথায় লইল।

এট বিদায়ের ক্ষণে খুড়িমার সকল কঠোরতা চোখের জলে ভাসিয়া গেল। তিনি বিপিন ও মালতীর চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন; তারপর বিপিনের হাতে মালতীর হাত রাখিয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিলেন—আমার মান ইচ্ছা, আমার সর্ব্বের তোমার হাতে দিয়ে নেগাম বাবা; তুমি তার সখ্যাদা রেখো।

বিপিন ও মালতীর চক্ষু ও শুষ্ক রহিল না। বিপিন বলিল—খুড়িমা, মা ত আমাদের আশীর্বাদ কংলেন না; তুমিও আমাদের ছেড়ে যাবার সময় আশীর্বাদ করে যাবে না।

খুড়িমা ক্ষণেক চুপ করিয়া

বলিলেন—আশীর্বাদ করছি আমি যেমন দুঃখ পেয়েছি তোমরা তেমনি সুখী হও।

খুড়িমা আর কিছু বলিতে পারিলেন না; কাদিতে কাদিতে নবকিশোরের লবিত্ত প্রস্থান করিলেন। বিপিন ও মালতী ক্ষুণ্ণিত হইয়া খুড়িমার এই অভিনন্দনের মতন ভীষণ আশীর্বাদের কথা ভাবিতে লাগিল।

(৩০)

বিপিন ও মালতী কলিকাতার আসিয়া তারকের বাড়ীতে উঠিয়াছে। নবকিশোরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। এখানে মালতী পরের অন্তঃপুরে আছে, সেখানে গিয়া বিপিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেছে না, নবকিশোরও কাছে নাই। তাচার মনে একটি শাস্ত্রময় ঘরের অতীত স্মৃতি ও একটি সম্ভবপর ঘরের সুখময় কল্পনা থাকিয়া থাকিয়া কেবলি আশাত দিতেছে, তাহাকে ব্যাকুল বাস্তব করিয়া তুলিতেছে, এ অবস্থায় মালতী ও নবকিশোর উভয়েরই সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিপিনের কিছুই ভালো লাগিতেছে না। তাহার উপর সমস্তদিন তারকের সহিত তর্ক করিয়া করিয়া তাহার মন ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। তারক তাহার প্রাণপণ চেষ্টায় বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিল যে বিধবা-বিবাহ আমাদের দেশের জিনিষ নয়, —ইহা বিলাতী খামদানি। যে দেশে বিধবার চরম আদর্শ পুড়িয়া মরা, যে দেশে বিধবা

মানে পুণ্যলীলা একচারিণী, সে দেশে একশ
অনাচার বাড়িচারেরই নামান্তর।

বিপিন বিরক্ত ও লজ্জিত হইয়া কদিন
তাহাকে বলিল—মাণ কোরো ভাই, আমি
তোমার সঙ্গে তর্ক করছিলাম, তর্কটা
তোমার কিশোরের অন্তরেই তোলা থাক,
তার সঙ্গেই তোমার বনবে ভালো। আমি
তখু বসতে চাই কি, তোমরা তখু
জীলোকের বেলাই এতটা কঠিন নর
রাখ কেন? আর পুরুষের বেলাই বা
রাখ না কেন? পুরুষের চোদটা বিয়ে
করলেও দোষ নেই, আর যত দোষ
বিধবার বেলা?

তর্কের সুযোগ পাইয়া তারক পরম
উৎসাহিত হইয়া উঠিল। দোজা হইয়া
বসিয়া বলিল—পুরুষ আর স্ত্রী সমান হল।
একুত্তিই যে তাদের তির ছাঁচে গড়েছে।
যে নারী সন্তানের জননী হবে, তার কি
একনিষ্ঠতা আবশ্যক নয়।

—মানি। কিন্তু বিধবা যে, তার বিবাহ
হলে একনিষ্ঠতা নষ্ট হয় না। বিনোদিত
যে বিধবা কুমারারই সমান আপনায়
সমস্ত প্রাণের অনিবেদিত ভালোবাসার অর্থা
সামিথে সার্বকর্তার অন্তে একজন কারুর
অপেক্ষা করে আছে, তার বেলাও কি
ঐ বাবদ্য?

—হী নিশ্চয়। একুত্তির নিয়ম কখনো
কি যত্ন লোকের অন্তে তির ভিন্ন রকমের
হতে পারে। নিয়ম নিয়মই। ওরকম
টেককে সেই নিয়মের অগ্রস্থল করে নিজে
গড়ে তুলতে হবে। সে চর্কল বলে ত
আদর্শ খাটো হতে পারে না। আদর্শ

চিরকালই উচ্চ; মানুষের মন চিরকালই
খাটো;—তাকে সংশ্রম করে সেই উচ্চ
স্থান পৌছতে হবে; এইতেই ত তার
গৌরব।

—এত একুত্তির নিয়ম নয়; এ যে
সমাজের শাসন। সকলকেই জোর করে
আদর্শে পৌছে দিতে গেলে কি ফল হয়
তা ত সমাজের মধ্যে আমরা নিতাই দেখছি।
তার ওপর, মনে কর, যারা অসহায়
নিরাশ্রয়, যাদের ভালো থাকবার ইচ্ছা
আছে কিন্তু সুবিধা নেই, তাদের উপায়?

তারক জোর দিয়া বলিল—নিরাশ্রয়
হলেই নিরুপায় হবে তার কি মানে আছে।
আমাদের দেশের সন্ন্যাসিনীরা কি?
একেবারে নিরাশ্রয় কিন্তু কত বড় সব
সাক্ষী। তোমায় আমি দেখাব দেখাব,
এতক্ষ দেখাব, বিধবা সাক্ষী সন্ন্যাসিনী কাকে
বলে।... তুমি ত খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী
নাম! সাক্ষ্য দেবতা! খ্রীষ্টকৃষ্ণচৈতন্যের
অবতার! নিজে যাব তোমাকে আজই
দর্শন করাতো। দেখবে দেখবে তিনি
নরনারীর কি চমৎকার আদর্শ প্রচার
করছেন। তিনি আমার ওকলী।

এই বলিয়া তারক চকু মুদ্রিত করিয়া
তাহার মাংসপূর্ণ কঙ্কালসার হাত দুটি ঝোড়
করিয়া কপালে ঠেকাইল। ওকলীর দরশনে
বিভোর হইয়া তাহার তর্ক খামিয়া গেল।

তারক বলিল—ওকলীকে দর্শন করতে
যাবে?

বিপিন বিজ্ঞাসা করিল—কোথায় তিনি
থাকেন?

—তার আশ্রম এখন খড়সহে। গঙ্গার

ধারাই আশ্রম, নামেও আনন্দাশ্রম কাজেও আনন্দাশ্রম, কি মনোরম পবিত্র সে স্থান।
গেলেই ইচ্ছে করে সংসারহুপে অলাঞ্ছল
বিয়ে গুরুজীর চরণতলে পড়ে থাকি।

বিপিন হাসিয়া বলিল—এ রকম মনের
অবস্থা যখন হয় তখন ত সে রকম আরগার
বাওয়া ঠিক উচিত হবে না।

তারক গভীরভাষন বলিল—সংসারে মারা
কি অত শিগগির কাটে যে ভায়া? মুক্তির
পথ অত সহজ নয়। ত্রিগুরর বিশেষ
কৃপা না হলে তাঁর চরণে আশ্রম মেলে
না।

বিপিন হাসিয়া বলিল—যদি তাঁর এই
অধমের প্রতি বিশেষ কৃপাই হয়ে পড়ে,
তখন?

—সে সৌভাগ্য তোমার হবে না, ভয়
নেই।

—ঠিক বলছ ত হবে না! •হলে কিন্তু
তুমি তার সঙ্গে দারী!

—হী হী, এখন চল।—বলিয়া তারক
বিপিনের হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

বিপিন হাসিতে হাসিতে প্রস্তুত হইয়া
তারকের গুরুজীকে দেখিতে যায়। করিল।
তারকের তর্ক বোঁচা দিয়া দিয়া বিপিনের
আবাল্যের সুমন্ত সংসারকে উদ্ধারিয়া তুলিয়া
তাঁহাকে বড় বিধার মধ্যে ফেলিতেছিল।
সে নিজের বিকিঞ্চ মনটাকে নতন দৃষ্টি
দেখিয়া গুরুজীরা লইবার মত সানন্দেই
তারকের আহ্বান স্বীকার করিল।

আছিরীটোলা ঘাট হইতে একখানি
পাঙ্গি ভাড়া করিয়া তারক ও বিপিন
খড়লহে আনন্দাশ্রমের ঘাটে আসিয়া নামিল।

প্রশস্ত ঘাটটি আগাগোড়া মার্কেল পাথর
দিয়া বঁধানো। জলের তল পর্যন্ত সোপান-
শ্রেণী নামিয়া গিয়াছে। বরকের মতো শুভ্র
সুন্দর ঘাটের শিলার গভীর জল ছলছল
তরতর করিয়া খেলা করিয়া বহিয়া ঘাইতে-
ছিল। সোপান বাহিয়া উপরে উঠিয়াই
বিপিন দেখিল একটি চমৎকার সুরমা
সুসজ্জিত পবিত্র পরিপাটি প্রকাণ্ড উদ্যান।
কোথাও কনকজুজ, কোথাও বকুলবীথি,
কোথাও কুম্বকের কেয়ারি; মাঝে মাঝে
গোলাপ বেশ মল্লিকা মালতী সুরভিপুষ্পের
ক্ষেত; কেয়াবুলের বেড়া; একপ্রান্তে
একটি চুতাবতান, তাহার প্রবেশপথে
একটি মার্কেলের শিলান, তাহার মাথায়
সোনালি পাথর বসাইয়া লেখা আছে—
কেলিকুল। মাঝে মাঝে শম্পক্ষেত্র চোখের
উপর মাধুর্যের স্রাব-অঙ্গন বৃণাইয়া দিতেছে।
পায়ে ঝাঁক আর গলায় গুত্তর পরিয়া দুটি
হরিণ কেল হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে;
ভালভাল কুঞ্জের তলায় তলায় গুটিকয়েক
মগ্ন চরিয়া বেড়াইতেছে; শান্ত নীরব
আশ্রম-বাটিকাটি কত শত পক্ষীর আনন্দ-
সঙ্গীতে থাকিয়া থাকিয়া স্বকৃত সুগরিত
হইয়া উঠিতেছে। স্থানে স্থানে বেতপাথরের
চোখাচ্চার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বিচিত্র সঙ্গীতে
কোয়ারার উচ্ছ্বাস ধারা হীরার শতমণী
হারের মতো উৎসারিত হইতেছে। এত বড়
বাগানের কোথাও অনাবৃত্তক ঘাস জন্মে
নাই, কোথাও একটি গুরুপত্র পড়িয়া
নাই, বেন একখানি নিরুপম চিত্রপট।
এই বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যস্থলে একখানি
ছবির মতো বাড়ী, আগাগোড়া আইত্তি-

লভায় ঢাকা; এই বাড়ীটিও প্রকাণ্ড। বাড়ীর ভোরণে লেখা আছে গোলেকিধাম। বাড়ীর প্রবেশপথেই একটি বর আছে, সেইখানে জুতা রাখিবার ঘাঁটতে হয়। জুতা রাখার ঘরের পাশেই একটি জলের চৌবাচ্চা, একটি পাথরের মা'ছর সুখবির দিগা জল নির্গত হইয়া পড়ে; তাহার উপরে সোনার পাত্রে লেখা—বৈতবন্দী। বাড়ীতে আরো অনেক চৌবাচ্চা আছে; তাহা হঠতে জল থাকির হইবার নালি কোনোটি বা গোবুখী, কোনোটি বা মকবুখী, কোনোটি বা শতধারা; কোনোটির নাম ভোগবতী, কোনোটির নাম মধ্যাকিনী, কোনোটির নাম অলকনন্দা।

বিপিন ও তারক জুতা খুলিয়া, বৈতবন্দীতে পা ধুইয়া অষ্টালিকার প্রবেশ করিল। অষ্টালিকার মেঝে পর্যায়ক্রমে বেত ও কুক্ষ মর্শ্বের মণ্ডিত, তাহাতে মধো মধো শউনল পুষ্পের আকার হইয়াছে; তত্তত্তলি বিচিত্র বর্ণের মাবেলৈঃ; কড়িকাঠ হইতে বিচিত্র স্নান আলোর ঝড়, লঠন, বেল, ঝুলিতেছে। ককে ককে সৈরিকধারী শিখামণ্ডলী ধর্ম-গ্রন্থ পাঠে রত। কেহ পীড়িতের সেবা করিতেছে। কেহ কেহ বা ধর্মবিষয়ে আলোচনা করিতেছে, কিন্তু তাহা উচ্চতভাবে তর্ক করিয়া নয়, শান্তভাবে বীরবরে।

বিপিন ও তারক মর্শ্বের সোপান বাহিয়া দিলে উঠিল। দিল্লীর একাংশে ঠাকুর-ঘর, ঠাকুরঘরটি গঙ্গার দিকে। বাহাওয়ার দাঁড়াইয়া গঙ্গার উগুস্ত বক্ষ চমৎকার দেখা যায়। ঠাকুরঘরের সম্মুখে লেখা আছে—
বৈকুণ্ঠ! তিতরে সাধাক্ষের বিগ্রহ, নাম

সাধাক্ষ। কয়েকজন শিখা ঠাকুরের পূজা আরতি ভোগের আয়োজন করিতেছে, তহারিও নীরব, অথচ এসময়। তারক বিগ্রহকে প্রণাম করিল, বিপিনও দেখা-দেখি করিল, সে এই শান্ত নীরব স্নানর আশ্রমে আপনার বিরোধকে বড় করিয়া রাখিতে পারিল না।

সেখানে হইতে তারক বিপিনকে গুরুসম্মর্শনে লইয়া চলিল। একে গুরু তার সন্ধানী, তাহার গৃহে সকলেরই অব্যাহ গতি; এ জন্ত এ গৃহের কোনো দ্বারে অর্গল পর্যাস্ত নাই। বিপিন গিয়া দেখিল একটি প্রশস্ত কক্ষ; বহুশূণ্য পুরু নরম গালিচার একপ্রান্ত চেষ্টে অপরপ্রান্ত পর্যাস্ত ঢাকা। ছাগি হইতে বিবিধবর্ণের স্নানর স্নানর বেলায়ারি ঝড় প্রদর্শিত; দেয়ালে বিচিত্র পুষ্পপত্র অঙ্কিত, তাহার মাঝে মাঝে মেষী গিলেসী পুরাণের চিত্র, গোপালজননী যশোদার পাশে দ্বিতজননী দেবীর ছবি, মহাকীর্তন সাধারণ পুরাণের দৃশ্যের পাশে পাশে দুর্মোপীর শিরশ্চক্কপের অঙ্কিত চিত্র সজ্জিত রহিয়াছে। ছবির উপরে দেয়ালের গারে বিচিত্র ছাঁদের শেখার ইংরেজি, সংস্কৃত, ফার্সী বচন চিত্রিত। ঘরের মধ্যস্থলে আর-একখানি ছোট কার্পেটের উপর বসিয়া আর্দ্রেন গুরুজী; আর তাহার সম্মুখে কতিপয় আগন্তুক।

ঘরের একপ্রান্তে একখানি প্রকাণ্ড মেহগনি কাঠের স্নানর খাট; তাহার শয্যা, মশারি সমস্তই রেশমী; দরজার দরজার চওড়া হাশিরাবার শালের পর্দা; পাশের ঘরে একটি স্নানর লাইব্রেরী বিভিন্ন ভাষার

পুস্তক ও হস্তলিখিত পুঁথির অশৃঙ্খল সরি-
বেশে সম্পদশালী।

আগন্তুকদের মধ্যে কেহ শোকাহুঁর, কেহ
জগতের কৃত্রিম আচরণে আহত, কেহ
দরিদ্র,—তাহারা সাহসনার স্বাক্ষরে এখানে
আসিয়াছে। কেহ বা আত্মা, ইহকাল
পরকাল, পুনর্জন্ম প্রভৃতির প্রভৃতি অতীন্দ্রিয়
বিষয়ের "মীমাংসা" করিতে আসিয়াছে।
গুরুজী হাসিয়া হাসিয়া সকলের সহিতই
শান্ত ধীর ভাবে আলোচনা করিতেছেন।
কত লোক কত অদ্ভুত প্রশ্ন করিতেছে তবু
তাহার বিরক্ত নাই। তাহার বদনমণ্ডল
সর্বদাট শ্রমজ, হাস্যমীশ্র।

গুরুজীর বয়স চরিত্রের নীচেই।
উজ্জল জামবর্ণ, অকোমল স্ত্রী শাও
মুর্জি। চুল দাড়ি গোঁফ কামানো, মৃদুভাবে
মেরেলি ডাবের উজ্জল লাবণ্য। গায়ে
একটি রেশমী গেরুয়া রঙের আলখেল্লা,
মাথার একটি রেশমী গেরুয়া পাগড়ী।
গুরুজীর শোণ চুটি চন্দ্রকান্ত সূন্যর, বুদ্ধিতে
কলমল করিতেছে, তাহার অন্তরের দর্পণের
মধ্যে প্রসক্ত নির্মল; সুগন্ধানি সংঘম-
নিষ্ঠার সীমিত উদ্ভাসিত, মৃদুতা-মাখানো
অখণ্ড সদাই হাস্যমধুর। এই অপরূপ পুরুষকে
দেখিয়া বিপিন মনে মনে বলিল—হাঁ মাহুঘ
বটে। গুরু হবার উপযুক্ত! প্রজ্ঞা সত্ত্ব
ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া বিপিন প্রণাম করিয়া
এক পায়ে বসিল।

এত সব বিলাসসজ্জা বিপিনের মনে
কিছুমান বিধা উদ্বেগিত করিল না।
তাহার মনে হইতে লাগিল এই অদ্ভুত
পুরুষের চারিদিকে এইরূপ সৌন্দর্য্য সম্পদের

গুরুজী স্মিত চোখে মাথা নত করিয়া
তাহা গিকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং হাসিমুখে
তারককে জিজ্ঞাসা করিলেন—কিহে সংসার-
নন্দ! ইনি?

তারক কৃতজ্ঞালিপুটে পরম বিনয়ের
সঙ্গে বলিল—উনি আমার একটি বন্ধু।
নাম বিপিনদ্বিহারী তার ভৌমুহী। উনি
এম-এ পাশ। আপনাকে দর্শন করতে
এসেছেন।

গুরুজী হাসিয়া বলিলেন—আমি এম-এ
করালান্দেহ, বড় ডরাই, তাঁরা শুধু
তর্ক করতাই আসেন... বিপিন বাবু,
আপনাকে আগেই বলে রাখি, এঁরা সবাই
আপনাকে বলবেন যে আমি একটা মজ
রকনের অবতার, বরাহ কুর্ষ দলের ঢের
উর্ধ্ব, চোঁকি আমি স্বয়ং ভগবানই। তবে
আমি যে সে কথা অস্বীকার করি সে হচ্ছে
আমার শীলা!... এসব কথা আপনি কিছু
বিশ্বাস করবেন না; আমি আপনাদের
মতনই একজন অতি সাধারণ মাহুঘ, পাশে
পুণ্য লাগসা বৈবাগো প্রভৃতি অতি
সাধারণ... তবে প্রত্যেক মাহুঘেরই চিত্ত-
প্রণালীর একটা স্বাতন্ত্র্য আছে; আমার
যেটা সত্য ও মঙ্গল বলে মৃদু প্রত্যয়
হয়েছে, তাই আমি শোককে বলি, কেউ
বা সে মত গ্রহণ করে, কেউ না করে
না! মহাপ্রভু ঈশা বলেছেন—You shall
know the truth and the truth
shall make you free. এ সত্য কি
রকম সত্য? সে কথাও মহাপ্রভু ঈশা

স্পষ্ট করেই বলে গেছেন—Then shall ye know, that I do nothing of myself; but as my father hath taught me, I speak these things. And He that sent me is with me; the Father hath not left me alone. এই বোধের যে ভরপুর আনন্দ, 'যে আনন্দে আমার অন্তর হুলে হুলে ওঠে তা আমি নিজে সমস্তগ কর্তে না পেরে আমার তাই ভগিনীদের বণ্টন করে দি। এই অপার আনন্দ প্রচার করা' ভিন্ন আমার জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। আমি সংসারভাগী নই, আমি শ্রীর রূপণ সংসারী! এত বুঝে তর্ক করবেন।

গুরুভীর চোখদুটি উজ্জ্বল হইয়া হাসিতে লাগিল। বিপিন অগ্রে হেমন ঘোহন চরিত্রভ্যাক মুখভাব দেখে নাই; মুখের প্রত্যেকটি রেখা যেন তাঁহার চিত্তের গভীর জ্ঞান, মনের সরলতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা চরিত্রের দৃঢ়তা ডাকিয়া ডাকিয়া বলিয়া দিতেছিল। বিপিন একেবারে মুগ্ধ হইয়া বলিল—প্রভু, আমি মূর্খ। কতকগুলো কথাই পড়ার ছাপ বিশ্ববিজ্ঞানের আমার নামের গারে মেরে দিয়েছে মাত্র। জ্ঞান আমার কিছুমাত্র হয়নি। আমি তর্ক করতে আসিনি, শিখার মতো জিজ্ঞাস্য হয়ে এসেছি। আমাকে অহুগ্রহ করে বলে দিন, মাহুঘের কর্তব্য কি, ধর্ম কি, কি ব্রত পালন করলে আমি প্রকৃত মাহুঘ হতে পারব।... আর দয়া করে আপনি আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করবেন না।

গুরুভী হাসিয়া হাসিয়া মাহুঘের ধর্ম ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তাহার সে কি প্রচণ্ড শক্তি, কি ওম্মমী প্রকাশ; বলিবার সে কি অপরূপ মনোহর ভঙ্গি; স্বরের কি গভীর মাধুর্য; অটল কথাকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া সরল করিবার সে কি চমৎকার নিপুণতা! কিন্তু সমস্ত ব্যাখ্যাবটা সঙ্গীতের মতো সুমধুর একটি তাললয়ছন্দে গীত। আরে অহুপ্রাণিত, হাসির মতো স্বচ্ছ ও মনোহর। বিপিন মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিল, আবিষ্টের মতো তনিত্তেছিল। গুরু কি বলিতেছেন সে ভালো করিয়া তনিত্তে পারিতেছিল না, বুঝিতে পারিতেছিল না, তনিত্তেছিল শুধু তাঁহার গানের প্রবল প্রবাহের অক্ষত সঙ্গীত, দেখিতেছিল শুধু তাঁহার অপরূপ সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল প্রহসন মুষ্টি!

আরতি আরম্ভের শব্দধ্বনি হইল। গুরু নীরব হইলেন। সকলকে লইয়া তিনি মাধাকান্তের আরতি দেখিতে গেলেন। বিপিনের চোখের সামনে আরতির পঞ্চ-প্রদীপের আলো যেন গুরুর চোখের আলোর কাছে রান বোধ হইতে লাগিল। আলোকে গকে আনন্দে আরতি হইয়া গেল। রানীকী তখন হুত্ব কবে উজ্জনেজে পরম পুলকিত ভাবে গান ধরিলেন—

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর

তুমি তাই এগেছ নীচে।

আমার নইলে জিতুবনের

তোমার প্রেম হত যে মিছে।"

বিপিন তখন হইয়া তনিত্তে লাগিল সে স্বর কি তীক্ষ্ণ, কি মধুর। ছন্দে ছন্দে

পর্দায় পর্দায় ভাবের হিমোলে হ্রদ তরঙ্গিত
হইতেছিল—সে হ্রদ কোথাও আপনার
সৌভাগ্যগর্বে প্লবিত, কোথাও বেদনার
আলুত, কোথাও মিনতিতে একেবারে
বিগলিত! সন্নীতরসধারা মন্দির ছাপাইয়া
অট্টালিকা ভেদ করিয়া অকাণে বাতালে
ছড়াইয়া পড়িতেছিল, গঙ্গা সেই সফারতির
বন্দনা-গার্মে তাল দিয়া তেমনি হিমোলে
গলিয়া পড়িয়া যুগল-সম্মিলনে ছুটিতেছিল।

স্বামীজী গান সমাপ্ত করিয়া মাঠাঝে
প্রণাম করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সকলেই
ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল। বিপিনের মনে
হইতেছিল এ প্রণাম যেন ঝপটে প্রণাম
হইল না, সমস্ত জ্বর লুটাইয়া দিলে যেন ঠিক
হয়। তার পর গুরুজী নিঃশব্দ হাতে সকলকে
প্রণাম পরিবেশন করিলেন, বিপিন ভক্তিতে
একেবারে গলিয়া অপ্রজ্ঞনে পরিণত হইবার
মতন হইতে লাগিল।

স্বপ্নাধিষ্টের মতন তাহাকে তারক
একরকম টানিয়া আনিয়া বাড়ীতে ঢেঁলিল।
সে বাড়ীতে আসিয়া মনে করিতে চেষ্টা
করিতে লাগিল গুরুজী কি বলিয়াছেন।
স্বপ্নভঙ্গের পর কিছুই বেমন স্পষ্ট ননে
হয় না, সমস্ত ব্যাপারটা আবছায়া; রকমে
অস্বভাবই থাকে, স্বভিতে ফুটিয়া ওঠে না,
চেষ্টা করিয়া তাহা স্মরণ করিলেও সফর-
মান চিত্রের মতো পশ্চাতের দৃষ্ট বসন
উপস্থিত হয় পূর্বের দৃষ্ট ভবন অন্তহিত,
বিপিনেরও তেমনি কিছুই বেশ একটি
ধারাবাহিক শৃঙ্খলার স্মরণ হইতেছিল না;
টুকরা টুকরা তালি জুড়িয়া সে এইটুকু
বুঝল যে স্বামীজী বলিয়াছেন—ঐরাগ্যমূলক

প্রেমই ধর্ম। মাহুৎ নিরেক্ষে কোনো
বিশেষ বেশকালের মধ্যে সন্নির্গ করিয়া
দেখিবে না, সে আপনাকে বিশ্বাসী মনে
করিবে, অতীত অনাগত সকল কালের
সকল লোকের সহিত প্রেমযোগ স্থাপন
করিবে ই ক্ষুদ্র সন্নির্গ মমতা নষ্ট হইয়া শান্ত
বৈরাগ্য জ্বর পরিপূর্ণ করিবে। মাহুৎ
মাহুৎ তেদ নাই,—সবল ভাতি সকল বর্ষ
সেই এক অবিভীত পরমপুরুষেরই বিচিত্র
প্রকাশ। অহঙ্কার এই মোহ উৎপাদন
করে, প্রভুত্বই এই ভেদ সংঘটিত করার;
নারী স্বর্গীয় জিনিষ, ইহারিগকে পূজা
করিতে হয়, ভোগে কলুষিত করিতে
নাই। ইংরাজ দেবতা; যিনি সৌন্দর্যের
আদি প্রসবণ পরমহুন্দর, নারী সেই
সৌন্দর্য্যহরণের সমুচ্ছল রশ্মি; আমরা
আমাদের জ্বর পরকলার ভিতর দিয়া দেখি
বলিয়া নারীকে লালসার রতিন করিয়া
দেখি, কিন্তু বস্ত্র নারী কুল উচ্ছল পবিত্র।
গেহের পাত্র শ্রীপুরুষ সকলেই সমান;
শ্রীপুরুষ ভেদে যদি ভাবের তারতম্য ঘটে
তবে সেখানে নিঃসর চিত্ত নির্মল নাই
ব্যুজিতে হইবে। আদল প্রেম জীবাত্মার
পরমাত্মার! জীবাত্মা বাধা, পরমাত্মা
ঐক্য; এইজন্ত ঐক্য রাখাকাত।
জ্বলমল-মকে ইহাদের নিত্য নিরন্তর
মিশ্রনোৎসব চলিতেছে বিচিত্র ভাবে বিচিত্র
ভঙ্গিতে; প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ হুন্দর
দিনে সেই আনন্দেব আভাস পাওয়া যায়।
ধারার আত্মকোড় আত্মবর্তি তাহার। ব্যুজিতে
পারেন কুলন রাস নোলে বাহিরের কোনো
গামগ্রিক উৎসব নয়, অস্তরে অহরহ নিত্য।

নিরন্তর জীবিত। পরমাখার বহুজিহোৎসব সম্পন্ন হইতেছে। জীবিত পরমাখার এই যে প্রেমযোগ তাহা মাহুৎসব বিববোব ও আত্মবোবোব ভিত্তব দিয়াই লাভ করে।

বিশ্বিন ভাবিতে লাগিল, তবু কি এই-সব সংসার-মারা মিথ্যা! মালতী আমার কেহ নহে, আমার বিশ্বের সম্পত্তি, বিশ্ব আমাদের বিবহে ক্রন্দন করিতেছে! নবকিশোর কিশোর আগের স্বামীজীকে একবার সমস্ত বাণীর নিবেদন করিতে হইবে, দেখি তিনি কি বলেন। নবকিশোরটা গায়ের কোবে সমস্ত মানাইতে চায়, স্বামীজী কি শাস্ত্র মুক্তিতে সব বুঝাইয়া দেন। নবকিশোরকে কিন্তু এখন শীঘ্র স্বামীজীর কণা বলা হইবে না, তাহা হইলে সে তর্কের ধূলা উড়াইয়া কোনো পথই ভালো করিয়া দেখিতে নিবে না।

চারিদিকের আঘাত সংঘাতে অমিলারের ছেলে বিশ্বেশ বখন নিত্যন্ত মুহ্যমান বোধ করিতেছিল; কাড়াক শব্দের মতো মাক্তগর্ভ হইতে তুমিষ্ট হইয়াও মাতার বহির্গর্ভের থলিটির মধ্যে আবৃত থাকাই বাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, চিরকাল পরের উপর নির্ভর করাট বাণীর অভ্যাস, পরের সাহায্য ব্যতীত বাহার আহার বিহার আরাম বিব্রম কিছুই সম্পন্ন হইবার জো ছিল না, তাহাকে যখন নিজের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে শিখাংরা হইতে হইতেছিল, ঠিক সেই মুহুর্তে তাহার শেব ছুটি অবলম্বন নবকিশোর ও মালতীর মস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া বিশ্বেশ নিজেকে নিত্যন্তই অসঙ্গ ও একাকী বোধ করিতেছিল।

এমন অবস্থায় প্রেমামল্য স্বামীর প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রভাব তাহার মনের উপর পড়িতে বিশ্বেশ যেন একটা আশ্রয় পাইয়া বাঁচিল। সেই দিন হইতে সে প্রায়ই স্বামীজীর আশ্রমে ঘাইতে লাগিল; স্বামীজী আজ বিভব গার্ভেনে, কাল টাউন হলে, পবন্ত কোনো থিওটোর-বরে বক্তৃতা দিয়া ফিরেন, আর শত সহস্র মুক্ত পৃষ্ঠির উপহার পাও হইয়া বিশ্বেশ ছাত্রের মতো স্বামীজীর পদাঙ্কে পদাঙ্কে ফিরে।

একদিন স্বামীজীকে নির্জনে পাইয়া বিশ্বেশ নিজের সমস্ত কাহিনী সনিষ্ঠানে নিবেদন করিল। স্বামীজী চোখ বুজিয়া শুক হইয়া বসিয়া সমস্ত শুনিলেন। কিছুকণ পরে ‘মাধাকান্ত!’ বলিয়া নিখাল ফেলিয়া চোখ খুলিলেন। বিশ্বেশের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—বৎস, তোমার ত আমি বোঝি প্রেমই ধর্ম। তুমি মহা ভাগ্যবান তাই মাধাকান্ত তোমার জন্মে এমন প্রবল প্রেম দিরেছেন। তুমি সেই প্রেমকে একধারার ভোগের মক্কুণ্ডিতে কেন বইয়ে দেবে, তাতে তোমারই বা লাভ কি, কপ্তেরই বা লাভ কি? সেই প্রেমকে তোমার জন্মবিমলণ পেকে জালী-ধারার মতো সহস্রধারার বইয়ে দাও, যাক সে বিশ্বমানবের মহালাগরে মিলে, সে সার্থক হোক, সে বক্ত ককক! আরি বহুদূর দেখছি মালতী লাক্ষ্যে মাধারামীর বিকাশ, সে সকল কলঙ্ক মাধার করে তোমার যে বহন করেছে, তার সেই অপূর্ণ অমল প্রেম সে কি শুধু তোমার নিজের ভোগে কলুষিত করার জন্তে? না না, তা

কখনো নয়। তেমনি অধ্যাত্মিক বোঝে
বসিষ্ট হবে, বিখ্যাতোদের প্রেমের প্রশংসা
পেয়ে ধস্ত হয়ে যাবে। এই তোমাদের
পথ। আত্মা শুধু-যে কেবলনার আছে
তা ত নয়—আত্মা জ্ঞান প্রেম ও আনন্দের
খনি। পৃথিবী কত যুগযুগান্তর তুলত
করে আত্মাকে পেয়েছে। আত্মা পৃথিবীর
অন্ধকারের আলো, মঙ্গলুন্নির সুরেশিশ।
আত্মাকে পেয়ে পৃথিবীর স্রী কিয়ে গেছে।
সঙ্গার। পৃথিবীর সমস্ত ধনরত্ন ভোগ
একদিকে, আর আত্মা একদিকে,—আত্মার
জ্বলনার ভোগ অকিঞ্চিৎকর ছাই ভস্ম।
যেদাশপাত্র বলেন যে, আত্মা, অস্তিত্ব ভাতি
এবং প্রিয়—এই তিন সাধনের ধন
একাধারে। অস্তিত্ব কিনা আত্মার হিরপ্রতিষ্ঠা,
ভাতি কিনা আত্মার জ্ঞানালোক, প্রিয়
কিনা আত্মার প্রেমামৃত। তাই হিন্দুধর্মের
শ্রেষ্ঠ সাধনতত্ত্ব আত্মানন্দ বিজ্ঞি, “আত্মাকে
জানো; তারপর আত্মাকে প্রেম কর,
দেহকে নয়, নিবের ভোগের লাগলকে
নয়। পুষ্করীতে পাকপ্রাণের জল’ যেমন
তার জল অমৃতবাহী হয়, তেমনি প্রবৃত্তির
এলোপ লেগে আত্মার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়;
নষ্ট পুষ্করীকে ঝালিয়ে যেমন আবাব
কাকচক্ষু জল পাওয়া যায়, তেমনি বিবেক
ঐশ্বর্য্য এবং সংযমের বারী আত্মার পঙ্কোচ্চার
করা আবিস্কার, তা নষ্টলে আত্মা সাধকের
ভোগে আসতে পারে না।—আত্মবিস্তার
রতির চরম বশেই জেনো। তাহার মধ্যে
যেমন ব্যাকরণ অক্ষর কণা সাহিত্য
সবই অস্তিত্ব, তেমনি সমগ্র আত্মাতে
জ্ঞান বীর্ঘ প্রেম আনন্দ সবই অস্তিত্ব

আছে; তাহা আদৃত করতে হলে যেমন
প্রথমে ব্যাকরণজ্ঞানকে আদৃত করা চাই,
ব্যাকরণ শুধু মৌরস বলে ছেড়ে দিয়ে
একবারেই কণা ধরণে সকল দিকট পাত
হয়ে যায়, কানোর রস কিছুতেই আদৃত
হয় না, তেমনি সাধনের ভিতর দিয়ে
প্রকৃত আত্মার প্রেম আদৃত না করলে প্রেম
ব্যর্থ হয়ে পড়ে।...তুমি যদি মাগতীকে
শরুত ভাগ্যবাসতে চাও তার আত্মার
সঙ্গে তোমার আত্মার যোগ স্থাপন কর;
আত্মাদের ভোগলালসাকে ধরী কর।...
তুমি ভাগ্যবান, তুমি ভাগ্যবান। এমন
সর্ব্বত্র-পোষানো প্রেম সাধনাত্মকে নিবেদন
করে দিয়ে তোমরা ধস্ত হও।

গুরুদ্বী আবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া
ধান্য হইলেন। বিপিন শুদ্ধ হইয়া বসিয়া
রহিল। স্বামীজীর তথ্যকথা তাহার চোখের
সামনে আকাশ পাতাল উলটপালট করিয়া
দিশা দলনন করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

গুরুদ্বী চোখ মেলিয়া বলিলেন—বৎস,
তুমি অবসর-মতো কথাগুলি ভেবে দেখো।

বিপিন স্বামীজীর পায়ের ধূলা মাথার
লইয়া নীরবে প্রণাম করিল। বিপিনের
মনের উপর স্বামীজীর কথাগুলি কাটিয়া
কাটিয়া দিতে লাগিল—স্বামীজী যে
মাগতীকে ভাগ্য করিতে বলিলেন না,
আবো গভীর ভাবে প্রকৃত ভাবে ভালো
বাসিবার পথনির্দেশ করিলেন, এই কথা-
টাতেই তাহাকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া
কেনিল। তাহার মনে হইতে লাগিল
বাস্তবিকই ত দেশবিশেষের ইতিহাসে কাব্যে
এই কথাই দেখা যায়—শৌন্দর্য্য ও প্রেম

যেখানেই সমগ্রকে আচ্ছন্ন করিয়া বাসনার
সকণি গতিব মধ্যে ঘুরিয়া মরিয়াছে, যেখানে
মজল করে বৃহৎকর্ণে আপনাকে বাস্তব
করিতে পারে নাট, সেখানেই ত অংশে
নিদারুণ প্রাণের প্রলম্বাঘাতে সেই ভীষণ
প্রেমের নাগপাশ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।
নিজের চেতনের অর বিশ্বদর্শনের অরকে
অস্তিত্বাত্মক আচ্ছন্ন করিয়া নিজেকেই যদি
একান্ত প্রবল করিয়া তোলে তবে সেট
তোগত মুহূর্তই ন্যায়তর! বিপিনেব মনে
হইতে লাগিল, নাত্তবিকই যদি সে মালতীকে
ভালোবাসিয়া থাকে তবে তাহাকে পবিত্র
রাগিয়া স্মরণ রাখিয়াই ভালোবাসিতে
হইবে, নিজেদের বাসনার পক্ষে আত্মাকে
আচ্ছন্ন বিমলিন করিয়া নহে।...কিন্তু
মালতী বড় স্নেহ! এই 'অন্তিম বসন্তের
একগাছি মালা' কি একনিমেষ অন্তর্যুকে

তুলিয়া লওয়া অসম্ভব হইবে? 'যে মিলন
স্বপ্নাত্মক মুক্তার মতন।' তাহার কি স্বপ্না
মিটিবে না? জীবনযুদ্ধে যে জট বাধিয়া
থাইতেছে, তাহা কি ঘুগিবে না?...না না,
ও বিষয়ে আর ভাবনা বুঝা—

'একি দ্রব্যানাম বসন্ত হারগো উদয়,
চোখী ছাড়ু এ মিলন আছে কোনখানে।'
বিপিন পণ চলিতে চলিতে চক্ষু সূত্রিত
করিয়া বলিতে লাগিল—জরুদেব, জরুদেব,
অজ্ঞানভিত্তিমিরাক্ষকে পথ দেখাও, পথ
দেখাও।

ভাবপর হাত মোড় করিয়া অগাম
করিতে করিতে বলিল—

অজ্ঞানভিত্তিমিরাক্ষ জ্ঞানানন্দ-পলাকরা
চক্ষুস্রবীণিতঃ যেন তপৈঃ ঐতর্যবেদমঃ।

ক্রমশঃ

চাক বন্দোপাধ্যায়

নবাব

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দশ সকার

মহাদেবের সহিত পথে সেদিন দে
কাণ্ডটা ঘটয়া ঘাইবার প্রায় সাত দিন
পরে নবাব ডিউকের আসায়ে চলিলেন।
সেদিন বৃহস্পতিবার। এ কয়দিন ইচ্ছা
পাকিলেও নবাব ডিউকের ঘরে হাজিরা
দিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে ছিলেন। সে
বটনা পল্লবিত হইয়া ডিউকের কানে নিশ্চয়ই
পৌছিরাছে। ডিউক অত করিয়া নিবেদ
করিয়া দিবার পক্ষও নবাবের বৈয়াক্তি

যটা ঠিক হয় নাই। ডিউক ইহাতে
নিশ্চয়ই অশান্ত হইয়াছেন। এই অশান্ত্যের
মাত্রাটা টাটকা থাকিতেই ডিউকের সঙ্গে
দেখা করিতে নবাবের সাহস হইল না।
অথচ না দেখা করিলেও নয়! লি-মার্কার
তাহার রিপোর্ট লিখিয়া শেষ করিয়াছে,
শেফের বৃথে এ সংবাদটাও রাষ্ট্র হইয়াছে।
সে রিপোর্টে যুক্তি বত না থাকুক,
নবাবের বিরুদ্ধে তীব্র অপবাদের ভাষা যে
প্রচুর সঞ্চিত আছে, এ খণ্ডটুকুও
নবাবের কানে উহার ছই চারিজন

অধিকারিত চিঠিবী বন্ধ অজ্ঞানপূর্ণক
তুলিরা ঘাটেতে ভুলেন নাট! এখন নবাবের
পক্ষে ডেপুটি নির্বাচিত হওয়ার অশা
খুবই কম—তবে ডিউক মোরা তাঁহার
সহায়! কায়েত নবাব হাল ছাড়িতে
পারেন নাই। আজ তাই সব বিধা নন
হইতে বাড়িয়া ফেলিয়া নবাব ডিউকের
আশায়ে চলিয়া ছিলেন।

আসাদের অধুর পথে অসংখ্য গাড়ী!
গাড়ীর সারি আসাদ পর্ষদ লাইন-বন্দী
দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সে গাড়ীর ভিড়ে
নবাবের গাড়ীর গতি মন্থর হইয়া পড়িল;
নবাব বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন। তাই
ত। এ যে অসংখ্য গাড়ী! বাপরে
কি! কোন মজলিসের আয়োজন হইয়াছে
না কি! কৈ, নবাব ত কোন সংবাদ
পান নাই! তবে কি তাঁহাকে—? না, তাহা
হইলে আজ আর যাওয়াটা ঠিক হয় না।
গাড়ী কিমানো যাক! একটা উদ্বেগে
নবাবের বুক কাঁপিয়া উঠিল। নিজের
উপর রাগও ধরিল। সেদিন মশারকে
উপেক্ষা করিলে কি ক্ষতি ছিল! তাকে
চাবকাইয়াও ত বিশেষ কোন লাভ হয়
নাই। ক্ষতি যেটুকু করিবার তাহা ত
সে করিয়াছেই। লি-মার্কারের কলমের
একটি খোঁচায় নবাবের সমস্ত জীবনটাই
বিপর্যাস হইয়া গিয়াছে। তবু ডিউক
তাঁহার সহায় ছিলেন! মশারকে সেদিন
চাবকাইবার ফলে সেই ডিউক আজ
তাঁহার উপর বিরূপ হইলেন—এতখানি
বিরূপ যে, মজলিসে তাঁহাকে একটা ডাক
দিতেও জুলিয়া গেলেন। অহুশোচনীয়

নবাবের সমস্ত
লাগিল।

তিনি কোচম্যানকে গাড়ী ফিরাইতে
বলিবে, এমন সময় ছুইজন পলিকের
কথা তাঁহার কানে গেল। ছুইজনেরই
মুখের ভাব বিশেষ উদ্ভিগ্ন। একজন
কহিল, “এ বাজা তাহলে রক্ষা পাওয়া
দায়!” অপর জন কহিল, “তা আর বলতে।
কিন্তু হঠাৎ এমনটা হবে, কে ভেবেছিল!”

প্রথম পলিক কহিল, “দোবে-ওণে
ডিউক একটা মাহুকের মত মাহুব ছিল,
কিন্তু।”

এ কি কথা! তাহার অল্প—এমন
অবস্থা! ডিউকের না কি! পলিক ছুইজন
ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছে, নবাবের গাড়ীও
ডিউকের ফটকের সম্মুখে আঁসিয়া পড়িয়াছে।
নবাব মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, ফটক
হঠাৎ বাহির হইয়া ডিউকেরই এক ভূতা
লগ্নভাবে ছুটিয়াছে। নবাব তাহাকে ডাকিয়া
কম্পিত স্বরে কহিলেন, “ডিউকের অস্থখ
না কি!”

ভূতাটা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল,
“খাচেন কি না সলেন! ডাক্তারে বাড়ী অসমি
গিস-গিস করছে। কত ডাক্তারই আসছে-
যাচ্ছে! হু-একজন স্পষ্ট জবাখও দিবে
গেছে।”

সমস্ত আসাদটা যদি সেই মুহূর্তে
ডাকিয়া নবাবের মাথার পড়িত, তাহার
অবস্থাও বুঝি তাঁহার এত ভীত চৈকিত না।
নবাবের চোখের সম্মুখে কে যেন একাও
একখানা ঘসা কাচের পরমা তুলিয়া ধরিল
—সমস্ত বাহুদ্বা চকিতে মিলাইয়া গেল।

যুদ্ধের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল।
নবাব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গাড়ী
হইতে নামিলেন। পা তাঁহার টলিতেছিল
—নাবাব মধো যেন একখানা চাকা
ঘুরিতেছিল। কোনমতে পা-হট্টানাকে
টানিয়া আসাদের হলে আসিয়া কতানভাবে
নবাব একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।
মুখ ঘামিয়া উঠিয়াছে! কমাতে ঘাম মুছিয়া
নবাব ভাবিলেন, “তাৎপরে আমারও সব
আশা নির্মূল হয়ে গেল! সব শেষ!”

মৃত্যু আজ ডিউকের শিরে আসিয়া
দাঁড়াইয়াছে। অত্যন্ত অস্বস্তিতে ভেঁটে সে
আসিয়া দেখা দিয়াছে। রবিবার ডিউক যখন
বেড়াইয়া ক্রিস্টেন, তখন তাঁহার মাথাটা
অন্য ভাব নোদেহে চলেছিল। ক্রমে নাকী-
শলাও অদৃষ্ট বেলনার টানটান করিতে
লাগিল। সমস্ত শরীরের মধো কে যেন
তপ্ত লোহা হুটাইয়া দিতেছে, এমনই
বেদনা! বাজে নিস্তা নাই—বিছানায়
পড়িয়া সারা রাত্রি ডিউক ছটফট করিলেন।
ডাক্তার জেক্সকে তখনই খপর পাঠানো
হইল। ডাক্তার আসিয়া ঘরের ঔষধ দিলেন;
তাঁহার ফলে শেষ-রাতিটা ডিউকের কেমন
যে আসিল। পরদিন সকালে আবার রক্ত
ধসিয়া দিগন্ত আক্রোশে ফুসিয়া উঠিল।
বরফ আনো—বরফ! সারাদিন মাথা গায়ে
বরফ চাপাইয়া সে আলা জুড়াইবার চেষ্টার
কুতোর দল হিমসিম খাইয়া গেল। তবুও
সে আলা জুড়াইতে আসে না। ডিউকের
আশখানা যেন তাতিয়া গিয়া বাহির হইবে।
জেক্স হু-খড়ি ঔষধ বদলাইতে লাগিল,
কিন্তু কোনই ফল হইল না।

বাহিরে সংবাদটা তত রাষ্ট্র হয় নাই।
জেক্স ইচ্ছা করিয়াই ব্যাপারটাকে লুপ্ত
বস্তুর উড়াইয়া দিয়াছিল। ডিউকের বন্ধুর
দল, জেক্সের সে আশ্বাসে একরূপ স্থির
হইয়াই বসিয়া ছিল। পরে তৃতীয় দিন
সকালে যখন ডিউকের ঘুম ভাঙিল, চোখ
চাছিয়া ডিউক দেখিলেন, মাথার বাশিশে
রক্তের কুঁকটা দেথা স্মৃতির মতই জমিয়া
রাহিয়াছে! দাড়িতে ও ঠোঁটে শুকানো
রক্ত! তিনি চমকিয়া উঠিলেন। মানব-
জীবনের এই চরমতম দৃষ্টান্ত, রোগের
এই বীভৎসতা লক্ষ্য করিয়া ডিউকের হাত-
পা কঁদে কঁদে করিতে লাগিল। মশাত
জেক্সের শিকনে দাঁড়াইয়া এই রক্ত লক্ষ্য
করিয়া শিহরিয়া উঠিল; ডিউকের মুখের
দিকে একবার করণ পুটিতে চাছিয়া তাঁহার
অলক্ষ্যে জেক্সকে বাহিরে আসিবার অন্ত সে
ইঙ্গিত করিল।

জেক্স বাহিরে আসিলে মশাত
কহিল, “ডিউকের অস্থিটা ত এবার বড়
গুরুতর দেখছি, ডাক্তার!”

জেক্স মৃদুস্বরেই কহিল,
“আজ ভয় হচ্ছে।”

“এ রোগটা হঠাৎ দাঁড়াল কি করে?”

ডাক্তার ঈষৎ কুপিত স্বরে কহিল,
“এরই অন্ত আক্রমণ সাধনা করে আসছেন
যে! তাহলেও বরফ যখন আসে ছিল,
তখন এ সব অত্যাচার সহ্য, এখন সহ্যে
কেন? এই বদখেয়ালির অন্তই আগটা দিতে
বসেছেন।”

দারুণ হিংসার ডাক্তারের প্রাণ
জ্বলিতেছিল। কণাটার মধ্যে জেক্স

আগের সেই সমস্ত আশা মিথাইয়া দিয়া-
ছিল! জেঙ্কিন্সের আগে যেমন যা দিচ্ছিল,
তেমনই তাহার ফল ফলিয়াছে ত!

পরক্ষণেই কিন্তু হুব বদলাইয়া ফুৎকাবে
জেঙ্কিন্স কহিল, “বেচারি—বেচারি ডিউক!
“ওঃ, আমি ত কোনই আশা দেখছি না—
ম্যসিগো—”

এই “কথাটার মশার্তার প্রকৃতই বেদনা
লাগিয়াছিল। সে কহিল, “শোন, এত
বড় দারিদ্র্যের ব্যাপার নিজের হাতে রেখে
তুমি ভাল করছ না, ডাক্তার জেঙ্কিন্স এত
বাড়াবাড়ি অসুখ—অসুখ দ্বিতীয় একজন
ডাক্তার ডাকি হরনি—একটা পরামর্শ
করবারও কারও সঙ্গে দরকার য়েধ
করছ না!”

একটা নিশ্বাস কেলিয়া ডাক্তার কহিল,
“বিশেষ বল যে তাতে পাওয়া যাবে—”

সে কথার বাধা দিয়া মশাফ্র কহিল,
“তবু আমাদের মনের একটা সাধনা চাই
ত! ত্রিসে, জুন্সলিন, বুর্নার এদের একবার
এখনই ডাকা হোক!

জেঙ্কিন্স কহিল, “কিন্তু ডিউক তাতে
ভর পাবেন, না?”

মশাফ্র বিরক্ত হইল, চড়া গলায়
কহিল, “ভর! ডাক্তার, তুমি জান না,
ডিউক মোরা আর আমি, ছুজনে ভর কাকে
বলে কখনও জানিনি। হাক—মোন্স! ভর
পাবে ভেবে একটা চেঁচা-চরিত্র অবধি
আমরা করব না! আচ্ছা! না, না,
ত্রিসে, জুন্সলিন—এঁদের এখনই ডাকাও।
আমি নিজে ডিউককে বলাছি, যে আমরা
আরও পাঁচজন ডাক্তার ডাকাছি। হোগটা

কি, সকলে মিলে দেখে ধরে দিন—তারপর
সকলের পরামর্শ-মত চিকিৎসা চসুক।”

মস্যার সময় আসাদের এক নিভৃত
কক্ষে ডাক্তারদের কমিটি বসিল। পরামর্শ
গোপনেই চলিল। সেখানে একটা প্রাণীরও
প্রবেশাধিকার ছিল না। ডিউক নিজে
ডাক্তার আনাইতে মত দিরাছিলেন।
রোগের যত্না তাঁহার সহৃৎ, তবে এই
রোগ যে সাধারণ মানুষের সহিত এক
পংক্তিতে তাঁহাকে বসাইতে চাহে, এই ছুঃপই
সব চেষ্টা অসম্ভ!

তাই ডাক্তারী খেঠকে পরামর্শের আজ
এত ধুম! ডাক্তারদিগের মূখ গভীর—মুখে
কথাও মিতান্ত সংক্টিত! কিন্তু হার;
এতখানি গাভীও ডিউকের যত্না লাঘব
করিতে সক্ষম নহে, আরোপ্য দান ত
দূরের কথা!

“প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ডাক্তারের দল
গভীরতর মুখে ডিউকের কক্ষে পুনঃপ্রবেশ
করিলেন। বিচার-প্রার্থী অপরাধীর মতই ডিউক
করণভাবে তাঁহাদের পানে চাহিলেন।
না জানি, ইহারা কি কথা বলিবেন! অবাধ
মুক্ত আরোগ্যের আভাষ, না, কঠোর কঠিন
মৃত্যুদণ্ড! ডাক্তারদের নীরব গভীর দোষিরা
ডিউক কহিলেন, “আপনাদের শাস্ত কি
বলে, বলুন।”

ডাক্তারের দল অস্পষ্ট জড়িতভাবে
উৎসাহ-আশ্বাসের ছইটা মুহু বাণী বলিলেন
—টাকা খাইয়াছেন বিত্তর, তাহার বিনিময়ে
এটুকু না দিলে অর্থহীন হইবে। তাহার পর
তাঁহারা ডিউকের করকম্পন করিয়া সিগার
ধরাইয়া বিদায় লইলেন। মশাফ্র ছুটিয়া বাহির

হইয়া গেল। জেভিল ও পুরাতন ভূতা দুই ডিউকের শব্দাংশে ঝাঁড়াইয়া রহিল। ডিউক জেভিলকে ডাকিয়া একটা কথাও কহিলেন না। তিনি জানিছেন, প্রায় করিলেও লতা কথাটা। এই বাৎসরীনের কাছে হঠাতে কিছুতেই আশ্রয় হইবে না। তাই আর বৃথা কথা বাড়াইতে তাঁহার এতটুকু আগ্রহ বা ইচ্ছা ছিল না। মপাত্ ফিরিয়া আসিলে ডিউক তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া সুস্থের লিচ্ছাঙ্গা করিলেন, “তুমি আমার সঙ্গে লুকোচুরি করবে না, জানি তাই। যত কঠোর হোক, লতা কথাটা বল দেখি। ডাকারেরা কি বলে গেল। আমার আর কোন আশা নেই,—না?”

মপাত্ মুহূর্ত্তের অন্ত বিরতাবে ডিউকের পানে চাহিয়া রহিল; তারপর উজ্জ্বলিত করে কহিল, “কোন আশা দেয় না, ওরা, মোরা।”

ডিউক অবচলিতভাবেই এ কথা শুনিলেন, শুধু কহিলেন—“হঁ—” তারপর চেটাসকেও একটা দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার বুকের মধ্যে হঠাতে ছুটিয়া বাহির হইল। আশা নাই। তাহা হইলে প্রস্তুত হইয়া লও।

তারপর চকিতে ডিউক দেখিলেন, জীবনে বাহা কিছু তাঁহার প্রায় ছিল,—ক্ষমতা, সম্মান, ঐশ্বর্য—এই বিপুল সমারোহ, সব কোথায় সরিয়া গিয়াছে! সেগুলো আর তাঁহার আশ্রয়ে নাই—অতীতের সান্নিধ্য হইয়া পড়িয়াছে! এত বড় আঘাতের বেগনা এড়াইতে অনেকখানি শক্তির প্রয়োজন। সে শক্তি যেন সকলই কোথায় অন্তরিত হইয়া গিয়াছে। এত ঐশ্বর্য, এত ক্ষমতা

কিছুই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। হারের মাহুষের অক্ষম দুর্জয়তা! ভিতরটা তাঁহার অশ্রুর সাগরে ডুবিয়া গেল। কিন্তু না, এ শেষ মুহূর্ত্তে কেন এ কাতর অশ্রু! যে মৰ্ণলইয়া আত্মবন তিনি কাটাঁইয়া দিয়াছেন, আজ কেন সে মৰ্ণকে দূর করিয়া দিবে ন? লোকে দেখিবে, ডিউক কাতর হইয়াছেন! না, তাহারাই আসিবে। ডিউকও তবে সাধারণ মাহুষের মত মৃত্যুর নামে ভয় পায়। না, কখনই নহে। জীবনে দর্শকের যে ডঙ্কা সমানে বাজাইয়া আসিয়াছেন, এখনও সেই ডঙ্কা বাজাইয়া মৃত্যুর হাতে তিনি আত্ম-সমর্পণ করিবেন। মৃত্যু ত আসিবেই—ঐ বাগানের অলংকা গাছের একটি পাতা, একটি পল্লবও না ভাঙ্গিয়া, মৰ্দ্দন-সোপানে স্থবক্ষিত মূলগাছগুলার মূলের একটি দলও ছিন্ন না করিয়া মৃত্যু তাঁহার কঠোর কর বাড়াইয়া আসিবেই। নীরবে চরণ ফেলিয়া, কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলা না ঘটাইয়া সে আসিয়া ডিউকের শিরসে ঝাঁড়াইয়া বলিবে, “এল।” তখন বাইতেই হইবে! কেহই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। সর্ব্বই বিসর্গও নহে। ডিউক তখন চোখের জল ফেলিবেন? না। ডিউক বালিলে চোখ মুছিলেন, একবার শিরসের পানে চাহিলেন, মনে মনে বলিলেন, আমি প্রস্তুত—ওগো মৃত্যু, প্রস্তুত—চল, কোথায় লইয়া যাইবে। তাঁহার মত মাহুষের পক্ষে ইহাই ত বোগা ভিরোধান—কিন্ন, অবচল, অতর্কিত।

ডিউক মপাত্কে ডাকিয়া কতকগুলি নামের তালিকা দিলেন, ইহাদিগের সহিত

তিনি একবার শেষ দেখা করিতে চাহেন। তখনই তাণ্ডারের কাছে লোক ছুটিল। তারপর জেকবিসকে তিনি কহিলেন, “কালকের দিনটা বেঁচে থাকব কি না, বলতে পার, ডাক্তার ? একটু যেন বল পাড়ি। কিন্তু “এ বলটুকু কতক্ষণের মজা ?”

সুই একবার অগ্রসর হইয়া কহিল, “ডাক্তার একবার আসতে চান—তিনি বড় অধির হয়ে পড়েছেন।”

ডিউক কহিলেন, “পোড়ার, একটু অপেক্ষা করতে বল। এ-নিককার কাজ-গুলো এতবার শুদ্ধিয়ে নি, আগে—” তারপর ডিউক বলিলেন, “মপাভ, ঐ ডরারটা খোল। ওতে বস চিঠি-পত্র আছে, সব বার করে আবার দমনে পুড়িয়ে ফেলো। না, ওখানে হবে না—অনেক চিঠি। বাইরে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলো; তুমি হাতির খেকো, দেশো, সমস্তগুলো যেন ঠিক পোড়ানো হয়—”

জেকবিস দুই পা আগাইয়া আদিয়া কহিল, “চলুন, আমিও নয় সাহায্য করছি। চটপট হয়ে যাবে’খন।”

ডাক্তার খুঁসিয়া চিঠির একটা প্রকাণ্ড ডাক লাইয়া মপাভ ও জেকবিস বাহিরে আসিল। রক্ত বেরঙের খাবে মোড়া অসংখ্য চিঠি! এখনও মধুর পুষ্প-স্রবস্ত্র তাহাদের অঙ্গে মাথানো রহিয়াছে—সবগুলোই প্রেম-পত্র! কোনটাতে কোন সাহসিকা আপনাব প্রাণের ব্যাকুল নিবেদন ঢালিয়া দিয়াছে, কোনটা বা উপেক্ষিতা অভিমানিনীর মৃদু তৎসনার স্রোত ভরা! জেকবিস চিঠি বাছিতেছিল—এবং মপাভ আগুনে ধরিয়া

তাহার সংকার করিতেছিল। সেই অবসরে ঈষৎ সতর্কভাবে দুই-চারিখানা চিঠির উপর চোখ বুলাইয়া লটতে জেকবিস জ্বলিয়া যায় নাই। যেন পুষ্প-স্রবস্ত্রের মধ্যে তাহার কি দিগ্ধ স্রব তাহা উঠিয়াছে! যেন এ গোলাপ-কুঞ্জের মধ্যে দলিয়া বিচিত্র পাবীর মল করণ কাকলী তুলিয়াছে! হঠাৎ দুই খানা চিঠি হাতে করিয়া জেকবিস চমকিয়া উঠিল। বড় পরিচিত হস্তাক্ষর! মপাভ’র পানে মৃদু কটাক্ষপাত করিয়া তাহার অলঙ্কার চিঠি দুইখানা সে পড়িতে আরম্ভ করিল। মপাভ’র সেন্দিকে দৃষ্টি পড়িল। মপাভ কহিল, “বুহে ডাক্তার, তুমি যদি এমন করে সব চিঠি পড়তে বসো, তাহলে এক মাসের চিঠি পোড়ানো শেষ হবে না।”

জেকবিসের গাল দুইটা লাগ হইয়া উঠিল। চিঠি দুইখানা আগাগোড়া পড়িয়া লইবার উৎকর্ষ নাশনা তাহার মনের মধ্যে গর্জিয়া উঠিতেছিল। তবু মপাভ’র এ কথার পর আর তাহা পড়া ভাল দেখায় না! মপাভ’র মনে সম্মেহ জন্মিতে পারে! না জানি, জেকবিস কোন্ হারামির সন্ধান করিতেছে! সে তখন সে চিঠি দুইখানা একধারে ঠেলিয়া রাখিয়া আবার মজা চিঠি বাছিয়া মপাভ’র হাতে আগাইয়া দিতে লাগিল। মপাভ সেগুলো আগুনে ধরিতে লাগিল—ঘাউ ঘাউ করিয়া চিঠির গোছা পুড়িতেছিল। তাহার সহিত কত প্রাণের কত গোপন কথা, কত মর্ম-ব্যাকুলতা, প্রেমের কত মান, কত অভিমান, বিরহের কত বেদনা,—কত পাপ, কত অভিসার, সব আজ আগুনে পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল।

জেরিক্স চঠাৎ এঠাট চিঠি হাতে লইয়া কহিল, “এটা ত ভালবাসার বাণীর নয়। এট যে কি লেখা—প্রিয় ডিউক, আমি ত ছুঁতে বসিয়াছি। দেনার ধারে বুকি সব ঘর। মান সম্বল খুঁটার লুটার। তুমি যদি—”

মপাঠ কান খাড়া করিয়া শুনিল, “সচরা সচলে চিঠিখান ডাক্তারের হাতে হাতে টানিয়া লইয়া সে ঝড়াইয়া উঠিল। এ যে তাহারই লেখা! ডিউকের অসতর্কতার সেখানেও এগুলাব” সবে মিশিয়া রহিয়াছে! চিঠিখানা আগাগোড়া পড়িবার ইচ্ছায় দেখানো হাতে লইয়া সে জানালায় ধাবে আসিল, আশিবার সময় ডাক্তারের পানে একটা তীব্র দৃষ্টি সে ফানিয়া আসিল।

জেরিক্সও এমনই হৃৎকোপে প্রতীক্ষা করিতেছিল। এট অবসরে সে চিঠি চুইখানা কি প্রাণে আপনায় পকেটের মধ্যে পুরিয়া ফেলিল। এমন সময় চঠাৎ লুইয়ের স্বব শুনা গেল। সবে সবে ডিউকের তীব্র ভৎসনার গুর—“নে, নে, বাপু, যা পারিস্ নে—মোকা, শব্দ করিস্ নে! আমার একটু বুঝাতে দে।”

মপাঠ ও জেরিক্স তাড়াতাড়ি ছুটিয়া ডিউকের ঘরে প্রবেশ করিল। গিয়া দেখে, ডিউকের ডয়ার পোলা—কতকগুলো মুত্ৰা ছড়ানো রক্তমাখা—এবং সমুখে ঝড়াইয়া লুট, তাহার মুষ্টি মুক্তার ভরা! ডিউককে নিভ্রানু দেখিয়া সে টাকাতনায়িত্তে হুক করিয়াছিল, ডিউক তাহা দেখিয়া ফেলিয়াছেন!

সে রাইট ডিউকের আত্মরক্তাঘেই কাটিল। একটু তত্বা আগে, আবার তখনই তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। ডাক্তারের ঔষধে রোগ সারিব্যব এতটুকু সন্তোষনা নাই। তবুও যদি ধরিয়া ঔষধ খাওয়ানো চলিতে লাগিল—মরণ-পথে ডিউক যাত্রা ত করিয়াছেনই—যতটা তবু তাঁহার বাতনার লাগল কল যায়!

তারপর বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে ঘুম ভাঙ্গিলে মপাঠ, কাম্বিনাক ও আরও দুই-চারিটা নিভ্রাণ পরিচিত মুখ দেখিয়া ডিউক মুক্ত হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “সচরে লোকে সব কি বলে?”

সহস্র অনেক কথাবই আলোচনা চলিতেছিল। তবে তাহার কথাটাই লোকের মুখে বেশী করিয়া ফিরিতেছিল। ডিউকের অবস্থা শব্দটান—বৃদ্ধ আর বাঁচেন না, এইটাই ছিল, সবচেয়ে উত্তেজক সংবাদ! আরে নবাব! ডিউকের মৃত্যু,—তাহার স্বর্গ, তাঁহার সর্পনাশ, ধ্বংস, তাহারও মৃত্যু! নবাব এ সংবাদ শুনিয়া বাহিরে ফোন কাতরতা দেখাটেনেন না বটে, কিন্তু তাহার মনে হইল, বুক বেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—সমস্ত পূর্ণিটাই তাহার লুপ্ত মনে হইতেছিল। বেন দারিজা, ধ্বংস ভাঙাবের নিকট মুষ্টি লইয়া নগালের চোখের সমুখে তাক্তব নৃত্য লাগাইয়া দিয়াছে!

ডিউক আর আপনাকে একটু গুরু বোধ করিতেছিলেন। নানা লোক আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া বাটতেছিল—ডিউক তাঁহা-দিগের সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছিলেন। নিদারের পূর্বে একবার শেষ দেখা।

একে একে সকলে দেখা করিয়া চণ্ডিমা গেলেন ক্রমে জাঁহ্নলের পালা আসিল। ডিউক তখন কেমন অবসর হইয়া পড়িলেন—চোখ তাঁহার মুদ্রিমা আসিল। জাঁহ্নলে ঘরে চুকিতে জেকিন্স কহিল, “আঃ, কি লোক! কাককে এ শেষ মুহূর্ত্তে ড়োলেন নি! এটুমাড় আপনারই কথা কহিলেন। এখন একটু ঝিমিরে পড়লেন।”

“আমার কথা বলছিলেন?” নবাবের ঘরে কি সে কৃতজ্ঞতার ছুর মিশানো ছিল! জেকিন্স কহিল, “হাঁ, আপনার নির্দোষের কি হল, তাই জিজ্ঞাসা কহিলেন।”

জাঁহ্নলে কৃতজ্ঞতার শির নত করিলেন। এমন সময়ে, মুতু-লোকের ঘরে দাঁড়াইয়াও ডিউক তাঁহার কথা ভুলেন নাই। হাঃ, তাঁহারই ভাগ্যদোষে আর এত বড় বিপর্যয় কাণ্ড ঘটতে বসিয়াছে।

ডিউকের সহিত দেখা করিতে আসিয়া জাঁহ্নলের একটা কথা কহিবারও সুযোগ মিলিল না—ইহাও কি অল্প দুর্ভাগ্য!

নবাব সেই ঘরে আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। মহাবৈষম্য এমন ধ্বংশ চোখে দেখা যায় না! জব্ব-হীন পারির মধ্যে একমাত্র বিনী জব্ব-বান, তাঁহার এ ধাতুমা দেখিলে পাষাণও বুঝি কাটিয়া যায়, নবাব ত মাহু! নবাব ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলেন। সিঁড়ির কাছে ভৃত্যের দল নানা কথা কহিতেছিল। কেহ বলিল, “চেষ্টা টাকা েরে গেছি। আর আমি চাকরি করছি না।” আর একজন কহিল, “আমি ডেসের কাছে থাকব।”

নবাব সে কথা কানে না তুলিয়াই হল-ঘরে দর্শক ও বন্ধুবর্গের অস্ত্র বে খাতা ছিল, তাহাতে নিবের নাম লিখিলেন। লিখিয়াই তাঁহার নম্র পড়িল, ঠিক পূর্ণেকার নামটির উপর—এ কি—এ যে হেমারলিঙ্ক! তাহার চির-মুখ হেমারলিঙ্ক! নবাব শিহরিয়া উঠিলেন—অদৃষ্টের কি ক্রুর পরিহাস, এ! তাঁহার নামের উপরই হেমারলিঙ্কের নাম? সে যেন বিজ্ঞপের হাসি হাসিতেছে!

নবাব আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। এখন তিনি কোথায় যাইবেন? ক্রাণে? বাড়ীতে? না। নবাব হোটেলের অভিমুখে চলিলেন। অত্যন্ত কুখা বোধ হইতেছিল।

হোটেল লোকের মুখে আর অস্ত্র কথা নাট; কেননাই ডিউকের কথা! ভেগ্ননে বসিয়া একটা কথা ডিউকের কানে গেল—কে বলিতেছিল, “আশা আছে বৈ কি! এর চেয়ে বড় বড় রোগ লোকের সারছে—এঁত কি! চিকিৎসার অত দুঃ!”

নবাবের প্রাণখানা আশার উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। আহা! অসমাপ্ত রাখিয়াই বিলের টাকা সম্পূর্ণ চুকাইয়া দিয়া আবার তিনি ডিউকের প্রাসাদের অভিমুখে গাড়ী হাঁকাইবার আদেশ দিলেন।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ডিউকের প্রাসাদ উজ্জ্বল আলোকে ঝলমল করিতেছে। সে যেন আশারই হর্ষোজ্জ্বল হাসির দীপ্তি। ভৃত্য-পরিজন এখানে ওখানে নিত্যকার মতই চলা-ফেরা করিতেছে। দেখিলে মনে হয় না, এ গৃহে কোন ভীষণ মর্দ-ঘাতী নাটকের অভিনয় চলিতে পারে!

নবাবের বিষয় চিন্তে আশার অনিশ্চয়তা
মুটিয়া উঠিল। গাড়ী হঠাৎ নামিয়া তিনি
আশায়ে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখেই
চোমার বসিয়া মপাও এবং আরও কয়-
জন লোক—আচাণ্ডাও বসিয়া রহিয়াছেন
যে! তবে কি—তবে—!

নবাব নিষ্কারিত নেত্র সকলের পানে
চাহিয়া দেখিলেন। মপাও কহিল, “ঠিক
খাপ খাবে কি না, এই হচ্ছে কথা।
তাবুন, মোবার দে-সবে বিশ্বাস ছিল—অর্থাৎ
বুঝলেন কি না—তার মত লোকের যোগ্য
আয়োজন—”

জিজ্ঞাসের বৃত্তি ফল্গু করিয়া উঠিল।
তাহা হইলে সব শেষ! মপাও কহিল,
“এই যে নবাব বাহাদুর। আমাদের এখনই
সকলকে পদ পঠাওয়ার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।
ঘেরা করা ঠিক হবে না। কাল সকালেই

কবরের ব্যবস্থা হয়েছে। ডিউকের ইচ্ছাও
তাই ছিল। ডিউকের যোগ্য আড়ম্বর-সমারোহ
চাই—সেই কথাই হচ্ছে! কত গাড়ী, কত
লোকজন সঙ্গে যাবে—”

নবাবের কানে আর কোন কথাই
প্রবেশ করিল না। সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড
তাহার চোখের সম্মুখে একটা নীল
গোলকপটে রূপান্তরিত হইয়া গেল।
নবাব মাপার হাত দিয়া নিকটবর্তী একটা
চোমার বসিয়া পড়িলেন। ভিতর হইতে
একটা তীব্র দীর্ঘনিশ্বাস তৈলিয়া বাহির
হইল—সে নিশ্বাসের শেষে মপাও'র মুখের
কথা মুখেই রহিয়া গেল—তাহার মনে
হইল, নবাবের প্রাণবায়ুটুকুও যেন সে
নিশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া গিয়াছে!
নবাব মূর্ছাকৃত হইয়া পড়িলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রিন্সেসমোহন মণোপাধ্যায়।

চয়ন

নাট্যকার ব্রায়ো

অধুনিক কবিতা মনোবিদ্যার মধ্যে
নাট্যকার ও সমাজতত্ত্ববিৎ ইউজিন ব্রায়োর
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি Ibsen,
Heyenmans, Echegaray, Shaw এবং
Galesworthyর দ্বারা বাস্তবদর্শী। তিনি
একাধারে ভাষ্যকার, জননাট্যক এবং উপদেষ্টা।
ইনি সমাজদোষের ব্যাধি আবিষ্কার ও তাহার
প্রতিকার-সাধনে সর্বদাই বৃত্তবল বটে—কিন্তু

উহা লইয়া তিনি কখনও নীচ বিদ্রূপ বা
অ-পুণি-তাই করেন নাই।

ব্রায়োর রচনার ইংলেন্ডের রচনা অপেক্ষা
অধিক ব্যক্ত-বৈশিষ্ট্য এবং পার্শ্বাঙ্গ ন'র অপেক্ষা
অধিক কোমলতা আছে। Hauptmannএর
ভুলনার কথিত্ব তিনি নিকট বটে,—কিন্তু
দৈনন্দিন জীবন-চক্রের তাহার শক্তি অধিক।

Adolphe Brisson সম্প্রতি ইহার

সবকে নিশিরাছেন,—“অগতঃ বাপি ও দ্ব্যর্থ্য প্রভৃতির ভিতরে ইনি নিশিরাছেন বটে—কিন্তু নিজে তাহাতে মিশ্রিত হইয়া পড়েন না। শরীর ও মনের বাহ্য ইহাঁর রচনার পূর্ণাঙ্গের বিরাজমান।”

ত্রাঁগো প্রায় ২০ পানি নাটক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম নাটক Blanche প্রায় বাইশ বৎসর পূর্বে রচিত হয়। শক্তিমান নাটককার বলিয়া এখন তাঁহার খ্যাতি ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। লরেন্স আরভিং ইহার “Three Daughters of M. Dupont” নাটক অভিনয় করাইয়াছেন। ইহাঁর রচিত করণরসায়ক উৎকৃষ্ট নাটক ‘Les Avaries’ বানার্চ’ল’ কর্তৃক অনুদিত হইয়া ‘Damaged Good’ নামে অভিনীত হইয়াছে।

এই ধরণের নাটকে ত্রাঁগো সমাজ-ব্যাপি সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন;—উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষা লটরাই তিনি ইহাঁ করিয়াছেন—বাহ্যতে রোগের প্রতিকার হয়, এই তাঁহার ইচ্ছা।

নারীজাতির উপর ত্রাঁগোর সমধিক সমাদরতা দেখা যায়। পুরুষের দুর্ভাবহার ও স্বার্থপরতার অজ্ঞ নারীর কষ্ট দেখিয়া মর্মান্বিত হইয়া, বাহ্যতে এই অভ্যাচারের উপশম হইতে পারে, তজ্জ্ঞ তিনি সর্গদাই ঘটাইল। তাঁহার আধুনিক নাটক ‘La Femme Seule’ পারির ‘Theatre Du Gymnase’এ অভিনীত হইয়াছে। ইহাতে আধুনিক নারীদের মধ্যে বাহ্যেরা যেচ্ছায় বা বাধ্য হইয়া জীবিকাার্জনের অজ্ঞ কর্তৃকোজে প্রবেশ করে তাহাদের দৈনন্দিন কষ্ট ও

যাতনা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

এইরূপঃ—

নাটকের নায়িকা আশির বয়স তেইশ বৎসর। সে সুন্দরী, হৃৎকরা ও উচ্চশিক্ষিতা; তাহার অবস্থাও স্বচ্ছল। রেনী নামক যুবকের সে বাক্দস্তা! যুবক আসিঁকে খুব ভালবাসিত—আসিঁও যুবকে ভালবাসিত। আসিঁর বাপ মা ছিল না বলিয়া সে তাহার দর্শনিতার সহিত বাস করিত।

চাঁৎ এই সৌভাগ্য হইতে আসিঁ দারিজো পতিত হইল—বাক্স ফেগ হওয়াতেই তাহার এই দুর্দশা। কত্যা দরিত্র বলিয়া রেনীর পিতামাতা সন্তানের এ বিবাহে আপত্তি করিলেন। যোতুকহীন কস্তার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া কি লাভ? রেনী নিজেও উপাঙ্গনকম নহে—বিবাহ করিয়া কোথা হইতে সে পরচ টালাইবে?—অধু ভালবাসিয়া স্ত্রু আর পেটের ক্ষুধা মিটিবে না!

আসিঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—সে উপাঙ্গনে সক্ষম, নিজের জীবিকা স্বচ্ছন্দেই সে সংগ্রহ করিতে পারিলে। তাহার আশ্রয়-দাতারা নিজেদের পল্লী-ভবনে উত্তিগা গেলেন। আদি তাহাদের তারবন্ধপ হইয়া থাকিতে অস্বীকার করিল। সে হির করিল, পারিতে থাকিরাই তাহার জীবিকা সংগ্রহ করিবে। যে দৃষ্টে সে আশ্রয়দাতার নিকট এই সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া বলিতেছে—নাটকের সে দৃষ্টটি অতি সুন্দর।

আত্মনিবাস ও উচ্চ সঙ্কল্পে ছদ্ম তাহার পূর্ণ—সাহিত্য ও ইতিহাসের জ্ঞান তাহার প্রচুর। তাহার ইচ্ছা, সে তাহার বন্ধুর পরিচালিত “La Femme Libre” পত্রিকার

একজন নিয়মিত লেখক হয়। কারণ, পত্রিকা সম্পাদক তাঁহার পূৰ্ণ প্রকাশ্যের মধ্যেই লিখাতি করিয়াছিলেন।

কিন্তু আসি' ক্রমে দেখিল, সম্পাদকেরা সখের লেখকদের প্রতি এবং অর্থপ্রদানী লেখকদের প্রতি একরূপ বাহ্যিক করেন না। আরও দেখিল, সম্পাদকের চক্ষু কি নির্মমভাবেই অজ্ঞের চরিত্রের আচরণকে পরখ করিয়া থাকে! যা হোক, কোনরূপে দিন চলে যেমনি সামান্য একটি কাজ সে ভোগাড় করিয়া লইল।

জারভীর সঙ্গী রসিকতা, আসি'র সহকর্মীদের চরিত্র-চিত্রনে সুন্দরভাবে প্রকাশ পাউয়াছে। Mlle Mewicr's চরিত্রে মহত্বের ধারা নিপুণভাবে দেখানো হইয়াছে।

ক্যারোলাইন লিগ্রাও একজন সাক্ষাতিষ্ট রমণী;—পুরুষকে তিনি স্তরনক ভুগা করেন। কিন্তু তিনি তাহাদের পরিচ্ছদ, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অত্যন্ত প্রিয় চক্ষে দেখেন। এটা লটরা হাসির কোঠারা ছোটানো এবং তিলকে ভাল বানানো নাট্যকাব্যের পক্ষে কঠিন নয়। কিন্তু ইহাদের আতিবাহ ও উর্দ্ধ্বতর মধ্যে চরিত্রকে সহাসুভূতি-সিক্ত করিয়া তোলা অত্যন্ত কঠিন। হ্র'এক লাইনে ক্যারোলাইনের পুরুষ-বিষয়ে কেমন কুটিয়া উঠিয়াছে :—

"আসি—ক্যারোলাইন লিগ্রাও!—থুন একটা ভাল ধর আছে—তুলে তুমি তারী পুণী হবে।

ক্যারোলাইন।—কি, সব পুরুষগুলো একেবারে নিকাড় হয়ে মরে গেছে নাকি?"

আসি' যে সংবাদপত্রের কর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতে ভাল ভাল লেখা থাকা সত্ত্বেও কাগজখানি স্থলরূপে পরিচালিত হইতেছিল না। পরিচালকগণ ব্যয়-সংক্ষেপের জন্য কর্মচারীদের বেতন কমাইবার সঙ্কল্প করিলেন।

আসি' কর্মভ্যাগের সঙ্কল্প করিল; কারণ এ বেতনে যেমন-তেমন, তাহেও তার পেট চলিবে না। তাঁহার সংকল্পের কথা শুনিয়া সম্পাদক আসি'র প্রতি অহুগ্রহ দেখাইয়া তাহাকে পূর্ববেতনে রাখাই মঞ্জুর করিলেন।

তাঁহার প্রতি এই অহুগ্রহে আসি' মোটেই সন্তুষ্ট হইল না। সকলকে বঞ্চিত করিয়া তাহার প্রতি এ অহুগ্রহ কেন? এইখানে নাটকীয় ঘটনা সম্পূর্ণ বিকাশলাভ করিয়াছে। তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায়, আসি' বেশ ভাল কাজ পাউয়াছে। যেমনিও এখন কাজের ভোগাড় করিয়াছে। কিন্তু আসি'র উর্দ্ধাঙ্গা তখনও শেষ হয় নাই। ভ্রমজীবী সম্প্রদায় সহসা নারীজাতির উপর বিরোধ ঘোষণা করিল,—নারীদিগকে কর্মচ্যুত করিতে হইবে।

শেষ অঙ্কে নাটকীয় ঘটনার বিকাশ অন্নই হইয়াছে। কিন্তু কলোপকথনে জারো তাঁহার অতীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন। পুরুষের প্রতিবন্দীরূপে নারী কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে—পুরুষের তাহা সহ্য হইবে কেন? নাট্যকার এই সমস্ত-সম্বাদনের সুন্দর ইচ্ছিত দিয়াছেন।

আসি' কার্য ভ্যাগ করিয়া পারিতে যেমনির সঙ্গে যোগ দিতে গেল। তাহার

শেষ কথাই নাট্যকাব্যের নিম্নেরই মত বিবৃত হইয়াছে :—নবনারীর এই গৃহে পুরুষেরই পরাক্রম অবশ্রম্যবী; তাহণ পুরুষের চেয়ে নারী অধিক তুষ্টি, পুরুষের মত বাজে খরচ তাহাদের নাই—অতিরিক্ত শ্রবণ পাটরা মদের দোকানে শুঁড়ির পেট মোটা করিবার আশ্রয় তাহাদের নাই। নগরের - যুবক-সম্প্রদায় বাহ্যিক, বিনা পণে বিবাহে নারাজ, তাহারা পরে এতদন্ত অতন্ত চাইবে; কারণ তাহারাট নারী-আত্মকে সংসারের কটে চালিত করিয়াছে।

যে সকল পুরুষ মদের খোরাক যোগাইতে

যোগাইতে এবং নিজেদের বাজে ব্যয়ে বিবাহের সামগ্ৰী হারাইতেছে, তাহাদের হইয়া নারীদেরও জীবিকার সংগ্রহ করিতে হইবে; কল-কারখানা, দোকান, অফিস সর্বত্রই তাহাদের কর্ম-চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

পুরুষ তাহাদিগকে গৃহিণী করিবে না। অতএব, নারীরাও শ্রমজীবী হইবে। এ স্থলে প্রতিবন্ধিতা অবশ্রম্যবী।

এই নাটকে আমি ও যেনীর ভূমিকাই প্রধান বিষয় নহে—নারী ও শ্রমজীবী-সমস্যা এই নাটকের মূল ভিত্তি। এই নাটকের ঘটনা-প্রবাহ—বাস্তব জীবনে দৃশ্যমান নহে।

ক্রীড়ানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

হগোর প্রণয়-কাহিনী

অমর কবি ভিক্টর হগোর সহিত জুলিয়েত ড্রউতের প্রেমের কাহিনী সাহিত্য-রসিকের কাছে পরিচিত। সংগ্রহিত জুলিয়েত ড্রউতের লেখা কথানি প্রেম-পত্র বাহির হইয়া সেই প্রেম-কাহিনীর সঙ্গে আরও গুটিকরেক নূতন পরিচ্ছেদ জুড়িয়া দিয়াছে।

১৮২৯ ও ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে আঁকা, ভিক্টর হগোর দ্ব্যানি তৈল-চিত্র আছে। ঐ ছবি দ্ব্যানি দেখিলে, হগোর চেহারা তিনটি-মাত্র বছরের ভিতরে বদলাইয়া কি-রকম খারাপ হইয়া গিয়াছিল, তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। এই আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ কি? কারণ,—তাহার সধবন্দী এবং বন্ধুবান্ধবের বিশ্বাসঘাতকতা। চিত্র-

বেদনায় অস্থির এবং প্রেম ও বন্ধুত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া ভিক্টর হগো এই সময়ের একখানি চিঠিতে লিখিয়া ছিলেন :—
“আমি আমার মনের আবেগেই বেঁচে আছি। হৃৎ-হঃথে, প্রকাশ্যে-নিভুতে আমার জীবনের আলল কামনা হচ্ছে, ভালবাসা।.....যাকে আমি আমার সমস্ত প্রেম সমর্পণ করছি, সে যে আমার দিকে কিবে না-তাকালেও না-তাকাতে পারে, এটা আমি এতদিনে খুব-সম্ভব বলে বুঝতে পেরেছি।”

হগোর জী দেখিতে পরমা সুন্দরী হইলেও তাহার কোনরূপ রুচি বা সজ্জা-মৈপুণ্য ছিল না। তিনি তাহার প্রতিভাবান স্বামীর মরমের মরমী বা মরমের মরমী ছিলেন

না। "সুগল আত্মার অমর্যোগেব বিমল
মিলন মঠো আরম্ভ হয়, অর্গেণ্ড তাতাব
অবসান নাহি।" - এট যে প্রেমের একটা মতে
আদর্শ হুগো তাঁর প্রাণের মধ্যে গড়িয়া
তুলিয়াছিলেন, সে আদর্শ হঠাৎ তাঁর
জী মূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি কান-
তেন শুধু টাকা—চাছিলেন শুধু টাকা!



ভিক্টর হুগো
(১৮২২)

হুগোব দ্রো, কবির এক পত্রব সঙ্গে এক-
ঘোট চটয়া তাঁহার প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকের
ব্যবহার করিয়াছিলেন, কবি তাঁহা ঘৃণা-
ভরে দ্রবণ রাখিয়াছিলেন। এইসকল নানা
কাবলে হুগো শেষে বাধ্য হইয়া অপর
রমণীর আকর্ষণের মধ্যে তাঁহার চিরকাল
প্রেমকে পুড়িতে লাগিলেন। প্রাণে

চিতার আঙনু আলিয়া
কোন্ কবি নিঃশব্দ
অধকার কামাগারে
কয়েদী হইয়া থাকিতে
পারেন?

১৮২২ খৃষ্টাব্দের
২৩শে মে তারিখে,
এক নৃত্য-অভিনয়ে হুগোর
সঙ্গে জুগিয়েত ড্রুইয়ের
প্রথম দেখা। জুগি-
য়েতের স্কপের শিখা
ছিল এমনি উজ্জল ও
প্রগর, যে হুগো তাঁহার
সহিত আলাপ করিতে
ভরসা পাইলেন না।
ভরমাস পেরে হুগো আবার
অভিনেত্রী-রূপে জুগি-
য়েতের দর্শন লাভ করি-
লেন। হুগোর একজন
চেন' লোক তাঁহাকে পরা-
মর্শ দিলেন যে, তাঁহার
নাটক Lucrice Borgia
হইতে জুগিয়েতকে একটি
ভূমিকা দেওয়া হউক।
হুগোর পক্ষে এই

৩৯শ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।

পরামর্শ 'পেটুককে ভাত পাঠতে বসার' মত পাড়াইল। তিনি তখন বাকার পাঠা জুলিয়েতকে একটি ছোট ভূমিকা দিলেন।

এই পরিচয়ের স্বতঃস্ফূর্ত হইতে উহার। এইজন্যে যে সম্বন্ধ-বন্ধনে বান্ধা পড়িলেন, পরবর্তী পক্ষাশ বঙ্গবরের মধ্যেও সে বান্ধন চিগা হয় নাই। জুলিয়েতের বৃদ্ধার পূর্ণাঙ্গ পণ্ডিত হগো সমস্ত জুলিখা উাহাকে কায়মনো-বাক্যে ভালবাসিয়া ছিলেন, জুলিয়েত ছাড়া পৃথিবীর আর কোন ভাবনা তিনি ভাবিতেন না। মগতের কঠোর বাস্তবতার মধ্যে এমন অমর-অক্ষর প্রেমের অগ্নি, আর কাহারো জীবনে ধোর করি, সকল হইবার অবকাশ পায় নাই—ইহা নধুব, অপূর্ণ, অতুলনীয়।

পরিচয়ের প্রথমেই জুলিয়েত কাছে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন,



জুলিয়েত উইতে

জানি, 'তধু তোমাকেই ভালবাস্তে ; তা-ছাড়া আর সবদিকে আমি একেবারে অপরাধ!' "

কই সেণ্ট ডেনিসে ছিল জুলিয়েতের বাসা। উহার বাড়ী হইতে কিরিমার মুখে, গরি মোড়ে আসিয়া হগো সম্বন্ধে পিছনপানে চাতিতেন ; জুলিয়েতও তখন জানালাব কাছে আসিয়া কবির দিকে পলকহীন নেত্র তাকাইয়া পাড়াইয়া থাকিতেন। চারি চোখে এক হইবামাত্র, দুজনে দুজনকে ইন্ধিতে চুষনের পব চুষন বিনিময় করিতেন। পরে, কবিকে যখন আর বেগা যাইত না, জুলিয়েত তখন বিশ্বনাথে আপনাকে একাকী বড়ই একাকী—মনে করিয়া বিষয় হইয়া পড়িতেন এবং নিঃশব্দে যেমন স্বপ্নে বুদ্ধি বোঝায়, তপ্পে কথা কয়, উহারও বোধ হইত, তিনিও যেন ঠিক তেমনি স্বপ্নচালি-

তের মত বগ্ন-মগ্নে গাম করিতেছেন ! উহার চারিদিকে তখন যেন এক গীমাহীন শূন্যতা হইয়া কবিতে থাকিত এবং উহার স্বপ্নে একটিমাত্র কামনা বারবার জাগিয়া উঠিত ; সে কামনা—কবিকে মাঝে রেখিবার কামনা—অবিচ্ছেদ্য মিলনের একান্ত বাসনা ! এই প্রসঙ্গ শূন্যতা হইতে নিস্তার পাইয়া চিত্তবিনোদ করিবার বহু, জুলিয়েত

অবশেষে কবির লিখিত নিম্নোক্ত পত্র-স্বাক্ষর
প্রতী হইলেন।

ভাষ্যের লিখিত বাণী হইতে, ভাষ্যের কোন
বন্ধুর বাণী হইতে, রম্যের হইতে, হোটেল
হইতে—জুলিয়েট যখন বেগমের থাকিতেন,
তখন সেখানে হইতেই ভাষ্যের প্রিয়তমকে তিনি
পত্র লিখিতেন। ভাষ্যের পত্রের উপাদানও
ছিল বিচিত্র! যে-রকমেরই হোক না কেন,
একটুকরা কাগজ হইলেই ভাষ্যের চিঠি
লেখার কাজ চলিয়া যাইত; অনেক সময়ে
আর কিছু না পাইয়া একখানা খামের
উপরে বা খবরের কাগজের সাদা অংশে
হু-চাট কথ্য লিখিয়া পাঠাইতেন। কলম
না পেলেই না পাইলেও ভাষ্যের পত্র-রচনার
ধাঁচ একটুও দমিয়া যাইত না,—একটি
কৃষ্ণবর্ণরঞ্জিত ‘পিনে’র সাহায্যেই তিনি মনের
কথ্য কাগজে ফুটাইয়া তুলিতেন। প্রথম
ও প্রতিভা,—দুই উদ্ভাস। তাহার কোনই
মানা মানে না।

পত্রের ভাষ্যের প্রতি জুলিয়েট বড় একটা
নজর দিতেন না। ভাষ্য জাহির করিবার
জন্ত ভালবাসা কি কখনও অন্তিধান খুঁজিয়া
নয়? প্রাণে যখন আবেগ-সারর ঘোড়াল
জুলিয়া উঠে, কোন রম্য তখন ব্যাকরণ
লইয়া মাথা ধামাইতে বসে? জুলিয়েট
নিজেই বলিয়াছেন, তিনি এ-সব ঝড়োটার
ধার ধারিতেন না বলিয়াই ভাষ্যের প্রথম
জীবনের প্রেমপত্রগুলি এতটা মনেরম
হইবার অবকাশ পাইয়াছে। তাহার
সহজ সরল প্রেমের স্বরূপ-সঙ্কেত
ভাষ্য।

আমরা এখন জুলিয়েটের নব-প্রকাশিত

অংশের প্রথমের ভিতর হইতে হু-চাট-
খানি বাছিয়া দিলাম।

১

স্বপ্নবাস। হাত পাড়ে আটটা। (১৮০০)

ওগো আমার ক্ষুধে পাগল,

তোমার লেখা নকল বা তার কথা
গণ্যের আগে (জুলিয়েট মাঝে মাঝে
কবির দৈর্ঘ্যের কারণ করিতেন) আমি
এক লাইন প্রেমের কথা লিখিব। আমি
তোমাকে ভালবাসি—বুঝে গিয়াছ!—আমি
তোমাকে ভালবাসি! ভালবাসা হচ্ছে
বিশ্বাসের ব্যবসা, আমার সকল নির্ভরতা
ও কর্তব্য নিয়েই তার কাছাকাছি। আমি
তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমার বিশ্বাস
স্বপ্ন, আমি শুধু তোমাকে দেখি, শুধু
তোমার কথা ভাবি, শুধু তোমাকেই কথা
বলি, শুধু তোমাকেই স্পর্শ করি, শুধু
তোমাকেই স্বপ্নে দেখি, আমার নিখোঁস
তুমি, আমার কামনার তুমি,—এক কথায়,
আমি তোমাকে ভালবাসি! এই এক
কথায় সব কথা আছে।

অতএব, আর বেদনার মনে টলে পড়ে
না। তুমি আপনাকে ভালবাসতে দাও,
স্বপ্ন হতে দাও। আমাকে ভয় করো
না, আমাকে কখনো সন্দেহ করো না,—
দেখবে, আমরা এমন নন্দনিন্দে নন্দিত
হব, ‘বাক্যে’ বা কখন না বাক্য।

তুমি স্বপ্নে আসবে বলে আমি তোমার
আশা-পথ চেরে বসে আছি। শেষ হয়,
আমার যত্নের উত্তাপে ও কোমলতার তুমি
উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারবে।

ভাষ্যের ‘জুজু’ (১৮০০)

“তুমি চলে বাবার পর থেকে আমি বুকের মধ্যে যেন মুকুকে পুখে বেখেচি। আজ রাতে তুমি যদি বল-নাচে যোগ দ্বাও, তাহলে আমাদের মাঝে নিশ্চিত বিচ্ছেদ হবে বলে জেনে। তুমি যদি একদল মনভুগানো জুনারী রমণীর সঙ্গে ঘুরে-দিয়ে বেড়াও, তা হলে আমার উপরে অস্ত্রায় করা হয়; এটা ভাবলেই আমি কষ্ট পাট। আমার ঠিকানা “কেরার-অক মাদামকে -০-”। চিঠি লিখো। মাঝরাতের আগে তোমার চিঠি না পেলে বৃথা, তুমি আমাকে ‘খোড়াই কেরার’ কর... আবেগ বৃথানো, তোমার আমার মধ্যে সকল সম্বন্ধ বুটে গেল... হী, চিরকালের মত।—জো।”

৩

বেলা দুইটা (১৮৩০)

আমার ভিক্টর,

আমি তোমাকে লন্ডন জালবাসি এবং আমার কাছে তোমার চেয়ে অস্ত্রির লাজ অল্প কোন ব্যক্তির কথা কল্পনাতেও আসে না।

আমি তোমাকে একজন বিশ্বাসী, নির্ভরযোগ্য বন্ধুর মত দেখি। এত নম্র ও এমন মাননীয়, আমি আর কোন লোককে জানি না।

আমার অতীত জীবন যে তোমার বিশ্বাসকে আহত করেছে, এ অশুভ্য করে আমি আখ্যাত পেরেছি। তোমাকে জানবার আগে আমি বা করেছি, সেজন্যে আমি একটুও লজ্জিত নই; সে কথাকে আমি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নপ্তে বা লুকোতেও চাই না। কিন্তু, যেদিন থেকে আমি তোমাকে জেনেছি, সেদিন থেকেই আমার মনের গতি সশ নিকেই নপ্তে গেছে। আমার প্রেম যে অতীতের দাগকে মুছেতে অক্ষম, এ কথা ভেবে আমি লজ্জা-ভরে জন্মে মরি। কিন্তু আমার ভয় তপনি দেখা হইবে ওঠে, যখন তুমি আমাকে অস্ত্রায় সম্বোধ কর।

আমার ভিক্টর, তোমার প্রেম আমাকে পবিত্র করবে, আমার মাঝে একদিন বাহা নং ও শুদ্ধ ছিল, তোমার ভালবাসা আমার তাকে নূতন তের দেবে।

আমি এমন একান্তভাবে তোমাকে প্রাণ সঁপেছি যে, বা নপ্পুর তা সব সম্ভব হতে পারে। যদি তুমি আমাকে সহোদ্য কর, তবে আমি তোমার যোগ্য হব।

বিদায়। তুমি আমার আত্মা, আমার প্রাণ, আমার ধর্ম। আমি তোমাকে ভালবাসি।

জুলিয়েত।”

—Vanity Fair and Hearth & Home হইতে

ক্লশ-প্রতিভার নব-পরিচয়

বিশ্বসাহিত্যে ক্লশ-প্রতিভার এতাব্য জন্মেই বাড়িয়া চলিতেছে। অগতে মাহুষের

জীবন-যাত্রার ভিতরে ক্লশ-সাহিত্য নূতন চিত্রা, নূতন কাব্য, নূতন ঐশ্য লাগাইয়া

তুলিয়াছে। ক্রিশ্চিয়ান শক্তির ঔপন্যাসিকগণ আপনাদের সমাজের ভিতরের রূপটি এমন অকোশলে ছুটাইয়া তুলিয়াছেন যে, তাহা আর সংকীর্ণতার অঙ্কুর কাবাগারে বদ্ধ হইয়া নাই; পরন্তু, বিশ্বের সঙ্গে ছন্দ তাল ও লয় বজায় রাখিয়া বিশ্বের মধ্যে তাহা ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুদূর বাঙ্গালার নিরীহ সন্তানেরাও ক্রিশ্চিয়ান রণত্রির কসাক-খুবকের সরল স্মৃতি-ছাঘের কথা পড়িয়া এবং অপরিচিত বিদেশী কৃষক পরিবারের নিরাশা ও নির্যাতন দেখিয়া চোখের অঙ্গে বুক না ভাসাইয়া থাকিতে পারে না।

কিন্তু ক্রশ-সাহিত্যের পরিচয় কতটুকু আমরা রাখি? গোয়েলা, টুর্গেনিভ, ডোষ্টয়েভস্কি, টলষ্টয় ও ম্যান্নিম গোর্কির পুস্তক লইয়া আমরা আলোচনা ও আন্দোলন করি বটে, কিন্তু প্রধানতঃ ইহাদের সাধনার মধ্যেই সমগ্র ক্রশ-সাহিত্য সীমাবদ্ধ নহে। আগে আমরা জানিতাম, টলষ্টয়ই ক্রশ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। পরে জানিলাম, টুর্গেনিভের ঔপন্যাসিক-প্রতিভা টলষ্টয়কে ছাড়িয়া উঠিয়াছে। তারপর ম্যান্নিম গোর্কি শ্রেষ্ঠের মাত্র লাভ করিয়াছেন। সংগ্রতি প্রকাশ পাইয়াছে, ক্রশদেশে গোর্কির অপেক্ষা বড় লেখকেরও অভাব নাই। যেমন, লিওনিডাস আণ্ড্রীভ। বৈশাখের “ভারতীতে” তাঁহার জীবন ও রচনার সংলগ্ন পত্রিকা পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

আজ আমরা আর একজন প্রতিভাবান ক্রশ-লেখকের পরিচয় দিব। তাঁহার নাম, ভাসিলি নেমিরোভিচ ডান্‌কোভো। সকল দিকেই তিনি এখনকার জীবিত ক্রশ লেখক-

দের মধ্যে একজন জনপ্রিয় ব্যক্তি। একাধারে তিনি ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক, কবি, ঐতিহাসিক, ভ্রমণকারী, জীবনচরিতকার এবং মুক্তসংবাদদাতা। অথচ, এতদিন তাঁহার নাম আমরা একেবারেই জানিতাম না।

ডান্‌কোভোর জন্ম হয় ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দেী ডায়েটান ও অর্জিয়া নামক দুর্গরক্ষিত নগরবন্দ্রে তাঁহার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। তারপর, মতো নগরের “জালাক-জাশ্রুত্বি সাময়িক বিভাগলয়ে” তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করেন। কিন্তু মৈনিকজীবন অপেক্ষা সাহিত্য-জীবনের দিকেই তাঁহার আগ্রহ অধিক আকর্ষিত হইল। ফলে, কুড়ি বৎসর বয়সের ভিতরেই তিনি রচনাযুগে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যে ‘জাত-শিখরে’, ঐ লেখা-গুলি প্রকাশিত হইয়া তাহাই প্রমাণিত করিল।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ক্রশ-ভূগর্ভস্থ যুদ্ধ বাধিল। সেই জীর্ণ সংগ্রামের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁহার বন্ধু দোবেলেভের সঙ্গে রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ব্যক্তিগত সাহসের লব্ধ তিনি “Cross of St. George” নামক পদক পুরস্কার পান। রণক্ষেত্রে হইতে তিনি বদলে যে সকল পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে একেবারে বিখ্যাত করিয়া দিয়াছিল। “White General” নামক পুস্তকে তাঁহার যুদ্ধের পত্রগুলি বাহির হইয়াছিল, সে বইখান সর্বকলেরই দরদর করিতে পারিয়াছিল। আজ তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার মন এখনও যুবার মত কাণক্ষম ও সযল। বার্কফোর ভায়ে তিনি আজও মত বদলাই নাই। বর্তমান

পাশ্চাত্য কুরুক্ষেত্রে তিনি একখানি রূপ সংব্যবপত্রের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিয়াছেন।

ডান্‌চেস্কো বদিও চর্লিশখানিরও বেশী সর্বজনপ্রিয় উপজাতি লিপিয়াছেন, তথাপি ছোটগন্নেই বোধ হয় তাঁহার হাত পেলিয়াছে

গুলি। সাময়িক ব্যাপারের সঙ্গে তাঁহার যতটা আনন্দনা ততটা খুশি কম লোকেরই আছে। এই পরিপূর্ণ জ্ঞানের সহিত সাহিত্য-শক্তির সমাচার বটাতে তাঁহার যুদ্ধের গল্পগুলি বসন্ততরঙ্গ, একেবারে জীবন্তের মত নির্দোষ হইয়া উঠিয়াছে।

—Strand Magazine হইতে

প্রতীচ্যের কুরুক্ষেত্র এবং ‘জার্মান আর্ট’

এখনকার একটি প্রধান প্রশ্ন এই যে, বর্তমান যুদ্ধের কালে ললিত কলায় লোকসান, না লাভ হইবে? মিঃ উইলিয়ম ডি, হওয়েলসের মত সুপণ্ডিত ও সুপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির মতে, বর্তমান যুদ্ধ সাহিত্য-কলার গীর্জা একেবারে ভুগ্ন করিয়া দিবে। কিন্তু, জার্মান সমালোচক রবার্ট ওয়েস্ট বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

জার্মানিতে ললিত কলায় এমন যে নমুনা পাওয়া যায়, তাহাতে কালাগ্নিতের ওস্তাদী কসরৎ থাকে নানা-রকম। বাস্তবকে এখানে খুব বাহাদুরির সহিত ঠিকঠাক কলাইয়া তোলা হইয়াছে। একালের কলাবৎ শিক্ষাপটুতা দেখাইতে মজবুত হইলেও চিত্রা এবং কল্পনার তিনি একান্ত দরিদ্র।

হয়ত’ এই কারণেই এমন নিসর্গ-চিত্র ও অড়-চিত্রের ছড়াছড়ি যেমন বেশী, ঐতিহাসিক চিত্রে প্রভৃতির পরিকল্পনা ভেদনি করিয়া বাইতেছে। আজকালকার শিল্পী লাগ-সৈ উপাদান আবিষ্কার ও তাহা

পরিপুষ্ট করিবার শক্তি হইতে ক্রমেই বঞ্চিত হইতেছে। পরন্তু একালের সমালোচক, কলাবিন এবং জনসাধারণ, ললিত কলার আলোচ্য বিষয়ে আর মনোযোগ দেয় না। চিত্রার্পিত বিষয়ে ভিতরের প্রাণটি ফুটাইতে না পারিলে সকলি যে নিফল, এ-সত্যও কেহ অগ্রণ করে না। কেবল রেখাপাত, বর্ণরঞ্জন, তুলির লিখন, impressionism ও pointillism লইয়াই যে কলার কারবার নর, এ কথাটাও কেহ খুলিয়া বলে না। ললিত কলায় এই অবনতির সহিত বর্তমান সামাজিক অবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

আধুনিক কলায় ব্যক্তিগত কোন-কিছুর স্থান বড় অল্প; একালের সমগ্র জীবন-ধারণ ভিতরেও ব্যক্তিকে খুব কম আনন্দ দেওয়া হইয়াছে। মানুষের প্রতি মানুষের এমন অমনোযোগ আর কখনও দেখা যায় নাই। মানব-জীবনের বাহিরের দিক লইয়া এত নাড়াচাড়া এবং সেই তুলনায় তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রতি এত অবহেলা আর

কখনও হয় নাই। ইহার স্বাভাবিক ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, সাধারণ নর-স্ত্রীরা এবং ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি আমরা সহমর্মিতা হারাইয়াছি। এমন-কি, একালের শিল্পী যখন কাহারও প্রতিমূর্তি আঁকিতে বলেন, তখন তাঁহার ব্যক্তিত্বে প্রতি অতি সামান্য দৃষ্টি দেন।

প্রাচীন কুরুক্ষেত্রের আভিকার এই জীবন-যুদ্ধ, জাতিগত আত্মাকে ধার-করা কৃত্রিমতা হইতে মুক্তির পথে লইয়া যাইবে। মিত্রা সম্ভ্রাতার বিবাক্ত বীজ যুদ্ধের ঝড়ে উড়িয়া যাইবে। জাতিগত জাতির ভিতরে আভিও যে এই দৈব-প্রেরণার সাধনা, এই আত্মত্যাগের সাহস, এই কর্তব্যের জ্ঞান, এই নিষ্ঠাওতা, এই বিশ্বস্ততা এবং পিতৃভূমির প্রতি এই ভালবাসা হুগু ছিল, একথা এতদিন যোগেও কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই।

ফরাসীরা আমাদের ওস্তাদ। আমাদের শিল্পীরা ফ্রান্স হইতে শিক্ষালাভ করিয়া আসিত। সে ভাল কথা। জাতিগত শিল্পের পক্ষে এই শিক্ষাকাল বাস্তবিক দরকারী ও উপকারী ছিল। কিন্তু সে কাল গিয়াছে। জাতিগত শিল্পের ক্ষুদ্র আর ফরাসী আদর্শের প্রয়োজন নাই।

ফরাসী শিক্ষার শাস্ত্র অঙ্গুলরের ভিতরে আমাদের শিল্পকারী প্রায় বন্ধ হইয়া যাইবার জো হইয়াছিল। কারণ, শিল্পে আমাদের হাত যখন পাকিয়াছিল, আমরা তখন নকল ছাড়িয়া নিজেদের আসল পথটি চিনিয়া লই নাই। সুস্থানে পথের কোন চিহ্ন না পড়িলে দক্ষগণই কি আমাদের এই দশা

ঘটিয়াছিল? আগাইয়া দিবার পোনার কাঠি ছিল না বলিয়াই কি আমাদের প্রাণ লাফা দিতে পারে নাই! আমাদের শিল্প ক্রমে ক্রমে সঙ্গীর্ণ, দরিদ্র ও বিবর্ণ হইয়া পড়িল।

এই সঙ্গীর্ণতা, দরিদ্রতা ও বিবর্ণতার মধ্যে সহসা সহস্র ছন্দে সহস্র ভাবের প্রবাহ গর্জিয়া উঠিল। আমাদের ভিতরে জীবন ও মৃত্যুর গমনাগমন চলিতে লাগিল।..... —জাতিগত কবি এবং পটুগারী ক্ষুদ্র অসংখ্য উপাদান সৃজিত হইয়াছে। আমাদের বর্তমানের ইতিহাস, আমাদের জীবন শিল্পের সৃষ্টিপত্র হইবে। এখন আমাদের ঘরে কোন দাবী যুদ্ধপট নাই। হুগু এইবারে আমরা একখানি ভাল ছবি আঁকিতে পারিব। হুগু, যৌবন, ও সৈনিকের ছবি এইবারে আঁকা হইবে। নরনরোহন সমরবেশ এবং সৈনিকের ছন্দ ভাল ও লম্বের ভিতরে ললিত কলা একদিন কোন কারণ খুঁজিয়া পায় নাই; হুগু' এবারে তাহার সন্ধান পাইবে

সে সকল পটের ক্ষুদ্রপূর্ণ হইবে অলস প্রেমের পর প্রেম, ধর্ম-ভয় দুর্গের পর দুর্গ, পদদলিত শত্রুক্ষেত্রের পর শত্রুক্ষেত্র এবং হাসপাতালের করুণ দৃশ্য, হুগু ও তিন্ত অভাব এবং বিলম্বোন্মাদ অপেক্ষা গভীরতর আনন্দ, এক সহস্র ঐক্য-স্বপ্নে প্রবৃত্ত হইয়া যাইবে।

পূর্ন-ঐশ্বর্যের অধিবাসীরা এখন অপূর্ণ বর্ধমানতার মুখে পলায়ন করিতেছে এবং আমাদের পশ্চিম সীমান্তভাগে এখন রক্তের দুফান বহিয়া ফরাসী আক্রমণকে ব্যাহত

করিতেছে; আর আমাদের শিল্পভূমিকে
ধ্বংস প্রিয় দেখিতে হইয়াছে, এমন
আর কখনও হয় নাই। ইহার ফলে জার্মানি

জাতির ব্যক্তিগত আবার আমাদের সুস্থ
শ্রী-ছাঁদে কমনীয় হইয়া উঠিবে।

The American Review of Reviews হইতে

যুদ্ধের পরে জীবন ও সাহিত্য

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক চার্লস "গার্ডিস
বলিতেছেন, "সাহিত্য পেলন বলিবার বর্তমান
যুদ্ধ তাহার উপর সত্ত্বাৎ রেখাপাত করিতে
পারিবে। যুদ্ধ যখন প্রথম শুরু হয়,
লেখকদের মন তখন বেজায় কাহিল।
যুদ্ধসংক্রান্ত পুস্তক ভিন্ন আর সমস্ত পুস্তকের
বিক্রয় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পড়ুয়াদের
মতি-গতি প্রবন্ধ, কথা-সাহিত্য, বিজ্ঞান ও
ইতিহাসের দিক হইতে হঠাৎ কিরিয়। দাড়া-
ইয়াছিল। তারপর, প্রথমবার উত্তেজনা
ধীরে ধীরে থিতাইয়া আসিতে জন-
সাধারণ আবার ক্রমে ক্রমে পড়া
শুরু করিয়া দিয়াছে। শুনিতেছি, বইয়ের
খাবসায় আবার চাঙ্গিয়া উঠিতেছে এবং
কতকগুলি বই আবার পূর্নকার মতই
বিকাইতেছে।

খাটি সাহিত্যের দিক হইতে দেখিলে
বলিতে হয় যে, এখন ও শরের ছতিন
বছর ধরিয়া যে-সব বই লেখা হইবে,
যুদ্ধের ফলে তাহাদের হার ও গুণ
বদলাইয়া বাইবে। যুদ্ধারম্ভের পূর্নকণ পর্যন্ত
এবং অভ্যন্তর কিছুকাল হইতে যে-সকল
উপন্যাস লেখা হইতেছিল, তাহাদের প্রতি
খুঁটিনাটিটি অবধি লেখকের চোখ এড়াইয়া
যায় নাই; জীবনের দুচ্ছ ও কণিক

ব্যাপারটি লইয়াও সে-সকল উপন্যাসে তত্তত
করিয়া দেখা হইয়াছে।

এমন সময় সচসা অসিতে অসিতে
কল্পনা বাজিল, আরহের আর্দনাগ উঠিল
এবং মরণ কাসিয়া কালো ভায়ার আঁপার
চালিয়া দিল। পৃথিবী এখন তাহার উদাস
পরিহার করিয়াছে। এ-সময় ছোট-কিছুতে
কাগারো মন মটিতে পারে না।

লড়াইয়ের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া লোকে
আবার কথা-সাহিত্যের দিকে ফুঁকিয়াছে
বটে,—কিন্তু আমার বিবেচনার ভবিষ্য
কথা-সাহিত্যের ধবংস-ধারণ হইবে আলাহিনা
মক্কেম। বাজে যা তা গল্প, সামান্য
খুঁটিনাটি লইয়া তিলকে তাল করিয়া
বিরক্তিকর আলোচনা, ভবিষ্যতে কেহ
চাহিলে না। আমাদের উপন্যাসে আমরা
তখন একটা মেরুও চাহিব। নিছক প্রেম
আমাদিগকে তৃপ্তি দিতে পারিলে না।
আকাশ-বাতাসে অশান্তি;—মাঝেবে পব-
সেগ ও আশ্বত্যাগের কল্প চেষ্টার কাহিনী
এবং উচ্চতর জীবনের জন্ত তাহার অন্ধ
অথচ উদ্দেশ্যমূলক চন্দর-সংগ্রামের কথা
চিন্তিবার কল্প এখন আমরা আগ্রহ প্রকাশ
করিব। অবশ্য, আমি আমার মন-গড়া
কথাই বলিতেছি; কিন্তু, একটি মতে
অনেকটা বিশ্বাস করা যায় :—উপন্যাসে

কেহ যুদ্ধ জিনিষটাকে দেবিস্বার, দানি করিবে না। এই মতের গোড়াপত্তন, পূৰ্ব্ব অভিজ্ঞতার উপরে; যুদ্ধের যুদ্ধের পরে সকল ঔপন্যাসিকই বুঝিয়াছিলেন যে,—অস্ত্র বাহ্য-কিছু লেখা হোক না কেন,—যুদ্ধ যুদ্ধ লইয়া কোনকিছু লেগা ঠিক নহে।

আজিকার এই মৃত্যুশীলার উদ্বোধন আঘাত হইতে যখন আমরা মুক্তি পাইব, আমাদের অস্ত্রের কাণ্ডগুলি যখন আমরা জ্বালায় দগ্ধা বধাসাধ্য সংশোধন করিব, পাপী ও কৃত্যচাৰীকে যখন আমরা দণ্ড দিতে পারিব, তখন যে মহাভীতির ভিতর দিয়া আমরা চলিয়া আসিয়াছি এবং যে যন্ত্রণা আমরা সহ করিয়াছি, তাহার কথা আমরা বত-কম-পারি অনিতে চাহিব,—বত-কম-পারি পড়িতে চাহিব।”

ভদ্র, এল, অৰ্জ্জ বসিতেছেন :—

“যুদ্ধের পূৰ্বে যে-সকল উপভাস লেখা হইয়াছে, তাহাদের একেবারে আন্দোল না দেওয়া সমালোচকদের একটা বাস্তবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, অনেকে বোধ করি ভাবিতেছেন যে, যুদ্ধের পর আমাদের ধাত্ একেবারে বদলাইয়া যাইবে, আমরা একেবারে নতুন মানুষ বনিয়া যাইব। মানুষ মস্ত, কঠোর ও সাহসী হইবে, ভোট-ভিখারিণীর দল একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাহারার আর ভোট চাহিবে না, কম সাহিনার জন্ত আর ধৰ্ম্মঘট হইবে না, নিরাসিদ্ধার দল অদৃষ্ট হইবে, কল নরক-মৰ্ত্তকীয় কথা আর আমরা অনিতে পাইব না, এবং কাল্পনিক চিত্র আর আঁকা হইবে না।

এসব নিরেট বোকার কথা। একথা শুনিলে বোধ হয়, ইহার পূৰ্বে যুরোপে যেন আর লড়াই হয় নাই। পূৰ্বে আমরা যে-সব আন্দোলন করিতাম, যুদ্ধের পরে আমাদের সাহিত্যে যে আবার তাহার প্ৰত্যপাত হইবে, তাহাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে। আমরা এখন পাগল নারক ও নারিকার পথ চাহিয়া বসিয়া নাই। সমরোদ্ভাসে বুঝিয়া গেলে পর, সাহিত্যের অর আমরা আরও উচু-পর্দার ঝাড়িয়া লইব। আমাদের জাতি কখনও পবিত্র, সরল, গভীর ও নির্ঝোঁহ হইবে না। (ইতিমধ্যেই ভোট-ভিখারিণীর আলাতন হুজু করিয়াছে এবং খনিমজুর ও গাড়োয়ানেরা ধৰ্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছে।) সাহিত্যরসিকের দলও যেমন ছিল, ঠিক তেমনই থাকিবে।”

টিকেনফিলিপ্‌স্‌ বসিতেছেন :—

“আমার বতটুকু অভিজ্ঞতা, তাহাতে আমি বিশ্বাস করি যে, যুদ্ধের পরে আমরা কল্লাবানী হইব। আশ্চর্য্য নী যে হারিবে, তাহা নিশ্চয়; কিন্তু, *Might is Right* এই উক্তির অস্ত্র, কোর যার মুদুক তার এই বিশ্বাসের অস্ত্র যে একটা প্রতাপশালী জাতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, ইতিহাসে এমন দৃশ্য আর দেখা যায় নাই। সত্য বটে, নেপোলিয়ন এমনি কল্লাবানী অবতার; কিন্তু নেপোলিয়ন একজন দুর্দম প্রতাপসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষ স্বতঃ। এখানে আমরা কেবল একজন রাজা বা জনকব্রেক রামপুত্ৰকেই দেখিতেছি না; পরন্তু, একটি কল্লাবানী জন্ত একটা সমগ্র জাতি তাহার জাতীর-



बादो

৩২শ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।

জীবন উৎসর্গ করিতে উজ্জত হইয়াছে।
ইহাতে এই বুঝায় যে, প্রাণল শক্তি

ছাড়িয়া অবশলকেই

—“The Bookman”

আলোক-চিত্রে ভাস্কর্য্যের নকল

আলোক-চিত্র বাস্তবকে ছব্ব। ফুটাইয়া
তোলে গটে, কিন্তু সে যেমন মাহুষের
চোখকে ঠকাইতে পারে, এমন আর
কেউ নয়। একালের ‘ছায়াবাজী’তে
‘ভাগগাছের সনান উঠু, আলল জীবন্ত
মাহুষের ছবি, উদ্ভূত মাহুষের কাণ্ডকার-
খানা আমরা নিত্যই দেখিতে পাই।
বেশিয়া আমরা অশাক হই, কিন্তু ভিতরের
লুকাচুরিট কোনমতেই ধরিতে পারি না।
এতল হইতেছে আলোক-চিত্রের জ্যাচুরি।

‘ফটো’তে এখন চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য-
কলার চমৎকার নকল হইতেছে। এসকল
নকল-করা ছবিতে ‘আলোক-চিত্রের কনিষ্ঠ-
শুভ প্রায়শ বা বাস্তবতার কঠোরতা থাকে
না; কল্পনার বিচিত্র রং তাহাদের সঙ্গে
এমন মিলিয়া যায় যে, ধরবার-ছুইবার
আদোপেই যো থাকে না—এমন-কি
কলার সঙ্গেই ত্রুটি চোখ ও মনে একেবারে
হাব মানিয়া যায়।

আমরা এখানে ভাস্কর্য্যের জ্বালি নকল-
পট দিলাম। প্রথম পানি,—মর্ম্মর-মূর্ত্তি
এবং বিত্তীয়পানি—শিল্প-মূর্ত্তির অঙ্কন।

মর্ম্মর-মূর্ত্তি নকলের সময়ে, যাহার ছবি
লওয়া হইবে, সেই লোকটীর মুখে, গলায় ও
হাতে খাশে পাউডার ও খানা চর্শ্মি মাখাইয়া
লইতে হয়। মাথায় শাখা পরচুল পরাইতে
বা চুলেও পাউডার মাখাইতে হয়। পোষাক
একেবারে খুদা হওয়া ঠিক নয়, তাহা কিকে
নীল বা পাটল রঙের হইলে অলঙ্কারে খানা
রঙের চেয়ে তাহাতে ছায়াব লীলা ও অল্প
সব পুঁটিনাটি বেশ মানান সুই দেখাইবে।
‘নেগেটিভ’ শেষ হইলে, মূর্ত্তির চারিপাশ
হইতে ‘ব্যেকগ্রাউন্ড’ (back-ground) কাটিয়া
বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাহা কোন কাগজে জমির
উপরে বসাইয়া দিতে হইবে।

শিল্পের মূর্ত্তি নকলের সময়ে ‘মডেল’র
কাপড়চোপড় বেশ সাধারণ ও সাধাসিধা
ভাবে রাখা সবকার। দেহে ঘন শিল্প
রঙের চর্শ্মি মাখাইতে হইবে। বস্ত্রাদি
মাটিনে তৈয়ারি হইলেই ভাল হয়।

একল অসুকৃতি-কোহুক কাজে খাইতে
হইলে আরও কতকগুলি নিয়ম পালন
করিতে হয়। কিন্তু এখানে সে-সব কথা
লিখবারে বর্ণনা লাভ নাই।

—Pearson's Magazine হইতে

রিম্‌স্ গির্জার ঐশ্বর্য

রিম্‌স্‌গের গির্জা-তৈয়ারী হ্রস্ব হয় ১২১২ খৃষ্টাব্দে। গত সাত শত দুই বৎসরকাল ইহা ক্রাস্তীয়জাতির ধর্ম-প্রতিষ্ঠার এবং লালিতকলার অপূর্ণ নিদর্শনরূপে বর্তমান ছিল; সংপ্রতি আধুনিক ছন্দগতি ইহাকে ইতিহাসের দৃষ্টিতে পরিণত করিয়াছে। বৈশাখের 'ভারতী'তে আমরা রিম্‌স্‌গের গির্জার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি; আজ তাহার সহিত আর গোটা কয়েক কব! যোগ করিয়া দিব।

ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও উত্তর-আফ্রানীতে যখন গথিক ভঙ্গীর অভিব্যক্তি হয় নাই, তখন রোমীয় রচনা-পদ্ধতি অল্পদূরে সেখানকার গির্জাগুলি তৈয়ার হয়। তাহার পর, সাধারণের সরল কিন্তু গভীর ধর্মবিশ্বাস যখন প্রকৃতির দিকে ফিরিয়া আসিতে চাহিল, তখন সেই বিশ্বাসকে বাহিরে ফুটাইবার জন্য গথিক রচনা-ভঙ্গী আত্মপ্রকাশ করিল। ইহাও উচ্চ ও বহুদিক রেখাবিশিষ্ট, ইহার কঠিন সংলগ্নতা ইহাকে এমন একটি রূপ ও সম্পূর্ণতা দান করিয়াছিল, কোন কৃত্রিম রচনা-ভঙ্গী দ্বারা দিতে পারে না। প্রকৃতির দৃশ্যমান ব্যোমচূড়ী অরণ্যাদিপশ্চেষ্টীর সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য, তাহার বহুকাঙ্কিত শাখা-শ্রাখা গথিক গির্জাগুলির জ্যেষ্ঠত্ব বিন্যাসে সুকোশলে অনুল্লভ হইয়াছে; বন্যাদিপগুলির মাঝে মাঝে যে অন্ধকার থাকে, গির্জার গবাক্ষ-জ্যেষ্ঠিতে তাহারই অনুকরণ দেখা যায়। উক্ত রচনা-ভঙ্গীর ভিতর কেবল আড়ম্বর

দেখাইবার জন্য কোন-কিছুর সমাবেশ নাই। তাহার ভিতরে অপ্রয়োজনীয় কিছুও নজরে পড়ে না। তাহার প্রতি ভিন্নিষটিতেই অর্থ আছে, উদ্দেশ্য আছে। রচনা-ভঙ্গীর পরিপূষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে ক্রমে ক্রমে জাতীয় ও অলঙ্কৃত শিল্পের সমাবেশ ঘটতে লাগিল। রিম্‌স্‌গের গির্জায় এই বিভিন্ন সমাবেশ দেখা যায়। ভগবানের মহিমা ও মানবের আনন্দ এখানে এক হইয়াছিল; তাই, সর্ব্বযুগের, সর্ব্বকালের লালিতকলার ভিতরেই ইহা উদ্দীপনার স্ফোরক করিবে।

ফ্রান্স ও ক্রাস্তীয় জাতির নিকটে রিম্‌স্‌গের গির্জা কতটা মহিমাময়, তাহা বৃত্তিতে গেলে, ইহার নির্মাণকালের সাতশত বৎসর আগেকার ঘটনা সরণ করিতে হইবে। সেই সঙ্কর রিম্‌স্‌গের প্রধান ধর্ম্মচাণী ছিলেন সাধু রেমি। ক্রিস্টান রাজ্যরূপে রাজা ক্রেভিস, তাহার মুকুট-ধারণের স্মরণীয় উৎসব-দিনে সাধু রেমির নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, "তিনি যাহা পুণ্য করিয়াছেন, তাহা পুড়াইয়া ফেলিবেন এবং তিনি যাহা পুড়াইয়া ফেলিয়াছেন তাহা পুণ্য করিবেন।" রিম্‌স্‌গের গোরব সেইদিন হইতে।

কথিত আছে, যে পবিত্র তৈলে ক্রিস্টস্‌ অভিব্যক্ত হন, একটি ঘুঘু তাহা সর্ব্ব হইতে সাধু রেমিকে আনিয়া দেয়। ইহার পর ফ্রান্সের অধিকাংশ রাজাই রিম্‌স্‌গের গির্জায় এই পবিত্র তৈলদ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছেন। ১৪২৯ খৃষ্টাব্দে যখন Charles VII, রিম্‌স্‌গের গির্জায় অভিব্যক্ত হন,

তখন বীরশালার জোরান অফ আর্কি তাঁহার অপূর্ণ স্বপ্নের সফলতা দর্শন করেন। রিম্‌সের গির্জায় এই রাজ্যাভিষেক উৎসবটি সঞ্চালন করা বিধাতা। সুবর্গীয় ঠৈলশালারটি নিম্নোক্ত-কালে এক উদ্ভাবন ভাসিরা দেয়; কিন্তু মৌভাগ্যক্রমে তাহার ঠৈলশালার একধণ্ড ভয়াংগ রক্ষা পাইয়াছিল! "একটি অপূর্ণ কারুকার্যের সত্ত্বচিত-পবিত্র আধারের ভিতর পরে সেই ভয়াংগ রক্ষিত হয়। Charles X-এর অভিষেক-ক্রিয়া আবার সেই বর্গীয় ঠৈলশালা সম্পন্ন হইল। ফ্রান্সে একটা প্রচলিত কথা আছে যে, কোনজন ভবটনাতেই এই বর্গীয় ঠৈল একেবারে নষ্ট হইয়া বাইনাম নহে।

মধ্যযুগের গির্জা কিরূপে যে গড়িরা উঠিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত বিষয়। পুরোহিতেরা ইহা একটি ধর্মকার্য বলিয়া প্রচার করিলেন, রাজগণ ইহার ক্ষমতাকে উৎসাহ দান করিলেন, এবং সাধারণে একাগ্র চিত্তে আপনাদের অর্থদান করিল। রিম্‌সের নাগরিকেরা তাহাদের অপূর্ণ গির্জার কথা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, তাহার কারুকার্য লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল এবং তাহার ক্রমবর্ধমান সৌন্দর্য দেখিয়া আপনাদের মনে গর্ভাহুত্ব করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার বহু বাক্যবার করিয়াছিল, তার চেয়ে কাণ করিয়াছিল ঢের বেশী। তাহার সাধারণ বাহিনী-করা কারিকরের মত এই ধর্ম-বন্দিতের গঠনে হস্তার্পণ করে নাই। তাহার ক্ষমতার সমস্ত তক্তি, প্রাণের

সমস্ত কৃমি, হস্তের সমস্ত নিপুণতা দিয়া এই ধর্ম-ভবনকে ক্রমেই পুথিও হইতে বর্গের দিকে টানিয়া তুলিয়াছিল। তাহার যাহা করিয়াছিল, একালের কোন কারিকরই বড়ো ও বাহিনীর দিকে চোখ রাখিয়া ভাঙা করিতে পারেন না।

রিম্‌সের গির্জার সন্মুখাংশ যেন শাপের একখানি বাইবেল! সেখানে পু'বির লেখা পাতা পড়িতে পারে, এমন লোক সংখ্যার বড় বেশী ছিল না। অতএব, পাথর বা কাঠের ফলকের উপর বাইবেলের গদ্য-ভুলিকে ছবিতে পুনিয়া পুনিয়া এমন পরিষ্কার ক্রিয়া দেওয়া হইত যে, চোখে পড়িলেই লোকের তাহার মনে মুগ্ধিত দেখি হইত না।

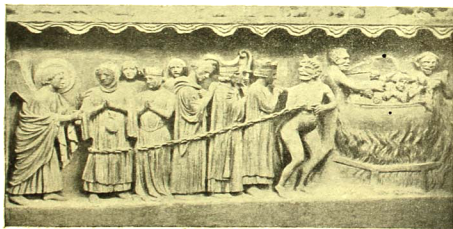
তবে, এই পোদাই-করা গদ্য-চিত্রগুলি যে একেবারেই ধর্মমূলক ছিল, তাহা নহে। সেখানে খয়ের কাগজ ও মানিক কাগজ ছিল না ত! হুতরাং যে-সব শিল্পী ছিলেন হস্ত-বসিক, তাহার মনের কথা বাহির করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র না পাইয়া এই ধর্মালয়ের দেয়ালে দেয়ালেই হাঙ্গির ছবি পুন্ডিতেন ও লোক হাসাইতেন। তাহাদের তীক্ষ্ণ চোখ হইতে রাজা বা ধর্মাত্মক বা সন্ন্যাসী বা নাগরিক—কহারও ছাড়ান ছিল না,—তাহাদের আঁকা বাস্তব-পট সকলেরই প্রতি সমান নিষ্ঠুর!

রিম্‌সের একটি প্রাণ আছে যে, সাধু রেমি সহর হইতে মাজুয়ের অনিষ্টকারী ভূতের দলের আড্ডা ভাঙিয়া সকলকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। খোদাইকার এক ব্যঙ্গাঙ্গর সেই গল্পের



গাম্বুৱে মি তুত তাড়াই হৈছে ন

ছনিটি পুদিয়াছেন। যে তুতটি পালেৰ একটা বাজা তুত লইয়া দাতব্যুপ নিচাইয়া
গোলা, সেটা ভাৰি বদমায়েস ; সে তায় লগে দাড়াইয়া আছে, কিছুতেই এক পা নড়িতে



নয়কে পাপীয় মাঝা

যাজি নয়! সাধু অনেক আড়ম্বর করিয়া ও মনঃভর আচরণে তাহাকে তাড়াইতে চেন। আরও দুইটা ঘূতের রকটা, সাধুকে বিস্তারিত করিয়া বেতার ভাড়াটেতে ও আর একটা, এসব পূর্ব মন্তব্যকমেব ঠাট্টা ও ঠাট্টাটকা হা হা করিয়া হাসিতেছে। টহাট টহল ছবিও দেখা।

‘আব’ এক ভাষণের নরকের কৃষ্ণ-কার-ধূ-আঙনের উপরে একখানা

কফি এবং তাহার ভিতরে পাণীদর ফেলিয়া ঘনমুখে আঙা করিয়া ভাঙিতেছে! আর একদিকে আর এক মল পাণীকে লোটার শিকলে বাধিয়া আনা হইতেছে। দলের প্রথমটাই আসিতেছেন, একজন রাক্ষ, তারপর এক মর্দাদাক, তারপর এক সন্ন্যাসী! এ ছবি যে খুশিগে, নিশ্চয়ই তাহার নরকের পাটা পূর্ণ শক্ত ছিল!

—Munsey's Magazine হইতে

ঐ.প্রসাদনাম রাগ

দেবশর্মা ও দেবশর্মা

ব্রাহ্মণের ‘দেবশর্মা’ ও ক্ষত্রিয়ের ‘দেব-শর্মা’ যে সাধারণ উপাধি তাহা সকলেরই সুনির্দিষ্ট। কিন্তু ইহাদের প্রকৃত মূল ও ভাবগর্ভা আমাদের নিকট ভ্রমের স্থল নহে। আলোচনাযোগ্য এতৎসম্বন্ধে কিছুটা তথ্য লাভ করা যাউতে পারে—তাহা দেবশর্মার ক্ষুদ্রই আমরা বর্তমান প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করিতেছি।

‘দেব’ শব্দের অর্থ আমাদের সকলেরই নিকট সুগম। সুতরাং প্রথমে আমরা ‘শর্ম’ ও ‘বর্ম’ শব্দের অর্থেরই আলোচনা করিব। ‘শর্ম’ শব্দ আমরা অভিধানে সুপার্বক দেখিতে পাই। যথা—‘শর্মশাত সুখানি চ।’ রঘুবংশে কালিদাস শর্ম শব্দের ব্যবহার এত অর্থেই করিয়াছেন। যথা—‘শর্মশাতঃ শুদ্ধবঃপ্রাচি লবজৈরহে শর্মণে।’ ‘বর্ম’ শব্দটী বৃহৎ সূত্রে উৎপন্ন। বৃহৎ শব্দটির অর্থ আবরণ। ইহা হইতে ‘বর্ম’ শব্দটির

অর্থ আবরণ ও রক্ষা হয়। বীর পুরুষেরা শরীরে যে ‘বর্ম’ ধারণ করে তাহাতে আবরণ ও রক্ষা উভয়ইই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

একদে ‘দেব’ শব্দ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় নামের সহিত কিছুকালে সংযুক্ত হইয়াছে তাহাই আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব। অভিধানে সন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই ব্রাহ্মণ ‘বৃদেব’ নামে আখ্যাত ও রাক্ষ ‘নরদেব’ নামে আখ্যাত হইয়াছেন। রাক্ষকে আমরা শুধু ‘দেব’ নামেও আখ্যাত দেখিতে পাই। যথা—‘রাক্ষ ভট্টারকো দেবঃ স’ ব্রাহ্মণ সর্গদেবদেবকাণ্ডে নিম্নত থাকিতেন বলিয়া অধিক আধ্যাত্মিক সম্পদ বিশিষ্ট হওয়াতেই যে ‘দেবত্বা’ অর্থেই ‘দেব’ বলিয়া আখ্যাত হইবেন এবং ক্ষত্রিয়গণ সর্গদেবকে অধিক শক্তিশালী হওয়াতেই দেবশক্তি সম্পন্ন বলিয়াই যে

‘দেব’ নামে কথিত হইলেন তাহা সহজেই
অজ্ঞান করা যায়। মর্শ্বি মধু রাজার শক্তি
স্বৰূপে তাহা লিখিতাছেন তাহাতেও আমরা
ইহারই প্রমাণ প্রাপ্ত হই। যথা—

আমাদের বক্তৃতাের যাথার্থ্য বিশেষরূপেই
উপলব্ধি হইবে :—

“উত্তম নান কৃত্যৈঃ পিঠৈব বশমে হু হনি।

দেবপুংসঃ নরাণাঃ হি শৰ্ম্মবর্ধাধি সংযুতম্।”

ইতি শব্দকল্পদ্রুম খৃত বিস্ময়ান।

“শৰ্ম্মাবশ্যেণ্ড বিকৃত বর্ষ জাতাচ্চ ভূত্বকঃ।”

ইতি শব্দকল্পদ্রুম খৃত যদধনে।

“শৰ্ম্মাত্ম্যত্রাক্ষণত ত্রাবর্ধাতঃ কত্রিঘাট।”

ইতি শব্দকল্পদ্রুম খৃত শাতাতপ বচন।

এক্ষণে ব্রাহ্মণ ও রাজার পূর্বোক্ত ‘দেব’
আখ্যায় সতিত যথাক্রমে ‘শৰ্ম্ম’ ও ‘বর্ষ’
শব্দের যোগ হইল। কি অর্থ হয় তাহাট
আমরা বিবেচনা করিয়া দেখি। এই
যোগে ‘দেবশৰ্ম্মা’ শব্দের অর্থ ইহাই হয়
যে যিনি দেবরূপে শৰ্ম্ম অর্থাৎ সুখ বিধান
করেন এবং ‘দেববর্ষা’ শব্দের অর্থ ইহাই
হয় যে যিনি দেবরূপে বর্ষ অর্থাৎ রক্ষা
বিধান করেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের প্রথম
এই ‘দেবশৰ্ম্মা’ নাম হইতে কালে ব্রাহ্মণ
জাতি মাজেই ‘দেবশৰ্ম্মা’ নামের অধিকারী
হইয়াছেন এবং দৈবশক্তিসম্পন্ন রাজার
প্রথম এই ‘দেববর্ষা’ নাম হইতে রাজার
জাতি বা ক্ষত্রিয় মাজেই ‘দেববর্ষা’ নামের
অধিকারী হইয়াছেন।

শৰ্ম্ম বা সুখবিধানের সুখার্থতা হইতে
আমরা দেবশৰ্ম্মার পরিবর্তে সংক্ষেপে কেবল
‘শৰ্ম্মা’ ব্রাহ্মণের নামের অন্তে সংযুক্ত
দেখিতে পাই এবং বর্ষ বা রক্ষার সুখার্থতা
হইতে আমরা দেববর্ষার পরিবর্তে সংক্ষেপে
কেবল ‘বর্ষা’ ক্ষত্রিয়ের নামের অন্তে সংযুক্ত
দেখিতে পাই। এখানে আমরা কয়েকটা
শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিতেছি—তাহা হইতে

অগতের হিতসাধন ব্রাহ্মণের ব্রত ও
রক্ষাসাধন ক্ষত্রিয়ের ব্রত। তাহাতেই
পূরণাদিতে দেখিতে পাই ব্রাহ্মণ অগতের
শ্রমঃ সাধন অল্প বস্ত্রের অহুষ্ঠান করিতেছেন
আর ক্ষত্রিয় সমস্ত উৎপাত উৎসব নিবারণ
করিয়া ব্রাহ্মণের সাহায্য করিতেছেন।
বিখ্যাত্তি স্ববি এই সাহায্যের অল্পই দশরথের
নিকট হইতে রাম ও লক্ষ্মণকে চাহিয়া
লইয়া গিয়াছিলেন। অতি পুরাকালেই
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এইরূপে এক স্বাভাবিক
স্বৰূপে গ্রথিত হইয়াছিলেন। তাহাতেই
আমরা শাস্ত্রের মধ্যেও ইহার অজ্ঞানদান
দেখিতে পাই। যথা—

“নাত্রক কত্র্যগ্নোতি নাক্রতঃ ব্রহ্ম বর্জতে।

ব্রহ্মকৃত্যেভু সম্প ক্তে ইহচানুজ বহতঃ।”

ভট্টকাল্যে ইহারই অজ্ঞানদাে লিখিত
হইয়াছে :—

“মহাবিশ্বাশাঃ পরাঃ ভগ্নে

বহঃ বহাগ্যাপ্যাদি শৰ্ম্মবন্ধে।

কাত্রঃ বিশ্বেক পরশরার্দ

শকাঃ কৃণা না গ্রহিহু স্বত্বম্।” ২১

১ম অধ্যায়।

ইহা হইতে পৃথিবীর শব্দ ও বর্ষরূপ
দেখোচিত কার্যে পরস্পর সহকারিতা
হইতেই যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সাধারণ একই
'দেব' নামে অভিহিত হইয়াছে তাহা
আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

দৈবকার্যে পরস্পর সহযোগিতা করিয়া
যেমন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পৃথিবীতে ও সমাজে
দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন—তদ্রূপ জগতের
অজ্ঞাত বাবতীর কারণেও তাঁহারা দেবত্ব
প্রাপ্ত করিয়াছেন। মহাসংহিতার আমরা
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উল্লিখিত দেবযোগ্য
শব্দ ও বর্ষভাব সম্বন্ধে অতি সুন্দর চিত্রই
প্রাপ্ত হই। এখানে আমরা তাহার একটু
আভাস প্রদান করিব। ব্রাহ্মণের প্রকৃতি
কিহুপে সম্পূর্ণভাবে জগতের হিতাভিযুগী
করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে মত লিখিয়াছেন—

ব্রাহ্মণ কেবল জগৎকারাই সিদ্ধি লাভ
করিবেন তাহাতে আর সংশয় নাই।
বৈদিক বাগাদি অস্ত্র কর্ম করুন না করুন
নৈঋ অর্থাৎ পশু জীবাদির প্রতিহিংসা শূন্য
হইয়া জগৎপরিচয় হইলেই তাহাকে ব্রাহ্মণ
বলা হয়।

“অহোহৈবৈব জ্ঞানামর জ্যোত্বা পুনঃ।

যাবুজিতাং সমাহার বিহোজীবেদনাপদি।” ২

১ম অধ্যায়।

“দ্বিপং উপস্থিত না হইলে বিদ্র জ্ঞতহিংসা না
করিয়া বা সামান্য হিংসা করিয়া যাহাতে জীবন
যাপন করিতে পারে তাহাই করিবেন।

অতিশয়-নির্গোপে লোকের রক্ষারূপ
লক্ষ্য লইয়াই যে রাজা অদ্ব্যগ্রহণ করেন
তৎসম্বন্ধে মত লিখিয়াছেন :—

“যে যে ধর্ম বিবর্তনাঃ সর্গোদমহুর্গণঃ।

বর্ণনামাত্রমণ্যাক রাজা যতৌচিত্তব্রজিত।” ৩৯

৭ম অধ্যায়।

“বধর্মনিরত আহুর্গুর্গণক সকলবর্ণ ও আর্যের
সমাকৃতিরক্ষকরূপে রাজা যত হইয়াছেন।”

উল্লিখিত মঙ্গল ও রক্ষাভাবকে জীবনে
তির উদ্বোধিত রাখিবার জন্য নামকরণের
মধ্যেই যেমন তত্তৎকর্তা সন্নিবেশ করার
বিধান মহর্ষি মত করিয়াছেন—তন্মত
নামের অস্ত্রে তত্তৎকর্তার স্পষ্টবোধক শব্দ
ও বর্ষ শব্দ সংযোগেই বিধানও তিনি
করিয়াছেন। যথা—

“নামধেয়ঃ বশমাস্ত্র ষাণ্ডিত্যঃ বাক্ত কারয়েৎ। ৩০

ইন্দ্রল্যঃ ব্রাহ্মণতত্ত্বাৎ ক্ষত্রিয়ত্ব বলাবিতম্। ৩১

শর্মণশ্চাক্ষণত তাত্ত্বাজো রক্ষা সমবিতম্। ৩২

২য় অধ্যায়।

“বশম বা ষাণ্ড দিবসে দ্রাক্ত বাণকের নামকরণ
করিবে।” ৩০

“ব্রাহ্মণের মঙ্গল বাচক ও ক্ষত্রিয়ের বল বাচক
নাম রাখিবে।” ৩১

ব্রাহ্মণের শর্মণশ্চ ও ক্ষত্রিয়ের রক্ষাত্বক বর্ষ,
উপসম্বৃত্ত করিবে।” ৩২

প্রাপ্ত শব্দ ও বর্ষভাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত
করিবার জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সাহচর্যের
স্পষ্ট বিধিও মত এইরূপে সন্নিবেশ করিয়াছেন।
যথা—

“ব্রাহ্মণান্ পশুপালীত শ্রাতকৃৎসার পার্ধিবঃ।

২২বিদ্যু বৃদ্ধান্ বিদ্বদ্ভিত্তেভেভ্যক্ শাসনে।”

৩৪ অধ্যায়।

“রাত্রি প্রতিদিন আত্মকালে গায়োথান করি।
কণ্ঠস্থঃমান এই বেদভরে নন্দার্থান্তিক রাক্ষসদিগের
ও নীতিশাস্ত্র রাক্ষসদিগের দেবা করিবেন, এবং
ভাৱাৱা যে সকল আবেশ করেন, তৎসমস্ত প্রতি-
পালন করিবেন।”

“বাব্যবাস্য দিব্যবৃত্ত রাক্ষসঃ সহ পার্শ্বিণঃ।

মহুঃসমঃপ্রিত্তিপ্তেব বিনীতঃ প্রবিশেৎ সত্যম্।” ১

৮ন অধ্যায়।

“বিচারে বর্ণমতুঃ রাত্রা রাক্ষসঃ মহুঃপ্রিত্তিপ্তঃ
সহ বিনীতঃসে সত্যম্ প্রবেশ করিবেন।”

রাত্রা স্বয়ং রাক্ষসার্ণা পর্বাৎকণ্ঠে অসমর্থ
হইলে ত্রাক্ষণকেই নিজ প্রতিমিথি পদে
সংস্থ করিবার বিধিও মন্ত্র করিয়াছেন।
যথা—

“দদাথঃ ন হৃণাত নৃপতিঃ কাণ্ডবর্ণনঃ।

তদানিগুজ্যাধিষ্ঠাসঃ ত্রাক্ষণঃ কাণ্ডবর্ণনঃ। ২

সোমস্ত কাণ্ডানি সপ্তকেন্দ্রং নৈকোত্তেব জিত্বৃতঃ।

সত্যমেব এবিষ্টাঃপ্রাদানৌনঃ হিত এন বা।” ৩.

“যখন রাত্রা যঃ কাণ্ডবর্ণন করিতে না
পারিবেন তখন বিধান ত্রাক্ষণকে রাক্ষসার্ণা পর্বাৎকণ-
্ঠে নিযুক্ত করিবেন।” ২

“তিনি তিনজন সত্যমেব হইয়া রাক্ষসভার
প্রবেশ করিয়া তথায় উপবিষ্ট অথবা নতানন হইয়া
রাক্ষসার্ণা পর্বাৎকণ্ঠ করিবেন।” ১.

এই প্রকারে ত্রাক্ষণের শব্দভাব ও
ক্ষত্রিগের শব্দভাবের সংমিশ্রণে এক সময়ে
ভারতবর্ষে যুগশাস্ত্রের স্বর্ণরাজ্য প্রতিষ্ঠিত
হইবার আয়োজন হইয়াছিল।

পূর্বোক্ত স্বর্ণরাজ্যের উপর অধিষ্ঠান

করিবার অত্র ত্রাক্ষণ ও ক্ষত্রিয়কে আপনা-
দের নিমিত্ত যে দেব-আদর্শ গঠন করিতে
হয় তাহা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই
ভাৱাদের শব্দ ও অর্থ এই উপাত্ত নামের
পূর্বক ‘দেব’ শব্দ সংযুক্ত হইয়া ভাৱা
যথাক্রমে দেবশব্দ ও দেববর্ষা এই সাধারণ
নামে পরিচিত হইয়াছেন।

উপরে আমরা দেবশব্দ ও দেববর্ষা
নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিলাম। এক্ষণে
আমরা ইহাদের ঐতিহাসিকতা সন্ধানে দুই
একটা কথা বলিষ্টাই আমাদের প্রবন্ধের
উপসংহার করিব। উপরে আমরা পুরাণ
ও শ্রাটোন দ্বিতী সংহিতাদির যে সমস্ত
বচনে ‘শব্দ’ ও ‘বর্ষ’ এবং ‘দেব’ পূর্বক
উভয় শব্দের উল্লেখ পাইরাছি, তাহা
হইতেই পূর্বোক্ত শাস্ত্রগণের পূর্বকই যে
এই সমস্ত উপাধির সৃষ্টি হইরাছিল, তাহা
যুক্তিতে পারি। ত্রাক্ষণি কার্ণা যে
আবহমানকাল হইতে শব্দাদি শব্দের প্রয়োগ
পাওয়া যায় তাহাতেও ইহাদের শ্রাটোন
প্রমাণিত হয়।

‘শব্দ’ ও ‘বর্ষ’ শব্দের এবং ‘দেব’ শব্দের
সহিত ইহাদের সংযোগের এইরূপ শ্রাটোন
ও ইহাদের তাৎপর্য সন্ধানে পূর্বোক্তরূপ
শাস্ত্রোক্তি হইতে আমরা উপলব্ধি করিতে
পারিতেছি, অরণ্যভীতকালেই হিন্দুসমাজ ও
জীবনের আদর্শ বিকল্প স্বর্গীয় মহাহুতভার
ধারা পরিকল্পিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীভগবতঃ ক্ষেত্রজী।

স্বামী

(গল্প)

আত্মাকান হঠাৎ নবাবের ফৌজ তখন দিল্লী ফিরিতেছিল। পথে বাংলা দেশে এক গ্রামের বুকে তাহাদের তাঁবু পড়িল। কয়দিন বিশ্রাম করিয়া সকলে একটু জুড়াইয়া লইবে।

পরদিন কোজ দেখিতে দলে দলে বালক বৃদ্ধ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। প্রথমে ভয়ে তাহারা দূরে দূরে রহিল; কিন্তু পরক্ষণেই যখন দেখিল, যে উহার তাহাদেরই মত হাসে, গল্প করে, তখন তাহাদের ভয় ভাঙ্গিল এবং সকলে কাছে গিয়া নানা প্রশ্ন তুলিয়া অলীক বীরত্বের অসংখ্য কাহিনী শুনিতে লাগিল।

এই ক্ষুদ্র দলের সর্দার ছিল, এক মুসলমান যুগ। নবাবের সহিত তাহার না-কি কি সম্পর্ক ছিল; তাই সে অল্প বয়স হইতেই ধরাকে লম্বা জ্ঞান করিতে শিখিয়াছিল। ক্রমতাকে নিজের বিলাপের জন্ত খরচ করিতে সে ভাল করিয়াই জানিত। যুগা বিবাহ করে নাট, কোনরূপ শৃঙ্খলে বাধা পড়িয়া আপনাতর পূর্ণ স্বাধীনতা ক্ষয় করিতে মোটেই তাহার ইচ্ছা ছিল না।

বৈকালে যুগা গ্রাম দেখিতে বাহির হইল। সে গ্রামে শুধু হিন্দু বাস, ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। সকলেরই অবস্থা স্বচ্ছল; কিন্তু ধনী তেমন কেহই নহে।

তিনজন অহুতরকে সঙ্গে লইয়া অপরোহণে যুগা গ্রামের পথে বাহির হইল। দৃষ্টি তাহার চতুর্দিকে ঘুরিতেছিল। চলিতে চলিতে পথের ধারেই তাহার সুন্দর পরিচ্ছন্ন একখানি বাড়ী দেখিতে পাইল। যুগা কণ্ঠকাল পথ দাঁড়াইল।

বাড়ীর মালিক বামাচরণ ভট্টাচার্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। অবস্থা বেশ স্বচ্ছল; জায়গা-জমি যথেষ্ট আছে। নিজে তিনি গৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। বাড়ীটি এমন মাজা-বসা, অন্তর-বাহির এমন সুন্দরভাবে নিকানো, খাঁটি বেওরা, যে দেখিলেই বেশ একটা দিগ্ধ আশ্রয় ও পবিত্রতার ভাব মনে আসিয়া উঠে। যুগা কিন্তু এসব কিছু দেখিতেছিল না। তাহার তাঁহা দৃষ্টি অন্তর নিবদ্ধ ছিল। সে দেখিতেছিল, এক কিশোরী সজ্জন সারিরা ভিরা কাপড়ে গৃহপার্শ্ব পুকুরী হইতে ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছে, কাঁধে তাহার মল-স্তন্য কলসী! তাহার দিক্ত-বাস-লিঙ্গ নিটোল পরিপূর্ণ দেহ হইতে সৌন্দর্য যেন উছলিয়া পড়িতেছিল। ক্ষুদ্র ঘোমটোখানি তাহার নিম্ন রমণীয় মুখের অতি অল্পটুকুই ঢাকিতে পারিয়াছিল; বাকিটুকু অন্তর্গামী সূর্যের শেঘ রশ্মি মাখিয়া এমন অপূর্ণ স্রীতে ভরিয়া উঠিয়াছিল যে যুগা তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। কিশোরী ছাত্র-ভ্রমল

পথ ধরিয়া অন্তরে চলিয়া

দৃষ্টি

নিজ নিজ বিপদের আশঙ্কা যখন

তাঁহার নত, গতি ক্ষুদ্র।

কিশোরী দৃষ্টির অন্তরালে গেলে যুগ
সঙ্গীদিগকে বলিল, “বৃষ্ণে ত,—আমিই।
বিশ-বিশ আশ্রয়ি বৃষ্ণসি মিলবে!”

সঙ্গীরা বলিল, “আশ্রয়, কুছ পোয়
নেই।” তারপর বাড়ীটার অবস্থান ভাল
করিয়া সকলে দেখিয়া লইল। যুগা খুদী
হইয়া আতর-মাখা গোকৈ চাড়া দিয়া ধীরে
ধীরে ঘোড়া হাঁকাইয়া অগ্রসর হইল।

২

গভীর রাত্রে গ্রামবাসীরা শুনিল,
বামাচরণ ভট্টাচার্য্যের গৃহে মহা-রোরগোল।
সকলেই ঠিক করিল, ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে
ভাঙাত পড়িয়াছে। তখন তাহার বাহা-কিছু
লুকাইবার ছিল, সব লুকাইয়া ফেলিল। স্ত্রী-
লোকেরা ছেলে-পিলে লইয়া খাটের নীচে আশ্রয়
গ্রহণ করিল। কোন কোন ব্রাহ্মণও
যে ব্রাহ্মণীর সহিত মলক-সঙ্কুল খাটের
নীচে প্রবেশ না করিলেন, এমন নহে।
সকলেই কম্পমান বকে নিঃশব্দে চুপ করিয়া
বস করিতে লাগিল—ভট্টাচার্য্যের বাড়ী
ছাড়িয়া ডাকাতেরা কখন কাহার বাড়ী
চড়াও হয়, তাহার কিছুই ঠিকানা নাই।

কিছুক্ষণ পরে ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর
গভাগোল খামিয়া গেল। তখন সকলেরই
বুকের স্পন্দন বিস্তৃত বাড়িয়া উঠিল। এইবার
না জানি আবার কাহার সঙ্গীত হয়। কিন্তু
অনেকক্ষণ পরাশ্রয় যখন আর কোন
মৃতন আশ্রয় কারণ উপস্থিত হইল না,
তখন সকলে হাঁক ছাড়িয়া বাঁচিল—ঠাকুর
এবার খুব রক্ষা করিয়াছেন।

কটিয়া গেল, তখন তাহারের দ্বন্দ্ব বেচারা
বুদ্ধ ভট্টাচার্য্যের মস্ত সমবেদনার ডরিয়া
উঠিল। অনেকেরই বৃহত্তর ঘোর আশঙ্কা
সবেও অসীম সাহসে ভর করিয়া পাট-
মোড়ার আঁটি বাঁধিয়া বড় বড় মশাল
জালিল, তারপর দল বাঁধিয়া সকলে
ভট্টাচার্য্যের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভট্টাচার্য্য শিরে করাঘাত করিয়া যখন
তাহাদিগকে জানাইয়া দিল যে দ্রুততর
তাঁহার লক্ষী-ব্রহ্মলীপী পুত্রবধূ নরনতাকাকে
লইয়া গিয়াছে, তখন সকলেই বিস্ময়ে
নিপথে অভিভূত হইয়া পড়িল। কাহারও
মুখে একটিও কথা সরিল না।

কিন্তু বেচারী বুদ্ধকেও ত সাবনা দেওয়া
চাই। তাই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া
একে একে ক্রমেই বুদ্ধকে বুঝাইতে
লাগিল, ভগবানের বাহা ইচ্ছা, কে তাহা
থুগাইতে পারে? বুঝা শোক করিয়া
কোন লাভ নাই, ভগবানের কার্য্য মাথা
পাতিয়া লওয়াই বিধেয়। যদিও সকলে
স্বীকার করিলেন যে, তাহার, মত শ্রমীণ
বিজ্ঞ ব্যক্তিকে এ-সব কথা বুঝাইতে বাওয়া
ধূর্ততা মাত্র, তবুও উপদেশ দিতে কেহই
ছাড়িলেন না। এমন কি, এখন কর্তব্য
কি তাহাও হ্রি হইয়া গেল। যাদব
তর্কালকার শোকটা যদিও গরীব, কিন্তু
তাহার যেহেতু বেন সাক্ষাৎ লক্ষী,—তাঁহার
সহিত পুত্রের বিবাহটা শ্রী দিয়া ফেলিলে
উপযুক্ত পুত্রবধূর অভাব অভিরেই মোচন
হইবে।

বুদ্ধ কোন কথা বলিলেন না। পুত্র

সমানাধ ক্ষিপ্তের ছায় উঠানবর ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার স্বপ্নের উপর দিয়া ক্রোধ, বিবাদ, করুণা প্রভৃতি স্বপ্ন-বৃত্তিগুলি একটা প্রবল ঝড় বর্ষাইয়া তুলিয়াছিল। ঝটিকার প্রথম বেগ একটু শান্ত হইয়া আসিলে সমানাধ বুঝিতে পারিল, রমণীকে উদ্ধার করিবার তাহার কোন ক্ষমতা নাই—বিধাতার এ নিষ্ঠুর বজ্র বুক পাতিয়াই তাহাকে লইতে হইবে! তখন তাঁহার হৃদয় এই অসহায় রমণীর অস্ত করুণার ভরিয়া উঠিল। একে একে অতীত জীবনের ছবিগুলি তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। সেই ছয় বৎসর পূর্বে বারো বৎসরের ক্ষুদ্র বালিকার স্মৃতি-ছবির সমস্ত ভাব যখন সে গ্রহণ করে, তখন হইতে কত ভাবই না বালিকাকে সে আপন করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে! তারপর ধীরে ধীরে তরুণী যখন তাহার সস্ত-মুগ্ধরিত যৌবন লইয়া নিত্যই আশ্রয়ের মত তাহাকে লতাইয়া ধরিল, তখন তাহার জীবনে কি মধুর বসন্তের হাওয়া বহিয়া গেল—তাহার। সকল ক্ষণ-কমল সম্ভবিত করিয়া এক নূতন পুলক আগিয়া উঠিল। ইহার পর এ কয় বৎসর সে কি অসাবিত আনন্দেই যে, কিশোরীর সাহচর্য ও পূজা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। আর আজ! কোন্ দশা তাহার ছাপিও উৎপাদন করিয়া এমনভাবে তাহার জীবনটাকে বিপদের ঘন অন্ধকারে পূর্ণ করিয়া দিল।

সমানাধ কিছুতেই তাহার হৃদয়কে শান্ত করিতে পারিল না—বিধাতার এই কঠোর বিধান মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবার মত

স্বপ্নের, বল কিছুতেই সে আশ্রয় করিয়া উঠিতে পারিল না। তাই উদ্ভ্রান্ত চিত্তে পাগলের মত সে কেবল উঠানবর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এ দিকে পাড়ার সমবেদনাকারীর দল যখন ছিলিমের পর ছিলিম পুড়াইয়া ক্রান্ত হইয়া পড়িল, তখন একে একে সকলেই শব্দ উপদেশ প্রদান করিয়া গিবার লইল।

৩

রাত্রি প্রভাত হইল। দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর সকলের শোক আরও বাড়িয়া উঠিল—পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতেই হৃৎয যেন ভীষণ নূতন মূর্তি ধরিয়া দেখা দিল।

ক্রমে বেলা বাড়িল। হা-ছতাপ করিয়া আসিতে লাগিল। নিরস বদনে ধীরে ধীরে যে বাহার কাজে যন দিতে শুরু করিল। সংসারের খুঁটিনাটি সব কাজই আবার পূর্বের মত চলিতে লাগিল। কিন্তু একটি গ্রাম শুধু কিছুতেই আর নিম্নেতে গুছাইয়া লইতে পারিল না। সারাটা দিন নিশ্চল নিশ্চলভাবে সমানাধ তাহার ঘরে বসিয়া কাটাইয়া দিল। কাহারো কথা শুনিবার বা মুখের দিকে চাহিবার শক্তিও তাহার ছিল না।

আবার সন্ধ্যা নাহিল। আজ সন্ধ্যার আকাশে বাতালে যেন ছিন্ন স্বপ্নের রক্তের টেডে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে রক্তের বহা আমহ দেবালয়ের সন্ধ্যারতির কাঁশর ঘণ্টার রবের সহিত মিশিয়া রমানাধের কণ্ঠ ঘরে হুঁকিয়া তাহার চারি পাশে একটা করুণ যন্ত্রণার আবেশের সৃষ্টি করিয়া তুলিল।

আপনা হইতেই রমানাথের চোখ বুজিয়া আসিল। অল্পক্ষণ পরেই সারাদিনের অবশ্যস্ততার সে ঘুমাইয়া পড়িল।

যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। পাড়ার লোক ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; চতুর্দিক নীরব নিস্তর। খানিকটা চাঁদের আলো জানালা দিয়া তাহার বিছানার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। ঘুম ভাঙ্গিলে প্রথমটা কিছুই তাহার মনে পড়িল না—কিন্তু বোধ হইতে লাগিল, যেন কি একটা ভাবন কিছু ঘটয়া গিয়াছে। ক্রম সর্ব তাহার মনে পড়িল। তখন আবার নতুন করিয়া শোকাবেষ তাহার হৃদয়টাকে প্রাণিত করিয়া ফেলিল। রজনীর নিস্তরতার চাঁদের স্নেহের দ্বারা তাহার আরো ঘনাইয়া উঠিল। একটি দিনের ভিতর তাহার জীবনের উপর দিয়া পরিবর্তনের কি এ দাঙ্গা বজা বহিয়া গিয়াছে!

আশে-পাশে তাহার জীবন কত স্থিতি পড়িয়া রহিয়াছে। সে একে একে সব দেখিতে লাগিল, ঘরের প্রত্যেক স্থানেই তাহার জীবন কৰ্ম্মকুশলতার পরিচয় বর্তমান। এমন কি, তাহার মাথার কাছে জীবন সেই বাণিশিটে এখনো তাহার হৃদয়ের স্নেহ গন্ধ আগিয়া রহিয়াছে—সমস্তই আছে। নাই শুধু সেই সহাস হৃদয়ের সুখখানি!

রমানাথ শুটয়া পড়িয়া কত কি আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। বতই ভাবে, ততই জীবন প্রতি অহরহ তাহার বাড়িয়া উঠে। ততই আরও বেশি করিয়া মন তাহার স্নিগ্ধ হয়। এমন সময় হঠাৎ

রমানাথ চমকিয়া উঠিল—সে দেখিতে পাইল, তাহার সম্মুখে খোলা দরজার মাঝখানে নরনতারা দাঁড়াইয়া আছে,— তাহারি সারাৎসরে চন্দ্রের আলো মুটাইয়া পড়িয়াছে। ছুটিয়া গিয়া রমানাথ তাহাকে ধড়াইয়া ধরিল, তারপর ঘরের ভিতর তাহাকে লইয়া আসিল।

৪

রমানাথ নরনতারার চোখের অল মুটাইয়া দিয়া বলিল, “তুমি কেন মিছে ভেবে কষ্ট পাও? আমি তোমাকে বস্তার বলব নহন, তোমাকে গ্রহণ করতে আমার মনে এতটুকু বিধা নেই!”

নরনতারা বলিল, “কিন্তু আমার যেন মনে হয়, আমার কপাল ভেঙ্গেছে, নইলে এমন ঘটনা না। আমার সমস্ত দেহ যেন আগুনে পুড়ে বাড়ে—যেখানটা তুমি স্পর্শ করছ, সেখানে কি বে একটা আমার পাচ্ছি, তোমাকে তা বোঝাতে পারব না। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমি তোমার স্পর্শের অযোগ্য হয়ে পড়েছি। তোমাকে আমার অঙ্গ স্পর্শ করতে দিতে যেন আমার পানের মাত্রা আরো বাড়িয়ে তুলছি!”

রমানাথ দেখিল, নরনতারার মুখ হতাশের কালিমার আচ্ছন্ন রহিয়াছে। সে মুখে কোনদিন যে হাসির উজ্জলতা বিরাজ করিত, কল্পনাতেও আজ তাহা বৃক্ষবার উপায় নাই। সে বলিল, “মিছে কেন কষ্ট পাও? তুমি কি বুঝতে পার না, দেহটা আমাদের কিছু নয়। মনটাই আসল। আমি ভালবাসি তোমাকে, তোমার দেহটাকে নয়। তুমি

কি মনে কর, তোমার দেহের একটা কিছু হলে—রোগ হবে তোমার একটা হাত পসে গেলে তোমাকে আমি ভালবাসব না? তোমার কি কোন পরিবর্তন হইবে? তুমি যা ছিলে, তাই আছি। রোগ তোমার দেহের উপর অত্যাচার করে না? রোগ সেরে গেলে কেউ কি তা মনে করে কষ্ট পায়? মনে রেখো, আমাদের সম্পর্ক দেহ নিয়ে নয়। যতদিন মন আমাদের একনিষ্ঠ হয়ে পরম্পরে অহরহ থাকবে, ততদিন আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বাইরের কোন আঘাতই ভাঙতে পারবে না। মিছি-মিছি বা-তা ভেবে মনকে আর কষ্ট দিও না।”

স্বামী দ্বন্দ্বের পরিচয় পাইয়া নরনতারা আনন্দে গর্জে কাদিয়া ফেলিল। সে দীর্ঘে দীর্ঘে বলিল, “যখন নরাদম্পদের ঐক্যকে পালিয়ে আসি, তখন মনে ঠিক করেছিলাম, আমি আত্মহত্যা করব, এ পাশ সূখ শোক-সমাজে আর দেখাব না। কেন জানি না, ইচ্ছা হল, তোমাকে একবার শেখ দেখা দেখে যাই। তাই বাড়ীতে এলাম। কিন্তু এখন আর আমার কোন ক্ষোভ নেই, কোন লজ্জা নাই। তোমার চরণে যখন স্থান পেয়েছি, তখন আর আমার কিণের ভয়।”

৫

পরদিন ভোর হইতে না হইতেই চতুর্দিকে ঞ্চর হইয়া গেল, ভট্টাচার্য্যের বউ ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আন্তর্য্যের বিষয় এই যে, বাহারা হুই দিন নরনতারার লজ্জা এতখানি শোক করিতেছিল, তাহারা কেহই এ সংবাদে এতটুকু আনন্দিত হইল না।

বেচারী এখন কোথায় গাড়াইবে, সেহ তাবনাটাই সকলের কাছে এখন বড় হইয়া উঠিল। কারণ এটা জ্ঞান সত্য যে, তাহাকে সমাজে আর স্থান দেওয়া যাউতে পারে না। পাছে বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য দেহবশতঃ এমন-একটা কিছু করিয়া বলেন, বাহাৰ লজ্জা হয় ত তাহাকে সমাজের কাছে লবাববিহী করিতে হয়, তাই গ্রাম্য সমাজ পতিয়া পরাপরবণ হইয়া তাহাকে বুকাইয়া গেলেন যে ভগবান বাহাৰ কপাল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, মানুষ তাহাৰ আর কি করিতে পারে? পূর্বজন্মকৃত পাপের ফল তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে—সমাজের চেয়ে ত আর বউ বড় নয়।

কাজেই বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্যকে অনেক কানিয়া গলা ঝাড়িয়া অপর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পুত্রকে বলিতে হইল, “বাবা, দেখ, কি করব,—দুর্ঘটনা যেনে, সমাজ যেনে ত চলতে হবে। তোমাদের আর বয়স, ও সেবর দার বড় দার না। কিন্তু তাই বলে ত আর তোমাদের আমি সহ্যচ্যুত করে রেখে যেতে পারি না। তোমার কপালে যখন ভগবান হুঃখ লিখেছেন, তখন তা কেউ খণ্ডতে পারবে না; নইলে অমন সোনার বউকে কেন ত্যাগ করতে হবে! বউমাকে দুখিখে-তখিয়ে বিদায় করে দাও,—বলে দাও, যেন বাকি কটা দিন যথার্থ মন রেখে নববীণে বা কন্ঠিতে কোথাও তিনি কাটিয়ে যেন।...আর দেখ, যাতে আজই তিনি চলে যান, তারও বিহিত করে দাও। নইলে কে আবার কি বলবে, তার ঠিক নেই।”

এ কথা যে রমানাথকে শুনিতে হইবে,

তাঁহা সে জানিত এবং সে মজ্ঞ সে
অপনাকে প্রস্তুত করিয়াও রাখিয়াছিল। পুন
রাছেই নিধের কর্তব্য সে ঠিক করিয়া
কেনিয়াছিল। তাই সে ভিজালা করিল, “কি
অপরাধে তাকে ত্যাগ করতে আদেশ করছেন?”

পুত্রের প্রশ্নে পিতা আশ্চর্য হইয়া বলিয়া
উঠিলেন, “কি অপরাধ! কেন, সে যে
এখন পতিতা!”

রমানাথের আজ বিদায়ের দিন; তাই
সে আজ নিজের কথাগুলি বলিবার জন্য
তুধু হৃদয়োগ খুঁজিতেছিল। সে বলিল,
“হৃদয়েরা তার উপর বল প্রকাশ করেছে
বলে পতিতা হল, সে! সে কি কোন
অপরাধ করেছে যে, সমাজ তাকে শাসন
করবে? গ্রামে অপমান নিজেই সে মরে
আছে, কোথায় সকলে তাকে সাহায্য দেবে,
তা না আরো দার উপর খাড়ার ধা দিচ্ছে!”
বুদ্ধ কহিলেন, “কি করবে! সমাজে থাকতে
হলে—” রমানাথ বাধা দিয়া কহিল, “যে সমাজ
তুধু বর্জন করতেই জানে, মার্জনা জানে না,
সে সমাজ ভগবান আমার জন্য সৃষ্ট করেন নি।”

পুত্রের কথা শুনিয়া বুদ্ধ অশ্রু হইয়া

বহিলেন। রমানাথ বলিল না কবিতা
পিটার সমুখ হইতে চলিয়া আসিল।

পুত্রের রাগে রমানাথ ও নরনতার গৃহ
পরিভ্রাণের মজ্ঞ প্রস্তুত হইল। নরনতার
বলিল, “দেখ, তোমাকে আবার বলছি,
আমার জন্য কেন তুমি সব ত্যাগ করবে?
তুমি থাক, আমি একা বাই।” আমার
অনুষ্ঠে গা আছে, তাই হবে।”

রমানাথ বলিল, “তোমার অনুষ্ঠে আর
আমার অনুষ্ঠে কে ভগবান একন্থে বেঁধে
দিয়েছেন, এ কথা তোমাকে কতবার বোঝাব?
তুমি কি মনে কর, তুমি বিশেষ বিপাকে পথে
পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, আর আমি
এখানে বড় আরামে বাড়িতে শুয়ে যুবে?”

নরনতার চোখ জলে ভরিয়া আসিল।
স্বামীর পারে হাত রাখিয়া সে বলিল,
“এত দিন তোমাকে চিনতে পারি নি। সত্যি
বলছি, তুমি দেবতা।”

রমানাথ তাহাকে বন্ধে জড়াইয়া ধরিয়া
কহিল, “বেবতাই নরন, তুধু তোমার স্বামী।”

ঐহেমুচন্দ্র বসু।

কোষ্ঠী-বিচার

[পণ্ডিত-সরটি, পাণ্ড-বিদ্যায়, ঐমং নবমুসার কবিয়র, মোয়াজ্জিদী, তুতুতুণ, মিহির-নগাণ, খন-বচন-খনি, বরাহ-বিজ্ঞা-বারিবি ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি কৃত-সারসং Sir চিত্ত-চিকিৎসকত ডাক্তার ঠাহুরোপাধিক্ত ঐরবীন্দ্রনাথ গুপ্ত-কোষ্ঠী-বিচার।]

“নমো কৃতসংহিতাটো নমঃ শ্রীভূগবে নমঃ।
নুত্ৰায় তু সনুত্ৰায় সামুদ্রিকায় এবচ ॥”
কৃতসংহিতাকে নমস্কার করি; শ্রীমদ্

ভূগবে নমস্কার করি; সামুদ্রিক বিজ্ঞাকে
নমস্কার করি। সনুত্ৰকে অর্থাৎ বিনি সনুত্ৰায়
সহিত বর্তমান ঠাহাকে নমস্কার করি;

আর ধোঁয়ায় ভূমিকে ঘোষিত করেন সেই
শত্রুসমর্দন আনন্দসমর্দন মুক্তা-সকলকে আধি-
শত শত নমস্কার করি।

“গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী গোকুলানন্দ গো-
গোপ-গোপিকা-কান্ত গোবিন্দ আমাকে
গো-ব্রাহ্মণের অঙ্কজুঁত জানিয়া কোনো
মতেই আমার উপর জুঁত হইবেন না”—
ইহা যোগবলে জানিয়াই যিনি জীতগযানু
জীকৃত বাহুসেবের বক্ষে পদাব্যাত করিয়া-
ছিলেন সেই শোকচরিত্রাঙ্ক বিজয়র ভৃগু-
মুন্ডিকে আমি নমস্কার করি। যিনি গণক-
দিগের অগ্রাণী ও ভৃগুগণহিতায় জনক
সেই শাস্ত্রমণী আদর্শপুরুষ ভৃগুমুন্ডিকে
আমি নমস্কার করি। লক্ষ্যক্ষেত্রে তুতে বাঁহাণ
দাড়ি উপড়াইয়াছিল সেই মুনিপুংসব
ভৃগুমুন্ডির কৃপার ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই
আমি ‘ফুট’ কথিয়া, ‘ফুট’তর করিয়া নথ-
মর্শনের জার দেখাইব। আপনরা একটু
অবহিত হউন।

২। জাতকের জন্ম বিশাখা নক্ষত্রাদিত
বৈশাখ মাস; বৈশাখ মাসে রবি মেঘ-
রাশিতে অবস্থিত করেন। আবার জাতকের
নামও হইবে রবি; হুতরাং তাৎকালীন
গগনচারী রবির যে দশা ভূতলচারী রবিরও
সেই প্রকার, অবস্থা হইবে। রবি মেঘ-
রাশিতে ছিলেন, হুতরাং রাশীকৃত মেঘের
মধ্যে ইহাকে দিন যাপন করিতে হইবে।
ইহার প্রতিভার ‘ফুন্ডে’ মধ্যে মধ্যে এই
রাশীকৃত মেঘে অর্থাৎ রাষ্ট্রব্যাপী ভেড়ার
গোমালে আশুদ লাগিয়া যাইবে। তজ্জন্ত
ভেড়ার অর্থাৎ গড্ডলিকার ইহার বিরুদ্ধা-
চরণ করিবে। কিন্তু এই ভেড়াদের শৃঙ্গে

পতিত হইলেও ইহার ধার কমিবে না,
কারণ ভেড়াও শৃঙ্গে পড়িলে হীরাতে ধার
ভাঙে, রবির ভাঙে না। ভেড়ার ভেড়া
বলিয়াই রবিকে একখণ্ড প্রকাণ্ড হীরা
বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু ইহা ভেড়াদের
জূল। হুতরাং গড্ডলিকার শৃঙ্গে পড়িলে
রবির কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না, ভেড়ারই
শিং পুড়িয়া যাইবে।

২। জাতকের জন্ম-সন বার-শত আট-
ষটি। অর্থাৎ আট, ষাট, বার। বার—
অর্থাৎ বারে বারে ইহাকে অল্প ধরিতে
হইবে, কলিতে কলম ধরিলেও চলিবে;
কারণ কলিতে কলম-ধারীরই অল্পধারীদের
হান অধিকার করিবে। ষাট—অর্থাৎ অস্ত্রভঃ
ষাট বৎসর কাল এই প্রকার যুদ্ধ করিতে
হইবে, তাহাতে লোকে ইহাকে কলমধারী
অঙ্গীশাট বা ঐ প্রকার কিছু বলিবে; ঐ
প্রকার একটা উপাধিও দিবে। আট—
অর্থাৎ আটকাইতে পারা অসম্ভব। বারে
বারে কলম ধারণই ইহার ভবিষ্যৎ।

৩। ইহার জন্ম-তারিখ পঁচিশে, আর্ঘ্য-
ভট্ট এবং ব্রহ্মগুপ্ত হলেন পাঁচকে পাঁচগুণে
গুণিত করিলে পঁচিশ হয়। ইনি পাঁচজন
লোককে গুণ করিবেন, অর্থাৎ পাঁচ রকম
গুণের দ্বারা পাঁচ জনকে বশ করিবেন।
ইহার জন্ম-তারিখ পঁচিশে হওয়াতে
ইহার মনের বসে চিরকালই পঁচিশ থাকিবে,
—মনের বছরেও পঁচিশ, পরষটি বছরেও
পঁচিশ।

৪। জাতকের জন্মতিথি কৃষ্ণা
জ্যেষ্ঠাশী। সর্কসিদ্ধি ত্রয়োদশী! ইনি বে-
কাজে হাত দিবেন তাহাতেই সিদ্ধিলাভ

হইবে। অল্পগা হইবে না। তবে এগোদশী কৃষ্ণ পক্ষীয় বলিষা শাদার উপর কালি দেওয়াই ইহার পক্ষে প্রশস্ত। শাদা কাগজে কালির আঁচড় টানিয়া ইনি যে পরিমাণ সিঁদিলিও করিবেন, ব্র্যাক্-বোর্ডের উপর খড়ি পাড়িয়া ঝাঁক কমিষা অর্থাৎ বাটারি করিয়া ইনি ঠিক সেই পরিমাণ সিঁদিলিও করিতে পারিবেন না।

পুনঃ—কৃষ্ণা এগোদশীতে জন্ম হওয়ার কাতকের কখনো এককালীন এগোদশীর দেশী অন্তরঙ্গ বহুলাত ঘটিবে না। শুক্লা এগোদশীতে জন্ম হইলে, তের চুঙগে ছাফিবণ, এমন কি এককালীন তিন-তেরং উন-চল্লিশটি পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু পাইতে পারিতেন। চিকিৎসা করিতে পারেন, কেন এমন হয়? শাস্ত্র বলিতেছেন শুক্রে ও কৃষ্ণে অর্থাৎ গোমায় ও কালার অনেক তকায়, সূতরাং ফলেরও তকায় হয়।

৫। জাতকের জন্ম-মাগ বৈশাখ, বই হইয়াছে শাখা যার তিনিই বৈশাখ। সূতরাং বাৎসর্যসিদ্ধিকর এই বনস্পতির বই-রূপ শাখা বাহির হইবে। ভূগুণসংহিতার ইহা স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে।

৬। জাতকের জন্মকালীন চন্দ্র মীন-রাশিতে অবস্থিত করিতেছিলেন; মীন জলচর জীব; সূতরাং জাতকের বশোরূপ চন্দ্রনা জলচর জাতের মধ্যে যে রূপ প্রভা-ভাল বিস্তার করিবে, জলচর মেঘনিগের মধ্যে শুভ্রপ পারিবে না। এখানে জলচর লব্ধ জলবেষ্টিত বীপবাগীহিগের সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারিবে। কারণ জলের নিকটে থাকিলেও জলবাগী অর্থাৎ জলচর

বলা যায়। সর্গশাস্ত্রেণ বাসবরূপ যে ব্যাকরণ-শাস্ত্র তিনিও এ কথাই সারি দিয়া থাকেন। “গগরাং ঘোব” কি না, ঘোব মহাশয় গগরার বাগর বাধিয়াছেন, কি না গগরাবাসী হইয়াছেন অর্থাৎ গগরাভীরবাসী হইয়াছেন। এ-সম্বন্ধে ব্যাকরণ-শাস্ত্রের কথা। সূতরাং অকটা। আমরা শাস্ত্র-পরিচয় ও জাতি, শাস্ত্র লভ্যন আমরা প্রাপ্যভেদে করি না, করিতে পারিও না। চাগ মেবাদি যেমন ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাইতে পাবে না, আমরাও তেমনি শাস্ত্র ডিঙাইয়া কোনো কিছুতে প্রবৃত্ত হইতে পারি না। ইহা অশ্বদেহীতের ভবিষ্য। ইহাও ভূগুণসংহিতার লেখা আছে—স্পষ্টাক্ষরেই লেখা আছে।

৭। মীনের ঠিক পাশের ঘরেই কুস্ত। সূতরাং মন্ত-লোকে কীর্ষি কীর্ষিত হইবামাত্র কুস্ত-রাশির প্রভাবে কুস্ত কুস্ত অর্থাৎ বড়া বড়া টাকা গিনি বা মোহর প্রাপ্তির খুবই সম্ভাবনা। অন্তঃ শাস্ত্রে এই প্রকারই লিখিত আছে। শাস্ত্রে যে রূপ দৃষ্টি করিতেছি সেইরূপই বলিতেছি। অপিচ শাস্ত্রই আমাদের চক্ষু। আর লোকে বাধাকে চক্ষু বলিয়া আসে তাহা রক্ত-মাংস-ময় পর-কোলা মাত্র। উহা তো ভোগ্য-ব্যভেদও আছে, কুণী মজুরেরও আছে। আমরা শাস্ত্রবাবাসী, বিতর্ক শাস্ত্রজ্ঞানের হৃদয় আলোচনা করিয়া থাকি। স্থল রক্ত-মাংসের ধার ধারি না।

৮। মেঘ-রাশিহিত রবির দ্বিত্বস্থান, কর্কট। অর্থাৎ কর্কট রবির দ্বিত্ব। মেঘ-গণ যখন সবিকে একত্রে বৃহৎ হীরা মনে

করিয়া ঐ হীরাতে নিজ নিজ শিং ঘষিতে আসিবে তখন কর্কট করজোড়ে অর্থাৎ দাড়া জোড়ে মিনতি করিবে; মিনতিতে ফল না হইলে কর্কট কত্টিয়া শুনাইয়া দিবে। কর্কট করিয়া শুনাইয়া দেয় বলিয়াই উহার নাম কর্কট। ইহাতেও যদি গড়-ডলিকা বিরত না হয় তবে দাড়া দিরা ভেড়াইয়া গলা আঁকড়াইয়া ধরিলে। ইহা হইল চরমের ব্যবস্থা। কারণ কর্কট মলচর জীব, সহজে উহারের রক্ত গ্ৰহণ হইবে না।

৯। মেঘহ রবিব নানিলাস্থানে তুলা। জাতকে তুলাবত্ত্ব অর্থাৎ দাড়িগালা ধরিতে হইবে। দাড়িগালা ধরিয়া ইহাকে তুলা অথবা তক্তা কোনো দ্রব্য অর্থাৎ কোমর-ভাষাপর বস্ত্র কাষবার করিতে হইবে। তুলা মানে যদি নিষ্পত্তি ধরা যায়, তবে ইনি ডাক্তার হইবেন। কারণ নিষ্পত্তি হইল ডাক্তারীর প্রদান অঙ্গ। উহাতে করিয়াই ডাক্তারী ঔষধ গুলন করিতে হয়।

১০। ইহাঁর অর্থাৎ মেঘহ রবিব বিজাহানে সিংহ। ইহাঁর বিজায়, বোধ হয়, সন্নীতবিজায় যুদ্ধ হইয়া শক্তির বাহন সিংহ ইহাঁকে খাতির করিলে, পিঠ পাতিয়া দিবে। ইনি যদি কখনো পশুপাণা দেখিতে যান তবে ঐদিন উজানস্থ সিংহসকল আনন্দে গর্জন করিলে, আমার গণনা ভুল হইবার নয়।

১১। দশমে মকর, অর্থাৎ কর্ণস্থানে মকর। মকর হইল গঙ্গাদেবীর অন্তর্ভুক্ত (Submarine) বজরা; সুতরাং বজরায় থাকিয়া গঙ্গা বা তৎৎ কোনো বৃহত্তী নদীতে

ইনি কর্ণ করিবেন। নির্জলা মাঠে দিয়া ইহাঁর কাজকর্ম তেমন সুবিধার হইবে না। তবে যদি ঐ মাঠে মকরাকৃতি বজরা বা বজরাকৃতি ভবনে বাস করতঃ কাণ্যাদি করেন, তবে মন্দের ভাল হইবে।

১২। মেঘহিত রবিব আর-স্থানে কুন্ত, সুতরাং ইনি যেক্ষের ধন পাইবেন। অর্থাৎ যে ধন যুগযুগান্ত ধরিয়া মালিকের অপেক্ষার মাটির তলে আছে তাহা ইহাঁর করগত হইবে। জাতক যদি যশোধন হন, তবে ইনি কুন্তমস্তব অগস্ত্যের স্তায় অনেকের যশোক্ষপ সমুজ্জ্বল নিঃশেষে পান করিয়াই যশোধন হইবেন।

১৩। জাতকের জন্ম দেখিতেছি সোমবারে, ইহা নিশ্চয়ই ঠিকুটাকারের তুল। রবিব জন্ম রবিবারেই নিশ্চিত। নিজের নাম থাকিতে কেহ জন্মের বারে কল্পগ্রহণ করিতে যায় না। স্বকীর গৃহ বর্তমান থাকিতে বাবুই বিহঙ্গের বর্ষাভিষেক হওয়া সম্ভবপর নয়।

১৪। জাতকের জন্মনক্ষত্র—একশে দিনমান বলিয়া—ঠিকু নৃষ্টিগোচর হইতেছে না। দিবাভাগে নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া অতি দুর্ঘট ব্যাপার। বাহার বহু-নিয়মাদি অন্ত্যাদ-পূর্নক যোগী হইরাছেন, অথবা বাহার নিয়মিত কুটুঙ ও পলাতু তত্ত্ব করেন, কেবল তাঁহারাও দিনে তার দেখিতে পান। যদি কুটুঙ ও পলাতু খাইতাম তবে আমিও দেখিতে পাইতাম। সত্যতঃ আবার যৌব-নাত্তিক প্রারম্ভিত করিয়া শুদ্ধিভাষ্য নাম লিখাইয়াছি, সুতরাং ৩২শ জিনিসের নাম আর মুখে আনা নয়। সুতরাং চোখের

ভেজ কমিগাছে। তব্বির ভূত বর্ণিত পথে
 বাহারি বিচরণ করেন উৎসাহের নক্ষত্র-
 পর্ষাবেক্ষণ সমীচীন কিনা তাহাও বিচার্য।
 আপনারা বিম্বিত হইতেছেন? স্থির হউন।
 বাহা বলি শ্রবণ করুন। ভূতবংশীর পরজ-
 রাম জ্যোতির্মদিগকে গর্জ্বাত ও রোষদীপ্ত
 ক্ষত্রবস্ত্র মনে করিয়া উদ্ভাসিত হুঙ্কার
 করেন, তাহাতে উহার "ন ক্ষত্র" অর্থাৎ
 "আমরা ক্ষত্রিয় নই অতএব আমাদের
 মারিশেন না" এইরূপ কাপুরুষোচিত উক্তি
 দ্বারা আশ্রয় লইয়াছিল। আমি এই
 কাপুরুষদের কোনো কথাই থাকিতে চাই না,
 উদ্ভাসের মুখদর্শন করিতে চাই না। সকলে
 উদ্ভাসের মুখ দেখিলে দিন ভাল বাইবে না।
 আর নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু
 কপালে তুলিবারই বা প্রয়োজন কি?
 নক্ষত্রবিষয়ে বাহা জ্ঞাতব্য তাহা তো ভূত-
 মূর্তির পুঁথির মধ্যেই পাইব। আমি ক্ষত্রি-
 যের আশ্রয় চাইতে অধিক আশ্রয়

দুঃসাক্ষ্য রাখি না; আমি স্নেহ
 নই।

* সে বাহা হটক, আপনারা আমার কোষ্ঠী-
 বিচারের ক্ষমতা স্বত্বকে দেখিলেন, স্বকর্ণে
 শুনিলেন। এক্ষণে নষ্ট-কোষ্ঠী সম্বন্ধে বাহাদের
 কোতুলক আছে তাহার গোপনে পান
 সুপারি ও পরমা লইয়া একদিন একাধে
 আমার সঙ্গে বাসায় দেখা করিবেন। আমি
 চটক-পক্ষীর নথ দেখিয়া আপনাদের সকলের
 সম্মানক্ষত্র বলিয়া দিব। পূর্বাঙ্কে পক্ষিকা
 দেখাইয়া দিন * ক্ষণ দেখিয়া আসিবার
 আবশ্যকতা নাই! সামুদ্রিক গগনায় স-মুদ্র
 হইয়া আসিবেন, আমি আপনাদের মনো-
 বহা পূর্ণ করিব। তবে, দেখুন, ব্রাহ্ম-
 মুহূর্তে আসিবেন না, হিন্দুর ছেলের পক্ষে
 ব্রাহ্ম-মুহূর্তে কোনো কাজ করা ভাল নয়।
 কারণ ঐ মুহূর্তটার সঙ্গে ভট্টাচার ব্রাহ্মদের
 নাম সংযুক্ত আছে। ও সময়ে আসিলে
 আমার গণনা ফলিবে না।

শ্রীমৎকুমার কবিরত্ন।

বেঙ্গলি

বিগত ৮ই মে বেঙ্গলি জ'হাজের নামকরণ
 অনুষ্ঠানে আমরা নিমন্ত্রণ-সভায় উপস্থিত
 ছিলাম। সভায় কার্যাবিবরণ অভিভাষণাদি
 তৎপর দিনই সংবাদপত্রগ্রন্থাৎ সকলে
 অবগত হইয়াছেন, কিন্তু তথায় সমবেত
 প্রত্যেক বাঙ্গালীর ক্ষমতা সেদিন যে উৎসাহ-
 প্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা বিনি

সাক্ষাৎভাবে অল্পভব না করিয়াছেন তাহাকে
 কথাই সে ভাব স্থান অসম্ভব।

সভাপূত্র সে যুগজীৱ হুইলেন। বৃহৎকার
 হুগোল হুদ্রত জ্ঞাতাবলী শোভিত, চম্ভাতনশীর্ষ,
 হুসজ্জিত গ্রিন্‌মেণ বাট-নঙে সপারিবদ
 গভর্ণর সাহেবের স্থান, তৎপার্শ্বে সামিয়ানার
 নিয়ে দর্শকমণ্ডলী সমাসীন, শ্রীপুরুষের

হান পৃথক। তাঁহাদের পার্থে উন্মুক্ত মরদানে
শ্রেণীবদ্ধভাবে মণ্ডারমান থাকি-পাখাকধারী
বেজাদেশবক বাঙ্গালী যুক্তবৃন্দ। ইহারা এই
আহত নৈনিকবিগের সেনার লজ পেশলি
জাহাজে আফ্রিকার যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা
করিলে।

বেশ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের
চেহারাও কি আশ্চর্য্য পরিবর্তন। বাঙ্গালী
বলিরা আর চেনাই যায় না, অস্তিত্ব আশ্রিত
চিনিতে পারি নাই। লিখ বলিতে পারা
যায় না, গুণদল বলিয়াই ভ্রম হয়; অস্ত্রধারী
হইলে এ ভ্রমটুকুও হইত না—অধিকাংশ
যুবকই এমনি গ্রহ ও বলিষ্ঠকার। যখন
তমিলায় ইহাবাই বেজাদেশবক—আমাদেরই
দেশের ছেলে, তখন আনন্দে বুকটা যেন
ভরিয়া উঠিল।

ইহারা অনেকই বেশ ভদ্রব্রহ্মের সন্তান
এবং উপার্জনশীল; কোন না কোন আফিসের
ক্লার্ক; কয়েকজন প্রীভারও ছিলেন। বদেশ,
পরিবার গ্রহ স্বাক্ষর উপার্জন সমস্ত ছাড়িয়া
বীমোচিত পরোপকার কার্যে আত্মদান
করিতে প্রবলে চলিয়াছেন। কে জানে
ইহারা পরিণামে কি? চোখে জল আসিল।
কিন্তু সে আনন্দ-হিম্মোলেশের মধ্যে অশ্রু হান
নাহি আজ, নহনের জল নহনেই গৌন হইয়া
পড়িল।

সভাভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম,
যাহারা বাঙ্গালীর ভীক নাম দ্বন্দ্ব করিয়াছে
তাহাদের সহিত একটা কথা না কহিরা কি
পাকা যায়। অবসর পাইবামাত্র নিকটে
আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “ইচ্ছা হুখে
ঘাইতেছ ত?” এক বাক্যে উত্তর ধ্বনিত

হইল “অবশ্য অবশ্য।” আকাশে প্রান্তরে জলে
হুখে সেই উৎসাহ-বাক্য শত উচ্চারণে যেন
ছড়াইয়া মিলাইয়া পড়িল। আর গভীর-
প্রমুখ মস্তকে কি তাহার কথা স্পর্শ করে
নাই? নিশ্চয়ই করিয়াছিল। সেদিনকার
উৎসাহে রাজা প্রজা জেতা বিজৈতার
সমীকরণ হইয়া গিয়াছিল তাই সেদিনটি
বাঙ্গালির পক্ষে একটি অরণির দিন।

একদিন বাঙ্গালী জাতির ভীকতা অপমান
কত ব্যঙ্গ কবিতার পোরাক ভোগাইয়াছে—
কিন্তু আজ। আজ হইতে ইতিহাস নুতন
কাহিনী গাইবে; আজ যে প্রাণদানের লজ
বাঙ্গালীর মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে।

এই যে অঙ্গ বঙ্গের বীরভাণ—আত্ম-
দানের ইচ্ছা—গভর্ণমেণ্টে যদি এই সুযোগ
গ্রহণ করিয়া ইহাকে অংশে চালিত করেন
তবেই দেশের কার্যে গভর্ণমেণ্টের কার্যে
ইহা সম্পূর্ণভাবে সার্থকতা লাভ করিতে
পারে। আমাদের মনে হয় এই নীতিই
রাজপ্রোহিতা নিবারণের একটি অমোঘ
উপায়। বাহারা মরিতে চায় রাজকন্ঠেই
তাহারা মরুক না।

আমল কথা শুধু অস্ত্র বাধিলেই চলিবে
না, ইচ্ছার গতি বাধা চাই। যখন অস্ত্র
আইন ছিল না, যখন অবাধে লুণ্ঠনে অস্ত্র
ব্যবহার করিতে পাইত তখন করদান ভদ্র-
সন্তান খুল ডাকাতি করিত বা রাজপ্রোহী
ছিল? রাজপ্রোহিতা বলিয়া একটা কথা তখন
ভারতের—অস্ত্রত: বাঙ্গালার আইন আদালতে
উঠে নাই। আর এখন অস্ত্র আইন করিয়াও
গভর্ণমেণ্ট অস্ত্র ব্যবহার নিবারণ করিতে
পারিতেছেন না।

যে দিন গভৰ্ণমেণ্ট এই বীৰভাবাপন্ন যুৱকদিকৈ দৈনিক কৰিবা লইবেন, আমাদেৱ বিৰাম, সেই দিন সেই মুহূৰ্ত্তে তাহাৰা গভৰ্ণমেণ্টেৰ সহিত এক হইবা পড়িব। এবং কালেক্টৰেই তপন হইতে গভৰ্ণমেণ্ট-স্বেচ্ছা অতীতেৰ একটা কথা মাত্ৰ হইবা গাঁড়াইবে। ইহাৰ চূড়ান্ত বাস্তৱ্য পুনিশ। পুনিশকে বিৰাম কৰিবা এমন অকালেও গভৰ্ণমেণ্টকে কোন দিন অহুতাপ কৰিতে হইয়াছে কি? আৰ এও কথা, দৈনিক আটন বড় কড়া আইন; একবাৰ তাহাৰ পাশে বন্ধ হইলে কোন যুৱকেৰ গতি-বিশৃঙ্খলাও উন্নয়ন নাই।

যেমন অধুনা এই বৃদ্ধ উপলক্ষে ইংৰাজ-ৰাজহুৱেৰ নিয়ম বিলাতে ভাৰত দৈনিকে ইউৰোপীয় দৈনিকে প্ৰাণেৰ মিলন ঘটয়াছে সেইৰূপ বাঙ্গালী-সন্তানকে যুদ্ধে গ্ৰহণ কৰিলে এদেশেও ৰাজা প্ৰমাণ মধ্যে বিৰামসম ও কাৰ্যেৰ একটা প্ৰেমময় মহামিলন ঘটবে। ৰাজা প্ৰজা উত্তৰেৰ পক্ষেই ইহা কি মহাশক্তি নহে?

যাক শে কথা, কত বড় বড় লোকে এই প্ৰস্তাব লইবা নৃত্তিক আলোড়িত কৰিতেছেন আৰ আমাৰ ভাৱ ক্ষুদ্ৰ হইতে ক্ষুদ্ৰাবশি লোকেৰ এ প্ৰসঙ্গ উত্থাপন বিড়ম্বনা মাত্ৰ। তবুও মন বাহা বলে, যুধে তাহা বাহিৰ হইবা বাৰ।

গভৰ্ণৰ সাহেব জাহাৰ দেখিবা চকিৱা বাইবাৰ পৰ আমাৰা জাহাৰ দেখিতে গেলাম। জাহাৰেৰ বেঙ্গলি নামকৰণ দেখিলাম সৰ্ব্বতোভাবে সাৰ্থক। বেঙ্গলিৰ ভাস্কৰ বাঙ্গালী, বেঙ্গলাসেবক বাঙ্গালী, খালানীৰ

পণ্ডিত বাঙ্গালী। কাপ্তেন কেবল ইংৰাজ— কিন্তু তিনি বাঙ্গালীৰ বেতনভোগী। জাহাৰেৰ সমুদ্র খৰচই তুলিলাম বাঙ্গালীৰ দান। কেন্দ্ৰৰ খৰচ, চালাইবাৰ খৰচ আসবাব শত্ৰেৰ খৰচ সবাই বাঙ্গালীৰ; জাহাৰেৰ যে ইলেকট্ৰিক কাৰখানা তাহাও বাঙ্গালী-ইঞ্জিনিয়াৰ কৃত; আৰ এত বড় একটা উদ্যোগেৰ কৰ্ত্তা হইবেহেন স্নেহেৰ সৰ্বাধিকাৰী প্ৰমুখ বাঙ্গালীৰ দল। বাঙ্গালী নামেৰ কলঙ্ক-কালিমা তাহাৰা আজ সৰ্বজন সমক্ষে কালন কৰিলেন। তাহাকে অন্তৰেৰ সহিত আমাৰা স্বত্ববাদ জাপন কৰিলাম।

জাহাৰেৰ নীচেৰ ডেক বেঙ্গলাসেবক দিগেৰ বাসস্থল, আৰ উপৰেৰ ডেক আহত দিগেৰ উদ্দেশে তত্ত্বব্ৰশোভিত খট্টাশে পূৰ্ণ। ডেকেৰ আপে-পাশে শব্দালয়, চিকিৎসালয় ইত্যাদি।

উপৰ ডেকে বাইবাৰ সিঁড়ি নিত্যন্ত ছোট, অনবরত দৰ্শক ভ্ৰমী সেই ক্ষুদ্ৰ পথে উপৰ নীচে যাতায়াত কৰিতেছেন। আমাৰা যখন উপৰে উঠিবাছিলাম তখন ভিত্ত একটু কম ছিল,—নাদিবাৰ সময় হু একটা বাঙ্গালী যুৱকেৰ সহায়তা লইবা নানিৰ্ণায়। এইৰূপ সহায়তা-দানেও তাহাদেৱই বা কত উৎসাহ আৰ তাহা এংগে আমাদেৱই বা কত আনন্দ। দেশেৰ ছেলে আজ দেশেৰ মেয়েদেৱ সম্মান ৰক্ষা কৰিতে শিখিৱাছে।

ইহাৰ পৰ আমাৰা নীচে নামিবা একটা ছোট ক্যাবিনে গিৰা বসিৱাছি হঠাৎ অনুম্ন কৰিবা একটা শব্দ হইল। পাশেৰ ক্যাবিনে দুএকজন ইংৰাজ চা পান কৰিতেছিলােন, সেইদিকে চাহিবা দেখিলাম

একজনের হাতের পেরালা নীচে পড়িয়া
টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে! শুনিমাইলাম
কাচভাঙ্গা কুলকণ। হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম।

* * * *

আজ ২৩শে মে সকালে সংবাদ-পত্রে
দেখিলাম, বেঙ্গলি আর্ডার ডুবিয়া গিয়াছে।
হা ভগবান! এত আনন্দের এত উৎসবের
পরিণাম কি ইহাই! কাগজখানা হাত হইতে

খসিয়া পড়িল। অনেককাল পরে আবার
সেখানা তুলিয়া পড়িয়া দেখিলাম, লোক
কেহ মরে নাই, সকলেই রক্ষা পাইয়াছে।
কি সাশ্বনা! ছেলেরা কেহই ভাগ্যক্রমে
এ আর্ডারে ছিল না; তাহারা অল্প পণে
আগে হইতে সিলনে গিয়া অপেক্ষা
করিতেছিল। এখন তাহারা কোথায়
বাইবে? তাহাদের গতি কি?

ঐশ্বর্যকুমাৰী দেবী।

সমালোচনা

সাহিত্য। ঐশ্বরী প্রবীতি দেবী প্রণীত।
কলিকাতা, কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত ও কেশবদাস
শিখালা বেঙ্গলি সিটি হইতে প্রকাশিত। মূল্য
আট আনা মাত্র। এখানি কয়েকটি ছন্দ কবিতার
সমষ্টি। কবিতাগুলি বাসিকা-কবির আট হইতে
পনেরো বৎসর বয়সের রচনা।

চন্দ্রহাস-বিষয়া। ঐগুরু নগেন্দ্রকুমার গুহ
রায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীকালীমোহন সোম, ২০২
কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। লক্ষ্মীবিলাস প্রেসে
মুদ্রিত। লেখক 'নিবেদনে' বলিয়াছেন, 'মৈমিনি
ভারত হইতে তিনি প্রস্থের উপাখ্যান-কাণ্ড সংগ্রহ করিয়া-
ছেন এবং ৮ ব্রাহ্মকৃষ্ণ রায় প্রণীত 'চন্দ্রহাস' নামক
নাট্যগ্রন্থ হইতেও কিছু সাহায্য পাইয়াছেন।
উপাখ্যানের বিষয়টি এখানে সজবৎ সকলেরই জানা
আছে, কিন্তু লেখার দোষে বিষয়টি এমন নিম্নাণ
হইয়া পড়িয়াছে যে দেখিলে কষ্ট হয়। তবে বাঁধানোর
জলপে ও ছাপার চটকে পাঠকের তাক লাগাইবার
লজ্জা যথেষ্ট আশা করা হইয়াছে; কিন্তু গ্রন্থের বিষয়,
আসর্য তাহার স্বাধাতি করিতে পারিলেন না।
অভ্যুৎসাহে চাপে শিরসার পড়িয়াছে। প্রবন্ধ ছবিও
কয়েকখানি দেওয়া হইয়াছে—সেগুলিরও ছাপা এবং

পত্রিকার অক্ষত। অর্থাৎ হইখানি দেখিলে
ভীষের গভীর কখাই মনে পড়ে—এমন ভারী মিনিস
পাঠকের শব্দে উঠিতে নাই।

অন্য। নাট্যকাব্য। আলো ও ছায়া প্রণেতা
প্রণীত। কলিকাতা, রায় এম, সি, সরকার বাহাদুর
এও সঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৭১১ নং হারিসন
রোড। ১৯১৫। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য
নাট দিক। মাত্র। 'আলো ও ছায়া' বাংলাভার
কাব্য-সাহিত্যে একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'আলো
ও ছায়া' যে হাতের লেখা, 'অন্ধা'ও সেই হাতের।
'আলো ও ছায়া' প্রকাশিত হইবার বেড়ে বৎসর
পরে লেখিকা অখ্য রচনা করেন। অর্থাৎ সে আলো
চল্লি বৎসরের কথা। লেখিকার প্রতিভা তখন
পূর্ণ বিকশিত। 'অন্ধা'তে সে প্রতিভার ছাপ
আছে। তবে 'অন্ধা'কে নাটকের বিভাগে না
কেনিয়া আমরা ইহাকে কাব্যেরই অন্তর্ভুক্ত করিতে
চাহি। নাটকের কাব্য-গতির হিসাবে বলিলে, এ কথা
আখ্যানিকে খাটার করিতেই হইবে, যে, অখ্য
দে কাব্য-গতি একটু 'রো'-মুহু! তবে কাব্যের
উপাখ্যান ইহাতে আছে। 'অখ্য' চরিত্রটুকু লেখিকা
অলস স্টুডেন্ট তুলিয়াছেন—উপেক্ষিত। দারীত সকল

ভেন, সকল শক্তি, তাহার জননের ভীষণ ধন্য
 লেখিকার প্রবল তুলিকার সজীব হইয়াছে। আমাদের
 চোখের সমুখে ভেরাবিনী আর্ধ্য রমণীর—তুখু আর্ধ্য
 রমণী কেন,—রমণীমাত্রেয়ই ধবরের যে হবিটুহ
 জাণিয়া উঠিয়াছে, তাহা জীবাশ্ম, তাহা জ্ঞানময়!
 তুলির চুই-গাঠিত। মাত্র বোনাও আদর্শ-চরিত্র ভীষ্মের
 যে পরিচয়টুকু জুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অশ্রুত!
 অথবা ভীষ্মের উপর প্রতিপোধ-গ্রহণে তৎপর হইলে
 মহাভেদ অথাকৈ দ্বিজ্ঞান করিলেন, ভীষ্মের প্রতি
 এ বিবেচ কেন? অথবা উত্তর বিলেন,

“বেহ-বলে পেছিল যে পনের সানিয়া
 কিনিতে নারীর স্রোম, তার ঠাট্টাতোর
 দিতে চাই ভার দণ্ড।”

অল্প মহাভারত-কার এ-সকল বৃত্তি বা কাহনের
 উল্লেখ করেন নাই। এ বৃত্তি ‘অথ’ কীং-প্রশ্নেতর
 বক্ষণোৎকর্ষিত; প্রশ্ন! মহাভারত অথাকৈ জী-
 বনের অস্ত্র বিলেন; কিন্তু ভাবিগা-ভিত্তিগা অথবা তাহা
 প্রত্যর্পণ করিলেন। অথ! কহিলেন,

“বেহ, বুধা অশ্রুলাভ।

রমণী-ধবরে মোর রমণী-হুলত
 শাখিরস নিশিদিন করে মকরন,
 মীরবে, নিতৃত-তলে; উপরে আশ্রুত
 প্রতিহিংসা বাণুবর-সম। শুক কর
 এই অভ্যঙ্গীনা নদী, নহিলে পারি না
 ভীষ্মের করিতে নাপ। রমণীর বেহে
 বেহ পুত্রবের মন, নির্দ্বন্দ্ব নিহুত;
 হত কর বহুগায়। বনি নারীবেহে
 তুগা করি, পুত্রবর না চাহে আশ্রিতে,
 দগা করি দাঁও নোরে পুত্রবের বেহ;
 পুত্রব পুত্রব নামে করিব সংগ্রাম।”

তাই পদ-দ্বয়ে অথার শিবভীতে পরিণতি।
 বলিতে কি, এইখানেই কথির পরীক্ষা—সে
 পরীক্ষার তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি পদ-রক্ষা
 করিতে পারিয়াছেন। দ্বিতীয় বতই কেন প্রতি-
 হিংসা-পরায়ণা যৌব না কেন, তিনি সারীই।
 লেখিকা এইখানে নারী-চরিত্রের সর্বাঙ্গী রক্ষা

করিয়াছেন। এইখানেই তাহার শক্তির পরিচয়।
 মোটের উপর, অথ! পাঠ করিগা আনন্দ প্রবী হইয়াছি।
 প্রস্তুত হাণা, কাগল, বাখাই বেশ মনোহর হইয়াছে।

উত্তীর্ণিত নোহিসি। ঐগুত কিত্তিগ্রন্থ
 ঠাহুর তত্ত্ববিদী প্রবীত। আদি ব্রাহ্মদেব যত্রে মুদ্রিত।
 একাশক, ঐদ্বিরূপকর সুপোপাখ্যার, ঠাংনং বারিকা-
 ন্য ঠাহুরের লেন, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।
 এগনি দার্শনিক গ্রন্থ। লেখক বেশ সমগ্র ও
 সরলভাবে বিজ্ঞ-মতাক বৃত্তি-তর্কের সাহায্যে এই গ্রন্থে
 মঙ্গলময় চিত্রের পিত্তের আলোচনা করিয়াছেন।
 ইহাতে শাস্ত্রাদির যতন অপেক্ষা সংগঠের ঘটনা-
 পরামর্শের উপরই লেখক অধিক নির্ভর করিয়াছেন,
 তাহার কলে সম্প্রদিত বিখ্যটুকু জনসাধারণের পক্ষেও
 সহজবোধ্য হইয়াছে।

দারিস্র্য ও সম্ভার। ঐগুত কীরোদ-
 চক্র পুত্রকাহর, এখ-এ প্রবীত। গিলেট, করিমগঞ্জ
 প্রাপ্তভলে পাবলিশিং এগেলি গিলেট, এগে
 মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ আনা। আবদ-হুসাইর বিবরণ
 হইতে লেখক এ বেশে দারিস্র্যের আলোচনা করিয়া
 তাহা নিরাকরণের পক্ষে সম্ভারের প্রয়োজনীয়তা
 কতখানি তাহাই সম্ভার করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন।
 তাহার সে চেষ্টা সফলও হইয়াছে। বাঙ্গালা
 ভাষার অর্থনীতি বিধরক গ্রন্থের একান্ত অভাব;
 সম্ভার সবকে কোন গ্রন্থ আছে বলিয়া আমাদের
 জানা নাই। এ ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের এ চেষ্টা বিশেষ
 প্রশংসারোগ্য, সন্দেহ নাই। তবে এ বেশের
 দারির নিশা এমন হুশচলিত, এবং সম্ভারিত করেকটি
 শুদ্ধতর কার্যে লাঠালাঠিরও এতখানি দ্রুষ্টি ইঙ্গিত
 পাওয়া গিয়াছে যে জন-সাধারণের এধিক সম্ভে
 থাকায় অপর্যায়ের বিবরণ নহে। বাহা হৌক, প্র-
 থানিতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করা
 হইয়াছে—এ গ্রন্থের সমধিক প্রচার বাঞ্ছনীয়।

কাহিনী। ঐগুত হরিদগণ তও প্রবীত।
 ঢাকা, ভারত-মহিলা যত্রে মুদ্রিত। মৈমুনদি,
 হুজাপাহা হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য
 ছয় আনা। এখানিতে করেকটি ‘মত’ জুতের পদ’

সুরলা। শ্রীযুক্ত বলদকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
 এশ্বিত। যদুর্ণী বুক ডিপো, ৩৬১ এমর্টার বড়াল
 ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সম্বন্ধী এসে সুত্রিত। মূল্য
 ছয় আনা। লেখক 'জুনিফার' বলিগাহেন, "কোন এক
 বন্ধুর উপহারে ভারতীয় মুদ্রিত। এক নিঃসন্তান বিধবা
 আশ্রিত্যার পাঠের জন্যই ইহার রচনা হয়। * *
 আদর্শ বিবহার চিত্র অঙ্কন করাই আনার উদ্দেশ্য
 ছিল।" এ গ্রন্থখানিকে কিছুতেই উপভোগ বলা
 যায় না। লেখক নিজে ইহার নাম দিগাহেন,
 "কথা-গ্রন্থ।" গ্রন্থখানি কতকটা উপদেশের মত।
 লেখকের রচনা-কৌশল ইহাতে আদৌ নাই।

অদৃষ্ট-লিপি। ঈশ্বরী মনোজমুখারী দেবী
 এশ্বিত। একাংশ, ক্রীষ্ণদাস বাণগুপ্ত, ইতিহাস
 পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। কাস্তিক গ্রন্থে মুদ্রিত।
 মূল্য আট আনা। এ গ্রন্থে লেখিকার চারিটি গল্প
 সংগৃহীত হইয়াছে। প্রথম গল্প 'অদৃষ্ট-লিপি'র নামেই
 গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। গল্পগুলি স্থলিখিত।
 লেখিকার তাহা বেশ সরল, আড়ম্বরহীন। গল্পগুলি
 চিত্র-বিশেষে মূল্য, মৃগাঠা। তবে ছোট গল্পের
 আটের দিক দিগা এগুলির বিশেষ মূল্য আছে 'বলিগা'
 মনে হয় না। কেন না, মানব-চিত্তের বিশেষ কোন
 তাব গল্পগুলিতে সীমাবদ্ধ হয় নাই, চরিত্রগুলিতেও
 বিশেষত্ব বড় নাই। 'অদৃষ্ট-লিপি' গল্পটিতে ঈশ্বরী
 স্বর্ণমুখারী দেবী এশ্বিত 'কাহাকে' উপভাষার দ্বারা
 এতখানি আদর্শ পড়িয়াছে, যে 'অদৃষ্ট-লিপি'র
 নিজের কোন স্বাক্ষরই পাঠকের চোখ পড়িবে না।
 বাহা হোক, গ্রন্থখানি যে স্মরণীয় হইয়াছে, সে
 বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

নবীন। শ্রীযুক্ত মূল্যচরণ সরকার এশ্বিত।
 নিউ ইতিহাস গ্রন্থে মুদ্রিত মূল্য পাঁচ আনা।
 এখানি 'নবীন-চিত্র', 'অর্থাৎ উপভাষ। ইহার
 রচিৎ অল্প, তাহা অল্প, তাব অল্প। লেখকের
 মুঠা অসুখাধার।

গো-ধন। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী

এশ্বিত। কিশোরগঙ্গা হইতে ঈদীনচন্দ্র গোপ
 কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, চেরি গ্রন্থে মুদ্রিত।
 মূল্য রাম সংস্করণ আড়াই টাকা; সাধারণ সংস্করণ
 দুই টাকা। ইহা গোষ্ঠাতি-স্বপ্নকীর নান্যপ্রকার
 জাতক-ভগ্ন-স্বপ্নলিত একখানি সচিত্র গ্রন্থ। গ্রন্থ-
 খানি সুবহুৎ, এবং স্থলিখিত। গো-মুদ্রের উপভাষিত।
 লখন্ডে কোন কথা মূল্য করিয়া বলিবার প্রয়োজন
 নাই। গো-পালন ভারতবাসীর সখের ও আদরের
 বস্তু; বাজারীর ত বটেই। সম্রাতি গভীর মর্দশার
 সহিত বাসানী জাতির বাহোয়ও যে অবনতি ঘটতেছে,
 সে বিষয়ে চিত্রাঙ্গীল ব্যক্তিমানেরই মধ্যে মতবৈধ
 নাই। এই গ্রন্থে লিখিত গ্রন্থকার বিস্তর পরিচয়
 দীকার করিয়া গোষ্ঠাতির রক্ষণ ও তাহার চিকিৎসা
 এবং গৃহাধি লখন্ডে বৈজ্ঞানিকভাবে যে আলোচনা
 করিয়াছেন, তাহা অমূল্য। মানবদেহের গভীর
 আলোচনাও বাব পড়ে নাই। এখনও বহু সম্পদ
 গৃহস্থ গো-পালন-বিষয়ে মনোযোগী; অনেক Dairy
 খুলিবার পক্ষেও উচ্চাশ্রী; অথচ উভয়েই পক্ষের
 গো-মাত্রি লখন্ডে সকল তত্ত্ব জানা থাকার বিশেষ
 প্রয়োজনীয়তা আছে। কি ব্যবসায়, কি গৃহস্থালী,
 উভয় দিক হইতেই গো-মাত্রির লখন্ডে এই সকল
 বিষয়ে উদাসীন থাকিলে চলে না—আনাড়ির হাতে
 সকল জিনিষেরই লখন্ডে-লাত ঘটয়া থাকে।
 গ্রন্থখানি সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ডে লেখক গৃহাধি
 লখন্ডে আলোচনা ও গোষ্ঠাতি উন্নতির উপায়
 নির্দেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে 'গোষ্ঠাতির গুণের
 জ্ঞেয় বিভাগ', তৃতীয় খণ্ডে 'ব্যবহার বিশেষ বিবরণ',
 চতুর্থ খণ্ডে 'গোপালন', পঞ্চম খণ্ডে 'গো', ষষ্ঠ খণ্ডে
 'গোষ্ঠী' ও সপ্তম খণ্ডে 'গোষ্ঠাতির রোগ ও চিকিৎসা'র
 আলোচনা লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির উপভাষিতা
 খুবই। গ্রন্থকারের অধ্যবসায় ও এই দিকের অদৃষ্টমানে
 তাহার এতখানি আগ্রাস প্রকৃতই প্রশংসার্য। এ
 গ্রন্থ নিজেই গৃহস্থালী বাজারীমানেরই গৃহে গৃহে
 বিয়াল কলক, ইহাই আবাদিগের কামনা।

কলিকাতা, ২২ অক্টোবর, ১৩২২, ঈদীনচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি গার্ড, ব্যক্তিগত হইতে

ঈদীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



শ্রিঃ পরাধাং বিনয়ং বিদ্যতি
 তমো নিরতগ্রতিতৃত্যহুং ।
 দুদচিলাং তি তচারচল্লমাঃ
 স বন্দ্যতেহর্হন ইহ গত নোপমা ॥

তিব্বতীয় চিত্র হইতে

অধ্যাপক সমাদরের অনুমতানুসারে

ভারতী

৩৯শ বর্ষ]

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২

[৪র্থ সংখ্যা

সন্ধ্যার

আজ 'এই দিলের শেষে
সন্ধ্যা যে ঐ মাণিকখানি পরেছিল চিকন কালো বেশে
গেঁথে নিলেম তারে
এই ত' আমার বিনিমুহুর গোপন গলার চাঁদে ।
চক্রবাকের নিঃস্রাবীকরণ বিজন পদ্মাতীবে
এই যে সন্ধ্যা ছুঁইয়ে গেল আমার নতুন
নির্মাল্য তোমার
আকাশ হয়ে পার ;
ঐ যে মরি মরি
তবুওহীন স্রোতের পরে ভাসিছে দিল তারাব ছায়া তবী ;
ঐ যে সে তার সোনার ঢেলি
দিল মেলি
রাতের আঙিনায়
ঘূমে আলস কার ;
ঐ যে শেষে সপ্তমুখির ছায়াপথে
কালো ঘোড়ার রথে
উড়িয়ে দিয়ে আশুন ধূলি নিল সে পিয়ার ;
একটি কেবল করণ পরশ বেবে গেল একটি কবির ভালে ;
তোমার অনন্ত মাঝে এমন সন্ধ্যা ছয়নি কোনোকালে,
আর হবে না কভু ।
এমন করেই, প্রভু
এক-নিমেষের পত্রপুটে তরি'
তিরকারের ধনটি তোমার ক্ষণকালে লও যে নুতন করি !
পদ্মা ।

শ্রীমদীশ্বরনাথ ঠাকুর ।

• নালক

৯

শিখেরা যেখানে সিদ্ধার্থকে একা ফেলে চলে গেছে—উরাইল বনের সেদিকটা ভারি নিশ্চিন্ত। বন বন শাল বন সেপানটা দিন রাত্রি ছাওয়া করে বেখেছে। মানুষ সেদিকে বড় আসে না; ছোট্টা হরিণ আর ছোট্টা কাঠেরাণী শুকনো শাল-পাতা মাড়িয়ে খুন্ খুন্ চলে বেড়ায় মাত্র।

এই নিঃসাতা নিরালা বনটির গা 'দিরেই' গারে বাবার ছোট রাত্তাটি অজানার ধারে এলে পড়েছে। নদীর ধারেই একটি প্রকাণ্ড বট গাছ;—সে বেকত কালের তার ঠিক নেই। তার মোটা মোটা শিকড়গুলো উঁচু পাক্ত নেয়ে রজবর সাপের মত লটনি অলের উপরে জুলে পড়েছে। গাছের গোড়ুটি কালো পাথর দিয়ে চমৎকার করে বাধানো। লোকে দেবতার স্থান বোলে সেই গাছকে পূজা দেয়। জুল-ফলের নৈবেদ্য সাজিয়ে নদীর ওপারের গ্রাম থেকে যেয়েরা বখন পুণ্য ভোরে নদী পার হয়ে এদিকে আসে তখন কোনো কোনো দিন তারা বেন দেখতে পার যেহারা কাণ্ড-পরা কে একজন গাছের তলার বসে ছিলেন, তাদের দেখেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। কাঠুরেরা কোনো কোনো দিন কাঠ কেটে বন থেকে ফিরে আসতে দেখে গাছের তলা আলো করে সোনার কাণ্ড-পরা দেবতার মত এক পুরুষ! সবাই বোলতো নিশ্চর ওখানে দেবতা থাকেন কিন্তু দেবতাকে

স্পষ্ট করে কেউ কোনোদিন দেখেনি—‘পুরা’ ছাড়া। মোড়লের ঘরে জজাতা বিয়ের পরে একদিন ওই বটগাছের তলার পূর্বা দিতে গিয়ে পুরাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সেই থেকে সে মোড়লের ঘরে আর-একটি মেয়ের সমান মানুষ হয়েছ। এখন তার বয়েস দশ বছর। জজাতার ছেলে হরনি তাই তিনি পুরাকে যেয়ে মত যত কোয়ে মানুষ করেছেন, আর মানত করেছেন যদি ছেলে হয় তবে এক বছর বটতলার রোজ একটি বিয়ের শিদিম্ দিবে নতুন বছরের পূর্ণিমার ভাল কবে বটবরকে পুজো দেবেন।

জজাতার ঠাকুর জজাতাকে একটি সোনার-চাঁদ ছেলে দিবেছিলেন তাই পুরা রোজ সন্ধ্যা-তলা একটি বিয়ের শিদিম্ দিতে ওই বটতলার আসে। আজ এক বছর সে আসছে, কোনো দিন কোনো দেবতাকে কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পারিনি। কখনো সে আসবার আগেই ছাওয়ার মত দেবতার সৃষ্টি অন্ধকারে মিলিয়ে যেত, কখনো বা সে গাছের তলার শিদিম্টি রেখে বখন একলা গারে হেঁটে মদীপার হয়ে ফিরে চলেছে তখন দেখতো বেন দেবতা এসে সেই পাথরের বনীর উপরে বসেছেন!

আজ শ্রীতের কবাস ঘরে পুরা ছাওয়ার মত—বেন পাতলা কুশাশার ভিতর দিবে দেবতাকে দেখছে, একলা সে জজাতাকে বলেছিল—আর কাউকে না। জজাতা

সেইদিন থেকে পুরাকৈ দেবতার ভক্ত
আগেলে বেঁধে ছুটি করে ফল নিয়ে যেতে
বোলে দিয়েছিলেন, আর বোলে দিয়েছিলেন
যদি দেবতা কোনো দিন স্পষ্ট করে দেখা
দেন, কি কথা কন্ তবে যেন পুরা বলে
—দেবতা! আমার হুজাতা মাকে আমার
বাংকে আমার ছোট ভাইটিকে” আর
আমার মোড়লদাদাকে ভাল রেনো,—বড়
হলে আমি যেন একটি হুনার বর পাই।

এমনি করে পুরার হাত দিয়ে হুজাতা
ছুটি করে ফল সেই রটতলার পাঠিয়ে
দিয়েন। তিনিও জানতেন না, পুরাও
জানতেন না যে সিদ্ধার্থ রোজ সন্ধ্যাবেলা
সেই বটতলার ঠাণ্ডা পাথরের বেদীটির
উপরে এসে বসেন। আজ বহুরের শেষ;
কাল নতুন বছরের পূর্ণিমা। পুরা আজ
সকাল করে পাঁচটি পিদিম, পাঁচটি ফল
খালায় সাজিয়ে একটি নিজের নামে একটি
তারের নামে একটি মায়ের নামে একটি
বাপের আর একটি মোড়লদাদার নামে
সেই বটগাছের তলায় সাজিয়ে রাখছে।
বিকেল-বেলায় সোনার আলো বটগাছের
ডগাটিতে এগে লেগেছে। রোদে-পোড়া
বাণির ঢেঁড়ি ধলের দাগ টেনে বসে
চলেছে—অজানা নদীটি। ওপারে দেখা যাচ্ছে
অনেক দূর পল্লভ ধানের ক্ষেত, তার
মাঝে মাঝে আদম-কীটালের বাগানে ঘেরা
ছোট ছোট গ্রামগুলি—মাটির ঘর, খড়ের
চাল, একটা পাহাড় সে কতদূরে দেখা
যাচ্ছে মেঘের মত। নদীর ওপারেই মেঠো
মাঠা, সবুজ সাক্ষির সাদা পাড়ের মত লক
সোজা। সেই সাক্ষর চাষার মেঘেরা চলেছে

বাপের বোকা মাথায় নিয়ে। তাদের পরশে
রাঙা সাক্ষি, তাতে রূপের চুড়ি, লিঠের
উপর সুলি-বাধা কটি ছেলেটি ঘুমিয়ে
আছে হাত দুটি মুঠো করে। একটুখানি
ঠাণ্ডা বাতাস নদীর দিক থেকে মুখে
এসে লাগলো—একটা চিল অনেক উচু
থেকে বুবতে গুরতে আস্তে আস্তে একটা
গাছের ঝোপে নেমে গেল।

পুরা দেখছে বেলা পড়ে এসেছে। বাণির
উপর দিয়ে চলে আসছে অনেকগুলো কালো
ঘোষ; - একটার পিঠে মত একগাছ লাটি-
হাতে বসে রয়েছে গোয়ালাদের ছেলেটা।
সে রোজ সন্ধ্যাবেলা ঘোষের পিঠে চড়িয়ে
পুরাকে মোড়লদের বাড়ি পৌছে দেয়।
আজও তাই আসছে। অনেক দূর থেকে
সে ডাক দিয়েছে—আরেকের পুরায়! ছেলেটার
নাম সোরাতি। পুরা তার গলা পেয়েই
তাড়াতাড়ি পিদিম পাঁচটা আলিয়ে দিয়েই
যেদিক দিয়ে সোরাতি আসছিল সেইদিকে
চলে গেল।

তখন একখানি সোনার বাণার মত
সুবদিকে চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে। পুরা
আর সোরাতি ঘোষের পিঠে চড়ে
বাণির চড়া দিয়ে চলেছে। উচু পাড়ের
উপর বটতলাতে ঝিক্ ঝিক্ করছে পুরার
দেওরা পিদিমের আলো। সেই আলোর
সোরাতি পুরা হুনেই আজ স্পষ্ট দেখলে
গেকরা বসন-পর্যায় দেবতা এগে গাছের
তলায় বসেছেন—পাথরের বেদীটিতে!

পুরাকে তাদের বাড়ির দরজায় নামিয়ে
দিয়ে সোরাতি চলে গেল। হুজাতা তখন
গোক-বাছুর গোয়ালে বেঁধে ছেলেটিকে ঘুম

পাড়িরে সকালের জন্তে পুজোর বসন শুদ্ধিযে রাখছেন। পূজা এসে বসে—মা, আজ সত্যি দেবতাকে দেখেছি। কাল পূব ভোরের উঠে যদি ভূমি দেখানে যেতে পার তো ভূমিও দেখতে পাবে। সোমাস্তি আমি হুজনেই দেখেছি। কিন্তু ঠাকুরের কাছে কিছু চেরে নিতে ভুলে গেলুম মা।

সুজাতা বলেন—যদি মনে পড়ত তবে কী চাইতিসু পূজা? সোমাস্তির সঙ্গে তোর বিয়ে হোক—এই বৃষ্টি?

পূজা তখন পানিরেছে। সুজাতা পুজোর সমস্ত শুদ্ধিযে রেখে বসন ঘরে গেলেন পূজা তখন ছোট ভাইটির পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুজাতার চোখে আজ আর ঘুম নেই,—রাত থাকতে তিনি পূজাকে ডেকে ফুলেছেন। পূজা গোষ্ঠালের দরজা খুলে এক কোণে একটি পিদ্ম আলিগে গোকগুলিকে ছইতে বলেছে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ার গোকগুলির শীত লেগেছে, তারা একটু ভয় খেয়েছে, চঞ্চল হয়ে এদিক ওদিক চেরে দেখেছে—এত রাত্রে কে ঘুম নিতে এল?—কিন্তু পূজা যেমন তাদের পিঠে বা হাতটি বুলিয়ে নাম ধরে ডাকে অমনি তারা হিং হয়ে ধাঁড়াকে।

সুজাতা উঠোনের এক কোণে একটি উছুন আলিগে দিয়ে কুরোর ভালে দান করতে গেলেন। পূজা হুথুহু হুয়ে একটি ধোয়া কড়ার সেই উছনের উপরে চাপিয়ে দিলে;—তথ উক্বগ করে কুটে লাগলো। সুজাতা ধোয়া কাপড় পোরে পূজাকে এসে বলেন—তুই গোটা কতক

ফুল ফুলে আমি ঘুম এল দিচ্ছি।

মোড়লদের বাড়ির ধারেই বাগান, দেখানে গাণা ফুল অনেক। পূজা সেই ফুলে একটা মালা গেথে মটের শক্তির একটু ভেল নির্ভর পুজোর খালার সাজিয়ে রেখে হুজাতাকে ডাকে—মা, চল, আর দেবী কল্লৈ সন্ধ্যা হয়ে যাবে; দেবতাকে দেখতে পাবে না। সুজাতা আল-দেওয়া টাটকা হুথুহু একটি নতুন ভাঁড়ে ঢেলে পূজার হাতে দিবে বলেন—তুই এইটে নিয়ে চল, আমি পুজোর খালা আর মহতাকে নিয়ে যাউ।—সুজাতার ঢেলের নাম মনুয়া।

ভোরের অন্ধকারে গাঁয়ের পথ একটু একটু দেখা যাচ্ছে। পূজা চলছে আগে আগে গুঘের ভার নিয়ে কুহুর কুহুর মল বাকিয়ে, সুজাতা চলছেন পিছনে পিছনে ছেলে কোলে পুজোর খালাটি ডান হাতে নিয়ে। পূজার সঙ্গে একলা যেতে সুজাতার একটু একটু ভয় করছিল। সোমাস্তিদের বাড়ির কাছে এসে সুজাতা বলেন—চেরে সোমাস্তিকে ডেকে নে না।—সোমাস্তিকে আর ডাক্তে হোলো না, সে পূজার পায়েদ শক পেরেই একটা লাঠি আর একটা আলো নিয়ে বেরিয়ে এল। তিন জনে মাঠ ভেঙে চলেছেন। তখনও আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে,—রাত পোহাতে অনেক দেবী কিন্তু এমি মধ্যে সকালের বাতাস পেরে গাঁয়ের উপর থেকে সারা রাতের অমা ঘুঁটের ধোয়া সাণা এসখানি টানোরায় মত ক্রমে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। উলু বনের ভিতর হু একটা ভিত্তির, বহুল-

গাছে ছু একটা শালিক এরি মধ্যে একটু একটু ডাকতে লেগেছে। একটা কটিং পাবী শিস্ দিতে দিতে মাঠের ওপারে চলে গেল। ছাতারেরগুলো কিচমিচ্ সুপ্. সুপ্ করে কাঁঠাল গাছের তলায় নেনে পড়ল।

• আলো নিভিয়ে স্নানাতা আর পুরাকৈ নিয়ে সোরাতি নদীর ধারে এসে দাঁড়াল। তখন দূরের গাছে পালা একটু একটু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; নদীর পারে দাঁড়িয়ে স্নানাতা হেখছেন—বটগাছের নীচে বিনি বসে রয়েছেন—তীর গেরুয়া, কাপড়ের আভা বনের মাথার আধখানা আকাশ আলো কমে দিয়েছে সকালের রঙে।

১০

স্নানাতা, পুরা মনের মত করে পূনো দিয়ে সিদ্ধার্থের আশীর্বাদ নিয়ে চলে গেছে। সোরাতি কিন্তু কিছু তাঁকে বিতে পারে নি তাই সে সারাদিন নদীর ধারে একলা বসে অনেক ঘন্টা কুশিলাসের একটা আসন বুনে নদীর জলে সেখানি ঠাণ্ডা করে সিদ্ধার্থকে দেবার জন্তে এসেছে। সিদ্ধার্থ তখনও সে বটতলাতে আসেন নি। সোরাতি কুশাগনখানি বেদীর উপর বিড়িয়ে দিয়ে মনে মনে সিদ্ধার্থকে নমস্কার করে নদী-পারে চলে গেল। তখন সন্ধ্যা হু-হু; সিদ্ধার্থ অজানায় ঘান করে সোরাতির দেওয়া কুশাগনে এসে বসলেন। জলে থোরা কুশ-বাসের দিটি গন্ধে তাঁর মন যেন আজ আরায পেরেছে। পূর্ণিমার আলোর পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত আজ যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন—স্পষ্ট পরিষ্কার। পাথরের বেদীতে কুশাগনে বসে সিদ্ধার্থ

আজ প্রতিজ্ঞা করলেন এ শরীর থাক্ আর থাক্ হু-থের শেষ দেখবোই দেখবো; —সিদ্ধ না হয়ে বুঝ না চেষ্টে এ আসন ছেড়ে আর উঠেছিলেন;—বজ্রাসনে অটল হয়ে সিদ্ধার্থ আজ যখন ধানে বসে বসেন—

ইহাসনে শুভাতু যে শরীরঃ

ওগাহিসাংসং প্রলম্বক বাতু

অপ্রোপ্যং বোধিঃ বহুকল্পজলভাঃ

নৈবাপনাত্ কামমতন্তলিযাতে।

তখন 'মার'—মার জয়ে সংসার কম্পমান, যে লোককে কুবুদ্ধি দেয় কুখ্যা বলায় কুকর্ষ করায়—সেই 'মারের' সিংহাসন টল্ নল্ করে উঠল। রাগে মুখ অন্ধকার করে 'মার' আজ নিজে আসছে মার-মার-মর্মে বুকের দিকে। চারিদিকে 'মারের' দলবল আজ জেগে উঠেছে! তারা ছুটে আসছে বত পাগ বত হুং বত কালি বত কলহ বত 'আলা বয়গা মলা আর ধূলা জলহল-আকাশে দিকে-বদিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে। পূর্ণিমার আলোর উপরে কালোর পরদা টেনে দিয়েছে—'মার'! সেই কালোর ভিতর থেকে পূর্ণিমার চাঁদ চেয়ে রয়েছে—যেন একটা লাগ চোখ, তা থেকে বয়ে পড়ছে পৃথিবীর উপর আলোর বদলে রক্ত-বিষ্টি! সেই রক্তের ছিটে লেগে তারাগুলো নিভে নিভে যাচ্ছে।

আকাশকে এক হাতে সৃষ্টির বদে পাভালকে একপায়ে চেপে রেখে 'মার' আজ নিজ সৃষ্টিতে সিদ্ধার্থের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার গায়ে উড়ছে রাতা চাঁদর—বেন মাল্লবের রক্তে ছোপানো! তার কোমরে ফুলছে বিদ্যাতের তলোয়ার, মাথার

মুহুর্তে হৃদয়ে 'মারেন' প্রকাশ্য একটা রক্ত-মণির দ্রল, তার কানে হৃদয়ে মোহন কুণ্ডল তার বৃকের উপরে অলঙ্কারে অনল-মালা—আঙনের সুতোয় গাঁথা। বৃক ফুগিয়ে 'মার' সিদ্ধার্থকে বলছে—বৃথাই তোমার বৃদ্ধ হতে তপস্তা।—'উত্তিষ্ঠ'—ওঠো—'কামেশ্বরোহ্মি'—'আমি 'মার'! ত্রিভুবনে আমাকে ভয় করে এমন কেউ নেই! 'উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ মহাবিরহং বচং কুব্ধ'—ওঠো, চলো বাও, আমাকে ভয় করতে চেষ্টা করোনা, আমার আত্মাধারী হয়ে থাক; ইচ্ছের ঐশ্বর্য তোমার বিজি, পৃথিবীর রাজা হয়ে স্রুতভোগ কর; তপস্তার শরীর ক্ষয় করে কি লাভ? আমাকে ভয় করে বৃদ্ধ হওয়া কারো সাধ্যো নাই।

সিদ্ধার্থ 'মারকে' বলেন—হে 'মার' আমি ভয় ভয় ধরে বৃদ্ধ হতে চেষ্টা করছি তপস্যা করছি, এবার বৃদ্ধ হব তবে এ আসন ছেড়ে উঠবো, এ শরীর থাক্ বা থাক্ এই প্রতিজ্ঞা—

ইহাসনে শুভাতু মে শরীরং

ঔগান্ধিবাসং প্রলয়ক বাতু

অশ্রাপ্য বোধিৎ বহুকলম্বলভাৎ

নৈবাসনাৎ কারমন্তল্লিঘাতো।'

তিনবার 'মার' বলে—'উত্তিষ্ঠ'—ওঠো, চলো বাও, তপস্তা রাখ। তিনবারই সিদ্ধার্থ বলেন—না। না। না।—'নৈবাসনাৎ কার-মন্তল্লিঘাতো।'

রাগে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করে বিকট হুঙ্কার দিয়ে তখন আকাশ ধরে টান দিলে 'মার'। তার নখের আঁচড়ে এমন যে টানে-তার

সাধানো নীল আকাশ সেও ছিঁড়ে পড়ল শত টুকরো হয়ে—একখানি নীলাম্বরী পাড়র বহু। মাথার উপরে আর চাঁদ নেই, তারি নেই, রয়েছে কেবল মহাপ্রভ, মহা অন্ধকার। মুখ মেলে কে কেন পৃথিবীকে গিলতে আসছে। যোষ হল তার কালো জিহ্বা বেগে পৃথিবীর উপর পড়ছে লম্বাট রক্তের মত কালো নীল। 'মার' সেই অন্ধকার মুখটার দিকে ফিরে দেখেছে কি আর বিহ্বাতের মত দুপাটি সাধা দাঁত মুখে তিলিক দিয়ে কডম্বফ করে উঠেছে; আর হুঙ্কার দিয়ে, বেরিয়ে এগেছে সেই সর্কগ্রাসী মুখের ভিতর থেকে 'মারেন' দলবল। যোগাশন থেকে বৃদ্ধদেরকে টেনে ফেলতে পৃথিবীর উপরে নেমে আসছে 'মারেন' দল; চক্রে স্বর্গা ঘুরছে তাদের হাতে দুটো বেশ লাগনের চরকা। দশদিক অন্ধকার করে ঘুরতে ঘুরতে আসছে—'মারেন' দল ঘুগি: বাতাসে তর দিয়ে, পৃথিবী জুড়ে বুলায়ে ফেলা উড়িয়ে। তারা শূন্য থেকে ধ্বংসকুণ্ডলোকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কেলছে আঙনের কাঁটার মত। পৃথিবী থেকে গাছগুলোকে উপড়ে, পাহাড় গুলোকে ধুড়ে নিয়ে বন্-বন্ শব্দে ঘুরিয়ে কেলছে তারা চারিদিক থেকে অনবরত নিলাবৃত্তির মত; লক্ষ লক্ষ ফেলা বোড়া বেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে 'মার'-সৈন্য বৃদ্ধসেবের চারিদিকে। তাদের পুর থেকে বিহ্বাৎ ঠিকরে পড়ছে, তাদের মুখ থেকে রক্তের অলস্ত ফেলা আঁগলা আঁগলা ছড়িয়ে পড়ছে—সেই বোধিবটের চারিদিকে, সেই পাথরের বেলীর আসনে পানে। উরাইল বনের এতোক গাছটি গাভাটি ফুলটি এমনকি বাগগুলিও আর অলে উঠেছে; অলস্ত

রক্তে অঙ্গনার জল ঘুরে ঘুরে চলেছে
 আঙনে মাথা। বিদ্রোহের শিখার তলোয়ার
 শাণিরে মশাল আলিরে দলের পর দল ঘত
 রক্তবীজ তারা অন্ধকার থেকে শেরিরে
 ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে পড়ছে আজ বুড়দেবের
 উপরে। তাদের অঙন নিশ্বাসে আকাশ গলে
 যাকে বাতাস অলে যাচ্ছে, পৃথিবী দেখা
 যাচ্ছে—বেন একপান্ জলন্ত করলা ঘূর্ণি বাতাসে
 ঘূষে ঘুরে চলেছে আঙনের ফুলকি ছড়াতে
 ছড়াতে; তার মাঝে অশ্রু একটা তাল গাছ
 ঘুরিবে 'মার' ডাকছে—হান্ হান্! পারের নখে
 রসাতল চিরে ভেগে উঠেছে মহামারী। আজ
 'মারের' ডাকে রসাতলের কাঁকল অন্ধকার
 কাঁধার মত সর্কাদে উড়িয়ে নিয়ে আর্শনাদ
 করে ছুটে আসছে—সে 'মারী'। তার ধূলা-
 মাথা কটা চুল বাতাসে উড়ছে—আকাশ-ঝোড়!
 ধূমকেতুর মত! দিকে দিকে শোকের কারা
 উঠেছে, ত্রিভুবন ধরধর কাঁপছে! মহামারীর
 গায়ের বাতাস ঘেঁদিকে লাগল সেদিকে
 পাছোড় চূর্ণ হয়ে গেল, পাণর ধূলা হয়ে
 গেল, বন উপবন অলে গেল, নদী সমুদ্র
 ত্বকিরে উঠলো। আর কোথাও কিছু দেখা
 যাচ্ছে না! সব একতুহি হয়ে গেছে, সব তুরে
 পড়েছে, সব সুরে পড়েছে, অলে গেছে, পুড়ে
 গেছে, ধূলা হয়ে ছাই হয়ে উড়ে গেছে! অগত-
 জুড়ে উঠেছে 'মারীর' আর্শনাদ, 'মারের'
 সিংহনাদ, আর গ্রন্থানের মংস-পোড়া বিকট
 গন্ধ!

তখন রাত এক গহর। মারের দল,
 মারীর দল উকামুখী শেরালের মত, রক্ত-আঁধি
 বাহুড়ের মত মুখ পেতে আঙনের হলুদ ছড়িয়ে
 চারিদিকে হাং হাং কোরে ডেকে বেড়াচ্ছে,

কৈবে বেড়াচ্ছে! আকাশ ঘুরছে মাথার উপর,
 পৃথিবী ঘুরছে পারের তলার স্বর্ঘ্ব শব্দে,—
 একান্ত জাঁতার পাথর ছপানা বেন বুড়দেবকে
 শিবে ফেলতে শুড়িয়ে ফেলতে চেষ্টা করছে!
 'মার' ছাতে ছুটা বিদ্রোহের মশাল নিয়ে
 বুড়দেবকে ডেকে বলছে—পালাও পালাও
 এখনও বলছি তপস্তা রাখ। বুড়দেব 'মারের'
 দিকে চেরেও দেখছেন না, তার কথার কর্ণ-
 পাতও করেন না! 'মারের' মেয়ে 'কামনা'
 তার ছোট ছই বোন হলুদলাকে নিয়ে
 বুড়দেবের বোগ ভঙ্গ করতে কত চেষ্টা
 করছে—কখনো গৌতমী মারের রূপ ধরে,
 কখনো ঘোষাধরার মত হরে বুড়ের কাছে
 আজ হাত বোঁড় করে কৈবে কৈবে লুটিয়ে
 পড়ে! তাঁর মন গলাবার ধান ভাঙবার
 চেষ্টার কখনো তারা বর্গের বিভাধরী সঙ্গে
 গান গায়, নাচ করে কিন্তু কিছুতেই
 বুড়দেবকে ভোলাতে আর পারে না।
 বজ্রাসনে আজ তিনি অটল হয়ে বসেছেন,
 তাঁর ধান ভাঙে কার সাধা! যে
 'মারের' তেজে বর্ণ মর্ত্য পাতাল কম্পমান,
 যার পারের তলার ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ, অল
 গুল আকাশ,—সেই 'মারের' বর্ণ চূর্ণ হয়ে
 গেল আজ বুড়ের শক্তিতে! 'মার' আজ
 বুড়ের একগাছি মাথার চুলও কাঁপাতে পারে
 না, সেই অক্ষরবটের একটি পাতা, সেট
 পাথরের বেলীর একটি কোণও খসাতে পারে
 না! বুড়ের আগে 'মার' একদণ্ডও কি
 দাঁড়াতে পারে! বুড়ের দিকে ফিরে দেখবারও
 তার সাহস নেই! ছই হাতের মশাল
 নিভিয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে 'মার' আস্তে আস্তে
 পাণিরে গেছে—নরকের নীচে—যার অন্ধ-

কারে—চারিদিক কালো কমে দিগে। বৃহস্পতি
সেই কালল অন্ধকারের মাঝে নিউঁয়ে এক।
বলে হয়েছেন ধ্যান ধরে পরেবর পর পর।

রাত শেষ হয়ে আসছে কিছু ‘মায়ের’
তবে তখনও পৃথিবী এক একবার কঁপে
উঠছে; —চাঁপও উঠতে পারছে না, লকালও
আসতে পারছে না। সেই সময়ে
ধ্যান ভেঙে ‘মায়কে’ ভয় করে সংসার
থেকে তার ঘুড়িরে বৃদ্ধ পাড়ানেন। তিনি
আজ সিঁদ হয়েছেন, বৃদ্ধ হয়েছেন, হুঃখের

শেষ পেয়েছেন। ডান হাতে তিনি পৃথিবীকে
অস্তর দিচ্ছেন, বাঁ হাতে তিনি আকাশে
দেবতারের আশ্রয় দিচ্ছেন। তাঁর সোনার
অঙ্গুথিমে সাত রঙের আলো! সেই
আলোতে জগৎসংসার আনন্দে জ্বল জ্বল দিয়ে
জেগে উঠেছে—নতুন প্রাণ পেয়ে নতুন লাগে,
সেজে। বুকের পায়ের তলায় গড়িয়ে চলেছে
নৈরজন নদীটি একূলে ওকূলে, শান্তিভল
ছটিয়ে।”

ক্রমশঃ

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্রোতের ফুল

(৩১)

বিপিন বন প্রেমানন্দ পানীর আকর্ষণী
লক্ষিতে মত্তস্তম্ভিতের মতো হইয়া বিশ্বসংসার
কুলিতে বসিয়াছিল, সংসার কিন্তু তখন
তাহাকে কুলিয়া থাকে নাই।

বিপিন মালতীকে লইয়া চলিয়া আসিলে
হরিবিহারী ও গিরি উভয়েই পুত্রের
প্রত্যাবর্তনের জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।
গিরি দ্বর্ষলের বল কনাথের নাথ লক্ষী-
জনর্দনকে প্রোতাহ একশ-আটপাত কুলসী
ও ডবল ভোগ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন,
এবং রামলাল আচার্য্যকে ডাকাইয়া ডাইনি
মালতীর দিক হইতে বিপিনের মন কিরাইবার
জন্ত গ্রহশাস্তির আরোজন করিতে লাগিলেন।
আচার্য্য-ঠাকুর সময় বুঝিয়া যে লখা চওড়া
কর্দ দিলেন তাহাতে কনকধূতীরের ফুল,
অরুণবর্ণ অম্ব, নীলবস্ত্র, কবল, মৃগময় ও

নবরত্ন প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে বেশে বেশে
লোক ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

হরিবিহারী তাহার বুদ্ধির তাঁড় নিবারণকে
ডাকিয়া অনন্তর-করণীর লব্ধকে পরামর্শ
প্রিজ্ঞাসা করিলেন। নিবারণ পরামর্শ দিল
মালতীর মত্তরবাড়ীতে এবং বিপিনকে স্থানি
পত্র দেওয়া হোক। মালতীর তাহরকে
লেখা হোক বিবাহের বিবাহী কুলতাপেরই
লাগিল; ইহাতে তাহাদের কুলের কলঙ্ক,
বংশের অপমান; তাহাদের উচিত ইহা
রোধ করা, টাকা বত লাগে তাহা হরিবিহারী
দিবেন। এবং বিপিনকে এই মর্মে চিঠি লেখা
হোক যে মালতীকে তাহার ভালো লাগিয়া
থাকে বেশ ত, মালতী তাহার কাছেই থাকুক,
কিন্তু তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে না;
বিবাহ যদি করে তবে তাহাকে ত্যাগ-
পুত্র করা হইবে।

হৰিবিহাৰী এই সংগ্ৰামৰ্শে আনন্দিত হইয়া দ্ব-আয়গাভেই চিঠি লিখিলেন এবং বিপিনেৰ চিঠিতে বৰং বৃদ্ধি পৰচ কৰিয়া আৰ এক লাঠিন যোগু কৰিয়া দিলেন যে বিপিন যদি দ্বিগুই বাকী কৰিয়া না বাহ তাহা হইলে নিবাহণ-পুত্ৰ পটলাৰ সহিত বিনিৰ বিবাহ দিবেন।

বিপিনেৰ চিঠি বখন সংসাৰ ও সন্ধ্যাপেৰ মধ্যো বেগ খাইচেছিল, ঠিক সেই সময়ে সে পিতাৰ চিঠি পাইল। একে সে ভাবপ্ৰবণ উত্তেজনাশীল প্ৰকৃতিৰ লোক, তাহাৰ উপৰ প্ৰেমানন্দেৰ প্ৰবল প্ৰভাৱ তাহাকে মাতাল কৰিয়া তুলিয়াছিল। সেই অবস্থায় বিপিন এই চিঠি পাইয়া লক্ষ্যৰ বৃণাৰ একেবাৰে পাগল হইয়া পিতাকে যে চিঠি লিখিল তাহা পড়িয়া হৰিবিহাৰীৰ মনন নিশ্চেই লোক ও নিজে উত্তোষী হইয়া উকিল ডাকাইয়া বিপিনকে ডাঙ্গাপুৰ কৰিয়াৰ অস্ত আয়োজন কৰিতে লাগিলেন।

বিপিন পিতৃসংসাৰেৰ সহিত সম্পৰ্ক একে-বাৰে চুকাইয়া একককম নিশ্চিত হইল। এক একবাৰ তাহাৰ মাত্ৰেৰ অস্ত বড়ই মন-কেমন কৰিত। কিন্তু সে তাহা মনন কৰিয়া ভাবিত গুৰুদেব তাহাকে একে একে বন্ধন-মুক্ত কৰিতেছেন, ক্ৰমে ক্ৰমে সব দিক ঠিক হইয়া গাইবে। এক একবাৰ বিনিৰ ভাগ্যেৰ কথা মনে কৰিয়া তাহাৰ চক্ষু ছলছল কৰিয়া উঠিত, কিন্তু তাহাৰ পিতামাতাই যদি তাহাৰ পক্ষপাতিৰণ কৰেন তবে সে আৰ কতদিন সংগ্ৰাম কৰিয়া তাহাকে বন্ধ কৰিতে পাৰিবে। না, না, এদৰ চিন্তা আৰ না, ইহাতে শুধু বিবেকণ, শুধু অনাড়ি, শুধু আধ্যাত্মিক

অবনতি! বৈরাগ্যমেবাভগম্—বিরতিই চৰম স্থপ।

মাগতীৰ ভাৰুৰ এতদিন ভাতৃবধু সখকে দিয়া উনাসীন ও পৰম নিশ্চিত ছিল, কিন্তু এখন হৰিবিহাৰীৰ পত্ৰে বত টাকা লাগে পাইবাৰ প্ৰত্যাশায় অকপ্ৰাণ তাহাৰ বধুৰ প্ৰতি মনতা ও কুলমৰ্যাদাৰ প্ৰতি সতৰ্কতা অত্যন্ত কঠোৰভাবে আগ্ৰত হইয়া উঠিল। সে খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাৰকেৰ বাড়ী সন্ধান কৰিয়া বাহিৰ কৰিল। সন্ধ্যাৰ প্ৰাকালে গেৰুয়া মন্তেৰ একখানি মলিমাৰ চাদৰ মুড়ি দিয়া দৰকাৰ ধাৰে একখানি বেৰিতে বসিয়া বসিয়া তাৰক মালাপ কৰিতেছিল, জ্বলিৰ ছিত্ৰ দিয়া শীৰ্ণ তৰ্কনী অঙ্গুলীটি সোজা হইয়া বাহিৰ হইয়া ছিল, আঙুলেৰ অষ্টধাতুৰ ভাৰেৰ পুটে দেওয়া আঙটি চকচক কৰিতেছিল। এমন সময়ে মাগতীৰ ভাৰুৰী মুকুন্দ একটা কালো কাপ্টীয়াৰ কোটেৰ উপৰ একটা চেক আলোহান মাথা পৰ্গায় মুড়ি দিয়া আদিয়া তাৰককে জিজ্ঞাসা কৰিল—মশাৰ এটা কি তাৰক বাবুৰ বাড়ী?

তাৰক বলিল—হাঁ, আপনি কি চান?

—আমাকে চিত্তে পাৰবেন না। আমি আসচি বাৰাণসাত থেকে, আপনায় সঙ্গে একটু দৰকার আছে।—বলিয়া মুকুন্দ দৃষ্ট হাতে গাৰেৰ কোট ও আলোহান কোমৰেৰ কাছে শুটাইয়া তাৰক বে বেকিতে বসিয়া ছিল সেই বেকিতে বসিতে গেল। তাৰক অমনি বাস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—হাঁ হাঁ হাঁ কৰেন কি? কৰেন কি?

মুকুন্দ খতমত খাইরা চারিদিকে চাহিতে
চাহিতে বলিল—কেন হরছে কি? কথা
কটা বলতে হবে তাই একটু বসব।

ভারক বলিল—দেখছেন না আমি
মালা লপ করছি?...

—তাতে কি? আমি ত ব্রাহ্মণ।

—হোন না কেন ব্রাহ্মণ। পারে
জুতো আছে ত? জুতো পদে আমার
মালা ছোঁবেন?

—আচ্ছা, না হয় নাই ছুঁলাম। আমার
কথা অন্ন, আমি গাড়িয়েই বলে যাই।
...আমি গুনলাম মথুরাপুরের জমিদারের
ছেলে বিপিন বাবু এখানে আছেন?

—হাঁ আছেন ত?

—তার সঙ্গে একটি গ্রীলোক এসেছে?

—হাঁ, তার নাম মালতী। তাকে
বিপিন বিয়ে করবে বলে।

—আমি সেই মালতীর ভাইর।
আমার ভাবের-বোকে আমি বাড়ীতে না
রেখে দূর করে দিয়েছিলাম কেন জানেন?
আমি কি আর আমার ভাইয়ের বিধবা
বোকে একবেলা ছুটি হবিচা দিতে পারতাম
না? আমি কি এমনি কশাই মশাই?
কিন্তু তাকে ভক্তলোক করে ঠাই দিতে পারে
না, এমন সে। বৃক্কে পারছেন ত কথাটা?

ভারকের মালালপ স্থগিত হইয়া গিয়া-
ছিল। সে বিম্বিত হইয়া তাহার বসি গাল
আঙো তুবড়াইয়া বলিল—আঁা বলেন কি?
তাকে ত বেশ চুপচাপ লক্ষ্যটির মতো
দেখতে।

মুকুন্দ বলিল—ঐ ত, ঐখানেই ত ওর
বাহাদুরী; খরবার ছোঁবার ছোট নেই...

—তা আপনি কি করতে চান?

—আমি এখন গুনলাম যে সে আপনার
বাড়ীতে এসে আছে তখন মনে করলাম
নিশ্চয় ভক্তলোক না হলে এমন নষ্ট
মেরমাগুবকে নিজের পরিবারে ঠাই
দিরেছেন; কিন্তু আমাদের ত উচিত নয়
তাকে ঠাকানো। যদিও নিজের ঘরের
জুতো বলতে নিজেই মুখ হেঁট হচ্ছে,
কিন্তু...

ভারক তাকাতাড়ি বলিয়া উঠিল—
না না না, তা আপনি পূব ভালো কাজই
করেছেন। আপনি—হেঁ হেঁ—গাড়িয়ে
রইলেন যে...বহন বহন এই বেকিতেই
বহন, আমি ত এখন আর মালালপ
করছি নে।...তা আমি বিপিনকে বলব।

মুকুন্দ বেকিতে বসিয়া বলিল—বলব
নয়, মেরটাকে দূর করে দেবেন।
আপনাকে তবে একটা গোপনীয় কথা
খুদেই বলি, আপনাকে ভালো মাহু বলেই
ত ঠেকছে, আবার আপনি বিপদ-টিপদে
পড়বেন?

বিপদের নাম শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া
ভারক দীপ্ত বাহির করিয়া বলিল—
হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি ঠিক ঠাওরছেন,
আমি একথাও নেহাত ভালো মাহু।
সংসারের মার-পেচ কিছুই বুঝিনে। বিপদ-
টিপদের কথা কি বলছেন...তবে আমার
গা কাঁপছে। মোহাই...আপনার নাম
জানিনে...মালতীর ভাইর মশাই, আমাকে
বাঁচান।

মুকুন্দ গভীর হইয়া বলিল—সেই জন্তেই
ত আমার গাঁটের পদমা বসচ করে এতদূর

আমি।...তুহুন সব গুলে বলি।...আমি পুলিশ-আদালতে নাগিন করেছি যে নিগিন আমার ভাদ্রবোকে ফুলে বার করে এনেছে। আর হাইকোর্টে দরখাস্ত করেছি বিয়েটা যাতে রদ হয়, আর মালতী যাতে আমাদের বাড়ীতে গিয়ে থাকে। হাজার হোক ফুলের বো ত সে, অমনি চোদ্দটা বিয়ে করে বেড়াবে সেটা ত আমাদেরই লজ্জার কথা। লোকে বলবে ঐ মুহুম্মদ মজুমদারের ভাইয়ের বো। কি বগেন আপনি? তাই বলছি, আপনার বাড়ীতে শেবে কি পুলিশের হাঙ্গামা হওয়া ভালো হবে?

মুহুম্মদ তারকের গা ঠেলিয়া বলি। তারক পুলিশ ও আদালতের নামে ভীত হইয়া মুহুম্মদের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—না না মশায় দোহাই আপনার, আপনি ত ব্রাহ্মণ, পায়ের ধূলা মাখান দিন, আমার বাড়ীতে পুলিশ-হাঙ্গামা করবেন না। আমি জানি এই রাজ্যেই ওদের ভাড়িরে দেবো।

মুহুম্মদ বলিল—তা ত আপনি দেবেনই আমি জানি, হানার হোক আপনি উত্তরলোক ত। কিন্তু আপনাকে আরও একটা কাজ করতে হবে, ওরা কোথায় যায় তার বোঝাট আপনারকে রাখতে হবে; নইলে পুলিশ যখন ওদের সন্ধান পাবে না তখন আমি বলে দেবো আপনিই ওদের লুকিয়ে রেখেছেন। বুঝেছেন ত?

তারক বলিল—হী হী হী খুব বুঝছি। আমি রাখব রাখব যখন রাখব!

—আচ্ছা তবে বহুন। আমি আদি।

--বলিয়া মুহুম্মদ উঠিয়া পাড়াইল।

তারকও উঠিয়া বলিল—একটা কথা বলতে ভয় হচ্ছে, একবার একটু এই অধনের বাড়ীতে পা ধরে গেলে ভালো হত না।

মুহুম্মদ বলিল—না না, সে আজ থাক, আপনার সঙ্গে ত আমার পরে আরও দেখা হবে।

তারক মনে মনে বলিল—না দেখা হলেই ভালো হত।—প্রকণ্ডে বলিল—আজ্ঞে আজ্ঞে তা ত বটেই...আচ্ছা তবে প্রণাম।

মুহুম্মদকে বিদায় করিয়া দরজার খিল দিয়া তারক বাড়ীর ভিতর গেল এবং উবেগ-লভিত কণ্ঠে স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—কৈ গো কোথায় গেলে?

তারকের স্ত্রী রান্নাঘরে রুটি সঁকিতেছিল, মালতী রুটি বেলিয়া দিতেছিল, এবং ডেরিডাহরি পাঁচ ছয়টি ছেলেমেয়ে চোঁচোমেচি কান্নাকাটি করিয়া হাট বাধাইয়া তুলিয়াছিল। তারকের ডাক শুনিয়া তাহার স্ত্রী উৎকর্ণ হইয়া ছেলেদের ধমক দিয়া বলিল—আঃ খাম না তোরা একেবারে হাট বাধিয়ে ফুলেছিস! কিছু কি শোনবার জো আছে ছাই। উনি বোধ হয় ডাকছেন।...

ছেলেরা সব কণেকের লজ্জা সন্ধি করিয়া চুপ করিল। তখন আবার তারকের আহ্বান শোনা গেল—ওগো কখন?

মালতী বলিল—হ্যাঁ তারক বাবু ডাকছেন।

একটা ছোট মেয়ে মাতার বাহুর পাশ দিয়া মাথা গলাইয়া শুনপান করিতেছিল; সেটাকে সরাইয়া দিতেই সে তারস্বরে হাতপা ছুড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

তাহার সেই সব আন্দোলন ও আগতি
অগ্রাহ্য করিয়া তারকের গ্রহীণী খুঁড়ি হাতে
করিয়াই বাহির হইয়া আসিল, তাহার
গায়ে কাপড়টা পৈতের মতো জড়ানো,
আঙুন-ভাতে ছিল বলিয়া সর্কাক ঢাকা
নয়; স্বামীর আঙ্গানে বা হাতে আঁচলের
একটা খুঁট মাথার মাঝখানে একটু তুলিয়া
দিয়াছিল কিন্তু পশ্চাতের পোপাটা বাহির
হইয়াই ছিল। সে স্বামীর সম্মুখীন হইয়া
বলিল—কেন? কেন ডাকছ?

—ঐ যে খোঁট বিপিনের সঙ্গে এসেছে
তার ভাষার এসেছিল। তিনি বলেন
খোঁটের চরিত্রের ভালো নয়, সেই জন্তেই
তারা একে বাড়ী থেকে দূর করে দিয়েছিলেন,
আমাকেও বলে গেলেন আজকে রাতেই
দূর করে দিতে; না দিলে 'পুলিস' এসে
হালান্না করবে। খোঁট ত ওখানে আছে,
তাকে বল।

তারকের জীকে কিছু বলিতে হইল
না, মালতী সব তর্কিত্তেছিল। একজন
অশরিত্ত পুরুষের মুখে নারীর এই চরম
অপমানের কথা শুনিয়া মালতীর চোখ মুখ
দিয়া আঙুন বাহির হইতে লাগিল এবং
এই মাঘমাসের রাতেও তাহার সর্কাক
দিয়া দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল।

তারকের জী গালে হাত দিয়া বাড়ী কাত
করিয়া স্বামীকে বলিল—ওমা বল কি গো?
শেষকালে কি পরের দারে আমাদের হাতে
মড়ি পড়বে নাকি? এতগুলি কাকো বাচ্চা
নিরে কি শেষে পথে ভাসবে?—ওগো ভালো
মাছুষের কি, শুনছ তোমার শুণের কথা।
বেশোও আমায় বাড়ী থেকে এখনি এই দণ্ডে।

তারকের জী ঘনঘন পুত্তি সঞ্চালন করিয়া
মালতীকে বাসবার ঘর নির্দেশ করিতে
লাগিল। মালতী তেজস্বিনী মেয়ে, সে
একবারে জাতিয়া পড়িবার পাত্র নয়। সে
এতদিন এ বাড়ীতে আছে, তারক তাহাকে
দেখে নাই, তাহার গলা শুনে নাই। আজ,
অপমানের আঘাত পাইয়া উদ্ধত বদনীর
মতন সে বাহিরে আসিয়া বলিল—তুমি নেই
আপনারে। বিপিনবাবু ফিরে এলেই চলে
যাব।

মালতী উহাদের আর গ্রাহ্য না করিয়া
ঘিতলে গিয়া আপনার ও বিপিনের সমস্ত
সামগ্রী গুছাইয়া লইতে লাগিল। তারক
বিপিনের এতীকার বাহিরে আসিয়া ঠাতে
জড়োলেডো হইয়া বসিয়া হি হি করিয়া কাঁপিতে
লাগিল।

অনেক রাতে বিপিন আসিয়া দরজার
কড়া নাড়িল। তারক উঠিয়া দরজার খিল
খুলিয়া দিয়াই বিনা জুমিকার হঠাৎ বলিল—
এ তোমার ভাষি অজ্ঞার।

বিপিন হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ তাই একটু
সাত হয়ে গেছে। গুহুজীর সঙ্গে আজ
অনেক হুন্দর হুন্দর কথা হল। খেয়ে নিয়ে
বলব তোমার।

তারক বিরক্তির স্বরে বলিল—না না
বক্তৃতা পোনবার জন্যে ত আমার ঘুম হচ্ছে
না। এ তোমার কি অজ্ঞার ব্যাভার?

গিগিন তারকের ভাব দেখিয়া বিস্মিত
হইয়া বলিল—কি বলছ? কি অজ্ঞার
করেছি?

—আমার বাড়ীতে একটা বেশী এনে
রেখেছি।

বিপিন দাঁতের উপর দাঁত চাপিয়া ঘুসি তুলিয়া পঙ্কজন করিয়া বলিল—দেখ্ ভাড়কা রাক্‌সী, এক বুসিতে তোব ঐ মুলোর মতো দাঁতগুলো ঝরিয়ে একেবারে বাকরোখ করে দেবে। ভক্তলোকের সঙ্গে কথা বলতে জানো না ঠুপিঙ।

তারক কান-কান হইয়া বলিল—এ ত আমার জ্বরির বিপদ হল দেখছি। মালতীর ভাব্নর এসে বলবে তোমার পুনির্নে দেবে, তুমি বলবে ঘুসি মারব ?...

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—মালতীর ভাব্নর ?

—হ্যাঁ। সেই ত এসে এইসব বলে গেল ?

—কি বলে গেল বল।—বলিয়া বিপিন তারকের হাত ধরিয়া আচ্ছা করিয়া নাড়িয়া দিল। তারক দম-দেওয়া গ্রামোফোনের মতো আড়ট ভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনবর্ণল সমস্ত কথা বলিয়া গেল। বিপিন চুপ করিয়া শুনি। সে চিন্তিত হইয়া ভাবিতেছে, এমন সময় মালতী সেখানে আসিয়া বলিল—বিপিনবাবু, শিগগির একখানা গাড়ী ডাকুন; এ বাড়ীতে এখনো দাঁড়িয়ে আছেন ?

বিপিনও * বুঝিতেছিল, আশ্বাসআনবোধ বাহার আছে তাহার এ বাড়ীতে আর এক দণ্ডও থাকা উচিত নয়। কিন্তু সে এই রাজ্যে এই প্রকারী সমসীকে সঙ্গে লইয়া যার কোণার ? বিপিন মহাসমুদ্রে পড়িয়া কুল পাইতেছিল না, সে যে সংসার-ব্যাপারে নিস্তান্ত অনভিজ্ঞ, সম্পূর্ণ অসহায়। সে কাতরভাবে মালতীর মুখের দিকে চাহিল। মালতীর চক্ষু দুটি বড় হীরার স্থরীর মতো জ্বলিতেছিল। মালতী বলিল—চুপ করে ভাবছেন কি ? চলুন।

বিপিন হতাশভাবে বলিল—মালতী কোণারখাব ?

মালতী জোরের সহিত বলিল—সে ভাবনার সময় এখন নেই, একখানা গাড়ী ত ডাকুন। বণ্টা-হিসেবে গাড়ী করবেন; গাড়ী পথে পথে নিয়ে বেড়ান। সেই সময়ে যা হয় একটা টিক করে তেল খাবে।

বিপিন বক্তচাক্তিতের জার নিজেই গাড়ী ডাকিতে বাহির হইল। তাহারোম চিরপুরাতন ভূত্ব নিধিরাম যে পাশের ঘরে পড়িয়া নিশ্চিন্ত নিজার অচেতন আছে, একথা তখন তাহার মনে আসিল না। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বিপিনের মনে হইল আজ যেন কলিকাতার সমস্ত গ্যাসের আলো ধূম ও কুশাশা মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে, অজগরের মতো পথগুলো পথ জ্বলাইবার মতই যেন অসংখ্য শাখার আঁকিয়া বাঁকিয়া গিরাজে, অট্টালিকার অরণ্য কুহ-বার অর্গল বাহ্যারা চাপিয়া ধরিয়া দুটি গৃহহীন নরনারীর হৃদশা দেখিবার মত শুক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিপিন একখানি সেকেন্ড ক্লাস গাড়ী বণ্টা-হিসাবে ডাড়া করিয়া আনি। তারপর সমস্ত জিনিষ তারকের বাড়ীর একটা ঘরে গুছাইয়া রাখিয়া তখু একটা বিছানার মোট ও একটা কাপড়ের ট্রাক গাড়ীর মাথার চাপাইয়া বিপিন ও মালতী অতুস্ত অবস্থাতেই গাড়ীতে চড়িয়া বসিল। কেহ একবার বলিল না, খাইয়া গেলে ভালো হইত। এতগুলো রুটি যে ন দেবার ন ধর্ম্মার নষ্ট হইল এমন্ত তারকের স্ত্রী করলার উনানের আঙারের মতন গনগন করিতে লাগিল। এবং ছেলোটাকে চড়ু কসাইয়া

মেঘেটার কথা নিংড়াইয়া সে এক মণামারি
কুকক্ষেত্র গণ্ডগোলে বাধাইয়া তুলিল।*

এই গোলমাতে নিধিরামের ঘুম ভাঙিয়া
গিয়াছিল। সে তাহার মুনিবদের গাড়ীতে
চড়িতে দেখিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে নিজের
পুঁটুনিটি বগলে করিয়া গাড়ীর কোচবাক্সে
আপনার স্থান করিয়া লইল। তারক জিজ্ঞাসা
করিল—তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

বিপিন বলিল—ঘরের বাড়ী।

তারক ভাবিল, তাইত। সে আরগাটার
সন্ধান ত পুলিশের ভয়েও করা মুশ্কিল এবং
চেষ্টা করিয়া সন্ধান পাইলেও ভূত হইয়া
পুলিশকে পাওরা ছাড়া আর কোনো একায়ে
ত পুলিশকে সন্ধান জানাইবার উপায় নাই।
তারক মদ্য সমস্তার পড়িয়া ভাবিতে লাগিল—
তাইত।

গাড়োয়ান গাড়ীর দরজা বন্ধ করিতে
আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বাবু, কোথায় যেতে
হবে?

বিপিন বলিল—তোমার বেগানে খুঁসি,
পথে পথে নিরে বেড়াও।

গাড়ী নিশিতে-পাওরা রোগীর মতন এ-
পথ ওপথ করিয়া টলিয়া টলিয়া উদ্বেগহীন
ভাবে ঘুরিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে
হুড়ুম করিয়া সাড়ে নটার ভোণ শড়িল,
আর সেই ফাঁকা চোপের শব্দ শুনিয়াই
ঘরে ঘরে স্যোক বোমকালী বলিয়া চমকিয়া
উঠিল। গাড়োয়ান হাঁকিল—বাবু, আর কত
দূর?

বিপিন ও মালতী একতক্ষণ ভাবনার
মধ্যে ডুব দিয়া একেবারে তলাইয়া গিয়াছিল।
ভোপের শব্দে আর গাড়োয়ানের ডাকে

সচকিত হইয়া নিতান্ত নিরুপায়ভাবে বিপিন
বলিল—তাঁত কোথায় যাব?

মালতী বলিল—শুনেছি কলকাতার
কোথার কোথার সব হোটেল আছে, সেই-
খানে চলুন না।

বিপিন বিপদের ভাবে বলিল—হোটেল?—
তাইত! সে-সব কোন রাত্তার তা ত
জানিবে।

—গাড়োয়ানকে বলুন খুঁজে
কোথাও নিরে যাবে।

—কোথার অনেকো জায়গায় রাজে গিরে
শেবকালে কি বিপদে পড়ব?

—অত ভাবলে ত চলবে না, এক
জায়গায় ত যেতে হবে। সমস্ত রাত ত
আঁর গাড়ীতে ঘোরা চলবে না।

বিপিন একটু চিন্তা করিয়া বলিল—এক
খুড়িয়ার কাছে গেলে হত, কিন্তু তাঁদের
টিকানা ত জানি না, শেবে কি কাশীর
শুভার হাতে পড়ব?...একমাত্র পথ আমি
দেখতে পাচ্ছি।...শুক্লদীর আশ্রমে গেলে
হয়।

মালতী বিস্মিত হইয়া বলিল—শুক্লদী?—
আপনার আবার শুক্লদী কে? তাঁর আশ্রম
কোথায়?

—আশ্রম তাঁর পড়বার পঙ্গর ধারে।
তাঁর নাম শ্রীশ্রীশ্রীমানন্দ স্বামী। সন্ন্যাসী
তিনি। মহাপুরুষ! অপাধ্যায় লোক।

মালতী বলিল—শ্রীমানন্দ? হন না
তিনি শ্রীমানন্দ, হন না তিনি মহাপুরুষ।
কিন্তু সন্ন্যাসীর আশ্রমে আমরা যাব কেন?

বিপিন এই প্রশ্নে একটু সঙ্কট হইয়া
বলিতে লাগিল—দেখ মালতী, তোমার

আমার সাংসারিক মিলন হওয়া বোধ হয় ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়, নইলে এমন সব অঘটন কেন ঘটবে। শুক্লভীষ বলছেন তোমার সঙ্গে আমার সাংসারিক মিলন মঙ্গলকর হবে না। চল আমরা প্রজ্ঞানেই সন্ন্যাস গ্রহণ করি; কামনা বিসর্জন দিয়ে আমরা প্রজ্ঞা আধ্যাত্মিক বোলে মিশিত হবে, দুজনে পাশাপাশি থেকে পরস্পরকে ভালো বেগে অগতের পেশা করব। আমার মন আজ কদিন থেকে এই কথাই বলছে; আমি বাসনা বিসর্জন দিতে পারিনি বলে ভগবান আজ একেবারে বাড়ি ধরে পথে বাঁক করেছেন; সব বাড়ীর দরজা বন্ধ; শুধু সেই প্রেমিক ডাকের আশ্রমে কোনো ঘরে অর্পণ নেই। চল আমরা সেইখানে যাই। সন্ন্যাসই আমাদের চরম অবলম্বন, ভগবানের ইচ্ছিত নানা প্রকারে শুধু এই কথাই আমাদের বলছে।

বিপিনের কথাটা মালতীর বুকে শেলের মতো গিগা বিঁধিল। সে এত অপমান, এত নির্যাতন, এত বিপদ মাথার করিলা যে বিপিনের সঙ্গে অকূলে ভাদিরাছে সে কি এইজন্য? * হিন্দু বাঙালী ঘরের বিধবা সে, সে যে কতখানি ভালোবাসিরা তবে এত বড় সংস্কারের, গতি পার হইরা বিপিনকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইরাছিল, সেই ত্যাগের সেই ভালোবাসার গভীরতা বিপিন বুঝিল না? আজ একটু অসুবিধার পড়িরা বিপিন কিনা অন্যায়সে চিরজন্মের বিচ্ছেদের কথা মুখে আনিতে পারিল, একবার ভাবিরা দেখিল না মালতী তাহার অজ্ঞ কি না সঙ্গ করিরাছে, কি না ত্যাগ

করিরাছে। মালতী মিনতির বরে বলিল— যা আপনীর ইচ্ছে হয় করবেন, নবকিশোর বাবু কিরে আসা পর্যন্ত অসুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। আজকে হোটেলের চপুন।

আবার নবকিশোরের নাম? বিপিনের উপর মালতী নির্ভর করিতে পারে না? এই কি তাহার ভালোবাসা? নবকিশোরই যদি তাহার অধিক হিতৈষী হয় তবে সে নবকিশোরের সহিতই বুঝা-পড়া করুক, বিপিনের সহিত তাহার আর কোনো সম্পর্ক না থাকাই ভালো। বিশিন ত ভাই চাহ, ভগবানের অলক্য মঙ্গলহস্ত তাহার বন্দনগুলি যে একে একে খুলিরা দিতেছে, এ যে গুরুদেবেরই পরম কৃপার ফল, ইহা কি সে বুঝে না? ভালো, তাহাই হোক মালতীকে নবকিশোরের বিছার সোপর্দ করিরাই বিপিন একেবারে মুক্ত হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিরা বিপিন গাড়েগানকে কোনো হোটেল লইরা গাইতে বলিল। গাড়েগান অনেক খুঁজিরা খুঁজিরা তাহা-বিগকে এক হিন্দু-নিবাসে উপস্থিত করিল। অনেক ডাকাডাকি, কড়া খটখটি পর হোটেলের চাকরদের তুলিরা তাহার আশ্রয় পাইল। ঘণাতি বচসার পর গাড়ীভাড়া চুকাইরা তারাক্রান্ত জ্বর ও শূঁচ উদর লইরা বিপিন ও মালতী হোটেলের ছই ঘরে দুটি বিছানা পাতিরা শুইরা পড়িল। নিখিরাম আপনীর কথলখানি বিছাইরা মালতীর ঘরের দরজার সামনে পড়িরা রহিল।

(৩২)

ভোর না হইতেই কলিকাতার নিম্নিত-

দেয় আগাইয়াব উৎকট চেষ্টা পথে পথে চলিতে লাগিল। কলে কলে বাঁশি বাজিল, মহলা-ফলা গাড়ী উৎকট শব্দে ছুটিতে লাগিল, ট্রাম চলিল। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে কাকের কলরব, ভিখারী বষ্টমের করতাল বাজাইয়া নাম-সঙ্কীর্্তন এবং নানা ফেরি-ওঠাণার কড়ি-কোমল সাধা জ্বের আর্ন্তনাদ জ্বল হইয়া উঠিল। এততেও বাহার ঘুম না ভাঙে সে কুস্ত্রপূর্ণের আধুনিক সংস্রবণ। স্তব্ধতাং নিপিন ও মালতীকে পরিভ্রমিত পূর্বেই নিদ্রা ভাগ করিয়া উঠিতে হইল।

বিপিন নবকিশোরের চিত্রির আশায় একবার তারকের বাড়ীতে গেল। কোনো চিঠি আসে নাই। তারক বাঁশি—চল তোমার বাসাটা দেখে আসি; চিঠি এলে আমি পৌছে দেব'খন।—মুহূর্ত্তকে বিপিনের নূতন বাসার সন্ধান দিতে হইবে বলিয়া তারকের এত আগ্রহ।

বাসার ফিরিবার সময় বিপিন আপনাকে বড় বিব্রত বোধ করিতে লাগিল।

মাতার আদরের খন বিপিন চিরদিন পরের যত্নে ও বিলাসিতায় একেবারে অকর্মা হইয়া গিয়াছিল; বড় হইয়া যখন সে মাতার সঙ্গীত হইয়া বিদেশে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল, তখন তাহার পরম আশ্রয় ছিল বলিষ্ঠ সতেজ নবকিশোরের বক্ষুত্ব। আজ অপরিচিত নূতন বাসার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার ভার পড়িয়াছে একা তাহার উপর! সে ত কখনো নিজের বা পরের আশ্রয়ের অস্ত্র মাথা বাসার নাই, আজ হইতে একটি নূতন অগঠিত অসম্পূর্ণ সংসারের সমস্ত গুটিনাটি তাহাকেই

বহন করিতে হইবে। আর তাহাকে চল ডাল তরকারি, তেল লুন লবড়ি, হাঁড়ি কুড়ি, হাতা খুঁটি বেড়ির তুচ্ছ জাবল জাবিতে চইনে।

সে খুঁজিয়া পাতিয়া করিয়া করিয়া লইবার লোক ঘোটেই নহে। অথচ এই সমস্ত কাছ, শেস্তপীরর গেটে বন্ধন নবীত্র ভুলিয়া গিয়া, তাহার নিজে না করিলে নয়, ইছাই মনে হইয়া তাহার মন ক্লান্ত ভীত ভালাক্লান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। বাসার, ফিরিতে তাহার পা উঠিতে চাহিতেছিল না। সে এক এক বার মনে করিতেছিল, বিলাতে যেখন এক এক পরিবার সারা জীবনটা হোটেলের পরের হেকাজতে কাটাইয়া দেয়, সেও তেমনি কাটাইয়া দিবে, বরকরার হাদাসা সে ঝড়ে করিবে না। সব চেয়ে সুবিধা হয় সে যদি প্রেম্যানন্দের আশ্রমে গিয়া আশ্রয় লইতে পারে! সেই চিন্তাটাই বড় নিশ্চিত্ত আশ্রয়ের।

যখন বিপিন নিশ্চিত্ত হইবার অস্ত্র ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, তখন নিশ্চিত্ত থাকিবার সুবিধা পাইয়াও মালতীর নিশ্চিত্ত থাকিতে ভালো লাগিতেছিল না।

মালতী আজ এই অস্থায়ী অচেনা গৃহের সর্পময়ী গৃহিণী। তাই সে হৃৎপের মধ্যেও আনন্দ বোধ করিতেছিল। সে প্রাতঃকালেই শ্রান করিয়া নিখিরাহকে বলিল—নিখিরা, হোটেলের ঐ রেজ নোংরা রান্না ত মুখে ক্ষণে না; তুমি হোটেলের ম্যানেজারকে বলে এই ঘরের একপাশে রান্নার হুকুম নিয়ে এস; আমরা বরং ঘরে

কলি কেরাবার খরচ দিয়ে যাব; আর বাবার থেকে একটা লোহার আখা, কাঠ, হাড়ি, চাল ভাল তরকারি সব কিনে নিয়ে এস, আমি রাখব।

নিধিরাম বিনা বাক্যব্যয়ে ভোগাড় করিতে বাহির হইয়া গেল; মালতী কোমড়ে কাপড় জড়াইয়া, সিঁদু হুল চূড়ার আকারে মাথার উপর তুলিয়া গৃহকর্মে নিজেকে ব্যাপ্ত করিয়া দিল।

বিপিন আদিয়া বেধিল, তাহার করিবার কাজ কিছুই বাকী নাই; মালতী নিজেই সমস্ত ভোগাড় করিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। বিপিন হাঁক ছাড়িয়া বাটিল। গৃহকর্মের মধ্যেই রমণীর আসল রূপটি প্রকাশ পাবে; বিপিন মালতীকে অত্যন্ত সহজভাবে এই অচেনা জায়গার অসীম অজ্ঞবিধার মধ্যে তাহারই আশ্রয়ের কাজ গৃহকর্মে ব্যাপ্ত দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। মালতীর এই কল্যাণী অরুণা ন্তি দেখিবার সুযোগ বিপিনের কখনো ঘটে নাই। আজ এই দুদিনেও তাহার প্রকৃত মুখ ও অনিগূণ তৎপরতা বিপিনের মন এক নতুন রূপেই অঙ্গুত করিয়া তুলিল। প্রেমাম্বলের মোহ তাহার মনে যে ব্যবধান রচনা করিতেছিল মালতীর আচরণে আজ তাগা নুষ্টি গুচিয়া যাইবে বলিয়া মনে হইল।

এতদিন সমস্ত সংসার তুলিয়া সর্ব্বের মূল্য দিয়া বিপিন বাহাকে চাহিয়াছিল, তাহাকে আজ পাইয়াছে, আজ উভয়ের মাঝখানে কোনো বাধা নাই, আজ বিপিনের বড় আনন্দের দিন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আজ কোনো বাধা নাই বলিয়াই

মিলনেরও কোনো ব্যাঘাত নাই, আজ বিপিন নিজেই নিজের বাধা হইয়া উঠিয়াছে।

হোটেলের নিকট বসিয়া দুদিন গেল; মালতীকে একা ফেলিয়া বিপিন কোথাও বাইতেও পারে না, আর উভয়ের মধ্যে আবার এমন একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে যে উভয়ের উত্তরকে লইয়াই যথেষ্ট বোধ্য হয় না। বিপিন বলিয়া বসিয়া শুধু শুককীর কথা বলে আর ভাবে, আর মালতী ভাবে পুঙ্খবত্তা কি হুঁসখা ভাত, একটুখানি হিরতা নাই দৈর্ঘ্য নাই নিষ্ঠা নাই, অবস্থার পর অবস্থার ক্ষণিক উদ্ভা-দনা শুধু চাখিয়া ফিরিতে চায়! মালতীর মনে হইতেছিল বিপিনের এই যে সম্মাস-গ্রহণের পূর্ণ, তাহা তাহাকে ত্যাগ করিয়া মুক্ত হইবার ছল মাত্র। সত্য বটে জীবিত্যের ছেলে বিপিন ক্রমাগত অঘাতের পর-অঘাত পাইয়া ভাঙিয়া পড়িয়া পৃষ্ঠভঙ্গ নিতে যে চাহিবে ইহা আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু হুঃখ কি শুধু সেই মালতীর কাজ পাঠতেছে, মালতী কি বিপিনের কাজ কোনো হুঃখ স্বীকার করে নাই? হিন্দু বাঙালী-বরের ঘেরে সে, বিধবা হইয়া বিবাহ করিতে যে স্বীকার করিয়াছে, ইহার কাজ যে লজ্জা থিকার ও লাজনা তাহাকে উত্তর হইতে হইয়াছে, তাহা যে তাহার অধিপনীর ক্ষার চেয়েও ভাবণ। তাহা কি তুচ্ছ হইল? সেই অধিপনীর ক্ষে বাহার মুখ চাহিয়া অবাধে স্বীকার করিয়াছিল, সেই কিনা আজ তাহার সকল আশ্রয় নষ্ট করিয়া দিয়া নিরুপায় অবস্থার পরিভাগ করিতে উত্তত হইয়াছে?

এর চেয়ে অপমান তাহার নামের মিথ্যা বলকে বা কুৎসার ত তাহার বোধ হয় নাই।

মালতী হোটেলের ঘর হইতে বলিয়া বলিয়া দেখে কত বর বাতবস্ত্রের কোলাহল ও আলোর সমাবেশ করিয়া বিবাহ করিতে যাইতেছে; কত বধু নবনিবাহের রঙিন সজ্জার মান মুখে অপরিস্রবিত স্বাধীর সহিত স্বস্তরবাড়ী যাইতেছে। দেখিয়া দেখিয়া তাহার নিখাস পঙ্কিত; নিখের দুর্ভাগ্য মরণ করিয়া লক্ষ্যের অপমানে তাহার সমস্ত অন্তর তাহাকে শত দিকার দিয়া উত্তীর্ণ।

বিপিনের সহিত একটা শেষ যোজনা পড়া হওয়া পরকায় হইয়া উঠিয়াছে। বিপিন যদি তাহাকে বিবাহ নাই করে তবে বিপিনের কাছে থাকা তাহার আর এক দণ্ডও উচিত নয়। পথে পথে তাকা করিয়া বেড়াইতে আর চেয়ে সম্মানের, এর চেয়ে সুখের। এই সময় নবকিশোর থাকিলে ঠিক হইত। কিন্তু কেহ যদি সাহায্য করিবার নাই থাকে, তবে তাহাকে নিজেই নিখের অগৃহের একটা হৃদয় বুঝিয়া লইতে হইবে। জীলোকের পক্ষে ইহা বড় লক্ষ্যের কথা। কিন্তু উপায় আর নাই।

মালতী সফর ও সাহস সফর করিয়া বিপিনের কাছে কথাটা বখন উত্থাপন করিতে গেল, তখন সে কথা বলিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সুন্দর মুখের ক্রন্দন শ্রবণে অতুলনীর ক্ষমতা। বিপিন বলিয়া বলিয়া মুখে নেয়ে দেখিতে লাগিল। অকস্মৎ তাহার মনে হইল, না না, এসব মোহ, ইহা মারের মারিবার ফাঁদ। সে তখন বস লগ্রেহ

করিয়া মালতীকে বক্তৃতা দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল প্রকৃত্তির বশীভূত হওয়ার কল্যাণ নাই, এমননি বা এর চেয়েও বেশী বিপদ ঘটবে; আসল আনন্দ আধ্যাত্মিক মিলনে। গুরুজীর কৃপায় তাহাদের বর্ধাশ মিলন ও কল্যাণের আনন্দ লাভ হইবে।

এমন সময় তারক পথ দেখাইয়া মুহূর্ত্তক হোটলে লইয়া আসিল। মুহূর্ত্ত পূর্ণিমা আদালতে ও হাইকোর্টে মোকদ্দমা রুজু করার কথাটা বিপিন ও মালতীকে লাগড়ারে ও সাড়ম্বরে শুনাইয়া গেল।

বিপিন বলিল—দেখছ মালতী, ভগবানের কত রকমের নিবেদন কতবারে কত রকমে আসছে? চল আমরা গুরুজীর আশ্রয়ে যাই।

মালতী মিনতির স্বরে বলিল—আর অন্ন অপেক্ষা করুন, নবকিশোর বাবুকে আসতে দিন।

আবার নবকিশোর! মালতী মনে করিতেছিল বিপিনের এই যে ক্ষণিক দুর্বলতা তাহা নবকিশোরের বলিষ্ঠ মনের আশ্রয় পাইলেই দূর হইয়া যাইবে, নবকিশোরের এমন একটি শক্তি আছে যাহার দ্বারা সে অনায়াসে তাহারিগকে সকল কুফল কাটাইয়া বন্ধনের ঘাটে পৌছাইয়া নিরাপদে নগর করাইয়া দিবে। সে ভগবানের নিকট অহুত্ব প্রার্থনা করিতে লাগিল, যে ভগবান নবকিশোরকে শীঘ্র প্রেরণ কর।

এদিকে নবকিশোরের প্রতি মালতীর বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাবকে প্রেরণের

পক্ষপাত মনে করিয়া বিশিন ক্রমশ বন্ধুর
প্রতিও বিরূপ হইয়া উঠিতেছিল। সে মনে
করিতেছিল এত সমস্ত কাণ্ড সব-
ত নবকিশোরের বুদ্ধিতেই সংঘটিত হইয়াছে।
বিশিন ইহার মধ্যে আগাগোড়া তাহার বন্ধু
একটা মতলবের খেলা দেখিতে পাইল।
তাহার এ-সমস্ত কাণ্ড বিশিনের মাপার
কাঠাল ভাঙিয়া সমাজ-সংস্কারের সুনাম
সত্তার নিজে ভোগ করিবার ফন্দি। উঃ !
কি ভীষণ প্রতারণা! বিশিনের সরলতার
স্বযোগ লইয়া সে তাহার কি সর্বনাশ
না করিয়াছে? পাঠশালায় ছুতা করিয়া
ভিন-ভিনখানা তালুক নিজে হস্তগত
করিয়াছে; শৈতুক জমিদারী ও পিতা
মাতার ঘেহ হইতে তাহারই অল্প বঞ্চিত
হইতে হইয়াছে; অবশেষে মালতীরও মন
হরণ করিবার ফন্দি খেলাইয়াছে—সে
ফন্দিগুলি যে কি তাহা ঠিক স্পষ্ট এখন
জানা না গেলেও নিশ্চয় কিছু আছে,
নতুবা মালতী এত তাহার অল্প ব্যাকুল
হইতেছে কেন? এই ফন্দিগুলি ঘটাই
বিশিন তাহার করিতে পারিতেছিল না,
ততই সেগুলিকে নিগূঢ় ভীষণ বলিয়া
অস্বভব করিতেছিল। গুরুদ্বার কুপার
তাহার জামচক্ষু উদ্বীলিত হইয়াছে,
বিশিন বৃদ্ধিলাছে সংসার মারের মারাচক্র।
বিশিন আর এ মায়ার জুলিতেছে না।

এইরূপে আরো দুদিন গেল। তার পর-
দিন অকস্মাৎ নবকিশোর আসিয়া উপস্থিত
হইল। কতক সংবাদ সে তারকের কাছে
শুনিয়া আসিয়াছিল। হোটেলের আসিয়াই
বিশিনকে বলিল—বেশ লোক যা হোক!

এতদিন এই হোটেলের পড়ে আছি, একটা
বাড়ী ভাড়া করে নিতে পারিনি। নাও ওঠ!

নবকিশোরের সরল বলিত ব্যবহারের
কাছে বিশিনের দুর্বলচিত্ত পাশাপাশি হইয়া
মাঝেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে কুণ্ঠিত
হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন? কোথায় যাব?

—বাড়ীভাড়া করে' সব ঠিক করে
এসেছি; হুগারে প্রস্তুত গাড়ী, বেলা বিশ্রাম,
এখন হুজুর চলুন। এখানে যেতে নাহি দিব
বলবার কেউ নেই, থাকতে নাহি দিব
বলবার আমি হাজির। ওঠ ওঠ, উঠে পড়।

বিশিন সন্ধির সময়ে বলিল—তুমি এলেই
বা কখন আর বাড়ী ভাড়া করলেই বা
কখন?

—এসেছি পাত্রাব মেলে তোয়ে।
তারকের কাছে সব শুনেই ছুটে গিয়ে বাড়ী-
ভাড়া করে সেখানকার সমস্ত বন্দোবস্ত করে
এই-চলে আসছি।

বিশিন মুখখানি ধখাস্তব গভীর করিয়া
বলিল—শুনেছি। আদালতে নালিশ করেছে।

নবকিশোর উপেক্ষার ভাবে বলিল—ওঃ!
তার অজ্ঞে কিছু ভেবনা, মালতী সাবালগ,
তার বা খুঁসি সে করতে পারে, যেখানে খুঁসি
থাকতে পারে। ওর ভাহরের ক্ষমতা নেই
ওর বিয়ে বন্ধ করে কি ওকে কিরিয়ে নিজে
যায়।

নবকিশোরের এই আশ্বাসবাক্যে বিশিনের
মুখ তেমন প্রগল্ভ হইল না; সে
যেমনটি মনে করিয়াছিল তেমন ত ঘটিল
না; তাহার উপর সে দেখিল যে মালতী
এই কদিন তাহার কাছে বিমর্ষ হইয়া
কাটাঁইয়াছে, আজ সে উৎফুল্ল হইয়া নব-

কিশোরের কথা বেন সর্কোজির দিরা পান করিতেছে, তাহার চোখমুখ হাসিতে জ্বলজ্বল করিতেছে, সর্কোজি দিরা বেন হাসি ঠিকরিয়া পড়িতেছে।

নবকিশোর কিন্তু বিশিনকে লক্ষ্য না করিয়াই বিয়েবাড়ীর কর্দমকর্তার মতন অনর্গল বকিয়া বাইতে লাগিল—আদালতের লাঠা চুকে গেলেই চটপট বিরোট। সেবে কেলেতে হবে। কিন্তু সেখানেও এক মুদিল আছে...আমি আজ কদিন ধরে তাই ভাবছি।..

মালতী উৎকণ্ঠিত হইয়া চকু বিক্ষিপ্ত করিয়া নবকিশোরের মুখের দিকে চাহিল। বিশিন উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি ?

নবকিশোর বলিতে লাগিল—তাবহিলাম বিরোট। কি প্রণালীতে সম্পন্ন হবে। প্রচলিত হিন্দু প্রণালীতে বিবাহ দিতে হলে শালগ্রাম লিলা আর অগ্নিকে ভগবান স্বীকার করে বিয়ে করতে হবে, কিন্তু তা যখন আমাদের বিশ্বাসের প্রতিকূল তখন সে বিবাহপ্রণালী গ্রহণীয় ত নয়ই। আমার শালগ্রাম ও অগ্নি-হোম ত্যাগ করে বিবাহ দিলে আইন-সঙ্গত হবে না। আইনের মতে রেজেষ্টারী করে বিয়ে হতে পারে, কিন্তু তাতে স্বীকার করতে হয় আমি হিন্দু নই; এ কখনো স্বীকার করা যেতে পারে না—আমরা হিন্দু, একশবার হিন্দু, আমাদের দেশের এতবড় অতীত ঐতিহ্য ছেড়ে একেবারে অহিন্দু হতে আমরা কখনো স্বীকার করতে পারি না।... তা বিয়ের অন্তে তোমরা ভেব না, একটা উপায় কেবে ঠিক করবেই। এখন চল।

সকলে গিরা জিনিষপত্র লইয়া গাড়ীতে উঠিল। 'নবকিশোর বাবু বাহা হর একটা জুখুবস্থা করিবেনই,' তাবিয়া মালতী আশ্বস্ত হইয়া, সকল ভাবনা তুলিয়া গিরাছিল। কেবল বিশিন ভাবিতছিল—নবকিশোরের সবই বাড়াবাড়ি। এও একটা বোধ হয়। নবকিশোরের ফদি! আমার সঙ্গে মালতীর বাতে বিয়ে না হয় তারই একটা, চল।

বিশিন নবকিশোরকে আর তেমন গ্রাণ খুলিয়া বিখান করিতে পারিতেছিল না। আমার তাহার চকুল মন তাহার প্রতি ভালো করিয়া রাগ করিতেও পারিতেছিল না; সে মনে মনে নবকিশোরের প্রতি একটু বিরূপ হইয়া থাকিলেও তাহার এমন শক্তি ছিল না যে সে সেকথা প্রকাশ করিয়া বলে। কাজেই তাহার কক বোব পুটপাকের মতো তাহার অন্তরকে জারিয়া ছাই করিয়া ফেলিতেছিল, অথচ বাহিরে তাহার কোনো প্রকাশ ছিল না।

(৩৩)

মোকদ্দমা চুকিয়া গিয়াছে। বিশিন এখন মালতীকে স্বজন্মে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু বিশিনের মন এই মোকদ্দমার আবর্তে পড়িয়া সংসারের প্রতি আরো বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।—দিনের পর দিন আদালতে বাওয়া আদালত কষ্টে, জীলোক-স্বন্দীয় মোকদ্দমার সকলের সম্মুখে গাড়ানোর লজ্জা, সমস্ত দর্শকের সত্যোক্ত নৃষ্টির আঘাত, এবং সর্কোপরি বিপক্ষ-পক্ষের উকিলদের অন্তঃপ্রোচিত বিজ্ঞপাশ্বক প্রশ্ন বিশিনকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। সে এই-সকলের মধ্যে ভগবানের মঙ্গলহস্তের স্পষ্ট নিবারণ

দেখিতে পাঠিতেছিল। এদিকে মালতী কিন্তু ডাক্তারের বয়স-পরীক্ষা, উকিলের জেরা ও বিক্রয় সহ্য করিতেছিল শুধু এত দুঃখের ও অশ্রুমানের পর বিপিনের প্রাণে সুস্থনা পাইয়া পুরুষত্ব হইবে এই আশায় বুক বাঁধিয়া।

বর্তদিন বোকন্দা চলিতেছিল গতদিন মাথা ঘামাইয়াও নবকিশোর বিপিনের বিবাহ দ্বার একটা পদ্ধতি মনের মতো খুলিয়া পাইল না; কোনোটার মতে বিপিনে বাধে, কোনোটার আইনে বাধে, কোনোটার ধর্মে বাধে। তাহার মনে হইতে লাগিল কি মুক্তি! রেজেষ্টারী বিবাহের আইনটা এমন কেন হইল? এতদিন এই আইনটা চলিয়া আসিতেছে অথচ ইহার সংস্কার যে প্রয়োজন তাহা কাহারও মাথায় আসে নাই? কিন্তু তাহা হয় নাই তাহার জন্য দুঃখ করিয়া ফল কি? এখন উপায়? উপায় সে কিছু খুলিয়া পাইল না। তবে কি ইহাদের বিবাহ হইবে না? তাইত! রক্ষা করিবার মতন লোক ত নবকিশোর নয়।

নবকিশোর যখন বিপিনের বিবাহ ও সংসার পাণ্ডহিবার উজোগে ব্যস্ত হইয়া ক্রিান্তেছিল, বিপিন তখন দিব্য সুযোগ পাইয়া পেডাছ পঃম নিশ্চিন্তভাবে প্রেমানন্দের আশ্রমে যাত্রারত করিতেছিল। মালতী ভীত হইয়া উঠিল। বিপিন পাছে মালতীকে স্বার্থপর অধার্মিক বা এমনি কিছু ভাবিয়া তাহার উপর রাগ করে এই ভয়ে সে বিশিষ্ট কিছু বলিতে পারিতেছিল না, অথচ তাহাকে প্রেমানন্দের প্রত্যাশ হইতে রক্ষা করণও আবশ্যক ও

কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছিল। একদিন সে নিষ্ঠুর ভীত হইয়া নবকিশোরের শরণাগত হইল। বিশিন তখন চলিয়া গিয়াছে। মালতী নবকিশোরকে বলিল—আপনার বড় আজকাল কোথায় যাত্রারত করছেন খবর রাখেন কি?

মালতীর রান মুখ ও হতাশাকরণ স্বর শুনিয়া ভীত হইয়া নবকিশোর বলিল—না। কেন? কোথায় সে যায়?

—সন্ন্যাসীর আশ্রয়। তিনি সন্ন্যাসী হবার সুকল্প করছেন?...

অবশ্যমাত্র নবকিশোর হাহা হাহা করিয়া হাসির রবে বর তরির কেলিয়া বলিল—বিপিন ইবে সন্ন্যাসী!... তাহলে তার গেকরা কাপড় কুঁচিরে দেবার জন্তে আর আলখোলা গিলে করে দেবার জন্তে নিধি-দাদিকে, আর তার নিরম সংঘর পালন করারার জন্তে আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী হতে হবে।... তাই কি তোমারও সন্ন্যাসিনী হওয়া দরকার হতে পারে।...

মালতী নবকিশোরের হাসি ও প্রেববাক্যে সজ্জিত ও আশ্রিত হইয়াও বলিল—আপনি হাসছেন, কিন্তু আমার বড় ভয় হচ্ছে। তিনি রাতদিন মুখ তার করে বসে শুধু সন্ন্যাসীর কথাই ভাবেন। আমাকে স্নেহ সন্ন্যাসিনী হতে বলেন।... বলেন যে আমাদের মিলন ঈশ্বরের আভিপ্রেক্ত নয়। আর তাঁর ক্ষুদ্র তাঁকে বুঝিয়েছেন যে এরকম মিলন ধর্মসঙ্গত হবে না।...

নবকিশোর গভীর হইয়া বলিল—শুধু। শুধু কে? বাদরটা শেষকালে একটা গুরু কেড়ে বসল নাকি? কে সে?...

— তাঁর নাম নাকি প্রেমামনক। খড়বার তাঁর আশ্রম। সেই আশ্রমেই রোজ বান ... চিরদিনের জন্তেই থাকেন বলে প্রস্তুত হচ্ছেন।

প্রেমামনকের নাম শুনিয়া নবকিশোর চিত্তিত হইল। সে প্রেমামনকে একদিন দেখিয়া বুকিয়াছিল যে লোকটার আকর্ষণী শক্তি অসাধারণ এবং আরকাল যে দলে দলে নব্য যুবকেরা বহুদূর পতঙ্গের দ্বারা তাহার চোলা হইতেছে এ খবরও তাহার অদ্বিত ছিল না। এই ক্যাশানের বশবর্তী হইয়া বিবিধ বিক্ষেপে উদ্ভ্রান্তচিত্ত বিপিনও সেই দলে সহজে ভিড়িয়া যাওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়।

নবকিশোর অত্যন্ত চিত্তিত হইলেও বাহিরে প্রকৃতভাবে ধারণ করিয়া মালতীকে বলিল—তুমি কেলেছ? বিপিন হবে সন্ন্যাসী? তোমার কিছু ভয় নেই।... তোমার উড়ুকুখ পাখীটির ডানাগুলি ঈগণির বিবাহের সোনার পিকলে বেঁধে তোমার হাতে দেখো।...তুমি নিশ্চিত থাক।

নবকিশোরের প্রতি মালতীর অগাধ বিশ্বাস। সে সাব্বনা পাইয়া প্রকৃত হইয়া উঠিল। কিন্তু নবকিশোরের মনের মধ্যে অমঙ্গল-আশঙ্কার মেঘ বেন কাশা হইয়া চারিদিক ছাইয়া ফেলিতে লাগিল।

নবকিশোর অত্যন্ত চিত্তিত হইয়া ঠিক করিল তলে আর ইহাদের বিবাহে একদিনও বিলম্ব করা উচিত নয়।

পরদিনই নবকিশোর বিপিনকে বলিল— বিপিন, কোন পদ্ধতি অঙ্গসংযমে বিয়ে হওয়া উচিত আমি ত অনেক ভেবে চিন্তেও ঠিক

করতে পারলাম না। যে পদ্ধতিতে বিবাহ করা তোমার অভিকৃতি বল, আমি তারই যোগাড় করে দেখো।

* বিপিন মাথা নত করিয়া বলিল— আমি বিয়ে করব না।

নবকিশোর যদি জোর করিয়া বিবাহ দিয়া দিত, বিপিন হয়ত আপত্তি করিত না। কিন্তু নবকিশোর তাহারই উপর জোর দেওয়াতেই সে অবকাশ পাইয়া বলিল—আমি বিয়ে করব না।

নবকিশোর এই উত্তর শুনিয়া জুঁজু হইয়া বজ্রনির্ঘোষে বলিল—মূর্থ, ব.জ্ঞা করল না ঐ কথা মুখে উচ্চারণ করতে? একজন উগ্রবরের মেরেকে সকল আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করে এতদূর টেনে এনে এখন তাকে প্রত্যাখ্যান করতে চাও। কাপুরুষ।

নবকিশোরের উচ্চতায় বিপিনও উত্তপ্ত হইয়া বলিল—তগ্রবরের মেরেকে যে এতদূর টেনে এসেছি তার জন্তে দাণী আমি, না, তুমি? তুমিই ত আগাগোড়া আমার প্রযুক্তির ইকনে ব্যতাস দিবে বিয়ে এই দায়ণ অধিকাংশ ঘটয়েছ। * এখন আমার চৈতন্য হয়েছে। তুমি নিজে মালতীকে ভালোবাস, মালতীও তোমার আমার চেয়ে ঢের বেশী ভালোবাসে। তুমিই মালতীকে বিয়ে করবে।

এতদিন ধরিয়া যে সম্বন্ধবিষেবের উত্তাপ তিল তিল করিয়া বিপিনের অন্তরে বিশিনেরও আর অজ্ঞাতসারে সঞ্চিত হইতেছিল তাহা আজ নবকিশোরের তিরস্কারে হঠাৎ অগ্নিগিরির উৎস্রবশে জ্বালা বিপিনের

সুখ কাটিয়া তাহাদের এতদিনের স্রণ সান্ত্বনার আয়োজন সমস্ত এক নিমিষে আলাইয়া পুড়াইয়া থাক করিবার জ্ঞান বাহির হইয়া পড়িল। এ আশ্রম নিভাইতে অনেক দিনের চোখের জল লাগিলে, মষ্ট ঐশ্বর্য কিরিয়া পাইতে বহুদিনের শ্রম-সাধনার আবশ্রুক হইবে।

নবকিশোর বিপিনের কপার বিধে এক-বারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। মালতীঃ সাক্ষাতে এমন রূঢ় ও গর্হিতভাবে যে বিপিন এই কথা কেমন করিয়া বলিতে পারিল তাহা নবকিশোর সহসা ধারণা করিতে পারিল না। সে যে মালতীকে একটুও ভালোবাসে ইহা সে নিজেই কাছেই স্বীকার করিত না; কিন্তু বিপিন যখন সেই অতিগুপ্ত খবরটিকে তাহার অন্তরের অন্ধকার স্রোত হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আলোকে প্রসারিত করিয়া ধরিল তখন সেই কথার মধ্যকার সত্যের সর্বপ্রমাণ বীংকিত অকস্মাৎ বাহুরের মারাত্মকের স্রার অক্লান্ত পলাত পুন্নিভ হইয়া উঠিল,—তাহার প্রকাশের সৌন্দর্য্য মোহ আর ঢাকিয়া রাখিয়া অস্বীকার করা গেল না। সে চকিতে মনের মধ্যে পল্টাৎ কিরিয়া দেখিয়া লইল সেই হেমন্তেব স্মিত বৈকালে মালতীর সহিত প্রথম সাক্ষাতের দিনেই তাহার জড়তাযজ্ঞিত সঙ্গ সাহস দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছিল; তারপর চৌধুরীবাড়ীতে মালতীর নির্গাতন দেখিয়া সে সহানুভূতিতে তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, মালতীকে সে আশ্বাস ও নির্ভয় দিয়া মালতীর বিশ্বাস লাভ করিয়াছিল; সব শেষে সেই যে দিন

তাহার পিতা মালতীকে বধূরূপে গ্রহণ করিতে উদ্বৃত্ত হইয়া নবকিশোরের মনে অগত্যা জন্ম ও আশা ও আশ্রয়ের মোহ রচনা করিয়াছিলেন,—আজও সে সফলের স্বস্তি তাহার মনের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া আছে; হৃদয় ছিল মাত্র, বিপিনের নির্দয় আঘাতে বেদনার আর্জনাৎ করিয়া এক মুহূর্তে আগিয়া উঠিয়াছে। নবকিশোর নিজেই মন হাতড়াইয়া দেখিয়া মালতীর সুপের দিকে চাহিল, দেখিল সে বিপিনের নির্লজ্জ আঘাতে স্তম্ভিত হইয়া আরক্ত নত বধনে দাঁড়াইয়া আছে। নবকিশোরের মনে হইল এই নির্লজ্জ কাপুরুষের রূঢ় আঘাত হইতে মালতীকে বাঁচাইবার অধিকার ও উপায় তাহার হাতে আছে। তখন সে নিজেই উত্তেজনার দ্বিধা মাত্র না করিয়া বিপিনের সুপের দিকে চাহিয়া অবজ্ঞায় হাসি হাসিয়া বলিল—বুর্জ। তুমি কাপুরুষের মতো একে যদি ত্যাগ কর, আমি কখনো ত্যাগ করতে পারব না। মালতী যদি স্বীকার করে, আমিই তাকে গ্রহণ করব।

—বাস! আজ থেকে তবে আমি খাপস। মালতীর সম্বন্ধে আমার আর কোনো দাবি নেই। আমি খাপস!—বলিতে বলিতে বিপিন ঘর হইতে বেগে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু বিপিনের কেবলই মনে হইতে লাগিল এই নিষ্ঠুর বাক্য হয় ত মালতীর হৃদয়ের ঠিক মাঝখানে তাঁর মতো গদা বিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু যে তাঁর একবার ধরুক ছাড়িয়া যায় তাহাকে আর ত ফেরানো যায় না!

মালতীর আজ অপমানের চরম। সে বাহ্যিক ভালোবাসিগা এত হুঃখ সহ্য করিতেছিল আজ সেই অনাগালে তাহাকে পনের হাতে কেলিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। মালতী নবকিশোরকে পদসম্বদ্ধ মনে করিয়া প্রজ্ঞা করিত, আজ সেই নবকিশোরের প্রহর প্রণয় তাহার কাছে উদ্ঘাটিত হইয়া তাহাকে লজ্জার মারিমা কেলিবার উপক্রম করিল। নবকিশোরের প্রতি তাহার বক্তৃদের নির্ভরকে প্রণয়ব্যাকুলতা বলিয়া তুল করিয়া তাহার প্রতি নবকিশোর ও বিপিন উভয়েরই আচরণ মালতীকে চরম আঘাত করিল। তাহাকে লইয়া পুরুষদের এই নিলজ্জ কৌতুক তাহাকে পাগল করিয়া তুলিতেছিল। বিপিন যখন ঘর হইতে প্রস্থান করিল তখন মালতী যেন একটা প্রচণ্ড আঘাতে অগ্নিকের লজ্জা হত-চৈতন্য ও ত্রুটিত হইয়া পাড়াইয়া রহিল— চিত্তা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত রহিল না। গভীর নিষ্কর নৈশ অন্ধকারে তাহার হৃদয় যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল, বড় বড় কালো কালো ঢাকা যেন তাহার দৃষ্টির সম্মুখে সনসন পড় করিয়া ঘুরিতে লাগিল, আর তাহার মধ্যে সবুজ আগুনের হাজারলক্ষ ফুলকি গোড়াহত ঘোমাহির মধ্যে তন্ তন্ করিয়া উড়িতে লাগিল। তারপর যখন চৈতন্য হইল, গভীর বিবাসে তাহার হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল যেন তাহার বয়সবেশ স্বথসৌভাগ্য চিরকালের লজ্জা অন্তর্হিত হইয়াছে।

তখন অস্ত্রফলের একটা বিপুল আবেগ মালতীর বুকের মধ্যে বার বার চৌলিয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠ ও চক্ষু পর্য্যন্ত আকুল করিয়া

তুলিতে লাগিল। অগত্যাগারে তাহার আপনার বলিতে, আহা বলিয়া দেহ করিতে, অশ্রয় বলিয়া পাড়াইতে, মনের হুঃখ ব্যক্ত করিয়া বলিতে কেহ কোথাও যে নাই, একথা কালত তাহার মনে ছিল না,— আজ একি হইল বাহ্যে তাহার কেবলই মনে হইতেছে বিপিন তাহার সম্পূর্ণ নির্ভর-স্থল নহে? নবকিশোরকেও অ্যর বিশ্বাস নাই। কেন মনে হইতেছে, এই বিশ্বভুবন অশ্রয় বৃহৎ ও কঠোর এবং সে বাগিক অত্যন্ত ক্ষুদ্র দুর্বল অসহায়?

দেখিতে দেখিতে অস্ত্রফলে তাহার বুক ভাসিয়া বাইতে লাগিল। কী মর্দভেদী সেই অস্ত্রফল! তাহার মনে হইতে লাগিল, হে ভগবান! আমার এমন কোনো জায়গা দাও যেখানে আমি আপনাকে ইহাদের কলের দৃষ্টি হইতে লুকাইতে পারি। হে ভগবান! এল তুমি মৃত্যুরূপে এস! সকল লজ্জা, সকল মানি, সকল হুঃখ, যোবাতে ঢাকা পড়ক!

মালতীকে ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া নবকিশোর বুঝিল সে নিজের উত্তেজনায় বেশ নিজের অজ্ঞাতদ্বারে মস্ত একটা আঘাত করিয়া বসিয়াছে। তখন সে নিজেকে মালতী ও বিপিনের নিকট মতান্ত্র অপরাধী বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এ অপরাধ কালনের ক্ষমতা নির্দমনভাবে তাহার অধিকারের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে, বিপিন বা মালতী তাহাদের আচরণ দ্বারা এই আচরণটিকে কোনরকমে ঢাকিয়া না ফেলিলে এই মৃত্যু চিরকাল তাহাকে দিকার দিবে ইহা নিশ্চিত বুঝিয়া নবকিশোর নিতান্ত

লজ্জিত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল; আপনায়
নিফলতায় আপনাকে দণ্ড করিতে লাগিল;
সেও যে বিপিনের সহিত মিলিত হইয়া এতদূর
কদম্বা অশমনে মালতীকে অর্জুনিরিত করিয়াছে
এই সূত্রতার বেদনার সে অতিভূত হইয়া
চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া বিচারকের সম্মুখে
অশ্রুধার মতো নিঃস্বাসভাবে শান্তির অপেক্ষা
করিয়া রহিল, ক্রন্দনকাতরা মালতীর কাছে
একটি সাপ্তাহার কথাও উচ্চারণ করিতে
পারিল না।

কল্পনাগ্রবণ বিপিন যখন দেখিল যে
কল্পনা ও বাস্তবে আকাশ-পাতাল প্রভেদ
তখন তাহার দুর্দল চিত্ত প্রভাবতই ভাঙিয়া
পড়িতে চাহিতেছিল। বিপিন এখন নিজের
ভরদায় সংসারে দাঁড়াইতে গিয়া দেখিল সে
কতদূর অসহায়, সে কতদূর অক্ষম। সে
সমুদ্রবক্ষে নৌকার লগিত নৃত্য দেখিয়া
ভাবিয়াছিল সেখানে বৃষ্টি শুধু আনন্দের
হিম্মোল, সে বৃষ্টি শুধুই মধুর বায়ু মূলে
রন্ধে ভাসিয়া যাওয়া, সে বৃষ্টি জলধোলা; কিন্তু
নৌকার বৃকে পা রাখিয়াই সে দেখিল, দূর
থেকে সে বড় ভালো, কাছে গেলে চীদে
হুগা নাই; কল্পনা ও কর্তব্যে বিষম
অন্তর; ইহা ত শুধু বসিয়া বসিয়া দোল
খাওয়া নয়, এবে প্রত্যেক মুহূর্তে সচকিত
সচেতন থাকা দরকার, কখনো একটু
অস্বস্তময় হইবার জো নাই, একা হাতে
নৌকার জল সেচিতে হইবে এবং অনভ্যস্ত
হাতে প্রাণশলে দাঁড়ও টানিতে হইবে।
দক্ষিণে ঘামে একটু কাত হইলেই একেবারে
জলে গিয়া পড়িবার আশঙ্কা অহরহ
বৃকের পাশে কীটার মত লাগিয়াই আছে।

একটু অবনোযোগ, এতটুকু হুল, একটু
নড়াচড়া হইলেই একেবারে সর্পনাশ! আজ
তাহার আশ্রয়স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। সে
স্থান তাহার কোনো কাগেই খুব বিতর্কিত ছিল
না, কিন্তু নিরাপদ নিশ্চিত নিঃস্বাভে ত
ছিল। সেই অস্ত্রাশ্রয় ও অতিভূততার বশেই ত
সে যেন করিয়াছিল মালতীকে পাঠলে
তাহার জীবনটা একটা সুখের গানের মতো
সহজ মৌলোহেম হইবে বহিরা বাইবে। কিন্তু
এখন ঠেকিয়া দেখিল সে শুধু মনোচিকা,
তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া মরতে
হুথ থাকিতে পারে, কিন্তু বস্তু নাই।
হুথ চেরে বস্তু ভালো। মালতীকে পাওয়ার
হুথের পশ্চাতে যে বিষম উবেগ রহিয়াছে,
তাহার আওতার সেই ভাবময় হুথ কতক্ষণ
টিকিবে? প্রেমাময় স্বামীর আশ্রমে নিশ্চিত
একটু আশ্রয়, অষ্টোৎসাহ সামান্য অগ্রব্রত
কুটিলেই বিপিন বাঁচিয়া যায়। মালতীর অদর্শনে
তাহার বৃকে ভুবেল আশ্রয় জলিবে। তা
অনুক, তাহাও এই দুঃস্বপ্নময় জীবনসংগ্রামের
চেরে চেরে সংজ্ঞে সহনীয়; আর মালতীর
বিরহদুঃখের মধ্যেও ত আনন্দ আছে,
ভালোবাসিবার অন্তরের সার্থকতা, প্রেমাম্পদের
চিন্তায় তত্ত্বমতা। মালতীকে ত্যাগ করিয়া
সে সন্ন্যাসীর আশ্রমে গেলে মালতীর প্রেম
তাহার নিকট যথও স্বাভাবিক সম্পূর্ণ হইয়াই
থাকিবে, সেই প্রেমকে সংসারের সংঘর্ষে
জীবনের জটিলতার পথে পথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
দেখিতে হইবে না।

বিপিনের সমস্ত সংবাত হইতে সরিয়া
পড়িবার একমাত্র অন্তরায় ছিল মালতী—
তাকে বিপিন কোথায় ফেলিবে ঠিক

করিতে পারিতেছিল না। গুরুজীর আশ্রমে লইয়া যাইতে পারিত, কিন্তু মালতী ত তাহাতে সম্মত ছিল না। এইখানেই বিপিনের একটু গোল বাধিয়াছিল। কিন্তু যখন নবকিশোর মালতীর ভার গ্রহণ করিল, এমন কি মালতীকে বিবাহ করিতেও স্বীকৃত হইল, তখন বিপিন মালতীর সৎক্ষে নিশ্চিত হইল বটে কিন্তু নবকিশোরের নোভাগ্যের ঈর্ষায় অলিতে লাগিল। মালতীকে এইরূপ অবস্থায় ত্যাগ করাতে তাহার প্রতি বিপিন যে কিছুমাত্র অবিচার করিতেছে তাহা তাহার মনে হইল না; মালতী নবকিশোরকে ভালোবাসে, হৃত বা বিপিনের চেয়ে বেশী ভালোবাসে; নবকিশোরকে বিবাহ করিয়াই সে সুখী হইতে পারিবে, বিবাহসম্বন্ধ ত এক ঘরের কত লোকের সঙ্গেই হয়—অবশেষে বাটার সহিত বিবাহ হয় সেই ত সমস্ত জনর জুড়িয়া বসে। যদিই বা মালতী বিপিনকে একটু ভালোবা সরা থাকে তবে সে ভাব সে হৃৎপের মতো দু দিনেই ভুলিয়া যাইবে।

মাতুল যখন কোনো কাজ করিতে নিতান্ত ইচ্ছা করে তখন তাহার বর্ষবুদ্ধিকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিবার মতো যুক্তির অদস্তাব কিছুতেই হয় না। যখন কোনো অশান্তি বা অশুভ উপস্থিত হয় তখন লোকে নিজের দিকে না চাহিয়া সমস্ত ঘোব পরের উপর নয় অদৃষ্টের উপর চাপাইয়া নিশ্চিত হইতে চায়।

বিপিন এতদিন এতোক বাধার মধ্যে জগবানের নিবেদ দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল; এখন সমস্ত ঘোব নবকিশোরের উপর চাপাইবার সুযোগ পাইয়া বিপিন

নিজেকে অনেকটা নিশ্চিত ও দায়িত্বমুক্ত বোধ করিতে লাগিল। সে কতকটা প্রসূর জুবেই গুরুজীর আশ্রমে যাইবার আয়োজন করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু পোটলাপুঁটলি যতই দড়িমড়া দিরা কথা হইতে লাগিল, বিপিন অসুস্থত্ব করিতে লাগিল তাহার মনের একধারে যেন টান পড়িতেছে, মনে যেন বেদনার টনটন করিয়া উঠিতেছে। যখন তাহার যাইতে পাঠাই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল, তখন তাহার থাকিতেও লজ্জা বোধ হইতেছিল। তাহার মনে মনে তারি অভিমান হইতে লাগিল যে নবকিশোর তাহাকে তিরস্কার করিয়া প্রতি-নিবৃত্ত করিল না, মালতী অশ্রুতরা মিনতিতে তাহাকে সাধিল না। তবু বিপিন প্রস্থান করিতে বিলম্ব করিতে লাগিল, যদি বিলম্বও কেহ তাহাকে ফিরাইতে আসে। মালতীকে ছাড়িয়া গেলে তাহার জীবনের যে কতখানি খালি হইয়া যাইবে তাহা বিপিন ক্রমশ বিশেষভাবেই অনুভব করিতেছিল।

কিন্তু নবকিশোর বা মালতী সেক্ষণ প্রকৃতিতেই গঠিত নয় যে যুক্তি দেখানে হার মানিয়াছে, জগবানের যোথানে অবস্থাননা হইয়াছে, সেখানে গিয়া দয়া ভিক্ষা করিবে। মালতীর আত্মমর্যাদার ভাব এবং নবকিশোরের লজ্জা এমন তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, যে তাহার বিপিনকে আর কোনো অশ্রুতোধ করিতে পারিল না।

বিপিন যখন দেখিল যে কেহই তাহাকে সাধিতে আসিল না, তখন সে আহত অভিমানের প্রবল ধাক্কা বাকী হইতে বাহির হইয়া ছিটকাইয়া পড়িবার উপক্রম

করিল। কিন্তু তখনো আশা একেবারে ছাড়িতে পারিতেছিল না।

গাড়ীতে মোট ভুলিয়া বিপিনের মনে হইল এইবার মালতী তাহার সমুখ দিয়া অলিত হইয়া, চিরদিনের মতো অনায়াস হইয়া চলিয়া বাইতেছে; এমনো ইচ্ছা করিলে সে বাহ বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে পারে। জরজর ইতস্তত করিয়া বিপিন একটা দীর্ঘনিশ্বাসে সেই দুরাশাকে একেবারে ভুলিয়া করিয়া দিয়া গাড়ীতে চড়িতে যাইবে, ঠিক সেই সময় মালতী আসিয়া তাহাকে বলিল—একটু দাঁড়ান, আমিও যাব।

আনন্দে বিপিনের মন নৃত্য করিয়া উঠিল। মালতী ইচ্ছা করিলে নবকিশোরকে বিবাহ করিয়া স্বপ্নে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিত; সে স্বপ্ন ত্যাগ করিয়া এই নবীন বয়সে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বুকে পুষ্টিয়া তাহার সন্ন্যাসিনী হওরা উচিত নয়;—মালতীকে এমন-সব কথা একবার বলিবার জন্য অভিমান বিপিনকে একটু ইঙ্গিত করিল; কিন্তু বিপিনের প্রণয় তাহাকে সে কথা বলিতে দিল না, কি জানি অভিমানিনী মালতী যদি সে কথা শুনিয়া সত্যসত্যই থাকিয়া যায়। মালতীর সহিত একই আশ্রমে থাকিলে অন্তত সেবার আনন্দ ত সে পাইবে। তাহার আভাস ত এখন সে মনের মধ্যে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত করিতেছে। কিন্তু পাছে সেই আনন্দ ধরা পড়িয়া তাহার বৈরাগ্যের শাণ্ডায়া খর্ব্ব হইয়া যায় এই ভয়ে বিপিন বশাস্তব গভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

মালতীর মন কোনো অবস্থাতেই সম্পূর্ণ হাল ছাড়িয়া দিতে জানে না—তাহার

তেজস্বী মন নৈরাশ্রকে স্বীকার করে না এবং আশাকেও স্বীকড়িয়া ধরিয়া একেবারে ব্যাকুল হইয়া ওঠে না। মালতীও ঠিক বিপিনের মতোই ভাবিয়াছিল যে বিপিনকে ত সে এখন পাইতেছে ন', কিন্তু তাহাকে চোখের দেখার সৌভাগ্য সে ত্যাগ করে কেন। বিপিনের প্রণয় নানা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া বেগহীন হইয়া পড়িয়াছিল; সেই নষ্ট বেগ সে ফিরিয়া পাইতে পারিবে যদি মালতী তাহার প্রণয় দিয়া বিপিনের মধ্যে নৃতন আশ্রয় সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারে; রক্তহীন রোগী যেমন অগ্নয়ের হৃৎ তাকা রক্ত পাইয়া বাঁচিয়া ওঠে, তেমনি বিপিনের মনস্ক প্রণয় মালতীর প্রণয়ের নিকট হইতে বলশালী করিয়া নৃতন হইয়া উঠা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। মালতী বেশ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিল যে এই পথ ছাড়া তাহার বাইবার অল্প পথ নাই; সে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল সংগ্রাম যতই কেন বিশদ্বিত ও কঠোর হোক না তাহার প্রণয়ের জয় নিশ্চিত, কিন্তু অল্প আর যে কোনো পথের অন্তে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে ঐক্য সর্ব্বনাশ।

তৎক্ষণাৎ আপনার তোরঙ্গ বিছানি গুহাইয়া লইয়া মালতী গাড়ীতে গিয়া চড়িল।

মালতী যখন বেছুরি নবকিশোরকে ত্যাগ করিয়া বিপিনের সঙ্গ গ্রহণ করিল তখন নবকিশোর হাঁক ছাড়িয়া বাঁচিল। তখন আবার সে নিম্নের স্বাভাবিক জ্বর-বল বশাস্তব আহরণ করিয়া তুটি তেজ-বিতার সহিত বিপিন ও মালতীর নিকট

আসিয়া বলিল—তোমরা যাচ্ছ যাও, আমি
এটো বাড়ীতেই তোমাদের অপেক্ষা করে
বসে থাকব, যেদিন ইচ্ছে হবে ফিরে
এস।—ফিরে তোমাদের আদতেই হবে।
বিপিন, তোমার আর আমার অপরাধের
প্রায়শ্চিত্ত তোমাকেই করতে হবে।

শেষের কথাটা নবকিশোর আর দিবা
বলিল। মালতী ও বিপিন আড়ুটে দাঁড়া
বসিয়া রহিল, নবকিশোরের দিকে কেহই
চাহিল না; তাহার পরম্পরের দিকেও
চাহিতে পারিতেছিল না। উভয়ে মৃত
দৃষ্টিতে গাড়ীর জানালা দিয়া চতনে চুনিকে

রাড়ার চকল জনপ্রবাহের পল্লভে ক্রমশ
অপরিচয়মান অষ্টাদিকান্ত্রীর দিকে চাহিয়া
রহিল।
আর নবকিশোর দীন অপরাধীর মতো
কুণ্ঠিত পরাক্রান্ত শুষ্ক হইয়া সেই ক্রমশ
দূরগামী গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল,
তাহার হৃদয়ের সমস্ত বল তেজ দর্প
সাহস বিশ্বাস উৎসাহ যেন একেবারে এক
ধাক্কায় কুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ইহার
প্রায়শ্চিত্ত বিসেস কেমন করিয়া হইবে
তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না।

ক্রমশ

চাক বন্দোপাধার।

কবর-ই-নূরজাহান

“বন্ধু মাঝারে যা পরীবা তঃ চেহাণে তঃ ভলে।

তঃ পরে পরমানা হুজু তঃ কতাবে নুসুলে।”

আজকে তোমার দেহেতে এলাম অগৎ-আলো নূরজাহান !
সন্ধ্যা রাতের অন্ধকার অজ্ঞ জোনাক পোকার স্পন্দমান।
বাংলা থেকে দেহেতে এলাম মরুভূমির গোলাপ ফুল,
ইরান দেশের শকুন্তলা ! কট সে তোমার রূপ অতুল ?
পাষণ-কবর-বোরকা খোলো দেখব তোমার হৃদয় !
দাঁড়াও শোভার ঐকান্তী ভূমি-বিদ্যর রূপ ধরি।
অগৎ-জ্যেষ্ঠা জাহাঙ্গীরের অগৎ আজি অন্ধকার,
আগ ভূমি জাহান-নূরী আলোর ভর দিক আবার,
কর গো হতভী ধরার রূপের পূজা প্রবর্তন—
কত বৃগ্গ আর চলবে অলৌক পরীর রূপের শব-সাধন ?
আগাও তোমার রূপের শিখা, মরে মরুক পতঙ্গ,
প্রতিম মূর্তিতে জাগ, অজ লজ্জক অমঙ্গ।

রূপের গোলাপ রোজ কোটে না বুলবুলে তা জানেনগো,
 গোলাপ ঘিয়ে পরম্পরে তাই তারা ঠোঁট'হানে গো ;—
 বুঝে রূপায় তরে মাহুব কুহছে কত চকুতি,
 রূপের তরে হানাহানি, তার চেয়ে কি বড় রীতি ?
 খনির'সোনা নিত্য মেলে হাট বাজারের দুইধারে,
 রূপের সোনা রোজ আসে না, যেতে না সে পোকারে ।

•

রূপের আদর জান্ত সেলিম, রূপ-দেবতার মান্ত সে ;
 সোনার চেয়ে সোনামুখের চেয়ে বেশী দাম জান্ত সে ;
 বিপুল ভারতভূমির সোনা সঞ্চিত তার ভাণ্ডারে
 ওবুও কেন স্তবল না মন ? হার তুখিত চায় কারে ?
 তোমার সোনামুখটি 'ররি' পাগল-সমতুল্য সে,
 রূপের ছটার ঝললেছে চোখ পুণ্য পাতক ভুলল সে,—
 রক্ত-সাগর সাঁৎরে এসে দখল পেল পদ্মটির
 রূপের পাগল, রূপের মাতাল, রূপের কবি জাহাঙ্গীর ।—
 টাঁকশালে সে বহু দিন তোমার পেয়ে পূর্বকাম
 "টাকার লেখ জাহাঙ্গীরের সন্কেতে নুরজাহাঁর নাম ।"
 মোহরে নাম উঠল তোমার, লেখা হল তার স্নোকে,
 "সোনার হ'ল দাম শতগুণ নুরজাহানের নাম যোগে ।"

•

•

দকভূমির শুক বুকে অয়েছিলে হুলতান !
 গরীব বাপের গরব-মণি সাপের ফণা আতান ।
 তোমার ফেলে আসছিল সব, আস্তে ফেলে পারল কই ?
 দৈন্ত দশার নির্দয়তা, টিকল না ছ দণ্ড বই ।
 জরী হ'ল মায়ের অশ্রু, টলে গেল বাপের মন,
 ফেলে দিয়ে কুড়িয়ে নিল মেহের পুতুল বৃকের ধন ।
 দকভূমির মেহেরবানী ! তুমি মেহের-উম্মিসা ।
 তোমার ঘিরে তপ্ত বাপু'র বহন চির দিন নিশা !
 পথের প্রহ্মন । তোমার রূপে দুর্গিরতি আকৃষ্ট—
 ফেলে দেওয়া কুড়িয়ে নেওয়া এই তো তোমার অদৃষ্ট !

•

•

দিনে দিনে উঠিলে ফুটে পরীধানের জরীন জল !
 মলিন ক'রে রূপরাশীনের ফুটল তোমার রূপের সুল ।
 রূপে হ'লে অপারো আর নৃত্যগীতে ক্লিন্নো,
 যোজননোর সন্ন্যস্তী বী-শ্রীমতী স্মরণে,
 তীর ছোড়া আর খোড়ার চড়ার জুড়ি তোমার রইল না,
 এমন পুরুষ ছিল না যে মুরত বৃকে বইল না ।
 রূপের গুণের খ্যাতি তোমার ছাইল ক্রমে সব দিশা
 নারীকুলের স্বর্গ্য তুমি, তুমি মেঘের-উল্লাস !
 বাদশাহাদা দেখল তোমার—দেখল প্রথম নওরোজে,
 খুশী দিলে র পুনঃপোজে তার জীবন মরণ দুই যোজে ।
 থল হঠাৎ খোদা তোমার, সন্ন্যস্তা মূর্ণপানি
 একে গেল দ্বার বৃকে রূপরাশী গো রূপরাশী !
 বাদশাহাদা চাইল তোমার, বাদশা হ'লেন তার বানী ;
 শের আফগানের দিবি তুমি হ'লে অনিচ্ছার কাঁদি ।
 বাঘ মাঝে শের শুধু হাতে তোমার শাওয়ার হর্ষে গো
 বর্জমানের মাটি হ'ল রাঙা তোমার স্পর্শে গো ।

দিনের *রে দিন গেল টের ছ'টা ঋতুর সুল-বোনা,
 বাদশা-জাদা বাদশা হ'ল তোমার তবু তুলল না ;
 অজ্ঞানের দে বৈরা চির তুলল হঠাৎ বর্ষ-স্তা
 জুবে তেলে তলিমে গেল রূপের মোহের কী বজায় ।
 কুচক্ষে তার প্রাণ হামাগু সলল পাঠান মতা প্রাণ
 উদারচেতা সিংহ-জ্যেষ্ঠা সিংহ-তেজা শের আফগান ।
 সেলিমের হৃদ-হারের ছেলে সুবাদারীর তৃষ্ণাতে
 মারতে এসে পড়ল মারা শেরের অসি-সংঘাতে ।
 তেজস্বী শের স্বর্ণ্য কৃতব পাশাপাশি ঘুরায় আজ
 রাঢ়ের মাটি স্নাত্তিমে বিগুণ আগুছে জাহাঙ্গীরের শক্তি ।
 সকল লজ্জা ভূমিরে তবু জাগুছে নারী, তোমার জয় ।—
 সকল ধনের সার যে তুমি, রূপ সে তোমার ফুজ্জ নয় ।

পাকী এল "আগ্রা চল" শাহানশাহের অন্ধরে,
 কাছে গিয়ে দেখলে তফাৎ, আঘাত পেলে অন্ধরে ।

মহলে কই বাদ্শা এলেন ? মোনে বাবা সুইলে গো
 চোন্দ আমা বোরা পোরাকৈ রং-মহলে রইলে গো ।
 রেখ'মী পটে নজা এ'কে, পাড়ে ফুলের অলঙ্কার,
 বাদী নিরে বিক্রী ক'রে 'হ'ত তোমার দিন-ভজার ;
 সাধা-সিধা স্থতির কাপড় আপনি পরে থাকতে গো,
 চাকরাণীদের রাণির সাজে সাজিয়ে তুমি রাখতে গো ।
 স্পর্শে তোমার জুঁট-বুঁকেছেন শিলার শিলার ফুটল ফুল,
 রূপে গুণে ছাপিয়ে গেল রং-মহলের উভয় ফুল ।

* * * *

কথায় বলে মন না মতি,—পেলিমের মন ফিরল শেষ,—
 হঠাৎ তোমার কক্ষে এস, দেখল তোমার মলিন বেশ ;
 দেখল তোমার পুষ্প-কান্তি, দেখল কোন্‌তির পুত্র চোখ,
 ভুলে গেল খুনের আঁড়াল, ফুলল সে হৃদ-ভয়ের শোক ।
 বাদ্শা হুদান্ “এ বেশ কেন ? নিভের দানীর চাইতে ম্লান !”
 জবাব দিলে “আমার দানী—সান্নাই যেমন চাহ পরায় ।
 তোমার দানীর অঙ্গে খামিন্ ! তোমার খুঁটির মতন সাজ ।”
 বাদ্শা বলেন “সত্যি কথা, দিলে আমার উচিত লাজ,
 আর অবধি প্রধান বেগম তুমি মেহের ! জন্মেরী !
 চল আমার বাসমহলে মহল-আলো অঙ্গরী ।
 সিংচাসনে আসন তোমার, আর থেকে নাম নুরমহল,
 বাদ্শা তোমার গোলাম, জেনো, কবেছ তার দিল্‌ দখল ।”

* * * *

পাঁচ হাজারের এক এক মোতি, এম্‌নি হাজার মোতির হার
 বাদ্শা দিলেন কণ্ঠে তোমার লাভ লাগবের শোভার সার ।
 বাদ্শার উপর বাদ্শা হ'লে, বাদ্শা হ'লেন তোমার বশ
 অকুরান্ যে শক্তি তোমার, অগাধ তোমার মনের রস ।
 দরবারে বার দিলে তুমি রইলে মাকো পদাভে, *
 জাহাঙ্গীর সে রইল শুধু ব্যস্ত তোমার চর্চাতে ।
 পিতা তোমার মন্ত্রী হলেন, তুমি আগল শাহান্‌শা,
 সেনা-নারক তাইটি তোমার বোদ্ধ কবি আসফ জা ।
 দেশে আবার শান্তি এল ভারত জুড়ে মহোৎসব
 বাড়ল ফসল শির-ফুলল হ'ল ফিরে শিল্পী সব ।

নৃত্য কত শির প্রচার করলে ভারত মণ্ডিতে
 ফুলের আয়া আঁতর হ'ল অমর হ'ল ইন্দ্রে !
 তুমি গো সাত্ত্বিক্য লক্ষী কর্ণে লগা উৎসাহী
 জাহাঙ্গীরের পাত্রা নিয়ে করলে নারী বাঁধনহীনী ;
 নারীর প্রতাপ, প্রতিভা আর নারীর দেখে মহাবল
 দরবারী সব চটল মনে, উঠল জলে ওম্মাদল ;
 বাঁধন্যজ্ঞান ধূম্য এবং দশহাজারী মহর্ষি
 বিষম হ'ল বৈরী তোমার তবুও তুমি স্বর্গাবধ
 রইলে দীপ্ত, রইলে দৃষ্ট করলে নিরোধ সব হান
 ধী-জী-জী-জী হুজ মাথার জড়বতী জলুতানী !
 বাঁধন্য বধন নগর-বন্দী মহর্ষিতেম কন্দীতে
 চললে তুমি সিংহী সম চললে স্বয়ং রণ দিতে ;
 হাতীর গিঠে হাওরা এঁটে ঝিলায়-নদের তরঙ্গে
 ব্যাভা তুলে লড়তে এলে মাতলে তুমি কি রকম ;
 শত্রু ঘেরে করলে খালি তীরে-ভরা তিনটে জুগ,
 আঘাত পেয়ে কর্ণে কাঁধে যুগ্মে তবু চতুর্গণ ;
 দুঃখিনেরা উঁচু ডাঙায়, তুমি নদীর গর্ভে গো,
 তোমার হানায় অধীর তবু জাবছে কি যে করবে গো ;
 চঠাৎ বেঁকে বসল হাতী বিমূখ হ'ল অস্ত্র-সার
 ফিরলে তুমি বাধ্য হয়ে ক্ষুদ্র যোযের বহুগায় ।
 বন্ধী স্বামীর মোচন-ধেতু হ'লে এবার বন্দিনী
 মহর্ষিতেম মুঠা শিখিল করলে ইহাণ-নন্দিনী,
 জিতে তবু দারল শত্রু, করলে তুমি ফিতিয়াৎ
 তোমার অস্ত্র অঘোষ লগা, তোমার অস্ত্র সে নির্ঘাত ;
 ককীর-বেশে শত্রু গালাব, তোমার হল অর শেষে,—
 তোড়ে তোমার ঐরাবত ঐ মহর্ষিত-থা বার তেলে ।

আজ লাহোরের সহরতলীর কাঁটাবনের আবডালে
 লুপ্ত তোমার জপের লহর জললে আর জজালে,
 জীর্ণ তোমার সমাধি আজ, যীনায় বাহার ঘার ঘরি,
 আজকে তুমি নিরাত্মরূপ চিরদিনের জলধী !

চোখা তোমার স্বামীয় সমাধু-বস্ত্রে তোমার উজল ভার
 মল্লমলিছে শাহ-ডেরা রতন-মণির আল্পনার।
 গরীব বাগের গরীব ঘেরে তুমি আছে একগাটি, —
 সিংহাসনের শোভার নিধি পালাং তোমার আজ মাটি !
 শাহ-ডেরার হুগু মালিক জেগে তোমার ডাকছে না,
 তুমি যে তার নাটকো পাণে সে বোঁক সে আজ রাখছে না।
 হুগু সোমার হুতার গোনাই নাই সে গদি তোমার হার !
 আজকে তোমার বুক পাপর, মাথা পাপর, পাথর পাপর।
 বিশ্ববন্দী গতার বনে ঘুমাও মাটির বন্ধনে
 গোরা ! তোমার গোরের মাটি রূপের গোপীচন্দন এ।
 সোহাগী ! তোমার দেহের মাটি স্বামী-সোভাগ-সিন্দূর গো,
 জীর্ণ তোমার শ্রীহীন কবর বিশ্বনাথীর শ্রীচূর্ণ !

শিরে কি লিখন লেখা ! অপ্রভর করণ শোক
 এ যে তোমার দৈববাণী জাগার আগ্নেয় দাক্ষণ শোক
 হে হুগুতান ! লিপেছ এ কী আকস্মিক হুন্দরী !
 লিপেছ তুমি “গরীব আমি” পড়তে যে চোখ যায় ভারি।—
 “গরীব-গোরে দীপ জ্বল না হুগু দিহো না কেউ জ্বলে—
 শামা পোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না পায় বুলবুলে।”
 সতি তোমার কবরে আর দীপ জ্বল না, নূজাহান !
 সতি কাঁটার জ্বলে আজ পুন্ডলতার লুপ্তপ্রাণ।

- নিঃস্ব তুমি নিরাস্তরণ ধূসর ধূসির অক্বেতে,
 অবহেলার খহার তলার ডুগ্ধ কালের সম্বন্ধে।
 ডুগ্ধে তোমার অধিমাত্র—স্বতি তোমার ভুব্বে না,
 রূপের স্বর্গে চিরনূতন রূপটি তোমার ব্যর্থ চেনা।
 মেথায় তোমার নাম ঘিরে হুগু উঠছে হুটে লক্ষদাট,
 বচুরাগের চেরাগ বস্ত উজল অঁলে বিরাম নাট,
 চিত্ত-বোঁকে তোমার পুতা—পুছা সকল যুগ ভারি’
 মোগল-বৃগের তিলোত্তমা ! চিরযুগের হুন্দরী !

ঐশতোম্মনাথ দত্ত।

ওবেলায়

(গল্প)

এবার দাঙিলিতে এসে এই কাহিনীটি
জন্মলুম।

অনেক দিনের কথা। ভুটিয়া-বস্ত্রীতে
এক ইংবেজ পাড়ী বাসা বেধেছিলেন।
ভুটিয়ারা সবাই তাঁকে লক্ষ্য ভাষণে আসত—
বিশেষ করে ভুটিয়া-শিল্পগণ।

বিশদ-আপদে এই পাড়ীসাহেব ভুটিয়াদের
বল ভরসা সবই। কারুর অগ্রহ কহলে
বুক দিয়ে পড়ে তিনি সেবা করতেন,
—তাঁকে ডাকতে হত না। এমন তাঁর
যত্ন যে আপনাদের জনের যত্ন তাঁর কাছে
হার মেনে যেত।

পাড়ীসাহেবের নিজেসব কোনো সুখস্বাস
ছিল না। ভুটিয়াদের নিয়েই তাঁর সংসার।
তাঁদের ভালোমন্দ নিয়েই তাঁর ভাবনাচিন্তা।
ভুটিয়া-পাড়ার বেখানে মা-একু বটত পাড়ী
সাতেরেবের অকানা থাকত না, এবং ছোটো-
বড় যেরকম অহুষ্ঠানই হোক না তাঁর
মধ্যে তাঁর হাত, তাঁর পরামর্শ থাকতই
থাকত। কোথাও বিবাদ বাধলে সকলের
আগে তাঁরই ডাক পড়ত এবং বিবাদের
মিলন-স্বস্তি বাধা হবার সময়ও তাঁকে
বাগ দেওয়া চলত না।

ভুটিয়া-শিল্পগণ যেন তাঁর প্রাণ ছিল।
তাঁদের বুক করে, কোলে করে, গিঠে
করে, কাঁধে চাপিয়ে, মাথার বসিয়ে, চট্টকে,
টিপে, কানিয়ে, হাগিয়ে তাঁর মনের আশ
যেন মিটত না। তাঁর কাছে জন্মের

কুৎসিত ছিল না—ছেলে হলেই হল।
রাস্তার উপর থেকে ধূলাকাপা-মাথা ছেলে
অবলীলাক্রমে তিনি বুকে তুলে নিয়ে চুষ
পেতেন, মনে কোনো ঘৃণা হত না।
অনেক সময় নিজের হাতে তাঁদের গায়ের
ময়লা পরিষ্কার করে দিতেন। তাতে তাঁর
আনন্দই ছিল। ছেলেমাও তাঁর ভারি
জাঙটা। দেখবাবাজি ছেলের পাল তাঁকে
ঘিরে দাঁড়াই—কেউ লাফিয়ে বুক উঠত,
কেউ কাঁধে উঠত, কেউ চুহাত দিয়ে তাঁর
পা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকত।

ভুটিয়াদের মাগ্রহ করে তোলবার অস্ত্রে
তাঁর মনে অনেক-কিছু সংকল্প ছিল। কিন্তু
নিজের সামর্থ্য ও সংস্থান তেমন ছিল না
বলে বেশী কিছু বয়ে উঠতে পারেন নি।
যা করতে পেরেছিলেন সে একটি ঝুল।
ঝুলটিও যে রীতিমত বাড়ি-তুলে তৈরি
করতে পেরেছিলেন তা নয়,—ঝুলের জন্ত
নিজের দলবার ঘরটি ছেড়ে দিয়েছিলেন
মাত্র। তাইতেই ঝুল চলত,—পাড়ার সব
ছেলে সেখানে একত্র হত। একসঙ্গে
সবাইকে তিনি পেতেন—এতে তাঁর ভারি
আনন্দ ছিল। সেখানে পড়াশুনা যত না
হত, খেলাধুলা তাঁর চেয়ে ঢের বেশী হত,
সেই জন্ত ছেলেরা সে জায়গাটা ছাড়তে
চাইত না।

এই ঝুলে আর-একটি ব্যাপার হত, সে
মানামকম উৎসবের অনুষ্ঠান। এই সব

উৎসবে আলো জালিয়ে, সূর্য ছড়িয়ে, নিশান উড়িয়ে, বাঁশ বাজিয়ে যে ঘটটা হত তার বেশ অনেক দিন পর্যন্ত ছেলেদের মনের মধ্যে বাজতে থাকত। কিন্তু সব চেয়ে জমত বড়-দিনের উৎসবটি। সে সময় খাওয়া-পাওয়া আর সব আয়োজ্য ভোজ্য থাকতই তার উপর লাভ হত নানা রকমের, নানা রঙিন খেলনা। এই খেলনাগুলি পুরা-আকারে না হোক, টুকরো টুকরো হয়েও সারা-বছর দিনরাত ছেলেদের হাতে হাতে ঘুরত।

(২)

সে বৎসর উৎসবের দিন ভোর না হতেই ছেলেরা পাত্রীসাহেবের দরজা ঠেলেতে আরম্ভ করেছে। পাত্রীসাহেব কিছুতেই তাদের ঘরে ঢুকতে দেবেন না। তিনি ঘরের ভিতর থেকে চীৎকার করে বলছেন—“ওরে, এখন না! এখন তোরা যা! ওবেলা আসিস।” কিন্তু সে কথা কান দেয় কে? শেষে তারা সকলে মিলে এমন ঠেলাঠেলি আরম্ভ করলে যে দরজা বৃষ্টি ভেঙে পড়ে।

পাত্রীসাহেব দেখলেন, ভালো-মুখে বললে হবে না। তখন তিনি ধমক দিয়ে উঠলেন। ছেলেরা প্রথমটা হতভয় হয়ে গেল—তার পর কেউ ছলছল-চোখে, কেউ কাঁদো-কাঁদো মুখে—ককণ বৃষ্টিতে পাত্রী সাহেবের দিকে চাইতে চাইতে ধীরে ধীরে চলে গেল।

আর কোনো বাধা ছিল না। আজকের উৎসবের জন্য তাঁর ঘরটি তিনি নতুন রকম করে সাজাচ্ছিলেন; মতলব ছিল

এখন কারো কাছে নীচ করবেন না, সন্ধ্যার অন্ধকারে ছেলেদের একপাশে ডাক লাগিয়ে দেখেন। সেই জন্য এবারকার উৎসব সকাল থেকে আরম্ভ না হয়ে সন্ধ্যাবেলা হবার আয়োজন হয়েছিল। তৈরিকরা গাছ দিয়ে, লতাপাতাফুল দিয়ে, ঝরণা দিয়ে ঘরের মধ্যে এমন একটি বাগান গড়ে তুলছিলেন যে দেখলেই যেন ছেলেদের মনে হয়—এ কী! এ যে বর্ণের নন্দন কানন! দিনের আলোর এর মুক্তি তেমন হুটেবে না; সেই জন্য সন্ধ্যাবেলাকার কাপসা আলোর অপেক্ষায় ছিলেন। এখন ছেলেদের ঘরে ঢুকতে দিলে এর মোহিনী মায়া নষ্ট হবে যাবে সেই জন্য বাধ্য হয়ে তাদের ডাকিয়ে দিয়েছিলেন। এর মধ্যে তাঁর মনে কিন্তু একটি তাঁক বেগনা বিঁধে রয়ে গেল।

দ্বিতীয় দিন তিনি ঘর সাজাতে ব্যস্ত। জানলার ফাঁক দিয়ে এক একবার তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন—ছেলেগুলো আশেপাশে ঘানমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে; আজ তারা কোনো খেলাতেই মন দিতে পারছে না। আজ যেন তারা পথের কাঙাল—আশ্রয় নেই, আশ্রয় নেই, তাদের জীবনের ক্ষুধিই যেন উবে গেছে—এমনি তাদের মুখের ভাব।

পাত্রীসাহেব জানালা দিয়ে ঘন ঘন আকাশের দিকে চাচ্ছিলেন—কখন বিনের আলো একটু স্নান হয়ে আসে।

বিকেল বখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় তিনি ঘর থেকে একবার বেরিয়ে এলেন ছেলেদের বলতে—ভালো কাপড়-চোপড় পোরে উৎসবের জন্য তারা তৈরি হয়ে

আজ্ঞক। কিন্তু বাইরে এসে দেখলেন, কেউ কোথাও নেই। ভাবলেন, বলবার আঁশ তারা অপেক্ষা রাখেনি, নিজেরাই গেছে। * * *

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে আকাশে মেঘ ঘনিঘে এল। দূর সন্ধ্যাকে হঠাৎ একটা কালো পর্দা দিয়ে কে ঘন মুড়ে ফেলল। জোর বাতাস বইতে লাগল, বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি নামল।

পাত্ৰীসাহেব একলাটি ঘরের মধ্যে বসে বসে ভাবছিলেন—কখন ছেলেরা আসে! বৃষ্টির বেগ কমেই বাড়ছিল, ঝড়ের গর্জন ভীষণ হয়ে উঠছিল! এই ঝড়বৃষ্টি ঠেলে ছেলেরা কেমন করে আসবে তাঁর একটা দুর্ভাবনা হচ্ছিল বটে কিন্তু মনে এ আশাও হচ্ছিল যে বৃষ্টি হয় ত শীঘ্রই থেমে যাবে, এবং ছেলেরা আজকের এই উৎসব থেকে কিছুতেই বাদ পড়তে চাইবে না। * * *

ঘন ধারার বৃষ্টি পড়ছে—উদ্ভ্রান্ত গর্জনে সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়ে দিয়ে ঝড় ছুটোছুটি করছে—বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। প্রাণীদের মান আলোর পাত্ৰীসাহেব ঘরের মধ্যে একা। ছেলেরা কৈ? ছেলেরা কৈ? উৎসবের আনন্দগুলি কৈ?—তাঁর প্রাণের মধ্যে থেকে কেবলই এই ব্যাকুল প্রশ্ন উঠছে। এত সাঙলজা সবই নীরস হয়ে শুকিয়ে উঠল যে! তার হয়ে বৃকে চেপে বসেছে যে। ঝড় বহে চলেছে—তার পিছে পিছে সমরও বহে চলেছে,—কিন্তু অতিথি কৈ? অতিথি কৈ? উৎসবের আলোর শিখাগুলি যে এখনো জ্বল না।

আজকের এত আয়োজন যে বার্থ হয়ে যায়!

একটি ব্যাকুল বেদনা পাত্ৰী সাহেবের প্রাণটিকে কাঁদিয়ে তুলতে লাগল। তাঁর কেবলই মনে পড়তে লাগল—ছেলেদের সেই স্নান সুখগুলি! মনে হচ্ছিল, আজ তিনি যে আঘাত তাদের দিয়েছেন সেই আঘাত ফিরে ফিরে তাঁর বৃকে এসে বাজছে। * * *

ঝড় করে একটা শব্দ ঘরে সমস্ত পৃথিবী ঘেন হঠাৎ হুদ হুদ হয়ে গেল। বাতাস আর বইছে না, বৃষ্টিধারা আর নেই।

পাত্ৰীসাহেবের মন আশ্বাসিত হয়ে উঠল—এইবার ছেলেরা আসবে। তিনি উদ্ভ্রান্ত প্রতীক্ষার বসে রইলেন। এতক্ষণে তারা বাতী থেকে বেরিয়েছে!—এতক্ষণে তারা মাঝপথে!—ঐ বৃষ্টি এল। তিনি উঠে গিয়ে দরজার কাছে গাড়ালেন। কিন্তু কৈ? কেউ তো আসেনি।

গাড়িয়ে গাড়িয়ে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। ক্ষুদ্র মুহূর্তগুলি ভীষণ হয়ে তাঁর ব্যাকুল মনকে আরো ব্যাকুল করে তুলতে লাগল। সমর তো বহে যায়—তবু তো তারা আসে না! তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে বেগে উঠল—তারা অভিমুখ ভরে চলে গেছে, বাবা পেয়ে চলে গেছে; আর কিরে আসবে না—ফিরে আসবে না। * * *

হঠাৎ একটা দম্কা হাওয়া তাঁর ঘরের হুখানা দরজা ধরে সন্ধ্যারে একবার নাড়া দিয়ে চলে গেল। ঘরের উপরকার টিলের চাপখানা একবার কন্ডক্ন করে উঠল,

দেয়ালের গা থেকে ফুলের মালাগুলো খসে খসে পড়তে লাগল। দরজা-জানলার ফাঁক দিয়ে কেমন-একটা শির্শিরে বাতাস এসে তাঁর সমস্ত শরীরটাকে শিউরে দিতে লাগল। * * *

হঠাৎ ঘরের বাইরে মুহূর্ণ পায়ের লব্ধ, * অফুট কলধ্বনি শোনা গেল। মনে হল, কারা যেন ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে, টিপে টিপে পা ফেগছে। কিন্তু ঘরের ভিতর কেউ আসছে না। এ নিশ্চয় তাদের অভিমান— অভিমানের মৌরব তিরস্কার!

পাত্রীসাহেব উঠে গিয়ে দরজা খুলে হাত ধরে তাদের আনতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দরজা আর খুলতে হল না। ঝড়ের আপটে দরজা আপনি খুলে গেল। কে যেন হুহু শব্দে ঘরের মধ্যে ছুটে এল—আলো নিবিয়ে, কুল ছিঁড়ে, সমস্ত সাজসজ্জা একেবারে ওলটপালট করে বিরে তাতব নৃত্যে মেতে উঠল।

পাত্রীসাহেব অনেক চেষ্টা করলেন, ব্যতি আর জলল না; যেন কার ভীত ফুৎকারে বার বার নিবে যেতে লাগল। বাইরে তখনো চাপা গলার মুহূর্ণ গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। পাত্রী সাহেব হেহের স্বরে ডাকলেন—“ওরে তোরা আর! আর দেয়ী করিস্ নে!”

একদল ছেলে ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করল। তাদের কারো মুখে একটি কথা নেই—এতটুকু হাসি নেই!

পাত্রী মনে মনে বললেন—এ প্রতিবন্ধে আরই যুঁচবে—বোলে! আগে দেখাবা বাবু করি। তিনি অন্ধকারের মধ্যে হাওয়াইয়া ছেলেদের জত পেলনা বার করতে লাগলেন—

—এই নে তোর বাঁশি!
—এই নে তোর কাহুস!
—এই নে তোর কলের গাড়ি!
—এই নে তোর বিবি-পুতুল!
—এই নে—

কিন্তু এ কি! সমস্ত খেলনা মাটিতে গড়াগড়ি বে! কেউ যে তাঁর উপহার নেয় নি! তিনি সমস্ত উপহার উদ্ধাড় করে ফেললেন, ঠৈ কারো মুখে তো হাসি ফুটে উঠল না! তিনি লকলকার দিকে চেয়ে দেখলেন—এখনও সেই স্নান মুখ, সেই ছলছল চোপ!

—ওরে তাদের এ কী দুর্জয় অভিমান।

* * * *

পাত্রীসাহেব গভীর স্বপ্নে বাস হয়ে দেখলেন ভুটিয়া-বস্তীর একটা অংশ—বেথানে ছেলেরা থাকত সেখানটার একটা গভীর গহ্বর বৈতোর মতো হাঁ করে আকাশের দিকে চেয়ে পড়ে আছে—বাড়ি বর দুগার সমস্ত কোন্ অতলে ধ্বংস চলে গেছে।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

ককরের অহঙ্কার

(বক্তা বোদ কব্বা)

বক্তা বোদ কব্বা—

শ্রীমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দর্শনে আমার দর্শন পাণ্ডনা বলিয়া আমার প্রতি আক্ষেপ করিবার কোন কারণ নাই। কেননা, কণাদ কপিলা আমাকে শীর্ষে স্থান দিয়াছেন, আমাকে এসম করিবার ক্ষমতা হারহরকার .গোতম অকপাদ আখ্যা ও বেদান্তহরকার বাদরায়ে কৃষ্ণপারদ আখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মহরির ভাষাকার 'শঙ্করঃ শঙ্করঃ ব্রহ্ম' আমাকে অঙ্ক ধারণ করিয়াছেন, তাই প্রকৃততত্ত্ব তাহার নিকটে কামলতত্ত্বও প্রতীতমান। চার্লসের আনিই বাক ফুটাইয়াছি। তিনিও লোকান্তরদর্শনে মীল প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অবলম্বন করিয়া আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। শারীরিকতত্ত্ব ও বৈশেষিকদর্শনে আমি আছি; সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরব্রহ্মের কামিকার আমি 'আদ্যবস্ত্রে চ' রহিয়াছি। সাংখ্যতত্ত্বকোমুদী ও কুমুদাঙ্গলি আমার কৃতিত্বের নিদর্শন। ইংরাজী ও বাংলায় কোমত কোমত কব্বা কব্বা প্রভৃতি বহু রকমেই তাহারিগের কব্বাও গুরুর নাম বিস্তৃত করুন, আমাকে এড়াইতে পারিবেন না। ক্যান্ট, ফিফ্টে, হুজিন, ডেকার্ট, লক, বার্কলে, মাকল, প্রভৃতি বৈশেষিক দার্শনিকও আমার অধিকারভুক্ত।

আধ্যাত্মিক আধৈবিক আধকোডিকে,

অবিকৃতি মূলপ্রকৃতিতে, প্রকৃতিবিকৃতিতে, কণিকবাসে, অধিকরণে, অহঙ্কারে, আধৌক্ষিকী বা তর্কবিজ্ঞান প্রাথমিক কলকলিতে, কালী-শঙ্করীতে, অবচ্ছেদকে, পূর্ণপক্ষে, কাকাকি-গোলক-প্রাথমিক, দুটিকটাকপ্রাথমিক, গতা-গতিকপ্রাথমিক, কাকালীপ্রাথমিক আমি, আমার কৃত্তক রেক পুরক প্রভৃতি বোধ্যপ্রাথমিক ক্রিয়াও আমি। নবদ্বীপের প্রাথমিক রচনাও আমারই কটাক কণাকট্টে পরিণত। জরম্মোদ্যমকে আমি, আমার শঙ্কর তর্কবাগীশ, কালিদাস বিজ্ঞানতত্ত্ব, কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, কুমুদাস বেদান্তবাগীশ, কালীপ্রাথমিক বেদান্তবাগীশ, কুমুদাস প্রাথমিক কৈলাসপ্রাথমিক, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, প্রভৃতি নৈমিত্তিক বৈদান্তিক আমার অধিকারভুক্ত। এতদ্বির বহু তর্কবাগীশ, তর্ককানন, তর্কালঙ্কার, তর্কভূষণ, তর্কচূড়। তর্করত্ন, তর্কতীর্থ আমার পায়ে গড়াগড়ি বান।

শঙ্কাকল্পব্যাকরণও আমি মুর্ত্তিমাম্। আমার আমার বাহ্যে অধিধামের নাম হইয়াছে কোব। কলাপ-কাত্ত্রে, সিদ্ধান্ত-কোমুদীতে, কামিকার, সংক্ষিপ্তপ্রাথমিক, কবি-কল্পক্রে, শঙ্করপ্রাথমিক, প্রকৃত-প্রকাশে, এমন কি, ব্যাকরণকোমুদী ও উপক্রমণিকাও, কোবাম আমি নাই। আমিই হরির সহিত বাস্তবিক গোপ করিয়া

দিয়াছি, কাতারন-কৈরট-ক্রমদীপের মাথা
চড়িয়াছি, ভট্টোজিনীকিতবে দীক্ষিত
করিয়াছি, সংস্কৃত রোষক ঐকি প্রভৃতি
ক্রাসিকাল ভাষা গড়িয়াছি। সকল অক্ষরে,
বিশেষ করিয়া যুক্তাক্ষরে, আমিই অড়াইয়া
আছি, কঠাবর্ণের উচ্চারণকালে বর্ধ ও
অমুনাদিক বর্ণের উচ্চারণকালে নাদিকা
আমিই চাপিয়া আছি।

কর্তৃকর্মক্রিয়ায়ক বাক্যে, প্রাপ্তিপদকে,
প্রকৃতিতে, বিভক্তিতে, কৃতপ্রত্যয়ে, কৃত-
প্রত্যয়ে, কর্তৃবাচ্য কর্মবাচ্য কর্মকর্তৃবাচ্যে
(কেবল ভাববাচ্যে আমার অভাব) আমি।
কোন পুরুষে আমি নাই, কিন্তু স্ত্রীবর্ণিণে
আছি। কামকে আমি, একবচনেও আমি
আছি। জ্যাদিগণে আমি, জিন্নার
কালবোধক বিভক্তিতে আমি। কর্মধারয়ে,
একশেষবন্ধে, অলুক সমাসে, শাকপাখিবা-
মিহাং সমাসে, আমি। বিকল্পবিধানে
আমি। আমারই যুগ্মরকার ভক্ত 'তি',
'ত', 'তৎ' 'জি' 'জ' 'কনত'
সংজ্ঞালাভ করিয়াছে; 'গণবৃক্যোরভাংনং'
কিপ্‌প্রত্যয় ও ইওপদ্যজ্ঞাপ্তিকিরঃ কঃ
আমারই অরজরকার। স্বার্থে কন, সমাসাশ্র
ক, এবং যিক ও নক প্রত্যয়--
এই চারিটা অঙ্গে সকল শব্দকে কৃত্রিম
উপারে স্বকীর অধিকারে আনিবার জন্ত
ক্রুরকর্মী আমিই কোণল প্রবেশ করিয়াছি,
তাঁহা কখন লক্ষ্য করিয়াছে কি?

তুধু নীরস দর্শন-ব্যাকরণে কেন, সরস
ভাব্যেও আমি প্রকাশমান। 'বাক্যং
রশাযকং কব্যং' ইতি লক্ষণেই আমি বার
বার তিনবার তাঁহা স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

অলঙ্কারেও আমার অহংকার প্রস্টে। কব্য-
প্রকাশ কব্যাবর্ণ্য কর্তৃত্তরণ প্রজ্ঞালোক
চম্পাশোকে তাঁহা দেখিতে পাইতেছ নাকি?
কাকু আমারই বরবিকাশ, লক্ষণ আমারই
কল্পনা, অধিকাকৃত্তবশিষ্ট আমারই অধিকার।
অগাচকতা প্রতিকটুতা চূড়ান্তসংকৃতি প্রভৃতি
দোষেও আমি ঢাকা পড়ি না। বমক
রূপক দীপক বাতিলেক, উৎপ্রেক্ষা কব্য-
শিঙ্গ পরিবর, সহোক্তি অতিশয়োক্তি
বভাবোক্তি সমানোক্তি বিশেষোক্তি, সমস্তই
আমার শক্তির বিকাশ। আমার ছন্দঃশাস্ত্র
যুগ্মরকারের আমাকে দেখিতে পাইবে।
শ্লোক যুগ্মক বিশেষক কলাপক কুলক
সকলই আমার কোণল। তোটক তুণক
দোষকে আমিই পদান্তে আছি, পজটকার
আমিই ঝটকা উৎপাদন করিয়াছি, বসন্ত-
তিলকে আমিই তিলক পরাইয়াছি, পথ্যা-
নক্তের নক্তে আমিই শোভা পাইতেছি,
শার্দূলবিজীড়িতের জোড়ে আমিই জীড়ি
করিতেছি। আমারই ককবার মলাক্রান্ত
শোক 'ভারাদগসগমন'।

শতক, শতশ্লোকী, কোবকাণা, কণা,
আখ্যায়িকা, প্রােহলিকা, নাটক জোটক
রূপক প্রকরণ, সব আমারই প্রকারভেদ।
ভূমিকা বিকৃত্তক প্রবেশক প্রবর্তক কথোদঘাে
আমাকে পাইবে, অঙ্ক গর্ত্তকে আমাকে
পাইবে, 'আকাশে' 'জনাত্তিকে' 'কর্ণে'
'নেপথ্যে মহান্ কলকলে' আমাকে পাইবে,
আবার গটক্ষেপণেও আমাকে পাইবে।
বিদূষক, পারিপার্শ্বিক, ককুকা, পরিব্রাজিকা,
শকার, নাগক নারিকা, বকীয়া
পক্ষীয়া, অভিসারিকা স্বাধীনভর্তৃকা কল-

হাস্যিতা, কষ্টাঘাতোৎপত্তা সলজ্জা নব-
যৌবনা—কেহই আমাচড়া নহেন। সাংখ্যিক
ভাবে, কামজ দশকগণে, স্তোকবাক্যে, ক্লেশক-
কোপে, ক্লেশকলগে, আমি লাগিয়াই আছি।

ভক্তাসম্পৃক্ত বক্তৃতাের মধ্যে মুখস্তের
মিষ্ট বা মধুর না থাকিবা। কটুভিত্তিকভাবে
থাকি, তাই সেই কহুর কাটাইবার জন্য
আমি কবাসম্পৃক্ত নববসের মধ্যে কল্পনাসে
থাকিবা তাহাকে মধুর করিয়াছি। Our
sweetest songs are those that
tell of saddest thought—ইংরাজ
কবির এট নাক্য আমার কথার পোষক।
পক্ষান্তরে আমি ভরানকরসেও রহিয়াছি।

বাস্তবিক বা রহস্যকর আদিকবি
আমারই মহিমার। তাই ক্রোড়বন্দননে
কবির বক্তৃতা হইতে প্রথম শ্লোকের অভি-
বাস্তি, শ্লোকবন্দনগত বঙ্গ শোকঃ। নিজ-
মাদিত্যের সভাকবি কালিদাস নিজ নাদের
আভাসে আমার মান রূপিতাছেন, আর
আমিও তাঁহাকে কবিশ্রেষ্ঠ করিয়াছি।
কথার বলে, বাক্যে রাগ সেই রাগে।
আমারই ঘোটকভার নীলকণ্ঠসদৃশ আত্মকণী-
পুষ্ট ত্রীকণ্ঠকবি কল্পনাসে কৃতী। ধানক
আমারই কল্যাণে কাব্যবিজয়ে কাঞ্চনলাভ
করিয়াছিলেন। শূন্যক মুদ্রকটিককার
আমারই কোশলে। কবিস্বর্ণপুর আমার
কুণার ভরপুর। কৃষ্ণকর্ণামৃত, চমৎকার-
চেন্দ্রিকা, চৈক্যচন্দ্রিকা আমারই বর্ষে
বৈষ্ণবের কর্ণে অমৃতস্রবণ করে।

রামায়ণের কাণ্ডট আমারই লইয়া—
লঙ্কাবাসে কিংকর্য্যবাসে আমার কিচ্ছিত্তি
কমিতে পাও না কি? ত্রিশঙ্ক, ইক্ষাকু, ককুৎস,

জনক, কুশধ্বজ, কেকয়, কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন প্রভৃতি
কপ্তির নৃপগণে, তাত্ত্বিক নিকষ কালনেমি
কৃষ্ণকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষস-রাক্ষসীতে, কপি-
কটকে, শুভকে, বিন্ধ্যাক্ষরীতে, জঙ্ঘকে,
অভিষেকে, বণ্ডকারণে, কিংকর্য্য, লঙ্কা,
অশোকনগে, কোথায় আমি নাই? বিশেষতঃ,
কুকার কুমন্ত্রণাচ, কেকরীর জুনভার, কোশল্যার
জন্দনে, জানকীর অশোকনগে বাসন্ত্যে ও
অন্যকলগ-কথার, লক্ষ্মণের পতিপেলে,
কুশল্যের রামকথাকীর্তনে, আমার কৃতিত্ব।
আমারই জন্য লক্ষ্মণ শোভারের আদর্শ,
কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন শৌর্য্যবীর্য্যের আদর্শ
(কৃষ্ণকর্ণও কম কি?)

মহাভারত-কার কৃষ্ণাষ্টপাঠনে আমি,
টীকাকার নীলকণ্ঠও আমি। কৃষ্ণকর্ণে,
কশিধ্বজরথে, অকৌহিলী সেনামধ্যে আমি
বিরাজ করিতেছি। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণার কথার,
তক্ষক-পানীকৃতকথার, কোরবের জুনভার,
লক্ষ্মণের কণ্ট অক্ষকৌড়ার, কৃষ্ণদত্ত কক্ষক
রক্তপানে, ত্রীকর্ণের রক্তজ্বারগে, কর্ণের
কবচকুলদানে, ও অভিষেককার্য্যে বৃষককু-
ন্থে আমি (‘করাত্তে কাট্টুনে পুত্রে না
হবে কাঠর’)। কুন্তী, কর্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণা,
কৃষ্ণাচাণা, কৃতবর্ষা, লক্ষ্মণ, কোরব, কীটক,
বকরাঙ্গল, ঘটোৎকচ সকলেই আমার
অধিকারভুক্ত। আমার আমার সন্তোষের
জন্ত শ্রোণী কৃষ্ণা, মুখিষ্টর বক, ভীষ্মের
কৃষ্ণদত্ত, অর্জুন কীরীট।

কালিদাসকৃত শকুন্তলা, কুমারসম্ভব,
বিজয়োৎসব, মালবিকাগ্নিমিত্র আমারই
প্রভাবে শ্রেষ্ঠ কাব্য। আমার অত্যাশ্রিত
রঘুবংশ ‘রঘুরাশি কাব্যে রঘুরাশি চ পাঠ্যে’

বলিয়া দিক্‌ত। পক্ষান্তরে, আমি মেঘদূতে
নাই বলিবার ঘো নাই, কবি ‘কশিৎকাত্তা’
বলিয়া কাব্য আরম্ভ করিয়া আশুরই
মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন; ‘বক্ষ্যন্তেকে জনক-
ভনয়ান্নানপুণ্যাদেকমু’ ইত্যাদিও আমায়ই
‘চক্রান্তে; পরন্তু অলকা হইতে কুবের-
কর্তৃক বহিষ্কৃত কুবেরকিন্ধর বক্ষের বিমহ-
কাহিনীতে আমি বহুস্থলে স্বত্ব—‘কামার্তী
হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাতোভেনমু’ প্রকৃতি
বাক্যই তাহার সাক্ষ্য। ‘অমরিত্তা চমৎকারা
কাতরে কবিতা কৃতঃ’ কালিদাস-সম্পর্কে
এই কিংবদন্তীতেও আমি প্রকৃষ্টরূপে
পরিচিত। ‘একেহতুং নলিনাং’ প্রকৃতি
কর্ণটরাজপ্রিয়ম কাণ্ডেও আমি প্রকট।

কালিদাসের ষণ্ডকাব্যের অঙ্করণ
পদাঙ্কদূত আমার পদাঙ্ক দেখিতে পাও না
কি? আমি কিরাতাজুর্নীরে আচি, শিত-
লালবধে না থাকিলেও কোলাচল-মলিনাথ-
হরির সর্ষৎকা টীকার আছি।
নাটকের মধ্যে আমি বিশেষভাবে মহানাটক
মৃচ্ছকটিক চণ্ডকৌশিক মুদ্রারাক্ষস অবিমারক
প্রিয়দর্শিকার শেষ রক্ষা করিয়াছি। ইহা
ছাড়া কামদকী কপালকুণ্ডলা মকরন্দ মদরস্বিকা
মাণবিকা বহুলাবলিকা নিপুণিকা কুরঙ্গী
চণ্ডিকা রাক্ষস প্রকৃতি বহু নাটকীয় পাত্রপাত্রী
আমার বস্ত্রতা স্বীকার করেন।

গুণকাব্যে কাদম্বরী আমার প্রধান কীর্ত্তি।
শুধু নারিকা কাদম্বরী কেন, শূরক শুকনাস
কপিলঙ্গ ইহার সাক্ষী। আর চণ্ডাল-
দারিকা ও তাৎখলকরত্নবাহিনীর কথা তুলিব
কি? দণ্ডুমারচরিতে, ব্যাট্রিংপুস্তলিকার
আমি বিশদ্রাজ করিতেছি। কথাসিংসাগরে,

বৃহৎকথাও, কামদকীর নীতিদ্বারে, কোটলা
হুত্রে, চাঁপকান্নোকে, আমার সাক্ষ্য পাইবে।
পঞ্চতন্ত্রকে কাকোপকীরে, কাককূর্ণকথাও,
মুখিককপোতকথাও, কসটক-দমনক-কথাও,
কল্যাণকটকে, শক্তশরণে, কয়ালকেশর
কপূরপট কাটকুট বীণাকর্ণ প্রকৃতি রকবারি
নামে, ‘কথমেতৎ’ ও ‘কশ্মিন্শ্চিৎ’ বলিয়া
কপারস্ত্রে আমাকে পাইবে।

কাঁকড়া অঙ্কর ও শিত্তিকিবাহন্যের জন্ত
যদি কটমট সংরত ভাষা দেখিয়া ঈর্ষাকাইয়া
উঠ, তাহা হইলে না হয় কোমলপ্রকৃতি
বাঙ্গলা ভাষার কথাই কহিতেছি।

প্রাকৃত ভাষার বিকার বাঙ্গলা ভাষার
আধুনিক ব্যাকরণগার পণ্ডিত নকুলেশ্বর
আমার অঙ্গুগীত। প্রথমতঃ বাক্যে কি,
কেন, কোথায়, কৈ, অহুজার কহক, বসুক,
হউক, বাউক, লব্ধ পদে আদ্যকার, কালকার,
সত্যিকার, বিভাসাগরী ভাবার করিবেক,
বাইবেক, দেখিবেক, রাঢ়ের গ্রাম্য ভাষার
বেতেক্ নারি শুভেক্ নারি, এ সকলই আমার
রকম রকম কারসামি। কণ্ঠের শিঙনে ‘কে’
লাগিয়া আছে, সে যে আমিই তাহা বুঝ
না কি? ‘বেতক’, ‘এতক’, ‘কতক’, ‘কয়েক’
হলে আমিই উড়িয়া আসিয়া যুড়িয়া বসিয়াছি।
আমারই জোরে ‘এলকে বেতে আঁচলে ধরে
কাল।’

আবার বাঙ্গলা ভাষাকে ‘মাধু’ সাতাইতে
হইলেও আমার ডাক পড়ে। কৃষাক্তর বোণে
যোগিকক্রিয়ানির্মাণে আমি করিবৎসরা।
আমাব যোগসাযোগে রন্ধন করা, ভক্ষণ
করা, শরন করা, উপবেশন করা, ভিন্ন
মাধুভাষার একদণ্ড চলে না। আমারই

মাগটে 'সাহিত্যিক' 'ঐতিহাসিক' 'ঐতিহাসিক' প্রকৃতি জীবের উদ্ভব। আর কিছুকাল আগেকার পাইলে 'কাব্যিক,' 'গায়িক' 'গাভিক' 'গাভিক' বানাইয়া ছাড়িব।

বামনা সাহিত্যে 'ক' 'খ' জানিলেই এতকার হয়—(কবি ও পাঁচালীওঠাণার আবার অনেক আরও এক কাঠি সরেস ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা কেহ কেহ একেবারে নিরক্ষর ছিলেন।) হুতরাং একেত্রে আমার কীত্তি অল-অল বসি-তেছে। মাসিক, ত্রৈমাসিক, বাৎসরিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, 'ত্রাহিক', দৈনিক, সব রকম কাগজেই আমি। প্রত্যেক-প্রত্যেক-নব বিভাকরে আমারই কর শোভা পাইত, একেণে নাটক, দর্শক, সাধক, বিক্রমপুর, কুলদহ, দৈনিকচন্দ্রিকা প্রকৃতি ক্ষুদ্রকার কাগজে আমি জোনাকির আলোক বিকীর্ণ করিতেছি। কারত্বকোত্তর আমারই কীর্তিতে উজ্জ্বল। 'কারত্বক' 'কার' হই দিক্ রক্ষা করিবার দরকারে আমি আকার গ্রহণ করিয়াছি। পথের কাগজের প্রত্যক্ষদর্শীর পক্ষে আমি, লেখক-সমালোচকে আমি, আটকেলে আমি, 'সডাক' বাহিক মূল্যে আমি। পুস্তক বা কেতাবে আমি, সংস্করণ-সকলনে আমি, প্রকাশকে আমি, কম্পোজিটরে আমি, ভূমিকা অবতরণিকা-গৌরচন্দ্রিকার আমি, ক্রোড়-পত্রে আমি, ত্রমণঃ প্রকৃত্তে আমি, কল্পকলে উপহারে আমি, কাটালগে আমি, সাক্ষুটেং লাইব্রেরীতে আমি, পাঠক-পাঠিকার আমি। মৌলিকে আমি, অমুকরণে বা অধিকল নকলে আমি, কোটেশন-কণ্টকিত কলমবালীতে আমি, ডাবুক

কবিত্তে আমি, বর্ণন-কল্পিত কথার আমি, কষ্টকল্পনার আমি। মৌখিক বক্তৃতায়, ডাকের কথা, রূপকথার, ছড়াকাটার, কবির লড়াই-কু, কলেজের কবিতাপুস্তক, আধুনিক কাহিনী আমি। রূপকথার বক্তাবতী, কেশবতী রাজকল্পা, পক্ষিরাজ ঘোটক, রাক্ষস, কোটালদ্বন্দ্ব, সকলেই আমার সম্পর্ক রাখেন।

প্রাচীন কবি কৃত্তিবাস-কাণ্ডাদাস, ক্ষেমানন্দ কেতকীদাস, কবিকল্প-কবিরঞ্জন-কবিরঞ্জন-কবিরঞ্জন, রাঘবদাস, সাধক কল্পকান্ত, কল্পদাস-কবিরাজ, কল্পকল্প গোবিন্দী, আমার উপাসক। হাকিমপুরাণে, কাল-কেতুতে, কর্পুরে, দুমকেতুতে, কালীদেহে কল্পে কামিনীদর্শনে আমারেই প্রত্যক্ষ কর। আমার অক্ষরসংবাদে, বড়োয়, ভক্তমালা আমার সাক্ষ্য পাও।

আধুনিক কালের কলেজে কৃত্তবিত্ত ব্যক্তি-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লেখক বাক্ষি আমি রহিয়াছি। আমি মধুসূদনে নাই, তাই বাইকেল নামকরণ করাইলাম, প্যারীচাঁদকে টেকচাঁদ ঠাকুর নাম ভাঁড়াইলাম, ইন্দ্রনাথকে 'পাচু-ঠাকুর' বানাইলাম, রবীন্দ্রনাথের ক-অক্ষরের অতাব পুরণের দ্বন্দ্ব তাঁহাকে ডক্টর ও কবিসম্রাট উপাধি দেওয়াইলাম। কান্তকবি (রজনীকান্ত সেন) ও রজনীকান্ত শুভ্র আমারই কল্যাণে লোকপ্রিয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ উত্তর ভারতই আমার অনুরক্ত। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিদ্যার আমার ডবল ডোজে চড়াইয়াছেন, তাই তাঁহার কলম হইতে 'মিঠেকড়া' জন্মিয়াছে। অক্ষর মন্ত, অক্ষর সরকার (কমলচন্দ্র), অক্ষর

মৈত্রেয়, অক্ষর নড়াণ, চারি অক্ষরেই আমি
অক্ষর হইয়াছি।

অরুণেন্দ্রের বাসস্থলী কেন্দুবিবে আমি,
চতুর্দশের সমাধিস্থান কর্ণধারে আমি,
বায়ুগাংগার কণ্ঠক্ষেত্র কৃষ্ণনগরে
'আমি, মধুসূদনের জগদ্বান কপোতাক্ষলে
আমি, বিভাসাগরের অবকাশগার্মন-স্থান
কণ্ঠাটোড়ে আমি, বঙ্কিম-সজীবের . বাসগ্রাম
কাঠলপাড়ার আমি, বোসজার বিশ্বকোষ-
জুড়ীর কাঁটাগুহরেও আমি।

কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গাবশতক, রাধাকৃষ্ণের কাব্য-
কলাপ, কালীকৃষ্ণের কামিনীকুমার, অক্ষর
বড়াণের কনকাল্ললি, ক্ষীরোদ প্রদায়ের কনি-
কাননিকা, মানকুমারীর কাব্যকুসুমজাগি,
বর্ণকুমারীর 'ছিন্নমূল' 'কাহাকে' এই
কয়েকগুলো লেখক ও পুস্তক উত্তরগ্রহী আমি।
করণানিধান, কালিদাস, কুমুদরঞ্জন, ভিনজন
নবীন কবি আমারই এসাদে কবিকীর্তি লাভ
করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগরের দেওয়ান ৮ কাষ্টিকেরচন্দ্র
রায়ের ক্রীড়াবংশাবলীচরিত আমারই
ওগে উৎকৃষ্ট ইতিহাস। আমারই অসকল
সংযোগে ভাষাশক্তির তর্করত্নের 'কাবছরী'
বাণভট্টের মূল অণেকাও স্থগলিত। বিভাস
সাগর বিভাসাগরও 'কথামালা' লিখিয়া
আমার আবিদার রক্ষা করিয়াছেন।
পুরুষপনোক্ষা, প্রবোধচন্দ্রিকা, কৃষ্ণচন্দ্র-
চরিত, পত্রকৌমুদী, সুপিতকৌশিক, কুলীন-
কুলসর্গদ্ব, নবনাটক, কলিনাটক প্রভৃতি
সকলে পুস্তকেও আমার আটক নাই।

কাঠের অক্ষরে কেরি-উইলকিন্দের কীর্তিতে
আমিই প্রকাশমান।

বঙ্কিমের কৃষ্ণচন্দ্রের, লোকরহস্যের,
কমলাকান্তের দপ্তরের, কৃষ্ণকান্তের উইলের
ও কপালকুণ্ডলার উৎকৃষ্টতার নিদান আমিই।
কপালকুণ্ডলা, কন্দনলিনী, কমলমণি, কুলনম,
নবকুমার, ক্রম্মণীকুমার, ভবানী পাঠক,
প্রভৃতির চরিত্রমাধুর্য্য আমারই জন্ত। সেকাল
ও একাল, কৃষ্ণকুমারী, কণ্ঠদেবী, কখনে
কামিনী, কবিতাবলী, কল্পতরু, কুদিরাম,
মাধবীকল্প, কালাচাঁদনীতা, অবকাশরঞ্জিনী,
রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, কক্যাবতী, কঠমালা,
কামিনী ও কাকন, এবং রবীন্দ্রনাথের
কণিকা, কণিতা, কড়ি ও কোমল, কপা
ও কাহিনী, নোকাডুবি, ডাকঘর, সবই
আমার কীর্তিকথা।

আমারই ওগে কাব্যচিত্রা ও কাব্যজয়ীর
উৎকৃষ্ট সমালোচনাগ্রন্থ। তর্কালঙ্কারের
'কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল' ইত্যাদি
প্রভৃতিবর্ণনেও আমি, আবার মাইকেলের
'একাকিনী শোকাহুলা অশোক-কাননে'
ইত্যাদি কল্পনাসেও আমি। আজকালকার
কীর্তিমান বক্তা ও লেখক পাঁচেকড়ি বাবু কর
কড়া কড়ির জন্ত আমারই নিকট গুণী। আর
আমার স্বীকারোক্তির বকলমে স্বাক্ষর-
কারী এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি যে 'ব্যাকরণ-
বিভীষিকা' লিখিয়া শতর কিত্তি পাইয়া
বৈদ্যকর-কেশরী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন,
সেও আমার ঘটকালীতে—ইতি কিম্ব
বক্তব্যম্ ?

* ছাঁঃ, আমাকে টিটকারী করা। 'ক'এর সকল কথাই ত কাণ করিয়া শুনিলাম। কিন্তু কুণের কথা
একাল করিয়া কহিব কি? তবে অবশ্য করন। 'ক'এর মতিবির নাই, সন্ধিকালে কখন 'গ' কখন 'ঙ' হইয়া

যান, যাহা বাণেশ্বরী ও সমগ্র বায়ুর তাহার সাক্ষী। বিকৃত উচ্চারণেও 'ক' 'খ' হইয়া পড়েন, কাণে যেন তাহা টের পায়, শ্রবণেও তাহা ঢাকা পড়ে না, আর 'বিগানের' স্রোত ত একেবারে বিপড়াইয়া বলেন। তাহার পর 'ব'এ যুক্ত হইলে বাহাণা উচ্চারণে কনিত কিত্ত মহাপ্রাণ 'খ'এর দিকে হেলেন ও তাহার সম্বলী সম্পত্তি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলেন। যাক, সে সকল হলে নিজের বর্ণ ভাঙেন না, ইহাও যেনের ভাল। কিন্তু অত্যন্ত ঘাটতে যে 'ক'কার 'চ'কার হইয়া পড়েন (দ্বিটের 'চ'কার ইহার প্রমাণ), তখন যে জাতিগুল পথান্ত লাগে না। আরও দেখুন, প্রাকৃত তাহার বিকার ঘটিলে 'ক'ই আগে কারু হরেন (মহুন—নেউল, দেবহুল—বেউল, বাহুল—বাউল, মুকর—মুর, ভবাক—ভুর, কেতকী—কেয়া, শূক—শুরা, বণিক—বেণে, আলোক—আলো।) এই ত কনতা! তবিকে আবার পরের ঘরেও দিকেও লক্ষ্য আছে; অনহার (—হসত) 'চ' 'জ' বা 'শ' পাইলে নিজে তাহাবিধের স্থান অধিকার করিয়া লয়ন—জলমুক, বণিক, বিক্, ইহার সাক্ষা দিক। নিজের এত গুলন, অপর অহকার—অপণ তাহাবিধার বোমাক, ঠেকার, ঠলক দেখ কে? আমাকে ঘটাইলেই জ্বলের কথা একাধ করিয়া দিব। ইতি ব্যাকরণ-বিশীলিকা-কারের টীকা।

বর্ষার আগমন

বৃষ্টি-বহুল মঞ্জীর পায়
সুউজ স্বাক্ষী পরি,
কঠে জড়ারে দৌরভ্রম
মাগতীর সাতনরী,
কদম্বের হল . কর্ণে দোলায়ে
বৃক্ষিকা-বল্লভ হাতে,
এস জলরী মোহিনী বনবা
আজিকে আবাচ-প্রাতে।

বলাকার শ্রেষ্ঠি সর্গনি দেপায়ে
উড়িয়া চলিবে আগে,
ইন্দ্রধনু সাভাবে তোরণ
সমুখে অঙ্গুরাগে,
কারিনী-বহুল ঝরিয়া ভূতলে
কোমল করিবে পণ,
দধিমাণ-গীতি স্রাতি হরিবে
বাতাস বহিবে রথ।

ধরশী সে হের বরিতে তোয়ার
কত উল্লাস মনে।
ইন্দ্র-গোলের চুবকিতে মাণ্ডা
পাতিয়াছে তৃণাসনে,
ভূমি-চম্পক ফুটায় যতনে
উপাধানপানি গড়ি
সেতনে সাধারণ পুষ্প-চামরে
বাজন করিতে, মরি।

বাগত সরসী বনবা ক্রপসী
নিশি রতি মস্ত-গাদ্য
দেখ-মুগ্ধে করি করাণ্ডত
বিদ্রাৎ-পতাকায়া।
সর্গক হোক সকল বিধ
আগমনে তব রাণী,
স্রীতির বজ্রা উল্লি পন্নানে
ধূরে দিক সব মানি।

ঐনলিনীনাথ দে।



চলি থেও, চলি গেল, যাই গেল চলি।—“কাম্বলী”—রবীন্দ্রনাথ।

উপনিষদে আৰ্য্যদিগের উত্তরকুরুবাসের একটি প্রমাণ

বেদ, উপনিষদ, আৰ্য্যদিগের সঙ্গীনি-গ্রন্থ। এই সমস্ত গ্রন্থে আৰ্য্যদিগের সম্বন্ধে যে বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তাগা যে বিশেষ ক্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহা যোগ্য হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

‘উত্তরকুরু’ ও ‘কুরু’ আমরা * সংস্কৃত সাহিত্যে একই পৰ্য্যায়ভুক্ত দেখিতে পাই। ছান্দোগ্যোপনিষদে কুরুদেশের ভীষণ ছত্রিকের একটি উপাখ্যান পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

“মটীহতেষু কুরখাটীকাসহ জায়মোশুর্ভিঃ ক্রায়ণ ইত্যগ্রামে প্রজাণক উবাচ। ১

“মহেভ্যঃ কুরগান্ খণ্ডং বিভিক্তে তং হোবাঃ নেতোহন্তে বিভক্তে যত মে ম ইন উপনিহিতা ইতি। ২
এতথাঃ মে দেহীতিহোবাচ তানস্মৈ প্রযদৌ হস্তাশ্বপানিত্যুচ্ছিষ্টেঃ যৈমে সীতঃ স্রাবিতি হোবাচ। ৩
নবিদেতেষ্যুচ্ছিষ্টা ইতিনবা অমৌশ্মিহিমান খাদয়িতি হোবাচ কামোম উদকপানযোতি। ৪

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ১ম অধ্যায় ১০ম খণ্ডঃ।

“পাশাণবৃষ্টির দ্বারা শতসম্পত্তির নামে কুরুদেশে ছত্রিক উপস্থিত হইলে, চক্রতনুর উত্তরি বশেন পরিত্যাগপূর্ব্বক অজ্ঞাপ্ত বৌবনা নিম্ন ভাৰ্য্যা আটিকার সহিত এসময় করিতে করিতে পর-লাভ হেতু মরণাপন্ন অবস্থার হস্তিপকদিগের গ্রামে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ১

উত্তরি বদুচ্ছাক্রমে কুৎসিত মাংসকলায় ভোজনকারী এক জন হস্তিপকের নিকট উপস্থিত হইয়া উক্ত কলায় বাজা করিয়াছিলেন। উত্তরিক কলায় বাজা করিতে দেখিয়া ঐ হস্তিপক বলিয়াছিলেন, আমি যাহা ভক্ষণ করিতেছি, এই উচ্ছিষ্ট কলায় তির আর আমার কলায় নাই, আমার যাহা কিছু ছিল, তাহা এই পায়েই রক্ষা হইয়াছিল। ২

হস্তিপকের বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তরি বলিয়াছিলেন, উহা হইতে আমাকে কিছু লাভ। হস্তিপক ওহাকে উদ্ধারই কিয়দংশ প্রদান করিয়াছিল। পরে যখন হস্তিপক উত্তরিকে পানীয় গ্রহণ করিতে বলিয়াছিল, তখন উত্তরি বলিয়াছিলেন, ঐ পানীয় গ্রহণ করিলে আমার উচ্ছিষ্টভোজন করা হইবে। ৩

তদ্বৎসে হস্তিপক বলিয়াছিল, আপনি এই যে কলায়গুলি গ্রহণ করিলেন, এইগুলি উচ্ছিষ্ট নয়? উত্তরি উত্তর করিয়াছিলেন, এই কলায়গুলি ভক্ষণ না করিলে আমার জীবনরক্ষার সম্ভাবনা ছিল না বলিয়াই আমি এইগুলি ভক্ষণ করিয়াছি।

এখন পানীয় আমার ইচ্ছামুসারে অন্ততঃ পাইতে পারি অতএব উচ্ছিষ্ট মল পান করিব না। ৪

শ্রীকৃষ্ণ ভাস্কর্য্য গোবিন্দ অমৃতাবধ।

এখানে পাশাণবৃষ্টি শিকারপাত বলিয়াই বোধ হয়। উত্তরিক ও হস্তিপকের মধ্যে কপোপকথন হইতে জাতি ও স্পৃষ্টা-স্পৃষ্ট বিচার যে তৎসময়ে বিশেষভাবেই বর্তমান ছিল, তাহার স্পষ্ট আভাসই প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এতদ্বস্তুর মধ্যে উত্তরিকেই উচ্ছ্রাভীর বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। উত্তরি কৃতঃশম কোন রাজার বস্ত্রে ঋত্বিক কারণে বৃত্ত হইয়া ধন প্রাপ্ত হন, উপাখ্যানের উপসংহারে এরূপ উল্লেখ আছে। ইহা হইতে উত্তরিক কেবল উচ্ছ্রাভি ছিলেন বলিয়াই বুঝা যায় না পরন্তু তিনি যে সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণ জাতি ছিলেন তাহাই বুঝা যায়। কারণ ঋত্বিক কারণে ব্রাহ্মণ তির অজ্ঞ জাতির অধিকার থাকার কোন প্রমাণ শাস্ত্রে আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। ব্রাহ্মণ কর্তৃক অপূর্ণ জাতির স্পৃষ্টার ভোজন কেবল আপদার্থ রূপেই শাস্ত্রে বিহিত আছে, তাহাতেই

উন্নতি কেবল প্রাণরক্ষার্থই উদ্ভিষ্ট মাংসলাই পাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রাণরক্ষা হইলেই তিনি আর উদ্ভিষ্ট জলপানে সম্মত হইলেন না। সুতরাং এখানে আমরা জাতিধর্মের পূর্ণ প্রভাবের পরিচয়ই প্রাপ্ত হইতেছি। ইহা হইতে উত্তরকুরুদেশের সমগ্রই যে আর্ধ্যদিগের মধ্যে জাতিধর্মের প্রাণ্ডিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হই। পারদীপ-দিগের মধ্যে যে ভারতীয় আর্ধ্যদিগের অসুস্থ উপনয়নপ্রথা ও জাতিবিভাগ দৃষ্ট হয় তাহাতেও সপ্রমাণ হয় যে আর্ধ্যদিগের পরম্পর বিচ্ছেদ সভ্যতাই হইবার পূর্বেই তাহাদিগের মধ্যে বর্ণাশ্রম ধর্মের উৎপত্তি হয়।

ছানোগোপনিষদে কুরুদেশের নাম যেমন আমরা প্রাপ্ত হই, তেমনিই কেকয় দেশ (৭।১।১ ৪-২) ও গাকার দেশের নামও (৬।১।১-২) প্রাপ্ত হই। শেষোক্ত দেশ দুটী ভারত বহির্ভূত দেশ—ভারতবর্ষে কোন দেশের নামই ছানোগো উল্লিখিত দেখা যায় না। সুতরাং কুরুদেশ যে উত্তরকুরু দেশকেই বুঝাইতেছে তাহা আমরা অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করিতে পারি।

ছানোগোপনিষদে কেবল যে কুরুদেশের নামই পাওয়া যায় তাহা নহে; পরন্তু শত্রুদিগেতে আর্ধ্যদিগের আদি বাসভূমিতে ছয় মাস দিবা ও ছয় মাস রাত্রি থাকার যে রূপ আভাস রহিয়াছে, তাহার বর্ণনাও পাওয়া যায়; যথা :—
“অপ তত উর্ধ্ব উবেতা নৈবোবেতা নান্ত মৈতকল এষ বধাহতা। তদেব যোকঃ।”

নৈবতত্র নানিগোচ বোদিগার কথাতন যোবাশ্র-
নাতঃ সত্যেন বাবিত্রাধিগি ব্রহ্মগেতি ১২

নববা অশ্বষ্টমোতি ননিগোচতি সত্যুদ্বিধা ঈহাশ্রি
কথতি য এতামেবা ব্রহ্মোপনিষৎ বেদ ১৩

ছানোগোপনিষৎ তৃতীয় অধ্যায় ১১ম শ্লোকঃ।

“অদকর ঐ স্থান হইতে উর্ধ্ব উভিত হইয়া উনদের পর আর উদরান্ত ভোগ করিতে হয় না। ঐ স্থানে সূর্য্য একভাবে মথোই অবস্থান করিয়া থাকেন। তদ্বিধে বক্ষ্যমান যোক উক্ত হইয়াছে।”

ঐ যোক, যথা—ঐস্থানে ত্রমিক উদরান্ত নাই। ঐস্থানে সূর্য্য কখন অস্তময়ন করেন না; অতএব ঐস্থানে অস্তময়নের পর যে উদয় তাহাও হয় না। যেহেতু অস্তম ককুন, আদি সত্য বাধ্য বলিতেছি। ঐ সত্যের প্রমাণে আমি ব্রহ্মতাব লাভ বর্জিত হইব না ১২

যিনি এই ব্রহ্মব্রহ্ম অবগত হন তাহার পক্ষে একবারেই দিবা ইয়—সূর্য্য উদয় হন না বা অস্তময়ন করেন না ১৩

উপরিবর্ণিত স্থান-মাধ্যাক্ষ্য যোকাকার প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া আমরা সুস্থিতে পারি যে ঐস্থান পবিত্র স্মৃতিমাজে সর্বাধিসিত হইয়াছিল এবং আর্ধ্যগণ একরূপ স্থানেই তখন অধিষ্ঠিত হইরাছিলেন যে দেখানে প্রতিনিয়ম সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত হইত। তাহাতেই উত্তরকুরু ছয়মাস একভাবে দিবা অসম্ভাব্য ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল। এই সমস্তই ইহার সম্বন্ধে প্রত্যয় অস্বাইবার সঙ্গ একরূপ পঞ্চ-সংস্কৃত উক্তির প্রয়োগই হইয়াছে।

উপনিষদ-বর্ণিত চিরদিবা-লোক-বিশ্বাসিত স্থান যে চিরতাবার ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত তুলিত হইয়াছে তাহাতেই আমরা আমাদের পরম দিব্যধাম ব্রহ্মলোকের আদর্শ যে কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার একান্ত রহস্য উদ্বেগ করিতে সমর্থ হই। মহর্ষি মহু তদীয় সংহিতার প্রথম আর্ধ্যাদিবাসকে যে ব্রহ্মাবর্ত অখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমরা . যেমন ব্রহ্মার অধিষ্ঠানরূপে করিত দেখিতে পাই,

ভেদনই দেবহানরূপে ও ক্ষয়িত দেবিত্তে পাই
যথা—

“সরস্বতী দৃশ্যাতো দেবমজ্জোৎসবতম্।

ওং দেবদ্বিধিতং বেণু ব্রহ্মবর্তঃ প্রকথতে।”

অঙ্গাবর্ত আর্ঘ্যদিগের আদিহান, উত্তর-
কূক ও আদি অদিহান। উত্তরকূকর ছয়নাস
ক্রমাগত দিবা ও অঙ্গাবর্তস্বরূপ ব্রহ্মধামের
চিরদিবাণালোকের সাদৃশ্য হইতে অঙ্গাবর্তকে

আমরা উত্তর কূকর সহিত অভিন্ন মনে
করিবার যথেষ্ট কারণই প্রাপ্ত হইতেছি।

প্রাকৃত পর্যালোচনা হইতে আমরা এই
সিদ্ধান্ত লাভ করিতে পারি যে উপনিষদের
উল্লিখিত দিবাগামই কাশ্মীরে অঙ্গলোক,
অঙ্গাবর্ত, উত্তরকূক প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত
হইয়াছে।

ঐন্দ্রতনুচন্দ্র চক্রবর্তী।

বৈদিক সভ্যতা.

যজ্ঞ :—দেবতার তৃপ্তি-সাধনের অজ
যজ্ঞ সম্পাদন করিবার বিধি হিন্দু ও খ্রীষ্টান
ধর্মে প্রচলিত দেখা যায়। বৈদিককাল হইতেই
ভারতের অধিগণ যজ্ঞকার্য্য সম্পাদনের
একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন; ‘হোতা’ ‘পাতা’
‘অধ্বর্য্য’ প্রভৃতি তিন্ন তিন্ন শ্রেণীর
কর্তৃকগণ যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করিতেন।
অগ্নি না হইলে কোন যজ্ঞই সম্পন্ন হইত
না; এইজন্য ঋগ্বেদের অনেক স্থলে অগ্নিকে
পুরোহিত বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সাধন
বলেন,—“যথা রাজা পুরোহিতঃ তদভীষ্টং
সম্পাদতি, তথা অগ্নিরপি যজ্ঞস্য অপেক্ষিতং
হোমং সম্পাদয়তি যথা সধাক্ষিনি পূর্নভাগে
আহবণীয় রূপেণ অবস্থিতঃ”। পুংকালে
আর্য্যাবর্তে অবস্থিত। সরস্বতী নদীর তীরেই
বড় বড় যজ্ঞ সম্পাদিত হইত, তাহার
তীরভূমি প্রতিদিশে বেদমন্ত্রে মুগ্ধিত থাকিত;
এইজন্যই পরবর্তীকালে সরস্বতীকে মন্ত্রের

দেবী বা বাগ্বেদীকূপে করুনা করা হইয়া
থাকিলে। (Muir)

জাতিভেদ :—বৈদিক যুগে জাতিভেদ
ছিল না। ১৭১২ অব্দে পক্ষিকৃতি শব্দ লইয়া
পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। সারণ
পক্ষিকৃতি অর্থে চারি জাতি এবং নিবাদ—এই
অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে পণ্ডিত
মমানাধ সরস্বতী যাহা বলেন, তাহা এট,—
প্রাচীন কালে ইন্দোনীত্বন জাতি-বিত্তাগের
কোন উল্লেখ দেখা যায় না। • • ক্ষিত্তি
শব্দে কিরূপে জাতি বা বর্ণ বুঝাইবে?
ক্ষিত্তি শব্দের অর্থ হান। আমার বোধ হয় যে
পাকাল প্রদেশের পাকননাস্তবর্ত পক্ষভূতগ,
যেখানে আর্ঘ্যেরা প্রথমে বাস করিয়াছিলেন,
এই মন্ত্রে তাহারই উল্লেখ আছে। এই
পাকনদের নামও অজ্ঞত দৃষ্ট হয়। মোক্ষ
মূল্যও সাধনের অর্থ গ্রহণ করেন নাই। তিনি
বলেন, “If, then, with the document

before us, we ask the question, does caste, as we find in 'Manu' and at the present day, form part of the most ancient religious teaching of the Vedas? We can answer with a decided no"—Chips from a German workshop. Vol II. স্বপ্নের মধ্যে কৃত্তিক শ্রমশ্রী ও রাজপুরুষগণের উল্লেখ দেখা যায় বটে, কিন্তু এই তিনশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে আহারাদি ও বিবাহ-কাণ্ড নিষিদ্ধ ছিল না। বেবার এই লম্ব বিষয়ের আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, "There were no castes as yet; the people is still one united whole and bears but one name that of the visas.—Indian Literature (Translated) P.38. Muir সাহেব কর্তৃক রচিত Sanskrit Texts নামক পুস্তকে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে কিন্তু সেরূপ স্থান বিচারের স্থান আমাদের নাই। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, বর্তমান কালে আমরা জাতিভেদ বলিতে বাহা বুঝি ঋগ্বেদের কোথাও তাহার আভাস নাত্র পাওয়া যায় না।

১। ১০। ১ ঋকে আবার ব্রাহ্মণ শব্দ লইয়া এই রূপ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সারণ 'ব্রাহ্মণঃ' অর্থে ব্রাহ্মণ করিয়াছেন। পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী ইহার অর্থ করিয়াছেন ব্রাহ্মণ অজ্ঞাত কৃত্তিকেরা; উইলসন্ সাহেব সারণের অর্থ গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন, The Brahma of a sacrifice does not necessarily

involve the notion of a Brahman. আমাদেরিগেরও সেই কথা সম্বলিত বলিয়া বোধ হয়। কারণ ঋগ্বেদে ব্রহ্ম অর্থে জ্ঞতি; ব্রাহ্মণ একজন জ্ঞতিগণক পুরোহিত। স্মৃতরাং 'ব্রাহ্মণঃ' অর্থে জ্ঞতিবাহকগণ বা পুরোহিতগণ। ঋগ্বেদে সপ্তজন হোতার (১। ১৫—২। ১৬ জন) কথা পাওয়া যায়,— সপ্ত হোতা প্রাচী বয়টী কৃত্তিক—সারণ। তাহানিগের মধ্যে যজমান যজ্ঞের অঙ্কুরান করিতেন, হোতা মন্ত্র পাঠ করিতেন, উপস্রুতা মন্ত্র গান করিতেন, পোতা হব্য প্রস্তুত করিতেন, নেট্টা অগ্নিতে হব্য নিক্ষেপ করিতেন, ব্রহ্মা সমুদায় তত্ত্বাবধান করিতেন, ও রক্ষা বার রক্ষা করিতেন। সারণও অনেক স্থলে ব্রহ্মা বলিতে এই জ্ঞতিবাহক হোতা অর্থ করিয়াছেন। সেইজন্য তাহার 'ব্রাহ্মণঃ' অর্থে ব্রাহ্মণ দেখিয়া মনে হয় যে তিনি জ্ঞোর করিয়াই বেদের মধ্যে জাতিভেদ দেখাইতে চান।

বেশভূষা :—ডাক্তার রায়েব্রাণাল মিত্র বলেন, The first step in the march from barbarism to civilization is indicated by the dress of a nation.—Indo-Aryan Vol I. P 166. এ কথা সত্য। বেশভূষার দ্বারা সভ্যতার অনেকটা পরিমাণ করা যায়। বৈদিক যুগে নানা প্রকারের বেশভূষা উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

২। ৩। ৬ ঋক পাঠ করিয়া অম্বমান হয় যে তৎকালে আর্ঘ্যগণ টানা-ও পোড়েন দিয়া বস্ত্র বদন করিবার

প্রণালী অবগত ছিলেন। ‘বয়োব
রশিতে’ শব্দের ব্যাখ্যায় সাধারণ বলেন,
‘বান কুশলে ইব x x পরম্পরো গচ্ছন্তে’।
ইহা ব্যতীত ২।৩৮।৪ থেকেও বঙ্গবার-
কারিণী রমণীদিগের উল্লেখ দেখা যায়।
‘উইলগন্ সাহেবও স্বীকার করিয়াছেন
যে, বৈদিক যুগে আর্ঘ্যগণ বঙ্গ-বধীন ও
তাঁহার ব্যবহার অবগত ছিলেন।

ইহা ব্যতীত বৈদিককালেও আর্ঘ্য
রমণীগণ অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন। ৯।৪৬.২
থেকে বিবাহ-কালে পিতৃকর্তৃক সালঙ্কার কস্তা-
সম্প্রদানের কথা দেখা যায়।

এতব্যতীত বেদের দেবতাগণের আলো-
চনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহা-
দের অনেকেরই দেহ নানা অলঙ্কারে ভূষিত
এইরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ
বলা যায় যে, রুদ্রের দেহ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত
এইরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। সেইরূপ
মরুৎ ও অশ্বিনীগণেরও। এমন কি মনুস্যাগণও
যে তাঁহাদিগের আরাধ্য দেবতাগণের অনু-
করণে অলঙ্কার ধারণ করিতে অভিযুক্ত হইয়া
উঠেন, এ কথাও বলা আছে। এতব্যতীত
যজ্ঞাবসানে ঋত্বিকগণকে স্বর্ণের তাল বা
স্বর্ণালঙ্কার-দানের কথাও অথর্বশ্রবের বহু
স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই
প্রাচীন যুগের বহু অলঙ্কারই এখন বিলুপ্ত
হইয়াছে। আর নাম করিলেও তাঁহাদিগকে
চেনা বাইবে না। উদাহরণস্বরূপ আদি ও
কমল নামক অলঙ্কারের উল্লেখ করা বাইতে
পারে। (৭।৫৬।১)

আহার :—বেদের আর্ঘ্যগণ মাংস-
ভোজী ছিলেন। বেদের কথা ছাড়িয়া দিয়া

পরবর্তী রানাহী যুগের আলোচনা করিলেও
দেখিতে পাই মাংস-ভক্ষণে তাঁহাদিগের
আপত্তি ছিল না। অথর্বশ্রবের ১ বক্তৃতির
৩১ হতে ১৫ থেকে আছে,—

“হে অগ্নি! যে যজমান ঋত্বিকদিগের
দক্ষিণা দান করিয়াছে, তুমি সেই পুরুষকে
হাত বর্ণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা কর।
যে যজমান হস্তাহু অন্নের দ্বারা অতিথি
দিগকে স্তুতি করিয়া, বস্তুহে পশুবলিগুরু
যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, সেই স্বর্ণের উপমাফল
হয়।”—(৮।৫৫শস্ত্র দত্তের অনুবাদ) যুগে
“ভোজ্য যজ্ঞং যজতে” আছে। সাধারণ
ইহার অর্থ পশুবলিসহিত যজ্ঞ বা পশু-
বলিযুক্ত যজ্ঞ এই উভয় অর্থ করিয়াছেন।
উইলগন্ সাহেব বলেন, আর্ঘ্যগণ অতিথির
ক্রীতি-সাধনের জন্য তাঁহার উপস্থিতিতে
গাভী হমন বা রক্তন করিয়া তাঁহাকে
আহারের জন্য আহ্বান করিতেন। Rosen
ও Langlois এই মতই সমর্থন করিয়াছেন।
কোস্ত্রাক এই প্রসঙ্গে বলেন, It seems
to have been anciently the custom
to slay a cow on this occasion
(The reception of a guest) and a
guest was therefore called Goghna
or cow-killer—Religious Cere-
monies of the Hindus. রামা
রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ও এই মতের সমর্থন
করেন। তিনি বলেন, The Sutras,
both Kalpa and Grihya and the
Vedas themselves display even
less reserve and reticence. They
distinctly affirm that bovine meat

was used as food and in details points out the different occasions when cattle should be slaughtered and eaten. Gobhila recommends beef for Sraddhas. (যথা বষ্টা উৰ্দ্ধং কঠমাং গো) এ বিষয়ে পণ্ডিত সমানাথ সরস্বতীও এই মতের পক্ষপাতী। তিনি বলেন, “তৎকালে গো-মাংস অভ্যাস ছিল না। অশ্বাশ্রয় গৃহস্থদের প্রথম অব্যাহারে কৃষ্ণবর্জ্যের তৈত্তিরীয়া ব্রাহ্মণের অশ্বমেধ প্রকরণে এবং শুক্লবর্জ্যের বাগ্‌সেনীর সংহিতায় পুরুষমেধ-প্রকরণে আর্ঘ্যগণের বিবিধ মাংস ব্যবহারের কথা আছে। গোমেধ, অশ্বমেধ, অজমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ পূর্বে প্রচলিত ছিল। দ্ব্যুতিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে পূর্বকালে আর্ঘ্যসমাজে অতিথির সমাগম হইলে “মহোক্ষং বা মহোজং” অর্থাৎ বুধ বা অজ বধ করিয়া স্তুতিবি সৎকার হইত। উত্তরচরিতের চতুর্থ অঙ্কে আমরা দেখিতে পাই, জনক বৎসতরী ভোজন করিয়াছিলেন। এই কারণেই অতিথির নাম গোর হইয়াছে। বেদে অশ্বমাংস ভোজনের কথাও উল্লিখিত দেখা যায়। (১। ১৬২। ৬)

বেদে রমণীজ্ঞাপ্তি :—বেদের সময় রমণীজ্ঞাপ্তির অবস্থা আর্ঘ্যসমাজে কিরূপ ছিল, তাহা বেশ স্পষ্ট করিয়া জানিতে পারা যায় না। সভ্য বটে, যথেষ্ট স্থল-বিশেষে রমণীগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা হইতে তাহাঙ্গিণের অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না।

সে সময়ে গ্রীষ্মকালে প্রচলিত ছিল কি

না ঠিক বলা যায় না। তবে যথেষ্টের মধ্যে বিদ্রুমগণের যে পরিচয় পাই তাহা হইতে মনে হয় যে রমণীগণ তৎকালে সর্বাধিক পুরুষের সঙ্গিনী ছিলেন। তাহাঙ্গিণকে সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অশ্বঃপুত্র-মধ্যে বন্দি করিয়া রাখিবার প্রথা তখন প্রচলিত ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে অজিগোত্রজা বিপবারা নারী রমণী ৫। ২৮ সূক্তের কবি; তিনি ৩য় অঙ্কে দাম্পত্য পৃথগা-স্থাপনের ক্ষত্ব অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। এইরূপ অনঙ্গের ভাণ্ডা অঙ্গিরার কস্তা শাশুতী আর এক নারী কবি। তিনি ৮ম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের চতুঃক্রিংশ অঙ্কের কবি। অঙ্গলা আর একজন কবি; তিনি ৮। ৯২ সূক্ত রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত ১। ১৬৬। ৫ অঙ্কে সজীক যজ্ঞ সম্পাদনের কথা আছে। ইহাতে অনুমান হয় যে, তৎকালে রমণীগণকে নিরোধ ও বিলাসের সামগ্রীমাত্র বলিয়া কেহ মনে করিত না। সাধারণ বলেন, খেল নামে এক রাজা ছিলেন। বিশপলা তাঁহার স্ত্রী। তিনি স্বামীকে সহিত যুদ্ধে গিয়াছিলেন, যুদ্ধে তাঁহার একটি চরণ ছিন্ন হয়।

বেদের সময়েও বোধ হয় পুরুষগণ একাধিক পত্নী গ্রহণ করিতে পারিতেন। কক্ষীবান কবি অধ্যয়ন-সমাপনান্তে গৃহ-প্রত্যাপনকালে পথিপার্শ্বে নিম্নিত হইয়া পড়েন। বৈবস্বতে মনুর নামে একজন রাজা সেই পথ দিয়া যাইবার কালে নিম্নিত কক্ষীবানকে দেখিতে পান এবং তিনি

তাহার রূপে তুষ্ট হইয়া তাহাকে আপনার গৃহে লইয়া যান ও তাহার হস্তে আপনার মল কস্তাকে সমর্পণ করেন। ইহা হইতে বৃদ্ধিতে পারা যায় যে, তৎকালে একাধিক পত্নী-গ্রহণ অপ্রচলিত ছিল না।

বেদের সময় বিবাহের পূর্বে কোন কোন কুমারীর পুত্র এসবের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ পুত্র কানীন পুত্র নামে অভিহিত হইত। ১১১৬২১ নং পৃথুশ্রব নামক একজন রাজার কথা আছে। সারণ বলেন, ইনি কানীন পুত্র। তৎকালে কানীন পুত্র সমাজে নিম্নমীর হইতেন কি না, বোধ হইতে তাহা অবগত হওয়া যায় না।

যেদে দাম্পত্য-জীবনের যে চিত্র পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় না যে জীলোকের মর্যাদা সামান্য ছিল। ৮৩১২৯ নং লিখিত আছে যে, দেবতাগণ ও যজ্ঞরত দম্পতীর স্তুতি কামনা করেন এবং দম্পতীর জীবন চির-স্থায়্য।

বেদের সময় ভ্রাতৃ ও ভ্রগঠন কস্তা আপনার মনোমত্ত পতি নির্বাচন করিতে পারিতেন। Muir সাহেব কথোদের ১০১২৭১২ নং আলোচনী করিয়া বোধ হয় এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়া থাকিবেন। তিনি এই ক্রমকে বলেন, "May we not infer from this passage that freedom of choice in the selection of their husbands was allowed, sometimes at least, to women in those times ? Sanskrit Texts Vol V. P 458-59. আলোচ্য শব্দটির অর্থ এই যে কোন কস্তা অর্থেই দম্বষ্ট হয়, কিন্তু ভ্রাতা আপনার

মনোমত্ত পতি গ্রহণ করেন। এই স্ত্রীকে অন্ধ কষ্টীকে বিবাহ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। অপলা অক-যোগে আক্রান্ত হইয়া স্বামী-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয় ব্যাধিগ্রস্ত সমীর গন্ধেও বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল।

বৈদিক যুগে নগরাদি :—বৈদিক যুগে আধ্যগণ গ্রাম ও নগরের পার্থক্য বৃদ্ধিতেন। গ্রামীন, পুরপতি প্রভৃতি শব্দের দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয়। নগরে শত দ্বার ও ত্ত্বনির্দিষ্ট গৃহ থাকিত। দহ্ম ও রাফস-গণ নগরের আধ্যগণকে ঐতিমিত্ত আক্রমণ করিত। এই জন্য আশ্রয়কাহেতু তাঁহারা সুরক্ষিত নগর নির্মাণ করাইয়া তথায় বাস করিতেন। ৭৮ স্ত্রীতে বর্ণিত দ্বি অধো-নির্দিষ্ট নগরের দ্বারা আশ্রয়কা করিবার জন্য স্তব করিয়াছেন। ৭১২৭১৫ নং আশ্রয় তিনি অধোনির্দিষ্ট ও শতদ্বার পুরীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই অধোনির্দিষ্ট নগর কি ? ইহার উত্তরে সারণ বলেন, এই শব্দের দ্বারা নিরাপদ নগর বুঝাইতেছে।

এতদ্ব্যতীত ২৪১৫ নং ত্ত্বনির্দিষ্ট অট্টালিকার উল্লেখ আছে। আধ্যগণ এই সকল গৃহনির্মাণ-পদ্ধতি অবগত ছিলেন।

বৈদিক-যুগে এইরূপ বৃহৎ অট্টালিকা নিত্যন্ত কম ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কামর একরূপ অট্টালিকার উল্লেখ গ্রাহ্যই দেখা যায়। একবার অহরগণ কঠোর পরীক্ষার জন্য তাহাকে অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া ছিলেন। আর একবার তাহার শতদ্বার বস্ত্রগৃহ নির্মাণ করিয়া অত্রি দ্বিধিক ভিতরে পুরিয়া তাহাতে অগ্নিদহযোগ করিয়াছিল।

বেদে জ্যোতিষঃ—পৃথিবীর স্বর্গ-পরিভ্রমের দ্বারা যে বৎসর-গণনা করা হয়, দ্বাদশ অমাবস্তা গণনা করিলে, তাহা অশুভ করেকদিন কম হয়। এষ্ট অল্প দৌর বৎসর ও চান্দ্র বৎসর গণনা করিবার ক্ষুদ্র চান্দ্র বৎসরের প্রতি তৃতীয় বৎসরে একটি পূর্ণক মাস ধরিতে হয়। ইহাকে মলমাস বলে। ১২৫৮ অব্দ হইতে জানা যায় যে আর্য্যগণ এই উভয় গণনা-পদ্ধতিই অবগত ছিলেন। সেই অকটির অমুখ্য এই :—
“বিনি দ্বতন্ত্রত হইয়া স্বপ ফলোৎপাদী দ্বাদশ মাস জানেন ও অপর যে ত্রয়োদশ মাস উৎপন্ন হয়, তাহাও জানেন।” (৬মশতাব্দীর দত্তের অমুখ্য)

আর্য্যগণের বিষয় অকবেদের অবিগণ মাধ্যাকর্ষণ ও পৃথিবীর গতি-সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত ছিলেন। ঐতরের আরম্ভকে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, স্বর্গের এককৃত উদয় বা অস্তময়। ইহা পৃথিবীর দৈনিক গতির পরিচায়ক সম্বন্ধে নাই। এতদ্ব্যতীত স্বর্গ যে পৃথিবীর দারক তাহা অকবেদের অনেক অক দেখিতে পাওয়া যায়। ১০ মণ্ডলের ১৬২ স্বর্গের একটি অক আছে, সনিতা যন্ত্র পৃথিবী মরুদাগা কন্তনে সনিতা ভ্রম দৃং হং। ইহার অর্থ এই যে, সনিতা যন্ত্রসকল (সংযম শক্তি) দ্বারা পৃথিবাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, যোবশু হইয়া সনিতা জালোককে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ইহা মাধ্যাকর্ষণের জ্ঞান-হটক সম্বন্ধে নাই। বেদে পৃথিবীর গতি শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় ১৩১০ সালের ভারতীতে দেখাইয়াছেন যে পৃথিবীর গতি বৈদিক আর্য্যগণের

নিকট পরিজ্ঞাত ছিল; তাহার প্রধান বেদে পৃথিবীবাচক গো, গ্ৰী, জ্যা জা, জা, কমা, জ্যেদি কিত্তি, অবনি, রিপ, গাভু ও নিরুজি শব্দের দ্বারা গতি বুঝাইয়া থাকে। গম ধাতুর উত্তর ও প্রত্যয় করিলে গো পদ সিদ্ধ হয়। গো পৃথিবীর নাম কেন ? তাহার উত্তরে ষাঙ্ক বলেন, “যেহেতু ইহা দূর-পথে গমন করে ও যেহেতু ইহাতে জীবগণ বিচরণ করে। গ্ৰী পদও গম্ ধাতু হইতে নিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং গো ও গ্ৰী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ একট; জ্যা-পদ-জম্-ধাতু হইতে হইয়াছে। বেদে জম্ বা জমতির অর্থ গতি। সুতরাং জ্যা-শব্দের দ্বারাও পৃথিবীর গতি বুঝাইতেছে। এইরূপ জা, জা, কমা ও কিত্তি এই পদ চারিটি গভার্বক ক্ষি ধাতু দ্বারা সিদ্ধ করিতে পারা যায়। এই সব আলোচনা করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে পৃথিবীর গতির বিষয় আর্য্যগণ বিশেষরূপেই অবগত ছিলেন। নতুবা গতি-ক্রিয়া গইয়া গীহায়া পৃথিবীর এতগুলি নাম করিতেন না।

অকবেদের জনপদঃ—অকবেদে যে সব আর্য্যসভ্যতা-পরিণোদক জনপদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাহারই উল্লেখ করিব। আর্য্যগণ সিদ্ধনদের তীরেই প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন, যুরোপীয় পণ্ডিতগণ এইরূপ অমুমান করিয়া থাকেন। এই অমুমান কতদূর সঙ্গত তাহার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। তবে প্রসঙ্গক্রমে বলা ঘাইতে পারে যে, সিদ্ধনদের তীরভূমি যে একটি প্রসিদ্ধ ও পুরাতন জনপদ, তাহাও সম্বন্ধে কনিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

এইখানেই প্রথম অশ্বযজ্ঞের আয়োজন হয়। এই সময়ে আৰ্য্যগণ বোধ হয় অশ্বযাগ-ভোজন করিতেন। এই অশ্বযজ্ঞই ক্রমে যজ্ঞ-ভারতের সময় অশ্বযজ্ঞের আকার ধারণ করে। সিদ্ধুর পরই আৰ্য্যগণের অবস্থিত। সরস্বতীর কথা বলিতে হয়। এই সরস্বতীর তীরে বহু যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়াছে। পণ্ডিত-গণ অনুমান করেন যে সরস্বতীর তীরভূমি প্রতিনিয়ত যজ্ঞের মত্রে সুশরিত থাকিত বলিয়াই কালক্রমে সরস্বতী বাগ্‌দেবীরূপে পরিচিতি হইয়াছে।

এই দুইটি প্রধান নদী বাতীত অগ্নিদে (৭।৭৫৫) আরও আটটি নদীর নাম পাওয়া যায়;—গঙ্গা, যমুনা, শতদ্রু, পরকী, মরুগুয়া, অশ্বিনী, বিতস্তা ও জাহ্নবী। ইহা বাতীত ঐ স্থানেই হ্রস্বমানাসক আর একটি নদীর নাম পাওয়া যায়। যাহা বলেন, এই হ্রস্বমানাসক নদের নামান্তর। ঐ আটটি নদীর মধ্যে যাহার মতে পরকী নদী ইরাবতী।

কবেদে গঙ্গা বাতীত জাহ্নবী নামও পাওয়া যায়। (৩।৫৮।৬) উইলসন সাহেব বলেন, It may imply to the Ganges, Jahnvi, if we have reason to suppose the legend of her origin from Jahnu, was known to the vedas বৈদিক আৰ্য্যগণ গঙ্গা-সম্বন্ধীয় পৌরাণিক গল্প কি করিয়া অবগত হইলেন, অজ্ঞ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

৪।৩১।১৭ থেকে যমুনার উল্লেখ দেখা যায়। অগ্নিদেবের সময় হইতেই যমুনার তীরে গাতী সকল “অতঃ” ছিল। ইহা হইতেই ভাগ-

বতের গুপ্তের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। ৭।১৮।১৯ থেকে আর একবার যমুনার উল্লেখ আছে।

৫।৫৩।১ থেকে রসা, অনিতস্তা ও কুস্তা নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদিগের স্থান আজিও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

৫।৬১।১৬ থেকে গোমতী নদীর নাম পাওয়া যায়। এই গোমতী নদী অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত।

আৰ্য্যগণ এই নদী-বহুল জনপদে বাস করিতেন। এই উর্বর ভূমি লইয়া আৰ্য্য গণের মধ্যে বিবাদ হইত। এক আৰ্য্য নৃপতি অজ্ঞ আৰ্য্য নৃপতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন, বেদে একরূপ কথাও দেখা যায়।

তৎকালে এক জনপদ হইতে অজ্ঞ জনপদে গমনাগমনের কোনরূপ বন্দোবস্ত থাকাই সম্ভব। কেন না অগ্নিগণ যজ্ঞ-সম্পাদন-বাগ্‌দেবে গমনাগমন করিতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা বাইতে পারে যে, এক সময়ে বিশ্বামিত্র অগ্নি পিবজনের পুত্র অদাস রাজার পৌরোহিত্য করিয়া এক জনপদ হইতে অজ্ঞ জনপদে প্রত্যাগমন-কালে বিশাশা ও শতদ্রু নদীর সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইয়া কয়েকটি শকের দ্বারা উক্ত নদীতীরের স্তব করেন।

এতদ্ব্যতীত ধন-লাভ ও বাণিজ্যের জন্য যাদের কথা কি জনপথেও গমনাগমনের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। (৫।৫৫।৬)

আৰ্য্য জনপদ বাতীত বৈদিক কালে কতিপয় অনাৰ্য্য দেশের কথাও বেদে দেখিতে পাই। উদাহরণস্বরূপ কীকট দেশের উল্লেখ

করা যায়। প্রমগন্ড এই জনপদের রাজা ছিলেন। সাধন বলেন, হুদ লইয়া যে টাকা দেয় তাহার নাম মগন্ড; প্রমগন্ড তাহার পুত্র। এই কীকট দেশ বর্তমান বিহার প্রদেশে অবস্থিত। উইলসন্ লিখেন বলায়, "Kikat usually identified with South Behar. বোনার আরও স্পষ্ট করিয়া বলেন, It seems not impossible that the native inhabitants being particularly vigorous, retained more influence in Magadh than elsewhere after the country had been Brahminised." Indian Literature (Translation) P. 79. হুতরাং দেখা যাউতেছে যে, আৰ্যগণ পার্শ্ববর্তী জনপদের সকল তথা রাধিবির অস্তিত্ব বথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। আৰ্যগণ নিত্যন্তই pastoral life বাপন করিতেন ও সে যুগে একদেশের সহিত অন্যদেশের কোনই সম্পর্ক ছিল না, এমন কথা বলা চলে না।

এই সম্বন্ধে বাতীত গাফার সেনেরও নাম আছে। তথ্য উৎকৃষ্ট লোম পাওয়া গাইত। অতএব কোন্ বিশেষ বংশে কোন্ বিশেষ ব্রাহ্ম পাওয়া গাইত, আৰ্যগণ তাহারও সংবাদ রাখিতেন। এই সকল প্রমাণসমূহও কি কেহ মনে করিবেন যে, আৰ্যগণ কেবল গরু চরাইয়া ও মাটিতে লাঙ্গল দিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন?

৪১০-১৮ খ্রকের সময় আৰ্যগণ সরহু নদী অতিক্রম করিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। রাজ্যলিপ্সা ও প্রাধান্য-লাভ চিরদিনই মাহুকে উদ্বৃত্ত করে। আৰ্যগণও নানা ক্ষুদ্র রাজ্য-সংস্থাপনের পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না।

৫১২৬ খ্রকে সরহু নদী বাতীত দৃষতী ও অপমান নাম পাওয়া যায়। ইহা হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, আৰ্য সভ্যতা বহুদূর-বিস্তৃত হইয়াছিল।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিন্ধু।

ছন্দিবার

সে যদি তেমন ক'রে চায় ;
নিমেষে অবনি খেনে যায়
শোণিতের নিত্য নৃত্য,
সব সেহ সর্পি চিত্ত
খান রোদ্দি' চকিতে ঝাঁড়ায়
অচল পাথর ছবিপ্রায়।

সে যদি তেমন ক'রে চায়
সব যাওয়া অখনি তুরায়।
পাথানে ঝাঁড়িয়া বৃক্ষ
যবে মো ফিরাই মূণ
সে আঁধি পিছন হ'তে ছায়।

মাগা-কর শিঠিতে তুলায়।
চলিতে চরণ তুলি' ফেলিতে তা খাই তুলি'
সমুখ বিমূখ সম ভায়,
মুখ যে আগনি ফিরে যায়।
নিখিল তুঙ্গময়ন
ডাকে যদি আগণণ
আগন পরাণ যদি কাটে
সে মাগা-ঝাঁধন নাহি কাটে।
কোথা কেবা কোথা কি যে কোথা আনি রহি নিজে
শুধু সে কৃষকী আঁধি ভায়;
সে যদি তেমন ক'রে চায়।

সে যদি তেমন ক'রে ডাকে ;
 থাকি না যেখানে কেন কাণে আসি পলে পেন
 বরষ পুরিরা যেন থাকে ।
 নরু গিরি পারাবার পার হ'রে অনুবার
 গিছানা আকাশে তাসি আসে
 যাকুল বাহর ডোরে বাধি ল'য়ে দূঢ় যোরে
 না জানি কেমনে টানে পাশে ।
 কোথা রহে বর্ধ লাজ লগোরে কৰ্দ-কাজ
 পূরন গৌরব কোথা থাকে ।
 সে যদি তেমন ক'রে ডাকে ।
 সে যদি তেমন ক'রে বলে
 লাজ-কতি হুখ-হুখ কে হিগাব করে হুখ
 পশি আমি অনলে বা ললে ?
 লজব বা অলজব নাহি রহে অহুতব
 চাহি না সত্ত্বের কিবা পিছে
 আসে-পাশে নব রাগে তাহারি নিবেশ জালে
 সে যিনে সকলি আর মিছে ।

এখন সে তির দুনি'বারে
 কণেক তুলিতে কেবা পারে ?
 তাই বোর লর মনে পৌছিল গেই অগে
 জীবনের অগ্রিম কিনারে ;
 সত্যার তৈরব হবে মুক্ত কা'প বিয়া হবে
 পড়িবারে চাহিব—পাশারে
 তখনো পিছন থেকে সে যদি আরেক ভেঙে
 আমারে পামিরা সেতে বলে,
 নারিগ লজিতে বাধি আগদিখা-রেখাখানি
 নিবিতে নিবিতে র'বে অলে ।
 আগি'রবে একবার চিরশান্তি পাড়াবার
 বরণের বিরাট মাধুরী
 সবলে টানিবে নিতি তাহার আছান-শ্রুতি
 আমারে রাখিবে ক'রে ছুটি ।
 চেতনার শব্দ বল সুখি হবে অচপল
 সে শুধু আগিবে এক বলে
 সে যদি মরিতে নাহি বলে ।
 ঐশ্বিনেস্তনারাধন বাগী

যুদ্ধের দস্তুর*

(গদ্য)

রূপ ও তুর্কী উত্তর মলের সৈন্তেরা গবেষাত্র
 গুণিবর্ষণ শুরু করিয়াছে ।

চারিদিকে এমনি জমাট কুহাশা বে,
 শত্রুপক্ষ আর নজরের আড়ান ঠেঁকাছে ;
 একসঙ্গে জমায়েৎ গিশৃংখল গৈত্রদিকে দূর
 হইতে কতকগুলি টুকরা মেঘের নত
 দেখাইতেছিল । সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া
 কসাকেরা মিছা তাহাদের দৃষ্টিকে বাধিত
 করিতেছিল ; কারণ, এমন ভীষণদৃষ্টি কাহার

আছে যে, ঐশ্বাদের
 করিতে পারে !

এখানে তুর্কীরাই অগ্রবৃত্তি শুরু
 করিয়াছিল । ফণেরা শুধু জবাব দিতেছিল ।
 কোন পক্ষই শত্রুকে দেখিতে পাইতেছিল না ।
 সকলের অগোচরে শত্রুরা গুঁড়ি মারিয়া
 পাছে একেবারে কাছে আসিয়া পড়ে, সেই
 ভয়ে অগ্রবৃত্তির বিরাম ছিল না । এমন
 অবস্থার উত্তর পক্ষের সৈন্তেরা একরূপ নানাক

* বঙ্গ ভগবানিক ভাসিনি দেখিরাতিচ্ ডানশেবে হইতে ।

হইয়াও, পরস্পরের প্রতি এলপাতাড়ি গুলিগুলি কমিরা জানাইয়া দেয় যে, তাহারা খুব কাছাকাছেই আছে !

রজনী বীরে বীরে নানিয়া আসিতেছিল,—তুবারক্ষেত্রের উপর বিক্ষিপ্ত মৃতদেহগুলির উপরে একটা আধারের আত্মরূপ বিছাইয়া দিয়া ! রাত্রি যত গভীর হইয়া উঠিল, অগ্নিবৃষ্টিও তত কমিরা আসিতে লাগিল এবং বন্দুকের শব্দও চারিদিককার সঁাৎসেতে তিক্তা আগহাওয়ার ততই ঘামিয়া পড়িতে লাগিল । শেষে অস্ত সব শব্দ বন্ধ হইয়া গেল। মাঝে মাঝে শুধু আত্মের আত্মনাশ, বা মৃত্যু ঘোড়ার চীৎকারে রণক্ষেত্রের নীরবতা ভাঙ্গিয়া বাইতেছিল । সারাদিনের হাঁটুনি ও লড়াইয়ের প্রবেশ পৈতৃকদের দেহ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল । এমন কি, মৃত শব্দদের সমাহার রাখিবার জাবনাও তাহাদের আর ভাবিবার অবসর ছিল না । তখন তাহাদের আগে শুধু একটিমাত্র কামনা জাগিতেছিল,—সে শুধু বিশ্রামের কামনা, নিশ্রাম কামনা !

“নূতন বছরের আশোদ-আহ্লাদ সব মাটা !”—কথাগুলি যিনি বলিলেন, তিনি একজন কর্ণেল, ছাকার ক্ষুদ্র হইলেও দেখিতে বেশ বলিষ্ঠ । কথাগুলি যাহাকে বলা হইল, তাহার আকৃতি দীর্ঘ, ক্লশ ; একপাও বস্ত্রের বন্ধনীতে তাহার একখানা হাত ঝুলিতেছিল । একটা তুর্কী বাড়ীর বারান্দার তাঁহার দুইজন বসিয়াছিলেন ।

“কপাল বড় মন্দ হে ! চিঠিপত্রও কিছু পাওয়া গেল না ।”

“সেরস্তে আমি বড় মাথা বাঁজাছি না ।

বুড়ক্ষেত্রে ডাকঘরের বন্দোবস্ত যে কেমন চমৎকার, তা আমার বিনক্ষণ জানা আছে !”

• “তবু ক লাইন চিঠি গেলে মনটা কিছু খুসি থাকে । লড়াই কর্তে কর্তে বড়দিনটা কোথা দিয়ে কেটে গেল, তা আশ্চর্য পালান না, আবার আজকের হালখাতার দিনটাও তেমনি করেই কেটে গেল আর কি ! হা ভগবান ! দেশের বাড়ীতে এখন কি রকম হাস-খুসিই চলছে ! আমি চোখ দুটোই বেন দেখতে পাট, ছেলেপুলেরা আহ্লাদে আটখান্না হয়ে নেচে-কুঁদে বেড়াচ্ছে ! আমার বোধ হয়, তোমার জী আর ছেলেমেয়েরাও এককণে আমাদের বাড়ীতে এসেছে ! আমাদের কোন বসর না পেয়ে নিশ্চয়ই তারা তারি ভাবিত হয়ে উঠেছে—”

“আচ্ছা, তোমার হাত এখন কেমন ?”

“খুব ভালো ; তবে মন্দও হতে পারে, ভালও হতে পারে ।”

“বেশ ত, এই অস্থিরের তুমি ছুটির দরপাত্র কর না কেন ?”

“বল কি । ফৌজে এখন কর্মচারীর যে অভাব হয়েছে ! বিশেষ এতকাল আরহা একসঙ্গে আছি যে, ছাড়াছাড়ির কথা মনেও আমি ভাবতে পারি না । না—আমি যাব না । দাঁদ আমরা কখনও ফিরতে পারি, তাহলে দুজনই একসঙ্গে ফিরব ।”

রাত্রি তখন বেশ থমথমে হইয়া আসিয়াছে । গাঁয়ের পথে হঠাৎ একটা অলস মশালের রাসা আলো এবং একঝোড়া মর্গ গোঁকে ছুই ভাগে ভাগ-করা একখানা মূখ দেখা গেল ।

মশালের দিকে চাহিয়া কর্ণেল বলিলেন,
“প্যাটেলিফ আসছে, না?”

সেই গাঢ় অন্ধকারকে সমুজ্জ্বল করিয়া
মশালটা আঙ্গিনায় ঢুকিল। একজন ছোট-
সওয়ার কর্ণেলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

কর্ণেল হিঙ্কাসা করিলেন, “তুমি কোথায়
যাচ্ছ?”

“কাঁড়িতে, হুজুর! লড়াইয়ের সুর
হয়েছে!”

“আজ্ঞা, যাও। আরে—এ কি?”

আঙ্গিনায় জনকদের সৈন্ত ধ্বংসাবস্থা
করিতেছিল।

প্যাটেলিফ মশালটা উঁচু করিয়া তুলিয়া
ধরিল। সেই আলোর দেখা গেল, কয়জন
লোক কাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

“ওরে বুড়ো নেড়ে,—আর বলছি,
আর! তোদের আশায় কি একপাত
হুস্থির থাকতে পার্জ না? নিপাত যা—
তোরা নিপাত যা!”

কর্ণেল উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, “ওহে
বাপু,—সব ওখানে দাঁড়িয়ে হচ্ছে কি?”

“হুজুর, এ একজন তুর্কী। লোকটা
ঝোপের নীচে লুকিয়ে ছিল, আমরা হঠাৎ
থোঁটাকে ধরে ফেলেছি।”

“ঝোপের নীচে লুকিয়ে ছিল, কি
করছ?”

“কাপুরুষের মত জড়সড় হয়ে ঝোপের
তলায় পড়েছিল, হুজুর! লেফটেন্যান্ট
জাসিলিয়েফ বলেন, একে আপনার কাছে
হাজির কর্তে। এর নাম হচ্ছে মাহুদ।”

মশালটা বন্দীর মুখের সামনে ধরা হইল,
তাহার নাক খুব লম্বা, গৌরব বেশ ঘন,

নাকের মাঝখানটা ফুলা। কপালে একটা
নুতন ক্ষত। পুরাণো তাঁবু হইতে ছিঁড়িয়া
লওয়া একখানা ময়লা কাপড়ে তাহার
মাথার ক্ষত বঁধা।

বন্ধুর দিকে ফিরিয়া কর্ণেল সোজায়ে
বলিলেন, “বাহবা কি বাহবা! আমরা যে
একজন হোম্মা চোম্মা অফিসারকে পাক্‌ড়াও
করেছি!”

তাহার বন্ধু মেজর বন্দীর দিকে তীক্ষ্ণ
নেত্রে মনোযোগের সহিত চাহিয়া ছিলেন।

“শুধু চোম্মা-চোম্মা অফিসার নয় হে,
লোকটা আমাদের চেনা-তনো। তুমি কি
একে চিন্তে পারছ না? ওর কপালের
কাটা দাগটার দিকে চেয়ে দেখ দেখি!
ওর বা হাতে নিশ্চয়ই দুটো আঙ্গুল নেই!”
—সৈন্তদের দিকে ফিরিয়া তিনি হুজুম
দিলেন, “ওরে, ওকে ওর বা হাতটা বার
কর্তে বুলতো!”

“হী—হী—ঠিক! এ হচ্ছে মাহুদ বে,
একজন তুর্কী কর্ণেল।”

“হঁ—ফেরার বন্দী। লোকটার বহাত
ভারী খারাপ দেখছি। প্রধান সেনাপতি
বোধ হয় ওকে ভালি করে মার্তে হুজুম
দেবেন। আহা, বেচারার জড়ে আমার হুখে
হচ্ছে। ওকে এখানে নিরে আর ত রে।
তোরা খালি একজনকে এখানে পাহারায়
রেখে বত ঐগ্গিরি পারিস, সব সনে
পড়ু!”

মাহুদ বে ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।
ধারের কাছে একজন সিপাহী বন্দুক বাড়
দাঁড়াইয়া রহিল।

বন্দীকে একটি দৈত্যবিশেষ বলিলেও চলে।

তাহার বরষ পক্ষাশের কিছু বেশী। চোখ দুটিতে তারি একটা চঃখের ভাব মাখানো। গোকজোড়া পাকিয়া ধব্ধবে হইয়া গিয়াছে। থাকিয়া পাকিয়া তাহা কাপিয়া উঠিতেছিল। তাহার পরণে ছোঁড়া-গোড়া কাপড়। কাঁথের উপরকার কাপড়খানার টাটকা রক্তের দাগ লাগিয়া রহিয়াছে।

কর্ণেল কঠোর স্বরে কহিলেন, “বন্দীর কাঁধে ও কিসের রক্ত?”

“হুজুর, লোকটা যখন কোপের ওলায় ছিল, তখন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমাদের গলা ঐরা ভেঙ্গে যাবার যোগাড় হয়েছিল। আমাদের ডাকাডাকির উত্তরে ও তার পা দুটোকে আমাদের দিকে রেখে গলা-ফড়িংয়ের মত শুধু নাচাচ্ছিল। কাজেই কিরিলিয়েফ শেখটা মহা খাপ্পা হয়ে ওকে বেগনেটের এক খোঁচা না দিয়ে আর থাকতে পারলে না। খোঁচা খেয়ে ও তখন শুড়-শুড় করে বেরিয়ে পড়ল। লেফটেন্যান্ট ডািসিলিয়েফ মানা না করলে আমরা ওখনি ওর দফা রফা করে দিতাম।”

“সাইমন, বন্দীর জন্তে একখানা চেয়ার দিয়ে এসো।”

বন্দী আসনের উপর বসিলেন। তাঁহাকে এখন আরও ছয়-ছাড়ার মত দেখাইতেছিল। এই নূতন হুজুমদারদের কাছে আসিয়া তিনি বড় বেশী সাব্বনা পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাহার নাক যেন গোক-জোড়ার ভিতরে বসিয়া গিয়াছিল, মাথা ছই কাঁথের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছিল।

মেজর তুর্কী তাহা জানিভেন। তিনি

বলিলেন, “এস আগে আমাদের দেখাশোনা হয়েছে, না? আপনার নাম কি বামুন বে মর?”

তুর্কীর মাথা যেন আরও নীচে নামিয়া গেল। তাহার ভাবগতিক দেখিয়া বেশ বুঝা গেল যে, তিনি একেবারে নিরাশার-শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

“যদি আমার ভুল হয়ে থাকে, বলুন। আপনি কি অস্ত্র লোক?”

“আমি কখনো মিথ্যা বলি নি”—বন্দী উদ্বিগ্ন দাড়াইলেন। “কাল আমি ক্যাথানলিক থেকে পালিয়ে এসেছি। আজ আবার আমি আপনাদের কাছে বন্দী হলাম। পায়ে হেঁটে বেশী দূর পালানো ভারী শক্ত”—বন্দী স্নান হাত করিলেন—“বিশেষ, পায়ে আর মাথার চোট লাগলে ত কথাই নেই। এখন আবার আমার কাঁধ অথম হয়েছে,—সেটা—”

কর্তব্যের পদোংমুক্ত কাঠিভ্রাক্ষণের বিফল চেষ্টা করিয়া মেজর বলিলেন, “বসুন আপনি। এ কথা জানেন তো, যে যুদ্ধের দস্তর হচ্ছে—”

“আমাকে তা মনে করিবে দেবার দরকার নেই। আপনাদেরই জিৎ। আমাকে গুলি করে মারবার হুকুম দিন। সমস্ত দায়িত্ব বাড়ি নিজেই আমি পালিয়েছিলাম। মৃত্যু-খেলার আমি হেরেছি। মৃত্যুই আমার দণ্ড।”

মেজরের স্বর করুণার কোমল হইয়া আসিল।

“আপনার সঙ্গে কি কোনরকম খামাপ ব্যবহার করা হয়েছে?”

“কিছু না। ধীর কাছে আমি বন্দী
 ছিলাম, তাঁর চেয়ে দয়ালু লোক আর থাকতেই
 পারে না। তাঁর নিঃসঙ্গ বিছানায় আমাকে
 তিনি শুতে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে থেকে
 আমি ‘স্বাভাব-স্বাভাব’ সব পেয়েছিলাম।
 তিনি আমাকে শত্রুর মত না দেখে তাইয়ের
 মতই দেখেছিলেন।”

“তবে, আপনি কি ভেবেছিলেন যে,
 যখন আপনাকে কলিঙ্গ পাঠানো হবে,
 তখন আপনি কষ্ট পাবেন?”

“আমি জানি, কলিঙ্গ তাদের বন্দীদের
 সঙ্গে কুব্যবহার করে না।”

“তবে আপনি পালালেন কেন?”

“কারণ জেনে এখন লাভ কি? আমি
 আপনাদের হাতের সুঠোর। আপনারা
 কর্তব্য পালন করুন; কিন্তু কাজটা শীঘ্র
 শেষ করে ফেলুন—শীঘ্র শেষ করে ফেলুন।”

বৃদ্ধ তুর্কীর বুকের মধ্য হইতে যেন
 একটা রক্ত ক্রন্দনের অক্ষুট স্বর ফুটিয়া
 উঠিল। তিনি খেম এখনই একেবারে
 জাঙ্গিয়া পড়িবেন।

“কি আশার যে আপনি পালাছিলেন,
 আমি ভ’ কিছুতেই সেটা বুঝতে পারছি
 না। তুর্কীরা সব যুদ্ধগাতেই রণে ভঙ্গ
 দিচ্ছে। আপনাদের কোন্‌ আশ্রয়ের
 সংস্থান নেই? সবার ছেড়ে বাসিন্দারাও
 পালাচ্ছে। আপনার আর কিছুকাল বৈধব্য
 ধরে থাকা উচিত ছিল। এ বৃদ্ধ শত্রুই
 শেষ হবে। তখন আপনাকে ছেড়ে দেওয়া
 হোত; আপনিও অন্যত্রাশে ধরে ফিরে যেতে
 পারতেন।”

“কবে?”

“অপরাধ নেবেন না। আপনার কথা
 আমি বুঝতে পারছি না।”

“বুঝিয়ে দিচ্ছি। কি যে হচ্ছে, আমি
 তা ঠিক জানতে পারছি। আমি ভুল বলছি
 না। ঈশ্বরাল থেকে হুকুমনামা বেরিয়েছে
 যে, রাতের সব লোক যেন এগিরা
 মাইনরে চলে যায়। অস্ত্র অস্ত্র সকলের
 সঙ্গে হস্ত আমায় পরিবারবর্গও এগিরা
 মাইনরে গিয়েছে। তাদের আমি কি
 করে আবার দেখতে পাব? বেঈশ্বর বলা
 বাহুল্য। আমার যা কর্তব্য ভেবেছি,
 আমি তা করেছি। এখন আপনাদের কর্তব্য
 আপনারা করুন। যুদ্ধের চাত থেকে
 কোথাও ছাড়ান নেই। যা হবার, তা
 হবেই। এ যে কপালের লেখা! নির্যাস
 যেটুকু সময় দিয়েছে, তার বেগে কেউ
 বাচতে পারে না। আমি যা করেছি, তা
 আমার নিজের জন্ত করিনি—”

বন্দীর স্বরভঙ্গ হইল। হতাশতাবে তিনি
 মাথা নাড়িলেন।

যেজর নম্রতাবে কহিলেন, “আপনি
 আপনার পরিবারের কথা বলছেন। আমারও
 পরিবার আছে।”

“আপনি যে আবার পরিবারের কাছে
 ফিরে যেতে পারেন, এতজ্ঞে নিজেকে
 ভাগ্যবান মনে করুন। আপনি যে শত্রুর
 হাতে বন্দী হন নি, এরজ্ঞ ভাগ্যবানকে
 দণ্ডবার দিন।”

“জানি যে আপনাকে এত কথা
 জিজ্ঞাসা করছি, এসব আপনার পরিবারের
 মঙ্গলের জন্ত, জানবেন।”

যতক্ষণ সকলে বৃদ্ধ রহিলেন।

কর্ণেল বলিলেন, “ওহে, জিজ্ঞাসা কর না, ঠিক ক’টি ছেলে-মেয়ে।”

অতি অস্পষ্টবরে
“চারটি।”

“তার কি বেশ বড়-সড়?”

“না—সব ছোট। আমার বড় মেয়েটি এই সব ছ-বছর পড়েছে।”

মেজর আপন-মনে বলিলেন, “আমারও বড় মেয়েটির বয়স ঠিক ছয়।”

মেয়েৰ কথা মনে করিয়া বন্দী প্রকুর হইয়া বলিলেন, “আমার মেয়ে কাল রূপবতী হবে। তার ডাগর চোখ দুটি এখনি কসকে ওঠে। পাঁচমাস ধোল, তাকে শেব দেখেছি; বিদায় নেবার সময় সে কেঁদে-কেটে রাস্তাল বাধিরে তুলেছিল। আমার ছোট খোকাটির বয়স এখনো এক বছর হয়নি। আমি যখন বাড়ী ছেড়ে আসি, সে বেচারী তখনো হাঁটুতে শেখেনি। তার সবাই আশ্রয়ানোপলের কাছে থাকে; সেখানে আমার চমৎকার একখানি বাড়ী আর বাগান আছে। আমরা বড় সুখে ছিলাম। তারপর এই যুদ্ধ বাধল। যে লড়াই বাধিয়েছে, আমার অভিলাষ তাকে দখল করুক! ভগবান সারথান। বারা এই যুদ্ধের সাগর বইয়েছে আর আমাদের নিশ্চাপ সুখের সাগরে আশ্রয় জেলেছে, ভগবান নিশ্চয়ই তাদের শান্তি দেবেন।”

মেজর বলিলেন, “আপনার কথা ঠিক। এরকম যুদ্ধে কার উপকার হয়? আমি ধারবার মনে মনে এই কথা নিয়ে তোলা-পাড়া করে দেখেছি। আমরাই কথা বকুন, না হয়! মনে করুন, আমি যদি

কাল মরে যাই, তবে আমার পরিবারের কি হাল হবে?”

মেজর করার ধারণা একেবারে বদলিয়া গেল। তিনজনকে একসঙ্গে বসিয়া বসিয়া এখন আপন আপন পরিবারের সুখ-দুঃখের কথা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। মেজর বন্দীর সকল কথা তর্জমা করিয়া কর্ণেলকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। কর্ণেলও বন্দীর প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন।

কর্ণেল কহিলেন, “শুধু বল যে, ছেলেমেয়েদের ভালোর জন্যে উনি ক্রমিয়ার না গিরে এরকম ভাবে জীবনকে বিপন্ন করিতে গেলেন কেন? মাসকতকের হেরফেরে এমন আর কি হোত?”

মামুর উত্তরিতভাবে বলিলেন, “আমার দেশের লোকেরা,—বিশেষ জীলোকেরা যদি কলদের ভাল করে জানতো! তাহলে যতদিন আমরা না ফিরে যেতাম, ততদিন তাঁরা বাড়ী-ঘর ও ছেলেমেয়েদের নিশ্চিন্ত হয়ে দেখতে সন্তোষ পাবতো। কিন্তু তারা ত’তা বোঝে না। আর দিনকয়েকের মধ্যে বাসিন্দারা সবাই পালাবে; আপনাদের সৈন্তেরা যখন আশ্রয়ানোপলে গিরে হাজির হবে, সহর তখন একেবারে খালি হয়ে পড়বে। সহরে পড়ে থাকবে শুধু জনকতক ক্রিমিচান।

“কেন আমি পালিয়ে এসেছি? আমার জী আর ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে। যাদের আমি ভালবাসি, তাদের কি দশা হবে, আপনি কি তা জানেন? না, জানেন না। বলছি, শুধু না। আমার জী আতঙ্কে

সার। হঠে, বাড়ী, ঘর, বাগান, সব ছেড়ে পালাবে। যা পড়ে থাকবে, ঐকি কি আর্থে নিশানরা তা লুণ্ঠন করবে। আমার স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে ইগাংল-যাবে বটে, কিন্তু সরকার থেকে সে কোন সাহায্য পাবে না। আর এতগুলো হতভাগ্য পরিবারকে সাহায্য করার টাকা সরকার কোথা থেকেই বা পাবেন? সরকার শুধু তাদের এগিরা মাইনরে, কিংবা 'স্টোরি'তে প্যারি দেবেন। তারপর আমার পরিবারের কথা সকলেই ভুলে যাবে। একাকিনী অবলা রমণী সে, এমন বিপাকে পড়লে কি কর্তে, বলুন তো? তার চোখে এক-মাত্র উপার আছে। আমার মেয়েগুলি নীরোগ সুস্থ, সে তাদের বেচে ফেলবে। বাঁদীর মত পনের ঘরে তারা মানুষ হবে, বাপের নাম পর্যন্ত জানবে না, শুনেবে না। বড় হলে, কোন ধর্মী কাছে আবার তাদের বিক্রী করা হলে। আমার ছেলেরাও দাস হবে। আর আমার স্ত্রী? তার হৃৎকেন্দ্রে গেলেন কোন হারিয়ে গিয়ে চুকে। আমি যদি এক বছর পরে দেশে ফিরি, তখন গিয়ে কি দেখতে পাব? কিছু না! না বাড়ী-ঘর, না স্ত্রী, না পুত্র-কন্যা! তাদের যে কি দশা হল, তাও আমি জানতে পারব না। তাদের পোজ দিতে পারে, এমন কোন লোককেও আমি দেখতে পাব না। আমি আমার সব হারাব। আমার বাড়ীর মালিক হবে অন্য কেউ। আপনি আমাকে বিজ্ঞাসা করেছেন, কেন আমি পালিয়েছি! মনের ব্যতন। সেইবার সাহস আমার আর ছিল না, তাই আমি পালিয়েছি।"

মেজর বলিলেন, "হ্যাঁ—হ্যাঁ। যুদ্ধ তারি নিষ্ঠুর, তারি নিষ্ঠুর ব্যাপার!"

বন্দী আবার বলিলেন, "এই হতভাগ্য যুদ্ধের আগে আমি বাড়ীর বাইরে সংগ্রহ পা বাড়াতাম না। আমি আমার সব ছেলেমেয়েগুলির হস্তকালে উপস্থিত ছিলাম। দিনে দিনে তাদের আমি বাড়িতে বেগেছি। বছরের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বৃদ্ধি কি রকমে পেকে উঠেছে, তাও আমি লক্ষ্য করে গেয়েছি। তাদের সবগুলিই কখন আমার সব প্রথমে চিনতে পেরেছিল, আমার তা বেশ মনে আছে। কখন তারা প্রথমে কথা কটবার চেষ্টা করেছিল, আমার আগে তা গাথা আছে। ক্রমে ক্রমে তাদের পল্কা লাগলি, পানীর ছানার মতই তাদের ছোট মুখের সেই রাস্তা রাস্তা হ্যাঁ,—সমস্ত—সমস্ত—আমার সমস্তই মনে আছে। প্রতিদিন এখন কে তাদের খাওয়াবে দাওয়াবে? তাদের গর্ভধারিণী? সে অভাগিনীও যে এখন বিপাকে পড়ে! আগে—"

বন্দী কথা শেষ করিতে পারিলেন না। উদার নক্তি ও সাহস, দুইই লুপ্ত হইয়াছিল।

কর্ণেল অত্যন্ত অসন্তোষের সহিত ঘরের মধ্যে পাঠচারি করিতে করিতে বলিলেন, "বুড়, আপনাদের আর আমাদের মাঝে তফাৎটা কি? হ্যাঁ, আমরা সকলেই ঐ এক গর্তে পড়ে আছি।"

মেজর বলিলেন, "আচ্ছা, বন্দীকে নিয়ে আমরা কি করব? এঁকে আজই সেনা-পতির কাছে না পাঠিয়ে, আমাদের কাছে রাখলে হয় না?"

“হ্যা—হ্যা—বেশ ত ! আম উনি এখানেই থাকুন। ঠিক কথা—যা বলেছ। আম উনি থাকুন।”

“কাল পর্য্যন্ত ঠিক আমাদের সঙ্গে রাখা চলবে ত ?”

“কেন চলবে না ! উনি এখানেই থাকুন, আমি সাইমনকে ওর সঙ্গে বিজ্ঞানা-পত্রর ভোরেও করতে বলব। চার-চারটি সস্তান ! আহা, চার-চারটি সস্তান !”

“জাচ্চা, সেনাপতি যদি ঠিক গুল করে মারতে হুকুম দেন ?”

“হঁ, কি বলচ—সেনাপতি যদি ঠিক গুল করে মারতে চান ? এ সবই সৈবের উপর নির্ভর করে। বন্দীর যে চারটি ছেলেমেয়ে, সেনাপতিকে কি এ কথা কোন গতিকে জানিয়ে দেবার উপায় নেই ?”

“তোমার কি মনে হয় না যে, বুকের মধ্যে অনেক ঘৃণাকর ব্যাপার আছে ?”

“জ্যা, তা—যা বলেছ,—হ্যা, আছে বৈ কি !—কর্ণেল বড়ই অগ্রকৃতিহ হইয়া উঠিলেন—“কিন্তু কর্তব্য ত’ পালন করতেই হবে। আমরা লক্ষ্য করেছি, মনে আছে ত ?—বাক, সব চুপোর বাক ! এ লক্ষ্য-ছাড়া ব্যাপারটা মন থেকে এখনকার মত বুকে কেলতে পাবলে অস্বস্তি; কাল পর্য্যন্ত শান্তিতে থাকা যাবে। বন্দী মদ খান কিনা, বিজ্ঞাপা কর। উনি আজ রাতে আমাদের সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করবেন।”

কর্ণেল ও মেজরের সহিত বন্দী শরন করিলেন। বাহির হইতে মাঝে মাঝে দুই চারিটা বন্দকের আওয়াজ আসিতেছিল। তা-ছাড়া আর সব নীরব-নিঃশব্দ।

মেজরের ঘুম চাটখা গিয়াছিল। তিনি কেবলই এপাশ ওপাশ করিতেছিলেন। লেপখানা একবার ছুড়িয়া ফেলিতেছিলেন, আবার গায়ের উপর টানিয়া লইতেছিলেন। এইবার লটখা মলবার তিনি খবরের কাগজ পড়িবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কাগজখানা হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া গেল। মাঝে-মাঝে তিনি ঘুমন্ত বন্দীর দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন; অভাগার ভট্ট হইতে হুঃস্বপ্নের অস্পষ্ট ভাষা বাহির হইতেছিল। মেজরের চিন্তাও খুঁসিয়া খুঁসিয়া ক্রমাগত সস্তানের দিকে সরিয়া আসিতেছিল। বন্দীর সস্তান নয়,—তিনি ভাবিতেছিলেন, নিজের সস্তানের কথা।

অবশেষে, যখন তিনি চোখের পাতা মুদিলেন, তখনও তিনি যে ভাবনা কুলিতে পারিলেন না। তাঁহার চিন্তা সেই রক্তাক্ত রণক্ষেত্র হইতে হাওয়ার-হাওয়ার মাইল পার হইয়া, যেখানে, চারিদিকের নিরালা শব্দ-ক্ষেত্রের জামলতার মাঝে তাঁহার শান্তিহরণ পরিবারবর্গ বাস করিতেছিল, সেইখানে ছুটিয়া গেল। সেখানে শুদ্ধ নাই, মৃতদেহ নাই, ধ্বংসপাথরে রক্তের ঢেউ নাই।

হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, তিনি একটি মাকারগোছের ঘরে গিগা হালির হইয়াছেন। এককোণে ছোট বাতির সূহ আলোয় ছুটি ছোট বিজ্ঞানা দেখা যাইতেছে। বিজ্ঞানার মণারীত মধ্য হইতে ঘুমন্তের নিঃশব্দ শব্দ আসিতেছে। মেজর একটি বিজ্ঞানার মণারী কুলিয়া ধরিলেন। ভিতরে একটি ছোট্ট মেয়ে ঘুমাইয়া আছে,—গা হইতে লেপখানা সে খুঁসিয়া ফেলিয়া দিয়াছে।

আপনার মোটা মোটা পা-তুপানি সে
জুড়াইয়া পেটের কাছে তটাইয়া আছে,
টোট-তুপানি তার ফাঁক-করা। এই চুলুপে
যেহেটি সামান্যনের স্তনস্থলনার পব "এখন
একবারে এগাঠিয়া পড়িয়াছে। মেজরের
"দেহমাথা দুটি বহুকণ দরিদ্রা সেট গুমস্ত
ননীর পুতলির পানে দ্বির চাইয়া রহিল।"

মেজর আপন-মনে বলিলেন, "বুমাও
তলালী, বুমাও বর্ণের পরী।"

তিনি দ্বিতীয় বিজ্ঞানার নিকে গেলেন।
মহুত্বের এই ছোট টুকুনাটির দিকে এক-
বার চাতিয়া দেখ! এখনো বরষ তাহার
দুই বছর হয় নাই, কিন্তু উপরন্তু মধ্যে এই
লীলপুষ্ক দিনন্তোব শুধু বৃদ্ধ দেখি, বৃদ্ধ
দেহি মন ছাড়া আর কিছুই জানে না।
তার কচি কচি গাশচটিতে আঁড়-আঁড়ির
দাগ। শত্রুদের একজনের সঙ্গে সে কলিক
লুদি করিয়াছে, তাহার পাশে যে বিভাগটি
পারের মধ্যে মাথা লুকাইয়া শুইয়া বুমাট-
তেছে, তাহাকে দেখিলে এ কথা স্পষ্ট
বুঝা যায়। মেজরের খোকাটি কেমন
মোটা-মোটা। গোল মাথাটি তাহার
কঁকড়া-কঁকড়া চুলে ভরা। বহু বয়স
হালা নবর গালে ঐ যে ছোট টোলটি,
ঐখানটিতে চুমা খাইবার জন্য মেজরের
মনে ভারী সাধ হইতে লাগিল। কিন্তু না,
—চুমা খাইতে গেলে সোনামণির খুন
জানিয়া যাইবে।

পারের আঙ্গুলে ভয় দিয়া মেজর আস্তে
আস্তে পারের বগটিতে গেলেন। সেখানে
তাঁহার স্ত্রী বড় ছেলের সঙ্গে শুইয়া আছেন।
বড় খোকার বরষ ছয় বৎসর। আপনাব

ভাই-বোনের চেয়ে বরষে বড় বলিয়া
মনে মনে তাহার বড়ই গর্ব! বাতির শিখা
কমাত্রা বেওয়া চাইয়াছে; নীলরঙের বৃদ্ধ
আলোর মাত্রা-পুষের দেহ রঞ্জিত। বিদ্যা-
নার পাশটিতে ছোট টেবিলের উপর
যেতবেব কোটোগাক ও এতখানা খোলা
খবরের কাগজ বহিয়াছে। মেজর বুলিলেন,
"টিক গুনাইয়া আসলেই তাহার প্রিয়তা
খবরের কাগজে তাঁহারই কথা পড়িতে-
ছিলেন। খবরের বেওয়ারে দেওয়ারে মেজ-
রের আরও করখানি ছবি টানানো।
তাঁহার স্মৃতি এখানে কেব ভুলে নাই।
সামান্যনে, ছোট্ট হইয়া মেজর তাঁহার প্রিয়
ওঠে চুখনের দাগ আঁকিয়া দিলেন,
তারপর গোথ বুলিয়া তিনি স্ত্রীর কপালে
আর একটি চুখন করিলেন।

এখানে চারিদিকে অগাধ শান্তি, গভীর
সুপ্তি ও মধুর প্রেম বিরাজ করিতেছে।
এই সব বৃন্দ বহু হইতে সমস্ত অন্তত,
হতাশা ও স্তম্ভ-হিংসার চিন্তা দূর করিবার
জন্য এখানে যেন কোন অপরাধী বেশপুত
একান্ত প্রাণে প্রাণনারত রহিয়াছে।

তখন অল্পমুহুর্তে মেজরের দিকে
কেব লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইত,
তাঁহার মুখে পুশক-হাসির লীলা ফুটিয়া
উঠিয়াছে।

ঠাৎ তাঁহার মুখের হাসি মুছিয়া
গেল। হাসির পরিবর্তে তথার আগা
উঠিল, একটা বিষম ও ভয়ের ভাব।
তিনি উঠবার চেষ্টা করিলেন, পারিলেন
না। তিনি যেন তখন একটা বিচি-
ত্ৰাণ দৃষ্ট দেখিতেছিলেন, তাঁহার পোশ-ত-

এবার দীতল হইয়া শিরায় শিরায় বহিয়া চলিয়াছিল।

তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট বাড়ীর যে ঘরখানি একটু পূর্বে এমন নিশাড় ছিল, তাহা এখন অস্পষ্ট বরলহরীতে ভরিয়া গিয়াছে। ছেলেমেয়েরা বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে। তাহাদের মাথার উপর এক-পান্না নিশ্মিলে কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহারা সবধে উর্দ্ধমুখে সেটিকশানে ভাকাইয়া! কি লুকানো ঐ মেঘের মধ্যে,—কি লুকানো আছে? পিতার বৃকের স্পন্দন দ্রুততর হইল—সে বৃক যেন এখন ফাটিয়া চৌচির হইয়া বাইবে।

ধীরে ধীরে ধীরে কালো মেঘ ছলিতে ছলিতে নামিয়া আসিতেছে, কাপিতে কাপিতে নামিয়া আসিতেছে।

শিশুরা সব বিছানার উপর হইতে নামিয়া পড়িল। তাহারা ভরে চোঁচাতে নামিল, কিন্তু কোনখান হইতে কোন উত্তর আসিল না। তাহারা মাকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কালো মেঘ মাঝখানে পড়িয়া তাহাদের মাকে চোখের আড়াল করিয়া দিল। সেই রহস্তময়, ভীষণ, অস্পষ্ট মেঘখানা ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া যেন একটা স্পষ্ট আকার ধারণ করিল। অবশেষে সকলেই দেখিতে পাইল—কি সে ভিনিষটা! সে এক দীর্ঘাকৃতি লোকের মৃতদেহ এবং সেই দেহের চারিপাশ ঘিরিয়া চারিটি শিশু! শিশুরা বাতনার ফুলিয়া ফুলিয়া কাদিতেছে—তাহাদের ছোট বৃক যেন জাঙ্গিয়া হইয়া বাইতেছে।

খানিকপরে সাতসে ভর করিয়া মেজরের ছেলেমেয়েরা মৃতদেহের কাছে আগ্নেয়া আসিয়া দেখিতে লাগিল। মেজরের বুকিতে বাকি রহিল না যে, সে খব কাঁচাব? কপালে সেই কাটা দাগ, সেই সাদা চুলে ভরা মত্ত মাথা, সেই ঘন, ধবধবে গোঁফ! কাঁধের সেই নূতন ক্ষত-চিহ্ন, রক্তাক্ত বস্ত্র ও ছেঁড়াখোঁড়া ইজার পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক দেখা বাইতেছে।—না, কোন সন্দেহ নাই! মেজরের বুকটা খড়াসু খড়াসু করিতে লাগিল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

মেজরের ছোট মেয়েটির রান্না গাল পাঞ্জাপ হইয়া গেল। সে কিজ্ঞাপা করিল, “কে,—কে এ কাজ করেছে?”

মেজরের বড় ছেলেটি দ্বিজ্ঞাপা করিল; “কে মানুষে এক?”

সবকে ঘিরিয়া যে চারিটি অচেনা, কালো শিশু বিছান্তের মত চোপ লইয়া বসিয়াছিল, তাহারা সকলেই আশ্বুল ফুলিয়া মেজরকে দেখাইয়া তাঁহাকেই দোষী করিল।

“ওই আমাদের বাপকে মেরেচে। ওই আমাদের পথে বসিয়েচে—আমাদের ভিখারী করেছে।”

মেজর কথা কহিতে গেলেন। কিন্তু তাঁহার গুঁঠ যেন পক্ষাবাতগ্রস্তের মত আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার নিজের সম্মানেরা শক্ত মূখে তাঁহার কাছ হইতে সরিয়া গেল। ছোট ছেলেমেয়েদুটি যেন আশ্চর্য্যের অন্ত আপনাদের হাততালি তুলিয়া ধরিল। মেজর তাঁহার মেজের কাছে আগাইয়া আসিলেন, কিন্তু সেও

ওরে পলাইয়া গেল। তারপর সে মেজবের হাত দেখিয়া আঁকড়াটা উঠিল, “রক্ত! রক্ত!”

মেজর নিজের চাত্তুর দিকে চাহিলেন। শিশুর কথা ঠিক। তাঁহার হাতছটি—রক্তে “মাগা।

মেজর আবার কথা কহিবার জন্য নিশ্বাস চেঁচা করিলেন। তাঁহার মনে হইল, যেন কাহার লোহহস্ত সম্বোধে তাঁহার কণ্ঠ চাপিয়া ধাপরোধ করিতে চাহিতেছে! তিনি সুস্থির ভ্রম প্রাণপণে মুস্থিতে লাগিলেন,— হাঁ, মরিয়া হইয়া! সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া! তারপর আর একবার শেষ চেঁচা— তারপর, ভাগরণ!

গায়ের লেপখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া তিনি একলাফে বিছানা ছাড়িয়া মাটিতে পড়িলেন। বন্দী তখন উঠিয়া বসিয়াছেন। কর্ণেলও টেবিলের ধারে বসিয়া আছেন।

“কিহে মেজর, তুমি ত’ দেখছি দিবা একচোট ঘুমিতে নিলে!”

“হাঁ, আমি যন্ত্র দেখছিলাম।”

একটু বিচলিত হইয়া কর্ণেল বলিলেন, “কি। তুমিও?”

“—‘তুমিও’ বলছ, তাঁর মানে?”

“আমি নিজে এক বিশ্রী যন্ত্র দেখেছি।”

“তুমি কি যন্ত্র দেখেছ? বন্দীর বিষয়ে কিছু?”

“তাই বটে। নটলে আর কি দেখব, বল? তুমি আমার একরত্তি ভুলোড়িগাকে জান ত?”

“বেশ জিজ্ঞাসা করছ, বাহোক! আমি না তাঁর ধর্মপিতা? আমি তাকে জানি ন?”

“তট্টিত’ হে—আমি বে দেখছি বেজার গাথা! আমার মাথাটা নিশ্চয় খারাপ হয়ে গেছে। বাকু—পোম বলি। ভুলোড়িয়া কাল সারারাত যন্ত্রে আমার পা ধরে মিনতি করেছে,—ঘাতে বন্দীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কেন?’ সে বলে, ‘বন্দীর ঘরেও ছোট ছোট ভুলোড়িয়া আছে। তাদের কাছে বাবার ভ্রাতৃ বন্দীকে আমি ছেড়ে দিতে পলছি।’—আজ্ঞা, কাল রাতে যবে কিছু ছিল বলে কি তোমার মনে হয়?”

মেজর পলকহীন মেয়ে কর্ণেলের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

“তোমার যন্ত্রের কথা আমাকে বল।”

মেজর তখন যন্ত্রের কথা খুলিয়া বলিলেন।

কর্ণেল কহিলেন, “বাস্তবিক, এ সব শুনে আপনা-আপনি মনে একটা কুসংস্কার জন্মে যায়। ওসব কথা থাঙ্—এখন ব্যাপারটার একটা নিশ্চিন্তি কর্তৃত্ব হবে ত’। যত শীঘ্র পারা যায় বন্দীকে সেনাপতির কাছে পাঠানো ছাড়া আর ত’ কোন উপায় দেখি না। তার নগিবে কি আছে সে কথা সেনাপতিই বলতে পারেন, আমরা না। বন্দীকে আর বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে রাখলে, আমরা পাগল হয়ে যাব।”

“তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। বন্দীকে আমি নিজে সেনাপতির কাছে নিয়ে যাব। কি বল?”

কর্ণেল মানদিকে চাহিতে লাগিলেন, বাহাতে মেজরের সঙ্গে তাঁহার গোথোথোখি না চয়। বলিলেন, “বেশ ত’! তাতে আর আমার আপত্তি কি?”—তাঁহার পর পদস্থ

কর্ণধারী তাঁহার অধীনস্থ কর্ণধারীকে যে
 ঘরে হুকুম দেন, সেটরূপ ঘরে তিনি
 কহিলেন, “এখন যত শীঘ্র ইচ্ছা তুমি যেতে
 পার। সেনাপতির কাছে গিয়ে, বন্দীকে
 তুমি তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে আসবে।”

•••

মামুদ কেঁকে সঙ্গে লইয়া মেজর বোড়ার
 চড়িয়া ধীরে ধীরে চলিলেন। তাঁহার মনের
 ভিতরটা আগেকার মতই ভ্রমোন্মত্ত করিয়া
 ছিল। খানিকপরে তাঁহার রূপ ফোড়ের
 শেষ কাঁড়িতে গিয়া পৌঁছিলেন।

কুশাশার ভিতর হঠাৎ একজন কসাক
 সওয়ার বাহির হইয়া আসিল।

সামনের একটা হুঁড়িপথ দেখাইয়া দিয়া
 মেজর জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা বাপু, এ
 পথটা কোথায় গিয়েছে, বলতে পার ?”

“শত্রুদের আচ্ছাড়, হজুর!”

“আজ কোন তুর্কীকে তুমি
 পেয়েছ ?”

“না হজুর—একজনকেও না। তাঁরা
 দেখছি আজকে বেজার ঠাণ্ডা বনে” গেছে।
 কিন্তু কাল তাঁরা পাগলের মত বিষম গোল-
 মাল করেরছিল। ভগবানের দরবার আজ
 আব্বায়া একটু শান্তিতে আছি।”

মেজর বন্দীকে তাঁহার পিছনে আসিতে
 ইঙ্গিত করিয়া সেই হুঁড়িপথের ভিতর
 হুকিলেন। কিন্তু তাঁহার বেনাদুর বাইতে
 না বাইতেই সেই কসাক সওয়ার বোড়া
 ছুটাইয়া আবার তাঁহাদের কাছে আসিয়া
 হাজির হইল।

মেজর জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিহে,
 ব্যাপার কি ?”

“হজুর, একটা কথা আপনাকে বলতে
 ভুলে গিয়েছি। তুর্কীরা বেশী তফাতে নেই,
 তাহা হঠাৎ একটা হাদাম বাড়িয়ে তুলতে
 পারেন।”

“বহৎ আচ্ছা! আমিও চোখ বুজে থাকব

“হজুর, আপনার বন্দী পালাতে পারেন।”

“কোনু ভয় নেই। তুর্কীরা কোথায়,
 কি রকমে আছে, বন্দী আমাকে সে সব
 দেখিয়ে দেবে বলেছে। তুমি যেতে পার।”

কসাক প্রস্থান করিল। অল্পপূর্বে তাঁহার
 হুইকনে নীরবে বহুদূর অগ্ৰসর হইলেন।

তাঁরপর মেজর বোড়া খামাইয়া দাঁড়াইয়া
 পড়িলেন।

“মামুদ বে, আমার কথা শুন। এখান
 থেকে তুর্কী ফৌজ বেশী তফাতে নেই।
 আপনি পাশান! আত্মরক্ষা নাগলে আপনার
 চেঁকেনেয়েদের কাছে যান। শুনতে পাচ্ছেন,
 বা বলছি? আমারও ছেলে আছে, মেয়ে
 আছে। এ কি, কি জন্তে আপনি এখনো
 যাচ্ছেন না? আর সময় নেই। আপনি
 যদি বেনাদুর দাঁড়িয়ে থাকেন, তাহলে আমার
 মন বদলে যেতে পারে। দোঁহাই আপনার!
 —মশাই, আপনি কি আমার কথা বুঝতে
 পারছেন না?”

মামুদ বে যেন পাথরে গাঁরগত হইয়া
 গিয়াছেন! কেবল তাঁর চোখদুটি অলিয়া
 অলিয়া উঠিতেছিল। তিনি যেন স্বপ্ন দেখিতে
 ছিলেন।

অতি দীর্ঘভাবে মেজর কহিলেন, “আপ-
 নাকে আবার বলছি, আপনি বাতান, নিজের
 বাড়ীতে ধরে যেতে পারেন।”

এই কলনাতীত সত্য যেন বন্দী এতকণে
খুঁজিতে পারিলেন। মানুষ বে হঠাৎ হেঁট
হইয়া মেজরের হাট ধরিয়া আবেগভরে ডাড়া
চুপন করিলেন।

“কল, শুভ্রন। আপনি আমাকে এমন
*জগের পাশে রাখলেন, যা আমি কখনো
শোধ করতে পারব না। আপনি কোনদিন
বন্দী হলে শত্রুপন্থিরে আপনারই মৃত সঙ্গীর
এক তুকীকে দেখতে পাবেন—এ কথা বলা
আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু,—একটি
কথা। ঈশ্বর এক। ধর্ম্য ভিন্ন হতে পারে,
কিন্তু ঈশ্বর এক। আমি শপথ করছি,
আমি আর আমার ছেলেমেয়েরা বছরদিন
বাঁচব, ভগবানের কাছে ততদিন প্রার্থনা
আপনার জন্য প্রার্থনা করব যে, আপনার
ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে তিনি যেন আপনাকে
রক্ষা করেন, যেমন আমার ছেলেমেয়ের মুখ
চেয়ে আপনি আমাকে বাঁচালেন। ভগবান
আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। বিদায়, কল!
বিদায়।”

তারপর,—শাছে মেজর তাঁর মন বহুশান
যেন এই ভরেই—হঠাৎ ঘোড়াকে জোরে
চাবুক কশাইয়া মানুষ বে অদৃষ্ট হইয়া গেলেন।

মেজর পানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।
বোব হহ, আরও কিছু আগাইয়া নিরাপদ
ব্যবস্থানে চলিয়া যাইবার জন্য তুকীকে তিনি
সময় দিতে চাহেন।

যখন তিনি কল ফাঁড়ির কাছে ফিরিয়া
আসিলেন, তখন সেই কলক অঝোরোচীর
গর্জিত আবার তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

মেজর কহিলেন, “ওহে বাপু, তুমি ত’
ঠিক বলেছিলে। বন্দী পাণ্ডারে গেছে।”

কলক ভাল করিয়া তীক্ষ্ণ নেত্রে মেজরের
মুখটা দেখিয়া লইল। পদত্ব কর্তৃপক্ষের দিকে
কোন সাধারণ দৈনিক পেন-সকম দৃষ্টিতে
চাহে না! তারপর বলিল, “তার জোর
বরাত, হজুর! আমাদেরও বন্দীর অস্তিত্ব
নেই।”

মেজর যখন ঘবে ঢুকিলেন, বর্ণিল তখন
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হল হে?”

হুজুর, আমাকে প্রেস্তার ককম।
আমি বন্দীকে ছেড়ে দিচ্ছি।”

কর্ণেল কিছু বলিলেন না। সামনে আসিয়া
নীচর আনন্দে মেজরকে অভিনন্দন করিলেন।
দেই তাঁচার উত্তর।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

আধুনিক ভারত

তৃতীয় কাল-বিভাগ

ইংলণ্ডের ভারতশাস্ত্রাঙ্গা

ইংল্যান্ডের ভারত-বিজয়ে ভারতে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, সেই পরিবর্তনের ইতিহাসে এই সিপাহী-বিদ্রোহ, একটা সুনির্দিষ্ট কালবিভাগের আরম্ভ স্থচনা করে। তখন হইতেই এই ইতিহাসের সেই তৃতীয়ভাগ আরম্ভ হইল, যে-ভাগে দুবোপীর্ণ সভ্যতা ও ভারতীয় সভ্যতা উত্তরোত্তর মিশিতে আরম্ভ করিয়াছে।

১৮৫৭—৫৮ অব্দের ঘটনায়, ইংল্যান্ডের ক্রটিগুলি প্রকাশ হইয়া পড়িল। ভারতের শাসনভার নতুন করিয়া বড়িয়া কুলিবার ক্ষমতা আইনের যে পাণ্ডুলিপি ইতিপূর্বে প্রস্তুত হইয়াছিল, ইংলণ্ডীয় মহাসভার দুই বিভাগেই, বহু বাদানুবাদের পর ঐ পাণ্ডুলিপি ২রা আগষ্ট ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে আইনরূপে গৃহীত হইল। কোম্পানী যৌর বিশেষাধিকার হইতে বঞ্চিত হইল এবং কোম্পানীর অধিকৃত সমস্ত ভূসম্পত্তি ইংলণ্ডের রাজার অধিকারভুক্ত হইল। ভারতের রাজপ্রতিনিধিগণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া লর্ড ক্যানিং, ১লা নভেম্বর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এক রাজকীয় ঘোষণাপত্র জারি করিলেন। ঐ ঘোষণাপত্র ভারতের অধিকার-পত্র হইয়া গড়াইল।

মহারাজা ঘোষণা করিলেন যে, তিনি স্বয়ং ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিবেন,

কোম্পানীর নিয়োজিত কর্মচারীগণকে বহু বৎসর বাহাল রাখিবেন, কোম্পানীর সহিত রাজাদিগের যে-সব সন্ধি হইয়াছিল সেই-সব সন্ধি মাজ করিবেন, এবং স্বকীয় অধিকারসকল যেদ্রুপ সতর্কতার সহিত রক্ষা করিবেন, রাজাদিগের অধিকারও সেইরূপ সতর্কতার সহিত রক্ষা করিবেন।

পুরাতন ভূস্বামীদিগের ভূসম্পত্তিতে স্বকীয় স্বত্বাধিকার বজায় থাকিবে (কোম্পানী উদ্বাসিনীগকে বঞ্চিত করিয়া ঐ সকল অধিকার চাষাদিগকে প্রদান করিয়া ছিলেন) এইরূপ অঙ্গীকার করা হইল।

তাহার পর, মহারাজা ঘোষণাপত্রে এই কথাগুলি সংযোগিত করিলেন :—

"যে সকল কর্তব্যের বন্ধনে, যে সকল দায়িত্বের বন্ধনে আমরা সমস্ত প্রজামণ্ডলীর সহিত আবদ্ধ, সেই একই কর্তব্য ও দায়িত্বের বন্ধনে আমরা ভারত-রাজ্যের অধিবাসীদিগের সহিতও আবদ্ধ। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাহায্যে, ঐ সকল কর্তব্য যথাযথরূপে ও ধর্মতঃ পালন করিতে আশাধিক্ষে সমর্থ করিব। খৃষ্টপূর্বের সভ্যতার আমাদের নির্দেশ একটা অন্ধ বিশ্বাস আছে, ঐ ধর্মের সাধনা আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি; কিন্তু ইহা আমরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের নির্দেশ ধর্মবিশ্বাস আমাদের কোম প্রজার উপর বলপূর্বক চাপাইয়া বিবাহ আমাদের কোম অধিকারও নাই, ইচ্ছাও নাই। আরও এই কথা আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, কোন বিশেষ ধর্মবিশ্বাসের দ্রুপ কিংবা ধর্মদ্রুপের দ্রুপ

কাহারও প্রতি অসুগ্রহ বা নিগ্রহ অবর্ণন করা হইবে না। পরন্তু সকলেই অগম্যভাষ্যসহকারে ও সমান-রূপে আইনের আশ্রয় লাভ করিবে; ইহাই আমাদের ইচ্ছা ও আবেশ। এবং আমাদের বাহ্যিক প্রতিনিধি তাহারের প্রতি আমাদের এই উপবেশ ও আবেশ যে, তাহার দ্বারা আমাদের কোন প্রকার ধর্মগির্বাস ও ধর্মাসুষ্ঠানের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করেন—যদি করেন, তবে তাহার আমাদের অস্তিত্ব-ভাঙ্গন হইবে.....আরও আমাদের এই ইচ্ছা যে, মতদূর সম্বন্ধ, জাতি ও ধর্মনির্দেশে আমাদের সকল প্রকার অগম্যভাষ্যসহকারে ও উদ্বাস্তভাবে আমাদের কার্যকর্মে নিযুক্ত হইতে পারিবে।”

মহারাজী আরও ঘোষণা করিলেন যে, বিজ্ঞোহীদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিবেন যদি তাহার ১৮৫৯ অব্দের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে তাহারের অন্ত্রপ্রসন্ন সন-কারের হস্তে প্রত্যর্পণ করে এবং সব গৃহে ফিরিয়া আসিলে। কেবল যাহার ত্রিটিয় প্রজাতিগকে হত্যা করিয়াছিল তাহারাই ক্ষমা হইতে বঞ্চিত হইবে।

রাজীব অস্বীকারগুলি ইংলণ্ড রক্ষা করিয়াছেন। রাজী যে কার্য্যাসুক্ষ্মেয় রেখাপাত করিয়াছিলেন, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী হইতে ইংলণ্ড তাহার অসুগ্রহণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

এই কার্য্যাসুক্ষ্মেয় পাত্রসম্পর্ক পর্যালোচনা করাই আমাদের পক্ষে সুবিধা। প্রথমে সাধারণ রাষ্ট্রনীতি; তাহার পর, শাসন-কার্য্য, সাময়িক বন্দোবস্ত, বিধিব্যবস্থা ও শিক্ষা; পরিশেষে বৈধারিক ও ভৌতিক উন্নতি।

অনেক ও আকবর যে কার্য্য সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের রাজনিধির দ্বারা সেট কার্য্য সম্পন্ন হইল। এই তৃতীয়বার,—ভারতের সমস্ত রাজা এক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। কোম্পানী রাজাদের সহিত যে সব সন্ধি করিয়াছিল সেট সন্ধির প্রত্যাবে রাজারা কোম্পানীর অধীনে আনিয়াছিলেন। কিন্তু কোম্পানী রাজাদিগকে বিজিত পক্ষ বলিয়া জ্ঞান করিত, আশ্রিত বলিয়া জ্ঞান করিত না। তাহাদিগকে রক্ষা করা পূরে থাকে, কোম্পানী তাহাদিগকে দুর্বল করিবার চেষ্টা করিত, এমন কি তাহাদিগকে বন্দন করিবার চেষ্টা করিত। তাহা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজারা কোম্পানীর অসুগ্রহ ছিল, (১) অনেক কোম্পানীকে বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছিল। তাই, এই সব বিজ্ঞোহের গোলাযোগ চুকিয়া গেলে, ইংলণ্ড স্বকীয় রাজশক্তির একটা নূতন পত্তনভূমি স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ভারতের সমস্ত স্বতন্ত্রাঙ্গ, দেশীয় রাজাদিগের রাজা ও ত্রিটিয় আধিকারভুক্ত রাজা—সমুদ্রই এক সাম্রাজ্যের অধীনে আসিলে এবং তাহার অধিবাসী হইবেন—ইংলণ্ডের অধিপতি।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এক গুরুতর লর্ড ক্যানিং এই রাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন :

“দ্বিতীয় রাজবংশের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। দেশোত্তার উত্তরাধিকারের শেখ-দাখিরার অস্তিত্ব

(১) সিংহাসনচ্যুত রাজারাই বিজ্ঞোহের বেষ্টা ছিল। সিংহাসনচ্যুত রাজারা সকলেই অসুগ্রহ অথবা উদাসীন ছিল। ইহার ব্যতিক্রমত্ব—সেই সব স্বতন্ত্রাঙ্গের সাধারণ-ভূগতিগণ বাহ্যিকের কৃপাসনের উপর যোষণা করা হইয়াছিল।

হইয়াছে। এক্ষণে ইংলণ্ডেরই সমস্ত ভারতের অধিস্বাধিত অধিবাসী এবং ইংলণ্ডের রাজপুত্রিই ভারতের সর্বস্বত্বের ভারপ্রাপ্ত। এই সর্বস্বত্ব, ইংলণ্ড সমস্ত রাজ্যদিগের সমুদ্রে সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের অধিস্বাধিত এক্ষণে এমন একটা বাস্তবতা লাভ করিয়াছে, যাহা ইতিপূর্বে আর কখন করে নাই। ভারতের সমস্ত ভূগতিরা ইহা বিলক্ষণ অসুত্ব করিতেছে, সকলেই উহা আগ্রহের সহিত খোঁজ করিতেছে।

আর এখানে লর্ড ক্যানিং খুটকা-ভাঙিত উদ্ভাস-মাগব ভবনের বেগ-নিরোধক প্রাচীর-বাধের স্তম্ভিত সমস্ত ভূগতিদিগের তুলনা দিয়া এইরূপ বলিয়াছেন :—

“যে সকল রাজা আমাদের অগ্রগত তাহাদিগকে বঙ্গের রাণিলে আমাদের সাম্রাজ্যের শাস্তি কবিরে না, বরং আরও বর্ধিত হইবে। যদি কখন বিদেশীয় শত্রুকর্তৃক ভারতমাত্রবৎসর আগত হইত, যদি পৃথিবীর অস্ত্রাশ্রয় অংশে ইংরাজ-স্বার্থ ইংলণ্ডের প্রাচ্য সাম্রাজ্যকে বিপর্যস্ত করিতা তুলে, তখন যেই রাজ্য-দিগের রাজ্যগুলিই সাম্রাজ্যের সর্বোৎকৃষ্ট রক্ষাভূগুণরূপে পরিণত হইবে।”

এই রাষ্ট্রনীতির ফলে লর্ড ড্যালহৌসির রাজবিধি রহিত হইল :—উত্তরাধিকারী নির্বাচনে এবং উত্তরাধিকারের নিয়ম নির্ধারণে রাজারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিলে কোন রাজার রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে অধিকারভুক্ত করিয়া লওয়া দূরে থাক,—ভাবত-সংকার, প্রাচীন রাজবংশদিগকে স্বকীয় সিংহাসন প্রত্যর্পণ করিয়াছেন; তাই, যে মহীশূর রাজ্যের শাসনকার্য ইংরাজেরা ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে পরিচালন করিয়া আসিয়াছেন, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সেই মহীশূর-রাজ্য মহীশূরের প্রাচীন রাজবংশ পুনঃপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু রাজ্যদিগের দরবারে একজন করিয়া ইংরাজ রেন্ডেণ্ট

থাকেন এবং তাঁহাদের রাজ্যের মধ্যে এক একদল ইংরাজ-রক্ষীসৈন্য গ্রহণীয়রূপে অর্পিত করিলে। রাজারা আপনাদিগের মধ্যে কিংবা কোন এমিরিক বা যুরোপীয় রাজপুত্রের সহিত সন্ধিবন্ধন করিতে পারেন না।

এক্ষণে ছোট বড় ৭০০ পঞ্চাশো ভারতসাম্রাজ্যের অস্বত্ব হইয়াছে; রাজ্য-দিগের রাজ্যের পরিমাণ, সমস্ত ভারতের এক তৃতীয়াংশ এবং উহার লোক সংখ্যা ৬০,০০০,০০০।

ব্রিটিশ সরকারের আশ্রয়ে থাকিয়া, এক্ষণে রাজারা ইংলণ্ডের অগ্রগত দ্বিত্ব বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। ভারতে ইংলণ্ডের যুগের আগমন, সাম্রাজ্যের পরিচালনা, রাণীর ছুটি “ফ্রান্সি”, রাণীর মৃত্যু,—এই সব উপলক্ষে, খুব দুঃখামের সহিত রাজস্বত্ব প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যখন কপের সঙ্গে গোলযোগ বাধে, এবং ভারতের পত্র, যোগ্য-মুদ্রণ সমস্ত, চীন-অভিযানের সমস্ত, সমস্ত রাজ্যের ইংলণ্ডকে সৈন্ত দিয়া সাহায্য করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

অবশ্য, শুধু অগ্রগত যুগভারতী প্রকৃত আত্মগতের—বিশেষত প্রাচ্য রাজ্যদিগের আত্মগতের তেমন অল্প প্রাতিষ্ঠ বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ব্রিটিশ প্রাধিকার রাজ্য অধিকাংশ রাজ্যদিগের স্বার্থ। খুব কম রাজবংশই জাতীয় ভাবাপন্ন; প্রাচীন রাজবংশের সংখ্যা আরও কম। সমস্ত ভূগতিদিগের অগ্রগত নিয়ম—একজন মুসলমান। তাঁহার এক কোটি হিন্দু প্রজা।

ভারতবাসীরা স্বকীয় রাজ্যের প্রতি তেমন আসক্ত নহে। ইংরেজরাজশক্তির অধঃপতনে প্রায় সমস্ত দেশীয় রাজবংশ ও যে সেই সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এক্ষণে ভারতেব্বরের প্রতিনিধি ভাইসরয় অধীন রাজ্যদিগের শাসনকার্যের উপর দৃষ্টি রাখেন। জাওয়ানোতে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে, কতকগুলি আইন সমগ্র রাষ্ট্রের প্রতিই প্রযোজ্য। ভারতের ক্ষেপ কোন সাধারণ আইন নাই, কিন্তু Sir Henry Maine একটা কথা ঠিক বলিয়াছেন—এতোক খণ্ডরাজ্যেই, রাজার সহিত ভাইসরয়ের আধিপত্য-অধিকারের একটা ভাগাভাগি আছে। ভারত-সাম্রাজ্যের সহিত খণ্ডরাজ্য সমূহের যে সন্ধি হইয়াছিল, সেই সন্ধির সর্ব-অঙ্গুসাবে, এতোকেরই আধিপত্যের একটা অংশ নির্ধারিত হইয়াছে।

ইংলণ্ড চান যে, রাজারা যথেষ্টাচারের দ্বারা প্রজাপালন না করেন, পরন্তু ব ব প্রজাবর্ণের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শাসনকার্য্য নির্বাহ করেন।

লর্ড মেরো ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজপুতানার রাজ্যদিগকে এইরূপ অভিভাবণ করিয়া ছিলেন :—

“রাজ্যের প্রতিনিধিবরূপ আমি কতকগুলি কথা আপনাদিগকে পূর্ব্বকার বলিবার জন্য এখনে আনিয়াছি—এ কথা আমার পূর্ব্বক ও অন্তের নিকট আপনারা তুলিয়াছেন। মহারথীর রাজসরকার আপনাদিগের নিকট এবং আপনাদিগের উত্তরাধিকারীদিগের নিকট এই অস্বীকার করিতেছেন যে আপনারা আপনাদের প্রাচীন অধিকারসকল পূর্ণ্বাভাৱে ভোগ করিতে পারিবেন, এবং আইননিরুদ্ধ না হইলে

আপনাদের সমস্ত প্রচলিত অথবা আপনারা স্বাধীনভাবে অঙ্গুসরণ করিতে পারিবেন। আপনাদের পূর্ব্বকারী ও বহুশতাব্দী হইতে আপনারা পূর্ব্বকারীরা যে আধিপত্য ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, সেই আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য মহারথীর রাজসরকার আপনাদিগকে সাহায্য করিবেন।

সিদ্ধ এই লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার জন্য আপনাদের আনুষ্ঠানিক সাহায্য আবশ্যক। আমরা যেমন আপনাদের অধিকারসমূহের প্রতি—আপনাদের বিশেষ অধিকার সমূহের প্রতি—সম্মান প্রদর্শন করিতেছি, আপনাদিগের আশ্রিত রাজ্যদিগের অধিকারাবির প্রতিও সেইরূপ সম্মান প্রদর্শন করা আপনাদিগের কর্তব্য। আমরা আপনাদের প্রশাসনিক বজায় রাখিব, কিন্তু ইহার প্রতিধানবরূপ আমরা চাহি যে আপনারা ভাল করিয়া প্রজাপালন করিবেন; আমরা চাহি যে, সমস্ত রাজ্যখানে স্বাধীন ও প্রশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে; প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতার অঙ্গুর পাকিবে; অর্থ-কারী সর্ব্বত্র নিরাপত্তা প্রদান করিতে পারিবে; কৃষিকারী নিজ জমির ফল, এবং বণিক নিজ বাণিজ্যের পণ্য-সামগ্রী অবাধে সঞ্চালন করিতে সক্ষম হইবে। আপনারা রাজ্য প্রস্তুত করিবেন এবং বাণিজ্য করিয়া প্রজাবর্ণের অবস্থার উন্নতি হই, রাজ্যের সুখি হয়—সেইরূপ জনগণের প্রাণী প্রভৃতি হিতকর অনুষ্ঠান রাজ্যের মধ্যে প্রবর্তিত করিবেন; শিক্ষার বিস্তার উৎসাহ দিবেন এবং ক্রম ও শৃঙ্খলবিধির প্রচারণা যথোচিত করিবেন।

ইহা আপনারা নিকট আনিবেন, এই সকল কাজে আপনাদেরই লাভ হইবে। যদি আপনাদিগকে হীনবল করিবার আমাদের ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে আমরা আপনাদিগকে বলিভান :—আপনারা দারিদ্র্যের মধ্যে, অস্বাস্থ্যের মধ্যে, অস্বাভাবিকতার মধ্যেই চিরকাল অবস্থিত করন। আপনাদিগকে শক্তিশালী দেখিতে ইচ্ছা করি বলিয়াই আমরা চাহি, আপনারা ধনবান হউন, আপনাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হউক, প্রশাসন প্রবর্তিত হউক।

মহারথীরা চাহার যে সকল প্রজাদের উপর ভারত-

শাসনের ভার দিরাছেন, সেই প্রজাদিগের ইহাই একমাত্র লক্ষ্য। বিধাতা সেই সকল জুপতিদিগকেই রক্ষা করেন, যাঁহাদের একটি মাত্র লক্ষ্য হাড়া আর কোন লক্ষ্য নাই—সে লক্ষ্য প্রজাবর্গের ভিত্তিসাধন।

আমি এখানে কয়েক বৎসর মাত্র অবস্থিত করিব। আমার নিকটে যে সকল মুদ্রক ও বিদ্যকর্ণ কর্মচারী আছেন তাঁহারাও অনতিবিলম্বে ইংলেণ্ড চলিরা যাইবেন, কিন্তু যে রাজশক্তি প্রতিনিবিশ্বরূপ আমরা এখানে আছি, সে রাজশক্তি শতশত বৎসরকাল ভিত্তি রাখিবে। প্রতিদিনই এই সাম্রাজ্য আমাদের মহারাজার সিংহাসনের নিকটবর্তী হইতেছে। বাণীয়া চাহাঙ্গ ও রেলপথ প্রতি বৎসর ভারতকে আরও গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিবার ক্ষমতা ইংলেণ্ডকে সমর্থ করিতেছে। এই সকল বন্ধন গোঁহের বন্ধন নহে, ইহা বর্ধন্য ক্রীতির বন্ধন, শান্তির বন্ধন। বিদিকরের দিন চলিয়া গিয়াছে; এক্ষণে উন্নতির দিন আরম্ভ হইয়াছে।

রাজা, মহাজান, আপনারা সোচাপথে অগ্রসর হউন। আপনাদের পুত্রপৌত্রদিগকে, আপনাদের প্রজাবর্গের উত্তরবংশীয়দিগকে এই ধ্রুব বাবাস্যাক্য জ্ঞানাইরা দিন যে, তাহারা এমন এক রাজশক্তির অমুগ্রহ ও আশ্রয় লাভ করিরাছে যে রাজশক্তি তাহাদের সঙ্গল হাড়া আর কিছুই চাহে না।” (২)

এই লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে লর্ড মেয়ো তিনটি মূলত্ব স্থাপন করেন। ভারত-সরকার এই তিনটি মূলত্বের অঙ্গস্বরূপ করিয়াছেন।

প্রথম মূলত্বটী এই:—কোন রাজার আচরণে, ভাটস্বরূপের হস্তক্ষেপ আবশ্যক হইলেও, মিতব্যবহার অবলম্বন করা উচিত; এইরূপ অবস্থার, ভাইসরয়, সেই রাজ্যের শাসনভার ইংরাজ বা দেশীয় মন্ত্রিদের হস্তে অর্পণ করিবেন; আবশ্যক হইলে সেই রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিরা, প্রতিনিবিশ্ব-

শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা করিবেন, অথবা কোন উত্তরাধিকারীকে সিংহাসনে স্থাপন করিবেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বরোদা রাজ্যের ক্ষত্র এবং ১৮৮৯ হইতে ১৮৯১ পর্য্যন্ত কাশ্মীর রাজ্যের ক্ষত্র এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় মূলত্ব:—যে সকল রাজ্যে অশুশীলা প্রতিষ্ঠিত হইরাছে, উন্নতির চেষ্টা হইতেছে, তদৈ সকল রাজ্যের শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ না করা। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পাইলে তবেই সেই রাজ্য অশুশীলতা হইতে মুক্ত হইবে। প্রায় সকল খণ্ডরাজ্যেই নিজের আইন আছে, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা বিচার করিবার অধিকার আছে; তাহারা নিজেই রাজস্ব সংগ্রহ করে, কেহ কেহ পণ্যস্বেচ্ছা সংগ্রহ করে; ১৮২৯ হইতে ১৯০০ পর্য্যন্ত—সমস্ত সামন্ত রাজ্যদিগের রাজস্ব ১৫,০০০,০০০ পৌণ্ড পর্য্যন্ত উন্নীত হইয়াছিল। তদুপরে কেবল ৬১৫,০০০ পৌণ্ড কাহাং ভারত-সরকারকে প্রদান করে। ঐ সময়ের মধ্যে, ঐ সকল রাজ্যের কার্য্যোপযোগী সৈন্য সংখ্যা ৮৬,০০০ ছিল। তা ছাড়া উহার সাম্রাজ্যের, সৈন্যমণ্ডলীকে ১৭,০০০ সৈন্য যোগাইরাছিল। এই শেখোক্ত সৈন্য যুরোপীয় নীতি-অনুসারে অঙ্গসম্বিত ও অশিক্ষিত।

কিন্তু দেশীয় রাজ্যসমূহের শ্রীভূক্তিসাধন খুবই অসম্ভবভাবে হইয়াছিল। নিজামের প্রধান মন্ত্রী তার শাশুর-জং, হাইদ্রাবাদকে এলিয়-মূলত সামন্ততন্ত্র-রাষ্ট্র হইতে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছেন। মাধবরাও, পরম্পরা-ক্রমে ত্রিবাঙ্কুরে, গোয়ালিয়ারে ও বরোদার

যে শাসন-প্রণালী প্রচলিত করিয়াছেন, তাহার সহিত ইংরাজশাসিত ভারতের শাসন প্রণালীর অমূল্য প্রভেদ লক্ষিত হয়। ভূপালের নগরেশ্বর স্বর্গীর রাজ্যটিকে পুনর্নয়ন সমুদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন। (৩)

স্বর্গীর কাণ্ড সম্পূর্ণ করিবার প্রতিপ্রাণে লর্ড মেয়ো আর একটি তৃতীয় মূলমন্ত্র স্থাপন করিলেন। সেই মূলমন্ত্র তাণ্ডী ভূপতিদিগের স্বশিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখা। তিনি কাথেওয়ারের রাজ্যদিগের অন্ত এক বিভাগ স্থাপন করিলেন এবং রাজপুত রাজারা স্বয়ং আমায়ের মেয়ো কলেজ স্থাপনের জন্য ৭০,০০০ পোতা টাকা স্বাক্ষর করিলেন (৪)। কিন্তু এমনও অনেক রাজা আছে যাহারা তরুণ বয়সে অস্তঃপুরের ভোগ বিলাসে হীনবীৰ্য হইয়া রাজ্য শাসন করিতেও অসমর্থ, পুত্র উৎপাদনেও অসমর্থ।

মেয়ো উপর বলিতে গেলে, উনবিংশ-শতাব্দীর বিভাগার্ধে, দেশীয় রাষ্ট্রসমূহে যে জনগণের উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে ভারতীয়

সভ্যতা ও প্রাচ্য সভ্যতার অঙ্গুলে শুভ-স্থানা করা ঘাইতে পারে। ১৮২০-এর পূর্বে, সামন্ত রাজ্যসমূহেব অস্বত্বত মূলদান রাজ্যভগ্ন নিরুৎসাহ ও নিষ্ঠুর বিদেশী মৈনিক-দলের অগ্রগাহাধীন ছিল, এবং তদন্তত্বত হিন্দুরাজ্যগুলিও আক্ষয়দিগের প্রভাবাধীন ছিল;—আক্ষয়রা তাহাদের মধ্যে নানাবিধ সুড় সংস্কার এবং নিত্যত্ব গুল ও হ্রদ্বীভজনক অঙ্গুষ্ঠানাদি প্রবর্তিত করিয়াছিল।

ঐ সমস্ত রাজ্যের রাজারা ভোগমুগ্ধে, বড়বস্ত্রে, কুচক্ষে, বিজোহে বিমুগ্ধ হইয়া গড়িয়াছিল; ঐ সমস্ত রাজ্যে, নিষ্ঠুর নৃত্যাদি প্রচলিত, প্রাণনা করতাবে নিপেদিত, রাজবনবাদের বিলাসিতার ও রাজবনস্ত্র দিগের ধনগুরুতার রাজকোষ ক্ষয়প্রাপ্ত। না-ছিল রাজ্য, না-ছিল খাল, না-ছিল ডাকের বন্দোবস্ত, না-ছিল পুলিশ। আনেকাল অনেক রাজাই শিক্ষিত হইয়াছে, এবং আর সকল রাজাই স্থাপিত হইতেছে। এখন ঐ সকল রাজ্যে মেল-পথ, ডাক,

(৩) মর-সালার জং (১৮২২—৮৩), তাহার পিতৃব্যের উত্তরাধিকারীস্বরূপে, নিজাদের প্রধান সত্ৰীপদে (১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত হন। এতদিন ইংরাজেরা বেরার প্রদেশের পতিতালন-ভার গ্রহণ করিয়া উৎকর্ষ রাজব সিদ্ধান্তকে বিবেচিলেন, এক্ষণে মর সালার জং সেই বেরার ইংরাজকে এক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিলেন। (১৮৬৩) রাষ্ট্রিক সামাজিক আর্থিক সংস্কার সাধন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের বিজোহের সময় ব্রিটিশ-সরকারকে, অগ্রগতা সহকৃত সাহায্য প্রদত্ত হয়। নিরানের বৃত্তান্তে তিনি প্রতিনিধি শাসনকর্তা (১৮৬২)। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহার ইংলও গিয়া। (১৮৭৩) ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু।

সাধনব্রত ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রচলিত হয়। ১৮৬৪ হইতে ১৮৭২ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের বৈদেশিক; গোষ্ঠালিয়ারে প্রবাসিন্ত্রী; ১৮৭৭ হইতে ১৮৮০ পর্যন্ত বরোয়ার শাসনকাণ্ড নির্বাহ করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রনীতিস্থল সচিবদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—গোষ্ঠালিয়ারের দিবসরাজ, জম্মুর কুপারায়, আলোয়ারের পতিত মানকল, কোল্‌হাপুরের বাখোরাও বারোএ, এবং মহীগুরের সুর্গি। (Sir Richard Temple India id 188০ p 76) খ্রীষ্টাব্দ

(৪) রাজকোটের রাজকুটার-কলেজ, ইন্দোরের ডালি-কলেজ, লাহোরের এডিনব-কলেজ—এইগুলি উল্লেখযোগ্য। এই সকল কলেজের দ্বািত সংখ্যা সর্বদমেত দুইশতের উপর।

টেলিগ্রাফ স্থাপিত হইয়াছে। রাত্তোর অধিবাসীরা ও ভ্রমণকারীরা এখন নিরাপদে যাতায়াত করিতে পারে। রাজকর বেশী নহে, দ্রুতকারি সড়ক সেখানে বৈয়াক ও ভৌতিক উন্নতি স্পষ্টই উপলব্ধি হইয়া থাকে।

এইরূপে ব্রিটিশ-গৱর্ণমেন্ট, ভারতকে একটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত করিলেন। ভারতের নিজস্ব অভ্যবস্য়াজন, ভারতের নিজস্ব রাষ্ট্রনীতি। এই নূতন অবস্থার দক্ষণ, একটা নূতন মন্ত্রের প্রয়োজন হইল। ১৮৭৬ অব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে মহারানী “কাইমার-ই-হিন্দ” অর্থাৎ ভারত-সাম্রাজ্ঞী এই উপাধি গ্রহণ করিলেন। (৫)

একশ্রে ভারত-সাম্রাজ্ঞা, একটা সাম্রাজ্য-সাধারণ রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করিতে চাহিলেন। পূর্বদিকে উচ্চ ব্রহ্মদেশাধিকার; স্ত্রীমের পশ্চিমে ধারাতে ভারতের প্রভাব অঙ্গুর থাকে সেই উদ্দেশে চীনের সহিত সন্ধিস্থাপন; যে-ভ্রমদেশের পশ্চিম উপকূল ভারতসাম্রাজ্যভুক্ত, সেই ভ্রমদেশে নানা বড়বড়ের প্রতিবিধান; উত্তরে,—আফগান, হিমালয় ও কাশ্মীরের রক্ষা-সৈন্তেরা তির্যক পথান্ত চেলিয়া চলিয়াছে; পশ্চিমদিকে চিত্রল-বিজয়, বেলুচ-স্থানে রেলপথ নির্মাণ। পারস্যদেশে কতকগুলি গ্রাম এবং পারস্য-উপদ্বীপের কতকগুলি দ্বীপ অধিকার-করা; বৈজ্ঞাতিক রাজ্য দ্বারা, কাগাজির সহিত আরব্য উপকূলের যোগ-বন্ধন; Kewitএর মূলতানের সহিত মৈত্রীবন্ধন; পারস্যদেশের একটা বৃহৎ টেলিগ্রাফ-লাইনের কার্যভার

এক ইংরেজ-কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ; পরিবেশে, ভারত-উপনিবেশ এডেনের বিশ্বাস সাধন;—১৮৯৮ পর্যন্ত এই এডেন-উপনিবেশ, সোমালিদিগের উপকূলকে আপন আশ্রিতের দ্বার রক্ষা করিয়াছিল।

অতএব, ভারতের ব্রিটিশ-সাম্রাজ্ঞা, ভারতীয় ক্রমবিকাশের একটি লক্ষ্য কার্যে পরিণত করিয়াছে। ইংরেজেরা বাহ্যকে “ব্রিটানিকো শান্তি” (Pax Britannica) বলিতে ভাল বাসেন, ইংরেজ-সরকার ভারতকে সেই শান্তি এবং সেই শান্তির সঙ্গে—যে-একতাপাধনের চেষ্টা জিন পতাকা কাল বার্থ হইয়াছিল সেই রাষ্ট্রীয় একতাও প্রদান করিয়াছেন। ভারতের এই সমস্ত খণ্ডরাষ্ট্র লইয়া সমগ্র একটি সাম্রাজ্য গঠিত হয় নাই, পরন্তু একটি রাষ্ট্রসমবায় (confederation) গঠিত হইয়াছে। এই সম্মিলনের ফলে, ঐ সকল রাষ্ট্রের অধিবাসী-গণ স্বাধীনতা হইতেও বিচ্যুত হয় নাই, স্বকীয় নিজস্ব হইতেও বিচ্যুত হয় নাই। তাছাড়া, এই ব্রিটিশ-সাম্রাজ্ঞা ভারতকে এশিয়ার মধ্যে একটি প্রবল রাষ্ট্রগতি করিয়া তুলিয়াছে। ব্রিটিশ ভারতের দিগ্বিজয়, ব্রিটিশ ভারতের প্রভাব ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারতের ইতিহাসে, ও এশিয়ার ইতিহাসে ইহা একটি অভিনব তথ্য। যোগল-অভিধানের শেষ হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, এশিয়ার লোকেরা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতেছিল। একটা এশিয়া-সাধারণ রাষ্ট্রনীতি

(৫) ভারত সাম্রাজ্যের নিজস্ব পতাকা—নীল কাপড়ের উপর, ভারত-ভারত; কিন্তু সরকারী ক্রিয়াকর্ম-অনুষ্ঠানে আরই ব্রিটিশ পতাকা উত্তোলিত হইয়া থাকে।

ছিল না। এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ভারত ও জাপান উভয়েই এক একটা নিজস্ব লক্ষ্য নির্ধারিত হইয়াছে এবং এক্ষণে তাহা হ্রস্বপক্ষে গণনার মধ্যে আনিতেই হইবে। কেননা, জাপান স্বাধীন এবং ইংল্যান্ডবিশেষের দ্বারা পরিচালিত হইলেও

ভারতগতর্ঘ্যমেন্টেরও কতকগুলি নিজস্ব উচ্চাভিলাষ আছে। সেদিন নিশ্চয়ই বেধে দূরবর্তী নদে যেদিন ভারতীয় লোকমত উদার কতকগুলি অভিলাষ পূর্ণ করিবার ঈচ্ছা দানী করিলে। (৬)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চয়ন

ফ্রেডারিক নিট্শে

ফ্রেডারিক নিট্শের নাম আজ সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দুই-এক বৎসর পূর্বে বাঙ্গলা দেশে নিট্শের নাম শুনিয়াছে এমন-লোক খুব কম দেখা যাইত। কিন্তু আজকাল বাঙ্গলা সাহিত্যে যখন-তখন নিট্শের নাম ও মত লইয়া আলোচনা চলিতেছে। সুতরাং এ সময় তাঁহার জীবনের দুই-চারিটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে জার্মান-সাম্রাজ্যের স্যাক্সনী প্রদেশে, লুটভেন নামক সহরের কাছে ফ্রেডারিক নিট্শে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাদরির সন্তান। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে একটি বৃত্তি পাইয়া তিনি 'পোর্টা'র স্কুলে গিয়া ভর্তি হন। দুই বৎসর পরে তিনি সেখানে 'জার্মেনিগা ক্লাব' নামে এক সমিতির প্রতিষ্ঠা

করেন। সেখানে মাসে একবার করিয়া সভাপণ পরস্পরে কবিতা, প্রবন্ধ, স্থাপত্য-পরিকল্পনা ও সঙ্গীত রচনা লইয়া আলোচনা করিতেন। জীবনের প্রথম হইতেই নিট্শের বিবাস ছিল যে, ললিত-কলামা এই মানবজাতির প্রকাশ, সেই জন্য আট তাঁহার কাছে সাধারণ 'ক্যালচার' বা তুচ্ছ আনন্দের সাহায্যী ছিল না।

কিছুদিন পরে তিনি "এন জুনিভার্সিটি"তে ভাষাতত্ত্ব পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহার চোখ খারাপ থাকিলেও, তাঁহাকে মৈস্ত্রমলে যোগদান করিতে হয়। সামরিক বিভাগে বৎসরকাল কাজ করার পর হঠাৎ একটা গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটায় তিনি মৈস্ত্রমল ছাড়িয়া চলিয়া আসেন। এই সময়ে তিনি

(৬) এ পর্যন্ত ভারতীয় লোকমত বিপ্লবিত্বের প্রতিফলন বিশেষতঃ ব্রহ্মবৈশ্য-অধিকারের প্রতিফলন ছিল। এই সকল বিপ্লবিত্বের ফলে, তির জাতি ও তির ধর্মের সংখ্যা বাড়িয়া গেল—সুতরাং কতকগুলি বাহির রাজ্য সংস্কার ঐলিগা রাশিবার পক্ষে ইংল্যান্ডেরা বেশ একটা মুক্তি দেখাইতে পারে। কিন্তু যখন ভারতে একটা ভারতীয় রাষ্ট্রবৃত্তি গঠিত হইবে, তখন ভারতবাসীরাই জাপানীদের দ্বারা রাজ্য বিচার-নীতির পক্ষপাতী হইয়া উঠিবে। এক্ষণে এই যৎসৌন্দর্য্য রাষ্ট্রবৃত্তি একাধিক হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

‘বাস্লে’তে ভাষ্য-তত্ত্বের অধ্যাপকের
প্রাপ্ত হন।

নিটশে এখানে ভাষ্যতত্ত্বের উপর যে
সকল বক্তৃতা দিতেন, শ্রোতৃগণ তাহাতে
একেবারে বিম্বিত ও মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন।
শব্দের কসরৎ না দেখাইয়া, ‘হোমারিক’ যুগ
ও ‘গ্রীক কালচারকে’ ভিত্তি করিয়া তিনি
এক নবধর্ম প্রচার করেন। শ্রব ও হৃৎ
এবং অবহেলা ও তাৎক্ষণিক নিদারুণ
আঘাতেও তিনি মুহূর্তের ক্ষণে নিজের এই
নূতন মত হইতে ত্রুটি হন নাই। অবশেষে
তিনি উন্মাদবোগ-গ্রস্ত হন এবং ১৯০০
খ্রিষ্টাব্দে লুট্টেন সহরে সন্ন্যাস ধোঁগে তাঁহার
মৃত্যু হয়।

নিটশের বিবাদ ছিল যে, আধুনিক
খ্রিষ্টধর্মে দুর্বলতার পূজা করা হয়। সন্দেহবিৎ
ও দ্ব্যগনাদের টোকা ছিল,—যে খ্রিষ্ট মাহুষের ক্ষমতা
আপনি বাধ্য-বেগনা সহিষ্ণু মাহুষকে উচ্চতর
অনন্দলোকে তুলিয়াছেন, সেই খ্রিষ্টের ধর্ম
যাহাতে অর্থও হইয়া উঠিতে পারে,—তিনি
সেই ‘চেষ্টা’ করিবেন। ওয়গনারের এই
কল্পনার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিটশে “The
Anti-Christ” ও “The Case Against
Wagner” প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।
“Thus Spake Zarathustra” নামক
গ্রন্থে তিনি তাঁহার বিখ্যাত মহামানব
(Superman) ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নরশক্তির
সাক্ষ্যের আলোচনা করিয়াছেন।

—T. P.'s Magazine হইতে

আধুনিক অস্ত্র-চিকিৎসার অপূর্বত্ব

একালে অস্ত্র-চিকিৎসার আমেরিকাই
পৃথিবী মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে।
ডাঃ উইলিয়াম জে. মেয়ো ও ডাঃ চার্লস এটচ
মেয়ো নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের অস্ত্র-চিকিৎসা
দেখিবার জন্য যুরোপ হইতে আমেরিকায়
নলে নলে লোকজন আসিয়া থাকে। ডাঃ
হার্ভে কাসিং মস্তিষ্কের অস্ত্র-চিকিৎসার
সর্বশ্রেষ্ঠ। ডাঃ অলেক্সিস কারেল জাতিতে
ফরাসী হইলেও আমেরিকায় বাস ও চিকিৎসা
করেন।

আমেরিকায় অস্ত্র-চিকিৎসকগণ মাহুষের
অঙ্গহীনতা দূর করিয়া চিকিৎসালগতে
যুগান্তর আনিয়াছেন। তোষাষ হাঁতের

কোন আঙ্গুল যদি, হাত হইতে ছিঁড়িয়া
একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে
আধুনিক অস্ত্র-চিকিৎসার ক্ষমতা সে কাটা
আঙ্গুল পুনরায় বেমানুষ ঘোড়া লাগিতে পারে।
কৃৎসিত আহত হইলে সাধারণ ক্ষতের মতই
সে স্থানটি অনায়াসে সেলাই করিয়া
দেওয়া হয়। মস্তিষ্কের মধ্যে স্বাধীনভাবে
ছুরি ঢালাইতে আমেরিকায় অস্ত্র-চিকিৎসকেরা
একটুও ইতস্ততঃ করেন না। এক দেহের
অঙ্গবিশেষ এখন অনায়াসে অন্য দেহে ফুঁড়িয়া
দেওয়া যায়।

১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে এক মিট্রো বালকের বুক
কেহ ছুরি মারে। ছুরির ফল্য বালকের

জংলিগের মাঝখানে সরাসর চুকিয়া গিয়াছিল।
বালককে যখন অস্ত্র-চিকিৎসার টেবিলের
উপর খোঁচানো হইল, মৃত্যু তখন তাহার
শিরে। এমন কি, তৃত্বাপা-টাইট ও তখন
ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে। জংলিগের উপর
সার্জনরা ছোট গবাকের মত একটি ছিঁড়
করিলেন। সেইখান দিয়া ক্ষত-স্থান দেখা
যাইতে লাগিল,—নাড়ীর প্রতি স্পন্দনে কাটা
যারে তখন ঝলকে ঝলকে রক্ত ঝরিতেছিল।
একজন সার্জন বকের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া
দিয়া জংলিগটাকে টানিয়া উপরে তুলিয়া
ধরিলেন, এবং ক্ষতস্থান সেলাই করিয়া
দিলেন। এই অস্ত্র-চিকিৎসা পকার মিনিটকাল
স্থায়ী হইয়াছিল। বালকটি কিছুদিনের
মধ্যে একেবারে আরোগ্য লাভ করিল।

যদি কাহারও গায়ে চামড়া পুড়িয়া বা
অল্প কোন কারণে নষ্ট হইয়া যায়, সার্জনরা
তাঁহা হইলে অল্প কোন লোকের কাটা চাত-
পা বা কোন সস্ত-মুত লোকের গা হইতে
চামড়া খুলিয়া আনিয়া তথায় লাগাইয়া দেন।
জনস্ হপকিন্স যুক্তিগতির ডাঃ জন ষ্টেজ
ডেভিস্ এন্সেলগীর্ড অস্ত্র-চিকিৎসা আবিষ্কার

করিয়াছিলেন। এখন চিকিৎসক-মহলে এ
পদ্ধতিটা খুব চলিয়া গিয়াছে।

রককেলার ইনষ্টিটিউটের ডাঃ অগেন্সিল
কাবল অগনীনতা দূর করবার জন্য অপর
বেহ চেষ্টে অগনিপ্রেম কাটিয়া আনিয়া
অগনীন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলেন।
এ কাজে তাঁহার মত মজা পূর্ণিতে আর
কাহারও নাই। তিনি যে শুধু জীবিত বা
মৃতমুত লোকের বেহ হইতেই প্রয়োজনীয় অঙ্গ
কাটিয়া লন, তাহা নহে; তিনি নরদেহের
নানা অঙ্গ পূর্ণ হইতেই কাটিয়া মাসের পর মাস
ধরিয়া এমন কোশলে তাঁহা জিয়াইয়া রাখেন
যে, সে-সকল বিচ্ছিন্ন অঙ্গের মধ্যে পেশী
ও শিরার কাজ সমান জীবন্তভাবেই চলিতে
থাকে! পরে প্রয়োজন হইলেই এই-সকল অঙ্গ
তিনি যোগীর দেহে বুদ্ধি দেন! (সম্প্রতি
ফ্রান্সের বণকেন্দ্র হইতে পথর আনিয়াছে,
গোলারি আঘাতে একজন সেনাপতির বাহু
উড়িয়া যাওয়ার ডাঃ কারেল এক মরণোশুণ
সৈনিকের হাত কাটিয়া লইয়া সেনাপতির
কাঁধে বুদ্ধি দিয়াছেন।)

—The World's Work হইতে

কলাবিদের আদর্শ

ইউরোপের শিল্পীরা সমুখে জীবন্ত আদর্শ
রাখিয়া কাজ করেন, এ কথা বোধ করি
সকলেই জানেন। অগতির রাজপথে মৌন
মানসী প্রতিমাকে আমরা সকলেই দেখিতে
পাই, কিন্তু সে প্রতিমাকে যে সম্পূর্ণ করিয়া
তুলিয়াছে, সে চিরদিন সর্দার আড়ালেই

থাকিয়া যায়, আমরা তাহাকে অনুমান করিতে
পারি, অনুভব করিতে পারি না।

শ্রী-কাদম্বকে বহুখানি বছর
বয়েন পূর্ব-আদর্শকে তত করেন না।
ইহার কারণ, শ্রী-আদর্শের হৃদভিত্তি। সৃষ্টন
ও স্রষ্টা শ্রী-আদর্শ শিল্পীর ভাগ্যে সহজে ফুটে

না; পূর্বে তাঁহাদিগকে একত্র বৃড়ই বেগ পাইতে হইত, কিন্তু আজকাল “The Artists' Model's Club” স্থাপিত হওয়াতে তাঁহাদের অনেকটা সুবিধা হইয়াছে। এখানে আদর্শের যোগ্য বহু রমণী একসঙ্গে বসবাস করেন এবং শিল্পীরা এখান হইতে আপনাদের পছন্দমত আদর্শ বাছিয়া আনিতে পারেন।

শিল্পীর আদর্শ হইয়া জীবন কাটাতেছেন, এমন এক রমণী এইভাবে আপনার কথা বলিয়াছেন :—

“আদর্শের জীবন সুখের নয়। কুলের বিছানার শুইয়া এ কাজ চলে না—এ কাজ বড় ক্লেশের কাজ। ধর, তোমাকে ছয় ঘণ্টা কাজ করিতে চাইবে। ঘণ্টার দশ মিনিট করিয়া তুমি বিশ্রামের অবকাশ পাইবে। এই ছয়ঘণ্টা কাল, (বিশ্রামের সময় ছাড়া) তোমাকে

এক ভঙ্গিমায় আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, মাথা একটু উঁচু কি নীচু করিলে চলিবে না—কারণ, তাহা হইলে তোমার ভঙ্গিমা খারাপ হইয়া যাইবে।

লাগুন সহরে আমরা এইরূপ যোগগার করি :—

শিল্পী যখন শুধু আমাদের মাথাকে আদর্শ-রূপে গ্রহণ করেন, তখন বেলা দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত খাটিয়া আমরা পাঁচ শিলিং পাই। ঘণ্টা-হিসাবে ধরিলে ঘণ্টার এক টাকা।

শিল্পী যখন আদর্শের সর্বাস্ব নকল করেন, তখন দশটা-চারিটা খাটিয়া সাত শিলিং পাওয়া যায়। তাহা হইলে ঘণ্টা-হিসাবে পাঁড়াইল, ঘণ্টার এক শিলিং ছয় পেন্স।

যে-সকল রমণী খুব বেশী খাটিতে পারেন, তাহাদেরও আর বছরে আশী পাউণ্ডের বেশী নয়। তবে যদি কোন রমণীর গড়ন বেশ ভাল



কলাবিদের আদর্শ

হঠ, মুখের ডোলা বা হাত-পা খুব জ্বল্লর হঠ, তবে তিনি আপনার দাম চড়াইতেও পারেন। কারণ, আদর্শ অসাধারণ হইলে শিল্পী একেবারে বর্জিত যান এবং টাকা পরচ করিতে কিছুমাত্র ইচ্ছাও করেন না।

শরীর নীচাইবার জন্য আমাদেরকে সর্বদাই সাবধানে থাকিতে হয়। সারাদিন আদর্শরূপে নসিরা থাকিরা আমরা এমন শ্রাস্ত চইরা পড়ি যে বায়ুসমন বা শারীরিক ব্যায়ামের জন্য আমাদের মনে মোটেই কোন

উৎসাহ থাকে না; অপর ব্যায়াম না করিলে ও পোশা হাওয়ায় না বেড়াইলেও চলে না। আপনার বেশী খাইলে মোটা ও কম খাইলে যোগা হইবার ভয়ও আছে। ইতমায় এদিকেও লচর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়।

আদর্শের মধ্যে 'প্লাস্টিক'র প্রলেপ বিজ্ঞ শিল্পীরা আদর্শকে নিজেদের মনের মত করিয়া লন। গারে এই কানাব প্রলেপ মাখাটা বড় কষ্টকর ব্যাপার। আমার মনে আছে, আমি যেদিন সর্বপ্রথম আদর্শের জন্য বসি, সেদিন কেবল আমার গলা ও বুককে আদর্শ করা হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরেই আমার মনে হইতে লাগিল, যেন আমার দম আটকাইয়া আসিতেছে। তাড়াতাড়ি ভয়ে আমি সমস্ত প্রলেপ গা হইতে তুলিয়া ফেলিয়া দিরাছিলাম। অপর দুই-চারদিনের অভ্যাসে এসব "কষ্টবোধ" আর থাকে না।

আমরা কাজ পাট চুই-আরম্ভ। এক শিল্প-বিদ্যালয়ে আর এক শিল্পীর গৃহে। আমাদের মধ্যে অনেক শিল্প-বিদ্যালয়ে গিয়া কাজ করিতে যাই হই না; কারণ, এখানেকাব কাজে কষ্ট বেশী। আমি কিন্তু বিদ্যালয়ের কাজই পছন্দ করি। এখানে কষ্টের মাত্রা বেশী হইলেও, টাকাটা বেশ নিঃশিতরূপেই পাওয়া যায়।

শিল্পীদের গৃহে কাজ করিতে গিয়া অনেক সময় আমরা আত্ম-সম্মানে আঘাত পাই। এক-একজন শিল্পী আছেন, বাহারি আমাদেরকে প্রাণশূন্য



পাখাণ্ড প্রতিমা বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা ভাবেন, নির্দয় বাক্যে আমাদের মনে বাধা লাগে না, অবসাদ বলিয়া কোন-কিছু আমাদের ভিতর নাই।

যাহারা কৰ্ম্ম দেন, তাঁহাদের মধ্যে আমার অনেক দয়ালু ও চন্দ্রবান শিল্পীও দেখিয়াছি। আমাদের মনে যাহারা গম্ভীর, তাহারা হঃখ-কষ্টে বা অশ্রুতে পড়িলে, অনেক সময়ে শিল্পী তাহাদিগকে সাহায্য দান করেন। প্রত্যেক

হইলে আমরাও অনেক দরিত্র শিল্পীকে সাহায্য করিয়া থাকি। আদর্শের লক্ষ্য বসিয়াও আমরা তাঁহাদের কাছ হইতে পরমা-বড়ি কিছু লই না।

আমাদের অনেক শিল্পীর আদর্শ হইবার শক্তি নাই। তাহারা ভ্রমিত হয়। তাহারা শিল্পকাল হইতেই একাজে আশ্রয় নিপুণতার পরিচয় দেয়।"

The London Magazine হইতে

প্রাচ্য চিত্রকলা

"বোষ্টন মিউজিয়ম অফ্‌ ফাইন আর্টসে" সম্প্রতি পারস্ত, আরব ও ভারতীয় চিত্রাবলী এবং সচিত্র পুস্তক-প্রদর্শনী ও চিত্র-বিচিত্র পুথির এক চমৎকার প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার ডেমহ্যান ডব্লু রস পুথিবী-প্যাটনে বাহির হইয়া প্রাচ্য চিত্রকলার এই সকল সমুদায় যোগাড় করিয়া আনিয়াছেন। ফ্রান্সে গত কর বৎসর ধরিয়া যে-সকল পারস্ত ও ভারতীয় চিত্রে প্রদর্শিত হইতেছিল, বোষ্টন মিউজিয়মে এইসঙ্গে সেগুলিকেও দেখানো হইতেছে।

এই প্রদর্শনীর যে বিশেষ একটা মূল্য আছে, সে কথা বলা বাহুল্য। দশম চইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত, প্রাচ্য চিত্রমালা ও লুক্সেমবুর্গ চিত্রালয় বত-রকম পদ্ধতি দেখা যায়, এই প্রদর্শনীতে তাহা সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রথম যুগের পারস্ত-চিত্রে জুব্বী ওদীর ছাপ্‌ ২৬ স্পষ্ট। পঞ্চদশ শতাব্দীর শিরে চীনদেশের প্রভাব পড়িয়াছে। কারণ, তৈয়ুস

লংএর রাজত্ব-কালে চীনদেশ পারস্তের সংস্রবে আসিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পারস্ত-কলার মজা ও রংকলানো একেবারে খাটি—পরশের নীতি-পদ্ধতির আঁচটুকু পর্যন্ত তাহার উপর পড়ে নাই। এই সময়ের ছবিগুলিতে বিচিত্র বর্ণের অভিরাম নীলা দেখিলে মন মজিয়া যায়। আর তাহাদের রেখার কারিগরীও সুন্দর! চিত্রকরেরা সমসাময়িক যুগের উৎসব, যুদ্ধ, রাজসভা ও বর-সংসারের দৃশ্য অঙ্কন করিতে, তাহা কতাত্ত লক্ষ্যপ্রাণী হইয়া উঠিয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে প্রাচ্য কলার ভারতীয় চিত্র-পদ্ধতির প্রাধান্ত দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে যোগেশ রাজত্বকালে ভারতীয় চিত্রকলা উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল। ভারত শিরে রাজ-সম্রাটের মূর্তি-চিত্রই সকলের চেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহাদের রেখাপাত ও বর্ণ-রঞ্জনেও যথেষ্ট লালিত্য আছে; এবং বিশেষ করিয়া

উল্লেখযোগ্য তাহারের স্থান
চমৎকার স্বভাবাভিগামিতা।

“Hydraulic Automata” নামক
বিখ্যাত পুঁথির সচিত্র পরগুলিও অল্প



• একটি পুঁথির ছবি
(ভারত পারস্ত অঙ্কন পদ্ধতি)

চিত্রগ্রাহী নহে। ধারণ শক্তিশালী হইতে
তাহার অঙ্কনকাল আরম্ভ হইয়াছে। এই
পুঁথিখানি কনস্টান্টিনোপলে আবিস্কৃত হয়
এবং এ ধরণের পুঁথির মধ্যে এইখানিই
না কি প্রথম। পুঁথির যারোখানি
মাত্র পাঁচ। পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে
যে-সকল মূর্তিপট আছে, তাহার মধ্যে
“মুসলমানী যুগকে”র ছবিখানি অল্প
সকলগুলিকেই হাস মানাইয়াছে।
ইহার বৈখ্যামালায় কোমলতা, সোমালি
রংমাখানো নীল গোষ্ঠাকের উজ্জলতা
এবং সমগ্র রচনার শৌণ্ডিক্য ও সরলতা,
সপ্তদশ শতাব্দীর পারস্তদেশের ওস্তাদ-
পটুয়া আগা মিরাককে মনে করাইয়া
দেয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক চিত্রের
মধ্যে, সপ্তদশ শতাব্দীর ভারত-পারস্ত
• রচনা-পদ্ধতির সংমিশ্রণে যে যুগের
পটখানি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা
বিশেষরূপে উপভোগ্য। এই ছবিটি
দেখিলে প্রাচীন ইতালীর রচনা-পদ্ধতির
কথা স্মরণ হয়।

—Art and Progress হইতে

পুরুষ ও রমণীর মন

চরিত্র হইতেছে মানস-বস্তু। রমণীর
সাধারণ চরিত্র পুরুষ-চরিত্র হইতে ভিন্ন।
হিমালয় এবং উইরম্ভা নামক দুইজন জার্মান
প্রোফেসর, এই বিষয় লইয়া আলোচনা
করিয়াছেন। এক-এক বিষয় ধরিয়া অনেক

প্রশ্ন করিয়া তাঁহারা পুরুষ ও রমণীদের উত্তর
চাহিয়াছিলেন। তাহার পর সেই সকল উত্তর
দেখিয়া তাঁহারা মোটামুটি একটা মীমাংসা
করিয়াছেন।

মন-চরিত্রে নিয়ন্ত্রিত গুণগুলির আদিক

বিকাশ হয়। তাহার অধীনস্থ লোকের প্রতি সম্মান, স্বাভাবিক শক্তি, সমালোচনার উৎসাহ, নিরামিত, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তর্কশ্রম ও খেলাধুলা ভালবাসে। পুরুষ স্বাধীনতাপ্রার্থী, টাকা রোজগার করিতে চায়, শোক-দুঃখ সহজে ভুলিয়া যায়, যাহা পড়ে তাহা ত্রিকটক মনে রাখিতে পারে, এবং নানা বিষয় লইয়া জীলোক অপেক্ষা অধিক নাড়াচাড়া করে।

নারী-চরিত্রে নিম্নলিখিত গুণগুলির চর্চ্চা হয় বেশী। তাহার পরিশ্রমী, আবেগময়, মিছা সাধুসজ্জা করিতে চাহে, বৈদগ্ধ্যশীল, ধর্মপরায়ণ, আত্মীয়তায় নিপুণ, সহনশীল, এবং শোকজননের সঙ্গে বাৎসর্য করিতে উৎসাহী। তাহার ঠেকারী, মিতাচারী, বৈচিত্র্যের অভিলাষী, অল্পেই উত্তেজিত হয় এবং লক্ষ্যহীন যালে কাজে পুরুষ অপেক্ষা সমধিক মনোযোগী।

দে-সকল ইন্দ্রিয় দিয়া আমরা বহিঃ প্রকৃতির জ্ঞান লাভ করি, সেই সকল ইন্দ্রিয়ের বিচার করিয়া দেখিলে জানা যায়, পুরুষ ও জীলোকের ইন্দ্রিয়গুলির কারও একরূপ নয়। পুরুষের চেয়ে রমণীর স্পর্শশক্তি অধিক প্রখর। রমণীর প্রাণই প্ররোদ্ধা হয় না; অর্থাৎ ছুটি স্তরের পার্থক্য তাহার সহজেই ধরিতে পারে। রাগ-রাগিণীর প্রভেদ তাহার প্রথম বৃক্ণতে পারে, পুরুষ তেমন পারে না।

বর্ণচ্ছতা লক্ষ্যেও সেই কথা। শতকরা চারিজন পুরুষ বর্ণাঙ্ক। তাহার উচ্ছল লোহিত এবং উচ্ছল সমুদ্রের বিভেদ ঘোটেই টেম্ পায না। কিন্তু জীলোকের শতকরা একজন মাত্র বর্ণাঙ্ক।

আন্তর্গোচর বিষয় ইহাই যে, রমণীরা যদিও বর্ণাঙ্ক মতে, তথাপি সম্মানের দোহে তাঁহারাই বর্ণাঙ্কতা সঙ্গারিত করে। অর্থাৎ কোন বর্ণাঙ্ক পুরুষের গুরুসমাজে সম্মান বর্ণাঙ্ক হয় না; কিন্তু ব্রাহ্মী বর্ণাঙ্ক না হইয়া যদি পুত্রী বর্ণাঙ্ক হয়, তবে তাহার গুরুসমাজে সম্মানও বর্ণাঙ্ক হইবে। আবার সম্মানদেয় ভিতর 'যাহারা পুরুষ, তাহাদের সম্মানের বর্ণাঙ্ক হইবে না, কিন্তু যাহারা রমণী, তাহাদের গুরুসমাজে সম্মানদেয় মধ্যে বর্ণাঙ্কতা থাকিবে।

অনেক সময় পদের ক্রমে পড়া যায় যে, অমুক ব্যক্তি খুব সামান্যরূপে 'আহত হইয়াও (ধনন, ঠোঁট কাটিয়া) রক্তজ্বরের ফলে মরিয়া গিয়াছে। রক্তের মধ্যে এমন একরূপ পদার্থ আছে যে, রক্ত ধ্বন বাতাসের সংস্পর্শে আসে, উক্ত পদার্থ শুধন রক্তকে ধনীভূত করে। যাঁদের শোণিতে ঐ পদার্থ নাই, সামান্য আঘাতে রক্তপাতের ফলে তাহারই মৃত্যু হয়। এই পীড়াটিও রমণীর দ্বারা গুরুসমাজে সম্মানের দোহে সংক্রান্ত হইয়াছে।

এ যুগে মানুষের পর্যবেক্ষণ-শক্তি কমিয়া গিয়াছে। সামান্যরূপে জ্ঞানলাভ করি বলিয়া আমরা চোখ দিয়া দেখিয়া সকল জিনিষকে জানিবার চেষ্টা করি না। সমুদ্রগামী জাহাজের সমস্তটা আমরা তর তর করিয়া দেখি না। কতকটা চোখে দেখি, বাদ-বাকী সমস্ত পূর্বাঙ্কিত জ্ঞানের দ্বারা সারিয়া লই। অসত্য মানব বা পশুপক্ষীর সকল জিনিষ সূক্ষ্মরূপে পর্যবেক্ষণ করে; এবং রমণীরাও এদিকে পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

স্বতিশক্তি আছে, দুটো-প্রকার। এক, — অর্গহীন জিনিস মনে রাখিতে পারা। যেমন, কণা, অক্ষ, নাম ও সংখ্যা প্রভৃতি। কোন লোকের নামে কিছু মানে থাকে না; আর ইহা মনে রাখিতেও যজ্ঞকের প্রয়োজন হয় না; মরনা পাণীর বুলি-পড়া এই-রকম। দ্বিতীয় :—কোন ভাব মনে রাখিতে পারা। এমন অনেক পণ্ডিত লোক দেখা যায়, যোগার বদ্ধবান্ধবে নাম বা কবে কোন তারিখ তাহা মনে রাখিতে পারেন না। অথচ অনেক গুরুপূর্ণ এ-সব বিষয়ে পণ্ডিতকে টেকা দিতে পারে। কিন্তু ভাব মনে রাখাই শক্ত কথা।

বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তকের কতগুলো কথা অরণ রাখিয়া কিছু লাভ নাই। বড় বৈজ্ঞানিকেরা সেই পুস্তকের পরীক্ষা-পদ্ধতি ও ভাবপুঞ্জই অরণ রাখেন। পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, পুস্তকের সাধারণতঃ ভাবই অরণ হাখে; কিন্তু রসায়নের বেশি মনে পাকে গিয়া।

এই স্বতিশক্তির বিচার দ্বারা বলা যায়, মানসিক বিচার-শক্তিতে রসায়ন অপেক্ষা পুস্তকের শ্রেষ্ঠতা অধিক। আবার, পুস্তকের ঘড়টা 'বিশ্লেষণ-ক্ষমতা' আছে, রসায়নের ততটা নাই।

নৃত্য-কাব্যের কথা

লোকের ভারতীয়ে রূপ-নৃত্যের কথা সংক্ষেপে কিছু বলা হইয়াছিল। গতবারের আলোচনাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য, পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নর্তকী আনা পান্ডুলোভা-কথিত একটি প্রবন্ধের স্থলবিশেষ উদ্ধৃত হইল।

“প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্বে হইতে রূপ সস্ত্রাটেরা আপনাদের প্রজাগণকে নৃত্য-কলা শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। ইতালী, ফ্রান্স বা স্পেন দেশে যখনই কোন নৃত্যন নট নাম কিনিয়াছেন, তখনই তাঁহারা রূপরাজ্য হইতে আমন্ত্রণ-পত্র লাভ করিয়াছেন। ফলে, আমাদের জাতীয় নৃত্যকলার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা

বিদেশী কালোয়াতদের ভাল দিকটাও দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি।

বর্তমান সস্ত্রাটের ভাবাবদানে রূপদেশের জাতীয় নৃত্য-বিজ্ঞানের অতিদ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে। ‘অপেরা হাউস’, ‘ফ্রেড লিগেটাব’ ও নৃত্য-বিজ্ঞানদের পরিণোদনের জন্য রূপ-সস্ত্রাট প্রতি বৎসর বাট লক্ষ টোকা খরচ করেন। নৃত্যবিজ্ঞানদের ছাত্রদের সর্বদা সাবধানে চোখে-চোখে রাখা হয়; শিক্ষকেরাও খুব যত্নের সহিত শিক্ষা দেন। সে শিক্ষার কঠোরতাও দৃঢ় অঙ্গ নহে। আমাদের কৌশলের সহিত নৃত্য-কলা এমনভাবে জড়াইয়া গিয়াছে যে, দেশের ছোটখাটো বিজ্ঞানগণলি পরসার

অভাবে উদ্ভিন্না যায় না,—বড় বড় ছাত্রদেরা
সেখানে গিয়া বিনামূল্যে শিক্ষা দিয়া
তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষা করেন।

রুশেরা নৃত্যকলা ধারা আপনাদের
ভাবপ্রকাশ করে। একান্ত হুঃখ বা
উদ্বেগ অনন্দকে তাহারা নৃত্যকলার
ফুটাইতে পারে। রুশদেশের প্রমজীবী-
সম্প্রদায়ের রমণীরা নৃত্য-বিজ্ঞার যে সকল
জ্ঞানী শিক্ষা করে, আপনাদের মনের ভাবকে
তাহারা সেই জ্ঞানীর সাহায্যে ফুটাইয়া
তোলে। ধর,—তাহারা শ্রান্ত হইয়াছে ;
নির্দোষ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় তাহারা
সেই শ্রান্তিকে প্রকাশ করিবে। যাহারা
আসল নৃত্যকলার অনভ্যস্ত, তাহারা এ-
রূপ ছন্দপূর্ণ ও কবিত্বময় ভঙ্গিমায়
মানসভাব প্রকাশ করিবার আনন্দ হইতে
বঞ্চিত।



নর্তকী পাতশোভা

নৃত্যকলার কোন দেশের নটেরা
সর্বাপেক্ষা আনন্দ ও বিবাহকে আঁগাইতে
পারে,—আমাকে সর্বদাই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করা হয়। উত্তরে জুামি বলি, বিবাহ,
হুঃখ, আনন্দ, উল্লাস ও আমোদ—
একাধারে এই সবগুলির বিচিত্র সমাহার
রুশ-নৃত্যে বতটা দেখা যায়, ততটা আর
কোথাও নয়।

নৃত্যকলা কাব্য ও গীতকলার সংগোত্রণ।
আমরা যে-ধরণে কাপড়-চোপড় পরি,
আমাদের নাচও সেই ধাঁজের উপযোগী
হয়। পৃষ্ঠাস্ত-স্বরূপ প্রাচীন গ্রীক নৃত্য-কলার
কথা ধরা যাক্। গ্রীকদের নৃত্য জ্ঞানকে
একটা অবাধ স্বাধীনতা ছিল। তাহাদের
অলংকারে টিলা পোষাক এই স্বাধীনতার
উপযোগী। হিংরাঙ্গী স্কুলে নাচ শিখাইতে
হইলে, নাচকে ঠিক ললিত কলার মত

করিয়া শিখাইতে হইবে ;
কারণ, বিভাগের যে-
ভাবে ব্যায়াম বা জিম-
নাস্টিক শেখানো হয়,
তেমত গোপনভাবে নাচ
শিখাইলে কোন ফল
হইবে না।

কশিরাপুর নর হইতে
বারো বছর বয়সের
ভিতরেই ছেলেদেরদের
প্রায় নাচ শিখিতে
পাঠানো হয়। তাহারা
যে তুখুই নাচ, পান
ও নাটকীয় কলার শিক্ষা
পায়, তাহা নহে ;

পয়সে সেইসঙ্গে তাহার সাধারণ শিক্ষাও লাভ করে। কে কেমন নাচ শিখতেছে, তাহা পরখ করিবার জন্য প্রতি বৎসরই ছাত্রদের পরীক্ষা শুধুরা হয়। পরীক্ষায় যে ছাত্র কৃতকার্য হইতে পারে না, বিভাগের হইতে তাহাকে বিসর্জ দেওয়া হয়।

যে সকল শিক্ষিত নট নৃত্য নিপুণ হইবার জন্য প্রথম যৌবনের কয়েক বৎসর ব্যয় করিয়াছে, নাচের সঙ্গে শুধু তাহাদের পা মিলে না; মাথা ও চোখ নাচে, মুখ ও গলা নাচে, বাহ ও হাত নাচে—এক কথায় তাহাদের সর্বদাঙ্গ ছন্দে ছন্দে নৃত্য করে।

বিভাগের বয়স্ক ছাত্রেরা আপনা-আপনি নাচ অভ্যাস করিবার জন্য বড় অল্প কাল কাটার না। আমার মনে আছে, একজন যুগা দিনে ছয় ঘণ্টা ধরিয়া নাচ অভ্যাস করিতেন। সকল বিভাগের মত নাচেও বঠোর সাধনা এবং ব্যক্তিগত শক্তির

প্রয়োজন। নাচিলে দিচ্ছি চর্পিত। এমন কি, যে-সবল নট দিচ্ছি ও বশ অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও অনেক সাংখ্যাতিক। তাহার যদি কেতা-চরিত্র স্থাপিতে চান, তবে গ্রাহমিনই তাঁহাদিগকে নৃত্য অভ্যাস করিতে চাইবে। অভ্যাস করিয়া করিয়া নাচে তাঁহাদিগকে এতটা পাকা হইতে হইবে, যে, রঙ্গমঞ্চে গিয়া নৃত্য উপযোগী ভাবের সমাবেশ ছাড়া তাহার আর কিছু তাবিত্তে পারিবেন না; —অভ্যাস-বশে নাচ তাঁহাদের আপনাই চলিতে থাকিবে।

কল মেনে বৃদ্ধ নটের স্থান নাই। সাধারণতঃ কৃড়ি বৎসর নাচের পরই নটের কার্যকাল শেষ হইয়া যায় এবং স্ট্রাণ্ডবৎ বৎসর বয়সের সময় তাঁহারা পেঙ্গন লইয়া অবসর গ্রহণ করেন।

—The Strand Magazine হইতে

শ্রী অসাদদাস রায়।

নবাব

ঘোড়শ পরিচ্ছেদ

সমাপ্তি

“তুমি অমন করে কেঁদো না পরী, আমার ওতে বুক তেজে যায়। তুমি বরং কষ্টে নুগ্নোয় যাও—নিজের কাজকর্ম দেখ’গে। ত্রেহিমের দশ হাজার ফ্রাঙ্ক হাতে পেলে হোমার আর ভাবনা কি? আমি সেখানে গিয়েই তোমার টাকা পাঠাব। সে আমার হাতের গড়া মুষ্টি চার—তা তাকে দেব—নীতিমত তার দানও

আদায় করে নেব। আবার আমার টাকা-কড়ি হবে—অনেক টাকা। কে জানে, হয়ত স্থলতানিও হতে পারি একদিন।”

“তাই হও—তুমি স্থলতানিই হও। কিন্তু আমার আর তা চোখে দেখতে হবে না—আমি ততদিন বাঁচছি না।”

ফ্রেনসিক্ চোখের জল মুছিয়া গাড়ীর এককোণে জড়সড় হইয়া বসিল।

ফেলিসিয়া পাশি ভাগে করিতেছিল।

এখনকার এই ভয়ঙ্কর শূন্যতা, তীক্ষ্ণ নৈরাজ্য ও কঠোর নিয়ন্ত্রণ-লাঞ্ছনার মধ্য হইতে সে এখন শলাইয়া বাঁচিতে চাহে। মোরার মৃত্যু তাহাকে কি ভীষণ আঘাত দান করিয়াছে! একটা তীব্র দুরাকাজ্ঞার বশে সে ডিউকের হাতে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিল। নিজের সহিত নারীর সকল সম্মান, সকল গৌরব, লজ্জা-স্বৰূপ অবধি সমস্তই সে ডিউকের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। আর আজ ডিউক ঘাইবার সময় তাহার কিছুই ফেলিসিয়ায় জ্ঞাত রাখিয়া যান নাই—ফেলিসিয়াকে এই কঠিন নগরের পথের উপর বসাইয়া গিয়াছেন; সারা জীবনের মত তাহাকে নিঃশব্দ সর্ব হারা করিয়া গিয়াছেন। গভীর বেদনায় ফেলিসিয়ার বুক ডাঙ্গিয়া গেলেও চোখে তাহার অশ্রু ঝরিবার আজ উপায় নাই! শোক-চিহ্ন ধরিবার অধিকার হইতেও সে বঞ্চিত—এতটুকু সম্মান অবধি আজ ফেলিসিয়ার নাই! কিন্তু কি করিয়াছে ফেলিসিয়া যে, সারা জীবন তুণের আশ্রমে এমন করিয়া তাহাকে পুড়িতে হইবে! ডিউকের সহিত পেন্ট ভেম্‌স্‌ জুই চারিটিমাত্র সফা-বাগন—দুই-চারি বাড়ি থিয়েটারে একত্রে বসে বসিয়া অভিনয় দেখা—ইহারই মধ্যে প্রাণহীন প্রণয়-হীন অভিসারের শত কলঙ্ক-রেখা কে যেন তাহার সর্বাঙ্গে মাথাইয়া দিয়াছে! উদ্ভ্রান্ত নারী,—মগতে চলিবার ঠিক পথটি তাহার জানা ছিল না—আজ তাই সে সতলের চক্ষে একটা কলঙ্কের নিশানের মত পড়িয়া রহিল!

একবার ফেলিসিয়ার মনে হইল, সে আত্মহত্যা করিবে। পরক্ষণেই মনে হইল,

না, তাহা হইলে তাহার ভয় জনদের ইন্দিত করিয়া এখনই কুৎসাধ খারা পারি-ময় ছড়াইয়া পড়িবে! শবরের কাগজে জরনি মোটা কাপে অক্ষরে কালিমাং মালা হুলিতে থাকিবে। তবে উপায় কি—কি উপায় আছে? ফেলিসিয়া স্থির করিল, সে নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়াইবে—পারিতে আর থাকিবে না। কিন্তু দেশ বেড়াইতে গেলে অর্থ চাই,—প্রচুর অর্থ! ফেলিসিয়ার যে তাহার অভাব বড় বেশী। তখন তাহার মনে পড়িল, বেব কথা! এস্ত্রিয়নে তাহার গড়া মূর্তি দেখিয়া দে'র মুখে প্রাণের বৃষ্টি করিয়াছিল—বে তাহাকে বহু অর্থ দিয়া টিউনিং লইয়া ঘাইবার জ্ঞাত প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিল—তাহার গড়া মূর্তি দিয়া বে টিউনিং প্রাণের সাপাইবে। তখন ফেলিসিয়া এ প্রস্তাবে সম্মত হই নাই—প্রাণের বিপুল প্রোভেন তাহাকে এতটুকুও চকল করিতে পারে নাই! কিন্তু আজ। আজ তাহার মনে হইল, এ হৃদয়ে ঐ একটা, একটিমাত্র উপায় আছে! তাই সে আর এক মুহূর্ত্তও বিধা করিল না। কয়েকখানা টেলিগ্রামে কথাবার্তা-চলোচলের পর দর ঠিক হইয়া গেলে, ফেলিসিয়া টিউনিং-বাড়ার উত্তোগ করিল। চটপট জিনিষ-পত্র গুছাইয়া লইয়া সে একদিন-পারি ভাগ করিবার অভিশ্রমে শৈশবের অভিমুখে বাহির হইয়া পড়িল। পারিতে আর একদণ্ডও নহে। সারা আকাশ বেন এখানে তাহাকে চাপিয়া ধরিবার উপক্রম করিয়াছিল। তাই সে এক অজানা দেশে নূতন জীবন-বাগনের বন্ধনের বিভোর হইয়া শত

দুস্তিয়ার হাত হইতে মুক্তি-লাভের চেষ্টা দেখিল।

বেনোয়ার বে'র সম্মুখ বজরা তাহার অপেক্ষা করিবে। সেখান হইতে বঁরাগর সে টিউনিংসে ঘাইবে। সেখানে তাহার পাকিয়ার অস্ত্র প্রকাণ্ড বাঁড়ী--গাড়ী-ঘোড়া, লোকজন--অত্যাশ্চর্য্য হুড়াত্ত আগোলন হইয়াছে।

গাড়ীর মধ্যে বসিয়া চকু মুদ্রিয়া ফেলি-
সিয়া ইতালির জুদু বন্দরের ছবি দেখিতে-
ছিল। খেত মধ্যরে বাধা ঘাট--চিত্র-বিচিত্র
শোভাক পরিয়া ইতালির কিশোর-কিশোরী
নৌ-বিহারে বাহির হইয়াছে--কোথাও মধুর
বাত্ত বাজিতেছে, লতা-পাতার মালা মাথায়
পরিয়া কোথাও ইতালির বালক-গলিকার
দল গান ধরিয়াছে। তাহার পর কোথায়
জুদুর টিউনিংস! মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য--
মাঠে কালো-কালো ছেলেমেয়েরা সরল
আনন্দে নৃত্য করিতেছে, খেলা করিতেছে।
চমৎকার বৈচিত্র্য!

আর এখানে পারির আকান--কি দিষ্টী
কণ্ঠ্য বেশ ধরিয়া তাকাকে বিহার দিতেছে।
কাল রাজি হইতে বৃষ্টির আর বিরাম
নাই। পথে কাদা জমিয়া একটা নিরানন্দময়
অবসাদেয় সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। অসহ্য এ
দৃশ্য! ইহার মধ্য হইতে গলাইতে
পারিলে ফেলিসিয়া বঁচে!

আজ পারির এই নিরানন্দময় বৃকের উপর
আর এক নিরানন্দময় বাণীরের অভিনয়
চলিতেছিল। আজ ডিউক মোরার সমাধি।
সেই কাদা-জলে ডগা পথের উপর
জনজোতের যেন আর বিরাম নাই।

কাতাল-কাতারে লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছে--
সারি দিয়া গাড়ী চলিয়াছে। সমাধি-বাড়ার
এত বড় দিরাট সমারোহ পারির লোক
বহুগল চক্ষে দেখে নাই! ফেলিসিয়ার গাড়ী
একটা মোড় বাঁকিয়া বড় হাওয়ার ক্রমে এই
গাড়ীর ভিড়ে পড়িয়া গেল; তখন তাহার গতি
অত্যন্ত মৃদু হইয়া আসিল। ওদিকে গাড়ীর
মধ্যে ফেলিসিয়ার মন উদ্বাগ কখনার ভাসিয়া
হ্রস্ব ঘোড়ার মতই ছুটিয়া চলিয়াছে--
বাহিরের এই বৃহৎ প্রান্ত তাহাকে একেবারে
দিশম বিবস্ত্র করিয়া তুলিল। সে চীৎকার
করিয়া কোচম্যানকে কহিল, "ঝোরে হাঁকাও,
গাড়ী।" -

কোচম্যান লবিনেরে উত্তর দিল, ঝোরে
চলাইবার উপায় নাই। ডিউকের সমাধি-
বাড়ী গাড়ীর ভিড়ে পড়িয়া তাহাকে লাইন
ধরিয়া মল গতিতে ঘাইতেই হইবে; বৈ-লাটনে
বেগে চলাইবার হুকুম নাই। ফেলিসিয়া
রাগে উত্তপ্ত হইয়া কহিল, "গল্প রাত্না দিহে
নিচে দাও।"

ফেলিসিয়ার মাথাব মধ্যে একটা ঘুরী
বাতাস ছুটিয়াছিল। বাহার হাত এড়াইবার
উদ্দেশ্যে সে এত সূর্য্য করিয়া আত্মস্বের বাস
জাড়িয়া চলিয়া ঘাইতেছে, তাহাই আবার
এ কি পাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে চাহে!
স্বস্তির হ্রস্ব দাহে তাহার মনপানা যেন পুড়িয়া
ঘাইতেছিল। সে একবার গাড়ীর জানালা
দিয়া মাথা বাঁহর করিয়া সূঁকিয়া দেখিল
--বৈস্তের দল বন্দুক নামাইয়া অত্যন্ত গভীর
চঃলে শবে চলিয়াছে, তাহাদের পিছনে
সামাহীন জন-তরঙ্গ। ফেলিসিয়া আর দেখিতে
পারিল না; তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল।

তাহার সকল লজ্জা, সকল অপমান, সকল ঐশ্বর্য, সকল দৈন্য যেন এই জনতান্দ্রাজিতে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছে। ফেনিসিয়া কোচম্যানকে কহিল, “প্রথম যে গলি পাবে, সেই গলিতে হুকে গাড়ী কোরে ইঁাকিয়ে যাও।” তাহার পর সে গাড়ীর জানালা বন্ধ করিয়া ছই হাতে মূণ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

পথে তখন সমাধি-বাজার রীতিমত ঘটা বাধিয়াছিল। রাজ্যের যত সন্ন্যাস, পদস্থ কর্মচারীর দল সেই কানায় হাঁটিয়া ডিউকের প্রতি সারা নগরের শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছিল। মৃতের প্রতি জীবিতের শেষ শ্রদ্ধা, শেষ সম্মান! প্রথমেই বিপুল বাস্তব-সমারোহ, পরে পাঁচখানি গাড়ীতে পাজীর দল,—সকলেরই পরিধানে ক্লান্ত পরিচ্ছদ—তাহার পর ডিউকের সমাধি-শব্দট, গাঢ় কাণে রঙের ছয়টি ষোড়। সে গাড়ী টানিয়া চলিয়াছে। কফিনের উপর একখানি তরবারি, একটি ইউনিফর্ম-পোষাক, পালক-বেগম টুপি, স্বর্ণলচিত্র তাহার গায়ে বড় বড় মুক্তার গ্রন্থিত প্রকাণ্ড একছড়া মালা! ডিউকের গাড়ীর পিছনে শোকচিহ্নধারী কমিটির সদস্য, এবং ডিউকের বন্ধু ও আত্মীয়ের দল হাঁটিয়া চলিয়াছে। সকলেরই মুখে আভ্যন্তরীণ শোকের উদাস গভীর ভাব। এতগুলি লোকের মধ্যে প্রকৃত শোকের বেদনা—যদি কাহারও বুকে বাড়িয়া থাকে, তবে সে নবাবের! তাহার মুখে কে যেন গভীর হতাশার ছাপ টানিয়া দিয়াছে। নবাবকে দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন ঐ পুরুষটির সহিত আপনার প্রাণের সমস্ত সাধ, আশা, আপনার সকল ঐশ্বর্য-গরিব মজার নীচে সমাহিত করিতে চলিয়াছেন।

সমাধি-বাজার দল ক্রমে গোরস্থানে আসিয়া পৌছিল। সেখানেকার কর্মচারী সমস্ত ব্যাপার শেষ হইলে ঠাণ্ড এক গমলা বৃষ্টি দেখা দিল। তখন চারিদিকে একটা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া গেল। সকলে ব্যস্ত হইয়া বৃষ্টি ছইতে নিত্যম পাইবার জন্য ছুটিয়া মণ্ডার উপর একটু আশ্রয়-লাভের চেষ্টা দেখিল। চেয়ারলিড আসিয়া একটা খোপের মধ্যে গাঁড়াইল—আকাশের পানে অধীর দৃষ্টিতে সে চাহিয়া আছে, এমন সময় সে দেখে, নবাব সেই খোপটার দিকেই আসিতেছেন। নবাবের প্রকৃতি হেমারলিডের বিলম্বজন্য ছিল; তাহার একটু ভয় হইল—কি জানি, এখানে কেহ নাট, যদি নবাব মনের কাল মিটাইয়া লয়! কাছাকাছি অপর কোথাও সরিয়া পড়িবার উপায় ছিল না। হেমারলিড কি করিবে স্থির করিতে পারিতেছে না, এমন সময় নবাব আসিয়া গভীর কণ্ঠে ডাকিলেন, “হেমারলিড—” হেমারলিডের পূর্ব নাম ছিল, লাজেহার। সে একটা উত্তর দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু স্বয়ং বাহির হইল না। নবাব আবার ডাকিলেন, “হেমারলিড—”

পরক্ষণেই হেমারলিড আপনার স্বন্ধে নবাবের ভারী হাতের তত্ত্ব স্পর্শ অনুভব করিল। সে ঈর্ষৎ চমকিয়া উঠিল। নবাব কহিলেন, “শোন, তুমি কোন কারণে নেই। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। আমি শুধু তোমার অনুগোষ করছি, তুমি আর আমার পিছনে শেগো না।”

হেমারলিড নিশ্বাস ফেলিয়া বাটিল। নবাব আবার কহিলেন, “এ যুদ্ধে তোমারই জিত, আমার হার। দেখ, আমি ক্ষতিকৃত হইছি, আর যুদ্ধে পারছি না। পুত্ৰগো

বন্ধু বলে আমার দয়া কর। আমার স্মৃতি দাও।”

হেমারলিঙের প্রাণের কম্পন তখনও পামে নাই। পারে বত বগই পাকুক, অপরাধীর মন তবু অতি সহজেই সজ্জিত হইয়া পড়ে। হেমারলিঙের মনে পড়িল, সেই অতীত দিনের কথা। মারিজা যখন পিষিমা মারিতেছিল, তখন দুই বন্ধুতে ভাগ্যোন্মেষের চেষ্টায় অল্প টিউনিংস যাত্রা করে। নির্মাণনে থাকিয়া যোত্রে ছুটিয়া ছইতনে পরসার চেষ্টায় কি কষ্টই না সহ্য করিয়াছে। মারিজার সমস্ত কঠিন অভিযাত্রার দুই বন্ধুতে মৌরবে মাথা পাতিয়া লইয়াছে। নবাব কহিলেন, “তোমার ভাড়া নেই, বেধ হয়? এস না, একটু বেড়াই। স্মৃতিও ধরে গেছে, আকাশ পরিস্কার হয়েছে। তোমাকে পেয়ে আমার মনে হচ্ছে যেন আমি আমার অতীত বিশ বছর আমার ফিরে পেয়েছি—।”

হেমারলিঙ কহিল, “হাঁ, আমারও বড় ভালো লাগছে। কিন্তু তুমি জানো, আমার পারের বেদনার অস্ত্র বেশী চলবার ক্ষমতা আমার নেই।”

নবাব কহিলেন, “তোমার পারের কথা আমি জ্বলে গেছলুম। এসো, আমার হাতে ভর দিয়ে এসো।”

ভাইয়ের মত যত্নে নবাব তখন হেমারলিঙের হাত ধরিলেন। খানিকটা চলিয়া উত্তরে একটা বেঞ্চে আশ্রিয়া বসিল। নবাব ডিউকের পানে চাহিয়া কহিলেন, “বেচারি ডিউক—

হেমারলিঙ কহিল, “এ মুহুর্তে দেশের বড় কতি হল।”

নবাব কহিলেন, “আমার যা কতি হয়েছে, তার আর সীমা নেই! আর যদি কিছুদিনও বাঁচতেন; তোমারই বরাতে, লাজেরান। তা ছাড়া তোমার ক্ষমতাও খুব।”

হেমারলিঙ কহিল, “তা যদি বললে, যমতা আমার নয়, এর অস্ত্র মেরির কাছে আমি দ্বিষ্ট।

“মেরি।”

“হাঁ, মারগেস। বিশ্বের সময় পে জীশচান হয়—তখন তার পুরোণো নাম বহলে মেরি নাম বেওয়া হয়। তার একটা শক্তি আছে, বটে। ব্যাকের কাজ পে বেশ গোপনে। সে-ই ত সব চালান—আমার যা-কিছু দেখা-শোনা, সব সে-ই করে।”

নবাব একটা নিখাস কেলিয়া বলিলেন, “তোমার মত বরাতে কটা শোকের হয়।” নবাব আপনার জোর কথা জানিতেছিলেন। একটা জানোয়ার সে! ছদ্ম-হীনা!

তার পর উত্তরে কিছুক্ষণ নিশ্চল রহিল—সে নিশ্চলতা ভঙ্গ করিয়া হেমারলিঙই কথা কহিল। হেমারলিঙ বলিল, “মেরি তোমার উপর বড় ঘটেছে। তোমার সঙ্গে এই আমি কথা কছি, এ দেখলে সে একেবারে রসাতল বাধিরে দেবে।”

নবাব কহিলেন, “কিন্তু কৈ, আমি ত তার কোন কতি করিনি।

“নিশেষ ভাল ব্যবহারও করনি তুমি। আমাদের দ্বয়ের পর সেই কাণ্ডখানা মনে পড়ে? তোমার স্ত্রী বলে পাঠালে, যে একটা বীকার সঙ্গে সে দেখা করতে পারবে না! কেন, আমাদের বন্ধুত্ব কি এ সামান্য কুসংস্কারটুকু জ্বলতে পারত না? জানো,

দেবে সাহু
ভোলে না।”

“কিন্তু আমার তাতে কি হাত ছিল, বল? তুমি ত জান, আফসিনদের দর্প কতখানি!”

নবাবের কিন্তু এ দর্প ছিল না, হেমারলিড্ তাহা বুঝিত। তাহার উপর এই শ্রুতানের বৃক্ক বসিয়া মনের ভাব তাহার কোমল হইয়া আসিয়াছিল। সে কহিল, “শোন বার্ণার্ড, এক উপায় আছে। আমাদের পুৰানো বন্ধু কালিমে ডোলবার একটি মাত্র উপায় আছে। তোমার স্ত্রী আমাদের এই বাবধান দূর করতে পারে। তার সেই অপমানের কথা ব্যারগেসের বৃক্ক কাটার মত বিধে আছে। আমাদের বাড়ীর মধ্যকার এই গোলটুকু যদি মিটে যায় তাহলে আবার আমরা আগেকার মত বন্ধুভাবে পরস্পরে মিশিতে পারি—”

নবাব কহিলেন, “কি করলে যেটে, বল।”

“শোন তবে, বলি। আগছে শনিবার ব্যারগেস একটা পাণ্ডি দিচ্ছেন। তাতে পারির সমস্ত বড় বড় লোকই আসবেন। তুমিও তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এসো! অংশ নিমন্ত্রণ-পত্র পাওবে। তোমার স্ত্রী এসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে মেশামিশি করুক—সব গোল চুকে যাবে। আমি বুঝতে পারছি, তুমি বড় বিপদে পড়েছ—আমি তোমার সে বিপদ থেকে উদ্ধার করব। বেকের তুমি ধার দিয়ে খুব এক চাপ চেলেছিলে বটে, কিন্তু কি করবে? তোমার পড়তা যে ব্যাপার আছে। রড্ পেরেও খেলা শুছিরে নিতে পারছ না—কেবলই হার হচ্ছে।”

নবাবের দর্পিত শির আর এতখানি নত দেখিয়া হেমারলিড্ মনের মধ্যে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিতেছিল। তাহার দয়াও হইল—আহা, পুরাতন বন্ধু! কিন্তু এ ধার হইতে উদ্ধার-লাভের এক উপায় মাত্র আছে—সে উপায় কি হেমারলিড্ আর তাহারও ইঙ্গিত দিয়াছে। কিন্তু কাঁহলে একেবারেই বিখাল হাওয়াইয়া ফেলিয়াছিলেন—মোরাকে হারাইয়া তিনি যে আজ সব হারাইয়াছেন। হেমারলিড্ কহিল, “তুমি ডিউককে হারিয়েছ বটে, কিন্তু আমার কিরে পাছ।”

নবাব কহিলেন, “কিন্তু শোন দেখি, এতে কোন ফল হবে কি? লি মার্ক্যার ত তার রিপোর্ট লিখে শেষ করে ফেলেছে।”

হেমারলিড্ কহিল, “আর একটা নতুন রিপোর্ট লিখতে কতক্ষণ? এক, দুই, তিন, চার হাজার ড্রাক খরচ কর—সব ঠিক হয়ে যাবে।”

নবাব ভক্তিত হইয়া গেলেন—সবিশ্রমে কহিলেন, “এ কি সম্ভব! লি মার্ক্যার—অত কড়া লোক—”

“পরশায় কে না মরন হয়? শোন, টাকাটা কি আর নগর হাতে দেবে? একটু ফিকির চাই। লি মার্ক্যারের ছবির তারী সখ। খুব নামী ছবিতে সে ঘর সাজিয়েছে। মোরানাক্-টাক কি এমনি কারো ছবি একখানা দাও দেখি—বলো, আপনায় ঘরে টাঙ্গাবার অল্প একখানা ছবি পেলুম—সেখানা টাঙ্গাবার অল্পমতি দেন যদি—। ছবিখানা কোন ধর্ম-বিষয়ের হলে ত আর কথাই নেই—” নবাব ভাবিতে লাগিলেন,

তাই ত!...কিন্তু কি করিয়া ছবির
ঐশ্বর্য তুলিবেন, তিনি।

হেমারিঙ্ কহিল, “সে আমি ঠিক
করে দেব। মোদা, আগে তুমি ব্যারণেসের
সঙ্গে সন্ধি করে ফেল। তাহলেই দেখবে,
চারিখার ফরসা হয়ে গেছে। আমার যা
কিছু এই মান সম্রাট, ঐশ্বর্য বল, এর সীমন্তর
মূলে মেরির বুড়ি! মেরির সঙ্গে ভাব
করে ফেল, বার্গার্ড, কোন ভাবনা থাকবে না।

“বেশ, তুমি তাহলে ভাব নিচ্ছ—
আমার এ বিপদ থেকে টেনে তুলবে?”

“অবিখ্যাসের কোন কারণ নেই, বার্গার্ড।
শনিবার আমাদের ওখানে তোমরা সম্রাট
এসো—সেখানেই তখন মেরির সঙ্গে পরামর্শ
করে সমস্ত ব্যাপার ঠিক করে ফেলব।
লি মার্কারের ওখানে কবে যাওয়া যায়
—বুঝলে?”

“হাঁ—তাহলে তুমি, আমার লি
মার্কারের ওখানে নিরে যাবেন—?”

“হাঁ, হে, হাঁ।”

ক্রমশঃ

ক্রীস্টোফ্রোহান সুখোপাখ্যায়।

দেড়ে টিকটিকি

(ইস্‌হাক বিন্‌ খলিফা)

বঁটে দাউদের লম্বা দাড়ি।
গোফে ও দাড়িতে একটি গাড়ী।
আগে চলে দাড়ি পিছে দাউদ
যাপের পিছনে যেন সে পুত।
চড়াই পেয়েছে মদুর-পুচ্ছ।
দাড়ি বিনা মিক্রা দাউদ তুচ্ছ।
দাড়ি সে মৈরখেছে, বর্ষা জাড়ে—
সূকাতে বুঝি ও দাড়ির জাড়ে।

একরা দাউদ মিক্রার ধরি,
দাড়ি বাস দিরা ওজন করি,
তেরিঅ কবির গেলিগু তাই
দাউদের কোনো ওজনই নাই!

ছায়া যেন দাড়ি বহিতে আছে
দাউদ সে জটা দাড়ির গাছে!
দাড়ি নেড়ে চেড়ে আছে বাতিরা
দেড়ে টিক্ টিক্ দাউদ মিক্রা।

দাড়ি পুখে হল দাউদ মোগা!
ফড়িঙের গারে দাড়ির চোগা!
ফিরিছে কাহিল দাড়ির সুটে
নগরের কুটো দাড়িতে পুটে।
নিবিড় জমাট দাড়ির কাঁড়ি
চামড়িকাদের বাগান-বাড়ী!
হেসে ছিঁড়ে যায় পেটের নাড়ী
ছন্কের মুখে মুনকে দাড়ি!

ক্রীস্টোফ্রোহান দত্ত।

সমালোচনা

বৈজ্ঞানিক জীবনী। ইংরাজ পণ্ডিত নিচোপী এম. এ. এফ. সি এস প্রণীত। কৃত্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল পাঁচ দিকা; বাংলায় বেড়ে টাকা। লেখক এই গ্রন্থে "একদিকে হুজুত, নাগার্ডন, আর্থাইট প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় ও পেরিসিও, নিউটন প্রভৃতি ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের জীবন-বৃত্তান্ত ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার চেষ্টা" করিয়াছেন। লেখক 'জুয়িকা'র আর একটি কথা বলিয়াছেন, "কোনও বৃহৎ বৈজ্ঞানিক সত্য সম্যক বুঝিতে হইলে উহার আবিষ্কারকে জানা উচিত। কিন্তু তিনি ক্রমে ক্রমে সেই সত্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হইলেন, তাহার বর্ণনা কেবল কোঁইহলোকীপক নহে, প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উপাদানও বটে।" কথাটা খুব ঠিক! হুজুর বিদ্য, কয়টি জীবনের আলোচনাতেই লেখক এই ধারাই হুঁক করিয়াছেন, ইহাই এ গ্রন্থের বিশেষত্ব। লেখকের এ প্রচেষ্টার উহার যৎসামান্যগতরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় প্রাচীন বৈজ্ঞানিক জীবনের সম্রাট ও নিরূপক আলোচনাই হুঁক একতাই উপলব্ধি—তাহাতে অসম্ভব উচ্ছাস বা অনাবশ্যক প্রশংসার এতটুকুও উল্লেখ নাই। একশ্রেণীর লোকের ধারণা, প্রাচীন ভারত অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ইহা যে মাত্রণ ভ্রান্তত্ব, হুজুরের আলোচনা পাঠ করিলে সহজেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে। Anatomy সম্বন্ধেও হুজুরের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তিনি মানব শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবরণ বিরাট কাণ্ড ছিলেন না, শরীরের কোন স্থানে কয়টি স্নায়ু, অগ্নি, শিরা প্রভৃতি আছে, তাহাও সঠিক নির্ধারণ করিয়া ছিলেন। ১০২৭ খঃ অব্দে পান্ড্যাত বৈজ্ঞানিক উইলিয়াম হার্ডি বেরের মধ্যে রক্তের গতি (Circulation of blood) আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন—কিন্তু তাহার বহু-সত্যকী পূর্বে হুজুর রক্তের গতি নির্দেশ করিয়া ছিলেন। হুজুর বলেন, "১৭৭৮

রক্তবাহিনী শিরার দ্বারা রক্ত সমগ্র দেহে চলাচল করিতেছে। এই সকল শিরা বহুত ও স্নায়ু হইতে উৎপত্ত হইয়া মস্তিষ্ক শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া আছে।" শোণিত, প্রকৃতির অবস্থার বতরণ দ্বারা শিরামধ্যে ঘিরণ করে (circulates) ততকণ বাতাসবাহকের পূরণ, বর্ণের উজ্জ্বলতা, শরীর-জ্ঞানের তীক্ষ্ণতা এং অস্ত্রাঙ্গ নানাশকার গুণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেই হুজুর মুখিত হইলে রক্ত-জন্ত নানাশকার পীড়া লভে।" এ সংবাদটুকু ভারতবাসীগণের গৌরবের—সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারতে অস্ত্রচিকিৎসারও যথেষ্ট প্রচলন ছিল। রামায়ণ মহাভারতে দেখা যায়, উপযুক্ত অস্ত্রচিকিৎসকগণ সেনানায়কগণের যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে দেখিতে পাই, যুধিষ্ঠির ও দ্রুপদ্যোন উভয়েই অস্ত্রচিকিৎসক ও অস্ত্র-চিকিৎসার উপযুক্ত বন্ধনী (Bandage) ব্যবহারি সঙ্গ্রহ করিতেছেন। হুজুর অস্ত্র-চিকিৎসাকে আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, (১) ছেদকিয়া—কোন অঙ্গ ছেদন করা; (২) তেজকিয়া—কোন স্থানে তেজ করা; (৩) সেধাকিয়া—কোন স্থানের চর্মে উত্তোলন করা; (৪) বেধাকিয়া—যুগ্মিত রক্তাধি বাহির করিয়া বিহার মন্ত্র শিরাদি ভেদ করা; (৫) এ্যা কিয়া—মানুষীয়া প্রকৃতি যোগে শ্রুতাবির পরিমাণ অধেবণ করা; (৬) আহাধাকিয়া—অবরী প্রকৃতি যোগেস্ত্রুত জ্রাবাধি বাহির করা; (৭) বিশ্রাব্য কিয়া—শ্রাব উৎপাদন করা; (৮) সীযদ—সেদাই করা। পণ্ডিতবাহু প্রভৃতির চিত্রাবিও সংগ্রহ করিয়াছেন—এ গ্রন্থে বহু মস্তের চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—তাহা হইতে বিবরণটি সম্পূর্ণ বুঝা যায়। অস্ত্র-প্রয়োগ-করে হুজুর ১২৫ রকমের অস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু হুজুর অস্ত্র-চিকিৎসাও তৎকালে প্রচলিত ছিল, পণ্ডিতবাহু তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন—পর্গত যুগসম্মান ছেদন করিয়া বাহির করিবার প্রকৃতির বর্ণনাও হুজুরে আছে। সে প্রকরণ চিত্রও

এ প্রহর এতদূর হইয়াছে। ক্ষুদ্রতর বহুবিধ বন্ধনীও (bandage) উল্লেখ দেখা যায়। বন্ধনপ্রাণী চতুর্দশ প্রকারের ছিল। চূড়ন ইহাই যে আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মধ্যে অনেকে এ সকল তথ্যের খরচ করেন না— তাঁহারা সাধারণের মধ্যে এ সকল তথ্যপ্রচার সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য সহিত গিয়াছেন—তাঁহারা শুধু নিজেদের দাবদাহটুকু সুবিধাই লাভ আঁকে; তাঁহাদের, যে এবিধে একটা ক্ষুদ্রতর কর্তব্য আছে, এ কথা তাঁহাদের মনে আছে বলিষ্ঠও সূত্রাৎ নয় না। যাঁরা হোক, এই সাধু স্বেচ্ছায় লজ্জা পলায়ন বা সু সমস্ত, বেশের সূত্রজ্ঞতা ভাঙন হইয়াছেন। প্রহর ভাঙা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর, কোথাও পাতিভোর ছড়ার নাই—তাঁহার দলে নিত্যই অল্প-নিশ্চিত ব্যক্তিও এ প্রহর সহজে সূত্রিতে পারিবেন, ইহার ভিতরকার কঠিন ও মটিল রহস্যগুলি আদৃত করিতে পারিবেন। বহিঃশাসি এমনি কোঁড়হালোখীর্ণক হইয়াছে যে, উপজ্ঞানের বড়ই উপভোগ্য। এই প্রহর সকল প্রবন্ধগুলিই “ভারতী” পত্রিকার পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল—এবং “ভারতী” পত্রিকার ইহার চিত্রাঙ্কিত সে সমস্ত বাহির হইয়াছিল। প্রহর ভাঙা বাঁধাই কাগজ চমৎকার। বহিঃশাসি বঙ্গভাষার সম্পদবজ্ঞ হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

নামিকে। ঐদৃক দূরপ্রসঙ্গ বন্যোপাখ্যায় প্রদ্রুত। ২২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইতে ইন্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত; কালিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি ভাণ্ডারী উপজ্ঞানের বঙ্গোপাখ্য। লেখক “সুবিদ্যা”র লিখিয়াছেন, “কবি-কল্পনা নামিকের ভিত্তি নয়; সুবিদ্যা ভাণ্ডারী বোঝা মার্গাল প্রিন্ট, ওয়াশিং স্কয়ার দীর্ঘনের করণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত।” বাস্তবিক উপজ্ঞানখানি সর্গবিধয়েই উপভোগ্য হইয়াছে—ইহার মধ্য বিদ্যা যে করণ রূপের; খারী বহিরা গিয়াছে, তাহা যেমন শান্ত, তেমনই অনাবিল। উপজ্ঞানের আট ইহাতে প্রচুর। কয়েকটি দৃষ্ট প্রকৃতিই মটিকার ভাষার ভাণ্ডারিতে মনু,—হৃদিকে আঁকিয়া রাখিবার বোধ্য। উপজ্ঞানখানির অন্তরগত মূল ভাবটি

সর্গবৈশেষ ও সর্গভাঙির সম্প্রতি; তাই এ প্রহর সর্গরই পাঠকের আগ লক্ষ্য পক্ষে—উপজ্ঞান-লোকের কার্যনিক চরিত্রগুলির বর্ণন-রূপে আদ্যের সহ্যপ্রতি সর্গরই পরিচয় পড়ে—তাঁহা আদ্যগোড়াই লগ্ন্য থাকে। “প্রাচীনেও নবীনে, তরুণ ও প্রবীণে সর্গর বেশে বেশে সকল জাতির মধ্যেই অলবিস্তর দিল্লমান, জাপানেও অন্তথা মন্ত।” উপজ্ঞানখানি পাঠ করিয়া এ সত্য সূত্রিতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না। প্রহর নাটিকা নানি সুবিদ্যা ভাঙা তাইকাট লেটউজ্জাট মেনারেল কাটাওকার কোঠা কত্যা—আট বৎসর বয়সে জননীকে হারাইয়া পিতার আবেগ ও বিন্যাসের অনাবিরে ক্রোদমতে সে ব্যক্তিরা উঠিতেছিল। তাহার পর বৈশেষোপাখ্যেই সাধুই বন্দী তাকেও নৌ-বিভাগে কাম করে। তাকেও মত প্রেমিক খামীর হাতে নামির দিন যুগে কাটিতেছিল।

তাকেও পিতা ছিল না; বাতা কেইদেহ দেহাভ বড় রুক্ষ; আধুনিক কালের শিক্ষা ও চরিত্র উপর তিনি ঝড়ে চটা। বধুর সহিত তিনি রুঢ় আচরণ না করিগেও তাঁহার প্রতি তাঁহার মন বড় প্রায় ছিল না, কাম্য পূত্র তাকেও বধুক বড় ভালবাসে। কিছু কাল যুগে কাটিবার পর নামির বন্য রোগ হইল; এবং মাতৃবহু-পুত্র চিঞ্জিওয়ার চক্রান্তে নামিকে গুর হইতে বিদায় বেগা হইল; তাকেও তখন কাব্যোপলক্ষে বিবেশে। নামি দিয়া পিতার যুগে আশ্রয় পাইল—খামীর সহিত আর লাক্ষ্য হইল না। তবুও বন তাহার খামীর লজ্জা বিদ্যাক্তি অধীর-আতুল হইয়া রহিল। চীন-জাপানের যুদ্ধ-শেষে তাকেও বন বস্ত্র-যুগে ফিরিল, তখন নামি ইহরগতের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার সকল চম্প বঙ্গার শেষ হইয়াছে। ইহাই প্রহর মূল—ইহাকে অবলম্বন করিয়াই নানা চরিত্র অবতারিত হইয়াছে, নানা ঘটনার ব্যত-প্রতিব্যত চলিয়াছে; এবং এই ব্যত-প্রতিব্যতে উপজ্ঞান-বর্ণিত বিবিধ চরিত্রগুলি বর্কীয় বিশেষের উচ্চল বর্ণে ছুটিয়া উঠিয়াছে। দূরদর্শন্য বিদ্য বৎকাল ভাণ্ডারি ছিলেন,

আপানী আচার-ব্যবহার ওঁহার বিশেষ, পরিচিত—
তাই ওঁহার এ প্রসঙ্গে—অনুবার হইলেও—আপানের
নিজস্ব বিশেষবস্তু ক্রোধান্ড ঢাকা পড়ে নাই।
তাঁহার উপর অনুবার এমন ব্রহ্ম—হৃদয় হইয়াছে
যে, উপজ্ঞানধানি পড়িবার সময় পাঠ-পাঠ্যগুলিকে
নিভান্নই যারের লোক বলিয়া মনে হয়। আদ্য একাধানে
বসিয়া উপজ্ঞানধানি পড়িয়া ফেলিয়াছি। অথবা যে
সকল বৌদ্ধ উপজ্ঞান বিপুল চিন্তা-নাথ করিয়া বসন্তাবার
একাদশ হইতেছে, তাঁহার মধ্যে দুই-চারিখানি ছাড়া
অপর কোনখানিই 'নামিকোর পার্শ্ব' দাঁড়াইতে পারে
না, তাঁহাদের বহু উদ্বেগ নামিকোর স্থান,—এ কথা
আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। ইহার ভাষা বেশ
বহু, সরল,—তাব বেন নদীর পাড় প্রান্তের মতই
উৎকলি বহিয়া চলিয়াছে, কোথাও একটা ছোট-খাট
বাধা অবধি আসিয়া পড়ে নাই। সে দুই-চারিটি
বৃত্ত হবিত্তে আঁকিবার মত হইয়াছে, তাঁহার একটির
ইন্দ্রিয় করিতেছি। নামিকে। যখন বস্তুর-গৃহ হইতে
নির্মলিত হইয়া পিতার কাছে ছিল, সে সময় পিতা
তাঁহাকে এক আশ্রয়কর বেশে বেড়াইতে লইয়া
গিয়াছিলেন; কিরিবার সময় তাঁহার একখানি পূর্ব-
বিক্রাসী টেনে চাপিল—এখন স্রেষ্ঠ কামরার
তাঁহার তিনজন। নামি খোলা জানাসার ধারে এবং
পিতা ঘুরে বলিয়া কাগল পড়িতেছিলেন। টেনে একটা
টেনে ধামিরাছে—এমন সময় পূর্ব বিক হইতে
আর একখানি টেনে আসিয়া সেই টেনে ধামিল।
নামির টেনে চলিতে আরম্ভ করিল—নামি পার্শ্বের
টেনেধারির দিকে চাহিয়াছিল—টেনে যেমন অপর
টেনের একখানা দ্বিতীয় স্রেষ্ঠ কামরার সম্মুখে
আসিয়াছে—অমনি সে দেখিল, সে কামরার একটা
"ব্রহ্ম হস্ত কপোল রাগিয়া বসিয়া আছে। সুহৃৎের
অন্ত তাঁহাদের চোখে চোখে সাক্ষ্য হইল। নামি
একটা অস্বস্তি মত করিয়া উঠিল।

ব্রহ্ম 'নামি-মান' বলিয়া জীবন্য করিয়া উঠিল।
সে তাকেও।" তাঁহার পর টেনে চলিয়া গেল।
ছাড়াছাড়ির পর স্বাধীন সহিত নামির এই
এখন ও শেষ সাক্ষ্য। বড় কলন, বড় হৃদয়
বৃত্ত। এমন বৃত্ত এ প্রসঙ্গে আরও আছে। এই
দীর্ঘ ১২২ পৃষ্ঠা ব্যাপী গ্রন্থাবির মধ্যে তাঁহার কয়েকটি
ক্রটি চোখে পড়িল। ১১৮ পৃষ্ঠার একস্থলে আছে,
—কেই তাকেওকে বলিতেছে, "আমিবার সময় তুমি
জুগিতে খেমেছিলে?" "খেমেছিলে" কথাটা স্বাভাবিক
এখানে গ্রন্থক হইতে পারে না—হয়, বলিতে হইবে,
"সেমেছিলে?" না হয়, বলিতে হইবে, "আমিবার সময়
তুমি জুগি হইবে এলে?" বহিখানি ভিতরে-বাহিরে
সরল-হৃদয় হইয়াছে, তাই ক্রটির কথা না জুলিয়া
পারিয়ায় না। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে পারিয়া
লওয়া হইবে। বহিখানির ছাপা কাগজ বাধা প্রভৃতি
নমনাতিরাম হইয়াছে।

গোবরগণেশের 'গবেষণা' গ্রন্থক
হরিদাস হালদার অর্পিত। ১০২ নং ছাপিসন রোড,
আরও ব্রহ্মল হইতে প্রকাশিত। বিজয়া প্রেসে
মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এই প্রসঙ্গে লেখক বেশ
নিষ্ঠাক্রমে আমাদের বহু বোধ ও চরিত্রতার সম্বন্ধে
আলোচনা করিয়াছেন। ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও নীতি
সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে,—সব মতগুলির
সহিত সকলের সহানুভূতি না থাকিলেও লেখকের
নিষ্ঠা মতভিত্তিক হইতে উপজ্ঞান, এবং তাহ
ভাষিা দেখিবার মত। লেখকের আলোচনা
কৌতুক-রসে মগ্নিত। সে রসে আগ্রহ আছে—
তাঁহা নিষ্ঠা বা অন্ধ ক্রান্তির রূপান্তর মত;
তবে স্থানে স্থানে এমন রসিকতাও আছে যাহাতে
কোনো রস নাই, এবং মধ্যে মধ্যে কল্পনা অত্যন্ত
কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। রসিকতার লেখক যে
খুব পাখা এ কথা বলা যায় না।

ঈশ্বরভক্ত দর্শী।

কলিকাতা, ২২ অক্টোবর, কালিক প্রেসে, ঈশ্বরভক্ত দর্শী দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, নামি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে
ঈশ্বরভক্ত দর্শী দ্বারা প্রকাশিত।



ইতিহাস্ সেন্স—এলাহাবাদ ।

ভারতী

৩৯শ বর্ষ]

ভাদ্র, ১৩২২

[৫ম সংখ্যা]

নালক

বেথানে কাশী, সেখানে গঙ্গা একখানি
ধাপলো খাঁড়ার মত বঁকে চলেছেন। আর
ঋষি-পত্নের নীচেই বরুণা নদীর পাড়
পাঠাড়ের মত শক্ত। তার গায়ে বড় বড় সব
ভরা গর্ভে বড় অটোখারী বক-বেড়ালি-ব্রহ্মচারী
ধূনি জ্বলিয়ে ছাইভস্ম মেখে বসে রয়েছে।
পাড়ের উপরেই সারনাথের মন্দির। মন্দিরের
পরেই গাছে-গাছে-ছায়া-করা তপোবন।
সেইখানে সত্তি ষায়া ঋষি তপস্বী তাঁরা
রয়েছেন। হরিণ তাঁদের বেখে ভয় খায় না,
পাখী তাঁদের বেখে উড়ে পালায় না। তাঁরা
কাউকে বঠে সেন্ন না। কার ঘুম ভাঙবার
আগে তাঁরা একটবার বন থেকে বেরিয়ে
নদীতে স্নান করে যান; দিনরাতের
মধ্যে তপোবন ছেড়ে আর তাঁরা বাঁধ হ'ন না।
দেবল ঋষি নালককে নিয়ে এই তপোবনে
একটি বটগাছের তলায় আজ ক'মাস ধরে
রয়েছেন।

তখন আষাঢ় মাস। বেলা শেষ হ'লেও
বেন হয় না,—রোদ পড়েও বেন পড়তে চায়
না! সারনাথের মন্দিরে সন্ধ্যার শীথ ঘণ্টা
বাজছে, কিন্তু তখনও আষাঢ়াস্ত বেলায় সোনার
রোদ গাছের মাথার ঝক্ ঝক্ করছে, হরিণ-
গুলি তখনও আন্তে আন্তে চলে বেড়াচ্ছে,
ছোট ছোট সবুজ পাখীগুলি এখনও
বেথানটিতে একটুখানি বোন সেইখানটিতে
কিচমিচ করে বেলে বেড়াচ্ছে। একলাটি
বনে নালক বর্ষাকালের ভরা নদীর দিকে
চূপ করে চেয়ে রয়েছে। একটা সাদা বক্
তরে চোখের সামনে দিয়ে কেবলি নদীর এপার
ওপার আনাগোনা করছে;—সে বেন ঠিক
করতে পারছেন! কোন্ পারে বাঁধা বাধবে।
বর্ষাকালের একটানা নদী আজ সারাদিন
ধরে নালকের মনটিকে টানছে—সেই বর্ষনের
বনের ধারে—তাঁদের সেই গাঁয়ের দিকে!
সেই তেঁতুলগাছে-ছায়া-করা মাটির ঘবে

তার মায়ের কাছে নাগকের মন, একবার ছুটে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। মন তার যেতে চাচ্ছে মায়ের কাছে, কিন্তু ঋষিকে একলা রেখে আবার যেতেও মন সরছেনা। সে ওই বকটার মত কেবলি যাচ্ছে আর আসছে, আসছে আর যাচ্ছে!

দেবল ঋষি নাগককে ছুটি দিচ্ছেন তার মায়ের কাছে যেতে। এদিকে আবার ঋষির মূখে নাগক তখনেই বৃদ্ধদেব আসছেন এই ঋষিগুণের দিকে! আজ সে কত বছর নাগক বয় ছেড়ে এসেছে; মাকে সে কতদিন দেখে নি। অথচ বৃদ্ধদেবকে দেখবার সাধটুকু সে ছাড়তে পাচ্ছে না। সে একলাটি নদীর ধারে বসে ভাবছে—বার কি না বার।

সকাল থেকে একটির পর একটি কত নৌকো কত লোককে বার বার দেশে নামিয়ে দিতে চলে গেল; কত মাঝি নাগককে বাবেগো বাবেগো বলে ডেকে গেল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আর একখানি মাত্র ছোট নৌকো নাগকের দিকে পাল তুলে আসছে—অনেক দূর থেকে। তার আগেটি দেখা যাচ্ছে নদীর জলে একটি বেন ছোট শিদির ঝিকঝিক করে তপে চলেছে! এটখানি চলে গেলে এদিকে আর নৌকো আসবে না—যাত্রী নিতে। নাগক মনে মনে দেবল ঋষিকে প্রণাম করে বসে—ঠাকুর, বেন বৃদ্ধদেবের দর্শন পাই।

দেখতে দেখতে নৌকো এসে তপোবনের ঘাটে লাগল। সেই ছোট নৌকোর নাগক তার মাকে দেখতে দেশের দিকে চলে গেল। আজ কত বছর সে তার মাকে

দেখেনি! ঠিক সেই সময় বরুণার খেরা-ঘাট পার হয়ে বৃদ্ধদেব সায়নাখের তপোবনে এসে নামুলেন। আর একটি দিন যদি নাগক দেখানে থেকে, যেত।

কত দেশবিদেশ ঘুরে, কত নদীর তরে, খালের ধারে নিত্য সন্ধ্যাবেলায় ভিড়তে ভিড়তে নাগকদের নৌকোখানি চলেছে—বে গায়ের বে. লোক তাকে সেই গায়ের রেখে; পুরানো যাত্রী যেমন নিম্নের গায়ের নেমে যাচ্ছে অমনি তার জায়গার ঘাট থেকে নতুন যাত্রী এসে নৌকোর উঠছে। এমনি করে নাগকদের নৌকো চলেছে—কতদিন কতদূর!—কেবলি যাত্রী উঠির নিয়ে যাত্রী নামিয়ে দিবে। নৌকো কখনো চলেছে সকালের বাতাসে পাল তুলে দিয়ে তীরের মত জল কেটে, কখনো বা চলেছে রাতের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে কোনো জলে পিঁপড়ের একটু আলোর দাগ টেনে;—এমন আশ্রয়ে যে মনেই হয় না বাচ্ছি।

দিনে দিনে বর্ষাকালের নদী জলে ভরে উঠছে। আগে কেবল নদীর উঁচু পাড়ই দেখা যাচ্ছিল, এখন উপরের ক্ষেতগুলো, তার ওধারে গায়ের গাছগুলো বনগুলো, এমন কি অনেক গুঁবর মন্দিরটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। জল উঁচু হয়ে উঠে বালির চরগুলো সব চুঁবিয়ে দিয়েছে!

নৌকো বখন নাগককে দেশের ঘাটে নামিয়ে দিয়েছে তখন ভরা প্রাণ মাস; সুপ-সুপ বিষ্টি পড়ছে, নদীর ধারে ধারে বাপ-ঝাড়ের গোড়া পর্যন্ত জল উঠেছে। ঠৈ ঠৈ করছে জল। খাল বিল খানা খন্দ ভরে গেছে, ঘাটের ধাপ সব ডুবে গেছে—শ্রোতের জলে—বর্ষাকালের নতুন জলে।

নাশক ঘাটে দাঁড়িয়ে বেথছে কতদূর থেকে কার হাতের একটি ফুল ভাসতে ভাসতে এসে ঘাটের এক কোণে লেগেছে; নদীর ঢেউ সেটিকে একবার জুতার দিকে একবার জলের দিকে ফেলে দিচ্ছে আর টেনে নিচ্ছে।

* নাশক জল থেকে ফুলটিকে তুলে নিয়ে মনে মনে বুদ্ধদেবকে পূজা করে মাঝ-নদীতে আবার ভাসিয়ে দিলে। তারপর আন্তে আন্তে সেই ঘরের দিকে চলে গেল—বিস্তার জলে ভিজতে ভিজতে। এই ফুলটির মত নাশক—সে মনে পড়ে না। কতদিন আগে—

অবির সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে, মাঝে ফেলে, সংলামে বাইরে ভেসে গিয়েছিল। আজ

এতকাল পরে সে আবার 'ওই ফুলটির মতই ভাসতে ভাসতে তাদের দেশের ঘাটে, মারের কোলের কাছে কিরে এসে আটকা পড়ল। আবার সে দিন কবে আসবে যৌদিন বুদ্ধদেব এই দেশে এসে ঘাটের ধারে আটকা-পড়া ফুলটির মত তাকে তুলে নিয়ে আননের মাঝ গগায় ভাসিয়ে দিয়ে যাবেন।

নাশক তাদের ঘরখানি দেখতে পাচ্ছে, আর দেখতে পাচ্ছে ঘরের দাওয়ার তার মা বসে রয়েছেন, আর উঠোনের মাঝে একটি তিথারী-দাঁড়িয়ে গাইছে—

“এরে তিথারী সাজিয়ে তুমি কি রঙ্গ করিলে।”
(সমাপ্ত)

শ্রী জগদীশনাথ ঠাকুর।

নবাব

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ব্যারনেস হেমারলিঙ

হেমারলিঙ এও সন কোম্পানির অফিস-গৃহের একেবারে দক্ষিণ কোণে দ্বিতলের উপর ব্যারনেস হেমারলিঙের বাস-কামরা। সেই ঘরেই আজ খুব জমকালো রকমের পার্টির আয়োজন হইয়াছে। ঘর খানি সে জন্ত কারদা-মাকিক সাজানো হইয়াছে—দেওয়ালে শতা-পাতার বিচিত্র আলর হুজিতেছে—ঘর একেবারে ফুলের গন্ধে ভরপুর।

অতিথির মধ্যে জর্জান, ইছদি, ব্যাকার

ও কমিশন-এজেন্টের সংখ্যাই অধিক। আফ্রিকা প্রভৃতি প্রাচ্য দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া ইহারা প্রচুর ধনৈশ্বর্য উপার্জন করিয়াছে—কাজেই হেমারলিঙের প্রাসাদ-ভবনে তাহাদিগের ষাট অবাসিত বলিলেও চলে।

ঐশ্বর্যের আড়ম্বর যতই থাকুক, ব্যারনেসের জীবনে কালির রেখা যেনেটাই ছিল। পূর্ব-জীবনে সে দাঁতী ছিল—এক দাস-বিক্রেতা আফ্রিকানপুলের বাজারে তাহাকে কিনিয়া মরক্কোর দরবারে বেচিয়াছিল; সম্রাটের মুক্তার পর তরুণ বে আহমদ আপনায় হারেমের জন্ত তাহাকে কিনিয়া

লয়। পরে হারেম ত্যাগ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে
হেমারলিঙ ত্যাগে বিবাহ করে। কিন্তু
টিউনিংসে ব্যারনেলকে লইয়া হেমারলিঙ
বড় বিপদে পড়িল। সে দেশের কোন
গৃহে—তুর্কি বা য়ুবোপীর যে কোন জাতিই
হোক না কেন—কোথাও ব্যারনেলের
প্রবেশাবিকার ছিল না। একটা বান্দাকে
বন্ধুর সম্মান দিতে সকলেই নারাজ ছিল।
পারিতে আসিয়াও হেমারলিঙের সে বিপদ
কাটিল না। কাজেই ব্যারনেলকে প্রথম
হুই-চারি বৎসর নির্জনে বাস করিতে
হইয়াছিল। কিন্তু ব্যারনেলের বুদ্ধি ছিল
অসাধারণ তীক্ষ্ণ—সত্য সমাজ বশ করিবার
মন্ত্র সে জানিত। সে মন দিয়া অল্প দিনের
মধ্যেই ফরাসী ভাষা বেশ আয়ত্ত করিয়া লইল
—সাজ-সজ্জা ফরাসী কেতার গড়িল। বহু
মূল্য রেশমি পোষাক পরিয়া সে যখন
থাক্মকে বেরুসে চড়িয়া পারিস পথে
বেড়াইতে বাহির হইল, তখন তাহার ঐশ্বর্য
ও রূপের ছটার সহরের আপামর সাধারণের
তাক লাগিয়া গেল। সকলে বলিল, হাঁ,
একটা রূপসী বটে!

তারপর ব্যারনেল খুব সমারোহে খুঁটধর্ম
গ্রহণ করিল; গির্জার ও আতুর সভার
অল্প অর্থ দান করিয়া প্রচুর নাম কিলিল।
এই সব ব্যাপারে তাহার প্রধান সহায় ছিল,
লি-মার্কায়ার। তাহারই উপদেশে ব্যারনেল
বুঝিল, এখানকার সমাজকে হাত করিতে
হইলে খুঁটধর্ম গ্রহণ করা তাহার পক্ষে বিশেষ
প্রয়োজনীয়। তার পর বাহা করিবার আপনা
হইতেই ঘটবে; আরোক্তনের প্রয়োজন হইবে
না। কারণ সমাজ বশ করিতে হইলে প্রধান

যে দুইটি অঙ্গের প্রয়োজন, ব্যারনেলের তাহা
প্রচুর আছে—সে দুটি অঙ্গ, রূপ ও অর্থ!

লি-মার্কায়ারের কথায় সভা গাঁড়াইল।
পারিস সম্রাট সমাজ, দুই হাত বাড়াইয়া
হেমারলিঙ-খুঁটধর্মকে বুক তুলিয়া লইল।
একজন শুধু ইচ্ছাতে সাহায্যে পারিল না—
সে মাদাম জাঁজলে। মাদাম টিউনিংসের
সম্রাট পরিবারের কন্যা—পারিস লোক যতই
ব্যারনেলকে মাখার তুলুক, মাদাম জাঁজলে
এই বান্দাকে কিছুতেই বন্ধুর চক্ষে দেখিতে
পারিল না। এ অপমান ব্যারনেলের হাড়ে
হাড়ে বিধিরা রহিল।

তাহার পর মাদামের কোন অধীশ্বরী
যেমন করিয়া ধীরে ধীরে আপনাম শক্তির
প্রভাব বিশপ পক্ষকে ভালো করিয়া জানাইয়া
দেয়, ব্যারনেলও রূপ ও অর্থের সাহায্যে
জাঁজলে-পরিবারকে তেমনই ভাবে বিশপকে
করিয়া তুলিল। তখন একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধ
চলিল। সে যুদ্ধ খুঁটধর্ম অস্ত্র চলে না—
গোপন অন্তরাগে বসিয়া ব্যারনেল পরক্ষেপ
করে, আর সে পর শিখা বেচারী নবাবকে
বিধিরা একেবারে জর্জরিত করে। নবাব
বিষম, পরাজিত হইলেন। হেমারলিঙ ও
তাহার পত্নী অধের গর্ভে মাতিয়া উঠিল। কিন্তু
তবুও ব্যারনেলের মনে একটা ক্ষোভ রহিয়া
গেল। এ পর মাদাম জাঁজলেকে কৈ
এতটুকুও বিচলিত করিল না ত! ব্যারনেল
ভাবিয়াছিল, এ শরের আঘাতের বেদনার
মাদাম জাঁজলে আসিয়া তাহার দরবারে
মাথা নত করিয়া গাঁড়াইবে, তাহার ক্ষমা
চাহিয়া তাহার সখী মাদামের সেই অতীত
দিসের তীক্ষ্ণ অপমানের আলা হইতে

ব্যারেনসকে মুক্তি দিবে! কিন্তু কোপার মাদাম জাঁহ্নলে!

তাই সেদিন হেমারলিঙ আসিয়া যখন মেরিকে গোরহানের ত্যাগাব খুলিয়া বলিল, তখন একটা জয়ের আনন্দে মেরির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মেরি ভাবিল, এবার পাটি বেগম তবে তাহার সার্থক হইল। দর্পিতা নারীর উপর সে মর্পের শোধ কেমন করিয়া লইবে, তাহারই উপায় সে চিন্তা করিতে লাগিল।

পাটির দিন ব্যারেনস একটা লোকের প্রতীক্ষায় অধীরভাবে বসিয়া রহিল—কখন সে আসে। যতই বিলম্ব হইতেছিল, অধীরতা ততই বাড়িয়া উঠিতেছিল। সন্ধ্যার অভ্যর্থনার ভার অপরের হস্তে অর্পণ করিয়া ব্যারেনস নিজে এক নিষ্ঠুর কক্ষ গিয়া বসিয়া রহিল। এই কক্ষের খোলা জানালা দিয়া বাড়ীর ফটক দেখা যায়! বসিয়া বসিয়া বহুক্ষণ কাটিয়া গেল; তবু হাত, সে আকাঙ্ক্ষিত জন আসিল না! ব্যারেনসের মনটা ক্রমশঃ মর্পের মতই গর্জিতে লাগিল।

পাটি তখন শেষ হইয়া গিয়াছে—রাজি পড়ার হইয়াছে। অতিথির দল ঘাইতে লুপ্ত করিয়াছে, এমন সময় কালো একটা কোট গায়ে নবাব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি একেলা, মুখ তাঁহার শুক, চোখে দারুণ উবেগ ও বিরক্তি মাখানো রহিয়াছে। পাগলের মত মুক্তি। মাদাম আসিতে রাজী হইল না—কিছুতেই না; নবাবের সহস্র কাতর অশ্রুস্রবও নয়।

সেদিন ভোর হইতেই নবাব ক্রীকে ভাড়া দিতেছিলেন, সাধ-সজ্জার আয়োজন কর।

একালে একটা নিমন্ত্রণ রাখিতে ঘাইতে হইবে। একে ত এই মূল সেহানা লইয়া টানাটানি করিতে মাদাম জাঁহ্নলে সরাসরি নারাজ, তাহার উপর যখন সে শুনিল, হেমারলিঙের গৃহে নিমন্ত্রণ এবং এ নিমন্ত্রণের মূলে সেই বানী, তখন সে একেবারে কঠিন হইয়া বসিল, কিছুতেই সেখানে ঘাইবে না। ইহার অন্ত পৃথিবী যদি রসাতলে যায়, তবুও না! এত বড় অপমান মাদাম জাঁহ্নলে একটা রাজ্যের বিনিময়েও মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না। নবাব কত বিনতি করিলেন, কত সাধিলেন,—নহিলে সব দ্বার—এ অভিমান, এ গর্ব লইয়া বসিয়া থাকিলে পথের ভিখারী হইতে হইবে। প্রাণে যোগ না-ই থাকিল, শুধু একবার হাজিরা দেওয়ার দোষ কি! অন্তরে বিরক্তির মহাভার ঢাপিয়া রাখিয়া একবার হাসিমুখে হুইট। কথা বলিগেই বা! কিন্তু মাদামের ধর্ডঙ্গ-পন, কিছুতেই নড়িবার নহে। প্রাণ যায় বাক্—সর্ব্ব হারাইয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হর, তাহাতেও মাদাম জাঁহ্নলে কাতর নহে—কিন্তু তাই বলিয়া একটা বানীর পাটিতে গিয়া ইচ্ছা খোঁড়াইবে—অত-বড় আক্‌শিন বংশে জন্মিয়া এক কলঙ্কিনী বানীর সখী স্বীকার করিবে—তেমনি পিতার কড়াই সে নয়!

নবাব মাখিলেন, কাঁদিলেন, রাগিলেন, তবুও দ্রীর মন টলিল না। তখন অগত্যা তিনি একেলাই হেমারলিঙের গৃহের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলেন।

হেমারলিঙের গৃহে পৌছিয়া সম্মুখেই হেমারলিঙ ও ব্যারেনসকে দেখিয়া নবাব

কম্পিত স্বরে করটা কথা উচ্চারণ করিলেন, “মানব জাতির শরীরটা বড় খারাপ—আসতে পারলেন না বলে তিনি ভারী চ্যুত! আমারও লেজ্ঞ আসতে দেয়ী হয়ে গেল—” কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই ব্যাংগেল কহিল, “হাঁ, আমি জানি, আমি জানি—” নবাব স্পষ্টই বুঝিলেন, সে স্বরে ব্যাংগেলের মনের সমস্ত ঝাঁপ ফুটিয়া বাহির হইল! ব্যাংগেল সেখান হইতে ক্ষিপ্ত পাক্ষেপে চলিয়া গেল।

নবাব ও হেমারলিও উভয়েরই সুপে ক্রিয়াক্ষেপের জন্য কোন কথা ফুটিল না। পরে হেমারলিও একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “বড় দুঃখের বিষয় যে, তোমার স্ত্রী এলেন না!”

গভীর নৈরাস্তে জাহ্নগের নৃত্তিক হ্রি ছিল না। তিনি কোন মতে হেমারলিওর কথারই প্রতিবাদ ফেলিয়া বলিলেন, “বড় দুঃখের বিষয় বৈ কি!” তাহার পর হেমারলিওর মুখের পানে চাহিয়া নবাব আবার বলিলেন, “কিন্তু শোন লাদেয়ার, আমাদের স্ত্রীদের মধ্যে বনিবনাও নেই বলে আমাদেরও কেন বনিবনাও থাকবে না? আমাদের বন্ধুর কত দিনের এ—”

হেমারলিও কহিল, “তা ত বাটেই! দেখা থাক—এখন তুমি একটু বসবে কি?”

নবাব কহিলেন, “না, থাক। তুমি বোধ হয় ব্যস্ত আছ—!”

“হাঁ, ভালো কথা। তা হলে লি-মার্কারের সে ছবির ব্যাপারটা—কবে তোমার সুবিধা হতে পারে, বল দেখি।”

“তার আর সুবিধা-অসুবিধা কি! যেদিন

হোক! ভাল কথা—আমি দিন দ্বিহ করে পরে চিঠি লিখব’খন। হু’একদিনের মধ্যেই সেরে ফেলা যাবে—কি বল?”

“তুমি তুলে যাবে না? দেখো। স্বয়ং ত, কত জরুরি কাজ এটা—”

“আবে না, না! তুলব কি! চ’এক- দিনের মধ্যেই তুমি আমার চিঠি পাবে। তাহলে আর এই অবধি—”

হেমারলিও সেখান হইতে চলিয়া গেলেন নবাব বিদায় লইলেন।

ইতাম দুই দিন পরে হেমারলিওর নিকট হইতে নবাব এক পত্র পাইলেন। হেমারলিও লিখিয়াছে,

“বন্ধুবরেন্”

আমি নিজে তোমার সঙ্গে করিয়া লি-মার্কারের ওখানে যাই, এমন অবসর ইতিমধ্যে চট্ট করিয়া মিলিতেছে না! বড় কাজের কিছু পড়িয়াছে; অথচ এটা খুব জরুরি ব্যাপার। যাই হোক, ভাবিয়া দেখিলাম, তোমার একলা যাওয়াই ঠিক। মর কি? কোন বিধা করিলো না। লি-মার্কারকে বলা আছে, যে কোন দিন সকালে বেলা আটটা হইতে দশটার মধ্যে তুমি তাহার কাছে যাইতে পার।

তোমারই হেমারলিও।”

চিঠির তলার ‘পুনঃ’ বলিয়া লেখা আছে, “ছবির কথা মনে রাখিলো।”

চিঠি পড়িয়া নবাব বিম্মিত হইলেন। চিঠিখানার অর্থ কি? সত্যই কি তাহার অবসর নাই, না, অসম্মতি জানাইবার এ একটা ক্ষত্র রকমের ছিল, তবু? বাহা হোক, এ-সব ভাবিয়া দেখিবার আর সময়

নাই। কাজেই একদিন সকালে জাঁজুশে লি-
মার্কারের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল।

স্বা ক্যাপের কাথলিক ক্লবের নিকট
লি মার্কারের গৃহ। লি মার্কার ব্যারিষ্টার,
লারনের ডেপুটি, ফ্রান্সের বহু ধর্ম সভায়
এগেণ্ট। হেমারলিঙের সহিত পরিচয়
হইবার পর হইতে তাহাকে আর ব্যারিষ্টারি
করিতে হয় না—হেমারলিঙের ব্যাংকে মোটা
রকম পাওনা আছে। সপ্তাহে দুই-চারি দিন
হেমারলিঙের অফিস তদারক করাই তাহার
কাজ।

লি মার্কারের গৃহে তখন ভারী ভিড়।
রাজ্যের লোক নানা কাজে দেখা করিতে
আসিয়াছে। সকলে হল-বসে বসিয়াছিল
—যখন বাহার ডাক পড়িবে, তখন সে
গিয়া দেখা করিবে। নবাব আসিয়া সেই
দলে মিশিয়া বসিলেন। বসিয়া থাকিতে
থাকিতে ক্রমে তাহার ডাক পড়িল। নবাব
উঠিয়া কম্পিত বক্ষে লি মার্কারকে কক্ষে
এবেশ করিলেন।

যখনখানি বড়। প্রকাণ্ড একখানা
গদিরান চেয়ারে লি মার্কার তাহার দীর্ঘ দেহ
ভুজিয়া বসিয়া আছে। ঘরের চারিধারে
বড় বড় ছায়—ছায়-পথে মোটা পরদা
ঝুলিতেছে। নবাব লি মার্কারকে অভি-
বানন করিলেন—লি মার্কার চেয়ারের দিকে
ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে বসিতে বলিলেন,
পরে চোখ হইতে চশমাঝোড়া নামাইয়া
টেবিলে রাখিয়া লি মার্কার কহিলেন,
“আপনার কি কথা, বলুন।”

“সেই কথাটি আমি বলতে এসেছি,
মাসিমো! আপনি হঠাৎ আশ্চর্য হইছেন,

যে এ কথা কমিটির কাছেই বলগে চলে
—কিন্তু ব্যাপারটা এত ঘোরেরা রকমের
যে সাধারণের কাছে অত কথা প্রকাশ
করে বলা ঠিক হবে না—বিষয়টি গোপনীয়।
বিশেষ সে কথা নিজে সাধারণে নাড়াচাড়া
করলে আমার একজন পরমাত্মীয়ের মনে
অত্যন্ত বেদনা দেওয়া হবে। তাই আপনাকে
কষ্ট দিতে আমার এখানে আসা।”

লি মার্কার গোঁকে দুই চারিটা পাক
দিয়া বলিলেন, “বলুন।”

নবাব বলিলেন, “তখন তবে। আপনার
রিপোর্ট যে সঠিক আর নিরপেক্ষ হবে, সে
বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।
তবে পথে-বাটে আমার নামে যে একটা
অপবাদ সম্প্রতি রটে বেড়াচ্ছে, সেটা এক-
বারে মিথ্যা। আপা করি, সে মিথ্যা জনরব
থেকে আপনি আমার সবক্ষে কোনরকম
ভুল ধারণা করে বলেন নি। সেই অপবাদ
সবক্ষেই দু-চারটে কথা আর আমি বলতে
এগেছি। আপনি নিশ্চয় শুনেছেন, সে সব
কথা। আমি আমার নির্দোষতার প্রমাণ
অবধি আর দগে এসেছি। সব দেখলে-শুনলে
সবক্ষেই আপনি বুঝবেন, ব্যাপারটা কতখানি
গোপনীয়, আর কেনই বা সেটা সাধারণে
প্রকাশ করা যায় না।”

তাহার পর নবাব লি মার্কারকে এক-
খানি সাটিককেট দেখাইলেন। সেখানা
টিউনিস মন্ত্রীভার সাটিককেট—তাহাতে
লেখা আছে, দীর্ঘ বিশ বৎসর জাঁজুশে
টিউনিসে ছিলেন—এবং এই দীর্ঘ কালের
মধ্যে দুইবার মাত্র তিনি টিউনিস ত্যাগ
করিয়াছিলেন—একবার যুদ্ধ-সময়ের তাহার

পিতাকে দেখিতে—আর একবার দে'র সঙ্গে দেখা করিতে। তাহা ছাড়া এ বিশ বৎসরে নবাব কখনও এক দিনের জন্যও টিউনিং-ছাড়া হন নাই! নবাব কহিলেন, “আপনি এখন বলতে পারেন, এখন প্রমাণ আমার হাতে থাকতে কেন আমি এই সব মিথ্যা অপবাদে প্রতিবাদ করিনি? তারও কারণ আছে, মাসিরো। আমার এক ভাই আছে—বেচারি ভাই—পারি সর্ব্বের বিলাস-পাপে পড়িল, রুগ ভাই! প্রথম বয়সে পারির বদ সঙ্গে পড়ে সে কলঙ্কের কালি মেখে বসে কিয়েছিল! কিন্তু সত্যই কি—এই যে অপবাদ-কলঙ্ক আমার নামে আজ বটে বেড়াচ্ছে, সে এতদূর মেখেছিল? তার লঙ্কান নেয়ার সাহস আমার কখনও হয়নি—তবে সে লঙ্কান নিওটনি আমি। আমার বাপ এই ভাইয়ের উপর বড় আশা গড়ে তুলেছিলেন। সেই ভাইয়ের এই কীর্তি বেখে তিনি বড় শোক পেয়ে মারা যান। মরবার সময় অতি দুঃখে আমার তিনি বলেছিলেন, ‘বার্গার্ড, তোমার দাবাই আমার মারলে! এত বড় লঙ্কা, এতখানি কলঙ্ক গারে বেখে বাঁজ যার না!’ সে কথা আমি কখনও তুলবো না।”

নবাব নিখাস ফেলিলেন, পরে আবার কহিলেন, “বাবা গেছেন, কিন্তু আমার মা এখনও বেঁচে আছেন, মাসিরো। আমার বেচারী, ঘেহনরী মা! মা আমার এ-সব কিছুই জানেন না। তিনি জানেন, ছেলে তাঁর যোগে ভুগেই এমন হয়েছে। এ সব কথা শুনে মা আমার পাগল হয়ে যাবেন। ভাই আমি মুখ ফুটে কোন কথা বলতে

পারি না। না হলে ‘মেসেয়াব’ কাগজ প্রথম বেদিন আমার গাল দিলে, সে দিন আমি তাকে অবনি ছেড়ে দি! নালিশ-মকদ্দমা করলে চারদিকে ঢাক, বেজে যায়ে—মার কানে সব কথা পৌঁছুয়ে—তুখু সেই তরে আমি চুপ কবে সে সব অপমান সহ্য করেছি। এখন” বলুন, “মাসিরো, আমার অপরাধ কি, আপনাদের কাছে আমার মিনতি! এই শু প্রমাণ। আমি দেখানুম শু, এ অপবাদের মূলে আমার খাকা কতখানি অসম্ভব। আপনি সব চেনবেন, এখন আপনি আমার বিচার করুন।”

শি মার্কাস হিরতাবে সব কথা শুনি, কিছু বলিল না। তাহার পর নবাব সবিত্তরে আপনার জীবন-কাহিনী বলিরা গেলেন। পিতার দরিদ্র অবস্থা,—তাহার যথোপযুক্ত ভাইকে মাহুব করিবার জন্য কি তাহার আগ্রহ! কত ব্যয়ে তাহাকে সহরে পাঠানো—সেই ভাই শেষে কি হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর তাগায়েবেলে কোন্ সে সহায়-হীন স্রুৎ বেখে নবাব ঘায়া করিলেন। সেখানে অল্প বয়সে মাথা পাতিয়া, বহু অসত্য লোকগণের সঙ্গে মিশিয়া-মিশিয়া একটু-একটু পরমা উপার্জন করিয়া এতখানি ঐখ্য জমাইয়া তিনি বেখে ফিরিয়াছেন। এখানে চারিধারে কি এ চৌকাস্ত—নিষ্ঠুর বড়বস্ত্র—আর নবাব একা সে সকলের সঙ্গে সমানে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। তিনি একমাত্র সহায় ছিলেন, তিনিও আজ পার্শ্ব নাই।

বলিতে বলিতে নবাবের ক্রোধ কখনও সমস্তর গলিয়া বাইতেছিল, কখনও জোখে

ভাতিয়া উঠিতেছিল; লি মার্কাস যুদ্ধভাষে বসিয়া সমস্ত উত্তীর্ণা শুনিয়া চলিয়াছিল। বর্ণনার উচ্চারণে নবাব শেষে বলিয়া ফেলিলেন, “ভাল কথা! আমার বন্ধু হেয়ারলিও বলছিল, আপনার ভাবী ছবির মত! অনেক ভাল ‘ভাল ছবি আপনি চড়া দামে কিনেওছেন!’”

লি মার্কাস নব্বু বরের কহিল, “কোথায় ভেমন ছবি। ছবির বাব কি আজকালকার বাজারে—! ও-সব বড়মামুষেরই সাধে! ডিউক, নবাব—তাদেরই এ সব পোষার—নাহলে আমাদের মত গরীবদের—! হঁ! ঐ ত ক’খানা ছবি শুধু, এই বয়েই ঐ রয়েছে। ওইই দাম কি!”

নবাব বেওয়ালের পানে চাহিলেন। লি মার্কাস খুব সতর্কভাবে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছিল। নবাব কহিলেন, “মামুষের বেওয়ালটা ফাঁক রগে গেছে যে! আমার কাছে ভার্জিনের একখানা ছবি আছে—ছবিখানা ভাল, দামও বটে! অসুখতি করেন ত সেখানা ঐ বেওয়ালে টাঙিয়ে দিয়ে যাই।”

নবাবের অলঙ্কার লি মার্কাসের অধর-প্রান্তে হাসির একটা মুহূর্ত বিদ্যুৎ-রেখা পেলিয়া গেল। লি মার্কাস ইটাই চাহিতেছিল। এই কথাটুকুর অন্তর্হই পে অতখানি ঐখ্য ধরিয়। নবাবের কাহিনী দিয়া শুনিয়া যাটতেছিল। এখন এটী কথা শুনিয়া লি-মার্কাস মগ্ন করিয়া জলিয়া উঠিল। তীব্র স্বরে সে কহিল, “আপনি বলতে চান, এই ছবিখানা ঘৃণ নিয়ে রিপোর্টটা আগাগোড়া আবার বদলে লিখি—কেমন, এই শু চান আপনি? ধনু, সেই অন্তর্হই আজ এসেছেন এখানে।” পরে

দাঁড়াইয়া উঠিয়া বট্টা টিপিয়া লি-মার্কাস আবার বলিল, “ঐখানে অনেকের অনেক-রকম আশ্পর্ক দেখেছি বটে, কিন্তু আপনার এ আশ্পর্কের আর তুলনা নেই! আমার বাড়ীতে বসে আপনি আমার এমনভাবে অপমান করতে সাহস পান—!”

“কিন্তু শুধু, মানিয়ে, রিপোর্টের লম্বকে কোম কথা—!”

ঘণ্টার মত শুনিয়া একটা ভূতা কক্ষ প্রবেশ করিল। লি মার্কাস তাহাকে কহিল, “এঁকে বাঁটবে ঘাবার পপ দেখিয়ে দাও—”

লক্ষ্য অপমানে জাঁজলে বেন মরিয়া গেলেন। এতিনি উত্তীর্ণা যন্ত্র-চালিতের মত ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন শূন্য স্থলিতেছেন, পাখের তলা হইতে মাটি সরিয়া গিয়াছে—! লি মার্কাস কহিল, “আপনি শুধু আজ আমার অপমান করেন নি, ফ্রান্সের সমস্ত সভার অপমান, সমস্ত ফরাসী জাতির অপমান করেছেন, তা জানেন। এ কথা আজই আমি সকলকে বলব। মনে রাখবেন, নবাব বাতাজ্ব, এটা আফ্রিকা মত, এ ফ্রান্স। এখানে পচসা দিয়ে লোকের বিবেক কেনা-বেচা চলে না।”

নবাব পাগলের মত টলিতে টলিতে ঘর হইতে বাহির হইলেন। তিনি চলিয়া গেলে লি মার্কাস পাশের ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া পরদা টানিয়া মুহূর্ত হাসিয়া কহিল, “কেমন, ব্যারনেস মেরি, আমার অভিনয়টা দেখলে কেমন, হুম্মরী!”

(ক্রমশঃ)

ঐন্দ্রোয়ীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আধুনিক ভারত

ভারতের শাসনপদ্ধতি

ভারতের রাষ্ট্রের একতা বিধান করিয়া, ইংলণ্ড যে বৃহৎ কাৰ্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা স্মৃদ্ধি কবেন নাই, পরন্তু শুধু তাহার আয়োজন মাত্র করিয়াছিলেন। সেই বৃহৎ কাৰ্য্যের অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলি এই—যথা :—ভারতকে জাতিভেদে হইতে, ব্রাহ্মণ্যক উৎপীড়ন হইতে, সামন্ততন্ত্র হইতে মুক্তিরান করিয়া, স্বকীয় ক্রমবিকাশের পথ অব্যাহত করিয়া রাখিতে সক্ষম করা। নৈতিক ও ভৌতিক সম্ভাব্যতার পুষ্টিসাধন করিয়া, কেবল যুরোপীয় প্রভাবই এই রূপান্তর সংসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ভারতের নৈতিক সম্ভাব্যতার উপর এই প্রভাব কিরূপ কাজ করিয়াছিল তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, ভারত সাম্রাজ্যের শাসনকাণ্ডানির্মাণপ্রণালী, মৈত্র-মণ্ডলী, বিধিব্যবস্থা ও শিক্ষাপদ্ধতির পর-পর অনুশীলন করিলে সুবিধা হইবে।

১৮৫৭ অব্দের ঘটনাবলী, প্রাচীন পদ্ধতিকে সন্দোহ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিল। সুতরাং কতকগুলি নূতন প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থা ভারতের প্রকৃত আবশ্যক হইল। এই প্রতিষ্ঠানগুলির যুগল প্রকৃতি :—বর্তমানে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান অশান্তি-বিস্কৃত দেশে পুনর্জার অনুশীলনা অনিয়ম করিবে; কারণসে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলিই উহার নৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। কারণ, বিদেশে উপনিবেশ-রাজ্য স্থাপন সম্বন্ধে ইংলণ্ডের যে একটা

বিবেচনা পটু হইয়াছে, সেই পটুত্বের সমর্থনী হইয়াই ইংলণ্ড বৃদ্ধিগত, শিপাহী-বিদ্রোহ হইতে যে শিক্ষালাভ হইল তাহা প্রজা-পীড়নের শিক্ষা নহে, পরন্তু মুক্তিদানের শিক্ষা।

অতএব ভারতের শাসনপদ্ধতি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উত্তরোত্তর কি-ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল এক্ষণে তাহার আলোচনার প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

প্রথমে দুইটি সমস্যার সমাধান আবশ্যক হইল। প্রথম, ইংলণ্ডের সহিত ভারতের কিরূপ সম্বন্ধ—এই এক সমস্যা। জাতি ও আচার ব্যবহারে ভারত ইংলণ্ড হইতে ভিন্ন; উভাদের স্বার্থ স্ব-স্বমুখে এক হইতে পারিবে না; অতএব উহা স্বাভাবিক যে ভারত ইংলণ্ডের ঐকান্তিক প্রাধিকার হইতে আপনাকে নিঃসৃত্ত করিবার প্রকৃত সম্ভব উদ্বেগ হইবে। কিন্তু ভারত ইংলণ্ড সাম্রাজ্যের একটা অংশ; শান্তির সময়ে ও যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডকে সাহায্য করা ভারতের কর্তব্য। তা ছাড়া, ১৮৫৭ অব্দের শিপাহী বিদ্রোহের ফলে, স্বকীয় উপনিবেশ-রাজ্যের তত্ত্বাবধান-ভার গ্রহণ করিতে ইংলণ্ডের রাজধানী বাধ্য হইয়াছিল, অতএব ঐ তত্ত্বাবধান অন-বচক; তথাপি এখনো সে সময় আসে নাই যে, অস্ট্রেলিয়া ও ক্যানোডাস জায় ভারত ব্রাহ্মশাসনের অধিকার লাভ

করিতে পারিবে; ভারতের আত্মবিকাশের জন্য ইংরাজ-পশ্চিমবঙ্গী আত্মশক্তি; পরস্পর-স্বার্থে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির মধ্যে শান্তি রক্ষার্থে এবং যে প্রকৃত অর্থের জন্য ভারত ইংলণ্ডের নিকট গৃহীত, সেই জন্য পরিশোধার্থে ইংরাজের শাসনকর্তৃত্ব আবশ্যিক। এইরূপে, ভারত ইংলণ্ডের অধিপতি ও ইংরাজ পার্লামেন্টের কর্তৃত্বাধীনে থাকিতে বাধ্য হইয়াছে।

এই পার্লামেন্টের অধীনে, ভারতের প্রতিনিধিত্বের কাজ করিবার জন্য, এবং আইন ও পরোক্ষা প্রভৃতি রাজ্যের দ্বারা মনুষ্য ও স্বাক্ষর করাইয়া লইবার জন্য, ভারত-রাষ্ট্র-সচিব-পদের সৃষ্টি হইল; এই ভারত-সচিব ইংলণ্ডের মন্ত্রি-পরিষদের অন্তর্ভুক্ত; একজন স্থায়ী সহকারী সচিবও নিযুক্ত হইল এবং ১০ হইতে ১২ জন সভাপতি লইয়া একটি ভারত-মন্ত্রী-পরিষৎ গঠিত হইল। সচরাচর সময়ে, ভারতসচিব যে সকল কার্যোপায় অবলম্বন করেন ভারত-মন্ত্রি-পরিষৎ তাহারই অনুমোদন করিয়া থাকেন। তবে কোন বিশেষ জরুরী কাজ উপস্থিত হইলে, ভারত-

সচিব ভারত-পরিষদের অধিবেশন আহ্বান না করিয়াই স্বয়ং কার্য সম্পাদন করেন।

এই প্রকার পদ্ধতির একটু বোধ আছে। ইংরাজ ভারতের স্বার্থকে, ইংলণ্ডের স্বার্থের, এমন কি পার্লামেন্টে-অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি মন্ত্রের স্বার্থের অধীন করিয়া রাখে। কিন্তু উক্ত দুই দেশের মধ্যে ঐক্যের যে বীজ মন্ত্রট রহিয়াছে, উহা উভয়ের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অবস্থা-অনুসারে, নিরন্তর অবলম্বন পরিণতি হইবে। গোড়ার, কয়েক লক্ষ মনুষ্য লইয়া একটি জাতি, কোটি কোটি মনুষ্যের বাসভূমি এক মহাদেশকে বসীভূত করে। কিন্তু বিবেচনাযোগ্যের সত্যতা বিবেচনা-দিগকে এই শিক্ষা দিয়াছিল যে, স্বাধীনতার শিক্ষা দেওয়াতেও লাভ আছে; পক্ষান্তরে বিবেচনাযোগ্যের প্রভাবের বশবর্তী হইয়া বিবেচনা-রাও বুঝিয়াছিল যে, স্বাধীনতার অধিকার ও কর্তব্য-সকল যারপরনাই বাছনীর। (১)

•••

বিত্তীয় সমস্যা—ভারতীয় রিউন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন

(১) বর্তমান ১২ জন সভাপতি লইয়া “ভারত-পরিষৎ” (India Council) গঠিত। ১৮৫৮ অব্দে আইনের দ্বারা সভাপদের সংখ্যা ১০ জন নির্ধারিত হয়। তার পর, ১৮৬০ অব্দের আইনের দ্বারা এই সংখ্যা কমাইয়া ১০ জন নির্ধারিত হয়। ভারতসচিবের প্রত্যক্ষ-অনুসারে ১০ বৎসরের জন্য এই সভাপতি সকল রাজ্যকর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকে। প্রাইমি, দ্বন্দ্ববৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, আবার উহার ৫ বৎসরের জন্য মনোনীত হয়। সমগ্র ভারতের ব্যাপারে, ভারত-সচিব পরিষদের মন্ত্রণা গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি এই মন্ত্রণা উপেক্ষা করিতেও পারেন, এবং কোন বিশেষ জরুরী কার্য উপস্থিত হইলে, পরিষদকে আহ্বান না করিতেও পারেন। বিচার-বিভাগ, কোষ-বিভাগ, সদর-বিভাগ, রাসদ-বিভাগ, রাষ্ট্রনৈতিক কার্যের বিভাগ, পূর্তকর্ষের বিভাগ—এই সকল বিভাগ অনুসারে, ভারত-পরিষৎ বিভিন্ন সমিতিতে বিভক্ত। এই সকল বিভাগের এক এক জন স্থায়ী সম্পাদক আছে, উহার পরিষদের অধীভূত নহেন। এই সকল কার্যসম্পাদক বা প্রধান সুদী প্রাইমি ভারত-সভাপতির অবলম্বন-প্রাপ্ত কর্তব্যধারীদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইয়া থাকে।

করা। অর্ধশতাব্দীকাল হইতে, ভারত-সরকার 'কেন্দ্রীকৃত' শাসন ও 'নির্কেন্দ্রীকৃত' শাসন—এই দুই প্রণালীর কাণ্ডাই সমাধা করিয়াছেন। কেন্দ্রীকৃত শাসন এই মন্তব্য—যেহেতু তিনটি বিভিন্ন প্রদেশের স্বাভাবিক, কেবল ইংরাজকর্তৃক ভারতজয়ের সোপান-পরম্পরা ধারণ করাইয়া দেয় মাত্র; তাই উত্তরোত্তর সমস্ত বড় বড় পদের কর্তব্য, কলিকাতার আশ্রিতা সম্মিলিত হইয়াছে। নির্কেন্দ্রীকৃত শাসনের প্রয়োজন হইল এই মন্তব্য, ১৮৫৮ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া, রাজ্যবিত্তারের সঙ্গে প্রতিদিনই নূতন নূতন প্রদেশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইতে লাগিল;—সেই সকল প্রদেশের মধ্যে জাতিগত ভেদ, ঐতিহ্যভেদ, ভূমির প্রকৃতিভেদ, আব-হাওয়াভেদ ভেদ। কাছের তাহাদের বিশেষ বিশেষ বিধি-ব্যবস্থা, বিশেষ প্রকারের বন্দোবস্ত আবশ্যক হইল। সম্ভবত এই সকল বিভিন্ন প্রদেশও, অস্ট্রেলিয়া ও ক্যানাডার

ভার অনেক পরিমাণে স্বতন্ত্রশাসনের অধিকার লাভ করিবে। (২)

এই দুই সমস্ত সমাধানান্ত্রে, এক্ষণে অল্পসংখ্যক করা যাক, কি পরিমাণে ইংরাজি মতামত ও ভারতীয় মতামত ভারত-ব্রিটেনীয় রাষ্ট্রের সংগঠন-কার্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র স্বতন্ত্র মূল-ভাবটি ইংরাজি নহে, পরন্তু ভারতীয়; যেহেতু, মূল্যেণ ভারতের শাসনতন্ত্র পিতৃশাসনতন্ত্র ও অসীম কর্তৃব্যসম্পন্ন। কিন্তু তাহার পরেই, শাসনতন্ত্রটি ইংরাজি মূল-ভাব, ভারতীয় মূলভাবটির তীক্ষ্ণতা একটু কমাইয়া দিল, একটু সংযত করিল। বর্তমানে ভারতীয় শাসনতন্ত্র অসীম কর্তৃব্যসম্পন্ন হইলেও, তাইসূত্র অসীম কর্তৃব্যসম্পন্ন নহেন। ইংলেণ্ডে, তিনি ভারত-সচিবের অধীন।

ভারতের একটি কার্যনির্বাহক মন্ত্রণা-সভা আছে; ইহা সম্পূর্ণ ইংরাজি ধরণে

(২) কেন্দ্রীকরণ চেষ্টার পক্ষে, এখনো কতকগুলি সংস্কার সাধন করিতে বাকি আছে; যথা,—এখন যেমন ইংলেণ্ডের ভারতপরিচালক, ইংলেণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিকবিদের মত হইতে যোথাই ও মন্ত্রণার গভর্নর মনোনীত হয়—তাহা না হইয়া, তাইসূত্র কর্তৃক ঐ দুই গভর্নর মনোনীত হওয়াই উচিত। লেক্টেনেন্ট গভর্নরদের ভার উদ্ভাবনের তাইসূত্রের অধীনে থাকাই উচিত—ইংল্যান্ডের মন্ত্রীমন্ত্রার সহিত সাক্ষাৎভাবে উদ্ভাবের প্রস্তাব্যহার থাকা উচিত নহে।

নির্কেন্দ্রীকরণ চেষ্টার পক্ষে, যে সকল প্রধান-প্রধান সংস্কার সাধিত হইয়াছে তাহার মধ্যে এইগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে—যথা;—প্রথমে লর্ড-বেরো এবেলগলিফ কোষ-স্বতন্ত্র কতকটা স্বাভাবিক দান করিয়া সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন; বঙ্গদেশের মন্ত, (১৮৬১) উত্তর-পশ্চিমে এবেলগলির মন্ত (১৮৬৭) ব্রহ্মদেশ ও পঞ্জাবের মন্ত, (১৮৬৭) ব্যবস্থাপক সভার পট্ট। শিক্ষা স্বতন্ত্র, পূর্ত্ত্ব স্বতন্ত্র, পুলিশ প্রভৃতির স্বতন্ত্র, এবেলগলি আর সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা উপভোগ করে। যোথ হয় আর কতকগুলি সংস্কার আবশ্যক হইবে। বাঙ্গালা, উত্তর পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশের লেক্টেনেন্ট গভর্নর, গভর্নর উপাধি লাভ করিতে পারেন। যথা-ভারতের এবেলগলি ও আগাখের চীফ-কমিশনার লেক্টেনেন্ট গভর্নর উপাধি লাভ করিতে পারেন। সকলেরই এক একটা শাসনকার্যনির্বাহক পরিষদ (Executive Council) থাকা আবশ্যক; তাহারা ই মন্ত্রীমন্ত্রার স্থান অধিকার করিবে। এই সংস্কারটি বিশেষরূপে ব্রহ্মদেশ ও বঙ্গদেশে বিভাজ্য আবশ্যক।

গঠিত এবং ইহা মন্ত্রি-পরিষদের স্থাপত্যভিত্তিক। ভারত-সচিবকর্তৃক এজন সভাসদ মনোনীত হইয়া থাকে। এবং ভারতের প্রধান সেনাপতি এই পরিষদের একজন অতিরিক্ত সভাসদ। ইহার ছয়টি বিভাগ আছে; এই ৬ বিভাগের অধ্যক্ষ ছয়টি সচিব। কোষাধ্যক্ষ সচিব, পূর্তকর্ম্যাধ্যক্ষ সচিব, আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের সচিব, ক্রয় ও রাজস্বের সচিব, স্বল্পমুদ্র ও নৌযুদ্ধের সচিব, বিধিব্যবহার সচিব, পররাষ্ট্রের ব্যাপারের সচিব এবং সামন্তরাষ্ট্রের ব্যাপারের সচিব।

একটি ব্যবস্থাপক সভা আছে; ইহাও ইংরাজি ধরণে গঠিত। ইহার বিশদিত ক্রমবিকাশ, ব্রিটিশ-পার্সে-মেন্টের ক্রমবিকাশকে স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রথমে ইহা ভাইন্সররের একটা সামান্যিধা পরামর্শ সভামাত্র ছিল, তাহার পর স্বাভাবিকভাবে ও স্বাধীন মতের অধিকারী হইল, এবং ১৮৯২ হইতে ভারতের ভারী রাষ্ট্রসভার প্রথম-আকার ধারণ করিল। ভাইন্সরর, সেনাপতি, সচিববর্গ, বঙ্গের লেফটেনেন্ট গভর্নর সমেত, ১৭ হইতে ২৩ জন পর্য্যন্ত ইহার সভাসদ সংখ্যা। (৩) অস্ত্রান্ত সভাসদ, সরকারের কর্মচারীমণ্ডলী হইতে, জন্ম ও কৌতুহির মধ্য হইতে, অথবা কোন কোন নির্বাচন মূলক সভাসমিতি হইতে, ভাইন্সরর কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকে। এই সভা, আইন-

জারি সুশৃঙ্খলিত সভাসদ প্রদান করে, বার্ষিক আয়ব্যয়ের আভ্যন্তরিক হিসাব পরীক্ষা করে; কিন্তু যেহেতু সরকারী কর্মচারীমণ্ডলেরই সংখ্যাধিক্য, সুতরাং, যে বাধাহ্রবান প্রকাজ-রূপে হইয়া থাকে ও সংবাদপত্রাদিতে সমালোচিত হয়, সেই বাধাহ্রবাদের কেবল একমাত্র লক্ষ্য—বতর্নর সম্ভব সরকারকে সকল বিষয়ে তাল করিয়া ওরাকি-হাল করা।

এই কেন্দ্রগত কর্তৃমণ্ডলীর নীচে, কতকগুলি বড় বড় শাসন-বিভাগ আছে। দুই প্রেসিডেন্সি :—বোম্বাই ও মাদ্রাজ। এই দুই বিভাগের গভর্নর সাংসদভাবে ভারত-সচিব কর্তৃক মনোনীত হয়। ইহার পর আর সাতটি প্রদেশ :—বঙ্গদেশ, মিলিত-প্রদেশসমূহ (উত্তর-পশ্চিম ও অযোধ্যা), পাঞ্জাব, ও ত্রক্ষদেশ;—এই সকল প্রদেশ লেফটেনেন্ট গভর্নরের অধীন। মধ্যভারতের প্রদেশসমূহ ও আসাম, চীফ কমিশনরের অধীন; এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্ত-প্রদেশ (১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে সৃষ্ট হয়) ভাইন্সররের একজন প্রতিনিধি কর্মকর্তার অধীন। (৪) মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের একটি কার্যনির্বাহক সভা ও একটি ব্যবস্থাপক সভা আছে; বঙ্গদেশ, ত্রক্ষদেশ, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের যুক্ত-প্রদেশসমূহ ও পাঞ্জাব—ইহাদেরও এক-একটি ব্যবস্থাপক সভা আছে।

(৩) অধ্যকার বখন লিখিয়াছিলেন, তাহার পর কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইয়াছে।—অনুবাদক।

(৪) ডা. ছাড়া, কর্ণ, ব্রিটিশ বেলুচিস্তান, আশামান-বীপপুত্র—এই সকল স্থানেরও চীফ-কমিশনার আছে।

কিভাবে মনোনীত সভ্য লইয়া, কিসে
নির্বাচিত সভ্য লইয়া, কিছু অধিকাংশই
মনোনীত সরকারী কংগ্রেসে লইয়া এই
সকল সভা গঠিত। এই সকল সভা, নিজ
নিজ এলাকায় প্রণীত আইন প্রণয়নে
সহায়তা প্রদান করিয়া থাকে।

ভারত ২৪৮ জেলার বিভক্ত। পড়ে উদ্ধারের অধিবাসী-সংখ্যা ৮৮০,০০০। এই সকল বিভাগ কালেক্টর মেজিষ্ট্রেট কর্তৃক পরিশাসিত। এই বন্দোবস্তই সম্পূর্ণ ভারতীয় ধরণের বন্দোবস্ত। কেননা, কালেক্টর (তহসিলদার) খাননা আদার করেন, বদমায়েশদিগকে শাসন করিবার চেষ্টা করেন, এবং তাহাদের প্রতি ছই বৎসর কাল মেয়াদের কারাবদ্ধ ও হাজার টাকা পরিমাণ অর্থদণ্ড বিধান করিতে পারেন। তাহার কার্যে সাহায্য করিবার লক্ষ একজন অসিষ্টেট-মেজিষ্ট্রেট-কালেক্টর, একজন এসিষ্টেট মেজিষ্ট্রেট-কালেক্টর এবং একজন ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হইয়া থাকে। তাহাদের হুকুম তালিম করিবার লক্ষ, সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও সহকারী সুপারিন্টেন্ডেন্টের অধীনে পুলিশ অবস্থিত। এই সকল বিভাগ আবার ১০৮১ উপবিভাগে

বিভক্ত। উপবিভাগগুলি সব-ডেপুটি মেজি-
স্ট্রেট কর্তৃক পরিশাসিত।

যাত্রাজ ছাড়া, আর সকল প্রদেশেই ৫০৩ট- বেশী মিলিয়া এক একটা উপরিতন শাসন-বিভাগ গঠিত হইয়াছে। এই বৃহৎ বিভাগের কর্ত্তা—একজন কমিশনার (৫৭টা কমিশনার পদ); বোম্বাই ছাড়া আর সকল প্রদেশেই এক একটা রাজস্ব-পরিষৎ আছে (Board of Revenue); তা ছাড়া সকলগুলিতেই এক একটা স্ক্রিসি-সেক্রেটারি আছে (Secretariate)—উৎস একপ্রকার প্রাদেশিক সচিব-পরিষৎ।

বিচার-বিভাগের বন্দোবস্ত একেবারেই যুগোপীর্ণ স্বরূপের। প্রবেশের প্রধান প্রধান স্থানে উচ্চ-আদালত বা প্রধান আদালত অবস্থিত। জেলা-বিভাগে, দেওয়ানী ও ফৌজদারী জজ, সর্ভিমেন্ট জজ, উপ-বিভাগগুলিতে মুনসেফ্‌। ছোট আদালতের খুল্লা মোকদ্দমা ছাড়া, কি দেওয়ানী, কি ফৌজদারী সকল মোকদ্দমারই আপীল চলে। স্থলবিশেষে, উকীলেরা ইংলণ্ডের প্রিভি-কৌন্সিলের মিকট পুনর্বিচারের প্রার্থনা করিতে পারে। (৫)

এখন দেখা যাক, শাসন বিভাগের কার্যে দেশীয় লোকদের কতটা হাত আছে। নির্দিষ্ট বিধি-অনুসারে, ইংরাজের সহিত উহাদের সমান অধিকার। কিন্তু কার্যত খুব অল্প ভারতবাসীই উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়া থাকে। কখন কোন ভারতবাসীই শাসন-কার্য নির্বাহক পরিষদের সদস্য হয় নাই। (৬)

১৮২২ অব্দের আইনে আঁড়ে—বড়লাট অথবা ছোটলাট কতকগুলি ভারতবাসীকে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে নির্বাচিত করিবেন এবং আর কতকগুলির নাম, নির্বাচনমূলক কতকগুলি জনসভা, নির্বাচনের অল্প উচ্চ ছুই লাটের নিকট সমর্পণ করিবেন। শাসন-বিভাগের প্রধান প্রধান পদ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অল্প সন্তত-ভাবে রক্ষিত। এই সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত ১০০০ হইতে ১১০০ জন রাজ-পুরুষ সব্বদে সংগৃহীত হইয়া থাকে; এই সিভিল সার্ভিস এক শতাব্দী হইতে ভারতকে ভাল ভাল বুদ্ধিমান অর্থতঃ উদ্যমশীল কর্মচারী বোগাইয়াছে। বর্তমান শাসন পদ্ধতির প্রতিবাদীপক্ষও তাহাদের বোগ্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের দ্বার ভারতবাসীদিগের অল্প উদ্-বাটিত আছে, কিন্তু ইংলণ্ডে উহার পরীক্ষা হয় বলিয়া এখনো পর্যন্ত অতি অল্প ভারত-

বাসীই উহার করিয়াছে। (৭)

অতএব উচ্চ-পদের শাসনকর্তৃব প্রায় এক মাত্র ইংরাজের হস্তেই রহিয়াছে। এবং আরও দীর্ঘকাল উহা ইংরাজের হস্তেই থাকিবে। কেননা, ভারতের ধর্মমত, শ্রেণীবিভাগ, জাতি প্রভৃতি এত অসংখ্য এবং এত মিশ্রিত যে, কোন এক প্রদেশ শাসন করিতে সমর্থ একজন দেশীয় কর্মচারী পাওয়া দুর্ঘট। তাছাড়া, লোকেরা যেরূপ শিক্ষা পায় তাহাতে ভাল কর্মচারী তৈয়ারী হইতে পারে না। প্রাচ্য দেশে, পদসম্মান দান করা আবশ্যিক; কিন্তু এপর্যন্ত গভর্ণমেন্ট উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগকে ও প্রাচীন সামন্ত-রাজবংশের উচ্চ-রাজিকারীদিগকে এই শাসন বিভাগের কার্যে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছেন।

কিন্তু যদিও শাসনবিভাগের প্রধান প্রধান কর্মচারী ইংরাজ, তথাপি প্রায় সমস্ত সাধারণ কর্মচারীই ভারতবাসী; অধিকাংশ ডেপুটি কমেন্টর (ভারতে অভিযোজিত একজন ইন্-ভারতীয় ও (কিরিরি) ইহার অন্তর্ভুক্ত) সমস্ত সব-ডেপুট মেজিস্ট্রেট, প্রায় সমস্ত পুলিশ,—(কেবল হুপারিনটেণ্ডেন্ট ও সহকারী বাপে)—ভারতবাসী।

(৬) একথা এখন আর বলা চলে না। অনুবাদক।

(৭) পূর্বে ইহার নাম ছিল—Covenanted Civil Service. Warren Hastings ও Lord Cornwallis নিজে কর্মচারীদিগের সহিত যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, এই নামটি তাহা দ্বারা করাইয়া দেয়। ইহার উচ্চ-স্তরে বেতন পাইত, এবং তাহার বদলে এই অধীকার করিয়াছিল যে, উহার বাসিন্দা লিপ্ত হইবে না, এবং প্রজাদিগের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করিবে না।

অন্তএব কার্যাত ভারতবাসীরাই ভারত শাসন করিবার থাকে, কেবল তাহাদের উপরে, ৩৭ শত উন্নতদের ইংরাজ কংগ্রেসী তত্ত্বাবধানের অস্ত্র রহিয়াছে।

বিচার-বিভাগে, এই দুই উপাদানের মিশ্রণ কার্যটি আরো বেশী অগ্রসর হইয়াছে। সমস্ত বড় আদালতে ভারতবাসীরা বিচার-সনে বসিতে পারে, এবং সমস্ত নিম্নপদে ভারতবাসীরাই নিযুক্ত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, জেলা-জরের পদটা সচরাচর সিন্ডিকাল সার্জিসের লোককেই দেওয়া হয়। কোন কোন বিশিষ্ট কর্মক্ষেত্রে (ডাক, টেলিগ্রাফ, পুর্ককর্ম, বিবরণ-সংগ্রহ, ইত্যাদি) কতকগুলি মাত্র যোগ্য ভারতবাসীকে নিযুক্ত করা হয়; কিন্তু ব্যবহারিক বিভাগের অস্থানীনে অতিক্রমি না থাকায়, ভারত-বাসীরা এই সকল কর্ম পাইবার অস্ত্র চোঁচ করে না।

যদিও যৎসামান্যতমই ভারতের রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি, যদিও রাষ্ট্রের শাসনকার্য হইতে ভারতবাসী বঞ্চিত, তথাপি ভারত-বাসীগণ পৌরসভার হিসাবে বিপুল স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া থাকে :—যথা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, গৃহের অলঙ্কারস্বত্ব, সম্মিলনের, আবেদনের ও সভাসমিতি স্থাপনের অধিকার-লাভ এবং মুক্তাবস্থার স্বাধীনতা। লর্ড রিপনের রাষ্ট্রসংস্কার, ভারতকে স্পেন, অষ্ট্রিয়া ও জার্মানী অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীন করিয়া তুলিয়াছে।

তাছাড়া দুইটি ইংরাজি প্রতিষ্ঠান ভারত

ইংরাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। একটি—কোমনারী বোম্বার্ডার জুরীস ব্যবস্থা। আর একটি—মণবাগিতে (ম্যুনিসিপাল) পৌর-সভা ও মেয়র গ্রাম্য-সভা; এই সকল সভার উপর পুলিশের ভার, পুর্ককর্মের ভার; এবং উহাদের মতামত (vote) অস্থলারই আবশ্যক টেক্স স্থাপিত হইয়া থাকে। মদ্য-সংখ্যার একাংশ কর্তৃপক্ষকর্তৃক এবং অপরাংশ অধিকতর-টেক্স-পাতা ব্যক্তিগত কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া থাকে। যদি সম্ভব হয় তবে নির্দোষিত মদ্যসংখ্যা নামকর্ষকারী-সদস্য-সংখ্যা হইতে অধিক হওয়া চাই, ভারত বাসী-সদস্যের সংখ্যা। ইংরাজ মদ্য-সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হওয়া চাই। লোকেরা নিজ অধিকার কার্যে পরিণত করিবার অস্ত্র তেমন যত্নশীল ও আগ্রহান্বিত না হওয়ায়, নির্দোষ-কর্তারা অতিক্রমে প্রতি-নিধি নির্ধারণ করিয়া থাকে। অনেক নির্দোষ-গণীয় মধ্যে, নির্দোষের অস্ত্র কোন উদ্দেশ্যই উপস্থিত হয় না। অধিকাংশ স্থলে সচরাচর এক প্রেমীর লোককেই উপস্থিত হইতে দেখা যায়—হয় উকীল, নয় সৎবাদ প্রবাসীর লোক। কেবল বড় বড় সহরের পৌরকার্যনির্বাহক সভাগুলি প্রদর্শনিত ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়া থাকে।

ইংলণ্ড ভারতবাসীকে শুধু যে পৌরসভার স্বাধীনতা দিয়াছেন তাহা নহে ভারতবাসী ও ইংরাজের মধ্যে সম্পূর্ণ সাম্য স্থাপন করিয়াছেন।

ভারতে, ভারতবাসীরা বঞ্চিত রাষ্ট্রীয় অধিকার উপভোগ করে, কিন্তু ইংরাজদিগের অধিকারও তদপেক্ষা বিস্তৃত নহে; ইংলণ্ডে

ভারতবাসীগণ নির্বাচনের অধিকারী ও নির্বাচনের পায় বলিয়া পরিগণিত; কতকগুলি ভারতবাসী ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রবেশলাভ করিয়াছে (৬)। অবশ্য, ভারত-শাসন-বিভাগের উচ্চপদে ইংরাজেরা নিযুক্ত হইল। কিন্তু সকল দেশেই, গভর্ণ-মেন্টের নির্বাচনে বাধীনতা আছে এবং অনেকসময়েই, কোন এক রাষ্ট্রনৈতিকদল, প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে, সর্বপ্রকার শাসন কার্য হইতে, ২০১০ বৎসর-কাল, বঞ্চিত করিয়া রাখে। বস্তুতঃ, আইন ইংরাজকে শুধু একটি বিশেষাধিকার দিয়াছে; কোম্পানী নালিসে অস্তিত্ব হইলে, ইংরাজেরা বিচারার্থ হইয়া কতকগুলি ইংরাজ জজ পাইবে—নয়, উচ্চপদস্থ দেশীয় জজ পাইবে এবং তাহার স্ত্রী হইবে—ইংরাজ অথবা আমেরিকান।

.

(৭) বাবাভাই নোরোজি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রথম ভারতীয় সভ্য। ইনি একজন পার্শী, ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে ৮টা সেপ্টেম্বরে, বোম্বাইনগরে জন্মগ্রহণ করেন। *Elphinstone Institution-এ শিক্ষালাভ করেন। ই বিভাগেই তিনি গণিত ও আভ্যন্তরীণ বিজ্ঞানের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। ভারতবাসী-দিগের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথমে একটা বড় কালেক্টর অধ্যাপক হন। ভারতের নৈতিক ও বৈদ্যিক উন্নতিকল্পে যত সভাসমিতি ছিল, এতদ্ব্যতীত তিনি নির্দ্বন্দ্বিতা ছিলেন। ১৮৫৫ অব্দে লণ্ডনে যে সভাপত্রী স্থাপিত হয়, তিনি তাহার এক সভ্য ছিলেন। ১৮৫৫ অব্দে তিনি East India Association স্থাপন করেন। ১৮৭৪ অব্দে তিনি বরদ্বার বেওয়ান-পদে নিযুক্ত হন। বোম্বাইয়ের Municipal সভ্যের সভ্য (১৮৭৪) তাহার পর (১৮৮৫) বোম্বাই প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভ্য সভ্য। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সভ্য দ্বিতীয় বর্ষের অধিবেশনে (১৮৮০) এবং নবম বর্ষের অধিবেশনে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন (১৮৯০)। Central Finsbury-র দ্বিতীয় নির্বাচিত পার্লামেন্টের সভ্য (১৮৯২)। London Indian Society-র সভাপতি। ভারতের রাষ্ট্রীয় অর্থায়ন পরীক্ষা কমিশন দেখিবার দ্বিতীয় ভারতীয় প্রেরণার এক Royal Commission বসিয়াছিল (১৮৯৫)। ১৮৯৫ অব্দে তিনি পার্লামেন্টের সভ্যরূপে পুনর্নির্বাচিত হন নাই।

Sir Mancherjee Bhownagjee ইনিও একজন পার্শী। ১৮৫১ অব্দে ১৫ আগস্ট বোম্বাইনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি Elphinstone College-এ শিক্ষালাভ করেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের fellow (১৮৮১), সংবাদপত্রের পরিচালক, ওয়ার পিটার দ্বারা গঠিত হইতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়, ও রাষ্ট্রনৈতিক পুরস্কার, ১৮৮৭ অব্দে ভবনগরের মহারাষ্ট্রের রাজা; ভবনগরের রাজা তিনি নিযুক্ত শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। ১৮৯৫ অব্দে পার্লামেন্টের সদস্য।

এই ভারত-ব্রিটিশ রাজ্যশাসনের ব্যাধি হইতে কতকগুলি অবাঞ্ছিত চিন্তা মনোবোধে সমৃদ্ধিত হয়।

বাণিজ্য-বিস্তাররূপ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই কোম্পানী ভারতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে; এবং রাষ্ট্রনৈতিক লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ইংলণ্ডাধিপতি কোম্পানীর আধিপত্যের দ্বারা নিজ আধিপত্য স্থাপন করেন। অবশ্য, কতকগুলি উদারচেতা লোক পার্লামেন্ট সভ্যর ভারতের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন; অবশ্য ভারতের বড়-লাটেয়া বোম্বাড়া ও ধর্মজ্ঞানের কতকটা পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু মূলত ভারতের স্বার্থ ব্রিটিশ সম্রাজ্যের স্বার্থের নিম্নে অধিষ্ঠিত এইরূপই বিবেচিত হইত। এবং যেহেতু রাষ্ট্রনৈতিক পুরুষেরা রাষ্ট্রনীতিজ্ঞও নহেন,

তত্ত্বজ্ঞানীও নহেন ; এবং যেহেতু তাঁহাদের
অত্যন্ত অতীত সংকীর্ণ, আবাস, সেই
মতামতের অত্র তাঁহারা গৌরব করিয়াও
থাকেন, সুতরাং এই ব্রিটিশ সম্রাজ্যের
স্বার্থই তাঁহাদের নিকট প্রত্যক্ষ স্বার্থ।
তথাপি ইংলণ্ডের উদারনৈতিক প্রতিষ্ঠা-
নাথির একুশ প্রবল শক্তি (যে শক্তির
প্রত্যাব গোড়ার কেহই বৃদ্ধিতে পান নাই)
যে, অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এমন কতকগুলি শ্রেষ্ঠ-
ধরণের স্বাধীনতা ভারতবাসীকে প্রদান
করা হইয়াছে, যাহা কোন প্রাচ্যদেশ
ইতিপূর্বে ভোগ করে নাই এবং যাহা
কেবল যুরোপের অধিকাংশ দেশ ভোগ করিয়া
থাকে।

এই সর্বপ্রথম, আতি-ধর্ম-শ্রেণিনির্ধিষ্টেবে
সমস্ত ভারতবাসী কতকগুলি সমান অধিকার
উপভোগ করিতেছে। এই সর্বপ্রথম,
সকলেই এক মাস্টার অস্বত্ব হইয়াছেন।
সম্ভবতঃ রাষ্ট্রের একতার সঙ্গে সঙ্গে বৈদে-

নিকেরা ভারতকে নৈতিক একতাও প্রদান
করিতে কৃতকার্য হইবে।

মোটকথা, যে দুই সভ্যতার মধ্যে
ইতিপূর্বে বৈর-ভাব ছিল ইংলণ্ড সেই দুই
সভ্যতাকে একত্র মিশাইয়া দিবার ভার
লইয়াছেন। এই কার্যে সাফল্যলাভ
করিতে হইলে, প্রথমে অহমত্বান করা
আবশ্যক, যুরোপের কোন্ কোন্ রীতি-নীতি
ও প্রতিষ্ঠানাদি গ্রহণ করা ভারতের
কর্তব্য এবং ভারতীয় কোন্ কোন্ রীতি-
নীতি ও প্রতিষ্ঠানাদি ভারতের রক্ষা
করা কর্তব্য। এইরূপ অহমত্বানে অনেকটা
বিধা হইতে পারে, অনেক ভুল হইতে
পারে ; কেন না, যুক্তিবিচারের ঘাটা
উন্নতির সমস্ত ভারী পরিণাম পূর্ণ হইতে
কতকটা পরিলক্ষিত হইলেও, ক্রমবিকাশের
কতটা দৌড় ও পাল্লা, একমাত্র কাল-ই
তাহার পরিচয় দিতে পারে।

শ্রীমোতিরসজ্ঞানার্থ ঠাকুর।

ককারের অহঙ্কার

(বস্ত্র খোদ কর্তা)

বকলমে স্বাক্ষরকারী :—শ্রীমলিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কি, কেন, কেমন করিয়া, প্রকৃতি প্রদ-
পরম্পরায় কৌতুহলোন্মেষে এবং কার্যাকারণ-
সম্পর্কের আবিষ্কারে যখন বিজ্ঞানের উৎপত্তি
ও পরিণতি, তখন যে ক্ষেত্রেও আমার

জরাজরকার—কেমন কি না ? প্রকৃতি ও
শক্তি, উভয়ই আমি। আকর্ষণ, বিকর্ষণ,
মাধ্যাকর্ষণ, কৈশিক আকর্ষণ (Capillarity),
আকৃকনীয়াতা, স্থিতিস্থাপকতা, ক্রান্তিক্রি

ও কেন্দ্রাঙ্গন শক্তি, চৌধক শক্তি, ইলেক্ট্রিক শক্তি, আণবিক, কাচের পরকোণ, কিছুই আমাছাড়া নহে। আমিই ভূমিকম্প ঘটাই, কুআটকা উঠাই, মরোচিকা বা মৃগভূমিকা দেখাই, কোটাগে বান ডাকাই, কম্পাসের কাঁটা চালাই। কোডাক ক্যামেরার, বেকা রেকর্ডে, বায়োথ্যাপে, ক্যালিডোস্কোপে, আমারই রকম রকম প্রচার। টেলিগ্রাফের টেরেটকার আমার আওতাধীন পড়ে না কি?

কিমিথ-শাস্ত্র আমারই অধিকৃত। ফেলভিন হাক্সলী জুঁকু রকম পাখাল ফেলভার ডেকার্ট সকলেই আমার অধীন। আরক, গন্ধক, সোঁকো, ফটকিরি, আর, জাবক প্রভৃতি বাঙ্গলা নামই ধর আর এলকেলি, এলকহল, মার্করি, কার্বন, ক্লোরিন, আর্সেনিক, অক্সিজেন, এসেটিক, অক্স্যালিক প্রভৃতি ইংরাজী নামই ধর, আমি সকলেই উপাদান। বাঙ্গলা করিয়া সোঁকো সৈকতকই বল আর ইংরাজী করিয়া আর্সেনিক সিলিকনই বল, আমাকে এড়াইতে পারবে না। কেমিক্যাল কম্পাউণ্ড আমারই কর্তব্য, কেমিক্যাল ওয়ার্ক আমারই কারখানা।

উদ্ভিদবিশার বেষীদূর যাইতে হইবে না, অকুং বা ট্যাংকেই আমাকে দেখিবে। শরীরবিজ্ঞানে রক্তের সঙ্গে আমি মিশাইয়া আছি। বাহ্যাবিজ্ঞানে আমিই কৃত্রিম ও পরিণামের উপকারিতা শিখাই। নৃতবে আমিই ককেশিয়ান জাতির স্রষ্টা রটাই, জার্বিন-নৃতবে আমিই উৎকর্ষ অপকর্ষ ক্রম-বিকাশ ঘটাই।

জ্যোতিষে পৃথিবীকে কদম্বকুম্বাকৃতিই বল আর কমলালেবুর মতই বল, আমার পরণ লইতে হইবে। কোপারনিকাসে আমি, বোনক-সিদ্ধান্তে আমি, ভাঙ্কনাচার্যেও আমি। আমি উত্তরাংশে নাই দক্ষিণাংশে আছি, রাহতে নাই কেতুতে আছি, গ্রহ উপগ্রহে নাই নক্ষত্র ধুমকেতুতে আছি, অরুণভীতে নাই কালপুরুষে আছি, প্রান্তার নাই শুক্রতারার আছি। আমি অধিনী-ভরগীতে নাই কৃত্তিকাতে স্রগন্ধ আমার করিয়াছি, দেব বৃষ মিথুনে নাই, কর্কট কক্কা বৃশ্চিক কৃত্ত মকরে প্রথমভাবে আছি। শুক্রপক্ষ কক্ষপক্ষে আমার কোন পক্ষপাত নাই। আর্থিক বার্ষিক উভয়েই আমার গতি। রশিচক্র, নক্ষত্রচক্র, কক্ষা, অক্ষাংশ, ক্রান্তিপাত, সংক্রান্তি সর্বত্র আমি। কলিত-জ্যোতিষে কালবেলা কুলিক বেলায়, কালরাত্রিতে, দিক্‌শূলে, জুঁগ্রহে, সপ্তশল্যাকায়, রাগবোটক মিলে, স্রুতিহিষ্ট গোণে আমি আছি। জন্মকুণ্ডলীতে আমি কুণ্ডলী পাকাইয়া আছি। করকোণী আমারই স্রুটি। শাকুনিক, গণক বা গণ্যকার আমার বল, এলমানাক, ক্যালেন্ডার, পঞ্জিকার আমার অধিকার, বার্ষিক মাসে শুক্রবার আমার সকার। কালগণনার কল্যাকাঠার আমি, পলককণে আমি, শক-শাকে আমি, কলমেও আমি। কনাই বল, সকাল বিকালেই বল, আমি কামিন্‌কালে তিলেকও কাহারও কাছছাড়া হই না।

অকশ্যে ঐক কাটাও, ঐক কবার, চোকে, ইলেকে, একুনে, ঠিক দেওয়ার, জমাধরচবাকীতে, বড়ি ও কাহনে, কাক-

কড়াক্ষত্রি হিসাবে, শুভ্র, এক হইতে কুড়ীতে, কুড়ীধরণে ক্রম-বিক্রমে, কড়াকিরা গড়াকিরা বড়াকিরা শতকিরা প্রভৃতিতে, একক দশক হইতে লক্ষ কোটি সংখ্যার, কাঠাকালী মোকাকালী পুস্তককালীতে, কড়িকরা কাগজকরা, কুড়ো কাঠা রেক কুনকে কীজা ছটাকে (গোয়াটেক সেমটেকেও), শুভকরী মানসাত্মে আমারই কাণ্ড। আবার শুভনীলক-শুভিতকে, লক্ষলনে, লক্ষকরণে, কুণীর ও চক্রবৃদ্ধিতে, বর্ণমূল বনমূল নিৰ্ধাপনে, প্রকৃত অপকৃত উভয় প্রকার ভগ্নাংশে, ত্রৈরাসিক বহুরাসিকে, দশমিক শোনাগুনিকে আমাকে পুনঃপুনঃ পাইবে। কোণে, কোণে, লক্ষকোণে আমার অধিকার। ত্রিকোণমিত্ত ও আমার এলাকার অস্তিত্ব। ক্যালকুলস্ কোয়টারিয়মের কথা কহিরা আর আডকের উল্লেখ করিব না। গোমীলক্ষ, কে, পি, বহু ও কে, পি, টেট্রাভের অঙ্কর কেতাবের উল্লেখ করিয়াই কাজ হইল।

ইতিহাসে, আমারই প্রাণদে অশোক কণিক বিজয়াদিত্য প্রেষ্ঠ রাজচক্রবর্তী, চাপকা বা কোটিল্য প্রেষ্ঠ রাজনীতিক, আলেকজান্ডার বা আলিকসন্দর বা সেকন্দর বেশ অধিকারে অধিষ্ঠার, আকবর প্রেষ্ঠ মেগল সম্রাট, মীরকাশির বাঙ্গালার শেব মবাব, ফ্রাইড আর্কটবিজয়ী কর্ণবীর। আমারই অস্ত্র দাঙ্গাসিকো হুগুভিত, অশোক-পুত্র কুনাল স্মৃষ্ণিল। স্বপ্নগুপ্ত কুমারগুপ্ত, রাণা কুন্ত, শক্তসিংহ, বল্লভার কুতুবুদ্দিন সবকুশিন আবুবকর কৈকেয়াব, অকল্যাণ কর্ণওয়ালিস বেন্টিক নর্থকক, কেহই আমা

ছাড়া নহেন। ক্লেমেন্স ক্যামিংএ আমি, হুজ্জন কর্জনে আমি, আবার কায়মাইকেলেও আমি। লক্ষাবৎকুলের শোধবোধে আমি, আবার কাপানের হারাকিরিতেও আমি। তিলোয়ারির বেকনলকোন্ডে আমি, কাইজার বিসমার্কে আমি, জার নিকোলাসে আমি, ফ্রেডরিক দি গ্রেটে আমি। বীরনারী কর্ণদেবী কর্ণবতী কুমলাবতী ও কুমারী কুমলুমারী আবার মানে মানিনী। অস্তোরলোনি মহামেটে আমি, তিলোয়ারিা মেমোরিয়াল হলে আমি, অককুল বা রাবকহোলে আমি, সেকেন্সা কুতবমিনারে আমি, আবার কমলদীর ও চৈতককা চব্বতারার আমি। দিল্লীর তক্ত-তাটসে আমিই আসীন। ক্রকেন্স হুদকো কতপুর্বাশী কালজর-অবরোধ, ব্যানকবর্ণ কিশোজ্যাকি ফ্যালকার্ক ম্যাগ-প্রাক্টে ব্যালাকলাশ্য প্রভৃতি বহু লড়াই আবার পরাক্রমে ফতে হইয়াছে।

আমারই প্রাণদে ক্রকনগরের রাজা ক্রকচক্র, তাঁহার সভাকবি রায়গণাকর ও তাঁহার সভাপতিত্ব ক্রকানন্দ বিভাবচম্পতি। রসগানের প্রকৃত নাম ক্রককান্ত ও নিবাস বাড়েবালা আমারই অধিকারকৃত। ক্রীতীশ-চক্র ক্রোশীশচক্রও আমার অহুগ্রহে বকিত নহেন। আধুনিক বাঙ্গালার রামকৃষ্ণ বিদ্য-কৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র বিবেকানন্দ, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন শিরিরকুমার, কৃষ্ণ বন্দ্যো কৃষ্ণদাস পাল, তারক পরামণিক, তারকনাথ পালিত, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, জানকীনাথ ঘোষাল প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ লোক আমার অহুগ্রহীত।

কৃষ্ণপাত্রি ও কান্তাবাব, রাজা নবকৃষ্ণ ও মহারাজ নন্দকুমার, ষাটকানাথ ঠাকুর

কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, সাধাকান্ত দেব কদমকৃষ্ণ দেব, কাম্বোজবাহুর মাঝে কৃষ্ণনাথ, অরুণক মুখো ঘোংকুমার মুখো প্রভৃতি আমারই প্রাণে ধনে মানে এসিদ্ধি লাভ করেন। দেওরান কাঠিকেচেন্দ্র রায়, কান্তি-চন্দ্র মুখো, কালিকান্দেব দত্ত ও এলাবিন্দন রাজকুমার বন্দ্যো আমার কৃপায় "ওরুপ উচ্চ পদ পাইয়াছিলেন।

খগোল-ভূগোলে খেলক, উপত্যকা, অধিভাকার আমাকে পাটবে। আমি হুম্বকতে নাই কুম্বকতে আছি, বিদ্যাচলে নোলাচলে নাই কুলাচলে লোকলোকচলে আছি, হিমালয়ে নাই মৈনাক আছি, ধবলগিরিতে নাই কাকনছক্বা-গৌরীশঙ্করে আছি, রাম-গিরি খণ্ডগিরিতে নাই ত্রিকুট চিত্রকুটে আছি, পঞ্চবটীতে নাই মণ্ডকারণো আছি, মহিষমর্দিনীতে নাই ক্যারোবকীরোনে আছি, উত্তরাখণ্ডে নাই কুমারিকা আছি, গঙ্গাবত্নী সরস্বতী গোমতী গোদাবরীতে নাই, কাবেরী করতোয়ার আছি। নদীর কথা যদি উঠিল, তবে আরও বলি—কৃষ্ণনগরের কঙ্কণ, বর্জমানের বাঁকা, বশোরের কপোতাক্ষ এবং মম্বরাকী শ্রীতল-লক্ষ্য দাক্ষিণ্যের কুমার কুম্বী কাঠমুড়ী কর্ণকুম্বী কর্ণনাশা কীর্তিনাশা প্রভৃতি অনেক নদনদী কুম্বকলয়ে আমার কীর্তিকথা কহিতেছে। কাম্বী কাকী কোশল কলিঙ্গ কেরল বাহ্লীক কর্ণাট কোশাবী কান্দীর কাবোজ কাছ কাজকুম্ব কর্ণবর্ণ অমরকোট মঙ্গলকোট তক্ষশিলা ব্যাক্ত্রীয়া কাবুল কান্দাহার—কোথায় আমি নাই? তুরক বন্দুকান কনজাভিনোপলে আমি, ডেনমার্ক কোপেন-

হেগেনে আমি, আবার কাক্ত্রীর দেশ আফ্রিকাও আমি। শুধু তাহা কেন, আমারই বাহিরে নবাবকৃত ভূখণ্ডের নাম আমেরিকা। আমারই চক্রান্তে কোটেল মেক্সিকো ঘর করেন।

ক্যালিকট ক্যানানোর কুম্বকোপন কজিভেরম্ কোটা লিকাভতী বিকানীর কর্ণর-ভলা কুর্চবহার কাছাড় কুম্বাগুল, সব আমার এলাকাজুত। আবার ভারতের বাহিরে কোচিন চংক মলকাস কোরিয়া টোকিও ক্যান্টন পর্যন্ত আমি হস্তা করি। মগের মুম্বকে আমি, লঙ্কার কলম্বোর আমি, কাম্বটকার আমি, কেশ কলোনিতে আমি। প্রাচীন গান্ধারকে কান্দাহারে পরিণত করা আমারই কারসানি। আমি সাহেবলোকের স্বর্ণ সিমলা দাখিলিঙ্গে নাট, কিন্তু স্বর্ণের শিঁড়ি কালকা কনিরয়ে আছি। বাকৌপুর কিল কাটিহার বোকানা কানপুরে বকৌ-এ আমি আড্ডা করিরাছি। লুভিকোটাল কাটভনার কোডারমা কাটারাস লক্শম চুমকা প্রভৃতি বেমকা নাম আমারই স্রষ্টি। আমি খাল বাঙ্গালার কৃষ্ণনগর বাঁকুড়া ঢাকা কুম্বার, বিক্রমপুর বাঁকলাহ, মুক্তাগাছা ভাগ্যকুলে আছি, কাম্বোজ মূলক বাকৌপুরে আছি, আবার কাঁচা উড়ের দেশ উৎকলে ভদ্রক বটকে আছি। কুট্রিয়া কুম্বারখালি কুম্বগঙ্গ চাকদহ, অধিকাকালনা কাটোয়া, কোড়া কীরগ্রাম কাগ্রাম কোগ্রাম কুলীন-গ্রাম কাকননগর, খানাহুলকুম্বনগর, কেশুলী কুলিয়া কালিকাপুর, কোড়করী কৈকলা কুচিয়াকোল কাওরাকোলা করচমারিয়া কাড়াগাড়া কাঁদোরা কড়কড়ে কুড়লগাছি

কাঁচকাটা কাঁচেরবাজার কাঁচেরকর কাঁচ-
কেওট কুচুচিগা, কলসকাটা ও অজ্ঞাত
কাটা এবং বকলমে স্বাক্ষরকারীর ক্ষুদ্র গ্রাম
কাঁচকাটা প্রভৃতি নামের তালিকা দিয়া
আর কাণ খালাপালা করিতে চাহি না।

কলিকাতার আমি দুই পদে ভর করিয়া
গাড়াইয়াছি, তাই ইহা লেরা সহর।
কলিকাতার কাঁচকাটা অনেক হানেও
আমার অধিকার আছে। কানীঘাট
ভূঁইয়াল শালিকর রামকৃষ্ণপুর গঙ্গাপুত্র
পাইকপাড়া কানীপুর কুঠীঘাটা কড়িয়া
কাঁচুড়িয়াছি কামাখ্যাডা চড়কডাঙ্গা নার-
কেনডাঙ্গা কোদালিগা পোট ক্যানিং
কাঁকন্যা কাঁচুড়াপাড়া বারাকপুর দক্ষিণেশ্বর
কোন্দনগর—আর কত কহি।

কলিকাতার ভিতরে ও আমার অধ-
িকার। কথুলেটোলা কপালিটোলা কলু-
টোলা কুমারটুলি কাঁচাপুত্র নেউগিলুত্র
মুরারিপুত্র হোগলকুড়িয়া কাঁচাপুত্র
পালকাঁচা মালিকতলা কানীতলা, সর্বত্র
আমি। আমি টাপাতলায় পটোলডাঙ্গার নাই—
বৈঠকখানার আছি, বোঝাঝায়ে নাই—
টিকটিকিঝায়ে আছি, নেতুলগার নাই—
কোরাইবাগানে আছি, নিমতলায় নাই
কানীমিত্রের ঘাটে আছি। পথেঘাটেও
আমাকে পাইবে। কলেকট্রাট কর্ণওয়ালিস-
ট্রাট কটনট্রাট রাইতট্রাট ফসট্রাট বরপোহে-
ট্রাট কীডট্রাট ক্যানাকট্রাট পার্কট্রাট
সাকুলার রোড ক্রীক রো স্টেশন কানাই
থরের পেন, সর্বত্র আমার গতিবিধি।
হাইকোর্টের ঘাটে কাণপিনের ঘাটে কল-
ঘাটে বেলকলঘাটেও আমি। আমি ইডন্-

গার্ডন গীডনগার্ডেনে নাই—কলেকট্রাটার
কর্ণওয়ালিসগার ও কর্ণওয়ালিস আছি,
চাননীতে নাই—কানীনীনের বাগানে আছি,
হেমিলটনের বাড়ী নাই—হুক কেলভার
দোকানে আছি, শ্রিণের বাথগেটের বাড়ী
নাই—স্টেট মেশন বা ক্রীটাল আইল কোম্পা-
নীতে আছি, উইলসনের হোটেল নাই—
কেলনার কোম্পানীর কাছে আছি।
খাকারের পুত্রকালরে, ডোরাকিন্সনের
ঘরে, ম্যাকজি লাহলের নীলাবে, ম্যাকিন্সন
ম্যাকজি বাড়ী আমার গতিবিধি আছে।

জীবিকা অর্জন করিতে হইলে আমাকে
চাইই। কৃষিকার্যে ক্ষেত্রকর্ষণে কৃষক-
রূপে আমি, বণিকের ক্রয়-বিক্রয়ে, ট্রেড
মার্কে, জাঁকোরে ফেনার, হকারের (haw-
ker) কাঁচকাটা আমি; চেকিকুলো মাস্টেটেকো
হইতে কল কারখানা দোকান কারবার
কুঠি কন্সার্ন ক্যান্ট্রি কোম্পানী পর্যন্ত
সকলই আমার কীর্ষি। কলকাটা কলকজা
কলিকল মাপকাটা আমিই গড়াই, কলের
ফুলী আমিই খাটাই, পাটকোঠা আমিই
কাটা, টিকার কন্সার্নের নক্সা আমিই
খাটাই, পল্লি ওয়ার্কস কন্সার্নহাউস কন্সার্ন
লোকো আফিস আমিই বলাই।

হাকিম উকীল মোকদার কোনস্থলী,
পেশকার কেরাণী লিফানবীশ নকলনবীশ,
সকলেই আমার এলাকাকুল। হাইকোর্টে
মলকতকোর্টে, কালেকট্রারী কাছানীতে, চৌকী
মহকুমার, হাকিমের হুকুম, মোকদ্দমা বা
কেসে, একরার বা বীকারোজিতে,
ডিক্লারেশনে, ক্রেমে, ফোরক্লোজে, কবুল
অবাবে, চুক্তি কন্সার্ন বা কড়ারে, ক্রি-

বন্দোতে, বকলমে বা বকলমে থাকলে, মুচলেকার, সাক্ষাতে, কমিশনে সাক্ষ্যে, ডিক্রীজারীতে, ক্রোকে, বেকহর খালাসে, কোডে, কাঠগড়ায়, চাবুকে, কঠিন পরিশ্রম সহ কারাবন্ডে, কাটকে আটকে, কানী কোর্টে লটকানয়, আমাকে পাইবে। আমি উইলে নাই, কডিসিলে আছি, উত্তরাধিকারীতে নাই এক্সিকিউটে। আছি, রেগুলেশ্যানে নাই এক্টকোডে আছি, আইনে নাই কাহুনে আছি, ধারায় নাই লেকশ্যানে আছি, অর মেম্বের্টোরে নাই কয়েনারে কমিশনরে আছি। হাইকোর্টে অহুফল মুখো ও ছারকানায় মিত্র বিচারকহর আমার মুখ রাখিয়াছেন, স্তার বার্নেস্ পৌকক হইতে সার লরেন্স বেঙ্কিন্স্ পর্যন্ত সাহেব প্রাডবিবাকগণও আমার ক্রেম পাক করিয়া বিরাজেন।

শাস্তিরক্ষক পুলিশের কোতোয়ালীতে আমাকে পাইবে। সেফলের কোটাল, একালের ইন্সপেক্টার কন্টেবল, আমার অধীন, চৌকিদারের ত কথাই নাই। ডাকতে, অকুছানে, সেনাক্ত করারও আমি।

মহাজনের রোকা রোকড় মোকররর, কুজিনাখা, ক্ষতি বা লোকসান, কর্জ, বদ্ধকী, কস্ত খত পরমিৎ কার্যকাগে, সর্ককর্থে আমি।

অমিয়ারের পাইক বরকন্দাজ কারপর-দাজ বকসী কারকুন আমিই নিযুক্ত করি, কোরকা প্রজার আমিই পত্তন করি, ধরপাকড়ে পলাতকা প্রজাও আমার কঠোরতায় বটে। থাকবনী, একন্দাজ, শিকড়পরতি, কারেবী স্বয়, কর্ণওরালিশের

কীর্তি, ভাণ্ডকম্বুসক সন্ধিক, সর্গরই আমি। কোটেকোবালা কবুলিয়ত তমঃতক মোকাবিলা কড়চা কবর নাকচ বাকী বকেরা নিকশ প্রকাশ পথকর পল্লিক ওয়াকস্ সহই আমার কারমাজি।

লোক্যাণ বোর্ড, ডিক্রীষ্ট বোর্ড, কোঅ-পারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি, মিউনিসিপাল করপোরেশন, পেরেক্টারী, সভ্যতার এসকল অনেই আমি বিরাজ করিতেছি। কন্গ্রেশন কন্ফাডেন্স কন্ডেম্প্তান, কমিটি আমিই বসাই, বরকট পিকটিং করিতে আমিই শাসাই, কমিশন আমিই যোগাই, ক্যান্ডিডামার আমিই ঘোড়াই, কন্ডোপেন্স কন্ট্রোলেশ্যোন আমিই পাঠাই, প্রোক্রা-মেশ্যোন ডিক্রাবেশন আমিই রটাই, কন্ট্রি-টিউডানাল এজিটেস্তান আমিই বটাই। ক্যাপিটেলের ম্যাক্স আমি, রায়ম্বে ম্যাক-ডোনাল্ডে আমি, তিলকেও আমি।

যুদ্ধের কাজেও আমি কম ঘাই না। গেলার বারিক ক্যাপ্টেনমেন্ট কমিসেরিরাটে কুচকাওয়াজে পদাতিকে পতাকাহ কন্যাবারে আমি আছি, ক্যাপ্টেন কর্ণেল এডিকং আমার হাতধরা, কিসনার ক্রীগ ক্রজি কনারক বরনেকাক মণ্ডকে হেলিকো ব্রেক ডেক্স ক্র্যাডক্ আমার নিত্যস্ত অন্তরঙ্গ। কামান বন্দুক ক্যাপ কার্ত্তুজে আমি, নালিকাস্থে আমি, ক্রিচ কুক্ষরীতে আমি, কোবণকার্থকরণে আমি, কহুক ক্রিট কুণ্ডল কটিবন্ধে আমি, ক্ষত্রিয়ের হকার-টকারেও আমি। কোম্যাগ্যাটোমারর নানা কথা আমিই রটাই, কোকাস্-কীলিংএর কাছে এন্ডেন আমিই কাটাই।

আবার কেবল সংস্কারার্থে, আমার ব্যবসায় নহে, জীবনরক্ষাকল্পে চিকিৎসা কার্যও আমার ক্ষমতার অন্তরীক্ষ নহে। বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রে রেক তাহার প্রকৃষ্ট শাক্তি। আমারই কৃপায় উক্ত শাস্ত্রে কৃত্রিম ব্যক্তি কনিদার নামে পরিচিত! আমি বায়ুশিষ্টে নাট, কিস্ত কফে আছি। আবার আমারই প্রকোপে বাতপিত্ত জ্বর হয় এবং দিবার ও সারিষাতিক ঘটে। কুষ্ঠ, কোষ্টেঘ আমরক্ত, রক্তপিত্ত প্রভৃতি সূক্ষ্মসিদ্ধ রোগ, বায়ক, হৃদিকা, ঠোঁটকা প্রভৃতি স্রোবোগ, তড়কা, ধনুটকার, ক্রমি বহু প্রভৃতি বায়রোগ, বক্ষা, ক্ষরকান, ক্ষত, পক্ষাঘাত, কন্দ্রম্বর কালজ্বর, আধকশালে, দাঁতকপাটি, কাঁওল, কুম্বী, কিকণ্ঠনা, বাতিক, চুলকানি প্রভৃতি রক্তমারী রোগ, সবই আমার কারসামি। আমিই অশোক, বাসক, ঘৃতকুমারী, কটিকারি, কুঁকসিমে, কালমিষে, ওলটকম্বল প্রভৃতি হইতে ঔষধ প্রস্তুত করাই, ঝটকা মোদক বা মোড়কে চূর্ণ ঔষধ দেওয়াই, কঠিন রোগে কস্তুরি মকরদ্বার হৃদিকান্তরগ কুঁলে বিধ খাওয়াই। পুটপাক আমারই গুণে ঔষধ রস্তুত করার প্রকৃষ্ট প্রণালী। আবার আমি কঁাক পাইলে চোটুকা খাড়াহু কুফ-তাকও চালাই।

কেবল কনিদার কেন, ডাক্তার ক্ষম-পাউত্তার হকিম অবদ্যৌতিক চিকিৎসক সকলেই আমার কৃপান্তিধারী। হোমিও-প্যাথিক ও বায়োকেমিক চিকিৎসার আমিই পেশবক্ষা করি। অগ্নিশ্যাবির পথেও আমি চলি। টনিক, হিন্দ্রার, এসব্রোকেশান, ক্যাপ্সুল, ব্যাক্স-বেক আমিই বোপাই।

অলপক্ষ-নিবারণে ডাক্সিসিনেশন বা টিকা, কলেরার ক্যাম্পন, চুলকুনিতে কিউটিকিটরা বা কার্বলিক সাবান, কাটাফাটির কানে ক্লোরোফর্ম আমারই ব্যবহা। ব্রনকাইটিস, জ্বপ, কলিক, কার্বকল, কলেরা, অলপক্ষ, সবই আমার কার্য। 'আধুনিক রোগতত্ত্ব মশক, মূবিক, মক্ষিকা ও ধূলিকণার রোগসংকার-ক্ষমতা আমারই আবিষ্কার।' ফেপা কুকুবেস কামড়ে জলাতক নিবারণের অস্ত্র ক্ষতস্থানে লোহাপোড়ার বদলে কষ্টিক লাগান ও সাবেক গোললপাড়ার পুরিগঠে কণৌলি পাঠান আমারই কষ্টক। এপিডেমিক এন্ডেমিক স্পোরোডিক তিন একম রোগ সংকার, ওসপটিক এটিসেন্টিক উত্তর প্রকার চিকিৎসা, টেথোথোপ দিরা বুকপরীক্ষা, ক্লিনিকাল থার্মোমিটার দিরা তাপপরীক্ষা, ফার্মাকোপিরা ও নেটেরিয়া মেডিকা অল্পদূরে প্রেসক্রিপ-শ্যান, পকেটকেসে অল্পসংগ্রহ, সবই আমার যোগসাবোপে। সিন্‌কোনা কুইনিন ক্যাস-কারা কাষ্টর অয়েলের গুণ গাহিবার সম্বন্ধ আমার কথা কহিও। এলোপ্যাথিক—লাইকার, হাইড্রোজেনিক হাইড্রোক্লোরিক, ক্লিকনিয়া ক্যাহারাইডিস ক্লোরোডাইন ক্যারিপুটি অয়েলে, হোমিওপ্যাথিক—একো-নাইট ইপিলাক ক্যানোমিলা মারকিউ-রিয়াস করোসিভাসে আমি মজস্ত পরিমানে আছি। কাহিল লোকের পথ্য ক্যানাডা ট্যাপিওকা (কে সি বহু) বিজুট বল্কা দুধের তিতহেও আমি।

হোমবাটোমরা ডাক্তার সকলেই আমার হাতধরা। তা' মাকনামারা ম্যাকোনেল ম্যাকলাউড কোট্টস জুনি মিক্স ক্যালভার্ট

বল, আর কে ডি য়োব কে শি শুভ্র,
ডাক্তার সরকার বা ডাক্তার সর্বাধি-
কারী, শুভ্র স্বর্গকুমার জেগুঠী বা
স্বর্গকুমার সর্বাধিকারী, এস কে মল্লিক
কোণার দাস কালী বাগতি প্রাণকৃত্য আচাৰ্য
‘অক্ষর দত্ত চন্দ্রশেখর কালীই বল।

বাক্য, আর অধিক বিজ্ঞ না চট্টকাঁইরা
আমি যুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, শিক্ষার
কোন দিকেই আমি কোণঠেসা নহি। তাই
মূর্খের চূড়ান্ত গালি ‘ক’ অক্ষর গোমাসে !
ক খ শেখার, কাকের ছা বকের ছা
লোহার, কোদালে ক বা ঝাঁকুরে ক,
কাঁকে কলসী ক, ইত্যাদি অক্ষর-পরিচয়ে,
কএ করতে ইত্যাদি সঙ্কেতে আমারই
পর্যাপ্ত, লাইতে হয়। কলাপাতার লেখা,
ময়ূ করা, কলমের কচ কাটা, কসি
টানার আমি, আবার কাগজে লেখা
(ক্রীমলেন্ড ব্লস্‌ক্যাপ হটলে ত কথাই
নাই), কপিটকের অহুসরণে লেখা, কার্পাস
কাগজে মকল বা কাপি করা,
কমা কোণম সেমিকোলন কোটেশন মার্ক
লাগান, বুকফীপিং, ডকেটিং, সবই আমার
কলাপে। কেরাখির কাপে কলম আমার
কলাপ। কালী কলম কাগর—আমি না
হইলে কোনটিই পাও না। প্রাথমিক
শিক্ষার, শিশুশিক্ষার ও শিশুসেবকের, দাতা-
কৰ্ম শুভদক্ষিণা কলকতজ্ঞান ও চাণক্যলোকে
আমি। আধুনিক কিপ্রারগাটেনও আমি।
মূলধামানের যুক্তাবে আমি, নোক্তার
আমি। মূল কামাই করিলেও আমাকে
এড়াইতে পারিবে না। ঠেকে শেখতেও
আমাকে চোখে ঠেকিবে।

শিক্ষক, পরীক্ষক, পরিদর্শক, অধ্যাপক,
অধ্যাপক, পাঠক (Reader!), কেহই আমার
কাছে সিনকহারামি করেন না। শিক্ষা ও
পরীক্ষার আমি, প্রাক্টিক্যাল ও বোধিক
আমি, ক্রাস সেক্টরান কম্বিনেশ্যানে আমি,
কারিকিউলামে কোর্সে আমি, কালেনডারে
আমি, ক্রী ক্রাম ক্রীব (Crib) ও ‘কোল্ডেন’
আমি, নোট টোকা কর্তৃক করার আমি। মূল
কলেজ একাডেমিতে আমি, ক্রাব কমন্‌-রয়ে
আমি, স্বাধিকূল গুরুকুলে আমি। ডেকেশ্যানেও
আমি, কম্‌ভোকেশ্যানেও আমি। দিতিকোট
ফ্যাকল্টীতে আমি, ব্রগারশিপ পারিভোষিক
পুস্তক পদক কেয়ুরে আমি। আমিই
পেক্সদ্রীয়ার, বার্ক বেকন কুপর কোলরিজ ফট
কোট্‌স ডিক্‌ন্‌স লবক কোল’ করিরাছি, কিছু
কলে অপেক্ষা করিলে মেরি করেলি কোনান
ডব্লেন ডিক্টোরিয়ার ক্রস এলা উইলকক্স ও
কোর্স* করিব দেখিতে পাইবে। আমিই
এন্ট্র্যান্সকে ম্যাট্রিকুলেশ্যানে বলাইরাছি,
কিপ্রারগাটেন আবিষ্কার করিরাছি, ক্রবি-
কলেজ করণিগাল কলেজ কারিগরি ও
কলানিকার মূল খুলিরাছি, বাঁকিপুরে
শোদনীয় পুস্তকালয় বলাইরাছি, কান্দিদ-
বাক্সারের ক্রফনাথের জীর্জিরক্ষাকরে
কলেজের নাম বলাইরাছি, দেকালে খ্যাকার
শ্মির কোম্পানীকে এবং একালে ক্যাবে
কোম্পানীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত
পুস্তকের কারেয়ী প্রকাশক করিরাছি।
এস্‌ কে লাহিড়ী, ম্যাক্সিমিলান কোম্পানী ও
ব্র্যাগিক এণ্ড সনকেও আমি নেকমনজরে দেখি।
মূল-কলেজের মধ্যে আমি বিশেষ করিরা
ঐক্য পাঠশালায়, সংস্কৃত কলেজে, ফটক

কলেজ কটন কলেজে, কৃষ্ণনগর কলেজ কৃষ্ণনগর কলেজে, ঢাকা কলেজ কুচবিহার জিওগ্রাফি কলেজে, ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ স্ট্রাটচার্কেস্ কলেজে, কেন্দ্র একাডেমি টি কে বোম্বের একাডেমিতে টিকিরা আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ভুক্ত কার্য পাঠশালা ও ক্যানিং কলেজেও আমি উকিত্ত্বিক মারিতেছি। আবার মেডিক্যাল কলেজে ক্যাথল স্কুলে আর জি কবের স্কুলেও আমি। তদুপাধায় আমি ছিলাম, অস্কাফোর্ড কেমব্রিজে

কেন্দ্র কলেজ কেরার কলেজে, কর্পন্স ক্রিষ্টিতে, স্ক্যাথেরগুন প্রেসে, ফ্রেডন্স স্ক্যানিক্যাল ইনস্টিটিউটে, কলেজ ক্যাণ্ডে আছি। আর কলিকাতার ত আমি ছুঁতে হইয়া বসিয়াছি। বকেরা তাইস্কাপেলার ব্রাঙ্কন আন্তোয় স্বয়ং সরস্বতী সাস্ত্রাচম্পতি হইয়াও 'ক' অক্ষরের নাগালে পান নাই, কুণীন কার্য সর্বাধিকারী কিন্তু অল্পে আমাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। কিমান্ধর্মমতঃপরম্।

অশোকের কথা

বসন্ত ফিরিয়া আসিয়াছে। গানে গন্ধে রঙে পৃথিবী ভরপুর। কিন্তু আজ এ আনন্দের দিনে সে কোথায়? যাহার কোমল রক্তিম চরণ ছুটির ঢকল গতিতে সমস্ত আকাশ বাতাস লাড়ি দিয়া উঠিত সেই আনন্দময়ী আজ কোথায়? ওগো, তোমরা যেহ আমার গৌরীকে ডাকিয়া দাও! আমি একবার তাহাকে দেখি!

আমি অশোক। বসন্তের আগমনে বন্য জানিদিকে নবজীবনের সাড়া পড়িয়া যায়, দক্ষিণ বাতাস বহিতে থাকে, তখন আমার সর্বাঙ্গ শুষ্ক শুষ্ক রক্তাণু ক্ষুদ্রমলক্ষ্য ভরিয়া ওঠে। আমি অশোক। লোকে বলে, কোনো বিশেষ দিনে আমার ফুল থাইলে নিত্যশোকসমাকুল সংসারে শোক থাকে না! তাই আমার ফুল, পুরাণনাদের নিকট পদম আদরের বস্তু। সংসারে যে শোক অবশ্যস্বত্বা নাই সেই সর্বজনীন শোককেও আমি জয় করিয়াছি, তাই আমি অশোক।

এতদিন আমি নিজের গৌরবে নিজেই বিভোর ছিলাম,—আজ আমার সে গর্ভ চূর্ণ করিল কে!

যেদিন তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা সেও এমনি এক ফাস্তনের অপরাহ্ন। সূর্য তখন অস্ত গিয়াছে। সুদূর বাতালে আমার আশপাশের ছোট ছোট গাছগুলি আমোদে মাতিয়া পরস্পরের পায়ে ঢলিয়া পড়িতেছিল। যদিও আমি তখন খুব বড় হই নাই, তবুও আমার কাছে যারা ছিল, তাদের চেয়ে আমি বয়সে অনেক বড়। তাই আমি তাদের সঙ্গে বড়-একটা মিশিতাম না। তারা যখন নেহাৎ ছেলেরাভূবের মত বাতাসের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে হাসিয়া সুটোপুটি খাইত, তখন আমি গম্ভীর ভাবে তাজিল্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিতাম। কখনো কখনো সঙ্গীর অভাবে আমার জীবন বড় দুর্ভাগ্য বোধ হইত; কাহাকেও ভালবাসিবার অস্ত, কাহারও

সেহ পাইবার অল্প সময়ে সময়ে আমার অস্তর তৃষ্ণাতুর হইয়া উঠিত। মাহুঘের মত বৃক্ষজীবনের ভিতরও যে ভালবাসিবার প্রযুক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তোমরা মাহুঘ—এ কথা বিশ্বাস করিবে কি?

কি বলিতেছিলাম? হাঁ! সেদিনের কথা। সেদিন অপরাজে আমি মার্ণা উচু করিয়া আমার চারিদিকে মৃতদূর নৃষ্টি চলে একবার দেখিলাম লইতেছিলাম। দিনের আলো তখন নিভিয়া আসিতেছিল। রাণাল-বাগলের উলাস বাশির জ্বলন মৃতদূর হইতে উত্তলা বাতাসে জ্বলিয়া আসিতেছিল।

কিছুদূরেই চাটুঘোদের পুকুর। তার চারিধারে সায়-বাধা ভাল ও স্পর্শি গাছের ছায়া ধীর বাতাসে স্নেহের উপর পড়িয়া কত বিচিত্র চিত্র লিখিয়া দিতেছিল। ঘাটে রমণীগণের হাসির উজ্জ্বল, গমের গুঞ্জন-ধ্বনি মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছিল। আমি অজ্ঞমনা হইয়া কি ভাবিতেছিলাম, হঠাৎ কে যেন উজ্জ্বলিত আনন্দে বলিয়া উঠিল—বাবা! বাবা! দেখ! এ গাছটির আগাগোড়া লাল, ফুলে ফুলে একবারে ভরে গেছে। এটা কি ফুলের গাছ বাবা?

কি মধুর স্বর তার! আমি মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া দেখিলাম, কৈলাস চাটুঘ্যে তার ছোট মেয়েটির হাত ধরিয়া বাগানে বেড়াইতেছে। আমি অবাক হইয়া সেই টুকটুকে মেয়েটির মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। কি স্নেহ তার সেই হাসিভরা মুখখানি! এক লাফে বাগের হাত ছাড়াইয়া সে দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিল। তার সেই কচি কচি হাত

দুপানি দিয়া আমার নীচেকার ডাল নোয়াইয়া সে ফুল ছিঁড়িতে লাগিল। সেই কোমল স্পর্শে আমার সারা অঙ্গ একটা ঢেঁল বিহ্বলতার শিরশির করিয়া উঠিল।

তখন হইতেই আমরা দুজনে প্রগাঢ় একটা মাতার বন্ধনে বাধা পড়িয়া গেলাম। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের বহু পূর্বেই গৌরী আমার কাছে ছুটিয়া আসিত। তাহার সঙ্গিনী কতকগুলি বালিকাকে লইয়া আমার ছায়ার মে খেলাঘর পাতিয়া খেলা করিত। তাহাদের কচিগলার কলহবে, ছোট পায়ে ছুটাছুটিতে, তরল হাসির ভরসে বাগান মাতিয়া উঠিত। এই আনন্দের হিজোল আমার গারে আসিয়া লাগিত,— আমার সমস্ত দেহ যেন সুদিয়া আসিত। হৃদয় নেলা তার মা তাহাকে কাছে লইয়া শুইতেন, তিনি একটু চোখ বুজিলেই গৌরী চুপি চুপি আমার কাছে পলাইয়া আসিত। কোনো কারণে বাড়ীতে কেহ কিছু বলিলে সে অভিনয়ের বেদনার ছুটিয়া আসিয়া আমার বুকে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাদিত। আমি যখন আমার কচি শাখাগুলি তাহার কপোলে বুলাইয়া দিতাম, তখন তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সব ব্যথা আমার সেই নির্জাক মেহস্পর্শে জুড়াইয়া যাইত। স্নেহে স্নেহে সকল সময়েই আমার গৌরী আমার কাছেই ছুটিয়া আসিত। দিনের কাজ শেষ করিয়া দিনমণি যখন পশ্চিম আকাশে চলিয়া পড়িতেন, আমি তৃপ্তিত নেত্রে পথের দিকে চাহিয়া থাকিতাম,—কখন আমার হাতময়ী গৌরী তাহার কলহাতের লহরী তুলিয়া

বাগানে বেড়াইতে আসে। তোমাদের আর কত বলিব?—তাহাকে পাইরা আমার নিঃসঙ্গ জীবনের সকল অভাব পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এমন করিয়া আমি অতি দুখে দিন কাটাইতেছিলাম।

গৌরীর বাপের নাম কৈলাস চট্টোপাধ্যায়। কৈলাসের সংসারে—পত্নী সাবিত্রী, পুত্র অমরনাথ ও কন্যা গৌরী ব্যতীত আর কেহই নাই। অবস্থা সামান্ত; আর অমরনাথ উপসর্গ হইতে সংসার চলে। লক্ষ্মীব্রহ্মপুত্র পত্নীর প্রসূত্বাধীন গুণে দরিদ্র সংসারেও বিশেষ কোনো অভাব নাই। অমরনাথ এখানে বেলাতুলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া হুতি লইয়া কলিকাতার পড়িতে গিয়াছে।

সেদিন এভাবে কৈলাসচন্দ্র চতুর্থমুখে বসিয়া ভাবাক টানিতেছিলেন। পূর্বসন্ধ্যায় ঝড়বুড়ি হইয়া গিয়াছে। পথ ঘাট এখনও কর্মমসিদ্ধ। বর্ষাঋতু গাছপালায় স্তাবল পত্রপল্লবে বড় বড় জলের ফোঁটার যেন পড়িয়া ঝকঝক করিতেছে। সাবিত্রী ঘর-দুয়ার কাঁট দিয়া বাসিগাট সারিতেছেন। গৌরী একটা লালা বিড়ালছানা লইয়া এতক্ষণ খেলা করিতেছিল, হঠাৎ কি মনে হইতে বাপের কাছে ছুটিয়া আসিল। তাহার একটি গুণ ছিল যে দুখ দুঃখের একমুহূর্তও থাকিতে পারিত না। আসিয়াই বলিল—দেখ বাবা, কাল যখন ঝড় উঠিল, আমি তখন মার সঙ্গে আম-কুড়োতে বাগানে গিরেছিলুম। অনেক আমি হরেছিল। আমি আমগুলো লব আনতে পারিলাম, মা আমাকে কিলুতেই

আনতে দিলে না। মা আমাকে কোনো কাজ করতে দেয় না কেন বাবা?

কৈলাসচন্দ্র তাহার চিবুকে হাত দিয়া আদর করিয়া বলিলেন—তুমি যে এখন এত-টুকু ছেলেমানুষ মা। তুমি কি এখন কাজ করতে পার? আগে বড় হও, তখন তুমিও আবার কত কাজ করবে।

এ কথটা গৌরীর তেমন ভাল লাগিল না। সে ক্ষুব্ধরে বলিল—হ্যাঁ! আমি ছোট বই কি। কেন ওই ক্ষেত্রী বামী ওরা ত আমার চেয়ে আরো কত ছোট, তারা তবে কি করে কাজ করে?

কৈলাসচন্দ্র একবার কোনো সহস্তর না পাইয়া গভীরভাবে তামাকে মনোনিবেশ করিলেন। গৌরীও স্নেহমত্ত হাস্য না হইয়া তৎক্ষণাৎ অজ্ঞ প্রসঙ্গের অবতারণা করিল—কাল আমি কি পেরেছি তা বুঝি এখনও তোমার বলিনি বাবা? দেখ, ঝড়ে একটা ছোট শালিকের ছানা তার বাসা থেকে গাছ-তলায় পড়ে গিরেছিল, আমি দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি সেটাকে—

—বাবাজি। কি হচ্ছে তোমাদের? বলিতে বলিতে পাড়ার হরিমাথ মুখুয্যে ওরফে হরি খুঁড়ো আসিয়া উপস্থিত। সময় কাটাইবার মত এমন উত্তম সঙ্গী পাইয়া কৈলাসচন্দ্র উৎসুক হইয়া উঠিলেন, সাগ্রহে বলিলেন—এস, এস, খুঁড়ো! তোমার যে আর দেখাই পাই না। কোথায় ছিলে এতদিন?

শালিক-ছানার ইতিহাস শোনাইবার পথে বাধা পড়ার গৌরী আর দেখানে পাঁড়াইল না। খুঁড়ো বাসান্দার উঠিয়া বসিয়া কৈলাসের

হাত হইতে হ'কাটি টানিয়া লইলেন, পরে অর্দ্ধমুদিত নেয়ে খোঁচা ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন—আমার কি একতিল সমর আছে বাবা! জান ত এ গ্রামটিতে—মনে কর গে—আমি না হলে ত কাকর কিছু হবার যো নেই। যখন বার কোনো দার উপস্থিত অমনি ডাক খুড়োকে! তা এই—মনে 'কর—আমারও ঐ যে কেমন একটা চক্ষুহস্ত আছে এই মুখের ওপর—মনে কর—কাককে 'না' কপাটি বলতে পারি নি। বল যাক বাপু! না হয় আমারই একটু কঠোর উপর দিয়ে গেল। তবুও—মনে কর—পরের একটা উপকার হয়। কি বল বাবা! ?

কৈলাসচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন—তা, ত বটেই খুড়ো! তুমি আছ বলেই বার আমরা এখনও পাঠাডের আড়ালে রয়েছি। জানি, বাই হোক না কেন, তাবনা নেই,—খুড়ো যখন রয়েছেন!

খুড়ো। তখন উৎসাহিত হইয়া বলিলেন—বল ত বাবা! বল ত! এই নিয়ে তোমার খুড়ী—মনে কর—রোজ আমার সঙ্গে কগড়া করে। বলে, তোমার এ ঘরের খেয়ে বনের ঘোষ ভাড়াতে বাঙরা কেন? আমি বলি—মনে কর—আমি তখন বলি—আরে তুই মুখা জীলোক—তুই এ সবের মর্ম কি বুঝিস? এই—ধর না কেন—শান্ত্রে আছে—

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন—তা বাগ্পে সে কথা! এখন—তুমি আজ সকালে কি মনে করে বল দেখি? তোমরা হলে কাজের লোক, বিনা কাজে ত কোথাও এক পা চল না।

খুড়ো। তখন হাসিয়া বলিলেন—হ্যা! হ্যা! বাগ! ঠিক বলেছ! দরকার একটু আছে বই কি। এই মনে কর—ও পাড়ার মতি রায় আমার কাল ডেকে পাঠিয়েছিল, তা আমার ত জান—পরের উপকার হবে—তাতে ত—মনে কর—না বলতে পারি নি। তা গেলুম। মতি রায় বলে—খুড়ো! গোবীর সঙ্গে আমার রমেশের সখ্য করতে হবে। মেয়েটি তোমার—মনে কর—দিকি ছবির মত কি না—তাই ওদের বড় পছন্দ হয়েছে। তা বাবাজি, মতি রায় লোক ভাল—আমার খুব খাতির যত্ন করে;—বলে খুড়ো! গোবীকে তোমার আমার বউ করে দিতেই হবে। আমি বললুম—তা কৈলাস বাবা! ত আমার অব্যাহা নর, বিশেষ—মনে কর—তার মেয়েটিও ত বড় হয়েছে। তা হবে না কেন?

কৈলাসচন্দ্র এ কথা শুনিয়া কিছুকণ চুপ করিয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন—আমি এখন গোবীর বিয়ে দেব না মনে করেছি খুড়ো! সে এখন নেহাৎ ছেলেনামুস। তার মায়েরও ইচ্ছা যে আরও দিন কতক থাক।

খুড়ো এ কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন, তাহার আকিঞ্চের মহিমায় চুপ চুপ চুপ হুটি সহসা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—সে কি বাবা! গোবীর বয়স ত এগারো পার হয়েছে। এ বয়সে—মনে কর—মেয়েদের হু বছর বিয়ে হয়ে যায়। তার এখনো বিয়ের বয়স হয় নি, বল কি?

কৈলাস বলিলেন—বিশেষ আমি ত

আমি রমেশ অনেক দিন পড়িনি। ছেড়ে দিয়েছে; যত সব বল ছোঁকড়াবের সঙ্গে বখানী করে বেড়ায়। তার সঙ্গে কি করে গোপীকীর বিয়ে দেব?

গুড়ো বলিলেন—রাখামাধব! কে তোমাকে এ সব কথা বলে বল ত? রমেশ অতি লজ্জিত—তবে একটু আধটু বা দেখ—তা মনে কর—কিছুই নয়—ও বয়স-কালে অমন সকলোই হয়ে থাকে। বিয়ে হলে, পরকর্য্য হলে ও সব কিছুই থাকবে না।

কৈলাস নীরব রহিলেন।

গুড়ো বলিলেন—আরও দেখ! মতি রায় নির্ধন লোক নয়। তার ঘরে—মনে কর—তোমার মেরের কোনো কষ্ট হবে না। আর তোমার কাছে সে কিছু চায়ও না। তা—যদি তুমি শুধু মেরেট দাঁড় তাতোও সে না বলবে না। তোমার অবস্থা ত আমি—ভাল করে মনে বিবেচনা করে দেখ। তোমার ভালর জন্তই আমার এত করে বলা।

কৈলাসজ্ঞে বলিলেন—গুড়ো! তুমি যে আমার ভালর জন্তই বলছ তা কি আমি বুঝি না? তবে কথা এই—তুমি ত জান, গোরা আমার কত স্নেহের ধন। আমি তাকে মূর্খ অমায়ুষ্যের হাতে দিতে পারব না। আমি বড়-বয়স চাই না, তবে ছেলেটি একটু বাছবের মত দেখে দিতে হবে ত? আমি এ সবকিছু রাজী হতে পারলুম না। কিছু মনে কোরো না গুড়ো!

ব্যর্থমনোরথ হইয়া গুড়ো একটু ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন—আমি বুঝিছি, আজকাল তোমার সাহেবী মত হয়েছে। ছেলেকে কালেজে পড়তে দিয়েছ, বায়ো

বছরের মধ্যেকে বল ছেলেমানুষ—আমি বলছি কিন্তু—মনে কর—এতটা দর্প ভাল নয়। এক পরমা লাগতনা, এমন বরটা ছেড়ে দিলে, এর পরে—মনে কর—এর জন্তে তোমাকে পড়াতে হবে।

গুড়ো চলিয়া গেলেন। কৈলাসজ্ঞে অস্ত-মনা হইয়া ভাবিতে ভাবিতে অনেকখানি কুণ্ডলীকৃত শ্মশ্রুপির সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন।

৩

এ ঘটনার অনেক দিন পরে একদিন বৈকালে গোরা আমার কাছে বসিয়া কৌচড়ে এক রাশ ফুল লইয়া মালা গাঁথিতে-ছিল। আমি একমনে তাহার দিকে চাহিয়া-ছিলাম। কেহ কোথায় ছিল না। হঠাৎ পদশব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিলাম, ছুটি যুবক আসিয়া বাড়ী হুকিল। একটু অগ্রসর হইয়া একজন ডাকিল—গোরা! কি হচ্ছে এখানে বসে?

গোরা চমকিয়া চাহিয়া দেখিল। তার পরেই এক লাফে ছুটিরা গিয়া তাহার হাত ধরিল।—ওমা! দাড়া যে। তুমি কখন এলে দাদা?

কৌচড়ের ফুলগুলি সব ছুড়াইয়া পড়িল। অমরনাথ বলিল—এই ত আসছি। তুমি ভাল আছিস ত? দেখ দেখি আমার সঙ্গে ইনি কে, চিনতে পারিস?

গোরা অনেকক্ষণ আগন্তকের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শেষে বলিল—আমি ত এঁকে কখনও দেখিনি।

অমরনাথ হাসিয়া বলিল—ইনি আমার একজন বন্ধু। আমার মত ইনিও তোরা দাদা হন, বুঝিছিস ত?

গোরা ইহা বলিয়াই দাদার হাত ছাড়িয়া

—ও মা! দাদা এসেছেন—বলিতে বলিতে বাড়ীর ভিতর ছুটিল।

শুনিলাম অমরের সঙ্গে বিমলের বড় বন্ধুত্ব। দুজনে কণেকণে একসঙ্গে পড়ে। বিমল কলিকাতার কোন এক ধনী উকিলের ছেলে। পাশে বিরা ছুটির সময় অমরের সঙ্গে কিছু দিনের অল্প পরীক্ষাসে বেড়াইতে আসিরাছে।

দুই বন্ধুকে সর্দসাই একসঙ্গে বগানে বেড়াইতে দেখিতাম। কখনও বা দুজনে পুকুর-বাটে বসিয়া মাছ ধরিতেছে দেখিতে পাইতাম। আর গৌরী? তাহার কথা আর কি বলিব? সে এখন আর আমার কাছে বড়-একটা আপে না। এই দিনের মধ্যেই বিমলের সঙ্গে তার ভাব হইয়া গিয়াছে। নতুন বন্ধুকে পাইয়া সে আশাকে এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছে। হার! মাহুকের মন কি চঞ্চল।

গৌরী এখন আর নিজের খেলাতেও মন দিতে সময় পায় না। দাদাদের লইয়াই সে ব্যস্ত। প্রথম পরিচয়ের পরেই সে বিমলকে তাহার খেলাঘর, তাহার পুকুর, তাহার পানী বিড়ালছানা সব দেখাইয়াছে। সে যতগুলি রূপকথা আনিত সে সবগুলি শোনানো হইয়া গিয়াছে। এখন সর্বপ্রকারে “নিঃসংশয় হইয়া সে তাহাদের সকল প্রকার করবাস খাটিবার ও ছিপ, চার ইত্যাদি বহিবার তার লইয়াই সর্দসাই ব্যস্ত।

সেদিন অমরনাথ বাড়ী ছিল না, কোথায় গিয়াছিল। বিমল তাহার প্রতীক্ষায় র্তানে না গিয়া ঘরে একলা একখানি বই

লইয়া শুইয়াছিল। ক্রমে বেলা বেড়ি হইতেছে দেখিয়া সাবিত্রী আসিরা বলিলেন—বাবা! অমরও এখনও এলনা, তুমি আর কতক্ষণ বসে থাকবে? রান করে এসে তাত খেয়ে নাও।

বিমল বই রাখিয়া উঠিরা বসিরা বলিল—আর একটু তার ক্ষত দেখি মা! সে এলে একসঙ্গে দুজনে মাইতে যাব এখন। বোধ হয় তার আর বেশী দেরী হবে না।

সাবিত্রী বলিলেন—না বাছা! তুমি আর কেহী কোরো না। তার এসব অনিয়ম সহ্য অভ্যাস আছে। তোমরা সহরে বাধা নিয়মে থুক—তবু এখানে এসে তোমার কত অনিয়ম হচ্ছে, কত কষ্ট হচ্ছে।

এমন সময়ে গৌরী হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিরা আসিরা বিমলের হাত ধরিয়া টানা-টানি বাধাইয়া দিল—ও বিমল দাদা! পুকুরের মাঝে দুটো পদ্ম ফুল ফুটেছে দেখে এলাম। আমাকে এনে দেবে এস না!

সাবিত্রী তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—ছি গৌরি! ঠেকে অমন করে বিরক্ত কোরো না। উনি কি মাঝ-পুকুরে অত ভাল গিয়ে পদ্ম তুলতে পাবেন?

—“না পারেন না বই কি! দাদা পারেন আর উনি পারেন না! উনি যেন এখনও কচি খোকা—বড় হন নি! সে হবে না! তুমি এস একবার দাদা!”

সাবিত্রী বিমলকে বলিলেন—শোন বাবা! একবার পাগলের কথা শোন! ওকে নিয়ে আমার এক এক সময়ে এত ভাবনা হয় যে কি আর বলব? অত বড় মেয়ে হল, এখনও ওর ছেলেমাহুদী গেল না।

কাকে কি বলতে হয় সে জানে নেই।
পরের ঘরে গিয়ে বেড়াকি ছুঁদনা হবে
আমি তাই দিনবাত ভাবি।

বিমল হাসিয়া সম্বোধে গোবীর মুখের
দিকে চাহিল, বলিল—আমি ত সঁতার
আনি না গোবী! অত জলে কি করে
যাব?

—সঁতার আনি না? গোবী অথাক
হইয়া গেল!—তুমি এত বড় হয়েছ, সঁতার
সেখনি?

কি করে শিখব গোবী? আমাদের
ঘেঁষে ত পুকুর নেই।

এবার গোবী একেবারে বিষমের তরু
হইয়া গেল। পুকুর নেই সে আবার
কেমন দেশ! মাগো! সেখানে তবে
লোকে থাকে কেমন করে?

বাড়ী ফিরিয়া বাইবার আগেও দিন
বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে বিমল বৈলিল
—গোবী! কাল আমি বাড়ী যাব। শুনেছ
ত? যাবা চিঠি লিখেছেন।

গোবী বলিল—হ্যাঁ! শুনেছি। তুমি
না গেলে তাঁরা পূণ ভাগ করবেন, না
দাদা?

বিমল বলিল—না ভাগ করবেন না, তবে
অনেকদিন এসেছি এইবার যেতে ত হবে?

গোবী বলিল—তবে আর কিছুদিন থাক
না দাদা! তুমি চলে গেলে আমাদের বড়
দুঃ-কেমন করবে। মা ত সেদিন তোমার
যাবার কথা শুনে কেঁদে ফেললেন।

বিমল খানিক চুপ করিয়া বলিল—আচ্ছা
গোবী। তুমি আমার সঙ্গে কলকাতার
গিয়ে থাকতে পার?

গোবী চুপ করিয়া রহিল।

বিমল বলিল—আমি যদি তোমার নিয়ে
যাই তা হলে আমার সঙ্গে যেতে তোমার
ভর করবে?

গোবী মাথা নাড়িয়া বলিল—না, ভর
করবে না। কিন্তু আমি ত মা আর
বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারি না। তাঁরা
যখন বাবেন, আমি তখন যাব।

সেদিন রাতে আহারের পর কৈলাশজ্ঞে
বিমলকে নির্মমেন ডাকিয়া বলিলেন—বিমল,
অমরের কাছে যে কথা শুনলুম তা কি
সত্যি?

বিমল নতমুখে বলিল—হ্যাঁ!

৪

শীঘ্রই রাষ্ট্র হইয়া গেল কলিকাতার এক
বিখ্যাত ধনী উকীলের ছেলের সঙ্গে গোবীর
বিবাহ। গ্রামের লোকে প্রথমতঃ কথাটা
বিশ্বাস করিল না, উড়াইয়া দিল।
অবশেষে যখন সমস্ত পাকাশাকি হইয়া
সব স্থির হইয়া গেল, বরপক্ষ হইতে
গোবীকে আন্তরিক্য করিয়া গেল, বিবাহের
দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গেল, তখন সকলে
একবারে অবাক হইয়া গেল। কৈলাস
চাটুগ্যের মত দরিদ্রের, তিনটা পাশ করা
রূপে শুণে যেন মাঝে এমন জামাই?
ব্যাপারটা কিসে কি হইল কেঁহ ঠাণ্ডাইতে
পারিল না, চারিদিকে এই বিবাহের কথা
লইয়া নানারূপ কল্পনা জন্মনা চলিতে লাগিত।

পাড়ার হিট্‌স্বিগীর দল আসিয়া
সাবিত্রীকে বলিতে লাগিল—তাবাই বলভাই!
যে যেমন লোক, তার তেমন দরের লোকের
সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে হয়। হাজার হোক,

তারি হল সহরে বড়লোক—তারের গুণ্যি
আদর ঘর ভবভাপান করা—এসব কি
আর তোমরা পরে উঠবে? একটু জট
হলেই তখন দেখবে উঠতে বসতে পোঁটা
খেতে খেতে মেয়ে তোমার সারা হয়ে যাবে।
গল্পনার আশার মেয়ে নাকের অঙ্গে
চোখের অঙ্গে হলে।

সাবিঠী অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতির; বেশী
কথা বলিতে জানেন না। তিনি বলিলেন
—আজকের দিনে দিদি, আর ও সব
কথার কাজ নেই। তাঁরা' যখন আমার
অবস্থা দেখেই দয়া করে গরীবের মেয়ে
ঘরে নিচ্ছেন তখন আমাদের আর কি
বলবার আছে? এখন তোমরা সকলে
আমার গোরীকে মন-খুলে আশীর্বাদ কর—
আমার কাম্বালের ধন সে—বৈতে থাক
সুখী হোক!—বলিতে বলিতে তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড
মিষ্ট চোখদুটি জলে ভরিয়া গেল।

বিমলের পিতা নবীনবাবু, ছেলের একান্ত
জ্ঞেয় দেখিয়া গোরীর সহিত তাহার
বিবাহ দিতে মুখে সম্মতি দিচ্ছিলেন
বটে* কিন্তু ছেলের এই অবাধ্য-
তার মনে মনে তিনি রুদ্ধ অভিমান ও
রাগে জ্বলিতেছিলেন। তিনি বিমলকে
নানারূপে বোকাইতে জট করেন নাই।
খেরালের বংশবর্জী হইয়া একটা নেহাৎ
নগণ্য লোকের মেয়েকে ঘরে আনা যে
বিষম নির্বুদ্ধিতা,—এ কথা তিনি তাহাকে
অনেক বোকাইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে
কোনো ফল হয় নাই। বরঞ্চ সে জেদ
করিয়া বসিল যদি ও মেয়ের সঙ্গে বিবাহ
না হয় তবে আর ইহজীবনে সে

বিবাহ করিবে না। নবীনবাবু 'ছেলের
প্রকৃতি জানিতেন; একবার যে কাজে সে
না বলে তাহাকে আর কিছুতেই হা
বলানো যায় না। কারণেই তিনি সোজা
পথ ছাড়িয়া ঝাঁক পথ ধরিলেন। সহজ
কথার বোঝানে কাজ সাগানো যায় না—
চাতুরী খেলিয়া সে কাজ কেমন করিয়া
উদ্ধার করিতে হয় এতদিনের ওকালতিতে
সে অভিজ্ঞতার তিনি পাকা হইয়া উঠিয়া-
ছিলেন। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন—
আচ্ছা, এ বিবাহে আমার মত আছে।

(৫)

গোরীর গায়েহলুদ চইয়া গিয়াছে।
আর চার দিন পরে বিবাহ। কৈলাশচন্দ্র
একমাত্র কস্তার বিবাহে অবস্থার অতিরিক্ত
আয়োজন করিয়াছিলেন। আজ তাহার
বাড়ী আশ্রয়স্থল্বে পরিপূর্ণ। সকলেই
গ্রন্থমুখে শুভকাক্ষে বাস্তব। ছোট ছোট
ছেলে ঘেরেরা ভাল ভাল কাপড় পরিয়া চারি-
দিকে কলরব করিয়া বেড়াইতেছে। সকলেই
অনন্দিত; কেবল বাহিরের বাগানে সকল
বেলাকার নহবতের করুণ-রাগিনী যেন
আমারই মনের বেদনাকে জ্বর দিয়া জুকারিয়া
উঠিতেছিল। আমার মনটা প্রতিক্ষেপে দারুণ
বিষাদে অবসর হইয়া পড়িতেছিল। আমার
গোরী—এই এতদিনের মেঘ তালবাসার বন্ধন
সব ছিন্ন করিয়া আর ছই দিন পরে কোথায়
চলিয়া যাইবে!

গাধ-হলুদের পদদিন সকালবেলা নবীন
বাবু বাড়ীর সরকার কৈলাশচন্দ্রকে একখানি
পত্র দিয়া গেল। পত্রে নবীন বাবু লিখিত-
ছেন :—যদিও বিমলের ও আমার একান্ত

ইচ্ছা ছিল যে মগধের কস্তুর সহিতই এ স্তম্ভকাব্য হয়, কিন্তু গৃহিণী প্রথম হইতেই এ সম্বন্ধে অসম্মত ছিলেন। আমরা সহকর্মে তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া একরকম মত করাইয়াছিলাম। কিন্তু কাল টেকালে কমলকুঠীর কুমোদার শ্রীযুক্ত কামিনী বাবু ঘটকী দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে তিনি নগদ পাঁচ হাজার টাকা, কড়াব তিন হাজার টাকার গহনা, এবং দানসামগ্রী বরাহদগ্ন বাবদে দশ হাজার টাকা খরচ করিয়া বিমলের সহিত কস্তুর বিবাহ দিতে রাজী আছেন। এই সম্বন্ধ পাঠিয়া আমার গৃহিণী একবারে বাকিয়া বলিয়াছেন। তিনি কাহারও কথা শুনিবেন না;—এইখানেই ছেলের বিবাহ দিবে। আমি অনেক বুঝাইলাম—তন্ত্রণাকের এক কথা—নিশ্চয় যখন গারে হলুদ হইয়া গিয়াছে—তা তিনি কোনো কথায় শুনিতে চান না। আমার পীড়াদীড়িতে অনেক কষ্টে অষ্টটুকু হইয়াছে যে যদি আপনি বিবাহের রাজ্যে অন্তত চারি হাজার টাকার ভোগাড় রাখিতে পারেন তবেই কার্য সমাধা হয়—নতুবা বাধ্য হইয়া ঐ দিনে কামিনী বাবুর বাড়ী বর পাঠাইবার ব্যবস্থা হইবে। এ কথা আপনাকে লিপিতে আমি যথেষ্ট লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইতেছি, কিন্তু উপায় কি? আপনিও ভাবিয়া দেখিবেন, আপনার যেকোনো জামাতা হইতেছে তাহার জুলনার টাকার পরিমাণ কিছুই নয়। যেকোনো দ্বি-ত্রয় সংবাদ দিবেন, সেইমত ব্যবস্থা হইবে।

পত্রপাঠ শেষ করিয়া কৈলাশচন্দ্র বজ্রাহতের দ্বার নিষ্পদ হইয়া গেলেন। অমরনাথ তাঁহার মুখ দেখিয়া ভীত হইয়া পত্রখানা

তুলিয়া লইল। পরক্ষণেই দ্বার ও ফ্রেমে তাহার মুখ লাগ হইয়া উঠিল। সে পত্রটা মোড়কাইয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—বাবা! আমি এখন বিমলের কাছে যাই। ডাকে লিখালা করব—এ সব ব্যাপার কি? বলিয়া পাগলের মত সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

মুহুর্তের মধ্যে এ কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। বাহির-বাড়িতে নব্বতের একটা দীর্ঘ তান আকাশের দিকে উঠিতে-ছিল, হঠাৎ যেন তাহা ছিঁড়িয়া গেল। যে যেখানে যে কাজ করিতেছিল তাহা অমনি পড়িয়া রহিল। সকলেই তরু। বাড়ীর সব উৎসব আনন্দ নিস্তিরা গিয়া একটা আশঙ্কার কালো ছায়া গভীরভাবে ঘনাইয়া আসিল। শাবিত্রী ভাঁড়ার ঘরে ভাঁড়ার গোছাইতে গোছাইতে স্তম্ভকাব্য নির্ঝরে সম্পন্ন হইয়া গেলে হুহুদনীর পূজা মানসিক করিতেছিলেন, সেখানে এ সংবাদ পৌছিলে তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া দুই হাতে মুক চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন।

দেখিতে দেখিতে কৈলাশচন্দ্রের বাহিরের ঘরে আমাদের লোক একবারে ভাঙিয়া পড়িল। বাহারা এ বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া অবধি মনের মধ্যে স্তম্ভবোধ করিতেছিল না, আজ তাহাদের ক্ষুণ্ণি দেখে কে? মহা আশ্চর্যন করিয়া তাহার। বলিতে লাগিল—আমরা শু ভখনই জানতাম যে এ বিবাহে এরকম একটা কাণ্ড ঘটবেই। বার যেমন অগ্নি তার তেমনি থাকাই ভাল। বামন হয়ে চাদে হাত দিতে বাওয়াই বা কেন?

হরিনাথ গুড়ো বলিলেন—এ আরতোমরা বলবে কি? মনে কর—এ শু জানাই কথা।

আমি শু আদ-বছর কৈলাস বাগানিকে
বলেই দিবেছিলাম যে কাগজ ভাল হল না।
মনে কর—হাতের লক্ষী পায়ের ঠেললে, এর
ফল ভুগতে হবে না? রমেশের মত এমন
জামাই—মনে কর শোকে ভাগ্য বলে মনে,
ঐ কি না তা পছন্দই হল না।

মতি রায়ও উপস্থিত ছিল, সে চোখ
টিপিয়া হাসিয়া বলিল—এ যে তোমার অজ্ঞার
কথা খুঁড়ো। কৈলাস ভাড়া দেখে শুনে ভাল
জামাই আনবেন, আমার রমেশকে ঐ কি
পছন্দ হতে পারে? ও কথা বলাই আমার
অজ্ঞার ধরেছিল। তা বাবু, এটা যদি নেহাৎ
হাত-ছাড়াই হয় তাতে ক্ষতি কি? অমর-
নাথের আরও কত বক্তব্যের আছে।
গৌরীর বিয়ের ভাবনা কি?

গলাধর ভট্টাচার্য্য আরলাষেরে মজা দশ
বছরের মেরেকে একটি পকাশ বছরের পায়ে
হাতে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। বিবাহের
বছর পাঁচেক পরেই ঘেরটির খত্তর বাড়ীর
দশ বাংলাই ঘুটিয়া গিয়াছে। এখন সে সিঁথার
সিঁথর মুছিয়া থান পরিয়া নিশ্চিত মনে বাপের
ঘরে হবেনা ভাত রাধিছেছে। মতি রায়ের
কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য অবাক হইয়া গালে
হাত দিলেন, বলিলেন—বল কি মতি ভাড়া!
রমেশকে ঐ মনে ধরে না? মেরের বিয়ে
দিতেই হলে, পায়ে দশদশ অমাজ করার
যো নেই। তার পরে কার কি হবে না হবে
সে ভাবনার আমাবের দরকার কি? অদৃষ্টে
বসি লুখ থাকে শু বার হাতেই দাও, মেয়ে
লুখী হবেই! এ .য কৈলাসের অতি দর্পের
কথা শুনেতে পাই!

কৈলাসচন্দ্র নীরব নিশ্বাস। প্রতিবেশীদের

টিটকারী তাঁহার বুকে তীক্ষ্ণ শেপের
মত বাজিতেছিল। কিন্তু তিনি কাহারও
কথার কোনো উত্তর দিতে পারিতেছিলেন
না। তিনি হস্তাশ হইয়া মনে মনে কেনলই
তোলাপাড়া করিতেছিলেন—এ বিপদ হইতে
নিকৃতি পাইবার কি উপায়? চার
হাজার টাকা! সে যে তাঁর যত্নেও
অভীত! এত টাকার জোগাড় করা কিছুতে
তাঁহার ক্ষমতার কুলাইবে না। সামাজ্য
বাড়ীখানি ও জমীদারী বন্ধক রাখিয়া না হয়
হাজার-টাকা কঠোরটে সংগ্রহ করিতে
পায়েন। আর তিন হাজার টাকা? কে যার
দিয়ে? তাঁহাও এমন কি আছে যে শোকে
বিশ্বাস করিয়া এত টাকা দিতে পারে?
এদিকে টাকা না সংগ্রহ হইলে বিবাহের দিনে
কামিয়া বাবুর বাড়ীতে বর বাইবে। ১২১৩
বৎসরের এত বড় মেয়ে—পায়ে হলুদ পর্য্যন্ত
হইয়া গিয়াছে, কি উপায় হইবে! জাতি কুল
যার, মান সম্মান দাও,—টাকা চাই-ই! কিন্তু
কোথা হইতে এ টাকার জোগাড় হইবে?

বেলা বিগ্রহের পর আনানাহের
অহুরোধে কৈলাসচন্দ্রের হইতখী বহুগণ
কিছুকালের মজা তাঁহাকে ভাগ করিয়া ব ব
গৃহে চলিয়া গিয়াছেন। কৈলাস তখনও
একলা সেই ঘরে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে
কেহ মান আচার করিতে ডাকে নাই,
তাঁহার নিবেদনও সে কথা মনে ছিল না।

বেলা ক্রমশ বাড়িয়া চলিল। নিম্পন্দ
কৈলাসচন্দ্র যখন কোনোদিকেই ভাবনার কুল
কিনারা পাইতেছিলেন না, সেই সময় হঠাৎ
গৌরী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার
গলা জড়াইয়া ধরিল। মোটা বেলকুলের

মত শুভ্র হৃদয় হৃদয়ানি তাঁহার মুখের উপর
রাখিয়া আবরণ করিয়া বলিল—বাবা!
বেলা হয়েছে! নাইতে চল না। বাবা!
মা কঁদছে কেন? কি হয়েছে তোমাদের
বাবা?

কৈলাস রক্তবর্ণ চক্ষু তুলিয়া একবার
তাঁহার দিকে চাহিলেন। রূপে অতি-
মানে তাঁহার অস্থির তুলিয়া উঠিতেছিল।
আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া গৌরীকে
সঙ্গে লইয়া গিয়া তিনি বলিলেন—দূর হয়ে
যা সর্বনাশি—আমার সামনে থেকে! হয়
তুই মর, আর না হয় ত আমার মরণ হোক!

গৌরী অবাক হইয়া গেল। বাড়ীতে
কি হইয়াছে? মা কঁদিতছেন, কাজ
কর্ম সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহারও
মুখে কথা নাই, ভিজাসা করিলেও কেহ
তাঁহাকে কিছু বলে না, সকলেই নীরব
তড়িত। এই ত সকালে সে বাগানে খেলা
করিতে গিয়াছিল, তখন ত কিছুই হয় নাই।

বেলা হইলে কেহ খাইতে না ডাকায়
কুখার কাতর হইয়া গৌরী মায়ের কাছে
গিয়াছিল। মা তখন তাঁড়ের ঘরে উপুড় হইয়া
পড়িয়াছিলেন। তাহাকে দেখিয়া মা আশ্রয়
করিয়া ডাকিলেন না, খাবার দিলেন
না,—কেবল অঝোরে কঁদিতে লাগিলেন।
গৌরী কত ভিজাসা করিল, কত কথা
বলিল, মা কিছুই বলিলেন না। মায়ের
কাছা দেখিয়া তাহারও কাছা আগিতে-
ছিল কিন্তু হঠাৎ তাঁহার মনে হইল বাবাকে
ধরিয়া আনিতে পারিলেই সব সমস্যা কাটিয়া
যাইবে, তাই সে বাবার কাছে ছুটিয়া আসিয়া-
ছিল। কিন্তু বখন কৈলাসচন্দ্র তাহাকে গালি

দিয়া চেলিয়া ফেলিয়া চলিয়া গেলেন তখন সে
একবারে তড়িত হইয়া গেল। শিশুর নিকট
এমন অনাগর সে কখনো পার নাই। তাঁহার
কুস্ত্র জ্বলিয়াছে যেন ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল।
খাকিয়া খাকিয়া কেবল তাঁহার মনে হইতে
লাগিল—আমি কি যোগ করিয়াছি! কেন
আমার উপর সকলের এত রাগ! অস্তিমানে
রূপে তাঁহার হৃদয় তুলিয়া তুলিয়া উঠিতেছিল।
সে কোথাও স্থান না পাইয়া সেই আগেকার
মত আবার আমার কাছে আসিয়া চুই
হাতে মুখ ঢাকিয়া কঁদিতে লাগিল।
আমার গৌরী! আজ কয় দিন বিবাহের
গোলমালে, বহু লোকসমাগমে ব্যস্ত থাকায়
সে আমার কাছে আসে নাই। হৃদয়ের
সময় সে আমার তুলিয়াছিল, আজ বখন
রূপের দিনে বাড়ীতে কোথাও স্নেহপ্রায়
মিলিল না; তখন সে সেই ছোটবেলার
মত আমারই বুকে ফিরিয়া আসিয়া বেদনার
অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল।

তাঁহার পরে—তাঁহার পরের কথা বলিতে
আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়—সমস্ত দিন সে
শুষ্ক মুখে শূন্য মনে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে
লাগিল। তাঁহার সে মুখ দেখিয়া আমার বুক
ফাটিয়া বাইতে লাগিল। বাড়ীর বাহিরে, পথে
ঘাটে, স্থানে স্থানে জঁপুকঘেরা তাঁহার বিবাহের
কথা লইয়া জটলা পাকাইতেছিল। ঘুরিতে
ঘুরিতে সেই সব কথা নানা লোকের মুখে
নানা প্রকারে শুনিয়া শুনিয়া সে মোটামুটি
ব্যাপারটা একরকম বুঝিতে পারিল। তখন
মায়ের সেই নীরব রোদন, বাপের সেই
হতাশার ক্ষিপ্তপ্রায় মুখ তাঁহার মনের
মধ্যে কেবলই প্রবলভাবে বা দিতে লাগিল।

তাহার ক্ষুদ্রই ত আন মা বাপের এত কষ্ট, এত লাঞ্ছনা,—পাড়ার সকলে আর তাঁহাদিগকে কত কথা বলিতেছে, কত টিটকারী দিতেছে। সে কি করিবে? কি করিলে তাঁহাদের সব বেদনা দূর হইবে? ভাবিয়া ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সে কেবলই কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে সন্ধ্যার সময় যখন সে শ্রান্ত অবসর দেহে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নিশ্চেষ্টে আপনায় বিছানায় লুটাইয়া পড়িল তখন প্রবল অরে তাহার আর চৈতন্য রহিল না।

কৈলাসচন্দ্র সেই-যে ৪ঠাৎ মনের আবেগ সঞ্চরণ করিতে না পারিয়া গোবীর সহিত কঠোর ব্যাধার করিয়াছিলেন তাহা দিনের মধ্যে কেবলই তাহার মনে কাঁটার মত বিধিত-ছিল। গোবীর সেই জটিল কাতর মুখ মনে হইয়া তিনি কোথাও স্থির হইতে পারিতে গেলেন না। একবার তাহাকে বৃকে লইয়া আদর করিবার ক্ষুদ্র তাঁহার দেহকাতর চিত্ত অকূল হইয়া উঠিতেছিল। নিঃশব্দ মাথার উপরে যে গুরুত্তর বিশদ খনাইয়া আসিতেছে সে কথা ভুলিয়া গিয়া তিনি চারিদিকে গোবীকে খুঁজিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় কোথাও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া ঘরে ফিরিয়া দেখিলেন, প্রথমে রোক্তাপিত্ত বৃষিকার মত শোনার গোবী বিছানায় লুটাইতেছে।

গভীর রাতে গোবী একবার খুলিল। মাকে ডাকিল—মা!

—কি মা!

—মা! বাবা কোথায়!

—“ওই যে আমি মা আমার!”

কৈলাস তাহার মাথাটি কোলে তুলিয়া লইয়া গভীর মেহে মাথার ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন। বাপের আশ্রয়ে গোবীর উদ্ভৃষ্ট হোদন আর বোধ মানিল না। সে কাঁদিয়া বলিল—বাবা! আমার ক্ষুদ্রই তোমাদের এত কষ্ট, আমি যদি এখন মরে যাই তাহলে আর তোমার কোনও দুঃখ থাকবে না!

মর্দাহত কৈলাসচন্দ্র এই অভিমানপূর্ণ শেলসম কথা শুনিয়া কোনো উত্তর দিতে পারিলেন না। বৃক কাটিয়া দুই কোঁটা গরম রক্ত অক্ষরূপে গড়াইয়া পড়িল। তাহার আহত চিত্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছিল—মা! আমি কিছু চাই না! আমার মান সন্তুষ্ট থাক, সর্ব্বর থাক! তুই ফিরে আর মা! ফিরে আর!

বিশ্বাসের দিন প্রাতঃকালে অমরনাথ বিমলকে লইয়া অতিশয় বাস্তবাবে বাড়ী আসিল। সমস্ত বাড়ীখানি নিঃশব্দ—বারান্দার কৈলাসচন্দ্র একা বসিয়াছিলেন। দুই দিন পূর্বে যে গৃহ আনন্দ-উৎসবে, লোকের কণরবে, সানাইয়ের মধুর আলাপে মুগ্ধরিত হইয়া উঠিতেছিল, আজ সেই আনন্দ-মগ্ন গৃহ শূন্য—শব্দহীন মত বোধ হইতেছে। বাড়ীতে পা দিয়া কি এক অমঙ্গল আশঙ্কার অমরনাথের বৃক কাঁপিয়া উঠিল। সে ভাড়াভাড়া বারান্দার আসিয়া বলিল—বাবা! বাড়ীর সব খবর কি? মা কোথায়? গোবী কই?

কৈলাসচন্দ্র উত্তর দিলেন না।

বিমল তাঁচাকে প্রণাম করিছে, কম্পিত
কণ্ঠে বলিল—অমরের কাছে যা শুভলভ্য তাকে
আপনার কাছে যুথ বেগাতে আমার লজ্জা
করছে। আমার বিশ্বাস করুন—আমি
অপণ করে বলছি—আমি এ বিষয়ের কিছুই
জানতাম না। এ আমার বাগের চাকুরি।
আপনার কোনো চিন্তা নেই—বিশেষ
কোনো প্রতিশ্রুতি হবে না।

কৈলাসগঞ্জে উদ্যোগে অগ্নির দৃষ্টে
বিমলের মূলের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অমরনাথ তাঁহার ভাব দেখিয়া অব
স্থিত থাকিতে পারিল না। গবেষকের
ছুটিয়া চলিল। উভয়ে ঘরে গিয়া দেখিল,
দিনশেষে স্বপ্ন-মূলের মত গৌরী বিজ্ঞান
উপর পড়িয়া আছে; তাহার পাশে সংজ্ঞা-
হীনা সার্বভৌম দেহ মাটিতে লুটাইতেছে।
“বোনটি আমার!”—বলিয়া অমরনাথ
বিহ্বল হইয়া উঠিয়া পড়িল। বিমল বসন্ত-
হস্তের মত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাঁহার পর আর কি বলিল?
চাঁদ্রবাস সোনার সংসার মূল্যে হইয়া
গিয়াছে। গৌরীর শোকে অন্ধদিনের মতো
সাগরীয়া তাঁহার অস্থির করিয়াছেন।
অমরনাথ উদ্ভাসিত পিতাকে চাইয়া কলি-

কাতার গিয়াছে। বাড়ীর ভাঙিয়া
পড়িতেছে;—মেঘানে গৌরী বিকালে বাগের
হাত দিয়া বেড়াইতে আসিত সেই মাথের
মূল্যবান জগলে ভরিয়া গিয়াছে। চারি
দিক শূন্য—নীরব নিঃশব্দ! এই অসীম
শূন্যতার মাঝে বিকল বনে আমি এখনও
দগ্ধ হৃদয়ে দাঁড়াইয়া আছি।

বসন্ত, আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।
নিম্নভরণ তরলতাকে নবীন পত্রগুলে
সাজাইয়া বসন্ত আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।
চারিদিকে বেগ, জ্বলন্ত চাপার মধুর গন্ধ
—নবমুগ্ধিত অমরনাথের দ্বিত্ব সৌভাগ্য,
ফলনের আগমন ঘোষণা করিতেছে।
মহাকার-পাথর অস্থির হইতে বসন্ত-মথা
কোকিলের কুহরন অবিরাম শোনা যাইতেছে।
সমস্ত বনজলী আর প্রাণে পূর্ণ—কিন্তু
এ অন্ধকার দিনে আর সে কোথায়?
বাহার কোমল স্তম্ভ চরণ ছুটি চকল
গতিতে সমস্ত বনজলী মুখরিত হইয়া উঠিত,
সেই অন্ধকারে আর কোথায়? শুণী!
তোমরা কেহ আমার গৌরীকে ডাকিয়া
নাও! আমি একবার তাঁচাকে দেখি।
বসন্ত আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, সে কি
আর ফিরবে না?

স্বপ্নমোক্ষমারী দেখি।



কালপ্রাপ্ত শক্তি

—যেন নিজেই একটি মহাকবি রাসি !

(ছিমটী স্বর্গদূত দেবীর “তুলসি মালা”)

বঙ্গ বিবাহ-বৈচিত্র্য

(আদম হুমারী)

বিবাহের পূর্বে মিলন

কতকগুলি আদিম জাতির মধ্যে এখনও বিবাহের পূর্বে যৌন সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়; বার্ষিক উৎসবের সময় দৈবচরিত্রা প্রভৃত পরিমাণেই পরিণত হয়। খারিয়া জাতির মধ্যে বিবাহ ও অস্ত্রাস্ত্র উৎসবের সময় গ্রামস্থ যুবক যুবতীরা নির্দিষ্টভাবে পরস্পরের সহিত মিশিয়া থাকে। ওরাও জাতির মধ্যে অবিবাহিত যুবকেরা পিতামাতার নিকট হইতে স্বতন্ত্রভাবে 'ধুমকুড়িয়া'র রাজি বাপন করে এবং অবিবাহিতা যুবতীরা কোন বৃদ্ধা জ্ঞানোক্তের বাড়িতে, নামমাত্র তাহার তত্ত্বাবধানে, রাজিবাস করে। যদি কোন বালিকা রাজে বালকদিগের ঘরে ঢুপি ঢুপি পলাইয়া যায়, বৃদ্ধা তাহা চোখে দেখিয়াও দেখে না। আবার কোন কোন গ্রামে ওরাও বালক বালিকারা একই স্থানে রায়ে শয়ন করে। যদি কোন যুবকের সহিত মিলনে কোন যুবতীর গর্ভ হয়, তাহা হইলে সেই যুবতীকে বিবাহ করিতে দেওয়া হয়, নতুবা পকারভের বিচারে তাহার দণ্ড হইয়া থাকে। সাঁওতালদিগের মধ্যে যদি কোন যুবক কোন যুবতীর গর্ভ-সফলতার পর স্ববংশীয়া বলিয়া তাহার শাপিগ্রহণে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহাকে পরশা কড়ি দিয়া একটি খামীর জোপাড় করিয়া দিতে হয়; সাঁওতালদের এইরূপ কামাইকে "কিরিং কামাই" (জীত কামাই) বলে।

পূর্বিকা বেলার রাজ-বংশীদিগের মধ্যে বিবাহে অত্যধিক ব্যয়ের নিমিত্ত বিবাহের পূর্বেই জী-পুরুষের মত একত্র বাসের প্রথা দেখা যায়। স্বজাতিরগণকে ভোজনে পরিতৃপ্ত করা তাহাদের বিবাহের একটি অঙ্গুষ্ঠান। তাহাদিগকে ভোজন না করাইলে বিবাহ নামধার হইয়া যায়। অর্থাৎ ভাবে যদি কেহ জাতিদের ভোজ দিতে না পারে, তাহা হইলে কোন জ্ঞানোক্তের সঙ্গে জল ছিটাইয়া তাহাকে লইয়া গেল করিতে পারে। কিন্তু বহু দিন ভোজ দিতে না পারে, সন্তান গ্রহিলেও ততদিন তাহার বিবাহ বাতিল থাকে; ভোজ দিতে পারিলেই বিবাহ মঙ্গল হইয়া যায়।

*

জী-হরণ

ছোটনাগপুরের কতকগুলি আদিম জাতির মধ্যে জীকে বলপূর্বক হরণ করিয়া বিবাহ করিবার প্রথা অতাপি বিস্তারিত আছে। উড়িষ্যার কুঁইয়াদিগের মধ্যে যদি কোন যুবক কোন যুবতীর প্রতি আগ্রহ হয়, এবং তাহার পিতামাতা সে বিবাহে সম্মতি দান না করে, তাহা হইলে বলপূর্বক যুবতীকে যুগা হরণ করিয়া লয়, এমনও দেখা যায়! হে-জাতির মধ্যে নৃত্যের স্থান কিংবা বাজার হইতে যুবকগণ যুবতী হরণ করে। এখনও অনেক নিম্ন জাতির "বহাত" প্রথায় জী-হরণ ও তৎসঙ্গ সংগ্রামের লক্ষণাদিও দেখিতে পাওয়া যায়।

সেবা ও বিবাহ

সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাওঁ, রাজবংশী ও হাড়িদিগের মধ্যে বর কিংবৎকাল কস্তার পিতা-মাতার গৃহে থাকিয়া সেবা-তৎপর্য্য দ্বারা কস্তার পিতা-মাতার মনজুষ্টি করিয়া, কস্তার পাণিগ্রহণ করে, এ প্রথাও দেখিতে পাওয়া যায়। সাঁওতালদিগের মধ্যে কস্তা, কুৎসিত কিংবা বিকলাঙ্গী হইলে অথবা কস্তার ভাই না থাকিলে উক্ত প্রথার তাহার বিবাহ হইতে দেখা যায়। এই “দাহারাদি জামাই” সাধারণতঃ দরিদ্র, পণ দিয়া কস্তা-গ্রহণে অসমর্থ, তাহী স্বত্ত্বের আশ্রয়ে পণের পরিবর্তে পাঁচ বৎসর বিনা মজুরিতে অকাতর পরিশ্রম করিয়া কস্তার পাণিলাভ করে; বিবাহের পর স্বত্ত্বের নিকট হইতে দুইটি মহিষ, কিকিৎ খাজ ও কতকগুলি চাব করিবার ঐশপাতি লইয়া গ্রাম সহিত সে বৃত্তবাস করিতে যায়। বড়ি জালক না থাকে, তাহা হইলে জামাতা স্বত্ত্ব-গৃহেই রহিয়া যায়, স্বত্ত্বের কাজকর্ম দেখা-শুনা করে এবং স্বত্ত্বের মৃত্যুর পর তাহার পরিত্যক্ত দ্রব্যের সম্পত্তির অর্জাংশ লাভ করে। সেই সকল “বর জামাইয়ের” পুত্রেরা মাতামহের নাম গ্রহণ করে। মুন্ডাদিগের মধ্যে “বর-জামাই” তিন বৎসর কাল স্বত্ত্ব-গৃহে বাস করে, তৎপরে কস্তার পাণিগ্রহণের পর স্বগৃহে ফিরিয়া থাকে। তৎকালে সে কতক জমি, বারো মণ চাউল ও দুইটি মহিষ বৌদ্ধ-বরূপ লাভ করে। ওরাওঁদিগের মধ্যে তিন প্রকার “বর-জামাই” দেখিতে পাওয়া যায়—এক

প্রকার—বৃত্তের মত, যতদিন কাণ কবে, ততদিন ভাত, কাপড় ও মজুরি পায়; দ্বিতীয় প্রকার—ভাত, কাপড়, মজুরি ও গ্রী-পদ্ম পাইয়া থাকে এবং তদ্ব্যতীত চলিয়া যাইবার সময় দুইটি মহিষ, একটি লাঙ্গল, কতকগুলি কৃষি-যন্ত্র ও কিছু-কিছু তৈয়্যস পত্রও লাভ করে; তৃতীয় প্রকার জামাতা চিরকাল অল্পতর স্বত্ত্বের আলয়ে বাস করে, স্বত্ত্বের সেবা করে এবং তাহার কাজকর্ম দেখে।

পণ-বিবাহ

বর্তমান কালে পণ-বিবাহ অত্যধিক পরিমাণে প্রচলিত—হয় বর না হয় কস্তাকে অর্থ দিতে হয়; উক্ত জাতির মধ্যে বরকে দিতে হয় এবং নিম্ন জাতির মধ্যে কস্তাকে দিতে হয়। আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উপর পণের হার নির্ভর করে। বিষমিজগলয়ের উপাধিই আজকালকার বিবাহের বাজারে বরের দর নির্ধারণ করে। বাঙ্গলা দেশে এষ্টাঙ্গ, এক্ এ, ও বি এ উপাধিধারী যুবক-গণকে বিবাহের বাজারে ৫০০ হইতে ৩০০০ টাকা পর্য্যন্ত দরে সাধারণতঃ বিক্রয় হইতে দেখা যায়; সময় সময় অনেক কস্তার পিতা ১০,০০০ টাকাও অল্পান বদনে বরকে দিয়া থাকেন। বাঁকুড়া জেলায় - সঙ্গোপদিগের মধ্যে কস্তাকে পণ দিয়া বিবাহের প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে; কিন্তু বর যদি পাণ করা হয়, তাহা হইলে বরের অর্থদণ্ড না ঘটিলে অর্থলাভ ঘটে। বর ও কস্তার বয়সের উপর দরের হার কতকটা নির্ভর করে। যেখানে কস্তা ক্রয় করা হয়, সেখানে অল্পবয়স্ক

বালিকার দর বেশী; যেখানে বর বিক্রয় হয়, সেখানে বরদ্বা বালিকার বিবাহ দিতে অধিক ব্যয় হয়। নিম্নলিখিত তালিকার বিভিন্ন জাতির মধ্যে বর ও কস্তার মোট মুঠ একটা বাজার-দর দেওয়া গেল—

দর

জাতি	কস্তা	দর
আওরি	—	২০০—৪০০\
বাগ্দি	৭—৬০\	—
বৈজ্ঞ	—	৪০০—৬০০\
বাওরি	৪—১০\	—
ব্রাহ্মণ	—	৪০০—৪০০\
গন্ধবণিক	—	৪০—৩০০\
গোয়াল	১০০—৪০০\	—
কাহার	৫০—১০০\	—
কৈবর্ত	২৫—১০০\	—
কাওরা	১৫—৫০\	—
কায়স্থ	—	২০০—৪০০\
কৈরি	৫০—১০০\	—
কুশি	২—১০০\	—
মুণ্ডা	৫—৮০\	—
নমঃশূদ্র	২০—১০০\	—
ওরাও	১০\	—
পোদ্	১৫—৫০\	—
রাজবংশী	৮০—১০০\	—
সদগোপ	৩০—৫০০\	—
সাঁওতাল	১০\	—
অম্ববণিক	—	৪০০—৬০০\
ডেওর	১৫—৫০\	—

সম্প্রতি বর ও কস্তার দর বড় বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্বে কুচবিহারে রাজ-

বংশী কস্তার ৩০০০ টাকা দর ছিল, কিন্তু এখন তাহা বাড়িয়া ৮০১০০ টাকার দাঁড়াইয়াছে। যেমন চাল, ডাল, মাছ, তরকারির দর বাড়িয়াছে, সেইরূপ বর ও কস্তার দরও বাড়িয়া গিয়াছে। আবার রেল পিতার হওয়ার বিবাহের ক্ষেত্রে অত্যধিক বর্ধিত হইয়াছে। লাহোরের পাত্রের সহিত কলিকাতার পাত্রের বিবাহ এবং চট্টগ্রামের পাত্রের সহিত এলাহাবাদের পাত্রের বিবাহ নিতাই এখন ঘটিতেছে।

বিবাহ ও বয়স

যৌবন-লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্বেই কস্তার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত। নিম্নজাতির মধ্যে ৮ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে সাধারণতঃ কস্তার বিবাহ হইয়া থাকে; কিন্তু উচ্চ জাতির মধ্যে বিবাহের বয়স বাড়িয়া যাইতেছে। বালিকাদিগের বিবাহের বয়স বাড়িয়া যাইবার একটি কারণ, উচ্চ-জাতিসমূহের মধ্যে শিক্ষা-বিত্তার। বিবাহে বাজারে বরের অত্যধিক দরও অপর একটি কারণ। কস্তাদার ক্রমশঃ অত্যন্ত কঠিন দার হইয়া উঠিতেছে। পিতা অনেক সময় অর্থাভাবে উপযুক্ত সময়ে কস্তার বিবাহ দিতে পারিতেছেন না।

সাধারণতঃ নেপালী, সাঁওতালী ও অন্যান্য আদিম জাতির মধ্যে যুবক ও যুবতীর মধ্যে বিবাহ হইয়া থাকে; তাহা-দিগের মধ্যে অল্পবয়সী বালিকার সহিত অল্পবয়স্ক বালক কিংবা যুবকের বিবাহ হয় না।

বাংলা-বিবাহ

নিরীক্ষাভিত্তিকের মধ্যে এখনও বাংলাবিবাহ দেখা যায়; বিচারে বিশেষতঃ গোষ্ঠা-বিধের মধ্যে বাংলাবিবাহ অত্যধিক প্রচলিত।

বিবাহ-পদ্ধতি

“সিন্দুর-দান” বিবাহের প্রধান অঙ্গ। কয়েকটি ক্রটির মধ্যে ব্যবস্থা আছে যে যদি কোন প্রেমিক কোন প্রেমিকার কপালে সিন্দুর দান করে, তাহা হইলে তাহাদিগের বিবাহ হইয়া যায়। এমন কি পূর্ণিমা জেলায় মুসলমানদিগের মধ্যেও যদি কোন ব্যক্তি কোন জীলোকের কপালে সিন্দুর পরাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে সেই জীলোকের সহিতই তাহার বিবাহ হইয়া যায়। সিন্দুর-দানেই সাঁওতালদিগের বিবাহ সিদ্ধ; কিন্তু যদি কোন সাঁওতাল দুবক সিন্দুর-দানের সময় ঘরা পড়ে, তাহা হইলে সে যথেষ্ট প্রহার লাভ করে; যদি হাতে হাতে ধরা না পড়ে, তাহা হইলে কস্তার আত্মীয় স্বজনদেরা যুবকের বাটতে বাইরা তাহাকে বাধিয়া প্রহার করে ও তাহার গরু কিংবা মহিষ কাড়িয়া আনে এবং পক্ষারতের বিচারে কস্তার পিতাকে অর্থদণ্ড দিবার পর সেই গরু বা মহিষ বর ও কস্তার সম্পর্কীদের লিগিয়া ভোজন করে। সিন্দুর-দানের পদ্ধতি, বোধ হয়, পুরাকালে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে রক্ত-বিনিময়-প্রথার নিদর্শন-স্বরূপ রহিয়া গিয়াছে।

রক্ত-বিনিময়-প্রথা এখনও বাংলাদেশে কোন কোন জাতির মধ্যে দেখা যায়। হাফিরা বর্মের অঙ্গুলিতে একটি কাটা বিধিরা

সেই দণ্ড হইতে রক্ত তুলিয়া কস্তার অঙ্গে এবং সেই ভাবেই কস্তাও রক্ত তুলিয়া বর্মের অঙ্গে নিশাইয়া থাকে। মুন্সের জিলার ধাড়ি ও দোদাগি জাতির। নাপিত ডাকাইরা নফন বিরা বর্মের অঙ্গুলি কাটাইয়া রক্ত বাহির করিয়া সেই রক্তে একটি লাল তুলা ভিজাইয়া লয়; পরে সেই তুলা একটি পানের মধ্যে পুরিয়া কস্তাকে এবং কস্তার রক্তে মাথানো তুলা আর একটি পানের মধ্যে পুরিয়া তাহা বহকে খাইতে দেয়। শুলগুলিরা জাতির মধ্যে বর্মের রক্তে মাথানো তুলা দিয়া কস্তার পারে আলুতা পরানো হয় এবং কস্তার রক্ত মাথানো তুলার বর্মের পা রঞ্জিত করিয়া দেয়। উচ্চজাতীয় বাঙ্গালীর মধ্যে এখনও নববধূকে “দুধে আলুতার” দাড় কাটাইয়া অভিব্যক্তির ব্যবস্থা বর্মের বুকে প্রচলিত। এই “দুধে আলুতার” ব্যবস্থা বোধ হয় পূর্বকালের রক্ত-ব্যবহার প্রথারই নিদর্শন-স্বরূপ রহিয়া গিয়াছে।

বিধবা-বিবাহ

উচ্চ জাতির বিধবা-বিবাহের অস্বাভাবিক করেন না; এখনও নিরীক্ষাভিত্তিকের মধ্যে বিধবা-বিবাহ সমধিক প্রচলিত রহিয়াছে; কিন্তু নিরীক্ষাভিত্তিকের মধ্যেও বাহায়া পর ও মধ্যাঙ্গার অভিলাবী, তাহার। বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী নহে এবং তাহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ-প্রথা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। কতক-জাতির মধ্যে বিধবার বিবাহ হইলেও তাহার স্থান কুমারী অপেক্ষা অনেক নীচে এবং কয়েক স্থলে আবার উপ-পত্নীর স্থান ঘূর্ণ। সাঁওতালদের। বিধবা-বিবাহ ঘূর্ণার চক্ষে

দেখিয়া থাকে ; বিবাহের সময় বিধবার কপালে সিন্দুর না দিয়া বর একটি ফুলে সিন্দুর মালাইয়া বাম হাতে করিয়া বিধবার মাথার ত্তাহা ফেলিয়া দেয়। মানকুমার জেলার কুর্দিয়া বিধবা-বিবাহে হাতে করিয়া না দিয়া পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া বিধবার কপালে সিন্দুর পরাইয়া থাকে। রাজবংশীদিগের মধ্যে যাঁহারা বিধবা বিবাহ করে, তাঁহাবিগকে “ডেবুয়া” বলে ; ডেবুয়া অত্যন্ত ঘৃণিত জীব ; যদি ডেবুয়া কোন মরা গরু স্পর্শ করে, তাহা হইলে চরণায়, শকুনিয়াও তাহাকে পরিত্যাগ করে।

ব্রাহ্ম-বিবাহ বিধি (১৮৭২ সালের ৩ আইন) অনুসারে ১৯০১ হইতে ১৯১০ পর্য্যন্ত সর্বসমেত ৩৫৪টি বিবাহ হইয়াছে ; ইহা মধো কেবল মাত্র ৩৪টি বিধবা বিবাহ। ইহাতে বোধ হয় অত্যন্ত : বিধবা বিবাহের ক্রমও ব্রাহ্ম-বিবাহ বিধির প্রয়োগ খুবই কম হইয়াছে।

দেবর বিবাহ

ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার নিম্ন জাতীয় হিন্দু এবং আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে এক প্রকার বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে—ইহাকে দেবর-বিবাহ বলা ঘাইতে পারে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা পত্নীকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিয়া থাকে—পরকে বিলাইয়া দেয় না, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যখন পণ দিয়া বিবাহ করিয়া আনিয়াছে, তখন সে যৌথ পরিবারের সম্পত্তি, তাহাকে পরের হাতে না দিয়া বর রাখাই কর্তব্য। সাঁওদিগের মধ্যে যখন কোন দেবর তাঁহার বিধবা ভাজকে বিবাহ

করে, তখন আর তাহাকে পণ দিতে হয় না। বিবাহের কোন আচারও পালন করিতে হয় না। হো এবং অস্ত্রাজ্ঞ জাতির মধ্যে দেবর বা ভাজ যদি বিবাহে অসম্মত হয়, তাহা হইলে বে ব্যক্তি বিধবাকে বিবাহ করে, তাহাকে বিধবার প্রথম বিবাহে লক্ষ পণ প্রথম স্বামীর স্বজনকে ফিরাইয়া দিতে হয়। গণ্ডা জাতির মধ্যে বিধবার দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর পণের টাকা দিতে না পারিলে সমাজচ্যুত হয়। দেবরের সহিত ভ্রাতার বিবাহে কোনরূপ বাধ্য-বাধকতা নাই ; দেবর বা ভ্রাতার ইচ্ছায় উপরই তাহা নির্ভর করে। উড়িষ্যার এখনও স্বামী যদি ছই বা তিন বৎসরের জন্ত কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে বাস করে, তাহা হইলে তাঁহার স্ত্রীকে দেবর বা অপর কোন পুরুষ কখনও কখনও বিবাহ করিয়া থাকে, এমন দেখা যায়।

কৃত্রিম বিবাহ

বান্দীদিগের মধ্যে প্রকৃত বিবাহের পূর্বে মহাদা গাছের সঙ্গে একরূপ কৃত্রিম বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে। খাফোজা জাতির মধ্যে আশ্র বৃক্ষ কিংবা সেই বৃক্ষের শাখার সহিত কৃত্রিম বিবাহ হইয়া থাকে। ছোট নাগপুরের কুর্দীদিগের মধ্যে বিবিধ বৃক্ষের সহিত কৃত্রিম বিবাহের পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায় ;—বরের সহিত আম গাছের এবং কস্তুর সহিত মল্লিকা গাছের বিবাহ হইয়া থাকে। নেপালে নেওয়ার বালিকাদের বেল ফলের সহিত কৃত্রিম বিবাহ এবং বড় হইলে স্বামীর সহিত পুনরায় বিবাহ হইয়া থাকে। এই সকল

গাছের সহিত কৃত্রিম বিবাহ-প্রথা দেখিয়া মনে হয়, ইহা আদিম সমাজেরই বিবাহ-পদ্ধতির নিদর্শন—ইহার দ্বারা বোধ হয় ত্রাশ্র আদিম মানব বিবাহিত জীবনের দুঃখ বৃক্ষকে কর্ণণ করিত।

আর এক প্রকার কৃত্রিম বিবাহ দেখা যায়—ইহার উদ্দেশ্য জীবাতির বিবাহ না হওয়ার কলঙ্ক মোচন করা। কোন জাতির মধ্যে অগ্নির সহিত, কোন জাতির মধ্যে ফুল বা বৃক্ষের সহিত কিংবা জীবের সহিত কৃত্রিম বিবাহ হইয়া থাকে। আই-বুড়া নাম ঘুটানোই এইরূপ বিবাহের উদ্দেশ্য।

যদি কোন কুমার কোন বিধবাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে গাছ বা ফুলের সহিত তাহাকে কৃত্রিম বিবাহ করিতে দেখা যায়।

বাঙ্গলা দেশে ত্রাশ্র কাগরহ প্রভৃতি উচ্চ জাতির মধ্যে দুইবার জীবিতগণের পর তৃতীয় বার যদি পুরুষের বিবাহ হয়, তাহা হইলে সেই বিবাহের পূর্বে কোন বৃক্ষের গায়ে বা কুকুরের গলায় তাহাকে মালা পরাইয়া দিতে হয়। ইহার অর্থ—যদি আবার কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে, ত তাহা ঐ গাছ বা কুকুরের উপর দিয়াই ঐতিয়া যাক! চতুর্থ বার বিবাহ করিতে হইলে এ ব্যবস্থা নাই; পক্ষমব্যয়ে কিন্তু তৃতীয়বারের ব্যবস্থাই বাহাল থাকে।

বেশ্যাদের বিবাহ

যদিও বেশ্যাদের জীবন বিবাহের অন্তর্গত প্রতিবাদ, তথাপি বেশ্যাদের মধ্যে একপ্রকার

কৃত্রিম বিবাহের ব্যবস্থা আছে। বাঙ্গলা দেশে বেশ্যাকৃত্তাদের যৌন উপহৃত হইলে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে কোন গাছ, তরবারি, ছোরা, অথবা কোন ভাড়াটিয়া বৈফব, বেশ্যাপুত্র বা বোকা হাথা লোকের সহিত তাহাদের বিবাহ হইয়া থাকে। নীচ জাতীয় ত্রাশ্রণ আদিরা বিবাহ দেয়; কিন্তু ভাড়াটিয়া স্বামীর জীব উপর কোন দাবী-দাওয়া জন্মে না; বিবাহের পর জীবকে পরিভ্যাগ করিয়া থাইতে হয়। মুসলমানী বেশ্যাদের কৃত্রিম বিবাহে মোল্লা আদিরা বিবাহ দিয়া থাকে। হিন্দু বেশ্যাদের আর গাছের সহিত এবং মুসলমানী বেশ্যাদের ছোরা বা তরবারির সহিত বিবাহ হইয়া থাকে। জুই, মল্লিকা, গোলাপ গাছই হউক, আর কদলী বৃক্ষই হউক, কিংবা ছুরি, ছোরা বা তরবারিই হউক, বেশ্যাদের বিবাহে আচার-অনুষ্ঠানের কোনরূপ জট থাকে না। বেশ্যারা এই কৃত্রিম বিবাহের মাঝা অনেক দূর পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়। ইহার অতি যত্নে সেই বৃক্ষে অলসেচন করে এবং সিন্দূকের মধ্যে সেই তরবারি তুলিয়া রাখে; যত দিন গাছ বাঁচিয়া থাকে বা তরবারি না হারায়, ততদিন বেশ্যাকৃত্তা আপনাকে সখ্যা মনে করে; পরে গাছ মরিয়া গেলে কিংবা তরবারি হারাইলে বিধবার মতই সে হাতের লোহা খুলিয়া ও ফপালের সিন্দূর মুছিয়া ফেলে। মনে হয়, এই সকল কৃত্রিম বিবাহের উদ্দেশ্য শুধু আইবুড়া নাম ঘুটানো।

বিবাহ-বিচ্ছেদ

জীব দ্বন্দ্ববিভা, বাড়িচাঙ্গিণী, বধ্যা বা

ছুরাযোগ্য রোগগ্রস্তা হইলে তাহার সহিত বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে। বিবাহ বিচ্ছেদ হইলে স্ত্রী হাঁতের লোহা ভাঙিয়া ফেলে কিংবা কোন গাছের পাঁতা ছিঁড়িয়া ফেলে। কতক জাতির মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের পূর্বে পক্ষাভ্যন্তর অশ্রুযুক্তি লওয়া প্রচলিত; সন্ধ্যাপূরে গাভী জাতির মধ্যে “শেতিয়ার” (যা আমের প্রধানের) অশ্রুযুক্তি ব্যতীত বিচ্ছেদ হইতে পারে না। খ্রীলোক-দিগের সাধারণতঃ বিবাহ বিচ্ছেদ করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু নেপালে নেয়ার জাতীয় খ্রীলোকেরা ইচ্ছা করিলে যুহুস্ত মাঝেই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে। স্ত্রী দুইটা সুপারি বিছানার মাঝিরা প্রস্থান করিলে বৃষ্টিতে হইবে যে, সে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে। পূর্বিয়া জেলার মুসলমানী খ্রীলোকদিগের মধ্যে বিবাহ বন্ধন অত্যন্ত শিথিল। যদি কোন মুসলমানী স্বামীর সহিত বর করিতে নারাজ হয়, তাহা হইলে স্বজ্ঞানে সে হাটে গিয়া মনের মত বিত্তীয় স্বামী পুঁজিয়া লইতে পারে—তাহাকে কেবলমাত্র তাহার সেই নির্দোষিত স্বামীর সঙ্গে কতকগুলি মুড়কি ছড়াইয়া দিতে হয়। তাহা হইলে পূর্বে বিবাহের বন্ধন ছিন্ন এবং নূতন বিবাহ শিক্ত হইয়া যায়। কোন সাঁওতালী যদি স্ত্রীর বিনা অশ্রুযুক্তিতে বিত্তীয় দার পরিগ্রহ করে, তাহা হইলে সে স্ত্রী ইচ্ছা করিলে স্বামীর সহিত বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিবার দাবী করিতে পারে।

বহু ভর্তা

দুই একজন বহুবর্ত্ত্ব্য দেখিতে পাওয়া

যায়—একপ্রকারে খ্রীলোকের বহু স্বামীদের মধ্যে পরস্পরের কোন সম্পর্ক নাই; অত্র প্রকারে, খ্রীলোকের বহু স্বামী মধ্যে ভাই-ভাই সম্পর্ক। ভুট্টা সাঁওতালদিগের মধ্যে বহু জাতীয় একটা খ্রীক বিবাহ করে। সাঁওদিগের মধ্যে অবিসাহিত দেবরের ভ্রাতৃপে গৃহণের অধিকার আছে।

বহু-বিবাহ

যদিও বহু-বিবাহে কোনরূপ শাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক নাই, তথাপি উচ্চজাতীয় হিন্দুদিগের মধ্যে বহু-বিবাহ অত্যন্ত বিরল। স্ত্রী বক্ষ্য কিংবা তুরারোগ্য রোগে প্রদীড়িতা হইলে, কোন কোন স্বামীকে কতিং একাধিক বিবাহ করিতে দেখা যায়। এক খ্রীকেই ভাত দিতে অনেকের অক্ষম, তাহার উপর বহু স্ত্রী হইলে এই অনাবটনের দিনে সন্তানের কলহেই মধ্যে সংসার চালানো যে কি সুপের তাহা সকলে সংক্ষেপে বৃষ্টিতে পারেন। সাঁওতাল পরম্পরের সাঁওড়িয়া পাছাড়িয়া বা মালের জাতীয়েরা পাঁচ বা ছয়টি স্ত্রীকে এক সঙ্গে বিবাহ করে; প্রথমে বড়, তাহার পর ছোট এবং তৎপরে তাহার ছোট স্ত্রীর সহিত বিবাহ হয়। বড় স্ত্রীর বিনা অশ্রুযুক্তিতে ছোট স্ত্রীর সহিত বিবাহ হইতে পারে না। বিবাহের পর স্ত্রীরা এক বাটীতে এক সঙ্গে বাস করে, রাজে স্বামীর সঙ্গে এক শয্যা শয়ন করে। বড় স্ত্রীর আবেশ-ব্যতিরেকে ছোট স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে পক্ষাভ্যন্তর বিচারে স্বামী দণ্ডনীয় হয়। সাঁওদিগের মধ্যে স্ত্রীলীর সহিত সখ্য বড় শিথিল; যদি কাহারও বারা তাহার স্ত্রীলিকার

গর্ভগকার হয়, তাহা হইলে তাহাকে সেই ভ্রাতীকে বিবাহ করিতেই হইবে।

পূর্ণে কুণীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বহু-বিবাহ প্রচলিত ছিল; এখন শিক-বিভ্রাঘের সহিত উহা আর লোপ পাইয়াছে।

কতকগুলি বিচিত্র প্রথা

সাধারণতঃ কস্তার বাটীতে বিবাহের সময় বয় আসে; কিন্তু রাজবংশীদিগের মধ্যে কস্তা বরের বাটীতে যায়—পূর্ণে ভট্টপতির পিঠে চড়িয়া বাইত। যশোরের নেনদের মধ্যে বিবাহের পর নববধূ স্বতন্ত্রাণেরে বার না; নব-দম্পতীকে একটা “টঙ্ক” তৈয়ার করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে তাহার। বাল কবে। সম্বলপুরে বিবাহের পূর্বরাত্রিতে বরের সম্পর্কীরা কতকগুলি বিবাহিতা স্ত্রীলোক কোন নদী বা পুকুরিণী হইতে গোটা স্ত্রিরা জল আনে এবং সেই জল আবার অপর সাতটি বাটীতে লইয়া বাইরা তাহার পরিবর্তে অল্প জল লইয়া আসে এবং শেবোক্ত জল দিয়া বরকে স্নান করাইয়া তাহার কৌমার্য্য ধোত করিয়া দেয়। আবার কস্তা-পক্ষেও ঠিক এইরূপ আচার পরিলক্ষিত হয়। সুতা জাতির মধ্যে বরবাতীরা কস্তার বাটার নিকট উপস্থিত হইলে, স্বস্তাবাতীরা তাহাদের নিকটে যায় এবং উভয় দল একত্র মিলিত হইলে বর ও কস্তার মা, খুড়ী বা কেঠাই প্রভৃতি জলপূর্ণ কলস হস্তে অগ্রসর হইয়া পরস্পরে পরস্পরের গায় আম পাঁতা দিয়া জল ছিটাইয়া আশীর্জন করে।

বিবাহিত জীবনের অবস্থা

এখানে প্রায় সকল স্ত্রীলোকেরই একবার

পিণ্ডাহ হয়; কেহ তিব্বতগণ আইবুড়া থাকে না। পুরুষদিগের মধ্যে অবিবাহিতের সংখ্যাও অতি অল্প। হিন্দুবা প্রায় সকলেই বিবাহ করে। ইংলণ্ডের সহিত বাঙ্গলা দেশের বিবাহের তালিকা মিলাইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইংলণ্ডে শতকরা ৬০ জনের উপর পুরুষ এবং ৫৮ স্ত্রীলোক, বিবাহ যে কি বস্তু, তাহা জানেও না; বাঙ্গলা দেশে শতকরা ৫১ জন পুরুষ ও ৩৪ জন স্ত্রীলোক অবিবাহিতা থাকে এবং শতকরা ৫৫ জন পুরুষ ও ৪৬ স্ত্রীলোক বিবাহিত। ২০ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক বিবাহিত পুরুষ অপেক্ষা বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক; ৫০ বৎসর বয়সের পর বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম। সকল বয়সেই অবিবাহিত পুরুষ অপেক্ষা অবিবাহিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম; কিন্তু নিপট্রীক অপেক্ষা বিধবার সংখ্যা বেশী।

বাঙ্গলা দেশে যদি ১২ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদের তালিকা লওয়া হয়, তাহা হইলে দেখা যায়, শতকরা ২২ জন বালিকা এবং ২২ জন বালক অবিবাহিত। ২০ বৎসর বয়সের পর বাঙ্গলার ৮৩ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ১ জন অবিবাহিতা থাকে। কুণীন ব্রাহ্মণের ঘরে ও আদিব নিবাসীদের মধ্যে প্রকৃত কুমারী দেখিতে পাওয়া যায়। মুক, বধির, অন্ধ, খজ বা হুসারোগা ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রীলোকদের অধিকাংশ স্থলে অবিবাহিত থাকিয়াই জীবন যাপন করিতে হয়। যেস্তা-কস্তারা অবিবাহিতা থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রায় সকল স্ত্রীলোকই বিবাহিত।

পশ্চিম বঙ্গ, উত্তর বঙ্গ ও ছোটনাগপুর ব্যতীত বাঙ্গলার সর্বত্র মুসলমান অপেক্ষা

হিন্দু মণ্ডো বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা অধিক। কিন্তু বাঙ্গলার সর্বত্রই হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের মণ্ডো বিবাহিতা জীলোকের সংখ্যা বেশী। ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে বাঙ্গলা দেশে বিবাহিত হিন্দু পুরুষের সংখ্যা বিবাহিত মুসলমান পুরুষের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক; কিন্তু ৪০ বৎসর বয়সের উর্দ্ধে হিন্দু সংখ্যা কম। ৫ হইতে ১০ বৎসর বয়স্ক হিন্দু বালিকাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, ৮ জনের মধ্যে ঐতি ১ জনের বিবাহ হইয়াছে এবং ১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক বালিকাদের ৬ জনের বিবাহ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ৫ হইতে ১০ বৎসরের মুসলমান বালিকাদের শতকরা ৯ জনের এবং ১০ হইতে ১৫ বৎসরের বালিকাদের শতকরা ৫৬ জনের বিবাহ হয়।

বাঙ্গলা দেশের সর্বত্র প্রায় বিবাহিত ব্যক্তির সংখ্যা একপ্রকার; সর্বত্রই প্রায় সমান; কম-বেশী নাই।

শিশু-বিবাহ বাঙ্গলা দেশে অত্যন্ত বিরল। বিহারে ১ হইতে ৫ বৎসরের শিশুর বিবাহ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। গত আদম ত্বমারিতে বাঙ্গলায় ২০,৩৩৩ বিবাহিত ও ১২৭৮ বিধবা শিশুর সংখ্যা পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু বিহারে ১২৭,৯৮৪ বিবাহিত ও ৮০৬৪ বিধবা শিশু দেখা গিয়াছিল। বাঙ্গলার শিশু বিবাহ নিরুল হইলেও বাণ্য-বিবাহ যথেষ্ট পরিমাণেই প্রচলিত। হিন্দুরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্বেই বালিকাদের বিবাহ দিয়া থাকেন, কিন্তু মুসলমানদিগের মধ্যে বালিকা সামাজিক ঠেলে বিবাহ দেওয়া যদিও প্রাপ্ত, তথাপি

হিন্দু প্রভুত্বের তথ্যদের বাণ্য-বিবাহই ঘটয়া থাকে।

বাণ্য-বিবাহ যে উচ্চ জাতি অপেক্ষা নিম্নজাতির মধ্যে অধিকতর পরিমাণে প্রচলিত, তাহা নিম্ন তালিকা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে—

ঐতি ১০০০ বিবাহিতা বালিকার মধ্যে

জাতি	বয়স ০-৫	বয়স ৫-১২
ব্রাহ্মণ	৩	১৫৪
বৈজ্ঞ	২	৪৮
কার্ব	২	৮৩
বাগদি	৯	২৪৪
ডোম	১৩	২৬৭
চামার	৭	২০৯

পার্কীতা ও আদিম জাতিদিগের মধ্যে বাণ্য-বিবাহ অতি বিরল। অহিন্দু অপেক্ষা হিন্দুদের মধ্যে বাণ্যবিবাহ অধিক।

শিক্ষা-বিত্তার, জীবিকা নির্বাহের জন্য অধিকতর ব্যয় এবং বয় ও কস্তার পণের হার বৃদ্ধির সহিত বাণ্য-বিবাহের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া যাউতেছে।

হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের মধ্যে বিধবা-বিবাহ অধিকতর প্রচলিত। লেপঙ্কা, ভোটাটা প্রভৃতি পার্কীতা জাতির মধ্যে বিধবার সংখ্যা কম। অ-হিন্দু অপেক্ষা হিন্দু-বালিকাদিগের আদিম-নিবাসীদের মধ্যে বিধবার সংখ্যা অধিক। ব্রাহ্মণ, বৈজ্ঞ, কার্ব প্রভৃতি উচ্চ-জাতির মধ্যে বিধবার সংখ্যা বেশী। ডোম, চামার, মুচি প্রভৃতি নিম্ন জাতীয়দিগের মধ্যে বিধবার সংখ্যা অল্প। গোরালা, কৈবর্ত, নমঃশূত্র, সঙ্গোপ, ছুতার, ভেণি ও তিলিদের

মধ্যে বিধবার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ; উচ্চজাতীয় হিন্দুদের অশ্রু করণে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়াই এই সকল জাতির মধ্যে বিধবার সংখ্যা এত অধিক ।

বিপত্নীক অপেক্ষা বিধবার সংখ্যা অধিক । মুসলমানদের মধ্যে যদিও বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, তথাপি তাহাদের মধ্যে বিপত্নীক অপেক্ষা বিধবাই বেশী । তবে বিধবার সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে । ইহার কারণ কিয়ৎ পরিমাণে বিবাহের

বহুসংস্কার, কিয়ৎ পরিমাণে বিধবা বিবাহের অধিকতর প্রচলন । উচ্চ জাতীয় হিন্দু-দিগের মধ্যে বাল-বিধবাদের বিবাহ বিহার অল্প চেষ্টা হইতেছে । যে সকল জাতির মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে প্রায়ই বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা আছে ; কিন্তু যে সকল জাতির মধ্যে বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা নাই, তাহাদের মধ্যে বিধবার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ।

ক্রীতপুণ্ড্রনাথ বহু ।

শ্রুতের ফুল

৩৪

যখন মালতী ও বিপিনকে বৃক্ষে করিয়া পালি উল্লান ভাসিল তখন মালতীর মন ঢুকিয়া কাঁদিয়া উঠিল—সংসার ছাড়িয়া এ কোন্‌ নিরুদ্ধেশ যাত্রা ! মালতী পালিতে বসিয়া দেখিতে লাগিল গ্রামবধূর রাত্রের মতন অলসকর করিয়া গইবার অল্প বলসী লইয়া ঘাটে আনিরাছে, কেহ কাপড় কাটিতে জলে নামিরাছে ; কেহ জল হইতে উঠিয়া তিজা কাপড়ে ঘড়া কাঁধে করিয়া সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে হুথ ফিরাইয়া ঘোমটার আড়াল হইতে চলন্ত পালিখানির দিকে কোতৃহলী দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিতেছে । তাহাদিগের সকলেরই ঘর আছে, কাজ আছে, আপনার বলিয়া যত্ন করিবার লোক আছে, মালতীর কিছু নাই, কেহ নাই, নাই নাই ।

পালি যখন

শ্রুতপাথরের ঘাটের কাছে আসিয়া ডিড়িতে-ছিল, তখন হঠাৎ ভুবুভুবু ! নদীর জল সোনার আলোর হাসিমাখা চোখের মতো তরল উদ্ভল । ওপাথরের নদীর কোণে কোণে কাজল-রেখার মতো অন্ধকার, তটের উপর তরুমাঝি ভুফর মতো একটানা কালো, তাহার উপর নটকনারঙা আকাশের মাঝে রাতা রবি যেন জ্বলর • নিটোল ললাটে একখানি সোনার ডাগর টিকণির মতো বড় জ্বলর দেখাইতেছিল । আশ্রয়ের শাপিঙলি অন্তরবির লাল আঙনে স্থিলিক হানিতেছিল ;—শ্রুতপাথরের ঘাটের কোণে তরল জলে সোনার আলো চলকিয়া উঠিতে-ছিল, যেন রূপসী তরুণীর পানখাওয়া ঠোটে হাসির ঝলক ।

একখানা টিমলক পিছনে কতকগুলি গাথাখোট বাঁধিয়া হপ হপ করিয়া তরল সোনার ঢেউ ছড়াইয়া, নৌবা নাচাইয়া

চলিয়া গেল। গাথাবোটাগুলি শ্রোতের মুখে গা ভাসান দিয়া নিশ্চিন্তভাবে স্থির হইয়া ছিল, যেন কত গভীর বনিয়াদি ঢাল, বাইবার কিছুমাত্র ক্ষয় নাই; কিন্তু যাত্রা নিকেরা নড়েনা, তাহাদিগকে সংসার নাকে দড়ি বাধিয়া নড়ায়, গাথাবোটাগুলিকে পশ্চাতে বাধিয়া টিমলকথানা ইহাই যেন বলিয়া দিয়া গেল।

আগ্নিস-বাবুদের পালিগুলি দাঁড়ের টানে, ক্রীড়ের জোরে হনহন করিয়া চলিয়াছে, বাবুদের কেহ তামাক খাইতেছে, কেহ সিগারেট ফুঁকিতেছে; একজন লৌশীন বাবু মাথার কৌচানো চাবুর বাধিয়া গলা ছাড়িয়া গান ধরিতেছে—

"এনের অধিক যারে ভালো বাসি।

আমি তারে চোখের-বেগা দেখে আসি।"

মালতীকে পালিতে দেখিয়াই তাহার গানের স্বর সপ্তমে চড়িল। আর-একজন বাবু চীৎকার করিয়া বিপিনের উদ্দেশে ডাকিতে লাগিল—ও ভিনকড়ি, ও হয়েকটে, নবোজ, পকানন, হারাদন,.....কে যাচ্ছ বাবা, লাড়া দাও।—তারপর সে উত্তীর্ণা গানের ভালে বর্ষের তদ্বিধে নাচিতে আরম্ভ করিল।

মালতী পালির জানালায় মুখ দিয়া এই-সব দেখিতেছিল, আর ভাবিতেছিল, পুরুষ-গুলি সব জানোয়ার নাকি? সে যে নারী, এমনত সে মনে মনে আত্মপ্রলাপ অস্থত্ব করিতে লাগিল।

বিপিনের এসব কিছুই দিকে লক্ষ্য ছিল না। একখানা খালি পালি তাহাদেরই পালির পিছে পিছে আসিতেছিল, তাহারই হালি বাড়লের স্বরে গান করিতেছিল—

ওরে দুখহে নাও ডুনাইয়া বাও

"ওরে রসিক নাইয়া!

ওরে ভাঙ্গা নাও যে খাইতে পারে

তারে বলি নাইয়া।

ওরে হালি বেড়না তর করনা

পারবারে খাইতে বাইয়া,

ও তোরা ভাঙ্গা নাও লোণা পানি—

হাইড়া দিচ্ছে খাইয়া।

ওরে পনের ঘাড়ে ক'দি পেতেছে

বাঁধীকরের মাইয়া।

বিপিনের মন এই গানের মিষ্ট স্বরের অন্তরালে রহস্যময় অর্থের মধ্যে একবারে ডুবিয়া গিয়াছিল। তাহার মনের মধ্যে সহস্র ভাবলভ্যাত গল্পাতরঙ্গে পালিখানার মতো তাহার চিত্তকে দোলা দিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন এই গান তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া গাওয়া হইতেছে।

বিপিনের পালি আসিয়া খেতপাথরের ঘাটের উপর জল চলকাইয়া যখন ভিড়িল তখন বিপিনের চৈতন্য হইল। বিপিন ও মালতী নৌকার ঘর হইতে বাহির হইয়াই দেখিল তারক ঘাটের রানার বসিয়া আছে। তারক ও তাহাদিগকে দেখিল। তারককে দেখিয়া বিপিন ও মালতীর মুখ লাল হইয়া উঠিল; তারকও অপ্রতিত হইল। কিন্তু লজ্জার ভাব সামলাইয়া লইয়া তারক দাঁত বাহির করিয়া বলিল—হেঁ হেঁ হেঁ..... বিপিন যে! একেবারে ঝোড়ে। এটা সম্যাদীর আশ্রয়, কলিকুল নয়।

তারক দাঁত বাহির করিয়া রহিল এবং তাহার কুহুরের দাঁতের মতো বড় বড় শালা দাঁতের উপর সূর্য্যের আলো পড়িয়া চিকচিক করিতে লাগিল। তাহার সেই ব্যদমিত্র

অসভ্য ভাব দেখিয়া মালতীর মুখ লাল হইয়া উঠিল; ঘোমটা একটু টানিয়া দিয়া মালতী মুখ নত করিল। বিপিনের ইচ্ছা হইল বাদরটাকে ধরিয়া গম্বীর ভাণ্ডে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়; কিন্তু সে ভাব সমন করিয়া কাঠ হাসি হাসিয়া বলিল—ভয় নেই হে ধর্ম্মধ্বজ! আমরা দুজনইেই সম্যাস গ্রহণ করিতে এসেছি!

ভারক তেমনি ভাবেই দীপ্ত বাহির করিয়া বলিল—ও! সঙ্গীকো ধর্ম্মচরৎ!

মালতীকে লইয়া এই ব্যাপ মালতীর যে প্রতিক্রিয়াকর হইতেছিল না তাহা বিপিন বুঝিতেছিল, কিন্তু সে সম্যাসী, তাহার ত ক্রোধ করিতে নাই, সে জোড় ধর্ম্ম করিয়া এবার একটু গভীরভাবে বলিল—না না, আমরা বিয়ে করিনি, করব না।.....তুমি বলেছিলে আমি সম্যাসী হলে তুমি তার দায়ী।...এস তবে তুমিও, তোমাকেও সম্যাসী হতে হবে।

ভারক মহা বিপদগ্রস্ত হইয়া গভীর হইয়া বলিল—তোমার ভাগ্য ভালো, তাই এত সহজে গুরু কৃপা লাভ করে সংসারের দ্বারা কাটরে উঠতে পেরেছে। আমাদের আর এখানে কিছু হল না।...আমি তোমার নোকাতেই ফিরে যাই, আমার ছোট ছেলেটার আবার ঠাণ্ডা লেগে ব্রনকাইটিস হয়েছে। উহুহ! কি দীর্ঘ পড়েছে এবার।... যাও যাও তোমরা দেরি কোরো না, গুরুজী আবার আরতিতে বসবেন।.....ওরে মাঝি আমার নিরে বাঁধি?...

বিপিন ভারককে আর লক্ষ্য না করিয়া মালতীকে লইয়া আশ্রমের ভিতর চলিয়া

গেল। তারক হাঁক ছাড়িয়া বাটিল, সে ভাবিতে লাগিল—বিপিনটা সত্যি সত্যি সম্যাসী হবে নাকি? এর অদৃষ্ট ভালো দেখছি, আমি এতদিন গুরুদেবের চরণ সেবা করেও তাঁর করুণা পেলাম না, আর বিপিনটা দুদিনেই তাঁর কৃপায় তরে গেল.....যাই, আবার রাত হয়ে যাবে, ঠাণ্ডা লাগবে। এই মাঝি.....

শ্রোমানন্দ সমুখে দুইটা শামাদান আলিয়া একাকী বসিয়া ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। বিপিন ও মালতী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাড়াইল। শ্রোমানন্দ মুখ তুলিয়া চাহিতেই মালতীর সহিত তাঁহার চোখোচোখি হইল। মালতী দেখিল গুরুজীর চোখদুটি অন্তরের একটি উত্তাপময় জ্যোতিতে উজ্জ্বল! তাঁহার দেহ দীর্ঘ কৃশ একগাছি দৃঢ় লাঠির মতো, বেন একটি সতেজ চারাগাছ স্বর্ঘ্যে মাথা ঠেকাইবার অল্প পরম উৎসাহে উর্দ্ধে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, একটি আনন্দের দীপ্তি তাঁহার সর্কাসে ঢলঢলায়মান। গুরুজী দেখিতে আশ্চর্য্য তরুণ ও যুগ্মমার! যুবা বয়সেও শৈশবের অন্নান লাভ্যা তাঁহার মুখত্রীকে ভাগ্য করে নাই। অথচ তাঁহার চতুর্দিকে একটি গাভীর্ণ্য প্রদীপের পাখে রশ্মিছটার জায় বিকীর্ণ হইতেছিল।...এই শ্রোমানন্দ। ইনি গুরু!

আর শ্রোমানন্দ দেখিলেন জোড়া বাতির আলো মালতীর মুখের উপর পড়িয়া তাহাকে একখানি প্রাতিমার মতো দেখাইতেছে। এ কী অপূর্ণ হৃদয় মৃষ্টি! এ যে কল্পনার মতো হৃদয়, মুর্ছার

মতো মনোহর, দীপশিখার মতো উজ্জল, বাসন্তী মঞ্জরীর মতো শুকুমার, প্রজাপতির মতো আনন্দ-চঞ্চল, সৌন্দর্য্য-লক্ষীর চক্রে কাঙ্ক্ষ-মগ্নির অমল মন্দির! ইহাকে কল্পনা করিয়াই বুঝি বৈশ্বকবির লিখিয়াছেন—

“বিজুনি বাটরা কেবা গা-পানি মারিল গো।

জাবে মাখিল দখপানি।

লাগে বাটরা কেবা রস নিভায়েল গো।

অপজপ রূপের বলনি।”

প্রেমামন্দের এই মুহূর্ত্তে মালতী অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল; তাহার কেমন মনে হইতেছিল এ দৃষ্টি যেন শুধু সৌন্দর্য্যমুখের প্রশংসার দৃষ্টি নহ। মালার মধ্যে কাঁটার মতো এ দৃষ্টি মালতীকে পীড়া দিতে লাগিল।

মালতীর সন্ধ্যাচ-কুণ্ডিত ভাষে চেতনা লাভ করিয়া প্রেমামন্দ বিপিনের দিকে ফিরিয়া লিঙ্কাসা করিলেন—ইনিই মালতী ? ...সাক্ষ্যে রাখারানীর মূর্ত্তি। তোমাদের শিষ্যরূপে পেয়ে আমি খুজ হব; তোমাদের সোমের শুল্লিগ যেন আমার প্রাণের বিশ্ব-প্রেমকে আলিয়ে ছায়ে।...এখন চল আরতির সময় হয়েছে। আরতির পরে তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তা হবে। আজ থেকে বিপিন তোমার নাম হল স্বরূপামন্দ, আর মালতীর নাম হল রাখারানী।...

তারপর প্রেমামন্দ উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন—শান্তি! যোগানন্দ।

একটি সন্ন্যাসিনী ও একজন সন্ন্যাসী আদিয়া উপস্থিত হইল। প্রেমামন্দ বলিলেন—শান্তি, ইনি রাখারানী, তোমাদের নূতন ভগিনী; এঁকে নিয়ে যাও। লাইব্রেরীর

পাশের ঘরটিতে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দাওগে।—আর যোগানন্দ, ইনি ত তোমাদের পরিচিতই; কিন্তু আজ আর ইনি বিপিনবাবু নন; আজ থেকে ইনিও তোমাদের স্বকুড়াই, স্বরূপামন্দ!...বাও তোমরা হাতমুখ ধুয়ে শুভি হয়ে ঠাকুরদর্শন করবে এস।

৩৫

মালতী শান্তির সহিত নির্দিষ্ট ঘরে গিয়া দেখিল, ঘরটি গঙ্গার দিকে, ঘরে বসিয়াই গঙ্গা দেখা যায়। তখনও সেই ঘরে অতঃপূর্ব্বের লাগিমা মার্কেল পাথরের বহু মন্দের উপর ধূখে-আলতার মতো টলটল করিতেছিল। তাহার উপরে গা দিতেই মালতীর ভাসি হাসি পাইতে লাগিল,—এই তার বিবাহ! সন্ন্যাসী প্রেমামন্দ তাহার পুরোহিত! বিধবা সন্ন্যাসিনী শান্তি তাহার এহো! আর মরণ-রাগিণীতে অন্তঃস্বর্য্য গেরুয়া রঙের চামর টাঙাইয়া তাহাদের অন্তঃদৃষ্টির আরোজন করিতেছে। ঘরের মহিষের মাখার চেয়েও কালো কালো কাকের দল যেন তাহার বাসরঘরের তোরণমালা রচনা করিয়া উড়িয়া বাইতেছে! বড় বড় ষ্টিমারগুলি ডারিকি গিঙ্গির ছায়া ও ষ্টিমলক-ডলি চট্টল কিশোরীর মতো এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া শাঁখ বাজাইয়া বিয়েবাড়ী মাতাইয়া তুলিতেছে। পরক্ষণে তাহার মনে হইল ইহা তাহার সকল সাধের গঙ্গা বাতায় ঘর—এইখানে তাহাদিগকে ভীত্ব করা হইয়াছে!

তাহার চিত্তের বাধা দিয়া শান্তি প্রাণবলস

দীর কণ্ঠে বলিল—আপনি বহুদূর, আমি আলো এনে দি।

মালতী বলিল—আলোর কি দরকার দিদি, এগনি ত ঐকুৎসর্পন করতে যেতে হবে।...আমি কি এ ঘরে একলাই থাকব ?

মালতী দেখিল শান্তির বয়স পরিত্রিশ, মাঝারি আকারের চেহারাটি; তাহার মধ্যে কোথাও কোনো চকলতা নাই; মূলখানি কি এক গভীর বেদনার দ্বান, কণ্ঠে বিবর ধীর। শান্তি বলিল—এখানে একলা থাকাই নিরম।

—আপনি কোন্‌ ঘরে থাকেন ?

—আমি আপনার পাসের ঘরেই থাকি।

—আর কজন সন্ন্যাসিনী আছেন ?

—সম্প্রতি আমরা চারজন ছিলাম, আপনি আসাতে পাঁচজন হলো। কখনো কখনো সংখ্যা বাড়ি কমে; যেখানে সেবার দরকার হয় আমাদের যেতে হয়।

—আপনি এখানে কতদিন আছেন ?

—প্রায় ছব্বৎসর হবে।

—কিছু মনে না করেন ত আর-একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।...আপনি এই পথ কেন গ্রহণ করেছেন ?

শান্তির চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সে বলিল—আমি বড় দুঃখিনী; ঋকে নৌকোডুবি হয়ে একদিনে স্বামী পুত্র সর্বস্ব হারিয়েছি; অভাগিনীকে গুরুদেব জলথেকে তুলে চরণে ঠাই দিয়েছেন; এখন রাধাকান্তই আমার স্বামীপুত্র সব।

গুরুদেব বলেছেন যেদিন আমি মেথরের ছেলেকেও বৃকে তুলে নিতে পারব, মনে একটুও বেদনা হবে না, সেদিন আমি আমার হারানো ছেলে কিয়ে পাব। তা কি আমি পারব বোন !

মালতী চোখ মুছিয়া বলিল—দিদি, আমি আপনার ছোট বোন, না কেনে কষ্ট দিলাম। আমিও বড় দুঃখী। আমাকে ত আপনি জিজ্ঞাসা করেন না, আমি কি দুঃখে এসেছি।

শান্তিও চোখ মুছিয়া বলিল—আমাদের জিজ্ঞাসা করতে নেই। সন্ন্যাসিনীর আবার কৌতুহল কি। জানি তোমারও দুঃখ আছে, আর সে দুঃখ গভীর দুঃখ। দুঃখ না পেলে ত কেউ বোন ভগবানের দিকে মুখ ফেরাতে চায় না। সব দিগে তবু তাঁকে পেতে হয়, সে যে অদৃশ্য ধন, তাকে কি বে-সে মূল্যে কেনা যায় ?

মালতী শান্তির কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিল—আপনি কি মনে করেন যে সন্ন্যাসী না হলে ভগবানকে পাবার আশা নেই !

—না, সন্ন্যাসী না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না। সে সন্ন্যাসী শুধু গেকরা কাপড় পরলেই হয় না, সংসার ছাড়লেও হয় না, সংসারে নির্গম্য মনকে বৈরাগ্যের গেকরা রঙে রঙিয়ে যে তুলতে পারে সেই সন্ন্যাসী। গীতার ভগবান সন্ন্যাসের লক্ষণ নির্দেশ করে বলেছেন—

কামান্যং কৰ্মণ্যং ভ্রাসং সন্ন্যাসং কথয়ো বিদুঃ
সৰ্জকস্কলভ্যাগং প্রাহন্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥

শান্তির মুখে বিতক্ত স্পষ্ট সংকৃত ভূমি

সম্মুখীন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া
মাণ্ডী লিখিয়া করিল—গুরুদ্বীর মত কি
এই ?

—আমরা মূর্খ মেয়েমানুষ, আমরা বঁতরা
মতামত কোণায় পাব। আমরা গুরুদ্বীরই
প্রতিশ্রুতি মাজ।

—তবে গুরুদ্বীর সংসার ছেড়ে বাইরে
এলেছেন কেন ?

—যেমন চোখের অতি কাছে জিনিস
রেখে দেখা যায় না, খানিক দূরে ধরে দেখতে
হয়, তেমনি সংসারকে বুঝতে হলে, ভালো
বাসতে হলে নির্দিষ্ট হয়ে বাইরে এসে
দাঁড়াতে হয়। গুরুদ্বীর বলেন তিনি যোগ
সংসারী ; বাস্তবিক তাঁর বিশ্বজোড়া প্রকৃত
সংসার। সংসারী লোক নিজের গুটিকতক
ছেলেমেয়ে ছাড়া-পরিবার নিয়ে ব্যতীত
থাকে, আর গুরুদ্বীর সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে
চিহ্নিত। যেখানে পীড়িত ক্ষুধিত বিপন্ন
সেখানে গুরুদ্বীর ব্যথিত চিত্ত বৃক্ষ দিয়ে
গিয়ে পড়ে।

—সে-সব সেবা ত আপনারা করেন,
গুরুদ্বীর তাতে লাজহী কি ?

—সমস্ত বাহাদুরীই তাঁর। হাতপা-
গুলো কাজ করে আর অদৃষ্ট মস্তিষ্ক
নিশ্চিন্ত থাকে একথা বলাও বা, আর
গুরুদ্বীর নিশ্চেষ্ট, আমরাই কাজ করি,
একথা বলাও তাই।

—আপনাদের কি কি করতে হয় ?

—পালা করে ঠাকুরের সেবা, পুস্তক-
আশ্রমের সেবা, ছুঃখীদের সেবা করতে
হয় ; গ্রামের ঘরে ঘরে গিয়ে অক্ষয় গৃহ-
দের ছেলেমেয়েদের, বৌদ্ধদের পড়াতে

হয়...সকাল সন্ধ্যায় আমাদেয়ও
করতে হয়।

—আপনারা নিজেরাই পড়েন, না কেউ
পড়ান ?

—নিজেরাও পড়ি, কখনো কখনো
গুরুদ্বীর পড়ান, কোনো বিষয় নিয়ে
উপস্থিত থাকলে তিনিও পড়ান।

—কি বই পড়েন ?

—সব বই, কোনো বাছবিচার নেই।
সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস ; বাংলা
ইংরেজি সংস্কৃত ফার্সি ; ধার-বা খুদি আর
যে যা পারে, সে তাই পড়তে পারে।

ইহা শুনিয়া মাণ্ডী সমস্ত হঠাৎ
লিখিয়া করিল—এখানে কি অনেক বই
আছে ?

—অনেক। এই গাশের ঘরেই পাঠাগার।

—এখানে পুস্তক কতজন আছে ?

—এগুন মাত্র তিনজন আছে।

সকলে প্রচার ও সেবা করতে গেরিয়েছেন।

—আর-একটা কথা আপনাকে লিখা
করব, কিছু মনে করবেন না।.....গ্রী-
পুস্তকে একত্র একবারেই থাকার ব্যবস্থা,
এটা.....

শান্তি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া
তেমনি শান্তভাবে বলিল—বিপদের আশঙ্কা
যে নেই তা নয়, কিন্তু কখনো কিছু
অভাব ত ঘটেনি। সকলেই গৃহ গভীর
একটা বেদনা নিয়েই এখানে আসে, তার-
পর গুরুদ্বীর উপদেশ যেনে আর নিঃস-
থেকে সকলেই বেশ সখ্যত হয়ে ধার।

মাণ্ডী কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—কিন্তু
স্বতন্ত্র কি একেবারে অতিক্রম করা যায় ?

শান্তি বলিল—আমি না। যার • কিনা।
কিন্তু গুরুজী বলেন যার। যোগের ধারা
আত্মশাসন সহজ হয়।

যোগের দোহাই এর পর আর কথা
চলিল না। একটা সন্দেশকে আর-একটা না-
কানা বিষয় দিয়া চাপা দেওয়া বড় সহজ।
মালতী নিরুত্তর চাইয়া চিন্তা করিতে
লাগিল। শান্তি বলিল—চলুন, আরতির
সময় হয়েছে।

তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া শুচি হইয়া
মাণ্ডী বসন, ঠাকুরঘরে গেল তখনই
আরতি সমাপ্ত হইল। শুক তখন কীর্তন
গান আরম্ভ করিলেন,

বনচঞ্চল কোন কৃষ্যারে কুলিল গো,

কে না কুলিলে ছই আমি।

বেধিতে বেধিতে মোর পরাণ যেমন করে

সেইসে পরাণ তার সাধি।

* * *

রতন কড়িয়া কেবা বহন করিয়া গো।

কে না বড়াইয়া দিল কামে।

মনের সহিতে মোর এ পাঁচ পরাণ গো

যোগী হইল ওয়ারি দেখানে।

* * *

কহন্তর কর যিনি বড়ের বলনি গো

হিজুলে মর্দিত তার আগে।

দেবন-বনের পাখি পিড়াসে বরষে গো

উদারি পরশ-রস মাগে।”

মালতীর এ গান শুকজীর মুখে ভালো
লাগিল না। তাহার মনে কেবলি প্রশ্ন
উঠিতে লাগিল—এ কি ধর্মসঙ্গীত ?

৩৬

গান সমাপ্ত করিয়া প্রেমানন্দ আপনার
বক্ষে অঙ্গিয়া বসিলেন; সমস্ত দ্বিধা

শিথারাত্ত অঙ্গিয়া প্রণাম করিয়া বসিল।
প্রেমানন্দ মালতীকে বলিলেন—কেমন
রাধারাগী, তোমার এই নৃতন জীবনের
আরম্ভ কেমন লাগছে ? সাধন করতে করতে
বেধবে যে ভ্যাগে নির্মল শান্তি, ভ্যাগে
উল্লাস মাত্র। ব্রহ্মচর্যই মাহুঘের একমাত্র
ধর্ম; সেই ধর্ম মিষ্টার সহিত পাশন করতে
পারলে জীবাত্ম পরমাচার মিলন হয়;
সেই যে বিবাহ, তার আনন্দের গীতা নাই।
জীবাত্ম পত্নী, পরমাচার স্বামী; তিনি ত্রীকৃষ্ণ,
আমরা গোপী; ‘এই পরমসত্য অন্তরে
পরিচ্ছূট হলেই মাহুঘের সকল দুর্গতি দূর
হয়। এই পথ নিত্যস্থ দুর্গম বা আনন্দ-
হীনও নয়; একটু চেষ্টা করে একবার
অস্তরকে অন্তরের সুরে মিলিয়ে যদি বিতে
পার তাহলে বেধতে পারবে যে এ জীবন
ভানলয়যুক্ত একটি সঙ্গীত,—একদিকে যেমন
নিজে স্বতন্ত্র আর-একদিকে বিধের একতান
সঙ্গীতের সঙ্গে মিল গেঁথে চলেছে। যদি
তুমি শুধু তোমার নিজের সুরটিই বাগাও তবে
তাতে করে একটি পরিপূর্ণ সঙ্গীত হবে না;
তোমাদের প্রাণেব মধ্যে যে ভালোবাসার
সুর বেজেছে, তাকে রাসিগীতে ধারিয়ে
তুলতে হলে বিধের অপরা সুরের সঙ্গে
অনুকূলভাবে মিলিয়ে তুলতে হবে। যেমন ?
কথটা ঠিক বুঝতে পারছ ত ?

মালতী আবারের পর আবার পাইয়া
পাঠিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; সবশেষে বসন
তাহার সৌভাগ্যভাগিনী সাতবারের অল
খাইয়া, ঝড় তুফান কাটাইয়া বন্ধবে ভিড়িতে
বাইতেছিল, ঠিক সেই সময় এই একটা
কোথাকার কে সন্ন্যাসী শুণ্ড শৈলশূন্যের

মতো, চোরা বাণির মতো, অকস্মৎ ক্রহক
বিস্তার করিরা তাহা নানচাল করিরা দিগাচ্চে,
হরত বা ঘাটে আসিরা ভরাডুপি হইবে;
একজ্ঞ মালতীর মন প্রেমাম্বলের. ঐতি
বিশেষ প্রসন্ন ছিল না। সে প্রেমাম্বলের
এমের উত্তরে নিত্য সুখরার মতো বলিল
—আমি আপনার শিষ্য। হবার যোগ্য
নই, ওসব কথা আমি বুঝতে পারছি না।
আমি সুখ মেরেমাছুব, আশা প্রগল্ভতা
দাঁপ করবেন। আমার মনে হয় যে বিশ্ব-
প্রেমের একতান সঙ্গীতে যোগ দেবার আগে
নিজের ক্ষমতাকে ভালো করে ঠিক হুরে
বোধে নিতে হবে; তা যদি না হয়, তবে
ত বেহুয়ো যোগ দিবে সমস্ত সঙ্গীতকেই
নষ্ট পণ্ড করে ফেলা হবে। আমরা কোনো
জিনিষকে ত ভালো বলেই ভালো বলিনে,
ভালো বাসি বলেই ভালো বলি; মাহুকে
যদি আগে ভালোবাসি তবেই সে আমার
চোখে সুন্দর হয়ে দেখা দেবে, তার সকল
জটিল মার্জনা করা প্রেমেরই সহজ হয়ে উঠবে।

প্রেমানন্দ মালতীর নিঃসঙ্কোচ কথা
অনিয়া বুদী হইয়া বলিলেন—ভাই ত। সেই
কথাই ত আমিও বলছি। সংসারমাখার
ঘরা আপনার ক্ষমতাকে বোধে তুলতে
পারলেই বিশ্বসঙ্গীতে সে ক্ষম আর বেহুয়ো
বাক্যে না; তখন সকলকেই বেশ ভালো
লাগবে।

মালতী বলিল—সেই ভালো লাগা কি
সম্যাপ ছাড়া হয় না? মাহু যখন এক-
জনকে ভালোবাসতে শেখে তখনই যে তাই
কাজে সমস্ত অগৎ মধুময় হয়ে ওঠে।

প্রেমানন্দ হাসিরা বলিলেন,—মাধাধাণী,

তুমি সন্তোষ আর প্রেমকে এক করে তুল
করছ। আমি ত তোমাদের মিলনকে বাংলা
দিক্খি না, তোমাদের সন্তোষের লাগনাকে
দমন তবে আধ্যাত্মিক মিলনে যোগযুক্ত
হতে বলছি।

—ভগবানকে ভালোবেসে মাহুকে
ভালোবাসা সহজ না, মাহুকে ভালোবেসে
ভগবানকে ভালোবাসা সহজ?

—হুটই সমান। এক অপরের নামাঙ্কর।
যত কীৰ্ত্তন শিব। কিন্তু ভাই বলে
একটিকে বুকের কাছে আঁকড়ে বলে থাকা
মোহনত, তাতে হবে ভগবানকে পাওয়া
যায় না।

—তা হলে কি সংসারার্থ্য পালন করা
অপকর্ষ? সংসায়ে থেকে তাহলে ভগবানকে
পাওয়া যায় না?

—যার না, এমন কথা বলা যায় না;
তাকে পাওয়া বড় কঠিন, ধারা নিম্প্রহ উদাসীন
অথচ ভগবদর্পিতপ্রাণ সংসারী, তার পথে
পারেন। কিন্তু সে রকম ব্যক্তি দুর্লভ।
জলে ডুবে অথচ গায়ে জল লাগবে না,
এমন কৌশল সকলে অবলম্বন করতে পারে
না; যেমন লোক কোটিকে শুটক বেলে।

—তা হলে আপনি কি বলতে চান যে
ভগবান লোকগুলোকে ভোগাবার জন্তেই
ভবসংসারে পাঠিয়ে আপনি এড়িয়ে এড়িয়ে
পেড়াচ্ছেন? সংসার ত্যাগ না করলে
তাকে পাবার জো নেই বলছেন। তাকে
পাওয়াই যখন মাহুদের জীবনের প্রধান
লক্ষ্য তখন সকলেরই সংসার ত্যাগ করে
বনে বাওয়া উচিত। সংসায়ে নষ্ট করবার
জন্তেই কি তবে ভগবানের সংসার সৃষ্টি?

শ্রোমানন্দ হাসিয়া বলিলেন—“সংসার”
 যদি জীবের পরিণতির অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির
 Stage of Development হয় তা হলে
 ব্রহ্মপ্রাপ্তি হলে সংসার ত নষ্ট হইবে।
 সে হিসাবে সংসার নষ্ট করার জন্যই
 সংসারের সৃষ্টি বলতে পার। তা ছাড়া
 জীবনের উন্নততম আদর্শ মাত্রাই সংসার
 নষ্ট করার অসম্ভব। বুদ্ধ খ্রীষ্ট ও ভক্তির
 আদর্শ ত অসুসঙ্গত, কিন্তু সকলেই যদি
 সে আদর্শে চলে তবে সংসার নষ্ট হইতে
 একটি দিনও লাগে না। কিন্তু সে ভয়
 ভোমার করতে হবে না, সবাই বনে গেলে
 বনই আবার সংসার হয়ে উঠবে। সংসার
 ঠিক চলবে, সংসার যে মানুষের কল্লোল-
 চোপের ক্ষেত্র! আমরা সংসার ছেড়ে
 এসেছি বলেই যে সংসারকে এড়িয়ে বাণ
 তার ত বো মেই, কর্ম ত আমাদের
 করতে হবে, এবং সেই কর্মই আমাদের
 অনেকে সংসারে টেনে নিয়ে যাবে।
 সংসারে বৈরাগ্য ত আর পূর্ণ সোভাগ্য
 নয়, আংশিক; ভগবানকে বহন না পাপ
 ততক্ষণ ত আর পূর্ণ নিকৃতি নেই। সেই
 অংশকেই পূর্ণ করে তোলবার চেষ্টা করতে
 হবে। ভগবান যখন তোমাদের ডেকে
 নিতে চাচ্ছেন, তখন কি তোমাদের উচিত
 হবে বিমুখ হয়ে বেকে বসে থাকা।

মালতী তর্ক হইতে নিরস্ত হইল। তখন
 শ্রোমানন্দ সাংখ্য নীমাংসা বেদান্ত প্রভৃতি

দর্শনের মত আলোচনা করিয়া এমন একটা
 প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যের খিচুড়ি তৈরি করিলেন
 যে তাহা মালতীর পক্ষে অত্যন্ত গুরুপাক।
 নিম্নলিখিত চিরকাল কাণের সেবা করিয়া
 আসিয়াছে, দর্শনের দর্শন তার ভাগ্য ঘটে
 নাই, এবং দর্শন তাহার কাছে স্বদর্শন
 চক্রে তার নামে চমৎকার হইলেও বাস্তবিক
 বড় ভয়ুণ বেধে হইত। সে গুরুজীকে
 পাণ্ডিত্যের ভেঁজি খেলাইয়া মালতীর বাক্য
 রোধ করিতে সক্ষম দেখিয়া মনে মনে
 তারি সন্তুষ্ট হইল। গুরুজীর প্রতি ভক্তি
 তাহার বিস্মারিত চোখ দিয়া ঠিকরিয়া
 পড়িতে লাগিল।

গুরুজীর বাক্য তাহার নিকট বড়ই
 প্রকোপ ঠেকিতেছিল, তাহার ততই মনে
 হইতেছিল এ সব মুক্তি একেবারে অকাটা।
 মালতী নিশ্চয় গুরুজীর পাণ্ডিত্যের কাছে
 পরাজিত হইয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

গুরুজী বক্তৃতা করিয়া মালতীর স্রুথ
 বদ্ধ করিলেন বটে, কিন্তু তাহার প্রতি
 সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে তাহার প্রশংসা করিতে
 লাগিলেন। তাহার সহিত এমন করিয়া
 কেহ কথা না তর্ক কবে নাই; যে কেহ
 তাহার নিকট হইয়াছে সেই তাহার প্রতিবে
 মুগ্ধ হইয়া বিনীত শিষ্যের দলে ভিড়িয়া
 গিয়াছে। কিন্তু মালতী সম্পূর্ণ বৃত্ত-ধরনের
 লোক। শ্রোমানন্দের মনের কাছে মালতী
 খুব বড় স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

চাক বন্দোপাধার।

টম্বন ছোটগল্প

একালের সামরিক পত্রগুলি যেন ডোট গল্পের কল্পতরু। এটা চোখে ছোটগল্পের যুগ,—যদিও এ যুগের ছোটগল্পগুলি গুণতঃ যেমন, গুণে তেমন নয়।

এ বছরে যতগুলি ভাল গল্প বাহির হইয়াছে, একজন বিখ্যাত লেখক তাহার একটা হিসাব দিয়াছেন। এই হিসাবে একশটি গল্প নির্ধারিত হইয়াছে। গল্প-গুলির অধিকাংশই চরিত্রের গল্প। নিরাকৃত হলেন, ঘটনার গল্প অর্থাৎ চরিত্রের গল্পট সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ।

“কথাসাহিত্যে চরিত্র-চিত্রণ বড়? না, ঘটনা-সংস্থান বড়?” একজন লেখক এই সমস্তার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, “ছোটগল্পে স্নোবিত্তান বা চরিত্রচিত্র দ্বারা মোহন ও নিষ্ঠুরত্বপূর্ণ ফুটরা উঠুক না কেন,—গুপ্তবহুত, অনিশ্চয়তা ও ঘটনা-বিচিত্র কাহিনীই পাঠককে বেশী আকর্ষণ করে। বাধা-গত ধরিয়া ছোটগল্প লেখা চাই। একজন সুপুত্র কোন-একটা বাড়ী তৈয়ারি করিবার আগে, যেমন নড়া প্রস্তুত করেন, একজন পটুয়া যেমন ছবি তৈরি করিবার আগে মূল বিষয়টি আঁকিয়া নেন, ছোটগল্প লিখিবার আগেও লেখককে তেমন আখ্যানবস্তুর একটা মুসাবিদা করিয়া লইতে হয়। আগাগোড়া না ভাবিয়া-চিন্তিয়া লিখিতে বলা মারাত্মক ব্যাপার। বৈদম্বিন

জীবনে যে-রকম বাস্তবিক ঘটনা ঘটে, গল্প-বর্ণিত ঘটনাও ঠিক তেমনই হওয়া চাই। কল্পিত ঘটনা ছোটগল্পে একেবারেই অচল। গল্পলেখকের আখ্যানবস্তুর কল্পিত হইলে ক্ষতি নাই। কিন্তু ঘটনাগুলি বাস্তবিক হওয়া দরকার। তুমি নিজের ব্যক্তিগত খেয়ালমত যেমন খুসী তেমন আদর্শের বাড়ী তৈয়ারি করিতে পার 'যে, কিন্তু তৈয়ারী করিবার মূলমন্ত্রগুলি সত্যিকার হওয়া চাই। তেমনকে পাহাড় হইতে পাথর আনিতে হইবে, মাঠ হইতে মাটি আনিতে হইবে, বন হইতে কাঠ আনিতে হইবে।

আখ্যান-বস্তুর আপনাতঃ-আপনি সম্পূর্ণ হওয়া আবশ্যক;—এটি একটি প্রধান কথা। কোন ঘটনার সমস্তা যেন বাস্তবিক দরকার না হয়, আপনাতঃ উদ্বেগ তাহার। যেন আপনাবাই বুঝাইয়া দিতে পারে। কল টিশিয়া দিগেই সে যেমন আপনীর কাজ আপনি সারিয়া যায়, আখ্যান-বস্তুরও ঠিক তেমন করিয়া গড়িতে হইবে। ভাল মট তাহাকেট বলা যায়, বাহার ভিতরে একটোমাত্র সর্কার-সম্পূর্ণ মূল ঘটনা আছে। এই মূল ঘটনাটাই কতকগুলি বাস্তবিক ও নিরনিত কুস কুস ঘটনার স্রব্ধ সমাহারে ক্রমে ক্রমে পুরত হইয়া উঠিলে। প্রতি ঘটনাটির সহিত পূর্ববর্তী ঘটনার একটানা শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া



উপসংহারকালে আকস্মিকভাবে মীমাংসার আনিয়া দিতে হইবে। এই মীমাংসা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া চাই; কারণ গল্পের কথা শেষ হইয়া গেলে শর, পাঠকের মন তার ব্যাখ্যামের ক্ষুদ্র আর অপেক্ষা করিবে না। আখ্যানগল্পের জটিলতা আর হুঁচকার কথায় পরিহার করিয়া দিতে হইবে।”

আর একজন লেখক লিখেছেন :—
“যতটুকু ঘটনা সমাবেশে গল্প একঘেয়ে হইতে পারে না, ততটুকু ঘটনা সমাবেশই ভাল—তার বেড়া নয়; ঘটনার পর ঘটনার পাঠকের নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দিবার ক্ষমতা ছোটগল্পে ঘটনা সমাবেশ করা হয় না। আখ্যানবস্তুর পরিণামের অনিশ্চয়তা ও অন্তিমত্ব আমি ততটুকু চাই, যতটুকুতে গল্পের পাত্রসাজোগণের অদৃষ্টমুখে

পাঠকদের উৎসব ঘরে ঘরে ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে পারিবে। আসল কথা, গল্পে নারক-নারিকারা কি করিতেছে বা কি করিবে আমি তাহা জানিতে চাহি না; আমি জানিতে চাহি নারক-নারিকাদের চরিত্রের গুণ্ডি।”

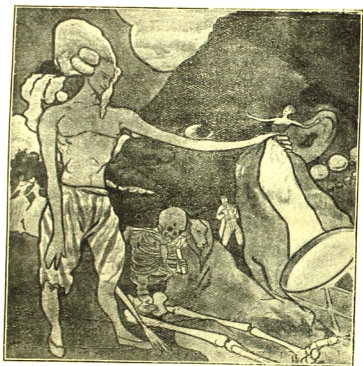
উপরে যে দুটি মত দেওয়া গেল, তাহা পড়িলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে, একজনের মতে ছোটগল্প ঘটনাবল্ল হওয়া দরকার—যেহেতু আখ্যানগল্প চিত্তাকর্ষক না হইলে ছোটগল্প পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে পারে না। আর একজনের মতে ঘটনাবল্লতা ছেলে ভুলাইবার ক্ষমতা। অতএব, কাগজখানা চরিত্র বুঝাইবার চেষ্টা না করিয়া, চরিত্রের আসল রূপ ফুটাইয়া চরিত্র বিশিষ্ট করাই শক্তিধরের কার্য।

—The Book News Monthly হইতে।

নব কলাবিদ

বর্তমান যুগে, পৃথিবীর সকল বিষয়ের সকল বিভাগেই পুরানো বাধা-গতকে পারে দলিয়া অগ্রাহ্য করা হইতেছে। পুরাতনের আকার, পুরাতনের কল্পনা এবং পুরাতনের রীতি পদ্ধতিগুলি, আরও উজ্জ্বল আরও দামবীর ও আরও সতেজ আকার, সহৎ কল্পনা ও সুন্দর রীতি-পদ্ধতির কাছে আমোল মা পাইয়া আপনা-আপনিই সরিয়া পড়িতেছে। ললিত কলাতে আদ্যকাল তাই চারিদিকেই প্রাচীনের পতন এবং নবীনের উত্থান দেখিতে পাইতেছি। অক্ষরগণের একঘেয়ে

সৌন্দর্যকে ছাড়িয়া মাহুকের চিত্র এখন যুগের জীবনের বিশাল পরিধিকে এবং সর্ববিষয়ের মূলীভূত কারণকে ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে চাহে। এতুগে বাহ্যিকের নুতন ভাব ও কল্পনা আছে বিস্তরমালা তাহাদেরই কণ্ঠে পড়িবে। এই নুতনত্বের মধ্যে পড়িয়া অনেকে অনেক একেজো এবং উদ্ভট কল্পনাকে আকার দিয়াছেন;—যেমন, এক জাপানী শিল্পী প্রকৃতির সব জিনিষকে “ঘনক্ষেত্রের” (cube) আকারে দেখিতে ও দেখাইতে চান।



ॐ नमः

কিন্তু, এ-সব ক্যাপাদিস কথা ভাঙিয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাউ, যুগেত এমন সকল উদ্ভাব-শিল্পী আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, যাহাদিগকে লইয়া নিয়োহী নবোন্মের দল যথার্থ গর্ভপ্রকাশ করিতে পারেন।

কিছুদিন আগে মিস্ ফিলিস শিল্পীর ক্যাম্পবেল নামে এক মহিলা-শিল্পীর আঁকা কয়েকখানি ছবি বিলাতের 'হাননিশেষে' প্রদর্শিত হয়। ফলে, প্রদর্শনীর প্রথম দিনসেই চিত্রকারিত্বীর নাম বিলাতের শিল্প-সমাজে বিখ্যাত হইয়া পড়ে।

চিত্রাংকিত এই সকল 'ট্রাজেডী'র দিকে চাহিয়া দেখিলে মহাকবি দান্তেকে মনে পড়িয়া যায়। জীবন ও মরণের গভীর অজানা বিষয় রহস্য লইয়া এই শক্তি-শালিনী মহিলা, তাহার কল্পনাকে বেরূপ অবলীলাক্রমে নীলম্বিত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের প্রাণ-বীণায় ত্রীভূলি সাড়া না দিয়া থাকিতে পারে না। নিটশে, ইংলেন্ড ও পো প্রভৃতির মত ঐতিহ্যের অধিকারী না হইলে মাহুয়ের চিত্তবৃত্তিকে এমনভাবে অভিজুত করা এত শক্ত কথা।

ক্যাম্পবেলের চিত্রগুলি চিত্রাঙ্কক। অথচ, শিল্পীর কল্পনা-নীলার ভিতরে কিছু-মাত্র জটিলতা নাই—তিনি বাহ্য বলিতে চান, পরিষ্কার দিনের আলোর মত সবাই তাহা বুঝিতে পারে। যাহারা ঐক্যবান্যার দেয়াল সাজাইবার ক্ষমতা বাহারে তস্মির কিনিতে বাহির হন, তাহারা অবশ্য এই ছবিগুলিকে একেরায়েই অপছন্দ করিবেন; কিন্তু যাহারা গট বলিতে রঙচঙে খেলনাযাত্র

বুঝেন না, তাহারা এই নক্সাগুলির ভিতরে তুলির টানে টানে একএকটি নূতন ও গভীর অর্থের সন্ধান পাইবেন।

প্রথম ছবিখানির নাম, "অনন্তের পথে।"—জীবন হটেতে পরলোকের দ্বৈততার মধ্যে গুল আত্ম নিরাস্পেদ যাত্রা করিয়াছে। উষ্ট্র তাহাদের বাহন; তাহা সত্যের চিহ্ন প্রাপক। মীমার নাগপাশ ভাঙাইয়া এই দুই গোঁমক-গোঁমিকা অসীম অনন্তের ভিতরে ফাঁপ দিয়া পড়িয়াছে। দৃষ্টমান বিশাল খুজের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহারা ললক হইয়া উঠিয়াছে। ধ্বংসের সম্মুখে পড়িলেও গ্রেম যে আত্মমহিমায় আপনি-অটল থাকে, এই ছবিখানি তাহাই প্রকাশ করিতেছে।

দ্বিতীয় চিত্র—"ক্রীড়ক,"—জীবন একটা মিছা ক্রীড়াময় ও খেলা খেলনা মাত্র; পরিত্যক্তপ্রমাণ কাফির মস্তক জীবনের মূল্য ও অজ্ঞানতাকে দেখাইতেছে। খেলোয়াড় তাহার পুতুলটিকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতেছে, তাহার কোথাও কোন পুং আছে কিনা! অজ্ঞান মূর্খির মধ্যে প্রবীণরক্তে বলিয়া যুতা তাহার শূন্য করেটির ভিতরে লুপ্ত দৃষ্টিকে অন্বেষণ করিতেছে। আমরা যাহাকে অদ্বিত্য বলি, "ক্রীড়ক" তাহাই স্মৃতিত।

তৃতীয় চিত্র,—"বাহুরকর।"—চীনা বাহুরকরটি মগ্ন পড়িয়া দেখিয়া এমন এক দানবের সৃষ্টি করিয়াছে, জগদ্বাই যে তাহার বদমাঁতাকেই ফলার করিতে উত্তত হইয়াছে। আমরা সাধিয়া আপন অমঙ্গলকে আপনি ডাকিয়া আনিয়া আত্মাহুতি দি,—এই চিত্রে তাহাই স্মৃতিত হইতেছে।

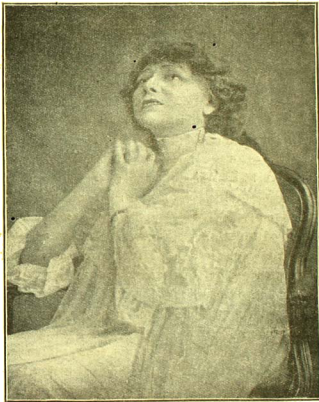


সৌন্দর্য-চর্চা *

কপের যতই কদর থাকে,—মাত্রের কাছে কপের কদর অস্তরের গুণকেও মলিন করিয়া দেয়। সৌন্দর্য-চর্চা মূলতঃ মনো-মূলক সমাজেই আছে। তবে, জীবন-সংগ্রামের ধাক্কাটা পুরুষদিগকে বেশীমাত্রায় সামলাইতে হয় বলিয়া, কপের দিকে তাহাদের মনর তট্টা নাই, পুরুষের মনর বাহর ছায়াশ্রিত রমণীদের যতটুকু আছে।

যুগোপের অভিনেত্রী-সমাজে আবার এই রূপচর্চা চরম সীমায় পিঠা উঠিয়াছে। অরূপ নট যত নীচ দর্শকের মনকে ময়-পড়া সাপের মত বশ করিতে পারে, কুরুপ তেমন পারে না। রূপাহীনোলের দিকে নটসমাজের দৃষ্টি ততই এত মতর্ক।

যুগোপে এই কপের অহু-ইলন বহুদূরের অভিজ্ঞতাও গ্রাস পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে



অভিনেত্রী-সমাজের সারা বার্ষিক

দে, যৌবন-বসন্তের মধুপুষ্প বার্ককোর
কঠোর শীতেও তুলুত। হঠাতে সহজে
খসিয়া পড়িতে পারে না। প্রাচ্যের বৈষ্ণব-
কবি গারিরাছেন, “জোমারের পানী নারীর
যৌবন—” প্রতীচ্য এ কথাই কিছুতেই
কাণ পাতিবে না।

ইতিহাসে যে-সকল রমণীর রূপ,
উপভাসের সৃষ্টি করিয়াছে, সৌন্দর্য্যচর্চার
দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি যে যথেষ্ট প্রাণের ছিল,
তাঁহার অনেক প্রমাণ আছে। ক্রিওপেট্রা,
লুক্রেশিয়া বার্গিরা, রোসামন্ড, ও মেরী,
কুইন-অফ-স্কটল প্রভৃতি রমণীরা কতদূর
আগে সাহসের নমের উপরে রূপের যে
রেখাপাত করিয়া গিয়াছেন, কালের
নির্ধম কর আজিও তাহা মুছিয়া দিতে
পারে নাট। রত্নপচিত কাচ-পাত্রে ক্রিওপেট্রা
নানাবিধ স্নগন্ধ তৈল ও এলেনাদি মিশ্রিয়া
দিতেন। লুক্রেশিয়া নানা ফলের নির্যাস
ব্যবহার করিতেন। একজন ইতালীয়
ডাক্তারের পরামর্শে মেরী ঠোরাট বিবিধ
দ্রব্যের সাহায্যে লইয়া আপন রূপের প্রদীপ
উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেন।

সভ্যদেশের মধ্যে একালে ফ্রান্সে বড়টা
রূপচর্চা হয়, ততটা আর কোথাও নয়।
জরার কবল হঠাতে দেহলাভ্যাকে
বাচাইয়া রাখিতে ফরাসীরা সকল জাতির
চেয়ে বেশী ওস্তাদ। ফ্রান্সে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও
চর্মবিজ্ঞানের (Dermatology) বিশেষজ্ঞগণ
প্রজাতির দেহে চপল রূপকে বন্দী করিবার
অল্প নানারূপ কৌশল পাতিবার কন্দি
করিতেছেন।

দেশভেদে রূপ-রক্ষার উপায়ও বিবিধ।

ইংরাজ রমণীরা প্রধানত মুক্ত বায়ুতে
স্নান ও ক্রীড়া করিয়া বেশী ফল পান।
সুইডেনের রমণীরা প্রধানত বাতাসে
মর্দন ও জিম্‌নাস্টিক করিয়া দেহকে স্বাস্থ্য-
সবল রাখেন। কিন্তু স্নগন্ধ তৈল ও
বিবিধ দ্রব্যাদির উপরেই ফরাসী মহিলাদের
বিশ্বাস ও যৌক বেশী। তবে, রূপকে
স্থায়ী করিতে হইতে হইলে সকলকেই
নিয়মিত স্নান, স্নান্যাম ও পখ্যাদির ব্যবস্থা
করিতে হয়।

রূপচর্চার জীবন্ত নিদর্শন চিত্র-যৌবনা
সারা বার্গহাউট। সারার বিখ্যাত পারি-
বারিক ডাক্তার কাইজারেটো বলেন,
প্রতিদিন নিয়মিত সৌন্দর্য্যচর্চা ও কর্ম্মের
জীবন-গাপন করিয়াছেন বলিয়াই সারা
বার্গহাউটের কাছ হইতে যৌবন-রূপ আজিও
বিদায় মানিতে পারে নাই।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবরে
পৃথিবীর এই সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী জন্মগ্রহণ
করেন। সারার বয়স এখন একাত্তর
বৎসর। কিন্তু এই বয়সেও তাঁহার মুখ,
চোখ, দেহ ও গতি সুতীক্ষ্ণ মত সবল ও
সতেজ। তাঁহার মাথার চুল পাকিয়া
গেলেও দেহের কোথাও বার্ককোর কুকন-
রেখা গড়ে নাই। তাঁহার পুর এখনও
কিছুমান কৌণ ও বিকৃত হইয়া যায়
নাই। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের বাহ ও চরণের
ভঙ্গিমা এমন মধুর যে, তাহা অনাগ্রাসেই
যে-কোন শ্রেষ্ঠ ভাস্করের প্রতিমার আদর্শ
হইতে পারে। সারা প্রতিদিন যে পরিশ্রম
করেন, অনেক যুবকও তাহা পারেন না।
সংগতি ফ্রান্স হইতে খবর আসিয়াছে,

৩৯শ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা

সারার একপানি পা, কোন অহুপের জন্ত চিকিৎসকেরা একেবারে কাটিয়া দেহ হইতে অংশাল করিয়া দিয়াছেন। অগ্রচিকিৎসার আগে সকলেরই আশঙ্কা ছিল, এত বয়সে একপ গুরুতর বাণীর সারার পক্ষে চরিত সাংঘাতিক হইয়া গাঁড়াইবে। কিন্তু সারা আপনায় স্বাস্থ্যের স্ববলতা জানিছেন। তাই তিনি নিজেই জোর করিয়া চিকিৎসকগণকে অগ্রচালনার বাধ্য করেন।

রূপরক্ষার জন্ত ফরাসী মহিলারা "মৌন্দর্যা-বান" (beauty baths) করেন। সারা বার্গার্ডট্ট এই মৌন্দর্যা-বানের অভ্যাস পক্ষপাতী। এই প্রসিদ্ধ মৌন্দর্যা-বানকালেই সারা, তাঁচার জন্ত নির্দিষ্ট কোন নৃতন নাটকের ভূমিকাপাঠ প্রণয়ন করিতেন। লিনা ক্যাভেলিয়াসি আপনার কাণ্ডিকে কোমল রাগিবার জন্ত ছুড়ধারায় ঘান করেন। (বাঙ্গলা বেশের রংগা-সমাবেশ হুগের সর



অভিনয়-মুখ্য সারা বার্গার্ড

গায়ে মাখার রীতি আছে) খেন, হেডিং নামে আর একজন অতিমোজী ত্রাম্পেন-
নামক বিখ্যাত রূপবতী মহিলা, ট্রুপের ফণের মদের খারার সৌন্দর্য-স্বান করিতেন।
ফেনিল রস গায়ে মাখিতেন। লেন্দেলুমি —Nash's Magazine হইতে।

শিশু-শিক্ষা

আমেরিকায় এখন শিশু-শিক্ষা
একটা নূতন আলোচনার স্বরূপ হইয়াছে।
এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন যে,
শিশু-শিক্ষার বর্তমান পদ্ধতি ঠিক নয়।
পৃথিবীর যে-সকল ব্যাপার যে-সময়ে জানা
দরকার, শিশুরা ঠিক সেই সময়টিতে সে-সব
ব্যাপারের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ-
লাভ করে না। শিশুরা এখন আট বৎসর
বয়সে বড়টা জ্ঞানলাভ করে, আরও অল্প
বয়সে তাহারিগকে ঠিক ততটা পরিদ্রাণেই
জ্ঞানবান হইতে হইবে। অনেক শিশুর
অল্প নব আদর্শের প্রাথমিক বিদ্যালয়
স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এখানে
আগে নানা বিষয় শিখি, শিশুরা উচ্চতর
বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে। উচ্চতর বিদ্যালয়-
গুলির কার্যকালও সংক্ষিপ্ত করিবার
কথা উঠিয়াছে। এই কথা কার্যে পরিণত
হইলে, ছাত্রেরা এখনকার চাইতে অল্পবয়সে
কলেজে প্রবেশ করিতে পারিবে।

এখনকার প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে
অনেক অকারণ বাহ্যিক আছে। সেই
বাহ্যিককে পরিহার করিয়া শিশুদের প্রথম
শিক্ষাকালটা আসল কাজে খাটাইয়া
সময়ের স্ফাবহার করিতে হইবে;—এইটি
হইতেছে উপর-উক্ত নব-পদ্ধতির মূল কথা।

সংগ্ৰহীত উইনিফ্রেড জাক্টিল টোনারের
“Natural Education” নামে যে নূতন
ও বিখ্যাত বইখানি বাহির হইয়াছে,
তাহাতে নব শিশু-শিক্ষার পদ্ধতি ও তাহার
অন্তর্গত ফললাভ সম্বন্ধে চিত্তগ্রাহী আলোচনা
আছে। লেখিকা বলেন, “শিশু-জীবনের
প্রথম পাঁচ ছয় বছর বাজে কাজে
খাটাইয়া, আমরা সময়ের অত্যন্ত অপব্যবহার
করি। নিম্নমিত শিক্ষা দিতে পারিলে
ঐ সময়টাতেই অল্প সময়ের মধ্যে টের
দেশী ফল পাওয়া যায়। তাহাতে
পরজীবনের ছয়,—এমন-কি দশ বৎসরব্যাপী
অকারণ শিক্ষার পেষণ-বস্ত্র হইতে ছাত্রগণ
পরিভ্রাণ পাইতে পারে! আমাদের মনে একটা
নিশ্বাস আছে যে, পাঁচ ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত
শিশুদের জোর করিয়া লেখাপড়া দেখানো
উচিত নয়। তারা একটু-আধটু বাহা
শিখে, তাই ভাল; কামল, তাদের
হাল্কা নৃত্তিক গুরুতর শিক্ষার গুরুভার
সহিতেপারে না। কিন্তু আমার দুট ধারণা,
—এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।”

শ্রীমতী টোনার কল্পনার উপরে নির্ভর
করিয়া কোন কথা বলেন নাই; তিনি
তাঁহার শিক্ষা-পদ্ধতিকে হাতে-নাতে কাজে
খাটাইয়াছেন। তাহার কল্পার নাম

উইনিফ্রেড। তাহার বয়স আরো বৃদ্ধ। এই বয়সে সে এক নিম্ন শিখিরাছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরিণতবয়স্ক প্রফেসরের কাছ হইতেও ততটা আশা করা যায় না।

উইনিফ্রেড, ফ্রেন্স, জার্মান ও ইংরাজী ভাষায় লিখিতে, পড়িতে ও কথা কহিতে পারে। স্পেনীয় ও ইতালীয় ভাষাতেও তাহার যথেষ্ট দক্ষতা আছে। এস্পারেন্টোতে সে দুই-তিনশাব্দী ছোট-ছোট বই লিখিরাছে। বই না বেচিরা তাহা দিল্লী ও সিন্সেরায় রচনা হইতে সে দীর্ঘ দীর্ঘ অংশ আয়ত্ত্বি এবং তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে পারে। নামজাদা অধ্যাপকেরা তাহাকে নানাভাবে পরীক্ষা করিরাছেন, কিন্তু কোনমতেই কেহ তাহাকে ঠকাইতে পারেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব ভাল ছাত্রও যে তাহার চাইতে ভাল প্রশ্নোত্তর দিতে পারে না, ইহাও সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

অধুনা লেখাপড়িতে নয়, উইনিফ্রেড নানা ললিত-কলাতেও সিন্ধুত। পিরাণো ও বেহালায় তার হাত তারি মিলি। নাচেও তাহার পটুত: বড় কম নয়। নাচে ও বাজনার সে একটা দক্ষ যে, তাবিধাতে ইচ্ছা করিলে সে রঙ্গমঞ্চে নাচিরা-বাজাইরা অনায়াসে নাম ও পরমা করিতে পারে। চিত্র-অঙ্কনেও সে যথেষ্ট নিপুণ।

শিটলবার্গে যত দাবাবোড়ে-বেলোয়াড় আঁসিরাছে, উইনিফ্রেড তাহাদের সবাইকে হারাইয়া দিরা নাই কিমিরাছে। অনেক ওস্তাদ দাবাবোড়ে-বেলোয়াড়কেও তাহার

ক্রীড়ামগ্নতায হার মানিতে হইরাছে। অকশ্যে, উদ্ভিদবিজ্ঞা ও প্রাণীতত্ত্বের উপরে সে যে করপানি নোটবই লিখিরাছে, তাহা পরীক্ষা করিরা কোন অধ্যাপক বলিরাছেন, অনেক ভাল কলেজেও ঐ নোটবইগুলি অনায়াসে চলিরা বাইতে পারে।

অনেকে এখানে জাবিতে পারেন, এক অল্পবয়সে এমনভাবে মস্তিষ্কচালনা করাতে উইনিফ্রেডের শারীরিক স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হইরাছে। কিন্তু তা নয়। চক্ষিণ বয়স বয়সে যে-রকম ক্ষমতা স্বাভাবিক, যাহা বয়স বয়সে সে ঠিক সেইরকমই শক্তিমতী হইরা উত্তিরাছে,—ইউনাইটেড টেট্রুসে তাহার সববয়স্ক আর কোন বাগিকার গারে এক বেশী জোর নাই। উইনিফ্রেডের গড়নও খুব বাড়ত, বেশিতে তাহাকে বেগল, সতেরো বছর বয়সের দুবতীর মত। তরবারি-খেলায়, দৌড়ানোতে, মুষ্টিযুদ্ধে অনেক পুরুষও তাহাকে আঁটিরা উত্তিতে পারিবে না।

উইনিফ্রেড এই বয়সেই নানা নিম্ন লইরা দশ-গারোখানি ছোট ছোট বই লিখিরা ফেলিরাছে। গতবৎসরে কলম্বের জোরে সে দেড় হাজার টাকারও বেশী মৌজগার করিরাছে। তাহাকে অনেক নিম্ন লইরা যাত্ন থাকিতে হয়, নহিলে সে আরও ঢের বেশী টাকা মৌজগার করিতে পারিত। জুনি কন্মন্স দিলে সে যে-কোন নিম্ন লইরা কবিতা-রচনা করিতে পারে। একেশর ও-দিরা, একগার কোন ছাত্রাচিত্ত একটা প্রবন্ধ উইনিফ্রেডের হাতে দিরা বলেন, "এই গল্পটাকে গড়ে পরিণত কর দেখি।"

টাইপরাইটারের সুবধে বসিয়া উইনিফ্রেড সেই গল্প-প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া নারো মিনিটের ভিতরে একটি চুম্বাশি পংক্তির কবিতা লিখিয়া ফেলিল। আমরা এই গল্প ও পত্র হইতে প্রথম অংশ তুলিয়া দিলাম।

গল্প :—Bones is the framework of the body. If I had no bones in me I should not have so much shape as I have now. If I had no bones, my brain, heart, lungs, and larger blood-vessels would be lying round in me, and might get hurt.”—ইত্যাদি।

উইনিফ্রেডের গল্প :—

“The framework of the body is
The bones—so teachers say ;
And if we didn't have'em
Our shape it wouldn't stay.
Besides, some bones my liver
And brain and even heart
Would get some awful hurtin's
And maybe come apart.”

—ইত্যাদি।

শেষ দুই-তিন বৎসর ছাড়া, উইনিফ্রেড বরাবর তার মায়ের কাছ থেকেই লেখাপড়া শিখিয়াছে। শ্রীমতী টোনার বলেন, “স্বাভাবিক শিক্ষা-পদ্ধতি”র প্রথম কথা কি? একরকম জন্মের সঙ্গেসঙ্গেই শিশু-শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। উইনিফ্রেড যখন একরকমি কচি মেয়ে, শ্রীমতী টোনার তখন তাহাকে দোণার তরাইয়া ড্যানিলের কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে

ঘুম পাড়াইতেন। কবিতার স্নেহে শিশু কারা তুলিয়া ঠাণ্ডা হইয়া থাকিত। উইনিফ্রেডের বয়স যখন একবৎসরও পূর্ণ হয় নাই, তখন সে আধো-আধো স্নেহে ড্যানিলের *Aeneid* হইতে কবিতা আবৃত্তি করিতে পারিত। শ্রীমতী টোনার একটি বল লইয়া ঘরের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিতেন, “Arma”! উইনিফ্রেড আবার বলটি মায়ের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিত, “Virumque”।

(ড্যানিলের একটি কবিতার আছে :—

“Arma virumque cano
Troiae qui primas ab oris”)

• মিসেস টোনার ঘরের সঙ্গে বল খেলিতে খেলিতে যখন দেখিতেন, কবিতার প্রথম কথাটি তাহার মুখ হইয়া গিয়াছে, তখন আবার তাহার পরের কথাটুকু—“cano” ও “Troia:”—মেরেকে খেলিতে খেলিতে মুখস্থ করাইতেন। এইরূপে, খেলাধুলার সঙ্গেসঙ্গে উইনিফ্রেড ড্যানিলের কবিতার পর কবিতা কণ্ঠস্থ করিয়াছিল।

মিসেস টোনার বলেন, শিশুদের অজ্ঞাতসারে এইরূপ খেলাধুলার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের শৈশবশিক্ষা ক্রমেই অগ্রসর করিতে হয়। দেশের ভাষাই হউক, আর বিদেশের ভাষাই হউক,—সমন্বিত এই উপায়ে শিশুদিগকে শিক্ষাইতে হইবে। অক্ষাশ্রয়, ভূগোল, বাসন কল্পিত নানা বিষয়ের শিশুদের দক্ষ করিয়া তুলিবার অল্প মিসেস টোনার এক-এক বিষয়ের উপযোগী এক-একরূপ জীড়া নির্বাচন করিয়াছেন। ইউনাইটেড টেটসের জোসিডেন্টদের কথা

আনাইবার অল্প মিসেস টোনার প্রেসিডেন্টের লইয়া একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তারপর উইনিফ্রেডের সামনে উক্ত নাটকীয় অভিনয় হয়। ফলে, সে প্রেসিডেন্টের নাম ও কার্যাবলী সমস্ত ঠিকঠাক জামিরাও সন্দেহ করিতে পারে নাই যে, তাহাকে কোন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

মিসেস টোনার আর এক উপায়ে যেরূপে শিক্ষা দিতেন। তিনি নানারূপ জ্ঞানের কথা গম্ভীরভাবে মেরেকে শুনাইতেন—এমন-কি অক্ষাতের নৌরূপ কথাগুলিও। তাহার গম্ভীর পাত্রপাত্রীরা যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ প্রভৃতি দৈতানামে বিবাক করিত এবং এই অদ্ভুত দৈতান্ত্রিক কার্যকলাপ দেখিয়া উইনিফ্রেড ভাণ্ডারের বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি মোটামুটি এক-রকম জানিতে পারিত। মিসেস টোনারের

যত, যাঁহাব ভিতরে পক্ষ আছে, তাহার প্রতি শিশুদের টান্ বাকা অত্যন্ত বাস্তবিক।

অনেকে মনে করিতে পারেন, উইনিফ্রেডের মত অপূর্ণ বিহীন বালিকা জগতে একটি কি ছটির বেশী জন্মিতে পারে না। কিন্তু মিসেস টোনার এ কথা মানেন না। তিনি বলেন, “আমার ঘরের চারিদিকে সাধারণ বালিক-চরিত্র অপেক্ষা বিশেষ কোন বিশেষত্ব নাই। যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমি আমার কন্যাকে শিক্ষাদান করিয়াছি, সেই পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইলে জগতের সকল শিশুই উইনিফ্রেডের মত বিধান হইতে পারিবে।”

মিসেস টোনারের শিশুশিক্ষাপদ্ধতি বাহারা ভাল করিয়া জানিতে চান, তাহারাই তাঁহার “Natural Education” নামে নবপ্রকাশিত পুস্তক পড়িয়া দেখিতে পারেন।

—McClure's Magazine হইতে।

ইউরোপের রাজনৈতিক গুপ্তচর

ফ্রান্স-প্রুশিয়ান-যুদ্ধের পর হইতেই, আর্মীজ রাজ-সরকার ফরাসীদেশে গোয়েন্দার পর গোয়েন্দা পাঠাইতে আরম্ভ করেন। এই গোয়েন্দার দল বেকানদার, অহরী, বর্ণকার ও বিশেষ করিয়া হোটেলওয়ালায় বেশে সারা ফ্রান্সে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

প্রথম-প্রথম আর্মীজ গবর্নেন্ট ফ্রান্সের গোয়েন্দাদের কাছে পুরুষ-প্রতিনিধি পাঠাইয়া সমস্ত খবর জানিয়া লইতেন। কিন্তু কিছুদিনের ভিতরেই ফরাসীরা সমস্ত

ব্যাপারটা ধরিয়া ফেলেন। তখন, পুরুষ প্রতিনিধির বদলে সংবাদ আদান-প্রদানের অল্প স্ত্রী-প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইল। এই স্ত্রীলোকগুলি আধাবয়সী ও তদ্রবণীয়া ছিল।

এই রমণী-চরিত্রা রেলপথে ফ্রান্সের নানান জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইত। মাঝে মাঝে কোন নির্দিষ্ট ঠেগনে থাকিয়া, তাহারাই ফ্রান্সের গোয়েন্দাদের সঙ্গে দেখা করিত। কথাবার্তা বড় হইত না,—টোণ ছাড়িবার

আগেই তাঁরা বে-বার আপন-আপন বক্তব্য চিঠি-পত্রের দ্বারা পরস্পরকে জানাইয়া যাইত।

গত দশবৎসর করাসীদেব গুপ্তকার্য-বিভাগ জার্মান গোয়েন্দাদের লইয়া অত্যন্ত বিস্তৃত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছে। পরপালের মত সমস্ত ফ্রান্সটা আছর করিয়া শত্রু-পক্ষের গোয়েন্দারা যে কিরূপ গুপ্তচক্রান্তে নিযুক্ত হইয়া আছে, করাসী গবর্নেন্ট তাহার সব কথা জানিতে না পারিলেও কতক কতক আন্দাজ করিতে পারিলেন। দেশের গুপ্তকাব্য বাহ্যতে চিঠিপত্রের ভিতর দিয়া শত্রুদায়ে গিয়া পৌছিতে না পারে, করাসী গবর্নেন্ট সেইজন্য ডাকবিভাগের কর্তাদের নিষেটে এক হুকুমনামা পাঠাইলেন।

কিন্তু হুকুমনামা শত্রুপক্ষের গোয়েন্দাদের কাছে গোপন রহিল না। জার্মান গবর্নেন্ট বুঝিলেন ডাকে এখন কোররকম সঙ্কেতলিপি বা সম্বেদজনক পত্র পাঠানো নিবেদনার কাজ নহে। অতএব তাঁহারা চিঠিপত্র লিখিবার এক নূতন কায়দা বাহির করিলেন। চিঠিগুলির ধরণ-ধারণ প্রায় এমনিধারাই হইত :—

“প্রিয় বর্জ্জ,

তুমি আমাকে যে টাকা ধার দিগাছিলে, আমি তাহার হ্রদ পাঠাইলাম।

তুমি আমাদের যে উপকার করিয়াছ, আমরা তাহা জুলিব না।

এখানকার খবর বড় রঙ্গ নহ, আগামী বৎসরে লাভের অংশ থেকে তুমি বোধ হয় কিছু বেশী টাকা পাইবে।

আমরা এ অল্প বন্দ্যাদায়া চেষ্টা করিব, জানিবে।

দুর্দ্বারাই পত্র লিখিবে;

খবর আমরা জানিতে চাই।

চার্লস খুড়াকে মিছাই তুমি অবিশ্বাস করিয়াছ, তিনি খুব ভাল লোক। তাঁর উপরে তুমি অনার্যাসে নির্ভর করিতে পার।

আমার স্বামী ও সন্তানদের ভালবাসা নাও। চার্লস, চার্লটী ও ফ্রেডারিকের আলিঙ্গনও গ্রহণ করিবে।”

চিঠিখানির আদল মানে :—

“আমি তোমাকে তোমার গেলমানদের মাহিনা পাঠাইলাম। তোমার দেওয়া খবর সম্ভাবনমক। তুমি যদি এইভাবে বরাবর কাজ চালাইয়া যাইতে পার, তাহা হইলে আগামী বৎসরে তোমার মাহিনা বাড়াইয়া দিব। সংবাদ আরও নিশ্চয়ভাবে ও তাড়াতাড়ি দেওয়া চাই। চার্লসকে অবিশ্বাস করিও না,—সে আমাদেরই লোক। চার্লস, চার্লটী ও ফ্রেডারিক নামে আমাদের যে তিনজন সংবাদদাতা আছে, তুমি তাহাদের সঙ্গে সত্বে রাখিও।”

সাধারণত, গোয়েন্দাদের মাহিনা দিবার সময়েই জার্মান গুপ্তকার্য-বিভাগের কর্তারা ডাকদারফতে পত্রব্যবহার করেন। নহিলে, বিশেষ কোন দরকারি কথা থাকিলে পুরোক্ত রমণী-গোয়েন্দাদের দ্বারাই কুজ চালাইয়া নেওয়া হয়। কারণ, তাহাই অধিক নিরাপদ।

ফ্রান্সে যত জার্মান গোয়েন্দা আছে, তাহাদিগের কত জার্মান গুপ্তকার্য-বিভাগকে বৎসরে প্রায় চল্লিশ হাজার ডলার (এক ডকার প্রায় তিন টাকা দুআনা) খরচ করিতে হয়।

আগেই বলা হইয়াছে, গোয়েন্দারা ব্যবসারীর ছদ্মবেশে থাকে। সময়ে সময়ে ফরাসী ডিউকটিভেরা তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে। ব্যবসারে গোয়েন্দাদের যে আয় হয়, ফরাসী-কর্তৃপক্ষ সেই আয়ের সঙ্গে গোয়েন্দার খরচের তুলনা করেন। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী দেখিলেই দৃঢ় গোয়েন্দাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, এই অতিরিক্ত ব্যয় সংকুলানের জন্য সে কোথা হইতে টাকা পাইল? সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারিলে দৃঢ় গোয়েন্দা বিপদে পড়ে। কিন্তু সে প্রায়ই পূর্কোঙ্কৃত পত্রের মত চিঠি দেখাইয়া প্রমাণিত করে যে, অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য তাহার দেশ হইতে টাকা আসিয়াছে।

আর্ম্মাগদের মত ফরাসীরাও গোয়েন্দা পোষণ করে, কিন্তু আর্ম্মাগ গোয়েন্দাদের চাকুরীরা আছে তাহাদিগকে অনেকবার হার মানিতে হইয়াছে। ফরাসীরা যখনই আর্ম্মাগীতে গোয়েন্দা পাঠাইয়াছে, তখনই আর্ম্মাগ গুপ্তকাণ্ডবিশিষ্টে সে সংবাদ আগে থাকিতে গিরা পৌঁছিয়াছে। একবার ফরাসী-দের নৌবিশাগ হইতে আর্ম্মাগীর হেলিগোলাও ও কিয়ল খাল প্রকৃতি আরগার মানচিত্র আনিবার অন্যতরন উচ্চশ্রেণীর কর্ত্তারীকে চর নিযুক্ত করা হয়। এই গুপ্তসংবাদ গুপ্ত রাখিতে বর্ণাধা চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। দৈনিক কর্ত্তারীরা অসামরিক পোষাক পরিয়া একখানি পানী ভাড়া করিলেন—সডরচর লোকে যেমনভাবে জলবিহারে বাহির হয়, তাহারও যেন তেমনি তাবই সমুদ্রে হাওয়া খাইতে বাহির হইলেন।

যথেষ্ট সাধনানে থাকিয়াও তাহার কিয়ল খালের কাছে বাইবামাত্র বন্দী হইয়া, বিচারার্থ লিপদিকে প্রেরিত হইলেন। বিচারকালে ফরাসী কর্ত্তারীরা বিম্বিত হইয়া দেখিলেন, আর্ম্মাগ হুধু যে তাহাদিগকে গোয়েন্দা বলিয়া জানে, তাহা নহে; পরন্তু, তাহাদের উদ্বেগ ও অতি গোপনীয় কথা-গুলিও আগে থাকিতেই শক্তপক্ষের কর্ত্তাগোচর হইয়াছে! তাহাদের মধ্যে একজন যে বহু বঙ্গর পূর্কোঙ্কৃত কতকগুলি কেরার নক্সা লইবার জন্য আর্ম্মাগীতে আসিয়াছিলেন, এ খবরটাও লুকানো নাই।

আর একজন ফরাসী কাপ্তেন গোয়েন্দা-গিরি করিবার জন্য ছদ্মবেশে বাগিনে গিয়া হাজির হন। তাহার উপরে বাহাতে সন্দেহ হইতে না পারে, গেলজ তিনি অত্যন্ত সাধনানে ছিলেন। বাগিনের এক বিখ্যাত হোটেলে আহারাদি করিয়া তিনি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, একটি পরমা সুল্লরী মহিলা অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছেন। ভিড়ের ভিতরে তিনি তাহার সঙ্গের লোককে হারাইয়া ফেলিয়াছেন এবং পথ না জানায় দরুণ বাড়ী ঘাইতে না পারিয়া তিনি আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। মহিলাটিকে দেখিলেই বুঝা যায়, তিনি সত্যজবংগীরা।

ফরাসী কাপ্তেন এরূপ অবস্থার তদ্র-লোকের যাহা করা কর্ত্তব্য—তাহাই করিলেন। তিনি একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া মহিলাটিকে সঙ্গে লইয়া তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়া, তাহাকে নামাইয়া দিয়া আসিলেন।

হোটেলে ফিরিয়া আসিবামাত্র তিনি দেখিলেন, একজন ভদ্রলোক তাহার জন্য

অপেক্ষা করিতেছেন। কাপ্তেনকে দেখিয়া সেই ভত্রলোক আপনার পরিচয় দিয়া বলিলেন,—“আমি এখানকার পুলিশ কমিশনার।”

কাপ্তেন আপনার “পাসপোর্ট” বাহির করিয়া দেখাইলেন।

পুলিশ কমিশনার ঈর্ষ হাতের সহিত বলিলেন, “আমাকে বোকা বনাবার চেষ্টা করে কোন দাত নেই। এই ‘পাসপোর্টে’ আপনার ছবি থাকলেও এখানি যে আপনার ভাইয়ের, আমরা তা জানি।”—তারপর, তিনি বিস্মিত ও হতভম্ব করাসী কাপ্তেনকে একে একে জানাইয়া দিলেন যে, ফ্রান্সের কোন্ কোন্ রেলস্টেশনে, কোথায় তিনি কাজ করেন, কবে, কোন্ তারিখে তিনি যুদ্ধ-বিভাগের ভাগ করিয়াছিলেন, কোন্ কোন্ সময়ে সৈন্তদলে তিনি কোন্ কোন্ কর্ত্তে নিযুক্ত ছিলেন এবং কোন্ তারিখে কোন্ জাহাজের তাহার কর্ত্ত্বত্ব ছিল—এককথার তাহার সমস্ত জীবনচরিত্তি পুলিশ কমিশনার

একনিম্নাঙ্গে বলিয়া গেলেন,—এমন কি কাপ্তেন ঠিক কোন্ সময়ে বাগিনে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেটি পর্য্যন্ত।

জীবনচরিত্ত সমাপ্ত করিয়া পুলিশ কমিশনার আপনার পকেট হইতে একখানা কবাল বাহির করিলেন, তাহার উপরে কাপ্তেনের নাম ইত্যাদি লেখা ছিল। সেখানি কাপ্তেনকে দেখাইয়া পুলিশ কমিশনার আবার বলিলেন :—“আপনি যখন দরাসে আমাদেরই এক ক্রী-গোয়েন্দাকে তার বাড়ীতে পৌঁছে দিতে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে আমরা মহাশয়ের ঘরে হুকে আপনার পোর্টম্যান্টো’র কৃত্রিম তক্তা সহিয়ে এই প্রমাণ সংগ্রহ করেছি। আশ্রয় নশাই, ফ্রান্সে যাবার ট্রেন শীঘ্রই ছাড়বে,—আমি আপনাকে সসন্মানে ট্রেন পর্য্যন্ত পৌঁছে দেব। বেশী ভাববেন না, আমরা আপনার অন্তরে প্রথম শ্রেণীর কামরাই ভাড়া করেছি।”

—The Saturday Evening Post হইতে।

শ্রীপ্রসাদবাস রায়।

তুکانিয়া ফকির

(পূর্ব্ববঙ্গের পন্নীচিহ্ন)

তাহার নাম ছিল তুکانিয়া। সে তখন আমাদের বাড়ী কৃষকের কাজ করিত। দৈনিক দুবেলা আহার এবং পূর্ব্বার সময় একখানা নুতন কাপড় ও একগোড়া নারিকেল বাদে তাহার বার্ষিক বেতন পঁচিশ টাকার বেশী ছিল না। গরু চরাইতে,

লাঙ্গল টানাইতে, জমী নিড়াইতে, ধান কাটিতে, হাঠবাঠ করিতে ও তাহাকে হইতট, তাহাছাড়া, অল্প কোন পরিশ্রমের কাজ পড়িলে বিনা আপত্তিতে তাহাও সে তৎক্ষণাৎ করিয়া দিত। তখন হিন্দু-মুসলমানের বড় সদ্ভাব ছিল। একের সাহায্য

ভিন্ন অঙ্গের উপায় নাই জানিগা উভয়েই উভয়ে ক্রীতির চক্ষে দেখিত। হিন্দুরা তখন বয়োভ্যোষ্ঠ মুসলমানগণকে “চাচা”, “মামু”, “মামা” এবং মুসলমানেরাও বয়োভ্যোষ্ঠ হিন্দুদিগকে “দাদা”, “ঝাঠা” “কাকা” প্রভৃতি মধুর সম্ভাষণে আত্মহীন করিত। হিন্দু কালীবাড়ীতে মুসলমানের মানত পাঠা-বসি হইত, হিন্দুরাও মুসলমানের দরগাহ চিনি-বাতাসার শিপি দিত!

সেকালে সমস্ত জিনিষই অত্যন্ত মূল্যবান। তুکانিয়া এই সামান্য বস্তুতেও নির্বিশেষে সংসার চালাইতে পারিত। তাহার সংসারটো নিত্যই ক্ষুদ্র ছিল না, বুঝা মাতা, নিকা-করা স্ত্রী, একটি অন্ন-বস্ত্র, কস্তা, একটি ছয়মাসের পুত্র ও দুইট তরুণবয়স্ক কনিষ্ঠ সহোদরের ভরণ-পোষণের ভার তুکانিয়ার উপর ছিল। আরের মধ্যে তাহার বস্তুতন্ত্রের একটি টাকা এবং শৈশবিক দুই-তিন বিধা অমীর উৎপন্ন সামগ্রীই সঞ্চল। ইহা ভিন্ন তাহার মধ্যম সহোদর বোচা কতিপয় কথনও কোন গৃহস্থের বাড়ীতে -রাখালের কাজ করিয়া দুই এক টাকা আনিয়া দিত। বর্তমান জীবন-সংগ্রামের কঠোরতার দিনে অনেকে ধারণাই করিতে পারিবেন না, কি করিয়া এই সামান্য আয়ে তুکانিয়া অতগুলি লোককে প্রতিপালন করিত।

শ্রুতকালে একদিন হঠাৎ শুনিতে পাইলাম, তুکانিয়া “ককিরী” লইয়াছে।—আর সে চাকুরী করিবে না। তাহার বাড়ী আমাদের বাড়ী হইতে বড় বেশী দূরে ছিল না, কিন্তু মুরগীর বাতাস গায়ে লাগিবার ভয়ে

আমরা * সেখানে বড় একটা ঘাইতাম না। তুکانিয়া “ককিরী” লইয়াছে শুনিয়া আমার দিক-দুরে সহসা একটা বিপুল বিশ্বাসের স্ফূর্তি হইল। সে তুکانিয়া সাধারণ মানুষের মতই আমাদের বাড়ীতে কৃষাণের কাজ করিত,—বাহার কাঁধে চড়িয়া কত বেড়াইয়াছি, রাগের সময় বাহাকে কৌল-চড় মারিতেও বিধা করি নাই, সেই তুکانিয়া আজ কেমন করিয়া যে হঠাৎ একেবারে “ককিরী” উচ্চলমান লাভ করিল, আমি তাহা কোনমতেই ভাবিয়া উঠিতে পারিলাম না। এমন কোতুলকের বশবর্তী হইয়া একদিন মানের পূর্বে ব্যাপার কি দেখিবার জন্য উহাদের বাড়ীতে গেলাম। দেখিলাম, তুکانিয়ার বুঝা মাতা উঠানের একপাশে একটা আগুনের কুণ্ড আনিয়া সম্মুখে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে, আর তাহার চারিদিকে গ্রামের আরও দশবারো জন মুসলমান গভীরভাবে বসিয়া আছে, কাহারাও মুখে কোন কথা নাই। উহাদের অসম্ভব গভীর ভাণ দর্শনে কোন প্রশ্ন করিতে আমার ভয়সা হইল না। কাজেই মনের কোতুলক মনে চাপিয়া ফিরাইয়া আসিতে উত্তম হইলাম।

এমন সময় দেখি, তুکانিয়ার বাহির-বাড়ীতে ফুলগাছের তলায় ঈশান ঘোষ দাঁড়াইয়া আছে। ঈশান আমার চেয়ে এক বৎসরের বড়;—গ্রাম-সম্পর্কে সে আমার খুঁড়া হয়। তাহার সঙ্গে আমার বড় বিনিময়ও ছিল না; কারণ, সে এই বয়সে দুইতিন বার তাহার মামার বাড়ী টাংকাইল অঞ্চল ঘুরিয়া আসিয়া নিজেকে একজন মাতব্বর ও

বহুদূর লোক বলিয়া মনে করিত, এবং আমরা গ্রাম ছাড়িয়া কোন দূরবর্তী স্থানে ঘাই নাই বলিয়া—কৃপমত্নক ভাবিয়া আমাদিগকে নিতান্তই করুণা ও অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। বাহা হউক, আর কারো কাছে জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ না থাকায় বাধ্য হইয়া আমাদের ঈশানেরই মুণাপেক্ষী হইতে হইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “হাঁ ঈশান, (সম্পর্কে খুঁড়া হইলেও, গ্রাম সমবয়স্ক বলিয়া আমরা ঈশানকে নাম ধরিয়াই ডাকিতাম, তাহাকে খুঁড়া বলিয়া ডাকিতে গেলে নিজেই যে ছোট করিতে হয় তাহাতে” আমরা নারাজ ছিলাম),—তুکانিয়া নাকি “ককির” হয়েছে? সে কেমন করে “ককির” হল? সে কই? তাকে ত দেখতে পাচ্ছি না!” ঈশান কহিল, “তোমরা পাড়া-গেয়ে ভূত,—জানইবা কি, আর বুঝই-বা কি? কোনদিন ত মায়ের আঁচল ছেঁড়ে কোন জায়গা গেলে না,—এসব ব্যাপার দেখবে কোথায় বল? আমি মামাদের ওখানে যেতে আসতে এমন কত “ককির” দেখেছি। এসব আমার আর জানতে পাকী নেই। তুکانিয়াকে কি আর এখন দেখবার উপায় আছে, সে ত মাদার নীচে “কবর” নিরেছে। দেখত না, তুکانিয়ার মা আর পাড়ার সকলে কবরের উপর পাহারা দিচ্ছে?”

সত্যই তখন চাহিয়া দেখি, তুکانিয়ার মা ও পাড়ার অজ্ঞাত মুসলমানগণ বেপানে বলিয়া আছে, তাহার নিকটস্থ ভূমি চির

মত উচু করিয়া তোলা হইয়াছে। সত্যই কি তুکانিয়া উহার নীচে আছে! কি সর্বমান! মুসলমান মরিগেইত কবর দেয় তুমিরাছি, তবে তুکانিয়াকে জীবন্ত কবর দিল কেন? সে মাদার নীচে কি খায়? কোথায় শোয়? কেমন করিয়া তাহার খাস-প্রাণসেই বা কাজ চলে?—কিছুই ত বুঝিতে পারিলাম না। ঈশানকে এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সে একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল—“তবেই হয়েছে, তবেই সব বুঝেছ!” বলিয়া সে বাড়ী চলিয়া গেল। আমিও নিতান্ত ক্ষুব্ধমনে, আমার চেয়ে ঈশান কত বেশী জানে ও বুকে, ভাবিতে ভাবিতে তাই বাড়ীর পিছনে “বৈরাগী”দের পুকুরে দান করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

মধ্যাহ্নে আহ্বারের সময় মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “হাঁ মা, তুکانিয়া নাকি “কবর” নিরেছে? ও! সে কি খায়? কবরের নীচে সে কেমন করে বেঁচে আছে?” মা চারিদিকে মশক ভাবে চাহিয়া বলিলেন, “চুপ, চুপ, ওসব কথা বলতে নেই। ওসব কথা মুখে আনিব না! আনিব না, তুکانিয়াকে “মাধার” তর করেছে? সে জাধুরা (বাতিবি লেবু) গুলুতলার এক কলসী টাকা পেরেছে, সে টাকা মাধারের। একমাস কবরের তলে থেকে যে দিন সে উপরে উঠবে, সেইদিনই মাধারের পুণা আরম্ভ করতে হবে।” আমি মায় সব কথা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলেও এটুকু বুঝিলাম যে, হিন্দুদের শিব, দুর্গা, গণেশের মত “মাধার” মুসলমানদের এক দেবতা,

তুکانিয়া সেই মাদারের অস্থগ্ৰাহে অনেক টাকা পাইয়াছে, কাজেই সমারোহের সহিত মাদারের পূজা করিবে।

তুکانিয়ায় বাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গোহালের পার্শ্বস্থিত জঙ্গলে সভ্যসভ্যই একটা জাদুয়া গাছ ছিল,—মার কপার বৃক্ষিলাম, তুکانিয়া সেই গাছতলাতেই টাকা পাইয়াছে। একবার সেখানে গিয়া অবস্থাটা স্বচক্ষে দেখিয়া আদিবার জন্ত প্রাণে আমার বড়ই কৌতুহল জন্মিল,—কিন্তু একে গভীর জঙ্গল, তাহার উপর আবার মাদারের আশ্রয়স্থান, কাজেই সেখানে বাঙরাটা বড় সহজ মনে হইল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার ছোট ভাইয়ের নিকট কথাটা প্রকাশ করিলাম। সে আমার চেহের প্রায় আড়াই বছরের ছোট, কিন্তু শারীরিক শক্তি এবং মনের সাহসে আমার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। আমাদের বড় খুঁড়ামহাশয় ভিন্ন ছনিয়ার সকলকেই সে তৃণযৎ গণ্য করিত। আমি জাদুয়া গাছতলার বাইতেছি তুনিয়া সেও আমার সঙ্গে বাইতে রাজি হইল। অবশ্য, এসব কথা নাকে বলা হইল না। “দুজনে চুপ চুপ সকলের অগোচরে সেই জাদুয়া গাছতলার উপস্থিত হইলাম। তবে আমার গা ছমছম করিতে লাগিল, কিন্তু আমার ছোটভাইটির বিন্দুমাত্র ভয় ছিল না। জাদুয়া গাছতলার দেখিলাম, সভ্যসভ্যই একস্থানে মাটি খুঁড়িয়া প্রায় দুই হাত গভীর ও দেড় হাত চওড়া গর্ত করা হইয়াছে। আমি বলিলাম, “দেপেদিস্, এইখানে তুکانিয়া টাকার কলসী পেয়াছে।” আমার ছোট ভাই “হো হো” করিয়া হাসিয়া বলিল, “টাকা না ঘণ্টা।—দেখছ মা, কে

বুনো আশু তুলে নিয়ে গেছে।” বাস্তবিকই ঐ আরগার একটা বুনো আলু ছিল সভ্য এবং দুই এক টুকরা বুনো আলু মাটির ডেলার সঙ্গে পড়িয়া আছে দেখিলাম। সভ্যই কেবল আলু তুলিয়াছে, না তুکانিয়া টাকা তুলিবার সময় আলু আপনি বাহির হইয়াছে, তাহা বুদ্ধিতে পারিলাম না। এই জাদুয়া গাছের নিকটেই একটা বহুকালের পুরাতন পুকুর এবং একটা উঁচু একাড বাস্তভিটার চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। লোকে বলে, এইখানে প্রাচীন কালে একদল ডাকাইতের আড্ডা ছিল, তাহারা মাথায় খুন করিয়া এই পুকুরে ডুবাইয়া দিত এবং টাকা মোহর সব জপলে পুঁতিয়া রাখিত। এই প্রথাখের মূলে কতটুকু সভ্য আছে, এখন আর তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই; কিন্তু তুکانিয়ার টাকা পাওয়ার জনস্ব সভ্য হইলে এই প্রবাদকে নিতান্ত ভিত্তিহীন বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না।

মাথমালের মাঝামাঝি তুনিলাম, তুکانিয়া কবর হইতে বাহির হইয়া বারোয়ারী-তলার বটগাছের নীচে আশ্রয় লইয়াছে। দিনরাত সেইখানেই সে থাকে; মাদারের পূজা না দেওয়া পর্যন্ত আর সে বাড়ী ফিরিতে পারিবে না। মার অস্থমতি লইয়া একদিন বৈকালে বটতলার গিয়া দেখি, তুکانিয়া মাটির উপর পশ্চিম শিরের চিং হইয়া শুইয়া আছে, আর মোটা গলায় “মন দে অবোব, বুকে দেব সে ভাই,—দেহের মধ্যে বস দমবেশ খুঁজলে তাহা পাই।” বলিয়া গান করিতেছে। তাহাকে দেখিলে এখন হঠাৎ চেনা যায় না। দেখিলাম তাহার শরীর পূর্ণাপেক্ষা

অনেক ক্ষণ ও চর্যল হইয়া পড়িয়াছে,—মাথার বাবরী চুল ও মুখের ঘন দাড়ী অত্যন্ত রক্ষ হইয়া গিয়াছে, চোখে-মুখে কেমন ঘেন একটা অস্বাভাবিক গভীর ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার পরিধানে পূর্বোক্ত সেই ময়লা ধূতির বদলে, চিত্র-বিচিত্র এক সুদী, মাথার লাল বনাতের টুপী, গলায় লাল কাণো সাদা ও সবুজ রঙ্গের বেণোয়ারী মালা এবং হাতে একখানা সুন্দর ককি। দেখিয়া অধিক হইয়া গেলাম। তুکانیار এমন নিচিত্র-মুর্তি ও অদ্ভুত বেশভূষা পূর্বে আর কখনও দেখি নাই;—তাহাকে আগে আর, কখনও গান গাহিতে শুনি নাই।—একমাসের মধ্যে সে কেমন করিয়া গান করিতে শিখিল, এই সব মালা, সুদী এবং বনাতের টুপীই বা কোথা হইতে সংগ্রহ করিল, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। আরও একটা গুরুতর আশ্চর্যের বিষয় এই—কি হিন্দু, কি মুসলমান, ওখানে যে আসিতেছে, সেই তুکانیارকে ভক্তিতে পেলাম করিতেছে। তুکانیارও নিতান্ত নির্গুণ এবং উদাসীন ভাবে সেইসব সেলাম গ্রহণ করিতেছিল,—যেন এইসব সেলামে তাহার চিরস্থান অধিকার, —এবং সে যেন ইহাতে চির-অভ্যস্ত! যে তুکانیار আমাদের বাড়ীর একজন নগণ্য কৃষক ছিল, যে তুکانیار ঘরে ঢুকিলে হিন্দুরা হাঁকায় অল অধি ফেলিয়া দিতেন, যে তুکانیار আমা বাজার মা না দুইয়া ঘরে লইতেন না, আজ কোন্ মন্ত্রবলে সেই তুکانیار এত মান, এত সম্মান-প্রতিপত্তি হটল? বটতলার

দেখিলাম, একস্থানে প্রকাণ্ড এফ অমিহুত; তাহাতে দুই তিনটা বড় গুড়ি কাঠ ঘীরে ঘোঁষে স্থাপিতহে, কত লোক তাহার চারিদিকে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে,—কেহ বাড়াইয়া ফিল্ম-ফাস্ করিতেছে, কেহ আসিতেছে, কেহ যাইতেছে, কিন্তু সকলেরই সমস্ত দৃষ্টি তুکانিয়ার প্রতি।

করদিন পরেই দেখিলাম, এ অঞ্চলের পাঁচ ছয়খানি গ্রাম হইতে মুসলমানেরা দলে দলে তুکانিয়ার আস্থানা সেই বটতলার আসিয়া সমবেত হইতেছে। তাহাদের প্রায় সকলের হাতেই এক-একটি সুদীর্ঘ সুমাজিত বংশদণ্ড,—কেহ তাহাতে রং মাখাইয়াছে,—কেহ চিহ্নিত-ছলিয়া তৈল মাখাইয়া উহা চকচকে মন্থন করিয়া ফেলিয়াছে। কেহ লাগ নীল বা সাদা কাপড়ের বেঠনৌ দিয়া বাঁশের আগাগোড়া ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কাহারও বাঁশের আগায় লাগ ও সবুজবর্ণের নিশান উড়িতেছে। সকলেরই মুখ উৎসাহে উদ্দীপ্ত,—সকলেই যথাসাধ্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বেশভূষা সাজিয়া আসিয়াছে। যাহাদের মাথার বাবরী চুল, তাহারা সেই বাবরী তেল-ফুটু-ফুটু করিয়া এবং তাহাতে লম্বা শিঁখী টানিয়া আসিতেও বিশ্বস্ত হয় নাই। কুমারডাঙার কয়েকজন বাস্তকর ঢোল সানাই এবং কীসি বাজাইয়া দেখিতে দেখিতে গ্রামখানিকে উৎসবানন্দে তোলাপাড় করিয়া তুলিল। সবাপ্ত মুসলমান-গণ “চলো ডাই ইহামকা লকর!” বলিয়া ঘন ঘন চীৎকার করিতে করিতে তাহাদের অস্থগত জাকৃবুলকে উৎসবে যোগদান করিবার লক্ষ্য আহ্বান করিতেছিল। বট-

গাছের উত্তর দিকে ফকির জাহানালি মীর পাঁচ ছয়টা খাসী ও বকরী এবং কুড়ি চুট-ভিন মুরগী একে একে জবাই করিয়া খুপাকার করিতেছিল,—হিন্দু-মুসলমান, বালাক বৃদ্ধ ও যুগ্ম অনেকেই অগুরে দাঁড়াইয়া সেই সব মুরগু পত্ন-পক্ষীর মৃত্যুবরণা অনিবেশ নরনে ভাকাইয়া দেখিতেছিল। জাহানালি মীর একটা খুব তেজীমান মোরগের গলার ছুরি বসাইয়া তাহার সম্পূর্ণ কর্ণক্কেস করিবার পূর্বেই অকস্মাৎ উহা তাহার হস্তচ্যুত হইয়া উড়িতে উড়িতে আসিয়া আমার সেই পূর্ববর্ণিত গুড়া ঈশান ঘোষের গাণের উপর পড়িল। রক্তে ঈশানের চোখমুখ, কাণড়চোপড় সব রক্তা হইয়া গেল। ঈশান ত দৌড়িয়া গিয়া সেই এঁদোপুঙ্খের পটা জলে লাফাইয়া পড়িল,—আমরাও অত্রদিকে গ্রামের ভিতর ছুটিয়া গিয়া “ঈশানের আত গিয়েছে,—তার মুখে মুরগীর রক্ত পড়েছে” বলিয়া চারিদিকে রটি করিয়া দিলাম। ঈশান কিন্তু সে কথা বেমানান উড়াইয়া দিল। তাহার চোখ-মুখ-দূরানিতে এবং উচ্চ কর্ণ-ধ্বনির তোড়ে আমাদের সকল কথাই মিথ্যা সাব্যস্ত হইয়া গেল।

বৈকালে গিয়া দেখি, বটগাছের চারিদিক কোদাল দিয়া পরিষ্কার করিয়া গোমর ও মৃত্তিকার লেপ দেওয়া হইয়াছে, এবং প্রায় চারি পাঁচশত মুসলমান নানা পংক্তিতে বসিয়া আহার করিতেছে। উহারি বেক্সর আগাধের সহিত আগার করিতেছিল, তাহাতে আহার্য্য প্রবোর উপাদেয়তা লব্ধকে কাহারও সন্দেহ করিবার কারণ ছিল না।

সারারাত্রি লোকের কোলাহল ও বাজের বিরাম হইল না। পরদিন সকালে গিয়া দেখি, বটগাছের নীচে এক লাগ টাবোরি পাটানো হইয়াছে, সেই টাবোরির নীচে একটা খেদীর মত স্থানে এক অর্দ্ধ-চন্দ্র (Crescent)। সেই অর্দ্ধচন্দ্রের নিকট সকলের সম্মুখে সফরআলি ফকির, জাহানালি মীর এবং তুহানিয়া এক শ্রেণীতে, এবং উহাদের পশ্চাতে প্রায় দশ বারো শ্রেণীতে অপর সকলে নমাজ করিতেছে।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা নমাজ চলিল। তারপর সকলে একসঙ্গে বাস্ত বাজাইয়া বংশ-বওয়ালসহ* অদ্বন্দ্বী আয়মা নদীতে স্নানার্থ যাত্রা করিল। বলাবাহুল্য যে আমরাও তাহাদের অনুগামী হইলাম। পরম উন্মাদে আমরাই হান ও বংশবওয়ালি ধৌত করিয়া একে একে সকলে কূলে আসিয়া বৌদ্ধে সমবেত হইল এবং সফরআলি ফকির ও জাহানালি মীরের আদেশক্রমে এক এক বংশবওয়াল এক এক সর্বের বেটনী বোজনা করিতে লাগিল। তারপর উহাদের মধ্যে এক একজনে এক একটি বাপ জুলিয়া শইল। একটি বড় অদ্বত বংশবওয়াল দেখিলাম, একরূপ বাপ ইতিপূর্বে আর কখনও দেখি নাই। এই বাপের মূল কাণটি প্রায় চারি হাত উর্দ্ধে হুই সমভাগে বিভক্ত হইয়া হুইটি সমানাকার শাখার সৃষ্টি করিয়াছে। শুনিলাম, ইহাই নাকি মাদারের বাপ। যাহার বাগানে এইরূপ বাপ জন্মিবে, সে ধনী হউক, আর দরিদ্র হউক, মাদারের পুত্র তাহাকে করিতেই হইবে। এই বাপটি নাকি তুহানিয়ার স্বহস্তে রোপিত

বাঁশের কাড়ে জড়িয়েছে, এবং সেইজন্যই তুৎানিয়াকে এইভাবে মাদারের পুত্রা দিতে হইতেছে। এই বাঁশটি অতি বহু চাচিয়া ছলিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। তুৎানিয়া আপন হাতে এই বাঁশের দুইটি আগার দুইটি খেতবর্ণের খেটনো পরাইয়া দিল, —মাদারের চিহ্নই নাকি খেত। সকলেই বাঁশটি স্পর্শ করিয়া আপন আপন কপালে হাত ছোঁয়াইতে লাগিল। ব্যবস্থা মত এই বাঁশ তুৎানিয়াকেই বহন করিতে হয়, কিন্তু সে মাসাধিক কাল “কবরে” থাকার নিত্য দুর্গম হইয়া পড়াতে এই বোড়া বাঁশ বহা তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিলনা, এজন্য এই বাঁশটি তুৎানিয়ার ভাগ্নে-জামাই জাবারিয়া সেখকে তুৎানিয়ার প্রতিনিধিরূপ বহন করিতে দেওয়া হইল। জাবারিয়া বহন এই বিশাল বংশলগ্ন হাতে করিয়া তাহার বাব্রী চুল ধোলাইয়া “গাজীমিঞা সা মাদার দোন্, দম্‌চি মিঞা সা মাদার দোন্।” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তখন তাহাকে যমদূতের দ্বার বোধ হইতে লাগিল। তুৎানিয়ার মামা জুমাদেখ দুইট খেতবর্ণের চামর আনিয়া এই বোড়া বাঁশের এক এক মাথার এক একটি আঁটিয়া বাঁধিয়া দিল। দেখাদেখি আরও অনেক তাহাদের বাঁশের আগার সাগা ও কালো চামর বাঁধিয়া লইল। বাজনার তালে তালে জাবারিয়া বহন নাচিতে লাগিল, তখন উর্দে দুইটি খেত চামর এবং নিয়ে জাবারিয়ার কালো বাব্রী চুল ছলিয়া ছলিয়া এক অপূর্ণ দৃষ্টের সৃষ্টি করিল। জাবারিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত আর সকলেও একসঙ্গে

“গাজীমিঞা সা মাদার—“ইত্যাদি বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—সে শব্দ এক ক্রোশ দূরের লোকের শুনিতে পাইয়াছিল।

এই সব শব্দ হইলে, সকলে ভিজা কাপড়ে বাঁশ কাঁধে ফেলিয়া বাজনার তালে তালে উদ্‌মভাবে নৃত্য করিতে করিতে পার্শ্ববর্তী ভিন-চারিখানা গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া তুৎানিয়ার আত্মানার কিরিয়া আসিল। পথে কি হিন্দু কি মুসলমান, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই দুইহাত যুড়িয়া মাদারের উদ্দেশে সোণাম করিতে লাগিল। কেহ কেহ মাদারের নামে চিনি-বাতাশার শিপি, কেহ-বা বড় বড় আকাজ্ঞা লইয়া পাররা, মুরগী পাখী বকরী ইত্যাদি মানত করিতে লাগিল।

সকলে যখন বটতলার কিরিয়া আসিল, বেলা তখন বিপ্রহরের বেশী হইয়া গিয়াছে, লোকসংখ্যাও বোধ হয় এক সহস্রের উপরে উঠিয়াছে। আমাদের একলে মুসলমান-গৃহে এইরূপ সমারোহের ব্যাপার ইতিপূর্বে আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। কাঁধেই কেহ ভক্তি, কেহ বিশ্বাস, কেহবা কৌতুহলে অভিজুত হইয়া এই ব্যাপার দেখিবার জন্য সমাগত হইয়াছিল। তুৎানিয়া, তাহার মামা, ভাই এবং অসংখ্য আত্মীয়-স্বজনের সাহায্যে সমাগত সকল মুসলমানকেই বিশেষ বহু ও পরিতোষসংকারে পানভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিল।

সন্ধ্যার পূর্বে আবার বাঁশ হাতে সৌরূপ প্রচণ্ড নৃত্য আরম্ভ হইল। নাচিতে নাচিতে কেহ কেহ পাগলের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া দশা প্রাপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। এক একজন

যেমন দশাশ্রান্ত হইয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল, অমনি নৃত্য ও বাজ বন্ধ করিয়া অপর সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। দশাশ্রান্ত লোকের উপর মানার “ভর” করিয়াছেন বলিয়া কতজনে তাহার নিকট কত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কেহ পুত্র-কামনা, কেহ পিতৃ-কামনা, কেহ শত্রু-বন্দনার্থ, কেহ রোগনিবারণ প্রত্যাশার, দশাশ্রান্ত লোকের নিকট নিজ নিজ প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। মাদার দেবতাও অমনি সেই দশাশ্রান্ত লোকের মুখ দিয়া কাহারও উপর ছাগল, কাহারও উপর তেড়া, কাহারও উপর ছুড়, কাহারও উপর চিনি, কাহারও উপর উপবাস প্রভৃতি দাবী করিয়া—সেই দাবী পূর্ণ করলেই—তাহাদের মনঃস্থান পূর্ণ হইবে এইরূপ ভরসা দিতে লাগিলেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী যেকোন একগ্রন্থ ও তদ্রূপতার সহিত দশাশ্রান্ত লোকদের প্রত্যাশা শ্রবণ করিতে ছিল, তাহাতে ঐশ্বর আদেশে কাহারও মনে বে বিদ্‌মান্য বিধা, অনায়া বা অবি-বাসের সকার-হইয়াছিল, তেমন বোধ হইল না। জাবারিয়াই সকলের চেয়ে বন বন দশাশ্রান্ত হইতেছিল। সে এক একবার যেকোন ভাবে কাতের বাঁশ ছুড়িয়া ফেলিয়া বিষম শব্দে মাটিতে সবেগে উলট-পালট খাইতেছিল, তাহাতে তাহাকে দেবতা কি অপদেবতা ভর করিয়াছে তাহা বুঝিয়া উঠা ছকর হইতেছিল। তাহার মুখ হইতে বহু পরিবারের বহু গুপ্তকাহিনী এবং কত জগলে কত পোতা টাকার সংবাদ শুনিয়া, উপস্থিত সকলে তত্তে বিস্ময়ে উল্লাসে

উষেগে বিচলিত হইয়া উঠিতেছিল। বার বার এই ভাবে দশাশ্রান্ত হওয়ারে জাবারিয়ার শরীর তদ্রূপ হইয়া বাইবার তরে, অবশেষে মাদারের বাঁশ তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া অল্প দৈর্ঘ্যের হাতে বেগরা হইল। জাবারিয়াকে আর নাচিতে দেওয়া হইল না। অল্পও তুکانিয়ার মত আমাদের বাড়ীতে কৃষাণের কাজ করিত। মাদারের বাঁশ হাতে লইবার পর সেও দুই তিনবার দশাশ্রান্ত হওয়ার আশা বড় চিত্তিত হইয়া পড়িয়া। অল্প ও তুکانিয়া দুইজন কৃষাণই যদি কাজ বন্ধ করে, তবে আমাদের অস্থবিধার সীমা থাকিবে না। সৌভাগ্যবশতঃ এই সময় নম্বরের সময় উপস্থিত হওয়ারে সে দিনের মত নৃত্যগীত বন্ধ হইয়া গেল, কানেই অল্প অল্পে অল্পেই নিবৃত্তি পাইল। তিন দিন এইভাবে নৃত্য, গীত ও পানভোজনের পর সে বৎসরের মত মাদারের পূজা শেষ হইল।

ক্রমাগত তিনবৎসর এই ভাবে তুکانিয়ার বাড়ীতে মাদারের পূজা চলিয়াছিল। প্রত্যেক বৎসরই উহার কোথা হইতে এক একটি দো-ডালা বাঁশ সংগ্রহ করিয়া আনিত। এক বৎসরের বাঁশ পরবৎসরের উৎসবে ব্যবহার করা হইত না।

দেখিতে দেখিতে তুکانিয়ার নাম চারি-দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। পূর্বে তুکانিয়ার “ক”-অক্ষর হারাম ছিল; সেই তুکانিয়া এখন কথার কথার কোরাণের বহান বলিয়া তাল্লা তাল্লা উদ্‌ ও হিম্মাতে ঘায়া-ইচ্ছা-তাহাই আওড়াইতে লাগিল। লোকের অরে, প্রীহার, ওলাউঠার বসন্তে,

সে কত মলপড়া, ভেলপড়া এবং টোটকা টাটকি ঔষধের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। কত বন্ধানাগ্রীকে সম্মান লাভের জন্য সে মাহুলী দিগা আশাবিহিত করিল, কত ভূত-এতাকে ঝাড়ফুক দিয়া ভূতের হাত হইতে উদ্ধার করিতে লাগিল,—কত সপ্নবষ্ট কত শৃগালকুক্কুদন্ত ব্যক্তিকে মত্তপ্রভাবে নির্ব্বিষ করিল। মামলামোকদ্দমার লোকে তাহার পরামর্শ লইতে লাগিল। বিদেশস্থ আত্মীয়স্বজনের মঙ্গলামঙ্গল, অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনা সে মাটিতে দাগ দিরা গগিরা বলিতে লাগিল। কত ভনের কত হারাগো গল্প তাহার কেরামতে বাহির হইয়া পড়িল। এককথায় বলিতে গেলে ও অঞ্চলে সে একজন “কেট বিজু” হইয়া দাঁড়াইল। চারিপাশের পাঁচ ছয়খানা গ্রামে কোন বৃহৎ কার্য্যই তাহার পরামর্শ ব্যতীত করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। যদি তাহার ঝাড়ফুকের বনে বেহ আবার হইত, তবে চারিবিিকে খজ খজ পড়িয়া বাইত, যদি কেহ মারা ঘাইত, তাহা হইলে তাহার পরমাণু শেষ হইয়াছে বলিয়া সকলে মনকে প্রবেশ দিত;—“তুکانیار হাতে পড়িয়াও যখন বাঁচিল না, তখন আর কেহই উহাকে বাঁচাইতে পারিত না, পরমাণু না থাকিলে ত তুکانیار কাহারও পরমাণু বাড়াইয়া দিতে পারিবে না—” এই বলিয়া লোকে তাহার ক্রটি সংশোধন করিয়া লইত। তাহার গণনা সত্য হইয়া দাঁড়াইলে লোকে অবাক হইয়া বাইত, কিন্তু যদি কোন স্থলে তাহার ভবিষ্যৎ-বাণী সার্থক না হইত, তাহা হইলে লোকে সে ঘোষ নিভেদেরই কোনো

ক্রটির জন্য ঘটয়াছে বলিয়া মানিয়া লইয়া তুکانیارকে নিষ্কৃতি দিত।

বনের সঙ্গে সঙ্গে ধনাগমও তুکانیار মন্দ হইল না। ফকিরী শওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার কতকগুলি চেলা জুটিয়াছিল, তাহার দিব্যরাত্রি তুکانিয়ার আত্মনার পড়িয়া থাকিত, এবং কোন লোক তুکانিয়ার নিকট ঔষধ, মাহুলী বা ঝাড়ফুকের জন্য আসিলে নানা প্রকার বাক্যবিজ্ঞাসে তাহার নিকট যত পারিত টাকা পরমা আদায়ের চেষ্টা করিত। তুکانিয়া নিজে কখনও খুলি কাঁধে লইয়া ভিক্ষা করে নাই বটে, কিন্তু কেহ কোন কাঁধে তাহার নিকট আসিলেই সে বলিত—“দেখিতেছ ত, আমি “ফকির,” আমার কোন “ফকির” নাই,—ভিক্ষাই আমার সম্বল,—তোমরা সকলে মেহেরবানি করিয়া কিছু কিছু না দিলে আমার কেমন করিয়া চলে?” তাহার এই বিনয়ে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যথাসাধ্য দান ধরমাৎ করিত। ইহাতে তাহার যে বেশ ভাণ্ডারকমেই দুই পরমা আর হইতেছিল, অল্প দিনেই তাহার পরিচর পাওয়া গেল। ফকিরী শওয়ার অল্প দিন পরেই সে পূর্ব্ববাসস্থান ছাড়িয়া গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে এক পুরাতন সম্ভ্রান্ত বংশের পরিত্যক্ত বাস্তভিটা বাগান পুকুরিণী সমুদায় ক্রয় করিয়া তথায় কয়েক খানা উৎকৃষ্ট টিনের চৌচালা ও দুচালা ঘর প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে লাগিল। এতৎসম্বন্ধেই গ্রামের কয়েকজন নিঃস্ব লোকের জমীদারী কতক ক্রয় করিয়া, কতক বন্দক রাখিয়া অল্পদিনের মধ্যেই

সে একজন মত্ত মাতকর ব্যক্তি হইয়া উঠিল। জন্মে জন্মে তিনি চারিখানা লাঙ্গলের উপবৃত্ত বলদ এবং চারিপাঁচটি হুত্ববতী গাভীতে তাহার গো-শালায় শোভা বর্ধন করিতে লাগিল। তাহার স্ত্রী এবং কস্তার সঙ্গে করেখানা সোনারুপার গহনাও হানি পাইল।

অকস্মাৎ হঠাৎ ঘটনার তুকাণিয়ার এই অশেষ সম্মান এবং বিশাল ধনাগ্রাভা মলিন হইয়া গেল।

আমাদের গ্রামের বাহ্যি পুঁইই ভাল ছিল। গত পূর্বত্রিশ বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা, বন্য ম্যালেরিয়া বা অন্য কোন সংক্রামক রোগ কখনও আমাদের গ্রামে দেখা দেয় নাই। দুইদিকে দুইটি বিস্তীর্ণ মাঠ, তাহার মধ্যস্থলে এই ক্ষুদ্র গ্রাম। পরিষ্কার বাতাস ও রোজ সর্বদাই গ্রামময় ধেমিষা দেড়ায়। তুকাণিয়া দর্শন করিয়া বলিত, কেবল তাহারই প্রত্যাপে কোন আদি-ব্যাদি এই গ্রামে প্রবেশ করিতে পারে না। লোকেও সেই কথা সরলভাবে বিশ্বাস করিত। গত ১৯০৭ সালের কার্তিক মাসে প্যাটগা জল খাইয়াই হউক, অথবা অন্য বে কোন কারণেই হউক, আমাদের গ্রামের পাশে হঠাৎ ওলাউঠা দেখা দিল। প্রতিদিন সেখানে বহুলোক মরিতে লাগিল। লোকে গ্রামের ভরে প্রশানকালীপূজা, হরিসকীর্্তন, শান্তি বস্ত্রারন-প্রভৃতি নানাবিধ ক্রিয়াকলাপের অহুত্বান করিতে লাগিল বটে, কিন্তু ছদ্মস্ত ব্যারিস প্রকোপ হ্রাস না পাইয়া উত্তরোত্তর বাড়িতেই লাগিল। আমাদের গ্রামে

জীবন আতকের সকার হইল। তুকাণিয়া বিবাহান্তি আমাদের গ্রামের চারিদিকে ঘুরিয়া কোরাণের এমন সব নরান চোঁচাইতে লাগিল গাধার অর্ধগ্রহ করা বয়স কোরাণকারেরও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। সকালে সকাল তাহার “আজানের” শেষ চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখনও আমাদের গ্রাম ওলাউঠার প্রকোপ হইতে মুক্ত ছিল। তুকাণিয়া এমননি তার দেখাইতে লাগিল যেন তাহারই কেরামতে এইরূপ হইয়াছে।

২৩শ কার্তিক সকালবেলায় তুকাণিয়া গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া প্রচার করিতে লাগিল যে গতরাতে ওলাউঠা-রাকসী পালকী চড়িয়া কুবুধুব বেশে যখন আমাদের গ্রামে প্রবেশের উদ্ভোগ করিতে-ছিল, তখন তুকাণিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া, সমুদ্রে নওরমান হয়, এবং ওলাউঠা-রাকসীকে এই গ্রামে প্রবেশ করিতে নিষেধ করে। ওলাউঠা তাহাতে নিরস্ত না হইয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তুকাণিয়ার সহিত কুবুধুব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। বহু কষ্টে তুকাণিয়া ওলাউঠা-রাকসীকে পরাজিত করিয়া তাহার গলায় পা দিয়া চাপিতে থাকে, এবং আমাদের গ্রামে কদাচ প্রবেশ করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুত না হওয়া পর্যন্ত সেই তাবোই তাহাকে দলন করিতে থাকে। ওলাউঠা তখন কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কুবুধবপুত্রের দিকে চলিয়া যায়। সুতরাং এই গ্রামে আর কাহারও ভয়ের কোন কারণ নাই,—তবে কুবুধবপুত্রের ভাগ্য কি আছে, তাহা বলা যায় না।

তুকাণিয়ার এই আশ্বাস-বাণীতে সকলেই

আশ্চর্য হইল বটে, কিন্তু সেই আশ্চর্য
অধিকক্ষণ উপভোগ করা অসুটে সহিল
না। তুৎকানিয়া নদীদেব বাড়ীর দ্বারের
দাঁড়াইয়া পুনরায় যখন গত রজনীর
সময়-কাহিনী নানাছন্দে বর্ণনা করিতেছিল
সেই সময় দেখা গেল তুৎকানিয়ার বিত্তীয়
পুত্র শ্রীমান (ছেরমান) হাঁপাইতে
হাঁপাইতে সেইদিকে দৌড়িয়া আসিতেছে।
তাহার ভাব দেখিয়া সকলের মুখেই একটা
প্রবল উৎকর্ষা আগিয়া উঠিল। ছেরমান
তুৎকানিয়াকে অবিলম্বে বাড়ী ফিরিয়া
ঘাইতে বলিল, কারণ তাহার ঘোষ্ঠভ্রাতা
(তুৎকানিয়ার প্রথম পুত্র) কুরম্মানের ঘন
ঘন দান্ত ও বমি হইতেছে। তুৎকানিয়ার
মুখখানায় কে যেন এক রাশ কালি
চালিয়া দিল, চক্ষু যেন কপালে উঠিল।
তাহার এত দর্প যে ভগবান এত ক্ষীণ
এমন ভাবে চূর্ণ করিবেন, একথা স্বপ্নেও
সে মনে করে নাই। তাহার আরক
সংগ্রামবর্ণনা আর শেষ হইল না,—সে
উর্দ্ধ্বাসে বাড়ী চলিয়া গেল। তাহার শ্রোতৃ-
বৃন্দও পরস্পর মুখ চাওরা-চাতুরি করিতে
করিতে যে বাহার করে প্রবেশ করিল।

সন্ধ্যার পূর্বেই শুনা গেল তুৎকানিয়ার
ঘোষ্ঠপুত্র কুরমান এবং একটা দৌহিত্র
ওলাউঠার প্রবল আক্রমণে ইহলোক ত্যাগ
করিয়াছে। আর একটা কস্তাও মৃত
প্রায়! তাহার প্রতিবেশীদের মধ্যেও দুই-
তিন বাড়ীতে কয়েকজন এই রোগে আক্রান্ত
হইয়া আর সময়ের মধ্যেই প্রাণত্যাগ
করিল। তুৎকানিয়া এই আঘাতে একেবারে
মুগ্ধিয়া গেল।

অগ্রাহ্যরূপে নাসের শেবাশেবি স্মৃত
বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ওলাউঠার প্রকোপ
ভ্রাস পাইল, কিন্তু তুৎকানিয়ার নষ্টগৌরবের
আর পুনরুদ্ধার হইল না। এখন আর
কেহই তাহার ভড়ংঘে বিশ্বাস করে না,—
কেহই আর তাহাকে ঝাড়কুক বা
টোটকাটাকি ঔষধের ব্যবহার অস্ত্র ডাকে
না। সাধিরা কাহারো বাড়ী গেলেও আর
কেহ তেমন আদর যত্ন করে না। কামেই
তাহার আরও অনেকটা করিয়া গেল।
ফকিরী করিয়া এখন সে আর কিছুই
পাইত না, তজ্জপরি উপযুক্ত পুত্র এবং
দৌহিত্রটি মারা যাওয়ার চাব্বাসের কাজেও
আর পূর্ববৎ ব্যবস্থা রহিল না। বয়স
অধিক হওয়ার এবং শোকভারগ্রস্ত হইয়া
পড়ার সে নিজেও আর তেমন পরিশ্রম
করিতে পারিত না। তুৎকানিয়া উল্লাসিয়া
(ছলাসিয়া) সেখের বিধবা স্ত্রীকে নিকা
করিয়াছিল। মুসলমানশাস্ত্রমতে না কি কুমারী
কস্তা বিবাহ না করা পর্যন্ত পুরুষের
প্রকৃত বিবাহ হয় না। তুৎকানিয়া এই
শাস্ত্রবচনের দৃঢ় ধরিয়া। জীবনের এই
অপরূহ কালে অকস্মাৎ এক কুমারীর
পাণিপীড়ন করায় তাহার প্রথম পত্নী
অভিমানে নিজ পুত্রধরকে লইয়া পৃথকভাবে
বাস করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে
তুৎকানিয়ার আর এবং প্রতিপত্তি আরও
কমিয়া গেল।

অবশিষ্ট যেটুকু মানমর্যাদা ছিল, একটি
দলিল রেজেষ্ট্রী করিতে গিয়া তাহারও শেষ
হইল। পূর্বেই বলিয়াছি, তুৎকানিয়া লেখা
পড়া কিছুই জানিত না, কিন্তু ফকিরী

লইবার পর সে মাহুলী দিবার সময় কাগজে কোরাণের বহান বলিখা যা-তা আঁচে কাটিয়া মাহুলীতে পুরিয়া দিত। গ্রামে ঢেক দলিল প্রভৃতি লেখা হইলে, সাক্ষীরূপ তাহাতে সে কতকগুলি দাগ কাটিয়া স্বাক্ষর করার ভাগ করিত। তাহার এই সব লেখা কোন্ ভাষার বর্ণমালায় লিপিত,—সে ভাষাটা কোথার কাহার নিকট কবে সে শিক্ষা করিল, তাহা কেহ জানিত না, জানিবার চেষ্টাও করিত না। যেন কবিরী লইবার সঙ্গে সঙ্গেই তুৎকানিয়া এই বিচিত্র বিভ্রাটিও দৈববলেই লাভ করিয়াছে, সকলে এইরূপ মনে করিত। কাজেই সে বিষয়ে কেহ তাহাকে কখন কোন প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করা আবৃত্তক মনে করে নাই।

একে রোজগার নাই, তাহার উপরে উপগ্র্যপরি দুই বৎসর অজন্মা হওয়ার্তে তুৎকানিয়া কিছু স্বপ্নগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তদ্বশলক্ষ্যে তাহাকে কতক জমী রেহান দিতে হয়। সেই রেহানীখত যেকোন কবিরার সময় = তুৎকানিয়া সবরেজিষ্ট্রারের সম্মুখে দলীলের পৃষ্ঠে নিজ নাম স্বাক্ষর করিলে, সবরেজিষ্ট্রার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কোন্ ভাষা? তুৎকানিয়া এত বড় সাংঘাতিক প্রশ্নের অন্তর্যস্ত ছিলনা, কাজেই একটু থতমত খাইয়া বলিল—“উহা কবিরানাগারী!” সবরেজিষ্ট্রার যাবু তুৎকানিয়ার ভাবগতিক দেখিয়া ব্যথিতে পারিলেন, ইহাতে নিশ্চয়ই কোন গদ্য আছে; সেজন্য তুৎকানিয়া ঐ ভাষা

কোথার = কাহার নিবট শিক্ষা করিয়াছে, তাহা তিনি জানিতে চাহিলেন। তুৎকানিয়া বলিল, সে ঐ ভাষা তাহার পীর কবির মহম্মদ সার নিকট শিখিয়াছে। এই পীর মহম্মদ সাকে বর্ণনা করা দূরে থাকুক, আমাদের দেশে কেহ তাহার নামও কখন শ্রবণ করে নাই। সবরেজিষ্ট্রার যাবু ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন বলিয়া বোধ হইল না। তিনি তিনখানা সাপা কাগজের টুকরায় স্বতন্ত্রভাবে তুৎকানিয়ার এক একটা স্বাক্ষর গ্রহণ করিলেন। তারপর দলিলের পৃষ্ঠের স্বাক্ষর এবং এই তিনটি স্বাক্ষর পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলেন, কোনটির সহিত কোনটির মিল হয় না! তখনই তুৎকানিয়াকে কোমদারীতে দোপদ করা হইবে বলিয়া সবরেজিষ্ট্রার গর্জন করিয়া উঠিলেন। তাহার সঙ্গীগণ সবরেজিষ্ট্রারের হাতে পায়ে ধরিয়া দলীল পরিবর্তন করিয়া দিয়া তুৎকানিয়াকে সে ব্যাভা উদ্ধার করিল বটে, কিন্তু এই দিন হইতে তাহার সকল সম্মান, সকল মর্যাদা, সকল গৌরব জন্মের মত অন্তলে তলাইয়া গেল।

এখনও তুৎকানিয়া গলায় সেই কাঁচের মালা এবং মাথায় সেই চিরপুতাতন বনা-তের টুপী পরে বটে, কিন্তু মহুদলম্বালে সে আর বড় বাহির হয় না। পুনরায় সে যে চাৰা সেই চাৰাই সাজিয়াছে। তবে এখন সে আর পরের বাড়ী চাকুরী করে না, নিজেই কোনমতে একখানা লাল চালাইয়া কারক্লেপে সংসার চালায়।

শ্রীমহীশ্রীমোহন চন্দ্র।

কাজুরী-পঞ্চাশৎ

(১)

(এল) শ্রাবণ কিরে ভুবন পরে
এল মিলন-ধাম,
সেই পালিয়ার পিরাস-হরণ
সেই যে ঘনভ্রাম !
বিধুর ধরার বজ্র এল
(অক) পূরবে মনভ্রাম—
(যেথ) দিগ্বিদিকে চিক দিরেছে
সুরন্ অবিশ্রাম !

(২)

(যেথ) ভ্রমর হয়ে উড়ল ঝাঁকে
কী কালো ছায়া ।
খুলে এখন ঘোমটা কে বল *
বলবে বেহায়া ?
(ও সে) দিনকে করে মিলন রাস্তি
এমনি তার মায়ী !
(তার) মনটি ভালো আলোর ভরা
কালো তার কারা ।

(৩)

(আমরা) ঝুলিয়ে দোলা হুলিয়ে দেবো
বাঁধল-হাওরতে,
পাখীর স্রবের আনব সোরাধ
পিরাল্ ছাওরতে ।
গাইব পাখীর চাইতে মধুর
(ভুবন) ভরব গাওরতে,
ধেলেবে মেঘে বিজুলী এই
চোখের চাওরতে ।

(৪)

(আহা) লুকিয়ে ছিল এই বিজুলী
কোন্ কাজল চোখে !
কালো মেঘের ডাক শুনে কি
উঠল সে চমকে !
কদম-হুলে ভাব লাগে রে
(সেই) আলোর পুলকে
কার পানে কে চার লুকিয়ে
জানবে কি লোকে ?

(৫)

(ও কার) মিলিয়ে গেল নীলাধরী
নিবিড় বায়লে ।
ভ্রামল বনে সঘন সঁাথে
মেঘের কাজলে !
(ওগো) কোন্ তমালে ঝুলনো তোমার ?
(বল) কোন্ মালা গলে ?
(তোমার) দোরডে আজ চিনু গহন
রসের অতলে !

(৬)

(ওগো) কোন্ বনে আজ বাঁধলে দোলা
গহন আঁধারে ।
তোমার গলার মালা কোথায়
গন্ধ বিখারে ।
(ওধু) গন্ধে তোমার পাই যে নাগাল
(নীরব) ঝুলন-সঁাতারে
(তোমার) রূপ-বিজুলি ভুব দিরেছে
বাঁধল-পাখারে ।

(৭)
 (তুমি) আস্হ পথে জুই-চাপাতে
 জ্বলন সাজায়ে ।
 বাদল-ধারার ভাল মিলিয়ে
 (দুঃ) নপুর বাজায়ে !
 হাস্হ তুমি জুই চানেলির
 পরাণ বাঁচায়ে ।
 আস্হ তুমি পেখম-খোলা
 মগ্ন নাচায়ে ।

(৮)
 (সখী) যখন কেবল শ্রবণ চলে
 নরন না চলে—
 সেই শ্রাবণের আমল এখন
 এ রজ-মহলে ।

(আজ) শোন্ গো কেবল দাদুর কী কর
 (জীও) ফিরী কি বলে,
 একলা পাখী কী গায়—বাদল-
 ধারার বিরলে ।

(৯)
 (আজ) কুজ-পথে সবুজ কানায়
 নতুন কে দিলে ।
 মেঘ-ডগরী মঙের তাঁবু
 (ধার-) জলের বিলম্বিলে ।
 আজ বেরবার নেই মানা আর
 সব সখী মিলে,
 বাঁশীর হরে হর বাঁধা আজ
 বাসর নিধিলে ।

(১০)
 (জীও) নতুন শাখে বাঁধ তোরা সই
 নতুন হিম্মোলা,
 আজকে হাওরার নতুন হুগার
 হল যে খোলা ।

(নব) . নীপের নীপে কেয়ার ধূপে
 আজ জ্বলন তোলা,
 নতুন বঁধুর নতন মধুর
 কাজী উতলা !

(১১)
 (ওগো) ঘোমটা খোলা সরম তোলা
 আজ বিধির লেখা,
 (প্রথম) ভর-ভাঙার পুলকে প্রাণে
 ধরনিছে কেকা ।
 কুল ভেঙেছে বয়না আজ
 (তার) নাই সীমা-রেখা,
 (তৃত্ব) ঘনঘটার ঘোমটা রেপে
 চল পথে একা !

(১২)
 (ওগো) এমন দিনে উপাস মনে
 কে ঘরের কোণে ?
 (এদ) আপনাকে আজ লোফাফুফি
 করব পবনে ।
 বুক দিয়ে আজ বিঁধব বাতাল
 (আকাশ) ঠেক্বে চরণে
 কিশোর তরুর সকল অণু
 ভরবে শ্রাবণে ।

(১৩)
 (আজ) যে বোলাতে ছজন কুলারি
 সেই দোলা বাঁধিদ্,
 বন্ধু বিনে, নইলে যে হাব,—
 ঠেক্বে সবই বিধ !
 মিশ্ কালো ওই মেঘে মিশে
 (আজ) সুলন্ অহনিশ
 বিছলী ডোর ধরবে দোলায়,
 উধুলাবে হরিষ ।

(১৪)

(অজ) বাঘল রাত্তির কাঁজল পাঁতি
এল কার তরে !
পৌছে দিল পূবের বাতাস
কাহার অন্তরে !

সজল আঁধার কী বোল্ বলে
(অজ) বিভোল্ অথরে !

(হাঃ) বাশীর পাগল বেরিয়ে প'ল
বাঁজ মাধার ক'রে !

(১৫)

(অজ) গগন 'পরে ধর দিহে কে
গড়লে এ মোচাক !
কে ধোঁচালে হঠাৎ !—কেপে
ছুটল কিসের কঁক !
ছুটল রাগে হুঁদ হয়ে সব
(চাকের) দুয়ার রেখে কঁক !
কুঁকিরে করে রসের ধারা
অবাক গো অবাক !

(১৬)

(ওট) মেঘের দেশে রাত হ'ল, ডাখ্
হাওরায় লাগে হুল !
গুগ্‌গু উগারে তরল
অপ্‌রাজিতায় কুল !
নীল কমলে ঢাকুল ডানার
কাশে ভরকুল

(যেন) সাপের শেষে গা ঢেলে কে
এলিয়ে মিল চুল !

(১৭)

(ও কে) দোল্ দিল মোর মনে, ওগো !
তাই দোলে ভুবন !
প্রাণ দোলে পথ দোলে
দোলে সকল বন !

দুন্দর-দোলায় চলছে গো কার
আনন্দ-খুলন !
খুলন-মাড়াল রাগ-রাগিণী
কাজ-রী-মিমাংসন !

(১৮)

(এবার) ছুটল কিনা কদম বনে
খবর রাখি নে,
প্রাণী কুল ছুটেছে মোর
মনের বিপিনে !
(বধূ !) আমরা হলাম পুলক-কদম
(তোমার) সোহাগ-হৃদিনে,
(মোদের) পরাগ-স্তরা এই অজুরাগ
নাও কুঁচি মিনে !

(১৯)

(গেচে) কুলনো বেঁধে রাখাল-ছেলে
সকাল বেলায় আজ,
সেই দোলাতে গুলুত হবে
তোমার রাখাল-রাজ !
(মোদের) রাই-রাজা পরাবে তোমার
(আপন) মাখার কুলের তাজ,
(অজ) হিন্দোলে হিন্দোলে কেবল
টলবে সকাল সাঁঝ !

(২০)

(মোদের) দুপুর বেলাই কুলন খেলা
আইন মানিনে,
(অজ) খনখটাই ঘোমটা যে, তাই
ঘোমটা টানিনে !
কে বিশেষী যার বে পথে
আমরা জনিনে,
যে খুসী সে হাফুজ হাসি
আমল আনিনে !

(২১)

(ওকি) দোলন-চাঁপা ছলছে হাওয়ার

দোলন-চাঁপার স্রল।

(তার) দোলন বেধে কুম্ভকো জবা

ছলছে গো দোছল।

তুণ্ড হৃদয়ের মাখন তুহ

(তারে) দেখলে যে হয় তুল।

মুখটি কচি কাঁচা-হৃদয়ের

মনীর সমতুল।

(২২)

(আমরা) ভালবাসার রূপ দেখিনি

(তুধু) নাম ত্বনি গো তার।

তুন্তে যে পাই আওয়ার বাবল-

ধারার অনিবার।

চোখ বুজে তার ডাক শোনা যায়

সাত সাগরের পার,

(তার) পরশ পেলে প্রাণ নাকি হয়

গুলাবে গুলজার।

(২৩)

(আজ) তোমার তরে এনেছি এই

সফামণি স্রল,

এই ধোঁপাটি হবেন তোমার

ছুটি কানের স্রল ;

চরণ-পাঁড়ি হবেন রাখা-

পদ্ম এ রাতুল,

রায়-বেলে সেই সাজান আজ

তোমার কানো স্রল।

(২৪)

(আজ) স্থলন-দিনে স্রল গহনা,

সোনা নামছর।

কঠিন সোনা আজকে মাল

আজ রাখ তার স্রল।

স্রলের কাঁকণ স্রলের মুকুট

(আর) স্রলের রতনচূড়,

স্রলের নুপুর বাজে নীরব

ভরবে দ্বন্দ্বপুত্র।

(২৫)

(ওগো) তোমরা চোখে কাজল দিয়ে

হয়িল-লোচনা।

ওই কাজলে আমরা করি

কাব্যী রচনা।

ওই কাজলে হয় গো সজল

বাদল-জোছনা,

ওই কাজলে উজল হিয়া

লুকার শোচনা।

(২৬)

(আজ) অন্ধকারে গন্ধস্রল

হোলি খেলার পুত্র।

মাদল বাজে বারল-মেঘে

নাইক চোখে স্রল।

পিচকারী সব ভরছে কেরা

(আর) কদম সে কুম্ভ,

গঞ্জে রত্নী অঙ্গে হাওয়া

সঞ্চয়ে নিখুন্ন।

(২৭)

(তোমরা) চলিয়ে বেনী কুলিয়ে দিলে

রেশমী হিলোলা।

কুম্ভেরা বটের কুরি বোদের

কুলনের ধোলা।

রাজার মেয়ে তোমরা সবাই,

(যোরা) রাখিল মন্-তোলা।

অ-বোলা কে কর ? তোমাদের

ভারি বোলতোলা।

(২৮)

(আজ) স্বামীর হাওরায় তরল যোতি
কিরণেছে লীলার !
তাই বুঝি গো মুক্তোজ্বর
তোমার ভয় ছায়।
কি দিয়ে কিশোরী ! গোয়ী।

(বল) মুছাই, হার, তোমার ?

(তু) আখির পাতা ব্লাই, লখী !
তোমার গোরা গায়।

(২৯)

(আজ) এমনি ভিজে আসতে কি হয়
ও বাঁশীর পাগল !

(তোমার) সোনার গায়ে মুক্তোজ্বাতি*
জ্বাতিয়ে পড়ে জল।
তর কি গো নেই দেয়ার ডাকে ?
(এই) বিষম ঝড় বাদল !

(ওগো) ভালবাসায় এমনি অতর—
এমনি কি তার বল !

(৩০)

(ওগো) তোমার দোলা কদম-শাখে,
আমার তনালে ;
কাছে-কাছেই চলছে দোলা
(তবু) নাইক নাগালে !
ওই আঁচলের আভাস লাগে
এ মোর কপালে !

(তোমার) চুলের রাশি নিশাস ফেলে
নিশির আড়ালে !

(৩১)

(আজ) তোমার আঁমার মন মিলেছে
মনের মাশকে !
কে জানে আজ ছুনিয়া সমাজ
পড়শী পকে ?

অকলে বেঁধেছি মোরা
(আজ) সাত নাজার ধন যে !
কাকনে নাই কড়ি, চরণ
মাণিকের মকে !

(আজ) তোমার আঁমার মূল জুটেছে
মনের মাশকে।

(৩২)

(দোলা) হুল এবার বাদল হাওরায়
হারিয়ে দিখিদি।
হুলবে কে, আর কে দোলাবে
(তার) নাই কিছুই ঠিক !

ভর-ভোলা মন ভুলছে ভরম
আজ সরমে থিক ;

(আজ) যে পারে সে দিক ছড়িয়ে,
যে পার লুকে নিক।

(৩৩)

(আজ) ভুব-সাঁতারে বার কে চুপে
হার্য পূর্ণিমার !

গহন মেঘের ওপার দিয়ে
স্বপন-সীমার।

চাঁদ ! যেখানে অমন করে
(তুমি) পাগিয়ে না গো, হার,

(আজ) আনন্দের গন্ধরাজে
পূজব দে তোমার।

(৩৪)

(আজ) কাজল-সতার পাতার, 'পরে
ভ্রমর বুলেছে !

কাজল আখির জলদাতে মোর
কাজনী খুলেছে।

চন্দনী পরশে হাওরায়

(আজ) ভুবন ভুলেছে,

হিম্মলে আনন্দ ঘন

ছন্দে চলছে।

(৩৪)

(ওগো) আজ কোণার ডেউ লেগেছে
সারি গননময়।

সাগর চুরি করেছে দে,
পুতুর চুরি নয়।

চলছে যখন এমন চুরি
(ওগো) তখন কিসের ভয় ?

(আজ) চোরা চোপে চাইলে, ধরা
পড়বে না নিশ্চয়।

(৩৬)

(বল) শ্রাবণ ! তুমি শিখবে কবে
নয়ন ঝাঁকানো ?

ভুলতে তুমি বসেছ চোখ
মেলে তাকানো !

হিম যে তোমার নাকের নিশাস
(তোমার) বার না জাগানো,
পাতা বাতাস মেঝু-ফুলের
গন্ধ মাখানো।

(৩৭)

(আমার) কাজী গাখার কাজল-লতা
দিব কার করে।

কার জ্বাখির আপ্নি-কাজল
জ্বাখির ঘুম হয়ে।

(কার) পারের পাতা ছন্দ রচে
(বাগদ) মেঘের ডগ্নে !

কার পুলকে নীপ-মুকুলের
অঙ্গ শিহরে।

(৩৮)

(আমার) সকল জ্বন দোল দিলরে
জনম জনমে।

দোল দিল আনন্দ-বিবাদ
শব্দ সরমে।

* দোল দিল কামিনী-কুঁড়ি

(মোর) গোপন মরমে।

হৃদয়-তারার মাগর-দোলায়
ছন্দেই মরে !

(৩৯)

(ওগো) বাসল-মেলায় শাওন-বেলায়
আর কত নাকী !

(আমার) দোল দিয়ে গিয়েছে সে তাই
হুলছি একাকী !

হুলছে দোলা, ভুলছে না মন,
মিছাই মুখ ঢাকি,

(হ'ল) জ্বাখির লোরে ঝরম হাওয়া
মেঘের কী জ্বাখি !

(৪০)

(ও তোমার) মানের দোলা হুলছে পে কই ?
হুলছে মস্তুরে।

তুমি যে তার গেছে কেটে
অলখ মস্তুরে !

(তোমার) একলা-গরব জ্বাখির জলে
(হার) জাজ্ যে সস্তুরে।

যে কৈদে বার কাঁদিয়ে সে, হামি,
বার জনম তরে।

(৪১)

(ও সে) যগে আমার এসেছিল
কুঞ্জে স্বপ্ননী !

ছিল সে যোর কুহুম-শেবে
সকল রজনী।

ছিনিয়ে হঠাৎ কে নিল তার
(হার) কিছুই না জানি।

(গুপ্ত) তুচ্ছ ভেগে দেয়ার হা হা
আর গরজনী।

(৪২)

(মরি) আজকে করে দেবতা ডাকে
ডাকে গো দেহা !
দিনের আলোয় তার যে উকি
আকাশে আলোয় !
আজ যমুনার জম্বাট নীলে
(ও কে) জম্বা শেষ পেরা !
গায় কাঁটা তার, শিঙের ওঠে
কনক আর কেশা !

(৪৩)

(আজ) জীবন মরণ জ্বলন খালে
দোল দিচ্ছে কে !
সুখ-সুখ-সোম-ধুতুরার *
চেউ পিড়েছে কে !

(আজ) বাদল ধারার জ্যোৎস্না জড়ায়
(হার) সে রথ দেখে !
জ্বলন কোলে ঝাড়া তালের
ঝঞ্ঝাতে বেকে !

(৪৪)

(হার) অশ্রুজলের শ্রাবণ হেথ
বহু ! কোথা যাও ?
দাঁড়াও আবার জ্বলনো বাঁধি
রথ রাথ, দাঁড়াও !
মাধব ! ঐ মাধবী লতার
জ্বল পানে চাও !

(বারেক) গাও বানীতে পাগল গানের
শেষ কলিটি গাও !

(৪৫)

(ভূই) উজান বয়ে চল যমুনা !
চল অমুরাগে,
চল নিয়ে কের তুইরে ঘোদের
বধুর সোহাগে ।

চোখের কাজল কানের সোনা
(ভোরের) দিব যা' লাগে,
কাজল-গাথা আঁধার রাতে
গাইব তোর আগে ।

(৪৬)

(এবার) হিলোলা হায় বহু আমার,
বহু মধুবাণ ;—
বাদল-নিশির আঁধারে ঘোর
নাটরে প্রদীপ, হায় !
(ভবু) বাতাস আমার দোল দিতে চাও,
(ফুল) সোরভে ভোলায়,
কাজলী হুয়ে মরন জ্বরে
পরান লহরায় ।

(৪৭)

(এবার) কুটিল ! তোর জ্বলন হবে,
(আর) করিস্নে তুই রোষ ;
জ্বা হ'ল দোলায় বিবি,
তোর হ'তে কি দোষ ?
রাই-কমলের দিন গিয়েছে,
(তার) শুকাই ফল-কোষ ;
(এখন) কুব্জা-কুটিলার আঁশে,
আর কিসের আক্শোষ ।

(৪৮)

(আমার) মরন-জলের শ্রাবণ এত,
বহু এল না !
জ্বলন-দোলায় রইল পরান
(অথ) দুলতে পেল না !
হায় ! মধুবাণ এতই কি দূর
ধবর পেল না !
যমুনা কি পাগল হ'ল
অশ্রুতে লোণা ।

৩৯শ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা ব্রাহ্মণগ্রন্থে আৰ্যদিগের উত্তরকুরুবাসের প্রমাণ

(৪৯)

(ভূমি) মোহন বাঈর মধুর ডাকে
ডাকলেনা, হাঃ, আজ ;
ডাক নিচ্ছে বন্ধু ! তোমার
বাজের পাখোড়াক !
(আমার) তান-করমের সুটল কি কুল !
(যোর) টুটল গো তর লাজ !
(তোমার) অংঘরাজ পেয়ে বেরিয়ে এলাম
(ভূমি) কই গো ছদর-রাজ !

(৫০)

(হার) সুনকো-কুলের আগর-গাথা
কুলম অবসান,
কোথার প্রেমো ? কোথার প্যারী ?—
ভূন বাবধান !
শূত্র দোলা ব্রহ্মে তবু,
চলছে তবু গান !
(তবু) বাঁধছে গোকুল-গোলোক সেতু
কাজ্নী অনুরান !

ঐতিহ্যপ্রমাণ দত্ত ।

ব্রাহ্মণগ্রন্থে আৰ্যদিগের উত্তরকুরুবাসের প্রমাণ

বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুই ভাগ।
ব্রাহ্মণভাগে বস্ত্রভাগেরই সাখা, হুতরাং
ব্রাহ্মণভাগ যে মন্ত্রের পবই প্রাচীন তাহাতে
সন্দেহ নাই। এই ব্রাহ্মণভাগে উত্তরকুরু
সম্বন্ধে কোন কথা থাকিলে তাহা অবশ্যই
বিশেষ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে
হইবে। এতৎপ্রসঙ্গে আমরা সেইরূপ একটি
প্রমাণেরই আলোচনা করিব।

“ঐতরেয় ব্রাহ্মণের” একস্থলে উত্তরকুরু
সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে :—

“তন্মাদেতশ্চানুরীচ্যাং দিশি যে কেচ পরেণ হিমবস্ত্রং
জনপদাঃ উত্তরকুরুব উত্তরমর্য ইতি বৈরাজ্য্যঃ তে-
হভিবিভাক্তে। বিরাড়িত্যেতান্ অভিগিতান্ অচকতে।”

—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৮।১৫)

“হিমবানের অপরপারে উত্তরদিকে উত্তরকুরু ও
উত্তরমর্য নামক জনপদ, তথাকার লোকেরা বৈরাজ্য্য
অভিবেক করে। এইরূপে বাহারা অভিবিক্ত হই,
তাহাবিগকে বিরাড বলে।”

উক্ত বর্ণনা হইতে উত্তরকুরু ও উত্তর-

মর্যের রাজ্যগণের যে বিশেষ উপাদি ‘বিরাট’
ছিল তাহাই আমরা জানিতে পারিতেছি।
আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রে আমরা দেখিতে
পাই যে “মহু” নামের প্রথম সমাজ ও
রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা অধিরাজগণই বিরাট আখ্যা
প্রাপ্ত হইয়াছেন। যথা—

“যতেষু তেষু স্বর্গার্থং প্রবাসিবনতামিদান্।

উপদেশে স বিখ্যাতা শতরূপামনিশিতান্।

সখত্বং তথা সার্কষিতকামাতুরো দিমুঃ।

সলজ্জাঃ চমকে বেদাঃ কমলোদর যদ্বিরেঃ।

দাবদলপতঃ বিখ্যাঃ যথাক্তঃ প্রাকৃতোজনঃ।

ততঃ কালেন মহতাঃ ততঃ পুরোহিতবহুভুঃ।

যারজুঃ ইতি খ্যাতঃ স বিরাড়িত্তি নঃ ঐতম্।

অরুণগণানাত্তদবিপুলং উচ্যতে।

বৈরাজ্য যজ্ঞতে জাতাঃ বহবাঃ শাসিতব্রতাঃ।

যাজুঃ বা মহাত্মনাঃ সন্ত সন্ত তথা পরেঃ।

যারোচিষাক্তাঃ সর্গতে ব্রহ্মতুলাঃ বরুণিণাঃ।

ঐতনি প্রমুখাতরম্ সোদাঃ যঃ সন্তমোহমুনাঃ।”

ইতি যাজুঃ ৩য় অধ্যায়ঃ

“তাহার স্রষ্টাকার্য্যার্থ প্রহান করিলে বিদ্বান্ ত্রজ্ঞ।
সেই প্রণামাধমতা অনিশ্চিত। শতরূপার পানিরূপ
করিলেন এবং তাহার সহিত অতীত কামাতুর হইয়া
তিনি কাল কাটাইতে লাগিলেন। তিনি প্রাকৃত-
জনের ভাব দেখে লক্ষিত। ললনার সহিত শতবর্ষ
যাবৎ কমলগর্ভে থাকিয়া রতন করিলেন। অনন্তর
দীর্ঘকাল অতীত হইলে তাহার এক পুত্র জন্মিল।
এই পুত্র বাদেজুব মহু নামে অভিহিত। আমরা
জানিছি ঐ মহুই বিরাট পুরুষ এবং তদনুগত
তদনুসংযোগে ইনি অবিপুরুষ নামেও নির্দিষ্ট।
অপর যে সপ্ত সপ্ত ব্রতপরায়ণ মহাত্ম্যশালী বহু
মহু ত্রজ্ঞ হইতে জাত হইয়াছেন তাহারাও তথায়
বিরাট পদবী লাভ করিয়াছেন। ষারোটিবাড়ি ও
উত্তমি গ্রহিত সকলেই ত্রজ্ঞ বতপ। অধুনা তুমি
তাহাদের সত্তম নম্ণ।”

এই “পূরণ” বর্ণনার সহিত পুরোদ্ধৃত
‘ব্রাহ্মণ’ বর্ণনার তুলনা করিলে উত্তরকুরু
ও উত্তরমত্তের “বিরাট” আখ্যা যে মহাগণই
প্রথম প্রাপ্ত হন তৎসম্বন্ধে অল্প সন্দেহই
থাকে। উল্লিখিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অপর
একস্থলে উত্তরকুরু “দেবকেত্র” বলিয়া বর্ণিত
হইয়াছে। যথা—

“ই যেন (উত্তরকুরু) দেবকেত্র, মর্ত্য (মহুবা)
উহা জর করিবার অযোগ্য।” অষ্টম পুষ্কি, ৯ম বও
১-শত অধ্যায় ঐয়ুক্ত রামেন্দ্রস্বামীর ত্রিবেদীর অনুবাব—
৩৩৩ পৃষ্ঠা।

মহুসংহিতার আমরা প্রথম আখ্যাধি-
ষ্ঠানকে “দেবনির্গিত দেশ” রূপেই নির্দেশিত
দেখিতে পাই যথা—

“সরস্বতী দ্বন্দ্বতোল্যে বনভার্গবস্তরম্।

তং দেবনির্গিতঃ দেশঃ ত্রজ্ঞাবর্ষে প্রচক্ষতে।”

“সরস্বতী দ্বন্দ্বতী এই দেবনদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী
দেবনির্গিত দেশকে ত্রজ্ঞাবর্ষ বলিয়া বলা হইয়া
থাকে।”

এই প্রকারে “দেবস্থান” রূপে ত্রজ্ঞাবর্ষ
উত্তরকুরুই সহিত অভিহিত হইতেছে।

অগ্রিকপী ত্রজ্ঞা এইদেশে প্রথম উপাসিত
হইতেন বলিয়াই তদনুসারে ইহার “ত্রজ্ঞাবর্ষ”
নাম হইয়াছিল। আমরা প্রথম বিরাট্ যে
মহু নাম পুরাণে প্রাপ্ত হইয়াছি তিনিও
ত্রজ্ঞার পুত্র। সেইজন্য ত্রজ্ঞার “বরহু”
নাম হইতে তাহার নাম “বায়জুব মহু”
হইয়াছে। ইহা হইতে বায়জুব মহু যে
ত্রজ্ঞাবর্ষ বা উত্তরকুরুতেই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত
করিয়া প্রথম ‘টৈরাজ্য’ পদ লাভ করিয়া-
ছিলেন তাহা আমরা বৃষ্টিতে পারিতেছি।

বায়জুব মহু যে আখ্যাদিগের জ্যেষ্ঠ
আদি রাজা ছিলেন তাহা নহে; পরন্তু
তিনি তাহাদিগের আদি পিতাও ছিলেন।
তাহাতেই মহুর সন্তান বলিয়াই সমগ্র
মানবজাতিই ‘মহু,’ ‘মহুবা,’ ‘মাহুবা,’ ‘মহুবা’
‘মানব’ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতীর
জ,বায় এই সম্বন্ধের ইতিহাস যেক্রম
স্থাপিতকরে সংরক্ষিত হইয়াছে এক্ষণ আর
অন্ত কোন দেশের ভাব্যই দেখিতে পাওয়া
যায় না। ইহাতে মহুর কহিত ভারতীর
আখ্যাদিগেরই সর্বিশেষ বনিষ্ঠতার পরিচয়
পাওয়া যায়। এই প্রকারে মহু ভারতীর
আখ্যাদিগের আদি পিতা ও উত্তরকুরু
আদি রাজা বলিয়া বহন প্রতিপন্ন হইতেছেন
তখন তৎসঙ্গে সন্ধেই যে ভারতীর আখ্যাদিগের
উত্তরকুরুতে আদিবাসও প্রতিপাদিত
হইতেছে তাহা আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন
করে না।

ঐশ্বতলস্ব চক্রবর্তী।

বর্ষা-নিশায়

আজিকে ঘেঘেতে ঢাকা নিশীথ নির্জন,
বায়ু কোথা দূর দূরে যায় নিশ্বসিয়া —
যুবিকার যুগ গদ্য করি আদরণ ;
অন্ধকারে বনভূমি ওঠে মর্দরিয়া ।
তারাহীন দীপ্তিহীন আধার নিশার,
নিভ্রাণ কোলেতে ময় নিখিল নিশ্চল ;
রহি রহি গরজিয়া মর্দবেদনাগ
ঢালিছে নীরদ রাশি বন অবিরল ।
আজ তুমি কত দূরে ? উঠিছে ভাসিয়া
জলন্ত মূৰ্ত্তি তব জলি-দগুপণে ।
স্বপ্ন দূরের পানে চাহিয়া চাহিয়া—
কবে যার অশ্রু শুধু এই নিরলসে ।
জ'জনের মাঝে আজি অসৌম্য অশাণ—
ফেনিল সাগর করে উদ্ভাণ নর্তন !
তুমিনা তোমার বার্তা—পশে না গো আর
এ পারে ;—কেবলি শুনি সিদ্ধ-গরজন !
নয়নের স্প-আলো হরণ করিয়া,
দগুপের মাঝে স্থজি অপার দূরতা —
গিরিছ চলিয়া তুমি । তবুও ধরিয়া
রাখিবারে চাহি আমি ; এ কি এ মূঢ়তা !
যাও তবে, ওগো চিরবসন্ত জীবন,
যথা কুটে শ্রী'ত-কুল পুষ্প রাশি রাশি,
যথা বহে কুলগজী মলয় পবন,
যথা আছে চির স্নেহ, চির মধু হাসি ।
তুমি যাও স্নেহ যথা ; আমি থাকি তবে
আমারি আধার-ভরা দগুপের তলে
চির-স্নেহ ;—দীপসম স্মৃতি জেগে রবে
আধার নিররে মোর । যাও তবে চ'লে ।
শ্রীঅনঙ্গমোহিনী দেবী ।

সমালোচনা

আকাশ-প্রদীপ। ঈশ্বর অপরূপ রায় এম. এ. এম্ভিড। একাশক, ইনসিনিয়ার তটপানী এম. এ. নির্দল সূত্র, ঢাকা। ঢাকা, ইইবেলল প্রিটিং এও পাবলিশিং হাউসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। লেখকের বক্তব্য কি, ঠিক বুঝা গেল না—ছাংখের বিদ্য, সন্দেহ নাই। আমাদের নিত্যজীবী হোমলির মতই ঠেকিল। গ্রন্থখানি নাটকীয় ধরণে লিখিত। মাঝে মাঝে কবিত্ব আছে, তবে তাহার উপর চকিত আবার লেখক হোমলির লাল চাপা দিয়েছেন। গ্রন্থের ছাপা কাগজ খারাপ তাল।

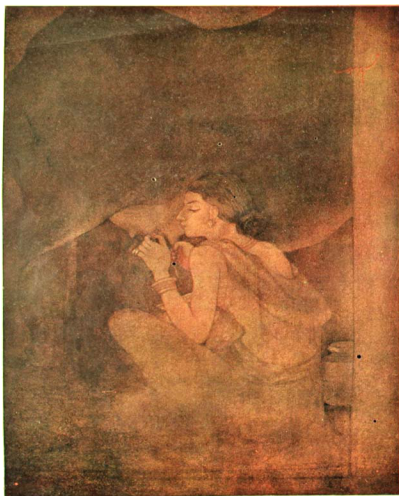
আহতের সত্ত্ব সেবা। ঈশ্বর বীরেন্দ্র-কিশোরী বন্দোপাধ্যায়, এল, এম, এল, এম-আর-স্তান-আই, এম-আর-আই-পি-এচ্, এম্ভিড The Indian Manual of First Aid নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। ভারতীয় বিত্তি ভাষার এই মূল গ্রন্থখানির অনুবাদ বহুপূর্বে একাশিত হইয়াছিল—কেবল বঙ্গভাষায় ইহার কোন অনুবাদ ছিল না। গ্রন্থখানি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এতদ্যক গৃহে পল্লিকার মতই স্থানপাতের যোগ্য। লেখক ইত্যর বঙ্গানুবাদ একাশিত করিয়া দেশের প্রচুত উপকার সাধন করিয়াছেন। সহসা সাহিত্যিক কোন দৃষ্টান্তে গটলে ডাক্তার ডাকিবার পূর্বে বাড়ীর কোন আহতকে কতখানি সাহায্য করিতে পারেন, এ গ্রন্থে তাহারই বিপদ আলোচনা আছে। তবে সেই সঙ্গে একটা বিষয়ে সঞ্চলকেই সতর্ক করা হইয়াছে, যেন কেহ চিকিৎসার চেষ্টা না করেন—কারণ তাহা কেবল শিক্ষিত ডাক্তারেরই অধিকারভূক্ত। গ্রন্থখানি এসেসের উপযোগী করিয়া বেশ গরোখা ধরণে লিখিত। তবে বঙ্গানুবাদে ভাষার বেশ বড় বৈধি রহিয়া গিয়াছে। তাহার কলে স্থানে স্থানে লেখকের বক্তব্য পরিষ্কৃত

হয় নাই। লেখক কোন পাক লেখকের সাহায্য লইয়া ইহার তাল গুথরাইয়া লইলে ভাল করিতেন। আশা করি, বিত্তীয় সংকল্পে এই সম্মাপ্ত বোধ নিবারণিত হইবে। এত-বড় প্রয়োজনীয় গ্রন্থে ভাষার সলগতা থাকি নিত্যের বরকাত। বহিখানির আকার ক্ষুদ্র, অনায়াসে পকেটে রাখা চলে।

তাই তাই—ঈশ্বর কাশিকচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ভিড। কে, ডি, সেন এও ব্রাহ্মণ কর্তৃক একাশিত। মূল্য হয় আনা।

হেলেনেরের মন্ত লিখিত কাশিকবাবুর "সামিতি" যেমন আদর লাভ করিয়াছে আমাদের বিখ্যাস এই গ্রন্থও তেমনই আদর লাভ করিবে। এখানি শিশুদের মন্ত লিখিত ছড়ার বই। এ ছড়া প্রাচীন ছড়া নয়, কাশিকবাবুর তৈরি নতুন ছড়া। মাত্র দুই চার বৎসর লাইনের মধ্যে আবদ্ধ বিভক্ত হলে গাঁথা এই কবিতার টুকরাগুলি শিশুদের আনন্দ বর্ধন করিবে এবং তাহাদের কল্পনারাজ্যে যে সমস্ত ছবি আঁকাবার মত বিখ্যাস প্রদিতহে, ইহারই সাহায্যে সেগুলি জীবন্ত হইয়া উঠিবে, এবং শিশুরা নতুন কল্পনারও সম্ভান পাইবে। বইখানির পাতার পাতার রবিন—বহুপূর্বে রচিত ছবি আছে। ছাপা কাগজ খুব চমৎকার।

ফুলফুলি—ঈশ্বর কাশিকচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ভিড। কে, ডি, সেন এও ব্রাহ্মণ কর্তৃক একাশিত। মূল্য হয় আনা। এখানি "তাই তাই"রের ভূড়ি। ইহা শিশুজীবনের কবিতা এবং তাহারই রবিন ছবিতে ভরপুর। পঠন পঠিপাঠে এই বইখানি বইই ইংরাজি শিশুপাঠ্য গ্রন্থের সঙ্গে একাধানে স্থান পাইতে পারে। পুস্তক বাজারে কাশিকবাবুর বই দুইখানি শিশুদের প্রলুব্ধ করিয়া তুলিবে সন্দেহ নাই।



ବ୍ରଜାତା

ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ବନ୍ଧୁ ଅଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଚଢ଼ିତେ

ভারতী

৩৯শ বর্ষ]

আগ্নি, ১৩২২

[৬ষ্ঠ সংখ্যা

জীবন মরণ

আমি যে বেদেছি ভালো এই অগতেরে ;

পাকে পাকে ফেরে কেবে

আমার জীবন দিয়ে অড়ারেছি এর ;

প্রভাত সন্ধ্যার

আলো অন্ধকার

মোর চেতনায় গেছে তেলে ;

অবশেষে

এক ধরে গেছে আজ আমার জীবন

আমি আমার ভুবন ।

ভালোবাসিরাছি এই অগতের আলো

জীবনেরে তাই বাসি ভালো ।

তবুও মরিতে হবে এও সত্য জানি ।

নোর দাপি

একদিন এ বাতাসে কুটিবে না,

মোর আঁখি এ আলোকে লুটিবে না,

মোর হিয়া ছুটিবে না

অরণ্যের উকীল আছানো

মোর কানে কানে

রজনী ক'বে না তার রহস্যবারতা,

শেষ কবে' যেতে হবে শেষ দৃষ্টি, মোর শেষ কথা ।

এমন একান্ত করে' চাওয়া

এও সত্য যত

এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া

সেও সেই মত।

এ ছয়ের মাঝে তবু কোনাথানে আছে কোনো মিল ;

নহিলে নিখিল

এত বড় নিদারুণ প্রবন্ধনা

হাসিমুখে এতকাল কিছতে বহিতে পারিত না।

সব তার আলো

কীটে কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কালো ফুল

সে কোন্ পাহাড় তা আমি জানিনা ;
কিন্তু এটা আমার মনে পড়ে দেবদারু-
বনের কাঁক দিগে একটা বরফের পাহাড়
বেশা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে সেই পাহাড়ের
দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আমার গায়ে
এসে লাগছে—আর ছোট একটি চৌমের
গাম্ভীর্য আমাকে নিয়ে একটা পাহাড়ী-
মেয়ে বাজারে বেচতে এসেছে।

সেখানটার সেদিন ফুলের বাজার
বসেছিল ;—লাল নীল হলুদে মাঝা সে কত
ফুলগাছ ! সাহেব বিবির। সেই সব
ফুলগাছ কিনে নিয়ে যের কিরছিল, কেবল
কেসাংসু—কালোফুলের গাছ—আমাকে কেউ
নিতে চাইলে না।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে ; পাহাড়ের গা

যেরে সাধা কুয়াশা থেকে জোরে এক
শঙ্গা বৃষ্টি নেমেছে ; হু-আমার এক বাঙালীর
যেরে আমাকে বেচে পাহাড়ী মেয়েটা
ভিন্নতে ভিন্নতে চলে গেল।

আমার কালো ফুল তখনো ফোটেনি।

তারপর অনেকদিন চলে গেছে।
কলকাতার একটা অন্ধকার গলির ছোট
বাড়ির ছাদের আলসের তারা আমাকে
এনে রেখেছে। কারো আদর পাইনে, কারো
বড় পাইনে ; কেবল বাবুদের ছোট মেয়ে
মাগী আমাকে নিয়ে খেলা করে, ঐত্যাৎ
অল দিগে আমার গা ভিঝিরে দেয় আর
তার বড় বড় দুটি কালো চোখ নিয়ে
অনেকক্ষণ ধরে আমার দিকে চেয়ে থাকে।
সে কি ভাবে তা সেই জানে, কিন্তু তার

কালো চোখের আলোতে আমার সব
প্রাণটা যে একটা কালো ফুল হয়ে ফুটে
উঠবার ক্ষেত্রে আকুলি-বাকুলি করছে
দেউ আমি বেশ বুঝতে পারি।

হঠাৎ একদিন প্রকাণ্ড একটা অশ্বপুং
কাণো ফুল হয়ে দেখা দেবার উৎকট লাগল।
আমাকে শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর
থেকে যৌবনে বাড়িয়ে তুলেছে। যাহূবের
এমন হয় কি? জানিনে কেন, এতজ্বরে
সমস্ত বসন্ত কাগটা ধরে গুটির ভিতরে
গুটি-পোকার মত আপনার ভিতরে আপনি
আমি একবারে অসাড় হয়ে পড়ে আছি!
চারিদিকে আমার যখন হাওয়া বইছে,
পাখী গাইছে, আমার আশপাশের ছাদের
টেবে সব গাছগুলো অজস্র নূতন নূতন
পাতা ফুলছে, ফুল ফোটাচ্ছে তখন আমি
কেবল এ সকলের সঙ্গে আড়ি দিয়ে
রয়েছি—সম্পূর্ণ নিষ্কট।

লোকে আমার বেখে আবকাশ বলছে
রাশির গাছের মরণদশা উপস্থিত ! কিন্তু
আমি জানি আমি কালোফুল ; বেল চাপা
ফুল কবীর মত জীবনের ঐশ্বর্য্য নানা-
বর্ণে নানা ছন্দে নিত্য ছুটিয়ে তোলা
আমার কাজ নয়, জীবনের শেষদিনটিই
হচ্ছে আমার কেটিবার দিন—বেদিন আমার
সকল ঐশ্বর্য্য তার সমস্ত শোভা সমস্ত রং

এক-কুরে-নিরে দেখা দেবে—কালো-ডানা
প্রকাণ্ড একটি প্রমাণিত মত—ভোরের
অন্ধকারে চপি চপি।

কোন হুদিনে বে রানীর বিয়ের জল
 ফুটো, কেব দাঁখী বাজলো, বর এলো
 হুটু গোলাপের মত রানীকে তারা এখন
 থেকে সেখানে জুলে দিয়ে গেল তা আমি
 জানিনে। আমার বর তখন আমার দিকে
 আসছিল বহু পূর থেকে, আমি তার
 আসার পথে সমস্ত ঘন পেতে দিয়ে
 শুনছিলেম—বুকের মাঝে তারই বরষাভার
 বিপুল। অয়োজনের কক্ষক্স্ স্মৃতিস্ম
 ধবনিটার।

শেষে শ্রীমতের হাওয়ার রেদিন আমার
গ্রেমের পাশ ভরে উঠেছে, সারাসাতের
অবিশ্রান্ত শিলাবুটি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে—
আমাকে বেঁধে রেখেছিল যে ত্রিবিচিত্র
চীনের টব্ স্কেট—সেই দিন অকালের
বারলে আর ঝড়বাতের শব্দধ্বনির মাঝে
আমার মূল ফুটলো! বাসা-বাড়ির আল্পে
ছেড়ে দিয়ে এলুম আমি আমার মারের ঘরে
পথের পরে—বিরের কনে এলো-খোঁপা
কালো ফুলে সাজিয়ে। রথের চাকার আমার
বৃক্কের পাঞ্জর ভেঙে দিয়ে দেখা দিলেন
আমার বর—পথের শেষে হৃদ্বিনের সে
কালো ফুলের কালো ভ্রমর।

श्रीचरनीप्रनाथ ठाकुर ।

অবিমারক

অবিমারক নামক নবাবিভূত ভাসের নাটকখানি নারকের নাথান্সসমে নাম-প্রাপ্ত হইরাছে। সাধারণতঃ সংস্কৃত নাটক নাটিকা নারিকা বা নারক-নারিকার যুগল-নামে খ্যাত হয়। রত্নাবলী শালতীমাধব প্রভৃতি নাম-গুলি ইহার প্রমাণ। “চণ্ডকৌশিক” “প্রগম-রাশব” প্রভৃতি নামকরণে নাটকের নারক বা অপার কোনও প্রধান পুরুষ চরিত্রের নাম প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কেবল নারকের নামে নাটক সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। ভাসের “অবিমারক” ও “চাকমত” নাটকদ্বয় নারকের নামে আখ্যাত হইরাছে।

অবিমারকের জন্ম-কাহিনী এইরূপ :—
সুদর্শনা ও সুচেতনা দুই সহোদরা। সুদর্শনার সহিত কানীরাঙ্গের ও সুচেতনার সহিত সৌবীররাজের বিবাহ হয়। অগ্নি হইতে সুদর্শনার এক পুত্র উৎপন্ন হয়। সুদর্শনা সেই পুত্র সুচেতনাকে প্রদান করেন। প্রসব-সময়েই সুচেতনার এক পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুদর্শনার পুত্র লইয়া মৃতপুত্রের স্থানে স্থাপন করাতে জনসাধারণ সুদর্শনার পুত্রকে সুচেতনার পুত্র বলিয়াই আনিতে। সৌবীররাজ পুত্রের নাম রাখিলেন বিষ্ণুসেন। বিষ্ণুসেন বখন ষালক, তখন ধুবকেতু নামক এক অত্র সৌবীররাজ্যে আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। ষালক বিষ্ণুসেন সমবয়স্ক ষালকগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে

বিস্ত্রস্তকেশে ধূলিধূসরিত কলেবরে এই ষালকের নিকট গিয়া পড়েন। ষালক-রক্ষীগণ সুরাপানমত্ত হইয়া নিজ কর্তব্য অবহেলা করিতেই বিষ্ণুসেন এই অঙ্গুরের নিকট গিয়া পড়িয়াছিলেন। অত্র বিষ্ণুসেনকে স্থান্যর আহার মনে করিয়া গ্রাস করিতে উজ্জত হইলে নিরস্ত্র বিষ্ণুসেন এক আঘাতে এই অঙ্গুরকে বিনাশ করেন। এই ধুবকেতু “অবি” নামেও পরিচিত ছিল। “অবি”কে বধ করার বিষ্ণুসেন “অবি মারক” নামে বিখ্যাত হইলেন।

অবিমারক যৌবন প্রাপ্ত হইলে একদিন সৌবীররাজ যুগলা করিতে অরণ্যে গমন করেন। চণ্ডভার্গব নামক এক গুণি কান্তপ নামক শিষ্য সমভিষাহারে সৌবীররাজ্যে আগমন করিতেছিলেন। যে অরণ্যে সৌবীররাজ শিকারার্থ গমন করেন, সেই অরণ্যেই কান্তপ ব্যাক্তকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া অকালে নিহত হয়। যুগলা-বিহারী রাজাকে সম্মুখে পাইয়া চণ্ডভার্গব রোষে তিরস্কার করিতে থাকিলে, সৌবীররাজ বলেন, “তুমি ক্রোধের দাস। তুমি কি মূর্খ? তুমি চণ্ডাল।” এই কথা শুনিয়া চণ্ডভার্গব অতি ক্রোধে শাপ দিলেন—“আমি চণ্ডাল? তুমি ক্রীপুত্রসহ চণ্ডালও প্রাপ্ত হইবি।” সৌবীররাজ তখন অহতস্ত হইয়া শাপ-মোচনের জন্ত চণ্ডভার্গবের বহু আরাধনা করিলে গুণি বলিলেন, “এক বৎসর চণ্ডালও প্রাপ্ত হইয়া ছদ্মবেশে কাল যাপন কর। পরে নিজ-

প্রকৃতি পুনঃপ্রাপ্ত হইবে।” এই শাপ বশে সৌধীররাজ, তাঁহার ত্রী পুতেকনা ও পুত্র অবিমারক চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া ছদ্ম-বেশে কুন্তিভোজের রাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন কুন্তিভোজের কস্তা কুন্দী সখীগণসহ উজ্জান বিহার করিতেছিলেন, এমন সময় অন্ননগিরি নামক রাজহত্যা মদমত্ত হইয়া সেই উজ্জানে প্রবেশ করিল। বীর রক্ষীগণ হস্তীকর্তৃক নিহত হইল। কুরঙ্গীর সখীগণ আত্মনাশ করিতে লাগিল। হস্তী কুরঙ্গীর শিবিকার নিকট উপস্থিত, এমন সময় চণ্ডালত্ব-প্রাপ্ত অবিমারক সেইখানে উপস্থিত হইয়া রাজহত্যাকে বাধা দিলেন। তাঁহার ভাড়াটা হস্তী রাজকুমারীর শিবিকার প্রতি লক্ষ্য ভাগ্য করিয়া অবিমারককে আক্রমণ করিল। কিন্তু অবিমারক অপূর্ণ কৌশলে সেই মদমত্ত হত্যাকে শীঘ্রই বশ করিলেন। কুরঙ্গীও অস্ত্র-পুরে প্রবেশ করিল।

এই প্রথম দর্শনেই অবিমারক ও কুরঙ্গীর প্রণয়সম্বন্ধ। কুরঙ্গী বিরাট-কাতরা হইয়া ধাত্যকে অবিমারকের নিকট পাঠাইল। অবিমারকও কুরঙ্গীর দর্শনে উৎকণ্ঠিত। স্থির হইল, মিশ্রিখে গোপনে অবিমারক অস্ত্র-পুরে প্রবেশ করিবেন। রাজবাড়ীর সংস্থান জানিয়া গাইরা সেই রাজ্যেই অবিমারক চোরের বেশে রাজ-অস্ত্র-পুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় কুরঙ্গীর সহিত তাঁহার মিলন হইল। অবিমারক অস্ত্র-পুরেই বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ স্ত্রের দিন অধিককাল স্থায়ী হইল না। কুন্তিভোজ

সমস্ত বাণীয়ার জামিতে পারিলেন। কিন্তু সতর্ক প্রহরী বসিবার পূর্বেই অবিমারক অস্ত্র-পুরে হইতে পলায়ন করিলেন।

পলায়ন করিলেন বটে কিন্তু সতর্ক প্রহরী অস্ত্র-পুরে তাঁহার পুনঃপ্রবেশের উপায় রাখিল না। তখন অবিমারক আত্মহত্যা করিতে উত্তম্ব হইলেন। প্রথমে তিনি অগ্নি-প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তিনি অগ্নিরই পুত্র। সেই অস্ত্র অগ্নি তাঁহাকে বধ করিলেন না। শেষে তিনি পর্বতশিখর হইতে লক্ষ দিগা প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেন।

এই সময় আকাশ-বানে বেৎমান নামক বিজ্ঞান সৌদামনী নামক পত্নীর সহিত সেই পর্বতে অবতরণ করিল। অবিমারকের অবস্থা দেখিয়া রূপা-শরতন্ত্র হইয়া বিজ্ঞান কুরঙ্গীর সহিত গোপন-মিলনের উপায়-স্বরূপ এক অঙ্গুরীর অবিমারককে দান করিল। এই অঙ্গুরীর দক্ষিণ হস্তে যে ধারণ করে সে অদৃষ্ট হয়। তাহাকে যে স্পর্শ করিয়া থাকে, সেও অদৃষ্ট হয়। আবার অঙ্গুরীটি বাম হস্তে ধারণ করিলে সে সকলের দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। এই অঙ্গুরীর পাইরা অবিমারক নিজ মিত্র বিদূষকসহ অদৃষ্ট-ভাবে পুনরায় কুন্তিভোজের অস্ত্র-পুরে প্রবেশ করিলেন।

অস্ত্র-পুরে কুরঙ্গী তখন উৎকণ্ঠে প্রাণত্যাগ করিতে উত্তম্বা। সহসা অবিমারকের আবির্ভাবে ও বাধাদানে তাঁহার সে সকল দূর হইল এবং উভয়ের পুনর্মিলন হইল।

এদিকে কুন্তিভোজ কুরঙ্গীর সহিত বিবাহ দিবার অস্ত্র কাশীরাজের পুত্র অদ-

বর্ণাকে আবাহন করিয়াছিলেন—“অরবর্ণার সঙ্গে তাঁহার মাতা অরবর্ণাও আসিয়াছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে এই অরবর্ণাই অবিমারকের জননী। অরবর্ণা সৌবীরহাজপত্নী হুতেনাকে পুত্র দান করিতেই হুতেনাই অবিমারকের মাতা বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। নারদ আসিয়া সকলের সম্মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া দিলেন। তখন কুব্জীর সহিত অবিমারকের এবং কুব্জীর কনিষ্ঠা ভগিনী অমিত্রার সহিত অরবর্ণার বিবাহ হইল।

অবিমারক নাটকের মূল ঘটনা এইরূপ। আমরা অবিমারক সম্বন্ধে যে যে বিষয় আলোচনা করিব, তাহা সম্যক বুঝিতে হইলে নাটকের ঘটনাটি ঘোঁড়াঘুটি জানিয়া রাখা একান্ত আবশ্যিক। তাই সৰ্ব্বাঙ্গে সংক্ষেপে নাটকের আখ্যান-বস্তুর পরিচয় প্রদত্ত হইল।

অবিমারকের আখ্যানবস্তুর ভাস্কর স্বকপোলকল্পিত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। এমন কি অনেকে এরূপ মতও প্রকাশ করিয়াছেন যে, সংস্কৃত মালতীমাধব প্রভৃতি নাটকের ঘটনার অনুকরণে অবিমারকের ঘটনা-সৃষ্টি হইয়াছে। কোনও সমালোচক ভাস্কর বহু-পরবর্তী কবি বলিয়া এমন মতও প্রকাশ করিয়াছেন যে ভাস্কর পুত্রক ভবভূতি প্রভৃতি নাট্যকারের আখ্যান-বস্তুর অনুলয়ন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখাইব যে অবিমারকের কাহিনী বহু প্রাচীন ও কোন কবি-বিশেষের নাট্যকার্যের রচিত নহে।

প্রাচীন ভারতে বহু কিম্বদন্তী ও

গল্পের প্রচলন ছিল। এই সকল গল্প রূপান্তরিত হইয়া বিদেশীয় ভাষাতেও স্থান পাইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীর সহিত বিদেশীয় গল্পসমূহের অদ্ভুত সাদৃশ্য ইহার অসম্ভব প্রমাণ। পুৰাতন কাহিনী বা কিম্বদন্তী পূর্বে জনসাধারণের মুখে-মুখেই চলিয়া আসিত; পরে স্বাক্ষরিত হইয়া স্থান লাভ করে। এই সকল কাহিনীর মূলে কোনও মত বটনা নিহিত আছে কি না, থাকিলে সে মত কতটুকু, ও সেই ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া কতটা মিথ্যা সংযোজিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কিন্তু ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে এই সকল হস্তপ্রাচীন কাহিনী-অনুলবধনে যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে, অজ্ঞাত স্বকপোলকল্পিত নাটকের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য দেখা গেলে প্রথমোক্ত নাটকগুলি যে শেষের অনুকরণ, তাহা বলা যাইতে পারে না। বরং শেষোক্ত নাটকগুলিই প্রথমোক্ত নাটক-সকল বা ঐ সকল নাটকের মূল কিম্বদন্তী অনুকরণ করিয়াছে বলা যাইতে পারে।

সামান্য ও মহাভারতের ঘটনা লইয়াই ভাস্কর অধিকাংশ নাটক রচিত। “পঞ্চরাত্র” “দুর্ভট্টাৎকট”, “উক্কতন” “কর্ণভার”, প্রভৃতি নাটক ইহার প্রমাণ। আর কতকগুলি নাটক প্রাচীন কিম্বদন্তী-মূলক। উদয়ন ও বাসবদত্তার কাহিনী অতি প্রাচীন ও সুপরিচিত। এই কিম্বদন্তী দ্বারা আকারে “বৃহৎ-কথা”, “কথা-সংলগ্নাগর” প্রভৃতি গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এই চিরস্তন কাহিনীর উপর ভাস্কর “বৃহৎ-

বাসবদত্তা” ও “প্রতিজ্ঞা-যোগদ্ধারণ” নাটকের প্রতিষ্ঠা। শ্রীহর্ষের “রত্নাবলী” প্রভৃতি নাটকও এই উদগনের কাহিনী অবলম্বন করিয়াছে।

এইরূপ এক প্রাচীন কাহিনীর উপরই অবিমারকের ভিত্তি। কেবল অশ্বমদ সাহায্যে আমরা এ কথা বলিতেছি না, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা ইহা প্রমাণ করিব।

বাংলাদেশ-প্রসিদ্ধ “কামহুত্ৰ” একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ। যুঃ পুঃ চতুর্থ শতাব্দী ইহার রচনা কাল। ইন্দ্রপাদ উপাধিধারী বশোধর এই গ্রন্থের জরমঙ্গল নামক একখানি টীকা রচনা করিয়াছেন।

কামহুত্ৰের পঞ্চম অঙ্করণের চতুর্থ অধ্যায়ে আছে :—“অহল্যাবিহারকশাস্ত্র-লাগীজ্ঞাতাপি শৌকিকানি চ কথয়েৎ।” অর্থাৎ “অহল্যা, অবিমারক, শকুন্তলা প্রভৃতি ও অন্যান্য শৌকিক কাহিনী বলিবে।” দ্বিতীয়ে কিরূপ ভাবের কথাই অবতারণা করিতে হইবে, তাহার প্রসঙ্গে এই পংক্তি লিখিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে “অবিমারকের” কাহিনীর উল্লেখ রহিয়াছে। ব্যাংজারনকৃত পুরোদ্ধৃত মূল হুত্ৰাংশে অবিমারকের কাহিনীর কোনও বিশদ পরিচয় পাওয়া যায় না বটে কিন্তু উক্ত হুত্ৰের “জরমঙ্গল” নামক টীকায় অবিমারকের আখ্যানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে :—“অগ্নিহোত্রকেপায়ি পরিচরণে বধূনিবৃত্ত। সা চ কুণ্ডলধিতেন স্তম্ভিতা অগ্নিনা কাষিতা। আতগর্তাক তং যত্তরঃ কুলদোষভগ্নাদটব্যং তত্ৰাণ। প্রহৃত্যক সহ স্তনেন শবর-সেনাপতিরপত্যবুদ্ধা সংবর্জিত-

বান্। তৎপুত্রশ্চ আশাবিকসমুদেন বাসব-
সদ্যং ক্রৌড়নানঃ পরিএবন্ তৎকীর
পানাম্ভগাবলোহভূদ্ যেন শিক্তরোং হস্ত-
গ্রহণাদশাবিকং অদান, সেনা-পতির
শাযর্থমজ্ঞ নাম চক্রে ‘অবিমারক’ ইতি।
ততঃ প্রবৃদ্ধযৌবনঃ কদাচিত্ত্রাজোহটয়াং
সমাবলিতস্য হুহিতরং হস্তিনা ব্যাপাদমানাং
তং হত্বা রক্ষ। ততো জাতোত্যকর্তা সা
ব্রহ্মসেব পাণিং গ্রাহিতবতী।”

ইহার মর্ম এই :—এক বধু অগ্নিহোত্র
অনল রক্ষার ভার গ্রাপ্ত হয়। অগ্নি-পরি-
চরণে নিযুক্ত। সেই বধু অগ্নিকুণ্ড হইতে
উপিত স্তম্ভিনান অগ্নিকর্তৃক ভুক্ত। হন।
তাহাকে সগর্ভা দেখিয়া তাহার যত্তর কুল-
কলঙ্কের ভয়ে তাহাকে অরণ্যে পরিত্যাগ
করেন। সেইখানে বধু পুত্রসন্তান প্রসব
করেন। শবর সেনাপতি বধুকে ও তাহার
পুত্রকে নিজ পুত্রসম করিয়া প্রতি-
পালন করেন। সেই পুত্র ছাগপালবিগের
সহিত বাল্যে ক্রৌড়া করিতে করিতে হুত্ৰ-
পানে মহাবলসম্পন্ন হইয়া উঠে এবং শিক্ত
কালেই বহুস্তে ছাগপালকে বধ করে।
শবর-সেনাপতি তখন ইহার সার্বক নাম
দেন, ‘অবিমারক।’ ক্রমে যৌবনগ্রাপ্ত হইলে
অবিমারক এক সময়ে বনে হস্তী-কর্তৃক
বধ্যমান রাজার হুহিতকে হস্তী নিধন
করিয়া রক্ষা করেন; তাহার পর জাতাহুবাগা
সেই রাজপুত্রী নিজেই উত্তোগ করিয়া অবি-
মারককে বিবাহ করেন।

এই কাহিনীর সহিত অবিমারক নাটকের
ঘটনার সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। নাটকে
অবিমারক অগ্নির পুত্র ইহামাত্র উল্লিখিত

আছে; কিন্তু কিরূপে অধির উন্নত তাহার জন্ম হয় এমন কোনও পরিচয় প্রদত্ত হয় নাই। বাৎসর্য্যের জন্মকাল টীকার সে কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে। অবিমারকের মাতা অরণ্যে পরিত্যক্তা হন, সেখানে অবিমারক পবন দ্বারা প্রতিপালিত হন প্রভৃতি কাহিনী নাটকে বীকৃত হয় নাই। কারণ ভাস নিজ নায়ককে রাজপুত্র করিয়া অংকায়না করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন কিম্বদন্তীতে অবিমারক রাজপুত্র কি না তাহার উল্লেখ নাই। বরং রাজপুত্র না হওয়াই সম্ভব। নিজের অসীম শক্তিতে সে ছাগপালকে বধ করিয়াছিল। হত্যাকে বধ করিয়া রাজকুমারী' প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, এইজন্য রাজকন্যা তাহাকে বিবাহ করিতে উৎসাহিত হইরাছিলেন। এক অগ্নি হইতে জন্ম ভিন্ন প্রাচীন কাহিনীতে অলৌকিক কিছুই নাই। আর অগ্নি হইতে জন্মের বিবরণটাও যে অবিমারকের অতুল শক্তি কোথা হইতে আসিল তাহাই বুঝাইবার ক্ষমতা নাই হইয়াছে, ইহাও বেশ যুক্তিতে পারা যায়। ঠরত সত্যই কোনও বধু অরণ্যে পরিত্যক্তা হইয়া মধ্যবলসম্পন্ন সন্তান প্রসব করে। সে পরে নিজ পৌরো রাজকুমারীকে মুক্ত করিয়া তাহাকে বিবাহ করে। এই সাধারণ ঘটনাটিই কিম্বদন্তীর আকারে প্রচলিত ছিল। এইরূপ এক বপার্শ্ব ঘটনা ঘটী কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। ছাগপাল বধ করিয়া অবিমারক নাম-প্রাপ্তিও কিছুমাত্র অলৌকিক নহে।

কিন্তু অলঙ্কার-শাস্ত্রাভ্যাসী সংকৃত নাটকের নায়ক হীন পাত্র হইতে পারে না। কাজেই ভাস অবিমারককে রাজপুত্র

রূপে খাড়া করিলেন। প্রাচীন কাহিনীতে ছিল, রাজকন্যা নীলমাতীর যুবক অবিমারকের প্রতি অহরন্তর হন। ইহা কথঞ্চিৎ বজায় রাখিতে ভাস করিলেন অবিমারক বপার্শ্ব রাজপুত্র বটে কিন্তু অধির পাণে তিনি চণ্ডালদ্ব্য প্রাপ্ত হন। অধির পাণের অলৌকিক কাহিনী এইরূপে অবতারণিত হইল। ছাগপালবধ ততটা বিষয়কর নহে—ভাস তাই অহর-বধের কাহিনী সৃষ্টি করিলেন।

অবিমারক নাটকখানিতে প্রাচীন কালের সমাজের চিত্র কিরূপ আঁকিত হইয়াছে, তাহা এইবার প্রদর্শন করিব। কুরঙ্গীর প্রতি অহরন্তর অবিমারকের গোপনভাবে রাজাস্ত্র-পুর-প্রবেশ প্রশংসনীয় কার্য্য নহে। প্রাচীন কাহিনীতে বেকর ছিল, হীন অর্থহীন যুবক রাজকুমারী প্রেমে বরং এক্ষণে সামাজিক কার্য্য করিলেও করিতে পারিত। অস্ত্রপুরে প্রবেশ খারিত হইলে আত্মহত্যার সংকল্পও তাহার পক্ষে বিচিত্র নহে। কিন্তু নাটকের নায়ক অবিমারক যুবরাজ। তাহার সহিত কুরঙ্গীর বিবাহের প্রস্তাবও হইয়াছিল। অল্প দিন পরেই তাহার চণ্ডালদ্ব্য ব্রূ হইত। নিজ পরিচয় দিয়া কুরঙ্গীর পাণিপ্রার্থনা করিলে সে প্রার্থনা সফল হওয়ায়ই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কাজেই নাটকের অবিমারকের আত্মহত্যার চেষ্টা ততটা সম্ভবপর মনে হয় না। কুরঙ্গীর আত্মহত্যার চেষ্টাও প্রাচীন কাহিনীর নায়ক থাকিলে বড় দুশ্চরিত্র মানাইত। হীন যুবককে আত্মদান করিয়া তাহার অভাবে, লজ্জায়, হতাশে আত্মহত্যার উদ্যোগ বেশ স্বাভাবিক হইত।

কিন্তু সংস্কৃত নাটকের নায়ক “প্রথাভ-
বংশ” রাজা হওয়াই চাই। ভাস তাই
অবিহারকে রাজপুত্র করিয়াছেন;—
নাটকের অবিহারক ও কুরঙ্গীর আচরণ
গুলি অতিরিক্ত ভাবাতিশ্যের সোাতক
(Sentimental) বোধ হইলেও “কামত
বামা গতিঃ” এই ঘটন-অংশদ্বয়ে তাহার
কথাক্রমে সমর্থন করা যায়।

প্রাচীন ভারতে রাজ-অন্তঃপুরে বহু
রমণীর লভ্য হেতু সময় সময় তাহাদের
কাহারও কাহারও চরিত্রভ্রংশের সম্ভাবনা
ঘটিত। বাৎস্তারনের কাম-সুত্রে ইহার
লক্ষ উল্লেখ আছে। অন্তঃপুর সতর্কভাবে
রক্ষিত হইলেও বাহির হইতে পুরুষগণ
নানা কৌশলে তথায় প্রবেশ করিত।
কামসুত্রে আছে, অন্তঃপুরচারিণীগণ ধাত্মীয়ার
বাহিরের পুরুষগণকে মনোভাব জানাইয়া
 থাকেন। এই ধাত্মীগণ পুরুষদের বলে,
“রাজপুত্রীতে প্রবেশ করা সহজেই হয়।
বাহির হইবারও সহজ উপায় আছে।
অতিবিস্তৃত অন্তঃপুর, কোথায় কে আছে,
কি করিতেছে তাহার সংবাদ কেহ রাখে
না।(১) অন্তঃপুরের রক্ষীগণও অসাবধান।
রাজ-পরিজনসমূহও সর্বদা সন্নিহিত থাকে
না।” এই সকল কথাবারা বিশ্বাস উৎপাদন

করিয়া ধাত্মীগণ পুরুষদের লইয়া যায়।
বাৎস্তারন লিখিয়াছেন, পুরুষেরাও অন্তঃপুরের
সংস্থান অবগত হইয়া কোথায় কি আছে,
কোন সময়ে কি বেশে কিরূপভাবে প্রবেশ
করিতে হইবে তাহা জানিয়া অন্তঃপুরে
প্রবেশ করে। (“কক্ষাপ্রবেশঃ চ দৃষ্টে।
তাভিহেব বিহিতোপয়াঃ প্রবিশেৎ।”
কামসুত্র ৫।৬।১)

রাজ্যন্তঃপুরের এই দুর্নীতিমূলক আচরণ
ঠিক বাৎস্তারন যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন
সেই ভাবের ঘটনা প্রাচীন কাব্যাদিতেও
দেখিতে পাওয়া যায়। মণকুমারচরিত
তৃতীয় উচ্ছ্বাসে উপহারবর্ষা গোপনে
রাজ্যন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ভ্রষ্টচরিত্রা
রাজমহিষীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন
এইরূপ কাহিনী আছে। দেখানোও দৃষ্টো—
ধাত্মী ও রাজমহিষীর পরিচায়িকা। উপহার-
বর্ষা অন্তঃপুরের সংস্থান, রক্ষীগণের বাস-
স্থান, উদ্ভান প্রভৃতি কোথায় কিরূপ আছে
তাহা জানিয়া লন।(২) পরে অন্ধকার
রাত্রে নিঃশব্দে বহু পরিধান করিয়া বস্ত্র
হস্তে রাজ্যন্তঃপুর-প্রবেশে উত্তর হন। বংশদ
ঘারা পরিধা পায় হইয়া তাহারই সাহায্যে
প্রাচীর উন্নয়ন করিয়া তিনি অন্তঃপুরে
প্রবেশ করেন।(৩)

(১) “ভোয়াহুপার্বর্তনে ধাত্মৈরিকাকাত্যশ্রব-সংহৃষ্টা, আয়তিঃ বর্ণনস্তাঃ অকতরন্। অথপ্রবেশিতা-
মণদারভূমি বিশালতাঃ বেস্তনা, অমায়ঃ রক্ষিপাশনিভ্যতাঃ পরিদনন্ত বর্ণনয়ঃ।”

কামসুত্র, ৩ম অধিকরণ, ৩৪ অধ্যায়।

(২) “ভ্রষ্টমস্তা এব দকশাধস্তঃপুরনিবেশমত্বাংশিকপুরুষহান্ অমদবনপ্রবেশোনিশি বিস্তাপেদাবগম্য.....”

মণকুমারচরিত, ৩য় উচ্ছ্বাস।

(৩) “কার্দ্দিকবিদ্যদনক.....যতপাপাণিকপতঙ্গভ্রষ্টতোপকরঃ.....বেদুপ্তিমাবাধ তত্রা শাধিতয়া
পরিধা, হাপিতয়া চ আকারিতস্তিমসলয়ন্।”

মণকুমারচরিত ৩য় উচ্ছ্বাস

“অবিহারকে”ও দেখি, ধাত্রী অবিহারকে বলিতেছে, “রাজ্যন্তঃপুরে প্রবেশ করাই সুকঠিন। কোনক্রমে প্রবেশ করিতে পারিলে অনেকদিন থাকিতে পারা যায়।” (বিত্তীয় অঙ্ক) অবিহারক বলিলেন, “রাজ্যন্তঃপুরের কোথাও কি আছে আমার বুঝাইয়া দাও।” (বিত্তীয় অঙ্ক) ধাত্রী তাহাই করিল। তৃতীয় অঙ্কে দেখি, রজ্জু ও তরবারি লইয়া অবিহারক রাজ্যন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে যাইতেছে। রজ্জুর অগ্রভাগে সংলগ্ন ঝাঁকড়া প্রাচীরের উপর আটকাইয়া অবিহারক রজ্জু ধরিয়া প্রাচীরের উপর উঠিয়া পড়িলেন এবং প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে লাফাইয়া পড়িলেন।

এই প্রকার ঘটনা প্রাচীন ভারতে ঘটিতে পারিত। রাজধানীর পথে গভীর রক্ষার ঘোরাফকারে চোরের লক্ষ্যণ, রক্ষা দেখিও শৌভিকালয়ে প্রবেশ—এসকল প্রাচীনকালের চিত্র। অসুদীক্ষকের অদ্বুত লজ্জিতে বিশ্বাসও প্রাচীনকালের নাট্যাভিনয়-দর্শকেরই থাক। সম্ভব। মনি, মন্ত, মহোদধির অভ্যাসগত শক্তি প্রদর্শন সংস্কৃত নাটকের অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। রত্নাবলী নাটকের অকালে বুদ্ধের কুসুমোদগম মালবিকায়নিদ্রে সর্প-বিব-হর মণি প্রভৃতি ইহার প্রমাণ। অবিহারক নাটকের প্রথম অঙ্কে যেরূপ উন্নত হস্তী-দমনের বর্ণনা আছে, মুচ্ছকটিকেও বিত্তীয় অঙ্কে কর্ণপূরক বসন্তসেনার নিকট এইরূপ এক হস্তী দলনের বর্ণনা করিতেছে। অবিহারকে নারক যেরূপ হস্তীর অক্রমণ হইতে নারিকাকে রক্ষা করিল, মালতীমাধবের তৃতীয়

অঙ্কে স্কন্দরূপ সেইরূপ মদরস্তিকাকে বাহ্য কবল হইতে রক্ষা করিল। অবিহারকের চোরবেশে স্কন্দরণের সহিত মুচ্ছকটিকে চোরবেশী শর্কিলকের আচরণের তুলনা করা বাইতে পারে।

অবিহারকের প্রাচীনত্বের আর একটি প্রমাণ, ইহার প্রধান ঘটনা, নারকেস মাতুলকন্যা-বিবাহ। কুরঙ্গী অবিহারকের মাতুল-কন্যা। এই প্রকার বিবাহ অতি প্রাচীনকালে প্রচলিত থাকিলেও পরবর্তী যুগে দ্বিতীয়াত্রকারগণ-কর্তৃক ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

অবিহারক নাটকখানিতে অজ্ঞাত সংস্কৃত নাটকের ঘটনা ও চরিত্রের অল্পরূপ ঘটনা ও চরিত্রের অভাব নাই। নির্দোষ ভোজন-দোলুপ বিদূষক নারকের সখা, অন্তঃপুর-পরিচারিকার হস্তে বিদূষকের নিগ্রহ, নারক-নারিকার মাদুলী বিবহ-বর্ণনা, আত্ম-হত্যার উত্তোষ, অলৌকিকচরিত্র বিজ্ঞান, নারদ প্রভৃতির স্রষ্টি অনেক নাটকেই দেখিতে পাওয়া যায়। বিদূষকের মুখে “অবিহারকে” একস্থলে “বোধ প্রমত্ত”র উল্লেখ আছে। রাজকন্যা বর্ষার স্তুতিধারার দান করিতে যাইতেছেন। নারক সন্ধ্যার সময় ঘনি ও আলিঙ্গন করিতেছেন। রাজ্যন্তঃপুরের সেই চিরন্তন ঐশ্বর্য-বর্ণনা—উপবনের অল্পপত্র মাদুলী—আশাদের অলৌকিক স্নেহ। মদুরা বিচরণ করিতেছে, শুক-সারিকা আলাপন-মত্ত। চম্পাপোকে হৃদয়শিখরে রাজকন্যা মহার্ঘ্য আশ্রয়ণে পলন করিয়া আছেন।

অপর দিকে নিম্নোক্ত রাজমার্গে ঘোর

অন্ধকার। রক্ষীগণের দৃষ্টি এড়াইয়া চোর ও কামুক বিচরণ করিতেছে। মাঝে মাঝে রাজপ-পার্শ্বের ক্ষুদ্রাধিকার গবাক্ষ দিয়া দীপালোক পথের উপর পড়িয়াছে। কোন গৃহাভ্যন্তর হইতে রমনী-কণ্ঠের সঙ্গীত শ্রুত হইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ বীণা বাজাইতেছে।

ভাসের নিপুণ হস্তে সরল অথচ মৃদুর ভাষায় এই সকল চরিত্র ও চিত্র নিখুঁত-ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। ভাল উপহার উপর উপমা প্রস্তুত করিয়াছেন। এক

এক স্থলে এমন এক একটি উক্তি বিস্তারিত যে তাহা সর্ব্বগুণে প্রযুক্ত। প্রথম অঙ্কে কস্তুর বিবাহে পিতার কর্তব্যের উল্লেখ, এই শ্রেণীর উক্তি। এরূপ আরও আছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা ও দিবসেব গতিঃর সময়ের বর্ণনাতেও ভাস তুল্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যাপু-রাণীর নিকট এই নাটকখানি উপেক্ষার সামগ্রী নয়। কেবলমাত্র ইহার বর্ণনাগুলি পাঠ করিলেই পাঠক ভাসের কবিত্ব-শক্তির বথেষ্ট পরিচয় পাইবেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

চাষার বাড়ী

(গল্প)

(মোপাসাঁর ফরাসী হইতে)

একটা ছোট পাহাড়ের তল-দেশে দুটি কুটার পাশাপাশি অবস্থিত। তাহার নিকটেই একটি ক্ষুদ্র নগর। বাহ্যের লোকের এই নগরে যান করিতে আসে। এই দুই কুটারের মালিক দুজন চাষ। শিশু-সন্তানের জরপোষণার্থ এই অশ্রুর্ধর ভূমিতে ফসল উঠাইবার জন্য উহাদের খুবই খাটিতে হয়। এতোকের ঘরে চারিটি কামরা সন্ধান। এই দুই পাশাপাশি কুটারের দুই ঘরের সম্মুখে, মাটির উপর গড়াগড়ি দিয়া বেলেগুলি সকল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৃশাধেলা করে। এতোক ঘরের বড় ছেলে দুটির বয়স ৬ বৎসর, আর ছোট

ছেলে দুটির বয়স ১৪ মাস। এই দুই ঘরে বিবাহ ও জন্ম আর এক সময়েই ঘটয়াছিল।

দুই মা ঐ শিশুর গাভার মধ্যে বড় একটা তফাৎ বৃত্তিতে পারিত না। আর দুই বাপ উহাদিগকে একেবারেই এক-সামিল করিয়া ফেলিয়াছিল। ৮ টা নাম উহাদের মাঝার সর্ব্বদাই ভাসিয়া বেড়াইত, ক্রমাগত একত্র মিশিয়া থাকিত। এবং যখন একজনকে ডাকা আবশ্যক হইত, উহার তিনজনের নাম ধরিয়া ডাকিত। শেষে আসল নামটিতে আসিয়া পৌছিত। প্রথম বাড়ীতে থাকিত “তুবাঙ্গ” নামক একজন চাষ।

ভাষ্য তিনটি মেঘে, একটি 'হেলে'।
দ্বিতীয় বাড়িতে থাকিত 'ভাল্লী'। ভাষ্য
একটি মেঘে, তিনটি হেলে।

উহার আভি কষ্টে জীবনধারণ করিত।
উহার আহার ছিল একটু স্নান, কিছু
আলু, আর আকাশের মুক্ত বায়ু। প্রাতে
সাতটার সময়, তার পর দুপুরবেলা, তার
পর অপরাহ্ন ৬ টার সময়, তার পর সন্ধ্যাবেলা,
হুই বাড়িবে হেলেমেঘের একত্র করিয়া
উহার ভাষ্যদিগকে এক-একটু মাংসর ঘণ্টা
খাইতে দিত। হংস-পালক হাঁসের বাচ্চাদের
যে রকম খাওয়াইয়া থাকে সেই রকম।
একটা কাঠের টেবিল, ৫০ বৎসরের অবিবাহিত
যাযাবরে ভাষ্যদের মত চক্চকে হইয়া
উঠিয়াছে। এই টেবিলের চারিধারে ছেলে
মেয়েগুলি বসিয়া অল্পস্বল্পে সারি-সারি
খাইতে বসিয়াছে। সব-ছোটটির মুখ ও
টেবিলের ধারটা প্রায় সমভূমিতে স্থাপিত
বলিয়া বোধ হয়। তাহাদের সম্মুখে এক-
একটা খোদল-করা স্টেট। স্টেট গরম
কলে ডোবান পাউরুটির টুকরার পূর্ণ।
সেই কলে কতকগুলি আলু, আখ্যানা
কপি ও তিনটে পেরোজ রাখা হইয়াছিল।
ছেলেমেয়েগুলি খুব ক্ষুধার সহিত উহা
খাস করিতেছিল। মা নিজে কেবল
সব-ছোটটিকে উহা গিলাইয়া দিতেছিল।
আত্মনের পাকে দ্বিধা করা একটু মাংস—
ইহাই সকলের রবিবারের ভোজ। ঐ দিন
বাবা একটু বিলম্ব করিয়া আহার
করিতেন। আর পুনঃপুনঃ বলিতেন, এমন
ভোজ ত রোজ হয় না। আজ বীরে
হুই খাওয়া থাক।

একদিন অগষ্ট মাসের অপরাহ্নে, একটা
হালকা-ধরণের গাড়ী হঠাৎ ঐ দুই কুটিরের
সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন তরুণী
নিজে গাড়ী হাঁকাইতেছিলেন, তিনি গার
পানের পুরুষটিকে বলিলেন :—

"ওগো, চেয়ে দেখ,—এক-গালা ছেলে।
অমন হুইর ছেলেগুলি কি না খুঁজি গড়াগড়ি
বাড়ে!" পুরুষটি কোন উত্তর করিল
না। একরূপ প্রশংসা তার শোনা অভ্যাস
ছিল। তার পক্ষে এই প্রশংসা একটা
কষ্টের বিষয়—কতকটা তিরস্কারের মতো।

তরুণী আবার আশঙ্ক করিল :—

"আমার বড় চুমো খেতে ইচ্ছে
করচে। আহা, ঐটি যদি আমি পাই—ঐ
সবার ছোটটি!"

তাহার পর, গাড়ী হুইতে লাফাইয়া
পড়িয়া, তরুণী শিশুদিগের নিকট ছুটিয়া
গেল। দুবাসের একটি ছেলেকে কোলে
তুলিয়া লইয়া তার নোংরা গালে চুম্বা
খাইতে লাগিল, মাটি-মাখানো কৌকড়া
কৌকড়া কটা চুলের উপর চুম্বা খাইতে
লাগিল, ছোট হাত দুটিকে চুম্বা খাইতে
লাগিল। ভেগেটি তার সেই ছোট
হাত দুটি মাড়িয়া তরুণীর বিরক্তজনক
আধর হুইতে আপনাকে আগল্গাইবার
চেষ্টা করিতেছিল।

তাহার পর, সেই তরুণী আবার
গাড়ীতে উঠিয়া, দ্রুত কদমে বোড়া হাঁকাইয়া
চলিয়া গেল। কিন্তু পর-সপ্তাহে আবার
সে আসিল, মাটির উপর আসিয়া বসিল,
আবার সেই ছেলেটিকে কোলে লইয়া,
খুব ঠাসিয়া তাহাকে কেক খাওয়াইতে

লাগিল; অল্প ছেলেমেয়েদের শুধু কতক-
শলা বাতাসা দিল। এবং তাহাদের মলে
মিশিরা তাহাদের সহিত খেলা আরম্ভ করিয়া
দিল। এদিকে তাহার স্বামী সেই ভদ্র
পাকীতে বসিয়া খুব ধৈর্যের সহিত তাহার
অল্প প্রতীক্ষা করিতেছে।

সেই তরুণী আবার একদিন আসিল;
আসিয়া বাপ-মার সহিত আলাপ পরিচয়
করিল। তারপর, মিটার ও পয়সার পাকেট
ভরিয়া প্রতিদিন আসিতে লাগিল।

একদিন প্রাতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত
হওয়ার, তাহার সহিত তাহার স্বামীও
গাড়ী হইতে নামিল। তরুণী ছেলেদের
কাছে না থামিয়া একেবারে তাদের বাপ-
মারের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

তারা ঘরে ছিল। স্বামীর অল্প কাঁচ
চিহ্নিতছিল। বিস্মিত হইয়া তাহারা উঠিয়া
দাঁড়াইল। বসিবার অল্প সময়ের মধ্যে চোঁকি
এগাইয়া দিল। তখন সেই তরুণী বাধ-বাধ
বরে থামিয়া থামিয়া আরম্ভ করিল :—

“ওগো বাছা, আমি তোমার কাছে
এসেছি—কেন? জান? আমার ইচ্ছে হয়েছে
...আমার বড় ইচ্ছে হয়েছে...তোমার ঐ
ছেলেটিকে...আমার সঙ্গে...নিরে ঘাই...”

চাষার হতভম্ব হইয়া রহিল, সহসা
কোন উত্তর করিতে পারিল না।

একটু দম লইয়া তরুণী আবার আরম্ভ
করিল :—

“আমাদের ছেলেপিলে নেই। আমরা
শুধু ছটি প্রাণী—আরি ও আমার স্বামী।”

চাষাণী, কথাটা যেন একটু বুঝিতে আরম্ভ
করিল। সে জিজ্ঞাসা করিল :—

—“তুমি আমাদের শার্লোকে নিয়ে
যেতে চাও? ওমা তাকি কখন হয়। তা
হেঁটে পারে না।”

তখন তরুণীর স্বামী এই কথাবার্তার
যোগ দিলেন :—

—“আমার স্ত্রী তোমাদের ভাল করে’
গোছাতে পারেন নি। আমরা ওটিকে
“পুঁথি” নিতে চাই। ছেলেটি আমার
তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে।
যদি ছেলেটি ভাল-রকম ওয়ার, তাহলে
ও-ই আমাদের উত্তরাধিকারী হবে। যদি
নৈঃযোগে আমাদের কখন ছেলেপিলে হয়,
তাহলে, তোমার ছেলেটি তাদের সঙ্গে
বিষয়ের সমান ভাগ পাবে। কিন্তু খুব
আদর যত্ন করেও যদি ছেলেটির মন আমরা না
পাই, তাহলে সে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে, তাকে ২০
হাজার টাকা আমরা দেব; আর ঐ টাকা
তখনই তার নামে উকীলের ঘরে গচ্ছিত
রাগা যাবে। আর তোমাকেও তোমার
মৃত্যু পর্যন্ত মাসে মাসে ১০০ টাকা করে
মাসোহারা দেওয়া যাবে। এখন সব ভাল
করে’ বুঝলে ত?”

চাষাণী অস্বস্তি হইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল।

—“তুমি চাও আমি আমার শার্লোকে তোমার
কাছে বিক্রী করি? না, তা কখনই হবে না।
না-কে না কি একথা কেউ জিজ্ঞাসা করতে
পারে! মিন্‌স্টো বলে কি। ওমা! কি
ঘোরর কথা।”

চাষা কোন কথাই কহিল না; গভীর
হইয়া ভাবিতে লাগিল। কিন্তু সে ক্রমাগত
ঘাড় নাড়িয়া-নাড়িয়া তার স্ত্রীর কথার
সার দিতেছিল।

ভরুণী হতাশ হইয়া কাদিতে লাগিলেন এবং স্বামীর দিকে ফিরিয়া, কোঁপাইতে কোঁপাইতে—আনুয়ে মেয়ের মত আধ আধ হবে বলিতে লাগিলেন :—

“ওগো ওরা যে দেখেনা বলচে, ওরা যে দিতে চাড়ে না।”

তখন ভরুণীর স্বামী আর একবার শেক-চেষ্টা করিয়া দেখিলেন।

—“কিন্তু বাপু, তোমার ছেলের ভবিষ্যৎ-টার দিকে একবার তাকিও—তার অশ্বের দিকে, তার...”

চাষানী, আর সহিতে না পারিয়া তার কথা শেষ করিতে দিল না :—

—“ওগো সব শুনেছি, সব দেখেছি, সব বুকেছি—আর বেশী বোঝাতে হবে না... এখান থেকে দূর হও, যদি আবার এখানে এসো ত ভাল হবে না বলছি। এই রকম করে ছেলে না কি কেউ কাউকে দেয়। মরণ আর কি।”

তখন ভরুণী গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আর দুইটি ছেলেকে দেখিতে পাইলেন। এবং নারীজলন্ত নছোড়-বল্লা ছেলের বশবর্তী হইয়া সাক্ষরমনে জিজ্ঞাসা করিলেন—“কিন্তু এছেলেটি ত তোমার নয়।”

চাষা তুয়াস উত্তর করিল :—

“ও ছেলেটি পাশের ঘরের, যদি ইচ্ছে হয় ত ওখানে যেতে পার।”

এই বলিয়া চাষা তুয়াস আবার ঘরে ফিরাইল; তখনও তাহার শ্রীর সুপিত কর্তব্যর প্রতিজ্ঞানিত হইতেছিল।

পার্থক্য দুটায়বাসী চাষা—“ভাল।” তখন

আহারে বসিয়াছিল। খান করেক কাটর চাকলা, ছুদীর আগা দিরা কার্পণ্যসহকারে তাহাতে একটু মাখন মাখানো হইয়াছে, ইহাই সে ঘরে ঘরে খাইতেছিল।

সেই ভরুণীর স্বামী আবার সেই প্রস্তাব আরম্ভ করিলেন, কিন্তু এবার খুব ঠাণ্ডে-ঠাণ্ডে, এবং সর্ক ও চতুর বাক-বিজ্ঞাস-সহকারে। কৃষক ও কৃষক-গৃহিণী অস্বীকার-মুচক ঘাড় নাড়িলেন। কিন্তু যখন তাহারা শুনিল, তাহারা ১০০ টাকা মালোহাণা পাইবে, তাহারা চোখ ঠারিয়া পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল—সাত-পাঁচ বিবেচনা করিতে লাগিল। মনে হইল, “তাহারা বেন একটু টলিয়াছে।

উহার অনেককণ চুপ করিয়া রহিল, ভাবিত হইয়া পড়িল, ইতস্তত করিতে লাগিল। অবশেষে কৃষক-পত্নী কৃষককে জিজ্ঞাসা করিল :—

—“ওগো মিনসেটা তোমার বলে কি ?”

ভরুণীর স্বামী উত্তর করিল :—

“আমি ভাল কথাই তোমাদের বলছি।”

ভরুণী তরে তরে ছিল, “এও যদি একেবারে অস্বীকৃত হয়। এখন একটু আশ্রয় হইয়া, ছেলেটির ভাবী অশ্বের কথা, পরে ছেলেটি যে টাকা পাইবে- তাহার কথা একে একে সমস্ত বলিল।

কৃষক জিজ্ঞাসা করিল :—

“যৎসরে ১২৩ টাকা পাবে, আর সে কথা উকিলের সামনে করার করা হবে ?”

ভরুণীর স্বামী উত্তর করিলেন :—

“তা নয় ত কি, —কাল থেকেই এই বন্দোবস্ত হবে।”

এতক্ষণ কুবকপত্নী ভাবিতেছিল;—সে এখন উত্তর করিল:—

—“মানে মাসে ১০০ টাকা? এত কম টাকার আশা কি ছেলে দিতে পারি বাপু? আর কয়েক বৎসর পরে আমার ছেলে ত নিজেই রোজকার করবে। না, ১২৫ এর কমে হবে না। ১২৫ টাকা চাই।

তরুণী বড়ই অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছিলেন,—এই প্রত্যাবে তখনই স্বীকৃত হইলেন। ছেলেকে এখনই লইয়া বাইবেন দ্বিঃ করিয়া কুবকপত্নীকে আগাম ১০০ টাকা দিলেন। ততক্ষণ কুবক একটা চুক্তিপত্রে নাম স্বাক্ষর করিতেছিল। সেই পত্রীর একজন সরকারী কৰ্মচারী ও একজন প্রতিবেশী সাক্ষী হইল।

তখন তরুণী আফ্রাদে আসিথানা হইয়া—সোকানে কোন একটা মথের জিনিস কিনিবার মত,—ছেলেটিকে লইয়া একবারে ছুটিয়া চলিলেন। অপর কুবক তুবাঙ্গ নির্জাক ও কঠোরভাবে নিজ কুটারের দ্বারে বসিয়াছিল,—উহাদিগকে এক্ষণে বাইতে দেখিল। এখন বোধ হয়, কেন অস্বীকার করিল বলিয়া মনে মনে সে অশ্রুতাপ করিতেছিল।

কুবক ভাণ্ডার কণা আর তাহাকে কিছু বলিতে শোনা বাইত না। কুবক ও কুবকপত্নী প্রতি মাসে উভ্যলের বাড়ী গিয়া ১২৫ টাকা লইয়া আসিত। ইহারা তাহাদের প্রতিবেশীদের ব্যবহারে চটিয়াছিল, কেন না, অপর কুবক তুবাঙ্গের পত্নী, কটুকাটখ্য প্ররোগ করিয়া তাহাদের বড়ই কষ্ট দিত; ঘরে-ঘরে কেবল বলিয়া বেড়াইত,—তুবাঙ্গার

কি অর্থনিষ্ঠা, অর্থের লজ্জা মাংসের পেটের ছেলেকে বিক্রয় করিয়াছে। কি নোংরা কার, কি লব্ধ ব্যাপার।

কখন কখন তুবাঙ্গ-পত্নী নিরন্তর ছোট ছেলে শালোঁকে কোলে লইয়া খুব ভক্ত করিয়া তাহাকে মথোদন করিয়া বলিত:—যেন সে তার কথা কতই বুঝিতেছে।—

—“আমি তোকে বিক্রী করিনি বাচ, আমি তোকে বিক্রী করিনি। আমার ঘন দৌলত নেই, তবু আমি আমার ছেলে বিক্রী করি নে।”

কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন এইরূপ চলিত; প্রতিদিন নিজ কুটার-দ্বারের সম্মুখে, ভাণ্ডার উদ্দেশে কত কথাই চাৎকার করিয়া এইরূপ বলা হইত। এমন করিয়া বলা হইত যাতে পাশের গৃহে কথাগুলি পৌছায়। তুবাঙ্গ-পত্নীর মনে মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তার শালোঁকে বিক্রয় করে নাই বলিয়া সে দেশের মধ্যে সব-চেহে মেরা।

অন্ত লোকেও তুবাঙ্গ-পত্নীর নাম করিয়া এইরূপ প্রশংসা করিত।

—“তুবাঙ্গ-পত্নী বড় ভাল—ও ঠিক মায়ের মতই কার করেছে।”

মকলেই তুবাঙ্গ-পত্নীর দৃষ্টান্ত দেখাইত। শালোঁর এখন বয়স দশ বৎসর;—এই কথা জন্মগত শুনিয়া শুনিয়া তাহারও বিশ্বাস জন্মিল, তার সঙ্গীদের মধ্যে সেই সব চেহে মেরা; কেন না, কেহ তাহাকে বিক্রয় করে নাই।

সেই মাসোহারার কল্যাণে ভাণ্ডার হুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিল। তুবাঙ্গের শেষ ততই বাড়িতে লাগিল;

উহার স্বচ্ছল অবস্থা দেখিয়া উহারাই বড়ই
বিস্ময় হইয়া পড়িল।

তুবাসুদের বড় ছেলেটি, চাকরীর জন্য
বাহির হইয়াছিল। বিত্তীয় ছেলেটি মারা
গিয়াছিল। একমাত্র শার্লো কেবল তার
বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে থাকিত। তার জননী
ও ছোট ভগ্নীকে দেখিবার জন্য সে ভিন্ন
আত্ম কেহই ছিল না।

জন্মে সে ২১ বৎসরে পড়িল। এক-
দিন প্রাতে একটা জাঁকাল গাড়ী ঐ
হই কুবক-কুটারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়া-
ইল। সোণার বড়ীর চেনে ত্বরিত একটি
যুবক গাড়ী হটতে নামিয়া, একটি পলিত-
ফেনা বৃদ্ধাকে বাহ-অবলম্বন দিবার জন্য
হাত বাড়াইয়া দিল। বৃদ্ধা তাহাকে বলিল :—

“বাছা, ঐ—ঐ দ্বিতীয় কুটারটা।”

তখন যুবক নিম্ন পিতা ভার্ণায়ার গৃহে
প্রবেশ করিল।

বৃদ্ধা জননী কাপড় কাচিতেছিল;
অস্বাভাবিক অক্ষম পিতা উনানের নিকট
বসিয়া হুসিতেছিল।

হৃৎকেন্দ্রই মাথা তুলিল এবং যুবক এইরূপ
বলিল :—

“প্রণাম হই বাবা। প্রণাম হই মা।”

উহার নিঃস্বচ্ছন্দ্যারিত-লোচনে পাড়া
হইয়া উঠিল।

কুবকপত্নী মনের আবেগে সাবানটা
জলের মধ্যে ফেলিয়া দিরা গদগদবনে
এইরূপ বলিতে লাগিল :—

—“বাছা তুই এসেছিস্? তুই এসে-
ছিল বাছা?”

যুবককে বুক চাপিরা ধরিয়া—“প্রণাম

হই মা, প্রণাম হই মা” এই কথাটি পুনঃ
পুনঃ মুখে উচ্চারণ করিতে করিতে—
তার লগাট চুষন করিল।

এদিকে তার পিতা বৃদ্ধ কুবক, তার
দেই চিন্ন-অভ্যন্ত প্রণাম স্বরে কাশিতে
কাশিতে বলিতে লাগিল যেন এই এক
মাস পূর্বে তাহাকে দেখিয়াছে :—“আবার
তুই কিরে এসেছিস্?”

যখন পরস্পরের সহিত দেখাক্রম হইয়া
গেল, পিতামাতার বড় ইচ্ছা হইল, তখনই
তাহাকে পল্লীর লবাইকে দেখাইয়া
আনে।

তাহাকে গ্রামের প্রধান সরকারী কর্ম-
চারীর নিকট, সহকারী প্রধান কর্মচারীর
নিকট, পাত্রির নিকট, প্রধান শিক্ষকের
নিকট লইয়া গেল।

প্রতিবেশী প্রথম-কুবকের পুত্র শার্লো
তার কুটারের ঘরদেশে ছিল, সে কুবক
ভার্ণায়ার পুত্রকে বাইতে দেখিল।

অপরূপে আহোরের সময় তার বৃদ্ধা
বাপ মাকে সে এই কথা বলিল :—

সেণ বিকি তোমরা কি বোকা,—
দেখ দেখি, ভার্ণা কেমন তার ছেলেকে
বিক্রী করলে।”

মা বলিল :

“আমরা ছেলে বিক্রী করতে চাই না।”

বাপ কিছুই বলিল না। পুত্র আবার
বলিল :—

“তোমাদের মন্দভাগ্য বলতে হবে—

অমন দাঁও ছেড়ে দিতে আছে।”

তখন কুবক তুবাসু একটু
স্বরে বলিল :—

“তোকে আমরা ছাড়িনি বলে তুই আমাদের তিরস্কার করচিস্?”

যুবক নির্দ্বন্দ্বভাবে বলিল :—

“হাঁ আমি তোমাদের তিরস্কার করচি, —তোমরা নেহাৎ বোকা। তোমাদের মত বাপ-মাই ছেলের অনিষ্ট করে। অমন বাপ-মাকে ছেড়ে চলে যাওয়াই ভাল।”

স্নেহময়ী কুব্জকপত্নী কাদিতে লাগিল। চামচ দিয়া স্নানগা খাইতেছিল—অর্ধেক স্নানগা মুখ হইতে পড়িয়া গেল।

“তোকে দশ মাস গর্ভে ধারণ করেছি বলে’,—তোকে বাহুব করেছি বলে’ তুই কি আমাদের এখন মাস্তে চাস্?”

যুবক কঠোরভাবে উত্তর করিল :—

“এরকম অবস্থার থাকবার চেয়ে আমার পক্ষে না সম্মানই ভাল ছিল। আমি যখন ওদের ছেলেকে দেখলাম, তখন আমার শরীরের রক্ত মাথা থেকে পা পর্যন্ত চুনচুন করে’ উঠল। আমি মনে মনে ভাবলাম—‘আমি ত ওরই মত হতে পারতাম।’”

যুবক উষ্ণগা দাঁড়াইল।

“দেখ আমরা এখানে থেকে চলে যাওয়াই ভাল। কেন না আমি যদি এখানে

পাকি, শ্রান্তদিনই আমি তোমাণের বোটা দেব, তোমরা আলাতন হবে। তোমরা যে কাজ করেছ তার জন্য কখনই তোমাদের আমি কমা করব না।”

বুড়াবুড়ী চূপ করিয়া রহিল। অলে চোপ্ জরিয়া আসিল। তারা ঘেন বজ্রাহত হইল।

যুবক আবার বলিতে লাগিল :—

“না আমি এখানে আর থাকতে পারব না। আর কোথাও গিয়ে আমার উন্নতির চেষ্টা করতে হবে।”

যুবক দার খুলিল। কতকগুলি লোকের কঠোর ‘দন্ডা-বাতানের মত ঘরে প্রবেশ করিল।

ভ্যালী ও ভ্যালী-পত্নী খুব আনন্দ করিতে করিতে পুত্রকে লইয়া সেই সময় গৃহে, ফিরিয়া আসিতেছিল। তখন চলে। মাটিতে পদাঘাত করিয়া ভাংরা বাপমাণের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং এই কথা বলিয়া উঠিল :—

“মা, বাবা, আমি চলে যাই!”

এই বলিয়া রাত্রির অন্ধকারে অগ্রহিত হইল।

ত্রিভোজিতরিন্দ্ৰনাথ ঠাকুর

কালো জুড়ি

[সম্পাদকীয় মন্তব্য :—এই রচনাটি গল্প কি প্রবন্ধ তাই লইয়া গোল বান্ধিতে পারেন। সেইজন্য তানাইয়া রাখা ভাল। যে, লেখকের নিকট হইতে সন্ধান পাইরাছি ইহা একটি গল্প।

গল্প বলিয়া এই রচনাটিকে পাঠক অবজ্ঞা করিবেন না। ইহা আভ্যন্তরীণ বাস্তব চলিত থাকে চুটকি গল্প নহে। ইহা গল্পরূপে যুগান্তর আনিয়াছে। নানা আলোচনার পরিপূর্ণ হইয়া এমন সারালো ও ধারালো গল্প জানি হে কোথাও পড়ি নাই—এবং আমার বিশ্বাস কেহই পড়েন নাই। গল্পের ভাণ করিয়া লেখক এমন অনেক গুরুতর সমস্যা উপস্থাপন করিয়াছেন যাহা সার্বজনীন এবং সর্ববিশেষ। গল্প বলিলে স্বকণ্ঠস্বরিত বোঝায়, —ইহা মোটেই সে ধরণের নহে, ইহাতে কল্পনার ছায়াভাষা নাই, আগাগোড়া বাস্তব। লেখক ক্রান্তিল কক্ষে বসিয়া চুপচাপ ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে সমস্ত ধোঁয়ায়কার করিয়া তোলেন নাই;—ইনি আশ্চর্যবলে-বুঝিয়া বুঝিয়া প্রাণপাত করিয়া অখণ্ডমাত্রের একেবারে প্রাণের কথাটি লিখিয়াছেন;—সেইজন্য ইহার রস ধর্মীর উজ্জল প্রাসাদ-শিখরে যেমন উপভোগ্য, কৃষকের বিষয় কুটীরেও তেমনি উপভোগ্য। লেখক যে বাস্তবতার মারি কাটাটাই ইতর জীবজন্তুর স্বপ্ন-স্বপ্ন, তাহাদের জীবনের সমস্যা লইয়া জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন সেজন্য তিনি আমাদের নমস্কার।]

(১)

হাড়কাটার পাঁচু মিকার টিনের ছা-
ওলা আশ্চর্যবলে সেই কালো বোড়া ছটির
ছিল আশ্রয়। একখানি সেকেন্ড ক্লাস
কাড়াটিয়া গাড়ি তার টানিত। এই
গাড়িখানির সঙ্গে তাদের কবে যে মিলন-
হৃত বাধা হইয়াছিল সে কথা ঠিক তাদের
মনে পড়ে না—তখন তারা নিতান্ত ছেলে-
বোড়া।

গাড়িখানির বয়স তাদের চেয়ে
চের বেশী। তাই বলিয়া তাকে জীবনের
সঙ্গিনী করিতে বোড়া ছটি আপত্তি করে
নাই;—কারণ জীবনসঙ্গিনী নির্বাচন করিবার
কোনো অধিকার সনাতন কাল হইতে
বোড়াসমাজে প্রচলিত নাই। যাহার

অনুষ্ঠে যেমন মোটাটাইরা দেওয়া হয় সে
তাহাই গ্রহণ করে—মনের মতো হুক আর
নাই হুক, বিচার করে না, যাহাকে পার
তাহাকে গটরা চোককান বুঝিয়া কোনো-
রকমে চিরজীবন তাহাকে বহন করে।

ইহার বিরুদ্ধে একালের একদল অস্বাভাবিক
বোড়া মধ্যে একবার গুরুতর ক্রোধের
উদ্ভিগ্ধাভিগ্ধ। কিন্তু প্রাচীন বোড়ার দল
এতবড় অনাচার কিছুতেই ঘটিতে দিবে না
বলিয়া পণ করিয়া বসিয়াছে। একালের
বোড়াদের মধ্যে কেহ কেহ এই প্রাচীন
দলকে অগ্রাহ্য করিয়া মাঝে মাঝে বিদ্রোহ
করিয়া উঠিতেছে;—সেইজন্য পথে-ঘাটে
দেখা যায় এক একটা বোড়া বোড়া পিছনের
পা দিয়া তার গাড়িখানাকে লাথাইয়া

লাথাইয়া খেঁৎলাইয়া ফেলিতেছে। শিঠে অনেক চাবুক পড়িলেও এই দলের বোড়া কিছুতেই সাহেস্তা হয় না;—সেইজন্য বোড়া ও গাড়োয়ান-সমাজে একটা ভূর্তাবনার টেট চলিতেছে। এই দলের নিত্ৰোহ যাচাতে ছড়াইয়া না পড়ে সেজন্য অতি সাবধানে উহাদের রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে—উহাদের ছোঁয়া বাগাতে আর-কাণে না লাগে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি আছে;—উহা-দিগকে আতিষ্ঠাত করা হইয়াছে এবং বৃদ্ধ-বয়সে পিলরাপোলে স্থান দেওয়া হইবে না” বলিয়া শাসনো হইয়াছে।

এদিকে অশ্বকোবিলগণ অভিমত দিরাছেন যে উহা একপ্রকার সংক্রামক রোগ;—আজ-কাল ইখরের মধ্য দিয়া ঐ রোগের বীজাণু ইউরোপ হইতে পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে;—এ রোগ আতিবিচার করে না, মহাযা, পশু, পক্ষী সকলকেই পাইয়া বসে। যাহার অন্তর-বাহ্য দুর্বল—অর্থাৎ বাহ্যের অন্তরে সনাতনী মহাপ্রকৃতি শুদ্ধাচারের আত্মাবে লোপ পাইয়াছে—এই রোগ তাহা-দিগকেই পাইয়া বসে। খবর পাওয়া গিয়াছে, ঐ রোগের বীজাণু ধ্বংস করিবার জন্য ভেটোরিনারি কাজেজে গজীর আলোচনা ও অহুদকান চলিতেছে। বৈজ্ঞানিক উপারে রোগবীজ ধ্বংস করিবার প্রণালীর উপর অনেকের আস্থা নাই—তাহারা শাস্তি-ব্যবস্থার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং খ্রীষ্টীয়-যোষের মানসিক মানিয়াছেন।

সে বাহা হোক, আমরা যে কালো জুড়ির কথা বলিতেছি, তাহাদের এলব বালাই ছিল না,—তাদের সহিত তাহাদের জীবনসঙ্গিনীর

বেশ মনের মিল ছিল। সেকেন্ড ক্লাস গাড়িখানি বৃদ্ধা হইলে কি হয়—সাগ্রে সম্ভার চাকটিকো মেনি চমৎকার দেখেন হয় যেন পূর্ণ যুগতী। পাঁচ মিক্রা শুড়ার গাড়ি খাটারে বটে কিন্তু গাড়ির সব তার আছে। সেইজন্য তার আত্মাণের গাড়ির বয়স ধরে কার সাধ্য! কালো জুড়ি তাহাদের জীবন-সঙ্গিনীর বয়স টের পাইয়াছিল কিনা জানিনা কিন্তু এ কথা বলিতে পারি গাড়ি নিয়ে সে কথা উগাদের কাছে ফাঁপ করে নাই।

(২)

কালো জুড়ির জীবন বেশ সুখেরই ছিল;—পাঁচ মিক্রার আদর-বস্ত্রের অভাব ছিল না, আহাির মনের মতো মিলিত এবং পরিশ্রম বাহ্য করিতে হইত কাঁচা বয়স বলিয়া-গায়ে লাগিত না। কিন্তু নিম্নবচ্ছিন্ন সুখ ইহজন্যেতে যেলেনা। সেইজন্যই কালো জুড়ির অদৃষ্টে মধ্যে মধ্যে দুঃখভোগ থাকিত;—সে দুঃখ বিরহ-বশ্রণা। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ গাড়িখানি কোথায় অপূত্র হইয়া বাইত। হুই চারিদিন পরে আবার ফিরিয়া আসিত। কালো জুড়ি গিজাসা করিলে গাড়ি বলিত—“আমি বাপের বাড়ী গিয়াছিলাম।”

জীবনসঙ্গিনীকে দেখিয়া তখন কালো জুড়ির বিরহ-বশ্রণা যেন আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া বাইত—এমন চমৎকার রূপ লইয়া সে ফিরিত যে তার দিক হইতে চোখ ফেরানো বাইত না;—সে কী লাবণ্য, সে কী চাকটিক্য! দিবারাত্র হাড়ভাঙা খাটিয়া খাটিয়া তার কঠা বখন বাহির হইয়া পড়িত, দুধার কাবার লে

যখন বিল্লী হইয়া উঠিত তখনই তাহাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইত। সেখানে সেবাশ্রমীরা পাঠ্য সে আলো-করা রূপ লইয়া কালো ছুড়ির কাছে ফিরিয়া আসিত! কালো ছুড়ি আত্মবলে পড়িয়া পড়িয়া যখন বিরহব্রতী ভোগ করিত,—তাদের অলস দিনগুলি যখন আর কাটিতে চাহিত না, সন্নিহী অস্তাবে জীবন যখন মরমর হইয়া উঠিত তখন কল্পনার ঐ রূপের মাধুর্য্য সূটরা উঠিয়া তাদের বিরস চিত্তকে সরস করিয়া তুলিত;—সেই রূপসুখা পান করিয়াই তাহারা বিরহী জীবন বাচাইয়া রাখিত।

আমি তখন পাঁচু মিক্কাের আত্মবলের কাছেই থাকিতাম। যখন তনিতাম গাড়িখানি কালো ছুড়িকে বলিতেছি—“আমি বাপের বাড়ী গিয়াছিলাম”—তখন আমার চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিত। রমণী হইয়া এ কী, লবঙ্গ চাকুরী! সে গিরাছিল কারখানার আর বলে কি না বাপের বাড়ী গিরাছিলাম! রমণী জাতির কতদূর অধঃপতন হইতে পারে জাবিরা আমি শিহরিয়া উঠিতাম। রমণীর মুখে মিথ্যা, প্রবচনা—এ কি সহ্য করা যায়? আমি দেখিলাম, উহা সংশোধন করিবার জন্য পাঁচু মিক্কােকে না বলিলে আমার কর্তব্যের হানি হয়। আমি পাঁচু মিক্কােকে একদিন বলিলাম। সে আমার কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। বলিল,—“বেথানে বার ভয়, সেই তো তার বাপের বাড়ী!” আমি বলিলাম—“তা বটে।” কিন্তু মন হইতে এখনো সন্দেহ ঘোচে নাই। মনে হয় ঐ কথাটার মধ্যে কোথায় একটা ফাঁকি আছে। সেইজন্য আমার মতে—বাপের

বাড়ী গিরাছিলাম—না বলিয়া—বোধ হয় বাপের বাড়ি গিরাছিলাম—বলিলে—বোধ হয় ঠিক হয়।

মিথ্যা প্রবচনা ইত্যাদির কথা বলিতে গিয়া আমি আর-একটি স্তরতর অবিচারের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছিলাম। যদি রসভঙ্গ হয় পাঠকগণ অহুগ্রহ করিয়া মার্জনা করিবেন।

আমাদের বাড়ীর পাশে একজন ধনী মহাজনের একখানি টম্‌টম আছে—সেই টম্‌টম এক লাল ঘোড়ার টানে। ইহা ছাড়া সহরে মফস্বলে টম্‌টম আমি ঢের দেখিয়াছি। কিন্তু ঐ টম্‌টম দেখিলেই আমার চিত্ত অলিঙ্গা ভঠে। এ কী অবিচার!—চারি পা-ওয়ার ঘোড়ার সঙ্গে দুই-চাকার গাড়ি। সাম্য-মন্ত্রের এত বড় অপমান? কি আশ্চর্য্য, এটা কাহারো চোখেই পড়ে না। বিজ্ঞান এত অসাধ্য সাধন করিয়াছে, দুই-পেয়ে ঘোড়া দিয়া টম্‌টম চালানো কি তার পক্ষে এতই অসাধ্য? এদিকে বৈজ্ঞানিক-দের দৃষ্টি পড়িতেছেন। বড়ই ক্ষোভের বিষয়। বড় বড় প্রেমের সমাধান* ছাড়িয়া দিয়া এই সব ছোটো-খোটো বিষয়ে মন দেওয়াই তো চাই। এই ছোটোকে অবলম্বন করিয়াই তো বড় হইতে হয়। নর ত আক্ৰান্তে উড়িয়া, গাছপালাকে গান শেখাইয়া তো আর পেট ভরিলে না। আমি অনেকবার এ সবকে চীৎকার করিয়াছি—কিন্তু সে আমার অরণ্যে যোদন হইয়াছে।

জুড়ে আপানী এত বড় হইয়াছে কেমন জানি? তোমরা অনেককে অনেক কথা বল, আমি সে সব মানি না। আমি

বলি, জাপানীরা হঠাৎবাঁধ গাড়ি রিক্সা দু-পেয়ে জানোয়ার দিরা টানার বলিরা তাহার। উন্নতির এই উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এসল কথা তুলিয়া লাভ কি? বাহা বলিতেছিলাম বলি।

দিম বেশ চলিতেছিল, এবং চিরজীবন বেশ চলিতে পারিত কিন্তু হঠাৎ একটা পরিবর্তনে সব গোলমাল হইয়া গেল। এই পরিবর্তনই তো সর্ব্বনেশে! যেমন চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে তেমনি বরাবর চলিলে কোনো হান্সাম থাকে না,—চোখ বুজিয়া বাধা-পথ ধরিয়া নিশ্চিত মনে চলিয়া বাও—বাদ! কিন্তু তা নয়। সুখে থাকিতে ভুতে কিশাইবার মন্ত্র, কতকগুলি নিকোঁধ জীব আছে, তারা একেবারে অধির! তারা কেবলই বলে—“পরিবর্তন কর, পরিবর্তন কর!” আরে বাপু, পরিবর্তনের আবর্তের মধ্যে ঘুরপাক খাইয়া খাইয়া মরিবার মন্ত্র এত ছটুকাটনি কেন? মরিবার কি আর পথ পাওনা?

ঘোড়ার ট্রাম উঠিয়া গিয়া সহরে যে দিন ইলেক্ট্রিক ট্রাম চলা আরম্ভ হইল, ঘোড়া-সমাজ সেই দিন মনে মনে বিপদ গণিল। ট্রামের ঘোড়াদের কাজ গেল। তাহাদের স্ব্বেহ বলিল—“হার! আমাদের আরও যাইতে বলি।” কেহ বলিল—“হার, আমাদের মূল্য কমিয়া গেল।” কেহ বলিল—“কলিযুগে দিন দিন হইতে চলিল কি! আমাদের এতদিনের অধিকার—বাহা পুরুষাঙ্কুরে ভোগদখল করিয়া আসিতেছি তাহা হইতে আমাদেরকে বঞ্চিত করিল? এখনও চন্দ্রহর্ষা উঠিতেছে—ধর্ম কি এত

বড় অস্তায় সহিবেন?” আর একজন অশ্রু-গদগদ কর্তে বলিল—“মাহুঘট যদি না বহিতে পাইলাম, বোঝা যদি শিঠে না করিলাম তবে এ ঘোড়া-জীবনের প্রয়োজন কি? আমরা একজন মূষ করিয়া উচ্চবর্গে গাহিয়া উঠিল—“অন্ অন্ তিতা বিগুণ, বিগুণ—পরাম সঁবে অধিনীকুল!”

(৩)

যতটা ভয় হইয়াছিল আসলে দেখা গেল ততটা ভয়ের কারণ নাই। ট্রামের বরাখাত ঘোড়ার অমৃত্ত কাজ জুটিয়া গেল। তাড়া গাড়ির ভাড়াটির কিছু-কিছু কমিল বটে কিন্তু কাজ একেবারে অচল হইল না। হইবাং মধ্যে এইটুকু হইল যে, বছর-বছর সহরে যে ঘোড়ার আমদানি হইত তাহার মাত্রা অনেক কমিয়া গেল। সে একরূপ ভাঙেই হইল। ছত্রিশ-শতের ঘোড়ার সহর ভরিয়া যাইতেছিল—তাহাদের সহিত আতিথ্য বাঁচাইয়া লোকলৌকিকতা করা শক্ত হইয়া উঠিতেছিল। এখন সে ভাবনা অনেকটা বুটিল।

এই তো গেল সাধারণ ভাবের কথা। পুটিনাট করিয়া বেধিতে গেলে অনেকের অনেক রকম অহুবিধা ঘটতেছিল। পাঁচু মিঞার উপার্জন কমিয়াছিল। সেইজন্য সে সর্ব্বদাই মুখ তার করিয়া থাকিত;—তাহা দেখিয়া আমাদের কালো জুড়ির মনে বড়ই দুঃখ হইত। পাঁচু মিঞার বেজালাও আগের চেয়ে অনেক খারাপ হইয়া উঠিয়াছে—সেই মন্ত্র কালো জুড়ির শিঠে যখন-তখন চাবুক পড়ে;—সেও এক দুঃখ। লাভ কমিয়া

গেছে বলিয়া তাঁদের আশারের* মাণও কমানো হইয়াছিল।

এ সব দুঃখ একরকম করিয়া সহ্য হাইত কিন্তু ঐ যে জীবন-সঙ্গিনীর সহিত মিলনের অবসর কম খটতেছে সেজন্য মনটা দিন দিন বড়ই খারাপ হইয়া উঠিতেছিল। ভাড়া তেমন ঘোটে না বলিয়া আনকাল আর গাড়ি সব সময়ে ঘোড়া হয় না—অনেক সময় বেকার পড়িয়া থাকে।

কথার বলে, দুর্দিন একা আদেশনা। হঠাৎ পাঁচু মিঞার অসুখ হইয়া পড়িল। যে কটা দিন সে বিছানায় পড়িয়া ছিল, সে কটা দিন কালো জুড়ির যে কি কষ্টে গিয়াছে বলা যায় না। জীবনসঙ্গিনী আত্মবলের এক ধারে কাৎ চইয়া পড়িয়া আছেন—আর এক ধারে দড়ি-বাঁধা কালো জুড়ি। দু'দলের মিলন নাই!—এ যেন সেই নদীর এপারে চখা, ওপারে চবী! হার, হার! সে অবস্থায় কালো জুড়ির পায়ের কাছে কাগজ কলম ছিল না; যদি থাকিত তাহা হইলে আমি হোর করিয়া বলিতে পারি তামা নিম্নের কতকগুলো কবিতা লিখিয়া ফেলিত। কে বলিতে পারে সে কবিতা ভাষায় সম্পদ বৃদ্ধি করিত না! এমন করিয়া কত ভালো ভালো জিনিষ নষ্ট হইয়া গাইতেছে।—ইহার একটা উপায় করা উচিত।

পাঁচু মিঞার সারিতে বসই ঘেরি হইতে লাগিল, কালো জুড়ি দুঃখে ভাবনার কতই সারা হইতে লাগিল। গাড়ির এ কী অবস্থা! এ কি চোখে দেখা

যায়? যুথের উপর কালি পড়িয়াছে,— সর্ব্বাঙ্গে ধূলা কণা! তাহার সে অপরূপ শ্রী আজ কোণার! কালো জুড়ির বুক ফাটিয়া দুঃখ উথলিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু হার, উপায় নাই—হাত পা বাধা। গাড়ি একবার গড়াইয়া কালো জুড়ির কাছে হাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু নিজের ঘোরে চলিতে সে কখনো শেখে নাই—কেমন করিয়া পারিবে? চাকা কিছুতেই গড়াইল না। তার এই নিম্নল উত্তম দেখিয়া গুণ হইতে লাগল—জ্বাটা একটা কচকে টিটকারি দিয়া বলিয়া উঠিল—“কেমন? বলি নাই—তোমাদের জীবনসঙ্গিনীদের নিজের পারে চলিবার অধিকার দাও?—এখন টের পাইতেছে ত।”

কালো জুড়ি সেই ছোকরার বেয়াবনীতে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সজোরে একবার চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ করিয়া উঠিল। পা খোলা থাকিলে নিম্নের একটা লাখি কলাইয়া দিত।

(৪)

বর্ষা চিরদিন থাকে না—আবার রোদ ওঠে, হাসি কোটে। পাঁচু মিঞা সারিয়া উঠিল। আগের মতো আবার দিন চলিতে লাগিল।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল কোথা হইতে মোটর গাড়ি উড়িয়া আসিয়া জুড়ির বসিয়াছে। ঘোড়াহুল এইবার মাথায় খুর দিয়া বসিয়া পড়িল।

যবরের কাগজে পড়া গেল—লণ্ডনে মোটর গাড়ির আধিক্য দিন দিন এতই প্রবল হইয়া উঠিতেছে যে ঘোড়ার গাড়ি আর নির্মূল। তবে উপায়? এখানেও তো সেই অবস্থা হইবে। সহরের অধিকাংশ

ঘোড়া ঢকল হইয়া উঠিল। কেবল কয়েকটা কচুকে বাহারি ইটড়ে পাকিয়াছে তাহার। ক্ষুণ্ণির সহিত বলাবলি করিতে লাগিল—“তালাই হইয়াছে। এইবার আমরা লাগাম-মুক্ত হইলাম।”

একজন ঘোড়া-সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী সে কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন—“সর্বনাশ! লাগাম-মুক্ত! তাহা হইলে যে সমাজ উচ্ছিন্নতার রাসাতলে জুবিয়া মরিবে!”

একজন ভার্কিক ছোকরা মুক্তি দেখাইয়া বলিল—“এমন ঘোড়া তো ঢের আছে বাদেশ-মুখে এখনো লাগাম পড়ে নাই—তাঁরা তো দিব্য বাঁচিয়া আছে।”

হিঁটবী মহাশয় গভীর ভাবে বলিলেন—“তাঁদের কথা ছাড়িয়া দাও—তাঁরা বর্জর বুনো ঘোড়া!”

কচুকে ছোকরা মাটিতে ধূর ফুঁকিয়া বলিল—“আমরাও না ভর সেই বুনো ঘোড়া হইলাম!”

এই কথায় এক পণ্ডিত ঘোড়া রোষ-কষ্মিত গোচনে বলিয়া উঠিলেন—“তোরা উচ্ছন্ন বা! উচ্ছন্ন বা! বা-খুঁসি করিয়া তোরাই তো আমাদের মহাইতে বসিয়াছিস। তোদের পালেই তো আমাদের এই দুর্দশা!”

এক বুদ্ধিমান ঘোড়া জুড় বস্তার পিঠে ল্যাজ বুলাইয়া বলিলেন—“রাগ করিতে নাই বাপু, রাগ চণ্ডাল। ঐ চণ্ডালের স্পর্শে দেহ মন অন্তি হই।”

তারপর ঐ কচুকেগুলোকে ডাকিয়া তিনি সংপদামর্শ দিতে লাগিলেন। বলিলেন—“বোঝো বাপু, আমাদের পূর্বপুরুষগণ বাহা করিয়া গিয়াছেন আমাদেরও তাই করা উচিত নয়

কি? তাঁরা তো আর বোকা ছিলেন না। আমাদের ধর্মই হইতেছে—বোকা বত্তা। বোকা যদি আমরা না বই তাহা হইলে যে ধর্মভ্রষ্ট হইব;—‘ধর্মের নিধনং শ্রেয়ঃ।’ এই কথায় উত্তরে কচুকেগুলো এমন ভোমে হানিয়া উঠিল যে বস্তার আর বাক্যক্ষুণ্ণি হইল না।

(৫)

ঘোটার গাড়ির অধিষ্ঠান লইয়া ঘোড়া মহলে তুলুল আন্দোলন চলিতে লাগিল। সে সব কথা লিখিয়া লেখার ভার বৃদ্ধি করিতে চাই না। কিন্তু তার মথোকার একটি মূল্যবান কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। একজন বস্তাকে একবার বলিতে শুনিয়া-ছিলাম—“প্রতিদিন আমরা কি শিক্ষালাভ করিরাছি? আমাদের আশ্রয়ালে চোখের সম্মুখে, মিক্রোসায়েবের সুরগির ডিমগুলো যে প্রতিদিন নিজের আবরণ ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে সে কিসের লজ্জা?—সে কি নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া মিক্রোসায়েবের রসনায়ে পরিতৃপ্তি দিবার লজ্জা নহে? বিজ্ঞান কি গাছতটীয়া আমাদের কানে কানে দিনরাত শোনাইয়াছেন? সে কি পরার্থে জীবন বিসর্জন নয়? সেই মহৎ শিক্ষা পাইরাছি বলিয়াই আমরা মানুষের লজ্জা—আমাদের ধর্মের লজ্জা এমন করিয়া প্রাণপাত করিতে পারি। যতক্ষণ প্রাণ থাকে আমরা মানুষকে বিনা আপত্তিতে বহুদৃষ্টিতে বহন করি; তার পর লাগামহীন মুখ-ধুড়াইয়া পড়িয়া মরণের বাঁদা জীবনকে সার্থক করিয়া তুলি। হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের জীবনের এই ধর্ম, এই মহৎ যেন না ভুলি!”

এই সব ব্যাপারে কোনো জুড়ি নকি মনে করিয়াছিল তাহা আমরা ঠিক জানিনা, কিন্তু এটা জানি যে তাহারা ভাবিতেছিল—কাজ যদি মারা যায় তাহা হইলে জীবন-সঙ্গিনীর সহিত যে অত্যন্ত বিচ্ছেদ হইবে! সেই ভাবনার তাহার দিন দিন শুকাইয়া যািতে লাগিল। এবং মনে মনে মোটর গাড়ির নিপাত কামনা করিতে লাগিল।

ঘোড়ার দল কি করিবে স্থির করিতে করিতে—তর্ক বিতর্ক, বিচার বিবেচনা, আলোচনা আবেগময় ঠিক করিতে করিতে এমিকে সচর মোটর গাড়িতে ছাটয়া গেল। তখন হুড়াবনা হইল মোটরকুল সংখ্যার এত বেশী এবং ওঝনে এত ভারি হইয়া উঠিতেছে যে বহুতার নূরে আর তাহাদের হটানো যাইবে না। এমনি করিয়া দিন দিন প্রসন্ন জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল। সেই জটিলতার মোমাংসা করিতে গিয়া ব্যাণ্ডার আরো জট পাকাইয়া যাইতে লাগিল। এবং দীর চিত্তে সব দিক দেখিয়া-শুনিয়া বুঝিয়া-বুঝিয়া সে জট পুলিশের চেষ্টায় যে সময় গেল তার মধ্যে তার চকুগুণ জট অল্পত পাকাইয়া গেল। এমনি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। শেষে ভাড়াটিয়া মোটরও দেখা দিল। তখন ঘোড়ারা একেবারে হতভান।

* * *

কালো জুড়ি সেদিন বৈকালে বাহির হইয়া চৌরঙ্গীর গাড়ির আড্ডায় গাঁড়াইগাছে। পাঁচু মিঞা কোচ-বাঁকে আছে। সমস্ত দিনের মধ্যে সে কিছুই রোজগার করিতে পারে নাই। সেইজন্য মনঃক্ষুব্ধ হইয়া আছে।

পাঁচু বসিয়া বসিয়া আকাশপাতাল ভাবিতেছিল।

ভাড়াটিয়া নাই। প্রায় পচিশমানা গাড়ি গাঁড়াইয়া—কাহাবো একটা ডাক নাই। এমনই দুর্দিন। অনেকক্ষণ পবে এক সাহেব খানিকদূর হইতে হাতমাড়া দিয়া ইলারা করিল। অমনি যে দেখানে ছিল গাড়ী লইয়া উর্দ্ধবাণে দৌড়িল। এমনি হটোপাট গে এ ওর বাঁকে গিয়া পড়ে। এমন সময় পাশের গলি হইতে ঝড়ের মতো এক মোটর হুড়মুড় করিয়া আসিয়া পড়িল;—পড়বি তো পড় এতবারে কোনো জুড়ির ঘাড়ের উপরে! কোনো জুড়ি চিংপাত হইয়া পড়িয়া গেল—পাঁচু মিঞা গাড়ির উপর হইতে ছিটকাইয়া পড়িল। বিপদ দেখিয়া অল্প গাড়োয়ানেরা যে দেখানে পাইল ছুট তিল—পাছে পুলিশে সাক্ষী দিতে হয়। রাস্তা পরিকার হইয়া গেলে দেখা গেল—কালো জুড়ি রক্তাক্ত—গাড়ি অর্ধ-ভয়, কেবল পাঁচু মিঞা অক্ষত।

এই ব্যাপার লইয়া বোড়া মহলে খুব একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল। সকলেই মোটর গাড়ির দাস্তকতার কেষিয়া উঠিল। একজন সিচক্ষণ বোড়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল—“বুঝিলে কি? ব্যাণ্ডারটার গুঁড় অর্থ বুঝিলে কি? মোটর গাড়ি যে অশ্বকুল নির্মূল করিবে তাহা ভগবান প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিলেন।” এই কথা শুনিয়া ঘোড়ারা চকল হইয়া উঠিল, কিন্তু কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া সে রাত্রি সমস্তক্ষণ আন্তাবলে পড়িয়া মনের ঘোচে কেবল চিঁ হিঁ চিঁ হিঁ চিঁ হিঁ করিতে লাগিল।

ভাষণর ? তার পর আর কি ? অনেক চিকিৎসা করিয়া দেখা গেল কাশো জুড়ি একেবারে অকর্ণণ্য হইয়া গেছে। তাহাদের পিঞ্জরাপোলে পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইল। চারি চক্ষু দরদর-ধারায় বিগলিত করিয়া যুযুৎ জীবন-সন্ধানীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া তারা পিঞ্জরাপোলে চলিয়া গেল। বাইবার সময় মর্দংপণী তাহার বলিয়া গেল—“হে মানববুন্দ ! জীবনে বড় হুঃখ রহিয়া গেল—শেষ পর্যন্ত তোমাদের সেনার প্রাণপাত করিতে পারিলাম না। হে প্রভু, তোমরা ক্ষমা করিও—কত অপরাধ করিয়াছি ! দোহাক হইয়া হয় ত কত সময় নিঃশেষ গৌড়ের চলিতে গিয়া তোমাদের অধুবিধা ঘটাইয়াছি। যেখানে তোমাদের দ্রুত যাওয়া প্রয়োজন, সেখানে হয় ত অবহেলা করিয়াছি—ছি, ছি ! হয় ত অচল হইয়াছি। আম জীবনের শেষদশায় তার ক্ষম লজ্জিত ও অমৃতপ্ত। তোমরা ক্ষমা

করিও—। হে দেব, বড়ই চেষ্টা করি না কেন তবু আমরা তোমাদের হাতের কল একেবারে বন্দিয়া যাঁতে পারি নাই—অনেক সময় নিঃশেষ দৌর্ভাগ্যবশত বেচ্ছাচার করিয়াছি—এ অক্ষমতার ক্ষম লজ্জিত। কিন্তু এখন এ আশা লইয়া মরিতে পারিব—আমাদিগের স্থান বাহারা অধিকার করিবে তাহারা তোমাদের হাতে তেমনই নাচিবে যেমন তোমরা নাচাইবে; আমরা বাহা পারি নাই আমাদের চেয়ে উন্নত বাহারা তাহা পারিবে।”

শুনিয়াছি পিঞ্জরাপোলের কর্তৃপক্ষের নিকট কাশো জুড়ি আবেদন করিয়াছে তাহাদের সহিত তাহাদের অকর্ণণ্য জীবনসন্ধানীকেও পিঞ্জরাপোলে রাখা হউক। কিন্তু পিঞ্জরাপোলে গাড়ি রাখিবার ব্যবস্থা নাই বলিয়া কর্তৃপক্ষেরা সে আবেদন নামজুর করিয়াছেন।*

শত্রু

(ইংরাজী নাটিকা অবলম্বনে)

পাত্র ও পাত্রী

পূরণ সিংহ...অনেক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি ;

সম্রাট বংশের হীনাবস্থ বংশধর।

মৌজীবাদী...পূরণ সিংহের যুবতী স্ত্রী।

একজন চিকিৎসক।

একটি প্রব্রাতন ভৃত্য।

ছাত্রাশ্রমি।

প্রথম দৃশ্য

[কাম্বীরের একটি প্রব্রাতন কেজার

কাম্বা ; কাম্বাটি একরকম আস্থাবহীন, দেওরালে ছবি নাই, কিন্তু ক্রোমের দাগ আছে ; মর্ম্মর প্রতিমাগুলি বিকাইয়া গিয়াছে, অথচ তাহার মূর্ত্ত বেদীগুলি দাঁড়াইয়া আছে। থাকিবার মধ্যে পূরণ সিংহের পূর্বপুরুষদিগের

* এইখানে শেষ না করিয়া লেখক যদি আরো অগ্রসর হইতেন আমার মনে হয় ভালো হইত। কারণ ইহা একটু আধুনিক যন্ত্রের মতো হইয়া পড়িয়াছে। বাহা হউক, আশা করি, ভবিষ্যতে তিনি এই ক্রটিটুকু সংশোধন করিয়া যথাসময়ে অর্থাৎ কাশো জুড়ি ইহলোক ত্যাগ করিলে তাহাদের পারলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া এই গল্পটি শেষ করিবেন।—সম্পাদক।

কতকগুলি বর্ষ ও শিরদ্বারা মাছুবের লাকারে
দেওয়ালে ঠেস দিয়া খাড়া হইয়া আছে।
সবর—মধ্য রাত্রি। আভার-খানীতে আগুন
জলিতেছে। পূরণ সিংহ ও মীঠীবাঈ
আনীন।]

পূরণ সিংহ।

হার প্রিয়া। বড় ব্যাধি পাই আমি প্রাণে
বধনি পৈতৃক এই গেহ পানে চাই ;
ছতলজ্ঞা কক্ষ সব, আন্তরংহীন
ফজাহত নিশ্বর এ বনবলী হার।
সুগম্যাত্মের যত সঞ্চিত সম্পদ,—
মুষ্টি, চিত্র, গিরেছে বিকারে একে একে,
অতীত জয়ের যত স্মৃতি-নিদর্শন
শত্রু-রক্ত-রেখাঙ্কিত থকা তলোয়ার
সব গেছে নষ্ট হয়ে। পৈতৃক বৈভব
কিছু নাই ; নিবে গেছে বাশের গরিমা।
কঠোর উপরে কঠ হার শ্রমতমে !
তোমারে মলিন দেখি, আরামের নীড়ে
স্থপে ছিলে হে কিশোরী ! ঐশ্বর্যের কোলে ;
না করিতে পদার্পণ আনন্দ ঘোঁষনে
বন্দীসম বন্ধ মোর নিরানন্দ গেছে।

[বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া আসন
পরিভ্রমণপূর্ব্বক পারচারি করিতে লাগিলেন।
মীঠীবাঈ আভার-খানীর আগুনের দিকে
আরো দৃষ্টি রাখা বলিলেন।]

কে দারী ? কে দোবী ইথে ? এই হৃদ্যার
দার সোব—সে কি মোর ? মিতব্যারী আমি
চিরদিন, আশক্তি নাহিক দূরে কত,
মত্তে মোর নাহি কচি ; তবু, নিত্য নব
ছিন্নগতি ভাঙ্গ মোরে হৃথ, বলে ঘোরে
হুই পায়ে, ধূলিচলে কমে অবনত,

মহুগত পনি সম নিয়ত ফিরিছে
অলক্ষ্যে নির্ভর শত্রু মোর গিছে গিছে।

মীঠী বাঈ।

শত্রু ?...অতীত জীবনে, কখনো কি হার
করেছ অহিত কারো ? দেখ দেখি ভেবে,
সে বুঝিবা এতদিনে লর প্রতিশোধ।
কিবা এ পৈতৃক শত্রু ?—প্রাণে আগে বার
শত্রুশোণিতের তৃকা—অতৃপ্ত হৃদ্যার।

পূরণ সিংহ।

জেনেগুনেন কতু কারো করিনি অহিত।

মীঠী বাঈ।

অজানিতে হয় তো করেছ ; ভেবে দেখ।

পূরণ সিংহ।

পৈতৃক শত্রুর কথা...তাও তুমি নাই
পিতৃমুখে কোনোদিন ; বংশগত রোষ
আমাদের বংশে নাই। এই শুধু জানি
শত্রুপূর্ব্ব ক্ষেত্র যত, যত মোর গ্রাম—
একে একে গ্রাসিয়াছে শত্রু নামহীন,
মুগ্ধ পরিণামুখে গিছনে লমুখে
অহিনিশি ফিরিছে সে গুপ্ত ছোঁরা হাতে
লক্ষ্মিয়ার এ এক মোর পিতৃদনহারী।
মিছে তারে খুঁজে মরি বরিতে না পারি।

[বরে ভোবের আলো চকিতেই মীঠীবাঈ
কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া পাড়াইল।]

মীঠী বাঈ।

উঠেছে ভোরের হাওয়া, দেখিগে খোকানে।

(প্রস্থান)

পূরণ সিংহ।

(বর্ধময় মুষ্টিগুলির দিকে ফিরিয়া)

ওগো বর্ধনসিহিত পিতৃপিতামহ !
অতীতের দেশমুখ ওগো বীরগণ।

আছে কি এ বংশে কোনো অত্যাচার কালি ?
এ রক্ত কি অত্যাচারে চক্কিত পড়িল ?
কোন অন্ধ যুগে হার করেছ কি পাণ
কলভোগ করি বার আমি এতদিনে ?
তুমি পুন্নপিতামহ ! তুমি হে হমীন্ !
দ্রুতভিতে হঃশাপন ছিলে তুমি তুমি,—
সেবধেবী, রমণীর অপমানকারী,
পরের পীড়ক চির,—তোমারে কি কেহ
দিয়েছিল অভিলাষ অমোঘ দারুণ
বার দাহে আমি আজ নহি অহিনিশি ?
তুমি করে গেছ পাণ, এতদিনে তার
প্রাণশিঁট হব কি গো মোরে দিয়া ? বল,
বল, বল, কথা কও একজন
ভোরের আলোকে পরিম্বাভ কথা কও।

[এই সময় বর্ষময় মুষ্টিগুলির উপর অঙ্গে
অঙ্গে ভোরের আলো আদিত্য পড়িল।]

সবাই নির্ঝক ! সব স্থির ! স্পন্দহীন।
তবু সাধি পুনর্বার, মৃতেরে জাগাই
প্রেমের উত্তর লাগি। বল, কে আমার
করিল এমন দিক্ত সর্কি বিস্তহীন ?
কে করিল নগ্ন মোরে অগতের আগে ?

ছায়ামুষ্টি।

(অন্ধ-কলকে ঢাকা জানালার পিছন হইতে)
আমি !

পূরণ সিংহ।

(আতঙ্কের স্বরে)

তুই !...কে তুই ? জীবন্ত জীব কি রে ?
কিধা মোর চিত্ত-ভক্ত মস্তিষ্কের মারা ?
স্থপনে আবৃত মুখ...কথা ক'...কে তুই।

[পূরণ সিংহ স্বপ্নাবিষ্টের মত ছায়ামুষ্টির নিকে
অগ্রসর হইতে না হইতে মুষ্টি মিলাইয়া গেল।]

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পূর্ণোক্ত কামরা ; সময়—মধ্য-রাত্রি ;
পট উঠিবার সময় দূরে পেটা বড়িতে নানোটা
বাজিল। পূর্ণ দৃশ্যে যোখানে ছায়ামুষ্টি মিলাইয়া
গিয়াছিল ঠিক সেইখানে পূরণ সিংহ
দণ্ডায়মান।]

পূরণ সিংহ।

সেই তবে শত্রু মোর—মুখেতে মুখস,—
সহসা দেখিছ যারে ভোরের আলোর
আবছায়ে, সেই মোর হৃদিশার চেতু
নিম্নমুখে করেছ স্বীকার ; তবু ঠিক
পাটনি জবাব ; বাহির করিতে তবু
সবিশেষ পারিমিক হার, কোনো কথা।
মিকেটে যেতে না যেতে হল অন্তর্ধান
নিঃসাড়, যেমন এসেছিল নিঃশব্দে।

[গর্ভ-গৃহের নিকে চাহিয়া]

শিশু'মোর বুঝাইছে, কিত কোথা গেল
প্রহৃতি তাহার ? এ রাতে কোথা দে নারী ?
(পত্র হস্তে দ্বানবেশী বৃদ্ধ ভৃত্য প্রবেশ
করিল।)

ভৃত্য।

প্রহু ! ঠাহরাণী মোর দিলেন এ চিঠি,
হজুরের হাতে বিতে হকুম তাহার
হুপূর বাজিয়া গেলে রাতের বড়িতে।

(পূরণ সিংহ সাগ্রহে ভৃত্যের হাত হইতে
চিঠি লইলেন।)

পূরণ সিংহ।

(চিঠি খুলিয়া পাঠ)

“স্বামিন্ ! আমি বাড়ী ছাড়িলাম, আর
ফিরিব না। বাড়ী ছাড়িলাম বটে, কিন্তু
ইহা স্থির জানিবেন আমি নিঃশঙ্ক। আমি

তোমার কুলে কালি দিই নাই, অশ্রু কানো
লোকের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নাই।
থাকিতে পারিলাম না, তাই চলিলাম।
আমাকে ক্ষমা করিও, আর থোকা বড়
হইলে তাহাকে আমার ক্ষমা করিতে
পিণাইবো। ইতি মীঠা বাঈ।”

[পূরণ সিংহ তৃত্যকে চলিয়া বাইতে
ইঙ্গিত করিলেন।]

পূরণ সিংহ।

চলে গেল, সেও ছেড়ে চলে গেল মোরে,
লক্ষ্মীশূভ্র মেহ মোর অশ্রুধারা করিয়া
চলে গেল।...হে বিধাতা! আর কিনা থাকে ?
ছেড়ে গেল অকারণে ? পারিল সে যেতে ?...
দুশ্চিন্তার অবিশ্রান্ত দংশনের ব্যথা,—
মিত্য নব চিত্তের উবেগ, দৈহিক জালা,
অতিষ্ঠ বা করিল নারীয়ে। তাই বৃষ্টি
ছেড়ে চলে গেল ; সম্পদে লাভিত সে যে
বিপদের দিনে শেষ লাগা নিয়ে গেল
বুকে।

(সহসা গর্ভগৃহের দিকে ফিরিয়া
ভাটাইয়া রহিলেন।)

শিশু হোথা অঝোরে ঘুমায় একা !
জীবনের রক্তরাগ জাগে মুখে তাই,—
নহিলে ও ঘুম মনে হ'ত শেষ ঘুম
বলে ; হার, এরোও ছাড়িয়া গেল নারী !
বনের যে হিংস্র পশু—সেও নাহি ছাড়ে
আপনার শাবকেরে মরণের মুখে।
সে তবে কিসের লোভে ছেড়ে চলে গেল
অসহায় এ শিশুরে ? লিখেছে চিঠিতে
“শ্রম জেনো, নিরুপক আমি।” তবে হার,
কিসে তারে করিল এমন গৃহত্যাগী ?

ছায়ামূর্তি।

আমি !

পূরণ সিংহ।

তুই ! তেঁসু তুই ! মুগ্ধদের আঁফে
নিজমুখে আপনারে করিস্ ঘোষণা
আমার চুৎকর ছেতু বলি, যে চুৎকর
অধঃপাতে নাই হোথ, অবলম্ব্য নাই,—
তার হেতু তুই ! তুই !...মোর কাছে আমি
ঢাকিতে নারিবি তুই নাম আপনাম,
বল্ নাম বল্ ; কি করেছি অপরাধ
তোমর কাছে আমি ? কী সে মহা অপরাধ
যার লাগি রিক্ত, শূন্য, উদ্বাস, হতাশ
আমারে করিলি তুই এমন করিয়া ?
(উত্তরের প্রতীক্ষার চূর্ণ করিয়া রহিলেন।)

দিবি না উত্তর ? তুই কি রে রক্ত মাংস ?
কিবা উঠে এনেহিস্ প্রেতদ্বান হতে
প্রতিহিংসাপূর্ণিত অন্তরে, মোর পরে
নিতে প্রতিশোধ ? মরণে কি ঢাকে নাই
বিশ্বস্তি-অঙ্গারে অতীতের অমিকণা ?
কোন্ অনন্দের কোন্ অপমান স্মরি
ওরে প্রেত ! মোর পিছে ফিরিস্ নিশ্চয় ?
অমোঘ এ চির যুগা তোমর নির্দাক্ত,
মর্ত্য যান্ধবের মত নহে এ কণিক।
কে তুই ?...না জেনে আমি ছাড়িব না আজ।
(ছায়ামূর্তির দিকে বেগে বাতিল হইবা
নাত্র মূর্তি অদৃশ্য হইয়া গেল এবং পটক্ষেপণ
হইল।)

তৃতীয় দৃশ্য

[পূর্বোক্ত কাম্বা ; সময়—গভীর রাত্রি ;
পূরণ সিংহ উৎকণ্ঠিতভাবে নেশখোর দিকে

চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সহসা দরজা
খুলিয়া একজন পক্ষকেশ চিকিৎসক কাম্বার
আসিলেন।]

পুরণ সিংহ।

থোকা ?...জীবনের আশা আছে ?

(চিকিৎসক বিষন্নভাবে ঘাড় হেঁট
করিলেন।)

(চিকিৎসক মীরবে তাঁহাকে শান্ত
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পুরণ
সিংহ একটা মলিন চোকীর উপর বসিয়া
পড়িলেন।)

পুরণ সিংহ।

বৈজ্ঞাণ্ড গো ! ও গো বৃদ্ধ ! বল, তুমি বল,
দুঃখের উপরে দুঃখ জড় হ'য়ে হ'য়ে—
মতিভ্রম ঘটছে কি মোর ? বল, বল ;
প্রতি দ্রব্ধটন কালে, মনে হয় মোর
কারে যেন দেখি আমি জানালার পাশে
ওই ঝানে, সর্বাঙ্গ বসনে ঢাকা তার,
মুখশে আবৃত মুখ। যখনি কাতরে
বিধিরে জুধাই নিজ দ্রব্ধটন-হেতু,—
ওই মুক্তি কাছে এসে বলে শুধু “আমি”।
বাহির করিতে নারি আর কোনো কথা
তার মুখ হ'তে, হার ! কাছে যদি বাই
অমনি সে হয় অন্তর্ধান। বল মোরে
বিজ্ঞ তুমি, জ্ঞান মন, স্বচ্ছন্দ শরীর,
বল, বল, এ কি হার মনের বিকার ?
অধিক দ্রুতিভ্রমে মতিভ্রম আমার
সদা তপ্ত,— এ কি গারি বিকৃত করনা ?
কিবা বেক পিছে ফেরে প্রতিহিংসা লাগি' ?
থাক তুমি এইখানে সতর্ক সজাগ,—

তোমার'নাড়ীতে নাই চকলতা লেশ,—
দেখ তুমি কী এ ছায়া ; বস মোর কাছে ;
উত্তপ্ত মতিভ্রমে মনে দাও হে আশাস।

চিকিৎসক।

বিপদে বিকিপ্ত মন, বিকৃত চরিত্র,—
জাগিয়া স্বপন দেখে, বিচিত্র এ নগর।
প্রভাতের আগে আমি পাঠাব ঔষধ,
পান করি' ঘুমাইবে, ডর কিছু নাই।
(ঘীরে ঘীরে প্রস্থান।)

পুরণ সিংহ।

স্বর্গাসীন ভগবান ! সর্বশক্তিমান !
জানি আমি দণ্ড ওষুধে প্রতীকৃত,
তোমারে জুধাই প্রভু কী অস্তায় আমি
করেছি জীবনে, বার লাগি এই শাস্তি ?—
বার লাগি জীহীন এ বাস্তবিতা মোর ?—
বার লাগি অকারণে চলে গেল নারী ?—
বার লাগি মৃত্যু নিল সন্তানের হরি ?—
অভিশপ্ত আমি হার, কী সে অভিশাপ ?

(ছায়ামূর্তি আবিস্কৃত হইয়া।)

আমি !

পুরণ সিংহ।

ফেরে তুই এসেছিস হেথা ? কোথায় ?
বার বার ভিনবার ! তবে ছায়া ন'স ?
লুপ্ত আমি দেখি তোরে ডোখের সম্মুখে,
শত্রু বলে জেনেছি তোমার, আপনি তা
কহেছি স্বীকার বায়ে বায়ে মোর কাছে,
বলেছিস—আমার দুঃখের হেতু তুই।
আজ হ'তে সঙ্গ নেব, পিছে পিছে তোরা
কিরিব দিবস নিশি সাগরে প্রান্তরে ;
অরণ্য হসনি আভো তেমন নিবিড়

যেথা ভুই লুকাইবি আশাবে এড়ায়ে,
 ভূর্গ আঞ্জো হয় নাই তেমন ভূর্গর
 আশাষ করিবি যেথা মোরে ফাঁকি দিবে,
 ওরে মূঢ়!—হেন দূঢ় হয়নি কল্যাট।
 যেমন ফিবেছ তুমি আশার পিছনে
 তেমনি ফিরিব তোর পিছে পিছে আমি
 আজ হতে, শিকারের পিছে ব্যাধ সম,
 শেষ দেখে তবে সে ছাড়িব। একা আমি
 শোকাক্ত, নির্দন, নিঃসংসার—আজ হতে
 এই কাজে শুধু সঁপিব জীবন মন;
 যিক এ পৈত্রিক মোর ভিটার নপথ
 সম্মত পুত্রের আতপ্ত বেহ আগে
 দিবা করি কতি আমি,—নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়
 নিঃশেষে বর্জন করি আজ হতে শুধু
 তোর পিছে ছুটিব নিরন্তর; যতদিন
 বোঝাপড়া না হয় নিকাশ হিসাবের
 ততদিন নিস্তার নাহিক মোর হাতে।

(ছাত্রমূর্ত্তিকে ধরিতে বাইবামাত্র উহা
 অদৃশ্য হইল। পটক্ষেপণ।)

চতুর্থ দৃশ্য

(একটা অত্যন্ত সর বোনা গলি; মেঘজিহ
 হৃদ্য অস্ত্র বাইতেছে। ছাত্রমূর্ত্তি গলির মোরা
 মুখের দিকে লম্বা পা ফেলিয়া অগ্রসর
 হইতেছে। সহসা পুরণ সিংহ ধূনিধ্বজর বেশে
 দৌড়িতে দৌড়িতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে
 প্রবেশ করিলেন।)

পুরণ সিংহ।

এইবার পেরেছি নাগালে! আর কোথা?
 আর কোথা পালাবি এখন? বোনা গলি,—

পালাবার নাই পথ, আশ-প্রকাশের
 তোর এনেছে সময়। দাঁড়া, ঘুরে দাঁড়া,
 পোল ও মুখল, মহিলে ফেলি ফেড়ে
 এই খজাখাতে।

(তলোয়ার খাঁপ হইতে নিমেষে বাহির
 করিয়া)

ঘুরে দাঁড়া হ'ল যদি

রক্ত মাংসে গঠিত মানুষ, ঘুরে দাঁড়া;
 এইবার বিতে মোবে হবে পরিচর,—
 এইবার বোঝাপড়া হিসাবনিকাশ;—

প্রত্যাশান করিবার সাপি নাই পথ;
 ঘুরে দাঁড়া, পিছে হ'তে মারিব না আমি।

(ছাত্রমূর্ত্তি ধীরে ধীরে ঘুরিয়া দাঁড়াইল
 এবং আঁতে আঁতে মুখে মুখস এবং গায়ের
 আবরণ খুলিয়া ফেলিল; ইহার মুখ চোখ,
 সাদাসজ্জা সমস্তই হবহ পূরণ সিংহের
 অনুরূপ।)

ছাত্রমূর্ত্তি।

পূর্ণ সিংহ। 'পূর্ণ' হ'ল সাধ?

পুরণ সিংহ।

(বিকট চীৎকার করিয়া)

এ কি! আমি!

[বিকটক্ৰম বরণাহত পুরণ সিংহের কাঠবৎ
 দেহ অড়পদার্থের মত ছাত্রমূর্ত্তির পার্শ্বে
 গোড়ার পড়িয়া গেল। ছাত্রমূর্ত্তি পুরণ সিংহের
 কৃষ্ণ উপর পা মাঝিয়া দাঁড়াইল; তাহার
 পর ধীরে ধীরে মুখে মিলাইতে লাগিল।
 সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিকা পড়িল।]

ঐশ্যোজ্ঞনাথ দত্ত।

ছুনিয়ার পশ্চিমতম নগর

১। পূর্ব ও পশ্চিম

ইরাকি স্থানের 'মধ্য পশ্চিম' এবং 'আরব পশ্চিম' ভূমণদান্দুহ এক্ষণে আমাদের পূর্ব দিকে। কলকাস-আবিদুত ভূখণ্ডের মহাপশ্চিম প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছি। ২২তঃ ইহা সমগ্র ভগতেরই পশ্চিমতম অংশ।

প্রকৃত প্রস্তাবে পশ্চিমতম অথবা পূর্বতম বলিয়া কোনো শব্দ ব্যবহৃত হইতেই পারে না। প্রকৃতি দেবীর জ্ঞানে পূর্ব বা পশ্চিম নামে কতকগুলি চিহ্নিত স্থান নহি। রামের বাড়ীর যে ঘর পশ্চিম ভিটার অবস্থিত, সেই ঘর ঘর বাড়ীর হিসাবে পূর্ব ভিটার অবস্থিত। ইরাকিদের পশ্চিমতম প্রদেশ ক্যালিফর্ণিয়া—কিন্তু ক্যালিফর্ণিয়া-বাসী প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পারে স্থগাত্য দেশ মেনে না কি? কাজেই ভ্যান্ডারভিল্ডের লোকেরা আপানের টোকিওকে পাশ্চাত্য দেশীয় নগর বিবেচনা করিতে বাধ্য। ভারতবাসীর হিসাবে আকগানিস্থান হইতে ইংলিস্থান পর্যন্ত সকল দেশই পাশ্চাত্য, সেইরূপ ক্যালিফর্ণিয়া বাসীর হিসাবে আপান হইতে হিন্দুস্থান পারন্ত তুরস্ক পর্যন্ত সবই পশ্চিম দেশ। কাজেই ভ্যান্ডারভিল্ডকে ছুনিয়ার পশ্চিমতম নগর বলিলে ভৌগোলিক জ্ঞানের অগত্যা সপ্রমাণ হয়। অথচ বিশ্ববাসী সকলেই এই ভুল বিশ্বাস ও ধারণা সংশোধন করিতেছে না কেন? আমরা

শিকিত অশিকিত অর্ধশিকিত ভগতের সকল লোকই পৃথিবীর কতকগুলি দেশকে Near East বা সমীপবর্তী প্রাচ্য, কতকগুলি দেশকে Farther East অথবা Middle East—দূরবর্তী বা মধ্যবর্তী প্রাচ্য এবং কতকগুলি দেশকে Farthest East—দূরতমবর্তী প্রাচ্য বলিতে সঙ্কোচ বোধ করি না। সঙ্গে সঙ্গে ছুনিয়ার কতকগুলি দেশকে আমরা বিনা বাধ্য-ব্যয়ে পশ্চিম ও মহাপশ্চিম বিবেচনা করিয়া থাকি। প্রাকৃতিক হিসাবে ভ্যান্ডারভিল্ডের লোকেরা টোকিও নগরকে পাশ্চাত্যদেশীয় বিবেচনা করিতে বাধ্য। অন্যতম দেখিতেছি এখনকার মহাপণ্ডিতেরাও জাপানীগণকে প্রাচ্যতম দেশের লোক বিবেচনা করে। ছুনিয়ার পশ্চিমতম দেশের পশ্চিমে পূর্বতম দেশ অবস্থিত হইল কি করিয়া? আবার জাপানীরা প্রাকৃতিক হিসাবে আমেরিকাকে হর্গোয়ানের দেশ অর্থাৎ প্রাচ্য বিবেচনা করিতে বাধ্য। কিন্তু তাহারাও ইরাকি সমাজকে পাশ্চাত্য বিবেচনা করিতেছে। ছুনিয়ার লোকেরা কি উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম নির্ণয় করিতে জানে না?

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য শব্দ ছুইটা পারিভাষিক শব্দরূপ ব্যবহৃত হইতেছে। প্রাকৃতিক ভূগোলের হিসাবে এই ছুই শব্দে বাহা বুঝার পারিভাষিক হিসাবে তাহা বুঝে না। ভৌগোলিকের বিবেচনায় কোনো দেশ সর্বদা

প্রাচ্য, এবং কোনো দেশ সর্বদা পাশ্চাত্য থাকিতে পারে না। একই জনপদ কোন দেশের পক্ষে পূর্বে অবস্থিত কিম্বা অন্য দেশের পক্ষে তাহা পশ্চিমে অবস্থিত। অথচ পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করিলে প্রাচ্য শব্দে সর্বদা সূর্য্য দেশের লোকই কতকগুলি জনপদ বুদ্ধিগা আদিত্যেছে। আফগানিস্তান হইতে তুরস্ক পর্য্যন্ত সূর্য্য দেশই ভারত-বাসীর পক্ষে পাশ্চাত্য—এবং চীন, ব্রহ্ম, জাপান ও জাপান প্রাচ্য। কিম্বা পারিভাষিক ভাবে আমরা সমগ্র এশিয়ায়কেই প্রাচ্য বলিতেছি—জাপান হইতে তুরস্ক পর্য্যন্ত সকল দেশকেই ভারতবাসীরা প্রাচ্য বিবেচনা করে। তুরস্কের পশ্চিম হইতে ইয়োমোপের আরম্ভ বিচার করা হয়—আমেরিকাকে ইয়োমোপেরই বিস্তৃত অংশ ধরা যায়। এই দুই ভূখণ্ডকে এক সঙ্গে “ইয়োমোমেরিকা” বলা যাইতে পারে। সমগ্র এশিয়াবাসীর চিত্তের এই দুই ভূখণ্ডের যে-কোনো অংশ পাশ্চাত্য নামে পরিচিত।

এইরূপ ক্রীম অর্থবৃত্ত পারিভাষিক শব্দের উৎপত্তি কেন হইল? প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই ধরণের পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইত না;—হুনিয়ার বড় বড় মহাদেশগুলিকে এইরূপে বিভক্ত করা হইত না। তখন জুজ গ্রীসের রাষ্ট্রপুত্র তাহাদের বহির্ভূত সমাজকে মোটের উপর Barbarian বা বর্বর বলিয়া জানিত। ইংল্যান্ডের বিদেশীয় লোকজনকে Welsh বলিত, হিন্দুরা বিধর্ম্মাদিগকে রেজ বা মত্য় বলিত, মুসলমানেরা অপর ধর্ম্মপ্রাপ্তিদিগকে কাফের বলিত। আফ্রিকার

প্রাচ্য পাশ্চাত্য ইত্যাদি শব্দ তখন সৃষ্ট হয় নাই। এই শব্দগুলি বর্তমান যুগের ইয়োমোমেরিকানেরা আবিষ্কার করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বিশেষভাবে এই জাতীয় মানবেরই বিশ্ব-বাণিজ্য ও বিশ্ব-সাহিত্যের যুগ। ইংরাজ নিজ নিজ স্থানীয় অগ্রগতির হুনিয়ার বিভিন্ন অংশের নামকরণ করিয়া থাকে। সমগ্র পৃথিবীর কেন্দ্র ইয়োমোমেরিকা—এই বিবেচনা করিয়া ইংরাজ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। এই বিস্তৃত ভূভাগের জনগণ যেন এক অখণ্ড সম্রাজ্য ও সমাজের অন্তর্গত—সুতরাং ইংরাজ এক অঞ্চলের পক্ষে যাহা প্রাচ্য, সকল অঞ্চলের পক্ষেও তাহাই প্রাচ্য এইরূপ বিবেচিত হইতেছে। বিলাতী কবি কিপ্লিংডের

“East is East, and West is West.

The twain will never meet”

ইত্যাদি সুপরিচিত দোহাতে East এবং West এই পারিভাষিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

২। ইয়াকি নগরের নৈশ দৃশ্য

জানুয়ার্সিঙ্কোর পদ্যার্পণ করিবার পূর্বে রাজিকালে ঈমারে জুজ উপনগর পার হইতে হইয়াছিল। ঈমারে বসিয়াই হুনিয়ার পশ্চিমতম নগর ও বন্দরের নৈশ শোভা দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইয়াকিহানের প্রত্যেক নগরই রাজিকালে নগরপুরোতে পরিণত হয়। দেওয়ানীর উৎসব এই দেশে প্রতি মজনীতেই অদৃষ্ট হইয়া থাকে বলা যাইতে পারে। তড়িতের বাতী গৃহে গৃহে রাখার রাখার বাগানে

বাগানে,—নগরবাসীদিগের মনন বলিয়া দেয়। বাতীগুলি একমাত্র আলোকদানের জন্যই তৈয়ারী হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রাস্তার দোন্দর্য, উত্তানের শোভা, হোটেল ও দোকানের আকর্ষণীয় ইত্যাদি নানা উপারে বাড়তিয়া তুলিবার জন্যই বাতীগুলি বিশেষভাবে সাজানো হইয়া থাকে। গৃহাদি নির্মাণ করিবার সময়ে এম্বিনারেরা আলোক-বিকীরণের প্রণালী বিশেষ দক্ষতার সহিত আলোচনা করেন। বাতী সাজাইবার বিজ্ঞাটা এদেশে একটা স্বতন্ত্র সাধনার সামগ্রী। কাজেই নিউইয়র্ক হইতে ত্রান্সম্যান্সিয়ে পৰ্যন্ত কুস্ত বৃহৎ প্রত্যেক নগরেই আলোকমালা একটা দেখিবার জিনিস। রাজিকালে নগর পর্যটন একটা কার্যবিশেষ। একমাত্র দিব্যভাগে নগরাদি দেখিলে এদেশের অঙ্গাংশ দেখা হয় নাই।

দোকান-গৃহের মালিকেরা বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য আলোকমালায় অশেষবিধ বৈচিত্র্য উৎপাদন করিয়া থাকেন। তড়িতের শক্তি ব্যবহার করিয়া আজকাল লোকেরা আলোকের ইচ্ছাকৃত বর্ণ পরিবর্তন, আকৃতি পরিবর্তন, স্থান পরিবর্তন ইত্যাদি সাধন করিতে পারে। ইয়াকিরা পাকা ব্যবসায়ী—বিজ্ঞাপন প্রচার ইচ্ছাদের সর্বপ্রধান কার্য। তড়িতের সাহায্যে আলোকমালায় শোভা ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে ইহার। ব্যবহার-নাই বস্তুমান। এক্ষণে ত্রান্সম্যান্সিয়ের বিশ্ববাসীর সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইতেছে। ক্যালিফোর্নিয়া রাষ্ট্র দুনিয়ার লোককে আহ্বান করিয়াছেন। কাজেই

বিজ্ঞাপনের ছটা এখানে আজকাল চূড়ান্ত দেখিবারই কথা। কার্যেও তাহাই দেখিতেছি।

ঈমার হইতে দেখিলাম—দে-বাটে নারিন তাহার মাথার তড়িতের বাতী ধরা লেখা রহিয়াছে—“California invites the World—Panama-Pacific Exposition, 1915” প্যানামা বোমবে খাল কাটা সম্পূর্ণ হইয়াছে—একপে প্রশান্ত মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই ঘটনা স্মরণীয় রাখিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশ ‘এফ বিরাট প্রদর্শনী’র ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে জগতের সকল জাতিই তাহাদের নিজ নিজ উৎকর্ষ-বিজ্ঞাপক বস্তু প্রদর্শনীক্ষেত্রে পাঠাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। ১৯১৫ সালের সারাবৎসর এই প্রদর্শনী খোলা থাকিবে। গত কেক্সারী নামে ইহার ধার উদ্বৃত্ত করা হইয়াছে।

ঈমার হইতেই সুবিস্তৃত প্রদর্শনীক্ষেত্রের সৌধসমূহের আলোকমালা দেখিতে পাইলাম। অটলিকাবলীর শিরোভাগ বিভিন্ন ধরণের—কোনটা গম্বুজের মত, কোনটা মন্দিরশীর্ষের মত, কোনটা গির্জার মত ইত্যাদি। এই সকল আকৃতিবিশিষ্ট সৌধের “রোশনাই” সাগরবক্ষ হইতে বেন কোন একটা আলোক-লোকের আভাস দিতেছে। বাতীর রংগুলি এবং জগদিত Search light-এর রেখাপাত সমগ্র নভোমণ্ডলকে অদ্ভুত রূপে রঞ্জিত করিয়াছে। মহানগরের উপরে বেদশূন্য নীল আকাশ, তাহাতে জগৎজের চাঁদ—কিন্তু

“মূলভাগের মীণাবলী” চিত্র-কিরণকে নিতান্তই মলিন করিয়া তুলিয়াছে।

নগরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি তানজাবান্‌নিকোর নগর-শালকেরা এখানকার নিতানৈমিত্তিক রোশনাই সৰ্ব্বক্ষে বিশেষ বহুমান। কোন কোন রাস্তার বাতীর ফটক প্রস্তুত হইয়াছে।

৩। বিশ্ব-মেলা

এই বৎসর দুনিয়ার সকল জাতি তানজাবান্‌নিকো নগরে সম্মিলিত হইয়াছে। মশ বৎসর পূর্বে এইরূপ একটা বিশ্ব-সম্মিলন ইরাঙ্কিস্থানের আর এক নগরে অস্থগীত হইয়াছিল। ১৯০৪ সালের সেই মেলা সেণ্ট লুই নগরে আহৃত হয়। এই নগর মিসিসিপি ও মিসৌরি নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। শিকাগোর দ্বারি ইহা মহাপশ্চিম জনপদের প্রধান নগর। এই দুই নগরকে কেন্দ্র করিয়াই ইরাঙ্কিরা ক্রমশঃ মহাপশ্চিম প্রদেশে বাণিজ্য বিস্তার এবং বসতিস্থাপনে প্রবৃত্ত হয়। সেণ্ট-লুইয়ের পূর্বে শিকাগো নগরে বিশ্ব মেলা বসিয়াছিল—সে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। সেই সম্মিলন উপলক্ষে বিবেকানন্দ ইরাঙ্কি-স্থানে বেদান্ত প্রচারণার সুযোগ পান। প্রতি মশ বৎসরের মধ্যে জগতে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা ইত্যাদির উন্নতি অল্প সাধিত হয় না। মানব-সভ্যতার ক্রম-বিকাশ বৃদ্ধিবার জন্যই এইরূপ আন্ত-জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়া থাকে। ইরাঙ্কিরা মশ বৎসরের ভিতর তিনবার এইরূপ বিশ্ব মেলা আয়োজন করিল।

ইরাঙ্কিরা ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাহাদের সর্ব-প্রথম প্রদর্শনীর খুলিয়াছিল। সেই মেলা স্বাধীনতা-পুরী ফিলাডেলফিয়ার বগে। ইংরাজ হইতে স্বাধীনতা লাভের শতবর্ষ স্মরণীয় রাখিবার জন্য তাহারা এই আয়োজন করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইরাঙ্কিরা প্রথমে প্রাচ্য জনপদে, পরে মধ্য জনপদে সর্বশেষে পশ্চিম জনপদে তাহাদের সম্মিলনক্ষেত্র নির্মাণ করিয়াছে। তাহাদের ভৌগোলিক এবং রাষ্ট্রীয় ক্রমবিকাশের ধারাও এইরূপই;—তাহারা পূর্বে হইতে ক্রমশঃ পশ্চিমে অগ্রসর হইয়াছে।

ফিলাডেলফিয়ার সম্মিলনের ফলে প্রাচ্য জনপদের উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশ পরস্পর পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ হইতে পারিয়াছিল। ইহার কিছুকাল পূর্বে Civil war বাধে;—সেই গৃহবিবাদ ও যুদ্ধের ভের মিটাইয়া দিবার পক্ষে এই মেলা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। মধ্য প্রদেশের মেলাধরের প্রভাবে ইরাঙ্কিস্থানের লোকেরা স্বদেশের বিস্তৃত জনপদসমূহের স্বার্থ পরিচয় পাইল। এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে পর্যটন আরম্ভ হইল। মধ্য প্রদেশের সুযোগ সুবিধাগুলি প্রাচ্য জনপদের লোকেরা জানিতে পারিল। ইরাঙ্কিস্থান সৰ্ব্বক্ষে স্বার্থ ধারণা জন্মিবার পক্ষে নানা উপায় সৃষ্ট হইল। বর্তমান বিশ্ব-মেলায় ফলে ইরাঙ্কিরা তাহাদের স্বদেশকে সত্য ভাবে চিনিতে পারিলে। তাহাদের মহাপশ্চিম জনপদ যে কত বড়, ইহার অভ্যন্তরে যে কত প্রকার ধাতু রত্ন শত পত্ত লুকায়িত আছে তাহা এইবার ইহারা স্বার্থরূপে জানিতে

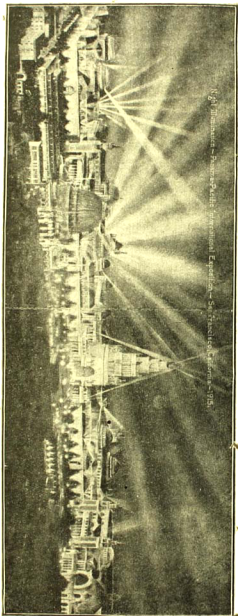
পারিবে। পূর্বে ও মধ্য প্রদেশ হইতে সহস্র সহস্র নরনারী এই বিশাল মহাবেশে পঞ্চাটন করিতে আসিবে। এতদিন পর্য্যন্ত যে সকল জনপদের নাথবাঈ জানা ছিল, সেই সকল জনপদ এখন হইতে জীবন্ত সভ্যতাপে ইগ্নাঙ্কিরে চিত্তে স্থান পাইবে। রেলকোম্পানির পৰ্য্যটকগণকে জ্ঞান্দ্ৰা-সিঙ্ঘের আকৃষ্ট করিবার অল্প মানা প্রলোভন দেখাইতেছেন। তাহারি এক ডাড়াই বাতায়নের সুবিধা দিগছেন। এইরূপ ব্যবহার কলে অসংখ্য বাজী এই দিকে ছুঁকিতেছে। জ্ঞান্দ্ৰাঙ্গিকো দেখার সঙ্গে সঙ্গে পৰ্য্যটকেরা মধ্যবর্তী পন্নী নগরাধিতেও প্রবণ করিবার সুযোগ পাইতেছেন।

ভারতবর্ষের নগরে নগরে কংগ্রেস আঁহুত হয়। তাহার কলে ভারতবর্ষ বাঙ্গালী, মাজাজী, মারাঠী, পাঞ্জাবী ইত্যাদি সকল প্রদেশবাসীর মধ্যে পরস্পরের মৃত্তাধিক পরিচয় সজ্জাটতঃ হইতে পারিরাছে। শিল্প-সম্মিলন, সাহিত্যসম্মিলন, ধর্ম্মসম্মিলন, শিক্ষা সম্মিলন ইত্যাদির সাহায্যেও এইরূপে দেশের পরিচয় সকলেই পাইয়া আসিতেছে। এই সকল অমুষ্ঠানের সাহায্যে আর কোন সুফল না কলিলেও অন্ততঃ দেশদ্রমণের সুযোগ ও প্রবৃত্তি সৃষ্ট হয়। দেশবাসীর পরস্পর দেখাভন্য মেলামেলা ও জাববিময় এবং কর্ম্মবিময় করিতে পারে। তাহা ছাড়া তুলনাপাঠন, আত্মসংশোধন এবং আত্মোন্নতির উপায়ও সহজেই উদ্ভাবিত হয়। নিম্নের মামুলি কর্ম্মপ্রণালীকেই আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিবার কুসংসার চলিয়া যায়।

৪। প্রদর্শনী-ক্ষেত্র

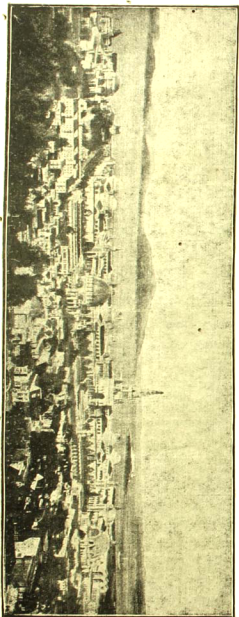
উপসাগরের ধারে সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর প্রদর্শনী-ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। আর আড়াই মাইল দীর্ঘ এবং অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত স্থানে একটি নানি ক্ষুদ্র নরম নগর দেখিতে পাইতেছি। এই নগরের ভিতর মাদ্রাস, উজান, কোয়ারা, আগার, সৌধ, আলোক-স্তম্ভ, নাচগৃহ, প্রমোদালয়, রেলওয়ে ইত্যাদি সবই আছে। সমগ্র প্রদর্শনী-নগর নির্মাণ করিতে বহুকেটি টাকা খরচ হইয়াছে—কিন্তু মেলা শেষ হইয়া গেলে নগর ধ্বংস করিয়া ফেলা হইবে। মেলায় সকলপ্রকার খরচের অল্প কর্ম্মকর্ত্তারা ১৫০,০০০,০০০ টাকা মূল্য করিয়াছেন।

দেড় টাকার টিকিট কিনিয়া প্রদর্শনী-নগরে প্রবেশ করিবার। ফটক হইতে প্রাঙ্গণে পড়িয়াই মনে হইল যেন দিল্লীরবাসে উপস্থিত হইয়াছি। মহাভারত-বর্ণিত রাজহর-যজ্ঞের বিরাট আয়োজন চোখে পড়িতেছে। চারিদিকে মহোৎসবের লক্ষণ। পার্শ্বস্থিত কতকগুলি গৃহে নাচ, গান, বাজনা চলিতেছে—এদিকে এদিকে সর্বত্র লোকের ভিড়—অপূর্ণ নরনারীর সমাবেশ। সৌধ-সমূহ নানাবর্ণে বিহ্বলিত, আলোকস্তম্ভগুলির আকৃতি এবং বর্ণ মননরঞ্জক। বিভিন্ন পতাকা, মুর্ত্তি, কোয়ারা ইত্যাদির প্রভাবে সমগ্র আগর ও পথগুলি এক রমণীয় দৃশ্যের আধার হইয়াছে। কোনো কোনো স্থানে আমাদের দেশের বিবাহোৎসবের উল্লাস উজ্জ্বল বা 'বজ্রবাড়ি'র মহাশব্দমোরোহ দেখা দাইতেছে। মোটের উপর মনে হইতে



Palace of the International Exposition - San Francisco, California - 1915.

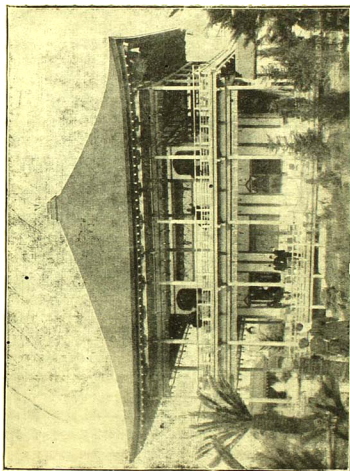
THE PALACE OF THE INTERNATIONAL EXPOSITION



লাগিল যে, ছনিয়াব নানাহান হটেতে
আনীত বস্তুগুলি না দেখিয়া কেবল প্রদর্শনী-
ক্ষেত্রের সৌধ, সাজসজ্জা, আসবাবপত্র,
উদ্ভান, ফোয়ারা, আলোক-স্বস্ত্র ইত্যাদি দেখিয়া
গেলেন। এই দিরাট বিশ্বদৃশ্যলনে আসা
সার্থক হইবে। প্রদর্শনীর বাহিরে ইয়াকিরা
অত্যাচ্ছন্নীয় স্বকুমার শির, কলাজান,

দৌলখানবোদ, বিজ্ঞানশক্তি এবং স্বশৃঙ্খলার
পরিচয় দিয়াছেন। এই বিশ্ব-যেণার বাহ
অঙ্গগুলি প্রত্যেক ব্যক্তিরই সর্বপ্রথম দর্শন-
যোগ্য।

কি দিবাভাগে, কি রাত্রিকালে, একট
গৃহ সকলেরই চোখে পড়ে। তাহার নাম
“রত্ন-মন্দির” বা Tower of Jewels।



যেদিকে হাপানী চোখ

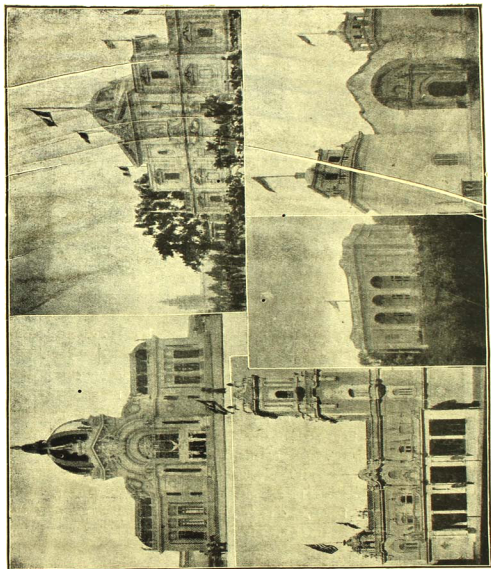
দেখিতে টাৱা হিম্ম-মন্দিরের মত—মন্দিরের “নিধর” টাৱার বিশেষত্ব। জগদ্রাশ্বদেবের মন্দির অথবা রদের স্থান এই প্রাঙ্গণটি কয়েক তুরে বিভক্ত। সমস্ত প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের খোঁজা বৃক্ষের জটাই ইহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিতরে প্রদর্শনযোগ্য কোন পদার্থ রক্ষিত হয় নাই। চুনী, মরকত, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য, চীরা এবং অজ্ঞাত রত্নের বর্ণবিবিশিষ্ট কাচ-প্রজন্ম এই মন্দিরের গায়ে পড়িত দেখিতে পাটলাম। দিনে স্থগেব কিরণে মণিমালায়-বিস্তৃত এট সৌন্দর্য্য দর্শক-গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রায় ১৫০০০ ফুট বৃহৎ রত্নমণ্ডল উজ্জল বস্ত্র এই সৌন্দর্য্য নিদ্রাণে ব্যবসৃত হইয়াছে। রাজিকালে ইহার গোপন শতভাগ বন্ধিত হইয়া ওঠে। কারণ প্রায় দুই শত নানা রঙের আলোক নানা স্থান হইতে এই মন্দিরের উপর নিক্ষিপ্ত করিবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তন্মিত পাই উত্তর ও দক্ষিণ েকতে স্থগের কিরণ সপ্তবার্ণে বিভক্ত রামধনুর স্থায় দেখায়। তাহাকে ইংরাজিতে বলে Aurora Borealis। সেই রামধনুগদূর আলোক-সরিপাতের আয়োজন প্রদর্শনীর কর্তারা উদ্ভাবন করিয়াছেন। এইখানে রাজিকালের Aurora Borealis-এর অলঙ্করণ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের সৌণ্ডালির রচনা-রীতি নানা রকমের। এক এক ভবনের জন্ত এক এক প্রকার নির্মাণ-কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক কারদা, মধ্যযুগের বাস্ত-পদ্ধতি, মুসলমানী রীতি, রেপার্টাম্-প্রণালী ইত্যাদি নানা প্রকার

গৃহ-নির্মাণ-রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৈচিত্র্যের ফলে ভোক্তার অনিন্দ্য বেগ জন্মে—গৃহ হইতে গৃহান্তরে ঘাইতে দৃষ্টি পরিবর্তন ও স্থান পরিবর্তনে মন রাস্ত হইয়া পড়িবার অবসর পায় না। এক্ষেত্রে গৃহসজ্জা অথবা পথ-সমাবেশ দেখিতে হয় ত বিশেষ কষ্টকর হইত। প্রদর্শনী-নগরের এক স্থানে ফরাসী-রীতি, অপর এক স্থানে জাপানী-রীতি, কোন অংশে ওলন্দাজ বাস্তবিকতার নিদর্শন—অজ্ঞাত চরিত্র স্পেনের মুসলমানী স্মারদ। এই বিশ্বমেলায় ছুনিচার বিভিন্ন কারিগরী একত্র দেখিবার সুবিধা পাইলাম। দশ লক্ষ হইতে পনব লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত এক-একটা সৌন্দর্য্যে খরচ করা হইয়াছে।

কেবল গৃহনির্মাণ-রীতি দেখিরাই যুড় হইতেছি তাহা নহে। এখানে চিত্রকর-গণের কাককাণ্ডও কম দেখিতেছি না। সৌন্দর্য্যমুগ্ধের লোকসজ্জার চিত্রবিভাগ প্রাচীরে বহুল পরিমাণে দেখিতেছি। স্থাপত্য-নির্ম্মের পরিচয়ও প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের বে কোন অংশেই দেখিতে পাই। প্রত্যেক ভবনের প্রাচীর, কার্ণিস, স্তম্ভ, ফটক ইত্যাদিতে নরনারীর সূক্তি স্থাপিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ক্ষেত্রের ভিতরকার প্রত্যেক উজানে ও প্রাঙ্গণে বহু ঐচ্ছ প্রণীত ভাস্কর্য্য সরিবেশিত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে জলের ফোয়ারা অবস্থিত—সেইগুলির প্রত্যেকটাই স্থপতিগণের কারিগরীর অপূর্ণ নিদর্শন।

আলোক-বিকীরণে, বর্ণবিজ্ঞানে ও ফোয়ারা নির্মাণে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান চরম প্রয়োগ দেখিতেছি। গৃহনির্মাণে



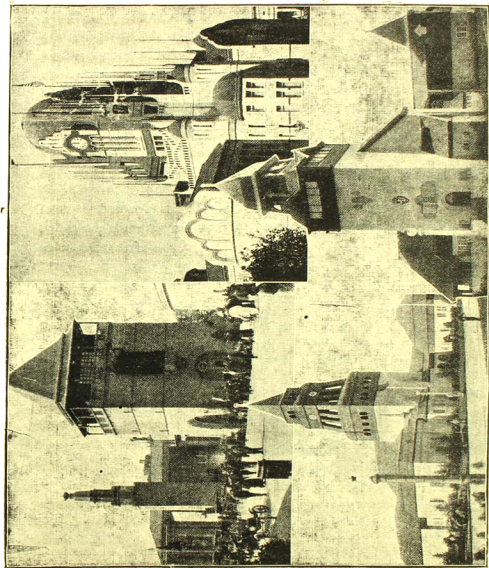
এজিনীয়ারিংয়ের পরাকাষ্ঠা পরিচেষ্ট।
স্বহৃদ্য শিল্পকলা, ভাস্কর্য, উত্থান-রচনা
ইত্যাদিও এই প্রদর্শনী-নগরে বিশেষরূপেই
দেখিবার জিনিস। এই সমুদয়ের সাফল্য-
ভঞ্জন কার্যও উচ্চ অঙ্গের দৌন্দর্য্যজ্ঞান
পরিপূর্ণ রহিয়াছে। রাজিকালে কোন
কোন দিন Fire-works বা আতশবাহীর
খেলা দেখান হয়। হাওয়াই, তুবাউ
ইত্যাদির শেষ পরিণতি যেন তখন চোখের
সম্মুখে একটি হইয়া যেনে। মনে হয়, বিজ্ঞান ও
শিল্প উভয়ই যেন একেত্রে অবতাররূপে একত্র
আবির্ভূত হইয়া প্রদর্শনীর কর্মকর্তাদিগকে
এই নগর-রচনার পরিচালিত করিয়াছে।
বিশ শতাব্দীর যুরোপীয় মহাকুরুক্ষেত্রেও এই
ছই অবতারের রাক্ষসী-লীলা দেখিতে পাঠ।
সেই অবতারঘরেরই অপর দোলা—মাস-মুষ্টি
জানুয়ান্সিয়ার এই মেলা কেন্দ্রে দেখিয়া
লইলাম। সৌন্দর্য্যমূহের অভাবের সংগৃহীত
দ্রব্যনিচয় না দেখিলেও মনে ভাব থাকিবে
না। বহির্ভাগেই সমগ্র বর্তমান ভগতের
কর্ষণশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ধনশক্তি প্রকট
রহিয়াছে।

প্রদর্শনী-নগরের সাধারণ সৌন্দর্য্যমূহের
সংখ্যা বেশী নয়—কিন্তু তাহাদের আকৃতি
সুস্বাদু এবং রচনা-রীতি সৌকর্য্যের পরি-
পোষক। এই সৌন্দর্য্যমূহ ব্যতীত বহুলংঘ্যক
আন্দোল-আন্দোল-ভবন রহিয়াছে। এইগুলিতে
চীনা, জাপানী, মিশরীয়, গোহিতাজ,
মেক্সিকান, মেওর ইত্যাদি নানাভাষীর
জনগণের পল্লীকীর্ষন বুঝাইবার হ্রস্ব
সেওয়া হইয়াছে। এই সমুদয়ের নির্মাণে ভিন্ন
ভিন্ন “বদেশী” কারদা অগ্রসৃত দেখিলাম।

এগুলির ভিতর প্রবেশ করিলে বিভিন্ন জাতীয়
নরনারীর শিল্প, চিত্রকলা, দোকান ঘাট,
নাট্যগান, ক্রীড়াভৌতিক জগদ্রম্য করিতে পারি।
যায়। প্রত্যেক গৃহে প্রবেশ করিতে পরসা
লাগে। যাইরা অনেকক্ষণ সময় কাটান
গেল। সহজে বিভিন্ন দেশের রীতিনীতি
জান-কারদা জগদ্রম্য করিবার পক্ষে ইহা
বেশ ভাল উপায়।

এই সমুদয় ভৌতিকগৃহ ব্যতীত আরও
কতগুলি অট্টালিকার প্রদর্শনী-কেন্দ্র পরি-
পূর্ণ। তাহাদের সংখ্যা প্রায় অর্ধশত।
এইগুলির অর্ধেক যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন
প্রদেশ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। কোন
কোন প্রদেশের সকলপ্রকার প্রদর্শনযোগ্য
বস্তু এইরূপ এক ভবনে সংগৃহীত রহি-
য়াছে। কালিফোর্নিয়া-রাষ্ট্রের আসাদ বিশেষ
উল্লেখযোগ্য। জাপান, চীন, হাওয়াই, তুবাউ,
আন্তর্জাতিক, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি বিভিন্ন
রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রও ২০:২২টা গৃহ নির্মাণ
করিয়াছেন। এই আদেশিক ও নিদেশীয়
রাষ্ট্রভবনগুলির কোন কোনটা বিশেষ-
ভাবে দর্শনযোগ্য। অবশ্য এই সমুদয়
দেশের প্রদর্শিত দ্রব্যনিচয় সাধারণ সৌন্দ-
র্য্যমূহেই রক্ষিত হইয়াছে।

চীনাগৃহ-নির্মাণের ক্ষেত্রে চীন হইতে
কারিগর ও মিস্ত্রী আমদানী করা হইয়া-
ছিল। এমন কি বহু উপকরণ, তৈজসপত্র,
উত্থানরচনার সামগ্রীও চীন হইতে আনা
হইয়াছে। জাপানী গৃহও এইরূপে নির্মিত
হইয়াছে। আমেরিকীয় ভবন পুরাপুরি আম
রাষ্ট্রেরই প্রস্তুত করা হইয়াছিল। পরে
ইহার বিভিন্ন অংশ টুকরা টুকরা করিয়া



কলকাতা-কলকাতা স্ট্রীট

স্যান্ড্যান্ডিদের পাঠান হইয়াছে। এই-
খানে জামনেদ্বীর মিস্ত্রীমাই গৃহ প্রতিষ্ঠা
করিয়াছে।

এশিয়ার সকল দেশের পরিচয়ই এই
বিশ্ব-মেলায় ক্রুর পরিমাণে পাইলাম।
বহুতর জাপানী ও বহুতর চীনা ভবন স্বাভাবিক
সাধারণ সৌখ-সমৃদ্ধের প্রত্যেকটাতাই জাপান
ও চীনের প্রত্যেক বিজ্ঞান। কিন্তু ভারত-
বর্ষের চিত্র কোথাও দেখিলাম না।
একজন পার্সী দোকানদার নিজ ব্যবসায়ের
স্বার্থে কতকগুলি জিনিষ সংগ্রহ করিতে
পারিয়াছেন;—ভারতবর্ষের অল্প কোন প্রতি-
নিধি নাই। খাজুর-বাড়িতে, সাধারণ

সৌখের ভিতর দেখিলাম, বিলাতী, ইরাকি,
ফরাসী, আফ্রান, তুরকী, চীনা, জাপানী,
নিগ্রো, মেক্সিকান ইত্যাদি নানাজাতীয়
রতনপ্রণালী প্রদর্শিত হইতেছে। এই গৃহে
পর্থাটকেরা বিনা পরস্পর নানাবিধ খাদ্য
খাইতে পার। গুরিতে গুরিতে ফেঁচিলায়
মগনা কটি বিস্মৃতির এক ইচ্ছা মধুকন
প্রকাণ্ড মিঠাইয়ের দোকান খুলিয়া
ধসিয়াছে। তাহার এক প্রকাণ্ডে একজন
পাগড়ী-ধারী ভারতবাসী খাদ্যভোজ্য তথ্যাবধান
করিতেছে। লুটি পকোড়ি ইত্যাদি তামিষা
দর্শকগণকে উপহার দেওয়ার ইচ্ছা করিয়া
বিরাট বিশ্ব-মেলায় ভারতবর্ষের স্থান এইটুকু।

ঐনিন্দ্রকুমার সরকার।

শরৎ

দ্রৌপদ-গরদ ঝলমল বাসে
রামধনু ধরি করে
কে ওই আলিছে বরষা-বিকল
বিশ্বরাগীর ঘরে।
চলিতে চরণে কোটে ঘরে ঘরে
কমল কুসুম কত,
মঞ্জীর মধু বাজে মদী-মৌরে
কলোলে অবিসৃত।

পরশে তাহার কাশের ক্ষেতেতে
হৃদয়ের লহর তটে,
সৌরভময়ী ফেফালিকা আর
বন আলো করি ফোটে;
কৌকে-কুঞ্জে বাজে বীণা বেগু
বাতাসে শিশির লেখা,
মৌরনিমজ্ঞা থাকে শৈব
উকি দেখে—বার দেখা।

বারিধি বরণ আকাশ আন্ধিকৈ
মুক্ত মেঘের স্তম্ভ,
আলোর কোমরে পূর্ণ পৃথিবী
রানিবার নাহি ছায়া;
রিস্তা চিত্ত উঠিছে তরিতা
চখার মধুর সান্দে,
চলচকল সকল ধরনী
পূণ্য পূলক বানে,

সাগত শরত কুবনমোহিনী
কতকুল অধিরাণী,
মানস সরলে দাগ দেবী তব
সরস পরশবাণী;
ছুটিয়া উঠুক কলনা-কলি
মেলিয়া হাজার দল
জাব-সৌন্দর্যে করি মধুময়
মলিন মর্দতল।

ঐনিন্দ্রকুমার দে।

শ্রোতের ফুল

(৩৭)

পরদিন বিপিন ও মালতীকে প্রেমাসক্ত স্বামী সন্মানে সীমিত করিয়া তাগাদিগকে প্রেমবোধে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ব্যাক-মনের সংবোধে তত্ত্ব তাহাদের প্রতি প্রোতাহ লক্ষ কৃষ্ণনাম জপ করিবার আদেশ হইল; সে জপ একদিন মালাতে এবং একদিন কাগজে লিখিয়া করিতে হইবে।

গুরুদ্বী প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে নিষাধের কাছে শাস্ত্রপাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করেন; ব্যাখ্যার পর কীর্ত্তন করেন। এই অবসরে প্রোতাহ তিনি দেখিতে লাগিলেন যে বিপিন ও মালতীর ব্যাকুল দৃষ্টি ঘন ঘন অভিসার করে এবং চকিতে মধ্যপথে মিলিত হইয়া লজ্জাস্তরে ফিরিয়া আসে। তাহারা কৃষ্ণনাম লিখিতে লিখিতে অনেক সময় ভুলিয়া নিজেদের প্রেমাস্পদের নাম লিখিয়া ফেলে এবং গুরুদ্বীর কাছে বরা পড়িয়া এমন একটি লগজ্জ আবেশের ভাবে পরস্পরের দিকে ছুরি করিয়া তাকায় যে তাহা অনির্জন্যের।

এই দৃষ্টি ব্যাকুল প্রাণের শাস্ত নীরব প্রণয়নীলা গুরুদ্বীর মনে প্রথম প্রথম একটি অননুভূতপূর্ণ আনন্দের সকার করিতে লাগিল এবং সেই জন্তই তিনি বিপিন ও মালতীর প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিতে লাগিলেন।

তাগাদিগকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে গিয়া গুরুদ্বী দেখিলেন যে এই দৃষ্টি লোকের কাছে তাঁহার আসন অস্তিত্ব একজনের নীচে।

এমন ঘটনা গুরুদ্বীর অস্তিত্বের এই নূতন; তাঁহার আশ্রমে আসিয়াছে, অথচ তাঁহার চেয়ে অল্প লোকের প্রতি বেশি আকর্ষণ, এমন লোক তিনি এত প্রথম দেখিলেন। তাঁহার সকল তত্ত্ব শিখা তাঁহাকেই ঈশ্বরের আসনে বসাইয়া পূজা করিয়া আসিতেছিল; আজ বিপিন ও মালতীর কাছে তিনি সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম ব্যক্তি নহেন; ইহাতে তাঁহার অস্বস্তির আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া দেখিতে দেখিতে ক্রুর হইয়া উঠিল। সংঘর সাধনের জন্ত বিপিন ও মালতীর মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় না হয় গুরুদ্বী এমন ব্যবস্থা করিলেন।

গুরুদ্বী নিম্নের অজ্ঞাতসারে মনের সমস্ত অস্বস্তির ও লালসা চুকাইয়া নিজের প্রাণপ্রদীপ সুরিগা রাখিয়াছিলেন, অপেক্ষা ছিল একটি বোঝালো প্রাপ্ত সুলিঙ্গের। তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে বিপিন ও মালতী চকমকি ও ইঙ্গিতের মতো নিজেদের প্রণয়সংবোধে যে দীপ্ত অধিকণা বিকীর্ণ করিতেছিল তাহা গুরুদ্বীর প্রাণপ্রদীপখানি জ্বালাইয়া দিল। গুরুদ্বী এত নূতন আলোকে ছরদৃষ্টি হইয়া বিপিন ও মালতীর দৃষ্টি আধরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

গুরুদ্বী বিপিনকে বুঝাইয়া দিলেন যে সাধনের প্রথম অবস্থার মালতীর সহিত লাক্ষ্য তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বিরুদ্ধাইহে। অতএব তাহাদের একপে পরস্পরকে দেখা দেওয়া উচিত নয়। মন স্থির হইয়া গেলে তাহারা স্বচ্ছন্দেই পথ-

স্বপ্নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলে।
বিশিষ্ট গুরুজীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া
মালতীকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু
মালতী বিশিষ্টকে এড়াইবার অল্প বিশেষ কিছু
বাক্য হইল না; তাহার যে আধ্যাত্মিক গণে
জ্ঞাত অগ্রগত হইবার কিছুমাত্র অধা আছে
এমন লক্ষণ সে একেবারেই দেখাইল না।

কিন্তু চেষ্টা করিবার মালতী আর এখন
বিশিষ্টকে দেখিতে পার না। গুরুজী এখন
স্ত্রী ও পুরুষ শিষ্যদিগকে পৃথক ভাবে শিক্ষা
দিবার ব্যস্থা করিয়াছেন; এবং স্ত্রী-
পুরুষের অগাধ মেলামেশা যে আধ্যাত্মিক
বিশুদ্ধির ইচ্ছা এখন তিনি মুক্তকণ্ঠে যখন-
তখন প্রকাশ করেন।

মালতী বিশিষ্টকে অত্যন্ত দেখিতে
পাইবার লোভেই এই সন্ধ্যাসীমার আশ্রমে
আসিয়াছিল; সে আধ্যাত্মিক উন্নতির
আকাঙ্ক্ষায় লুপ্ত হইয়া আসে নাই। এখন
সেই একমাত্র অবশিষ্ট স্বপ্নটুকু হইতেও
বঞ্চিত হইয়া এই আশ্রমমণ্ডপ তাহার নিকট
কষ্টকর কার্য্যবাহক হইয়া উঠিল। সে অযোগ্য
খুশিয়া যদি বা কখনো বিশিষ্টের
কাছাকাছি হইত, বিশিষ্ট গুরুজীর ও
আধ্যাত্মিক বিদ্য হইবার জন্মে তাহাকে
দেখা দিত না। সে অকস্মাৎ কখনো
বিশিষ্টের গৈরিক উত্তরীরের চকল
আভাস দেখিয়া চমকিয়া উঠিত, বিশিষ্টের
দূরগত কথা আসিয়া লগ্নে লগ্নে তাহার বুক
বাজিত। বিশিষ্ট তাহার কত কাছে অধিক
কী স্বপ্ন। তাহার সেই আর্ন্ত জীবনের
সহিত কী নিদারুণ ভাবে বিচ্ছিন্ন। মালতীর
দিনগুলি একটার পর একটা বোঝার মতো

নাথিয়া যািতে লাগিল। তাহার মনে হইতে
লাগিল সময় যেন একাকী একটা অরূপ
স্বভাব গুলি এবং দিনগুলি যেন লম্বা ধূসর
বর্ণের হুতা, সেই গুলি হইতে ক্রমাগতই
খুলিয়া খুলিয়া আসিতেছে, তাহার অস্ত
নাট, অবসান নাই, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত
এই ধূসর ক্রান্ত দিনগুলি। এমনি উদাস-
বিবর ভাবেই আসিবে ও যাইবে এবং আনন্দ
তাড়কে এই আশ্রমে গুরুজীর গুরু কঠোর
উপদেশামৃত হৃদয় করিবার চূর্ণমহ বহুলা
•ভোগ করিতে হইবে।

মালতীর মনে তাহার পূর্ণ অবস্থার যে-সব
আনন্দময়ধূসর ভাবরস সঞ্চিত হইয়া ছিল
সেই-সব ভাবস্বত্ব আজ তাহাকে একাকিনী
পাইয়া তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে গুঞ্জন করিতে
লাগিল; তাহার কেহ সহিনী ছিল না যে
চন্দ্র ও তাহার সহিত কথা কহিলে বা
তাহার কাছে নিজের বেদনা উজাড়
করিয়া ছন্দ লবু করিলে; তাহার যত
কিছু স্বপ্নঃখ চিত্তান্তাবনা স্বপ্নানিই
তার নিজের একলার; সেই-সব অতীত ও
অনাগত ভাব ও আশা-আশো-আধারের
আল বুনিয়া তাহার চারিদিক বিরিয়া দিতে
লাগিল। সে আলোর ত অস্ত্র নাই,
বিরিয়া বিরিয়া তাহার গুটি ঝাপসা করিয়া
তুলিল, আলোর আধারের গলাগলি হইয়া
তাহার যেন ঝাপসা করিবার উপক্রম
করিল। কখনো কখনো তাহার চিত্তা যেন
অকুণ অপার সাগরের মতো দিক্‌দিগন্তে
ছড়াইয়া পড়িত; জীবন গর্জনে কালো
কালো ঢেউ যেন তাহাকে গ্রাস করিতে
আসিত; তখন সে চোখ বুজিয়া মনে

করিত নিজেকে ছিন্ন করিখা শইয়া এখন
হইতে কোথাও পলায়ন করিবে,—দূরে—
দূরে—সে বহুদূরে,—তাঁহার মাসিমা ঘেমন
সংসার অতিক্রম করিখা গিয়াছেন তাঁহা
অপেক্ষাও অনেক দূরে—সে পলায়ন করিবে,
সে পলায়ন চিরজন্মের পলায়ন, তাঁহার
পশ্চাতে শ্রোতব্যবর্তন থাকিবে না, এই ধূসর
দিনের মধ্যে এই চুপেই চুপেই অবসার আর
সে কখনো কিরিয়া ধরা দিবে না।

যখন মালতীর নিজের এই নিঃসঙ্গ
দারুণ অবস্থা দ্রবহ বোধ হইত তখন সে
মাঝে মাঝে পড়িতে চেষ্টা করিত। পড়িতে
পড়িতে মনে হইত সে যেন আর এই
সন্ন্যাসীর আশ্রমের লোক নয়, সে যেন
কোন আনন্দ-লোকের অধিবাসী; কিন্তু
বই বন্ধ করিলেই মনে হইত সে যেন
আনন্দের মলিনচূড়া হইতে একেবারে ভাঙ্গের
তিমির গল্পেরে পতিত হইয়াছে। তখন সে
প্রায়ই ভগবানের উপাসনা করিতে বসিত
এবং উপাসনাস্তে মনে হইত যেন ভূধার-
শ্রুতল চন্দনবাসিত তাঁহার চরণামৃত
জ্বরের সমস্ত জালা ধুইয়া মুছিয়া ফুড়াইয়া
গেছে।

ওদিকে বিপিনের গুরুজীর প্রাতি অচলা
ভক্তি এবং সাংঘম অভ্যাসের প্রাতি অসাধারণ
আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার অবস্থা ক্রমশ
অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল।
বিপিন সংসারের অবস্থা-পরম্পরার আঘাতে
ব্যতিব্যস্ত হইয়া কোথাও একটু নিশ্চিন্ত
আশ্রয় পাইবার ক্ষমতা হইয়া উঠিয়াছিল;
এখানে আসিয়া বিপিন নিশ্চিন্ত আশ্রয়
পাইয়াছে, এবং সেই ক্ষমতা এখন তাঁহার

মন মালতীর অভাব বিশেষ কবিতাই অহুত
করিতে পারিতেছে। আধ্যাত্মিক মিলন
প্রভৃতি বড় বড় কথা শুনিতে যেন চমৎকার,
ভীষনকর বিপিনের তাহা তেমন লোভনীয়
বোধ হইতেছিল না। জীবনের বিকল
মাত-প্রতিদাতে চকল চট্টা বিপিন নিজের
প্রাণের প্রাতি তাকাইয়া দেখিবার অবসর
পায় নাই; এমন তাহাকে নিশ্চিন্ত দেখিয়া
মালতীর প্রাতি তাঁহার প্রেম আকার ধারণ
করিয়া, জীবন গ্রহণ করিয়া, জাগ্রত হইয়া,
মোহন রূপে একেবারে চোখের সামনে
উপস্থিত হইল। বিপিন কাব্যসাহিত্যে
প্রেমের কথা বহু কিছু পড়িয়াছিল সমস্তই
সে দেখিল তাহারই জ্বরের তুচ্ছ প্রতিধ্বনি।
মালতী যখন আশ্রমে আসিতে চাহিয়াছিল,
তখন বিপিনের অন্তর পুণিক্রিত হইয়া
উত্তিয়াছিল; কিন্তু এখন সে দেখিতেছে
মালতীর এখানে আসা না-আসা সমান।
মালতী উপরের ঘরে থাকে, সে
পাক টিক তাহারই নীচের ঘরে—
একবারি ছাদ মাত বাসখান, কিন্তু সে-ই
কত দূর! মালতী উত্তর বেরতে থাকে
বা, এখানে অদর্শনীয় হইয়া থাকে তাই।
মাঝের উপর 'ঘরের' মেঝের কবির পদমল,
জিনিষ বাহার খুটপাট লক্ষ্য কর,—হয়ত সে-
সব মালতীরই অস্তিত্বের পরিচয়, কিন্তু সে-
সব যেন জ্বরের মাঝে স্মৃতির স্পন্দন,
দেখিবার নয়, শুধু অহুতবে বৃষ্টির।
মালতীকে তাহার বহুই দুর্ভাগ্য মনে হইতে
লাগিল, ততই তাহার আবেগময় চিত্ত কিঞ্চিৎ
হইয়া উত্তিবার উপক্রম করিতে লাগিল।
পাকিয়া পাকিয়া তাঁহার মনে হইত সমুখে

সমস্ত জীবনই ত পড়িয়া আছে—তারার অতুল উপবাসী জীবন; তাহা কি সে এমনট ভুলেই সন্ধ্যাকালে জড়াইয়াই রাখিবে, না, একদিন সকলে ছুট ছাউ দিয়া সকল জাল জড়ান দূর করিয়া দিয়া নিভের ক্ষণ নিটাইবে। এমন মালতীকে একেবারে হারাইতে যদি। কপণের মতো মালতীর পায়েব ধ্বনিটুকু, কাশির শব্দটুকু, চাঁবি বা ছুড়ির টুনটুনিটি, আবছায়া মৃদ্রির চকিত পুটটি হুড়াইয়া বেড়ানোই বিপিনের কাজ হইয়া উঠিল। মালতীর অস্তিত্বেব পরিচয় পাইবার জন্য বিপিনের সর্বোচ্চ সর্পনা সতর্ক হইয়া থাকিত, আর যখনই সে মালতীর অস্তিত্বেব এতটুকু চিহ্ন ধরিতে পারিত, তখনই সে আনন্দে গগন হইয়া উঠিত। এই নিবৃত্ত গল্পাভ্যাসের মনোরম উদ্ভাসে বিশ্বসত্তার মাঝখানে সে আপনাব আরাধ্যা দেবীর ধ্যানমুস্তির নিকটে আপনাব জগৎকে পূণের মতো দণ্ড করিতে লাগিল। একবিকে পারায়া দিতে গিয়া বিপিন আর সব দিকে অমনোযোগী ও অজ্ঞান হইয়া উঠিতেছিল; সে নাম লপ করিতে করিতে উদাসভাবে বসিয়া থাকিত, একটু শব্দ শুনিগেই চমকিয়া উঠিত।

মালতীরও অবস্থা বিপিনেরই অতুল হইয়া উঠিয়াছে। মালতী নিশ্চিন্ত হইয়া পথার অধিকক্ষণ থাকিতে পারিত না; রাজ্যে সকলের মৃদ্রির শুভ্রতার মাঝখানে সে একা বারান্দার উঠিয়া গিয়া গগন দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিত—জীবনটা ও এমন একটানা যুগ্মোত্তের মতো ভাগিয়া ধাইতে পারিত! বিপিনকে সে কত ভালো

বাসিগাছিল; কিন্তু আর এমন অবস্থা আনিয়াছে যে বিপিনের জন্য বেদনা বোধ করা তাহার পক্ষে লজ্জাকর। অগত সে বিপিনকে বিচার করিয়া অপরাধী করিতেও চায় না। কেন সে দুদিনের জন্য একটা দৈন্য ছুটিপাকের মতো চৌধুরী-পরিবারে গিয়া পড়িয়াছিল, সে পূর্ণী উড়াইয়া তাহার আত্মার মেহনীর হাতে বিপিনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়াছে কিন্তু নিভের সঙ্গেও ত মিলাতে সে পারিল না; এর চেয়ে তাহার বাপের জিটার পড়িয়া থাকিয়া মরা যে সতত্তে ছিল ভালো। বাহার যদি সে জীবনে কখনো জানে নাট, জানা যাক উচিত ছিল না, সেই প্রশ্নের যদি জানিল যদি তবে আনিয়াই সন্তুষ্ট থাকিল না কেন? সে যে বিপিনের নিকট আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে হইয়া লজ্জা সে কিছুতেই ঢাকিতে পারিতেছিল না। এ কথা ঢাক বিপিন যদি তাহাকে এখনও গ্রহণ করে। হুতরাং সে নিভের কাছে স্পষ্ট স্বীকার না করিলেও তাহার অন্তরের অন্তরালে একটি মিলনচেষ্টা আত্ম-বিকৃতি করিতেছিল। এইরূপে তাহাদের প্রণব বাধ্যপ্রাপ্ত হইয়া বাধ্যক নদীস্রোতের মতো ফাঁপিয়া ফুলিয়া গর্জিয়া উঠিতেছিল। এক একবার সকল বাধ ভাঙিয়া মিলিত হইবার বিশ্রোভকাত ও তাহাদের মনে আসিতে আরম্ভ করে নাই এমন নয়।

কিন্তু নূতন শিষ্যবিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অতিমাত্র সতর্ক ও উৎকর্ষিত শুক সর্পদাই তাহাদিগকে পারায়া দিয়া ফিহিতেন বলিয়া শিষ্যদের এতটুকু চাকলা

ঈষৎ মিলন-চেষ্টা। গুরুর দৃষ্টি এড়াইত না। গুরু তখন বিপিন ও মালতীকে নৃতন নৃতন নিয়ম সংঘন অঙ্গুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ করিতে চাহিতেন। তাহারিগকে বুঝাইতেন যে এই-সব চাকলা ধর্মপথে চিরকালই অন্তরাঙ্গ-রূপে উপস্থিত হয়; ইহাকেই বুঠানে ও মুসলমানের বলে সন্নতান, বুদ্ধ বলিয়াছেন বার। মহাশয়ের মতো মনন ভয় না করিলে গৌরীকে পাওয়া যাইবে না; লক্ষ্যকে পাইতে হইলে গৌরীরও তপস্বী করিতে হইবে।

বিপিন গুরুদ্বীর উপদেশ বিরোধার্থ্য করিয়া আবার আপনাকে দমন করিতে চেষ্টা করিত। মালতী কিন্তু তেমন আগ্রহ সহকারে গুরুদ্বীর উপদেশ ও বিবিধ অঙ্গুষ্ঠান পালন করিত না। এই বিরোধী নারীটিকে লইয়া গুরুদেব বিব্রত হইয়া উঠিলেন; তাহাকে শাসন করিতে গেলে সে তর্ক করে, শাস্ত্রের দোহাই সে মানে না, ব্যবহৃত অঙ্গুষ্ঠান সে পালন করে না। এই-সব কারণে গুরুর বাধা হইয়া এই অবস্থা শিষ্যাটিকে অত্যন্ত অধিক মনোযোগের সহিত আগলাইবার দরকার হইতে লাগিল।

গুরু বতই নিবিষ্ট মনে মালতীর আচরণ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন ততই তিনি সেই তেজস্বিনী বুদ্ধিমান স্বাধীন গুরুদ্বীর বিপিনের প্রতি অঙ্গুষ্ঠান ও প্রশংসাপূর্ণতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে প্রেমাম্বেষের মনে ঈষৎ ঈর্ষা দেখা দিল,—

“দুশের ক্ষুদ্র মন

কুদ্র দৃষ্টি-অগোচর তবু তীক্ষ্ণতম।”

গুরুর কেবলি মনে হইতে লাগিল তাঁহার গুরু কাহাবো গুরু ত এমন করিয়া ব্যাকুল বেননার স্পন্দিত হয় না। এককাল নিরবচ্ছিন্ন সন্ধান সন্ধান পাঠরা পাঠরা তাঁহার অচঞ্চল পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল; আজ মালতী সেই চিরাত্যন্ত জীবনপ্রাণের মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটাইয়া প্রেমাম্বেষের মনে এমন একটি নৃতন ভাবের সঞ্চার করিয়া দিল যাহাতে তিনি কিছুতেই নিজেকে জুলিয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল মালতীর অঞ্চল মনোযোগ তাঁহারই প্রাণ, বিপিন তাহা কৃত্রিম দ্বারা নিজে আত্মসাৎ করিতেছে।

তখন, মালতীর মন বিপিনের দিক হইতে একেবারে বিমুখ করিয়া দিয়া নিজের দিকেই নিত্যস্ত নির্বিশেষ করাইবার গুরু গুরু বিপিনের প্রতি কঠিনতর নিয়মের ব্যবস্থা করিলেন এবং আপনি মালতীকে শাসনা দিয়া ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু এটরূপ গোয়েন্দাগিরি করিতে গিয়া নিজের কাছেই নিজেকে তাঁহার ছোট বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তখন তিনি নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া নিজেকে প্রবেশ দিতে লাগিলেন যে তিনি কিছুমাত্র অজ্ঞার করিতেছেন না, কষ্টবাহী তিনি করিতেছেন, শিষ্যের ইংগিতাত্মক কল্যাণের গুরু গুরু ত এমনি সতর্ক প্রহরী হওয়াই চাই,—গুরু হওয়া কি অমনি সুখের কথা, শিষ্যের পাণের অংশীদার যে গুরু!

নিজের কাছে যখন কাজটা বেশ সঙ্গত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া গেল তখন গুরু

বেশ চটভাৰেই মালতীৰ
উৎসাহিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

(৩৬)

গুৰু ঘণন মালতীকে লইয়া বাস্তৱ হটয়া
উঠিয়াছিল, মালতীও তখন নিজেৰে
লইয়া অস্থিৰ হটয়া উঠিয়াছিল। প্ৰথম
প্ৰথম এই আশ্ৰমে আসিয়া তাহাৰ বেশ
ভালেই বোধ হৈছিল; গঙ্গাৰ ধাৰে
এমন একটি চমৎকাৰ উজানে বিচিত্ৰ
ৰকমৰ ফুল, অপূৰ্ণ ধৰণেৰে কেৱলি, কত
কান্ধা অজানা গাছৰে আশ্ৰয় দোন্দৰা,
ৰকম ৰকম পাখীৰ গান, মৃদু হৰিণেৰ
নাচ, গঙ্গাৰ বৃক্কে প্ৰতিদিনে কোমল-তাৰ
আস-বাগ্ৰা, বিচিত্ৰ ৰকমেৰে নৌকা টিমাৰেৰ
গতিভঙ্গী, সকালে সন্ধ্যায় গঙ্গাৰ বৃক্কে
আলোছায়াৰ খেলা, মাখিৰ গান, বাতাস
চিৰিয়া টিমাৰেৰ বাহিৰ চাঁৎকাৰ দেখিয়া
ও শুনিয়া তাহাৰ দিন উছাৰই মধ্যে বেশ
একৰকম আনন্দেই কাটিতেছিল। মালতী
মগুৰাপুৰে শিশিৰেৰে বাতীতে সকলো
ছন্তেৰ ভাৱে আঁঠুই নিকৰ্ণা হটয়া থাকিতে
থাকিতে বিৰক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; এখানে
আসিয়া ৰাৱা কৰিয়া সকলকে খাওৱাটো
দত্ত কৰিয়া ঠাকুৰেৰ সেৱা কৰিয়া সে
অনেকটা নিজেৰে লঘু মনে কৰিতেছিল।
কিন্তু গুৰুৰ কৃপায় তাহাৰ সেই-সব কাজ
হৈতে অব্যাহতি মিলিগাছে, তাহাকে নড়িয়া
বসিতে হয় না, একগাছি কুটা ভাওৱা
চটুকৰা কৰিতে হয় না, উপৰ হৈতে
নীচে নামিবাৰও তাহাৰ জৰুৰ নাই। কিন্তু
মালতী এমন অজুৰ ৰকমেৰে লোক বে
ছন্তেৰ মতন খাটুনি হৈতে অব্যাহতি

পাওৱাৰ এতদৰ্ভে দোভাগ্য সে গুৰুৰ প্ৰতি
প্ৰদৰ্শিতভাৱে হাসিমুখে গ্ৰহণ কৰিতে
পাৰিল না। সে নিজেৰ ঘৰটিতে বসিয়া
বসিয়া সমস্ত দিন গঙ্গাৰ দিকে চাহিয়া
থাকে; তথাপেৰে গাছৰেৰে আপোনা খোপেৰে
মাথো মাথো আবহাৱা বাতীতলি ছবিৰ
মতন চিৰদিনই নিশ্চল, কোনো বাতীতে
একটু আশেৰে পৰিচৰ পাওৱা যায় না,
যেন সৰাই মালতীৰ মতোই নিৰ্ভৰা আঁঠুই
হটয়া বসিয়া আছে। অকস্মাৎ যদি কোনো
দিন মালতী দেখে কোনো বাতীৰ ছাঁদে
কোনো বধু কাণ্ড শুকাইতে দিওঁছে, কি
কোনো চিলেৰ ছাঁদেৰে উপৰে একখানা
মণ্ডলতা ঘূৰি কোনো অদৃষ্ট বালকেৰ
মোহনস্পৰ্শেৰে পূৰ্ণকে স্পন্দিত হৈছেহে, অমনি
তাৰাৰ সমস্ত শৰীৰ মন যেন সজীৱ
জাগ্ৰত হটয়া উঠে। সেই প্ৰাণেৰে পৰিচৰ
শীঘ্ৰই মিলাইয়া যায়; তখন মালতী দেখে
নদীৰ বৃক্কে জলেৰে স্ৰোত চলিগাছে,
অজুৰত হতাৰ মতন, জোপদীৰ শাঙীৰ
মতন, অস্ত নাই, বিৰাম নাই, কাহাৰো
দিকে জৰ্জৰ নাই, বেৰ বিধেৰে সৰে
কোনো সম্পৰ্ক নাই, কাহাৰো বাৰ সে
ধাৰে না, কাহাৰো স্বৰূপে তাহাৰ কিছু
আসিয়া যায় না। স্ৰোতৰ উপৰ নৌকা-
গুলি কালো কালো পাখীৰ মতো শাৰা
পালেৰে ভান্ধা মেলিয়া নীৰবে জাসিয়া যায়,
টিমাৰগুলি লোকাৰে চাকীহাঁসেৰে মতো ভীক
চাঁৎকাৰ কৰিয়া জল কাপাইয়া পাখা
খটপট কৰিয়া ছুটিয়া চলে, ব্যস্তমন্ত
পাখিৰ বৃক্কে বসিয়া আশিৰেৰে বাবুয়া
ভান্ধাক যায়, গান গাৰে,—কিন্তু লবই

যেন নিত্যকর্মের আবৃত্তি মাত্র, কোথাও যেন একটি সচেতন চেষ্টা আঁট হইয়া নাট, সমস্তই যেন যত্নবদ্ধ একত্রে বেধ হয়। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসে। পাখীর দল স্নানামান সূর্যাস্তদীপ্তির স্বর্ণশোণিত-প্রাননেয় মধ্য দিয়া নদীর উপর দিয়া ভোরগবারে পুষ্পলবনের মঙ্গল-মালোর মতো উড়িয়া যায়, মালতী দেখিয়া দেখিয়া কত কি ভাবে। লম্বা লম্বা তাল আঁতর গাছগুলির ছায়া তাহার চোখের সামনেই পশ্চিম হইতে আশিরা পূর্ব দিকে ক্রমশ দীর্ঘ হইয়া পড়ে, ওপারের কালো কালো গাছগুলির উপর কালো অন্ধকার ঘন হইয়া উঠে, সমস্ত ক্রমশ একাকার সমুচিত হইয়া যায়, দূরে আর দৃষ্টি চলে না, তখন মালতীকে ঘরের কোণে একলা আপনাকে লইয়া চুপটি করিয়া কাটাইতে হয়। পরিণামবিরম শীতের দিনগুলি যেন কিছুতেই কাটিতে চাহে না।

যখন তাহার আর কিছু ভালো লাগে না, তখন মালতী বই খুলিয়া বসে; অনেক সময় বই তাহার কোলের উপর চোখের সামনে খোলাই পড়িয়া থাকে, মন তাহার ঘুরিয়া বেড়ার বিলিনের স্মৃতিটির চারিদিকে—বন্ধকমল বেটন করিয়া ভ্রমরের মতো, ফাহুলচাকা দীপের পাশে পতঙ্গের ছায়া। কখনো কখনো বা সে নিজের মনোবেদনাকে কবিতার আকার দিতে চেষ্টা করে, কখনো নিজের অজ্ঞাতসারে বিশিনের নাম লিখিতে থাকে। সেই নামের শব্দটি ও রূপটিও যেন তাহার হৃদয়ের উপর অমধুর ম্পর্ক হুলাইয়া যায়, যেন অপর-

মের কক্ষণ-সার্জ হুইট তরল চোখের দৃষ্টি তাহার গভীর বেদনার উপর সাক্ষ্য বিকীর্ণ করিয়া যায়। তেঁশিরা কাচের ভিতর দিয়া দেখিলে বাহিরটা যেমন বিচিত্র সর্ব রঞ্জিত বলিয়া মনে হয়, অতীতের স্মৃতির ভিতর দিয়া দেখিয়া মালতী তেঁশিরা নিজের এই হৃদয় জীবনকে রঙিন করিয়া দেখিতে চাহিত।

মালতী যাগু করে গুরু তাহা দরজা স্রবৎ ফাঁক করিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া দেখেন। নিকারী বিড়ালের মতো গুরু নিঃশব্দে পা টিপিয়া আশিরা খিলসুস্ত কপাট ফাঁক করিয়া মালতীর প্রত্যেক কার্য লক্ষ্য করেন। মালতী অনেক সময় প্রেমামনের এই চুরি টের পাও, কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্যই করে না। প্রেমামন্য যখন বেশ ব্যস্তিত পারিলেন যে মালতী তাঁহার গোয়েন্দাগিরি টের পাইয়াও অগ্রাহ্য করিতেছে, তখন তাঁহারও সাহস ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া উঠিল।

একদিন মালতী বুক বালিশ দিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া কবিতা রচনা করিতেছে, গজার খোলা হাঁওরা ঘরে ঢুকিয়া খোলা বইয়ের পাতাগুলি লইয়া ফরফর করিয়া নাচাইতেছে, মালতীর অলকগুচ্ছ চোখের উপর আঁিয়া ছুটিতেছে—এমন সময় প্রেমামন্য নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া একেবারে মালতীর পাশে গিয়া ঝাঁড়াইলেন, এবং নিজের হাত দুখানা গলিতে সূক্ষ্মকিত করিয়া শরীরের উপরার্দ্ধ কুঁকাইয়া মালতীর কাঁধের ফাঁক দিয়া দেখিতে লাগিলেন মালতী কবিতা লিখিতেছে। তাহাপর আস্তে আস্তে নড় হইয়া হাত

বাড়াইয়া হোঁ মারিয়া কবিতার কণ্ঠস্বৰাশা
টানিয়া লটলেন।

মালতী কবিতা বচনায় তখন হইয়া
গিরাছিল বসিয়া কিছুই টের পাও নাট,
চমকিত হইয়া কিংবা মেলিল প্রেমামল!
সে সৰ্গভীত বা হাড়িং-স্টে বাস্তব হাৰ
অটুটি উঠিয়া আপনায় কেশবাল সংঘত
করিয়া যখন প্রেমামলকে দিকে চাহিল তখন
তাহার চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতেছে।

প্রেমামল তাহা লক্ষ্য না করিয়াই হাসিতে
হাসিতে বলিলেন—সন্ন্যাসিনীও ত্রুত পালন
চমৎকার হচ্ছে, রাধারাজী! সন্ন্যাসিনী কেপেন
প্ৰণয়-কবিতা। নাম লগ্ন করেন পরলুক্বেষের!

মালতী গুরুর এই দ্বেষবাক্যে মর্মেত
হইয়া নিজের ক্রোধে নিজেকে পুড়াইয়া
ছাই করিয়া ফেলিতে পারিলে বাঁচিত।

মালতী চোখ পাকাইয়া বলিল—আপনি
গুরু, না চোর?

প্রেমামল হাসিয়া বলিল—আমি গুরু!
শিষ্য যখন চুরি করিয়া চুরি করিতে
আরম্ভ করে, তখন গুরুকেও বাধ্য হইয়া
চুরি করিয়া চুরি ধরিতে হয়। তুমি কি
সন্ন্যাসিনীর ধর্ম পালন করছ?

মালতী আর থাকিতে পারিল না।
চৌৎকার করিয়া বলিল—আমি সন্ন্যাসিনী
নই! আমি চৌৎকার করে বলছি, হাজার
বার বলছি, আমি সন্ন্যাসিনী নই! আপনি
আমাকে দূর করে দিন আপনার অশ্রম থেকে।
আমাকে এখন করে অপমান করবেন না।

মালতী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে
লাগিল। তাহা দেখিয়া প্রেমামল একটু
লজ্জিত হইবৎ স্তম্ভিত হইয়া বলিল—কাদ,

রাধারাজী, কাদ! অশ্রুচলে সমস্ত মানি
মুগ্ধে ফেল। ধর্মের পথ বড় দুর্গম। মনের
সকল ভাব পশ্চাতে ফেলে দিয়ে লগ্ন হয়েই
যেতে চলে, নইলে লক্ষ্য স্থানে পৌছানো
দুর্ঘট হবে। প্রাণ যখন বাকুল হবে
ভাগবত পোড়ো, ধর্মগ্রন্থ পোড়ো, কবিতা
লিপতে টেঁকা হয় ভগবানের চরণে আশ্র-
নিবেদন কোথো—নিজেকে জোক্তের মুখে
এমন করে ছেড়ে দিও না।

মালতী মুখ ফিরাইয়া বাড়াইয়া এই
ভাবে মাসের দাকণ ঠাঁতে দরদর করিয়া
ঘামিতেছিল। শুক যে অধঃপাতের পুতি
গল্বরে কতখানি নাশিচা গিড়াছেন ইহা
মনে করিতেও মালতীর কুসংলক্ষ্য বোধ
হুটেছিল।

মালতী যখন মুখ ফিরাইল তখন তাহার
মুখ সিঁদুরে আমের মতো হইয়া উঠিয়াছে।
সে দৃষ্টান্তে বলিল—আপনি আমার ঘর
থেকে একদিন বেরিয়ে যান, নইলে আমি
চেঁচিয়ে হাট বাধিয়ে দেবো।

প্রেমামল ব্যস্তিত হইয়া বলিলেন—আজ্ঞা,
তোমার মন এখন চড়াবাপালেতায়ের মতো
বাতাসেব স্পর্শে অক্ষর দিয়ে উঠছে, তুমি
ঠান্ডা হও। আমি অল্প সময় এসে তোমার
বুঝিয়ে দেবো, এটা তোমার অত্যন্ত বাড়-
বাড়ি হচ্ছে।

প্রেমামল এক পা দু পা করিয়া হটিতে
হটিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

মালতী বিছানার উপর কাঁপাইয়া উপড়
হইয়া পড়িল, এবং লাগিলে মুখ জঁকিয়া
উজ্জ্বলিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

চাক বন্দোপাধ্যায়।



ভরা সৈন্ধ

ঐশ্বর্য পথনেত্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

পূর্ণ

মবিষ্যের সকালবেলাকার তাসের আঙা ভাঙিয়া বাড়ি ফিরিতেছি, পথে একজন ছোকরা আমার ধরিয়া—খালি পা, চূণ উয়খুক, শুকনো মুখ, অত্যন্ত ময়লা কৌচোর টিপ গায়ে। সে মাটির দিকে মুখ নীচু করিয়া বিড়বিড় করিয়া কি আমার বলিল, ভালো স্নিতে পাইলাম না। আমি ভীত দৃষ্টিতে তার আপদমস্তক একবার দেখিয়া লইলাম। সস্ত্র বোগ-শয্যা ছাড়িয়া উঠিলে মাহুকের যেমন চেহারা হয় তার শরীরের অন্তরা ঠিক তেমনি। চোখ কোঠেরে প্রবেশ করিয়াছে, গাল দুটা তুবড়িয়া চুপুসিয়া গেছে—একটা দুকলতা তার শরীরের কল-কজাকে ছমড়াইয়া যেন তাকে মাটির দিকে টানিতেছে।

আমি বলিলাম—“কি চাও?”

সে মুখ না তুলিয়াই বলিল—“মশায় বলতে বড় লজ্জা—” কথাটা সে শেষ করিল না।”

আমি বলিলাম—“কি বলি না!”

—“বড় বিপদ!”

আমি বলিলাম—“কি, স্নি!”

সে বলিল—“ভদ্রসন্তান হবে তিন্কা চাইতে মাথা কাটা যার।”

আমি দেখিলাম, লোকটা ভিবিরা, কেবল কথার ভড়ং বাড়াইতেছে। ভিবিরাই ধৌরান্দো পথ চলা দায়; তাড়াইয়া দিলে মড়ে না—মাছোড়বান্দা; পাড়াইয়া তার কথা শুনিলে কি আর নক্ষা আছে? একেবারে

পাইয়া বসিবে। আমি তার দিকে আর দৃকপাত না করিয়া বাড়ির দিকে চলিতে লাগিলাম।

লোকটা ছাড়িয়া না, আমার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে লাগিল, একটু কাছাকাছি হইয়া কাতর কণ্ঠে বলিল—“মশায়, ভদ্র-লোকের ছেলে, বড় দায়ে পড়েই প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমি পথের ভিবিরা নই!”

সে যে ভদ্রলোকের ছেলে তার ছাপ এখনও কিছু কিছু তার বেহের উপরে আছে। তার কথা আমি একেবারে অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আমি ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। তার কণ্ঠের কাতরতা আমার মনের উপর একটু থা দিল। আমি বলিলাম—“কি বলতে চাও, স্পষ্ট করে বল।”

সে বলিল—“আমি সকালে আমার পিকুবিবোগ হয়েছে, এমন সংস্থান নেই যে তাঁর সংকার করি। আমার বড় গরীব। ঘটি-বাটি পেতে বাপের চিকিৎসা হয়েছে; —তাঁর যে আয় ছিল তাতে কারেক্ষণে সংসার চলত, তিনি ব্যাঘাত পড়ে অবধি একটি পরগা উপার্জন নেই—অনেক দেনা হয়েছে, আর কেউ ধার দিতে চায় না। আপনি যদি পাঁচটি টাকা যেন তাহ’লে তাঁর সংকার হয়। আপনি আমার মা-বাপ—আমার নক্ষা করুন।”

আমার গকেটে টাকা ছিল না, আমি বলিলাম—“আজ্ঞা বাড়ি চণ, টাকা দিচ্ছি।”

বাড়ির সামনে আসিয়া বলিলাম—
“দরজার কাছে দাঁড়াও, আমি টাকা
আনছি।”

টাকা হাতে করিয়া বাহিরে আসিয়া
দেখি লোকটা বাহিরের রকে শুইয়া
পড়িয়াছে। আমাকে দেখিয়া উত্তিরা
দাঁড়াইল।

আমি টাকা দিতে গেলাম। সে
কাপড়ের ভিতর হইতে হাতখানা বাহির
করিল।

হঠাৎ আমার ক এমন ধাঁপা লাগিল।
লোকটার ডান হাতে ছটা অংকুশ। এই
ছয় অংকলের একটা অস্পষ্ট দৃতি আবছারার
মতো আমার মনের মধ্যে পেলিয়া গেল।
আমি টাকা কয়টা মুঠোর মধ্যে লুপ্ত করিয়া
ধরিলাম। একটা সন্দেহ আমার মনটাকে
মোশা দিতে লাগিল। অবশ্যই দুইতে
চাহিয়া চাহিয়া আমার সেই সন্দেহ যেন
দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। আমার ভাব-
গতিক দেখিয়া সে অশ্রুত!

আমি ক্রুদ্ধিত করিয়া বলিলাম—
“জোজোর! তুমি না সেদিন আমার কাছ
থেকে ক টাকা ধার চেয়েছিলে?”

সে যেন আকাশ হইতে পড়িল, বলিল
—“কবে মশায়?”

আমি বলিলাম—“তারিখটা ঠিক মনে
নেই। কিন্তু সেবার তোমার পিতৃবিয়োগ
নয়; সেবার তোমার গাঠকাটা,—বেলের
টিকিটখানি পর্ধ্যন্ত দিয়েছিল। তারি বিপদ!
বিদেশী লোক, কোথায় যাবে, কি করবে,
কিছু জানতে না। সেবার তোমার ফলি
ছিল টিকিটের দান আগার কমা।”

সে বিদ্রিত হইয়া গেল, বলিল—“বলেম
কি মশায়! ভ্রমসত্তান হয়ে এমন কাজ
করতে পারি।”

আমি রাগিয়া উত্তিরা বলিলাম—“যেথেষ্ট
দাও তোমার ভ্রমসত্তান!”

সে বলিল—“বিখাল করছেন না মশায়!
চলুন আমার বাড়িতে চলুন—অচক্ষে
দেখবেন আমার পিতৃবিয়োগ হয়েছে কি
না।”

আমি বলিলাম—“এ রকম জুয়াচুরি
টের জানা আছে! সেবারেও তুমি
এমনিধারা সব অকাটা প্রমাণ দিতে চেয়েছিল।
পকেটে তোমার কাঁচিকাটার চিহ্ন ছিল।
দেশে ফিরে গিয়েই অবিলম্বে তুমি যে
আমার টাকা মানি-অর্ডারে পরিশোধ করবে
—ভদ্রতার এই আশ্বাস দিয়ে আমার নাম
ঠিকানাটি পর্ধ্যন্ত লিখে নিয়েছিলে; মনে
পড়েছে?”

সে প্রতিবাদে স্বরে বলিল—“আপনি
ভুল করছেন মশায়! সে আমি নই!”

আমি বলিলাম—“নিশ্চয় তুমি! তোমার
সঙ্গে বহু কথা কছি ততই আমার সে
বিখাল দৃঢ় হয়ে উঠছে! কথাবার্তা সব
এক ছাঁচে ঢালা!”

সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।
তার পর হতান হইয়া বলিল—“বিখাল
করবেন না, কি করব বলুন!” বলিয়া সে
রকটার উপর বসিয়া পড়িল। কথার
উত্তরনার সে হাঁকাতৈছিল।

তারপর সে অবস্থা দেখিয়া আমার
কেমন মায় করিতে লাগিল। কিন্তু একটা
লোক যে ঠকাইয়া টাকা লইয়া ঘাইবে ইহা

আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছিলাম না।

আমি বলিলাম—“কবুল কর।”

সে কোনো উত্তর করিল না;—চোখ বুজিয়া ঝিমাইতে লাগিল।

আমি বলিলাম—“তুমি যদি কবুল না কর, তাহ'লে তোমার পুত্ৰিশে দেব।”

সে কথা সে যে গাছে আমিল এমন বোধ হইল না।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে যেন আপনায় মনেই বলিতে লাগিল—“কবুল না করে করি কি। একে আর দিন চলে না। কেউ আর বিশ্বাসও করে না—কথাই ভোলেও না।”

আমি বলিলাম—“ভক্তলোকের ছেলে হয়ে জুয়াচুরি বৃত্তি কর।”

সে গম্ভীরভাবে উত্তর করিল—“কি করব?”

—“কেন চাকরী করতে পার না?”

—“চাকরী কে দেবে?”

—“লেখাপড়া জান?”

—“সে না-জানারই সামিল!”

—“বেশ! লেখাপড়ার কাজ করতে না পার, অস্ত্র কাজ কর।”

—“কি কাজ বলুন?”

—“মোট বইতে পার!”

—“আজ্ঞে ভক্তলোকের ছেলে কি মোট বইতে পারে?”

—“কেন পারবে না? তুমি বুড়ো নও, হাবুড়া নও।”

সে একটা অবজ্ঞার সঙ্গে বলিল—“হাজার হোক ভক্তলোকের ছেলে ত! পারব কেন?”

—“না পার, কোনো বাবু বাড়ি চাকর-নফরের কাজ নাও।”

—“আজ্ঞে, ভেটো-লোকের কাজ!”—

বলিয়া সে মুখটা বিকৃত করিল।

লোকটা কুড়ের সর্দার। যত রকম

কাজের কথা তুলিলাম সব তাতেই সে মাথা নাড়িতে লাগিল। আমি বলিলাম—

“তুমি যে দেখছি একেবারে নবাব খাজা খা! কোনো কাজই তোমার মনের মতো নয়।”

সে আমার বখার কোনো উত্তর করিল না, বলিল—“মশায় দয়া করে আমার কিছু খেতে দিন;—আজ দুদিন জলস্পর্শ হইল।”

আমি বলিলাম—“তোমার মতো লোককে আমি দয়া করতে পারব না। নিজেই উপার্জনে পেতে পার তো খাও—নয় তো মর।”

সে বলিল—“কোথার কাজ পাব বলুন।”

আমি বলিলাম—“আমি তোমার কাজ দিচ্ছি।”

—“কি কাজ?”

—“বাগন বাজা।”

—“বাগন বাজা।”—সে চোখ দুটা

কপালে তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

তার পর বলিল—“আমি তো কখনো বাগন

মাজিনি—আমি তো পারব না।”

আমি বলিলাম—“না পার দুই হও।”

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল; তার পর

কি ভাবিয়া বলিল—“আজ্ঞা রাখি আছি।

কিন্তু আগে দুটি খেতে দিন, নইলে শরীর বইবে না।”

আমি দেখিলাম সে কথা মিথ্যা নয়।

তার ক্ষেত্রে কিছু জলপানের ব্যবস্থা করিয়া আমি যিকে ডাকিয়া বলিলাম—“ঝি, একে আমাদের বাসনগুলো মাজতে দিস।”

ঝি লোকটার মুখের দিকে একবার কটাক্ষপাত করিল, তার পর বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল।

আমি ঘান-আহার সাধিয়া বাহির-বাড়িতে আসিতেছি, দেখিলাম, কলতলার একতাল বাগন সমুখে রাখিয়া লোকটা চুপ করিয়া বসিয়া আছে,—তখনও কাছে চাপ দেয় নাই। জাবিলাম, লোকটা দেখিতেছি বাসনাহী কুড়ে! দেখি কি হয়--মনে মনে বলিয়া বৈঠকানা ঘরে চলিয়া গেলাম। তানাক টানিতে টানিতে তুলিলাম ঝি গর্জন করিয়া বলিতেছে—“কেমন মাহুষ গো! হুঁটো নাকি! বাসন কোলে করে সেই অংশ বসে রয়েছে!”

রবিবারের ছুপুরবেলাটা বৃথা নষ্ট করা উচিত নয় মনে করিয়া তামাকের ধোঁয়ার তন্ত্রাদেবীর আরাতি করিতেছিলাম, তারপর তিনি যে কখন ভক্তের পূজার সম্বন্ধে হইয়া শরীরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা ঠিক মনে নাই। যখন নিদ্রামন্দির ছাড়িয়া উঠিলাম তখন বৈকাল হইয়াছে। লোকটা আমার সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম—“কাজ শেষ হয়েছে?”

সে বলিল—“আজ্ঞে হাঁ।”

আমি তার হাতে দুই-আনার পরসাদ দিয়া বলিলাম—“এই নাও তোমার পারিশ্রমিক। কালও যদি বাসন মাজতে এস তাহলে একবেলায় খাবার আর এই রকম দু-আনা পয়সা পাবে।”

সে দুই-আনিটি আমার হাত হইতে লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। পর দিন ঠিক সময়ে আসিয়া হাজির। আমি দেখিলাম লোকটার ভাবগতিক আজ একটু কেমন এক রকম;—গা হইতে একটা জ্বর্ণাঙ্ক বাহির হইতেছে। আমি ব্যাপারটা বুঝিলাম কিন্তু কিছু বলিলাম না;—দেখি কি হয়। যিকে বলিতে হইল না, লোকটাকে দেখিয়াই সে আপনা হইতে বাসন আনিয়া হাজির করিল। কাজ শেষ করিয়া বৈকালে দুই আনা লইয়া সে চলিয়া গেল; তুলিলাম সেদিন আর সে আমার বাড়ির ভাত খায় নাই—শরীর না কি ভালো ছিল না।

একমাস আমাদের বাড়ি সে নিয়মিত কাজ করিল;—প্রথম প্রথম তার গারে বাড়ির গন্ধ পাইতাম বটে কিন্তু শেষোশেষি খুব শিথলভাবে লক্ষ্য করিয়াও মেসার কোনো চিন্তা দেখিতাম না। বাস্তবিকই লোকটার আশ্রয় পরিবর্তন হইতেছিল। তার শরীরের অবস্থা দিন দিন ভালো হইয়া ত উঠিতেই নছিল, তা ছাড়া তার মনের মধ্যেও যে একটা সুবাস বহিতেছে এমন পরিচয়েরও অভাব ছিল না।

আশ্বগৌরবে আমার মনটা ভরিয়া উঠিতেছিল। একটা লোককে বিনাশের পথ হইতে উদ্ধার করিবার আশঙ্কা যে কী তাহা এই কাজের কাজী ভিন্ন অস্ত্রে বুঝিতে পারিবে না। নিজের হাতে গড়া জিনিষের উপর মাহুষের যেমন মায়া হয় তেমনি একটা মায়া ঐ লোকটার উপর কমিয়া উঠিতেছিল। নিজের হাতের জিনিষ

অসম্পূর্ণ রাখিয়া যেমন তৃপ্তি হয় না—তেমনই লোকটা সর্বদা একটা অতৃপ্তি আমার মনের মধ্যে জাগিতেছিল। কি করিলে লোকটার উন্নতি হইবে এই ভাবনা তখন আমার সব চেয়ে বড় ভাবনা হইয়া উঠিয়াছিল।

আমি তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম—
—“তুমি লেখাপড়া কিছু জান ?”

সে বলিল—“নামান্ত্র লিখতে পড়তে পারি।”

আমার মাথায় একটা কমনা ছিল। আমার এক বন্ধুর একাণ্ড এক ছাপাখানা আছে। তাহাকে অহুরোধ করিয়া একখানা চিঠি লিখিতে বলিলাম।

এতদিন আমি লোকটার নাম জিজ্ঞাসা করি নাই;—চিঠিতে নামের উল্লেখ করিতে হইবে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম।

সে বলিল—“আমার নাম পূর্ণচন্দ্র বসু।”

চিঠি শেষ করিয়া আমি বলিলাম—“পূর্ণ! এই চিঠি নিয়ে যাও,—ছাপাখানার কাজ লিখলে তোমার উন্নতি হবে।”

পূর্ণ চিঠিখানা হাতে করিয়া কেমন একটু ইতস্তত করিল; কোনো উৎসাহ দেখাইল না। আমি ভাবিলাম, লোকটার মজাগত বুডেমি বোধ হয় এখনো যায় নাই। আমি তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলাম। সে চুপ করিয়া সব শুনিল; তার পর আমার বাড়ির কলতলাটার দিকে কেমন একটা ককণ দৃষ্টিতে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আমি মনে মনে হাসিয়া উঠিলাম—আমাদের কলতলাটার উপর পূর্ণর মায়া পড়িয়া গেল না কি।

আমার বন্ধুর ছাপাখানার পূর্ণ বেশ মনোযোগ দিয়া কাজ করিতেছে—মধ্যে মধ্যে খবর পাইতাম। অল্প অল্প করিয়া তার মাহিনাও বাড়িতেছিল। প্রথম প্রথম প্রায়ই আমি পূর্ণর খবর লইতাম, কিন্তু যখন দেখিলাম সে সত্যকার মানুষের মতো হইয়া উঠিতেছে—আমি কোনো ভয় নাই, তখন আমার একটু ঢিল পড়িয়া গেল। সেবে নানা কাজের হেতুতে আর খবর লওয়া হইয়া উঠিত না।

অনেক দিন পরে একদিন আমার এক আত্মীয়কে লক্ষ্মিলিং মেলে উঠাইয়া দিয়া টেনন হটতে বাহির হইতেছি এমন সময় পূর্ণর সঙ্গে আমার দেখা। সেই প্রথম দিনের পূর্ণর চেহারা আমার মনে পড়িল; তার সঙ্গে আন কত তফাত! সে-পূর্ণকে এ-পূর্ণ বলিয়া চেনাই যায় না। সুস্থ সবল চেহারা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—রীতিমত তত্ত্বলোক! পূর্ণকে দেখিয়া সভাই একটা আনন্দ বোধ করিলাম। আমার স্মিতর হইতে “বে একটা আশ্চর্যের গল্প উল্লিখা উঠিতেছিল তাহা বোধ হয় পূর্ণ লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। সে বলিল—“আপনার অহুগ্রহে—”

আমি কথটা চাপা দিয়া বলিলাম—
“কি হে, কেমন আছে ?”

সে বলিল—“নাজে ভালো আছি।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“এখন মাহিনা পাও কত ?”

সে বলিল—“আজ্ঞে ত্রিশ টাকা।”

আমি বলিলাম—“বেশ! বেশ!”

আমার ধারাই যে পূর্ণর ভালো হইল এ কথাটা এতদিন করার চেয়ে গোপন

রাখাতেই যে মহৎ তাহা আমি জানি, তবুও আমার ভিতর চাইতে বোধ হয় ঐ কথাটা বার বার ঠেগা দিতেছিল, তাই আমি বলিয়া ফেলিলাম—“তবে দেখ দিকিন্ পূর্ণ। তুমি যদি সেই সর্জনশায়ের পথ থেকে না ফিরতে তাহলে আর কোথায় থাকতে!”

পূর্ণ কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলিল—
“তা আর বলতে মশাই! আপনার অহুগ্রহ না পেলে আমার বে কী মশা হত, বলতে পারিনি—আপনি আমার জীবন—জীবন কেন—জীবনের বাড়ী মনুষ্যত্ব ছিরিয়ে দিয়েছেন, আপনার এ শব্দ আমি—”

এই কথাগুলার গুচ্ছই বোধ হয় আমার ক্ষুধিত অন্তর অপেক্ষা করিতেছিল। মাহুঘ যেমন তার উপাস্যের সামগ্রী অল্পে অল্পে হার লইয়া খায়, আমার প্রশংসাটাকে তেমনি করিয়া গ্রহণ না করিয়া আমার পরিতৃপ্তি হইলতছিল না, সেইগুচ্ছই সম্ভবত আমি বাধা দিয়া বলিলাম—“থাক, থাক—সে সব কথা! এখন যাওয়া হচ্ছে কোথা?”

সে বলিল—“একটু কাগজে—বারাক-পুরে।”

আমি বলিলাম—“ট্রেন কেন হবে না ত?”

—“আজ্ঞে না, এখনো ঘেরী আছে।”

পূর্ণ কথাটা শেব না করিয়া থাকিতে পারিতেছিল না। সে বলিতে লাগিল—
“একটা কথা আপনাকে জানাতে না পারলে আমার শাস্তি নেই। আপনি আমার এত

উপকার করেছেন কিন্তু আমি আপনাকে কীকি দিয়েছিলুম।”

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—“কীকি?”

সে বলিল—“আজ্ঞে হাঁ। আপনি বে আমার বাসন মাজতে দিয়েছিলেন তার একখানাও আমি মাজিনি।”

—“মাজনি?”

—“আজ্ঞে না। বাসন মাজবার জেজে আমি কিছুতেই হাত তুলতে পারতুম না;—আমি চূপ করে বসে থাকতুম—আপনার সেই দাসীটি আমার সমস্ত বাসন বেজে দিত।”

আমি অবাক হইয়া গেলাম।

পূর্ণ বলিতে লাগিল—“আমার পানে শুধু একটিবার ঢেরে, কোনো কথা না বলে, সে যখন আগ্রহ করে বাসনগুলি মেজে নিলে তখন আমার মনে যে কী হ’ল তা আমি ইহজন্মে তুলতে পারব না। আমার মনে হল, আমার সমস্ত পাপ তার ঐ চোখ দুটি দিয়ে যেন সে মুছে নিলে। সেই মুহূর্ত্তে আমি যেন নতুন মাহুঘ হয়ে গেলুম। আমার হৃৎকের বোঝা এমন আঁদর করে কেউ তো কখনো বুকের ওপর টেনে নেয় নি—”

বলিতে বলিতে ঢং ঢং করিয়া গাড়ি-ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল;—পূর্ণ উৰ্দ্ধ্বাসে গাড়ির দিকে ছুট দিল।

আমি ভাবিতেছিলাম—পূর্ণকে শুধরাইল কে?

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

সঙ্কল্প

তেমন-ই কি আসে উষা ভূমি অন্ন স্নানকার,
 উদ্ভাসিয়া স্রাম তহু শরৎের ?
 শুনি যবে পানীদের মধু-গীতি-ঘোষণার
 হীরে ভালে নীরবতা অগতের ?
 প্রভাতের বাদু যবে বহে বার,—কহে বার
 কাণে কাণে কাননের কাহিনী,
 মণ্ডবর্ণ-ঐক্য পর্ণে তেমনি কি রহে বার
 দ্বিত-শোভা চাক্রপ্রভাবাহিনী ?
 বসন্তে নিদায়ে মোর গাও শিক পানিরা !
 অরিব মানসে স্তু-মাদুহী ।
 আশ্রয়প্রাপ্তে নিশা উৎসবে যাপিরা,
 জাগ যবে স্নিগ্ধ ও দাছরি ।
 কেমনে জানিবে কবে কোন্ শুভ লগনে
 সাধের শরৎ মোর আসিবে ?
 সরসী-সলিলে আর গাঢ় নীল গগনে,
 স্বপনে জড়ানো আলো ভাসিবে ?
 পুলক-ললিত হাসি, পুষ্পরাশি আননের,
 ফুটিলে না পানি আর লখিতে ।
 জগতে অতুল্য সে যে সুরশোভা মানবের ;
 নিরীক্ষিত কোথা গো সে চকিতে ?
 প্রভাত সাগর সন্ধ্যা । অস্ত যাও ঐশ্বরে ;
 নিশা ! কেঁদে মরে যত নীরবে ।
 তমিস্রার পরপার পাড়ি দিরা সঁতারে,
 লভিব নবীন জ্যোতি বিস্তবে ।
 এস স্পর্শ গন্ধ গান ! ভূমি প্রাণ স্নানকার ;
 বিরচিব নবস্তু অগতের ।
 জাগ শ্রীতি ! বিধে আলি নব গীতি-ঘোষণার
 উষোধিব দেব-লীলা অগতের ।
 শ্রীবিজয়চন্দ্র মল্লভট্ট ।

আর্য্যদিগের আদি জন্মভূমি

আর্য্যদিগের প্রথম স্থতিকাগার কোথায় ছিল এবং তথায় তাঁহারা কিরূপ সভ্যতার বিকাশ করিয়াছিলেন ইত্যাদি পুরাতত্ত্বের সহিত তাঁহাদের সমগ্র ইতিহাসেরই অতীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং আর্য্যজাতির মূল ইতিহাসের উচ্চার করিতে হইলে প্রথমতঃ আমাদেরই ইহার মূলোচ্চারেরই চেষ্টা করিতে হইবে।

‘পুরাণ’ কল্পনামাত্র এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া অনেক পুরাণের ঐশ্বর্য্য প্রাচুর্য্য করিতে একেবারেই প্রস্তুত নহেন। কিন্তু পুরাণে ইতিহাসের যে সমস্ত মূল্যবান উপাদান নিহিত রহিয়াছে—সে সমস্তের দ্বারাই ভারতের ঐতিহাসিক কালের পুণ্যভূতের বহু অধ্যায় বিরচিত হইতে পারে। আমাদের উপস্থিত আলোচনা প্রসঙ্গে এই সত্যটিই শরিক হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

মন্ত্রপুরাণে ইলাবৃত্তবর্গ দেবতাদিগের জন্মভূমি বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায় যথা—

“ইলাবৃত্তমিতিখ্যাতঃ তবর্গঃ বিশ্বভারতম্।
বহু বজ্রোৎসর্গস্তো বরিধ্বতঃ সংঘতঃ। ২
দেবানাং জন্মভূমির্বা ত্রিলোকেনু বিক্রতা।” ৩

মন্ত্র পুরাণ ১৩৭ অধ্যায়।

“যেখানে বসি বস্তু করিয়াছিলেন এবং বস্তু হইয়াছিলেন—সেই বিশ্বত আদ্যতম স্থানই ইলাবৃত্তবর্গ—ইহা দেবতাদিগের জন্মভূমি বলিয়া ত্রিলোকেই খ্যাত আছে।”

ইলাবৃত্তবর্গ মেরুকে বেঠেন করিয়া

রহিয়াছে বলিয়া পুরাণে ইহার অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা পাঠ করিলেও ইহাকে মেরুস্থান বলিয়া আনিতে পারা যায়—

“নতর্য্য দৃগুতপতি নতর্য্যদীপ্তি মানবাঃ।

চন্দ্রসুখ্যো নকত্রঃ ন একাশমিলাবৃত্তে।”

ইতি লিঙ্গ পুরাণম্।

৩. “ইলাবৃত্তে সূর্য্য ভাগ গ্রহণ করেন না—চন্দ্র সূর্য্য ও নকত্র তাহাতে প্রকাশ পায় না। ইহাতে লোক সকল জরাগ্রস্ত হয় না।”

ইলাবৃত্ত মেরুস্থল বলিয়া সূর্য্য তথায় উদিত হইলেও ইহার ভাগ অশ্রুত হয় না এবং কখনও সূর্য্য সম্পূর্ণ অপ্রকাশ থাকে এবং ক্রমাগত বধন হয় মাস দিবা থাকে তখন চন্দ্র তারকাদি একবারেই দৃশ্যমান হয় না ইত্যাদি প্রাকৃতিক অবস্থাই উক্ত বিবরণের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে।

ইলাবৃত্তের লোক সকলের বিবরণ নিম্নে চিত্রিত উক্ত হইতেছে :—

“পশ্চাদ্ভাবাঃ পশ্চাদ্ভাবাঃ পশ্চাদ্ভাবাঃ নিত্যকথাঃ।

পশ্চাদ্ভাবাঃ পশ্চাদ্ভাবাঃ পশ্চাদ্ভাবাঃ তবতাবিতাঃ।

জহুসরসাহারা অনিশ্চয়াঃ সুগন্ধিনঃ।

দেবলোকপতত্ত্বঃ পশ্চাদ্ভাবাঃ হার্য্যদ্বিরাঃ।

ত্রয়োদশ সহস্রাদি সূর্য্যপাতঃ নরোত্তমাঃ।

আত্মঃসূর্য্যঃ সৌর্য্যঃ বর্ষেদিয়েতিলাবৃত্তে।”

ইতি লিঙ্গ পুরাণম্।

অথমেই লিঙ্গপুরাণের বর্ণনায় যে ইলাবৃত্তে “নতর্য্যদীপ্তি মানবাঃ” দৃশ্য সকল জরাগ্রস্ত হয় না বলিয়া উল্লেখ আমরা পাইয়াছি— তাহাতেই উহা যে প্রকৃত দেবস্থান নহে

প্রত্যুত মর্ত্যস্থান তাহা আশ্রয় লষ্টে বৃষ্টিতে পারি। ইলাবৃত্ত শ্রীতপ্রধান স্থান বলিয়া তৎকাল্য লোক সকল তিরস্বোধন ভোগ করিত ও তিরস্বোধন হইত বলিয়াই যে দেবতার জার ‘অমর’ ‘অমর’ রূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও আশ্রয় উপলব্ধি করিতে পারি। ইহা হইতে দেবতুল্য লোকদিগের বাসভূমিই যে ইলাবৃত্ত ‘দিব্য’ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে, তাহা আশ্রয়ের নিকট স্থান বলিয়াই বোধ হয়।

ইলাবৃত্তের আশ্রয়স্থিত দক্ষিণে পৃথিবী পর্বতই উত্তরকূলের সীমা ছিল। এই পৃথিবী পর্বতের উপরেই উত্তরকূল অবস্থিত ছিল। ইহার অবস্থান সম্বন্ধে মন্ত পুরাণে এইরূপ নির্ণিত হইয়াছে :—

“উত্তরে গাত পুস্ত সমুদ্রোত্তর দক্ষিণে।

সুসংসার তৎকাল্য পুণ্য সিদ্ধি নিবেদিত।”

মন্ত পুরাণ ১১৩ অধ্যায়।

“এই পৃথিবী পর্বতের উত্তরদিক দক্ষিণভাগে উত্তরকূল—ইহা সমুদ্র পর্ষদ বিতর্কিত এবং পুণ্য সিদ্ধি নিবেদিত।”

এই উত্তরকূলের লোক সকল ইলাবৃত্ত রূপ দিব্যালোক হইতেই যে তপস্য আশ্রিত হইয়াছিল তাহা লিঙ্গ পুরাণে উল্লিখিত দেখা যায় :—

“কুরুবর্ষে কুরু বর্ষলোকায় পশ্চিমে।

২২ অধ্যায়।

ইলাবৃত্তবর্ষ যে দেবলোক বা বর্গলোক বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল তাহাতে ইহাকে সকল আধ্যাত্মিক সাধারণ পূর্ণপুরুষদিগের আদি অশ্রয়স্থান বলিয়াই বোধ হয়। এবং মন্ত পুরাণের দেবতাদিগের অশ্রয়স্থিতিরূপে

ইহার নির্দেশ হইতে তাহাই বৃষ্টিতে পারা যায়।

কালে স্রষ্টাবিগ্রহের সত্যটি হইলেই আধ্যাত্মিকগণ পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেহ কেহ উত্তরকূলে আসিয়া আশ্রিত হইয়াছিলেন। ইহাতেই তাহার “বর্গলোক পরিচ্যুত” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

আমরা যে বিরোধের কথা অল্পমান করিয়াছি, ‘অমর’ নামের অভিধান আলোচনা করিলে আমরা তাহার যথেষ্ট সমর্থনই পাইতে পারি। ‘অমর’ নামের অভিধান সম্বন্ধে অমরকোষে এইরূপ নির্দেশ পাওয়া যায় :—

“অমর ইতি বৈতন্য-বস্তুমন্ত্রা-বিনাশঃ।

তদ্বিনাশিতিত্বত পূর্ণবেদ্যঃ ব্রহ্মণঃ।”

ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি আধ্যাত্মিক পরম্পরের সহিত বিরোধ করিয়াই ‘ব্রহ্ম’ ও ‘অমর’ এই দুই ভাবে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহাতেই অমরগণ সুরধেবী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এইরূপে বিভক্ত হইলেও পূর্বে যে তাহার এক দেবতা জাতির অস্তিত্ব ছিলেন তাহা তাহাদের ‘পূর্ণদেব’ নামের দ্বারা লষ্টকালে প্রকাশ পায়।

পূর্বে দেবতাসকল দেব ও অমর উভয় নামেই পূজিত হইতেন। বিরোধের পর কিন্তু একদল দেব নামেই পূজা করিতে লাগিলেন—অপর দল দেব নাম ছাড়িয়া কেবল অমর নামেই পূজা করিতে লাগিল। এইরূপে দেবোপাসকেরা ‘দেব’ নামেই আখ্যাত হইলেন এবং অমরোপাসকেরা

‘অম্বর’ নামে আখ্যাত হইলেন। ‘অম্বর’ শব্দের অর্থ পূর্বে ‘অম্ব’ অর্থাৎ গ্রাণ বা বলযুক্ত ছিল। কিন্তু পূর্বোক্তরূপ প্রতীপক্ষতা হইতেই ইহা “স্বরধেবী” অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইন্দ্র-পুত্রা লইয়াই প্রথম বিরোধের উৎপত্তি হয়। একদল ইন্দ্রকে প্রাধান্য প্রদান করেন—কিন্তু অপর দল তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। তাহাতেই অম্বরগণ বিশেষভাবে ‘ইন্দ্রারি’ নামে পরিচিত হইয়াছিল।

উপরি উল্লিখিত দেবপুঙ্ক আখ্যোয়াই যে ভারতীয় আখ্যাদিগের পূর্বপুরুষ তাহা না বলিলেও চলে। এই দেবপুঙ্ক আখ্যোয়াই আখ্যাদিগের আদি জন্মভূমি ইলাবৃত হইতে আসিয়া উত্তরকুরুতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাহাদের প্রতীপক্ষ অম্বরেরা তাহাদেরই পক্ষে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন—লিঙ্গ পুত্রাণের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনার তাহার স্পষ্ট আভাসই পাওয়া যায় :-

“যেভ্যানাং বানবানাক যেতঃ পর্তত উচ্যতে।

সুসবান্ পর্ততৈকৈব পিতণাঃ নিলয়ঃ সদা।”

৪২ অধ্যায়।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে “যেত পর্তত যেতন বৈতা বানবদিগের হান ছিল, সুসবান্ও তদ্রূপ পিতৃপুরুষদিগের হান ছিল।”

আমরা পূর্বেই পাইয়াছি যে বর্গলোক-পরিষটে দেবগণই সুসবান্ পর্ততাবহিত উত্তরকুরুতে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। অতরাং পিতৃপুরুষ যে ভারতীয় আখ্যাদিগেরই পূর্বপুরুষ তাহা আর বলিতে হয় না।

কারণ পুরাণকার পিতৃগণের দ্বারা যে আপনার পূর্বপুরুষের কথাই বলিতেছেন—তাহা অনাধারসেই বুদ্ধিতে পারা যায়। আখ্যাদিগ ভারতবর্ষে আগমন করিবার পূর্বে সম্ভবতঃ উত্তরকুরুতে বহুকাল বাসব্য করিয়াছিলেন—তাহাতেই “পিতৃগাং নিলয়ঃ সদা”—এইরূপ বর্ণনা দ্বারা ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত পিতৃভূমিক্রমে নির্দেশিত হইয়াছে। পুরাণে বৈষ্ণব নিরস্ত পিতৃভূমিক্রমে উত্তরকুরুস উল্লেখ আমরা প্রাপ্ত হইতেছি তাহাতে আখ্যাদিগ ভারতবর্ষে আগমন করিলেও যে উত্তরকুরুস সহিত তাহাদের পিতৃভূমি-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ছিল তাহাই সম্ভব হইবে।

আখ্যাদিগ ইলাবৃত বা দেনলোক হইতে উত্তরকুরুতে উপনিবিষ্ট হইলেও তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষের লোকোত্তর দিবা প্রভাব ও বিক্রমের এইরূপই পরিচয় দিয়াছিলেন যে এই উত্তরকুরুও দেবদেপ রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা হইতে তাহার স্পষ্ট প্রমাণই আমরা প্রাপ্ত হই :-

“সেই বানিষ্ঠ সাত্যাহব্য (অভ্যাজিক) বলিয়াছিলেন, তুমি [বিদ্যাবলে] সর্গ দিকে পৃথিবীর অন্ত পর্যন্ত ভ্রম করিয়াছ, আশ্বাকে, অভ্যাজিক জানত্বশি বলিলেন, “ওহে ব্রাহ্মণ, আমি যখন উত্তরকুরু ভ্রম করিব, তুমি তখন এই পৃথিবীর সীমা হইবে, আমি তোমার সেনাপতি হইব।”

বানিষ্ঠ সাত্যাহব্য বলিলেন,—

“ঐ দেশ (উত্তরকুরু) দেবক্ষেত্র, মর্ত্য (মহুয়া) উহা ভ্রম করিবার অযোগ্য, • তুমি আমার স্রো

(প্রভাষা) করিলে, তোমার এই (বীণা) আদি অশ্রবণ করিবে।" অষ্টম পক্ষিকা ১ম খণ্ড ৪-শ অধ্যায় শ্রীশুক্ত রামেন্দ্র দ্বন্দ্বের শিববীর অমুখ্য ৩৩৪ গুঃ।

উত্তরকৃত্ত যেমন এই প্রকারে সেবা-পালকদিগের দ্বারা অধুষিত হইয়া দেবদ্বান রূপে আপ্যায়িত হইল ;—অনুরোপাসকবিগের উপনিবেশও তদ্রূপ অমুর-দেশ দা আসিহিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইল।

যে বলি ইলাবুতে বজ্র করিয়াছিলেন বলিয়া, মৎস্ত পূর্ণাবের বর্ণনা হইতে, আমরা জানিতে পারিয়াছি—তিনি অমুর বা দৈত্যাদিগেরই রাজা ছিলেন। বেদে 'বল' নামক অত্রকে আমরা ইন্দ্রের শত্রুরূপে বর্ণিত দেখিতে পাই ; যথা :—

"বঃ বলন্ত গোমতোঃপাশমজিবে। বিলম্ব।

ভাঃ দেবা অবিহুগতজামানান আবিহুঃ ৪" ৭

কবেল ১ম মণ্ডল ১১শ সূক্ত।

"যে বজ্রধনু ইন্দ্র। তুমি গাত্ৰী-বন্দককারী বল নামক অমুরের গহ্বর উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। তখন বলার দিশীড়িত দেবভাগ্য তদ্রূপ হইয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

এস্থলে এসেনবাবু লিখিয়াছেন—

"ভাক্তার কৃষ্ণমোহন যক্ষোপাখ্যায় আসিত্তীর ইতিহাসের বাবিলনাশিত বলদিগের সহিত বৈদিক যলের ঐক্যাদান করিতে সন্মতক।" বস্তত আসিত্তীর হুপ্রসিদ্ধ রাজা বেলান (Belus) দৈত্যরাজ বলির সহিত অস্তির বলিয়া পুতাত্যাবিং গতিতবিগের দ্বারা বিবেচিত হইয়াছেন। এই প্রকারে বল বা বলির বাশের সহিত ইন্দ্রের শত্রুতা হইতেই যে অমুরগণ "ইন্দ্রাণি" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা আমরা যুক্তিতে পারিলাম।

ইলাবুতে যেমন প্রথম বজ্রাঘুষ্ঠানের উৎপত্তি হইয়াছিল, তেমনি বিবাহ ও জাত

কর্মাদি সংস্কারেরও যে উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা আমরা মৎস্ত পুরাণের বর্ণনা হইতেই জানিতে পারি যথা—

"বিবাহঃ ক্রতবৈব জাতকর্মাধিকাঃ শ্রিগাঃ। ৩

দেবানামঃ বহুবৃত্তানি কত্তাবানানি বানিতঃ ৪" ৪

১৩৫ অধ্যায়।

"বেদভাদিগের গাণ, মজ, বিবাহ ও জাতকর্মাণি শ্রিয়াকলাপ এবং কত্তাবানানি বাবতীর কার্য ই ইন্দ্রেই লক্ষ্য হই।"

ইলাবুতের দক্ষিণারমের ছয় মাস রাত্রি বশতঃ বিবাহাদি কার্য সম্পাদিত হওয়ার পক্ষে বাধ্যত ঘটত বলিয়া উত্তরারণের ছয় মাস দিবাতে ঐ সমস্ত কার্য অমুষ্ঠিত হইত। "ইলাবুতের এই প্রথা আর্ঘ্যদিগের মধ্যে এইরূপই বহুল হইয়াছিল যে ছয়মাস রাত্রির বেশ ছাড়িয়া আসিলেও সেই পূর্ন-সংস্কার তাঁহার ছাড়িতে পারেন নাই। তাহাতেই তাঁহাদের চূড়া, উপনয়ন, বিবাহাদি সংস্কারে সেই আদি পুরুষদিগের উত্তরারণের বিধিই পূর্নবৎ বলবৎ রহিয়াছে যথা—

"উলারনে আর্ঘ্যমাণে পক্ষে কল্যাণে নমস্কে চৌড় কক্ষোপনয়ন গোধান বিবাহাঃ ৪" ইতি আশ্বলায়নঃ
বলা বাহল্যা যে "উপগমন" উত্তরারণকেই বুঝাইতেছে।

এই প্রকারে, আমাদের জাতীয় জীবনের নিলুপ্ত আদি ইতিবৃত্তের হিরন্ময় চির সংস্কারের বিষয়ীভূত হইয়া থাকিবার অন্তই যেন প্রত্যেকের জীবনের দশবিধ সংস্কারের মধ্যেই আত্মগুরুপে অমুহুত রহিয়াছে—আমাদের উপরি-উক্ত পর্যালোচনা হইতে তাহাই আমরা জানিতে পারিতেছি।

শ্রীশ্রীতলজ্ঞ চক্রবর্তী।

অপূর্ব কোটা

হের এই কুত্র কোটা হাতে বোর ! কোন্ রাজবালা
চাহে রাখিবারে ইথে সোহাগের কনকের হার ?
কোন্ এয়ে, স্নানভিগ্ন ঘনঘোর কেশের সম্ভার,
রাখিবারে চাহে ইথে লাগে-লাগ নিম্নের উজালা ?
রাজবালা রাগি কহে—“এ কি কোটা ! ছি ছি এ কি জালা !”
রোষ-কষাঘিত ঝাঁবি এয়ে কহে—“শোভার আধার
আবার গৃহের কোটা শতগুণে ! এ কি ব্যবহার
কবি ভব ! স্টাইলছাড়া অমুরোদ্ভূ ! কানে ধরে তালি !”

অনাদৃত, উৎপেক্ষিত রে আমার কোটা কবিতার,
থাক্ তবে, থাক্ তুই অতি শুণ্ড ছন্দ-মন্দিরে—
আমার সে নীলকান্তমণিধনে নরনের নীরে
পুঞ্জি বধা,—নিতা বধা মৃত্যু, গীত, আনন্দ অপার !
থাক্ লো তোরি মূর্ত্তে স্রুধাযথা হরিনাম-মালা,
জিনি কোটা কর্ণহার কান্তি দায় অগুরু উজালা ।
ঐদেবেজনাথ সেন ।

নবাব

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নির্বাচন

মধ্যাহ্ন-সূর্যের ধর-করজালের মধ্য
দিয়া একখানা গাড়ী আসিয়া নবাবের
প্রাসাদের সম্মুখে থামিল। তাড়াতীয়া গাড়ী ;
মাথার প্রকাণ্ড এক চামড়ার পোর্টম্যান্ট ও
দুই-চারিটা ছোট বাক্স।

গাড়ী থামিলে এক বৃদ্ধা নারী গাড়ীর
মধ্য হইতে নামিলেন।

প্রাসাদের ঘরে এক ভৃত্য গাড়ীইয়া
ছিল। বৃদ্ধা নিজস্বা করিল, “এ বাড়ী
জাহ্নলের ?”

ভৃত্য অবাক হইয়া গেল। এই নিতান্ত
সাধারণ-গোছ-দেখিতে বৃদ্ধা নবাবের প্রতি
সম্মান-স্বত্ব একটা উপাধি না দিয়া সটান
ঔদ্যোগ নাম ধরিয়া বলিল, জাহ্নলে। ভৃত্য
কহিল, “তারই বাড়ী। তবে তিনি এখন
বেরিগেছেন।”

“তাতে কিছু আসে-যায় না” বলিয়া বৃদ্ধা তৃত্যকে গাড়ীর মাথা হইতে ছোট-ঘাট নামাইতে আদেশ দিল; তাহার পর গাড়োয়ানকে ডাড়া ছুকাইয়া তৃত্যকে বলিল, “জিনিষ-পত্রের সব জাহাজের ঘরে রাখি, বুঝিলি?”

বৃদ্ধা উপরের ঘরে বসিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় নবাবের খাস-তৃত্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা কহিল, “তোমাদের মনিব বাড়ীতে নেই?”

খাস-তৃত্য উত্তর দিল, “না।”

“ছেলেরা?”

“তারা মাঠায়ের কাছে পড়ছে। এখন ত দেখা হবে না। হজুর নেই।”

“আর গিন্নী?”

“তিনি ঘুমোচ্ছেন। বেলা তিনটের আগে তাঁর ঘুম ভাঙবে না। সে ঘরে কারও বাবারও জো নেই।”

কুনিয়া বৃদ্ধার হাড় অলিয়া গেল। এই দিনে হুপ্পের বিছানার পড়িয়া গড়ানোর মত অপরাধ মাহুষের আর কিছু হইতেই পারে না—বিশেষ বাড়ীর গৃহিণী সে, বরসেও বৃদ্ধা নহে। শিফাহীনতার এমন কল ফলিবে না-ই বা কেন? বৃদ্ধা তখন গেরির সন্ধান লইল; তৃত্য কহিল, তিনি বিদেশে গিয়াছেন।

“বংশেন?”

“তিনি হজুরের সঙ্গে চেব্বারের গিয়েছেন।”

বৃদ্ধা তখন একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া কহিল, “থাক, তা’না নেই, তোমরা যাও। আমার গুজ্জ বাস্ত হতে হবে না—” খাস তৃত্য তখনও সরিল না—চোখে সমিধর দৃষ্টি

ভরিয়া বৃদ্ধার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধা তাহার বিষয়ের কারণ বুঝিল, তাই মুহু হাসিয়া কহিল, “আমি কোন কুটুম-অতিথি আসিনি, বাছা—আমি তোমার মনিবের মা। বুঝিলে?”

তৃত্য তাড়াতাড়ি সসম্মত অতিবাদন করিল। এবং এ সংবাদটা নিষেধেই তৃত্য-মহলে রাষ্ট্র হইয়া গেল। সকৌতুকলেন প্রায় সকলেই আসিয়া বৃদ্ধাকে অতিবাদন করিল। সেক্রেটারি বারো কহিল, “আপনাকে আমি আগে দেখেছি, একবার।”

বৃদ্ধা তাহাকে চিনিলা। বের অভ্যর্থনা-সমারোহের উদ্দেশ্যে লোকটা প্রায় দিয়া খাটিয়াছিল, বটে। আর আবার ইহাকে দেখিয়া সে অপমানের কথা নুতন করিয়া মনে পড়ার বৃদ্ধার আগে ঈদৎ বেদনা-বোধ হইল। বৃদ্ধা কহিল, “হঁ, তুমি ক’দিন ছিলে না, ওখানে।”

সেক্রেটারিকে ‘তুমি’ বলিয়া সম্বোধন করার বৃদ্ধার প্রতি তৃত্যবর্গের শ্রদ্ধা-সম্মত অনেকখানি বাড়িয়া গেল।

কিন্তু আগাদের এই ঐখণ্ড-আড়ম্বরে বৃদ্ধার কিছুমাত্র ভাব লাগিল না। দাঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় বৃদ্ধা লক্ষ্য করিল, ঘরের উপর আগাগোড়া কার্পেট মোড়া থাকিলে কি হইবে, সেই কার্পেটের প্রান্তে বিস্তর ধূলা জমিয়া রহিয়াছে—আলোর বৃহৎ ফাড়েও ধূলায় অস্তাব নাই। এত দাস-দাসী লোক-জন-সবেও এ অপরিচ্ছন্নতা দেখিয়া বৃদ্ধার মন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধা দেখিল, এত-সব ধূলায়ান আস্পাদন—তনুও ঘেন ঘরের একটা

ত্ৰী নাই! বৃদ্ধা নিজের হাতে তিরদিনই গৃহমার্জনা করিয়া আদিরাছে—এখন পুত্রের ঐশ্বর্য্য হইয়াছে—যার সেবার জন্য পুত্র কোথাও কোন ক্রটি রাখে নাই, তথাপি বৃদ্ধা এখনও নিজের হাতে কাজ-কর্ম করিতে কিছুমাত্র বিধা করে না। তাই ছুই-এক কথার পর সেক্রেটারির নিকট তৃত্যনের এই সকল অবহেলা-ক্রটির সম্বন্ধে অহুযোগ করিতে বৃদ্ধা তুলিল না। সকলেই বুঝিল, বৃদ্ধা বেশ পাকা রকমের গ্রহিণী বটে।

এমন সময় নবাবের পুরাতন ভৃত্য কাবাজ্জ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধাকে সম্মান অভিবাগন জানাইল। বৃদ্ধা প্রশ্নের দ্বারে কহিল, “এই যে কাবাজ্জ—ভাল আছ ত বাবা?”

এক-গাল হাসিয়া কাবাজ্জ উত্তর দিল, “আগনার আশীর্বাদে ভালই আছি।”

“ছেলেরা কোথার সব? কি করছে? সব ভাল আছে ত?”

“পড়ছেন। এখনই ছুটি হবে’খন। সবাই ভাল আছেন।”

“বার্ণার্ডের শরীর ভাল ত? কাজ-কর্ম চলছে বেশ?”

“কৈ আর তেমন চলছে! তবে মোটা-সুটি খবর সব মন্দ নয়। থাক, আমি এখন আপনার খাবার বোগাড় করিয়ে দি—” কথাটা বলিয়া কাবাজ্জ চলিয়া বাইবার উপক্রম করিতেছিল। বৃদ্ধা তাহাকে নিরন্তর করিয়া বলিল, “ধাক্ কাবাজ্জ, কিছু বাত্ব হতে হবে না। আমার খাওয়া হয়েছে।”

কাবাজ্জ কহিল, “তবে আমি বাট,

ছেলেদের খপর দিই গে—বলিগে ঠাকুরমা এগেছেন।”

“না, না, তাদের পড়াশোনার ব্যাঘাত করে কাজ নেই! তোমার মা-ঠাকুরম বুঝি সুমোচ্ছে?”

কাবাজ্জ সে কথার উত্তর দিল না। একটু কান পাতিয়া সে কহিল, “ঐ যে ছেলেদের পড়া হয়েছে। তারা আসছে, তাদের পাঠের শব্দ পাচ্ছি। তারা এই দিকেই আসছে, বটে!”

সত্যই তাহারা আসিয়া পৌছিল। তিনটি জুহু সবল বালক—পারে পরম পোষাক, মাথার নরম টুপি, পায়ে লাল মৌজা—হাতে একটি করিয়া চামড়ার ব্যাগ। ছেলেরা আসিয়া এই নূতন আগন্তকের পানে সবিস্ময় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

কাবাজ্জ কহিল, “ওঁকে চেন না,—ঠাকুরমা হন্ বে! তোমাদের দেখতে এগেছেন।”

ছেলেরা অবাক হইয়া বৃদ্ধাকে দেখিতে লাগিল। সাদাসিধা পোষাক, গ্রাম্য সরলভা-ত্তরা মুখ—ছেলেরা বৃদ্ধার পানে চাহিয়া আপনা হইতেই বুঝিতে পারিল, এই অপরিচিতা বৃদ্ধার দ্বন্দ্বের ঘেহের নিষ্কর উৎসাহিত রহিয়াছে—সে বেহ তাহারা ইচ্ছা করিলেই আকর্ষ পান করিতে পাইবে। কেমন এক ব্রহ্মন্তর নিশ্চিত আশ্বাসে সে চোখের দৃষ্টি পরিপূর্ণ।

সেক্রেটারি আবার কথা কহিল, সে বলিল, “মামাম্, আজ নবাবের এক মহা-দিন। মস্ত মিটিং। ডেপুটি হবার মিটিং। আজ এই সত্য নবাব তাঁর সমস্ত শত্রুকে জয় করে মাথা তুলে দাঁড়াবেন।”

বুঝা সেক্রেটারির পানে দিগিরি চাহিল। সেক্রেটারি আবার কহিল, “শত্রুদের সংখ্যা কম নয়, আর ক্ষমতাও তাদের অনেকখানি। কিন্তু তগগান নবাবের সহায়। আমাদেরই জয় হবে।”

এমন সময় এক কাত্তী বালক আসিয়া সংবাদ দিল, ছেলের খবর দেওয়া হইয়াছে। ছেলেরা বুঝাকে অভিবাগন করিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিল। অপর লোকজন চলিয়া গেলে ঘরে বসন শুধু বুঝা ও কাবাহু রহিল, তখন বুঝা কাবাহুকে জিজ্ঞাসা করিল, “এ যে মিটিংয়ের কথা সবাই বলছে—এ কি, কাবাহু? কেন?”

কাবাহু কহিল, “আজকে ভাটী জাঁকালো সত্যি বলেছে—এই সভার আজই স্থির হবে যে নবাব বাহাদুর কর্নিকার ডেপুটি হবেন কি না।”

বুঝা চমকিয়া উঠিল, কহিল, “ওঁহা,—এখনও ডেপুটি হয়নি। সে কি! আর আমি যে সকলকে বলে আসছি, সে ডেপুটি হয়েছেন—তবে গে, আজ হাস্থানেক হল আমি সার্ভে রোমানের পথে বাঁধা ঘোশনাইয়ের বন্দোবস্ত করেছিলাম। তাহলে সকলকে আমি মিথ্যা কথা বলেছি এতদিন—?”

কাবাহু তখন অনেক কথা কহিয়া বুঝাকে বুঝাইল যে একমাস পূর্বে নবাবের নাম শুধু ডেপুটি পদপ্রার্থী তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে, আজ পার্লামেন্ট মহাসভার সকলের মত সংগ্রহ করিয়া তবে ডেপুটি নির্বাচনের পালা সারা হইবে।

শুনিয়া বুঝা কহিল, “তাহলে আমার বার্ণার্ড এখন কোথায়? সেই সভায়?”

কাবাহু কহিল, “হাঁ, মানাম।”

“মেরেরা সেখানে যেতে পারেন? তাদের বসবার বন্দোবস্ত আছে, সেখানে? তোমার মাঠাকরুণ তবে সেখানে যাচনি যে। তার স্বামীর এত বড় একটা ব্যাপার আর নোমা সেখানে যায়নি? এদিনে সন্ত আত্মীয়-স্বজনকে কাছে পাওয়ার জন্ত তার যে বড় টঙ্কে হবে। আর কাবাহু, তুই আমার সেখানে নিরে চল। আমি এখনই সেখানে যেতে চাই। সে কতদূর?”

“এই কাছেই। এতক্ষণে সন্ধ্যা বসে গেছে, বেধে হয়। তবে আমার যাওয়া হবে না। এখনি থোমা ঘুম থেকে উঠেন। তা ছাড়া আপনার ত সেখানে ঘাবার টিকিট নেই।”

“নাই থাকল। আমি বলব, আমি জাঁহুলের মা! এ সুনলে আমার ঢুকতে দেবে না? আমি সেখানে গিরে সব সুনতে চাই, দেখতে চাই।”

হাঃ, যেচাটী মা—। সে জানে না, সেখানে গিয়া সে কি দেখিবে, কি শুনিবে।

কাবাহু কহিল, “তাহলে একটু অপেক্ষা করুন—আমি এখনই সঙ্গে লোক দিচ্ছি।”

“কাকেও সঙ্গে দিতে হবে না—তুমি খালি বলে দাও, বাড়ীটা কোন্ দিকে। আমি এখনই ঠিক ঘাব’খন।”

কাবাহু কহিল, “কিন্তু তাঁর শত্রুরা সেখানে তাঁর নামে ঢের কলঙ্ক, ঢের অপবাদ ঝটাবে।”

“মঠাক। তাতে কিছু এসে যাবে না। আমার ছেলে কি মাহুদ, সে আমি যেমন জানি তেমন তঁ আর কেউ জানে না। যার বা খুঁসি বলুক আমি তাতে এতটুকু

হঠাৎ না! তবে আমি চন্দ্র, কাবাহ।”
মাথার টুপি তুলিয়া বৃদ্ধা বাহির হইল।

খানিকটা পথ গিয়া বৃদ্ধা দেখিল,
এক একাড বাড়ীর সম্মুখে লোকজন ও
গাড়ীঘোড়ার ভারী জিড়! সকলেই ব্যস্ত
ভাবে চলকেরা করিতেছে। মুখে বিকট
গাঙ্গীর্বা—লোকগুণা যেন কি এক বিপুল
সম্ভাবনার উদ্‌গীৰ্ণ ঢকল হইয়া নড়ি-
তেছে, কিরিতেছে! বৃদ্ধা সেই বাড়ীর
কটকের সম্মুখে ধাঁড়াইল—তারপর দ্বারীকে
আপনার পরিচয় দিলে সে একটু সরিয়া
বৃদ্ধাকে পথ ছাড়িয়া দিল।

ভিতরে বিতীর্ণ হল—সজ্জিত, লোক
লোকায়ণ্য। অসংখ্য চেয়ার জুড়িয়া সারা
পারিস লোক বসিয়া গিয়াছে। সকলেরই
মুখে একটা কৌতূহলের অধীর আঁহ।
বৃদ্ধা আসিয়া দ্বিতলে একটা চেয়ারে স্থান
সংগ্রহ করিয়া বসিল। আশে-পাশে দুই-
চারজন লোক নবাবের নাম লইয়া রজ-
বিক্রম করিতেছিল। বৃদ্ধার সেদিকে
ক্রক্ষেপমাত্র ছিল না। নীচেকার সেই
উত্তাল জনতরঙ্গ ভেসে ক’ররা পরিচিত
একখানা মধুর মুখের সম্মানে সে তখন
ব্যস্ত ছিল। ঐ যে ঐ একধারে চেয়ারে
বসিয়া কাঁপুলে। হর্ষের এক ঢকল শ্রোতে
বৃদ্ধার বুক আলোড়িত হইল। জাঁহ্নলে
অত কি গভীর চিন্তার মগ্ন? আজ এ
বিপুল সমারোহ তাহারই উদ্দেশ্যে—এমন
উৎসব-প্রাচুর্যের মধ্যে বার্ণার্ডের এত কি
ভাবনা মাথায় আসিল? তবে কি ভাবনার
কোন কারণ আছে!

বোধ হয়, আছে। না হইলে এত

লোক ঠেসাঠেসি ঘেঁসাঘেঁসি বসিয়া আছে,
আর নবাবের পার্শ্বে কেহ বসে নাই
কেন? তাহার পার্শ্বে চারি-পাঁচখানা
চেয়ার একেবারেই শূন্য। যেন অশ্লীল কুট-
যোগির স্তায়ই সকলে জাঁহ্নলকে ঘুরে
রাখিয়া বসিয়াছে। কেন এ সতর্কতা?

নীচে তখন কি কতকগুলো বক্তৃতা
হইতেছিল। বৃদ্ধা সেগুলো ঠিক বুঝিতে
পারিল না। কতকগুলো হিসাব-নিকাশের
কথা—টাকাপয়সার এসব। বৃদ্ধা সুগভীর
দেহদৃষ্টিতে পুস্ত্রের পানে চাহিয়া রহিল।
আহা, মার এ এসব দৃষ্টিপাতে তোর
সকল বাধা সকল বিষ মুছিয়া থাক, বাছা!

সহসা বক্তা থামিয়া বসিয়া পড়িল।
ঘণ্টা বাজিল। আর একজন লোক বক্তৃতা
করিতে উঠিল। সে ভীষণ জনতা মুহূর্তে
হির হইয়া বসিল। একটু পূর্বে কোলাহলের
এই যে একটা মিশ্র গুঞ্জনধ্বনি উঠিতেছিল,
নিমেষে তাহা থামিয়া গেল। বৃদ্ধাও কি
এক সম্ভাবনার আশার বক্তার পানে কৌতূহল
দৃষ্টিতে চাহিল।

তাই ত—লোকটা ও কি বলে। বার্ণা-
র্ডের নাম করিল, না! বৃদ্ধা জীর্ণ মনের
সকল শক্তি সংগ্রহ করিয়া উৎকর্ষ হইয়া রহিল।
লি মার্কান্স একাড খাতা খুলিয়া দিপোর্ট
পড়িতেছিল। বৃদ্ধার চক্ষু কণে কণে কখনও
পুস্ত্রের কখনও বা বক্তার পানে বাড়ির
কাটার মতই ঘুরিয়া কিরিতেছিল। বক্তা
নানা জটিল সহস্ত্রের বিবরণী দিতেছিল,
তারপর বলিল, আইনের প্রতি এতটুকু
শ্রম নাই—প্রবক্তা, যতদূর, অত্যাচারের
চূড়ান্ত করিয়া বেড়াইয়াছে! দৃষ্টান্তের পর

দৃষ্টান্তেরও অভাব ছিল না। ভাড়া-করা জন্তার মত এখন দেশের বুকে চাপিয়া বসিয়া লোকের রক্ত শুষিয়া খাইতে চাহে। বক্তা উজ্জ্বলস্বরে আবেগে কহিল, “হাঁ, উজ্জ-মহোদয়গণ, দেশের লোকের রক্ত শুষিয়া খাইতেছে।”

কথা শুনি যেন বাজের মতই শুনাইল। বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিল, বিপ্লবিত নেত্রে বক্তার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এ কাহার কথা বলিতেছে। কে জ্ঞাত—দেশের রক্ত কে শুষিয়া খাইতে চায় ?

লি মার্কার বলিল, “এখন আমার একটি প্রশ্ন আছে—আপনারা বুঝিয়া সে প্রশ্নের মীমাংসা করুন। চিরদিন দল্য-তত্ত্বের মলে যে নিশিয়া বেড়াইয়াছে, দেশের নাড়ীর সহিত তাহার কিছুমাত্র যোগ নাই, তেমন একটা লোক আজ দেশের বুকে বসিয়া দেশের দণ্ডমুণ্ডের একজন কর্তা হইতে যায়। থাকিবার মধ্যে আছে তাহার টাকা। টাকার সে সকলের তাক লাগাইয়া দিয়াছে, স্বীকার করি। কিন্তু সে টাকা কোথা হইতে। কেমন করিয়া সে সংগ্রহ করিয়াছে, আপনারা তাহার কোনো সন্ধান রাখিয়াছেন কি ? সে টাকা যত মুখ নিকোঁথকে ঠকাইয়া সে সংগ্রহ করিয়াছে। এ টাকা সে মুঠন করিয়া আনিয়াছে, চুরি করিয়া আনিয়াছে—হাঁ, উজ্জ-মহোদয়গণ, এ টাকা চোরের টাকা—খটপাড়ের টাকা। আপনারা আজ তাহার টাকার লমক দেখিয়া দেশের প্রতি আপনাদের কর্তব্য ভুলিবেন না। তাহার উপর যখন দেখিতেছেন, এখনও এখানে আসিয়াও

তাহার • প্রবঞ্চনা-বৃত্তি শোষণায় নাই। নিলজ্জের মত এখানে বসিয়াও দিবা মে লোক ঠকাইবার ব্যবসায় আর করিয়াছে। আপনারা বোধ হয় বুঝিয়াছেন, আমি কোন্ ব্যাপারের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছি। যদি না বুঝিয়া থাকেন, তবে স্পষ্টই বুঝিয়া বলি।

“আপনারা কি ঐ কর্দমকার নুতন কোম্পানির সম্বন্ধে কোন সংবাদ রাখিয়াছেন ? শূন্য বলি আর আগছার লম্বনের অবস্থাটা স্বচক্ষে কেহ দেখিয়া আনিয়াছেন কি ? এই সমবেত উজ্জমণ্ডলীর মধ্যে এমন কি কেহ নাই, যিনি ঐ কোম্পানির শেয়ার কিনিয়াছেন ? জাহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইতে করটা টাকা ঘরে কিরিয়া পাইয়াছেন ? সে কোম্পানির কার্য্যই বা কতদূর অগ্রসর হইল ? বিজ্ঞাপনের চমক লাগাইয়া এই যে ব্যক্তি দেশের লোককে ঠকাইতেছে, সেই আজ কর্দমকার ডেপুটি-গবর্নর প্রার্থী ; সুপের বিষয়, এ কার্য্যবার-সম্বন্ধে গভর্ণমেন্ট হইতে তদন্তের আদেশ হইয়াছে। তখনই সকল সংবাদ আপনারা ওজন করিয়া বুঝিয়া পাইবেন। কিন্তু এইখানেই ইহার শেষ নহে ! আরও একটা কথা আছে—

“এই লোকটি ভাবে, টাকার সব পাওয়া যায়। দেশ-নাগকের বিবেক অবধি ক্রয় করিতেও সে পচাৎপদ নহে, এতখানি তাহার ধৃষ্টতা ! তাহার উপর সে একজন মেল-ফেরত আসামী—দাঙ্গী লোক। সে আজ বহু বৎসরের কথা—এই জাঁহুলে বেলে গিয়াছিল। তাহার প্রমাণও আমি দেখাইতেছি।”

লি মার্কার তখন বার্গার্ডের কথা "জাতীয় সমস্ত কলঙ্ক ভাল করিয়াই তাহার গারে লেপিয়া লেপিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীর সম্মুখে ধারিতে লাগিল। বিপুল জনতা রুদ্ধ নিশ্বাসে সব কথা শুনিয়া যাঁতেছিল—সহসা তাহার মধ্য হইতে এক রমণীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "সাবাস! সাবাস!" সে নারী ব্যাংগেন ফেয়ারলিড।

শুনিতে শুনিতে বৃদ্ধার আপাদ-মস্তক এক বিষম ক্রোধে অলিঙ্গা উঠিল। আর অঁহুলে? এতক্ষণ নতমুখে সে বসিয়াছিল—সেই যে এই অপবাদগুলি শুনিয়া সে যুগ তুলিয়া চাহিল। "তাহার চোখ দুইটা" বাবের চোখের মতই তখন অল্ অল্ করিয়া অলিতেছিল।

লি মার্কারের বক্তৃতা তখনও শেষ হয় নাই। সে বসিতেছিল, "এখন আপনারা বসুন, এমন লোককে আপনারা কোলিলে বসিতে দেখিলে কি স্থখী হইবেন? গর্বে আপনাদের লুক করিয়া যাইবে? দেশে কি আর দ্বিতীয় বোণ্য ব্যক্তি নাই? যদি না থাকে, তবে কসিকাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া সাগর-গর্ভে ডুবাইয়া দিন, কোন ক্ষোভ থাকিবে না।"

লি মার্কার উপবেশন করিল। জন-তরঙ্গে তখন সমালোচনার একটা অশ্রুট কাকলী উঠিয়াছে! নানা তর্কের মূহ সঞ্চিত! স্পষ্ট কিছু বুঝা যায় না। সেই অশ্রুট কাকলীর মধ্যে সবার তাহার বিপুল বেহ লইয়া নতরম্য হইলেন—ললাট ঘর্ম্মাক্ত। সবার গভীর কণ্ঠে কহিলেন, "সম্রমহোদয়গণ—"

দ্বিষাট সত্য আবার শুরু হইল। সকলেই

নবাবের গানে চাহিয়া দেখিল। একজন উচ্চ কণ্ঠে কহিল, "নবাবের লাবাটো এখন শোনা যাক—কি বলে!" বৃদ্ধা বিস্ময়িত নেত্রে পুস্তকের পানে চাহিয়া রহিল।

কমাণে ললাটের ঘাম মুছিয়া একবার কাশিয়া নবাব কহিলেন, "আমি আমার নির্দোষ সমর্থন করিবার জন্য কিছু বলিতে চাহি না। আপনাদের ইচ্ছা না হয়, আমার নির্দোষিত করিবেন না, তাহাতে আমি বিপুল্য ক্লান্ত হইব না। কিন্তু ঐ শেষের উপস্থাপন সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাই। আমাকে মেলকেরত আসামী, দাগী বলা হইয়াছে এবং লি মার্কার তাহার এমন অপবাদ আপনাদের সম্মুখে খাড়া করিয়া দিবে বলিয়া কথা দিয়াছেন। এই অপবাদ-সম্বন্ধেই শুধু একটি কথা আমি বলিতে চাই। কেন না, আমার নিজের নাম, বংশ ও সন্তানদের মঙ্গলের সম্বন্ধে সকল কথা প্রকাশ করা সম্ভব এবং তাহা আমার কর্তব্য।

"সম্রমহোদয়গণ, চুরি বাটপাড়ি করিয়া এ টাকা, এ ঐশ্বর্য আমি সংগ্রহ করি নাই। যে বাহা বলে বলুক—কিন্তু আমার মত যদি কেহ মাগার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সমস্ত আত্মীয়-জন ছাড়িয়া আপনাদের সাধারণ অশ্রুত্ব হইতে বহুদূর দেশে গিয়া শরীর খাটাইয়া পরমা উপার্জন করিয়া থাকেন, তবে তিনিই বৃথিবেন, আমার সে কষ্ট, সে পরিশ্রমের মূল্য কি! কিন্তু সে কথার প্রয়োজন নাই—সে কথা আমি এখানে তুলিতেও চাহি না।

"এই যে অপবাদে আমার আত্ম কলঙ্কিত

করা হইয়াছে, সে সবকে আমি কিছু বলিতে চাই। এ অপবাদ একেবারে মিথ্যা। আপনাতা একটু কষ্ট করিয়া যদি সন্ধান লন তবে সহজেই দেখিতে পাইবেন, যে, যে সময় পারিতে জাঁজুলে নামে এক ব্যক্তির জেল হয়, সে সময় আমি নিদেশে ছিলাম। আরও দেখিবেন, আমার নাম বার্নার্ড জাঁজুলে—কিন্তু জেলফেরত জাঁজুলের নাম সুই।”

সহসা নবাবের কণ্ঠমোধ হইল। কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইবার সময় চকিতের জন্ত দ্বিতলের একটা আসনের উপর নবাবের দৃষ্টি পড়িল—তাঁহার সারা অঙ্গ কাশিয়া উঠিল। ও যে মা! নবাব থপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন—আর একটি কথাও বলিতে পারিলেন না।

চকিতে তাঁহার মনের মধ্যে ঝড় বহিয়া গেল। বলার আর বাকী কি রহিল। এমনই স্বার্থপর কুপ্ত সে, যে কথা মা জানিতেন না—যে কথা জানিবার তাঁহার সম্ভাবনাও ছিল না, সেই কথা হঠাৎ কি এক দৃশ্যলব্ধ হৃদয়ে জাঁজুলে বলিয়া ফেলিলেন! হার, তুচ্ছ পদ গর্ষণের লোভে মগ্ন মনে আজ তিনি কতখানি আঘাত দিলেন! শত চেষ্টা করিয়া আগার তিনি উঠিলেন, কহিলেন, “আমার ক্ষমা করিবেন। ইহার অধিক আর আমি বলিতে পারিব না। বলিবার শক্তি বা অধিকারও আমার নাই। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, ও অপবাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই—ও কলঙ্ক হইতে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।”

জন-সত্ত্ব সহসা নিষ্ঠুর বাধা পাইয়া বিবশ বিচলিত হইয়া উঠিল। নবাবের কল্প

উক্তি “বাহাদের একটু সগাছত্ব উজ্জ্বল হইতেছিল, তাহারও বিষত্ব হইল। এমনই কোলাহল-বিড়ম্বনার মধ্যে বজ্রের মত সম্ভাপতির সারা লমিয়া উঠিল, “বার্নার্ড জাঁজুলের নির্দোষ নামহীন।”

একটি মাত্র কথা! কিন্তু একটা লোকের জীবন যেন সে কথার ধারে কাটিয়া ছিঁড়িয়া গেল।

উপরে বসিয়া জাঁজুলের মাতা অবাক হইয়া গেলেন—এ কি—! লোকজন চলিয়া যাঁইয়েছে যে! চারিদিকে ছত্রভঙ্গ ব্যাপার! দেখিতে দেখিতে নিতীর্ণ হল খালি হইয়া গেল। বার্নার্ডও উঠিয়া যার যে। ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া বৃদ্ধা পার্শ্ববর্তিনী এক মহিলাকে বিজ্ঞাপনা করিল, “হল কি? সব উঠে যাচ্ছে যে?”

“নবাব হেরে গেল—ডেপুটি হল না।”

“হল না!” বৃদ্ধার বুকটা ধক করিয়া উঠিল। তাঁহার মুখ পাণ্ডু হইয়া গেল। কোনমতে সম্মুখের বেলিতে ভয় দিয়া বৃদ্ধা আপনাকে পতন হইতে রক্ষা করিল;—তাঁহার মাথা ঘুরিতেছিল, পা কাঁপিতেছিল। তার পর গাড়াইয়া গাড়াইয়াই বৃদ্ধা সব বুঝিয়া লইল। পুত্র কি কথা বলিতে গিয়া আর বলিতে পারিল না? বলিতেছিল, কিন্তু তাঁহার সহিত চোখেচোখি হইবামাত্র থামিয়া গেল। পুত্র শুধু মাতার জন্ত এতখানি স্বার্থভাগ করিল। আপনায় ভবিষ্যৎ—আপনার সকল সাধ সকল আশার জলাঞ্জলি দিয়া বহুদৈ এত বড় কলঙ্কের কালি মুখে মাখিয়াই সে বসিয়া রহিল! বৃদ্ধা বৃহৎ বুদ্ধি, হতভাগা সুই শুধু নিজের সর্বনাশ

করিয়াই কাত্ত হর নই—তাহার অমন
ভাইয়েরও সর্জনশেষের কারণ হইয়া দাঁড়াইল।
বুদ্ধার মনে হইল, এই এতদূর লোককে
দাঁড় করাইয়া নিকে সে একবার সব
রহস্য সকলের কাছে প্রকাশ করিয়া বলে।
একজন ছেলে খারাপ বলিয়া সে অপমান
প্রকাশ হইবার ভয়ে আর একজনের উপর
অবিচার করিবে, এমন প্রাণ তাহার নহে।
ইহা সে চাহেও না—কোথায় বার্গার্ড ? আহুক
সে—মমতার কোন প্রয়োজন নাই! সত্য
কথা বলিয়া সে বলুক—এ মিথ্যা অপবাদ
তাহার মাথাঘ বহিবার কোন প্রয়োজন নাই।
মাতার প্রাণে আগ্রহ বাড়িবে, বাড়ুক! এ
ত্যাগ মা হইয়া পুত্রকে সে কখনই মাঝার
তুলিতে দিবে না।

বুদ্ধা অগ্রসর হইয়া আসিয়া একজনকে
সদৃশে দেখিয়া হিঙ্কাসা করিল, “কোথায়
গেল, বার্গার্ড ? নবাব,—আমার ছেলে ?”

লোকটা কহিল, “এই বে, আপনিই তাঁর
মা ? তিনি আমার পাঠালেন, আপনাকে নিয়ে
যাবার জন্য। তিনি গাড়ীতে আছেন।
আমুন।”

বুদ্ধা তাহার সহিত নীচে নামিয়া
আসিল। বাহিরের দালানে তখনও বহু
লোক দাঁড়াইয়া গল্প-গুস্তব করিতেছিল—
নবাবের নামে হাসি-ঠাট্টাও বেশ চলিতেছিল।
একজন বলিল, “কিন্তু বলতে বলতে অমন
হঠাৎ থেমে গেল কেন ?”

আর একজন হাসিয়া কহিল, “বুঝলে
না ? একটা কথা বলা সহজ—তারপর ঐ
প্রমাণ-পত্র বে লি মার্কারেং হাতে—তাই
আর কি চেপে গেল।”

বুদ্ধার মাথা চন্দ্র করিয়া উঠিল।
সে তীব্র স্বরে কহিল, “না, তা নয়। শুধু
আপনারা তবে, আমি বলছি—আমি তার
মা—বার্গার্ডের মা—আমি সব কথা খুলে
বলছি। আমার দুই ছেলে,—বার্গার্ড ছোট,
বড়র নাম সুই।” বুদ্ধা সহসা দেখিল,
সদৃশে দাঁড়াইয়া লি মার্কার। সে অগ্রসর
হইয়া বলিল, “এই বে—আপনিই ত অত
কথা বলছিলেন—বার্গার্ডকে অত দোষ
দিক্ষিণেন। শুধু, আমি তাব মা—
জামার দুই ছেলে,—বার্গার্ড আর সুই।
এই সুই প্রথম বরসে—”

লোকগণা বিজ্ঞপের একটা তীব্র কটাক্ষ
হানিয়া চলিয়া গেল। বুদ্ধা কাতরভাবে
কহিল, “ওগো জামরা একটু দাঁড়িয়ে
গুনো বাও। একটু শোন, না হয় তাকে
ডেপুটি নাই করলে। তা বলে একজন নিরীহ
নির্দোষ লোকের উপর অজ্ঞার অবিচার
করো না—”

কিন্তু হার, এ বে অরণ্যে রোমন।
এ বেন ঘোড়দৌড় প্রতীতির জায়ই ভিতরে
এতক্ষণ একটা খেলা চলিতেছিল—খেলা
জন্মে তেমনই লবু চিতে শিব দিতে দিতে
সকলে ঘরে ফিরিতেছে। অথচ নিষ্ঠুর
সব, জানে না যে, এই খেলার তাহার
প্রারম্ভ তাহার অমন গুণের পুত্র বার্গার্ডের
কি দারুণ সর্জনশেষ ঘটাইছে—তাহার বৃকের
হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! বুদ্ধার মনে হইল,
গুণগান কি নাই—এ পাপের শাস্তি কি
তিনি দিবেন না ?

এমন সব নবাব আসিয়া করুণ কণ্ঠে
ডাকিলেন, “মা, এসো বাড়ী এসো।”

বুঝা কাঁপাইয়া পুরের বৃকে যুগ
লুকাইল—হুঁপাইয়া কোনমতে বলিল, “কেন
তুমি সব কথা খুলে বললে না, বাবা ?
কেন এ কলঙ্ক মেখে বসে রইলে ? সব
খোঁসালে বো!”

নবাব ম্যান হাসি হাসিয়া বলিল, “কিছু
খোঁসাই নি মা। কিছু চাট না মা—আমি।
কলঙ্ক ? দিক্ কলঙ্ক ওরা—আমার মার
কোল আছে—দেখানে আমার প্রচুর শাস্তি

জমা রয়েছে। আমার কি সর্বনাশ
হবে ? কিছু না ! তুমি বাড়ী এসো।”

নবাব মাকে টানিচা লইয়া গাড়ীতে
গিয়া উঠিলেন। মাকে মুখে সাঁত্বনা দিলে
কি হইবে, বৃক তাঁহার ফাটিয়া বাইতেছিল।
গাড়ী চলিলে মার বৃকে মাথা রাখিয়া ছোট
শিশুর মতই মূহু কর্তে নবাব ডাকিলেন,
“মা, মা আমার—” সে স্বরে বৃক-ভাঙ্গা বেদনা
বেন উজ্জ্বলিরা উঠিতেছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীদেবীপ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বাতিদান

(রূপ গল্পলেখক আত্মন শেখত্ হইতে)

সাসা স্মার্মনন্ড, তাঁর মাঘের ‘সবে-ধন-
নীলমনি !’ খবরের কাগজে কি-একটি
জিনিষ মুড়িয়া বগলদাখা করিয়া লে নামজাদা
ডাক্তার কোসেলুকফের রোগী-দেখিবার-
ঘরে গিয়া ঢুকিল।

ডাক্তার তাহাকে দেখিয়া বলিলেন,
“কি হে ছোকরা, খবর কি ? আজ সকালে
তুমি কেমন আছ ?”

সাসা’র চোখ মিট-মিট করিয়া উঠিল।
বৃকও উপরে একহাত রাখিয়া, বাধো-বাধো
গলায় সে বলিল, “আপনি আমাদের যে
উপকারটা করেছেন সেজ্ঞে মা আপনার
কাছে বড়ই ধন্য আছেন। মায়ের আমি
একছেলে। আপনি আমার প্রাণ
বাঁচিয়েছেন।”

ডাক্তার খুসী হইয়া সদয় স্বরে বলিলেন,
“আহা, থাক্—থাক্ ! ও-সব কথা আর
তুলতে হবে না ! আমার জায়গার অস্ত
কেউ এলে বা কর্ত্ত আমি শুধু তাই
করেচি নৈ ত নয়।”

সাসা বলিল, “মাঘের আমি একছেলে।
আমরা তাঁরি গরিব ডাক্তার সায়েব !
আপনার ‘ভিজিটে’র টাকা ঠিক দিতে
পারিনি বলে আমরা বড়ই লজ্জিত।
তবে,—মা আপনাকে একটি জিনিষ ভেট্ট
পাঠিয়েছেন। এটি হচ্ছে অষ্টধাতুর পুতুলজলা
বাতিদান, বাজারে এখন আর এ কিন্তে
মেলে না।”

ডাক্তার বলিলেন, “না, না—তোমাদের
ভেট্ট-‘টেট্ট’ আর কিছু দিতে হবে না।”

সাসা মোড়কটি খুলিতে-খুলিতে বাড় নাড়িয়া বলিল, “সে কি হয় ডাক্তার-সাহেব! ভাংলে আমার বড় দুঃখিত হয়। আমার বাবার সেকালকার জিনিষ-পত্র সব কেনার ব্যতিক ছিল কিনা! তাই এটিকেও তিনি কিনেছিলেন। এবড় চুলত রত্ন ডাক্তার-সাহেব, বড় দুঃখিত রত্ন!”

সাসা মোড়ক খুলিয়া জিনিষটি গর্কিত ভাবে টেবিলের উপরে রাখিল। ডাক্তার দেখিলেন, সেটি একটি স্নায়ব ব্যতিনা—চমৎকার কারিগরী! ছটি নয় রমণীর মূর্তি ব্যতিনাটি কাঁধে করিয়া পাড়াইয়া আছে। মূর্তিছটির চোখে-মুখে ছটামিডরা হাসি। তাদের ভাবগতিক দেখিলে মনে হয়, ব্যতির তার বহিতে তারা যেন নেহাৎ নারাজ,—এমন-কি, তারা ছটিতে যেন, যে-কোন-মুহুর্তে মাথার উপর হইতে ব্যতিনাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, এমন এক বিধম অভ্যাস নাচ শুরু করিয়া দিতে পারে, যার কথা ভাবিতে গেলেও লজ্জার মুখ রাগা হইয়া উঠে!

পুতুলছটির দিকে অনেকক্ষণ কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া, ডাক্তার আন্তে-আন্তে হু-চোরবার কাশিয়া ও কান চুলকাইয়া বলিলেন, “হঁ, পুতুলছটিতে যে খুব ভাল কারিগরী আছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু—কিন্তু—বুঝ হে ছোটরা—কিন্তু—”

সাসা কহিল, “আপনি কি বলছেন?”

ডাক্তার বলিলেন, “বলি কি আমি? সত্যতঃই বোধহয় এমন বিদ্যুৎ পুতুল গড়তে পারে না। এ ব্যতিনাটা কি করে আমি টেবিলে সাজিয়ে রাখি?”

সাসা ক্ষুব্ধেরে বলিল, “বলেন কি ডাক্তার-সাহেব! আপনার সন্ধ্যা কি শেষ? এ যে আট। দেখুন না এতে কি সৌন্দর্য! একেবারে পৃথিবীকে ভুলে যেতে হয়। এর মাপজোকা কেমন নিখুঁত, খোদ্দাকারী হাত কি সাক্ষ, পুতুলছটির চেহারা হই বা কি অলঙ্কার।—”

ডাক্তার বলিলেন, “হঁ, হঁ, সে সব আমিও বেশ ম্পষ্ট বুঝতে পারছি। তবে কি-জান বাপু, আমি বিবাহিত পুরুষ, আমার ঘরে তত্ত্বমহিলারা আর ছেলপুলেই হামেসাই আলা-বাঙরা করে থাকে।”

সাসা বলিল, “হ্যাঁ, আপনি যে চোখে দেখছেন, সে চোখে দেখলে এরকম উচ্চরের আর্টেও খারাপ ভাব পাওয়া যায় বটে। কিন্তু, ডাক্তার-সাহেব, আপনার মত শিক্ষিত লোক অসজ্জা চাখা-ভুখার মত হলে চলবে কেন? বুঝছেন ত, আপনি যদি আমাদের এ সাধের উপহারটি ফিরিয়ে দেন, তাহলে মায়ের আর হৃৎক রাখবার ঠাই থাকবে না। মায়ের আমি একছেলে,—আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন।”

ডাক্তার বলিলেন, “আচ্ছা, আচ্ছা, —আমি এ উপহার নিলুম। তোমার মাকে আমার ধন্যবাদ জানিও।”

সাসা থোস্-মেজাজে ডাক্তারকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

ডাক্তার একলা-একলা বসিয়া ব্যতিনাটর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। হু-চোরবার কান চুলকাইলেন। খানিকক্ষণ কি ভাবিলেন।

“হঁ, এটা নিশ্চয়ই খুব উচ্চরের আর্ট।

একে ফেলে দেওয়াও বোকাবির কাজ, অথচ এখানে সাধাও বেজার মুদ্রিল! আচ্ছা, এটাকে অল্প কারুর খাড়ে চালিয়ে দিলে হয় না?”

হঠাৎ প্রাণের বন্ধ উকিল ঠেকফের কথা ডাক্তারের মনে উদয় হইল। সে তাঁর কাজ করে, অথচ টাকা দিতে গেলে নেয় না।

“ঠিক। সে বিধে করেনি, হুতরাং এমন উপহার পেলে নিশ্চয়ই সে কোন আপত্তি-‘টাপত্তি’ করবে না।”

ডাক্তার আর একটুও সময় নষ্ট করিলেন না। ভাল করিয়া বাতিদানটা কাগজে মুড়িয়া তিনি গোপা তাঁর বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া হাঞ্জির হইলেন।

“হুপ্রভাত, বন্ধু! আজ তোমার অঙ্গে একটি উপহার এনেছি। আমার কাছে তুমি যখন টাকা-কড়ি কিছু নাও না, তখন এ উপহারটি না নিলে তোমার কিছুতেই ছাড়ুটি না।”

বাতিদানটা দেখিয়া ঠেকফ একেবারে অবাক ও মোহিত হইয়া গেলেন।

“কি ভরানক করনা! অথচ কি হুন্দর। বাঃ বাঃ! কোবেকে এটা পেলে হে?”

“তোমাকে দিলুম।”

অসোয়াস্তির সঙ্গে দরবার দিকে চাহিয়া একটা চোক গিলিয়া, ঠেকফ আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন, “মাপ কর ভায়া, আমি তোমার উপহার নিতে পার্লাম না! এটাকে শীগ্গির এখান থেকে সরিয়ে ফেল।”

ডাক্তার যেন আকাশ থেকে পড়িয়া বলিলেন, “সে কি! কেন?”

“কি-জান? আমার মা এখানে আসেন, মকেলেরা আসে, চাকর-সাকবেরা আসে, ওটা কি এখানে লবার হুদুপে ফেলে রাখা যায়? সরিয়ে ফেল, জলদি সরিয়ে ফেল।”

একসঙ্গে হাতনাড়া ও মাথানাড়া দিয়া ডাক্তার বলিলেন, “না ভাই, না! এটা ফিরিয়ে দিলে আমি ভারি হুঃখিত হব। তোমার লজ্জা কিসের?—এ তো আর্ট! এর প্রতি তুমি অসিচার কোয় না।”

“সব ত বুঝুটি। কিন্তু পুতুলছোটেতে যদি কাপড়-পরানো থাকত, তাহলেও বরং—”

কিন্তু, ঠেকফের কথা শেষ হইবার আগেই ডাক্তার ঘর থেকে ভাড়াভাড়ি সরিয়া পড়িলেন। এই বিঘ্ন আটের গোপা বাড়ি হইতে নামাইয়া, ডাক্তার যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাটিলেন।

ঠেকফ ডাক্তারের মত একলাটি বসিয়া অনেকক্ষণ বাতিদানটার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। চ-চারবার সেটাকে আট্রে-পিটে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কি করা উচিত।

“খুব উত্তমের আর্ট বটে! একে ফেলে দেওয়াও যায় না, রাখাও চলে না। আচ্ছা, এটা কারকে গছিয়ে দিতে পারলে ত বেশ হয়। ঠিক! তাল্কাইন খিরেটার করে, আজ তার সাহায্য-রজনী—বিশেষ, এরকম জিনিষ সে খুব ভালবাসে।”

ঠেকফ আর দেরি করিলেন না। বাতিদানটা কাগজে মুড়িয়া শইয়া, কোনদিকে না চাহিয়া তিনি একেবারে তাল্কাইনের বাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

উপহার দেখিয়া তাস্কাইন ডাকি খুশি ! সেদিন তাঁহার ঘরে যত বন্ধুবান্ধব আসিলেন, সবাই মিলিয়া বাতিদানের কি তারিফটাই যে করিলেন ! কিন্তু এই হাসি-ঠাট্টা-হট্টগোলের মাঝখানে বখন একজন অভিনেত্রী আসিয়া হঠাৎ দরজার ঘা মারিলেন, তাস্কাইন তখন চমকিয়া তড়াক্ করিয়া চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিলেন ; তাঁহার মুখ শুকাইয়া একেবারে এতটুকু হইয়া গেল ।

দরজার পিছন হইতে মহিলাটিকে উদ্দেশ করিয়া ব্যস্তভাবে তিনি বলিলেন, “এখন ভেতরে এসনা গো, এসনা ! আমি কাপড় পরুঁচি !”

সে রাতে, অভিনয়ের পর বাড়ীতে কিরিয়া তাস্কাইন উপহারটির দিকে তাকাইয়া, ঘন ঘন মাথা চুলকাইতে শুরু করিলেন ।

“তাইত, কি সুখিল ! এখানে যখন-তখন অভিনেত্রীরা এসে থাকেন, অতশড় জিনিষটাকে, টপ্ করে যে টানার পুরে ফেলুব তারও ঘো নেই। এটাকে ফেলে দিলেও লোকে আমাকে বদরসিক ঠাঙরানে, —এ যে আর্ট !”

তাঁহার জামা খুলিয়া দিতে-দিতে চাকর পরাবর্ণ দিল, “আজ্ঞা, তার চেয়ে এটা বিক্রী করে ফেলুন না ! বাজারে একটা

বুড়ো জীলোক আছে, সে এ-রকম জিনিষ কেনে-বেচে,—তার দোকানে এটা পাঠালে হয় না ?”

তাহাই হইল। তাস্কাইন তখন নিখাস ফেলিয়া বাতিলেন ।

দুদিন কাটিয়াছে। ডাক্তার কোমেন্স্কেক আরাম-কেন্দারার বসিগা-বসিগা আপনমনে এটা-সেটা ভাবিতেছেন ।

হঠাৎ দরজাটা হুম্ করিয়া খুলিয়া গেল । সাদা হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল,—তার ঠোঁটের পাশ দিয়া হাসি ঘন উপ্ছাইয়া পড়িতেছে !

“খবরের কাগজে মোড়া একটা জিনিষ টেবিলের উপরে বস্তুতরে রাখিয়া গে বলিয়া উঠিল, “ডাক্তার-সারেব। বড় সুখবর ! আমাদের আর ছিল না বলে, আপনাকে একটা বাতিদানই দিবেছিলাম। আজ বাজারের এক জীলোকের দোকান থেকে ঠিক অমনিধারা আর একটা বাতিদান কিনে এনেছি। এইবারে আপনার বোড়া নিলল ডাক্তার-সারেব। মাত্রের আমি এক ছেলে,—আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন।”

কি আপন ! হতভম্ব ডাক্তার হাঁ করিয়া আড়ষ্ট হইয়া রহিলেন। তিনি কথা কহিতে গেলেন,—পারিলেন না ।

ঐহেমেন্দ্রকুমার রায় ।

অন্ধকারের কথা

হে সূর্য্য! ইদানীং কিছুদিন হঠাৎ আলোর গোরনে তোমার আর মাটিতে পা পড়িতেছেন, আলোর সহিত চারিদিকে দারুণ দাপ্তিকতা বিকীরণ করিতেছ এবং শুটিকতক মূঢ় লোকে অবাক হইয়া তক্তিভরে সেই আলোকে বিকাশলীলা দেখিতেছে। কিন্তু আমাদের সনাতনো সাম্রাজ্যমণ্ডলো সত্যার ঐতিহাসিকরূপ আমি তোমারই আলোকে, ঐদৃষ্টিয়া তোমাকে অকুণ্ঠিত কর্ণে জানাইতেছি যে, আমরা তোমাকে মানিনা ; —তোমাকে স্বীকার করিনা। তোমার ভক্তেরা বলিতেছে—“দৈনন্দিক কি আলোর পক্ষে মত বিকশিত হইয়া উঠিতেছেন?—বসরাজী কি সন্ধ্যাতে সুগমিত হয় নাই?—সত্যবিকশিত অসুত ফুলের বনসৌরভ-ভায়ে বাতাস কি মহরত্ন লাভ করে নাই?” মূঢ় তোমরা! তাই প্রত্যেককে প্রমাণ বলিয়া মনে করিতেছ। আলো ও প্রাণের অদ্বন্দ্ব লীলা থাকুক বা না থাকুক তাহাতে কারো আলো যায় না—এ বিষয়ের একমাত্র প্রমাণ আশ্রয়াক্য। আমাদের সত্যার দীর্ঘতম্য স্বমির স্বাক্ষরিত সার্টফিকেট দেখাইতে পার কি যে তুমি সূর্য্য? তাহা না পারিলে তোমাকে আমরা কিছুতেই স্বীকার করিব না। তোমার সঙ্গে আলো, প্রাণ ও গানের লীলা কতকটা জড়িত হইয়া আছে তাহা একেবারে অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু আমরা বলি তাহা কেবলমাত্র অভিনয়—ইঞ্জল—মাজিক—হিপনটিস্‌ম্

অথবা আর কিছু। আজ যদি পৃথিবীতে সত্যমুগ নিয়মান থাকিত কিবা কুমি ও আমরা যদি তিন চার শত বৎসর পূর্বে বর্তমান থাকিতাম তাহা হইলে এই আলোবিকীরণের অপরাধেও অল্প তোমার নিমিত্ত যে অভিনব মণ্ডের ব্যবস্থা করিতাম তাহার তুলনায় Bruno প্রকৃতির বড় ছেলেখেলা মাত্র। কিন্তু যোর কলি কাড়েই—।

তোমার আলো হয়তো কোনও রূপে ক্ষমা করিতে পারিতাম, হয়তো অণু-কুসুমসম্প্রাণ বলিয়া ছু একটি বচনও তোমার সম্বন্ধে আঙড়াইতে পারিতাম কিন্তু তোমার বৃদ্ধির দোষে সে দোষাগা হইতে বঞ্চিত হইলে। সমুদ্রপারে মেজ্‌সের দেশ—যেখানে বাওরা পর্য্যন্ত আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের নিষেধ এবং যেখানকার অধিবাসীদিগের প্রতি নির্জ্ঞা বিধেব আমাদের নবশাস্ত্রের বিধি—সেখানে আলো ছড়াইতে কে তোমাকে সাধিয়াছিল? ইহাতে যে তোমার আলোর আতি গিরগছে সে সংবাদ রাখ কি? আমাদের দেশের সূচীভেদ order-এর বড় বড় Knightরা এ সম্বন্ধে বৈঠক করিয়া প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন—তোমাকে একঘরে করা হইবে। কিন্তু হঠাৎ তাহাদের খেয়াল হইল তাহাতে কোনও ফল হইবে না;—তোমাকে একঘরে করার নির্গল আনল হইতে স্বয়ং ভগবানই আমাদেরগকে বঞ্চিত করিয়াছেন,—তোমাকে এমন দারুণ একঘরে করিয়া

সৃষ্টি করিয়াছেন যে তাহা ভাবিতে গেলে আমাদেরই কষ্ট হয়। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে কাহারও সহিত কাঁখে কাঁখে মিলিবেনা—এ কি কম শাস্তি? এ সংসারে গাধা, গোক, ঐশ্বর্য—এমন কি বাঙালি কণ্ঠের সম্পাদক পর্যন্ত সকলেরই জুলা-মুলা লোক আছে—পাল আছে, তোমারই নাই। তোমাকে এমনই হেয় করিয়াই বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন—এমনি নিঃশব্দ, এমনি একাকী। সে বাহা হউক, তোমার উক্তের। যে তোমার আলোকের এত গৌরব করিয়া থাকে তাহা তাহাদের অর্কচীনতা মাত্র।

আলোকের কি কোনও মূল্য আছে? উহা চকল, চাপকা—একবারে বস্তশূন্য। তোমার সমস্ত সৌরভগতের সমস্ত স্রোতি-চ্ছের সকল আলো ফুড়াইয়া ওজন করিলে এক ছটাকও হয় কি না সন্দেহ। আমাদের দলের ক্ষুদ্রতম অর্ভকের মস্তিক কোটরে যেটুকু অন্ধকার আছে তাহার ভারেই পৃথিবী টলমল করিয়া উঠে। তাহা ছাড়া আলোকটা নিত্যন্তই হঠাৎ নবাব—upstart; আমাদের অন্ধকারের মত দনাতন বনেদী নহে। আর এটুকুও তোমার আনিয়া রাখা উচিত—তোমার আলো বতই শুভ্র হোক তাহা একেবারে পবিত্র নহে। কোনও রূপে গোমর লিপ্ত করিয়া একটু শুদ্ধ করিয়া লইলে তাহা হিন্দুর ব্যবহারে লাগিলেও লাগিতে পারিত। এ সম্বন্ধে একবার আমাদের বৈঠক বসিয়া সাব্যস্ত

হইয়াছিল আমাদের দলপতিবিশেষ মধ্যো-
বাহার মাথার গোমর ও অন্ধকারের
পরিমাণ সন্নিবেশ্য অধিক তাহাকে কোনও
রূপে উদ্ধে স্থাপন করিতে পারিলে গোমর
ও অন্ধকার বর্ণন হইয়া তোমার আলোকের
গৌরব অনেকটা কাটিতে পারে। নানাক্রম
বস্ত্র-সহকারে তাহাকে উদ্ধে তুলিয়া ধরি-
বার অস্ত্র রীতিমত চেষ্টাও করা হইয়াছিল
কিন্তু এমনই গুরুভার যে কিছুতেই মাটি হইতে
বেশী উদ্ধে তুলিতে পারা গেল না—সমস্ত
গোমর ও অন্ধকার কেবল আমাদেরই মাথার
উপরে পড়িতে লাগিল;—আলোকের লীলা
যেমন চলিতেছিল, চলিতে থাকিল। বাহা
হউক, আমরা একেবারে নিরাশ হই নাই;
—আমাদের স্রোতি-বহোদয় বিশেষ বস্ত্র-
সহকারে গণনা করিয়া বলিয়া দিয়াছেন
যে, স্বাধীন মনুষ্য অধিকারের অস্ত্রে স্বরো-
চিব মনুষ্য অধিকার, তদন্তে তামস মনুষ্য
আবির্ভাব—তাহার পরমায়ু পক্ষ পরাধি বৃদ্ধ;
—তাহার পর কৃষ্ণ-গোকম প্রবর্তন হইলে
ভুলোকের একেবারে গোলোক-প্রাপ্তি ঘটবে।
ততদিন পর্যন্ত আলোকের অধিকার ও
তোমার প্রভাব থাকিবে—তার পর আর নয়
সময় কিছু দীর্ঘ বটে কিন্তু আশার আশার
চোখ-কান বুজিয়া এক রকমে কাটিয়া যাইবে।
এস ভাইসকল, আমরা সেই শুভদিনের
আগমনের জন্য তপস্যার ঐহিক হই এবং
বখালাখা ভুলোকের গোলোক-প্রাপ্তিসম্বন্ধে
সাহায্য করি। বাচ্চু।

ঐতিহাসিক নন্দা শাস্ত্রী এম, এ।

চরন

জার্মানীর তিন মহারথ

জার্মানীর আধুনিক সাহিত্যের এই তিনজন প্রতিভাবান লেখকের নাম এখন সাহিত্য-সমাজেও সর্বত্র প্রচারিত হইয়া গিয়াছে,—হুডারমান, ভন্ ওপ্পটেডা ও গাংখোফার। তিনজনেই শক্তির ও প্রথম শ্রেণীর লেখক এবং তিনজনের রচনার ভিতরেই এতটা স্বাভাব্য আছে যে, তাঁহাদিগকে কিছুতেই একজাতীয় লেখক বলিয়া মনে হয় না।

এই তিনজনের মধ্যে হুডারমানই সমধিক ক্ষমতাবান, সমধিক নির্দোষ ও সমধিক বাস্তববাদী। তাঁহার রচনা পাঠকগণের প্রাণমন একেবারে মোহিত হইয়া যায়। ভন্ ওপ্পটেডার রচনা বিশ্লেষণ-প্রধান এবং মনোবিজ্ঞানের বিচিত্র রহস্যে পরিপূর্ণ। তিনি আমাদের কাছে ধাপে-ধাপে আগাইয়া লইয়া যান এবং পরিণামে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির কার্যকারণ-প্রণালী আমাদের কাছে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন। তাঁহার প্রতি গল্পের আখ্যান-বস্তু ও চরিত্র-চিত্রণ নূতন—লিখন-শৈলী ও রচনা-পদ্ধতিসমৃদ্ধ ছাড়া উহাদের ভিতরে আর কোন সাদৃশ্য নাই।—এই বৈচিত্র্য-সৃষ্টিতেও ওপ্পটেডার নিপুণ মুদ্রারূপের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার লিখন-শৈলী পরিষ্কার ও সংযত এবং স্থানে স্থানে তাহা স্বপ্নের মত মিহি কবিত্বের আভাস প্রদান করে—হুডারমান বা গাংখোফারের সঙ্গে এদিকেও তাঁহার কিছুমাত্র মিল নাই। গাংখোফার

‘রোম্যান্স’-সৃজনে সিদ্ধহস্ত এবং তিনজনের মধ্যে প্রকৃতি-বর্ণনার তিনি সমধিক কৌশলী ও শুভাঙ্গের শিরোমণি। হুডারমানেও কবিত্ব আছে—কিন্তু সে অল্প রকমের।

হুডারমানের এক-একটি গল্প এতটা বিরোগাত ও বুদ্ধতাবাদী দীর্ঘবাদে পূর্ণ যে, দ্বিতীয়বার তাহা পাঠ করিতে মন সরে না। আবার, করুণ ও বিরোগাত হইলেও তাঁহার প্ৰকায় কোন গল্পের এমন মোহিনী শক্তি আছে যে, বারংবার পাঠ করিয়াও আমাদের চিত্ত-বুধা পরিতৃপ্ত হয় না।

তাঁহার “Dame Carc” গল্পটিতে কেবলই জীবন-সংগ্রামের তীব্র স্বাভাব্য প্রতিঘাত। উপজ্ঞানের চেয়ে সত্য যে আশ্চর্য্য, হুডারমানের এই গল্পটিতে তাহা আশ্চর্য্যমান। লেখকের অশ্রুপরিবারের জীবন-সংগ্রামের সত্য কাহিনীই Dame Carc-এর আখ্যান-বস্তু।

It was নামে উপজ্ঞানসন্ধানির রচনা-প্রণালী এতদূর হৃদয় এবং তাহা এমন খণ্ড-দোন্দলো পরিপূর্ণ যে, তাহার যে-কোন একটি পরিচ্ছেদ মাত্রই হইতে খুলিয়া পড়িতে বসিলেও উপভোগের এতটুকু ব্যাঘাত হয় না। পূর্বা-প্রসঙ্গের সম্ভাষণ-বংশীর গ্রাম্য ব্যক্তিবর্গের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রা এবং সেখানকার সহজ মাজুদের সরল ছন্দগুলি এই উপজ্ঞানে নির্মূল-ভাবে ছুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার চরিত্র-

গুলিও অত্যন্ত চিত্তগ্রন্থক। তরুণী Hertha চরিত্র-চিত্রণ একেবারে সর্বসাম্পূর্ণ এবং পড়িতে পড়িতে হেঁচাই মনে করিবার আশ্চর্য্য হইতে হইবে যে, রমণীর হৃদয়ের মনটিকে পুরুষের এমনভাবে বৃত্তিতে পারে! এ বিষয়ে হুডারম্যানের প্রতিভা গেষের সমকক্ষ।

তের বৎসর আগে হুডারম্যানের John the Baptist নামক বিধেগোস্ত উপন্যাসখানি, এমিগ্‌রার সর্বত্র, সর্বসাধারণের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাও ভাষার উপরে কাব্যের যে ছায়াপাত হইয়াছে, তাহা অপূর্ণ! হুডারম্যান এই পুস্তকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন, মতের সংকীর্ণতা ও বিবেকের কঠোরতা অপেক্ষা দুর্নীতিমূলক প্রেমও অনেক উচ্চ, অনেক শ্রেষ্ঠ।

হুডারম্যানের রচনা ইংরাজিতে অনুদিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অল্পবাসে মূল্যের রস ও ভাষার মাধুর্য্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ডব্লু ডব্লিউ টেডা, তাঁহার একখানি উপন্যাসে দেখাইয়াছেন, একজন হতভাগ্য ভাস্কর নৈরাস্য ও অভাবের হাহাকারে কেনন করিয়া অবশেষে চোর ও হত্যাকারীতে পরিণত হইয়াছিল। এই উপন্যাসের সমগ্র সৌন্দর্য্য ভাস্করের পত্নীর চরিত্রে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। ভাস্কর, আপন সহধর্ম্মিণীকে আদর্শ করিয়া একটি প্রতিমা গড়িতেছিল। কিন্তু পাবাণী প্রতিমাকে প্রাণময়ী করিয়া ফুলিবার চক্রে তাহার সকল সাধনা ব্যর্থ হইয়া বাইতেছিল।

একরায়ে ভাস্কর, পত্নীর কাছে আপনায় হত্যাপরোধের কাহিনী খুলিয়া বলিল। হত্যার কারণ বুদ্ধিগা সাধনী পত্নী অন্যায়সে স্বামীকে ক্ষমা করিয়া বলিল। অমুতাপী ভাস্করের দৃষ্টি তখন খুলিয়া গেল, সে দেখিল তাহার পত্নীর জন্মের ভোঁ পাবাণের নম, প্রেমের মাধুর্য্য তাহা কি কোবল, কি উবার।

সামারাত ধরিয়া ভাস্কর সকল ভুলিয়া প্রতিমা গড়িতে লাগিল। ভোরবেলায় সে বিচারকের হাতে আত্মসমর্পণ করিল।

কিন্তু সাধনার মুকুল আজ পুষ্পিত। প্রতিমার পাষণ-নেত্রে আজ জীবন হুটিয়াছে, পাবাণময়ী প্রতিমা আজ প্রাণময়ী। এতদিন ভাস্কর শুধু পত্নীর রক্ত-মাংসের রূপ দেখিতেছিল, তাই সে জীবনের সাড়া পাইতেছিল না; কিন্তু আজ সে আদর্শের মধ্যে জন্ম-সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়াছে।

বাহারার উদ্ভাস্ত কল্পনার বিভিন্ন লীলা দেখিতে ভালবাসেন, গাংঘোফারের রচনা তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিবে। তাঁহার উপন্যাসের অনেক ঘটনা চিত্তোত্তেজক ও একটু অবাভাবিক।

তাঁহার কোন কোন উপন্যাস একবার পড়িতে বসিলে শেখ না করিয়া উঠা যায় না এবং একেবারে শেখ না হইলে গিন্না হাজির না হওয়া পর্য্যন্ত নাথক-নাথিকার অনুষ্ঠে যে কোন্ পলে ফিরিবে, তাহাও আন্দাজ করিতে পারা যায় না। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি সাধারণত মাধুর্য়্যভূক্তির। এমন কি, তাঁহার উপন্যাসের যে চরিত্রগুলি অভ্যন্ত অদ্বৈত ও হীন, তাহাদের ভিতরেও একেবারে সংজ্ঞার অভাব নাই।

গাংদোফারের রচনার আদর। হোজোঙ্গল
আরম-পাণ্ডের বার্তা পাঠেরা থাকি।
সেখানকার ক্রমবর্ধমান জীবন,
আকাশের প্রদীপ্ত নীলিমা, স্বর্গস্থি বোরে
খলিত অনন্ত তুহান-প্রান্তর, সবুজ পত্রের
অনিবার্য মর্মর-গান, গভীর বনানীর অতুল
রহস্য স্থি, স্বামীন পাখীর নির্ভর কাকলি,
মাতাল বাতাসের এলমেলো-হা-হা হাসি,
অন্তর্হৃদয়ের অগস্ত চিত্ত, সাগরের ঊপর
প্রভাতের প্রথম আনির্ভাব,—প্রকৃতির এই
অপূর্ণ লক্ষ্যগুরুত্বের মধ্যে আসিত্য আমরা
কাব্যলোকের এক মায়াময় স্বপ্নপ্রেম ভিতরে
ডুবিয়া—আরও ডুবিয়া যাউ।

গাংদোফার, জীবনের অধিকাংশ কাল
গিরিশ্রেণীর চারিদিক ছায়ায় এবং শুষ্ক
অরণ্যের নির্জনতাও মধ্যে সাধনা-সমাহিত
পাকিয়া কাটাওয়া দিরাছিলেন। এইজন্য,

প্রকৃতির সকল নৈচিত্র্য এবং যতাব্যবস্থাপন
কবচের সখল জীবন তিনি সমস্ত স্বপ্ন
দিয়া গ্রহণ করিবার অবকাশ পাইরাছিলেন।
সমস্ত ও শরৎকালটা এই বিজনতার ভিতরে
তিনি একাকী পাকিতেন; কিন্তু গ্রীষ্মকালে
ভাঁহার নির্জন জীবন অতিথিদের সমাগমে
পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। তখন তিনি স্ত্রী-পুত্র
ও বন্ধুবান্ধব লইয়া আনন্দ-হাথে চারিদিক
সুন্দরিত করিয়া তুলিতেন। রাত্রিই ভাঁহার
রচনার নির্দিষ্ট সময় ছিল। দিনের বেলাটা
অতিথিদের মনোরঞ্জন, গল্পবলে, ঈশ্বরে
ও বংশীবাদনে পরমরূপে কাটিয়া যাউত।

আমরা এখনে জাঙ্গানীর তিন সাহিত্য
রবীর রচনার মূল কথাগুলির ইঙ্গিত
দিলাম মাত্রে; বাহ্যিক ভাঁহাদের সৌন্দর্য
উল্লেখ্য করিতে চান, এই সামান্য ইঙ্গিত
ভাঁহাদের কাজে লাগিতে পারে।

The Simmons Magazine হইতে।

জাপানী বালুকা-চিত্র

সমুদ্রের ধারে ছেলেমেয়েরা বালির
খেলাঘর গড়ে আর ভালে; ভালে আর গড়ে।
বহু লোকেরা এ-সব ছেলে-খেলা পছন্দ
করেন না। আর, বালি ছড়াইয়া যে আঁট'
'ফলানো' যায়, এ কথা ভাঁহার কানেও না।

কিন্তু, জাপানীরা এই বালুকা-কলাকে
কাজে লাগাইয়াছে। সেখানে Bon-scki
বা Bon-kei নামে একরকম আঁট'
আছে, তাহাতে বালির গটে আঁচড় কাটিয়া
চমৎকার ছবি আঁকা হয়।

জাপানী-শিল্পীরা সমুদ্র-তটে গিয়া ছবি
আঁকিতে বসিয়া যান না। কালো বর্ণিন-
করা একখানি পালার উপরে জাপানী
শিল্পী বাসী আর নানান আঁকাবের ছোট
পাথরের টুকরা ছড়াইয়া দেন। তারপর
একটি পালক বা কাটি লইয়া, পালার
বালুকা ও পাথর-কুচিগুলি অকোণে
মাড়িয়া-চাড়িয়া সাঙাইয়া দেন,—আর অমনি
পালার উপরে একটি স্বন্দর প্রাকৃতিক
দৃশ্য—সাগরের ঢকল তরঙ্গ, দিগন্ত-রেখা

কুরানার পেনা বা এমন
আম-কিছু ভোগবাকীর
মত কুটিল ওঠে!

জাপানীদের এই অদ্ভুত
চিত্রাঙ্কণ-পদ্ধতি নূতন
নহে,—আজ প্রায় সাড়ে
চারিশত বৎসর ধরিয়
তাহার এইরূপ চিত্রাঙ্কণ
করিয়া আসিতেছে।
মুরাতা হুকে নামে
একজন জাপানী নৌ-
পুরোহিত সর্বপ্রথমে এই
Bon-scki-র আঁট
আবিষ্কার করেন। Bon

মানে বাস্কোণ্ড ও scki মানে পাথর।
মুরাতা হুকের সময়ে বাস্কোণ্ডে পাথর
বিকার্য করিয়াই ছবি আঁকা হইত। ঊর্ধ্বার
শতবৎসর পরে জাপানের একজন সন্ধ্যাত
লোক পাথরের টুকরার সঙ্গে বালির
কণাও ব্যবহার করিতেন। সেই সময়ে হইতেই
পাথর-কুটির সঙ্গে বালুকণার ব্যবহারও
চলিয়া গেল।



“অশান্ত সাগরের উপরে শান্ত শশী”

আমরা এখানে একখানি ছবির নমুনা
দিলাম। ইহার নাম,—“অশান্ত সাগরের
উপরে শান্ত শশী।”—অবশ্য, এই নমুনার
আঙ্গলের কোন রূপই হুটে
নাট,—কেবল তাহার আভাস আছে
মাত্র।

প্রাচীন মিশর

ঐক্যতাত্ত্বিকগণ স্থির করিয়াছেন, পৃথি-
বীর মধ্যে সর্বপ্রথমে সভ্যতার মুখ দেখি-
রাছে—মিশর। গত কুড়িবৎসর ধরিয়
ঐক্যতাত্ত্বিকদের দিবারাত্র পরিশ্রমের ফলে,
প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে যে-সকল ধর

বাহির হইয়াছে, তাহা উপজ্ঞানের মত
চিত্তাকর্ষক।

মিশরের অতীত সভ্যতাকে দেখিবার
অল্প কল্পনাকে যদি সারবী কর, তাহা
হইলে সে তোমাকে ছয় হাজার বৎসর

আগেকার এক উন্নত প্রাচীনতার মধ্যে লইয়া যাইবে।

৪২৪১ খৃঃ পূঃ শতাব্দীতে, প্রাচীন মিশরের জ্যোতিষীগণ সর্গপ্রথমে বৎসরকে তিনশত পঁয়ষট্টি দিনে ভাগ করিয়া দিয়া-
ছিলেন। এই ৪২৩১ খৃঃ পূঃ শতাব্দীটি কেবল যে মিশরের প্রথম তারিখ তাহা নহে;—ইহার আগে পৃথিবীতে যে কাল-
নিকরপণের অজ্ঞ আর কোন সাল-তারিখ ছিল, আজ পর্যন্ত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ইহা প্রথম ঐতিহাসিক বৎসর।

ঐ বৎসরের আগে ক্রমোন্নত সভ্যতার কি বিচিত্র ইতিহাস লুকানো আছে! সেকালের অলিখিত কারিনী আর কখনও জানা যাইবে কিনা,—কে জানে?

নেপোলিয়ান যখন ইজিপ্ট আক্রমণ করেন, তখন তাঁহার একজন সেনাপতি, ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মেনেপ্টা নামক স্থানে খোদাই-করা বিখ্যাত কৃষ্ণ প্রস্তরের ফলক আবিষ্কার করেন। লিপি তিন ভাষায় লেখা হইত। এই আবিষ্কারের পর হইতেই মিশরের ইতিহাসের দিকে প্রত্ন-
তাত্ত্বিকগণের দৃষ্টি ভাল করিয়া আকৃষ্ট হয়।

বাড়ী তৈয়ারি করিবার অজ্ঞ খিলান ও ধানের আবিষ্কার মিশরেই সর্গপ্রথমে হয়। গ্রীকরা যখন সভ্যতার আলোক দেখে নাট, মিশরবাসীরা তখন হইতেই ভাস্কর-কার্যে জুগুপ্স। মিশরেই প্রথম সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মিত হয়। মানব-
জাতির মধ্যে গডমেন্ট, আইন-কাজুন ও বিচার-পদ্ধতির ব্যবস্থা মিশরবাসীরাই

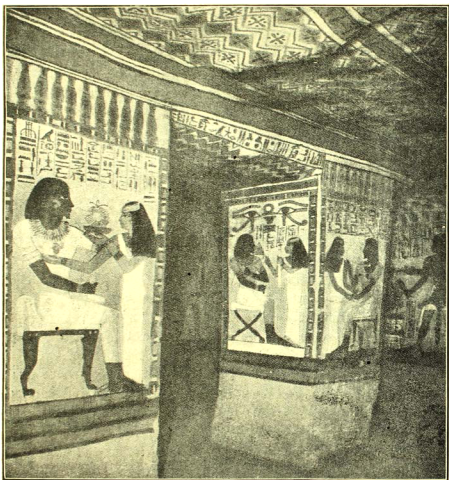
করেন। মিশর হইতে পুরোপ ভাষার বর্ণমালা, জ্যোতিষ ও চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। অনেকে বলেন, মিশর-
বাসীদের দ্বারাষ্ট লক্ষণের আগে ঔষধ-
সম্বন্ধে ধারণা পরিপূর্ণ হয়। অগতঃ সর্গপ্রথম কাব্য ও কথা-সাহিত্য প্রাচীন মিশরেই রচিত হইয়াছে।* রমণী যে পুরুষের চেয়ে ছোট নন, পুরুষের সহিত রমণীর যে সমান অধিকার,—মিশরেই সর্গপ্রথমে এই বাণী উচ্চারণ করেন।

প্রাচীন মিশরবাসীর উৎপত্তি কোথায়? এ বিষয় লইয়া এখনও বিচার-বিতর্কের অবসান হয় নাই। কপ্ট নামক জাতির যে হাওয়ার-সাতক লোক এখনও উত্তর ইজিপ্টে দেখা যায়, পণ্ডিতগণের মতে তাহারাই মিশরের আদিম অধিবাসীগণের বংশধর। প্রাচীন মিশরবাসীর তেলকল প্রস্তর-মুদ্রিত পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মুখ-
কৃতি ও দৈহিক গড়নের সঙ্গে আধুনিক কপ্ট-জাতির ব্যক্তিগণের আকারের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। ঐ সাদৃশ্য হইতেই এই সিদ্ধান্ত।

মিশরবাসীরা মরুভূমির অসভ্যগণের সহিত আপনাদের পার্থক্য বজায় রাখিবার অজ্ঞ আপনাদিগকে “মাজুব” বলিতেন।

প্রাচীন মিশরের নাম ছিল ‘কেম’ বা ‘কেমি’—অর্থাৎ ‘কৃষ্ণদেশ’। আগে সমগ্র দেশটি ছড়াগে বিতক্ত ছিল,—উত্তর ও দক্ষিণ ইজিপ্ট। পঞ্চদশ শতাব্দী পূর্বে ইজিপ্টের আদিম বাসিন্দারা বড় টাকার ‘টেজ’ দিতেন, আজ এই বিংশ শতাব্দীতে

* এই প্রসঙ্গে এই সংখ্যার ৩০০ পৃঃ মুদ্রিত গ্রন্থ লক্ষ্য রাখ বস্তুর মিশরী কবিতার লক্ষণাবলি উল্লেখ্য।



আটান মশরের এক সমাধিস্তবনের দেওয়ালে অঙ্কিত ছবি

ইংরাজ-শাসনে আসিয়াও এপানকার বর্তমান
অধিবাসীরা ঠিক তত টাকাই রাজকর দেন।

মেনিপো নামে এক পুৰোহিত গুঃ পুঃ
২৬৩ অব্দে মিশরের গ্রন্থন রাজবংশাবলী
রচনা করেন। এই বংশাবলীর ইতিহাস
সম্পূর্ণ ও প্রামাণিক না হইলেও এখন
পর্যন্ত প্রধানত এই ইতিহাসের সাহায্যে
পণ্ডিতগণের আলোচনা চলিতেছে। এট রাজ-
বংশাবলী চাইতে রাজাদিগের একটি ঠিক
শ্রেণীকৃত শৃঙ্খলা বা তালিকার কার্যাবলী

বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না,—অনেক
কেবল নামমাত্র সার হইয়াই আছেন।

আমরা এখানে প্রাচীন মিশরের এক-
পানি ছবির নমুনা নিলাম। ইহার অঙ্কন-
কাল গুঃ পুঃ ১৪০০ অব্দ। রাজকুমার
সেনোফারের পিণ্ডারচিত সমাধিস্থানের
দেয়ালে এট ছবিগুলি আঁকা আছে।
ছবিগুলির প্রধান মুক্তিহুটির একটি রাজকুমার
সেনোফার এবং অষ্টটি তাঁহার ভগিনী
মেরিত্।

‘মমি’র মাথা

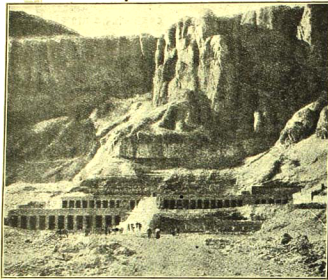
ইজিপ্টের লুজর নামে সহরের কাছে
জুসাসিদ্ধ বিবিসের প্রাচীন মন্দির আছে।
মন্দিরের আগেকার খ্রীঃাব্দ এখন আর
কিছু নাই। আরগেরা সমাধি হইতে
মমিগুলোকে বাহির করিয়া বাণির উপরে
টানিয়া ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়াছে এবং মমির
সঙ্গে যা-কিছু দামী জিনিষ-পত্র ছিল, সে-সমস্ত
লুটিয়া লইয়াছে। মন্দিরেরও এখন ভগদনা।

মিঃ জর্জ এলফাউণ্ডার নামে এক
ভ্রমণলোক একদিন উটে চাপিয়া সস্ত্রীক
এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। মিঃ
এলফাউণ্ডারের উট হঠাৎ হোচট খাইয়া
তাঁহাকে পিঠের উপর হইতে ফেলিয়া দিল।
ভূমিষ্ঠ হইতে গ্যাঞ্ঝোখান করিয়া তিনি
দেখিলেন, উটের পারের কাছে কি-একটা
কানো জিনিষ বাণির ভিতরে আঁচটাকা
হইয়া রহিয়াছে। বাণি সরাইয়া তিনি

দেখিলেন, সেটা একটা মামুখের মমি।
সমস্ত দেহটাকে বাড়ীতে লইয়া যাওয়া
অসম্ভব দেখিয়া, এলফাউণ্ডার মমির মাথাটা
ছুরি দিয়া কাটিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া
গেলেন।

বিশান্তে ফিরিয়া আসিবার পর, মিঃ
এলফাউণ্ডার নানাক্রম দৈনজর্জিপাকে পড়িতে
লাগিলেন। তিনি যে কালে, যে ব্যবসারে
হাত দেন, তাহাতেই বিষম লোকসান
হইতে লাগিল। তাহার জ্বর স্বাস্থ্য খুব
ভাল ছিল, কিন্তু এখন তাহার দেহ হঠাৎ
একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। মমির মাথাটা
তখন তাহার সঙ্গেই ছিল। কিন্তু
তাহার অস্তিত্বের কথা তিনি ভুলিয়াই
গিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে তাহার মাথার প্রোতত্ব
চর্চা করিবার ব্যতিক হকিল। কিছুদিন



পাবনার মন্দির

বোম্ববর্ষের পর তিনি মিঃ ব্রেল নামে একজন 'মি'ডফোর্ড'কে পাইলেন।

একদিন চক্রে বসিয়া মিডফোর্ড অচেতন অবস্থায় মিঃ এলফাউটারকে বলিলেন, “আপনার সঙ্গে একজন আসিয়া দেখা করতে চান। আমার দিকে একটি মুক্তি আসতে,—তার চারিদিকে পুণ্যের মেঘ! ওকি! মুক্তির যে মাথা নেই—সে ঘেন কি বলতে চাইতে!”

মিঃ এলফাউটার মিডফোর্ডের কথা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সেদিন এই পর্যন্ত।

আরও কিছুদিন পরে শ্রীমতী একে নামে অল্প একজন মিডফোর্ড লইয়া চক্রে বলিলেন। এলফাউটার বিস্মিত হইয়া শুনি-

লেন, একেও ঠিক আগেকার মিডফোর্ডের মতই মুগ্ধহীন এক দেহের বর্ণনা করিতে-ছেন! মুক্তিটি কোথায়? সে কথা জিজ্ঞাসা করায় মিডফোর্ড বলিলেন, “উঁচু পাহাড়—নীচে বাড়োবর আর বাণি!”

এ বর্ণনা ঠিক পাবনার মন্দিরের মত! এলফাউটার তাহার দ্বার কাছে এই ব্যাপারের কথা বলিলেন।

তাহার দ্বী বলিলেন, “কি মুক্তি! তুমি যে মহির মাথাটা সঙ্গে করে এনেচ, এর সঙ্গে নিশ্চয়ই তার সম্পর্ক আছে।”

মিঃ এলফাউটার বলিলেন, “কি সর্ক-নাশ! এ কথাটা আমার মাথার ত একেবারেই আসেনি! নাঃ—এ মহির মাথা আর কাছে রাখা নয়—বেথানকার

জিনিষ, সেখানেই পাঠিয়ে
হোক।”

এলফাউটার, মমির মাথাটা উঠায়
এক ইঞ্জিনিসিয়ান বন্ধর কাছে পাঠাইয়া
লিখিলেন যে, পিন্সের মন্দিরে একে যেন
আবার কবর দেওয়া হয়।

কিন্তু, বৈদগ্ধিক মমির মাথা কবরস্থ
না হইয়া ডাঃ ‘এন্স’ নামে একজন সিখাত
মিশরতত্ত্ববিদের হস্তগত হইল। ডাঃ ‘এন্স’
তাঁহার এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন :—

“এটি একটি যুবকের দাড়ি-গোফ-
কামানো স্তম্ভের মূখ,—মাথার ছোট ছোট
কৌকড়ানো চুল আছে, তাহা দেখিলে
বোঝা যায়, এ মাথা যাহার, সে টগেমিদের
সাম্রাজ্যকালের লোক। দাঁতগুলি এখনও
সব ঠিকঠাক আছে। আকৃতিতে একে
ইঞ্জিনিসিয়ান বলিয়া মনে হয় না।” পরীক্ষার
পর মাথাটি কবরস্থ করা হয়।

আর একজন কৌতুহলী শোক এল-
ফাউটারের কণা শুনিয়া মিঃ ড্রেলিকে
লইয়া আবার ঢেকে বসিয়াছিলেন। মিড্-
রামের মূখ দিরা সেই সময়ে এই কথা-
গুলি পাওয়া গিয়াছিল :—“আপনারা যে

আমার মাথাকে কবর দিয়েছেন, একজনে
আমি বড়ই স্থগী। কিন্তু মাথাটিকে
মন্দিরের ভিতরে কবর দেওয়া হয়নি—
নাইরে দেওয়া হইছে। যিনি আমার
মাথাটিকে মন্দিরের ভিতরে সমাধি দিতে
পারবেন, পূর্ণবীতে তিনি যতকাল থাকবেন,
আমি তাঁকে সাহায্য করি। এককালে
আমি পিন্সের মন্দিরের পুরোহিত ছিলাম।
একবার অত্যন্ত নির্ধ্যাতন হওয়ারতে আমি
মন্দির ত্যাগ করতে বাধ্য হই; কিন্তু
মৃত্যুর কিছুদিন আগে আবার মন্দিরে
ফিরে আসি। আমার পিতা ঐক্ ও
মা পার্ভের দাসিন্যা ছিলেন। আমি
আবার আপনাদের ধস্তাবাদ দিচ্ছি—মনে
রাখবেন, ইঞ্জিনিসিয়ানরা উপকার তোলে
না।” পরীক্ষা করার জন্য গিয়াছে, যমিটি
পুঃ পুঃ ২,০০০ অব্দের।

এই ঘটনাটি গিনি প্রকাশ করিয়াছেন,
সাধারণের বিশ্বাসের ক্ষয় তিনি অনেক
সন্তোষজনক প্রমাণ দিয়াছেন। আমরা
সে প্রমাণগুলির আর তর্জমা করিয়া
দিলাম না।

The Wide World Magazine হইতে

সূর্য-বড়ী

সমর-নিরূপণের ক্ষয় যত রকমের কল
আজ পর্যন্ত তৈয়ারি হইয়াছে, তাহার
ভিতরে সূর্য-বড়ী সকলের চেয়ে পুরাতন।
কিন্তু আজকাল সাধারণের মধ্যে ইহার
চলন আর উঠিয়া গিয়াছে। শুধু যুরোপে

ধনীদের বাগানে, এখনও মাঝে মাঝে
সূর্য-বড়ীর দেখা পাওয়া যায়।

একথা ঠিক যে, আমরা এখন যেভাবে
সমর-হিসাব করিয়া থাকি, সূর্য-বড়ীতে
তাহা হয় না। জ্যোতিষীরা সূর্য-বড়ীর

নিরূপিত সময়কেই সিক বলিয়া * ধরিয়া
 নেন, কিন্তু আমরা গ্রীণউইচ-সময় ধরিয়াই
 কাকতল্য করিয়া থাকি। গ্রীণউইচ-
 সময়ের সঙ্গে বঙ্গবের ভিতরে কেবল
 চারিদিনমাত্র স্থা-ঘড়ী ঠিক সমান-সমান
 হয়। আর সকল দিনই স্থা-ঘড়ী ও
 গ্রীণউইচ-সময়ের ভিতরে কয়েক সেকেন্ড
 হইতে মোগ মিনিট পর্য্যন্ত এদিক-ওদিক
 হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা যদি সামান্য রকম
 *অভ্যাস করি, তাহা হইলে এই পার্থক্যের
 ঈর্ষ আশাদের কোন অহুবিধা ভোগ করিতে
 হইবে না; এমন কি, তখন আমরা অনাগ্রাসেই
 স্থা-ঘড়ী দেখিয়াই, ঘণ্টার প্রতি সৈকে-ওট
 পর্য্যন্ত ঠিকঠাক বলিয়া দিতে পারিব।
 সংগ্রহিত, মিলাতে মি: ভি, জে, গিব্বন্ নামে
 একজন ভ্যাণ্ডিও, "বেলিওক্রোমোমটার"
 নামক একরূপ নূতন স্থা-ঘড়ী তৈয়ারি
 করিয়াছেন—যাহা বিংশ শতাব্দীর বাস্তবতা-
 প্রাধান্য জীবনেও, সর্বসাধারণের পক্ষে
 বিশেষ উপকরণী ও সোধগম্য।

ইতিহাসে সর্বপ্রথম স্থা-ঘড়ীর উল্লেখ
 পাওয়া যায়, খৃ: পূ: অষ্টম শতাব্দীতে। ফুডার
 রাজা Ahaz উক্ত স্থা-ঘড়ী নির্মাণ করিয়া-
 ছিলেন। ভ্যাণ্ডিও-শাস্ত্র-প্রিয় চ্যান্ডিগানবাই
 যে সে-যুগ স্থা-ঘড়ী আবিষ্কার করিয়াছিলেন,
 তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। খৃ: পূ:
 তৃতীয় শতাব্দীর পর হইতে গ্রীক ও
 রোমানরা বহুধা স্থা-ঘড়ী ব্যবহার করিতেন,
 তাহার নমুনা এখনও আছে। ৬৭০ খৃষ্টাব্দে
 নির্মিত একটি স্থা-ঘড়ী দেখিয়া বুঝিতে
 পাওয়া যায়, সন্মত্তরাও এই বস্তু ব্যবহারে
 অনভিজ্ঞ ছিল না।

পিরামিড পাহাড়ের চাষাও এখনও
 স্থা-ঘড়ী দেখিয়া সময় নিরূপণ করে।
 কোন কৃষকে এই বাণীর লইয়া 'মেডেলেন'
 বলিয়া ঠাট্টাতায়াণ্য করাত, একজন
 আমেরিকানকে সে বলিয়াছিল, "কোন
 মাহুরের এমন সাধা নেই যে, স্থা ও
 দিনের ঠিক সময়টি বলিয়া দিতে পারে;
 কারণ, স্থা যদি না থাকিতেন, তাহা
 হইলে পৃথিবীতে সময় বলিয়াও কোন
 বাণীর থাকিত না। আমরা তাই সময়-
 নিরূপণের সময়ে স্থাকে দেখিয়াই ঘড়ীর
 কাণ্ড সারিয়া থাকি।" সত্য আবেদিকান
 এই সামান্য কৃষকের উত্তর শুনিয়া
 একেবারে নিরুত্তর হইয়া গিয়াছিলেন।

কিছুদিন আগে, মরক্কোর গুলভানের
 ফরহাণে, বিলাতের এক ব্যবসায়ীর একটি
 চমৎকার ও নূতন আকারের স্থা-ঘড়ী নির্মাণ
 করিয়া দেন। এটি হচ্ছে কামানের ঘড়ী!



মরক্কোর গুলভানের স্থা-ঘড়ী

এই শিতলে ঠৈরারি ঘড়ীটি ঠিক সময় রাখিতে পারে। ঘড়ীর উপরে একখানি অভয়ী কাঁচ এমনভাবে সাজানো থাকে যে, প্রতিদিন ঠিক দুপুরবেলা সূর্য্য-রশ্মি সেই কাঁচের ভিতরে কেন্দ্রীকৃত হইয়া থাকতরুর কামানের ছিঃ্ৰে আশ্রয় পাইয়া দেয়। অগ্নিসংযোগ হইয়ামাত্র কামানটিও গর্জিয়া উঠিয়া মধ্যাহ্নকালের বার্তা ঘোষণা করে। কিন্তু পুরাণো ইংরাজী বাগানের সূর্য্য-ঘড়ীগুলি আপনাদের ঐ-ছাঁদে আর সব দেশেরই হারাইয়া দিয়াছে। দেশালের এই ঘড়ীগুলির গারে যে-সকল বচন খোদিত থাকিত, তাহাদের সৌন্দর্য্যও বড় অল্প নয়। আমরা দু-চারিটির মনুয়া দিলাম :—

১। অল্প সবাই ঝড়ঝাপটা আর বৃষ্টি-বাদলের কথাই বলুক; আমরা স্বধু তোমার রবিকরোজ্জল ঘটাগুলিকে শুণে শুণে ঘাব।

২। এই ঘড়ী কি বলতে জানো ?—

জীবন শুধু একটা ছায়া, যাহা তধু পলিদুষ্টি—
আমরা মন্থ, সবাই মন্থ !

৩। আলো ও ছায়ায় গড়া এই জীবন। তবু—সূর্য্য কি মহান্ আর ছায়া কত ক্ষুদ্র !

৪। সময় চলে যায় আর ফুল ফরে পড়ে। নতুন দিন, নতুন জীবন থাকে না—
থাকে পালি প্রেম।

৫। এই ছায়া—এই আলো; তবু সবাই ভালবেসে !

৬। কি বলছ—সময় যায় ? হার, সময় থাকে, বাই কেবল আমরা।

৭। ‘আগো, ওগো, জাগো—ওগো অলস, জাগো ! চেয়ে দেখ ‘বর্তমান’ যে ‘অতীত’ হয়ে গেছে !

৮। রজনী এল গো, রজনী এল !

Pearson's Magazine হইতে

ঐ প্রদানদাস যার।

আফ্তাব্

(এই কবিতাটি গট-অফের পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে দিশরে রচিত)

নরনাভিরায় নভোতলে প্রেতু ! তোমার আবির্ভাব,
হে সঞ্জীবন ! সংজ্ঞাসাধন ! আঘনু ! আফ্তাব্।
তুমি জীবন্ত জীবনের আদি, তুমি আদি-অমৃতত্ব,
তোমার অভাবে আঁধার জ্বলন, শবের মতন সব ;
যের যের হারি লুটার মানব বসনে আবৃত্ত দেহ,
আঁখি-তারারি থির বিবশ শরীর কারেও পুছে না কেহ।
তোমার নরন মূদিত যখন সেইক্ষণে জাগে পাণ,
সিংহ সে আসে হিংসা করিতে দংশিতে ওঠে সাণ।

তোমার আভাসে হাসে দশদিক্ হরষিত বহুমাতা,
 ক্ষুধিত দেখে সে ছেলে তৃণভূমি সকরে লতাপাতা ;
 হংস সারস অগতি কানার উচু ডানা ছুটি ছুড়ে,
 পা আছে যাহার ওঠে সে লাক্ষ্যে, পাখা আছে যার ডড়ে ।
 ডিঘের মাঝে পক্ষীর জন সহস্রা লভিরা আপ
 আবরণ ছুটি, বাহিরার ছুটি গাছি' মুহু কণ.গান ;
 তব আগরণে অগতে হৃৎ-কোলাহল যার শোনা,
 ঢেকল করি' নীলজল আগে নৌকার আনাগোনা ।
 তোমার উদর হৃদয়ে আমার আছে তুমি মোর মাঝ,
 অজ্ঞান বরপুত্র সে তোমারি হে রাজরাজ !
 তোমার শক্তি তোমার বিধান জানায়েছ মোরে তুমি,
 তোমার উদরে জেগেছে হৃদয় জেগেছে বিশ্বভূমি ।

ঐশ্যোত্তমানাথ দত্ত ।

ফেল-জামিন

(গল্প)

আমি ক্যাষেলের পান নেটভ ডাক্তার ।
 সাত ঘণ্টার জল খাইয়া সস্ত্রিতি প্রেসিডেন্সি
 জেলে বদলি হইয়া আসিয়াছি ।

বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে । বাসার
 সম্মুখে একটু খোলা জায়গা ছিল ;
 সেইখানে ইজিচেয়ারে বসিয়া খবরের
 কাগজ পড়িতেছিলাম, এমন সময় একটা
 ওয়ার্ডার ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল,
 জেলে একটা অ্যাক্সিডেন্ট কেস হইয়াছে ।
 উমেশ কয়েদী পাথর-ডাঙ্গা দুগুর নিজের
 মাথায় মারিয়া মাথা ভাঙ্গিয়া অজ্ঞান হইয়া
 গিয়াছে । এখনই আমাকে বাইতে হইবে ।
 ডাক্তার সাহেবের কাছেও লোক ছুটিয়াছে ।

তাড়াতাড়ি জেলে ছুটিলাম । আমার

বাগা হইতে
 পথ ।

বিনিটের

জেলে গিয়া দেখি, লোকটা বেহঁস
 হইয়া রহিয়াছে । কপাল ছিচিয়া গিয়াছে
 —রক্তাক্তি ব্যাপার । একটু আশঙ্ক
 হইলাম—মাথাটা একেবারে ভাঙে নাই ।
 তখনই পল্লোজনমত ঔষধ-ব্যাঙেজের ব্যবস্থা
 করিলাম । নাড়ী টিপলাম, ঠিক আছে ।
 ইতিমধ্যে ডাক্তার সাহেবও আসিয়া
 পড়িলেন । ব্যাঙেজ দেখিয়া রিপোর্ট
 লিখিতে বলিয়া তিনি দ্রুতবে চলিয়া গেলেন ।

ইহার চার-পাঁচ দিন পরে—ঠিক তখন
 জোর হইয়াছে,—সামারাজি ধরিয়া টীংকার
 করিয়া আলাইয়া ছোট ছেলেটা সবমাত্র

ঘুমাইয়া ঘুমাইবার ও একটু অবকাশ দিয়াছে—
আমিও বড়িৎ পানে চাহিয়া চক্ষু মুদ্রিয়ার
কল্পনা করিতেছি, এমন সময় ওয়ার্ডার আসিয়া
বহির্দ্বারে উচ্চ কণ্ঠে হাঁকিল, “বাবু—”

ভাল উৎপাত! বিরক্ত চিত্তে উঠিয়া
বাহিরে আসিলাম। ওয়ার্ডার সেলাম করিয়া
আনাইল, সেট উদ্দেশ্য করিয়া শেখরাগি
হইতে বিদ্রম বারনা ধরিয়াছে, ভাস্কর
বাবুকে একবার ডাকিয়া দাও। কিছুতেই
তাহাকে ধাবানো যায় নাই। বক্রিয়া
বুঝাইয়া সকলে হাস মারিয়া গিয়াছে।
তাই শেষে—

লোকটার সব অঙ্গ ছাড়িয়াছে। কল
যন্ত্রেও তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছি, অনেকটা
ভালট আছে! আগর পাছে কোন উৎপাত
বাধাইয়া তুলে,—কাজেই আমাটা গারে
দিয়া বেলে চলিলাম।

উদ্দেশ্যের বিধানার পাশে আসিয়া দেখি,
বাগিশে দুখ ওড়িয়া সে পড়িয়া আছে।
তাহার গারে হাত দিলাম, অঙ্গ নাই।
উদ্দেশ্য ফিরিয়া চাহিল, চোখ দুইটা তাহার
ফুলিয়া উঠিয়াছে, বুকিলাম, সে খুব
কাঁদিয়াছে। আমি কহিলাম, “কি হয়েছে
উদ্দেশ্য, ডাকছিলে কেন?”

উদ্দেশ্যের গোখে অঙ্গ দেখা দিল।
হুঁপাইয়া সে কহিল, “বাবু, কেন
আমার বাঁচাশেন? আজ ক’দিন এ মনের
মধ্যে কি যে আগুন জ্বলছে, তা যদি
বুঝতেন।”

তাবিলাম, লোকটার অহুতাশ হইয়াছে।
সে কহিল, “মরণ ত কিছুতেই দেখা দেয়
না, কতদিন জলব, তাও জানি না।

সব আমি তাই শেষ করে দিতে গেছলাম,
কিন্তু ধরে বেঁধে আবার আবার টেনে
তোলেন, কেন? মাথা ঝোড়া দিয়ে কি
করবেন? মনটা আমার ঠিক করে দিতে
পারবেন না ত?”

তাহাকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে দুই-চারিটা
হিতকথা পাড়িলাম। কিন্তু উদ্দেশ্য কহিল,
ও সব কোন ফল নাই। যে গাছের শিকড়
কাটিয়া গিয়াছে, তাহাতে জল-সিকন আর
কেন?

আমি তাহার গারে হাত বুলাইতে
লাগিলাম। উদ্দেশ্য কহিল, “এ সহরে আমার
পানে কেউ ফিরে চায়নি, তবু আপনি
চেষ্টাছেন। আপনার পানে একটু মার
আছে দেখলুম, তাই আপনাকে সব কথা
বুলে বলছি, শুনুন। শুনে বলা, এত
কালের পর কেউ যদি মরণে চায় ত তাতে
বাধা বুঝিতে আছে কি না।” সে তখন
আপনার জীবনের কাহিনী বলিতে শুরু
করিল।

২

উদ্দেশ্য বলিল, “সে আজ তিন বৎসরের
কথা। রাণীগঞ্জের হাটে গিয়াছিলাম, গরু
কিনিতে। আমার বাড়ী মিরালিতে।
মামোদরের উপরেই দিরাগি,—কুজ গ্রাম।

গরু কিনিয়া ফিরবার পথে এক মুন্সির
দোকানে বিশ্রাম করিতেছিলাম। সেখানে
এক লোকের মুখে শুনিলাম, মামোদরের
বাধ ভাঙ্গিয়া বর্জমান ভাসিয়া গিয়াছে—
এমন জল সে তলাটে বহুকাল কেহ চক্ষে দেখে
নাই। লোকের খবর-বাড়ী, গরু-বাছুর, সে
জলের হোতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে।

গুনিয়া বৃক আমার কানিয়া উঠিল।
আমার জিহালি? লোকটা কহিল, জিহালির
কোন চিক্কাই নাই! বছরে:শ ব্যাপিরা
সে এক সাগরের স্বস্তি ছইয়াছে! কাটা
ছাগলের মতই প্রাণটা ধড়ফড় করিয়া
উঠিল! জিহালি গিয়াছে? তাহার অর্থ,
—আমার সব গিয়াছে। ঘরে কমা স্ত্রী,
আমরের ঘের দুলালী, ক্ষেত-খানার, গর-
বাছুর,—সব—সব গিয়াছে! কিছুই আর
নাই!

দোকানীর ঘরে গর ফেলিয়া ছুটিয়া
পথে বাহির হইলাম। উদরে করদিন অন্ন
ছিল না, সূখার নাকী ছিঁড়িয়া ঘাইতেছিল
—তবুও সাত-আট খণ্টা পূরা ঘনে চলিয়া
বর্ধমানের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছলাম।
তাহার পরই যেঠো পথ জলের তলায়
অবৃত্ত হইয়া গিয়াছে! যে ধারে চাই,
কেবলই জল। বড় মাঠ বিলের অন্ধকার
ধারণ করিয়াছে, আর তাহারই মধ্যে মধ্যে ছই
চারিটা বড় বড় গাছ শুষ্ক প্রহরীর মত মাথা
তুলিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে। হুঁয়া তখন
অন্ত বাইতেছিল,—তাহার সে লাল আলো
জলে যেন সিঁদুর তুলিয়া দিতেছিল।

আমার চোখের সম্মুখে সে লাল জল
রক্তনদীর মতই টকটক করিতেছিল। পথ
নাই, পথ নাই—চারিদিকে কেবলই জল।
উপায় কি! মাথা কঁ-কঁ করিতেছিল।
সাঁতরাইয়া গুহে ফিরিব ভাবিয়া জলে
সানিবার উত্তোগ করিতেছি, এমন সময়
কঁড়ির এক চৌকিদার আমার চাপিরা
ধরিয়া ফেলিল। আমি কঁদিয়া বিনতি
করিলাম, ছাড়িয়া দাও—আমার সব ব্যয়।

সে কহিল, তাহার ছাড়িবার হুকুম নাই।
পাছে কেহ জলে নামে, তাই রোধ
করিবার অস্ত্র সেখানে সে যেতায়েন
আছে। আমার ছাড়িরা গাফিলির দণ্ড
স্বরূপ দশটাকার চাকুরিটি সে খোয়াইতে
পারিবে না। সেই চাকুরির উপরই তাহার
জান-বাক্কার নির্ভর। যেই জিন ধরিলে
সে আমার খানার জিন্মা করিয়া দিবে, এমন
ভরও খোয়াইতে ছাড়িল না। আমি কেমন
হতভাষের মত বসিয়া পড়িলাম। চোখের
সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী আধারে তরিয়া গেল।”

৩

উদ্দেশ বলিতে লাগিল, “কতক্ষণ সেই
ভাণে বসিয়াছিলাম, আমি না—মাথার উপর
দিয়া আধার রাজি পোহাইয়া গেল—
আবার হুঁয়া উঠিল। হুঁয়ের তাপ গারে
লাগার আমার হাঁস হইল। তখন সে
স্থান ত্যাগ করিয়া আমি অস্ত্র পথে
চলিলাম। চৌকিদার বাধা দিল না।

তারপর কোনমতে কোনখানে হাঁটু-
ডোর জল ডালিয়া, কোনখানে বা
সাঁতরাইয়া গ্রামে ফিরিলাম। কিন্তু কোথায়
ঘর! কোথায় গ্রাম! কোথায় স্ত্রী!
কোথাই বা মেয়ে! দাবোদর এক নিশ্বাসে
সমস্তই গ্রাস করিয়াছে। মাথার মধ্যে
কেমন কিম্ব কিম্ব করিতে লাগিল। আমি
তইয়া পড়িলাম! ঘুমে চোখ ছাইয়া
গেল।

যখন চোখ মেলিলাম, তখন দেখি,
এক কানাতের ঘরে আমি শুইয়া আছি।
পাশে একটি বাবু বসিয়া আছেন।
প্রথমটা কিছু খেদাল হইল না। কিন্তু পাশ

ফিরিতেই একটা নিখাস পড়িল। কমনিই মেঘের মত বিপদের কালো স্মৃতি মনেও উপর বসাইয়া আসিল। চোখে জল করিল।

বাবুদের চেঁচান মেঘে মিলিল—ক্রীকে পাওয়া গেল না। মেঘে আসিয়া আমার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল, কাদিয়া কহিল, “বাবা, আমার মা?”

তেরো বছরের মেঘে—তাঁহাকে বুঝাইতে পারিলাম না, আমাদের কি সর্বনাশ হইয়াছে। বুঝাইবই বা কি করিয়া—! তাঁহাকে বুকে চাপিতে চোখের জলে বুক ভরিয়া গেল। সাজানো ঘর, সাজানো সংসার দেখিয়া বাড়ীর বাহির হইয়াছিলাম—ফিরিয়া দেখি, ভোজবাড়ির মতই সব কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। জীবনে ছত্রিশ মাসের অনেক দেখে,—কিন্তু এ সত্য সে সে স্মরণেও অগোচর।

ভাবিলাম, ক্রী যে পথে গিয়াছে, হুলালীকে বুকে করিয়া সেই পথেরই পথিক হইব। সব যদি গেল ত এ গুঁড়টুকুকে লইয়াই বা কোথায় রহিব। চোখের একটি পলক-পাতমা—এ গুঁড়টুকু উন্মিত করতক্ষণ!

বাবু! বুঝি মনটাকে দেখিয়া ফেলিয়া-ছিলেন। তাঁহারা কহিলেন, মেঘের মুখ চাহিয়া আবার আবার গা ঝড়িয়া উঠিতে হইবে। গলা টিপিয়া ত ইহাকে মারিতে পারি না। মেঘের পানে চাহিলাম, তাহার চোখের কোণে জলের দাগ তখনও মিলাইয়া যায় নাই! সেই স্বাপনা জল-ভরা দৃষ্টিতে কি যে মমতা মাখানো ছিল। মরা হইল না

—তাঁহাকে হাতে করিয়া মাঝ—না, আরও অসম্ভব।

কিন্তু কি দিয়া পাঠাইব? ঘর নাই, অন্ন নাই—দু-খু প্রান্তরে কি দিয়া আবার ঘর বাধিব? কি খাইয়া বাঁচিব! এ বয়সে নূতন করিয়া সংগ্রহেরও সামর্থ্য নাই। তাহার উপর ডাক্তার মেঘে, এখনই নিবাহ দিতে হইবে। পাহাড়ের মত দ্রুতবনার ভাণ্ডী বোঝা মাথার উপর হুকিয়া পড়িল। আমি পাগল হইয়া উঠিলাম।

বাবু দল কহিলেন, সহরে যাও। কলিকাতার পথে পরমা ছড়ানো আছে। অতীতের সমস্ত স্মৃতি মুছিয়া মেঘের পানে চাহিয়া নূতন করিয়া আপনার সব গড়িয়া তোল!

তাঁহাদের মুখের উপর কোন কথা বলিতে পারিলাম না। তাঁহারা গাঁটের পরমা দিয়া টিকিট কিনিয়া আমাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন; সঙ্গে খেচও কিছু শুঁঝিয়া দিতে তুলিলেন না। চোখের জল মুছিয়া মেঘের হাত ধরিয়া সহর কলিকাতার আসিলাম।

৪

অসংখ্য গাড়ীঘোড়া, লোকজন—সকলেই ব্যস্ত, অধীর—এ এক সমারোহ ব্যাপার। এ ভিড়ের চাপে পড়িয়া গিয়া হুলা হইয়া বাইতে হয়। যদিকে শোক চলিয়াছে, সেই দিকে তাঁহাদেরই পিছনে চলিতে আরম্ভ করিলাম। গাড়ীর একাণ্ড পুল পার হইলাম। ভিড়ের আর বিরাম নাই। কোলাহলও

অবিরাম! কোন্ পথে যাই?

গিরা একটু আশ্রয় পাই?

হাটিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। হুলাণী আমার জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “বাবা, আর যে চপ্তে পারছি না! কোথাও একটু বসবে, চল!”

কোথায় বসি! বড় বড় বাড়ী—সব ছাদ গিরা যেন আকাশে ঠেকিয়াছে—লোকের কোণাহলে চারিধার গম-গম করিতেছে! কোন বাড়ীর সম্মুখে ছোট একটু রোয়াক। সেখানেও বসিবার ঠাই নাই। রঙ-বেরঙের সামগ্রী লইয়া লোকেরা বেচা-কেনা করিতেছে। নিকপায় হইয়া এক আয়ুগার দাঁড়াইয়া পড়িলাম—জনশ্রোতের প্রবল বায় কোথায় ছিটকাইয়া সরিয়া গেলাম—দাঁড়াইবার মাথা কি! ঘেরোটাকে ধরিয়া টানিয়া কোনমতে একটা খাবারের দোকানের সম্মুখে আসিলাম। হুলাণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কিছু খাবি, না?”

উদ্ভ্রান্ত নয়নে হুলাণী আমার পানে চাহিল। দোকানে ঢুকিয়া তাহাকে কিছু খাবার কিনিয়া মিলাম। নিজে চক্ চক্ করিয়া খানিকটা জল খাইলাম। একটু সুস্থ হইলে দোকানীর সহিত আলাপ শুরু করিলাম।

বর্ডমান হইতে আসিয়াছি শুনিয়া দোকানী মহা-উৎসাহেই আলাপে বোঁগ দিল। কেমন জল, কাহার কি রহিল-গেল,—তাহারই বিঘূত বিবরণ খুঁটিয়া খুঁটিয়া সে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ক্রমে শ্রোতাও বিস্তর জুটল। সকলেরই শুনিবার সে কি আগ্রহ! কি কৌতূহল! মনে মনে ভাবিলাম,

আঃ, ভগবান খুব আশ্রয় মিলাইয়া দিরাছেন! ঘেরোটাকে লইয়া জুড়াইতে পাইলাম!

কিন্তু কিছু পবেই ভূণ ভাগিল। শুনিবার সব কথা শেষ হইয়া গেলে দোকানী কহিল, “ভাংলে এখন এলো, কর্তী। আমার দোকানে লোকজন আগছে—ঠাই জুড়ে চোপের দিন বলে থাকলে ত আমার চলবে না। পাপ দাও।”

হুলাণী বুঝাইয়া পড়িয়াছিল। বড় শ্রান্তির পুর বড় আরামের ঘুম! সে ঘুম ভাঙাইতে মমতা হইল। কিন্তু দোকানী পর, সে শুনিবে কেন? তাহার অধুরোধের সুর ক্রমে চড়া হইয়া উঠিল—একটা ভৎসনাও মিলিল। অগত্যা বাধ্য হইয়া হুলাণীকে উঠাইয়া আবার পথে বাহির হইলাম। ঘুমে সে হুগিয়া পড়িতেছিল—পা ভাঙে সরিতেছিল না—টানিয়া তাহাকে লইয়া ফুটপাথে এক গাছতলার বসিয়া পড়িলাম। হুলাণী আমার গায়ে ঠেস দিরা চক্ সুদিল। কিন্তু বনাত মল—শান্তি মিলিবে কেন? এক পাহার-ওয়ালা আসিয়া কহিল, রাত্তা বন্ধ করিয়া বসিলে চলিবে না! চোখ রাত্তাইয়া সে উঠাইয়া দিল। আবার রাত্তার দাঁড়াইলাম।

সেই রোস্ত্রতপ্ত পথে কষ্টের আর সীমা ছিল না! বড় বাড়ী দেখিরা ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকি,—এমন দাতা কি কেহ নাই, যে শুধু একটু মাথা ভাঁজিবার ঠাই দেয়? বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে গেলে গলপাড়াওয়ালারা মোটা দরোয়ানের দল হাঁ-হাঁ করিয়া আসিয়া তাড়া করে। দুই দিন দুই রাত্রি

ধরিয়া কত ঘুরিলাম, কোথাও আশ্রয় মিলিল না।

তৃতীয় দিনে এক গণির মধ্য দিয়া চলিয়া একটা বাড়ীর ঘেরাকে আসিয়া বসিলাম। পথে দুই-চারি পরসার মুড়ি-মুড়কি কিনিয়াছিলাম, মেয়ের মুখে দিলাম—নিজেও কিছু খাইয়া লইলাম। রাত্তার কলের জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিলাম। তার পর একবার দেবতার নাম শ্রবণ করিয়া এক বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া ডাকিলাম, “বাবু—”

সম্মুখেই ঘরে বসিয়া এক বাবু গড়গড়ার মল টানিতে ছিলেন। নিকটে বিছানার উপর ঝাড়া-তবলা প্রভৃতি ব্যস্তের সরঞ্জাম পড়িয়া ছিল। তিনি চোপ তুলিয়া কহিলেন, “কি চাস?” একটা লোক ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, “বাড়ীতে বাবো, ভিক্ষে মিলবে না—পথ দাখ।”

হুলালী জড়সড়ভাবে আমার বুকে মূণ লুকাইল। আমি কাতর শব্দে কহিলাম, “ভিক্ষে আমি চাই না, বাবা, চাকরি চাই।”

বাবুটি কটমটু করিয়া চাহিলেন—অপেক্ষা পানেও একটা বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে তুলিলেন না। বাবু বলিলেন, “তোমার আমিন কেউ আছে?”

আমিন! কথাটা কানে নতুন ঠেকিল। অর্থ বৃদ্ধিলাভ না। বাবুর দিকে সঙ্গত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। বাবু বলিলেন, “তুই চোর কি ছাঁচোড়—তার পরিচয় কে দেবে?”

আমি কহিলাম, আমি চোর বা ছাঁচোড় নহি। নিজের হৃৎকের কাহিনী নিবেদন করিলাম। বাবু মুখ কিরাইয়া কহিলেন, “ও

সব লোককে চাকরি দেওয়া যায় না, বাবু। তোমার জ্ঞান-শোনে এমন লোক আনতে পার ত একটা মিলতে পারে—আমার জামাইয়ের বাড়ী লোকের দরকার ছিল বটে। তা তোমার আবাবর সঙ্গে দেখা, একটা মেয়ে। বরসটাও ত তার বড় সুবিধের নয়।”

কাঁদিয়া বাবুর পারে ধরিলাম—গৃহ-হীন আশ্রয় হীন, নিতান্ত অসহায় আমি। বাবুর কিস্ত সেই এক কথা, অজানা অচেনা লোককে চাকরী দিয়া তিনি দারৈ ঠেকিতে পারেন না। তাহার উপর বাড়ি এক খাড়ি মেয়ে।

মুখ চুপ করিয়া আবাবর পথে বাহির হইলাম। বাড়ী-বাড়ী ঘুরিলাম—সব জাহাঙ্গীর সেই একই কথা। অজানা অচেনা লোকের জন্য এ সমুদ্রে ঠাঁই নাই। তবে আমি বাই কোথা? খাই কি? একি ভীষণ শাস্তি, ভগবান।

ক্রমে গাঁটের পরসার ফুরাইয়া আসিল। যেদিন শেষ পরসারি বাহির হইয়া আমার একেবারে সঞ্চলহীন রিক্ত করিয়া দিল, সেদিন ঘুরিতে ঘুরিতে মাথার মধ্যে আশ্রয় ছুটিল। হুলালী কাঁদিতেছিল। ক্ষুধার তাহার আর চলিবার শক্তি ছিল না। সারাদিন এক গণির মোড়ে বসিয়া রহিলাম—হুলালী আমার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। আমি তাহার মুখে চোখে হাত বুলাইয়া ঘুম পাড়াইলাম। খাইবার বাহার কিছু জুটে না—নিদ্রা তাহার প্রতি বড় সদয়। নিমেষেই হুলালী ঘুমাইয়া পড়িল। আমি তাহার কপালের উপর হইতে কেশের শুষ্ক সমাইতে সমাইতে কত কথা ভাবিতে লাগিলাম। আমি গরীব

চায়া—কিন্তু সেখানে আমার ঘর হইতে কোন
 ভিক্ষারী-অতিথিও অতৃপ্ত বৃকে কোনদিন কিরিয়
 যায় নাই। সেই আমি,—আজ পথের কাটা-
 লেরও অর্থম! শেষে দ্বির করিলাম, ভিক্ষাই
 করিব। দেখি, সহরে ভিক্ষা মিলে কি না।
 সহরের উপর দারুণ অভিজ্ঞান অগ্রিয়াছিল।
 এই এত বড় বিরাট শহীর লইয়া সজ্জিত
 শহর পড়িয়া আছে—গলির ঘোড়ে সারাদিন
 বিষয় ঘুমে আমি বসিয়া—আমার দেখিয়া
 লোকের দয়া না হোক—এই কটি মেয়ের
 শুক স্নান মুখ দেখিয়াও কি কাহারও
 দয়া হয় না। সারাদিন আমারই সমুখ দিয়া
 এত লোক আসিল-গেল, তৈর কহে ত একবার
 কিরিয়া চাহিল না। দ্বিজ্ঞানও করিল না—
 কেন আমার এখানে বসিয়া আছি। কি
 চাই—কি আমাদের হুঃখ। আশ্চর্য্য। এ
 কি আমার সেই ছোট গ্রামে—সেই
 দরিত্রের পুরীতে সম্ভব হইত। পঞ্চাশ জন
 লোক আসিয়া গারে পড়িয়া সাহায্য করিত।
 আর এত বড় সহর—পাষণ—পাষণ
 সহর! লোকের এখানে গাণ নাই,
 মন নাই, ভিতরে পাষণ পুরিয়া নিজেদের
 লইয়াই সব ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছে!

বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছিল। সমুখে
 এক বাবু চুকট টানিতে টানিতে পথে
 চলিয়াছিলেন—গলার তাঁহার দুলের মালা,
 কটুকাটু পোষাক। গলির ঘোড়ে আর কোন
 লোক ছিল না। তাঁহারই কাছে ভিক্ষার লত
 প্রথম হাত পাতিল দ্বির করিয়া উঠিয়া
 পাড়াইয়া তাঁহাকে ডাকিলাম, “বাবু—”

বাবু কিরিয়া চাহিলেন। আমার ভিত
 কেন্দ্র লড়াইয়া গেল—কি বলিব। কখনও

ভিক্ষা চাহি নাই—ভিক্ষা চাহিতে বাধ-বাধ
 ঠেকিল। তবু কথা যখন আরম্ভ
 করিয়াছি, তখন তাহা শেষ করিতেই
 হইবে। কোনমতে বল সংগ্রহ করিলাম,
 কহিলাম, “আজ দুদিন কিছু খাইনি বাবা,
 এই মেয়েটি—এর মুখের দিকে চেয়েও
 না হয়—”

বাবু মেয়ের পানে চাহিলেন। রক্তের
 গন্ধ পাইলে বাধ যেমন দৃষ্টিতে কিরিয়া
 চায়, বাবুর দৃষ্টিও ঠিক তেমন। আমি
 সে দৃষ্টি লক্ষ্য করিলাম। সে দৃষ্টির
 অর্থ বুঝিতে বাকী রহিল না। আমার ইচ্ছা
 হটল, এখনই ইহার ছুটি টিপিরা চোখ
 দুইটাকে টানিয়া বাহির করিয়া দিই।

বাবু বলিলেন, “তাই ত, মেয়েটি ত দেখি
 দিয়া। তা এত কাজ কর না—পাষণ
 হুঃখ থাকবে না। আমার সঙ্গে আর, মেয়েকে
 নিয়ে। আমি থাকবার ঠাই দেখিয়ে দেব।”

কথাগুলো যেন বাজের মতই শুনাইল।
 কলিকাতার অনেক কীষ্টির কথা গ্রামে
 বসিয়া শুনিয়াছিলাম। আমি বাবুর পানে
 কটুকাটু করিয়া চাহিলাম। বাবু কেমন
 জড়কাইয়া সরিয়া গেল। আপন চুকিল।
 আমিও নিখাম কেলিলাম।

আমার মাথার তখন একটা মূল্যব দেখা
 দিল। চমৎকার। ঠিক। হুলালীকে উঠাইলাম।
 পথে মৈ ঘোড়ে করিয়া একটা লোক আলো
 আলিতে ছিল। তাহাকে দ্বিজ্ঞান করিলাম,
 গলার তীরে বাইবার পথ কোন্ দিকে! সে
 বলিল, বায়ে পুরিয়া লোভা পন্ডিরে গেলে
 গঙ্গাতীরে পৌছিব। হুলালীকে কোনমতে
 টানিয়া গলার তীরে আসিলাম।

৫

নিম্ন দীপ্ত বাতাসে সব জালা জুড়াইয়া গেল। চারিদিকে আঁধার নাহিতেছিল। মাক-গঙ্গার দুই-চারিখানা নৌকা হইতে আলোর স্নিগ্ধ আলোয় ভুলে পড়িয়াছিল। ভোরের কাছে কতক-গুলি বোট বাধা ছিল—সেখানে মাঝিরা মীনা-বারান্স আয়োজন করিতেছিল। ঘুরে এক ভোটের উপর বলিয়া কে গান গাহিতেছিল—বড় করণ সুর! আমার তপ্ত প্রাণ সে সুরে মাতিয়া উঠিল। চারিদিক শান্ত, কি এক আবেশে ভরা। ঘাটে তখন দুই-চারিটা কুলি ঘান করিতেছিল। আমি ঘাটের বাঁধানো সিঁড়ির উপর বলিয়া রহিলাম।

এই শান্ত নীরবতার মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর উপর দিগা একবার চোখ বুলাইয়া লইলাম। ঘরে ঘরে আনন্দের কোলাহল উঠিয়াছে—সকলে দিনের শেষে শান্তির কোলে মাথা ঝুঁজিয়া বিরাম পাইয়াছে। অতীতের কথা মনে পড়িল। সারাদিন ক্ষেত-খামার বেধাঙনার পর গৃহে ফিরিতাম—প্রদীপের আলোর আলো-করা ছোট স্তম্ভের ঘরখানি,—ত্রীর আদরে, মেঘের আদারে সে ঘর উজ্জল! সে ঘরে হুঁকিয়া দিনের সব ক্লান্তি নিমেষে ভুলিয়া যাইতাম। সে কি সুখ—কি আশ্রয়! কোন পাণে আমার সে ঘর—সে আশ্রয় কর্পূরের মত আজ উবির! গেল। গেল যদি ত এ মেয়েটা কেন আটকাইয়া রহিল? এ যে শিকলের মত আমার আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে! মাথার মধ্যে আঙুন জলিয়া

উঠিল। না, এ শিকল কাটিতেই হইবে—এ শিকল কাটিবই। না কাটিতে পারি ত, এই শিকল গলায় বাঁধিয়াই সব শেষ করিয়া দিব!

কুলিরা চলিয়া গিয়াছিল—মাত্রিও তখন গভীর। গোটের উপর জীবনের কোলাহলটুকুও নিঃসাড় হইয়া পড়িয়াছে। হুলালীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে জলে নামিলাম। শাওর সুরে মূহু তেট তেট কোলে আছড়াইয়া পড়িতেছিল—সে যেন মুহুর কাতর বিশাণের মতই করণ, বেদনাময়! সে সুর আমাকেই আহ্বান করিতেছিল। প্রাণ আমার নাচিয়া উঠিল। কোমর-ভোর জল ছাড়িয়া আরও একটু আগ্রসর হইলাম। হুলালী ডাকিল, “বাবা—” আমি কহিলাম, “চুপ কর। জুব নে—সব জালা জুড়িয়ে যাবে।”

হুলালী ডুপ দিল না—কাঁদিয়া আবার ডাকিল, “বাবা—”

আবার অমন করিয়া ডাকে! আমার রাগ ধরিল। তাহার ঘাড়টা টিপিয়া তাহাকে ডুগাইয়া দিলাম—বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিলাম। একটা পৈল্যাটিক বাসনা মনের মধ্যে গর্জিয়া উঠিয়াছিল—দে গর্জন আমি যেন স্পষ্ট কানে শুনিতেছিলাম। আমার মাথার পুন চাপিয়া ছিল।

হুলালীও প্রাণপণে সংগ্রাম করিতেছিল। তাহার মরিবার ইচ্ছা নাই,—সে মরিবে না। নিতান্তই অব্যক্ত হতাশা। যেরে। এত দুঃখেও তাহার বাঁচিবার সাধ হয়! শেষে তাহারই অর হইল। বোধ হয়, বাপের দেহ-চর্কণ হাত মুহুরের অস্ত শিখিল

হইয়া পড়িয়াছিল। সে মাথা ঝড়ো দিয়া উঠিল। আমি হারিলাম—তাঁহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। জল বাইরা উঠিয়া কানিয়া সে ডাকিল, “ও বাবা—আমি মরে যাব যে।”

আমি ভৎসনা করিয়া কহিলাম, “এত কটেও তোমার বাঁচবার সাধ হয়?”

“আমি মরতে পারব না, বাবা—” হুলাণী দুপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সে কান্নার আমার রাক্ষসের প্রাণ নিমেষের জন্ত গলিয়া গেল—কিন্তু তখনই জাবিলাম, না, এ মারা ভাল নয়। হুলাণীকে মরিতেই হইবে—মরা ছাড়া উপায় নাই! সারা পৃথিবীর উপর রাগ ধরিয়া ছিল! মাথার উপর অসংখ্য নক্ষত্র অলিতেছিল—আমি তীব্র দৃষ্টিতে সে নক্ষত্রগুলার পানে চাহিলাম—। মনে হইল, নক্ষত্রের মরিয়া, নিজে মরিয়া ছুনিয়ার এই এত-বড় ছন্দহীনতার চূড়ান্ত শোধ গ্রহণ করি—ইহারা তাঁহার সাক্ষ্য থাকুক। অনেক চেষ্টা করিয়াও হুলাণীকে ডুবাইতে পারিলাম না। প্রাণপণ শক্তিতে সে জীবনের রক্ত সংগ্রাম করিতেছে! মনে হইল, তাহাকে তুলিয়া ঐ শানের দিড়িতে আছড়াইয়া ফেলি! হুলাণীকে কোলে তুলিলাম। সে আমার গলা ঘড়াইয়া ধরিয়া আমার বুকে মুখ ঝুঁজিয়া “মাগো—” বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ও কি! এ কাহাকে ডাকে? আমার হাত-পা থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—তাঁহাকে আছাড় দিতে হাত আর উঠিল না। হুলাণী আবার ডাকিল, “ও বাবা, আমার ঘরে কেণো না। আমি মরতে পারব না—”

সে কি অধীর আগ্রহে নিশ্চিত নিশ্বাসে আমাকে সে চাপিয়া ধরিল। আমার চোখ কাটায়া জল বাহির হইল। তাহার মুখে অল্প চুমা দিয়া আমি কহিলাম, “না মা, মরতে হবে না। আর, তবে হুজনেই বেঁচে থাকি—যে-টুকু কষ্ট বাকী আছে, নিঃশেষে আর, ভোগ করি।”

হুলাণীকে লইয়া ঘাটে উঠিলাম। মরা হইল না! সে ক্ষণ কেন হারাইলাম! একটি ক্ষণ শুধু—না হারাইলে এ মনস্তাপ আর সহিতে হইত না। বেলে বাস ঘটিত না।

উদ্দেশ্য চূর্ণ করিল। আমি কহিলাম, “চূর্ণ কর, উদ্দেশ্য—আর আমি শুভতে চাই না।”

উদ্দেশ্য কহিল, “না বাবু, আর একটু শুভ—দয়া করে শুভ—প্রাণ আমার অগ্নে যাচ্ছে!” আমি কহিলাম, “আচ্ছা, বল।”

৬

উদ্দেশ্য বলিতে লাগিল, “সে হাতি ঘাটের চাতালেই পড়িয়া রহিলাম। পরদিন উঠিয়া দেখি, হুলাণীর চৌখ দুইটা অবা-স্থলের মতই লাল হইয়া উঠিয়াছে—গা আগুনের মত গরম। তাহার প্রবল অর।

সেদিন বুঝি কি একটা . যোগ ছিল। ভোর হইতে না হইতেই ঘাটে খুব জন-সমাগম দেখা গেল। ঘোমটার মুখ-ঢাকা কতিবো-কী হইতে আরম্ভ করিয়া অশ্রুতি-বর্ষীয় বুদ্ধ-বৃদ্ধা—কেহই আর ঘরে নিশ্চিত বসিয়া ছিল না—সকলেই গ্রাম সারিয়া গর করিয়া হারিয়া হাসাইয়া আসিল, চলিয়া গেল। দুই-চারিজন গালটা আঙুটা বিতরণ

কণ্ঠেও কার্পণ্য করিল না। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্পই। আমার তাগোও কিছু চাল তরকারী মিলিল। কিন্তু ইহা লষ্টয়া কি করিব? কাঁচা চাউল মাহুৎ কত চিনাইবে? কাঁচা আনাঙ্গ-তরকারীও খাওয়া যায় না।

মাংস একটা বৃদ্ধি ভোগাইল! বেলা তখন আবার পড়িয়া আসিয়াছে, এক ঘণ্টার মাত্রির কাছে গিয়া চাউলগুলি তাহাকে চালিয়া দিলাম—বলিলাম, “ভাই, চালগুলো নাও, নিরে এই আলু ক’টা আমার পুড়িয়ে দাও! আজ দুদিন আহাির ভোটে নি।”

মাকি বাবু নহে, ভদ্র নহে—তাই সৈ অত জামিন-জানার সন্ধান করিল না—হিতোপদেশ দিল না—তাহার মরা হইল। সে বলিল, “চালগুলো সিদ্ধ করে দেব কি? কিন্তু জেতে আমি সুন্দরলান—”

স্বধার বেগে জাতি-বিচারের জ্ঞান ছিল না। কিন্তু না, আমার ছলানী অরের ঘোরে পড়িয়া আছে—দুই দিন অর তাহার ফুটে নাই। আর আমি ভাত গিলিব কোন্ মুখে? বলিলাম, “না, ভাত চাই না, শুধু আলু ক’টা পুড়িয়ে দাও।”

সেই পোড়া আলু আমিরা ছলানীকে ডাকিলাম, “হা—”

ছলানী অভিকষ্টে চোখ মেলিল। আমি কহিলাম, “এই নে হা, হা,—

ছলানী আলু পোড়া খাইল—আমার বলিল, “তুমি একটা খাও, বাবা—

চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে পোড়া আলু মুখে দিলাম। সে যেন অমৃত!

সন্ধ্যার দিকে ছলানীর অর ছাড়িল

সে কৃপাবাস্তী কহিল—আমার প্রাণ একটু শান্ত হইল। ছলানী বলিল, “বাবা, চল, বাড়ী যাই। এখানে এমন করে বুঝে কি করে বাঁচবে, বাবা?”

সে কথা আমারও মনে হইয়াছিল। কিন্তু বাড়ী কোথায় যে, ফিরিব! জলে ধুইয়া বাড়ীর চিহ্ন অবধি যে লোপ পাইয়াছে! আর ফিরিব কি করিয়া? রেলের ভাড়া চাই—বিনা পরদার রেল কেহ যাইতে দিবে না। সকল পথই যে আজ আমার বন্ধ! এই সহরের পাবনা-প্রাচীরের মধ্যেই পড়িয়া থাকিতে হইবে। না পারি ত ঐ পাবনের দেওরালে মাথা ঠুকিয়া মরা ভিন্ন মুক্তিরও আজ আর কোন উপায় নাই।

আবার রাত্রি আসিল। মাথার উপর আকাশে একরশ্মি নক্ষত্র আলর জমাইয়া বসিল। তাহার নীরব নেত্রে যেন আমা-দেরই পানে চাহিয়া ছিল। মাহুৎ কত হঃখ সহিতে পারে—সহিয়া বাঁচিয়া থাকে, বিক্রম-ভরা চোখে বৃষ্টি তহিয়া তাহাই দেখিতেছিল।

তখন বোধ হয় মাহুৎরাত্রি—একটু ঘুম আসিয়াছিল—সহসা একটা দ্রুতদাপ শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ চাহিয়া উঠিয়া দেখি, ছলানী আমার পার্শ্বে নাই! ঝাঁড়াইয়া গঙ্গার পানে চাহিলাম—হির জল, মূহ তরঙ্গ-ভঙ্গে গান গাহিতেছে। আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। ঘাটের উপর যে চাতাল ছিল, সেখানে আসিলাম—দেখি, ঘাটের উপর একখানা ঘোড়ার গাড়ী। তিন-চারিটা

লোক বাণ্ড হইয়া গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বসিয়া বাব বন্ধ করিয়া কহিল, “বাণ্ড—” শুদ্ধ আকাশে বাব্ যেমন ইংকিয়া যায়— তেমনই লক্ষ করিয়া গাড়ী ছুটিল! আমার আবার মনে হইল—যেন কে ‘বাবা’ বলিয়া কানিয়া উঠিল। কানিয়াই সে নীরব হইল। এ না আমার হুলালীর স্বর! হুলালীকে চোরে চুরি করিয়াছে? আমি পাগলের মত গাড়ী লক্ষ্য করিয়া ছুটিলাম! কিছু হইল না—ভ্রমল পা, কি তাহার শক্তি যে সে গাড়ীর সঙ্গে সমানে ছুটিবে! ইফাইয়া শেষে একটা মোড়ের উপর বসিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, আর কেন এ মায়া! শিকল যদি এমন কঠিনই ছিঁড়িল ত সে ছিঁড়ুক! আর সে শিকলের পিছনে ছুটিয়া কি ফল! বাব্—যে ছোট লম্বলুই অবশিষ্ট ছিল—সে ত বহুপূর্বেই বাইবার কথা—উহাকে ত ফিরিয়া পাইবার কথা নয়। গেল যদি ত বাব্! আমার সব বন্ধন কাটিয়া গিয়াছে! আঃ, এ কি মুক্তি—কি আরাণ! এখন ঐ গঙ্গার কোলে পরম নিশ্চিন্ত চিন্তে গিয়া আশ্রয় লইতে পারিব। প্রাণে অত্যন্ত উল্লাস হইল—হা হা করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। সে হাসির শব্দে চারিদিক যেন হুলিয়া উঠিল। আমিও সে স্বরে কানিয়া উঠিলাম! তারপর এক বার প্রাণ ভরিয়া বিজ্ঞান করিয়া লইব ভাবিয়া সেই রাত্তির একঘায়ে শুইয়া চোখ বুজিলাম।

৭

ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। যেন আমার সেই দেশের বসে পরম সুখে শুইয়া

আছি, হুলালী আসিয়া ঠেলা দিয়া ডাকিতেছে, “বাবা—” ধড়মড়িয়া উঠিলাম। একটা মাহুস সতাই আমার ঠেলা দিয়া ডাকিতেছে,— “এই—”। চোখ মুছিয়া চাহিলাম, সে হুলালী নয়, লাল পাগড়ী মাথায় এক পাহারওয়াল! সে আমার ঠেলা দিয়া দাঁড় করাইল—হাতটা আঁটিয়া ধরিয়া গালি দিল, কহিল, আমি পাকা চোর—আমার খানার যাইতে হইবে।

কোন কথা বলিলাম না—তাহার ইদিতে চলিতে লাগিলাম। একটা বাড়ীর মধ্যে সে আমার লইয়া আসিল। ছোট ঘর—টেবিল-চোরায়ে সাজানো! একঘায়ে একটা বেকের উপর গান-করা বাধানো খাতা! টেবিলের উপর আলো জলিতেছে, আর তাহারই সমুখে বেকে বসিয়া টেবিলে মাথা রাখিয়া একটা লোক ঘুমাইতেছে। পাহারওয়াল আমার দাঁড় করাইয়া তাহাকে ডাকিল, “বাবু—”

সে চোখ মেলিয়া চাহিল, পাহারওয়াল সটান বলিয়া গেল, আমি পথে ঘুরিতেছিলাম। তাহাকে দেখিয়া পলাইবার উদ্ভোগ করি। জ্বা হওয়ার নোড়িয়া গিয়া সে আমার ধরিয়া ফেলে! ‘কাজ-কাম’ আমার কিছুই নাই।

বাবু বিচোয়া আমার গালি দিল, আমাদের আগের একদণ্ডও তাহার চোখ বুজিবার অবসর মিলিবে না। প্রকাণ্ড খাতা টানিয়া কি-সব লিখিয়া আমার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার ঘর-বাড়ী কোথায়। কাজ-কর্ম কিছু করি কি না! আমি কহিলাম, কাজ-কর্মের চেষ্টার সহরে

আসিয়াছলাম - তাহার পর যাহা ঘটতেছে, সেই খুলিয়া বলিলাম। বাবুটি পার্শ্ব-ওয়ালকে কহিল, “বাটে নিরে যা একে। সব তদন্ত করে আর।”

পার্শ্বওয়াল বিরক্ত চিত্তে আমার লটরা বাহিরে আনিয়া—কোথা হইতে দড়ি আনিয়া আমার কোমরে জড়াইল; এবং সেই দড়ির প্রান্ত ধরিয়া পত্তর মত আমার পথে খানিকটা গুবাইয়া আবার খানায় ফিরিল, বাটে গেল না।

তারপর আদালতে বথাসময়ে আমার চালান দেওয়া হইল। সেখানে পার্শ্বওয়ালী উঠিয়া সাক্ষ্য দিল, যে, আমার কাজ-কর্ম কিছুই নাই। অনেক রাজ্যে পথে ঘুরিতে-ছিলাম—তাহাকে দেখিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিলে সে আমার ধরিয়া ফেলে। তাহার পর আমারই কথামত দুই-চারি জারগার ঘুরিয়া সে তত্ত্ব লয়—সকলেই বলে, আমার কেহ চিনে না!

হাকিম জিজ্ঞাসা করিল, “কিরে—তোমার কাজ-কর্ম কিছু আছে?” ভাবিয়া ছিলাম, কথা কহিব না—কিস্তি কহিতে হইল। এতকণ হাজতে বসিয়া চোর ডাকাতির সুখে তনিতেছিলাম, আমার জেল হইবে! আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম—কি দোষ করিয়াছি যে, জেলে যাইব? খাইতে পাই না—ঘর নাই, আশ্রয় নাই, ভগবান নিষ্ঠুর বাজ ফেলিয়া সব পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়াছেন—তাই মেরেকে লইয়া পরস-উপার্জনের আশায় লহরে আসিয়াছিলাম—সে পরসও গতর খাটাইয়া উপার্জন করিব; সহরে ডাকিয়াও শু কেহ

একদিন জিজ্ঞাসা করে নাই, কোথা হইতে আসিলাম—‘ক চাই! চাকরির সম্বন্ধে যাইরা কেবলই কটু কথা ও হিডোপদেশ শুনিয়া আসিয়াছি—অপরাধ আমি কি করিলাম যে, জেলে যাইব! হাকিমকে কহিলাম, “চাকরি নেই, হুকুম—তাহাই চেষ্টার লহরে এসেছি। এসে কিছুই মেলে নি, একমুঠো অন্ন অবশি না! মেহেটাকে শেষে চোরে চুরি করে নিরে গেছে।”

হাকিমের মুখের তাবে বোধ হইল, কথাটা তিনি বিশ্বাস করেন নাই। হামে অভ্যাগা—ভগবান বাহার মুখের দিকে ফিরিয়া চাহেন না, ক্ষুদ্র মানুষ তাহার পানে চাহিয়া দেখিবে, এমন আশা এখনও তুই করিস্!

হাকিম কাগজে কি-সব লিখিয়া লইয়া আমার কহিলেন, “একে জেরা কর্বি?”

জেরা! কি তাহার অর্থ? কি সে? আমি একবার চোখ তুলিয়া চারিদিকে চাহিলাম। কাঠের পিঞ্জরের মধ্যে কি-এক দ্রষ্টব্য পত্তর মত আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম। এক-আদালত লোক আমার পানে চাহিয়া আছে। আমি মাথা নীচু করিলাম। হাকিম গর্জন করিয়া কহিলেন, “জেরা কর্বি কিছু?”

আবার সেই উত্তর শব্দ। যে কথার অর্থও বুঝি না--তাহার কি করিব? আমি বেজবের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। হাকিম হুকুম দিলেন, “একে কিছু জিজ্ঞাস করতে চান?” আমি বাড় নাড়িলাম—না। এমন করিয়া মিথ্যা যে সাক্ষাইয়া বলিতে পারে, তাহাকে আমি কি জিজ্ঞাসা

করিব ? তাহার দিকে চাহিতে চুপা করে
—আর তাহার সহিত কথা কহিব ?

হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে যেন
গানের বাঁধা গানের মত এক নিখালে তিনি
বলিয়া গেলেন, ‘ছ মাসের তত্ত্ব পড়াশ
টাকা জামিন, না বিলে ছ’মাস জেলা।’

ছোট ছেলেরা সাধা কাগজে যেমন
কালির দাগ টানিয়া নিম্নেদেই শুভ কাগজ
কাশো করিয়া দেয়, হাকিমের কলহের
একটি আঁচড় আমার লগাটে তেমনই
করিয়া কলহের কালি লেপিয়া দিল।
সন্ধ্যার সময় আঁটা গাড়ীতে চড়িয়া অসংখ্য
চোর-ডাকাত-খুনীর সঙ্গী হইয়া আমি প্রথম
জেলে আসিলাম।

৮

জেলে বসিয়া মুহূর্তের কথা কেবলই
মনে হইত ! এক এক সময় ভাবিতাম মাথার
মুণ্ডর মারিমা, না হয় আঁঠোর মাথা হুকিরা
সব শেষ করিয়া দি। কিন্তু একটা সাধ সে
সময় মনের মধ্যে উঁকি দিয়া আমার মস্তিষ্কে
দিত না। *সে সাধ—একবার শোধ তুলিব।
বাহার মিথ্যা কথায় রিক্ত সর্ব্ব-হারা
হইয়াও স্বাধীন আমি এই সব বসবাসের
দলে পড়িয়া আমার পে শুভ্র জীবনে
ছয়মাস ধরিয়া কেবল কলহের কাশো কালি
মাখাইয়াছি,—সেই পাহাড়ের সেই মিথ্যার
একবার হৃদয় শান্তি দিব ! জেলের সঙ্গীরা
আমার টটুকানি দিত, আমি বোকা—নিছা
বেশ খাটিতেছি। ইহাতে মজা নাই, কেবল
সাজাই আছে। চুরি করিয়া, লোককে মারিয়া-
ধরিয়া জেলে আসিলে তাকেই বলে জেল।
নর নর এত কেবল অদৃষ্টের ভোগ ! তাহার

দিব্য গুহির সঙ্গে বলিত, বাহার উৎসের
অর নাট, জেল শু তাহার কাছে কান্নির
অঙ্গস্র ! এ কথাটা মেহাৎ মন শুনাইত না।

ছয়মাস পরে জেল হইতে বাহির হইলাম।
বাহির হইয়াই—সেই পথের কথা প্রথমে
মনে পড়িল। জোর করিয়া তুলানীকে
তুলিলাম—ত্রীকে তুলিলাম—মিতের অতীত
তুলিলাম ! সে সব কথা মনে পড়িলে মন
দ্রব্বল হয়—শক্তি উবিধা যায়।

ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যার পর সেই
পাহাড়ওয়ালাকে দেখিলাম—সেই মোটা
ধরীর—বিপুল গোক-দাড়িতে সমাজের বিদ্রী
মুখ ! সে এক পানের দোকানের সমুখে
দাড়াইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে পানওয়ালীর
সঙ্গে রঙ্গ-রহস্য করিতেছিল। দেখিয়া
আমার প্রাণে বৈতন্য নাচিয়া উঠিল। বাহের
মত আঁপাইয়া তাহার ঘাড় পড়িলাম।
দাড়ি ধরিয়া সবলে টানিয়া তাহাকে জুনে
ফেলিলাম—তার পর অরঙ্গ কিল চড়
লাগিতে তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিলাম।
আমার জ্ঞান ছিল না—চোখের সমুখে
মহাকালী শোল রসনা মেলিয়া নৃত্য
করিতেছিল—কমালিনী কানীকে সেদিন যেন
আমি সভাই প্রত্যক্ষ করিলাম। নৃমুণ্ড-
মালিনীর ভীষণ নৃত্য ; চকিতে সে নৃত্য সরিয়া
গেল—চোখের সমুখে রক্তের নদী বহিল।

বিস্তর লোক আনিয়া আমাকে ধরিয়া
কেলিল—পাহাড়ওয়ালার তখন রক্তে দ্বান
করিয়া অস্ত্রান হইয়া গিয়াছে।

তাহার পর আবার সেই আদালতে
হাকিম, উকিল পেরানার ভিড়ের মধ্যে হাকিম
হইলাম। পাহাড়ওয়ালার কোনমতে প্রাণে

রক্ষা পাইল—কিন্তু তাহার সে ভাঙ্গা নাক
আর খাড়া হইল না। আমার দেড়
বৎসর জেলের হুকুম হইল। হির হইতাই
সে শাস্তির আদেশ শুনিলাম। যখন ডক্
হইতে আমার লইয়া গেল, তখন সে
পাহারওয়াল একদিকে গাড়াইয়াছিল—
ভাঙ্গা নাক—কাটা কপাল—কাটা মাথা—
মাথায় তখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা! তাহার
দিকে চাহিয়া হাসিয়া আমি হাজতে আসিলাম।
মনে আনন্দ হইল—জেলের আনন্দ!
সেবার বিনা দোষে জেলে ঢুকিয়াছিল
—এবার মনে ক্ষোভ রহিল না—দোষ
করিয়া জেলে চলিয়াছি।”

উদ্দেশ্য হির হইল। সে সুস্থিত ছিল।

তাহার চোখে চুইটাও জ্বলিতছিল। সে
যেন আরও কি বলিবে মনে হইতেছিল—
একটু যেন জিরাইয়া লইতেছে! এমন সময়
যড়িতে ঢং ঢং করিয়া সাতটা বাজিয়া
গেল। আমি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।
উদ্দেশ্য করিল “বাবু—”,

আমি কহিলাম, “বেলা হয়ে যাচ্ছে,
উদ্দেশ্য—এখনই ত আবার বেরুতে হবে—।
কাজ-কণ্ড চুকিয়ে ছুপুহবেলা এসে বাকি
টুকু সুনব'খন।”

উদ্দেশ্য কোন কথা কহিল না—আমার
পানে চাহিয়া রহিল,—উদাস, করুণ
দৃষ্টি!

ক্রীসোরীজমোহন মুখোপাধ্যায়।

বিজ্ঞান সীমা

সই আসিয়া ডাকিল—সই, ও সই, কি
করিতেছ?

আমি উত্তর দিলাম—যাহা নয় তাহাই
করিতেছি।

সই আসিয়া আমার সম্মুখে বসিয়া
বলিল—ও কি নেক্ট তাই?

আমি বলিলাম লিখছি আমার মাথা।
যখন যাহা তুমি, যখন যাহা মনে পড়ে, তখন
তাহা লিখিয়া রাখি।

সই বলিল—উহাতে কি হয় তাই?

আমি। অজ্ঞের কিছুই হয় না বটে,
তবে আমার মনে শাস্তি পাই।

সই। সে আবার কি?

আমি। অনেক দুখ পাতি।

সই। আচ্ছা সই, আমাদের পাড়ার রায়
গিরি বলে, তুমি নাকি খুব ইংরাজি, ফারসি
জাফা-পড়া জান। রায়-গিরি বলে, তুমি যা
জান তােকান্তে জাফা-পড়া মেয়েমানুষকে
পড়তে নাই।

আমি হাসিয়া বলিলাম—আমি যে
বিজ্ঞান জাহাজ তাহা রায়-গিরি কিসে প্রমাণ
পাইল?

সই। তা কি জানি! হা সই, তুমি
এত জাফা-পড়া কি করে লিখলে?

সইয়ের কথা শুনিয়া আমি দেখা বন্ধ
রাখিয়া তাহার নিকট আমার বিজ্ঞান আদি-

অন্ত পরিচয় দিতে বলিলাম। আমার যে বড়-দাদা ছিলেন, তিনিই আমাকে বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগ পড়াইয়া ছিলেন; তাহার পর বড় দাদার কাল হইলে পাল-পাড়ার উমেশ ঘোষ নামে একজন গোয়ালী ছোট দাদাকে পড়াইতে আনিতে, যা আমাকে তাহার নিকট পড়িবার কথা বলিয়া দিলেন। আমি তাহার নিকট বিত্তীয় ভাগ, নীতিকথা শেখ করিলাম।

তাহার পর মেহে-শুলে কিছুদিন আনা-গোনা করিলাম; তাহার পর পিতামাতা বিবাহ-শুশ্রূষে বদ্ধ করিয়া এই কারাগারে পাঠাইয়া দিলেন।

সই দীর্ঘনিশ্বাস ভাগ করিয়া বলিল—

আহা, তাই বটে সই! মেহেদাছঘের প্তর বাড়ী বাওর নিয়মটা কে করে ছিল?

আমি। যিনিই করুন তিনি নিশ্চয় পুরুষ, তাহার সম্বন্ধ নাই।

সই। ঐক্ কথা! বেটাছেলেরা আপনাদের বাড়ীতে থাকিবে আর মেয়েরা চিরকাল উহাদের বাড়ী গিরে দাস্তবৃত্তি করিবে! তাতেও মন পার না। সই, তুমি ত ভাকা-পড়া জান, তুমি ত আপনার স্বাধীন!

আমি। স্বাধীন আর কেমন করে?

সই। তুমি ত নেক্তে জান, মন হলে বাপের বাড়ি প্তর নেক্তে পার আমার যে ভাগ জানি না। কত খোলাখোল করেও কেউ একখানা পত্র নেক্তে দেয় না। সই, তুমি কি করে পর নেক্তে শিখে ছিলে?

আমি। আমি যদি চেষ্টা করতাম তবে আরো ভাল শিখতে পারিতাম।

সই। চেষ্টা কর নাই কেন?

আমি। এখন তাই মনে হয়—তখন চেষ্টা করি নাই কেন? তখন মনে হইত এত চেষ্টা করিতেছি তথাপি লেখা ভাল হয় না কেন? কিন্তু সই, চেষ্টা যে কাহার নাম তাহা এখন জানিতেছি। দিনকতক গিথিয়া দেখিলাম, বাবার মত হস্তাক্ষর করিতে পারিলাম না। কলম ফেলিয়া দিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, বত দিন না বাবার মত লেখা হইবে, ততদিন আর কলম ধরিব না।

সই। তবে যে বলে, নেক-নেক সরে আর খেতে-খেতেই মরে।

আমি। কিন্তু আমার হস্তাক্ষরের সীমা ঐ পর্যন্ত!

সই। তবে যে লোকে বলে তোমার স্বামী তোমার কাছে ভাকা-পড়া শিখেছিল। তাই তিনি অত পণ্ডিত হয়েছিল।

আমি সবিস্ময়ে কহিলাম—সে কি! এ কথা তোমার কে কহিল?

সই হাসিয়া বলিল—তুমি গোপন করিতেছ, কিন্তু তোমার বরই আমার কাছে বলিয়াছিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, তাহা পরিহাস মাত্র। সই, তখন যদি জানিতাম যে লেখাই আমার একমাত্র বন্ধু হইবে, লেখাই আমার একমাত্র শাস্তির উপায় হইবে, তবে কি আমি হাতের লক্ষী পায়ে তৈশিতাম? এখন বড়ই অসুতাপ হয়, কিন্তু নিরুপায়, আত্মবল অসুতাপ করিতেই রহিলাম।

সই আমার কপাল এক বর্ণও বুঝিল না।

আগ্রহের সহিত বলিল—সই, তবে এই
কল্পবটা কি আমাকে খুলিয়া বল। তোমার
কাছে জ্ঞান পড়া শিখিয়াছিল এ কথা কেন
তোমার স্বামী আমার কাছে বলিয়াছিল।

আমি বলিতে লাগিলাম,—

একদিনের একটা ঘটনা বলি শোন,
তাঁহাতেই বৃত্তিতে পারিবে আমি কত বড়
বিশ্রাবতী।

আমি পুর ছুটটিকে লইয়া শয়ন করিয়া
ঘুম পাড়াইতাম, আমার স্বামী শব্দার
পাশে বলিয়া বোম্বাঙ্গার ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ
করিতেন। আমি চুপ করিয়া সেই সংস্কৃত
শ্লোকগুলি শুনিতাম। সই, তেমন কখনও
তুমি নাই। আমি শুনিতে শুনিতে আশ্চর্য
হইয়া ঘাইতাম; শ্রোক স্বপ্নের কি সুখ
স্বপ্নের কি কষ্ট স্বপ্নের তাহা বৃত্তিতে পারিতাম
না। একদিন তাঁহাকে কহিলাম—আমাকে
সংস্কৃত শিখাও। তিনি বলিলেন—আজ্ঞা।
তুমি “আজ্ঞা” শুনিয়া আমার সন্তোষ হইল
না; তাঁহাকে বড়ই বিরক্ত করিতে লাগিলাম;
—পুস্তক কাড়িয়া লইতাম, প্রদীপ নিবাইয়া
দিতাম। আমি, একদিনে বিশ্রান্ত্য
হইবার অল্প বড়ই উপদ্রব আরম্ভ করিলাম।
একদিন তিনি কহিলেন—ভূতে পাইলে
ঝাড়ো হুঁচে ছাড়ে। কিন্তু পেট্রী পাইলে
ঝাড়ো হুঁচে বা জলপড়াতে ছাড়ে না।
বলিয়া তিনি একখানা সরল ব্যাকরণ হাতে
করিয়া আমাকে বলিলেন—এই নাও, এই
ব্যাকরণের গোড়াটা আজ সুখস্থ কর,
কাল তোমাকে পড়া বুঝাইয়া দিব। আমি
বলিলাম—এ কি বই। তোমার সেই বই
কোথা? আমি তাহাই পড়িব।

স্বামী কহিলেন—বালিকা ব্যাকরণে জ্ঞান
না জন্মিলে সংস্কৃত শিক্ষা হয় না। আগে
এই বই পড়।

আমি ব্যাকরণ পড়িতে বসিলাম।
তিনি আপনার পড়া দেখিতে লাগিলেন।
ব্যাকরণ খুলিয়া আমার কাগা পাইল।

সই বাগা দিগা কহিল—তাতে বৃত্তি
হরিনন্দ্রের পালা জ্ঞান ছিল? কিছুদিন
পূর্বে গ্রামে বাজা হইয়াছিল এবং তাহাতে
মাঝা হরিনন্দ্রের পালা অভিনয় হইয়াছিল;
সই সে স্থলে উপস্থিত ছিল। আমি বলিলাম
—না সই, হরিনন্দ্রের পালা কি ব্যাকরণে
লেখা থাকে? তাহাতে বাহা লেখা ছিল
তাহা বলিলে কি তুমি বৃত্তিতে পারিবে?

সই। পারি না পারি তুমি বলই না কেন?
আমি। পুস্তক গুলিয়া দেখি, তাহাতে
লেখা রচিয়াছে—অ, আ, ই, ঈ, উতাদিকে
ব্রহ্মবর্ণ কহে। সই, আমি অমনি পুস্তক বন্ধ
করিয়া শিক্ষকের মুখ-পানে চাহিয়া রহিলাম,
ক্রমে ঘুম আসিল। স্বামী কহিলেন,—আমার
মুখে কিছু লেখা আছে কি? আমি অতিশয়
অপ্রতিভ হইয়া সেই স্থানেই শয়ন করিয়া
অঞ্চল লইয়া মুখে ঢাপা দিলাম। সেদিন
আমার ব্যাকরণ-শিক্ষা এই পর্যন্তই হইল।
সই, পর-রাবে আবার স্বামী বলিলেন—এস,
আগে তোমার পড়া দেখি। আমি ব্যাকরণ
লইয়া বসিলাম। আমার হাতে পুস্তক,
তিনি পড়া বলিয়া দিতে লাগিলেন, আর
আমি হস্তভাগিনী তাঁহার মুখের দিকে
চাহিয়া চাহিয়া অথবা হুঁ দিতে লাগিলাম।

তিনি কহিলেন—বৃত্তিতে পারিলে? আমি
এক হুঁ দিলাম। তিনি কহিলেন,—কি

বুঝিলে, আমাকে বুঝাও। আমি অসন্তুষ্ট হইয়া
রাগিয়া গেলাম। বলিলাম—যাও, বুঝাইব না!

স্বামী কহিলেন—বুঝিতে পার নাই।
এস তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি—অব পর
আ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকাশ হয়।

আমি সক্রোধে কহিলাম—হয় হউক
তাহাতে আমার কি! আমি কেন তাহা লইয়া
মাথা কুটিয়া রাত জাগিয়া মরিব!

স্বামী কহিলেন,—আমারই বুঝিবার তুল!
সাড়ো মগটার সময় ঘুমাইতে না পাইলে যত
কতি অর পর আ থাকিলে কি তত কতি হয়?

আমি বলিলাম—যাও, ওসব বলিলে আমি
পড়িব না,—আর কখনও তোমার কাছে
পড়িব না। বলিয়া পাশ ফিরিয়া শয়ন করিলাম।

হাতের লম্বী পায়ে ঠেলিলাম; আর আমার
আরাধ্যদেব হাসিয়া বসিলেন—পায়ে পড়ি,
পিঠে হাত ছেড়ে দে, কাল সাতটা সন্নিহা
মাথার দিয়া গজাঘান করিব। কাল
তোমাকে লইয়া আমি পড়িতে বসিব, নচেৎ
আমার তৃকহিত শ্রেতিনী ছাড়াইবার
উপায় নাই! তোমাকে লইয়া না বলিলে
এ বৎসর পরীক্ষা দিতে পারিব না।

—সই, আমার বিজ্ঞান সীমা এই পর্যন্ত!
সই। ছিঃ সই, তুমি ত ছেলেমানুষ
নও ভাই, হুপূরবেলা কাদিতে নাই, হুপ
কর, ছেলেদের অকল্যাণ হইবে।

শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী।

লুপ্তকাব্য-পরিচয়

প্রবাস আছে যে বেদমন্ত্রগুলি এক
সময়ে বিলুপ্ত হইয়াছিল, এবং পরে ঋষি
সামন্ত ঐ নষ্টবেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন।
যে যুগকে বৈবিক যুগ বলি, সে যুগেও
যে শোকসাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য
লৌকিক-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা
বেদ এবং ব্রাহ্মণ নামক সাহিত্যের কোন
কোন উল্লেখ হইতে ধরিতে পারা যায়।
লৌকিক-কবিতার কবিদিগকে যে কার
বলিত, এ কথা বেদমন্ত্রেই উল্লিখিত আছে।
প্রলয়-পর্যোদি হইতে যে সময়ে কার্ধ-মন্ত্র
টানিয়া তোলা হইয়াছিল, তখন কোন
মহাপুরুষ কার কৃত সাহিত্যের উদ্ধার সাধন
করেন নাই। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে যে সকল

লৌকিক কাব্যের নাম পাওয়া যায়, তাহাদেরও
কোন সন্ধান নাই। অতি প্রাচীনকালের
কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি অক্ষাণীনবুগের
সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য করি, তাহা হইলেও
দেখিতে পাইব যে, যে সকল কাব্য এক-সময়ে
প্রশংসার বোধ্য বিবেচিত হইয়াছিল, তাহাও
ধ্বংস হইয়াছে। কাল বাহা ধ্বংস করিয়াছে
তাহা যে সম্পূর্ণ ধ্বংসের বোধ্যাই ছিল,
এ কথা বলিতে পারি না। এই প্রবন্ধের
কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে পাঠকেরা বুঝিতে
পারিবেন, যে প্রলয়-পর্যোদি আমাদের অনেক
অমূল্যরত্ন গ্রাস করিয়াছে।

জৈপুড়ার রাজধানী আগরতলা হইতে
এক সময়ে বগড়াবা নামে যে দাসিক

পত্রিকা প্রকাশিত হইত, তাহাতে ১২:১৩ বৎসর পূর্বে “করেখানি লুপ্তকাব্য” নামে একটি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, এবং উহাতে উল্লেখ করিয়াছিলেন—“নাটক লিখিয়া ‘ভাগ’ নামক কবি পূর্ব খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে, কিন্তু এই কবির নামাঙ্কিত কোন নাটক প্রাপ্ত হওয়া যায় না।” যাহা হউক সৌভাগ্যক্রমে কবি ভাস্কর করেখানি নাটক পাওয়া গিয়াছে। শুণ্ডা বা আত্মরাজ-কৃত বৃহৎ-কথা, কাশ্মীরি অথবা কতকগুলি পর্বাঙ্ক রক্ষিত আছে, তাহা জানা অসম্ভব। দৈবাৎ যদি সেই পৈশাচী-প্রাকৃত-ভাষার লিখিত গ্রন্থানি পাওয়া যায়, তবে ইতিহাসের অনেক উপাদান পাওয়া যাইবে। সম্ভবতঃ এই গ্রন্থানি আন্ধ্র-ভাষায় লিখিত ছিল, এবং হইতে পারে যে, ভাস্কর কাব্যের মত, মাজাজগ্রন্থের কোন পুস্তকালয়ে এখনও উহা রক্ষিত আছে।

উক্তার হরিচন্দ্রের গল্পকাব্য যখন বাণভট্ট কর্তৃক প্রাপ্ত, তখন নিশ্চয়ই এই গ্রন্থের লোপে একদান্ধি সুপাঠ্য সাহিত্যগ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। এমন পণ্ডিতও আছেন যাহারা ধর্মশাস্ত্রীয়-কাব্য-প্রণেতা হরিচন্দ্রকে এই হরিচন্দ্র বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন। প্রথমতঃ ধর্মশাস্ত্রীয় পদ্য মহাকাব্য,—গদ্য-বদ্ধ নহে। দ্বিতীয়তঃ এই কাব্য বাণভট্টের বহুকাল পরে, ৮০২ শকাব্দে অর্থাৎ ৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, বিলাসপুর জেলার রতনপুরের রাজসভায় লিখিত। (২১ সর্গের ১৮৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

কবি সাতবাহনের সম্বন্ধে বাণভট্ট এইরূপ লিখিয়াছেন :—

অগ্নিনিবনশ্রাব্যবকরোঃ সাতবাহনঃ
বিতন্নি জাতিভিঃ কোথং রৈহরিব হৃতাশিতঃ।

বাণভট্টের রচনা প্রেমপ্রায়, তাহা সকলেই জানেন। পিতৃক জাতির মধ্যে কোথ সংগ্রহ, এই অর্থ ব্যতীত “জাতি” কথার অন্য অর্থ আছে। জাতি, প্রাকৃত-রচনার একটি বৃত্তের নাম; ঐ বৃত্ত অক্ষর সংখ্যা দ্বারা অথবা মাত্রানিয়ম দ্বারা রচিত হইত। ভটি কাব্যে এবং কাণাদর্শে ইহার দৃষ্টান্ত আছে। ইহাতে ঐ গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় রচিত তাহা বুঝিতে পারা যায়। হাল কবির গাথা-সম্প্রদায়কে সাতবাহনের খ্রীষ্ট গ্রন্থ বলিয়া নির্ণয় সাগর প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। হাল কবির এই গ্রন্থ যে বিভিন্ন কবির রচনা, তাহার যথেষ্ট নিদর্শন আছে, এবং এই কাব্য যে কদাচ বাণভট্টের উল্লিখিত কাব্য নহে, তাহা সাহসপূর্ণক বলিতে পারি।

প্রথমতঃ, যে প্রাকৃত ভাষায় এই গ্রন্থ লিখিত, তাহা সম্ভব-শতাব্দীর পরবর্তী সময়ের প্রাকৃত। তাহার পর হাল কবিকে হাল, শালিবাহন এবং সাতবাহন করা বড় চঃসাহসের কথা। দ্বিতীয়তঃ, অভিনব-প্রণীত রামচন্দ্রে এই হাল-প্রণীত গ্রন্থের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে ঐ কাব্য সাতবাহন-প্রণীত বলিয়া লিখিত হয় নাই। তৃতীয়তঃ, বাণভট্টের বর্ণনা দেখিয়া ঐ কাব্যের নাম কদাচ গাথা সম্প্রদায় বলিয়া মনে করা যায় না। উহার নাম সম্ভবতঃ স্মৃতিভিত্তিক, অথবা স্মৃতিভিত্তিক রক্ষক, এইরূপ কিছু ছিল। চতুর্থতঃ, এই গাথা-সম্প্রদায় জাতিবৃত্তে রচিত নহে,

ইহাতে জাতিবৃত্ত আছে, কিন্তু অর।
প্রাচীন সময়ে যে প্রাকৃত রচনা জাতিবৃত্তেই
অধিক হইত তাহা কাব্যাদর্শে দেখিতে
পাই; এবং বাণভট্টের উক্তি হইতেও
জানিতে পারি যে, সাত-বাহনের এই
জাতিবৃত্তে রচিত হইরাছিল।

মহাকবি কালিদাস যে হুগ্রসিদ্ধ গুপ্ত-
সম্রাটের রাজত্বকালে অভ্যাসিত হইরাছিলেন
তাহা মঙ্গলীত “কালিদাস”-এষে বিদ্যুত
ভাবে লিখিয়াছি। সুশের বিদ্যে যে
ইউরোপীয় প্রস্তুতকবিদেরা আমার গ্রন্থের
চুড়িগুলি সুবিশেষিত মনে করিয়াছেন এবং
কালিদাসের অভ্যাসকাল সম্বন্ধে যাহা
লিখিয়াছি, তাহা স্বার্থ বলিয়া গ্রহণ
করিয়াছেন। কবি কালিদাসের পূর্বে,
মহারাজা সমুদ্রগুপ্তের সময়, যে হুগ্রবির
জয় হইরাছিল, প্রাচীন খোদিত-লিপিতে
তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহারাজা
সমুদ্রগুপ্তের সময়কার খোদিত-লিপিতে
কবি হরিসেনের নাম এবং রচনা পাওয়া
যায়। এই কবি হরিসেন সমুদ্রগুপ্তের
একখানি প্রস্তর লিপিতে ব্রহ্মা, শার্দূল-
বিক্রোদিত এবং মম্বাক্রান্তা ছন্দে পদ রচনা
করিয়াছেন, এবং অতি সুস্পষ্ট ওদয়ী
ভাষার গদ্য রচনা করিয়াছেন। এই
লিপিতে স্বয়ং সমুদ্রগুপ্ত হুগ্রবির বলিয়া বর্ণিত
হইয়াছেন। নূতন নূতন ছন্দ, এবং নূতন
ধরণের কাব্য-রচনা-কৌশল হইয়া যখন এই
সময়ে পণ্ডিতদিগের সহিত তর্কবিতর্ক হইত
তখন মনে হয় যে, ঐগুলি সম্ভবতঃ সমুদ্র-
গুপ্তের সময়ে প্রায় নূতনভাবে আরম্ভ। এই
সেখন, এই লিপির একস্থানে আছে :—

যত প্রজ্ঞানসৌচিত্তস্থ মনসাঃ শাস্তবর্ষার্থতঃ

.....ততো.....নি.....নোজ্জ.....

সংস্কাযা ইবিরোহান্ যুধ গণিতভগাচ্ছতানেন ব্রহ্ম।
বিন্দনোকে বি...ক্ষু চবৎ কবিতা কীর্ত্নিরাভ্যাঃ সুনতি।

সমুদ্রগুপ্তের কীর্তিকলাপ লইয়া যে
মহাকাব্য রচিত হইরাছিল, তাহা যেন
এলাবাংগদ-গুপ্তলিপির কয়েকটি অর্ধ-ফুট পদ
হইতে হুচিত হয়। “কাব্যং...খ্যানপাত্রং
জ্যোত বামনেকাতুতোদারচরিত্ত” প্রকৃতি
কথা আমার অনুমানের অনুকূল। হইতে
পারে, যে এটা বড় দুর্লভ ভিত্তি, কিন্তু
অসম্ভব নহে বলিয়া উহার উল্লেখ করিলাম।

কবি কালিদাসের সময়ের পরে ৪৭২
খ্রীষ্টাব্দের একখানি লিপিতে, কবি বৎস-ভট্টির
যে রচনা পাওয়া যায়, তাহা সুবিশেষ উল্লেখ-
যোগ্য। এই “রচিতা বৎসভট্টিনা” প্রস্তর-
লিপির কবিতার কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি।

যঃ প্রত্যহঃ প্রতিবিত্যাহুযগাক্ষেত্র

বিতীর্ণ ভুগ শিখরখলিতাং কালঃ

কীবাঙ্গনা জন কপোলতলাগিতামঃ

পাতাং স বঃ হুগ্রিগণাতরণো বিবৎস।

মদমত্তা রময়ীর কপোলের বর্ণের সহিত
স্বর্বাধিরণের তুলনাটা নূতন বটে। নদী-তটস্থ
নগরের শোভা-বর্ণনার লিখিত হইরাছে :—

তটোথ বৃক্ষচাতনৈক পুন্

বিচিত্র তীরাঙ্ক জলানি ভাতি।

প্রহুলগম্বীরাগণি বন

সরাগি কারওব সংকুলানি।

বিলোল বীচী চলিতাগ্রবিল

পতংবরঃ শিল্লমিতৈঃ হসৈঃ

সকেশমোদারতরাবতুং

কটং সরাঃতত্বকৈবৈক্যভাতি।

সম্পূর্ণ ভারাবনৈতনগোঁজ
মদিয়াপুতালি কুলখৈনক
অমর গারিণ্ড পুরানমতি
বনানি মদিনি সমলঃ কুতানি ।

এই প্রস্তরলিপির কবি বৎসভটি, যে বলজী নগরে প্রথম ত্রিধর সেন রাজার সভায় ভটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা ১২০৪ খৃষ্টাব্দের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি-র পক্ষে লিখিয়াছিলেন। ইউরোপীয় পণ্ডিত নিগের মধ্যে কয়েকজন আমার ঐ অস্থান গ্রহণ-যোগ্য মনে করিয়াছেন। পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন, যে শেষোক্ত পদগুলির সহিত ভট্টিকাব্যের দ্বিতীয় সর্গের পদগুলির রচনা-সাদৃশ্য আছে। যে সকল যুক্তির বলে উল্লিখিত সিদ্ধান্তটি করিয়াছি তাহা এখানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

আমরা এখন যে পদ্যত্রয় গ্রহণ করি, উহা শুশুতালের সাহিত্য। এই গ্রন্থ যখন প্রথম রচিত হয়, তখন ইহার তত্ত্ব বা ভাগ, পাঁচটির স্থলে ছাদশটি ছিল; নামও পদ্যত্রয় ছিল না। সম্ভবতঃ ইহার নাম ছিল, “করটকদমনকৌ” কারণ সিন্ধু

এবং আর্যে টোব ঐ নামের অস্থান পাওয়া যায়। পুস্তকখানি যখন ৪৩০ খৃষ্টাব্দে পারস্ত-ভাষায় ভাষান্তরিত হয়, তখনও ১১টি ভাগ ছিল। নূতন সংস্কৃত পদ্যত্রয়ে ভাষান্তরিতের প্রতি বিজ্ঞপের অংশ অনেক পরিভ্রান্ত হইয়াছে; এবং উহাতে পরৱর্তী সময়ের অনেক শ্লোকও সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। সকল লুপ্তকাব্যেরই উদ্ধার-সাধন হইতে পারিলে, তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। সেদিনকার অলঙ্কার-দর্পণ গ্রন্থে যে সকল নটক এবং অগ্রজ কবিতা হইতে লুপ্ত সংগৃহীত হইয়াছিল, সেইগুলিই যখন পাওয়া যায় না, তখন বেশি আশা করা চলে না। প্রাচীন পৌনিক লিপিতে অনেক স্থানে যে উক্ত রচনা পাওয়া যায়, তাহার কয়েকটির নিবন্ধন দিয়াছি। কেহ যদি খোদিত-লিপি-সংগ্রহের গ্রন্থগুলি হইতে পর্যায়ক্রমে সন্নিবিষ্ট কবিতাগুলি স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে অনেক অধিপাঠ্য রচনা সাধারণের নিকট প্রলভ হইবে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সাহিত্যিক ইত্তাহার

[সাহিত্যিক অস্থানের সন্নির্ভূত অস্থানে পূজার বাজারে আমরা এই ইত্তাহার প্রথম বাহির করিলাম। সাহিত্য ছাড়া অজ্ঞ কোনো বিষয়ের ইত্তাহার ইহাতে লওয়া হইবে না। এই ইত্তাহার প্রচারের অজ্ঞ আমরা অনেকগুলি শিক্ষিত সন্দেহবাহী পারাবত নিযুক্ত করিয়াছি। সেইজন্য এই ইত্তাহারে খোপের উল্লেখ পাইবেন। কোন ইত্তাহার কোন খোপে পড়িবে আমরা ঠিক করিয়া দিব। আমাদের বিশ্বাস, এই ইত্তাহারের মাধ্যমে আমরা সাহিত্যিকবর্গের এবং সাহিত্যবাসীদের উন্নতির চৌমুখা খুলিয়া দিতে পারিব। বিজ্ঞাপন না হইলে আলকাল কিছুই চলে না। আমাদের সাহিত্যিকেরা যে এত পদ্য তাহার কারণ এইজন্য বিজ্ঞাপনের অভাব নয় কি? পর পৃষ্ঠা দেখুন।]

ভারতী

আশ্চর্য্য ছিপ

এ ছিপ ধরিবার ছিপ নয় ; এখক গাঁপিবীর ছিপ । এই ছিপ কেলিগা ইচ্ছামত শেখক ধরিতে পারিবেন । তবে কোন্ লেখক কোন্ টোপ গিলিবেন তাহা আমাদের নিকট জানিরা লওয়া দরকার । বহুবিধ টোপ আমরা মজুত রাখিয়াছি । দরকার হইলে নূতন টোপ তৈয়ারি করিয়া দিতে পারি । খোপ নং ৪৯

সমালোচকের জন্য

সম্প্রতি কোনো কোনো সমালোচক ভারি মুস্তিলে পড়িয়াছেন । তাঁহারা গীতি-কবিতা, ছোট গল্প, প্রভৃতির ভাব ঠিক ধরয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না ; তাঁহারা এ সকল জিনিষ ঝাপসা দেখিতেছেন—অথচ চোখে ছানি পড়ে নাই । তাঁহাদের দাওয়াই আমাদের কাছে আছে । আমাদের কাছে আসিলে আমরা আঁজা-করিয়া-সমঝাইয়া দিব । খোপ নং ৪২

সম্পাদক প্রয়োজন

একটি নূতন মাসিক-পত্রের উদগম হইবে । একজন অগাঢ় বুদ্বুদ সম্পাদকের প্রয়োজন । প্রতিমাসে ছাপাখানার এবং পত্রের খানার বিল শোধ করিবার সামর্থ্য বিহার নাই, তিনি যেন আবেদন না করেন । বুদ্বুদ সম্পাদকের বুকের কোনো ব্যাঘাত হইবে না ;—সেদগ্ধ আমরা দায়ী থাকিব । খোপ নং ৭

গ্রন্থকর্তার কারখানা

আমি পত্রের খোসামোদ করিতে হইবে না !

এতদিনে দেশের দারুণ দুর্ভাবনা দূর হইল ।

আমরা গ্রন্থকর্তী প্রস্তুত করিবার কারখানা খুলিয়াছি ।

আমাদের এই কারখানা হইতে নানা প্যাটার্ণের চমৎকার চবৎকার গ্রন্থকার বাহির হইতেছে । পরীক্ষা প্রার্থনীয় । খোপ নং ১৪

সভাপতি হইবার কাকুতি

আমি সাহিত্যসংক্রান্ত (রাজনৈতিক নহে) সভায় সভাপতি হইতে চাই । আমার যোগ্যতা ও গুণগণনা এই :—আমার জন্মদারীর বার্ষিক কন্ম নহে এবং আমি রাজসম্মানেও ভূষিত । আমাকে সভাপতি করিলে সভার কর্তৃপক্ষগণের বিশেষ লাভবান হইবার সম্ভাবনা । খোপ নং ২১

মহামন্ত্র প্রচার!

অনেকদিন ধরিয়া এক জটাজুটধারী হিমালয়সদৃশ মহামন্ত্র মনস্তপ্ত করিয়া এই মহামন্ত্র লাভ করিয়াছি। আমার সেবার সম্বন্ধে হইয়া তিনি একদিন বলিলেন—“দাও বৎস! তোমাকে এই অমূল্য মহামন্ত্র দিলাম—জগতের হিতার্থে ইহার প্রচার করা।” পবিত্র হিমালয়ের ছাড়িয়া এই পাণ-পঙ্কল সংসারে আসিবার আশার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কি করি? শুদ্ধর আদেশ! সরাসরি প্রদত্ত প্রত্যক্ষ মূলপ্রদ মহামন্ত্রের গুণ এই যে ইহার মাহাত্ম্যে মাসিক-পত্রের সম্পাদক হইতে আরম্ভ করিয়া ছাপক পর্যন্ত বাহ্যকে খুসী বশ করা যায়। এই মন্ত্র পড়িয়া কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প বাহা পাঠাইবেন কিছুতেই ছাপা থাকিবে না—নিশ্চয় ছাপা হইবে। মন্ত্রবলে খলবতায় সর্প বশ হয় দেখিয়াছেন তো? তবে সন্দেহের কারণ কি? খোপ নং ২৮

সাহিত্যের উন্নতি

ইহা সকলেই জানেন আশ্চর্যকর অর্ধাচীন সাহিত্য আমাদের সনাতন আদর্শ নাপ করিতে বসিয়াছে। আমাদের এত সাধের গরল-হীন সরল সমাজ, ঘুটঘুটে-অন্ধকার অন্তঃপুর, কুণ্ডলীময় পরিণক পাকশালা, বিলাতি বৈ-বিবর্জিত বৈয়রিক বৈঠকখানা—এ সমস্তেরই উচ্চ আদর্শ অসার সাহিত্যের দোরাণ্যে হীন হইয়া পড়িতেছে। ইহার একটা উপায় করা চাই তাহারি আমরা যোগাঙ্গনে বলিয়াছিলাম। অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর একটা প্রকৃষ্ট উপায় বাহির হইয়াছে। বাজারে গোরুর ছবির মধ্যে আমাদের সমস্ত দেবদেবীর অধিষ্ঠান দেখিয়াছেন তো। এই গোরুকে দিয়া যদি সাহিত্য রচনা করানো যায়, তাহা হইলে কিছুতেই আমাদের উচ্চ আদর্শের মর্যাদা নষ্ট হইতে পারে না এবং তাহাতে সাহিত্যের উন্নতি হইতেই চুইবে। এ সবকিছু বক্ষ্য অনেকে। বিস্তারিত করিয়া সকল কথ! লিপিতে গেলে খরচ বাড়িয়া যায়। অতএব সাহিত্যের উন্নতি প্ররাসীগণ! আমাদের অকসিৎ আসিয়া পরামর্শ করুন। খোপ নং ২৯

গন্ধমাদন

ওয়েবটার ডিক্সনারী দেখিয়াছেন, লেখক নাই! আমরা তাই বিপুল আয়োজনে ঠিক সেই আকারের নূতন মাসিক-পত্র বাহির করিতেছি। প্রতিমাসে গুজন করিয়া লইবেন—এক মণ গুজনের পিরাট পত্রিকা। পাতায় পাতায় ছবি থাকিবে। লেখকদের ছবি তো ইহাতে থাকিবেই। তাহার উপর যে বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তাহাদের কলম ধরিবার প্রধান সহায় সেই বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছবি, বাহাতে লেখেন সেই দোরাণ্যের ছবি, কলমের ছবি থাকিবে। আরও শুভ্র। বিজ্ঞাপন-পাতাদের ছবি, তাহাদের কার্ণের ছবি—যে খ্রিস্টীয় কাগজ ছাপিবে তাহার ছবি—

যে সকল কম্পোজিটর প্রাণপাত-পরিচেষ্টায় কাপি দেখিয়া তুল টাইপ সাঁজাইবে তাহাদের ছবি, যে কুলী লণ্ঠারের দ্বারা চরণে কেলিয়া কাগজ বহিয়া আনিবে, তাহার ছবি, যে দপ্তরী বই বাঁধিবে তাহার ছবি,—এমন কি ডিক্শনারি কোম্পানির দপ্তরানবের ছবি পর্যন্ত আমরা প্রতি মাসে ছাপিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি।

তাহার পর প্রবন্ধ! যিনি বাহা লিখিবেন, গুরুদান সাধবে তাহাই নফে ধরিবে।

প্রথম সংখ্যার ক্ষুদ্র আঁকাশো আয়োজন হইতেছে। অনেক অর্থদ্বারে আমরা “আলকান্ধার স্বপ্ন” নামে প্রথম সংগ্রহ করিয়াছি। এই প্রবন্ধে ২২ খানি ছবি থাকিবে। পটুয়াঘের আঁকা ছবির তার এ ছবির ব্যাখ্যা দিবার প্রয়োজন নাই—ছবি দেখিয়াই সকলে বুঝি ফেলিবেন, আদি ও অন্তিম আলকান্ধা। এই ছবির গারে তুলি বুলাইয়া আপনারা বাড়ীর কড়ি-কাঠের কাঠি বুঝি করিতে পারিবেন। তাহা ছাড়া বিখ্যাত লকড় ও তুইকোঁড় কবিরের কবিতা, সবজাতীয় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের দ্বিচ্ছ-শীতল পাতা প্রবন্ধ এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লকড় হামবড়া গল্পলেখকদের “দমে-ডারী ও দমে-হারী গল্প” ও উপগ্রাসে গুরুদান আচ্ছাদিত থাকিবে।

মূল্য নগদে দিতে পারেন, খারও রাখিতে পারেন অর্থব্যয় বাহ্যর যেমন হুবিধা। যিনি তাহাও না পারিবেন, তিনি পত্র লিখিয়া বস্ত্র বন্দোবস্ত করুন। অত্যন্ত ক্ষান্ততা বিধয়ের ক্ষুদ্র চিঠি লিখুন—বোঝার পত্রও সাধবে গৃহীত হইবে। ইতি কার্যাদ্যক্ষ গুরুদান। খোপ নং ৬৩

প্রজ্ঞাচারী ফিল্টার বা বিশুদ্ধ বক-বস্ত্র

ধর্ম, সাহিত্য ও শির জগতে অভ্যাচারীরা আবিষ্কার! উচ্চ শিক্ষিত সাধারণের উন্নতি-করে — বিরচিত এই ফিল্টার-বস্ত্রটি ব্যবহার করুন। পরিভ্রম সাহিত্যের বিশুদ্ধানন্দ উপভোগ করিয়া নির্দোষ জীবন বাপন করিতে থাকুন। ইহার গুণ এই যে ইহা সাহিত্যের চিত্ত-উত্তোষকারী অসার রসকব মারিয়া একেবারে খাঁটি পবিত্র নীলটুকু বাহির করিয়া দেয়। প্রাপ্তিমান:—নয় নব্বয়, রসিক কর্মকাণ্ড লেন এবং মটীপাড়া নবীনবিরীন্দ্র জুতার সোঁকান ও বগদেবের তাবৎ ধর্ম-নাগা এবং পাঠ-শালায় সংলগ্ন আমাদের এজেন্সি।

“প্রশংসাপত্র”

বক্ষ, চুখন, রসনা, মেথলা, যুগল-মিলন, কুহ-কেকা ইত্যাদি ইত্যাদি ধ্বজাস্বক দুই সাহিত্যের পক্ষে আপনাদের প্রজ্ঞাচারী ফিল্টার ও বিশুদ্ধ বক-বস্ত্র সম্বন্ধিনীর কাজ করিতেছে। আর কিছুদিন ইহা রীতিমত চলিলে বঙ্গ-সাহিত্য সম্পূর্ণ দোষ-বর্জিত টেকসই বস্ত্রের আকার ধারণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতি—সম্পাদক “সম্বন্ধিনী।”

কলিকাতা, ২২ হাকিম ট্রাট, কান্তিক প্রেসে, ইন্ডিয়ান বারো দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, লালি পার্ক, বালিগড় হইতে ইন্ডিয়ান চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

ভারতী

সচিত্র বাসনিক পত্রিকা

সম্পাদক—

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(১৩২২ কার্তিক হইতে চৈত্র)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০] ভারতী কার্যালয়, [বাহ্যিক মূল্য ৩৬/০
২২নং ব্রুকিংস ট্রাট, কলিকাতা ।

সন ১৩২২ সালের
বর্ণানুক্রমিক সূচী
(কার্তিক—চৈত্র)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অতএব	শ্রীবিজয়চন্দ্রমজুমদার বি-এল	৮৪৮
অভূতি	শ্রীবিমলাচরণ দেব এম-এ, বি-এল	৭৪১
অভিকালের ছবি	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই	৬০০
আধুনিক ভারত ...	শ্রীক্রেমাতিরস্রনাথ ঠাকুর	৬৭৬, ৮৬০, ৯১৭
আমেরিকার ভারতীয় প্রমজীবা (সচিত্র)	শ্রীবিমলকুমার সরকার এম-এ	১১৮৪
আলোচনা	শ্রীবিনোদবিহারী রায়	৭২৯
আত্মান (কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায় বি-এ	৯৩২
"আনুর্জ্বেণ ও নব্যরসায়ন"	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বহু বি-এল	৯৭৭
আমাদের কথা	সম্পাদক	১২১৫
আমাদের গ্রন্থ	সম্পাদক	১০০৮
আমাদের শিক্ষা	শ্রীপ্রবণ চৌধুরী এম-এ, বার-ম্যাট-ল	১০৬৮
কথা ও কাজ	শ্রীনলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় শাস্ত্রী এম-এ	১০৬৪
কুসুম (গল্প)	শ্রীচৈতন্যকুমার রায়	৬৬০
গোলাকার (কবিতা)	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল	১০০৭

চরম—

আলবার্ট বেসনার্ডের ভারতীয় চিত্র (সচিত্র)
 কাইসারের চরিত্র চিত্র
 কৈসর-প্রাসাদের কাহিনী
 আপানী রঙ্গিন ছাশা (সচিত্র)
 জ্ঞানের জীবন্ত প্রতিমূর্তি (সচিত্র)
 নব্য ইতালির কবি
 নূতন শিল্প-শিক্ষা-পদ্ধতি
 পাগল ভাষা-তত্ত্ববিদের কথা
 কেউর ডোটোরেন্তিনি
 ফ্রান্স ও রুবিয়ার বাণী
 বিনা থাকনার মাতৃ (সচিত্র)
 বিনা নাথিকে জাহাঙ্গ-চালনা
 বিশ্বস্ত নগর (সচিত্র)
 ভাবাত্মক নাটক
 ভারতীয় চিত্রকলা

বিষয়

।

পৃষ্ঠা

সরগের পরশরে (সচিত্র)	২২৬
মার্কিন-কবি উইল্ফ্রদ	৭৯৭
মানবতার উপাসক (সচিত্র)	৮০৫
মোহা বোলা (সচিত্র)	২০৪
বোশেনারার ভারতীয় নৃত্য (সচিত্র)	২৯০
মোঁদার বিখ্যাত রাজী (সচিত্র)	৭১০
সারা বার্গডু (সচিত্র)	২০৬
চন্দ্রশপথ (কবিতা)	ঐকালিদাস রায় বি-এ ১১৪৪
জর্দানরী (কবিতা)	ঐগতোজনাথ দত্ত ১২১০
“ভালপাতার সেপাই” (গল্প)	ঐমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ১০০০
দরদো (গল্প)	ঐমুখ্যরত্ন সরকার বি-এ ১০৮৬
দাগী (গল্প)	ঐসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল ৮১৮
দারোগা-গিরির নমুনা (চিত্র)	ঐমৌরীন্দ্রমোহন চন্দ ৭৮৪
দারোগা-গিরির একটুকরা	ঐমৌরীন্দ্রমোহন চন্দ ১২০৮
ধাক্তি পালা ...	১০৭২
হুনিয়ার পশ্চিমতম নগর (সচিত্র)...	ঐবিনয়কুমার সরকার এম-এ ৩৫২, ৭৪৭
ধোলাপাওনা (কবিতা)	ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১১০
নবাব (উপভাষা)	ঐসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল ... ৬২৭, ৭৩৩, ৮৫৫
নিজাম	ঐঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই, ১১২৪
নীলপটী (কবিতা)	ঐগতোজনাথ দত্ত ১২১৫
পরিচয় (কবিতা)	ঐবিজয়রত্ন মজুমদার বি-এল ১১৪৩
পূর্ণের স্মৃতি (কবিতা)	ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১৮৪
প্রত্যাবর্তন (গল্প)	ঐমতী সরৎকুমারী দেবী ৮২২
প্রাণিবাহ্যে বহুব্যবস্থান	ঐজগদানন্দ রায় ২০৪
“কাকুনী”	ঐনগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ১১৬২
বকের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়	ঐনূপেন্দ্রনাথ বহু বি-এল ৬৮৫
বাক্যলার ইতিহাস	ঐগগননাথ দেবশর্মা বিজ্ঞাবিনোদ এম-এ ... ৭৭৫
বাক্যলার ইতিহাসের উপাদান	ঐরমা প্রসাদ চন্দ বি-এ ২৪১
বিগত (কবিতা)	ঐমতী প্রিয়দর্শা দেবী ১১৮০
বিনয়-পরিচয়	ঐবিধুশেখর শাস্ত্রী ৭১৭
বিপদার (কবিতা)	ঐবিজ্ঞেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম-এ ৮১৭
বিবেশে “জাতিসংঘ” (সচিত্র)	ঐবিনয়কুমার সরকার এম-এ ১০৩২
বিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট	ঐপঞ্চানন নিরোপী এম-এ, পি-জি-এল ১০৬০
বোটার (গল্প)	ঐমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৬০৭
বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তিস্থ	ঐনৈতলচন্দ্র চক্রবর্তী এম-এ ১৭৪
ভবনুরে (মাটিকা)	ঐতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ৮৭৬
ভাষাসংক্রান্ত বিচার	ঐবিজয়রত্ন মজুমদার বি-এল ৬৬২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ	৭৪৮
ভারতের শিল্প	ঐ	২৩৩
ভারতের মুদ্রা	ঐ	১৭৪৪
ভারতের খনিজ পদার্থ	ঐ	৮৮৫
ভাষাসংস্কার	শ্রীশ্রমণ চৌধুরী এম-এ, বার-ম্যাট-ল	৮২৭
ভারতের আর্থব্যয়	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ	১১২৭
ভেইরা (গল্প)	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৮২১
বনি-প্রদীপ (গল্প)	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	১১৭৪
মস্তিষ্ক ও আত্মার বিকাশ	শ্রীশ্রী চন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী এম-এ	৬৮০
মহাবির কথ্য	শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী এম-এ	২৫৬
মকরলের হাফিম ও মোক্তার ...	শ্রীমতীজ্যোত্স্না চন্দ্র	১০২৪
মাত্রাণে বিজ্ঞান-সম্মিলন (সচিত্র) ...	শ্রীপকানন নিরোগী এম-এ, পি-আর-এস	১১২৮
মাকিনের কাপালী "গ্রেজ" (সচিত্র)	শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ	২৫০
মেরুদেশের বিকাশ ...	শ্রীশ্রী চন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী এম-এ	৭৫৫
মুখ্য বার্ষিক ও বৃক্ষাবলোকন (সচিত্র)	শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ	৮৫১
মহা "কান্তিনী" (সচিত্র)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	১০২৮
মহাশোভা	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ৭০১, ৮২৫, ৯১৬, ১০৩৪, ১১১২, ১২১১	
মরসী (কবিতা)	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেন এম-এ, বি-এল	৭৪০
মহাসময়িক ভারতের সভ্যতা	শ্রীজ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুর	১০৫২
মহাসময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা	শ্রীজ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুর	১১৬৭
মহাশক্তি (কবিতা)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	১১১০
মাকী (গান)	শ্রীদ্বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল	৬৬২
মুচেরিতা (উপন্যাস)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ৯৮০, ১০৭১, ১১৮৭	
সেকলে কথ্য	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	১১১৪
মোতের কুল (উপন্যাস)	শ্রীচক্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ ৭২২, ৭৬৫, ৮৬৬	
মোচ্ছাচারী (উপন্যাস)	শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট বি-এল ৯৫৮, ১০০২ ১১৪৫,	
মদনের বিকাশ	শ্রীশ্রী চন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী এম-এ	৮৮১

চিত্র-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আলোক (বহুবর্ণ) প্রাচীন চিত্র হইতে...	৬১০	ফুলওয়ারী	১১১
আঙুরের ফেতে হিন্দুমানী কৃষক	১১৮৫	বসন্ত (বহুবর্ণ)	
আমেরিকার ভারতীয় কৃষকের কুটীর	১১৮৬	ঐযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কর অঙ্কিত	১১১০
আলোর উন্নয়ন (বহুবর্ণ)		বি, ম্যাগন হেডিকার	৮০২
ঐযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	১১৭	বিশ্রাম (বহুবর্ণ)	
ইরাকিস্থানে হিন্দু বাণক-পালিকা	৭৫২	ঐযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কর অঙ্কিত	
উত্তাল তরঙ্গ (হুগোই অঙ্কিত)	১১২	বেহলা (বহুবর্ণ)	
ওকশাওয়ার কিসকৎ	৬৫০	ঐযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত	৭০০
ওকশা-বাটের মন্দির	৭০৬	জাহ্নবী জর্জ গ্রে বার্ণাড	৮০৪
কর্ণ ও ভ্রাতৃত্ব	৮০৬	মাত্রাভের গো-বান শ্রেণী	১২০১
কে গো তুমি?—কামিনী ফুল	১১০৮	মাত্রাভ	৭১৪
গাছে রাসায়নিক জল ছিটাইতেছে ...	৭৪৯	"বে গয়ে লক্ষ্মীর বাস"	১১০৮
ঐক্য বিহীনতা	৬৫৫	যোগাভয়ের উৎসর্গ	৮০৮
চীনা বোকা	৬৬০	রিবেমন্ট—ডাঃ	৮১০
চুড়িওয়ারী	১১১	"রেকলা" নামক অর্থ বা গো-বান	১২০৬
ছাদনীর্ষে শিবের প্রকাণ্ড মূখ	৭০৬	রোমা রোলী	১০৫
জর্জেন্স পলিন	৮০৯	লালপতরা	১০৪২
জাপানী চা-গৃহ	১১৪	মুখার বার্মা ও কণ্টকহীন ক্রাকটাস	৮৫০
জীবনের বোকা	৮০৭	সমুদ্রগামী বেনী নোকা	১১১৯
"তালীবনমাজিনীলা"	১১৯৮	মস্ত্রে মস্ত্র ধরিবার	
মশামেধ ঘটি—কামিনী (বহুবর্ণ)	১০০১	"কাটমারগ" নোকা	... ১২০০
বোনের উপর আলোক-গৃহ	৬৫০	"সামুগাই" পূত্র	... ১১০
"বীরে বন্ধ বীরে বীরে"—অন্ধ বাউল	১১০৫	"সময় কালেরই বিত্ত, বেলা তাহে চুসি"	১১০৫
সর্বকী	১১২	"সবাই বায়ে সব নিতেছে"	... ১১০৬
পীডমন্ট বাগানে জাপানী চা-গৃহ	৬৫৬	স্বর্ণপত্র বৃত্ত	১১৪
শ্রেষ্ঠা—বেটিত ডাঃ হসমায়ন	১১৫	হিরোবিলগর আঁকা প্রাকৃতিক বৃত্ত ...	১১২
"কাকুনী"র বঙ্গলক্ষ্য	১১০৭	জামলেট বেশে সারা বার্ণাড	১০৮



অশোক

(প্রাচীন চিত্র চহিতে)

অধ্যাপক লক্ষ্যনারায়ণ অমৃতভট্টসারে

seyne

ভারতী

৩৯শ বর্ষ]

কার্তিক, ১৩২২

[৭ম সংখ্যা]

আদ্যিকালের ছবি

যুগের পর যুগ মাহুয যে এই পৃথিবীতে বাস করেছে তার অকাট্য নিদর্শন ও প্রমাণসকল আবিষ্কার কবে ভূতত্ত্ববিদেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে প্রাগৈতিহাসিক সময়ের মানবজাতি গুহাবাসী ছিল এবং তাদের অঙ্গশস্ত্র ও নানা ব্যবহার্য সামগ্রী পাথর দিয়েই তারা রচনা করতো এবং শূন্য, দস্ত ও অঙ্গশস্ত্র কাঠের কাজও তাদের জানা ছিল। এই পাথরের যুগে ভারতবর্ষেও মাহুয ছিল এবং তাদের নানা নিদর্শন দলিলভারত ও নর্থবার ভীরে পাওয়া যায়। যে সকল গুহায় আদি-মহুযোরা বাস করে গেছেন তাদের অনেকগুলি থেকে—চক্রবাকি পাথরের তৈরী তীরের ফলা, ছুরির বাট ইত্যাদি পাওয়া গেছে; আর সেই সঙ্গে তাদের হাতে লেগা নানা ছবিও এই সকল গুহায় আবিষ্কৃত হয়েছে।

আমি যে ছবিগুলির কথা বলছি সে সকল গুলিই ইউরোপের গুহাবাসীদের লেগা এবং এলাই বাহ্যিক যে অনেক তর্কবিতর্কের

পরে এগুলির সভ্যতা সম্বন্ধে সকল পত্রিতেই একমত হয়েছেন। আমাদের দেশে ঐ যুগের চিত্রের নমুনা সম্প্রতি মধ্যভাৰতে ঝাংগড় নামক স্থানে বেলকোম্পানির এক সাহেব আবিষ্কার করেছেন। ইউরোপীয় ঐ শ্রেণীর চিত্রগুলির সঙ্গে তাদের এমন মৌসামুশ আছে যে মনে হয় যেন একই লোকের লেগা। এই ভারতীয় গুহাবাসীদের ছবিগুলি আমি দেখবার আশিষ্কার মাত্র পেয়েছি কিন্তু এখনও প্রকাশের হুকুম পাইনি। ইউরোপীয় গুহাসকলের চিত্রাবলীর নমুনা Sparring সাহেব তাঁর The Childhood of Art নামক পুস্তকে প্রকাশ করেছেন; তাইই নমুনা হ'তে জানবা নৃকি যে সেই আদিকালের মাহুযের চিত্রকলায় সফতা বড় কম ছিল না।

এ ক্ষেত্রে সেই সময়ের কথা মাহুয যখন তরুণাব্দা ছেড়ে পক্ষিতত্ত্বায় এসে অশস্ত্র নিঃশেষে,—নিশ্চরাজোর অনেকটাই যখন তার কাছে অপরিচিত এবং অনির্দিষ্ট।

ভীষণ নিবিড় রহস্যের মধ্যে মানুষকে বন্দন অসহায় শিশুর মত তার অপেক্ষে আশ্রয় নিয়ে জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে নিজের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে চারিদিকে কেবল খস্ত-খস্তি করে চলতে চাচ্ছে সে সময়ে ছবি-লেখার শক্তি তার ভিতরে তেগেছে এবং সে ছবি-লিখতে বসেছে এটা হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না;—যদিও বা বিশ্বাস করি তবে সে ছবি যে দুর্গাক্ষরের মত বা ছোট ছেলের ক খ লেখার মত নিত্যস্থায়ী বা কাঁচোরা ও অস্পষ্ট ছিল এটা বলতে আমরা কিছুমাত্র ইতস্তত করি না। কিন্তু যেটা অদ্ভুত, যেটা অস্বাভাবিক, সেটাও দেখছি মানুষের ইতিহাসে ঘটে গেছে। আদিযুগের তাদের হাতে-লেখা শত শত ছবি পাথরের পৃষ্ঠার পৃষ্ঠার লেখা অতি অপূর্ণ একখানি ইতিহাসের মত দিনের পর দিন আমাদের চোখের সম্মুখে পুণে থাকে! এবং আমরা দেখছি চিত্রবিত্তার সঙ্গে প্রথম এবং প্রকৃষ্ট পরিচয়ের এই ইতিহাস ক্রমান্বয়ে বিচ্ছেদে যাদের বিজ্ঞান ছিলনা, সাহিত্য ছিলনা;—যারা কেবল বিষয়টাই বিশ্বরচনার দিকে বিন্ধিত দৃষ্টিতে চেয়েছিল—ঐক্য একটি শিশু যেমন করে চোখে থাকে অপরিসীমের ন্যূন।

কালে কালে প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় বস্তু বেড়েছে ততই মানুষ বিষয়টাই ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে শিরসরচনা একশ পাচ্ছে তার আড়ালে যে রচয়িতা রয়েছেন তাঁর দিকেই আকৃষ্ট হয়েছেন এবং নিজেদের শিরসকে সাহিত্যকে সঙ্গীতকে যেন তাঁরই মহিমায় মণ্ডিত করে তুলেছে, কিন্তু আদিম যুগের

মানুষ বিশ্ব-রচয়িতার পরিচয় পূরে থাকে বিশ্বের মধ্যে যেগুলি তাদের খুব নিকটে ছিল তাবও পরিচয় বন্দন ভালো করে নিতে পারেনি তখন এই ছবি-লেখার নানা কৌশলের সঙ্গে তাদের বসন্ত পরিচয় দেখে আমরা আশ্চর্য না হয়ে থাকতে পারিনা। চিত্রের যে স্বভাব—যেমন রূপ প্রমাণ তাব লাভ্য মানুষ এবং বর্ণিকত্ব—সেই ছদ্মস্বই সঙ্গে যে আদিম মানুষ কেমন সহজভাবে পরিচিত হয়ে গিয়েছিল এটা তাদের লেখা ছবিগুলি না দেখলে বোঝা কঠিন। রেখা রং এবং আলো-ছায়ার খেলা দিয়ে রূপের ডোলটা ছব্ব কুটির ডোলা, যেটা লিখছি সেটা, বা লিখছি বা থাকে লিখছি তার সমান হওয়া এবং ছবিটতে তাবও লাভ্য জুড়ে দেওয়া—এই হচ্ছে চিত্রবিত্তার সমস্ত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শুধাবাসী আদিমযুগের লেখা ছবিতে আমরা এর একটরও অভাব দেখতে পাইনে। তাদের লেখা মহিষ, বরাহ, হরিণ শুধু এক একটা রূপের ছাপ নয়, তারা এক একটি ছবি—যার ভিতরে শিল্পীর মনকে আমরা যেন ধরতে পাই। সত্যার একটা রক্তমাগ আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত নবন এলোছে, তাঁর মাঝে প্রকাণ্ড একটা নেকড়ে-বাবুর আনন্দটা খুব দেখা থাকে! এটা যদি ছবি না হয় তো ছবি আর কাকে বলি। সুইটা হরিণ আসছে, এক-ধারে নদী বয়ে চলেছে, জলে অনেক মাছ খেলা করছে, একটা হরিণ ঘাড় দিগিরে যেন তার শাবক-গুলিকে ডেকে নিচ্ছে; ছবির এককোণে

হৃদয়ের চুট চোখের আকারটি শিল্পী
টুক্রে রেখেছে। একটা বরাহ লাক-
দিয়েছে; একটা বোড়া দৌড়ে চলেছে; এক-
পাল মহিষ, অনেকগুলো বোড়া ছুটেছে
—একত্রে ঘেঁষাঘেঁষি।

এমন সব ছোটখাটো দৃশ্য; কিন্তু সেগুলি
লেখা হয়েছে একবারে পাকা চিত্রকরের
মত। বাস্তবিক মূখের প্রথম শ্রোকের
মত আদিমমুখের এই দাঁতের লেখা, তার
মধ্যে কোথাও অসম্পূর্ণতা নেই।

কিসের অস্ত্র তারা চর্চা লিখেছে? কার
অস্ত্র তারা মূখের ভাবের অভাব হ্রাসপূর্ণ
রেখা ও বর্ণপাতের দ্বারা সম্পূর্ণ করে তুলেছে?
ঘরতে গেলে যে ভীষণ অস্ত্রগুলোর
সঙ্গে নির্যাত সাংগ্রাম কোরে তাদের
বঁচে থাকতে হয়েছিল তাদের মৃত্যুবরণ
গুলোই উচিত ছিল তাদের নিপুণতাবে
গড়া। কিন্তু ঠিক এর বিপরীত ঘটনাটাই
ঘটেছে দেখছি। জীবজন্তুর ছবিগুলো লিখেছে
তারা পাকা-হাতে, তার অস্ত্রগুলো গড়েছে
অত্যন্ত কীর্তারকম! এক টুকরো পাথর
কোনোরকমে বসে তারা বানিয়েছে তীরের
ফলা, নরতো হাঁড়ির মাথা। একটা
পাহাড়ের গুহাকে কোনোরকমে পরিষ্কার
করে নিয়ে বাস করেছে তারা। তারি
ভিতর অঘট-চিত্রে সামান্য খুঁতটোও তাদের
সহ হয়নি।

অশ্রান্তভাবে জীবন-সাংগ্রামে জয়লাভ
করণের অস্ত্রই যার প্রস্তুত হবার কথা,
সেটা না হয়ে ওঠে কেন সে চিত্রলেখার
রেখা ও বর্ণের ছন্দ-বীথির পরিপক? এ
এক মহা মজা।

আবার ঘরতে গেলে যে পদার্থগুলো
ছিন্ন ও লেখা সচল—যেমন গাছ পাতা
ফল ফুল ইত্যাদি, সেইগুলোরই চিত্র
করা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু তা
না করে তারা দেখছি লিখে চলেছে সেই
গুলো দ্বারা জীবন্ত—ছুটে বেড়াচ্ছে, খেলে
বেড়াচ্ছে, গতিবিশিষ্ট এবং অস্থির! এরই
বা অর্থকি?

তবেই দেখছি মানুষ তদানিন্তন অবস্থার
সময়ের দ্বারা বিপদ-আপদ চেকিয়ে রেখে
যে-কোনো-প্রকারে আপনাকে এবং সম্মান-
গণকে রক্ষা করে চলাই একমাত্র কর্তব্য
বলে স্বীকার করেনি। শুধু যে তারা গৃহ-
স্থানি করেছে বা লড়াই করেছে তা নয়,
তারা দেখছি ছবি লিখে এক একটা
ঘটনা, এক একটা ভাব বর্ণনা করেছে।
তারা যে শুধু বিশ্বনাশে অবলোম্বী জীবের
মত একমাত্র আত্মরক্ষা ও সম্মানপালন
নিয়ে বাস্তব, তা নয়। চোপ তাদের নানা
পদার্থের পরিচয় নিজে, মন তাদের নানা
সময়ের আশ্রয় পাচ্ছে, এবং তাদের নিপুণ
অঙ্গুলি তখন থেকেই রেখার মধ্য দিয়ে রূপের
মধ্য দিয়ে রঙের মধ্য দিয়ে কুটির তুলছে
আপনাদের মনোভাবের নানা ছবি। তাদের
ছবিগুলো দেখলে বোকা বার যে তারা
দিনের অনেকখানি ধরে প্রকৃতির মধ্যে যে
বিচিত্র গতিভঙ্গী এবং আলো-ছাঁটার খেলা
চলেছে তা নিরীক্ষণ করতে, উপভোগ করতে,
সেগুলিকে নিরূপণ করেছে ও সেটা চিত্রের
দ্বারা বর্ণন করে আনন্দ পাচ্ছে!

অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত এই ছবিগুলো
লেখার অর্থ অহুসমান করতে গিয়ে মানুষ

বে কোনো স্বাধীনতার ক্ষমতা এতগুলি রচনা করেছিল সেই কথাটাই বলেছেন। ছাত্রের সঙ্গে কণ্ঠের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক দেখে আদিম মহাবোধ। সেই ছাত্রকে পাকড়াও করে নানা জীবনকল্পের কাগজটির উপরে লখন জমাতে পারবে এই বিশ্বাসই যে এক সকল চিত্রের রচনার কারণ—এই কথাটি পণ্ডিতেরা বলেন। কিন্তু এটা তাঁরা ভুলে যান যে মানুষ তখন এত অক্ষম ছিলনা যে ছাত্রাব্যক্তির মস্ত দিয়ে গোক-বীধবার ক্ষমতা তার! চেষ্টা পাবে বা কুশপুত্র পুড়িয়ে কার জীবন-সংহারে উত্তর হবে। তারা যাকে বীধতে চাইতো তাকে জোর করেই বীধে আনতো; মারতো তারা পাষণ্ডের আঘাতে নিজের হাতে। যের বসে মস্ত পড়বার তাদের সময় ছিল না।

নিজের খাতি-সংগ্রহের ক্ষমতা হরণের পিছনে দিনের পর দিন তারা মাঠে মাঠে পুরছে; শরহ তাদের হেড়ে আসতে, বস্ত্র মহিষ তাদের দিকে রক্তচক্ষু হয়ে দৃষ্টিপাত করছে নরতো পাখি মূল্যবোধের আঘাতে সে ধূলার স্তম্ভিত হচ্ছে!—এরূপে চাপি তারা লিখেছে। গ্রামবৃদ্ধ ধুনো আলিগে বঙ্গীকরণ মস্ত আওড়ানো—এ ছবি কল্কতির তখনকার কলিতা সন্তান লিখে যাননি। সেই সমস্ত পদার্থ যারা চোলেতো না, বলতো না, তাদের কোনো চিত্র তারা দিয়ে যাননি; যারা তাদের সঙ্গে লড়াই বিতে আসতো, তাদের কাছে থেকে পাশাতে চাইতো, তাদেরই মস্ত অক্লান্তভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতো, নির্ভীক নির্ভীক অথচ প্রাণের উচ্চাসে একেবারে পরিপূর্ণ কেবল তাদেরই দিকে

সেই আদিমমহাবোধ প্রাণ টেনেছে এবং তাদেরই ছবি তারা লিখেছে—অতি যত্নে, মহা আনন্দে, রক্তের রাঙা আঁতা দিয়ে, জীবনতার প্রগাঢ় দ্বারা দিয়ে। আকাশ, বাতাস, রাত্রির অন্ধকার, বনের নিবিড়তা, মূল্যপাতার বিচিত্রতা, বেঘের খেলা, এমন কি নানা কীট পতঙ্গ ও পক্ষীগুলির দিকে তারা লক্ষ্যই করেনি। যদিও এগুলো তাদের মনকে খুবই বিচলিত করতো মনেই নাই কিন্তু এগুলোর সঙ্গে তারা যে খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না; এবং তাদের চিত্রগুলি থেকে এইটাই প্রমাণ হচ্ছে যে এগুলোকে তারা একটু জোরের চোখেই দেখেছে। মনে হয় যেন তারা এ সকল থেকে দূরেই থাকতে চেয়েছে। অন্ধকার আকাশে প্রকাণ্ড নরকপাশখামার মত চক্রে উদয়, সন্ধ্যার অন্ধকারে বনের নিবিড়তা, হাওয়ার মাঝ-দিয়ে পাবীর স্ফটিকাড়া আন্তর্গতগতি—এ সবই তাদের মনকে ভাঙেই হোক বা বিষয়েই হোক বিষ্ময় করে দেওয়া বই আকর্ষণ করতো না—নিশ্চয়। পাহাড়ের মর্মে একটা নিষ্ঠাটা তারা অনুভব করেই তবে তাকে আশ্রয় করেছিল; চতুর্দশ জীবনগুলির সঙ্গে পৃথিবীর উপরে বিচরণ করা নিয়ে—একটা যেন আত্মীয়তার ভাব তাদের মনে বহুদূর হয়েছিল; তাই যেন পাবীর অগ্নিকা এই সকল জীবনকল্প খুব কাছে বেতে, তাদের যেন খুব কাছাকাছি পেতে, আদিমমহাবোধ প্রাণ চাইতো; এবং সেই প্রাণের টানই এই সকল চিত্রের সৃষ্টির কারণ। ওত্র-

শাস্ত্রের মাঠ-ময়ের কাজ করবার ক্ষেত্রে এ ছবিগুলোর অবতারণা নয়;—প্রাচীন মানবের অনিশ্চিত জীবন-সংগ্রামের মধ্যে মাঝে মাঝে যে ছুটি আসতো এগুলো সেই ছুটির খেলা;—এক-একটি দিনের অধিকাংশের এক একটু আনন্দের ইতিহাস।

যা যেমন মরাতালের খেলনাগুলি গোপনে রক্ষা করেন তেমন ধর্মত্রেয়েন তাঁর প্রথম-সন্তানের খেলার সামগ্রী—এগুলিকে মাটির তলার সূঁকিবে রেখেছিলেন যুগযুগান্তর ধরে এতদিন।

ঐঅনন্যস্বপ্ন ঠাকুর

বেচারি

বিষ্ণু রাহবাবুদের বাড়ীতে মোসাহেবী করিত।

এই চাকরিটি সে যে মাঝার ভায় পায়ে কেলিরা জোগাড় করিয়াছিল তাহা নহে—বিনা চেষ্টায়, বিনা আয়াসে, একরকম আপনা-হইতেই এ কাজটি তার ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছিল। কবে হইতে তার এ কাজ আরম্ভ হইরাছে তাহা সে নিজেই ঠিক জানে না;—বহুকাল পরে সে যখন একজন পাকা-মোসাহেব হইয়া উঠিল তখনই সে নিজের স্বরূপ বৃদ্ধিতে পারিল।

যে রাহবাবুদের সে এখন মোসাহেবী করিতেছে ছেলৈবেলায় তাগেরই সঙ্গে একত্রে সে খুলে পড়িত। রাহবাবুরা বড়-লোকের ছেলে;—তারা যে খুলে পড়িতে আসে এ ব্যাপারটাকে হেডমাষ্টার হইতে লেখারান পর্যন্ত এমনি করিয়া দেখিত যেন সেটা একটা তাগের মত অজ্ঞান!

রাহবাবুদের কাছে সমস্ত খুলটির এমনি ভাবে আনন্দ হইয়া থাকিবায় কারণও যথেষ্ট ছিল। মশখানা গ্রামের মধ্যে এই একটিমাত্র খুল। ঐ সব-বন-নীলদণ্ডকে

শত্রু-মুখে-ছাঁট-নিরা জিয়াইরা রাখিবায় অস্ত্র উপায় ছিল না, যারকর্তাদেই মুখ-তাকাইতে হইত। নানা অনটন ও নানা অঘটনের মধ্যে পড়িয়া এই খুল-তরীটি যখন একবার নাক-ঘরিয়ার ডুব-ডুব হইয়াছিল তখন রাহ-কর্তারাই ইহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তার পর থেকে বিশদ আপদে উহারাই একমাত্র ভরসা।

তা ছাড়া রাহবাবুরা যখন খুলে তরী হইল তখন হেডমাষ্টার হইতে আরম্ভ করিয়া খুলের অর্ধেকের উপর মাস্টারের প্রাইভেট টুইগনি জুটরা গেল। এবং যাদের জোটে নাই তারাও আশায় আশায় রহিল। কেহ রাহবাবুদের ইংরাজি পড়াইত, কেহ গণিত, কেহ বাংলা কেহ আর-কিছু, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল প্রাইভেট-টুউটনদের মাঝিনা ছাড়া, পুকা-পার্সণ জিফ-কর্ষ উপলক্ষ্যে উপহার-উপঢৌকন-ইত্যাদি-আকাদে অনেক উপরি-পাওনাও ছিল। এবং নীচের তলকাম চাকর-নফরমাও যে রাহ-বাবুদের করণা হইতে বঞ্চিত হইত তাহা নহে। কাগেই খুলটির সমস্ত নাকী যে কেন হইতে

রস সঞ্চয় করিত সেই ভেজ্রটের পায়ে মাথা না ঠেকাইলে ধর্মের সহিবে কেন ?

এই ক্ষুণ্ণটিতে ছেলে খুব বেঁটা পড়িত না, এবং যারা পড়িত তারা সকলেই পাড়ার গবীরের ছেলে;—কেহই পুরা মাহিনা দিতে পারিত না। কাজেই তারা ক্ষুণ্ণের মধ্যে নগণ্য হইয়া ছিল। কেবল রায়বাড়ার ছেলেবাই নিজেদের চারিদিকে ধনগৌরবের সন্নিবিষ্ট ছড়াইয়া ক্ষুণ্ণের মহিমা বর্দ্ধন করিত এবং নগণ্য ছাত্রদের সমস্তোচ্চ নৃষ্টির আগে আগে থাকিয়া তাহাদিগকে আরো সমুচিত করিয়া তুলিত।

বিষ্ণু ঐ নগণ্য ছাত্রদের একজন। কাজেই সধপাঠী হইলে কি হয়? ছেলেবেলা হইতে রায়বাবুদের উপর একটা সমীহ রাখা তার প্রকৃতির মধ্যে ঝাঁড়াইয়া গিয়াছিল। ইহা ছাড়া, তার বাপ-পিতামহ যে ঐ রায়বাবুদের অগ্রে একরকম মাদ্রাস বুলিলেই চলে।

নগণ্য ছাত্রদের মধ্যে কেহই সাহস করিয়া রায়বাবুদের সহিত সমান হইয়া মিশিতে পারিত না। রায়বাবুও গরীবের ছেলের সঙ্গে মিশিয়া নিজেদের পদমর্যাদা নষ্ট করিবার কুশিকা লাভ করে নাই। কাজেই সধক বতাই নিকট হোক, সধপাঠীদের সহিত রায়বাবুদের ব্যবহার অত্যন্ত নিকট রকমেরই ছিল।

হঠাৎ একটা ছেলে একদিন কলিকাতা হইতে আসিয়া এই ক্ষুণ্ণে ভর্তি হইল— একেবারে পুরা মাহিনা দিয়া। রায়বাবু ছাড়া ক্ষুণ্ণে কেহই পুরা মাহিনা দিত না;

কাজেই এই ঘটনাটা ক্ষুণ্ণের সকলকেই একেবারে অবাক করিয়া দিল। ছেলেটির নাম সতীশ। তার বাপ কলিকাতার একজন বড় উকীল। সে কলিকাতায় লেখাপড়াই মন দিত না—বন্ধু-ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া বহিরা ঘাইতেছিল। সেই জন্য তার বাপ তাকে এই গ্রামে তার কাকার কাছে পাঠাইয়াছেন। তার কাকা এখানকার মুন্সেফ।

সতীশ ক্ষুণ্ণে প্রবেশ করিয়াই পাড়ারগেরে ভূতভলোর স্রুতি অত্যন্ত অবজ্ঞা দেখাইতে লাগিল—রায়বাবুদেরও বাদ দিল না।

সতীশ ডবল ব্রেট সাইট গারে দিত— চিনাবাড়ির চকচকে পম্পহু পায়ে পরিত এবং তাঁর চোখে একঝোড়া সোনার চশমা ছিল। রায়বাবু বড়লোক হইলে কি হয়! সাজসজ্জার পারিপাট্য তাদের ঘোটেই ছিল না—পোষাক একেবারে সাদাশিখা।

এইখানেই সতীশ রায়বাবুদের একটা প্রচণ্ড খা দিল। এতদিন তারা সব-বিষয়ে সকলের চেয়ে বড় হইয়াছিল—কোথা হইতে একটা ছেলে আদিয়া তাদের সমস্ত মান-সম্মান বেন রসাতলে তলাইয়া দিল। সতীশ যখন-তখন সাটের আস্তিন হইতে দিকের ক্রমাল বাহির করিয়া ঘূর্ণ সুছিত,—এসেমের গন্ধে চারিদিক ভরভর করিতে থাকিত। ছেলেরা তদ্রূপ হইয়া তাহা উপভোগ করিত, রায়বাবুদের মন কিন্তু আপশোষে জলিতে থাকিত।

রায়বাবু জমিদার, সহজে দমিবার ছেলে নয়;—কেহ যে তাহাদের উপর টেকা দিয়া ঘাইবে তাহা হইবে না। তাহার। তখন

গোলাপী-আত্মের তুলো কানে ভাঁজিয়া কূপে
আসিতে আরম্ভ করিল।

সতীশ সেই দেখিয়া একদিন হো-হো
করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং শেড-পেন্সিলের
ছুঁচোণো মুখটা দিয়া তুলোর কুণ্ডলীর উপর
একটা খোঁচা মারিয়া টানিয়া ফেলিয়া দিল,
বলিল—“What is that?” আত্ম-
মাঝখানে তুলো কান হঠতে থমিয়া মূল্য
গড়াগড়ি যাইলে লাগিল।

সতীশ তখন পেন্সিলের মুখটা নাকের
কাছে একবার ধরিয়া নাকটা দিক্ত করিয়া
বলিল—“What an obnoxious thing!”
বলিয়া সে পেন্সিলের শিগটা লুট করিয়া
ভাঙিয়া ফেলিল। রায়বাবুদের মুখ-চোখ
লাল হইয়া উঠিল। সতীশ তাদের দিকে
না চাহিয়া ফন্ করিয়া ডবল-ব্রেস্ট জামার
আত্মীন হইতে চওড়া-পাড় রেশমী ক্রমাল
বার্হর করিয়া পেন্সিলের মুখটা একবার
মুছিয়া লইল। তার পর আপন-মনে শিগ
দিতে দিতে চলিয়া গেল।

রায়বাবুদের এক পোষা মূর্তি ছিল।
সেই বাবুদের জুতো বানাইত। পুঞ্জার সময়
তারই হাতের জুতো পায়ে দিয়া যখন রায়-
বাবুদের ছেলেরা বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া গেড়াইত
তখন গ্রামের ছেলেরা লুক লুটিতে সেই
মূর্ত্তার দিকে চাহিয়া থাকিত—অনেক ছেলের
ঐতিহ্য দেখার কথা মনেই থাকিত না।
কিন্তু রায়বাবুরা যেদিন সতীশের পায়ে
পল্লী পুঞ্জার দেখিল সেই দিন তাদের জুতোর
কুমোর ভাঙিয়া গেল।

রায়বাবুদের মূর্তি কখনো পল্লী পুঞ্জার
করে নাই—চক্ষে দেখিয়াছে কি না

সন্দেহ। আবুদের ছেলেরা যখন তাঁকে
পল্লী পুঞ্জার করমাস দিল তখন জুতোর নাম
জানিয়াই তার মগা ভাবনা হইল। কিন্তু
মূর্তির পোষা চালাক ছেলে সে সময়ে
নিজের বিদ্যা ধরা পড়িতে দিল না। সে
বলিল—“তার আর কি! এ কথা তো
বলেই হ’ত—কোনখানে বানিয়ে দিতুম।
আমার শিসেমশায়ের খুঁড়ো কলকাতার
সাধন-বাড়ির মূর্তি ছিল—তার কাছেই
আমার কাজকর্ম পেপা—আপনাদের আশী-
র্কনে কোন কাজ শিখতে আমার বাকি?
এমন জুতো বানিয়ে দেব যে চকুধির
হয়ে যাবে!”

মূর্তির পোষা মুখে সাংস্কৃতিক করিয়া গেল
বটে কিন্তু কাজের বেলায় মনে মনে বিপদ
গণিল। কি করিতে হইবে সে কিছুই
মুখিতে পারিল না। সে কিছুদিন পালাইয়া
পালাইয়া বেড়াইতে লাগিল। রায়বাবুরা
গোজ করিয়া তাহাকে পাইত না। শেষে
ষারবান দিয়া যেদিন তাঁকে ধরিয়া আনা
হইল সে বলিল—“এ ত আর যে-সে কাজ
নয়—এ পান্সি জুতো! এর অনেক সরঞ্জাম
চাট, সে সব তো বেগাওড় করতে হবে।
তাড়া দিলে চলবে কেন?”

মাসের পর মাস কাটিয়া যাঁতে লাগিল,
তাগাদার পর তাগাদা চলিতে লাগিল,
তবু পল্লী পুঞ্জার তৈরি হইয়া আসিল না।

মূর্তির পোষা ভাবিয়াছিল—এমনি করিলে
বাবুরা শেষে হাল ছাড়িয়া দিবে কিন্তু সে
দেখিল বেগতিক—বাবুরা কিছুতেই হাল
ছাড়িতে চায় না, বরঞ্চ শক্ত করিয়া ধরে।
তখন সে একদিন বাবুদের বাড়ী গিয়া

বলিল—“সরকারি সব তৈরি এখন বসুন
কেমন পান্সি তৈরি করতে হবে। পান্সি
তো আর এক রকমের নয়—রকম রকমের।”

ছেলেরা পম্পহু সন্ধে দুটির পোর
মতোই অস্তিত্ব, কাজেই এ কথার পরস্পরে
মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। দুটির
পো মনে মনে চাসিতে লাগিল—এমনটা
হইবে সে গোড়া হইতেই আনিত, তাই
সে সাহস করিয়া বুক ফুলাইয়া বাবুদের
বাড়ী আসিতে পারিয়াছিল।

বড়বাবু বলিলেন—“কেমনতর জুতো
হবে আমি দেখিবে দেব... তুই আমার
সঙ্গে স্থলে আসিস।”

পরদিন স্থলে গিয়া দুটির পো সতীশের
পায়ে পান্সি দেখিয়া আসিল।

বৎসরম্বরে এক অদ্ভুত চেহারা পম্পহু
তৈরি হইয়া আসিল। রাহবাড়ীর ছেলেরা
মহা কুস্তির সহিত নৃতন জুতা পায়ে দিয়া
সদনন্দকে স্থলময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।
সতীশ সেই শব্দ শুনিয়া অকুণ্ঠিত করিয়া
বাড় বৈকটীয়া একবার জুতার বিকে চাহিল,
তার পর চীৎকার করিয়া উঠিল—
“Silence please !”

রাহবাড়ীর ছেলেরা ধতমত বাইরা
গেল। সতীশ বলিল—“জুতার শব্দ করা
কতজনক অপভ্রাতা—জানেন কি ? শিখুন !”

বাবুদের মুখ হেঁট হটগা গেল।
ছেলেদের সামনে এই অপমানের তাদের
যেন মাথা ঝাটা গেল।

ব্যাপার ঐখানেই শেষ হইল না।
সতীশ ঐ নৃতন পম্পহুর গঠন সন্ধে বে
সন্তব্য প্রকাশ করিল তাতে সে জুতো

আর পায়ে বেওয়া চলে না—অগে ভালাইতে
হয়।

এমনি করিয়া সতীশ যখন-তখন
বেশানে-বেশানে রাহবাবুদের ঠোঁকর মারিতে
লাগিল। স্থলের অস্ত্র ছেলেরা তাহা দেখিয়া
বিশ্বরে অথাক হইয়া বাইত। রাহবাবুদের
মুখের উপর কথা বলিবার সাধা যে এ
মগতে কারো আছে এ কথা তারা
কল্পনাও করিতে পারিত না। এ বে দেখি
তাঁও ছাড়াইরা গেল—এ বে একেবারে
অপমান!

সতীশের অপমানে রাহবাবু যা ইচ্ছা
করিয়া চুপ করিয়া থাকিত তাহা নহে,
চুপ না করিয়া উপায় ছিল না। সতীশ এমন
সব ব্যাপার লইয়া ঠোঁকর দিত বাহা
সতীশের বলিবার ধরণে রাহবাবুদেরও মনে
হইত—হাঁ অদ্ভুত বটে! সতীশ সহরে
ছেলে—সত্যতা সন্ধে তার শিক্ষা, কতি
সন্ধে তার অভিজ্ঞতা পাড়া-পেঁগে ছেলের
চেয়ে ঢের বেশী—এ কথা রাহবাবু মনে
মনে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, কাজেই
সেখানে তারা দুর্জল ছিল। সেই অস্ত্রই
সতীশের সনত্ত অপমান তাদের নীরবে
সহ্য করিতে হইত।

সতীশের আর-এক বিষয়ে প্রতিপত্তি
ছিল। এর আগে সে কলিকাতার এক
সাহেবী স্থলে পড়িয়াছিল। সেইমন্ত দে
কড়কড় করিয়া ইংরাজি বলিতে পারিত এবং
ইংরাজি উচ্চারণটা তার ভালোভ ছিল।
ক্লাসের মধ্যে মাষ্টারের তুল উচ্চারণ লইয়া
সে ছেলেদের সঙ্গে প্রকাক্ষভাবে আলোচনা
করিতে সক্ষম করিত না এবং তাহাদিগকে

ভুল উচ্চারণের বিরুদ্ধে সীতিমত সতর্ক করিয়া দিত। একদিন পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে Pudding কথাটা পাওয়া গেল। বঠোর মশায় সেটাকে উচ্চারণ করিলেন—পাডিং। সতীশ গাড়াইয়া উঠিয়া বলিল—“Beg your pardon Sir! ওটা পুডিং হবে!”

মাতারমশায় প্রথমটা খতমত খাটয়া গেলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ভীত বরে বলিলেন—“কে তোমাকে বলে পুডিং হবে?”

সতীশ বলিল—“Excuse me Sir! আমি খাপ সাহেবের ঘুমেই ও কথাটা ভনেছি এবং অনেক বার ও জিনিষটার আদৌ ইংরেজি বোটেলে গ্রহণ করিছি।”

মাতারমশায় খানিকটা আমতা-আমতা করিলেন, তাবপর চূর্ণ করিয়া গেলেন। এর পর থেকে সতীশ সবক্ষেত্রে তাঁকে একটু সাবধান হইয়া চলিতে হইল।

ইতিপূর্বে ইলাহারও যদি কেহ রাগ-বাড়ীর ছেলের প্রতি অসম্মান দেখাইত তাহা হইলে বারগান থেকে হেডমাষ্টার পর্যন্ত অধিনি হাঁ-হাঁ করিয়া উত্তীত এবং তার সীতিমত সাজা হইয়া যাইত। কাজেই সব ছেলে রায়বাবুরের সঙ্গে ভয়ে ভয়ে চলিত। কিন্তু সতীশ সবক্ষেত্রে সে নিয়ম খাটানো গেল না। একে সে মছরে ছেলে—তার সঙ্গে পারা যায় না, তাব পরে সে পুরা মাহিনা দেয়, সর্বোপরি সে মুন্সেফ বাবুর ভাইপো! কাজেই তাকে আর-সকলের মতো হেনস্থা করা চলে না। তার বাপ আবার কলিকাতার

উকিল। ছেলের উপর উপদ্রব করিলে ক্যালান্দে পড়িয়াও ভয়ও আছে। কে বলিতে পারে বিশ্বশিষ্টাণ্ডের কর্তৃপক্ষের কানে সে কথা উঠিবে না। অনেক কঠোর চাকরি কি শেষে যাইবে!—হেডমাষ্টার ও অস্ত্রাস্ত্র শিক্ষকের সে ভয় গুরুতর ছিল।

সতীশের আচরণ দেখিয়া কিছু করেকটা ছেলের সাহস বাড়িয়া গেল। তারা মনে মনে বাগবাড়ীর ছেলেরের উপর চট্টা ছিল কিন্তু কিছু করিবার সাহস ছিল না—মনে মনে কেবল গুমরাতিত। সতীশের সেই নিস্তিক্ততা তাদের মনের চটকা যেন ডাঙিয়া দিল।

একদিন টিকিনের ছুটির সময় হটোপাটি করিতে করিতে এগুটা ছেলের ঠেলা খাইয়া সতীশ রায়বাড়ীর মেজোবাবুর গাঘের উপরে পড়িয়া গেল। মেজোবাবু সতীশকে কিছু বলিল না কিন্তু যে ছেলেটা ঠেলা দিয়াছিল না। কবিতা তাকে এক চড় কসাইয়া দিল। ছেলেরা এমন চড় আগে অনেকবার সহিরাছে, পাঁখে মাখে নাই, কিন্তু সেদিন আর সে পারিল না—সেও মতোরে এক চড় কসাইয়া দিল। মেজোবাবু উত্তেজিত হইয়া জুতা খুলিয়া তাকে মারিতে গেল—সতীশ তাড়াতাড়ি মাঝে আসিয়া বুক-ফুলাইয়া গাড়াইল—মেজোবাবু হাতের জুতা হাতেই রহিয়া গেল।

এ ঘটনার স্মৃতির সমস্ত ছেলে একেবারে ভক। কি ব্যাপার! রাগবাবু মার খাইল! এমন অঘটন তারা কখনো চক্ষেও দেখে নাই। যথাসময়ে হেডমাষ্টারের

কানে এ কথা গেল। তিনি ছেলেটাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে হেডমাষ্টারের ঘরের দিকে চলিতে লাগিল। সতীশ কাহাকেও কিছু না বলিয়া ক্রাস ছাড়িয়া তার সঙ্গে সঙ্গে গেল।

হেডমাষ্টার বনে করিতেছিলেন ছেলেটার একটা রীতিমত শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন—কিন্তু সতীশকে দেখিয়া তিনি দমিয়া গেলেন।

হেডমাষ্টার ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুই কে ঘরেছিস?”

ছেলেটা ক্যান্ ক্যান্ করিয়া চাতিয়া অর্ধশুট ঘরে বলিল—“হ্যাঁ!”

হেডমাষ্টার বলিলেন—“পুর! শ্বেতগাহটা নিয়ে আর ত।”

পূর্ণ বেত আনিয়া হারির করিল;—হেডমাষ্টার হাতে করিয়া লইলেন।

ছেলেটা দূবে পাড়াইয়াছিল। হেডমাষ্টার বেতটা বাতাসের উপর ছুই চাক্রিবাব শানাইয়া লইয়া গর্জন করিয়া উঠিলেন—“এ দিকে সরে আর নশ্চি!”

ছেলেটা কাতরভাবে চাহিতে চাহিতে এক-পা এক-পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

সতীশ এতক্ষণ চূপ করিয়াছিল। সে এইবার থপ্ করিয়া গিয়া ছেলেটার হাত ধরিয়া ফেলিল, বলিল—“পাড়া!”

হেডমাষ্টার চোখ পাকাইয়া বলিলেন—“সতীশ।”

সতীশ অত্যন্ত সহজভাবে উত্তর করিল “Yes Sir!”

হেডমাষ্টার বলিলেন—“তুমি ক্লাসে যাও! এখানে তো তোমার দরকার নেই!”

সতীশ বলিল—“Pardon Sir! 'am not an intruder!” বলিয়া সতীশ গম্ভীর মুক্তি ধারণ করিল।

হেডমাষ্টার সতীশের দিকে আর না ফিরিয়া ছেলেটাকে ধমক দিয়া বলিলেন—“এদিকে আর!”

সতীশ 'সঙ্গেসে তার হাত চাপিয়া রহিল।

হেডমাষ্টার তখন সতীশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“সতীশ তুমি অজ্ঞায় করচ।”

সতীশ মাথাটা একটা ইংরাজী ভঙ্গীতে নত করিয়া কথাটার উপর শ্রদ্ধা দেখাইল। তার পর মুখ তুলিয়া বলিল—“If you allow my criticism Sir, তাহলে বলি, আমি অজ্ঞায় করিনি—Your Sirship অজ্ঞায় করেছেন সুবোধের তো কোনো দোষ নেই—আমিই মেজোবাবুর পাড়ে গিয়ে পড়েছিলাম—তাতে তিনি রেগে সুবোধকে মেরেছেন। সুবোধ মার খেয়ে মার কিরিয়ে দিয়েছে—and I admire his bravery!” বলিয়া সুবোধের পিঠটা সে একবার থাবড়াইয়া দিল।

হেডমাষ্টার একটু ‘চূপ করিয়া রহিলেন।

সতীশ একটা গুট চাহনি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল—“কলকাতার এক Class-friendএর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি Sir, সেখানে স্থলে বেত-মারা তুলে দেওয়া হয়েছে।”

হেডমাষ্টার খানিকক্ষণ চূপ করিয়া কি ভাবিলেন। তার পর সুবোধকে সে দিনকার মতো রেংহাই দিয়া বলিলেন—“আচ্ছা! আমি

বোঁজ করে দেখণ—দোষ কার ? এমন তোমরা যাও।”

কিন্তু সে বোঁজ সেইখানেই শেষ হইয়াছিল ;
—এ সম্বন্ধে আর উক্তবাচ্য হয় নাই।

স্ববোধ কখনো যেত যায় নাই—যেত দেখিয়া তার আত্মপুরুষ ঠকাইয়া গিয়াছিল। যেতের হাত চেষ্টে নিরুত্তি পাইয়া সে ভাণে করিয়া নিখাম ফেলিয়া বাটিল। সতীশ যে তাকে বাটাইয়া দিয়াছে সে অস্ত্র একটা ক্রতজ্ঞতা সে মুখে প্রকাশ করিতে পারিল না বটে কিন্তু তার সমস্ত দেহ দিবা অস্তরের ক্রতজ্ঞতা ফুটরা উত্তিতে লাগিল। পাড়ারগেথে জুত বলিয়া স্ববোধের প্রতি সতীশ কোনো দিন ভালো করিয়া তাকায় নাই কিন্তু আজ স্ববোধের সেই আশঙ্কানীড়িত করণ মুখখানি দেখিয়া অবধি তার প্রতি কেমন একটি ঘেহের উজ্জ্বল তার অন্তর পূর্ণ করিয়া তুলিতে-লাগিল। স্ববোধ হস্ততথ্য হইয়া পাড়াইয়াছিল ;
—সতীশ তার হাত ধরিয়া বলিল—“চল তাই, ক্লাসে যাই।”

স্ববোধের অস্ত্র ক্লাসস্থক ছেলে শক্তি হইয়া ছিল। “যখন শুনিলাম তার কোনো শাস্তি হয় নাই তখন তারা একেবারে অবাক হইয়া গেল। সতীশ যে একেবারে অবতন ঘটাইয়া দিল! আশ্চর্য্য কমতা! সেই মুহূর্ত্ত হইতে সতীশের শক্তির অসীমতার উপরে তাদের একটা অপ্রাপ্য শ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল।

এখন হইতে সতীশকে মলপতি করিয়া ছেলেরা নির্ভরে স্কুলে বেড়াইতে লাগিল।

রাঘবাবুদের উপর তাদের যে সমীহ ছিল তাহা কর্পূরের মতো উবিধা গেল।

এই মলে সকলেই যোগ দিল কিন্তু বিফল পারিল না। বিফল এই ছেলে-বরসেই বুদ্ধি পাতিয়াছিল। সে বুদ্ধিল সতীশ অড়ের মতো চন্দ্রের অস্ত্র আসিয়া পড়িয়াছে ;—রাঘবাবুগা চিরদিনের,—চিরজীবনের। সতীশের অড়ে পড়িয়া সে যে কোথায় গিয়া পড়িবে তার ঠিক নাই। সেই অস্ত্র সতীশকে সে বড় ভয় করিত। এই অস্ত্রদিনের জীবনের মধ্যেই বিফল অনেক চুঃখ পাইয়াছে, অনেক দেখিয়াছে। তার গাশ কত ফিকির-কলি করিয়া, কত হিসাব করিয়া তাহের চুঃখের সংসার চালাইত তাহা সে প্রতিদিন দেখিয়া আসিতেছে। বিশেষ-আপদে রাঘবাবুরা যে তাদের একমাত্র ভরসা তাহা সে এত টুকু বেলা হইতে বৃষ্টিগাছে। সে যে স্কুলে বিনা-বেতনে পড়ে তাহা রাঘবাবুদের দোশতে। সে যে জুতা জামা কাপড় পরিয়া স্কুলে আসে তাও তার বাপ বারবাড়ী হইতে জিকা করিয়া আনিয়া ভোগাইয়াছে। শুনিয়াছে তার পিতামহ একসময় দেনার দ্বারে জেলে বাইতে বসিয়াছিল, সে-সময় স্বর্গীয় রাধকর্তব্য তাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কথা বিফল মনে জাঅল্য হইয়া ছিল। সে দিব্যরাত্র ভিতরে-বাহিরে রাঘবাবুদের করুণা বহন করিয়া বেড়াইত—কাজেই তাদের বিরুদ্ধ-মলের সহিত যোগে সেওরা কিছুতেই তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ছেলেরা অনেক টিটকারি দিল—খোসা মূলে বলিয়া তাকে উপহাস করিল কিন্তু ভবুও বিফল অচল অটল হইয়া রহিল।

রাগবাবু। স্কুলের ছেলেদের ধারা যখন এমনি ভাবে অপমানিত হইল তখন তারা মনে মনে পূর্ব চটিগা উঠিল বটে কিন্তু সতীশ আছে বলিয়া কিছু করিতে পারেন না। সতীশ যদি না থাকিত তাহা হইলে এখান হইতে ছেলেগুলোর চাতে-মাথা-কাটা হইত।

ছেলেদের প্রতি তারা একরকম উদাসীন হইল;—কেবল নিজেদের গর্বপ্রকাশের জন্য তাদের একটু আবশ্যক ছিল, এখন সে প্রয়োজনেরও মাথা কাটাইয়া রাগবাবু ছেলেদের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবধারণ করিল। মনে হইয়াছিল, এই উদাসীন ছেলেদের জ্বাংতে গিয়া লাগিবে; কারণ তাহা স্বচক্ষে প্রতিদিনই ত দেখে তাদের বাপ খুড়ার একটু প্রসন্ন মুখ, একটু সমস্ত চাহনি লাভ করিবার জন্য এই সব ছেলেদেরই বাপ-দাদারা উমেদার হইয়া ফিরিতেছে;—বড়-মামুষের এতটুকু কৃপাকণা পাইলে তারা নিজেদের খত জ্ঞান করে, —এরা তো তাদেরই ছেলে! কিন্তু স্কুলের ছেলেরা তাদের ঐ উদাসীনতার মোটেই বিচলিত হইল না, বরং এমনি ভাব দেখাইল যে তারা উহা গ্রাহ্যই করে না। বাবুদের মন ভারি দহিয়া গেল এবং ছেলেদের উপর একটা আক্রোশ বাড়িতে লাগিল। তখন তাদের মনে হইতে লাগিল, বড়মামুষের অহুগ্রহ লাভ করাটা যে কী তাহা ছেলেদের একবার সমঝাইয়া দেওয়া চাই; তাহা না হইলে কেমন করিয়া বুঝিবে যে তারা কতটা বঞ্চিত। এই অহুগ্রহ বিহীন উপর

গিরাই পড়িল—কারণ প্রকার সহিত অহুগ্রহ গ্রহণ করে এমন ছেলে তো আর ছিল না।

বিহীন তখন আদর দেখে কে! রাগবাবু তার সহিত এমন ব্যবহার আরম্ভ করিল যেন সে তাদেরই এক ভাই! সর্বদা বিহুকে কাছে-কাছে রাখা, একসঙ্গে স্কুলে আসা, স্কুল থেকে যাওয়া, টিকিনের সময় একসঙ্গে বাবার ভাগ করিয়া যাওয়া—এই রকম খুঁটিনাটি হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বরকমে তাকে অহুগ্রহে একেবারে প্রাণিত করিয়া তুলিতে লাগিল। কোথাও এতটুকু ফাঁক থাকিতে দিল না। সারসজ্জার ডোল হার ফিরিয়া গেল—এখন আর সে ছেঁড়া জুতা, ছেঁড়া জামা নাট, এখন সব ঝকঝকে চকচকে! এক সতীশ ছাড়া এমন পারিপাট্য আর-কারো ছিল না। ছেলেদের ঈর্ষা উত্তেজিত করিবার জন্য তাদের চোখের সামনে রাগবাবু বিহুকে লইয়া একেবারে মাতিয়া থাকিত। যে রাগবাবু গুমোরে কারো সহিত তালো করিয়া কথা কহিত না, তারাই আজ বিহুর পরামর্শ না লইয়া এতটুকু কাজও করে না। অনেক সময় এরা দেখাইয়া দেখাইয়া নিজেদের চেয়ে ভালো জিনিষ বিহুকে দিত এবং নিজেদের ছোটো হইয়া থাকিয়া বিহুকে বড় করিয়া ধরিত।

বিহু রাগবাবুদের দেবতার মতো দেখিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেই বিহু যখন দেখিল, যে-রাগবাবু তার ছায়া মাড়াইতে যুগা করিত—কাছে পড়িলে মুখ বাকাইয়া চলিয়া যাইত, সেই রাগবাবু তার এত

কাছে, হাত ধরিয়া কথা কহিতেছে, তখন তার ছোটো মনটি ওটাইয়া আরও ছোটো হইয়া গাইতে লাগিল। রায়বাবুদের কাছে আগে তার যতটা সন্ধ্যা ছিল এখন তার চেয়ে ঢের বেশী সন্ধ্যা সে ভিতরে ভিতরে বোধ করিতে লাগিল। এতটা দয়ায় যোগ্য সে কিছুতেই নয়—এই তার দৃঢ়বিশ্বাস। সেইজন্য রায়বাবুদের এতপানি অল্পগ্রহ গ্রহণ করিতে তার বুক কাঁপিত, হাত কাঁপিত—কিন্তু মনের ভিতর হইতে এমন সাহস পাইত না যে সেই ভট্টকুও সে প্রকাশ করে। সে যেন কলের পুতুল; রায়বাবুরা যাহা দিত মাথা নীচু করিয়া তাহা গ্রহণ করিত। তার অন্তরের মধ্যে তার অযোগ্যতার যে কুষ্ঠা ছিল তাহা প্রকাশ করাও হইয়া উঠিত না। এমন সাহস তার কোথায় যে রায়বাবুদের সামনে গাড়াইয়া যেমন-হোক্‌ ছোটো কথা সে কহিতে পারে?

বিষ্ণু অন্তর ক্রতজ্ঞতার ভরিয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু সে ক্রতজ্ঞতাও সে কথা দিয়া প্রকাশ করিতে পারিত না, ক্রতজ্ঞতার উজ্জ্বল বাড়িয়াই চলিতেছিল। এ কি কম কথা! রায়বাবুরা তাকে ভয়ের মতো দেখে। এ কথা ভাবিতেও যে তার সর্দাস শিহরিয়া উঠে! কিন্তু তাই তো সে পদে পদে প্রত্যক্ষ দেখিতেছে। সে বুঝে কিছু বলিতে পারিত না কিন্তু তার মনটা রায়বাবুদের পায়ে তলার ধূলোর মধ্যে লুটাইতে থাকিত। তার মনে হইত—আর কিছু নয়, রায়বাবুদের ঐ পা গাড়াইয়া মাটিতে লুটাইতে পারিলে যেন তার জীবন তৃপ্ত হইয়া যায়।

প্রথমটা সে বিশ্বাসই করিতে পারে

নাই;—মনে, হইয়াছিল রায়বাবুদের এ পরিহাস! কিন্তু পরিচাস তো আর দিনের পর দিন চলে না। কয়েকটো এতবড় অন্তর্য ব্যাপারটা তাকে বিশ্বাস করিতেই হইল। তার পর একদিন যখন বড়বাবু সকলকার সামনে তাকে বিদ্রূপা বলিয়া ডাকিল এবং তার দেখাদেখি অল্প ভায়েরাও তাই বলিতে লাগিল, তখন তার মনের অবস্থাটা যে কি হইল তাহা ঠিক বর্ণনা করা যায় না। সে কোণাকার কে—এক অতি নগণ্য গরীবের ছেলে, তাকে মহাপ্রতাপাধিত রায়বাবুরা দাড়া বলিয়া ডাকিতেছে—এর চেয়ে সোভাগ্য ভগ্নে আর-কিছু আছে বলিয়া কিছু মনেই করিতে পারে না। তার মতো গরীবের উপর রায়বাবুদের যে এতপানি দয়া তাহা বহন করিবার মতো শক্তি যেন সে নিজের মধ্যে হাতড়াইয়া পাইতেছিল না! এ যেন তার এতটুকু ক্ষমতার উপরে একেবারে আত্মকা এক বস্তুর মতো আসিয়া পড়িয়াছে—সে বিশেষ্য হইয়া গিয়াছিল।

গোড়া হইতেই বিষ্ণু রায়বাবুদের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। এখন হইতে একেবারে তার সমস্ত প্রাণটা তাদের কাছে বিদ্যায় প্রণত হইয়া রহিল। এমন কি, যদি মনে হইত রায়বাবুদের কঠিন ভূমি মাড়াইয়া চলিতে কষ্ট হইতেছে তবে বুকখানা সেইখানে পাতিয়া দিবার জন্য তার প্রাণ আকুলি-আকুলি করিত। তার মন বলিত, আর ত উপায় নাই—এমনি করিয়াই তো অন্তরের জগৎ পরিশোধ করিতে হইবে।

ছেলেরা বিফুকে সঙ্গে টানিবার কাজ অনেক চেষ্টা করিল—অনেক সাধাসাধনা করিল, অনেক ভয় দেখাইল, গাল দিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বিফু যে স্বপ্নেও রায়বাবুদের বিরুদ্ধে যোগ দিতে পারে এমন বিশ্বাস তার ছিল না। সে ছেলেদের স্পর্ধা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। তাদের কাজ সময় সময় তার একটু হুঃখ হইত,—হার, গোয়ার সত্যের পাল্লার পড়িয়া ছেলেগুলো কী সঙ্কল্পে কণ্ড করিতেছে! তারা কি জানে না ইচ্ছা করিলে রায়বাবু তাদের রক্ষিতে পারে,—নারিতে পারে।

ছেলেরা যখন বিফুকে কিছুতেই বাগাইতে পারিল না তখন তারা তাকে আট্টে-পুটে টিটকারি দিতে লাগিল। এমন সব কথা বলিতে লাগিল যাতে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখা শক্ত। রায়বাবু কিন্তু এই টিটকারি বিশেষভাবে উপভোগ করিত। কারণ তারা বৃক্ষিত এ টিটকারি তো আর-কিছু নহে—বিফু যে আদর পাইতেছে তারই কাজ এ গানের আশা! যতই এই গানের আশা প্রকাশ পাইত, রায়বাবু ততই খুশি হইয়া উঠিত।

বিফু প্রথম প্রথম এই টিটকারিতে ঢকল হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু যেদিন দেখিল রায়বাবু তাহাতে খুশি, তখন তারও মনটা খুশি হইয়া গেল। তখন সে কামনা করিতে লাগিল—উহারা যত পারে টিটকারি দিক! আমাকে অবলম্বন করিয়া এই যে রায়বাবুদের মন খুশি হইয়া উঠিতেছে এ তো আমার সৌভাগ্য!—আমার কী সাধ্য

আছে যে রায়বাবুদের আমি খুশি করিতে পারি! ছেলেদের টিটকারিতে রায়বাবু যখন হাসিত বিফু সে হাসিতে যোগ দিয়া রসান দিত। শেষে ছেলেরা দেখিল এমন বেহাষার সঙ্গে পারিয়া ওঠা শক্ত।

বিফু রায়বাবুদের কাছে একেবারে পুতুল বনিয়া গিয়াছিল বলিয়া বিফুকে লইয়া য: টঙ্ক তাই করিতে তাদের আটকাইত না। নইলে এতটা কি সম্ভব হয়? খেলার পুতুল শিশুদের ইচ্ছার কোনো বাধা দেয় না, তাই ছেলেরা পুতুল এত ভালোবাসে—পুতুল যদি জীবন্ত হইত তাহা হইলে ছেলেদের সঙ্গে কিছুতেই তাব বনিত না। রায়বাবু যে দিন অসুস্থ করিল বিফু পুতুলেরই মতো, সেট দিন হইতে বিফুকে লইয়া খেলা করিয়া মজা দেখিবার প্রবৃত্তি মনে জাগিয়া উঠিল। বিফু সে খেলার প্রতিবন্ধক হইত না, সেই কাজ খেলা দিন দিন জমিয়াই উঠিতেছিল—নইলে কবে ভাঙিয়া যাইত!

একদিন রায়বাবু বিফুকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল। বিফু একেবারে গলিয়া গেল। তার পর রায়বাবুতে উপস্থিত হইয়া যখন দেখিল, বাবুদের সঙ্গেই, তার আসন পাতা হইয়াছে তখন সে একেবারে অবাক! ইহার পূর্বে সে পুন্ডার সময় বাপের সহিত রায়বাবুতে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছে বটে কিন্তু তখন আহানের স্থান হইত উঠানে। কিন্তু এ যে একেবারে বাবুদের খামনহলে! এবার পাতা পাড়িয়া নহে—রুপের বাসনে! সে বাবুদের সঙ্গে খাইতে বসিয়া সন্ধ্যাতে এতটুকু হইয়া গেল;

ভালো করিয়া আহারে মনই দিতে পারিল না। রাত্রিবাস তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিল, তখন তামা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু বই পীড়াপীড়ি হয় ততই আরো লম্বাচে তার হাত শুটাইয়া আসে। বাড়ীতে যখন সে খাইতে বসে—কেহ তার খোজও লয় না; তাহা ঢাকা পড়িয়া থাকে সে ঢাকা খুলিয়া আপন-মনে গলাধঃকরণ করিয়া যায়—কম পড়িল কি না এ প্রশ্ন যে উত্তিতে পারে এ ধারণাও তার ছিল না। আত্মকর এই পীড়াপীড়িতে, এই আদর-যত্নে সে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল।

বিফুকে যতই খাইতে বলা হয়, সে খাইতে পারে না—ইহাতে রাত্রিবাস মজা পাষ্টরা গেল। যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন এক ভাই আসিয়া জোর করিয়া বিফুর মুখের মধ্যে খাবার পুরিয়া দিল। বিফুর গলা তখন কট—খাবার সে গিলিতে পারিবে কেন? নাবুর সেদিকে দৃষ্টি নাষ্ট, সে খাবারের পর খাবার পুরিয়া ঘাইতে লাগিল। বিফু গিলিতেও পারে না, ফেলিতেও পারে না। শেষ গাঁল দুটো খুলিয়া যখন চোখ অবধি ঠেলিয়া আসিল, তখন তার সেই মুষ্টি দেখিয়া রাত্রিবাস সমস্তরে হো-হো-করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিফু ক্যান্স দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এ মজাটা বিফু নিজে না দেখিলে পুণ্য জন্মিবে না বলিয়া ছোটোবাবু ছুটিয়া গিয়া একখানা আরনা আনিয়া বিফুর মুখেব সামনে ধরিল। বিফু খানিকক্ষণ নিজের সেই গোবিন্দ-জননী মুষ্টির পানে স্থির

হইয়া চাহিয়া রহিল—তার পর তার দুই চক্ষু দিয়া টুন্টুন্টু করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। রাত্রিবাস আবার যেমন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল বিফু মুখের খাবার ফেলিয়া দিয়া তাদের সঙ্গে উক্ত হাতে যোগ দিল—তখনও তার চোখের জল শুকাই নাই। জানি না, তার জীবনের এই প্রথম রাজভোগ বিফু পাতাভাতের চেয়ে বেশী উপভোগ করিয়াছিল কি না।

ইহার অল্প দিন পরে আর একটা মজা হইয়া গেল। রাত্রিবাসদের এক ভায়ে—ছোট্ট ছেলে—রামাচরণের গল্প শুনিয়া হুম্মান দেখিবার ব্যর্থতা ঘরিল। ছেলেটি সম্প্রতি শক্ত রোগ হইতে উঠিয়াছে—এ সময়কার ব্যর্থতা দীর্ঘস্থায়ী হইলে শরীরের ক্ষতি হইতে পারে মনে করিয়া সকলে চিহ্নিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু হুম্মান এখন পাওয়া যায় কোথা? অগত্যা বিফুকেই হুম্মান সাজিতে হইল। দুই গালে ভূষা মাখিয়া লম্বা লাঙ্গ পরিয়া হাঁকে গাছের ডালে গিয়া বসিতে চাইল। তার সেই মুষ্টি দেখিয়া ছেলেটি হাসিয়া খুন—আর সকলেও হাসিতেছিল। বিফুরও একবার মনে হইয়াছিল হাঙ্গ, কিন্তু পাছে হাসিলে হুম্মানী নষ্ট হইয়া যায় এই ভয়ে সে হাসি চাপিয়া গেল।

পরদিন ছেলেদের কানে এখনও কেমন করিয়া গিগা পৌছিল। তাহা বিফুকে লইয়া কৈপটেতে লাগিল। বিফু তাদের কথা হা-হা-হা-হা-হা করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তবুও যখন ছেলেরা ডাড়িল না তখন একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিকোণ করিয়া বলিল—“জান ত, হুম্মানের জগ্রেই রাক্ষসকুল নিম্ণল।”

রাহবাবুদের উপর সতীশের উপর এখন আর তেমন দৃষ্টি ছিল না। প্রথমটা ভাবের যতটা অস্থির সে দেখিয়াছিল, এখন আর তেমন বোধ হয় না—ভাবের অনেক গোচ-গাচ সমান হইয়া গেছে। সে এখন হুটনল রূপ, ভিবেটিং রূপ প্রকৃতি লইয়াই মাতিয়াছিল,—রাহবাবুদের কথা লইয়া মথ্য-মোহাইবার সময় ছিল না। রাহবাবু কিস্ত সতীশের দান্তিকতা ভুলিতে পারে নাই—যদি কখনো আগে পার একবার শিক্ষা দিলে এ সংকল্প তাদের মনে মনে ছিল।

বিষ্ণু অস্ত্র ছেলেদের গ্রাহ্য করিত না—তারা কি কবে, না কবে তার জন্ত সে কিছুমাত্র চিন্তিত ছিল না; কিস্ত সতীশকে সে মনে মনে ভয় করিত। এ ভয়টা যে কেন তাত্ত্বিক বৃত্তিতে পাবিত না। তবুও সতীশের নামে তার বুকটা কেনন হতবাক করিয়া উঠিত। তার মনে চাইত—সে যেম ইচ্ছা করিলে একটা প্রলয় বাধাইয়া দিতে পারে। পাছে সে সতীশের কোপদৃষ্টিতে পড়ে এই অস্ত্র তার মনে একটা আতঙ্কও ছিল।—সেই জন্ত প্রকৃতভাবে সতীশের কোনোরূপ বিকৃততা করবার সাহস তার ছিল না। বরক হুবিধা পাইলে এমন ভাব সে বাহিরে দেখাইত যে সতীশে সে অসুগত। রাহবাবুরা অনেকবার সতীশকে জল করিবার ফন্দি আঁটিয়াছে, বিষ্ণু সে সব শুনিয়াছে, একবার তার সুযোগও হইয়াছিল কিস্ত বিষ্ণুর সাহস হয় নাই। দেবার পরীক্ষার সময় সতীশ একটা কাগজে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া

সুযোগের কাছে চাপান করিয়া দিতেছিল। সুযোগ সে বছর অনেক দিন ব্যায়ের ভাগিয়াছিল, পড়াভনা কিছুই হয় নাই, পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার তাৎ কোনোই সম্ভাবনা ছিল না, অথচ উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে তার বৃত্তি বন্ধ হইয়া পড়াভনার দফা শেষ চাইবে। সে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে ছিল—কেবল সতীশ সাহস দিয়াছিল—কোনো ভয় নাই! এবং সেট জন্তই সতীশ এমনি করিয়া সুযোগকে পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার সাহায্য করিতেছিল। বিষ্ণু গোখে ইহা পড়ে। বিষ্ণুর মনে হইল সতীশকে জন্ত করিয়া রাহবাবুদের প্রীতিভাজন হইবার এই সুযোগ। ব্যাপারটা প্রকাশ করিয়া দিতে পারিলে সতীশের লাঞ্ছনার অবধি থাকিবে না। বিষ্ণু মাহসে তার করিয়া উত্তীর্ণ দাঁড়াইল কিস্ত সেই সময়টিতে সতীশ লিখিতে লিখিতে একবার অজ্ঞমনবৃত্তাবে যেমন মথ্য ভুলিয়া বিষ্ণুর দিকে চাহিল অমনি তার হুক কাঁপিয়া উঠিল—সে থপ করিয়া বসিয়া পড়িল। কি করিতে কি হইয়া পড়িবে ভাবিয়া বিষ্ণু এ কথা কারও কাছে আর প্রকাশ করিল না।

সতীশ যেদিন শুনিল রাহবাবুরা বিষ্ণুকে হতমান সাধাইয়াছে, সে কোনোরূপ বিজ্ঞপ করিল না, শুধু বিষ্ণুকে গোপনে ডাকিয়া তীব্র স্বরে বলিল—“যেমন এ সকল অপমান তুমি সহ কর।”

বিষ্ণু অস্ত্র ছেলেদের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল কিস্ত সতীশের কথাই হানিষ্ঠাটোর গুরলতা ছিল না বলিয়া সে কোনো উত্তর করিতে পারিল না। অপমান

সে তখন বোধ করিতে পারে নাই কিন্তু সত্যীশের কথাই ভিত্তর কি ছিল সেইটা অসম্মানের খোঁচা হইয়া এখন বিফুর বুকে গিয়া বিধিল। এখন সে সত্যাই বুলিল কত-বড়-একটা অপমান সে সহ্য করিয়াছে। সত্যীশের তিরস্কারের বেশ তার অন্তরের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া রণিত হইতে লাগিল; এবং তারই ভাষে রায়বাবুদের উপর একটা বিবেচ্য তার মনের মধ্যে ঘোঁরাইয়া উঠিতে লাগিল। সে অনেকক্ষণ গভীর হইয়া রহিল। তারপর রায়বাবু যখন তাকে আদর করিয়া ডাকিল তখন কণ্ঠেরে জন্ত তার মন বিমূৰ্হ হইয়া রহিল বটে কিন্তু সে যখন সাড়া দিল তখন তার মন সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া গেছে। রায়বাবুদের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে তার হঠাৎ একবার মনে পড়িল—সত্যীশকে। —সে চোখের সামনে দেখিল সত্যীশ যেন একটা প্রাণের বড়—কিছু মানে না, সর্ব্বদা উড়াইয়া লইয়া চলিয়া যায়! পাছে সেই বড়ের ঘূর্ণীর মধ্যে গিয়া পড়ে সেই ভয়ে তার সর্ব্বদা শিহরিয়া উঠিল। সে মনে মনে সেই সময় রায়বাবুদের পা সজোরে জাঁকড়াইয়া ধরিল।

সত্যীশকে পালাইয়া বেড়াইতে পারিলে বিফুর বাচিল কিন্তু ছাড়ো-ছাড়ো ভাব দেখাইলে পাছে সত্যীশ রাগ করে তাই সে একেবারে তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিত না। তা ছাড়া সত্যীশের সঙ্গে কথাই এইটে সে অসম্ভব করিত সত্যীশ বিফুরকে একেবারে তাক্ষিল্য করে না—তার জন্ত একটুখানি যেন তার জনের কোথার

সঙ্গিত হইয়া আছে—মধ্যে মধ্যে তার বিফুর উপর করিত হইয়া পড়ে। দমার পাত্র বলিয়া বিফুর উপর একটা মায়া সত্যই সত্যীশের ছিল। এবং সেই মায়ার টানে বিফুর জন্ত যে কথামেলা সে মধ্যে মধ্যে বলিত তাহা বিফুর জনম একেবারে উপেক্ষা করিতে পারিত না।

বিফুর এক একবার মনে হইত একটা বিষের মত যেন কি সত্যীশ তার মনের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে এবং তারই চাকলা সে মধ্যে মধ্যে সমস্ত শিব-উপশিয়ার মধ্যে অমুত্তর করিত। হঠাৎ এই দিব এতটা কান করিয়াছিল যে সে একদিন রায়বাবুদের কথা গ্রাহ করে নাই;—তাকে লইয়া মজা করিবার মজলিল হইতে যে ডাক আসিল তাহা উপেক্ষা করিয়া সে ঘরে বসিয়া রহিল। সে বলিয়া পাঠাইল শরীর অসুস্থ, আজ ঘাইতে পারি না। তারপর সেই কথা শুনিয়া রায়বাবুয়া যখন হৃৎসুড় করিয়া তাহার ভাড়া কুঁড়েয় আসিয়া হাজির হইল এবং ঘরের সহিত তার শরীর সখ্যে তৎপারধান করিতে লাগিল তখন সে একেবারে গলিয়া গেল। অরক্ষণের মধ্যেই কপট বোগসন্ধ্যা ছাড়িয়া সে রায়-বাড়ী আসিয়া হাজির হইল। এবং রায়বাবুদের সখ্যে তার মনের সমস্ত মানি তখনই মুছিয়া গেল। ইহার পর কয়েকদিন সে সত্যীশকে এড়াইয়া চলিয়াছিল এবং তার মুখের দিকে ভালো করিয়া তাকাইতে পারে নাই।

বিফুরকে যোজনাই সকল-বিকাল রায় বাড়ীতে হাজিরা দিতে হইত। তাকে

লইয়া রাহবাবুদের বেশ জমিল উঠিয়াছিল—সে যেন একটা নেশার ভ্রমিষ! তার ছদ্মও আসিতে দেবী হইলে বাবুও ভট্টকটু করিত। এমনি বোক চলিতেছিল। হঠাৎ একটা ঘটনার কয়েকদিনের অন্তর বিজুব রাহবাড়ীতে আসা বাবু হইল। বিজুব বাপ বসন্ত-রোগে মারা গিয়াছিল—পাছে দোঁরা লাগে এই ভয়।

বিজু অনৌচের দিন কয়েকটা একলাটি বাড়ীতে বসিয়া কাটাইতেছিল, রাহবাবুদের অন্তর মনটা এক একবার কেমন-কেমন করিত বটে কিন্তু তার চেয়ে একটা ভাবনা বেশী করিয়া তাকে পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল। সেই ভাবনাতে সে বাপের শোকও ভেঁমন করিয়া অস্থির করিতে পারিতেছিল না। এত-বড় সংসারের ভাবনা তারই বাড়ি এইবার পড়িল। সে যে কি করিবে ভাবিয়া কুল পাঠিতেছিল না—চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিল। টাকা যে কেমন করিয়া হোজগার চয় সে সম্বন্ধে বিম্বুনাজ্ঞ জ্ঞান তার ছিল না—অথচ এটা সে দেখিতেছে টাকা না হইলে সংসার চলে না। সে তো কাহাকেও কোথাও দেখিতেছে না—কেহ তো এই দুর্দিনে তার কাছে একবার আসিল না। তবে সাহায্য কে করিবে? এই বিপদ হইতে উদ্ধারের পথ তাকে কে দেখাইয়া দিবে?—এই ভাবনা সে দিনরাত ভাবিয়াও কিছু ঠিক করিতে পারিতেছিল না। রাহবাবুদের কথা তার মনে উঠিয়াছিল বটে কিন্তু রাহবাবুদের সামনে পাড়াইয়া মুখ ফুটিয়া কেমন করিয়া সে নিজের দুঃখের কথা জানাইবে? কোনো কথা

তো সে আজ পর্যন্ত নিজের থেকে বলিতে পারে নাই—বলিতে তার ভেঁমন ভয়-ভয় করিতে লাগিল।

এমনি করিয়া শুকনুখে একলাটি আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে এমন সময় সতীশ আসিয়া ছাঙ্গির হইল। আসিয়াই বলিল—“বড় দুঃখিত হলুম বিজু তোমাদের বিপদ শুনে!”

তার অন্ত দুঃখিত! বিজু জীবনে এই প্রথম এমন কথা শুনিয়া। তারপর সতীশ আসিয়া যখন মেহের সহিত তাৎ হাতখানা ধরিল তখন সে একেবারে গলিয়া গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সতীশ বলিল—“কাঁদিসনে ভাই, এ দুঃখ তো আছেই, একদিন না একদিন সবাইকে সইতে হবে।”

বিজু এই ক’দিন নিজেকে কী ভয়ানক নিরাশ্রয় মনে করিতেছিল, আজ হঠাৎ মনে হইল সে যেন একটা শক্ত আশ্রয় পাঠিয়াছে—সে সতীশকে আঁকড়াইয়া ধরিল। সতীশ তাকে মেহের সহিত বুকের মধ্যে ধরিয়া নিজের হাতে তার চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিল।

এর পর থেকে সতীশ রোজ একবার করিয়া বিজুর সহিত দেখা করিতে আসিত এবং খুঁটিয়া খুঁটিয়া সব কথা জিজ্ঞাসা করিত। বিজু একদিন সমস্ত দুঃখের কথা বলিয়া বলিল—“কি করি বল দেখি ভাই সতীশ?”

সতীশ বিজুব সমস্ত ভাবনাটাকে বেশ সুঁ দিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিল—“এর অন্তে ভাবনা কি? আমি তো শীঘ্রই বলকাতার চলে যাছি—তুমি আমার সঙ্গে এস, সেখানে

একটা চাকরার যোগাড় আমি ঠিক করে দেব! এখানে পড়ে থাকলে বিফু ভোমার পচে মরতে হবে।”

সতীশের মতো এমন গুপ্তন বিফুর কে আছে? বিফু বলিল—“তুমি যা বল ভাই, আমি তাই করতে রাজী।”

সেদিন ঘাইবার সময় সতীশ বলিয়া গেল—“বিফু তুমি কিছু ভেব না, আমি আছি।”

সতীশ আছে।—এ কথাটা নিজের অন্তরের মধ্যে হইতেও বিফু বেশ স্তম্ভিত পাঠতেছে।

তারপর দুই বজুতে মিলিয়া দিনের পর দিন কলকাতা ঘাইবার পরামর্শ করিতে লাগিল। ঠিক হইল অশোচটা শেষ হইলেই সতীশের সঙ্গে বিফু চলিয়া যাইবে।

ঘাইবার দিন বিফু বলিল—“সতীশ, একবার মায়বাবুদের বলে যোগা দরকার। তাদেরই আশ্রিত আশ্রয়। না বলে গেলে রাগ করতে পারেন। কি জানি শেষে কি হতে কি হবে।”

সতীশ কথাটা শুনিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল—“আজ্ঞা!”

বিফু বলিল—“তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি চট্ট করে সৈরে আসি।”

বিফু খানিক দূর ঘাইতে সতীশ কি মনে করিয়া বিফুকে ডাকিল, বলিল—“দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।”

মায়বাবু গিয়া পৌছিতে বাবুনা হুলা করিয়া উঠিল—“এই যে বিফু দা। এই যে বিফু দা।”

সকলে আসিয়া হাত ধরিয়া তাকে বসাইল।

বিফু একেবারে খতমত খাইয়া গেল—কোনো কথা কহিতে পারিল না।

সতীশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—“বিফু, তোমার কাজটা সেরে নাও।”

সতীশের কথাই বিফু যেন চট্কা ভাঙিল, সে যেন একটু সাহস পাইল, সেই সাহসের ‘দুর্গিন্দেব মাখার’ সে খুঁট করিয়া বলিয়া ফেলিল—“আমি বিদায় নিতে এসেছি।”

চারিদিক হইতে একটা বিস্মিত প্রশ্ন উঠিল—“বিদায়?”

বিফুর মুখে আর কথা নাই।

সতীশ তখন অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—“বিফু চাকরী করতে কলকাতায় যাচ্ছে।”

সতীশের দিকে কেহ লক্ষ্য করিল না, কথাটা যেন বিফুরই—এস্মিতাবে বিফুর দিকে চাহিয়া সকলে বলিল—“সে কি হয় বিফুনা! আমাদের ছেড়ে যাবে কোথায়? তোমার ছাড়ে কে?” বলিয়া সকলে মিলিয়া তাকে চারিদিকে ঘিরিয়া বলিল।

বিফু মুগ্ধ মৌচু করিয়া বলিয়া রহিল। সতীশ দাঁড়াইয়াছিল। মায়বাবুদের কেহ তার দিকে ফিরিয়া তাকাইল না। এই ভাঙ্কিলে সতীশের মুখের আগায় একটা বোঁচা আসিরাছিল কিন্তু সে সামলাইয়া গেল। সে কেবল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বিফুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিয়া উঠিল—“তাহ’লে চমু তাই, বিফু!”

বিফু একটা ক্যান-কেনে দৃষ্টি তুলিয়া সতীশের মুখের পানে চাহিল। সতীশ বিফুর প্রতি শুধু একটা কঠোর দৃষ্টি-ক্ষেপ করিল, তার পর গটগট করিয়া চলিয়া গেল।

ঐমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

ছুনিয়ার পশ্চিমতম নগর

মোটরকারে নগর ভ্রমণ

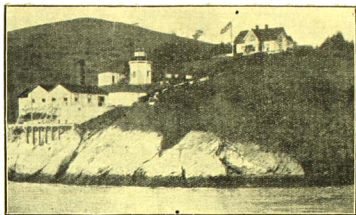
সেমিন Sightseeing Carএ বসিগা ডেন্ডার নগর দেখিরা লইয়াছি। আজ তান্ফ্র্যান্সিস্কা দেখিতে বাহির হইলাম। বাতরাতে প্রায় ৫০ মাইল হইবে—চারি ঘণ্টার পাল। মূল্য ৫. প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী ২৫১০ জন লোক বসিতে পারে। প্রদর্শক, আবেহাদিগের দিকে দৃষ্টি করিয়া, চালকের নিকট উপবেশন করে। তাহার নুখে একটা চোলা শাশান থাকে। ইহার ভিতর কথা বলিয়া প্রদর্শক সহজেই সকলের নিকটে নিজ বক্তব্য প্রচার করে।

তান্ফ্র্যান্সিস্কা সহরের কয়েকটা রাস্তা পার হওয়া গেল। সংরুট সন্মুখের সহিত সংলগ্ন পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এইরূপ সচর পূর্বে আর দেখি নাই। বার্কজিৎ, শিমলা ইত্যাদি ঠাকলে পাচাড় কাটিয়া সমতলভূমি প্রস্তুত করা হয়—তাহার উপর বাসগৃহ নির্মিত হইয়া থাকে; দুব হাতে সে গৃহগুলিকে সিঁড়ির স্তরবিভাগের অঙ্কন দেখায়। কিন্তু তান্ফ্র্যান্সিস্কা নগরের অল্প পাহাড় কাটিবার প্রয়োজন হয় নাই। তরঙ্গাক্রান্ত পর্বতের পূর্বে, বক্ষে, শিরোভাগে এবং পাদদেশে গৃহাবলী নির্মিত হইয়াছে। রাজপথ, উজান, দৌব, আলোকভঙ্গ্য সকলই এই অসমতল ভূমি উপর অবস্থিত। পাহাড়ের গায়ে বৃক্ষরাশি দেখণ দেখায়—তান্ফ্র্যান্সিস্কা নগরের অট্টালিকাবলী তিক সেইরূপই

দেখাইতেছে। যে কোন রাস্তা ধরিয়া চলিতে থাকিলে বৃক্ষ একবার উঠিতেছি একবার নামিতেছি—আবার উঠিতেছি আবার নামিতেছি। এই কারণে গৃহগুলি তরঙ্গাক্রান্ত বোধ হয়—সমস্ত নগরটাই যেন গৃহের তরঙ্গবক্রণ।

ডেন্ডার দেখিরা বাহ্যিকর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সৌন্দর্যময় নগরের একটা পরিচয় পাইয়াছিলাম। তান্ফ্র্যান্সিস্কা ডেন্ডার অপেক্ষা বৃহত্তর। জনসম্পদের প্রভাবও এখানে বেশী কিন্তু শিকাগো মিউইয়র্ক অপেক্ষা এই নগর বেশী সুশ্রী ও বাহ্যিকর বোধ হইতেছে। ইয়াকিরা এখানে নীল নভোমণ্ডল, উজ্জল স্থায়িকরণ, অসমতল পার্শ্বভূমি, বিভিন্ন উদ্ভিদরাশি এবং স্থানীয় সিদ্ধ প্রকৃতির দানবক্রণ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার সঙ্গে বিভাবল ও ধনবল প্রয়োগপূর্বক ইহারে ছুনিয়ার পশ্চিমতম প্রদেশে সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের কেন্দ্র স্থাপ্ত করিয়াছে। এই প্রাসাদপুরী দেখিবামাত্র প্রত্যেক ব্যক্তিই মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই।

মোটরকার উপসাগরের কিনারায় আসিল। এইখানে টিমারে ছড়িলাম। সাত মাইল সমুদ্রের হাওয়া খাইতে খাইতে অপর পারে পৌছিলাম। উপসাগরের ভিতর ছােকখানা রণতরী দেখা গেল। বন্দর রক্ষা করিবার অল্প উহা প্রহরীর কার্য করে। ক্ষুদ্র বীপও ছােকটা পথে পড়িল। একটাকে আলোকগৃহ নির্মিত হইয়াছে।



ডাঙার নামিয়া আবার মোটেবে বসা গেল। প্রদর্শক-কোম্পানীর ব্যবসায় সুবিস্তৃত—এখানে ওখানে সকল পাথরেই ডাঙাদের কাঁধে লেগে আছে। গাড়ী ওক্কাণ্ডে সঙ্গের ভিতর দিয়া চলিল। অত্যন্ত প্রাসাদ এবং প্রশস্ত রাজপথ ইয়াঙ্কিহানের সর্কট দেখিয়াছি—পশ্চিমতম জনপদেও এই সমুদায় লক্ষ্য করিতেছি। ওক্কাণ্ডেও প্রশস্ত কুলের বাগান রাজ্যের দুইধারে অনেক দেখিলাম। প্রত্যেক গৃহের সঙ্গেই কুত্রবৃক্ষ উদ্ভান সংলগ্ন। সবুজ পত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদের শোভা কালিকর্ণিমা প্রদেশের প্রায়স্ত হইতেই দেখিতে পাইয়াছি—ওক্কাণ্ডেও তাহার প্রাচুর্য উপলব্ধি করিলাম। সহরের নিত্য ব্যবসায়-পাড়ার ছাড়াইয়া আদিবার পর যেন কুত্রবনের ভিতর দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। নানাবর্ণের পুষ্পরাশি এই অঞ্চলের শোভার্থ্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

ক্রমশঃ বার্কলে নগরের ভিতর আসিয়া পড়িলাম। সুবিখ্যাত কালিকর্ণিমা বিশ্ববিদ্যালয় এই নগরে অবস্থিত। বিলাতের অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ যেমন বিত্ত-নগর, ইয়াঙ্কিহানের বার্কলেও সেইরূপ প্রধানতঃ ও সুখ্যাতঃ বিত্ত-নগর। এখানকার আব-হাওয়ার শিক্ষাপ্রচার ব্যতীত অল্প কোন অমুষ্ঠানের স্থান নাই।

ইয়াঙ্কিহানের প্রাচ্যতম প্রদেশে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। ছাত্রসংখ্যা কলম্বিয়ার বত আমেরিকার অল্প কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তত নহে। আজ ইয়াঙ্কিহানের পাশ্চাত্যতম প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত। ছাত্রসংখ্যা হিসাবে কলম্বিয়ার পরেই বার্কলের বিশ্ব-

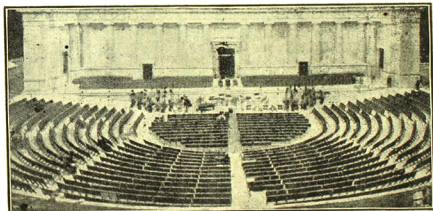
বিদ্যালয়, কিন্তু এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় যেকোন প্রাকৃতিক আবেষ্টনের ভিতর অবস্থিত, তাহার সঙ্গে কলম্বিয়ার তুলনা করিতে হইলে লক্ষ্যবোধ হয়। কলম্বিয়ার কলেজ ষ্ট্রীটের উপর মেনেট-হাউস, মেডিক্যাল কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ইত্যাদির অবস্থান স্মরণ করিলেই নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মালগুদামল্লন ব্যারাক-গৃহগুলির চিত্র কল্পনা করিতে পারা যায়। বিলাতের লোন্ডন ও ম্যাক্লেটর, অক্কাণ্ডের এডিনবরা এবং আরগণ্ডের ডাবলিন—এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ও অবস্থান হিসাবে নিতান্তই অবজ্ঞের। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজগুলির কোন-কোনটার নির্মাণকৌশল দেখিয়া পুলকিত হইতে হয়। কিন্তু মোটের উপর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যহিসাবে ইহারও হুনিয়ার পশ্চিমতম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হতশ্রেষ্ঠ। এমন সমগীর স্থানে জনগণের আর-কোন বিত্তা-মন্দির আছে কি না জানি না।

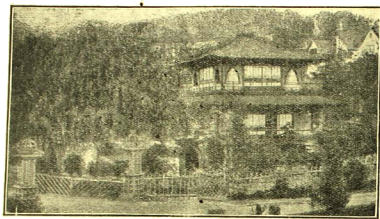
একটা পাহাড়ের পা হইতে কোমর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা-ভবন নির্মিত। দৌধগুলি একটা সুবিস্তৃত উদ্ভানের ভিতর স্থাপিত হইয়াছে মনে হয়। অজ্ঞাত স্থানে আগে গৃহনির্মাণ করিয়া পরে গাছপাতা বাগান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। এখানে প্রকৃতি-রচিত বাগানের অভ্যন্তরেই বিত্তা-মন্দির তৈয়ারী হইয়াছে। পাহাড়ের শিরোভাগ আজ কুরাণায় আচ্ছন্ন দেখিলাম—অর্থাৎ বৃক্ষাশ্রয় বৃক্ষ এই পর্য্যন্তকে নিবিড় ভাবে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শ্রেণি আটকম করিয়া পদক্ষেপের কটদেশে উপস্থিত হইলাম। এইখানে তরুণরসমাস্ত্র নিবৃত্ত স্থান দেখা গেল। প্রদর্শকের কথা অহুসারে গাড়ী হইতে নামিলাম। প্রাচীন গ্রীকেরা তাহাদের রসমঞ্চ দ্যে প্রাণালিতে প্রস্তুত করিত, কালিকর্ণিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় সেই প্রাণালিতে একটা মাটিমঞ্চ তৈয়ার করিয়াছেন। মঞ্চের উপরে কোন ছাদ নাই, পশ্চাতে কতকগুলি গৃহ, তাহার আটীর মাত্র দেখা যায়। মঞ্চের সম্মুখে স্বর্ভগোলাকৃতি স্থান—তাহার উপরেও কোন ছাদ নাই। এই স্থানে দর্শক ভঁ শ্রেষ্ঠমণ্ডলী উপবেশন করিতে পারে। জুনিয়ার এই “গ্রীক থিয়েটার” যুক্তরাষ্ট্রের কতিপয় সভাপতি বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন। নাট্যাভিনয়ের অল্প বিশ্ববিদ্যালয়ের শোকের। এই মঞ্চ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বার্কলে নগরের রাস্তা দিকে যাওয়া গেল। চারিদিকে ফুলের

বাগান 'ও ফলের বাগান। লাল নীল কীট বেগুনী রংয়ের ফুল, সবুজ তৃণমণ্ডিত জমি, এবং পত্রসম্বিত সুবৃহৎ বৃক্ষযাত্রী সর্বত্রই দেখিতে পাইতেছি। ক্রমশঃ পদক্ষেপের উচ্চ-তর অংশে আসিয়া পৌঁছলাম। এই অঞ্চলের বাগান বাড়িগুলি নিত্যই প্রমোদভবনবন্ধন। অবশেষে একুশাঙের এক উচ্চতানে আসিয়া গাড়ী নামিল। এইখানে গন্ধক-স্বরূপ দেখিবার জিনিষ। এতদ্বন্দ্ব নগরের বিভিন্ন অংশেই প্রাকৃতিক শোভার পূর্ণ দেখিতে-ছিলাম, কাজেই এই উচ্চতানের তরুণতা ফুলফল দেখিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইলাম না। ইহার ভিতরে জাপানী মৌক্তিতে নির্মিত একটা চা-পানের গৃহ আছে। সর্বাংশেই উন্নতযোগ্য এখানকার চিত্র-ভবন। এই ভবনে প্রায় পাঁচশত অতুল প্রতীক চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। রূপ, ফরাসী, জার্মান, ওলন্দাজ, ইতালী, ইতালীয় ইত্যাদি সকল শিল্পীর কার্যকার্য এই ভবনে দেখিতে





পিতৃহত বাগানে ভাপানী চা-গৃহ

পাইলাম। একমাত্র এই চিত্রগুলি দেখিবার জন্যই একবার এই উद्याনে আসা উচিত। চিত্রগুলির বর্ণিত বিষয় বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রদর্শককে চেষ্টিত দেখিলাম।

চিত্র-ভবন হইতে নৃতন পথে ফেরি-ঘাটে উপস্থিত হওয়া গেল। টিহায়ে বসিয়া দেখিলাম জনস্রাব্দান্দিয়া হইতে হাজার হাজার নবনারী টিহায়ে পার হইয়া আসিতেছে। দিব্যভাগে কর্ম করিয়া ইহারা সন্ধ্যাকালে গৃহে ফিরিতেছে। হাবড়া ও নিম্নলদহ ষ্টেশনযন্ত্রেও সন্ধ্যাকালে এই দৃশ্য দেখা যায়। ওকলাত ও বার্কলে ক্যান-ফ্রান্সিস্কোর উপনগর।

ক্যালিফোর্নিয়ার সম্পদ

কি দিনে কি রাজ্যে প্রদর্শনী-নগরের নৌখগুলি যতবার দেখিতেছি ততবারই মনে হইতেছে যেন অগণিত ভাঙ্গমহলের মেলা বসান হইয়াছে। প্রদর্শনীতে সাধারণতঃ

যে সমুদায় ভ্রম্য থাকা উচিত, গৃহসমূহের ভিতর সবই দেখিতে পাইলাম। তাহার তালিকা করিয়া লাভ নাই। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে ছনিয়ার কৃষ, শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভাগে যত প্রকার উন্নতি হইয়াছে সে সকলই এখানে সংগৃহীত। প্রদর্শনীগুলি বর্তমান যুগের সভ্যতা মাপিবার এক প্রকার কল-বিশেষ।

দুই তিন বৎসর পূর্বে এলাহাবাদে বিরাট প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। বাহারা সেই প্রদর্শনী দেখিয়াছেন তাঁহাদের এই বিশ্ব-মেলা না দেখিলেও চলিতে পারে। প্রদর্শনীতে প্রদর্শনীতে পার্থক্য করা বড় কঠিন। প্রত্যেকটাতাই আর এক ধরণের বস্তু দেখা যায়—কতকগুলি জিনিষ হয় ত একস্থানে দেখা, অন্য কতকগুলি অন্য একস্থানে বেশী। কাজেই যে কোন দুই প্রদর্শনীর প্রভেদ বুঝিতে হইলে বিশেষজ্ঞের জ্ঞান প্রত্যেক বিভাগে উল্লেখ্য দেখা আবশ্যক। কিন্তু

গুরুপ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিবার সময়, সুবিধা ও যোগ্যতা বহু লোকের নাই। স্বাধীনদেশের রাষ্ট্রকর্তৃক বিচক্ষণ ধূরন্ধরেরা এই কার্যের জন্ত নিযুক্ত হন। তাঁহারা নিজ নিজ বিভাগের সকল প্রকার খুঁটিনাটি বুঝিবার জন্ত প্রদর্শনীতে বহুক্ষণ কাটাষ্টয়া থাকেন। পবে বহুদেশে ফিরিয়া গিয়া তাঁহারা সমাধের কর্তব্য-নির্দ্ধারণে সাহায্য করেন। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার লোক প্রদর্শনী দেখিয়া উপকৃত হন। যাহারা শিল্প, কৃষি, ব্যবসায়, বিজ্ঞানের ইত্যাদির পরিচালক তাঁহারা নানাবিধ সংগৃহীত ব্রণের সাক্ষাতে আসিলে সহজেই ভবিষ্যতে লাভবান হইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন।

জানুয়ার্সিয়ারের বিশ্বমেলায় এই দুই শ্রেণীর লোকই নানা দেশ হইতে আসিয়াছেন। উদাহরণ্য প্রদর্শনীর নানা বিভাগ দেখিয়া নিজ নিজ অসম্পূর্ণতাগুলি সংশোধন করিবার প্রাণী চিন্তা করিতেছেন। ভারতবর্ষ হইতে এই ধরনের বিচক্ষণ লোক একজনও আসেন নাই। এমন কি ভারতবর্ষে আত্মকল ছোট-বড় বহু প্রদর্শনী খোলা হয় সেগুলি দেখিয়া যথার্থরূপে শিক্ষালাভ করিবার জন্ত কখনও ভারতবাসী চেষ্টা করেন, জানি না। বোধ হয় ভারতীয় প্রদর্শনীলব্ধ হইতে দেশীয় লোকের ভিতর ঘোষিত শিক্ষাবিস্তার হয় না। বরং ইচ্ছা, ইংরাজ, জাপানী ইত্যাদি বিদেশীয় ব্যবসায়ী ও পর্যটকেরা এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ভারতীয় লোকজনের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ভবিষ্যতে দখল করিবার পন্থা বুঝিয়া লন। এলাহাবাদের বিখ্যাত প্রদর্শনী

হইতে ভারতবাসীর লাভ অপেক্ষা ক্ষতি বেশী চইয়াছে মনে হইতেছে।

জানুয়ার্সিয়ারের এই মেলায় ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশের খাত্ত-রক্ত-পত্ন-লম্পদ বিশেষভাবেই সংগৃহীত হইবার কথা। যখন যে কেন্দ্রে বিশ্ব-সংগঠন কর তখন সেই কেন্দ্রের পার্থক্য জনপদই বিবেচ্য প্রচারিত হয়। এইবার ইয়াকিমোনের পশ্চিম প্রদেশ এবং বিশেষভাবে ক্যালিফোর্নিয়া সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িলে।

মেডাডা পর্বতের শৃঙ্গেই রেলগাড়ী ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশে চলিতেছে। তখন এই অকলের, আকর সম্পদ দেখিতে পাইলাম। অমল্য: নিম্নতম ভূমির উপর দিয়া গাড়ী চলিতেছিল। তখন মনে হইতেছিল বাঙ্গলা দেশের কথা আর সেই মিশরের কথা—
“এমন স্থান নবী কাহার, কোথায় এমন ধূম পাহাড়
কোথার এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশতলে যেনে
এমন ধানের উপর ডেউ খেলে যার বাতাস কাহার মেনে।

* * * *

শূণ্যে শূণ্যে তারা শাবী, কুণ্ডে কুণ্ডে গীর্থে শাবী
গুরুগিয়া আগে অগ্নি পুতে শূণ্যে ধোহে,
দে দে শাবীর ডাকে গুমিরে পড়ে শাবীর বাসে মেলে।

সুজলা সুফলা শতক্রমলা ক্যালিফোর্নিয়া-ভূমির ফুল-গাগান, ফল-গাগান, কৃষিক্ষেত্র, পত্র-চারণের মাঠ ছনিয়াবাসীর দৃষ্টি আকর্ষিত করবে তাহার আশংকা কি? মাত্র ৪০০০ ১২৭৪ হইল এই প্রদেশে বসতিস্থাপন যথার্থভাবে আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ৫০ বৎসরের ভিতর এই ধনধান্যপুষ্পভরা জনপদের সমৃদ্ধি কতগুলি ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত কৈ বলিতে পারে?

প্রদর্শনী-মগরের সুবৃহৎ ক্যালিকর্ণিগা-
ভবনে প্রবেশ করিয়া এই প্রবেশের সকল
সম্পদ একত্র দেখিয়া লইলাম। লতাপাতা
ফুলফল নবমণী পূর্ণতসাগর ইত্যাদি বিভাগ
হইতে উদ্ভাবিত ধনাগমের উপায়সমূহ এই
মৌখে প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন্ কোন্
অঞ্চলে প্রচুর ধনলাভের সুযোগ আছে
তাহা দর্শকগণকে বুঝাইবার চক্রে নানা
প্রকার বিভ্রাট ও পুঞ্জিকা বিতরিত
হইতেছে। কৃষিকার্য ও পশুপালন সম্বন্ধেই
লোকজনের দৃষ্টি বেশী আকৃষ্ট হইল।
অশেষবিধ ফলমূল শাকসব্জীর নমুনা
দেখিলাম। ফলমূল বহুকাল অবধি তামা
রাখিবার প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে।
ফলমূলের চাষে বৈজ্ঞানিক রীতি অবলম্বন
করিয়া ক্যালিকর্ণিগার প্রথার বার্ষিক
প্রসিদ্ধি চইয়াছেন। তাহার উদ্ভাবিত
প্রণালীর নিদর্শনসমূহও দেখিতে পাওয়া
গেল।

সোনার ক্যালিকর্ণিগার ইরোরোপের
নানা স্থানের নানা সৌন্দর্য একত্র দেখিতে
পাওয়া যায়। “জমায়ে চাঁদের সুখা বিধি
গড়েছিল তার।” ইরোরোপের সঙ্গে তুলনার
এই প্রদেশের কৃষিসম্পদও যথেষ্ট।

ভারতবর্ষের এক প্রদেশসম্বন্ধে আমরা
প্রাকৃতিক শোভা ও কৃষিসম্পদ নিরূপিত
ভাষার বর্ণনা করিয়া থাকি :—

“সবার—সবার হইতে নদ্র
যাহার শক্ত, যাহার নীর।
যাহার কুঞ্জে বিঘন গাইছে
গুঞ্জরি তব বাবাস ঐর,
যাহার কাননে বহিরা বাইছে
সুস্বতীক পবন বীর।

যেবার পাহাড়। যেবার পাহাড়।
দূর বাহার জুগ শির।
বর্ণ হইতে জোৎস্না নাথিয়া
ভাষার বাহার কানন-ভীর।
মাধুরী বস্ত্র কুণ্ডলে জালিয়া
দুবার করে রবপী-ভীর;
শৌর্যে তেজে ও শুভচরিতে
কে দম বেধার-হৃদয়ীর।”

অতরাং বাঙ্গালী ক্যালিকর্ণিগার গৌরব
সংক্ষেপেই বৃত্তিতে পারিবে।

চীনা-টোলা

উত্তর-ভারতের পার সকল সংরেই একটা
করিয়া বাঙ্গালী-টোলা আছে। কান্টিক
বাঙ্গালী-টোলা প্রপ্রসিদ্ধ। আমেরিকার বড়
বড় সংরে একটা করিয়া চীনা-টোলা দেখিতে
পাই। মিউইজর্ক, শিকাগো এবং স্যানফ্রান-
সিস্কোর চীনা-পাড়াগুলির নাম পর্যটক-
মাত্রেই শুনিতে পান।

মার্কিন বেশ জিনিষের বারইয়াসিতলা—
ইরোরোপ ও এশিয়া হইদিক হইতেই
এখানে লোক আসিয়া বাস করিতেছে।
বলাবাহুল্য পশ্চিম জনপদে এশিয়াবাসীর
প্রভাবই বেশী। চীনা ও জাপানী নরনারীর
সংখ্যা এই অঞ্চলে অত্যধিক—এমন কি
কয়েক হাজার ভারতীয় শিশু এবং
পাক্কাবীণ এবং নারীর অধিবাসী। মার্কিনেরা
ইরোরোপীয় জনগণকে সামরে গ্রহণ করিতে
চাহে, কিন্তু “প্রাচ্য-দেশীয় লোকের
উপনিবেশ-স্থাপন আদৌ পছন্দ করে না।
ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকার বাহাতে
লোক আসিতে না পারে, তাহার বিশেষ
যত্নই ইয়াকি-রাষ্ট্র করিতেছেন। এমন

কি ভারতীয় ছাত্রগণের আগমন এই বিধানে যথেষ্ট বাধাপ্রাপ্ত হইবে। ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ; সুতরাং ভারতবাসীর বিরুদ্ধে আইন জারি করিতে যাইয়া ইহাঙ্কিতের কোন বাধা পাইতে হয় না। অধিকন্তু ভারতীয় নরনারীর সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে অতিশয় অল্প—এই কারণে তাহাদের প্রত্যবে ইয়াঙ্কি-সমাজের হুকুম কুণ্ডল বেধে বটে না। কিন্তু চীনা ও জাপানীদের লইয়া মার্কিনদের মহাবিপদ। জাপানকে অসমুদ্র করা যুক্তরাষ্ট্রের নিত্যই ইচ্ছাবিষয়—জাপানের ক্ষমতায় ইহাঙ্কিতা সভ্যতাই আশঙ্কিত, কাজেই জাপানীদের বিরুদ্ধে আইনজারি করিবার পূর্বে ইহাদিগকে বিশেষ চিন্তাবিত্ত হইতে হয়। ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশে বহু জাপানী বসতিস্থাপন করিয়া বসিয়াছে। ইহাদিগকে ঘন ভেন একায়েন এখন হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য ক্যালিফোর্নিয়া-রাষ্ট্র অতিশয় চেষ্টিত। জাপানের সঙ্গে এই বিষয় লইয়া লড়াই বাড়িবার আশঙ্কাও কম নয়। কোন কোন ইয়াঙ্কির মুখে শুনিতে পাই—“জাপানীরা যদি ক্যালিফোর্নিয়া দখল করে, তাহা হইলে আমরা নেভাডা পর্বতের পূর্বে অকলে যাইয়া বাস করিব,—জাপানের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিব না।” জাপানের সঙ্গে মার্কিনদের ঘন কষাকষি অত্যধিক চলিতেছে। ক্যালিফোর্নিয়া রাষ্ট্র হুঁকুম হলে কিছু কাঁচা কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহা সাম্প্রদায়িক তুদবার জন্য ফেডার্যাল রাষ্ট্র যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন। যাহা হউক, ইহাঙ্কিতের জাপান-বিত্তীযিকা যে কোন মুহুর্তে একটা

বিগম কাঁকার ধারণ করিতে পারে। এই লুপ্তই আশঙ্কাল জাপানীতে ও ইহাঙ্কিতে বন্ধুত্ব, সদ্ভাব, সম্মিশন ইত্যাদির বহুবিধ অমুঠান দেখিতে পাট। কারণ “সেটার বতই অত্যাগ হব, ততই সেটা বগতে হবে।”

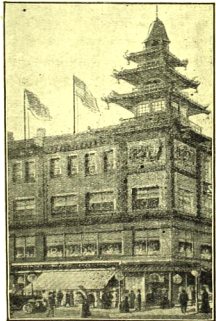
ভারতবাসীর মা-বাপ নাই; কাজেই মার্কিন রাষ্ট্রে এক কলমের খোঁচার ভারতীয় সমস্তা সমাধান করিতে পারেন। চীন বাধীন বটে এবং আশঙ্কাল স্বরাজ বা প্রজাতন্ত্র-পাশনের পর হইতে চীনারা ইহাঙ্কিতের মহাবন্ধু হইয়া পড়িয়াছেন সভ্য, কিন্তু চীন অতি দুর্বল—তুনিয়ার বাহার স্বরূপ—স্বাভাব্যহীন মেরুগ্রহীন “কোম্পানীর নাগড়া”। সেদিন পর্য্যন্ত মিশরের যে দুঃবস্থা ছিল, তুরস্কের আশঙ্ক যে দুঃবস্থা রহিয়াছে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের যে দুঃবস্থা ছিল, চীনের এখন সেই দুঃবস্থা। শক্তিশীন চীন-সমাজ কশ, ইংরাজ, জার্মান, জাপানী ও ইহাঙ্কি এই পাঁচজাতির প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। কাজেই চীনদেশে আশঙ্কাল চীনাগের গলায় আওরাজ শুনিতে পাওয়া কঠিন। চীনের হাতে কখনও ইংরাজের গলা, কখনও ইহাঙ্কির গলা, কখনও জার্মানের গলা শুনিতে পাই—চীনাগের গলা শুনিতে কখনও পাই কিনা সন্দেহ। এই হ-ল-ব-ল-রের ভিতর ইহাঙ্কিতা নিচেদের প্রতিপত্তি কিছু শ্রেষ্ঠী বকমেই স্থাপিত করিয়া লইয়াছে। চীনারাও ইহাঙ্কি-দিগকে খুব ভালবাসে—ইহাঙ্কি-সমাজকে সকল বিষয়েই ইহাংরা স্তম্ভ ও পথপ্রদর্শক এবং উদ্ধারকর্তা বিবেচনা করিতেছে।

ইয়াকিরা যুবক চীনের জন্মসময় সন্ধ্যা
প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কাজেই রাষ্ট্র ও
আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ হিসাবে চীনাগণের সঙ্গে
ইয়াকিদের সেন্স-সেন্স বেশ জ্ঞে-বুদ্ধকেই
চলিয়া থাকে। কিন্তু রক্তসংমিশ্রণ, শ্রমজীবী-
সমাজ, পারিবারিক ও সামাজিক কার্যকলাপ
ইত্যাদি সম্বন্ধে ইয়াকিরা চীনাগণকে ও
ভারতীয় ও জাপানী হইতে পৃথক বিবেচনা
করে না। এইজন্য চীনা মরনারীগণকে
ইয়াকিহানে মলে মলে গ্রহণ না করিতে
দিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বহুবিধ আইন
আছে। ইয়াকিরা ভারতবাসীদের সম্বন্ধে
কোন সংবাদই রাখে না—জাপানীদিগকে
প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু বিবেচনা করে—ও
চীনাগণকে বন্ধুভাবে আদর করে এবং
ভাণ্ডারের পিঠে হাত ব্লাইয়া কাপ হাসিল
করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এই চীন
জাতীয় লোকের কোন ব্যক্তিকেই ইয়াকি
মার্কিনদেশে বসতি-স্থাপনের জন্য আশ্বাস
করিতে চাহে না। সকল এসিয়াবাসীর
উপরেই ইয়াকিদের ঘৃণা অত্যধিক।

বর্তমানে চীনা-টাউন বা চীনা-টোল
ইয়াকিহানের বড় বড় নগরমাত্রেরই আছে—
বিগত ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরের ভিতরে
এইগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। কাজেই এক্ষণে
এগুলি কোন আইনের আওতা উঠিয়া দেওয়া
সম্ভব নয়। তবে ভবিষ্যতে বাহাতে চীনাগণের
আবদানী কম হয়, তাহার জন্য বিশেষ
কঠকগুলি Immigration Rules প্রচারিত
হইয়াছে।

কলিকাতার চীনা-বাড়ার চীনা-মাই
এখনতঃ এবং বিশেষভাবে সুচিহ্নিত করে।

ছুতার-মিরির কাণ্ডে চীনাগণকে আমরা
দেখিতে পাই। আমেরিকার চীনা-
টোলগুলি কেবলমাত্র ছুতারপাড়া বা সুচিপাড়া
মাত্র নয়। এখানকার নগরের চীনাপাড়ার
অগ্রাঙ্গ পাড়ার জায় ধনীদরিদ্র, শিল্পী,
দোকানদার, দর্জী, হোটেলওয়ালা ব্যাংকার,
ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকই থাকে।
মিউজিক, পিকাপো, ভান্ডান্দিয়া ইত্যাদি
নগরে নিয়োগপাড়া, ইয়াকিপাড়া, জাপানপাড়া,
গোলপাড়া, ইতালীপাড়া ইত্যাদি নানাভাষির
বড় বড় পাড়া আছে। প্রত্যেক পাড়াতেই
ভিন্ন ভিন্ন ভাষার অন্তর্গত সকল সম্প্রদায়ের



শোকই বাস করে। চীনাপাড়াতেও ঠিক সেইরূপ চীনা সমাজের সকল প্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়। চীনাদের মন্দির, হোটেল, নাচঘর, গিটেটার, ব্যাংক, বিজ্ঞানগর, সভাসমিতি ইত্যাদি সকলেরই প্রতিষ্ঠা চীনা-টোলার আছে। তান্ত্র্যান্দিয়ার চীনা-টোলার অধিবাসীরা চীনা ভাষায় টেলিফোন পর্বাস্ত ব্যবহার করিয়া থাকে। এইরূপ টেলিফোন-কোম্পানি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সকল কারণে পর্বাটকেরা চীনা-টোলার বেড়াইতে আসা একটা অবশ্য-কর্তব্য কার্যের মধ্যে গণ্য করে।

চীনা-টাউন দেখিবার অল্প নগর-প্রদর্শক-কোম্পানীর মোটরকারে বসি গেল। নৈশ-ভোজনের পর বাহির হইলাম। মৃণা দিতে হইল তিনটাকা। যে গাড়ীতে বসিলাম, তারার ভিতর আর পকাশজন পুরুষ ও রমণী। এইরূপ গাড়ীভরা 'টুরিষ্ট'র সঙ্গে রাস্তার অনেকবার দেখা হইল।

নগর প্রদর্শন-কার্য্য এদেশের একটা বিশেষ ব্যবসায়। এমন্ত কোম্পানী সকল প্রকার ব্যবস্থা পূর্ণ হইতেই করিয়া থাকে। কোন্ কোন্ বাড়ীতে বাইতে হইবে—কোন্ কোন্ শোকের সঙ্গে আলাপ করিতে হইবে—কোন্ কোন্ পরিবারের পরিচয় দেওয়া হইবে—কোথার কোন্ ব্যক্তি বক্তা ও প্রদর্শকের কার্য্য করিবেন—এই সকল বিষয়ই বাঁচি বাৎসরিক নিয়মে নির্দ্ধারিত করা হয়। পর্বাটকেরা কোম্পানীর আশ্রয় লইয়া নগরস্থ কোন কোন জিনিষ অতি সহজে বুঝিতে পারেন। এমন কি ফ্যাক্টরী, বিজ্ঞানগর, সভাসমিতি ও কৃষিক্ষেত্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান

দেখা সম্বন্ধেও প্রদর্শক-কোম্পানী সাহায্য করিয়া থাকে।

গাড়ী নগরের নানা নৈশ-বৃক্ষের ভিতর দিয়া এক চীনা-মন্দিরের নিকটে আনিয়া গাড়াইল। এই মন্দির দেশাইরা বক্তা বলিলেন—“কয়েক বৎসর হইল চীনা-দের সম্মত এই নগরের অজ্ঞাত অট্টালিকার সঙ্গে ভূমিসাৎ হইয়াছিল। ১৯০৬ সালের ভীষণ ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডের কপা মনে করুন। কিন্তু এই মন্দিরে ধনবান্ চীনা-দের আসা-যাওয়া আছে। কাজেই অল্পকালের ভিতরই কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে মন্দির পুনরায় নির্মিত হইয়াছে। চীন-দেশ হইতে সকল প্রকার মাল-মসলা ও উপকরণ আনা হইয়াছিল।”

মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বক্তা বেশ সরসভাবে চীনা-দের ধর্ম, পূজা, দেব-দেবী, আচার-ব্যবহার, বিবাহ-পদ্ধতি, ও শবসংস্কার ইত্যাদি নানা বিষয়ের গল্প করিলেন। মন্দিরের ভিতরকার কারুকার্য্য, মূর্তি, সিংহাসন ইত্যাদির ভিতর উচ্চ অঙ্গের শিল্পকর্ম বিস্তারিত। বক্তৃতা হইতে দর্শকেরা তাহাও বুঝিতে পারিল। বর্তমানে খ্রীষ্টানদের পক্ষে দেবতাপূজা, আরাতি, দেবমন্দির প্রার্থনা ইত্যাদি জঘন্যদ্রব্য করা কঠিন। কাজেই চীনা-ধর্ম প্রণালী ইহাদের নিকট অদ্বিতীয় বোধ হইল। আমি দেখিলাম মূর্তি-পূজা যে যে দেশে আছে, সেই সকল দেশেই পূজা-প্রণালীও ঘোড়ের উপর এক প্রকার। ভারতীয় জনগণ চীনা-মন্দিরের আসবাব-অনুষ্ঠান ও রীতি-পদ্ধতিতে নিজেদের সুপরিচিত বস্তুই দেখিতে পাইবে। কাশর-ঘন্টা বাজাইয়া চীনা-পুরোহিত দেবতার

নিম্নাভঙ্গ করাইয়া থাকেন, দিবারাত্র
আগুন আলাইয়া আলোক-রক্ষা করা চীনারা
বিশেষ আবশ্যক বোধ করে। যেহেতু
পরিধান করা অশৌচের লক্ষণ বিবেচিত হয়।
দেবতার “চালী”তে অসংখ্য মূর্তি সংস্থাপিত
দেখিলাম। চালী অগাগোড়া পোনার পাতে
মোড়া। এই স্বর্ণমুক্তি সিংহাসনের ভিতরে
ও উপরে বহু স্বর্ণমুক্তি দেখিয়া সাধারণ হিন্দুরা
তাঁহাদিগকে সহজেই তেত্রিশকোটি দেবদেবীর
অন্ততম বিবেচনা করিবে। ব্যক্তিগত পক্ষে
মূর্তিগুলির আকার যদি চীনাভাষিতর অসুস্থক না
হইত, শিক্ষিত হিন্দুও তাহা হইলে এইরূপই
বিবেচনা করিতে বাধ্য হইতেন। অন্তঃঃ,
যাহারা বহুদেবদেবীর মূর্তিতে মনোনিবেশিত
আকৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহারা চীনাধর্মে
হিন্দুপ্রভাব ও হিন্দুধর্মে চীনা-প্রভাব বুঝিতে
পারিবেন। মূর্তিগঠননিম্নে চীনা এবং হিন্দু
সামান্য অনার্যসেই ধরিতে পারা যায়।

মন্দির দেখিয়া অত্যন্ত সন্মোহিত গলির

ভিতর দিরা বাইতে হইল। চীনাধর্মের কয়েকটা
বড় বড় দোকানে প্রবেশ করিলাম। এক
চীনা-পরিবারের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগুজবে
কাটান গেল। চীনা বাণিজ্যলিপিকার আসিয়া
গান শুনাইল। অবশেষে এক চীনাগৃহে
আসিলাম। গান-বাজনা হইতে লাগিল।
চীনা-বাণিকারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিনামূল্যে
চা-পান করাইল। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই
এক “পুয়া” চা উপহার পাইলাম।

বন্ধু মাঝে মাঝে চীনের প্রজাতন্ত্রপদন
সম্বন্ধে The Great Republic of China
বলিয়া উল্লেখ করিলেন। ইহার মুখে শুনিলাম—
“চীনারা অত্যন্ত সাধু। ইহারা রপিদ না লটরাই
টাকা খার দেয়া ইহাদের কথার দাম বুঝেনা।”

ঘটোতিনেক আমনের সহিত কাটান
গেল। দলের মধ্যে একজন ইংলি-রমণীর
সঙ্গে আলাপ হইল। গৃহ নেত্রিকা-প্রদর্শনে।
ইনি পৃথিবীর অনেক দেশ দেখিয়াছেন।

শ্রীবিদ্যকুমার সরকার।

সাক্ষী

(গান)

পানী আবার সাক্ষী আছে, উষা-অরুণ এসেছিল।

কুহুতলে, দীঘির জলে হাসির দাঁপ্তি ভেসেছিল।

আধার ঘরে আমি এক।

আমাকে না দিল দেখা।

তুলে গেছে, আগে আমার কত ভালবেসেছিল।

শিশির-ধোঁয়া কুহুমরাশির

গাল-ভরা সেই শুভ্র হাসির

মধুটুকু মুটে নিতে এই কাননের বেণে ছিল;

তখন আমি হুয়ার খুলে

ছুটে গেলাম তরুর মূলে;

আমার হুখে ডাকল পানী, বাতাস একটু বসেছিল।

জামত তারা আগে মোরে কত ভালবেসেছিল।

শ্রীবিদ্যকুমার সরকার

কুসুম

ক

সে পতিতা। জীবনের কণিক ভ্রমতে
নয়,—বিধাতার বিধানে সে পতিতা!.....

পঙ্কের ভিতরে পদ্মের মতই কুসুম
ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

• • •

ঘরে ঘরে সন্ধ্যানীপ জ্বলি উঠিবার
আগেই, পথের ধারের বারান্দায় কুসুম
তাহার রূপের প্রদীপ উজল করিয়া বলিয়া
থাকিত। তাহার শ্রাণ তখন কাদিত,
মুখ হাসিত।

রাত্তার লোকগুলা ঘেন ‘উর্দ্ধবুত্ত’ ব্রত
গ্রহণ করিয়াছে,—সকলের চোখ তাহার
উপরে। তাহাদের সেই নিষ্ঠুর, ক্ষুধিত, ও
ঘৃণিত দৃষ্টির মাঝে কুসুম, বিধের নারী-
জাতির প্রতি মৌন দিকারকে ইটিয়া
উঠিতে দেখিত পাইত।

রাত্তার গাফীর পর গাড়ী ছুটিতেছে।
এক-একবানা গাড়ীক পড়পড়িকপাট সব
তোলা। কিন্তু কুসুম দেখিত, পড়পড়ির ফাঁকে
ফাঁকে ফুললক্ষ্মীদের কোতুহলী দৃষ্টি বাহিরের
মুক্ত আলোর দিকে একাত্ম হইয়া আছে।
সে দৃষ্টি কুসুমের উপর পড়িলেই সচকিত
হইয়া উঠিত। কুসুমের মনে হইত, সে
পবিত্র নয়নের নির্মল দৃষ্টি ঘেন বিদ্রোহাশ্রম
মত তার দেহ-মনকে কলুষাইয়া দিয়া
বাইতেছে। মরমে মরিয়া কুসুম, বারান্দার
রেলিন্দে মাথা রাখিয়া বসিয়া থাকিত।
সেখেন ভিতর হইতে তাহার নারী-শ্রাণ

ঘেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিত, “এ রূপের
প্রদীপ নিবিয় দাও,—ওগো কতালের
বাঁধন খুলে দাও!”

খ

বারান্দা হইতে কুসুম সেদিন উৎকণ্ঠিত
হইয়া দেখিল, ট্রামগাড়ী থেকে মাঝিতে
গিয়া একটি ভদ্রলোক পা কড়াইয়া রাত্তার
ট্রামের পড়িয়া গেলেন। গাড়ীহুক লোক
হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল,—কিন্তু গাড়ী না
খামাইয়া চলক আরও জোরে গাড়ী
চলাইয়া দিল।

পাথরে মাথা ঝুকিয়া বৃদ্ধ একেবারে
অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাহার চারিপাশে
ক্রমেই লোক জড় হইতে লাগিল।

একজন বলিল, “ওহে, মাথা দিয়ে রক্ত
পড়ছে যে!”

আর একজন বলিল, “মরে যার নি
ত?”

আর একজন বলিল, “উহা!”

আর একজন বলিল, “মরেনি, কিন্তু
মহুতে কতক্ষণ! চলছে, এখন পুলিশ-
টুপিস এসে পড়বে, আর সাক্ষী মেনে
থানায় ধরে নিয়ে যাবে!”

বারান্দার উপরে ঝুকিয়া পড়িয়া আতুল-
চোখে কুসুম দেখিল, সবাই গোলমালই
করিতেছে, বৃদ্ধকে সাহায্য করা কাহারও
ইচ্ছা নয়।

কুসুম আর থিন থাকিতে পারিল না,
তাড়াতাড়ি উপর হইতে নামিয়া আসিল।

ভিত্তি ঠেলিয়া সে ভিতরে গেল।
অচেতন বৃদ্ধের দিকে একবার চাহিয়া,
কুহুম বলিল, “আপনার এঁকে দয়া করে
আমার স্বপ্নে তুলে দিবে আসবেন? নৈলে
ইনি মারা যাবেন।”

তিন-চারজন লোক ছুটিয়া আসিল।

ভিত্তির ভিতরে ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া একজন
বলিল, “বুড়োটা এর কে রে?”

আর একজন বলিল, “হেঃ! তা আর
বুড়ো পার্শ্ব না মাড়াকাত?”—সে একটা
অর্থপূর্ণ প্রশ্ন করিল। অনেকেই হো-হো
করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কুহুম সে সব কাণেও তুলিল না।
চোখ নাড়াইয়া সে মাটির দিকে তাকাইয়া
রহিল।

চারজন লোকে ধরাধরি করিয়া বৃদ্ধকে
তুলিয়া ধরিল। তখনও তাঁর জ্ঞান হয়
নাই; মাথাঘেঁষা রক্তপাড়াও বন্ধ হয় নাই।
তাঁর মুখ একদিকে হেলিয়া আছে,—হাত
ছুখানি অসহায়ভাবে দুর্দিকে ফুলিয়া
পড়িয়াছে। কুহুম আস্তে আস্তে হাঁটু
আবার বৃদ্ধের বুকের উপরে তুলিয়া দিল।

পিছন হইতে কে একটা অসভ্য উচ্চকণ্ঠে
বলিয়া উঠিল, “এই কব্বার এমন মনের
মানুষ পেলে আমিও বাবা, দিনে গুলোয়ার
টাম থেকে পড়ে যেতে রাজী আছি!”

গ

একরাত একদিন গিয়াছে,—বৃদ্ধ তেমনি
অজ্ঞান।

কুহুম একরকম খাবার-দাওয়া তুলিয়া
তাঁহার সেবাশ্রদ্ধা করিতেছে।

সে নিজের কাপড় ছিঁড়িয়া বৃদ্ধের

কতকানে বাঁধিয়া দিয়াছে; রাতভোর
জাগিয়া, বিছানার পাশে বসিয়া তাঁকে
পাখার হাওয়া করিয়াছে। বাড়ীর তলার
একজন ডাক্তার থাকিত, কুহুম তাহাকে
ডাকাইয়া আনিয়াছিল।

কিন্তু সকাল গেল, বিকাল গেল—কৈ,
রোগীও এখনো চোখ মেলিয়া চাহিলেন
না! কুহুম ভাবনার পড়িল।

সন্ধ্যার সময়ে বৃদ্ধের গারে হাত দিয়া
কুহুম দেখিল, গা ঘেন আগুন।

তার পাইয়া তবনি সে চাকরকে একজন
নামজাদা ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে বলিল।

ডাক্তার আসিল। সে বহুসে বুঝক,—
লবে বিলাত হইতে ফিরিয়াছে।

পরীক্ষার পর ডাক্তার বলিল, “এঁর
অবস্থা বড় ভাল নয়।”

কুহুম কাতরে বলিল, “তবে কি হবে?”
“ভাল করে চিকিৎসা হলে, বিশেষ
কোন ভয় নেই।”

রোগীর মাথার ‘ব্যাণ্ডেজ’ বাঁধিয়া ও
‘প্রেসক্রিপশন’ লিখিয়া ডাক্তার উঠিয়া
গাড়াইল।

কুহুম, ডাক্তারের হাতে ‘ভিথিটের’
টাকা কটা ভঁজিয়া দিল।

আজুল দিয়া টাকাগুলি অল্পতব করিতে
করিতে কুহুমের দিকে চাহিয়া ডাক্তার
বলিল, “ইনি তোমার কে?”

কুহুম কি উত্তর দিবে ভাবিতেছে, কিন্তু
তার আগেই ডাক্তার আবার বলিল, “ইনি
বুড়ি—”

ডাক্তার কি বলিবে, সেটা আগে
বাঁকিতেই আশ্চর্য করিয়া তাহার কথা

শেষ না-হইতে-হটতেই কুহুম সবেগে মাথা-নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, “না, না, না।”

“তবে ?”

কুহুম অল্প হু-চাঃ করিয়া মন বুঝাইয়া দিল।

ডাক্তার খানিকক্ষণ কি ভাবিল। তারপর বলিল, “দেখ, তুমি এক কাজ কর। একে কাল সকালেই হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও। দেখানো ভাল চিকিৎসাগ্র হবে, আর হঠাৎ কিছু হলে তেঃমারও কোন দায়দোষ থাকবে না।”

দরজার কাছে গাড়াইয়া এক শ্রোটা জীলোক ডাক্তারের কথা একমনে শ্রুতিতে-ছিল। এখন, হঠাৎ দে ঘরের ক্ষিত্রে চুকিয়া বলিল, “আমিও তাই বলি ডাক্তার-বাবু। তাৎপর্যকিন্, কোথাকার আপন কার ঘাড়ে এসে পড়ল! ও ছুঁড়ির মতিচ্ছন্ন হয়েছে,—আমার কথাতে কিছুতেই ও কাণ পাতবে না। আপনাদের পাঁচতনের দয়ার কেনরকমে টুটাকা-পাঁটাকা ঘর আসে, তা ও হানবে তানবে, কপীয়ে ডাক্তার রে, ওঘু রে পত্তি বে,—ভলমান্দের ওদব কি শোবার, না ভাল দ্যাখার? তা তুই—”

কোনরকম উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া আপনমনে দে গড়গড় করিয়া বলিয়া বাইতেছিল, কিন্তু কুহুম অখীর হইয়া বলিয়া উঠিল, “মা তুই খাম্ বন্টি!”

“খাম্? কেন খাম্? বলব, তা—”

“ফের যদি ক্যাচ-ফ্যাচ বন্বি মা, তাহলে এই ঘট নিয়ে—” বলিতে বলিতে

কুহুম ‘অপের হাড্ডাটল।

কুহুমের মা ভর পাইয়া ঘর থেকে বাহির হইয়া নীচে নামিয়া গেল। এবং সেখান হইতে অকপা ভাবার মেরেকে গালি পাড়িতে লাগিল।

সেদিকে কাণ না পাতিয়া কুহুম, ডাক্তারকে বলিল, “এঁর জ্ঞান হবে কখন?”

ডাক্তার এতক্ষণ চুপটি করিয়া কি-এক চোখে কুহুমের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার প্রশ্ন শুনিয়া বলিল, “আজ রাতেই জ্ঞান হতে পারে। তবে, বলাও দার না,—তারপর হাত বাড়াইয়া বিছানার উপর হইতে টুপিটা তুলিয়া লইয়া বলিল, “তবে, আমি এখন চলে যাই।”

“আমুন,—” কুহুম, ডাক্তারকে নমস্কার করিল।

ঘাইতে ঘাইতে হঠাৎ গাড়াইয়া পড়িয়া ডাক্তার বলিল, “দেখ, তোমার ‘ভিহিটের’ টাকা ফিরিয়ে নাও।”

কুহুম, বিস্মিতবরে বলিল, “কেন?”

ডাক্তার নিঃশব্দে কুহুমের চকিত চোখের দিকে চাহিয়া, হুঁ বলিল, “না।”

কুহুম অত্যন্ত সন্দেহ ও বিরক্তির সহিত কহিল, “কেন নেবেন না, বসুন আপনি।”

কুহুমের মনের ভাব বুঝিয়া ডাক্তার মুখ টিপিয়া নীরব-হাস্ত করিল। তারপর হাতের টাকাগুলো বন্ধু-বন্ধু-বন্ধু বিছানার উপরে ছুঁড়িয়া দিয়া, জুতা মসৃন করিতে করিতে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

কুহুম খানিকটা খাড়া হইট করিয়া গাড়াইয়া

রহিল। আপনমনে অ'ফুট ও হুণিত কঠে বসিল, “এমন পোড়া মন নিয়ে সংসারে এসেছি যে, সাধুকেও সন্দেহ হয়।”

য

অনেক রাতে রোগীর জ্ঞান হইল।

পাশ দিরায়া, থামিরা থামিরা তিনি বলিলেন, “বুক জলে থাকে—একটু জল।”

পাখার বাতাস করিতে করিতে তখন কুহুমের সবে একটু ওজ্রা আসিয়াছে। রোগীর গলা শুনিয়া ধুঁমুফু করিয়া সে উত্তীর্ণা বসিল। তাড়াতাড়ি কুঁঝা হইতে একটা কাঁচের গেলাশে জল গড়াইয়া সে রোগীর মুখের কাছে ধরিল।

জলপান করিয়া রোগী আরাম পাইলেন। কুহুম তাঁহার তপ্ত কপালে আপনায় ঠাণ্ডা হাতধুখামি আলুতভাবে বুলাইয়া দিতে লাগিল।

“ওঃ! বুক জলে থাকে, বুক জলে থাকে।

কুহুম তখন রোগীর বুক হাত বুলাইতে লাগিল। তিনি “জাঃ” বলিয়া চোখ বুজিলেন।

খানিক পরে আবার তাঁহার তৃষ্ণা পাইল। কুহুম আবার জল দিল।

রোগী খানিকক্ষণ বিমত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তারপর একবার জড়িত কঠে বলিলেন, “কে? মা হুধা?”

মুখ ফিরাইয়া কুহুম বলিল, “না, না! আমি পোড়াকপালী!”

রোগী চোখ মুদ্রিয়া আপনা-আপনি বলিলেন, “এত রাত অর্থাৎ ভেগে আছি মা!”

সে কি কথা, সে কি হুধা!—

কুহুমের সারা বুক ভরিয়া উঠিল। পাটের পরে মাথা রাখিয়া সে একমনে, সেই হুম আপন মনের মধ্যে উন্টাইয়া-পাটাইয়া ভুনিতে লাগিল।

তার বোধ চাইল, সে যেন এই বিপন্ন বুদ্ধের আপন কস্তা। বাধা যে কেমন, কুহুম ত একথা কখনই জানে নাই,—আজ যেন তারই একটা অজানা আনন্দের আভাস প্রাপ্তে তার জাগিয়া উঠিল।

হঠাৎ ঘরের দরজায় বাহির হইতে কুমাঘাত হইল।

কে ডাকিল, “কুহুম!”

কুহুম শুনিয়াও তনিল না।

বুঝি মা-ডাকু শুনিতেছে!

“কুহুম!—অ আমার কুহুমকণি।”

কুহুম চুপ।

“ও কুহুম, শুচু?”—সঙ্গে-সঙ্গে

আগন্তুক বাজুখাই গলার একটা গান ধরিয়া বসিল। সে ত গান নয়—যেন বাঁড়ের ডাক!

এবারে কুহুমের মনে তারি ভয় হইতে লাগিল,—রোগী যদি শুনিতে পান?

“(হঠাৎ গান থামাইয়া) ওগো কুহুম, —ও—” কিন্তু কথা শেষ হইতে-না-হইতেই হঠাৎ নীরবে দরজাটা খুলিয়া গেল এবং বিদ্রোহের মত বাহিরে যুথ বাড়াইয়া নিয় অথচ ত্রিভুবে কুহুম বলিল, “কে? যদি কুহুম কুহুম করবে, তাহলে খাঁটা ঘেরে বিষ ঝেড়ে দেব। বেরোও এখান থেকে—।

যেমন সহসা দরজাটা খুলিয়াছিল তেমনই সহসা আবার বন্ধ হইয়া গেল।

ও

পরদিনের সন্ধ্যাবেলা। কুহুম জানালায় কাছে একলাটি বসিরাছিল।

আজ সকালে রোগীর অর হঠাৎ বাড়িয়া উঠাতে কুহুম তার পাইয়া অনিচ্ছা-সত্ত্বেও রোগীকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিয়াছে। না দিয়া আর উপায় কি?

আপন জীবনের মলিনতা, কুহুমকে সব-সময়েই কাতর করিয়া রাখিত। এই মলিনতার ভিতরে থাকিবাও, সে যে একটা ভাল কাজ করিতে পারিয়াছে, এটা ভাবিয়াও মন তার সস্তোষ ও পুলকে পুরিয়া উঠিত্বে-ছিল।

আর, রোগীর উপরে তার কেমন একটা মরাও পড়িয়া গিয়াছিল। রোগীর পেই রোগকাতর মুখখানি এখনও তার আগের ফাঁকে ফাঁকে উকি মারিতেছিল।

দিনের ভিতরে চার-পাঁচবার চাকর পাঠাইয়া কুহুম রোগীর খবর লইয়াছে। জানিয়াছে যে, রোগীর বাড়ীর লোকেরা কেমন করিয়া সংবাদ পাইয়া হাসপাতালে আসিয়াছে।

* * *

তিন-চারদিন পরে শুনিল, রোগীর অর বন্ধ হইয়াছে, কাল তিনি নিঃশ্বর বাড়ীতে ফিরিবেন।

একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কুহুম ভগবানকে ধন্যবাদ দিল। ঠিক করিল আজই সে রোগীকে এববার দেখিতে যাইবে।

চ

হাসপাতালের সুমুখে আসিয়া কুহুম গাড়ী হইতে নামিল। হুলদার রেশমী

চাদরখানি মাপার উপরে টানিয়া দিয়া চাকরের সঙ্গে চলিল। চাকর তাহাকে রোগীর ঘর চিনাইয়া দিল। আন্তে আন্তে মরমা চেলিয়া কুহুম ভিতরে ঢুকিল।

একটি বালিসে চৈদান দিয়া বৃদ্ধ বসিরা আছেন। পাশে একটি যুবক ও একটি বৃদ্ধা রমণী। বৃদ্ধ কি কথা কহিতেছিলেন, — হঠাৎ কুহুমকে চুকেতে দেখিয়া বলিতে বলিতে খানিরা গেলেন।

কুহুম সজুচিতভাবে আগাইয়া গিয়া বৃদ্ধের পায়ে মাথা ছোঁরাইয়া ভক্তিমতী কণ্ঠার মত ঙ্গাম করিল।

কুহুমের দিকে চাহিয়া বিস্মিত বৃদ্ধ বলিলেন, “কে গা তুমি?”

কুহুম মুঠবরে বলিল, “আমাকে চিনতে পারছেন না বাবা?”

ভাল করিয়া কুহুমের মুখ দেখিতে-দেখিতে বৃদ্ধ বলিলেন, “হঁ, চিনি-চিনি কর্ণি বটে। বোধ হয়—বোধ হয়, অল্পখের সময়ে তোমাকে কোথায় দেখেছি। তাই নয় কি?”

কুহুম বাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

“রোলো—রোসো, মনে পড়েছে। তুমি কি আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন, আমাকে জল খেতে দিয়েছিলেন?”

“ট্রাম থেকে পড়ে গেলে পর আপনাকে আমি আমার ঘরে তুলে নিয়ে গিয়েছিলাম। আপনি আমার বাড়ীতে দু-রাত ছিলেন। তারপর আপনাব অর বেড়ে ওঠাতে আমি তার পেয়ে আপনাকে এখানে পাঠিয়ে দি। আপনি ভাল আছেন শুনে একবার যেতে যেতে এসেছি।”

ভাষা-সংস্কার-বিচার

দিনকর-দিন গল্পালা ভাষার বেশ আদর বাড়িয়াছে; বাহাদের হাশিফা আছে, পনমধ্যাঙ্গা আছে, তাঁহাদের অনেক, এখন বাঙ্গালার রচনা করা কিংবা বাঙ্গালা-সাহিত্য পড়া বিশেষ লজ্জার কথা মনে করেন না। বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রতি ভালবাসা বাড়িয়াছে বলিয়াই, ক্রীড়ন ভাষার শিখিত হইবে বা রচনা-শীল বিক্রম হইবে প্রতিটি বিষয় লইয়া, অনেক আলোচনা চলিতেছে। ভাষা এবং সাহিত্যকে উন্নত করিবার উপায়-নির্ধারণই যখন সকলের উদ্দেশ্য, তখন এ বিষয়ের আলোচনার সময়ে কেহ যেন মহত্বের জন্ত ঘোঁরা না হারাই।

একবার স্মরণাচ্ছলাম যে কোন কোন হুদী ব্যক্তি নাকি আমাদের সাহিত্যে হুদী বাঙ্গালা চালাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং নিজেরা ঐ রীতিতে রচনা প্রকাশ করিতেছেন। বাহাদের নামে এই কথাটি রটিয়াছিল, তাঁহাদের সহিত কথা কহিয়া এবং তাঁহাদের মুখেই তাঁহাদের রচনা-পাঠ স্মরণাচ্ছলাম, কথাটি মিথ্যা। হইতে পারে, বাহাদের নাম স্মরণাচ্ছলাম, তাঁহারা ছাড়া অল্প কোন ব্যক্তি ঐরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বাহা হুদী, এখন যখন সংবাদপত্র বাড়িতেছে, সাহিত্যসূত্র (magazine) বাড়িতেছে, নানা শ্রেণীর পুস্তকের সংখ্যা বাড়িতেছে, এবং লেখক ও পাঠকদের বুদ্ধির সঙ্গে নানা মূর্খির নানা মন্ত জাণিবার সম্ভাবনা আছে, তখন

সাহিত্যের আদর্শ-ভাষা সম্বন্ধে কিংকি আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছি।

সাহিত্যে যদি শব্দগুলিকে অনসারগণের উচ্চারণের অপরূপ মূর্তিতে ব্যবহার করিতে হয়, অর্থাৎ যদি হুদী ভাষাকে হুদী হুদী করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে সঙ্গীতের কমিদার সেরস্তার মূহুরি এবং আদর্শের মোজ্জুদিদিগকে বিভ্রান্তের শিকার করিতে হয়। আদর্শ-ভাষা চালাইবার জন্ত যদি একখানা পত্রিকার প্রচেষ্টা হয়, তবে এইভাবে ভাষার বিজ্ঞাপন দিলে চলিবে :—“আত্মা শিগগির অ্যাক্ লতুন কাগোজ চালাগো, ও তার কস্তা কোর্দো জগোবদু বিদেসাগোবদু, আর সহোকারি কোর্দো ওতুল চন্দো বিসেসসকে। চোত্তিরের তিরিশের মোদুধে বারো আনা না পেলো কাক্কেও কাগোজ দোবো না। আত্মা মোজ্জোর নৈন, তা মোজ্জিকি মিত্তিরের মোতো ভদোর বেজিবে বোলবেন। ভালো যে শিখ্বে, তাকো ভাবনা মেই। দৈতি ছি গংআ নারান্ রোক্ষিৎ। সাবিন্ কোলকতা ত্যারো নোম্বোর পেল্লাব মোরিকের গোলি।”

কেহ যদি বলেন যে তিনি ঠিক জন-সাধারণের উচ্চারণ ধরিবার জন্ত আদর্শ-মুহুরির বিষয় দেখিবার অধিকসংখ্যক লোকের হিসাব লইবেন না, কেবল তাঁহার নিজের দলের কয়েকজন ভ্রাতৃলোকের উচ্চারণ লক্ষ্য করিয়া চলিবেন, তাহা হইলেও গোল

মেটে না। সকলে না হয় একটা নির্দিষ্ট শব্দকে আদর্শ ভদ্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারি, কিন্তু তাহা হইলে যে আবার সেই প্রাচীন “সাদু বনাম অসাদু”র কথা তুলিতে হয়। পাকৈ চক্ষে সকলকেই ঘবন একটা সাধুভাষা খাড়া করিতে হইতেছে, তখন সাধু কথাটাকে তামাশার জিনিস না করিয়া, কে সাধু কে অসাদু তাহার বিচার করিলেই ভাল হয়। এই বিচারের সুবিধায় স্তম্ভ একটুখানি ইংরেজি-ভাষার দৃষ্টান্ত ও নক্সা দিতে হইবে; কারণ প্রথমতঃ এই বিচারের স্তম্ভ স্তম্ভ একটি উন্নত ও লোক-ব্যবহৃত ভাষার সহিত কিঞ্চিৎ তুলনা করিয়াই প্রয়োজন আছে, এবং বিতীর্ণতঃ ভাষা-বিজ্ঞানটি ইউরোপীয় এবং উহার মূল সূত্রগুলি খাটাইয়া যে সকল ভাষার উন্নতি এবং ক্ষয়ের কথা বিচারিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে আমরা ইংরেজির সহিত অসামান্য পরিচিতি।

সকল ভাষারই পরিবর্তনে এবং গড়নে ছোট ছোট জিনিস লক্ষ্য করা যায়,—একটি Phonetic decay বা স্বর-ক্ষয় এবং অল্পটি Dialectic regeneration বা প্রাদেশিক শব্দের উদ্ধারে ভাষার পুষ্টি। ভাষা-বিজ্ঞানের কথায় যাহাদের নামের মোহাই দেওয়া চলে তাহারা বলেন, যে বাহুবেরা স্বাভাবিক আলোকে এবং অজবিশ্ব প্রাকৃতিক কারণে নিরন্তরই ভাষার শব্দগুলিকে জামিরা ছোট করিতেছে এবং উচ্চারণ-বিকৃতিতে একেবারে নতুন শব্দের মত করিয়া তুলিতেছে। Dr. Skeat বলিয়াছেন যে সমুদ্রের ঢেউ গলা ধেমস অসম্ভব, এই Phonetic decay কার্য-

নির্দেশ করাও তেমনই অসম্ভব। আমাদের মনে কি ভাবে শব্দ-বিকৃতি এবং স্বর-ক্ষয় চকিয়া আসিয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত না দিয়া সুবিধায় স্তম্ভ মোহাইয়ের উপরই নির্ভর করিলাম, কারণ-প্রসূক্ত স্বত্রের যথার্থতা দেখাইতে গেলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়।

মাহুবে প্রতিনিয় প্রতি মুহূর্ত্তে স্বাভাবিক নিয়মে যে সকল পরিবর্তন ঘটাইতেছে, তাহাই যদি আদর্শ-ভাষার গৃহীত হইত, তাহা হইলে সাহিত্যের আদর্শ-ভাষাকে প্রতি মুহূর্ত্তে নবজন্ম পরিগ্রহ করিতে হইত। নতুন নতুন রদিনশব্দে সাহিত্য-মুহুর প্রকাশ কবিবার মত, না হয় প্রতিদিন ভাষাকে নতুন মূর্ত্তিতে খাড়া করা ঘাইত; কিন্তু পরিবর্তনের ঢেউগুলি অসংখ্য বলিয়া এ কাজটি করা অসম্ভব। সাধুশব্দের লোকেরাও এবংসর যে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত শব্দ চালাইতেছেন, কয়েক বৎসর পরেই তাহাদিগকে তবতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত এবং বিকৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে; এরূপ অবস্থার স্বাভাবিক বিকৃতির মতোয় সঙ্গে সঙ্গে ভাল ঠিক রাখিয়া চলা, সকল ভাষার পক্ষেই অসম্ভব। তবে যদি কোন নির্দিষ্ট শব্দের লোকেরা বলেন, যে আমরা এই মুহূর্ত্তে যেসকল সংক্ষিপ্ত এবং বিকৃতরূপ দেখাইতেছি, তাহারা তাহাই চিরস্থায়ী করিয়া রাখ, তাহা হইলে সেই অবস্থার গ্রাহ্য করা চলে কি না, তাহা দোষিত দেখিতে হয়।

ইংলণ্ডের মত ছোট দেশেও অনেকগুলি প্রাদেশিক ভাষা বা Dialect পূর্ণ-

গৌরবে মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইছে, অথচ সেই সকলগুলি প্রাদেশিক ভাষাই একটি আদর্শ-সাহিত্যের ভাষার শাসনে শাসিত হইতেছে। এ কথাও উল্লেখ করিয়া রাখি, যে লগুন সহরের প্রাদেশিকতা এবং লগুনের নিকটবর্তী স্থানের প্রাদেশিকতাও আদর্শ বলিয়া গ্রহীত হয় না বরং আদর্শের শাসনে নিয়মিত হয়। নটিকাদিতে এবং অজবিধ রচনার প্রয়োজন-মত ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রাদেশিক ভাষা, উচ্চারণের অসুকপ করিয়া লিখিত হয়, এবং প্রয়োজন হইলে সকল প্রদেশের ঘরওয়া কথা এবং প্রবাদ-রচনাদি আদর্শ ভাষা, রচনার কাছাকাছিই উদ্ধৃত হয়; এবং তাহাতে আদর্শ-ভাষাকে ক্ষণিক বা উপহাসিত হইতে হয় না।

এ পর্য্যন্ত বাহা বলিলাম, তাহার সহিত 'সবুজ পত্র'র জযোগ্য সম্পাদকের কোন গিরোধ নাই। তিনি সর্জনাম এবং ক্রিয়াপদগুলির সম্বন্ধে যে বাত্বা করিতে চাহেন, তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে বলিয়া রাখি, যে তিনি দেশবিশেষের বিকৃত উচ্চারণের শাসন মানি দূরে থাকুক, বরং সাহিত্যে আদর্শ-ভাষার প্রভাবে প্রাদেশিক পিকৃতিকে দূর করিতে চাহেন। শব্দের মৌলিক শুদ্ধতা রক্ষা করিবার দিকে এবং বর্ণাঙ্কানে যথার্থ ভাব-বাঙ্গক শব্দ প্রয়োগ করিবার দিকে সুপণ্ডিত প্রমথনাথ চৌধুরী সর্বদাই দৃষ্টি রাখেন। সাহিত্যের আদর্শ-ভাষার দ্বি-সর্জনবিধ বিকৃতি পরিহার করেন, তিনি যে কি অজ সর্জনাম এবং ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে নিয়মের বাস্তবায়ন করিতে চাহেন তাহার আলোচনা করিতেছি।

বহুশ্রুত প্রমথনাথ জানেন এবং দীকার করেন, যে, করিয়া, খেলিয়াছি, গিয়াছে, ঘটিল প্রভৃতি রূপগুলি ভাষার কল্পিত নহে এবং ক'বে, পেলেতি, গেছে, ঘটল প্রভৃতি উদ্ভাদেরই কব্ধে জাত। তিনি বলেন যে "কীণ" ক্রিয়াপদগুলি ভাষার অধিকতর বগলানো এবং অবিকল পদগুলি বাক্যের ক্রতগতির দাণা। যে সকল শব্দ গুরু-রচনার ব্যাখ্যার করিলে বেশ ভাল শোনার সেগুলিও অনেক সময়ে পত্র-রচনায় কথা, এবং ভাবের ঘোর রাখিতে পারে না। কবিতার যখন—ধরিয়া চরণ, করিয়া ঘটন, মরবে মরিয়া, ভরিয়া লইবে কৃত, খেলিয়াছি কত খেলা করিয়াছি কত আয়োজন, গিয়াছে চলিয়া, নিশ্চয় মরিল, ঘটিল কি দায়, চলিতেছি পথ একেলা প্রভৃতি কোন প্রকার হ্রস্বলতার সৃষ্টি করে না, এবং বরং রবীন্দ্রনাথের মত শব্দরূপের ও মূব-তালের ওস্তাদ যখন ঐ সকল ক্রিয়া ভাষার পত্র-রচনার অসম্বন্ধে ব্যবহার করিতে পারেন, তখন উদাহরণকে ক্ষীণ করিয়া বগলানোর চেষ্টা না করিলে চলে। পত্র-রচনাতেই সময়ে সময়ে অনেক শব্দকে কাটিয়া ছাটিয়া লইতে হয়; পত্রের বাহ্যকে আস্ত রাখা চলে, গথ্যে তাহাকে খস্ক করিবার কোন কারণ নাই। ক্রিয়াগুলির ব্যাখ্যায় যখন একটা সাধারণ নিয়ম থাকিলে তখন এ কথাও বলা চলে না যে, দৃষ্টান্তের ক্রিয়াপদগুলি এবং ঐরূপ আরও কতকগুলি ক্রিয়াপদ না হয় পূর্ণাঙ্গরূপে রাখত হইবে, কিন্তু অতিদীর্ঘ ক্রিয়াপদ-গুলিকে খস্ক করিতে হইবে।

এখন সর্জনামের করেকটি নমুনা দেওয়া বলিতেছি। উত্তম-মধ্যমের বাংলায় সর্বশেষেই নীচব, অর্থাৎ নেপথ্যে; আমি, আমরা, তোমাকে, তোমাদের, আপনি, আপনাদের প্রভৃতি ধ্বনি ছিল, তখনই র'ইয়া গিয়াছে। "সে" এবং "তিনি"র বহু:তনে এবং কর্মাদি কারকের রূপে যে "হা" এবং "হী" আসে তাহা লোপ করিলেই যে ভাষার গায়েব জোর অধিক হইবে এবং রচনার গাভীরা বাড়িবে তাহা বুদ্ধিগা উঠা শক্ত। কথায় মোর উহার emphasis বা কোঁকের উপর নির্ভর করে; যেখানে কোঁকের মাথায় "হা" বা "হী" আপনি লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে, সেখানে অক্ষর থাকিলেও কোন বাধা হয় না এবং সঙ্গ ভাষাতেই যৌক এবং টানের (accent) অধিকতর শব্দের অক্ষরবিশেষ অধুকাবিত বা অর্ধ-উচ্চারিত থাকে। কোনস্থানেই এখন নুং কিছুর পরিবার প্রয়োগ হইল না, তখন এট তুচ্ছ "হা" "হী" লইয়া তর্কের ঝড় তুলিবার প্রয়োজন কি? এইসঙ্গে আর একটি কথাও বলিয়া রাখি। তর্কের পাতিরে যদি স্বীকার করা যায়, যে চৌধুরী-মহাশয় যে পদ্ম অবলম্বনীর মনে করিয়াছেন তাহাই প্রশস্ত, তাহা হইলেও পদ্যরচনের অবলম্বিত পদ্ম তিনি একাকী পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যেখানে চরিত্র-নিষ্ঠার কথা নাই, জীবন-বরণের কথা নাই, সেখানে চৌধুরী মহাশয় তাঁহার নিজের মতটি প্রমাণিত করার করিতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যে তাঁহার মত গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে প্রচলিত প্রথাই মানিয়া চলিতে হইবে। ইংলণ্ড প্রভৃতি

যে সকল স্থানে সাহিত্য-সমাজ সুতন্ত্রিত, অর্থাৎ যেখানে আমাদের দেশের মত প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীন হইতে পারে না, সেখানে কেহ নূতন মত-প্রচারণার জন্য তাঁহার নূতন ব্যাকরণ অথবা বানান অথবা অস্তিত্ব পরিবর্তন, দৃষ্টান্ত বাবা বুঝাইয়া যে কোন পরিকার প্রবন্ধ লিখিতে পারেন; কিন্তু নিজের উদ্ভাবিত পদ্ম অমূল্য করিয়া যদি সাধারণ প্রবন্ধে নূতন বানান, ব্যাকরণ প্রভৃতি চালাইয়া যান, তবে প্রবন্ধটি ভাষার হিসাবে কুণ্ডলিত বিবেচিত হইবে এবং কৃত্রিমি মুদ্রিত হইবে না। কেহ নূতন উচ্চারণতা না আনেন ইহাই প্রার্থনা।

এ পর্যন্ত স্বাক্ষরের কথা বলিয়াছি; এখন Dialectic regeneration সম্বন্ধে করেকটি বিশেষ প্রয়োজনের কথা বলিব। সর্বশেষে আনেন যে বিশেষ্য-বিশেষণজাপক শব্দমাণি অর্থাৎ Vocabulary লইয়া ভাষার কাঠামো রচিত হয় না এবং যে ব্যাকরণ লইয়াই ভাষা, তাহার পনরআনা হইল সর্জনাম এবং ক্রিয়াপদের রূপ ও সংযোগ লইয়া। সর্জনাম এবং ক্রিয়াপদগুলি যদি অমূল্য থাকে অর্থাৎ ঐগুলি যদি কোন প্রাদেশিক বিকৃতির অধরূপ না হয়, তাহা হইলে আমাদের সাহিত্যের আদর্শ-ভাষা কোন একটি নির্দিষ্ট প্রদেশের বলিয়া তর্কই উঠিবে না। কোন বিশেষ কারণে যদি কোন একটি প্রদেশের শব্দ বেশী ব্যবহৃত হয়, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না; এতদিন পর্যন্ত সে বিষয়ে কোন কথাই উঠে নাই। আরব ও পারস্যের অনেক শব্দ আমাদের ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে,

এবং এখন ইউরোপের অনেক শব্দ আমরা ব্যবহার করিতেছি। সংস্কৃত নামে প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্বও বৈদিক শব্দ ছাড়া ভারতবর্ষের ভাবিভাদি জাতির এবং বাহিরের গ্রীক প্রভৃতি জাতির শব্দ প্রচলিত হইরাছিল। ভাব-প্রকাশের জন্য শব্দস্বর অভাব হইলে লোকে প্রথমতঃ আপনাদের ভাষার শূঁজিয়া দেখে এবং পরে বাধ্য হইয়া অপরের কাছে শব্দ ধার করে। মূলতঃ ইংরেজি ভাষায় পূর্ক-মর্শিয়ার শব্দই অধিক ছিল, কিন্তু হাজার নবীর উত্তরভাগের প্রাদেশিক শব্দ বহু পরিমাণে অধিকার লাভ করিতে ছাড়ে নাই। আদর্শ-ইংরেজি ভাষায় ভাব-প্রকাশের সুবিধার জন্য দেশের সকল প্রাদেশিক ভাষা হইতেই সমস্ত শব্দ সংগৃহীত হইয়া থাকে। ইংরেজি ভাষা-বিজ্ঞান এহে দেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে সংগৃহীত শব্দগুলির দীর্ঘ দীর্ঘ তালিকা আছে।

ভাব-প্রকাশের সুবিধা দেখিয়া মহাত্মা অক্ষরসুয়ার দত্ত বর্ধমান জেলা হইতে সেধানকার দেশী “ভাস্কর” শব্দটি সংগ্রহ করিয়া চালাইয়া দিরাছেন। আমাদের যদি আপনাদের ভাষার প্রতি যথার্থ অনুশ্রাব থাকে, সকল প্রদেশগুলিকে টানিয়া একদিকে বাঁধিবার ইচ্ছা থাকে, উপযুক্ত ভাব-প্রকাশক শব্দ সংগ্রহ করিয়া ভাষার পুষ্টি-বিধানের চেষ্টা থাকে, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই ইংলণ্ডের ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের মত বহু করিয়া প্রত্যেক প্রদেশের শব্দগুলি ভিন্ন ভিন্ন কোণে সূত্রিত করিব, এবং যে প্রদেশের যে শব্দটি ভাষার অভাব পূরণ করিবে মনে হইবে, তাহাই আদর্শ-ভাষায় প্রচলিত

করিব। *নিজের ঘরের শব্দ-ভাষার না শূঁজিয়া সংস্কৃত-কোষ হইতে শব্দ শূঁজিতে যাওয়াও অভাব বলিয়া মনে করি। বাঙ্গালার বিভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক ভাষার ভাষার হইতে যেদিন শব্দ সংগৃহীত হইয়া আদর্শ-ভাষা পুষ্টিলাভ করিবে, সেদিন অলঙ্কার বিভিন্ন প্রদেশগুলি আগের টানে একত্র মিলিবে এবং আমাদের আদর্শ ভাষা অমুক বিশেষ প্রদেশের বলিয়া অসার কোলাহল উঠিবে না। জিবেণী হইতে কলিকাতার উত্তরভাগ পর্যন্ত গঙ্গার উত্তরকূলস্থিত স্থানের শব্দ-উচ্চারণের যে ধাঁচা আছে এবং টান্ (accent) আছে, কেহ কিছু না বলিলেও উহাই সর্বত্র গৃহীত এবং শিক্ষিত হইবে; কারণ ঐ ধাঁচা ও টান্ আপনার প্রাকৃতিক মধুরীতে সকলকে মুগ্ধ করিয়া থাকে।

Dialectic regeneration প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিতেছি। অনেককেই এ-যুগে নূতন ভাব বুঝাইবার জন্য নূতন নূতন কথা চালাইতে হয় এবং নূতন করিয়া শব্দ গড়িতে হয়। যে পদ্ধতিতে এই কাজটি হইয়া থাকে তাহার সমালোচনার দুই ভিন্নটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের দৃষ্টান্ত দিতেছি। (১) একজন একটী নূতন শব্দ ব্যবহার করিবার পরেও অন্য ব্যক্তি অন্য নূতন শব্দ চালাইতে চেষ্টা করেন, এবং তাহাতে নূতন ভাব-প্রকাশক একটা সুনির্দিষ্ট শব্দ পাওয়া যায় না। একজন আগে কিছু লিখিয়াছেন বলিয়াই যে তাহার কথাটি বজায় রাখিতে হইবে, তাহা নয়, তবে প্রথমকার ব্যবহৃত শব্দের যে কোন বিচারই হয় না, এবং ইচ্ছামত সকলকেই যে নূতন

নূতন শব্দ গড়িতে থাকেন, এইটাই ধ্রুপদ। একালের বিজ্ঞানের Evolution শব্দটির বিভিন্ন শব্দে অনুবাদ দেখিতে পাই। প্রথমে Evolution অর্থে বিবর্তন শব্দটি চলিয়াছিল এবং এখনও উহার ব্যবহার আছে, কাহারও কাহারও আপত্তি এই, যে বিবর্তন বলিলে ঠিক Darwin-এর Evolution বুঝায় না। এটা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি। Darwin-এর এপিথামের লক্ষ্যের পূর্বেও Evolution শব্দটি ইংরেজি ভাষায় ছিল, এবং উহার যে অর্থ ছিল তাহাতে Darwin-এর তত্ত্ব পরিমুখ্য হইত না। নূতন বিজ্ঞানে ঐ শব্দটি, যে ভাব বুঝাইবার অল্প গৃহীত হইয়াছিল, তাহা নূতন তত্ত্ব না পড়িলে কাহারও বুদ্ধিতে পারা অসম্ভব। একটা ভাবের কথাকিৎ অনুচ্চ শব্দ যদি ভাষায় পাই, তবে তাহাকেই নূতন ভাব দিয়া বুঝাইয়া তুলিতে পারি; চিরকালই এই প্রথাই কাজ চলিয়াছে। Darwin-এর বিবর্তন-বাদ বলিলে কোন প্রকারে হিন্দু-দর্শনের কথা সহিত গোল বাধে না, এবং যেখানে ঐ শব্দ ব্যবহৃত হয় সেখানে কথার ভাবেই বুদ্ধিতে পারা যায় যে কোন্ বিবর্তনের কথা বলা হইতেছে। যে উহার তত্ত্ব কিছুই জানে না, তাহার কাছে সকল শব্দই সমান হইয়া উঠিবে। বিবর্তনবাদের সঙ্গে যে Progress কথা চলে তাহারও অনুবাদে আমরা উন্নতি শব্দ ব্যবহার করিতে পারি,—কোন ক্ষতি হয় না; Progress বলিতে এবং উন্নতি বলিতে একটা ভালর দিকে গতি হইতেছে বুঝা যায়; অর্থাৎ বিবর্তনের উন্নতিতে ভালদল বিচার আদৌ নাই। কথা বলিবারাই

সমস্ত বিজ্ঞানের ভাব লোকে বুঝিয়া ফেলিতে পারিবে, এমন শব্দ কেহই আবিষ্কার কিংবা উদ্ভাবন করিতে পারিবেন না। নূতন ভাবের কাছাকাছি হইলেই একটা দেনী শব্দ লইয়া সেই নূতন ভাব বুঝাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে হইবে; এবং তাহাতে এক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ জন্মিতে পারে,—এবং চিরকালই সকল দেশে তাহা হইতেছে। বিবর্তন শব্দটাও দার্শনিকদের নূতন গড়া শব্দ নহে, এবং প্রাচীন ভাষায় উহার অল্প অর্থ ব্যবহারও ছিল। এইরূপ শ্রেণীর শব্দ লইয়া স্বল্প হইতে স্বল্প বিবাদের সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন নাই। ক্রমাগত ইচ্ছামত নূতন নূতন শব্দ গড়িলে পাঠকদিগকে কেবল বিভ্রত করা হয়। Evolutionটি যে তত্ত্বের অন্তর্গত তাহার সাধারণ নাম Genealogyকে উদ্ভব-তত্ত্ব নাম দিলে সকলেই বেশ বুদ্ধিতে পারে; এবং ঐ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিবার সময় নূতন বিবর্তন-পদ্ধতি বুঝাইলে কিছুই ক্ষতি হয় না।

(২) সংস্কৃত ভাষা হইতে অপ্রচলিত নূতন শব্দ আনিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়া নূতন ভাব বুঝাইবার আগে দেনী শব্দের দিকে ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করা উচিত। অল্প কয়েকদিন পূর্বে Prestige এবং Sensitive শব্দের অনুবাদ লইয়া কয়েকজন পণ্ডিত বিধব তর্ক তুলিয়াছিলেন, এবং অবিদিত সংস্কৃত কোষগ্রন্থ হাতড়াইতেছিলেন। জ্ঞানীদের দেশের “গুণ” শব্দটির গারে অল্প যে কোন ভাবের ছায়া থাকুক না কেন, ঠিক Prestige কথা বুঝাইবার সময়ে যদি “গুণ” শব্দটির ব্যবহার করা যায়, তবে কোন

লোকের পক্ষে যথার্থ অর্থ বৃত্তিতে গোল হয় না। যতদিন একজনের কোন চর্যলতা প্রকাশ থাকে এবং বাহ্যিকের লোকে তাহা ধরিতে পারে না, ততদিন তাহার বদব্যবহাি ও গুণের বেশ বজায় থাকে, কিন্তু কোন প্রকারে সেটা প্রকাশ হইয়া পড়িলেই গুণের চলিয়া যায়। ঐ গুণের শব্দটি কখনও *Pride* এবং কখনও *Conceit* অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সেজন্য স্থলে শব্দের আকাঙ্ক্ষা এবং আসক্তি প্রভৃতি দেখিয়া সকল ভাষাতেই শব্দের অর্থ স্থির করিতে হয়।

(৩) *Sensitive* কথাটা লটুয়াই আর একপ্রকার গোলযোগের কথার দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইংরেজি একটা শব্দে বহু রকমের ভাব স্থচিত হয়, সেই সকল ভাব-গুলিই আমরা একটা শব্দে সন্নিবিষ্টে চেষ্টা করিব কেন? পরীক্ষা একটা প্রমাণের ফলে একটি স্থান *Sensitive* হয়, অর্থাৎ সে স্থানটি অল্প একটু ছুইলেই ছন্ছন্ করিয়া উঠে, সেখানে ছন্ছন্ কথার বিশেষরূপে “ছন্ছন্” বলিলে *Sensitive* কথা সচক্ষে ব্যক্ত হয়। একটু কথা কহিলেই বাহার লাগে এবং কথার কথার অভিমান হয় তাহাকে অভিমানী বলি; সেও *Sensitive*। যেখানে অল্প ছুইলেই স্পর্শটি সর্বত্র চালিত হয়, অথচ দেখানো অভিমানের কথা নাই, সেখানে বৃত্তান্ত শব্দ স্থচিত হইবে। অমূলক যন্ত্রটি *Sensitive* অথবা অমূলক গাছটি *Sensitive* বলিলে যে যন্ত্রকর্মের স্পর্শাত্মক-সামর্থ্য ব্যাহার, তাহা যখন কেবল তথ্যার্থ-বিগকে

ব্যাহাি, হইবে, তখন সংকৃত স্পর্শভেদ্য শব্দ ব্যবহার করা চলে। শব্দগুলি সাহিত্যে চালাইবার জন্য শিবি নাই; শব্দ গড়িবার পদ্ধতির আলোচনার জন্যই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলাম।

যখন নীরকুমের অজ্ঞের ফল হইতে চটুগ্রামের কর্ণকুল পর্যন্ত এবং কশাই বা কাশাই নামে পরিচিত কপিলা হইতে ত্রিশ্রোতা বা তিতা পর্যন্ত সকল প্রদেশের শব্দ সংগ্রহ করিতে পারিব, তখন হরত দেখিব যে বিভিন্ন নূতন ভাব প্রকাশ করিবার অনেক শব্দ পাওয়া যাইবে। সমগ্র বঙ্গভূমির প্রতি বর্ষাভ ভালবাসা না বাড়িলে এ কাজ হইতে পারিবে না। প্রাদেশিকতার ক্ষুদ্রতা আমাদের কাছে সমগ্র ভারতের প্রতি ভালবাসা হারাই, সেইজন্য হরত প্রতিদিন স্থানের সময়ে সমগ্র দেশের প্রধান প্রধান নদীর নাম করিয়া মস্ত পড়িতে হয়। “গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোমাবরি, সরস্বতী, সর্ম্মদে, সিদ্ধ, কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু” বলিয়া আমরা প্রথম ভূমিটু দিব, কিন্তু দ্বিতীয়বার ভূমি দিবার পূর্বে যদি নিম্নলিখিত নূতন শ্লোকটি পড়ি, তাহা হইলে হরত বা নিরত মস্তজ্ঞের ফলে যথার্থ স্বদেশ-প্রীতি একটু বাড়িতে পারে। আমার প্রস্তাবিত শ্লোকটি এই :—

অজ্ঞপ্রীতসদীতঃ কপিলে, বাককেশর,
বায়োদর, তথা ভগ্ননারায়ণ শিতাবুধে।
ত্রিশ্রোতঃ তথা কর্ণকুলি, গংগা, চ যমুনে,
কপোতাক, তথা গকে, জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।
ত্রীবিজ্ঞচক্রে মজুমদার।

আধুনিক ভারত

(পূর্বাভাস)

সৈন্য ও বিধি-ব্যবস্থা

শাসন-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে, সৈন্য-বিভাগের নতুন বন্দোবস্ত আবশ্যক হইল; কেননা সৈন্যবিভাগ হইতেই ১৮৫৭ অক্টোবর যত কিছু উৎপাত উপস্থাপন সমুদৃত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর বিতীর্ণার্ধে, সামরিক প্রণালী পর-পর তিনটি অবস্থা অতিক্রম করে।

• •

প্রথম অবস্থায়,—ভারত-সরকারের রাষ্ট্র-নীতির মূল-কথা:—“যুদ্ধ দেখি।” ভারত সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা ঘরে থাকুক, সৈন্যমণ্ডলী ভারত সাম্রাজ্যকে বিপর্যস্ত করিতে চাহিয়াছিল। ভারতীয় সৈন্যগণ দুই বৎসর ধরিয়া স্বকীয় প্রধানদের সহিত বিবাদ করিয়াছিল এবং কোম্পানীর যুরোপীয় সৈন্যগণ সিপাহী-বিদ্রোহের ঠিক পূর্বেই বিদ্রোহী হইয়াছিল। তাই উভয় সৈন্যদলেরই নতুন বন্দোবস্ত আবশ্যক হইল।

প্রথমই যুরোপীয় সৈন্য। কোম্পানীর সৈন্যদলকে বিদায় করা হইল; “রাজকীয়” সৈন্য সংস্থা বাড়াইল। কেবলমাত্র এই সৈন্যমণ্ডলী হইতেই তোপের সৈন্য ও অস্ত্রাস্ত্র বিশিষ্ট সৈন্যদল গৃহীত হইবে স্থির হইল।

ভারতীয় সৈন্য। এই সৈন্যের সংখ্যা আর অর্ধেক কমাইতে হইল। পুরাতন

“বঙ্গ-ফৌজ”কে একেবারেই রহিত করা হইল। নতুন ফৌজ গঠিত হইল:—বাহারা সিপাহী বিদ্রোহের মূল, সেই উচ্চবর্ণের হিন্দুস্থানী দিগের মধ্য হইতে আর সৈন্য সংগ্রহ করা হইবে না স্থির হইল। তাহাদের বদলে পঞ্জাবী (বিশেষতঃ শিখ) স্ত্রী, আফগান ও বেগুতিদিগকে সৈন্যভুক্ত করা হইবে।

কিন্তু কেবল সাবধানতা ও দূরদর্শিতা হইতেই এই সকল উপায় অবলম্বিত হইরাছিল।

সামরিক গঠনশক্তির আর কোন বদল হইল না। সেই তিন সৈন্যমণ্ডলী লইয়াই সৈন্যসংগঠন, অঝারোহী ও পদাতিক পল্টনের সেই একইরূপ বিভাগ, দেশীয় সেনা-নাগকনিগের সেই একইরূপ নিয়মে নিয়োগ। সৈন্যসংগ্রহকার্যে ও ইংরাজ সৈন্যদলকনিগের উন্নতিসম্বন্ধেই বাহা কিছু অন্নবন্ন পরিবর্তন হইয়াছিল। ফলতঃ প্রকৃত পরিবর্তন বাহা হইরাছিল—তাৎ ভিত্তিকার মূল-ভাবটির। লর্ড ডেলহৌসী সৈন্য দেশ-ব্যপের সৈন্য ছিল। ১৮৫৭ হইতে ১৮৭০ পর্যন্ত ভূটানের কতকগুলি প্রদেশ ছাড়া আর কোন বিষয় সাধনের কাজ হয় নাই। সৈন্যমণ্ডলী আর পুলিশের বতই পাহারা ও পরিদর্শনের কাজে নিযুক্ত ছিল।

বিত্তীয় অবস্থায়,—আফগানিস্থান ও ব্রহ্ম-দেশের যুদ্ধবিগ্রহে, সৈন্যের মধ্যে সামরিক

ভাষাটা ফিরিয়া আসিল। আশিয়ার ক্রমশঃ
অগ্রসরণ, ভারতের পক্ষে আশঙ্কায় কারণ
হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিপূর্বে সাধারণ প্রজা-
বর্গ ও দেশীয় সৈন্তসমূহকে ইংরাজ-সরকারের
যে অবিখ্যাত জমিদারি ছিল, ত্রিশ বৎসরকাল-
ব্যাপী রাজতন্ত্রের প্রভাবে সেই অবিখ্যাত
বিদূরিত হইল। এখন হঠাৎ অধিক
সংখ্যায় সিপাহী সৈন্ত সংগৃহীত হইবে,
পূর্বাগ্রেহা উহারায় রণসাজে ভুল করিয়া
সজ্জিত হইবে, আধুনিকভাষ্য আদর্শের বস্তু
প্রাপ্ত হইবে এইরূপ স্থির হইল। ইংরাজ-সৈন্ত
বাহাদুর কাল শুধু উহার উপর সন্তর্ক
দৃষ্টি রাখা—এখন হঠাৎ তাহার সম্পূর্ণ-
রূপে উদ্বিগ্নকর বকৌর মুসলমানরূপে গ্রহণ
করিল। এক্ষণে ভারতকে একটি সামরিক
শক্তিরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে এইরূপ চেষ্টা
আরম্ভ হইল। যে বড় বড় পদগুলি তিন
প্রেসিডেন্সির মধ্যে বিভক্ত ছিল, সেই
সকল পদ কলিকাতার কেন্দ্রীভূত হইল।
এখান সেনাপতি “বঙ্গ কোর্সের” সেনাপতি
পরিচালনা করিলেন। “বঙ্গ কোর্স” এক্ষণে
স্বতন্ত্র দুই বিভাগে বিভক্ত হইল,—“বঙ্গলা”
ও “পঞ্জাব” সর্বসময়ে উপসেনাপতিদিগের
অধীনে চারিটি সৈন্তমণ্ডলী গঠিত হইল।

শীঘ্রই সৈন্তের ক্ষুদ্র বিভাগগুলি রহিত
হইয়া তাহার ফলে সমস্ত সৈন্তমণ্ডলী
বড় বড় স্বতন্ত্র সৈন্তমণ্ডলে বিভক্ত হইল।
যে প্রদেশে সৈন্ত সংগৃহীত হইবে, ইহার
দ্বারা সেই প্রদেশের দেশীয় বিশেষজ্ঞকে
শক্ত হইতে পারিবে।

ভারতীয় সৈন্তের ক্রমবিকাশ, অবশেষে
পরিবর্তনের তৃতীয় অবস্থায় প্রবেশ করিল।
সাম্রাজ্যবিত্তর ও এশিয়ার দুঃখপীড়িত
উপনিবেশদিগের পরিপূষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, ভারত
দুর্জয় শক্তিমত্তের সম্পর্কে আসিল।
গভ্যস্তরে, রাষ্ট্রনৈতিক বিস্তারবশতঃ, চীন,
মৌরান ও এডেনে সৈন্ত পাঠান আবশ্যক
হইয়া পড়িল। বড় বড় নগরে রাজা-
দিগের রাজধানীতে একটা ভারতীয় বিশেষ
মতামত ও ভারতীয় মনোভাব গড়িয়া
উঠিতেছিল। যদি সরকার-বাহাদুর কখন
কখন শিক্ষিত লোকদিগের, রাজকর্মচারী
দিগের, অধ্যাপকদিগের, মুদ্রাবস্ত্রের এবং
ভারতের বোদ্ধাজাতি সামন্তমণ্ডলীর সাহায্য
না পান তাহা হইলে একটা সাম্রাজ্য-
সাধারণ রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা
অসম্ভব হইয়া উঠে। সৈন্তসংগ্রহের কোন
এক নূতন প্রণালীকে জাতীয় ভাবধারণ
করিতে হইলে, বাহ্যে মঙ্গলবংশধরেরা,
সম্রাটবংশীয় মুসলমানেরা, প্রাচীন ভারতী
সর্দারেরা, উচ্চপদে উপনীত হইতে পারে
তাহা দেখা আবশ্যক। সাধুত শাসনের
অধিকার ছাড়া আর সমস্ত অধিকারই যে
সেখানে আছে, সে দেশে বিন্দুমাত্র সৈন্ত-
ধ্যাক্ষের অধীনে কেবল একটা পেশাদার
সৈন্তমণ্ডলী অবস্থিত। এই সব কারণেই
সেখানে যুদ্ধ-প্রধান রাষ্ট্রনীতি অসম্ভব।

ভারতীয় সৈন্তের ক্রমবিকাশ হইতেই
আমরা ভারতের দুই শতাব্দীব্যাপী ক্রম-
বিকাশের ইতিহাস অবগত হই। পেশাদার

ভারতীয় সৈন্তগণ কর্তৃক ভারতবর্ষ, এই
পেশাদার সৈন্তের মধ্যে বিশেষের আবির্ভাব,
কিছুকাল ধরিয়া প্রত্যক্ষ ও অবিখ্যাসের
অবস্থা, আবার যে সময় হইতে, একটা
জাতীয় সৈন্তমণ্ডলী ক্রমশ গড়িয়া উঠিলে
বলিয়া একটু অভ্যাস পাওয়া যায় সেই
নূতন যুদ্ধবিগ্রহের কাণ।

বিধি-ব্যবস্থা

সামান্যার্থ্য সৈন্তমণ্ডলীর দ্বারা
বর্তমানে ভারত-জয় সাধিত হইল; এবং
ভবিষ্যতে এই বিজয় কাব্য স্থিরতর রাখিবার
কল্প বিধিব্যবস্থা ও শিকাবিভাগ অবশ্যক
হইল।

ভারতীয় বিধিব্যবস্থা এক জটিল ব্যাপার
সিপাহী বিদ্রোহ হইতে গভর্ণমেন্ট এই
যুগলায়ক শিখাটি লাভ করিয়াছিল :—
ভারতীয় সভ্যতার প্রতি গভর্ণমেন্টের
অধিকতর প্রজ্ঞা প্রদর্শন করা, অথচ সুরোপীয়
সভ্যতার দ্বারা, সাবধানে ও অধ্যবসায়
সহকারে, ভারতকে নূতন করিয়া গড়িয়া
তোলা।

নূতন বিধিব্যবস্থার স্থল রেখাগুলি নিয়ে
প্রদর্শিত হইতেছে।

• •

হিন্দু ও মুসলমানের প্রাচীন ব্যবস্থাদির
দ্বারা, জাতি ও বর্ণের প্রাধান্যের দ্বারা,
ব্যক্তিগত অধিকার এবং উত্তরাধিকার
সাধারণভাবে নিয়মিত হইয়া থাকে। কিন্তু
এই সকল আইন, এই সকল প্রথা,
আদালতের বিচার-নিষ্পত্তি, ও ভাষাকার-
বিগের লেখার দ্বারা, আইনের আলোচনা

অনেকটা সহজ হইয়া উঠিয়াছে এবং
বিশেষাধিকারসম্বিত বর্ণবিশেষের দ্বারা,
যে মিথ্যা বাখ্যাকে প্রসন্ন দিয়াছিল, সেই
মিথ্যা বাখ্যার রহিত হইয়াছে। ক্রমশঃ একটা
পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও হুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার গড়িয়া
উঠিল। তবে কিনা উহা একটু বেশী পাণ্ডিত্য-
পূর্ণ—কেননা, লোকপ্রচলিত প্রথার সরল
আকারগুলিকে উহা জটিল করিয়া তুলিল;
এবং উহা একটু বেশী হুনির্দিষ্ট কেন না,
এই ব্যবস্থাপত্র পরিবর্তনশীল রাখাগুলিকে
স্থিরনির্দিষ্ট করিয়া দিল, আইনের পরিভাষা
নিয়মগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিল, বহুজাতি
সমূহের উপর—অম্পূর্ণ বর্ণসমূহের উপর
হিন্দু আইন আরি করিল। এমন কি,
তদ্বারা তাহাদের নীচেরও কতকটা বুটাইয়া
দিল। এই সকল বাড়বাড়ির মূল কারণটি
এই :—

ভারতবাসীদিগের মন নিয়ম-বন্ধনের
অমুরাগী ও স্বতন্ত্রবন্দী; তাই যে সকল
সাধারণ নিয়ম তাহারা কার্যে পরিণত করিতে
চাহে না (প্রকৃত প্রাচীণ জাতিগত অমুরাগ),
সেই সকল সাধারণ নিয়ম হইতে তাহারা
কতকগুলি বিচ্ছিন্ন তথ্য বাহির করিতে
ভালবাসে; কিন্তু ইংরাজেরা দৃঢ়চিত্ত ও
তাহাদের ব্যবস্থাদর্শিনী বুদ্ধি; হুতরাং তাহারা
আইনের আক্ষরিক অর্থ সর্বদাই বিচারে
করিয়া দেখে এবং ভারতবাসীরা যে সকল
উপপত্তি মূলক নিয়ম অহুসরণ করিয়াছে,
ইংরাজেরা প্রায়ই তাহা কার্যে পথোগ
করিয়া থাকে।

এই অভিনব ব্যবস্থাপত্রের কতকগুলি
ক্রটি সত্ত্বেও ইহার গুণগুলি ঢাকা পড়ে নাই।

উহা বিবিধ প্রকার বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আনিয়াছে; হিব্রনির্দিষ্টতা,—অনিশ্চয় ও পরিবর্তনের স্থান অধিকার করিয়াছে।

উহারই মধ্যে সংহিতাব্য বার, অথবা নূতন একটা ব্যবস্থাপ্রণালীর প্রতিষ্ঠা বার, উত্তরাধিকার এবং চুক্তি প্রভৃতি আইন বিধি-বদ্ধ হইয়াছে। অনতিবিলম্বেই কতকগুলি আইন সংহিতার পরিণত হইবে। মুসলমান আইন, সম্বন্ধে কোন প্রকার কষ্টিনতা উপস্থিত হইবে না। কেননা, বহু শতাব্দী হইতে মেদ্রা, বাগ্‌রাম ও দিল্লির ব্যবস্থাপ্রণালী বিচারস্থ পতি হুদায়ের দ্বারা ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু আইন সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। মসূর ধর্মশাস্ত্র এবং অজ্ঞাত ধর্মশাস্ত্রীরা কখনই আইনের বলবত্তা প্রাপ্ত হয় নাই। হিন্দু আইন ত্রিকালই ব্যবহারের আইন হইয়া থাকিবে। তথাপি বিবিধ প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভা হইতে কতকগুলি প্রাদেশিক ব্যবহার লিপিবদ্ধ হইতে পারে এবং ক্রমে কতকগুলি ব্যবহার ক্রমশ আইন-সংহিতায় পরিণত হইবে।



এই ভারতীয় বিধিব্যবস্থা প্রণয়নে ব্যবস্থাকর্তারা এসিয়ার মতামত ও যুগোপায়ের মতামতের একটা আশোষ বা “মন রাখার” সংকল্প করিয়াছেন। এ সমস্ত বিভিন্ন ব্যবস্থাপক সভার প্রবর্তিত আইন।

ব্যক্তিগত অধিকার, উত্তরাধিকার এবং সমাজাতি ও সমবয়সী শোকদিগের মধ্যে চুক্তি-ব্যবহার সম্বন্ধে এই সকল আইন পূর্ব দাবাদান সহকারে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে।

কিন্তু দেওয়ানী মোকদ্দমানসম্বন্ধে আইন-গঠিত কতকগুলি মূল-নিয়ম স্থাপন করা, দেওয়ানী কার্যাবিধি হিব্রনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, যুরোপীয়, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে চুক্তি-ব্যবহার নিয়মিত করা আবশ্যক হইয়া পড়িল। এখন যে ফৌজদারী আইন আছে তাহা সমস্ত ভারতেই প্রযুক্তাঃ—১৮৬০ অব্দের দত্তবিধি, ১৮৬১ অব্দের ফৌজদারী কার্যাবিধি (মধ্যে মধ্যে প্রায়ই পুনঃসংস্কার হইতেছে), ১৮৭২ অব্দের “প্রমাণ বিধি” ইত্যাদি।

পরিশেষে সমস্ত যুরোপীয় ধর্মের বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন। ইংরাজ পার্লামেন্টের বিধিবদ্ধ আইন, সমস্ত ভারতে প্রযুক্তা। অনেক সময় রাষ্ট্রনৈতিক সমস্তা সম্বন্ধে, দিভিল-সার্ভিস সম্বন্ধে, দৈনন্দিন সম্বন্ধে এই সকল আইন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দেয়। দেওয়ানী মোকদ্দমান উপরেও উহার কতকটা প্রভাব আছে; তাহার পর, কীহার দ্বারা আইন প্রণীত হইবে, কি ইকম-তাবে প্রণীত হইবে, কিরূপে উহার প্রয়োগ হইবে—এই সমস্তও উহার দ্বারা হিব্রীকৃত হইয়া থাকে।

অতএব, ভারতীয় ব্যবস্থাপ্রণয়নের ক্রমবিকাশে আমরা দুইটি লক্ষণ দেখিতে পাই।

একটিকে হিব্রনির্দিষ্ট হইবার দিকে এই সকল ব্যবহার প্রণয়ন। কেননা, একটা শৃঙ্খলা স্থাপন করা, সমস্ত পরিবর্তন-শীল প্রথাবিন্দকে কতকগুলি ক্রম নিয়মের

অধীনে আনয়ন করা—ইহাই আর্থিকালের আধুনিক সমাজের একটা পরিচায়ক লক্ষণ।

সমাজতত্ত্বে, হিন্দু আইন ও যুগোপীয়া আইন একত্র মিশ্রিত একটা আভি-সাধারণ

আইন গড়িয়া তোলাই এই ব্যবস্থাকর্তৃ-দিগের চেষ্টা হইয়াছে। এবং ইহার দ্বারা হিন্দু-যুগোপীয়া সভ্যতার পথ যে প্রস্তুত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীমন্তোত্তমোজ্জ্বল ঠাকুর।

মস্তিষ্ক ও আত্মার বিকাশ

পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদে মস্তিষ্কের বিকাশই জীববিকাশের শেষ পরিণামরূপে নির্দেশিত হইয়াছে। এই মস্তিষ্কের বিকাশ দ্বারাই মনুষ্য জীবজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ অংশন লাভ করিয়াছে। সুতরাং মস্তিষ্কের বিকাশ আলোচনার জীবব্রাহ্মণে মনুষ্যের ব্রাহ্মণত্বের প্রকৃতত্ব আনন্দ উন্মোচন করিতে সমর্থ হইব আশার উপস্থিত প্রদেশের অবস্থার প্রকৃত হইতেছি।

জন্মের বিকাশের সহিত যেমন রক্তের সাক্ষাৎ সঞ্চয় দেখিতে পাওয়া যায় মস্তিষ্কের বিকাশের সহিতও তেমনিই দ্ব্যুৎ সাক্ষাৎ সঞ্চয় দেখিতে পাওয়া যায়। রক্ত শরীরের প্রথম উপাদান;—তাহাতেই “রক্তমাংসের শরীর” এইরূপ কথা প্রচলিত হইয়াছে। রক্তকে যেমন আমরা শরীরের প্রথম উপাদান বলিতে পারি—দ্ব্যুৎকে তেমনিই শেষ উপাদান বলিতে পারি।

জন্মের যেমন রক্তমাংস কেন্দ্রীভূত হয়—দ্ব্যুৎও তেমনিই মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত হয়। এই প্রকারে জন্মের যেমন রক্তের আধার মস্তিষ্কও তেমনিই দ্ব্যুৎ আধার

হইয়াছে। ইহা হইতে জন্ম ও মস্তিষ্ক যে শরীর ধারণের প্রধান যন্ত্র তাহাই বুঝিতে পারা যায়। উভয়ই শরীর ধারণের প্রধান যন্ত্র, হইলেও ইহাদের মধ্যে দ্ব্যুৎই বিশেষ প্রাধান্য পরিণমিত হয়। কারণ দ্ব্যুৎ শক্তিতে রক্ত সর্বদেহে সঞ্চারিত হইয়া তৎসেই দেহের রক্ষা ও পোষণকার্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

রক্ত হইতেই আমাদের দেহে চৈতন্তের সঞ্চার হয়। তাহাতেই রক্তহীন স্থানে অঙ্গভূতির অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। রক্ত চৈতন্তের সঞ্চারক বলিয়াই রক্তাধার জন্মের চৈতন্তের আধার হইয়াছে। এই অঙ্গই জন্মের ক্রিয়া রহিত হইলে চৈতন্তেরও নিলোপ হয়। জন্মের এই প্রকার অঙ্গভূতির আধার বলিয়াই জন্ম-জন্মের অঙ্গভূতি জন্মে চইয়া থাকে।

দ্ব্যুৎ দ্বারা শরীরের রক্তসঞ্চালন কার্যের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কার্যই নির্ধারিত হয়। এই কারণেই দেহের কোন অঙ্গে দ্ব্যুৎ বিকল হইয়া গেলে তাহা যেমনই রক্তাভাবে শুষ্ক হইয়া যায় তেমনিই অকরণ্যও

হইয়া যায়। কোন অঙ্গে প্রায়শ্চলিত কার্য-
কারিতা নষ্ট হইয়া গেলে তাহার অহুত্ব
শক্তিও নান পাটয়া থাকে। পক্ষাঘাতের
দ্বারা যে অবশ্যশক্তি ঘটে ইহাই তাহার
প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই প্রকারে আমরা প্রায়শ্চলিত
রক্তাপেক্ষাও অধিক বোধশক্তির আধার
দেখিতে পাইতেছি। ইহা হইতে প্রায়শ্চলিত
যে রক্তাপেক্ষাও অধিক চৈতন্য নিহিত
আছে তাহাট আশ্রয় দিচ্চা করিতে
পারি। সুতরাং জগৎ রক্তকে প্রায়শ্চলিত
এবং চৈতন্যধার মস্তিষ্ক প্রায়শ্চলিত বলিয়া
যে তদপেক্ষাও চৈতন্যধার তাহাট আশ্রয়
বুঝিতে পারিতেছি। এই প্রকারে মস্তিষ্কেই
আমাদের চৈতন্যের প্রধান মূল্যধার হইতেছে।
সম্মানযোগে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইয়াতেই
সংজ্ঞা লোপ পাইয়া থাকে। নিদ্রাতেও
মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বদ্ধ হইয়াতেই
অচৈতন্যাবস্থা সংঘটিত হয়।

পূর্বেক্ষিত আলোচনা হইতে চৈতন্যশক্তিই
যে মস্তিষ্ক-বিকাশের প্রধান ফল তাহাই
আমরা প্রতিপাদন করিতে পারি।

মস্তিষ্কের উপরি-উক্ত চৈতন্যশক্তির
মাত্রাধারাই বিকাশের মাত্রা পরিমিত হইয়া
থাকে। বাহ্যতে উক্ত চৈতন্যশক্তি বা
চিহ্নিত্তির অধিক পূর্ণতা, তাহাতেই বিকাশের
অধিক পূর্ণতা ইহাই চৈতন্য বা চিহ্নিত্তির
দ্বারা বিকাশ-বিচারের পদ্ধতি। মস্তিষ্ক
আমাদের দেহের উৎকৃষ্ট বিকাশ বলিয়াই ইহার
আধারভূত মস্তক দেহের “উত্তমাদ” অর্থাৎ
প্রকৃষ্টাঙ্গ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রায়শ্চলিত মস্তিষ্কের এই চিহ্নিত্তির প্রাধান্য
প্রায়শ্চলিত মস্তিষ্কের এই চিহ্নিত্তির প্রাধান্য

নির্ধারিত হয় ইহাই পাশ্চাত্য দর্শনের মত।
পাশ্চাত্য দর্শনমতে এই চিহ্নিত্তিই “মন”
আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং মস্তিষ্ক ইহারই বস
বা ইঞ্জিন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য দর্শনের ন্যায় আমাদের শাস্ত্রেও
মস্তিষ্কেই সমস্ত কার্যপ্রেরণার স্থান মসি-
বেদিত দেখিতে পাওয়া যায়। যে প্রায়-
শ্চলিতের দ্বারা এই প্রেরণার কার্য সম্পাদিত
হয় তাহার নাম শাস্ত্রে “আজ্ঞাচক্র” প্রেরণ
হইয়াছে। ইহার বর্ণনা এইরূপ :—

“জ্ঞানোক্তপরিমিতানাং জ্ঞানানাং প্রাপ্ত উচ্চাতে।

তৎপ্রাপ্ত্যঃ ত্রিপদ্যনানং বটকোণঃ চতুঃসঙ্গলং।

রক্তবর্ণং যোগৈঃ প্রায়শ্চলিতমিতীহিতম্।”

ইতি শব্দকল্পদ্রুমতঃ কালিকাপুরাণে ৪৪ অধ্যায়।

পাশ্চাত্যগণ যেমন মনকে মস্তিষ্কের
অধিষ্ঠাতা বলিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছেন,
শাস্ত্রে “আজ্ঞাচক্রের” অধিষ্ঠাতাও মনকেই
উল্লিখিত দেখা যায়; বর্ণা :—

“বটমাজ্জাস্রঃ চক্রং ত্রিঘনং যেত মূহমম্।

বারহেঁমিতীহিতাঃ মনঃস্থান একীভূতম্।”

ইতি শব্দকল্পদ্রুমতঃ পাণ্ডে বর্ণ খণ্ডে ২৭ অধ্যায়।

কিন্তু এই প্রকারে মন মস্তিষ্কের অগ্র-
ভাগে বা ললাটদেশের অধিষ্ঠাতারূপে
বর্ণিত হইলেও ইহা পাশ্চাত্যদর্শনের মন-
স্তত্ত্বের সম্পূর্ণ অহুত্ব নহে। আজ্ঞাচক্রের
অধিষ্ঠাতারূপে মন আশ্রয়ই সহযোগী।
পাশ্চাত্য দর্শনিকগণ কিন্তু আত্মা হইতে,
সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবেই মনস্তত্ত্বকে বুঝিয়া
থাকেন। এই আত্মনিরপেক্ষ মনস্তত্ত্বের স্থান
কিন্তু ললাটদেশ নহে—তাহার স্থান জগৎ
বা জগদ্ব্যবস্থা। নিম্নোক্ত বর্ণনা পাঠ করিলেই
তাঁহা বুঝিতে পারা যাইবে :—

“অগাধময় নারীনাঃ জবরে চৈতন্য ভবেৎ
 উৎসাহিঃ বোড়শাঃ স্তাৎ সত্যজ্ঞানমাপতঃ।
 তৎশ্রীতমুক্তং বোপজ্ঞেয়মি বোড়শচকম্।
 ধ্যানানামময় স্তাণাঃ চিত্তবন্ত মণ্ডলঃ।
 বন্দ্যাদ্যন্তক রম্যঃ তৎসামান্যি গন্ততে।”

ইতি শলকরচন্দ্রমতঃ কালিকাপুরাণে ৫৪ অধ্যায়ঃ।

চৈতন্যের আদিষ্টান জ্বর বলিগ্রাই
 ইহার নাম “আদিত্র” চটগ্রাছে।

লগাট বে প্রকৃত মনের অধিষ্ঠান স্থান
 নহে পরন্তু আত্মারই অধিষ্ঠান স্থান, তাহা
 নিম্নোক্ত তাত্ত্বিক বর্ণনা হইতে বুঝিতে
 পারা যায় :—

“আজ্ঞাচক্রঃ তদুর্দ্ধে জ্ঞানবিকীর্ণঃ পরমঃ”

ইতি শলকরচন্দ্রমতঃ তত্ত্বসারঃ।

জ্বর ও মস্তিষ্কে আমরা শরীরের
 প্রধান দ্রব্য বলিগ্রাছি। এই দুই দ্রব্যযোগেই
 আমাদের দেহমনের কার্য পরিচালিত হইয়া
 থাকে। (১) জ্বরকে মনের অধিষ্ঠান বলিয়া
 বুঝিলে এবং মস্তিষ্কে আত্মার অধিষ্ঠান
 বলিয়া বুঝিলে জ্বর ও মস্তিষ্কের একযোগে
 কাজ মন ও আত্মার একযোগে কাজই
 বুঝিতে হয়। আমরা “মনোগ্রাণে” কার্যের
 কথা যে বলিয়া থাকি তাহাতে পূর্বেকৃত
 মন ও আত্মার যোগই বুঝায়। ইংরেজী
 ‘Heart and Soul’ কথাই এই যোগের
 কথা বিশেষরূপেই পরিমুখ্ত। আত্মা যে
 মন হইতে পৃথক পদার্থ তাহা প্রমাণতঃ
 নিজের স্বপ্ন-ব্যাপারের দ্বারা প্রমাণিত
 হইতে পারে। স্বপ্নে আত্মা নিজের থাকার
 তখন কেবল মনেরই কার্য হইতে থাকে—
 তাহাতেই অনেক সময় স্বপ্নে অসম্ভব ঘটনা-
 পরম্পরা দৃষ্ট হয়। উদ্যোগের লোকদিগের

মনের উপর আত্মার প্রভাব না থাকতেই
 তাহাদিগকে অসংলগ্ন উক্তি ও অসম্ভব
 কাহা করিতে দেখা যায়।

আমরা মন হইতে অতিরিক্ত যে প্রকৃষ্ট
 চৈতন্তের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াস
 পাটগ্রাছি—আমাদের দর্শনশাস্ত্রে তাহাই
 আত্মতত্ত্বরূপে অনীকৃত হইয়াছে; যথা—

“তত্ত্বাসকঃ নিত্যগচ্ছবুদ্ধমূল সত্য বসত্যঃ
 প্রত্যচ্চৈতন্তমবাস্তবম্।” ইতিশলকরচন্দ্রমঃ।

এই বিদ্যুৎচৈতন্যের যে মস্তিষ্কের
 স্নায়ুগুণেরই বিকাশ ঘটুকের সহস্রার
 (সহস্রদল) পদ্যের বর্ণনায় তাহা স্পষ্টই
 উপলব্ধি হইতে পারে; যথা :—

“সহস্রদল সত্যকর্ণঃ পরমাত্মপ্রকাশকম্।

নিত্যজ্ঞানময়ঃ সত্যঃ সহস্রাবিত্যঃ সত্তিতম্।”

ইতি শলকরচন্দ্রমতঃ পাণ্ডে বর্ণনাত্তে ২৭ অধ্যায়ঃ।

এখানে যে সহস্রদল পদ্যকে আমরা
 ‘পরমাত্মার প্রকাশক’ বলিয়া উল্লেখ পাইতেছি
 তাহা যে মস্তিষ্কের উপর বিস্তৃত স্নায়ুগুণেরই
 রূপকমাত্র এ কথা বীতারা। মস্তিষ্কের
 আয়তনকারী স্নায়ুগুণের ভিত্তি কোন শরীর
 বিজ্ঞানগ্রন্থে দেখিতে পাইয়াছেন তাহারাই
 মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

এই সমস্ত হইতে আত্মার প্রধান
 লক্ষণ আমরা প্রকৃষ্টচৈতন্ত বলিগ্রাই নির্দেশ
 করিতে পারি। চিন্তাকেই এই চৈতন্যের
 কার্য বলিয়া নির্দেশ করা যায়। চৈতন্য
 ও চিন্তা যে একই চিৎখাত্ত হইতে উৎপন্ন
 তাহাতেই উভয়ের যোগ প্রমাণিত হয়।

লগাটে আত্মার স্থান বলিগ্রাই যোগগণ

(১) ইংরেজী “Head and heart” কথাই এই যোগের বিশেষ আভাসই পাওয়া যায়।

শলাটে আত্মতত্ত্বের চিত্রা করিয়া থাকেন।
 যোগীদিগের সমাধি হইতে আমরা আত্মার
 অস্তিত্ব লক্ষ্যে বিশেষ প্রমাণই প্রাপ্ত হই।
 তখন সমস্ত শারীর কার্যই নিবৃত্ত হয়—
 যেমন ক্ষুধাশেষে কার্য স্থগিত হয়—তখনই
 মনোব্যাপারও স্থগিত হয়, তাহাতেই যোগের
 সংজ্ঞা হইয়াছে—‘যোগান্তিত্ত্বত্বনিবোধঃ।
 ‘চিত্তবৃত্তিনিবোধের নামই যোগ।’ মনের
 কার্য, শরীরের কার্য যখন রহিত হইয়া
 যায় তখন আর কোন শক্তিবলে প্রাণ
 নক্ষা হইতে পারে? ইহা যে এতদতিরিক্ত
 অস্ত্র কোন শক্তির কার্য তাহা অবশ্য
 স্বীকার করিতে হইবে। সেই শক্তিই
 চিত্তবৃত্তি আত্মশক্তি।

আত্মার বিকাশ যে মনের বিকাশের
 উর্দ্ধে অবস্থিত নিম্নোক্ত গীতোক্তিতে তাহা
 স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে; যথা—

ইন্দ্রিয়ানি পশ্যন্ত্যাহঃ ইন্দ্রিয়ৈস্তাঃ পরং মনঃ।

মনস্ত পরাবুদ্ধিঃ যো বুদ্ধেঃ পরতত্ত্বমঃ ॥ ১

৩য় অধ্যায়ঃ।

‘ইন্দ্রিয়গণকে (বাহ্যি অপেক্ষা) শ্রেষ্ঠ বলা যায়,
 ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ,
 বুদ্ধি অপেক্ষা যিনি পর (শ্রেষ্ঠ) তিনি দেহ (আত্মা)।’

আত্মা একত্ব চৈতন্যতত্ত্ব বলিয়া আত্মার
 যোগ ব্যতীত কোন কার্যই সম্ভবপর হয় না—
 তাহাতেই আমাদের দর্শনে আত্মাকেই
 সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিরামকরূপে নির্দেশ
 করা হইয়াছে যথা—‘আত্মেন্দ্রিয়ানুভিষ্ঠাতা।’

‘আত্মাই ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা।’ ইন্দ্রিয়
 শব্দের ব্যুৎপাদনেও আমরা ঐ প্রমাণকে
 আত্মা অর্থেই ব্যাখ্যাত দেখিতে পাই; যথা—
 ‘ইন্দ্রত আত্মনঃ শিবঃ ইন্দ্রিয়ম্ ॥’

উপনিষদে রূপকরূপে আত্মাই সারথী
 বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে যথাঃ—

‘আত্মানঃ সারথিঃ বিদ্ধি মনঃশরস্ববেবচ।

ইন্দ্রিয়ানি হমানাহঃ ॥’

‘আত্মা সারথি (চালক) ইন্দ্রিয়গণকে অব আর মন
 শরস্বতী বলিয়া।’

মস্তিকের পরমবিকাশরূপ আত্মা কেবল
 পার্থিব দেহেরই শেষ বিকাশরূপে শাস্ত্রকার-
 গণ কর্তৃক বিবেচিত হয় নাই—কিন্তু ইহা
 বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের শেষ বিকাশরূপেও বিবেচিত
 হইয়াছে। তাহাতেই বিশ্বের চরম তত্ত্বরূপে
 পরব্রহ্মের অধিষ্ঠান যেমন ‘ব্রহ্মাণ্ড’ নামে
 আখ্যাত হইয়াছে—ব্রহ্মরূপী আত্মার অধিষ্ঠান-
 ভূত বলিয়াই মস্তিকও তদ্রূপ ‘ব্রহ্মরূপ’ (২)
 নামে আখ্যাত হইয়াছে।

সহস্রার পদ্ম যে পরমাত্মার একাংশক
 তাহা আমরা উপরি-উদ্ধৃত পুরাণের বর্ণনা
 হইতেই জানিতে পারিরাছি।

শলাটদেশস্থ মস্তিকের ‘আজ্ঞাচক্র’ নামক
 স্থান যে আত্মার অধিষ্ঠান তাহারও উল্লেখ
 আমরা উপরে পাইরাছি। সহস্রারাদিষ্টিত
 আত্মা যেমন পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত
 হইয়াছে—আজ্ঞাচক্রাধিষ্টিত আত্মাও তেমনই
 জীবাত্মা বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।

(২) জাকা যমুয়া সন্তোমঃ কৃষা বায়ুক যোগগম্।

বিদ্যা সর্বৈব স্থানানি ব্রহ্মরূপে নিরোধয়েৎ।

বিষকোষভূত হটযোগী গীপিকা। ৪।১৩

পরমাত্মা ললাটস্থিত স্নায়ুদণ্ডে অধিষ্ঠিত হইয়া মন ও ইন্দ্রিয়যোগে সমস্ত কার্যের কর্তৃত্ব করিয়া থাকে বলিয়াই এই মণ্ডলের ‘আজ্ঞাচক্র’ নাম হইয়াছে। আত্মা যখন মন ও ইন্দ্রিয়ার সহিত যোগবিরহিত হইয়া সহস্রারে ব-ভাবে অবস্থিত হয় তখনই ইহার কূটস্থ চৈতন্য অবস্থা বলা যায়। ইহাই পরমাত্মার ভাব—পরম ব্রহ্মভাব। যোগে আত্মাকে আত্মাচক্রে হইতে আনিয়া সহস্রার চক্রে স্থাপন করিতে হয়। এইরূপে জীবাত্মা সহস্রারে আসিয়া পরমাত্মার সহিত যুক্ত হয় বলিয়াই এই কার্যের নাম যোগ হইয়াছে। চিত্তবৃত্তির নিরোধ যে যোগসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে—তাহাতেও সমস্ত চিত্তবৃত্তির কার্য নিবৃত্ত করিয়াই যে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হয় তাহা বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ যে সহস্রার পঞ্চকে আমরা পরমাত্মার অধিষ্ঠানরূপে বর্ণিত দেখিতে পাই—তাহা পরমাত্মার অসংখ্য বৃত্তিরই রূপকমাত্র। অসংখ্যবৃত্তির কার্যাবল্যরূপেই স্নায়ুসকল সহস্রবলরূপে কল্পিত হইয়াছে। আত্মার

বৃত্তিসকল বহিস্পৃহ হইলেই বাহ্যবিষয় সকল আরম্ভ হয়। বৃত্তিরূপে এই প্রকারে আত্মা যে বাহ্যবিষয়সকলে ব্যাপৃত হয় তাহাই জীবাত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৃত্তি সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় মূলকেন্দ্রে আসিয়া উপসংহত হইলে যে বিশুদ্ধ চৈতন্যলা উদ্ভাবিত হয়, তাহাই পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হয়। জীবাত্মা বিষয় হইতে নিপীড়িত হইতে হইতে যে পরমাত্মার সাক্ষ্য প্রাপ্ত হয় তাহাই ইহার পরমাত্মার লীন হওনা বলিয়া কথিত হয়। ইহাই যোগের মুক্তি। এই যুক্ত আত্মা বা পরমাত্মা ও পরব্রহ্ম উভয়ের একই স্বরূপ স্তূতরাং উভয়েই মূলে একই তত্ত্ব। যোগের দ্বারা ঈশ্বরভাব সিদ্ধ হয় বলিয়াই যোগের অষ্টশক্তি, অষ্টঈশ্বর্য অর্থাৎ অষ্টঈশ্বর প্রভাবন্যে নির্দেশিত হয়। এই প্রকারে আমাদের মস্তিকে কেবল যে আত্মারই বিকাশ হয় তাহা নহে, কিন্তু ঈশ্বরত্ব, পরব্রহ্মত্বেরও যে বিকাশ হয় তাহাই আমরা এতক্ষণে বুঝিতে সমর্থ হইলাম।

শ্রীশ্রীতলচন্দ্র চক্রবর্তী।

বঙ্গের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়

(আদম্ জুমারি)

গত আদম্ জুমারিতে বঙ্গে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির সংখ্যা কত ছিল, নিম্ন-লিখিত তালিকা হইতে তাচা জানি যায় :

ধর্ম	সংখ্যা ১৯১১ খৃঃ আদ
মুসলমান	২৪,২৩৭,২২০
হিন্দু	২০,২৪৫,৩৭২
এনিমিষ্ট	৭৩০,৭৮০
বৌদ্ধ	২৪৬,৮৬৬
খৃষ্টান	১২২,৭৪৬
জৈন	৬,৭৮২
ব্রাহ্ম	২,২৪৮
শিখ	২,২২১
ইহুদী	১,২২০
কনফিউসিয়ান	
পার্সী	
অাধ্য	

হিন্দু ও মুসলমান

বঙ্গদেশে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক ; অধিবাসীগণের মধ্যে শত-করা ৫২'৩ জন মুসলমান, ৪৫'২ জন হিন্দু, এবং ২'৫ জন অন্তান্ত ধর্মাবলম্বী।

বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যা

সর্বত্র সমান নয় ; পূর্ববঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা সর্বাধিক। কয়, পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক অধিক, এবং উত্তর ও মধ্যবঙ্গে মাঝামাঝি।

হিন্দুর সংখ্যা শতকরা

পশ্চিম বঙ্গ	৮২
মধ্য বঙ্গ	৪১
উত্তর বঙ্গ	৩৭
পূর্ব বঙ্গ	৩১

বঙ্গে ১৯০১ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ-কালের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৪ জন হিসাবে বাড়িয়াছে। এ বৃদ্ধির হারও আবার বঙ্গের সর্বত্র সমান নয়—

হিন্দুর বৃদ্ধির হার

পূর্ববঙ্গ	৬.৬	শতকরা
মধ্য বঙ্গ	৫.২	
উত্তর বঙ্গ	৩	
পশ্চিম বঙ্গ	২	

যেখানে হিন্দুর সংখ্যা বহু কয়, বৃদ্ধির হারও সেখানে সেই পরিমাণে বেশী।

বঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা সর্বাধিক। অধিক ; কিন্তু সর্বত্র সমান নয়, পূর্বে বেশী, পশ্চিমে কম।

মুসলমান সংখ্যা শতকরা

পশ্চিম বঙ্গ	১৩
মধ্য বঙ্গ	৪৮
উত্তর বঙ্গ	৫২
পূর্ব বঙ্গ	৩২

হিন্দু ৩ অংশ পশ্চিম বঙ্গে, ৬ অংশ পূর্ব বঙ্গে, এবং ২ অংশ মধ্য ও উত্তর বঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়; মুসলমানের ২ অংশ পূর্ব বঙ্গে, ২ অংশ উত্তর বঙ্গে, এবং ৩ অংশ মধ্য বঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়।

১৯০১ হইতে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ১০.৪ জন হিসাবে বাড়িয়াছে; কিন্তু বৃদ্ধির হার সর্বত্র সমান নয়—

মুসলমানের সংখ্যা-বৃদ্ধির হার	
পূর্ব বঙ্গ	১৪.৬
উত্তর বঙ্গ	৮.২
পশ্চিম বঙ্গ	৪.৯
মধ্য বঙ্গ	৩.১

যেখানে মুসলমানের সংখ্যা যত বেশী সেখানে বৃদ্ধির হারও তত অধিক।

বঙ্গে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে; মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা হিসাবে তিনগুণ বাড়িয়া যাইতেছে। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে হিন্দুরা শতকরা ১৬ জন হিসাবে বাড়িয়াছে, কিন্তু মুসলমানের বৃদ্ধির হার শতকরা ২৯ জন হিসাবে। গোটসাহেবের মতে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের এই সংখ্যা-বৃদ্ধির কারণ—

- (১) তাহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহের সমধিক প্রচলন;
- (২) স্বামী ও স্ত্রীর বয়সের মধ্যে সামান্য পার্থক্য;
- (৩) পুষ্টিকর আহাৰ;
- (৪) উন্নত আর্থিক অবস্থা

এবং এই সব কারণে তাহাদের উৎসরতাও সমধিক।

অবার ১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক গ্রীণোকের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের মধ্যেই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

	কুমারী	সখা	বিধবা
হিন্দু	২	৭৬	২২
মুসলমান		৮৭	

১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক নিবাহিতা

গ্রীণোকের সংখ্যা

হিন্দু	৩, ২৬৮, ১৮৮
মুসলমান	৪, ১৮৩, ২৮৮

মুসলমানের সংখ্যা অধিক, উৎসরতা অধিক এবং গ্রীণোকের পরিমাণও অধিক; সেই জন্যই তাহাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বিধবা-বিবাহ এবং বহুবিবাহও এ বৃদ্ধির হার কিয়ৎপরিমাণে বাড়াইয়া দিতেছে।

এনিমিষ্ট

পশ্চিম বঙ্গে, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার অগ্রদূত অংশে, আর তিন লক্ষ এনিমিষ্ট (অধিকাংশই সাঁওতাল) বাস করে; মালদহ, দিনাজপুর ও কলপাই-গুড়ি জেলার আর ২০৮,০০০ ঔপনিবেশিক সাঁওতাল দেখিতে পাওয়া যায়, এবং মহম্মদসিং ও চট্টগ্রামের পার্শ্বভাগে প্রদেশে কোচ, কুকি, ময়ং, কামো, ত্রিপুরা প্রভৃতি জাতি দেখা যায়।

এনিমিষ্টদের সংখ্যা ১৯০১ হইতে ১৯১১ সালের মধ্যে শতকরা ৬৪ জন হিসাবে বাড়িয়াছে; বৃদ্ধির কারণ বঙ্গের বিভিন্ন অংশে ইহাদের উপনিবেশ-বিস্তার।

বৌদ্ধ

কলিকাতার বিভিন্ন বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী চীন দেশিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের আদম শুমারিতে বঙ্গের বিভিন্ন জেলার বৌদ্ধগণের সংখ্যা ছিল,—

চট্টগ্রাম বিভাগে	১৭০, ১২৪
বাংলাগঞ্জ	৮, ৮২৮
পার্বত্য ত্রিপুরা	৫, ৯২৭
	১৮৮, ০১৯
দক্ষিণবঙ্গে	৪৭, ২০৪
সিক্কিম	২৮, ২১৫
অলপাইগুড়িতে	৮, ০৫৪
	৮৪, ৮৭৪

এখন বঙ্গের পূর্ব দক্ষিণে এবং উত্তর অংশে মগ, নেপালী, তুটিয়া ও লেপচা জাতিবর্গেরা বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

শিখ ও জৈন

১৯১১ সালের গণনার সময় কলিকাতার শিখের সংখ্যা ছিল, ২০২ জন এবং জৈনের সংখ্যা সমগ্র বঙ্গদেশে ৬৭৮২ জন। জৈনদের অধিকাংশই মাড়োয়ারী।

ব্রাহ্ম

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় আদম শুমারিতে ব্রাহ্মের সংখ্যা ছিল ৩৫৪৩, জন এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ছিল, ৩১৭১ জন। দশ

বৎসরে ব্রাহ্মের সংখ্যা কেবলমাত্র ৩৭২ বাড়িয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাউতেছে যে, নূহন কেহ বড়-একটা ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হইতেছেন না। উচ্চ শিক্ষা-পিত্তারের সহিত লোকের গোড়ামি কমিয়া যাউতেছে এবং আধুনিক হিন্দু দল ব্রাহ্ম নামে অভিহিত হইবার কোন আশঙ্কতাও বিবেচনা করেন না। আবার ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও হিন্দু-আখ্যার অভিহিত হইবার প্রবণ ইচ্ছাও দেখা যাউতেছে। ব্রাহ্মদের মধ্যে শতকরা ৪০ জন কলিকাতায় বাস করেন; বাকীর অধিকাংশ দক্ষিণবঙ্গের বড় বড় সহরে বাস করেন; পল্লীগ্রামে ব্রাহ্ম নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, বিগত আদম শুমারিতে পল্লীগ্রাম হইতে কেবলমাত্র ৫৭৪ জন ব্রাহ্মের সংখ্যা পাওয়া গিয়াছিল।

ইহুদি, পার্শী ও কনফিউশন

বঙ্গদেশের সমগ্র ২,০১৮ ইহুদীর মধ্যে ১৯১৯ জন কলিকাতায় বাস করে। ইহারা আবার দুই ভাগে বিভক্ত—একভাগ স্পেনদেশীয় ইহুদী, ধর্মের ভাঙনের স্পেন পরিত্যাগ করিয়া এতদ্দেশে আসিয়া বহুকালাধি বসবাস করিতেছে; অপর একভাগ আরব ও তুর্ক হইতে এদেশে আসিয়া ইদানীং বাস করিতেছে। ইহুদীদের ৬ অংশের ভাষা ইংরাজী, বাকীরা হিব্রু কিংবা আরবি ভাষায় কথাবার্তা করিয়া থাকে। ইহুদীদিগের ৮ অংশের কনস্টান্টিন কলিকাতা, বাকী ২ অংশের অন্য আরবে।

পার্সী বণিকেরা সকলেই জোরোয়াষ্টার মতাবলম্বী; চীন ব্রূচী ও ছুতারেরা কতক

কমফিউসান মতাবলম্বী, কতক-খা বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী। চীনাবের সংখ্যা ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে।

ইউরোপীয়

বঙ্গ গত আদম প্রমারিতে ইউরোপীয়-রান, আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান, ও টউ-রোপীয় জাতি-সমূহ অপর জাতির সংখ্যা ছিল ২৪,৩৮৮; আরমানীয় সংখ্যা, ১০৬০, এবং এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের সংখ্যা ছিল ১০, ৮৩৩ জন। কলিকাতার শতকরা ৫৫ জন ইউরোপীয়ান, ৭৭ জন আমেরিকান ও ৭১ জন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বাস করে।

উক্ত ইউরোপীয়ানদের ৩২- ভাগ বৃটশ প্রজা এবং সর্বাপেক্ষা ইংরাজের সংখ্যাই অধিক। গত আদম প্রমারিতে কলিকাতার ইউরোপীয়ানের সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ পাওয়া গিয়াছিল—

ইংরাজ	২,২১৫
আইরিস	২২০
ফর	১,৫৮৪
জার্মান	২৮০
ফরাসী	২১২

সমগ্র বঙ্গে ১৪,৭২১ জন (প্রায় অর্ধেক) ইউরোপীয়ান মুক্তসাজে জন্ম বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল এবং ইহাদের মধ্যে ১১, ০২৯ জন ইংরাজ।

ইউরোপীয়ানের মধ্যে শতকরা ৫৬ জন এমসিকান, ২০ জন রোমান ক্যাথলিক, এবং ১০ জন প্রেসবিটেরিয়ান।

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের (অর্থাৎ ইউরোপীয়-রানের) মধ্যে শতকরা ৫৮ জন রোমান

ক্যাথলিক, ৩২ জন এংলিকান, বাকী ব্যাপটিষ্ট, মেথডিস্ট অথবা প্রেসবিটেরিয়ান।

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে প্রায় ১২০০ জন পুরুষসত্তা ফিরঙ্গী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহারা বাথরগর, নোয়াখালি ও চট্টগ্রামে বাস করে; প্রায় সকলেই এখন রোমান ক্যাথলিক ও ওলন্দাজ দ্বারা সং-সমূহ। ইহারা এতদেবীর জ্যৈষ্ঠকে বিবাহ করে এবং ইহাদের আচার-ব্যবহারও কতকটা এতদেবীর নিয়ন্ত্রণের মত; প্রভের যা-কিছু তা কেবল ধর্ম, পরিচ্ছদে, নামে ও বর্ণের কৃচ্ছতার।

মেদিনীপুর জেলার পৌরোখালির নিকট কতকগুলি ফিরঙ্গী বাস করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহিষাসুরের রাজা বর্গীর রাজ্যে হইতে নিজ রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য চট্টগ্রাম হইতে যে সকল ওলন্দাজ গোলন্দাজ আনিয়াছিলেন, ইহারা তাহাদেরই বংশধর। ইহাদের সংখ্যা অল্প—১২০ জন মাত্র। ইহারা নাম ও ধর্ম ছাড়া সকল বিষয়েই সাধারণ বাঙ্গালীর মত।

আরমানীরা বঙ্গে নানাবিধ তিন শতাব্দী-কাল ধরিয়া বাস করিতেছে। বাণিজ্য করিবার জন্য ইহারা স্থানটিতে (বর্তমান কলিকাতা) অব চার্টারের অন্ততঃ ৬০ বৎসর পূর্বে এক উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে আরমানীরা সম্রাট ওরঙ্গজেবের নিকট হইতে পঞ্চাশখানা পাইয়া স্থানবাসের নিকটস্থ সৈন্যবাস্য গ্রামে উপ-নিবেশ স্থাপন করে, এবং ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে এতদেবে বাণিজ্য করিবার অধুগতি পায়। ইহারা

যদিও প্রধানতঃ বাণিজ্য-বান্ধায় করিত, তথাপি রাজস্বাবে তৎকালে ইহাদের যথেষ্ট সম্মান ছিল; আরমানী বনিক খোজা সার-হদের প্রভাবে ইংরাজেরা মোগল সম্রাট ফারকসিরবের নিকট হইতে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিবার অধুমতি লাভ করিয়াছিল। আরমানীদের মধ্যে অনেকে একদেবে বাদশাহগণের দৈত্য-বিভাগে উচ্চ পদ লাভ করিয়াছিল; গুরগন্ পী (খোজা গ্রেগরি) মীর কামেম আলির প্রধান পেনা-পতি ছিলেন।

১৯১১ সালে বঙ্গে ১,০৬৩ জন আরমানী ছিল এবং ইহাদের ঃ আংশের বাস কলিকাতায়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ইসলামীস্তন পারস্তের জুফা নামক স্থান হইতে আসিয়াছে। ইহারা যখন কলিকাতায় প্রথম পদার্পণ করে, তখন ইংরাজী ভাষা ঘোটেই জানিত না, কিন্তু অল্পকাল পরে ইংরাজী ভাষা শিখিও লয় ও ইংরাজী চাল-চলনের অধুকরণ করে। কলিকাতাবাসী আরমানী পুরুষদের অর্ধেকের জন্ম পারস্ত দেশে; কিন্তু পারস্তদেশীয় আরমানী স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতিশয় অল্প।

গত আদম্ জুমারিতে বঙ্গে ৮৩,২৬০ জন দেশী খৃষ্টান পাণ্ডা গিয়াছিল। ১৯০১ হইতে ১৯১১ সালের মধ্যে বৎসরে ২৩, ১৫০ (অর্থাৎ শতকরা ২১.৭ জন) দেশী খৃষ্টান সংখ্যায় বাড়িয়াছে; কিন্তু ছোট-নাগপুর বিভাগে ২৫,৭৬৭ জন অর্থাৎ শতকরা ৫৫.৫ জন হিসাবে বাড়িয়াছে। শাঙ্গলা দেশ অপেক্ষা ছোটনাগপুরে খৃষ্টান ধর্ম অধিকতর প্রচুরভাবে আদিম নিবাসীদের

মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। একমাত্র রীতিতেই দেশী খৃষ্টানের সংখ্যা সমগ্র বঙ্গের সংখ্যার বিত্ত। নিম্ন তালিকা হইতে বঙ্গের নেটিভ খৃষ্টানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা জানা যাইবে—

রোমান ক্যাথলিক	২৮,৮০৫
লুথারেন্	৩,৯৭৬
এংলিকান	১৮,০০৮
বাপ্টিষ্ট	২২,৯০৩
প্রেসবিটেরিয়ান্	৪,১১৫
মেথডিষ্ট	৩,০০৭
কন্‌গ্রিগেশন লিষ্ট	২,৩৩৬
	৮৩,২৬০

বঙ্গে সেপছা ও সাঁওতালদের মধ্যে "নেটিভ খৃষ্টান"র সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং ছোটনাগপুরে ওরাও, মুন্ডা, খাড়িয়া ও সাঁওতালদিগের মধ্যে খৃষ্টানধর্ম সর্বাধিক বিস্তার লাভ করিয়াছে।

আদিম নিবাসীদের মধ্যে খৃষ্টান ধর্মের অধিকতর প্রসার লাভের একটি কারণ বোধ হয় এই যে, তাহার। স্বধর্ম পরি-তাগ করিলেও স্বজাতিদের সহিত সংস্রব-সম্পর্ক হারায় না; এমন কি একসঙ্গে পান-ভোজনেও তাহাদের কোন বাধা থাকে না। অপর একটি কারণ এই যে তাহার। চুকা করিলে খৃষ্টান ধর্ম ইত্তফা দিয়া আবার স্বধর্মে ফিরিতে পারে। আবার খৃষ্টান হইবার পক্ষে তাহাদিগের প্রধান প্রোত্শোভনও এই যে, পাঁচী সাহেবেরা তাহাদিগকে জমিদারের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবেন ও তাহাদের জমি-জমা লইয়া যে সকল

বিবাদ-বিসম্বাদ বাধে, তাহাতে সাহায্য করিবেন। পাদরী সাহেবদের চেষ্টায় তাহাদের ভূমি-সংক্রান্ত আইনেরও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটরাছে।

পার্বত্য জাতিদিগকে বার দিগে দেখা যায় যে খৃষ্টান ধর্ম কিয়ৎপরিমাণে নিম্ন-জাতীয় হিন্দুদের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছে। ইহার কারণ উচ্চজাতীয় হিন্দু খৃষ্টান হটলে স্বজনের সহিত সকল সংস্রব তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়; গৃহ-ত্যাগীও হইতে হয়। কিন্তু নিম্নজাতীয় হিন্দু খৃষ্টান হইলে বরং সে মর্যাদা লাভ করে, সমাজে স্থান পায়,—যেন এক ধাপ উপরে উঠিয়া গিয়াছে।

হিন্দুত্ব

হিন্দু কে? সিদ্ধ নদের অপর পারে যে বাস করে। হিন্দু শব্দ পারস্যী ভাষা হইতে উদ্ভূত। সিদ্ধনদের পূর্ব পারে বাহারী বাস করিত, পারসিকেরা তাহাদিগকে হিন্দু বলিত। কালক্রমে ‘হিন্দু’ আখ্যা প্রসার লাভ করিয়া এক বিশেষ-সমাজ-বন্ধনে-বদ্ধ, এক বিশেষ-ধর্মাবলম্বী ভারত-বাসী জাতি-সমষ্টিকে বুঝাইতেছে। শুধু ভারতবর্ষে বাস করিলে, কিংবা কোন বিশেষ জাতিভুক্ত হইলে, কিংবা কোন বিশেষ প্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্মমত অবলম্বন করিলেই হিন্দু হয় না। যে কেহ হিন্দু হইতে পারে না—হিন্দুর ঘরে না প্রাণিলে হিন্দু হওয়া যায় না; হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান বা খৃষ্টান হইতে পারে, কিন্তু মুসলমান বা খৃষ্টান হিন্দু হইতে পারে না।

একদম এক পদাৱলম্বী, শাক্ত অপর পদাৱলম্বী, কিন্তু উভয়েই হিন্দু; আবার বৈদান্তিক যে সেও হিন্দু। কেবল ধর্ম মত বা মার্গের উপর হিন্দুত্ব নির্ভর করে না। একেশ্বর-বাদ, অনেকেশ্বর-বাদ, নিরীশ্বর-বাদ, বৈতবাদ, অবৈতবাদ, সবই হিন্দু-ধর্মে স্থান লাভ করিয়াছে। মতসম্বন্ধে হিন্দু অত্যন্ত উদার। কিন্তু আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে হিন্দু অত্যন্ত কঠোর; আচার-ভ্রষ্ট হইলে হিন্দুত্ব লোপ পায়। হিন্দুর সমাজ আচারের উপর গঠিত, জাতিভেদ ইহার একটি অঙ্গ। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে আচারই অভিব্যক্তির প্রধান অঙ্গ। সামাজিক অভিব্যক্তি সামাজিক আচারের উপর নির্ভর করে, সামাজিক আচার ত্যাগ করিলে সামাজিক অভিব্যক্তির ব্যাঘাত ঘটতে পারে। সামাজিক আচারই সমাজের ধর্ম; আচারই সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে; আচারই অভিব্যক্তির মূল। সামাজিক অভিব্যক্তি ধাপের পরে ধাপ ধরিয়া চলিতেছে; এক একটি জাতি অভিব্যক্তির পথে এক একটি ধাপ; এবং প্রতি জাতির আচারের উপর ইহার অভিব্যক্তি নির্ভর করিতেছে। সনাতন ধর্মে অভিব্যক্তিবাদের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। যে হিন্দু সমাজের উপযোগী আচার পালন করে, সে “হিন্দু”; যে করে না, সে অহিন্দু, “লেক্স”।

গত আমম স্মরণিতে হিন্দু ও অহিন্দুর মধ্যে কি প্রভেদ তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা হইয়াছিল—(১) যে কোন বিশেষ দেবতার পূজা করিলে হিন্দু আখ্যা দেওয়া যায় কি

না; (২) হিন্দু মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার থাকিলে, হিন্দু বলা যায় কি না; (৩) সম্ভ্রান্ত্রণ বাহার পোষোহিত্য করে, সে হিন্দু কি না; (৪) পতিত ব্রাহ্মণ বাহার পুরোহিত, সে হিন্দু কি না; (৫) উচ্চজাতীদের বাহাদের জল এচল করে তাহারই কেবল হিন্দু কি না; এবং (৬) অম্পূজ জাতীয়েরা হিন্দু কি না।

কেহ ভূর্গা, কেহ কালী, কেহ হরি, কেহ হু, কেহ মনসা, কেহ শীতলা, কেহ মটী, কেহ বা গণেশের পূজা করে। সকলেই হিন্দু; হিন্দুর দেবতা অসংখ্য; • সুতরাং কোন বিশেষ দেবতার পূজার উপর হিন্দু নির্ভর করে না। দেবমন্দিরে প্রবেশ করিবার ও পূজা দিবার অধিকার থাকিলেই কাহাকেও হিন্দু বলা ঠিক হয় না। অনেক নিম্ন-জাতি আছে দেবমন্দিরে বাহাদের প্রবেশাধিকার নাই, তজ্জন্ত তাহারাই অহিন্দু নহে। আবার নিম্নজাতীর হিন্দু মন্দির স্থাপন ও নিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, কিন্তু স্বয়ং সে বিগ্রহের পূজা করিতে পারে না; পূজার তার ব্রাহ্মণের উপর। অহিন্দু “ফিরঙ্গী” বহবাঙ্গেরে “ফিরঙ্গী কালীর” পূজা দেয় বলিয়া সে হিন্দু হইয়া যায় না। পুরীতে জগন্নাথের মন্দিরে চণ্ডাল, হাড়ি, ডোম, চামার, বাগ্‌দী, তেওর, ভুঁড়ি প্রভৃতির প্রবেশের অধিকার নাই; গরার বিজুপান মন্দিরে চামার, ধোপা, ডোম ও মুচিরা প্রবেশ করিতে পারে না; পেনজ তাহারাই কেহই অহিন্দু নহে।

আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে দেখা যায়, হিন্দু ধর্মমতের উপর নির্ভর করে;

মৌকিক-আচারের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু পাশ্চাত্য-শিক্ষাভিমান-বঞ্চিত শত সহস্র হিন্দুর চক্ষে হিন্দুত্বানী হিন্দুর চাল-চলন ও হিন্দুর আচার-ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। হিন্দুর বলিলে প্রকৃত পক্ষে ধর্মমত, জাতিভেদ, জন্মস্থান শৌকিক আচার ও সামাজিক মঙ্গলের সমষ্টি বুঝায়। পেনজ কেবল ধর্মমত, বা পূজা-পদ্ধতি, বা জাতি-গত ভেদ, বা আচার-ব্যবহার, বা ব্রাহ্মণের শাসনের উপর হিন্দুর পরিচয় নির্ভর করে না। এই কাবণে গভ্র আদম স্থমারিতে একটি ভালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে, বাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে হিন্দু নামে পরিচিত অনেক জাতি আছে, বাহারাই ব্রাহ্মণের শ্রাধ্যাজ্য বীকার করে না, ব্রাহ্মণের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করে না; বেদ মানে না; হিন্দুর প্রধান প্রধান দেবতার পূজা করে না; সম্ভ্রান্ত্রণ বাহাদের পোষোহিত্য করে না; বাহাদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত মোটেই নাই; হিন্দুর দেবমন্দিরে প্রবেশে বাহাদিগের অধিকার নাই; বাহারাই অম্পূজ; বাহারাই শব্দাহ না করিরা সমাহিত করে; এবং বাহারাই গো-খাদক।

বৈষ্ণব, বৃগী, শাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাও, ভূমিজ, চমরা ও কোরা জাতির ব্রাহ্মণের শ্রাধ্যাজ্য বীকার করে না। বাউরি, ভুঁইয়া, চামার, কোরা, মুচি, মুন্ডা ও শাঁওতালের ব্রাহ্মণ বা কোন হিন্দু ভরার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করে না। সুব্রাহ্মণে বাদী, বৈষ্ণব, বাউরি, ভুঁইয়ালী, ভুঁইয়া, ভূমিজ, চমরা, চামার, চাষাধোপা, ধোপা, ডোম, হাড়ি, বৃগী, জেলে, কৈবর্ত, কল, কাওরা, কাশালী,

কোট, কোরা, মাল, মালো, মুচি, মুতা, নমঃশূত্র, ওরাত্ত, পাটলী, পোদ, রাজবংশী, সাঁওতাল, সাহা, সোণার, স্বর্ণবণিক, তুঁড়ি, ছুতার ও তেওর প্রভৃতি জাতির পোরোহিত্য গ্রহণ করে না। বৈষ্ণব, বাউরি, জুঁইয়া, ভূমিজ, চকমা, চামার, ডোম, হাড়ি, মুখী, কাওরা, কোরা, মাল, মুতা, ওরাত্ত, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির আদৌ ব্রাহ্মণ পুরোহিত্য নাই। বাগ্দৌ, বাউরি, জুঁই মালী, জুঁইয়া, ভূমিজ, চামার, ধোপা, ডোম, হাড়ি, মুখী, কল, কামার, কাওরা, কাপালী, কোরা, মাল, মুচি, নমঃশূত্র, পোদ, রাজবংশী, সাঁওতাল, সাহা, সোনার, তুঁড়ি ছুতার ও তেওর প্রভৃতি জাতির হিন্দু দেব-মন্দির-প্রবেশে অধিকার নাই। বাগ্দৌ, বাউরি, জুঁইমালী, ভূমিজা, জুঁইয়া, চামার, ধোপা, ডোম, হাড়ি, কাওরা, কোরা, মাল, মুচি, মুতা, ওরাত্ত, পোদ, সাঁওতাল, মুচি ও তেওর অস্পৃশ্য। বৈষ্ণব ও মুখীরা তাহাদের শব দাহ না করিয়া পুঁতিয়া ফেলে। বাউরি, চামার, ডোম, হাড়ি, কাওরা, কোরা, মাল, মুচি, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির মধ্যে গোপাদক দেখা যায়।

বেদ নামে না বা হিন্দু দেবতার পূজা করে না, এক্ষণ হিন্দু জাতি বঙ্গের নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রেল, ঈমার প্রভৃতিতে গতিবিধি ক্রমশ বাড়িয়া যাওয়ায়, হিন্দুদের মধ্যে “ছোঁচাছুঁতের” ভাব ক্রমশ লিখিল হইয়া যাইতেছে। অস্পৃশ্য জাতিদিগের মধ্যে শব দাহ না করিয়া সমাহিত করিবার কারণ বোধ হয় তাহাদিগের দারিদ্র্য, কাঁট

কিনিবার অক্ষমতা। যে সকল গো-বাদক নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দু বেশিতে পাওয়া যায়, তাহার কপাইয়ের ধারা গোহত্যা করার না, বা গোমাংস খরাদ করিয়া খায় না, তাহার কেবল মৃত গরুর মাংস ভোজন করে। উপগৃহীত তালিকার অনেকগুলি জাতির নৈমোক্ষণ করা হইয়াছে, বাহারি প্রকৃতপক্ষে এনিমিট, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদিগকে হিন্দু বণা ঠিক নহে।

বঙ্গের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের অধিকাংশই আদিম নিবাসী অনাথ্যদিগের বংশধর; এবং তাহার অল্পকাল হইতে নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেছে। পশ্চিম বঙ্গের অধুনার প্রান্ত ও ছোটনাগপুরের অধিত্যকা কয়েক শতাব্দী পূর্বে অনাথ্য ভূমি বলিয়া পরিচিত ছিল। বৈবস্বত পুরাণে বীরভূমি খন-মুন্ডলে পরিপূর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং তথায় কুককার, নীতি-বিহীন ও ধর্ম-বিহীন এক জাতির বাস ছিল বলিয়াও জানা যায়; বরাহভূমিতে (মানভূম ও বাকুড়ার পশ্চিমাংশে) ধর্মহীন, বস্ত্র ও সর্পভুক, তদ্ব্য-দহাদের বাস ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে; তাহাবাই বোধ হয় “চোরাক জাতী” আধুনিক বাগ্দৌ, বাউরি, ও ভূমিজ। আণ্ডাজাতীয়েরা ক্রমশ বঙ্গদেশে অধিকার করার অধিকাংশ অনাথ্য জাতি পাছাড় পর্বত, উপত্যকা, অধিত্যকা, বনে ও জঙ্গলে পলাইয়া যায়, এবং সামাজিক আর্থিক দাপ্তর স্বীকার করে এবং ক্রমশ তাহাদের ধর্ম ও ভাষাও গ্রহণ করে। অহিন্দু অনাথ্য কিঞ্চিৎ এখনও হিন্দু লাভ করিতেছে, তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। অহিন্দু

হিন্দু লাভ করিবার এক প্রকৃষ্ট উপায়, ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করা। যে জাতি ব্রাহ্মণকে পুরোহিতরূপে নিয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছে, সেই জাতিই হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার পাইয়াছে। ব্রাহ্মণ নিয়ন্ত্রণের হইতে পারে, তাহাতে কিছুই আসিরা যায় না—তধু ব্রাহ্মণ হটলেই হইল। অনাচারময়ী জাতিদের স্বজাতীয় “পণ্ডিত” পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ-পুরোহিত নিয়োগ করিতে পারিলেই হিন্দু-আখ্যা লাভ করিয়া, ক্রমশঃ পদ-মর্যাদাও প্রাপ্ত হয়। এমনও দেখা যায়, কোন কোন জাতি “পণ্ডিত”-স্বত্ত্বও ব্রাহ্মণ নিয়োগ করে, কেহ বা পণ্ডিতদিগকে ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ নিয়োগ করে, আবার কেহ-বা পণ্ডিত-বংশ লোপ পাইলে ব্রাহ্মণ নিয়োগ করে। ব্রাহ্মণেরা ক্রমশঃ পণ্ডিতদিগকে অপসারিত করিতেছে। পূর্বে হাড়িদিগের পুরোহিত বৌদ্ধ ত্রিমূর্তি সংজ্ঞা-ধর্ম-মন্ত্রের মধ্যে “ধর্মকে” পূজা করিত; এখন ব্রাহ্মণেরা “ধর্ম”কে বিষ্ণু বা শিব বলিয়া পূজা করে।

বর্তমান হিন্দুয়ানি

শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে হিন্দু দর্শন ও ধর্ম পুনরুজ্জাগিত ও পুনরুদ্ভূত হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী এবং ধর্মসমিতির হিন্দুগুরু পর্যাণোচনা করিবার ফলে বাঙ্গলা দেশে বেদান্তের চর্চা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। বৈদান্তিকেরা সাধারণতঃ উদার মতাবলম্বী; আচার-ব্যবহার, এবং পানাহার

প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহাদের কোন গোড়ামি নাই।

বৈদান্তিক

পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের উক্তি বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে বেদান্তের সার কথাও বাঙ্গালী জানিয়াছে। স্বামী নিগেনকানন্দ দ্বয়ং ভারতবর্ষ, আমেরিকা ও ইংলণ্ডে পরমহংস দেবের শিক্ষা বিস্তার করিবার প্রয়াস করেন এবং সম্যকরূপে বেদান্ত-চর্চার নিমিত্ত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে “রামকৃষ্ণ মিশন” স্থাপন করেন। খৃষ্টান-মিশনের ত্রাদ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা, আত্মর ও রোগগ্রস্ত জীবের সেবাশ্রম-স্থাপন এবং ধর্মপ্রচারের প্রচার করিতেছে। বৈদান্তিক অভ্যাস উদার; সকল ধর্মই তাহাতে লীন হয়; যে, যে পথে থাকিয়া ভগবানকে সর্বাঙ্গ-সংগ্ৰহে পাইতে চাহে, সে সেই পথেই তাহাকে পাইবে; তুমি যে পথে বাও, চাহিলে তাহাকে পাইবেই।

জ্যোতিঃস্বরূপ উপাসনা

কুড়ি-পঁচিশ শতাব্দীর পূর্বে গাজিপুর হইতে পরমহংস শিবনারায়ণ বন্দে আসিয়া জ্যোতিঃস্বরূপ উপাসনা-পদ্ধতি প্রচার করেন। সূর্য, চন্দ্র, জ্যৈষ্ঠ, ঈশ্বরের জ্যোতিঃস্বরূপ; এবং পরমহংসদেব সেই জ্যোতিঃস্বরূপের একাংশ উপাসনা-পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন। জাতি-ভেদ বা প্রতিমা-পূজা তাঁহার শিক্ষার স্থান পায় নাই।

রাধাস্বামী

আগ্রা-নিবাসী শিব দয়াল সিং রাধাস্বামী

সম্প্রদায়ের অবশ্যক। ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই; এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে কোন হিন্দকে তাহার সামাজিক আচার-ব্যবহার ও পরিত্যাগ করিতে হয় না। আত্মার মুক্তি কেবল যোগ-সাধনায় সম্ভব; কিন্তু সম্ভব ব্যতীত তাহা ঘটিতে পারে না। চট্টগ্রাম অঞ্চলে কতকগুলি এই সম্প্রদায়ের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতাতেও অনেক রাখাশামী-সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙ্গালী আছেন।

হরিসভা

হরিসভা বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে দেখিতে পাওয়া যায়! জ্ঞান-মার্গ সাধারণের নহে; কিন্তু ভক্তি-মার্গ জন-সাধারণেরই। হরিসভার ভক্তি-পথে সাধারণের মুক্তির ব্যবহার নিমিত্ত শ্রীবদ্ভাগবত ও পুৰাণাদি পাঠ, হরিনাম-সংকীৰ্ত্তন প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়া থাকে। দেব-মন্দিরে দেব-পূজার সাধারণের অধিকার নাই; কেবল ব্রাহ্মণেরই পূজার অধিকার; বিনা “মারকতে” কোন পূজা সম্ভব নহে। কিন্তু হরিসভার মৌল, জম্বাঠিরা প্রভৃতি উৎসবের সময় পূজা ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ এবং ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতাাদি হইয়া থাকে; হরিসভার সকলেই যোগদান করিতে পারে। শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয়েই হরিসভার যোগদান করিয়া থাকে।

গীতাসভা

জন-সাধারণের মধ্যে গীতার উপদেশ প্রচারই গীতা-সভার উদ্দেশ্য। পল্লীতে পল্লীতে হরিসভা এবং নগরে নগরে এখন গীতা-সভা দেখিতে পাওয়া যায়; উভয়েরই উদ্দেশ্য

ধর্মতত্ত্ব জন-সাধারণের নিকট সরস সুবোধ্য করিয়া তোলা।

কর্তৃতত্ত্বা

এই সম্প্রদায়ের লোকেরা জগৎ-কর্তার গুণানুষ্ঠান করে; ইহাদের সংসার-ত্যাগের ব্যবস্থা নাই; সংসার-ধর্মেপালনই প্রেরণ; এবং সংসার-আশ্রমে কর্তাকে একাধি ভজন করিলে সামান্য-মুক্তি হইয়া থাকে। কর্তা-ভজনা বিপায়া কথা নলে না, প্রতিদিন পাঁচ বার—সাম্প্রদায়িক মন্ত্রোচ্চারণ করে, প্রতি শুক্রবারে উপবাস, ধ্যান-ধারণা, ধর্মচর্চা ও “মঞ্জলিস” করিয়া থাকে। তাহার মন্ত ও মাস আহার করে না; এবং ঘোষ-পাড়ার মেলায় উৎসব উপলক্ষে ঘণাসাধ্য যোগদান করিয়া থাকে। ইহার সম্প্রদায়ের বাহিরে সামাজিক আচার-ব্যবহারে আদৌ হস্তক্ষেপ করে না; কিন্তু ইহাদের সম্প্রদায়ের ভিতর ছোট-বড় বিচার নাই, সকলে সমান, জাতিভেদ নাই। সাধারণ লোকের মধ্যে ইহাদের গুণতত্ত্ব প্রচারিত না হওয়ায়,— এবং ইহাদের নিত্যক্রিয়াকলাপ সাধারণ চক্ষুর অগম্য হওয়ায়, সাধারণ লোকের ধারণা যে অন্তরালে ইহারা বিভৎস ব্যাপার সংঘটিত করিয়া থাকে। চৈতন্যদেবের বদে আবির্ভাবের পূর্বে বৈষ্ণববিগের “স্বহৃদ বর্ণ” প্রচলিত ছিল; কর্তৃতত্ত্বার সহিত সহজিয়ার প্রভেদ এই যে বৈষ্ণবের মার্গ ভক্তি এবং কর্তৃতত্ত্বার মার্গ জ্ঞান।

বাউল

বাউল এক প্রকার বৈষ্ণব সম্প্রদায় জনসাধারণের মধ্যে ইহার গুণবস্তুর

গান গাহিয়া বেড়াই; চুল বা নখ কাটে না, সতেঝো ডালি দেওয়া মরণা আশখানা পরিয়া থাকে, হাতে সফদাই গোপীদত্ত থাকে।

সতীমার দল

ইহা একটি নূতন সম্প্রদায়। সুশিলাবাদ, নবদীপ ও কলিকাতা অঞ্চলেই ইহাদের বাস। ইহারা শক্তির উপাসক। ইহারা সংসার-ধর্ম পালন করে; পুরুষেরা বড় বড় চুল ও নখ রাখে; স্ত্রীলোকেরা মাথার জটা রাখে। ইহারা মত্ত মাংস ভোজন করে না; ব্যারাম হইলে ঔষধ খায় না, সতীমার পীঠের মাটি মাথার ছোঁয়ার। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে মেলা-মেসার বাধা নাই। এই সম্প্রদায়টি বোধ হয় কর্তাভজাদেরই একটি শাখা। কর্তাভজার দল পুরুষ কর্তার ভজনা করে এবং সতীমার দল এক্তিতরুণী আত্মশক্তি সতীকে ভজনা করে, এই যা প্রভেদ। নতুনা ইহাদের আচার-ব্যবহার, করণ-কারণ প্রকৃতিতে যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। রামশরণ পাল এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক; তাঁহার গ্রীকে “সতী-মা” বলা হইত; যে গাছের তলায় সতী-মার সমাধি হইয়াছিল, সেখানকার একটু মাটি অঙ্গে ছোঁয়াইতে পারিলে সকল প্রকার ব্যাধি সারিয়া যায় ও সকল পাপ বিদূরিত হয় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

কালাচণ্ডী

নবদীপের এক নূতন বৈষ্ণব দল দেখা দিয়াছে, ইহাবিগকে “কালাচণ্ডী” বলে; পাগল কালাচাঁদ ইহাদের সম্প্রদায়ের

প্রবর্তক। ইহাদের মতো পৌত্তলিকতা নাই, ভীষণতা নাই, আভিভেদ নাই। ইহাদের অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক।

মাণিক-কালীর দল

মেদিনীপুরের দক্ষিণভাগে মাণিককালীর দল বলিয়া একটা সম্প্রদায় আছে; হেদারাম দাস,—আভিভেদ কৈবর্ত,—এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন। তিনি উড়িষ্যা ভাষায় আগম পুরাণ প্রকৃতি শিখিয়াছেন, এখনও জলমুখা পরমবার অস্তর্গত গোপীনাথপুর গ্রামে ইহার পাঠকা ও আগম পুরাণের নিত্য পূজা হইয়া থাকে। হেদারাম নিজে সাধক ছিলেন; মাণিক কালী তাঁহার মত প্রচার করিয়া খ্যাতি লাভ করে। মাণিকের বুলি ছিল, “যতো ধর্ম ততো জরঃ”। মাণিকের দলে আভিভেদ নাই।

সাঁই

ইদানীন্তন বাঁকুড়া জেলার সাঁই নামক একটি নূতন সম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়াছে। ভগবান সাঁই এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ইহারা অপ্রত্যক্ষ দেবতার বিশ্বাস করে না; শুকই ইহাদের প্রত্যক্ষ দেবতা, ইহারা শুকর উপাসনা করে। ইহাদের শুকর উপদেশ—মিথ্যা কথা না বলা, চুরি না করা, স্ত্রী-সহবাস না করা, সাধু-সঙ্গে বাস করা, ও আত্মজ্ঞান-লাভের চেষ্টা করা।

শিঙ্কাপড়া

ইহারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি কুদ্র শাখা; মধ্য বাঙ্গালার ইহাদের কয়েক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বিশ্বাস

শ্রীকৃষ্ণই এ বিধে একমাত্র পুণ্য, তথা-
ভীত সবাই প্রকৃতি; শ্রীলোকের শ্রীকৃষ্ণই
বায়ী; এ অগতে শুকই শ্রীকৃষ্ণ-হানীর;
এবং সেই শুকই পূজা করা কর্তব্য।
ইহাদের মধ্যে জ্ঞাতিভেদ নাই।

বিবিধ মুসলমান সম্প্রদায়

মুসলমানদিগের মধ্যে বিশ্বাস যে প্রতি
শতাব্দীর গোড়ার দিকে খোদা তাহার ইমামকে
ধর্মের রানি নিবারণ ও সংস্থার করিবার
নিমিত্ত প্রেরণ করেন; এবং প্রেরণের পূর্বে
নাহদি আবির্ভূত হইয়া, দজ্জলকে শাসন
করিয়া, জগতে ইসলাম ধর্ম 'প্রোথিত'
করিবেন। আধুনিক কয়েকটি মুসলমান সম্প্র-
দায়ের মূলে উক্ত বিশ্বাস নিহিত রহিয়াছে।
কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে
পাওয়া যায় যে বর্তমান সম্প্রদায়গুলি ওহাবি
সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অষ্টাদশ
শতাব্দীর মধ্যভাগে মহম্মদ ইবন আব্বাস
ওহাব নামে আরবদেশীয় এক ধর্মসংস্কারক
ওহাবি সম্প্রদায়ের স্রষ্টা করেন। ওহাবিরা
উৎকট ধর্মনিষ্ঠ; ইহারা স্বাধীনভাবে
কোরণ ব্যাখ্যা করে; গোঁড়া মুসলমান
দিগের হনিকা, মালিক, সফি, ও হনবল
নামক চারিজন ইমামের মত গ্রাহ্য করে
না; ইহারা মৃত পীর প্রভৃতির পূজা
নিবেদন করে; এবং বিশ্বদ্বার সহিত
জেহাদ কর্তব্য বলিয়া মত প্রকাশ করে।

ভারতে সৈয়দ মহম্মদ ওহাবি-মত
প্রচারকদিগের মধ্যে সর্বাগ্রেষ্ঠ। ইনি ১৮১২
খৃষ্টাব্দে মক্কায় গমন করিয়া ওহাবের
শিষ্য গ্রহণ করেন এবং ভারতে প্রত্যা-

গমন করিয়া পীর পূজা নিবেদন
মৃত্যুতির পূজার কোন লাভ নাই বলিয়া
প্রচার করেন, সমাদৃত্ত্ব নির্দায়ক করিতে
নিবেদন করেন এবং বিশ্বদ্বার সহিত জেহাদ
করিতে উপদেশ দেন। বাঙ্গালাদেশের
বর্তমান মুসলমান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এই
সকল মত সমধিক প্রচার লাভ করিয়াছে।

তিতুমিরা বঙ্গ ওহাবি ধর্ম প্রচার
করিবার বাগদার জেহাদ করেন; ১৮৩১
খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে ১৮৩২রের
মার্চ মাস পর্যন্ত ২৪-পরগণা, নদীয়া ও
ফরিদপুরে বলপূর্বক কতকগুলি হিন্দুকে
ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন, গোঁড়া মুসল-
মানদিগের প্রতি অত্যাচার করেন, ও
অনেক গ্রাম লুণ্ঠন করেন এবং প্রচার করেন
যে মুসলমানেরা তাহাদের রাজ্য শাসনের
ভার পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রিটিশ
গবর্ণমেন্টের সহিত ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে
তিতুমিয়ার লড়াই হয়; এবং সেই যুদ্ধে
তিতুমিয়ার মৃত্যু ঘটে। তাহার ৩৫০ জন
শিষ্যও বন্দী হয়।

তিতুমিয়ার মৃত্যুর পর পাটনাবাসী
ওহাবি এনায়েত আলি মালবহ, বজ্জা,
রাজসাহী, পাবনা, নদীয়া ও ফরিদপুর
জেলায়, কেরামত আলি ঢাকা, ঐম্মনসিং
নোয়াখালি ও বাখরগঞ্জ জেলায়, এবং
জৈরেন-উল-আবদিন ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টে
ওহাবি মত প্রচার করেন।

বিচারে ওহাবিদিগের রাজবণ্ড হইবার
পর হইতে তাহারা তাহাদের নাম পরি-
বর্তন করিয়াছে। এখন তাহারা আপনাদের
হয়, "আহল-ই-হাদিদ" না হয়, "যরের মুকার্রিদ"

বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। “আহল-ই-হাদি”রা স্বাধীনভাবে “হাদি” (মহম্মদের উক্তি) বাখ্যা করিয়া থাকে, “যেহে মুকল্লিদেয়া হুদ্রোদেহ চারিজন ইমামের মধ্যে কাহাকেও মানে না। আহল-ই-হাদিরা তাহাদের ধর্মমত সম্বন্ধে এতদূর নিষ্ঠাবান যে তাহারা গোড়া মুসলমানদিগকে নিখর্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে এবং সর্বদাই তাহাদের মসজিদ দখল করিবার প্রয়াস করে এবং দেই অভিপায়ে কখনও কখনও দেওয়ানি আদালতে মকদ্দমা অবধিষ্ট করু হয়। তাহারা নিবাহাদি উপলক্ষে গীত-বাত্ত, মৃত্যুস্তব উদ্দেশে শিপি চড়ান, এবং নীরেহ কবরে পূজা দেওয়া নিষেধ করে। নদীয়া জেলার মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া

মহম্মদীয় কতকগুলি “আহল-ই-হাদি” দেখিতে পাওয়া যায়।

পাংগল-পংক্তি

ঐমমসিংহে একদল লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আচার-ব্যবহার এতই উদ্ভট যে লোকে তাহাদিগকে “পাংগল-পংক্তি” বলে। করিম দরবেশ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ইহারা কোরণ ও মহম্মদে বিশ্বাস করে, প্রসন্ন করে না, এবং নিজ সম্প্রদায়ের বাহিরে বিবাহ বা আহারাদি করে না। ইহারা টাকার হুদ লব্ধ না, বিবাহে পণ দেহ না, শয়ন না, এবং পাকী, ছাতা কিংবা ছুতা ব্যবহার করে না।

খ্রীশ্চেন্দ্রনাথ বসু।

নবাব

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

পার্সি জীবন-দোণা

মাদাম জেভিস সম্বন্ধিত হুম্মর কল্লে বসিয়া শিখানোর হুন্নে কঠ ছাড়িয়া নুতন গানটা গাহিবার চেষ্টা করিতেছিল। ওস্তাদ সেদিন সকালে আসিয়া এই গানটাই শিখাইয়া গিয়াছিল। মাদাম গাহিতেছিল,

“ভালবেলে ভারে কৈবে মায় আদি

রুক ফাটে সব, বলিতে।

মে যে বলে ঘোরে, ‘ভালবাসি কত’—

সে কেবলি মোরে চলিতে।”

বেদনার এই স্বর-লহরী

আকাশ-পাতাসটুকুকে অবধি কম্পন করিয়া ফুলিয়াছিল। মাদাম আবার গাহিল,

“এই যে প্রাণের প্রেম-আরাবন

আবর, মোহাব, প্রীতির বচন—”

গাতিতে গাহিতে মাদামের বুক বেদনার ভরিয়া উঠিল। হঠাৎ হুন্নে ছাড়িয়া সে একটি দৌর্বিন্দাস ভাগে করিল। গানের হুন্নে আজ নিভেরই প্রাণের সহস্র হুন্নে বেদনা সর্বের মত ফণা ভুলিয়া উঠিয়াছে! দেওলা যেন এখনই তাহাকে দংশন করিবে! মাদাম পিছানো ছাড়িয়া উঠিয়া জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে কৃত্রিম-পাহাড়ের

গায়ে-২৮' কৃত্রিম নিষ্কর হইতে ফটকের মত
স্বল্প জল সহস্র ধারার উচ্ছিন্ন পড়িতেছিল
—রৌদ্র-কিরণ পড়ার সে জল মাঝার
রূপালি ঝলঝল মত দেখাইতেছিল। মাদাম
একদৃষ্টে সেই নৃত্যশীল জলরাশির পানে
চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ডাক্তার জেডিস গৃহে ছিল না। কারের
ভিড়ে ও স্বাক্ষর আদ্যানে ডাক্তার আর
করদিন পারি ভাগ করিয়া গিয়াছে। তাই
এই নিঃসঙ্গ নির্জনতার মাঝামাঝি প্রাণের
মধ্যে নিম্নলিখিত প্রাণের সংস্রব বেদনা কোনমতেই
আর আপনাদের বাঁধা রাখিতে পারিল
না। সে আর কত দিনেরই বা কথা!
ইহারই মধ্যে তাহাদের প্রাণের স্রোতে
এতখানি বাধা লাগিল, কেন? আর কর
মাগ ধরিয়া ছইজনের কথাবার্তাও অনেকটা
চিলা পড়িয়া আসিয়াছে। আগের সময়
মাত্র ছইজনের শুধু সাফা হইত—তখন
সংসারের প্রেরণার ছই-চারিটা মাথা-
বাঁধা কথা হুড়া উঠের মধ্যে আর কোন
কথা হইত না। অপর কথা যদি উঠিত ত
সে মাদামের পুত্র মাঝামাঝি হইয়া। ডাক্তার
মাঝামাঝি সম্বন্ধে ছই-চারিটা কঠিন মন্তব্য
প্রকাশ করিত, মাদাম তত্ব হইয়া সে
মন্তব্য শুনিয়া বাইত,—চোখের পিছনে
অশ্রু আসিয়া ঠেলিয়া বাহির হইবার
চেষ্টা পাইত, মাদাম প্রাণপণ বলে সে
অশ্রু বোধ করিত। এট প্রাণতীর্ণ বর্ষ
যদি সে অশ্রু দেখিয়া ফেলে ত পরিহাসের
আর সীমা থাকিবে না! মার প্রাণের সে
অন্তরিক্ত বেদনার এতটুকু অপরানও মাদাম
সহ্য করিতে পারিবে না!

এত হৃৎখেণ্ড ডাক্তারের প্রতি মাদামের
ভালবাসা কিন্তু একটিল কমে নাই! আশ-
কাল করিয়া বিবাহ-ব্যাপারটা পিছাইতে
পিছাইতে ক্রমেই চাপা পড়িয়া গিয়াছিল—
ইচ্ছা পাকিলেও মাদামের সে কথা নুতন
করিয়া তুলিবার প্রবৃত্তি ছিল না! অথচ
বিবাহ-বন্ধন-হীন এই দুখী জীবনও আর
বহন করা যায় না! একবার অতিকটে
মাদাম কথাটা তুলিয়াছিল—ডাক্তার হাসিয়া
উত্তর দিয়াছিল, “জীবিত-মত হবে”খন।
তোমার কি সম্বন্ধ হয়, আমাকে?” ইহার
পর মাদামের মুখে আর দ্বিতীয় কথা
জোগাইয়া উঠে নাই।

স্তাহার পর চারিদিকে বিপদের মেঘ
ঘনাইয়া আসিল। ডিউকের মৃত্যু ডাক্তারের
সমস্ত আশার মূল কাটিয়া দিয়াছে! এত
বড় একটা রোগকে মৃত্যু আসিয়া হাত
হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেল! ডাক্তার বিষম
রাগিয়া গেল; ক্রোধ গণিল। দেশের লোকের
ডাক্তারের উপর বিশ্বাসও কমিয়া গিয়াছে—
তাহার উপর বেলিহামের অমন আশ্রমটাও
লোকসানে দাঁড়াইলে—নবু আর তাহাতে
এক পঞ্চমও সাহায্য দান করিবে না!
নানা কারণে কোন দিকেই আর সামঞ্জস্য রক্ষা
করা বাইতে ছিল না। ডাক্তারের আর্থিক
অবস্থাও ক্রমে মন্দ হইয়া দাঁড়াইল! এই
সকল ব্যাপারের কষ্ট ডাক্তার কিছু দিনের
মত পারি ভাড়িয়া বাহিরে কোথাও থাকিবার
সঙ্কল্প করিল। মাদাম নিঃসঙ্গ একা এই
প্রকাণ্ড পুরীর মধ্যে পড়িয়া রহিল। যদি
বিবাহটা হইয়া বাইত, তাহা হইলে মাদাম
কেমন থাকিত বলা যায় না—কিন্তু এই

অঃহেলিত জীবন লইয়া এত বড় পুরস্কার মধ্যে পড়িয়া থাকি—না, এ অসম্ভব কষ্ট, নির্দয় দুঃখ!

তবু এ কঠোর মধ্যেও মাদাম কোনমতে একটু সাহসী হুঁজিয়া গইয়া ছিল। হুঁজিয়া গইয়া মনের মত গানগুলি গাইয়া কোনমতে সে দিন কাটাইবার চেষ্টা করিতেছিল। আপনার প্রাণের সহিত কথা কহিয়া, আপনার মনকে এ সমস্ত বেদনার সাক্ষ্য রাখিয়া মাদাম একটু পরিতৃপ্তির সন্ধান করিতেছিল—কিন্তু কোথায় সে পরিতৃপ্তি, কোথায় বা সাহসী! কিছুই মিলে নাই!”

বাঁহিরের পানে চাতিয়া মাদাম আপনার মনস্ত্র জীবনটার উপর দিয়া একবার চোখ বুলাইয়া লইতেছিল, এমন সময় দাসী আসিয়া হাতে একখানা কার্ড দিল। কার্ডে লেখা আছে—“হার্ট্‌জ্—এগেণ্ট।”

দাসী কহিল, লোকটি মাদামের সহিত দেখা করিতে চাহ—বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মাদাম কহিল, “তুমি বলো, ডাক্তার সাহেব বাড়ী নেই।”

দাসী কহিল, “বলেছি, তিনি বললেন, মাদামের কাছেই তাঁর দরকার।”

“আমায় কাছে!” মাদাম ডাবিল, আমার সহিত এ অপরিচিত লোকটার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে! নিশ্চয় কোন ভুল করিয়াছে! তবুও একটু পরে কহিল, “আজ্ঞা, যাও, তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।”

হার্ট্‌জ্ আসিয়া মাদামকে অভিমান করিয়া গাড়াইল। কাঠের মত শক্ত মুখ—ভাবহীন চক্ষু—ক্রমাগত আইন খাট্রা বেড়াইলে যেমন একটা মমতা-হীন কাঠিত্বের

ছাপ মুখে-চোখে আঁটিয়া যায়, লোকটার মুখে-চোখে তেমনিই একটা কঠিন পক্ষতা! সে মুখ দেখিলে বুকের রক্ত ঘেন জল হইয়া যায়।

মাদাম কহিল, “আপনি জানেন না, গেথ চর, আমার স্বামী ডাক্তার জেফ্রিস এখন এখানে নেই—আর তাঁর বিশ্ব-কণ্ঠ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।”

হাতে কাগজের তড়া দেখাইয়া হার্ট্‌জ্ কহিল, “আমি সব কথা জানি, মাদাম। তাঁরই কাছ থেকে আমি আসছি।”

মাদামের মুখ চকিতে পাংগু হইয়া গেল। মাদাম কহিল, “তাঁর কাছ থেকে আসছেন, আপনি?”

“হাঁ, মাদাম। ডাক্তারের অবস্থা—এখন—অর্থাৎ সে সব আপনি ত জানেনই। চারদিকেই তাঁর সব কারবারে লোকসান যাচ্ছে। তাই তিনি বাড়ী, গাড়ী, ঘোড়া, আসবাবপত্র, অর্থাৎ সবই আর কি, এট মোক্তার-নামার আমার নিজী করবার অধিকার দিয়েছেন।”

মাদাম একটা কথা বলিতে বাইতেছিল, —মোক্তার-নামা কেন—এ কাজ কি আমি করিতে পারিতাম না! কিন্তু সহসা দারুণ অভিমান তাহার বুকের মধ্যে গর্জিয়া উঠিল! ইহার সহিত তর্ক? না, যুগা হয়! মাদামকে নিকটর দেখিয়া হার্ট্‌জ্ আবার কহিল, “একটা কথা—আপনাকে না বললেও নয়—মানে, ডাক্তার জেফ্রিস পারিতে কবে ফিরবেন, আর ফিরবেন কি না, তারও কোন ঠিকানা নেই—অর্থাৎ যেখানে তিনি এখন মাথা তুলে

অত্থানি প্রতিপত্তিতে বাস করতেন, এখন সব খুট্টে দেখানে পাকা—বুঝতেই ত পারছেন—তাই আর কি তিনি বলেছেন, আপনি যদি আপনার ছেলের সঙ্গে থাকতে চান ত তাতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। মানে, আপনি এখন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই—অর্থাৎ বুঝেছেন কি না—”

মাদামের কানে আর কোন কথাই প্রবেশ করিল না। স্ত্রীর মুখ ধরিয়া টানিলে বিলে চড়ানো স্ত্রী যেমন অনর্গল বাহির হইতে থাকে, হার্টজের মুখ হইতে তেমনি কথার রাশি কুণ্ডলী-মুক্ত হইয়া অব্যাহত বাহির হইতেছিল। মাদামের কর্ণে তখন চকিতে সেই গানের সুরের রেশটুকু বাজিয়া উঠিল—

“এই যে প্রাণের প্রেম-আরাধন,
আদর, সোহাগ, ঐতিহ্য বচন—”

মাদাম ডাবিল, মিথ্যা। মিথ্যা কথা! এত মিথ্যা কে রচিয়াছিল? ভালবাসা! সে ত শুধু কথার কথা মাত্র! তখনই আগের তাহার চিত্তে মারীর গর্জ জাগিয়া উঠিল। দৃষ্ট বরে মাদাম কহিল, “থাক, আর কোন কথা বলতে হবে না, মশায়, আমি সব বুঝছি। বুঝছি, যে, আমার এই দণ্ডে বর ছেড়ে পথে গিয়ে পড়তে হবে—একটা দাসীর মত পথে পড়তে হবে। আর কথা বলে আমার অপমান করবেন না। যথেষ্ট হয়েছে, আমি এখনই যাইছি।”

হার্টজ একটু লম্বাছড়তি দেখাইবার উদ্দেশ্যে কতিন মূলে হাগির দেখা টানিয়া কহিল, “আমি কি করব, মাদাম, এর জন্য

যথার্থই আমি চেষ্টা করি! তবে ডাক্তার বলে দিয়েছেন, এ ছাড়াছাড়ির জন্য তাঁরও খুব কষ্ট হয়েছে—কিন্তু কি করেন? তিনি নিরুপায়! হাঁ, তবে তিনি বলে দেছেন—টেবিল, চেয়ার, সোফা, কোচ, বাজনা,—এ সব জিনিষের মধ্যে আপনি যা দরকার মনে করেন, সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন—এ বিষয়ে আপনার মতকে মেনে চলতে আমি বাধ্য। ডাক্তার আপনাকে একেবারেই নিঃস্বল করতে চান না—এই আর কি মানে!”

• মাদাম বিক্রমের সুরে কহিল, “যথেষ্ট অসুগ্রহ তাঁর! থাক, এ অসুগ্রহের কোন প্রয়োজন নেই।” বলিয়া মাদাম ঘটা টিপিল। নিম্নে এক দাসী আনিয়া দেখা দিল।

মাদাম কহিল, “আমি এখনই বেরব—আমার টুপি আর ক্রোকটা নিয়ে যাও। দীর্ঘ গির—”

দাসী চলিয়া গেলে মাদাম হার্টজকে কহিল, “এখানকার এ সমস্ত জিনিষ ডাক্তার জেকিঙ্গের। আপনি এ সমস্তই বিক্রি করিতে পারেন। আমি এর কিছুই নিতে চাই না—আমার কোন দরকার নেই।”

হার্টজ কোন উত্তর দিল না। উত্তরের প্রয়োজনও ছিল না। তাহার কাণ্ড শেষ হইয়া গিয়াছে—বাকীটুকুতে হতক্ষেপ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

মাদাম একটা ডরার খুলিয়া কতকগুলি চিঠি-পত্র বাহির করিল। এগুলি মাদামের চিঠিপত্র। যতগুলি চিঠি সে মাদামকে লিখিয়াছিল, মাদাম তাহার সবগুলিকেই বহু

করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। এইগুলোকে নাড়িয়া চাড়িয়া বুকে ধরিয়াই মাদাম আপনার অতৃপ্ত মেচ-সুখা মিটাতে বসিত। দাসী পোষাক আনিয়া দিলে মাদাম দীর্ঘ তাহা গায়ে দিয়া দাঁড়াইল, আবার ডিম্বার পুশিল,— যদি একখানা চিঠিও পড়িয়া থাকে। না, নাই—একখানিও পড়িয়া নাই।

দাসী কহিল, “একখানা গাড়ী দেব?”

“না, না, গাড়ী কি হবে?” মাদামের স্বর অচঞ্চল। মাদাম বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

বেলা তখন পাঁচটা বাজিয়াছে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বার্নাড জঁহুনে মার বুকে মাথা তুলিয়া গাড়ী করিয়া সম্মুখ-পথ দিখা চলিয়া বাইতেছিল। মাদাম জেঙ্কিন্সের জীবন-নাটকের অভিনয়টুকুও নবাবের জীবন-অভিনয়ের মতই করণ, বেদনাময়। না, বৃষ্টি, এ অভিনয়ের খেলা আরও করণ, কেন না, ইহা নিত্যন্তই আকস্মিক, নিত্যন্তই অন্তর্কিত।

মাদাম জেঙ্কিন্স কিপ্রা চরণে চলিয়াছিল। কি দারুণ, ভীষণ এ পতন। পাঁচ মিনিট পূর্বে ঐখণ্ডের ফ্রেড়ে সে বসিয়াছিল—চারিধারে সন্মত ও সম্মানের বিপুল সমারোহ—আর এখন—মাথা তুলিয়াবার একটুকুও আশ্রয় নাই। নিত্যন্তই নাম-হীনা অভাগিনী—পণের কাদালেরও অধম সে! নিশ্চয় অদৃষ্ট।

মাদাম এখন কোথায় বাইবে? কি করিবে?

মরাণের কথাই আজ সকলের আগে

তাহার মনে জাগিল। কিন্তু পুত্রের কাছে সকল অপরাধ, সকল দ্রুতি স্বীকার করা—সম্মান ও ইচ্ছা বোঝাইয়া অমন উদু-মন ছেলের কাছে গিয়া কানিয়া পড়া—সে বড় কষ্ট—সে কষ্ট সহিবার সামর্থ্যও যে মাদামের আজ নাই! না, কি বলিয়া কোন্ মুখ লইয়া অমন ছেলের সম্মুখে গিয়া আজ সে দাঁড়াইবে? না, না, সে তাহা পারিবে না। তবে মৃত্যু! মৃত্যুই তাহার একমাত্র উপায়—মুক্তির একটিমাত্র পথ। বত শীঘ্র নারা বার, মৃত্যুর হাতে আপনাকে সঁপিরা দিতে হইবে।

কিন্তু কেমন করিয়া, কোথায় গিয়া মরা যাব? মৃত্যুগোকে বাইবার পথ ত অনেক! মনে মনে সব পথগুলারই একটা চিত্র সে আঁকিয়া লইল। সহসা মাদামের মনে হইল—কিন্তু এ মৃত্যু—আত্ম-হত্যার সে বিকৃত মূর্ত্তি, ভীত কুংসা—না, না, চারি-ধারে কোলাহল পড়িয়া বাইবে। সে কোলাহলে ছেলের মাথা আরও হেঁট হইবে! সে অনেক সহ্য করিয়াছে—এ সব সে সহ্য করিতে পারিবে না! না, না, ছেলের হিতের জন্য আত্মহত্যা করা হইবে না! আত্মঘাতিনী সে হইতে পারিবে না! তবে—উপায়—উপায় কি?

মাদাম জেঙ্কিন্স মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল—কি ভাবিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। সহসা কে অভিযান করিয়া ডাকিল, “মাদাম জেঙ্কিন্স—”

মাদাম মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে, মার্ক হেন্স মপাভ—শক্ত প্রেটওয়াল সাটের উপর কালো স্কেলডেটের কোট চড়াইয়া দণ্ড-স্বীত বক্ষে দাঁড়াইয়া—আমার বোতামের দ্বিত্তে এক

শুষ্ক ফুল গাথা—মুখে মুহু হাসির রেখা !
মাদাম মুহু হাসি। প্রত্যভিগমন করিখা
জ্ঞত সরিষা গেল—দাঁড়াইল না।

মোরাব প্রিয় বন্ধু মণ্ডাভ'। মুখে হাসির
রেখা টানিলেও ভিতরটা তাহার আজ পুড়িয়া
থাক্ হইয়া বাইতেছিল। তাহার টাকাকড়ি
বস্ত্রের জলে দুইটা জালিয়া গিয়াছে।
পাওনাধারের ডিড়ে বাড়ীতে থাকিবার জো
নাট। কেবলই তাগাণা আসিতেছে ! গোবা-
কের দান, মদের দান, আমবাণের দান—
সেনার মণ্ডাভ'র মাঝে চুল অশনি বিক্রম
হইবার জো ! পাওনাধারের দল তাগাণায়
শেষ তার মানিয়া আদালতের আশ্রয় লইয়া-
ছিল। সেই দিনট পান্ডেছরখানা ক্রোড়ের
নোটশ জারি হইয়াছে। মাঝা আর তুলিয়া
থাকা যায় না। মণ্ডাভ'র ক্রকের পাঁজরা-
গুলি যেন চূর্ণ হইয়া বাইবে, এমনই
মনে হইতেছিল। নোটশ পাঠিয়া মণ্ডাভ'
বাড়ী ছাড়িয়া পথে ঘুরিতেছিল। কি
করিবে সে উপায়ও হির হইয়া গিয়াছিল।
সেনার দায় অত বড় বংশের ছেলে চটয়া
শেবে সে তেলে বাইবে—মণ্ডাভ' জেলে ! না,
না, না !

গোপনীয় চিঠি-পত্র পুড়াইয়া ছাই করিয়া,
ছোট-বোট ব্যাপারগুলো সারিয়া লইয়া মণ্ডাভ'
আজ পথে বাহির হইয়াছে, সরিষার জন্ত।
সে সরিষে ! কিন্তু কোথায় গিয়া, কেমন
করিয়া সরিষে সে ? পারিতে নয়। এখনই
একটা ছলছল বাষ্প বাইবে। কলকতর
কালিতে সহর কালো হইয়া উঠিবে।
সরিষে সে নিশ্চয়—কিন্তু পারিল বাহিরে
গিয়া মরা চাই ! এক নিভৃত নির্জন

কোণে ! বিকৃত মুখে পরিচরের তিস্তমায়
থাকিবে না ! মণ্ডাভ' তাই সরিষার জন্ত
এক নিভৃত বিজন কোণের সন্ধানে বাহির
হইয়াছিল।

হাটিয়া সহর পার হইয়া মণ্ডাভ' এক
ক্ষুদ্র গ্রাম-প্রান্তে আসিয়া পৌছিল। তখন
রাত্রি হইয়াছে। খানিকটা পথ চলিয়া
মণ্ডাভ' দেখে, এক কয়লার দোকানের
পার্শ্বে গেট-ওয়ার্ড একটা বাগান। বাগানের
ফটকে অল্পটুকু আলোর অক্ষরে লেখা
রহিয়াছে, “বাথ” (স্নানাগার)। মণ্ডাভ'র
মুখে হাসি দেখা গিল। আর, একক্ষণে
মিলিয়াছে,—স্নান মিলিয়াছে ! এই নিভৃত
গ্রাম-প্রান্তে ক্ষুদ্র একটা বাগ-ফনে,—ঠিক !
কেঁহ চিনিতে পারিবে না—কোন গোল উঠিবে
না—নামহীন পরিচরহীন একটা সাধারণ
লবের মতই তাহার মূর্তি দেহগিঙটাকে ইহারা
টানিয়া কোথায় লুকনের মতো পুঁতিয়া
ফেলিবে। ঠিক হইয়াছে ! সরিষার জন্ত
এমন ঠাই আর কোথাও মিলিবে না !

মণ্ডাভ' ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল।
সম্মুখেই খানিকটা সরু পথ—পথের দুইধারে
বস্ত্র গাছের খোপ। পথ গিয়া একটা কুটারের
ধারে মিলিয়াছে ! মণ্ডাভ' ধারে আসিয়া
ডাকিল, “বেয়াণা—”

একটা লোক আসিয়া
দাঁড়াইল।

মণ্ডাভ' কহিল,
স্নান করব।”

মণ্ডাভ'কে ভিতরে বসিতে বলিয়া ভূত
চলিয়া গেল। ঘরে সম্মুখেই একটা বুদ্ধ
আসনা ছিল। মণ্ডাভ' তাহার সম্মুখে

আসিয়া পাড়াইল। আপনার প্রতিবিম্বের
পানে চাতিয়া রহিল—এই গর্জ্জিত বুক—
এই তেজোদীপ্ত মুখ—না, আর এখন ও-সব
দেখিয়া, ও-সব ভাবিয়া কি ফল ? চাতকের
পাশা পড়িয়া গিয়াছে—ও-সব কথা ভাবিবার
কোন প্রয়োজন নাই !

ভূত্যা আসিয়া সেলাম করিয়া জাঁটল,
জল তৈয়ার হইয়াছে। “চল” বলিয়া
মপাভ কুটারের বাতির আসিল। বাগানের
এক কোণে বাধ-কুম—মপাভ ভিতরে ঢুকিয়া
বার বন্ধ করিয়া দিল।

টিক সেই মুহূর্ত্তে কল্পিত বন্ধে মাদমে
জেকবিন আঁত্রের টুডোরো-ঘরে প্রবেশ করিল।
ঘরে কেহ নাই ! মাদামের পা কাঁপিয়া
উঠিল। সে যেন চোর—এ ঘরের বিষম
শাস্তিটুকু যেন সে চুরি করিতে আসিয়াছে !
ঘরের একটা চাবি তাহার কাছে পূর্ক
হইতেই ছিল—মারাপের দেওয়া চাবি—
আর একটা মারাপ নিজে রাঁপত।
কাছেই ঘরে ঢুকিতে কোন বাধা ছিল
না।

তিরপ্রথামত টেবিলের উপর তাঁল-করা
এক-টুকরা কাগজ ছিল। মারাপের লেখা।
মারাপ লিখিয়া রাখিয়াছিল, “আমি রিটার্নস্কে
বাইতেছি। সন্ধ্যার পরই ফিরিব।”

এ ব্যবস্থা বহুদিন হইতেই চলিয়া
আসিতেছিল। মা যদি আসিয়া পূজকে দেখিতে
না পার, তাই বাহিরে গেলে কখন তাহার
ফিরিবার সম্ভাবনা, সে কথা এমনইভাবে সে
লিখিয়া রাখিত। সেই লেখাটুকু মাদাম

বুকে পরিচা'সেই কাগজটুকুতে অল্প চুবন
চালিয়া আণ ভরিয়া একবার কাঁদিল।
কিসের গোত্র, কিসের প্রয়োজন, এই
পুত্রের সারিখা ছাড়িয়া সে বুঝে ছিল !
পুত্রের প্রতি কিসের জ্ঞান সে এতখানি
অনিচার করিয়াছে—আপনার জীবনের
সমস্ত স্নেহ-ভালবাসারও এতখানি অশ্রুমান
করিয়াছে ! ধিক তাহার নারী-জন্মে, ধিক
তাচার মাতৃষে ! এই কুত্র ঘরের কোণে যে
বিপুল শাস্তি জমা রহিয়াছে, তাহার একটা
কণাও যে জেকবিনের সেই অত-বড় প্রাসাদে
পুঁজিলে মিলে না ! কখনও মিলেও নাই !
মাদামের হৃদে চোপ বহিরা ছ-ছ করিয়া জল
বরিয়া পড়িল।

মাদাম বসিয়া অতীতের কথা ভাবিতে-
ছিল ! পাণিষ্ঠের প্রত্যাহারসময় সেই সব
প্রয়োজন—পুত্রের সহিত ছাড়াছাড়ি—কি
সে মুহূর্ত্ততলা ! চিত্তার পর চিত্তা তরঙ্গ তুলিয়া
নাতিয়া ছুটিয়াছিল। তাহার আর সীমা
নাই—শেষ নাই !

সহসা বাহিরে জুতার শব্দ পীওয়া গেল।
শিব দিতে দিতে আঁত্রে আসিয়া ঘরে ঢুকিল।
অন্ধকার ঘর। মন আজ তাহার উল্লাসে ভরা
ছিল—জুজের গৃহে এখনই নিমন্ত্রণ বাইতে
হইবে। আলো ! আলো ! আজ একটু
সাজিবারও প্রয়োজন আছে ! এগরী আজ
এগরিনীর গৃহে ভোজন করিবে ! আলো
জালিতেই পহনে কাটার দীর্ঘশ্বাস শুনা
গেল। চমকিয়া আঁত্রে ফিরিয়া চাহিল,
কক্ষ ঘরে বলিল, “কে ? মা !”

তখনই দ্রষ্টব্যনা অধীর হস্ত আসিয়া
আঁত্রে একটা আঁটা ধরিল—ঘেঁহের একটা উক

তাপ—মা ছেলেকে বুকের মধ্যে ঢাপিয়া
ধরিল ; কহিল, “হাঁ, আমি।”

হুই-চামিটা কথা কহিয়াই মাদাম
পলাটবে, স্থির করিয়াছিল। তাড়াতাড়ি সে
বলিল, “একটু বেড়তে বাব, আমি। তাই
বাবার আগে তোমার সঙ্গে একবার দেখা
করতে এসেছিলাম,”

“কেন মা ? কোথায় বাবে ? এত
তাড়াতাড়ি কেন ? আমার নতুন নাটক
বিয়েটারে ‘দ্রে’ হবে—তুমি দেখবে না ?
না মা,—তোমার দেখতেই হবে। তার পর
আমাদের বিয়ে আসছে—তুমি সে সময় না
থাকলেই যে নয় মা ! ও বুঝি তোমার
আসতে দেখে না ? সেই মতলবেই—”

মাদাম তাড়াতাড়ি সে কথার বাধা
দিয়া—হুই-একটা মিথ্যা ওজরে কথটা ঢাপা
দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু আঁত্রে কহিল,
“না, মা, আমি কোন কথা শুনেই চাই
না।”

মাদাম আর পারিল না, কাঁদিয়া বসিয়া
পড়িল। আঁত্রে আসিয়া মার হাতটা
টানিয়া আপনার হুই হাতে ঢাপিয়া ধরিল,
কহিল, “কি হয়েছে, মা—আমার বল, তুমি।
খুলে বল আমার—”

মাদাম চোখের জল মুছিয়া কহিল,
“কিছু না, বাবা, কিছু নয়—আবার মনটা
ভাল নেই—তাই একটু ঘুরে আসতে চাই,
তুমি আমার এমন চোখেই দেখো—আমি
তোমার মা—বড় ছাঃখিনী মা—”

আঁত্রে মিনতি করিল, “না, মা, তোমার
পায়ে পড়ি মা, তুমি আমার বল, কি
হয়েছে !”

মাদাম কোন কথা কহিল না—চাহিয়া
রহিল।

আঁত্রে কহিল, “তোমাদের কি ছাড়াছাড়ি
হয়েছে, তবে ?”

মাদাম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, মুখ
কিরাইয়া লইয়া কহিল, “আমার বলো না,
ও সব কোন কথা তুলো না, মারাম।”

“মা, আমার কাছে কি লুকোচ্ছে, তুমি !
আমি ত ছ’বাস আগেই বলে রেখেছিলাম—
নয় কি, মা ?”

“তুমি তা হলে সব জানো ?”

“সব জানি ! এ যে ঘটবে, তা আমি
বহুদিন থেকেই জানি, মা ! আমি ত এই
দিনেরই প্রতীক্ষায় ছিলাম—”

“আমি এখানে এসুম—”

বাধা দিয়া মারাম কহিল, “এই ত
তোমার ঘর, মা—এ তোমার মন্দির !
আজ মন বছর আমি তোমার কাছ-ছাড়া
হয়েছি—তোমার কাছ থেকে মন বছরের
বেহ আমার পাওনা আছে—আমি আর
তোমার ছেড়ে দেব না,”

বাহিরে আবার কাহার পদ-শব্দ শুনা
গেল। এলিস মরণের বোঝে আসিয়া-
ছিল। ঘরে চুকিয়াই আলিসন-বন্ধ মাতা-
পুত্রকে দেখিয়া সে খমকিয়া দাঁড়াইয়া
পড়িল। মারাম কহিল, “এসো এলিস,—
মার কাছে এসো, এই আমার মা। মা,
এই এলিস—তোমার বো—”

হুই হাত বাড়াইয়া মাদাম তখন
এলিসকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল,
অমল চুপনে তাহার মুখানিকে রাখাইয়া
তুলিল, তারপর গাঢ় স্বরে কহিল, “একবার

আমায় ডাকো—‘মা’ বলে একবার ভোমরা
 দু’জনে আমার ডাকো,—আমার সব দুঃখ
 এখনই বুকে ধাবে।”

আম্রে, এলিস দুইজনে তখন মাদামের
 বুকে মাথা রাখিয়া ডাকিল, “মা—”

“আঃ, বড় সুখ, বড় সুখ” সুখভীর পরি-
 তৃপ্তিতে মাদামের বেনদনা-দীর্ণ মন ভরিয়া
 গেল। সত্যই বড় সুখ! পৃথিবীতে যে এত
 সুখ ছিল,—মাদাম তাহা কোনদিন ধারণাও
 করিতে পারে নাই।

ও-ধারে পল্লী-প্রান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র বাথ
 তখন মহা কলরব পড়িয়া গিয়াছিল। এক
 জন লোক বাথে ঢুকিয়া বহুকণ বাহির
 হইতেছে না দেখিয়া ভৃত্যকে সন্ধান লইতে

পাঠানো হয়। সে গিয়া দেখে, রক্ত-মাখা
 একটা মাংস-পিণ্ড পড়িয়া আছে—তাহার মুখে
 গলায় ‘অজস্র কুরের দ্বা—আণ-হীন দেহ।
 মূলের মত শুভ্র সার্টের প্রেট রক্তে রাঙা
 হইয়া গিয়াছে। বীভৎস সুখ! দেখিলে চেনা
 যায় না। সে চোৎকার করিয়া উঠিল।

হায়, যেচারা মপাভ! মাদামের এ
 তৃপ্তির একটি কণারও স্বাদ সে জীবনে কখনও
 পায় নাই! এই মেঘ-স্তরা দৃষ্টির অতি কণ
 একটা রশ্মিও কোনদিন তাহার আশায় বুকে
 মুহুর্তের জন্য সূতিবার অবকাশ পায় নাই।
 হতভাগ্য জীব।

(ক্রন্দন)

শ্রীমদৌরীশ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

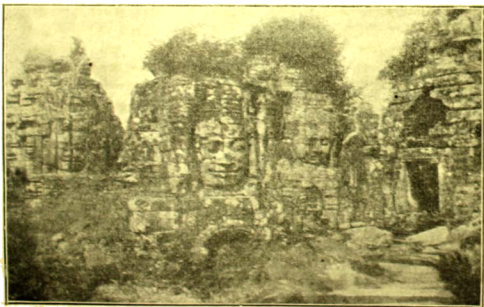
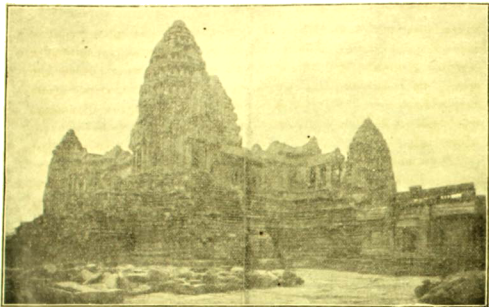
চয়ন

বিশ্মৃত নগর

একটি বিশাল নগর গভীর জঙ্গলের
 স্তিতরে কেনন কুরিয়া হারাইয়া গিয়াছিল,
 আজ কেহ তাহা বলিতে পারে না। সে
 কতদিনের কথা! ইংলণ্ড তখনও প্রায়-
 অগম্য, পারি তখন ছোটখাট একটি
 গুণ্ণামের মত এবং খেতানের নিকট
 আমেরিকা তখনও একটি না-বোখা স্বপ্ন!
 সেই সুদূর অতীতে কিন্তু এই বিশ্মৃত
 নগর সম্ভার সিংহাসন ছিল,—ঐ ক্ষুদ্র
 আটলিকা এবং তদ্রূপ ভূভাবলীকে জিত্রাসা
 কর, উহার মৌন ভাষায় এক বিশুপ্ত
 বংশের প্রতীক ও ক্ষমতা, ধৈর্য ও

নিপুণতা এবং অর্থ ও সামর্থ্যের অপূর্ণ
 কাহিনী আবৃত্তি করিলে—যে অবর্ণিত কাহিনী
 ইতিহাসে স্থান লাভ করে নাই।

‘ইণ্ডো-চায়না’র এক নির্ভয় অংশে এই
 বিশ্মৃত নগর আজও ধ্বংস-বিধ্বস্ত দেহে
 দাঁড়াইয়া আছে। একদিন ইহা Khmer
 বা কাষোভিয়ার রাজ্যগণের বড় আদ্যের
 রাজধানী ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এখানকার
 ইট-কাঠ-পাথর ও শিলালিপি প্রকৃতি পরখ
 করিয়া বলিয়াছেন, নবম খৃষ্টাব্দে এই নগর
 নিশ্চয় হইয়াছিল। সধর হইতে মাইল-
 খানেক তফাতে—ওড়ার-বাট নামে একটি



ছাদশিখে শিবের একাত্ত মূৰ

প্রাকৃতিক হস্তিয়ার আছে, তাহার নির্মাণকাল
যাখন গুটীক। নগর এখন ভাঙিয়া-চুঁড়িয়া
একাকার, ভাঙনবঙলি বুনো পাহালায়
অসহ্য, বাতীঘর বস্ত্র পত্রেরেব মিগাশ
বিভায়াগার হটলেও হস্তিয়ারি এখনও প্রাচ
অটুট আছে—কোন লামা ভাঙা ভাঙা
বসিয়া সিঁচাছে।

এই রাজধানী-প্রতিষ্ঠার পূর্বে, এক
হিন্দুধর্মী যেনে দুই পত্নী হইয়া এখানে
আনিয়া রাজ্যস্থাপন করেন। এখানকার
হানীর বাসিন্দাদের বস করিতে তাঁহাকে বড়
দেখি বেশ পাটতে হয় নাই। রাজার সর্গে
কেবল যে সৈন্যশাসন আনিয়াছিল, তাহা
মহে। পহু, বলে বলে প্রোথিত, পণ্ডিত,
শিল্পী, স্থাপত্যবিদ, রাজমিস্ত্রী, বর্ককার এবং
তদ্ব্যবহৃত তাঁহার সাধের লাবী হইয়াছিল।
ইত্যেব লইয়া রাজা এখানে জঁকিয়া
বসিলেন; এবং যেখানে যেখানে তাবত-
বর্ষের উন্নত চিকু সজাতা যাবের ব্যতিরেকে
এক যন্ত্রের মত বিচিত্র 'মহানবের পুরী'
পড়িয়া আকাশের অনেকটা শক্ত পূর্ণ করিয়া
তুলিল। এই প্রবাহ-কারিনীর মধ্যে কতটুকু
ঐতিহাসিক সত্য ও কতটুকু অনবধের
অকৃত্রিম আছে, তাহা ঠিক বলা না ফেলের
এ কথা নিশ্চিত যে, এই বিস্তৃত নগর চিকুর
কোঁঠি।

কিন্তু এই নগর নির্মাণা পরাক্রমশালী
রাজবংশের অব্যপত্তনের কারণ কি? নগর
কেন পরিভ্রান্ত হইল—রাজবংশ কোথায়
শেল? সে কাহিনী এখনও ভাল করিয়া
জানা যায় নাই। কোন প্রাকৃতিক বিলসে
বা ভূমিকম্পে নগর যে সহসা পড়ানে

পরিভ্রান্ত হয় নাই, অসম্ভবতঃনি যেখানে
সে কথা বেশ স্পষ্ট বলা যায়। তর্কিত বা
অন্ত কোন পরাক্রমশালী ব্যক্তির দ্বারা
প্রাকৃতিক হইয়া কি ভাঙা-বাধের পরিভ্রাম
এমন গোচরীও হইতে পারে। এ প্রেরণও কোন
সম্ভব পাওয়া যায় না।

হানীর বাসিন্দারা এই ভাঙাটোয়া,
পুহাণো সত্বেও শেষ কুটিলকৃত হুঁহুয়া
ফেলিবার ভক্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল।
কাকতাল-করা পান্থেরেব বাস, সিংহমুদ্রি,
মাগের মাথা এবং শিব ও যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া
প্রকৃতি মানবকন্দের হাইকৃত জিম্ব
হাট্বেব অত্যাচারে হাম্ভাত হইয়া এবিধে-
ক'থকে পড়িয়া আছে। সেকালের সেই
প্রতিভাবান্ শিল্পিগণের অল্প অত্যাগা মন-
ধরেয়া আত্ম এতটা আত্মবিস্মৃত হইয়াছে
যে, তাহার আশ্রয়বের শরীর দৌরবেদ
মুগেও কঠোরভাবে করিতে লক্ষ্যবোধ
করে নাই। সংগতি কলী-পত্নীকে
কালের ও রাজ্যের অত্যাচার-মিথ্যারপেও
চেষ্টার মনোবোধী হইয়াছেন। কিন্তু সেট
প্রাচীন মুগেও আরত-শিল্পীর মাল-মূল্য ও
নির্মাণ-পদ্ধতি এমন চমৎকার ছিল যে,
যদিও না প্রেসিডেন্ট ফেলকন অংশ হাম্ভাট
বা বসিয়া সিঁচাছে, এই উন্নত, বৈজ্ঞানিক
মুগের কারিকরেয়া যথাসাধ্য বস্ত্র-চেষ্টাতেও
সে-সকল কারণ আর বেহাষত করিতে
পারে নাই।

ভাঙা-বাধের ব্যক্তি-ঘর, যন্ত্রিত, ভক্ত,
এক-কি পদমাট পদ্য শিল্প-সুধা ও
যোজন-মুদ্রার পরিপূর্ণ;—সে কল-বৈচিত্র্য
যেখানেই অজ্ঞতা, এলোপা, লাকী, সাহসার

ও কণারকের ঐক্যমূলিক নিম্নগণকে মনে পড়িয়া যায়। পাথরের গায়ে এখানেও শত শত অবদান খোদা আছে। কোথাও একটি যুদ্ধযাত্রার চবি খোদিত। সকলের আগে-আগে ভেরী-বাদকের দল; তারপর ছত্রধারীদের মাথখানে হস্তপুটে সেনাপতি; তারপর বর্ষা-চন্দ্রধারী রথাগোহী ফোনের সারি, তারপর রণ-হস্তী প্রভৃতির সম্মুখে বর্ষাবৃত, অঝোরাচী ঘোড়াগণ; তারপর তীর-ধনু, তরবারি, কুঠার ও বাট লইয়া পদাতিক সেনাদলের পিছনে সেনাদল ও ক্রৌঞ্চাদগণ, গরুর গাড়ীতে বোকাই-করা ভারে ভারে রসদ, ঘোড়াদের পরিচর্যা ও আনন্দবিধানের প্রকৃত ভূতগণ, বাতবাকের শ্রেণী ও নর্তকীহৃদয়। বায়ু-পাথরের উপরে খোদা এসকল ছবির প্রতি খুঁটিনাটি পর্যন্ত শিল্পীর তীক্ষ্ণবৃত্তি এড়াইয়া যায় নাই। মৃষ্টিগুলি জীবন্ত, স্বাভাবিক ও তেজ-ভরা,—তাহাদের ভঙ্গিমাও হৃদয় ও গিটিক! চারিদিকে শতসহস্র মূর্তির ভিতরে গিয়া ধাঁড়ালে, কৈনাড়ি আগে বা কৈনাড়ি পরে দেখিব, কৈনাড়ি ভাল বা কৈনাড়ি মন্দ এ-সব কিছুই ঠাহর করিতে পারা যায় না। সমস্ত মূর্তির মুখে-চোখেই খোদকারী এক-একটি বিশেষ ও বিভিন্ন ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছে। তাহাদের কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ মুখে উন্নতিত, কেহ মুখে ত্রিহমান! শুধু মানুষ নয়, ছবিতে জীবন্তদের যে-সকল মূর্তি দেখা যায়, সেগুলিও প্রশস্তিত ভাবপূর্ণ। হাতীর ছোট ছোট চোখগুলি ঠিক যেন জীবন্তের মতই ঝিক্‌ঝিক্‌ করিতেছে, গরুগুলি ঠিক

যেন মৃষ্টিমান বৈদ্য, শূকরগুলি পালকের ডাঙ্গসের বা খাইয়া রাগে ঘোংঘোং করিতেছে। শিল্পীরা যে নেহাৎ বৈদ্যিক ছিলেন না, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এক জারগার, একজন মাহুত ভরে-ভরে আড়-চোখে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে পিছন দিকে হাত চালাইয়া দিগ্‌সংবন্ধানে খলি হইতে খলি চুরি করিতেছে। এমনি পাথরের পটে ঠিক যেন ব্যাংকোপের মত ছবির পর ছবি,—ছবির পর ছবি! যুদ্ধ-দৃশ্য, শিকার, মো-বিহার, মাছ ধরা, উৎসব, শোভাযাত্রা, কীর্তন-সম্রাস, রাজপথের জনতা, কুচ-কাণ্ডহাণ্ড, রাজ-অভ্যর্থনা, মঙ্গ-ক্রীড়া, গৃহস্থের ঘর-সংসার, কুটনা-কুটা, রাজা-বারা ও পারিবারিক মেলা-মেলা প্রভৃতি সেকালের সেই অত্যন্ত সম্ভ্রান্তর বিষয়ে ধারা-কিছু জানিবার-বুঝিবার,—তখনকার জীবন-যাত্রা-প্রণালী, আচার-পদ্ধতি, মানুষদের আকৃতি-প্রকৃতি পোষাক-পরিচ্ছদ, ব্যবহার্য জিনিষ-পত্র, অলঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্র এবং ঘটি-বাটি-গেলান প্রভৃতি সমস্তই বাটালির মুখে দেওরালে দেওরালে পুড়িয়া রাখা হইয়াছে। এইসব^১ দেখানে-সেখানে হিন্দু-দেবতা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের অসংখ্য ত্রিমূর্তি নজরে পড়িয়া যায়।

এক জারগার বাহারিটি কোণাকৃতি চূড়ার মাথখানে আদ্যদের প্রধান চূড়াটি আকাশ ছুঁইতে উপরে উঠিয়াছে। প্রতি চূড়ার সঙ্গে শিবের চারিটি করিয়া মুখ খোদিত। চাদের উপরে উঠিয়া ধাঁড়ালে সমস্ত ওকার-খার মূলিখিত চিত্রের মত চোখের সামনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

নয় মাইল জলল বুদ্ধিরা ধ্বংস-তৃপ্তের পর ধ্বংস-তৃপ্ত, গভীর কাননের সম্মল বর্ণলীলায় মাঝে মাঝে কোথাও একটা হেলিগা-পড়া প্রাসাদের চূড়া, কোথাও একটা শৈবালস্ত্রায় মন্দিরের মুকুট, কোথাও-বা একটা ভাঙ্গা খামের আখখানা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। প্রাসাদের ছাদ হইতে দেখিলে বুঝা যায়, একদিন এই নক্ষত্রালী রাজার রাজধানী, নিখালস্তায়, মহিমায় ও সৌন্দর্য্য-শ্রীতে নিরোর ঘোমকেও সন্ধ্যা-শে পরাজিত করিয়াছিল।

এই প্রকাণ্ড সহরের চারিদিক বেড়িয়া এক দীর্ঘ প্রাচীর চলিয়া গিয়াছে। প্রাচীরের উচ্চতা বাট ফুট; পাঁচটি ফুটক আছে। এই ফুটকগুলির ভিতর দিয়া অনায়াসে হাতীর দল হাওদা-সমেত চলিয়া বাইতে পারে। দৈনন্দন, ক্রীতদাস ও কুলি প্রভৃতি রাজক্যার্থে নিযুক্ত অসংখ্য লোকের কথা ছাড়িয়া দিলেও অনায়াসে উহা বলা যায় যে, এ সহরে অসংখ্য উইলক গাঙ্গিয়া বাস করিত।

ওড়ার-বাঘের অনুরে ওড়ার-বাট। আকারে ছোটখাট তটোও এটিও একটি মগর-বিশেষ। এখানেও রাজপ্রাসাদ, এবং পুরোহিত, অতিথি ও অসংখ্য দৈত্যের জন্ত বাজী-ঘর আছে। ওড়ার-বাঘের মত এখানেও মাইলের পর মাইল বুদ্ধিরা শিরবিচিত্র প্রস্তরপট আছে। তবে এখানকার শির ওড়ার-বাঘের কাককর্ণ্য অপেক্ষা দেখিতে শেলব ও হুন্দর হইলেও ততটা সতেজ ও বাস্তবিক নহে।

এ-সব ছোটখাট পুঁতের কথা ছাড়িয়া

দিলেও ইহা মিস্তর বলা যায় যে, ওড়ার-বাঘের খোদন-শির পৃথিবীর ভিতরে একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার। এখানে দেড়শত ফুটের চেয়েও দীর্ঘ এক এক-খণ্ড প্রস্তর-পটের উপরে হামারণ ও মহাকায়ের এক-একটি গল্পচিত্র খোদিত আছে। নৌদ্বন্দ্বর্ম্মূলক চিত্রাবলীরও অভাব নাই। ওড়ার-বাঘের প্রধান চূড়াটির উচ্চতাও বড় অল্প নহে—সমতল ভূমি হইতে দুইশত ফুটেরও অধিক।

হায়, এই বিরাট-নিখাল শির পুণী গড়িয়া কুলিবার জন্ত শত শত বর্ষ ধরিয়া কত কষ্ট, কত ব্যয়, কত দৈর্ঘ্যের আয়ত্তক হইয়াছিল! মহাকায়ের একটি দীর্ঘনিশ্বাসে আজ তাহার সকল মহিমা, সকল গরিমা কোণার উড়িয়া গিয়াছে,—পড়িয়া আছে শুধু দিগন্তব্যাপী এক মহা-কঙ্কাল। কিন্তু এ কঙ্কালও বাধুবান্ধিত নহে,—কলাবিদ্যের কাছে এখনও ইহা আনন্দ ও দৈববাণীর মত, কবির কাছে সোণার স্বপ্নের মত, দার্শনিকের কাছে ধর্ম্মবাণীর মত, শিল্পিতের কাছে জ্ঞানাগারের মত, এবং নৃত্যমঞ্চার্থী ভ্রমণকারীর কাছে যেন অলস্ত উত্তেজনার মত।

পশ্চিম-গগনে স্বরচিত শ্রবান-চিতার সূর্য্য বশন ধরণ-পরনে চলিয়া পড়েন। ওড়ার-বাঘের বিপুল ধ্বংস-তৃপ্তের উচ্চ শিখরের উপরে তখন বনীকৃত অন্ধকারের বনিকা নানিয়া আসে, চারিদিকের শত শত কুঠীর ভিতর হইতে সহস্রা তখন হাজার হাজার বাহুরের দল নিবিড় তিমিরের বাস্তী বহন করিয়া মাথার উপরে

চক্ষে চক্ষে সুরিমা সুরিমা উড়িতে থাকে,
তাঁহাদের ডানার ঝটপট শব্দে ঘুমন্ত
বনভূমি যেন ভরে নিঃশব্দতা জাগিয়া উঠিয়া
বলে! রজনীর আগমনে আকাশেব বিনীরমান
নীলিমার উপরে ঐ কাণো কাণো নিশাচর-

অন্যকে দেখিতে কি ভয়ানক—কি ভয়ানক!
—বাহাদুরের প্রাণের একান্ত কামনার
ওজস্ব-ধামের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল,
উহারা কি তাঁহাদেরই অশান্ত অতৃপ্ত
আত্মা?.....কে বলিতে পারে?

The Pall Mall Magazine হইতে

নূতন শিশু-শিক্ষা-পদ্ধতি

ভাষ্যম্বলেন ভারতীতে প্রকাশিত “শিশু-
শিক্ষার নবপদ্ধতি” পাঠ করিয়া অনেক
পাঠক আগ্রহপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন; অতএব,
এ-বিষয়ে আরও দু-এক কথা বলিলে যোগ
করি, মন্দ হইবে না।

আজকাল আন্দোলিত হইতেই শিশু-শিক্ষা
লইয়া বেগী আলোচনা চলিতেছে। কলে,
শিশুশিক্ষার ক্ষেত্র তথায় অনেকগুলি নূতন
পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ-সকল পদ্ধতি
ঠিক একরকমের না হইলেও, উহাদের মূলকথা
এক। শিশুদের শৈশবকালটা বাহ্যতে
অকেজো শিক্ষার বিফল হইয়া না যায়,
সকল পদ্ধতিতেই প্রধানত সেই চেষ্টাই করা
হয়।

ডাঃ বোরিস সিভিল নামে আন্দোলিত
বিখ্যাত পণ্ডিত একজন নূতন পদ্ধতিতে
তাঁহার পুত্রকে এমন শিক্ষিত করিয়া
তুলিয়াছিলেন যে, এগার বৎসর বয়সের
সময়েই তাঁহার বালকপুত্র হার্ভার্ড যুনি-
ভার্সিটিতে উচ্চ শিক্ষালাভের অধিকারী
হইয়াছিলেন। এই নবপদ্ধতির বিক্ষেপে
অনেকে অনেকরকম মত জাহির করিয়াছেন।

কেহ বলেন, “কি ছেলেকে এমন ঘোর
করিয়া লেখাপড়া শিখাইলে বয়সকালে
তাঁহার দৈহিক ও মানসিক অবনতি
ঘটিবে।”—কেহ বলেন, “ইহাতে শিশুর
শিশুত্বের উপরে ডাকাতি করা হয়।”—কেহ
বলেন, “নবপদ্ধতির গুণে একজন শিক্ষালাভ
হয় না,—ছাত্রের বিশেষ একটা শক্তির
গুণেই হয়। সকল শিশুর ভিতরেই কিন্তু এই
বিশেষ গুণটি নাই”;—এই নতগুলির
কোনটিই কাজের নয়।

নূতন পদ্ধতি শিশুকে ঐযথ গিলাইবার
মত করিয়া লেখাপড়া শিখায় না, বা
তাঁহার শিশুত্ব হরণ করিয়া তাঁহাকে
‘ইচ্চে পাকার’ না। এ শিক্ষা দেওয়া হয়
আনন্দের সহিত, শিশুকে খেলায় মাতাইয়া,
ক্রীড়াঙ্কলে। এতি শিশুর ভিতরেই হৃষ্ট
ভাবে যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, তাঁহার
বিকাশ সাধন করাই নবপদ্ধতির উদ্দেশ্য।

এর্ভিন গান্ডা নামে একটি শিশু দুবছর
বয়সের সময় সমস্ত ইংরাজী বর্ণমালা
শিখিয়া ফেলিয়াছিল। যে ঘরে বাড়ীর
অস্তিত্ব ছেন্দেহা লেখাপড়া ত,করি এর্ভিন

সেই ঘরে উপস্থিত থাকিত। ছেলেদের পড়াশুনা এতদিন যেমন দিরা তখনিত, তার ভাব দেখিলে তাহা আদোপেই টের পাওয়া বাইত না। অবশেষে তার বাপ-মা নৈব-গতিকে ৪ঠাৎ একদিন টের পাঠিলেন যে, এতদিন আপনা-আপনি সমস্ত বর্ণমালা শিখিয়া ফেলিয়াছে!

এই সত্যটা জানিতে পারিয়া পিতা-মাতার আগে বড়ই আনন্দ হইল; তাহার উৎসাহের সহিত এতদিনকে বানান ও অঙ্ক শিখাইতে লাগিলেন। এতদিনও খুব খুসি হইয়া এই শিক্ষা গ্রহণ করিত। মাস-কতকের ভিতরেই এতদিন বানান ও অঙ্ক সম্বন্ধে এতটা জ্ঞানলাভ করিল, যে সকলেই তাহার আশ্চর্য্য প্রতীভা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন।

কিন্তু এতদিনের বয়স বখন তিন বৎসর, তাহার পিতামাতা তখন শিশুর অনিষ্ট-আশঙ্কার লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দিলেন।

এতদিনের পিতা বলিতেছেন, “আমার ছেলে পাছে শিশুদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়, সেই ভয়েই আমি তার লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম।” এতদিনও অতি শীঘ্রই যা-কিছু শিখেছিল, সব ভুলে গেল। তার পরে বখন তাকে ফুলে তত্ত্বি করে দেওয়া হল, তখন তাকে আবার নতুন করে সমস্ত শিখতে হয়েছিল। শিশুকালে যে-সব বিষয় সে খুব কৃষ্টির সঙ্গে অনায়াসে শিখতে পেরেছিল, বালকবয়সে সেই বিষয়গুলিও সে তেমন সহজে শিখতে ও বুঝতে পারে নি। এখন তার বয়স আঠারো বছর। সে উপাধি পেয়েছে বটে, কিন্তু সাধারণ

বালকের চেয়ে আবার পুর বোনা কোন শক্তি বেধাতে পারে নি। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, শিশুকালে তার লেখাপড়া বন্ধ না করলে, সে তিক ডাক্তার মিডিসের পুত্রের মত শক্তির পরিচয় দিতে পারত।”

টিক নিরম্মে শিক্ষা দিতে পারিলে, এমন শিশু নাই, যে অল্পবয়সে অসাধারণ ক্ষমতার প্রমাণ দিতে না পারিত। যেভাবেও এ, এ, পার্ণ নামে এক পাদরী তাহার চারিটি সপ্তাহকেই নতুন প্রণালীতে শিক্ষাদান করিয়া আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছেন। তিনি বলেন, “আলোচনা করে বুঝতে পেরেছি, পিতামাতার আপনাদের দায়িত্ব ভুলে মাহিনাকর মাষ্টারের হাতে ছেলেদের সঁপে দিয়ে নিশ্চিত থাকেন বলেই ছেলেরা উপযুক্ত শিক্ষালাভ করতে অক্ষম হয়। আমার বড় মেয়ে লিনার বয়স বখন তিন বছর, আমার তখনি তাকে লেখাপড়া শিখাতে শুরু করি।—ফুলে বাবার আগেই শিশুদের লেখাপড়া শুরু করা উচিত; এ শিক্ষার শিশুরা কষ্ট বোধ করে না, আর নৈশবের হাসি-পুলিতেও বঞ্চিত হয় না। আমার মেয়ে লিনা পুতুলখেলাও করত, লেখাপড়াও শিখত। আমার তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, লেখাপড়াও একরকম খেলা। সেও তাই বুঝেছিল।”

মিঃ বার্ণের বড় মেয়ে লিনার বয়স এখন ষোল বৎসর; সে র্যাডক্লিফ কলেজে পড়ে; আপাতত ‘আওয়ার প্রাইমারি’। তাহার প্রথম পুত্রও হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটির ‘আওয়ার প্রাইমারি’। তাহার বয়স পনেরো বছর।

হার্ভার্ড্‌ য়ুনিভার্সিটির প্রফেসর লিও উয়েনারও শিশুশিক্ষায় নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। ফলে, তাঁহার পুত্র-কস্তারও অপূর্ণ বিদ্যার পরিচয় দিচ্ছিলেন। অধ্যাপকের ছোটপুত্র নরগাট এগার বছর বয়সে কলেজে প্রবিষ্ট হয় এবং চৌদ্দ বছর বয়সেই গ্রাজুয়েটের সম্মান লাভ করে। এখন সে Ph. D. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সাধারণ বাগকেরা যে বয়সে সর্বপ্রথম কলেজের শিক্ষা আরম্ভ করে, সেই বয়সেই নরগাট যে Ph. D. ডিগ্রি লাভ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

নরগাটের পিতা বলিতেছেন :—যারা মনে করেন আমার ছেলেমেয়েরা বিশেষ একটা গুণ পেয়েছে, তাঁরা নিরর্থক। অজ্ঞাত বাগক-বাগিকারা আমার পুত্র-কস্তার মত জ্ঞানলাভ করতে পারে না, তার প্রধান কারণ এই যে, আমার সন্তানেরা যেভাবে শিক্ষা পেরেছে, অজ্ঞাত বাগক-বাগিকা সেভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ প্রাপ্ত হয় না।

“শিশু-মাতারা তাঁদের শিশুসন্তানকে যতটা নিরর্থক মনে করেন, তারা ততটা নিরর্থক নয়। শিশুদের স্বাভাবিক বুদ্ধি কাজে খাটালেই অকল পাওয়া যায়।

কিন্তু তাদের বুদ্ধি ও শিক্ষা-প্রসূতিকে চেপে রাখলে অনিষ্ট বৈ হইত হবে না। শিশুর কথা ও কার্যের উপরে শিশু-মাতার মন্তব্য দৃষ্টি রাখা উচিত। শিশুর সামনে বিস্তৃত ভাষার কথা বলতে হবে, ছেলে-মেয়েরা যাতে বাপ-মায়ের সঙ্গে সমানভাবে আলোচনার সুযোগ পায়, তাও করতে হবে, তাদের বুদ্ধিবে দিতে হবে যে, সকল বিষয় উপভোগ করবার ক্ষমতা তাদের আছে। এক কথায়, যাতে তাদের বিচারবুদ্ধি বিকাশলাভ করে, সর্বদাই সেইদিকে মনোযোগী থাকতে হবে।

“তারপর, শিশুদের মনের টান যে বিষয়ের প্রতি, সেই বিষয়ই তাদের লেখনী দরকার। হয়ত কেউ আঁক কষতে ভাল-বাসে, কেউ পড়তে ভালবাসে, কেউ ছবি আঁকতে ভালবাসে। তাদের ভালবাসা উপেক্ষা করলে চলবে না। আমার ছেলে নরগাট এখন আঠারো মাসের, তখন তার স্বাক্ষর একদিন তাকে নিজে সাগরতীরে গিয়ে বলিতে এ, বি, সি, ডি লিখে খেলা করছিল। নরগাট খুব মন দিয়ে সব দেখতে-শুনতে দেবে স্বাক্ষর বাগির উপর আঁচড় কেটে তাকে বর্ণমালা দেখাতে লাগল। ছদিন পরে সে আমার কাছে এগে বসে যে, নরগাট সবকিছু বর্ণমালা শিখে ফেলেছে।”

The Lady's Realm হইতে

রৌদার বিখ্যাত ছাত্রী

ভাঙ্গর-কাণ্ডে সাধারণত পুরুষের অগ্রগতি বেশী দেখা যায়। কিন্তু সংগ্রামে একজন রমণী ভাঙ্গরের কাজে আশ্চর্য্য নিপুণতা দেখাইয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

এই মহিলার নাম কাথেলীন ব্রুট ; তিনি অজ্ঞাত কুমার-রাজ্যের আনিকারক, মহাবীর কাথেলীন ব্রুটের উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী।

কাথেলীন ব্রুট সর্ব্বপ্রথমে চিত্রশিল্পা শিখিবার জন্য প্যারিসে গমন করেন। কিন্তু সেখানে শিল্পা তাঁহার মন ফিরিয়া যায়। ছবি-স্বাক্ষর চেয়ে মূর্ত্তি-গড়ার কাজই তাঁহার বেশী পছন্দ হইল। ফলে, তিনি বিখ্যাত ফরাসী ভাঙ্গর রৌদার শিষ্য গ্রহণ করিলেন।

রৌদার কাছে তিনি পাঁচবছর ধরিতা শিক্ষানবীসি করেন। এই পাঁচ বছরের শিক্ষা ও সাধনার তিনি যে শক্তি অর্জন করিয়াছেন, অনেক পুরুষের পক্ষেও তাহা সাধারণ কথা।

কাথেলীন ব্রুটের হাতের কাজ এতটা শাকা যে, সেগুলি দেখিলে সকলেরই মনে হইবে তাহা খোস রৌদারই তৈয়ারী। তাঁহার গড়া সকল মূর্ত্তিই সত্যজীবন ও জীবন্ত। কোন মহিলা-শিল্পী যে মাতৃব্রতের ভিতরের আত্মাকে এমন অবলীলায়, এমন ভক্তের সহিত প্রকাশ করিতে পারেন, এ কথা এতদিন কেহ কল্পনাতেও আনিতে পারিতেন না। মূর্ত্তিগুলির গড়ন-গিটনে, জীব-স্তম্ভীতেও শিল্পীর আত্মপ্রকাশ নাই, রমণীর রমণীত্ব বা কোমলতা নাই, তাহাদের

ভিতরে পুরুষোচিত ভাব আছে, রৌদার মতল অহঙ্করণ আছে।

কাথেলীন ব্রুট বলেন, “পুরুষ-মাতৃব্রত গড়তে আমার বড় সাধ। আমি মেয়েমানুষ গড়তে চাই না—কুণ্ডু চাই পুরুষ গড়তে। এতে বেশী আনন্দ পাওয়া যায়।……টাকার জেজে আমি মূর্ত্তি গড়ি না। শিল্পকর্ম্মের ভিতরে যখন টাকার পরসার কথা ওঠে, তখন আমি নিরাশ হয়ে পড়ি। ইচ্ছা করলেই আমি অগাধ অর্থ উপার্জন করতে পারি, কিন্তু তেমন ইচ্ছা আমার কখনো হয় না। আমি যখন নিজের মনের গুদিতে কাছে লেগে বাই, তখন আনন্দও পাই, কাজও ভাল হয়। কিন্তু যখন কারও কল্পনা-মত পরসার জেজে কাজ করতে বসি, তখন আমার সর্ব্বাঙ্গ কঁপতে থাকে,—আমার খালি ভর হতে থাকে যে, হঠাৎ আমার কাজ খরদারের মনে ধরবে না।”

কাথেলীন ব্রুট অনেক নামদ্রাণা লোকের প্রতিমূর্ত্তি পড়িয়াছেন; যেমন, ম্যাক্স বীর-ভোম্, জন গ্যাল্‌স্‌ওয়ার্দি, জর ক্রেমেন্ট্‌স্‌ মার্কহাম্, ডাঃ ক্রান্সেন্, শি, এম্, রল্‌স্, মিঃ অ্যান্‌স্‌হুইথ্ প্রভৃতি। ইহার মধ্যে শি, এম্, রল্‌স্‌ের প্রতিমূর্ত্তিটি বিশেষরূপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বর্গীও শি, এম্, রল্‌স্‌ বিলাতের বিখ্যাত পুশ্‌ক-রথ-সারথি। পুশ্‌করথ আবেশন করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমে ‘ইংলিশ প্রবালী’ পার হইয়া-ছিলেন। রল্‌স্‌ শিল্পী মূর্ত্তিটিকে এমন লঘু করিয়া গড়িয়াছেন, যে মূর্ত্তিটি জুতলে



মাতৃ

দাঁড়াইয়া থাকিলেও মনে হয়, তাহা যেম
অনারাধ্যেই শূণ্ণে উড়িয়া যাইতে পারে!

তাহার গঠিত “শৈশব”, “যৌবন” ও
“জ্ঞাননের” প্রতিমূর্তিও অপূর্ণমূল্যের; এবং
কঠিন পাবাণেও পেলব জীবনের এমন
উচ্ছ্বাস ও আভাস দেখিলে দর্শকমাত্রকেই
চমৎকৃত হইতে হয়।

আমরা এখানে কাথেলোন ব্রুটের
“মাতৃ”র প্রতিমূর্তি বিলম্ব। কাথেলোনের

উপরে মেরীমার প্রভাব যে কতটা বেশী,
এই মূর্তিটি দেখিলে তাহা বুঝা যায়। হৃৎকপে
মা তাঁর বৃকের রক্ত প্রাণের স্রলগকে
দান করিতেছেন; জননীর নিম্নলিত মেহ-
দৃষ্টি পুত্রের উপর আনত। “মাতৃ”
ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না,—ইহার স্বর্গীয়
সৌন্দর্য্য সকলেরই বোধগম্য।

Nash's Magazine হইতে
প্রাপ্তসামগ্র্যস্বরূপ।

নব্য ইতালীর কবি

নব্য ইতালীর নুভন কবি দান্নুন্সিওর
(Gabriele D'Annunzio) নাম
আমাদের অনেকের নিকট অপরিচিত;

কিন্তু তাহার অপূর্ণ মনীষা ইতালীর
সাচত্বে নব্যযুগের অবতরন করিয়াছে। তিনিই
নব্য ইতালীর জাতীয় কবি এবং এই

বিখ্যাত গ্রীষ্মাণীয়া যুদ্ধের সময় তাঁহার বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত "Song of the Dardanelles" ইতালীর নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে এবং পথে পথে নর-নারীর কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত ও গীত হইতেছে।

দার্মুন্সিয়োর বয়স এখন পঞ্চাশ বৎসর মাত্র। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে আক্রান্সি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হোত্রবাত উল্লুত প্রাক্কাঙ্কেতের মধ্যে তাঁহার বালাকাল অতিবাহিত হয়—প্রকৃতির এই নয় সৌন্দর্য যে তাঁহার বালাকালে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মধুর আশুর-কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-ত্রি মূলের মত তাঁহার জন্মের মুকুলিত হইয়া এবং যথাকালে তাহা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া ইতালীর সাহিত্যকে বৈচিত্রে ও মাধুর্য্যে অপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। যোল বৎসর বয়সে যখন তিনি টাঙ্কানিতে শেখ বিভাগিকা গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন তিনি *Primo Vere* নামক এক কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই কাব্যপাঠে ইতালীর বিখ্যাত সমালোচক Giuseppe Chiarini এতদূর মুগ্ধ হন যে, তিনি নবীন কবির কবিতাসমূহে এক প্রবন্ধ লিখিয়া উদীয়মান সাহিত্যিককে অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার সচিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন।

এই সময় হইতেই তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত। প্রতিভার প্রদান ধর্ম, যৌলিকতা। দার্মুন্সিয়োগু পুরাতনকে ভাগ করিয়া নূতনকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সৃষ্টি এই অন্তিম সাহিত্য তাঁহাকে চিরদিন মহিমাবিত করিয়া রাখিবে। দার্মুন্সিয়োগু

যখন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করেন, তখন ইতালীর অনেক দিনের "ভজ্জা বীরে বীরে" ভাবিয়া আসিতেছিল, এবং ইতালীর সাহিত্য-শিল্পের ভিতরে আগরণের চেতনা সূটগা উঠিতেছিল। দার্মুন্সিয়োগু এই আগরণের পার্থক্যবোধ করিবার তার লইলেন। কিন্তু এখানেও সেই পুরাতন নিষেধের ব্যতিক্রম ঘটল না—সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার অনেক শত্রুসৃষ্টি হইল। তাঁহার নূতন প্রণালী পুরাতন-পন্থীদিগকে আঘাতদান করিল। এমন-কি, তাঁহার সাহিত্য-গুরু Chiariniও তাঁহাকে অশীলতা-বোঝে অপরাধী করিয়া তাঁহার কলঙ্কিত লেখনীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন।

এদিকে কেবলমাত্র নিছক সাহিত্য-সৃষ্টির ব্যর্থ দিনাতিপাত করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। উদর-পোষণের জন্য তিনি সংবাদপত্রের আশ্রয়গ্রহণ করিলেন, এবং 'Tribuna' পত্রে 'Duca Minimo' ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও নাটক প্রভৃতি রচনা দ্বারা সংবাদপত্রের লেখনীর মধ্য দিয়াও যে প্রকৃত সাহিত্য-সৃষ্টি কতটা করা যায়, সকলকেই তাহা স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার একমাত্র প্রতিবন্ধী ছিলেন, ক্রান্তির আঁতড়া ক্রান্তনু।

এইবার দার্মুন্সিয়োগুর সাধনার কথা। তাঁহার সমুদ্রে আগোচনা করিতে গেলে এই কথাটাই সর্ব্বাগ্রে মনে হয় যে, তিনি একজন ইন্দ্রিয়-পরায়ণ কবি; বস্তুত, তাঁহার লেখাকে Physical passion হইতে বিচ্ছিন্ন করা শক্ত। তাঁহার সমগ্র লেখাতে ইন্দ্রিয়-সম্পর্ক-

জনিত সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় আছে। তবে এ কথা সফলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি যেরূপ আত্মকৃত্যের সূচিত পুণ্যবীর সৌন্দর্য্য, হুঃখ ও নৃশংসতাকে অশ্রুভব করিতে পারিয়াছেন, বিংশ শতাব্দীর অল্প কোন লেখক তাহা পারেন নাই। তিনি যেমন পরিপূর্ণভাবে, মেঘ-মোড়ের খেলা, সুমিষ্ট আশ্রয়ের আগ্রাণ, তরুণীর এলাহিত বেষ্টীর সুখা এবং ঘনকণ্ঠ মেঘের ত্রি-ঈশ্বর অশ্রুভব করিতে পারেন—তেনমন অপরের পক্ষে অসম্ভব। প্রকৃতির এই বিচিত্র শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ তাহার লেখনীর সুখে মধুস্বরণের সৃষ্টি করিয়াছে।

দার্বুন্সিয়ের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ, তাহার রচনা দুর্নীতির নিদর্শন। তিনি যেরূপ ভাবে Sexual relation বিশ্লেষণ করিয়াছেন—তাহা দর্শন করিলে ইবসেন কিম্বা টি ও'বার্গের শিব্যোরাও ভরত চমকিতা উঠিবেন। তাহার অধিকাংশ উপভাসই স্ত্রী-পুরুষের বিরহ-বিলন লইয়া রচিত।

দার্বুন্সিয়ের একজন ইংরাজভক্ত এই অভিযোগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন :—
“বেশত,—পৃথিবীতে কোন্ জিনিসই বা দুর্নীতি নহে—এই প্রকৃতিটাই ত' একটা মস্ত দুর্নীতির খেলা। জন্মটাও কত বড় কামুকতার ব্যাপার।”

“Birth is a grossly sexual thing !” এত বড় কথার পরেও আমাদের নীতিবাহিনী সাহিত্যিকেরা যে দার্বুন্সিয়াকে

আমোল দিবেন; তাত মনে হয় না। এমন-কি, ইংলেণ্ডেও তিনি বেগী শিখালাভ করিতে পারিবেন না। বাহা হউক, যিনি সৌন্দর্য্যের পূজারী, তাহার নিকট এই ইতালীয় কবির কাব্য পরম উপভোগ্য।

ইতালীতে কেবল কবি বলিয়া নহে, বদেপ-প্রেমিকরূপেও দার্বুন্সিয়ের স্থান অতি উচ্চে। তাহার বিখ্যাস, প্রাচীন গোরব ইতালীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তিনি বলেন, এই প্রাচীন গোরব ইতালীর গলায় ভারী পাথরের মত স্থলিতেছে। আর ইতালী কি কেবল যুরোপ ও আমেরিকার ক্রীড়া ও ভ্রমণ-ক্ষেত্র হইয়াই থাকিবে? ইতালীর কি কোন উচ্চতর আদর্শ নাই?

তিনি সেদিন উচ্চকণ্ঠে মুক্তস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, “না, আমার ইতালী আর বিদেশীর অল্প বাহুঘর হইয়া থাকিবে না—জাগিয়া উঠুক রোমের সমস্ত শক্তি! বিদেশীর ক্রীড়াক্ষেপে ভাঙ্গিয়া চূরদাস করিয়া দিও।

“তিনিসের খালে খালে ঐ যে আমোল আকুল নরনারীদের বহন করিয়া প্রায়ো-ভরণীভণা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, পুড়াইয়া দাও—উদ্বাহগিকে পুড়াইয়া দাও।”

নব্য ইতালীর কবি দার্বুন্সিয়েরা যে মহিমময়ী নূতন বাণী প্রচার করিতেছেন, ইতালীকে একদিন তাহা গোরবের তুল্য শিখরে অগ্রসর করিয়া দিবে।

শ্রীহরীচন্দ্র সরকার।

বিনয়-পরিচয় *

প্রাচীন খোঁজ সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, বুদ্ধদেবের বুদ্ধজ্ঞানোত্তর পর যত দিন তাঁহার ধর্ম লোকমধ্যে প্রচারিত হইয়া বেশ-একটু প্রসার লাভ করিতে সমর্থ না হইয়াছে, তত দিন তিনি নিজের অধিগত তত্ত্ব বা সাধা-সাধন বুঝাইতে ধর্ম শব্দ প্রয়োগ করিতেন, বিনয়ের কথা বা ঐ শব্দ তখন তাঁহার নিকট স্নানিতে পাওয়া যাউত না। বোধিসত্ত্বের পর তিনি অজগালনামক-ভরতলে বসিয়া প্রবর্তিতেন (মহা.১-৫-২), তিনি যে ধর্ম লাভ করিয়াছেন, (১) তাহা গভীর, হৃদয় ও হৃদয়। সংসারাসক্ত ব্যক্তি তাহা বুঝিতে পারিলে না। তিনি ধর্ম উপদেশ করিতে পারেন, (২) কিন্তু বুঝিলে কে? ইহার পর ব্রহ্মার সহিত তাঁহার কথোপকথনে (মহা ১-৫), আড়ার কালাম ও ব্রহ্মক নামপুত্রকে উপদেশদানে (১-৬), এবং পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ হইতে আরম্ভ করিয়া (১-৬-১৪) বশের আত্মীয়বর্গকে উপসম্পাদা দান পর্যন্ত (১-১০) সর্বত্রই তাঁহার সুখে ধর্মের ই কথা শুনা যায়, বিনয়ের কথা তিনি কিছুই উল্লেখ করেন নাই।

শব্দ-শব্দ: দুই-চারিজন করিয়া লোক তাঁহার নব-ধর্ম গ্রহণ করিতেছে।

ইহাদের সংখ্যা ৬১ জন পর্যন্ত হইয়াছে (১-১০-৪), তিনি ইহার বহুল প্রচারের জন্য বলিতেছেন (১-১১-১) — “ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতের জন্য, বহু-জনের সুখের জন্য তোমরা ভ্রমণ কর। একসঙ্গে দুই জন যাইও না। তোমরা আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ ও অন্তকল্যাণ ধর্ম উপদেশ কর।” ভিক্ষুগণ এই আদেশ লাভ করিয়া নানাদিকে নানা জনপথে গমনপূর্বক ধর্মপ্রচার করিতে লাগিলেন, এবং বহু-বহু লোকে আকৃষ্ট হইয়া এত নব ধর্মে ক্রমশঃ ও উপসম্পাদা গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। ভিক্ষুগণ চারিদিকে দূর-দূরতর স্থান চাইতে দলে-দলে এই সমস্ত লোককে বুদ্ধদেবের নিকট লইয়া আসিতে লাগিলেন এবং তাঁহার চতুর্দিকে এইরূপে বহুলোকের একটি দল সৃষ্ট হইয়া পড়িল। পূর্বে তিনি নিজেই প্রব্রজ্যা ও উপসম্পাদা প্রদান করিতেন, কিন্তু তখন দেখিলেন একাকী তাঁহার দ্বারা ইহা হওয়া কঠিন। তিনি বহুদিকে বহু অনুবিদ্য বৃত্তিতে পারিলেন। দূর-দূরতর স্থান হইতে ধর্মার্থী লোকসমূহের তাঁহার নিকটে আসা কষ্টকর, আবার ভিক্ষুগণেরও তাহাদিগকে তাঁহার নিকটে আনা কষ্টকর (১-১২-২)।

* বিনয়শাসিতের (ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী উভয়ে) প্রাপ্তি মোক অবস্থাকার-কৃত অনুবাদ ও অনুবৃত্তীকার সহিত অতিরিক্ত একাধিক হইবে, এই অবস্থায় তাহারই কৃতিকার একাধিক।

১। “অধিগতো ধো যান্নং বসো।”

২। “ধর্মং দেসেয়্য।”

তিনি ইহা আণোচনা করিয়া ভিক্ষুগণেরও উপর প্রভুত্ব ও উপসম্পত্তি প্রদান করিবার ভার অর্পণ করিলেন। ভিক্ষুগণ এতদিন কেবল নিঃস্বপ্ন ভাব বহন করিতেছিলেন, এখন হইতে তাঁহাদিগকে অস্ত্রেরও ভার গ্রহণ করিতে হইল। পূর্বে ধর্মসামান্য কেবল বুদ্ধ ও ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত, এখন হইতে ভিক্ষুগণ অর্থাৎ সন্তেরও আশ্রয় গ্রহণ করা আরম্ভ হইল। (৩) সন্তের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল।

ভিক্ষুগণ বেদ-সেবাস্ত্রের পরিভ্রমণ করিয়া ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। বুদ্ধবোও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন না; তিনিও নানাত্বানে স্বয়ং পরিভ্রমণ করিয়া প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহার ধর্মকথা শ্রবণ করিয়া মগধ-জনপদের এত লোক তাঁহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল যে, সেখানকার অধিবাসীরা হত্যা হইয়া বিগণ করিতে আরম্ভ করিল (মহা. ১-২৪-৫)—‘স্রমণ গোত্রম স্রীলোকসের বৈদ্যসামান্যের স্রজ, অপূত্রতার স্রজ, বংশোচ্ছেদের স্রজ স্রমণ করিয়াছেন!’ ভিক্ষুর সংখ্যা বহন এইরূপ বাড়িয়া উঠিল; উত্তম-অধম যোগা-অযোগা, অধিকারী-অনধিকারী সকলেই বহন নিশিগেয়ে দলে-দলে সত্যবোধে প্রবিষ্ট হইল,

তখন, বশা বাহ্য, বৈদগ্ধিক নিয়মেই—মানবের স্বাভাবিক ব্রহ্ম-প্রবাদ প্রভৃতি বোঝ-বশতই এই ভিক্ষুগণের মধ্যে নানাবিধ ক্ষুণ্ণ পরিস্থিতি হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম নবপ্রবিষ্টগণকে শিক্ষা উপদেশ দিবার বিশেষ কোনো ব্যবস্থা না থাকার কারণে ভাবে কি করিতে হইবে, না-হইবে, তাহারা ঠিক করিতে পারিত না; নানাত্বানে নানা-রূপ অসুখী করিয়া ফেলিত। গৃহিণী এই সমস্ত দেখিয়া বিরক্ত হইতে লাগিল, এবং বুদ্ধসেবকে ইহার উপায় চিন্তা করিতে হইল। তিনি উপাখ্যায়ের ব্যবস্থা করিলেন (১-২৫-৬)—“ভিক্ষুগণ, আমি উপাখ্যায়ের অমুখ্যা প্রদান করিতেছি (‘অমুখ্যানানি ভিক্ষুগণ উপাখ্যায়ং’))। এইখানেই সর্ব-প্রথমে বিনয়ের সুপাত হইল। তিনি উপাখ্যায়ের বিধান করিয়া বলিলেন—“ভিক্ষুগণ, উপাখ্যায় নিম্নের সহচর (‘সন্ধি-বিহারিক’) ভিক্ষুকে পুত্রের মত দেখিবেন, এবং সহচরও উপাখ্যায়কে পিতার মত দেখিবেন। তাহা হইলেই তাঁহারাই এই ধর্ম-বিনয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপুষ্টি হইতে পারিবেন। (৪) তিনি পূর্বে ধর্মের ই কথা বলিতেন, এখন হইতে ধর্ম ও বিনয় উভয়কেই একত্র বলিতে

৩। এই স্রজই সেবাযাত্র (১-৪-৫) উপাসকও হইতে হইলে পূর্বে বুদ্ধ ও ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত—“এত বয়ঃ ভয়ঃ ভগবন্তঃ সন্ন্যাসঃ গচ্ছান ধর্মঃ চ,...তেষাং লোকেষু পঠমঃ উপাসকো অহেতুঃ সেবা চি কা” কিন্তু পরে সন্তেরও আশ্রয় প্রাপ্ত হইল। পূর্বে “বাসুদেবো যমো, চর ব্রহ্মচরিতঃ সত্যো হ্রস্বদস্য অত্র ক্রিয়াম্য” (১-৬-৩২, ৩৪, ৩৭, ইত্যাদি)—এই মাত্র বলিয়াই ভগবান উপসম্পত্তি প্রদান করিতেন কিন্তু পরে (১-১২-৪) বুদ্ধঃ সন্ন্যাসঃ গচ্ছামি, ধর্মঃ সন্ন্যাসঃ গচ্ছামি, সত্যঃ সন্ন্যাসঃ গচ্ছামি—ইহাই ভিনবার পাঠ করা হইয়া উপসম্পত্তি দান বিহিত হইল।

৪। “ইদমিহ ধর্ম বিনয়ে বৃদ্ধিঃ...আগজিসসতি।”

আরম্ভ করিলেন, এবং মৃত্যুর পূর্নকণ পর্যন্ত ইহাই বলিচাছেন। (৫)

দেশ-দেশান্তরে ধর্ম প্রচারের বুদ্ধির সহিত সত্যও ক্রমশ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং পূর্নক যেরূপ সূচিত হইয়াছে, এই সত্যমধ্যে আচার-বিহার, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সর্ববিষয়েই নানাবিধ বিশুদ্ধতা বুদ্ধি পাঠিতে লাগিল, নানাক্রপ আচার দেখা দিতে লাগিল। (৬) যথোচিত নিয়মের মধ্যে আনিয়া সংঘট করিতে না পারিলে, এই সত্যকে সম্পথে পরিচালিত করা অসম্ভব দেখিয়া বুদ্ধদেব* ভিক্ষুগণের ঈশ-অর্থাৎ বস্তাব-সম্বন্ধে, শরীর ও বাক্যের সংযম-সম্বন্ধে শিক্ষার (৭) বিধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তিনি নানাক্রপ আচারের (৮) ও নানাক্রপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভিক্ষুগণের এক-একটি অঙ্গার কার্য ও অঙ্গাঙ্গের সংবাদ তাঁহার নিকট পৌছিতে লাগিল, আর তিনিও তাহার প্রতিকারের জন্য এক-একটি নিয়ম করিয়া ভিক্ষুগণকে সোধোদনপূর্নক ভবিষ্যতে তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবার

জন্ত উপদেশ দিতে লাগিলেন। আগার তাহাদের কোন অঙ্গাঙ্গ-অভির্ভোগ বা অস্বাভাবিক উপস্থিত হইলেও তিনি অবিলম্বে তাহা অঙ্গনয়ন করিবার জন্ত নুতন-নুতন নিয়ম বিধান করিতেন। আবশ্যক হইলে তাহাদের কল্যাণের জন্ত পূর্নবিহিত কোন নিয়ম পরিবর্তন করিয়া তাঁহাকে তাহার স্থানে নুতন নিয়ম উদ্ভাবন করিতে হইত, অথবা তাহাতেই আর কিছু যোগ করিতে হইত, কিংবা তাহার প্রতিপ্রসব করিতে হইত। তাঁহার ধর্মপ্রচারের পর হইতেই বহুদিন যাবৎ তাঁহাকে এই বিধিনিষেধ লইয়াই কাটাইতে হইয়াছিল। এই সমস্ত বিধি-নিষেধের সংখ্যা এত অত্যধিক, এবং ইহাদের কোনে-কোনটি এতই যৎসামান্য ও অনাবশ্যক বোধ হয় যে, বুদ্ধদেব এই সকল লইয়া তাঁহার আমূল্য সমস্ত বার্ষ নষ্ট করিরাছেন বলিয়া মনে হইতে পারে। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিয়া দেখিব। বুদ্ধদেবের প্রবর্তিত ঈশবিষয়ক এই সকল বিধিনিষেধই বিনয় নামে প্রসিদ্ধ। (৯)

৭। “ইমস্মিঃ ধর্ম বিমসে অকত্তন্তি পবুজ্জং” (দীঘ. ১৬-৭-২৮)। এইরূপ অনেক। বুদ্ধদেব মহাপরিদর্শন-সময়ে বলিতেছেন (দীঘ. ১৬-৬-১) — “যো যো কানম্ম যদা ধম্মো চ বিনমো চ বেদিতো।” এই ধর্ম ও বিনয় একত্র শাসন (উপদেশ) নামে অভিহিত হইয়া থাকে (মহা. ১০-৭) ; — “এসো যম্মো এসো বিনমো এত্তং সখু সা স নং।”

৮। “অ না চা ত্তং আ চ র ত্তি।” — মহা. ১০-২৬-১ ; ভিক্ষুবিভঙ্গ, সন্ধ্যা, ২২-১। এইরূপ বহু স্থানে। “বি বি ধ ম্পি অ না চা ত্তং আ চ র ত্তি।” — ভিক্ষুবিভঙ্গ, সন্ধ্যা ১৩-১-২। বিবিধ অনাচারের বিকল্প তাহাও এইস্থানে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

৯। “অধীলসিসুখা” (অবিশ্লিষ্টশিক্ষা) ;

১০। “আপায়েসনা” (আজ্ঞাদেশনা)।

১১। প্রাচীন আচার্যগণ বিনয় শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিরাছেন :—

“বিবিধ-বিসেস-নয়ত্তা বিনয়নত্তো চ কারবাচানাঃ।

বিনয়বিবুধি অজা বিনমো বিনমোতি অকুখাতো।”

বুদ্ধদেব প্রথমত নিজের ধর্মই প্রচার করিতেছিলেন। তিনি তাহার সমস্ত ধর্ম-তত্ত্বকে,—সাধা-সাধনকে চারিটি সহজ কথায় বলিতেন। তিনি ইহাদের নাম দিয়াছিলেন আরাধ্যমত্যা। তিনি বলিতেন, ১। হুঃখ আছে, ২। হুঃখের কারণ আছে, ৩। হুঃখের ধ্বংস আছে, এবং ৪। হুঃখধ্বংসের উপায়ও আছে। হুঃখধ্বংসের উপায় (১-৬-২২) “এমাগুদর্শন” প্রভৃতি এসিদ্ধ অষ্টাঙ্গ পথ (আরাধ্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ)। লোকেরা ইহা তুলিল ও গ্রহণ করিল। তাহারা বুদ্ধিল হুঃখধ্বংসই লক্ষ্য; বা সাধা। এবং তাহার উপায় বা সাধন হইতেছে ঐ অষ্টাঙ্গ পথ। বলিবার বা বুঝিবার আর-কিছু বাকী থাকিল না, ধর্মের প্রচার ও গ্রহণ চলিতে লাগিল। কিন্তু ইহা অতি-ব্যস্তান্বিত যে, অনেক সময়ে কেবল সাধা-সাধনেরই উপদেশে কাণ ধর না, হইতেও পারে না; সাধনেরও সাধন উপদেশ করিতে হয়। শিষ্যসার উপদেশের অন্তর্ভুক্ত উপদেশ করিয়া কখনো-কখনো কোনো-কোনো লোককে কোথা হইতে কিজগে কিসের দ্বারা

তাঁহা সংগ্রহ করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিতে হয়; সাধনেরও সাধন বলিতে হয়। বুদ্ধদেবকেও ইহা করিতে হইয়াছিল। তিনি প্রথমে ধর্ম অর্থাৎ সুপল্লভ সাধা-সাধন নির্দেশ করিয়া অবাস্তব সাধনবন্ধন উল্লিখিত বিধি-নিষেধাত্মক বিনয় বিধান করিয়াছিলেন। তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন, চক্রের অভাবে যেমন রথ চলিতে পারে না, সেইরূপ বিনয়ের অভাবে তাহার ধর্মও চলিতে পারে না। এইজন্যই পরিনির্বাণ-সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন (মহাপ.৬-১) —“আনন্দ, তোমাদের মনে হইতে পারে যে, ‘আমাদের প্রবচনের (উপদেশের) শাসক (উপদেশক) চলিয়া গেলেন, আমাদের আর শাসক কেহ নাই।’ আনন্দ, এতদ্ব মনে করিও না; আমি যে, তোমাদিগকে ধর্ম ও বিনয়ের উপদেশ করিয়াছি, বুঝাইয়া দিয়াছি, আমার অভাবে তাহাই তোমাদের শাসক হইবে।” (১০) ধর্মের অন্তর্ভুক্ত যে, বিনয় চাই-ই চাই, ইহা তিনি গভীরভাবে বুঝাইবার অন্ত পুনঃপুনঃ পুনঃপুনঃ ঐ শব্দ দুইটিকে একত্র প্রয়োগ করিতেন; এবং সর্বত্রই

ইহার অর্থ:—সেহেতু ইহাতে বিবিধ নয় (—নীতি) ও বিশেষ নয় আছে, এবং সেহেতু ইহা কার ও বাক্যের (অভ্যাসের অর্থাৎ অসংযমকে) অপনয়ন করে, সেই মত বিনয়বিষয়ক ইহাকে বিনয় বলিয়া থাকেন। বিবিধ নয়—পূর্ববিধ প্রতিমোক্ষপথে, পারাভিকাদি সমুদ্রবিধ যোগসমূহ, মূল প্রতিমোক্ষ ও-বিস্তারাদি। বিশেষ নয় ঐ সকল নয়েরই আবর্তকরূপে দুলীকরণ, শিথিলীকরণ, ইত্যাদি।

১০। “যো বো আনন্দ, বহা বম্মো চ বিনয়ো চ বেসিতো পঞ্জ-কম্মো। সো বো সমভত্তেন সমা।” ইহা বাহা শাস্ত্রনির্ভর উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধদেব আর এক স্থানে (দীঘ.১৬-১-৬; —মহাপ.২-৭৭) অপরিহার্য ধর্মের মধ্যে এই কথাটি খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন—“ভিক্ষুগণ, আমি বাহা বিধান করি নাই, বহুদিন পর্যন্ত ভিক্ষুগণ তাহা বিধান করিতে না; বা বাহা আমি বিধান করিয়াছি, বহুদিন পর্যন্ত তাহারা তাহার সমুদ্রের করিতে না; এবং আমি যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছি, তৎসমূহই অবলম্বন করিয়া বহুদিন পর্যন্ত তাহারা চলিবে, যে ভিক্ষুগণ, ততদিন পর্যন্ত তোমাদের উন্নতি হইবে, হানি হইবে না।” বিহিত বিধানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ না করায়

ধর্ম শব্দকে প্রথমে ও দিনর শব্দকে তাহার
অব্যবহিত পরে প্রয়োগ করিতেন।" (১১)
এইরূপ গৌরব দেখিয়াই তাঁহার শিষ্যগণ
মহাধর্মশাস্ত্রীতির সময়ে প্রথমে দিনর আনুতি
করিয়া পরে ধর্ম আনুতি করেন (চুল-
১১-১-৬, ৮)। তাঁহার বর্ণনাছিলেন দিনর
ষ্টিক ভাবে থাকিলে ধর্মও ষ্টিক ভাবে
থাকিবে, অতথা ধর্ম ষ্টিকিতে পারে না।
সেই জন্যই বুদ্ধবোধের সমস্তশাসনিকার
(২৮৯ পৃ) প্রথম ধর্মমহাসম্মতিতির বিবরণে
উক্ত হইয়াছে, মহাকান্ত্রণ বধন সমবেত
ভিক্ষুসম্মতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে প্রথমে
ধর্ম বা দিনর আনুতি করা যাইবে,
তখন ভিক্ষুগণ উত্তর করিয়াছিলেন—
“দিনর ই বুদ্ধশাসনের আনু, দিনর
থাকিলেই শাসন থাকিবে, অতএব আমরা
প্রথমে দিনর ই আনুতি করিবা।” (১২)

দেখা যায় দিনরই নির্মাণলাভের প্রথম
সোপান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (১৩)
সমগ্র বুদ্ধবচনের একই তাৎপর্য
(‘বিমুক্তিরস’) হইলেও এইরূপে তাণ্ডা স্পষ্টত
হুইত্যাগে বিস্তৃত হইল, ধর্ম ও দিনর।
বুদ্ধবোধের পরিনির্মাণলাভের পরেই রাজ-
গৃহের ধর্মমহাসম্মতিতে সমবেত ভিক্ষুগণ
পরিশুদ্ধভাবে এই হুই তাগেই সমগ্র বুদ্ধ-
বচনকে বর্ণাক্রমে উপালি ও আনন্দোর
নিকট জিজ্ঞাসা করেন (চুল.১১-১-
৭-৮)। পরে,—বুদ্ধবোধের মৃত্যুর অনেক
পরে, তাঁহার চিত্রাশীল শিষ্যবর্গ ধর্মেরই অংশ-
বিশেষ, অর্থাৎ দার্শনিক চিত্তার অঙ্কুল
বিবরণমুহুর্তে অবলম্বন করিয়া একটি নূতন
তত্ত্বের, নূতন সাহিত্যের উদ্ভাবন করেন,
ইহার নাম হইল অতি ধর্ম। (১৪) এবং
বুদ্ধবচনের যে অংশ পূর্বে ধর্ম নামে

কতকগুলি ভিক্ষু কর্তৃক দুর্গতিগ্রস্ত ও অসুস্থ হইয়াছিল, দিনরে (হস্তবিত্ত, পারা.১-৭) তাহাও দেখিতে
পাওয়া যায়। শ্রীমত্তগবলীতার ঐক্যকণ্ড এই শাস্ত্রনিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন (১৬-২৩, ২৪) :—

“যঃ শাস্ত্রবিদিশুসজ্ঞা বর্জিতঃ কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন মুখং ন পরাং গতিম্।
তন্মাত্ত্বাঃ প্রমাণং তে কার্যাকার্যাব্যবহিতৌ।
আত্মা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ত্ত্ব কর্ত্ত্বমিহাৰ্হসি।”

১১। “ইযমিহ ধর্মো দিনরো আকথ্যতি গুরুজ্ঞঃ”,—মহাপ ১-৩৮-১। এইরূপ শতশত বাক্য আছে। তাঁহার
পরেও বোধদাত্ত্বিত্যে এই শব্দযুগল এইরূপ ভাবেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

১২। “বিনরো নাম বুদ্ধশাসনমুপ আণু, বিনরো ষ্টিতে শাসনং ষ্টিতঃ হোতি, তন্মা পঠমং বিনরো সংগাহাম।
বুদ্ধবোধের অজ্ঞাত অর্থকপাতের ইহা উক্ত হইয়াছে (হঃ—হৃদয়লবলিগিনি, ১০ পৃ)।

১৩। “বিনরো সংবরণথায়, সংবরণে অবিসম্মতিমারথায়.....বিমুক্তি জ্ঞান বসুদনং অমুপাদিশ্যপিসিকানথায়।”

১৪। অতি ধর্ম—অতি ধর্ম (তুণ্ডঃ—“অভিসম্মতিকার্যম সিদ্ধবার সিদ্ধাপেতুঃ, অতি ত্রুচ্ছাত্তিকার্য সিদ্ধবার
সিদ্ধাপেতুঃ, অতি ধর্মো বিনেতুঃ, অতি বিনরো বিনেতুঃ”—(মহা.১-৩৬-১২)। অর্থাৎ বর্ধবিষয়ক। ধর্ম শব্দ
এখানে বর্ধের দার্শনিক তত্ত্ব অংশে প্রযুক্ত বুঝিতে হইবে। বুদ্ধবোধের জীবদ্দশায় অতি ধর্মের কোনো কথাই
ছিল না, তিনি এ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। চুলবর্ণনে বর্ণিত প্রথম (রাজগৃহের) ও দ্বিতীয় (বৈশালীর)
ধর্মমহাসম্মতিতে ইহার কোনো উল্লেখ নাই; কেবল ধর্ম ও বিনরোর কথা আছে। বুদ্ধবোধের অর্থকপা-
ত্ত্বলিতে ধর্মমহাসম্মতিতির বিবরণমুহুর্তে অতি ধর্মের ও পাঠের কথা আছে, কিন্তু ইহা পরবর্ত্তী সংযোগ ভিন্ন
কিছুই নহে।

প্রেলিভ ছিল, পরে তাহাই হুঁত বা হুত্র নামে কথিত হইতে লাগিল। অবশিষ্ট বিনয় অংশ সেই নামেই চলিতে থাকিল। ক্রমশ এই তিন অংশ পৃথক পৃথক তিন ভাগে স্বকলিত ও লিখিত হইল, এবং এক-একটি পৃথক-পৃথক পিটকে (অর্থাৎ পেটী বা কাঁপিতে) রক্ষিত হওয়ার কালক্রমে আধার ও আধেয়ের অভেদ-

ব্যবহারে (১৫) প্রত্যেক অংশই এক-একটি পিটক নামে অভিহিত হইতে লাগিল। ইহা হইতেই তিনটির সাধারণ নাম হইল ত্রি পিটক। এই তিন পিটকে প্রধানত তিনটি বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে; ঐলবিষয়ক (১৬) শব্দ: বিনয়ে, চিত্তবিষয়ক শব্দ: হুত্রে, (১৭) এবং প্রজ্ঞাবিষয়ক শব্দ: অভিধর্মে।

ত্রিবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

শ্রোতের ফুল

(৩৯)

এই ঘটনার পর মালতীর মন অত্যন্ত দ্বিষ্ট হইয়া উঠিল, না ভাবি কখন প্রেমামন্য আসিয়া তাহার নিহৃত বাসে উপস্থিত ঘটাইয়া উলিবে। ঘরে এমন একটি খিল নাই যাহা কদ্ব করিয়া মালতী একটু আপনাকে অন্তরাল করিতে পারে। মালতী মনে করিল কণাট ভেজাইয়া তোমার প্রভুতি ভারি বিনিব চাপাইয়া দার কদ্ব

করিয়া রাখিবে; কিন্তু দেখিল দরজাগুলি সমস্তই বাহির দিকে খোলে। ইহাতে তাহার মন এমন ভরস্কিত হইয়া উঠিল যে তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল সকল দরজার ফাঁকে সুদৃঢ় দৃষ্টি পাতিয়া প্রেমামন্য সুখ তাহাকে দেখিতেছে; কোথাও একটু খুঁট করিয়া শব্দ হইলে, কাহারও পদশব্দ শুনিলেই সন্ত্রস্ত হইয়া সে চমকিয়া উঠে। মালতীর বিশ্রাম নিস্ত্রা

১৫। "জিহুবন-বানী জানে" এই অর্থে "জিহুবন জানে" প্রচলিত কথা হইয়া থাকে। এখানে আধার ও আধেয়ের অভেদ ব্যবহার করা হয়। প্রকৃতভাবে বিনয় রাবিরায় একটা পৃথক পিটক ছিল, এইরূপ হুত্র ও অভিধর্মে রও পৃথক-পৃথক পিটক ছিল। এখন-এখন সকলে বলিত "বিনয়ের পিটক," "হুত্রে পিটক," "অভিধর্মে পিটক"; তাহার পর অন্তরে বিনয় পিটক ইত্যাদি ব্যবহার হয়। মুদ্রাবোধের ব্যাঘাৎ অবলম্বন করিলে এইরূপই বলিতে হয়। তিনি পৌরাণিকগণের মতামতানুসারে (স্বয়ং ১৮—১৯ পৃ) বলেন— "তেন এবং ছবিধর্মে পিটকগণের সহ সমাস করা বিনয় চোপা পিটক ত পরিমিতভাবে। তদন্ত অবদন ভাবনভোগিত বিনয় পিটক।" বস্তুত, কর্ণধারসম্মান বা করিয়া বিনয়ের পিটক, বিনয় পিটক, এইরূপ বস্তুতঃপূর্বব সমাস করিলেই হইতে পারে।

১৬। ঐল—বস্তাব (অভিধান. ১৭৮, ১-২১), সংবন (ঐ, ৪০০)।

১৭। অর্থাৎ কিরূপে ধ্যান-সমাধি-ভাবনাদি দ্বারা চিত্তকে সংকৃত করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক।

একেবারে বন্ধ হইয়া গেল; সে আপনাকে লইয়া একটু নিরাশা বদিয়া ভাবিবারও সময় পায় না।

কিন্তু চার পাঁচ দিন মালতী গুহর দর্শন পর্য্যন্ত পাইল না; তিনি সপ্না নিষ্কের ঘরটিতে বসিয়া পূজা পাঠে অত্যন্ত ব্যাপৃত হইয়া উঠিয়াছেন।

হঠাৎ এতদিন প্রভাতে প্রেমানন্দ বিপিন ও মালতীকে ডাকাইয়া আনিলেন। গুহর আহ্বান শুনিয়া মালতীর মন ভয়ে অস্তিত্ব হইয়া উঠিয়াছিল; সে শান্তিকে জিজ্ঞাসা করিল—দাদি, সেখানে আর কে আছেন?

শান্তি বলিল—যোগানন্দ আর আমি ছিলাম; যোগানন্দ স্বরূপানন্দকে ডাকিতে গেছেন, আমি তোমার ডাকতে এসেছি।

মালতী যখন দেখিল যে বিপিনেরও ডাক পড়িয়াছে, তখন সে নির্ভয়ে গুহর গৃহের অভিমুখে শান্তির সঙ্গে যাত্রা করিল।

প্রেমানন্দ বলিতেছেন—দেখ বিপিন বাবু, আমি ভেবে দেখলুম এ আশ্রমে তোমাদের থাকা কল্যাণের হবে না। তুমি মালতীকে নিয়ে সংসারশ্রমেই ফিরে যাও...

কথাটা মালতীর কানে গেল। মালতী আদিয়া ক্লান্ততার অবনত হইয়া প্রেমানন্দকে প্রণাম করিয়া এক পাশে উত্তরক হইয়া বলিল।

বিপিন একবার অপাঙ্গে মালতীর দিকে চাহিয়া গুরুকে বলিল—আমাকে এমন কঠোর আদেশ করছেন কোন্ অপরাধে? সংসারে আমার কোথাও ঠাই নেই দেখে আমি আপনার চরণে আশ্রয় নিরেছি—আমার কি কোথাও আশ্রয় নেই?

নিষ্কণায় ভাবপ্রবণ বিপিনের চোখে দিগ্বাঙ্গল পড়িতে লাগিল।

প্রেমানন্দ তব্ব হইয়া বসিয়া রহিলেন; আর একটি কথাও তিনি বলিলেন না। অনেককাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া মালতী হঠাৎ উঠিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল। তখন বিপিনও গুরুকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গাড়াইল। প্রেমানন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—দেখ বিপিন, তোমার মনে বৈরাগ্য এসে থাকলেও মালতীর মন বড় তরল আছে; এ আশ্রমে আর থাকা কল্যাণের হচ্ছে না! তুমি তাকে অগ্রত্ন রাখবার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।

বিপিন মালতীর উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে নিষ্কর আশ্রম-প্রতিকূল এমন আচরণ কিছু করিয়াছে বাহার জন্য গুরু তাহাকে আশ্রমে রাখিতে শক্তি হইয়া উঠিয়াছেন। বিপিন হনহন করিয়া গিয়া মালতীর ঘরের সামনে গাড়াইয়া ক্রুদ্ধবরে ডাকিল—মালতী।

আশ্রমে আসিয়া অবধি বিপিন একটি বারও মালতীর নিকটে আসে নাই, কথা বলে নাই। আর তাহাকে ডাবিতে শুনিয়া মালতীর অনন্দ-পাগর উবেল হইয়া উঠিল, জ্বরশতদল বিকশিত হইয়া উঠিল, —তবে সুখিণী গুরুদেবেণ অহুরোধে সংসারে ফিরিয়া যাইবার জন্য বিপিন তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে। মালতী তাড়াতাড়ি অগ্রদর হইয়া আদিয়া লজ্জিত স্নিতমুখে বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া গাড়াইল।

বিপিনের মনের সমস্ত উগ্রতা নিম্নে

মিলাইয়া গেল। তাহারও অন্তরে স্রবের
প্রলোভন উঁকি মারিতে লাগিল। বিপিন
আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল
না; সে মালতীকে কিছুই না বলিয়া ফিরিয়া
চলিল।

মালতী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—আপনি
জামাকে কি বলছিলেন?

কুণ্ঠিত বিপিন একবার মালতীর দিকে
ফিরিয়া তাকাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল
—তুমি কি আশ্রমের নিয়ম পালন কর না?

মালতীর অত্যন্ত রাগ হইল—প্রেমজনক
নিষ্ঠুর বিপিনের কাছে তাহার নামে নালিশ
করিয়াছে। মালতী উগ্রবরে বলিল—না।

—কেন?

—কেন? জানিনে কেন।—বলিয়াই
মালতী ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

বিপিন দেখিল মালতী যেখানে বসিয়া
পড়িয়া থাকে তাহার বিছানার মুখ ওঁজিয়া ফুলিয়া
ফুলিয়া কাটিতেছে। বিপিন অনেকক্ষণ চুপ
করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস
কেশিয়া চলিয়া গেল।

(৫০)

বিপিন সীতে নামিয়াই দেখিল ভূম্মের
মতো তারক দাঁড়াইয়া আছে। বিপিনকে
দেখিয়াই তারক তাহার গড় বড় দাঁত
ঘাতির করিয়া হাসিয়া বলিল—কি হে
সৌখীন সন্ন্যাসী, অপি তপো বর্জ্জিতে?
কিংবা—

অপি এসকল বহির্বিষয় কং

সমাপ্ত-বিনোদ্যমতো পূহায়?

কালোক্তঃ সংশ্লিষ্টঃ বিতায়ঃ

অসঙ্গোক্তকবসঃসংঃ তে।

বিতায় আশ্রমে প্রবেশের ভোগাড় ত
গাটছড়া বেধে ভাষার সঙ্গে-সঙ্গেই ফিরছে।
কেমন নয়?

বিপিন তাহাকে গ্রাহ্য মাত্র না করিয়া
নিঃস্বের ঘরে গিয়া যোগাধিশিষ্ট ফুলিয়া
পড়িতে বসিল—

এই যে চর্য্যচর-চেষ্টা-সম্বন্ধ ভোগা বিষয়,—এ
সম্বন্ধই অস্বি, ইহা আপদের মূল ও পাণের হেতু।
বিষয়-সম্বন্ধের যে পরস্পর লব্ধ তাহা ঐহিক
মানসিক কলহামায়া।

শিখা-ককাল-গ্রহ-মালিনী মাংসপুতলী রমণীর যন্ত্রণা
চকল অঙ্গসমূহে একতরপে শোভার সাবিত্রী কি
আছে? পুষ্ণ সংসার-পবনের মংসা, চিত্তকর্ম্ম
তাহার বিহারক্ষেত্রে, দ্রষ্টবাননা সেই মংস ধরিবার
ইচ্ছা-পূজ এবং তদ্বৎ সেই ইচ্ছা-হিত শিষ্টকপিল।

হে রাম! শতভেদা বাসনা-করকেই মুক্তি এবং
বিষয়বাসনার আশ্রিত্যকেই বন্ধন বলিয়া থাকেন।

যদ্যপি পরমপুরুষার্থ আশ্রিত হয় এবং পুনর্জন্ম-
যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, আর বাহ্য
পরম শান্তির আশ্রয়, তাহাই জীবনপরমার্থ।

কিন্তু শাস্ত্র বাহাই বলুক, সমষ্টিকে
বতই কদর্ঘ্য করিয়া চিত্তিত করুক, বিপিনের
মনের মধ্যে মালতী কিছুতেই অস্থল
হইতেছিল না, মালতীহীন জীবন তাহার
নিকট জীবনপরমার্থ বোধ হইতেছিল না।
সদ্য সে মালতীকে কাঁধিতে দেখিয়া
আসিয়াছে—সেই তাহার গুপ্ত অশ্রুবিপ্লুগুলি
একে একে গলিয়া গলিয়া বিপিনেরই
জ্বরপাত্রে পড়িয়া মুক্তাময় বরমাণ্যের আকারে
সকিত হইয়া উঠিতেছিল।

ছাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে
ভাবিতেছিল ঐ উপরের ঘরেই মালতী
আছে, ইচ্ছা করিলে সে তাহাকে পাইতে

পারিত, এখনো পারে, কিন্তু এই সুখ সে বেঞ্চায় ভাগ করিগাছে; এই জন্ত বেদনার মধ্যেও ভাগের একটা গর্ল অহুতব করিতেছিল।

তপানি শাস্ত্রের উপদেশ ও অহুশাসন এবং বৈরাগ্যের গর্ল অগ্রাহ করিয়া তাহার চিত্ত কেবলই মালতীর দিকেই অস্তিসার করিতেছিল। তাহার এক একবার মনে হইতেছিল, এর চেয়ে মালতীকে বিবাহ করিয়া কেরানীগিরি করাও ভালো ছিল। নিঃসঙ্গ একাকী বসিয়া যোগযাশিষ্ঠ সামায়ণ পড়িবাব মতো মনের গঠন বিপিনের নহে।

বিপিন ভাবিতে লাগিল—মালতী আমার একটি প্রেমই অমন করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল কেন? তবে কি মালতী এখনো আমার ভালো বাসে? এখনো কি তাহার মন আমার প্রতি তেমনি অহুতব আছে? আমি তাহার প্রতি যে অস্তার করিগাছি তাহা কি সে ক্ষমা করিতে পারিগাছে? আমি যেমন তাহার অস্তাবে দগ্ধ হইতেছি, উহার প্রাণেও কি ভেমনিস্তর প্রাণদবহি অলিতেছে? হাব, অভাগিনী! কেন তুমি মবকিশোরকে বিবাহ করিয়া তাহার কাছে থাকিলে না। তাহা হইলে আমার সাধনার বিষ ঘটাইয়া তোমার চিত্তা সর্করা আমার ঘিরিয়া থাকিত না। আগে মনে করিয়াছিলাম মালতী কাছে থাকিলে নিশ্চিন্ত মনে ধর্মসাধন করিতে পারিব; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নামিয়া দেবিত্তেছি তাহা ভ্রম; পরম প্রলোভনের সাধন্যো পার্বে রাখিয়া তপস্তার মনোনিবেশ করিতে পারিবার মতো দৃঢ় চিত্ত আমার নহে, এ কথা স্বীকার

করিতে লজ্জা নাই। তার চেয়ে বরং মালতী নবকিশোরকে বিবাহ করিলে তাহাকে একেবারে আত্মতাঁত মনে করিয়া হয়ত তুলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু সত্যই তাহা পারিতাম কি? সে হরত আরো অসহ্য হইত। দূর হোক ছাই, এ সন্ন্যাসের পথে বর্গসাধন আমার কর নহ; আমি আজই গুরুজীকে বলি মালতীকে না পাইলে আমার ইহ-পরকাল দুই-ই নষ্ট হইয়া যাইবে।

এইরূপ চিত্তা করিতে করিতে দিপিনের অস্তর মালতীর প্রতি অহুগে প্রতাপ হইয়া উঠিল। সে তখন দীর্ঘনিশ্বাস কেণিয়া গুরুজীর সন্ধানে বহির্গত হইল।

সে গুরুর ঘরে গিয়া দেবিল গুরু একখানি আসনে তক্ত হইয়া চকু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছেন।

বিপিন এতকণ যে সস্তর দৃঢ় করিয়া আসিয়াছিল তাহা এখন গুরুর সন্মুখে আসিয়া দিখিল হইয়া পড়িল। সে এই মুষ্টিমান ব্রহ্মচর্যকে কেমন করিয়া বলিবে যে সে আর পারিতেছে না, মালতীকে তাহার পত্নীরূপেই চাই। বিপিনের মুখ লজ্জার আক্ৰিম হইয়া উঠিল, সে অপ্রতিভ ভাবে ধীরে ধীরে আবার ফিরিয়া আপনায় ঘরে গিয়া গীতা খুলিয়া পাঠ করিতে বসিল—

অলম্যং মহাবীরো বনো ব্রহ্মগ্রহং তলম্।

অস্ত্রাণেন তু কোত্তরং বৈরাগ্যেণ চ সুহৃতে ॥

যতো যতো নিশ্চলতি মনস্তকলম্বহিরম্।

ততস্ততো নিরমৈতন্ম আদ্যেনোব বন্দ্য নরেন্।

বিপিন অবশ চিত্তকে দমন করিবার জন্ত

আগামী মাঘীপূর্ণিমা হইতে নিৰ্জ্জন-বাস আরম্ভ করিবে স্থির করিল। যে সন্ন্যাসী নিৰ্জ্জনে জপ আরাধনা কৰিতে চার তাহার অল্প আশ্রম-উপায়ে চার কোণে চারটি গুহাগৃহ আছে ; সে সেই গৃহে সংকল্প থাকে—আশ্রমের একজন নির্দিষ্ট কেহ দিনান্তে তাহাকে কিছু পানীয় ও আহাৰ্য্য দিয়া আসে। ঈশ্বরই আশ্রমে রটরা গেল বিপিন নিৰ্জ্জনে তপস্তার অল্প প্রস্তুত হইতেছে। বিপিন নিৰ্জ্জনবাস করিবে শুনিয়া মালতী ভীত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

(৩-)

আশ্রমের সকল শিষ্য ও শিষ্যারা লক্ষ্য করিতেছিল কেহক দিন ধরিয়া গুরুর মন অত্যন্ত ক্লান্ত চকল হইয়া আছে ; তিনি সৰ্ব্বদাই চিন্তাকুল, দিনে ও রাতে অধিক সময়েই তিনি চকু মুদ্রিত করিয়া ক্লান্ত হইয়া বসিয়া কাটাইতেছেন ; থাকিয়া থাকিয়া উঠিয়া গিয়া ঠাকুরঘরে পূজার বসেন। পূৰ্ণের চার তাহার মুখে স্নিগ্ধ হাসি লাগিয়াই থাকে না ; সমবেত শিষ্যদের মিষ্ট কথার উপদেশ জান না ; শিষ্যশিষ্যারা অধ্যায় ও নিরম-মত প্রাতে ও সন্ধ্যায় আসিয়া তাহার ঘরে সমবেত হইলে গুরু কেমন ব্যস্ত হইয়া পড়েন ; কেহ কোনো প্রশ্ন করিলে নীরস বিরস ভাবে তাহার উত্তর দিতে দিতে হঠাৎ হঠাৎ মাঝখানে ধামিরা অজমনত্ব হইয়া যান অথবা সেখানে হইতে চকল হইয়া চলিয়া যান।

ইহা দেখিয়া ও বুঝিয়া শিষ্যশিষ্যারা আর তাহার কাছে কেহ আসিত না ; সবলেই ভয়ে ভয়ে দূরে দূরে রহিত। ছ-চার-দিন পরে হঠাৎ এক সন্ধ্যা প্রেমহানন্দ

নিঃসই সকল শিষ্য-শিষ্যাণ্ডে ডাকিয়া তাহা-দিগকে শান্ত পড়িয়া তনাইতে বসিওন, কোনো দিন বা বৈষ্ণৱ পদাবলী কৌটল করিতেন, কিন্তু কোনো দিন তিনি মালতীকে ডাকিতেন না, মালতীও গুরুর মুখে বৈষ্ণৱ্যের উপদেশ শুনিবার অল্প বিবেচ্য ব্যগ্র ছিল না।

মালতী বুঝিতে পারিতেছিল গুরু তাহাকে এড়াইয়া চলিতেই চাহিতেছেন। প্রেমহানন্দের ঘর হইতে ঠাকুরঘরে বা নীচে বাইতে হইলে বা ঠাকুরঘর বা নীচে হইতে তাহার ঘরে আসিতে হইলে মালতীর ঘরের সম্মুখ দিয়া বাইতে হয় ; মালতী দেখিত প্রেমহানন্দ অভ্যাসের বেশ সেই পথে বাইতে বা আসিতে গিয়া হঠাৎ কিরিয়া অল্প দিকের বারান্দা দিয়া ঘুরিয়া বাইতেন। মালতী বুঝিতেছিল যে গুরু হইয়া তিনি যে মালতীর গোপনতার মধ্যে একদিন উকি মারিতে গিয়াছিলেন এইজন্য তিনি লজ্জিত হইয়া মালতীর সম্মুখীন হইতেও পারিতেছিলেন না ; মালতী লজ্জা করিয়া নিজে তাহার সম্মুখে গিয়া বসতিন না তাহার মনের মানি মার্জনা করিয়া দিবে ততদিন তিনি আর মালতীর নিকটে সহজভাবে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। মালতীর কিন্তু প্রেমহানন্দের এই লজ্জার দীনতা দূর করিবার বিবেচ্য কোনো আগ্রহ হইতেছিল না। প্রেমহানন্দের ঘরের মল্লিসে বোগ দিলে মাঝে মাঝে বিপিনকে দেখিতে পাইবে বলিয়া বাইবার প্রণোদন হইত, কিন্তু প্রেমহানন্দের দৃষ্টির সম্মুখে বিপিনের সহিত মিলনও তাহার একটুও বাহনীর মনে হইত না।

বিপিনও এই সুযোগটি বুঝিয়া গুরুর

মজলিমে সন্ধ্যায়ে আসিয়া হাজির হইত এবং মালতীকে দেখিতে না পাষ্টরা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া সকলের শেষে চলিয়া যাইত। তাহার দিন এক-একটা করিয়া বড় শূণ্য চলিয়া যাইতেছে, তাহাকে মাঝে পূর্ণিমা হইতে ফাস্তনী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত নির্জনবাস করিতে হইবে—কি পাণের কি সন্ধ্যা লইয়া সে ঐ দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকিবে? তাহার আগে মালতীকে যদি সে একটাবারও ভালো করিয়া দেখিয়া লইতে পারিত।

আজ মাঝে পূর্ণিমা। আজ চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিপিনকে শুভ্রা স্নান হইতে হইবে। দুইঘণ্টা ভীক মৈনিকের জাহ্নবী যাইতে তাহার কিছুতেই মন চাহিতেছিল না, থাকিবারও তাহার আর জো নাই। বিপিন আজ হটফট করিয়া বেড়াইতেছিল।

মালতীরও আজ ভ্রূণ ঘন চরমে উঠিয়াছে। এতও তাহার অনুষ্ঠে ছিল! যে বিপিনের কাছে-কাছে থাকিতে পাইবে বলিয়া সে সন্ধ্যাসীর আশ্রমে আসিয়াছে, সেই বিপিন তাহাকে অসহায় কোথায় কাহার কাছে রাখিয়া নির্জন শুভ্রা উপভোগ করিতে চলিল! এত বড় ধার্মিক সে। এত বড় নিষ্ঠুর নির্দয় 'নির্দয় পাষণ সে! মালতী আপনার ঘরের চারিদিকের দরজা ভেজাইয়া দিয়া আপনার তোবড়ের গোপন ভল হইতে বিপিনের একখানি ফটোগ্রাফ বাহির করিল; এই ছবিখানি সে মধুরাপুর হইতে আসিবার সময় বিপিনের ঘর হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছিল; এখানি তাহার বড় লজ্জার বড় গোপনের বড় আদরের

ধন! ইহার নিকট চাহিতেই তাহার অগ্র-ধারা পাগল চইয়া ছুটিল। মালতী ফটোগ্রাফখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুতে অন্ধ হইয়া সাপিত অশ্রুরে নীরবে আর্তনাদ করিয়া দৃষ্টিত হইতে লাগিল—ওগো তুমি এত নিষ্ঠুর! এত নিষ্ঠুর!

মালতী ছবিখানিকে খাটের বিছানার উপর রাখিয়া তাহার সামনে মাথা কুটিয়া কানিতে কানিতে ভাবিতেছিল—ওগো তুমি কি এমনি কাগজে তৈরি—প্রাণহীন ভাবহীন দহাহীন!

কখন গঙ্গার হাওয়া আসিয়া নিঃশব্দে মালতীর ঘরের বাগান্দার দিককার কপাটটি আন্তে আন্তে খুলিয়া দিয়াছিল। মালতী মাথা নীচু করিয়া চোপ সুবিয়া অশ্রুতে অন্ধ হইয়া আপনার গজীর বেদনার অন্ধকারে ডুবিয়া ছিল, সে টের লাগ নাই। ঠিক সেই সময় প্রেমামানন্দ সেই গগ দিগাঠাকুর-ঘরে বাইতেছিলেন; মালতীর ঘরের সামনে আসিয়া থমকিয়া ফিরিতে যাইবেন; দেখিলেন মালতী বিপিনের ছবির পায়ে মাথা রাখিয়া ব্যাকুল হইয়া কানিতেছে।

প্রেমামানন্দ কপেক পাড়াইয়া ইতস্তত করিলেন; একবার ফিরিয়া গেলেন; আবার আসিয়া পাড়াইলেন; তারপর সন্তর্পণে ঘরে ঢুকিয়া ছবিখানি চোখে চোখে উঠাইয়া লইয়া ঝড় স্ববে বলিলেন—রাধারাবী, এ উত্তম!

শাওক চুরি করিতে গেলে বাঁধনী যেমন করিয়া কাঁপাইয়া পড়ে মালতী তেমনি করিয়া ধুক-ছাড়া বাণের মতো প্রেমামানন্দের উপর লাফাইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—চোর!

শ্রেয়ানন্দ মালতীর গুরুত্ব মৃষ্টি ও আবেগময় আক্রমণে ভীত হইয়া ভাড়াভাড়া একহাতে মালতীকে চৌনিয়া সরাইয়া দিয়া একহাতে ছবিখানিকে পিছনে সরাইয়া ধরিয়া ঘর হইতে বাহ্যাব্যাহার হইয়া পড়িলেন।

মালতী চীৎকার করিয়া উঠিল—আমার জিনিস আপনি দিবে যান বলছি।

মালতীর চোখ হইতে আগুন ঠিকরিয়া পড়িতেছিল।

গোলমাল শুনিয়া কহেকজন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী দেখানে ছুটয়া আসিয়া ওড়া হইল—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার গুরুর দিকে একবার মালতীর দিকে চাহিল।

মালতী গর্জন করিয়া শ্রেয়ানন্দের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল; উঠগ—এই চোরটাকে আপনারা গুরু বলে পুজো করেন।

সকলে অবাক হইয়া গুরুর দিকে চাহিল।

গুরু মালতীর দৃষ্ট মৃষ্টির সম্মুখে একেবারে অপ্রতিভ নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি আজ যেন অপরার্থী—বিচারকদের সম্মুখে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিপিনের ছবিখানি সকলকে দেখাইয়া বলিলেন—সন্ন্যাসিনী এইখানি বুকে করে বসে ছিলেন! চোর কে?

কি লজ্জা! কি লজ্জা! এত লোকের সামনে এমন করিয়া একজন স্ত্রীলোককে অপমান করিতে পারে—এমন কাপুরুষ বলিয়া মালতী ত একবারও শ্রেয়ানন্দকে ভাবে নাই! কি লজ্জা! কি লজ্জা! একজন সন্ন্যাসিনী একজন সন্ন্যাসীর ছবি বুকে করিয়া

রাখিতে পারে এমন অবদান ত এ আশ্রমে কখনো ঘটতে সম্ভবত সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর মধ্যে নাই। তাহার সকলে মালতীর দিকে ঘুরার দৃষ্টি হানিয়া অবাক হইয়া চলিয়া গেল। মালতী বোজ্রপদ্ম লতার মতন বিবর্ণ হইয়া সেইখানে জুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল। শ্রেয়ানন্দ বিপিনের ছবিখানি লইয়া নিজের ঘরে গিয়া লুকাইলেন।

বিপিন তখন গুহার মান করিয়া নুতন গৈরিক বস্ত্র পরিয়া এক হাতে কমণ্ডলু ও একহাতে যোগবাণিষ্ঠ সামায়েন লইয়া গুহার অবরুদ্ধ হইতে ঘাইতেছিল। এমন সময় সন্ন্যাস বাতাস বিদীর্ণ করিয়া মালতীর আর্জ কণ্ঠ চীৎকার করিয়া উঠিল—চোর!

বিপিনের রক্ত প্রতাপ হইয়া উঠিল, চরণ চঞ্চল হইয়া উঠিল, ইচ্ছা হইল ছুটয়া গিয়া মালতীকে জুই বাহু দিয়া আগলাইয়া বলে—ভয় নাই তোমার, আমি আছি।

যোগানন্দ বলিল—গুরুমাই, এখন তোমার চিত্তবিক্ষেপ হওয়া উচিত নয়, তুমি গুহার চল।

বিপিন একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

মালতী ছুটয়া আসিয়া পথরোধ করিয়া ধাড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—আমাকে অসহায় ফেলে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনি বাকে গুরু যেন করে পুজো করছেন সে একটা চোর!

বিপিনের মুখ শুকাইয়া ফাফাশে হইয়া গিয়াছে; সে শূন্য ভীত দৃষ্টিতে মালতীর দিকে চাহিয়া কম্পিত অশ্রুট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—হয়েছে কি?

শ্রমদানন্দ অগ্রণর হইয়া আসিয়া
বলিলেন—সন্ধ্যাদিনী একজন পুরুষের ছবি
বুকে করে কাঁদছিলেন; আমি কেড়ে
নিরেছি।

বিশিষ্ট যেন কতদিন আগে মরিয়া
গিয়াছে, যাহা আছে তাহা তাহার শব।

মালতী ভীষণরূপে বিপিনকে 'বলিল—
বলুন আপনি আপনার গুরুকে, আমার
জিনিস আমার কিহরে দিতে।

বিশিষ্টের রসপূত্র গ্রহণ কষ্টে গ্রহণাস
করিল—কায় ছবি ?

মালতীর মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিয়া
ছিল; এন লজ্জার আভা সেই লালিমা
গাঢ়তর করিয়া তুলিল; তাহার উপর
আসিয়া পড়িয়াছিল অস্ত্রস্থরের আলো
আর উদীরমান চক্রে ক্রোড়। মালতী
মাথা নত করিয়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—
সে আমি জানিনে, আপনি দিতে বলুন।

বিশিষ্ট ধীরেনিখাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে
অগ্রণর হইয়া তাহার মতো প্রবেশ করিল।

মালতী সেই পথের ধূলায় স্তম্ভিত হইয়া
ধূলের চেয়েও ঘিক্ত উপেক্ষিত তাহার
অস্তিত্ব বিলীন করিয়া দিতে চাছিল।
এমনি লজ্জার জানকী মাটিতে মিশাইয়া
ছিলেন; যে অপমানে ক্রীড়াক্ষের চরমতম
আবগটুকু চরণ করিয়া তাহাকে সমস্ত
সংসারের নিষ্ঠুর কোড়াল দৃষ্টির নান্যমানে
দাঁড় করাইয়া ত্যক্ত, এ সেই অপমান;
সেই দারুণ অপমানের লজ্জার মালতী
মাটির ধূলা চোপের অঙ্গে ভিষাইতে
লাগিল।

কে ছপানি সেরকোমল হস্তে তাহাকে
আকর্ষণ করিয়া করুণাশ্রিত স্বরে ডাকিল—
বিদী, তুমি উঠে এস।

মালতী ভাড়াভাড়া উঠিয়া শাস্ত্রের বুক
মুখ লুকাইয়া লজ্জা ঢাকিয়া যেন বাটিল।
পুরুষ পুরুষের দৃষ্টি হইতে শাস্ত্র তাহাকে
সরাইয়া লইয়া গেল। মণীপূর্ণিমার চক্রে
তখন সমস্ত অশ্রুতরিতা হাসিতেছিল।

(ক্রমশঃ)

চার বন্ধোপাখ্যাত।

আলোচনা

আর্যাদিগের আদি জন্মভূমি

আদিবৈদ্য ভারতীতে ক্রীড়িত নীতলচল চক্রবর্তী
মহাশয় "আর্যাদিগের আদি জন্মভূমি" সম্বন্ধে যে
প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কয়েকটি কথা নিয়ে
লিখিলাম। আপা করি নীতলবাহু বিবেচনা করিয়া
যেখিনে।

মূলোদ্ধার না করিলে আর্যজাতির মূল ইতিহাস
উদ্ধার হইবে না। এমিক ওমিক বাদ বিদ্যা মধ্য

হইতে ইতিহাস লিখিলে তাহা কখন ঠিক হইতে
পারে না। এমনকি প্রথম হইতেই ইতিহাস-উদ্ধারের
চেষ্টা করিতে হইবে। আমার "পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব"
এই প্রণেয় পুস্তক।

বীহারা পুরাণ পড়েন নাই, তাহারা ই পুরাণকে
দৃঢ় করেন। বীহারা পড়িয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন,
তাহারা তাহা হইতে ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা
করিতেছেন, এ হিসাবে নীতলবাহু প্রণেয় পুস্তক।

পুরাণে প্রাচীন ইতিহাসের যে উপাখ্যান আছে তাহা কত সূচ্যবান* তাহা উত্তরকালের একজন পড়িলে বিশেষরূপে জানা যায়। “পুণ্ডরীক পুরাতন” পাঠ করিলে তাহাই ঐতিহাসিকরূপে জানিতে পারিবেন।

ইলাবৃত্ত বর্ষ দুইটি। যে ইলাবৃত্ত বর্ষে সূর্য হর মাস উদিত এবং হর মাস অন্তর্গত থাকেন, যেখানে তিনি তাপ গ্রহণ করেন না, যেখানে চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্র একত্র পায় না বলিয়া গিরিপুত্রের দ্বিতীয় আছে, সেই ইলাবৃত্ত বর্ষই প্রাচীন অর্থাৎ প্রথম ইলাবৃত্ত বর্ষ। ইহা উত্তরমেরু প্রদেশে অবস্থিত। ইহাই নারায়ণের দ্বিতীয় বসতি। পুরাণে কথিত। এখানেই আদি আর্ধ্যমানব প্রজাতির জন্ম হইয়াছিল। দ্বাদ্ধাশি প্রথম এখানেই প্রচলিত হইয়াছিল।

যে ইলাবৃত্ত বর্ষে দেবতারিণের অর্থাৎ ইন্দ্রাদির জন্ম হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় ইলাবৃত্ত বর্ষ। ইহা প্রথম প্রদেশে অর্থাৎ আলুটাই পার্বত্য প্রদেশে সাইবেরিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত। পুণ্ডরীক পুরাতন দ্বিতীয় খণ্ড মেরুতবে ইহা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ইলাবৃত্তের অব্যবহিত দক্ষিণে যে উত্তরকূক, তাহা আদি উত্তরকূক নামে। আদি উত্তরকূকতে ও ভারতে সূর্য একসঙ্গে উদয় হয় না। ভারতে লক্ষ্যর বসন সূর্য্যোদয় হয়, উত্তরকূকতে নিম্নপূরে তখন সন্ধ্যা হয়। এই উত্তরকূকই আদি। পরে যখন প্রমেরু প্রদেশ (আলুটাই পার্বত্য প্রদেশ) ইলাবৃত্ত বর্ষ হইয়াছে, তখন প্রথম ইলাবৃত্ত বর্ষের দক্ষিণে উত্তরকূক স্থাপিত হইয়াছে। এই উত্তরকূকর কথাই রামায়ণে প্রদ্রীত নুখে উক্ত হইয়াছে। এখানে ও ভারতে সূর্য্য এক সঙ্গে উদয় হয়।

১৩২১ সালের মাঘের দশমীতারিখের ৩২২ পৃষ্ঠার আবার প্রতিবাদের উত্তরে তীব্র দৃষ্টি প্রকাশ করিয়াও যে শীতলবাবু ১৩২২ সালের আশ্বিনের ত্যারতীতে

লিখিয়াছেন যে, “আর্ধ্যগণ পরম্পরের সহিত বিরোধ করিয়াই মৃত ও অমৃত এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন এবং পূর্ণের ঠাহারা এক দেবতাব্রাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন,” ইহাতে আদি ঠাহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। পুণ্ডরীক পুরাতনে এ সব বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত ও প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রাচীন মিশর

ঐতিহাসিকগণ না কি হির করিয়াছেন, পুণ্ডরীক মধ্যে সর্বপ্রথমে সভ্যতার মূখ দেখিয়াছেন—মিশর। কিত্তি ঠাহারা যদি হিন্দু পুরাণাবি শাস্ত্রকে বিশ্বাস করিতেন তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন মিশরের প্রথম রাজা “মেনা” পুরাণাদিতে “মহু” নামে কথিত হইয়াছেন। সার্ববিস্ম মিশরের প্রথম রাজা। ইনি বিদেশী শাস্ত্রে “মহু” নামে কথিত হইয়াছেন।

সার্ব মহুর পুত্রের নাম হুতি, নির্দোহ, বংশ, হুমতি ইত্যাদি। মিশরের প্রথম রাজা বেনার গরে তৎপুত্র “তেতা” রাজা হইয়াছিলেন, এই তেতাই “গুতি” নামে কথিত। নির্দোহ হার নামে, বংশ বাবেত নামে এবং হুমতি নাম নামে কথিত হইয়াছে। সকলেরই গোড়া ভারতীয় শাস্ত্রে পাইবেন, হুমতী: যে আর্ধ্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ঠাহাদেরই ব্রজাতি মিশরের প্রবেশ করিয়াছিলেন। কণ বরিয়া টানিলেই মাথা আপনি আইসে, মিশর আদি সভ্যবেশ বলিলে ভারতের সভ্যতার এর আপনি সীমাসিদ্ধ হইয়া যাইবে। চাই আলোচনা।

“মিশরবাসীরা মরুভূমির অশ্রুভাগের সহিত আপনাদের পার্শ্বকা বসায় রাখিবার জন্য আপনাদিগকে “মামুখ” বলিতেন” কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের মায়েই জানেন, “মহু” পুত্রই মামুখ বা মানব নামে কথিত।

ঐতিনোববিহারী রায়।

সমালোচনা

অশোক অনুশীলন। (মূল পাঠ, অনুবাদ, বিবিধ টীকা, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণ ও সংকৃত ভাষণসহিত) শ্রীযুক্ত চান্দ্রসেন বসু ও শ্রীযুক্ত অমিত্যোহন কর কাণ্ডার্বী এম. এ. কর্তৃক সম্পাদিত। প্রিন্টার ও পাবলিশার শ্রীযুক্ত চৈতন্য বাগ, মেটাকাফ সিস্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা। মূল্য বেড় টাকা, কাপড়ে বাঁধাই দুই টাকা মাত্র। এই গ্রন্থে সমগ্র অশোক অনুশীলনের মূল, টীকাবিশিষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই ঐতিহাসিক-তথ্যসম্বলিত সম্পাদকবহু, তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Study) অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার্য বলেন, “ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহের যত্নসূচক পথ। নিম্নে আছে, ভূগোলে (১) বিশেষতঃ ঐতিহাসিক ও ভ্রম্যকাহি-গণের লিখিত ইতিবৃত্ত, (২) প্রস্তর-লিপি, খাজুর-ফলকে বা অস্ত্র আধারে খোঁদিত লেখ্যলিপি ও মুদ্রা লিপি, (৩) গাথা কাহিনী ও আখ্যায়িকা এবং সমসাময়িক সাহিত্যই সর্বাপেক্ষা উপযোগী।” কথাটা খুবই ঠিক। হুকের বিখ্যাত আদ্যের ঐতিহাসিকগণ এখন এই গবেষণায় পথিক এবং এইরূপ আলোচনা ধারাই সম্প্রতি আদ্যের জাতীয় লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধার-কাণ্ড চলিয়াছে। প্রাচীন ভারতে সচরাচর অশোকই যে উৎকীর্ণ ‘লিলালিপি’ সর্বমুখ্য অবশ্যক ছিলেন, সে বিষয়েও ঐতিহাসিকগণ এখন একমত। “সেই লিপিগুলি মূল্যবান; ‘ব্রাহ্মী’ অক্ষরে লিখিত।” সম্পাদকবহু যেন স্বকৃত্যের সহিত ‘ব্রাহ্মী’ অক্ষরের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানামতের আলোচনা করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, “এই ব্রাহ্মীলিপিই এক সময়ে প্রাচীন ভারতের জাতীয় লিপি ছিল; কুশান, চত্ব, প্রাচীন ত্রাবিড়, মেঘনাগরী, বাঙ্গালা, তিহুতী, উড়িষা, তাম্রলুণ্ড, মায়ুরাসী, প্রভৃতি, তেলুগু, তামিল, মলয়ালম, গিহলী বন্দী, সানী, কন্নাড়, মালয়, দাক্ষিণ প্রভৃতি ভারতের ও বহির্ভারতের ভাষ্য প্রাচীন ও আধুনিক লিপি এই ব্রাহ্মী বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত।” তাহার পর

সম্পাদকবহু ‘প্রাচীন বস্তু-চিত্র’ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার্য বলেন, মিসর, আসিরীয় ও চীন প্রভৃতি দেশের বর্ণমালা বস্তু-চিত্র হইতে উৎপন্ন। ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মী বর্ণমালায় আচার ও গঠন-প্রণালী বিবেচ্যভাবে আলোচনা করিলে উহাও যে প্রাচীন বস্তু-চিত্র (hieroglyphics) হইতে উৎপন্ন তাহা বেশ বৃষ্টিতে পাতা পড়া।” এই সিদ্ধান্ত তাঁহার্য বেশ সুনিপুণ পুস্তি-প্রমাণাদির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার্য আরও বলেন, “অশোক মুদ্র-বেবের উপদেশের অর্থ শিরোধার্য করিয়া লইয়া কথিত জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় আদ্যের বস্তুবা প্রচার করিলেন, পরবর্তী ভারতীয় রাজ্যগণের জায় সঙ্কটের আশ্রয় লইলেন না। তাঁহার অনুশীলনের ভাবকে মগধী প্রাকৃতের প্রাচীনতম মিসরন বলা গাইতে পারে। এই মগধী প্রাকৃত হইতেই কথিত বাঙ্গালার উৎপত্তি হইয়াছে এবং কথিত বাঙ্গালাই সেরা সঙ্কটের অনুকরণ করিয়া ‘সানু’ বা সাহিত্যের আকার পরিমূহ করিয়াছে। এই হিসাবে অশোকের ভাবকে প্রাচীনতম বাঙ্গালা বলিতে পারা যায়। তাহাঃ বাহুসম্বন্ধের পক্ষে ‘এই কারণে অশোক অনুশীলনের মূল্য অধিক।’” নতুন কথিত বাঙ্গালার ‘মিসর’, ‘কেওট’, ‘মেখা’, ‘বহুত’ ‘বাহুতন’ ‘চিকিৎসা’ প্রভৃতি অনেক শব্দ অশোক অনুশীলনেও দেখা যায়।” এই প্রমাণাদি মান্য বিদ্যে বিদ্যাই আদ্যের বাঙ্গালা সাহিত্যের—বিশেষ করিয়া ইতিহাস-বিশেষের সমধিক সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। সমগ্র অনুশীলনের সংগ্রহ ভারতীয় অপর কোন ভাষাতেই এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, বাঙ্গালার এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সম্পাদকবহুর সুপজীয় গবেষণা-পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনার নিপুণতা, অসাধারণ অধ্যবসায় ও যত্নশীল-প্রীতির প্রমাণ পরিচয় পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে যে যে ভাষ্যমণ্ডলী প্রত্যেক বাঙ্গালীর ঘরে স্থান-লাভের যোগ্য।

সজানারায়ণের পাঁচালী।

'প্রগীষাশ্বাৎ
যটক বিরতিষ্ঠি। শ্রুত যাদবেশর তর্কর কৰ্ত্তক
সমোষিত; রতপুত্র সাহিত্য পরিবে কৰ্ত্তক প্রকাশিত।
কলিকাতা বিবেকোৎসবে মুদ্রিত। মৃগা হই আনা।
এখানি প্রাচীন পুঁথি হইতে সংগৃহীত এবং মুদ্রিত।
এই গ্রন্থের কৃত্বিকার বিবেক মৃগা আছে। 'কৃত্বিকা'র,
সজানারায়ণের পুত্র-প্রবর্তনের কাল-বিবরণের চেষ্টা
হইয়াছে এবং তারতের নানা প্রদেশে কি ভাবে এই
পুত্র প্রচলিত, তারারও একটু কোতূহলপূর্ণ আলোচনা
আছে।

বঙ্গাল দেশ।

শ্রুত যোগেন্দ্রনাথ দাস
প্রণীত। কলিকাতা, লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে
মুদ্রিত ও প্রবক্তার কৰ্ত্তক প্রকাশিত। মৃগা এক
টাকা। এখানি নাটক। আনন্দটু রচিত 'বঙ্গাল-
চরিত্র' এই নাটকের ভিত্তি। নাটক-হিসাবে গ্রন্থের
কোন বিশেষ নাই—নাটক-চরিত্র লেখকের শক্তির
কোন পরিচয় পাইলাম না।

অবদান। শ্রুত যিনিবিস্বাসী চক্রবর্তী
প্রণীত প্রকাশক, ইতিহাস সাহিত্যিক: হাউস, কলিকাতা।
নিউ আর্টস্টিক প্রেসে মুদ্রিত। মৃগা আট আনা।
"ই:রাজী ও বাঙ্গাল বিবিধ প্রবাহি হইতে সঞ্চয়ন
করিয়া" এই পুস্তকের আখ্যায়িকাগুলি রচিত।
হকিকত তার, ইউরোপিয়া, তুসসীদার, মার্গারেট, লুং-
কট্রিসা প্রভৃতি নব্বই আখ্যায়িকা হইতে সংগ্রহিত।
আখ্যায়িকাগুলি ঐতিহাসিক। লেখকের উদ্ভব ও
নির্ভর্য্যে অংশ:মার্গ, কিন্তু রচনার বিশেষ নাই।
আখ্যায়িকাগুলির স্বকীয় একটা রস আছে—লেখক
কিছু সে রস সূত্রিতে পার নাই। লিপিকুলতার
অভাবে সংবাদপত্রের সংবোধের মতই আখ্যায়িকাগুলি
নির্মল্যব ও অগোচর হইয়াছে।

ভাষ্য ও সুর। শ্রুত আশুতোষ মুখো-
পাধ্যায় বি, এ প্রণীত। কলিকাতা, লীলা প্রিণ্টিং
ওয়ার্কসে মুদ্রিত ও প্রবক্তার কৰ্ত্তক প্রকাশিত।

মৃগা এক টাকা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। লেখক
কৃত্বিকার বঙ্গারত কবিগণ লিখিয়াছেন:—"কবিতা-
গুলির মধ্যে একটা আত্মকিতা—একটা আবেগ,
একটা অসহ্য আবেগ বহিরা আবার বিশ্বাস।" আশ্রয়
লেখকের বিধানের অনুবর্তী হইয়া লেখকের সন্ধান
লইতে বিরা কিত নিগ্রহ হইয়াছে—আশা করি,
লেখক ইহাতে সুর হইবেন না।

বঙ্গরী।

শ্রুত কামিনীদাস রায়, বি, এ,
প্রণীত। প্রকাশক, ইতিহাস চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা।
প্যারাগ প্রেসে মুদ্রিত। মৃগা আট আনা। এখানি
কবিতা-গ্রন্থ। অনেকগুলি পদ্যকবিতা এই গ্রন্থে
সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার লেখক বাঙ্গালীর একজন
স্বাধীন কবি। কবিতাগুলির অধিকাংশই ভাবে
শুদ্ধ, ভাবের মন্দ, অস্বাভাবিক—হৃদয়ের অপরূপ
বাহ্যে মনোহর। মন-চরিত্রে লেখকের স্বকীয়তা
অপরূপ। এই তরুণ কবির কল-স্বক্যে এমন একটা
আত্মকিতা আছে যে প্রাণের তার সে স্বক্যে
সবন স্পন্দিত হইয়া উঠে। এই কবির ভবিষ্যৎ
উজ্জ্বল, এ কথা আশ্রয় অস্বক্যেতে বলিতে পারি।

চেউ।

শ্রুত বলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।
প্রকাশক, শ্রীপ্রজ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি.এ, যশোহর।
কলিকাতা, বিজয়া প্রেসে মুদ্রিত। মৃগা আট আনা।
এখানিও কবিতা-গ্রন্থ; কয়েকটি পদ্যকবিতার
সংষ্টি। কবিতাগুলিতে ভাব কোথাও বড়-একটা স্পষ্ট
হুটে নাই; কোথাও বা আবার ভাব ও শব্দের
গহনে ভাব উদাস বিপার্য্য হইয়া ছুটিয়া সরিয়াছে!
লেখকের হাত কাঁচা—তবে চর্চ্চা যদিও 'চলন-মহ'
কবিতা ওঁহার হাতে বাহির হইতে পারে বলিয়া মনে
হয়। 'চেউ'র কবিতাগুলিতে চেষ্টা ও কষ্ট-কল্পনার
ছাপটাই সব-চেয়ে চোখে পড়ি। লগট-পেটে
বিজ্ঞানচর্চ্চা ভাঙাব শ্রুত অসুন্দর রায়-বংশধরের
অংশ:সার ঠিকিট আঁটা পাক্য সবচেয়ে আশ্রয় এ
গ্রন্থের অংশ:সার কবিতা পাইলাম না।

ঐসত্যত পর্বা।

কলিকাতা, ২২ কলিকাতা স্ট্রিট, কালিক প্রেসে, শ্রীহরিতরঙ্গ সন্ন্যাসী বাহা মুদ্রিত ও ৩, দ্যাব পার্ক, বাল্লভ হাউস
ঐসত্যতরঙ্গ মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



বেহুলা

ভারতী

৩৯শ বর্ষ]

অগ্রহায়ণ, ১৩২২

[৮ম সংখ্যা

নবাব

বিংশ পরিচ্ছেদ

বিসেলে

তিন সপ্তাহ পরে পল দ্য গেরি টিউনিস চটেতে দেশে ফিরিতেছিল। তিন সপ্তাহ কাল টিউনিসে থাকিয়া সে হেমারলিঙ্ক কর্তৃক অগৃহীত বিপুল বড়বস্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে। সেখানে পৌছিয়াই সে শুনিল, জাঁহ্নলের বিরুদ্ধে গোপনে এক মকদ্দমা রুজু করিয়া বে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তিতে ফৌক দিয়া বসিয়াছে। নবাবের অফিস বন্ধ, জাহাজ ও সম্পত্তিতে শীল পড়িয়াছে—এবং তাঁহার প্রকাণ্ড প্রাসাদের সম্মুখে সতর্ক সশস্ত্র গ্রহরী দিবারাত্রি মোহায়েন রহিয়াছে! সমস্ত আয়োজন ঠিক—তধু লুঠের জন্য ভাগ করিয়া লইতেই বাকী! ইহারই মধ্যে মাথা পেলাইয়া গেরি বাহিরের টাকাকড়িগুলোকে কোনমতে আদায় করিয়া ক্রত দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিল।

সে এক অক্লান্ত শ্রম, বিপুল সংগ্রাম! নৈরাজ্য বা অবসান কোনটিকেই গেরি যুদ্ধের জয় আনোল দিল না! হেমারলিঙ্কের কাঁস কাটাইয়া নবাবের পাওনা টাকার কতক উত্তুল করিয়া গেরি টিউনিসে যুদ্ধকালও আর অপেক্ষা কল্প সমত ভাবিল না। কে জানে, বাস্তব বের হকুমে এখনই এ টাকা হরত পথেই বাজেয়াপ্ত হইতে পারে! ইহার উপর সে টেলিগ্রাম পাইয়াছিল, পারিতে নবাবের নির্দোষ নাকচ হইয়া গিয়াছে! এ সংবাদ টিউনিসেও রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। গেরি তখন কত আশিষা একথানা ইতালী-গামী জাহাজে টিকিট কিনিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল। সে দললক্ষ টাকা আদায় করিয়াছিল। এই লুঠের বন্দরে আগার পাছে তাহা হারাতে হয়, এই ভয়ে ক্ষণে ক্ষণে তাহার বোম্বাক হইতেছিল।

সকালে জাহাজ চাড়িল। গেরি এখন

ডেকে বলিয়া দেখিল, টিউনিসের খেত
অট্টালিকাগুলি আহারের পক্ষান্তে ক্রমে
অসুস্থ হইয়া গেল, তখন সে হাঁক ছাড়িয়া
বাহিল। ক্রমে আহার আসিয়া কেনোয়ার
বন্দরে নোঙ্গর ফেলিল। গেরির বুকেটা
একবার ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কি জানি,
টিউনিস হইতে যদি কোন টেলিগ্রাম আসিয়া
থাকে এবং সেই টেলিগ্রাম পাঠিয়া ইতালীর
পুলিশ যদি কাহাজে উঠিয়া তাহার সন্ধান
করে? কিন্তু না,—কেহই তাহার কোন
সন্ধান করিল না। পল আহার হইতে
নামিয়া ট্রেনে উঠিল। এট ট্রেন বরাবর
সমুদ্রতীর দিয়া মার্শেল যাইবে।

পথে কিন্তু এক বিপদ ঘটিল। সাভোনা-
ট্রেনে একজন বিগড়াইল। দশ-বারো ঘণ্টা
এখানে এখন অপেক্ষা করিতে হইবে।
রিশিফ-এক্সিন না আসিলে ট্রেনের আর
নড়িবার সামর্থ্য নাই।

তখন আহার সকাল হইয়াছে। বিলম্বে
বিরক্ত হইয়া গেরি ট্রেন হইতে নামিয়া
পড়িল। কোথার গিয়া এখন এট সমস্ট্রু-
কাটানো যায়! লোকচকুর সম্মুখে থাকিতে
কিছুতেই তাহার মন সরিতে ছিল না।
বেচারা জাঁহুলের কথাই সর্ব্বোপরে
তাহার মনে হইল। তাহার ইচ্ছা, তাহার
সম্মত—সব যে এট টাকার উপর নির্ভর
করিতেছে! আর আগুন,—তাহার
প্রাণাধিকার আগুন! সে যে গেরির পথ
চাহিয়াই বলিয়া আছে! কিন্তু উপায়
নাই—দশ-বারো ঘণ্টা এখানে পড়িয়া
থাকিতেই হইবে!

গেরি তখন একথানা গাড়ী ভাড়া করিয়া

নাইস লাইবার সড়ক
করিল।

চারিধার তরুণ স্বর্ঘ্য-কিরণে ঝলমল
করিতেছিল—সেই নিম্ন মৌসুমে যান করিয়া
তরুণতা অপূর্ণ শ্রীতে সারিয়া উঠিয়াছিল।
দূরে-অদূরে অনতি-উচ্চ গিরিমালা মৌল
আকাশের দিকে অসংখ্য শৃঙ্গ-বাহু জুলিয়া
আনন্দে বেন তাহারে অভিমান করিতেছিল।
পথের দুইপার্শ্বে সবুজ লম্পে মণ্ডিত কুমি
অঙ্গে স্বর্ঘ্য-কিরণ মাখিয়া সবুজ ডেলডেটের
মুতই পড়িয়া ছিল। চারিদিকে সমস্তই
সজ্জিত, হ্রস্ব! গেরির অপান্ত চিত্ত সে
দৃশ্যে মুগ্ধ হইল!

গেরির গাড়ী আসিয়া পর্ত-প্রান্তে অব-
স্থিত ব্রেগট হোটেলের সম্মুখে থামিল। গেরি
হোটেলে ছুটিতেই সম্মুখে দেখিল, প্রকাণ্ড
একটা কুকুর! কাছুর, না—ফেলিসিয়ার
কুকুর? দেখিতে হুবহু কাছুরের মতই।

গেরি আসিয়া আপনাদ নিশ্চিন্ত কক্ষে
প্রবেশ করিল। পোষাক ছাড়িয়া হাত-মুখ
ধুইয়া সে খোলা জানালায় সম্মুখে দাঁড়াইল।
পাহাড়ের গারে ছোট ছোট গাছগুলি চকন
শিশুর মতই বায়ুর সহিত লীলা-রমে মাতিয়া
খেলা করিতেছে। হঠাৎ পাশের ঘরে কাহার
ধর শুনা গেল! এ কি স্বপ্ন! গেরি চমকিয়া
উঠিল। না, ভুল হইয়াছে, নিশ্চয় ভুল। এ
পৃথিবীতে দুইজনের কর্তব্যেরে এতখানি মিল
থাকিতেই পারে না। নিম্ন বায়ুস্পর্শে গেরির
সকল ক্রান্তি যুটিয়া গিয়াছিল—তাহার
তন্ত্রাণোথ হইতেছিল। গেরি আসিয়া বিছানায়
তটয়া পড়িল। নিজা আসিয়া নিম্নে তাহার
স্রাত শিরে হাত দুলাইয়া দিল; গেরি ঘুমাইল।

ঘুমাটয়া সে স্বপ্ন দেখিল,—বিচিত্র, মধুর সে স্বপ্ন !

—আগিনের সত্বে যেন সে মধু-বাসর-বাগনে যাত্রা করিয়াছে। হৃন্দরী বধু! উজ্জ্বল চকু, প্রেম ও নিশ্বাসে ভরা আলিনের নৃষ্টি তাহারই মুখের উপর বির-নিবদ্ধ! আর এই হোটেলেরই অপর প্রান্তের ঘরে সে ছিল—ফেলিসিয়া! তাহার উজ্জ্বল শুভ্র রেশমী পোষাক—ভাণ্ডালেটের গন্ধে ভরপুর! অদূরে ফেলিসিয়ার অস্তিত্ব সে স্পষ্ট অনুভব করিতেছিল।

আবেগে গেরি আলিনকে চুম্বন করিল। আলিন চমকিয়া সরিয়া গেল। তাহার মুখে নিবেদে করুণ বিবাদের এমন একটা ছায়া পড়িল যে তাহা দেখিয়া গেরির 'প্রাণ আর্জ হইল। গেরি সাবধে আলিনকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। আলিন তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া মৃদু কল্পিত স্বরে কহিল, “ফেলিসিয়া রয়েছে—তুমি আমার আর ভালো বাসবে না।” হাসিয়া গেরি কহিল, “কে বললে, ফেলিসিয়া এখানে আছে?” আলিন সহসা মুখ তুলিয়া সত্যের কহিয়া উঠিল, “হ্যাঁ, সে আছে ঐ বে—ঐ বে সে—” আলিন পাখের ঘরের দিকে অঙ্গুলি দেখাইল। অমনি গেরি ভুলিল, ফেলিসিয়ার স্বর! স্পষ্ট! ফেলিসিয়া হাঁকিতেছে, “কাছুর—কাছুর—”

চমকিয়া গেরি আগিয়া উঠিল। চোখ মুছিয়া সে দেখে, ঘরে সে একা! কোথায় আলিন! কোথায় সে প্রেমের লীলা-রঙ্গ! কিন্তু এবার সে স্পষ্ট ভুলিল, পাখের ঘরে একটা কুছুর ডাকিতেছে।

গেরি বিছানার পড়িয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিল। পাখের ঘরে কে, করাঘাত করিল। পরমুহুর্বেই গেরি মাথুঘের কঠ ভুলিল, “দোর খোল গো—আমি এসেছি—আমি জেক্সিস।”

এ কি সত্য—না, এখনও সে স্বপ্ন দেখিতেছে? না, এ'ত স্বপ্ন নয়! ঐ বে জানালায় বাহিরে পাখড় দেখা যায়। ঘরে রৌত্র-কিরণের চেউ উৎখারি উঠিয়াছে—আর এই ত সে জাগিয়া আছে! তবে—তবে!

গেরি বিছানার উঠিয়া বসিল। সত্যই কি তবে ফেলিসিয়া এখানে আছে? আর সেই পাশিষ্ট জেক্সিসটাও এখানে আসিয়া ছুটিয়াছে! পাখের ঘরে বার পোনার শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরুষ কঠের পরিচিত স্বর—“কেমন, এবার তোমার খুঁজে বার করেছি ত!”

না, কোন ভুল নাই। সে নাম না বলিলেও শুধু স্বর ভুলিয়াই গেরি ঠিক বৃত্তিত, এ আর কেহ নহে, জেক্সিস! এমন পুরুষ কর্কশ স্বর আর কাহারও থাকিতে পারে না।

জেক্সিস কহিল, “তোমার আঙ্গ পেয়েছি, তা হলে। আট দিন ধরে তোমার খুঁজে বেড়াছি—কেনোরা থেকে নাইসের মধ্যে ভ্রম ভ্রম করে তোমার সন্ধান করেছি। আমি জানি, তুমি এখনও বোরখে পড়নি। বের বজরা এখনও বন্দরে বাঁধা রয়েছে! সমুদ্রের ধারে সমস্ত হোটেল খোঁজ করেছি! ব্রোটারের কথা আজ মনে পড়ল। ভাব-লুম, হয়ত তাহলে এখানে আছি। এসে

বোঝ নিলুম—ঠিক। এখানেই তুমি আচ, তাহলে! জ্ঞাঃ—”

কিন্তু এ কাহাৰ সহিত জেঙ্কিন্স কথা কহিতেছে। কৈ, কেহ উত্তর দিল না। ত! তবে—তবে—না, ঐ যে কে উত্তর দেয়! বড় কোমল মুঠ কঠ! উত্তর হইল, “হাঁ, এখানে আছি। কিন্তু তাতে কি হয়েছে, জনি—”

গেরি উঠিয়া বেগমালে কাণ পাতিয়া ঠাড়াইল। তাহার বুকের মধ্যে একটা দাচন অস্তিত্ব সাড়া দিয়া উঠিয়াছিল— তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। জেঙ্কিন্স কহিল, “আমি এসেছি, তোমার আটকে রাখতে। টিউনিসে তোমার যেতে দেব না।”

“টিউনিসে আমার কাজ আছে। আমি সেখানে যাবই।” না, কোন জুল নাই। এ বর ফেলিসিয়ায়ই বসে!

জেঙ্কিন্স কহিল, “কিন্তু তুমি বুঝছ না—ফেলি, শোন—”

—“কোন দরকার নেট, শোনবার। আমি নিজে যা ভাল বুঝব, করব। তুমি আমার অতিভাবক নও যে আমার উপদেশ দিতে আসবে! আমি অবাধ হজি, তোমার এ আশ্পর্কী দেখে! এ অনধিকার চর্চা কেন! তোমার উপদেশের মূল্য কেনো—ঐ কুকুরটার চাঁৎকারের মতই আমি অর্থাহীন, সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করি।”

“বোঝ, ফেলিসিয়া, তোমার এই রূপ, এই বয়স! টিউনিস তোমার পক্ষে এমন অবস্থার মোটেই নিরাপদ জায়গা নয়। বিশেষ তুমি একা—”

—“পারিতোও ত আমি এক। ছিলাম। তা ছাড়া আমি কনফীকে নিয়ে যাকি—।”

—“তুধু কনফীকে নয়—আমাকেও তাহলে সঙ্গে নিতে হয়।”

—“তোমাকে?” ফেলিসিয়া বিজ্ঞপের হাসি হাসিল, পরে কহিল, “আর তোমার পারিকে—তোমার মজ্জাগদের—তোমার স্তম্ভ্য সমাজটি—তাদেরও সঙ্গে নিতে হবে, কি বল? তুমি পাগল।”

—“যাই বল, ফেলিসিয়া, তুমি যেখানেই যাও না কেন, আমি তোমার সঙ্গে যাবই—এ আমার প্রতিজ্ঞা।”

তাহার পর মুহূর্তের লজ্জা উভয়েই শুরু রহিল। পল ভাবিল, এ ভাবে লুকাইয়া এ সঁকল কথাবার্তা শুনা তাহার পক্ষে উচিত হইতেছে না! কিন্তু এখানে তাহার অদম্য কৌতুহল জাগিতেছিল। যদি নূতন তথ্য কিছু সংগ্রহ হয়! ক্রান্তিতে পা তাহার লড়াইয়া আসিতেছিল—ঠাড়াইয়া থাকিতে কষ্ট বোধ হয়। তবুও পারির সত্য সম্ভ্রান্ত সমাজের যে চূড়ান্ত প্রেহেলিকা ধীরে ধীরে আজ আপনার বড় ফাঁদের স্তম্ভাগুলিকে জোটে খুলিয়া মুক্ত করিয়া ধরিতেছিল, তাহার ঘটখানি বুঝিতে পারা যায়—তুধু এই জালায় পল কিছুতেই আপনাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। সেই লজ্জাই কোন মতে সে নিশ্বাস রোধ করিয়াও স্থির জড়পুস্তকের মতই বেগমালে কান পাতিয়া সেই স্থানে ঠাড়াইয়া রহিল।

ফেলিসিয়া কহিল, “বোঝে কথা থাক্ জেঙ্কিন্স—তুমি চাও কি?”

—“আমি তোমার চাই, ফেলিসিয়া।”

—“জেন্সিস—” সে বর ভীত, পুরুষ।

—“হী, আমি শুধু তোমায় চাই, ফেলিসিয়া। এ কথা আমার মুখে উচ্চারণ করতে তুমি খারজ করেছ—কিন্তু অল্প অনেকে তোমার কাছে এত কথা বলেছে—তখন তুমি বিরক্ত হওনি—কাজেই আমি আবার এ কথা বলছি। আমার কঁধাই বা তুমি রাখবে না, কেন, ফেলিসিয়া?”

পাশের ঘরে মুহূর্তে যেন বাজ হাঁকিল। ফেলিসিয়া ভীত দীপ্ত বরে কহিল, “সাবধান হয়ে কথা বলো, জেন্সিস, আমার মর্যাদার আঘাত করো না। বতাই তোমার শক্তি থাকুক না কেন,—তবু জেনো, আমিও একেবারে দুর্বল নই। এ দৃষ্টতার শাস্তি আমি দিতে জানি—”

গদগদ কণ্ঠে জেন্সিস কহিল, “কেন এত রাগ করছ, ফেলিসিয়া? আমি তোমায় ভালবাসি—চিরকাল ভাল বেসেছি—। কেন, তুমি নির্ভর হচ্ছ? তুমি বিচার করে দেখ, তোমার ভালবাসি বলে—”

“আমার ভালবাসি!” ফেলিসিয়া বিজ্ঞপের বরে কহিল, “ভালবাস, জেন্সিস? তোমার মর্জি হয়, আমার ভালবাসতে পার। কিন্তু জেনো, আমারও মর্জি, আমি তোমার যুগা করি। এত যুগা মাছই হইত পণ্ডকেও করতে পারে না! আমার বত কিছু বিশ্বাস শক্তি সে সমস্ত তোমারই লজ্জা আজ ধূলায় লুটিয়ে গেছে! আমার সমস্ত জীবনটা তোমারই নিখাসে জলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমার নারীত্ব তোমারই স্পর্শে কলঙ্কিত অপমানিত হয়েছে! তুমিই আমাকে আমার মর্যাদার আসন থেকে টেনে এনে মাটিতে

লুটিয়ে দেছ। তোমার সঙ্গ-হৃৎয়ের চেয়ে আমি যে কোন অমর্যাদা যে কোন কীমতাকে আজ মাথায় তুলে নিতে পারি। পারি সমাজের বত কিছু ভাব, নিখ্যা, জানি মাথায় তুলে নিরেছি—নিরে নিরে অস্তিত্ব হারিয়েছি—সে সব শুধু তোমারই কৃপায়! আর কেউ তোমার চিনতে না পারে, কিন্তু আমি তোমায় চিনি—একটা ভক্ত, স্বার্থপর, পাণ্ডিত্য, নির্লজ্জ কাপুরুষ—পারি সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত পাপের কুৎসিত ঐতিমুষ্টি—তুমি এসেছ, আমার কাছে ভালবাসা জানিয়ে আমার ছন্দ অধিকার করতে—”

ক্রোধে ফেলিসিয়ার মুখে বর আবহা হইল না। সে রাগে হুঁসিতে লাগিল।

জেন্সিস কহিল, “তুমি এ সব কি বলছ, ফেলিসিয়া? যদি তুমি জানতে, তোমার এ রাগে আমার বুক কতখানি জলে যাচ্ছে! দ্বারে গড়ে আমার এমন অমাহুয হতে হয়েছিল, ফেলিসিয়া! কি বিপুল বিষের বিকছে গাড়িরে আমার দিন কাটাতে হয়েছিল, তা যদি তুমি জানতে! তবুও একমাত্র তোমাকেই আমি চিরদিন ভাল বেসেছি! তোমার ক্রোধ, তোমার বিজ্ঞপ, তোমার অপমান—কিছুতেই আমার এ ভালবাসা কম পড়েনি। সেই ভালবাসার বলেই আমার সাহস আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ আছে—না হলে তোমার কাছে যে সমস্ত আমার আজ সাহস হত না, ফেলিসিয়া। আজ আর কোন দিকে আমার লক্ষ্য নেই—কোন বিষয়ে স্পৃহা নেই। আমি সব ত্যাগ করতে পারি—ত্যাগ করেছি—কিন্তু

তোমার আশা ত্যাগ কবতে পারব না।
ফেলিসিয়া তুমি আমার বিয়ে কর।”

“বিয়ে!”

“হাঁ, বিয়ে।”

“আর তোমার স্ত্রী?”

“সে মারা গেছে।”

“মারা গেছে? মাসাম জেফ্রিস মারা
গেছে! এ কথা সত্য?”

“তুমি আমার স্ত্রীকে জানতে না,
ফেলিসিয়া। যাকে জানতে, সে আমার
স্ত্রী নয়। তার সঙ্গে যখন আমার দেখা
হয়, তখন আমার স্ত্রী যে ছিল, সে বেঁচে,
আয়ালীও পাঁকত। এর সঙ্গে জানাশোনা
হবার ঢেব আগেই আমার গলায় দড়ি
পড়েছিল। তখন আমার বয়স পঁচিশ
বৎসর, আয়ালীও আমি ডাক্তারি পড়ছিলাম।
অবস্থা খারাপ—পড়ার খরচ চলত না।
সেই সময় এই বিয়ে হয়। তার নাম
ছিল, মিস্ ট্র্যাগ। বেনার তখন আমার
মাঝের চুল অবধি বিকোবার বো। এই মিস্
ট্র্যাগের ভাইয়ের কাছে পাঁচশ পাউণ্ড ধার
জমে গেছিল। সে আমার জেলে পাঠাবার
উদ্ভোগ করে ছিল, কাজেই সেই জেল
আর দেনা দুয়েরই হাত এড়াতে তার
বেতো-রোগী বোন মিস্ ট্র্যাগকে বিবাহ
করি তেবেছিলুম, কালে তাদের
সম্পত্তিরও মালিক হব। কিন্তু মাহুঘ
জাবে এক, হয় আর! সম্পত্তি পাওয়া ঘুরে
থাক, সেই বেতো স্ত্রী ক্রমে এক ভাঙ্গ হয়ে
দাঁড়াল। তার কড়া তদারক আর কড়া
যেকালের জালায় আয়ালীও ছেড়ে পারিতে
এলুম, ভাগ্যাবেশের চেষ্টায়। চারিদিকে

বিশ্বের আর পুণ-কিনারা দেখা যাক্ছিল না,
তাতে মাহুঘকে একটু হুঃসাহসিক ভাবে হয়—
সেই হুঃসাহসে ভর করে পারতে এসে মাশা
তুললুম। নারিত্রোর সঙ্গে যুক্ত মাহুঘের উপর
আমার প্রবল ঘৃণা জন্মেছিল। সেই ঘৃণার
বিষে জর্জরিত হয়ে চারিদিকে শুধু বিষই
ছড়িয়েছি। মান ইচ্ছা টাকা লখই হু হাতে
ছড়িয়ে বেড়িয়েছি! কিন্তু কোন দিন শান্তি
পাইনি। তাই শেষ সে-সব ছেড়ে দিয়েছি।
স্ত্রীর সে ভাইটা নিঃশব্দ হয়ে মারা গেলে
বেতো স্ত্রীকে পাগলা গারমে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত
* হয়ে। আজ আমি আমার মুক্ত,
বাধীন—”

“মুক্ত, বাধীন! ঠিক বলেছ, জেফ্রিস।
তবে যে তোমার স্ত্রী না হয়েও স্ত্রীর
অধিক তোমার অঙ্গুষ্ঠা, দানীর মত
পড়েছিল, তাকে কেন বিয়ে কর না?”

“না, আর নয়। সেও এক কয়েদ! অত
মিনমিনে ভাব, অত অসুখাগ, তাও আমার
অসহ্য বোধ হয়। তা ছাড়া তাকে ঘরে
এনে রাখলেও যেদিন তোমার দেখেছি,
মন আমার সেই দিন থেকে তোমারই
পিছনে ছুটে বেড়িয়েছে—মন শুধু তোমাকেই
চায়। তার সঙ্গে আমার সব দেনা-পাওনা
চুকিয়ে ফেলেছি।”

“হঠাৎ এমন সর্বস্বত্যাগী হলে যে!”

“পারি, সমাজ—সব ত্যাগ করেছে।
সেখানে শান্তি নেই, সুখ নেই—”

“পারিতে আর কিরণে না?”

“না। এখন শুধু তোমার সঙ্গ-সুখের
প্রার্থী আমি। সব ত্যাগ করে আমি
তোমার বাসায় গেলুম। গিয়ে দেখলুম,

নাড়ী খালি পড়ে আছে—গায়ে টিকিট খাঁটা, “বাড়ী গাড়া।” তখন আমার মাথার মধ্যে রক্ত চন্‌চন্‌ করে উঠল। পানী উড়ে পালিয়েছে! তুমি পারি ছেড়ে আমার সেখানে আমার আর স্থান নেই—আমিও তাই পারি ছাড়লুম। তুমি তোমার ঘর-বাড়ী বেচে ফেলেছ, আমিও আমার ঘরবাড়ী বেচে এসেছি।”

“আর সে? সেই সাধ্বী, সেই অসুগতা নারী যে তোমার স্ত্রী না হলেও লক্ষ স্ত্রীর চেয়ে তোমার ভালবাসত, তোমার স্বপ্নের অঙ্গ নিয়ে এরা দিতেও যে কুণ্ঠিত নয়—সেই নারীকে তুমি পথে বসিয়ে এসেছ! চমৎকার কাজ করেছ, জেফ্রিস, চমৎকার কাজ! আজ তার সেই পরিত্যক্ত মহাবল্য আসনে আমার বসাবার অঙ্গ তুমি অল্পরোধ করতে এসেছ! স্বার্থপর কাপুরুষ—” কথাটা বলিয়া ফেলিসিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

জেফ্রিস বক্রণ করে কহিল, “আর আমার লজ্জা দিও না, ফেলিসিয়া। তাকেও যে আমি ত্যাগ করেছি, সে তোমারই অঙ্গ। আজ আমি সর্বত্র ত্যাগ করে এসেছি, শুধু তোমারই আশ্রয়। আমার এ অবস্থার তুমি আমার ডাকিয়ে দিও না—নিষ্ঠুর হও না। আমার দয়া কর।”

“দয়ার আশা মনেও স্থান দিও না, জেফ্রিস। এত বড় নিষ্ঠুর কাপুরুষের হাতে আপনাকে আমি সঁপে দেন, এমন পরিচয় পাবার পরও? তা হয় না, জেফ্রিস, তা অসম্ভব!”

জেফ্রিস তখন জুমির উপর নতজাহ্ন

হইয়া বসিল, বক্রণ আবেগনের দৃষ্টিতে ফেলিসিয়ার পানে চাহিয়া রহিল।

ফেলিসিয়া কহিল, “এ আশা ত্যাগ কর, জেফ্রিস। তুমি অসম্ভব কামনা করছ। আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোথাও কিছু রাখা-টাকা নেই। বিশেষ এ-সব কথার পর তোমাকে মুহূর্তের অঙ্গও আমি বিশ্বাস করতে পারব না। তা ছাড়া আরও শোন, জেফ্রিস, আমার চরিত্রও নিষ্কলঙ্ক নয়—আমি মোরার রক্ষিতা ছিলাম।”

পল চমকিয়া উঠিল। এ সন্দেহ অত্যাধিক তাহার মনে উঁকি দিত। তবুও সেই কষ্ট হইতে এমন পরিষ্কার অকল্পিত স্বীকৃতি সে কোন দিনই আশা করে নাই! পৃথিবীর সমস্ত আগো নিমেষে যেন তাহার চোখের সম্মুখে নিবিয়া গেল। এই নারী— এই জনর লইয়া এমন নিষ্ঠুর খেলা গেলিয়া আসিয়াছে!

জেফ্রিস মুহূর্ত নীরব থাকিয়া উত্তর দিল, “আমি তা জানি। তুমি, তাকে যে সব চিঠি লিখেছিলে, তার কতক আমার হাতে পড়েছে।”

“আমার চিঠি!”

“হ্যাঁ, তোমার চিঠি—এই সে চিঠি। নাও, আমি এ চিঠি তোমার কিরিয়ে দিলাম। নাও। ও চিঠি অনেকবার করে আমি পড়েছি, আমার লগ সুখস্থ হয়ে গেছে। এ চিঠির কথা মনে হলে আমার বড় কষ্ট হয়! কিন্তু জীবনে এর চেয়েও ঢের বড় বড় কষ্ট আমি সহ্য করেছি! ওঃ, কত পাল’ ডিউককে আমি খাইয়েছি। যত খেয়েছে, তত চেয়েছে। এই পাল’ই তার

মৃত্যুকে আরও এগিয়ে এনেছিল! বড়
আলা আমি পেয়েছিলাম, ফেলিসিয়া। অলে
পালের মাতা বাড়িরে তাকেও আরও
আনিরেছি! তবুও সে চেয়েছে। আমিও তার
মুখে ধরে দিয়ে মনে মনে বলেছি, —আরও
অন্তে চাও, তুমি? নাও, পেয়ে অলো—”

* * *

পল সত্যে সবিদ্যা আসিল। আর
না—এত বড় পানের কথা ঐশ্বর্য ধরিল
কানে শুনাও যায় না! সে আর শুনিবে না!

সহসা তাহার দ্বারে করাঘাত হইল—
“গাড়ী হাজির—”

পল তাহার পোটমাস্টোটা তুলিয়া লইয়া
দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। পালের ঘর

তখন নিশ্চয় হইরাছে। তাহারও মুখে কোন
কথা নাই। পল দ্রুত হোটেল হইতে
বাহির হইয়া গেল।

গাড়ী ছাড়িলে পল আপনার আবার
পকেট হইতে শেলিলে আঁকা একখানি
ছবি বাহির করিল। হুসর মূগ, উজ্জল
চোখ! সে চোখে অথও বিশ্বাস—অপূর্ণ
অনুভব অন্বেষণ করিতেছে। পল দ্বির
দৃষ্টিতে সে ছবির পানে চাহিয়া রহিল,
পবে পরিপূর্ণ আবেগে ছবিখানাতে অল্প
চুপন বর্ণন করিয়া সেখানাকে সে বৃক চাপিয়া
ধরিল। তাহার প্রাণের আলা মুহূর্তে
যেন জুড়াইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীমদৌরোক্তমোহন যুগোপাধ্যায়।

সরসী

কি শোভা খেলিছে ঘোর অঙ্গে অঙ্গে লহরে লহরে !

কোটা রতনের ধনি, নাহি যায় অন্ত ও অবধি,

আমি নহি ফেনময় কণাময় সে নীল জলধি ;

শাখা-বাহু প্রসারিণী, আলিঙ্গিতে জীবন সাগরে

উজ্জ্বল গতি বার, আমি নহি সে কুম্ভা নদী

কল কল ছল ছল করি আমি ক্ষুদ্র গরিসরে ;

জল মম বিহীন-শৈবাল-রাশি ! ভ্রমরে ভ্রমরে

লীলাহিত, হের বক্ষে লত পল্ল, কুমুদী শারদী !

কবিত্তকুণ্ডলনে আমি ক্ষুদ্র সনেট-সরসী !

হের হেব, লাল নীল খেত পীত ভাবের লক্ষ্মী ,

উজ্জল উজ্জল নাচে অঙ্গে মম দিবস-লক্ষ্মী !

এ কি লহরীর লীলা !—ওই হের হাসে পূর্ণলগ্নী

এক। শূন্য ; কিন্তু মোর অপরূপ খঞ্জে শুভ্রলগ্নে

চতুর্দশ রাক। টান !—হেন টান আছে কি ভূতলে ?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

অতৃপ্তি

একটা গান কেবলই ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে আসে—

আমার সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল,
সকলি হুয়ায়ে যায়, যা!

কি করণ, কি হতাপ, হতভাগ্যের আক্ষেপ! সংসারও আবার এমন স্থান যে যদি এতোক লোককে পরীক্ষা করা যায়, বা বিশেষভাবে চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে দে'পব, এতোকেরই 'একটা না একটা বা একাধিক আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকিবে তাহাকে বেননা দিচ্ছে। এই অতৃপ্তিই যখন অত্যন্ত বেননাধারক হইয়া উঠে, তখনই আকুল ক্রন্দনে স্বতঃই তাহা বাহির হইয়া আসে।

তবে এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা সকলেরই একরূপ নহে। কাহারও হয় ত অর্থ, কাহারও স্ত্রী, কাহারও পুত্র, কাহারও বশ লইয়া; কাহারও আকাঙ্ক্ষা পবিত্র, কাহারও বা অপবিত্র। কেহ চায় আত্মতৃপ্তি, স্বার্থ, কেহ চায় পরোপকার, পরার্থ। কিন্তু সংসার বেকরূপ নথর, সেইরূপ অসম্পূর্ণ; সম্পূর্ণ তৃপ্তিও কোথাও নাই; সাময়িক তৃপ্তিমাত্র দেখিতে পাট। - অথবা তাহাকে সাময়িক তৃপ্তি না বলিয়া "সাময়িক অবসাদ" বলা উচিত। এই সাময়িক অবসাদের অবগানে আবার অতৃপ্তির উদ্রেক ও কট।

তাই গীতাতে দেখি—

যে হি সম্পর্কিতা ভোগা হুঃখ্যোনম এব তে।

আত্মসংস্রঃ কোত্তেজ ন তেজুঃ সমতে বুধঃ ৪ ৪৩২

আমাদের সংসারে আমরা যত প্রকার আনন্দ জানি, তাহার সবগুলিই সম্পূর্ণ। রসনার সহিত স্পর্শ হইলেই ত্রব্যের সম্পূর্ণ চটলেট স্বপ্ন, প্রবোধিত্রয়ের সহিত স্বপ্নের সুমধুর সঙ্গীতের সম্পূর্ণ চটলেট আনন্দিত হট। কিন্তু এই প্রকার স্বপ্ন বাহ্যনীর নহে। কারণ তাহাদের উৎপত্তি ভ্রমে। এট সকল স্বপ্নের প্রত্যাবল্লিত যে অহুত্ব, তাহা অতীব ভ্রমকর। কালেই দেখিতেছি, তাহাদের উৎপত্তি প্রারম্ভ ভ্রমে। আবার যাহার আরম্ভ আছে, তাহার শেষও আছে। সংসারের নিরমই এই। এট ভ্রম আবার শেষেও ভ্রমে প্রবোধিত্র্যের ভ্রম। স্বপ্নটা শেষ হইয়া গেল, আর তাহা ভোগ করিতে পাটতেছি না! এইরূপে যে স্বপ্নের আদি আছে, অস্ত আছে—বাহার আদিতে ভ্রমে, ইচ্ছার উদ্রেক অবধি,—যাহার অস্তে ভ্রমে, স্বপ্নটা শেষ হইয়া অবধি, বোধ হয় মৃত্যু পর্যন্ত,—এমন ভ্রমে এমন স্বপ্নে পত্তিতগণ যুগ চন না। ইহাই গীতার একটি প্রোট উপদেশ।

তাই প্রায়ই দেখিতে পাট, লোকে কোন একটি আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া অত্যন্ত আকুল হইয়া পড়িয়াছে; অত্যন্ত ছুটাছুটি, পরিশ্রম, কলহ করিতেছে। আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইতেছে না বলিয়া স্বীয় পুরুষকার, দৈব, ভগবান, এতোকে, একের পর এককে আহ্বান করিতেছে এবং সফলকাম বা সম্পূর্ণ সফলকাম হইতে

পারিতেছে না বলিয়া অশেষ মনের গুণে কালখাপন করিতেছে। কিন্তু হরত একদিন তাহার আকাজ্ঞা পূর্ণ হইল, অথবা সে জাবিল যে, তাহার আকাজ্ঞা পূর্ণ হটল, অমনি তাহার মূখে হাসির বেগা ফুটিল। তাহার ললাট কৃত্রিম অশান্ত ভাব পরিভাগ করিয়া প্রসন্ন ভাব ধারণ করিল। তাহার শরীর আর বিহ্বল বেদনাক্রান্ত বা আকুল সন্ধাননে বাত্ন নহে, এখন তাহা বেশ শান্ত, স্থব্ধ।

কিন্তু আবার শীঘ্রই চাকল্যের লক্ষণ দেখা দেয়। এবারের চাকল্য ঠিক যে অতৃপ্তির তাহা নহে। এবারকার চাকল্য দীর্ঘ সৈমিত, আজ এত নিকট,—তৃপ্তির মূখ চাহিয়া। এই তৃপ্তি, যাহার অস্ত সে কত আকুল হইয়া বেড়াইয়াছে, কত খাটিয়াছে, কত প্রার্থনা করিয়াছে, ইহার অস্ত কত পবিত্র, কত অপবিত্র চিন্তার মন পরিপূর্ণ করিয়াছে, সে আজ এত নিকট, ইহারই অস্ত, এই চাকল্য। পরে যখন সেই আকাজ্ঞা মুক্তি পরিগ্রহ করিয়া নিকটগর্তী হয়, তখন তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিবার অস্ত চাকল্য আরও তীব্র হইয়া উঠে। তখন এই স্থব্ধ বস্ত গভীরভাবে বস্ত অধিক কাল ধরিয়া ভোগ করা যায়, সেই চিন্তা, সেই চেষ্টা তাহাকে তত অহুপ্রাণিত করে। এই নূতন চাকল্যে তাহার ভোগ পরিপূর্ণ হয় এবং যতক্ষণ তাহার সে স্থব্ধ ভোগ শেষ না হয়, ততক্ষণ তাহার ভোগের আনন্দের সঙ্গেই সেই ভোগ শেষ হইবার আকাজ্ঞা তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। তাহার এই যে ভোগ-জনিত আনন্দ

ভাণ্ডার যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ অনিমিত্ত বা সম্পূর্ণ নহে। তাহাতেও আশঙ্কা ভয়, বিবাদের জড়িত রহিয়াছে।

স্থব্ধভোগ বস্ত শেষ হইয়া আসে, ততই এত আশঙ্কা, ভয়, বিবাদের ছায়া ঘনীভূত হইয়া মানব-জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ক্রমে যখন সত্যই স্থব্ধভোগের অবসান হয়, তখন প্রবলসাত্তাবজনিত দুঃখ ও নৈরাশ্র তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে।

এই অস্তই দেখি, সামান্যিক স্থব্ধের প্রথমে দুঃখ, মধ্যে আশঙ্কা-মিশ্রিত স্থব্ধ, শেষে আবার দুঃখ। এই অস্তই স্রীতার সম্পূর্ণজনিত স্থব্ধ-ভোগের বিরুদ্ধে মানবকে সতর্ক হইতে বলা হইয়াছে।

কিন্তু ঠিক দেখিলে দেখিতে পাই যে সংসারের সম্পূর্ণজন আনন্দ ত সবই। হয় শারীরিক, না হয় মানসিক। যাহা শারীরিক তাহাও সকলেই দেখিতে পাই। মানসিক দেখি, মনে কোনও একটি ভাব বা চিন্তার উদ্ভেগে। কিন্তু ইহাশেষও ত আরম্ভ এবং শেষ আছে।

মনে কোন একটি ভাবের উদ্ভেগে আনন্দ হয়। কিন্তু হরত তৎপরেই ভাবান্তরের ষাট-প্রতিবাস্তে আনন্দের স্থলে নিরানন্দের আবির্ভাব দেখিতে পাই। তাহা আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই, প্রত্যহ না হউক, প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

তৃপ্তি কোথাও নাই। তাহার স্থলে একটা সামান্যিক অবসান মাত্র আসিয়া পূর্বাধার অতৃপ্তির হাহাকারকে তীব্রতর

করিয়া দেখায়। বিরতি সাধারণ তৃষ্ণা ক্ষুদ্র মানবের তৃষ্ণাব নিকট হার মানেন।

যদি তর্কের খাতিরে বলি যে, আমরা তৃপ্তি পাই, তাহা হইলেও যে বিশেষ সুবিধার কথা, তাহা নহে। কারণ প্রায়ই দেখিতে পাই যে বাহ্যিক তৃপ্তি বলিয়া তাহার শান্ত ভাবের কীর্জন করি, তাহা তনোভাবপ্রধান, আশস্ত-জনিত ক্ষুদ্রতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কর্ম হইতে, চেষ্টা হইতে বিরতি চাহি বলিয়া তৃপ্ত হইয়াছি, এই ওজরে হাত গুটাটরা বসিয়া থাকি। এই তৃপ্তি আধ্যাত্মিক মৃত্যুরই নামান্তর মাত্র।

অথচ গীতার দেখিতেছি, আশ্রম, "নিত্য তৃপ্ত" হও। এই "নিত্য তৃপ্ত" হইবার চেটার আবার যেন কালনিক তৃপ্তির শান্ত ভাব হইতে হুপ্তি, এবং হুপ্তি হইতে আধ্যাত্মিক মৃত্যুতে গড়াইয়া না পড়ি। তাহা হইলে কি গীতার এই নিত্য তৃপ্ত হইবার উপদেশ মিথ্যা?

আবার উপনিষদে দেখি, "ঋতুমহো পুরুষঃ, অথ জাতুং সুবীত", অধ্যবসায় কর।

কুর্বন্নবেহ কর্মাদি রিজীবিষেদন্তঃ সমাঃ।

এবং যদি নাশ্রবেতহরি নৃকর্ম দিপাতে মরে।

অনবরত কর্ম করিতে করিতে একশত বৎসর বাঁচিতে চাহিবে ইহাই উপদেশ। ইহা ব্যতীত ভোগের আর কিছু করিবার নাই।

বিষম সমস্তার কথা। বিরুদ্ধ দুই মত সমান ভেজে অস্তিত্বজ্ঞ হইতেছে।

আবার যদি অধ্যবসায়ই কলিগাম, তাহাতে লাভ কি?

যদি অতৃপ্তিই মানব-ভাগ্যে স্থিরভাবে লেখা থাকে, তাহা হইলে জানিয়া শুনিয়া অধ্যবসায় করা মূর্খের কাজ। অধ্যবসায় না করিলেও ত অতৃপ্তি ঘুচে না। অধ্যবসায় করিয়াও ঘুচে না। শান্তির মধ্যে পরিভ্রম-জনিত পারাৱিক অবসাদ ও তাহার ফলস্বরূপ আশান্তর, অতৃপ্তি, মানসিক অবসাদ। ইহাই অধ্যবসায়ের সমগ্র ফল।

আবার যদি বলি তৃপ্তি হয়, তাহাতে ত' দেখি যে "তৃপ্তি" কথাটার কোন স্থির অর্থ নাই। কে বা কতটুকুতে তৃপ্ত হয়, তাহারও ঠিক নাই। অসংখ্য হৌনমতি লোকে অন্তরেই তৃপ্ত হয়। তাই বলে—

হৃদ্রা তান্ব কুনদিকা হৃদ্রো বৃদিকান্ধিঃ।

হৃদ্রস্তঃ কাপুধ্যঃ বদকেদাপি জ্বাতিঃ।

আবার দেখি, একজন বাহাতে তৃপ্ত, আর একজন তাহার বিপক্ষে তৃপ্ত, তৃতীয় ব্যক্তি তাহার একশত গুণে তৃপ্ত ইত্যাদি। কিন্তু যে দিন তাহার তৃপ্ত আসে, সেই দিনই (তাহার অধোগতি না হউক) উর্দ্ধগতি বন্ধ হইয়া যায়। একটা বিরতি সম্ভাবনার হঠাৎ কি এক ক্ষুদ্রত্রে পর্যাবসান!

উপনিষৎ এই বিষয় সমস্যার সুন্দর দীর্ঘাংসা করিয়াছেন। উপনিষৎ গন্ত্যের বরে ঘোষণা করিয়াছেন—"যো বৈ ভূমা ভবঃ স্বখং, নাম্নে স্বধমন্তি, ভূমৈব স্বখং...যো বৈ ভূমা তদমৃতং, অথ বদন্তঃ তদ্ব্যতীৎ"। ভূমাই স্বখ, আরে স্বখ নাই, ভূমাই অমৃত, যাহা অল্প, তাহা মরণশীল। ইহা যে অকাটা সত্য, তাহা আমরা জীবনে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। সামান্ত ক্ষুদ্র দীপবর্তিকা অন্ধকারে যথেষ্ট

খুব আনন্দ পাইলাম। কিন্তু সত্য সত্য কতখানি আনন্দ সে পাইয়াছে, তাহা বিচার করিলে দেখা যায় যে, সে পূর্ণ একমাত্রাও মাহুদ-আনন্দ পায় নাই। একমাত্রা মাহুদ-আনন্দ পাইবার পাত্র কিরূপ, তাহা উপ-নিষৎ বলিয়াছেন—তিনি যুগ, অর্থাৎ শারীরিক, ও মানসিক ইন্দ্রিয় শক্তি প্রভৃতি পূর্ণ স্বাস্থ্যে বর্তমান; তিনি সাধু, কারণ যুগও অসাধু হইতে পারে, এবং তাহা হইলে তাহার অশান্তি ও অসুখেরই সম্ভাবনা; তিনি অধ্যায়ক, অধোভবেদ; তিনি আশিষ্ট, অশাস্তম; তিনি দৃঢ়, তিনি বালিষ্ঠ; এইরূপ গুণসম্পন্ন লোকের পক্ষেই এই পৃথিবী সৰ্ব্ব দিতে পূর্ণ, ইনিই একমাত্রা মাহুদ-আনন্দের অধিকারী।

ইহাতেই প্রস্তুত হইয়াছে যে যিনি ইহা অপেক্ষা গুণে যতখানি হীন, তিনি সেইরূপে ততখানি কম মাহুদ-আনন্দ পাইতে পারেন। তাহা হইলে কত কম সংখ্যক লোকে যে একমাত্রা মাহুদ-আনন্দের অধিকারী তাহা আশ্চর্য্য বৃদ্ধিতে পারি। এই একমাত্রা মাহুদ-আনন্দের শতগুণ আনন্দ মাহুদ-গন্ধর্ষদ্বিগের আনন্দ। এই শতগুণ আনন্দও মাহুদ পাইতে পারে। কিন্তু যে সে মনে—যিনি এই আনন্দ আকাজক্ষা করেন, তাহার “জ্ঞানবহত” হওয়া চাই। তিনি যদি “কামবহত” হইয়া ঐ অতি চূর্ণত একমাত্রা মাহুদ-আনন্দে মজিয়া যান, তাহা হইলে আর তাহার উর্দ্ধগতি নাই। তাহার ভাগ্যে ঐ একমাত্রা মাহুদ-আনন্দ বিলিয়া সব শেষ হইয়া গেল; কিন্তু তিনি যদি ঐ একমাত্রা মাহুদ-আনন্দে

না মজিয়া, তাহাতে অতৃপ্ত হইয়া আরও উর্দ্ধগতির জন্য চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহার ক্রমে ঐ প্রথমলক্ষ একমাত্রা মাহুদ আনন্দের শতগুণ যে একমাত্রা মাহুদ-গন্ধর্ষদ্বিগের আনন্দ, তাহা লাভ হইবে। এখানে দেখিতেছি যে অতৃপ্তিই উর্দ্ধগতির মূলীভূত কারণ।

এইরূপে অতৃপ্তি ক্রমে সোপান-পরম্পরার উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতরে মানবকে লইয়া যায়। মাহুদগন্ধর্ষদ্বিগের আনন্দ হইতে দেবগন্ধর্ষদ্বিগের আনন্দে, তাহা হইতে পিতৃলোক-দ্বিগের আনন্দে, তাহা হইতে আত্মানন্দ দেব-দ্বিগের আনন্দে, তাহা হইতে কন্দেবদ্বিগের আনন্দে, তাহা হইতে ইন্দ্রের আনন্দে, তাহা হইতে বৃহস্পতির আনন্দে, তাহা হইতে প্রজাপতির আনন্দে। এইরূপে মাহুদ-আনন্দ হইতে শতগুণ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে প্রজাপতির আনন্দে উপস্থিত হওয়া যায়। ইহার মধ্যে এক আনন্দে উপস্থিত হইয়া তৎপর এবং উর্দ্ধস্থিত আনন্দে বাইতে হইলে, পূর্বলক্ষ আনন্দ যতই লোভনীয় হউক, তাহাকে ভাঙ্চল্যের সহিত ত্যাগ না করিলে উচ্চতর আনন্দ-প্রাপ্তি অসম্ভব।

এখানে দেখিতেছি যে প্রজাপতির আনন্দ চূর্ণত মাহুদ-আনন্দের ১০০০০০০০০০০০০ গুণ। এই আনন্দ যে কত বেশী তাহার ধারণা করা অসম্ভব। কিন্তু ইহার অপেক্ষাও উচ্চতর আনন্দ আছে। এই বিরাট প্রজাপতির আনন্দও তৃপ্ত না হইয়া, যে আরও উচ্চতর আনন্দের চেষ্টা করিলে, তাহার সমুদয় এই আনন্দ

সেই আনন্দ ত্রকের আনন্দ। তাহা প্রকাশিত হইবে আনন্দেরও পতন। আর এ আনন্দের গুণ একগুণ যে এ আনন্দ কেহ পাইলেন—

“ন নিতেতি কুতস্তন (কদাচন)”

“অন্তরং গতো ভবতি।” ইত্যাদি

তাহার কারণ যে মূল হইতে যে ক্ষুদ্র বৃহৎ অগতির গতিব আনন্দের ধারামূহ বহিরা বাইতেছে, সেই আনন্দের মূলকেই সে পাইয়াছে; “রসো ঐ নঃ। রসং হেবাং লক্কাহনন্দো ভবতি।”

কিন্তু এই আনন্দ পাইতেছি না যতক্ষণ না সাক্ষ্য ত্রক সংস্পর্শ হইতেছে। মাহু-আনন্দ হইতে যত উর্দ্ধে উঠিব, ততই ত্রকের আনন্দে নিকট বাইব। উচ্চ হইতে উচ্চতর গোপানে উঠিলেই ক্রমে ব্যবধান কমিতে থাকিবে। কিন্তু যেখানে তৃপ্ত হইব, আমার উর্দ্ধগতি সেইখানেই রুদ্ধ। এমন কি যদি প্রকাশিত আনন্দে গিয়াও তৃপ্ত হই, তাহা হইলে আমার লক্ষ আনন্দ ও ত্রকের আনন্দের মধ্যে ব্যবধান সামান্য হইলেও উচ্চ ত্রকের আনন্দ হইতে আমাকে রুদ্ধভাবে বঞ্চিত থাকিতে হইবে।

এই ত্রক সংস্পর্শ যে কি বস্তু, তাহার কথা কেনোপনিষদে আছে যে, ইন্দ্র অগ্নি ও বায়ু দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহারাষ্ট প্রথমে ত্রকে দেখিয়াছিলেন। আবার এই তিন দেবতার মধ্যে ইন্দ্রই শ্রেষ্ঠতম পদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ তিনিই প্রথম ত্রকে আনিয়াছিলেন।

কিন্তু এই ত্রকের আনন্দপ্রাপ্তির কারণ ত্রক সংস্পর্শ। এখানে আবার এক সমস্যা—সংস্পর্শ। গীতাতে ত সংস্পর্শ দুইভাবে ভাগ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এখানে তবে “সংস্পর্শ” কিরূপ?

একরূপে দেখিতে গেলে “সংস্পর্শ” কথা ব্যবহার-টিক এবং অজ্ঞরূপ ভুল। “সংস্পর্শ” মাত্র হইলে ভুল মত। কারণ সে সংস্পর্শের অবসান হইলেই আবার দুঃখের পুনরুৎপত্তি এবং জ্বলের পর বলিয়া সে দুঃখ তীব্রতর বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

কিন্তু আমরা যে সংস্পর্শের কথা বলিতেছি, তাহা উপলব্ধি-ব্রহ্ম। বাহ্য আছে, এতকাল উপলব্ধি হয় নাই, এবং হইলেই যে সংস্পর্শের ভাব মনে আসে, ইহা তাহাই।

আরও সাধারণতঃ আমরা খণ্ড উপলব্ধি, খণ্ডসংস্পর্শ লইয়াই থাকি। এই সমস্ত খণ্ডসংস্পর্শ ক্রমে ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ যাব। তখন এক খণ্ডসংস্পর্শ তদপেক্ষা বৃহৎ খণ্ডসংস্পর্শে লয় পাইয়া স্বীয় অস্তিত্ব হারায়। এইরূপে যখন বৃহত্তমতে আসিয়া পৌছাই, তখন দেখি—

“অনন্তমানো বদনব্রহ্মণি”

তিনি সকলকে গ্রাস করিয়া আছেন, তাঁহাকে গ্রাস করিতে পারে এমন কেহই নাই। এত সর্বগ্রাসী, যে ইহার জোরায় ভাঁটা নাই। ইহার পরিচ্ছেদ নাই। তাঁহারই কথা—

“ন এবাধিত্বং স উপরিষ্ঠং স পশ্চাৎ স পূর্বাভং স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবং স সর্বমিতি।”

ইনিই সৎ, ইনিই লভ্য, ইনিই সত্য

ইনিই আনন্দ। ইহা বাতীত, যাহা কিছু, এক চুপ কম হটক না কেন, তাহা সং হটতে হীন, তাহা খণ্ড সত্য, তাহা খণ্ড সত্য, তাহা আপেক্ষিক তাহা বেদনাপূর্ণ ও বেদনাপূর্ণ স্মৃতি, তাহা নব্ব ; যতই দীর্ঘস্থায়ী হটক না কেন, অনন্তের হিসাবে তাহা অগম্য, তাহা মিথ্যা, আদ্য আছে, কাল নাই।

যতদিন এই সত্য বাতীত অল্প 'জ্ঞান' আমাদের অধিকার করিয়া থাকিবে, ততদিন আমরা সত্য হটতে বঞ্চিত থাকিব, ততদিন 'মিথ্যা' আমাদের অধিকার করিয়া থাকিবে। ততদিন আমাদের স্বরূপ যে সত্য, তাহা হটতে বঞ্চিত হইয়া নিস্বার্থের বাধনে বাধা পড়িয়া থাকিব। যেদিন এই পূর্ণ সত্যের উপলব্ধি হইবে, সেদিনই এই মিথ্যারূপ ত্যাগ করিয়া সত্যস্বরূপ পাইব ও আমাদের মুক্তি হইবে। তাই ভাগবতে আছে—

“মুক্তিহিতাত্মক রূপঃ পরমেন বাবহিতিঃ।”

কিন্তু এই মুক্তিতে পৌঁছবার মূলীভূত কারণ, অতৃপ্তি। নিরন্তর আনন্দে অতৃপ্ত

হও। উচ্চতর আনন্দের আকাজুক কর। নিরন্তরকে গোপান-স্বরূপ করিয়া উচ্চতরকে উত্তীর্ণ কর। নিরন্তর যেন তোমাকে আকর্ষণ করিয়া বাধিয়া না রাখে। ত্রিশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

“ততোহধিকতরঃ পুরুষার্হঃ প্রাপ্যনপি জ্ঞানপরিণঃ ক তরাহো ভবেৎ। ন কশ্চিৎ তদস্যারম্ভপ্রবর্তী ভবিত্যর্থঃ। ন সর্বো ভাগ্যধূপার্থো যুজ্যতি মোকঃ।”

এইরূপে অতৃপ্তির সাহায্যে যখন সূত্র আনন্দকে তৃষ্ণ করিয়া বৃহৎ হটতে বৃহত্তর আনন্দের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়া বৃহত্তম পূর্ণতমতে গিয়া দেখিব—

পূর্বমমঃ পূর্বমমঃ পূর্বং পূর্বমুদয়ত।

পূর্ণত পূর্ণমধোঃ পূর্ণমেতাবশিষ্যতে।

তখন আনন্দ এত হইবে যে দেখিব,

“আনন্দাচ্ছ্যে যন্তু ইমানি ভূতানি জাগ্রেত, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দঃ প্রসূতি, অতি-সংবিশ্টি।”

অতৃপ্তির চাকল্যের মধ্য দিয়া লাভ হইবে,—অথও অনন্ত তৃপ্তি ও আনন্দ!

ত্রিবিমলাচরণ দেব।

হুনিয়ার পশ্চিমতম নগর

বর্তমান যুগের কৃষিকার্য্য

আধুনিক যুগে কৃষিকার্য্য কলম্বিত নিয়ন্ত্রিত শিল্প-বিশেষ। সাধারণ শিল্প-কারখানার নিয়মেই কৃষিক্ষেত্রের কার্য্য চলিয়া থাকে। ভূমি-করণ হইতে আশ্রয় করিয়া বাজারের খাদ্যাদ্রব্য

ও প্রাকৃতিক উপকরণ সরবরাহ করা পর্য্যন্ত সকল কাষেই উচ্চতম বিজ্ঞানের প্রয়োগ দেখিতে পাই। বিলাতে নিম্নুট-ফ্যাক্টরী দেখিয়া সামান্য সামান্য কার্য্যেও কলকারখানার আধিপত্য বৃদ্ধিতে পারিয়াছিলাম। আমের-

রিকার কৃষিক্ষেত্রেও তাহাই বেশ দেখিতে পাউতেছি। রেল বসিরা ভুট্টাভাজা, মুড়কী, চীনাবাদামভাজা, গুকনা মিষ্ট ভুসুৰ, কোটার সুস্বাদু তাক। আনারস ও নাগপাতি এবং অল্পাংশ বহুবিধ কৃষিজাত দ্রব্য পাউরাছি। মনে চটতেছিল, এট সকল জিনিষ পরিকার করিবার সময় প্রম-লাবণ্যকারী যন্ত্রেব ব্যবহার হইরাছে—পেৰ পৰ্য্যন্ত পুঁরিয়াৰ মধ্যে বাখিবার সময়েও কলেশ সাহায্যই লগতা হইরাছে। পাশ্চাত্যদেশে লোকসংখ্যা অল্প হইলেও প্রকৃত প্রত্যয়ে বেশী—কারণ এক একটা কল বা যন্ত্র বহু ব্যক্তির কার্য সম্পাদন করিতেছে। গাভীতে বসিরা ডানিতেছিলাম—টরাঙ্কিরা কি ক্রমশঃ চীন ও ভারতবর্ষের মুড়িমুড়কীর দোকানগুলিও সঞ্চাল করিয়া ফেলিবে? এ তার নিত্য প্রজ্বলক বলিয়াও মনে হয় না।

প্রদর্শনী-মগরের কয়েকটা সৌধে প্রবেশ করিয়া আধুনিক কৃষিকার্যের চরম নিদর্শন দেখিতে পাইলাম। ফ্রান্সে মনে হইতেছিল—“করাসীরা কৃষিকারী জাতি, কি শিল্পী জাতি, কি ব্যবসায়ী জাতি, তাহা হির করা কঠিন।” ইয়াঙ্কফ্রান্সের পশ্চিম অঞ্চল এবং এই প্রদর্শনী দেখিয়াও ভাবিতেছি—মার্কিনদেশ কৃষিপ্রধান কি শিল্পপ্রধান কি বাণিজ্যপ্রধান তাহার মীমাংসা করা অসম্ভব। এখানে কৃষিসম্পদের চূড়ান্তই দেখিতেছি। ভারতভূমিকে সুকলা সুকলা শতশ্রামলা ধনদাতা পুষ্পে ভরা বিবেচনা করিতে এখন লক্ষ্যবোধ হয়। ভারতের কৃষিসম্পদ লইয়া বর্তমান যুগে আর গৌরব করা চলে না। প্রাচীন এবং মধ্যযুগে এমন কি অষ্টাদশ

শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ বাহাই থাকুক না কেন, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ কৃষিকার্যে হিসাবেও নিতান্তই অবলোম্ব। কাজেই মন-বিশ বৎসরের ভিতর ভারত-বাসীর মুড়িমুড়কী, চিঁড়ে, পেঁ, আম, জাম, পেজুৰ, আলু ও কপিও বিদেশীয়েরা যোগাটেও থাকিবে একপ আশঙ্কা করা পাগলামি বোধ হয় না।

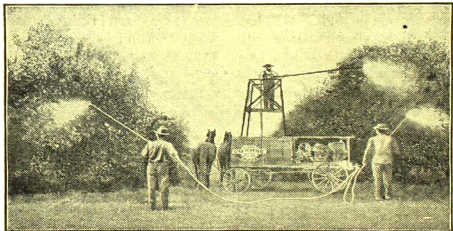
বিগত ৫০।৭৫।১০০ বৎসরের মধ্যে কৃষিকার্যে এবং কৃষিবিজ্ঞানে বহু পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হইরাছে, তাহার পূর্বদর্শী ৫০০০ বৎসরের তত হয় নাই। এই অতিদ্রুত পরিবর্তনের কোনটাতেই ভারত-বাসী সাহায্য করেন নাই; এবং করিবার সুযোগও পান নাই। কাজেই কৃষিজাত দ্রব্য সম্বন্ধেও ভারতবাসী ক্রমশঃ বিদেশীর উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইবেন।

আজকালকার কৃষক বলের সাহায্য-কারী মনবমাত্র নহ। তাহার শিল্প-কার-খানার মজুরের তার কলযন্ত্রের পরিচালক বৈজ্ঞানিক অগুষ্ঠানসমূহের নিয়ন্তা। প্রদর্শনীর ক্যালিফোর্নিয়া-ভবন, কানাডা-সৌধ, Horticulture-গৃহ ইত্যাদির ভিতর দেখিলাম, কৃষকদের সকল কার্যই উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞাবলের ফল। ভূমির উর্বরতা নাই—তাতে আধুনিক কৃষক ভীত হয় না। সে হাস্যজনক উপকরণের সাহায্যে ভূমির উৎপাদনী শক্তি বহুগুণে বাড়াইয়া লইতেছে। উত্তাপ, আলোক, গ্রীষ্ম-বর্ষা, কলাভাব, জলপ্রপাত, জলাধিকা ইত্যাদির কোনটা কৃষকের কার্যেই আজ-কাল অন্তরায় থাকিতে পারে না। বৃদ্ধি

বলে বর্ধমান যুগের কৃষক এই সমুদয়
প্রাকৃতিক শক্তির ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করি-
তেছে। বীজ, অকুশ, ফসল, ফল, মূল,
পত্র, লতা ইত্যাদির আকার বাড়ান-কমান
অথবা স্থান ও বর্ণ বদলান—এই সব
কার্যও কৃষকেরা অতি সহজেই করিতে
পারে। ছোট আলুকে বড় আলুতে পরিণত
করা, সপটক ও নিম্বাদ শাক-শস্মকে
নিম্বটক ও সুস্বাদু জাতিতে পরিণত করা
এই সমুদয় কার্যে ইহারা সিরুহস্ত।
আলকালিকার উদ্ভিদ-জগতে কৃষকেরা
ঐচ্ছন্দ্যলব্ধ ও বাহ্যকরের মত। তাহার পর
বীজবপন হইতে শস্তকর্তন পর্য্যন্ত সকল কার্যেই
শতলোকের পরিবর্তে একজন লোকের সাহায্য
লভ্য হইতেছে। অন্নমাত্র মানবশ্রমে প্রচুর
ফল পাওয়া যাইতেছে। অধিকতর কৃষিকার্য
সম্পর্কিত কোন ত্রুটি বৃথা নষ্ট হয় না।
কোন না কোন উপায়ে নিত্যই নিশ্চয়ো-

জনীয় পদার্থসমূহও নানাবিধ অর্থকর প্রয়-
নীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যান্ত্রিক কোন
জিনিষই অনাবশ্যক বিবেচনার ফেলা যায় না।

ভারতবর্ষে দেখা যায় আম জাম কাঁঠাল
গাছ একবার খরোপ হইতে থাকিলে
সেগুলির আর উন্নতি হয় না। বৎসর
বৎসর এই সমুদয়ের ফল ক্রমশঃ ক্ষুদ্র,
স্থানহীন ও অন্নসংখ্যক হইতে থাকে।
পান্চাভাদেশে প্রত্যেক বৃক্ষের উৎপাদনো-
শক্তি অপেক্ষ উপায়ে বাড়াইবার ব্যবস্থা
আছে। গাছের পাতাগুলি মাঝে মাঝে
ধুইয়া পরিষ্কার করিবার জন্যই বহুবিধ
কণের ব্যবহার হয়। কণের মধ্যে নান-
প্রকার রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত করিয়া
মাগীরা গাছের পাতায় সেই মল ছিটাইয়া
দেয়। বৃক্ষের ব্যাধি নিরূপণপূর্বক রাসা-
য়নিক পদার্থ নির্বাচন করা হয়—এবং
বৃক্ষের আকার অল্পসংখ্যক জন ছিটাইবার



কল ব্যবহার করা হয়। “ব্লক-মুর্সের”-বিভা হিম্মুর অপরিচিত নয়—কিন্তু বর্তমান যুগে তাহার ব্যবহার অত্যন্ত হইতেছে—অধিকতর, নবীন বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহার কিছুমাত্র উন্নতি সাধিত হয় নাই।

কৃষিকার্যে ব্যবহার্যোপযোগী নানা কল এলাহাবাদের প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল। জাঙ্কানসিদ্ধোতেও অনেক দেখিলাম। লক্ষণ ব্যবহার যেমন কৃষকমস্তকেই অত্যাবশ্যক সেইরূপ নানাবিধ সমকল, জল ছিটাইবার কল, Force-Pump, Sproyer ইত্যাদির ব্যবহারও আজকাল অত্যা-বশ্যক বিবেচিত হয়।

আলুব ক্ষেত্রে, তুলার জমিতে, ফল-ফুলের বাগানে সর্বত্রই এই সকল কলের ব্যবহার হইতেছে। বহুবর্ষজীবী প্রাচীন এলুম তরুণ এই সমুদয়ের প্রয়োগ-ফলে নবীন ও সন্তোষ হইয়া উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য ভারতসর্বে এই সমুদয়ের ব্যবহার-প্রচলন নিত্যক্রমে আশঙ্ক। প্রাচীন ব্লক-মুর্সের ব্যবহার সঙ্গে নবীন Horticulture বিজ্ঞান সংযোগ-বিধান শীঘ্রই কর্তব্য।

উন্নত লাজল ও সাহায্যে অনেকেরই অনেক কথা জানা আছে। কতকগুলি সামান্ত সামান্ত কার্যে কারিগরী দেখিয়া বিম্বিত হইলাম। একটা কলের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন আকারের ছোট বড় মাথারি নালপাতি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে সাধন হইতেছে। কোন লোকের সাহায্যের প্রয়োজন নাই। একটা ক্ষুদ্র কলে মুড়কী প্রস্তুত হইতেছে—গড়ের সঙ্গে ষৈ মিশাইবার জন্য কোন লোকের না বলিয়া থাকিলেও চলে। এমন কি চীনাবাদামও

কলে ভাঙা হইতেছে। আন্তরিক তপস্বী একজন কলে নিম্নোক্ত যে, হঠাৎ খানিকটা বাদাম বেশী-ভাঙা হইয়া যাঁতে পারে না। কলের সাহায্যে বাদামগুলি আপনাপনিই যথাক্রমে হইতে পড়িয়া নিরম-মত ভাঙা হইয়া যথাক্রমে জমা হয়। কলের সাহায্যে কিশমিশের বোটা ছাড়ান, পোশা ছাড়ান, পরিষ্কার করাও দেখিলাম। প্রত্যেক স্থলেই পুরিত-বাঁধাও কলে হইয়া থাকে।

এই সব দেখিতেছি আর ভাবিতেছি—
রজনীকান্তের সাধ

“যদি কুমড়োর মত চালে ধরে ত’ত
পান্তোরা শত শত

আগে সঁঝার মত হত মিদিদানা

বুদ্বিগা বুটের মত”—ইত্যাদি

একমাত্র মিটার সম্বন্ধেই মিটমাতে এমন নছে—মার্কিনদেশের লোকেরা উদ্ভিদ্ধ বিষয়েও এইরূপ সাধ মিটাইতে সমর্থ। কৃষিক্ষেত্রে যাহকরেরা অল্পত ফল প্রদর্শন করিতেছে।

দক্ষিণ আমেরিকার চিলি দেশের মুক্তিকাত্যন্তরে প্রচুর পরিমাণে সোরা উৎপন্ন হয়। এই সোরা সারের উপাদান। কিন্তু এখানে সোরা যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে আজকালকার কৃষকেরা হা হতোহ্মি করিতে থাকিবে কি? বৈজ্ঞানিকেরা আশ্বাস দিয়াছেন—“কোন ভয় নাই!” কৃত্রিম উপায়ে বাতাস হইতে সোরা প্রস্তুত করিবার প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে। সোরাই শ্রধান উপকরণ নাইট্রিক গ্যাসিড। এই গ্যাসিড প্রস্তুত করিবার জন্য খোলা আকাশ হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করা হয়। তাহার সঙ্গে অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ বিধান

করিলে সহজে নাইট্রিক স্যাসিড তৈয়ারীর ব্যবস্থা হয়। কানোই ভূমিতে সোরা না পাওয়া গেলেও কৃষকেরা পিত্ত হয় না। জ্ঞানত্ৰ্যাস্নিসিদ্ধার একজন বিজ্ঞানসেবীর সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি বাতাস হইতে নাইট্রিক স্যাসিড ও সোরা প্রস্তুত করিবার সত্তা ও সহজ প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। একদিন ইহাও লাবরেটরীতে বাইরা কলগুলি দেখিয়া আদিলাম।

প্রকৃতির দাসত্ব স্বীকার না করিয়া প্রকৃতিকে দাসীতে পরিণত করা বৈজ্ঞানিকের কার্য। বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষকেরা অসাধ্য সাধন করিতেছে। বর্তমান জগতের কৃষিকার্য্য প্রকৃতির পেয়ালের অধীন নয়—প্রাকৃতিক শক্তিগুলি মানবকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। মরুভূমিতে সোনাফসান, আধার ঘরে চাদ ডালান, বর্ষাকালে আমসময় শুকান, কালীধায়ে ভূমিকম্প ঘটান, পশ্চিমে দূর্য্য উঠান—এ সব কার্য্য বর্তমান যুগেই সম্ভব।

তুমিতে পাই, কৃষিকার্য্যে বিজ্ঞান প্রয়োগ জরুরিতে চূড়ান্তরূপেই হইয়া থাকে। জরূপ দেশের ভূমি বিশেষ উর্ব্বা নয়—অথচ এখনকার কৃষকেরা কবিবার কৃষকগণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জয়ী হইতেছে। জরূপির ভূমি হইতে সম্ভার বেশী মাল উৎপন্ন হয়—কৃষকগণের লাভও বেশ থাকে। ত্রিশ বৎসরের মধ্যে জরূপিতে পূর্ণ অপেক্ষা লতকরা ৬০ ভাগ বেশী গোদুগ উৎপন্ন হইতেছে—অজ্ঞাত পশুর উৎপত্তিও আর লতকরা ৮০ ভাগ বাড়িয়াছে। অথচ কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণ কিছুই বাড়ান হয় নাই

এবং কৃষকদিগের সংখ্যাও পূর্ব্বের মত সমানই রহিয়াছে। এই শতবৃদ্ধির একমাত্র কারণ বিজ্ঞানের সাহায্য। বস্তুত ইহাতির জাৰ জরূপেরাও শব্দ “Manufacture” করিতেছে বলা বাইতে পাবে। জুতা তৈয়ারী, জারী তৈয়ারী, কাপড় তৈয়ারী, টেবিল তৈয়ারী, ও রাস তৈয়ারী ইত্যাদি শিল্পের জার আসু, কলি, নীট-টিনি, গোদুগ ইত্যাদি তৈয়ারীও জরূপেরাও একটা শিল্পশিল্প!—ইহাকে কৃষিকার্য্য বলা উচিত নয়। প্রচুর পরিমাণে সার ব্যবহার করিয়া কৃষকেরা সাধারণ ভূমির উপর একটা ইচ্ছাহীন কৃত্রিম ভূমি প্রস্তুত করিয়া লয়। এই কৃত্রিম ভূমির সাংগঠনিক পদার্থসমূহই উদ্ভিদকে আকারে দেখা যায়। এই এক উদ্ভিদসমূহকে প্রাকৃতিক অথবা কৃষিজাত না বলিয়া শিল্পজাত বলা হইল।

ছুধের ব্যবসায়

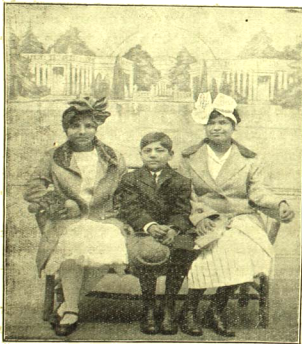
একদিন প্রদর্শনীক্ষেত্রে আর বাব বণ্টা কাটানো গেল। চীন, জাপান, ফিলিপাইন, হাওয়াই, জাব, জুসক ইত্যাদি দেশীয় জবন-গুলি দেখানো। জাপানী বাগান, চা-গৃহ এবং প্রেমাদালর বিশেষরূপেই উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানত্ৰ্যাস্নিসিদ্ধা নগরের পাড়ার পাড়ার জাপানী প্রভাব দেখিতে পাই—প্রদর্শনীতেও জাপানীরা প্রভুত্ব করিতেছে। এখানে মার্কিনদের পরেই জাপানীদের জরজরকার দেখিতেছি।

যুঝিতে যুঝিতে করেজন ভাৰতবাসীর সঙ্গে দেখা হটল। কেহ কেহ পথপ্রান্ত পৰ্য্যটকগণকে গাড়ীতে বসাইরা প্রদর্শনী দেখাইতেছে! এই উপায়ে তাহাদের জীবিকা

উপার্জিত হয়। এই ধরনের ভারতীয় যুবক
 দুইজন মাত্র" ঘোষণা পড়িল। দর্শনমণ্ডলীর
 ভিতর দুইট ভারতীয় বালিকার সঙ্গে আলোচনা
 হইল। ইহার আমেরিকাত্যেই বাস করি-
 তেছে। ইহাদের সঙ্গে একটি অন্নবঞ্চে শিশুকে
 দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—“এটি কে?”
 হুজিলাম—এই দুই ভ্রমী ইহাদের তিন
 ভাইয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতে এখানে
 লেখাপড়া শিখিবার জন্য আসিয়াছে। এখনে
 আর তার বৎসর হইল ইহার। গৃহত্যাগী।
 দিল্লী নগরীর বণিকসংঘে ইহাদের জন্ম।
 গৃহ হইতে কোন সাহায্য না লওয়া ইহাদের

উদ্দেশ্য। পাঁচ হাজার টাকা লাইগা মেন
 হইতে বাহির হইয়াছিল। অন্নকালের মধ্যে
 সে অর্থ নিঃশেষ হয়। তাহার পর হইতে
 বড় ভাইয়েরা দোকানে ও ক্রমিক্সে মজুরী
 করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতেছে। দৈনিক
 বেতন ইহার। ছয় টাকা করিয়া পায়।
 জ্যেষ্ঠভ্রাতা শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর
 ধনবিজ্ঞান শিক্ষা করিতেছিল—অর্থাত্যে
 লেখাপড়া সম্প্রতি স্থগিত রহিয়াছে। কনিষ্ঠ
 ভ্রাতা ইংরাজী ভিত্তি অল্প কোন ভাষা
 জানে না। এখন ইহার। আমেরিকার
 পরীক্ষণ করে তখন এই শিশুর বয়স ৫৬

বৎসর মাত্র ছিল। কনিষ্ঠা
 ভ্রমীও হিন্দী কিম্বা উর্দু
 জানেন না। স্থানস্থান-
 সিদ্ধের বিভিন্ন বিভাগেরে
 ইহার। লেখাপড়া শিখি-
 তেছে। উচ্চতম শিক্ষা না
 পাইয়া কেহই স্বদেশে
 ফিরিবে না। বালক-
 বালিকারা ইয়াক্সিমের
 মতই ইংরাজী যেনে—
 ভারতবর্ষের কোন কথাই
 জানে না। ইতালীয়,
 জার্মান, পোল ইত্যাদি
 ভাষার লোকেরা ইয়াক্সি-
 য়ানে আসিয়া বসবাস করত,
 এই ভারতসন্তানগণকেও
 সেটুকু বোধ হইল।
 ঘোড়ের উপর ইহাদের
 উৎসাহ, ভাবুকতা ও
 অসমসাহসিকতা দেখিয়া



পুলকিত হইলাম। ভারতীয় পুরুষ ও রমণী-
গণের মধ্যে এই স্নেহী উভয় ও চঠকারিতা
এখনও অতি বিরল—কিন্তু অল্পকালের ভিতরই
এই সকল গুণের আবির্ভাব আমাদের সমাজে
হওয়া অত্যাবশ্যক।

পশুবিভাগে খানিকক্ষণ কাটাইলাম।
ঘোড়া খরস, গো বলদ, মেঘ ছাগল, শূকর
কুকুর, বিড়াল, এবং পাখী ইত্যাদি
নানাবিধ জন্তু সংগৃহীত হইয়াছে। এই
সকল পশু-পক্ষী এখানে বিক্রয় করাও হয়।
তাঁহা ছাড়া এইগুলি লইয়া নানাবিধকার খাজা
খেলিবার বন্দোবস্ত আছে। কোন্ সুখী
সঙ্গোপক্ষে বেণী ডিম পাড়ে তাহারও পরীক্ষা
চলিতেছে। এই প্রতিযোগিতার নাম
“International Egg-laying contest”।
অঞ্চলেন, ঘোড়দোড়, পোলো-প্রতিযোগিতা,
কুকুরের লড়াই ইত্যাদি নানাবিধ খেলারও
ব্যবস্থা আছে।

পশুশালায় গাভী ও বলদগুলি একটা
দুগ্ধব্যবহারী কোম্পানীর সম্পত্তি। এই
কোম্পানীর প্রস্তুত দুগ্ধ স্তানড্যানিসিয়ার
আদিরা অবধি বোজ পান করিতেছি। এইজন্ত
ইহাদের গোষ্ঠাল-ঘরে কিছুকাল ঘুরিয়া
কিরিয়া দেখিলাম। আশ্রয় গোদেবক
গোপূজক জাতি, কিন্তু আমাদের গোমাতা
ভারতমাতার জায়গাই জীর্ণশীর্ণ ও অস্থিকঙ্কাল-
সার। মার্কিন দেশের গোখাদক জাতির
গোশালা এবং গোদান দেখিবামাত্র আমাদের
দুঃখবহা স্মরণ করিলাম। একজন দেড়মণ
দুগ্ধ দেয় একমণ গাভী এখানে অসংখ্য।
অধিকন্তু গাভীর জাতি-সংস্কার করিবার
জন্ত ইরাজি বৈজ্ঞানিকেরা উষ্ণিয়া পড়িয়া

লাগিয়াছেন। উদ্ভিদগণের বিরুদ্ধে উন্নতি,
চাণোগাছের উন্নতি, ফলের উন্নতি, ফুলের
উন্নতি ক্রমাগত সাধিত হইতেছে। গুট-চারি-
মণ বংশেরের ভিতর এক একটা উদ্ভিদের
জাতি ও বংশ বদলাইয়া ফেলা হইতেছে।
বীজনির্কীচন ইত্যাদির প্রভাবে অতি নিম্ন-
জাতীয় উদ্ভিদসমূহও উচ্চজাতীয় উদ্ভিদে
পরিণত হইতেছে। এইরূপ নির্কীচন-প্রণালী
অবলম্বন করিয়া পশুপালকেরাও জীব-জগতে
নূতন নূতন গুণ-রূপ-বিশিষ্ট বংশ ও
জাতির সৃষ্টি করিতেছে। Breeding বা
(উদ্ভিদ পালন ও পশুপালন) বর্তমান
যুগে হাভুডের কাজমাত্র নয়—উচ্চ অবস্থার
প্রাণি-বিজ্ঞানের নিয়ম প্রয়োগপূর্বক ক্রিয়-
কর্মী লোকেরা উদ্ভিদ ও পশুর রূপান্তর
ও গুণান্তর সাধন করিয়া থাকে। মানব-
জগতেও এই ধরনের গুণ-রূপ পরিবর্তন
করিবার জন্ত বৈজ্ঞানিকগণ উষ্ণিয়া পড়িয়া
লাগিয়াছেন। তাঁহাদের নাম Eagerist
বা “বংশোন্নতি সাধক।” বাহা হটক
পশুশালায় থাকিতে থাকিতে মার্কিন দেশের
Breeding বিভাগ ঘণ্টে পরিচয় পাইলাম।
এই বিভাগ-সম্পর্কিত নানাবিধ দাসিক ও
সাংস্কারিক পত্র এবং পুস্তিকাও সংগৃহীত
হইয়াছে। কোনটা পক্ষী-সম্বন্ধীয়, কোনটা
অশ্ব-সম্বন্ধীয়, কোনটা সুখী-সম্বন্ধীয় ইত্যাদি।
এই রচনাগুলি খাটে বৈজ্ঞানিকের ভাষায়
লিখিত নয়—সাধারণ কৃষক পশুপালক
এবং প্রাণী শোকেরা ঘাহাতে বংশোন্নতি-
বিজ্ঞা সহজে বুঝিতে পারে, তাহার জন্তই
এই ধরনের রচনা প্রকাশিত হয়।

গোশালা দেখিয়া দুগ্ধের কারখানার

আসিলাম। এ কতদিন লক্ষ্য করিতেছি—
আধুনিক যুগের কৃষিকর্ষ একটা শিল্প-
বিশেষ। আজ দেখিলাম, আজকালকার
গোয়ালগিরিও কলঙ্কনিরস্ত্রিত কারবার-
বিশেষ। লাম্বাৎ কারখানার আশে রুখের
কারখানার কোন প্রভাব নাই।

আমরা ভারতবর্ষে “গোয়ালিনী মার্ক”
গাড়ে রুড়ে”র বিজ্ঞাপন দেখিয়া থাকি।
এই কন্ডেপড্ মিক হুইবল্যাণ্ডে প্রস্তুত
হয়। বাহ্যিক চাপানের জন্ত অথবা শিত্তরের
জন্ত এই রুড় ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার
জানেন—এই রুপের সঙ্গে চিনি এবং
অজ্ঞাত পদার্থও মিশ্রিত আছে। গরম
জলের সঙ্গে না মিশাইলে এই রুড় তরল
হয় না। ইহা আঠাল, বেশিলে রুধ মনে
হয় না। ইহার আলও খাঁটি রুধ হইতে
অনেকটা স্বতন্ত্র। কিন্তু মার্কিন দেশে
কোটার বন্ধ করা একপ্রকার রুধ পান
করিতেছি, তাহাতে রুড় ছাড়া আর কোন
কিন্তু নাই—ইহার ২০ ও ২৫ খাঁটি
গো-রুড়ের মত। বস্তুতঃ গাভীর রুধ হইতে
জল শুকাইয়া ফেলিলে রুধের যে অবস্থা
হয় এই রুধ সেই ধরণের। অথচ আগুনে
আল দেওয়া ঘন রুধ, ফোর বা রাবড়িও
ইহাকে বলা উচিত নয়। প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে
আসিয়া রুধের জল Evaporate বা
শুকায়িত ফেলিবার প্রণালী দেখিয়া লইলাম।

এই গৃহের কর্তা যন্ত্রগুলির কার্য
বুঝাইয়া দিলেন। যন্ত্রগুলি বিশেষ জটিল
বোধ হইল না। আবার সেই ম্যাকোটোয়ের
বিশুট-ক্যাভারীর কথা মনে হইল। মাত্র
১০১২টা স্বতন্ত্র কল। ইহাদের প্রায় ৫০টাতে

গো-রুড় ঢালা হইতেছে—এখান হইতে
আপনা-আপনিই রুধ পরবর্তী কলে ঢালান
হইতেছে। রুড় এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন কলের
ভিতর দিয়া আসিতে আসিতে অবশেষে
বাজারে রাখিবার উপযোগী কোটা-বন্দী হইয়া
পড়ে। এইরূপে হাজার হাজার কোটা
প্রতিদিন বাহির হইতেছে।

কলগুলির সাহায্যে রুড় সম্পূর্ণরূপেই
নিষ্কলা হইয়া যায়। কোটাগুলিকেও
ভাঙিতের দ্বারা বিশেষরূপে শুদ্ধ করিয়া
লুণ্ঠা হয়। কারণেই রুধের মধ্যে কোন
প্রকার ‘ব্যাটিলাই’ বা স্বাভাবিকের পদার্থ
আসিতে পারে না। শত শত সহস্র সহস্র
মাইল দূরবৎ এই সমুদ্র রুড়ের কোটা
ঢালান বেড়া চলে। বছকাল পরে ব্যবহার
করিলেও রুধের কোন দোষ দেখা যায় না।
ভারতবর্ষে আমরা এখনও মানুষি প্রকার
রুধ মোহাইয়া থাকি—তাই এবেলায় রুধ
ওগেলা পর্যন্ত থাকিলে নষ্ট হইয়া যায়। কারণেই
বর্তমান যুগের রুড়-ব্যবহার আশাধের পক্ষে
বিশ্বকরম সন্দেহ নাই। আজকালকার
কৃষকের দ্বার গোয়ালগিরিও বস্তুতঃই শিল্পী
ও কারিগর বা Manufacturer। ইহারা
ঐজ্ঞানিকের দ্বার অসম্ভবও সম্ভব
করিতেছে।

ছোট কোটার প্রায় এক পোতা রুধ
থাকে—মূল্য দশ পয়সা। রুধ এত ঘন
যে জলের সঙ্গে না মিশাইয়া পান করা
চলে না। অর্ধেক জল ও অর্ধেক রুধ
মিশাইয়া এক পোতা পান করিলাম।
মূল্য দিতে হইল না। কলিকাতার পাঁচ
আনা পেরের রুধ আল দিলে যেমন পান

হয়, এই অলমিষিত চতুর্থ বাদ দেইরূপ মনে হইল। প্রত্যং মার্কিনেরা অতি সম্ভা দরেষ্ট দ্বন্দ্ব Manufacture করিতেছে না কি? হায়, অমকালের ভিতবেই ইয়াক্সিরা

ভারতের গোপনাতিকেকও বে দ্যাদারহীন করিয়া ফেলবে দেখিতেছি। * ভবু কি আমবা নিরেনের আয়ংকার অস্ত্র কিছু করিব না?

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

মেরুদণ্ডের বিকাশ

প্রাণিবিজ্ঞানে প্রাণীদিগের মেরুদণ্ড ও অমেরুদণ্ড এই দুই প্রধান বিভাগ দেথিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বিকাশক্রমে মেরুদণ্ড প্রাণিশ্রেণীই শ্রেষ্ঠ। ইহাদিগের "মেরুদণ্ড" নামের দ্বারা মেরুদণ্ডেই যে ইহাদের শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য নিহিত আছে তাহার অভ্যাস পাওয়া যায়। সুতরাং মেরুদণ্ডের বিকাশ-অলোচনার ক্রমবিকাশের বিশেষ রহস্যই যে উন্মোচিত হইবে, তাহা আমরা আশা করিতে পারি।

মেরুদণ্ডের প্রথম গঠন মৎস্যজাতীর জীবের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। মেরুদণ্ডের পাক্কা ভাবার নাম হইতে ইহার বিশেষ প্রমাণই পাওয়া যায়। পাক্কা ভাবার মেরুদণ্ডের নাম Spine। ইহা যেমন মেরুদণ্ডকে বুঝায় তেমনি মালের পীঠের ডীক্ষাও কীটা বিশেষকেও বুঝায়। মৎস্যটিকে আমরা কীটা বলিয়া থাকি।

Spine শব্দের প্রকৃতিগত অর্থও অতিধানে কীটাই পাওয়া যায়।

মৎস্যজাতীর কীটাসকল অপর মেরুদণ্ডী জীবদিগের অস্থিসকলের দ্বারা দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় না।* সুতরাং ইহাদের মেরুদণ্ডও অপর মেরুদণ্ডী জীবদিগের মেরুদণ্ড অপেক্ষা যে কোমল হইবে তাহা সহজেই ধারণা করা যায়। ইহা হইতেও তাহাদের মেরুদণ্ডই যে মেরুদণ্ডের প্রথম বিকাশ তাহার প্রমাণ পাই।

মৎস্যাদির মেরুদণ্ড অপেক্ষা পক্ষীদিগের মেরুদণ্ড অধিকতর দৃঢ়; পক্ষীদিগের অপেক্ষা আবার পশুদিগের আরও অধিক দৃঢ়। পশুদিগের মধ্যে আবার বানর ও বনমাতৃব্রজাতির মেরুদণ্ড সর্বাধিক দৃঢ়। মনুষ্যদিগের মেরুদণ্ড বানর বনমাতৃবাদির মেরুদণ্ড অপেক্ষাও দৃঢ়তর। এই প্রকারে মেরুদণ্ডকেই আমরা মেরুদণ্ডী জীবদিগের

* "With respect to fishes, whose growth is slow, and whose skeleton never attains to the consistency which characterizes the bones of mammalia and birds and which in some, as the ray, skates, sharks etc. remains permanently cartilaginous * * *"

ক্রমবিকাশের মানদণ্ড বলিয়া মনে করিতে পারি।

মহুযজ্ঞাতির বিকাশ-ক্রম পর্যালোচনা করিলে আমরা মেরুদণ্ডসম্বন্ধে পূর্নোক্ত তথ্য বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারি। মানবশিশুকে যে প্রাপ্যে হামাগুড়ি দিয়া চলিতে হয়, তাহা হইতে তাহার মেরুদণ্ড ঘনোচিত দৃঢ় না থাকায়ই প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্রমে যতই মেরুদণ্ডের দৃঢ়তা হইতে থাকে ততই শিশু প্রথমে উত্তীর্ণা দাঁড়াইতে আরম্ভ করে এবং পরে হাঁটিয়া চলিতে সমর্থ হয়। মেরুদণ্ড দ্রাব্যজ্জ্বল আধার। দ্রাব্যজ্জ্বল পুষ্টির সংলগ্নেই মেরুদণ্ডের বল বর্ধিত হইতে থাকে। এই প্রকারে মেরুদণ্ডের সবলতা হইতেই দেহের গতি সাধিত হয়। সুতরাং দ্রাব্যজ্জ্বলই আমাদের দেহকে উর্দ্ধমুখে উত্তীর্ণ করে। এইজন্যই দ্রাব্য বিনিষ্ট পরিণাম বিকাশের পরিচিহ্ন হইয়াছে। ইহা হইতে মেরুদণ্ডের বা তৎসঙ্গে সঙ্গে দেহের উন্নয়নই যে আমাদের উচ্চবিকাশ বা উন্নতির প্রকৃত অর্থ তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

মহুযজ্ঞাচিত উচ্চ বিকাশের আনুমানিক রূপেই দ্রাব্য বিশেষ পরিপূর্ত হইয়া থাকে, এবং দ্রাব্য বিশেষ পরিপূর্তির আনুমানিক রূপেই মেরুদণ্ডের দৃঢ়তা হইয়া থাকে। এইজন্যই কোন কারণে মহুযজ্ঞমাগে শিশুর পক্ষে প্রতিপালিত হওয়ার সুযোগ না ঘটিলে তাহার মেরুদণ্ডের মহুযজ্ঞাচিত দৃঢ়তা না ঘটিলেই সম্ভাবন। বস্তুতঃ ব্যাক্সকর্জক মহুযজ্ঞাতির প্রতিপালিত হওয়ার যে ঘটনা জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে ব্যাক্সের

জারই তাৎপৰ্য্য, হাতে ও পায়ে চলিতে জানা গিয়াছে, মহুযজ্ঞ জার কেবল পায়ে হাঁটিতে জানা যায় নাই।

পশুদিগের মধ্যেও মহুযজ্ঞাতির সহিত বাহাদিগের সর্কোপেক্ষা অধিক নোনাগুণ্ড পরিগণিত হয়,—যেমন বানর ও বনমাহুযজ্ঞাতি, তাহাদিগকে কখন কখন হাঁটিয়াও চলিতে দেখা যায়। আমাদের তাহার ইহাদের ‘বানর’ ও ‘বনমাহুয’ উভয় নাম বারাই ইহার। যে মহুযজ্ঞাই পূর্নবর্তী বিকাশ তাহা পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হয়। ‘বানর’ শব্দের অর্থাহুযাবন বানর। ‘মরুদগুণ’ এই অর্থই উপলব্ধ হয়; কারণ ‘বা’ অব্যয়ের উপমা অর্থ অভিধানে স্পষ্টরূপেই স্বীকৃত হইয়াছে, যথা—

“বাস্তবিকরূপেঃশরীরোদেবার্হেহি সমুচ্চরঃ।”

‘বনমাহুয’ নামের বানর কেবল বস্তু তাৎপৰ্য্যই মহুযজ্ঞের সহিত পার্থক্যের অর্থ প্রকাশিত হয়। পান্ডিত্য জীব-বিজ্ঞানে ইহার। যে anthropoid ape অর্থাৎ “মানব লক্ষণাবিষ্ট বানর” সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছে— তাহাতেও পূর্নোক্ত ব্যাংগতিরই পোষকতা দেখা যাইতেছে। এই প্রকারে ইহাদের প্রকৃতিতে মানবের জুলা বিকাশ হইতেই ইহাদের মেরুদণ্ডও মানব মেরুদণ্ডের সদৃশ দৃঢ় হইয়াছে—তাহাতেই অল্প কোন পশু হাঁটিতে সমর্থ না হইলেও ইহার। হাঁটিতে সমর্থ হইয়াছে।

মেরুদণ্ডের উন্নতি কেবল যে মানবিক বিকাশেরই মানদণ্ড তাহা নহে; তাহা আধ্যাত্মিক বিকাশেরও মানদণ্ড। এইজন্যই উপাদান—যোগ-সাধন প্রকৃতি আধ্যাত্মিক

অমুঠানে আমরা আসনের বিশেষ বিধান দেখিতে পাই; এবং এই সমস্ত বিধানেই মেকদওকে বিশেষরূপে সমুন্নত রাখার ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। আমরা গীতা হইতে একরূপ আসনের একটি বর্ণনা নিয়ে প্রদান করিতেছি :—

তত্রৈকাগ্রং মনঃকুবা যতচিত্তপ্রিক্রিয়াঃ।

উপবিষ্টাসনে পুত্রাশোণবান্ধবিতচ্ছরে ॥ ১২

মনঃ কাশ্মিনোত্রীযঃ বারহস্তচলঃপ্রিসঃ।

লংসেক্ষ্য নাসিকাগ্রং যঃ বিশন্দানবলোকরন্ ॥ ১৩

প্রশান্তায়া বিগতভীতঃশুচ্যারিত্তেবিত্তঃ

মনঃ লংঘন্য মজিতো নুত্ৰ আনীতবৎপরঃ ॥ ১৪

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

“সেই আলনে বসিয়া মনকে একাগ্র করিয়া, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া সংযত করিয়া চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যোগ সম্ভাষণ করিবেন।”

“মেহের মধ্যভাগ মণ্ডক ও ত্রীবাহেনকে (অর্থাৎ মূলধার হইতে মণ্ডকের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত) সরল ও নিশ্চলভাবে ধারণ করিয়া হির হইয়া খীর নাসিকার অগ্রভাগ (জহমের মধ্যভাগ) অবলোকন করিয়া এবং অগ্রদিকে অবলোকন না করিয়া (শিবনেক্স হইয়া) প্রশান্ত চিত্তে, নির্ভীক ও ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত হইয়া মনকে সংযত করিয়া আমাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়া সংপরাধণ ও শূন্য হইয়া অবস্থিত করিবেন অর্থাৎ ভরুণদ্বিষ্ট সাধন করিবেন।”

আর্যাদিশদ অমুখ্য।

পাশ্চাত্যবিজ্ঞানেও শিরোত্রীভের সমভাবে অবস্থানই শরীরের স্বাভাবিক অবস্থানরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

মেকদওের সমুচিত দৃঢ়তা ধারাই পূর্ণোক্ত রূপ সমুন্নত ভাবটি স্থায়ী হইতে পারে। আমাদের আধ্যাত্মিক অমুণীণনের দ্বারা স্নায়ু বল সঞ্চিত হইয়াই সেই দৃঢ়তা সম্পাদিত

হয়। তাহাতেই বৌদ্ধগণকে যুগ যুগান্তর অক্লান্তভাবে এইরূপ সমুন্নত অবস্থার অবস্থিত হইতে দেখা যায়। এই প্রকারে আমরা সমুন্নত বেকদওকে আধ্যাত্মিক বলের মান-দণ্ডরূপ নির্দেশ করিতে পারি। ইংরেজীতে “strong backbone of character” ‘চরিত্রের দৃঢ় বেকদও’ রূপ কথা যে প্রচলিত আছে, তাহা ও মেকদও যে আধ্যাত্মিক বলেরই আধার তাহারই আভাস প্রদান করে।

আধ্যাত্মিক উন্নতিতে যেমন বেকদওকে সমুন্নত কবে—আধ্যাত্মিক অবনতিতে তেমনই ইহাকে অবনত কবে। জগতের অস্ত্রতম শ্রেষ্ঠ মহাকবি সেক্সপীয়ার তদীয় “Tempest” (ঝটিকা) নামক নাটকে—সাইকোরেক্স (Sycorax) নাম্নী ডাকিনীর বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন “who was with age and envy almost bent double”,—“যে বার্দ্ধক্য ও ঈর্ষার ভারে প্রায় বিগুণ নমিত হইয়াছিল।”

এই প্রকারে মেকদওের অবনত ভাবের সহিত অমুচ্চ বিকাশের বেকদও সম্বন্ধ রহিয়াছে—মেকদওের অভাবের সহিত তরুণ আরও অধিক অমুচ্চবিকাশের সম্বন্ধও জড়িত হইয়াছে। তাহাতেই নৈতিক চরম অবনতি প্রকাশ করিবার অন্ত্র ক্রমি কীটের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়া থাকে। মেকদওহীন অন্তর সৃষ্টিকার বৃকে ভর দিয়া ঢোলা বুঝাইতে ইংরেজীতে creep শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই creep শব্দ চাটুকামিতার হের অর্থও প্রকাশ করে। ইংরেজীতে চাটুকামিতার বচক যে “cringe” শব্দ

পাওয়া যায়, তাহার প্রকৃত অর্থ নতদেহ বা অনিত্যাত্ম হওয়াই বুঝায়। ইহা ধারণাও দেবদত্তের মততাবের প্রমাণই আমরা প্রাপ্ত হই। স্তম্ভাং আমাদের দেবদত্তের

উন্নতি যেমন উৎকৃষ্ট বিকাশের নির্দেশক তেমনিই দেবদত্তের অবনতি বা অস্তিত্ব যে নিম্নত বিকাশের নির্দেশক তাহা পরিষ্কার বৃত্তিতে পাওয়া যাইতেছে।

খ্রীষ্টীয়চন্দ্র চক্রবর্তী।

ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য

গবর্ণমেন্টের Statistical Report বাহির হইয়াছে। তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে ভারতের বহির্বাণিজ্য নটনঃ নটনঃ বাড়িতেছে। ১৯০৪—৫ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টের সহিত ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টের তুলনা করিলে এই কথাই বাখ্যার্থ্য সহজেই উপলব্ধি হয়। ঐ বৎসরে আমাদের দেশ হইতে ১৫০ কোটির অধিক দ্রব্য রপ্তানি এবং কিছু কম ১১০ কোটির দ্রব্য বিদেশ হইতে আমাদের দেশে আমদানি হয়। ১৯০৬-৭ সালে আমাদের দেশ হইতে রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য ১৬৫ কোটি মুদ্রা। ঐ বৎসরে আমাদের দেশে আমদানী দ্রব্যের মূল্য ১১০ কোটি মুদ্রা হইবে। ১৯০৬-৭ খৃষ্টাব্দে রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য আরও বেশী,—এই বৎসর আমরা প্রায় ১৭৫ কোটি মুদ্রার দ্রব্য বিদেশে চালান দিই, এবং ১২০ কোটি টাকার দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি করি। পর বৎসরে ১৯০৭-৮ খৃষ্টাব্দে আমদানি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়; রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য গত বৎসরের অনুরূপ; —আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য যথাক্রমে ১৩৫ কোটি ও ১৭৫ কোটি মুদ্রা।

১৯০৮-৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের বাণিজ্যের কিছু অবনতি ঘটে। এই অবনতির প্রধান কারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International trade)-বিপ্লব। ঐ সালে আমরা মাত্র ১৫০ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করি; এবং বিদেশ হইতে আনীত দ্রব্যাদির মূল্যও ১০০ কোটি মুদ্রার অধিক নহে। ইহার পর বৎসর হইতে আবার ভারতীয় বাণিজ্যের উন্নতি হইতে থাকে। ১৯০৯-১০ খৃষ্টাব্দে আমাদের দেশ হইতে রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য কিছু কম ১২০ কোটি মুদ্রা; এবং আমদানি দ্রব্যও প্রায় ১৩৫ কোটি টাকার। ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দে আমাদের দেশ হইতে রপ্তানি বাবদে কিছু কম ২১০ কোটি টাকার দ্রব্য চালান যায় এবং প্রায় ১৫০ কোটি মুদ্রার দ্রব্য ভারতে আমদানি হয়। ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত আমরা যথাক্রমে প্রায় ২৩০, ২৫০, ২৬০, ও ২৭০ কোটি মুদ্রার দ্রব্য বিদেশে পাঠাইয়াছি এবং বিদেশ হইতে আনীত দ্রব্যের মূল্য যথাক্রমে ১৩৮, ১৫০, ১৭০ ও ২১০ কোটি মুদ্রা। উপরে এই যে নয় বৎসরের

তুলনামূলক (comparative figure) অঙ্ক দেওয়া গেল, তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, ভারতের বাণিজ্য ক্রমশঃ উন্নতির মুখে চলিয়াছে। ইহা আশঙ্ক্যের কথা, সন্দেহ নাই।

বর্তমান ভারতীয় বাণিজ্যের একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। এখানে সেই স্বাতন্ত্র্যের কথাটিও সংক্ষেপে বিবৃত করা উচিত। মোটামুটি ভাবে এ কথা বলা পারা যায় যে, আমরা সমস্ত সভ্যজগৎকে কাঁচা মাল (Raw Material) ঘোণাই আর তাহার পরিবর্তে সত্য অগতের নিকট হইতে আমরা তৈয়ারি মাল পাইয়া থাকি। উদাহরণস্বরূপ বলা ঘাইতে পারে যে, আমরা কার্পাস-বস্ত্র উৎপন্ন করিয়া তুলা প্রস্তুত করি, তুলা বিদেশে চালান যায়, এবং তাহা হইতে আমরা সেই তুলাই বস্ত্রে পরিণত হইয়া আসিয়া আমাদের লজ্জা নিবারণ করে। আমাদেরই দেশে প্রস্তুত চামড়া (Hide) জুতার পরিণত হইয়া আসিয়া আমাদের খ্রীচরণে বুটের আকার ধারণ করে। আমাদেরই দেশে উৎপন্ন পাট বিদেশে গাজবস্ত্রে পরিণত হইয়া আবার এখানে আসিয়া আমাদের শরীর রক্ষা করে। এইরূপে আমাদের দেশের উৎপন্ন অধিকাংশ দ্রব্যই বিদেশীরা দ্বারা Raw Material ভাবে ব্যবহৃত হয়। ইহার অর্থ কি? ইহার সহজ অর্থ এই যে, ইচ্ছা যুগান্তরের সূচনা করিতেছে। এতদিন আমরা নিষ্ক্রিয় শান্তি-প্রিয় আতিমাত্র ছিলাম। ছায়া-নিয়-ঘেরা কলহশূন্য গল্পীবন আমাদের আদর্শ ছিল। কিন্তু সে নেশা ছুটিতেছে। এখন বৃদ্ধিতে পারিয়াছি যে, বাচিতে চাহিলে

কলহ চাই, মারামারি চাই, ঠেলাঠেলি চাই। এট শিকার কলে আমাদের দেশে নগরের সংখ্যা বাড়িয়াছে। বাণিজ্যের পথ ক্রমশঃ স্রগম হইতেছে এবং ভারতগামীর জীবিকা-নির্ভরতার নানা উপায়ও উদ্ভাবিত হইতেছে। কিন্তু প্রাচীন ভারত এখনও নৃতনের সহিত সম্পূর্ণ বোঝাপড়া করিয়া লইতে পারে নাই; তাই এখনও অতি-বৃদ্ধ ভারতবর্ষ Factoryর জীবন সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারে নাই; ইহার ক্ষমতা প্রস্তুত হইতেছে মাত্র। এইজন্যই ভারতে উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা বিদেশে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং বাধ্য হইয়া আমরা তাহাদের সাহায্য লইতেছি। এইজন্যই ভারতকে Mart for Raw materials নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু ১৯১১ খৃষ্টাব্দে হইতে ভারতে কল-কারখানাও কিছু কিছু বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। আর কয়েক বৎসর হইতে আমাদের দেশের যুগকণ্ঠ বিদেশ হইতে কলকারখানা চালাইবার উপায় শিক্ষা করিয়া আসিতে-ছেন। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, ভারত ক্রমিকভাবেই আর একমাত্র অবলম্বনরূপে গ্রহণ না করিয়া Factoryর জীবন শীঘ্রই বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করিবে। তাহার সূচনা কিরূপ দেখা ঘাইতেছে, প্রথমে তাহাই বলিতেছি।

চাষ-বাস ভারতবর্ষের প্রধান অবলম্বন। ভারতবর্ষে শতকরা প্রায় ৬৭ জন চাষ-বাসের উপর নির্ভর করে। অংশিষ্ট লোক নানা উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করে।

ভারতবর্ষে যে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হই-
রাছে, তাহার সহিত ইহাদের মধ্যে
অনেকেরই তুলনাসূত্র জড়িত। বর্তমান
এবং আগের সময়ের মধ্যেইতেছি, এই কল-কার-
খানা আমাদের দেশের সাধারণ লোকের
জীবিকা-অর্থের পথে কতটুকু সহায়তা
করিতেছে। ইহার পর বিলাতের কল-কার-
খানার সংখ্যা ও অগাণীর সহিত ভারতীয়
কল-কারখানার তুলনা করিয়া দেশের ধন-
বিজ্ঞানের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রকার কল-কারখানার
সংখ্যা ছিল ৩৩২৭। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারতে
৩৮৬৭টি কারখানা (Factory) স্থাপিত
হয়; ইহা ব্যতীত কয়লা ও মিস্ররাজ্য কর্তৃক
পরিচালিত কারখানার সংখ্যাও ১৭টি।
কোনপ্রকার কারখানার সংখ্যা ভাঙ, নিম্নে
তাচার একটি তালিকা দেওয়া গেল;—

তুলার কল—২৮৮

পাটের কল—৬৫

পাট শিখরা পাট বাধিবার কল—১২০

তৈল ও তুলা বাধিবার কল—১৫৩৯

চালের কল—৩২৭

রেলগাড়ির কারখানা—১২৯

সরকার কল—৪১

লোহা ও পিতল ঢালাইয়ের কল—৪৮

কাঠ কাটিবার (Saw mill) কল—১২৯

উল্লিখিত কলগুলির মধ্যে পাটের কল ও
কাগজের কলগুলিই বিখ্যাত। যে দেশে
যে Raw Material হয়, সেই দেশে প্রায়
সেই আত্মীয় কল প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।
বেহার প্রদেশে যথেষ্ট পরিমাণে তুলা উৎপন্ন
হয়, এজন্য বোম্বাই প্রদেশেই কাগজের

কল অধিক। পাট বাংলাদেশ একচেটিয়া,
এইজন্য কলিকাতা হইতে আহৃত করিয়া
হুগলী অবধি গঙ্গার দুই ধারে অসংখ্য পাটের
কল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্রহ্ম
চালের আড়ং। এইজন্য চাল ভান্ডিবার
কল ব্রহ্মদেশে অধিক পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছে। উপরে কল-কারখানার যে
Figure দেওয়া গেল, তাহার মধ্যে যেগুলি
নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং কারখানার আটনের
মধ্যে আসিয়া পড়ে না, সেগুলি ছাড়িয়া
দেওয়া গেল। ঐ কল এতদিন বা তড়িত
সাহায্যে পরিচালিত; কিন্তু অবশিষ্টগুলি
প্রায়ই স্বভাবের সাহায্য গ্রহণ করে না।
সেগুলি সাধারণতঃ ছোট কুঠি এবং খুব অল্প
লোক লইয়া সেখানে কাজ-কর্ম হয়। এই
আত্মীয় কলগুলি প্রায়ই পাথরের কল,
না-হয় রেশমের ছোট ছোট ছিপিবানী
ছাপাই কল।

ভারতের কলগুলিতে যে সমস্ত শ্রমজীবী
তাঁহাদের জীবিকা-অর্থের জন্য কাঁচা
করে, তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় ১০,৪৮,১৪১
জন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের সংখ্যা ছিল
৯,৭৮,২২৩ জন। এই মোট শ্রমজীবীগণের
মধ্যে যাহারা কেবল কারখানা-সংক্রান্ত
আটন-কর্তৃক পরিচালিত কলে কাজ করে,
তাঁহাদের সংখ্যা ৮,৬২,৬৪৩ জন; তাঁহাদের
মধ্যে ৬,৮৫,৮২২ জন পুরুষ, ১,৩০,০২৪
জন স্ত্রী, ৪৪,১৩২ জন বালক এবং ২,
৬৬৪ জন বালিকা। মোটামুটি বলিতে
হইলে, বলা যায় যে, সমগ্র ভারতে যত
লোক কারখানার কাঁচা করিয়া দিনপাত
করে, তাঁহাদের মধ্যে কেবলমাত্র ৩৭ জন

বাল্যশালার এবং ৩০ জন বোম্বাইয়ের কল-সমূহে কার্য করিয়া থাকে।

এখন আমরা বেশ বৃত্তিতে পারিতেছি যে সংঘর্ষের ভাণ্ড প্রবলভাবেই আমাদের দেশে প্রবেশ করিতেছে। ইহাকেই আমরা যুগান্তরের হুচনা বলিয়া মনে করি। ভারতে কল-কারখানা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই বিশ্বাস হয়। আমাদের দেশের অনেক কাঁচা মাল (Raw material) ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য পরিণত করিবার জন্য বহু সহস্র কারখানার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশে কাপড়ের কলের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়া আবশ্যিক, কেন না এখনও আমরা অনেক কাপড় ভারতের বাহির হইতে আনিয়া তবে আমাদের লক্ষ্য নিবারণ করিতেছি। জুতার কারখানা এদেশে একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে বাল্যশালার “উৎকল টানারি” প্রতিষ্ঠিত হইয়া বেশ কার্য করিতেছে; এই জাতীয় বহু ‘টানারী’র এখনও প্রয়োজন আছে। পশম ও রেশমের কারখানারও বৃদ্ধি বাহ্যনীয়। কোন দ্রব্য বাবনে কত টাকার দ্রব্য আমাদের দেশে আমদানি হয়, তাহার আলোচনা করিবার পূর্বে, আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত কল-কারখানার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতেছি।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে আমাদের দেশে কাপড়ের কল ছিল না। আমরা ঘরে কাটা হুতা তাঁতিদের নিকট পাঠাইয়া দিরা, তাহাদের দ্বারা কাপড় বুনাঁইয়া লইতাম। তাহাতেই আমাদের লক্ষ্য নিবারণ হইত। এই জাতীয় বস্ত্র অভ্যস্ত মোটা ও দীর্ঘকাল-

স্থায়ী হইত। শিলানৌদিগের জন্য একপ্রকার হুস্ত বস্ত্র ঢাকা ও বর্ণদাবাদের তাঁতিগণ হাতে প্রস্তুত করিত; কিন্তু গৃহস্থগণ তাহা কখনও চক্ষেও দেখিতে পাইত না। আর্ক-রাইট প্রভৃতি মনোবিগলকর্ষক উদ্ভাবিত অভিনব কলে পরিপূর্ণ মার্কেটার যদি আমাদের দেশে আসা হুলো উৎকৃষ্ট বস্ত্রের আমদানি না করিত তাহা হইলে ঘরে সহস্র গভাভূগতিক তত্ত্বাবহ-সম্প্রদায় আরও কতকাল সনাতন প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিত, তাহা কে বলিতে পারে?

ভারতের মধ্যে বোম্বাই প্রদেশ ব্যবসায়-হিসাবে সমধিক উন্নত। তথাকার ব্যবসায়ীগণ যুরোপবাসিগণের সহিত বাণিজ্যে অনেকটা প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরেই প্রথম কল স্থাপিত হয়। আমাদের দেশের লোকেরা তখনও কল-কারখানার উপযোগিতা বৃত্তিতে পারে নাই,—যুক্ত মন্যদানে বিভূত গগন-তলে নসিরা পুরুষাভূত্রে স্বচ্ছন্দে বাহারা উন্নত পূর্ণ করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে বক স্থানে পিঙ্গরবাক পক্ষীর ন্যায় হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছুক হওয়া বিচিত্র নয়। কাজেই বাল্যশালার কল-কারখানার আশাভরূপ উন্নতি এখনও দেখা যায় নাই। বোম্বাইয়ের উন্নতিশীল পারদীগণ কাপড়ের ব্যবসা অনেকটা নির্ব্বিঘ্নে হস্তগত করিয়া লইবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছে। অভ্যন্তরীণ মধ্যে বোম্বাই কাপড়-কলের পীঠস্থান হইয়া উঠিয়াছে। কাপড়ের ব্যবসায় কেমন ধীরে ধীরে এই ক্ষেত্রে উন্নত হইতেছে, নিম্নে উক্ত তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে তাহা বুঝা যাইবে;—

১৮৭৯—৮৪ সাল পর্যন্ত কাপড়ের কল ৬৩	কল হয়। বোম্বাইয়ের কলগুলির তাহাদের
১৮৮৪—৮৯	২৩ সহিত লেন-দেন ছিল, কালেই এই দুর্ঘটনার
১৮৮৯—৯৪	১২৭ পর হইতে তাহাদেরও আর্থিক অবস্থা শোচনীয়
১৮৯৪—৯৯	১৫৬ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ব্যতীত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে
১৮৯৯—১৯০৪	১৯৫ বেরার প্রদেশে প্রচুব জ্বলা উৎপন্ন হয়।
১৯০৪—১৯০৯	২১৮ কলগুলাগুলি পর-বৎসরে উচ্চসরে বস্ত্র বিক্রয়
১৯০৯—১১	২৪৫ করিবার আশায় অধিক সংখ্যক বস্ত্র প্রস্তুত
১৯১০—১১	২৫৪ করাইয়া গুদাম-জাত করে; পর বৎসরেও
১৯১১—১২	১৫৮ তুলার দর বৃদ্ধি পায় নাই, তাহার উপর
১৯১২—১৩	১৬৬ যুরোপে মহামসরের হুমো হইতেই রপ্তানি
১৯১৩—১৪	২৬৪ ও আমদানি প্রবাহের পরিমাণ আশাভীতরূপে

Currency Reform এর পর হইতেই ভারতের বহির্বাণিজ্য ক্রমশ উন্নতিলাভ করিতেছে। ১৮৯৪—১৮৯৯ সালের মধ্যে বোম্বাই সহরে ২৭টি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর উন্নতি তত দ্রুত না হইলেও বোম্বাই নিত্য পিছাইয়া পড়িতেছে না। কেবল গত বৎসরে বোম্বাইয়ের কোনই উন্নতি হয় নাই, বরং দুইটি কল উঠিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কি?

আমাদের দেশে প্রস্তুত সমস্ত কাপড় কেবলমাত্র আমরাই ব্যবহার করিতাম না। তাহার অধিকাংশই আমরা হয় চীনে, না হয় জাপানে বিক্রয় করিতাম। সম্প্রতি জাপানে এই সব জিনিষের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার যে শুধুই আমাদের কাপড় লইতেছে, তাহা নয়, অধিকন্তু চীনের ব্যবসায়ও হস্তগত করিয়াছে। ইহা ব্যতীত আরও দুইটি সামগ্রিক দুর্ঘটনার বোম্বাইয়ের কলগুলাদের কিঞ্চিৎ ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। ১৯১৩ সালে আমাদের দেশের কতকগুলি দেশীয় ব্যাংক

কাপড়ের কলগুলিতে প্রায় ২,৬০,৮৭৭ জন লোক কার্য্য করে। ইহাদের মধ্যে ১,৮৯,৫২৮ জন পুরুষ, ৭৪,৮৪৮ জন স্ত্রীলোক এবং ২৬,৫০১ জন বালক-বালিকা। ১৯১৩—১৪ খৃষ্টাব্দে ভারতে সর্বসংগে ৬৪,৪৮,৫২৮৭৭ পাউণ্ড হুতা প্রস্তুত হয়। ইহার মধ্যে ২০,৬৭৯,৪১৭ পাউণ্ড আমরা বিশেষে পাঠাইয়া দিই। এক্ষণে আমাদের দেশে যে হুতা উৎপন্ন হয়, তাহা ২৫ লক্ষের নীচে। কিন্তু পূর্বে আমরা ইহা অপেক্ষা হুতর হুতা যথেষ্ট প্রস্তুত করিতাম। গত বৎসর ভারতবর্ষে প্রায় ১২০০০০০ পাউণ্ড হুতা হুতা প্রস্তুত হইয়াছে।

এইবার পাটের কথা বলিব। পাটের কার্য্যকারিতা অধিকৃত হইবার পূর্বে বাঙ্গালা নীল চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। বাঙ্গালা দেশই নীলের একচেটিয়া ব্যবসার স্থান ছিল। ইহারও পূর্বে বাঙ্গালা যুরোপকে দেশীয় বোম্বাইত। বাঙ্গালার প্রাচীন ব্যবসায়ের ইহাই সংকীর্ণ ইতিহাস। কিন্তু ক্রমশঃ

বখন বাঙ্গালার বেশমের ব্যবসার চীন ও নীলের ব্যবসার জায়াপি এগু করিয়া বসিল, তখন হইতেই সে পাটের একচেটির কারবার লাভ করিয়াছে। এখন পাটের কারবারই বাঙ্গালার প্রধান কারবার। শুনা গাইতেছে যুরোপীয়গণ রসায়ন-সাধ্যো বৃক্ষ-জক হইতে খুঁতা বাহির করিয়া নকল পাট প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু বর্তমান না তাঁহাদের সে চেষ্টা ফলশ্রী হয়, ততদিন পাট আমাদেগ একচেটির ব্যবসার থাকিয়া যাইবে। ১৮৭৮—৭৯ পর্য্যন্ত পাটের কারবার তত লাভজনক ছিল না, কাজেই শোকে এই ব্যবসারে ততখানি মনো-নিবেশ করিত না। কিন্তু ১৮৭৯—৮০ হইতে এই ব্যবসার ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। নিয়ে পাটকলের কারখানা ও সমজাবিদিগের সংখ্যা প্রবৃত্ত হইল :—

কারখানার সংখ্যা প্রমজীবীর সংখ্যা

(নবরগুলি হাজার-করা হিসাবে)

১৮৭৯—৮০	= ২১
১৮৮০—৮১	= ২৪
১৮৮১—৮২	= ২৬
১৮৮২—৮৩	= ৩১
১৮৮৩—৮৪	= ৩৬
১৮৮৪—৮৫	= ৪১
১৮৮৫—৮৬	= ৪৬
১৮৮৬—৮৭	= ৫৮
১৮৮৭—৮৮	= ৫৯
১৮৮৮—৮৯	= ৬১
১৮৮৯—৮৯	= ৬৪

সাল	পাটের খলি (নবরগুলি বর্ষশক হিসঃ)	পাটের কাপড় (নবরগুলি ১০ লক্ষ গর হিসঃ)
১৮৭৯—৮০	৫৪.৯	৪.৪
১৮৮০—৮১	৭৭	১২.৪
১৮৮১—৮২	১১১.৫	৪১
১৮৮২—৮৩	১৭১.৫	১৮২
১৮৮৩—৮৪	২০৬.৫	৪২৭.২
১৮৮৪—৮৫	২৫৭.৮	৬৯৮
১৮৮৫—৮৬	৩৬৪.৪	৯৪০.১
১৮৮৬—৮৭	৫৬০.৯	৯৫৫.৩
১৮৮৭—৮৮	২৮২.৯	৮৭১.৫
১৮৮৮—৮৯	৩১১.৭	১, ০২১.৮
১৮৮৯—৮৯	৩৬৮.৮	১, ০৬১.২

ইতিমধ্যে কাঁচা পাটের রপ্তানিও যথেষ্ট বাড়িয়াছে। ১৯১৩—১৪ খৃষ্টাব্দে প্রায় ১৫৫০,০০০ হনড্রেড ওয়েট কাঁচা পাট রপ্তানি হইয়াছে। ১৮৭৯—১৮৮০ কাঁচা পাটের রপ্তানি ৭৫০০০০ হনড্রেড ওয়েট মাত্র ছিল। কাঁচা পাটের দাম ক্রমশঃ উঠিতেছে। ১৯০৭—৮ খৃষ্টাব্দে যে বেলের পাটের দাম ৪২ টাকার মাত্র ছিল, ১৯১৩—১৪ খৃষ্টাব্দে সেই বেলের পাটের দাম পাঁড়াইয়াছিল, ৭৬৫। ইহাই পাটের Record Sale.

ভারতে আর একটি প্রথা ক্রমশঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় হইয়া উঠিতেছে। সেটি কাগজ। ভারতবর্ষের বাসিন্দারা এখন আর ভূর্জপত্র লিখে না। পূর্বে মহা-ভারতের ভায় একাও এহণ ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ হইত। কিন্তু এখন কাগজ না হইলে কাহারও চলে না। ১৯১৩—১৪ খৃষ্টাব্দে আমরা ২৩৯ লক্ষ যুগ্মের কাগজ

ব্যবহার করিয়াছি। কাজেই আমাদের কলের কর্গঞ্জের প্রয়োজন আছে। গত বৎসর পর্যন্ত ভারতে মোট কাগজের কল ছিল নয়টি। এট নয়টির মধ্যে তিনটি বাঙ্গালায়, চারটি বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে, একটি মুক্ত রাঙ্গো, এবং একটি গোয়াশিরর টেটে অবস্থিত আছে। এই সমস্ত কলে ৪৪ লক্ষ টাকা ফেলা (Invested) হইয়াছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এই সমস্ত কল হইতে ৮১৭ লক্ষ টাকার, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ৭৭ লক্ষ এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ৮০ লক্ষ টাকার কাগজ প্রস্তুত হয়। এই সময়ে যুরোপে প্রস্তুত পত্তা ধরের কাগজ আমাদের দেশে আমদানি হয়। তাহাতে আমাদের ব্যবসায়ের ক্ষতি হইয়াছে। এই আমদানি ক্রমশঃই বাড়িতেছে। নিয়ে বিদেশ হইতে আনীত ও এ-দেশে প্রস্তুত কাগজের একটি তুলনামূলক তালিকা দিলাম :—

নাম ভারতে উৎপন্ন কাগজ
(মূল্য)

১৯০৯	৭৯,১২,০০০
১৯১০	৮১,৪২,০০০
১৯১১	৮০,০৪,০০০
১৯১২	৭৭,০৬,০০০
১৯১৩	৮০,৩৭,০০০

ভারতবর্ষ কখনই পশমের অল্প বিখ্যাত ছিল না। ছাগ, চামরী প্রভৃতি পশুলামে কাশ্মীরে ও পঞ্জাবে হাতের তাঁতে গা-বস্ত্র প্রস্তুত হইত। ভারতে উৎকৃষ্ট পশম পর্যাপ্ত পরিমাণে কখনই পাওয়া যায়িত না। পশমের ব্যবসারে লাভের সম্ভাবনা

বেশিরা কতিপয় যুরোপীয় বণিক কয়েকটি কারখানা খুলিয়াছেন। তাহার অট্টেলিয়ান বস্ত্র পশমের সহিত ভারতের নিষ্কৃষ্টতর পশম মিশ্রিত করিয়া শৈনিকগণের অল্প একরূপ গাভবস্ত্র প্রস্তুত করিতেছেন। সমগ্র ভারতে সাড়েটি পশমের কল দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে মহেশ্বর টেটে একটি কানপুরে এলুগিন ও লালিম্‌লি নামক দুইটি এবং পঞ্জাবের অন্তর্গত ধারওয়ালের পশ-মের কলই সমধিক প্রসিদ্ধ। নিয়ে ভারত-জাত ও বিদেশ হইতে আনীত পশমে কাপড়ের তালিকা দেওয়া গেল :—

ভারতে প্রস্তুত (মূল্য)	বিদেশ হইতে আনীত (মূল্য)
৪৩২৫০০০	২০১৮৫০০
৪৭২০০০০	২৯২৯৭০০০
৫১০৪০০০	৩৪৪৪৩০০০
৫৩৮৩০০০	৩০৪৭২০০০
৬১১৫০০০	৩৮৪১২০০০

আমরা কিছু কিছু কল ও কারপেট ইত্যাদি পশমীজবাও ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানি করিয়া থাকি। কেন্‌ বৎসরে কত টাকার ভ্রব্য বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে, নিয়ে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

১৯০৯ সালে	২০৬৮০০০
১৯১০ সালে	২৪৫৪০০০
১৯১১ সালে	২৪৪৮০০০
১৯১২ সালে	২২৬২০০০
১৯১৩ সালে	২২৩০,০০০

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র।

শ্রোতের ফুল

(৪২)

বিপিন মালতীকে উপেক্ষা করিয়া গুহার গিরা রুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু জগৎয়ের মালা গুহার বাহিরে রুদ্ধ করিয়া আসিতে পারিল না। গুহার মথোকার নিরেট অন্ধকার একখানা প্রকাণ্ড কালো পাথরের মতো তাহার বুকের উপর ঢাপিয়া বসিতে লাগিল; গুহার সে একা, তাই সহস্র চিন্তা তাহার মন ছেঁকিয়া ধরিতে লাগিল। মালতী কার ছবি বুকে করিয়া কানিতে-ছিল? মালতীর জন্ত সে পিতামাতার বেহ-স্বর্গচ্যুত; নিরাশ্রয় সম্যাসী হইয়াও সে ত মালতীর চিন্তা ভাগ করিতে পারে নাই; সে যে নির্জন গুহার তপস্যা করিতে আসিয়া শুধু মালতীরই ধ্যান করিতেছে। আর মালতী?—সে কাহার অহুহুত, কাহার বিষহে তাহার এত আকুলতা, অশ্রুধারা সে কাহার স্মৃতির তর্পণ করে? বিপিনের মন নানা সন্দেহে নানা আশঙ্কা সীড়িত হইতে লাগিল—কেন সে জানিয়া আসিল না সে ছবিখানি কার! বিপিন বৃশ্চিকদণ্ড বন্দীর মতো ছটফট করিতে লাগিল—এত কষ্ট, এমন কষ্ট, জীবনে সে কখনো ত পায় নাই। বিপিন গীতা পাঠে মন দিল—

বিহার কামান্ যঃ সর্গান্ পুমান্ধরতি নিম্মহঃ।

নির্মমো নিরহঙ্কারো সা শান্তিঃ অবগচ্ছতি।

মালতীরও বুকে বড় বাথা বাজিয়াছিল। তাহাকে অপমানের মুখে অসহায়

কলিয়া বিপিন অল্পেই চলিয়া যাইতে পারিল! পুরুষ মাত্রেই কি এমন নিম্মহ, এমন নিষ্টব, এমন জনহীন! কোনো পুরুষ ও তাহাকে কখন এতটুকু করণ্য করে নাই। শাস্তি যদি না থাকিত তবে তাহার লজ্জা ঢাকিত কে? সে বড় বিশ্বাস করিয়া বিপিনের সঙ্গে আসিয়াছিল—নবকিশোর থাকিলে তাহার প্রতি এই অপমান কখনো সে মৌরবে সহ্য করিত না। মালতীর নবকিশোরের উপর দারুণ রাগ হইতে লাগিল—কেন সে বিপিনকে ধোর করিয়া ধরিয়া রাখিল না, কেন সে বিপিনকে এমন করিয়া বহিয়া যাইতে দিল!

ওর প্রেমামনের অবস্থা আরো শোচনীয় হইয়া উঠিল। তিনি আপনায় কাছে আপনি শক্ত হইয়া উঠিলেন, আপনায় প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া দুর্বল সঙ্কচিত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। ওর সত্ত্ব করিলেন তিনি তীর্থপর্ষাটনে যাইবেন। বিলম্ব করা নয়, শীঘ্রই।

ওর দীর্ঘকালের জন্ত তীর্থপর্ষাটনে যাইবেন, শিষ্যশিষ্যারা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ বিষম হইয়া উঠিয়াছে। শাস্তি সর্বজন ওর কাছে-কাছেই তাহার সেবা করিয়া ফিরিতেছে। মালতী আবার একাকী হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার আগে যেমন একটা স্মৃতির আনন্দ উৎফলিত হইয়া উঠিতেছিল; এই আশ্রমে কিছুদিন অত্যন্ত

ওক থাকিবে না, বিশিন কিছুদিনের অল্পও প্রেমামনের প্রভাব হইতে বিযুক্ত হইবে, এই সত্যসম্বন্ধেই মালতীর মন প্রবৃত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

কাল প্রভাত্রে প্রেমামন্য তীর্থগণটনে যাত্রা করিলেন। সমস্ত দিন তিনি ঠাকুরঘরে বসিয়া ধ্যান পূজা করিয়া তীর্থযাত্রার আয়োজন করিয়া লইতেছিলেন। সমস্ত দিন অনাহারে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যাকালে সমস্ত শিশুশিশুকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দিয়া গুরু আগনার ঘরে আসিয়া বসিলেন। কেবল মালতী আশ্চর্যমান লইতে বা শুককে প্রণাম করিয়া বিদায় দিতে আসিল না। বিশিন ত শুভার বন্ধ। কিসের একটা উদ্বেগনা ওকর চিত্ত আলোড়িত করিতেছিল—তাহার সংঘাতে তাহার মুখ প্রবীর্ণ ও অবস্থা বিচকল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রেমামন্য বুকের উপর দ্রষ্ট হাত মুখানিত করিয়া দীর্ঘ শ্বাসে ঘরঘর পাগড়ার করিতে লাগিলেন।

রাত্রি গড়ীর নিশীথ হইয়া গেল তবু তাহার পাগড়ারির নিদ্রান নাহে; একবার ঘর হইতে লাইব্রেরী-ঘরে, আবার লাইব্রেরী-ঘর হইতে ঘরে, বাসবার ঘরে ঘরে গভাবাত চলিতে লাগিল; মুখ গভাব, দৃষ্টি উদাস লক্ষ্যহীন।

ওক গভীর নিশা। ঘরের মধ্যে একটা বড়ী মুহূর্ত্ত গণিতেছে, পানের ঘরে মালতীর নিদ্রান গভাবের শব্দ শোনা যাউতেছে; বর্ণনোপানে গভাবের শব্দ শব্দ প্রবাহিত কানে প্রবাহিতনের মতো হিমস্তর বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। গভাব পরপারে একটা কুকুরের চাবকান-শব্দ জলের উপর

দিয়া গড়াইয়া এপারে আলিতেছিল। আর কোথাও কেনো প্রাণের সাড়া নাই। প্রেমামন্য বেড়াইতে বেড়াইতে এক-একবার ঘির হইয়া দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া তাহাই, জনিতেছেন।

হঠাৎ মালতীর ঘরের অর্ধ-দ্বার কপট উন্মুক্ত হইয়া গেল। কপাটের ফাঁক দিয়া লাইব্রেরী-ঘরের প্রদীপের স্বর্ণাকরন সোনালি স্তম্ভের জলের মতন বাতাসে ভাসিয়া গিয়া মালতীর মুখে পড়িয়া কাঁপিতে লাগিল।

প্রেমামন্য বম্বিকরা দাঁড়াইয়া মুখেরে দেখিলেন মালতী ঘুমাইতেছে। নরম বালিলে তাহার মাথাটি ভূবিয়া গেছে; খোঁপাতে চাপ লাগিয়া মুখের চারি-ধারে চুলগুলি ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর প্রদীপের সোনালি আলো আসিয়া মুর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে,—যেন জলের উপর বড় একটা পদ্মফুল অরণ্য-লোকে পূর্ণাবলিত হইয়া উঠিয়াছে। বুকের উপর স্রবাস নিবাসে প্রবাসে টেউয়ের মতো ছলিতেছিল, যেন উদারায়ী ফুলের বনে নিদ্রাময়।

প্রেমামন্য সত্যক দৃষ্টিতে সেই অপকর্ণ রূপ নিরাকর্ণ করিতে লাগিল। বতই ঐ মুখ তাহার অন্তরের মধ্যে মূর্ত্তিত ও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই তাহার সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমশঃ অবশ হইয়া চারি-দিকের হাফা হাওয়ার সহিত মিশাইয়া যাইতে লাগিল,—বিশ্বব্রহ্মের মধ্যে কিছুই আর রহিল না, রহিল শুধু তাহার অচল দৃষ্টি আর ঐ নিদ্রাময় মুখখানি। তাহার দিকে চাহিতে চাহিতে প্রেমামন্যের মন

হঠাৎ নিশি, শুভাগির্নু, আশ্রম, নিম্ন, বিশ্বকর্মা তিবোহিত হইয়া গেল, তাঁহার মনে হইতে লাগিল, অন্য দেশকালের অসীম সৌন্দর্যের শতদলেব মাঝখানে তিনিই শুধু ভক্ত উপাসক মধুসূক্ত ভ্রমরের মতো একাকী দাঁড়াইয়া আছেন। বিশ্বদৌন্দর্যের সুবাস, চুনির পেদালার জার মালতীর অধবপুটে, তাঁহারই প্রজ্ঞা সঞ্চিত হইয়া আছে; প্রেমামনের টঙ্কা হইতে লাগিল তাঁহার আকর্ষণের উদ্ভাস নিপাসা এক চুমুকে মিটাইয়া মাতাল হইয়া উঠেন। কে বলিতে পারে এই প্রদীপ্ত দৌন্দর্যের অপরূপবর্তী প্রণয়-লাগল প্রাণ এই গভীর নিম্নে চূষন-মূল্য লাভ করিয়া চকমকির অগ্নিতে সোনার মতো অগ্নিরা না উঠিবে? প্রেমামনের দ্বন্দ্ব গুরু স্পন্দিত হইতে লাগিল, আগ্রহ ও অপেক্ষার মধ্যে মন আকোষিত হইতে লাগিল, টঙ্কা হইতে লাগিল সেই মোহের মতো নরম নমনীয় স্তম্ভর নারীটিকে ছুই বাহুব নিবিড় চাপে একবারে মিষ্টাভিরা ফেলেন। এই নীরব নিম্নে নিম্নে দৌন্দর্যের পদতলে আপনাকে নিঃশেষে নিবেদন করিয়া স্থান।

এমন সময় নিত্ৰাধোরেই প্রেমামনের প্রতাপ বাগনার উত্তম আক্রমণ অস্ত্রতব করিয়া মালতী মুখ অগ্রসর করিয়া একবার পাশ করিল—চোখে আলো লাগিতেই পরক্ষণেই ধড়মড় করিয়া উঠিয়া লাফাইয়া বিছানা হইতে নামিয়া ঘরের এক প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল। চোখে আলো লাগতে এবং হঠাৎ ঘুম হইতে উঠিয়া সম্মুখে প্রেমামনকে শুক লুক

দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মালতীর মাথা নিম্নমুখ করিতে লাগিল, সে মুক্তিপায় দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

তাঁহার মনে হইতেছিল, অন্ধের গৃহে আগুন লাগিলে সে যেমন প্রজ্বলিত গৃহ হইতে নিরাশ্রয় হওয়ার ভয়ে ও মুক্তির আশঙ্কায় নৃতন নিপনের আশঙ্কা না করিয়া পাগলের মতো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন কবে সেও তেমনি করিয়া এই আশ্রম ছাড়িয়া পলায়ন করিতে পারিলে বাচে।

প্রেমামন্য মালতীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, মালতীর চোখ দুটি দুখানি ধারালো, ছুরীর মতো তাঁহার বুকের রক্ত চূষিয়া খাটবার প্রজ্ঞা যেন উত্তত হইয়া আছে। প্রেমামন্য দেখানে আর থাকিতে না পারিয়া আপনার ঘরে পলায়ন করিলেন।

ঘরে অনেকক্ষণ শুক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বারান্দার গিয়া প্রেমামন্য ডাকিলেন—যোগামন্য, শান্তি, আমার তীর্থযাত্রার উত্তোগ কর।

বাহিরে তখন উষার গোলাপী ওড়নার সোনার পাড় বোমা হইতেছিল। দিবার জলে গাছের সবুজ ছায়া পড়িয়া তরল পান্নার মতো টলটল করিতেছিল। ছোট ছোট শাখা শাখা যেন আকাশের ছড়াইয়া আছে; তাহাদের উপর যখন প্রভাতকরণের চূষনরাগ ফুটিয়া উঠিতেছিল, মনে হইতেছিল যেন বিশ্বর-আনন্দে আকাশ রোমাঞ্চিত হইতেছে। প্রভাতের আগমন-সংবাদ ক্রমশ বিশ্বের বুকের মধ্যে গিয়া পৌঁছিতে লাগিল,

গাছপালা ঘের ছাতপা মেলিতে লাগিল, পথে পথে শিহরণ খেলিয়া বাইতে লাগিল; কত নামগোত্রহীন মূল স্বর্ণাখ্যা সাজাইয়া ফুটিয়া উঠিল, কত বিচিত্র মিশ্র গন্ধ বাতাস জরিয়া তুলিল। বড় বড় নীল প্রতাপতি এক এক টুকরো আকাশভাঙা আনন্দের মতো মূলে মূলে নাচিয়া বেড়াইতেছিল, টিগাপাখীগুলি স্বর্গিক বাধিরা উড়িয়া বাটতে-ছিল, বেন সবুজ ঘাসের এক-একখানি ক্ষেত আকাশের গারে জালিয়া বাইতেছে। পরবের মরমর, ঝরণার ঝরঝর, গঙ্গার কলকল, কাকের কলরব বেন একতান সঙ্গীতে প্রভাতী নহবত বাজাইয়া তুলিতে-ছিল।

এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের দিকে প্রেমামন্যের দৃষ্টি ছিল না। তিনি তীর্থযাত্রার বাহির হইয়া পড়িবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

(৪৩)

প্রেমানন্দ চলিয়া গেলেও মালতী অশ্রুদানের লক্ষ্যে কৃত্রিম নিষ্পন্দ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর দাশানল-দণ্ড বন হইতে হরিণীর ঞ্জর জাসচকল ছদয়ে ধর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। লক্ষ্মীপ্র গতিতে নীচে নামিয়া একবার বিশিনের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল, কিন্তু তখনই তাহার মনে হইল বিশিন গুহার বড়, ঘরে নাই; আর ঘরে থাকিলেই বা কি? সে এই দুদিন আগে তাহার ঘাচিরা-বলা হ্রাথ-নিবেদন শুনে নাই, অবহেলা করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আরই কি ভনিত? যে উপেক্ষা করে তাহার

কাছে ভিক্ষার মীনতা বীকার করা আর নহ, আর নহ! কিন্তু অগ্রে তাহার আশ্রয়ও ত বিতীর আর কেহ নাই? না থাকে গঙ্গার গহীর ক্রোড় আছে, তবু বিশিনের কাছে দণ্ডা ভিক্ষা করা আর নহ! তখন সে ক্রতপদে বাগানে নামিল; অককার ঈশ্বর রাজি—আকাশ কোমলসর আচ্ছন্ন, বরষের মতো কনকনে ঠাণ্ডা, তাহার তলে বাগানের ফোপকাড় অককার বাহাইয়া কালো কালো দৈত্যের মতো দাঁড়াইয়া আছে। মালতী একবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল একটা তার। পূর্ণ গগনে আশ্রনের মূলের মতো দপদপ করিতেছে, আর সমস্ত বিশ্বচরাচর ঈশ্বরের ভরে কোমলসর চানর মুড়ি দিয়া আকাশের অসংখ্য দেউটি নিবাইয়া নিশ্চিন্তনীরবে ঘুমাইতেছে। কোণাও জীবনের এতটুকু সাড়া নাই—গঙ্গার জল নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে অকগর সর্পের চিত্রণ কক্ষচন্দ্রের মতো স্থানে স্থানে ঐকমিক করিয়া উঠিতেছে। দীর্ঘের কালো জল প্রাকাত দৈত্যের বড় একটা চোখের মতো সমল দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে বেন তাহাকে চোখের ইসারায় ডাকিতেছে। মালতীর মনে হইল এমন জীবন্ত গঙ্গা থাকিতে পূর্বের ডুবিয়া মরিব কেন, জীবন দিব যদি ত জীবনশ্রোতেই ঢালিয়া দিব। সে ক্রতপদে গঙ্গার দিকে চলিতে লাগিল। হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে কিরিয় পলাহন করিল—অত তোরে কে একজন গঙ্গাস্নান করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিতেছে। মালতী এক দৌড়ে একেবারে বাগান

পার হইয়া বাহিরের
পড়িল।

পল্লীপথ নিরুদ্ভন নিঃশব্দ। মধ্যে মধ্যে
পথকুকুর চীৎকার করিয়া উঠিতেছে।
একাকিনী এই পথে চলিতে মালতী
গা ছমছম করিতে লাগিল, প্রতি পদ-
বিক্ষেপে বিপদের আশঙ্কা তাগকে সচকিত
করিয়া তুলিতেছিল, কিন্তু সে যে প্রেম-
নন্দের আশ্রম হইতে মুক্তি পাইয়াছে এই
স্বপ্নে তাহার নূতন বিপদের ভয়ও তুচ্ছ
বোধ হইতেছিল। সে জানে না কোথায়
সে যাইতেছে, কোথায় সে যাইতে চাহে।
তবু সে যে সকলের অজ্ঞাতমারে আশ্রম
হইতে বাহির হইয়া পড়িতে পারিয়াছে
ইহাতেই সে যেন মুক্তির আনন্দ পোষ
করিতেছিল, বাহিরের বাতাস হাফা বোধ
হইতে লাগিল, মাথ মনের ভোরের হিম-
তীত্র বায়ুর নিষ্ঠুর স্পর্শও তাহার নিকট
আশ্রমের আরাম-স্বা। অপেক্ষা স্তম্ভকর
বোধ হইতে লাগিল। সে যেন লঘুচরণে
উড়িয়া চলিতেছিল, পথের বৃক্শ শিশিরের
দানা ভাঙিয়া তাহার পায়ের দাগ যেন
মাটিতে পড়িতেছিল না।

সে জানে না কোন্ পথে কোন্ দিকে
যাইতে হয়—কোন্ পথ কোন্ অজানা বিপদের
দিকে না কানি তাহাকে লইয়া যাইবে।
তবু সে শুকতারটিকে সম্মুখে রাখিয়া
বরাবর ছুটিয়া চলিয়াছিল,—শুকতারটি
সম্মুখে রাখিয়া চলিলে সে ঘুরিয়া ফিরিয়া
বেধা-নই গিয়া পড়ুক আশ্রম হইতে দূরেই
চলিয়া যাউবে। মালতী উর্ধ্বদ্বাশে চলিতে
চলিতে এক-একবার ফিরিয়া ফিরিয়া

দেখিতেছিল কেহ তাগকে ধরিতে আসিতেছে
কি না, কেহ তাহার অঙ্গসংলগ্ন করিতেছে
কি না। তাহার মনে হইতেছিল এতক্ষণ
হঠক আশ্রমে ঠেঠে পড়িয়া গিয়াছে, হঠক
সকণে দলে দলে লঠন লঠিয়া তাহাকে
পুঁকিতে ছুটিয়াছে, তাহাঃ আসিল বলিয়া,
ধরিল বলিয়া। এতোক ঝোপঝাড় তাহাকে
চমকিত করিয়া তুলিতেছিল, পথের ধানে
সামান্ত একটু পল তাগকে আতঙ্কিত
করিতেছিল। বতট বিলম্ব তটতে লাগিল
ততট তাহার মনে হইতে লাগিল যে
অবেষণকারীরা এতক্ষণে হঠক তাহার পূর্ব
নিকটে আসিয়া পৌছিয়াছে, এমনি আসিয়া
তাহার তাহাকে ধরিলে, লাকনা করিয়া
টানিতে টানিতে তাহাকে আশ্রমে লঠিয়া
গিয়া অবরুদ্ধ করিবে, আবার পোনানন্দের
গল্পনা ও অযুক্ত ব্যাখ্যার সহ্য করিতে
হইবে। এই কথা বতট তাহার মনে
হঠ, ততট সে বিম্বণ বেগে ছুটিতে থাকে;
তাহার অনভ্যন্ত চরণ ক্রান্ত হইয়া বেদনার
ভাষাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কাণ্ডার কাঁকরে
কোবল চরণগুল কতবিস্কৃত হইয়া গিয়াছিল,
তবু তাগার গমনে বিরতি ছিৎ না।

ক্রমে কর্তা হইয়া আসিল। ক্রমে ক্রমে
অন্ধকারের ঘবনিকা পশ্চিমদিশে গুটাইয়া
যাইতে লাগিল। কোকিল জাগ্রত হইয়া
আস্তকুলে তস্ত্রাভিধি কঠে কুহসিয়া উঠিল,
দোরেল ভাষা কুলকুল শিশের একতান
ঝঝারে প্রভাতী বন্দনা গাহিতে লাগিল।
পথপার্শ্বে ঘানের ঐবে শিশিরকণাগুলি
অরুণচুখনে হাসিয়া উঠিল। কিন্তু তখনো
রাতার ধানের গাছগুল ঐতের অভিমায়

নিকেদেব পূর্ণাবসরনের মধ্যে আড়ষ্ট হইয়া
দাঁড়াইয়া কেবের বাড়িতে দাঁড়াইয়া বসিয়া
পাড়ার চালে চালে তখনো কুণ্ডলা কুণ্ডলা
লাকাইয়া দিবার চেষ্টা ছল, যেন বড় বড়
হাস্যভঙ্গি বসিয়া বসিয়া 'ডমে' হা দিতেছে।
তখনো কোনো গৃহে কাগজের লক্ষণ
পরিদৃষ্ট হয় না। ক্রমে পথে ছ'একজন
লোক দেখা যাউতে লাগিল। তাহারা
একজন অপরজন ক্রমশঃ একাকী হইতে
দেখিয়া কোতলী দৃষ্টিতে মালতীর দিকে
চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মালতী
আপনাকে যথাসম্ভব সমাবৃত্ত করিয়া কোনো
দিকে ক্রকোল না করিয়া চলিতে লাগিল,
কিন্তু বৃক্কের মধ্যে তাহার গুহ ভোগপাড়
করিতেছিল। ক্রমে ক্রমে রৌদ্র উঠিল;
পথের ধারে ধারে নন্দানী রোডে পিঠ
দিয়া অড়লু হইয়া বসিয়া সেবারকার
কনকনে শীত আর প্রচুর আমের ফলের
সম্ভাবনা প্রকৃতি স্বর্গকে আলোনা করিতে
আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু মালতীর আবির্ভাবে
তাহাদের আঁকু আগুন ধারিয়া যাউতে
ছিল, সকলেই অগাধ দৃষ্টিতে মালতীকেই
দেখিতেছিল এবং মালতী তাহাদিগকে
অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে না-হইতে
তাহার স্বর্গে কনকী কনকী অসুখান
আলোনা আরম্ভ করিতেছিল। মালতী
এসময়ই অসুখ্য করিতেছিল বসিয়া আপনাকে
লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকাইবার জন্য যাকুল
হইয়া উঠিতে লাগিল। একজন শিউলী
বাঁকের দ্বারা অনেকগুলি খেজুর-রসের
ভাবিয়া লইয়া একগাছের তলা হইতে অপর
গাছের তলার রসসংগ্রহের জন্য হনন

করিয়া চলিয়া গেল; তাহার পিঠেব দিকের
কোমরে কাপড়ের মধ্যে একখানা চাঁচনা
গোঁড়া; গলায় গাছে উদ্ভিদার জন্ত একগাছা
দাঁড় জড়ানো। সে বাঁকের বাহু বিস্তৃত
করিয়া সাতা জুড়িয়া চলিতেছিল, মালতী
একপাশ হইয়া তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল।
আর অগ্রসর হইয়াই মালতী একখানে
দেখিল কয়েকজন রমণী ঘেঁসাঘেঁসা বসিয়া
বোম পোতাটেতে পোতাটেতে পরস্পরের
মাথার উকুন নাড়িতেছে; একটি আশুপূর্ণ-
শর্মা বালিকা সম্পূর্ণ নগ্ন বোমের দাঁড়াইয়া
আছে, তাহার কোমরে একগাছা ঘুন্দি,
একহাতে একটি ধামিতে মুড়কি লইয়া
যাউতেছে, আর গীতে তাহার নীচের
ঠোঁটটি পরপর করিয়া কাপিতেছে; একটি
বালকের গায়ে দোলাই জড়ানো, গলায়
পিছনে গিট বাঁধা—অগ্ন্যধ-সুঁত্র মতো
নিম্বল দাঁড়াইয়া মধ্যে মধ্যে বালিকার
মুড়িমুড়িকর ধারিত দিকে লোপুণ দৃষ্টি
হানিতেছে। একটি শিশু উকুন-বাছিতে-
বাক জননীর হাতের পাশ দিয়া মাথা
গলাইয়া গুজপান করিতে লাগিয়া গিয়াছে;
নিকটেই একটা কুণ্ডল কুণ্ডলী পাকাইয়া
সুটরা, আর একটা বিড়াল লেজ খাড়া
করিয়া দোলাই জড়ানো ছেলটির গায়ে
গা বসিয়া বসিয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে
ঘর-ঘর লক্ষ করিয়া নিকেদেব একটুখানি
উক করিবার চেষ্টা করিতেছে।

মালতী দেখিল সমুদ্রেই রেল-লাইন।
তখন সে রাতা ছাড়িয়া রেল-লাইনে গিয়া
উঠিল এবং রেল-লাইন ধরিয়া টেমের
দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। হাতে তাহার

পরশা নাট, টেগেনে গিয়া কি হইবে, এ ভাবনা তখনো তাহার মনে উঠে নাই— সে শুধু ভাবিতেছিল, যেলে উঠিতে পারিলে আঁত সত্তর সে প্রেমহানদের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া যাইবে। সমুখে সুদূর-প্রসারিত রেল-স্টেশনগুলি সেন ভ্রাহাকে অজানার উদ্বেগে আচ্ছাদন করিয়া ইঙ্গিত করিতেছে। প্রত্যন্ত-রোজ্জ হিমসিক্ত রেলের উপর পড়িয়া চকচক করিতেছে, সঙ্কট-স্তরের মাংস লষ্ঠনের লাল সবুজ কাচে রোজ্জ লাগিয়া শোঁহিত চরিত্র হৃদয়মুর্তি চোপে ঝিলিক চানিতেছে।

এই-সব দেখিতে দেখিতে মালতী টেগেনের প্লাটফর্মে গিয়া উঠিল। অমনি তাহার দৃষ্টি পড়িল তাহার শিষ্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন প্রেমহানন্দ। মালতী তাহাকে দেখিয়াই ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল—এ ব্যাধবেষ্টিত হরিণীর জাগ্রৎ কোন্ পথে যে কোথায় পলাইবে তাহা খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

প্রেমহানন্দ তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন—মাধারানী, আমি তোমাকে চেনি; তবে কিম্ব, কিম্ব কি না, ঠিক নেই। তুমি কোথায় যাবে বল, যোগানন্দ টিকিট করে তোমায় সেই গাড়ীতে তুলে দেবে।

মালতী কণেক অবাধ হইয়া প্রেমহানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—আমি ... কান্দী—না, কলকাতা যাব।

প্রেমহানন্দ বলিলেন—বেশ, তাই হবে।

মালতীর আবির্ভাবে প্লাটফর্মে উপস্থিত যাত্রী বাবুস দলে সাড়া পড়িয়া গেল। যেমন

গরুর মাঝপান দিয়া টিমার চণ্ডী গেলেন তাহার আন্দোলন হই তটকে স্পর্শ করে, তেমনি মালতী বাবুদের জনতা ভেদ করিয়া বাইবার সমর ছুঁতেই জনগণে আন্দোলন নাচিয়া উঠিল। মালতী দৃষ্ট অটল গতিতে গিয়া মেয়েদের অপেক্ষা কক্ষ প্রবেশ করল।

কলকাতা বাইবার ট্রেন আসিলে যোগানন্দ মালতাকে মেয়ে-কামরাগ তুলিয়া টিকিট দিয়া গেল। মালতী জানালার ধারে বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল— রেল-লাইনের ধারে ধারে রেল-কর্মচারীদের, কুলিদের ও স্থানীয় বাসিন্দাদের বাসা ও বাড়ী; কোনো বাড়ীর জানালার একটি বধু দাঁড়াইয়া আছে, কোথাও ছেলেরা দাড়াইয়া খেলিতেছে, কোথাও গাছের তাল নারিকেল শজিনাঝুকে বেষ্টিত ভোগায় রমণীরা শ্রান করিতেছে, বাগান বাঁজিতেছে, জল্লা করিতেছে, কলহ করিতেছে; হেলের ধারে গুলিয়া কাজ করিতেছে। গাড়ী হুসহুস করিয়া প্রকাণ্ড অজগরের মতো এক দড় প্রাণের নোয়া উপরে বহন করিয়া ছুটয়া চলিতেছে, কিন্তু নিত্যকার ব্যাপার বলিয়া অভ্যাসবশত কেহই তাহার দিকে ক্রক্ষেপণ করিতেছিল না। দিগন্তবিস্তৃত মাঠে মাঠে বেগুন, কপি, মটর, আর মরিচ শস্যের ক্ষেত; গোলা ছাগল চরিতেছে, রাখাল গান গাতিতে গাতিতে পানিয়া চলিয়া গাড়ীর আরোহীদিগকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে এবং এই অর্থহীন আচরণেই অপখ্যাপ্ত কৌতুক তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে। মালতী দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছিল, সকলেরই আশ্রয় আছে, কাজ

আছে, আনন্দ আছে; সেই কেবল নিরাশ্রয়, জগতের কল্যাণ।

গাড়ীতে উপায়ে কত বাড়ী, বাগান, কত খামার, কলকারখানা বাগানবাগানের ছবি মতো ফণিকের জন্ত দর্শন দিয়া সে! সে! করিয়া সরিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে গাড়ী আসিয়া পিছলদেহে পৌছিল। একদিকে সমস্ত প্রাটফর্ম জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। আবার দেখিতে দেখিতে জনতা পাশলা হইয়া গেল। তখন মালতী নামিরা একপাশা টিকা গাড়ীতে, যে প্রথমে তাড়াতাড়ি ডাকিল তাহা হইল, ডাড়া টিক না করিয়াই চড়িয়া বসিল। গাড়োয়ান দরজা বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যেতে হবে?

মালতী বলিল—চোরবাগান।

গাড়োয়ান দুই হাতে ঘোড়ার গাশ আঁড়ড়াইয়া হেই হেই টকাস টকাস শব্দ করিতে করিতে ও পাখানিতে পা বসিতে বসিতে অশ্রিনীকুমার যুগলকে গমনে উৎসাহিত করিতে করিতে রওনা হইল।

গাড়ী নবকিশোরের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মালতী গাড়োয়ানকে গাড়ীর কড়া নাড়িতে বলিল। গাড়োয়ান গাড়ী চাইতে নামিরা বাড়ীর কড়া নাড়িতে লাগিল। নবকিশোর দরজা খুলিয়াই মালতীকে গাড়ীতে দেখিয়া সন্মুখে বলিল—মালতী! তুমি একলা?

মালতী নবকিশোরের মুখের দিকে কক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—হ্যাঁ, আমি চলে এসেছি।

—কেন? হয়েছে কি?

মালতী অত্যন্ত চম্ অত্যন্ত কমিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

নবকিশোর অবাক হইয়া মালতীর ক্রন্দন দেখিতে লাগিল; কি হইয়াছে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া একটিও সাহসের কথা বলিতে পারিতেছিল না।

বাহির হইতে গাড়োয়ান চীৎকার করিল—ওগো বাবু, দোরারি নামিয়ে লও না গো! আমি কি লাগে মোর খাড়া খাব?

নবকিশোর তাড়াতাড়ি গাড়ীর দরজা খুলিয়া মালতীকে বলিল—তুমি বাড়ীর ভিতর যাও।

মালতী নামিরা গেল। নবকিশোর গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল—কত ভাড়া?

গাড়োয়ান বলিল—কেতে ভাড়া আবার? আপনে কি কপেরা দো কপেরা দেবে না আমি ভি মানব? শিরালনা সে চোরবাগান ত বাসে আনা হিসাব ধরা আছে।

নবকিশোর বিকৃতি না করিয়া বাসে আনা পরস্য দিয়া গাড়োয়ানকে বিদায় দিল।

ইতাবসরে মালতী আত্মসংবরণ করিয়া মুখ মুছিয়া বসিয়া ছিল। নবকিশোর ফিরিয়া আসিয়া দেখিল মালতী সন্তপনাপ্ত-বর্ষণ সন্ধ্যাকীর মতো নীপ্ত বিষমতার প্রোতি-মুষ্টির স্তায় বসিয়া আছে। সে সসঙ্গমে জিজ্ঞাসা করিল—মালতী, বিলিন ভালো আছে ত?

মালতী মাড় নাড়িল। তখন নবকিশোর অধিকতর বিস্মিত হইয়া ধাঁধার পড়িয়া গেল। কি জিজ্ঞাসা করিবে টিক করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তবে তুমি একলা এলে যে?

মালতী গভীর ভাবে বলিল—আমি কাউকে বলে আসিনি।

এ উত্তরে নবকিশোরের নিকট সমস্তার সমাধান না হইয়া বরং সমস্তা অধিকতর জটিল হইয়া উঠিল। সে কিছুট ঠিক কবিত্তে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কাউকে না বলে একলা চলে এলে, ব্যাপার কি?

—গুরুজীর অত্যাচারে আমার লেখানে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

মালতী একে একে সমস্ত কথা সংক্ষেপে নবকিশোরকে বলিল। নবকিশোর তুমিরা ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল—বিপিনকে ঐ কথা জানাওনি কেন?

—জানাতে চেষ্টা করেছিলুম, তিনি শোনেন নি। তারপর গুরুর অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠতে কাল রাত্রে গঙ্গায় ডুবে মরতে গিয়েছিলুম, তাতেও বাধা পড়ল। মাসিমার কাছেই যেতুম, কিন্তু ঐদিকে প্রেমানন্দ যাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে যেতে সাহস বা প্রযুক্তি হল না। তাই আপনার কাছে পালিয়ে এসেছি। আপনি আমাকে মাসিমার কাছে নিয়ে আসুন।

গভীরভাবে নবকিশোর বলিল—পালিয়ে এসে কারটা ভালো করনি মালতী।

তোমার ফের আশ্রমে ফিরে যেতে হবে। বাহুবের মনের মধ্যে স্বাভাবিক একটা আত্ম-স্বপ্ন আছে, যাতে করে সে সহজে শান্তিকে খাঁটিয়ে গভোগোল বাধাতে চায় না; সেইজন্তে সে জেনে শুনেও মিথ্যাকেও সহজে অস্বীকার করতে চায় না। বিপিনের এই বিশ্বাস তোমাকেই ভাঙতে হবে।

মালতী রুদ্ধশ্রুণী হইয়া বলিল—আপনিও

আমার ত্যাগ করবেন? তবে কি আমার সূত্রা ভিন্ন আর গতি নেই?

নবকিশোরের চন্দ্রবীণার প্রণয়তন্ত্রী কোমল পর্দার আঘাত করিয়া মালতীর এই কথা কটি একটি করুণ রাগিণী ধ্বনিত করিয়া তুলিল। নবকিশোর বলিল—বিপিনকে ছেড়ে গেলে, বিপিনের সঙ্গে মিলনে তোমার বাধ্যত ঘটবে।

হত্যাশয় করুণ রাগিণী বাজাইয়া মালতী বলিল—সে আশা সে আকাঙ্ক্ষা আমার আর নেই। কোথাও একটু নিরুপদ্রবে থাকতে গেলে বেঁচে বাই। আপনি আমার মাসিমার কাছে রেখে আসুন।

—আশা আকাঙ্ক্ষা নেই, সে মিথ্যা কথা, আশা আকাঙ্ক্ষা আছে বলেই অস্তিম্যান জন্ম হইল। এই উপদ্রবের ভিতর দিয়েই নিরুপদ্রব হবার সুচনা হয়েছে। একদিন না একদিন বিপিনের মোহ কাটবে, ...সেদিন পর্যন্ত বৈধব্য ধরে তোমার বিপিনের কাছে থাকতে হবে।.....তুমি মরতে পাবে না, পালাতে পাবে না, সকল অত্যাচার থেকে আপনাকে রক্ষা করে বিপিনকে সেই-সব অত্যাচারের আঘাত দিয়েই সচেতন করে তোলা তোমার এখনকার কর্তব্য হবে।.....এই বে তুমি আমার কাছে এসেছ, এতে তোমার কাজ অনেকখানি শিখিয়ে গেল। তাঁর তুল করেছ, তুমি চলে না এসে যদি বিপিনকে আর-একবার একটা নাড়া দিয়ে দিতে তাহলে এতক্ষণে তার সকল মোহ ঝরে পড়ত; তোমরা দুজনে একসঙ্গে আমার কাছে এসে হেসে বলতে পারতে, বহু, অনেক তুফান

কাটিয়ে আদরা আজ মিলতে পেরেছি।
.....আসবে সেদিন শীগগির আসবে, তুমি
কিছু ভেব না। এখন চণ। আর বিলম্ব

নয়।.....তোমার খাওয়া হয়নি, না ?
চট করে দান করে খেয়ে নাও, আমি গাড়ী
ডেকে আনি। (আগামী বারে সমাপ্য)
চাক বন্দোপাধ্যায়।

বঙ্গালার ইতিহাস*

(আলোচনা)

বোধ হয় বর্গীর রাজকৃত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই সর্বপ্রথম স্বাধীন গবেষণার আশ্রয় লইয়া বঙ্গালার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ইতিহাস ছাড়া আর বস্তুগুলি বঙ্গালার বা ভারতবর্ষের ইতিহাস বঙ্গভাষার দৃষ্টে হইতে তাহাদের প্রায় সকলগুলিই ইংরেজী পুস্তকের তরজমা। ইদানীং বঙ্গীয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বদেশের প্রত্নতত্ত্ব আলোচনার অধিকতর মনোযোগ দিয়াছেন। তাঁহাদের এই সাধনার ফলস্বরূপ সম্প্রতি হুইথানি ইতিহাস-এই প্রচারিত হইয়াছে। একখানি ত্রিযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র প্রণীত গোড়-রাজমালা, অপরখানি এই আলোচ্যমান রাখাল বাবুর বঙ্গালার ইতিহাস।

যে সকল বঙ্গালী প্রত্নতত্ত্বাহসিকানে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ত্রিযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রাচীন লিপিসিদ্ধার

একজন প্রকৃষ্ট পণ্ডিত, কাজও করেন প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে; ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম এবং বঙ্গীয় এতিহাসিক সোসাইটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত। এতাদৃশ ব্যক্তি ইতিবৃত্ত প্রণয়নে হস্তার্পণ করিলে তাহা যে অতি শোভন হইবে এটা বলাই বাহুল্য।

আলোচ্য পুস্তকখানিকে রাখাল বাবু যদি “বঙ্গালার ইতিহাস” না বলিয়া “ভারতবর্ষের ইতিহাস” বলিতেন, তাহা হইলেই বোধ হয় বদার্থ কথা বলা হইত। তিনি যেভাবে ভারতমণ্ডল শিলালিপি ইত্যাদির আলোচনা করিয়াছেন, তাহা আর একটু বাড়াইলেই সমগ্র ‘ভারতের প্রাচীন ইতিহাস’ রূপে এই গ্রন্থ পরিগণিত হইতে পারিত। ভিক্টোরেট এ, শিখ কৃত আলি হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া (প্রাচীন ভারতের ইতিহাস) গ্রন্থে ইহার অধিক হু-একটি অধ্যায়ে হুই চারিটি বেশী কথা বলা হইয়াছে মাত্র। ত্রিযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র মহাশয় গোড় রাজমালায়ই সংক্ষেপে বঙ্গ (গোড়-মণ্ড) রাজ্যের ঐশ্বর্য

ইতিহাস লিখিয়াছেন; সুতরাং এক্ষেত্রে না চলিয়া রাখালাবাবু বিস্মৃততর ক্ষেত্রে পিচরণ করিলেই ভাল হইত।

স্বদেশের ঐতিহাসিক উপকরণ সম্বন্ধে তিনি উদারতা দেখাইতে পারেন নাই। যে মহাগ্রন্থ উপলক্ষ করিয়া “ইতিহাস” শব্দটি সংস্কৃত অভিধানে ব্যবহৃত হইতেছে সেই মহাভারতেরই ঐতিহাসিকতা তর্কের বিষয় মনে করিয়া রাখালাবাবু উহা পরিহার করিতেছেন। (১) ইতিহাস শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই; “ইতিহ” পারম্পর্য্যোপদেশ অর্থাৎ লোকপরম্পরা। যাহা চলিয়া আসিয়াছে। “আস” আসন, স্থান। ব্যাভ্যন্তে লোক-পরম্পরাগত উপদেশ স্থানলাভ করিয়াছে। রাখালাবাবু গোড়ামি করিয়া ইতিহাসের এই শাস্ত্রিক অর্থ গ্রহণ করিবেন, অথবা মহাভারতের অমুখ্য-বিসর্গকেও আধুনিক ‘ইতিহাস’ বলিয়া গণনা করিবেন, তাহা আমি বলিতেছি না। কিন্তু শুধু তর্কের বিষয় বলিয়া মহাভারতকে বর্জন করিবেন, এটা তাঁহার কাছ হইতে আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি নাই। স্বর্গীয় বন্ধিমক্সে চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনা উপলক্ষে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন রাখালাবাবু অবশ্যই তাহা দেখিয়াছেন। তবে অন্ততঃ বন্ধিমবাবুর মতটায় অসমীচীনতা দেখাইয়া দিয়া এইরূপ বর্জন করিলে শোভন হইত। মহাভারতেরই বখন

এই অবস্থা, ‘পুরাণ’ও যে রাখালাবাবুর নিকট সমাদরণীয় হইবে না, তাহা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত নহে। (২) কিন্তু সুখের বিষয়, পুরাণেও যে ইতিহাসের উপাদান আছে, আধুনিক অনেক প্রাক্তব্যাহুসন্ধারী কর্তৃক ইহা স্বীকৃত হইতেছে। তারপর অ্যামিতির বৃত্ত:সিঙ্কের স্তায় রাখালাবাবু—কেবল তিনি কেন, ইংরেজী-লিখিত প্রায় সকলেই—স্বীকার করিয়া লইতেছেন যে এই ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক পূর্বে ছিল না। আধ্যাত্মিক মধ্য এশিয়া—অথবা বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী কিংবা এতাদৃশ অপর কোনও স্থান হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে লক্ষ্যপ্রবেশ হইয়াছে। এটা ভাবাতঙ্ক-আলোচনাকারি-গণের অমুমান হইতে প্রচারিত হইয়াছে—কোনও শিলালিপি, তাম্রশাসন, মুদ্রা, গ্রন্থ ইত্যাদিতে এ বিষয়ের যুগ্মকরেও উল্লেখ নাই। বরং এদেশের বেদ পুরাণ ইতিহাস সংহিতা প্রভৃতিতে ইহার বিপরীত কথাই পাওয়া যায়। এতদিন একতরফা বিচারই চলিতে ছিল। সুখের বিষয় অধুনা স্টুন্টা দিক্টার আলোচনাও হইতেছে, এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস শাহিড়ী মহাশয় প্রমুখ হই একজন লেখক ভারতবর্ষে যে আধ্যাত্মিকতার সনাতন আবাসভূমি তাহা প্রমাণিত করিতেছেন। আমরা সবিনয় অনুরোধ, রাখালাবাবুর স্তায় মনস্বী ব্যক্তিগণও কেবল ইংরেজি গ্রন্থকার-গণের কথা উদ্ধৃত না করিয়া বরং

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস, পরিচিষ্ট (ক) ২৬ পৃষ্ঠা

(২) পরিচিষ্ট (খ) ৪৬পৃঃ। রাখালাবাবু প্যারিটর সাহেবের প্রচ্যোদিত পুরাণের মাত্র দুইটি লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। বরং সেদিকে যান নাই।

দুইপক্ষ দেখিয়া বাহা হয় একটা মীমাংসা করিবে। (৩)

একটি দ্বিতীয় কথা এতৎসম্পর্কে এখানে বলি। পৌণ্ড জাতির প্রাচীনত্ব স্বর্ধে রাখালবাবু বলেন, “ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও মানব ধর্মশাস্ত্রে পুণ্ড জাতির উল্লেখ আছে।” পাদটীকার বলেন, “মানব ধর্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের অন্তর্গত যে সকল ক্ষত্রিয় জাতির বৃহলত্ব প্রাপ্তি হইয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে পৌণ্ড গণের নাম আছে।” (৪) সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই—

“নবৈকন্ত ত্রিরাশোলোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ
বৃহলত্বং গতা লোকং ব্রাহ্মণ্যর্পণেন চ।”

দেখা গেল ব্রাহ্মণ্যর্পণ এবং ক্রমে ক্রমে ত্রিরাশোলোপ হইয়া পৌণ্ড প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জাতি বৃহলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহাতে অনেক পূর্বে আর্থ্যনিবাগ ও আর্থ্যোচিত সংস্কারাদির সত্তা ঐ সকল জাতিতে বা ভগ্নস্থাবিত স্থানে ছিল বলিয়াই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না কি? নতুন নতুন: ‘ত্রিরাশোলোপ’ হইতে যে কত সময়ের প্রয়োজন তাহাও ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয়। ভারতীয় আর্থ্য সত্তাতার এই আকৃষ্ণ-প্রসারণের স্পষ্ট নিদর্শন পূর্ব-ভারতীয়-বৌদ্ধপুত্র ও তৎ সমীপস্থ এশিয়ার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে আজও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না কি?

রাখালবাবু সমতট, শিলিচটল কমলাক প্রভৃতির অবস্থান স্বর্ধে বাহা নির্ধারণে, তাহার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। তিনি, “সমতট যদি বর্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম হয়” (৫) এই বলিয়া ফুটনোটে শ্রীমন্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের যে ইহাই মত তাহা বলিয়াছেন। নলিনীকান্ত বাবুর লিখিত এসিয়াটিক সোসাইটির প্রবন্ধ পড়ি নাই। কিন্তু তল্লিখিত “পূর্ববঙ্গের একটি বিস্তৃত জনপদ” নামক প্রবন্ধ পড়িয়াছি। তাহাতে তিনি বলেন, “বর্তমান ত্রিপুরা নোয়াখালি বরিশাল ফরিদপুর এবং ঢাকা জেলা লইয়া এই (সমতট) রাজ্য গঠিত ছিল। বলিয়া বোধ হয়। কুমিল্লার নিকটবর্তী কন্দাক্ত নগর এই বৃহৎ রাজ্যের রাজধানী ছিল।” (৬) অতএব রাখালবাবু ঠিক বাহা বলিতে চান, নলিনীবাবু তাহা বলেন নাই। বাহা হউক এখানে নলিনীবাবুর অভিমত স্বর্ধেও আমার যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি।

“শিলিচটল” ও “কমলাক” স্বর্ধে ইউরান্ চুয়াং বলেন যে, শিলিচটল সমতটের পূর্কোত্তর ভাগে অবস্থিত ছিল এবং কমলাক শিলিচটলের দক্ষিণপূর্ক ভাগে ছিল। শিলিচটল ও কমলাক উভয়ই সমুদ্রের তীরে পর্শতমর ভূভাগে অবস্থিত। ইউরান্ চুয়াং

(৩) শিক্ত ব্যক্তিগণ বোধ হয় এই মতটিতে একটা আশ্বাসের হেতু পাইয়াছিলেন: আফ্রিকা-আমেরিকার ইউরোপীয় উপনিবেশকারিগণ তদেবীয় প্রাচীনতর অধিবাসীদিগকে “নেটিভ” বলেন—আমরা ভাবুন “নেটিভ” বহি—আমরাও অস্তিত্ব ব্রাহ্মীরা প্রভৃতিতে তাড়াইয়া দিয়া এখনো উপনিবেশ হইয়াছি।

(৪) বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ১১—৩৮ পৃঃ।

(৫) বাঙ্গালার ইতিহাস, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৪৮ পৃষ্ঠা।

(৬) প্রতিকা, ৩য় বর্ষ, ১২ম সংখ্যা, ৩৮২ পৃঃ।

এইরূপ বলাতেই একদল প্রত্নতাত্ত্বিক সমুদ্র-
ভটস্থ নিয়ন্ত্রণে উদ্ভাসের স্থান নির্দেশ
করেন। কিন্তু ওয়াটার্স সাহেব বলেন,
তাহা হইলে সমুদ্রের “পূর্বদিক” বলা
ইউরান্ চুয়াংয়ের উচিত ছিল; কিন্তু
এ পর্যন্ত বতগুলি পাঠ আছে সমুদ্রই
একথাকো “পূর্বোক্ত” নির্দেশ করিয়া
থাকে; অতএব ইহা বর্তমান ত্রিপুরা জেলা
হইবে। (৭) ওয়াটার্স সাহেবের এই
উক্তি ভিন্নমন্তব্য সমর্থন করিয়াছেন। (৮)
কিন্তু ওয়াটার্স সাহেব প্রকৃত স্থানের
কাছাকাছি গিয়াছেন মাত্র। শিলিঙেল দ্বারা
বস্তুতঃ ঘাটা বুঝার বর্তমান ত্রিপুরার উত্তরার্ধ
মতরণগুলি বা সরাইল পরগণা সেই
খ্রীষ্টের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। ৮ রাজকুমার
মুখোপাধ্যায় ও ৩ কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রভৃতির
এই মতই ছিল; এবং ইহাই সমীচীন মত।
এ বিষয়ে পূর্বেও অল্পতালি বলায়, (৯)
এখনও এখানে বলি, যে চীনদেশীয়
পরিব্রাজকের নিকট “খ্রীষ্ট” এই কট-মট
গোছের নামটি ‘খ্রীষ্ট’ বলিয়া প্রতীত
হইয়াছিল—ভালা আবার চৈনিক অক্ষরে
শি-লি-চ-ট-ল রূপে লিখিত হইয়াছিল।
তবে খ্রীষ্ট সমুদ্রতীরবর্তী হইল কিরূপে ?
এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। রবার্ট লিওসে

নামক জনৈক ইংরেজ ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে
রেন্ডিভেট ও কালেক্টরের পক্ষে নিযুক্ত
হইয়া ঢাকা হইতে কর্ণওয়ালিস সাহেবের সমুদ্র
পথের বে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে আছে—

“In passing my boat towards Sylhet,
I had recourse to my compass, the same
as in sea and steered a straight course
through a lake not less than one hundred
miles in extent”. (১০)

মাত্র একশত পনেরো বৎসর পূর্বের
এই কথা। ইহারও প্রায় ১১২৫ বৎসর পূর্বে
কি অবস্থা ছিল, একবার ভাবিয়া দেখুন।

এই খ্রীষ্ট রাজ্য তখন বহুবিস্তৃত
ছিল। বর্তমান ময়মনসিংহের পূর্বাংশ এবং
ত্রিপুরার উত্তরাংশ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল।
এই বিস্তৃত রাজ্যের দক্ষিণপূর্বদিকে
“কমলাক” প্রদেশ ছিল। ইহাও একটা
উপদাগরের তীরস্থ বলিয়া ইউরান্ চুয়াং
বলিয়া গিয়াছেন। ইহার উত্তরস্থ খ্রীষ্টের
যখন ঐ অবস্থা ছিল, এই কমলাক অর্থাৎ
“কোমিল্লা” রাজ্যেরও যে তাদৃশ বীণা ছিল না,
এ কথা বলা যায় না। (১১)

প্রাচীন পুঁথিতেও এই “কমলাক”
রাজ্যের ঐ অঞ্চলে অবস্থানের প্রমাণ
পাওয়া যাইতেছে। খ্রীষ্ট নলিনীকান্ত

(৭) Watter's Yuang Chwang, Vol ii. pp. 188-89.

(৮) Watter's Yuang Chwang, Vol ii. p. 340.

(৯) বিজয়, আশা, ১৩২০, ৬৩০ পৃষ্ঠা।

(১০) Lives of the Lyndsays (খ্রীষ্টের ইতিবৃত্ত হইতে উদ্ধৃত)।

(১১) এবার বক্তার যে দৃষ্ট বোঝা গিয়াছে প্রায় ১২১৫ বৎসর পূর্বে ঐ অঞ্চলের বাতাত্ত্বিক অবস্থা যে
এইরূপই ছিল তাহা অনুমানিতঃ বলা যাইতে পারে।

ভট্টাণালী কর্তৃক সম্পাদিত ময়নামতীর
গানে দেখা যায়—

বাগের মিশ্রণ এড়ি যাইবু পৌড়ির নগর।

দাবার মিশ্রণ এড়ি যাইবু কংলাকনগর। (১২)

এই ‘কমলাক’ যে ‘কমলাক’, মলিনী
বাবু তদীর ‘ময়নামতীগানের ভূমিকাত্ত’
তারা বলিয়াছেন। ফলতঃ ‘কোমিল্লা’ই যে
‘কমলাক’ তদ্বিধের সম্ভব থাকিতেছে না।

তবে অবাগের হইলেও এখানে মলিনী
বাবুর একটি কথাই আলোচনা করিতে
হইতেছে। তিনি কোমিল্লায় ১২ মাইল
পশ্চিমাহিত বড়-কামতা নামক স্থানটিকে
‘কমলাক’ নগররূপে আবিষ্কার করিয়াছেন
এবং ইহাকেই সমতটের রাজধানী বলিয়া-
ছেন। আমার বোধ হয় এই ‘কমলাক’
‘কমলাকেশ’ই রূপান্তর—এস্থান হইতে হরত
কমলাক নগর স্থানান্তরিত হইয়া নিকটস্থ
কোমিল্লায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

ঐন্দ্রকুমার মলিনীকান্ত ভট্টাণালী সমতটকে
একটি বিশাল রাজ্য বলিয়াছেন—যাহা
বর্তমান বঙ্গপ্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।
তাহার রাজধানী এমন একটা প্রান্তভাগে
হইবার বিশেষ কারণ আছে কি? তিনি
ই-চিং-কবিতা সমতট-রাজ্যের ভাষ্যপাঠন
বিশেষে উল্লিখিত “রাজভট্ট” ও কাম্বোজরাজ
“রাজভট্টকে” একই ব্যক্তি মনে করিয়াছেন।
কিন্তু দুইটি কথা এখানে বিবেচ্য; ১ম

ইচিং যে নামটি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন
তাহা বহু অংশে “রাজভট্ট” হইয়াছে।

“Iching who uses our pilgrim's (Yuang-
chwang's) transcription of the name,
merely places the country (sancatata)
in East India. He calls the king at
his time 'Hoh-to-she-po-ta' which M.
Chavannes restores as Hatshabbata but
the first three characters are as he states
used to express Raja, and the king's
name was probably "Rajabhata." (১৩)

ইউয়ান চুয়াং অবশ্যই ‘হোলশে’ অর্থাৎ
হর্ষ নাম ‘রাজা’ শব্দ বুঝাইতেন; কেননা
তখন ভারতবর্ষের রাজা হর্ষই ছিলেন। কিন্তু
ইচিং সকল বিষয়ে ইউয়ানের অনুকরণ
করিলেও সাহসিক্যের কেরাণ্ডির জায় রাজা
অর্থে ‘হর্ষ’ লিখিবেন কেন? বিতীর্ণঃ, যদিই
বা ইচিং এর সময়ে সমতটের রাজার নাম
রাজভট্টই ছিল, তথাপি তিনি এবং
কাম্বোজরাজ প্রবক্তাশাসনে উল্লিখিত ‘রাজভট্ট’
যে একই ব্যক্তি তাহার প্রমাণ কোথায়?
মলিনীবাবু প্রধানতঃ অক্ষরের সাপেক্ষ
দেখিয়াই কাম্বোজের রাজভট্টকে ইচিং-এর
সমসাময়িক বলেন, কিন্তু এই সাপেক্ষ সত্ত্বেও
হর্ষের ফলকের সঙ্গে কাম্বোজের ফলক
পতাধিক বৎসর অগ্র-পশ্চাৎ হইতে
পারে (১৪) এবং সমতটের প্রবল

(১২) অতিভাষ্য প্রকাশিত ময়নামতীর খান ৬ পৃষ্ঠা। (অজ্ঞোনিখিত ‘পৌড়’ ও সন্নিকটে ‘শ্রীহট্ট’ রাজ্যের
একাংশ ছিল।)

(১৩) Watter's Yuang Chwang, Vol p. 188.

(১৪) ইয়াও স্রবণ রাখা কর্তব্য যে সমতটের কেন্দ্রস্থান আধাব্যবর্তের মধ্যভাগে অক্ষরাদির পরিবর্তন
যেতন সর্ব হইয়াছে পূর্বতম প্রাপ্তচিত্র স্থানবিশেষে তাহা না হইতে পারে। কাছাড়ের দিলদাহিতে
আজও এমন অক্ষর দেখা যায় যাহা হরত কলিকাতাতে সতবর্ষ পূর্বে অদলিত ছিল।

পরাক্রান্ত রাজতটের নামে কৰ্ম্মান্তের
রাজকুমারের নামকরণ হওয়াও বিচিত্র নহে।
বিখ্যাত সমুদ্রগুপ্তের দেখাদেখি কামরূপ-
রাজ 'সমুদ্র'বর্ষার নামকরণ হইয়াছিল।
বিশেষতঃ পূৰ্ববঙ্গের আদি প্রতাপাসক
(১৫) গঙ্গামোহনবাবু এবং ডাঃ রাজেন্দ্রলাল
মিত্র একবাক্যে এই শাসনকালকে 'অষ্টম
শতাব্দীর বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।
যাউক; আমার বক্তব্য বলিবার।
আশা করি রাখালবাবু এবিষয়ে একটু
মনোযোগ প্রদান করিবেন। তিনি অগ্ৰজ
(১৬) লিখিয়াছেন, "সমুদ্রটের পূর্বে শ্রীক্ষেত্র
(বর্তমান প্রোম) কমলাতর (বর্তমান পেঙ্গ)"
ইত্যাদি। লিঙ্কান্য এই যে প্রোম 'পেঙ্গ'
এগুলি কি কোমিল্লার পূর্বে? অতএব
তাহারই উক্তিতে 'সমুদ্র' কোমিল্লা হইতে
পারিতেছে না।

প্রকৃতবে কলনা অমুমান ইত্যাদির কার্য-
কারিতা খুবই আছে এবং থাকিবেও। তবে
সেগুলি সঙ্গত হওয়া চাই। এই তুমিকা দিয়াও
আমাদের এই একটি আনুমানিক কথা
আজ বলিতে হইল—অসঙ্গত হইলে আশা
করি প্রত্নতাত্ত্বিক মহাশয়গণ উদারতাগুণে
মার্জনা করিবেন। কমলাতরের পূর্বে
ইউরান চুয়াং "তলপতি" এবং তৎপূর্বে
"ইশাংনোপুল" প্রবেশের কথা জানিতে
পাইয়াছিলেন। (১৭) কমলাতরকে কৰ্ম্মান্ত

—কোমিল্লার সঙ্গে এক করিলে তাহার
পূর্বাংশে ত্রিপুরা রাজ্য—পাওয়া যায়।
তৎকালে যে টহা ছিল, ত্রিপুরানদী তাহার
প্রমাণ। আজ ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে চলিতেছে
অর্থাৎ '৫৯০' খ্রিষ্টাব্দে টহা আরম্ভ হয়। অতএব
'তলপতি' ত্রৈপুরপতির রাজ্য ত্রিপুরা হইতে
পারে কি না একটু ভাবিয়া দেখা উচিত নহে
কি? তৎপরে টহার পূর্বে "ইশাংনোপুল"
মণিপুর রাকোর "বিজুপুর" হইতে পারে
নাকি? ত্রিপুরা রাজ্য তখন লুপাই পাহাড়
নিধা অবস্থিত ছিল—তাহার পূর্বে মণিপুরের
সংস্থান বটে। এই বিজুপুরের অস্তিত্ব
আমরা একসম্প্রদায় মণিপুরী হঠতে
পাইতেছি—উদাহরণে তাহা 'আর্বাগকি'।
ডাঃ ত্রিয়ারসন ডব্লী "লিঙ্গুইস্টিক্ সার্ভে
অব্ ইন্ডিয়া" গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—

(১৫) ইহা বলিনোবাবুর প্রস্তাব বিশেষণ; কিন্তু ৮১কলাপচন্দ্র দিঃহ প্রত্নতত্ত্ব উপর অবিচার হয় নাই
কি?

(১৬) বাঙ্গালার ইতিহাস পঞ্চম পরিচ্ছেদ ২০ পৃ:

(১৭) Watter's Yuangh Chwang Vol ii p p 487-88.

আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস এই বিক্ষুণ্ণ মলিপুৰেৰে এটোন ৰাজধানী। (১৯) এবং তাই ইউরান চুয়াং বিক্ষুণ্ণেৰে কথা শুনিয়াছিলেন।

ঐগুস্ত ৰাখালবাবু অহুগ্ৰহ কৰিয়া তদীয় ইতিহাসে ভাৱ-বৰ্ণাৰ কৰ্ণহুৰ্ণ অধিকাৰ সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্ৰ লেখকেৰ নামেও গ্ৰহণ কৰিয়া স্বভাৱসিদ্ধ উপাৱতা প্ৰদৰ্শন কৰিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও আমাৰ ঘাৰা বক্তব্য আছে, সবিনয়ে বলিতেছি। তিনি বলেন—

নিধানপুৰেৰ (২০) আবিষ্কৃত ভাৱ-বৰ্ণাৰ ভাস্কৰ্য্যাদি দেখিতে পাওৱা যায় যে উক্ত ভাস্কৰ্য্যাদি কৰ্ণহুৰ্ণ বাস হইতে প্ৰস্তুত হইয়াছিল। ইহা হইতে ঐগুস্ত (এই লেখক) অনুমান কৰেন যে কৰ্ণহুৰ্ণ তৎকালে কামৰূপ ৰাজ্যেৰ অন্তৰ্ভুক্ত ছিল। * কিন্তু এই অনুমান বৰ্ণাৰ বলিয়া বোধ হয় না। স্বৰ্ভাৱ বা বাসক শব্দে ৰাজধানী বুজায় না। সম্ভৱতঃ ভাৱ-বৰ্ণাৰ

শৰাৰেৰে সহিত বীৰ্য্যকালব্যাপী যুদ্ধেৰ সময় কৰ্ণহুৰ্ণ অধিকাৰ কৰিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে নিধানপুৰে আবিষ্কৃত ভাস্কৰ্য্যাদি প্ৰস্তুত হইয়াছিল। যুদ্ধৰ সময়ত ভাস্কৰ্য্যাদি প্ৰদানৰ আৰম্ভ হুই একটি উপাৱতা ইতিহাসে দেখিতে পাওৱা যায়। গহড়বাণ-বংশীয় ৰাজকুমাৰ-ৰাজ গোবিন্দচন্দ্ৰ ১২০২ বিজয়মাৰ্গে যুদ্ধ-পৰিৱেত গজাৱান কৰিয়া ঐশ্বৰ ঠাকুৰ নামক জনৈক ভাস্কৰ্য্যকে একখানি আম দান কৰিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্ৰ এই সময়ে নিচৰাই যুদ্ধাভিযান উপলক্ষে যুদ্ধপৰিৱেত বা যুদ্ধেৰে আৱিৰ্ভাৱছিলেন। কাৰণ, অজ্ঞান তখনও গহড়বাণ ৰাজ্যেৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় নাই। (২১)

“কৰ্ণহুৰ্ণ তৎকালে কামৰূপ ৰাজ্যেৰ অন্তৰ্ভুক্ত ছিল” এ কথা আমি বলি নাই। “তৎকালে” বোৱা ৰাখালবাবু যেন হৰ্ষ বৰ্দ্ধনেৰ কালে বুজাইয়াছেন—আমি তাহাও বলি নাই। বোৱা বলিয়াছি নিজে উদ্ধৃত কৰিতেছি—

“হৰ্ষবৰ্দ্ধনেৰ যুদ্ধাৰ পৰে সেই বিপ্লবেৰ সময়তই হউক বা চৌমদুতৰ সাহায্যেৰে প্ৰতিদানস্বৰূপেই হউক, তৎকালে ভাৱ-বৰ্ণাৰ হাতে কৰ্ণহুৰ্ণ ৰাজ্যটি পড়িয়াছিল, এটা আমৰা অনুমান কৰিতে পাৰি।”

(১৮) Dr. Grierson's Ling. Surv. of India, Vol. V, part I, p. 419.

(১৯) এ বিষয় অত্যন্ত বৰ আলোচনা কৰিয়াছি তাই এখানে উল্লেখ কৰিলাম। Vide Mr. Gait's History of Assam—a critical study. Hindustan Review, 1908 Feb'y. p. p. 106-198.

(২০) ছানটীৰ প্ৰকৃত নাম নিধানপুৰ।

(২১) বাঙ্গালীৰ ইতিহাস, পঞ্চম পৰিচ্ছেদ ২০—২১ পৃঃ

“কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল” টিক্‌ এট বাক্যটি আমি বলি নাই বটে, কিন্তু উহা বস্তুতঃ কামরূপের অধীন হইয়া পড়িয়াছিল বই কি? কর্ণহুবর্ণ ভাস্করবর্মান “রাজধানী” না হইতে পারে। ইংরাজীতে বাহ্যকে “কেম্প” বলে কর্ণহুবর্ণ তাহাই হইয়াছিল। লর্ড হার্ভিং ‘আল’ গোহাটি আসিয়া যদি একটা আদেশবাক্য প্রচার করেন তবে তাহা “কেম্প গোহাটি” হইতেই বাহির হইবে—তুঙ্গপ ভাস্করবর্মানও স্বাক্ষার কর্ণহুবর্ণ বাসক হইতে দানপত্র প্রচারিত হইয়াছিল। ইহাতে আপত্তির স্থল কোথায়? শশাঙ্ক ও ভাস্করবর্মান যুদ্ধের সময়ে এই শাসনপত্র জারী হয়, এটাও মানিতে পারি না। কর্ণহুবর্ণ শশাঙ্কের জীবিত অবস্থায়—ভাস্করের দূরে থাকুক—হর্ষের হস্তেও পতিত হইয়াছিল কি না সম্ভেদ! শশাঙ্ক সম্বন্ধে রাখালবাবু বিশেষজ্ঞ—সুতরাং তাহার প্রতিবাদে কিছু বলিতে বাধ্য অতিসাহসের কথা। কিন্তু শশাঙ্ক সম্বন্ধে আমার যে ধারণা তাহাতে বোধ হয় যে ভাস্কর, শশাঙ্ককে ব্যাঘ্রের জায় ভর্য করিতেন এবং হর্ষবর্দ্ধনও শশাঙ্ক না মরা পর্যন্ত আত্মাৎকটে একছত্র সম্রাটরূপে নিজেকে পরিগণিত করিতে পারেন নাই। দেই মহাবীর শশাঙ্ক যে গ্রাণ থাকিতে যুদ্ধে বিমুখ হইয়া কর্ণহুবর্ণ ছাড়িয়া পলাইয়া ছিলেন এটা অবিদ্যাস্য কথা। এবং যুদ্ধেও

যে তিনি মরেন নাই, ইউরান চুয়াংই তাহার সাক্ষী। একথা অন্যত্র বলিয়াছি। (২২)

রাখালবাবু দৃষ্টান্তরূপ ‘গড়ফালের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের যে নকীর দিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে এইমাত্র বক্তব্য যে রাখালবাবুর কথা আমি বিশ্বাস নাই। তিনি উদ্ধৃত অংশে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, “অবশেষে কখনও গড়ফাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই” অথচ একাদশ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন, “১২০২ বিক্রমাব্দে গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গদেশের (২৩) ক্রিয়দংশ অধিকার করিয়া মুলাগিরি বা যুদ্ধের পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। উক্ত বর্ষে দৈশ্যাপ নামের তুঙ্গপক্ষে অক্ষয় তৃতীয়ায় গোবিন্দচন্দ্র মুলাগিরিতে গঙ্গাস্নান করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণকে একপানি গ্রাহ্য দান করিয়াছিলেন। এই তান্ত্রশাসনময় গোবিন্দচন্দ্রকর্তৃক মগধ ও অন্ধ অধিকাংশের স্পষ্ট প্রমাণ। গোবিন্দচন্দ্র বোধ হয় পালবংশীয় নরপালগণের সাহায্যার্থে মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশ অধিকৃত হইলে তিনি উহা পালরাজগণকে প্রত্যর্পণ করেন নাই। (২৪)

রাখালবাবুর কোন কথা গ্রহণ করিব? একটা রাজ্য যদি ব্রুটিশ সম্রাটের দখলে আসে, তবে উহা অবশ্যই তদীয় রাজ্যের অর্থাৎ ব্রুটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তই হইয়া পড়ে। তবে রাখালবাবু যদি কপার মার-পেচ খেলান, সে বস্তুর কথা। ক্ষুদ্র বৃত্তিতে আমরা তাহার এই দুই স্থলের উক্তিতে অসামঞ্জস্য

(২২) বিজয়া, আশাঢ়, ১৩২০। ৩২০—২৭ পৃ:

(২৩) না “অবশেষে”?

(২৪) বঙ্গালার ইতিহাস ২২০ পৃ:

দেখিয়া, “বুঝিতে পারিলাম না” এইমাত্র বলিলাম।

এট “পুর্কোদ” বিষয়ের অপর একটি ক্ষুদ্র কথাই উল্লেখ করিব। “মাৎস্তন্যায়” শব্দের অর্থ ত্রিযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রামচরিতের ভূমিকায় বাহ্য লিখিয়াছেন, ত্রিযুক্ত অক্ষরকুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাহা গোড়-লেখমালায় উদ্ধৃত করিয়াছেন—ইহাতে রাখালবাবু “বিজ্ঞপের” ভাব দেখিতে পাইলেন কিরূপে ? (২৫)

আর একটি আশ্চর্য্য আমাদের খটকা বাধিয়াছে। রাখালবাবু লিখেন—

“নারায়ণপালের তান্ত্রশাসন হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে জরপাল প্রাগ্-জ্যোতিষের অবীথরকে পরাজিত করিয়া ছিলেন। ত্রিযুক্ত হরপ্রসাদ চন্দ্র অজ্ঞান করেন, ‘ভগবন্ত’বংশীয় ঞ্জলবের প্রণেয় জরমাল বীরবাহ সন্ততঃ এট সময়ে প্রাগ্-জ্যোতিষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।” (২৬)

এই জরপাল, দেবপালের পুত্রতাত-পুত্র; তাহারই রাজত্বকালে (৮২২—৮৬৪) বিজয়মান ছিলেন। ঐ সময়ে প্রাগ্-জ্যোতিষ রাজ্যে হর্জরদেব রাজা ছিলেন—৮২২

খ্রীষ্টাব্দে (৫১০ খ্রীষ্টাব্দে) উৎকর্ষ তেজপুরস্থ পর্কতগাজ-লিপিতে তাহার নাম পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইলে বড় জোর তদীয় পুত্র বনমাণদেবের সঙ্গে জরপালের যুদ্ধ ঘটনা থাকিতে পারে। জরমাল বীরবাহ নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্তমান ছিলেন বলিয়া আমাদের অজ্ঞান। (২৭) এবং আরও অজ্ঞান করি যে বিজয় ‘জরপালের’ নামে হয় তো ‘জরমালের’ নামকরণ হইয়াছিল; কেননা বঙ্গীয় ও ভারতীয় অনেক দ্বিধিকায়ী রাজার নামে বহু কীর্ত্তিপাথিপতির নাম দেখিতে পাইতেছি—পুষা, সপুষা, চর্ষ, গোপাল, ধর্ম্মশাল,—কত দলিৎ ?

রাখালবাবুর বাঙ্গালার ইতিহাসে খ্রীষ্ট রাজ্যের কোন উল্লেখ নাই; অথচ আজ ইহা আমাদের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ১৮৭৪ অব্দ পর্য্যন্ত খ্রীষ্ট বাঙ্গালার অংশই ছিল। এবং ভবিষ্যতেও আবার হরত বাঙ্গালার সামিল হইতেও পারে। ১৮৮০ অব্দের আগষ্ট মাসের এশিয়াটিক সোসাইটির প্রসিডিংসের মধ্যে খ্রীষ্ট ভারতের প্রাপ্ত দুই-পানি তান্ত্রশাসন দেখা যায় (২৮) তাহাতে “খ্রীষ্ট” রাজ্যের “নরগীর্ষণ খরবাণ”

(২৫) বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম পরিচ্ছেদ, ১৪৮ পৃ., ২৭ সংখ্যক পাখটিকা।

(২৬) বাঙ্গালার ইতিহাস, অষ্টম পরিচ্ছেদ ১৮০—৪ পৃ.

(২৭) এ বিষয়ে প্রাচীন কামরূপের রাজমালা এবং ত্রটবা (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ১৩২০, ৩য় সংখ্যা)।

(২৮) ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র উহা আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহার পাঠে ভুল আছে—খ্রীষ্টের ইতিপূর্বেও সকল ভুল রহিয়া গিয়াছে। তদ্ব্যতীত একটি ভুল বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম শাসনখানির ৪র্থ স্লোকের দ্বিতীয় পাদে আছে, “শৃং রাজাকমলায়াঃ”। ইহার পাঠ ডাঃ রাজেন্দ্রলাল “বন্দ্রাজ্য কমলায়াঃ” করিয়াছেন। কিন্তু ঐ পাদে দুইটি শব্দ কম হইয়াছে, কেননা একটি অক্ষর পড়িয়া গিয়াছে; সেই অক্ষরটি “ট”; অতএব “শৃংট রাজ্য কমলায়াঃ” পাঠ হইবে। “খ্রীষ্ট” বলে “শৃংট” বানান এই শাসনের অপসৃতও দেখা বাইবে।

প্রভৃতি পাচজন ভূপতির • নান আছে—
হং বাসনাগর প্রাচীন ইতিহাসের এক
অখ্যাত হইবার উপযুক্ত। খ্রীষ্টের ইতিবৃত্তেও
অনেক নতুন কথা আছে; কিন্তু রাখালবাবুকে
জেলার ইতিবৃত্তগুলির প্রতি তেমন
অজ্ঞানহরণ বলিয়া বোধ হইল না। ঐ
গুলির কোনওটির উল্লেখ তদীয় ইতিহাসে
দেখা গেল না। কিন্তু এগকের প্রতি
একটু দৃষ্টিক্ষেপ করিলে বাসনাগর ইতিহাস
পরিপুষ্টব্যব হইত।

রাখালবাবু ইতিহাস-সঙ্কলনে তাত্ত্বশাসন,
শিলালিপি, মুদ্রা ও প্রাচীন সাহিত্যে
লিপিবদ্ধ জনপ্রবাদ অন্বেষণ করিয়াছেন—
ভাল কথা। রাষ্ট্রীয় ইতিহাস (পলিটিকেল
হিস্টরি) এইগুলি হইতেই পাওয়া যায়।
ঐযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিজ্ঞানদর্শন
মহোদয় বহু পরিমাণে কুলগ্রন্থগুলির উপরেও
নির্ভর করিয়াছেন—কেননা তিনি বঙ্গের
সামাজিক ইতিহাস লিখিয়াছেন। আমার
বোধ হয়, নগেন্দ্রবাবুর পক্ষা ওয়গ্রাতে,
রাখালবাবু তাঁহার গ্রন্থে নগেন্দ্রবাবুর এত
প্রতিবাদ না করিলেই ভাল হইত। কুল-
গ্রন্থের উপর রাখালবাবু, রমায়ণাদিবাবু
প্রভৃতি অনেকই বীতরাস; কিন্তু এগুলি
একবারে কেবল দ্বিবারও লিখিলে নহে।
যেখানে তাত্ত্বশাসন বা শিলালিপি প্রভৃতির
সঙ্গে অনৈক্য হয় সেখানে কুলগ্রন্থোক্ত
বিবরণ বর্জনীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাত্ত্ব-
শাসন যে ভুল হয়, রাখালবাবুই তার দ্ব-একটি
উদাহরণ দিয়াছেন। তাত্ত্বশাসনেরই বহন
এই অবস্থা তখন মুদ্রা তো অনায়াসেই
কৃত্রিম হইতে পারে। অতঃত আধুনিক

সময়ে এই প্রত্নতত্ত্বের হুজুগ উপরওয়ালার
সহোদর নিমিত্ত অথবা নান কিনিবার
জন্ত কেহ সামান্ত চেষ্টারই আগমুদ্রা তৈয়ার
করাইতে পারে। অতএব শাসন বা মুদ্রা
মাত্রেরি যে গ্রন্থের এবং কুলগ্রন্থ মাত্রেরি যে
বর্জনের তাহা বলা যায় না।

কুলগ্রন্থে অথবা প্রাচীন পুঁথিতে অনেক
অবিখ্যাত কিংবদন্তীও স্থান পাইয়া থাকে।
এক হিসাবে সেগুলিও গ্রন্থীয়। মহামতি
গেইট পাহাড়র তদীয় আসাম-ইতিহাসে
‘জয়মতী’র কাহিনী বোধ হয় বিশ্বাসযোগ্য
নহে বলিয়াই পরিভাগ করিয়াছেন—অথচ
তাঁহার অলৌকিক বৈশ্য মহিষ্মতার ও
আত্মবলির স্মৃতিচিহ্নরূপ লক্ষ্যগণ আঁও
বর্তমান আছে। আসামের আহোম রাজ-
বংশের কোনও ব্যক্তির কাহিনী যদি বঙ্গীয়
সমাজে প্রচারিত হইয়া থাকে তবে এই
জয়মতীর কাহিনীই নানা গ্রন্থে এমন কি
ঐতিহাসিকের হানলভ করিয়াছে। যাহারা
আনান্দিককে এই সকল বর্জন কবিত্তে শিক্ষা
দিয়াছেন, তাঁহাদেরই জ্ঞাতীর একজন বিশিষ্ট
ইতিহাস-লেখকের কথা এখানে উদ্ধৃত
করিতেছি :—

Our ideas of Roman characters are
derived in some degree from the legends
which appear in the earlier part of
the Roman story and which we have
rejected from history. Those legends
however were universally received as
true by the Romans themselves and
therefore they are, as a distinguished
writer (Dr Merivale) says “true to the
genius of the time and of the people,
true in the lessons of Roman charac-
ter which they inculcate, true for the
practical purpose of teaching us what

manner of men those old Romans really were." Legendary lore possesses in fact a formative power in moulding the national character by consecrating traditional types of men for the admiration and imitation of posterity. The Romans thought of early Rome and of her heroes as the poets and orators taught him to think and so from the legends we can understand in a measure the thoughts and actions of those who implicitly believed them. (২০)

আমরা উভয় "রাজহান"কে চোরজনে করিতে পারি কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে এই মহাগ্রন্থ আমাদের বাঙ্গালা দেশের কত মহাকাব্য খণ্ডকাব্য নাটক উপজাস প্রবন্ধ নিবন্ধ সৃষ্টি করিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে উদ্দীপনা প্রদান করিয়াছে। তি, এ, হিথের 'আর্লি হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া' স্থল কলেজের পাঠ্য হইতে পারে কিন্তু তাহাতে আমাদের তাদৃশ উপকার হইবে কি ? কেতে চাউল বুনিলে চারা হয় না ; বায়ু

রাশিতে শুধু অগ্নমান থাকিলে সংসারটা ছারখারে গিয়া শ্মশান হইত। ভগবানের এই উপস্থিতের প্রতি আমাদের উদীরমান ঐতিহাসিকগণ একটু দৃষ্টিপাত করেন এই অঙ্গুরোধ।

উপসংহারে শ্রীযুক্ত রাধাগদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে তদীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থের লজ্জা আমরা কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি—ইহা হইতে আমি বহু শিক্ষালাভ করিচ্ছি। যবে ভুলভ্রান্তি মানবের সকল পিষিয়েই থাকিবে—ইহাতেও আছে, তাহা তিনি নিজেও ভূমিকার স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার এই মূল্যবান গ্রন্থখানি, যথাসম্ভব নির্দোষ দেখিতে বাসনা করিচ্ছি এই সামান্ত আলোচনার হৃদয়ক্ষেপ করিচ্ছি। যদি ইহাতে আলোচিত গ্রন্থের অণুস্মারক উপকার হয় তাহা হইলে নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে করিব।

শ্রীগদ্যনাথ দেবশর্মা ;

দারোগা-গিরির নমুনা

জেলায় হাজিষ্ট্রেট প্লেক সাহেব, জাম-লাল বাবু দারোগার এলাকা ডেপুটিলাখানার অধীন তারাপুর গ্রামে একটি bad livelihood বোকদমা (চলিত ভাষায় ইহাকে "বদমহেসা" বোকদমা বা "১১০ ধারার বোকদমা" বলে) বিচার করিতে যাইলেন। বর্ষীয় প্রাচুর্যবন্তঃ স্ফোট সন্-

ইনস্পেক্টর-বাবু স্বকীয় কোটের ভাণ্ড করিয়া অতদূর বাইতে নারাজ হইলেন। অবস্তা পুলিশের চাকরিতে "রাজী", "নাংলা" বলিয়া কোন আপত্তি চলে না, "Police officers are always on duty,"—তবে কোর্ট-বাবু হইতেছেন, সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবের পেছানের পোক, কাজেই তাহার

সাত খুন মাপ! সময়ে আর কোন নাও-
 যারেন মাল না থাকার কোতোয়ালী খানার
 ছোট দারোগা,—“ছাই কেনিবার ভাঙ্গা
 কুশো” আবার উপরই এই কাজের ভার
 পড়িল। আমি নতুন লোক, কর্মজীবনের
 পরমায়ু আমার তখন দুই বৎসরও পূর্ণ
 হয় নাই,—কাজেই “চু” শব্দটি উচ্চারণের
 সাহস না করিয়া ঘাত্যর বক্ত প্রস্তুত
 হইলাম।

পান্ডীতটায় গিয়া ডকিলাম, “ভাড়া
 যাবি কে রে?” অমনি এক সঙ্গে সাত.
 আট জন মাঝি দ্রব, দীর্ঘ, প্রুত, উদার,
 দুদার, তারা—নানা স্বরে চোৎকার করিয়া
 উঠিল, “আইসেন কত্ভা, আমার নৌকার
 আইসেন, বাবেন কোহানে?” আমার হৃদে
 কি যে শনি চাপিল, পরিণাম অজ্ঞাত না
 থাকিলেও রসনার হঠাৎ সত্য কথাটাই
 বাহির হইয়া পড়িল, বলিলাম, “যাব, ডেকল-
 তলা খানার।” খানা-পুলিশের নাম শুনিলেই
 নৌকার মাঝিমাঝারা শীতের সাপের মত
 একধারে ঘেন জড়সড় হইয়া পড়ে, কোন
 মতেই আর মাপা তুলিতে চায় না। আমার
 কথা শুনিবামাত্রে উহাদের আর বৃথিতে বাকী
 রহিল না যে আমি একজন “পুলিশ”।
 অমনি সব চূপচাপ,—কাহারও মুখে
 আর কথাটি নাই, ঘেন নৌকা ভাড়া
 দেওয়া উহাদের কামই নহে। মুহূর্ত্তমধ্যে
 সব মাথাগুলি কচ্ছপের গলার মত নৌকার
 ছইয়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। বুঝিলাম,
 মুখের দোষে সব মাটি হইয়াছে। আর
 সংশোধনের উপায় নাই। তথাপি একবার
 শেষ চেষ্টা করিবার জন্য সর্লোপেখা নিকটে

যে নৌকাখানা ছিল, তাহারই মাঝিকে
 ডাক দিয়া বলিলাম, “কিরে যাবু, কত
 ভাড়া চাস?” মাঝি মহাশয় নিতান্ত কাতর
 ভাবে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন,
 “আপনাকে নৌকায় নেওয়া ত আমার
 ভাগ্যের কথা,—কিন্তু কি করব কত্ভা,—
 মানা ভজনেরই আর ষাৎ দিন দাবৎ জর,
 নৌকা বাটনে কে? কদিন থেকে বাটে
 বসে বসে বাট-মাঝির পরদা দিচ্ছি,
 আমার পরে এসে কত নৌকা ভাড়া হয়ে
 চলে গেল, আমিই এখনও পড়ে আছি!
 বাড়া হতে যা চাল ডাল এনেছিলাম,
 তাও প্রায় শেষ, এখন না খেয়ে মরতে
 হবে দেখছি।” মাঝি এই কথাগুলি বলিতে
 না বলিতে, গলুইয়ে বসিয়া যে নামাটি
 রসুইয়ের উত্তোলন করিতেছিল, তাহার
 কোঁকানি ও কাঁপুনি একসঙ্গে আরম্ভ
 হইল,—বিভী মাঝিটি এতকণ ছাত্রের
 উপর বলিয়াছিল; সেও ভাড়াভাড়া
 পালখানা বেশ ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া
 দিল। উহাদের কাণে দেখিয়া আমি হাসিব,
 না নিঃশুষ্টি ধারণ করিব, তাহা স্থির করিবার
 পূর্বেই চাহিয়া দেখিলাম, অপর সব নৌকার
 মাঝিমাঝারা “পাড়া” খুলিয়া “পাড়ি” ধরিয়া
 ঘেন-কতই-কাজে-ব্যস্তভাবে ওপারে “দাসের
 বাজারে” বাইবার উত্তোলন করিল।
 বিশেষ কার্য্যহানি ভাবিয়া তৎক্ষণাত্ আমি
 জর-হওয়া এই দুইজন মান্দারই নৌকাখানার
 লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িলাম। কাজেই
 উহারা আর নৌকা বুলিতে অবসর পাইল
 না। মাঝি মহাশয় আরও দীনভাবে বলল,
 “হজুর, আমার নৌকায় উঠলেন কেন?”

দেখছেনই ত, আমার ডান হাত বা-হাত
হুথানাই ভাঙ্গা,—(অর্থাৎ হুটজন দাঁড়েরই
অনুভব)।” আমি বললাম, “শেষে কেন
চিন্তা নাহ, আমার কনটেল বেল হাল
ধরিতে জানে, সে তোমার বদলে যাকি
গিরি করবে, তুমি একখানা দাঁড় টানিও,
আর একখানা দাঁড় টানিবার ক্ষমতা না হয়
একজন চৌকদারকে সঙ্গে লইব।”

দাঁড়বিধক আপত্তি ভুলন হইলেও
মাকি কিন্তু নিমত্ত হইল না। সে দ্বিতীয়
অঙ্গ ভাগ করিয়া বলিল, “হুজুর, আমার
এই একটুখানি নৌকো, তাতে আপনার
বিছানা-পত্র, বাস, পেটারী সব তুলে
আনলে সে সবই বা রাখব কোথায়,—
আর আমার এই মাল্লাদেরই বা ক্ষেত্রে
দেব কেন্থানে? এ নৌকার গেলে
আপনার বড়ই কষ্ট হবে। আরও ত
কত নৌকো আছে, আপনি তারই এক
খানা নিয়ে যান না কেন?” আমি গম্ভীর
না হইয়া মাকির দোড় কতদূর, তাহা
দেখিবার জন্য, অত্যন্ত নরম হইয়া
বললাম, “বাবা, আমি বাস-পেটারী কিছুই
সঙ্গে লইব না,—বিছানা-পত্রও অতি সামান্য,
—একখানা তোষক, দুইটা বালিশ আর
একখানা কবল মাত্র, তাহাতেও যদি
তোমার মাল্লাদের অসুবিধা হয়, তবে না
হয় আমি কবলখানা পাতিয়াই বসিব,—
বিছানা আর বিছাইব না।” মাকি যেন
আমার হৃদয়ে বড়ই কাতর হইয়া বলিল,
“তাও কি হয় হুজুর,—ডেকলতলা ত
নিকটের রাস্তা নয়,—এক ভাঁটা এক
কোণারো সেখানে বাড়িয়া উঠে,—ততক্ষণ

আপনি কেমন করে সঙ্গে কাটাবেন? আপনি
হচ্ছেন বড়লোক, আপনি ডাক
দিলে এখনই কত নৌকা এসে পড়বে,—
তারই একখানা নিয়ে যান,—আমার নৌকার
এসে কেন যিচ্ছে কষ্ট পাবেন?” আমি
বললাম, “আচ্ছা! আমার কষ্টের কথা
ভাবিয়া তোমার মনে খেদ উপস্থাপন
দেখিতেছি, তাহাতে অল্প নৌকার বাইতে
আমার আব ইচ্ছা হইতেছে না,—আমার
দুঃখ তোমার মত আর কেহই বুঝিবে না।

বিশেষতঃ আমার হৃদয়ে তুমি যখন এতটা
হৃদয়িত হইয়াছ, তখন তোমার হৃদয়টাও
ত আমার বুঝা উচিত। তা’ না হইলে
হৃদয়ে সহিবে কেন! তোমার দুইজন মাল্লা,
দুই জনেই এত দিন যাবৎ অবিরাম পড়িয়া
আছে, ওদিকে তোমার খোরাকীও শেষ,
এমন অবস্থায় তোমার সাহায্য করা ত
আমার একান্ত কর্তব্য! তা বেশ, আমার
নিজের লোক দিরাই নৌকা বাহিরা লটব,
—তুমি বিনা মেহনতে যা হয় কিছু পাইবে
ত, তাহাতে আর কিছু না হোক, ষাট-
মাকির খাজনা এবং তোমাদের পেটের
খোরাকিটা একসকলে চলিয়া যাইবেই,—
মন্দ কি?” ভাবিয়াছলাম, বাগ্‌যুক্ত এট
খানেকই শেষ হইবে,—মাকির মাথার আর
কোন আপত্তি বোধ হয় যোগাইবে না।
কিন্তু আমার সে ভ্রম দৃষ্টিতে বিলম্ব হইল
না।

মাকিটা যেন দ্বিতীয় সবাসাচী, সে
যেমন হুটহাতে সমান অঙ্গ ধরিতে
জানে, তাহার হৃদয় তুণীও তেমনই
অক্ষর! সে এবার তাহার ব্রহ্মাণ্ড ভাগ

করিয়া বলিল, “হুজুর, এই তুমি। বাদলের মধ্যে আমার এই ভাড়া নৌকার আপনাকে আমি কোনমতেই তুলিতে পারিব না। শেটের আলার ঘব হইতে তাড়াতাড়ি ব্যতির হইয়া আসিয়াছি, নৌকার উপরে নীচে, কোন খানেই হাত দিতে পারি নাট,—এখন দেখি, কুট্ট হইলে ছাপ্পর দিয়া জল চুঁয়াব,—আবার তলা দিয়াও পানি নেয়। এ নৌকার কি ভদ্রলোকের যাওয়া পোয়ায়? ঘণ্টার ঘণ্টার বিছানা তুলিয়া জল সোঁচিতে হয়,—আবার কুট্ট নাহিলে ত উপাত্তের সোমাই থাকে না,—বিছানাপত্র সব শুটাইয়া ঢাকিয়া চুকিয়া না বসিলে ত সব ভিজিয়া একাকার হইয়া যায়। হাঙ্গামার অন্ত নাট!”

মাস্তির কাণ্ড দেখিয়া আমার হৃৎ পুণিষ্ট মেজাজ ক্রমেই আগিয়া উঠিতেছিল, তথাপি বখাসাখা ধৈর্য অবলম্বন করিয়া বলিলাম, “কলিকালেও যে তোমার মত এমন সাজা লোক লম্বা, সে ধারণা আমার আনো ছিল না ম’কি,—আজকালকার দিনে দেখিতে পাঠি, শোক “মেকি”কেই “সাজা” বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করে, আর কুহি কি না নিজেই তোমার নৌকার মত দোষ আছে, সব তোমার চড়নদারকে আগে হইতে জানাইয়া দিতেছ! তোমার মত খাঁটী লোক আর কখনও আমার চোখে পড়ে নাই,—তোমার মত সাধু লোক মর্শনেও পূণ্য! তোমার কথা শুনিয়া বড় আশ্চর্য হইলাম। তা বাপু, সেভক্তও তোমাকে কোন চিন্তা করিতে হইবে না। কুহি নিজেই যখন বলিতেছ যে, হোঁদার নৌকাখানা খারাপ, ছাপ্পর দিয়া জল

পড়ে, তলা দিয়াও জল নেয়,—তার উপর তোমার মান্নাদেরও জরে শয্যাভ্রাণ, তখন আমি তোমাকে ভাড়া বহুব্ব সম্ভব কম করিয়া দিব! অল্প নৌকার ভাড়া রোজ এক টাকা,—তা আমি তোমাকে ছয় আনা হিসাবে দিব, তবেই আর কোন গোল থাকিবে না। কেমন, এটবার চাইল ত?—আর ত কোন আপত্তি নাই? এই বার তোমার হাটলটী খুলিয়া আমার সঙ্গে চল দেখি বাপু,—আমার বিছানাপত্র লইয়া আসিলে।” মাস্তির মাথার ঘেন বস্ত্রাঘাত হইল,—তাঁহার এত বাক্-প্রণকের পরিণাম যে এমন সাংঘাতিক ধাঁড়াইবে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। আর বাক্-চাতুর্য বিস্তারে ভরসঃ না করিয়া এবার উগ্রবৃষ্টি ধরিয়া সে বলিল, “আপনার সঙ্গে আমি এত বক্তে পারি না বাবু,—আমি ভাড়া বাব না,—আপনি অল্প নৌকার চেষ্টা দেখুন।”—এই কথা বলিয়া সে গলুইয়ে আসিয়া “পাড়” তুলিবার উপক্রম কুরিবামাত্র আমিও নিঃস্বস্তি ধরিয়া বলিলাম, “তবে যে বেটা বদমায়েস, চালাকি পেয়েছিল! ভাল চাপ ত চল,—না হয় পরে নিয়ে বেলে পুরে দেব, জানিন্?” তরা আলার একখানা ইট ছুড়িয়া মারিলে আলার জল যেমন ছিট্-কাটা উঠে, আমার মুখে জেল-পানার নাম শুনিবামাত্র, মাস্তির সঙ্গে সঙ্গে মালা গুইজনও হেমনট লাফ দিয়া উঠিল,—আব তাগামের সে কাপুনি-কৌকানি নাই, আর সে শীতে অড়মড় ভাব নাই, তিনজনকে ছুটা চক্ষু ঘেন দুর্জাসা মূনির মত আমাকে ত্রস্ত করিবার জন্য

একসঙ্গে অলিয়া উঠিল। তিনজনে সম্মুখে
বলিয়া উঠিল, “কি? কি? কি বলে
বাবু, তুমি? কেলে দেবে?—কেল অমনি
পথে ঘাটে পড়ে আচে কার কি! কার
ব’বে ছুরি কবেছি,—কার চোলে আঙন
দিয়েছি,—কার বুক ছুরি মেরেছি,—কেল
অমনি দিলেট হলো ‘আব কি? এটা
বুনি মগের মুল্লুক? খুণী হলো না ভাড়া
গেলাম না,—তার আবার জোর-জবরদস্তি
কি? বান্, বান্ মলায় আগনি,—নামুন
আমাদের নৌকা থেকে,—আমাদের নৌকা
ভাড়া হয়ে গেছে কবে! যতবাবু উকীলের
মেরেছে নিরে আমরা বাপগেড়ে থেকে
এসেছি, জামাইবাবু আবার এখনট এট
নৌকার বাড়ী ফিরে যাবেন। আমরা তাঁর
কাছে আগাম ভাড়া পেয়েছি।” আমার
আব সহ হইল না,—সব-চেয়ে জোরান
বে নান্টি, তাহার গালে ঠান্ করিয়া এক
চড় মারিয়া বললাম, “এই নে বেটা তোর
আগাম ভাড়া,”—“এই নে বেটা, তোর
জরের পাটন,”—(আর এক চড়),—“আগ,
এইবার নিরে যদি চ তোর যতবাবুর
জামাইকে,”—বলিয়া নিজহাতে আমি
চাইলটি পুলিয়া উহার কাঁখে চাপাইয়া
দিলাম। অল্প আঙনে হঠাৎ এক কলসী
জল ঢালিয়া দিলে সে আগুন ঘেমন বৃহর্ষে
নিবিয়া যাও,—আমার এট চুটেটি বস
চাপড়ে মাঝি-দাস্ত তিনজনেরই নর্দন
কুর্দন একদম ধানিয়া গেল,—আঙন নিবিলে
তবু একটু ধোঁরা পাকে,—ইহাদের কিস্ত
তাঁহাও বহিল না, একেবারে সব
অবাক্, হতভম্ব! গোলমাল শুনিয়া কণকাল

মধ্যে সেখানে অনেক লোক জমিয়া গেল,
—বাট-মাঝিও * দৌড়িয়া আসিল। বাট-
মাঝি লোকটি আমার পরিচিত,—সে
আমাকে বেশিরাই লগা এক সেলামে ঝাড়িয়া
বলিল,—“আপনি কেন নৌকা নিতে এসেছেন
ছোটবাবু? আপনি নেমে আহুন,—আমিই
সব ঠিক্ কবে দিছি।” তাহপর মাঝির দিকে
চাহিয়া বলিল, “আরে কি রে করিমবন্ধ,
—বাড়ী চুল পেকে গেল, তবু লোক
চিন্তে পরলে না? আমাদের ছোট
বাবুর মত সদাপর লোক কি আর আছে?
উনি অল্প পুলিশের মত নন। যাও,
যাও, ঠর সঙ্গে যাও, ভাড়া নিয়া
কোন গোল হবে না। যাওয়া-নাওয়ারও
জোন কটে পাবে না, নিশ্চিন্তে চলে
যাও।” বাটমাঝিকে দেখিয়া মাঝিমানাদের
থড়ে ঘেন প্রাণ আসিল। করিমবন্ধ মাঝি
অমনট জুর বদলাইয়া বলিল, “ভাড়া বাব
না কেন? ভাড়াট যদি না বাব, তবে
এসেছি কি করতে? বাবুদের সঙ্গে যাওয়া
ত আরও সুখের কথা,—কোন চোর
ভাকাতের ভর থাকে না,—কোন লোক
কোন কথা বলতে সাহস পায় না,—ঘাটে
পেলেট চাহিতে না চাহিতে মাহ তখ
তরকারী সব আশিয়া হাজির হয়,—এমন
সুখের ভাড়া বাব না কেন? অবস্ত ভাড়া
বাব। বা রে পীরমামুদ ঘা, বাবুর বিছানা
নিরে আর!” মাঝির আদেলে সেই চপেটা-
বাক্ত-প্রাপ্ত মাল্টি হাইল কাঁখে লইয়া
নামিতে উদ্ভত হইলে বাটমাঝি বলিল,
“হাইল আর নিতে হবে না,—ঘা, আমি
যখন আছি, তখন আর এদের পাশাবার

যো নাই, ছোটবাবু,—আপনি বান্, বিছানা নিশ্চিতে পাঠিয়ে দিন্-গে।” বাটমাস্তির কথায় হাইলটা রাখিয়াই মাস্তার সঙ্গে থানায় ফিরিলাম।

থানার আসিয়া রামদীন সিংহ কনষ্টেবলকে আমার বিছানা-পত্র লইয়া অবিলম্বে নৌকায় যাইতে আদেশ করিলাম,—সে “বহৎ আচ্ছা, হজুর,”—বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। আমিও তাড়াহাড়ি থানাহার শেষ করিয়া বাতায় বস্তু প্রস্তুত হইলাম, কারণ ভাঁটার নড় অধিক বিলম্ব ছিল না। ভাঁটার আবাদিগকে কল্যাণপুর* পর্য্যন্ত গিয়া তথা হইতে ঘোরাহে ডেকল-তলা থানার যাইতে হইবে। সেখানে ক্রামলগাবু দারোগার নিকট মোকদ্দমার অবস্থা শুনিয়া তবে আমাকে ত্রাণপুরে মোকদ্দমা পরিচালন করিতে হইবে। পুন, ডাকতি, চুরি ইত্যাদি মোকদ্দমার মত Bad livelihood Case-এ পুলিশ প্রায়ই কোন ডায়েরী দেয় না, কেবল মানুষী-মত একটা রিপোর্ট দাখিল করে মাত্র। সে রিপোর্ট বেক্স অদ্বুত রকমের সেকেনে বাঙ্গলা ভাষায় লেখা থাকে, তাহা বুঝিয়া উঠা আমার মত নিত্যন্ত একেলে লোকের পক্ষে তখনও তেমন সহজ হইয়া উঠে নাই। সেই জাতীয় বাঙ্গলার একটু নমুনা দিতেছি,—“ছং হর বে, লাং বাং হাং হর, —তিনি কং এর সম্ভাবনক কৈং ছং পং করেন।”*

আহারায়ে বাটে আসিয়া দেখি, রামদীন কনষ্টেবল খোলাটা শিরের দিয়া, বাটমাস্তির ঘরে পাশাপাশি-পাতা চুইয়া কেবোসিনের বায়েব উপর পড়িয়া গভীর নিদ্রায় অচেতন, আর আমার বিছানাটা একথানা মাহুরের উপর বেছেতে পড়িয়া আছে। বাটে কোন নৌকা নাই, বাটমাস্তিও অস্থিত। ভাঁটার টান কিরিয়াছে,—অবিলম্বে বাত্মা না করিলে গোয়ার আসিবার পূর্বে কল্যাণপুর পর্য্যন্ত যাওয়া হুজুর। অন্তরে তখন যে ভাবের সকার হইল, তাহার তাহা ব্যক্ত করা হুজুর। হাতের লাঠি দিয়া রামদীনের পার্শ্বদেশে এক খোঁচা মারিলাম, অমনি গে “কোন্ হার,” “কোন্ হার,” বলিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বসিল। আমার দিকে চাহিতেই তাহার মুখখানা যেন অন্তরগে তরিয়া গেল। সে তাড়াহাড়ি গাত্রোথান করিয়া নিবেগ পাগড়ী দিয়া একটা কেবোসিনের শাম মুছিয়া, “বৈঠিগে হজুর, হাম্ মান্জি কো বেলাওতে হৈ,” বলিয়া ফ্রতপদে ঘরের বাহির হইয়া গেল। পাখী যে শিকুলি কাটিয়া উড়িয়া গিয়াছে, সে কথাটা তাহাকে বনিবারও অবদর পাইলাম না,—সে উধাও হইয়া বাটের দিকে ছুটিয়া গেল। এখন কি করি,—কোথায় যাই,—কেনন করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পম্মা স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়, এই সব কথা ভাবিতেছি, আর রামদীনের নির্পু, কিতার জন্তই যে

* “হজুর হর বে, লাইনবাবুর (Reserve Sub-Inspector) হাওয়া হর,—তিনি কনষ্টেবলের সৎবা-জনক কৈকিয়ৎ হজুরে পেশ করেন।”

এত কষ্টে ঠিক-করা নৌকাখানা হাত-ছাড়া হইয়া গেল, সেই কথা জানিয়া মনে মনে অত্যন্ত চট্টা উঠিতেছি,—এমন সময় সুনিলাম, রামদীন “ও মান্নিক, মান্নিক, জলদী কিত্তী হিয়া লে আও, বাবু আরা হার” বলিয়া ডাকাডাকি করিতেছে। সে কোন্ মান্নিকে কোথা চাইতে আসিতে বলিতেছে, তাহা বুঝিবার পূর্ণেরই নদীর অপর পার চাইতে একজন লোক উত্তর দিল, “এই যাচ্ছি গো! পেঙ্গারবাবু এখনো আসে নি।” রামদীন আবার ঘাটমাফির ঘরে ফিরিয়া আসিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “নৌকা কোথায় হে রামদীন?” সে তত্ত্বত্তে জানাইল, আমি নৌকা ভাড়া করিচ্ছি জানিয়া, পেঙ্গার কেদারবাবুও আমার সঙ্গে সেই নৌকার যাইবেন, হির করিচ্ছিলেন। কেদারবাবু বাড়ী নদীর অপর পারে “দাসের বাগানে।” আমার আগমন-সংবাদে তিনি রামদীনকে বলিয়া বিছানাশয় জানিবার জন্য নৌকা নিকর ঘাটে লইয়া গিয়াছেন। আমার প্রদ্রুত ক্রোধ কাজেই আর বহিষ্কৃত হইতে পারিল না; বরং অন্তরে হর্ষেরই স্ফূর্তি হইল। কারণ, এতটা পথ একাকী যাওয়ার চেয়ে একজন ভ্রমলোক সঙ্গী পাওয়া আনন্দেরই কথা, তাহার উপর কেদারবাবুরও আমারই মত দাবাখেলার বড় আগ্রহ, কাজেই তাহার মত একজন সঙ্গীভাষ্য করা ভাগ্যের কথা! রামদীনকে তখনই বাসা হইতে দাবা-বোড়ে এবং খেলিবার নক্সা-করা পেটবোড়খানা জানিবার জন্য দৌড়িয়া যাইতে বলিলাম। সে ফিরিয়া

আসিতে আসিতে নৌকাখানাও পেঙ্গার বাবুকে লইয়া এপারে আসিল। আর বিলম্ব না করিয়া বিছানাশয়সহ তখনই নৌকার উত্তীর্ণ পড়িলাম, এবং মাঝিমাঝিরাও “দরিদ্রার পাঁচশীর, গাজী, বদর বদর,” বলিয়া নৌকা গুলিয়া দিল।

এখন আর মাঝি-মাঝিদের ভেতন অগ্রসর ভাব ছিল না,—আমারও মনটা নিশ্চিন্ত। কাজেই একটু ভাসাশা দেখিবার জন্য মাঝিকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলাম, “দেখুন কেদারবাবু, আমাদের এই মাঝিদী বড় নিষ্পৃহ, এবং ভারী সাধু লোক। উহার নৌকার ছাপড় দিয়া জল চুয়ায়, এবং তলা দিয়া জল উঠে বলিয়া সে নিজেই দৈনিক ছয় আনা হিসাবে ভাড়া লইতে রাজী হইয়াছে।” মাঝির মুখখানা অমনি পোড়া হাঁড়ীর তলার মত বলিল হইয়া গেল,—সে আমতা-আমতা করিয়া বলিল, “হু” আনা ভাড়া দিলে কি গরীব বাচে কতী? আমার নৌকার তলা দিয়া ত কই ভেতন পানি উঠে না,—যদিও-বা একটু-আধটু উঠে, তা দিলে একবার সেঁচে ফেলুণেই যথেষ্ট। আর ছাপড় দিয়া ত কখনও পানি চুয়াতে দেখি নাই,—বুঝি বা হঠাৎ কখনও একটু আধটু চুয়ায়, তবে তখন না-হয় আমার কাপাখানা ছাপড়ের উপর গেতে দিব,—তাই বলে কি আপনাদের গার পানি পড়তে দিব?” আমি সে কথা না শুনিবার ভ্রম করিয়া রামদীনের দিকে চাহিয়া বলিলাম, “ভাল কথা, রামদীন, তুমি ত বেশ হাইল ধরিতে জান, (বলাবাহুল্য

বে, রামলীন আরো জেলার বিত্তক ছত্রী, তারার সাত পুরুষের কেহ কখনও নোকার হাল ধরে নাই),—তা তুমি গিয়া নাকির হাত থেকে হাইগটী নিয়ে বল গে,—আর সেখণ্ডার পাশ দিয়ে বাবার সময় নৈমুদ্রি চৌকিদারকে ডেকে নিও,—কারণ মাল্লারা হুজনেই অত্বে, নোকা বাইতে পারবে না।”

করিমবন্দ্য মাঝি অমনি বলিয়া উঠিল, “কেন আর মিছে চৌকিদারকে ডাকবেন কর্তী,—একেই ত এট ছোট নোকা, তার উপর আরও লোক তুললে নোকার জাহগা হবে কেন? কি আর করা যাবে, গীরমাসুল আর সোন্দ-উল্লাই কোনমতে গাড় টেনে যাবে আর কি! অর বলে বসে থাকলে কি আর আমাদের মত গরীব কাপালের চলে কর্তী?”

আমি তখন করিমবন্দ্যকে বলিলাম, “আজ্ঞা মাঝি, এখন যে তুমি সব কথাই কাটাইয়া দিতেছ, প্রথমে তবে অত সাত পাঁচ ঘোর-কোর কথা বলিতেছিলে কেন? পুলিশের কাছে নোকা ভাড়া দিতে তোমাদের আপত্তি করিবার কি হেতু থাকিতে পারে? প্রায়ই দেখি, পুলিশের লোক নোকা ভাড়া করিতে আসিলেই সব নাকি-মাল্লারা পলাইয়া বাইবার চেষ্টা করে,—ইহার কারণ কি? ভাড়াও ত আমার বিবাস, পুলিশের নিকট কেহ কম পার না! কারণ ভাড়ার পরমা ত পুলিশের লোক কখনও নিজের গাট হইতে দেয় না। বদলী হইয়া বাইবার সময়, কিবা সরকারী বাজনা

কি আফিং, কি কয়েদী প্রভৃতি একদান হইতে অত্বে হানে লইতে হইলে সে ভাড়াও সরকার হইতেই পাওয়া যায়। খানার দারোগারা খুন, লুণ্ঠ, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি মোকদ্দমা তদন্ত করিতে মকঃবলে গেলে তখনকার নোকাভাড়াও ত পক্ষগণ আইন ধরচের মতই বিনা আপত্তিতে বহন করে,—হুতরাং পুলিশের লোকের ভাড়া কম বিবার কোন কারণই আমি বুঝিতে পারি না। আগরাহি যে ভাল হয়, সে কথা ত তুমি নিজেই বলিলে,—তবু পুলিশের লোককে নোকাভাড়া দিতে তোমরা এত আপত্তি কর কেন?” করিমবন্দ্য আমার মুখের বিকে চাহিয়া রহিল,—কোন উত্তর দিল না। কেদারবাবু বলিলেন, “কিহে, চুপ করিয়া থাকিলে কেন,—দারোগাবাবু যে কথা বিজ্ঞান করিলেন, সে কথাও জবাব দাও না।”

মাঝি তখন অত্যন্ত কুণ্ঠার সহিত বলিল, “বলুন আর কি কর্তী? আমাদের এই বাবুটী যেমন সদাশয় (?), হেমন? ত পুলিশের সকল বাবু নন! অনেক বাবুই আমাদের লোককে জোয়ার-ভাঁটার, যোত্রে-বৃষ্টিতে অন্যাহারে অনিত্যায় খাটাইয়া বেজার কট দেন। খুন লুণ্ঠ চুরি ডাকাতি ইত্যাদি মোকদ্দমার সংবাদ পাইলে তাঁহারায় ঘটনা-রূপে পৌছিবার অত্বে এত ব্যস্ত হইয়া পড়েন যে, তখন তাঁহারায় নোকার বাইতে-ছেন কি ঈদারের বাইতেছেন, সে কথাটা যেন জুলিয়া যান, কেবল বলেন, ‘ও মাঝি, জোরে চালাও, আরও জোরে চালাও,—ভারি দেবী হয়ে গেল যে!’ যদি বলা

বার, 'বাবু বেগম * হ'য়ে গেছে। নৌকো এখন চালাব কেমন করে?' অমনি বাবু ভেড়ে উঠে বলেন, "বেগম হয়েছে, ত ভারি বয়ে গেছে,—বাঁড়ে না চলে ত শুনে নেমে যা,—ঘণের পথ না থাকে ত লগি খুঁচিয়ে চল, বজ্রাতি করে যদি কাল নষ্ট করিস্, তবে এক পরসাত ভাড়া পাবি নে, আনিস্?' কাজেই আমরা প্রাণপণে নৌকা বাইতে ছুঁক করি। ঈশ্বরের যে ইচ্ছা, সেও করণা আর জল না পেলে চলতে পারে না,—পুলিশের বাবুয়া আমাদের ইচ্ছার চেয়েও বোধ হয় ভাল কল বলে মনে করেন,—সেজন্তে আমরা নাওয়া খাওয়া করতে চাইলেও নৌকা থামতে দেন না! থানার ফেরবার সময়েও আবার 'চল্ চল্, নিগুঁরি চল,—না-আনি, এক'দিনে থানার কি হয়ে গেছে.' বলিয়া তখনই ভাড়া দিতে থাকেন! এত খাটুনির পর যেই ভাড়া চাওয়া গেল অমনি কসাকসি আরম্ভ হইল। নৌকা ভাড়া কন্টার সর্ব্বই বা চাই, বাবুয়া ভাতের রাঙী, কিন্তু টাকা দেবার বেলাই দু-দু। বাবুয়া ত বাটে-বাটেই, যেখানে যে মোকদ্দমা থাকে, সব মোকদ্দমার আসামী করিগাদী ছ'পক্ষের কাছ থেকেই নৌকাতাড়া বলে গুণ্ডা গুণ্ডা টাকা আদায় করেন। কেউ হুঁ-চার-আনা কম দিতে চাইলে আমাদের সাক্ষ্য মানিয়া বলেন, 'জিজ্ঞাসা কর না মাঝিকে যোল কত ভাড়া—'। আমরাও পাইবার আশার এক টাকার জারগার দেড় টাকা হাঁকিয়া বসি। লক্ষণগণও

আর সামান্য টাকার ক্ষুদ্র দারোগাবাবুর কোপ না জমাইরা যাহা চান তাই দিয়া ফেলেন। সে টাকাটা কিন্তু আমাদের হাতে আসে না,—বাবুর মজরের টাকার সঙ্গে সঙ্গে নৌকাতাড়ার টাকাটাও কনটে-বলের হাতে পড়ে,—বাবুয়া নিজ হাতে কখনও কখনও কাছ হইতে এক পরসাত গ্রহণ করেন না। কাল-অন্তে থানার আসিয়াই বাবু সটান আসাথ চলিয়া যান, কনটেবল মহাশয় দিন গরিয়া যত দিন হয় ততটা টাকাও আমাদেরগকে দিতে চায় না,—বলে, 'বেটা, সে দিন ত দত্ত দুই বেলা থাকতেই থানা থেকে রওনা হয়ে গেলাম, সে দিনের আর ভাড়া পাবি কি? তার পরদিন থেকে হিসাব করা' হই দত্ত থাকতে নৌকা ছাড়া হয়েছিল, সে কথা ত্রিক্ বটে,—কিন্তু সারাটা রাত্রি যে নৌকা ঠেলে গেলাম, সে পরিশ্রমটা কনটেবল ধর্তব্যের মধ্যেই আনুলে না। যেখানে পাব জাযা পাচ টাকা, সেখানে ফকিরের ভিক্ষার মত বড়-জোয় দুটো টাকা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। যদি অত কম ভাড়া নিতে আপত্তি করা যায়, তবে বলে, 'মাছা, তা'হলে এখন চলে যা, বাবু আহ্ন, তখন যত নিতে পারিস্ নিবি,—বাবু আমাদের এম চেয়ে বেনী ভাড়া দেবার হুকুম দিয়ে যান্ নি, আমি কোথা থেকে নিব?' তিনদিন তিন রাত্রি খাটুরা কোথায় একটু বিশ্রাম করিব, তা ন', আবার বাবুর খোঁজে আসিতে হইবে! হয়ত তখন আসিয়া শুনিব যে, বাবু অস্ত্র কাছে

কোথায় চলিয়াই গিয়াছেন! কাজেই কনটে-
বল বাহা মিল, তাহাই হাতে লইয়া বাবুর
বাসার ভর্য্যে আসিয়া দাঁড়াইল। কনটেবল,
বন্দী, জমাদার সকলে অমনি ভাড়া
আরম্ভ করিল, 'এখানে দাঁড়াণি কেনে
বেটা, বাবু তিন দিন তিন রাত্রি কত
খাটিয়া আসিয়া, সবে বাড়ীর মধ্যে গিয়াছেন,
এর মধ্যে আবার তাকে ভাক করিতে
গেলি কেন? ভাড়া ত পেয়েছিস্, আবার
কি চাস্? কোন কথা থাকে, একটু পরে
আসি।' আমরা ত আর খান সনেত
পালিয়ে যাব না,—ভয় কি?' মজা
দেখুন—বাবুর বেলা বলা হলো,
'তিন দিন তিন রাত' কিন্তু ভাড়া দিবার
সময় দুই রোজের বেশী দেওয়া হল না!
কিন্তু সে কথা মুখ ফুটে বলে, এমন
সাহস কার? ভাড়া খেয়েও যদি সেখানে
দাঁড়িয়ে থেকে "বাবু," "বাবু," বলে ডাক
দেওয়া গেল, তা আধ-ঘণ্টার মধ্যে কোন
সাতাই পাওয়া গেল না। নিতান্ত নাছোড়-
বান্দা হয়ে যদি তখনও ডাকাডাকি বন্ধ না
করিলে, তবে হয় ত বাবু চক্ৰ রক্তবর্ণ করিয়া
বাহিরে আসিয়া বলিলেন, 'কি হয়েছে হে
বাপু, তোমরা অত চোঁচোমিচি কচ্ছ কেন?
কি চাও? বাড়ী কোথায় তোমার?'
হায় রে! তিন দিন তিন রাত যে বাবু
আমার নোকাখ কাটাইয়া আসিলেন, আজ
আর তিনি আমাকে দেখিরা চিনিতেন
পারিলেন না! নিজের পরিচয় দিয়া
ভাড়ার টাকা চাহিবামাত্র তিনি কনটে-
বলকে ভাড়া দিরা উঠিলেন, 'এখনও
ইহাদের ভাড়া দাও নাই কেন?' কনটে-

বল অগ্রসর হইয়া বলিল, 'সে কি কথা?
ভাড়া ত আমি কোন্‌কালে দিয়েছি।
—বেটা বজ্রাতি করে আবার তবু
আপনাকে ভাক কর্তে গিয়েছে?' যেই
কনটেবল এই কথা বলেছে, বাবু অমনি
পায়ের জুতা খুলে 'তবে রে বেটা হারাম-
জার—গোজোর, এত বড় আম্পর্কী,
খানার উপর কোঁকি দিয়ে ছ'বার ভাড়া
নিতেন এসেছিস্,—বাবের ঘরে ঘোগের
বাগা?' বলিয়া মায়ের আর কি!
ইহাতেও যদি হাত ঘোড় করে বলা যায়,
'হজুর, তিন দিন তিন রাত খাটিয়া
যদি দুইটিমাত্র টাকা পাওয়া যায়, তবে
আমাদের কেনন করিরা চলে? অমনি
বাবু বলেন, 'ওহো! দু'টাকা পেয়েও
তোমরা সুখী হও নাই,—আচ্ছা, বেশ,
দেখি টাকা দুটো, দাও ত আমার হাতে'
—যেমন টাকা দুইটা হাতে দেওয়া গেল,
অমনি তিনি বাড়ীর মধ্যে ফিরিয়া গেলেন।
দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আনা করিতেছি, বাবু
বোধ হয় একখানা পাঁচটাকার নোটই
আনিয়া দিবেন। শোভান আজ! সে
আশায় ছাই পড়িতে বিলম্ব হইল না।
বাবু তাঁহার চাকরের হাত দিয়া একটি
টাকা আর আট আনার পয়সা পাঠাইয়া
দিয়াছেন! চাকর বলিল, 'বাবু বলিয়াছেন
যে, আপ-খোরাকী ভাড়া রোজ বার-
আনা,—তোরা ত অত্যন্ত দু'বেলা খোরাকীও
পেয়েছিস্, কাজেই রোজ আট-আনার
বেশী কিছুতেই পাবি না,—হাতীর বত
বোহান এক এক বেটা, চার আনার
তোদের একজনেরও দুবেলা খোরাকী হয়

না। যা হোক, বাবু দয়া করে আট আনা হিসাবে তিন দিনে পুরা দেড় টাকাই দিয়েছেন। এই নিয়ে যা তোরি,—এখন গিয়া ঘাটেই থাক্, মকিমপুরে একটা বড় চুরি হয়ে গেছে,—বাবু নেয়েখেয়েই সেখানে যাবেন। তোদের নৌকাখানা নাকি ভাল, বাবু আবার তোদের নৌকাতেই যাবেন—’। শুনিবামাত্র আমাদের পেটের পিলে চমকে উঠল,—আর ‘ভিকার কাল নাই বাবা, তোর কুকুর ঠেকা’ বলিয়া মনে মনে বাবুকে ‘ধনে পুত্রে লক্ষী লাভ হোক’, আশীর্বাদ করিতে করিতে দে সটান দৌড়! তারপর ঘাটে আসিয়াই লম্বা চম্পট! এই ত গেল মফঃস্বলের কথা। যদি বদলী বা খাওয়ান লইয়া একস্থান হইতে অজ্ঞাত বাবুদের লইয়া যাওয়া হয়, তবে ত ভাড়া আদৌ দিতে চায় না,—বলে, ‘এখন টাকা পাব কোথায়? আগে বিল করি, সরকার থেকে টাকা পাই, তারপর ত তোদের টাকা দেব। টাকা কি আর আমার বাসে মজুত আছে? মাস্কাবারে যখন বিল পাশ হয়ে আসবে, তখন খবর দেব, এসে রসিদ দিয়ে টাকা নিয়ে যাস্!’ কাজেই বুঝতে পারেন যে, আমরা কেন বাবুদের নৌকা ভাড়া দিতে ভয় পাই। কি বলব বাবু, নেসটি-পর্য্য যত্ন থেকে নৌকা বেঁধে বেঁধে মাড়ী-চুল পেকে গেল, অনেক বেঁধে-ঠেকেই এই রকম কর্তে হয়।”

মাকির এই স্মরণীয় কাহিনী একটু রঞ্জিত হইলেও, উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিতে আমার জিজ্ঞাস্তাও বাধে, কাজেই

আর ঘাঁটার্খাটি না করিয়া ‘মোনং হি শোভনং’ নীতি অবলম্বন করিয়া দাবা-ব’ড়ে লইয়া কেন্দারবাবু সহিত সপ্ত-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলাম।

পর দিন অতি প্রভাতেই আমাদের নৌকা ডেকলতলা খানার উপস্থিত হইল। আমাদের গমন-সংবাদ শ্রামবাবু পূর্বেই পত্রযোগে অবগত হইরাছিলেন, তাহাকে অত সকালে ঘাটে পাঠচারি করিতে দেখিয়া যৌধ হইল যে, তিনি যেন আমাদের আগমনের জন্তই প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। কেন্দারবাবুর পিশতাত ভাই ডেকলতলা কাছারীর নারেশ, নৌকা ঘাটে ভিজ্জিবামাত্র কেন্দারবাবু সেইখানে চলিয়া গেলেন। তিনি আমাদেরও তাঁহার অহুযর্তী হইতে অহুরোধ করিলেন, আমি জিজ্জ কাটিরী বলিলাম, “আরে দাদ, তাও কি হয় মশা’র, শ্রামলালবাবুকে আগে থেকে খবর দিয়ে রেখেছি, এখন অজ্ঞাত গেলে তিনি কি মনে করবেন?” শ্রামলালবাবুর সঙ্গে এক খানার কাল করিবার সৌভাগ্য না ঘটিলেও তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় পূর্বে হইতে ছিল। সাক্ষাৎ না হইলেও কোন কার্য-উপলক্ষে সঘরে গেলেই তিনি আমাদের খানার একবার পদধূলি দিয়া ও সন্দের কুশল-সংবাদ লইয়া আপ্যায়িত করিয়া আসিতেন। সময়ে অসময়ে দুই একবেলা এই দৌনের কুতীরে আতিথ্য স্বীকার করিয়াও কৃতার্থ করিয়াছেন। আমাদের অভ্যর্থনার জন্ত তিনি নৌকার নিকট আসিবামাত্র আমি মমকার করিয়া কুশল-প্রদ জিজ্ঞাসা করিলাম, এবং তিনিও

প্রতি-মমকারীতে আমার শারীরিক ও পারিবারিক কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কেশারবাবুকেও সাদর সম্ভাবণ জানাইয়া খানার বাইতে অহুরোধ করিলেন। কিন্তু কেশারবাবু ঘণ্টে বিনয়ের সহিত সে অহুরোধ এড়াইয়া চলিয়া গেলেন। বাইবার সময় কেশারবাবুর চক্ষু দুইটি বেনে আমার দিকে একটু বক্রবৃত্তি নিক্ষেপ করিয়া গেল, —তখন আমি ইহার কোন হেতু উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

শ্রামলালবাবু আর আমার পিতার বয়সী, এবং একজন সিনিয়র অফিসার, কাজেই আমি বেষ্টে সম্মের সহিত তাঁহার পিছনে পিছনে গিয়া খানা-ঘরে উপবিষ্ট হইলাম। একথা সেকথা বহু কথার পর কাজের কথা আরম্ভ হইল। আমি যে মোকদ্দম-পরিচালনের জন্য তামাপু ব চলিয়াছি, সেই মোকদ্দমের আসুল বৃত্তান্ত একে একে তাঁহার নিকট জানিয়া লইলাম। কয়জন আসামী, কাহার কয়টি পূর্ন-শাস্তি (Previous conviction) আছে, কে কয়টা মোকদ্দমের কি কি কারণে সন্দিষ্ট হইয়াছে, কাহার সংসারে কয়জন পাইবার লোক, কাহার কত বিধা অধি-জমা আছে,—কাহার বিকছে কোন্ কোন্ সাক্ষীদ্বারা কি কি বিষয় প্রমাণিত হইবে, —এক একে এই সমস্ত প্রয়োজনীয় কথাই সংক্ষেপে নোট-বহিতে টুকিয়া লইলাম। বাহাতে আসামীগুলি সকলেই ত্রিমন্দির দর্শন করে, শেষজ্ঞ মোকদ্দমটি বিশেষ মনোযোগের সহিত পরিচালন করিবার জন্য শ্রামলালবাবু পুনঃপুনঃ আমাকে

সনির্লক্ষ অহুরোধ করিতে লাগিলেন, আমিও যথাসাধ্য বহের জট করিখ না বলিয়া প্রতিজ্ঞত হইলাম।

বড়ির দিকে চাহিয়া দেখি, বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছে,—কথাবার্তার এতক্ষণ স্নানাহারের চিন্তা মনেও আসে নাই। বড়ির দিকে চাহিয়াই মনে পড়িল, পূর্ন রাত্রে আমাদেয় কিছুই আহাৰ হয় নাই,—কাজেই শ্রামলালবাবু সে বিষয়ে কোন কথা বলিবার পূর্বেই আমি আত্মীয়তার ভাব দেখাইয়া বলিলাম, “আর কেন মশায়, এইবার উঠে পড়ুন, স্নানাহার করা যাক্‌গে,—” আমার কথার শ্রামলালবাবুর যেন চমক ভাবিল,— তিনি বলিলেন, “হাঁ, হাঁ, তাই ত, তাই ত, বেলা যে ঢের হয়ে গেছে,—সহরে থেকে তোমাদের সকাল সকাল খাওয়ার অভ্যাস,—তা বেশ, এখন তুমি ওঠ। আমাদের ত আজ একদণ্ড,—আহার এক প্রকার নাই বলিলেই হয়,—বেলা গেলে যা হয় একটু ফলটল খাব,—তা তুমি তাগা যাও, স্নানাহার শেষে ফেল,—ঐকালে কিছু আমার একটু কাজ করে দিতে হইবে।” আমি বলিলাম, “তা বেশ ত, আহাৰান্তে যা বলেন করে দেব। এখন একটু তেল দিতে বসুন, স্নানটা করে আসি।” শ্রামলালবাবু অমনি, “কানাই, কানাই, ও কানাই,—আঃ, যেটা ঘেন কুড়ের বাদনা,—কোথায় গেলি, ও কানাই—” বলিয়া হাঁক দিতে লাগিলেন। কিরংকাল পরে একটা কুশকার ভূতা আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্রামলালবাবু তাহাকে একটু তৈল আনিয়া দিতে বলিলেন। ভূতাটি অত্যন্ত

কুঠার সহিত বলিল, “আজ্ঞে, তেল কোথায় পাখ ? আজ সারা হবে না বলে ত তেল মোটে আনাই হয় নি,—সেই কাল হুপুবে যে ভূ-পরমার তেল আনতে দিবেছিলেন, তা’ত কালকেই প্রায় শেষ হয়েছিল,—নিশিৎ-তলার যা একটু-খানি ছিটে-ফোটা ছিল, তাও আজ সকালে আগনার আকিড়ে বেধে দিবেছি,—তল ত আর নাই—”। শুনিয়া আমি যেন অকাল হইতে পড়িলাম ! শ্রামলাল বাবু কি তবে আমার পত্র পান নাই ? কিন্তু পত্র না পাইলেই বা ক্ষতি কি ? আমরা যে আশিয়াছি, সেও ত প্রায় চারি পাঁচ ঘণ্টার কথা,—ইহার মধ্যে কি আর একজনর আহ্বানের যোগাড় হইয়া উঠিতে পারে না ? এইবার কেন্দ্রবাবুর সেই অশ্রদ্ধ ভঙ্গির কথাটা আমার মনে পড়িল ; অমনি সকল ব্যাপার জলের মত তরল হইয়া উঠিল। হায়, হায়, এত-কণ যে চর্যা-চোখা-লেখ-পের কত কি উপাদেয় পূর্ণার্থের আশার রসনা আমার অসংঘত হইয়া উঠিতেছিল ! নিজের কাছেই নিজের ধারণা লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। কোথায় কত বহুত আহ্বার করিব ভাবিয়া মনে মনে আকাপকুস্তম রচনা করিতেছি,—আর কোথায় একবারে অরক্ষন,—প্রানের তেলটুকু পর্যন্ত নাই !

যের তৈল না থাকা, এবং অহিফেন-দেবনের অভ্যাগন থাকা, এই দুইটা অগো-রবের ব্যাপার যুগলং আবার গোরমীভূত করিতে শ্রামলালবাবু কানাইয়ের উপর বড়ই অগ্রসর হইলেন, ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন,

—“হা, হা, যেটা গোবরগণেশ, দুই হয়ে যা,—বুড়ির ঢেঁকি যেটা,—হা দেখ্ বিহুয় বাসার তেল আছে কি না,—থাকে ত একটু তেল এনে দে—”। বিনোদ দে শ্রামলালবাবুর জমাদারের নাম,—সে শ্রামলালবাবু অধীনে টাউন-চৌকিদারী, কনষ্টেবলী এবং বস্ত্রীর কাজ করিতে করিতে বাইশ বৎসর পরে এতদিনে জমাদারের পদে প্রোমোশন পাইয়াছে,—শ্রামলালবাবু কিন্তু এত পদোন্নতিতেও বিনোদকে সেই সাবেক আদরের নাম “বিহু” বলিয়াই ডাকেন,—অথবা বিনোদ ইহাতে তেমন সন্তুষ্ট নহে,—অথচ মুখ কুচিয়া কিছু বলিতেও পারে না। কানাই বিনোদবাবুর বাসার তৈল আনিতে বাইবার পূর্কেই বিনোদবাবু স্বয়ং তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া শ্রাম-লালবাবু অত্যন্ত আশ্চর্যের সহিত বলিলেন, “দেখেছ বিহু, আমার কপাল,—ভাড়া ত (আমার দিকে তাকাইয়া) কোন দিন এদিকে পদার্পণ করেন না,—আজ যদিও-বা ভাগ্যগুণে ততাগমন হলো, তাও কি না একদমই দিনে, যেদিন আমাদের ঘরে ভাঁড়ই চড়ে না ! কথায় কথায় বেলাও হয়ে গেছে ঢের,—ভাড়া যে কোথায় কি খাবার যোগাড় করেছেন, তার কিছুই দেখতে পেলুম না। একটু ঘানের তেল যে দেব কানাই যেটা সে উপায়ও রাখেনি। তুমি বাবা একটুখানি তেল তোমার ঘর থেকে ঝটু করে তারাকে এনে দাও ত।” জোখে ও যুগার আমার আপাদমস্তক অগ্নি উঠিতেছিল,—অনেক কষ্টে সে ভাব

দমন করিয়া বলিলাম, “না, না, না, আর তেল আনতে হবে না,—একবারে বাজারে গিয়েই ঘানাহার করব, তেল সেখানেই পাওয়া যাবে।” বিনোদ বেচারী আমার কথায় বড়ই অপ্রতিভ হইয়া গেল,—সে বোধ হয় আনিত না যে দারোগার গৃহে সেদিন “অদ্যাত্তো দহত্বং”। তেল নিতে গে আর সাহস করিল না; তবে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত আমার সহিত বাজার পর্যন্ত

গিয়া সব বলোবস্ত করিয়া বিতে প্রস্তুত হইল। আমি ধস্তবাদের সহিত সে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিয়া নৌকা খুলিয়া নদীর অপর পারে বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে ভাল খাবার কিছুই নাট,—সামান্য কিছু বাতাসা ও মুড়ি পাওয়া গেল, তাহা দিয়াই একটু জল খাইয়া রামদীনকে গুটি প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলাম।

ঐদহীপ্রমোহন চন্দ্র।

চরম

মার্কিন-কবি উইলকক্স

এলা হইলার উইলকক্স মার্কিন দেশের জনপ্রিয় মহিলাকবি। উইলকক্সের জন্ম-এহণের পূর্বে তাঁহার সাহিত্যগুরুগিনী জননীর প্রাণে একটা অকৃত ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, এবারে তাঁহার কল্পা-সন্ধান জন্মিবে, এবং সে বড় হইয়া সাহিত্যের সেবাতেই জীবন সমর্পণ করিবে। তাঁহার ফলে কুমারী এলা আপনার শৈশবচারণা ও নবআয়ত্ত বিস্তার উৎসাহে দেখামে-সেখানে বাহা-কিছু লিখিতেন তাহাতেই পরিবারের সকলের একটা উৎসাহ দেখা ধাঁহিত।

তিনি নিজেও বলেন—“বাস্তবিক, ছেলে-বেলার আমার মা আর বাবা আমাকে কি উৎসাহটাই দিতেন। সাত বৎসর বয়সের সময়,—তখন বছর-দুই সবে

লিখতে শিখেছি আর কি,— আকা-বাকা, ছোট-বড় অক্ষরে দেখানে হুবিধা পেতুম, আপনার খেদালে ছ-চার লাইন ছাঁড়ান বিধে ফেলতুম; আমার বাবা ও মা সেগুলো দেখলেই ভারি খুসি হয়ে আমাকে আদর করে, পিঠ চাপড়ে নানা রকমে খুব উৎসাহিত করতেন; বাবার অবস্থা আমার সবক্ষে যে বিশেষ উচ্চ ধারণা ছিল তা নয়; মা কিন্তু মনে করতেন আমি সেক্সপীয়ার বা এমার্সন বা অমনি একটা-কিছু হব। আমাদের বাড়ীর আর সকলেও তাঁদের দেখাদেখি আমার বিশেষ গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছিলেন।”

এই রকমে পরিবারের সকলের নিকট হইতে সন্তত উৎসাহ লাভ করিয়া কুমারী এলায় মনে একটা আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব

যেণ স্পষ্টরূপে জাগরক হইয়া ছিল। তিনি আট বৎসর বয়সের সময় রীতিমত খাতা বাঁধিয়া সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করিয়া যেন; পনেরো-ষোল বৎসর বয়সের সময় এই শিল্প, পরিবারের সংকীর্ণ গভীর মধ্যে আর বন্ধ থাকিতে পারিলেন না। স্থানীয় কোনও একখানি কাগজের অফিসে তিনি ছোট ছোট তিনটি কবিতা লুকাইয়া পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু কয়দিনের ভিতরেও কোন উত্তর না পাইয়া নবীন কবি যখন কবিতা-প্রকাশের আশা একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছেন, তখন একদিন সকালে পাঠিতে বসিয়া একান্ত অপ্রত্যাশিতরূপে সম্পাদকের জবাব পাইলেন। তাঁহার কবিতা নির্দোষ করিয়া, সম্পাদক মূল্যবস্তুর একখানি চেক পাঠাইয়া দিয়াছেন।

কাগজে কবিতা প্রকাশিত হইলেই যথেষ্ট, —আবার তাহার উপর টাকা, কেন— কিসের লজ্জা? তিনি একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেলেন! তাড়াতাড়ি পিতা মাতাকে সেই চিঠিখানি দেখাইলেন—ওঃ! সেদিনকার আমল তিনি জীবনেও ভুলিবে না! এই বয়সে লিখিয়া একেবারেই টাকা পাওয়াতে বাড়ীর সকলেই অবাক হইয়া গেলেন। মাতা চুপে চুপে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন, পিতা এতদিন মাত্র আদর্শ উপভোগ করিবার লজ্জা তাঁহাকে উৎসাহ দিলেও, তাঁহার কজা যে কেবল দখল হাওয়া, বেগুয়া আশ পূর্ণ-সৌরভ লইয়াই জীবন কাটাইয়া দিবে— মনে মনে এটা তিনি ঘোটেই পছন্দ করিতেন না। আজ কিন্তু তিনিও কজার

এই অভাবনীয় সাফল্যে পুলকিত হইয়া উল্লসকে পুরস্কার দান করিলেন। ফলে, কবির উৎসাহ এত বাড়িয়া গেল যে, তিনি যখনই একটু সময় পাইতেন, তখনই কবিতা লিখিতে বসিতেন। কিন্তু বাহা লিখিতেন তাহাই ছাপা হইত না; অনেক সময় তাঁহার ডাকটিকিট খরচ করিয়া সম্পাদকের কাছে লেখা পাঠানোই সার হইত। একজ্ঞ তাঁহার পিতা অসন্তুষ্ট হইয়া যেরূপে এত বাজে খরচ করিতে মানা করিতেন।

একবার উপর-উপরি তিনমাস দেশের কোন সম্পাদক তাঁহার কবিতা না ছাপাতে মিঃ হটলার যেরূপে আবার তিরস্কার করিলেন। কিন্তু চতুর্থ মাসের প্রথম মধ্যাহ্নে উইলকিন্স আবার কবিতার লজ্জা একখানি চম্পি ডলারের চেক পাওয়াতে, তাঁহার পিতার সকল অসন্তোষ দূর হইয়া গেল। কজার কবিতাশক্তি বুঝিয়া তিনি আর কখনও বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই।

মিসেস উইলকিন্স বলেন—“একদিন বাবা সহরের বাহিরে গিয়েছিলেন; যখন ফিরলেন তখন সবেমাত্র তোর হরেক্কে। বাবা ফিরে এলেই তাড়াতাড়ি একেবারে আমার ঘরে হাজির—আমার তখনও ভাল করে ঘুম ভাঙেনি—তাড়াতাড়ি আমাকে তুলেই তিনি সেই রাতে আমার কবিতার পক্ষপাতী একজন পাঠকের কথা আমাকে বলেন। তাঁর সঙ্গে এই লোকটির ট্রেনে আলাপ হয়েছিল। মেরের সুখ্যাতি শুনে বাবা আমার এমনই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, নিজে ত সারা রাত্রি একবার চোখের পাতা বোজেননি,

আর তাকেও বুঝতে দেননি! লোকটাও এমনি পাগল যে, সে নাকি “আমার আমার কবিতার লাইন তুলে তুলে বাবাকে তনিরেছে! জীবনে প্রশংসা আমি অনেক পেয়েছি, কিন্তু এর চেয়ে বড় প্রশংসা আমি আর কখনও পাই নি।”

জীবনে নিম্নাও তাঁহার যথেষ্ট লাভ হইয়াছে। তাঁহার সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভে যখন তিনি আপনাব্য দেহপূর্ণ পরিসারের গভী ছাড়িয়া বাহিরের পৃথিবীর সহিত প্রথম পরিচয় লাভ করিলেন, তখন হইতেই লোকে তাঁহাকে নিকংসাহ করিয়া আসিয়াছে।* লোকে ক্রমাগতই তাঁহার মনের মধ্যে এই কথা বেশ করিয়া গাঁথিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে যে, তিনি যাহা-কিছুই লিপ্ত না কেন, তাহা তাঁহার বহু পূর্বে বলা হইয়া গিয়াছে, তিনি নূতন কিছুই বলিতে পারিবেন না—কেবল চর্কিত-চর্কিত করিবেন মাত্র;— এমন কি যখন তাঁহার কবিতা-শক্তি অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না, যখন তাঁহার নাম আমেরিকার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, তখনও অধি লোকে তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর কবি ভিন্ন আর কিছুই বলিতে চাহে নাই। বড় বড় সমালোচক পর্য্যন্ত তাঁহার কবিতা কেবলমাত্র পত্র, এই আখ্যা দান করিয়া মাসিকা কুচিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তার পর এমন দিন আসিল, যখন এই সকল সমালোচকই আবার বলিতে বাধ্য হইলেন যে, মিসেস উইল-কন্সের কবিতা মার্কিন-সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তন করিয়াছে। তাঁহার Laugh and

the world laughs with you” পড়িয়া আমেরিকায়সী মুগ্ধ হইয়া। তাঁহার নাম দিয়াছিল The poet of everlasting laughter বা চিরহাস্যের কবি। তাঁহার কবিতা পড়িলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যত মন্দই হউক না কেন তাঁহার মধ্যে যে তাঁহার অস্থির নিহিত আছেই;—এ-কথা তিনি নিজেও গৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন এবং বাহ্যিক উচ্চকণ্ঠে এই সত্যটি তিনি প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার কবিতা যেমন সরল, তেমনি কোমল।

নিজের লেখা সম্বন্ধে তিনি বলেন— “আমার মনে হয় বিশ্বজুড়ি এই বিরাট সৃষ্টির অংশরূপে আপনাকে মিলাইয়া লইতে পারা, তাঁহার বাণী উচ্চারণ করিবার শক্তি লাভ করা এবং তাঁহার কর্ণের কন্ঠী হইতে পায়াই আমাদের জীবনে পূর্ণতা লাভ এবং পরিপূর্ণরূপে সন্তোষলাভ করিতে পারিবার একমাত্র উপায়, ইহাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। জীবন বলিতে আমি কেবলমাত্র এই পার্থিব জীবনটুকু মনে করি না। আমি জীবনের উপাসক, নরনারী, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, ফুলফলে আমি জীবন দেখিতে ভালবাসি, পার্থিব এই জীবন, লোকান্তরের সেই মহাজীবনের উপক্ৰমণিকা মাত্র, ইহাই আমার বিশ্বাস, ইহাই আমার বক্তব্য—।”

মিসেস উইলকন্স পরমেশ্বরকে গভীর ভাবে উপাসনা করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই তিনি সহমর্ম্মিতা, মনোভাষিত ও মানবতা পরিদৃষ্ট করিয়াছেন।

নানা ধর্ম নানা আতি
নানান্ধা নানা গতি
করে খালি গুণগোল
বুঝিবে না হার,
কণামাত্র দয়া শুধু
ধরা যাহা চার।

মিসেস উইলকিন্সের মতে এই কবিতাটিই তাঁহার সর্বোত্তম রচনা। ইহা যতবার উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহার আর কোনও কবিতা ততবার হয় নাই।

সৌন্দর্য্য না থাকিলে জীবন সম্যকরূপে পরিচুত হয় না, তাই তিনি সৌন্দর্য্যের উপাসনা করেন। তাঁহার বয়স এখন ঘণ্টে হইলেও তাঁহাকে অতি তরুণীর মত দেখায়; সেইজন্য আমেরিকার লোকের তাঁহার নাম দিয়াছে, “চিরযৌবনা।” এ বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন— “সৌন্দর্য্যই জীবনের চিহ্ন, জীবনের লক্ষণ, যাঁহাতে জীবন নাই, তাঁহাতে কোন সৌন্দর্য্যও নাই, প্রকৃতির মধ্যে চাহিয়া দেখিলেই একথা বুঝা যাইবে; কাজেই আমি মনে করি, প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিরই স্তম্ভর হইবার এবং সৌন্দর্য্যের সাধনা করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য। ইহাই আমার Philosophy বা ধর্ম, আমি ইহা বর্ণে বর্ণে পালন করিবার জন্য সারা জীবন ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছি। যে ব্যক্তি স্তম্ভর হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই, তাঁহার স্তম্ভর হইতে চেষ্টা করা আবশ্যিক। কারণ আমরা সকলেই চিত্তার ফলমাত্র, মনে বেকল চিত্তা করা হয়, শরীরের

উপর সেই চিত্তার ছব্ব ছাপ পড়িয়া যায়। আমার মতে সৌন্দর্য্যলাভের জন্য তিনটি পথ আছে। প্রথম আধ্যাত্মিক, দ্বিতীয় মানসিক ও তৃতীয় শারীরিক। সর্বনা পুতচরিত্র হইয়া শুদ্ধাভ্যাসে সফল প্রকার পাণ হইতে পূরে থাকিতে, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে এবং সকল জীবের স্নাত্ত্যাব দেখিতে হইবে। অলং সংসর্গ ত্যাগ করিবে, কিন্তু অলং লোককে ত্যাগ করিলে চলিবে না; এগ্নি খুলিয়া তাহার প্রতি সৎস্মৃতি প্রকাশ করিতে হইবে, তাহার পত্তনে হুঃখবোধ করিতে হইবে,—ইহাই আধ্যাত্মিক জীবনের সাধন-প্রণালী। দ্বিতীয় প্রণালী মানসিক :—মনকে সর্বদা বিভিন্ন ভাব ও উপভোগ্য বস্তু লাভ করিতে অবসর দেওয়া আবশ্যিক। তৃতীয়, শারীরিক সাধনা :—অন্নাহার, গভীর ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও বিশেষ বিবেচনার সহিত সামর্থ্যোন্নয়নে ব্যায়াম অন্ত্যাস। ইহাই সৌন্দর্য্যলাভের উপায়।

বিশ্ব-মানবতার গতি সহিত সম্পূর্ণরূপে যোগ রাখিয়া স্তম্ভরভাবে জীবন বাপন করাই আমার মতে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য, মানুষের জীবনে কেবল বসন্ত, ফুল ও জ্যোৎস্না নাই, দেখানে মাঝে মাঝে হুঃখ-শোকের অবসাদে প্রাণমন আচ্ছন্ন হইয়া যায় বটে, কিন্তু ভগবান মঙ্গলময়। তিনি হুঃখ দেন একগুণ, আর সুখ দেন তার তিনগুণ। জীবনে আমি চেনা আলা সহিয়াছি, কিন্তু হুঃখের পর আমি আমার সুখের যে স্বাদ পাইয়াছি, সুখে তাহা বলিয়া বুঝানো যায় না। জীবনের তুলনাত্তে

ওজন কাঁটার কাঁটার সমান হইবেই-হটবে। যখন বালিকা ছিলাম, তখন অসীম স্তরে পিতামাতার আদরিত্ব হইয়া কালযাপন করিয়াছি; তারপর যখন তাঁহাদের য়েহনীড ছাড়িয়া আর একজনের সহিত আমার জীবন-সূত্র গ্রথিত করিলাম, তখন মনে করিয়া-ছিলাম বুঝি বিধে আমি এবার একেবারেই নিঃসহায় হইয়া পড়ি। কিন্তু আমার সে ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। আমার জীবন-দেবতার স্মরণ মনে, উপায় স্রষ্ট, ও মহাপ্রাণতার আমি মুক্ত হইয়াছি, তাঁহার সংলব্ধতার সতর্ক প্রেরণার আমি এতদিন যে স্বপ্ন, যে নির্ভরতার সহিত কালযাপন করিয়াছি তাহা আমার পৈশবের দায়ের কোণ হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে।”

মিসেস উইলকিন্স বিশ্বাস করেন যে, কবি হইয়া না জন্মিলে কেহ কবি হইতে পারে না। তিনি বলেন, কবিয়ারই “Inspired”, পরমেশ্বর কবিকে ভাবসম্পন্ন দান করিয়া থাকেন, তিনিই তাহাকে কাব্য-রচনার অল্পপ্রাণিত করিয়া থাকেন, সে অল্পপ্রাণিত কবি তুমিট হইবার সঙ্গে সঙ্গেই লাভ করে এবং চিরজীবন তাহা হইতে বঞ্চিত হয় না।

মিসেস উইলকিন্স গল্প-রচনাও করিয়াছেন; তবে তাঁহার কাব্যের তুলনায় তাহা অতি সামান্য। তাঁহার মতে The woman of the world নামক বইখানিই তাঁহার সজ্ঞাতকৃষ্ট গল্প-রচনা।

ত্রিংশতচন্দ্র দত্ত।

জ্ঞানের জীবন্ত প্রতিমূর্তি

বি, মাদন হেডিকার বিপ্লবের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। মি: হেডিকারকে বাস্তবিকই জ্ঞানের পূর্ণপ্রোতি: বলিলেও অতুক্তি হয় না। অতি অল্প বয়সের মধ্যেই তিনি যে পরিমাণ জ্ঞানার্জন করিয়াছেন, তাহা কল্পনা করিলেও, বিশ্ব-বিস্ময় হইতে হয়। অধুনা সাধারণের মধ্যে “জানী” আখ্যায় যোগ্য হওয়া বড়ই কঠিন; কারণ, জ্ঞানের শাখা-প্রাণা আনুমানিক এতই অধিক, যে তাহার ইয়ত্তা হয় না; মি: হেডিকার বিশিষ্টরূপে অপূর্ণ প্রতিভা-বান্ ব্যক্তি। তাঁহার প্রতিভা যে কেবল জ্ঞানের কোন এক নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে

মধ্যে আবদ্ধ, তাহা নহে; তিনি অনেক-গুলি বিষয়েই তুল্যরূপে পারদর্শী। জ্ঞান-রাশির অন্তর্নিহিত যে-কোনও প্রশ্নের সীমাংসা, তিনি অতি অল্প আয়াসেই করিতে পারেন। দেশ-দেশান্তর হইতে, প্রস্তুত-সামগ্রীর জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ও সুখী-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে প্রত্যহই তিনি নানা-বিষয়ক বহুসংখ্যক পত্র পাঠিয়া থাকেন এবং আর অল্প জ্ঞান-প্রভাবে সেগুলির বখাখখ সহজতৎদানে প্রত্যেকেরই প্রীতি, আনন্দ ও ভক্তি আকর্ষণ করেন। ইহার অল্প তিনি কোনরূপ মূল্য বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না। পত্রাবারাই হটক বা স্বয়ং



বি, ম্যাকন হেডিকার

আসিয়াই হউক, এ-পৰ্যন্ত কোন ব্যক্তিই
গ্রন্থের উত্তর পুঁইবার জন্য তাঁহার নিকটে
আবেদন করিয়া পিচলকাম হন নাই। তাঁহার
নেতৃত্বাধীনে অষ্ট্রিয়া, ইটালী, ফ্রান্স, কবিয়া,
যুক্তরাজ্য এবং অত্যন্ত অনেক রাজ্যের
বিভিন্ন প্রকারের পারিভাষিক তত্ত্ব নির্ধারিত
হইয়াছে।

মিঃ বি, ম্যাকন হেডিকার লণ্ডন-বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্র ও রাজনীতি বিভাগ-
বিভাগের লিনোয়ান্স-সমাজের একজন সভ্য।
অর্থশাস্ত্রে ও রাজনীতি-বিষয়ে তিনি
অবিতীৰ্য। অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বহুমান
তাঁহার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন।
তাঁহার মত অনেক সময়ে মন্ত্রিসভার শাসন-

প্রণালী ও ‘পার্লামেন্টে’র আইন-গঠনো-
দ্ধেয়ে বিশেষরূপে সহায়তা করে। পৃথিবীর
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পুস্তকাগারের রাজনৈতিক
অর্থশাস্ত্র-বিশয়ক পুস্তকাবলী তাঁহার রীতি-
মত অধীত। তাঁহার নিত্যেরও একটা
পুস্তকাগার আছে। এই পুস্তকাগারে
বিবিধ বিষয়ের অসংখ্য পুস্তক ও ত্রিভুজ সংগৃহীত
হইয়াছে। পুস্তকাগারের উপস্থিত পুস্তক-
সংখ্যা ২৫০,০০০। হেডিকার এই সংখ্যা
বর্দ্ধিত করিবার জন্য প্রতি সপ্তাহে ১,০০০
করিয়া নূতন পুস্তক ক্রয় করিতেছেন। অর্থ-
শাস্ত্র-বিশয়ক যে সকল অনুশাসিত পৃথিবীর
অন্ত কোনও পুস্তকাগারে দেখিতে পাওয়া
যায় না, তাঁহার পুস্তকাগারে তাহা অনায়াস-

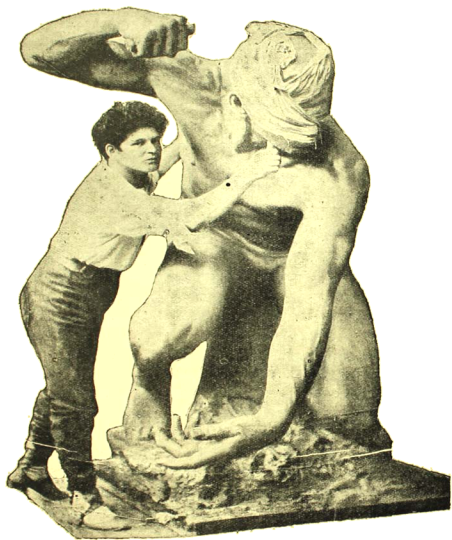
লভ্য। তিনি নিজে বহুশ্রমাদি, গুহরায় তাঁহার পুস্তকাগারে বহু ভাষার রচিত নানা পুস্তকও রক্ষিত হইয়াছে।

ব্যক্তিগত ভাবে, পত্রবারা বা তারদোণে সহস্র সহস্র ব্যক্তির ও বহু সম্প্রদায় এবং শালন-বিভাগের প্রবেশ সমাধান করা ব্যতীত তিনি তালিকাভুক্ত গ্রন্থ দ্বিসহস্র ছাত্তের পাঠ-প্রণালী নির্দেশ করিয়া থাকেন। লণ্ডনের অর্থশাস্ত্রবিদগণের ভিতর হইতে যে-কোন গ্রন্থ, পুস্তক বা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়, তাহার প্রত্যেকটির জন্য তিনি দায়ী। মিঃ হেডিকার বলেন, “উপহিত আমার হাতে ‘সমগ্রোচিত বাণিনা’ ‘রেলওয়ে-নিয়ম-প্রণালী,’ ‘ঐর্থ্যের মূলতত্ত্ব,’ ‘স্বাধিকৃত অর্থশাস্ত্র,’ ‘যুদ্ধ’ ও ‘সাধারণ নগরবাণী’ প্রভৃতি বিষয়ের পুস্তক-রচনার ভার অর্পিত আছে।

মিঃ হেডিকারের জনকরেক প্রতিভা-বান্ সহকারী আছেন। ইহাদের প্রত্যেকেই তাঁহার পরম তত্ত্ব ও তাঁহাবই শিক্ষায় উন্নত। ইহাদের মধ্যে W. D. Webb, B. S. C., F. S. S., হেডিকারের শক্তিতে বিশেষরূপে অগ্রাণিত এবং এই সঙ্গীত সাহায্যে হেডিকার বিগত কয়েক মাসের মধ্যে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ-প্রণয়ন করিয়াছেন। পাঠক-বিগের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় ভূবন-বিখ্যাত অমূল্য গ্রন্থ “Britannica”র সহিত সুলক্ষিত এবং জ্ঞানসাগরার মধ্যে উহার স্থান যে কত উজ্জ্বল, তাহাও বোধ হয়, তাঁহারী সকলে উত্তমরূপে অবগত আছেন। হেডিকারের আত্মকৃত্যে ওয়েব-রচিত এই গ্রন্থখানি “Britannica” অপেক্ষা কোন

অংশেই নূন নহে। “Unemployment and Insurance” নামক খুদাখান গ্রন্থের রচয়িতা Mr I G, Gibbon, ছাত্রোবনের অধিকাংশ পাঠই হেডিকারের পরামর্শরত সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

মিঃ হেডিকার যে কেবলমাত্র আধুনিক ভাষান্তরিতই বিশেষরূপে ব্যুৎপন্ন, তাহা নহে; অধিকন্তু বিবিধ প্রাচীন ভাষাও তাঁহার বেশ ভালরকমই জানা আছে। সংপ্রতি তিনি ভারতবর্ষের এটোরা নামক স্থানের কোন একটা সংস্কৃত পুস্তকাগার দেখে একটা ছন্দগ্রাহী গ্রন্থ লিখিয়াছেন। বিভিন্ন জাতির অবগতির জন্য তিনি প্রতিমাসেই “Les Meilleurs Livres” নামে শ্রবণার্থ ও বহু পুস্তকের সংক্ষিপ্তসার-সংলিত একখানি তালিকা প্রকাশ করিয়া থাকেন। বহু উপাধি-ভূষিত এবং ‘কলেজ’ ও স্নাতক-প্রদত্ত প্রভূত পদকপ্রাপ্ত, জ্ঞানের জীবন্ত মূর্তি মিঃ হেডিকারকে যদি কখনও, তাঁহার ‘মূল’ বা ‘কলেজ’-স্নাতক-সংস্কৃত কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে তিনি তাহার যে উত্তর দান করেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। তিনি বলেন, “দামো বৎসর বয়স হইতে আমি বিজ্ঞানের ভোগ করিয়াছি।” বিশ্ব-বিজ্ঞানের উপাধি ভূষণে ভূষিত না হইয়াও যে অনেকে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করিয়া পৃথিবীতে কীর্তি রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন, একথা ইতিহাসের অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু হেডিকারের স্থায়ী এক জ্ঞান বয়সে বিজ্ঞানের হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া মাহুত যে জীবনের মধ্যাহ্নেও একরূপ

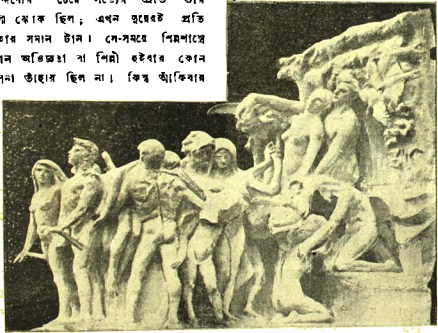


ভাস্কর দ'জঁ গ্রে বার্নার্ড

সহরের জনতা ছাড়িয়া মিসিমিপুর গভীর
নির্জনতার মধ্যে পলায়ন করিতেন।
দেখানে গেলে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত
হইত—শান্তি, আনন্দ, নীরবতা ও দৈব-
ধ্বংসের মধ্যে তিনি দিনের পর দিন ও
রাত্রির পর রাত্রি ধরিয়া নদীর ধারে বসিয়া
ধাকিতেন এবং পানী, বীজ, ইঁদুর ও
ধরগোশদের অপূর্ণ স্বাধীন জীবনকে আশ-
্বসন দিয়া পর্যবেক্ষণ করিতেন। জীবজন্তুর
প্রতি নির্দয় ব্যবহার করা তাঁহার প্রকৃতি-
বিকৃত হইলেও, তাহাদের শরীর-তত্ত্ব
আনিবার জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া থাকে
যাকে পত-পক্ষী বধ করিতে হইত। তখন
সৌন্দর্যের চেয়ে সহ্যের প্রতি তাঁর
দেখা ঝোক ছিল; এখন ঘুরেঘুরে প্রতি
তাঁহার সমান টান। লে-সময়ের শিল্পশাস্ত্রে
কোন অস্তিত্বই বা শিল্পী হইবার কোন
বাসনা তাঁহার ছিল না। কিন্তু আকিবার

কোন নিয়ম না জানিয়াও সে-ব পত-পক্ষী
তাঁহার জিহ্বা ছিল, তাহাদের ছবি তিনি
আপনা হইতে বেশ ভালরূপই আঁকিতে
পারিতেন।

এই-সব ছবি দেখিয়া তাঁহার পিতা
তাঁহাকে এক ‘এন্থ্রোপোমোর’ কাছে কাজ
শিখিতে পাঠাইয়া দিলেন। এখানে দুই বছর
ধরিয়া তিনি একেবারে নিজের মনের মত
করিয়া আঁকিতে শিখিলেন। কোন সামান্য
ব্যাপারও তিনি এমন উচ্চশ্রেণীর কলা-
পটুতার পবিচর দিতেন যে, তাঁহার ওস্তাদও
তাঁহাকে তারিফ না করিয়া থাকিতে
পারিতেন না !



তাহার হাতে বধন কিছু-কম আড়াই শো টাকা কমিল, তখন তিনি জীবিকা-নির্বাহের জন্য শিল্পকে অবলম্বন করিলেন। ঐ সমাজ টাকার উপর নির্ভর করিয়া তিনি অন্যভাবে ও অর্জাণ্যে কাঙ্ক্ষণে একটি বৎসর কাটাইয়া গেলেন। এমন কঠোর জীবন-সংগ্রামের পর তিনি “শিকাগো-আর্ট-ইনস্টিটিউটে” রক্ষিত কয়েকটি ‘প্লাষ্টারের’ ছাঁচ, আদর্শরূপে ব্যবহার করিবার চক্ষু পাইলেন। গ্রীক আর্টের সঙ্গে এই তাহার সর্বপ্রথম পরিচয়।



বার্ণার্ড বলেন, “স্কুলের কয়েকটা বন্ধু ছেলে ছাঁচগুলির প্রতি কু-ব্যবহার করেছিল, কর্তারা তাই প্রথমটা কিছুতেই আমাকে ছাঁচগুলি ব্যবহার করতে দিতে চাননি। আমি কিন্তু জোর করে তাঁদের বুঝিয়ে দিলাম যে, ঐ ছাঁচগুলি ব্যবহার করবার একমাত্র যোগ্যপাত্র আমিই। শেখটা অবশ্য আমি অসুস্থতি পেলাম; এবং ছাঁচগুলির ভিতর গ্রহণযোগ্য বা-কিছু ছিল, অবিলম্বেই তা একেবারে আরম্ভ করে ফেললাম।”

অন্তঃপর, কোনরূপ শিক্ষাগত না করিয়াই বার্নার্ড ভাস্কর্য্য-শিল্পে হস্তক্ষেপ করিলেন। নদীর ধার হইতে সংগৃহীত একতাল মাটি লইয়া তিনি তাহার ভায়ের একটি আবক্ষ প্রতিমূর্তি গড়িয়া ফেলিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি একটি কাজ করিয়া ৭০ পাউণ্ড পাইলেন এবং এই মূলধন লইয়া পারি-নগরীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

পারিতে তাহাকে যে কঠোর সাধনা করিতে হইয়াছিল, তাহা বলাবাহুল্য।

প্রতিদিন নানা শিল্পশালায় গমন করিয়া তিনি নূতন নূতন শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। ঐকি আটের অসংখ্য নিদর্শন দেখিয়া চলিতকলার গুঢ় কথাটি তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু কেবল ঐকি আট লইয়াই বার্গাড ভুট্টে রহিলেন না— কারণ তিনি এই উন্নত বিজ্ঞানের যুগে অগ্রিয়া আধুনিকতাকেই বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন, “আমি দেখলাম, ঐকি আটের আদর্শ, দেবতা-গড়া। ঐকিরা হুন্সর আকার, হুন্সর প্রতিরূপ গঠন করে বেদীর উপরে স্থাপন করত। কিন্তু যেখানে মানবতা ও ব্যক্তিত্ব হুটিয়ে তোলাবার দরকার, সেখানে তাদের শক্তি পিছিয়ে পড়ত। দেবতাদের যুগ চলে গেছে;—এটা হচ্ছে মানুষের যুগ। ভাষ্যার্থে আমি তাই মানুষ ও তার বিশেষ লক্ষণ-

গুলি হুটিয়ে তুলতে চাই। লোকে বলে, ‘মুষ্টি গড়ে লাভ কি?’ যা কদ্বার তা হয়ে গেছে,—‘আমি উত্তর দি, ‘না। ভাষ্যার্থে আমরা এই সব হত্যাধর্ষণ করেছি মাত্র—পাথরে হুটিয়ে তোলাবার ক্ষেত্রে সমগ্র মানবতা এখনো গড়ে আছে’।”

বার্গার্ডের শিল্পে এই মানবতাই হইতেছে গোড়ার কথা ও আসল বিশেষত্ব। এইটুকু বুঝিলেই বার্গার্ডের গড়া মুষ্টিগুলির সৌন্দর্য ও রহস্য সকলেই চন্দ্রলক্ষ্য করিতে পারিবেন।

Salonএ তাহার গঠিত যে-সকল মুষ্টি দৃষ্টিত হইয়াছে, সেগুলি দেখিতে গেলে দর্শককে ও যেন চিত্রোপিতের মত হইয়া যাঠতে হয়। মুষ্টিগুলি বাস্তবিকই অপূর্ণ-নির্দিষ্ট। তাহাদের মধ্য হইতে নৃত্তি ও কাণ্ড যেন মুক্ত হইয়া হুটিয়া উঠিতেছে। অভ্যন্তর মানসকাটিতে তাহাদিগকে মাপিতে

গেলে তাহারা অগ্রের সমালোচনার বস্তু হইতে পারে; কিন্তু বর্তমানের কষ্টিপাথরে কদ্বিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, তাহারা হুন্সর ও ভাবান্তিরাম।

অবিখ্যাত ফরাসী-চিত্রকর পল লরেন্স, বার্গার্ডকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, উপলব্ধিতে আমরা তাহার কিরদংশ তুলিয়া দিলাম :—

“আপনার কাজ আমাকে আনন্দদান করে। আপনি আপনার বিজ্ঞান



যোগাত্মকের উৎকর্ষ

ও ফলাফল করার করিয়াছেন ; না—আপনি তার চেয়েও বেশীদূর অগ্রসর হইয়াছেন,—প্রকৃতির সামনে মুখোমুখী হইয়া আপনি দাঁড়াইতে পারিয়াছেন। আমরা—করাসী শিল্পীরা—প্রচলিত নীতি-নীতি ও বাধা আইন-কানূনের অধীন ; আপনি যেমন

সমস্তই নিজের মত করিয়া গিয়া দেখিতে পারিয়াছেন, আমাদের মধ্যে একজনও তেমনটি পারেন না। আপনি সুখ নিজের চোখে দেখিয়াই খাশিয়া যান নাই ; পরন্তু, দৃষ্ট বস্তুটিকে আকারও প্রদান করিয়াছেন।”

বিনা যাতনায় মাতৃ

বর্তমান যুরোপ-ব্যাপী মহাসমর আরম্ভ হইবার কিছুদিন পূর্বে সমগ্র ফরাসীজাতি এক স্থলংবাদ গ্রহণ করিয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল। সংবাদটি এই :—বিখ্যাত রসায়ন-শাস্ত্রবিৎ জর্জেস পলিন বহুবৎসর



জর্জেস পলিন

গবেষণার পর এক অপূর্ণ ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ঔষধজ্ঞে উদ্ভিদে রমণীগণকে আর এসব-যাতনায় কাতর হইতে হইবে না !

সন্তান-সন্তানবানার সময় রমণীকে বেদনা-

নাশক ঔষধ-সেবন করানো, কিছু একটা নতুন কথা নহে ;—কিন্তু আগরপ্রসবা রমণীকে আফিমের সার বা অস্ত্র কোনরূপ ব্যাধারী ঔষধ সেবন করাইলে যথেষ্ট বিপদ-ভর আছে। এমন-কি, সময়ে সময়ে তাহাতে ব্যথা না কমিয়া দীর্ঘকালব্যায়ী হয়। শ্রীযুত পলিনের আবিষ্কৃত ঔষধের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহাতে কোন অনিষ্টকর পদার্থ নাই এবং তাহা সেবন করিলে স্বাভাবিক এসবে কোনরূপ বাধা হয় না। শ্রীযুত পলিনের বহুদিনব্যাপী পরীক্ষার পর আফিমের সার হইতে বিবাক্ত অংশ আর পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আজ কিছু-বেশী দুই বৎসর পূর্বে এই ঔষধ আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কারের পক্ষে শ্রীযুত পলিন ও তাঁহার সহকারী ডাক্তার পিয়ের লরেন্ট কুজুর, বিড়াল ও খর্গোশ প্রভৃতি জন্তুদের উপরে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া চূড়ান্ত সীমাংশের উপস্থিত হইয়াছেন। এক বৎসর পরীক্ষার পর তাঁহার Beanson Hospital-এর বিখ্যাত ডাক্তার Ribemont-

Dessaigne-এর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে এই নব্যবিশুদ্ধ ঔষধের কথা গোপনে খুলিয়া বলিলেন।



ডাঃ রিবমন্ট

ডাক্তার Dessaigne যখন বুঝিলেন, এই প্রাণ-বিবহীন আফিমের সার স্রোতাল ও ক্লোরোফর্ম প্রভৃতি তপাকথিত বেদনানাশক ঔষধের মত প্রুতি বা গর্ভস্থ সন্তানের কোন অনিষ্টসাধন করে না, তখন তিনি বিনা-বাক্যব্যয়ে এক গর্ভবতী রমণীর উপর ঔষধটি প্রয়োগ করিলেন। বলাবাহুল্য তাঁহার পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে সফল হইল।

প্রথম পরীক্ষার পর সর্বদেহে একশত ষারোজন রমণী এই অপূর্ণ ঔষধের জ্বলে বিনা যন্ত্রণার মাতৃদেহে সন্তানলাভ করিয়াছেন।

এই নূতন ঔষধ সম্পূর্ণরূপে বিবহীন নয় বটে, কিন্তু ইহা যথা মাপ করে। ইহা

সেবন করিলে প্রসব দীর্ঘকালহাযী হয় না এবং গর্ভস্থ সন্তানেরও সামান্যতম অনিষ্ট-স্তর থাকে না। প্রসবকালে গর্ভবী সন্তান থাকিবেন—কেবল মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইবে, তিনি যেন কি-এক সুখের স্বপ্নলোকে বাস করিতেছেন। তাঁহাকে ডাকিলে তিনি চোখ তুলিয়া চাহিবেন, তাঁহার দৃষ্টিতে দেখা যাইবে বিশ্ব, আনন্দ ও মাতৃপ্রেম। তাঁহার কঠ দিয়া আর্তমানের একটি ধ্বনিও বাহির হইবে না—পরন্তু, প্রসবকালে তাঁহার প্রসব সুখ উজ্জল হাতে উদ্ভাসিত থাকিবে।

পূর্ণ-উক্ত একশত ষারোজন রমণীর ভিতর তিনি জন যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছেন—কিন্তু, তথাপি সামান্য যন্ত্রণা-ভোগও করেন নাই। ডাক্তার Ribemont-Dessaigne বলিতেছেন:—

“কোন পরীক্ষাতেই কুফল পাওয়া যায় নাই; অতিমিত্র ঔষধের বা কোনপ্রকার কু-প্রতিক্রিয়ার চিহ্নও দেখা যায় নাই। মানসিক যাতনা বা আত্মির কোন লক্ষণও—প্রসবের পর যাহা সচরাচর দেখা যায়—প্রকাশ পায় নাই। এই স্রীলোকগুলি কিছুমাত্র শারীরিক কষ্টভোগ করে নাই। একজনকে দেখেও আমি অবলাদ বা দ্রাব্যসংক্রান্ত উত্তেজনা দেখি নাই। বাহারা সন্ধ্যাকালে সন্তান প্রসব করিয়াছে, তাহারা পরদিন পর্য্যন্ত পরম ন্যায্যে নিদ্রাতোগ করিতে পারিয়াছে।”

ফরাসী-বিজ্ঞান-মন্ডা একান্তভাবে নিম্ন-লিখিত মত জ্ঞাপন করিয়াছেন :

১। আনন্ডকাল একটুও বিপদ-স্তর না করিয়া অত্যন্ত জননীর পক্ষে বিনা যন্ত্রণায় সন্তান প্রসব করা সম্ভব।

২। এই চিকিৎসার সম্ভাবন-প্রসঙ্গে কোন বাধা বা বিলম্ব হয় না; পরস্পরকে মূলে দেখা গিয়াছে, এই ঔষধ-সেবনে ঐন্দ্র-স্বপ্ন সব হইয়াছে।

৩। অশ্রুক্ষেপে প্রতি তিনটি সম্ভাবনের মধ্যে গড়ে একটি করিয়া নীরব থাকে— এই নীরবতা বাস্তবিকপক্ষে অবিধাকর।

৪। এই ঔষধে প্রসবাত্তেও বেদনানোথ হয় না।

৫। ইহা একটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত যে, অত্যন্ত রমণীয়া বিনা বাতনার মাতৃদ লাভ করিবেন।

ফ্রান্স ও রুশিয়ার বাণী

একজন অবিখ্যাত আমেরিকান লেখক বলিতেছেন :—“পৃথিবীকে সহজ জ্ঞান, রুচি ও বিচারবুদ্ধি শিক্ষা দিয়াছেন—ফরাসী জাতি। স্বাধীনতা, ভাষাব্যাখ্যা ও চিত্রকলা এবং গল্প রচনা-ভঙ্গীতে ফরাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।

ইংরাজ গল্প লিখিতে শিখিয়াছে ফরাসী-দের কাছ হইতে। চতুর্দশ শতাব্দির রাজত্ব-কালে ইংরাজী সাহিত্য যখন ফরাসী-প্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, অবশ্য ইংল্যান্ডেরা তখন গড়েই কথা কহিতেন ও রচনা করিতেন; কিন্তু সে গল্পের ভঙ্গীট ঠিক এখনকার মত স্বচ্ছন্দ ও সুচল ছিল না। ফরাসী লেখকেরাই ইংরাজদিগকে গল্প লিখিবার প্রসঙ্গত ভঙ্গী দেখাইয়া দিয়াছিলেন; এবং এই ভঙ্গী ইংরাজদের এতটা সুদৃঢ় করিয়াছিল যে, ইংলণ্ডের কবিরা পর্যন্ত তাহার প্রভাববশত হইতে পারেন নাই। তাই ডাইডেন ও পোপের পদ্যছন্দেও ফরাসী গদ্যের গন্ধ পাওয়া যায়!

ফরাসীরা দুটি বিষয়ে তাহাদের দুই নিকট-প্রতিবেশীর কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য। কাণে ইংরাজ ও সঙ্গীতে জার্মান জাতি ফরাসীদের অপেক্ষা সমুদ্রত।

জাগতিক সভ্যতার দাফা-কিছু মহৎ, তাহার অমুদ্রিতনের প্রধান পুত্র হইতেছে, ফ্রান্স। সবগ্র যুরোপের মধ্যে যদি কোন সভ্যতারি বাচিয়া থাকার প্রয়োজন হয়, তবে সে ফরাসী জাতির। মধ্যযুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত পৃথিবীর চিন্তা-রাজ্যে ফরাসীরা অটলভাবে প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছে। এ-যুগের ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্রান্সের উপজাতিগুলি পাঠ কর। পৃথিবীর মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক মন বটে, কিন্তু এমন কোন ইংরাজ, জার্মান বা রুশ ঔপন্যাসিক দেখাইতে পার কি, তাহার উপজাতি ভবিষ্য সভ্যতার দিকে দৃষ্টিতে এতটা আগ্রহ করিয়া দিতে পারে? হেন্সি ডি বোণিয়ার যে গল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা স্বার্থ :—

“প্রতি মাহের দুইটি পেন আছে— তাহার অশ্রুভূমি এবং ফ্রান্স।”

কিন্তু যুরোপ ও আমেরিকাকে ফ্রান্স সর্বপ্রধান কি শিক্ষা দান করিয়াছে? রাষ্ট্রবিপ্লবের মঙ্গা শিক্ষা।

দুইটি বিষয়ে ফরাসীরাষ্ট্র-বিপ্লব প্ররোধ হইয়া উঠিয়াছে—গিলোটিন এবং নেশোনিয়ন।

কিন্তু, কল কি হইল, দেখ।

১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দের ১ই অক্টোবরে প্রশিয়ার
রাজা হুকুমজারি করিলেন,

“আমাদের রাজ্যে সকলকার দাসত্ব ঘুচিয়া
গেল,—এখানে কেবল স্বাধীন ব্যক্তিরা
থাকিবেন।”

কেন? প্রশিয়ার ফরাসীদের পদদলিত
হইয়াছিল বলিয়া। নেপোলিয়নের শাসন-
কালে ফরাসী কৃষক-সমাজ স্বাধীন ছিল।
নেপোলিয়নের পূর্বে সাধারণ-তন্ত্রের সময়েও
কৃষকেরা স্বাধীন ছিল, কিন্তু পুরাতন
রাজবংশের শাসন-সময়ে তাহাদের কোন
স্বাধীনতা ছিল না। এই স্বাধীনতা
রাষ্ট্রবিপ্লবের মহাপ্রসাদ। স্বাধীন কৃষকেরা
মানন্দে ভেঙের সহিত চাষ-বাদ করিত—
তাহাদের ভাতার ধনধান্তে পরিপূর্ণ হইয়া
উঠিত। বিপ্লবের মনোমগ্নত্বে নেপোলিয়ন
এই স্বাধীনতার অঙ্গভূত।

প্রশিয়ার রাজা লিবিয়াছিলেন:—

“নেপোলিয়নের কাজ হইতে আমরা
অনেক বিষয় শিখিতে পারি। ‘ভগবান
তাহার সঙ্গে থাকুন’—এ কথা বলিলে ঈশ্বর-
নিম্মা করা হইবে; কিন্তু এ কথা ঠিক যে সর্ব-
শক্তিমানেও হস্তে তিনি চালিত যন্ত্রের মত,—
এ যন্ত্র প্রাচীন ও জীবনহীন বাহ্য-কিছু স্পর্শ
করিত, তাহা ভয়মাত্বে করিয়া ফেলিত।”

যুরোপের অধিকাংশ স্থল হইতে নেপো-
লিয়ন যে স্ফুটী দাসত্ব-শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া-
ছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু বিপ্লবের আর
এক মহামন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন,—কি
ব্যক্তিগত আর কি ব্যবসায়-গতভাবে আইনের
সম্মুখে সকল লোকের সমান অধিকার।

নেপোলিয়ন বে-চাৰে এই স্বাধীনতা
ঘোষণা করিয়াছিলেন, প্রশিয়ার রাজাও ঠিক
সেইভাবেই রাজত্ব হইতে দাসত্বকে বিদায়
দিলেন। কলে সম্রাট ব্যক্তি ও কৃষকের মধ্যে
আর কোন পার্থক্য রহিল না। ইচ্ছা
হইলে কৃষকেরাও সম্রাট হইতে পারিত এবং
সম্রাট ব্যক্তিগণও সাধারণ ব্যবসায়ের প্রবৃত্ত
হইতে পারিত।

ফরাসী বিপ্লবের মহাদান,—এই সাম্য-
নীতি।

চিত্তাভাণ্ডে প্রশিয়ার এখনও অপূরণ
নিকট অগম্য। তাহার ছাত্রের অভ্যন্ত
অধিক—তাহার শিক্ষকর অতি সামান্ত।
বিজ্ঞান, প্রবন্ধিত বা শাসনতত্ত্বে, সম্রাটের
ক্ষেত্রে কবিবার দান খুঁজিল—কিন্তু মলিত
কলার সে একটি ছাত্রী আসন দখল
করিয়াছে। সঙ্গীত-রচনার Tschaiowsky,
চিত্তাঙ্কনে Verestchagin, নৃত্যে Mord-
kin বা Pavlowa-কে আমরা কখনও
ভুলিতে পারি না। কিন্তু ইহার সকলেই
যে স্ব বিভাগে সমগ্রের মধ্য দিয়া আপনার
ব্যক্তিত্বই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

কবিবার সকল প্রেত ঔপজাসিকের
মধ্যেও বিনোদ করিয়া যেন এই গুণটিই
ফুটিয়া উঠিয়াছে। নানা ঘটনার মধ্য দিয়া
কব ঔপজাসিক আপনার উদ্দেশ্যই প্রকাশ
করেন। পৃথিবীর উপর আমাদের প্রতি-
ক্রিয়া—আমার!

টলষ্টয়ের নভেলগুলি হইতে পরিণামে
আত্মপ্রকাশ করেন টলষ্টয়! তিনি একজন
অপূর্ণ কলাধিন নন,—কিন্তু তিনি স্বয়ং
একটি অপূর্ণ কলা-বত্ত।

এই ঔপজাতিকদের সাহায্যে রচনা পৃথিবীর উপর এক অসীম প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। ইংলণ্ড ও অজ্ঞাত সকল দেশের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ ঔপজাতিক রচনার

কথা-সাহিত্যের মহিমার অস্তিত্ব হইয়া পড়িয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে রচনার ঔপজাতিকগণই কানতিক সাহিত্যে সমদিক প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছেন।

শ্রীপ্রসাদনাথ দাস।

পাগল ভাষাতত্ত্ববিদের কথা

সার জেম্‌স্‌ ম্যারের নাম বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন। ইনি একজন বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিৎ এবং এক খ্যাতনামা অভিধানের সম্পাদক। সম্প্রতি ইহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর সময় ইনি অসুস্থ উৎসাহে তাঁহার নূতন অভিধানের দ্বিতীয় পত্রিকা প্রকাশ করিতেছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে গ্রন্থ তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

ম্যারে তাঁহার অভিধান-গ্রন্থের দ্বিতীয় বহু লোকের সাহায্য পাঠিতেছিলেন। তিনি এক-একটি শব্দ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পাঠকদের নিকট প্রেরণ করিতেন এবং তাঁহারা সেই সকল শব্দের মানে প্রকার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠাইতেন।

ম্যারে তাঁহার অভিধানের ভূমিকা লিখিয়াছেন যে, খ্রীষ্টক ডাক্তার মাইনর এই গ্রন্থ-প্রণয়নে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। সম্প্রতি খ্রীষ্টক হেডেন চার্লস মহাশয় উক্ত ডাক্তারের সম্বন্ধে এক কোডুহলোদীপক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

সার জেম্‌স্‌ ম্যারে মাইনরের পত্র দ্বারা ই আশাশ্রয়িত হইয়াছেন। ডাক্তার মাইনর মৃত্যু হইয়া তাঁহাকে ইংরাজী শব্দ

সম্বন্ধে গবেষণা-পূর্ণ নিবন্ধ পাঠান। ম্যারে তাহা পড়িয়া দেখিলেন, ডাক্তার মাইনর বিদ্যান বাস্তব এবং ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অপরিসীম। সার জেম্‌স্‌ ম্যারে এই অজ্ঞাত সাহায্য-কারীর প্রকৃষ্ট পরিচয় জানিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। তবে উত্তরের মধ্যে পত্র লেখালেখি পূর্বের জারই চলিল। মাইনরের চিত্রাঙ্কন টিপ্সন ও প্রদলক অঙ্কন ক্রমেই সার জেম্‌স্‌কে মুগ্ধ করিতে লাগিল।

ম্যারে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি মাইনরের কথা অস্বকোচ বিশ্ববিজ্ঞানের মাতব্বর লোক-দিগকে জানাইলেন। তাঁহারা চেষ্টার ফলে বিশ্ববিজ্ঞানের পক্ষ হইতে তখন মাইনরকে কয়েকদিন অস্বকোচ থাকিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইল। উত্তরে মাইনর লিখিলেন, বিশ্ববিজ্ঞানের তাঁহার উপর এতাদৃশ দয়া প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে ধন্য করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোন বিশেষ কারণে বিশ্ববিজ্ঞানের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে অক্ষম।

ম্যারে ডাবিলেন, মাইনরের আর্থিক অবস্থা বোধ হয় ভাল নয়, সেই জন্য

তিনি অস্বকোর্ড পরাম্ব আসিবার ব্যৱ-
সংকল্পনে অপরগ। তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন,
আর্থিক অসচ্ছলতাই যদি মাইনরের না
আসিবার কারণ হয়, তাহা হইলে তাঁহার
জীবনের প্রয়োজন নাই; বিধবিভালগই
তাঁহার সমস্ত ব্যৱ-ভার বহন করিবে।
তদন্তবে মাইনর লিখিলেন, আর্থিক অবস্থাই
তাঁহার না-বাওবার কারণ নয়, কারণ, তাঁহার
শারীরিক দৌর্বল্য। তাহার চেয়ে মারে
যদি দুই দিনের অল্প তাঁহার অতিথি হন
তবে তিনি বিশেষ আপাদ্রিত হইবেন।

মারে ডাক্তারের সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতূহলী
হইয়া উঠিয়াছিলেন। চিঠি পাইয়া তিনি
ভাবিলেন, মজা কি! একবার না-হয় দেখিয়া
আসাই যাক না! মাইনরকে তিনি লিখিয়া
দিলেন, তিনি যাইতে প্রস্তুত।

মাইনরের বাড়ী ফ্রোংনে'। মারে
আসিয়া অস্বকোর্ড হইতে ওয়েলিংটন
কলেজ ঠৈণনে নামিলেন। ঠৈণনে তাঁহার
অল্প মাইনর-প্রেরিত ভূতা ও একখানি
ছড়ি-গাফী অপেক্ষা করিতেছিল। ভূত্যের
মুখে মাইনর বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে
কোন কারণবশতঃ তিনি ঠৈণনে সার
জেম্‌সের সঙ্গে দেখা করিতে পারিলেন না।

সার জেম্‌স্‌ গাড়ীতে উঠিলেন; দুই
মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গাড়ী আসিয়া
এক প্রকাণ্ড বাড়ীর সম্মুখে থামিল।
ভূতা পথ বেধাইয়া লইয়া চলিল; অবশেষে
এক সম্বন্ধিত ককে সার জেম্‌স্‌কে প্রবেশ
করিতে বলিয়া সে চলিয়া গেল। ভিতরে
হুকিয়া মারে দেখিলেন, এক ব্যক্তি ডেস্কের
পাশে বলিয়া কি লিখিতেছেন। তিনি

চুপিতেই লোকটি দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে
যথারীতি অভিবাদন করিল।

প্রতিশব্দ্য করিয়া মারে কহিলেন,
“আপনি বুঝি ডাক্তার মাইনর?”

লোকটি বলিলেন, “না, আমি ডাক্তার
মাইনর নই, তাঁর সঙ্গে আপনার সীদ্বই দেখা
হবে—তাঁর আগে আমার বলে রাখা ভাল যে,
এই জরগাটা হচ্ছে ব্রডমুরের বিখ্যাত পাগলা
গারদ, আর আমি হচ্ছি এর অধ্যক্ষ।”

বিস্ময়-বিহ্বল বৃদ্ধ মারে কহিলেন,
“ব্রডমুরের পাগলা গারদ! মাইনর তাহলে—”

“হাঁ, তিনি পাগল। আর তিনি একটা
খুনও করেছেন। নিচয়ের পর থেকে
তাঁকে এইখানেই রাখা হয়েছে। আমি
আপনাকে তাঁর জীবনের সমস্ত কথা খুলে
বলছি, শুনুন।” এই বলিয়া তিনি আরম্ভ
করিলেন—

“ডাক্তার মাইনর আমেরিকা-নিবাসী,
এখানে তিনি যখন প্রথম আসেন, তখন তিনি
প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। তবে এখন বেশ
ভালই আছেন ও আমাদের অছুরোধে
তাঁকে বেশ সুন্দর বরাই দেওয়া হয়েছে।
এখানে তিনি বেশ থেকে বসে ভাল ভাল বই
আনিতে লাইব্রেরী সাজিয়েছেন। ইনি বেশ
পরমাণ্ডালা লোক। সেই অল্প তাঁর
কোন অত্যাচার নেই। কি করে ডাক্তার
মাইনর এখানে এলেন, সে কথা আপনাকে
আমি সব বলছি।”

সার জেম্‌স্‌ মস্তমুগ্ধভাবে শুনিতে
লাগিলেন। অধ্যক্ষ মহাশয় বলিয়া গেলেন—

“১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা-
যুদ্ধের সময় ডাক্তার মাইনর তাহাতে যোগ

বেন। উহার বয়স তখন ২৬ বৎসর মাত্র। কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি অল্প-বিত্তার পণ্ডিত হইয়া উঠেন। ইহার অগাধ পরমা—কোন ভাবনা-চিন্তা নাই। অত্যন্ত অনেক বিষয়ে তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, চিত্র-বিজ্ঞানও তাঁহার পারদর্শিতা বিলক্ষণ।

“এই সময় একজন পলাতক ‘সৈন্তকে দাঙ্গী করিবার জন্য ডাক্তার মাইনরের নিকট আনা হয়। কঠকর হইলেও মাইনরকে তাঁহার কর্তব্য পালন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যাপার তাঁহার মনের মধ্যে অশুভ বেথাপাত করিয়াছিল। ইহার কলে সময়ের সময়ের তাঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত হইতে দেখা যাইত।

“কিছুদিন পরে ডাক্তারের একবার সর্দিগর্গি হয়। ইহার পর তাঁহার মন এতদূর খারাপ হইয়া পড়ে যে তাঁহাকে পড়াশুনা একথাও বন্ধ করিতে হয়! এবং ঐ কারণে ডাক্তারী কার্যও তাঁহাকে ছাড়িতে হয়।

“এই সময় তিনি সর্বদা কাল্পনিক ভাবে স্রষ্টা থাকিতেন। সর্বদা তাঁহার মনে হইত, যেন কতকগুলি আইরিশ্ তাঁহাকে মারিবার জন্য বড়বড় করিতেছে; এই কাল্পনিক ভয় তাঁহার মনে এতদূর আঁটিয়া গেল যে তাঁহার হাত হইতে আগ্নেয়াস্ত্র করিবার জন্য তিনি সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

“এইরূপে কিছুদিন গেল। মাইনরের আত্মীয় ও বন্ধুবর্গ তাঁহাকে ইউরোপে ঘুরিয়া আসিবার পরামর্শ দিলেন। পুর্বেই বলিয়াছি, মাইনরের টাকার অভাব ছিল না। যথেষ্ট টাকাকড়ি সঙ্গে লইয়া তিনি আমেরিকা ছাড়িলেন। সঙ্গে তাঁহার অনেক

গুলি পরিচয়-পত্র ছিল। পত্রগুলি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লোকদের লেখা। মাইনর আমেরিকার থাকিতে বিধব-সম্বারে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ঐ পত্রগুলির মধ্যে ইয়েল-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-লিখিত বিখ্যাত ইংরাজী সাহিত্যিক জন্ রাবিনের নামে একখানি পরিচয়-পত্রও ছিল।

“মাইনর প্রথমেই ইংলণ্ডে আসিলেন। লণ্ডনে টেম্পলের নিকট টেনিসন্ ষ্ট্রীটে তিনি থাকিবার জন্য ঘর ভাড়া লইলেন।

“এখানে আসিয়া মাইনর তাঁহার গৃহ-কত্রীকে নানারূপ অসংলগ্ন কথা বলিয়া ভীত করিয়া তুলিলেন। এমন-কি একবার তিনি পুলিশে চিঠিও লিখিলেন, ‘আমার প্রাণ লইবার জন্য অনেক লোক বড়বড় করিতেছে, তাহার আমাকে যে-কোন দিন খুন করিতে পারে।’ পুলিশ কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিল না।

“ইহার পর এক ভগ্নানক ঘটনা ঘটে। মাইনর যে বাড়ীতে থাকিতেন, সেই বাড়ীর কিছু দূরে ময় চুয়াইবার এক আত্মনা ছিল। এই বাড়ীটি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি দুইটার সময় ডাক্তার মাইনর বাড়ী ফিরিতেছিলেন। মাথার উপর পরিষ্কার নক্ষত্র-খচিত আকাশ। যদের আঁড়ার কাছেই মাইনর অর্জ্জ মেরিট্ নামক ঐ স্থানের একজন কর্মচারীর দেখা পাইলেন। তারপর হঠাৎ সেই নির্জন নিস্তব্ধ রাস্তায় তিনবার গিড়গেড়ের আগওয়াজ হইল। সেই মুহূর্ত্তেই রাস্তায় হতভাগা অর্জ্জ মেরিট্ চির-

নিজের চলিয়া পড়িল। নিকটস্থ পাহার-ওয়ারী
রক্ষণে ছুটিয়া আসিয়া দেখে, ডাক্তার
মাইনের পিছল-হস্তে দণ্ডারমান, আর কক্ষারীর
দেহ ভূতলে পড়িয়া আছে। পাহার-ওয়ারী
বিজ্ঞাসা করিল, 'কে এলি ছুড়লে?'

"মাইনের উত্তর দিলেন, 'আমি—
আমিই ঐ শোকটাকে খুন করেছি।'

"ইতিমধ্যে বন্দকের শব্দ শুনিয়া আর
একজন পুলিশ কক্ষারী তথায় আসিয়া
উপস্থিত হইল। নিবস্ত্র করিয়া ডাক্তারকে
সাবিধানকার্ক নামক খানার আনা হইল।

"অতঃপর কলে মাইনের নিকট
একখানা ছোঁয়া পাওয়া গেল। পুলিশ
তাহার বাড়ী খানাতালাগী করিয়া রাখিলেন
নামের পরিচয়-পত্র পাশ; মাইনের-অস্ত্র
অনেকগুলি অস্ত্র ছবিও সেই সঙ্গে বাহির
হইল।

"পরবর্তী এপ্রিল মাসে প্রাণ বিচারপতি
লর্ড বক্তিলের নিকট মাইনের বিচার
হয়। সার (তখন মিটর) এডওয়ার্ড
ক্লার্ক মাইনের পক্ষে কৌতলী ছিলেন।
জুরীগণ মাইনকে নির্দোষ বলিয়া মত
দিলেন। বিচারপতি জুরীগণের সহিত
একমত হইয়া মাইনকে এই শাসনা গারদে
বন্দ রাখিবার আজ্ঞা দিলেন।

"তারপর হইতে ডাক্তার মাইন এই-
খানে বাস করিতেছেন। এখন তাহার
মাথার অবস্থা অত্যন্ত আশাশ্রয়। তাহার

ইতিহাস-অনুসন্ধান ইহার বড়ই আশ্রয়
সম্প্রতি আমেরিকা হইতে তাহার অনেক
পুস্তক আসিয়াছে।"

যারে নিত্যক হইয়া অধ্যাক্ষের গল্প শুনিয়া
গেলেন। গল্প শেষ হইলে মাইনের সহিত
মারের দেখা হইল। দুইজন বিধান,
ভাষাতত্ত্ব-সানন্দে পরস্পরের কল্প-কল্পন
করিলেন। ইহার পর মারের মৃত্যু পর্য্যন্ত
উত্তরের বন্ধু অটুট ছিল এবং মাইনের
শেষ পর্য্যন্ত অভিধান-গ্রন্থ-প্রণয়নে মারের
সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন।

"সার জেমস ক্লার্ক লিথিংহাম, প্রায়
৮০০ কথার বিভিন্ন ব্যবহার মাইনের একা
সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

এই কাহিনীর এক বর্ণন মিথ্যা বা
কল্পনা-রঞ্জিত নহে। যারে নিজে ইহার
সত্যতা-সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন।
প্রবন্ধ-লেখক ঐচ্ছিক হেডেন চার্চ মহাশয়
মাইনের পক্ষে নিযুক্ত কৌতলী সার এড-
ওয়ার্ড ক্লার্ক মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া এই
কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ অবধি
সংগ্রহ করিয়াছেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা
এপ্রিল তারিখে মাইনের বিচার হয়। ঐ
সময়কার টাইমস্ পত্রে এই মকদ্দমার আশুল
বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। মাইন
অখনও জীবিত। তবে, তিনি ব্রহ্মসুত্রের
পাশাপাশি গারদ হইতে আমেরিকার ফিরিয়া
গিয়াছেন।

ঐতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বিপর্যায়

ওলো ননদিনী—তোর এ কি হ'ল আজ কেন এ নুতন ধার।
গল্পনা কেন নীরব কেনগো বিড়ল আপনাহারা ?
নিশিদিশি বাজে ভ্রামের বাশরী তোর সে কঠোর বাণী
দৌড়ে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে পুরেছে মরমখানি।
ভ্রামের বাশীর মাঝারে গজে তোর সে দারুণ কথা
তোমর গল্পনার পরাণে গজে বাশীর বিপুল ব্যথা।
ওলো ননদিনী এ ব্রজ-মণ্ডলে সবাই বধির আর
তুনেনি শ্রবণে বাশীর মিনতি বুঝনি মরম তার।
সবার মাঝারে বোধের দৌড়ারে বেঁধেছে বাশীর
তোমার কণ্ঠে গল্পনা ফুটে আমার চক্ষে লোহ।
মনোচোর তোর মনেতে পশেছে সারা মনে জাগে রোল—
“গেল গেল সব সামাল, সামাল ধনেরে জাগারে তোলা,
সকল রক্ত রক্ত ক'রে দে—বাশীর প্রবেশ-দ্বার
পাষাণ প্রাচীর কুণের ধরমে বিরি দেরে চারিধার।
মনে মহাভয় কোলাহল জাগে সুখে বাণী নিদারুণ—
আপনি জান না অন্তরে তার বাজে বাণী সঙ্কল্প।
মনোহর শুধু পশিরাছে মনে হরে নাই সারা মন
মনের ধরম জেগে উঠে' তাই বাধার তুমুল রণ।
জানিতাম আমি জানিতাম মনে আসিবেই ছেন দিন
রসের সাহসে ভলাইয়া যাবে বাধা ব্যবধান—ক্ষীণ।
আমার মতন তোরো হ'বে দশা দুকূলে রবে না ঠাই
সুখার লহরে ভাসিতে ভাসিতে ঠেকিবি ভ্রামের পার।
ভ্রামকলক রাশীর ঢীকাটি উজল জলিবে ভাল
লাল ঘোমটার কেমনে ঢাকিবি নিবিবে না কোনও কালে।
যতেক গল্পনা দিয়েছিল মোরে কিরে তা শুনিতে হবে
কানে যদি পশে ভ্রামের বাশরী প্রাণে সব বাধা স'বে।
মহাক্ষয় যদি এলে থাকে আজ লাল কিবা তাহে বোন,
কে কবে মরণ এড়ার শ্যাম সে মরণ-অধিক ধন।

ত্রিধিবেশনারায়ণ বাগচী।

দাগী

(গল্প)

তখন আমার জুনিয়ারির পালা। সারাদিন কোটে বুরিমা বোত্র ও ধুগা খাইয়া গৃহে ফিরি; গ্রাণে বৈবাগোরও বাগনা দেখা দিয়াছে।

বেশ মনে পড়ে, পেনিন সকাল হইতে বাদলা স্রুত চইয়াছে—পথে কান্না, আকাশে বেধু, চারিদিকে বিষম নিখানন্দ ভাব,—হাতে কোন কাজ ছিল না। হাকিম সধানন্দ পেন একটা একল'-দশ বাবার মান্দা করিতেছিলেন। একটু রস পাইবার আশায় তাহার একলাসে আসিয়া বসিলাম।

আশায় এক বাঙ্গালী যুবক—গায়ে রক্ত ভাষার মত, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পরনে মরলা কাপড়, অঙ্গে একটা তালি দেওয়া ছিটের কামিজ! কাঠগড়ার বেগিতে মাথার ভর রাখিয়া মুখ ঝুঁজিয়া সে দাঁড়াইয়া ছিল। পুলিশ হইতে গ্রাণ ত্রিশ জন সাকীর জবানবন্দী লওয়া হইতেছিল। কয়েকজন দোকানদার, কয়টা পতিতা নারী, ছই-চারিজন পানওয়ালা—সকলেই হলফ লইয়া সাকী দিতেছিল, আশায় একটা গুণ্ডা, কোন কাজ-কর্ম করে না—যখন-তখন তাহাদের কাছে আসিয়া জুপু করিয়া ভর দেখাইয়া দেখা-ভাঙ করিবার অস্ত্র পরসা আদায় করে—বে-গোছ দেখিলে না কি ছুরিও উঠাইতে ছাড়ে না। গ্রাণের ভয়ে সাকীর দল কেহ চার আনা, কেহ সাত পরসা, কেহ বা পাঁচ সিকাও কখনও কখনও তাহাকে

দিয়া কেলিয়া গ্রাণে খুব রক্ষা পাইয়া গিয়াছে। এই পরসা কেহ দিরাচ্ছে, এক মাস পূর্বে; আবার কেহ-বা সাত-আট মাস পূর্বে। ইহার বিকজে কোন দিন কেহ আদালতে নালিশ করে নাই; বা পুলিশেও কোন ডায়েরী লেখায় নাই।

লোকটার চেহারা দেখিলে মনে হয়, সে চিরকথ,—অত্যন্ত রূপ দেহ, পেশীগুলি নিত্যতাই ক্ষৌণ, দুর্বল! অগচ্ সে এমন জুলুম-জবর-দস্তি-করিয়া এই-সব বক্তা কোথান দোকানদার ও ভীমা বাসান্দাদের কাছ হইতে পরসা আদায় করিয়া থাকে,—তিনিও গ্রাণে কেমন একটা বিষম-কোতূহলের স্কার হইল।

একজন বদ্ধ কহিলেন, “এস না হে, এর হয়ে দাঁড়ানো বাক্!”

আমি কহিলাম, “পরসা বেবে কে?”

বদ্ধ কহিলেন, “কি এমন পাঁচন’ দশ রোজগার করা যাচ্ছে যে পরসার ভঃবে মরে যাবে! অমনই একবার পরাধ করি—এই ত রাখিল সাকী—”

অপর বদ্ধ কহিলেন, “বিনা পরসার দাঁড়িয়ে লোকটাকে মেলে ঠেলব? পরসা পেলে ভবু নেমকহারামী পাপটা ঘটত না!”

আমি কহিলাম, “মল্ল নয়—শাস্ত্রেও আছে, শতমারী তবৎ বৈভ্য। তা এ নয় হবে আমাদের নদর ওরান্না।”

হাকিমের অসুখতি; চাহিলাম। তিনি

বিরক্ত চিত্তে কহিলেন, “ওর আবার উকিল দেওয়া কি! পাঁচবারের দাণী—”

আমরা নাছোড়বন্দা—আসামীকে জনান্তিকে রাজী করাইয়াছিলাম; হাকিম অগ্রহা অহমতি দিলেন। আমরা আসামীর আমিন প্রার্থনা করিয়া বসিলাম। হাকিম বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আমিনের আবেশ দিলেন। আমরা অমনি মোক্তার নারায়ণবাবুকে আনিয়া গাটের পরসী বার করিয়া তাহার আমিন করাইয়া লইলাম।

পুলিশের দারোগা তখন কোট বাবুকে কি-একখানা ছোট কাগজ দেখাইতেছিল। হাকিমের সেদিকে নরম পড়িল। হাকিম কহিলেন, “কি ওটা?”

দারোগা সমস্তই দেখি হাকিমের হাতে দিয়া কহিল, “আসামীর কাছে সম্পত্তির মধ্যে এই ছবিখানা শুধু পাওয়া গেছে।”

হাকিম ছবিখানার পানে চাহিয়া পর ক্ষণেই আসামীর দিকে চাহিলেন। চোখের মতই কৃত্রিম দৃষ্টি! যুগ তাহার নিম্নে বিবর্ণ হইয়া গেল—কপালে বেশ স্পষ্ট বেদ-বিন্দু কুটিয়া উঠিল। চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস কেলিয়া আপনায় খাস-কামরায় উঠিয়া গেলেন; কোনদিকে আর কিরিয়া চাহিলেন না।

আমরা অবাক হইয়া গেলাম। কি এমন কটোগ্রাক—কাহার কটোগ্রাক যে মুহূর্ত্তে এ ইন্দ্রজালের সৃষ্টি!

কটোখানা হাকিমের টেবিলেই পড়িয়াছিল। কোট বাবুর খোদামোদ করিয়া চাহিয়া লইলাম। এক জীলোকের ফটো—সুন্দর। কৃত্রিম সজ্জিত কৃষ্ণ বেশদামের

মধ্যে অপরূপ স্তম্ভরী এক কিশোরীর মুখ! ছবিখানি অত্যন্ত পুরাতন—কালের নিখাসে ঈষৎ অস্পষ্ট ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে।

পেয়ার, আমরা সকলেই কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কড়া হাকিম—সাক্ষা দিতে অবিচীর—সে বিষয়ে বাপের খাতিরও যিনি রাখিতে জানেন না, এ ছবিতে হঠাৎ তাহার এমন পরিবর্তন ঘটিল কেন?

সকলেই আসামীর পানে চাহিল—এ দিকে তাহার জ্ঞেয়পণ্ড ছিল না। আমিনের কাগজ সহি করিয়া নারায়ণ মোক্তারের সহিত এক কোণে বসিয়া সে তখন দিশ্য গল্প জুড়িয়া দিয়াছে।

২

পরদিন সকালে আসামীকে ধরিয়া পড়িলাম, “ও ছবি কাহার? বলিতে হইবে। আসামী প্রথমটা কিছুতেই বলিতে চাহে না—শেষে বিস্তার পীড়াপীড়িতে কহিল, ও ছবি তাহার মৃত্যু জননীর!

তারপর সে আপনায় জীবনের কাহিনী বলিল। তাহার নাম, মাখন।

মাখন বলিল, “আমার বয়স তখন সাত বৎসর, তখন আমার মা মারা যান। বাবা পাগলের মত হইলেন। তিনি তখন এম, এ পড়িতেছেন—পরীক্ষা পড়া সব ছাড়িয়া আমার বুক টানিয়াই বাহিরের ঘরে দিবা-রাত্রি তিনি পড়িয়া থাকিতেন। আত্মীয় বন্ধুর দল বাড়ি পড়িয়া তাহার সে জীবন শোকাঘি নিবাইবার চেষ্টা জুড়িয়া দিল।

পুরুষমহুষের শোক, তার আবার জীবিরোগের—সে মুছিতে বড় বিলম্ব হয়

মা—তবে ঠিক ঐষধটি দেওয়া চাই। পেখে সেই ঐষধেরই ব্যবস্থা হইল। বাবা আবার বিবাহ করিলেন। নূতন মা এক বড় চাকুদের কন্যা। সদন্ত দ্বৈত-বেদনা নিরানন্দ, মুছিয়া তিনি একদিন আমাদের গৃহে সম্রাজ্ঞীর আসন পাতিয়া বসিয়া গেলেন। বাবার মূখে অচিরেই আবার হাসি দেখা দিল—মাতা যেন পুর্নেকার চেহেরে বৈশী।

আমি কিন্তু তাঁহার পানে আর ঘেঁস দিলাম না। প্রথম হইতেই কি যে কুসুদি ঘটিল! নূতন মার উপর রাগ ধরিয়া ছিল। নিজের মাঝে হারাইয়াও একটা সাধনা ইহাই ছিল, বাবাকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করিয়াছি! এতখানি লাভের মূখে মাহারাপোষ লোকসানটা মনেও উঠে নাই! কিন্তু নূতন মা বাবাকে আমার কাছ হইতে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন! আমার পানে করিয়া চাহিবার অধক্যপও বাবাকে তিনি দিতে পারিতেন না! আমার বেশ মনে পড়ে, মা তখন বাঁচিয়া ছিলেন, দুপুর-বেলা তিনি নিদ্রা গেলে আমি বাহিরের ঘরে আনন্দের ধারে আসিয়া ঝড়াইতাম, দেখিতাম, ঠিক পখের অপর পাশে একটা নিমগ্নাঙ্গের তলার একটু ছাগর আড়াল পাইয়া একটা দগ্ন কুকুর আসিয়া তথার পড়িয়া আছে—অত্যন্ত রক্ষ তাহার মুষ্টি—নিভাত্ত নিঃসঙ্গ বেচারা। বাবার এই পরিবর্তনে আমার নিজের মনটা ঠিক সেই কুকুরটার মতই যেন এক অসীম বেদনার বা খাইয়া তেমনই নিঃসঙ্গ কুণ্ঠিতভাবে পড়িয়া থাকিত। অথচ উপারও ছিল না। একদিন জোর করিয়া বাবার আদর

কাড়িতে গিয়াছিলাম—নূতন মা তাড়া দিলেন, “পড়া নেই, শোনা নেই, বুড়োখাড়ি ছেলে, খালি খেই খেই করে নেচে বেড়াচ্ছেন!” দ্বৈত আবার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু জোর করিয়া কান্নাটাকে ধোঁধ করিলাম—এই পাষাণীর কাছে চোখের জল ফেলিব না, কখনও মা! বাবার পানে একবার চাহিলাম, বাবার মুখ নিকৃষ্ট কুষ্ঠার একেবারে যেন সাদা হইয়া গিয়াছে। গতক বৃষ্টিয়া আমি সে ঘর ত্যাগ করিলাম।

বাড়ীতে আত্মীয়ও যে কেহ মা ছিল, এমন নহে। তবে সকলেই নিজাদের লইয়া ব্যস্ত। স্কুলে বাইতান—ইংরাজী বইয়ের একটা গল্প পড়িয়াছিলাম—কি একটা দেশের তখন অত্যন্ত অমঙ্গল অবস্থা। যে যেমন করিয়া পারে, শুধু নিজাদের বিনিময়-পত্র সামলাইতেই দক্ষল ব্যস্ত, আপো-পাশে কত নিরীহ দুর্বল অত্যাচারে চীৎকার জুড়িয়া মিমাছে, কিন্তু সেদিকে মন দিবার কাহারও অবসর নাই—আমাদের বাড়ীর দশাটাও তখন ঠিক সেই রকম! মাঝার উপর শত্রু অভিভাবক নাই, —বাবা বাড়ীর বড় ছেলে—অপরে জ্ঞাতকুটুম মাত্র, তাহারো উৎসব-আমোদের সময় দূর মেলিয়া সম্মুখে আসিয়া হাজির হইতে জানে—বিপদের লক্ষণ বুঝিলে নিমেষে কোথায় অন্তর্ধান হয়!

এইভাবেই ভাঙ্গা নৌকার মত জীবন-টাকে যখন টানিয়া লইয়া ফিরিতেছি—তখন সহসা একটা দমকা হাওয়া দেখা দিল। বাবা এ-এ ফেল করিয়া বসিলেন—এবং তাহার হুই-চারি মাস বাদেই শ্বশুরের অশান্তি ও কোম্পাঙ্কের জোর

একদিন হাকিম হইয়া দেশান্তরে চলিয়া গেলেন।

আমাকেও বাবার সঙ্গে লইয়া যাইবার কথা ছিল—কিন্তু হঠাৎ যাত্রাকালে নতুন মা বিশেষ বিবেচনা করিয়া পরামর্শ দিলেন, তাহাতে আমার মঙ্গল হইবে না। কারণ, হাকিম চাকরি লইয়া বাবাকে সাত ঘণ্টে জল খাইয়া ফিরিতে হইবে—আমি সঙ্গে থাকিলে আমার পড়াশুনার দিবস ব্যাঘাত ঘটবে এবং তাহার অবশ্রুতাবী কলঙ্করূপ আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎটুকু একদম মাটি হইয়া যাইবে! স্রীলোকের দূরদর্শিতাসম্বন্ধে সহসা বাবার বড়ই আশ্চর্য দেখা দিল। কারণেই তিনি মাসহামার আশা দিয়া আমাকে জাতির দলে রাখিয়া গেলেন।

আমি কোন কথা कहিলাম না। আমার কেমন তাক লাগিয়া গিয়াছিল! মনে হইতেছিল, এ বিষ্ণু-রসভূমে কোথায় কি অভিনয় চলিতেছে, আমার যেন শুধু তাহা দেখিবারই পালা! এ অভিনয়ে আমার নামিতে হইবে না—আমার জন্ত এখানে কোন ভূমিকাই নির্দিষ্ট নাই! হৃদয় মতই অচল জিন্দে আমি বাড়ীতে পড়িয়া রহিলাম।”

৩

মাখন বলিতে লাগিল, “তুই-তিন বৎসর এক রকমে কাটিয়া গেল। তারপর একদিন বড় কাকা বলিলেন, “বাড়ী বিক্রী হইবে গেছে, তোমার বাবাই এ বিষয়ে প্রধান উদ্ভোগী। আমরা নানান্ দিকে ছড়িয়ে পড়ি—তোমার পক্ষে এখন তোমার বাবার কাছে যাওয়াই উচিত।” বড় কাকার কথার প্রভাব ইজিতটা বৃষ্টিতে বিলম্ব হইল না! সাধারণ

দশ বৎসর বয়সের বাঙ্গালীর ছেলেরা এসব বিষয় বড় একটা বৃষ্টিতে পারে না—কিন্তু মা-মরা ছেলে—বিশেষ আমার মত অবস্থায় পড়িলে—বুদ্ধি তাহার একটু চট্ট করিয়াই বাড়িয়া উঠে!

সে রাজ্যে নিত্যা হইল না—কেবলই ভাষিতে লাগিলাম,—কোথায় যাই, জি করি! একবার ভাবিলাম, বাবার কাছে যাট। বাবা তখন খুলনার ওদিকে কোথায় এক মহকুমার হাকিম—কিন্তু পরক্ষণেই বিমাতার সেই রোষ-রক্ত যুগু ও কঠিন দৃষ্টির কথা মনে পড়িতেই সে বাসনা কর্পূরের মত উবিয়া গেল! ভাবিলাম, সেখানে যাওয়ার চেষ্টা পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ানোতেও চের আরাম, চের সুখ! ঘরের দেওয়ালে মার একখানি ফ্রেমে-আঁটা ছবি টাঙ্গানো ছিল। সারা রাত্রি এদীপের অহুজ্জ্বল আলোয় সেখানার পানে চাহিয়াই চোখের জল ফেলিলাম। মার শোক সে রাজ্যে যেন নতুন করিয়া বৃক্ষে বাজিল! শেষে সেই ছবিখানাকে মাত্র সন্ধ্যা করিয়া পরপের উই-চারি-খানা কাপড় লইয়া ভোরের দিকে বাড়ী ছাড়িলাম।

সমুখে দীর্ঘ পথ পড়িয়া আছে। দম-দেওয়া কলের পুতুলের মত সেই পথে চলিতে হুড় করিলাম। মাথার উপর তরুণ রক্ত স্বর্ধ্য ক্রমে রক্ত মূর্তিতে রক্ত আঁধি মেলিয়া দেখা দিল—সেদিকে দৃষ্টিপাতমাত্র না করিয়া আমি চলিতে লাগিলাম—স্বর্ধ্য হার মানিয়া শেষে আবার শাস্ত্র শীতল মূর্তি বরিয়া মুগ্ধ হাসিয়া নিগন্তের কোলে সরিয়া পড়িল—তবুও আমি চলিয়াছি! হাইট পর্যন্ত ধূলায় ভরিয়া

গিরাছে, দারুণ পিপাসার গলায় মধ্যে যেন বৃত্ত ফুটিতেছে, এমনই বেদনা বোধ হইতেছিল। কিন্তু কোথায় বসিব—আমার যে এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তিলার্কি স্থান নাই।

যাক, সে পথের কষ্ট আর খুলিয়া বলিয়া কাজ নাই। শেষে আশ্রয় মিলিল। এক গৃহস্থের বাড়ী বাগন-মাজার কাছে লাগিয়া গেলাম। চার বৎসর কাজ করিলাম—মন্দ লাগিত না, আরামও পাইতাম। এক একবার মনে হইত, আমার বাপ হাকিম, —তখনই চাপি আসিত। কিন্তু একদিনের জন্তও কোত লাগে নাই।

আমার নিখালে বৃদ্ধি কি বিষ ছিল। নহিলে বাড়ীর কর্তা একদিন আমায় মন হইতে অর গার গৃহে ফিরিয়া যে বিছানা লইলেন—সে বিছানা আর তাঁহাকে তাগ করিতে হয় না কেন? সুতরাং তাঁহাকে আপনার কোলে টানিয়া লইল। পাখীর বাসার ঢিল ছুড়িলে সুস্থেরে যেমন তাহা ছিন্ন-স্তম্ভ হইয়া যায়—মনবের গৃহের দশা তিক তেমনই ঘটিল। আমি আবার পথে বাহির হইলাম। বাবা তখন কটকে আমার এক ভাইয়ের অস্বাস্থ্যবশত পুত্র আশ্রয়।

তার পর এই সহর কলিকাতায় আসিলাম। এ এক মজার দেশ। বাহারা এখানে শ্রমী, বাহারা বড় লোক, তাহারা কাহারও পানে ফিরিয়া না চাহিলেও গ্লানী-গরিবের দল লাগিয়া কথা কহে, ডাকিয়া ছুট মুঠা খাটতেও দেয়। এক ঠাকুরবাড়ীতে আস্তানা দিলি। কিছুদিন সেখানে পুজারীর মত ঘোপাইয়া কাটাইয়া দিলাম; কিন্তু টিকিলা থাকিতে পারিলাম না। কোথা

হইতে যেন এক ক্লান্ত রত্ন কোন্ এক অজানা পথে আমার টানিতেছিল। তিন-চার বৎসর এখানে-ওখানে ঘুরিয়া একটা হোটেলের চাকরি করিতে আসিলাম। সেখানে বিশ্বের যত বিবেষ, কলহ, নীচতা, স্বার্থ এক বিপুল বড়বস্ত্র পাকাইয়া বসিয়া আছে, হিংসার জোটে বিছানো আছে—তাহাতে পা বাধিল। সেই বড়বস্ত্রের মধ্যে পড়িয়া একেবারে আবালভের ঘরে গড়াইয়া পড়িলাম। হোটেলের কর্তার এক প্রোঁড়া প্রণয়িনী ছিল—আমার উপর না কি তাহার একটু অহম্মাগ সন্ধান হইয়াছিল। নেপথ্যেই ইহার ইঙ্গিতাভিনয় চলিতেছিল, তাহার আত্মকমাত্রও আমার পাইবার স্রোণে ঘটে নাই—ইতিমধ্যেই কর্তার মনে কেমন করিয়া সন্দেহ হয়—সে একেবারে খালা-ঘটি-সম্মত চুরির চার্জ দিয়া আমাকে পুলিশের হাতে তুলিয়া দিল। আমি কেমন হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিলাম। ব্যাণায়খানা ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্বেই হাকিমের মায় বাহির হইয়া গেল—তিন মাসের জন্ত আমার জেলের যাবস্থা। জেলের গাড়ীতে বসিয়া সতাই সেদিন প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া ছিলাম—বাঃ, আশ্রয়হীন আমি, আশ্রয় এখানে, কাল সেখানে জাগিয়া বেড়াইতেছিলাম, ভগবান আজ আমার দিবা আশ্রয় মিলাইয়া দিলেন ত। আর অস্তের ভাবনা ভাবিতে হইবে না, পড়িয়া ঘুমাইবার জন্ত ছাদ-ঢাকা একটু ঠাইও অনায়াসে মিলিবে।

তিন মাস পরে জেল হইতে বাহির হইলাম। তৎকা মাগিয়া দিন কাটিত। একদিন রায়ে বাজারে বাজা হইতেছে

তুমিরা সেই দিকে চলিলাম—পথে পাহার-
ওরালা পাকড়াও করিয়া* খানার চালান
দিল। দাগী চোর রাজে রাত্তার খোদা
অপরাধে হাকিমের বিচারে আবার চারি
মাসের জন্ত জেলের দণ্ড হইল। ব্যাটার
কথা হাকিম আমলই দিলেন না, পুলিশ ত
সে কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিল।* কোথাও
যাত্রা! ও শুধু একটা মিথ্যা ছিল!

এবার জেল বসিগা স্থির করিলাম,
এই পথই ভাল। বাহিরে দখল নিরাপদ
হইবার সম্ভাবনা নাই,—কাজ করিতে গেলে
লোকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিবে, কাজের
চেষ্টার পথে বাহির হইলে পুলিশে ধরিয়
চালান দিবে। তাহার চেয়ে জেলে থাকিলে
বাঁধাবাদির আর ভয় থাকিবে না, ক্লেশের
স্বতা হইতেও রক্ষা পাইব।

এবার জেল হইতে ফিরিলাম,—অনুষ্ঠ
প্রথম মূর্ত্তিতে অন্তর্ভাবনা করিল। এক
বড়লোকের কাছে চাকরি মিলিল। জেলেই
এক বড় ছুটিয়া ছিল—আমারই সমবয়সী।
সে তাহার মনিবের খুব সুখ্যাতি করিত।
মনিব কোকেন-ওরালা। সে তাহার অধীনে
থাকিয়া লুকাইয়া কোকেন বেচিত। মনিবের
ঘরের ত্রুটি নাই। কোকেন-বেচার আশঙ্কা
খুবই, অথচ লাভেরও সীমা নাই। ধরা
পড়িলে মনিব বেশ মোটা টাকা ব্যয় করিয়া
বড় উকিল লাগাইয়া বাঁচাইবারও বখেটে
চেষ্টা করে। বরাত্তে যদি জেল থটে, ঘটুক
—ফিরিয়া কিন্তু মনিবের কাছে রীতিমত
বখশিস মিলিবে!

সেই চাকরিই ধরিলাম। দুঃসাহসের
কাজ, সন্দেহ নাই। কিন্তু বড় ঠিকই বলিয়া-

ছিল, লাভ ইহাতে বিলক্ষণ! এই কোকেন
লইয়া হইবার আরও জেল খাটিয়া
আসিলাম।

শেষবারে ফিরিয়া কিন্তু পুনর্মুণ্ডিক! কোকেন-
ওরালা মনিব এক খুনী মামলার আসামী
হইয়া বিচারে ধীপাশুরে চালান হইয়া
গিয়াছে। চারিবার অজ্ঞকার দেখিলাম।
হাতে টাকা ছিল না। কোনরূপে কিছু
যোগাড় করিয়া একবার ভ্রমলোক সাজিয়া
বাবার সহিত দেখা করিব, ভাবিলাম। তাহার
পর একবার এমন একটা কীর্তির কাজ
করিব, তাহাতে দেশের বুকে আমার নাম
চিরকালের জন্য খোদা থাকে! বাবার মুখ
উজ্জ্বল হয়!

একটা দল জড় করিলাম। রাজে
উণ্টাডিন্ডির বিখ্যাত মহাজন বনজ্রাম সাধু-
খ্যার তহবিল চলিয়াছিল, লোকের মাথায়।
তাহাদের মাঝে পড়িয়া সেই তহবিলে ছোঁ
দিলাম। বেশ মোটা টাকা হাতে আসিল।

নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবারও অবকাশ
মিলিল না, পুলিশ আসিয়া গ্রেপ্তার করিল—
এই হাকিমেরই কাছে চালান দিল। এ
হাকিম বড় কড়া—ভাল লোক বলিয়া নাম-
ডাক আছে—আমার পূর্ক-শান্তির বহর
দেখিয়া একেবারে বেড় বৎসরের জন্ত জেলে
আমার নিরাপদ নীড়ের ব্যবস্থা করিয়া
দিলেন।

তাহার পরই এই উৎপাত! এবার
কিন্তু এ সবই কামনিক ব্যাপার! বেড়মাস
জেল হইতে ফিরিয়াছি—পরীর ত এই—
দেহে বল নাই—মনে ক্ষুণ্ণ নাই। মার
ছবি লইয়া একেবারে দেশে গিয়া সেই

সমালোচনা

ভূতপত্নীর দেশ। ঐগুত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত। একাঙ্গক, ইন্দ্রিয়নাথ দাল ভণ্ড, ইতিহাস পারিশিঃ হাউস, কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি শিশু-পাঠ্য গ্রন্থ,—কলাকুশল লেখকের অপূর্ণ হৃষ্ট ৭ পড়িতে পড়িতে পাঠকের চিত্ত কল্পনার লগ্ন পক্ষে ভর করিয়া বিম্বর-কৌতুহলের অপরূপ উজ্জল সারালোকের মধ্য বিধা এক অজানা রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হয়—বই শেষ করিয়া কেবলই মনে হয়, এখানেই থাকিলাম কেন! আরও চলি। শিশুবিদের চিত্র-পরিচিত অত্যন্ত সাধারণ গল্পের বেই ধরিয়া নয় নয় ভাব, নয় নয় চিত্রা শিশু-চিত্রে বেশ-একটু মৃদু বোল বিদ্যে যায়। প্রতি ছায়ে এমন বিরাট আশ্রয়, অপূর্ণ কৌতুহল জানিগা উঠে যে বইখানি একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়ি যায় না। ভাষা গল্পের স্রোতের মত উধাও বহিরা চলিয়াছে, দে স্রোতে ভাবের মূর্তি অঙ্গ প্রাণে করিয়া গড়িয়াছে—তাহা যেমন শুভ, তেমনই উজ্জল। ইহার মধ্য বিদ্যা ভ্যরতবর্ণের অতীত ইতিহাসটুকুও এক নতুন মৃষ্টিতে বেধা বিদ্যা—অতীত ও বর্তমানে নিশিচা—বিদ্যা বিভিন্ন রসের সৃষ্টি করিয়াছে। একাধারে এতখানি বাঁট আনন্দ, শিক্ষা ও কৌতুকের অবতারণা শিশুপাঠ্য গ্রন্থে বিরল। বইখানিতে চিত্রশিল্পী প্রস্তুতকরের কয়েকখানি বহুপ্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি এদত ছইয়াছে—সেগুলিও যেন কৌতুহল ও কৌতুকের কোষায়া! Pen-and-ink sketch ইইলেও সেগুলি দীর্ঘত, প্রাণবন্ত! বইখানির ছাপা হ্রস্ব, ইংলিশ অক্ষরে—বাঁধাই মসোরম—অর্থাৎ ভিতর ও বাহিরের সৌষ্ঠব—সর্বোপায়েই গ্রন্থখানি শিশু-সাহিত্যে অন্তিম, অমূল্য।

নয়ন-তারি। ঐগুত শিবদাশশাস্ত্রী, এম.এ., প্রণীত। কলিকাতা এস. কে. লাইব্রেরী এও কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত। কটন প্রেসে মুদ্রিত। দ্বিতীয়

সংস্করণ। মূল্য পাঁচ দিকা মাত্র। এখানি-পারিবারিক উপক্ৰাস। বহুভাষায় যে কথখানি উল্লেখযোগ্য উপক্ৰাস আছে, এখানি তাহার অন্ততন। এতদিনে যে এ উপক্ৰাসের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল, ইহাতে বাঙ্গালী পাঠকের লক্ষিত হওয়া উচিত। শাস্ত্রী মহাশয় একজন বহুবর্ণী দলেখক। এ উপক্ৰাসে তিনি যে কয়টি আদর্শ চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সর্বকাল ও সর্বদেশের উপযোগী। উপক্ৰাসের প্রটট যেমন সরল, অনাড়ম্বর, ভাষাও তেমনই সরল এবং সর্বস্পর্শী। রায় মহাশয়ের ক্ষুদ্র গৃহটি এমনই শান্তি-দ্রুপে পরিপূর্ণ যে তাহার পানে চাহিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। রায় মহাশয়ের শিক্ষা-প্রণালী এমনই মধুর, পুস্তক-কল্যাণলির চরিত্রে এমন একটি রমণীয় শ্রদ্ধতা আছে, যাঁহা বাঙ্গালীর সর্বদমা-সীড়িতে কোলাহল-মুগ্ধিত গৃহে একান্ত আর্ধ-নীচ। দ্বিতীয় হরের চরিত্রে যে তেজ ও মনুষ্যত্ব প্রতিফলিত, প্রত্যেক বাঙ্গালী যুগের পক্ষে তাহা শিক্ষণীয়। নয়ন-তারি লেখকের অপূর্ণ হৃষ্ট—সাহস্যে ও দৃঢ়তা, কোমলতার ও তেজের এমন মিশ খাইয়াছে যে কোথাও তাহার নারীত্ব ব্যাঘাত ঘটে নাই। অথচ চরিত্রটিকে রোমান্সও প্রচুর। বাঙ্গালীর সংসারে নিত্য যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহারই সাহায্যে লেখক অপরূপ চিত্র আঁকিয়া তুলিয়াছেন—জাতীয়তা ও মনুষ্যত্ব-প্রদর্শনের প্রচুর যোগ্য বাঙ্গালীর বৈদম্বিন জীবনের ঘটনার ভেদন অনুমানসমূহ, উপক্ৰাসখানি পাঠ করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এ উপক্ৰাস-পাঠে বিজ্ঞান-কণ্ড ত আনন্দে কাটিবেই, তদ্বিত্ত ইহার চরিত্রগুলি পাঠকের চিত্তে যে মৃদু উজ্জল রেখাপাত করিব, তাহার সাহায্যে বাঙ্গালী মহত্তর আদর্শের সন্ধান পাইবেন। উপক্ৰাসখানির ইহাই একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। প্রচুর ছাপা, কাগজ হ্রস্ব। এ উপক্ৰাস বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে স্থান পাইবার যোগ্য।

পদসম্ম। ঐশ্বর্য্য বেবেশসুখ্যায় সাংগীত।
 ঐশ্বর্য্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।
 কলিকাতা, প্রমোদকান্দ্র প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য
 এক টাকা। 'পদসম্ম' ছোট গল্পের সমষ্টি—'কেশরী',
 'সুতির শ্রুশানে', 'কপোতী', 'দেশের মূল্য', 'জীবন-
 গৃহে', 'অন্ধ' ও 'সোনার চুড়ি'—এই সাতটি গল্প
 পদসম্মে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আশাযের মঙ্গলপেখা।
 ভাল কাগজের, 'সোনার চুড়ি' গল্পটি। অবলম্বিত
 কবরের ঘনটুকু লেখক বেশ দক্ষতার সহিত ফুটাইয়া
 তুলিয়াছেন—কামরা অত্যন্ত তত্ত্ব জন্মে ওয়ায় চিত্র-
 গুণের অঙ্গুদগণ করিয়াছি; তাহার পরিণাম তাবিয়া
 যথেষ্ট চিত্রিতও হইয়াছিল। কিন্তু লেখক শেষ দক্ষ
 করিয়াছেন—পুস্তিক পরিচয় দিয়াছেন। গল্পটির
 পরিণাম পূর্ব সরল, পূর্ব সহজ এবং পূর্ব বাস্তবিক
 হইয়াছে। কোন অন্ধ লেখকের হাতে পড়িলে
 গল্পটি মাটি হইয়া বাইত। এই গল্পটির সম্বন্ধে
 একশত 'মুখবন্ধে' যথেষ্ট কৈফিয়ৎ কটিকাছেন।
 এ কৈফিয়তের কোন প্রয়োজন ছিল না। আশাযের
 বেশ এক প্রেমের মৌলিক-কতি-বাঙ্গীল অকালপক
 সমালোচক আছেন, বাহার vulgar বা দুর্বীতির অর্থ
 না বুঝিয়া যখন-তখন বা-তা বলিয়াই চীৎকার করিয়া
 উঠেন,—নারী-জন্মের পুত্র একটু চিত্র। সামান্য
 একটু ভাষান্তর একেবারে এসদ-হুতোরই রূপান্তর
 বলিয়া তাহারে মনে হয়। তাহার চাহেন, পদসম্ম
 উপেক্ষিত। শ্রী পদাঘাত খাইয়া পরকণ্ঠই অক্ষ
 মুছিয়া ধানীর চরণে গরম তৈল মাগিল করিতেছে,
 শুধু এমনই চিত্রিত খাঁকো। বাকী ত্রীকে অভ্যস্ত,
 কটু বা কুৎসিত গালি বিলে, শ্রী যদি বাপ করে
 ত তাহারি অধনি বলিবে, 'ধনদার, তোম রাঙাইও না,
 দুর্বীতি এসব পাইবে।' দোস্তাভাফের এ প্রেমের কাত-
 জানহীন সমালোচকের সংখ্যা অল্প—এবং তাহারের
 নতায়তে বাস্তব। সাধিতের কিছুই আনিয়া যায় না—
 তাহারের অসুখ-ভগ্নকে উপেক্ষা করিবার মত শক্তি ও
 সাহস, 'পদসম্ম' লেখকের আছে—কাজেই 'মুখবন্ধে' এ
 ভণিতার কোনই প্রয়োজন ছিল না। Art ও vulgar-
 ism এ প্রভেদ কি, শ্রী পাঠকস্বর্গেই তাহা নুহেন।

'সুতির শ্রুশানে' গল্পটিতে বেশ বৈচিত্র্য আছে।
 'কেশরী' ও 'জীবন-গৃহে' গল্প দুইটি Realistic, 'অন্ধ'
 চমকনীয়। 'দেশের মূল্য' গল্পটি অস্বাভাবিক, এ গ্রন্থে
 স্থান না পাইলেই ভাল হইত। 'কপোতীতে, কাহার
 মায়া কিছু বেশী। বাহা ভৌক, গল্প-রচনার লেখকের
 হাত আছে—তাখও নয়। দুই-একটি ক্রটির
 এবার উল্লেখ করিব। গল্পগুলিতে উচ্ছৃঙ্খল মাত্রাভিযা
 দুই—সেজন্য বহু স্থানেই রসতল হইয়াছে। লেখক
 এ উচ্ছৃঙ্খলের অস্তিত্ব খীকার করেন, একশতক মহাপর
 'মুখবন্ধে' তাহার আভাও দিয়াছেন—এবং এ কথাও
 বলিয়াছেন, "নানাকার্য্যে ব্যত থাকার জন্য লেখক
 ইচ্ছাযেও ঐ সামান্য ক্রটিটুকু সংশোধনের অবকাশ
 পান নাই।" এ ক্রটির জন্য কখনও তিনি প্রার্থনা
 করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট সাক্ষ্যই বলিয়া আবার
 মনে করি না। দ্বিতীয় ক্রটি, তাহার বহু স্থানে দুঃস্বপ্নের
 আছে। তাহার উপর কথাপকথনের ভাষার ও বর্ণনার
 তাহার মধ্যে মধ্যে মিশি বাইয়া রসতল ঘটাইয়াছে।
 আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে এ সকল ক্রটি সংশোধিত
 হইবে। বহিঃখানির ভাণ্ডা কাগজ বাঁধাই ভাল।

ঐশ্বর্য্যেতে বিলাস। অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যচন্দ্র
 অশেষ প্রভুর পথিত চরিতাখান। প্রথম খণ্ড।
 আদি ও মধ্যখণ্ড। মূল্য এক টাকা দুই আনা।
 দ্বিতীয় খণ্ড। উত্তর খণ্ড। মূল্য এক টাকা দুই আনা।
 ঐশ্বর্য্যচন্দ্র চরিতাখান আশাযের কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা,
 ভারতমিহির প্রেসে মুদ্রিত। "ঐশ্বর্য্যেতে প্রভুর চরিত
 সম্বন্ধে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা—পদ্যে পদ্যে বহু প্রকার গ্রন্থ
 আছে, তৎসমূহের হইতে বিবরণ লভন করিয়া এই
 গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।" বিস্তার পুণি ও গ্রন্থ হইতে
 লক্ষিত এই গ্রন্থখানি লেখকের অসীম অধ্যবসায়
 ও অসাধারণ পরিশ্রমের ফল। গ্রন্থের ভাষা সজ্জিত,
 প্রাঞ্জল। বৈকল্যবিশিষ্টের নিকট এ গ্রন্থের মূল্য যথেষ্ট
 হইবেই; তাই বলিয়া সাধারণ বাঙ্গালীর নিকটও ইহার
 মূল্য সামান্য নহে। চৈতন্যদেব-সম্বন্ধে এখানি আশায
 গ্রন্থ-সংগ্রহ গ্রন্থ হইবে বলিয়া আশাযিসের বিশ্বাস।
 তাহার উপর ইহার আরও বিশেষ মূল্য এইজন্য যে,
 গ্রন্থে কোনরূপ গোঁড়াধি নাই।

পুঁতি। শ্রীমত অমৃতকান্ত মুখোপাধ্যায়
 এশ্বিত। কলিকাতা, ১০০ নং অপর চিংপুর রোড,
 রামময় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে প্রিণ্টিংপন বন্ধোপাধ্যায়
 কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ৭৭ আনা।
 এখানি উপভাষা—অর্থাৎ লেখকের কথার “গার্হস্থ্য
 চিত্র।” নিতান্তই বিশেষ-রস রচনা। লেখক
 ‘বিবেচনে’ বলিয়াছেন, “পূর্ণের জয় পাপের
 শোচনীয় পরিণাম প্রদর্শন করাই ‘গতির মূখ্য
 উদ্দেশ্য।” সেই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তিনি এক
 দ্রুত যাতায়াত যাত্রীর অবতারণা করিয়াছেন।
 যাতায়াত ক্রিকে কেবলই প্রচার করিয়াছে, বেশিলাস;
 ভ্রমের তাহার আর অপর কোন কারণ নাই। আর ত্রি
 খেচরীও পড়িয়া পড়িয়া মার বাইরাছে। তাহার
 মূখে একটা কথা নাই, চিত্তবৃত্তিরও কোন আভাস
 পাওয়া যায় না—অথচ যাত্রার পূর্বেই হঠাৎ দেখা
 গেল, এই ত্রিখি যাত্রীর চরণ বেশিবার জন্ত
 ছুটুক, করিতেছে। সৈবস্রমে যাত্রী যেন
 আসিয়া দাঁড়াইল, অমনি ত্রি ‘একবার কানিল
 ও রক্তবন করিল এবং যাত্রীর “দিকে চাহিয়া
 চাহিয়া প্রাণত্যাগ করিল।” প্রকৃত পক্ষে চিত্রনী
 কাটিয়াছেন, “লীলা সতীলক্ষী, তাই যাত্রা-সময়ে যাত্রী
 সম্মুখনে বহিতা হইল না।” চমৎকার। এই একটি
 ঘটনাতেই এক-বয়স সতীলক্ষী। ইহাওই বলে, আশ্রয়
 সৃষ্টি। সীতা, সাবিত্রীর বেশে এ কথা লিখিতে
 বাহার লক্ষ্য হয় না। মাতুলি জগন্নাথ রসোক্তারাই
 বাহার আশ্রয়, তাহারও উপন্যাস লিখিবার সাধ হয়।
 —আশ্রয়। এমন অসুখ ভাব লইয়া উপন্যাস-নাটক
 লেখার ভেতী শুধু খুঁজা বোঝান। বাণেশ্বর বড়তা ছাড়া
 উপন্যাসখানিতে মাপুষ-চুরি ডাকাতি আরম্ভ হয়। সুখ,
 জালিয়াতি সবই আছে—অর্থাৎ ফৌজদারী অপরাধের
 এমন কিরিত্তি বাস্তবায়ন বালক উপন্যাসেও কৃত্রিম দেখা
 যায়। তাহাও অবিকল ভাবের অসুস্থ-প—ইনি বলেন,
 আমায় বেশ, উনি বলেন, আমায় বেশ!

কেতকী। শ্রীমতী ইন্দ্রিমা দেবী এশ্বিত।
 প্রকাশক, শ্রীমতীরেব মুখোপাধ্যায়, কুৎসে কবন,
 চুঁচুড়া। কলিকাতা ভারতমিহির প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য

বারো আনা, বাঁধাই এক টাকা। এখানি ছোট
 গল্পের বহি। এ গ্রন্থে “জ্যোতিঃহার,” “মিলন,”
 “বাকপুং,” “টুনে,” প্রভৃতি তেরটি ছোট গল্প লিখি-
 য়েই হইয়াছে। অধিকাংশ গল্পই পূর্বে বিচিত্র মাসিক
 পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পগুলির মধ্যে
 কয়েকটি বিশেষত্বের অনুবাদ ও অপরগুলি মৌলিক।
 ‘অপরাধ,’ ‘টুনে,’ ‘জ্যোতিঃহার,’ প্রভৃতি মৌলিক
 গল্পগুলি আমাদের মনে লাগে নাই—গল্পগুলির ভাষা বড়,
 প্রাণবন্ত; ভাষাও নির্দোষ, অনাড়ম্বর। বিশেষত্বের গল্প
 গুলির মধ্যে ‘বিচার,’ কোন বিশেষত্ব নাই—অপর
 গুলির নির্বাচন ও রচনা প্রশংসনীয়। অনুবাদ-
 গল্পগুলির ভাষার বেশ বড়তা আছে, পড়িতে বাধে
 নাই, কোনখানে অনুবাদ বলিয়াও মনে হয় না। বাঁধার
 বাস্তবায়ন বিশেষত্বের গল্পের অনুবাদ করেন, তাহারিগকে
 এগুলি বিশেষ করিয়া পাঠ করিতে বলি। বহি
 খানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই চমৎকার হইয়াছে।

বাকপুং। শ্রীমত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম. এ.,
 বি-এল, সরস্বতী, কাব্যার্থী, বিভাভূষণ ইত্যাদি
 এশ্বিত। প্রকাশক, শ্রীমতীরেব চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা,
 কাগজ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি
 ছোট গল্পের বহি। ‘বাকপুং,’ ‘অন্যতঃ,’ ‘আবার চাকরি,’
 প্রভৃতি এগারটি ছোট গল্প ইহাতে সংগৃহীত এবং
 প্রথম গল্প ‘বাকপুং’ নামে গ্রন্থের নামকরণ
 হইয়াছে। গল্পগুলির ভাষা ভাল,— সরল এবং
 অনাড়ম্বর, তবে ছোট গল্পের আটের দিক বিচার
 দেখিলে ভ্রমের সহিত বলিতে হইবে, গল্পে ত্রুটি
 আছে, বিস্তার। “আমায় চাকরি” গল্পটি ছোট গল্প
 হিসাবে আমাদের বেশ লাগিয়াছে। অপরগুলি
 দুখপাঠ—ছোট গল্পের রসও অনেকগুলিতে আছে,
 তবে সে রস তেমন স্মৃতিতে পায় নাই; তাহার
 কারণ, গল্পগুলি তেমন বাস্তবিক বা প্রসঙ্গমূলক হয়
 নাই। ‘বাকপুং’ গল্পে কত বাস্তবিক লক্ষ্য হয়নাথ
 ও নীরবাহুস্বরীর মনোবালিস্তের মাত্র। এতদূর
 গড়াইয়াছে যে তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক ঠেকে—কারণ
 নীরবাহুস্বরীর চরিত্রে অভিন্নতার সহসা এতখানি কাটিয়া
 স্মৃতির কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ‘পুনর্জন্ম

গল্পটিতে ছোট গল্পের উপাধান বেশ ছিল,—তবে শান্তভাবে অন্তর্ধান রক্তাঙ্গী সাড়াইবার পক্ষে লেখক পূর্ণ হইতে কোন আয়োজন করেন নাই। ‘অন্যতঃ’ গল্পের গোপীবোধন কতকটা বেহুণ জড়ভরত হইয়া ঠাড়াইয়াছে—লেখকের লেখনীতেই তাহার অস্তিত্ব পর্য্যবসিত, ‘তাহার ঘেন বতর আগ নাই। ‘স্বতিরক্ষা’ গল্পটি একটু অনাবরক্ত দীর্ঘ হইয়াছে। ‘রেলবাড়ী’ও অনাবরক্ত ভাবে আক্রান্ত। ‘প্রেমশাপে’ বৃদ্ধার বহু ভাব ভগবতীর স্তোহাদিক্য না বুঝিয়া অস্ত উপরে তাহার পরিচয় দিলে গল্পটি সমিতে পারিত। বেগনির মান করিলাম, পেঙলিতে ছোট গল্পের উপাধান আছে; পেঙলি একটু চোঁটোতেই ফুটিতে পারিত! শুধু লেখকের অধঃস্থার ফুটে নাই। লেখকের হাত ভাল, লিখিবারও শক্তি আছে, তাই এত কথা, অশ্রিত হইলেও, গুলিয়া বলিলাম। আশা করি, লেখক বিরক্ত না হইয়া সুস্থিতা দেখিবেন।

প্যারাডাইস লস্ট্‌। ইংল কালীন্দ্র যোব কর্তৃক অনুবৃত্ত। প্রথম সংস্করণ। একাশক, এস, জোব, মাগুরা বাবুই-পাড়। পোঃ আঃ, বেলা পুসনা। কলিকাতা বিজয়া প্রেসে মুদ্রিত। এখানি মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট্‌র প্রথম সর্গের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ পদ্যে, অনিত্যাকর হলে। অনুবাদের নমুনা দিতেছি,

“মানবের অবাধ্যতা প্রসঙ্গে এখন,
নিবন্ধ তব্বর ফল-বিগন-আবান
জুতলে আদিল বার মরণ-সন্তাপ,
নন্দন-বিচ্যুতিসহ—আবার ঘাবৎ
না স্থাপনে পূর্ণভাবে নরোত্তম নর
নিধিন-মানবে, না লজেন স্রাবাস,
বাহ ওহে ঈশহুতে, হোরেব-সিনাই-
নিহৃত চূড়ায়, অমুখাপিলেন বিনি
সে মেঘপালকে, লিপালেন পুরাকালে
নির্দোষিত জাতে বিনি এখনে আরম্ভ

কারণঃ সলিল হতে উঠিল কেননে

পৃথী-গ্রহ-তারা।”—ইত্যাদি

লেখক অসাধ-সাধনে অগ্রসর হইয়াছেন। আমরা কোনরূপ বতাবত একাশ করিতে চাহি না; তবে একটা কথা লেখককেই জিজ্ঞাসা করি—এ অনুবাদ কি মূল্যের চেয়েও কঠিন, দুর্বোধ্য ঠেকিতেছে না? গ্রন্থের উপক্রমদিকায় মিলটনের জীবনী ও তাহার রচনার আলোচনা এবং পরিশিষ্টে টাকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

আফ্রিকাচারতদ্বাবশিষ্টম্‌। ইন্দ্রকুমার-জাবিরাম-কোচবিহারানিপতি-মন্ত্রিসহোদর বর্গের শিব-প্রসাদ শর্মা সঙ্কলিত। ইংল পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম এ বিজ্ঞানভোপাদিকেন সম্পাদিত। কানোবদন্ত মুদ্রিত প্রথমঃ স্রাবণাংগেয়ঃ রসপূর সাহিত্য পত্রিকাবান্বিতম্‌। অর্থ মূল্য মাত্রঃ মূল্যঃ। গ্রন্থ-খানি সংস্কৃত বিরচিত, তাহা বলা যোহ হয় নিম্নপ্রো-জন। এই গ্রন্থে আতঃকৃত্য, শৌচবি, আতঃস্তান, তর্পণ, ও পূজাদির মত প্রকৃত সংগৃহীত হইয়াছে।

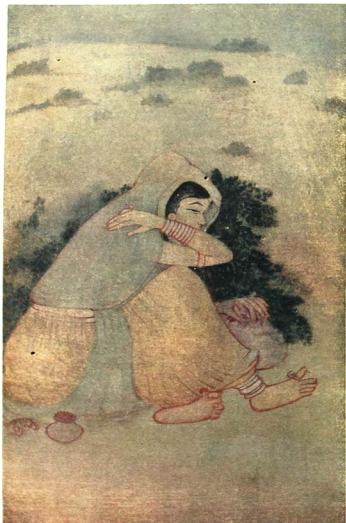
ইসত্যন্ত শর্মা।

সুরল প্রসূতিদর্পণ ও শিশুপালন।—

নিমেন দি, দাস প্রণীত। কুচলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। গৃহ ও অর্থনৈতিক বাস্তবিকের জন্য এ গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। লেখিকা লেডি ডকরীন্‌ হাসপাতালের দাত্রী ছিলেন। অনেক মধ্যে বিদ্যার প্রয়োজনীয় কথা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। বিষয়গুলি বুঝাইবার জন্য কয়েকটি চিত্রও ইহাতে বেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের ভিত্তি ইংরাজী, উর্দু, ও বাংলা গ্রন্থ এবং লেখিকার বর্ণকালের অভিজ্ঞতা। গ্রন্থখানি বিশেষ সত্যকর্তার সহিত লিখিত। এ গ্রন্থ বাস্তবিকের জন্য রচিত, তাহার ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন। তবে গ্রন্থের মূল্য কিছু বেশী হইয়াছে—‘আট আনা’ হইলেই ঠিক হইত।

ডাক্তার।

কলিকাতা, ২২ প্রকিয়া স্ট্রিট, কান্তিক প্রেসে, ইন্দ্রচন্দ্র বাবু দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে ইন্দ্রজীবন মুখোপাধ্যায় দ্বারা একাশিত।



বিভ্রাম

ঐশ্বর্য হরেন্দ্রনাথ কর অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভারতী

৩৯শ বর্ষ]

পৌষ, ১৩২২

[৯ম সংখ্যা

প্রত্যাবর্তন

তৃতীয় খণ্ড

১৩১০ সালের ভারতীতে এই প্রসঙ্গের প্রথম ও দ্বিতীয় চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল ; পাঠকদের সুবিধার কল্প প্রকাশিত অংশের চূড়ক দেওয়া গেল :—বর্ধমান জেলার বাঁকা ও গঙ্গা নদীর সঙ্গমে উত্তরাংশে স্থান করিয়া অনন্ত ও জয়রাম প্রভৃতি গ্রামবাসী ত্রীলোকদের সঙ্গে লইয়া স্বগ্রামে ফিরিতেছেন। অনন্ত, জুলক্ষণার স্বামী। অনন্তের চরিত্র-স্বভাবের মধ্যে গ্রামে ছন্দা রটে। এই বিষয় লইয়া একবার যন্ত্রণাবাদীতে ত্রীর সঙ্গে তাহার বাদানুবাদ হয়, ফলে অনন্ত অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া শরনকক্ষ পরিত্যাগ করে। জুলক্ষণা বহির্বায়ে আসিয়া স্বামীর পায়ে লুটাইয়া পড়ে। কিন্তু অনন্ত সজোরে পা ছাড়াইয়া লইয়া রাত্রির অধিকারে মিশিয়া যায়। সেই হইতে অনন্ত আর যন্ত্রণাবাদী যায় না বা ত্রীকে আনিবার নামও করে না। জুলক্ষণার বয়স পনেরো। হেমার বয়স চব্বিশ, চঞ্চল প্রকৃতি। সে যুবতী ব্রাহ্মণকন্যা, বড় ডানপিটে, হাসিতে ও হাসাইতে শটু। হেমা, পাড়ার যুবতী ও কিশোরী বউয়ের সন্নিবিষ্ট ও উপদেষ্টা ছিল। পার্শ্বতী ও রক্ষা সহোদরা। তাহারাই বিধবা কুলিনকন্যা। বাতীদলের মধ্যে কেবল কণের মা ও হাবুর মা জাতিতে শূত্র। জয়রামের বয়স ১৮।১৯—গ্রামসম্পর্কে অনন্তের কাঁট।

উত্তরাংশে গঙ্গাধান শেষ করিয়া এক্ষণে কেবল দলহ ত্রীলোকেরা নানাপ্রকার অপরাধে আমাদের পূর্ণপরিচিতি বাতীদল গর করিতে করিতে চলিল। পথে হাটতলা পরিত্যাগ করিয়া আবার গ্রাম কুতোম মা লিঙ্গাসা করিল, “গরি, তুমি কি পথ ধরিয়া গৃহান্তিমুখে চলিল। অনন্ত ও কিন্লে ?” জয়রাম হাঁতপুঙ্খই অগ্রাঙ্গামী হইয়াছিল। হাবুর মা বলিল “আমি ? আমি

হাবু নেগে ফুটকলাই মুড়কি আর জিলাপী
মিলাম।”

“আর বোয়ের নেগে কি মিলে?”

“বোয়ের নেগে আবার কি নেবে? বুড়মাগী তার জ্বাঝ কি চাই? বাড়ী
গাব কতক্ষণে গো?”

হেমান্নিনী কহিল, “বাড়ী যেতে বোগা
ডাকবে; এঁখানেই ত বেলা গেল।”

আরও খানিকদূর অগ্রসর হইয়া বাড়ীর
দেখিল তাহাদের পরিচিত আর একদল
বাড়ী আসিতেছে। পরস্পরে সাক্ষাৎ হইলে
প্রণাম ও আশীর্বাদের ধুম পড়িয়া গেল।
তারপর হেমা ও পার্শ্বতী কহিল, “মাউইয়া
আমাদের বউ কই বল।”

গৌরবর্ণা মূলকায়া একজন প্রোড়া
হাসিতে হাসিতে কহিল, “এই বে আমার
বউয়ার কাছে, ‘আরগো মূলক্ষণ,’ তার
ননদেরা তোকে খুঁজছে।”

প্রোড়ার কথা শুনিয়া দুইটী অবগুষ্ঠিতা
জ্বাঝী আসিয়া হেমা ও পার্শ্বতীর সহিত
মিলিত হইল। নবগত বাড়ীদের আর
পরিচয় দিতে হইবে কি? মূলকায়া
গৌরবর্ণা প্রোড়া, অনন্তের বশষ্ঠাকুরাণী।
মূলক্ষণা অনন্তের সেই অভাগিনী পত্নী।
আর “বো”, মূলক্ষণার ভ্রাতা গোবিন্দের
স্ত্রী। টহারাও আজ স্বদলবলে গঙ্গারানে
আসিয়াছিল। বেলাতলার জয়রাম ইহাদের
সাক্ষাৎ পাইয়া সে কথা অনন্তের কর্ণগোচর
করে, তাহা বোধ হয় পাঠকগণের মনে
আছে। বাসুদেবের বউ ও কৌদার
বউ এতক্ষণ বোমটা খুলিয়া বাজারের
ভিতর ঘুরিয়া খেড়াইতেছিল, কিন্তু যেমন

ফুটকলাইর জীলোকদিগকে দেখিতে পাইল,
অমনি একহাত বোমটা টানিয়া আবার
বউ সাজিল। ইহাই পল্লীগ্রামের রীতি,
টহাট পল্লীগ্রামের জীলোকদিগের লজ্জা।
এই প্রকার লজ্জাশীলা পল্লীবাসিনীরা
সহরের ঘরে-ছেলেকে “বেহারা” বলিতে
কুণ্ঠিত হয় না। একটা কারণও আছে।
পল্লীগ্রামের বারহাতি পুত্রা অথবা শ্রাভ
প্রকৃতি উপলক্ষে সহর হইতে বাই-খেমটা,
যেরঘাড়া এবং মেরকীর্জন গিয়া থাকে।
এই সকল নষ্টচরিত্র কুলটানগকে দেখিয়াই
পল্লীবাসিনীরা সহরের জীলোকের আচার-
ব্যবহার ও লজ্জা-শরমের পরিমাণটা আন্দাজ
করিয়া লইয়া থাকে। ইত্যবসরে মেলাতলার
সেই কাঠওয়ালী কলহপ্রিয়া বৃদ্ধা মেথার
খাশুড়ীও তাহাদের সহিত আসিয়া বোগ
দিল। তাহাকে দেখিয়া হেমা, পার্শ্বতীকে
কহিল, “দাঁড়া ভাই, মাগী এখন এসে
জুটেছে শুধন একটা কাজ করিয়ে নিই।”

এই বলিয়া সেই বৃদ্ধাকে বলিল, “এইঘে
বেহান্, দুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?
আমি তোমাকে কত খুঁজলাম!”

বৃদ্ধা বাধা দিয়া কহিল, “তোমরা
কোথায় বাসা কোয়ে ছিলে, আমি
খুঁজে খুঁজে হালাক হলাম। তাই
ভাবলাম যে, বাইতো। মোরানে বাগে,
এই বাগ দিয়েত তানারা বাবে তাই
এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছি। আমি মনে
করলাম—আর জাঝটবাড়ী যাব না, তা
বেহান ঠাকরোন্ বসে, তা সে কথা কি
ঠিলতে পারি?”

হেমা বলিল, “তা বাবে বইকি সে কি

কথা? তোমরা হলে গোতুরে লোক, কাজের লোক, বাবে বইকি। দেখ পার্শ্বী, যেহান বড় কাজের লোক, এট মোটটা বইতে আমাতে আর তোতে হিম সিন খেয়ে যাক্‌, ওনারা কি এসব গেরাচ্ছ কবে?”

“আর গভর কি আছে বেহান ঠাকরোন? দাওনা পুঁটুলিতে, আমার হাতে খানিক দাও—”

বাধা দিয়া হেমা বলিল “ওমা লোক কথা? তুমি কুটুমবাহু, ওদরলোকের মেরে (বুড়ী যাতে চলে) তুমি আমার মোট নেবে কেন?”

আর আর কোথা! ব্রাহ্মণকণ্ঠা একে বলিয়াছেন “কুটুম” তার উপর আবার “ওদর লোকের মেরে” আর কি রক্ষা আছে! মাগী বিমবাক্যাব্যয়ে হেমার হাত ছুটে মোট লটকা নিয়ে মাথার করিয়া চলিল।

মেথিরা পার্শ্বী সহান্তে হেমাকে বলিল, “চুপ কর না, মাগী যাচ্ছেত যাড়ে করেই নিয়ে যাক্।”

এদিকে অনন্তের খাণ্ডী যাইতে যাইতে রক্ষাকে সন্ধান করিয়া বলিল, “ইগা ঘেরে, বলতে পার জামাই আনতে লোক পাঠালে বিহান জামাইকে পাঠান না কেনে? লোক কিরিয়ে দেয়।”

রক্ষা দ্বিভ্র কাটয়া বলিল, “বাপেরে অমন কথা বোলনা মাউই-মা, তোমার বিয়ানের তুলি মাহুৰ কি আর আছে? তাকে একটা দোষ দিচ্ছে লোকে।—”

অনন্তের খাণ্ডী শুনিয়া সবিধাৎ কহিলেন, “হেইমা, কি হবে গা! আমার শুনে বড় ভর নাগছে।”

“ভর কি?”

“ভর আবার কি? তোর কাঁচা মেয়ে, জামিন না মা ভর বোলান। একে ছেলেমাহুৰ, সেমত বয়েস, মাথার উপর বাণ নাই, খুড়া কেঁটা মাথা কেউ নাই, তাতে বিবরওয়াল লোক, এর যদি দোষ হয়ে থাকে তাহলে বড় মুত্বিল। বা খুলি তাই কর্ণে কাকের আর মানবে না, আর মানতেই বা আছে কে? মাগীগুলোকে কি আর গেরাচ্ছ করবে? এক একটা ধমক দিলেই হল।”

“কর, এমন কি বয়ে গেছে বাচ্চা-তা ভ কিস্টই দেখতে পাই না। তবে যেটাছেলে কোথায় কি কমে না কমে সে আশা কণা। এইতো আমরা মাড় হয়েছি, বাড়ীর পাশে বাণ করছি কখনও উচু নজরটি নাই। বরক আমাদেরকে কত মাজি করে, কত সাহায্য করে, অবিত্তি আমাদেরই নিয়ে আমাদের করে, তাই-বা আমার কমে কে? তাই-বা না করবে কেন? পাড়া পিলিবাসী কতে হয় বই” কি। যদিই তোমার জামাই মশ হয়ে থাকে তাতেই বা তোমার ছাধু কি? তোমার মেয়েকে আর অনাদর করে নাই। আর করেই যদি? আমরা এই যে কখনও পোয়ামীর মুখ দেখতে পেলাম না, তা কি কর্ণ সব সহিই কর্তে হয়।”

অনন্তের খাণ্ডী আর-রক্ষার কথার উত্তর দিলেন না। এদিকে স্থলকণা প্রেরসকিনী হেমাসিনী ও পার্শ্বীকে পাইয়া অনেক দিনের পর মমের কবাট খুলিয়া ফেলিল। দশমাস বাপের বাড়িতে আছে,

কিন্তু একদিনও স্থবে কাটাও নাই বরং বিশেষ মনের কষ্টেই আছে, তাহা সমগ্রঃখিনী-দ্বিগের নিকট প্রকাশ করিয়া কাদিতে লাগিল। জলক্ষণা যে নীরবে কাদিতেছিল, তাহা বলা বাহুল্য। রাত্ৰী ঠাকুর, ভাতার মা প্রভৃতি গৃহিণীদিগকে দেখিয়া জলক্ষণা ঘোমটা দিয়াছিল। পার্শ্বতী সকলের হৃৎকের হৃৎখিনী, সেও জলক্ষণার হৃৎকে কাদিয়া ফেলিল এবং একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ভাগ করিয়া বলিল, “হে হরি, যে যে করদিন বাচে সে যেন হালিহুখে পাক্তে পায়। কাকও কষ্টে দিও না হরি! বেরেদাহুকের এর বাড়ি আর কষ্ট নাই। বলে—

আপনার হৃৎকে অসংসারী,

পরের হৃৎকে সেবতে নারি।

মেহেনাহুগুণো মরে ব্যস্ত বেশ হয়।”

হেথা বাধা দিয়া কহিল, “বালাই, মর্কে যদি তবে মাসে মাসে গোটা পাঁচ ছয় একাদশী করবে কেলা নেকি? মর্কে হয় তুই মরিস, আমি তো কখনও মরব না। একাদশীর সংখ্যা দেখে তবে মরবো; নইলে বৃষ্টি মলেই হল?”

জলক্ষণা সান্ত্রনেত্রে বলিল, “আমার ভাই মর্কেও ইচ্ছা হয় না আর একবার দেখা না করে!”

জলক্ষণার কথার হেমা রাগিয়া বলিল, “তোমার হৃৎখটা কি বলত ভর্না।”

তখন জলক্ষণা প্রথম হইতে বাহা বাধা ঘটাইয়াছিল সমস্ত খুলিয়া বলিল। তারপর কহিল, “আমি পায়ে ধরিতে গেলাম আমাকে নাতি মেরে পাঁচ হাত দূরে ফেলে দিবে সেলা।”

সদ্যকৌতুকময়ী হেমাও চক্ষু মুছিয়া বলিল, “নাঃ! এই ঘোটে পাঁচ হাত, তবেই ভাঙ্গি ফেলে দিবেছে! আমি থাকলে শিখিয়ে দিতাম, তাকে দশ হাত দূরে ফেলে দিত।”

জলক্ষণা আবার সারোমনে বলিল, “তা পারে, তাতেই পটু। বতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে পথে বাড়ি ততক্ষণ তোমাদিগকে দেখি নাই। বোধ হয় একত্রে আর দেখা হবে না।”

পার্সতী বলিল, “ছি ভাই, ও কথা বলতে নাই।”

“না হয় না বলান কিন্তু ভাই, আর সহ্য হয় না।”

এইবার হেমা রাগিয়া বলিল, “সে ডেকরা বাসুন এমন? লবু পাপে শুক দণ্ড কর্ত্তে কবে শিবেছে সে বিটলে বাসুন? অহ অহ তাকে এমন জলন করছে কেন? সে হাড়হাবাতে লক্ষ্মীছাড়ী উড়ুগেরে, তাতেই বৃষ্টি গঙ্গাতীরে বসে এত আরিজুরি হচ্ছিল? আমি তখনই বুকেছি—তোমার মাথা খাচ্ছে হতভাগা! কি বলব ভাই হয়।”

পার্সতী কহিল, “আ মরণ! ডেরের খাতির ত কত হোচ্ছে।”

“ঐ রকম ডেরের ঐ রকম খাতির।”

ভাঙ্গার সকলে অনেক কথা কহিতে কহিতে অনেক পরামর্শ করিতে করিতে বাইতে লাগিল। অকস্মাৎ হেমা উচ্চহাস্ত করিয়া কহিল, “ভাই, যদি তোমার কালো মাণিককে মিণিরে দিই, তা হলে তুই কি দিস?”

শ্রুতগণা হাসিয়া কহিল,
একদিন ভাগ নিই।”

হেমা শ্রুতগণকে চিমটি কাটিয়া কহিল—
“মরলো মত, আপনি স্ততে ঘরগা পারনা
শঙ্করকে ডাকে।”

অনন্ত, জররাম ও অনন্তের সখ্যকী
গোবিন্দ, তিনজন একত্র হইয়া ‘অগ্রগামী
হইয়াছিল। ভাগরা তেমহলার উপর বসিয়া
বিশ্রাম করিতেছিল। অনন্ত বলিল, “কইনে,
ভাদের যে দেখা নাট, কোথায় ফেলে এলি
তাহিকে?”

জররাম বলিল, “যেখানেই থাকনা, তোমার
একলাকার ত নয়! এই একজন ভ্রমশ্রোতার
স্ত্রী।”

গোবিন্দ সহজে কহিল, “শালা আমার।”
জররাম বলিল “ঐ রথের ধ্বজা দেখা
গিয়েছে। অনন্ত আহুন আমরা এগিয়ে
যাই” বলিয়া তিনজন আগাইয়া চলিল।

ঘাইতে ঘাইতে গোবিন্দ কহিল, “আগে
আমাদের বাড়ী হয়ে যেতে হবে, তারপর
খাওয়া শোওয়ার বিবেচনা।”

অনন্ত করবোড়ে কহিল, “আজকের মত
মাশ করুন। দেখছেন ত, এ পল্টন নিয়ে
কি কোথাও যেতে আছে?”

“তবে কবে আসবে?”

“এখনও ঢের হাসিয়া রয়েছে—মাঠে
ধান রয়েছে বওরা হয় নাই, এই সব ধ্বজাট
ফেলে আমার গঙ্গা নাইতে আসাই অস্ত্রার
হয়েছে।”

“তা বটে তাই, তবে কি না অনেক
দিন রাও নাই তাই বড় মন-কেমন করে, সে
যা-হক রায়ে উঠে পালিয়ে এসেছিলে কেন?”

অনন্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ভাগ
বলিল, “পালিয়ে আসব কেন?”

“পালিয়ে না হয় লুকিয়ে ত বটে।”

অনন্ত আর কোনও কথা কহিল না।
জররাম আপন মনে গান করিতে করিতে
চলিল।

এদিকে শ্রোলোকেরা পরস্পর গল্প করিতে
করিতে চলিতেছে; শ্রী শ্রী সখ্য হই-হই, এমন
সময় হাবুর মা কহিল, “দিদি ঠাকুরগো,
মুরি না খেলে ত চলতে পারনা।”

রক্ষা বলিল, “আ মর, এই ভাত খেয়ে
এলি, এখনও গলার ভাত উঠছে এম মখে।
মুড়ী খাওয়া?”

“কিবে কি আমার লাগে গা? এই
নড়ি গাছটা বেয়ে আমার আরও কিবে
নেগেছে” এই বলিয়া সেই তৈলপক লাঠি
গাছটা দেখাইল।

রাডা ঠাকুরণ বলিল, “তাইত, তুই
আবার লাঠি কোথায় পেলি?”

বাহুনবেড়ের বউ বলিল, “এই লাঠি
যে ঠাকুরগো, সে একলে গেছে
লুকি?”

কৌদার বউ বলিল, “হাবুর মার গতিভক্তি
আছে, দেখ সে ফেলে এসেছে ও ত ফেলতে
পারে নাই বাবা।”

হাবুর মা বলিল, “তোমরা গর্দী কর
আর যাই কর আমি ত মুরি না খেয়ে
নরুতে নারব।”

সন্ধ্যার আগেই সকলে কপুরভানার
মাঠে উঠিল। সেই কাঠওয়ালি বুড়ী বিধু
কহিল, “দিঠাকুরন, সন্ধ্যা হলে আমারও
একটু রাত বাদে।”

হেনা করিল, “এই মধেচেরে পোড়া-
কপালী! তু হলে তুই এলি কেন?”

“তুমিইত বলে যে তোব নাতনার
বিয়ে, তা তোকে না বলুকগে, তুই চ আমি
বলে করে দিব তোর জামাইকে।”

“তবেই হরুছে! নামদ শেষে ঢেঁকি
ধাড়ে করবে নাকি? তুই বলি আমি
পুঁটুলি নিয়ে যাব—আর তুই মুখুই চপ্তে
পান্‌চল না, তা আর পুঁটুলি নিবি কি করে?”

সকলে নিকটস্থ একটা বটবৃক্ষতলে
বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল এবং মুড়ি
খাইতে আরম্ভ করিল। প্রায় এক ঘণ্টা
বিশ্রামের পর অনন্তের খাণ্ডী কহিলেন,
“মহে, তোমরা আজ আর বাড়ী ঘেঁষো না,
সবাই আমাদের বাড়ী থাকবে চল।”

রক্ষা কহিল, “সে কি হয় বা, বাড়ী
যাব বইকি, সব ঘরকরা ফেলে এয়েছি
হুদিন বাড়ী-ছাড়া।”

“তা একটা রাত বইত নহ কাল সকালে
উঠে বাড়ী ঘেঁষো।”

“আর তোমার জামাইয়ের যদি মত না
হয়? সে সঙ্গে থাক্‌লে বা হয় হোত।”

“জামাইও চলুন তিনি না গেলে কি
হয়? সেই অবধি বাছা যান নাই আর
খণ্ডরবাড়ীর দোর দিয়ে কি রাত্রে বাড়ী
যেতে আছে?—”

রাক্ষা ঠাকুরপ বলিলেন, “আর বউ
সোমস? তা তোমরা বা বল বাছা
তোমাদের বলবার সখ্য।”

সহরের পাটিকারা শুনিয়া বোধ হয়
আশ্চর্য্য হইবেন, যে উত্তোগ আরোজন
কিছুই নাই, অনন্তের খাণ্ডী এক রাত্রে

অকস্মাৎ দশ বার জন কুটুখ লইয়া বাইতে
চাহিতেছেন কোন্ সাহসে?

অশময়ে একজন কুটুখ আসিলে আমরা
বিরক্ত হইয়া উঠি আর পল্লীগামের লোকে
অর্ধরাত্রে একপাল কুটুখকে নিজের গৃহে
লইয়া বাইতে উত্তত। সহরের লোকে
পরমা পরচে কাতর নহেন, কাতর একটু
শারীরিক পরিশ্রমে। মধ্যাহ্নে আহাঙ্গাদির
পর কেহ বই অথবা পদম লইয়া বসিরা-
ছেন, এমন সময় কুটুখ আসিলে সেই বিশ্রামে
ব্যাঘাত হয়, রাত্রে কুটুখ আসিলে গেল
ছাড়িয়া উঠিতে কষ্ট হয়। সেইজন্যই সহরের
স্রীলোকেরা অতিথির উপর বিরক্ত।
তাহারা বলেন, “পাড়াপাড়ের লোক কি
অসভ্য! তা-না হলে এমন অশময়ে কি
কুটুখবাড়ী আসতে হয় গা?—কিন্তু তাহারা
এটুকু বুঝিতে পারেন না যে, পল্লীগাম-
বাসিনীরা কুটুখ বা অতিথি আসিলে কত
দূর আগায়িত হন; তাই তাহারা মনে
করেন, আমরা যেমন কুটুখ পাইলে ক্তার্থ
হই, আমাদের সহরবাসিনী ভাষীরাও বুঝি
সেইরূপ হন, সেইজন্যই পল্লীগামের লোকে
সময়-অসময়ের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া
কুটুখবাড়ী বাইয়া থাকেন। কিন্তু সহরে
কুটুখের বাটীতে অশময়ে উপস্থিত হইলে,
প্রায়ই গৃহিণীর বিরক্তির সহিত দোকানের
মিষ্টান্ন উপভোগ করিতে হয়। আর এক
কথা; সহরের কুটুখিনীগিরের সেবার গুস্ত
নানাবিধ দ্রব্য আরোজন করিতে হয়, এমন
কি, অনেক গুলে গুল করিয়াও। পল্লীগামের
কুটুখিনীগিরের গুস্ত সে সকল কিছুই করিতে
হয় না।

পল্লীগ্রামবাসিনীরা নিজে বাহা নিতা বাইহা থাকেন, কুটুম্বিনীগকেও তাহাট দিতে সঙ্কচিত হয়েন না এবং কুটুম্বিনীও ভদ্রপেকা বেশী কিছু আশা করেন না। এটা সকলেই স্বীকার করেন যে, সহর অঞ্চলে মৌখিকতা অধিক আর পল্লীগ্রামে আত্মনিকতা অধিক। সহরের কোনও রমণী ছুই এক দিনের জন্য কুটুম্ববাড়ী গিয়া জলের ঘটি লইয়া অথবা আহানের স্থান করিয়া লইয়া আহারে বসিতে অপমান বোধ করেন, কিন্তু পল্লীবাসিনীরা এক বেলায় জন্তও কুটুম্ববাড়ী গিয়া বসিয়া থাকিতে অপমান বোধ করেন। কুটুম্বের বাটী গিয়া যদি তাঁহাদের আপনজনের মত রাখিতে, কুটনা কুড়িতে, জল তুলিতে, উজ্জিষ্ট পরিষ্কার করিতে,— এমন কি গো-সেবা করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে আর আত্মীয় কি ?

অনন্তর খাত্তড়ী জানিতেন, বাড়ীতে যথেষ্ট সুড়ি আছে, থেঁতুল গুড় আছে, একটা মহিষ এবং পাঁচ-ছয়টা গরুর দুধ প্রায় ১২।১৩ সের বাড়ীতে সঞ্চিত আছে, সুতরাং কুটুম্ব গেলে ভাবনা কি ? জামাতা এবং ভৎসহচরের জন্য আর হইবে ছানা হইবে এবং অজ্ঞাত সকলের জন্য সুড়ী, গুড় ও গুড়ই যথেষ্ট, তবে আর আতিথি-সেবার ভাবনা কি ? সহরপুরে অর্থাৎ অনন্তর খাত্তরবাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইলে অনন্তর খাত্তড়ী আর একবার সকলকে থাকিতে অগ্ররোধ করিলেন।

তখন হেনা চুপে চুপে করিলেন, “অত জিদ করে আমাদিগকে তোমার বাড়ী নিয়ে না গিয়ে যদি আমার একটা

পরামর্শ শুন তবে সকল দিক রক্ষা হয়।”

অনন্তর খাত্তড়ী আগ্রহের সহিত করিলেন, “কিনা, বল যদি ভাল হয়, তবে তাই করব।”

“জামাদের বউকে পাঠিয়ে দাও চুপি চুপি নিয়ে যাও, নইলে তোমার জামাই আসে সে জামাই নাও, একেবারে বয়ে গেছে! সে শিত্তিজে করেছে নিজে আর কখনও সহরপুরে আসবে না আর বউকেও কখন নিয়ে যাবে না, আর যদি তোমরা রেখেও এমো তাহলেও কিরিয়ে দেবে! সেইজন্যই ত ওর মামি বউকে নেবেতে পারে না, নইলে এমন বউ কি আবার বাপের বাড়ী ফেলে রাখে গা ?”

অনন্তর খাত্তড়ী একেবারে ভয়ে বিবর্ণ হইয়া ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে করিলেন, “কি দোষ আমার মেয়ের ?”

“দোষ তল আবার কি ? আর তার সে বিবেচনা করবার দক্তি” রেখেচে গা ভালখানি !”

অনন্তর খাত্তড়ী করিলেন, “আমি বলি কি জামাইকে একবার বাড়ী নিয়ে গেলে হোত।”

হেনা করিল, “নিজে না-হয় গেলে, কিন্তু একদিন নিয়ে গেলে কি হবে ? আবার তার পরদিন বাড়ী কিরে গিয়ে যে-কে-মেই হবে তখন তুমি কি করবে ? তার চেয়ে আমার কথা শুন, বউটিকে পাঠিয়ে দাও আমাদের সঙ্গে, তাহলে সব গোল মিটে যাবে, কি বল পাঞ্জতী ?”

পার্সী সহান্তে কহিল, “তা বটেই।”
পরে হেমার গা টিপিয়া কটিল, “কি কোবে
তোমর অত মিছা কথা বেকল, তুই সব
পারিস্ ভাই।”

হেমা নীর্যনিঃশ্বাস ফেলিয়া মূহুরের
কহিল, “ধখার্থই” আমি সব পারি, ঐরূপ
মিথ্যা বলে জুয়াচুরি করতে আমি বড়
ভালবাসি।”

অনন্তের খাণ্ডী কহিলেন, “তা বটে,
তবে বা আমার তর হচ্ছে পাছে লোকে
নিন্দা করে।”

হেমা। সে তার আমার, আমি তার
জবাব দিব।

অ-খা। বেমান যদি রাগ করে ?

হেমা। কে, জেঠাই-মা ? সে এমন
লোক নয় গো ! বউ পেয়ে সে বস্তু যাবে,
কেবল ভায়ের ভয়ে বউ নিয়ে বেতে পারে
না। তা নইলে কি এত দিন বউ বাপের
বাড়ী থাকে ?”

অ-খা। সবকিছু পারি, যদি অনন্ত কিছু
বলে ? সে ঈষত আরও চটে যাবে, আমার
সেই ভয় করে বাছা।

হেমা। ওগো সে ভয় তোমার কিছুই
নাই।

অ, খা। সব শুনে আমি ত হতবুদ্ধি
হয়েছি। যাতে ভাল হয়, নিন্দা না হয়, তাই
তুমি কর না।

হেমা। আমি ভালই বলছি
কোন ভয় নাই।

অ, খা। একবার কর্তীকেও বল না ?

হেমা। তাঁকে না বললেও ক্ষতি নাই।

অ-খা। একবার গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা

করি কি বলে ! হাঁ গা ওর গহনা কাপড়
চোপড় সব বাড়ীতে আছে যে।

হেমা। সে সব তোমার ছেলেকে দিয়ে
পরে পাঠিয়ে দিও।

অ, খা। মনে করেছিলাম তেল পান
মশলা দিব, আর-বার দিই নাই বলে বেমান
কত রাগি করেছিল।

হেমা। আর বাপু সে যেনে দাও সে,
আর এত কষ্টে হবে না।

অ, খা। মিষ্টি সঙ্গে না দিয়ে পাঠাতে
আছে কি ?

হেমা। সে কি না আমার কর্ত্ত ?
সে তোমার জামাইয়ের কাছ থেকে আমার
কর্ত্ত।

এইপ্রকার কথোপকথন করিতে করিতে
সকলে সহরপুরে প্রবেশ করিলেন। অবি-
লম্বে তাঁহার অনন্তের খত্তরবাড়ীর নিকটবর্ত্তী
হইলেন। ঐ সেই ঘর দেখা বাইতেছে,
যে ঘরের নিকটে মর্দগীড়িতা হুলস্থল
ক্ৰুদ্ধ অনন্তের পদদলিত হইয়াছিল।
যে ঘরের বাহিরে আসিয়া মায়া দগা
মেহ ভালবাসা পরিত্যাগ করিয়া পাষণ-
তদর নিষ্ঠুর অনন্ত—অনন্ত আধারে মিশিয়া
গিয়াছিল; কালরাত্রে যে ঘরের নিকট
আসিয়া পাষণতদর ডুব হইয়াছিল,
জহরামের পরিহাস-চীৎকারে আশ্রয়
অনন্ত যেখানে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল,
অনিচ্ছায় যে ঘর পরিত্যাগ করিয়া মগ্ন-
মুগ্ধের ভ্রাম্য চলিতে হইয়াছিল, যে ঘর
দেখিয়া একখানি বিষম প্রতীমা অনন্তের
স্মরণ হইয়াছিল, এবং প্রস্তুতহস্তে পবিত্র
গঙ্গাবারির স্নান, পাষাণে নির্মিত স্তম্ভ

দ্রবীভূত করিয়া ছুইবিন্দু পবিত্র অশ্রু অনন্তের বিচ্ছিন্নিত নগনপ্রান্তে দেখা দিরাছিল, ঐ সেই বহুবার ভেসনই বহু রহিয়াছে। সেই ঘাবের নিকট আসিয়া, তিনজন যুবাপুরুষ থমকিয়া দাঁড়াইল, প্রথম যুবক গোবিন্দ কহিলেন, “সে কি হয়, যা বলেছে একবার, দ্বিতীয়বার বলিও না।”

অনন্ত করবোধ করিয়া কহিল, “আজকের মত ক্ষমা করুন।”

গো। কাল তোমাকে পাব কোথায়?

অ। আপনায়ই খাটিতে।

গোবিন্দ অনন্তের যুক্তকর ধারণ করিয়া বলিলেন, “শালা বদমাস, এত চাতুরী কোথায় শিখেছিলে?”

জয়রাম তাকাতাড়ি বলিলেন, “বলব? আমি বলছি কোথায় শিখেছে। বলব অনন্তদাবা?”

অনন্ত একবার জয়রামের বিকে মুখ ফিরাইলেন, জয়রাম হাসিল।

অতিকণ্ঠে অনন্ত গোবিন্দের হাত হঠতে নিজ হাত ছাড়াইলেন, কিছু কথা এড়াইতে পারিতেছেন না। আজি গোবিন্দ অনন্তকে আটকাটিতে অভ্যস্তই ছিলেন।

গোবিন্দ কহিলেন, “সেইট চব্বনা, আজ তোমার কিছুতেই ছাড়ব না।

অ। আপনি যে অস্বীকার কর্তে বলবেন, আমি তাই করব, পরন্তু নিশ্চয় অস্ব।

গো। আর তোমাকে বিশ্বাস নাহে।

অ। কাল কৃপাবিগকে কাজ দেখিয়ে দিয়ে পরন্তু আমি নিশ্চয় আসব, আর আমাকে বার বার গজ্ঞা দেবেন না, আমি নিশ্চয়—”

জয়রাম অনন্তের কথার বাধা দিরা বাঁকুড়াবেলার হয়ে বলিল, “ভাত বটেই, ছোকা বড় ভদ্রব আছে। ঐ যে কালো-পাখা মরণটী বড় ভদ্রব, কোথোনো মিছে কথা কহেক নাই, আনেক নাই, উহার হাত কোথোনো কাহার গায়ে উঠেক নাই, উহার সোকালাি শুণ, কেবল সত্য কথা কহিতে আকটুকু খাট আছে।” বলিয়া জয়রাম দুইবার মন্তক সঞ্চালন করিলেন।

অনন্ত জয়রামের পরিহাস বুঝিয়া চািলেন, সহান্তে কহিলেন, “তুই অকু জয়া, আমি আগে বাড়ী যাই, তোকে একবার পাট করো ভাল কোমে রে। তুই বাড়ী হতে বাহির হয়ে অবধি আমার পিছনে বড় লেগেছিস। তোর যা মুখে আসছে তাই বলছিস। যা মনে আসতে তাই করছিস।”

জয়রাম কৃত্রিম কোণ প্রদর্শন করিয়া কহিল, “ওর খোলাসোদে কাজ নাই, চক্রবর্তী তুমি আমাকে নিয়ে চল। ও না বার নাটক গেল, তারি ত আমাই।”

অনন্ত সহান্তে কহিল, “সেই ভাল। আজ আমি বাড়ী যাই জয়রাম, তুই আমার প্রতিনিধি হয়ে নতুনবাড়ী কোরে আর।”

গোবিন্দ অনন্তের কাণ ধরিয়া কহিলেন, “শালা কাজে নাই কথার আছে।”

এমন সময় ঐকভাবে অনন্তের বাঁহুড়ী খোমটা দিরা আসিয়া গোবিন্দকে ডাকিলেন, তাহাকে দেখিরা অনন্ত ও জয়রাম তাকাতাড়ি ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন।

গোবিন্দের মাতা সংক্ষেপে তাহাদ্বয়কে আশীর্বাদ করিয়া পুত্রকে ডাকিয়া লইয়া

গেগেন, বাইবার সময় গোবিন্দ বলিয়া গেগেন, “আমি না আসলে যেন তোমরা যেও না।”

অন্তরালে লইয়া গিয়া মাতা, পুত্রকে হেমাঙ্গিনী প্রস্থান য়া কিছু ভিন্ধাছিলেন সমস্তই বলিলেন, এবং হেমা যে অশ্রুতি দিচ্ছিলেন তাহাও বলিলেন। গোবিন্দ একটু চিন্তা করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “ও কথা, কথাই নয়। অনন্ত যে অত বয়ে গেছে ও কথা আমার বিশ্বাস হয় না।”

গো, মা। মতগুলো নোকে কি মিছে কথা বলছে।

গো। তার আর আশ্চর্য্য কি? সকলেই ত মাগী, ওরা সব পারে।

গো, মা। তা বাই বল অলক্ষণাকে পাঠাতেই হবে।

গো। তাতে আমার আপত্ত নাই, তবে একবার বাবাকে বোলে হোত না?

গো, মা। না বাছা তার দরকার নাই, তিনি তাতে রাগ করবেন না, তাঁকে বলতে গেলে অনন্ত তন্তে পাবে, হেমা বলেছেন অনন্ত যেন না পোনে।”

গোবিন্দ হাসিয়া বলিলেন, কি বললে, যেতে রাজি আছে?

গো-মা। তারও গোথ হয় মত আছে, কেননা তার সঙ্গে পরামর্শ করেই হেমা অধিক বললে, স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে কোন সন্দেহ জন্মালে কোন্ রমণী স্বামীর কাছে পাকুতে বাসনা করে না বাবা?

গোবিন্দ আবার হাসিয়া বলিলেন, “অনন্ত সে ছেলেই নয়।”

গো-মা। অলক্ষণা ছেলেমাছধ তাই

আলও অনন্তকে চিন্তে পারে নাই, বাই হোক তুমি তাকে বারণ করে দিও এবার যেন অনন্তের সঙ্গে কগড়া না করে।

গোবিন্দ মনে মনে কহিলেন, “অনন্ত কোটিপাথর আর অলক্ষণা অর্ঘ্য প্রতিমা। অনন্তের একটা বাক্যরূপ ঘর্ষণে অলক্ষণার দ্বন্দ্ব একটু ক্ষয় হইয়াছে ও তাহাতে অলক্ষণা অনন্ত বহুলা ভোগ করিতেছে।”

গোবিন্দের মাতা কহিলেন, “বাড়ীতে গিয়ে অনন্ত যখন দেখতে পাবেন, তখন অলক্ষণাকে কি বলবেন জানিনা, হয়ত বাছা কতই কাঁদবে।”

গোবিন্দ হাসিয়া বলিলেন, “তুমিত আগে কাঁদ, তারপর তার ভাগো যা হয় হবে। বাড়ীতে বৌলবে আবার কি? সে এমনি ক্ষেপেছে কিনা তাই বোলে।”

চক্ষু মুছিয়া মাতা কহিলেন, “কি জানি বাবা?”

মাতাপুত্রের ফিরিলেন, গোবিন্দ হাসিয়া বলিলেন, “বারে দাঁড়িয়ে কেও?”

অ। (সহাস্তে) আক্ষে আমরা অতিথি।

গো। এতরাত্রে আমরা অতিথিকে স্থান দিইনা, কিরে দেখ।

গোবিন্দ ঘারে আশ্বাস করিয়া বাবা, বাবা, বলিয়া ডাকিলেন। তাহাদের সাড়া পাইয়া গোবিন্দের পিতা আসিয়া কবাত খুলিয়া দিলেন।

এদিকে অররাম ও অনন্ত অর্ধাক হইয়া ক্ষণেক তথায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরে প্রস্থান করিলেন।

গোবিন্দের ভয়ে তাঁহার মাতা প্রকান্তে কাঁদিতে পারিলেন না। চক্ষু মুছিতে মুছিতে

অনন্তের খাণ্ডী বাজীদের দলে বাইরা
মিশিলেন। যাঁরা যাত্রা তেঁমা জিজ্ঞাসা করিল,
“কি মত চল গো তোমার ডেলের?”

গো-মা। ডেলের অমত কিছুই নেই—
তুমি যা মত কোরেছ তা বুকেই করেছ।
তবে আমি আর বেশী কি বলব? তোমার
সঙ্গে পাঠাচ্ছি তুমি একটু নড়র রেখো,
যেন বাছা আমার আঁড়ালে দাঁড়িয়ে কাঁদেনা।

হে। না আবুই-মা, তোমাকে সে
জাবতে হবে না।

শুলক্ষণার মাতা কানিলেন, মাতার
রোবন দেখিয়া শুলক্ষণাও কানিল। তাঁর
পর প্রণাম ও আশীর্বাদ শেষ হইলে সকলে
আবার চলিতে লাগিল, বতক্ষণ দেখা গেল
ততক্ষণ শুলক্ষণার মাতা ধীর্বে দাঁড়াইয়া
কন্যার দিকে চাহিয়া রহিলেন, শুলক্ষণাও
কানিতে কানিতে পিছনে চাহিয়া চাহিয়া
বাইতে লাগিলেন।

ক্রমে বাজীমণ্ডলী সহজপুরের মাঠে
পড়িলেন। বাইতে বাইতে হেমা কহিল,
“ভাই পার্শ্বতী! আমরা যে বউকে নিয়ে
যাচ্ছি তা ভাই কাকেও বলা হবে না।”

পা। সে কি করে হবে, এত লখ
কি করে নিয়ে যাবি?

হে। আমরা একটু পেছিয়ে পড়ব।

পা। তা হলে হতে পারে!

অনন্ত ও অররাম ধীরে ধীরে চলিতেছেন
ও কথা করিতেছেন।

অ। ব্যাপার বুঝতে পারলেন না।

অ। কি আমি দান্য, মায়ে বেটায় কি
পরামর্শ করে এলো, আর আমি আমাদিগকে,
কিরিয়ে দিলে।

অ। ভাল হল—

“বাগবে ডবাও তুবি,
সেই সে যোগাভা আমি।”

যে ভয়ে অনন্ত বলিলেন, ভালই হইল,
সে ভয় আর কতক্ষণ থাকিবে?

হেমাসিনী যাহা প্রতিজ্ঞা করে তাহা
অলক্ষ্যনীর, তবে সোভাগোর বিষয় এই,
হেমার প্রতিজ্ঞা কখনও কাহারও ইষ্ট ভিন্ন
অনিষ্ট সাধন করে না।

পঞ্চাৎ হইতে ভুতোর মা হাঁকিল,
“দাঁড়াও গো, আর ফেলে দেও না।”

অররামও সেই সুরে হাঁকিল,
চলে এস।”

অনন্ত। মাগীরা আদবে চলতে পারে না।
শ্রীশোকেরা আসিয়া জুটিল।

অনন্ত কহিলেন, “তোমরা যে অনেকগুলো
দেখছি, গোলমাল হয়ে ছুই একটা বাজে
লোক এসে পড়েনি ত?”

হে। আসে যদি তবে তোমার বাড়ী
অতিথি হবে।

অ। আমার বাড়ী অতিথি হলে বড়
স্বপ্ন হবে।

রক্ষা। কেন?

অ। তাহলে আজ রায়ে বহুলতলে
বসিয়ে রেখে দেব, তারপর কাল অতিথি
সেবার ব্যবস্থা হবে।

হে। হবে বইকি! তাহলে তোমার
নাক কেটে স্বাম্য ঘসে দেবে, জাননা
যুঁঝি?

দলহ সকলে হাসিয়া উঠিল।

রক্ষা কহিল, “মরণ আরকি, তোর না
ভাই হর?

হে। ভাই হল ত বরষে গেল কি ?
অজ্ঞায় দেখেছে চোটলাট বোলবো, ভাটত
কোন ছায়, ওর কেননা হোকনা।

অনন্ত নীরব রহিলেন। অগেক পরে
বিধু কহিল, “নিষ্ঠাকরণ আমি আর চলতে
নারবো।”

পার্বতী কহিলেন, “চলতে নারবি ত
কোথা থাকবি?”

বি। বাবুনি কেনে। বাবো, তবে আমার
স্বত্ব বাদে, হাতটা ধর।

রক্ষা। ও জঘরাম, লকি দাদা আমার,
ওর হাতটা ধর ভাট।

ক। কে ও মাগী ?

হে। মেথার খাণ্ডী।

বিধুর কথা শুনিয়া অনন্তের অন্তমনস্কতা
ভঙ্গ হইল। অনন্ত মনে করিলেন, এ ত
দেখছি সেই কাঠগরালী মাগী!

প্রকাশে কহিল, “মেথার খাণ্ডী?”

বা-বো। তোমারই “বেরনি”, তোমার
কিরসেনের খাণ্ডী।

ক। অনন্তদা, তোমার উচিত বেরানের
হাতটা ধরা।

অ। আমার সঙ্গে প্রথম চোটে বড়
আলাপ হয়েছিল বেরানের সঙ্গে।

হে। কোথাও কাট কিনতে গিয়ে নাকি?

হু-হা। আলাপটা কি রকম?

অ। তা খুব! আমি যে বলেছি কাঠ,
অমনি বেরান আমার বলে উঠল বাট
এখানে কোন্ডা রে ডেগোর, ঐ মড়া-খাটার
দা।

র। তবেত খুঁস আদর
তোমাকে।

অ। আমার আর একটা কথার বড়
রাগ হয়েছিল।

অ। তোমার
উপর।

অ। বথার্থ, আমি ওকে খুব ছেলে
বেলায় দেখেছি, তারপর আর দেখি নাই,
মাগীকে চেন-চেন করচি কিন্তু চিন্তে
পারচি না, তারপর ওর সুমিষ্ট কথা শুনে
আর পাতের বাহার দেখে অবাক হয়ে ওর
মুখপানে চেরে আছি, আর তাই দেখে
মাগী কিনা বলে “আমার ত চেগড়া বরষ
নইরে ডেকরা, তুই কি দেখছিস্ হা করে?”
আমি যেন ওর বরষ দেখছিলাম।

রক্ষা। তা বটেত, ও যেহেমাঙ্গুস আর
তুমি পুরুষমাঙ্গুস ওর নিকে তোমার চাওয়া
কেন!

অনন্ত কহিলেন, “জানদিকে একটা থানা
আছে কেউ যেও না।”

কিন্তু বলিতে না বলিতে বিধু সেই
গর্ভে পড়িয়া গেল। অনন্ত কহিলেন, “বেশ
হয়েছে, মাগী কালো নাকি?”

বা-বউ। সত্যি ও কালো, আহা পড়ে
গেল!

জঘরাম তাড়াতাড়ি আসিয়া বিধুকে
তুলিয়া বলিল, “কেন, তোমার হাবুর মা
পড়ুগ না, ও কেন পড়বে।

অ। তবে পড়চে কেন, ধরে রাখনা।

ক। না ধরে রাখবে না, এই ত ধরে
নেযাকি, আরত পোড়তে দিব না। তোমার
হাবুর মাকে কি করবে কর।

অনন্ত আর কোন কথা কহিলেন না,
কেবল হাসিলেন।

হাবুস মা কহিল, “দিষ্টাকরণ আমিও চলতে পারবো, সুনি চাটী না খেয়েও পরাণ বাঁচে না।”

হে। আ মর মাগী, ডগে ডগে মুড়ি খেতে হয় নাকি ?

হা। আমি তখন দুটি খেয়েছিলাম শেষে বেঁধেছিলাম।

মা। তা বেশ করেছ এখন বলে বলে মুড়ি খেতে গেলে ত চলবে না, পেতে খেতে চ।

কাজেই হাবুস মা মুড়ি খাইতে খাইতেই চলিল।

অরাম কহিল, “অনন্তদা, ও আলোটা কিসের গা ? কোথা জলছে বল দেখি ?”

অনন্ত হাসিয়া কহিল, “বোধ হয় ঝাঁকর ধামে। ও যে কিসের আলো তাকি আর বোলেতে হয়।”

হাবুস মা মুড়ি খাইতে খাইতে দুটিটা আসিরা অনন্তকে স্পর্শ করিল।

অ। পালিয়ে এলে যে ?

হা। ও আলা ত আলা নয়। ও যে পেস্তার আলা।

অ। (কৃত্রিম ভয়ে) তাইত কি হবে ? ঐটেই ত আমাদের বাবার পথ। হাবুস মা, তুমি এগিয়ে চল আমার বড় ভর হচ্ছে।

হা। আর গিরে কাজ নাই তুমি কিরে চল।

অ। কোথায় ?

হা। সহজপুরে।

অ। বটে, সেই খুঁজি সহজ কথা !

হা। হেই মা, আমি কেন মস্তে এলে-

ছেলাম গা ! আমি আস্ত ঠাই পাকতে পেস্তার চাত মগাম গা। ডবকা পরাণটাকে খোঁচাতে এলাম গা ? কেনে মনে গলা নাইতে এলাম গা ?”

কাল প্রায় সমস্ত রাত মাঠে মাঠে সকলে হিমে হিমে চলিয়াছে, আলিও রাত্রে সকলে হিমভোগ করিতেছে তাহাদের মধ্যে অনেকেরই সর্দি হইয়া নাকের জলে চপের জলে ভাসিয়া বাইতেছে।

হাবুস মার কথ ও পেটের আলা দুই সমান হইরাছে ; সে মনে করিল আজ যদি মরিতে হইবেই তবে মুড়ি কটা না খাইয়া কেন মরিব !

হাবুস মা যেমন এক দুটো মুড়ি মুখে পুরিল ওমনি তাহার নাক সম্বন্ধ করিয়া হাঁচি আসিল ও হাঁচিয়া ফেলিল, আর যত মুড়ি হাবুস মার মুখ হইতে বাহির হইয়া তার সম্মুখে ছড়াইয়া পড়িল, কতক অনন্তের গাত্রে, কতক অরামের গাত্রে ও কতক-বা বিধুর গাত্রে ছড়াইয়া পড়িল, অনন্ত তাহার দেশী আলোরান তাড়াতাড়ি জড়িয়া ফেলিল।

অরাম ও গাত্র-বস্ত্র ঝাড়িয়া ফেলিলেন ও বিলক্ষণ রাগিয়া উঠিলেন। রক্তনেত্রে কহিলেন “কেন বল দেখি মাগী, আমার লল নিরেচিস্, যেতে আস্তে কেবল আমার গায়ে লাল দিচ্চিস্ ? নে মাগী, চিমটে নে, বল মাগী বল—

সত্ কুসুমে হেঁছে দিলে।

পত কুসুমে চেঁচে নিলে ॥

বল, বোলে চিমটে নে, নইলে দেখাব যম্মা, মাগী ঘেন আমাকে আত্মকুড় পেয়েছে” এই বলিয়া অরাম বোধেরে চড়

উঠাইল, কিন্তু অনন্ত তাহার হস্ত ধরিয়া ফেলিল। অগত্যা হাবুর মা হাঁচির প্রতিকার করিল। অরবিন্দ মুখভার করিয়া বলিলেন, “বহালক্ষী আমার সঙ্গে নাইতে যাবে যদি জানতে, তবে আগে থাকতে সঙ্গে একটা প্রোপার্শ্ব নিতে হয়।”

অ। হ্যাঃ, আর বকিস্ নে কথা।

হা। বলত পাঠাঙ্গুর, আমি ওকে আকড়েছি, না ঐ আমাকে আকড়েছে, এই মাক মাঠে আর আন্তর কাল আর ডাইনে বায়ে সপথ বিট ছেলে, আর এই তোমার নাড়হাতে আর ঐ আগে পাছে বাসুন আর হাতে বেতে মা লক্ষী, (মুখে মুড়) আমি যদি আগে আকড়ে থাক তবে বেন স্বী-বোয়ের মাতা পাই।

ক। আমি যদি ওকে আগে রাখেডে থাকি তবে বেন সেই বুড়ো ভেড়ার মাথা পাই।

হে। আর! তুই এখনও মা লক্ষীকে আবার কাটছিল?”

ক। তুমি কি রাখেডেছ, তুমি রাকড়ার বাবা কেড়েছ।

সকলে বিটবে ছাড়িয়া হরিণ-ডান্দার প্রবেশ করিল।

কৌশল্য বউ। “আমিত আর চলতে নারব এই বসুন্ধর” বলিয়া বসিয়া পড়িল।

অ। তবেই হয়েচে, এই রকম চলগেই আজ বাড়ী গিয়ে পৌঁচেচ।

খা-বউ। তা বসে কি হয়, তোমার পারবেত আমরা চলব না। আমাদেরই এই রকমই চলব। বলিয়া সেও বসিয়া পড়িল; তখন একে একে সকলেই বসিল।

অবশেষে অনন্ত ও অরবিন্দও বসিলেন। হেমা ও পার্শ্বী স্থলক্ষণকে অতি বহু কথিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। মন্থপীড়িতা স্থলক্ষণা সত্তরে সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাঁতেছেন, অনন্ত যে হাবুর মা, শিশু ও অরবিন্দকে লইয়া এত রহস্য করিতেছেন, তাহা কি স্থলক্ষণার ভাল লাগিতেছে! যখন অনন্ত আনিতে পারিবেন যে স্থলক্ষণা পদব্রজে তাহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ আনিতেছেন, তখন যে তাহার অন্তরে কি আছে তাহা ভাবিবার স্থলক্ষণা বারণান্তেই আনিতে পারিতেছিল না।

হেমা কহিলেন, “আর মধ্য উঠ”।

কুমা। এরি মধ্যে উঠতে হবে? আমার বেকারী আসচে গা!

খা। ওলো আমাদের তাই।

অ। তাইত ঠাকরণ-দিদি, তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথা, তোমার যে সাড়ী শব্দ পাই নাই।

খা। আমি? আমার এতক্ষণ চল আসছিল।

অ। চলতে চলতেই নাকি?

খা। হাঁ ডাই, চলে চলে পা বেথা করছিল নাকি তাই ঘুব পাচ্ছিল।

অ। বেশ আরামের ঘুম বটে।

হে। আর দেবী করে না উঠ।

বীরে বীরে সকলে উঠিল এবং উহু আহা করিয়া চলিতে লাগিল,—সকলেরই পা স্থলিমাছে।

খা। উহু মাগো, পা আর বাড়তে পার্জিনা লো হিমি! তুই আর এমন করে নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে আসনে,

এমন জানলে তোমার সঙ্গে আসতাম নাশো !

হে। আমার দরকার তোমাকে নে-যাও কি না ? তোমার নামে গড়ি দেওয়ার কাজ কি ?

পা। আমরা এত মাগো বাবাগো বলছি কিন্তু বেটাছেলেরা বেশ চলেছে। কই কেউ কিছুই ত বলে নাট, ধরি ওদের পা বাহোক !

রা। ওদের ভাবনা কি বল, ওরা ইটামিন পায়ে দেচে, জুতো পায়ে দেচে, ওদের ভাবনা কি বল।

বাইতে বাইতে হঠাৎ অনন্ত চমকিয়া গাড়াইলেন এবং পশ্চাৎদিকে চাহিলেন।

বা-বো। ঠাকুরগো, গাড়ায়ে যে, কি দেখেচো ?

অ। কিছু নয়।

কো। আরত চলতে পারিনা, কেন যে মরতে এসেছিলাম।

একটু অগ্রসর হইয়া গয়রাম হাঁকিল, "গগো একটা মড়ার মাথা"।

পশ্চাৎ হইতে ত্রীলোকেরা হাঁকিল 'হঁবো'। ছুট একজন 'হঁবো' বলাতে হেমা হাঙ্গা করিয়া হাসিয়া উঠিল। মাঠে আসিতে আসিতে সকলেই হাসিতে হাসিতে গল্প করিতে করিতে আনিয়াছিল, তখন অনন্ত বিরক্ত হইয়া নাট, কিন্তু এবার হেমা হাস্য করিতে অনন্ত ধমক দিয়া কহিলেন, "অন্ত হাস্ত কেন, চুপ কবে কি আসতে পার না ?"

রা। ওরে চাহুগ হাঁহুগ, ওদের এখন হাসবার বয়স তা হাসবে না ?

অ। হাসবার আর কাদবার বুঝি আবার বয়স আছে !

রা। আছে বই কি।

অ। তবে কাদবার বয়স কোন্টা ?

হে। পনের বৎসর।

অনন্তের এত, তাই দ্বিজাঙ্গা করিয়াছিল যে কাদবার বয়স কোন্টা ?

হেমা উত্তরে অনন্তের সঙ্গে বেশ দুটোখাত হটল ; সে বাড়ি হেট করিয়া নীরবে রহিল। মশমাস পুঙ্কের একটা নির্দয় ব্যবহার তাহার মনে পড়িল, সে আপনাকে আগুনি দিবার দিল।

পা। হেমা, তোমার স্বত্ত্ববাড়ীর হতে গঙ্গা কতদূর ?

হে। কি জানি তাই !

ধারি না।

পা। তোমার বিয়ে কিছুই মনে পড়ে না ?

হে। কিছুনা, কখনও বিয়েও করি নাট, বরষাও যাই নাট।

পা। স্বত্ত্ববাড়ী না হইয়া বাস নাই কিন্তু বিয়ের কি কিছুই মনে পড়ে না ?

হে। পড়ে একটু একটু। একজনকার টোপের দেখিয়া একদিন কেঁদেছিলাম, তা ভাই টোপেরটি আমার দিলে না, একটা পাতি হাঁস না পাতি মগুর কি পরিচয় দিলে। তাই মনে আছে।

এট সকল কথা পাক্তী ও হেমা চুপে চুপে কহিতেছিলেন। সকলেই কথা কহিতেছেন কেবল অনন্ত নীরবে চলিতেছেন। চলিতে চলিতে অনন্ত আবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন।

বা-বো। এতগুলো ঘেরের দিকে বার বার তাকাচ্ছ কেন বলত ?

অনন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল “তোমাদের দলের মধ্যে কাহার পারে মনের শক্তি পাচ্ছি ? বাবার সম্বন্ধ কারো পারে মল দেখিনি !”

চেনা তাতাতাড়ি মূলক্ষণাৎ গ্যা-টিগিয়া বলিলেন, “আমর পোড়ার মূশী, মল গুলোকে নোঙ্ক,—হেঁটোর উপরে তুলে রাখনা মতা ! টের পেলে এমুনি এই মাঝ মাঠে তোকেও মারবে, আমাকেও বন্ধবে—জানিনা নেতি ?”

তবে ভরে মূলক্ষণাৎ মল গুলোকে পারের উপর গুলিল।

মূলক্ষণাৎ ! আজ তুমি নতুন হটরা অনন্তের বাটা বাইতেছ নাকি ? তুমি কি অনন্তকে চেননা ? কোনদিন অনন্ত তোমাকে গ্রহণ করিয়াছে কি ? কিহা অনন্ত তোমাকে কোনদিন ধমক দিয়া কোন কথা বলিয়াছে কি ? তবে তাহাকে তোমার এত গুণ কেন ? যদি বল, তাহা হইলে জামিও সেটদিন তোমারই দোবে তুমি অপমানিত হইয়াছিলে, তোমারই দোবে তুমি পদদলিতা হইয়াছিলে।

“তুমি কি জান না যে, পুরুষ জাতি লেবুর সমান ; যে রমণী লেবুর আঁজ রস বাহির করিয়া লয়, সেই রমণী অগন্ধি অন্ন রসে ভিজে পরিভৃষ্ট করে। আর যে রমণী লেবু তইতে অধিক রসের প্রত্যাশা করে সেই তিক্ত রসে পরিপ্লুত হয়। সেখ আট মাস পূর্বে তুমি না হয় বুঝতেই পার নাই, একটু বেশী নিরুত্থাইয়াই ফেলিয়া-

ছিলে, কিন্তু জামি পর্যন্ত তুমি তিক্ত রসে প্রাণিত আছি। জামি তইতে জামিগা রাখ, ডাবের মল বেক্ষণ ক্লাস্তিনাশক ও শান্তিজনক, লেবুর রস মেক্ষণ মদে। বিশ হাত উচ্চ হইতে ডাব ভূপতিত হয়, কিন্তু ডাবের ভারতমোর কিছু প্রভেদ হয় না। আর লেবু যদি বিহস্ত উচ্চ হইতেও পতিত হয়, তবে তাহাতে অন্নরস কমিয়া গিয়া তিক্ত রস বৃদ্ধি পায়। একটী দুর্ভাকো পুরুষ জনর যত উত্তপ্ত হইয়া উঠে, শত অশ্রাব্য বাক্য প্রবণেও রমণীর জনর গুণটা উত্তপ্ত হয় না অথবা কঠব্যাপালনে বিরত হয় না।

সকলে বাক্য পার হইয়া স্বগ্রামের নিকটবর্তী হইলেন।

কৌদার বউ কহিল “আর কতদূর আছে জেঠাই-মা ! জামিত আর চলতে পারি না।”

মা। বাবা, শান্তরে বলে :—

নাগাট

পথে বসে কীদাই।

তাকি মিয়া হণে ?

জুতোর মা কহিল, “উঃ মাগো ! পাটা ফেটে-চোটে আক্সা হয়ে গেছে, উত্তিই জামি গলা নাটতে বাই নাট, জা পাড়ার আবাগী রে কি বুঝে গা ? ক্যাবোল বলে গলা নাইতে বাও নাই কেনে ? উঃ মাগো ! পরাণ গাল, এবার ত আগে বাড়ী বাই, আর কখন এমন কুলাক কবুনি।”

জুতোর মারের মতন আরও দুই এক জনে কাগা ধরিল এবং প্রতিজ্ঞা করিল, এমন কুলাক তাবা আর কখনও করিইব না।

হেমা কহিল, “রক্ষে দিদি, সেদিন ভোর
গিরেটা হতে-হতে হোল না কেন?”

স। (সহাস্তে) বর পাওয়া গেল না
যে!

বা-বো। আজ ত বর আছে, তবে
বিরেটা চরে থাক্।

কৌ। হাঁ হাঁ নেট ভাল কণা, বর
কই?

প। বিধু বর হবে।

হে। না না, বিধু কনে হোক, আর
আর—

বা-বো। (বাধা দিয়া) না, না, বিধু
কনে হক, আর ঠাকুর-পো, তুমি বর
হও।

অ। (সহাস্তে) ওরে জ্যা!
যে আবার বিরে উপস্থিত।

জ। বিরে যদি কর্তেই হয় তবে মেয়ে-
মানুষকে ত আর নয়। এ-জনমে বিরে?
আমার ত আর কখনও নয়ট, বরং যদি
দেখি কোন বেটাছেলে কোন মেয়েকে
বিরে করছে তাকলে তখনি বিরে আমি সে
বিরে ডাকিয়ে দেবো।

অ। কেনবে, মেয়েদের উপর
এত ঘৃণা কেন?

জ। তুমি আমার বিজ্ঞানা করত?
কেন, মনে মনেই ভেবে দেখ না কেন।

ক্রমে ক্রমে সকলে স্বগ্রামে প্রবেশ
করিলেন, আর কাহারও মুখে হাসি বা
কোন কথা নাট, সকলেই নিতক।

রক্ষা কহিলেন, “হেমার মোটটা দাও
বেহান, ঐ তোমার আমাইবাড়ী দেখা
যাচ্ছে, তুমি বিদেহ হও।”

ক্রমে ক্রমে একে একে ভুতোর মা,
রাঙা ঠাকুরণ, হাবুর মা, বায়ুন-বেড়ের বো
ও কৌবার বো প্রভৃতি বরানে প্রস্থান
করিল। পরে জয়রাম বিবাহ লইল;
তারপর রক্ষে ও পার্শ্বীও চলিয়া গেল।
অনন্ত আখাইয়া গিয়াছে, আপনার বাড়ী
ছাড়াইয়া বরাবর চলিয়াছে। হুলক্ষণও
নবমীর পাঠার মত কাপিতে কাপিতে
যেন হাড়কাঠে গলা দিতে যাইতেছে!
হেমা মুখ টিপিয়া টিপিয়া হানিতেছে।

হেমা ডাকিল, “অনন্ত! এখুই
দাঁড়াও।”

অনন্ত চমকিয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন;
দেখিলেন হেমা ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
আর একটি স্ত্রীলোক আসিতেছেন।

হেমা কহিল, “অনন্ত, দাঁড়াও।”
অ। কেন দাঁড়াব?

হে। তোমাকে একটা কথা বল্ব।

অনন্ত দাঁড়াইয়া বলিলেন, “আজ থাক,
কাল কথা বলিও।”

হেমা ক্রমশ অগ্রসর হইতেছেন আর
কথা কহিতেছেন। অবগুষ্ঠনবস্ত্রী হুলক্ষণও
কল্পিত পদে হেমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর
হইতেছেন।

অনন্ত হুলক্ষণকে ভাল চিনিতে
পারিতেছেন না বটে, কিন্তু সেই অপরিচিত
রমণীর দিকে বিন্মিত চোখে চাহিয়া আছেন
আর হেমাকিনীর সহিত কথা কহিতেছেন।

অনন্ত বলিলেন, “আজ থাক, কাল
বোলো।”

হে। আজই বল্ব, এখন তোমাকে
জনেতে হবে।

অ। আল আমার বড় পা বাণা
কহছে, ঠীঠে বড় কষ্ট হচ্ছে। আল
তোমার কথা শুনে পাব না।

হে। এখন বলছি।

অ। তবে আর এগিরে এস না, ঐখান
থেকেই বল, কি বলবে।

হে। আর একটু কাছে বাব।

অ। আর না, যা বলবে ঐখান থেকেই
বল।

কৌতুকময়ী হেমা মহাসো কহিল,
“বলি। তেলি হাত কোন্‌কে গেলি,”
বলিয়াই সুলক্ষণাকে এক ধাক্কা দিয়া আবার
বলিলেন, “তেলি যার ধন সে পেলি”
বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

সরলা সুলক্ষণা চতুৰা হেমাদ্বিনীর
মতলব বোধে নাই, অসাবধান হইয়া
দাঁড়াইয়া ছিল, হেমার ধাক্কা খাইয়া সঙ্গে
অনন্তের বকে গিয়া পতিত হইল; এবং
সে আঘাত সঘরল করিতে না পারিয়া
অনন্তও দুই চারি হাত পিছাইয়া গেল।
দুহস্তের জন্ত উভয়ে আশ্চর্য হইল,
ক্ষণেকের জন্ত উভয়ে বাক্যহার হইল।
উভয়েই অপ্রতিভ। স্পর্শেদ্বারা অনন্তের
নিকট সুলক্ষণাকে চিনাইয়া দিল।

হেমা তখন একেবারে অদৃষ্ট!

এখন সুলক্ষণা আর যার কোথা? বড়
শ্রীত এবং বাতায়নের পথশ্রমে উভয়েই কাতর
হইরাছে, অনন্ত আর দাঁড়াইতে পারিল
না, সুলক্ষণাকে বলিল, “বাড়ী এস!”

সুলক্ষণা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।
অনন্ত সুলক্ষণার হাত ধরিয়া কহিল,
“বাড়ী এস।”

তথাপি সুলক্ষণা নড়িল না। অনন্ত
মহাসো আবার কহিল, “যদি অহুগাহ
করিয়া আসিলেন তবে এ অধমের বাটীতে
পদার্পণ করিলে কৃতার্থ হইব।”

সুলক্ষণা অধিকতর লজ্জিত হইল।
মনে করিল, আপনি উপযাচিকা হইয়া
পদত্বে আসিয়া ভাগ করি নাই।

সুলক্ষণা ভয়ে দুঃখে অভিমানে রাগে
ও শ্রীতে কর্তব্যহার হইয়া দাঁড়াইয়া
রহিল।

অবশেষে অনন্ত সুলক্ষণার হাত ধরিয়া
টানিতে লাগিলেন।

সুলক্ষণা আড়ট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকতে
অনন্ত মহা বিপদগ্রস্ত হইল এবং হেমার
উপর তাহার বড় রাগও ধরিল।

অনন্ত আবার সুলক্ষণাকে লিজাসা
করিলেন, “বাড়ীতে আসবে না?”

কম্পিত কণ্ঠে সুলক্ষণা কহিল, “না।”

অ। তবে এলে কেন?

অ। তোমাকে একবার দেখতে এসেছি।

অ। দেখা ত হল, এইবার কিরে
যাও।

সুলক্ষণা নিরস্তর, অনন্ত এইবার বাক-
চাতুর্য্য ধরিল, মহা কৃত্রিম তরঙ্গপ্রদর্শন
করিয়া বৃহ চীৎকারে বলিল, “ঐগো!
কে বকুল গাছে বসে পা ধোলাচ্ছে।”
বলিয়াই দৌড় দিল এবং প্রায় বিশ হাত
দূরে ছুটিয়া গিয়া একটা ঘাসের নিকট
দাঁড়াইল।

সুলক্ষণাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া
গিয়া অনন্তের আলোচনায় ধরিল এবং
হাঁপাইতে লাগিল।

অনন্ত বহাভেত্রে কহিল, “এইবার পথে এস, দোলা আনুলে ত ঘি ওঠে না, এখন এলে কান্না ?

হু। তুমি যে তর দেখালে।

অ। (নাকিসুরে) আমি বুঝি তর দেখালাম ? তুমিই ত আমাকে বললে যে আমি তোমার কাছে যাব না, -ঐ বকুল গাছে বসে যে পা দোলাজে আমি ওর কাছে যাব।

হু। আমি বুঝি তাই বললাম ?

অ। (নাকিসুরে) তবে কি বললে ?

হু। যাও !

অ। আচ্ছা তাই। আমি সে দিন রাত্রে চলে এলে পর তোমার দাধা কি তোমার বকেছিলেন ?

হু। দাধা আবার কি বলবেন ? তুমি যেমন, আমার উপর তোমার ত দধা মারা কিছুই নেই। আমার হুং তুমি যেমন বোঝ না, দাধা তেমন নয়।

অনন্ত আর স্নানক্ষণকে কথা বলিতে দিল না—সেই গভীর রাত্রে অনশ্রুত পথে হা-হা করিয়া বিজ্ঞপের হাসি হাসিয়া উঠিল এবং স্নানক্ষণার গীতবস্ত্র হস করিয়া খুলিয়া দিয়া বলিল, “বেশ, বেশ, তুমি তবে ভাল করে দেখেছ যে আমি যেমন, তোমার দাধা তেমন নয়, আমার চেয়ে—”

স্নানক্ষণ অনন্তের মুখ চাপিয়া ধরিল, অনন্ত দত্তাধাতে স্নানক্ষণার হাত সরাইয়া দিয়া উচ্চবরে ডাকিল, “ওরে গদা, দোর খুলে দে।”

অনন্তের ক্রোধণ গদা আনিয়া দার খুলিয়া দিয়া স্নানক্ষণার দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে কহিল, “উনি কে গা মলাই ?”

অনন্ত ক্রটিম তরে পিছরিয়া কহিল, “ওকথা আর বলিস্ নে গদা। আমি জপদান্ পুরুষ কি না। যেখানে-সেইখানেই বিপদ ! বেনে-পুকুরের পাড় দিগে আম-ছিলাম, সেখানে একটা চাপ’ গাছ আছে আনিস্ ত ?”

গদা। এজে হাঁ, আনি বই কি, বল না তুমি, তেনাকে লগাই চেনে।

অ। (হাসিয়া) সেই চাপা গাছে বসে উনি পা দোলাছিলেন, আমি যেই সেখানে এগেছি, আমনি অজ্ঞাহ করে উনি আমার স্বন্ধে পদার্পণ করেন। আর রক্ষে নাট, আমি ত গেছি—তুইও আর এদিকে চাস্‌নে, আমার তোকেও অজ্ঞাহ করলে আমার আর মাঠের ধান বাড়ী আগলে না।

গদা মুচি অনন্তের অত কথা শুনে নাই, যেমন শুনিয়াছে “স্বন্ধে পদার্পণ—” এমন সে “ঐ” করিয়া আড়ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পঞ্চমাত্র দম্পতী অনতিবিলম্বে বাটার ভিতর প্রবেশ করিল।

পরদিন সাতঃকালে প্রাতে প্রচলিত হইল, গদাধানে গিয়া লম্পট অনন্ত এক যুবতীকে ধরিয়া আনিয়াছে। এ কথা যে কে প্রচার করিল, তাহা অজ্ঞ কেহ না বুঝুক, অনন্ত ও স্নানক্ষণার বিস্তৃত বৃত্তিতে বাকী রহিল না।

সমাপ্ত

ঐশ্বরী পরমেশ্বরী দেবী।

অতএব

অনেক সময়েই দেখিতে পাই, যে অতি সহজ সহজ কথাগুলি অতএবএর শিকলে বাঁধা পড়িয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া এবং সকল অর্থবায় নিরর্থক করিয়া তর্কের কারাগারে আবদ্ধ হয়। তুমি-আমি হয়ত একটা সামাজিক কথার বিচারের ক্ষণে অনেকগুলি ঘটনা গণিয়া বাছিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছি, —সমাজে বিধবার বিবাহ হয় না, অথবা কাহারও কাহারও হয়, কেহ বা দুঃখ পায়, কেহ বা পায় না; তখন হয়ত একজন পণ্ডিত আসিয়া ঐ ছোট-খাট প্রচারণি কথা এমন করিয়া অতএব দিয়া জুড়িতে বসিবে, যে তাঁহার মতবাদের আলাদা তোমাকে উদ্ভ্রান্ত হইতেই হইবে। ঘটনা বুঝিবার আগেই সিদ্ধান্ত আসে—গাছে না উঠিতেই আমরা এক কাদি পাড়িয়া ফেলি। বহু ভুল-সিদ্ধান্তের অব্যাহত পিতাকে আমি একটু সংযম শিখাইতে চাই।

বিজ্ঞান বড় বড় কথা শুনাইয়া, শ্রোতা-দিগকে তাক লাগাইয়া, যেভাবে অধ্যাত্ম-তত্ত্বের ব্যাখ্যা হয়, তাহা আমরা কিছু কিছু জানি,—ত্রিভুজের তিনটি বাহু আছে, বৈদ্যুতিক শক্তির একটা ধোলা আছে, দিনা-তারের সংবাদ দেওরা চলে প্রকৃতির সঙ্গে অতএব জুড়িয়া নিত্যই প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রলয়কালের পিতৃপুত্রদেরা নূতন যুগের বংশ রচিতহেঁদেন। অতএবএর একটা পরিচিত উৎপাতের দৃষ্টান্ত দিতেছি।

মাহুষ মরে, একথাটা হয়ত বাপের যুগে কেহ কেহ ভুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বয়স যুথিতির সে ভুল ডানিয়া গিয়াছিলে। দেদিন হইতে এ পর্যন্ত সকলেই কথাতাকে সত্য বলিয়া মানিয়া আসিতেছে। তবুও যখন বাউল ফকির, অতি ক্ষু-রতিত বীভৎস “বাপের দোলাতে উঠে” গাছেন, তখন বুঝিতে পারা যায়, যে একটা মতলব আছে,—ফকিরটি একটা অতএব জুড়িবার ফিকিরে আছেন; পরমা-কড়ি সঙ্গে যাইবে না, ‘অতএব আমাকে কিঞ্চিৎ দাও, অথবা ঈশ্বর-চিত্তা কর। ফকিরকে কিছু দিতে রাজি আছি, এবং ঈশ্বর-চিত্তার কেহ মন বসাইয়া দিলে হুখী হইব, কিন্তু আমি “মরিব” এই সত্যের সঙ্গে অতএব-জুড়িলে কিরূপে দান বা ঈশ্বর-চিত্তা আসে, সেইটিই বুঝিতে পারা যায় না। আমি হলধরকে এক-গাল মুড়ি দিতে রাজি আছি, কিন্তু আমার পাখী পড়ে কি না, সে অজুহাতে কি করিয়া দিব? কেহ যদি বলেন :—

সংগারটা ফাঁকি দে

যেন তোমার বাজী।

জীবাত্মটা পানী দে

উড়ে পালার পাখী!

জানিয়ে টাকা লিঙ্গকে

কেলে বাবে পিছে;

মাঝি ভব-সিন্ধুতে

বলবে ও লব মিছে।

অন্তঃ ভোজনেই

ভাল কর্ণে লাগে।

মেজাজখানার ভোজনেই

স্বাভাবিক লাগে।

ভোজনের শিকল সর্বত্রই সমান স্তর।

"ভোকে নাও দিন জুলাল" এবং "হেলে নাও
হুদিন বইত নয়" একই অর্থবোধক।
ধার্মিকেরা জোড়হীন এবং উপহাস-সহিষ্ণু;
তাঁহারা আমাকে ঘোঁড়াবোঁই বলিবেন, যে
তাঁহাদের আদর্শ এবং আমার উদয়-
বাসে প্রভেদ আছে। তাঁহাদের কথা এটো,—
"আমরা যখন মরিব এবং সকলই যখন অসার,"
তখন বাহা সার তাহাই ধরিতে হইবে।
মৃত পদ্মলোচন শরীফ তবুও মুক্তিভঞ্জন না।
বাহা মাংস নয়,—বালা সার,—বালা রুচ,—
বালা চিহ্নহীন, তাহাকে ধরিতে ত মন
ছুটিবেই,—এ জীবন এবং সংসার অসার
হইলেও ছুটিবে, সার হইলেও ছুটিবে। তবে
কাবার উপযুক্ত নামের অধিকারী পদ্মলোচন
যদি সে সৌন্দর্য্য দেখিতে না পারে, তবে
তোমার তর্কশাস্ত্রেব কোন্ যুক্তির বলে
মরণের অন্ধকার দিগা সেই প্রদীপ্ত সূর্য্যকে
বুঝাইবে?

আমরা এবং আমাদের এই সংসারটি যে
অসার যাত্রার ফাঁকি, কিংবা সর্বনিরস্তার
অস্থির-চিহ্ন বিখের সমগ্র পদার্থ অগুণে
অগুণে সত্য, সে তর্ক তুলিব না। যে ব্যক্তি
মরণের আতঙ্কে এবং সংসার-মত্তোন্মে
পরাজিত অথবা বিভ্রান্ত হইয়া, অন্ন রূপ নাই
বলিয়া বৃহৎ ব্রহ্মকে ধরিতে চাহ, পদ্মলোচন
তাঁহাকে বিলাস-লোলুপ স্বার্থপর বলেন,
ধার্মিক বলেন না। তোমার শরীর এমন-

ভাবগড়া,—তোমার মন এমন হাঁচি ঢালা,—
যে আকাশের নৌমাত্রা,—পাহাড়ের উচ্চতা,
—গগনের বিস্তার, তোমাকে মুগ্ধ হইতেই
হইবে। তোমার ঘরের কোণের কোন
পুতুল বা চিত্রপট ক্ষুদ্র বলিয়াই সে উহার
অমর, তাহা নয়; তোমার হোগা সারাইবার
ডাকাতের প্রয়োজন নয়,—মুগ্ধ ভাঙার
কুপেরেব ধন আনাইবার জন্ত নয়,—ভুখু
লোলুপ আত্মাকে খানিকটা চিরস্থায়ী মধু
খাওয়াইবার জন্ত নয়, কেবল যদি অমর
দেখিয়া সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইতে না পার,—
সমগ্র শরীর ও মনের বিকাশের জুড়িতে
যদি তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে না পার,
তবে ভণে পদ্মলোচন—তুমি সারের নামে
মাংস চাটিতেছ।

তপস্বী বলিতেছেন,—যাহারা কাছে ছিল
তাহারা চলিয়া গিয়াছে, তুমি তবে কাছে
কাছে থাক। এবার ঠিক বুঝিয়াছি।
উড়া-খই গোবিন্দকে নিবেদন করিলে, তিনি
লইবেন কি? এবং খইয়ের ডালায়
পরিবর্তে আমার ফাঁকিতে পড়িয়া চিনির
মুড়কি দিবেন কি? চোখু গেল দেখিতে
পাই না,—গাঁত গেল খাইতে পারি না,
এবার হয় চোখের উপর রাখ করিয়া বাকি
মেজের মাটিটুকুকেই আদর করিব, আর
না হয় চোমকে আমার যথাসম্ভব ফিরাইয়া
দিতে বলিব। চোম যদি আমার হেঁড়া
যথা এবং ভাঙ্গা সর্বত্র ফিরাইয়া না দেয়,
তবে আশ্রয়িত এবং আশ্রয়িত হইয়া সাধক
সাজিব। পদ্মলোচন! নীলে ভাবের সিদ্ধ-
সিদ্ধি গিয়াছে,—গাছের হরিৎ গিয়াছে,—
আলোক গিয়াছে,—হ্যালোক গিয়াছে;

কিন্তু তাহা ছাফিয়া ছাফিয়া যে মধু
 তুলিষ্ঠাছিলে, তাহা ত বার নাই। তুমি
 হাসিতে পার না,—গাহিতে পার না,—তুমি
 হর্জন,—এবং অপটু; তোমাকে এখন
 উৎসবের মন্বিরে,—পরিচাসের মজলিসে
 যদি কেহ না ডাকে, তবে তুমি,—তোমার
 রাগ এবং অভিমানকে তক্ত-বৈরাগ্য নাম
 দিয়া ঘরের কোণে তপস্বী সান্নিধ্য বসিলে
 কেন? যাহা তোমাকে চায় না, তুমি কি
 আশপণে তাহাবিগের সেবা করিতে পার না?
 তুমি মনে করিয়া দেখ, তোমার জন্ম এই
 সেবায়,—আত্মকীড়ায় এবং পরনিরপেক্ষতার
 নহে; তুমি বাড়িয়াছ এই সেবায়,—তুমি
 প্রতিপদে পবের সাহায্য না লইয়া,
 পরকে সাহায্য না করিয়া বাড়িতে
 পার নাই; এই সেবায়,—এই অবিদ্যাসংগত
 প্রাকৃতিক কর্তব্যপালনে জীবন ব্রত কর।
 বাড়িতে বৃত্তবর্ণ দম আছে, তত্ত্ববর্ণ পর্যন্ত সে
 যেমন টকটক করিয়া অগ্রসর হইতে বাধ্য,
 তেমনি করিয়া তোমার ভাঙ্গা লাঠিখানা
 ঠক্ঠক্ করিয়া অগ্রসর হও। তোমার
 অস্ত্রএব নাই,—উদ্বেগ নাই। মরিতে
 হইবেই অস্ত্রএব আগেই মর,—উপবাস
 এবং তপস্বী করিয়া শরীর জীর্ণ করিয়া
 ফেল,—ফাঁসির হুকুমের আগেই দড়ি-
 কলসী সংগ্রহ কর—এ উপদেশ মানিও না।
 ভবপারে বাইবার জন্ত সাধনা করিতে
 হইবে না; দিক্‌টি বিনা ডাকেই তর্জন
 করিয়া আসিবে, এবং পাড়ি-মাঝি না
 থাকিলেও তোমাকে পার হইতেই হইবে;

তবে তুমি আগে গিয়াই অসময়ে নাকানি
 চুবানি খাইবে কেন? পদ্মলোচনের প্রতিজ্ঞা,
 সে মরিতে না,—আমি মরিব না।

বড় গোল করিয়াছি; আমি যে মরিব
 না, সে কথাটার বিজ্ঞাপন না দিলে ভাল
 হইত। ভীষ্ম উহার না মরার প্রতিজ্ঞাটা
 প্রচার না করিলে দশরথের মোটে করিয়া
 উহারকে মারিয়া ফেলিতে পারিত না।
 কথাটা মহাভারতে নাই,—কিন্তু আমি
 জানি। ভীষ্ম বলিলেন যে, তিনি অগ্রহারণ
 পৌরষের দাক্ষিণ্যে গায়ে কখন জড়াইয়া
 কাপিতে কাপিতে মরিবেন না; সূর্য্য একটু
 মাথা তুলিলে অর্থাৎ উত্তরাধার হইলে ঘীরে
 মৃত্যু মরিবেন। এই জন্তই শোকের বলে,
 ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে উপায়ে
 শিশু-বধ করা হয়, শ্রীকৃষ্ণ এবং যুধিষ্ঠির
 প্রকৃতির তাহা জানা ছিল; উহার প্রাণের
 উপর প্রাণ বিজ্ঞাসা করিতে করিতে ভীষ্মকে
 মারিয়া ফেলিলেন। উহাতে ব্যাসদেব,
 বৈশম্পায়ন এবং দ্রৌপদী কিছু লাভ হইল;
 কারণ মহাভারত ফুলিয়া ডবল হইয়া উঠিল
 এবং গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি হইল; কিন্তু ভীষ্ম
 মরিগেল। পদ্মলোচনের চক্ষের দোষ থাকে
 থাকুক, তাহার বুদ্ধির দোষ নাই। এ
 প্রবন্ধের জন্ত যদি কেহ কৈকিরব কাটিতে
 বলেন, প্রাণের উপর প্রাণ বিজ্ঞাসা করিয়া
 আনার শাস্তিভঙ্গ করিয়া শাস্তিগর্ভ বাড়াইতে
 বলেন, অথবা সম্পাদকদের সুবিধার জন্ত
 পত্রিকাভাগি ফাঁপাইয়া তুলিতে বলেন, তবে
 আমি সে কথায় কর্পণাত করিব না।

শ্রীপদ্মলোচন শর্মা

লুথার বার্কাক ও আধুনিক বৃক্ষায়ুর্বেদ

বরাহমিহিরের “বৃহৎ সংহিতা” সুপ্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ প্রাচীন হিন্দু বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বকোষরূপ। পৃথিবী চতুর্ধ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবাসীরা অগতঃ দেখে সকল জ্ঞান ও তথ্য জানিত, তাহার অনেক কথাই বরাহমিহির ইচ্ছাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঋতু-পরিবর্তন হইতে উদ্ভিদের আকৃতি-পরিবর্তন পর্যন্ত কোন বিষয়ই বাদ দিয়া নাই।

বর্তমান বৃক্ষকে লতার রূপান্তরিত করিবার প্রণালী বরাহমিহিরের গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারি। অল্পজানমূল্য ফলের পরিবর্তে মিষ্ট ফল-সৃষ্টির উপায়ও ইনি নির্দেশ করিয়াছেন। ফলের আঁল, আঁটি, খোলা ইত্যাদি বদলাইবার রীতিও বৃহৎ-সংহিতায় আলোচিত হইয়াছে। এই সকল পাঠ করিবার সময় Harwood প্রণীত New Creation in Plant-world নামক পুস্তক চোখে পড়ে। তাহাতে ক্যালি-ফোর্নিয়ার লুথার বার্কাক-প্রবর্তিত নানাবিধ অদ্ভুত কৃত্তিকোশল বিবৃত হইয়াছে। এই অল্প আকারে কোন ইংরাজি রচনা বরাহমিহিরকে “The Luther Burbank of Hindu India” রূপে বর্ণনা করিয়াছি। বরাহ-মিহিরের সঙ্কেতগুলি দেখিলে মনে হইবে তিনি কতকগুলি নিত্য অবিখ্যাসযোগ্য একপ্রকার-জলজ প্রণালী নির্দেশ করিতেছেন। বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকেরা লুথার বার্কাককে

বাস্তবিকই “Plant-wizard” বা উদ্ভিদগণের বাহুর বলিয়াই জানেন।

প্রদর্শনের Horticulture গৃহে লুথার বার্কাকের উদ্ভাবিত কতকগুলি নূতন জাতীয় উদ্ভিদ প্রদর্শিত হইয়াছে। যে সকল উদ্ভিদ অগতে আপনা-আপনি জন্মিতে পারে না সেইরূপ বহু উদ্ভিদ ইনি তৈয়ারি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

নূতন নূতন উদ্ভিদ সৃষ্টি করা, নূতন ধরণের ফল-ফুল সৃষ্টি করা, সঙ্কটক উদ্ভিদকে নিষ্কটক উদ্ভিদে রূপান্তরিত করা, মনের পরিবর্তন করা, বীজের আকার বাড়ান বা কমান—ইত্যাদি কার্য প্রথমতঃ অসম্ভব বোধ হয়। বাস্তবিক পক্ষে এই সকল কার্যের অল্প অতি উচ্চ অঙ্গের বৈজ্ঞানিক পাণ্ডিত্য বা দার্শনিকতার আবশ্যক হয় না। ইংলণ্ড ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ বার্কাককে বিজ্ঞান-মহলের অস্ত্রতম পুরুষ বিবেচনা করিতে প্রস্তুত নন। তাঁহারাই ইহার পর্থাৎক্ষণ-শক্তি, সহিষ্ণুতা এবং অধ্যবসায়ের প্রশংসা করেন মাত্র। যে কোন কৃষক ও উদ্ভান-পালকই, বার্কাকের জায় কষ্টসহিষ্ণু ও অধ্যবসায়শীল হইলে, এইরূপ বিস্ময়জনক ফল দেখাতে পারে। “কলম” করা, বীজনির্বাচন করা ইত্যাদি কার্যে অল্প কোনরূপ অসাধারণ মনোবীর্য প্রয়োজন হয় না।

লুথার বার্কাক গণ্যে একাও একাও

আলু প্রস্তুত করিয়া মার্কিন দেশে প্রসিদ্ধ হন। সে আক ১২/১৯ বৎসরের কথা। বার্পাক্সের নামে সেই আলু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র প্রচলিত। উদ্ভিদগুরুকে কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি চুষিতে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই বার্পাক্স সর্গপ্রথমে মনোনিবেশ করেন। এটাদিকে কার্য্য করিতে কবিতাই নানা বিষয়ে উৎসাহ দুষ্ট পুলিচা দায়। আধুনিক বুদ্ধাযুক্তদের বাক্যকে দ্বিতীয় "চরক"রূপে বিবেচনা করা যাঠিতে পারে।

এসদিন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপকের নিকট সংবাদ পাইলাম—বার্পাক্সের গৃহ স্যানফ্রান্সিস্কোয় অতি সন্নিকটে। প্রায় ৫০ মাইল দূরে "স্যান্টো বোভা" বা "গোলাপ-নগর"। দেরখানে বার্পাক্সের বাগান ও বাসস্থান।

গোলাপনগরে যাঠিয়া বার্পাক্সের সহিত দেখা করিবার ব্যবস্থা করা গেল। একজন হিন্দু-টেইবিলি মার্কিন-রমনীর পত্রে জানিলাম—আমেরিকা স্যান্টোবোভা নগরে Rose Carnival বা গোলাপ-উৎসব সুরু হইয়াছে। বার্পাক্স তাহাতেই বিশেষরূপে ব্যস্ত আছেন। অধিকন্তু স্যানফ্রান্সিস্কোর প্রদর্শনী-উপলক্ষে তাঁহাকে সর্ব্বদা লোকজনের সঙ্গে নানা কাজকর্মে লিপ্ত থাকিতে হয়। কাজেই দেখা করিবার অবসর না হইতেও পারে। কিন্তু একজন কণ্ঠচরীর সাহায্যে বাগান দেখিবার ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব।

বাগান দেখিবার জন্য রেলের যাত্রা করিলাম। সঙ্গে চলিলেন স্যানফ্রান্সিস্কোর বেদান্ত-স্তম্ভের বানোজি। একজন ইংলি-রমনীর গৃহে মধ্যাহ্নভোজন করা গেল। টনি

মার্কিনদেশীয় সম্ভ্রান্তবংশে জাত বলিয়া গোষণ করিয়া থাকেন। কপাবর্ত্তার জানিবার ইহার পূর্ব্বপুরুষেরা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনেব নেতৃত্বে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। একজন ইনি "বিপ্লব-ললনা-সমিতি"র (Daughter of the American Revolution) সভ্য। বর্ত্তমান কালেও ইহার আদ্য-ব্রহ্মগণের মধ্যে কেহ কেহ উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রকর্মচারী হইয়াছেন। ইহার গুরুত্ব্যত ওয়াশে প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। একটি আঙুটি দেপার্টা রমনী বলিলেন—“আমার পূর্ব্বপুরুষগণ রাজবংশ-সমূহ ছিলেন। যখন তাঁহারা বিলাতে বাস করিতেন—অর্থাৎ আমেরিকার উপনিবেশ স্থাপন করিতে আসিবার পূর্বে—তাঁহাদেরই একজন করাসী-সম্রাটের নিকট হইতে এইটি উপহার পান।”

এই মার্কিন-রমনী কিছুকাল হইতে নানাবিধ অধ্যাত্তবের আলোচনার সময় কাটাঠিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। বিবেকানন্দের বেনাস্থাখা, বাহান্ন, থিরলফি, গীতাঞ্জলি ইত্যাদি সকল বিষয়েই ইহার “interest” (জনিয়ার ও জানিবার ইচ্ছা) আছে। ইহার সঙ্গে আর একজন রমনী ছিলেন। ইনি পেনিসিয়ারে জাত। ক্যালিফোর্নিয়া দেশে পেনিসি জাতির বসতিই সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হয়। স্যানফ্রান্সিস্কোর স্যান্টো বোভা ইত্যাদি নগরের নাম পেনিসি জাতির লোকেরই উদ্ভাবিত। এই রমনীর পূর্ব্বপুরুষগণ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এই অঞ্চলে আসিবার প্রথম বাণ করেন। সেই সময়ে ক্যালিফোর্নিয়ার শোণার খনি প্রথম আবিষ্কৃত

হয়। তারার পূর্বে এট প্রদেশে বৈশি
খেতাজ নরনারোব বসতি ছিল না। এট বন্য
গোলাপ-নগরের গিরজাকাল মোমাইটি
সম্পাদক—আনি বেসামের ভক্ত।

সমগ্র বার্ষিকের বাগান
অন্ত আদ্যদের সঙ্গে চলিলেন।
দেখিয়া গিয়ে প্রীত হইলাম না।



সুখার বার্ষিক ও কটেকান ক্যাক্টাস

ক্ষুদ্র অহুতান—ইটার মধ্যে ছোট-বড় নানা
ফেত। এক-একটার ভিতর এক এক
প্রকার পক্ষী চলিতেছে। বার্ষিক গৃহে
ছিগেন না। তাঁহার সহকারী বাগানের
সকল বিভাগ বৃক্ষাটরা দিলেন। এখণ্ড
করিয়া বার্ষিকের কৃষিক্ষেত্র ও বৃক্ষা-
কর্মেতত্তা দত্তা জানিতাম, বখাঝানে উপস্থিত

হইয়া তাহা অপেক্ষা বেশী-কিছু
জানিয়াত করিলাম না।

একটা চের বৃক্ষ পাঁচশত চের
ফল উৎপন্ন করা হইতেছে। একটা
নামগাতি বৃক্ষে একশত পাঁচশ জাঁতির
নামগাতি উৎপন্ন করা হইতেছে।
প্রণালী অতি সরল। কতগুলি
নূন বৃক্ষ হইতে শাখা আনিয়া মূল
বৃক্ষের সঙ্গে কলম করা হয়। কতক-
গুলি সপুষ্পক চারা গাছ দেখিলাম।
প্রদর্শক বলিলেন—“পূর্বে এই সকল
উদ্ভিদের ফুলগুলি তাঁটার একধারে
অস্মিত—তাহাতে পুষ্পের শোভা দেখা
যাইত না। বার্ষিকের ৮০টার ফুলগুলি
তাঁটার দুইধারে অস্মিতেছে। পূর্বে
যাত্রী একবর্ণবিগিষ্ট ফুল অস্মিত—
বার্ষিকের উদ্ভাবিত চারার একসঙ্গে
নানা রঙের ফুল ফুটিতেছে।”

একস্থানে কতকগুলি ক্যাক্টাস
উদ্ভিদের তৃণ দেখিলাম। প্রদর্শক
বলিলেন—“ঐ দেখুন, বার্ষিকের
অনুত কীর্তি। কাঁটাহীন ক্যাক্টাস
(Cactus) কেহ পূর্বে দেখিয়াছেন
কি? কিন্তু দশ-বার-বৎসর-ব্যাপী
অধ্যবসায়ের ফলে বার্ষিক নিরুপক

ক্যাৰ্ণাটাস শ্ৰেণ্ত কৰিতে পারিষাছেন। পূৰ্বে ক্যাৰ্ণাটাস বাৰা ভগতের কোন কাৰ্য সাধিত হইত না। এক্ষণে এইগুলি খাণ্ড-জবোৰ অস্ত ব্যবহৃত হয়। বার্কাক্কেৰ বাগান হইতে এই নিকটক ক্যাৰ্ণাটাসের চাৰা দুনিয়ার সৰ্ব্বত্র রপ্তানি হইতেছে।

বার্কাক্কেৰ বিবাস ছিল ক্যাৰ্ণাটাস উদ্ভিদের গায়ে কণ্টকের উৎপত্তি নিত্য অবশ্যজ্ঞাবী নয়। কাঁটাগুলি এই উদ্ভিদের কংসাদানকারী জীবজন্ত হইতে আত্মরক্ষার উপায় মাত্র। এই বিবাসের বশবর্তী হইয়া বার্কাক্কেৰ ক্যাৰ্ণাটাস সমাজে যৌন নিৰ্কাচন হুত করেন। বহলক্ষ নিৰ্কাচনের পর নিকটক জাতীয় ক্যাৰ্ণাটাসের আবিৰ্ভাব হইয়াছে।

বার্কাক্কেৰ বাসগৃহ এই বাগানের সমুখেই অবস্থিত। সংখ্যক পাইলাম ব্যাসসায়ের অস্ত বার্কাক্কেৰ অস্ত্রাত্ত বহু ক্ষেত্রে আছে। এখানে অহুসকান ও পরাক্ষা চলে মাত্র। পৰ্য্যটকগণকে এই বাগান দেখান হয়; কিন্তু ব্যবসায়-ক্ষেত্রেগুলি দেখান হয় না। বার্কাক্কেৰ কাৰ্য্যশ্ৰণালী অহুসারে ব্যবসায় চালাইবার অস্ত এক বিরাট কোম্পানী শ্ৰবৰ্ণিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর নাম The Luther Burbank Society, কোম্পানীর বড় অফিস নিউ ইয়ৰ্ক নগরে অবস্থিত। বার্কাক্কেৰ বৃক্ষাযুৰ্দ্ধনতত্ত্ব সম্বন্ধে এই কোম্পানী কতকগুলি গ্রন্থও প্রকাশিত কৰিয়াছেন। এষ সচিহ্ন।

বার্কাক্কেৰ বাগান দেখা হইল। ইয়াক্কে-রমণী বলিলেন, "চলুন, আপনাদিগকে অমায় আবাদ দেখাইয়া আনি। সেখানে এ-দেশের অনেক কৃষিক্ষেত্রে ও ফলের বাগান

ইত্যাদি দেখিতে পাইবেন।" ইহার মোটরকাৰে বদিয়া ১০১২ মাইল বাণ্ডগা গেল। নিৰ্জন পল্লীপথ ও কৃষিকৃষিৰ পরিচয় পাইতে পাইতে অগ্রসর হইলাম। সান্তার একটা নগর-সদৃশ জনপদ চোখে পড়িল। নাম সেনাটিল। রমণীৰ বলিলেন — "এই অঞ্চল হইতে ইংরেজোপের নানাদেশে নানাপাতি রপ্তানি হয়। এ বৎসর যুদ্ধের অস্ত রপ্তানি হুগিত রহিয়াছে। ফলের বাগান ও গালাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।"

খানিককণ সমতল ভূমিতে চলিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর পার্শ্বতা ভূমিতে উঠিলাম। কোন কোন আবাদে সুৰণী গোবা হইতেছে। সৰ্ব্বত্র ফলের বাগানই দেখিতে পাইতেছি। নিত্য পাত্ৰাৰ্গেয়ে সুকীৰ্ণ পথের ভিতর দিয়া মোটর চালাইয়া অবশেষে যথাহানে উপস্থিত হইলাম। এই বাগানে কেবল নানাপাতি গাছ। শুনিলাম এই সকল বাগানে জনসেচন কৰিতে হয় না। জমি চৰিয়া দিতে হয় মাত্র। নানাপাতি গাছগুলিকে ছোট ছোট পেয়াৰা গাছের মত দেখায়। পাহাড়ের সৰ্ব্বোচ্চ অংশে এই বাগান অবস্থিত। এখান হইতে দুই স্যাটা রেজা নগর দেখিতে পাইতেছি। ইহার চারিদিকে নানাবিধ ফলের বাগান পাহাড়ের গায়ে সারি দিয়া নামিয়াছে। এই স্তম্ভবিশিষ্ট বাগানগুলি হিমালয় প্রদেশের চা-বাগানের অধুৰূপ। এখানকার সমগ্র অঞ্চলই সবুজতৃণভূমিত। এক্ষণে পুষ্পের শোভা কোথাও দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু সুখী উদ্ভানগুলি দেখে দক্ষিণ ক্রান্তের হুদমা স্তম্ভে আসিল।

ক্রীতিনকুমার সরকার।

নবাব

একবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রথম-অভিনয়-রজনী

কার্দ্দেশ্যের নৃতন পিরেটের লোক আজ ঘরে না। মরাগের নৃতন নাটক 'বিত্রোহ'র আজ প্রথম-অভিনয়-রজনী। নানা সাজে সজ্জিত দর্শক, দলে দলে আসিয়া অধিতে লাগিল। পিরেটারের সম্মুখে অনেকখানি পথ আলোর ঘটায় দিনের মতই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। গাড়ী ও লোকের ভিড়ে লে এক সমারোহ-বাপার! সকলেরই মুখে ব্যস্ত আগ্রহের একটা ছাপ সম্পষ্ট হুটিয়া উঠিয়াছে।

টিকিট-বরের পাশেই কার্দ্দেশ্যক দাঁড়াইয়া ছিল। আশার আনন্দে হই চোখ তাহার দীপ্ত, উজ্জ্বল—সম্মিত মুখ। বিস্তর টাকা ধার করিয়া এই শেষবার সে তাহার ভাগ্য পরীক্ষার উত্তর হইয়াছে। গৃহটা নবাব এক লক্ষ টাকা দ্বায়ে নিৰ্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছে—সাজসজ্জা ও সরঞ্জামে কার্দ্দেশ্যকও প্রায় সেড় লক্ষ ব্যয় করিয়াছে। তিনবার দেনার দ্বায়ে তাহার নায়ে পেউলিয়ার ছাপ পড়িয়াছিল—চতুর্থবার সে জীবন পণ করিয়া আবার লাগিয়াছে। মনটা সন্দেহে বেশই দোল খাইতেছিল। সময়টাও সুবিধার নহে। পারির পিরেটারবাজ লোকেরা এখন পারি ছাড়িয়া বেড়াইতে সাহির হয়। তাহার উপর নাট্যকারটি একেবারে নৃতন, সাধারণের সম্পূর্ণ অপরিচিত। 'বিত্রোহ'ই আবার তাহার এই প্রথম নাটক। এমন ক্ষেত্রে

আশা করিতে মন সরে না। বাহা হৌক, তবুও সে কপাল-চুকিয়া আঘাতনে ধূম নাগাইয়া দিগাছিল। দলে দলে লোক আসিতেছে শুনিয়া কার্দ্দেশ্যক আসিয়া সাহিরে দাঁড়াইল—ভিড় দেখিয়া তাহার সকল সন্দেহ দূর হইল! এবার তবে জয়, জয়, নিশ্চয় জয়।

শঙ্কিত চিত্তে মারাগ কিন্তু টেজের এক নিভৃত কোণে দাঁড়াইয়া টেজ-মানোজারের কাৰ্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। বুক তাহার এক নৈরাশ্রের অজানা ভয়ে হ্রস্ব হ্রস্ব কমিয়া কঁপিতেছিল। অসম্ভব ভিড়ের কথা শুনিয়াও বাহিরে আসিতে তাহার সাহস হইল না। এতগুলি লোকের দৃষ্টি সম্মুখে বাহির হইতে প্রাণ তাহার একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তবু সকলের কথায় একবার সে কোনমতে বনিকার অন্তরাল হইতে উকি দিয়া রঙ্গালয়ের দিকে চাহিয়া দেখিল—বিরটি গৃহে লোক একেবারে গিল্ গিল্ করিতেছে। তিল-খারগের স্থান নাই! এমন লোকারণা পূর্বে সে আর কোথাও দেখিয়াছে বলিয়াও তাহার মনে পড়ে না।

আর ঠিক পনেরো মিনিট বাকী আছে। টেজ-মানোজারের কাজ শেষ হইয়াছে। অভিনেতা অভিনেত্রীর দল সাজিয়া প্রস্তুত। শুধু পট উঠিলেই হয়! দারুণ উবেগে মারাগের প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে এখন কি করিবে, কোথায় বাইবে? উপরে—বন্ধে? চারিদিক হইতে অসংখ্য চোখের নানাক্রপ

হিল। কোথাও এতটুকু সাফা-সব্ব নাই।
একটা দূর পক্ষিপেদ তালীর নব জন্ম
যায়—বিরাট রত্নপুর এমনই শুভ, কোলাহল-
হীন। মহলা: নীচে টেলের এক বর্ষক যুগ
কঠে করিল, “এ যে গুহ।” আর একজন
কৃত ভাবকে বাধা দিয়া কহিল, “চুপ,
আমি চমৎকার ত।” মাঝপথে প্রাণের
মহা বিরা আনন্দের একটা বিদ্যামণিবা
ছুটিল। মেল। বর্ষকবের এট নিশ্চয়
সমস্তইয়া বুটী—এই অথবা কোম্বল—সে
যেন মনীর মাটাকারেব ক্রিষ্টকে ধ্যান-
মৌলভাবে বরণ করিয়া গঠিতই সন্তেত।

কবির হৃদয় রত্নকে তখন মনীর পাত
ভবনের মতই মাটিয়া ছুটিল। বেলিগা
বেড়াইতেছিল। প্রবন্ধ অভিনেতা-অভিনেত্রীর
কুপল কঠে সে হৃদয় বিভিন্ন ভাবে
আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। পারির মৌলীন
মহাভের মণ্ডামৌলীন ব্যক্তিগুলি হইতে
পালারিব নিত্যক ভাবতীর সাধারণ বর্ষকের
চিত্তটুকু সে ভবনের মলীল দূর ভবনে
মৌলার মতই যোগ বাইতেছিল।

ভবনের মধ্যে বলিয়া বেসামলিত,
ব্যারপেল ও ব্যারপেলের প্রাণী লি মার্কার
বীণ কোম্বলনে মটকের প্রতি দ্বন্দ্ব অঙ্গনবণ
করিতেছিল,—ভাষায় পানের বস্ত্র পারির
বিখ্যাত বিলাসিনী জ্ঞান্ দ্রুত লাগলজ্ঞার
দিকে সম্পূর্ণ উৎসাহী ব্যক্তিরা ট্রেকের
পানে চাৰিগা ছিল—ভাষায় পানে এনি
কোটা। মণ্ডান ভাষায় ছুটী মাটিভাব
সঙ্গে আর-এক বস্ত্র বলিয়া গল্প বামাইগা
অভিনেতা বেকিতেছিল। পেটে মাটিকা
ভাষায় সুবেব বণল দাপতলাকে চাকিয়া

আসিলেও পানে সেতলা লোক-জনে এত-
টুকু আত্মপ্রকাশ করিয়া ফলে, এই
ভরে পট উদ্ভিবার পূর্ণকণ অবধি সেতলার
পানে সে কিরিয়া কিরিয়া চাৰিতেছিল।
কিন্তু অভিনেত্রী এমনই উৎসাহী,
মহলায় এমনই মৃত্যু ছিল যে এমন সে
কথা সে সম্পূর্ণ তুলিয়া দিয়াছিল। মকলেই
মাটাকারেব মচলা-কোম্বলে ও অভিনেতা-
অভিনেত্রীর অভিনেতা-বকতার একবারে কেন
ভবন দূর হইয়া পড়িয়াছিল। মাঠায়
শিত সুবে কলিত চিত্তে বর্ষকের সুবেব
উপর দিয়া কণে অবন আপনার ব্যাটুল
বুটী মূল্যইয়া গঠিতেছিল।

মহলা বর্ষক-বলে চাকলোব দূর ভবন বেবা
ছিল। বিপুল জনসম্মিলনের সাড়া পাইয়া
উপরের দিকে কিরিয়া চাৰিল। কোম্বল
যে বহুশূণ্য বস্ত্রী এককণ বালি পড়িয়াছিল,
মকলের বুটী সেই দিকে কিরিয়া। অন্য
মকলের সুবে গোবে একটা স্তম্ভের
চেউ ছুটিল। মণ্ডান কিরিয়া চাৰিল,
মুত বস্ত্র একজন লোক আনিয়া বলিয়াছে।
মাঠায় সুবে চিমিল, সে মহাব।

বন বিনে মহাবের বরষ যেন ছুটি
বলয় ব্যক্তিরা দিয়াছে। চুলে অসম্ভব
পাক ববিয়াছে। অত বস্ত্র ছুটিয়াব পর
মহাবকে এক কণবিন কেব পথে বারিব হইতে
বেবে নাই। দূর, আন-বত মহাব
আপনাকে নিয়ালব পূব-জর্বে বস্ত্র মাটিয়া-
ছিল। মিলেব আলো, দূর আকাশ,
সুবরিত পথ,—এ মহাবের মাঝ মহাব দূর ভিত্ত
ভাপ করিয়াছিল। বাবিবে ভাষায়ই মাদ
মইয়া পারির মোক কিরণ তর্জন করিতেছে,

তাহার আভাসমাত্রও নবাবের কাছে পৌঁছান না। ধ্বংসের একটা ভীষণ ছায়া নবাবের দীপ্ত প্রাণটাকে বাহ্য মতই গ্রাস করিতেছিল। মাদাম জঁহুনে এ সব বিষয়ে জ্ঞেয়মাত্র না করিয়া নিম্নো বীদী-বান্দা লইয়া হাওয়া খাটিতে দেশান্তরে গিয়াছিল—ব্যাকাম্প তহবিলের তুর্দশা দেখিয়া ঐতিহ্যবোধে দারুণ হুঁতুগোর আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিতেছিল। নবাবের বৃদ্ধা মাতা শুধু আসন্ন ধ্বংসের মুখে পুত্রকে আঙুলিয়া বসিয়াছিল। নবাব একেবারে বাক্‌হীন স্কন্ধ বেষণায় এক মহা সর্জনশয়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল। বাহিরের সহিত তাহার সব সম্পর্ক আজ চুকিয়া গিয়াছে।

এমন সময় মার্শেল হইতে গেরির টেলিগ্রাম আসিল, নবাবের দশ লক্ষ টাকা কোনমতে আদায় করিয়া সে ঘরে ফিরিতেছে। নবাবের মনে নৈরাশ্রের কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছিল, সুহৃৎ কে যেন তাহা চেলিয়া সরাইয়া দিল। আশায় স্বর্ণালোক আঁধার বৃত্ত ক্রিয়ণে জাগিয়া উঠিল। দশ লক্ষ টাকা! আঃ—সেনাপত্র তবে বোধ হইবে; দেউলিয়া নামের কলঙ্ক হইতেও মুক্তিলাভ ঘটবে। আবার নৃতন করিয়া ভীষনটাকে গড়িবারও প্রয়োগ মিলিবে। নবাব উত্তীর্ণ নিখাস ফেলিয়া টেবিলের উপর হইতে একটা খবরের কাগজ টানিয়া লইল। এ দশ দিন নবাব খবরের কাগজও খুলিয়া দেখে নাই। কাগজ খুলিতেই কার্দ্‌লোকের পিরেটারের বিজ্ঞাপন চোখে পড়িল। নারায়ণের নৃতন নাটক লইয়া পিরেটার খুলিতেছে! ভাষী সবাবোধে ব্যাপার। নবাবেরই টাকার

তৈয়ারি পিরেটার, তাহারই বৃক্কের সঙ্গে মাদানো পিরেটার। নবাব ভাবিল, একটু ঘুরিয়া আসা যাক! পারিল লোকগণও দেখুক, তাহাদের বর্ষের নিষ্ঠুরতা নবাবকে এতটুকু বিচলিত করিতে পারে নাই।

মা আসিয়া পুত্রের মুখের ভাব দেখিয়া নিবেদন করিলেন—পুত্র হাসিয়া মার সে উবেগ কাটাইয়া দিল। মা শিহরিয়া নিশ্বৃত হইল।

বন্ধে চুকিয়াই নবাব উপস্থিত দর্শক-মণ্ডলীতে যে চাকল্যের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা তাহার চোখে পড়িতে বিলম্ব ঘটিল না। কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্যও করিল না। দর্শক-মণ্ডলী সে ভাব বুঝিল। তখন তাহাদের মধ্যে বাহারা নিলক্ষ তাহার ঠাই-চাষিটা কঠিন মন্তব্য প্রকাশ করিতে ছাড়িল না।

একজন কহিল, “নবাব, না?”

“তাই ত নবাবই যে।”

“ইহু, কি বেহালা যে!”

“মুখ দেখাতে লজ্জা হল না! ডাকাত বেটা—”

নবাবের একবার মনে হইল, উপর হইতে এই বড়ো খাঁপাটরা পড়িয়া এই সব অলম্ব্য বজ্র আনোয়ারগণের টুঁটি লে চাপিয়া ধরে। কিন্তু না, উহাদের মন্তব্য কানে শুনিয়াও না শুনার ভাব দেখাইয়া উহাদের উদ্বেগ সম্পূর্ণ নিফল করিয়া দিতে হইবে। ভিতরে ভিতরে নিফলতার ভূঁয়ে ইহারা শুয়ুরিয়া মরুক।

কিন্তু হায় যে—এমন করিয়া আপনাকে অবিচল রাখাও যে অনেকখানি শক্তির কাণ্ড। নবাবের এ চর্য্য হাড়ে অন্তধানি শক্তি যে আর নাই! নবাব প্রাণপণে আপনাকে

স্বপ্ন করিল। বর্ষার ঝড়া তবুও তাহাদের
মস্তক-প্রকাশে ক্ষান্ত হইল না। নবাব আর
কাহারও পানে ফিরিয়া চাহিল না! পথে
কুকুর চোঁককার করিলে সাহসী পলিক সেমন
সে দিকে ত্রুৎপনহার না করিয়া অটল
ঔদাসীয়ে আগনার পথে চলিয়া যায়, সে-
সকল নীচ নৃত্যনো নবাবও ঠিক তেমনই
ঔদাসীনা থাকিয়া অভিনয় দেখিতে লাগিল।

এমন সময় প্রথম অঙ্কের শেষ পট পড়িল।
তখন দুলে হাঁক ছাড়িয়া চারিদিকে চাহিয়া
নানাবিধ মিশ্র কোলাহলের সৃষ্টি করিল।
কতকগুলো ভাণ্ডা ভাণ্ডা কথা শুধু নবাবের
কানে গেল। আপনার সঙ্গে অটলভাবে বসিয়া
সে সব কথাই পর নবাব ঔদাসীয়ে হৃদয়
বশে ঘোড় করিতে লাগিল।

“চমৎকার নই! এরা শ্রুত করচে বাসা—”

“একেবারে নতুন ধরণের বই!”

“নবাব কি বলে এস, এখানে? বৃকের
পাটাও ত কম নয়!”

“দেখা যাক—আগাগোড়া বইখানা কেমন
গোড়া!”

“এটটিট প্রথম নই! নতুন নাট্যকার!”

“লি-হার্কারটা একেবারে ব্যারগেস হেমার
লিগের খপ্পরে পড়েছে,”

“ভাই হেমারলিগের এত পলায়!”

“আরে ছা! বড়লোকের সবই
খাপল!”

“কেঙ্কলটা গেল কোথায়?”

“টিউনিসে আছে। ফেলিসিয়াও তার সঙ্গে
জুটে গেছে। বের যাচ্ছে দুজনেই ভারী
খাতির! বেকের চেষ্টা পার্ল খাওয়াচ্ছে! খুব
পলায় জমিয়েছে, সেখানে”।

“একের নথর—একবারে,
কি না!”

সহসা নবাবের বস্ত্রের পিছনে সুত কোমল
কণ্ঠ কে করিল, “নাই বা আলাপ থাকল,
বাবা,—তুমি যাও আলাপ করগে! আচ্ছ,
তিনি নেছাৎ একলা পড়েছেন—”

“কিন্তু আলিন, আমার যে উনি মোটেই
চেনেন না, মা—”

“নাই চিত্রন, নিজে থেকে চেনা করে
নাও গো! তুমি একটু কথা করগে—উনিও
জানেন—ঐর তবু একজন বন্ধুও এখানে
আছে—”

পরক্ষণেই নবাব ফিরিয়া দেখেন, এক
বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাহার বস্ত্রে আসিয়া
দাঁড়াইয়াছে। সে বৃদ্ধ জুলা। সে কি
আরাম—কি আখাল পাইয়া নবাব সাগ্রহ
বাছ বাড়াইয়া বৃদ্ধকে অভ্যর্থনা করিল।
বৃদ্ধের তপ্ত কর আপনার করে বসিয়া
নবাব এক অপক্লপ ঘোঁরার সংস্পর্শে মুহূর্ত-
পূর্বেকার দেই বর্ষার মানির কথা ভুলিয়া
গেল। তাহার পর বহুকাল বসিয়া নানা বিষয়ে
ব্রহ্মকেনে কত কথা করিল। এমন ঘো-
আখাল-ভাষা পর নবাব এ সহরে পূর্বে আর
কখনও শুনে নাই। আচ্ছ, এতদিন কোথায়
তুমি ছিলে, বন্ধু! এই লুঠের আচ্ছা, বর্ষারতার
মজলিসের আত্মরালে এমন একখানি হৃদয়
প্রাণ লইয়া লুকাইয়া তুমি কোথায় বসিয়াছিলে।
এখানে বেশের গজ, টাকার গজ দিবারাত্রি
শৃগাল-কুকুরের ঘন চলিয়াছে—এই কদম্ব
রকাক্ষ শব্দের পশ্চাতে এমন একখানি ঘোঁর-
নির্গল নিরামর নীড় আছে, জানিলে নবাব
যে কবে সেখানে গিয়া মাথা তুলিয়া বাঁচিত।

ঘণ্টা বাজিল। দর্শকের দল যে বাহ্যিক আসনে বসি হইয়া বসিল। গট উঠিল। দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় শুরু হইল। দর্শকের দলে আবার সেই চোখে চোখে সঙ্কেতের বাণ ছুটিল।

নবাব ভাবিল, আমি ইহাদের কি করিয়াছি—যে ইহারা এমন বর্ষদের মত আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে! পারি কি আর আমার চাহে না? আমার সহিত সব সম্পর্ক তাহার চুকিয়া গিয়াছে?

কিন্তু ছয়-মাস! শুধু ছয়মাস নবাব পরিত্যক্ত আসিয়াছে। ছয়মাসেই রাক্ষসের মত নবাবকে তাহার লুপ্ত গ্রাসে পুরিয়া চিহ্নিত হইয়া হৃৎ-কর-অর করিয়া পারি আজ পথে মাংসের হাড়ের মতই তাহাকে ফেলিয়া দিয়াছে! ছয় মাসেই সব নিঃশেষ হইল! নবাবের মাথার মধ্যে আন্তর ছুটিতেছিল। দর্শকের দলে তখন অভিনয়-ভারিকের লখন করতালি-নাচ উঠিতেছিল। নবাব চিত্তার সূত্র কাটিয়া অভিনয়ের মনঃ-সংযোগ করিল। রঙ্গমঞ্চে নায়ক তখন বকুতার স্নেহের পরাকাষ্ঠা তুলিয়াছে। এই যে সহরের বৃকে বসিয়া রক্তপিপাসু বাঘের মতই সজ্জা সমাজ গরিবের রক্ত অহরহ শুষিয়া করিতেছে—গরিবের রক্ত দেখে ক্রোধ করিয়া সেই গরিবেরই খাড়ে পা দিয়া ক্ষুণ্ণের একশেষ করিতেছে, ইহা কি কোন অতিক্রম নাই?

দুই দর্শকের দল নবাবের পানে ঘন ঘন চাহিয়া দেখিতেছিল। যেন এই বিজীর্ণ সহরের মধ্যে নবাবই শুধু একমাত্র রক্তপিপাসু ব্যাঘ্র, আর উপরে ঐ হোমানলিত, লি-মার্কার,

ঐ সজ্জিত বস্ত্র অপকরণ সাজে সজ্জিত বড় বড় লোকগুণা সকলেই নিরীহ দেব! সূত্র-ভাষ্যের উদ্যোগ কিছুই জানে না। ক্রোধে নবাবের চোখ দুইটা অগ্নি উঠিল, সমস্ত শরীর অসহ্য তাপে ভাতিয়া উঠিল। দর্শকের সে দৃষ্টি নির্ভীক হইলেও যেন বলিতেছিল, “চলিয়া যাও, চলিয়া যাও নবাব, এখান হইতে তুমি চলিয়া যাও। আমাদের সহিত একগুঁহে বসিবার এতটুকু যোগ্যতাও তোমার নাই!”

নবাবের চোখের সম্মুখে কাহারো যেন নুভা করিতেছিল। তাহারও যেন ঐ সকল দর্শকের সহিত মিশিয়া রক্ত বরে করিতেছিল, “তুমি চলিয়া যাও, চলিয়া যাও, নবাব, এখান হইতে চলিয়া যাও।”

নবাবের মন কড়ের মেঘের মত গন্ধন করিয়া উঠিল,—“কি, অযোগ্য আমি! লক্ষ্মীছাড়া রাক্ষসের দল, তোদের চেয়ে হাজার গুণে আমি শ্রেষ্ঠ! আমার ঐশ্বর্য দেখিয়া হিংসার অগ্নি তোরা খাচ্ হইয়া বাইতেছিল—কিন্তু আমার এ ঐশ্বর্য, এ ছয় মাসে, সূত্রের লাইনকে, কাহারো? তোরা, তোরা কাপুরুষ বর্ষের, লাগা মনের কঁপ পাতিয়া, ভণ্ডামির খুলি লাইয়া, ভিখারীর বেশ ধরিয়া, নানান্তাবে আমার এ ঐশ্বর্য তোরাই শুধু লুণ্ঠন করিয়াছ! ঘৃণা পথের কুকুরের মত আমার এক কণা প্রাণদ পাইবার আশার আমার ভারী ক্ষুণ্ণ মাথার বহিয়াছিল—আমার এতটুকু উজ্জ্বল পাইবার লোভে আমার দোরের মাটি চাটিয়াছ,—আর আজ এখানে তোরা সাধুর খোলস

পরিয়া আমার পানে বর্ষর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিতেছিল—আমি ডাক্তার, আমি চোর, আমি শূঁতবাছ। ঐ যে মাকুঁইস অমির জামা গায়ে আঁটিয়া, এক চরিত্র-হীনা নারীকে পাশে বসাইয়া অহঙ্কারে ধরাকে সহ্য দেখিতেছিল, তুইই ত সেদিন আমার পায়ে ধরিয়া সাধিয়া এক লক্ষ টাকা ভিক্ষা লইয়াছিলি! না দিলে ক্রাব হইতে অপমান করিয়া তোকে তাড়াইয়া দিলে। আর তুই, বিলাসিনী নারী, যে সব মণিযুক্ত আঁটিয়া এখানে আজ তোর ঐশ্বৰ্য্যের বহন দেখাইতে আসিয়াছিল, ও ঐশ্বৰ্য্য ত আমারই খোসামোদি করিয়া আমারই হাত হইতে তুই ভিক্ষা লইয়াছিলি! আর তুই নিরঞ্জন মশাদ—মাথার শুধু কালো কালি-ভরা, তুই ত আমারই উজ্জ্বল শরীরটাকে এতদিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছি; তারপর ভিক্ষা বন্ধ করিয়াছি বলিয়া আমার আজ কুকুরের মত দংশন করিয়া ফিরিতে-ছিল—তোকে কি মাছ বলিয়া ডাবি? সেদিন পথে আমার হাতের চাবুক খাইয়াও তোর লজা হয় নাই, তাই তুই ঐ ধবল-রোগী গণিকটাকে লইয়া এখানে আসিয়া বসিতে পারিয়াছি! আর এই তোদের পারির সমাজ তোদের মত পায়ও-দের মাগার তুলিয়া মাটিয়া ফিরিতেছে! আমাকে পরিহাস করিস, তোরা? আমার জুতা খুলিবার যোগ্যতাও যদি তোদের থাকিত! তোরা আমার কুৎসা করিস? তোদের চেয়ে আমার আসন অনেক, অনেক উপরে, তা তোরা জানিস? ”

জুঁজু প্রাণের মধ্যে কণাগুলি বিরাট

চৌকারে গর্জন করিতেছিল। একটা অস্থির উত্তেজনার নবাবের শিরঃশূল্য সুলিয়া উঠিতেছিল। কেবলই তাহার মনে হইতেছিল, আর না, আর চুপ করিয়া থাকা যায় না। এখনই একটা বিরাট অলোক্যাসের মত ঐ হস্তাগা জনতার উপর লাফাইয়া পড়িয়া মুহূর্তে তাহাদিগকে সে আহত, বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। দারুণ উদ্‌যাদনার নবাবের সারা চিত্ত মাটিয়া উঠিয়া-ছিল। শুধু নথ দিরাই এই বর্ষর দর্শকদের একটি একট করিয়া দু’টি ছিড়িয়া দু’টি নিরঞ্জন মুখগুলোকে ছিন্ন-ভিন্ন করিবার বাসনা মুহূর্তে তাহার প্রাণখানাকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেছিল। নবাব ত গিরোচ্ছেই! সঙ্গে সঙ্গে এ লোকগুলারও অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিয়া যাইতে হইবে!

নবাবের চোখের সমুখে রক্তালয়ের উজ্জল আলোওলা চকিতে সহসা ম্লান হইয়া গেল—অভিনেতার উচ্চ চৌক্যর ক্ষণিকের মিলাইয়া পড়িল। নবাবের মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল, দেহ চুলিয়া আসিল। “নবাবের মনে হইল, সহসা যেন পৃথিবীখানা ভীষণ কৃত্রিমকল্পের বেগে ছলিয়া উঠিরাছে—আসনে বসিয়া মাথাটাকেও আর খাড়া রাখা যায় না—কে যেন জোর করিয়া টানিয়া তাহাকে শোরাইয়া দিতে চাহিতেছে। বুকের কাছে কি যেন ঠেলিয়া সুলিয়া উঠিতেছে। সহসা পরক্ষণেই চোব তাহার মুদিয়া আসিল। নবাবের শির হেলিয়া পড়িল।

চকিতে অমনি কে আসিয়া পিছন চইতে ডাকিল, “নবাব, মরু”—। এ যে বড় পরিচিত স্বর—বড় বেহ-কামল! কিঙ্ক

বড় দুঃস্থ হইতে এ সাড়া আসিতেছে না ?
মার্শেল—মার্শেল—সে যে বহুদূরে !

নিরুপায় মজ্জমানের মত নবাব স্ত্রী
হাত বাড়াইল—কাহার তপ্ত স্পর্শ উত্তেজিত
নিরায় দুহর্ন্তে অবনি হিড়তার প্রলেপ
সিকন করিল। তারপর কীণ, অতি-কীণ
কণ্ঠে কে কহিল, “আমি এসেছি, নবাব,
আমি—আমি গেরি।” নবাব দুর্জিত
হইয়া পড়িলেন। গেরি ছই হাতে টানিয়া
নবাবকে বুকে তুলিয়া পানের জনহীন
অন্ধকার বারান্দায় লইয়া আসিল। অধীর
দর্শকের দল উল্লাসে মাতিয়া তখন “সাবাস !
সাবাস !” বলিয়া চাৎকার করিতেছিল।
আলোর লহরে রঙ্গালয় একেবারে হাদিয়া
সারা হইয়া ঘাইতেছিল।

* * *

রক্ত-ক্ষরণ, কাপিং-গ্লাস, পুলটিশ কিছুতেই
আর সে অচেতন শরীরে স্পন্দন হুটাইতে
পারিল না। দুইজন ডাক্তারও স্রবক্ষ
তত্ত্বাবধায় হিমসিম খাইয়া গেল, গেরি
কাহার সকল শক্তি লইয়া প্রাণেপণ চেষ্টা
করিল; কিন্তু নবাবের চৈতন্য কিরিতার
কিছুমাত্র আশা দেখা গেল না। কার্দ্দেশ্যাক
নিম্নে বেধিতে আসিতে পারিল না; সে তখন
ভারী ব্যস্ত, তবে লোক পাঠাইয়া দিল, সেবার
যেন কোন দ্রুতি না হয় ! আরও সে লোকের
মুখে বলিয়া পাঠাইল, পক্ষম অক্সেস যবনিকা
পড়িলেই সে ছুটিয়া আসিবে !

বারাণ্ডার এককোণে গিরেটারের মত
কিছু পরিত্যক্ত আসবাব পড়িয়াছিল, ছিন্ন
ভিন্ন দৃষ্টপট, কাঠের বড় বড় বাস, কাঠের
ভাণ্ডা সিঁড়ি, ফুটা বালুতি, পাগ-হারানো

অকেজো টেবিল—আবজ্ঞানার স্তূপ !
তাহারই মধ্যে গেরি কোণা হইতে এক-
খানা সোফা টানিয়া আনিয়া নবাবের দেহ
তাহার উপর শোয়াইয়া দিয়াছিল। এ
যেন জল-গিরিশূন্যে চূর্ণ একখানা আহাঙ্ককে
ডাক্তার এক ধবে কাহারো টানিয়া তুলিয়াছে !
ভেমনই বিশাল দেহ, সর্ব্বাঙ্গে তাহার বিরাট
ঋদ্রভেদী ধ্বংসের ভেমনই চিহ্ন !

কপালে হাত দিয়া গেরি নবাবের
মুখের পানে চাহিয়াছিল। তাহার চোখ
জলে ভরিয়া গিয়াছে ! হাত, একটু দেহী
“হইয়া গিয়াছে—আর যদি কমমুহূর্ত পূর্বে
সে পৌঁছিতে পারিত ! রাক্ষসের গ্রাস
হইতে কিছুও যে সে সংগ্রহ করিতে
পারিয়াছে,” এ খবরটা সে নিঃশব্দ মুখে
নবাবকে দিতে পারিলে হয়ত এতখানি
কাণ্ড নাও ঘটিত।

বাহিরে আবার করতালির বজ্রনাদ উঠিল,
সারা রক্তগৃহ সে নাদে কাঁপিয়া উঠিল।
তাহার পরক্ষণেই বাহিরে গাড়ী-খোড়ার
শব্দ ও লোকের কোলাহল দুহর্ন্তে জানাইয়া
দিল, অভিনয় শেষ হইয়াছে—নিজম-দীপ্ত
দর্শকের দল দাঙ্গা স্রবের উচ্ছ্বাসে মাতিয়া
গৃহে ফিরিতেছে ! নবাব নাট্যকারের
লগাটে প্রাণসংসার অসুখীকা পরাইয়া, তাহার
প্রাণে নব-জীবনের উদ্বেগ-রাগ ফুটাইয়া
দলে দলে বখন সব গৃহে ফিরিয়াছে তখন
ও-ধারে এই থিয়েটারেই এক পরিত্যক্ত
নিভৃত কোণে—কি এক শোচনীয় করণ
নাটকের অভিনয় স্রব হইয়াছে ! কেহ
জানে না, কেহ তাহার সন্ধানও রাখিতে
চাহে না। ঋদ্র-হীন বর্ষর সহর !

অগতঃ এই রাজিতিরই কাগমন-কল্পনার নবানু কতদিন অধীর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে! এই আশো, হাশি ও গানের সমাহার-সুগন্ধ তাবির কতখানি উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে! হায়, গুণাকরও সে ভাবে নাই, একদিন এ আশো জলিবে, তবে সে তাহাকে পুড়াইবার ক্ষমতা—হাশিও ফুটিবে, কিন্তু হায়, সে-তাহারই এই শাস্ত সহ্যহুত্বকে নিষ্ঠুর স্বাক্ষর করিবার ক্ষমতা!

সহসা নবাবের দেহ একবার কম্পিত

হইল—ওঠ একবার নড়িল, সুদিত চক্ষু একবার গেঁড়ির মূগ লক্ষ্য করিয়া পলক মেলিল—মৃত্যুর পূর্বে সে চাহনি গেরিকে ঘেন পাতিল এই নিষ্ঠুর বর্ষের বড়বড়, এই দারুণ শোচনীয় হত্যা-ব্যাপারের একমাত্র সাক্ষ্য থাকিবার কল্পন-মিনতি হানিয়া পরক্ষণেই আবার চিরকালের জন্য মুদ্রিত গেল!

সমাপ্ত

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আধুনিক ভারত

শিক্ষা

পূর্বে যে নবপ্রবর্তিত বিদ্যাব্যবহার কথা বলা হইয়াছে সেই বিদ্যাব্যবহার অধিকাংশ লোকে তেমন ইচ্ছাপূর্ণক গ্রহণ করে নাই বরং কতকটা বাধ্য হইয়াই গ্রহণ করিয়াছিল; কেননা, তাহাদের শিক্ষা ও সংস্কারাদি অত্র প্রকারের ছিল। কিন্তু শিক্ষার প্রভাবে যখন এক নব্য-বংশের লোক গড়িয়া উঠিল তখন তাহাদের নিকট এই শিক্ষা পূর্ব স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। উনবিংশ-শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, শিক্ষা-পদ্ধতিকে এমন নূতন করিয়া ঢালাই করা হইল যে, ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্মোপনিষদ সভ্যতা—এই উভয় সভ্যতারই অংশ এই পদ্ধতির মধ্যে স্থান পাইল।

• •

প্রথমে, প্রাথমিক-শিক্ষা সমস্তই দেশীয় ভাষায় দেওয়া হইয়া থাকে। দুই বর্ষের পাঠশালা। এক বর্ষের পাঠশালা

ছাত্রদিগের কোন প্রকার পরীক্ষা দিতে হয় না এবং সে সকল পাঠশালার কোন বিবরণ লেখা হয় না। ত্রাঙ্কণেরা, গ্রাম্য গুরুরা প্রায় আড়াই লক্ষ ছাত্রদিগকে এইরূপ শিক্ষা দিয়া থাকে।

আর এক বর্ষের পাঠশালা আছে যাহার ছাত্রদিগকে পরীক্ষা দিতে হয় এবং যে-পাঠশালাগুলি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা:—গবর্ণমেন্টের পাঠশালা; রাজসরকার হইতে সাহায্য পায় এইরূপ স্বাধীন পাঠশালা; এবং রাজসরকার হইতে সাহায্য পায় না এইরূপ স্বাধীন পাঠশালা। এই সকল পাঠশালার বালকেরা পড়িতে শেখে, লিখিতে শেখে, অঙ্ক কষিতে শেখে। ১৯০০ অব্দে, এই প্রাথমিক শিক্ষার ছাত্রসংখ্যা ছিল সাড়ে-ত্রিশ লক্ষ, তদাধো চারি লক্ষেরও কম—বাশিঙা।

ভারতীয়, মাধ্যমিক বিভাগের। এই বিভাগের ছাত্রেরা ইংরাজিভাষা, জ্যামিতি বীজগণিত, ভূগোল, ইতিহাস, ভৌতিক-বিজ্ঞান কতকগুলি দৃশ্যতত্ত্ব, রসায়ন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা করে।

কোন কোন স্থলে ইংরাজি পড়ান হয় এবং কোন কোন স্থলে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়; কিন্তু এই শ্রেণীকৃত বিভাগগুলি ক্রমশই দৈন্তগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। ১৯০০—০১ অব্দে এই বিভাগ শ্রেণীর বিভাগগুলির ছাত্র-সংখ্যা ছিল—৫৫৫,০৪৪।

উচ্চশিক্ষা। এই বিভাগে, যুরোপে যে সকল বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয় এইখানেও সেই সকল বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়। লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলিকাতা, বোম্বাই, আলহাবাদ ও মাদ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন “কলেজ” গুলিতে এই উচ্চশিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কেবল লাহোর-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট একটি শিক্ষকসঙ্ঘনী আছে। সকল বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই সাহিত্য, আইন, চিকিৎসা, শিল্পকলা ও ব্যবসায়-আদির জন্য পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ক্সাপেক্ষা অধিক বিজ্ঞান-বাণিজ্যের উপাধি এবং লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে, সর্ক্সাপেক্ষা অধিক প্রাচ্য-শিক্ষার ডিগ্রী প্রদত্ত হয়। ১৯০০—১৯০১ অব্দে উচ্চশিক্ষার ছাত্রসংখ্যা ছিল ২১,৮২০ (১৮৯৯—১৯০০ অব্দে ছিল ২০,৭৪৪; ১৮৯৮—৯৯ অব্দে ছিল ২১,০০৬); আর ৬০০০ উপাধি-পত্র বিতরণ করা হয়।

১৮৯৯—১৯০০ অব্দে, সরকারী শিক্ষার

আরব্যের পরিমাণ ছিল, ৩৭,৭৫০,০১৪ টাকা, এবং ১৯০০—১৯০১ অব্দে আরব্যের পরিমাণ ছিল ৩৮,৪৪৬,০০৯।



ভারত-গবর্ণমেন্ট-কর্তৃক প্রদত্ত ভারতীয় লোক-শিক্ষার এইরূপ কার্যাবল। এই কার্যাবল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যিক।

প্রাথমিক পাঠশালার চারি লক্ষ, গ্রাম্য পাঠশালার চারি লক্ষ ছাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে শতকরা বশকনেরও কম ভারতবাসী লিখিতে পড়িতে জানে। ইহা নিশ্চয়ই বৃহৎ নহে। গভর্ণমেন্টের আরও বেশী ভ্যাগবাহীকার করা উচিত এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষাপদ্ধতি আর আর কারিয়া ক্রমশ প্রবর্তিত করা কর্তব্য।

যে সকল ছাত্র স্থলে যার তাদের সংখ্যা অল্প; আর ৩৫০ লক্ষ; এবং যারা কলেজে শিক্ষা লাভ করে তাদের সংখ্যা ৫ লক্ষ। যে সময়ে ব্রাহ্মণের আধিপত্য ছিল সেই সময়েরই মত এই শিক্ষা এক শ্রেণীর ঘনি বিশেষাধিকার হইয়া দাঁড়াইতেছে। চীনের মাদারোনদিগের স্তায় শিক্ষিত লোকের একটা বিশেষ শ্রেণী হইয়া না দাঁড়ায় তৎপক্ষে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক।

যে হেতু মাধ্যমিক শিক্ষা অর্থনৈতিক এবং যৌক্তিক জমির খাজনাই রাজস্ব, অতএব মধ্যমশ্রেণীর শিক্ষার যে ব্যয় হয়, সে ব্যয়ভারের অধিকাংশ স্বাক্ষরগণকেই বহন করিতে হয়।

কতকগুলি বিশেষ জাতি, আর সমস্ত শিক্ষিত লোকের যোগান- দিচ্চা থাকে। যথা :—বাঙ্গালী, শুকরাতি, তামূল ও তেলুগু। ইহা আর একটা আশঙ্কার বিষয়; কেন না, প্রতিযোগিতার পরীক্ষা করিবার ভবে লোকদিগকে সরকারী কাজে নিযুক্ত করা হয়।

অধিকাংশ ছাত্র শাসন-বিভাগের পদ, উকীল-কৌতলি-পদ ও সংবাদপত্রের সম্পাদক পদের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহারি বাহ্যতে বিজ্ঞানের দিকে, বিশেষতঃ ব্যবসায়িক বিজ্ঞানের দিকে মনোযোগী হইয়া উৎসাহে গভর্ণমেণ্টের প্রবৃত্ত আশ্রয়। ভারতে উকীল কৌতলির সংখ্যা, সংবাদ-পত্র সম্পাদকের সংখ্যা খুবই বেগুনি; তাহঁদের অস্তাব—চিকিৎসকের, পণ্ডিতদের, ইঞ্জিনিয়ারের, কৃষি-বিশেষজ্ঞের, কলকারখানা-ওয়ারার ও বণিকের। ভারতের মন উপনিষদের স্বপ্ন-কল্পনার পরিপূর্ণ। কিন্তু আরবেরা যেরূপ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই শিক্ষা যুরোপীয়দিগেরও চালান উঠিত; ভারতবাসীদিগের স্বপ্নদর্শিনী বুদ্ধিকে তথ্যদর্শিনী বুদ্ধিতে,—কার্য্যকরী বুদ্ধিতে পরিণত করা কর্তব্য।

ভাষা সম্বন্ধেও অনেক প্রতিবন্ধক আছে। মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার ছাত্রেরা দেশীয় ভাষা ত্যাগ করিয়া ইংরাজি ব্যবহার করে। এই প্রবণতা ক্রমে বাড়িবে বৈ কমিবে না। কেন না, যদিও দেশীয় ভাষার অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোনটাই রীতিমত ধর্ম-নীতিবিজ্ঞা, ঐতিহাসিক বিজ্ঞান অথবা গণিত-

শাস্ত্র শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নহে। শিক্ষান্তরে, লোকসংখ্যার হিসাবে যাহারা শতকরা ২-শেই কৃষিকারীরা ইংরাজি কাঁহতে চেষ্টাও করে না। হয়ত এমন সময় আসিবে যখন প্রাথমিক পাঠশালাতেও এই ইংরাজি ভাষার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

• •

ইংরাজের ভারতবিজয়ে ইংলণ্ডের যে নৈতিক সভ্যতা ভারতে প্রবর্তিত হইয়াছে তাহার দুল দেখাগুলি উপরে প্রদর্শিত হইল। অবশ্য এই কার্য্যটি আমাদের নিকট অনিশ্চিত ও অসম্মান বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কেন না, যে জাতি আর এক জাতির অন্তরায়্যাকে বৃদ্ধিতে ও ক্ষয় করিতে চেষ্টা করে তাহার কার্য্য এইরূপ হওয়াই সম্ভব। ইংরাজের সম্পাদিত সকল কার্য্যই এইরূপ হইয়াছে। কেবোবুদ্ধি ও দৈনিক প্রয়োজনের উপযোগী বুদ্ধি ইংরাজের চরিত্রে সমৃদ্ধি থাকার, ইংরাজ যত্ন তদ্বাদিতে বিশ্বাস করে না, আসুমানের উপর নির্ভৃত গুরুত্বসম্পন্ন নির্মাণ করিতে ভালবাসে না। এই সকল অভাব সবেও হিন্দু-খ্রিষ্টানীর রাজসরকার ভারতে সভ্যতা প্রচাররূপকর্তব্য সাধনে ক্রটি করে নাই। হুশুখী ও শান্তির দ্বারা ইংলণ্ড এই সভ্যতা ভারতে আনয়ন করিয়াছে। অর্দ্ধশতাব্দী কাল হইতে ভারত, বিদেশীর আক্রমণ হইতে, যুদ্ধবিগ্রহ হইতে, কিংবা অন্তঃকলহ উৎপাত-উপদ্রব হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। বিশেষতঃ ইংলণ্ড, স্বাধীনভার

যারা ভারতকে সভ্য করিচ্ছে। ভারত-
বাসীর সামাজিক প্রথা ও ধর্মামুর্ছানাগির
উপর চরিত্রেরূপ করা হইবে না
রক্ষণশীল রাজনৈতিকদিগের মূল

আবার উদারনৈতিকেরা ভাষ্যতক্রে সেই
সমস্ত পৌরজনিক-স্বাধীনতা প্রদান করিচ্ছে
যাহা স্বয়ং ইংল্যান্ডেরা ইংলণ্ডে উপভোগ
করিয়া থাকে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রোতের ফুল

(৩৪)

মালতী গঙ্গার তীরে গিয়া বাহাকে
দেখিয়া কিরিয়া পলাইয়া গিয়াছিল, সে
বিপিন। বিপিন আর আপনার বন্দ্য হইয়া
গুহার মধ্যে বদ্ধ থাকিতে না পারিয়া
সেইদিন প্রত্যুষে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল;
গঙ্গার প্রান্তঃস্নান করিয়া আশ্রমে ফিরিতে-
ছিল। দেখিল মালতী সেই প্রত্যুষে গঙ্গার
ঘাটে ঘাইতে ঘাইতে তাহাকে দেখিয়া
উর্ধ্ব্বাসে পলায়ন করিল। এক ভোরে
মালতী গঙ্গার স্নান করিতেছিল কেন? তাহাকে
দেখিয়া মালতী অমন করিয়া পলায়ন
করিল কেন?

আশ্রমে কিরিয়াই বিপিন শুনিল গুরু
ঔর্ধ্বপর্ষ্যটনে যাত্রা করিতেছেন। বিপিন
যে তপস্যা ভঙ্গ করিয়া বাহির হইয়া
পড়িয়াছে, এই লজ্জার সে আর গুরুর
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিল না। গুরু
ঔর্ধ্বযাত্রা করিলেন—ওরেলার জুড়ী কীটন
গাড়ী চালাইয়া আশ্রমের উজ্জ্বলমের ফটক
পার হইয়া যেল।

স্থূহা উঠিল; বেলা চড়িল। বিপিন

তরু হইয়া তখনও আপনার ঘরে বসিয়া
আছে। এমন সময় শাস্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া
বলিল—রাধারমণীকে আশ্রমে পাওয়া যাচ্ছে
না! আপনি চট করে হেঁসনে গিয়ে
গুরুদেবকে পথের দিন!

বিপিনের নাথার মধ্যে রক্তধারা নাগর-
দোলায় চড়িয়া আকাশ পাতাল একাকার
করিয়া ঘুরিতে লাগিল, চোখের সামনে
বিধ্বস্তস্বাভাৱতাও স্নেহ প্রদত্ত হইয়া উঠিল;
কানের মধ্যে হাজার কিংকির কঙ্কার বাজিতে
লাগিল; সকল গণ্ডগোলের মধ্যে
একটি ধ্বনি শুধু স্পষ্ট ছিল—মালতী
আশ্রমে নাই! নাই নাই, সে আশ্রমে
নাই! বিপিনের দৃষ্টি যেখানে তাহাকে
ধরিতে পারে হয় ত সে তেমন আরগার
কোপাও নাই! পৃথিবীতেই আছে কি না
কে জানে!

বিপিনের মনের মধ্যে আশ্রমনিধি দিকার
দিয়া তাহাকে বলিতেছিল—কেন সে সেদিন
মালতীর বাহা বলিবার ছিল তাহা শুনে
নাই। কেন সে তাহাকে পদে পদে শুধু
আবাত করিয়াই আসিয়াছে। মালতী

কোথায় গেল, কেন গেল এ সমস্যার
মীমাংসা কে করিয়া দিবে? জীবনে আর
কখনো তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে কিনা
কে বলিবে?...মাগতী বাঁচিয়া আছে কিনা
তাহারই বা ঠিক কি? অমন কূলে কূলে
অরাণল দৌদি, অমন উজ্জ্বল-তরঙ্গা জাহ্নবী
...এদের লোলুপ গ্রাসের কাছে—মাগতীর
শ্রমের কোমল জীবনটি কতদূর? এক
নিমেষে হয়ত সব শেষ হইয়া গেছে!
সে যেন দত্তবর্ষ মাগতীকে দেখে নাই।
তাহার যুগযুগান্তের সন্ধিত বিরহবাণী আজ
অকস্মাৎ তাহার অন্তরের মধ্যে ঠেলিয়া
উঠিয়া তাহার হৃদয় ফাটাইয়া অপ্রাঞ্জল
বাহির হইবার অন্ত আকুলি-বিকুলি করিতে
লাগিল।

আজকার এই হুৎখারুণ দুর্দিনে তাহার
আবাণের বন্ধ, পরম নির্ভর নবকিশোরকে
মনে পড়িল, আর মনে পড়িল তার সেই
স্নেহময়ী মাকে। আজ তাহার নিরাশ্রয়
এগে সেই দুটি স্নেহের বন্দরে আশ্রয়
লাইয়া নিশ্চিত হইবার জন্য আকুল হইয়া
উঠিতে লাগিল। যে-সমস্ত আচরণে
তাহাদের দেহকোমল এগে সে আঘাত
দিরাছে আজ তাহার হৃদয়ের মতো ভীষণ
দুঃখ দিয়া তাহার মনকে ধারবার বিদ্ধ
করিতে লাগিল। আজ সে বুঝিতে লাগিল
তাহার জন্য যে সাধনা তাহা গুরু চরণে
নহে, শাস্ত্রের হৃদ্যোদ্য পুঁথির মধ্যেও
নহে, তাহা আছে কেবল তাহার বন্ধুর
স্নেহ-উপায় বক্ষে আর মাতার স্নেহশীতল
জোড়ে! যে ক্রিমি গুরুত্বপূর্ণ উত্তেজনা
ভিতরকার মানুষটাকে বন্দী করিয়া তাহার

সমুখে ধর্মের সঙ্গীত চড়াইয়া পাহারা
দিতেছিল, তাহা সরিয়া • পড়িয়ামাত্র
ভিতরকার মানুষটা বিপিনকে দত্ত দিবস
অন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; রাশি রাশি
বসন্ত-চাপা জ্বর আঠেপুঠে বহু ছিল, আজ
চরম হুৎখের আঘাতে তাহা অপমৃত
হইয়ামাত্র মুক্ত জ্বর আপনায় চিরকালের
সকল সমাপ্তকরণ দেহ-আশ্রয়ের দিকে
ধাবিত হইল। তাহার আর তখন গুরু
রক্তচক্ষু, বা আশ্রয়বাসীনের কোত্থলী
দৃষ্টির প্রতি জ্বলন্ত রহিল না, সে তখন
হুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল।

এমন সময় তারক তাহার দাঁতগুলি বাহির
করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।
বিপিন তাহাকে লক্ষ্যও করিল না। কিন্তু
তারক খুব টেকসই মানুষ, সে উপেক্ষা
অবহেলায় দমিয়ার পাতাই নয়। সে হাঁই
হাঁই করিয়া শান চিৎবাইতে চিৎবাইতে
বলিতে লাগিল—কিহে কারা? আমরা
মনে করছিলাম তোমার বাপ মা তোমাকে
বনবাস দিলে, বাস, ঐখানেই গাড়ি। তা
নয়, মহাকাব্যের কোনো অংশ বাব পড়বে
না; ... লক্ষণবর্জনটা ত আগেই হয়ে গেছে,
এবার সীতা হরণও হল। তাৎপর্য আর
বাকী কি?

বিপিন একলক্ষে গিয়া তারকের টিকি
ধরিয়া নাড়িতে নাড়িতে দাঁতের উপর দাঁত
রাখিয়া বলিল—তারপর তাড়কা রাকসী
বহু আর হুমানের মুখ পেড়ানো বাকী
আছে।... বেগো বাবর, নইলে তোকে
দিয়েই বাকী অমুঠান লাগে হবে বাবে।

বিপিন এক ধাক্কা তারককে ধর

হইতে বাহিরের দালামে ফেলিয়া দিল।
বিশিনের কথা ও কাছের ব্যয়না-বস্তু
তারক দ্বারা পাটল তাহাই বখেট মনে
করিয়া ফাউএব প্রত্যাপনা না রাখিয়া
তাড়াতাড়ি উঠিয়া পলায়নের উপক্রম করিল।

বিশিন দেখিল তারকের হাত হইতে
বারান্দার মার্বেল বেঞ্চে উপর তাহারই
একখানি কটোগ্রাফ পড়িয়া গেল। এই
কটোগ্রাফ তাহার মন্থাপনের ঘরে ছিল।
ইহা এখানে কেনন করিয়া আসিল তাহা
অশুভ হইয়া বিশিন তাড়াতাড়ি উঠা
কড়াইয়া লইয়া তারককে জিজ্ঞাসা করিল,
—এ তুমি কোথায় পেলে?

তারক কানকাস ঘরে বলিল—এটেই ত
তোমার নিচে এলোছিলুম। গুরুদেব তাঁর
বাঞ্ছন মনে সকাল-সকাল তাঁকে প্রণাম
করতে এসেছিলুম। এসে দেখলুম গুরুদেব
চলে গেছেন, তাঁর ঘরে এইটে পড়ে
আছে। তখনুম এই ছবিখানি বুকে করে
নাকি মালতী কানছিল, তাই গুরুদেব
তিরস্কার করেছেন, আর সেই রাগে
মালতী আর বেরিয়ে গেছে।

বিশিনের চোখের সমুদ্র হইতে বিব-
চরচর লুপ্ত হইয়া গেল... চোখের সমুদ্রে
কালো অন্ধকারের মধ্যে সবুজ নীল হলদে
লাল আলোর কথা বিচিত্র স্তরিতে ঘুরিয়া
ঘুরিয়া গোল-গোল ভোর। কাটিয়া ফিরিতে
লাগিল। তাহার মনের ভিতর এমন
একটা দিক দ্বিপ্রহা জমিয়া উঠিল যে সে
শুভ্রদৃষ্টিতে তারকের দিকে চাহিয়া মন্থর-
বোধিত পাগলদৃষ্টির মতো নিম্পন্দ নির্ঝক
দাঁড়াইয়া রহিল।

(৪৫)

কণেক পরে ভেতর পাইয়া বিশিন
ছুটয়া টেপনে গেল। গিফা দেখিল টেপনে
সেমানন্দ বা মালতী কেহ নাই—শুধু
আছে আফিস-বাজী ডেলী-প্যাসেঞ্জার বাবুদের
ভিড়।

বিশিন নবকিশোরের কাছে বাইবার
অল্প টিকিট কিনিয়া গাড়ীর আগমনের
প্রতীক্ষার অধীর পদক্ষেপে প্র্যাটফর্মের এ-
মুড়া হইতে ওমুড়া পর্যন্ত পারদারি করিতে
লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে গাড়ী আসিল। বিশিন
গাড়ীতে উঠিতে বাইতেছে, পাশের কামরা
হইতে বোগানন্দ নামিয়া আসিয়া বিশিনের
কাঁধে হাত দিল। বিশিন পিছন ফিরা
বোগানন্দকে দেখিয়া স্তম্ভিত কুণ্ঠিত হইয়া
গেল—সে যে অসময়ে তপস্বীর গৃহ ছাড়িয়া
আশ্রম হইতে অস্ত্র শাস্ত্র সন্ধান
চলিয়াছে। বোগানন্দ তাহাকে সে বিষয়ে
কিছুমাত্র প্রশ্ন না করিয়া বলিল—গুরুদেব
তীর্থে গেলেন, আমি তাঁকে আগিরে দিই
এগম। সাধারণী কলকাতা চলে গেছেন
.....হুমি বাও, তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে
এসগে।

বিশিন গাড়ীর পা-দান হইতে পা
নাবাইয়া লইল, গাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বোগানন্দ আর কিছু বলিল না।
বিশিনের হাত ধরিয়া লইয়া আশ্রমে
ফিরিল। বিশিন গাড়ীর নির্ঝক; সে
আপনার ঘরে গিয়া শুক হইয়া বসিল।

অনেকক্ষণ পরে যখন সে মাথা তুলিল,
দেখিল তাহার ঘরের ঘরে দাঁড়াইয়া

আছে নবকিশোর ও তাহার পুত্রাভে কুণ্ঠিতা মগনতী। বিশিষ্টের *জন্ম আনন্দে অভিমানে পরিপূর্ণ হইয়া উত্তিগ। তাহার বন্ধু ও মালতীকে এমন অপ্রত্যাশিত রকমে নিকটে পাইয়া তাহারিগকে বাহুবৈঠনে বৃকে চাপিয়া ধরিতে ইচ্ছা হইলেও বাহুল অভিমানে সে স্থির হইয়া বলিয়াই রহিল।

নবকিশোর প্রথম কথা কহিল—মালতীর এ আশ্রমে থাকা বিশদসকল হয়ে উঠেছে; তাই খুড়িমার কাছে নিয়ে বাবার জন্তে সে আশ্রম কাছে গিয়েছিল—তুমি তখন গুহার বশে তপস্যা করছিলে। কিন্তু ওকে* আশ্রমে এনেছ তুমি, তোমাকে না বলে বাগমা ওর উচিত নয়, তাই আমি ওকে রাখতে এগেছি। তুমি ও গুহা থেকে বেরিয়েছ—তোমার গুহর অত্যাচার থেকে মালতীকে রক্ষা করতে না পার ওকে খুড়িমার কাছে রেখে এসো।

নবকিশোর বিশিষ্টের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে গ্রহান করিল। মালতী নতমুখে অসহায় পাড়াইয়া রহিল—সে না পারে থাকিতে, না পারে কোথাও সে বাইতে, সে যে এ আশ্রম হইতে পলাইয়া গিয়া ইহা হইতে ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বিশিষ্ট যুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছিল এই অমূল্য স্মরণীয় তাহারই প্রতি অমূল্য বলিয়া সে গুহর লাগনে লালিত। সে আনন্দ-গঙ্গাগ কণ্ঠে বলিল—মালতী, তুমি পাড়াও, আমি শান্তিকে ডেকে দিচ্ছি।

মালতী আসিয়াছে ধব পাইয়াই শান্তি তাড়াতাড়ি আসিতেছিল। বিশিষ্ট ঘর

হইতে বাহির হইয়াই দেখিল শান্তি তাড়া-তাড়ি আসিয়া মালতীর হই দ্বিত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—এস দিদি এস। আমি আর কখনো তোমার চোখের আড় করব না। তুমি এস।

মালতী নত হইয়া শান্তিকে প্রণাম করিয়া পাথের ধূলা লইল—এমন ঘেঁষে সে ত মা ছাড়া আর কাহারো কাছে পার নাই। মালতীর চোখে জল পড়িল।

শান্তি মালতীর চোখে মুছাইয়া তাহাকে লইয়া উপরে চলিয়া গেল; যুদ্ধ বিশিষ্ট প্রসন্ন দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া পাড়াইয়া রহিল।

মালতীর মনের মধ্যে জলতরঙ্গের দ্বারা বিশিষ্টের কথার দেহ করণা বাজিতে আরম্ভ করিয়াছিল; বাহ্যিক জন্ত সে এত সহিতেছে সে তাহার প্রতি একেবারে উদাসীন *নহে, এই আশ্রমে মালতীর অন্তরে প্রণয়প্রাণ বিস্তৃত বেগে বহিতে লাগিল। গুরুদেব আশ্রমে নাই; পরম নিশ্চিন্ত প্রভুর মনে মালতী শান্তির সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকুর ও আশ্রমবাসীর সেবা যত্নে আপনাকে একেবারে নিযুক্ত করিয়া দিল; এতকাল নিশ্চেষ্টতার পরে অকস্মাত তাহার নারীপ্রকৃতি ছাড়া পাইয়া নিশ্চল সেবা-যত্নে সকলকে পবনাত্মীর যুদ্ধ করিয়া তুলিল।

বিশিষ্ট বাহ পড়িল না। মালতী নানান কাজের মধ্যে কতবার বিশিষ্টের কাছাকাছি হইত; মালতীর চক্কল গতি, কর্ণে বাগতা, কর্ণে নিবিষ্ট তাহার মুখমার কপালের একটি অংশ, তাহার বসিবার বিশেষ ভঙ্গী, তাহার কপালের উপরকার

কৃত্তিক সুরিত হুলস্থলি—যাহা বিপিন দেখে তাহাতেই তাহার ব্যাকুল চিত্তের মধ্যে তুফান উঠে। কিন্তু বিপিন নিজের হাতে তাহার ও মালতীর মাথখানে একটা এমন অদৃশ্য অথচ শক্তিশালী প্রাচীর গাথিয়া তুলিয়াছিল যে তাহার। কিছুতেই পরস্পরের নিকটবর্তী হইতে পারিতেছিল না। যেমন একখানা বড় টিমার যাত্রী লইয়া ঘাটের কাছে আসিয়াও ডাঙার ভিত্তিতে না পারিয়া একবুকে আগ্রহ লইয়া ডাঙার দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে, বিপিনও তেমনি করিয়া মালতীর দিকে তাকাইয়া থাকিত।—কে সে লেভু, কে সে ষেয়া নৌকা যে স্রোতের মধ্যগতকে ডাঙার সহিত মিলন করাইয়া দিবে! বিপিন ও মালতীর এখন বহুবার সাংঘাত হয়, কিন্তু দৃষ্টি একবার সম্মিলিত হইয়াই মত হইয়া পড়ে, দুজনেরই চক্ষু কি জানি কিসের অভিমানে ছলছল করিয়া উঠে।

মালতী আশ্রমের পরিচোয় ভাষ্য নিজের হাতেও তুলিয়া লইয়াছিল। কিন্তু সমস্ত আশ্রমের গৃহীতপনা সম্পন্ন করিয়াও তাহার সবর কাটিতে চাহিত না। আর এই আশ্রমে তাহার থাকিবার হেতুই বা কি? বাহ্যিকের সেবা করিতেছে তাহার। তাহার সেবার কাঙাল মহে; সেখতা বলিয়া যে বিগ্রহের সেবা হয় তাহার প্রতি তাহার ঈশ্বরপ্রভার নাই; স্তম্ভরাং এখানে থাকার সার্থকতাই বা কি? মালতীর মনে হইতেছিল এর চেয়ে কোনো দীন আত্মার আশ্রমে সেবিকা হইলে লগন্তেরও উপকার হইত, তাহারও জীবনের

একটা অর্থ মিলিত। এই-সব কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার ‘কল্পনার গার্হস্থ্যের একটি মোহিনী ছবি স্মৃতিয়া উঠিত—যেখানে সে বিপিনকে আর তাহার সন্তানগুলিকে প্রাণ মন দেহ দিগ্ন সেবা করিতে পারে এমন একখানি প্রাণপ্রবৃত্তি স্নেহসরস গৃহে স্থান পাইবার প্রাণোত্তর তাহার বুকের ভিতর হইতে দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়া বাহির করিত।

(৪৬)

এখনই স্বপ্নদ্রব কল্পনা নিরাশ্রমেই তাহারের আরো কত দিন কাটিতে পারিত।

হঠাৎ উৎসব আসিয়া সকলের নিজের ভাবনা ভুলাইয়া দিল। আজ দোলপূর্ণিমা। তাহার উপর অকস্মাৎ গুরু তীর্থ হইতে আশ্রমে কিরিয়া আসিয়াছেন। তাই আজ সমস্ত দিন আশ্রমে উৎসব চলিয়াছে। আবিদের দুলার পথ ঘাট বর দুয়ার আজ লালে লাল; যেত পাথরের স্বচ্ছ মেঝের আবিদের ছোপ ঘেন উবার আকাশের মতো হৃদয় দেখাইতেছিল। আজ সকলের গৈরিক বাসের উপর আবিদের লাগিয়া দিবস-প্রারম্ভের জ্বার লোহিতপীত শোভা ধারণ করিয়াছিল। সব চেয়ে হৃদয় দেখাইতেছিল আজ মালতীকে। রক্তচন্দন-লিপ্ত শ্বেতপদ্মকোরকের জ্বার, নবোদগত-কিশলয়শোভিতা লতার জ্বার, কন্দর্পের কুহুমকান্দুকের জ্বার সেই ক্রমবধামাকে আজ চমৎকার দেখাইতেছিল। আবিদের রক্তরাগ লোহিততর হইয়া উঠিয়াছিল তাহার লজ্জার অরুণিমার। আজ তাহার ও বিপিনের দৃষ্টি আবিষমভরা ক্রমক্রমের মতো কতবার

মিলিত হইয়াছে, শ্রোতের মধ্যে তাহাদের
বাঁধা বাগনা আশ্রিত হইয়া উঠিয়াছে, যে
রঙে রঙে প্রিয়জনকে রঙাটকা তোলা যায়
তাঁহা কাটিয়া পড়িতে চাহিয়াছে, কিন্তু
লজ্জায় বাধিয়াছে, শুধু নিজেরাই নিজেদের
শ্রোতের রঙে রাঙিয়া উঠিয়াছে।

এমনি কয়টি সমস্ত দিন গেল। সন্ধ্যা
হইতে না হইতে পশ্চিমবিকের আকাশে
আবির ছড়াইয়া দূরব্য আকাশের অপর
শ্রোতে সহস্রকর বুলাইয়া চূষন করিল,
অমনি সে দিককার আকাশও আকাশান-
ন্তর্ভাষ-বেশানো আবির মাখিয়া কমলাপটে
ভরিয়া উঠিল।

যখন বিতারমান জ্যোৎস্না আকাশ
ঘিরিয়া সোনারপার-বোনা চক্রেচক্রে ছড়াইয়া
দিল, যখন কোকিল পাখিয়া গাহিয়া গাহিয়া
দিগ্‌পরশ মক্ষিমা হাওয়া মথিয়া তুলিল,
যখন বহুল চাঁপার গাছগুলি সূলের দেশায়
মাতিয়া উঠিল, তখন তালীকুঞ্জের পাশে
শপাক্ষেত্রের অবিরমাতা লালজলের কোমলতার
ধারে সমবেত শিষ্যমণ্ডলীকে লইয়া প্রেমামল
হোলির গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন।
সে গান শ্রবণে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে চিত্ত
উষোবিত করিয়া প্রকৃতির ভাষায় মতো
করিত হইতে লাগিল—

কুহব গুহে নব গম্ব বোল।
মধু গিবে মধুকরী মধুকর বোল।
ভাষে নব কোকিল পক্ষম-বায়।
হুঁ হুঁহুস আশ্রিত চন্দন-বায়।
পুণ্ডিক রতি বোহন কতুমান।
বিদগদী বিদগদ দিলন সমান।

তার পর বাহির হইতে আনন্দহিরোল

যখন জ্বর পল্লী করিল, তখন গুরু অন্তর-
ভাবে বিস্তার হইয়া গাহিতে লাগিলেন—

মাঝিরে অশল সর্ব সুখাবন
উড়িয়া গগন ছাড়।
দক্ষা আশার দিয়ার মাঝারে
কেহ না বেহিতে পার।
চপল নয়ন শিচকারি বেব
নিরখে নয়ন যৌর।
নব অশুরাণ কাণ্ড তরল
তম্বু মন করি তৌর।

গানের উত্তেজনার ভাব যখন আকার
পাইবার লজ্জা ব্যাধ হইয়া উঠিল তখন সেই
জ্বলন্ত সৃষ্টিবনের চিরন্তন নরনারীর ঐশ্বর্য-
লীলার তিতর দিয়া বৈষ্ণব ভবির কঠিনবে
নিজের জ্বরহতাধ ঢালিয়া দিয়া গুরু গাহিতে
লাগিলেন—

বেলত ফাগু সৃষ্টিবন-চাপ।
কতুপতি যমযথ-মমমহ ছাপ।
আঙ কাণ্ড দেই নাগরী-নয়নে।
অবসরে নাগর চূষে ঘরানে।

এইরূপে মানবজন্মের সৃষ্ট লালসার
পিঠে গানের চাবুক মারিয়া মারিয়া গুরুজীর
উৎসব-রথ খুব বিজয়গর্ভেই অনেক রাত
প্যন্ত অগ্রতিহত ভাবে চলিতে লাগিল।

গুরু ক্লাস্ত হইয়া ধামিলে শিষ্যগণ গান
ধরিতেছিল, শিষ্যগণ ধামিলে গুরু গান
ধরিতেছিলেন, আসর জুড়াইতে পাইতেছিল
না। সকলেই আশা বেন মধুমন্ত।

মালতী সেখানে আর স্থির হইয়া
থাকিতে পারিতেছিল না। যখন সকলে
কর্তনে তন্দ্রার হইয়া উঠিয়াছে, তখন সে
আঙে আঙে সকলের অজান্তসামে সেখানে
হইতে উঠিয়া নির্জনে আনিল। সে একবার

মাথার উপর চাহিল, তাহার মনে হইল আকাশখানি যেন একাত্ত একখানি মুক্তা-অননী শুক্তিপুটের মতো গোলাপি নেশায় বিভোর হইয়া আছে। আকাশে যেন হিমস্পর্শ আভন লাগিয়াছে। একটা বাত্ৰু মাথার উপর নিম্ন ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে-ছিল, যেন মাধবী ঘামিনীর ফুলশয্যার লজ্জা-রূপালি-সোনালি জ্যোৎস্নার টানার অন্ধকারের গোড়েন বুনিতোছিল, যেন নিশার অন্ধকার লুপ্ত হইয়া যোগে স্বাদের আড়াল হইতে একটুকরা দূতকে আকিকার এই আলোক-উৎসব দেখিতে পাঠাইয়াছে। তরলতাও আজ প্রবালকান্তি কিশলয়ে সাজিয়া, ভ্রমর-ভঞ্জে প্রাণ বকিয়া, দক্ষিণা চাওয়ায় চলিয়া চলিয়া উৎসবময় মাতাল হইয়া উঠিয়াছে।

আজকার উজ্জল জ্যোৎস্না, অস্ত্রমুকুলের মদিরগন্ধ, আর উতলা-করা দক্ষিণ: হাওয়া যেন তাহার প্রাণের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার অন্তর বাহির সমাবেশে আপত্ত করিয়া তুলিতেছিল। আজকার এই রাত্রিটি যেন তাহার সমস্ত জীবনের আনন্দধন সৃষ্টি ধরিয়া অমৃতনির্ধ্যাসের মতো দেখা দিয়াছে... আজকার রাত্রি ব্যর্থ বাত্ৰা যেন সমস্ত জীবনটার ব্যর্থতা। তাহার মনে হইতেছিল আজকার এই মধুনিশা দেশার মতো ভালবাসার ছবিয়া ঘাইবার রাত...এরাত শুধু প্রাণ খুলিয়া ভালো বাসিবার আর প্রাণতরা ভালোবাসা পাইবার। এই নিঃশব্দ তত্তরাত্রি যেন কিংবাবের করাল বিভাইয়া তাহারই মতো বিরহিনীর বেশে আগিয়া কাহার লজ্জা অপেক্ষা করিতেছে—

মাধবী নিশার এই পরিপূর্ণ বাসকসজ্জার মাঝখানে যেদিনে কাঠেরও প্রাণ ভেদ করিয়া শোণিত-রাতা পলকের যোনাক ফুটিয়া উঠিতেছে, গন্ধপাগল ফুলের ঠিকঠিকানা থাকিতেছে না, সেদিনে মাগুয়ের প্রাণ ভেদ করিয়া প্রেমের আকাজ্জা ফুটিয়া ওঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক। মালতী নিজেই আর সঞ্চরণ করিয়া রাগিতে পারিতেছিল না; তাহার অন্তর ভেদ করিয়া রক্তচোরাণো অক্ষ চোখ চিরিয়া বাহির হইবার লজ্জা আকুলিবিকুলি করিতেছিল। সে আস্তে আস্তে গঙ্গার ঘাটে গেল। সেখানেও যেত পাথরের উপর জ্যোৎস্নার সোনালি প্রলেপ, গঙ্গার অদ্রব্ধত হ্রোতের উপর চন্দ্রবিষের সোনালি প্রুতিচ্ছায়া, ওপারে অদৃষ্ট নৌকার সোনালি আলোক-বিশ্ময় স্পন্দন, তাহার প্রাণের সমস্ত সৌন্দর্য্যরকে উৎবেদিত করিয়া তুলিল। তাহার ব্যর্থ যৌবনশ্রী আজ পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে তাহার ললিত অধরে, তাহার ভ্রমর-কালো চোখের আড়ালে, তাহার সমাশ্রিত শান্ত দুটির মধ্যে ফুটিয়া উঠিল—এবং মালতী এই আকস্মিক আবির্ভাব অন্তরের অন্তরে অনুভব করিতে লাগিল। মালতী যেত পাথরের সোপানে সোপানে আবিষ্কারটা পারের দাগ রাবিয়া রাবিয়া প্রার লেগে ধারে গিয়া গুচ্ছ হইয়া বসিয়া পড়িল।

আজ বিশ্রামের চিন্তাও নিশ্চিত ছিল না। কোনো কল্পবৃন্দাবনের কল্পিত নরনারীর রসসন্তোষের মধ্যে সে আপনাই বাস্তব চরিতার্থতার সম্ভাবনা অনুভব করিতেছিল। উদ্ভাটনা যখন চরম হইয়া উঠিতেছিল

তখন সে মনে করিতেছিল, আর নয়, এমন জীবন আর নয়। আজ সে শুধুকে আপনার অক্ষমতা নিবেদন করিয়া এই সম্রাসের পথ হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইবে, মালতীকে আজ গভীর-দুঃখে-বাচাই-করা খাটি প্রাণ দান করিয়া সে স্থগী হইবে। যে রমণীকে প্রথম দর্পনের দিনেই সে সঙ্গ করিয়াছিল, বাহ্যকে প্রত্যেকবার যখনই সে গ্রহণ করিতে উত্তত হইয়াছে তখনই সেই বাহ্যিক বিচিত্র ঘটনাসংঘাতে তাহার হৃদ্রোগ হইয়া উঠিয়াছে, সেই অহরহ প্রেরণী নারীকে আজকার এষ্ট পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যসের মাসখানেক একেবারে আপনার করিবার আনন্দ তাহার বুকের মধ্যে মহোৎসবের মতো ভরিয়া উঠিতে লাগিল। আজ সকল সন্ধ্যা জ্বলিয়া সেই প্রেমসীর কাছে ফরা ভিক্ষা করিতে হইবে এবং এদিকে কোনো অপরাধের অবসর আর রাখা হইবে না,—এই চিন্তার দুঃখে ও সুখে, অর্থেও ও আশার বিশিনের অন্তর-বোণার সমস্ত তারগুলি বিচিত্র রাগিণীতে স্বরূত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে এতক্ষণ মাথা নত করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। গান বন্ধ হইয়ামাত্র সে পূনকপূর্ণ দৃষ্টিতে মালতীর দিকে চাহিতে গেল, কিন্তু দেখিল মালতী সেখানে নাই, গীতগভার অঙ্গে গীতাইয়া আছে নবকিশোর ও তাহার হু-পাশে হুহাত ধরিয়া বিনোদ ও বিনি।

বিশিন গুরু জ্বলিয়া, গীতগভা জ্বলিয়া, আশ্রয় জ্বলিয়া এক মোড়ে ছুটিয়া গিয়া বাহ্যেই বিনোদ ও বিনিকে একসঙ্গে

বুকে টানিয়া লইয়া চুবনের পর চুবন করিতে লাগিল। তাহার অন্তরে সঞ্চিত যে ভাবরাশি একাশের জন্য উদ্ভূত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা দীর্ঘ অনশনের পর তাই-বিনোদের বুকে পাইয়া অপ্রত্যাশিত মূর্ত্তি পাইয়া বাঁচিল। নবকিশোর বিশিনের কাঁধে হাত রাখিয়া বাষ্পপূর্ণ কণ্ঠে বলিল—তোমার বাবার খুব অসুখ; যা তোমার নিতে এসেছেন; বাগানের বাইরে গাড়ীতে আছেন।

বিনোদ ও বিনিকে দুই হাতে দুই কোলে উঠাইয়া বিশিন ছুটিয়া চলিল মাহের কোলে এতদিন পরে আপনাকে সমর্পণ করিয়া দিতে। বিশিন গাড়ীর ধরজা খুলিয়া মাহের পায়ে উপর লুটাইয়া পড়িল, গিরি দুই হাতে পরিত্যক্ত পুত্রে জ্বলিয়া ধরিয়া কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া অপ্রত্যাশিত চুবনে এতদিনকার সকল ম্লানি মোচন করিয়া ফেলিলেন।

কণেক নীরব ক্রন্দনের পর গিরি অশ্রুজল ধরে বলিলেন—বিশিন, উনি আর এ যাত্রা রক্ষা পাবেন না; তাকে দেখবার জন্যে বাস্তব হয়ে উঠেছেন; যা, যোমাকে ডেকে নিয়ে আয়, এই গাড়ীতেই আমি তোদের নিয়ে গুণে ফিরব।

বিশিন মাহের আদেশে প্রসূর অন্তরে মালতীকে ডাকিবার জন্যে বাণকের মতো ছুটিয়া আশ্রয়ে ফিরিল। কিন্তু গীতগভার কাছাকাছি হইয়া তাহার অত্যন্ত লজ্জা হইতে লাগিল, কেমন করিয়া সে শুধর নিকটে বিদায় লইবে, কেমন করিয়া সে অপর সম্রাসীদের দৃষ্টির বিকার সহ করিবে।

বিপিন বতই আশ্রয়ের মধ্যে সন্বেশ করিতে লাগিল তাহার গতি ততই মধুর ও মন ততই কুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

অনেক বাক্য পলে ঘুরিয়া অনেক ইন্তস্তত করিয়া বিপিন যখন গীতসভায় ফিরিয়া আসিল, শুধন দেখিল যে গীতসভায় মালতীও নাই, গুরুও নাই। বিপিন আনন্দিত হইল—নির্জনে গুরুর নিকটে বিদায় লইয়া মালতীকে চুপিচুপি ডাকিয়া লইয়া সে মারের কাছে ফিরিয়া বাইতে পারিবে।

বিপিন আশ্রমবাটিকার বরে ঘরে ঘুরিল, কোথাও গুরু বা মালতী নাই। তালীযম, শতাবিতান ঘুরিয়া বিপিন গঙ্গার বাটের দিকে চলিল। দূর হইতে দেখিতে পাইল গুরু ধীরে ধীরে সোপানে অবতরণ করিতেছেন। বিপিন লজ্জিত কুণ্ঠিত হৃদয়ে গুরুর কাছে বিদায় লইবার জঙ্ক অগ্রসর হইতে লাগিল।

গঙ্গার বাটের সিঁড়ির চাতালে আসিয়া দাঁড়াইয়া বিপিন দেখিল মালতী ছুই পা জলে ডুবাইয়া সিঁড়ির একটা ধাপে বসিয়া ছুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে, আর ক্রন্দনাবেগে তাহার দেহখানি রূপের ঢেউটির মতন আন্দোলিত হইতেছে; এবং তাহারই চরণস্পর্শে গঙ্গাস্রোত একগাছি বড় কলাশি ভাবিষ্যের মতন কুণ্ঠিত হইয়া শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে। জ্যোৎস্নার আলিঙ্গন-বদ্ধা রূপসীর ক্রন্দন দেখিতে দেখিতে প্রেমামন্য এক পা এক পা করিয়া ধাপের পর ধাপ নামিয়া ক্রমে ক্রমে একেবারে মালতীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন—

গঙ্গার কলধ্বনি ও নিজের ক্রন্দনশব্দে মালতী প্রেমামন্যের ধীর পদশব্দ শুনিতে পাইল না।

প্রেমামন্য নত চটয়া ধীরে ধীরে প্রখানি হাত মালতীর ছুই কাঁধে রাখিলেন। মালতী চকিত চমকিত হইয়া ঝটিকি ছুই হাত দিয়া দৃষ্টির উপর হইতে অক্ষপাণ অপসৃত করিয়া চাহিয়া দেখিল—প্রেমামন্য একেবারে তাহার মুখের কাছে অবনত হইয়া আসিয়াছে। মালতী চীৎকার করিয়া ছুই হাতে তাহাকে ধোর ঠেলিয়া দিয়া গঙ্গার জলে নোঙা হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। অমনি মালতী দেখিল চাতালের উপরে বিপিন হির নিশ্চল পাখাঘুমুস্তির মতো দাঁড়াইয়া আছে।

মালতীর মুখ আনন্দে পদীপ্ত হইয়া উঠিল—দেখুক, বিপিন দেখুক, তাহার গুরুর আচরণ! কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, বিপিন যদি তাহাকে ভুল বুকে! এই অপেক্ষায় তাহার সমস্ত জীবনের সমস্ত আশা ভরসা করনা আনন্দ এক আঘাতে ভগ্ন করিয়াছে মতো বসবস করিয়া তাড়িয়া চুরমার হইয়া গেল; তাহার প্রাণের মধ্যে অশ্রুনের হাহাকার দাঙ্গল আটুরোলে তাহাকে বধির করিয়া তুলিল। আজিকার আকাশভরা জ্যোৎস্নার কালি ঢালিয়া দিয়া বসন্তরাত্রির সমস্ত সুধারস এক নিমিষে উবিয়া গেল। সেই কেরারি-করা বাগান, সেই মার্বেল পাথরের বজ্জ নির্মল ঘাট, সমস্তই আজ অস্বপ্নর! গঙ্গার জল শাণিত হিম্মাতের তরবারির মতো তাহার সমস্ত আশা উত্তর লক্তি ছিন্ন করিয়া ভাসাইয়া লইয়া বাইতেছে। এতকালের এত অপেক্ষা, এত আকাঙ্ক্ষা,

এত সাধনা সমস্ত আজ নিকল। সে নিরবচ্ছিন্ন বার্ষিকতার মধ্যে অসাময়িক দুঃখের থাকিবে, আর নির্দ্বন্দ্ব বিচারক যিনি যেনম পূরে ছিল তার চেয়েও পূরে সরিষা গিয়া তাহাকে কুল বিচার করিবে। মালতীর চক্ষু কাটিয়া জল বাহির হইল। সে এতদিন বুক দিয়া যে পাথর সরাইতে চেষ্টা করিতেছিল, সেই পাথর বুকের সমস্ত বল ও আশা পিষিয়া গিয়া শুধু রক্তপাতই তাহার সার হইল, সেই কঠিন পাথর যুগ্মে পরিমাপও সরিষা বসিল না। কী ভীষণ বার্ষিকতা! ওঃ এ কী ভীষণ পরিণাম! এতদিন ধরিয়া দুঃখের গোড়াজেই কি সে জগৎয়ের রক্ত সেচন করিল শুধু নিকলতা পাইবার জন্য। হায় হায় এ কি লজ্জা, এ কি দুঃখ, এ কি নিষ্ঠুর নির্যাস!

শ্রোমানন্দ মালতীর গুটি অহুসরণ করিয়া যখন দেখিল সোপানের উপরে যিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে তখন তিনিও মর্শ্বাস্তিক লজ্জার আড়ষ্ট অভিজুত হইয়া উঠিলেন। তাহার একবার মনে হইল জাহ্নবীর অতল গর্ভে তাহার নিতল নৌচ-তার সকল লজ্জাশ্রী ডুগাইয়া দিবে। কিন্তু তাহার অঙ্গে ও পশ্চাতে যুগল বিচারকের চমক নৃত্যবিধান না শুনিয়া মরিতেও তাহার সাহসে কুলাইতেছিল না। তিনি বজ্রাঘাতের জ্বর নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যিনি শুধুকে গ্রাহ্য্য্য না করিয়া শাস্ত দেহার্য্য কর্তে বলিল—মালতী, এস, মা আমাদের নিতে এসেছেন। আজ আমাদের বিবাহেরাতি!

বিপিনের বাক্যে মালতীর সর্ব্বাস্বৈর্য্য সঙ্কর্য্য করিতে লাগিল। এ কি স্বপ্ন, না ঘোষ, না মতিভ্রম। এ যে বিবাহেরাতি বিবাহ বলিয়া মনে হয় না! এত সৌভাগ্য কি তাহার! মোতের কুল কি এতদিনে কুল পাইল! •

মালতীর মনে হইতে লাগিল যেন চন্দ্রলোক হইতে সুরগায়কেরা অমৃতধারা ঢালিয়া গাহিতেছে বিবাহেরাতির অভিনন্দন। —তাহার মনে হইতে লাগিল—আজ জল হল আকাশ মধুময়! অন্তরীক্ষ বায়ু মধুময়! পদ্ম পূর্ণ মধুময়! পৃথিবী মূলি পূর্ণ আজ মধুময়! ভগবান কি দুঃখকে চরমে তোলেন সুখকে এমনি পরিপূর্ণভাবে সম্ভোগ করাইবার জন্য? মালতী মনে মনে সকল ভয়ের তর ও সকল আশীর গতি যিনি অন্তরবেশতা তাহাকে একইকালে দুঃখবিধাতা ও সুখবিধাতা জানিয়া মনে মনে স্তুতিত হইয়া প্রণাম করিল। সে আনন্দবাহল্যে বিপিনের দিকে চাহিতেও পারিল না। তাহার সমস্ত জ্বর আনন্দের অঙ্গুলে আঁর্ষ হইয়া গেল।

শ্রোমানন্দ এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—বিশনুবাবু, মালতী, আমি তোমাদের কাছে এই শিক্ষা পেলাম যে গুরু হওয়া বাহুরের সাধে না। আমার গুরুগিরির আশ্র এই শেষ। আমি এখনই আমরণ তীর্থপর্য্যটনে চলাম। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

সমাপ্ত

চাক বন্দোপাধ্যায়।

ভবঘুরে

(নাটিকা)

দৃশ্য :—কুটীরস্থ গ্রাম্যনে একটি মধ্যবয়সী
স্ত্রীলোক গৃহকর্ণে ব্যস্ত। নিকটেই
একটি বালক খেলা করিতেছে।

বালক।—মা, আজকে তুমি এ বসন্তুলো
এমন করে সাজাচ্ছ কেন ?

মা।—আজকের দিন যে আমার জীবনের
একটা স্মরণীয় দিন বাবা !

বালক।—কেন মা ?

মা।—সাত বছর আগে ঠিক এই দিনে
তারা আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে
দিরেছিল,—আমি তাদের বাড়ীর দানী
হিলাম।

বালক।—সত্যি ? সে বাড়ী কোথায়
না ?

মা।—সে অনেক দূরে বাবা !—তার
কাছেই একটা-ছোট পাহাড় ছিল—লোকে
সেটাকে সোনার পাহাড় বলত।

বালক।—সোনার পাহাড় ! বাঃ ! তা'লে
জামগাটা কি চমৎকার !

মা।—হ্যাঁ বাবা, জামগাটা চমৎকার
বটে। কিন্তু আমি যখন পথে বসলাম তখন
শ্রুতির কনকনে হাওয়া বইচে। সেই দারুণ
শ্রুতি আমার কোনো আশ্রয় ছিল না।
কতকগুলো লোক আমার নামে লাগালে
তাইতেই তারা আমাকে তাড়িয়ে দিলে—
তুমি তখন খুব ছোট—তোমাকে বুকে
করে আমি রাস্তার এনে দাঁড়ালাম।

বালক।—(নিকটে আসিয়া) সত্যি ?
শ্রুতি তোমার খুব কষ্ট হ'ল ?

মা।—কষ্ট হয়েছিল বৈকি বাবা। কিন্তু
কি করব বল ? তোমাকে নিয়ে আমি সেই
ঠাণ্ডার খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে চলে
লাগলাম। শ্রুতি আমার সমস্ত গা একেবারে
হিম হয়ে গেল—তোমার সমস্ত শরীর নীল
হয়ে উঠল। আমি কত লোকের পাথর
কাছে কেঁদে পড়ে বসলাম—“ওগো আজ রাতের
মতন আমার বাহাটিকে একটু থাকবার
ঠাই দাও, ওর ভো কোনো অপরাধ নেই !—
আমি না-হয় রাস্তার পড়ে থাকি !” কিন্তু
কেউ সে কথা কানে নিলে না। আমি
ছুটে ছুটে বীরপুর পর্যন্ত এলাম...

বালক।—আঁা, বীরপুর ? সে ত
কাছেই। ঐ যে পাহাড়ওলা এখানে থাকার
দেড়তে আসে, সে বলে তার বাড়ী
সেইখানে।

মা।—তা হবে। কিন্তু সেদিন কারও
দরজা খোলা পাইনি। রাস্তার অনেক
হয়েছে—যে ঘর ঘরে গিয়ে পড়েছে ! আমার
পা আর চল না, আমি রাস্তার ধারে
পাথরের উপর গুবে পড়ে গেলুম।

বালক।—আমিও যে একবার পাথরের
উপর পড়ে গিয়েছিলাম...আমার পা ভেঙে
গিয়েছিল—এই দেখনা !

মা।—পড়ে গিয়ে আমি তোমাকে
বুকের মধ্যে চেপে ধরলাম। খানিকক্ষণ পরে

অন্ধকারে দেখলুম একজন লম্বা লোক আমার দিকে আসছেন।" সেই ভরানক অন্ধকারেও আমি তাঁকে বেশ স্পষ্টে দেখতে পেলুম। তাঁর হাতে একটি মালা দেখেছিলুম,—সে মালাটি যেন এখনও আমার চোখের সামনে রয়েছে।

বালক।—সে কে মা?

মা।—তা তো জানিনে বাবা! তাঁকে আমি কেবল সেই একদিন মাত্র দেখেছিলুম, তার পর আর কখনও দেখি নি। তিনি আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে তুলে বললেন "ঐ সামনের রাস্তা ধরে কিছুদূর গেলে একটা বাড়ী পাবে, সেখানে বাও। সেখানে তুমি থাকবার আরাগা পাবে।"

বালক।—তারপর?

মা।—তারপর আমি তাঁকে আর দেখতে পেলুম না। আত্তে আশ্বে উঠে আমি এখানে চলে এসেছি। এ বাড়ীতে তখন একটি বুড়ো থাকতেন। তিনি আমাকে আদর করে ঘরে এনে বসালেন...আমি তাঁকে আমার হুংখের কাহিনী বলুম—তিনি সব শুনে আমাকে এই বাড়ীতেই থাকতে বলেন...তারপর তিনি মারা যাবার সময় আমাকে এই বাড়ীটা দিয়ে গেলেন।

বালক।—মা, সেট লোকটি আবার কবে আসবে?

মা।—তা তো জানিনে বাবা! তিনি বলেছিলেন আবার দেখা হবে, কিন্তু কবে তা তো ঠিক করে বলেন নি; তাঁর অপেক্ষার তো আছি। কতবছর ধরে আঁকড়ের দিনে ঘর সাজিয়েছি, কতবার রাত্তির বেলা দরজা

খুলে উকি ঘেরে দেখেছি...কিন্তু কৈ তাঁর দেখা তো এখনো পেলুম না!

বালক।—মা, তিনি এলে যদি আমি ঘুমিয়ে থাকি, তবে আমার আগেরে দিও। আমি তাঁকে দেখব।

মা।—আচ্ছা দেব। কিন্তু এখন তুমি কোথাও যেও না, লম্বাটির মতন ঘরে বলে থাকো—বুকেছ, আমি পাশের বাড়ী থেকে এখুনি আসছি।

বালক।—আমি ঐ গাছটার কাছে পর্যন্ত যাব মা? ঐখানটিতে খেলতে আমার বড় ভাল লাগে।

মা।—না বাবা, তুমি ঘর থেকে বেরিও না। আর সকাল থেকে নদীটা কেমন ডাকছে। আমার কেমন ভয় হয়,—বাইরে বেরিয়ে পাছে তুমি নদীর ধারে গিরে পড়! আমি এখুনি ফিরে আসব।

বালক।—আচ্ছা মা, আমি এখানেই বসে-বলে খেলব। তুমি কিন্তু বেগু দেবী করো না।

মা।—না আমি এখুনি আসব।

[প্রস্থান]

বালক।—(কতকগুলি গাছের ডাল লটগা ভাঙিতে ভাঙিতে) একটা...দুটো...ও...এটা কি শক্ত...এটা আবার ভিজে, ...হিন্টে...পাঁচটা হলই চলবে...একটা ছোট কেল্লা তৈরি করতে হবে...এবার ঐ বড় ডালটা ভাঙা বাক্...ও...কি শক্ত! আবি পারব না...না...

(দরজা খুলিয়া একটি লোকের প্রবেশ। পা খালি, কাপড়ে কাঁদা মাথা—গায়ে কাপড় নাই। বালক কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।)

বালক ।—কে তুমি ?

লোক ।—আমি ভবঘুরে ।

বালক ।—ভবঘুরে ! সে আবার কি ?

লোক ।—আমি সব কারাগার ঘুরে বেড়াই ।

বালক ।—ওঃ তুমি সব কারাগার ঘুরে বেড়াও ? তাহলে তুমি সোনার পাহাড় দেখেছো ?

লোক ।—দেখেছি বৈকি ! সেইখানে থেকেই ত আশুছি । তাই বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি । আমি এখানে একটু বিশ্রাম চাই ।

বালক ।—বেশ বেশ, তুমি এখানে আমার কাছে বোস । আমি তোমার কাছ থেকে সোনার পাহাড়ের গল্প শুনব ।

লোক ।—(বসিয়া) বেশ । সোনার পাহাড় ? সে একেবারে সোনার পাহাড় । তার মাঝখানটিতে একটি সুন্দর বাগান আছে—সেখানকার গাছে কেবল ফুল আর ফল !

বালক ।—আর কি আছে ?

লোক ।—আর ?—কত রঙের যে পাখী ! লোকে সেখানে পুরো দিতে যায় । চারদিকে উচু উচু পাটিল দিয়ে বাগানটা ঘেরা ।

বালক ।—পাটিল দিয়ে ঘেরা ? তবে লোকেরা কি করে তার ভিতর দায় ?

লোক ।—বাগানের চারটে বড় বড় ঘর আছে—একটা সোনার, একটা রূপোর, একটা পিতলের আর একটা পাথরের ।

বালক ।—আচ্ছা আমরা এই কাঠি-ভুলো দিয়ে একটা বাগান তৈরি করি এস ।

লোক ।—আচ্ছা, বেশ ।

(উভয়ে কণ্ঠি দিয়া বাগান প্রস্তুত করিতে লাগিল ।)

বালক ।—সোনার পাহাড়ের আর কি আছে ?

লোক ।—সেখানে চারটে বড় বড় পুকুর আছে—তার জল পরিষ্কার—তৃষ্-তৃষ্ করতে—একেবারে তলা পর্যন্ত দেখা যায় । কত রকমের রঙিন মাছ সেখানে খেলে বেড়াচ্ছে ।

বালক ।—আমাকে ঐখান থেকে ঐ মাটির পেয়লাগুলো পেড়ে দাও না—আমি ঐগুলো দিয়ে পুকুর তৈরি করব ।

(লোকের তথাকরণ ।)

লোক ।—বাঃ এখন দিবি একটি বাগান হচ্ছে ।

বালক ।—আচ্ছা, কি করে আমরা সোনার পাহাড়ের কাছে যাবো ?

লোক ।—কেন আমার ঘোড়ার চোড়ে যাবো ।

বালক ।—আমাদের ত ঘোড়া নেই ।

লোক ।—আমি তোমাকে ঘোড়া এনে দেব । এখনকার মতন তুমি আমার পিঠে চড়—আমি তোমার ঘোড়া হই ।

বালক ।—বাহবা, সে বেশ মজা হবে ।

(বালক লোকটির পিঠে চড়িল)

লোক

গান ।

আমি তোমার নিয়ে যাব

কত দূরের সেই অজানা দেশে...

[বালকের মাতার প্রবেশ । লোকটি গান বন্ধ করিল]

মা।—[লোকের দিকে কিছুক্ষণ সন্নিহিতভাবে চাহিয়া বালককে কোণে উঠাইয়া লইয়া] তুমি কি রকম লোক গা? এই রকম করে ঘরের ভিতরে এশে ছেলের গায়ে হাত দাও? তোমার আঙ্গুলি ত' কমন নর। যাও—এখনি বেরিয়ে যাও!

বালক।—ওকে তাড়িয়ে দিও না মা! ও বেশ লোক। আমাকে কতরকম গল্প বলে—আমার ঘোড়া হয়ে কেমন গেলছিল।

মা।—তোমার সঙ্গে খেলছিল? ওকি তোমার সময়গুণি লোক বাছা? দেখদিকি, তোমার কাপড়খানার কি রকম ধুলো কাণা লাগিয়ে দিয়েছে—তোমার কি কিছু আঁকেল নেই বাপু—যাও, এখনও বলছি যাও—

বালক।—ও অনেক দূর থেকে আসছে মা, আরকের মতন ওকে ওখানে থাকতে দাও।

লোক।—হ্যাঁ বাছা, আরকের মতন আমাকে থাকতে দাও—আমি বড় ক্লান্ত।

মা।—তুমি কতদূর থেকে আসছ গা?

লোক।—অনেক দূর, এই নদী ঘেঁষানে শেষ হয়েছে—সেইখানে থেকে—তোমার পাহাড়ের কাছ থেকে। গ্রামে আমাকে কেউ থাকবার জায়গা দিলে না—তাই ঘুরতে ঘুরতে শেষটা এখানে এলেছি—

মা।—না বাপু, এখানে তোমার থাকা হবে না—আমার এখানে অল্প লোক আসবেন—এখানে জায়গা হবে না। সহর এখান থেকে ত বেশী দূর নয়। সেইখানে যাও না।

বালক।—মা, দেখ আমরা একটা কেমন বাগান তৈরী করেছি।

মা।—আমার এই সব পেরালাগুলো কে নাবালে? আমি তোমাকে দুই বনে-বনে এট করতে বনে গিয়েছিলুম?

(বালককে চপেটাঘাত)

লোক।—(শ্রদ্ধা সহ হইয়া) আহা, ঘেরোনা, ওর কিছু দেখ নেই, ও-সব আমিই ওকে পেড়ে দিয়েছি?

মা।—তুমিই দিয়েছ? তারি কাজই করেছে! তোমার এলেন কি দরকার ছিল বাপু? এ ভদ্রলোকের বাড়ী—তোমার মতন বদমাশদের তো আড্ডা নয়—এখান থেকে যাও, বেবোও বলছি, এখানই তোমার কিছুতেই পাকা হবে না—

লোক।—আচ্ছা তাই যাচ্ছি বাছা! আমার হাংব নেই, আমাকে শ্রাবই রাত্তার রাত্তার দিন কাটাতে হয়, লোকের বাড়ীতে আশ্রয় আমার ভাগ্যে খুব কমই পড়ে।

মা।—তার আর আশ্রয়টা কি?—তোমার মত লোককে বাড়ীতে কে আশ্রয় দেবে বল? তোমার সন্তানের কাছে কিরে যাও—যত রাজার মাতাল, বদমাশ, চোর—

লোক।—ঠিক বলেছ। যত রাজার মাতাল বদমাশ আর চোরই আমার বন্ধু—আমি তাদেরই সঙ্গে সঙ্গে থাকি—তোমরা যদিও খুঁজা কর, যদিও তোমরা ঠাই দাও না, না পেতে গেলে তারা মরে—যত অভাগা, পতিতা—সকলেই আমার সখী—যত গরীব, যত পাগল, যত খারাপ লোক, আমারই সঙ্গে তারা থাকে।

মা।—আচ্ছা, খুব বন্ধুদা হয়েছে—এখন

বাও, তোমার সঙ্গীদের কাছে কিরে যাও—
যাও বল্ছি! এখুনি যাও, মইলে—

(বীরে বীরে লোকটি চলিয়া গেল)

কোথাকার হতভাগা লোক এসে
আমার সমস্ত জিনিষ একেবারে ওগট
পালটু করে দিচ্ছে পেল। দেখ দিকিনি,
যে একরান ধুলো জমে গেছে—

(জিনিষগুলি বখাড়াবনে সাজাইয়া শুছাইয়া
রাখিতে লাগিল)

বালক।—(তুমি হইতে একটি মালা
ভুলিয়া লইয়া বগত) এটা নিশ্চরই সেই
তবুয়ে ফেলে গেছে। ওটাত এখানে ছিল
না বাই, এটা তাকে কিরিয়ে দিবে
আদি।

(মায়ের অলঙ্কার বালক কাপড়ের
স্তিত্তরে মালা লইয়া বাহির হইয়া গেল।)

মা।—আমার এই ভাল ভাল চক্চকে
তক্চকে পেরালাগুলোকে কি-রকম হাচ্ছেতাই
নোঙর। করে দিবে গেছে...আমার সব
খোঁসান করে দিলে—মাগো, দেবে আমার
কান্না পাড়ে।

বালক।—(কিরিয়া আসিয়া) না, তবুয়ে
চলে গেছে, তাকে খুঁজে পেলুম না।

মা।—কাকে খুঁজে পেলি না?

বালক।—তবুয়েকে।

মা।—সে কে?

বালক।—ওই যে ঐ পোকটা, তাকে
তুমি এখুনি তাড়িয়ে দিলে! ও বলে ওর

নাম তবুয়ে—ও খালি বুয়ে-বুয়েই
বেড়ার।

মা।—সে হতভাগাকে খুঁজতে পেলি
কেন?

বালক।—সে যে এই মালাটা ফেলে
গেছে, তাই আমি তাকে ওটা কিরিয়ে
নিতে গিড়েছিলুম। সে বেধে হয় অনেক দূর
চলে গেছে মা,—আমি তাকে দেখতে পেলুম
না। অন্ধকার হয়ে এল।

মা।—দেখি দেখি, কি মালা!

বালক।—(কাপড়ের স্তিত্তর হইতে
মালা বাহির করিয়া) এই যে!

মা।—ঐ! এ ত সেই মালা।

বালক।—কোন্ মালা মা?

মা।—ঐ সেই মালা—এ তাঁরই মালা!—

এ মালা আমি ভুলিনি! আজ তবে তিনি
এসেছিলেন! আমি অভাগী তাঁকে চিন্তে
পারলুম না—চিন্তে পারলুম না। এ
আমি কি করলুম—তার-বেওয়া ঘর থেকে
তাঁকেই তাড়িয়ে দিলুম। আমার চুরারে এলে
তিনি কিরে পেলেন—আমি তাঁকে এই ঘরে
বসাতে পারলুম না। গোড়া মন আমার
এই মাটির জিনিষগুলো নিয়ে যেতে রইল—
ওরই পানে চেয়ে রইল—তার মুখের দিকে
একবার চাইলে না। দূর হোক! এ ছাই
জিনিষ! দূর হোক!

(বলিতে বলিতে জিনিষগুলি ভূতলে ছুঁড়িয়া
ফেলিয়া দিতে লাগিল)=

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

হৃদয়ের বিকাশ

হৃদয় কণাটি একদিকে অতি সরল। কিন্তু অপর দিকে ইহা তেমনই অতীব জটিল। সেই জটিলতার সরলতা সম্পাদনের জন্যই আমাদের উপস্থিত প্রয়াস।

আমাদের শরীরে রক্তের আধার যে একটা বস্তু আছে তাহাকেই সাধারণতঃ হৃদয় বা হৃদয় বলা হইয়া থাকে। অল্পসঙ্কান করিলে আমরা জানিতে পারি যে এই বস্তুর বিকাশ হইতে বহু সময় লাগিয়াছে। ইতর প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্যতেই ইহার পূর্ণ পরিণতি হইয়াছে। ইতর প্রাণীতে এই হৃদয় কেবল যে অপরিণতি তাহা মনে কিছু কোন কোন ইতর প্রাণীতে ইহার সম্পূর্ণ অভাবই পরিলক্ষিত হয়। পর্যাবেক্ষণের দ্বারা পতঙ্গ-জাতিতে হৃদয়ের প্রথম সূচনা-মাত্র দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। (১) পতঙ্গী মনুষ্য মাঝেই হৃদয়ের প্রকৃত পরিণতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে হৃদয়ের পরিণতির সঙ্গে যে প্রাণীদ্বিগের বিকাশের একটা বশিষ্ট লক্ষ্য আছে তাহা অজ্ঞান করিয়া বাইতে পারে। বস্তুতঃ নিম্নতম জীব-শ্রেণীতে হৃদয়ের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি উচ্চতর যেকোনও জীব সংসা-জাতিতেও ইহার অজ্ঞাবাহমাত্র দেখা যায়। (২)

আমরা হৃদয়কে রক্তের আধার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। সুতরাং রক্তের পরিণামের সহিতই যে ইহার লক্ষ্য হইবে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। দেহগঠনে আমরা রস ও রক্তকেই মূল উপাদানরূপে দেখিতে পাই। ইহা হইতে আমরা রসজীবী দেহ ও রক্তজীবী দেহ—দেহের এই দুই প্রকারের বিভাগ প্রাপ্ত হইতে পারি। উদ্ভিদাদি যে রস দ্বারা পুষ্ট ও বর্ধিত হইয়া জীবিত থাকে তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি। নিম্নতম জীবের মধ্যেও দেহের প্রধান উপাদানরূপে একমাত্র রসকেই বিস্তারিত দেখা যায়—তাহাতে রক্তের কোনও সম্পর্কই দেখিতে পাওয়া যায় না। কীটাদি ক্ষুদ্রতম জীব এই শ্রেণীভুক্ত। উদ্ভিদাদির সহিত জীবের পূর্কোক্তরূপ সাদৃশ্য হইতে জীব ও উদ্ভিদ যে একই জন্মবিকাশ-সূত্রে প্রযুক্ত তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। উচ্চতর জীবের রক্তও রসেরই পরিণতি। কারণ ভূতপ্রত্যয় প্রথমতঃ রসেরই পরিণত হয়; তাহা হইতেই পরে রক্তের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

জীবদেহের রক্ত আধার শীতল ও উষ্ণ এই দুই প্রকারের হইয়া থাকে। এই দুই প্রকারের রক্ত বিশিষ্ট জীবদ্বিগকে

(১) "The first indication of an organ like the heart is seen in insects. National Encyclopædia.

(২) "Among vertebrate animals the simplest form of heart is found in fish. National Encyclopædia.

আমরা “শীতলশোণিতধারী” ও “উষ্ণ-শোণিতধারী”, এই দুই নামে অভিহিত কৰিতে পাৰি। মগ ও শৈত্যগুণদিশিষ্ট বলিয়া শীতল শোণিত অনেকটা মসৈয়ই প্রকৃতিযুক্ত। তাহাতেই শীতল শোণিতজীবী দেহের মসজীবী দেহেরই সহিত অধিক সাদৃশ্য। হুতৰাং শীতল শোণিতধারী জীব বিকাশক্রমে মসজীবী অপেক্ষা উন্নত হইলেও উষ্ণ শোণিতধারী জীব অপেক্ষা নিকট হইয়াছে। এই প্রসাৰে শীতল ও উষ্ণ শোণিত যে জীববিকাশের বিশেষরূপ নির্দেশক হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পাৰি।

মন্ত যে এইরূপে বিকাশের লক্ষণ হইয়াছে, তাহার কারণ এই বলিয়াই আমাদের মনে হয় যে মন্তের মধ্য দিয়াই চৈতন্তের প্রথম প্রকাশ হইয়া থাকে। এই অজ্ঞই মসোপজীবী উদ্ভিদ ও নিম্নতম জীবে আমরা চৈতন্ত বিশেষরূপে অক্ষুট দেখিতে পাই এবং শোণিতধারী জীবে আমরা চৈতন্তের অধিক স্ফূৰ্ত্তি দেখিতে পাই। শোণিতধারী জীবের মধ্যেও আবার শীতল শোণিতধারী জীব অপেক্ষা উষ্ণ শোণিতধারী জীবে চৈতন্তের অধিক স্ফূৰ্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে শোণিত চৈতন্তের প্রকাশক বলিয়া শোণিতের উৎকর্ষই যে বিকাশের উৎকর্ষ হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পাৰি। আমাদের সমাজে বংশোৎকর্ষের যে বিচার দেখিতে পাওয়া যায় স্তূলে তাহা মন্তোৎকর্ষের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

শোণিত চৈতন্তের আবার বলিয়া জীব দেখে শোণিতের স্ফূৰ্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে

চৈতন্তের স্ফূৰ্ত্তি হইয়া থাকে। যে সমস্ত জীবে জন্মের নাই তথায় মন্ত কোন নিদিষ্ট আধাৰে স্ফূৰ্ত্তি হইতে না পাৰায় সৰ্ব্ব দেহেই ব্যাপ্ত হয় জন্মের ইহাদেশ মধ্যে চৈতন্তও সৰ্ব্ব দেহেই ব্যাপ্ত থাকে। তাহাতেই ইহাদেশের কোন অঙ্গ ছিন্ন হইলে তাহাতে চৈতন্তের লক্ষণ বহুক্ষণ পর্যন্ত বিস্তৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে যে সমস্ত জীবে মন্ত জন্মের স্ফূৰ্ত্তি হয় চৈতন্তও তথায় বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে। তাহাদের চৈতন্ত বিশেষরূপে জন্মের সন্নিবিষ্ট থাকায় তাহাদের কোন অঙ্গ ছিন্ন হইলে তাহাতে কোন চৈতন্তই বিস্তৃতি দেখা যায় না। মন্ত জন্মের স্ফূৰ্ত্তি হয় বলিয়াই ইহার নাম জন্মপিত্ত হইয়াছে। জন্মপিত্তকে যেমন সমস্ত মন্তের কেন্দ্রস্থান বলা যায় তেমনিই ইহাকে সমস্ত চৈতন্তেরও কেন্দ্রস্থান বলা যায়। চৈতন্ত হইতে যেমন মন্ত সমস্ত দেহে স্ফূৰ্ত্তি হয় তেমনিই জন্মপিত্তের কার্য হইতেই সমস্ত ভাবেরও উৎপত্তি হয় বলিয়া আমরা মনে করি। ভাবপ্রকাশের ইঞ্জিরের নাম আমাদের ভাষায় “অন্তঃকরণ”। অন্তঃকরণ শব্দে আমাদের মনকেই বুঝাইয়া থাকে। মনই আমাদের মধ্যে সাধারণ চেতনতত্ত্ব। জ্ঞান বা জ্ঞানশক্তি আমাদের মনকে বুঝাইয়া থাকে। এই প্রকারে জ্ঞান বা জ্ঞান যেমন মন্তোপস্থিত জন্মপিত্তকে বুঝায়—তেমনই ইহার কার্যরূপ মনোব্যাপারকেও বুঝায়। আমাদের দর্শনশাস্ত্রে মন, জ্ঞান ও চেতন উত্তর প্রকৃতিরূপেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। জন্মপিত্ত ও ইহার কার্য

আমরা সেই উত্তর প্রকৃতির স্পষ্ট ব্যাখ্যাই প্রাপ্ত হই। স্তম্ভরাং স্থং-ও মন ক্রমপে অতির হটচাছে তাহাই আমরা বুদ্ধিতে পারিতেছি।

স্থংপিও ও মনের পূৰ্ণোৎকর্ষণ সঞ্চ হইতে স্থংপিওই যে মনের প্রকৃত স্থান এই গুঢ় রহস্যটি আমরা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতেছি। স্থংপিও চৈতন্তত্ব বা মনের স্থান বলিয়াই স্থংপিওের ক্রিয়া বদ্ধ হইলে চৈতন্ত ও জীবন উভয়ই বিশোপ পায়। আমরা এখানে জন্ম ও মনকে যে একার্থক প্রতিপন্ন করিমাছি তাহা আমাদের জীবন আবহমানকাল হইতেই বীকৃত হইয়া আসিতেছে। তাহাতেই অমব-কোষ অভি-থানে আমরা উত্তর শব্দকেই একই পৰ্যায়-ভুক্ত দেখিতে পাই বধা—“চিত্তস্থ চেতো জন্মং বাস্তবং জ্ঞানসং মনঃ।” এখানে চিত্ত ও যে জন্ম বা মনেরই নামের ত্যাগ ও আমরা পরিষ্কারই বুদ্ধিতে পারিতেছি। এই এক্ষারে এক জন্মেই যেমন আমরা বৈজ্ঞানিক শরীরবস্ত্র প্রাপ্ত হইতেছি— তেমনই দার্শনিক জন্ম, মন, চিত্ত প্রভৃতি চৈতন্তত্বও প্রাপ্ত হইতেছি। এই এক্ষারে জন্মবস্ত্র যেমন একদিকে মনপ্রভৃতির আধার হইতেছে তেমনই অপরদিকে মন প্রভৃতিও জন্মস্ত্রেরই ব্যাপার হইতেছে।

জন্মস্ত্রের সহিত মনোভাবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লব্ধে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইমাছি—ভাষার ও সাহিত্যে তাহা আন্দ্য-রূপেই পরিষ্কৃত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন লোকের জন্মবস্ত্রের বিশেষ পরিচয় পাইলে আমরা তাহাকে ‘জন্মবান্’, ‘সজন্ম’

বা ‘জন্মান্’ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। আমরা কোন ব্যক্তিতে জন্মবস্ত্রের পরিচয় না পাইলে আমরা তাহাকে ‘জন্মহীন’ বলিয়া অভিহিত করি। ইংরাজীতে একপ-স্থলে ‘possessed of good heart’, ‘heartless’ প্রভৃতি কথার প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহা হইতে জন্মস্ত্রের উৎকর্ষের সচিতিই যে উৎকর্ষ মনোবৃত্তির যোগ এবং জন্মস্ত্রের অপকর্ষের সহিতই যে নিকট মনোবৃত্তির যোগ তাহাই উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

কাহারও উদার মনোভাব দেখিলে আমরা তাহাকে ‘প্রশংসজন্ম’, ‘উদারচেতা’, ‘মহামনা’ প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া থাকি। আবার তুষ্ণিগীত অহুদারভাব দেখিলে ‘সকীর্ণ জন্ম’, ‘সুত্রচেতা’, ‘নীচমনা’ প্রভৃতি বিশেষণে তাহার নিম্নাবাদ করিয়া থাকি। ইংরাজীতেও এতদনুরূপ ‘large hearted’, ‘broad minded’, ‘high minded’ এবং ‘narrow minded’, ‘small hearted’, ‘low minded’ প্রভৃতি কথার প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা হইতে জন্মস্ত্রের প্রশংসার সহিতই যে উন্নত মনোভাবের লব্ধ তাহাই বুদ্ধিতে পারা যায়। ‘নীচ’ শব্দের মধ্যেও জন্মবস্ত্রের অবস্থানের রহস্যই আবিষ্কার করা যাইতে পারে। মনুষ্যব্যতিক্রম প্রাণী সোজা ভাবে ঠাড়াইয়া চলিতে পারে না বলিয়া— তাহাদের মধ্যে স্থংপিও নিঃশূন্যে অবস্থিত থাকে। মনুষ্য সোজাভাবে ঠাড়াইতে অসমর্থ হওয়ার তাহাতে স্থংপিও উর্দ্ধমুখ হইয়াছে। মনুষ্যের স্থংপিওের এই উর্দ্ধমুখ ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জন্মবস্ত্রের উৎকর্ষ সাধিত

হওয়াতেই মনুষ্যের সম্বন্ধে এই উক্ত ভাবের প্রকাশক, 'উচ্চদম', 'উচ্চাতঃকরণ' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে যে সমস্ত মনুষ্যের ক্ষমত্ব ইত্যব প্রাণীক ভাব অধীনত তাহাদিগের সম্বন্ধে ইতর প্রাণীক দৃষ্টিভঙ্গির অবস্থাপ্রকাশ "মৌল্য জনক", "মৌল্যাতঃকরণ" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

দ্বন্দ্ব আশ্রয়ের শাস্ত্রে পশুসদৃশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইতেই 'দমকমল' 'জ্বকমল', 'জ্বপুণ্ডরীক' প্রভৃতি কথার উৎপত্তি হইয়াছে।

দম ভাবের আধার বলিয়াই অত্যধিক হর্ষবলে আশ্রয় বলিয়া থাকি 'জ্বরে আনন্দ আর ধরে না' আশ্রয় অত্যধিক কষ্টের সম্মত বলি 'দময় জ্বরে বিবীর্ণ হইয়া বাইতেছে।' ইংরেজীতে 'heart-rending' কথাটিও এই অর্থই প্রকাশ করে। আশ্রয়ের 'ভগ্নদম' ও ইংরেজী 'broken hearted' প্রভৃতি কথার ব্যর্থ অর্থ দ্বন্দ্বের সহিত যোগের দ্বারা পরিষ্কার রূপে উপলব্ধি হইতে পারে।

ইংরেজী 'heart' শব্দ সংস্কৃত 'জ্ব' শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। তাহাতেই উক্ত শব্দের মধ্যে অর্থগত একত্র সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

আমাদের হৃদয় কথাটিতে মিত্রভাবের দ্বারা যে আমাদের হৃদয়ের প্রেরণতা উৎপাদন হয় তাহাটী বুদ্ধিতে পাওয়া যায়। তদ্বিশীতে 'হৃদয়' কথাটিতে অমিত্রভাবের দ্বারা হৃদয়ের অগ্রসরতা উৎপাদন হয় তাহাই বুঝা যায়। এই উক্ত ভাবই যে

দ্বন্দ্বের ক্ষমতির ভাব ও অক্ষমতার ভাব তাহাতে সম্বন্ধ নাই।

দ্বন্দ্বের ক্ষমতাই আধার হুতরং ভাবের সহিত দ্বন্দ্বের যেমন সম্বন্ধ ক্ষমতের সহিতও যে ভাবের তদ্রূপ সম্বন্ধই হইবে তাহা সহজবোধ্য। আমাদের একটি কথা আছে "রক্তের . টান", তাহাতে রক্ত সম্বন্ধ-মূলে যে একটি ভাবের বন্ধন ঘটে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। ইংরেজীতে অসম্ভাব বুঝাইতে 'ill-blood' কথার প্রয়োগ হইয়া থাকে। জোনের ভাব উদ্ভিত হইলে 'blood is up' কথার দ্বারা প্রকাশিত হয়। ইহা হইতে রক্তের উপর ভাবের কিরূপ প্রভাব তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইংরেজীতে 'warmth of feeling', 'warmth of love' প্রভৃতি যে সকল কথা আছে তাহাতে উক্ত শোণিতের সহিতই যে এই সমস্ত ভাবের বিশেষ যোগ তাহাই যেন প্রমাণিত হয়। আমাদের "হৃদয়রক্ত" কথার সহিত রক্ত কথার যে মূলগত সাদৃশ্য বস্তুমান আছে তাহাও রক্তের সহিত অমুরাগের সম্বন্ধেই যেন প্রমাণ দিয়া থাকে। রক্ত শব্দ রঞ্জিত অর্থের প্রকাশক। অমুরাগের দ্বারা রক্তের বর্ণ বিশেষরূপে উজ্জ্বলতা ধারণ করে—ইহাই রক্তমাখের তাৎপর্য বলিয়া বোধ হয়। 'বিরাগ' 'বিরক্ত' শব্দের দ্বারা ইহার বিপরীত ভাব অর্থায় রক্তের বিবর্ণ ভাব প্রকটিত হয়—ইহাই যেন তাৎপর্য বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ জ্ব, জ্ব, হর্ষ, শোক প্রভৃতিতে যে রক্তের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া থাকে

—তাঁহা বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন।

এই প্রকারে রক্তের মধ্যে কিরূপে প্রথম চৈতন্তের অতীত সজাত হইয়া রক্তের

জ্বলিবার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহা জড় দ্রব্য ও চেতন জগৎ-তত্ত্ব দ্বিগুণ প্রাপ্ত হইয়াছে—তাঁহা আমরা ভাষা ও সাহিত্যে সুস্পষ্ট প্রতিকলিত দেখিতে পাইলাম।

ঐশ্বর্যশালী চক্রবর্তী।

ভারতের খনিজ পদার্থ

আমাদের স্বর্ণ-প্রভৃ ভারত চিরকাল বহু রত্নের আকর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। আমাদের দেশের স্বর্ণ এবং হীরক দৌলার্য্য-প্রভৃতির জগৎ আলো করিত। কিন্তু দেই প্রাচীন কালে খনিজ পদার্থ খনি হইতে উৎসে তোলা অত্যন্ত ক্লেশসাধ্য ছিল। স্বর্ণের কবিত-কাতি চিরকালই মানব-সমাজকে প্রলুব্ধ করিয়া আসিয়াছে। স্বর্ণ ব্যতীত ভারত ইন্দ্রাণীর জন্মও বিখ্যাত ছিল। আমাদের গ্রাম্য কণ্ঠকাণ্ডগণ যে সমস্ত ইন্দ্রাণী তৈয়ারি করিত, যুরোপের কারিকরেরা বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহা জানিত না। আমাদের কাঁসার এবং অস্ত্রাস্ত্র ধাতুর কার্য্য অনেকদিন অবধি জগতের নিকট আদর্শস্থানীয় ছিল।

কিন্তু ভারতবর্ষের নেতৃত্ব বহুদিনস্থায়ী হইল না। যুরোপ কালের সুবিধার জন্য Steam power এবং electric power আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। রেলওয়ে এবং টেলিগ্রাফ লোকের বাতায়ন এবং বিভিন্ন প্রদেশে জিনিষের আমদানী ও রপ্তানী সুবিধাজনক করিয়া তুলিল।

আমাদের ভারতীয় শিল্পিগণ বহুদিন ভারতের বাহিরের কোন ধরম না রাখার ক্রমশঃ প্রতিবন্ধিতার হস্তিরা আসিতে লাগিলেন। প্রথম অষ্টাব্দ শতাব্দী অবধি আমরা কোন খনিজ পদার্থ বিদেশ হইতে আমদানী করি নাই; দেশোৎপন্ন প্রকার সাহায্যেই আমরা প্রয়োজনীয় সমস্ত কাঁচাই দেশ অশুখলার সহিত চালাইয়া লইতে পারিতাম। পঞ্চাশের যুদ্ধের পর হইতে ইংলণ্ডের প্রভু ভারতে অটুট হইয়া উঠে। ভারতও ক্রমশঃ ইংলণ্ডের সহিত আদান-প্রদান করিতে আরম্ভ করে। উনবিংশ শতাব্দীতে যুরোপে যুগান্ত উপস্থিত হয়। কারণ এই সময়েই steam power আবিষ্কৃত হইয়াছিল। রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ ক্রমশঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। দীর্ঘকালব্যাপী ক্রান্তী-রাষ্ট্র-বিপ্লব যুরোপের জনসাধারণের মধ্যে নবোৎসাহ ও কণ্ঠপ্রেরণা আগ্রহ করিয়া তুলে।

ভারতে ইংরাজ-সাম্রাজ্যের বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ এখানে ইংরাজী সভ্যতার ছায়াও

বিশালতর হইয়া উঠিতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ড কৃষিকার্য্য প্রায় ছাড়িয়া দিয়া কলকারখানার দিকে বেশী মূখিয়া পড়ে। ১৮৪৪ সালে যখন free trade principles গ্রহণ হয় এবং Cornlaw একেবারে তুলিয়া দেওয়া হয় তখন হইতেই ইংলণ্ড প্রকৃত পক্ষে কারখানার জীবন গ্রহণ করে।

আমাদের দেশে ক্রমশঃ ইংলণ্ডের কারখানার প্রস্তুত হুগত মূল্যের দ্রব্যের আমদানী হইতে লাগিল। যুরোপীয় বর্ণিবজের উদ্ভাবিত বস্ত্র যেমন আমাদের তাঁতীদের ব্যবসা অচল করিয়া দেয়, সেইরূপ সস্তার প্রস্তুত যুরোপীয় লৌহ ভারতে আসিয়া আমাদের কাষারদের ব্যবসারেও বা দিল। কারখানার একসঙ্গে একেবারে অনেক দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারা যায়। একেবারে অনেক দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারিলে মানা কারণে ধরচও খুব কম পড়ে। কাজেই হাতে প্রস্তুত দ্রব্য কারখানার প্রস্তুত দ্রব্য অপেক্ষা অধিকতর মর্য্যাদা হয়।

১৯০১ হইতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের statistical report দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে, গড়ে প্রতিবৎসর ১০,১৫৮,২৫২ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য আমরা ভারতে আমদানী করিয়াছি। কাঁচের দ্রব্য, মাটির ও চীনা মাটির খেলনা ইত্যাদি, গোহার দ্রব্য, ছুরি কাঁচি ইত্যাদি এবং রেলওয়ের কলকজা প্রভৃতি একসঙ্গে ধরিলে ৮০ লক্ষ পর্বাঙ্ক হইয়া সুতরাং দেখিতে পাইতেছি যে, 'আমরা' প্রতিবৎসর প্রায় এক কোটি

টাকার বনিজ-পদার্থ আমদানের ব্যবহারের অল্প বিশেষ হইতে আমদানী করি। আমরা কোন্ কোন্ দ্রব্য আমদানী করি, নিম্নে তাহার একটা তালিকা দেওয়া হইল।

বনি হইতে উৎপন্ন তৈল ২৪৫৬৮৭৫ পাউণ্ড।

লৌহ	২২৪৪২০৮ ,,
ইস্পাত	১৫১৭৯৬৯ ,,
তামা	১০২০৮৫৩ ,,
হীরা, মুক্তা ইত্যাদি	৮৩৫৩১৯ ,,
ডাক্তারি ঔষধপত্র	৩৭৭৪২৭ ,,
করলা ইত্যাদি	৩০২৩১৪ ,,
মায়বেল পাথর প্রভৃতি	১৭৪২৭০ ,,
সীসা	১৩৬৪৪৪ ,,
জার্মান সিলভার	১২৭৬১৪ ,,
পিতল	৬৬০৮৪ ,,
অজান্ত বনিজ পদার্থ	৭১৬৫১ ,,
দস্তা	৮৭৯৮২ ,,
কুইক্ সিলভার	২৮২৬০ ,,

উপরিস্থিত তালিকাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আমরা যত জিনিষ আমদানী করিয়াছি তাহার মধ্যে লৌহের ভাগই সর্বাধিক অধিক। লৌহ ও ইস্পাত শতকরা ৩৭, তামা ১৭, বনিজ তৈল ২৪.৩, হীরা মুক্তা ইত্যাদি ২৪.২ এবং লবণ ৪.৫ ভাগ।

আমাদের ভারতের বনিগুলিও অনর্থক পড়িয়া নাই। সভ্য-জগতের demand যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, মানবের কার্য্যক্ষেত্রও সেই অনুগাতে প্রসারিত হইয়া পড়ে। আমরা পূর্বে যে পরিমাণ বনিজপদার্থের ব্যবহার করিতাম, এখন

ভাষাধার ব্যবহার অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা প্রতিবৎসর ৮০ লক্ষ পাউণ্ডের জ্বা বিদেশ হইতে আমদানী করি এবং তাহাছাড়া আরও অনেক টাকার জ্বা আমাদের দেশেই উৎপন্ন করিতেছি। নিম্নের তালিকাটার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, আমাদের খনিজ পদার্থের সরোজনীয়তা ক্রমশঃ কেমন বাড়িয়া চলিয়াছে। *

কয়লা। আমাদের দেশের লোক পূর্বে কয়লার ব্যবহার জানিত না। উন্নতিশীল সভ্যবীতে ইহার কার্যকারিতার বার্তা মানব-সমাজে প্রচারিত হইলে, ভারতও কয়লার খনি আবিষ্কার করিবার চেষ্টা হইতে থাকে। কয়লা, ভারতের প্রধান খনিজ পদার্থ। মূল্য হিসাবে বিচার করিতে গেলে, সমস্ত উৎপন্ন কয়লার মূল্য সমস্ত উৎপন্ন স্বর্ণের মূল্যের নীচেই। আমরা বহু কয়লা উৎপন্ন করি তাহার শতকরা ৯৪ ভাগ আমাদের দেশেই নানান কার্যে খরচ হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের খনিজসমূহ হইতে ১,৩২৭,৮১৮

টন কয়লা পাওয়া যায়; ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ৭,৪৩৮,৩৮৬ টনে গিয়া দাঁড়ায়।

কয়লা বহু কার্যে লাগে। আমাদের রন্ধনের জন্ত, কয়লা নিত্যপ্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে কল-কারখানাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, সেগুলি চালানোর জন্তও কয়লার অত্যন্ত আবশ্যক। রেলওয়ে-গুলিতেও যথেষ্ট পরিমাণে কয়লা খরচ হয়।

ভারতের কয়লার খনিগুলি এখন জ্বলন্ত ভাবে চালিত হইত না, তখন আমরা বিলাত হইতে কয়লা আমদানী করিতাম। যদি আমাদের দেশেই প্রচুর পরিমাণে কয়লা না বিলিত, তাহা হইলে কে বলিতে পাবে, আজ এ দেশে এত কল-কারখানা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত কিনা! ভগবানের ইচ্ছায় আমাদের এ বিপদে পড়িতে হয় নাই। জগতে যেমন কল-কারখানার কার্যকারিতা প্রতিপাদিত হইল, সেই সঙ্গে সঙ্গে লোকে কয়লারও কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে পারিল। ভারতবর্ষ প্রথমে উপযুক্ত অর্থ এবং চেষ্টার অভাবে কিছু পিছাইয়া পড়ে। ক্রমশঃ যেমন অর্থ এবং

• খনিজ পদার্থ	১৮৮৮ পাউণ্ড	১৯০০ পাউণ্ড	১৯০৩ পাউণ্ড	গড়শতকরা পাউণ্ড
সোদা	১৬০৮৫০৪		২৩০২৫২৩	
কয়লা	২৪৭১৬২		১২২২৭১৬	
লবন	৩৪৮৯০৩		৩৩৬১৪৭	
পেট্রোলিয়াম	৩৭৮২১		৩৪৫৩৪৪	
কৃষ্ণ	৫৭২৫০		৯৮৪৭৫	
পারদ	৪৩৮৯০		৮৬২৭৭	
লৌহ	১২৪০৩		১৩২৭০	
টিন	২৪৫৩		৪৫০	

চেটে হইতে লাগিল, তেমনি ভারতবর্ষেও কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা এবং করণার খনি আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। ভারতবর্ষে করণা-খনির আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশ হইতে করণার আমদানী ক্রমশঃই কমিয়া আসিল। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে আমরা ৮৪৮৩৬৭ টন করণা আমদানী করি, কিন্তু ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে আমরা মাত্র ১২৭২২ টন আমদানী করি। এখনও আমাদিগকে কিছু কিছু করণা বিলাত হইতে আনিতে হয়। তাহার কারণ Welsh coal, navigation এর পক্ষে বড় সুবিধা-জনক। এরূপ উৎকৃষ্ট করণা আমরা এখনও ভারতে উৎপন্ন করিতে পারি নাই। বর্তমান, Welsh coal এর মত ভাল করণার খনি আমরা আবিষ্কার করিতে না পারিব, ততদিন কার্বোয় সুবিধার জন্য বাধা হইয়া আমাদিগকে Welsh coal ক্রয় করিতেই হইবে। আবার যেমন কিছু পরিমাণে করণা আমরা আমদানী করি, তেমনি কিছু পরিমাণে করণা আমরা রপ্তানীও করি। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে আমরা ৪৪১২৪৮ টন করণা রপ্তানী করি। আমাদের রপ্তানী করণা প্রধানতঃ সিংহল, আফগান, জাভা প্রভৃতি ভারত-মহাসাগর-হিত দীপ-সমূহে গিয়া থাকে। কিন্তু, সমস্ত উৎপন্ন করণার, মতকরা ৯৪ ভাগ আমরা দেশেই ব্যবহার করি। আমাদের রেল-গুলির বাৎসরিক করণার খরচ প্রায় ৬,০০,০০০ টন।

করণার উৎপত্তি স্থল। করণার উৎপত্তি স্থল দুই ভাগে বিভক্ত। Gondwana coal-fields এবং Tertiary coal-fields। বঙ্গাল, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য-ভারতবর্ষ,

মধ্য-প্রদেশ এবং হায়দ্রাবাদ, Gondwana coal-fields এর মধ্যে পড়ে। বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, রাষ্ট্র-পুতানা এবং আসাম, Tertiary coal-fields এর মধ্যে পড়ে। Gondwana coal-fieldsই বিখ্যাত। মতকরা ৯৭.৬ ভাগ করণা Gondwana করণার খনি-গুলি হইতে পাওয়া যায় এবং মাত্র ২.৪ ভাগ করণা, Tertiary করণার খনিগুলি হইতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত করণার খনি হইতে, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ১৬,২০৮,০০০ টন করণা উৎপন্ন হইয়াছে। ৩২৪০০০ টন করণা, খনির সম্বাদিকারীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে, সর্বমুদ্র ১৬৪৩২০০০ টন করণা পাওয়া গিয়াছে।

Gondwana করণার খনির মধ্যে এক দামোদর উপত্যকাতেই মতকরা ৮৬ ভাগ করণা উৎপন্ন হয়। রাণীগঞ্জ এবং ঝেরিগাই করণার অন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে, রাণীগঞ্জেই বাঙ্গালার প্রথম করণার খনি আবিষ্কৃত হয়। রাণীগঞ্জও যথেষ্ট পরিমাণে করণা উৎপাদন, ক্রিয়া ভারতের করণার খনি-গুলির মধ্যে ঈর্ষহান অধিকার করিয়াছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে হইতে রাণীগঞ্জ, ঝেরিয়ার খনিগুলির কাছে হার মানিয়াছে। উৎপাদিকা-শক্তি ধরিতে গেলে, এখন ঝেরিগাই প্রথম। রাণীগঞ্জ এখনও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে, ঝেরিয়ার খনি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ঝেরিগাই উৎপাদিকা-শক্তিতে রাণীগঞ্জকে পরাস্ত করে। রাণীগঞ্জের খনিগুলি প্রায় এক

পতাবী কাল ধরিয়া কয়লা যোগাটিয়া আসিতেছে। সুতরাং, এখনও রাষ্ট্রপক্ষ যে বিত্তীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়।

সুবর্ণ। প্রাচীন পুঁথি ইত্যাদি পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষে প্রচুর সুবর্ণের খনি ছিল। ভারতের নদী-সমূহও বালুকণার সহিত বর্ণ-রেণু বহিয়া লইয়া বাইত। সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র হইতে এখনও অনেক আউন্স বর্ণ প্রত্যেক বৎসর উৎপন্ন হয়। এই বালুকানি হইতে সঞ্চিত বর্ণের তালিকা রাখা বড় শক্ত। তাহাদের অধিকাংশ ভাগই স্থানীয় লোক-জনকর্তৃক গণনাভ্রমে ব্যবহৃত হয়। এখন মহীশূরের Kolar gold-fieldই সর্বাধিক বিখ্যাত। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে, ইংরাজ-মহাজনদের নগর এইদিকে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর, তাহারা বহুশ্রমের কল লইয়া আসিয়া এই মৌনার খনিতে কার্য আরম্ভ করিয়া নেন। ইংরাজ-বণিকগণের হস্তে বাইবার পূর্ণেও, দেশীয় ব্যবসায়ীগণ এই খনিতে কার্য করিতেন। কিন্তু, তাহাদের উৎপন্ন বর্ণের মূল্য আদ্য-কালকরে তুলনায় নগণ্য ছিল। ১৮৮০ হইতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য করিয়া তাহারা মাত্র ১৯,৮০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের বর্ণ উৎপাদন করেন। আর এদিকে ১৯০৪ হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য করিয়াই, ইংরাজ-কোম্পানী তাহাদের অংশীদারগণকে ৮,২৫০,০০০ পাউণ্ড ভাগ করিয়া দিয়াছেন। এমন কি, মহীশূররাজও ১,০০০,০০০ পাউণ্ড loyalty পাওয়াছেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এই কোলার ফিল্ড

৫৫২,১৯৮ আউন্স সুবর্ণ উৎপন্ন হয়। উহার মূল্য ৩২২৫২৯০০ টাকা। Kolar gold-field-এর পরই হায়দ্রাবাদের হাতি প্রদেশের খনি উল্লেখযোগ্য। গত বৎসরে, এই খনি হইতে ১১৫৮৪১৮ টাকা মূল্যের, ২০০১২ আউন্স সুবর্ণ পাওয়া গিয়াছে। এই দুইটা ছাড়া, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রদেশে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৌনার খনি আছে। সেগুলি হইতেও অল্পবিস্তর সুবর্ণ পাওয়া যায়।

লৌহ। যুরোপ হইতে সত্য লৌহ আমদানীর সহিত, ভারতের লৌহ-ব্যবহার এক একবার নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের খনিসমূহে প্রচুর পরিমাণে লৌহ নিহিত আছে। এই লৌহের খনিসমূহ ভারতের পূর্বভাগে অবস্থিত। মাদ্রাজ প্রদেশের সাহুই টেট এবং বেলারি জেলায়, মধ্য প্রদেশের রাইপুর এবং জব্বলপুর জেলাতেই অধিক পরিমাণে লৌহখনি বিস্তারিত। বর্তমানের উত্তর-পশ্চিমাংশ এবং মানভূমের মাটির সহিত যথেষ্ট লৌহ মিশ্রিত আছে। বরাকর iron-works-এ এই মাটি বিশ্লেষণ করিয়া iron-ore তৈয়ারী করা হয়।

এতদিন, বরাকর লৌহার কারখানার pig-ironই তৈয়ারী হইয়া আসিতেছিল। এখন, basic steel তৈয়ারী করিবারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত কানৌ-মাটিতে টাটার লৌহার কারখানা বেশ কাজ করিতেছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে, এই কারখানা হইতে ৩০০,০০০ টাকা দামের ৩০০,০০০ টন লৌহ উৎপন্ন হয়। ১৯১২ সালে, ৪৭১২৩২ টন টাকা দামের ৪৭১২৩২ টন লৌহ উৎপাদিত

হয়। টাটার এবং বরাকরের লোহার কারখানা বাঙ্গালা বা খেটনাগপুর হইতেই কাঁচা লৌহ প্রাপ্ত হয়। এইজন্য এই সমস্ত কারখানা, কাঁচা মাল সস্তার পায় বলিয়া সুবিধামত কার্য্য করিতে পারে। বাঙ্গালার সাধারণতঃ একটন্ লোহার দাম ১১/০, কিন্তু ভারতের অন্তর উহার মূল্য ৪ টাকা। এইজন্য, যুক্ত-প্রদেশে, মধ্য-ভারতবর্ষে, মাদ্রাজে, হাওড়াবন্দে, মদীপুরে, রাজপুতানায়, ত্রক্ষে এবং পান্নাবে, লোহার কারখানাগুলি নগণ্য অবস্থায় আছে। তাহাদের উৎপন্ন ত্রব্যের পরিমাণও বৎসানুক্রমিক।

পেট্রোলিয়াম। এখন আর রেডীর তেল আমাদের ঘরে আলো জ্বালায় না। এখন হয় আমরা কেরোসিন তৈল ব্যবহার করি, না-হয় ত্রক্ষেদেশে প্রস্তুত মোমবাতি ব্যবহার করি। ১৯০০-০১ খৃষ্টাব্দে আমরা মাত্র ৭২,০০০,০০০ গ্যালন কেরোসিন তৈল পুড়াই। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে, সেই জায়গায় ১৭৪,০০০,০০০ গ্যালন তৈল পুড়াইয়াছি। এখন বেশ বৃদ্ধি ঘাইতেছে যে, কেরোসিন তৈলের ব্যবহার আমাদের দেশে ঘরে ঘরে কেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কেরোসিন তৈলের কতক আমরা আমেরিকা এবং রুশিয়া হইতে আমদানী করি এবং বাকি ভাগটা আমাদের দেশ হইতেই প্রাপ্ত হয়। পশ্চিমে বেলজিয়ান ও পান্নাবে, এবং পূর্বে, আসাম ও ত্রক্ষে কেরোসিন তৈলের খনি আছে। আসাম এবং ত্রক্ষের তৈলের খনিই সমধিক এনিছ। ইংরাজকর্তৃক অধিকৃত হইবার পূর্বে

ত্রক্ষেদেশের খনিগুলি হইতে দেশীয়গণকর্তৃক বৎসর্বে ২,০০০,০০০ তৈল উত্তোলিত হইত। স্বাধিকারীর অধীনে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে হইতে, এই খনিগুলি, সুবোণীর প্রথায় চালিত হইতে থাকে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে, এই খনিগুলি হইতে ১০,০০০,০০০ গ্যালন ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৪০,০০০,০০০ গ্যালন তৈল উৎপন্ন হয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে, ২০০,০০০,০০০ গ্যালন তৈল পাওয়া হইয়াছে।

লবণ। মধ্য-আফ্রিকার লবণের অভাব হইতে পারে, মধ্য-রুশিয়ার লবণের অনটন সম্ভব, কিন্তু সাগর-বলরিতা ভারত-ভূমিতে কখনও লবণের অভাব হইতে পারে না। আমাদের বাৎসরিক লবণ-ব্যয় ১,৪০০,০০০ টন্। ইহার শতকরা ৪৪ ভাগ ভারত-সমুদ্রের জলরাশি হইতে প্রস্তুত হয়। ৪৩২,০০০ টন্ ভারতের বাহির হইতে আমদানী করা হয়। অবশিষ্ট লবণ রাজপুতানা এবং পান্নাবের লবণের পাহাড় হইতে সংগৃহীত হয়।

পারদ।—ভারতবর্ষে পারদ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আমরা প্রত্যেক বৎসর ৭৮,৮৮৮ পাউণ্ড মূল্যের পারদ ইংলণ্ডে পাঠাই। ইংলণ্ড আবার এই পারদ, জার্মানি এবং আমেরিকাকে বিক্রয় করে।

পূর্কোক্ত জিনিষগুলি বাতীত আরও বহু প্রকার খনিজ পদার্থ ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। সেগুলির কথা সকলের ভেতন ভাল লাগিবে না বলিয়া এইখানেই প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

ভেইয়া

নন্দবোহারা যখন রাগায়াগি করিয়া চলিয়া গেল খোকাকে লইয়া তারি সুস্থিগে পড়িলাম। খোকা নন্দর বড় ভাঙটা; সে এমন কারাকাটি আরম্ভ করিল যে বাড়িহুঙ্ক-সকলে অস্থির হইয়া উঠিলাম। এমনও মনে হইতে লাগিল দূর-দূর হাই, না-হর হাতে পায়ে ধরিয়া নন্দকে ডাকিয়া আনি। কিন্তু সে যে কোথায় উধাও হইয়া গেল কোনো সন্ধানই পাইলাম না। খোকাকে লইয়া বিদ্রম আভাসেরে পড়িয়াছি এমন সময় ছোট্ট বোহারা তার গ্রাম-সম্পর্কে এক সাত-বছরের ভাই-পৌকে লইয়া হাজির। বলিল—“হুজু! একে আপনায় বোকার নকর রাগুন।”

আমি তো অবাক। এতটুকু বাচ্চা চাকরী করিবে কি! নিজেই সামলাইতে পারে কিনা সন্দেহ, খোকায় হেপাজৎ করিবে! আমি অমত করিলাম; কিন্তু খোকা দেখি বাড়ির কর্তার উপরও কর্তৃত্ব করে। সে নিজেই তার চাকর পসন্দ করিয়া লইল। মরুকে দেখিবামাত্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তার বড় বড় চুলের গোচ্ছা লইয়া দিবি খেলা শুরু করিয়া দিল।

মরু খোকায় তার একেবারে ত্রিভঙ্গ সুস্থিতে বৈকিয়া পড়িয়াছিল—খোকাকে ভালো করিয়া তুলিয়ারাধিতে পারিতেছিল না, —পড়ে পড়ে এমন অবস্থা। কিন্তু খোকায় তো তাতেই মজা—সে কিছুতেই মরুকে ছাড়িবে না, জোর করিয়া কাড়িয়া লইতে

গেল কারাকাটি করে। কাণ্ডেই তখনকার মতো মরুকে রাখিতে হইল। মনটা খুৎখুৎ করিতে লাগিল—ছেলেমানুষ, খোকাকে লইয়া কখন কি-এতটা কাণ্ড করিয়া বসে। কিন্তু নন্দর জন্ম কানিয়া কানিয়া খোকায় অস্থিগে পড়িবার ঘো হইয়াছিল, এখন সে ভাবনা দূর হইল বলিয়া মনটাকে প্রবোধ দিলাম।

মরু ছেলেমানুষ। চোখদুটি বড় বড়, মাথাটি একরাশ কোঁকড়া চুলে তরা। মুখ-খানির উপর এমন-একটি কোমলতা মাখানো যে মারা করে। বেচারার মা বাপ নাই। থাকিলে কখনই এই ননীস পুতুলকে বিদেশ বিতৃত্যে এমন করিয়া ছাড়িয়া দিত না—এই মনে করিয়া তার উপর একটা ঘেহের আকর্ষণ আপনা হইতেই জন্মায়।

প্রথমে ভাবিয়াছিলাম—মরুকে লইয়া বেশিদিন চলিবে না, ছেলেমানুষ কাজ কিছু পারিবে না কেবল পরমাই গণিতে হইবে, এখন দিনকতক থাক্, পরে একটা ভালো দেখিয়া বোহারা রাখিয়া উহাকে বক্সিস দিয়া বিদায় করিলেই চলিবে। কিন্তু ক্রমে তাহা ঘটয়া উঠিল না। খোকা তো এক দণ্ড মরুকে ছাড়িবে না, গৃহিণীও আপত্তি করিতে লাগিলেন। আমি একবার জোর করিয়া তাহাকে তড়াইতে গিয়াছিলাম কিন্তু তার মুখের সামনে গিয়া আর সে কথা বলিতে পারিলাম না।

(২)

মল্প গ্রামে এক বছর আমাদের বাড়িতে আছে। বেচারার কোনো গোল নাই সত্যদিন যেন ভবে-ভয়েই থাকে—সর্বদাই মুখটি নীচু করিয়াই আছে, কাহারো সামনে পড়িলে ছুটিয়া পলাইতে পারিলে যেন বাচে। বাড়ির কাহারো সঙ্গে তার বড় ঘনিষ্ঠতা দেখিতাম না, একা-একাই কাটাটত, কেবল খোকির সঙ্গে সে খুব জমাইয়া লইয়াছিল।

আমার চোখে সে বড় পড়িত না,—সে যে কোথার থাকে, কি করে তাহা আমি ভালোরকম জানিতাম না। এতদিন পরে একদিন আমি তাহার গলা পাইলাম। বাহির-বাড়ি হইতে ভিতরে আসিতেছি, চাকিরদের ঘরের ভিতর কে যেন কোঁপাইয়া কানিতেছে, আর ছোট্ট মধ্যে মধ্যে গর্জন করিয়া উঠিতেছে। আমি ব্রহ্মটুক ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—“ব্যাপার কিরে ছোট্ট?”

ছোট্ট, বস্ত্রিল—“বাবুজি! আমি দেশ যাবো শুনে মল্প কানিতে লেগেছে—বলে আমিও দেশ যাবো।”

আমি বলিলাম—“আহা ছেলেমানুষ! থাক না।”

ছোট্ট বলিল—“কার কাছে বাবে বাবু, ওর তো কেউ নেই!”

আমি ডাকিলাম—“মল্প!”

মল্প বীরে বীরে বাহির হইয়া আসিল।

আমি বলিলাম—“তুই বাড়ি বাবি?”

সে বলিল—“হ্যাঁ!” কিন্তু তার গলা হইতে যেন বর বাহির হইল না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“কার কাছে বাবি?”

মল্প একটা কোঁপানির বেগ বুকের মধ্যে আটকাইয়া বলিল—“ভেইয়ার কাছে।”

—“ভেইয়া কে রে?”—জিজ্ঞাসা করিতেই ছোট্ট বলিয়া উঠিল—“ওর ঠাকুর্দা। -বুড়ো মারা যাবার সময় আমারই হাতে ওকে দিয়ে বার।”

আমি বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম—“তবে যে বলে ভেইয়ার—?”

ছোট্ট বলিল—“বাবু, হাবা ছেলে কিছুতেই বুঝবে না ওর ঠাকুর্দা মরেছে।”

আমি মল্পর শিঠের উপর হাতখানা বুলাইয়া বলিলাম—“তুই কার কাছে বাবি মল্প! তোর ভেইয়া তো নেই।”

মল্প কোঁপাইতে কোঁপাইতে বাহ্যিক হুসে কেবলই বলিতে লাগিল—“ভেইয়ার কাছে যাবো।”

ছোট্ট চকু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল—“তবে তাই যা তোর ভেইয়ার কাছে।”—বলিয়া একটা প্রচণ্ড কৌল তুলিল।

মল্পর মুখ দেখিয়া আমার মাথা করিতেছিল, আমি বলিলাম—“আহা, নিরে যা একবার ওকে দেখে।”

ছোট্ট উত্তর হইয়া বলিল—“সে হবে না বাবু, আমি ঐ হতভাগটাকে বাড়ি করে নিতে বাড়ি-হুজ লোক যেন আমার মারতে এল—এখানে পালিয়ে এসে তবে বাচলুম।”

ক্লশ বলিয়া ছোট্টর খ্যাতি ছিল, বোধ হয় সেটা ওর বংশেরই ধারা এই ভাবিয়া আমি বলিলাম—“তোর কিছু ভাবনা নেই, আমি

তার সব পরচ-পত্র দেয়—তুই ওকে নিয়ে যা।”

টাকার কথাতেও ছোট্টর তেমন উৎসাহ দেখা গেল না, সে একটা ঢোক গিলিয়া বলিল—“আচ্ছা বাবু।”

বলিল—“আচ্ছা বাবু।” কিন্তু হতভাগা ছোট্টর এমন পাজি, বাইবার দিন গাপনে চলিয়া গেল, মগ্নকে সঙ্গে লইল না।

মগ্ন চাকরদের ঘরে তক্তাপোষের নীচে পড়িয়া সমস্ত দিনটা কোঁপাইতে লাগিল।

(৩)

মগ্ন সেদিন খোকাকে লইয়া খেলা করিতেছিল। একটা লাগ-রঙের কাঠের শোলা সে খোকার চাতে তুলিয়া দিতেছিল, খোকা সেইটা লইয়া তাকে ছুঁড়িয়া মারিতে ছিল। গোলাটা একবার মগ্নর কপালে গিয়া ঠক্ করিয়া লাগিল। স্তনিগম মগ্ন বলিতেছে—“খোকাবাবু ছুঁই বাবু, মগ্নকে মারে। আমার ভেইয়াবাবু ভালোবাবু, আমাকে মারে না। ভেইয়া কেমন পাখীর বাচ্ছা যথেষ্ট দেখ, কাঁধে উঠিলে কেমন ঘোড়া চড়ায়—আমি খোড়াকে চাবুক মারি, সে চাবুক ভেইয়ার গায়ে লাগে না। ভেইয়ার কেমন কানো তৈলস্ আছে—তার পিঠে ভেইয়া আমার চড়িয়ে দেয়—খোকাবাবুর তৈলস নেই। ভেইয়ার বক্রী আছে, তার গায়ে আমি হাত বুলিয়ে দিই,—বক্রী পালায় না, আমার হাতে ধাপ খায়। ভেইয়া আমার রোটি দেয়। খোকাবাবু রোটি পায় না, খোকাবাবু ছুঁ পায়, ভাত খায়। আমার ভেইয়ার কাছে ঘাবে খোকা বাবু? ভেইয়া রোটি দেবে।”

খোকা বলিল—“হঁ।”

আর-একদিন দেখি মগ্ন আমার বড় ছেলেকে ধরিয়াছে। কোথা হইতে একটুকরা কাগজ ও একটা পেন্সিল ভোগাড় করিয়া বলিতেছে—“দাদাবাবু, তুমি চিঠি লিখতে পার?”

দাদাবাবুর উৎসাহ দেখে কে!

বলিয়া উঠিল—“হঁ পারি।”

মগ্ন বলিতে লাগিল, সে স্মাখানোচু করিয়া বড় বড় হরকে উজ্জকণ্ঠে বানান করিয়া লিখিতে লাগিল—“ভেইয়া তুমি জলদি এস। খোকাবাবু তোমার তৈলস্ দেখবে, বক্রী দেখবে। খোকাবাবু বলে তৈলস্ দেখলে ডর লাগবে না।”

মগ্নর আরো অনেক কথা লিখিবার ছিল কিন্তু ঐ কথাগুলিতেই দাদাবাবু কাগজ ভাঙি করিয়া ফেলিলেন, কানেই চিঠি শেষ করিতে হইল। মগ্ন চিঠিখানা সবছে ছুঁড়িয়া টাংকে ভুলিয়া রাখিল। খোকাকে বলিল—“খোকাবাবু তোমার ওজো তৈলস্ আসছে। তৈলস্ দেখে তার করবে না ত? আমার কিছু ভয় করে না।”

একটু পরে আমার বড় ছেলে কোথা হইতে একখানা খাম ভোগাড় করিয়া আনিয়া বলিল—“মগ্ন! ঠিকানা লিখতে হবে। ইংরেজিতে লিখব, আনিসু। বল কি লিখব?”

মগ্ন বলিল—“লেখ ভেইয়া!”

বড় খোকা খানিকক্ষণ উপরের দিকে চাহিয়া বিড়বিড় করিয়া বানান ঠিক করিয়া লইল, তারপর বড় বড় বীকা অক্ষরে

লিখিতে লাগিল— VA তে E ভেই AA
ভেইয়া VAEAA

—“তারপর ?”

ময় বলিল—“তারপর আবার কি ?”

—“মুখ ! এতে কখনো চিঠি যাব !

তোদের বাড়ি কোথায় বসে।”

ময় বলিল—“আমাদের বাড়ি ? সে
দরিদ্রা কিনারে ! ও ভারী দরিদ্র ! ও
দরিদ্রার আমি চান্ করি, ভেইয়া চান্
করে, আমাদের ভৈন্ চান্ করে—ভিখু
পারে না ;—সে কাঁদে।”

বড় থোকা ইংরাজি অক্ষরে “দরিদ্রা”
লিখিতে মাথা চুলকাইতে লাগিল। শেষে
নিকৎসাহ হইয়া বলিল—“ময়, ও কথা
ইংরিজিতে লেখা যাব না, বুঝি ? তুই
ইংরিজি করে বসে।”

ময় বলিল—“দাদাবাবু, আমি
তোমার মতো ইংরিজি পড়িনি।”

—“তবে তোর চিঠি যাবে কেমন করে ?”

ময় বলিল—“ঠিক যাবে। ডাকগুণা
ভেইয়াকে ঢেনে—সে কত চিঠি ভেইয়াকে
দেয়। আমার চিঠি ঠিক ভেইয়াকে দেবে।
তুনি দাওনা আমাকে—আমি ডাকে দেব।”

খবর পাটগাছিলায় ময়, সে চিঠি
ডাকে দিরাছে কিন্তু তার গতি কি হইল
আনিয়া।

প্রায়ই তনিতান থোকা কাঁদিলেই
ময় তাকে সাহায্য দিতেছে—“চুপ কর
খোকাবাবু, তোমার জেত ভৈন্ নিয়ে ঐ
ভেইয়া আসচে।”

(৪)

পুণ্ডার সময় সপরিবারে কাণী বেড়াইতে

আসিয়াছি। ময় সঙ্গে আছে। দেখিতে
দেখিতে কোথা দিরা যে দিন করটা কাটিয়া
গেল বলিতে পারি না। ফরিবার সময়
কাছে আসিয়াছে। গৃহিণী হইতে আরম্ভ
করিয়া বাড়ির সকলেই এখন জিনিষ কিনিতে
বাস্ত—দেখে গিরা উপহার বিলাইতে হইবে।
কেনার হেঁদাম আর কিছুতেই শেষ হয়
না ;—উপহারের সামগ্রী বাস্তবন্দী করিয়া
হঠাৎ মনে পড়ে ঐ যাঃ অগ্রকের জন্ত
কিছুই লওয়া হয় নাই,—অমনি ছুট
দোকানে ! বাচবিচার রহিল না—নিকট,
দূর, পাড়াসম্পর্কে সকল-প্রকার আক্সীরের
জন্তই কিছু-কিছু লওয়া হইল। বাড়ির
চাকর-নকরবাও বাদ রহিল না। কাণী-
ক্ষেত্রের মানচিত্র, বিখ্যেখের প্রসাদ, হরি-
নামের মালা, তার জুলি প্রভৃতি গম্ভীর
জিনিষও রহিল, আবার গালায় চুড়ি,
কাঁচপোকার টিপ, পানের স্মৃতি, বিশকোটা
প্রভৃতি ছোটকি জিনিষেরও অস্ত্র রহিল না ;—
খুলিয়া সাজাইলে একটা স্নাত্তমত মনোহারী
দোকান পাতি যায়।

এই সব দেখিয়া আমার মনে
হইতেছিল, জিনিষ-কেনার ব্যতিক্রম একটা
এপিডেমিক বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছে।
এমন কি, গরীব চাকরদাসীরাও নিজের
পায় নাই। ছোট্ট যে অতবড় রূপণ সেও
নগর ছুই টাকা খরচ করিয়া এক গোটা
কিনিয়াছিল। কেবল ময়কে কিছুই
কিনিতে দেখি নাই—আহা, কার জন্তই বা
কিনিবে ? সে কেবল অথাক হইয়া
এই কেনা-কাটার ধুম দেখিত। কখনো
কখনো দেখিতাম ফিরিঙ্গিগণের এক

একটা ভিনিষ দে হাতে, করিয়া নীড়িয়া-
চাড়িয়া দেখিতেছে, তারপর ঘোবে ঘোবে
আবার মাদিয়া দিতেছে।

বাইবার দিন সকালে ময়ূ আসিয়া
বিরস বদনে বলিল—বাবুজি, আমার তো
কিছু কেনা হইল না।”

আমি বলিলাম—“তোমার জেজে কি মেন
বল।”

সে বলিল—“আমার জেজে কিছু চাই
না;—ভেটনার জেজে—”

আমি বলিলাম—“এইনে টাকা, তোমার
যা খুসী কিনে নিয়ে আর।”

ময়ূ টাকা হাতে লইয়া লাকাইতে
লাকাইতে ছুট দিল।

ভাড়াতাড়ির সময়—যাত্রার আয়োজনে
ব্যস্ত, এমন সময় দেখি ছোট্টর সঙ্গে ময়ূ,
বাক্স হইতে ফিরিয়া আসিল—হাতে একটা
পুঁটুলি। কি ভিনিষ আনিয়া দেখিবার
অবসর হইল না।

(৫)

কলিকাতার ফিরিয়াছি। দানী চাকর-
দের কেমন বেগা বিদেশ হইতে ফিরিলেই
তার বাড়ি বাইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠে।
সকলেই সম্বরে ছুটি চাহিয়া বসিয়াছে।
গৃহিণী বাড়িয়া বাড়িয়া ছুটি ময়ূ করিয়া-
ছেন;—একসঙ্গে সবাই গেলে চলিবে কেন?

ছোট্ট ছুটির দলে। সে বাড়ি বাইতেছে
তুনিয়া ময়ূও বারনা ধরিল। আমি
বলিলাম—“তা বাক।” কিন্তু ছোট্টকে
বিখাস নাই, এবার তাকে একটু কড়া
শাসন করিয়া দিলাম।

গেল বাধাইলেন গৃহিণী। তাঁর আপত্তি,

ময়ূ গেলে কিছুতেই চলিবে না, খোকাকে
লইয়া তারি মুদ্রিল হইবে।” এত লোক
একসঙ্গে ছুটিতে বাইতেছে এ সময় ময়ূকে
কিছুতেই ছাড়া যায় না। এবং কি করিতেই
বা ও দেশে বাইবে? ওর দেখানে কে
আছে?

আমি ময়ূর পক্ষ লইলাম কিন্তু হাকিমের
হুকুম টলাইতে পারিলাম না। শেষে
আমার সহিত তর্কে না পারিয়া গৃহিণী বলিয়া
উঠিলেন—“ও যদি যায় তো জেজের মতো
বাক—যেন আর এ বাড়ি-মুখো না হয়।”

ময়ূ বাইবার হুকুম পাইয়া আছলানে
ছুটিয়া গিয়া ছোট্টকে খবর দিতে গেল।
হুকুমের সব অংশ দে তলাইয়া বোঝে মাই।

ছোট্ট আসিয়া বলিল—“মাইজি! ময়ূর
কি ছুটি ময়ূর?”

ছোট্টর মাইজি উত্তর দিলেন—“হী
একেবারে ছুটি।”

ছোট্ট ময়ূকে খবকাইয়া বলিল—“বা!
তোমার যেতে হবে না।”

ময়ূ খানিকক্ষণ ক্যাঙ্কফাল করিয়া
চাহিয়া রহিল—তারপর তার চোখ দিয়া
টস্‌টস্‌ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

আমি গোপনে ছোট্টকে ডাকিয়া বলি-
লাম—“বা, তুই চুপি-চুপি ময়ূকে নিয়ে যা।
আমি সব ঠিক করে দেব।”

ময়ূ চলিয়া গেলে খোকাকে লইয়া
সতাই গেল বাবিল। আমি একটা ঠিকা
লোক রাখিলাম—কিন্তু তার গৌকের ঘর
দেখিয়া খোকা তার দিকে কিছুতেই বঁসিল
না। গৃহিণীর গর্জন বাড়িয়া উঠিল—
আমারই পরতানীতে যে এমনটা ঘটিল

একথা দিনের মধ্যে পাঁচশ বার আমার
 স্মৃতিতে হইল—আমি বলিলাম—“আমার
 হাতে তো কোনো কাজ নেই—নাওনা
 আমিই ছেলের চাকরী করি।”

গৃহিণী ধপু করিয়া আমার কাছে
 ছেলেটাকে বসাইয়া দিয়া বলিলেন—“এই
 নাও, তাই কর।”

আমি ঘণ্টাকতক ছেলের পরিচর্যা
 করিয়াছিলাম। তার পর ছেলেকে ঘুম
 পাড়াইয়া নিজেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।
 জাগিয়া দেখি থোকা আছে নাই। তার
 পর কি হইল জানিনা—থোকায় পরিচর্যা
 সবকে আর কোনো নারিশ স্মৃতিতে
 পাইলাম না; থোকাকেও আমার কাছে
 পাঠানো হইল না,—বুঝিলাম, চাকর-মকরদের
 দণ্ডমুণ্ডের বিখ্যাত আমাকেও চাকরী হইতে
 বরখাস্ত করিয়াছেন।

(৬)

সপ্তাহ না ঘুরিতেই দেখি মনু ফিরিয়া
 আসিয়াছে। ছোট্টু তো রাগিয়া অস্থির !
 সে বলে—“হতভাগা ছোড়ার ভ্রজে এক
 দণ্ডও দেশে থাকা হ’ল না, কেবল পরসা
 নষ্ট, কান্নাকাটি করে ফিরে এল—কিছুতেই
 রইল না। রোসেনো আমি মজা দেখাচ্ছি।”

গৃহিণীর রাগ বোধ হয় পড়িয়াছিল,
 মনুকে দেখিয়া আবার অগিয়া উঠিল। কাজেই
 মনু থোকাকে লইবার হুকুম পাইল না।
 হুকুম হইল বাবুর বা-খুণী মনুকে লইয়া
 করিতে প্যারেন, আমার এবং আমার
 ছেলের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নাই।
 মনু এ সব কথাই তাৎপর্য বুঝিয়াছিল

কি না জানিনা। সে দেখি একবার ফাঁক
 পাওয়া ধর করিয়া থোকাকে লইয়া একেবারে
 বাহির-বাড়িতে ছুটু দিল। তার পর
 তার সঙ্গে রীতিমত লড়াইয়া লইল।
 তখন থোকাকে তার কাছ-ছাড়া করে
 কার সাধ্য! গৃহিণী নিরুপায়ের ক্রোধে
 মূগিয়া উঠিয়া গর্জন করিতে লাগিলেন—
 “হতভাগা ছেলেটা বাপেরই ধার
 পেয়েছে। নিজের গৌ কিছতেই ছাড়বে না!”

আমি সেই দিন বৈকালে ইসিচেরারে
 হেলান দিয়া তামাক টানিতেছি, মনু ঘরে
 ঘরে আমার কাছে আসিয়া চুপট করিয়া
 পাড়াইল। আমি বলিলাম—“কি রে
 মনু?”

মনু একটা উৎকর্ষার সঙ্গে বলিল—
 “আমার ভেইরা কোথায় গেল বাবুজি?”

ভেইরার কথা মনুর আঁতের কথা,
 হঠাৎ একটা উত্তর দিয়া তার আঁতে থা
 দিতে ইতস্তত করিতেছিলাম। এমন সময়
 সে আবার বলিল—“কোথায় গেল বাবুজি?”

আমি বলিলাম—“কেন বল দেখি?”

সে বলিল—“ভেইরার ভ্রজে গোটা
 কিনেচি, সে তো তাকে দেওয়া হয়নি।
 ভেইরাকে যে দেখতে পেলুম না!—ভেঁসও
 নেই, বকরীও নেই। দরিদ্রার গেলুম সেখানে
 তো ভেইরা চান করতে ঘারনি, মাঠে গিয়ে
 ডাকলুম সেখানেও তো জবাব পেলুম না।
 তবে কোথায় গেল বাবুজি।”

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

মনু বলিতে লাগিল—“ভেইরাকে একটা
 চিঠি দিয়েছিলাম—পোকাবাবুর ভ্রজে ভেঁস

আনতে। ভেইয়া তাই বেশ থেকে ঠেস
নিরে আসচে—না ?”

আমি কি উত্তর দিব খুঁজিয়া পাইলাম
না—গভীরভাবে শুধু বলিলাম—“হঁ।”

মধু দোড়িয়া গিয়া মোটাটা লইয়া আসিল,

বলিল—“বাণিজ্য! তবে এই মোটা তোমার
কাছে রেখে দাও, নইলে ছোট্টু নিরে নেবে।
ভেইয়া এগে দিগে!”

বলিয়া সে খোকাবাঁবুর কাছে ছুটিয়া
চলিয়া গেল।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

ভাষা-সংস্কার

ভাষা নিয়ে আমাদের পাচজনের ব্যব-
প্রতিবাদটি যেমন পুরোনো তেমনি এক্ষেত্রে
হরে আসছে। এ তর্ক করবার দৈর্ঘ্য
লেখকদের থাকতে পারে—কিন্তু শোনবার
দৈর্ঘ্য পাঠকদের সম্ভবতঃ আর নেই। অতএব
এ তর্কে ক্ষান্ত দেওয়াই শ্রেয়ঃ। তবে যে
আমি আবার এ আলোচনার প্রবৃত্ত হইছি
তার কারণ—শ্রীযুক্ত বিজ্ঞপ্তি মজুমদারের
মতামত আমি উপেক্ষা করতে পারিনে,
কেননা তিনি একজন ভাষাতত্ত্ববিদ। বাংলা
ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান, এমন কি ছন্দ
নিকটেরও তিনি সন্ধান রাখেন। তাঁর
মতামতসকল ভাষা-বিজ্ঞানের উপর
প্রতিষ্ঠিত, আমার মতামত ভাষাজ্ঞানের উপর।
এ বিষয়ে তিনি মোট অধিকারী, আমি কনিষ্ঠ
অধিকারী। এ সবও মৌখিক ভাষার
উপর তাঁর আক্রমণের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ
করা আমি কর্তব্য মনে করি।

মজুমদার মহাশয় আমাদের নাম
দিয়েছেন—ভাষা-সংস্কারক। আমরা এ নামের
যোগ্য নই। কেননা, আমরা বাংলা ভাষা

মুখে মুখে যেমন চলেছে Book এ Book এও
তেমনি চালাতে চাই। সংস্কারক হচ্চেন
তাঁরাই, বীরা মৌখিক ভাষাকে সংস্কৃত কবে
সাধুভাষা রচনা করেছেন। আমরা সাধু
ভাষার সংস্কার করতে চাইনে, ও বস্তু
আমরা ভাগ্য কবুতে চাই। এ কথা মজুমদার
মহাশয়েরও অবদিত নেই। তিনি নিজেই
বলেছেন যে, তিনি শুনেছিলেন যে আমরা
হুতুমি বাংলা চালাবার প্রস্তাব কবেছি এবং
নিজেরাও ঐ রীতিতে রচনা প্রকাশ করছি।
তিনি আমাদের সঙ্গে কথা করে বুঝেছেন—
যে আমাদের বিরুদ্ধে এ অপবাদ মিথ্যা।
অর্থাৎ তিনি আলাপে বুঝেছেন যে আমরা
প্রলাপ রকিনে। হুতুমি বাংলা—ভাষা নর—
Slang, সে উপাদানে standard prose
গড়বার চেষ্টা বাস্তবিকপ্রসূ নহ—বিকারপ্রসূ
লোকের কবুতে পারে। ইয়ারকির ভাষার বে
দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, ইতিহাস লেখা চলে না
—এ জানটুকু বার নেই, তার সঙ্গে জ্ঞানী এবং
শুণী ব্যক্তির কখনই ভাষাতত্ত্বের আলোচনা
করেন না। হুতুরাং বাংলাদেশের এত

ভণী এবং জ্ঞানী ব্যক্তিব্য বহন আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র এবং শাস্ত্র ধারণ করেছেন, তখন মজুমদার মহাশয়ের বোঝা উচিত ছিল যে, ভাষাকে সংস্কার করে আমরা তা slang-এ পরিণত করতে চাইনে। সাধুভাষার উপর আমার অশ্রদ্ধার কারণই এই যে, ও বস্তু—ভাষা নয়—slang;—ইংরাজির slang নয়, পাকিস্তানের slang। হুতুম পের্ডার ভাষা এবং লক্ষী পের্ডার ভাষার যে প্রভেদ, এ দুয়ের ভিতরও সেই প্রভেদ। এ ভেদ জাতিগত নয়,—সাম্প্রদায়িক।

মজুমদার মহাশয় বলেন যে, সর্গনাম এবং ক্রিয়াপদগুলি সবকিছু আমরা যে ব্যবহৃত করতে চাই—তাই নিয়েই সত্যভেদ। এ কথা সত্য। “করিয়া” এবং “করে”র ভিতর যে ব্যবধান, বইয়ের ভাষা এবং মুখের ভাষার ভিতর ঠিক সেই ব্যবধান, তার চাইতে এক চুল কমও না, একচুল বেশিও না। এই “ইয়ার” স্পর্শে ভাষা যে কেন এত সাধু হয়ে ওঠে তা সহজ বুদ্ধিতে বোঝা কঠিন, এবং যেখানে সহজ বুদ্ধিতে কুশোর না, সেখানে বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া আবশ্যিক। মজুমদার মহাশয় তাই ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, যে নিয়ম অহুসারে “করিয়া” কালক্রমে “ক’রে”তে পরিণত হয়, তার ইংরাজি নাম, phonetic decay। তথ্যস্তু! কিন্তু ভাষার এই স্বাভাবিক অক্ষয়চ্যুতি ক্ষয়-রোগ নয়—নয় অনেক ক্ষেত্রে তা উন্নতিরই লক্ষণ। “করিয়া” এই ক্রিয়াপদের “করে”তে পদোন্নতি হয়েছে—এই হচ্ছে আমার মত। “বাংলা ভাষা বনাম সাধুভাষা ওরফে বাবু-বাংলা” নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে

আমি বিস্তৃত আলোচনা করেছি—এ স্থলে সে ভর্কের পুনরাবৃত্তি নিজপ্রয়োজন।

তার পর সর্গনামের কথা। সর্গনাম খর্ব্ব হলে যে তার সর্গনাম হয়, এর কোনরূপ প্রমাণ নেই। মজুমদার মহাশয় বলেন যে—“আমি, আমরা, তোমাকে, তোমাদের... প্রভৃতি যেমন ছিল, তেমনই রহিয়া গিয়াছে। “দে” এবং “তিনি”র বহুবচনে এবং কর্ম্মাদি কারকের রূপে যে “হা” এবং “হী” আসে, তাহা লোপ করিলেই যে ভাষার গায়ের ঘোর অধিক হইবে এবং রচনার গাভীর্ষ্য বাড়িবে, তাহা বুঝিয়া উঠা শক্ত।”

এর নাম,—বাংলার যাকে বলে, উন্টো চাপ। আমরা তা কমিন্গালে কোন শব্দের কোনও অঙ্গের হানি করতে চাইনি। আমরা বলি—সর্গনামের প্রথম পুরুষের বেহ হতে যে “হা” কাণবলে খসে পড়েছে—তাকে কুড়িয়ে নিয়ে জুড়ে দিলে, সে পুরুষের স্নায়ের জোর বাড়বে না—তধু গা-ভারি হয়। ঐখ্যা, গাভীর্ষ্য, শৌর্ষ্য, বীর্ষ্য প্রভৃতি শব্দের অরণমাত্রা ঘাঁদের লেখনী হতে স্বতাই বনৌ-ক্ষরণ হয়, তাঁরাই উক্ত লুপ্ত “হা”কে রচনার যুক্ত করবার পক্ষপাতী। শব্দের অক্ষর-সংখ্যার বেশি-কমের উপর যে ভাষার ব্যক্তি-শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে—এ সত্যের পরিচয় আমরা কোন সাহিত্যেই পাইনি। ঘাঁদের সাহিত্যে লখাই-চোড়াই করবার অভিস্রাব আছে—কেবলমাত্র তাঁরাই লখা-চোড়া কথার পক্ষপাতী। আর যদি শব্দে বর্ণাধিক্যে ভাষার গৌরব বাড়বে, তাহলে সাধুভাষার “আজ্ঞার” “তুমার”ও লেখা উচিত; তাতে যে ভাষার ভার বাড়বে, তার আর কোনও সম্বন্ধ।

নেই। হিন্দি ভাষার উপর একটু কৃপাদৃষ্টিপাত করলেই মজুমদার মহাশয় দেখতে পাবেন যে, তাঁর প্রিয় হকাবের সংসর্গে সর্বনাম সে ভাষার গ্রাম্যতারই পরিচয় দেয়। “উন্হো” ভক্তদ্বন্দ্ব—কিন্তু “উন্হিকো” দেহাতি বুলি এবং জেনানা বুলি। অবলীলাক্রমে শব্দ উচ্চারণ করবার ক্ষমতা মাথুবে গুণ-গুণান্তরের সাধনার ফলে লাভ করেছে। যারা “উন্হিকো” বলে, হিন্দুস্তানীদের মতে তাদের “জবানু ছরগু” হয় নি। তাঁর কারণ কৌক-মেরে শব্দ উচ্চারণ করবার ভিতর রসনা-ক্লেশের পরিচয় পাওয়া যায়। এ দেশেও প্রীতিভাষার নিকট সর্বনামের প্রথম পুরুষ গৌরবে “ওনারা” “তেনায়া” নামে পরিচিত। সাধুভাষায় যদি “হা” আছে হয়, তাহলে “না” আছে হবে না কেন? এর উত্তরে সাধুবাদীরা হরত বলবেন, যে “হা” পুরুষালি এবং “না” মেয়েলি। তা হলেই গাড়াল, ছোর বার, সাহিত্য তার। এই ভাষা-সমস্যা যদি গারের ঘোরে মীমাংসা করা হয়, তাহলে অবশ্য আমাদের কিছু বক্তব্য নেই। সাধু ভাষার আক্রমণ থেকে মাতৃভাষাকে রক্ষা করতে আমরা যুক্তি-তর্ক প্রয়োগ করা ব্যতীত অন্য কোনও উপায় জানিনে।

মজুমদার মহাশয় আসলে আমাদের এই যুক্তি-তর্ক-করা-স্বরূপ ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধেই বজ্রাঘাত করেছেন। তাঁর শেষ কথা এই—

“তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করা যায় যে চৌধুরী মহাশয় যে পছন্দ অবলম্বনীয় মনে করেন, তাহাই প্রশস্ত, তাহা হইলেও দলদলের অবলম্বিত পছন্দ তিনি একাকী পরিত্যাগ

করিতে পারেন না। যেখানে চরিত্রনিষ্ঠার কথা মাট, জীবন-মরণের কথা নষ্ট, সেখানে চৌধুরী মহাশয় তাঁহার নিজের মতট প্রাধান্য প্রচার করিতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যে তাঁহার মত গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে প্রচলিত প্রথাই মানিয়া চলিতে হইবে।”

অর্থাৎ অপরাধে মৌখিক ভাষার লিপিতে উপদেশ দিবে নিজে সাধুভাষায় লেখাই আমার পক্ষে কর্তব্য, কেন না সাহিত্যে “চরিত্র-নিষ্ঠার কথা নেই।” চরিত্র-নিষ্ঠা শব্দের অর্থ কি, তা আমার জানা নেই। সম্ভবতঃ এটি হচ্ছে ইংবাজি character শব্দের সাধু-অনুবাদ। কিন্তু এ কথা কি ঠিক যে সাহিত্য-সমাজে character বলে কোনও পদার্থ নেই? সাহিত্য কি, sincerity বঞ্চিত? যদি তাই হয়, তাহলে যে insincere লেখক সাহিত্য সমাজে মুখে বলবেন এক, এবং কাজে করবেন আর, তাঁর প্রচারিত মত সাহিত্যে সত্য গৃহীত হবার কি কোনরূপ সম্ভাবনা আছে? মজুমদার মহাশয় বলেছেন, এ হলে জীবন-মরণের কথা নেই। এ কথা ঠিক। যদি জীবন-মরণের কথা থাকত, তাহলে বাঙ্গালী লেখকেরা ভাষা সমাজে এত যথেষ্টাচারী হতেন না। কোর করে বঙ্গ সমাজের ধাতু বদলে দেবার অভিপ্রায়ে তাঁকে নিয়ে যত্নাধস্তি করার যদি যথেষ্টাচারিতার পরিচয় দেওয়া না হয় ত কিসে হয়, তা জানি নে। এবং সাধু-পন্থীরা আজ একশ’ বৎসর ধরে সেই কাজ করে আসছেন। ভাষার উপর অত্যাচার করার বাঙ্গালী জাতির দৈহিক জীবন-মরণের কোনও কথা অবশ্য নেই,

কিন্তু মানসিক সরণ-বাটনের কথা আছে। বাংলা শব্দের যে এতটা বিশেষ রকম কোঁক ও টান আছে, সেই কথাটা আমাদের জানিয়ে দেবার মজা মজুমদার মহাশয় অনেক ব্যাখ্যায় করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের যে সে জ্ঞান নেই আঁকারে ইঙ্গিতে তাও জানিয়ে দিয়েছেন! রবীন্দ্রনাথের যে ছন্দেব কান নেই, এ অবস্থা বড়ই দুঃখের বিষয়; কেননা তিনি হচ্ছেন, বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু এও কম চাখের বিষয় নয়, যে, মজুমদার মহাশয়ের এ জ্ঞান নেই যে বাঙ্গালীর মনেরও একটা বিশেষ রকম কোঁক এবং টান আছে। সে কোঁক এবং সে টানের পরিচয় পাওয়া যায়—বাঙ্গালীর ভাষায়, অর্থাৎ যে ভাষায় তাঁরা কথা কন, সেই ভাষায়। ভাষা শুধু কানের জিনিষ নয়, প্রাণেরও জিনিষ। বাঙ্গালী-মনের গড়নের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালীর ভাষা গড়ে উঠেছে। কি ভাব আমরা প্রকাশ করতে চাই এবং কি ভাবে তা প্রকাশ করতে চাই,* তার পরিচয় পাওয়া যায় আমাদের মুখের ভাষায় এবং প্রাকৃতিক মূগের বাংলা সাহিত্যে;—এই সাধু ভাষা নামক “এক-পুঙ্খবে বনেনি বড়মারুখ” ভাষায় নয়। এ কথা ভুললে চলবে না যে, এ ভাষা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের পর ইংরাজি-নির্দিষ্ট বাঙ্গালী লেখকদের হাতে তৈরি হয়েছে; বঙ্গভাষার স্বাভাবিক ইভলিউশনে তা এ-হেন সাধু আকার ধারণ করে নি। স্বাভাবিক ইভলিউশনে ভাষার কি রকম পরিবর্তন হয়, তার পরিচয় কবিকল্প চণ্ডীর সঙ্গে ভারতচন্দ্রের অন্নদা-

মঙ্গলর যোগাযোগের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই দেখতে পাবেন। স্মরণেই লিখুন আর বিশ্রামেই লিখুন, এই সাধুভাষা অবগতন করতে আমি অপারগ, কেননা “সে সবার্ণা গমন আড়ষ্ট, তেমনি অন্তঃ। যদি ক্রিমি ভাষা লিখতেই হয়, তাহলে উনবিংশ শতাব্দীর” প্রথম-ভাগের পণ্ডিত বাংলার ফিরে যাওয়া শ্রেয়ঃ মনে করি। সাহিত্যে আমার আশঙ্ক-ভক্তি আছে। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, রামমোহন রায়, আনন্দচন্দ্র দেবদাসবাগীশ, ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর প্রভৃতির রচনার সংকৃত শব্দের দ্রুত প্রয়োগ নেই। সংকৃত শব্দ যদি ব্যবহার করতেই হয়, তাহলে সে শব্দের অর্থ জানা আবশ্যক, তার লক্ষণা এবং ব্যঙ্গনা দুইই জানা আবশ্যক এবং তার যথাযথ প্রয়োগ জানা আবশ্যক। সাধু ভাষার এ সকলই উপেক্ষিত হয়। যদি কেউ বিতর্কহীন সংকৃত লিখতে পারেন এবং সে রচনাকে বাংলা বলে চোখেতে পারেন, তাহলে তিনি তা করুন। আমার আপত্তি—এই চর্চা-নবাব সাধু ভাষার বিরুদ্ধে। কেননা সে ভাষার বিশিষ্টতা বিতর্ক-হীনতা নয়, ভক্তিহীনতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। বাংলা এবং সংকৃত এই উভয় ভাষার প্রতি সমান অস্তিত্ব থেকেই এ ভাষা জন্মগ্রহণ করেছে।

মজুমদার মহাশয় বলেছেন যে, ভাষা অর্থ শব্দরাশি নয়। Vocabulary নয়, structure-এর উপরই সকল ভাষা প্রতিষ্ঠিত। এই কথা আমি অন্তত মশ বার বলেছি। বাংলা এবং সংকৃত এ দুই ভাষার গঠনের পার্থক্য এত বেশী যে,

এর একটির ছাঁচে আর-একটিকে ঢালা যায় না। হুতরাং বাংলা ভাষা অপর ভাবার ছাঁচে ঢালাই করে নিতে গিয়ে সাধুপণ্ডীরা সে ভাষাকে সংস্কৃত নয়, বিকৃত করে ফেলেছেন। আমি প্রবন্ধান্তরে দেখিয়েছি যে, বঙ্কিমচন্দ্রেরও সাধুভাষা শুদ্ধ ভাষা নয়। এবং বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেও যখন সাধুভাষা বিকারপ্রাপ্ত হয়েছে, তখন আমাদের হাতে তার অপমৃত্যু অবশ্যভাব্য। তা ছাড়া প্রতিভার সাত খুন মাপ, কিন্তু ভোঁহা-আমার কলমের আঁচড়টুকুও সরস্বতীর গারে অসঙ্গ।

শব্দরাশি ভাষা নয়—কিন্তু সেই শব্দরাশির নির্মাচন ও প্রয়োগের সঙ্গেই style জন্মগ্রহণ করে। হুতরাং বাংলা গতে ভাবদিন style দেখা দেবে না, বহুদিন আমরা লেখার নির্মিচাবে একরশ শব্দ জড় করবার লোভে সঘরণ করতে না পারব।

মৌখিক ভাষার অদুরূপ ক্রিাপদ এবং সর্জনামগণ লেখার ব্যবহার করলে সকলেই দেখতে পাবেন, যে, ঐটি বাংলার কাঠামোর ভিতর শব্দভাষার অবসর অতি বিরল। কেন না, সর্জনামের অতিরিক্ত ব্যাক্রনের যৌক করে গিয়ে ভাষা অতিরিক্ত ঝরঝরে হয়েছে এবং ক্রিাপদের অতিরিক্ত প্রেরের টান কমে গিয়ে ভাষা অতিরিক্ত সচল হয়েছে। বঙ্গ-সরস্বতী যে তথ্যভানালিখনননা,—মূলানীলাপ্রকটনননা মন,—এ কথা তিনিই জানেন, যিনি তাঁর বীণাও শুনেছেন, তাঁকে চোখেও দেখেছেন। আমি প্রবন্ধান্তরে দেখিয়েছি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য অবশেষে

বাংলার এসে উপনীত হয়েছিল। তিনি বাংলা গদ্যকে যেখানে এনে পৌঁছে দিয়েছেন, আমরা সেখান থেকে ক্রিাপদে আর-একটু অগ্রসর হতে চাই।

(২)

কিন্তু মাতৃভাষার দিকে ঐ আর এক পা অগ্রসর হতে গেলেই এত পণ্ডিত ব্যক্তি যে আমাদের পথ আগলে দাঁড়ান, তার একটি গুঢ় কারণ আছে। মানুষের মনে কোনও একটা সংস্কার বহুমূল হয়ে গেলে, হাজার তর্ক-যুক্তিতে তার উচ্ছেদ করা যায় না। রোগ যেখানে psychology দেখানো logic-এর চিকিৎসা বাটে না। বাংলাভাষার প্রতি অসঙ্গ পাকাটাই আমাদের মনের পক্ষে বাস্তবিক। এ অসঙ্গ আমাদের পূর্বপুরুষদের নিকট উত্তরাধিকারী-হুত্রে লাভ করেছে। এই যুগ-সংকীর্ণ সংস্কার বাংলার শিকিত-সম্প্রদায়ের মনে এতই বহুমূল হয়ে গিয়েছিল যে, আর একপদ বৎসরের নব-শিক্ষার বলেও সে সংস্কার আজও একবারে নির্মূল হয় নি। বাংলায় পূর্ব ইতিহাসের দিকে ঈষৎ দৃষ্টিপাত করলেই এ সংস্কারের মূল কারণ আমাদের চোখে পড়বে। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা বাংলার একমাত্র শিক্ষিত-সম্প্রদায় ছিলেন। তাঁদের সকল শিক্ষা-দীক্ষার ভাষা ছিল সংস্কৃত এবং তাঁরা চিরকাল বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করেছেন এবং নিত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে দেখে এলেছেন। বাংলা যে একটি ভাষা, এ কথাও তাঁরা কখন স্বীকার করেন নি, কেন না তাঁদের মতে ও বস্তু শুধু সংস্কৃতের অপভ্রংশ। গৃহহুত্রে দেখতে

পাই যে, সেকালে আর্মোরার বাংলা দেশে পদার্পণ করবার-ব্রাত্তা তাঁরা জাতি হতেন, অর্থাৎ তাঁদের জাত যেত,—যেমন একালে বিশেষতঃ গণে আমাদের জাত যায়।

সম্ভবতঃ ঐ একই কারণে সংস্কৃত ভাষার বাংলা দেশের মাটিতে পা ঠেকবার-মাত্র তা পতিত হয়েছিল এবং এই পতিত ভাষার নামই বাংলা ভাষা। এই কারণেই এ ভাষা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের নিকট চিরকাল অপ্সৃত ছিল। চৈতন্যদেব যে এ ভাষাকে প্রেরণ দিয়েছিলেন তার কারণ, তিনি পতিতকে উদ্ধার করবার দ্রুতই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি আপামরচন্দালকে কোল দিয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে বাংলাভাষাকে কোলে তোলা ত অতি সাহাজ্য কথা। এ যুগে আমরাও ইংরাজি শিক্ষার গুণে ব্রাত্তাকে ফের জাতে তুলতে চাই, কিন্তু তা শুদ্ধ করে। আমরাও বাংলা ভাষাকে সাহিত্যে টেনে তুলতে চাই, কিন্তু সে তার গলায় পৈশতঃ দিয়ে। এই হচ্ছে সাধুভাষার কন্য-বৃত্তান্ত। অপর পক্ষে যারা বাংলা ভাষা যেমনটি আছে তেমনটি ছাপায় অক্ষরে বুলে নিচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সাহিত্যকে পতিত করবার অভিযোগ আনা তুচ্ছবাত্তিকপ্রভৃতি সাহিত্যিকদের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। এ দ্বন্দ্বলের মধ্যে কোন দলের মত ঠিক, তা কলেন পরিচর্যতে। এখানে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, যদি বাংলা ভাষা এতই অবজার বস্তু ছিল, তাহলে প্রাকৃতিক যুগে বাংলা সাহিত্য কি করে রচিত হয়েছিল? সংক্ষেপে তার উত্তর দিচ্ছি।

প্রথমতঃ সে যুগে বাংলার ব্রাহ্মণ-

পণ্ডিতেরা যে টীকা-ভাষ্যের বিপুল সাহিত্য রচনা করে গিয়েছেন, সে-সবই সংস্কৃত ভাষায়। কৃত্তিবাস প্রভৃতি রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদকেরা অবশ্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু তাঁরা কেউ আর বেজার বাংলা লেখেন নি, সকলেই রাজ-আজাদ। নসরৎশাহ, হুসেনশাহ প্রভৃতি গৌড়ের পাঠান বাদশাহদের এবং ছুটি-বাঁ, পরগণা বাঁ প্রভৃতি পাঠান সেনাপতিদের মৌলতেই বাংলায় জাতি রামায়ণ মহাভারত ভাগবত প্রভৃতির ভাষ্য পরিচর্য লাভ করেছে। চৈতন্য-মতাবলম্বী কোনও কোনও পণ্ডিত অবশ্য ভাষ্য গ্রহণ রচনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অতি বহু, দু'চার জনের অধিক হবে না। চৈতন্য-ভাগবতের রচয়িতা বৃন্দাবন দাস ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু পণ্ডিত ছিলেন কি না, আমাদের জানা নেই। অপর-পক্ষে চৈতন্য-চরিতামৃতের রচয়িতা কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ ছিলেন না। জাতিতে ইনি বৈষ্ণব; সম্ভবতঃ সেই কারণে তাঁর গুরু জীব গোস্বামী কবিরাজ মহাশয়কে চৈতন্যের জীবন-চরিত ভাষ্য লিপিবদ্ধ করতে আদেশ করেন, কেন না জীব গোস্বামী মহাশয় ব্রহ্ম বহু গ্রহণ রচনা করে গেছেন, কিন্তু সে সব সংস্কৃত ভাষায়।

তা ছাড়া, যে বৈষ্ণব সাহিত্যের এ যুগে এত গোরব করি, সে সাহিত্য—পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট কতদূর অবজার বস্তু ছিল, তার প্রমাণের দ্রুত আমাদের বৈষ্ণব-দূর বেতে হবে না। বাংলা গজের আদি শুধু ব্রহ্ম রামমোহন রায়ও এ কুলংকাঠের

বন্দীভূত ছিলেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখে গেছেন যে, চৈতন্য-পর্যায় ধর্মবিচারে অধিকারী নহ। কেননা তাদের শাস্ত্র ভাবায় লেখা।

একপ মনোভাবের মূলে অবশ্য একটি বৈধ কারণ ছিল—এবং সে কারণ এই যে, বাংলা ভাষা পেকাপে বিজ্ঞানিক ভাষা ছিল না। বাংলার দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, অলঙ্কার, ইতিহাস প্রভৃতি কিছুই ছিল না; ছিল শুধু ছড়া আর পাটালি, গান আর পদাবলী। রামমোহন রায় যে বাংলার বৈষ্ণবশাস্ত্রকে মোটে আমলেই আনেন নি, তার কারণ সে শাস্ত্র পরায় লাচাড়িতে লিখিত। তিনি এ শাস্ত্রকে বরাবর “চৈতন্য মঙ্গলাদি পুরান” বলেই উল্লেখ করেছেন। এ পরায় যে দর্শন বিজ্ঞান প্রচারের পক্ষে নিতান্ত অসুপযোগী ছিল তার বিশিষ্ট উদাহরণ “চৈতন্যচরিতামৃত।” এই কাব্য হচ্ছে মূলমন্ত্র-মুগের একমাত্র গ্রন্থ, যাতে দর্শনের ব্যাখ্যা এবং বিচার আছে। পাঠকের কণা ধূরে থাক, বরং গ্রন্থকারও স্পষ্ট বুঝেছিলেন যে, ভাষায় তিনি নিজেই বক্তব্য কথা মোটেই স্পষ্ট করে বলতে পারেন নি, কেননা একালের ইংরাজি শিক্ষিত অধ্যাপক মহাশয়েরা যেমন কথার কথার ইংরাজি quote করেন কবিরাজ মহাশয়ও তেমনি পাতার পাতার সংস্কৃত quote করতেন। ভাগবত, উদ্ভট নীলমণি, কর্ণামৃত এবং কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থের শ্লোক তিনি তাঁর বাংলার ঢীকা স্বরূপে ব্যবহার করেছেন। একপ ব্যবহার যে অসঙ্গত তা তিনি নিজেও জানতেন। কারণ তিনি লিখেছেন—

যদি কেহা ঐহে করে এখ কৈলে মোক্ষময়ে
ইত্যং জনে নারিবে মুখিতে।
প্রভুর যে আচরণ সেই করি বর্ণন
সেই চিত্ত নারি আরাধিতে।

এই একই কারণে ইংরাজি শিক্ষিত লোকেরাও মাতৃভাষাকে প্রথমে অবহেলা করতেন, আবার সেই ইংরাজি শিক্ষার ভণেই বঙ্গভাষা আমাদের মনমগ্নে পড়েছে। দেশ-ভাষার যে কি অপূর্ণ ঐশ্বর্য-শালী সাহিত্য রচিত হতে পারে—তার জাঙ্গল্যমান প্রমাণ, ইংরাজি সাহিত্য আমাদের চোখের সম্মুখে অট্টো প্রহর রয়েছে। আমাদের মূর্তন শিক্ষার প্রাদোদেই আমরা মাতৃভাষাকে তক্তি করতে না হোক চর্চা করতে নিষেধি। আমরা যে বঙ্গ-ভাষার ক্রিয়াকর্মগুলি করারত্ত করতে চেষ্টা করছি, বর্তমানের পক্ষে এট যথেষ্ট। তক্তি পরে আঁস্বে তখন, যখন এ ভাষার জ্ঞানের সাধনা করা যাবে। অর্থাৎ যখন এ ভাষা শুধু সাহিত্যের নয়, শিক্ষারও ভাষা হয়ে উঠবে। কর্ম তক্তি ও জ্ঞান এই ত্রিমার্গ অবলম্বন না করলে ভাষাও মুক্তিলাভ করে না।

যে ভাষা শুধু কাজের ভাষা তা অপভ্রা; যে ভাষা কাজের এবং ছন্দরের ভাষা তা উপভাষা, যে ভাষা জীবন মন এবং জ্ঞান এ তিনেরই ভাষা, তাই হচ্ছে পূর্ণাবয়ব ভাষা। বর্তমান না বাংলা, বিজ্ঞানিক ভাষা হয়ে উঠবে, ততদিন বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা আমাদের মন থেকে সম্পূর্ণ দূরীভূত হবেন না। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি যতদূর সম্ভব

অল্পকথায় এবং পরিষ্কার করে লেখা উচিত। যেখানে বিষয় কঠিন সেখানে ভাষা সহজ হওয়া একান্ত আবশ্যিক। জ্ঞানের রাজ্য সকলের পক্ষে স্বেচ্ছায় অধ্যয়ন করা একটা standard prose গড়ে তোলা দায়িত্ব, এবং আমার বিশ্বাস সে গল্প দুইটির কথা বিবেচনা করলেই হবে না, সহজ বোধ্যও হবে না। সাধুভাষার লিখিত দর্শন বিজ্ঞানের পুস্তক পুস্তিকা এবং নিবন্ধাদি পড়ে দেখবেন যে, সে পাঠে না আছে কোনও আনন্দ, না আছে কোনও শিক্ষা। ভাষার শক্তি ও গতি তার পদের দীর্ঘতার উপর নয়, তার বেহেতুত্বের উপর নির্ভর করে। মৌখিক ভাষার অল্পপ্রত্যয়-

সকল - যে-কজার যে-ভাবে গাথা আছে লেখার ভাষাও সেই কজার সেই ভাবে গেঁপে নিতে হবে। সাধুগদ্যের বাংলাভাষার পদমর্যাদা বাড়তে গিয়ে তাকে তধু আড়ট করে ফেলেছেন। মৌখিক ভাষা যে সাহিত্যে চলবে সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। যেহেতু সে ভাষা জীবন্ত সে কারণে চলৎশক্তি একমাত্র তারই আছে। প্রতি জীবন্ত ভাষার তধু একটি বিশেষ য়োক্তান্ নয়, একটি বিশেষ রোম্ভ আছে; সেই রোম্ভেই তা এগিয়ে যাবে, কেউ তার উন্নতির পথ আটকাতে পারবে না;—এর জন্য শোক করা নিরর্থক।

ঐশ্বর্য চৌধুরী।

চয়ন

রোমা রোলী

এ বছর সাহিত্যে ‘নোবেল প্রাইজ’ পাঠিয়েছেন, করাসী ঔপন্যাসিক রোমা রোলী।

ফ্রান্সের মহানগরে ক্রেমেন্সি নামক স্থানে ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে রোমা রোলী জন্মগ্রহণ করেন। প্যারিস ও রোম সহরে তাঁহার শিক্ষাশিক্ষা হয়। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে রোম নগরে তিনি মালউইজ ভন ওয়েসেনবার্গ নামক একজন জার্মান রমণীর সঙ্গীত করেন। এই রমণী ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দের করাসী-বিপ্লবের পর জুইতে ইংলণ্ডে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া-

ছিলেন। এই বিধবী মহিলা মাজিনী, মন্সী-রচনা-কৃপণ ওয়াগনার, বিখ্যাত লেখক নিট্শে, মহাবীর গ্যারিবন্ডী ও নাট্যকার ইব্‌সেন প্রভৃতি সেকালের চিত্র, কলা ও কণ্ঠরাজ্যের অনেক প্রতিভাধরের সহিত সাক্ষাৎসাক্ষ্যে পরিচিত ছিলেন। ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সঙ্গে রোলীর যখন প্রথম আলাপ হয়, রোলী তখন টলটলের শিশু ছিলেন। তারপর জার্মান মহিলাটির অসাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে আসিয়া তিনি

ঔহাৰ নিজেৰ বাদীম সৰহ-ভাৱটি ঊহুট আবিষ্কাৰ কৰিতে পালে। উক্ত মণ্ডলা আপনাৰ স্বক্তি-পুস্তকে ৰোণী'ৰ লগতে লিখিৰাছিলৈঃ— “এই ফৰাসী-গুণকেৰ ভিতৰে হিৰু তেমনি ভাববান, তেমনি উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তেমনি আগঢ়ি জ্ঞানৰ দায়ণ-শক্তি দেখিতে পাইতেছি, যাতা আমি অস্ত্ৰজাতীৰ মহাপুৰুষেৰ মখে লক্ষ্য কৰিছাছি।”

ৰোণী'ৰ সৰ্বশেষ পুস্তক “জন ক্ৰিষ্টোফাৰে”ৰ বীজ, ঔহাৰ মনে এট সময়ই ‘অদ্বিত হুয়। বদেখে কিৰিয়! আদিয়া



‘সামাজিক বহু’-ৰূপে ৰক্ষাৰেৰ পুনৰ্গঠনেৰ দিকে তিনি মনোযোগ বেন গু কয়েকখানি নাটকও রচনা করেন। সেই সময় হইতে অজ্ঞাবসি তিনি সন্নীত-সমাগোচক এবং সন্নীত-কলাগণকে বক্তাৰূপে পোৰ্বান আমক বানে অবস্থান কৰিতেছে।

তিনি বীজ-হোভেন, মাটকেশ এজিলো ও হুগো উল্ফেৰ জীবনচৰিত রচনা কৰিছাছেন। ৰোণী বীৰবেৰ একান্ত জন্ত। ঔহাৰ চোখে মহাপুৰুষেৰা পূৰ্ব-সত্যৰ অৱতাৰ। ঔহাৰ হুট চৰিত্র ক্ৰিষ্টোফাৰ পছন সত্যবানী;—সৰ্ব অসহাৰ, এমন-কি, জীবন বিপন্ন হইলেও তিনি মিথ্যা-কথা কহিবেন না। টহাই ৰোণী'ৰ নীতি। “জন ক্ৰিষ্টোফাৰ” নামক উপজ্ঞানেৰ সৰ্বশেষই সন্মীৰ সামাজিক নীতিজ্ঞান ও ক্ৰিষ্টোফাৰে'ৰ পবিত্র চৰিত্ৰেৰ মখে আগল বিৰোধ ও ঘাত-প্ৰতিঘাত অৱাহত ভাবে চলি থাকে, —ক্ৰিষ্টোফাৰ সৰ্বশেষই ব্যক্তিগত ও জাতীৰ অসন্তোষ ভিত্তৰ পিৰা পড়িতেছেন এবং সমাজে বে কিকৰণ মিথ্যাভাৱেৰ প্রতাব, ক্ৰিষ্টোফাৰ তাহাও সহজেই উপলব্ধি কৰিতে পাৰিতেছেন।

“জন ক্ৰিষ্টোফাৰ” উপজ্ঞানেৰ মখে সাহিত্য-হুটিৰ কোন-নকম কল-কোশল, এমন কি একটা নিদিষ্ট ঘটনা-সংস্থান পৰ্যন্ত নাই। পদ-ঘোষণাৰ সকল নিয়ম অগ্রাহ্য কৰিহা উপজ্ঞানে স্যবদ্বত লক্ষ্যগুলি একীকৃত হইয়া আছে এবং কোনৰূপ তৃণ্মল দার্শনিকতাৰ ধাব না ধাৰিয়া ইহাৰ ঐক্যেৰ ভাব, অগব তাৰেৰ ধাৰাকে ঠিক সাভাবিক ৰূপেই অঙ্গুসংগ কৰিয়া

চলিতেছে। সত্যের প্রকাশ হইলে জীবন যেমন সরল, বলিষ্ঠা বুঝা যায়, এই উপজ্ঞান-খানিও তেমনি সহজ, তেমনি পরিষ্কার। নারক ক্রিষ্টোকারের নিজের জীবনে বাহ্যিক পরম হয় নাই, জীবন গইরাও এমন কোন-কিছু এই উপজ্ঞানে কথিত বা চিত্রিত হয় নাই। ক্রিষ্টোকারের নিকটে বাহ্যিক অসত্য, লেখকও তাহার অস্তিত্ব দেখাইতে বান নাই; মানবীয় উন্নতি-অবনতির এমন কথা খুব কমই আছে বাহ্যিক এই পুস্তকে আলোচিত হয় নাই,—বর্তমান যুগের সকল পুস্তক অপেক্ষা ‘এন ক্রিষ্টোকারে’ আধুনিক জীবন লইয়া বিবৃত আলোচনা আছে।

উনবিংশ শতাব্দীর ভাব-জগৎ হইতে ‘এন ক্রিষ্টোকার’ একটি বিশাল সেতুর মত বিংশ শতাব্দীর ভাব-জগতের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর

সকল ভাব ও কর্মনা যেখানে পুঞ্জীভূত, ক্রিষ্টোকার ঠিক সেইখানটি হইতেই ভবিষ্যতের পানে ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রিষ্টোকারের জীবন সরল ও সম্পূর্ণ বাস্তব; তাহার স্মৃতি আছে, এই পুস্তক তাঁহাকে আনন্দ ও শিক্ষাদান করিবে এবং ক্রিষ্টোকারের সঙ্গে ব্যাখ্যা করিয়া পরিণামে তিনি বৃত্তিতে পারিবেন যে, পৃথিবীতে কারার পিছনেও হাসির ধারা আছে, সুখের মধ্যেও সুখের ছায়া আছে।

‘এন ক্রিষ্টোকার’ বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রধান গ্রন্থ। ইহাতে বিংশ শতাব্দীর আবাহন-সঙ্গীত আছে। আমরা কোথায় গিয়া দাঁড়াইব, ইহা তাহাই নির্দেশ করিয়াছে। ইহা অতীত ও বর্তমানকে প্রকাশ করিয়া আমাদের চোখের সামনে ভবিষ্যতের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

সারা বার্গাড্

সারা বার্গাড্ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। গত অর্ধশতাব্দী-কালের মধ্যে আর কোন অভিনেতা তাহার প্রতিভাকে মলিন এবং জনসাধারণের উপরে তাহার মত এত প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হন নাই। আজ তাহার বয়স সত্তর বটে; কিন্তু বৃদ্ধ কালও তাহার চির-যৌবনের কাছে হার মানিতে বাধ্য হইয়াছে। এই বৃদ্ধ বয়সেও সারার মুখে সুবস্তীর লাবণ্য এবং কঠিন্যের যৌবনোচিত কোমলতা আছে।

জনসাধারণে তাহার নাম দিয়াছে ‘বর্ণীর সারা’। কিন্তু কেবলমাত্র অভিনেত্রী

বলিয়া সারা সুপরিচিত নন, মানসিক শক্তি ও আদর্শ-চরিত্রের ক্ষমতা তিনি সকলকার প্রজ্ঞা-চক্রির অঙ্গণে পাইয়াছেন। তাহার সুদীর্ঘ জীবনে বহু যুগের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত আছে। সারার আলাপ আলোচনা ক্ষমতাও বড় অল্প নহে।

আমরা এখানে তাহার আত্ম-উক্তি তর্জমা করিয়া দিলাম :—

“সকলেই আমাকে আজকাল বিজ্ঞানী করেন যে, ‘কল্পে আমি আমার যৌবন রাখিতে পারিরাছি’”—

কল্পে ? অবশ্য সর্বদাই আমি যৌবনের

সাদা পাই বলিয়া। মানসিক ঘোবনই আমার দেহকে অস্বাভাবিক হইতে দেহ নাই। তারপরে, কাজের দিকে আমার টান বড় বেশী। আমার ডাক্তার যদি আমাকে কিছু করিতে বলেন, তবে আমি কিছুতেই তা করি না।

প্রতিদিন আমাকে যশেট খাটিতে হয়। সকালটা চিঠিপত্রের উত্তর দিতে দিতে কাটিয়া যায়। এই সময়ে আমাকে সারা সকালটায় আমার সেক্রেটারীকে লইয়া একশত আট-চল্লিশ খানা পত্র পাঠ করিয়া উত্তর দিতে হইয়াছিল।

পত্র লেখা সমাপ্ত হইলে রু-চার জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমি আহার করিতে বসি। খাওয়ার-দাওয়ার পর আমাকে রঙ্গালয়ে যাইতে হয়; সেখানে আমিই সর্ব্বেসক্য। রঙ্গালয়ে আমি সফা পর্য্যন্ত থাকি। বহনিকা পড়িলে সেখান থেকে বাহির হইয়া ছোট্টোলে যাই। তাহার পর মধ্যরাত্রে প্রমত্তাশ্রমে দেহ লইয়া আমি বস্ত্রহীন নিদ্রায় অচেতন হই।

কৃত্রিম উপায়ে বার্কাককে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। ঘোবন বাহির হইতে আসে না; আগে মনের ভিতর হইতে। মনকে তরুণ রাখ, কঠোর পরিশ্রম ও দৃঢ় বাতালে ব্যায়াম কর, সংসাহিত্য ও হুচিহা ব্যাং আগের যোগ্যক যোগ্যও, দেখিবে অভিন্ন-ঘোবন হুচিহা হইয়া উঠিগাছে।

ত্রিশ বৎসর আগে যখন আমি সব-প্রথম লণ্ডনে আসি, তখন এ-সহরটির আর এক রূপ ছিল। এখন এখানে বহু রঙ্গালয় ও মণ্ডীতশালা (variety house) হইয়াছে তখন ইহার দশাংশের এক অংশও ছিল

না। তখনিতে পাট, প্রমোদ-ভবন অসংখ্য হইলেও তাহার সকলগুলি জনতার একেবারে পরিপূর্ণ থাকে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বিলাতের বাসিন্দারা আগেকার চাইতে এখন বেশী আমোদ-প্রমোদ করিতে ভাল বাসে।

বিলাতি রঙ্গালয়গুলির আদর্শ বরাবরই উন্নত; হুতরাং এদিকে আমি বিশেষ কোন পরিবর্তন বুঝিতে পারি না।

কিন্তু, বিলাতে কোন জাতীয়-রঙ্গালয় নাই কেন? সাধারণের চানার অবিলম্বে এখানে একটি জাতীয়-রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত। পরলোকগত সন্ন্যাসী সন্তান এডোয়ার্ডের সঙ্গে আমার অনেকবার সাক্ষাৎ-মোক্ষাগা হইয়াছে;—তাঁহারও ঠিক এই মত ছিল।

হুদু জাতীয়-রঙ্গালয় নয়,—বিলাতে নাট্যকলা শিক্ষার জন্য একটি বিভাগেরও অভাব আছে। বিভাগের না থাকিয়াও এতদিন যে অভিনেতাদের কি-করিয়া চলিতেছে, সেখা ভাগিরা আমি আশ্চর্য্য হই। এরূপ বিভাগের যথেষ্ট হুফল এসব করে।

বিলাতি অভিনেতাদের, আসল দেখি এই, তাঁরা সকলেই আপন আপন খেয়াল-মত অভিনয় করেন। ফলে, অভিনয়ের সাধারণ গুণটি একেবারে মাটি হইয়া যায়। অবশ্য সকলেই এ দলের নন; এমন অনেক বিলাতি অভিনেতা আছেন, যাহাদের শক্তি অসামান্য।

নাট্যকলার বিভাগের, কোন অভিনেতার উপরে তাঁহার ব্যক্তিগত নিজেদের ছাপ

মাবিয়া দিতে থাকে না। এটে, কিন্তু এখন চটেতে
অভিনেতারি নোকরা ও 'মর্দেব' আকৃতি

সম্বন্ধে অনেক শূন্যগাত্ত করিতে পারেন।
সর্বোপরি এখনকার ছাত্র তাঁহার সহযোগী



হামলেটবেশে সারাথার্ণাড্

অভিনেতাগণের সহিত স্বরমিল
করিতে শিক্ষিত হন। আবৃত্তিতে
স্বরমিলপূত্র কোন কর্তৃ, ঐক্যতানগাড়ে
কোন পেরা যন্ত্রের মত স্রোতদের
কাণে একটা বেথাল্লা অগ্নিমাণ
করিতে থাকে।

সকল রকম চরিত্রেই কাঁচার
কতটা সমদক্ষতা, সেটা বিচার করিয়া
দেখিলে কোন্ অভিনেতা কোন্
শ্রেণীর, তাহা বেশ বুঝিতে পারা
যায়। আমার নিজের কথাই যদি
ধরি, তবে আমাকে বলিতে হয়,
আমার নিজের কোন বিশেষরূপে
প্রিয় ভূমিকা নাট। যদিও এটা
ঠিক যে, রমণীর চেয়ে পুরুষের ভূমিকাই
আমি বেশ পছন্দ করি। কিন্তু
সেক্সপিয়রের পোস্টিয়ার মত ভূমিকা
ছাড়া আর কোন রমণীচরিত্রের
ভূমিকায় সাধারণত চিত্তা করিবার
মত বড়-একটা-কিছু থাকে না।

কিন্তু হামলেট ও L'Aiglon-এর
চরিত্র! বাস্তবিক, এ দুটি চরিত্রের
ভূমিকা বিচিত্র! হামলেটের ব্যক্তিত্ব
আমি সর্বদাই জগতের মধ্যে অসুভব
করিয়া থাকি। যে অপূর্ণ ভাবের
ধারা তাঁহার ভিতরে থাকির তাঁহার।
সকল কার্যে বাধা দেয়, আমি সর্বদাই
তাহা আলোচনা করিতে ভালবাসি।
সেক্সপিয়র এই চরিত্রে, একটি ইচ্ছা
দেখে মহান আত্মার আগুন রচনা

করিয়াছেন। কারণ, আমার বিবেচনার
ছামলেটের মত ক্ষুদ্র চরিত্রের পক্ষে তাঁহার
আবেগের ধারা অতিশয় বিশাল। অনেক
ছামলেটকে পাগল বলিতে চান; কিন্তু
আমার মতে তিনি পাগল নন।

অনেকদিন আগে আমি তারি বোণা
ছিলাম এবং আমার ‘বাস্ত্য’ ততটা
ভাল ছিল না। সকলে ভাবিচাছিলেন,
আমার ক্ষয়রোগ হইয়াছে। একদিন এক
বন্ধু আমাকে বলিলেন, ‘আমি তোমাকে
কিছু উপহার দিতে চাই।’

আমি বলিলাম, “নটে, তবে তুমি”
আমাকে একটি কফিন পাঠিয়ে দিও।”

কফিন আসিল। আমি সেটিকে আমার

শরন-গৃহে রাখিয়া দিলাম। হঠাৎ আমার
এক বোনের অগ্রথ হইল। তিনি আমার
শরন-গৃহে ঘুমাইতে আসিলেন। আমিও
তাঁহার সঙ্গে শুইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু
ডাক্তার আমাকে মানা করিলেন। অতএব
আমি কফিনের ভিতরে গিয়াই ঘুমাইয়া
পড়িলাম।

এই শেষ কথায় পর আর : একটি
কথা সকলকে আমার শ্রবণ করাইয়া দিয়া
আমি বিদায় লইব। যৌবনকে যিনি
আমার মত চিরস্থায়ী করিতে চান, তিনি
যেন সর্বদা শ্রবণ রাখেন কঠোর শ্রম,
সবল ইচ্ছাশক্তি ও সংচিন্তার তাবনার
মধ্যেই অক্ষর যৌবনের মধুর উৎস আছে।

জাপানী রঙ্গিন ছাপা

জাপানের অনেক শিল্প-নিদর্শনেও এত
প্রভীচ্যের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে নটে,
কিন্তু জাপানী রঙ্গিন ছাপা যেমন সকলকার
মনোহরণ করে তেমন আর কিছুই নহে।
জাপানীদের কাঠের উপরে পোষাই-করা
ছবিতে রঙ্গের যেমন লগিত দীপা, পোঙ্ক-
কারীর যেমন বিভিন্ন হস্তচাতুরী দেখা
যায়, পূর্ণিণীর আর কোথাও তাহার তুলনা
মিলে না। যুরোপ ও আমেরিকার কলাবিদগণ
জাপানী রঙ্গিন ছাপাকে লগিত-
কলার মধ্যে একটি উচ্চ আসন দিয়াছেন।

আন্দর্যের কথা এট, জাপানী শিল্পের
এ বিভাগটি যুরোপ ও আমেরিকার নান
কিনিলেও জাপানে তার চেয়ে অধিক নাই।

এ বিভাগের ছবিগুলিকে জাপানে ‘বাকারে
ছবি’ বলিয়া ডাকিয়া করা হয়।

মাগুয়েব দৈনন্দিন জীবন লইয়া ছবিগুলি
আঁকা। নামজাদা অভিনেতা ও সঙ্গের
মেয়েমা পট্টরায় আদর্শ হন; কারণ তাঁহাদের
বর্ণচিত্র অঙ্গজ্ঞান চিত্রাঙ্গিত হইলে সকলেই
চিত্তরঞ্জন করে।

আগে জাপানী কলার প্রধান বিভাগ
ছিল দুটি,—Kano ও Tosa চিত্রশালা।
তখন সাধারণত রাজসভার সম্রাট ব্যক্তিগণ,
ছাত্রের দল ও পুত্রোচিত-শ্রেণীর লোকেরা
চিত্রাঙ্কন করিতেন। জাপানের মন্দিরে
মন্দিরে দে-সকল প্রাচীন পট দেখা যায়,
তাঁহার অনেকগুলিই পুত্রোচিত-শ্রেণীর



‘সানুয়াট’-পুত্র
(প্রাচীন চিত্র)

শিল্পীগণের অঙ্কিত। উক্ত বৌদ্ধ পুৰোহিত-
গণের মধ্যে শম্ভেজ (১৪০৬)
নামে পটুয়া-৬৬নট প্রদান। এই সময়ে
Kanno-চিহ্নকরেরা টাকা-কড়ি কিছুই
পাইতেন না। তবে, তাহাদের পৃষ্ঠ-
পোষকদের কাছ হইতে তাহারা পারিতোষিক-
বিসায়ে টাউল বা অস্ত্র-কিছু জিনিষ গ্রহণ
করিতেন। সেকালে জাপানে টাকার বড়
কমর ছিল না। শিল্পীরা টাকা নেওয়া
একটা অপমান বলিয়া ভাবিতেন।

তারপর Ukiyo-e চিত্রমালায় চলন
হইল। জাপানীরা পূর্জকথিত রত্নিন
ছাপারই নাম দিয়াছে Ukiyo-e বা
উকিয়ো-ইয়া।

কিন্তু সস্ত্রাভ শ্রেণীর জাপানীরা এই
নবীন শিল্পকে তখন একেবারেই আমোল
দেন নাই। যুরোপ ও আমেরিকার
প্রশংসাবাদ শুনিয়া সংপ্রতি জাপানীরা
তাহাদের রত্নিন ছাপার কিছু-কিছু আদর
করিতে শুরু করিয়াছে বটে,—কিন্তু আসল
ভক্তনুহুঁও এখন কাটিয়া গিয়াছে; কারণ,
প্রাচীন রত্নিন ছাপার ভাল ভাল নমুনা এখন
পাশ্চাত্য দেশে নষ্টয়া যাওয়া হইয়াছে।

১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে ইয়োসা মাতাহেই নামে
একজন সস্ত্রাভশ্রেণীর শিল্পী এই উকিয়ো-
ইয়া বা রত্নিন ছাপার আবিষ্কার করেন।
পুরাতন কলা পদ্ধতির অল্পসামান্য পরিবর্তন
কাচিনী অবলম্বন করিয়া যথেষ্টকি চিত্রাদি
অঙ্কন করিতেন। মাতাহেই সে চিত্রাচরিত
প্রথা ছাড়িয়া জাপানী চিত্রকলায় এক অপূর্ণ
বৈচিত্রের সঞ্চার করিলেন। সকলেই
যাহাতে সহজে সব বুঝিতে পারে, সাধারণকে

৩২শ বর্ষ, নবম সংখ্যা

তিনি এমন একটা আটপোরে বিনয়
দিলেন।

মাতাচোট বসিন ছাপার আবিষ্কারক
হটলেও এরিকে প্রথম ও প্রধান ওস্তাদ
হইতেছেন তথিকাওয়া মোরোনোবু। সম্ভবত
তিনি ১৬২৫ হইতে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার অসাধারণ
অঙ্কনপটুতা ছিল; তিনি বটেরের কল
শালা ও কালো রঙ্গে ছবি আঁকিতেন।
সে-সকল ছবিকে Sumi-e বা সুমি-ইয়া
অর্থাৎ 'কালো কালির ছবি' বলা হইত।
মাঝে মাঝে কেহ কেহ হাতে করিয়া
সেগুলির উপরে নানান রঙ্গের তুলি
বুলাইতেন। কিন্তু সে বর্ণরঞ্জনে চিত্রগুলির
সৌন্দর্য কিছুমাত্র বর্ধিত হইত না।
মোরোনোবুর হাতে আঁকা ছবি এখন
বাজারে বড় মেলে না। জাপানের অস্ত্রাভ
সকল শিল্পের মত, তাহার ছবি-ছাপার
পদ্ধতিও চীনদেশ হইতে আগিয়াছিল।

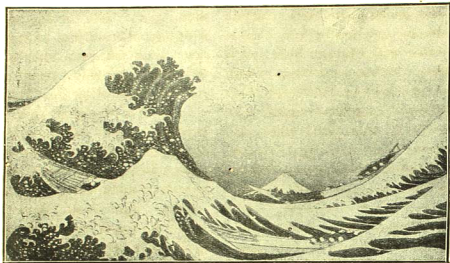
উকিয়ো-ইয়া-শিল্প-পদ্ধতির ওস্তাদগণের
আগল বিশেষত্ব হইতেছে, পরিকল্পনার
প্রতি খুঁটিনাটিতে, আখ্যান-বস্তুতে এবং
বর্ণবিভ্রাসে তাহাদের অপূর্ণ করণের খেলা।
জাপানে এই শ্রেণীর চাকার হাজার রঙ্গিন
ছাপার পট দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের
সকলগুলিরই বিষয় নূতন নূতন,—একখানি
ছবির সঙ্গে আর একখানি ছবির কোন
সাক্ষ্য দেখা যায় না।

অভিনেতা ও সহরে অস্ত্রাভ লোকজনের
ছবি ছাড়া চিত্রকরগণ চায়ের দোকানের
লগনা, অপক্লপ রূপবতী নর্তকী ও স্ত্রী
ভাগ্যদেবতা প্রভৃতির ছবি আঁকিতেন

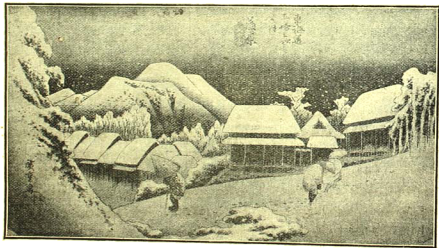


ফুলওয়াশো
(প্রাচীন চিত্র)

ভালবাসিতেন। হোকুসাই ও হিরোবিশগ যুরোপ ও আমেরিকার সকলের চেয়ে বেশী নামক শিল্পীদের চমৎকার নিসর্গ-চিত্রগুলি জাদুর পাইয়াছে।



উড়াল ভরঙ্গ (হকুসাই অঙ্কিত)



হিরোবিশের আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্য

হিরোবিগ হাতপাখার অল্প অনেক
অঙ্গর পরিকল্পনা করিয়াছেন। লোকালে
আপানের সন্মানবোধীয় যুবকরা এখন
সমারোহের লহিত কোন ডোলের আরোহণ
করিতেন, তখন উৎসবের সচিব তালিকা
অকনের ভায় শিমিগণের উপরে অর্পিত
হইত। অতিথিরা সেই সচিব তালিকা
দাতার স্বপনচিত্রবস্ত্র উপহার লাভ
করিতেন। হোকুসাই ও গাকুতেই নামে
দুজন শিল্পী এইরূপ অনেক এসিক সচিব
তালিকা বা ‘হুরিয়োনো’ অঙ্কন করিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে হোকুসাই
অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়া উঠেন। তখনকার
উপজ্ঞান-লেখকগণ আপনাদের পুস্তক
সচিব করিতে হইলে হোকুসাইয়ের সাহায্য
লইতেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে তিনি ‘মাকোরা’
নামে একখানি পট-পুঁথি প্রকাশ করিয়া
যশবান হইয়া উঠেন। হোকুসাই রসিক
চিত্রকর ছিলেন; কোন জিনিষেরই সরল

আশেটি তাঁহার পরচোখ এড়াইয়া বাইতে
পারিত না। প্রতি ছবিখানির উপরেই
তাঁহার তুলি লইতে যেন তরল হাতরসের বিলু
করিয়া পড়িত। তিনি কখনও একটা
আদর্শ খাড়া করিতে বাইতেন না, বাস্তবতা
তাঁহার একান্ত প্রিয় ছিল। অনেক ছবির
তলায় তিনি এই বলিয়া নিজের নাম
লিখিতেন—“চিত্রশাগল বৃদ্ধ লোক”।

হোকুসাই ও হিরোবিগের মৃত্যুর পর
হইতে আপানী রসিন ছবি-ছাপার কাজ
খারাপ হইতে আরম্ভ হয়। তাঁহাদের আগে
আরও অনেক ওস্তাদ-পটুয়া ছিলেন,--সকল-
কার পরিচয় এখানে দেওয়া অসম্ভব।

আটোয় অষ্টাশত বৎসর শিমিগণের মত
আপানী চিত্রকররাও, দর্শককে কণ্ঠকঠোর
পৃথিবীর হৈ-চৈ তুলাইয়া অপূর্ণ সৌন্দর্যের
স্বপ্নলোকে লইয়া বাইতে চাহিতেন,—
আটো শতাব্দী আপানী কলার এইখানেই
বিশেষত্ব।

কাইসারের চরিত-চিত্র

স্পেনের রাজকুমারী ইন্ফান্টা যুলেগিয়া
ইংরাজী সাহিত্যে অস্বাভিক্তর নাম করিয়া-
ছেন। বর্তমান যুরোপীয় যুদ্ধ আরম্ভ
হইবার পূর্বে তিনি জার্মান-সম্রাটের একটি
চরিত-চিত্র লিখিয়াছিলেন; সংগ্রহিত তাহা
প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার
কয়েকটি স্থান তুলিয়া দিলাম :—

“রাজকীর শোভাযাত্রার সঙ্গে আমি
আসানের ঘরের ভিতর দিয়া বেশ প্রস্থ

আগেই বাইতেছিলাম। আমার বয়স তখন
বেশী নয়। উপস্থিত জনতাকে প্রতি-
নমস্কার করিবার অল্প বয়সই আমি মাথা
তুলিতেছিলাম, শোভাযাত্রার সর্বপ্রায়ে
জয়কাণ্ডো পোষাক-পরা কাইসারকে তখনই
সমুজ্জল রোপ্যমুষ্টির মত দেখিতে পাইতে-
ছিলাম। তাঁহার বর্ণ ও শিরদ্বারা আলোক-
পাতে যেন অলিয়া অলিয়া উঠিতেছিল।
সম্রাটের সমুখে মধ্যযুগের পরিকল্পনার

চারিজন তেরোবাদক ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল।

সম্রাট স্বপ্নম চম্ভ্রাতঃপুত্র তলার সিংহাসনের সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া বিশাল সম্রাটের দিকে তাঁহার দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন, আমি তখন তাঁহার নীল চকুতে রাজার স্বর্গীয় সখ্যে দৃঢ় বিশ্বাসের চিত্র পরিষ্কৃত হইতে দেখিলাম।

সেদিন সকালে কাটসারকে দেখিয়া আমার মনে যে ভাবের ছাপ পড়িয়াছিল, তাহা নুতন নহে। বহুবৎসর পূর্বে তিনি যখন কুমার উটলচেলুন্স রূপে পরিচিত ছিলেন, তখন আমি তাঁহাকে সাদাসিধে একটি যুবাব বেশে দেখিয়াছিলাম। তারপর যেদিন হইতে তিনি 'ক্রাউন প্রিন্স' হইলেন, সেইদিন হইতেই তাঁহার স্বভাব বদলাইয়া বাইতে লাগিল। তাঁহার আচার-ব্যবহারে কেমন গর্ভ ও বেছাচারিতার ভাব আসিল। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর যতবার তাঁহাকে দেখিরাছি, ততবারই আমার মনে হইয়াছে যে, তিনি যেন আপনাকে স্বয়ং বিধাতার হস্তচালিত, সাম্রাজ্য-শাসনের একটি স্বর্গীয় বস্তু বলিয়া বিবেচনা করেন।

বাগিন নগরকে সম্রাট ঠিক তাঁহার সম্মানের মত ভালবাসেন। একদিন সকালে তিনি আমার বরে আসিয়া বলিলেন, "এতক্ষণ বড়ই বৃষ্টি হইছিল, এই সব পোষেছে। তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি তোমাকে একটি চমৎকার ব্যাপার দেখাব।"

আমাদের লজ্জা নীচে যে রাজশব্দট

অপেক্ষা করিতেছিল, আমরা তাহাতে চড়িয়া বসিলাম। গাড়া চলেতে লাগিল।

সম্রাট আমাকে এমন-কি-মাঞ্চর্য ব্যাপার দেখাইবেন, বসিরা বসিরা তাহাই ভাবিতেছি, এমন সময়ে তিনি চঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "দেখ। রাজ্যের দিকে একবার চেয়ে দেখ। এমন সুবন্দ্যের বৃষ্টি পড়ছিল—এই মিনিট-কতক আগে আকাশ সব করসা হইয়াছে—কিন্তু তবু তুমি রাজ্যের এক ছিটে ভাবা দেখতে পার কি?"

• বাস্তবিক, রাজ্যগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

সম্রাট বলিলেন, "রাজ্য খাঁট দেবার কাজে আমি মত্ত কোলের মত একদল লোক পূর্বা। বাগিনকে আমি কত পরিষ্কার রাখি, তোমাকে তাই দেখাতে এনেছি।"

—"কেবল এই দেখাতে এনেছেন—আর কিছু নয়?"

"আর কিছু নয়।"

আমরা দুজনেই হাসিতে লাগিলাম।

সম্রাট আমাকে বখেট অল্পগ্রহ করিতেন। নিচের ঘটনাটিতে তাহা প্রমাণিত হইবে।

আমি তখন স্বদেশে। প্যারিতে একটি কুর্তী মহিলার সহিত আমার আগাপ হই, —একদিন তিনি আসিয়া আমাকে বরিয়া বলিলেন যে, তুর্কদের হুলস্থলন আবহুল হামিদ, ইজ্জত্-শাহা নামে একজন লোকের প্রাণদত্ত দিতে চান। জার্মান-সম্রাট শীঘ্রই কনস্টান্তিনোপলে বাইবেন, আমি যদি বন্দীর মুক্তিপ্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে এক-

খানি পত্র লিখি, তবে তাঁহার অজুহাদে জলতান জাগদত্ত রদ্ করিতে পারেন।

টক্কর পাসা যে কে, আমি কোন কসে ভাটা জানিতাম না। কিন্তু তুর্কী মচিলটিব কাসুর জাগদত্ত সস্ত্রাটকে আমি একখানি পত্র না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না।

পত্রের উত্তর আসিল। কাসিসার আমার কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। কাসিসারের অজুহাদে জলতানও বন্দীকে মুক্তি দিয়াছেন।

কিন্তু ব্যাপারটা এতখানেই শেষ হইয়া গেল না। দুই বৎসর পরে একদিন আমি স্রমণের পরে মাত্রিমে ফিরিয়া আসিতেছিলাম। গাড়ী হইতে, মামিবাংমাত্র দেখিলাম, রাণী-মা ও আমার বোন রাজকুমারী ইলাবেলা আমাকে লইয়া বাইবার জঙ্গ টেনে আসিয়াছেন।

আমাকে দেখিয়া রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, “মুলেগিয়া, তুমি যে তুর্কী লোকটিকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে, তিনি কে?”

—“তুর্কী? আমিও কোন তুর্কীকে চিনি না।”

ইলাবেলা বলিল, “এঁকে তুমি তোমার কাছে রাখতে চাও, তাই ইঁন এখানে এনেছেন।”

আমি চটিয়া বলিলাম, “কি সব বাজে বোকো, তার ঠিক নেই! তোমরা দুজনেই কি পাগল হয়ে গেছ?”

রাণী বলিলেন, “উহ, পাগল হতে বাব কেন? তুর্কসের জলতান চিঠি

লিখেছেন যে, তোমাকে শুনী রাখবার চেষ্টে তিনি এত লোকটিকে তুর্কী মদ্রীকণে এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।”

এতকণে সব কথা বুঝিলাম। আগন্তক মামিব নিশ্চরিত স্তন্যচোচন আমার প্রার্থনা-তেই জাগদত্ত-সস্ত্রাট টক্কর পাসার মুক্তির জঙ্গ তাঁতাকে অজুহাদ করিয়াছেন। নারী-চরিত্র সঘর্ষে জলতানের বহুটুকু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল তাহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বন্দীর এই মুক্তিকামনার মধ্যে নিশ্চরিত জাগদত্ত-সস্ত্রাটের মত একটি প্রেম-কাহিনী লুকানো আছে; অতএব আমার হৃদয়কে প্রসন্ন করিবার জঙ্গ জলতান তাঁহার কল্পিত রোমান্সের নাটককে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ফরাসীরা ভাবিয়া থাকেন, কাসিসারের হৃদয়ে কেবল জার্মান আদর্শের স্থান আছে। এ ধারণা ভুল। কারণ, ফরাসী সাহিত্যে তাঁহার কৃতি অত্যন্ত অধিক। ফরাসী ভাবার ভাল ভাল বইগুলি তিনি সব পড়িয়া ফেলিয়াছেন। ফরাসী ভাষা, কলা ও নাট্যে তাঁরাব কতটা জ্ঞান, তিনি একদিন আমাকে তাহার পরিচয় দিয়া-ছিলেন।

পোট্‌সডামের প্রাসাদে যে বিখ্যাত কক্ষে ফ্রেডারিক দি গ্রেটের লাঠিরো আছে, সস্ত্রাট একদিন আমাকে সেখানে লইয়া গেলেন। ফ্রেডারিকের বহু ভুলটোয়ারের স্মৃতিচিহ্নগুলি আগে দেখিয়া আমি পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিলাম। আমার পিছনে বহন ঘরের দরজা বন্ধ হইয়া গেল, তখন দেখিলাম আমার চারিদিকে অনন্ত পুস্তকের

শ্রেনী বহিরাহে। বইগুলি সব ফরাসী ভাষায় লেখা।

আমি বড়ই ফরাসী-ভক্ত ছিলাম। তাই আমার দিকে চাহিয়া কাইসার হাসিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন, “এখানে এলে তোমার মনে হবে, তুমি তোমার প্রিয় ফ্রান্সে ফেরে ফিরে এসেছ।”

কাইসার, তাঁহার সাম্রাজ্যধর্ম সামরিক-তাকেই প্রাধান্যমান করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম সৈন্যদল ও নৌশক্তি স্থলির অস্ত্র প্রাণস, সমগ্র জার্মান জাতির মধ্যেও বে একটা প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে

আর সন্দেহ নাই। রাজ্যকে ভক্তি করিতে নিষিদ্ধ জার্মান প্রমাণগণ কাইসারের সমস্ত কাৰ্য্যই সার দিতে অত্যন্ত হইয়াছে। বগিচা-বিস্তারের অস্ত্র জার্মান-সম্রাট সর্বদাই চেষ্টা করেন। তাঁহার প্রমাণাও বৃত্তিতে পারিয়াছে যে, সম্রাটের চেষ্টার তাহার কতটা উপকৃত হইয়াছে। কাইসার নৌশক্তি ও সৈন্য বৃত্তি করিতে চান; অতএব, তাঁহার প্রমাণগণও কোন কারণ বিজ্ঞাপনা করে না অথবা বৎসরে বৎসরে বর্ধিতহারে টেনে দিতেও বিস্তার প্রকাশ করে না। সম্রাট উইলিয়ামের মত এই, যে, শান্তিরক্ষার বাহুবলই শ্রেষ্ঠ বল।

শ্রীজগদীশ্বর রায়।

সমালোচনা

ভিনাসচিত্র ও অঙ্কিত গল্প। শ্রীকৃষ্ণ ও অঙ্কিত গল্প। একাশক, ইতিহাস পারিগি হাউস, কলিকাতা। ব্রাহ্ম দিবস গ্রন্থে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। গ্রন্থিক যার্কিন হস্ত-রসিক যার্ক টোন্সনের কয়েকটি রচনা অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। ছবিবার যার্ক টোন্সনের স্মৃতিগত একটু পরিচয় আছে—সেটু হু বেল উপভোগ্য। তুষ্টি ‘ভিনাসচিত্র’ ‘অঙ্কিত’ অঙ্কিত কয়েকটি লেখা আছে। সেগুলি কোডু-রসে পূর্ণ—তবে তাহা সব জার্মান সমান স্বত্বের হয় নাই। অঙ্কিতের কটু গল্প রহিয়া গিয়াছে। একটু মনন দিতেছি, “জার্মান স্বত্বগুলি অতিবর্তিত ব্যক্ত করিল—জার্মান তাহার শমন ঘরের দিকে দেল। স্বত্ব-গুলি আসবাবপত্র চুরবার করিতে বাইতেছে বলিয়া

গেল (‘অঙ্কিত’)।” লাইন বহিরা অঙ্কিত করিলে এ ধোব অঙ্কিত—লেখক এইটুকু বৃত্তি তাবিত্তে সতর্ক হইলে জার্মান হুই হইব। যাহা যৌব, যোটার উপর গ্রন্থখানিতে বৈচিত্র্য আছে।

কাণ্ডিক-চরিত। শ্রীকৃষ্ণ বিবেচনায় দাস বি.এ. কর্তৃক সম্বলিত। ইপ্সিটোপোল ইঙ্গ কর্তৃক একাশিত। কাণ্ডিক গ্রন্থে মুদ্রিত। বিনামূল্যে বিতরিত। এ গ্রন্থে শান্তিপুর-মতঙ্গাশ্রমবাসী শ্রীকৃষ্ণ কাণ্ডিকচরিত দাস মহাপ্রেরণ জীবনী-পরিচয় ও তৎ-এসঙ্গে উক্ত গ্রন্থ ও তৎ-যৌবকভাষ্যের সংশ্লিষ্ট ইতিহাস সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থখানি সুশ্লিষ্ট, জীবনীটি সুখ্যাতি এবং ইতিহাসটুকুও বৌদ্ধধর্মোদ্দেশ্যক। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু—সম্বলনেও তিনি কয়েকটি অধ্যয়ন ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বিবাহেন।

শ্রীমতীস্বতী সর্বা।

কলিকাতা, ২২ ব্রিকফোর্ড, কাণ্ডিক গ্রন্থে, শ্রীমতীস্বতী সর্বা। যাহা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীমতীস্বতী সর্বাধ্যায় দ্বারা একাশিত।



শালোয় উদয়
 শ্রীমন্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভারতী

৩৯শ বর্ষ]

মাঘ, ১৩২২

[১০ম সংখ্যা]

আধুনিক ভারত

সরকারী কোষ ও পুষ্ঠকর্ষ

নৈতিক সভ্যতা ও ভৌতিক সভ্যতার
শ্রীবৃদ্ধি একই সম্বন্ধস্থলে এগিত; তাছাড়া,
উনবিংশ শতাব্দীতে যুরোপ যে ক্রমবিকাশ
লাভ করিয়াছিল ত্রুত ধনবৃদ্ধিই তার বিশিষ্ট
লক্ষণ বলিয়া স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়।
তাই ৪০ বৎসর হইতে ভারত-সরকার
ভারতের ভৌতিক উন্নতির পরিবর্তনে চেষ্টা
করিয়া আসিতেছেন। এই কার্যে সকলতা
লাভ করিবার দুইটি উপায় আছে :—
রাগস্ববৃদ্ধি ও বড় বড় পুষ্ঠকর্ষের
অমুষ্ঠান।

সরকারী কোষ

কোম্পানী ভারতকে মুষ্টিলের অবস্থায়
রাখিয়া গিয়াছেন :—সর্ভ ডেপার্টমেন্টের বিজ্ঞান-
সাধন ও সিগাছিবিত্তোহ দমনের ফলে
ভারত-সরকারকে বহুল ব্যয়ভার বহন
করিতে হইয়াছিল, এবং ইহার দরুন ভারত

সরকার করস্থাপন করিতে ও গণ করিতে
বাধ্য হইয়াছিল।

এই করবৃদ্ধির অন্ত পুণ্যনাত্রার কোবের
সংস্কারসাধন আবশ্যক হইল। “কেন্দ্রী-
করণ” ও “নিকেন্দ্রীকরণ” একযোগে এই
দুই প্রণালী অমুসরণ করিয়া এই সংস্কার
সাধিত হইল। স্বাধীনকরণ বোম্বাই ও
মাত্রাজ-প্রেসিডেন্সী সিপাহী-বিজ্রোহের খর্চা
নিতে অবীকৃত হইল; কিন্তু তাহারিপের
নিকট হইতে ভোগ করিয়া খর্চা আদায়
করা হইল। ভারতের একটি রাগস্ব-বিভাগ
ছিল এবং একজন রাগস্ব-সচিব ছিল।
রাগস্ব-সচিব—মস্ত্রিপরিষদের শাসন-বিভাগের
সদস্ত। এইরূপ বৃহৎ অবস্থায় মূল্যবোধিত
প্রাচীন ইংল্যান্ড কোব্যান্তিষ্ঠ ব্যক্তিকেই
ঐ পদে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে।

নিকেন্দ্রীকরণ। একটা সাম্রাজ্যের যতই
বৃহৎ ও লোকাকীর্ণ ভারত-প্রদেশগুলি
স্বাভাব্যসনের অনেকটা অংশ লাভ

করিয়াছে। যদিও প্রকৃতপক্ষে তাহাদের আশ্রয়ভোগে পুঙ্খ বকেট নাই কিন্তু ভারত-সরকার তাহাদের প্রত্যেকের ক্ষুদ্র বৈ আশ্রয় ধরিতা দিয়াছেন তাহা তাহাদের আশ্রয়ী রাজকরের অঙ্গপাতী।

রাজস্বপ্রণালীও নূতন করিয়া গঠিত হইল। অনেকগুলি প্রদেশে, সমগ্র রাজস্ব একটি নূতন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। পর্মিটের শুদ্ধরায় নূতন করিয়া বন্ধোবস্ত হইল। প্রথমে ভারত-সরকার শুদ্ধ সঞ্চকে রক্ষিত নীতি—পরে অবাধ বিনিময়ের নীতি অবলম্বন করে; শেষে সীমাবদ্ধ রক্ষিত নীতিতে প্রত্যাবর্তন করে। কনেকবার পরিবর্তন হইবার পর, আজকাল হুসা-প্রথা ছাড়া আর কিছুই উপর অপ্রত্যক্ষ কর বধীন হয় নাই এবং বিবিধ পরীক্ষার পর, এখনে প্রত্যক্ষ করের হিসাবে আর-কর আদায় করা হইয়া থাকে। এইরূপ-ইত্যন্ত কঠা হইতেই বুঝা যায়, কোন এক দেশের রাজস্ব-প্রণালী স্থির করা-ও নূতনকরের কার্য-ফল নির্ণয় করা ক্রান্ত কঠিন। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যুরোপীয় সভ্যতার দ্বারা ভারতের রূপান্তরীকরণ কেন এত বিলম্বে সংসাধিত হইয়াছে।

এইরূপ ইত্যন্ত কঠা সবেও, যে ভারগার ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ২১ কোড় টাকা ছিল, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৪০ কোড় টাকা রাজস্ব ছিল, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সেই ভারগার উহা ৭০ কোটি টাকার উঠিয়াছিল। তাই অর্থশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা, ও রাষ্ট্রশাসিতালক রাজনৈতিক-শুক্রবোধ বলেন যে ভারত-রাজকোষের দ্বিগুণিত স্থিতিস্থাপকতা আছে। দ্বিগুণ

সবেও; কৃৎকল্পের দারিত্র্যসবেও, প্রতি বৎসর গড়ত রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। এই রাজকোষের স্থিতিস্থাপকতা হইতে সম্ভব হয় যে, কতকগুলি বিপ্লবিত বাহ্য লক্ষণ সবেও, ভারত স্বাভাবিক নিয়মে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

•
•

যে দেশ রূপান্তরিত হইতেছে, সে দেশ রাজস্ব-গড়ত মূলধনেই কখন সম্বলিত থাকিতে পারে না। দেশের ভিতরকার ও বাহিরের প্রয়োজনের দরুন পূর্বেই অনেক টাকার স্বর্ণ হইয়াছিল,—সিপাহী-বিদ্রোহের পর আবার এই স্বর্ণ অধো বাড়িয়া গেল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় স্বর্ণ তিন মুখ্য বিভাগে বিভক্ত হইতে পারে :—কোম্পানী-দত্ত মূলধনের পরিশোধার্থ স্বর্ণ, ১৮৪৭ অব্দের পূর্বেকার স্বর্ণ এবং দেশবিরোধের পূর্বার হিসাবে স্বর্ণ এবং সিপাহী-বিদ্রোহের বর্জ্য বাবৎ স্বর্ণ। মনে হইতে পারে, অল্প জাতির কোষগুরুত্ব ইতিহাসে একরূপ স্বর্ণের দৃষ্টান্ত ত দেখা যায় না। কিন্তু সেটা শুধু বাহ্য অবস্থান মাত্র। বহিঃস্থ, গৃহস্থ, রাষ্ট্রবিপ্লব ও বহ্যবাস্যশেষ সংস্কারাদি বাতীত কোন জাতি গড়িয়া উঠে নাই; হস্তকার হাজার উপনিবেশ-বাদিন্দার বর্জ্য, উচ্চাংশীর জাপানীদিগের ও ভুল্পান্তি-চ্যুত আইরিশ ভূবানীদিগের ক্ষতিপূরণ-প্রভৃতি দৃষ্টান্ত সেও বাইতে পারে। সকল দেশেই জাতীয় স্বর্ণের কিয়দংশ, উহাদের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক একতা সাধনের মূল্যস্বরূপ ধরা বাইতে পারে।

ইংরাজকৃত দেশভয়ের খৰ্চ ও ভারতীয় জনের পরিমাণ এই উভয়ের মধ্যে একটা মিল দেখা যায়। কারণ ভারতের শত্রু-শক্তি ও শত্রু-রাজ্য হইতেই ইংরাজেরা একটা সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে।

শত্রুদের নিজেদের দোষপ্রমাণ হইতে, এবং অনাবিজ্ঞ যুদ্ধ বিপ্লবাদি হইতেও, দেশ অগ্ৰস্ত হইয়া থাকে। ১৮৭৭ অব্দের সামুদ্রাইদের বিদ্রোহের জার, ১৮৮৭ অব্দের সিপাহীবিদ্রোহ—বর্তমান সীতিনীতির বিকল্পে অতীত-ভক্তদিগের একটা ঐতিহ্যিক মাত্র। বুদ্ধির ভুলই ইহার কারণ। এই সকল ঘটনার উত্তরবংশীয় লোকেরা বিপুল অশক্তিতে প্রসিদ্ধিত হইয়াছে।

আর দুই কারণে ভারতের জন আরো বাড়িয়া গিয়াছে। একটা কারণ :—সকল সভ্য জাতির মধ্যেই সামরিক ব্যয় একটা প্রধান ব্যয়ের বিষয়। তবে তাহাদের সহিত ভারতের এই প্রভেদ যে, ভারতের বৈদেশিক সৈন্য এবং ভারতের সামরিক রাষ্ট্রনীতি, আরও ভারতের স্বার্থ অপেক্ষা, ইংলণ্ডের স্বার্থসাধনেই ব্যাপৃত। জনের দ্বিতীয় কারণ :—পুনঃপুনঃ হুঁত্বের আবির্ভাব। যুরোপীয়-শাসিত দেশে এইরূপ হুঁত্ব অতীব বিরল; ইহা হইতেই বৃদ্ধি যায়, ভারতের সত্যতা কতটা অক্ষয় ও অনিশ্চিত।

ভারতের অধিকাংশ জনের টাকা উৎপাদক কাজে খাটান হইয়া থাকে। দেশের বনবৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে ভারত-সরকার বড় বড় পুষ্ঠকর্ষের অনুষ্ঠান করেন। ভারতের বেশী মূলধন নাই, অল্পমত সভ্যজাতিদিগের জায় ভারতের

মূলধন নির্দিষ্ট আকারে হাবসভাবে পড়িয়া থাকে। কাজেই ভারত-সরকারকে ইংলণ্ডের বাজারের শরণাগত হইতে হয়। এই উদ্দেশ্যে দুই প্রণালী অনুসৃত হয়। একপক্ষে সরকারী কোষ হইতে মূলধন বাহিরা করা হয়; এবং পক্ষান্তরে, ইংলণ্ডে বাহার মূল-পতন—সেই সব রেল-কোম্পানী একটা নূনতম হারের স্বত্ব নিশ্চয়ই পাইবেন বলিয়া ভারত-সরকার তাহার প্রতীক থাকেন। অপরচালিত আরববাহন গুলে, ভারত কতকগুলি সুবিধামত ধার পাট্টাইয়াছিল এবং অনেক বার তাহা লভ্যবনক কাণ্ডে পাট্টাইয়াছিল। ভারত এখন শতকরা ২২ হইতে ৪ পর্যন্ত হারে স্বত্ব বিধি থাকে, তাহার বেশী নহে। খাল ও রেল হইতে ভারতরাত্ত্রের প্রকৃত আয় উৎপন্ন হয়। কিন্তু পুষ্ঠকর্ষের ধার্মিকতা, শ্রমশিল্প ও বাণিজ্যের যে ত্রিভুজ হইয়াছে, তৎপতিও লক্ষ্য করা আবশ্যক।

ভারত যে ইংলণ্ডের নিকট লক্ষ লক্ষ টাকা ধার করিয়াছে, তাহাতে ভারতের বিশেষ অবস্থাটা বেশ বৃদ্ধি যায়। যে জাপান যুরোপীয় সভ্যতার বশবর্তী হইয়া খেচ্ছাপূর্ণক আপনাকে সভ্য করিয়াছে,—ভারতের অবস্থা সেই জাপানের মত নহে; ভারতকে যুরোপ বশপূর্ণক সভ্য করিয়াছে। ইংরাজকর্তৃক প্রবর্তিত ভারতের জন-বন ইংলণ্ডে ব্যয়িত হয়, এবং উহা এক্ষণ কাজে নিয়োজিত হয় যে-কাজ কেবল ইংলণ্ডকর্তৃকই দ্বিগুণিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত কারণে এই সকল বড় বড় কাজে কখন-কখন ভারত অপেক্ষা

ইংলণ্ডেই উপকার হয়, অথবা ঐ সকল কাজের মতলবগুলি ভাবত অপেক্ষা ইংলণ্ডেই বেশী মনোমত ও অহুমোদিত বলিষ্ঠা বোধ হয়। দ্বিতীয়োক্ত কারণে, অনেক সময় দেশের সাধারণ উন্নতি হইবার পূর্বেই এই সকল কার্য অপ্রতিষ্ঠ হইয়া এবং তাহার দমন করে কংসর পরিচালনা উহার ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। জাপানীরা রেলপথ নির্মাণ করিয়াছে, কেন না, তাহারা উহার প্রয়োজনীয়তা বুঝে, এবং তাহার দ্বারা লাভও করিয়াছে। ভারত রেল পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবার পূর্বেই, ইংরাজ ভারতকে রেলপথ দিয়াছে; সেইজন্য উহা হইতে বড়টা লাভ আদায় করা উচিত ভারত তাহা করে নাই। ভারতের শ্রেষ্ঠ লেখকেরা, এই অহুমোদিত কার্য থাকে যে, রেলপথ ভারতবাসীদিগের উপর বিপুল ঋণভার চাপাইয়া দিয়াছে। ঈশ্বরকে, কি আর্থিক হিসাবে, কি রাষ্ট্রনৈতিক হিসাবে, ভারতের এই ঋণ ভারতকে ইংলণ্ডের করদ করিয়া তুলিয়াছে।

এইরূপ পরাবীণতা কতটা দুর্বল হইয়া উঠিতে পারে একটা তথ্যের দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয়। সে তথ্যটি রোপ্য-মূল্যের অবনতি প্রযুক্ত বিনিময়ের অধ্যয়ন। রোপ্য-আদর্শ-মুদ্রাই ভারতের আদর্শ-মুদ্রা এবং যে ইংলণ্ডের স্বর্ণমুদ্রাই আদর্শ মুদ্রা সেই ইংলণ্ডকে ভারতের দিতে হয় প্রতি বৎসর ১৫ হইতে ২০ কোটি পৌণ্ড। তাই, যে স্থলে এক টাকার বিনিময়ে দুই শিলিং পাওয়া বাইত, সেই স্থলে প্রায় এক শিলিং পাওয়া বাত, কাজেই ভারতের

ব্যয়ভার বিত্তগত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার বিপরীতে, টাকার বাটতি ভারতের স্বত্বানী হুজির পক্ষে কতটটা সহায়তা করিয়াছে। ভারত সরকার বিবেচনা করিলেন, তাহার সর্বপ্রথম কর্তব্য, পুনর্বার ভারতীয় মুদ্রার চলন (circulation) প্রকৃতির অবস্থার আনা। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে, টাকালো অগাধ রোপ্যমুদ্রার মুদ্রণ বন্ধ করা হইল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ভারত-সরকার স্বর্ণমুদ্রার আদর্শ গ্রহণ করিলেন। ইংরাজি নোটের মূল্য ১৫ টাকা হিম নির্দিষ্ট হইল। তথাপি ভারতের মুদ্রাঙ্গণালী, ইংলণ্ড অপেক্ষা ফ্রান্সের মুদ্রাঙ্গণালীকেই বেশী দমন করাইয়া বের। কেননা, ভারতে রূপায় টাকাই মুদ্রাঙ্গণোক্ত পূর্ণমাত্রিক এককের আদর্শ।

বজেট

ভারতীয় বজেট হইতে নিম্নতম তথ্য বাহির করিবার উদ্দেশ্যে, প্রথমে বজেটের স্থল রেখাগুলির নির্দেশ করিব।

প্রথম, আয়ের হিসাব। তিনটি বিষয় বিশেষ করিয়া দেখান আবশ্যিক। কলত অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ১০ জন পল্লীগাম্বে বাস করে। ইহা আর একটা প্রমাণ যে, এ পর্য্যন্ত জনসাধারণের উপর আধুনিক সভ্যতা যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা অত্যন্ত অল্প।

ভারতীয় রাষ্ট্র, এমিরিক রাষ্ট্রগুলত পিতৃশাসনের প্রকৃতিটাই দ্বারা চাখিয়াছে। সমস্ত ভূমিতেই রাষ্ট্রের স্বাধিকার, এবং ভূমিদ খাদ্যনা ও স্বাক্ষর এক সাধারণ হইয়া গিয়াছে। আরের একটা বৃহৎ অংশ, জুস্পজি অথবা

একচেটিয়া ভাষা হইতে উৎপন্ন—বন জন্তু, আফিম ইত্যাদি; ইহার সহিত আর একটা যোগ করিতে হইবে—মানব রাজ্যবি হইতে প্রাপ্ত বার্ষিক কর। কিন্তু স্বাধীনতার ভারতেও, আধুনিক রাষ্ট্রের আদর্শ-কল্পনা, ও এগিরিক রাষ্ট্রের আদর্শ-কল্পনা—এই দুইকে একত্র মিশাইয়া ফেলা হইয়াছে। ডাকঘর, টেলিগ্রাফ, অধিকাংশ খাল এবং রেলপথের লাইনগুলি—এ সমস্ত রাষ্ট্রের মিলন।

যে সকল রাজকর যুরোপীয় বজেরের মূলভিত্তি সেই সব রাজকর ভারতে প্রচলিত করা বড়ই কষ্টকর। অপ্রত্যক্ষ করের মধ্যে যে করটি আর সমস্ত যুরোপীয় দেশ হইতে প্রচলিত হইয়াছে,—ভাষিতে সেই লবণ-কর হইতে প্রকৃত আর উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারত এখনো একদম দরিদ্র যে, সর্কাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সেই একমাত্র খাজের উপরেই কর স্থাপন করিতে হইয়াছে। অপ্রত্যক্ষ খাজের উপর যদিও নগর-স্বত্ব স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু সরকারের কোষাগার পূর্ণ করিবার জন্য কেবল সুরা দ্রব্যাদির উপর কর স্থাপিত হইয়াছে। যদিও উক্ত কর্মের হার একপ্রকার নিবেদক বলিলেও হয় তথাপি ঐ কর্মোৎপন্ন-বার্ষিক আয়ের অল্প বেশিলে বুঝা যায় কতটা সুরাসেবনের বৃদ্ধি হইয়াছে। অল্পমত জাতিরা, উন্নত সভ্যতার ভাষা বল গ্রহণ করিবার পূর্বেই মদ্য ফলগুলি গ্রহণ করিয়া থাকে।

প্রত্যক্ষ করগুলিও সহজে স্থাপিত হয় না। ঐ কর্মের আকারটা ক্রমাগতই পরি-বর্তন করা আবশ্যক হয় :—বখা, দানসাহায্য,

পেটেন্ট, লাইসেন্স, পরিশেষে আয়ের উপর কর। এই আয়করের ভাণ্ডারটোয়রা হইতে ভারত সমাজের অল্পমত আদিনি আঁকা আমরা অবগত হই। জিন কোটি ভারতবাসীর মধ্যে, কেবল ৪৮২,০০০ জনের ৫০০ টাকার এবং ৭০ জনের লোকের দুই হাজার টাকার অধিক আয়। সমস্ত আয়ের অল্প ৫০০০০০০০ পৌণ্ড। তথাপি বাহাদুর উপর আয়কর ধরা হয়, ১৮৮৬ হইতে তাহারদের সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা একটা উত্তম দৃষ্টান্ত বলিতে হইবে। কিন্তু সমস্ত মোটের উপর বেলন ও পেন্সান—শতকরা ২২।২। কেবল বণিক কোম্পানীদিগের বিবিধ আয়—শতকরা ১২। চতুর্থ ভাগিকার মধ্যে (ব্যক্তি বিশেষের আয়) উৎপন্ন আয়ের তৃতীয়াংশ বেকওয়ারা ও কুদীদব্যবসায়ীরা যোগাইয়া থাকে। অতএব মোটের উপর ধরিতে গেলে, আদায়ী টাকার বজেট—এসিয়া ও যুরোপীয় এই দুই সভ্যতার প্রভাবই প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইহা বিপরীতে খরচের বজেটটা সমস্তই যুরোপীয় ধরণের।

বনের চাষ, আফিম প্রস্তুত করা, খাল কাটা ও খাল রক্ষা করা—এই সকলের খরচ ছাড়া আর কোনো বিষয়ের খরচে এগিরিক রাজ্যস্থল অধ্যায়ের পরিচয় পাওয়া যায় না।

কিন্তু বজেটের এই একটা বিশেষত্ব দেখা যায় যে, ১৪ হইতে ১৬ লক্ষ পৌণ্ড

প্রতিবৎসরে ইংলণ্ডে ভারত সচিবের নিকট প্রেরিত হয়। উহার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী, গণের জ্ঞান পরিশোধার্থ নিয়োজিত হইয়া থাকে। যে সকল রাষ্ট্র বাহির হইতে বার করে তাহাদের যে অবস্থা, এই বিষয়ে ভারতেরও সেই অবস্থা। যে সকল উৎপন্ন দ্রব্য ভারত-সরকার ভারতে সংগ্রহ করিতে পারে না, সেই সকল দ্রব্য বহির্দেশের অন্ত একটা আন্তর্মানিক *অঙ্ক লিখিয়া রাখা হয়।

যে সময়ে বেলাপপ নির্মাণ ও পরিচালনের সমস্ত উপকরণ ইংলণ্ডে বরাদ্দ করিতে হইত, সেই সময় এই ভারতের খরচ আরো অনেক বেশী পড়িত। অতএব এই খরচের লাগবে ভারতীয় শ্রমশিল্পের উন্নতি স্থিতি হয়।

ছোড়া, দেওয়ানী ও কোদারী কার্য চারীদিগকে অবসরপ্রাপ্তি দিতে হয়, ভারতীয় ইংরাজ সৈন্যদের বেতনের খরচ দিতে হয়। অতএব এই বজেট হইতে আমরা জানিতে পারি, ইংলণ্ড ভারতের কি কি উপকার করিতেছে এবং আরো জানিতে পারি, ভারতের অধীনতা হইতে ইংলণ্ডের কি সুবিধা হইয়াছে, ইংলণ্ড কিরূপ লাভবান হইয়াছে। ভারতের অধীনতার এই একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, ইংলণ্ডের ভারতীয় মন্ত্রণা-সভার বর্জ্য ভারতকে দিতে হয়।

সরকারী পূর্তকর্ষ

রাজস্ব ব্যবহার সংস্থারের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী পূর্তকর্ষও বিস্তার লাভ করে।

যুরোপীয় দেশে, শত শত বৎসর ধরিয়া এই সকল পূর্তকর্ষের উন্নতি ক্রমশঃ সংগৃহীত হয়, এবং সরকারের সহিত ব্যক্তি-বিশেষের চোঁটাও চলিতে থাকে, অথবা সরকারী চোঁটার পূর্বেও ব্যক্তি-বিশেষের চোঁটা আরম্ভ হয়। ভারতে, সকল বণিক-সম্প্রদায়ের জায় কোম্পানী উপস্থিত বার্থ লাইগা একল যাপ্ত ছিল যে বহুসময়সাপেক্ষ ও বহুঅর্থসাপেক্ষ এই সকল বৃহৎ অস্থানে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। ১৮৫৭ অব্দের সিপাহী-বিদ্রোহে, ভারতের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা হঠাৎ ইংরাজের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল। ইংরাজ দেখিতে পাইল, অষ্টাদশ শতাব্দীর অসামান্যতা-জনিত ধ্বংসকার্যের প্রতিবিধান করিবার কোন চোঁটাই হয় নাই, যুরোপীয় সভ্যতার ভৌতিক সুবিধা ও উপকারের কিছুই বিস্তার হয় নাই। ভারত-সরকার বৃথিগণ, যে-দেশে ব্যক্তি বিশেষের নুতন কোন অস্থানের চোঁটা অজ্ঞাত, সেদেশে সে কাল সরকারকেই করিতে হইবে, শূন্য করিতে হইবে, এবং সকল বিভাগেই করিতে হইবে।

■
" "

প্রথমে ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ১৭ লক্ষ পত্র; ১৯০০ অব্দে প্রায় ৪ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পত্র ও পোষ্টকার্ড। ১৮৫৭ অব্দে ৮৩ হাজার টেলিগ্রাফ-লাইন; ১৯০০ অব্দে ৫৩,০০০ লাইন, ১৭১,০০০ তার।

তাহার পর বন্দর, রাস্তা, রেলপথ।

লর্ড ডেলহৌসি ভবিষ্যতে কিরূপ রেল-পথের জালবিস্তার করিতে হইবে তাহার একটা নকশা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। সর্বপ্রায়ে মাদ্রাজ ও কলিকাতার সহিত, পরে লাহোর ও পেশোয়ারের সহিত বোম্বাইকে যুক্ত করা। এই দুয়া পথগুলি তৈয়ার হইলে পর, উহা হইতে ছোট ছোট পথ প্রস্তুতকরণ বাহির করা হইতে লাগিল। উহার মধ্যে অধিকাংশই বাণিজ্য ও শ্রমশিল্পের সুবিধার জন্য গঠিত। কতকগুলি কেবল সামরিক কার্য্যকোশলের মতলসে গঠিত। যথা :— পেশোয়ারের প্রান্তরীমা অহুসরণ করিয়া একটা পথ মুন্ডান ও করাচিতে গিয়াছে এবং তাহারই একটা শাখা বেলুচিস্তানের ভিতর দিয়া চমন্ পর্যন্ত গিয়াছে, কান্দাহারের দ্বার পর্যন্ত গিয়াছে। একটা রেলপথ রেহুন হইতে ভামো পর্যন্ত—দক্ষিণ ত্রকোণের ভিতর দিয়া গিয়াছে। এখনো বড় বড় দুইটি পথ মাত্র খুলিতে বাকী আছে :— একটা মাদ্রাজ হইতে কলিকাতা পর্যন্ত, আর একটা ত্রকোণ নদী অহুসরণ করিয়া ত্রকোণেশ্বর রেলপথের সহিত যিনিবে। তার পর এমন সমস্ত আসিবে যখন ভারতীয় রেলপথ পারস্তে, আফগানিস্তানে, তিব্বতে, চীনে ও জাপানে প্রবেশ করিবে। ১৮০০ বৎসরের অবনতিস পর আবার ভারত সমস্ত এশিয়াকে সভা করিয়া তুলিবে।

•
•

ভারতের সমস্ত অঞ্চলে গতিবিধির সুবিধার জন্য কতকগুলি পুর্নকর্মে অগ্রগতি

হইল—এই সকল দেশ বাহাতে বাতাসের ও উষ্ণের হ্রাসহ্রাস অগ্রগতি প্রাপ্ত হইল। যথা :—নবীতে বাধ দেওয়া, জলাভূমির জল লোষণ করা এবং পাল কাটা।

কেবল নদীর বধীশগুলিই সম্যক্রূপে জলমিত। অল্প সময় অকালের ফসল বর্ষার ফলের উপর নির্ভর করে, কিন্তু বর্ষার জল অনিশ্চিত। এখন দেশা বার, দশ-অশের নর-অংশ লোকের কৃষিই আঁকি; খারাপ ফসল হইলে, পত সহস্র লোকের দৈন্য-দুর্দশা—অথবা হুর্জিক। তাছাড়া কৃষি-শ্রম-প্রণেয় রক্তানীর জন্য ভারত একটা মহাবিশেষী। ইহা হইতেই খালের আনন্দকতা।

সিন্ধু, যমুনা, গঙ্গা, কৃষ্ণা, গোদাবরী প্রভৃতি প্রধান প্রধান নদীর অববাহিকা-ভূমিতেও অনেকগুলি খাল কাটা হইয়াছে। এই খাল হইতে প্রভূত আদর হয়। এইরূপ জলমিত প্রদেশগুলিতে আর হুর্জিক হয় না। সুবৎসরে ঐ অমিতে অনেকগুলি ফসল হয়।

আরও নূন নূন খাল কাটা আবশ্যক। এই সকল খাল কাটা হইলে, পঞ্জাব, আগ্রা, অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশ বাঙ্গালারই মত সমৃদ্ধ হইবে; রাণপুতনা ও বাক্সগাতোর অগ্রগতি প্রদেশগুলিও হুর্জিক হইতে রক্ষা পাইবে। ভারতীয় কোম্পানীরা, মূলধন খাটাইয়া বাহাতে লাভ করিতে পারে এইরূপ বড় বড় কার্যে তাহাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত। কিন্তু ভারতবাসীদের পক্ষে নূন কিছু করিবার উত্তম চেষ্টা নাই—পেছন কার্য্যমুদ্রি নাই। সুতরাং সমস্ত কর্ম্মভার গন্তর্ঘ্যমুদ্রকে বহন করিতে হয়।

গভর্ণমেন্ট খেটে খেটে করিতেছেন না বলিয়া গভর্ণমেন্টের উপর দোষারোপ করা অসম্ভব। অতঃপর বড় বড় কালের ভার একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু চাপ-দৈত্যগ্রস্ত, অজ্ঞ, দুর্বল-প্রকৃতি, ধর্মোন্মত্ত ভারতীয় জনাদের সহিত কি যুক্তরাষ্ট্রের ‘অদিনাসৌদিগের তুলনা হয়? তাছাড়া রুশ-গভর্ণমেন্টের কর্মসূচী ভারতীয় গভর্ণমেন্টের কর্মসূচী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে।

এক্ষণে ইংলণ্ড কর্তৃক ভারতবিজয়ের ইতিহাসের আবার একই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া উপসংহার করা যাক। তিনটা বড় বড় বড় কালবিভাগ। প্রথম কালবিভাগ :— এক বলিক-কোলম্বানী ভারতে দুকুটী স্থাপন করে; কালক্রমে সেই কুটীর এলাকাগুলি কতকগুলি উন্নতযোগ্য রাজ্যে পরিণত হয় এবং সেই বলিক-সমাজ একটা রাষ্ট্র-শক্তি হইয়া দাঁড়ায়। দেশের সাধারণ অসামর্যতা ঐ কোলম্বানীকে দিখিরতের দ্বারা রাজ্য বিস্তার করিতে বাধ্য করে। অবশেষে কোলম্বানী সর্বাধিকার রাজশক্তি হইয়া দাঁড়ায়। এই ক্রটিতে রাজধানী ইংলণ্ডের মনোযোগ আকর্ষণ হওয়ায় ইংলণ্ড স্বয়ং রাষ্ট্রনৈতিক কার্যভার গ্রহণ করিয়া সমস্ত ভারত জয় করিলেন।

দ্বিতীয় কালবিভাগ :—ভারতবিজয়ে দুই

সত্তার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। দ্বিতীয় ধর্ম-বিবাদ, ও পৌরিক প্রখাদির উপর হস্তক্ষেপ হইবার ভয়ে হিন্দু মূলগত উত্তরাধী বিবেচী রাজ্যের বিচ্ছেদ বিস্তারিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাবের কোন একটা বাধাবোধি মূল্য ছিল না, এমন কি, বিশেষ কোন লক্ষ্যও ছিল না। কতকগুলি হস্তাশ্রয় “বরিশা” লোকদের যেকোন কাল, তাদেরও কালের ভাব সৈক্য ছিল ঐ বিচ্ছেদের দমনে সুযোগীয় সত্তার জয় প্রাপ্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল।

তৃতীয় কালবিভাগ :—কোলম্বানীর জয়গার ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। এতদিন যে কাল লক্ষ্যভাগে হইতেছিল, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এখন হইতে তাহা একটা নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে করিতে লাগিলেন। একটা শাসন-কর্তৃক-শক্তি, একটা ব্যবস্থা-কর্তৃক-শক্তি, একটা প্রাণ অথচ ক্রটিভাবীকৃত রাজকার্য-পরিচালনশক্তি সৃষ্টি হইল। আইনের দ্বারা, শিক্ষার দ্বারা উত্তরোত্তর সৌভাগ্যের উন্নতি, এবং বড় বড় পুষ্ঠকর্মের দ্বারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি সংঘটিত হইল; এবং এই পুষ্ঠকর্মের অস্ত্রাধানে রাজকোষের লক্ষ্য ও জন-সাধারণের মধ্যে সমতার গুণ-ধর্মের চলাচল (circulation) সম্ভব হইল।

শ্রীযোগতিরিক্তনাম ঠাকুর।

প্রাণিরাজ্য মানুষের স্থান

প্রাণিজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মানবজাতিকেই সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ দেখা যায়। প্রাণী যে পথে চলিয়া আধুনিক মানুষরূপে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে, সে পথটি ভাগ করিলে প্রাণিরাষ্ট্রের সিংহাসনে কোন জাতি বসিত তাহা অনুমান করা কঠিন। বহা হউক, অভিযান্ত্রিক যে ধারা অবলম্বন করিয়া মানুষ প্রাণিশ্রেষ্ঠ হইয়াছে, তাহা আবিষ্কার করা আধুনিক প্রাণিবিদগণের একটি প্রধান কার্য হইয়া গাড়াইয়াছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া এই ধরাভুলে প্রাণের লীলা চলিতেছে; এই স্থনীচ কালে যে কত প্রাণী নব নব মূর্তিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ও জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হইয়া লোপ পাইয়া গিয়াছে, তাহার হিসাব হয় না। গভীর মৃত্তিকান্তরে, সমুদ্রতলে এবং শিলাভাস্তরে এই প্রেয়ীর অনেক লুপ্ত প্রাণীর দেহাবশেষ দেখা যায়; কিন্তু ইহাতে অভিযান্ত্রিক ধারা ঠিক বুঝা যায় না। নিজেদের অভিযন্ত্র একটুও চিহ্ন না রাখিয়া যে সকল প্রাণী লোপ পাইয়া গিয়াছে, তাহাদের আকৃতিপ্রকৃতি জানা না থাকিলে অভিযান্ত্রিক ধারা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। যে সকল বৈজ্ঞানিক নিকৃষ্টতম প্রাণী হইতে মানুষের অভিযান্ত্রিক সন্ধান করেন, তাহারাই সকল লুপ্ত প্রাণীর পরিচয় একত্র না পাইয়া অমুসন্ধানে খেঁচি হাড়াইয়া বেলেম, কাজেই তাহাদের চোঁটা সম্পূর্ণ সফল হয় না; কাজে কাজেই বহুনাশ

সাধায়া গ্রহণ করিয়া অভিযান্ত্রিক ধারা রক্ষা করিতে হয়।

কাল এবং স্থান উভয়ই অনাদি এবং অনন্ত। বর্তমান সময়ে যে মানবরাতি কালে ও স্থানের উপরে আধিপত্য করিতেছে, তাহাও আদি-অন্তহীন; চিন্তা করিলে এই কথাটাই ঘেন মনে হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক-গণ ইহারি ঠিক উল্টো কথা বলেন। তাহাদের মতে অনাদি ও অনন্তকাল ধরিয়া যে সৃষ্টি চলিতেছে, আমাদের পৃথিবী সেই সৃষ্টি-ক্রিয়া হইতে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহার বয়স অধিক নয়। তারপরে, জন্মগ্রহণ করিয়াই পৃথিবী জীবের বাসোপযোগী হয় নাই; লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া নিজেদের বেঁচে উত্তাপ ভাগ করিয়া শীতল হইলে তৃণ জীবদিককে আশ্রয় দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে জীব, সৃষ্টি-পর্যায়ের নিরন্তর স্থানে রহিয়াছে। তারপরে যেদিন ধরাভুলে প্রাথমিক জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল, মানুষ তাহার পূর্ণ মূর্তি লইয়া সেদিনই জন্মগ্রহণ করে নাই; অল্পপ্রাণ প্রাথমিক জীবই ক্রমান্বয়ে হইয়া অতি-আধুনিক কালে মানুষের সৃষ্টি করিয়াছে। কাজেই বলিতে হয়, মানুষই জীব-পর্যায়ের সর্বনিম্ন ধাপে অবস্থিত।

প্রোটোজোয়া (Protozoa) নামক যে জলচর প্রাণী এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই যে প্রাণিরাষ্ট্রেরই পিতামহ, এ-সম্বন্ধে আর মতবৈধ নাই। সাধারণ প্রাণীর জ্ঞান

প্রোটোজোয়ার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাট, বিশেষ পাকবস্ত্র বা শ্রুঙ্গবস্ত্রও নাই। সেগুলি আর জড়বস্ত্র বলে ভাসিয়া বেড়ায়। এই অস্থি-মজ্জাহীন প্রাথমিক প্রাণীধ বংশধরদিগের মধ্যে কতকগুলি 'কি-প্রকার আকৃতি-প্রকৃতি লইয়া ক্রমোন্নত হইরাছিল, তাহা ঠিক সলা যায় না। কিন্তু প্রোটোজোয়ার বংশধরগণই যে, এখন অতিকার্য্য হস্তী বা বুদ্ধমান মানবের আকারে জুতলে বিচরণ করিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ডিম্ব হইতে বহির্গত হইয়া ভেকশাবক "ব্যাঙাচি"র আকার গ্রহণ করিয়া কিছুদিন জলে বিচরণ করে। "ব্যাঙাচি"র আকৃতি-প্রকৃতি দেখিলে সেই প্রাণীই যে পরে মূলচর হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা কল্পনা করা যায় না। "ব্যাঙাচি"র ফুসফুস থাকে না; কঠিন খাত্ত গিলিয়া খাইবার ব্যবস্থাও তাহাদের দ্বারা নেহা যায় না। জলে সাঁতার কাটবার জন্য বড় বড় লেজ থাকে, জল হইতে বায়ুশোষণ করিয়া জীবনধারণ করিবার জন্য ইংরেজ ডায় "কান্কা" (Gill) থাকে। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে লেজ খসিয়া পিঙ্গা চারিখানি পা গজাইয়া উঠে এবং "কান্কা"র স্থানে ফুসফুস জন্মিতে থাকে। তারপরে "বেঙাচি" যখন জল ছাড়িয়া স্থলে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন তাহারা যে কোনো কালে মৎস্তের জ্ঞান জলচর প্রাণী ছিল তাহা বুঝাই যায় না। ভেকগণ শৈশব-জীবনে এই একারে পূর্ক জীবনের কতকটা পরিচয় প্রদান করে; ইহা হইতে ভেকের অতি প্রাচীন পূর্কপুরুষগণ যে রিহক জলচর প্রাণী ছিল, তাহা অনুমান

করা কঠিন হয় না। প্রোটোজোয়ার জপ ত্যাগ করিয়া ভেকজাতি যে পথে উন্নতির সোপানে উঠিয়াছে, মানুষ সে পথ ধরিয়া উন্নত হয় নাট; এমনকি মানব-শিশুর বেহে তাহার প্রাচীন জলচরকের প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু মানবদেহ হইতে তাহার প্রাচীন অবস্থার চিহ্ন একেবারে লোপ পায় নাই। মাতৃগর্ভে জগ্ন কি-প্রকারে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় আধুনিক শরীরবিদগণ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। যে সকল পরিবর্তনের ভিতর দিয়া প্রাণিগণ তাহাদের বর্তমান আকৃতি-প্রকৃতি পাইয়াছে, প্রত্যেক জগ্নের পূর্ণতা-প্রাপ্তির সময়ে সেই সকল পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। মানব-জগ্ন যবীন হস্তপদাদিযুক্ত মানবের আকৃতি গ্রহণ করিবার জন্য মাতৃগর্ভে পুটে হইতে থাকে, তখন তাহাতেও একে একে পূর্কজীবনের ইতিহাস একাংশ পাইতে থাকে। মানুষের অতি বৃদ্ধ শিশুমহ যে সভ্যই এককালে জলচর প্রাণীর আকারে সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইত জগ্ন-পরীক্ষার তাহা ধরা পড়িয়াছে। মানব-জগ্ন প্রথমতঃ ফুস-ফুস জন্মে না, মস্তাঙ্গাদি জলচরেরা যে "কান্কা" দিয়া জল হইতে বায়ু গ্রহণ করে, জগ্নে প্রথমে তাহাই জন্মে। পরে ঐ "কান্কা" রূপান্তর গ্রহণ করিয়া ফুসফুসে পরিণত হয়। সুতরাং মানুষ তাহার বর্তমান আকৃতি পাইবার অনেক পূর্বে যে মস্তাঙ্গাদির স্তায় খাটি জলচর প্রাণী ছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন হয় না।

যোগ্যতামের উত্তরণ (Survival of the fittest) প্রাণীর অভিযুক্তির মূল ব্যাপার

জড়প্রায় প্রোটোজোয়ার অঙ্গের কঠিন পর্বে তাহার বংশধরগণ, পরম্পরের সহিত যারামারি হানাহানি করিয়া নিজেদের যোগ্যতা দেখাতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা যায় না; সম্ভবতঃ লক্ষ বৎসর পরে যখন অস্থিমজ্জাহীন প্রোটোজোয়ায় সন্তানদিগের দেহে অস্থিময় মেম্ব্রেনের উৎপত্তি হইয়াছিল, তখনই তাহাদের পরম্পরের মধ্যে সংগ্রামের স্বরূপাত হইয়াছিল। তখন কেহ নিজের দেহ কঠিন চর্ম্মে আবৃত করিয়া শত্রু-জাতিগণের মধ্যে বিচরণ করিত, কেহ দেহটিকে তীক্ষ্ণ কাঁটার আচ্ছাদিত রাখিয়া দুর্ব্বল প্রতিদ্বন্দ্বিদের উপরে অত্যাচার করিত। এই প্রকার সংগ্রামে যাহারা জয়লাভ করিত, তাহাদেরই বংশ অক্ষয় থাকিয়া ক্রমোন্নতির ধাপে উঠিত, এবং পরাজিত দুর্ব্বল প্রাণীর অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য লোপ পাইয়া বাইত।

জলে যখন এই প্রকার সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন বৃত্তিক-জাতীয় এক শ্রেণীর প্রাণী তাহাদের তীক্ষ্ণধার ছল লইয়া স্থলচর হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারাই আধুনিক স্থলচর বৃত্তিকের আদিপুরুষ। ইহা ছাড়া, আর একদল জলচর জীব সম্ভবতঃ এই সময়েই স্থলচর হইয়া পড়িয়াছিল। আধুনিক পতঙ্গজাতীয় প্রাণীগণ এই স্থলচরদিগেরই বংশধর।

প্রাণি জগতের এই পরিবর্তনের পরে হুহুনি আর উল্লসখোয়ায় পরিবর্তন হয় নাই বলিয়া মনে হয়। জলচরগণ জলের মধ্যে থাকিয়াই ক্রমাগত তাহাদের দেহের উন্নতি সাধন করিতেছিল এবং পতঙ্গগণ

স্থলে বিচরণ করিয়া ক্রমে তাহাদের বৃত্তিক-বৃত্তিকে বিকশিত করিতেছিল। এই চেষ্টায় কীকড়া এবং কুস্তুরাদির জার কঠিন দেহ-বিশিষ্ট অনেক বৃহৎ বৃহৎ প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছিল এবং পতঙ্গগণও তখনকার প্রাণিবিশেষের মধ্যে বৃত্তিকবৃত্তিতে সূর্য্যপথান হান অধিকার করিয়াছিল।

প্রাণীর ইতিহাসের এই যুগের পরবর্তী কালকে উত্তরের যুগ বলা যাইতে পারে। সমুদ্রেও গভীর প্রদেশ সেই সময়ে তিমি মাছের জার বৃহৎ জলচর প্রাণী দ্বারা পূর্ণ ছিল। যে সকল স্থানে জল অগভীর ছিল, সেখানে ভীমকার উত্তর প্রাণীগণ বাস করিত। ইহারাই কিছুকাল জলে এবং স্থলে ইচ্ছাক্রমে বাস করিয়া শেষে একবারে স্থলচর প্রাণী হইয়া পড়িয়াছিল। স্থলের প্রাধান্ত লইয়া যোধ হয় এই সময়েই প্রাণীর সহিত প্রাণীর এবং জাতীর সহিত জাতীর প্রথম বিবাদ আরম্ভ; তখন হইতে বার্থগিছির জন্ত যে শোণিতপাত আরম্ভ হইয়াছে, তাহার আদ্য নিবৃত্তি হয় নাই। বাঘা হউক, সেই অতি-প্রাচীন যুগে স্থল-ভাগে বৃক্ষ-জাতীর অভাব ছিল না,—বড় বড় বন্যপাত এবং নানাজাতীর তৃণও পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকিত। জল হইতে উঠিয়া যে সকল প্রাণী স্থলচর হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের খাদ্যের অভাব হয় নাই; ইহার কারণ স্বচ্ছন্দেই ভূতলে বিচরণ করিত। কিন্তু এই প্রথের জীবন দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয় নাই,—তাহাদের নিজেদের আতিবর্গের মধ্যে কয়েক শ্রেণী মাংসাহারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কানেই

উদ্ভিদাশ্রয়ী প্রাণীদিগকে সৰ্জনাই মাংসা-
 হারীদিগের অভ্যাচার হইতে মুক্ত থাকিবার
 জন্য স্টো করিলে হইত এবং সময় সময়
 উভয় দলে ঘোষণার সংগ্রাম হইত। টিকটিকি
 প্রভৃতি সৰীসৃশ্বের আকারবিশিষ্ট ডাই-
 নোসর (Dinosaur) জাতীয় প্রাণীই তখন
 স্থলভাগে আধিপত্য করিত। ইহাদের যে
 সর্পিল কক্ষাল মুক্তিকার গভীর তর হইতে
 উদ্ধার করা হইরাছে, তাহা দেখিয়া বুঝা
 যায় সেগুলির কোনোটি ৫০ হাত, কোনোটি
 ৩০ হাত লম্বা ছিল এবং উচ্চতায়
 কেহই, ২০ হাতের কম ছিল না। এই
 বিশাল বেল লইয়া যখন ডাইনোসর-জাতীয়
 প্রাণীরা উদ্ভিদভোজী কৃষ্ণকার প্রাণীদের
 আক্রমণ করিত,—তখন ডাইনোসরগণই
 জয়ী হইত। এই প্রকারে এককালে
 পৃথিবীর এই বিশাল ভূভাগ ডাইনোসর-
 দিগেরই করতলগত হইয়া পড়িয়াছিল।

ডাইনোসর এত পরাক্রমশালী হইয়া
 গাড়াইলেও উন্নত প্রাণীর পৰ্য্যায় তাহারা
 হান পার নাই। যুগের কাছে প্রচুর খাদ্য
 পাইয়া তাহারা নিম্নের দেহগুলিরই উন্নতি
 করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি
 একটুও উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে নাই।
 বিপুল দেহের অগ্রপায়ে তাহাদের মস্তিষ্কগুলি
 যদি বৃদ্ধি পাইয়া বাইত, তাহা হইলে হয়ত
 তাহারা ইদীর্ঘকাল ধরিয়া পৃথিবীতে আধিপত্য
 করিত এবং ইহার ফলে মাৎস্যের জন্মই
 হইত না। জ্ঞান ও বুদ্ধির সীমা আছে
 কি না জানি না, কিন্তু দেহের বিস্তারের
 যে একটা সীমা আছে ডাইনোসর
 জাতীয় প্রাণিগণ তাহা অতিক্রম করিয়া

গিয়াছে। আধুনিক যুগে হাতীই সর্বাধিক
 বৃহৎ প্রাণী; কিন্তু ইহাদের দৈনিক উন্নতি
 চরমসীমায় আসিয়া গাড়াইয়াছে। এখনো
 যদি ইহাদের শরীর স্থলভর হইতে চরে, তবে
 চারিখানি পায়ে ইহারা আর দেহের ভার বহন
 করিতে পারিবে না। কাজেই প্রকৃতির
 নির্দেশে হাতীর দৈনিক উন্নতি ঘোষ
 পাইয়া গিয়াছে। ডাইনোসরদিগের অবস্থা
 হাতীদিগের মতই হইয়াছিল, চারিখানি
 পায়ের উপরে বসটা ভার রাখা সম্ভব,
 তাহাদের দেহ ঠিক ততটা ভারবিশিষ্ট
 হইয়াছিল এবং তারপরে তাহাদের দৈনিক
 ও মানসিক উন্নতির উন্নতিই বন্ধ হইয়া
 পড়িয়াছিল। যে জাতির উন্নতি অবরোধ
 প্রাপ্ত হয়, মুক্ত্য তাহাকে গ্রাস করে।
 ডাইনোসরের অবস্থাও অবিকল তাহাই
 হইয়াছিল, তাহাদের দেহের বিশালতা এবং
 বিপুল দৈনিক বল অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান
 প্রাণীদিগের নিকটে পরাজিত হইয়াছিল;
 কাজেই ইহারা একে একে পৃথিবী হইতে
 লোপ পাইয়া গিয়াছিল।

প্রকৃতির দ্বারা নিরপেক্ষ সত্য দর্শন।
 তাহার বিশাল শক্তি-ভাণ্ডারের দ্বারা
 চিরদিনই উৎকৃষ্ট থাকে, যে জাতি এই
 ভাণ্ডার হইতে উপযুক্ত পাত্রে সংগ্রহ
 করিতে পারে, কেবল সেই জাতি উন্নতির
 পথে নিরাপদে অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইয়া
 যায়। ডাইনোসর কেবল দৈনিক উন্নতির
 দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কিছুদূর অগ্রসর
 হইয়াই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখন
 ইহাদেরি যে দুই কৃষ্ণকার জাতি পৃথক
 পথ অবলম্বন করিয়া বংশবিস্তার করিতে

ছিল, তাহাদের মধ্যে কোনটি প্রাণিরাশ্যে আধিপত্য করিবে, ইহাই বিচার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল।

এই দুই প্রেক্ষিতে একদলকে আধুনিক পক্ষিভাতির পূর্বপুরুষ বলা বাইতে পারে। টিক্‌টিকি গিরগিটির আকারবিশিষ্ট দেহে ইহাদের এক এক ঝোড়া ডানা গম্বাইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ডানার পালক ছিল না, তাহা বাহুদের ডানার স্থায় চর্ম্মাচ্ছাদিত থাকিত। জলদলে ও আকাশে ইহারা অনায়াসে বিচরণ করিতে পারিত; কোনো ক্ষুদ্র ইহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিত না। এই প্রাণিই এককালে প্রাণিভগ্নতের রাজপদে বসিবে বলিয়া আশা হইয়াছিল। কিন্তু সে আশা সফল হয় নাই;—কুস্রকার হইলেও ইহারা ডাইনোসরদিগেরই বংশধর। পূর্বপুরুষেরা যে ভুল করিয়া অধঃপাতে গিয়াছিল, ইহারাও সেই প্রকার ভুল করিতে লাগিল। বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির দিকে ইহারা মন দিল না, কি প্রকারে গায়ের চর্মে পালক গম্বাইবে এবং সহজে উড়িয়া বেড়াইবে ইহাই তাহাদের সাধনার বিষয় হইল। সাধনার সিদ্ধি হইল,—বিচিত্র বর্ণের পালকে দেহ আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল, কিন্তু বুদ্ধি একটুকুও উন্নত হইল না; পূর্বপুরুষদের মতকর্তি যেমন কুস্র ছিল, ইহাদেরও মতকর্তি ঠিক সেই প্রকার কুস্রই রহিয়া গেল। কাজেই প্রাণিরাশ্যের সিংহাসন লাভ তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। ডাইনোসরের আর এক দল বংশধর খেচর হইবার আকাঙ্ক্ষা না করিয়া স্তম্ভপায়ী হইয়া পড়িয়াছিল। বলা

বাচসা প্রপন্ন স্তম্ভপায়ী প্রাণীর সহিত আধুনিক কোনো স্তম্ভপায়ীরই তখন ঐক্য পূঁজিয়া পাওয়া বাইত না। তাহারা সন্ন্যাস ও আধুনিক শত্রুর এক কিস্কৃতিকানকার প্রকৃতি ঠাইয়া অন্যগ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এই প্রাথমিক স্তম্ভপায়ী হইতেই যে, আধুনিক যুগের ব্যাভ-তমুক গো-মহিষ বানর-মাগুঘ সকলেই অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা সুনিশ্চিত।

এই সময়ে নবমাত্র স্তম্ভপায়ীদিগকে বিনষ্ট করার মত প্রাণী তৃতলে ছিল না। তখন সেই ভীমকায় ডাইনোসরদিগের বংশ প্রায় লোপ হইয়া ছিল। তাহারা গুইয়ানি জুন্সর ডানা পাইয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াইত তাহারা স্তম্ভির খবর বড় রাখিত না। জলে যে-সকল অতিকায় জলচর প্রাণী ছিল, তাহারাও ক্রমে ধ্বংসের পথে চলিতেছিল। কালক্রমে পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থার যে সকল পরিবর্তন হইয়াছিল, প্রাচীন প্রাণীদিগের মধ্যে কেহই সেই সকল পরিবর্তনের সহিত যোগসঙ্গ করিয়া চলিতে পারে নাই; কাজেই ইহাদের সকলেরই ধ্বংস অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। নতুন স্তম্ভপায়ী প্রাণিগণ এই স্তম্ভ যুগেই অন্যগ্রহণ করিয়া সম্ভবতঃ অল্পকাল মধ্যেই যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং তাহাদের বিচিত্র আকৃতি-প্রকৃতি-বিশিষ্ট বহু বংশধর ধরাতল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যে সকল প্রাণী অন্যগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের দেহে আধুনিক স্তম্ভ ও সন্ন্যাসপায়ীর স্থায় শীতল রক্তের ধারাই প্রবাহিত হইত; উষ্ণ-শোণিত এবং উষ্ণ

দেহ কোনো প্রাণীই ছিল না। মনজাত
সুতপাত্রীদের মধ্যে হঠাৎ এক জাতি উদ্ভ-
পোণিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহাদের সন্তান-
সম্প্রতি অম্মগ্রহণের পরেই স্বাধীন হইত না।
মাতার তত্ত্বাবধানে দীর্ঘকাল পালিত হইলে
পর তাহারা কার্যক্ষম হইত। যে সন্তান যেরূপ
মানুষের জন্মে হান পাইয়া এই হৃৎ-
সৈন্যের জীবনকে মধুর করিয়াছে, তাহার
অনুর এই সময়েই দেখা গিয়াছিল। এবং
সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের চিত্রা, পরার্থপরতা
এবং করণা প্রকৃতি উচ্চ ধর্মগুলি একে
একে পশুজন্ম অধিকার করিতে আরম্ভ
করিয়াছিল। এই সকল উচ্চবৃত্তিকে জন্মে
হান দিলে মস্তক অপরিস্রুত থাকিতে পারে
না। কাজেই নব নব জীবের জাগরণের
সহিত স্তন্যপায়ী বংশধরদিগের মস্তকও
পুষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রকৃতি
দেবী তাহার অপরিস্রুত শক্তির ধারায়
অলম্ব্য আকাশ প্রাবিত করিয়া, সেই
শক্তি কোন্ ক্ষেত্রে কি প্রকার ফল
উৎপন্ন করে, তাহা দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা
করিতেছিলেন। স্তন্যপায়ীরা যে পথ
অবলম্বন করিয়া জীবনক্ষেত্রে নানিয়া ছিল,
তাহা দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই
প্রাণিজাতিরই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

কিন্তু জীবন-সংগ্রামে সার্থকতা-পাভের
জন্য যে বুদ্ধিবৃত্তির অয়োজন স্তন্যপায়ীরা
তাঁহা সফলে লাভ করিতে পারে নাই।
যে পথ অবলম্বন করিয়া পূর্বের প্রাণিগণ
ধ্বংসনুখে পতিত হইয়াছিল, ইহাদের
কতকগুলি সেই পথে চলিয়া নিজেদের
মৌলিক বল বৃদ্ধি করিতেই মনোনিবেশ

করিয়াছিল। তাহারা আকারে খুবই বড়
হইয়াছিল এবং বলও যথেষ্ট সফল করিয়া
আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তাহাদের দন্তমণ্ডল
প্রকৃতি সহজ অঙ্গের নিকটে অপর
সুতপাত্রীরা পরাস্তব মানিত। আধুনিক
তিনি মাহ পূর্বে বৃশচল প্রাণী ছিল;
বলশালী অপর সুতপাত্রীদিগের সহিত প্রতি-
যোগিতায় টিকিতে না পারিয়া এই সময়েই
তাহাদিগকে সন্ত্রস্ত-জলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে
হইয়াছিল। তখন যুগে নিরস্তই ভগ্নাবশেষ
সংগ্রাম চলিত। বিচিত্র আকৃতি-সম্পন্ন
সহস্র সহস্র সুতপাত্রী দেখে বিচিত্র অস্ত্র-শস্ত্র
লইয়া অগ্নিত এবং পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত
হইয়া শোণিত-স্রোত প্রবাহিত করিত।
এই প্রকার পশুযুগে কোনো জাতিই
পৃথিবীতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে
পারে না; ইহারাও পারে নাই। অল্প
পৃথিবী পুঞ্জিরা সেই সকল ভয়ানক যুদ্ধ-
দিগের সন্ধান পাওয়া যায় না,—প্রাকৃতিক
পরিবর্তনের সহিত ইহারা ধ্বংস
করিয়া চলিতে পারে নাই; কাজেই বংশ-
লোপ অবশ্যস্বায়ী হইয়া পড়িয়াছিল। এখন
ভূতরে লুপ্ত হইয়া কালগুলিই তাহাদের
অভিষেক প্রমাণরূপ হইয়া রহিয়াছে।

যখন পূর্বোক্ত প্রকারে পাশব শক্তির
লীলায় ধরাশয় করিয়া রাখিত হইতেছিল,
তখন সম্পূর্ণ পৃথক গোত্রের কয়েক জাতীয়
প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধির অদ্ভুত বিকাশ দেখা
গিয়াছিল। সিপীলিকা ও মোমাছি এই
সময়ে যে প্রকার হৃৎস্পন্দনের নিজেদের
সমাজগুলিকে নিয়মিত করিতে আরম্ভ
করিয়াছিল, তাহাতে বোধ হইতেছিল

ভবিষ্যতে এই প্রাণিগণই পৃথিবীর অধিপতি হইয়া দাঁড়াইবে। ইহারা ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিত, সমাজের অকল্যাণকারীদের দণ্ড দিত, আশ্রয়প্রার্থীকে স্বাভাবিকভাবে সমাজচ্যুত করিত। প্রাণীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবার জন্য যে সকল বুদ্ধির প্রয়োজন, তাহা ইহারা একে একে সংগ্রহ করিয়াছিল, কিন্তু সংগ্রহ করিতে পারিল না কেবল দৈহিক শক্তি এবং পার্থক্য উন্নতি। কারণেই প্রাণিজগতের চেতনার আসনশ্রান্তি ইহাদের অদৃষ্টে ঘটিল না। অপর কোন্ সৌভাগ্যবান প্রাণীর অদৃষ্টে রাজ্যলাভের সম্ভাবনা আছে, প্রকৃতি দেবী অত্যাশ্রয় বসিয়া তাহাই দেখিতে লাগিলেন।

প্রাণীর পরে প্রাণী জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাভুল হইতে লোপ পাইতে লাগিল। তিনি মৃত্যু জলে আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিল; দৈহিক শক্তির ক্রমোন্নতি করিয়া প্রাচীন কৃত্ত হস্তপারিগণ মহাকার গণ্ডার ও জলহস্তীর আকার গ্রহণ করিল। হস্তীরও জন্ম হইল। এই অতিকার প্রাণী দেহের উন্নতির সহিত বুদ্ধির উন্নতিও দেখাইল। বুদ্ধির সাহায্যে ইহারা যে নিজেদের বংশকে স্থায়ী করিতে পারিবে,

তাহারও লক্ষণ দেখা গেল; কিন্তু প্রাণিজগতের সিংহাসনে বসিবার সকল গুণ ইহারা পাইল না। যে প্রকৃতি দেবী জীবনলীলা প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, তিনি বুঝিলেন, দত্ত নৃধর প্রকৃতি সহজ অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কোনো প্রাণীই প্রাণিজগতে রাজত্ব করিতে পারিবে না। পশুদিগের মধ্যে যাহারা পশুচাতুর্যে দুই পদে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সমুখের দুই অঙ্গে কৃত্রিম অস্ত্রশস্ত্র বুদ্ধির সহিত চালাইতে পারিবে, জগৎ তাহারই অধিকারে আসিবে। প্রাথমিক প্রাণীর সৃষ্টিকাল হইতে বিভিন্ন আকার গ্রহণ করিয়া যে সকল বিভিন্ন প্রাণী ভূতলে রঞ্জন করিয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কোনটাই বুদ্ধিমত্তা ছিল না, কারণেই নিজেদের জাতীয় অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবাব একটুও চেষ্টা তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না। প্রাথমিক মানুষ যখন তাহার নিভৃত গুহা হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মনির্মিত শিলাময় বস্তাদির সাহায্যে ভীষণ বস্ত্রজন্তুদ্বিগকে বধ করিতে লাগিল, তখনই প্রকৃতি দেবী বুঝিলেন, এই পরিণত-মস্তিষ্ক বুদ্ধিমান প্রাণীই জগতের রাজসিংহাসনে অধিকার করিবে। সৃষ্টির সমগ্র প্রাণিসত্ত্বের মধ্যে কনিষ্ঠ হইয়াও মানুষ এই প্রকারে শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

আস্থান

(জালালুদ্দীন কবী হইতে)

১

ডকা বাজিরাছে ঐ পশেনি কি আস্থার প্রবণে ?
চলিয়াছে চাণকেরা হৃদয়িত উত্তপ্তশ্রেণী সনে,
কণ্ঠে কণ্ঠে বাজিতেছে কিনি কিনি কিকিনী বুড়ুর
ডিঙা'তেছে শুক জিহবা, ওগো কা'রা নিঙাডি আঙুর ?
মুরাপানে স্তানহারি তকতলে পড়েছ হুগিচা,
অহিফেন-নিদ্রাগত বাতাপথ কে গেছ ভুলিয়া ?
জাগো সবে, জাগো সবে জলে ঐ মশাল-অনল !
এখনো চেতনা-হারি,—চারিদিকে এত কোলাহল ?
মঙ্গল ভীষণ দায়ে, শিশাসার—কণ্টকের বনে
কে কোথা লভিল মৃত্যু কুঙ্ক সহ যুঝি প্রাণপণে,
মহামিলনের রাজ্যে তবু সেই অনন্ত বিস্তর—
পথের ক্ষণিক মোহে কে ভুলিবে মহা মহোৎসব ?

২

লোহার পি'করে বহু পিপাসিত ওগো বুলবুল,
প্রিয়ের গোশেত'। সুরা গন্ধ তোমা কহেনি আকুল ?
কেল হতে কোণাস্তরে খটপটি বেড়াইবে কত,
শিঞ্জর ভাবিয়া ফেল কেন আছ পেচকের মত ?
নয়নে কি পড়েনিক নৃপতির উচ্চতম তাল
তাহার উদ্দেশে ধেতে এখনও তবু ভয় লাজ ?
অস্ত্রজান চণ্ডসম বুক দিতে হবে অসি মুখে ;
সামান্ত বাজের ভয় এখনও বাজিছে কি বুকে ?
কে কোথা করেছে তুল, কুহুমের মধুর ভবান
কণ্টকে মিমাছে প্রাণ,—তাহে তব কি গা প্রাণে যার ?
প্রোমোৎসবে হে অতিথি, হে অমর গগননিবাসী,
উঠ তবে পক্ষতরে দদি প্রায়-পরশ-শিখাসী ।

শ্রীকালিদাস দাস ।

ভারতের শিল্প

প্রাচীন যুগে ভারতের শিল্প-জাতীয় পরিপূর্ণ ছিল কি না, এবং ভারতবাসীর। তৎকালীন সভ্যজাতিকে স্বদেশোৎপন্ন শিল্প যোগাইয়া সকলের বিষয় উৎপাদন করিত কি না ইত্যাদি গবেষণামূলক আলোচনা পুরাতত্ত্ববিদদের হস্তে সস্ত করিয়া, আমরা বর্তমান প্রবন্ধে ভারতের বর্তমান শিল্পের বিষয়ই আলোচনা করিব। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভেও ভারতবর্ষের যে ঐতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে আমরা জানিতে পারি যে, ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। এখনও শতকরা প্রায় সাতষষ্ঠি জন লোক জীবিকা-নির্ভাহের জন্য কৃষিকার্যের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভর করে। তবে আজকাল দেশের হাওয়া বদলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। নব্যযুগের সূচনায় ভারতবর্ষেও কল-কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহ দেখা দিয়াছে। তাহার ফলে গত ১৮৮৩—১৯০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আমাদের দেশের কারখানা ইত্যাদি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের সংখ্যা ১০'১ হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে কাঁচা মালের রপ্তানিও শতকরা ২৮ ভাগ করিয়া গিয়াছে; ইহা হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে ভারতের শিল্প ও ব্যবসা ক্রমশই উন্নতির পথে চলিয়াছে। এই শিল্পের গতি ও বাণিজ্য ইত্যাদির আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় হইলেও প্রথমেই ভারতীয় শিল্পের বিশেষত্ব সন্ধান করিয়া আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভারতকে যুরোপীয় ঐতিহাসিকগণ একটি

মহাদেশের সহিত তুলনা করেন। এ-সম্বন্ধে আমাদের মতভেদ আছে। তবে একথা আমরা স্বীকার করি যে, "আর কোন দেশে এত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতি-বৃহৎ ভারত, শত শত ধর্মের উত্থান-পতনের স্মৃতি ধারণ করিয়া আছে। নানা কারণে ইহা একটি রহস্যবিশেষ; এইজন্যই হরত অনেকে ইহাকে একটি মহাদেশ বলিতে চান। কিন্তু বিভিন্ন ও রহস্যময় ভারতের সর্বত্রই একটা সামঞ্জস্য ও বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাতেই তাহার অনৈকোন্ম-মধ্যে ঐক্য, বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য। আমরা শান্তি-প্রিয় আছি। গল্পী-জীবনই আমাদের আদর্শ। হৃদয়বহন নাগরিক জীবন আমাদের দেশে একান্ত বিরল। হইলেও, কোনদিনই তাহা ভারতে প্রাধান্য লাভ করে নাই। একটি ক্ষুদ্র গ্রাম বিস্তৃত ভগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখিয়া, আপনায় সহিত তাহার কোন সংযোগের প্রত্যাশা করিয়া না করিয়া অতি সহজে আপনায় সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আপনাই উৎপন্ন করিয়া লয়,—ইংবাকিতে বলিতে হইলে একবাক্যে ইহা Self-sufficient। সাম্রাজ্যত্ব পর সাম্রাজ্যের পতন হটল, আক্রমণকারীর পর আক্রমণকারী ভারতকে শোণিত-সাগরে ডাসাইয়া গেল, কিন্তু একটি ক্ষুদ্র গ্রামে আপনায় সমস্ত স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত রাখিয়া কেমন নির্জীবনে আপনায় সহজভাবে

দিনগুলি কাটাইয়া চলিয়াছে। বাহিরের কোন সংবাদও তাহার কর্ণে পৌছায় না, বাহিরের সহিত আলাপ করিবার ক্ষমতা সে বিশুদ্ধত চক্ষু নহে। কথিত আছে, পলাশী-যুদ্ধে ভারতের ভাগ্য-পরিবর্তনের কথা হুত্ব পন্নীতমুহে পৌছাইতে হুত্বীর্ণ ত্রিশটি বৎসর লাগিয়াছিল। ইহাই ভারতের বিশেষত্ব। একটি কুস্তপন্নীও বৃহত্তর জগতের কুস্ত সংস্কারণ বিশেষ। কুস্তকারগণ কেবলমাত্র গ্রামবাসিগণের ভক্ত পরিশ্রম করে, তাহাতেই সমস্ত পন্নীর সকল অভাব দূর হয়; এইরূপ কর্তব্য ও স্বর্ণকার প্রভৃতি সমস্ত পন্নীর লক্ষ্য গ্রামের অভাব দূর করা মাত্র। এই division of labour পন্নী-জীবনের ভিত্তি; ইহাই আবার বংশ-পরম্পরাভ্রমে চলিয়া সমস্ত বিশুদ্ধতা দূর করিয়া দেয়। পন্নীগ্রামে এক সম্প্রদায় অল্প সম্প্রদায়কে হীন চক্ষে দেখে না; সেখানে আত্মত্বের দেহ-পাণে সকলেই আবদ্ধ; সেখানে শাস্ত্রময় জীবন নুষ্টিমান হইয়া কুটীরে কুটীরে বিরাজ করে। এইরূপ পন্নী-পিন্নই ভারতে সর্বাঙ্গের অধিক। তবে-বে আমাদের নাগরিক শিল্প একেবারেই নাই বা ছিল না, একথা বলি না। আগ্রার তাজমহল, সাজাহানা-বাঘের মতি-মসজিদ, ঢাকার মসজিদ প্রভৃতি এখনও জগতের বিস্ময় উৎপাদন করে।

ভারতের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এখানে “ব্যবসা-সমাজ” বলিয়া কোন সম্প্রদায় কোনদিন স্থান পায় নাই। যুরোপের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাট, একদমের ঐক্য সমাজ-গঠনের চেষ্টা যুরোপ

বহুদূর হইয়া গিয়াছিল। সেখানে মধ্যযুগে এক একটি নগরে কয়েকটি করিখা “ব্যবসা-সমাজ” থাকিত, কোন নূতন ব্যক্তি তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিত না। ইহা অভ্যন্তর সাংঘাতিক প্রকৃতির ছিল; এক-একটি ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় এক-একটি ব্যবসায় এক-চেষ্টা করিয়া তাহার ক্ষম-বিস্তার আপন-বিশেষ ইচ্ছামান করিয়া লইত। কোন ব্যবসায়েই নূতন লোকের সমাগম হইতে পারিত না; ফলে সমস্ত ব্যবসায়গুলিই কেবলমাত্র নির্ধারিত ব্যক্তিবিশেষের হস্তে থাকিত। এই প্রকারের ব্যবসায়-সমিতি ভারতে কোন দিন ছিল বলিয়া জানা যায় নাই। ব্যবসা-হুদারে জাতিভেদ হইয়াছিল কিনা জানি না, তবে একথা সত্য যে, ভারতে এক-একটি জাতি যদিও এক-একটি ব্যবসায়েরই অঙ্গুষ্ঠান করিত, তথাপি অল্প জাতির পক্ষে তাহা গ্রহণ করিতে কোন অন্তরায় ছিল না। তত্ত্ববায়গণ তাঁতের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া লইলেও, মুগী, জোলা ও নিম-শ্রেণীর মূল্যমানগণ অনেক স্থলে এখনও তাঁত চালাইয়া থাকে। এইরূপ কর্তব্যগণ লোহার কার একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল বটে, কিন্তু সমাজের অন্তঃশ্রেণীর লোকের তাহাতে একেবারে প্রবেশ-অধিকার ছিল না, এমন কথা বলা যায় না। এখনও আমরা তাঁতিকে কর্তব্যগণের ব্যবসা এবং কর্তব্যগণকে তত্ত্ববায়ের ব্যবসা গ্রহণ করিতে দেখি।

ভারতের তৃতীয় বিশেষত্ব, তাঁতের মূল্যমান জন-সংখ্যা। ৩৩ কোটি লোকের মধ্যে ৭ কোটি লোক মূল্যমান। হিন্দু ও

মুসলমানের মধ্যে জাতিগত বহু প্রভেদ বিস্তারিত। হিন্দু আধ্যাত্মিক, মুসলমানগণ হয় সেমেটিকবংশসম্ভূত, না-হয় বোঙ্গলীয়। কিন্তু এই মুসলমানগণও একাদিক্রমে আটপাত বৎসর কাল ভারতে বসবাস করিয়া আসিতেছে। সুতরাং ভারতের উপর তাহাঙ্গিগেরও যথেষ্ট দাবী জন্মিয়াছে; অতএব ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে মুসলমানগণকে বাদ দিয়া বলা চলে না। এইজন্যই ভারতের শিল্প-প্রসঙ্গে মুসলমান-শিল্পকে সেমেটিক-শিল্প বলিয়া বাদ দেওয়া সমীচীন নহে। ভারতবর্ষ মুসলমানেরও স্বদেশরূপে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং তখন তাহাদের শিল্পও ভারত-শিল্পের একাংশে পরিণত হইয়াছে।

তাহা হইলে ভারত-শিল্পের প্রতীক-বিভাগ কিরূপে সম্ভব? জাতিগত ভারতের প্রতীক-বিভাগ সম্ভবপর নয়, তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। ভারতীয় শিল্পের প্রতীক-বিভাগ করিতে হইলে, শিল্পগুলিকে বিভক্ত করিতে হয়। যে সমস্ত শিল্প কাঁচা মালের উপর নির্ভর করে, তাহা প্রথম স্তরের শিল্প। দ্বিতীয় স্তরের শিল্প কাঁচা মাল শুলিকে একটি আকার প্রদান করে। তৃতীয় স্তরের শিল্প তাহাকে কাঙ্ক্ষার্থে মণ্ডিত করে। নিম্নে শিল্প-স্তর-গুলির একটি তালিকা দেওয়া গেল :—

প্রথম স্তর। ক্ষেত্রজাত পদার্থ হইতে উৎপন্ন গ্রাষা শিল্প।

দ্বিতীয় স্তর। কারখানা সমূহে প্রস্তুত দ্রব্যাদি।

তৃতীয় স্তর। খনিজ পদার্থ।

চতুর্থ স্তর। বন-জাত পদার্থ।

ভারতের প্রত্যেক গ্রামের চাষিধারে ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে কলস জন্মে। গ্রাষা শিল্পগণ এই সমস্ত কলস কাঁচা মালের আকারে গ্রহণ করিয়া, তাহা ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যে পরিণত করে। এই প্রকার শিল্পে বড় বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু খনিজ পদার্থ লইয়া যে শিল্প গঠিত, তাহাতে বুদ্ধিমত্তার বিশেষ প্রয়োজন আছে। গ্রাষা শিল্প গ্রামে চলে, নাগরিক শিল্পের কেন্দ্র নগর, সেমিটিক অন্তর্ভুক্তি ও বহির্ভুক্তিগণের প্রচার ব্যতীত তৃতীয় স্তরের শিল্প বৃদ্ধি পায় না। ভারতের এক-একটি প্রদেশ এইরূপ এক এক জাতীয় শিল্পে অগম্য। এমন দেশ দেখিতে পাওয়া যায় না, যেখানে সমস্ত স্তরের সমস্ত শিল্প সমভাবে বর্তমান।

আবার প্রয়োজনীয়তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিতও আর কিছু নাই। যে শিল্প যে প্রদেশের উপযোগী, সেই প্রদেশেই সাধারণত সেই শিল্প বৃদ্ধি পায়। কোন শিল্প কোন প্রদেশের উপযোগী, এক্ষণে আমরা তাহারই আলোচনা করিবঃ—
বাঙ্গালা ও আসাম—প্রথমে বাঙ্গালীর কথাই ধরা যাউক। রবার (Indian Rubber), নানাপ্রকার তৈলজ পদার্থের বীচি, লম্বা, নীল, পাট, তরঙ্গ, কাগজ, গরুর চামড়া (Hide), ছাগল ইত্যাদির চামড়া (Skin), আকি, চা, তামাক, চিনি, গোধি, পারদ এবং নানাপ্রকার মাসীর খেলনা বাঙ্গালা দেশে উৎপন্ন ও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

উত্তর ভারতবর্ষ—উত্তর ভারতবর্ষ বলিতে, আমরা আন্ধ্রা, অযোধ্যা, যুক্তপ্রদেশ,

পাকাব, মধ্যপ্রদেশ, মধ্য ভারতবর্ষ ও উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশকে বৃত্তিগ। রেশিম, লজা, নানাপ্রকার তৈলজ পদার্থের বীচি, তামা, সীসা প্রভৃতি খনিজ পদার্থ, বাতি, সাবান, তুলা, রেশম, পশম, চামড়া, কারপেট, মাছের গুল, আটা, বিস্কুট, নানা প্রকার মদ, চা, চিনি ও লবণ ইত্যাদি দ্রব্য তথ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত কাঁচা মাল বাতীত এই দুই প্রদেশে চীনা মটির নানাপ্রকার দ্রব্য, লাকার নানা প্রকার দ্রব্য, পিতল-কাঁসারের নানাপ্রকার বাগান, সোনাকপার নানাপ্রকার দ্রব্য, হাতিদ গাঁতের নানাপ্রকার দ্রব্য, নানা প্রকার কাঠে প্রস্তুত কাককাণ্ডাবিশিষ্ট দ্রব্য ও নানাক্রপ মটির খেলনাও প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালার অধিকাংশ মাল কাঁচা, এবং উত্তর ভারতের পণ্যপ্রবাহগুলির মধ্যেও কতকগুলি কাঁচা মাল এবং কতকগুলি তৈয়ারি লিনিঙ্গ। (manufactured articles)

পশ্চিম ভারতবর্ষ—ইহার মধ্যে তুটীপ বেলুচিস্তান, বেগার এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীকেও ধরা গেল। গদ, নানাপ্রকার তৈলজ পদার্থ, তুলা, পশম, গরুর চামড়া, ছাগল ইত্যাদির চামড়া, নানাপ্রকার ঔষধপত্র গদ ও লবণ এখানকার উৎপন্ন দ্রব্য। সোনা, রূপা, চামড়া ও তুলা প্রভৃতির শিল্পকার্যও এখানে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। বোম্বাই-প্রদেশে বোম্বাই মালের (manufactured articles) সংখ্যা অধিক।

অন্ধ্রদেশ—এখানে কাঁচা ও বোম্বাই উত্তরবিধ মালই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অন্ধ্রের কাককাণ্ডাও খুব বিখ্যাত। গদ,

বার্নিস, ডামাক চা, চুকাট, কেরোসিন তৈল ও কাঠ প্রভৃতি কাঁচামাল বাতীত সোনা, রূপা, তামা, পিতল, কাঠ ও কাঁচ প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত দ্রব্যাদিও তথ্য দেখিতে পরিমাণে পাওয়া যায়।

কলিকাতার বাজ্বরে ভারতের উৎপন্ন কাঁচা ও বোম্বাই মালগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে:—

- ১। গদ, রেশিম ইত্যাদি।
- ২। তৈল ও নানাপ্রকার তৈলজ পদার্থ, ঘৃত, চর্কি প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রাণীজ পদার্থ এবং নানাপ্রকার গন্ধ-দ্রব্য।
- ৩। নানাপ্রকার চামড়া ও নানাপ্রকার রং।
- ৪। নানাপ্রকার প্রাণীজ পদার্থ।
- ৫। হুতা প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্ষেত্রজ এবং শোহ প্রভৃতি নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ।
- ৬। নানাপ্রকার ঔষধপত্র।
- ৭। নানাপ্রকার ভোজ্য দ্রব্য।
- ৮। বরগা, কড়ি প্রভৃতি কাঠ।
- ৯। নানাপ্রকার বাঁকু ও নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ।

পূর্বেকৃত দ্রব্যগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ দ্রব্য কত পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং কোন্ কোন্ দ্রব্যই বা কত পরিমাণে আমদানি রপ্তানি হয়, তাহার সঠিক তালিকা প্রস্তুত করা অসম্ভব বলিলেও অত্যাঙ্কি হয় না। উৎপন্ন দ্রব্যের অধিকাংশ ভাগই দেশেই ব্যবহৃত হয়। কোন্ দ্রব্য কত পরিমাণে আমদানি-রপ্তানি করা হয়, Indian

Gazette-এ তাহার একটি তালিকা আছে। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

কাঁচামালের (Raw material) হিসাব

আমদানি	রপ্তানি
লক্ষমুদ্রা হিঃ	লক্ষমুদ্রা হিঃ
১৮৭৬—৭৭	২০'৮২
১৮৮৬—৮৭	২৮'৩১
১৮৯৬—৯৭	৪০'৯৬
১৯০১—০২	৪১'৪৭
১৯০২—০৩	৪৯'৮৯
	১০'২৮৬
	১৮৯'৯৩
	১১৬'৩৬
	২০২'৯১

নানাপ্রকার তৈলজ পদার্থের বীতি ও গুরুত্বা প্রভৃতির হিসাব :—

১৮৭৬—৭৭	২৫'৭৮
১৮৮৬—৮৭	৪৮'৮২
১৮৯৬—৯৭	৭৯'৭৩
১৯০২—০২	৯৬'১০
১৯০২—০৩	৭৭'০৯

রং এবং চামড়ার হিসাব

১৮৭৬—৭৭	১২'৬৭
১৮৮৬—৮৭	২৬'১৩
১৮৯৬—৯৭	৭৩'১৩
১৯০১—০২	৭৯'০৫
১৯০২—০৩	৮১'০৬

প্রাণীক পদার্থের হিসাব

১৮৭৬—৭৭	
১৮৮৬—৮৭	
১৮৯৬—৯৭	
১৯০১—০২	
১৯০২—০৩	

তুলা, গম, রেশম, বাহুর ইত্যাদি নানা প্রকার কাঁচা মাণ ও পাঁকা মালের হিসাব :

১৮৭৬—৭৭	১৮৫'৭০	১৮৫৭'৯১
১৮৮৬—৮৭	৩৫৮৮'৭১	২৬০৭'২৮
১৮৯৬—৯৭	৩৬১৯'৫১	৫৯০৮'৯০
১৯০১—০২	৪০'২০'৭	৪৮৭২'৫৮
১৯০২—০৩	৩৭০২'৩৫	৪৮৫৫'১১

চা, কফি ইত্যাদি নানাপ্রকার পানীয় জিনিষের হিসাব :

১৮৭৬—৭৭	৩৩১'৯০	২৪৮৪'৭১
১৮৮৬—৮৭	৬৫১'৬৪	৩৭০৭'৫৬
১৮৯৬—৯৭	৮৪৮'৫৮	৩০৫৪'৩১
১৯০১—০২	১১৫২'৮৬	৩৮১৮'৩৯
১৯০২—০৩	১০৩০'১৭	৪৪১৮'৯১

নানাপ্রকার ধাতু এবং খনিজ পদার্থের হিসাব :

১৮৭৬—৭৭	২০২২'৮২	৪৬২'৭৩
১৮৮৬—৮৭	২৫০৯'৫২	৩২৯'৯০
১৮৯৬—৯৭	৩৭২৮'৩১	৩১৫'৮১
১৯০১—০২	৪৭৮৪'৪৫	১৩০১'৭৩
১৯০২—০৩	৪৮৮২'৮০	১১৩১'৭৪

বাড়ির শিল্পব্যয় ধরুপভাবে বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহার লব্ধ সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক :—

প্রথম স্তর—গদ রেশম প্রভৃতি কাঁচা মাণ প্রথম স্তরের অন্তর্ভুক্ত। লাক্ষা ও লোম ব্যতীত এই শ্রেণীর সমস্ত দ্রব্যই ক্ষেত্রজাত। ইহাদের অধিকাংশভাগ এদেশেই ব্যয়িত হয়। এই শ্রেণীর দ্রব্যগুলির যে অংশ আমরা আমদানি করি, তাহার আবার এক-তৃতীয়াংশ আমরা বিদেশে রপ্তানি করি।

আরও ও পারস্পরিক মধ্য দিয়া যুরোপের
গমনাগমনের বেশ সুবিধা না থাকায়, এই
সমস্ত দ্রব্য আমরা খোলাই মালকুণে লেখান
হইতে আমদানি করিয়া তাহার একাংশ
আবার যুরোপে রপ্তানি করিয়া থাকি।
পারস্ত-উপলগ্নবৎ এবং লোহিত-সাগরের
বন্দরগুলির উন্নতি সাধিত হইলে, মালকুণি
আর বোঝায়ে আসিবে না, বন্দর হইতে
একেবারে যুরোপে প্রেরিত হইবে।

লাক্ষা—ইহার রং গাঢ় লোহিতবর্ণ বলিয়া
সংক্ষেপে ইহাকে “লাক্ষা” বলে। ১৪৯৮
খ্রীষ্টাব্দে একজন ভ্রমণকারী ইহার উপকারিতার
কথা যুরোপে প্রথম প্রচার করেন। লাক্ষা
পোকা বৃক্ষে বাস করে; মালী পোকার
মৃত্যু হইলে, তাহার উপর কাটিয়া যায় ও
এক শিশু পোকা বাহির হয়। তাহার
গাছের পাতায় লাগিয়া থাকে এবং তথায়
বৃদ্ধি পায়। সে ও ছুন মাসে বা অক্টোবর ও
নবেম্বর মাসে লাক্ষা সংগ্রহ করা হয়। লাক্ষা
নানাকায়ীরা সেখিত পাওয়া যায়। কাহারও
বর্ণ গুড়ীর লাল, কাহারও বা ফ্যাকাসে
লাল। পূর্বে লোকের ধারণা ছিল গাছের
গুণাভূমিতে ইহার বর্ণের ইতরবিশেষ হইয়া
থাকে। কিন্তু গবেষণার পর এখন হিন্দীকৃত
হইয়াছে, ইহাদের নানা আভি আছে। পূর্বে
ভারতে এই লাক্ষার কাজ একচেটির ছিল,
কিন্তু জাপান ও ব্রহ্মদেশে এই ব্যবসা এখন
ক্রমশঃ ছড়িয়া পড়িতেছে। ইহা বহু কার্যে
ব্যবহৃত হয়; সুতরাং, কর্মকার্য প্রভৃতি
আম্রা শিরিগণ লাক্ষার প্রস্তুত বার্ণিশ
ব্যবহার করিয়া থাকে।

কাঁচের দ্রব্য—কাঁচের কারুকার্যের জন্য

ব্রহ্মদেশ বিখ্যাত। ব্রহ্মের পাগোডাগুলিও
নানা কারুকার্যের জন্য প্রসিদ্ধ। তথাপি
এই শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। কাঁচের
গায়ে গিঁটটি নামক একপ্রকার পদার্থের
আবরণ (coating) দিয়া, তাহার উপর নানা
চিত্র অঙ্কিত করা হয়।

মোম—ভারতবাসী কখনই আগ্রহের
সহিত মোমের কারবার করে নাই। এখনও
যাহা করা হয়, তাহার পরিমাণও খুবই
সামান্য। বহু লোকেরাই এ শিল্পের চর্চা
করে। এই শিল্প হইতে আমরা মোম ও মধু
পাই। মধু পানীয়রূপে অধিক পরিমাণে
উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক বৎসর কয়েক লক্ষ
টাকার মোম ভারত হইতে বিদেশে প্রেরিত
হয়। এই ব্যবসারের বিশেষ উন্নতি বা
অবনতি ঘটে নাই।

বিভীরা তর—নানাপ্রকার তৈলজন
পদার্থ:—ভারতবর্ষে যে বিবিধপ্রকারের
তৈল উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে মোটামুটি
তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়;
খনিজ, প্রাণীক এবং উদ্ভিদ। ভারতবর্ষে,
প্রত্যেক বৎসরে নানাপ্রকার তৈলের প্রায়
সত্তেরো কোটি টাকার ব্যবসা হয়। বার্ণিশ
প্রভৃতি নানাপ্রকার কার্যে তৈল ব্যবহৃত
হয়। ভারতবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই
গাঙ্গে, তৈল সন্ধান করে। তৈল নহিলে
আমাদের একেবারে চলে না; কেননা সাবান
ব্যবহার ভারতের অধিকাংশ লোকে জানে
না বলিলেই হয়। একপ্রকার খনিজ তৈল
হইতে বাতি প্রস্তুত হয়। এই প্রকার
তৈলের খনি ব্রহ্মদেশে বহুখণ্ড আছে।
ভারতবাসীও দিন দিন বাড়ির ব্যবহারে

অত্যন্ত হইয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যেক বৎসর অনেক টাকার তুলার বীচি, সরিষা, তিল, মেড়ী ও পোস্ত বিদেশে চালান যায়। কিন্তু সোভাগের বিষয় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে আমাদের দেশে তেলের কল প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হওয়ার, কাঁচা মালের রপ্তানি ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে।

দ্বিত। দ্বিত হিন্দুদিগের প্রধান ভোগ্য বস্তু। হিন্দুগণ কর্ম-কার্যের জন্য এশিয়ার চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আভা, হুমিত্রা ও সিংহল প্রভৃতি ভারত-মহা-সাগরের দীপসমূহে অনেক হিন্দু বেষিচে পাণ্ডুরা যায়। কাজেই তাহাদের ব্যবহায়েন জন্য ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যেক বৎসরেই ২৫২ লক্ষ টাকার দ্বিত প্রেরিত হয়। ভারতবর্ষ প্রত্যেক বৎসর বিদেশ হইতে ১৪ লক্ষ টাকার চর্কি ইত্যাদি ক্রয় করে।

গন্ধতৈল। ভারতবর্ষ গন্ধতৈলের জন্য চিরকাল বিখ্যাত। আজিও কোনপুৰ, কনোজ এবং গাজিপুৰে প্রচুর পরিমাণে গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হয়। এই সমস্ত গন্ধদ্রব্য দিল্লী, অমৃতসর এবং লাহোরের বাজারে নীত হইয়া, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হয়। বিদেশ হইতে আনীত গন্ধ-দ্রব্যের প্রধান আড়ৎ গোয়াই। গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য নিম্নলিখিত জিনিষগুলি ব্যবহৃত হয়। গোলাপফুলের পাতা, লেবু, মৃগনভি, পাতচৌলি ও চকন ইত্যাদি।

রং। ভারতবর্ষে নানাপ্রকার গাছ-গাছড়া হইতে রং প্রস্তুত হইত। সেই সমস্ত রং স্থায়ী হইত সত্য, কিন্তু তাহাদের

ব্যোতি তত উজ্জ্বল ত ছিলই না, বৈদ্যর ভাগ দানেও খুব চড়া ছিল। যুগোপ হইতে আনীত সত্তা রং আনিয়া ভারতের রংএর ব্যবসা নষ্ট করিয়া দেয়। যুগোপ হইতে আনীত রং, চাকচিক্যে ত্বরিতর রংএর চেয়ে উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু শুভটা স্থায়ী নহে। দামে সত্তা বলিয়া ইহা অত্যন্ত জন-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের নীল-চাষও নষ্ট হইতে বসিয়াছে। জর্জানি কৃত্রিম উপায়ে নীল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করায়, ভারতের একচেটিয়া নীলের ব্যবসার ক্রমেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এখন আমরা প্রত্যেক বৎসর প্রায় এক কোটি টাকার রং বিদেশ হইতে ভারতে আনয়ান করি।

প্রাণীর পদার্থ। চামড়া ইত্যাদি। আমাদের চামড়ার আমদানি এবং রপ্তানির পরিমাণ এক; অর্থাৎ প্রত্যেক বৎসর যত টাকার মাল আমরা ভারত হইতে বিদেশে চালান দি, তিক তত টাকার মালই আবার বিদেশ হইতে ভারতে আনিয়া থাকি। ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যেক বৎসর দশ কোটি টাকারও অধিক চামড়ার দ্রব্য যেমন বিদেশে প্রেরিত হয়, সেইরূপ দশ কোটিরও অধিক টাকার চামড়ার দ্রব্য বিদেশ হইতে ভারতে আসে। চামড়া ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য ভারতবর্ষে এখন ৪৩১ ট্যানারি আছে এবং সেই ট্যানারি-গুলিতে প্রায় ৭,২০০ জন লোক খাতিয়া জীবিকা অর্জন করে। পূর্বে লিখিত ট্যানারিগুলির মধ্যে সাঁইক্রিশটী, এক হাম্রাজ প্রেসিডেন্সিতেই আছে। কানপুরের

ট্যানারি সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই সকল ট্যানারিতে, জুতা ব্যতীত, ঘোড়ার লাগাম, জিন ও রেকাব ইত্যাদিও প্রস্তুত হয়। বিদেশ হইতে আনীত Boot এবং shoe এর পরিমাণও ভারতে দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। এখন আমরা প্রায় ২৭২ লক্ষ টাকার বুট ও শূ বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আনয়ন করি। কারুকার্যাদিনিষ্টে সৌখীন জুতাও ভারতে যথেষ্ট প্রস্তুত হয়। কটক, সীরাপ, রামপুর, লক্ষৌ, আত্রা, ঝাঙ্গি, সাহারাণপুর দেৱাগাজীবা, মাতগণ্ডি, বেঙ্গহাট, জয়পুর, বিকানীর প্রভৃতি স্থানগুলিতে জুতার উপর নানারকমের কারুকার্য করিবার জন্য অনেক নিপুণ কারিগর আছে। পেশওয়ার, বারু, বেঙ্গহাট, ডোমহাট প্রভৃতি স্থানে তরওয়ারের উপর চামড়ার বিবিধ কারুকার্য করা হয়।

হাতীর দাঁত। হাতীর দাঁতের শিল্পের জন্য ভারতবর্ষ ভূগর্ভস্থ। ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল হইতেই সমস্ত সভ্য-জগৎকে এই শিল্প বাগাইয়া আসিতেছে। দিল্লী, সুর্শিবাবাদ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর এবং বোলবেন প্রভৃতি স্থানগুলি দস্ত-শিল্পের পাঠশালা। হাতীর দাঁত হইতে নানাপ্রকার খেলনা, চিকুড়ী, বাস, টেবিল ইত্যাদি প্রস্তুত হয়; তা ছাড়া হাতীর দাঁতে ছাপা

ছবিও অল্প দিল্লী শূব নাম কিনিয়াছে। হস্তশিল্পের এই ছবিগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। ছবিগুলি প্রায়ই যোগ্য আদর্শে অঙ্কিত।

শিং। ভারতবর্ষে কিছু পরিমাণে শিংয়ের কার্যও হয়। কটক, সাতকিরা, হুগলী প্রভৃতি স্থানগুলিতে শূব-শিল্পের কারবার জাছে।

মণি-মুক্তা। মণিমুক্তা প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যগুলির কতকাংশ ব্রহ্ম ও সিংহল প্রভৃতি দেশের নিকটে ভারত-মহাসাগর হইতে উত্তোলিত হয়। কিন্তু কেবলমাত্র এই সকল স্থানের উৎপন্ন দ্রব্য বারাই ভারতের সমস্ত অভাব পূরণ হয় না। এইজন্য কয়েক লক্ষ টাকার মুক্তা, ইতালী, আরব এবং আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষে আইসে। এই সমস্ত বহুমূল্য দ্রব্য ভারতের ধনীলোকেরা অলঙ্কারাদিতে ব্যবহার করে। গভীবেশ ঘরে মণি-মুক্তার চলন নাই বলিয়া ইহার আবাদনি-রপ্তানিরও হ্রাস-বৃদ্ধি নাই।

জুলা, কাগজ, সিক, ইত্যাদি উদ্ভিদ ও প্রাণীজ পদার্থের এবং লৌহ, সূর্য, প্রভৃতি খনিজ পদার্থের আলোচনা আমরা 'ভারতী'তে পূর্বেই একাংশ করিয়াছি; কাজেই উদ্দেশ্যের বিধে বলিবার আর নূন্য কিছুই নাই।

ঐযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সম্মুখ (কলিকাতা) অধিবেশনের ইতিহাস-পাখাখ ত্রিযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছিলেন, “বাঙ্গালার ইতিহাস-সেবকগণকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে;—এক শ্রেণী পৌরাণিক, আর এক শ্রেণী ঐতিহাসিক।” চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত নাম লক্ষণের মনোমত নাও হইতে পারে, কিন্তু এদেশের ইতিহাস-সেবকগণের মধ্যে একটা ঘোঁটাঘুটি শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। উভয় শ্রেণীর মস্তভেদের মূল কি, তাহার আলোচনা করা উচিত, এবং পাঠক-সমাজকে এই বিষয়ে মহাভূতা করিবার অবসর দেওয়া কর্তব্য। আমার একজন প্রচেষ্টা বন্ধু, অধ্যাপক ত্রিযুক্ত পদ্মনাথ বিজ্ঞাবিনোদ মহাশয়, অগ্রহারণের “ভারতী” পত্রে প্রকাশিত “বাঙ্গালার ইতিহাস (আলোচনা)” শীর্ষক প্রবন্ধে ত্রিযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত “বাঙ্গালার ইতিহাস” উপলক্ষ করিয়া, এক শ্রেণীর সম্বন্ধে তাহার যে অভিযোগ আছে, স্পষ্টাক্ষরে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। আমি বিজ্ঞাবিনোদ মহাশয়ের উক্তি পূর্ণপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া উত্তরস্বরূপ এই শ্রেণীর ঐতিহাসিকগণের সম্বন্ধে বাহা বলিবার আছে, তাহা নিবেদন করিব।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

মহাভারতের এবং পুরাণের ঐতিহাসিকতা, মস্তভেদের একটা কারণ। এই বিষয়ে বিজ্ঞাবিনোদ মহাশয়ের অভিযোগ—

“যে মহাগ্রন্থ উল্লেখ করিয়া ‘ইতিহাস’ শব্দটা সংস্কৃত অভিধানে ব্যবহৃত হইতেছে, সেই মহাভারতেরই ঐতিহাসিকতা তাঁকের বিষয় মনে করিয়া রাখা যাবুঁ উহা পরিহার করিতেছেন।” (৭৭৫ পৃঃ)

সংস্কৃত সাহিত্যে ‘ইতিহাস’-শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং মহাভারতই বা কোন্‌ হিসাবে ইতিহাস, তাহার অবধান করিতে হইলে, ‘ইতিহাস’-শব্দের প্ৰয়োগ লক্ষ্যে বিদ্যুত আলোচনার প্রয়োজন। বিজ্ঞাবিনোদ মহাশয় তাহাতে যত্নক্ষেপ করেন নাই। কীরদ্বারা ইতিহাস-শব্দের এই প্রকার অর্থ নির্দিষ্টাছেন—“ইতি হ অগীতঃ ইতিহাস, ইতিরেবমর্থে, হঃ কিলার্থো।” এইরূপই ঘটয়াছিল (ইতি—হ—আস) যেখানে, অর্থাৎ বাহাতে অতীত ঘটনার বৃত্তান্ত থাকে, তাহা ইতিহাস, পুণ্যবৃত্ত, বা পূর্ণচরিত। অতীত ঘটনার অবিকৃত বিবরণ যে ইতিহাসের ‘বিষয়’, ‘ইতি’র সহিত ‘ই’র যোগ তাহা স্মৃতিত করিতেছে। হুতরাং ব্যুৎপত্তির হিসাবে ‘ইতিহাস’-শব্দকে history-শব্দের প্রতিশব্দরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু ব্যুৎপত্তি ও অর্থ বাহাই হটক, ঠিক সেই অর্থে ইতিহাস-শব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে সর্বত্র ব্যবহৃত হয় নাই।

বৈদিক যুগ হইতে সংস্কৃত সাহিত্যে ইতিহাস-শব্দের বহুল প্রচার দৃষ্ট হয়। অথর্ব-বেদ-সংহিতার (১৬।৩৮) “পুরাণ”, “পাখা”, “নারাশংসী”, এবং “ইতিহাস” একত্র উল্লিখিত

চইয়াছে। স্তম্ভপথত্ৰাঙ্কণে (১১.৪১৬) পুরু মহাবীরের অস্বর্ণিত “ব্রহ্মবজ্র” প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,—“বাহায্যো বৈ ব্রহ্মবজ্রঃ”, ‘বহঃ (বেদ) অধ্যয়ন ব্রহ্মবজ্র।’

তৎপরে বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন প্রাচীন অধ্যয়নের ফল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

“পর-আহুতরোহবা এতা বেবানাম্ বসুস্তঃ”—“ব্রহ্মত্বনি (অথেন) দেবগণের উদ্দেশ্যে চতুর্ভূতিব্রহ্মণ।’ এইরূপ বসুস্ত-ভুক্তিকে (বসুস্তেন) আত্মাহুতি (ব্রহ্মাহুতি), সামগুনিকে (সামবেদ) সোমাহুতি, অথর্ষাদি-রস যজ্ঞগুলি (অথর্ষবেদ) দেব-আহুতি বলা হইয়াছে। তৎপরে বলা হইয়াছে—

“মহাবাহুতরোহবা এতা বেবানাম্ বসুস্ত-পানানি বিজ্ঞাবাকোব্যাক্যমিতিহাসপুৰাণং গাথ্য নারাপংক্তঃ স ব এবং বিদ্যানমুপাস-নানি বিজ্ঞা বাকোব্যাক্যমিতিহাসপুৰাণং গাথ্যানারাপংসৌরিত্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে মহাবাহুতিভিরেব তদেবাং তত্পরতি।”

‘অমুপাসন, ‘বিজ্ঞা, বাকোব্যাক্য—(কথোপকথন), ইতিহাস, পুরাণ, গাথ্য এবং নারাপংগী দেবগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ-আহুতিব্রহ্মণ। যিনি এই তথ্য জানিয়া প্রতিদিন অমুপাসন, বিজ্ঞা, বাকোব্যাক্য, ইতিহাস, পুরাণ, গাথ্য এবং নারাপংগী অধ্যয়ন করেন, তিনি যজ্ঞ-আহুতি দান করিয়া দেবগণের তৃপ্তিপাথন করেন।’

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭.১১৪) “অথেনো বসুস্তেনঃ সামবেদ আথর্ষেন চতুর্ভূ ইতিহাস-পুৰাণং পুরুষো” ইত্যাদি বচনে অথেন, বসুস্তেনঃ, সামবেদ এবং অথর্ষবেদের পর

ইতিহাস-পুৰাণকে পুরুষের বলা হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যের আরও অনেক স্থানে ইতিহাসের উল্লেখ আছে। এই সকল অংশের আলোচনা করিলে মনে হয়, অতি প্রাচীন কাল হইতে বৈদিক আর্ধ্য-সাহিত্যের “ইতিহাস” নামক একটি অঙ্গ প্রচলিত ছিল, এবং তাহার অধ্যয়ন বা আবৃত্তি পুণ্যকর্ম বলিয়া গণ্য হইত। কোটিলীর অর্থশাস্ত্রে ইতিহাসের অধিকতর পরিচয় পাওয়া যায়। কোটিল্য বলিয়াছেন (১.১১৩), “সামর্গ্যার্হবেদান্ত্রয়ী। অথর্ষেনেমেতিহাসবেদো চ বেদাঃ।” ‘সামবেদ, অগ্নিবেদ, যজুর্বেদ, এই তিন বেদ ত্রয়ী। অথর্ষবেদ এবং ইতিহাসবেদও বেদ। পুনশ্চ (১.১৫) কোটিল্য এই ভাবে ইতিহাসের বস্তু নির্দেশ করিয়াছেন,—“পুৰাণমিতিবৃত্তমাত্ম্যারিকোদাহরণং ধর্মশাস্ত্রমর্থশাস্ত্রং চেতীতি-হাসঃ।” অর্থাৎ, ইতিহাস বলিলে পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র, এই সমস্ত বুঝায়। পুরাণাদ ইতিহাসের অঙ্গ। ইতিহাসের এই বস্তুভেদ মধ্যে, এখন ঐতিহাসিক ঘটনা বলিলে যাহা আমরা বুঝি, তাহা ইতিবৃত্ত নামে কথিত হইয়াছে। স্তম্ভমাং প্রাচীন ভারতে যাহা “ইতিহাসবেদ” নামে পরিচিত ছিল, ইতিহাস-শাস্ত্রের বৃত্তপত্তি-অমুপাসন বা এখনকার পাম্ভাত্য “হিষ্টরি”-র মতো যাহা বুঝায়, সেই-রূপ বিবরণ-পরিমল্লণ তাহার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। তৎকালে ইতিহাসের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল, ধর্মশাস্ত্রের এবং অর্থশাস্ত্রের অমুপাসন-গুলির প্রচারণ। সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ঐতিহাসিকগণ পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ প্রভৃতি নানাবিধ প্রকৃত এবং

কল্পিত ঘটনার বর্ণন করিতেন। প্রকৃত ঘটনার বর্ণনামধ্যেও উহা হইতে যে উপদেশ বা শিক্ষা লাভ করা যায়, ঐতিহাসিকগণের লক্ষ্য থাকিত সেই দিকে; স্মরণ্য প্রাচীন ইতিহাসে যে সকল প্রকৃত ঘটনার বিবরণ স্থানলাভ করিত, কালক্রমে তাহাদের বিকৃতি ঘটবার যথেষ্ট অবকাশ ছিল।

কৌটিল্য ইতিহাসের যে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, সেই লক্ষণ-কাত্ত একখানি প্রাচীন গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে। এষ্ট গ্রন্থ ইতিহাস বলিয়া কথিত, এবং পঞ্চমসেন বলিয়া এখনও পূজিত হয়। এই গ্রন্থ আমাদের ‘মহাভারত’।

মহাভারতের সূত্রকার ক্রমিগণ দৌহিত্যে অমুরোধ করিয়াছেন—

বৈশাম্ব্যসেন যং শ্রোতাং পুরাণং পরমবিদ্য।
সূত্রৈঃ ত্রৈলোক্যভিলাষে ক্রমাৎ কল্পিতপুঞ্জিতম্।
ভক্তাখ্যায়ন রত্নবিত্তং বিচিত্রপদপর্ণকং।
স্বস্বার্থভারতমুক্তং বেদার্থৈর্ভূতং বিত্ততঃ।
ভারতমোতিহাসস্য পুরাণং গ্রন্থার্থসংস্কৃতম্।
সংস্কারোপপত্তাং ত্রাশ্বীং নানাপ্রকোপকৃত্যং।
জনমেজয়স্য যং রাজো বৈশম্পায়ন উক্তবান্।
বধ্যবৎ স কল্পিতঃ সত্যং বৈশম্পায়নাজয়ঃ।
বৈশম্পায়নঃ সৎসুতাং বাসদায়নকর্তব্যঃ।
সংহিতাঃ শ্রোতুমিচ্ছাব্যঃ সূত্র্যং পাপপরাপরাঃ।
আখ্যাপিকা, ১১১—১১।

‘পরমর্ষি বৈশম্পায়ন (বাস্য) যে পুরাণ কহিয়াছেন, সেবগণ ও ত্রৈলোক্য প্রদান করিয়া বাহার পুজা করিয়াছেন, মনোরম পদ এবং বিবিধ পর্কে পূর্ণ, স্বস্বার্থ-প্রতিপাদক-শুভিলংঘনিত, বেদার্থ-সম্মত, অদ্বৈত-কর্মী বাসদায়নচিত সেই শ্রেষ্ঠ আখ্যান

ভাষ্য (মহাভারত) নামক ইতিহাসের (৫) গ্রন্থার্থবৃত্ত, ব্যাপ্তিভূত, সর্গশাস্ত্রাভ্যুগত, চতুর্ধক-সংযুক্ত, সংহিত, পুণ্যাকর, পাপভর-হর কথা, বাহা বৈশম্পায়নের আচ্ছাদ্যদের রাজা জনমেজয়ের বজ্রে কবি বৈশম্পায়ন যথার্থ কীর্তন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা স্মরণে রাখি।’

এখানে ‘মহাভারত’ পুরাণ আখ্যান এবং ইতিহাস বলিয়া কথিত হইয়াছে, এবং মহাভারতের নানা স্থানে, বিশেষতঃ শান্তি পর্কে এবং অমুরোধ পর্কে, ধর্মশাস্ত্রের এবং অর্থশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ও নিবন্ধ হইয়াছে। মহাভারতে “ইতিবৃত্তং, নরেন্দ্রাণাম্ অধীশ্বরং বদ্যাম্যহম্”ও যথেষ্ট আছে। “বৈশম্পায়নঃ সংযুক্তাং” এই বিশেষণ হইতে এবং অন্তর্ভুক্ত কারণে পণ্ডিতগণ মনে করেন, বৈদিক সাহিত্যে যে সকল ইতিহাস-পুরাণের উল্লেখ আছে, সেই সকল প্রাচীন ইতিহাস-পুরাণ অবলম্বনে মহাভারত রচিত হইয়াছিল। মহাভারতই আর্ধ্যগণের ইতিহাসবেদ, বা পঞ্চমবেদ। কৌটিল্য ইতিহাসের যে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, সেই হিসাবে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা ভক্তের বিষয় নহে। কিন্তু গ্রীক (Grecian) বা ফ্রীম্যানের (Freeman) গ্রন্থ যে হিসাবে ইতিহাস, মহাভারত সেই হিসাবে ইতিহাসপদবাচ্য কি না, ইহাই ভক্তের বিষয়।

মহাভারতে নানাপ্রকার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি পুরাণ বা স্মৃতি-প্রদান-মন্তব্যের কথা; কতকগুলি আখ্যায়িকা; কতকগুলি উপাখ্যান এবং কতকগুলি ইতিবৃত্ত। মহাভারতে “অদ্যাপুর্বা-

মহিমামিত্তিলাস পূরাণনম্" এই প্রকার
মুখবন্ধ করিয়া, অনেক পত্রপত্রকার গল্পও
বলা হইয়াছে। পুণ্যকর, পাণ্ডুরহর, উপদেশ-
পূর্ণ ঘটনার বর্ণন করাই মহাত্মারতকারের
মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অতঃপর আত্মোপাত্ত
মহাত্মারতকে "এখনকার হিসাবে ইতিহাস
বলিয়া গণ্য করা সম্ভব নহে; কিন্তু 'মহা-
জারতে' যে ইতিহাসের অনেক "উপাদান"
আছে, তাহা স্বীকার্য। কিন্তু মহাত্মারতকে
ইতিহাসের উপাদানের আকররূপে ব্যবহার
করিবার প্রধান অন্তরায়, মহাত্মারত-বর্ণিত
বৃত্তান্তের মধ্যে কোন্গুলি যে আখ্যায়িকা,
কোন্গুলি যে উদাহরণ, এবং কোন্গুলি
যে ইতিবৃত্ত, তাহা নির্ধারণের দুষ্করতা।
কেহ কেহ বলিতে পারেন—"এই
নির্ধারণ আর কঠিন কি? যে বৃত্তান্তে
আলৌকিক ঘটনার সংস্রব নাই, এবং যাহা
যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়, তাহা সত্য
ইতিবৃত্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।"
কিন্তু উদাহরণার্থে যদি আলৌকিক ঘটনা
কল্পিত হইতে পারে, তবে উদাহরণার্থে যে
লৌকিক ঘটনা কল্পিত হইতে পারে, এ কথা
কে বলিবে? অতঃপর মহাত্মারতের ঐতি-
হাসিক স্তরের আবিষ্কার এখন একান্ত
কঠিন বলিয়া মনে হয়। অতঃপর বাহ্য
প্রমাণের সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল
মহাত্মারতের উপর নির্ভর করিয়া, এই
কার্য কখনও সম্ভব হইবে কি না

সন্দেহ। ঐতিহাসিক উপাদানের সমীক্ষার
ইতিহাসবোধে মহাত্মারত হইতে আমরা
যে ইতিহাস বাহিয়া বাহির করিতে
পারিতেছি না, তাহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়।
কিন্তু তৎক্ষণে পরিতাপে সময় নষ্ট না করিয়া
তাব, ভাবা এবং চিন্তার সূত্র ধরিয়া,
মহাত্মারতের, কোন্ অংশ কখন সচি-
ত হইয়াছিল, তাহার যথাযথ নিরূপণে বৃত্তবান
হওয়া কর্তব্য। পাশ্চাত্যগণ তাঁহাদের
ধর্মপুস্তক বাইবেলের অন্তর্নিহিত ইতিহাসের
উদ্ধারের জন্য যেমন Higher Criticism-এ
প্রবৃত্ত হইয়া, অনেকটা সফলকাম হইয়াছেন,
আমাদেরও মহাত্মারতের এবং পুরাণের
সেইরূপ Higher Criticism (১) করিতে
বৃত্তবান হওয়া কর্তব্য। তবেই পঞ্চমবেদের
ঐতি সম্যক সম্মানপ্রদর্শন করা হইবে,
এবং ইতিহাসবেদের অন্তর্নিহিত ইতিহাস
উদ্ধারের পথ সহজ হইবে।

২। কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা

কুলশাস্ত্রের, বিশেষতঃ রাজ্যীয় এবং
বাসেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজের কুলজগণের পরি-
রক্ষিত কুলশাস্ত্রিকার ঐতিহাসিকতা সন্দেহে
ইতিহাসবেদক-সমাজে, মতভেদ লক্ষিত
হয়। এই বিষয়ে বিভাবিনোদ মহাপত্রের
ভাষ্য অপর পক্ষের অভিযোগ এই—

"কুলশাস্ত্রের উপর মাধববাবু, রমা-

(১) Criticism বা সমালোচনা শব্দের সাধারণ অর্থ বোধগম্যবিচার। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ সম্বন্ধে
Criticism লব্ধ অন্তরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই Criticism দুই প্রকার, Lower এবং Higher।
Lower বা Textual criticism-এর উদ্দেশ্য প্রকৃত পাঠোদ্ধার; Higher Criticism-এর উদ্দেশ্য
ঐতিহ্যবোধের রচনাকাল, রচনাকারী এবং রচনাপ্রণালী সম্বন্ধে বিচার।

প্রণয়নবান্ প্রভৃতি অনেকই বীতরাগ; কিন্তু এগুলি একেবারে ফেলিয়া দিবারও জিনিষ নহে।.....অতঃপাশন বা মুজ্জা-মাজ্জেই যে গ্রহণীয় এবং কুলপ্রভুত্বট্রেই যে বর্জনীয় তাহা বলা যায় না (৭০৩ পৃঃ)।

কুলশাস্ত্রগুলি যে একেবারে ফেলিয়া দিবার জিনিষ, একথা কেহ কখনও বলে নাই, এবং বলিতেও পারে না। পক্ষান্তরে, কুলশাস্ত্র তাহকলকে বা শিলাকলকে ক্ষোদিত লিপিবদ্ধ তুল্য মূল্যবান, এতরূপ মনে করাই সম্ভব। তান্ত্রশাসনে এবং শিলা-লিপিতে রাজকুলের প্রশস্তি লিপিবদ্ধ থাকে বলিয়াই ঐতিহাসিকের নিকট উহাদের এত আদর। হুতরাং তান্ত্রশাসন এবং শিলা-লিপিও কুলপঞ্জিকা ভিন্ন কিছুই নয়— দাতার কুলের কুলপঞ্জিকামাত্র। তান্ত্রপট্রে বা শিলাকলকে ক্ষোদিত হউক, আর তুলট-কাগজে বা তালপত্রে লিখিত হউক, সকলপ্রকার কুলপঞ্জিকাই ঐতিহাসিকের আদরের সামগ্রী। কিন্তু সকল প্রকার কুলপঞ্জিকাই ঐতিহাসিকের আদরের সামগ্রী হইলেও, কোনপ্রকার কুলপঞ্জিকারই সকল অংশ সর্বান আদরের সামগ্রী নয়। তান্ত্র-পট্রে বা শিলাকলকে ক্ষোদিত অধিকাংশ কুলপঞ্জিকাতেই দুইটী অংশ লক্ষিত হয়। প্রথম অংশে চন্দ্রবর্ষা প্রভৃতি দেবতা এবং রাম-লক্ষ্মণ বহু প্রভৃতি পৌরাণিক নৃপতি হইতে দাতার বংশোৎপত্তির বিবরণ থাকে; এবং দ্বিতীয় অংশে দাতার বংশে দ্বিনি রাজপদের প্রতিষ্ঠাতা, তাহার সময় হইতে ধারাবাহিক বংশাবলী থাকে।

ঐতিহাসিকেরা এই দ্বিতীয় অংশে বর্ণন

প্রকার সহিত গ্রহণ করেন, প্রথম অংশের প্রতি সেটরূপ ভ্রম। কখনও প্রদর্শন করিতে পারেন না। তুলট-কাগজে লিখিত কুল-পঞ্জিকারও তরুণ দুইটী অংশ আছে। প্রথম অংশে আদিশুর-আনীর রাজপুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া কৌলীভ্রমর্যাদা-লাভকারীর পূর্বপুরুষগণের বিবরণ নিবদ্ধ হয়; দ্বিতীয় অংশে কৌলীভ্র-প্রচার প্রতিষ্ঠা হইতে, আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক পুরুষের করণ-কারণের এবং মেল পঠি মত প্রভৃতির উৎপত্তির বিবৃত বিবরণ প্রদত্ত হয়। কৌলীভ্রের রক্ষার জন্তই কুলভ্রের অন্ত্যাদ্য; এবং কুলভ্রের স্বত্বাধিকার সফলতার জন্ত কুলপঞ্জিকার সম্ভব। হুতরাং কুলপঞ্জিকার কৌলীভ্রের বিবরণে অর্থাৎ দ্বিতীয় অংশে বর্ণন আদরশীল, প্রথম অংশে নিবদ্ধ তৎ-পূর্ববর্তী সময়ের বিবরণ ততটা আদরশীল হইতে পারে না। কেহ কেহ হয় ত বলিতে পারেন,—“আদিশুর বা আদিশুর-আনীর পঞ্চ ব্রাহ্মণ চন্দ্রবর্ষের মত দেবতা বা রাম-লক্ষ্মণ-বহুর মত পৌরাণিক ব্যক্তি নহেন; হুতরাং তান্ত্রশাসনের কুলপ্রশস্তির প্রথম অংশ অপেক্ষা কুলভ্রের কুলপঞ্জিকার প্রথম অংশের প্রতি অধিকতর আস্থা-স্থাপনের অন্তরায় কি?” কিন্তু একই উদ্দেশ্যে, রাজকুলের প্রশস্তিতে রাজা-প্রতিষ্ঠাতার রাজপদে অধিকার যে পুরুষপরম্পরাগত, এবং কুলীন ব্রাহ্মণের বংশাবলীতে প্রথম কৌলীভ্র-মর্যাদাভাষীর কৌলীভ্র-মর্যাদার দাবীও যে পুরুষপরম্পরাগত, তাহা প্রতিপাদনের জন্ত উভয়ে এই প্রথমোক্ত সংযোজিত হইয়াছে; এবং উভয়েই কল্পনার অবকাশ তুল্যরূপ।

কোনীকৃতমধ্যমা-প্রতিষ্ঠার পূর্বের এবং পরের বংশাবলীর যে ঐতিহাসিক মূলা সমান নয়, তাহার একটি প্রমাণ এই—কোনীকৃত-প্রতিষ্ঠার পরবর্তী বংশাবলীতে পঞ্চ গোত্রের ব্রাহ্মণের পুরুষ-পর্বারের সংখ্যা অসঙ্গত পার্থক্য লক্ষিত হয় না; -পক্ষান্তরে, তৎপূর্বের বংশাবলীতে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। কাক্তকুলগণত বীজপুরুষ হইতে কোনীকৃত-মধ্যমাভাগীয় ব্যবধান বাস্তবগোত্রে আট পুরুষ, এবং শান্তিলাগোত্রে পনের পুরুষ। এই সকল কারণে কেহ যদি ভাষ্যশালনের বংশাবলীর প্রথমার্ধের মত কুলশাস্ত্রের বংশাবলীর প্রথমার্ধ সন্দেহের চক্ষে দেখেন, তবে তাহাকে সমগ্র কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে বীতরাগ বলা হইতে পারে না। * রীতির সমাজের সর্লোপেক্ষা গ্রামাণ্য কুলগ্রন্থ জ্ঞানমন্ডল মিশ্রের “মহাবংশাবলী”তে এই প্রথম অংশটি বাদই দেওয়া হইয়াছে। রাখালবাবু প্রভৃতি গ্রাহ্য কুলশাস্ত্রের প্রতি বীতরাগ বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কেহ এ-বাৎ ব্রাহ্মণ-সমাজের ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করেন নাই, হুতরাং সমগ্র কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে মত-প্রকাশের তাঁহাদের অবকাশই উপস্থিত হয় নাই।

শ্রমবশিষ্টের ‘গুরুত্বস্ত-লিপিতে, ভবদেব ভট্টের ভুবনেশ্বরের প্রেক্ষিতে, চকুভূজের “হরিচরিত কাণ্ডে”, ঈলিমপুরের শিলালিপিতে, এবং অজ্ঞাত প্রাচীন লিপিতে, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ-সমাজের ইতিহাসের যে উপকরণ পাওয়া যাইতেছে, তাহার সহিত কুলশাস্ত্রের ব্রাহ্মণ-গমনকাহিনীর অধিরোধ লক্ষিত না হওয়ার, আমরা কেহ কেহ এই কাহিনীর ঐতি-

হাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু এই ব্রাহ্মণগমনকাহিনীও একেবারে ফেলিয়া দিবার জিনিষ, এ কথা কোথাও বলা হয় নাই। এই কাহিনীর ঐতিহাসিক স্তিতির অমূল্যত্বই চমিত্তেছে। কিন্তু আমরা কুলশাস্ত্রের একপ্রেরীর বচন-প্রমাণকে একেবারে ফেলিয়া দিবার জিনিষ বলিয়া মনে করিতেছি। এই বচনগুলি আদিশুর কর্তৃক পুণ্ডর অষ্টম শতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণ-আনন্দের প্রতিপাদক প্রমাণরূপে পুনঃপুনঃ উদ্ধৃত হইয়াছে। এক বৎসর পূর্বে সাহিত্যপত্রায় পঠিত “আদিশুর” শীর্ষক একটি প্রবন্ধে এই প্রেরীর কতকগুলি বচনের মৌলিকতার আলোচনা করিয়াছিলাম। এই বিষয়টির স্মরণও বিবৃতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক বোধ করিয়া, এই প্রবন্ধে ঐ প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি।

লঘুভারত-কারের মতে, ৪২৩০ কলি-গত্যক্ষে অর্থাৎ ৯৪১ খ্রিস্টাব্দে আদিশুর রাজত্ব শাস্ত করিয়াছিলেন। “সম্বৎ-নির্ণয়”-কারের মতে কলীপবংশাবলীচরিতে উল্লিখিত আদিশুরের আস্থানে কাক্তকুলের পঞ্চব্রাহ্মণ-আগমনেব কালজ্ঞাপক “নবনবতাবিক-নবশতী শকাব্দ” বচনকে সংবৎ পাঠ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণভাষ্যনিবাসী ৬ বংশীবদন বিজ্ঞানস্বতকের উপদেশ-অনুসারে “গৌড়ে ব্রাহ্মণ”-কার বেদবাণ্যকশাকে “কু গৌড়ে দিয্যঃ সমাগত্যঃ” বচন প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই তিন জন লেখককে আমরা প্রাচীন কুলশাস্ত্রগর্ভী বলিতে পারি। ইহাদের মধ্যে কার্যভাঃ দুই একজন মত দেখা যায়! এক মতে, ব্রাহ্মণ-আগমনের

কাল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী (ঐখ্যায় ১১১৫, ১১৫৪, বা ১১৯৯ শকাব্দ), এবং অপর মতে, দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ (১০৪২ খৃষ্টাব্দ)।

ইরানীঃ বাহারী কুলশাত্তের অঙ্গুসরণ করিয়া ইতিহাসের রচনা করিতেছেন, তাঁহার সকলই প্রাচীন কুলশাত্তপরিগ্রহণের উত্তরপ্রকার মত এবং তদনুসারে বচন-প্রমাণ একেবারে ফেলিয়া দিতে চাহেন, এবং নবাবিস্কৃত বচন-প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, আদিশূর “সম্বন্ধ-নির্ণয়”-কারের নিরূপিত সময়েও এই শতাব্দী পূর্বে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি, ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। এই মতের প্রধান পোষ্টা তিন জন;—৮ প্রহরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এবং প্রাচ্যবিজ্ঞানমহর্ষি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু। এই সকল পণ্ডিত যে সকল বচনপ্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, একে একে তাহার বিচার করিব।

১। ১০০৭ সালের “সাহিত্য-বিষয়-পত্রিকা”র প্রকাশিত “কৃত্তিবাস পণ্ডিত” শীর্ষক প্রবন্ধের একটা পাদটীকা (১১৯ পৃঃ) লেখক ৮ প্রহরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে,—“শাক্য বৈদ্যকলম্বটক-বিমিত্তে” অর্থাৎ ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশূর কর্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনীত করেন, এবং এই প্রমাণের বলে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, “রাষ্ট্রীয় কুল-পঞ্জিকার “বৈদ্যবংশ” শাক্যের স্থানে সিন্ধুই “বৈদ্যবংশ শাক্য” ছিল, কালবশে এবং নকলকারের দ্বারা তাহা রূপান্তরিত

হইয়াছে।” কিন্তু যখন কুলশাত্তের এবং “কিত্তিবাস-শাশ্বত-চরিত”র সময়ভাগ্যক সকল বচন উদ্ধৃতি বাইতেছে, তখন “বৈদ্যকলম্বটক-বিমিত্তে” বচন কেন যে বৈদ্যবংশের অবিস্মারিত গৃহীত হইবে, তৎসম্পর্কে বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র যুক্তি,—ব্রাহ্মণবংশাবলীতে আদিশূর হইতে বঙ্গালসেনের সময় পর্যন্ত যে পুরুষবংশাবলীর ব্যবধান কথিত হইয়াছে, তাহাতে “অন্ততঃ সাড়ে তিন শত বৎসর” ধরিতেই হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, কোনও গোত্রের বংশাবলীতে আদিশূর ও বঙ্গাল সেনের মধ্যে আট পুরুষের ব্যবধান, এবং কোনও বংশাবলীতে পনের পুরুষের ব্যবধান। আট পুরুষে এবং পনের পুরুষে সামঞ্জস্য বিধান যেমন দুষ্কর, এই দুইয়ের গড় করিয়া সাড়ে তিন শত বৎসর ব্যবধানের করণা করাও তেমনই অসম্ভব।

প্রকৃতবস্তুর আর একটি দৃষ্টান্ত,—তিনি বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকার একটিনাড়া বচনের বলে চিরপ্রচলিত “বৈদ্যবংশ”কে “বৈদ্যবংশ” পাঠের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকামাঝেই বঙ্গালসেনের সহিত শূর-রাজবংশের সম্বন্ধসূচক যে বচনপ্রমাণ আছে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে নাই। আমার মনে হয়, কুলপঞ্জিকার নিবন্ধ সময়-ভাগ্যক পরস্পরবিরোধী বচনের অপেক্ষা এই প্রকার ঐতিহ্য অধিক মূল্যবান। “গৌড়রাজমালা”র (৭৮ পৃঃ) পৃষ্ঠা-নিবাসী ৮ মহেন্দ্রচন্দ্র শিরোমণির দ্বয়ের কুশল হইতে এই সম্পর্কে একটি বাঙ্গালা বচন উদ্ধৃত হইয়াছিল। যথা—

“এই পঞ্চগোত্রে পঞ্চব্রাহ্মণ সংস্থাপন

করিয়া আদিশুর রাজার সর্বারোহণ : তদন্তে কিছুকালানুসর তত দৌড়িতকুলেত উদ্ভব হইলেন বশাল সেন।”

উক্ত শিরোনাম মহাশয়ের ঘরের কুল-গ্রন্থেও আর একটি ছিন্ন পত্রে আদিশুর ও বশালসেনের “সম্বন্ধ এইভাবে স্মৃতিত হইয়াছে—

“রাজ্য: সপ্তমসত্তানন্ত দৌড়িত্তেজুধ-
[বালাবাঃ] .” “সপ্তম সত্তানে”র অর্থ বৃত্তিতে না পারিয়া এত বচনটি পূর্বে উদ্ধৃত করি নাই। কিন্তু নিম্নত বঙ্গর মাধ্যগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিন্দ্রের সিদ্ধান্ত এবং শ্রীযুক্ত পশুনাথ মুকুটমণি বরেন্দ্র-অম্বুসকান-সমিতিতে যে সকল কুলগ্রন্থ উপলব্ধি দিয়াছেন, তদ্বোধে এই কথা নানা আকারে পাওয়া যায়।

(ক) “ইতপকালে আদিশুর রাজা পক-গোজোতে পকব্রাহ্মণ আনাশন করেন [পক ব্রাহ্মণের নাম ও গোত্র] আনাশন করিয়া আদিশুর রাজার শর্যারোহণ: সপ্তম পুরুষান্তরে দইজকুলে জন্মিলেন ॥ বশালসেনঃ ।”

(খ) “এই সকল ক্রিয়া করিয়া আদিশুর রাজার ‘সর্বারোহণঃ ॥ ব্রাহ্মণ বিগের’ সপ্তম পুরুষ আরঃ রাজার সপ্তম পুরুষ আরঃ রাজা জুগা পাত্র পার না কে রবিসেক করিয়া রাজা করেঃ ॥ কিছুকাল অহর দইজ সত্তানেত জন্মিলেন বশালসেন।”

ব্রাহ্মণভাঙ্গা নিবাসী ৮বংশাবলম বিজ্ঞানর ঘটকের বাড়ী চত্রেতে বরেন্দ্র-অম্বুসকান সমিতি যে “কুলগ্রন্থ” গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে “জন্মঃ স্মৃতিবর্ণিত” সপ্তজন শুর চাণের নাম আছে। যথা,—
আদিশুর, তৃশুর, ক্ষিতিশুর, অবনীশুর,

দক্ষশীশুর, ধর্মশুর এবং অম্বুশুর। সুতরাং এখানেও আদিশুরের সপ্তম পুরুষ যে শুর-বংশের শেষ সুপতি, তাহা স্মৃতিত হইয়াছে। বিজ্ঞানসেনের ৩০ বীজ্য সংবতের একখানি তাম্রলিপিসনে কথিত হইয়াছে,—বিজ্ঞানসেনের মহিষী এবং বশালসেনের জননী বিশালদেবী শুরবংশের জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্মগণ্ড উপলব্ধিস্থিত বচনগ্রন্থাণের একংশ সমর্থন করে। সুতরাং বরেন্দ্র-কুলগ্রন্থগণের রক্ষিত আদিশুর এবং বশাল-সেনের নর পুরুষের ব্যবধান-বিবরক ঐতিহ্য অমূলক নাও হইতে পারে। যদি এই কথা অমূলক না হয়, তবে আদিশুর পুত্রীঃ দশম শতাব্দের মধ্যভাগে, পালবংশীয় দ্বিতীয় গৌণালের বা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সময়মধ্যে, “সম্বন্ধ-নির্গম”কারের অম্বুসক্তি ১১১ সংবতের কিছুকাল পরে বিদ্যমান ছিলেন, এইরূপ অনুমানও করা যায়। রাঢ়েশ্বরচোলের ভিক্রমলগ্ন-লিপি হইতে জানিতে পারা যায়,—একাদশ শতাব্দের প্রথম পালে, গোড়াধিপ মহীপালের সময়ে, দক্ষিণরাঢ়ে রণশুর নামে একজন নরপতি ছিলেন। আদিশুর যদি প্রাকৃতপ্রভাবে দশম শতাব্দের মধ্যে প্রাপ্তকৃত হইয়া থাকেন, তবে ইয় ত তিনি রাঢ়বংশের অধিপতি ছিলেন। কাছোজ-আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে, এবং বরেন্দ্র বংশন কাছোজগণের পদানত, তখন রাঢ়ে, এবং যদে কোনও পরাজিত স্বাধীন নরপতির অত্যাচারের যথেষ্ট অবকাশ ছিল। আদিশুর কি সেই সুযোগে অত্যাখিত হইয়াই কাজকুল হইতে ব্রাহ্মণ আনাহীরা, কোনও

চিরোৎসব মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অক্ষর-কীর্তি অর্জন করিয়া গিয়াছেন? এইরূপ অসুমানের প্রলোভন সংবরণ করা স্মৃতিশীল। কিন্তু কেবল আকাঙ্ক্ষার উপর এত কথা কোনও মতেই বলা বাইতে পারে না।

২। মহামহোপাধায় ঐযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, কান্তকূজের রাজা যশোবর্তী আদিশূরের অগ্ররোধে পলায়িত হইয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। (২) কুলশাখ্য হরিমিশ্রের কারিকার উপর নির্ভর করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—

Thirty years ago the theory was that Brahmins were brought to Bengal by Adisura either in 999 Samvat i.e. 954 A.D. or in বৈকবৈদ্যব্দশক, i.e. 954 Saka or 1032 A.D. But since then careful study of all manuscripts of earlier genealogists has given more correct information on the subject. Hari Misra was a contemporary of Danauja-Madhava, who again was a contemporary of Ghiyatu'ddin Bulban (1265-1268 A. D.)...Hari Misra says,—that the Palas got ascendancy in Bengal shortly after the coming of the five Brahmins, and it is now very nearly settled that they became rulers of Bengal between A.D. 760 and 770. So Adisura brought the Brahmins not in the eleventh century but in the eighth. —J. A. S. B. Vol. VIII. New Series, 1912. p.p. 347-398.

শাস্ত্রী মহাশয় এবং নগেন্দ্রবাবু হরিমিশ্রের

এই কারিকার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, ইহা সত্যমূল্য। এই গ্রন্থে আদিশূর কর্তৃক ব্রাহ্মণ-আনয়নের পরে পালরাজ্যগণের অভ্যুদয়ের কথা আছে, পালরাজ দেবশামের কথা আছে, সেন-রাজগণের কথা আছে। নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন এট গ্রন্থ লক্ষণ সেনের পুত্র মহেন্দ্রনাথের সভায় প্রায় ৫৫০ বর্ষ পূর্বে রচিত (রাজতরঙ্গিণী ১৯ পৃঃ)। লক্ষণ সেন অনূন ৭০০ বৎসরের পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; ৭৩৩ বৎসর লক্ষণসেনের পুত্রের সভাপদ হরিমিশ্রের রচনাকাল “প্রায় ৫৫০ বর্ষ” না বলিয়া, বোটাখুটি ৭০০ বৎসর বলাই কর্তব্য। বিখ্যাত-কাখ্যালে নাকি “এই প্রাচীন পুথির দৃষ্টে শত বর্ষের হস্তলিপি” আছে (রাজতরঙ্গিণী, ১২৮ পৃঃ, ৪৮নং টীকা)। দৃষ্ট শত বৎসরের পূর্বে লিখিত, সাত শত বৎসরের পূর্বে রচিত, শূর, পাল এবং সেনবংশের এবং ব্রাহ্মণ-সমাজের ইতিহাস-সংবলিত এই মহাগ্রন্থ কেন যে শাস্ত্রী মহাশয় “এক নগেন্দ্রবাবু এতদিন প্রকাশ করিতেছেন না”, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। হুঁহু যে কুলশাখ্যানভিত্তিক মনীন ঐতিহাসিকেরাই হরিমিশ্রের এই বচনগুলি প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, তাহা নহে; প্রাচীন কুলশাখ্যানভিত্তিক সম্বন্ধ-“নির্ণয়”-কান্তকূজ আদিশূরের ব্রাহ্মণ-আনয়নকাল সম্বন্ধে তাঁহার পূর্বতন মত, ৯৯৯ সংবৎ, পরিহার করিয়া; নগেন্দ্রবাবুর দৃষ্ট হরিমিশ্রের

বচনাঙ্গণারে কোনও নূতন মতের প্রচার করেন নাই, এবং “ভাষাপরিচ্ছেদে”র ভূমিকার পণ্ডিতবর জীবনু রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর “ভাষাপরিচ্ছেদে”-কারের কালনির্ণয়-প্রসঙ্গে ১৯৯ “সংবৎসর” স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

নগেন্দ্রবাবু হরিনিস্তের যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে নৃপ-মাধবের বিষয় উদ্ধৃত করিয়াঃ—

“তৎপুত্রঃ কেশবো রাজা গৌড়রাজ্যে বিহার চ।
পতিঃ চাণ্যকরোঃ শ্রদ্ধে যখননা ভগ্নাত্তঃ।
য পত্ন্যস্তি তে বিয়া ত্ত্ব হৃৎং যবা পুত্রঃ।
প্রোহরভবত্বপীয়া সেবযঃপারনত্বত্ব।
দনোজমাধবঃ সর্বভূপঃ সেবাগম্যভূতঃ।
এতৎসভাগঃ বহব আগতা ব্রাহ্মণা নরাঃ।
দানোজমাধবঃ স্বাধিপতিভূতোভবঃ।
ধনৈক রাজসম্মানঃ পিতামহমিতীয়া।
সবদ্যঃ কৃতবরত সর্বো ভূধরপূজবাঃ।”

নগেন্দ্রবাবু অমুখ্য—“লক্ষণ-পুত্র কেশবসেন যবনের ভয়ে গৌড়রাজ্য ছাড়িয়া তাহারের সহিত (কিছুদিন) দ্বন্দ্ব চালাইতেছিলেন। এ সময় ব্রাহ্মণেরাও ভাষ্য ভিত্তিতে পারে নাই! অনন্তর সেন-বংশে দনোজমাধবী প্রোহৃত হন। সকল নৃপতিই তাহার পন্থেবা করিত। এই মহারাজের সভায় স্বাধিপতিভূতোভব নানোজমাধব বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ আগমন করেন। পিতামহকেও হারাইবার অভি-প্রায়ে তিনি ধন দ্বারা ও রাজসম্মান দ্বারা ব্রাহ্মণগণের সখ্যনির্ণয় করিয়াছিলেন, কেশব সেনের প্রসঙ্গের পরে, “অনন্তরং সেনবংশাৎ দনোজমাধবঃ প্রোহরভবৎ”

বলায়, উক্তের, মধ্যে কালবাবধান হুঁচিৎ হইয়াছে। “ব্রাহ্মণা নরাঃ” শুধু ব্রাহ্মণ বৃদ্ধাভিতে পারে না, অত্র প্রকার নয়ও বৃদ্ধা। শেষ শ্লোকটির অমুখ্য একে-বারেই মূলগ্রন্থত মধে। “কৃতবরতঃ” ক্রিয়ায় কর্তা “ভূধরপূজবাঃ”। অমুখ্য এইরূপ হইবে,—সকল নৃপশ্রেষ্ঠগণ পিতা-মহকে অম করিবার জন্য দানের দ্বারা এবং রাজসম্মানের দ্বারা সখ্য করিয়াছিলেন। এই শ্লোক দনোজমাধবের ব্রাহ্মণের কোনও উল্লেখ নাই, কেননা ভূধর অর্থ ব্রাহ্মণ নহে, রাজা।

এইরূপ অসম্বন্ধ রচনাকে বাঙ্গালার সংস্কৃতচর্চার সেই গৌরবময় যুগের লক্ষণ-সেনের উত্তরাধিকারীর সত্যকবির রচনা বলিয়া গ্রহণ করা হুঁচিৎ। নবীন ঐতিহাসিকেরা উনবিংশ শতাব্দির পশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের উদ্ভাবিত Critical Method বা ঐতিহাসিক বিচারনীতি-অবলম্বনে সত্যোদ্ধার করিতে চাহেন। বিচারনীল ঐতিহাসিক বা Critic কোনও বৃত্তান্তই অসমিষ্টভাবে গ্রহণ করিতে পারেন না। “For the critic is one who, when he lights on an interesting statement, begins by suspecting it.” “যতক্ষণ না ঐতিহাসিক আশোচ্য বৃত্তান্তের মূল অমূলকান করিতে সমর্থ হন, ততক্ষণ তাহার সম্মোহমোচন হয় না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এই পন্থা অবলম্বন করিলে, অতি অল্প। তথাই আভিচার করা বাইতে পারিলে, ধারাবাহিক ইতিহাসগঠন অসম্ভব হইয়া উঠিলে।

এই প্রসঙ্গের উত্তরে জিজ্ঞাসা করা যাউতে পারে, ইতিহাসসম্বন্ধে অধিকতর লাভবান হইতে পারেন কোন পথ অবলম্বন করিলে—পরিমাণে বেশী তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিলে, না যথারীতি তথ্যোদ্ধারের প্রচেষ্টার ও সাধনার ফলে? লর্ড আক্টন বলিয়াছেন—

"For our purpose, the main thing to learn is not the art of accumulating material, but the sublimer art of investigating it, of discerning truth from falsehood, and certainty from doubt. It is by solidity of criticism more than by the plenitude of erudition, that the study of history strengthens and straightens, and extends the mind." পুনরপি, "For us then the estimate of authorities, the weighing of testimony, is more meritorious than the potential discovery of new matter."

আমাদের এদেশের নবীন ঐতিহাসিকেরাও ধারাবাহিক কাহিনী গড়িখা সৌখীন পাঠকের কোতূহলনিবৃত্তি করিতে চাহেন না, পরন্তু যে বিচাররীতি সাহসের চিত্তকে প্রসারিত করিতে পারে, মানসিক শক্তি বিকশিত করিতে পারে, ইতিহাস-অধ্যয়নগামী জন-সমাজে সেই বিচাররীতি প্রচলিত, করিতে চাহেন। তাঁহারা কুলগ্রন্থের উপর বীতরাগ নহেন, কুলশাস্ত্রের নামে প্রচারিত এই প্রকার উদ্ভট বচনের উপর বীতরাগ। কুলশাস্ত্রাভিজ্ঞ প্রবীণগণের নিকট নব্য সম্প্রদায়ের সাহসের প্রার্থনা, তাঁহারা হাতের পুথিগুলি যথারীতি প্রকাশ করিয়া, ঐগুলির

বিচাষণের অবকাশ দিন। যদি হরিমিশ্রের গ্রন্থের পিটার করিলে, ইহার ভিতর এমন সকল তথ্য পাওয়া যায়, যাহা নিম্নে প্রকাশ্যের প্রত্যক্ষজ্ঞানমূলক, তবে তাহার ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইবার কোনও অন্তরায় থাকিবে না। •

৩। গত বৎসর বড়দিনের অবকাশে সাহিত্য-সভার "আদিশূর" নামক যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম, তাহাতে নগেন্দ্রবাবুকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—

নগেন্দ্রবাবু ব্রাহ্মণভাষার ৬ বংনী বিভাগ-রত্নের বাড়ী হইতে যে "মাজির কুলমঞ্জরী" মূল্য করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা হইতে ১৩২১ সালে প্রকাশিত "রাজকথাও" নামক গ্রন্থে (১০০ পৃঃ) এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"বৈবরণশাক ভু বৃণোঃকৃষ্ণাধিবৃকঃ।

বহুকর্ষাদেক শাকে ঘোড়ে বিদ্যাঃ সবাগতাঃ ॥"

অর্থাৎ, ৬৫৪ শাকে আদিশূর রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন; এবং ৬৬৮ শাকে ব্রাহ্মণগণ গোড়ে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি "ব্রাহ্মণকথাও" নামক পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থে আদিশূরের সময় লইয়া সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন; উক্ত ব্রাহ্মণভাষার পৃথক হইতে "ভূশূরেন চ রাজ্যাপি ত্রিভুবনভূতেন চ" উদ্ধৃত করিয়াছেন, অথচ "রাজকথাও"-পুস্তক এই অত্যাশঙ্কক বচনটি উদ্ধৃত করেন নাই কেন?

বিত্তীয় প্রশ্ন।—আমরা উক্ত বিভাগস্থ বটকের বাড়ী হইতে সংগ্রহ করিয়া যে পুথি সাহিত্য-সভার উপস্থিত করিয়াছিলাম,

তাহাতে নগেন্দ্রবাবু কর্তৃক “রাণীর কুল-মঞ্জরী” হইতে উদ্ধৃত সকল বচন অধিকল দৃষ্ট হয়, কেবল তিনটি পংক্তি বিকল অবস্থায় দৃষ্ট হয়। নগেন্দ্রবাবু যেখান হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, “কৃষ্ণের চ রাজ্যাপি ঐশ্বর্যভূতেন চ”, সেই প্রসঙ্গে আমাদের পুথিতে আছে,—

“কৃষ্ণের চ রাজ্যাপি আদিশূর-ভূতেন চ।” আমাদের পুথিতে “বহুর্দ্ধাঙ্গক (৮৯৮) শ্লোকে” আদিশূরের রাজ্যলাভ এবং “বেদবাণ্যক (২৫৪) শ্লোকে” গোড়ে ব্রাহ্মণ-অশ্রমের কথিত হইয়াছে। এতরূপ পাঠান্তরের কারণ কি?

প্রথম প্রশ্নের কোনও উত্তরই এ-দাব্যে আমরা পাই নাই। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে নগেন্দ্রবাবু সাহিত্য-সত্য বলিয়াছেন, আমাদের সংগৃহীত পুথি এবং তিনি যে পুথি মকল করিয়া আনিয়াছেন, তাহা এক পুথি নয়, দুইখানি ভিন্ন পুথি। আমরা নগেন্দ্রবাবুকে অহুদোধ করি, তিনি তাঁহার মকল করা পুথিখানি আত্মোপাত্ত প্রকাশিত করেন।

রাণীর এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কোন কোন কুলপাত্রের কতকগুলি বচন কেন যে কেলিয়ার দিবার জিনিষ মনে করি, তাহার কৈফিয়ৎ দিলাম। নগেন্দ্রবাবুর ব্যবহৃত আরও কতকগুলি কুলপাত্রের বচনের প্রতি

আমরা বীতরাগ। দৃষ্টান্তরূপ টোলা-নিবাসী ৮ গুরুচরণ বিজ্ঞানাগরের বাড়ী হইতে সংগৃহীত ঐশ্বর্য-কৃত “ঐবদিক কুলপঞ্জিকা” হইতে তিনি ষড়বংশীয় সামলবর্ণ্যার যে বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন (সামলকাত ২৯১ পৃঃ), তাহার উল্লেখ করা বাইতে পারে। রাণালবাবু “বাঙ্গালার ইতিহাসে” (১৩৪-১৩৬ পৃঃ), এই বিষয়টি বিশেষ লক্ষ্যতার সহিত খুব সংযত ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন। এতরূপ সন্দেহজনক আর একখানি গ্রন্থ—বটুভট্টের “দেববাংলা”। যে “কত্রপু” শব্দ কোনও সংস্কৃত অভিধানে বা আর কোন সংস্কৃত গ্রন্থে এ-দাব্যে পাওয়া যায় নাই, এই গ্রন্থের আরম্ভেই সেই “কত্রপু” শব্দটি আছে। সন্দেহের আর যে সকল কারণ আছে, রাণালবাবু তাহার উল্লেখ করিয়াছেন (“বাঙ্গালার ইতিহাস”—১৩০-১৩২ পৃঃ)। এই কয়েকখানি কুলগ্রন্থ হইতে প্রকাশিত কতিপয় বচনের প্রতি আমরা নির্ভর করিতে পারি না বলিয়াই, বাঙ্গালার স্মৃতিমের ইতিহাস-সেনকগণের মধ্যে একটা অনর্থক দলাদলি উপস্থিত হইয়াছে। পাঠকগণগকে এই দলাদলিতে মধ্যস্থতা করিতে আহ্বান করিবার জন্ত এই প্রবন্ধ উপস্থিত করিলাম।

ঐশ্বর্যপ্রসাদ চন্দ্র।

মার্কিনের জাপানী “ম্লেচ্ছ”

ইরোরোপ ও আমেরিকার বেতাজ
 লাতিপুত্র এশিয়া ও আফ্রিকার সবিক্যে
 বাবদাহ, শির ও কার্য দখল করিয়া
 বসিরাছেন। সমগ্র প্রাচ্য জনপদে বেতাজেরা
 মুখা ও গৌণ ভাবে প্রভুত্ব করিতেছেন।
 White Peril বা “বেতাজ-বিভীষিকা”
 একটা কল্পনামাত্র নয়। এশিয়া ও
 আফ্রিকার জনগণ ইহা মর্মে মর্মে অস্থির
 করিয়া থাকে।

আজকাল ইরোরোপে ও আমেরিকার
 ঠিক একটা উট্টা স্রেরের কথা শুনা যায়।
 প্রাচ্য জনপদের বেতাজেরা কেহ ক্রকাদ-
 বিভীষিকা দেখিতেছে, কেহ পীতাক-বিভীষিকা
 দেখিতেছে, কেহ মুসলমান-বিভীষিকা দেখি-
 তেছে! বেতাজদিগের পরাম্পরের ভিতরেও
 আবার এইরূপ বিভীষিকা দেখার বৈচিত্র্য
 আছে। ইয়াকিহানের বেতাজেরা ইরোরোপের
 বেতাজসমাজকে ঘুরে রাখিতে চাহে। ইহাদের
 এই বেতাজ-বিভীষিকার সূত্র Monroe
 Doctrine (মেনরো-নীতি)। মার্কিন-রেশ্মের
 লোকের দ্বিতীয় বিভীষিকার নাম Yellow
 Peril বা পীতাক-বিভীষিকা। পীতাক
 জাপানের ক্রমিক উন্নতি দেখিয়া আমেরিকার
 যুক্তরাষ্ট্রে অভিশর সত্ত্ব হইয়া পড়িয়াছেন।
 জাপানীদের অত্মসম্মানে চীনের পীত-জাতি
 এবং সমগ্র এশিয়ার লোক-সমাজ ক্রমেই
 নব ভাবে অস্থপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছে।
 কালেই জাপানের উন্নতিতে বাধা দেওয়া
 মার্কিনের বিশেষ লক্ষ্য।

১৯১০ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখে
 যুক্ত রাষ্ট্রের “রেপ্রেসেণ্টেটিভস” গৃহে একজন
 সভা, ইয়াকিহানের পীতাক-বিভীষিকা প্রচার
 করিয়াছিলেন।

এইরূপ বিকট কল্পনা বেতাজ-সমাজের
 মধ্যে মতলে প্রচলিত। বিশেষত ইয়াকিহানের
 ভিতর ইহা একপ্রকার বহুমূল্য। ইয়াকি-
 সমাজে ইরোরোপ বিভীষিকা ঘটা আছে
 তাহাব অপেক্ষা এশিয়া-বিভীষিকা অনেক
 বেশী। পীতাক-বিভীষিকা, প্রাচ্য-বিভীষিকা
 ইত্যাদি শব্দে ইহারা মোটের উপর জুড়ে
 এশিয়ার প্রভুত্ব বিস্তার বুঝিয়া থাকে। এই
 প্রভুত্ব বিস্তারে জাপানীরাই পথ-প্রার্থক—
 জাপানকে নবীন এশিয়া তাহার অম্বদাতা
 ও দীক্ষাগুরু বলিয়া বিবেচনা করে। এই
 কারণে জাপানের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাতই
 মার্কিন দেশে প্রাচ্য-বিভীষিকার রূপ গ্রহণ
 করিয়াছে। সোভিয়েত জাপানী-বিভীষিকা
 বলিলেই ইয়াকিহানের মনের কথা বর্ণনা
 বিরূত হয়।

ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশে আসিয়া দেখিতেছি
 —জাপানীদের প্রভাব মার্কিন দেশে নিত্য
 নগণ্য নয়। রেল, দোকানে, বাজারে, রাস্তায়,
 হোটেল, প্রদর্শনীতে সর্বত্র সকল কক্ষকেই
 জাপানীরা ঘর জুড়িয়া বসিয়াছে। বিশ্ব-
 যোগের যে-কোন সোঁধে প্রবেশ করিলেই
 জাপানের কৌশল দেখিতে পাই। তাহা ছাড়া
 জাপানী বাগান, জাপানী হোটেল, জাপানী
 ছাত্র-কছরত, জাপানী নাচ-গান-বাজন,



জাপানী চাপুৰ

জাপানী বাহু ইত্যাদি শ্রদধৰ্মী-ক্ষেত্ৰৰ বিশেষ অঙ্গবৰ্জপ। জাপানী-সিদ্ধান্তে সদস্যৰ বড় বড় মহানগৰ আগাগোড়া গৰাই জাপানী লোকজনে পৰিপূৰ্ণ। জাপানী বোকান-চোটেলৈৰ ক্ষিপ্তাশনপত্ৰ এবং নাম-ও বিবরণ জাপানী ভাষাতেই প্রচাৰিত হইয়া থাকে। জাপানী-ব্যবসায়ী-বৈষয়ী শ্রদধৰ্মী-ক্ষেত্ৰেও নানা-রূপ সচিব পোষ্টকাৰ্ড এবং চিত্ৰপ্ৰকাশ কৰিয়াছে। এইগুলিতে ইংৰাজী বিবরণের সঙ্গেসঙ্গে জাপানী বিবরণ দেওয়া আছে। ফলত বুঝিতে পারিতেছি যে, মার্কিনের জাপানী-সমস্তা সমস্তাই গুরুতর।

ভারতবাসীরা বাহাদিগকে পছন্দ করে না তাহাদিগকে "হেথেন" বলিয়া থাকে। বৰ্দ্ধনীয়, বহিষ্কারযোগ্য সকল বস্তই হিন্দু-সমাজে হেথেন নামে পরিচিত। বৰ্দ্ধনের কারণ

বাহাই হউক না, হেথেন জাতির বিজ্ঞা, বুদ্ধি, চরিত্র ও ধৰ্ম্মনীতি সমস্তই অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্ৰ বলিয়া বিবেচিত হয়। খৃষ্টানেরাও এইরূপ অখৃষ্টানদিগকে "হেথেন" (heathen) বলিয়াছে। ইহাদের বিবেচনায় হিবেনেয়া, তন্ত্ৰবিত্ত, বুদ্ধিহীন, নীতিহীন, ধৰ্ম্মহীন ও অসম্ম। আরকান Asiatic বা "এসিয়াটিক" শব্দটা ইথিওপীয় ও আমেরিকানদিগের নিকট "হিবেন"। শব্দরই নামান্তর রূপে ব্যবহৃত হয়। হেথেন বলিলে হিন্দু বাহা বুঝে, কাকের বলিলে মুসলমানের বাহা বুঝে, "এসিয়াটিক" বলিলে আফ্রিকাদের খৃষ্টান যেতানেরা ঠিক সেইরূপ বুঝে। অভিধানের ভিতর যতগুলি অক্ষাংশাংশি থাকিতে পারে, "এসিয়াটিক" শব্দে বৰ্দ্ধমান যুগে ঠিক তাহা বুঝায়।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে চীনাধিপত্য ইয়াকুজিমান হইতে শ্রেষ্ঠজ্ঞানে বহিষ্কার করিবার আঁটন প্রস্তাবিত হয়। সেই উপলক্ষে দক্ষ দরখাস্তের সম্ভার একজন সেনেটার দক্ষতা করেন। তাহাতে "এসিয়াবাসী" নামের অর্থ বৃদ্ধিতে পারি।

শ্রেষ্ঠ চীনা, শ্রেষ্ঠ জাপানী, শ্রেষ্ঠ হিন্দুস্থানী, সকলকেই ইয়াকুজিমান হইতে বহিষ্কার করা আবশ্যক। ইহা মার্কিন দেশের দ্বিতীয় মনো-নীতি।

চীনেরা পিরাট প্রাচীর নির্মাণ করিয়া বিদেশীয়গণকে স্বদেশের বাহিরে রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। হিন্দুরা সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া শ্রেষ্ঠদেশের সঙ্গে ভারতবাসীর আদান-প্রদান অবরুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল। ইয়াকুজিমাও এইরূপ বিদেশীয় বর্জন-নীতি অবলম্বন করিয়াছে। হুনিয়ার প্রত্যেক দেশেই একটা করিয়া "চীনের প্রাচীর" দেখা যায়। সকল জাতিই প্রায় একই ধরণের নীতি অবলম্বন করিয়া বিদেশীয়-গণের সঙ্গে বিদেশীয় লোকজনের সংলাপ বন্ধ করিতে চাহে। আগকাল ইয়াকুজিমা যে-সকল নীতি দেখাইতেছে, প্রাচীন কালে চীনেরা সেই নীতিই দেখাইত, মধ্য যুগে হিন্দুরাও ঠিক সেই নীতিই দেখাইত।

ইয়াকুজিমাতে জাপানীরা ধর্মজ্ঞানহীন দুশ্চরিত্র জাতি। ইহাদের সমাজে পারি-বারিক বন্ধন অতিশয় শিথিল। ইহাদের কথাবল কোন মূল্য নাই। ইহাদের সঙ্গে লেন-দেন করা বড় কঠিন।

জাপানী-সমাজে নাকি বারবান্দিয়ার সংখ্যা অতিশয় অধিক। জুয়াখেলায় অসন্তিও জাপানীদের একটা বিশেষ দোষ।

সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে আজকাল প্রায় ৭৫,০০০ চাকার জাপানী বাস করে। ইহাদের অধিকাংশই ক্যালিফোর্নিয়ার অধিবাসী। জাপানী ছাত্র, অধ্যাপক, পর্যটক, প্রচারক, উচ্চপদস্থ কর্মচারী ইত্যাদি লোকের সংখ্যা বেশী নয়। ক্যালিফোর্নিয়ার শতকরা প্রায় ৯৫ জন জাপানী হয় কৃষক, না-হয় মজুর, না-হয় বাস-দাসী। এটোমানেই ইয়াকুজিদের সঙ্গে জাপানীর বিশেষ বিরোধ।

মার্কিনের নরনারীগণ বলে যে, জাপানীরা নিত্যই অসংযতনে কর্মপ্রদর্শন করে। ইহারা অন্যায় সহ্য করিয়াও কর্ম করিতে পারে। দিনের ভিতর বহু ঘণ্টা খাটিবার জন্য ইহারা সজ্জাবাই প্রস্তুত। এই সকল কারণে যেভাবে ইহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে অসমর্থ। তাহা হইলে আমেরিকার লোক-জনের আর্থিক অবস্থা ঠাঁন হইবার সম্ভাবনা এবং বৈশ্বিক ও সাংসারিক অর্থের অধিক অধিক ঘটিতে বাধ্য। ইহা নিবারণ করিবার জন্য জাপানী বহিষ্কার-নীতি অবলম্বন করা আবশ্যক।

জাপানীরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা জানে না বলিয়া একটা অপবাদ মার্কিন-সমাজে রটিয়াছে। ইহারা একপুত্র যে গৃহে বাস করে সেই গৃহে ভবিষ্যতে কোন খেতাব আদিত চাহে না। এমন-কি সেই মহিলা হইতেও খেতাবে বা পরিচয় পড়ে। কালে পাড়াটা খাটি জাপানীটোলায় পরিণত হয়। ইহা আমেরিকার পক্ষে গৌরবজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

জাপানী কৃষকদিগের একটা দোষ সর্বত্র প্রচারিত। ইহারা নাকি ভূমি-কর্ষণ সম্বন্ধে

প্রথম প্রথম বড় অমনোযোগী থাকে। তারপর কলে জুনির উৎসাহদানী শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এই সবহার খেতাব মানিকেরা জুনি বেচিয়া ফেলে। তখন জাপানীরা টকা ফর করিয়া লয় এবং মনোযোগের সহিত জুনির উন্নতিসাধন করে।

ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশের রাষ্ট্রপতি জাফা-মেন্টো নগরে। ইহার অতি সরিকটে ফোরিং নগর। কৃষিকার্যের জন্য এই

অঞ্চল সুবিধাকৃত। এখানে জাপানীদের সংখ্যাও খুব বেশী। জাপানী-বিষেবও এই অঞ্চলে অতি ঘোরতর আকারে দেখা দিরাছে।

পরজাতি-বিষেব কাহাকে বলে, তাহা বুঝিবার জন্য ইরাক্তিয়ানের ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশে আসি আবশ্যক। ইরাক্তিদের নিগ্রো-বিষেবও বোধ হয় এতটা তীব্র নয়।

ক্রীষনকুমার সরকার।

মহর্ষির কথা

একবার যখন মহর্ষিদেব একাকী বোলপুর শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছিলেন, তখন আমার পরলোকগত বন্ধু আনন্দ* ঘোষন বহু ও আমি পরামর্শ করিলাম যে মহর্ষিদেবকে সংবার না দিয়া শান্তি নিকেতনে গিয়া উপস্থিত হইব। তদনুসারে একদিন প্রাতঃকালের গাড়ীতে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ১০টার পরে শান্তি নিকেতনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। চাকরের হাতে আমাদের নাম উপরে প্রেরণ করিলে দেখিতে পাইলাম যে মহর্ষি সিঁড়ির উপরের বায়োগার আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমাদিগকে উপরে বাইবার জন্য আদেশ করিলেন। আমরা উপরে উঠিলে বলিলেন—“আমি খেতে ব্যক্তি, এস তোমরাও আমার সঙ্গে খেতে বসো।” আমি বলিলাম—“খাবার ত একজনের মত হয়েচে, আপনি আমার কক্ষ, আমরা একটু অপেক্ষা করি, পরে খাব।” তখন মহর্ষি

হাসিয়া বলিলেন—“তোমরা কি মনে কর একজনের মতই খাবার প্রস্তুত হয়েচে? এস না, বসে দেখ না, কিছুই অস্তাব হবে না।” আমরা গিয়া তাঁর সঙ্গে আহায়ে বসিলাম। তিন জনে বেশ আহাির চলিল, কিছুই অস্তাব হইল না। পরে ভৃত্যদের মুখে শুনিলাম যে, কে কখন আসে তাহা স্থির না থাকাতো প্রতিদিনই দুই একজনের মত অধিক রান্না হয়।

আহািরান্তে মহর্ষি মুখ হাত মুঠিতেছেন, চিন্তামগ্নে আমরা দুজনে তাঁর বসিবার ঘরে গেলাম। গিরাই দেখি যে ভৃত্যক-বিভাগ বিষয়ে একখানি নব-প্রকাশিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাহার টেবিলের উপরে দৃষ্টিগোচর। ঐ গ্রন্থখানির প্রসংগে আমরা সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম। গ্রন্থখানি দেখিয়া আনন্দ ঘোষন বাবু বলিলেন—এই যইখানার অনেক প্রসংগে কাগজে পড়েছি, মহর্ষি কি

এখানো আনায়ে পড়ছেন ?”, আমি বলিলাম—“তাই ত মনে হয় কারণ বৈদ্যর ভিতর হাড়ের কাগজ-কাটা রয়েছে, দেখলে মনে হয় কাটছেন ও পড়ছেন।” ইতিমধ্যে মহর্ষি আসিয়া উপস্থিত; সে বৈদ্যনা আনন্দমোহন বাবুর হাতে দেখিয়া বলিলেন—“কি আনন্দমোহন, বৈদ্যনা কি আগে দেখেছে ?”

আনন্দমোহন।—না দেখিনি, তবে কাগজে অনেক প্রশংসা শুনেছি। এখানো কি আপনি পড়ছেন ?

মহর্ষি। হাঁ, আমিও প্রশংসা শুনে আনিয়ে পড়ছি।

আনন্দমোহন। (বিস্ময়াবিষ্টভাবে) আপনি Geology পড়ছেন ?

মহর্ষি। (হাসিয়া) সে কি আনন্দমোহন জ্ঞান করে দ্বিভাষা করছে যে! Geology কি অগাঠা? তোররা কি জ্ঞান না Geology আমার বহুদিনের পাঠ্য বিষয়; Geology বিষয়ে আমি একটা authority বললে হয়; বহু বৎসর পড়াতে পর্ত্তে ঘুরেছি ও Geology অহুণীলন করেছে।”

মহর্ষি যখন তাঁর পর্ত্ত জ্ঞানের ও Geology পাঠের কথা বলিতেছেন তখন আমি আনন্দমোহন বাবুর কানে কানে বলিলাম,—“আপনি কি মহর্ষির কস্তা স্বর্ণকুমারী দেবীর “পৃথিবী” নামক গ্রন্থের জুড়িকা পড়েন নাই? তাতে দেখবেন স্বর্ণকুমারী বলেছেন যে মহর্ষির ক্রোড়ে বসেই তিনি জুত-খ-শিকাকে ভালবাসতে শিখেছেন।”

উভয়দলের মহর্ষি হাসিয়া আনন্দমোহন বাবুকে বলিলেন, “কথাটা কি বুকলে

না? আমার বাবার সময় হক্কে কি না, তাই মনের জাহাজে ওত মাল বাধাই নিতে পারি তার চেটা করছি।”

মহর্ষির সেই হাসি ও সেই উজ্জ্বল কথনো আমি ভুলিব না। এই বার্ত্তিক্যে সেই মনের জাহাজ-বাধাইয়ের কথা মনে হয় এবং আমাকে জ্ঞানাগোচনাতে উৎসাহিত করে।

“পরে রাত্রিকালের আহারের পর আমরা মহর্ষির বসবার ঘরে গিয়া তাঁহার সহিত নানা আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম। কথা কহিতে কহিতে রাত্রি যখন সাড়ে ময়টো বাজিল তখন মহর্ষি আমাদেরকে বলিলেন—“আমি এখন একলা থাকব, তোমরা গিরে শয়ন কর।” আমরা নামিয়া আসিলাম, এবং শয়নগৃহে লুপাতে গিয়া নানা বিষয়ে কথা কহিতে লাগিলাম। রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিল, আমরা শুনিতেছি যে উপরকার বারান্ডার মহর্ষি বেড়াইতেছেন। শুনিতে শুনিতে আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রি তিনটার সময় আমার নিদ্রাত্তঙ্গ হইল, চাহিয়া দেখি সেই পূর্ণিমার রাত্রে শান্তিনিকেতনের বাগান মনোহর ঐ ধারণ করিয়াছে। বাগানে বেড়াইবার জন্য আমি আনন্দমোহন বাবুকে জাগাইয়া তুলিলাম। বলিলাম, “উঠুন উঠুন, চলুন একবার পূর্ণিমার রাত্রে বাগানে বেড়াই।”

আমরা দুজনে উঠিয়া বহু হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, মহর্ষিদেব তখনও উপরের বারান্ডার বেড়াইতেছেন। আমি আনন্দমোহন বাবুকে বলিলাম, “মহর্ষির ধ্যান-পর্যবেচনার বিষয়ে যে শুনিয়াছেন, ঐ

ভাঁহার দৃষ্টান্ত দেখুন। এই পূর্ণিমার রাত্রে আনন্দ-সাগরেও মগ্ন আছেন।”

একবার মহর্ষিদের দার্জিলিং পাহাড়ে বাস করিতেছিলেন। তখন আমি মধ্যে মধ্যে ভাঁহার নিকটে ঘাঁটতাম। একদিন আমি গিয়া বসিয়াছি, মহর্ষি জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি গতবারের ‘ভারতী’ পড়েছ ?” আমি বলিলাম—“না, এখনও পড়িনি”। তখন মহর্ষি ভাঁহার টেবিল হইতে একখানা “ভারতী” তুলিয়া লইয়া আমার কাছে দিয়া বলিলেন—“এই দেখ গত বারের ভারতী।” আমি পাতাগুলি উন্টাইয়া দেখি, মহর্ষি প্রবন্ধগুলির পাশে পাশে নিজের হাতে নিজের অভিপ্রায় লিখিয়াছেন। ‘বর্ণকুমারীর লিখিত একটি প্রবন্ধের পার্শ্বে লিখিয়াছেন, “বর্ণ, তোমার হস্তে পুষ্পবৃষ্টি হউক।” কোনও প্রবন্ধের পার্শ্বে লিখিয়াছেন, “বালকের হৃদয় মুক্তি”। কোনও প্রবন্ধের পার্শ্বে লিখিয়াছেন, “কুচিন্দ্র সঙ্গত নহে” ইত্যাদি। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে নিজ পরিবারের ব্যক্তিদের

প্রবন্ধ বিষয়েই, একজন মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। আমাকে বিষয়টি দেখিয়া মহর্ষি বলিলেন—“আমার কাছে ছুখানা ‘ভারতী’ আছে—একখানা আমার কাছে রাপি; আর একখানাতে আমার পরিবারের লোকদের লেখা সবক্কে আমার মতামত প্রকাশ করে ফেরত পাঠাই; সেখানা তাদের কাছে পাঠান হয়।” আমি বলিলাম, “ওঃ, আমি এতদিনের পর বুঝতে পারলাম কেন আপনার সন্তানেরা সাহিত্য চর্চাতে দেশের অগ্রাণী,—আপনি তার মূলে। বর্ণকুমারীর প্রতিভার পশ্চাতে যে আপনি তা বুঝতে পারছি। “বর্ণ। তোমার হস্তে পুষ্পবৃষ্টি হউক” যে বলেছেন, এ কি সামান্য কথা।” তুমি মহর্ষি হাসিয়া বলিলেন—“বর্ণের লেখা ত তুমি পড়েছ, তার লেখার শক্তি দেখে তোমার কি আশ্চর্য্য বোধ হয় না ?”

আমি বলিলাম, “তাতে সন্দেহ কি ? তার প্রতিভা দেখে আমিও চমৎকৃত !”

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

স্বেচ্ছাচারী

(উপজ্ঞাস)

প্রথম অধ্যায়

১

পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান হওয়া অনেক রকমেই অপ্রার্থনীয়। বাপ-মা এবং ছেলে—উভয়ের পক্ষ হইতেই এ কথা

বলা চলে। কাস্তিকচন্দ্রের জন্মের মাসছয়েক পরে অন্নপ্রাশনের সময় পিতা-মাতার মধ্যে ভাঁহার নাম-করণ লইয়াই মত একটা মতভেদ ঘটয়া গেল। পিতা নাম রাখিলেন, হরিদাস; মাতা রাখিলেন, কাস্তিকচন্দ্র।

এবং কালক্রমে তাহার মাতার জোর-
অধঃপতি ও কারাগারে পুত্রের কার্তিকচন্দ্র
নামই বাহাল রহিয়া গেল। পিতা যদিও
আশনার পিতৃ-স্বৰ্গ জাহির করিবার জন্য
পুত্রকে মাঝে মাঝে হরিদাস বলিয়াই
ডাকিতেন, তথাপি কোন দিক হইতে
কোনরূপ সাড়া না পাইয়া তিনিও শেষে
বিরক্ত হইয়া তাহাকে তাহার মাতৃদত্ত নামেই
ডাকিতে আরম্ভ করিলেন।

বিরোধের মধ্যেই বাহার জন্ম, তাহার
পুত্রিও সেই বিরোধের মধ্যেই হইতে লাগিল।
কার্তিকের মাতার উক্ত নাম রাখিবার মূনা
একর কারণের মধ্যে একটি কারণ এই
যে কার্তিকচন্দ্র দেখিতে ঠিক কার্তিকেরই
মত। অথচ এই পুত্রের মূম রাখা হইবে
কি না, হরিদাস! হর! ছি, ও যে
চাকর-বাকরদের নাম! কার্তিক কি
বাবুদের বাড়ী তামাক লাগিবে, না, তাত
রাখিবে যে তাহাকে হরি নামে ডাকিতে
হইবে? ছি, কার্তিকের বাপের কি কিছুমাত্র
বিবেচনা নাই! যে ছেলে পরে হাকিম-
সদরলা হইবে, তাহার নাম হইবে কি না,
হরিদাস! বাবুন যেন কি!

কার্তিকের পিতা শিবচন্দ্র ছারদহ
একজন সংকুলীন অথচ দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
গ্রামের জমিদার সুখোপাধ্যায়-গোষ্ঠীর শৈতক
টোলার বৃত্তি ও ব্রহ্মোত্তরের উপর নির্ভর
করিয়া এবং ছুই-এক বর শিব্য-সেবকের
বার্ষিকের আয়ে তাহাক সংসার-যাত্রা নির্বাহ
হয়। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও পূজা-পাঠেই তাহার
অধিকাংশ সময় কাটিয়া থাকে। তথাপি
তিনি তাহার একমাত্র পুত্রের ভবিষ্যৎ

উন্নতির জন্য গ্রাম এটেন্স স্কুলে তাহাকে
ভর্তি করিয়া না দিয়া স্বয়ংই তাহার অধ্যয়নাদির
ভার লইলেন। ইহাও কার্তিকচন্দ্রের মাতার
সহিত তাহার মতবৈধের আর একটি
কারণ।

এইরূপ বিরোধের মধ্যে বাহার জন্ম ও
বৃদ্ধি, বৃদ্ধিও যে তাহার প্রথম হইতেই
একটু 'বিরোধী' রকমের হইবে, ইহা অত্যন্ত
স্বাভাবিক। সেইজন্য কার্তিকচন্দ্রের প্রকৃতিতে
প্রথম হইতেই কতকগুলি পরস্পর-বিরোধী
গুণের বিকাশ দেখা দিল। সে তাহার
পিতার টোলার ছাত্রদের সহিত সম্বন্ধ ও
তীক্ষ্ণ মেধার সহিত অধ্যয়নাদি করিত বাটে,
তথাপি সে তাগাদের দলে প্রথম হইতেই
একটি মুষ্টিবীন বিশ্লেষক ভাবে বিরাজিত
ছিল। কিন্তু তাহার মুখের পরম গুণ্ডীর
ভাব দেখিয়া কেহ তাহাকে পর্যাণ্ড
পরিমাণে শাসন করিতেও পারিত না।
উপরন্তু অধ্যাপকের একমাত্র সন্তান বলিয়া
সে অনেক গুরুতর অপরাধ করিয়াও মার্জনা
পাইত। বিশেষতঃ তাহার মাতাঠাকুরাণীর
ভয়ে ছাত্রদিগকে কার্তিকের বিষয়ে অনেক
খানি সচুঁত থাকিতে চাইত।

টোলার ছাত্র সর্দানন্দর ব্যাকরণের
আন্ত পরীক্ষার সময় অতি সরিকট। সে
রাত্রি জাগিয়া ব্যাকরণের স্বয়ং কঠিন
করিয়াছে এবং অনেক রাত্রে প্রাণীপ নিবাহিয়া
শয়ন করিয়া প্রভাতে উঠিয়াই তাহার
ব্যাকরণখানির জন্য হাতড়াইতেছে,—ইহা,
প্রাতঃকৃত্য সাধিয়া আশিয়াই পড়িতে বলিবে।
কিন্তু দেখা গেল, তাহার মাধার শিরের
পুস্তকরাশি বিশদ্যস্ত এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত;

সকলোপরি সেই অতি-বড়ের মূর্ত্যোৎসবখানি যে কোথাও গিয়াছে, কেহই তাহা বলিতে পারে না।

কে করিল? কে করিল? আর কে?—
কান্তিকচন্দ্র। কিন্তু সে কোথাও, তাহারও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। পিতা বিরক্ত হইয়া বিস্তর অহুসফানে তাহাকে নিতাই বোঝের দাওয়া হইতে ধরিয়া আনিয়া প্রশ্ন করিলেন, “কেন, তুমি এ কাজ করলে?” কান্তিকচন্দ্র পরম গভীরভাবে বলিল, “সামান্য জাতি পড়ে সর্ব দাবার মাথা খারাপ হয়ে বাবে; পরীক্ষার ফল চলে, তাই ওর বইখানা সরিয়ে রেখেছি।” পিতা জুড় হইয়া বলিলেন, “শীঘ্র এনে দাও! আর যদি এরকম কর, তা হলে তোমার বিশেষ শাস্তি দেব।” কান্তিকচন্দ্র নির্ধিকার চিত্তে সর্বোচ্চ মনোযোগে একটা ভাঙ্গা বাস হইতে সেই আর্থিক পুস্তকখানি বাহির করিয়া দিয়া বলিল, “সর্বদাদা, সামান্য গ্যাজেট-গ্যাজেট করে না, বলছি, আমার শুদ্ধ মাথা খারাপ হয়ে বাবে।” সর্বানন্দ হাসিয়া বলিল, “তুমিও এখন পরীক্ষা দিতে বাবে, তখন এমনি করেই গ্যাজেট গ্যাজেট করবে।” কান্তিকচন্দ্র অত্যন্ত অবজ্ঞা-ভরে একটা অস্বস্ত শব্দ করিয়া চলিয়া গেল।

ইহা সর্ববালীসম্মত সত্য যে নীতকালেই পরম কামা-কাপড় গায়ে দিতে হয়, কিন্তু আমাদের কান্তিকের নিকট সে সত্য একেবারে বন্ধার পুঞ্জের জারিই মিথ্যা। বৈশাখের রৌদ্রে সকলে এখন বাম্বিয়া অস্থির হইতেছে, তখনই তাহার প্রাতঃক্রমের সময়। সে মধ্যাহ্নে আহাৰাদি সারিয়া সাতুলার

হইতে প্রাপ্ত লাল মোড়া ও গরম কোটে শোভিত হইয়া ছত্রহীন মস্তকে ঐ সময় সমস্ত গ্রামটা এদক্ষিণ করিয়া আসে। কেহ আপত্তি করিলে সে বলে, “সবাই যা করবে, তাই যে করতে হবে, এর কি মানে? সব কিনিবেরই যখন দুটো দিক আছে, তখন সব কাজেরই বা-দুটো দিক না থাকবে কেন?” সে যে একজন নৈসর্গিকের পুত্র, এ কথা নানাপ্রকারে প্রমাণ করিয়া কান্তিকচন্দ্র এই অল্পবয়সেই জ্ঞানের সুপ্তিমান ব্যক্তিকার-বস্তুপ্ত গুরিগা বেড়াইত। এবং তাহার অকালপক মূখের নিকট কাহারও কোনরূপ আপত্তি টিকিত না বলিয়া তাহার মাতা মনোমোহন ঠাকুরাণী প্রতিবেশিনীদিগকে মাঝে মাঝে গর্জিত হাজে বলিতেন, “বামুন আমার এমন ছেলেকে টোলে ভর্তি করতে চায়!” তাহার কথার কেহ যদি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া কিছু বলিত, অমনি তিনি বলিতেন, “ছেলে যদি আমার বাঁচে, তাহলে ও নিশ্চয় একটা হাকিম টাকিম হবেন। তবে যে ওর শরীর!” অবশ্য কান্তিকচন্দ্রের ভয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রতিবেশিনীদিগের সহিত রহত তাহার মাতার আত্মরিক অমিল থাকিতে পারে,—কারণ, কান্তিকচন্দ্রের বিবাহ নব্বয় গৌর কান্তি,—তথাপি মনোমোহন দেবীর মূখের সম্মুখে সকলেই তাহার কথার সার দিয়া বাইত।

কান্তিকচন্দ্রের এইরূপ বহুবিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও একটা বিশেষ দোষ ছিল এই যে সে পড়াশুনার অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। ইহাইই মধ্যে সে ব্যাকরণ ও কাব্যে তাহার পিতার অনেক বর্জ্যমান ছাত্রকেও

পরাজিত করিতেছিল; এবং জায় শাস্ত্রেরও
হুই-একটা বুকনি তাহার অবিরন্ত ছিল না।

অপরাজিত দেবারতনের নাট মন্দিরে
বসিয়া অধ্যাপক শিবচন্দ্র তাঁহার কতকগুলি
ছাত্রের সহিত জায়ের “অভাব” বস্ত্র সম্বন্ধে
আলোচনা করিতেছিলেন। একজন বুদ্ধিমান
ছাত্র, নাম ব্রহ্মপদ, অধ্যাপকের সহিত ঐ
বিষয়ে মূহুর্তাবে তর্ক করিতেছিল। নিকটে
বসিয়া কার্তিকচন্দ্র একটা পারাবন্তের
শব্দদেশে যুগ্ম ও গন্দ্যদেশে বিচিত্র বর্ণের
কিডা গড়াইতে ব্যস্ত ছিল। অধ্যাপক
যখন ছাত্রের তর্কে কিঞ্চিৎ উচ্চভাবে উত্তর
প্রত্যুত্তর করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়
কার্তিকচন্দ্র হঠাৎ পারাবতটিকে তুলিয়া
লইয়া একেবারে অধ্যাপক ও ছাত্রগণের
মধ্যস্থলে ফেলিয়া দিয়া সশব্দে হাসিয়া
উঠিল। পিতা জুঁক হইয়া তাহার দিকে
ফিরিবামাত্র সে গম্ভীর স্বরে বলিল,
“আপনি অভাব বস্ত্র বোঝাতে পারছেন না,
আমি বুঝিতে দিচ্ছি। ব্রহ্মনাথ, তোমার
বুদ্ধি নেই। এই অভাব বস্ত্র দরপাই
তুমি বুঝতে পারছ না। অতএব অভাব
বস্ত্রের অস্তিত্ব স্বীকার কর কি না? এই
দেখ, এই রত্ন (পল্লীটার নাম) কেমন
অভাব বস্ত্র বোঝে। ও বেশ বুকেছিল যে
ওর পায়ে যুগ্মের অভাব আছে, তাই
এতক্ষণ চুপ করে তাই পরছিল, তোমার
মস্ত তর্ক করেনি। কিন্তু তুমি এমন
বোকা, তোমার বুদ্ধি নেই, এই অভাব
বস্ত্রটা পর্য্যন্তও তুমি জান না।”

ছাত্রেরা অনেক যুঁক ফিরাইয়া হাত
সম্মুখের চোঁটা করিতে লাগিল, কিন্তু

ব্রহ্মপদ জুঁক হইয়া বলিল, “জায়ের মশায়,
চিরদিন কি আমাদের এইরকম অভ্যাচার
সহ্যে হবে?” অধ্যাপক স্বয়ং বিরক্ত
হইয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রের এই অকৃত
যুক্তি শুনিয়া তিনিও না হাসিয়া থাকিতে
পারিলেন না। ব্রহ্মপদ জুঁক হইয়া বসিয়া
রহিল। কার্তিকচন্দ্র তখন তাহার পৃষ্ঠ-
দেশে যুঁক একটা চপেটাঘাত করিয়া বলিল,
“এঃ, তোমার অভাব বস্ত্রতেই পেরে বসেছে
—বুদ্ধির অভাবের সঙ্গে হাসিরও অভাব
হয়েছে—হাসতে পর্য্যন্ত ভুলে গেছে! হিঃ”

কার্তিকচন্দ্র হাসিতে হাসিতে পারাবত-
টিকে লইয়া প্রস্থান করিল। অধ্যাপক
তখন নানা কথাই ছাড়ে পাশ করিয়া
পুনরায় অধ্যাপনার মন দিলেন।

শিবরাত্রীপুত্রের কালিকামোহন যুগ্ম-
পাখারের বহন বাহাই হুইক, তাঁহার ওক
গম্ভীর চাপ-চপনের জন্ত কেহই তাঁহার বরস
অগ্রদূত করিতে সাহস করিত না।
বসিয়াই গম্ভীর চাপের সমস্ত খুঁটিনাটিই
স্বত্ত্বের তিমি পালন করিয়া চলিতেন।
প্রাতঃকৃত্য-সমাপনের সময় সেই ঘেমন
বহু বৎসর পূর্বেও জনচৌকিতে বসিয়াই
পাইকদের ডাকিয়া নিকটে আনিতে,
আজও তাঁহার সে চাপের পরিবর্তন ঘটে
নাই। সেট বোলা সেড়টার পর কাছারি
হইতে উঠিয়া হুইটা পরজিদি মিনিটের
সময় আহারে উপবেশন আজিও অব্যাহত
ভাবে চলিতেছে। নিদ্রার সময়, উত্তান
পরিদর্শনের সময়, পিতামহের আমলের

সেই হলদে রঙের মোটা লাঠিটি লইয়া ভ্রমণের সময়—এ সব কিছুই একটু নড়চড় হয় নাই। এমন কি কেহ কেহ বলে, বাবু তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর প্রথম পুণ্যাহের দিনে যে বস্ত্রখানি যেভাবে পরিধান করিয়াছিলেন, আজও সেইরূপ বস্ত্র সেই ভাবে সেই তাঁতিদের নিকট চটেতেই ক্রম করিয়া পরিধান করিয়া থাকেন। অধিক কি, এট চাপ বজায় রাখিবার জন্য তিনি সহস্রান্তে গমনাগমনও একপ্রকার কাড়িয়া টিরাছিলেন।

তাঁহার ভয়ে বায় ও ভাগশিশু একত্র জলপান করিত কি না, এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই, তবে অনেক নরবায় অর্থাৎ ভোজপুরী পাহাল-বানকে তিনি পুরিতেন; এবং বহু দরিদ্র আত্মীয়-অনাত্মীয় শ্রেণীর লোক তাঁহার আশ্রয়ে পালিত হইত। তাঁহার প্রাসাদ ভূলা প্রকাণ্ড অট্টালিকা বহু লোক-লব্ধর ও জীব-জন্তুর কলরবে মুগ্ধরিত থাকিত। অশ্ব-শালীর অশ্ব, গোশালার গাণী, অতিথিশালার অতিথি, কুস্তুর শিখরে পারাবত, কড়ি বরগার ফুরে ফুরে চড়েই ভালচু,—পাকশালার পাচকের কলরব, দাস-দাসী-গণের বচসা, অন্তঃপুরে নিখবার দল—তাঁহার সংসারে কিছুই অভাব ছিল না। তথাপি কোন কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বলিতেন যে কালিকাবাসু পুত্র-সন্তান-অভাবে অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত স্ত্রিয়মাণ ছিলেন। অবশ্য এ কথা বাহিরের কেহ বুঝিতে পারিত না। কারণ কালিকাবাসু একমাত্র কস্তা জীবিতী শৈলজাহ্নবীর অন্তঃস্থ বাহ্যতঃ

তাঁহার পুত্রের অভাৱ পূর্ণ করিয়া, বরং তাঁহার অধিক হইয়াই, বিরাজ করিতেছিলেন।

এই শৈলজাহ্নবীর যখন মাত্র দেড় বৎসরের, তখন ইঁহার নামে একটা বড় মোজা ক্রয় করা হয় এবং এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বহু পত্নি, দরপত্নি, সেপত্নি মাহাল গিতা ইঁহার নামে ক্রয় করিয়াছেন। এমন কি ইঁহার সমস্ত বিষয়াদি তত্ত্বাবধানের জন্য পৃথক সেরেস্তা গোমস্তা কারকুন পাটক নিযুক্ত করিয়া কালিকামোহন অরং “গার্জেন” নাম রাখার করতঃ ইঁহার বিষয়-কর্ম চালাইতেছিলেন। কস্তার নামে পৃথক “বিবহ-আশর” করা তাঁহার অপত্য ঘরের যতখানি নিবর্শন, তদপেক্ষা শিশু কস্তাকে ইতিমধ্যেই জমিদারী করিয়া দেওয়ার একটা অহঙ্কারকেই বিশেষভাবে প্রকাশিত করিয়াছিল। শৈলজাহ্নবীর যদিও এখনও অষ্টম বর্ষ অতিক্রম করেন নাই, তথাপি ইঁহারই মধ্যে তাঁহার নাম বড় বড় মকদ্দমার বাদী অথবা প্রতিবাদীরূপে অগৎ সমক্ষে প্রচুরিত হইতেছিল। এমন কি ইঁহার নামের একটা মকদ্দমা প্রীতি কাউন্সিল পর্য্যন্ত গিয়া একটা “লিডং” কেসের মুষ্টিতে বর্জ্জহেন অঙ্করে I. L. R. এর অঙ্ক শোভিত করিয়াছে। যদিও উক্ত শৈলজাহ্নবীর উক্ত মকদ্দমার পরাজিত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহার পিতার পিতৃপিতামহগণের প্রসিদ্ধ নামকে স্মরণ শেতবীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া কালিকা-বাসু জমিদারী প্রভাগপের হৃদয়ে জলাতঙ্কের জ্বাঘ বিরাজ করিতেছিলেন। এরূপ কস্তার

শিতা হইয়া কালিকাবাবু ক্রোধানকে দৃষ্টই মনে করিতেছিলেন।

এহেন কস্তার বিবাহ দিতে হইলে অনেক চিন্তা, অনেকখানি সঙ্কটের আয়োজন, শৈলজাহ্নবীর পিতাও একথা বিশেষভাবে বুঝিতেন। অবশ্য একপ অবস্থায় সম্বন্ধ বা প্রস্তাবেই, অত্যাধিক কখনই হইতে পারে না, কারণ শৈলজা ধনী পিতার ধনী সন্তান। বহু দিক হইতে নানা প্রকার প্রার্থনীয়-অপ্রার্থনীয় সম্বন্ধ ইতিমধ্যেই ফাঁকে ফাঁকে আসিয়া উপস্থিত হইতেছিল। কিন্তু শিতা কালিকাবাবু মোহনের এ পর্যন্ত কোনটাই মনঃপূত হয় নাই। কালিকামোহনের বৃদ্ধা মাতা এখনও জীবিতা আছেন; এবং তিনিই গোষ্ঠী-দানে পুণ্য সঞ্চয়ের লোভে এখনও ৮ কাষ্টধামে যাওয়া বাস করিতে পারেন নাই। তবে ব্যাপার বেক্রম দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে গৌরী ত দূরের কথা, কস্তকা-দানও সম্ভবজনক হইয়া উঠিয়াছে।

শৈলজার বিবাহ-বিষয়ে ইনিও ইহার পুত্রের চিন্তার অংশ-ভাগিনী হইয়াছিলেন। কারণ বিবাহ দিয়া এই একমাত্র কস্তাকে একেবারে পর করিয়া দিতে কালিকামোহনও যেমন অনিচ্ছুক, তাঁহার মাতা জগদবা দেবীও তজ্জন। কিন্তু শৈলজাহ্নবীর মাতা অর্থাৎ জমিদারী সেবেস্তার বাহার নাম “বোমারী” লেখা হইয়া থাকে, তাঁহার ইচ্ছা কিঞ্চিৎ অন্তরূপ ছিল বলিয়াই প্রকাশ। শুনা যায়, তিনি না কি ঘরদামাই করার একান্ত বিরোধী। তিনি তাঁহার কোন কোন অন্তরঙ্গের নিকট মনের ভাব

প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যদি বিবাহই দিতে হয়, তাহা হইলে একেবারে দান করিয়া ফেলাই উচিত। কস্তার পরিবর্তে একটা পুত্র লাভ করা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ তাহাতে কস্তাই স্বামীর স্থান অধিকার করিয়া দাম্পত্য জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি হারাটরা ফেলে। জ্ঞানলোক যদি একেবারে স্বামীতে মিশিয়া যাউত না পারে, তাহা হইলে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্যই নিফল হইয়া যায়। অবশ্য তাঁহার মত যে গৃহের বহু মত বলিয়াই যথাবিধি উপেক্ষিত হইয়াছিল, একথা বলা বাহুল্য মাত্র।

একমাত্র কস্তার উপর যে মাতার এতখানি ঘেঁহীনতা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই মাতা যে তাঁহার স্বস্ত-ঠাকুবাণী ও স্বামী মহাপ্রবের নিকট টহার লজ্জা ত্রিফিং লাঙ্ঘিত হইবেন, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত; তথাপি ইঁহার চরিত্রি বে ইনি স্বীয় মতের এক চুলও পরিবর্তন করিতে পারেন নাই। স্ত্রী-বুদ্ধি (অর্থাৎ পত্নীর বুদ্ধি) চিরদিনই প্রশংসার! শাস্ত্র কি বিখ্যাত হয়!

জমিদার মহারাজ ও তাঁহার মাতা এইভাবে চিন্তাবুদ্ধি হইয়া কালাতীপাত করিতেছেন, এমন সময় একদিন কালিকা-মোহনের দৃষ্টি একস্মাৎ কাষ্টিকচন্দ্রের উপর পতিত হইল।

কাষ্টিকচন্দ্র তাহার মধ্যাহ্ন-ভ্রমণের সময় কখনও কখনও জমিদারী কাছারী, এমন কি জমিদারী প্রাসাদের অন্তঃপুর পর্যন্ত স্তম্ভাগমন করিত। তাহার অসুত

চাল-চলন ও বেশভূষা সদয় গোমস্তা হইতে পাইক দরওয়ান ঝাড়ুদার ফরাশ পর্য্যন্ত সকলের নিকটই পরিচিত ছিল; এমন কি অস্ত্রপুত্রের দান-দানী, পাটিকা ও অস্ত্রাজ্ঞ "দীনাঃপমাস্ত্রিতা", বিধবাগণের নিকটও সে জ্ঞানবন্ত মল্লপথে পুরুষ-রক্ত বলিয়া সমাদৃত, পরিচিত এবং সৰ্ব্বদোষে উপেক্ষিত হইত। তবে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সে বাবু মহারাজ অথবা তাঁতার মাতা "বুড়ী রাণীমার" মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কিন্তু জমিদারী কাছারীর দারোগার পাবাবস্ত-পের সহিত ইহার পরিচয় ঘনিষ্ঠতম ছিল। এবং সেই সামাজ্য কারণ হইতে সহসা কাষ্টিকচন্দ্র একদিন "বাবু মহারাজের" রাজকীয় 'দুষ্টি' আকর্ষণ করিল।

দ্বান জমিদারী কাছারীর সন্মুখস্থ একান্ত নাটমন্দির—অর্থাৎ যেখানে নানা উপলক্ষে বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ সার্ব্ব দ্বাদশবার দ্বাত্রা, নাট, গান হইয়া থাকে। কাল মধ্যাহ্ন এবং পাত্রে আশ্বাহের কাষ্টিকচন্দ্র ও কস্তকজলি বাগী, টাঙাল প্রভৃতি মিত্র শ্রেণীর লোক। উপলক্ষ বিবিধ,— কাষ্টিকচন্দ্রের পক্ষে "মুক্" নামক এক প্রকার পারাবস্ত-বংশের উপর অভিযাত্রা এবং তাহাদের বংশধরগণের দুই-একটিকে পিনাল কোর্ডের এণ্ডাংক্সন বারাহুধারী কার্যের দ্বারা বে-আইনি স্থানান্তর-করণ, এবং বাগীগণের পক্ষে জমিদার মহারাজের নিকট হইতে পথ-করের দার হইতে মুক্তি লাভ করা।

কাষ্টিকচন্দ্র একজন উচ্চ শ্রেণীর

লোককে আশ্রয় করিল, "রামু, এই বৈথানা চেষ্টে ধর ত, আমি উঠব।"

রামু ওরফে দাখা বাগী ক্রীণ বসে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "দাদাঠাকুর, বাবু মহারাজের সামনে কেমন করে এ কাজ করব?"

কাষ্টিকচন্দ্র একবার অবজ্ঞার দৃষ্টিতে কাছারীর কক্ষের দিকে চাহিয়া বলিল, "কেউ কিছু বলবে না, কুমি ধর।"

রামু তখন কাতর হইয়া বলিল, "দাদা-ঠাকুর, আমরা দরবার করতে এসেছি, এখন যদি দেওয়ানজী কোন কারণে বিরক্ত হন, তা হলেই সৰ্ব্বনাশ!"

কাষ্টিকচন্দ্র বিম্বিত হইয়া বলিল, "দরবার! এসে আবার কি? দরবার ত' নবাব-বাদশাহা করতেন, তোমরা তা কি করে করবে?"

চামু কহিল, "আজ্ঞে, মিছিমিছি আমাদের ওপর পথ-কর চাপানো হচ্ছে, সেই কথা মহারাজের কাছে নিবেদন পেতে এসেছি।"

কাষ্টিক কহিল, "তা করলে কি হবে?"

এই প্রশ্নে সেই বিধর জোক-হস্ত ব্যক্তিগণের মধ্যেও একটা অন্তুট হাসির রেখা দেখা গেল। রামু জাবিল, এই কাষ্টিকচন্দ্রকে দিগ্বাই হরত তাহাদের এ বিষয়ে কিছু উপকার হইতে পারে। মস্তমান ব্যক্তির কৃপাবলম্বনের দ্বারা রামচন্দ্র ইহাকেই অবলম্বন করিতে সম্মত করিয়া বলিল, "দাদাঠাকুর, আপনি যদি আমাদের চরে চুকখা বলে দাও, তাহলে আমি নিজেই কবিতোর ধরে দেব।"

কাণ্ডিক কহিল, “কাকের দাঁক বসতে হবে, বল, আমি এখনই বলছি।”

রামু কহিল, “দেওয়ানজীকে আর মহারাজকে বলতে হবে—”

কাণ্ডিক কহিল, “মহারাজ।

কে?”

রামু কহিল, “আজ্ঞে, বাবু মহারাজ—”

কাণ্ডিক কহিল, “ও, বুঝেছি। আজ্ঞে, কি বলতে হবে?”

রামু কহিল, “বলবেন যে এরা গরীব, এদের উপর আবার পথ-কর বসানো কেন? আমাদের যে চাকরান জমি আছে, তার ক্ষত ত আমরা তাঁবেদার হামেহাল হাজির আছি। রাত-বিরেত মানিয়ে, এখনই ডাক পড়ে, হুজুরে হাজির হয়ে কাজ-করে দি। এর ওপরও যদি আবার খাজনা দিতে হয়, তা হলে আমরা গাড়াই কোথা? এই সব কথা একটু গুছিয়ে কাকুতি মিনতি করে যদি বলতে পার, তাহলে দাদাঠাকুর, আমরা আপনাকে কেনা হয়ে থাকব।”

কাণ্ডিকচন্দ্র আর বিকসিত না করিয়া যেখানে শিবরামপুরের জমিদার কালিকা-মোহন ও তাঁহার প্রবল-প্রতাপ দেওয়ান দুর্গাপ্রসাদ বসিয়া কাগজ-পত্র দেখিতেছিলেন, একেবারে সেইখানে উপস্থিত হইয়া গম্ভীর মুখে বলিল, “আপনার কাগজপত্র রাখুন, দেওয়ানজী, আপনি রামু বাবুদের খাজনা মাপ করে দিন। ওরা গরীব, ওরা খাজনা দেবে কোথা থেকে?”

হঠাৎ জমিদারী কাছারির মূহু গুজন-ধ্বনি বাহিয়া গেল। দুগপৎ সকলেরই দৃষ্টি

কাণ্ডিকচন্দ্রের উপর পতিত হইল। দেওয়ান মহাপ্রের চক্ষু তাঁহার চশমার উপর দিয়া তেজ উদ্গীরণ করিয়া এই নির্ভীক বালকের উপর স্থাপিত হইল। দেওয়ানজী গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “কি বলছ, কাণ্ডিক?”

কাণ্ডিক কহিল, “আমি বলছি, কেন আপনারা এই গরীব মানুষের ওপর অত্যাচার করছেন? আমি ওদের অবস্থা জানি, ওরা খাজনা দিতে পারবে না।”

গোমস্তা মূহুরী ও অজ্ঞাত কৰ্মচারীর গ্রে পিষয়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। কারণ এই দুর্ভাগ্য দেওয়ানকে ভয় করে না, একপ ব্যক্তি দল-বারো ফ্রোণের মধ্যে একটিও ছিল না। এমন কি বরং জমিদার মহাপ্রের ইহার মাজ রক্ষা না করিয়া কথা বলিতে সাহস করিতেন না। ইহার ইংক-ডাকে বড় বড় ভোজপুরী দরওয়ানদেরও কলেশর কম্পিত হইত। আর সামাজ্য প্রথার ত ইংকে দেখিলে বাত্যা-তাড়িত শুকপত্রের স্তায় হৃদয়ে পলায়ন করিত—কিছা যদি মিতাভই দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার রোব-দুটির সম্মুখে আসিয়া পড়িত, তাহা হইলে বাত্যাভেদ কদলীর স্তায় ভূমি ভিন্ন তাহাদের অপর আশ্রয়-স্থান আর কোথাও থাকিত না।

এ-রূপে দেওয়ানেব চশমা ও গিজল চক্ষুর সম্মুখে গাড়াহারা চতুর্দশ বর্ষীয় বালক এখন প্রভুর নাম আজ্ঞা প্রদান করিল, তখন সকলেরই হৃদয়ে একটা আত্মবিশ্বাস-পাতের আশঙ্কা দেখা দিল। কাণ্ডিক চন্দ্র কিন্তু কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিল, “দেওয়ানজী, আপনি গোমস্তাদের

বলে দিন, ওরা যেন আর এদের ওপর
অত্যাচার না করে!”

দেওয়ান আপনাদের গাড়ীঘোর শিখর
হইতে না নামিয়া বলিলেন, “বাও কাঠিক,
এখন বিরক্ত করো না। অল্প সময় তোমার
আজ্ঞা শোনা যাবে।”

কাঠিক কহিল, “অনা সময় আবার
কি? এই ত সময়! এখনই ত’ কাছারি
হচ্ছে। এখনই ওবা এসেছে, যা হর এখনই
হুকুম দিবে দিন। ওরা আবার কতবার
ইটাটাটি করবে?”

দেওয়ান সিংহ-গর্জনে বলিলেন, “কে
আছিল বে, ঐ বাগুদি হারামজাদাদের দূর
করে দে ত। এত বড় আশঙ্কা! বা কাঠিক,
এখন গোল করিসনে, বলছি, মইলে—”

কাঠিকচন্দ্র গভীরভাবে বলিল,
“দেওয়ানজী, আপনি রাগই করুন আর
বাই করুন, ওদের খাজনা মাণ না করলে
আমি এখন থেকে উঠাচিনে। বাবু, আপনি
ত রগেছেন, আপনিই একটা হুকুম দিন
না।”

দেওয়ানজীর মারি সহ হইল না;
তিনি জমিদারি-চালে হুকুম দিলেন, “ঘনবরণ
সিং, এই চৌদ্দাটায় কান ধরে ওর বাপের
কাছে যেনে আরতো।”

ঘনবরণ সিং নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া
হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল, “চলিয়ে
ঠাকুরজী।”

কাঠিকচন্দ্র সহসা কাছারির চৌকির
উপর উঠিয়া তাহার গালে প্রচণ্ড এক
চোকাইয়া বলিল, “ভাকুখোর, তুই আমার
গায়ে হাত দিতে আসিস!”

* কালিকামেঠন এতক্ষণ সকৌতুকে
বাগকেও অদ্ভুত ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করিতে
ছিলেন। সচসা তাহার প্রসিদ্ধ পাইককে এই-
ভাবে অপমানিত চোখে দেখিয়া তিনি হাসিয়া
বলিলেন, “ঘনবরণ, বাইরে যা। কি বাবা
কাঠিক, তুমি কি দরবার করছ—আমার
কাছে কঁরা।”

• কাঠিক কহিল, “দরবার। কে দরবার
করছে? দরবার নবাব-বাদশা এরাই
করে, আমি কে করতে পারে। আমি এই
কথা বলতে এসেছি যে, যারা আপনাদের
“কাজ করে, তাহাই আপনাদের কাছ থেকে
মাইনে দাবী করতে পারে। তা না হলে
আপনি তাদের কাছ থেকে খাজনা নেবেন
কি হিসেবে?”

কালিকামোহন বেগতিক দেখিয়া
হাসিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, আচ্ছা, আমি
ওদের খাজনা মাণ করে দেব। বাতে কেউ
ওদের খাজনা না নেয়, তা করে দেব।
তুমি বাও, এই রোদ্‌য়ে ঐ গরম কোটী
খুলে ফেলো।”

কাঠিকচন্দ্র বিজয়-গর্জে গভীর মুখে
কিয়দা বাইতে বাইতে বলিল, “গরম
জামা খোলা না খোলা, সে আমার
ঠেকে।”

কাঠিকচন্দ্র নাট-মন্দিরে নামিয়া দেখে,
তাহার বান্দি বজ্রা বেগতিক দেখিয়া
পূজাঘরেই গুট প্রদর্শন করিগাছে। তখন-
সেই বিজয়-সংবাদ শ্রবণে তাহাদিগকে দিব্যম-
জনা উরত মতকে দেউকীর মধ্য দিয়া
দমোহানদের অস্ত্র দৃষ্টি উপেক্ষা করিতে
করিতে চলিয়া গেল।

৩

মধ্যাহ্নে বেণারতনের কূপে যান করিতে করিতে ব্রজপদ ও আর একটি ছাত্র, নাম জ্ঞানাপ্রসন্ন, এই দুইজনের মধ্যে গভীরভাবে তর্ক চলিতেছিল। জ্ঞানাপ্রসন্ন বলিল, “কাব্য পড়বার অল্প বাক্যরূপ বা অলঙ্কার খাঙ্গে দিগেব ব্যুৎপত্তির প্রয়োগ নাই। কবিভার তাব যোজনা সহজ বুদ্ধিতেই হয়।”

ব্রজপদ জ্ঞানের ছাত্র, তথাপি সে ব্যাকরণের উপাধিও লাভ করিয়াছিল বলিয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিল, “কখনই নয়, ব্যাকরণ আর অলঙ্কার খাঙ্গে অবলম্বন করেই কাব্য, নইলে সে কাব্য কাব্য নামেরই যোগ্য হতে পারে না।”

“অর্থাৎ তোমার মতে আগে ব্যাকরণ তৈরি হয়েছিল, তার পর কাব্য-সৃষ্টি! আগে রাস্তা তৈরি, তারপর লোক-চলচল! কি বুদ্ধি!”

“ব্যাকরণের সৃষ্টি যে আগে হয়েছিল, এ কথা জোর করে বলা যায় না, তবে—”

“আর তবোতে কাল নাই। তোমার জ্ঞানের কটিকার এখানে বাটবে না। যারা কবি হন, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, এ সব তাঁদের কাব্যকেই অনুসরণ করে। জীবনের লাজুলের অম্ন দেহটোর আগেই হয় না।”

“আগেই হয় না, কিন্তু একসঙ্গেই হয়। সাহিত্য-সৃষ্টির একটা নিয়ম আছে, সেই নিয়ম-অনুসারেই সাহিত্য গড়া হতে থাকে। কবি আর লেখকেরা, জেনেই হোক আর না জেনেই হোক, সেট নিয়ম-অনুসারেই সাহিত্য সৃষ্টি করিতে থাকেন। পরে যখন

কেউ সে সাধারণ নিয়মগুলি একত্র করে প্রকাশ করেন, তখন তিনিই হন বৈজ্ঞানিক, আলঙ্কারিক ইত্যাদি।”

তাহারোব তর্ক চলিতেছে, ইতিমধ্যে টোলার আরও কয়েকটি ছাত্র গমছা ও কাপড় লইয়া প্রানার্বে সেই স্থানে আসিয়া সমবেত হইল। নির্কটেই একটা দড়ি টানানো ছিল, তাহাতে কাপড়গুলি ঝুলিটার তাহারিও ব্রজপদ ও জ্ঞানাপ্রসন্নের তর্কে যোগ দিল। যে লোকটি এই সকল ছাত্রদের জল তুলিয়া দিতেছিল, সে বিরক্ত হইয়া বলিল, “আরতি শেষ হয়ে ভোগ-সম্বন্ধে, আপনারা শীগগির শীগগির চাম করে নাও, মাঠাকুবণ রাগ করেছেন যে।” কিন্তু সে কথা কে শোনে! তাহারোব তখন তর্কের মধ্যস্থলে উপস্থিত! এ সময় কেহ জল মাখার চালাতে পারে চালাতেছে, কেহ পায়ে চালাতে বীসের মধ্যে চালায়া দিতেছে। এমন সময় হঠাৎ একজন ছাত্র আসিয়া সংবাদ দিল যে, একটা “তার” আসিয়াছে এবং ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহার অর্থোজ্ঞানের জন্য হেড মাটির * মহাশয়ের নিকট গিয়াছেন। সকলেই তখন ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া যান সাবিতা গইল এবং পুরে টোলার দিকে প্রস্থান করিল।

শিবচন্দ্র অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া যান যুখে সংবাদ দিলেন, সর্বানন্দ পরীক্ষা দিতে গিয়া বিস্তুতিকা বোগাক্রান্ত হইয়াছে এবং কলিকাতার এক “মেসে” সে শক্তির আছে,—অজুই এতজনের সেখানে যাওয়া গয়োজন। কিন্তু কে বাইবে! সকল ছাত্রই নিক্তভাবে এ উহার শানে ও ইহার

পানে চাহিতে লাগিল। অধ্যাপক কাতর ভাবে বলিলেন, “সর্কানন্দ বিদেশী, এখানে কেউ ওর আশ্রয় নেই বলে কি ওর চিকিৎসা বা সেবা হবে না?”

কেহই কোন্ উত্তর দিল না দেখি। কাষ্টিকচন্দ্র ‘অগ্রসর হইয়া বলিল, “বাগা, আমি যাব।”

পুত্রের দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া শিতা বলিলেন, “তুমি ছেলেমানুষ, তুমি কি করবে? তা হলে আমাকেই যেতে হয়, দেখছি। সর্কানন্দর ত শুনেছি, মিকট আশ্রয় কেউ নেই, এমন অবস্থায় কে-ই বা যাবে? যাক, কাষ্টিক, তোমার গর্ভ-ধারিতাকে বলে এস, আমার ব্যাগটা ঠিক করে রাখতে।”

ব্রহ্মপদ কুণ্ঠিতভাবে বলিল, হোঁরাচে, আর কাউকে—”

কাষ্টিকচন্দ্র হাসিয়া উঠিয়া বলিল, “ভয়টাও হোঁরাচে, আমারও ভয় কচ্ছে। ভাগ্যল আমার ঐ রোগ হয়নি, তা হলে তোমাদের মত আগেই মরে বসে থাকতাম। আর সর্ক দাবাই ত মরছে, তোমরা ত মরনি, তুমি হয়ে হরির লুট দাওগে।”

বিজ্ঞপের ছাঁরটা ঠিক স্থানে পৌঁছিল কি না, সে সংবাদ না লইয়াই কাষ্টিকচন্দ্র চলিয়া গেল। শিবচন্দ্র তাড়াতাড়ি দ্রাবিড় সাহিত্য লইয়া গো-বানযোগে চলিয়া গেলেন। কিন্তু গ্রাম হইতে ক্রোশবানেক অগ্রসর হইয়াই তিনি দেখিলেন, কাষ্টিকচন্দ্র গামছায় একখানা কাপড় বাঁধিয়া তাঁহারই অপেক্ষার পথের ধারে এক বৃক্ষতলে অপেক্ষা করিতেছে। পুত্রের সুখের সেই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ

ভাঙ্গ দেখিয়া শিতা আর কোন আপত্তি করিলেন না, উত্তরে কলিকাতার চলিয়া গেলেন।

মেসের দুই একজন সন্তান ব্যক্তির সাচায্যে এগং শিবচন্দ্রে ও ভৎপুত্রের সেবার সর্কানন্দ সে ব্যক্তি বাঁচিয়া গেল। পরে সর্কানন্দ-কতকটা সুস্থ হইলে কাষ্টিকচন্দ্র একদিন তাহার পিতাকে বলিল, “বাবা, আমি বাড়ী যাব।”

শিবচন্দ্রে বলিলেন, “আর চার-পাঁচ দিন পরেই আমি সর্কানন্দকে নিয়ে বাড়ী ফিরব, তখন দেখা।”

কিন্তু কাষ্টিকচন্দ্র সে কথার কান না দিয়া বলিল, “এই মেসের একজন আজই বাড়ি যাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গেই আমি যাব। তিনি টিকিট করে দেবেন, তারপর ষ্টেশন থেকে আমি বাড়ী যেতে পারব। আমার মন কেমন কচ্ছে।” শিবচন্দ্রে পুত্রকে চিনিতেন। তিনি আর প্রতিবাদ না করিয়া তাহার বাগ্মরায় বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

প্রভাতে কাষ্টিকচন্দ্র যখন টোলে প্রবেশ করিতেছিল, তখন কয়েকজন ছাত্র তাহাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “খপর কি, কাষ্টিক?”

কাষ্টিক বিবর-মুখে বলিল, “খপর আর কি! • কাল সব শেষ হয়ে গেছে।”

দমবেত ছাত্রদের সকলের মুখ হইতে মুগ্ধতা একটা বিষয় ও ভৎহৃৎক লক্ষ্য বাহির হইল। “কাষ্টিক তীব্র দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে একবার চাহিয়া লইল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ব্রহ্মপদ বলিল, “এই যে

পরন্তু পত্র পেয়েছি, সর্জনন্দনের জীবন্ত অনেক ভাল।”

কার্তিকচন্দ্র আর কোন উত্তর না দিয়া মৃৎপরিধানে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার ওঠে সে সময় বে তীব্র ব্যঙ্গের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সকলেই তাহা লক্ষ্য করিল। ব্রহ্মপদ গজীর সূত্রে বলিল, “কার্তিকে আমার বিশ্বাস হয় না। স্তায়রত্ন দশায় এলেন না কেন? নিশ্চয়ই এ-সব ওর ছুটামি।”

দুই একজন মাথা নাড়িয়া বলিল, “এত বড় মিথ্যা কথাটা কি ও বলবে! আর এতে ওর লাভই বা কি হবে?”

ব্রহ্মপদ কহিল, “লাভ-অলাভ নিয়ে ওর দুটো মির পরিমাপ হয় না। এত অল্প বয়সে এতখানি দুটো বুদ্ধি আমি ত আর দেখিনি।”

কার্তিক তাহার মাতার নিকট কোন কথা গোপন করিল না, সেই ভক্ত কিছুক্ষণের মধ্যেই সত্য সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িল। ক্রুদ্ধ ব্রহ্মপদ মনোরমা ঠাকুরাণীর নিকট বাইরা কার্তিকচন্দ্রের দুটামির কথা নিবেদন করিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিল। কিন্তু কার্তিকচন্দ্র ততক্ষণে একটা চাপরে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া শুইয়া বলিল, “সারা রাত্তির ঘুমুই নি, এখন আমার বকিরো না।” মাতা তখন হাসিয়া ঘরের দ্বার-জানালা বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন, “কি করব বাবা, ওর আরেই ও ক্রমশ এমন দুটো হয়ে উঠছে। বাক, উনি আহুন, এলে ওর বা-হয় একটা বিশেষ শাস্তি করব। এখন একটু ঘুপক।”

তারপর কিছুদিন পরে সশরীরে সর্জনন্দ ও শিবচন্দ্র গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন, আসিয়া কার্তিকচন্দ্রের বিরুদ্ধে নালিশও তুলিলেন; কিন্তু ইহাতে মৃদু হাত বাতীত কোনরূপ শাস্তির ব্যবস্থা হইল না, দেখিয়া ব্রহ্মপদ হাড়ে হাড়ে অলিয়া গেল।

৪

সর্জনন্দ এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে, তথাপি এখনও পুত্কে মনোনিবেশ করিবার অনুমতি পায় নাই। এতাহ সকালে বৈকালে তাহাকে বেড়াইয়া আসিতে এবং বণাসময়ে আগারাদি করিয়া শয্যা গ্রহণ করিতে হয়। এই ভ্রমণের সময় কার্তিকচন্দ্রও কোন কোন দিন তাহার সঙ্গে থাকে।

আজ দে তাহার চোরখানি কাঁধে কেলিয়া বাহির হইবামাত্র কার্তিকচন্দ্র একখানা শিচের ডাল টাটিতে টাটিতে তাহার অহুসরণ করিল। সর্জনন্দ হাসিয়া বলিল, “কার্তিক, তুমি আজ দুপুরে বেড়াতে যাও নি কেন?”

“তুমি ত’ আজ-কাল পড়তে পাও না—তাই তোমার পড়া, আমার পড়া, দু’জনের কাজই আমি সেরে রাখছিলাম।”

সর্জনন্দ হাসিয়া বলিল, “ঐ রে, তাহলে আমার মাথাটি খেয়েছ, বোধ হয়,—সমস্ত বই, পুঁথিপত্র যেটে ঘুঁটে—”

“বেশ খিচুড়ি তৈরি করে রেখেছি, চমৎকার হজম হবে’খন। এখন যে কাজে যাচ্ছ, চল। সব সময় বই, বই। কি যে হয় তার ঠিক নেই।”

উভয়ে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন

সময় ধরে একটা পরিচিত টমটমের বোড়ার গলার ঘুড়ুরের স্ক্রুস্ক্রু শব্দ শুনা গেল। জমিদার কালীকান্ধার তত্ত্বা স্রীমতী শৈলজা-জ্ঞানমণী তাঁহার খাদ্য দাসী ও দরোয়ানের সহিত সাক্ষ্য-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ইহা তাহাদের প্রতিদিনের অভ্যাস, তাই কাঙ্ক্ষিত বা সর্কানন্দ কাহারও তেমন লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল না। তাহার পথের এক পার্শ্বে গাড়োয়ান গাড়ীটাকে শব্দ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু গাড়ীটা সবেগে অগ্রসর হইতে না হইতে একটা দুর্ঘটনা ঘটয়া গেল।

অপর দিক হইতে একখানা গরুর গাড়ী কাঙ্ক্ষিতের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। পল্লীগ্রামের গোমাতীর কৌবল্য যে কখন কি কারণে স্তব পাশ্ব তাহা বলা যায় না। সেই গাড়ীর বলদবহন সহসা সেই গাড়ী-সম্মত লক্ষ্যে পার্শ্ব নালাগ মধ্যে নামিয়া পড়িল। গাড়ীতে ছই একজন স্ত্রীলোক আরোহী থাকার একটা স্তরানন্দ হে-হে ও স্মার্ত শব্দ উদ্ভিত হইল। তিনিই সর্কানন্দ ও কাঙ্ক্ষিতের ছুটিয়া ঘটনাখলে গেল।

দুর্ঘটনার কাহারও তেমন আঘাত লাগে নাই বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকদের ব্যক্তির আনিতে ও গোড়োয়ানকে শব্দটের তলদেশ হইতে বাহির করিতে অনেকটা বেগ পাইতে হইল। ঠিকমধ্যে মহানন্দনামিতা—
— শৈলজা-জ্ঞানমণী তাঁহার টমটম থামাইয়া গাড়ীর উপর গাড়োয়ান মজা দেখিতে ছিলেন। গো-শব্দটের তলদেশ হইতে গোড়োয়ানকে যখন অদৃষ্টভাবে টানিয়া বাহিরে আনা হইল, তখন তিনি হাসিয়া তাঁহার টমটম হইতে প্রায় পড়িয়া বাইবার

মত হইলেন। কাঙ্ক্ষিতের ঘর্ষাক্ত কলহেরে গাড়ীটাকে টানিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়া উঠিয়া যখন দেখিল, টমটমের উপর উন্নত পাগড়ি দরোয়ান ও কোচম্যান চূপ করিয়া বসিয়া আছে, তখন ক্রোধে তাহার সর্কানন্দের অগ্নি গেল; তত্পর ঐ হাত্তো-জ্জ্বলিতা ব্যঙ্গকার সহজজ্ঞানহীন হাত্তের শব্দে সে আর হির থাকিতে পারিল না। এক লক্ষ টমটমের উপর উঠিয়া বসিয়া শিক্তা ওজনের এক চড় উঠিয়া সে বলিল, “কেস যদি তুমি হাসবে, তাহলে বুঝতে পারবে। ওদের নালাগ কেলে দিলে বলে বলে হাসি! চড় খেয়ে হাসতে পার ত’ বুঝি।” দাসী দরোয়ান ও কোচম্যান তিনজনেই অবাক এবং জিহ্বা সহজ মুদ্রা আয়ের সম্প্রতিপালিনী স্রীমতী শৈলজা-জ্ঞানমণী ভীত-জঙ্কভাবে বসিয়া পড়িয়া তাহার দাসীকে চাপিয়া ধরিলেন। অপূর্ণ দৃষ্ট।

সর্কানন্দ তাড়াতাড়ি টমটমের নিকটে আসিয়া কাঙ্ক্ষিতকে নামাইয়া আনিয়া কাঙ্ক্ষিত গাড়ী হইতে নামিয়া কোচম্যানকে বলিল, “হারামজাদা, কেস যদি বলে বলে এই রকম করে মজা দেখিল, তাহলে তোদের ছড়ি পেটা করব।” কোচম্যান আর বিকল্পিত না করিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। কিন্তু স্রীমতী শৈলজা-জ্ঞানমণীর সে দিন আর সাক্ষ্য ভ্রমণ হইল না, কাঙ্ক্ষিত কাঙ্ক্ষিত গাড়ীকে বাঁকি ফিরিতে আরম্ভ দিলেন।

এদিকে সর্কানন্দ মহাতীতভাবে কাঙ্ক্ষিতকে বলিল, “এ তুমি কি করে বললে! ছেলে মাহুদের ওপর রাগ

দেবিদেই বা তোমার কি লাভ হল ? তা ছাড়া এই রকম করে একটা বিপদকে ডেকে এনেই বা কি লাভ হল ? ওরা ত এখনি গিয়ে বাবুকে বলে দেবে, তারপর কি হবে, কে বলতে পারে ?”

কাণ্ডিকচন্দ্রের রাগ পাড়িয়া আসিয়াছিল, তাই সে উচ্ছ্বাস্ত করিয়া বলিল, “আমার ওপর কেউ রাগ করে না, তোমার মতর নেই।”

সর্জনন্দর ভয় কমিল না; তাই সে বাড়ী করিয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু কাণ্ডিক সে প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী নহী সে বলিল, “না, এখনও বেড়ানো চল নি। আমি কিছুতেই তোমার কিরতে দেব না।” সর্জনন্দ অগত্যা আরও খানিক বেড়াইতে বাধ্য হইল। কিন্তু বিপদ সেই খানেই শেষ হইল না। কিছুদূর যাইতে না যাইতে জমিদার মহাশয়ের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটয়া গেল। কালিকা-বাবু নিকটে আসিয়া বলিলেন, “কিরে কাণ্ডিক, তুই শৈলকে মেরেছিস কেন ?”

কাণ্ডিক গভীরভাবে বলিল, “ও তাহলে নিজে কথা বলেছে। আমি কেবল চড় উঠিয়েছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি, মারাই উচিত ছিল।”

“কেন ? মারাই উচিত ছিল, কেন ?”

কাণ্ডিক কহিল, “মজুদের এ রকম বিপদ ঘটলে দাঁড়িয়ে যে হাসতে পারে, তার উপযুক্ত ব্যবস্থা আমি কি আছে ! তার ওপর আপনাদের কাছে মিথো কথা বলেছে। আপনাদেরই ওকে বিশেষ শাস্তি দেওয়া উচিত।”

কালিকাবাবু সমস্তই শুনিয়াছিলেন এবং কি কারণে যে তিনি কাণ্ডিকচন্দ্রের উপর কোনরূপ ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া হাসিতে হাসিতে কথা বলিতেছিলেন, তাহারা অল্প-স্বরণকায়ী দরওয়ান ঘনবরণ সিং কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না। কিছুদিন পূর্বে এই দুই বাগকের নিকট যে চপেটা-ঘাট-লাভ তাহারও ভাগ্যে ঘটয়াছিল, তাহার অল্পভূতি এখনও তাহাকে পরিতাপ করে নাই। তাই অস্তকার অপরাধের সংবাদ শুনিয়া প্রতিশোধের আশার তাহার হস্তধর নিস্পৃগ করিতেছিল। কিন্তু ফলে যখন কিছুই হইল না, উপরন্তু বাবু মহারাজ যখন কাণ্ডিককে আদর করিয়া বলিলেন, “ছি বাবা, ছোট মেরের ওপর অত রাগ করতে নেই। ওর কতটুকু বুঝি !” তখন সে তাহার গালপাটী চুনরাইতে চুনরাইতে ভাবিল, “মহারাজ বাওরা হো গয়ে হোঁ।”

কালিকাবাবু যখন চলিয়া গেলেন, তখন বিম্বিত সর্জনন্দর নিকে “চাহিয়া কাণ্ডিক বলিল, “দেখলে সর্জনন্দা, আমার কেউ দকেই পারে না।”

কাণ্ডিকচন্দ্রের মাতা এই সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, “ওর মাঝে একমিন এক সাহেব মেরেছিল। কেমন লোকের ভায়ে !” কিন্তু তাহার পিতা গভীরভাবে বলিলেন, “এ সব তোমার কি হচ্ছে, কাণ্ডিক ? পড়া শোনা করে কোথায় লাভ প্রকৃতি হবে, তা না এ সব কি আবার ? সেদিন ঘনবরণ সিংকে মেরেছ, আজ আবার একটা ছোট মেরের ওপর বীরত্ব ফলিয়েছ। এ সব ত

ভাল নয়। এমন করলে আমার এখনকার
বাস উঠোতে হবে, দেখছি।”

পরদিন হঠাৎ একজন পাইক আসিয়া
বখন জায়গার মহাপরকে সম্ভাষণের পর
অমিয়ান মহাপরকে নিকট বাইবার জুতা
নিমন্ত্রণ করিয়া গেল, তখন সকলেই বুঝিল,
জ্ঞান একটা কিছু হইবে। কিন্তু বস্তুর
কিছুই ঘটিল না। কালিকাবাবু জায়গার
মহাপরকে পরম সদাশয় বসাইয়া নানাবিধ
সদাশয় করিয়া সহসা একটা অসুস্থ
অসুস্থের কথা করিলেন। বাবু বলিলেন,
“আপনার ছেলেটার বিষয় বা দেখাছি-
কিন্তু, তাতে সংকটের সঙ্গে সঙ্গে ওকে
ইংরেজি শিখুলে ও পরে একজন মরণাশ্রিত
লোক হতে পারে। সে জ্ঞান আমার
অসুস্থের, আপনি ওকে আমাদের এন্ট্রেন্স
ইন্সপেক্টর করি। আমি হেডমাস্টার
মহাপরকে বিশেষ করে বলে দেব, যাতে
ওর ওপর সর্বদা দৃষ্টি রাখা হয়।”

জায়গার মহাপর আপত্তিহীন হইয়া
বলিলেন, “কার্টিকের গর্তখানিও অনেক
দিন থেকে তাই হচ্ছে, কিন্তু ইংরেজি
শিখলে ছেলে স্নেহ-ভাবাপন্ন হয়ে যাবে,
হঠাৎ পিতৃপিতামহের হৃদয় নষ্ট করে
ফেলবে! তা ছাড়া ভবিষ্যতে এই টোপুলার
তার ত ওকেই নিতে হবে, তা হলে আর
ইংরেজি পড়ে ফল কি?”

কিন্তু কালিকাবাবু ছাড়িলেন না।
তিনি নানাবিধভাবে বুঝাইলেন যে ইংরেজি
পড়িলেই কেহ স্নেহভাবাপন্ন হয় না।
এবং বিজ্ঞ বা জ্ঞান জিনিষটার কোনরূপ
স্বাভাবিকতা নেই। যে কোন স্থান

হইতেই বিভ্রান্ত
কতক।

একে প্রায়ের একজন সস্ত্রী, তাহাতে
ভাষার পুত্রের ভাষার জ্ঞানই বখন
কালিকাবাবু এতখানি চেষ্টা, তখন জায়গার
মহাপর আর বেশী আপত্তি করতে পারিলেন
না। কেন্দ্র এইটুকু বলিলেন, যে ছেলেটা
ভাষার কিংবা একত্রের ধরণের, উহাকে
এ বিষয়ে মত করাইতে কিংবা সম্মত
লাগিতে পারে। এ কথার উত্তরে
কালিকাবাবু বলিলেন যে সে বিষয়ে তিনি
কখনই ভাব লইতে প্রস্তুত; তিনি বরং
কার্টিকচন্দ্রকে বুঝাইয়া সম্মত করিবেন।

কার্টিকচন্দ্র কিন্তু এই সংবাদ শুনিয়া
মাথা নাড়িয়া বলিল, সে ইংরেজী শিখিতে
ইচ্ছুক নয়। তাহার মাতা মনোমোহা
ঠাকুরাণী সপক্ষে বলিলেন, “তোকে সবাই
এত ভালবাসে, আর তুমি সে ভালবাসার
এই রকম প্রতিদান দিবি? আমি শুধু
যে কাজে এতদিন ধরে রাজী করিতে
পারি নি, আজ সেই তিনিও রাজী
হয়েছেন, তবু তুমি আমার কথা শুনবি নে?”

কার্টিক কহিল, “বাবা রাজী হয়েছেন,
তুমি কেন করে জানলে? তুমি ছিনে
জোঁকের মত লেগে-স্তায় মত করিয়েছ,
তার ওপর তিনি অমিয়ান মহাপরের সঙ্গে
রাজী হয়েছেন। আমি যে কারণে তাকে
কোন কাজ করব, এ হতেই পারে না।
বাবু যে শুধু দেখিয়ে, আমার মাঝার
অপমান করে আমাকে দিয়ে এই কাজ
করিয়ে নেবেন, তা আমি কিছুতেই সহিব
না। তুমি বাবাকে এ কথা সাক্ষ্য বলে দাও।”

মনোরমা দেবী চোখ কপালে তুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, “তুই ঠগ্ন মান অগমান দেখছিস, আর আমি যে তাদের বলে পাঠিয়েছি, তুই নিশ্চয়ই পড়বি,— ত্যার কি হবে? এখন আমার কথাটা কোথার ঠাড়াবে? আমার মান-অগমান কি কিছুই নয়?”

কাণ্ডিক কহিল, “তুমি নিজে বড় লোকের মেয়ে, টাকাকড়ি ধনদৌলতের ওপর চিরদিনই তোমার লোভ। তোমার এ সব বিকারের ঋণীর মত কাজ; তাই এ বিষয়ে তোমার কথা না রাখলেই তোমার মান বাড়ানো হবে।”

মনোরমা দেবী কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার ক্রোধের সমস্ত তেজটুকু নিরীহ শিবচন্দ্রের উপর ব্যক্তি করিয়া বলিলেন, “এমন ছেলেতে আমার কাজ নেই, তোমার ছেলের বা হয় কর, আমি ওর হাতের লগগুয় যদি নি—”

শিবচন্দ্র বাস্তব হইয়া বলিলেন, “খাম, খাম, মিছি মিছি একমাত্র বংশধরের ওপর এত বড় অভিলাষ দিয়ো না। আমিই ওকে ঐখিরে-সুখিরে ঠিক করে নিচ্ছি।”

কাণ্ডিকচন্দ্রকে অবশেষে বুঝিতে হইল বটে, কিন্তু সেও একটা সর্তে। সর্তে এই যে সর্কানন্দকেও ইংরাজি পড়াইতে হইবে।

কিন্তু সর্কানন্দ অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান। তাহার পড়াশুনার খরচের তার কে লইবে? কাণ্ডিকচন্দ্র গাভীরভাবে বলিল, জমিদার মহাশয় কি আর ইচ্ছা করিলে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলের এইটুকু উপকার করিতে পারেন না? শিবচন্দ্র বলিলেন, এ বিষয়ে কে তাঁহাকে অমুরোধ করিবে? তখন কাণ্ডিকচন্দ্র নিজেই এস তার গ্রহণ করিয়া বলিল, “আমার বনলে না হয় সর্কানন্দ পড়বে, তা হলেই হবে।”

শিবচন্দ্র ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, “তোমার পড়াশুনার খরচ ত আর তিনি দিচ্ছেন না। তিনি কেবল ব্যবস্থা করে দেবেন মাত্র। খরচ-পয় সবই আমার। সর্কানন্দকে যদি পড়াতে হয়, তাহলে সে খরচ আমাকেই বহন করতে হবে। তুমি সব বুঝছ, আর এটুকু বুঝছ না কেন? আর সর্কানন্দই বা ইংরিজি পড়তে স্বীকার করবে কেন? তুমি ছেলেমাছুরী করো না, আমি বা বলছি, তাই কর।”

কাণ্ডিকচন্দ্র পিতার কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করিল বটে কিন্তু মনে মনে একটা কলি জ্বাটয়া দে বাহির হইয়া গেল। ইহার দুই-একদিন পরে সকলেই সন্ধিরে গুলিল, বাবু সর্কানন্দের পড়ার সমস্ত ব্যয়-ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

ঐতিহ্যভূষণ ভট্ট।

বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তিতত্ত্ব

বৌদ্ধধর্ম নর্ত্তমানে একটা স্বতন্ত্র ধর্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে। কাজেই হিন্দুধর্মের সহিত আদিতে ইহার যোগ ছিল না। একজন ধারণাট বিশেষরূপে প্রবল হইয়াছে। কিন্তু ইহার আদিভাবের আলোচনা করিলে হিন্দুধর্মের সহিত ইহার যোগের প্রমাণ যে কেবল পাওয়া যায় তাহা নহে, পরন্তু হিন্দুধর্মট যে ইংকে মূলগঠন প্রদান করিয়াছে তাহাও প্রমাণ পাওয়া যায়।

বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতার নাম শাক্যসিংহ।

কিন্তু “বৌদ্ধ” নামের মূলার্থের অনুমান দ্বারা “বুদ্ধ”কেই এই ধর্মের প্রবর্তক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এই বুদ্ধ নামের মূলমন্ত্রান করিলে শাক্যসিংহ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই তাঁহার এই নাম হইয়াছিল।

“বুদ্ধ” শব্দ বৃদ্ধ হইতে নিষ্পন্ন। বৃদ্ধ হইলে অর্থ জ্ঞান। সুতরাং “বুদ্ধ” শব্দ তত্ত্বজ্ঞানীর অর্থট প্রকাশ করিয়া থাকে। “বুদ্ধ” শব্দের এই তত্ত্বজ্ঞানীর অর্থ যে শাক্যসিংহট ইংকে প্রথম প্রদান করেন, তাহা নহে, পরন্তু বৈদ্য-ধর্মের আদ্যায় সম্বন্ধে প্রাপ্ত অর্থে “বুদ্ধ” শব্দই প্রয়োগ পূর্বেই প্রচলিত ছিল। বৈদ্য-ধর্মের “বুদ্ধ” শব্দ যেমন আদ্যায় বিশেষরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে—তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্ত শাক্যসিংহেরও ইং প্রথম বিশেষরূপেই প্রযুক্ত হইত। শাক্যসিংহ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দেবতাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই “বুদ্ধ” বিশেষণ যুক্ত

হইয়া তাঁহার নাম “বুদ্ধবৈন” হইয়াছিল। এই প্রকারেই বিশেষণ হইতে “বুদ্ধ” শব্দ ক্রমে বিশেষ্যে পরিণত হইয়া, “বুদ্ধ” শাক্যসিংহের প্রধান নাম হইয়া পড়িয়াছে। “বুদ্ধ” শাক্যসিংহের ধর্মপ্রবর্তার নাম বলিয়াই তৎপ্রবর্তিত ধর্ম তাঁহার এই “বুদ্ধ” নাম হইতেই বৌদ্ধধর্ম নামে পরিচিত হইয়াছে।

তদু “বুদ্ধ” নামেই যে আমরা বৈদ্যেব সূচিত শাক্যসিংহের ধর্মের সংযোগের প্রমাণ দেখিতে পাই তাহা নহে, তাহার অপর একটা নামে তাহার আরও পরিচয় প্রমাণ দেখিতে পাই। সেই নামটি “অধ্ব-বানী”। এই নামটি অমরকোষ অভিধানে যুক্ত হইয়াছে; যথা,—

যজ্ঞকোষনগলাধ্ববানী বিনায়কঃ।

মুদ্রাঃ ত্রয়ঃ শাস্তা মুনিঃ শাক্যমুনিঃ।”

ইহা হইতে এইটী যে তাঁহার একটা প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নাম তাহাই বুঝিতে পারা যায়। “অধ্ববানী” এই নামের দ্বারা বুদ্ধবৈন যে বৈদ্যের অবৈত মতানুগামী ছিলেন, তাহাই নিঃসন্দেহরূপে সপ্রমাণ হয়।

বৈদ্য মতে, মুক্তিতে পরমাত্মার জীবাত্মার লয় হইয়া কেবলমাত্র পরমাত্মাই বিদ্যমান থাকার এই মুক্তির নাম “কৈবল্য” হইয়াছে। শাক্য মতেও এই মুক্তির অন্যতর “কৈবল্য জানে”রই “মুগ্ধ হইতে থাকে :—

“এবং ওষ্যাতাশান্তি মনোহ

মিত্য পরিণেব বিত্তং কেবলমুগ্ধতত্ত্ব জানদ্।”

সাখ্যাত্মকোমুদী।

সূক্তির এই “কেবলজ্ঞানে”র অইষ্টান হইতেই বৌদ্ধ সাধকের নাম “কেবলজ্ঞানী” ও “কেবলী” দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ নির্জ্ঞানেও এই “কেবলজ্ঞানে”র ভাবটী অপ্রতিহত। তাহাতেই অভিধানে আমরা “কৈবল্য” ও “নির্জ্ঞান” একই পর্য়ায়কৃত দেখিতে পাই; বলা :—

“বৃত্তিঃ কৈবল্যঃ নির্জ্ঞানঃ”—ইত্যমরঃ।

বুদ্ধের বহু নামের মধ্যে, একমাত্র “বোধিসত্ত্ব” ও অপর নাম “মহাসত্ত্ব”। তত্ত্বজ্ঞান লাভের দ্বারা সমুত্তমের সবিশেষ প্রাণুর্ভাব হইতেই যে বুদ্ধের এই দুইটী নাম হইয়াছে, তাহাই এই উত্তর নামের অর্থালোচনা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। কারণ “বোধি”, বোধ বা তত্ত্বজ্ঞানেরই বোধক এবং “সত্ত্ব” সমুত্তমেরই ভোক্তক। সত্ত্ব ও সত্য উত্তর শব্দ একই প্রকৃতিমূলক। উত্তরই একই সং শব্দ হইতে উৎপন্ন। সুতরাং মূলে উত্তর শব্দ একই নিত্যার্থের প্রকাশক।

এই প্রকারে বুদ্ধের বিভিন্ন নামের অর্থ পর্যালোচনা করিলে বেদান্তে আমরা মুক্তিদ্বা বা পরমাত্মার যে সমস্ত গুণের বর্ণনা প্রাপ্ত হই, ঐ সমস্ত অর্থ দ্বারাও তৎ-সমস্ত গুণই উপপাদিত হয়।

এখানে তুলনা করিবার জন্য আমরা আচার্য লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

“তত্ত্বজ্ঞানকঃ নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মূক্ত সত্য স্বভাবঃ
প্রত্যকুচেতনবাস্বতত্বম।”

আত্মতত্ত্বের পূর্কোক্ত লক্ষণ হইতে ইহার ‘বুদ্ধ’, ‘তত্ত্ব’, ‘সত্য’ প্রকৃতি এক-একটী লক্ষণই যে বুদ্ধের ‘বুদ্ধ’, ‘বোধিসত্ত্ব’, ‘মহাসত্ত্ব’

প্রকৃতি বিশেষ বিশেষ নামে পরিণত হইয়াছে তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। এই প্রকারে ‘বুদ্ধভাব’ আত্মতত্ত্বেরই লক্ষণায়িত হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে “বুদ্ধত্ব” প্রাপ্তি যে পরমাত্মাতে সম্পূর্ণ লব্ধ, প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মাতে সাক্ষ্য পরিগ্রহ তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি। গীতান্তে ব্রহ্ম বা পরমাত্মার লব্ধ যে “ব্রহ্মনির্জ্ঞান” = বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে, তাহাতেও বৌদ্ধ নির্জ্ঞানের অর্থ যে পরমাত্মার লব্ধ তাহাই বুঝিতে পারা যায়। বেদান্তের “সোমুৎসন্ন” তত্ত্ব এই লব্ধতত্ত্ব হইতেই উদ্ভূত। পরমাত্মাতে যখন সমস্ত বিষয়ত্ব অস্তিত্ব, তখন স্বতন্ত্র ক্ষমত্বের তত্ত্ব স্বীকারের আর আবশ্যকতা থাকে না। ইহা হইতেই বুদ্ধদের কেন যে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তুচ্ছীকৃত্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত রহস্য উন্মোচিত হইতে পারে।

কেবল যে বুদ্ধদেবের নামেই বেদান্তের নিদর্শন বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে—তাঁহার পিতামাতার নামেও সেই নিদর্শন বর্তমান দেখা যায়। তাঁহার মাতার নাম “মায়াদেবী” ও পিতার নাম “শুদ্ধোদন”। “মায়ী” বেদান্তের একটী প্রধান তত্ত্ব। সংসার-প্রবৃত্তি বা সৃষ্টি এই মায়ারই কার্য। সুতরাং “মায়ী” যে মাতারূপে বর্ণিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। বেদান্তের “শুদ্ধমাত্তত্বই” শুদ্ধোদন। আত্মতত্ত্বই বিশ্বের মূলতত্ত্ব। সুতরাং ইহা পিতারূপে বর্ণিত হওয়াই স্বাভাবিক। “বুদ্ধ” নাম যেমন বেদান্ত-দর্শন হইতে উপকল্পিত

নাম—তাহার মাতা-পিতার নামও তেমনই বেদান্তব্রহ্মাণ্ড উপকল্পিত নাম বলিয়াই স্পষ্ট অস্বীকৃত হয়। এই সমস্ত নাম যে ঐতিহাসিক নাম নহে, বুদ্ধ-পিতার যে পৌরাণিক “অজ্ঞান” নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতেই তাহা প্রমাণিত হয়। ঐমত্যাগপক্ষে এষ্ট প্রকারে বুদ্ধকে অজ্ঞান-স্বত্বরূপে ধারণা দেয়া যায় :—

“বুদ্ধো নারাজনমুতঃকাকটেশু ভবিষ্যতি ।”
ইতি শব্দকল্পদ্রুমমুতঃ ইমন্ত্যাগপক্ষে ১ম স্তম্ভে ৩য় অধ্যায়ঃ ।

বুদ্ধদেব যে কেবল বেদান্তের সাধনাই করিয়াছিলেন তাহা নহে—বেদান্তের “ব্রহ্ম-নির্মাণ”ও তিনি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার ধর্মপ্রচার এই “ব্রহ্মনির্মাণ” ভাব হইতেই অসুপ্রাণনা প্রাপ্ত হইয়াছিল।* এই সম্বন্ধে তাঁহার জীবনচরিতে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে :—

“জনসাধারণের জন্ত ইনি কৃতনিশ্চয় হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—“আমি ব্রহ্মতে হিত করিয়া ধর্মক্ষেত্রে প্রবেশিত করিব। এ ধর্ম সকলেই গ্রহণ করিবে।” জীবনোক্তোষ।

তাঁহার ধর্মচক্র-প্রবর্তনে আবার তাহাতে আমরা বিষ্ণুরই প্রতিরূপ দেখিতে পাই।

তিনি যেমন “ধর্মচক্রভূঃ”—বিষ্ণুও তেমনই “চক্রধর”। বিষ্ণুর চক্র আবার সূর্য্যোদয়রূপক।

বিষ্ণু “সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্তী” রূপে যে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—তাহাতেই সূর্য্য বিষ্ণুর চক্ররূপে কল্পিত হইয়াছে। বুদ্ধের সহিত বিষ্ণুর সঙ্গে সূর্য্যোদয়ও সম্বন্ধ হইয়াছে—তাহাতেই তাঁহার আর এক প্রসিদ্ধ নাম “অর্কবজ্র” বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায়; যথা :—

শৌভম্যাকর্কবজ্রস্ত সারাদেবীহতস্ত সঃ—ইত্যনন্তঃ

বুদ্ধদেবের “অর্কিতাভ” নাম এই সূর্য্য-সম্পর্ক হইতে হইয়াছে অস্বীকার করিলে বোধ হয় অসম্ভব হইবে না।

অস্তিত্বানে বুদ্ধদেবের যে “শ্রীমদ” নাম আমরা পাইরাছি, বিষ্ণুর “শ্রীগুণ” ও “শ্রীমুখি” নামের সহিত উহাকে সম্পূর্ণ একার্থক বলিয়াই বোধ হয়। বুদ্ধদেবের সুপ্রচলিত “জিন” নাম বিষ্ণুর “জিহু” নামেরই সম্পূর্ণ অস্বরূপ।

বুদ্ধ নামে বিষ্ণু-সম্পর্কের নিদর্শন যেমন আবিষ্কৃত হয়, তেমনই শিব-সম্পর্কের নিদর্শন তদুপেক্ষাও অধিকতর স্পষ্টরূপে আবিষ্কৃত হয়। বুদ্ধদেবের সুপ্রসিদ্ধ আর এক নাম “মারজিত”; শিবেরও প্রসিদ্ধ নাম “মরহর”। বুদ্ধদেবের ‘মার’ জয়ের যেমন আখ্যান আছে—শিবের মদন-ভয়েরও তেমনই আখ্যান আছে। বিশেষতঃ মার, কাম বা মদনেরই বাচক; যথা—“মদনো মদমধোমারঃ।”

এখানেই যে শিবের সহিত বুদ্ধের সাগুণ শেষ হইল তাহা নহে, শিব যেমন শ্রেষ্ঠসংখ্যী ও যোগিপ্রবর, বুদ্ধকেও আমরা তেমনই যোগীস্বরূপে স্মৃত হইতে দেখি; যথা :—

“শাস্ত্রং সখা প্রণিবখতিভীতম্।

বৃহজ্জটাজুট বরোস্তম্যাম্

তদুন্নম্য গৈরিক গোবরপ্রম্

যোগীস্বরং বুদ্ধমহং ভজেরম্।”

বুদ্ধদেবে এই সমস্ত নিদর্শন দর্শন করিয়া হিম্মুখের পূর্ণপ্রভাবের মধ্যেই যে তাঁহার জন্ম এবং তৎপ্রবর্তিত ধর্ম এই প্রভাবেরই ধারা যে সমগ্রপ্রাপিত, তাহাই আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি।

শ্রীশ্রীভগবন্ত চক্রবর্তী।

আয়ুর্বেদ ও নব্য-রসায়ন *

রাসদাহী কলেজের রসায়ন-অধ্যাপক, ঐশ্বর্য পকানন নিয়োগী, এম্. এ. এক, সি, এন্স, মহাশয় গত ছয়-মাস বৎসর ধরিয়া আয়ুর্বেদ ও আধুনিক রসায়ন সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ “ভারতী,” “এবামী,” “লাকা রিভিউ,” অঙ্কিত মাসিক পত্রিকায় লিখিত হইলেন, সেইগুলি সম্প্রতি পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত আকারে “আয়ুর্বেদ ও নব্য-রসায়ন” নামক গ্রন্থে সংগ্রহপূর্বক প্রকাশ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য—প্রথমতঃ, প্রত্যেক ধাতু ও তাহার যৌগিক সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে কিরূপ জ্ঞান ছিল, তাহার সবচেয়ে আলোচনা; দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক ধাতুর দ্বারা যাহা প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা সাংখ্যিক হই, তাহা নির্দেশ করা; এবং তৃতীয়তঃ আধুনিক কবিরাজ মহাশয়গণের দ্বারা ব্যবহৃত জারিত ধাতু দ্বারা, মকরদ্বারা অঙ্কিত রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা তাহাদের ধারণা-নিরূপণ।

গ্রন্থখানির প্রথম পরিচ্ছেদ পাঠ করিলে জানা যায়, আয়ুর্বেদের উৎপত্তি বৈদিক কালে। অথর্ব বেদই আয়ুর্বেদের উৎপত্তিস্থল। আমরা অথর্ব বেদে ঐশ্বর্য সমূহের বাহ্য ধারণে হিন্দু-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই। যে সকল ভেদ্যের (যথা অথর্ব, বহিষ্, হরিদ্রা, অগাধার্য, মূত্র, লবী, পুষ্কর্ণী ইত্যাদি) বাহ্য ধারণ অথর্ব বেদে উপস্থিত হইয়াছে, পরবর্তী কালে সেই সকল ভেদ্যই ঐশ্বর্যরূপে সর্বদা ব্যবহৃত হইয়াছে। ধাতু সকলের মধ্যে সৌন্দর্য ও স্বর্ণ বেদে ধারণ করিবার ব্যবস্থা অথর্ববেদে আছে, পরবর্তী তাত্ত্বিক গ্রন্থসমূহে ইহা এই এবং অষ্টম ধাতুর ভঙ্গ্য ঐশ্বর্যরূপে সন্নিবেশিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। চিকিৎসা-শাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, প্রথমে ঐশ্বর্য-সমূহের

বাহ্য ব্যবহার (external application) এবং পরে অভ্যন্তরীণ-ব্যবহার সহিত তাহার ঔষধাত্মক প্রয়োগ (internal administration) হইয়া থাকে। প্রথমে হস্ত বা গলবেদে ধারণ, পরে মালিন বা প্রলেপরূপে ব্যবহার এবং শেষে ঐশ্বর্যরূপে অতি শূণ্য স্বাভাবিক সেবন। এই রূপেই ঐশ্বর্য-সেবনের ক্রম বিকাশ সম্ভবিত হইয়া থাকে। অথর্ববেদে হিন্দু-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উৎপত্তি-স্থল বলিয়া বৈজ্ঞানিকের নিকট তাহা অনুভূত হয়। কেহ কেহ অথর্ববেদকে জুত-প্রোত কাড়ান মস্তুর সমষ্টি মাত্র মনে করিয়া তৎপ্রতি অবজ্ঞা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে প্রাচীন বিশ্বত বেদেও মস্তুরের নথ্য বিদ্যাই চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও রসায়ন-শাস্ত্রের জন্ম হইয়াছে। অথর্ব বেদে এতগুলি রোগের মস্তুর আছে যে উল্লের “হেথজ্যানি” ও “আয়ুর্বাদি” সমস্তগুলি বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিলে পৃথিবীর মধ্যে তাহা একখানি আদি চিকিৎসা-বিশ্বক গ্রন্থ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে অথর্ববেদের কাল হইতে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া বীরে ধীরে ধীরে প্রবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। আয়ুর্বেদের “ক্রমবিকাশের সহিত ভারতের রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তি ও উন্নতির বহির্ভূত সম্পর্ক রহিয়াছে। আয়ুর্বেদের ক্রমবিকাশের আলোচনা করিবার পূর্বে প্রথমতঃ একটি গুরুতর বিষয়ের সীমানা-সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছেন। বিষয়টি এই যে ভারতের আয়ুর্বেদ (এবং রসায়ন শাস্ত্র) গ্রীক, রোমীয় বা আরব জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত কি না; এবং তাহা না হইলে প্রাচীন গ্রীক, রোমীয় বা আরব চিকিৎসা শাস্ত্র ভারতের আয়ুর্বেদের নিকট কত দূর কি না? এ সম্বন্ধে বিসঙ্গ মস্তভেদ

* আয়ুর্বেদ ও নব্য-রসায়ন, প্রথম ভাগ, ঐশ্বর্যপকানন নিয়োগী, এম্. এ. এক, সি, এন্স, রসায়ন-অধ্যাপক রাসদাহী কলেজ প্রস্তুত, মূল্য ১০/-, বীখাই ১০/- টাকা।

আছে। বহু গবেষণার ফলে প্রাকৃতিক পদ্ধতিগণ এ সম্বন্ধে যে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, গ্রন্থকার তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রথম। আর্দুর্কেস ও গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মৌলসূত্র এবং ভারতীয় জ্ঞান গ্রীকগণই আর্দুর্কেসের নিকট কর্তৃ। অধ্যাপক ওয়েবার (Weber) তাঁহার History of Indian Literature এ লিপিয়া 'প্রিয়াছেন যে গ্রন্থ গ্রীকগণের চিকিৎসার নিকট কর্তৃ হইতে পারে না, পরন্তু বিপরীত মতই সঠিক বলিয়া বোধ হয়। ভারতীয় আর্দুর্কেসে বিদেশীয় পারিতোষিক লম্বা নাই। ভারতীয় জ্ঞান চিকিৎসা সম্বন্ধে ভারতীয় হার্সবার্গ (Hirschberg) বলিয়া প্রিয়াছেন যে হিন্দুদের কয়েক কয়েক গ্রন্থ-চিকিৎসা গ্রীকগণের সম্পূর্ণ অব্যবহৃত ছিল এবং ইউরোপীয়গণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই সকল গ্রন্থ-চিকিৎসা শিক্ষা করিয়াছেন। অধ্যাপক ডায়াস (Dias) বিস্তারিত গবেষণার পর যির তিরিয়াছেন যে গ্রীক চিকিৎসা-প্রণালী হিন্দু আর্দুর্কেসের নিকট বিশেষ ভাবে কর্তৃ।

দ্বিতীয়। মিসর দেশ (Egypt)* প্রাকৃতিক ভারতীয় আর্দুর্কেসের উপনিবেশ ছিল। গ্রীকগণ ও ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান বিপর্যাসীগণের নিকট কর্তৃ।

* তৃতীয়। গ্রীক লেখক নির্ঘটিতে নানাবিধ ভারতীয় লেখকের উল্লেখ ও ভগ্ন বর্ণনা আছে।

চতুর্থ। অষ্টম শতাব্দীতে ও তাহার পরবর্তী কালে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক বোধ্যাদের বাহ্যিকের চিকিৎসক ছিলেন; এবং অনেক সংস্কৃত আর্দুর্কেস গ্রন্থ এই সময় আরবীভাষায় অনূদিত হয়। এইরূপে চরক গ্রন্থে প্রভৃতি আর্দুর্কেস-গ্রন্থ আরবী ভাষায় স্থান পায়। সুতরাং এই সকল আর্দুর্কেসীয় গ্রন্থ আরবী ভাষা হইতে ল্যাটিন ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছিল এবং এই সকল অনুবাদ সমগ্র শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভিত্তি-বরণ ছিল।

পঞ্চম। বাস্তব আভ্যন্তরিক প্রয়োগ সম্বন্ধে গ্রীকগণ হিন্দুদিগের নিকট কর্তৃ।

ষষ্ঠ। সমগ্র শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আরবীয়গণ ভারতে বাসিয়া করিতে আসিত এবং দক্ষিণ ভারত হইতে, তাহারা নানাবিধ লেখক আফ্রিকা ও ইউরোপে রচনা করিত।

সপ্তম। অষ্টম শতাব্দীতে আধুনিক নিম্নদেশ বোধ্যাদের বাহ্যিক বাহ্যিক সমগ্রের কার্যকর হইয়াছিল। এই সময় হইতে বাহ্যিকের বহুবারে ভারত হইতে অনেক পণ্ডিত আমন্ত্রিত হইতেন। এইরূপে আধুনিকগণ ভারতের উন্নত বর্ণন, জ্যোতিষ, চিকিৎসা ও রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি অসম্মত আকৃষ্ট হন। আরব বাস বংশীয় মনহর ও হাকিম প্রভৃতি বাহ্যিকগণ বাহ্যিক বিজ্ঞান পুণ্ডিলোক ছিলেন। ওহাদের প্রভৃতিমানে প্রভৃতিগণের প্রভৃতিস্বাক্ষর, চরক, গ্রন্থ, পঞ্চম প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। বিখ্যাত জাফান পণ্ডিত মুলায় আরবীয় চিকিৎসা গ্রন্থ সকল বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে চরক গ্রন্থে ভিন্ন নানাব্যক্তির নিদান ও বাস্তবের অষ্টাঙ্গ এবং আরও কয়েকখানি সংস্কৃত আর্দুর্কেসীয় গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। মুলায় সাহেব আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে আর্দুর্কেস বাহ্যিকগণ বোধ্যাদের রাজকীয় চিকিৎসকও ছিলেন।

অষ্টম। ভারতের সহিত আরবীয়গণের পরিচয় হইবার পর অনেক মুসলমান পণ্ডিত ভারতে শিক্ষালাভ করিতে আসিতেন। ভারতের আর্দুর্কেসও অনেক আরবীয় পণ্ডিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেই জ্ঞান বিনিমিত পাওয়া যায় যে আরবীয় চিকিৎসা গ্রন্থ সমূহে 'সরক' (চরক); 'হুস্রফ' (হুস্রফ), 'বাহাম' (বাহাম), 'অসকর' (অষ্টাঙ্গ, অষ্টাঙ্গ) প্রভৃতি আর্দুর্কেসীয় গ্রন্থ সমূহের উল্লেখ বহুস্থানে আছে।

নবম। পরবর্তী তাত্ত্বিক মূলে বহু বাস্তব-ভিত্তি ভগ্ন সকল বহু। পরিমাণে আর্দুর্কেসে বাস্তব হইত, তখন পর্যন্ত ইউরোপীয় হাকিমেরা বাস্তব-ভিত্তি ভগ্ন বাস্তব করিতে ভীত হইতেন।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে আর্দুর্কেসের অসম্মতগণের সহিত রসায়ন শাস্ত্রের বিন্ধিত সম্বন্ধ

আছে। আয়ুর্কৌশলে উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের কাল তুল্যতা তিনটী—(১) বৈদিক যুগ, (২) আয়ুর্কৌশলীয় যুগ ও (৩) তাত্ত্বিক যুগ।

বৈদিক যুগের প্রধান গ্রন্থ অথর্ববেদ ও কোশিক ব্রহ্ম। এই যুগে বর্ষ, রোগ্য, লোহ, তাম্র, এণু ও মীন এই ছয় ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বর্ষ, রোগ্য ও মীন ধাতু রোগ-বিনাশ-করে “পরিহৃত” রূপে ব্যবহৃত হইত।

অথর্ববেদের পর “রত্নসংহিতা”, “অভিনীকুমার সংহিতা”, ও “অম্বেহ সংহিতা” এবং অগ্নিবিশ, তেল, জাতুকর্ণ, পরাশর, কারপানি ও হারিত্যুত সংহিতা সকল চরকেত পুর্বে লিখিত হইয়াছিল। চরকসংহিতা তন্ত্র অপর সংহিতাগুলি এখন লুপ্ত হইয়াছে। এই আয়ুর্কৌশল যুগ খ্রীষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রাক্কালে আরম্ভ হইয়াছিল। “আয়ুর্কৌশল ও নব্য-রসায়নের” তৃতীয় পরিচ্ছেদ-পাঠে এই আয়ুর্কৌশল যুগের কতকগুলি তুল্য কথা ধ্যানিতো পারা যায়। আয়ুর্কৌশল যুগে যেসকল পাই মন্ত্রবর্ণের বখেই উন্নতি হইয়াছে। নানাপ্রকার আমল, ক্ষীণ, মস্তুর উষ্মে চরক ও হস্ততে পাওয়া যায়। দৌবীর-কাত্তিক, ধাত্তর, ত্র্যম্বক (Vinegar) আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ষ, রোগ্য প্রভৃতি ছয় ধাতু ধাতুগুণের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ আবিষ্কৃত ও পতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়া উৎসর্গে ব্যবহৃত হইতেছে। হীরক, এবাল, সুতা প্রভৃতি রত্নবর্ণিত উৎসর্গে ব্যবহৃত হইতেছে। গন্ধকের ব্যবহারও চরক ও হস্ততে আছে। পদ্মলবণ ও দুই কার এবং সোহাগা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বনকার (Carbonate of potash) এবং সর্জিকাফার (Carbonate of Soda) বিভিন্ন পদার্থ বলিয়া বীজিত হইয়াছে। হস্ততে বৃদ্ধ, মধ্যম ও তীক্ষ্ণ ক্ষয়ের প্রস্তুত-প্রক্রিয়া বেশ বিশদভাবেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। হস্ততে ও বাগডাটে পারদেরও উল্লেখ আছে। চরকেত ধাতুর আভ্যন্তরিক প্রয়োগ দৃষ্ট

হয়। হস্ততে ধাতুর অপরূপিত পরবর্তী কালের ধাতু মারনের পূর্ণাভাব দিতেছে।

তাত্ত্বিক যুগে ভারতের প্রাচীন রসায়নের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। নাগার্জুনবের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া তিথ্যকপাতন, উর্ধ্বপাতন, অধঃপাতন, ধাতুর শোধন, জারণ মারণ প্রভৃতি বিক্রিয়া-প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বিবিধ ধাতুর অলকগুলি নূতন নূতন যৌগিক (Compound) এই সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছিল। কালো সাল্ফাইড অব মার্কারি (কজলী) লোহিত সাল্ফাইড অব মার্কারি (Red sulphide of mercury), রঙ্গসিন্দূর, বর্ণসিন্দূর, কেমোসেল (রঙ্গকর্ণ), ফেরিক অক্সাইড (ferric oxide; পুষ্টিত লৌহ), সাল্ফাইড অব কপার (sulphide of copper; মারিত তাম্র), অক্সাইড অব জিংক (oxide of zinc; মারিত বর্ণদ), অক্সাইড অব লেড (oxide of lead; মারিত মীসক) আর্সেনাইট অব পটাশ (arsenite of potash; হরিতাল ভস্ম), প্রভৃতি বিবিধ যৌগিক এই সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। নাইট্রো—হাইড্রো ফেরিক অম্ল (nitro hydrochloric acid সর্পস্রাব, বিড), সলফিউরিক এসিড (গন্ধক বা তেজাব) প্রভৃতি অজৈব অম্লও আবিষ্কৃত এবং উৎসর্গে দেখিত হইত। ত্র্যম্ব অম্লের মধ্যে এক ধাত্তর (vinegar) তন্ত্র, অম্ল অম্ল আবিষ্কৃত হয় নাই। ধাতু সকলের প্রস্তুত-প্রক্রিয়া (metallurgy) বেশ বিশদভাবেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গ্রন্থকার চতুর্থ হইতে চতুর্থ পরিচ্ছেদে প্রত্যেক ধাতুর প্রাচীন ইতিহাস, প্রস্তুত-প্রক্রিয়া, শোধন ও মারণ-প্রক্রিয়ার রাসায়নিক ক্রিয়া আলোচনা করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠ করিলে আমাদের রসায়ন জ্ঞানের অতীত গৌরব-কথা স্মরণ করিয়া, ক্ষম্যে প্রাণ, আবেগ ও আনন্দের সঞ্চার হয়। আমাদের প্রাচীন বৈজ্ঞানিক কীর্তির কথা বাঙালি ভাষায় প্রকাশ করিয়া পকানন বাহু আমাদের ভাষার মৌলিক বৃদ্ধি করিয়াছেন।

ঐক্যপঞ্জনাথ বসু।

স্মৃতিচরিতা

(উপহাস)

প্রথম ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমরা কে ?

ঐখানে সে শুইয়া আছে,—আগেককার মত এখনও তেমনি রূপসী! মাঝে মাঝে আমি ভই পা আগাইয়া বাইতেছি আর মৌন বাতনায় তার সুখের পানে চাহিয়া দেখিতেছি। কাল তাহাকে আমার কাছ হইতে এক্ষণের মত ছিনাইয়া লইয়া বাইবে, আর আমি একাকী পড়িয়া থাকিব, একাকী! আজ সে আছে ঘরের ভিতরে, মেঝের উপরে; কিন্তু, কাল সে থাকিবে তুহিন-শ্রুতল কবরের আধারে, শাদা কাপড়ে ঢাকা।

এমন কবরটন কেমন করিয়া ঘটিল, কে জানে! ভাল করিয়া বুঝিবার অজ্ঞ এই বখাটা লইয়াই ক্রমাগত মনে মনে নাড়াচাড়া করিতেছি। বেলা ছয়টা হইতে ক্রমাগতই কাটিতেছি আর ভাবিতেছি, কিন্তু একাত্তাবনার ত কোন কুল-কিনারা পাইলাম না! সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া আর-একবার ঠিক পরে-পরে সাঙাইয়া গেলে বোধ হয় একটা কিনারা হয়।—কিন্তু এ কথা বতই জাবি, ততই যে খেট হারাইয়া ফেলি। তবু একবার গোড়া হইতেই হুক করিয়া দেখি।.....

প্রথম দিন সে আমার কাছে সহজভাবেই আসিয়াছিল।

জিনিষ বহুক রাখিয়া কিছু টাকা ধার লওয়াই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। আর-আর সকলকরি সঙ্গে তাহার যে কোন তকাৎ আছে, প্রথমবারেই আমি তা বুঝিতে পারি না। কিন্তু, ক্রমেই তাহার বতাবের বিশেষত্ব অরে-অরে বুঝিয়াছিলাম।

সে সময় তার চুলগুলি মেঘমেঘ মত চিকণ ও সরু, গড়নটি বেশ পাতলা ছিপছিপে ছিল। দেখিলেই বুঝা বাইত মেয়েটি বড় লাজুক। টাকা পাটলে সে আর পিছন-পানে চাহিত না—মাথাটি হেঁট করিয়া আঙুলে আঙুলে বাহির হইয়া বাইত। বেশী কথা সে একটিও কহিত না, বহুকো জিনিষের দাম বাড়াইবার অজ্ঞ অজ্ঞ লোকে আমার সঙ্গে বর-দস্তুরি করিত বিলম্ব, সে কিন্তু অল্পেই তুষ্ট হইয়া চলিয়া বাইত।

যে জিনিষগুলি সে বাধা দিতে আনিত, সেগুলি এমন খেলো ও কম-বাসের যে আমি আশ্চর্য্য হইয়া বাইতাম। আমার বিশ্বাস, জিনিষগুলি যে খেলো, এটা সেও জানিত; কিন্তু তার সুখের করণ জাবি দেখিয়া মনে হইত, সেগুলি যেন তার বুকের নিধি। পরে শুনিয়াছিলাম, সুস্থ্যর সময় তার বাপ-মা এগুলি তাকে শেখ-উপহার দিয়া গিয়া ছিলেন।

একদিন সে পুরণিণা পরশ্রমেশ্বর
গোবের একখানি কঘল লইয়া আসিল।
জিনিষটার চেহারা দেখিয়া আমার
মেজাজ চটগা গেল, দু-চারিটা কড়া কথা
না শুনাইয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমার কথার তার সেই বড় বড়
নীল চোখটি একবার জ্বলিয়া উঠিল।
সে একটুও কথা কহিল না—কঘলখানি
লইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। সেই প্রথম—
তার চরিত্রের একটা দিক দেখিলাম।

কিন্তু সব-চেয়ে আমাকে বেশী মোহিত
করিয়াছিল, এই অপরিচিতা স্ত্রমরীর তরুণ
যৌবনজীতু। তার বয়স তখন বোলের কিছু
বেশী—কিন্তু দেখিতে সে ছিল চৌদ্দ বৎসরের
কিশোরীর মত।

এই ঘটনার পর দিনেই সে আমার
আমার দোকানে ফিরিয়া আসিল। পরে
জানিয়াছিলাম, আমার দোকান থেকে
বাহির হইয়া আরও দু-জায়গায় তার
পূবাণে কঘলখানি সে বাধা দিতে গিয়াছিল;
কিন্তু কোনই ফল হয় নাই; কারণ,
বাবের কাছে গিয়াছিল তারা কেবল
সোনা-রূপারই কারবারী।

আজ সে কাঠের একটি পাইপ
আনিয়াছে। জিনিষটি দেখিতে দিয়া বটে,
কিন্তু আমি সোনা-রূপার কারবারী,—কাঠের
পাইপে আমার কাজ কি?

তবু, জিনিষটি আমি লইলাম। কিন্তু
একটু বিরক্তির সহিত বলিলাম, “আমি
সুদু—তোমার জেগেই—এটা নিলাম জেনো।
বাবের সোনা-রূপার কারবার, তাদের আর-
কেউ এটা নিত না।”

“তোমার জেগেই”—এই কথাগুলির
উপরে বিশেষ করিয়া জোরে দিলাম।

আমার কথা শুনিয়া তাহার চোখগুলি
আবার তেমনি জ্বলজ্বলে হইয়া উঠিল।
তবে, মেনিনকার মত আমি সে আমার
টাকা কिरাইয়া দিল না। বরং আবেগে
জ্বলিতে জ্বলিতে টাকান্তি লইয়া সে বাহির
হইয়া গেল। কারণ—কারণ আর কি,
নারিত্রা! আমার কথার মেয়ে বড়ই আহত
ও জ্বল হইয়াছে, তাতে আর সন্দেহ নাই।

সে চলিয়া গেলে আমি নিজে
নিজেই জিজ্ঞাসা করিলাম, “খামুকা দু-দুটো
টাকা খরচ হয়ে গেল বটে—কিন্তু আজ
যে বাহ্যজরিসে করা গেল, তাতে এ
খরচটা কি সার্থক হবে না?” আমি খুব
একচোট হাসিয়া লইলাম।

“এমনি করিয়াই আমাদের পরিচয়ের
সুত্রপাত।” ইহার পর, আমার সে কবে
আসিবে, অত্যন্ত অধীরভাবে সেই আশার
রহিলাম।

তারপর যেদিন সে আসিল, প্রথম
ঘনিষ্ঠতার সহিত আলাপ জুড়িয়া দিলাম
যে, নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম।*

লেখাপড়া ও আদব-কায়দার আমি
তৈরি ছিলাম। দেখিলাম, মেয়েটি বেশ
ভদ্র। সেদিন সে আমার কাছে বিশেষ
কিছু প্রকাশ করিয়া বলে নাই; কিন্তু
পরে তার মুখে শুনিলাম, সে কোন
ভদ্র পরিবারে গৃহ-শিক্ষিত্রী হইবার
জন্ত খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছে।
তার সাংসারিক অবস্থা শোচনীয়।
সে মাহিনা চায় না, খাইখরচ ও বাসা

পাইলেই একরকম কষ্টেফটে তার চলিয়া যাইবে। কিন্তু বিজ্ঞাপন দিও আজ পর্যন্তও সে কোন কাজের যোগাড় করিতে পারে নাই।

আমি আর-একবার তাহাকে বুঝিয়া লইবার জন্য তাক্কীলোর সহিত বলিলাম, 'তার চেয়ে তুমি কেন দানীপনার চেষ্টা কর না! তাহলে ঠিক কাজ পাবে।'

আবার তাহার চোখে বিভ্রাৎ ঝকিল, —'আবার সে আমার ঘর ছাড়িয়া নীয়ে চলিয়া গেল।—যাক্কে, ভাঙটা কিসের? আমি বৈ তাহে ত আর গতি নাই, ঘরের কড়ি বাহির করিয়া তাহার অকেজো, রকী দালগুলো আর কেহই রাখিবে না। জাহাকে আমার কাছে আবার আসিতে হইবেই।'

ভাই! তিনদিনের মধ্যেই ফের সে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু সেদিন তার চেহারা যেন ভাগি-মাড়া! বুঝিলাম একটা কিছু ঘটয়াছে।

আজ সে একটু রূপার গিল্টি-করা দেবী-মূর্তি বহুৎ রাখিবার জন্য আনিয়াছে। জিনিষটির আসল দাম বড়-জোর ছয় টাকা মাত্র।

মূর্তিটি তাহার হাত হঠতে লইয়া বলিলাম, —'এর জন্যে আমি তোমাকে দশ টাকা দিতে পারি।'

—'না, আমি দশ টাকা চাই না—আমাকে পাঁচটি টাকা দিন, মূর্তিটি আমি আবার টাকা শোধ করে ফিরিয়ে নিবে বাব।'

—'সে কি! দশ-দশটা টাকা, নেবে না

কি বল! আর, এর দাম ত দশ টাকার কম হবে না।'

আবার তাহার নয়নে বিভ্রাৎ! সে কোন উত্তর করিল না। আমি তাকে পাঁচটি টাকাই দিলাম।

বলিলাম, 'গরিব বলে কারকে আমি দূণা করি না। আজ আমি এই ব্যবসা করছি বটে, কিন্তু একদিন আমিও গরিব হিলাম— এমন-কি, তোমার চেয়েও।'

সে একটু ভিত্তি হাসি হাসিয়া বলিল, 'আজ এই ব্যবসারে মেখে তাই বুঝি আপনি গরিবের উপর গারের ঝাল মিটরে মিচ্ছেন?'

আমি মনে মনে বলিলাম, 'হ, পথে এস,—তুমি' বে কেমন মেয়ে, ক্রমেই জা বোকা যাচ্ছে'—একান্তে বলিলাম, 'না, তা কেন? খারী ভাল হবে ভেবে শোকের মল করতে পার, আমি হচ্ছি সেই মলের মাহুদ।'

সে কহিল, 'আপনার কথা বোকা তার। কিন্তু আপনি যে কথাগুলি বলেন, আমি যেন এর আগে অমনি কথা আর কোথাও শুনেছি।'

'তুমি কি 'কষ্ট' পড়েছ?'

—'পড়েছি, তবে খুব মন বিরে নয়।'

'কথাগুলি 'কষ্ট' আছে। বইখানা ভাল করে পড়ো। হ,—তুমি বে হাস্ছ? তাবছ বুঝি, নিজেকে আমি বিধান বলে জাহির করছি?' এ তোমার জুল।'

'আপনি ত বড় ফাংসাদে লোক দেখছি! আমি ওসব ভাবতে পার কেন?'

আমি বলিলাম, 'সব কাজেই সকলে

পরের ভাল কর্তে পাবে। আমার নিজের কথা ধরছি না—আজ্ঞা, মনেই কর, আমি যদি পরের মন্দই করি, তবু—”

আমাকে বাধা দিয়া, তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে একবার চাহিয়া সে বলিল, “তবু সবশেষে সব জায়গায় শোকের ভাল কর্তে পারা যাবে।”

হার রে, সেদিনের সব কথা ছবির মত আজ আমার মনে জাগিয়া উঠিতেছে। সেদিনকার ঐতি মুহূর্তটি আমার স্মৃতির উজ্জানে ফুলের মত ফুটিয়া আছে।

যখন সে চলিয়া গেল, তখন মন স্থির করিয়া ফেলিলাম। বোম্বের লইয়া তাহার জীবনের কোনো কথা জানিতে বাকি রাখিলাম না।

কি ধ্বংসের জীবন তাহার! এমন শোচনীয় দারিদ্র্য গোপন রাখিয়া কি-করিয়া যে হাসিমুখে সে আমার সঙ্গে আলাপ করিত, কিছুতেই তা ভাবিয়া উঠিতে পারিলাম না। হাঁ, তাহার একটি অঙ্গ আছে—যৌবনের সামর্থ্য তাহার সহায়। অত্যাশীষ আশার জীবনের সামনে যৌবনই আলোর প্রদীপ ধরিয়া আছে।

আমি তার কথা ভাবিতে লাগিলাম। সে আমার—একাত্তই আমার। তাকে আমার মূঠার মধ্যে পাইয়াছি।

কিন্তু—এলব ছাইভস্ম কি বলিতেছি? আমি যদি এমনি আজ-বাজে কথা ভাবিতে থাকি, তাহা হইলে চিন্তার ত কোন অন্ত পাইব না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ-প্রস্তাব

তাহার জীবন-কাহিনী দু-কথার শেষ করা যায়।

আজ তিনশছর হুইল, তার বাপ-মা পরলোকে। সে এখন দুই পরিব খুড়ীর সংসারে আছে। খুড়ীদের একজন দুইটি লম্বান লইয়া বিধবা; আর-একজন কুত্ৰী, বৃদ্ধা, চিরকুমারী। তাহার পিতা ছিল কেরানী।

দেখিতেছি, ভাগ্যলক্ষী আমার সহায়। আমি তাদের চেয়ে ভাল ঘরের ছেলে। তদ্রবংশে আমার জন্ম, সংপ্রতি কাশ্মীরের পদ হইতে জীবসর লইয়া বাধীন ব্যবসা করিতেছি।

গত তিন বৎসর এই অসহায় বালিকা তাহার খুড়ীদের সংসারে দানী-বানীর মত কারজ্ঞেপে আছে। অথচ এমন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির ভিতরেও সে বিজ্ঞানসম্মত পণীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। সংপ্রতি খুড়ীর মেয়ে-ছেলেদের লেখাপড়া শেখানো, কাপড় শেলাই করা, ঘর-বার পরিষ্কার করা—সংসারের যত কাজ সব তার মাড়ে চাপানো হইয়াছে। চম্টা দিয়া তাহার উপর দার-ধরও করা হয়। আমার খুড়ীরা তাহাকে বিক্রয় করিতেও চায়! তাহার নিজের মুখেই আমি এ-সব ব্যাপার জানিয়াছি, শুনিয়াছি।

তাদের পানের বাড়ীতে একটা মোটা মোকানো থাকিত। পর পর দুই-তাইটা ক্রীকে কবরে পাঠাইয়া সে যখন তৃতীয় শিকার

খুজিতেছিল তখন এই অস্তাগীর উপর তাহার নজর পড়ে।

পক্ষাণ বছরের সেই বড়ো দোকানীটা বালিকার খুজীনের কাছে গিয়া বিবাহ-প্রস্তাব করিল। ভয়ে বালিকার প্রাণ উড়িয়া গেল। এই সময়েই সে অজ্ঞাত চাকরির আশায় কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছিল। বিজ্ঞাপনের পরচের কল্লট সে তাহার সমাজ জিনিস-গুলি আবার কাছে নদক রাখিতে আসিত।

সন্ধ্যার সময় আমি তাহার বাড়ীতে গিয়া ঐ লুকেরিচাকে ডাকিলাম। এই দ্বীপের কাছ হইতেই আমি বালিকার সব খবর পাটয়াছিলাম। লুকেরিচার মুখে শুনিলাম, সেই মোটা দোকানীটা বাড়ীর ভিতরে বালিকার পাশে বসিয়া আছে।

লুকেরিচাকে বলিলাম, “হেরেটির কাছে গিয়ে কাশে কাশে বলে এসগে, একটা দরকারি কথা জানাবার জন্তে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি।”

লুকেরিচার সঙ্গে বালিকা বাহির হইয়া আসিল। আমি কোনরকম ইতস্তত না করিয়া স্পষ্টাঙ্গাটি “বালিকাকে বলিয়া দিলাম যে, বাহ্যতে তাহার স্বপ-বাক্যের হয় সর্বদাই আমার সেট চেষ্টা। আমি খুব চালাক-চতুর লোক নই, হরত তেমন সবও নই—আর লেখাপড়তেও আমাকে মজা একটা দিগ্‌গজ বলিতে পারা যায় না। আমার সঙ্গে বিবাহ হইলে হৃদয় সে তেমন খুসী হইতেও পারিলে না; কারণ, আমি তাকে ভাল কাপড়-চোপড়ও দিতে পারিব না, বা খিচোর ও বশনাচেও লইয়া দ্ব্যইতে পারিব না—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমল কথা, আমি যে নিজে একজন মজা উত্তম লোক, বিবাহ-প্রস্তাবের ভিতরে এমন তাব আমি দুগাফেরেও প্রকাশ করি নাই।

সে যে আমাকে খুব-বেশী পছন্দ করিত না, তা আমি বেশ বুঝিতাম। কিন্তু সেই মোটা দোকানদারটাকে সে যে আমার চেয়েও টের-বেশী অপছন্দ করে, ইহাও আমার জানিতে থাকি নাই। সুতরাং আমাকে সে নিশ্চয়ই তাহার মুক্তিলাভা বলিয়া ভাবিবে।

কিন্তু আমাকে বিবাহ করিলে যে তাহার স্বপের সীমা থাকিবে না, এ কথাটা আর কোন মুখে বলি? তাই সোকাহুজি বলিলাম, “এ বিবাহে আমারই বেশী লাভ—তোমার নয়।”

যাহা হউক, শেষ-বরাবর আমারই জিৎ হইল। দরকার কাছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তরুতাবে ঘাড় হেঁট করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সে ভাবিতে লাগিল; তারপর আনমনে মূগ্ধ, অশ্রুটপরে আপনা-আপনি বলিল, “হঁ।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি বল?”
স্বপ্নোন্মিতের মত মাথা তুলিয়া দীর্ঘশ্বরে সে বলিল, “আঁ।?—কি?.....হঁ, দাঁড়ান, আমাকে ভাবতে দিন।”

তার ছোট মুখখানি গভীর,—এত গভীর যে, আমার সম্মুখ হইতেছিল! তবু মনে একটা আঘাত পাইলাম। সে কি ভুলনা করিয়া দেখিতেছে আমি ভাল, কি ঐ দোকানদারটা ভাল?—হায়, আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম, ভুল বুঝিয়াছিলাম। আজও সে ভুল বুঝি তাকে নাই।

থাক্,—আমি তার মত অপাইলাম।

মনে পড়ে, আমি যখন চলিয়া আসি, লুকেরিয়া তখন রাস্তার দুটিয়া আসিয়া উল্লাসে কামাকে বলিয়াছিল, “আপনি আমাদের দ্বিদিমণিকে বাঁচাণেন, ভগবান আপনার ভাল করবেন মশাই! কিন্তু দ্বিদিমণিকে কোনদিন যেন এমন কথা বলবেন না—বড় অভিমানী তিনি!”

অভিমানী? বেশত, অভিমানী রমণীকেই আমি বেশী পছন্দ করি। রমণীকে বলে জানিতে না পারিলে রাগ হয়,—কিন্তু নম্রের সময়ে রমণীর অভিমান বড় মধুর।

হী, আজও আমার ভাল ভাঙে নাই। যখন সে শুক, চিন্তাধিত হইয়া দরবার কাছে দাঁড়াইয়াছিল, তখন সে ভাবিতেছিল কি? “সেখনি, এ-দুঃখনের বার সঙ্গেই আমার বিবাহ হোক, আমি ত খুবী হতে পারুবই না। বরং ঐ ‘হুস্মন মোটা দোকানদারটাকে আমি যদি বিয়ে করি, তাহলে ও মাতাল হয়ে এসে হঠাৎ একদিন আমার গলা টিপে ধরে এই হুঃখের চনিয়া থেকে তাড়াতাড়ি রেহাই দিতে পারে!—হুদিকেই হুঃখ, তবে কোন্ হুঃখকে আমি বরং করব?”

আমাদের দুঃখনের ভিতরে ভাল কে,—এখনও এ প্রশ্নের সীমাংসা হয় নাই।—তাই কি? না—না, প্রশ্নের অলস্ত উত্তর এষ্ট যে আজ মুস্তিমত হইয়া ঘরের ভিতরে মেজের উপরে পড়িয়া আছে। তবে আমি কোন্ মুখে বলিতেছি, ‘এখনও এ প্রশ্নের সীমাংসা হয় নাই’?

এখন আমার কি হবে?—কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না যে! বড়ই মাথার যাতনা—এখন খুসাইতে বাট, খুসাইতে বাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অবিস্বাসের রান্না হাঙ্গি

আমি খুসাই নাই! এই নীচতা, এই ঘটনার কথা যখন আমি ভাবিতে গিয়াছি, তখন মাথার ভিতরে যেন অগুনত অলিয়া উঠিয়াছে। কি মলিনতায় মধ্য হঠতে তাহাকে আমি উদ্ধার করিয়াছি, অন্তত সেটা ভাবিয়াও আমার প্রতি তাহার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ছিল। যদিও, তখন আমার বদন একচোঁস, তার ছিল বোল।

বিবাহে কোন ঘটনা হইল না। ঠিক করিলাম, বিবাহের পর আমার কর্মস্থল মক্কা হইবে। কিন্তু আমার স্ত্রী তাতে বাধ্য ছিল। সে বলিল, বিবাহের পর আমি তার খুড়ীদের—যে খুড়ীদের গ্রাম হঠতে তাকে আমি উদ্ধার করিলাম—সেই খুড়ীদের কাছে গিয়া থাকিব। তাকে বিত্তর বুসাইলুম, সে কিছুতেই বোঝ মানিল না। সেখনি আমি তার খুড়ীদের হাত করিবার ফিকিরে রহিলাম। কিন্তু ঘটক-না সেই ধড়িবাগ খুড়ীহটোর হাতে মগদ একশোখানি টাকা সন্নিয় দিলাম, ততক্ষণ অবধি তারা কোন-মতেই গান্ মানিতে চাহিল না। বাহা হউক, এ ব্যাপারটা আমার স্ত্রীর কাছে আর ভাবিলাম না; কারণ আমার নীচতার কথা জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই সে আমাকে ঘৃণা করিত।

প্রথম হঠাৎই ফুলভারনত লতার মত
শ্রেমভারে সে আমার উপরে একেবারে
হুইয়া পড়িয়াছিল। সন্ধ্যাবেলা আমি যখন
দিনের কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিতাম, তখন
সে পুনর্বে উজ্জ্বলিত হইয়া আমার কাছে
ছুটিয়া আসিত। স্তরস্তর আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে
আমাকে তার শৈশবের, তার যৌবনের,
তার শিশুভাব, তার বয়স-বাড়ীর
কত কাহিনী সে অনবরত বলিয়া যাতিত।
হার, সরল নিষ্পাপ প্রেমের সে অর্ধদুট
ভাষা কি মধুর!

কিন্তু এ আনন্দের ভাষাকে আমি
আমোল দিতাম না।—আমার পড়াবটা
এমনি আশ্রয় ছিল।

আগন্তুক সে কথার পর কথা কহিয়া
“বাইত, আমি কিন্তু একেবারে চুপচাপ
থাকিতাম। শিউই সে বুকিল, আমরা চমকে
হুই ধরণের লোক—আমার ভিতর সহস্র
সমস্যা নাই।

সকল বিষয়েই আমি কঠোর নিয়মের
পক্ষপাতী ছিলাম। কিন্তু কেমন সহজেই
সে আমার সমস্ত কঠোরতা ভাঙাইয়া দিত।
আমি কিন্তু কিছুতেই অজ্ঞারকে প্রেরণ দিতে
পারিতাম না, আমি চাই, শৃঙ্খলা!

কিন্তু কি-করিয়া আরম্ভ করি?
আমাদের সংসারের জীবন কেমন ছিল,
তাহা বুঝানো বড় কঠিন।

আমার জী বলিত, টাকাকে সে ঘূণা
করে। আর আমি বলিতাম, টাকাই সব।
বতকপনা সে বাধ্য হইয়া চুপ করিত,
ততকাল আমি তাহার কথাই প্রতিবাদ
করিতাম। সে তার বড় বড় চোখদুটি

বিশুয়ে বিস্ফোজিত করিয়া আমার মুখে
অর্থের গুণগান গুণিত। তার প্রশ্নটি ছিল
উদার; কারণেই আমার মত সংসারসম্বন্ধ
লোকের প্রতি প্রচার্য্য তাহার পক্ষে নক্ত।

এখন, এমন নারীকে কেমন করিয়া
আমার পেন্সনের ব্যবসার কথা খুলিয়া
বলি? ক্রোড়েই আমাকে সব চাপিয়া বাইতে
হইত। পেটের কথা সচজে আমার জিন্তে
আগার আসে না—এটা আমার মস্ত গুণ।
এট গুণটির স্তম্ভ জীবনের অনেক ঝড়-ঝাপটা
আমি হাসিমুখে সহিতে পারিমাছি।

• এদিকে ষোল বৎসরের এই ছোট্ট
বাঁশকাটি লোকের কানাতুখা শুনিয়া আমার
হুই-চারিটা গুপ্তকথা কল্পনে আবিকার
করিয়া ফেলিল।—সে স্থির করিল,
আমার জীবনের সকল রহস্যট বুকি
ধরিয়া ফেলিগাছে। তবু আমি কিছুতেই
ঘোমস্তর ভাঙি নাই—আজ অবধি নয়।

মার্ছ'কি সেমাকী জীব!

আমার চরিত্র যদি সে বুকিতে চাহে—
বুঝুক না। কিন্তু বদলোকেস কানাকানিতে
কেমন?—নিজের বুদ্ধির জোরেই তাহাকে
বুঝিতে হইবে। বুকিরা, আমাকে সে
চিহ্নক।

তাকে একদিন বেশ সঙ্গতিভ-ভাবে
সোজা-হুজি বুঝাইয়া দিলাম, “দেখ,
যৌবনের গর্বে মধুর আছে বটে, কিন্তু তার
দাম একটি কানাকড়ও নয়।”

যৌবন শু-বিনাক্রেশে অর্জুন করা
যায়। তাহাতে জো জীবন-মরণের
লড়াই নাই। কিন্তু অর্থলভের স্তম্ভ
আমাকে সাজাজীবন বড় করিতে হইয়াছে।

প্রথম এখন আমার সঙ্গে খুব তেজস্বে
সে তর্কবিতর্ক করিত। তারপরে ক্রমেই
কথাবার্তী কমাইয়া আসিল—আমার ঘরের
পানে চোখ তুলিয়া সে হৃদয় শুকু বিষয়ে
কথা শুনিয়া বাইত। কেবল, তাহার ওষ্ঠাধরে
অনিবাসের একটা স্নান হাসি মাগানো

ধাকিত—সে-রকম হাসি আমি দু-চোখে
সেঁতে পারিতাম না। মুখে এমনি হাসি
লইয়াই সে বসকল্পা করিতে আসিয়াছিল।
আমার বাড়ী ছাড়া আর কোথাও তাহার
দাঁড়াইবার ঠাঁইও ছিল না!

কমল
ঐহেনেকুমার রায়।

চয়ন

ফেডর ডোটোয়েভ্‌স্কি

কল ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে বাস্তব
উপন্যাস রচনার, ফেডর ডোটোয়েভ্‌স্কির
নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বাস্তবতা কল
ঔপন্যাসিকগণের স্বাভাবিক ধর্ম হইলেও,
ডোটোয়েভ্‌স্কির মতন এত নিবিড়ভাবে
আর কোন কল-লেখক বাস্তবতাকে আরম্ভ
করিতে পারেন নাই।

টলষ্টয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে আসিয়া দেখা
দিয়াছিলেন, গুরুমশাধের সঙ্গে; কিন্তু
ডোটোয়েভ্‌স্কি সে ধার দিয়াই যান নাই।
তাঁহার সহযোগী ঔপন্যাসিক শেখত (গত
আখিনের ভারতীতে দেখন্তের একটু গমের
তর্জমা বাহির হইয়াছে), রক-ব্যন্ডে মত্ত
ওস্তাদ ছিলেন; ডোটোয়েভ্‌স্কির লেখার
এ-রকম হাতরসও নাই—অথচ তাঁহাকে
দুঃখবাণীও বলা চলে না। কারণ, অন্ধকার
বেধানে স্ট্রীভেজ, সেখানেও তিনি আশার
বাড়ী দেখিতে পান; তাঁহার স্ট্রীভেজ অধঃপতিত
মানব-আত্মার ভিতরেও পুনরুত্থানের একটা

মধুর সম্ভাবনা পাওয়া যায়। তাঁহার মতে,
জীবনের সকল জীবাণুগা প্রেমের বিহীন প্রলেপে
জুড়াইয়া যায়; প্রেমহীন মহাপাণীও উদ্ধার
লাভ করে—ডোটোয়েভ্‌স্কির রচনার পরতে
পরতে প্রগীর্ণ প্রেমের এমনি মহামহিমার
অঙ্গুর ধারা বহমান। তাঁহার Crime and
Punishment ও Letters from the
Underworld নামক উপন্যাস-দুখানিতে এই
সকল গুণ সর্বশ্রেষ্ঠরূপে জগত
করিলে।

টলষ্টয় ছবি আঁকিয়া সকলের চোখে-
আনুগ দিয়া দেখাইয়া দেন যে, ছবির
কোথায় কি নৈতিক উপদেশ আছে;
কিন্তু ডোটোয়েভ্‌স্কির কাব্যপ্রণালী সম্পূর্ণ
বিস্তৃত; তিনি কেবল চিত্রাঙ্কন করিয়াই
ক্ষান্ত হন—চিত্র ও দর্শকের মধ্যে
শিক্ষকের মত যথার্থতা করিতে চান না,
—তাঁহার ইচ্ছা তিনিই তাঁহার ছবি
দেখিতে, নিজের খুশি মত যেমন বুঝিযাছেন

ভেমন ভাবিতে পারেন। দর্শকে তিনি স্বাধীন চিন্তাশক্তি ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করেন।

ডোন্টোয়েভ্‌স্কির প্রেমবাদেও একটু আলাদা ধরণ আছে। সমাজের নিয়ন্ত্রণে বাহারা বিচরণ করে, বাহারা মাতাল, বাহারা বোগী, বাহারা রূপণ, বাহারা সারবিন্তা—ডোন্টোয়েভ্‌স্কির গ্রাণ সর্বদাই তাহাদের লজ্জা বাধিত, তাহাদের অন্য কাঁধিগা আঁকুল। পদত, তাঁহার স্বজিত চরিত্রগুলি বাহিরে ছোট চইলেও ভিতরে বড়,— তাহাদের অনেকেরই চিত্তে অতৃপ্ত প্রেমের কন্ড সকলের অদাক্ষতে বহিরা বাইতেছে—তাহাদের কেহ প্রেম-বিনা পাগল, কেহ প্রেমের আবাস পাইয়া পাগল। তাহাদের কেহ বলে, “শৈশবে আমি যদি বাপ-মায়ের ভালবাসা পেতাম আজ তাহলে আমার এমন দুর্দশা হোত না।”—তাহাদের কেহ পিতা,—“সেহে তিনি চোঁড়াখোঁড়া ময়লা, পুরাণো কাপড় ছাড়া আর কিছু পয়েন না, অঞ্চ নিজে ঘেঁষে সুখেয় লজ্জা তিনি অন্নানুখে রাগীর পোষাক তিনিয়া দিতে পারেন.....ঘেঁষে যুখ চাহিয়া তিনি জিহাৱী হইতেও প্রস্তুত.....প্রতিমানে তিনি যদি কজার ওঠ হইতে একটুখানি প্রেমের হাসি পাম।”—তাহাদের কেহ বলে, “যেখানে প্রেম নেই সেখানে জ্ঞানও নেই”—কেহ বলে, “দীর্ঘ হরে যে ভালবাসতে পারে, জীবন তার কাছে আনন্দের মত”,—কেহ বলে, “প্রেম হচ্ছে সকল রত্নের পেয়া রত্ন, নিখিল বিধ এই প্রেমের ভিতরেই কেন্দ্রীভূত.....প্রেমের লজ্জাই বাহু আঁঘদান

করবে—প্রেমের প্যারেই সে হাসিমুখে জীবন বিকিয়ে দেবে।”—ডোন্টোয়েভ্‌স্কির একখানি উপন্যাসে, এক নরবেদী লম্পট আর—একজন সমাজতান্ত্র হস্তাগাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, “মনে একবার ভাব দেখি, তুমি যদি তোমার বুকের ভিতরে একটি নাছোড়বান্দা ছোট্ট বোকারে পেতে, তাহলে কি তোমার আজ এমনিধারা হাল হোত?.....হামো, স্ত্রী আর খোকা, এই তিনে-যখন এক হয়ে—একেবারে এক—গ্রাণ হরে বাগ, তখন যেমন সুখ পাওয়া যায়, তেমন সুখ কি আর আছে?”

অনেক ঔপন্যাসিক, কেতাবী বাস্তবতার অনুসন্ধান। পৃথিবীর নিত্য-নৈমিত্তিক জীবন ঘটনাগুলি তাঁহারা কল্পনার দেখিয়া রচনা করেন। ডোন্টোয়েভ্‌স্কি সে-প্রশ্নের লেখক নন। সংসারের নরক বাহাকে বলে,—ডোন্টোয়েভ্‌স্কি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন,—সে দেখাও কেবল নিলিপ্ত দর্শকের দেখা নয়—অমনি এক নরকে বন্দী বাসিন্দা হইয়া, নত নত সমাজতান্ত্র নষ্টোয়ার লকে তিনি নৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিলেন। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করিয়া, উজাসনে উপবিষ্ট সমাজপতিগণের সম্মুখে তিনি নরকেয় উজ্জল চিত্র আঁকিয়া লিঙ্গাস্য করিয়াছেন,—“এ ছবি দেখিয়া সমাজ কি বলিতে চায়?” সমাজের কোন বিশেষ প্রশ্নের উপরে তিনি দোষারোপ করেন নাই,—তিনি নিজে বাহা দেখিয়াছেন, দর্শকে ডাকিয়া আনিয়া তাহাই দেখান এবং দেখাইয়া তাহাদের মত লিঙ্গাস্য করেন। সভ্যতার যে কত অপরাধ, কত

চিত্র, কত কুস্ত্রতা, সমাজের যে কত অসম্পূর্ণতা, কত ক্রটি-বিচ্যুতি, কত অসংলগ্নতা, সংসারের পিচ্ছল পথে অভাবের তাত্ত্বনাহ, ধর্মীর অভ্যাচারে, মাদ্রুঘের হীনতার মাদ্রুঘ যে কত নোচে ধাপে-ধাপে নানিরা যায়, ডোষ্টোয়েভ্‌স্কির অস্তিত মানব-প্রকৃতির বাস্তব আলোষণা নিখুঁতরূপে তাহা চিত্রিত। তাঁহার ছবিগুলিকে বিশ্লেষণের ছবি, কিশোর ছবি, বলিষ্ঠ কুজু-ভাঙ্কোণ্য করিলে চলিবে না—কারণ সেগুলি কেবল কিশোর চিত্র নহে—সেগুলি সমস্ত পৃথিবীর আধুনিক সামাজিক জীবনের অবিচল প্রতিচ্ছবি—তাঁহার ভিতরে একটা বিপুল সার্বজনিকতা আছে। তিনি যে মাদ্রুঘগুলির দ্বারা ব্যাঞ্ছন করিয়াছেন, সে মাদ্রুঘগুলিকে আধুনিক সভ্যতার কল্যাণে সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সার্বজনীনতা ডোষ্টোয়েভ্‌স্কির উপন্যাসের একটা প্রধান লক্ষণ।

‘ভাবতী’র বর্তমান সংখ্যায় ডোষ্টোয়েভ্‌স্কির যে কুস্ত্র উপন্যাসখানির অমূহাব (‘কুস্ত্রিতা’) আরম্ভ হইল, লেখক তাহাতে দেখাইতে চাহিয়াছেন, একজন গদ্বোধর, কর্কশ-বভাব মহাজন প্রেমের মহিমায় কিরূপে সর্বদা হইতে চেষ্টা করিতেছে। প্রাণ দিয়া সে তাহার স্ত্রীকে ভালবাসিয়াছিল বটে, কিন্তু আপনায় একজুঁয়েমি ও কড়া বেজার কিছুতেই জ্বলিতে পারে নাই। কলে, না-জানিয়া না-বুঝিয়া আপনায় প্রেমবতী পত্নীর বক্ষেই সে হৃৎ-বাতনের শূল বিদ্ধ করিয়াছিল।

পুস্তকের ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন :—

“এই গল্পটিকে যদিও আমি ‘কামনিক গল্প’

বলিয়াছি, তথাপি ইহার মূল সম্পূর্ণ বাস্তব উপাদান আছে।

মনে কর, একজন লোকের পাশে তাহার স্ত্রীর মৃতদেহ পড়িয়া আছে। সেই আকস্মিক চর্যটনার লোকটির দ্বারা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে; কি করিতে কি হইয়াছে সে তাহা ভাবিতে চেষ্টা করিয়াও পারিতেছে না। বহু মাকে মাকে আপনায় চিন্তাহুস্তের পেই হারাইয়া কেলিতেছে। একবার মনে করিতেছে, তার স্ত্রীই সকল দোষে দোষী,—এ চর্যটনায় তার কোন হাত নাই। কিন্তু এই আত্মপ্রবোধে তাহার মন কিছুতেই প্রবোধ নানিতে চাহিতেছে না—তাই পর-মুহূর্ত্তেই আবার সে বিপরীত চিন্তা-ধারায় অস্তিত হইয়া পড়িতেছে। হৃৎ-ও উত্তেজনায় সে ভাবিয়া পড়িয়াছে। অপরূপে, ক্রমে ক্রমে আত্ম হইয়া সে যথার্থ সভ্য বৃত্তিতে পারিল। এইজন্যই তাঁহার আত্মটিক আরম্ভে যেমন বিন্দুখল ছিল, শেষকালটার আর তেমনিখালা রহিল না।

এইরূপ দীর্ঘ আত্মটিক ঠিক ব্যতিক্রম না হইলেও, কলা-রাজ্যে ইহার ব্যবহার ‘নুভুন নদে’। ভিক্টর হুগো তাঁহার ‘The Last Day of Condemned Criminals’ নামক পুস্তকে (ইহার বঙ্গানুবাদ পূর্বে ‘বন্দী’ নামে ত্রিভুক্ত পৌরাণিকমোহন মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা ‘ভারতী’তে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে) ঠিক এই পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রাণরঙে দ্রবিত কোন ব্যক্তির পক্ষে যদিও তাহার জীবনের শেষদিন, শেষঘণ্টা—এমন-কি শেষ মিনিট পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার বিবরণ ও মানসিক ভাবের বিশ্লেষণ

লিখিয়া রাখা সম্ভব নহে—তদাশি, ভিট্রা রচনার মধ্যে সুসঙ্গীতের গাথব ও বাচনিক
হুগো যদি এই বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন না এই উপভাসখানি লিখিবার কোনই সুযোগ
করিতেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সমস্ত পাইতেন না।”

আলবার্ট বেসনার্জের ভারতীয় চিত্র

আলবার্ট বেসনার্জ আধুনিক ফ্রান্সের
একজন বিখ্যাত চিত্রকর। ১৮৭৪ খ্রষ্টাব্দে
—তাঁহার বয়স তখন পঁচিশ বছর, তখন
তিনি prix de Rome নামক স্মারকপত্র
লাভ করেন। সেইদিন হইতে অত্যাধিক
কঠোর পরিশ্রমের ফলে তিনি কলারাজ্যে
অমর কীর্তি অর্জন করিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর টেরাজ ওস্তাদ-চিত্র-
করগণ, রমণীষ পট আঁকিতেই জীবনের
শেষভাগ কাটাষ্টয়া দিতেন। বেসনার্জও
এই পথ ধরিয়াছেন। নির্গুণ চিত্রেও
তিনি সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার আঁকিত
বিশিষ্ট আলোকের কেবল প্রভাভের
বহিঃপ্রকৃতিই, বিকাশপাত্ত কণ্ঠে নাই—
তাঁহার তুলিকার মধ্য-স্পর্শে সূক্ষ্মরোম্মন
প্রাচ্যের অনেক বিচিত্র দৃশ্যও প্রস্তুত হইয়া
উঠিয়াছে। অক্ষুণ্ণতার বিরাট মরুভূমির
অলস্ত বর্ণ-কান্না তাঁহার পরিশ্রমের যেমন
ফুটিয়াছে, তেমন আর কোথাও বড়-একটা
দেখা যায় না।

গত ১৯১১ খ্রষ্টাব্দে বেসনার্জ সঙ্গীক
ভারত-ভ্রমণে আসিয়া এখানে ছয়মাসকাল
কাটাষ্টয়া গিয়াছিলেন। আমাদের ভারত-
বর্ষকে দেখিয়া তিনি বলিতেছেন :—

“ভ্রমণকারীদের উজ্জল বর্ণনা পড়িয়া

ভাবতর্জমকে কল্পনার যে উচ্চাঙ্গন দিয়া-
ছিলাম, এখানে আসিয়া দেখিলাম, তার
চেয়েও বিচিত্রসুন্দরী সে।”

চিত্রকরের সাধারণত সারিত্যক্ষেত্রে
আসিয়া কলম ধরেন না; কিন্তু বেসনার্জ
একসঙ্গে চিত্রশিল্পী ও লক্ষ্যশীল—তাঁহার
রচনা শুধু অতিশয় চিত্রশিল্পী। ভারতবর্ষ
দর্শন করিয়া তাঁহার মনে যে-সকল ভাবের
ছাপ পড়িয়াছে, একই হাতে তুলি ও
কলম ধরিয়া তিনি পটে ও খাতায় সেই
সকল ভাবের রূপ চিরস্থায়ী করিয়াছেন।
আমরা তাঁহার শব্দ-চিত্রের দু-এক আদর্শ
তুলিলাম :—

“পাণ্ডুর উপরে যে নদীটি শান্তভাবে
সহিয়া যাঠিতেছিল, এখানে সেই নদীটিই
ক্রম গর্জনে বিচ্যববেগে গিরিমাল্য
চরণোদ্দেশে খুঁপাটকা পাড়িতেছে। উপরে
দাঁড়ানো নিচের দিকে চাভিলে মনে হয়,
ওপানে যেন একটি বৃহৎ জলপাত্ত রহিয়াছে ;
—রাশি রাশি ফেণার ভিতরে সেখানে
আমি স্নানকারীগণকে দেখিতে পাইলাম।
তাহাদের অঙ্গভঙ্গি দেখিলে সন্দেহ হয়,
যদি তাহারা কোনরকম ধর্মবিধি পালন
করিতেছে! জলপ্রপাতের আশপাশেও উচ্চ
পর্বত এবং পত্রবল্লভ বৃক্ষমালার অন্ধ ছায়া

সকলকেই যেন কি-একটা "রহস্যের" নত বোধ হইতেছে। পাচাড় যেখানেই একটু হেলিয়া পড়িয়াছে, গাছের ডাল যেখানেই একটু সরিয়া গিয়াছে, সেখানেই ফাঁক পাঠিয়া স্বর্গার প্রবেশলাভ করিয়া কোথাও কোন দানার্ণীর মস্তক, কোথাও স্তন, আবার কোথাও-বা একটা কবচ ভর প্রস্তরমূর্তিকে বড়টুকু-পারে উদ্ভল করিয়া তুলিয়াছে।"

"ঐ দেব, মন্দিরের দ্বারপথ! আনরা ক্রমেই নিকট হইতেছি; মরগোগুধ দিবা-লোক বাড়ীর ছাদে ছাদে ও গাছের মাথায় মাথায় যেন বেতগিরদের কুচুম চড়াইয়া দিতেছিল। বিপুল দ্বারের ভাঁজ-করা কপাটের খানিকটা পুলিয়া যাইবামাত্র এমন

একটা আকস্মিক শব্দ উঠিল - যে, ফরর আমার স্তম্ভিত হইয়া গেল। যুদ্ধে যখন ক্রক্কা আত্মপ্রণের পুরীতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারও মনের ভাব বোধ করি, এমনিধারা "হইয়াছিল!"

বেসুনার্ড সর্গপ্রথমে সিংহলে উপস্থিত হইয়া সেখানকার বৌদ্ধ মঠ-মন্দির পরিদর্শন করেন। তারপর একে একে কালী, আত্রা, দিল্লী, জরপুর, আমোদাবাদ, বোম্বে দেখিয়া মাহুরার গিরা উপস্থিত হন। এখানে বোলদিন পাকিয়া তিনি অনেক-গুলি ছবি আঁকেন। তারপর তিনি ত্রিটিনা-পলী, তাতোর, পণ্ডিচারী, মাস্ত্রাজ, হারদ্রা-বাদ ও কলিকাতা দর্শন করেন।



হুড়িওয়ালা



এই ভ্রমণের কালে বেসনার্ড যে-সকল
ছবি আঁকিয়াছেন, তাহার ভিতর দেখির
ভাগই দক্ষিণ দেশের। ভারতের
উত্তরাংশে অবরোধ-প্রথার কড়াকড়ি বড়ই
অধিক। এমন-কি, বেসনার্ডের সহধাত্রী

পর্যায় সহজে উত্তর-ভারতের গোপন অস্তঃপুরে
হুকিতে পারেন নাই।

বেসনার্ডের আঁকি চিত্র-মালায় স্টেটজন্ত
আমরা যে-সকল নানোমুদ্রি দেখি, সাধারণত
তাঁহারা নিম্নশ্রেণীর ভারতীয় রমণীর আদর্শে

অঙ্কিত ; কিন্তু মুক্তিগুলি ঘে শ্রেণীরই • হোক
—বেস্‌মার্ভের ছবিতে ভারতের সাধারণ
মর-নারীর বাহিরের রূপ যে ঠিকমত
ছটিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এক-একখানি ছবি আবার এতটা দান্তব
যে, দেখিলেই জীবন্ত বলিয়া ভ্রম হয়।
যেমন “চুড়ি ওয়ালা”। এক রূপসী পরিদায়ের
পরিপুষ্ট ঝড়োল হাত হইতে চুড়ি ওয়ালা
পূব-কথা একগাছা চুড়ী ধোর করিয়া

গুলিবার চেষ্টা করিতেছে। স্থানীয় রূপে
সংস্কৃত ব্যাপার ভাব, ও অনিচ্ছাসংগত
চুড়ি ওয়ালাকে বাধা দিবার জন্যই ছবিতে
বেশ সুটীয়া উঠিয়াছে।

আর-একখানি ছবিতে ‘নর্তকী’র চেহারা
নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। এরকম
নর্তকী আনন্দা ভরিতের সব জায়গাতেই
পেপে-বাটে যখন-তখন দেখিতে পাই।

রোশেনারার ভারতীয় নৃত্য

রোশেনারা যখন ন্যচেন, বিলাতী
খিরেটারে তখন আর তিলধারনের ঠাই
থাকে না—তাহার নাচের তালে তালে
দর্শকের মন ও নাচিতে থাকে !

কলাবিদেরা বলেন, “কোন দেশের
নাচে ও গানে সেই দেশের, সেই জাতির
নিজস্ব ভাবটি ধরা পড়ে—যেমন, প্রজাপতি
ধরা পড়ে কালের ভিতর !”

রোশেনারার নাচেও তাই ভারতবর্ষের
আত্মা জাগিয়া উঠে ;—একালের গ্রাম-রেল-
লাইনে ভরা ও টেলিগ্রাফের তাবে-বেরা ভারত
নয়—সেকালের সেই বিস্তৃত দিবসের রূপ-
কথার ভারতবর্ষ রোশেনারার নাচের তালে
ও গানের তানে হৃদয়ের মত আত্মপ্রকাশ
করে।

রঙ্গমঞ্চের কক্ষ যবনিকার আড়াল হইতে
আগে একখানি ধবল হস্ত সাপের কণার
মত ভকীতে বাহির হইয়া উপদে-নীচে ডাইনে-

বামে উঠিতে নামিতে হেলিতে চলিতে
থাকে ; তারপর হঠাৎ যবনিকা সরিয়া যায়
এবং সর্প-নৃত্যের অপূর্ণ গোথাক পরিয়া
রোশেনারা দর্শকের সামনে আসিয়া দাঁড়ান
—তখন তাহার হাতজুপানি দেখিলে প্রাণে
চমক লাগে, সে-যেন ছুটি জীবন্ত সর্প !

এই সর্প-নৃত্য ভারতেরই • নিজস্ব।
দেবতার সন্মুখে এই নৃত্য-ক্রীড়া কুহুটিত
হয়। সর্প-নৃত্য শিখিয়ার মত রোশেনারা
ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। নাচ বাহাতে
বাস্তাবিক হয়, সেজন্য তিনি সাপুড়ে
ডাকাইয়া জীবন্ত সর্পের নৃত্য-ভঙ্গি
মনোযোগের সহিত অনেকদিন ধরিয়া পরীক্ষা
করিয়াছিলেন।

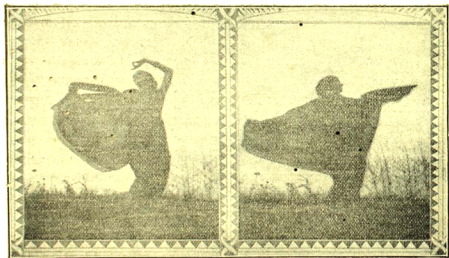
রোশেনারা ভারত-মহিলা মন—একেবারে
খাটি যুরোপীয় বংশে তাহার জন্ম। কিন্তু
ভারতীয় পোষাক-পরিচ্ছদ, হাব-ভাব ও
আদব-কায়দার তিনি এমনি কেতাদুরস্ত যে,

উভয়কে কিছুতেই কেও টংরাজ বলিয়া ঠাণ্ডা করিতে পারে না। উভয়কে দেখিলে বোধ হয়, রবিবন্ধীর চিত্রপট ছাড়িয়া কোন মূর্ত্তি ঘন কার বাহু-মধ্যে চতাব সঞ্চীর ও মৃত্যুতানে উচ্চাসিত হইয়া নাট্যমঞ্চের উপরে আবির্ভূত হইয়াছে!

রোশেনারার আর-একটি বিখ্যাত নৃত্য আছে। দাক্ষিণাত্যে যুগলের সময়ে, কৃষক-বালারা কুলা লটকা মঞ্চদানে যায়। দেখানো কুলা নাড়িয়া কাননিক শত ছাড়িতে ছাড়িতে বাতাসে ঘন ভূষ উড়াইয়া দিতেছে, এমনি জান-করিয়া সকলে একমুখে একতালে নৃত্য করিতে থাকে। কৃষক-কল্লাদের এই সমবেত নৃত্যের অঙ্গুরণেই রোশেনারার বিখ্যাত “বর্ণশযা-নৃত্য”। এই নাচে রোশেনারাকে কিসকম চিত্রাঙ্গিতের মত

জন্মের দেখায়, “বর্ণশযা-নৃত্য”-এ ছবি দুই-পানি দেখিলেই সকলে তাহা কতকটা আন্দাজ করিতে পারিবেন।

রোশেনারা বলেন, “রোশেনার ঐক্য-তানের সঙ্গে সমস্ত কারদ্বা ভারতীয় সমীচক প্রবেশোপযোগী করিতে গিয়া আমাকে বড়ই বেগ পাঠিতে হইয়াছিল। ইংরাজ শ্রোতার। কিছুতেই ভারতীয় গান শুনিতে সাজি হন না—সে গানে যে কি মাধুর্য্য তাও তাঁরা বুঝিতে পারেন না। একবার আমি একজন ভারতীয় হালকে বিলাতে আনিয়াছিলাম। সে একতরঙ্গ তংরাজী ব্যাণ্ডের সঙ্গে কোনমতেই বাজনা বাজাতে চাহিল না; আমার ব্যাণ্ডের লোকেরাও বলিল, ‘এ বাজান্দারটা গানের কিছুই জানে না, বুঝে না!’—কালেক্ট আমি বাধা চটাই মধ্যাধ্য ধরলাম,



“বর্ণশযা-নৃত্য”



শেতাঝা-বেটিত ডাঃ হুমায়ুন

বিশাকী গারকদের দ্বারা ঐক্যতানের উপযোগী করিয়া ভারতীয় সন্যাসীদের আদি স্তম্ভসংযোগে ফরাইলাম।

ভারতীয় নৃত্যকলা আমি অত্যন্ত পছন্দ করি—বাস্তবিকই, তাহা অপূর্ণ। কিন্তু চুঃখের বিষয়, ভারতের নানাপ্রকার নৃত্যের জটিলতা এই অল্প-অন্যতম হয় একেবারে লম্বা হটকাছে, নয় বাহ-বাহ হটকা আছে।” ভারতবাসী হইয়াও ভারতীয় নৃত্য বলিতে

সরণের পরপারে

“মৃত্যুই ভবিষ্যৎ” নহে—এ-মুগের পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক আলোচনা দ্বারা বিধি প্রকারে তাহা প্রমাণের চেষ্টা করিতেছেন। দেহ-নাশের সঙ্গে-সঙ্গেই তে সব শেষ হয় না, এ কথা অনেক দিনের পুরানো কথা। মৃত্যুর পর অস্তিত্বের বিশ্বাস চিরকালই সব দেশে আছে, অবশ্য অধিকাংশ স্থলেই তাহা অন্ধবিশ্বাসের মত; কিন্তু আজকাল আধুনিক জ্ঞানের সীমাকে অস্বীকার করিয়া নহে, স্বীকার করিয়াই এই মতের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। এই কাজে পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় নামজাদা পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক প্রাণপণে লাগিয়াছেন। সাইকিকাল রিসার্চ সোসাইটির সভাপতি বৈজ্ঞানিক প্রাণালিতে পরলোকের রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছেন—তাহা সকলেই জানেন। তাঁহাদের প্রকাশিত বিবরণী পড়িলে বিষয়ে অবাক হইতে হয়। সহজে বিশ্বাস হয় না কিন্তু এমন সব নামজাদা লোক এই সব আশ্চর্য ঘটনার সাক্ষী যে তাঁহাদিগকে অবিশ্বাসও করা যায় না। এমন

আমরা বাসিভোদের, লক্ষ্য নাচ বা বিয়েটোদের সখীদের না-কিরিগি না-বেশের নগণ্য নৃত্য ছাড়া আর-কিছু বুঝি না। কিন্তু, একজন ইংরাজ-মহিলা যে আমাদেরই অনাপৃত নৃত্য-কলাকে স্বদেশে পরিচিত ও সমাদৃত এবং তাহার অনতিদূর লক্ষ্য চুঃখপূর্ণ করিতে-ছেন, ইহা দেখিয়াও কি আমাদের মাথা লম্বা হইতে হইয়া যাইবে না?

সব ঘটনা তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, বাহাতে তাঁহাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে মরণের পরপারে দেহমুক্ত আত্মার একটা সজীব অস্তিত্ব থাকে; এমন-কি অনেক সময়ে তাঁহারা পৃথিবীর বন্ধ-বান্ধবের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ পর্যন্তও করিতে আসেন। একেবারে সার উইলিয়াম ক্রুস্ Kt., O. M., F.R.S., D. Sc., সার অলিভার লক Kt., F. R. S. D, Sc., এ, আর, ওয়ালশ, সার জেমস পাগেট, সার ডব্লু, এক, ব্যারেট, সি, এক, ভারগে প্রভৃতি অনেক বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মৃত্যুকে এখন নবজীবনের সোপান বলিয়া মনে করেন।

আমরা এখানে পণ্ডিতদের তর্কবিতর্ক না তুলিয়া একপাশে কটোর প্রতিপত্তি দিলাম। এ-খানি ডাঃ পিরোজোর হৃদয়মানের ছবি। এই আশ্চর্য ফটোখানি তুলিবার পরে দেখা গেল, হৃদয়মানের মূর্তির উপরে ও চারিপাশে কবি বাহে, রাবিন্দ্ৰনাথ ঠাকুর, প্রেসিডেন্ট প্রিন্স, প্রেসিডেন্ট ম্যাককিন্লে প্রভৃতির সঙ্গে হৃদয়মানের তিনজন মৃত আত্মার ছায়ামূর্তির সুন্দর সহিগাছে!

ঐ প্রসাদবাস রায়।

বিনা নাবিকে জাহাজ-চালনা

বিনা তারে সংবাদ-প্রেরণের কথা এখন আর নূতন নহে। সম্ভ্রুতি তার চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্ভব হইরাছে—বিনা নাবিকে জাহাজ যে চালানো যায় তাহাও দেখিতেছি।

জাহাজে জনগণী নাই—অথচ অতি শৃঙ্খলার সহিত উহা পৰ্ব্বতসমূহ সমুদ্র-মধ্য দিয়া আকিরা-বাকিরা নিরাপদে ছুটিয়া চলিয়াছে; তীরদেশে উপবিষ্ট প্রভু অঙ্গুলি-স্বেক্ষেতে জাহাজে হাজার তড়িতের বাতি অলিগা উঠিতেছে—শক্তিশালী ইঞ্জিন নড়িয়া উঠিতেছে; এমন-কি মাত্রির জন্যে অঙ্কারের ভিতরেও এই অপূর্ণ পোতখানি ঠিক নিয়মিতভাবে তীরবেগে আগ্রসর হইতে পারে! জগতে বিজ্ঞানের নূতন শক্তির ইহাই ঘোষণা।

সমুদ্র-উপকূলে পৰ্ব্বতপোশি ৩৬০ ফিট উচ্চ হুঁটি স্তম্ভ স্থাপিত। সেই স্তম্ভের উপরে একটি মঞ্চে উপবিষ্ট হইয়া আবিষ্কারক জন হেমন্ট Radio-Dynamics এর শক্তিতে বিনা তারে সমুদ্রে জাহাজ চালানো থাকেন।

সেক্ষেত্রের বিভাগদে হেমন্ট ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। একদিন তিনি গণিতের কোম অধ্যাপকের সহিত নানা বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা উঠিলে হেমন্ট সহসা বলিয়া উঠিলেন—“একদিন আমি কোনো চলন্ত গিনিথকে দূর হইতে আমার নিজের ইচ্ছায় চালিত করিব।”

হেমন্ট বার্থ অস্তর হইতেই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। কারণ আপন বাক্যের

সত্যতা তিনি কতদূর প্রমাণিত করিতে পারিয়াছেন, এই প্রবন্ধে তাহা বুঝা যাইবে।

অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে হেমন্ট স্থির করিলেন, তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেই জীবন কালাতিবাহিত করিবেন।

তিনি অধ্যবসায়ের সহিত Gloucester-এ—Radio Dynamics লইয়া নানাক্রপ গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত কতকগুলি বিচিত্র আবিষ্কারের তথ্য শোকমুগ্ধে শুনা যাইতে লাগিল। তাঁহার বাড়ীর সমুখের মরদ্বানে একটা স্তম্ভের উপর আলোক-রশ্মি ফেলিয়া অনেক আশ্চর্য্য ও অশ্রুতপূর্ণ ব্যাপার সংঘটিত হইত।

আলোক-রশ্মি-পাতে কখনও স্তম্ভের উপরে আপনাস্বাপন একটা বাণী বাহিয়া উঠিত, কখনও “ডিনামাইট” বিস্ফোরিত হইত, এবং কখনও-বা স্তম্ভের বাতিগুলির শাল, নীল, সবুজ চক্ৰিত বর্ণ-পরিবর্তন ঘটত।

স্তম্ভটীর সহিত হেমন্টের তার বা অস্ত্র কোমপ্রকারের সংযোগ ছিল না। স্তম্ভে একটা ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সংযুক্ত থাকিত, আলোক-রশ্মিপাতে তাহাই শক্তিসম্পন্ন হইয়া,—বিজ্ঞানের সহজ নিয়মেই এই সকল আশ্চর্য্য কার্যসাধন করিত।

প্রফেসর মেসব গোয়েবের একটা ‘পিওরি’ এই যে, পতঙ্গ-মেহে কোনো রাসায়নিক পদার্থ আছে বলিয়াই উহার আকৃষ্ট হইয়া আলোর উড়িয়া পড়ে। এই ‘পিওরি’টি অবলম্বন করিয়া হেমন্ট

আপনার অসাধারণ প্রতিভাবলে প্রথম-প্রথম উপকৃত হইতে সমুদ্র-বক্ষে তাহাকে আলোক ফেলিয়া উহাকে চালিত করিতেন। জাহাজে কতগুলি Solenium cell থাকিত। আলোক-রশ্মিপাতে Solenium শক্তি-সম্পন্ন হওয়ায় জাহাজের সমস্ত যন্ত্রগুলি আপনা-আপনি চল হইত। কিন্তু কেবল এট উপরে দূর হইতে জাহাজ পরিচালনা-কার্যের সঙ্গীত উন্নতি হইয়া অসম্ভব বুদ্ধিগা হেমন্ত এক নতুন প্রাণীভূত, অর্থাৎ বিনা-তারে বৈজ্ঞানিক শক্তি উৎপন্ন করিয়া তৎসাহায্যে ইচ্ছানুরূপ জাহাজ চালাইবার সক্ষম করিলেন।

আপনার নব আবিষ্কারের প্রথম ফল-পরীক্ষার দিনে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে তিনি প্তবনে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহার বিজ্ঞানাগারের এক বৃহৎ প্রকোষ্ঠের ছাদ হইতে একটি Wireless transmitter যন্ত্র লম্বিত ছিল; নিম্নে একটি টেলিফোন উপর-জাহাজ-চালন-যন্ত্রের মত একটি যন্ত্র সংযুক্ত। এবং ৩৬৫টি চুম্বক-বস্তুর মধ্যে জাহাজের হাইলটী স্থানান্তরিত ছিল। হেমন্ত একটি চাবি টিপিয়া উপরের যন্ত্র হইতে এই চুম্বক-বস্তুর মধ্যে শক্তি-সম্পন্ন করিলেন। তাহার ফলে চাইলটী তাহার ইচ্ছানুরূপ দিক্‌নির্দেশে ও বামে সরিয়া আসিতে লাগিল।

হেমন্ত তাহার অভিনব আবিষ্কারের কার্যকারিতা বুঝিতে পারিলেন বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রাকান্তভাবে অবতীর্ণ হইয়া তিনি দেখিলেন যে, আপনার ক্ষুদ্র বিজ্ঞানাগারের সহিত পৃথিবীর প্রশস্ততর পরীক্ষা-ক্ষেত্রের আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

প্রতিদিন নতুন নতুন বাধা-বিপত্তির জন্ত তাহার পরীক্ষা তাই বহুকাল ধরিয়া সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হইতে পারে নাই।

অনেক বিফলতা, অনেক পরীক্ষার পর অবশেষে হেমন্তের একান্ত সাধনান্তরে "Radio" নিখিত হইয়া সাগরজলে ভাসমান হইল। এই জাহাজ ৪০ ফিট দীর্ঘ ও ১৮০ অশ্বশক্তি-সমবিত এবং ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগবান।

"Radio" এবং এই অত্যাবশ্যক জনসাধারণের মধ্যে এবং জন-প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা এইরূপ :—
• "কিছুদিন হইল, এক রাত্রিতে আমি পক্ষীর মতোপরি উপবিষ্ট "Radio"র পরিচালক-মহাশয়ের পার্শ্বের হাইলট সোভাগ্য লাভ করিয়াছিল। ইনি বহুদূরবর্তী একখানি জাহাজকে এখানে বাঁধাই অক্ষতার দ্বারা আট মাইল ব্যাপী আকাশ-বাঁকা শৈল-সমূহ ভ্রম সাগর-বৎ চালাইয়া, তাহাকে নির্ভয়ে আবার বন্দরে ফিরাইয়া আনেন।

"এই জাহাজ নিজের এঞ্জিনের কোরেই চলিয়া থাকে বটে, কিন্তু বহুদূরের উপকূল হইতে পরিচালক ইহার গতি ও বেগ নিয়ন্ত্রিত করেন। ইহার সাহায্যে ভিন্ন জাহাজটী একটুও মড়িতে চড়িতে পারে না।

"পরিচালকের কানে একটি দূরসংব-যন্ত্র (Telephone) লাগানো থাকে। ইহার সাহায্যে তিনি বিনা-তার-বস্তুর বায়ুতরঙ্গ তন্ত্রিয়া অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পারেন।

"পরিচালক-মহাশয় একটি চাবি টিপিয়া ধরিমাত্র এক আলোক-স্মরণ ও ফাঁদ লাগিল। একটি আলোক-স্মরণ ও ফাঁদ

‘হিন্-হিস’ শব্দ ত্রির অস্মি আর কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাইলাম না; অথচ, ইহারই প্রভাবে নৌচে, অনেক তফাতে বিদ্যায়-উৎপাদন-গৃহে এক তুণ শক্তির বিকাশ ঘটয়াছে এবং সেই শক্তিতে জাহাজটী আপনি চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

“জাহাজটী এতক্ষণ নৌচে, যাত্রার ক্ষত প্রস্তুত হইয়া চালকের আদেশ-প্রতীক্ষায় স্থিরভাবে গাড়াইয়া ছিল। উপস্থলের একটা বৃত্ত “সার্কেলাইট” হইতে আলোক-রশ্মি পড়িয়া বাষ্পাচ্ছাদিত জাহাজটিকে জ্বার-খল দেখাইতে ছিল। কোনো যুদ্ধ জাহাজেও অল্প পর্যন্ত এত বৃহৎ ও প্রখর আলোক দেখিতে পাওয়া যায় না। সমুদ্রের সাত মাইল দূর পর্যন্ত ইহা ১৮৬,০০০,১০০ বোমবার্ভার আলোক বিক্ষুব্ধ করিয়া থাকে।

“এক হইতে পরিচালক অতি সহজেই এই “সার্কেলাইট”টিকে ইচ্ছামত উপরে-নৌচে—দক্ষিণে-বামে ঘুরাইতে পারেন। কিছু দূরের একটা গৃহে বাতিটী রক্ষিত। এই প্রখরপ্রসন্ন আলোক নিকটে থাকিলে পাছে পরিচালককে অন্ধ করিয়া দেয়, সেই ভয়ে বাতি-গৃহটী দূরে অবস্থিত; সুতরাং পরিচালক একরূপ অন্ধকারে বসিয়াই (একটা ক্ষীণ আলোকমাত্র মকের উপর অলিঙ্গ থাকে) আপনায় কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। তাঁহারই সতর্কতার উপর জাহাজটীর নির্ভরতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। “সার্কেলাইটে” তিনি সাগর-বকের অনেকদূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখিতে পান—তাই অতি সামান্য বাধা-বিপত্তিও

তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া ঘাইতে পারে না।

“এবংর ছাড়িয়া জাহাজখানি এইবার খোলা সমুদ্রে ছুটিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ “সার্কেলাইট”টী একপাশে খানিকটা ঘুরাইয়া পরিচালক বলিলেন, “এই দেখুন, আর একটু হলেই, জাহাজটি ঐ বোতামার উপর গিয়ে পড়ছিল! কি, দেখতে পাচ্ছেন না?—ওই—ওই যে একখানা প্রকাণ্ড বোট! কেনো আলো নেই—কিছু নেই—ওরা এই রকমেই চলকেরা করে থাকে, অনেক সময় তাই বড় উৎপাতেই—যাক। আমি আমার জাহাজখানাকেই সঠিকের নিচ্ছি।” বলিয়া তিনি একটা চাবি টিপিয়া ধরিলেন—দেখিতে দেখিতে জাহাজখানা বা-দিকে ঘুরিয়া গেল।

“রানি নিজাপা করলাম—আমাদের জাহাজখানা এখন কতদূর গেছে?”

‘প্রায় ৩ মাইল।—এই দেখুন, বোট-খানাকে ডান দিকে ২০০ গজ তফাৎ রেখে আমাদের জাহাজখানা পাশ কাটিয়ে চলে গেল।’

“মধ্যে মধ্যে পরিচালক-মহাশয় একটা নক্সার (chart) উল্লেখযোগ্য ঘটনাজলি লিখিয়া লইতেছিলেন।

“সার্কেলাইটটী এবার তিনি বা-দিকে ঘুরাইয়া বলিলেন—“মাল-জাহাজটার মতলব কি?—আমাদের কাছে এসে পড়বে না কি? ওর সঙ্গে আবার ছ-পাশে মল-বারো-খানা মাল-বোঝাই নৌকা বাধা আছে দেখছি। আমাদের জাহাজখানাকে ৩০ গজ ডানদিকে সঠিকের নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।—বাস, টিক চলছে!”

আপনার অসাধারণ প্রতিভাবলে প্রথম-প্রথম উপস্থাপিত হইতে সমুদ্র-পক্ষে জাটাকে আলোক ফেলিয়া উঠাকে চালিত করিতেন। জাহাজে কতকগুলি Solenium cell থাকিত। আলোক-বিশিষ্টাতে Solenium শক্তিশাল্য হইত। জাহাজের সমস্ত যন্ত্রগুলি আপনা-আপনি চলি হইত। কিন্তু কেবল এই উপায়ে দূর হইতে জাহাজ পরিচালনা-কার্যের সর্কারান উন্নতি হইত। অদৃশ্য বুদ্ধিগত হেমন্ত এক নূতন প্রণালীতে, অর্থাৎ বিনা-ভাবে বৈজ্ঞানিক শক্তি উৎপন্ন করিয়া তৎসাহায্যে ইচ্ছানুরূপ জাহাজ চালাইবার সক্ষম করিলেন।

আপনার নব আবিষ্কারের প্রথম ফল-পত্রীকার দিনে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা তিনি দৃষ্টবশে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার বিজ্ঞানাগারের এক বৃত্ত প্রকোটের দ্বার হইতে একটি Wireless transmitter যন্ত্র লক্ষিত ছিল; নিম্নে একটি টেলিফোন উপর জাহাজ-চালনা-যন্ত্রের মত একটি যন্ত্র যুক্ত - এবং - চাইতী চুম্বক-বস্তুর মধ্যে জাহাজের হাইলটী ফুলানো ছিল। হেমন্ত একটি চাবি টিপিয়া উপরের যন্ত্র হইতে এই চুম্বক-বস্তুরকে শক্তিশাল্য করিলেন। তাহার ফলে চাইলটী তাঁহার ইচ্ছানুরূপ দক্ষিণে ও বামে দিগা আসিতে লাগিল।

হেমন্ত তাঁহার অভিনব আবিষ্কারের কার্যকারিতা বুদ্ধিতে পারিলেন যে, কিছু কার্যক্ষেত্রে প্রাকৃতিকভাবে অবতীর্ণ হইয়া তিনি দেখিলেন যে, আপনার ক্ষুদ্র বিজ্ঞানাগারের সহিত পৃথিবীর প্রশস্ততর পরীক্ষা-ক্ষেত্রের আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

প্রতিদিন নূতন নূতন বাত-বিপত্তির জন্ত তাঁহার পরীক্ষা ভাট বহুকাল ধরিয়া সম্পূর্ণরূপে কাণ্ডাকর হইতে পারে নাই।

অনেক বিকলতা, অনেক পরীক্ষার পর অবশেষে হেমন্তের একান্ত সাধনান্তরে "Rabio" নির্মিত হইয়া সাগরমূলে ভাসমান হইল। এই জাহাজ ৪০ ফিট দীর্ঘ ও ১৮০ অশ্বশক্তি-সমবিত এবং ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগবান।

"Rabio" এবং এট অত্যন্তগুণ জলযান-সম্বন্ধে এবং জন অত্যন্তদর্শী বর্ণনা এইরূপঃ—
 "কিছুদিন হইল, এক রাত্রিতে আমি পক্ষীর মতোপরি উপবিষ্ট "Rabio"র পরিচালক-মহাশয়ের পার্শ্বচর হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। ইনি বহুদূরতী একখানি জাহাজকে এখানে বসিয়াই অন্ধকার রাত্রে আট মাইল ব্যাপী আকা-বাকা বৈল-সমূহ চূর্ণন সাগর-পথে চালাইয়া, তাহাকে নিঃশব্দে আবার বন্দরে ফিরাইয়া আনেন।

"এই জাহাজ নিজের এঞ্জিনের জোরেই চলিয়া থাকে বটে, কিন্তু বহুদূরে উপস্থল হইতে পরিচালক ইহার গতি ও বেগ নিয়ন্ত্রিত করেন। ইহার সাহায্য ভিন্ন জলযানটী একটুও নড়িতে চড়িতে পারে না।

"পরিচালকের কানে একটি দূরসংযোগ (Telephonic) লাগানো থাকে। ইহার সাহায্যে তিনি দিনা-তার-বস্তুর বায়ুতরঙ্গ তিনিসা অবস্থা বুদ্ধিগত ব্যবস্থা করিতে পারেন।

"পরিচালক-মহাশয় একটি চাবি টিপিয়া ধরিয়াই এক আলোক-সূত্র ও কৌণ

‘হিস-হিস’ শব্দ ভিন্ন অস্মি আর কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাইলাম না; অগত, ইহাটাই প্রত্যয়ে নীচে, অনেক তফাতে বিদ্যায়-উৎপাদন-গৃহে এক তুণ শক্তির বিকাশ হইয়াছে এবং সেই শক্তিতে জাহাজটি আপনি চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

“জাহাজটি এতক্ষণ নীচে, যাত্রার ক্ষমতা প্রস্তুত হইয়া চালকের আদেশ-প্রতীক্ষার স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। উপকূলের একটা বৃহৎ “সার্জলাইট” হইতে আলোক-রশ্মি পড়িয়া সাম্প্রদায়িক জাহাজটিকে তুধার-ধল দেখাইতে ছিল। কোনো যুদ্ধ জাহাজেও আজ পর্যন্ত এত বৃহৎ ও প্রখর আলোক দেখিতে পাওয়া যায় না। সমুদ্রের সাত মাইল দূর পর্যন্ত ইহা ১৮৮,০০০,০০০ বোম্বার্ডের আলোক বিকিরিত করিয়া থাকে।

“মক হইতে পরিচালক অতি সহজেই এই “সার্জলাইট”টিকে ইচ্ছামত উপরে-নীচে—দক্ষিণে-বামে ঘুরাইতে পারেন। কিছু দূরের একটা গৃহে বাতিটী রক্ষিত। এই প্রখরপ্রসূ আলোক নিকটে থাকিলে পাছে পরিচালককে অন্ধ করিয়া দেয়, সেই ভয়ে বাতি-গৃহটী দূরে অবস্থিত; হুতরাং পরিচালক একরূপ অন্ধকারে বসিয়াই (একটা ক্ষীণ আলোকমাত্র মকের উপর জলিয়া থাকে) আপনার কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। তাঁহারই সতর্কতার উপর জাহাজটির নির্ভরতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। “সার্জলাইটে” তিনি সাগর-বকের অনেকদূর পর্যন্ত দৃষ্টি দেখিতে পান—তাই অতি সামান্য বাধা-বিপত্তিও

তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া বাটতে পারেন না।

“এবার ছাড়িয়া জাহাজখানি এইবার খোলা সমুদ্রে ছুটিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ “সার্জলাইট”টা একপাশে খানিকটা ঘুরাইয়া পরিচালক বলিলেন, “এই দেখুন, আর একটু হলেন, জাহাজটি ঐ বোটখানার উপর গিয়ে পড়েছিল! কি, দেখতে পাচ্ছেন না?—ওই—ওই যে একখানা প্রকাণ্ড বোট। কোনো আলো নেই—কিছু নেই—ওরা এই রকমেই চলকেরা করে থাকে, অনেক সময় তাই বড় উৎপাতেই—যাক। আমি আমার জাহাজখানাকেই সরিয়ে নিচ্ছি।” বলিয়া তিনি একটা চাবি টিপিয়া ধরিলেন—দেখিতে দেখিতে জাহাজখানা বা-দিকে ঘুরিয়া গেল।

“আমি বিজ্ঞাসা করিলাম—“আমাদের” জাহাজখানা এখন কতদূর গেছে?”

“প্রায় ৩ মাইল।—এই দেখুন, বোট-খানাকে ডান দিকে ২০০ গজ তকায় রেখে আমাদের জাহাজখানা পাশ কাটিয়ে চলে গেল।”

“মধ্যে মধ্যে পরিচালক-মহাশয় একটা নক্সার (chart) উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি লিখিয়া লইতেছিলেন।

“সার্জলাইটটা এবার তিনি বা-দিকে ঘুরাইয়া বলিলেন—“মাল-জাহাজটার মতলব কি?—আমাদের ঘাড়ে এসে পড়বে নাকি? ভর সঙ্গে আবার দু-পাশে দশ-বারো-খানা মাল-বোঝাই নৌকা বাধা আছে দেখছি। আমাদের জাহাজখানাকে ৩০০ গজ ডানদিকে সরিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।—বাস্, ঠিক চলছে!”

“এখন জাহাজখানা কতদূরে ?”

‘পাঁচ মাইলের কম হবে না।—আপনি জাহাজখানা খানিক চালাতে চান ?’

‘আমি ?’

‘হী—কেন ?—এই নিম্ন। ডানদিকে আরো সরতে চান ?—তা বেশ !—এই ভাবে চাবিটা টিপে’ দিম্।—আজ্ঞে।—

হরেক্তে ! এখন বহল বসে দেখুন দেখি, ঠিক আপনার ইচ্ছামত যাচ্ছে কি না ?’

“চাহিয়া দেখিলাম—কি আশ্চর্য !

কেবল আমার অস্থূল-স্পর্শে, পাঁচ মাইল দূরবর্তী ৬৭ টন ওজনের একখানা জাহাজ, জানি না, কোন্ দৈবশক্তিতে সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছানুসারে, শবেই ভাসিয়া চলিয়াছে !”

শ্রীহৃদাঙ্কুরার চৌধুরী।

“তালপাতার সেপাই”

(ফরাসী গল্প)

আমার বাড়িতে সেদিন ছোটোখাটো একটা সাঙ্ঘাসন্নিহন ছিল। অতিথিদের মধ্যে আমার বন্ধু শ্রীমতী ভবয়ার ও তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ভাই রেনি—এঁরা ‘হুইকনেই’ উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ ঘরের এককোণ হইতে শুনিলাম, রেনি বলিতেছে—“আমার বিশ্বাস, এ দুনিয়ার এমন কেউ নেই যে বুদ্ধ-জ্ঞানের বলতে পারে যে জীবনে কখনো কারুর ঐতি অস্তর বা নিঃসম ব্যবহার করিনি।”

আমি শ্রীমতী ভবয়ারের কাছেই বসিয়াছিলাম। দেখিলাম, একটা চম্‌কানি তাঁর সমস্ত দেহের উপর দিয়া ছুটিয়া গেল, কেমন-একটা বিবর্ণতা তাঁর সেই সুন্দর দেহশ্রী উপর ছড়াইয়া পড়িল এবং সেই উজ্জল চোখ দুটির উপর একটা দুঃখের কালো ছায়া ঘনাইয়া আসিল। মনে হইল, ঘেন একটা মর্মান্তিক করুণ স্থিতিকে

স্বহিয়া লইবার জন্যই তাঁর হাতখানি একবার কপালের উপর বুলাইয়া লইলেন, —এবং যে কয়েকটি অকালপক চূর্ণ কৃষ্ণল মূণের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা তুলিয়া দিলেন। তারপর, হঠাৎ একটা অহুশোচনার উত্তেজনার বলিয়া উঠিলেন—“সত্যি। কথাটা খুবই সত্যি। হর ত বিশ্বাস করবেন না—আমাকে এখন যেমন দেখছেন এমন আমি চিরদিন ছিলাম না। একটা কঠোর অভিজ্ঞতায় আমি এই শিক্ষা লাভ করেছি যে আগাগোড়া তলিয়ে না দেখে কারো সম্বন্ধে কোনো-একটা ধারণা করা ভয়ানক অজ্ঞার। উঃ, আমি কি নিষ্ঠুরতাই করেছি।”

বলিয়া তিনি করুণ কণ্ঠে এই গরট আরম্ভ করিলেন—“আমরা সমুদ্রতীরে বেড়াতে গিয়েছিলুম—ব্রাফো প্রসিয়ার বৃদ্ধ তখন পাঁচ বছর হল শেব হয়েছে।

আমি, মা ও রেনি—এই তিন জনে আমরা এক হোটেলের ছিলাম। তখন আমার বয়স অল্প—রূপের গর্ভ প্রচণ্ড। আমি আশা করতুম—আশা কি, দাবাই করতুম—আমার আপ-পাশের সকলে দিব্যরাত্রি আমার রূপের বদনা করুক—আমার পায়ে তাদের মুখ ছদয়ের পুষ্পাঞ্জলি ঢেলে দিক।

হোটেলের মধ্যে বড়-কাউকে আমি গ্রাহ্যে আনতুম না, কিন্তু একটি লোকের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। বয়স তার ত্রিশের কাছাকাছি—হুশী, হুগতিত বলিষ্ঠ দেহ। মুখে-চোখে একটা উদ্যম উৎসাহ, একটা তেজ,—কিন্তু কেমন-একটি দারুণ হুঃখে যেন সর্বদাই অভিভূত। দৈনিকপুরুষের মতো তার ধবগটা। তার এক চাকর প্রতিদিন তার খাবার পরে নিয়ে যেত—খাবার-ঘরে গে কখনো আসত না। একলা আপন-মনে নির্জনে সে ঘুরে বেড়াতো—কারুর লবে সে আলাপ করত না, তার দিকেও কেউ ঘেঁগত না। দেখতুম, সেনাধ্যক্ষেরা যেমন লম্বা কালো কোট পরে—তেমনি একটা লম্বা দিনরাত গায়ে ঝুলতে।

আমার ভাবি অদ্বিত লাগতো—একটা কৌতুহল ক্রমেই আমার মনে জন্মে উঠতে লাগলো। আমি একদিন কন্দি করে তার সামনে গিয়ে পড়লুম; বা-হোক-একটা অছিলা করে কথা পাড়লুম—উত্তর পেলুম বটে কিন্তু তা তাম্বিলাতার পরিপূর্ণ—ভুধু “হী।” আর “না।” কিন্তু ঐটুকুর মধ্যেই দেখলুম তার সেই গভীর বিবাদমাথা মুখখানি এক একবার আনন্দের ফুলিবে যেন জলে-জলে উঠতে লাগল।

আমি অগ্রমনত্বতার অভিনয় করে হাতের দস্তানাটা মাটিতে ফেলে দিলাম। কী ছেলেমানুষি আমার! তার মুখে একটা দ্বন্দ্বভা, একটা চাকলা দেখা গেল, কিন্তু আমার দস্তানা না তুলে দিবেই সে চলে গেল।

সেই দিন থেকে আমার সঙ্গে ভাব্যতা করে ঘুরে থাকুক—আমাকে দেখলেই সে যেন ভয়ে পালিয়ে যেত—আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলত। রেনি এই নিয়ে খুব একটোটা হাসিঠাট্টা করে নিলে। সে তার নাম দিলে—“তালপাতার সেপাই”। তার এই হাসিতে আমিও যোগ দিলাম বটে কিন্তু সত্যি বলতে কি, সেপাইয়ের সেই রুঢ় অমাদরে আমার আত্মঅভিমান ক্ষুব্ধ হয়ে কঁদে উঠছিল।

ছুটি ঘটনার আমার এই আশংকিত অভিমান শেষে দারুণ ঘৃণার পরিণত হয়ে পড়ল। একদিন সকালে আমি সন্মুখের দ্বার থেকে বেড়িয়ে কিরচি পথে জনমানব নেই, কেবল এক রোগশ্রীর্ণ-বুড়ী মোট-মাথার ধীরে ধীরে অপস্থিত। এমন সময় দেখি “সেপাই” একটা কোপে-ঢাকা ব্যাকের দ্বাৰা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল। জানিনা কি কারণে—সেপাইকে অচেনাকা দেখেই হোক, কিবা মোটের ভারেই হোক, বুড়ীটা মোট-ছাড় খপ করে পড়ে গেল। বেচারী মাটিতে পড়ে কাতর ভাবে এ-দিক-ও-দিক চাইতে লাগল। আমি তাকে তুলতে ছুটে গেলাম এবং তার মোটটাও উঠিয়ে দিলাম কিন্তু “সেপাই” একেবারে অচল—সে এতটুকু সাহায্যও করলে না।

আমি রাগ দেখিয়ে তাই দিকে কটমট করে চাইলাম, বললাম—“এমন অত্যাচার তো আমি কোথাও দেখিনি—মামুষের চামড়া ঘাম গায়ে আছে সে যে এমন ব্যবহার করতে পারে জানতুম না। আমার কাছে পরহা নেই—কী আপশেষ! মশায় কি মজা করে—এই মুড়ীকে কিছু দান করবেন?”

সে কেমন ইতস্তত করতে লাগল। একটা ভীত বেদনার ছায়া তার চোখের উপর ঘনীভূত হয়ে এল। মনে হল সে যেন কি বলতে চাচ্ছে—বোধ হয় তার এই অত্যাচার ব্যবহারের অর্থ কি তাই, কিছা কমা-প্রার্থনা। কিন্তু দেখলাম বলবার চেষ্টাটুকুই তার পক্ষে মর্যাদাসিক। তাকে ঠোট একবার কাঁপলো—কিন্তু কোনো বোধগম্য কথা বার হল না। তার মুখ আবার কঠিন হয়ে উঠল, তার সেই একঘেরে অবিচ্ছিন্ন নীরবতা আবার ফিরে এল। সে আমার দিকে আর না চেয়ে, আমার কথা উপেক্ষা করে চলে গেল।

জীবনে এই প্রথম, আমি-হেন যে হুন্দারী সেও অহুরোধের অবস্থান পেলে—সে বেঁচে কী মর্যাদাসিক বলতে পারি না! রাগে ক্রোধে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলছিল। হোটেলের কিরে এসে রেনিকে সব বললাম—সেও চটে আস্তন। সে বলে, একবার দেখা হোক না সেপাইয়ের সঙ্গে, ভালো করে বোঝা-পড়া করে নেব। তার এই ভাগের আগুনে, আমার সেই তখনকার ছেলোমামুষীর উৎসাহে, খুব কসে ইচ্ছা দিতে লাগলাম।

সপ্তাহখানেক, আর তার সঙ্গে আমাদের দেখা হয় নি। আমি বললাম, “তাল-পাতার সেপাই” ভয় খেয়েছে, তাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। রেনিও এই কথাই সার দিলে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা জেটির উপর বেড়াতে গেছি—তখন ঝড় উঠেছে—পাথের তলার সমুদ্র কেবলই ঢলে-ঢলে আছাড় খেয়ে ফেনিয়ে উঠেছে। হঠাৎ নীচে থেকে একটা আর্ন্তনাদ উঠল। আমরা কিনারার দিকে ছুটে গেলাম—দেখি সেপাই ঝাড়িয়ে—তার সমস্ত সুখখামা একটা দারুণ ভয় ও উৎকর্ষায় কম্পিত হয়ে উঠেছে—সে ভয়ে চীৎকার করে উঠল—“দেখ দেখ একটা লোক জলে ডুবলো।”

আমি অত্যন্ত দৃষ্টিতে তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। আমার ভাব বুঝে মেনি আর থাকতে পারলে না। সে ছুটে-গিয়ে বলে—“মশাই কি মজা দেখছেন—একটা লোক ডুবছে।”—যেহে মামুষের মতো চীৎকার করা ছাড়া কি আর কিছু করবার নেই!”

এই বলে সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। দ্রুত নাবিক ছুটে এলে তার হাত ধরলে, তৃতীয় নাবিক জলে নেবে গেল।

“ঐ যে! ঐ যে! জলে ডুবেছে!—ঐ উঠিয়েছে!” বলে সেপাই সেইখানে ঝাড়িয়ে চীৎকার করতে লাগল।

অরক্ষণের মুখোই লোকটাকে উদ্ধার করে নাবিকেরা নিয়ে এল, আমাদের সামনে দিয়ে ধরাধরি করে নিয়ে চলে গেল। আমরা নিখাস ফেলে যাঁচলাম।

তার পর, লোকের ভিড় ক্রমে ক্রমে তেঙে গেল—শেষে কেবল আমরা ছুঁয়ে ও সেপাই সেইখানে রইলুম। আমার কেবলই মনে হতে লাগল তার সেই উরত হৃদয় চেহারার সঙ্গে, তার সেই মুখের উপরকার তেজস্বিতার সঙ্গে তার এই শিশুর মতো অসভ্যতার ভাংটা কী বৈশিষ্ট্যমান।

রাগে আমি প্রায় উদ্ভাদ হয়ে উঠেছিলুম। আমার কাছ থেকে ইসারা পেয়ে রেনি সেপাইয়ের মুখের সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবং দাঁতে দাঁত দিয়ে বলে উঠল—“কাপুরুষ কোথাকার।”

তার একটি কোমল কাতর দৃষ্টি আমার মুখের উপর এসে পড়ল—হঠাৎ মনে হল, আমার প্রতি তার হৃদয়ের একটি প্রীতি যেন সঞ্চিত আছে, কিন্তু আমাকে সে সঙ্গ করতে পারচে না। রেনির এই অবজ্ঞার অপমানে তার চোখের পাতাগুলি কাঁপতে-কাঁপতে একেবারে ঘুরে পড়ল—এবং একটা মর্শ্বাস্তিক কাতরতা তার সমস্ত মুখখানিকে আধার করে ফেলে। তার ঠোঁট দুখানি একেবারে নীল হয়ে গেল। সে একটি কথাও কইলে না।

তার এত অসহ্য নীরবতার আমার মেজাজ আরো ক্রমে উঠলো! রাগে, হুগার, কোতূহলে—এবং তার পক্ষে অশোভন এই কাপুরুষতার প্রতি কেমন-একটু অবিধানে—আমি যেন উৎকিষ্ট হয়ে উঠলুম। আমার শেষ-আঘাত আমি তাকে ছুঁড়ে মারলুম, বল্লম—“রেনি, তুমি যদি ওকে একথা চড় কসিয়ে দাও তাহলেও ওর

এমন সাহস হবে না যে সেটী অপমানের তাড়নার তোমার উপর হাতুড়ী পর্ষাত তুলবে! এমন পৌরুষ ওর নেই!”

আমার কথা শেষ হতে না হতেই আমি বুঝতে পারলুম, তার আঘাত কী সামাজিক, কী ভয়ঙ্কর! তার বিবর্ণ মুখের প্রত্যেক শিরটি কুঞ্চিত হয়ে গেল—মনে হল, একটা ভয়ঙ্কর মানসিক বিপ্লব তাকে চেপে ধরেছে। কড়-কঠে—তার এই কঠোর আমি ইহকালে কখনো ভুলতে পারবো না—হতাশার কড়, কাতরতার গুহ সেই কঠোর—সে আমার দিকে চেয়ে—গমরে বলে উঠল—“আমি কাপুরুষ নই কিন্তু দেবী, তুমি বড় নিষ্ঠুর! তোমাদু এই কঠিন নিষ্ঠুরতার আমার হৃদয়ের একটি গোপন ব্যথাকে আঁচ খুলে ধরতে হল। সে কোনো সত্যিকার ষ্ট্রীয়া লজ্জার কথা নয়, কিন্তু আমার দেহের শক্তি নিয়ে যে আমার চিরদিনের গর্ব—তাই সে আমার লজ্জার কথা! তাই আমি সেই লজ্জা বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখি। আমার হৃদয়ের কথা বলে আমি যে লোকের ভূপািত্র হব—বিশেষত তোমার—সে আমার পক্ষে নিদারুণ। তাই আমার এই গোপন কথাটী আমি মনের মাঝখানে বহন করি। কিন্তু কী নিষ্ঠুর তুমি! আমার সেই প্রাণের বেদনা গোপন রাখতে দিলে না—আমার মর্শ্বহল ছিন্ন করে তাকে বার করে আনলে তবে ছাড়লে!”—বলে সে বলতে লাগলো—“ওবে শোনো আমার গোপন কথা :—ফ্রাঙ্কো-প্রসিরান যুদ্ধে আমি গোলন্দাজ ছিলাম। একটা পুল তোপ দিয়ে ডেডে

দেশার মনর শত্রুদের এক গোণার আমার
হুটো হাটতে উড়ে যায়। আমি কাপুরুষ
নই।—হাত তুলে সে কথা তোমার সামনে
এষণ করবার উপায়ও ভগবান রাখেন
নি।”

অনুশেচিনার একটা তীত্র শিহরণ
আমার সমস্ত দেহের উপর দিয়ে বয়ে
গেল। আমি একেবারে ত্তস্তিত হয়ে গেলাম।
সামনে উঠে তাব কাছ থেকে ক্ষমা
চাইবার আগেই দেখি সে চলে গেছে।”

শ্রীমতী কবীর কণা শেষ করিয়া
একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন, মনে
হইল যেন সেই অতীতের মধ্যেই তিনি
তখনো ঘুরপাক খাইতেছেন।

আমি বলিয়া উঠিলাম—“বাতবিকই—
অনুতাপের কথা। তার সঙ্গে কি আপনার
আর কথা হর নি?”

—“না।” বলিয়া তিনি চুপ করিলেন।

শ্রীমণিলাল গুণোপাধ্যায়

সমালোচনা

পূজা ও সমাজ। শ্রীমত অধিনাটক
চন্দ্রকান্তী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীমদ্বীন্দ্রোদয় চন্দ্রকান্তী,
বি, এ, বেঙ্গলস্ট্রীট, হাই স্কুল, কলকাতা, চট্রগ্রাম।
মিলচর, এরিয়েন এসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ পিকা,
কাশড়ে বাঁধা বেড় টাকা যায়। লেখক “নিবেদনে”
বলিয়াছেন, “এই গ্রন্থে শরীরে পূর্ণপূজার মূলভাবপূর্ণ
সহজুত আমাদের জাতীয় চরিত্র ও সমাজ সম্বন্ধে
কিছু আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।”
পূজার ব্যাখ্যায় কিন্তু তিনি যথেষ্ট মৌলিকতা ও
উদার চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন—সে ব্যাখ্যায়
পৌড়াবির নাম-গন্ধ নাই। পূজার সহিত সমাজের
সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠ, সে বিষয়ে কাহারও মতভেদ
থাকিতে পারে না। বঙ্গের পূর্ণপূজা, লেখকের
মতে, পতিপূজা; ইহা লার্কিন্সন উৎসব। হিন্দু
আচার্যগণ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্মীর রাজা
রামচন্দ্রের দ্বারা প্রচলিত মতের সম্বন্ধে পাণ্ডা বিলাইয়া
তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন “ব্রহ্ম আর ভগবতী
পূর্ণা এক বস্তু।” তিনি আরও বলেন, “ব্রহ্ম আরাধ্য
বেদান্তে কোন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আপনার জন্ম
করিয়া লইতে ভালবাসেন। ইহাযকে বিত্ত পিতা,
সহস্রর প্রভু, অর্জুন সখা, বশোদা পুত্র, রামপ্রসাদ

রামকৃষ্ণ বা বলিয়া মানিতেন ও ডাকিতেন। ভগবতী
পূর্ণা বিবর্তনময়ী আমাদের সকলেরই জননী। পূর্ণা
পূজা মহাপ্রতিষ্ঠার পূজা, বিবর্তনাত্মক পূজা। * * *
দুর্গোৎসবে কাষ্টিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী এই
চারি দেবতার মূর্তি পূজা হইয়া থাকে; বলদেবতা
কাষ্টিক, জ্ঞানদেবতা গণেশ, ধনদেবতা লক্ষ্মী এবং
জ্ঞানোৎকর্ষবিদ্যারী কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী
সরস্বতী, এই পঞ্চভুটের উপাসনা বিধিত হইয়াছে।”
কারণ সমাজ-শক্তির বৃদ্ধিতেই স্বদেশবুদ্ধি এবং
উন্নতি। সকল সত্য সমাজেই দেখা যায়, এই চারিটি
শক্তির বিকাশেই উন্নতি—বেদশক্তি, জ্ঞানশক্তি,
জয়শক্তি এবং ধনশক্তি। “সমাজের সর্বাত্মক উন্নতি
এই চারিটি শক্তির সমন্বয়েই ঘটয়া থাকে। সমাজ
সম্বন্ধে এই মূলতত্ত্ব দুর্গোৎসবে বেশিতে পাওয়া
যায়।” তাহার পর লেখক ঐ পঞ্চভুটের
অন্তর্ভুক্ত করিয়া ‘ভাবা’, ‘প্রীতিক’, ‘স্বাভাব্য
কলাবিদ্যা, চরিত্রব্রহ্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে দৃঢ়ক আলোচনা
করিয়াছেন। লেখকের মত আগাগোড়া নিরপেক্ষ,
উদার এবং তাহাতে চিন্তাশীলতাও যথেষ্ট। ‘প্রীতিক’
নিবন্ধে লেখক বলিয়াছেন, “বাল্যবিবাহ প্রীতিকার
মূর্তিমান বিপর। বর্মীর শিক্ষিত যুবকল, যোযোয়দের

বিভিন্ন বিদ্ভাবনী, পরলিখনে কবীকং অভ্যাসে দুইতী
 বনশ্রীর সংসর্গে সন্তোষ থাকিতে পারেন কি? * * *
 সন্যাস লোকসংখ্যার আর অর্ধেকই রমণী; ইহাদিগকে
 আঁখিতে ফেলিয়া পুরুষগণের আলোক-ভোগের আশা
 বিভূষনামাত্র। * * * আশঙ্কিতা জননী শিশুকে কি
 শিক্ষা দিতে পারেন? "গুণের পূজা", "চাঁটুতা",
 "চাফরি", "ভীষতা ও সাহস", "সংস্কার", "শিক্ষা",
 "বিবাহলঙ্কার" প্রভৃতি সকল সম্বন্ধগুলিতেই লেখক
 যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যেমন, প্রবৃত্ত,
 প্রসঙ্গ, তেমনই সত্যের ও মিথ্যার। এমন হালিখিত
 সম্বন্ধ-পুস্তক বহুদিন আমাদের চোখে পড়ে নাই।
 এ গ্রন্থ আতি বিভ্রান্তে পাঠ্যভরণ নির্দোষিত হউক,
 ইহাই আমাদের কামনা। এ গ্রন্থ ভাষ্যগণের
 সহযোগ-বিকাশে সঘটন হইবে, আবরণের পদ-নির্দোষে
 সমারম্ভ করিবে।

আদর্শ জননী। ঐহিক যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী
 প্রণীত। কলিকাতা, ভট্টাচার্য এও সন্দ্বীর পুস্তকালয়
 হইতে প্রকাশিত। বর্ণ প্রসঙ্গে সুস্মিত। মূল্য আট
 আনা। এখানি জীবন-চরিত্র নহে; শিশুসন্তানের
 প্রাথমিক ও চরিত্র-গঠন-ব্যাপারে আদর্শ জননীর
 কর্তব্য কি, তাহাই এ গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত
 হইয়াছে। সন্তান-জনন এবং শরীর-পালন-বিষয়ক
 নিষেধগুলি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—
 আমাদের আশ্রিত শাস্ত্রমতের সহিত সে বৈজ্ঞানিক
 মুক্তির সমন্বয়ও লেখক অনুপাতিয়াই প্রদর্শন
 করিয়াছেন। চরিত্র-গঠন ও সন্তানের মানসিক
 শিক্ষার আলোচনাতেও উহার সুষ্ঠু এবং চিত্তাশীলতার
 পরিচয় পাওমা যায়। স্ত্রী, ঐহিক প্রকৃষ্টপ্র
 চটোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের একটি ছন্দিকা
 লিখিয়াছেন। ছন্দিকার তিনি বলিয়াছেন, মাতার
 হৃদয়েই সন্তানের জীবন ও স্বপ্ন-বাজেশা, তাহী
 উন্নতি ও সেই সঙ্গে বেগেরও ভবিষ্যৎ স্তম্ভ।
 সকল প্রকার মীচতা ও হীনতা বর্জন করিয়া
 সন্তানকে শিক্ষা দিতে হইবে, উহার সত্যের পথে
 সন্তানকে বহুদল-বিকরণ করাইতে হইবে, নহিলে
 সন্তানের ভবিষ্যৎ মাটি হইয়া যাইবে। মাতৃভের সেই

উক্ত আদর্শকে অবলম্বন রাখিয়াই প্রবীণ প্রকারে এ
 গ্রন্থে মাতার কর্তব্যাদি নির্ধারণ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি
 বাঙালির গৃহে গৃহে পঠিত হোক।

ক-কারের অহঙ্কার। ঐহিক ললিতমহার
 বন্দোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম. এ কর্তৃক প্রণীত।
 কলিকাতা, বঙ্গবাসী কলেজ প্রাইন্টিং প্রকাশিত।
 কলেজ প্রেসে মুদ্রিত। নিম্নের এক দিক ও এক
 আনা। মুদ্রণে গ্রন্থকার একটি "কৈতরিত"
 লিখিয়াছেন, "ককারের অহঙ্কার প্রকৃতপক্ষে 'অনুগ্রহ'
 নামক পুণ্ড্রের প্রকাশ্য রূপ। * * * তাহা-
 ত্বের কোন প্রকার আলোচনা ইহার বিপরীত
 নহে। * * * বিপরীত নির্দোষ আলোচনা প্রদান করিবার
 প্রয়াস করিত।" গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।
 বইখানি পড়িতে বেশ মজা লাগে—কথার ফাঁকে
 ফাঁকে একটা হাসির তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে।
 লেখক গোড়া হইতেই এখনই তীব্র কোমলতার
 সঞ্চার করিয়াছেন যে একবার পড়িতে আরম্ভ
 করিলে শেষ করিতে হইবে। কোথাও গণবৈপ্লব
 প্রদর্শন নাই, বিপরীত যেমন লম্বা, তেমনই স্বচ্ছ, সরল
 ইহার বর্ণনাত্মক। বিশ্রাম-কণ্টককে আনন্দ-মুখর
 করিবার পক্ষে পুত্রিকাখানি উপায়ের হইয়াছে।

ভালবাসা। ঐহিক ঐপতিমোহন রায়
 প্রণীত। একালক, ইতিহাসের বিষয়, ৩০ কলেজ স্ট্রীট
 কলিকাতা। অবসর প্রসঙ্গে মুদ্রিত। মূল্য বাথাই এক
 টাকা, আঁখি বাথো আনা। এখানি উপভাস।
 লেখকের বিরোধবাক্য উপভাস লিখিবার সক্তি আছে—
 "ভাষ্য হানে হানে প্রামাণ্যবোধ" থাকিলেও "ভাষ্য
 বজ্জ—ভাষ্যেই প্রবাহ আছে—প্রাণ আছে। চরিত্র-
 স্তম্ভ করিবার সক্তিও লেখকের মন্য নহে। তবে ইহার
 স্রষ্টাভে কয়েকটি বিষয় বোঝা যায়। প্রথমতঃ
 প্রথমতঃ নায়ক বেবরতের চরিত্রেই মনোমত তরলতা
 দেখা দিরাছে, বাহার দৃষ্ট লেখক পূর্ণাঙ্গ কোনরূপ
 আয়োজন করেন নাই, বাহা পাঠকের কাছে
 একেবারেই অস্বস্ত, বিশৃঙ্খল; দ্বিতীয়তঃ উপনায়ক
 বোহিভের চরিত্রের প্রথম দিকটা বিপরীতী চরিত্র
 তত্ত্ব—শেষে যদিও লেখক বোহিভের পরিণামটুকু

নূর নাহায়েল। লইয়াছেন। তৃতীয়তঃ কাকনের চরিত্রে লেখক শেখ রফা করিলেও তাহার কতকগুলি স্বাভাবিক শিক্ষিত মহিলার পক্ষে একেবারেই অস্বাভাবিক—বিশাঙ্গীরা রূপ-বাহনাদিরীক মতই হইয়াছে। তৃতীয় গোট-খাট অসঙ্গতি আরও আছে। আবার একটি কথা,—তাহার লেখক এতখানি কথা চলিয়াছেন যে, স্থানে স্থানে তাহা নিতান্তই ‘গা-ছুরি’ এবং ‘বেবাঙ্গা’ হইয়া উঠিয়াছে। সেজন্য চরিত্রগুলিও মতে মতে কৃত্রিমতার স্বেচ্ছা করিয়া ভাণ-অভিনয় করিতেছে বলিয়া মনে হয়। লেখকের সজ্ঞিত উপর আদ্যের বিখ্যাত আছে বলিয়াই এক কথা বলিলাম। আদ্যকাল অতি অল্প লেখকের উপস্থানেই আদ্যের একটা রচনা-শক্তির আভাষ পাই। “ভালবাসা”-র লেখক ভবিষ্যতে সতর্ক হইয়া লিখিলে তাহার নিকট হইতে কালে যে আদ্যের পূর্ণ উপলব্ধি উপভোগ্য উপভোগ্য পাইবে, এ আশা একান্ত দুঃখজনক বলিয়া মনে হয় না।

রক্ত ও বাজ। ঐহিক নটীপটের ঘটক, এন. এ. বি.এল. প্রমিত। কলিকাতা, সেন রায় এড. কোং, কর্ণওয়ালিস বিল্ডিং হইতে প্রকাশিত। ঐন্দোবাস প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ আশিক। এখানি রস-রচনা—ইহাতে সর্বদেহের সাতাশটি রচনা সংগৃহীত হইয়াছে—তন্মধ্যে তেরোটি পদ্য ও অপর-গুলি গল্প। রহস্যই ৮০গুলির অংশ। “আমার কুর্কুনি”,—পরিবেশলাগের প্রসিদ্ধ ‘আমার কুর্কুনি’র parody (সালিকা)—‘ভারতী’তে প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং অচিরেই এ সালিকাটি মূল গানের মতই সাধারণে সমাদর লাভ করে। ‘হাসি’ গল্প নিবন্ধ—স্বন্দর। লেখক এই নিবন্ধে হাসির বর্ণন লিখিয়াছেন—নিবন্ধটিতে লেখক রহস্য ও চিত্রাঙ্গীতের বেশ মিশ্রণ করিয়াছেন। “গল্পের পাড়ী” “পটিকা,” “চৌকি,” “বোলক,” “আরসি,” “টাকা,” “শব্দ,” ও “অলঙ্কার” আখ্যায়ের ভাল সাধারণ—এগুলির রহস্য উদ্ভব,—বিচিত্র—কোনখানে ‘কালুহুতু’ দিবা’ হাঙ্গাইবার অক্ষয় নিদ্রা দেটা নাই—অথচ সেই সঙ্গে প্রবন্ধগুলির বধ্য দিবা অস্তগতিলা কল্প মতই চিত্রাঙ্গীতের একটি স্বতন্ত্র প্রদর্শন দ্বারা বহিরা চলিয়াছে।

ঐহিক রহস্যই শিকিত সনাতনের প্রকৃত উপভোগ্য। সালিকাগুলির মধ্যে ‘সোনার ঘড়ি,’ ‘আমার প্রিভে’ ও ‘কুর্কুনি’ রহস্যে প্রাণ। “সপ্তকথ কাণ্ড” চলনশীল। এ প্রেমের রস-রচনার বিবেক বাঙালার বহু লেখক কুর্কিরাছেন—সালিকাও হারপোকার বাড়ির মত সাদিক গল্পের পুষ্ঠার বিস্তারিত কত-পত দেখা বাইতেরে—কিন্তু সেই সব অক্ষয় লেখক রহস্য ও ‘ভাড়া’র মধ্যে পার্থক্য ক্রি, তাহা জানেন না। সে সকল রচনার রহস্য (১) তাড়ি-খামার উপস্থিত—ভ্রম বা শিকিত সমাদর তাহাকে আঘাত দিবে না। “রক্ত ও বাজের” রহস্য-রস সে প্রেমের মধ্যে। এ রহস্যে উদ্ভব আছে, বৈচিত্র্য আছে, রস আছে—কোন আবিষ্কার নাই। তবে এমন করেই রচনাও এ প্রেম হান পাইয়াছে, যাঁরা যাব দিলে প্রেমের সৌন্দর্য বাড়িত বৈ কথিত না। প্রেম হইবারি ছবি দেওয়া হইয়াছে। হাঙ্গা কাগজ ভাল।

দারিদ্র্য। ঐহিক বেবানুয়ার রায় চৌধুরী প্রমিত। প্রকাশক, ঐন্দোবাস প্রেস সেন “দ্বিরাণ,” বরিশাল। কলিকাতা, সিদ্ধেশ্বর মেসিন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি কথিত-প্রবন্ধ। সর্বদেহের ২০টি গল্প কথিত। এ প্রেম সজ্ঞিত হইয়াছে। “কথিতগুলির অধিকাংশই ১০ বিবিধ সাদিক-গল্পের গল্প পাঁচ গল্প বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।” কথিতগুলি নানা ভাবে, নানা রসের। হাঙ্গা কাগজ ভালো।

রামায়ণ। ঐহিক হেমন্তকুমার সুখোপাধ্যায়, বি. এ. বি.এল. প্রমিত। প্রথম ৮০ (আদি কাণ্ড হইতে মূল্য কাণ্ড)। প্রকাশক, সেন রায় এড. কোং, ৮ ও ৯ নং কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা। হুস্তগীর্ন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বেড়ে টাকা মাত্র। এখানি ‘মহর্ষি বাস্করীক আদি কাণ্ডের পক্ষে মধ্যস্থতা’। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু, অধ্যবসায় ও আদ্যায়ন, ভাবা সঙ্গ, সহজ,—কোনরূপ আভ্যন্তর নাই—হৃদয় বিচিত্র। স্থানে স্থানে কথিত আছে। পড়িতে ও এক্ষণে লাগে না। প্রেমের হাঙ্গা কাগজ বাঙালি ভালই হইয়াছে।

দেবী-পূজায় জীবন্ত ছিল। শ্রীমত যদীশ নাথরায় কবিরায় সঙ্কলিত। কাণ্ডগ্রন্থকোলা, 'মৌর্যগণনাথরায় সমিতি' হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা, মণিগ্রন্থ-প্রতিষ্ঠান। গ্রন্থকার বহুকাল ধরিয়া দেবীপূজার জীবনবলি অস্ত্রায় প্রচার বিক্রমে আন্দোলন করিতেছেন। সে আন্দোলনের ফলে 'কতিপয় ব্যয়োগ্যাদি কলীপূজা হইতে হ্রাস' বলি উদ্ভূত হইয়াছে।' এই প্রস্তাবের বিরোধ-কল্পেই তিনি শাস্ত্রাদির যত সন্ধান করিয়া প্রতিপক্ষের 'নিম্নত্ব' বৃত্তির অসাহিত্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এ দেশে শুধু Sentiment-এর দ্বারা অস্ত্রায় প্রচার নিবারণ করা অসম্ভব—প্রতিপক্ষ শাস্ত্রের বোঝাই চাহে, সংস্কৃত শ্লোক বোঝে। তাই লেখক শুধু প্রবচন-বৃত্তি বিদ্যা নহে, শাস্ত্রীয় শ্লোক বিদ্যাই প্রতিপক্ষের যত-খণ্ডনে চেষ্টা করিয়াছেন। "দেবীপূজা", "খণ্ডপূজা", "ব্রহ্মসংসারী পূজা", অতীত ও "ঐতিহ্য" সমস্তই এ বিষয়ে লেখকের স্বপক্ষে। প্রমাণাদি একত্র করিয়া লেখক বিধি জীবন-গতের উপকার করিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ।

জল-চল ও খাদ্য-খাদ্য বিচার। শ্রীমত

বিদিশনাথরায় ভট্টাচার্য্য প্রণীত। সিংহগড়, 'আনুর্ভব শাস্ত্রীমুদ্রা' হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা, প্রতিষ্ঠান। গ্রন্থে মূত্রিত। মূল্য আট আনা। অল্পমূল্য পণ্ডিত জাতির পক্ষ অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থে লেখক তাহারিগণকে সমাজে বৃত্ত করিবার পক্ষে মানা বৃত্তির অবতারণা করিয়াছেন। এ দেশের প্রাচীন সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, উক্ত জাতিগণকে সমাজ হইতে প্রেরিত কলিবার মূলে অধিকাংশ মূলেই ছিল শুধু মীচ স্বার্থ বা বিদ্বেষ। শাস্ত্রাদি হইতে লেখক আরও প্রতিপন্ন করিয়াছেন, চরিত্র এবং বিদগ্ধ আচার-ব্যবহারেই লোকের সমাজে উন্নতি হয়। অতীত-পরিপ্রেক্ষার উপর বিচার নহে। দৈবাৎ ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম হইয়াছে বলিয়া পানচাঙ্গী ব্যক্তি পূজার্থ থাকিলে, আর চণ্ডালের বংশে জন্মিলে কোন ব্যক্তি যদি প্রবচন-বৃত্তিতে বড় হয়, তাহা পি তাহাকে পায়ের নীচে চাপিয়া রাখা, এ ব্যবহার সমাজে প্রচলিত হয়, টকিতে পারে না। লেখক নির্ভীকভাবে এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন—তাহার মূল্যও নিম্ন। এ দুইখিনি তিনি এ গ্রন্থে একত্র করিয়া প্রত্যেক সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তিরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

ঐসত্যব্রত শর্মা।

গোলাকার

অম্বলারিগ্রন্থের পয়ে পয়ে পয়ে' বেড়ে ওঠা,
 'চৈল্যাঠেই মারামারি করে' ছুটি পরমা লোটা,
 মাকে মাঝে মাঝে ভোগা এবং শেষে শিলা ফোঁকা,
 সবাকার-ই ভাগ্যে ঘটে, হোক সে জানী কিবা বোকা।
 জীবন-ভবের সহজ অর্থের চলছে শুধু দীর্ঘ টীকা;
 গরিবের ঘেঁষে ফাঁটার বনে সৰু মোটা গ্রাহলিকা।
 ঘুরে ফিরে শুক-আঁধার লাগে আবার বাটের তটে!
 প্রমাণিত হচ্ছে কেবল—ধর্ম্য গোলাকার-ই বটে।

ঐবিজয়চন্দ্র মল্লিক।

আমাদের প্রশ্ন

ভারতীয় সম্পাদনভার হাতে লইয়া অবধি এই কথটা আমাদের কেমনই মনে উঠিতেছে যে বাচারা অহুগ্রহপূর্ণক ভারতীয় গ্রাহক হইয়া আমাদের উৎসাহিত এবং ভারতীয় উপকার করিতেছেন, আমরা তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতে পারিতেছি কি না। গ্রাহকের বিবরণ, কোন গ্রাহকই ভালো-মন্দ, হ্যাঁ-না—কোন কথাই বলেন না। কাজেই তাঁহাদের মনোভাব সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া বাই। আমাদের মনের মতো করিয়া আমরা ভারতীকে সাম্রাটবীর চেষ্টা করি কিন্তু তাহা একান্তবর্ণের মনস্তত্ত্ব করে কি না জানিতে পারিলে মাথার ঘেঁষা ঠাঁহাদের চোখে যে ভ্রটি পড়ে এবং বাহা তাঁহাদের মনের-মত হয় না তাহা জানিতে পারিলে আমরা সংস্কারে চেষ্টিত হইতে পারি। এই উদ্দেশ্যে আমরা গ্রাহকবর্ণের নিকটে কয়েকটি প্রশ্ন উপস্থিত করিতেছি। আশা করি, তাঁহারা ঈশ্বরের প্রীতি অবহেলা না করিয়া, তাঁহাদের উত্তর পাঠাইয়া ভারতী পরিচালনে এবং তাহার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে আমাদের সাহায্য করিবেন।

প্রশ্ন

১। ভারতীতে এখন মাসিক বক্তৃতা পাতা দেওয়া হয়, তার চেয়ে বেশী চান কি না? এককমে বলিয়া রাখা ভালো আজ কাল বাংলা মাসিকপত্রের সংখ্যা এবং

পত্রিক বক্তৃতা বাড়িয়াছে, ভালো লেখকের সংখ্যা তত্ত্বপূর্ণোপী বাড়ি নাই। কাজেই আকার বৃদ্ধি করিলে বাজে মাল না চালাইয়া উপায় নাই।

২। প্রবন্ধের ভাগ বেশী চান, না গল্প, উপজ্ঞান, নক্সা ইত্যাদি?

৩। কোন্ প্রেণীয় প্রবন্ধ বিশেষ সুখ-রোচক—ঐতিহাসিক? প্রত্নতাত্ত্বিক? বৈজ্ঞানিক? সামাজিক? না সাহিত্য, শিল্প-কলা সম্বন্ধীয়?

৪। ছোট গল্প এবং ধারাবাহিক উপজ্ঞানের মধ্যে কোনটার পক্ষপাতী?

৫। বিদেশী ছোট গল্প এবং উপজ্ঞানের অনুবাদ ভালো লাগে কি না?

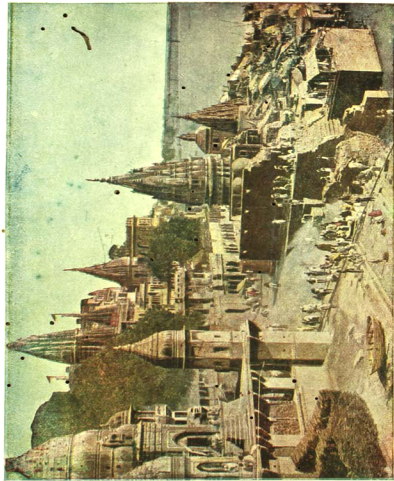
৬। কোন্ লেখকের ছোট গল্প এবং উপজ্ঞান পড়িতে বেশী উৎসাহ?

৭। কোন্ কোন্ কবির কবিতা ভালো লাগে?

৮। বিদেশী ছবির প্রতিলিপি, না, ভারতীয় চিত্রের প্রতিলিপি চান?

সমস্ত প্রিজন্স কথার প্রশ্নের মধ্যে বাঁধা ঘরি নাট, অনেক কথার নিশ্চয়ই বাধা পড়িয়াছে, সেজন্য আমাদের প্রশ্নের বাহিরের কথাও ইচ্ছা করিলে গ্রাহকবর্ণ আমাদের আশা করিয়া জানাইতে পারেন। আমরা তাহাতে খুশীই হইব।

সম্পাদক।



दशमेश्वर घाट—वाराणसी।

ভারতী

৩৯শ বর্ষ]

ফাল্গুন, ১৩২২

[১১শ সংখ্যা]

স্বৈচ্ছাচারী

(উপজ্ঞাস)

৫

শিবরামপুরের দুর্ভিক্ষ বেগমান দুর্গাপন্থর চট্টোপাধ্যায় মহাপন্থের বরস যদিও পঞ্চাশের উর্দ্ধে উঠিয়াছে, তথাপি তাহার মাত্র-গতি এ পর্যন্ত বন-গমনের বিবেচনা পড়িবার কোন লক্ষ্য প্রকাশ করে নাই। ইহার মুখ্য গৌণ সমস্যার প্রকৃতি নানাবিধ কারণের মধ্যে একটি বিশেষ কারণ এই ছিল যে তাহার পুত্র যশোদাস এখনও অবধি প্রবেশিকা পরীক্ষার দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া কলেজ-নামক বৃহৎ বিচরণস্থানে কিছুতেই প্রবেশাধিকার পাইল না। যশোদাস মহাপন্থের বেগমানের পুত্র বলিয়া অবশ্য কোনবীরই সে নির্বাচন-পরীক্ষার “বারিত” হয় নাই, কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মূখ্য পরীক্ষকগণ কেহই তাহার জ্ঞানের গভীরতা ও বিজ্ঞান বিদ্যুতি বা অস্তিত্বাধি উপলব্ধি করিতে পারিল না।

এই সমস্ত সমস্যার কারণে যশোদাস এক দাব সংকীর্ণ বিজ্ঞান গহন বনে প্রবেশের কল্পনাও করিয়াছিল। কিন্তু “সহবর্ষ্যঃ” প্রকৃতিব রেকর্ডি-কণ্টকে প্রথমেই তাহার মনের বেগমী চাবরখানি আটকাইয়া দ্বাণ্ডায় নিরস্ত হইয়া দে-কল্পনা সে ত্যাগ করিয়াছে। তাহার পিতার দুর্ভিক্ষ পাইক গণের অত্যাচার চেষ্টাতেও যখন বিজ্ঞান-পন্থের কণ্টক দূর হইল না, তখন সে অগত্যা একটা কন্সল্ট ও থিওরেটিক পাঠা' খুলিবার সঙ্কল্প করিল।

বেগমান মহাপন্থের ইচ্ছা ছিল, তাহার পুত্র বিজ্ঞানপন্থের সব-কণ্টা ডিগ্রি আদায় করিয়া শেষে আইনের মুকুট মাথায় চড়াইয়া কালিকাবাণী বিতরণ এষ্টেটের পরামর্শ-দাতা অস্ত কোন প্রকার দণ্ড-মুণ্ডের কণ্টা হইয়া তাহার সমস্ত শক্তি

উত্তরাধিকার নিয়ে লাভ করে। কিন্তু মণিষকর কোন প্রকারেই প্রবেশকার সিংহ-বার পার হইতে পারিল না; উপরন্তু দেওয়ানজী দেখিলেন, দুইটী অগ্ন্যাত অস্ত্রাভ্যাসনা • হস্তযন্ত্রিত তাহার পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে দিয়া অস্ত্রব্যব হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাগ্যাকাশে যুগপৎ এষ্ট যুগল ধ্বংসকর উপর দেখিয়া হর্গাশকর পূর্বাভূত সত্যক হইতে আশঙ্ক করিয়াছেন।

পরগণে কমবধুপুত্র ও তথক পরজার-ডেবার নিকাশ সারিয়া হিসাবনা ও নজরানার করেক শত টাকা সঙ্গে করিয়া হর্গাশকর রাজি আটটার সময় গৃহে ফিরিলেন। তাহার বিত্তীয় পক্ষের স্ত্রী নিস্তারিণী দেবী ইতিমধ্যে মহা উৎকর্ষা কাল-যাপন করিতেছিলেন; কারণ, পুত্র মণিষকর বৈকালে মাতার নিকট তাহার কনসার্ট-পাটার লজ দুইটা বাঁশের আদ্যার লইয়া বস্তুর কাপড়াকাটি করিয়া গিয়াছে। এমন কি, দুই একবার তাহার শূঙ্খার উপক্রমও দেখা গিয়াছিল। মণিষকর না কি বালাকাল হইতে বুদ্ধিশক্তি প্রাচুর্যের লজ ঐ বোগে জুগিতেছিল; তাই তাহার মাতা যখন-তখন দেওয়ান মহাশয়কে উক্ত বিষয়ে সতর্ক করিয়া মণিষকর বাহ্যে সক্ষমা প্রদান থাকে, তাহাই কঠিতে উপদেশ দিতেন;—অনন্ত উপদেশের সঙ্গে তাহার অস্ত্রাভ্যাসনা প্রয়োগ করিতেন কি না, সে বিষয়ে সঠিক সংবাদ কেহ বলিতে পারে না। তখন উক্ত দেওয়ান হর্গাশকরকে কেহ সেই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন না করিয়া চুপ করিয়া

থাকিতে দেখে নাই। এমন কি, দুই লোকে এ কথাও বলে যে দেওয়ানজীর “ব-কৃত” তালুকগুলির মুনাফার টাকাও কিস্তি কিস্তি ইহারই হিম্মতক্রমে হইয়া থাকে। নিস্তারিণী দেবী অনেক সময়েই বামী মহাশয়কে কৃপা করিয়া “ব-কৃত” বিষয়-চিন্তার ভার হইতে নিজের দিয়া থাকেন,—অন্ততঃ ইহাই বাজার-গুণব। কিন্তু বাজারে খায়া রটে, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা ঠিক নয়।

• হর্গাশকর অন্যবে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, “ওগো, কোথার আছ?” নিস্তারিণী দেবী অবশ্য অতি নিকটেই ছিলেন, কিন্তু অস্তরের উৎকর্ষা পাছে মুখে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাই কক্ষ হইতেই একজন দাসীর উপর হুকুম-ভারী হইল, “ওরে রাজ্জ, জল-চৌকি-আর গাড়ীটা এগিরে দে—বাবু এসেছেন।”

হর্গাশকর সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া টাকার ভোড়াটা দপাগ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, “উঃ, বেটারা কম হাঙ্গামা করেছে। কোন বেটার যদি বুদ্ধি শুদ্ধি থাকে। শোন, ওগুলো লোহার হিম্মতে তুলো না, আগুনামিতেই রেখে দাও। কাল আমার টাকার বিশেষ দরকার।”

নিস্তারিণী দেবী আগুনামি খুলিতে খুলিতে বলিলেন, “আমারও একশ’ টাকার বিশেষ দরকার। কত টাকা আছে এ তোড়ার?”

“সাত শ’ বাইশ।”

“তুমি কাল কত নেবে?”

“দরকার ত আর এগার শ’ টাকা। ঐ সাত শ’ আর চার শ’ কাল জোগাড় করে

আমার সন্নিপাতের খবরটা শোধ করে দিতে হবে, তারা ভাগাধা লাগিয়েছে।”

“এক শ’ টাকা আমার কাল দিতে হবে। বাদ-বাকি তুমি নিও।”

“হঠাৎ এত টাকা কি হবে?”

“মণির সঙ্গে জুটো বাণি কিনে দিতে চবো।”

“বাণি! বাণি কি হবে?”

“কি হবে, তা জানি নে। না পেলে আবার হয় ত সে মুক্কা যাবে। আজ অনেক কষ্টে তাকে সাবলেছি।”

পুত্রের বিষয় কোন কথা বলিতে গেলে এখনই একটা বিপদ ঘটতে পারে, সেই ভয়ে দুর্গাশঙ্কর ভাড়াভাড়ি মুখাবি প্রকাশন করিতে বাহিরে গেলেন। এত পরে জনযোগ সারিয়া গড়গড়ার নল মুখে বিরা বাহিরে বৈঠকখানার গিরা বলিলেন। বাহিরে গ্রামস্থ দুই একজন উদ্দেশ্যর ভলপিদার মোসাহেব তাঁহারই অপেক্ষার বসিয়াছিল।

দেওয়ানজী আসন গ্রহণ করিতেই বুদ্ধ পার্শ্বভীনাথ সরকার বলিলেন, “দেওয়ানজী, আপনি মণিশঙ্করের হারমোনিয়া বাজানো শুনেছেন? কি সুন্দরই সে বাজাচ্ছে! আমি আসতে আসতে পথে পৌঁড়া বাঙলাক ওর বাজনা শুনে এলাম।”

রাজীব জোয়াদার বাঁধানো হাঁকাটা আর একজনের হাতে চালান করিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন, “এই ত মোটে হাস্যবানেক হল হারমোনিয়াটা ও কিনেছে, এরই মধ্যে এত শিখলে কবে?”

পার্শ্বভীনাথ কহিলেন, “পূর্নজন্মের সংস্কার, ভায়া! পূর্নজন্মের সাধনা।”

পার্শ্বভীনাথের উপর সরকারি ছুটো ডিফি এখনও খুলিতেছিল। এবারে সেটার পরিশোধের কোন আশা ছিল না, তাই তিনি ঐদ নাতিটাকে মণিশঙ্করের থিয়েটারে জুটাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু পুলের পাণ্ড মাঠারটা এ বিষয়ে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক অমুরোধ করিয়া বিফল-মনোরথ। চটয়া দেওয়ানজীকে ঐ বিষয়ে অমুরোধ করিতে বলিয়াছিলেন। দেওয়ানজী তাই গস্তার মুখে বলিলেন, “সরকার মশার, আপনার নাতিটাকে এরই মধ্যে পড়াশুনা ছাড়িয়ে দিলেন? পাণ্ড মাঠার ত খুব চুপ করছিল। সে বলছিল, আপনার গিরিমা-নাথের বেশ জর আছে, সে এন্ট্রান্স পাশ করবেই। এরই মধ্যে ওকে পড়াশুনা ছাড়ানো ভাল হল না।”

পার্শ্বভীনাথ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, “আজ্ঞে দেওয়ানজী, মণিই এখন পাশ করতে পারলে না, তখন গিরিমা আর কতটুকু ধার! তাই মনে করছি, আমার যা কিছু আছে, তাই দেখবে-শুনবে আর মণির সঙ্গে থেকে যদি—”

রাজীব জোয়াদারের উচ্চ হাজে সরকার মহাপ্রহর নাকি কথাটুকু শুনিতে পাওয়া গেল না। দেওয়ান মহাপ্রহর সেই হাজে যোগ দিয়া বলিলেন, “না, না, সরকার মশা, এরই মধ্যে তা করবেন না। মণির সঙ্গে জুটলে ওর ইহকালও বাবে, পরকালও বাবে। ম’ণটাকে নিয়ে যে কি কুসব, তা আমিই ঠিক করতে পারছি না। তার ওপর আপনারা পাঁচজনে লাগলে ওকে আর সামলানো বাবে না। সেখান দেখি,

জায়গা মশায়ের ছেলেটিকে আর সন্ধানকে। এই মধো ওরা কেমন এগিয়ে যাচ্ছে। আহা, ছেলে দুটিকে বুকে ধরতে ইচ্ছা করে।”

উপস্থিত বক্তৃতাগুলোর মধো, রাজীব মোহান্দার ব্যতীত, “কালকেই দেওয়ানজীর এই মেবোপস করণার গলিয়া গিয়া “আহা তা বটে!” “ভাতে আর সন্দেশ কি?” ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার কথার পোষকতা করিল। কিন্তু মোহান্দার মহাপ্রবোধের কোটর-গত জ-সমাজের দুই চক্ষু হইতে একটা অস্বাভাবিক দৃষ্টি বাহির হইয়া দেওয়ানজীর অর্ধ নিম্নলিখিত চক্ষুর সহিত সঙ্গত হইল। এবং সুহৃৎই এই দুই বক্তুর চোখে-চোখে একটা নীরব কথাবার্তা হইয়া গেল। তাহার পর, দুই এক ‘বান’ দাবা খেলা ও তাসকূট খেলার পর সকলেই যখন উঠিয়া বাড়ী গেল, তখন মোহান্দার মহাপ্রবোধে একা পাঠের দেওয়ানজী বলিলেন, “কি করি বল ত, রাজীব? মণির যে কি করব, কিছু বুঝতে পারছি না।”

রাজীবলোচন তাঁহার খেত-কৃষ্ণ মস্তকটি আশ্চর্যান্বিত করিতে করিতে বলিলেন, “বাবি, তখনই বসেছিলাম তোমায় যে, এ ভাল হচ্ছে না, তুমি জায়গাটাকে টোল-তুল গল্পাশির করে দিয়ে এস,—তুমি ত তা শুনে নাই। যেদিন কার্তিক ছোঁড়াটা কাছারিতে বাবুর নাকের ভপর তোমায় অপমান করলে, সেই দিনই বুকেছিলাম, তোমার মণির তাগো কাঁচকলা!”

দেওয়ানজী কহিলেন, “এখন আর তা হয় না। বাবু এই ছোট্ট চ্যাঙড়াকে কি

নকশে যে দেখেছেন, তা বলতে পারিনে। স্বয়ং হেডমাস্টার ওদের মাস্টার হয়ে দেখাচ্ছে। জায়গা এখন পরামর্শ-দাতা, হস্তা-কস্তা-বিধেতা। কি করি!”

দেওয়ানজী মুখের নলটা ছুঁড়িয়া কেলিয়া বলিলেন, “হরে, তামাক দিয়ে যা না! বেটা এরই মধো ঘুসুচ্ছে।”

ভূতা হরিদাস কলিকার হুঁ দিতে দিতে প্রশ্ন করিয়া বলিল, “খাবার হয়েছে। মা ঠাকরণ—”

“বা, বা, এখন গোল করিস নে।”

হরিদাস গড়গড়ায় কলিকা বসাইয়া দিয়া বলিল, “ঠাকরণ, বল দেখে এস।”

“যাক্ছি, তুই যা না, কথাটা সেয়ে যাক্ছি, বল্গে।”

হরিদাস নাড়েড়বান্দা; আপন-মনে বকিতে লাগিল, “রামে মারলেও মারে, রাবনে মারলেও মারে। এখন যাই কোথা? রাজীব বাবু, বাড়ী বান না, রাত হয়েছে। মা যেসেছে,—বাবু ওঠো—আমার যেমন কপাল—খাটেতে খাটেতে এগাটা গেল—ওঠো বাবু—”

দেওয়ানজী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “রাজীব, কাল দুপুর বেলা এস।”

রাজীবলোচন অগ্রেই উঠিয়া পড়িয়া ছিলেন। কারণ মা-ঠাকুরাণীর রাগের অর্থ তিনি ভাল রকমই বুঝতেন। তাই পরদিন আসিতে বীকৃত হইয়া তিনি প্রশ্ন করিলে দেওয়ানজীও হরিদাসকে বকিতে বকিতে অন্তঃপুরে চলিলেন।

সতেরো বৎসর বয়সের মধ্যেই তিনি বহু ও গ্রামস্থ বহু বৃদ্ধের মরণে তাঁহার অপূর্ণ কবিত্ব-শক্তির এক বিখ্যাত হট্টবাহিলেন; এবং উনবিংশ বর্ষ গত হইতে না হইতেই তিনি "মকরাক্ষের মোক্ষ" নামক নাটক ও "গঙ্গার গোম্পদ লাভ" নামক মহাকাব্যের তিন সর্গ লিখিয়া বঙ্গ-গৌরবে মণ্ডিত হইয়াছিলেন।

আজ কোন এক অপূর্ণ গণ্ড-কাব্যের 'উদ্বোধন' তাঁহার মস্তিষ্কে জাগিয়া উঠায় তিনি বিশ্রামে তাঁহাদের বাগানের একটা আমগাছের তলার বাসরা উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে চাহিয়াছিলেন। পার্শ্বে হেরন্ডের বাড়ীর সুটটি বনাদরে পড়িয়া-ছিল। কবিবর মণিশঙ্কর এক-মনে এক রাখালের গোচারণ-কালীন স্মৃতি স্মরণিত-ছিলেন এবং তাঁহার মস্তিষ্কে সেই স্নেহ কাহার কমল চরণের রিগিকি ফিরির বধুর রাগিণী ফিরিয়া ফিরিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল, কে জানে।

রাখালের গানটো অতি চমৎকার, অতি করুণ। বিশেষতঃ তাঁহার গলায় অনিশ্চিত পটুত্বের অপূর্ণ নিদর্শন দেখিয়া আমাদের কবিবর তাহাকে তাঁহার থিয়েটারে কোনও একটা পার্ট দিতে পারেন নাকি না, ঐ সময়ে তাহাও ভাবিতেছিলেন। রাখালের গানটিতে বেশ বধুর ও করুণ রসের সমাবেশ ছিল। রাখাল গাহিতেছিল,—

"হেঁচি মা' পো। তেবা' য'হু পো।

ছনিয়া গোড়ালে আলা।

মা'ব কইরে সখা। পানী না'হি হয়,

বাঁচী 'কাইটা' হল চালা চালা।

বাছুর বাসুন যত হওয়া ছাটজ্যান
'শিখি' মাথা ওঁরা পানি ঢেইয়া বান,
কইবা ভাতুল হইল যাত মোঁকমন,
কোরাণ পইড়া হল চারানে মোরা।"

কবি মণিশঙ্কর "রাখাল-বাগকটীকে" নিকটে ডাকিয়া তৃতীয় নিকট হইতে গানটো লিখিয়া লইলেন এবং তৎক্ষণাৎ একটা নবতর সুরের শুজন-ধ্বনি তাঁহার মগজে জাগিয়া উঠায় তিনি রাখাল-বাগকের সঙ্গে বাঁধিতে তান ধরিয়া দিলেন। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় হুরটি তাঁহার বহুর, মহলে "শঙ্কর-দাহি" নাম ধারণপূর্বক প্রচারিত হইয়া গেল।

'কিন্তু এইরূপে আমাদের মণিশঙ্কর নব হুর, নবতর গান এবং নবতম কাব্যের জন্য, দ্বিগুণ মনে বৃত্তি পাঠিতেছিলেন। না। কারণ তাঁহার মানস-প্রতিমার মূর্তি তাঁহাকে শরনে বগনে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। এই মানস-প্রতিমাটো হঠাৎ এক শ্রান্তের সন্ধ্যার দশম বর্ষীয় এক বাণিকার রূপ ধরিয়া বহু জামা-জোড়া শ্রী-অঙ্গে ধারণ পূর্বক সবুট পনক্ষেপে কবিবরকে মানস-আম-দরবারে প্রবেশ করিয়া একেবারে রাগীর মহিমায় চিত্ত-পিংহালনে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। ইনি আর কেহই নন, আমাদের পরিচিতা ত্রিযুক্তা শৈলজামল্লরী। দ্বিগুণ কবিবর ইহাকে বহুর দৈখিয়াছিলেন, তবুও কে জানে কেন, কোন্-এক অপূর্ণ সন্ধ্যালোকে অপরূপ লয়ে টম্‌টমেগেরি উপবিষ্টা ত্রিংশ সফল ব্রূতা আয়ের সম্পত্তি-শালিনী এই মহিম-ময়ী কুমারী এক-লক্ষ

উচ্চারণ সাক্ষাৎসময়ের টমটম চটতে একেবারে কড়ির চিত্র-শব্দগুলির উপর চড়িয়া বসিয়াছিলেন, তাই কবি মণিশঙ্কর উদ্ভাস-চিত্ত, উৎকণ্ঠ-হস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। • হাজার বাতাস নিস্তারিণী দেবী বলেন যে তাহাঁদের পরিপাকের গোলা-মালা হইতেছে; বজ্র! বলেন, কবিতা দেবী কুটিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং শত্রুরা বলেন—না, সে কথার আর কাজ নাই। শত্রুর কথার কান দিতে গেলে অগতের কোন শক্তিমান পুরুষের সম্বন্ধেই কোন কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব হইয়া পড়ে— গজিকা-সেবনে বা ধাত্তেশ্বরীর সেবার কর্তব্যের উৎস খুলিয়াই যার, হজমের গোল • করে না, শত্রুরা বাহাই বলুক, মণিশঙ্করের • “শঙ্কর-নাহি” সঙ্গীত গজিকার ধূমে অথবা সমগ্রান্তরে ধাত্তেশ্বরীর চক্ষে অধিকতর ভবিষ্য উঠে। শত্রুর কথার কর্ণপাত নিস্তরঙ্গোজ।

কিন্তু প্রকৃত কবির মনোভাব কখনই গোপন থাকিতে পারে না, তা সে কথা যত গোপনীয়ই হোক। যে কথা তিনি লোকে কর্ণে অঙ্গুলি দান করিবে, তাহাও • যদি প্রকৃত কবির জীবনে ঘটয়া থাকে, তবে কবিতা দেবীর রূপাঙ্গ তাহাও অগতঃসমক্ষে প্রচারিত হইবেই; এবং নিরুদ্দেশ হি কবরঃ স্ত্রীমাহাত্ম্যে তাহা প্রকৃত কবিত্ব-শক্তির অভিব্যক্তি বলিয়া লোকে হজম করিবেই। চিরদিনের এট নিরুদ্দেশ্যে কবি মণিশঙ্কর গোপন কথাটি স্থান-কাল-পাত্র-বিশেষে প্রচারিত হইয়া পড়িল; এবং ক্রমশঃ সেই কথা কবির “শঙ্কর-নাহি” বোলে কোন্ এক বিশেষ বুদ্ধের বাতাস

নিস্তারিণী দেবীরও প্রতিগোচর হইল; পরে সে স্থান হইতে দ্বারীত পিতা গুণাশঙ্করের কর্ণেও সে কথা উঠিতে বাধী রহিল না। গুণাশঙ্কর তখন চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, “এ্যা! হারামজাদা কোন্ দিন আমারও সর্কনাশ করবে, দেখি! আরে চুপ, চুপ, কি বল, তার ঠিক নেই! আমার ছেলে শৈলয় ভক্ত-পাগল! মা গুণে, এ আমার কি বিপদে কেরে! তোমাদের আলার কি বেশ ছেড়ে পালাব না কি!”

নিস্তারিণী কহিল, “তা তুমি রাগই কর, আর ঘাই কর, এর একটা বিহিত করতে হবে। মণি আমার খার দার না—শৈলয় নামে কি একটা গান বেঁধেছে, তাই গেয়ে বেঁড়ায়।”

গুণাশঙ্কর কহিলেন, “আরে, থাম, থাম, চাকর-বাকর স্তনতে পেলে সর্কনাশ ঘটবে। হতভাগাটায় মাথা তুমি এমন করে ঝাঙে? আপন ছেলের ইষ্ট বুঝ না? এ সব কি হচ্ছে তোমার?”

নিস্তারিণী দেবী চটিয়া লাগ হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, “হবে আবার কি! তোমারই মাথা পালাপ হয়েচে, তাই নিম্নের ছেলের ডলে দেখতে পছন্দ না। বাবু ত ধর-জামাই নেবার চেষ্টার আছেন। আমার মণি কি তার ঐ স্তনের খোঁচন ঘেরের অঙ্গুলি? কেন, তুমি চেষ্টা কর না! চেষ্টা করে দেখলে এত দিন কোন্ কালে দেখতে, আমার মণি তোমার মনিব হয়ে তোমার ওপর ছুঁম চালাচ্ছে।”

পত্নীর পতিভক্তির এই স্বমধুর পরিচর পাইয়াও গুণাশঙ্করের ক্রোধ কমিল না।

তিনি জুড় বয়ে বলিলেন, “বাবু ঘরজামাই নেবেন বলে কি চাড-পা বেধে মেয়েটাকে জলে কেলে দেবেন! কে তোমার ঐ ষাঠাল গেলেন ছেলেকে ঘরে বেবে?”

নিজারিণী দেবীর আর সঙ্ক হটল না, তিনি মাটিতে পড়িয়া “ওগো, এইন বামীর হাতেও পড়েছিলুম গো, ওগো—” ইত্যাদি নানাবিধ স্করণ উচ্চারণ সহিত বহুবিধ রাগ-রাগিণী-সংযোগে আপনার ‘মহাশয়’ সমক্ষে প্রচারিত করিতে লাগিলেন। দুর্গাশঙ্কর তখন বৈ-প্রতিক দেখিয়া বহু অশ্রু-বিনয়ে এবং নিজারিণী দেবীর কথামত কার্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। সে যাত্রা নিজার লাভ করিলেন। *

৭

দুই-তিন বৎসর ধরিয়া হেডমাষ্টার মহাশয়ের গৃহে বাতায়িত করিয়া সর্জনন্দ ও কান্তিচন্দ্র যখন এন্ট্রান্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশের অগ্রবর্তী পাঠল, তখন শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র দাস একেবারে অপমানে প্রজ্বলিত হতাশাবৎ প্রধান শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, দুই এক বৎসরের মধ্যে কেহই তৃতীয় শ্রেণীর বোধ্য ইংরাজী ও অঙ্কে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে না; হুজা দুইটীকে আরও নিম্ন শ্রেণীতে ভর্তি করা হউক। প্রধান শিক্ষক বামরতন হাজরা হাসিয়া বলিলেন, “আপনি পরীক্ষা করে দেখুন, যদি অল্পশক্ত বোধ করেন, নামিয়ে দেবেন।”

তৃতীয় শিক্ষক মহাশয়ের স্পষ্ট-বক্তব্য নারক একটি সর্জন-বিদিত গুণ ছিল। তিনি যখন তখন সেই শুণ্যস্থান্য কার্য

করিয়া যশ অর্জন করিতে ছাড়িতেন না। সেট কারণেই এমন উপযুক্ত অবসরকে তিনি ছাড়িয়া দিলেন না,—তাঁহার টেরা চক্ষুর একটা মজ্জা একঘন, শিক্ষকের উপর এবং অপরটা খবাকের দরাদর উপর ক্রম করিয়া তিনি বলিলেন, “আপনি নিজে পড়িয়েছেন নলেন যে ওরা উপযুক্ত হবে, তার কোন অর্থ নেই। আমি নিজে পরীক্ষা করে নেই, আর অধঃপাত্ত (অধ-শিক্ষক) পরীক্ষা করেন।” অধঃপাত্ত সেট স্থানেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, “নাহে, আমার পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। আপনিই পরীক্ষা করুন।”

তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় তাহার দিকে ‘উপায় টেরা চক্ষুর এমন একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন,’ যাহার অর্থ বিচক্ষণ চক্ষুতত্ত্ববিদ ডাক্তার লাহেব তিন হাজার বৎসরের হুজুর আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা দ্বারাও উদ্ধার করিতে পারিতেন না। তবে উক্ত শিক্ষক মহাশয় সেই দৃষ্টি যে আত্মস্থাপন দৃষ্টি অর্থেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সন্দেহিত; কারণ তিনি তৎক্ষণাত তাঁর হৃৎ ও শঙ্ক পদের উপর ভর দিয়া স্বাভাবিক পদটা কিঞ্চিৎ দূরে ফেলিয়া ঘুরিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

উক্ত মহাশয়ই শিক্ষক তাহার রানামনে আগুন হইয়া যখন সর্জনন্দকে বলিলেন, “ওহে ছোকারা, কি নাম তোমার?” এ দিকে এস তখন ঐ শ্রেণীর সমস্ত তরুণ ছাত্রগণ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। কারণ, শিক্ষক মহাশয়ের ঘরের বহুবিধ তরুণ

অর্থ তাহারা, অস্থি-মজ্জা অহুত করিতে শিখিয়াছিল। সর্সানন্দ যখন সলজ্জভাবে তাহার লিংগাসনের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি গুরু-গভীর স্বরে বলিলেন, “ওহে, এত খেড়ো বয়সে এতটুকু-টুকু ছেলেদের সঙ্গে পড়তে তোমার লজ্জা করবে না?” সর্সানন্দ অধিকতর লাজ্জিত হইয়া অবনত মস্তকে চটী ফুটা পিমা প্লাটফর্মের পাথর আঘাত করিতে লাগিল। শিক্ষক মহাশয় উক্ত কাণ্ডকে “খেড়ো ছেলের” দুষ্টতা মনে করিয়া গর্জন করিয়া বলিলেন, “চুপ করে রইলে কেন? বল না।” সর্সানন্দ তখন অতি মুদ্র স্বরে বলিল, লজ্জা করিবে।

শিক্ষক বলিলেন, “কিন্তু সাবধান, যা জিজ্ঞাসা করি, বাণ তার ঠিক জবাব দিতে না” পার, তা’হলে তোমার এদের চাইতেও ছোট ছেলেদের সঙ্গে পড়তে হবে।”

সর্সানন্দের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।

শিক্ষক তাহাকে রয়েল রিডার নম্বর ফাইভ নামক অতি অপূর্ণ ও গুরুগভীর পুস্তক হইতে একটা গুরুতম স্থান বাহির করিয়া বলিলেন, “পড়।” সর্সানন্দ কম্পিত হৃদয়ে উহা পাঠ করিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্ধান বলিয়াই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, তাহার ঈর্জারণ তেমন সুবিধাজনক হইল না, তপে কোন স্থানে আটকাইল না। পূর্ণবায়ু তাহার চক্ষু চুইটিতে একটা অস্বস্তার হাসি ফুটাটাই। তুলিতে চেষ্টা করিলেন, ফুটিল কি না সে সংগম কেহ রাখে না, তবে তাহার দত্তপাণ্ডু সহসা বিকশিত কুন্দবৎ সমস্ত

ধোন ও ভীত জ্বরগুণিগ ভরেব অন্ধকার কণাকণে দ্বীভূত করিল। তিনি তাহার দংষ্ট্রময় প্রীতির পাত্র কোন এক বাগকের উপর পুঞ্জীভূত করিয়া বলিলেন, “কেমন বে নিধে, পড়া ঠিক হরেন্ছে?” নিধে ওরফে নিধিরাম ঐক-লক্ষে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, “ও, কিছু হয় নি।” শিক্ষক তাহাকে আদেশ করিলেন, “একবার শুনিবে যে ত, হেড মাটারের ছাত্র হলেই রিডিং পড়া দেখা যায় না।” নিধিরাম পরম পুলকিত চিত্তে অপূর্ণ ভঙ্গিমায় উক্ত শিক্ষক মহাশয় যে ভাবে যে স্থানে মাথা নাড়িতেন, ধারিতেন, বা হ্রস্ব টানিয়া ছোট-বড় করিতেন, অব্যবল তাহার অহুকরণ করিয়া ঠিক সেই ভাবে পাঠ করিল।

তাহার পাঠ-ক্রিয়া দেখ হইলে শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, “That’s all right. শুনলে হে ছোকরা, হ’বছরে এককম রিডিং পড়া দেখা যায় না।”

পরে তিনি সর্সানন্দকে ঐ স্থানের অর্থ করিতে আদেশ দিলেন। সর্সানন্দ ভয়ে ও লজ্জায় হুঁ-এক স্থানের অর্থ বলিতে তুল কুরার আবার তাহার উপর শ্রেণীস্থ মরত বাগকবৃন্দের বিজ্ঞাস্বক কলরব ও সর্বোপরি তৃতীয় শিক্ষক মহাশয়ের বিরাট হাতের তীত্র বিব বর্ধিত হইল।

এদিকে কান্তিকচন্দ্রে সর্সানন্দের অবস্থা দোঁবধা কোঁধে শুমরাতেছিল। হঠাৎ শিক্ষক মহাশয়ের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িবামাত্র তিনি হাসিয়া বলিলেন, “কি হে, অমন করে তাকাচ্ছ কেন? এদিকে এস ত দেখি, তোমারই বা কতদূর দৌড়।”

কাণ্ডিকচন্দ্র ফুৎ দৃষ্টিতে একবার সমবেত বালকমণ্ডলকে দেখিয়া লইয়া এক-লক্ষে সমুদ্রস্থ একটা ডেম্ন ডিঙাটয়া একেবারে শিক্ষক মহাশয়ের নিকটে গিয়া পাড়াইল। শিক্ষক মহাশয় তাহার প্রচণ্ড মুখভঙ্গীতে কিঞ্চিৎ পতমত পাঠ্য বালিলেন, “ও কি! অমনভাবে লাফিয়ে এলে যে? কেবল লাফালাফি শিপেছ, বুঝি?”

কাণ্ডিকচন্দ্র গভীরভাবে বলিল, “যেখানে যেমন রীতি, সেখানে তেমন করতে হয়।”

শিক্ষক মহাশয় অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বালিলেন, “ইচ্ছলে কি বাদর-লাফ লিখতে আসে না কি?”

কাণ্ডিক কহিল, “এখানে ত তাই শেখানো হয় দেখছি। বাক, কি জিজ্ঞাসা করবেন, করুন।”

শিক্ষক কহিলেন, “কি! হুকুম চালাচ্ছ যে! আমি ভোজপুরী ছাত্ত্বখোর দরোয়ান নই যে আমার গর দেখিয়ে সারবে! যা জিজ্ঞাসা করব, তা বলতে না পারলে বিভিন্নে লাগ করে দেব।”

কাণ্ডিক কৃত্রিম বিনয়ে হাত ঘোড় করিয়া বলিল, “বে, আন্তে! এখন জিজ্ঞাসা করুন।”

শিক্ষক মহাশয় বজ্র-নিদানে বলিলেন, “Rascal! bloody fool!”

কাণ্ডিকচন্দ্র টেবিল-চাপড়াইয়া বলিল, “এদের অর্থ চান? এদের অর্থ,—a squint-eyed lame man বাঙলা মানে, টেরা-চোখো, দেড়-ঠেলে মানুষ।”

জর রবার্ট বল বলেন যে ক্রাফাটোভা

নামক আশ্বেষ-সিটির বিকট প্রজ্বলন না কি বহুশত কোশ দূরস্থিত মালুর উপরীপেও শুনা গিরাজিল এবং তাহা হইতে উৎক্লিষ্ট ভয়রাশি স্রুত ঠংলঙের সাক্ষ্য আকাশকেও রঞ্জিত করিয়াছিল। কাণ্ডিকচন্দ্রের ভাবন বিজ্ঞপে তৃতীয় পিন্ধক মহাশয় যে প্রচণ্ড শব্দে আর্গনাকে উর্ধ্বে উৎক্লিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা স্রুত লাইটব্রো ও মরোয়ানের চীনের ছাদেও প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সেই ভাবন শব্দের নানা কারণের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ নামক দৃষ্টিনীত শক্তির যোগ পাকার ব্যাপারটা আরও গুরুতর হইয়াছিল বলিয়া অস্ত্রান্ত শিক্ষক-গণের অজ্ঞান। প্রত্যক্ষ বাহ্যায়

দেখিয়াছিল, তাহায্যও বলে যে, তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া তাহার চেয়ারপানি চৌকি হইতে উঠাকে লইয়াই পতিত হইয়াছিল। কিন্তু সর্বাঙ্গেক্ষা তীব্রতর বেদনার কারণ হইয়াছিল, কাণ্ডিকচন্দ্রের বিজ্ঞাত্যক হাতপরিপূর্ণ-বাঁকা! —উক্ত শিক্ষক মহাশয় যখন ধূলি ঝাড়িয়া উঠিয়া পাড়াইয়া শুনিলেন, কাণ্ডিকচন্দ্র পরিকার কঠে উক্ত বচনটি উচ্চত্ব করিতেছে, তখন তিনি ক্ষোভে হৃৎথে অপমানে কাঁদয়া ফেলিলেন; এবং ব্র্যাক বোর্ডের বেকের উপর আহত পাখানি তুলিয়া সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে অস্ত্রান্ত শিক্ষকগণ সেই কক্ষ সমবেত হইলেন এবং প্রধান শিক্ষক সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া কাণ্ডিকচন্দ্রকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, “কাণ্ডিক, তুমি এঁর অপমান করেছ?”

কাস্তিকচন্দ্রের ক্রোধ অহুশোচন্যের পরিণত হইয়াছিল। সে বিনীত স্বরে বলিল, “উনি মিছামিছি সর্বদাদাকে সকলের সামনে অপদত্ত করেছিলেন, তাই আমি সে অপমানের শোধ নিজেছি। তবে আমি ক্ষমা চাচ্ছি।” কাস্তিকচন্দ্র কোড়-করে তৃতীয় শিক্ষক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কিন্তু শিক্ষক মহাশয়ের অবাতির আলা তখনও কমে নাই; তাই তিনি মুখ পিকৃত কবিশ্য বলিলেন, “আগে ও কান মগুক, নাক-খং নিক, তবে ক্ষমা করব।” কাস্তিকচন্দ্র বিনাবাক্য-বারে উক্ত কার্য সম্পাদন করিল। তথাপি উক্ত শিক্ষক মহাশয় মুখ বক্র করিয়া রহিলেন। দেখিয়া হেডমাষ্টার মহাশয় বলিলেন, “ওর আর তি শাস্তির ব্যবস্থা করবেন, করুন। ও প্রস্তুত আছে।” পূর্ণবাবু আজ্ঞা গিলেন, উহারে সাতদিন বেকের উপর গাড়াইতে হইবে। হেডমাষ্টার মহাশয় বুঝিলেন যে, টেকা অভ্যস্ত বাড়াবাড়ি হইতেছে; তথাপি তিনি কাস্তিকচন্দ্রের উপর সেই আজ্ঞা প্রচার করিলেন। কাস্তিকও বিনা বাক্য-বারে তাহার নিজস্থানে গিয়া বেকের উপর দণ্ডারমান হইল; কিন্তু কোন গালকই সাহস করিয়া তাহার দিকে চাহিতে পারিল না।

হেডমাষ্টার মহাশয় তখন তৃতীয় মাষ্টার মহাশয়কে ডাকিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া বলিলেন, “আপনি কাস্তিকের পিছনে বেশী লাগবেন না। কারণ এর মধ্যেই ও আমার ফাট ক্লাশের সেরা ছাত্রের চাইতেও অনেক শিখে ফেলেছে। এত বড় মেধাবী

ছাত্র আমার হাতে কখনও পড়ে নি ওকে ফাট ক্লাশেই একেবারে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ও কিছুতেই সর্বদাস্বর সঙ্গ-হাড়তে রাজী নয়, তাই ওকেও আপনার ক্লাশে দিয়েছি। আর মনে থাকে যেন, কালিকাবাবুর দৃষ্টি ঐ ছেলেটির উপর সর্বদা পড়ে আছে। ওকে বেশী খাটালে কারও রক্ষা থাকবে না। আর এই বরসে এত মাইনের এমন চাকরী যে আপনার অল্প কোথাও ছুঁতে, তারও বড় স্তরসা দেখি না। সাবধান!”

৮

একাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া শৈলজা যখন দেখিল, তাহার বয়োকনিষ্ঠা বা সমবয়স্ক সুরমা, কমলা প্রভৃতি বহু আত্মীয় অনাভীয়া বালিকার বিবাহ হইয়া গেল, তাহার হইল না, তখন সে আশ্চর্য হইয়া তাহার ঠাকুরমার উপর আশ্রয় আরম্ভ করিয়া দিল। ঠাকুরমা হাসিয়া বলিলেন, “তুট কি রকম বয় নিবি?” শৈলজা সগর্জে বলিল, “কেন, মণিরায় মত।” মণিরায় ইতিমধ্যে মাক্-উপবেশে অমিদার-গৃহে যাত্রায়াত আরম্ভ করিয়াছিল এবং তাহার “মানস-প্রতিমাকে” ভুলাইবার জন্য বহুবিধ জাল বিস্তার করিতেও সে কোন ফলি রাখে নাই।

ঠাকুরমা চমকিত হইয়া বলিলেন, “কিরে, ঐ হস্তভাগাটার মত?”

শৈলজা ফুঁদ হইয়া বলিল, “গাল দিচ্ছ? আমি ওকে বলে দেব।”

“তা দিস, কিন্তু ওকে তোমার পছন্দ হল কেন?”

“ও কেমন মিছেটারে রাজা লাঞ্জে, গান করে, আমার আমার সেদিন কেমন পরগোল দিয়েছে, তুমি দেখনি?”

“দেখেছি, কিন্তু রাজা লাঞ্জে, পরগোল দিলেই কি বিদে হয়।”

“ও আমার কত আগর করে! বাঃ, আমার জেতে সেদিন কেমন মত্ত একটা জ্বলের ভোড়া এনেছিল, আমি মণিদাকেই বিয়ে করব, ঠাকুমা, তুমি বিয়ে দাও।”

ঠাকুরমা হাসিয়া বলিলেন, “ঝাজ্জা, দাঁড়া, তোম বাবাকে বলে গিরের বন্দোবস্ত করছি। কিন্তু মণির সঙ্গে নয়।”

“তবে কার সঙ্গে?”

“কাস্তিকের সঙ্গে।”

“হ্যাঁ, আমি ওকে বিয়ে করলে ত। ও যে হুটে।”

“হুটে। সে কি রে, কি হুটে মি করলে?”

“ও সন্ধ্যাইকে মাঝে। আমার-ত একবার মারতে গিয়েছিল, মনে নেই?”

“সে কিরে। সে কথা এখনও মনে আছে?”

“মনে নেই আমার! তা ছাড়া মণিমা তার কত নিন্দে করে, বলে, ইজুলে ছেলেদের সঙ্গে ও ভারী মারামারি করে, মাটিরদের সঙ্গে স্বগড়া করে। না ঠাকুমা, তার চেয়ে সর্ব্ব-দা ভাল, না হুঁ, ওরই সঙ্গে বিয়ে দাও। কাস্তিকদাকে বিয়ে করব না,—ও তাহলে কোন্ দিন আমার ঘেমে কেলেবে।”

ঠাকুরমা উচ্চ হাস্য করিয়া তাঁহার বৃদ্ধাত্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, “ও খোদা, তোমার মেয়ের কথা শোনো।”

শৈলজার মাতা নিকটে আসিয়া বলিলেন, “কি বলাছস, শৈল?”

শৈল কহিল, “ঠাকুমা আমার কাস্তিক-দাকে বিয়ে করতে বলছে। আমি বলছি, অত হুটুকে আমি বিয়ে করব না।”

মাতা হাসিয়া বলিলেন, “তা না করিস, না করবি! এখন বা, তোকে সরস্ব ডাকছে, তার শশুরবাড়ি থেকে কত খেলনা এসেছে, দেখ্ গিয়ে।” শৈলজা ছুটিয়া চলিয়া গেল।

শৈলজার মাতা তখন বৃদ্ধাঙ্গুরায়ীকে বলিলেন, “মা, ও লব কথা শৈলকে না বলাই ভাল। উনি ওতে রাগ করেন, বাগণ করেন।”

বৃদ্ধাঙ্গুরায়ী হাসিয়া বলিলেন, “তা জানি, মা। কিন্তু তোমার মেয়েই যে এদিকে পাকা বড়ী হয়ে উঠেছে, তার খবর ত’ রাখ না। ওই বলে, সরস্বার বিয়ে হল, কমলার বিয়ে হল, আর আমার বিয়ে হবে কবে? আমি তাই বিজ্ঞেস করছিলাম, কেমন বর মিবি? জ্বতে কি বলে, জান? বলে, মণিদাকে বিয়ে করব। এমনি তোমার মেয়ের পছন্দ।”

শৈলজার মাতাও চমকিত হইয়া বলিলেন, “সে কি মা, মণিশঙ্কর! বেওয়ারীমজর ছেলে।”

“হ্যাঁ, ওই বাউলুলে ছোঁড়াটা। ছোঁড়াটা না কি ওকে কি-কি দিয়েছে।”

“আর ওকে এখনে আলতে দেওনা নয়। ও ভারী বদ ছেলে।”

“তা কি আর আমি জানিনে?”

শৈলজার মাতা চিন্তিত মনে প্রস্থান

করিলেন; এবং সমর-মত্ত সমস্ত কথা কালিকাবাবুঃ নিকট বুলিয়া বলিলেন। কালিকাবাবু হাসিয়া বলিলেন, “এতেই এত ভাবনা! আমি বলি, ঘেঘের বুঝি সর্দি লেগেছে।” তা নয়, সে মণিটাকে বিরে করতে চেয়েছে! তাই বল। ডাক ত’ শৈলকে।” শৈলজাকে ডাকিতে আদেশ দিয়া গৃহিণী বলিলেন, “তুমি হেসে উড়িয়ে দিও না। ও বরসে মেঘেমাছুবের বর্ধন বিরে হয়ে যায়, তখন শৈলয় কথা হেসে ওড়ানো চলে না।”

কালিকাবাবু কহিলেন, “বাদের চলে না, তার। অমন করে বলতে পারে না যে, ‘আমার বিরে দাঁড়’। ও তা আশঙ্ক কার সঙ্গে, না, যে দুটো খরগোস দিয়েছে, কি দুখানা- ছবি দিয়েছে, তারই সঙ্গে! আমার শৈল চিরদিন খুঁটো থাকবে, তোমার ভয় নেই, ইন্দ্রি।” তবে তোমাদের একটা অহুরোধ, ভেঁপো মেঘেদের সঙ্গে ওকে মিথতে দিও না, এইটুকু করো, তা হলেই দেখবে, সব ঠিক থাকবে।”

গৃহিণী কহিলেন, “কিন্তু মা যে বাস্তব হয়ে উঠেছেন, আর কতদিন অপেক্ষা করবে? কাষ্টিককেই যদি তোমার এত পছন্দ হয়ে থাকে, তাহলে আর দেরী করছ কেন? ওর বাপকে বলে সব ঠিক করে কেল না। কিন্তু আমার মত যদি নাও, তা হলে সমান ঘরে বিরে দাঁড়, অমন গম্বীর ছেলে এনে শেষে ও বেচারার এ কুল ও কুল হই মজাবে।”

কালিকাবাবু কহিলেন, “তুমি কাষ্টিককে এখনও চিনতে পার নি, তাই ঐ ভয়

করছ। ঘর-আমাই হলেই যা হবার সম্ভাবনা, আমি ভাট দূর করবার জন্য কাষ্টিককে বখাসাধ্য শিক্ষিত করে নিতে চাই। ও বাতে মনে করতে পারে যে, ইচ্ছা করলেই ও স্বাধীন, এই রকম বিভ্রা-সাধ্য ওর করিয়ে দিয়ে তবে ওকে মেরে দেব। তাই এত যত্ন করে পড়াচ্ছি।”

• গৃহিণী ইন্দ্রি দাবী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, “কিন্তু মেঘের যদি ওকে পছন্দ না হয়?”

“তা চলে আঞ্জীবন কষ্ট পাবে। আমি কিন্তু আর কারও হাতে আমার মেঘে তুলে দিতে পারব না। কাষ্টিককে দেব, তারপর মেঘে যদি নিজেই বুড়ির দোষে সব নষ্ট করে, বুঝব, মেঘের কপালে জ্বল নেই। নইলে কাষ্টিককে যে জানে, সে ওকে ভাল না বলে থাকতে পারে, তা ত আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না।”

“তুমি যে কাষ্টিককে কি চোখে দেখেছ, তা তুমিই জান। কিন্তু আমি ত ওর খুব বুদ্ধি-ভক্তি ছাড়া আর কোন গুণ দেখতে পাইনে।”

“পাও না! আশ্চর্য। ওর ঐ গম্বীর মুগ্ধখানায় কি একটা প্রচণ্ড শক্তি। আপনাকে বিপদে ফেলেও পরকে ভাল-বাসবার ক্ষমতা ও রাখে। তা ছাড়া আরও যা আছে, তা তোমার কি বোঝাব? তার হৃদয়ে ধাঁড়ালে হয় ত রাজা-মহারাজের মাথা নীচু হয়ে যায়। সেটা হজ্জ, নির্ভিক ভেজাখিতা! দেখেছ কোন দিন, ওর তেজ? ওকে দেখলেই আমার মনে পড়ে, সেই পূর্বকালের তপোবনের স্মৃতি-

বালকদের কথা। ইন্দিরা, আমি ঘেঁষেন ওকে ভালবাসি, একদিন ওকে তোমার কাছে বসিয়ে কথা করে দেখো, তাহলেই সব বুঝতে পারবে।”

উভয়দেয় কথাবার্তা চলিতেছে, এমন সময় শৈলজা সেখানে আসিয়া বলিল, “কি বাবা, ডাকছে কেন?”

পিতা তাহাকে খাটের নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, “কি করছিলি?”

“কিছু না। একটা মজা দেখছিলাম।”

“মজা দেখছিলি? কোথায়, কি মজা?”

“কাণ্ডিকনা এসে তোমার আলমারি খুলে বই ঘাঁটছিল। যে বইখানা ও রোজ কেবলই-কেবলই ঘাঁটে, আমি সেখানা হুকিয়ে রেখেছি, ও তাই খুঁজছে আর রামচরণকে বকছে। আমি হুকিয়ে তাই দেখছিলাম, আর সরলাকে দেখাচ্ছিলাম।”

“তুই ত ভারি দুষ্ট। বা, গিরে বের করে দিয়ে আর।”

“না, দেব না। কেন দেব? ও কেন রোজ রোজ আমাদের বই ঘাঁটবে? ওর নিজের বই ঘাঁটুক না গিরে।”

“নাগলি, ও যে আশীর বই নিয়ে পড়ে। ও বই না পেলৈ ওর পড়া হবে না, শেষে ফুলে মার খাবে।”

“ও যেমন দুষ্ট, ওর মার খাওয়াই উচিত। বাবা, তুমি ইচ্ছার মটরদেয় নলে দিয়ে যে, ওর নিজের বই নেই, পরের বই নিয়ে পড়ে, তাই ও পড়া বলতে পারে।”

ইন্দিরা করিলেন, “তুই যেমন ওকে

দেখতে পারিস নে, আমরা যে তেমন ওকে খুব ভালবাসি।”

শৈল করিল, “তাইতেই ত ওর আদারা আরও বেড়ে গিয়েছে, নইলে যখন-তখন সবাইকে ও বকে কেন? আমি কিছু করলে ধমকায় কেন?”

ইন্দিরা করিলেন, “তুই ওর পেছনে লাগতে দাস কেন?”

শৈল করিল, “বেশ করব, লাগব। যে আমার মারতে আসে, বকে, তাকে আদর করবে! বাবা, তুমি ওকে কেন এখানে আসতে দাও? রোজ রোজ কেন ও তোমার লাইব্রেরী ঘাঁটবে?”

কালিকাবাবু করিলেন, “আজ্ঞা, কাল থেকে ওকে এখানে আসতে মানা করে দেব। তাহলেই ত হবে? ও বেচারার তাহলে কিন্তু খুব কষ্ট হবে।”

শৈলজা কিছুক্ষণ বিধানার উপর মাথা রাখিয়া চিন্তা করিয়া বলিল, “খুব কষ্ট হয়। ত এক-একদিন আসতে দিও, কিন্তু রোজ নয়। তার চাইতে ‘মণিলাকে’ ললে দেব, ও এসে রোজ রোজ তোমার বই পড়ে যাবে।”

ইন্দিরা দেবী গম্ভীর মুখে বলিলেন, “ধন্যকার শৈল, মণির সঙ্গে কথা বলিলেন। ও ভারী পাখী। কেবল যদি কোন দিন ওর কাছ থেকে কিছু তুমি নাও—”

গৃহিণীর কথা শেষ হইবার পূর্বেই কালিকাবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, “কি মিছি-মিছি ঘা-তা বকছ। না রে শৈল, মণির সঙ্গে কথা বলি। তবে তাকে সবাই মন্দ বলে, সেজন্য সে কিছু বিলে নিয়ো না।

নিশে সবাই আমার বকবে,
বকবে।”

শৈলজাসুন্দরী এইবার চটগা গেলেন। তিনি মহারাষ্ট্র-অধিরায়ের হত তার ক্ষুদ্র মণ্ডকটী উন্নত করিয়া বলিলেন, “আমি তোমাদের কারও কথা শুনিব না। কেন, তোমরা মণিদাকে বকবে? কি করেছে সে?”

কালিকাবাবু কস্তার মুখের তাব দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, “ওরে না, না, সে আমাদের কিছু করে নি। কিন্তু তুই যদি তাকে কাছ থেকে কিছু নিস, তাহলে সবাই আমাদের বকবে।” শৈলজার সে কথা বিশ্বাস হইল না, কারণ তাহার পিতাকে তিরস্কার করিতে পারে, এমন লোক সে চোখে দেখেই নাট, কমনাও করিতে পারে না। সেই কারণে সে মাথা নাড়িয়া বলিল, “তোমাকে কেউ বকবে না। তোমরা তাকে দেখতে পার না বলে এই কথা বলছ।”

কালিকাবাবু কহিলেন, “যে লজ্জাই বলি, তুমি তার কাছ থেকে কিছু নিয়ে না। নিশে আমার খুব ঘুমে হবে, তোমার মায় কষ্ট হবে।”

শৈলজা এইবার নরম হইয়া বলিল, “আজ্ঞা, তোমরা কষ্ট পাও ত’বেব না। কিন্তু মিছিমিছি তোমরা মণিদার উপর রাগতে পাবে না। আমি কিন্তু মণিদার পরগোস করিয়ে দেব না।”

—কালিকাবাবু অগত্যা সেই সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া কস্তাকে বলিলেন, “বাও, এখন বেলা করগে।” কস্তা অমনি বলিয়া উঠিল, “বেলা করব কি? কাঠিকরা কি করছে,

দেখে আসি। বই না পেয়ে নিশ্চই নে এককণ লাটব্রেরী মাথায় করেছে।”

কাঠিকচন্দ্র ওদিকে তাহার ওয়েবটার ডিগ্নাধারানা খুঁজিয়া না পাইয়া বৎসরো-মাস্তি বিরক্ত হইয়াছিল এবং শেষে অগত্যা আর একখানা পুস্তক অতিথান খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিয়া কাছ চালাইয়া লইতেছিল। তাহার সম্মুখে বলিয়া সর্জনন্দ একখানা খাতার কতকগুলি ইংরাজী idiom-এর বাংলা তর্জমার চেষ্টায় বারবার মাথা চুলকাইয়া পেনসিল কামড়াইয়া ক্ষণে ক্ষণে কাঠিকচন্দ্রের দিকে চাতিতেছিল—ইচ্ছা, সে একটু সাহায্য করে। কিন্তু কাঠিক চন্দ্র অজুড়িত করিয়া আপন মনে কাছ করিতেছিল, অস্ত্রদিকে চাহিবার তাহার অবসরমাত্র ছিল না।

এমন সময় ঘরের নিকট একটা স্তম্ভের হাল্যাবলি শুনিয়া সর্জনন্দ চমকিয়া দিহিয়া দেখে, শৈলজা দুই হাতে সেই অতিথানের দুই অংশ লইয়া ঘরে গাড়াইয়া হাসিতেছে। সর্জনন্দ হাসিয়া বলিল, “কাঠিক, ঐ দেখ তোমার ওয়েবটার।”

কাঠিকচন্দ্র তাহার পুস্তক হইতে “মুখ তুলিয়া শৈলজার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবারাজ, শৈলজা হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িয়া বলিল, “বেব না, কথখনো বেব না ত।” তখন কাঠিকচন্দ্র গজীর বরে বলিল, “দিয়ে বাও বলছি, শৈল, নইলে—”

শৈলজা কিন্তু কিছুমাত্র ভীত না হইয়া মাথা নাড়িয়া কেবলই বলিতে লাগিল, “বেব না—কথখনো দেব না।” তখন

কাস্তিকচন্দ্র চেমার ছাড়া তাহার দিকে
সংবেগে ছুটিতে গিয়া আর-একখানা চেমারে
কপড় আটকাইয়া পড়িয়া গেল; এবং একটা
আলমারির কোণে লাগিয়া তাহার কপাল
কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। তবুও কাস্তিকের
সে দিকে অক্ষিপণও নাই, সে ভাঁড়াভাড়
উঠিয়া বাহিরে বাগানদার শৈলজাকে ধরিতে
গেল। শৈলজা কিন্তু কিছু দূরে ছুটিয়া
গিয়া ফিরিয়া পাড়াইল, ইচ্ছা, কাস্তিক
ধনি বাহিরে না আসে, তাহা হইলে
আবার গিয়া তাহাকে ঐ বই ছুইনামা
দেখাইবে। কাস্তিকচন্দ্র বাহিরে আসিয়া
পাড়াইতেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া
শৈলজার সমস্ত হুটামি মুহূর্তে উড়িয়া
গেল। সে তাড়াভাড়ি বই ছুইনামা ফেলিয়া
দিল এবং কাস্তিকের নিকট ছুটিয়া আসিয়া
বলিল, “ও কাস্তিক-না, রক্ত যে! তোমার
কপাল কেটে গেছে। ও রামচরণ, জল
আন। ও সর্ক-না, স্নিগ্ধ গির এস।”

কাস্তিকচন্দ্র প্রথমটা কোঁকের মাথায়
বাহিরে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু বাহিরে
আসিবার আবাতির গুরুত্ব অসুত্ব করিল।
কারণ কপাল কাটিয়া রক্তের ধীরে তাহার
মুখ ও বুক আসিয়া ঘাইতেছিল। সর্কানন্দ
তাড়াভাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিল, শৈলজা
কানিতে কানিতে লাইব্রেরীর বাহিরে
যে এক-কলসী জল ছিল, তাহাই একটা
প্রকাণ্ড মগে ঢালিবার চেষ্টা করিতেছে,
আর কাস্তিক এক হাতে দ্রুত হান

চাপিয়া ধরিয়া মেলিয়া তর নদীয়া পাড়াইয়া
আছে।

লাইব্রেরীর থানসামা রামচরণ বিপ্রোচরিক
নিদ্রা দিতেছিল। শৈলজার চৌকারে সে
তাড়াভাড়ি উঠিয়া আসিয়া তৎক্ষণাৎ জল
ঢালিয়া কাস্তিকের কপালে জলপটী বাধিয়া
ডাক্তারকে সংবাদ দিতে গেল। কাস্তিক
খোঁসে খোঁসে উঠিয়া যখন লাইব্রেরীর একখানা
চেমারে বসিল, তখন শৈল চোখ মুছিয়া
ম্নান মুখে তাহার কাছে গিয়া বলিল,
“কাস্তিক-না, বাবাকে বলো না, আর আমি
হুটমি করব না।”

কাস্তিক হাসিয়া বলিল, “তোমার
দোষ কি! আমি শু আপনি পড়ে
গিয়েছি।”

“না কাস্তিক-না, আমারই দোষ। আমি
মাগ চাচ্ছি। সর্ক-না, ঐ দেখ, আরও
রক্ত পড়ছে! কি হবে?”

সর্কানন্দ বলিল, “তর কি! ডাক্তারবাবু
আনছেন। এখনই সেরে যাবে।”

“বঁকি রক্ত বন্ধ না হয়, আমার বড়
ভর করছে, আমি বাবাকে ডেকে
আনি।”

শৈলজা চলিয়া গেল। তারপর ডাক্তার
বাবু আসিয়া বাধা-ছাঁদা করিয়া বলিলেন,
“এখন নড়ো না, বিকেলে বাড়ী বেহো,
এখন খবরদার নড়ো-চড়ো না।”

(জন্ম)

শ্রীবিজুতিত্বরণ ভট্ট।

মফস্বলের হাকিম ও মোস্তাফ

বেলা তিনটার সময় রামদানের রাত্রি করা আল্পুর কুরআন এবং উরুসা ঘিরে ভাষা মোটা আটার লুচি বথাসাধা গলাধঃকরণ করিয়া নৌকায় আসিয়া শুইয়াছি, এমন সময় খান হইতে জামলালবাবু তাক হাঁক করিতে লাগিলেন, “আরে ভায়া, আর কত খাবে?—একবার এপারে এসনা,—আমার যে একটু জরুরী কাজ আছে।” লোকটার বেরাঙ্গাপণ দেখিয়া একবার মনে হইল কোন উত্তর দিব না,—কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে অন্তিমায় ভাগ্য কল্পিয়া আটার খানার বাটে কিরিয়া আসিল।

জামলালবাবুর “একাদশী” করা বেশি হয় তখন শেষ হইয়া গিয়াছিল, কারণ তাঁহার মুখখানি তাখুলরাগে রঞ্জিত দেখা গেল। বামহাতে একটা খোলা হাঁকা লইয়া তিনি কুৎং কুৎং করিয়া এক-একটা টান দিতেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে এক-একটি ঢেকুর তুলিয়া “একাদশী”টা যে একটু অতিরিক্ত মাত্রারতই করা হইয়াছে, তাহাই প্রকাশ করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, “ভায়া, মনে বড় কষ্ট দিবে গেলে, আমার বাসায় একটু জল পর্য্যন্ত খেঁদে গেলে না,—আমি কতবার তোমার ওখানে গিয়ে জামাই-আবরে খেঁদে আসি,—কত তাক করি,—আর আমার এমনি কপাল যে, তোমাকে একটু মিষ্টিখুণ্ড করতে পারলুম না! তা’ এবার যা’ হবার তা’ হয়ে গেল, আবার যদি কখনও এদিকে

আগমন হয়, তবে পাঁজি দেখে এস,—সেবারও যেন এমনি একাদশীতে এসে আমাদের কুর করে বেগ না,—আমার জী তোমাকে ছ’টা খেঁতে দিতে না পেঁয়ে জারি আপশোধ করছিল,—তা আমি তাকে অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-বুঝিয়ে এসেছি,—তুমি ত আমাদের ঘরের লোক—”।

আমি বহুকষ্টে বিজ্ঞপের হাসি সঞ্চার করিয়া বলিলাম, “তা’ত বটেই, তা’ত বটেই,—আমি কি আর আপনার পর? এখানে খেলেও আপনারই খেতেম, ওপারে গিয়েও আপনারই খেঁদে এসেম,—এ’তে আর আপনাদের কুর হবার কি আছে? বাস্তবতার ত লক্ষণই এই—”।

জামলাল বাবু এই কথাতে যেন বড়ই পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া বলিলেন, “তা ভাই, বেশ,—তোমাদের মত ইংরেজীবিশেষ সজে আমাদের মত মুখোহুখো লোকের ত আর কথার এঁটে উঠবার ঘো নেই,—তা বেশ,—এখন ভাই, যদি আমার একটু কাজ ক’রে দিবে, যাও, তাহলে বড় উপকার হয়।”

নিতান্ত বিরক্তির সহিত নৌকা হইতে ডাঙ্গার নামিলাম। জামলালবাবু আমাকে একখানা চেয়ারে বসাইয়া নিজে অদূরে আর একখানা চেয়ারে গিয়া বসিলেন। তার পর চাঁদের হাঁকাটা দেখালে ঠেস দিগা রাখিয়া বলিলেন, “হুংখের কথা আর কি বলব ভায়া,—তেজিগ বৎসর চাকুরী হল, পরমা-

কিছু কিছুই করতে পারলাম না,—খরচ-পত্র আমার বেজার! ভাগ্যে ভগবান আমাকে কোন পুত্র কন্যা দেন নাট,—সংসারে শুধু আমি আর গৃহিণী,—তাতেই ব্যয়বাহুল্য আমার প্রাণান্ত! Retire করতে আর গড়বোর তিনমাগ কি লাভে তিনমাগ থাকে,—একটা extension-এর জন্য সাহেবকে অনেক পীড়াপীড়ি করেছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই নম্র হ'লেন না,—অজকাল ত আর সেকালের মত দয়ালু মনিব পাওয়া যায় না,—পাক্ত যদি Boswell সাহেব, তবে, দেখতে পেতে আমার কত খাতির,—Boswell সাহেবের মত “মা-বাণ” মনিব আর চলে না! এই ত সামনে পূজা আসছে,—দ্বীপনে কখনও পূজা করা হয় নাট,—কোথার শাব টাকাপরশা? এবার গৃহিণী বড়ই পীড়াপীড়ি করে ধরেছেন, চাকরী ছেড়ে বাড়ী গিরে এগার দুর্গোৎসবটা করতে হবেই হবে। মেয়েমায়ে ত বুঝ না, কি কষ্টে একটা পরশা মোজগাব হয়। আমি ভাই, এলাকার চৌকিদার, দফাদার, পকাইত, প্রধান প্রজ্ঞতি সকলের কাছে চেব-চিবে কট্টেস্থটে কুড়ি দুই পাঠা আর হাজারখানিক নারিকেল যোগাড় করে বেখেছিলাম,—তা আমার ছোট ভাই চুনিলাল এসে দে-সব কিরিয়ে দিয়ে গেছে! হতভাগা আমার মুখের উপরই বলে কিনা,—‘গদা, কোনদিন ত কোন ক্রিষ্ণ-কর্ষ করলে না,—এবার যদি নৌদিদির তাড়নার একটা গুপ্তকাজ করবার সময় করেছে, তবে সেটা আর এইভাবে অগ্রহীন করে না! তোমার

যদি সাধো না কুণোর, তবে পূজা না কর কতি নেই,—তবু তিক্ত করে পূজার পাঠা সংগ্রহ করতে পারবে না! তুমি কব্বে পূজা, আর তার কনভাণী হবে এই সব চৌকিদার দফাদার,—আমি বেঁচে থাকতে তা কোনমতেই হতে পারবে না দাখা!—তোমার পয়সা কার জন্যে আর জমাঙ্ক বণ বেগি? বয়স ত আর কম হ'লো না,—আর কতকাল বাঁচবে? সারা জীবন ত কেবল রোজগারই করলে,—এখন কিছু-কিছু দেবদেবের কাজে অগ্র কর। না-হ'লে পরলোকে গিয়ে কি জবাবদিহি করবে বণ দেখি—?’ দেখলে ভাগা, আকেলটা দেখলে একবার!—ছোট ভাই হ'রে আসে কিনা আমাকে উপদেশ দিতে! আমার বলে কিনা ‘কত কাল বাঁচবে?’ কেন, আমার আর এমন-কি জেরাদা বয়স হয়েছে,—আমার বয়সে অনেকে তুমারপক্ষে বিবাহ করেও ত ছেলে মেয়ের বাণ হয়! ভাইটোও আমার তোমাদেরই মত টংরেজোনবীশ কিনা,—তা বোধ হয় কথার ধরণেই বুঝতে পেরেছ,—আমরা হজি দেখলে বাঙ্গলানবীশ, ‘মহিমার্নবেষু’র দল,—কিজেই আমাদের Old fool ব'লে অপ্রজ্ঞা করবে বৈক! ও'র মনে করে, আমার হাতে না-জানি কত টাকারি আছে,—তা পরের ধন আর নিজের পরমাণু, এ কি আর কেউ কম বেখে! Extension এখন পেলেই না, তখন পেঙ্গন নিয়ে যাওয়াট স্থির,—কোন মতে চোক-কাণ বুজে এট কয়টা মাস কাটাতে পারলে বাঁচি। কিন্তু বিবাতা

বোধ হয় আমার সে সাধেও বাদ সাধলেন,
—কপাল আমার এমনি পাখর-চাপাই
বটে! আমার ছোট দাবোঁগা ছিলেন
নরেশবাবু,—তিনি পরাগগঞ্জে বদলী হয়ে
গেছেন,—তাকে তুঁত তুমি চেনই,—তোমরা
দুজনে ত এক বসন্তেরই ভাগলপুর থেকে
‘পালি’ করে এসেছ,—তিনি ভারী লায়েরক,
—ইংরেজীতে বি, এ, ফেল, সর্বদাই মুখে
লেড্ বেড্ বুলি,—আমাদের ত তৃণ
বলেও গণ্য করেন না। তিনি এর মধ্যে
একদিন যেন কার কাছে থবর পেয়েছিলেন,
নাথের আধাবের জামতন্ত্র নাকি চোরাই
মাল রাখে। তুনেই আর বাণি কোথায়!
—আমার কাণে সে কথা এশে পাছে
বাহাদুরীটা আমিই নিই,—এই ভেবে
তিনি আমার কাছে সে বিষয়ে কোন
উচ্চবাচ্চা না করেই অস্ত্র কারের উপলক্ষ্য
কবে থানা থেকে ব্রহ্মন কনটেইনর নিয়ে
নাথের আবাদে চলে গেলেন। পথে জন
হুই তিন দকাদার চৌকাদারকেও সঙ্গে নিয়ে-
ছিলেন, গুলাম। তোরবেগার জামতন্ত্রের
বাড়ী ঘেরাও করে তিনি খানাতল্লাসী
করতে উদ্ভত হলে জামের নিদ্রাওক হয়,
—সে বিস্তর অর্জুনর-বিনয় করেও নরেশ-
বাবুর মন ভিজাতে না পেয়ে অবশেষে
সেগে একবারে “মরিয়া” হয়ে উঠে।
তারপর নরেশবাবু যখন আবার জামের
অবসরমহলে হুকুতে গেলেন, শ্যাম তখন তার
ছেলে, জামাই আর চাকরবাকরের সাহায্যে
তাকে বেধ করে চেপে ধরে একবারে
‘আটপুটে’ এঁটে বৈধে ফেললে! তারপর যা
হ’ল, তা’ত বুঝতেই পাচ্চ তারা,—কনটেইনর

আর দকাদার চৌকাদারেরা সেনাপতির
বিপরীত নগ্না বেবে রণে ভয় দিয়ে একবারে
উর্দ্ধবাণে থানার এসে উপস্থিত! আমি
এই থবর পেয়ে বিনোদকে নরেশবাবুর
উদ্ধারের জন্য পাঠাব বলে মনে মনে ভাবছি,
—(আমার নিজের শরীরটা সেদিন
বচই অর্জু হু ছিল কিনা!—) এমন সময়
দেখলাম, নরেশবাবু হাড়গোড়তারা “দ,”-
এর মত খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমার
দিকেই আসছেন! তিনি এসেই আমার
উপর ত নানাপ্রকার তর্জন গর্জন আরম্ভ
করলেন, যেন তার ধনঞ্জয়-প্রাপ্তির জন্য
আমিই অপরাধী,—আমিই নাকি এতকাল
জামতন্ত্রকে আটনের মূখ থেকে বাঁচিয়ে
আসছি,—আমি নাকি মাসে মাসে জামের
কাছে মালহরী খাই,—এবার পুলিশ-সাহেবের
কাছে তিনি সবই প্রকাশ করে দেবেন,—
এইরূপ অনর্গল কত কথাই যে তিনি
বলতে লাগলেন, তার আর ইয়ত্তা নাই।
বুলাম, অতিরিক্ত গাঢ়-জাগৃতিতেই নরেশ
বাবু ঐ সব আবোল-তাবোল বুদ্ধেন,
তখন উত্তর দিতে গেলে হয়ত একটা
লজ্জা-বিষ কাণ্ড হ’য়ে যাবে, কাজেই আমি
আর কোন উর্দ্ধবাচ্চা করলাম না। কিছু-
ক্ষণ পরে তিনি একটু স্থির হলে, আম
তাকে এই ব্যাপার নিয়ে আর বাড়ি-
বাড়ি করতে নিষেধ করলাম, কারণ জামের
বাড়ী খানাতল্লাসী করার জন্য তিনি
কোন ওরাবেন্টও পান নাই, শুকতর
মন্ডের কোন কারণও তিনি প্রমাণ করতে
পারবেন না। তার চেয়ে জামকে তলব
দিয়ে আনিবে যাতে সে নরেশবাবুর

পাথে ধরে কমা চাহ, আর কিছু নজর
সেলামীও দেয়, সেই ব্যবস্থা করতে চাট-
লাম। কিন্তু নরেশবাবু আমার কথা একে-
বারেই গ্রাহ্য করলেন না। তিনি
সোজাশুজি পুলিশ-সাহেবের কাছে এক
রিপোর্ট দিবে স্বামীর নিকড়ে, তৎ-
খাল-মত (সরকারী কর্মচারীর কর্তব্য-
কাণ্ডে বিষ ঘটাইবার উদ্দেশ্যে তাৎকৈ-
মারপিট করা) মোকদ্দমা রফা করবার
অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তদিকে শ্রমও
নরেশবাবুর নামে বেজাটনৌ জনতা, অনর্থকার
প্রবেশ, মানচানি প্রভৃতি নানাবিধ চার্জ
দিয়ে ম্যাগিস্ট্রেট-সাহেবের নিকট এক দর-
খাস্ত দাখিল করল। ম্যাগিস্ট্রেট-সাহেব
পুলিশের কাগজপত্র তলস করলে পুলিশ-
সাহেব নরেশবাবুর রিপোর্টটি ম্যাগিস্ট্রেটের
কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ম্যাগিস্ট্রেট-সাহেব
কোন পক্ষেবট মোকদ্দমা গ্রহণ না করে
প্রথমে আমার উপর তদন্তের ভার দিয়ে-
ছেন। আমার ভাই, এখন উত্তর সমস্তা,—
“না ধরিলে রাজা বধে, ধরিলে ভুজঙ্গ।”
সত্যকথা বলতে গেলে নরেশবাবু মারা
যান, অথচ বুড়া-বড়সে (৭) মিথ্যা রিপোর্ট
বা কেমন কবে দিয়ে অনেক ভেবে
চিন্তে আমি “নাশও হবে, লাঠিও নাড়াচ্ছে”
গোছের একটা রিপোর্ট বাস্তবায়ন লিখে
রেখেছি। তুমি যদি ঘরা করে সেটাই
ইংরাজী করে দেও, তবে বড় ভাল হয়।
শ্রেয় সাহেব বাজলা ভাল জানেন না,
আমারও ত ইংরাজী শিখা “Who is
you” পর্যন্ত! শুনলে বরং কোনরকমে দুই
এক কথা বুঝতে পারি, কিন্তু লিখতে গেলে

ইংরেজী বিভ্রান্ত আদোপেই হুলিলে উঠে
না। তুমি যদি ঘরা করে রিপোর্টটার
ইংরেজী তরজমা করে, তারপর সেটা
পত্রিকার করে নকল করে দেও, তবে
আমি নিচে নিজের নামটুকু কোনমতে
ইংরেজীতে লই ক’রে সাহেবের কাছে
পাঠাতে পারি। ছেলেমানুষ তোমরা, এট
তু. পাটুয়ার নয়স,—তোমাকে আমি চির-
দিনই ছোট ভাইএর মত দেখি, তাই
এটুকু কষ্ট করতে অনুরোধ করলাম,
আর কেউ চ’লে এত্তরসা চ’ত না।”

শ্রামশালবাবুর উপরোধ রক্ষা করতে
আমার অন্তরে টছার লেশমাত্রও ছিল
না, সেজন্য বলিলাম, “ইংরেজীতে আমার
দখল খুব কম,—আর আমার হাতের”
লেখাও অতি তরজ,—আমার মতে ইংরেজী
না ককে রিপোর্টটি বাস্তবতেই দেওয়া
তাল।—কিন্তু এই “রোজা-মরা ভুজঙ্গকে”
ভোগা দিয়ে জ্বলান সহজ নহে,—উপায়কে
নিতান্ত নাছোড়বান্দা দেউগরা টছার
বিকল্পেও আমাকে সম্মত চাইতে হইল।

অনেকদিনের কথা,—সেই . শুকুত
রিপোর্টের সব কথা এখন আর আমার
মস্তি মনে পড়ে না,—কিন্তু মুখবন্ধটুকু
তার এমন মধুর ছিল যে, একবার পাঠ
করিতে তাহা আমার দ্বারা একেবারে
মুগ্ধিত চাইয়া গিয়াছিল। মুখবন্ধটুকু এইঃ—
“মর্চিমার্গবিশেষঃ—

দারোগাবাবু টেলিগ্রামেট, নূতন শ্রী
শ্রামভক্ত, যেমন বুনাওল, তেমনি বাবা
ভেঁতুল, অধীন তাবদার সজেরীনে গিয়া
সমুদার হাণ ওরাকিব হইয়া হুজুর

আদেশ অমুখ্যায়ী দায়োগাবাবু অঙ্গসেবার
বিবরণ নিয়ে নিবেদন পাঠ্যেতঃ—

সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের এই মধুর
ভাব এবং ভাব্যসুংলিত রিপোর্টটির কম-
বাদের কষ্টসীকার করতে হইল না।
রিপোর্টখানা আগাগোড়া পাঠ শেষ হইতে
না হইতেই কেন্দ্রবাবু আসিয়া খানার
উপস্থিত হইলেন।

তিনি বলিলেন, “আর বিলম্ব করবেন
না, এতবার চলুন তারাপুর যাত্রা কর,
—সাহেব যে কখন আসবেন, তার কোন
স্বিরতা নাই। আমাদের একটু আগে
বাওয়াই ভাল।”

আমি বিপদ-সমুদ্রে কুল^{*} পাটরা বিক্রান্তি-
শ্রান্ত না করিয়া তৎক্ষণাত উঠিয়া পড়িলাম।
জামলাবাবু তখনও তাঁহার রিপোর্টের
তদন্তমার মস্ত অঙ্গরোধ করিতে থাকিয়া
আমি বলিলাম, “দেখুন, অমন পাকা
রিপোর্টের ইংরেজী করা আমার সাধের
অতীত,—ইংরেজী অমুখ্যায় করিতে গেলে
অর্থন স্বাক্ষর রিপোর্টটী একেবারে মাটি হয়ে
যাবে,—তার চেয়ে কাল আপনি তারাপুরে
রিপোর্টটী সঙ্গে নিয়ে যাবেন, সেখানে গুটি
সাহেবের নিকট পেশ করলেই হবে খন।”

জামলাবাবু তাঁহার রিপোর্টের অংশসা
তদন্ত বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন,—সেজন্য
আমার প্রত্যবে আর কোন আপত্তি
উত্থাপন করিলেন না। আমাদেরকে বিদায়
বিবরণ সময় জামলাবাবু বলিয়া দিলেন,
“তোমরা বাও, বিশ্রুকে আমি আজই
তারাপুরে পাঠাই,—আমিও কাল “পারগ”
করে বত শ্রিত পারি ওখানে গিয়ে চাঁদার

হব। যদি সাহেব-বাওয়াল আগাই এসে
পড়েন, তবে দয়া করে বলো, যে আমার
অস্থির হয়েচে।”

ডেকলতলা হইতে তারাপুর অমুখ্যায়
দশ মাইল ব্যবধান। উহা মুসলমান-
প্রধান গ্রাম; দুই তিন ঘর তিলু আছে
বটে, কিন্তু তাহাদের অবস্থা অতি হীন।
এই গ্রামে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের একটা ক্ষুদ্র
বিশ্রামাগার আছে, সেখানেই সকালে
কাচারী হইবে। গ্রামে এত বাড়ীটি “ডাক-
দাঙ্গলা” নামে খ্যাত, আমরাও সেই নামেই
ইহার উল্লেখ করিব। গ্রামে হাটবাজার
দুখে থাকুক, একটা দূরীর দোকান পর্যন্ত
নাই। তারাপুর আসিতে আমাদের রাজি
প্রায় নয়টা বাজিয়া গেল। মধ্যাহ্নে সেই বে
মোটা আটার করেখানা লুচি খাওয়া
হইয়াছিল, তাহাতে তৃপ্তি না হইলেও উদরে
অস্থিরতাটা চলিতেছিল যথেষ্ট, সেইজন্য নৈশ
ভোজনে আর তেমন রুচি হইতে ছিলনা,—
আর কচি হইলেও এখানে সে সাধ পূর্ণ
হইবার কোন উপায় বা সম্ভাবনা ছিল না।
পূর্ব-রাতিতে স্থানান্তারবশতঃ নৌকার
নিষ্কাশ বড় ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল, আর
সেজন্য কেন্দ্রবাবুকে নৌকার সাধিয়া
আমি নিজের বিছানাপত্র ও বোটমাট
সঙ্গে লইয়া “ডাকদাঙ্গলা” আশ্রয় গ্রহণ
করিলাম। ডাকদাঙ্গলা একবার পাঠ
করিবার জন্য মোকদ্দমার নব্বীও কেন্দ্র
বাবুর নিকট হইতে চাহিয়া লইলাম। আমি
বহন নৌকা হইতে নাহিয়া আসি, তখন
ডাকদাঙ্গলা প্রায় শেষ অবস্থা, নৌকাখানা তাই
একেবারে বাতের ওলায় গিয়া পড়িয়া ছিল।

আমি একটা আমগাছের ডাঁড়ির নিকট নৌকার গলুটী লাগাঠকা কোমরতে জুতা বাঁচাইয়া ডাকার নামিলাম। মাস্তার। সেই গাছের শিকড়ের সঙ্গেই নৌকা বাঁধিয়া নৈশভোজনের বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। রাসমদীন কনেটবলও আমার সঙ্গে ডাকার আসিয়া “ডাকবাংলার” ঘেঁহেতে “কমলী” পাতিয়া শয়ন করিল।

তখন অনেক রাত্রি, আমি গভীর নিদ্রায় অচেতন,—এমন সময় মনে হঠল, কে-যেন বাহির হইতে ডাকিতেছে, “দারোগাবাবু, ও দারোগাবাবু, ঐরা উঠুন, আমরা তাপে মারা গেলুম।”

দুই আমার ভাবিয়াও যেন ভাবিতে ছিলনা। বাহিরের ডাকাত্যাকি আমার কাছে স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অবশেষে রাসমদীনের ঠেলাঠেলিতে ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ কাটিয়া গেল,—আমি ‘খড়মড়’ করিয়া বিছানাব উপর উঠিয়া বসিলাম। বালিশের নীচে ভাগ্যে একটা দিগাশলাই ও একটা বোমবাতি রাখিয়া ছিলাম, ভাড়াভাড়ি আগে আলিঙ্গা দেখি, কেন্দারবাবু ভিতা গায় ভিতরা কাপড়ে দাঁড়াইয়া খরখর করিয়া কীপিতেছেন। ‘ব্যাখির কি’ লিখিয়া করিলে, তিনি বলিলেন, “ব্যাখির কি এখনও বুঝতে পাওছেন না?—নৌকা ডুবে গেছে।”

কি করিয়া নৌকা ডুবিল জানিতে চাটিলে পিছনদিক হইতে করিমবক্স মাঝি উত্তর করিল, “বাবু, আগনি দখল নেমে আসেন, নৌকাখানা তখন আমার আম গাছের শিকড়ের সঙ্গেই বেঁধে রেখেছিলাম। আমাদের খাওয়ার-বাওয়ার শেষ হইলে আমি

শীরমাযুদ্ধকে বললাম, ‘শীরমাযুদ্ধ, একটা পাড়া পুঁতে নৌকাখানা তুর সঙ্গে বেঁধে রাখ, কারণ গাছের যে শিকড়টার নৌকা বাঁধা আছে, সেটা প্রায় খালের তলার, মোস্তাফার সময় ওখানে নৌকা বাঁধা থাকলে নৌকার গলুট ভাসতে পারবে না।’ শীর মাযুদ্ধ আমার কথামত একটা পাড়া পুঁতে নৌকাখানা সেই পাড়ার সঙ্গে বেঁধে রাখলে—কিন্তু বুদ্ধি করে নৌকার গলুটটাও সেই সঙ্গে শিকড়ের কাছ থেকে সরিয়ে রাখে নি। মোস্তাফার সময় জলের সঙ্গে সঙ্গে নৌকা তখন উঠু হজিল, তখন গলুটটা কোনরকমে আমগাছের শিকড়ের নীচে আটকে গিয়েছিল। আমরা সারাদিন পাটুমির পর ঘুমিয়ে পড়তে ঐ-সব কাত কিছুই টের পাই নি। হঠাৎ গায়ে জলের খাপটা লাগতে হড়মড় করে যেমন উঠুতে বাব, আমরা নৌকাখানা জলের মধ্যে তলিয়ে গেল! গলুটটা তখনও গাছের শিকড়ে আটকে থাকতে ব্যাপার, বুঝতে বিলম্ব হল না। ভাড়াভাড়িতে আমরা নৌকার কোন ভিনিসট বাল্লির কংতে পারি নি, কেবল পেস্তার-বাবুকে কোমরতে ভাঙ্গড়ের নীচে থেকে টেনে হিচড়ে সাইরে আনতে পেরেছি। তাঁর বিছানা-বালিশ, আমাদের কাঁধা কাপড় হাঁকী-কুড়ি সব ডুবে গেছে হজুর, সব ডুবে গেছে।”

আমার মাগুটোন ব্যাগে শুকনো কাপড় ছিল, কেন্দারবাবুকে তাহারই এক-খানা বাতির করিয়া দিলাম, তিনি বসন্ত বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া আমার শবাসহচর হইলেন। এত দুঃখের মধ্যেও ‘নখীটা রক্ষা

পাঠিয়েছে' বলিয়া কেন্দারবাবু ঐশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। মাঝদের সাহায্যের ক্ষুদ্র রামদীনের সঙ্গে গ্রামের চৌকিদার এবং ডাক-বাংলার পাহারাওয়ালাকে পাঠাইয়া দিলাম।* ভাটার সময় কল স্টেশনে উঠিয়া নৌকাখানা উদ্ধার করিলে দেখা গেল, মিনিসপত্র বেশী কিছু ভাসিয়া যায় নাই,—কেবল ভিজিয়া গিয়াছে মাত্র। আহা! বড় সাধের দাবাবোড়গুলি ছাপ্পড়ের মধ্যেই পাওয়া গেল, তবে পেটেবোর্ডখানা একেবারে গলিয়া যাওয়াতে উরাকে খালের জলে বিসর্জন দিতে চাইল। কেন্দারবাবুর তেবক ও বিছানার চাদরখানা নিকটেই একটা ঝোপের মাথায় পাণ্ডুলি গেল,—কিন্তু তাঁহার মাথার সামলা এবং শিরের সালিটিক কোনই সন্ধান হইল না। মাঝরা পরের দিন সকালে "পাক্সা" খাইবে বলিয়া "স্ট্রটিক" মাছের কোল রাখিয়া রাখিয়াছিল, নোনা জলে সে ঝোলের আর চিকু রাখিয়া যায় নাই,—হাঁড়ের তলার কেবল মাছকরখানা কাদামাথা অবস্থায় পাওয়া গেল। সোনাউল্লা কাতর দৃষ্টিতে মাছ করখানা মাড়াচড়া করিয়া দেখিতে লাগিল, তারপর "নসোবে, না থাক্কে ভোগে আসবে কেন!" —বলিয়া মাছকরখানা খালের জলে ফেলিয়া দিয়া হাড়িটি খুঁটা ভাঙার তুলিয়া রাখিল।

ভাড়াভাড়ি সকল মিনিস ডাঙ্গার তুলিয়া শুকাইতে দেওয়া হইল,—কারণ, আর কিছু না হোক, চোগা চাপকান না শুকাইলে ত কেন্দারবাবুর এজলাসে বাওয়াই হইয়া উঠিবে না।

বেলা সাড়ে-নয়টার মধ্যে সকল সাকীকে

ডাকিয়ার ডাকবাংলার জমা করা হইল, এবং বাহাতে তাহাদের কেষ্ট উঠিয়া না যায় সেজন্য রামদান কনেটবল, এবং দুইজন চৌকিদারকে সেখানে মোতায়েন রাখা হইল। আশ্চর্যের বিষয় এষ্ট যে, বিনোদ জমাদার বা জামলালবাবু মারোগার তখনও কোন বোজা-খবর নাই। থানা হইতে একটা কনেটবল পর্যন্ত তারাপুরে পদার্পণ করে নাই! একেই বলে "ঘার বিয়ে তার মনে নেই"।

গতকলা আমাদের একপ্রকার অনা-চাঁরই কাটিয়া গিয়াছে, আজও কাহাকেও খাওয়া-দাওয়ার কোন বোগাড়-বস্ত্র করিতে দেখিলাম না! এখানে কোন দোকান-পাট না থাকিতে কিছু কেনাও দেল না। নৌকার মাঝিমাঝরা একে একে গ্রামের মধ্যে স্বভাতির বাড়ীতে গিয়া ঘাচিয়া আতিথ্য স্বীকার করিয়া আসিল,—রামদীনও চৌকিদার পাঠাইয়া গোটা-দুই ভাব-নারিকেল আনাঠরা কথকিং জুংলিপাশায় নিবৃত্তি করিল,—আমি আর কেন্দারবাবুই কেবল খালি পেটে বোকা বনিয়া মুখ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

বেলা এগারটার পর জামলালবাবু শশরীরে দর্শন দিলেন, এবং "পারল" করিয়া আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া আমাদের নিকট সন্ধ্যাতরে জমা প্রার্থনা করিলেন। চঠাৎ একটা অপঘাত-সূক্তার সংবাদ পাওয়াতে তিনি নাকি বিনোদ-জমাদারকে কালই অস্ত্র পাঠাইয়াছেন। স্বভাবসিদ্ধ উদারতার সহিত জামলালবাবু আমাদের খাওয়া-দাওয়া সারা হইয়াছে কিনা

মানিতে চাহিলে আমি কোন কথা বলিলাম না, কিন্তু কেদারবাবু গাভ্রজালা নিবারণ করিতে না পারিয়া ভ্রামলালবাবুকে কড়া-মিঠা বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিলেন। অক্ললোক হইলে বোধহয় লজ্জার অধোমুখ হইত—কিন্তু ভ্রামলালবাবুর সে সব বাংলাই নাই, তাহার কোনই ভাবাকুর দেখা গেল না। তিনি আমার চৌকিদার দফাদার পক্ষান্তে এতৃত্ত সকলকে ডাকিয়া তাহারা আমাদের ধারারের কোন বন্দোবস্ত করে নাই কেন। লিখা, খুব একচোট গালাগালি করিয়া লইলেন, এবং তখনই বেগুন থেকে পারে, চাল ডাল, মাছ ছুঁ, এল ছুন, মশলা তরকারী সব বোগাড় করিয়া আনিতে হুকুম দিলেন। হুকুমপ্রাপ্তিমাত্র ভ্রামলালবাবুর সঙ্গী থানার দুইজন কনেটবল, চৌকিদার দফাদারকে সঙ্গে লইয়া আমার মধ্যে ছুটিয়া গেল, এবং একঘণ্টা অতীত হইতে না হইতে প্রহরানের অতিরিক্ত জিনিসপত্র আনিয়া ভ্রামলালবাবুর নৌকার তুলিয়া দিল।

ভ্রামলালবাবু রক্তবের ব্যবস্থা করাই-বেন,—এমন সময় একদিক দিয়া একক সাহেব বোড়ার, আর "একদিক দিয়া আগামীদের মোস্তার" নাজিরালী মিক্রা পাখীতে চড়িয়া "ডাকবান্দার" উভাগমন করিলেন। খড়া-চুড়া আমার আগেই পুরা ছিল,—কাজেই সাহেব আসিবামাত্র দলদ্রমে একটা সেলাম দিয়া তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিলাম,—কেদারবাবু ও ভ্রামলালবাবু ইশকান করিতে করিতে দৌড়িয়া পোষাক পরিতে গেলেন। সাহেব বোড়া

হটেতে নামিয়াঠি, "বিলাসপুর দাঁকোমে বিচালি কাঁচে নেহি দিয়া,—চামারা বোড়াকা মোড় মাটিমে বৈঠু গিয়া থা"—বলিয়া ভ্রামলালবাবুকে বড়ই জোরতলপ করিলেন। ভ্রামলালবাবু তখন খুঁটি খুলিয়া মনে পেটুলানটি পরিচাছেন, তখনও বোতাম আঁটা হয় নাট,—সাহেবের ডাক ডাকিতে তিনি কোনমতে কোটটি গার এবং টুপিটি মাথায় দিয়া পেটুলানের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে দৌড়াইয়া আসিলেন। সাহেবের খুঁটি দেখিয়া ভ্রামলালবাবুর ঘেন মূর্ছা হইবার উপক্রম হইল। তিনি কোন কথাই বলিতে পারিলেন না,—বার দুই তিনি কেবল "Yes sir," "No sir," "হজুর মা-বাপ" বলিয়া বলদানের পাটার মত বখ-বখ করিয়া ক্রাপিতে লাগিলেন। এক সাহেব চোঁকরা সিভিলিয়ান হইলেও লোক মেহাৎ খারাপ ছিলেন না,—তিনি সাধারণের সম্মুখে ভ্রামলালবাবুকে আর কিছু না বলিয়া, আমার দিকে চাহিয়া তখনই সেই দাঁকোব "দুইধারে" বিচালি পাতিবার ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন,—ঘেন ফিরিবার সময় বোড়ার আর কোন কষ্ট না হয়। ভ্রামলালবাবুর নিকট তিনলাম, বর্ষার জলে বিলাসপুরের কাঁঠের পুনের দুইপাখের কাঁচা-মাটি সব দুইয়া বাওয়াতে সাহেব-বাহাজুর আগেই সেখানে মাটি ও গিচালি বিছাইয়া দিতে হুকুম পাঠাইয়া ছিলেন,—ভ্রামলালবাবু স্বয়ং সেখানে না-গিয়া একজন কনেটবলকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; সেই কনেটবল যে কি দিয়া কি করিয়াছে,

লে বিধরে আর তিনি কোন সন্ধান কবেন
নাই। বাহা ছউক, আমি তখনই একজন
সকাদার, চারিকন সৌকিদার এবং খানাব
একজন কনেষ্টেবলকে বিশালপূর্ব সাকোর
পাঠাইয়া দিলাম, এবং অবিলম্বে
সমুদায় ঘেরানত করিরা, সাহেব ফিরিয়া
না যাওয়া পর্যন্ত সেইখানেই অপেক্ষা
করিতে আদেশ করিলাম। উহারা গ্রাম
হইতে দুই-তিনখানা কোদাল এবং প্রত্যেক
এক এক বোকা বিচালি সংগ্রহ করিয়া লইয়া
গেল। সাহেবের সচিব তখনও আসিয়া
উপস্থিত না হওয়াতে একজন চৌকিদার
সাহেবের ঘোড়াটা এলিক ও'লক টহলাটতে
লাগিল।

আমি কেন্দ্রাবাবু বিপদের কথা
সাহেবকে বলিয়াবাহ্য তিনি হোহো করিয়া
হাসিয়া বলিলেন, “বেটে, তাই নাকি? আমি
বড় ভ্রান্তি চলাম বাবু! আজ্ঞা, পেদার-
বাবুকে সামলা না পরেই আসতে বসুন,—
সামলার সঙ্গে বাবু বে তাঁর মাথাটিও
খোরাননি,—এইটুকুই সোভাগোর বিষয়!”

সাহেব ডাকবাংলার হলঘরে সবে
গিয়া বসিয়াছেন, এমন সময় তিনটা
নব্য ছোকরাবাবু কোথা হইতে আসিয়া
গুরুরে উকি-খুকি মারিতে শুরু
করিলেন। চাপরাশী তখনও আসিয়া
পৌছায় নাই, কাজেই সাহেবের
স্বজনসভার গুস্ত কেন্দ্রাবাবু এবং আমিই
দারী। আমরা বাবু-কমটীকে সরিষা
বাইতে অস্ত্ররোধ করিলেও তাঁহারা সে
কথা আমোলেই আনিলেন না। তুলিয়া,
ইহারা পার্শ্ববর্তী গ্রামের একজন তালুক-

দারের ভাগিনেহ, শ্যালক ও শোষাশুয়।
অবশমবের মধ্যেই প্রেক্ষ সাহেবের দৃষ্টি
এই বাবু-তিনজীর উপর পড়িল। একে
সাহেব পিপুলবাড়ী টেপন হইতে
ঘোড়ার প্রায় ১২:১৩ বাইল কাটা দাওয়া
কাদানাটী ভাঙ্গিয়া আসিয়া একান্ত ক্লান্ত
হওয়া পড়িয়াছেন,—তাঁহাতে আবার সাকোর
নির্কট ঘোড়ার পা আটুকাইয়া যাওয়াতে
তাঁহার মেজাজটাও তত প্রসন্ন ছিল না,—
কাজেই ছোকরা-বাবু কমটীও এইরূপ
উকি-খুকি মারা তাঁহাদের পক্ষে বড়ই অসহনীয়
হইয়া উঠিল। তিনি আমাকে ডাকিয়া
বলিলেন, “বাবু, এই ভদ্রলোকদের জিজ্ঞাসা
করুন, এঁরা এখানে কি চান?”

আমি বাবু-কমটীকে তাঁহাদের আগমনের
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলিলেন,
“আমরা সাহেবকে দেখিতে আসিয়াছি।”

প্রেক্ষসাহেব বাহলা ভাল না জানিলেও
মোটামোটি একরকম বুঝিতে পারিলেন,—
অন্ততঃ “বেশিতে আসিয়াছি” এই কথাটা
বোধহয় ভালই বুঝিয়াছিলেন,—কারণ
বাবুদের মুখের কথা শেব না হইতেই
তিনি চাবুক হাতে লাফাইয়া উঠিয়া গঞ্জন
করিয়া বলিলেন, “কি! ওরা আমাকে
বেশিতে এসেছে? আমি কি মূখ? এখনি
ওদের দূর করে দাও!”

সাহেবের মুক্তিদর্শনেই বোধহয় বাবু-
কমটীর দর্শন-লিপশাস্ত্র ষ্ট্রল হইয়া গিয়াছিল,—
কারণ তাঁহারা দেখানে আর তিলাক্কেও
বিলম্ব না করিয়া, দীর্ঘ দীর্ঘ পদক্ষেপে দৃষ্টি-
পথের আগোচর হইয়া পড়িলেন।

বেলা একটার সময় সাহেব দোকদ্দমা

আরম্ভ করিলেন। তখন চাপরাশীও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, কাজেই “হানিফগাজী আসামী হাজির হার,—হানিফগাজী আ—সা—ম! নেহারদি মোল্লা আসামী হাজির হার,—নেহারদি মোল্লা আ—সা—ম!”—ইত্যাদি ডাকে-ইকে ডাক-বাঙ্গলা একবারে সরগরম হইয়া উঠিল। একটা গাছতলায় কয়েকটা নেংটিপরা, বালক দাঁড়াইয়া তামাশা দেখিতেছিল, চাপরাশীর স্বপ্নবৎ মুখমণ্ডল এবং মেঘমল্লক কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভাগ্যের আবৃত্তি অপেক্ষা করিতে সাহস না করিয়া উর্দ্ধ্বাশ্রমে আশ্রয় ভিতরে অন্তর্য হইল।

নাজিরালী মোক্তার অ-ত্ম-মুখ হইয়া সাহেবকে সেলাম করিয়া আসামীগণের পক্ষ-সমর্থনে দণ্ডায়মান হইলেন। মোক্তার সাহেবের স্তম্ভীতা তেমন মনোরম ছিল না। মোক্তারীতে তাঁহার পশার ঐশ্বর্যপতিও তেমন বেশী নয়। তবে সে-সময়ে সদরে আর কোন মুসলমান মোক্তার না থাকায় স্বজাতি-মহলে তাঁহার কিছু কিছু মক্কেল জুটিয়া যাইত, এবং তাহাতেই কোনমতে তাঁহার দিন-স্বপ্নরণ হইত। মোক্তার-সাহেবের বাড়ী এই ভায়াপুরেরই সরিকটে; শুনিলাম, একজন আসামী নাকি তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়,—এবং সেইজন্যই এই বোকন্দার তাঁহার শুভাগমন হইয়াছে। ১৮৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নাজিরালী মিক্রা বাঙ্গলা ছাত্রত্ব পন্নীকার দিবসের জন্ত সহরে গিয়াছিলেন। পরীক্ষার পর সেমস্টারের ডেপুটী কামিনীবাবুর পেডার আতাউল রহমান মিক্রাকে ধরিয়া সেলাস-আপিসে তিনি একটা

চাকুরী লাভ করেন। মাসিক বেতন ছিল বাবো টাকা, আচার্যের ভারটা আতাউল রহমান সাহেবই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই চাকুরী উপলক্ষে কাছারীতে দুইবার সময় নাজিরালী মিক্রাও মনে মোক্তারী পরীক্ষা দিবসের গুরুত্ব উদ্ভূত হয়। সে সময় বাঙ্গলা ছাত্রত্ব পাণ করিলেই মোক্তারী পরীক্ষা দেওয়া যাইত। আতাউল রহমান সাহেব দয়া করিয়া এর-তার কাছে চাহিয়া-চাওয়া মোক্তারীর পাঠ্য বহি-করণ্যাদি সংগ্রহ করিয়া দেন। নাজিরালী মিক্রা প্রত্যয় বিশেষ মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতে থাকেন। দুই মাসের পর ছাত্রত্ব-পরীক্ষার কল বাহির হইলে দেখা গেল নাজিরালী মিক্রা তৃতীয় বিভাগে পান করিয়াছেন। খোবার দুগ্ধই মোক্তারী পরীক্ষাতেও তিনি একবারেই উত্তীর্ণ হইলেন, এবং সনন্দ পাইবামাত্র সদরে আসিয়া বাবসা আরম্ভ করিলেন। ইংরেজীতে তাঁহার বর্ণজ্ঞান ছিল না,—তবে শুনিয়া শুনিয়া “yes sir,” “no sir,” “very good sir,” “poor man sir,” প্রভৃতি গোটাকতক স্বাধা গৎ তাঁহার কণ্ঠ হইয়া গিয়াছিল, এবং প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে দেখানে-সেখানে সেই কয়টা কপার তিনি সর্বাংহার করিতেন। সাক্ষীকে জেরা করিবার সময় নাজিরালী-সাহেব সর্বদাই অতি নিশ্চিন্ত ভাবায় কথা কহিতেন। একবার ডেপুটী-ম্যাজিস্ট্রেট তাঁরাপনবাড়ের একলাগে একটা হাজায়া বোকন্দার উপস্থাপন করিয়া নামক কুটনৈক আসামীর পক্ষসমর্থনেও জন্ত নাজিরালী মিক্রা উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষী ভয়ঙ্কর গোয়ালাকে জেরা করিবার সময় নাজিরালী

মিঞা বলিলেন, “দেখ ভগ্নহরি, এই বিচারপতি সূক্ষ্মত্ব ধর্মাবিকরণ, এখানে অবক্ষণ করিলে নিরঙ্গগামী হইতে হইবে,—তুমি ধর্মসাক্ষী করিয়া সত্য কথা বলিতে শপথ গ্রহণ করিগাঁও,—সে কথা যেন নিষৃত হইও না,—একবার বিচারপতির দিকে ‘চাহিয়া বল দেখি, ‘এই আসামী ইয়ার: মামুদ একজন “প্রতিভাশালী” লোক কি না? অধিক কথা বলিয়া আদালতের বহামুখ্য সময় নষ্ট করিও না,—এককথায় বল, “হাঁ,” কি “না”—” ভগ্নহরি ত অবাক,—মোক্তাবাবু এই সাধু ভাবার বিন্দুবিসর্গও তাহার মাথার চুক্তিগ্রাহিল কি না সন্দেহ,—কাজেই সে হতভম্ব হইয়া চারিদিকে ক্যাল-ক্যাল চোখে চাহিয়া দেখিতে এবং ঘন ঘন মাথা চুলকাইতে লুপ্ত করিল। নাজিরালী মিঞা সাংসাহে সাক্ষীর এইরূপ বিব্রতভাব হাকিমকে নথিতে নোট করিয়া লইবার জন্ত ভেদ করিতে লাগিলেন। মোক্তার-সাহেবের বিজ্ঞা-বুদ্ধি ভ্রান্তবোধবাবু অবিস্মিত ছিল না,—কাজেই তিনি বহু কষ্টে হাঁত সঘরণ করিয়া বলিলেন,—“আপনার প্রশ্নটা কি মোক্তার-সাহেব?”

নাজিরালী মিঞা বলিলেন, “হজুর, আমার প্রশ্নটা অতি সহজ, আমি সাক্ষীর নিকট জানিতে ইচ্ছা করি, আমার এই মকেল ইয়ারমামুদ একজন “প্রতিভাশালী” লোক কি না?”

মজা দেখিবার সময় ভাষণদাবাবু একটু চিৎকাইয়া চিৎকাইয়া কথাবলা অভ্যাস ছিল,—তার উপর তার কি-যেন একটা ব্যাঙ্গ্য

ছিল,—সমুখে ‘চাহিয়া কথা বলিলে তাহার কণ্ঠ হইতে সহজ সুরেই কথা বাহির হইত,—কিন্তু বাম বা দক্ষিণ দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া কোন কথা বলিতে গেলেই তাহার গলার মুর বেহালার মত অত্যন্ত সরু হইয়া যায়।—তিনি ডানদিকে মুখ ফিরাইয়া “সরু গলার বিজ্ঞাপন করিলেন,—“এ—তি—স্তা—না—লী—কা—কে—বলে—মো—ক্তা—র—সা—হে—ব?”

নাজিরালী মিঞা প্রত্যুত্তরে বলিলেন, “প্রতিভাশালী” বানে এই হচ্ছে হজুর, যে, ইয়ারমামুদের কর্মী, জমা, টাকা, পয়সা বখেটে আছে কিনা—?”

হাকিম আর গাভীরা রক্ষা করিতে না পারিয়া হো—হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন,—সঙ্গেসঙ্গে এজলাসে উপস্থিত উকীল মোক্তার, আমলা মজেল, এমন-কি ‘সাক্ষী ভগ্নহরি পদ্যন্ত সকলেই হাসিয়া মুটোপুটি খাইতে লাগিল। সেই দিন হইতে নাজিরালী-সাহেব সকলের নিকট ঘোরতর “প্রতিভাশালী” মোক্তার বলিয়া পরিচিত হইলেন।

মোক্তাবাবু আরম্ভ হইল,—সাক্ষীর পর সাক্ষী আসিয়া একব্যক্ত্য আসামীগণকে চোর, বদমাসের ও রাগী বলিয়া প্রদানিত করিয়া গেল। “প্রতিভাশালী” মোক্তারের সমুচ্ছল প্রতিভাপূর্ণ কূটপ্রসঙ্গ কোন সাক্ষী টলিল না,—হেলিল না,—কাহারও মুখ হইতে আসামীগণের সাংক্ষেপ একটিক কথা বাহির হইল না। গতক তাপ নহে দেখিয়া মোক্তার সাহেব জেরার পরিমাণ হ্রাস হইতে হ্রাস্তর করিতে আরম্ভ

করিলেন,—কারণ, মহীলতার অবোধণ করিতে করিতে প্রায়শ্চ অতি নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িতেছিল,—অনেক কথা, বারো আশাবারো বাহির হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, মোক্তার সাহেবের জোরার মুখে সাক্ষীর। পে-দব কথাও বলিয়া ফেলিতেছিল। জেরা নীর্য না হওয়াতে জবানবন্দীর পরিমাণ অত্যন্ত দ্রুত হইয়া গেল, কাজেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পুলিশ-পক্ষের সমস্ত সাক্ষীর, জবানবন্দী সমাপ্ত হইল।

এইবার “সাক্ষী” সাক্ষীর পালা। প্রেক্ষ সাহেবের সঙ্গে ইতিপূর্বে আরও দুই-একবার মকদ্দমে আদালত আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, Leading question জিজ্ঞাসা করিলে সাহেবের বড় ক্রোধ জন্মে। কোনমতে বিপক্ষের দুই-একটা প্রশ্ন leading বলিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিলেই সেদিনের মত নিশ্চিন্ত।

নাতিরাণী মিক্সা তাঁহার সাক্ষী-দিগকে, “কেনন হে বাপু, হানিকের তিন লাখলের তমী আছে কি না?—নেছারদি বৎসরে ২৫৩০ মণ শুড় বিক্রয় করে কি না?”—এবনি কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করিবারাত্র আমি সওয়ারমান চইয়া বলিলাম, “হুজুর, আমি মোক্তার-সাহেবের এই সব Leading question-এর দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।”

আর বার কোথা?—সাহেব তো চট্টা অস্থির! সিংহের স্তায় বিকট গর্জন করিয়া উঠিয়া প্রেক্ষ সাহেব মোক্তারকে ডাকিয়া বলিলেন, “চুপ—চুপ! এরকম করে তুমি প্রশ্ন করতে পাও না। তুমি যদি আইনমত

জেরা করতে তাহলে চুপচাপ বসে পড়।”

মোক্তার-সাহেব অমনি “হুজুর, হুজুর, poor man, poor man—” বলিয়া হাত কচলাইতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু কে কার কথা শুনে,—সাহেব আর মোক্তারকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে না দিয়া, নিজেই সাক্ষী সাক্ষীগণকে তাঁহার অস্থিত হিন্দী, বাঙ্গলা ও ইংরেজী মিশ্রিত ভাষায় ছুইচারি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া একে একে নিদ্রা দিতে লাগিলেন। আশার আর জেরা কবিবারও আবশ্যক হইল না। মোক্তার-সাহেবের জড়সড় ভাব দেখিয়া আসামী এং সাক্ষী সাক্ষীদের কেহই কোন উচ্চগাচা করিতে সাহস পাইল না। উহার মনে করিল মোক্তার-সাহেব না জানি কি একটা বেকাশ কথা বলিয়া সাহেবকে চটাইয়া দিয়াছেন।

যোকদ্দমার অবস্থা দেখিয়া মোক্তার-সাহেব বেনী সাক্ষী সাক্ষী উপহৃত করিতে সাহসী না হইয়া বলিলেন,—“হুজুর, আমরা আর সাক্ষী ডেকে আপনার সময় নষ্ট করিতে চাই না,—আমার মতলগণ যে নির্দোষ, তা বোধ হয় হুজুর ভালরূপেই বুঝতে পেরেছেন,—এখন আমার প্রশ্ননা এই যে, ধর্ম্মবিত্তার দয়া করে একবার আসামীদের শর-পাড়ীর অবস্থা দেখতে আজ্ঞা হয়। ওদের গোলা-ভরা ধান, গোহাল-ভরা গরু, আর বাগান-ভরা গাছপালা দেখলেই হুজুর বুঝতে পারবেন যে, কোন হুজুরে, কোন অত্যাচারে ওরা চুরি করতে বাবে?”

Bad livelihood যোকদ্দমার আসামী

যদি হাকিমকে নিজ বাড়ী-ঘর দেখিতে অস্বস্তি করে, তবে সে প্রার্থনা নামস্বর করিবার নিয়ম নাই,—কাজেই প্রেক সাহেবকে নিত্য অনিচ্ছা সহিত মোক্তারের প্রত্যবে সম্মত হইতে হইল।

সাহেব কাছারী ভাঙ্গিয়া পার্বত্য কল্কেটকিন্ খাইতে প্রবেশ করিলেন, এবং আঙ্গীলকে অবিলম্বে ঘোড়া প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। ইংরেজ ভাতি রলে করণে, পাহাড়ে পর্বতে, রণক্ষেত্রে যোগদেই যাকুন কেন, শত কাজের বাস্তব মধোও পেটটা কখনও খালি রাখে না। তাই জল-কাদা ভাঙ্গিয়াও একজন খানসান সাহেবের জন্ত প্রচুর ফল, মূল, কটী, মাখন, ডিম, মাংস, সোডা, হটকি প্রভৃতি নষ্টা তাহার সঙ্গে-সঙ্গে আসিয়াছিল। সাহেব তৃপ্তির সহিত সেই সব প্রবোধ সংস্কার আরম্ভ করিলেন, আর বাহিরে আরি ও কেন্দার বাবু—হীম, অধম বাঙ্গালী,—হটকিনের উপবাসী,—গেটের আলার জলিয়া-পুড়িয়া মর্মেতেছিল।

এর কুড়ি মিনিট পর সাহেব জলযোগ শেষ করিয়া বাহিরে আসিলেন,—কিন্তু তখনও আঙ্গীলির দেখা নাই। সাহেবের ঘোড়া প্রস্তুত হইয়াছে বিনা তাহা দেখিবার জন্ত আমি ডাকবাংলার পিছনদিকে একজন চৌকিদারকে পাঠাইয়া দিলাম, সে ব্যক্তিও আর কিরিত আসে না দেখিয়া শেষকালে একপা-তুটপা করিয়া আমি মিছেই সেইদিকে অগ্রসর হইলাম। সেখানে গিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম, ইচ্ছাও তাহা ভুলিতে পারি না। দেখিলাম, সাহেবের আঙ্গীলি ঘোড়াটির

গলার দড়ী ধরিয়া পাড়াইয়া আছে, আর একপাশ হইতে একজন লোক, (তাহাকে “লালখান্ড” বলিলেও “মহাজুজ” বলা যায় না,—কারণ তাহার গারে চামড়া ও হাড় ভিন্ন মাংস নামক পদার্থটির বড়ই অভাব ছিল)—মাছ ধরিবার জন্ত “খেপ্লা” জাল যে-ভাবে ছুঁড়িয়া মারে, সেই ভাবে বেচারসম্মত জিনটী ঘোড়ার পিঠে ছুঁড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। ঘোড়াটা খুব ভেজাঙ্গান্, যেমন উচু, তেমনই লম্বা। অধ-জীবনে এইভাবে জিন পবার আগ্রাস সে পোষ হয় আর কখনও ভোগ করে নাই,—কাজেই এই নবীনত্বের মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া চারি পা ভুলিয়া অধীনকুমারটি কেবল লক্ষ্য স্থাপ্য করিয়া বিশেষরূপে নিজের আপত্তি জানাইতেছিল। ঘোড়ার লাকানির সম্মুখেই ঐ কৌণকার লোকটিও “এ দাদা, জান্ গিয়া,—জান্ গিয়া—” বলিয়া “শত হস্তেন বাজিনা” এই নীতি-বাক্যের অঙ্গসংগ করিয়া তফাতে সরিয়া পড়িতেছিল।

ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই দেখিলাম, প্রেক সাহেব চাবুক হাতে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। ঘোড়া এবং জিনের চক্ষুশা দেখিয়া সাহেবের আপাদ-মস্তক জোখে জলিয়া উঠিল, এবং “কোন্ হার তোম,—হানারা সহিস কাহা গিয়া”—বলিয়া তিনি সেই কৌণকার লোকটির প্রতি চাবুক আন্দোলন করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। সে বেচারী তত্বের ঠক্ ঠক্ করিয়া কাণিতে লাগিল,—তাহার হৃদীয় জজ্বা-হুইটি ঐ কৌণদেহের ভার

বহনেও অশক্ত হইয়া দুটরা পড়িতে লাগিল।
জবাব দিতে বিলম্ব করিতে সাহেবের
ক্রোধ আরও বাড়িয়া উঠিল,—তিনি রক্তবর্ণ
চক্ষু বিক্ষারিত করিয়া বলিলেন, “কোন
ছাত্র তোম্ উরু? হামারা সহিস কাঁচা
গিয়া, জলদি বনো!”

সে বেচারী বোডহাতে বলিল,—
“হজুর, ধর্ম্মান্তর,—মাই-বাণ—হামারা
কুচ্ কহুর নেহি,—আপ্কা সহিস
বোখার হোকে পিপুলবাড়ী টিশনে
গিয়া ছাত্র,—চাম্কা ছোর কর্কে ডেজ
দিয়া,—বোলা কি, তোম্ নেহি যাওগে,
তব্ সাহেব তোম্কা কাঁচি চড়াওরে গা,—
ক্যা করে হজুর, সরকারকা হকুম,—হাম
জান্কা ডরসে চিরা চলা আঁঠা,—হামারা
তবিরৎ আছা নেই,—হাম্ আত ধুনকর,—
লেণ তোষক যদি তৈয়ারী কব্না হামারা
কাম ছাত্র,—বোঁড়া হাত্তীকা কাম্ হাম্
কতি নেহি কিয়া জনাব—”।

এত ক্রোধের মধ্যেও সাহেব আর হাত্ত
সংবরণ করিতে পারিলেন না, কানেই বেচারী
ধুনকর এ ব্যাড়া নিকৃতি লাভ করিল।
ধুনকারের হাতে পড়িয়া জিনটির অবস্থা অতি
শোচনীয় চইয়া উঠিয়াছিল। বেকারের সঙ্গে
লাগাম,—রাশের সঙ্গে পেট,—নামহারের
সঙ্গে কিনের ঢাকনি সব জড়াইয়া আটকাইয়া
একাকার হইয়া গিয়াছিল! সাহেব নিজ
হস্তে সেই সব খুলিতে খুলিতে, উদ্দেশে
সেই অস্থগস্থিত সহিসের মৃত্যুপাত করিতে
লাগিলেন। বহুকষ্টে যখন ঈষৎ লাগাম
পরাইয়া বোড়াকে প্রস্তুত করা হইল,
তখন সাহেবের সর্বাঙ্গে ঘাম ছুটিয়া গিয়াছে।

লাগ দিয়া বোড়ার উঠিয়াই সাহেব
মোক্তারকে লাগলেন, “চল্ বাবু, কাঁচা
তোমারা মজেন লোগ্কা ডেরা ছাত্র—”
মোক্তারসাহেব অসামান্যগত লইয়া লাড়োয়
খোক্তার পাশে পাশে চলিতে লাগিলেন,
আমরাও একটু পিছনে-পিছনে চলিলাম।
খালিপেটে কাপাডল ভানিয়া প্রচণ্ড রোজের
মধ্যে পপ-ভ্রমণ ব্যাপারটা যে আমাদের
পক্ষে তেমন সুখজনক হয় নাট, সে কথা
বলাই বাহুল্য। খানিক দূর গিয়াই মোক্তার
সাহেব ডাটনে বায়ে গাত কুলিয়া দেখাইতে
লাগিলেন, “হজুর, এই সব জমী হানিফ
গাজীর,—“ঐ নাগান নেছারদির,—“ঐ
এ গর চরিজেছ ওগুলো সব টক্সাভিয়ের।”
—সাহেব এই সব কথা শুনিতে-শুনিতে
ক্রমেই যে চট্টা উঠিতেছিল, লেকথা
আমরা পিছন হইতে বুঝিতে পারিলেও,
“প্রতিভাশালী” মোক্তার সাহেব উৎসাহাতি-
শয্যে উঠা উপলক্ষ করিতে পারেন নাই।
আরও একটু পপ অগ্রসর হইয়া সাহেবকে
শুনাইয়া শুনাইয়া মোক্তার সাহেব “তাহার
অন্ততম অক্কেল জনাবানী ককিরকে যেমন
বলিয়াছেন যে, “কট হে জনাবানি, তোমার
শেট বাঁধাঘাটওয়াল পুছুরটা কোন্ দিকে,
দেখাও না সাহেবকে।”—অম্মি সাহেব
বোড়ার রাশ ধরিয়া ডানদিকে হঠাৎ
এমন-এক হেঁচকা টান দিলেন যে,
বোড়াটা মুহূর্ত্তমধ্যে তড়াক্ করিয়া ঘুরিয়া
পড়িল। মোক্তার-সাহেব ভাড়াভাড়া
তাল সামলাইতে না পারিয়া পিছনের একটা
ছোট খানার স্তিতরে একবারে উপুড় হইয়া
পড়িয়া গেলেন,—তাহার চোখা চাপকান

সমস্ত জল-কানার একেবারে বিচিত্র হইয়া গেল! সামুলাদি মাথা হইতে ছিটকাইয়া পড়িল; বাতাসমত চটয়া উঠিতে গিয়া মোক্তার-সাহেবের একপাতি জুতা কানাদেতে প্রোথিত হইয়া গেল, এবং মুখকমলও পঙ্কলিপ্ত হইল। মোক্তার-সাহেবের এই আকস্মিক দ্রুতবৃত্তি দেখিয়া আমরা সকলেই বড় ব্যথিত হইলাম বটে, কিন্তু সাহেবের মনে ততটা সন্দেহনার সফর হইরাছে বলিয়া বোধ হইল না।

“তোম্‌ পহিলা বোলা ইয়া সব্‌ কন্নীন্‌, বাগান, গরু ঠেঁন্‌ সব্‌ তোমার মজেককা ছায়,—আজি বোলতা কি উন্‌ লোগ্‌কা ঘটিব্বা তালাও (পুত্ৰ)“ ছায়,—খোড়া বান তোম্‌ বোলগে কি ছনিয়াত্তু হিলোগ্‌কা এলাকা ছায়,—তোমার সব্‌ বাৎ‌ জুটা ছায়,—নেহি বাগা হাম্‌ তোমার সাথ,—নাও, হাম্‌ সব্‌ সম্‌ন্‌ গিয়া,—সগর বারকে নাম্‌শাকা হকুম দেগা,—“এই কথা বলিতে বলিতে সাহেব পিপুলবাড়ী ঠেশনের দিকে সরেপে বোড়া ছুটাইয়া দিলেন। সুতরাং আমরাও অগত্যা ডাকবাংলার প্রত্যাখর্জন করিলাম।

একগুলি লোকের সম্মুখে এইভাবে অপ্রস্তুত হওয়ার্তে মোক্তার-সাহেবের মেজাজটা বড়ই অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। “আচ্ছা, থাক্‌ বেটা সাহেব, আমি সবার গিয়েই হাইকোটে মৌশন করবার ব্যবস্থা করব্‌,—শ্রেয় সাহেবের কাছে এই মোকদ্দমার বিচার কোন মতেই হতে দেব না।”—বলিয়া তিনি মজেকদিগকে অবিলম্বে টাকার বোগাড় করিতে বলিলেন।

মজেকেরা কিন্তু সুবোধ বলকের মত পে প্রত্যবে সম্মতি দান করিল না।

তাহারা সম্বন্ধে বলিল, “যান, যান, সাহেব, আপনার জন্তই আমাদের এই সর্জনশয় হয়ে গেল,—আপনিই সাহেবকে বা’ তা’ সাত সতের বলে চটিয়ে দিলেন। আপনার মত জল-কান্ত মিথ্যাকথা আধারাও বলতে পারি না,—কার কন্নী, কার বাগান, কার গরু বাছুর সব আমাদের বলে দেখাতে গেলেন, তাতেই ত সাহেব অত রোগে উঠলো। কনাবানীর কোন্‌ পুরুষে কবে বাচ্চা ঘাটওয়ালা পুরুষ ছিল বে, আপনি দে কথা বলতে গেলেন? অত বড় মিথ্যা কথাটা বে বললেন, যদি সাহেব সত্য-সত্যই পুরুষ দেখতে চাইত, তবে কি উপার হোত? চারদিকে তিন ক্রোশের মধ্যেও যে কোন পুরুষ নাই!” বোঁকা দিগেই যদি সাহেবকে ভুলান যেত, তবে কি আর সাহেব হাকিমী করতে পারত? আপনাকে আনাই আমাদের গুঁকমারী হয়েছে,—সবের গিরে আমরা অস্ত্র মোক্তার দেব।”

মোক্তার-সাহেব গর্জিয়া বলিলেন,—“আচ্ছা বা, ভাই দিগে বা।—তোদের মত চোর মজেক আমার অনেক জুটবে,—বা, অস্ত্র মোক্তার দিগে জেলে পচে মরগে বা। ‘বার জন্তে চুরি করি দেই বলে চোর’—তোদের বাঁচাবার জন্তেই আমি সাহেবকে এত করে বোঝাতে গিরে শেষকালে আছাড় পর্যন্ত খেলুম,—আর তোরা বেটারাই বলিস্‌ কিনা, আমি মিথ্যুক!—বেইমান নিমকহারান বেটারা—আমিস্‌, এ-সব কথা

কল্পে মানহানির Case করা যায় ? একেই ত বাড়ি চেপেছে এই বনমায়েরী মোকদ্দমা, তার উপর আপনার মানহানির দাবি চড়া'লে যে বীণাতন্ত্রে যেতে হবে, সে খোঁজ রাখিসু ত ? থাক, তোদের সঙ্গে বকে বকে আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না,—দে আমার চুক্তির টা+১,—দে আমার পাখী-ভাড়া,—আমি চলে যাই,—তোরা তোদের পণ দেখ,—আমি দরখাস্ত করে এখনি তোদের জামীন এন্ড্রা কবে দিচ্ছি, যা এখন হাজতে।”

কিন্তু মোক্তার-সাহেবের তর্জ্জন-গর্জ্জন কেহ গ্রাহ্য করিলই না—বরং—উট্টাইয়া মুখ-ত্যাংচাইয়া তাহার। বলিল,—“বাও বাও নাহেব,—টাকা বা পেয়েছ তাই চের,—আর এক-পয়সাও আমার। তোমাকে দেব না। পাখী-ভাড়া কিসের ? এলে কেন পাখী ভাড়া করে ? তোমার কোন পুরুষ কে কবে পাখী চড়েছিল ? এখনও দেখ গিরে তোমার ভায়েরা সব রোদে

বুড়িতে লাগল ঠেলেছে,—অন্তধানে যা কর তা কর, এখানে পাখী চড়ে আস্ত্রে তোমার একটু লজ্জাও করল না ? দেব না পাখী-ভাড়া,—যা পার তাই কর গিরে,—।”

এই সময় ক্রানগালবার্ই একটু অগ্রসর হওয়াতে আসানীদার বাক্যপ্রোতঃ বন্ধ হইয়া গেল। মোক্তার-সাহেবের এই অপমানেরে আমিও অভিযত্ন দ্বঃপিত হইয়া কনেটবল-গর্গকে বলিলাম,—“লাগাও হাতকড়ী সব বেটাকে,—মোক্তার-সাহেব যখন জামিন এন্ড্রা করছেন, তখন সব বেটাকেই হাজতে যেতে হবে।”

হাজতের কথা উত্তিহামাত্র বাছানের মুখ আবার ছোট কইয়া গেল। একটু আগেই যে মোক্তারকে তাহার। যা-ইচ্ছা-তাই বলিয়া অপমানিত করিতেছিল, হাজতের নাম শুনিয়া আপনার মুখে মোক্তার-সাহেবেরই পা জড়াইয়া ধরিয়া লকলে অশ্রুপ্রবাহ করিতে লাগিল, তিনি যেন তাহারদের জামিন এন্ড্রা না করেন।

শ্রীযশোমোহন চন্দ্র।

বিদেশে “আর্য্য সমাজ”

অজরাতের স্বামী দয়ানন্দ প্রবর্তিত “আর্য্য সমাজ” ভারতবর্ষের সর্বত্র হুপরি-তিত। এই “সমাজের” আদর্শ অমূল্যের ধর্মপ্রচার ও সমাজ সংস্কার পন্থাধেই বিশেষ রূপে অঙ্গুষ্ঠিত হয়। ইহাদের প্রভাব যুক্ত-প্রদেশেও বিস্তৃত হইতেছে। বাঙ্গালী মানাঠা

ও মাস্তানী দিক্‌ভিত্ত জনগণ ইহাদের কার্য্য প্রণালী অবগত আছেন। আর্য্য সমাজের “গুরুকুল”, দ্যাঃমোদৈদিক কলেজ, বালিকা-বিদ্যালয়, “ভক্তি” বিধান, হিন্দী প্রচার ইত্যাদি সম্বন্ধে ভারতবাসীর নিকট নুতন পরিচয় দিতে হয় না। ইহাদের কার্য্য-

বিবরণ বাতলা, মাথাটি টটাদি সকল
প্রাদেশিক ভাষার প্রকাশিত চট্টা থাকে।
Modern Review, Indian Review
Vedic Magazine ইত্যাদি ইংরাজী মাসিক
পত্রও আৰ্য্য সমাজের অগ্রদূত প্রতীক
সমূহ বিবৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুই এক
জন ইংরাজ এবং ইয়াকি পণ্ডিতক আৰ্য্য
সমাজের অগ্রদূত চট্টা পড়িয়াছেন।
আত্মকাশকার দিনে বিদেশীয় যুগে বিজ্ঞাপন
প্রচারিত চট্টে থাকিলে দেশীয় সমাজে
শীঘ্রই প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায়। আৰ্য্য-
সমাজও সৌভাগ্যক্রমে এতদ্রূপ করেকজন
বিদেশী বন্ধু পাঠিয়াছেন।

ইয়োথোপ ও আমেরিকার নামা কেন্দ্রে
বিবেকানন্দ-পন্থী “রামী”রা বেদান্তভবমি
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দ্বানন্দপন্থীরা এখনও
ভারতবর্ষের বাহিরে কোন কেন্দ্র স্থাপন
করিতে অগ্রসর হন নাই বোধ হইল।
যুক্ত-প্রদেশের রামী রামতীর্থের তরুণসংখ্যা
একশে অতি অল্প মাত্র। ভারতবর্ষেই
এখনও তাঁহার কীৰ্ত্তি সুপ্রচারিত হয় নাই।
অল্প দিন হইল ঢালা বৈজ্ঞানিক রায়
বাগানুরের উদ্যোগে হরধারে “রামাশ্রম”
স্থাপিত হইয়াছে। ইহাই রামতীর্থ পন্থী-
দিগের একমাত্র কেন্দ্র। বিদেশে ইহাদের
অভিধান সূর চট্টে দেখা আছে।

লণ্ডনে থাকিতে দেশিরাঙিলান আৰ্য্য
সমাজপন্থীরা একটা ধর্ম মন্দিরের ব্যবস্থা
করিয়াছেন। তাহাতে ইহাদের নিয়মিত
রূপে বাওরা-আসা আছে। অস্ত্রান্ত মতা-
বলবী ভারতীয় ছাত্রেরা, পর্যটক এবং ব্যব-
সায়ীগণও এই মন্দিরের উপাসনা কার্যে

যোগদান করিতেন। ইংল্যান্ড-প্রবাসী
আৰ্য্য-সমাজ-পন্থীদিগের উদ্যোগে অস্ত্রান্ত
ভারতীয় উৎসবও দিল্লিতে অস্থায়িত হইয়া
থাকে। দ্বানন্দের অগ্রতিথি, গুরুকুল-
প্রতিষ্ঠা, প্রায়োনেটরিক কলেজ স্থাপন ইত্যাদি
উপলক্ষে সভাসমিতি আহ্বান করা অথবা
ভোক্তাণের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল
উৎসবে বিলাতের অধ্যাপক, পলিটেকনিক
সম্পাদক প্রভৃতিও যোগদান করেন। এই
উপায়ে বিলাতী শিক্ষিত সমাজের মহলে
মহলে আৰ্য্য সমাজের নাম প্রবেশ করিতেছে।

আমেরিকার আসিয়া দেখি কান্টার
“নবজীবন”-সম্পাদক ডাক্তার ব্রিগ্গস কেনব-
দেব শাস্ত্রী মহাশয় বৎসরকালাবধি ইয়াকি-
স্থানে নানাপ্রকার বক্তৃতা করিতেছেন।
কেনবদেব আৰ্য্যসমাজের একজন করিৎকর্মী
প্রচারক। ইনি পঞ্চদশের শেষ প্রান্ত
হইতে একদশের পর্যন্ত সকল প্রদেশে
পর্যটন করিয়াছেন। ইনি স্বয়ং পাঞ্জাবী—
ব্যবসায় উপলক্ষ্যে বাস করেন কান্টিতে—
এবং বহু বাঙ্গালী কেবোলোকের সঙ্গে
ইহার বন্ধুত্ব আছে। কাজেই মার্কিনদেশে
ইনি ভারতবর্ষের অনেক কথা প্রচার
করিতে সমর্থ হইয়াছেন। খৃষ্টান পাঞ্জাবী
সাধারণতঃ হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজের এবং
নিশেবর্ত্তাবে আৰ্য্যসমাজের বিরুদ্ধে মত প্রচার
করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে এতদ্রূপ আৰ্য্য
সমাজের সঙ্গে পাঞ্জাবী মহাশয়গণের ঝগড়া
লাগিয়াই আছে। আমেরিকারও কেনব-
দেবকে পাঞ্জাবীগণের সঙ্গে যথেষ্ট বাক্‌যুদ্ধ
করিতে হইয়াছে।

বিলাতে এবং ইয়াকিস্থানে

ভারতবর্ষলব্ধে মাঝে মাঝে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বক্তৃতার সারমর্ম প্রধানত এইরূপ :—“ভারতবর্ষে বননায়োগ অসম্ভব অথবা অর্হুৎসব; ইহাদের ধর্ম-জ্ঞান নাই—পারিবারিক জীবন অতিশয় নীতিহীন; জীবনের সকল কার্যে কুপন্যায়ের আচরণ আছে। একমাত্র খৃষ্টধর্ম-প্রচারের ফলে ইহাদের ব্যক্তিগত উন্নতি হইতেছে। খৃষ্টধর্ম গ্রহণ না করিলে ভারতবাসীরা মাহুষ হইবে না। আমরা অশেষ স্বার্থভাগ করিয়া এই অধর্ম ও কুপন্যায়ের দেশে বিভ্রা, নীতি ও ধর্মপ্রচারে ব্যস্ত হইয়াছি। আপনারা যদি প্রকৃত খৃষ্টান হন, তাহা হইলে আমাদেরিগকে লক্ষ লক্ষ টাকা সাহায্য করিয়া ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করিবেন।” এইরূপ বক্তৃতার সঙ্গেসঙ্গে পাণ্ডী-মহাশয়গণ ভারতবর্ষের নানা-প্রকার কুৎসিত চিত্র দেখাইয়া থাকেন। ইহাদের কোন-কোনটা হরত সত্য, কোন-কোনটা হরত কাল্পনিক। এই সকল দেখিরা-তিনিরা শ্রোতার দ্বারা হইয়া পড়ে—যাহার নিকট টাকা-পয়সা আছে সে তাহা দিয়া পাণ্ডীমাজের সাহায্য করে। এই কারণে ভারতবর্ষের নীতিহীনতা, ধর্মহীনতা, অসম্ভাভা ইত্যাদির কাহিনী প্রচার করা পাণ্ডীদিগের একটা ব্যবসায়বিশেষ! ভারতবর্ষের লোকেরা উচ্চশিক্ষিত, সচ্চরিত্র কিংবা ধার্মিক, একথা সপ্রমাণ হইলে ইহাঙ্কিবা অথবা দুঃশ্রোতাদের পাণ্ডী-প্রচারকগণকে সাহায্য করিবে কেন? এইজন্যই দেখিতে পাই, ভারতবর্ষের কোন লোক বিদেশে কোন ভাষা প্রচার করিতে আসিলেই, পাণ্ডীরা প্রথম হইতেই

তাঁহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হন। এইরূপ বাধা না দিলে যে তাঁহাদের, “ভাত মারা” ঘাইবে। বিবেকানন্দ-পন্থীর একথা মর্মে মর্মে বুঝেন। পাণ্ডীরা যে কেবলমাত্র ধর্মপ্রচারক-গণের প্রতিকূল, তাহা নহে। সেদিন আই-ওয়ার্ড নগরে ঐতিহাসিক ভ্রাম্যগণের কথা-বার্ত্তা শুনিয়াছিলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুখীজ নাথ বহুকে অধ্যাপনাকার্যে নিযুক্ত করার বিরুদ্ধে পাণ্ডী মহাশয়রাই অগ্রণী ছিলেন। তাহারাই রাষ্ট্রের নাথকগণকে লিখিয়া পাঠান, “যদি একজন হিন্দু আমাদের খৃষ্টান-সমাজের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে পূজ্যগণকে শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ কর, তাহা হইলে ভারতবর্ষে আমাদের খৃষ্টধর্ম প্রচার বন্ধ হইয়া ঘাইবে। ভারতীয় হিন্দুরা আমাদেরিগকে আর ভয় ও সম্মান করিবে না। দেশীয় ঠগাঙ্কিরাও বুঝিবে, যে ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষিত লোক ইহাঙ্কিহানে অধ্যাপক হইতে পারে, সেই ভারতবর্ষে আমাদের প্রচার-কার্য অনাবশ্যক। স্তম্ভরাং আমরা যদ্যে অর্থসাহায্য পাইব না।”

কেশবচন্দ্র ইহাঙ্কিহানের কতিপয় নগরে বক্তৃতা দিয়াছেন। হু-একখানা পুস্তকও ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন। এক্ষণে ন্যাশনালি-ফরিস গ্রন্থের কোন কলমে উচ্চশিক্ষিত চিকিৎসাবিজ্ঞা অধ্যয়ন করিতেছেন। ইটা-বাতীত আঘোরিকার হিন্দুস্থান পরিষদের কার্যে ভারতীয় ছাত্রগণকে ইনি সাহায্য করিতেছেন—বর্ত্তমানে ইহাকে পরিষদের সভাপতির পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। এবারকার বিশ্বমেলায় বাহাতে ভারতীয় ত্র্য-নিচর প্রদর্শিত হয় তাহার সমস্ত কেশবদের

কয়েক মাস যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। নানা কাৰণে শ্রম বিফল হইয়াছে। প্রদর্শনীতে ভারতের কথা প্রচারিত হইতে পারিল না। কিন্তু আগামী আগষ্ট মাসে “বিশ্ব-হিন্দুস্থানী-পরিষদের” সম্মেলন (International Hindusthance Student's Convention) আহুত হইবে। সেই সময়ে হিন্দুস্থানিস্থানগণে নানা সভা-সমিতি-সংগঠন ইত্যাদির অনুষ্ঠান হইবার কথা। তখন হাফাতে ভারতের কথা সুপ্রচারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। কেশব-দেবের উৎসাহ এবং ভারতীয় ছাত্রগণের উত্তম ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।

কয়েকদিন হটল, “আর্থালমার” সঞ্চকে



একখানি জলিখিত ইংরাজী গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। ইহা বিলাতের লংম্যান্স গ্রীণ কোম্পানীর দ্বারা প্রকাশিত। লেখক শ্রীযুক্ত লালমত রায়। ইনি বিলাতে এবং আমেরিকায় পর্যটন ও বক্তৃতা করিতে আসিয়াছেন। লালমত রায়ের নাম বিলাতের অনেক মহলেই পরিচিত ছিল—ইয়াক্সহাউনেও এটলার ইনি পরিচিত হইলেন। কোথাও বৈদিকধর্ম, কোথাও হিন্দুর নীতিজ্ঞান, কোথাও আর্থালমার ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বাহার বক্তৃতা হইয়াছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজে বক্তৃতা করিবার সুযোগও ইহার জুটিয়াছিল। কতিপয় অধ্যাপক ইহার অনুবক্ত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া

বুঝা গেল। ভারতের নেতৃ-হানীর ব্যক্তিগণের প্রতি বিদেশের শিক্ষিত জনগণের অন্ধা-অনুরাগ বহু বৃদ্ধি পায় ততই আমাদের মঙ্গল। এই সকল দেশের কাগজপত্রে কোন ব্যক্তির চিত্র প্রকাশিত হওয়া আতশের মামুলি কথা। সুতরাং কেশবদেব ও লালমত রায় প্রতিভার ফটোগ্রাফও বিভিন্ন দৈনিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের সঙ্গে কথোপ-কথন করিয়া সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণও মাঝে-মাঝে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই উপায়েই বর্তমান যুগে কার্য-প্রচার ও মতপ্রচার ইত্যাদি হইয়া থাকে। বিবেকানন্দ,

দ্বীপপ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র হট্টে ভারতু করিয়া ভারতবর্ষের এবং ছনিয়ার সকল ব্যক্তিষ্ট এইরূপে প্রচারিত হইয়াছেন। হুগলের কথা— অধিকসংখ্যক ভারতীয় নরনারী ছনিয়ার বাজারে প্রচারিত হইতেছেন না। অথচ ভারতবর্ষের বিজ্ঞান প্রচার করিবার জন্ত সহস্র সহস্র লোক লাগিয়া ঘাউন। মহত্ৰ সহস্র ভারতবাসীর চিত্র বিলাতী, ক্যান্টো, আর্দাণ, রুশ, ইরাকি, মেক্সিকান, ব্রিটিশ, লিগান, চীন ও জাপানী পত্রসমূহে প্রকাশিত হউক। ছনিয়ার রিপোর্টারগণ সহস্র সহস্র ভারতবাসীর মত ও কার্যের আলোচনা নানাপথে প্রকাশিত করিবার অযোগ্য লাভ করুন।

লাঙ্গনত রাধের গ্রন্থ সচিত্র। এই গ্রন্থে বর্ণিত সকল তথ্য এবং চিত্রগুলি ভারত-বাসীর সুপরিচিত। গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানধ্যাপক সিড্‌নি ওয়েব।

সিডনি ওয়েব কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি এই ভূমিকার তাহার নিজচোখে দেখা নানা বিষয়ের বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে 'নবীন ভারতে'র উত্থান হইল। তাহার পর হইতে নানাদেশীয় বিলাতী পত্রটুকুগণ ভারতীয় নবযুগের চাক্ষুষ পরিচয় প্রাইবার জন্ত ভারতে আসিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে নেভিলসন তাহার *The New Spirit in India* গ্রন্থে, রায়স্বে ম্যাকডোনালাণ্ড তাহার *The Awakening of India* গ্রন্থে এবং পাণ্ডী রায়চন্দ্র তাহার *The Indian Renaissance* গ্রন্থে আর্থ-

সমাজের প্রাথমিক ক'রয়াছেন। একদিকে বিবরণ, তাহার *The Unrest in India* গ্রন্থে আর্থসমাজের সম্বন্ধে 'নবীন ভারতে'র সকল প্রতিষ্ঠানকেই চিত্রিত করিয়াছেন।

লাঙ্গনত রাধের গ্রন্থ বিচকণ অজ্ঞাত শ্রেণ্যকগণের দ্বারা বর্তমান ভারতের অনেক তথ্য ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান ও জাপানী ভাষায় প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। অবিদ্যে তাহা আরও হইবে বলিয়াও বিশ্বাস হইতেছে। নিবেশে অতীত ভারতের জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, চিত্র, সাহিত্য ও দর্শন ইত্যাদির প্রচুর কিছুকাল হইতে চলিতেছে। কিন্তু 'নবীন ভারতে'র কর্মদ্বার ও চিত্রাবলী এবং অল্পজ্ঞান, প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনসমূহ এখনও লগতে প্রচারিত হয় নাই। লাঙ্গনত রাধের এই 'নবীন ভারতে'র প্রচারককে পথপ্রদর্শক।

লাঙ্গনত রাধের গ্রন্থ দেখিরা আর এক কথা মনে হইল। রাণাডে এবং রমেনচন্দ্র দত্তের পর আর কোন প্রবীন নেতৃস্থানীয় ভারত-সত্যান ভারতমধ্যে ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থরচনায় বিশেষভাবে অগ্রসর হন নাই। লাঙ্গনত রায় তাহাদের পরা অমুসরণ করিয়া অনেকের দৃষ্টি এতদিকে আকৃষ্ট করিলেন।

যুরোপ ও আমেরিকার রাষ্ট্রবদ্ধগণ সকলেই সুশ্রেণ্যক। এমনকি, সেনাপতি এবং অর্ণববানাদ্যকগণও তাহাদের বক্তৃতা মাসিকপত্র ও গ্রন্থাদিতে প্রচার করিয়া থাকেন। উড্ডো উইলসন, মর্লে, বার্বাডি ইত্যাদির নাম লেখক-মহলে সুপ্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষের জনসাধারণ প্রধানত বক্তৃতা

দান করিয়া থাকেন। বক্তৃতাগুলি দৈনন্দিনে সম্ভাবন।। তুমি তোহি স্ববক্তা। গ্রীষ্মক অধিকা-
 যোকানদারগণের খেরাগমত মুজিত ও চরণ মজুমদার ভারতীয় মহাসমিতি কংগ্রেসের
 প্রকাশিত হয়। এমন-কি গোথলেও ইতিহাস-প্রণয়নে নিযুক্ত আছেন। অতএব,
 বীজগণিত ব্যতীত অল্প কোন গ্রন্থরচনার বশিতে হইবে যে দেশে অল্প-অল্প স্বাভাৱ
 মনোনিবেশ করেন নাই। এই অবস্থার বহিরাঙ্কে।
 লালগত রায়ের দৃষ্টান্তে স্থল ফলিবার শ্রীমদভ্যুদয় সঙ্গকার।

ভারতের মুদ্রা

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা আধুনিক ভারতের মুদ্রা-সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। ইংরাজ-
 রাজত্বের পূর্বে ভারতের মুদ্রা বুলিলে, প্রধানত আমরা সিকা-টাকা এবং আকবরী মোহর
 বুঝিতাম। কিন্তু ভারতে তখনও মুদ্রার প্রচলন বধেই হয় নাই; অধিকাংশ লোকই
 দরিদ্র ছিল। তাহাদের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য সিকা-টাকা বা আকবরী মোহরের বড়
 একটা প্রয়োজন হইত না। কড়ি এবং তাহার মোগলকর পরসাই একটা ক্ষুদ্র
 পণ্যের সমস্ত ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য সম্পাদন করিত। সিকা-টাকা বা আকবরী
 মোহর বড়লোকদের ব্যবহারে লাগিত। তদ্বারা তাহারা ঢাকাই মসলিন এবং
 সুনিপাণদের সিঙ্ঘের দ্বারা বহুমূল্য বিলাসের প্রবাসকল ক্রয় করিতেন। বণিকগণও বহি-
 বাণিজ্য চালাইবার জন্য সিকা-টাকা বা আকবরী মোহর ব্যবহার করিত।

এইরূপ আমরা মুদ্রাবন্ধন নানাপ্রকার
 লিখি ব্যবহার করি; যথা, গভর্নমেন্ট
 প্রিন্সেরী নোট, টাকা, আধুনি, দিকি,

জুমানী, আনী, ডবল পরসাই, আধ পরসাই এবং
 পাই। ইংরাজী সভ্যরিন্ আমাদের
 ব্যবহারে আসিলেও ইহা এখনও প্রচলিত
 হয় নাই।

রৌপ্যমুদ্রা।—প্রাচীন হিন্দুরাজত্বের
 সমস্ত টাকা বিদ্যমান ছিল কিনা
 বলিতে পারি না, তবে বর্তমান টাকা বা
 পশ্চিমওয়ারায়া বাহাকে তুফা বলে,
 ঐতিহাসিক যুগ হইতেই তাহার প্রচলন
 হইয়াছে। দিল্লীর সম্রাট শেরশাহ নানা
 কারণে ভারত-ইতিহাসে অমর হইয়া
 আছেন। বঙ্গোপসাগর হইতে পাকাব
 পর্যন্ত তাহার নির্দিষ্ট বিস্তৃত রাজপথ
 এখনও তাহার অতুল কীর্তির সাক্ষ্য প্রদান
 করিতেছে। এই মোগল-সম্রাট শেরশাহই
 তুফা নামক রৌপ্য-মুদ্রা প্রচলন করেন। এই
 রৌপ্য-মুদ্রার আর-একটা নাম রূপিয়া।
 তুফা নামটীও অপরূপ টাকা।

মুগলসাম্রাজ্যের নিকট হইতে ইংরাজগণ
 রাজ্যভার গ্রহণ করিবার পর, প্রথম-প্রথম
 মুগলমানী মুদ্রাই তাহারা প্রচলিত রাখেন।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল। সিকা-টাকা এবং আক্‌বরী মোহর দুটাই যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। ভারতের বাহিরে রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রার কোন নির্দিষ্ট মূল্য নির্দ্ধারিত ছিল না। সোনা বা রূপার বাজার-দর অল্পস্বল্পে স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রার মূল্য নির্দ্ধারিত হইত। ভারতেও রৌপ্য মুদ্রার নির্দিষ্ট কোন মূল্য ছিল না। লণ্ডনের রৌপ্যের বাজার-দর অল্পস্বল্পে উহা নির্দ্ধারিত হইত। লণ্ডনের রৌপ্যের দর বাহা হইত, তাহার উপর লগুন হইতে ভারতে পাঠাইবার খরচ, mint charge এবং অন্যান্য ব্যয় বোঝা করিয়া, ভারতীয় রৌপ্য মুদ্রার দাম ঠিক করা হইত। তখন প্রতি রৌপ্য মুদ্রার একআনা মাত্র খরচ বিশদ হইত।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, সোনার বাজার-দর নামিয়া গাইতে আৰম্ভ হয়। তখন ভারত-গভর্নমেন্ট, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-ব্যাপারে ভারতকে লাভবান করিবার জন্ত সোনার মোহর আর প্রচলিত মুদ্রা (legal tender) রূপে গৃহীত হইবে না, এইরূপ ঘোষণা করেন।

সোনার মোহরের চলন তখন হইতে কমিয়া গাইতে থাকিলেও, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, দেশে সোনার মোহরের চলন একেবারে বন্ধ হয় নাই। কিন্তু, আন্তর্জাতিক ব্যবসারে, একমাত্র রৌপ্য মুদ্রার চল হইয়া যায়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সুবর্ণের বনি আবিষ্কৃত হয়। তখন হইতে রূপার দাম পড়িয়া গাইতে থাকে। পূর্বে

ভারতীয় রৌপ্য মুদ্রার মূল্য সাধারণত দুই শিলিং ছিল। এখন টাকা দিলে ইংরাজী একটা সতরিন্ পাওয়া গাইত। কিন্তু রূপার দাম পড়িয়া যাওয়াতে রূপার কদরও কমিয়া যায়। কাজেই অল্পশত-হিসাবে দাম কহিতে গৈলে, রূপার দরম সোনার দারের অল্পশতকে অনেক কমিতে থাকে। শেষে, এক টাকার দাম ১৪ পেন্স পর্য্যন্ত হইয়া গাড়ায়।

মুদ্রা-প্রগতি এইরূপ বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার, অতর্কিতভাবে বিশেষরূপে বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠে। রূপার মূল্য তুলনার পড়িয়া যাওয়ার, এখনকার উৎপাদিত স্রবের মূল্যও কমিয়া যায়; কিন্তু যে সময় দেশ তখন স্বর্ণ মুদ্রা ব্যবহার করিত, সেই সেই দেশে দেশোৎপন্ন স্রবের মূল্যও চড়িয়া যায়। কাজেই, ভারতের ব্যবসায়ীগণ রপ্তানী-ব্যবসারে খুব লাভবান হইতে লাগিলেন; কিন্তু যুরোপীয় ব্যবসায়ীগণ ভারতে স্রব প্রেরণ করিয়া লাভবান হইতে না পারায়, ভারতের আমদানী-স্রবের একবারে বন্ধ হইয়া যায়। ভারত-গভর্নমেন্ট এই মুদ্রা-বিপ্লবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠেন। ভারত-গভর্নমেন্টকে প্রত্যেক বৎসর ছাব্বিশ কোটি টাকা Home charge রূপে বিলাতে প্রেরণ করিতে হয়। এই Home charge বিলাতে সতরিন-রূপে বিবার নিয়ম। পূর্বে যখন ১০ টাকার একটা সতরিন্ কিনিতে পারা গাইত, তখন যে পরিমাণে টাকা খরচ হইত, এখন একটা সতরিন্ ক্রয় করিতে ১৫১৬ টাকা দিতে হওয়ার পূর্বাপেক্ষা দেড় খরচ হইতে

লাগিল। এই সমস্ত গোলমাল মিটাইবার জন্য, ভারত-গভর্নমেন্ট, রোপা এবং স্বর্ণের মূল্যের অস্থগত নির্দেশ করিয়া দেন। আমেরিকা, ফ্রান্স ও জার্মানি তখন রোপা এবং স্বর্ণ উভয়ই মুদ্রাই প্রচলিত মুদ্রা বলিয়া গ্রহণ করিত; ভারত-গভর্নমেন্টের অমুদ্রাধে উক্ত দেশসমূহের প্রতিনিধিগণ একটা কংগ্রেসে, এই মুদ্রা-বিপ্লবের সমস্তা করিতে বসেন। এই কংগ্রেসে হঠাৎ ইংলণ্ডকেও রোপা ও স্বর্ণমুদ্রাকে প্রচলিত মুদ্রাক্রমে গ্রহণ করিতে অমুদ্রাধ করা হয়। ইংলণ্ড সম্মত না হওয়ায়, আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্সও অসম্মত হন। তাহার পর আমেরিকা, জার্মানি এবং ফ্রান্স প্রভৃতি সকলেই একমাত্র স্বর্ণ মুদ্রাকেই প্রচলিত মুদ্রা বলিয়া ঘোষণা করেন। উক্ত দেশসমূহে যে-সমস্ত রোপা-মুদ্রা ছিল, তাহা গলাইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করা হয়। রূপায় বাজার তখন একরূপে পড়িয়া যায়।

ফল ভারত-গভর্নমেন্ট নিরূপায় হইয়া পড়েন। ভারতের অন্তর্ভুক্তি এবং বহির্ভাগিণী *জুয়াবেশার মত হইয়া উঠে। Home charge-এর মাত্রাও ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতে থাকে। তাহার উপর দুর্ভিক্ষ এবং প্রাদেশিক গোলাঘোণে সরকারের খরচ নানাদিকে আরও বাড়িয়া উঠে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৫শে জুন, ভারত-গভর্নমেন্ট ভারতে অবাধ মুদ্রা-করণ বন্ধ করিয়া দেন (The mint was closed to the public)। ভারত-গভর্নমেন্ট এখন হঠাৎ প্রত্যেক টাকার খানের ভাগ

বাড়াইয়া দেন।* এখন প্রত্যেক টাকার বা আধুলি-সিকি-দুহানীতে কত পরিমাণ খাদ মিশানো হয়, নিচে তাহার একটা তালিকা দেওয়া গেল।

প্রকৃত অংশ	খাদ	প্রকৃত ওজন
টাকা	১৩৫	১৫ ১৮০
আধুলি	৮২৫	৭৫ ৯০
সিকি	৪১৫	৩৫ ৪৫
* দুহানী	২০৫	১৫ ২২৫

পূর্কোঁক তালিকাটিতে দেখা যাইবে, প্রত্যেক টাকা হইতে ১৫ গ্রেন, প্রত্যেক আধুলি হইতে ৭৫ গ্রেন, প্রত্যেক সিকি হইতে ৩৫ গ্রেন এবং প্রত্যেক দুহানী হইতে ১৫ গ্রেন, বিত্তজ্ঞ রোপ্য বাহির করিয়া লওয়া হয়। এখন একটা টাকার ১৬৫ গ্রেন বিত্তজ্ঞ রোপ্য থাকে। একটা ইংরাজী সিলিংয়ে ৮০১/৪ গ্রেন বিত্তজ্ঞ রোপ্য থাকে। সুতরাং একটা টাকা ২০৩৯ সিলিং বা দুই সিলিং চারি পেন্সের সমান। এই অস্থগতে হিসাব করিলে একটা ইংলিশ সতরিনের দাম ১৫ টাকার ষাড়াই। সাধারণত রূপায় বাজার-দর সোনার অস্থগতে ১৫:১। এইজন্য ভারত-গভর্নমেন্ট নিষেধ করিয়া দিলেন যে, গভর্নমেন্ট ১৫টা রোপা মুদ্রা লইয়া প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে একটা ইংলিশ সতরিন দিবেন। রূপায় বাজার-দর বাহাই হউক, ভারত-গভর্নমেন্ট ১৫:১ অস্থগতে সোনার রূপায় দর বাধিয়া দিলেন। এই নিষেধ অস্থগারে কোন বৈদেশিক ব্যবসায়ী, কতকগুলি টাকা লইয়া ভারত-সরকারের কাছে যাইলে, ভারত-সরকার তাহাকে

২৫টি টাকার পরিবর্তে একটি টংগাঁজী সতরিন্ দিতে বাধ্য হইলেন।

এট নিয়ম প্রচলিত হইবার পর হইতে, বহিঃবাণিজ্যের অবস্থা সুবিধাজনক হইয়া আসিল এবং কত টাকা Home charge দিতে হইবে, তাহাও ঠিক হইয়া গেল। কিন্তু ভারত-গভর্নমেন্ট নিজে একটি গুস্তার দারিদ্র্যের প্রহণ করিলেন। আইন করিয়া, সোনারূপার একটি কৃত্রিম দর বাধিয়া দেওয়া হইল বটে, কিন্তু লগভের বাজারত ঐ আইন মানিতে বাধ্য নয়। লগভের বাজারে রূপার দাম যদি প্রচলিত দর হইতে কম হয়, তাহা হইলে, ভারত-গভর্নমেন্টকে তাহা পূরাইয়া দিতে হইবে। এইরূপ ভারত-গভর্নমেন্ট টাকার integral value উহার face value অপেক্ষা কম রাখিয়া, প্রত্যেক টাকা হইতে কিছু কিছু বাচাইতে আরম্ভ করিলেন। ইচ্ছা রচিল, যখন সোণের বাজার দর, কৃত্রিম অল্পপাত অপেক্ষা কম হইবে, তখন এট সঞ্চিত অর্থ হইতে, তাহা পূরায়ো দিবেন।

তাহার পর গভর্নমেন্ট প্রচলিত নিত্যক মুদ্রাগুলি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে ২৫ গ্রেণ বাগ মিণাটরা নূতন টাকা তৈয়ারি কারিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৯৭ এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ, এই প্রকারে অতিবাহিত হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে আর কোনপ্রকার টাকা মুদ্রিত হয় নাই।

ভারতের দেশীয় মুণ্ডিতবর্ণ ধারা শাসিত রাজ্যগুলিরও আপন আপন মৌণ্যমুদ্রা ছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে রূপার বাজার যখন নামিতে আরম্ভ হয়, তখন ঐ-সব

দেশীয় টাকাদলগুলিতে প্রয়োজনীয় টাকার সংখ্যা অপেক্ষা, অধিক টাকা মুদ্রিত হইত। কাজেই টাকার প্রচলন অধিক হওয়ার, ভ্রাবাদির মূল্য চড়িয়া যায়; এবং এরূপে দেশীয় রাজ্যগুলিতেও টংগাঁজী-শাসিত ভাবতেও জ্বর, মুদ্রা-বপ্প উপস্থিত হয়। ভারত-গভর্নমেন্ট টাকা এবং সতরিনের মধ্যে একটি কৃত্রিম অল্পপাত বাধিয়া দিয়া দেশীয় রাজস্ব-বর্গকে ভারত-গভর্নমেন্টের মুদ্রাশাল হইতে মুদ্রিত মুদ্রা লইতে অস্বরোধ করেন। কাশ্মির এবং জুপ্পল এট সন্তোষে সন্তুষ্ট হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে, মুদ্রাক্ষণ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠায়, ১৯০০ খৃষ্টাব্দেই ফ্রেজারী মালে আবার মুদ্রাক্ষণ-কার্য আরম্ভ হয়।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে, ভারত-গভর্নমেন্টের মুদ্রাশালগুলি হইতে, ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ এবং পুরোক্ত দেশীয় রাজ্য-গুলির ব্যবহারের জন্য ১৭ কোটি টাকা মুদ্রিত হয়। এট টাকাদলিতে, প্রত্যেক টাকার ১২ গ্রেণ করিয়া পাঁচ পাকী, ভারত-গভর্নমেন্টের আর বখেটে বাড়িয়া বাইতে থাকে। ঐ অতিরিক্ত অর্থের নাম Gold Reserve Standard রাখা হয়; রূপার মূল্য লাড়িয়া স্বর্ণ-রৌপ্যের কৃত্রিম দর বজার রাখিবার জন্য, যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হইবে, এই সঞ্চিত ভান্ডার হইতে তাহা দেওয়া বাইবে, এইরূপ স্থিরীকৃত হয়। পরে রূপার বাজার-দর একতাবেই রহিয়া যায়, কাজেই এই ষাণ্মিশ্রিত টাকা মুদ্রিত করিয়া, ভারত-গভর্নমেন্ট প্রত্যেক বৎসরেই বখেটে লাভবান হইতে লাগিলেন।

আর ক্রমে বাড়িয়া বাইতেছে, অথচ
অল্প হ্রদে টুকা পড়িয়া থাকে দেখিয়া
যোগাশঙ্কটে গোথলে, লর্ড কার্জনের
ব্যবস্থাপক সভায় এই উদ্ভূত টাকাকুলি
দেশের শিক্ষাপ্রচাৰ বা স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য
ব্যয় করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।
‘ভারত-গভর্নমেন্ট’ দেখিলেন, শিক্ষাদান
এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যাপারেও বেশ চলিয়া
যাইতেছে; কিন্তু দেশের উন্নতি করিতে
গেলে, রেলওয়ের একান্ত প্রয়োজন।
তখন পর্য্যন্ত, পর্য্যাপ্ত অর্থভাবে ভারতে
যেথৈ রেলপথ নির্মিত হয় নাই। ১৯০৭
খ্রীষ্টাব্দে ভারত-গভর্নমেন্ট, ‘সেক্রেটারী অফ
স্টেট’র সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন
যে, এখন হইতে উদ্ভূত অংশের অর্ধেক,
সকিত অর্থ-ভাণ্ডারে লইয়া দেওয়া হইবে
এবং অপর অর্ধেক রেলপথ নির্মাণে
ব্যয়িত হইবে।

এক আকস্মিক দুর্ঘটনা ভারত-গভ-
র্নমেন্টের এই ইচ্ছা ফলবতী হইতে দেয় নাই।
১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার সহিত বহি-
র্বাণিজ্য ব্যাপারে, আমেরিকার দিকট হইতে
ভারতবর্ষ বহু টাকা গ্রহণ করিয়াছিল।
তাহা অপেক্ষা অনেক কম টাকার দ্রব্য
আমেরিকার রপ্তানী করে। কাজেই ভারতের
হস্তিগুলির সংখ্যা আমেরিকার হস্তির সংখ্যা
অপেক্ষা বেশী হওয়ায়, ভারতীয় হস্তির
দাম বাড়িয়া যায়। এই বিপ্লবের সময়
ভারত-গভর্নমেন্টকে সকিত অর্থভাণ্ডারের
সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল ভারত-
গভর্নমেন্ট দেখিলেন যে, আন্তর্জাতিক-বাণিজ্য
ব্যাপারে মাঝে মাঝে এইরূপ আকস্মিক

বিপদ ঘটতে পারে; সে বিপদ হইতে
রক্ষা পাইতে গেলে, Gold Reserve
Fundএর একান্ত প্রয়োজন। এইজন্য,
স্থিরীকৃত হইল যে, বতদিন পর্য্যন্ত না
অর্থ-ভাণ্ডারে ২৬,০০০,০০০ পাউণ্ড জমিবে,
ততদিন পর্য্যন্ত উহা হইতে আর এক
কপর্দকও খরচ করা হইবে না। ১৯১২
খ্রীষ্টাব্দে, এই অর্থ-ভাণ্ডারে ১৯,৭৫৬,০৭৭
পাউণ্ড সঞ্চিত হয়।

ভারত-গভর্নমেন্ট খাদ্যমিশ্রিত রৌপ্যমুদ্রা
প্রচলিত হইয়া বাইবার পর, একে একে
‘নিম্নলিখিত দেশের রাজ্যগুলি ব্রিটিশশাসিত
ভারতের মুদ্রাকে নিজেদের মুদ্রা বলিয়া
গ্রহণ করিয়াছে। বম্বায়া, কোটা,
বোধপুর, রাধনপুর, ঝলওয়ার, ইন্দোর,
কাশে, দিরোহী, ডুনগপুর, বানসওয়ারী,
প্রতাপগড়, কাকুলি এবং টঙ্ক। ব্রিটিশ
ভারতের ছাত্র উক্ত দেশগুলিতে পূর্ষ প্রচলিত
মুদ্রাগুলিকে গলাইয়া পুনর্মুদ্রিত করা হয়
নাই। সেই-সময় মুদ্রারই সহিত বর্তমান
মুদ্রার একটি অল্পপাত ঠিক করিয়া দেওয়া
হইয়াছে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, আফগান
এবং Strait Settlement-এ প্রচলিত
রৌপ্য ডলার ভারতের মুদ্রাশালা হইতেই
মুদ্রিত হইত। কিন্তু, Colonial Govern-
ment* মুদ্রাসম্বন্ধে নতুন আইন জারি
করায়, Colonial dollar এখন একমাত্র
বোম্বায়ে মুদ্রিত হয়।

তামা ও ব্রোনিজ মুদ্রা। স্বতন্ত্র
কেনা-বেচা এবং দৈনন্দন আদান-প্রদান
ব্যাপারে, অল্পদায়ী মুদ্রা একান্ত আবশ্যিক।
এইজন্য ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার এবং

১৮৪৪ খ্রষ্টাব্দে মাস্ত্রাজ ও গোব্বাট প্রদেশে ভারত-গভর্নমেন্ট তাম্র-মুদ্রার প্রচলন করেন। ভারতে প্রচলিত তাম্র-মুদ্রাকে চারিভাগে ভাগ করা যায়,—ডবল-পরশা, পরশা, অর্ধ-পরশা এবং পাই। দেশের রাজ্যগুলির মধ্যে কেবল অলওয়ার এবং বিকানীর ভারত-গভর্নমেন্টের প্রচলিত তাম্র-মুদ্রা গ্রহণ করিয়াছে। অম্বালা রাজ্যগুলিও বৃত্তর তাম্র-মুদ্রা আছে। কোন্‌প্রকার তাম্র-মুদ্রার কত অংশ তামা আছে, নিয়ে তাহার একটি কর্দ দেওয়া গেল।

গ্রেণ, ট্রয় ওজন। *

ডবল-পরশা	২০০
পরশা	১০০
অর্ধ-পরশা	৫০
পাই	৩২½

১৯০৬ খ্রষ্টাব্দের কারেন্সি আইনে তাম্র মুদ্রার ব্যবহার উত্তীর্ণ গিয়া ব্রোন্‌জ মুদ্রা প্রচলিত হয়। এই বসর হইতেই ডবল-পরশার মুদ্রাকরণও কুলিয়া দেওয়া হয়। কোন্‌প্রকার ব্রোন্‌জ মুদ্রার ওজন কত এবং তাহাদের আকারই-বা কত, নিচে তাহার একটি কর্দ দেওয়া গেল।

পরশা—ওজন, ট্রয় গ্রেণ—আবৃত্তন মিলিমিটারে *

পরশা	৭৫	২৫.৪
অর্ধপরশা	৩৭½	২১.১৫
পাই	২৫	১৭.৪৪

১৯০৬ খ্রষ্টাব্দের কারেন্সি আইন দ্বারা ভারতে নিকেল মুদ্রা প্রচলনেরও ব্যবস্থা হয়। ডবলপরশার মুদ্রাকরণ বৎ ৮৫০০০ সনকার নিকেল আনি চালায়। ১৯১০ খ্রষ্টাব্দে, নিকেল ডবলপরশা চালাইবারও

কথা উঠে। কিন্তু প্রাদেশিক শাসন-কর্তারা ভারত-গভর্নমেন্টকে বলেন যে, আগে প্রমাণের নিকেল আনি ব্যবহারে অভ্যস্ত হউক, তাহার পর নিকেল ডবল-পরশা চালায় হইবে। *

গভর্নমেন্ট প্রমিশরী নোট। নোট সমস্ত দেশেই প্রচলিত। যুরোপে, সাধারণত বাস্তারগনট নোট ভাপাট্টা থাকেন, গভর্নমেন্ট কোনপ্রকার নোট ছাপান না। ১৮৬২ খ্রষ্টাব্দের পূর্ণ পর্যন্ত, আমাদের ভারতবর্ষেও বাঙ্গালা, বোম্বাই এবং মাস্ত্রাজ ব্যাঙ্ক হইতেই নোট বাহির হইত। ১৮৬২ খ্রষ্টাব্দে, ভারত-গভর্নমেন্ট এক আইন জারি করিয়া ব্যাঙ্কগুলির হস্ত হইতে নোট ছাপিবার ক্ষমতা কাড়িয়া লয়। তাহা পর চহতে ভারতে একমাত্র গভর্নমেন্টেরই নোট ছাপিবার ক্ষমতা আছে। ১৮৮২ খ্রষ্টাব্দে Currency Act অনুসারে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের স্থায়ী প্রদেশেও নোট চলিবে, এইরূপ হুকুমজারি হয়। *

ভারত-গভর্নমেন্ট যে-সমস্ত নোট প্রস্তুত করিবেন, তাহার অল্প-সম্মেলার স্বর্ণ ট্রেজারীতে জমা রাখিতে হয়। স্পেসে এক অনুমিত স্বর্ণ-পিত্ত সমস্তই ট্রেজারীতে পড়িয়া অনর্থক পতিত। তাহারপর গভর্নমেন্ট নিয়ম করেন যে, এত সঞ্চিত স্বর্ণ চহতে ৬ কোটি মুদ্রা খাটানো চহবে। এই খাটানো টাকা কমল ব্যাঙ্করা এখন ৪০ কোটি টাকাত গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

গভর্নমেন্ট প্রমিশরী নোট, সোণী-স্বপা টাকার স্থায় আইনত প্রচলিত। গভর্নমেন্টও বহু-টাকা প্রমিশরী নোট বাহির করিতে

পারেন। টাকার বদলে একদল নোট চালাইবার একটু হেতু আছে। ধাতুনির্মিত মুদ্রা, হাতে হাতে বুরিমা ফইয়া যায়, কালেটে তাহাতে প্রত্যেক বৎসর অনেক টাকা অনর্থক নষ্ট হয়। দ্বিতীয়ত, ধাতুনির্মিত মুদ্রা, সাধারণ অধিক হইলে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া বাওয়া বড় কষ্টের ব্যাপার। একখানি দশহাজার টাকার নোট যেমন সহজে লটরা বাওয়া যায়, দশহাজার টাকার বা সত্তরিশের হোড়া তেমন অনায়াসে স্থানান্তরে লটরা বাওয়া যায় না। এইজন্যই ধাতুনির্মিত মুদ্রা অপেক্ষা নোট অধিকতর সুবিধাকর। কেহ কেহ বলেন ইংলিশ সত্তরিশের প্রুভেন হওয়ার, নোটের কদর কমিয়া আসিতেছে। একপক্ষ সম্পূর্ণ সত্য নহে। কেননা অর্থজাতিক ব্যবসারে ৫০০, ১০০০ এবং ১০০০ টাকার নোটেরই অধিক প্রয়োজন; কিন্তু দেশের মধ্যে, ৫০ টাকার নিচের নোটগুলিরই অধিক দরকার। ৫০০, ১০০০ বা ১০০০০ টাকার নোটের ব্যবহার গত বাৎসরিক মধ্যে লক্ষ্য করা ১১ হইতে ৩৭ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়াছে, কিন্তু ৫০ টাকার নিচের নোটের ব্যবহার লক্ষ্য করা ১০০ ভায়েরও অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে; নিম্নে অবশ্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা স্বপক্ষম হইবে।

বৎসর দশলক্ষ মুদ্রা হিঃ

১৯০০—০১	২৫৬৩৯২
১৯০৫—০৬	৩৬১০০
১৯১০—১১	৪৮১২৭
১৯১১—১২	৫৭১৬৫

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কোম্প্রাকারের কত

টাকার নোট ছিল, এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তাহাদের সংখ্যা কত হয়, নিম্নের অঙ্কগুলি দেখিলে তাহা বুঝা যায়।

১৮৯০

২,৪৭,২৮০	১২৯৯৩৮৫
৩৯,১৭৩৩৬০	১৫০৯৭৪০০
৬,৬০১৬৬০	১৩১২৬৬০
১১৬২৪১০০	১৮৯৬২৭৫০
৫৬৮০৬৮০০	১৬৫২২০৯০০
২৫২২৪০০০	২৮০৫১০০০
৬৭৯৮১০০০	৯২৯৭১০০০
৫৪০৩০০০০	১৪৩২০০০০০

১৯০২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে, পাঁচ টাকার নোট ছিল নী। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কারেন্সি-আইনে পাঁচ টাকার নোটকে ব্রহ্মদেশ ভিন্ন ভারতের সর্বত্র প্রচলিত করা হয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের কারেন্সি-আইনে, পাঁচটাকার নোটকে ইংরাজ-পাসিত সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে চালাইয়া দেওয়া হয়।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও রেঙ্গুন ব্যতীত, কানপুর, লাহোর ও করাচাতেও নোট বাহির করা হইত। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের কারেন্সি আইনে, করাচী, লাহোর এবং কানপুরের নোট তৈয়ারি করিবার ক্ষমতা বন্ধ হয়। পূর্বে যে-সমস্ত নোট যে-প্রদেশ হইতে প্রকাশিত হইত, কেবল সেই প্রদেশেই তাহা ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এখন নিষম করা হইল, ৫, ১০, ৫০ ও ১০০ টাকার নোট ভারতবর্ষের সর্বত্রই চলিবে। ১০০ টাকার বেশী যে-সমস্ত নোট—অর্থাৎ ৫০০, ১০০০, এবং

১০০০০ টাকার নোট ভাঙাইতে হইলে, যে প্রদেশ হইতে বাহির হইয়াছে, সেই প্রদেশের যে-কোন ট্রেজারীতে সেগুলি ভাঙ্গান যাইতে পারে। কোন ছোট ট্রেজারী অন্ত দারী নোটের টাকা না দিতে পারিলে, প্রধান ট্রেজারীতে গেলে নোটের ভাঙ্গানি টাকা মিলিবে। ১৯১০ গুটাব্বের কারেন্সি-আইন দ্বারা ২০ টাকার নোট তুলিয়া দেওয়া হয়, তবে যে-সমস্ত নোট পূর্বে মুদ্রিত করা হইয়াছিল, সেগুলিকে আর নষ্ট করা হয় নাট। এখন কেবল নিম্নলিখিত সংখ্যার নোটগুলি মুদ্রিত হয়:—পাঁচ, দশ, পঞ্চাশ, একশ, পাঁচশ, হাজার, এবং দশহাজার টাকার। হাজার এবং দশহাজার টাকার নোট ধনীগণ ব্যবহার করেন। নগদ টাকা বাড়িতে রাখা প্রেরতর নয়, এইজন্য তাঁহারা সরকারের ঘরে নিরাপদে টাকা জমা রাখেন। নিম্নে যে-যে স্থান হইতে নোট বাহির হয়,

সেই সমস্ত স্থানের, নোট বাহির করিবার স্থান যে সমস্ত রাজকর্মচারীরা উপর অর্পিত, তাঁহাদের উপাধির এবং যে-সমস্ত নোট সর্পর প্রচলিত নয়, সেট সমস্ত নোট বেথানে-বেথানে চলিতে পারে, সেই সেই জায়গায় একটা ফর্দ দেওয়া গেল।*

পূর্বে বলিয়াছি যে, প্রত্যেক নোটের* অল্প সমান মূল্যের সুবর্ণ গভর্নমেন্টের ট্রেজারীতে জমা থাকে। এট-সমস্ত সুবর্ণ ট্রেজারী না পচাইয়া তাহাদ মধ্য হইতে ১৪০ কোটি মিলিয়ন, গভর্নমেন্ট হুদে খাটাইয়া তাহা হইতে গভর্নমেন্ট প্রীতি বৎসর ১৯২০-১৯২১ টাকা হ্রদ পান। এই বিত্তাগটি ডালাইনার অল্প গভর্নমেন্টের বাৎসরিক খরচ হই ১৮৫৭১২০ টাকা। সুতরাং খরচ বাড়ে, প্রীতি বৎসর ২৬৩৩২৬০ টাকা সরকারের লাভ হয়।

ঐতিহাসিক বিবরণ।

* নোট বাহির হইবার স্থান	যে-সমস্ত রাজকর্মচারী নোট বাহির করেন তাঁহাদের নাম	} যে যে প্রদেশে ১০০০, ১০০০ এবং ১০০০০ টাকার নোট চলিবে সেই সেই প্রদেশের নাম।
কলিকাতা	কনট্রোলার জেনারেল	
কানপুর	উত্তর-পশ্চিম অধ্যোধ্যা প্রভুপের একাউন্ট্যান্ট জেনারেল, পঞ্জাব	} আত্রা এবং অধ্যোধ্যা
লাহোর	একাউন্ট্যান্ট জেনারেল	
মাদ্রাস	ঐ	} পঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ
বোম্বে	ঐ	
করাচী	Agent to the Indian Government	} সিন্ধু-প্রদেশ
রেসুদ	একাউন্ট্যান্ট জেনারেল, বর্দা	

সমসাময়িক ভারতের সভ্যতা

আমরা ইতিপূর্বে, সামন্ততন্ত্রের প্রভাবে, বধ্য-এসিয়ার লোকদিগের প্রভাবে, মুসলমান-সভ্যতার প্রভাবে ভারতীয় সভ্যতার কিরূপ বিকাশ হইয়াছিল আলোচনা করিয়াছি। এইরূপে রূপান্তরিত ভারতের উপর ইংরাজেরা কিরূপে যুরোপীয় সভ্যতা স্থাপন করিলেন তাহাও পূর্বে দেখাইয়াছি। এখনে উভ্যনের চেষ্টার ফলাফল আলোচনা করা আবশ্যিক; কি পরিমাণে ভারতবাসীরা হংলও ও যুরোপের প্রভাবের বশবর্তী হইয়াছে এখনে তাহার অনুসন্ধান করা যাক। এই স্বৰ্কে প্রথমেই দুইটি কথাই উল্লেখ করিব:—

প্রথম কথা। মোটামুটি ধরিতে গেলে, এসিয়ার সভ্যতা ও যুরোপীয় সভ্যতা পৃথক নহে। অসমান পরিমাণে, উভ্যদের ক্রমবিকাশের মিল আছে; আরও এষ্ট কথা বলা হইতে পারে, এসিয়ার উন্নতি তপ্ত হইয়া যাওয়ার এসিয়ার আংশিক অবনতি ঘটিয়াছে। সুতরাং, কতকগুলি সামাজিক ব্যাপার আলোচনা করিলে দেখা যায়, উভ্যদের উভয়ের মূল-উৎপত্তির প্রভেদ নির্ণয় করা দুষ্কর। কখন কখন, বাহার বাহু আকার যুরোপীয়, আসলে তাহা এসিয়ার প্রাচীন প্রাতিষ্ঠানাদির অন্তর্ভুক্তি মাত্র। কখন কখন দেখা যায় যুরোপীয়েরা কোন এসিরিক আটন বা প্রথা বক্তৃতকার ভাবটি একটু পরিবর্তন করার উদ্যোগে যুরোপীয় হইয়া পড়িয়াছে।

দ্বিতীয় কথা। যুরোপীয় সভ্যতা হইতে, ভারত উহার একটা বিশিষ্ট রূপ অবগত হইয়াছে—সেটি আঙ্গলো-সাক্সন সভ্যতা; ভারতে, এসিরিক সভ্যতা খুবই একটা বিশিষ্ট আকার গ্রহণ করিয়াছে—সেটি ভারতীয় সভ্যতা। যেমন এসিয়া ও যুরোপের সভ্যতা—এই দুই একত্র মিলিয়া নানাবিধ পরিমাণে একই ক্রমবিকাশের পরিচয় দেয়, সেইরূপ আচার, জাতি, আবহাওয়া, ইতিহাস, এই সমস্ত—ভারতীয় ও ইংলণ্ডীয় সভ্যতাকে এমন-সকল ভাবে অশ্রবিত্ত করিয়াছে যাহাকে “স্বজাতীয়” আখ্যা দেওয়া হইতে পারে। অল্প অবস্থার পড়িলে হরত, ভারত ভারতীয় হইতে বিরত না হইয়াও, উত্তরোত্তর অধিকতর পরিমাণে যুরোপীয় ভাবাপন্ন হইতে পারে। ইংলও কর্তৃক বিজিত, ইংলও কর্তৃক হঠাৎ রূপান্তরিত ভারতের কিরূপ পরিমাণে ইংরাজি ভাবাপন্ন হইয়া পড়িবার কথা; যেমন গল্ (gaulle) রোমীয় ভাবাপন্ন হইয়াছিল, যেমন ইংলও এখনো নিজ স্বর্কের উপর নর্থন আধিপত্যের ছাপ্ বারণ করিয়া আছে। পক্ষান্তরে ভারতের জলবায়ু, জাতিবৈশিষ্ট্য প্রথা ও জাতিষ্ঠানাদি ইঙ্গ-ভারতীয়দিগের মর্মভাবটি অর-বর বদলাইয়া দিবে। বর্তমানে, ভারতের সভ্যতা ও ইংলওের সভ্যতা দ্ব্যন্তরভাবে পাশাপাশি রহিয়াছে, এখনো মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া যায় নাই। কিন্তু উভ্যদের সংমিশ্রণ আরম্ভ হইয়াছে।

এখন অনুসন্ধান করা আবশ্যিক, কেন
কেন হলে এই দুই সভ্যতার মর্মভাব
পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশ হইয়াছে।
তাহার পর দেখিতে হইবে, কিরূপে ইতাদের
মধ্যে অভিন্ন ঐক্য সংঘটিত হইতে পারে, এবং
উহা সংঘটিত হইতে কতটা সম্ভব লাগিবে
এবং উহা হইতে কিরূপ সভ্যতা প্রসূত
হইবে।

প্রথমে, সমসাময়িক ভারত-সংঘর্ষে
কতকগুলি তথ্য নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

১৯০১ অব্দের আদম-শুমারের পর,
লোকসংখ্যা ২৯৪,৩৬০,৩৪৬তে উঠিয়াছিল।
তন্মধ্যে ব্রিটিশ-ভারতের জনসংখ্যা ২৩১,৮৯৮,
৮০৭ এবং সামন্তরাষ্ট্র-সমূহের জনসংখ্যা
৬২,৪৬১,৫৪৯।

ব্রিটিশ-ভারতের লোকসংখ্যার এইরূপ
বিভাগ করা যাইতে পারে :—

মাদ্রাস	৩৮,২০৯,৪৩৬
বোম্বাই ও সিন্ধুদেশ (এডেন ইহার অন্তর্ভুক্ত)	১৮,৫৫২,৫৬১
বঙ্গলা	৭৪,৭৪৪,৮৬৬
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও অরোখা	৪৭,৬৯১,৭৮২
পঞ্জাব	২০,০৮০,৩০২
ব্রহ্মদেশ	১০,৪৮৯,৯২৪
মধ্যপ্রদেশ	৯,৮০৬,৬৪৬
আসাম	৬,১২৬,৩৪৩
বেরার	২,৭৪৪,০১৬
আজমীর মেরওয়ার	৪৭৬,৯২১
কুর্গ	১৮০,৬০৭
ব্রিটিশ বেলুচিস্তান	৩০৮,২৪৬
এডেন	৪৩,৯৭৪
আফগানিস্তান ও নিকোবর	২৪,৬৪৯

উত্তর-পশ্চিমের সীমান্ত দেশ

২,১২৫,৪৮০

এই সংখ্যাগ মধ্যে কেবল ১৬৯,৬০৭
যুবোপাধি; উহার অন্তর্ভুক্ত—দৈত্য ও রাজ-
কর্মচারী।

১৮৯১ অব্দে, সহস্রাধিক লোক ৪১
ভাষায় কথা কহিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত
ভাষাগুলির অধিকতর প্রসার :—

হিন্দোভাসী লোক	৮৫,৬৭৫,৩৭৩
বাঙ্গলা	৪১,৩৪৩,৭৬২
তেলুগু	১২,৮৮৫,১৩৭
মারাঠি	১৮,৮৯২,৮৭৪
পঞ্জাবী	১৭,৭২৪,৬১০
ভাষিল	১৫,২২২,৭৫৯
গুজরাতি	৯,৭৫১,৮৮৫
উড়িয়া	৯,০১৯,৯৭১
বর্মী	৫,৯২৬,৮৬৪

ধর্মমত-অনুসারে ভারতবাসীদিগের এইরূপ
বিভাগ, যথা :—

আদিম ধর্ম	৯,২৮০,৪৬৭
হিন্দুধর্ম	২০৭,৭০৯,৭২৭
মুসলমান-ধর্ম	৫৭,৩২১,৩৬১
খৃষ্	১,৪১৬,৬০৪
পার্সী	৮৯,৯০৪
ইহুদী	১৭,১৯৪
খ্রীষ্টান	২,২৮৪,৩৮০
অজ্ঞাত ধর্ম	৪২,৭৬৩

বাসসার-অনুসারে মোটামুটি জনসংখ্যায়

বিভাগ যথা :—

নাগরিক লোকসংখ্যা	২৭,২৫১,১৭৬
গ্রামা লোকসংখ্যা	২৫৯,৯৭২,২৫৫

এই সময়ে ৩,৬৪৫,৮৪৯ পশুপালক এবং

১৭১,৭৩৫,৩৯০ কুবক ছিল। ভূতোর সংখ্যা ছিল ১১,২২০,০৭২; রাজকর্মচারী ও মুনিসিপ্যাল কর্মচারীর সংখ্যা ছিল—৫,৬০০, ১৫৩। স্থল-বিভাগের ও নৌ-বিভাগের সৈন্য ছিল—৬৬৪,৪২২ (ইংরাজ সৈন্য উহার অর্ধভূত); বাহীরী উদার-শিক্ষিত (liberal) ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল তাহাদের সংখ্যা—৫,৬৭২,১২১। ১৮৮১ অব্দের আদম-শুমারে খণ্ডবিভাগের সংখ্যা ছিল ২,৮৮৯; উহাদের মধ্যে আবার উপবিভাগ ছিল। একই বর্ণের বিভিন্ন বিভাগ অনেক প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল—তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সংঘ ছিল না।

১৮৯১ অব্দে কোম্পানী-কাগজ ও “শেয়ার” প্রভৃতির অধিকারীর সংখ্যা—১২৩,২৯১ ৮ ১৮৯২-১৯০০ অব্দে ৪৮২,৪৮২ ‘শেয়ার’ আর ছিল ৫০০ টাকা। যাহার উপর আর-কর আদায় হইত এরূপ আয়ের পরিমাণ ৫০,৬৩০,০০০ পোণ্ড অতিক্রম করে, নাই*

নিম্নলিখিত সংখ্যাকের হিসাবও উৎস্রুত জনক;—পুরুষ-সংখ্যা (১৮৯১ অব্দ) :— ১৪৬,৭২৭,২৯৬; তন্মধ্যে ৬২,১২০,৩০০ বিবাহিত পুরুষ। (১৯০১ :—১৪৯,২৫১, ২৬০)।

স্ত্রীলোকের সংখ্যা :—১৪০,৪৯৩,১৩৫; তন্মধ্যে ৬২,৪৬৮,৯৪৬ বিবাহিত স্ত্রী। (১৯০১ :—১৪৪,৪০৯,১১৬)।

পাঁচ বৎসর বয়সের নীচে :—২০,৬০১, ৫৮০ পুরুষ; ২১,৪১০,১১৯ স্ত্রীলোক।

পাঁচ হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত :— পুরুষ ৩৭,৫৮৮,২০৫; স্ত্রী ৩২,৮৪৪,০৪৫।

২৫ হইতে ৪০ বৎসর পর্যন্ত :—৪৩, ৪৩৭, ৬৫০; ৪১, ১০২, ৪৩৬ স্ত্রী।

৪৪ হইতে ৫৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত :— ১৩, ৯৮৯, ৬৯১ পুরুষ; ১২, ৮৭৬, ৩৪১ স্ত্রী।

৬০ বৎসরের অধিক বয়স :—৬, ৭৬৯, ৪৩৩ পুরুষ; ৫,০৩২, ৪৪৮ স্ত্রী।

এই সকল গোড়ার তথ্য হইতে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, যথা :—

বহুসংখ্যক ভাষা, ধর্মমত, ও বর্ণভেদ হইতে হাঁইই সপ্রমাণ হয় যে, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক একতাসাধন করা অত্যন্ত কঠিন কার্য। মূল ভাগের নয় ভাগ লোক কৃষিকার্যে ব্যাপৃত; বহুসংখ্যক শিশুসন্তান এবং লোকের পরমায়ু স্বল্পহারী। কতকগুলি লোক ধনশালী, তন্মধ্যে অনেকগুলি প্রভূত ধনশালী; মধ্যশ্রেণীর লোক সংখ্যার খুবই কম; কেবল রাজ-কর্মচারী এবং বাহীরী “উদার” শিক্ষাপ্রিত ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন—তাহারাই যুরোপীয় সভ্যতার প্রভাবের স্বস্বত্ত্বী। কিন্তু জনসাধারণের উপর রাজকর্মচারী ও শিক্ষিত লোকদিগের এখনো তেমন প্রভাব দেখা যায় না। এইরূপে গত আদম-শুমারীর মোটামুটি পরীক্ষা হইতেই আমরা জানিতে পারি,—যুরোপীয় সভ্যতা ভারতে কতটা বাধা পাইয়াছে এবং এই বাধা অতিক্রম করিতে আরো কতকাল লাগিবে।

• •

একপে অহুসন্ধান করা বাক্য,—কিহুপে

ভারতের মুখ্য জাতিগণ ইংরাজপ্রবর্তিত অভিনব প্রণালী গ্রহণ করিয়াছে, এবং ঐ-সকল জাতি যুরোপের আচার-ব্যবহার ও শিল্প আদ্যসাৎ করিতে কতটা পটুতা দেখাইয়াছে।

বাঙ্গালী।—দৌর্জগন্জনক আব-
হাওয়ার মধ্যে, এবং অতীব সমৃদ্ধিশালী
ভূমির উপর ৭০ লক্ষ মহাব্যার বাস (১°)।
বাঙ্গালী মিশ্রজাতি, ক্রান্ত বা কৃত্তবর্ণ, অর্ধ
আর্য্য হিন্দুর, অর্ধ মোগলীয় হিন্দুর।
নব্য-প্রকৃতি, বুদ্ধিমান, প্রবল স্বাতিশক্তিবিশিষ্ট,
নুতন জিনিষ আদ্যসাৎ করিবার প্রবৃত্ত
শক্তি-সমবিত্ত, দোহা-প্রকৃতি ও ভোবামোদের
বশীভূত; বাঙ্গালীর মরণভীরু অভাব,
সাহসের অভাব ও নছোড়বন্দা-দৃঢ়তার
অভাব। উচ্চাঙ্গের মধ্যে হাজার হাজার
জাত। অল্পের শিকারী ও নোকার
মানি হইতে আরম্ভ করিয়া বিচারক ও
কলিকাতার খবরের কাগজ-ওঠালি পর্য্যন্ত
সকল ব্যবসায়ই উচ্চাঙ্গের মধ্যে আছে।

ধনীদিগের মধ্যে, দরিদ্রদিগের মধ্যে,
কতকগুলি শোক যুরোপীয় সভ্যতার ধরণে
গঠিত; ইংরাজেরা এই সভ্যতা বেড় লত
বৎসর বাবৎ বাঙ্গালীর উপর চাপাইয়াছে।
শিক্ষিত বাঙ্গালীর সহকারী রাজকর্ম
পাইবার জন্য ও “উন্নয়ন” ব্যবসায়গুলি
অবলম্বনের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। উচ্চাঙ্গের
মধ্যে দোকানদার আছে, মহাজনী কুঠীওয়াল
আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি শোক খুব ধনী।
জমিদারদিগের বহুবিস্তৃত ভূসম্পত্তি; ঐ

ভূমি কৃষিপ্রণালী কর্তৃক কণ্ঠিত হইয়া থাকে।
মুসাব্বর ও লাঠিতা বেশ প্রবলপুষ্টি। সকল
রকমের গোবাক :—বাবুর গোবাক যুরোপীয়
ধরণের; শিক্ষিত লোকের ও শিক্ষার্থীর
চাপকান ও হস্তে চোগা; দোকানদারের
সাদা পরিচ্ছদ, ইত্যৎ-সাধারণ প্রায় সর্ব
বিশিষ্টই হয়। উচ্চবর্ণের রমণীরা ঘোমটা
না দিয়া বাহির হয় না। ইত্যৎ-সাধারণ
রমণীরা শুধু একখানি শাড়ী পরিয়া থাকে।
পূর্ববঙ্গে এক কুতোরানে ও নীচ জাতের
সকলেই মুসলমান। প্রধান ভাষা—
বাংলা।

অশোখা ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল। এখান-
কার আবহাওয়া বঙ্গদেশ অপেক্ষা প্রাচ্য-
জনক, ভূমি ততটা সমৃদ্ধ নহে, ততটা
আর্দ্র নহে। গানের উপত্যকার “নগর
গুলি :—আগ্রা, কানপুর, লক্ষৌ, আলাহাবাদ,
বেনারস। জাতি প্রায় অমিশ্র :—হিন্দুহানী
ভ্রামর্য, ক্ষুদ্র ডিঙ্কার মুখ, লম্বা,
পাতলা, প্রাচ্যই শীর্ষ, খুব গর্জিত (বিশেষতঃ
উচ্চবর্ণদিগের মধ্যে)। ইহারাই পূর্বকার
ঘোড়-জাতি; ইহারাই ইংলণ্ডের হইয়া
ভারত জয় করিয়াছে; খুব গোড়া ব্রহ্মনিষ্ঠ,
(বিশেষতঃ বেনারস অঞ্চলের লোক), কিন্তু
বাঙ্গালীর দ্রাঘ, উচ্চাঙ্গের মধ্যে সেক্ষণ জঘন্য
কুলস্থান নাই। উচ্চাঙ্গ অত্যন্ত গোবর্ষের
স্বতি রক্ষা করিয়া থাকে; কেন না, গানের
উপত্যকাই দেই প্রকৃত ভারতভূমি, যেখানে
প্রাচীন সভ্যতা ও মধ্যযুগের সভ্যতা গুড়িয়া
উঠিয়াছিল :—তাই, হিন্দুহানীর আক্ষেপ-

(১) আসলে, বাহারি বাঙ্গালী বলে তাহাদের সংখ্যা ৩১ লক্ষ মাত্র। অল্প ত্রিশলক্ষ লোক বিভিন্ন
জাতির অঙ্কভুক্ত।

সহকারে যুবোপীথ সংস্থাপন ও রীতিনীতি গ্রহণ করিয়া থাকে। উহার প্রধান কার্য কল্যাণ বা “উদার” ব্যাপসাদাসির জন্ম বড় একটা চেষ্টা করে না। উহাদের মধ্যে শিকার প্রসার ঘীরে ঘীরে চলেছে। উহাদের মধ্যে দোকানদার ও বড় ভূমিদার তেমন দেখা নাট। সু. অধন্যসী কৃষিকারী; নগরের মধ্যে, ছোট ছোট বেনিয়া ও কতকগুলি নিপুণ কারিগর আছে। পৌরীক বিত্তে ধরণের। শতকরা ১০ জন মুসলমান। উহাদের মধ্যে হিন্দীর বিভিন্ন “ভাষা” বা উপভাষা প্রচলিত।

পঞ্জাবে ভারতের সকল জাতি ও মধ্য এশিয়ার লোক দেখিতে পড়িয়া যায় :— পাঠান বা ভারত প্রবাসী আকগনে, হিন্দুস্থানী, আট- (শুক্রাজী), রাজপুত, গুজরাতি, পারস্তদেশীয়, তুর্ক, মোঘল। কোখাত, অর্জুন ও মুণ্ডিতমস্তক হিন্দু, কোখাত ও পশমী চোগা ও দীর্ঘ পরিচ্ছদপরিহিত শাশ্বতী মুসলমান; সামান্ত-প্রদেশের লোকেরা স্বকীয় অস্ত্র-শস্ত্র রক্ষা করিয়াছে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি হিন্দুর ছাঁচের লোক দেখিতে পাওয়া যায় (বিশেষতঃ শিবদের মধ্যে);—উদারাই পূর্বে কালের বোদ্ধ জাতি; এখনো উহারা সৈন্তমণ্ডলোতে অনেক সৈনিক যোগাইয়া থাকে; মোহাট্টা কড়া, আন্তিভাতামূলক কুসংস্কারে পরিপূর্ণ :— রাজপুত ও বেনিয়াদিগের মধ্যে একটা বিধবাবিবার ঘটনেষ্ট সেই পরিবারের জন্ম হয়। অধিকাংশ লোক কৃষকী; তথাপি অনেকে বাণিজ্য-ব্যবসারে নিযুক্ত হয়। দরিদ্র কৃষকেরা কুসামজীবীর কবলে

পতিত। ইতরসাধারণ—অনক্ষর। অধিকাংশ লোকই মুসলমান। পশ্চিম ভাগে হিন্দু কম। ভাষা পঞ্জাবী;—হিন্দীর একটা উপভাষা।

সিন্ধুদেশ।—বেলুচী-প্রধানবিগের অধীনে কতকগুলি কৃষক ও পশুপালকের বাস। এই বেলুচীর গোড়া মুসলমান—সামন্ত-স্তরের রীতিনীতি-সম্বিত বোদ্ধ পুরুষ; কৃষকেরা শাস্ত্রশ্রুতি, সকল বিষয়ে উদাসীন ও অনক্ষর। কিন্তু যে-অবধি অমূল্য মজুতি ও জলাভূমিসমূহ জলসেচন-প্রণালীর দ্বারা রূপান্তরিত হইয়াছে, সেই অবধি উহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

রাজপুতনা।—কতকগুলি সামন্ত-তান্ত্রিক রাষ্ট্র। রাজারা রাম ও কৃষ্ণের বংশধর এইরূপ ভাষাদিগের অভিমান। রাজপুতরা দীর্ঘকায়, ছিপছিপে, সুসজ্জিত চকড়া, রং কতকটা কলা, নাসা শুকচকুৎস, চোখ প্রামদ্য; উহাদের মধ্যে অনেক গাণপাটী রাখে, কাহারও-বা উহা মাথার চুলের সহিত বাঁধা থাকে; একপ্রকার পরিচ্ছদ, বাহা কতকটা হিন্দুধরণের, কতকটা মুসলমান ধরনের এবং কতকটা যুবোপীথ ধরণের। উহারা উত্তম সৈনিক, উত্তম বোড়-সোয়ার, হিন্দুর অস্ত্রশস্ত্রের অগ্রগণ্য, রাসবে পরিণত জনসমূহকে উহারা অবজ্ঞা করে। যাহারা বেশী বুদ্ধিমান তাহারা বাণিজ্য-ব্যবসারে নিযুক্ত হয়। গোড়া হিন্দু। মুসলমান খুবই কম। উহাদের ভাষা গুজরাটী অথবা হিন্দীর কোন উপভাষা।

যেখানে ভাল ভাল বন্দর আছে সেই

শুভ্রাটে, সকল জাতিরই বংশধরেরা বিশেষতঃ শুভ্রাটীরা বাস করে। শুভ্রাটীরা হুন-প্রকৃতি, কার্যদক্ষ, বাণিজ্য-বাণীর তাহাদের স্বাভাবিক পটুতা আছে। ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত রাজধানী—বোম্বাই। শুভ্রাটের উর্ধ্বর ক্ষেত্র বহু-সংখ্যক কৃষকে পোষণ করে। পরিচ্ছদে বহুল বৈচিত্র্য। চাষাণ শুধু সাধা ধূতি পরে, এবং বেনিয়ারা দীর্ঘ পরিচ্ছদ ও তাঁলবিশিষ্ট পাগড়ি ব্যবহার করে। অধিকাংশ লোকই হিন্দু। ১২ ভাগের এক ভাগ মুসলমান। কতকগুলি বিশেষ-ছাঁচের লোক আছে যথা, মারোয়াড়ী—মারোয়ারের মৌলিক কুশীদজীবী। (মারওয়ার রাজ-পুতানার অন্তর্ভুক্ত একটি রাষ্ট্র)। তার পর ওরাকীল,—বামূল-মোকদ্দা চালাইবার লোক—ইহার চাষা ও বেনিয়ারিগের অর্থ পোষণ করে।

৮০ হাজার পার্শী। ইহার জোরোস্ত্র-টার সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের বংশধর। মুসলমান কর্তৃক ভাঙিত হইয়া উহার প্রথমে অমরেন্দ্র দীপে পরে সুরাটে বাস স্থাপন করে। উহাদের অধিকাংশই একগে (১০ হাজারের মধ্যে ৬০ হাজার) বোম্বাইয়ে। ধনীদিগের ঘুরোপীর পরিচ্ছদ। উহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও প্রভূত ধন সম্পত্তি যথা, মৃত সন্ন্যাসেরাজি জিহ্মিভাই—যিনি সার্বজনিক কাজে কত লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। কি প্রমশির, কি খেজ, কি তুলার কল, কি বাণিজ্যের কুঠী, কি জাহাজসংক্রান্ত কোম্পানী—এই সমস্ত কাজের ঈর্ষ্যহানে উহার। সাধারণ

লোকেরা পরিশ্রমী, স্বল্পকচি, ছোট ছোট ব্যবসারে নিযুক্ত, অন্তর্গত সামান্যতির জাতি, ধর্মসংক্রান্ত কুপংক্রান্তিতে উহাদের দৃঢ় আসক্তি। পুরুষদিগের এক প্রকার ধুচনী টুপি ও কাশোঁ টিলা কোর্তা। স্বতঃ-নির্কাসিত হইয়া উহার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, বেলুচিস্তানে, ব্রহ্মে, চীনে বাণিজ্যব্যবসায় ও কুশীদবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। এডেন-উপনিবেশে এখন-কি লগুনেও উহাদের বাণিজ্য-কুঠী আছে। পার্শী-সমাজ একটি শকাব্দভেদের দ্বারা শাসিত হইয়া থাকে। উহার ২০ জন সদস্য। উহার মধ্যে পুরোহিত-সম্প্রদায়ের ও গৃহস্থ লোকের প্রতিনিধি আছে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট এই সভার নিষ্পত্তি মন্থর করেন না। কাজেই উহার প্রভুত্ব ক্রীণ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, পার্শী সকলেই শুভ্রাটি ভাষা ব্যবহার করে।

যে পার্শ্বতা প্রদেশ অহরহর দেই। দাঙ্গিয়াভোর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কুশীদজীবী মারাঠাদের বাস। ভারতের উত্তরাংশের লোকেরা এই মারাঠাদের উচ্চবর্ণকেও বড় একটা ভ্রম করে না। উহাদের দৈনিক উচ্চতা মাঝামাঝি, খুব ভ্রামবর্ণ, আগলে আব্রিডারিগের জার চওড়া-মাথা ছাঁচের হইলেও হিন্দুদের সহিত যৌন-মিলনের ফলে উহা কতকটা সংশোধিত হইয়া গিয়াছে। উহার মাড়ী রাখে। যদিও এখনও গর্জিত ও লড়াকা-মেজাজ, তথাপি ঘুরোপীর সভ্যতার প্রভাবে উহার এখন বাণিজ্য-ব্যবসায় ও কুশীদ কর্যে নিযুক্ত। কেবল মধ্যভারতের মারাঠা-রাজ্যে যে রাজবংশ

আছে ও রাজকর্মচারীদের যে পরিবারগণ
আছে তাহারা আবৎ মরাঠা। লোক-
সাধারণ—হিন্দু, খ্রিষ্টিয় ও অশিক্ষিত
অসভ্য লোক। কিন্তু তাহাদের ভাষা ও
নীতিনীতি বহুভাষিগণেরই ভাষা ও নীতি
নীতি।

মধ্যভারতে আর মুসলমান; নিজামের
সাক্ষানি হৈত্যাগে বিস্তর মুসলমান।
হৈত্যাগে, বহির্দেশ হইতে আগত আরব,
পারসিক, এমনকি কাকি পর্যন্ত দেখিতে
পাওয়া যায়। সমস্ত মধ্যদেশে মরাঠা
ভাষা প্রচলিত।

দক্ষিণে, জাতিসমূহের মধ্যে অশ্রুতপূর্ব
সংশ্লিষ্ট। আদিমনিবাসী, উত্তর হইতে সমাগত
বিদেশীগণ, সমুদ্রপথে আগত প্রবাসীগণ
গণ। অধাপি খ্রিষ্টিয় ছাড়াই অধাপ্ত
লক্ষিত হয়। উপকূলগুলি, বিশেষত মাল-
বারের উপকূল-ভূমি উর্বরা। আভ্যন্তরিক
দেশটি নরম অশ্রুত। অধিবাসীগণ নয়-
প্রায়, স্বর্গিক ও কদাকার।

বিশেষরূপে কেবল দুই জাতির উন্নতি
পরিচয়িত হয়;—তেলুগু ও তামিল। ভারত-
উপদ্বীপে বা দাক্ষিণাত্যে তামিল সর্বাঙ্গ
প্রবল জাতি:—কুর্কি, কুর্কি, চণ্ডা-
মাথা, নোটা-টোটা, অল-অলে চোখ।
মচোড়ক ও একত্রে। অসভ্য চাষ।
ইহারা দেহপূর্ণক আত্মনির্ভরিত হয়।
সিংহলে উহাদের সংখ্যা ছয় লক্ষ; উহারা
নিম্ন ব্রহ্মদেশে, ক্রম ও মারিচ বীণে এবং
আঙল দ্বীপপুঞ্জ ও প্রবাস-স্থাপন করে।
অষ্ট্রেলিয়া ভারতবাসীর অষ্ট্রেলিয়ার
উপনিবেশ-বাসী রহিত করিয়াছে। কুশীরা

যেখানেই গঙ্গা স্থাপন করে, সেখানেই সঙ্গে
সঙ্গে আর লটকা খালে।

একটু প্রাক্কালে হৈত্যাগ হইতে
সভ্যতা প্রাপ্ত চণ্ডার, বঙ্গদেশের ভার
মাজাজেও শিক্ষার উন্নতি হইয়াছে। সমস্ত
সাম্রাজ্য, মন্দির-প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীরা সাতায়ে
একত্র সমবেত হইয়া তর্কবিতর্ক করে।
এইরূপ দৃষ্ট তাহাদের তত্ত্বার্থ মতেও দৃষ্ট হয়।
যুবকের মল, নয়ক, সাদা-জামা, সাদা
চব্ব-কাঁধে-ফেলা। স্বর্গের শেষ-রক্ষি, উচ্চ
“নিমান”কে (মনিবের চুড়া) জনকরচিত
কবিতা খোলাই-করা মস্তকের পাতার উপর
খেলা করে; শুভ্র, কুটিল, ও মঠের প্রাচীর
এবং শিক্ষার্থীদের উত্তরী, ছায়া আলোকে
অন্ধিত হইয়া উঠে। শুভ্র বহিঃপ্রাচীরের
উপর পাড়াইরা, বসিয়া, শিক্ষার্থীরা উচ্চকণ্ঠে
রাষ্ট্রনীতি, সম্বন্ধে, দর্শন সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে
তর্কবিতর্ক করে। যদি কোন যুরোপীয়
ভ্রমণকারী মঠ দেখিতে যায় অমনি ছাত্রেরা
তাকে আক্রমণ করে! বিশ্বব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে,
আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে, শিব ও বিষ্ণু
স্বভাব সম্বন্ধে তাহার মতামত জানিতে
চাে। বিশেষত মানবজাতির উন্নতি সম্বন্ধে
তাহার কি মত তাহারা তাহাকে বিজ্ঞাসা
করে। স্বর্গের পৌরাণিক ধর্মমতের শিক্ষার
বর্জিত চণ্ডার, বিশ্বমানবের অধঃপতন
হইয়াছে—এই সংস্কারটা এই প্রাচ্য দেশীয়
ছাত্রদিগের মন হইতে কিছুতেই অপনীত
হয় না। স্বর্গ অস্ত হইল, একটা গরম
দম্কা বাতাস আসিয়া নিশিড় ধূলা উড়াইয়া
দিল; আকাশে কাকেরা, বৃকশাখার টিরা-
পাখীরা খুব চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল।

ছাত্তেরা তখনও 'তর্ক' করিতেছে; কিন্তু যুরোপীয় জনগণেরা ১৩শ শতাব্দীতে লাগিলেন :—তৎপরে এই জাতির কিশা হইবে? যে জাতির লোকেরা একশ কঠিন গ্রন্থ লিখিয়া এক আবেগ ভরে সমাধানের চেষ্টা করিতেছে—এই সামান্য স্থপতির জাতি, এত প্রকৃত মাহুকের জাতি—যাহারা যুরোপীয় মধ্যযুগের মত' এই সব প্রকৃতির আগ্রহের আশোচন্য এক আগ্রহ ও উৎসাহ দেখাইতেছে, না-জানি তাহারা অচলু দিন আসিলে এই আগ্রহ ও উৎসাহ, জীবন-সংগ্রামে ও জীবনের কাজে কিরূপ প্রয়োগ করিবে।

উর্ধ্ব প্রকৃতিতে স্থিতিশীল অরণ্য; এই অরণ্যকূমি ইরানী ও তাহার শাখা-নদী তলির দ্বারা পরিসিদ্ধ। * বর্ষাজাতির জন্ম প্রকৃতি ও অরণ্য বৃদ্ধি, উহার। বৈজ্ঞানিক যুরোপীয় সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ-চিত্তাশ্রিত, অলস। রমণীয়া খুব উদার প্রকৃতি, মনোমোহিনী, নিপুণা, প্রভাবমিতা, কাজকরে স্বদক্ষ। সকলেই বোধ, কেবল প্রবাসী ভারতবাসীরা হিন্দুধর্মাবলম্বী (২৮৪,৮৮) ও মুসলমান ধর্মাবলম্বী (৩৩২,৪৩)। * পর্মীণা তাহার লোক আদর্শ প্রেমের মধ্যেই একটু সৌন্দর্য্যময় চাশিয়া দেয়। ছোট ছোট পাহাড়ের চূড়ার উপর বর্ণাচ্ছাদিত মন্দির; বিশাল প্রান্তরের মধ্যে খোদাই কাজ-করা মঠগৃহ, তাহার চারিদিক তক্ষা দিয়া রক্ষ; মণ্ডপের তিনটি পিরামিড-আকারের চূড়া, —ক্রমে সূচ্যে হইয়া উঠিয়াছে; মণ্ডপের ছাদ মণ্ডপের গা হইতে কুঁকিয়া বাহির হইয়া

আসিয়াছে। সর্বত্র প্রতিমা, প্রাচীন-পাথ্রে অম-উত্তোলিত ভাস্করকলা দেবদেবীর মূর্তি, মাগ-মূর্তি, কড়া ও কপাল গহনা, রংকরা অথবা সোনাগা বা রূপালী পাত, মোড়া। একটা দীর্ঘ সোপান দিয়া মন্দিরে উপনীত হওয়া যায়; সোপানের ধারে ধারে কাঠের দোকান ও খুব উজ্জ্বল রঙের বিকট মূর্তিসমূহ। দিবসের সকল সময়ে, বিশেষতঃ সাগরে বন্দীরা মন্দিরে গমন করে; উহাই—গাণাংগ মিলনের স্থান।

দেবালয়—ছত্রতলে, পুষ্পাশির মধ্যে, অগা বৃক্ষপ্রতিমা;—কোনটা পোয়া, কোনটা পিড়ান, কোনটা উল্লংগ-বন। হাজার হাজার মোমবাতি—বাতার আলো ধূপের ঘোঁরা মিশিয়া গিয়াছে। দারপেয়ে মাগ কামানো, হলুদ ধূতি চাদের-পরা নোভিস্ গল। চারিদিকেই আনন্দোৎসব জনতা। পুরুষদের চওড়া ধূতি, গালা নাক; উহার। পীতবর্ণ, উদারের রঙ্গিন পাগড়ী, * সাদা চিলা-আস্তিন্ কামা, কোমরে ঝড়ান পাটের জা ধূতি, জুতা ও পা অনাবৃত। শিশুরা নয়প্রায়, উদারের উরু ও পাছার ডাক। রমণীদের দেহের উজ্জ্বল মাকামাকি; উহার। পাতলা, হিপছিপে, মনোমোহিনী। চিকণ-দেওয়া উ'চু-বাধা চুন পুষ্পভূষিত। উদারের খোলা কপাল, ডিবাংকার মুখ, পাতলা নাক; ছাড়া-ছাড়া জু, টানা ও বাঁচা চোখ, মধুর ও চকুর দৃষ্টি; ওঠে মতো-বিলম্বী, মেঝালো ধূতি। পরিচ্ছদ :— "পামেটন"—এক রকম পাটের দোষ দোষী পাড়ী; তাহার সঙ্গে সেলাই-করা একটা

মার্কসী এবং একটা সাদা টিলা চওড়া-আস্তিন্
আঁরা। একটা ওরুনা। পুরুষ ও রমণী
উভয়েই রেসমী কাপড় পরে। বয়স
অনুসারে কাপড়ের রং :—যুবকদের অস্ত
লাল, শ্রোতাদের অস্ত বেগুনী, বৃদ্ধদের
অস্ত সবুজ। ঊরনার রং উজ্জ্বল কিন্তু
অকৃত্রিম নহে :—নারাঙ্গি, গোলাপী, নীল-
সবুজ। এবং সূর্য ঐ সকল বিচিত্র বর্ণের
প্রতিবিম্ব উহাদের পীতবর্ণের উপর নিঃক্ষেপ
করার উদ্যোগকে যেন আরো সজীব
করিয়া তুলে, উহাদের চোখ যেন আরো
উজ্জ্বল হটরা উঠে।

এইরূপে বিবিধ জাতি-সম্বন্ধিত এই
বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে, বিভিন্ন প্রদেশের,
বিভিন্ন শোক, যুরোপ হইতে প্রাপ্ত শিল্প
ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজ নিজ ভাবের
অনুরূপ ও প্রয়োজনের অনুরূপ রূপান্তরিত
করিয়াছে। এই প্রকারেই উহার পূর্বে

মধ্য-এসিয়ার, পারস্যের ও আরবের শিল্প ও
প্রতিষ্ঠানাদিকে রূপান্তরিত করিয়াছিল।
অতএব, সমসাময়িক ভারতের অবস্থা বর্ণনা
করিতে হইলে, প্রথমে নিরূপণ করা
আবশ্যিক—কোন্ কোন্ জিনিস সমস্ত
ভারতের নিজস্ব এবং কোন্ কোন্ জিনিস
বিক্ষেপ-বিশেষ প্রদেশের নিজস্ব; সর্বপ্রায়ে
অনুসন্ধান করিতে হইবে, কোন্ কোন্
জাতি এই নব সভ্যতার উপর নিজ নিজ
ছাপ অঙ্কিত করিয়াছে। একটা সাধারণ
ভাব হইতেও এই সমস্তের আলোচনা
করা বাইতে পারে। মোটামুটি বলিতে
গেলে—সমস্ত ভারত সমাজে, একটা গোল-
যোগ, অনিশ্চিততা, চেষ্টা-প্রবৃত্তি, এবং যুরোপীয়
প্রবণতা ও *এসিয়ারিক প্রবণতার মধ্যে
যুগ্মযুক্তি; সেই সঙ্গে, বিরুদ্ধ প্রবণতাসমূহের
মধ্যে উত্তরোত্তর আপোষ ও মিলন
সংস্থাপন—ইহাই সাধারণতঃ পরিচালিত হয়।

ঐক্যোত্তিরিচ্ছনাথ ঠাকুর।

বিজ্ঞান-সম্মিলন

গত বৎসর জাহুরারী মাসে ‘সাইন্স
কংগ্রেস’ বা বিজ্ঞান-সম্মিলনের দ্বিতীয়
অধিবেশন হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে
সম্মিলনের অধিবেশনে যোগদান করিবার
অস্ত গভর্নেন্ট কর্তৃক আমি প্রেরিত
হইয়াছিলাম। এতদ্ব্যপেক্ষে গভর্নেন্ট সেক্রেটারি
ডাক্তার পি, সি, রায় ও ডাক্তার ডি, এন্,
মল্লিক মহাশয়কেও প্রেরণ করিয়াছিলেন।

‘সাইন্স কংগ্রেস’ বা বিজ্ঞান-সম্মিলন
যাপারটী যে কি, তাহা জানিবার অস্ত হয় ত
অনেকের আগ্রহ হইবে। বিলাতে British
Association for the Advancement
of Science নামক একটি বিজ্ঞান-পরিষৎ
আছে। এই পরিষৎ বিলাতের সকল
প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক কর্তৃক পরিচালিত
হইয়া থাকে। বৎসর বৎসর গ্রেট ব্রিটেন

ও অঞ্চল ও এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে এই পরিষদের অধিবেশন হয়। পরিষদের নানা শাখা আছে—যথা, রসায়ন-শাখা, জীববিজ্ঞান-শাখা, প্রাণিবিজ্ঞান-শাখা ইত্যাদি। প্রত্যেক শাখায় একজন করিয়া লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সভাপতিরূপে নির্বাচিত হন। এখনকার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন এই ‘ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের’র আদর্শেই গঠিত হইয়াছে। এই সকল শাখার অধিবেশনে কেবল মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধই পঠিত ও আলোচিত হইয়া থাকে। কলে এই পরিষৎ বৎসর বৎসর বৈজ্ঞানিকগণের পরস্পর মিলনের ও ভাবিনিময়ের সুযোগ করিয়া দেন। সপ্তসপ্ত, যে-স্থানে পরিষদের অধিবেশন হয়, সেখানকার সবী বৈজ্ঞানিক-গণ সম্মিলিত লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পান এবং তাঁহাদের গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলির আলোচনার যোগদান করিয়া বিশেষরূপে শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই ‘ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের’র অধিবেশন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে হইয়া থাকে। গত বৎসর অষ্ট্রেলিয়ার অধিবেশন হয়। সেই সময় ইউরোপে মহাসমর উপস্থিত হইয়াছিল এবং ‘এম্ডেন’ নামক কণ্ট্রান রণতরী ভারত-মহাসাগরে ব্রিটিশ বাণিজ্যতরীগুলিকে জবাইয়া চারিদিকে মহাভয়ের সঞ্চার করিতেছিল। অধিবেশন শেষ হইলে বর্ধন বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলী অংশে ফিরিতেছিলেন তখন তাঁহাদের কাহাজের খালাসীরা ভারত-উপকূলে আসিয়া বর্ধনট করিয়া পলায়ন করে। তাহার কলে স্থর

অলিভার লজ গ্রুপ বিবিসিফ্রড বৈজ্ঞানিকগণ দরফে কাঁটা ও জাশ দিয়া কাহাজের ডেক ও ক্যানিন প্রভৃতি পরিষ্কার করিয়াছিলেন। সকলে বেশে ফিরিলেন—বুক না ঘেঁষিলে অনেককেই ভারতে আসিতে হইবে এবং আমরা তাঁহাদের সাহচর্যে ধস্ত হইতাম। কেবল সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক, Armstrong সাহেব কলিকাতার আসিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভারত-বর্ষে ‘ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের’র অধিবেশনের প্রস্তাব দুই-একবার হইয়াছিল বটে; কিন্তু আজ পর্যন্ত অধিবেশনের সুবিধা হইয়া উঠে নাই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে যে সকল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গবেষণা বা শিক্ষাদানে নিযুক্ত অছেন, তাঁহাদের পরস্পরে মিলন ও ভাবিনিময়ের কোনও সুবিধা নাই দেখিলে সাম্রাজ্য প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডাক্তার সাইমনসেন ও লক্ষ্য ক্যানিং কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক মিষ্টার ম্যাকমোহন ভারতীয় সংবাদ-পত্রসমূহে একখানি চিঠি ছাপিয়া Indian Science Congress-এর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। কলিকাতার ‘বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটি’ এই প্রস্তাব সাংঘে অমুমোদন করিতে গতবৎসর কলিকাতার কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে মাননীয় ত্রিযুক্ত স্ত্রীর আভতোব মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিরূপে নির্বাচিত হন এবং বঙ্গের মাননীয় গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল পেট্রনরূপে কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন। সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল তিনদিন এবং সভাকক্ষে অনেকগুলি প্রবন্ধ

পঠিত চট্টগ্রাম ছিল। সন্ধ্যার একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, ঘাটতে সন্ধ্যার প্রতিনিধিগণের মধ্যে ভাষারূপে ঘোষারূপে হইত। পাবে মেইলগ প্রতিনিধি সাক্ষাৎ সন্ধ্যার পাবক চট্টগ্রাম। এট সকল সাধাসন্ধ্যার লক্ষ্য কারণইকল বাহ্যিক ও ঐ যোগদান করিয়াছিলেন।

মাত্রাজে গত জাহাজের নামে বিজ্ঞান সন্ধ্যারের বিজ্ঞান অধিবেশন চট্টগ্রাম। এই বিলাস-পরবর্ণের সন্ধ্যার ও আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য সন্ধ্যারের মধ্যে তফাৎ এই যে, বাহ্যিক বিজ্ঞান সন্ধ্যার আহ্বান করেন তাহাদিগকে প্রতিনিধিগণের "ভরণ-পোষণের" জন্য সচর্য সচর্য মুদ্রা ব্যয় করিতে হয় না; প্রতিনিধিগণকে কংগ্রেসের "অন্ত পণ্ডে টাকা" করিয়া টাকা দিতে হয়, তাহা চট্টগ্রামেই কংগ্রেসের ব্যয় নির্বাহিত হইয়া থাকে। তাহার উপর প্রতিনিধিগণ বাতায়নের ব্যয় নিজেরাই বহন করেন, এবং থাকিবার ও আশ্রয়াদির বন্দোবস্তও নিজেরেরই করিয়া লইতে হয়। কংগ্রেসের "অন্ত বিজ্ঞান" পটমণ্ডলেরও "প্রয়োজন" হয় না।

"কীর্ত্তাং কৃত্তাং" এর কোনও ব্যবস্থা না থাকিতে এখানে বাজে লোকের স্তিও গোলমাল হয় না। সেইজন্য যে-কোনও সাধারণ গৃহস্থ কংগ্রেসের অধিবেশনের পক্ষে যথেষ্ট। প্রথম অধিবেশন চট্টগ্রাম— 'বেঙ্গল এসিগাটিক সোসাইটি'র সভাগৃহে। মাত্রাজে অধিবেশন চট্টগ্রাম মাত্রাজ 'এসিডেন্সি কলেজ'র বিভিন্ন ক্লাসের ঘরে। এক-একটি ঘরে এক-একটি শাখার

অধিবেশন ক্লাসে যেখানে অধ্যাপক-মহাশয় সভাপতি মহাশয় সেই আসন গ্রহণ করিলেন; এবং প্রতিনিধিগণ ছাত্রদের বেকের উপর স্থানীয় চট্টগ্রাম। প্রতিনিধিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকাদেই কংগ্রেসের সমস্ত খরচ মার সাধ্য-সন্ধ্যারের ব্যয় পর্য্যন্ত নির্বাহিত হইয়াও কিছু উপরি থাকে। আব আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য সন্ধ্যারের প্রত্যেক অধিবেশনের জন্য সচর্য সচর্য মুদ্রাও ব্যয়-সম্মুখীন হয় না। জনিলাম পক্ষমানের সন্ধ্যারের "অন্ত" অনেক টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। এই ব্যয়ের অহুপাতে ঘট্টাই সাহিত্যের আলোচনা হইয়াছিল, সেটুকু পর্য্যাপ্ত কি না ভোর করিয়া বলা বড়ই শক্ত। জনিলাম বর্ধমানের "প্রতিনিধি" সংখ্যা প্রায় চাই সচর্য হইয়াছিল অথচ বিজ্ঞান দিনের শাখাসমূহের অধিবেশনকালে প্রত্যেক শাখার পাঠ-সাত-সপ্তমের বেশী লোক দেখা যায় না। এক্ষেত্রে বলিতে হয় আসল কাজের জন্য নয়, কেবল আবেদ-প্রমোদ ও ভাষা দেখিবার জন্য অর্থ-সমনাকৃষ্ণের জন্যই এই চাই সচর্য প্রতিনিধি বর্ধমানে সন্ধ্যারিত চট্টগ্রাম! সাহিত্য-সন্ধ্যার এখন যে-স্তরে পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে বিশেষজ্ঞ ভিন্ন অপরে দেখান প্রকৃত হদের আসান পাটবেন না। এক্ষেত্রে খাওয়ার দাওয়ার ব্যাপারটো কিছু কমাটো বাহাতে বিনা আড়ম্বরে প্রকৃত কার্যের ব্যবস্থা হয় সন্ধ্যার কি তাহাট করিবেন না।

আমি একটা কথা বলা দরকার। এই বিজ্ঞান-সন্ধ্যারের প্রতিনিধিগণের মধ্যে

অধিকাংশই সাহেব। মাস্তাজ কংগ্রেসে স্থানীয় দর্শক ও প্রতিনিধি এবং আখরা কলেজের বাঙ্গালী ভিন্ন অধিকাংশ প্রতিনিধিই সাহেব ছিলেন। তাঁহার হুইট কারপ্স আছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমত, পদার্থবিজ্ঞান (Physics) ও রসায়ন শাস্ত্র (Chemistry), বিশেষত দ্বিতীয়টিতে, গবেষণা করিবার প্রযুক্তি বাঙ্গালী দেশে যত এতল পরিমাণে, জাগিয়াছে, ভারতের অগ্রজ, এখনও সেরূপ জাগে নাট। সেইজন্য বিজ্ঞান-সম্মিলনে অল্প গবেষণামীর অপেক্ষা বাঙ্গালীর সমাগনট বোধী হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্র ভিন্ন বিজ্ঞানের অল্প-অল্প বিভাগে, যে-সকল বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের অধিকাংশই সাহেব। আখরার কলেজসমূহে এখনও পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রই পড়ান হয়, কিন্তু তাহা ভিন্ন ভারত-সরকারের অধীনে চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান (Geology), প্রাণিবিজ্ঞান (Zoology), উদ্ভিদবিজ্ঞান (Botany) প্রভৃতি বিজ্ঞানেব বিভিন্ন বিভাগে বহু বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত থাকিলেও তাঁহাদেরও মধ্যে অধিকাংশই সাহেব। সেইজন্য এই সকল বিভাগে যাহারা গবেষণা করেন, তাঁহাদের মধ্যে ভারতবাসীর সংখ্যা কম হইবারই কথা। পৃষ্ঠান্ত্র বন্ধন দেখুন, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের 'মেডিক্যাল কলেজ' সমূহের অধ্যাপকেরা প্রায় সকলেই সাহেব, এবং বাঙ্গালী ডাক্তারদের মধ্যে যাহারা 'মেডিকেল কলেজে' কাজ করেন, তাঁহারা অনেককেই Demonstrator প্রভৃতি নিম্নতম পদে

অধিষ্ঠিত। তাহার ফলে চট চটগাছে যে, বাঙ্গালীদের মধ্যে সবকানী র বেসরকারী অনেক বড় বড় ডাক্তার আছেন—'বড় ডাক্তার' মানে যাহারা অনেক অর্থ উপার্জন করিয়া থাকেন—বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে গবেষণায় ডাক্তার রাত, ডাক্তার তাঁর লগুনার্ভ নোলাস' প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের মত একজন লোকও নাট। মেডিকেল কলেজে কাজ করিবার কতকটা সুবিধা পাঠ্যছেন বলিয়াও বন্ধুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় Bacteriology সম্বন্ধে কিছু-কিছু গবেষণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সেইজন্য, ভারতের উদ্ভিদ-সমূহের তথ্যসংগ্রহ করিবার জন্য কলিকাতা, দার্জিলিং প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'প্লেণ্টারিকেল গার্ডেন' আছে। সেই-সকল স্থানের ভারপ্রাপ্ত ইউরোপীয় অনেক বৈজ্ঞানিক উদ্ভিদ-বিস্তারবন্ধক গবেষণায় যথার্থ হইয়াছেন। তাহা ভিন্ন ভারতের বিভিন্ন স্থানে সিউলিয়ম আছে। এই-সকল মিউজিয়মে ভূবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের অনেক শাখা দেখা যায়। এই-সকল মিউজিয়মে কয় ক'রো ডাক্তার এনালিউগ প্রাণিবিজ্ঞান ও সার টমাস হলান্ড, ভূবিজ্ঞান গবেষণায় যারা বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিকরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক ও বাজিতে বাসমা গবেষণা করিতে পারেন না। তাঁহার জন্য 'লেবরে-টাং' চাই, মিউজিয়ম চাই, যন্ত্র দ্রষ্ট, সরঞ্জাম চাই। কলিকাতার মিউজিয়মে প্রাণিবিজ্ঞানে চাকার পাঠ্যছিলেন বলিয়াই বন্ধুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত বি. এল. চৌধুরী

মহাশয় পানিবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমাদের কলেজসমূহে বহুদিন চর্চিতে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন পাঠ্যে পঠন-পাঠন হইতেছিল। কিন্তু বিশ্ববিজ্ঞানগণের নূতন আটন হইবার পূর্বে বরদেলে এক কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ 'প্রিন্স অফ কন' কলেজে কোনও 'গ্যাবরেটরী' ছিল না—সেইকাজ এট দুষ্ট শাস্ত্র লইয়া অল্প কোনও কলেজে গবেষণাও হইত না। নূতন বিশ্ববিজ্ঞান-আটন পাশ হইবার পর জগতে বিজ্ঞানশিক্ষার এক নবীন যুগ আৰম্ভ হইয়াছে। এখন প্রত্যেক কলেজে 'গ্যাবরেটরী' আছে এবং যে কলেজে বি, এম, সি অনারস (B. Sc. Honours) পর্যন্ত পড়ান হয়, সে কলেজের 'গ্যাবরেটরী'

এত উন্নত হইয়া থাকে যে, তাহাতে অধ্যাপকরা ইচ্ছা করিলে গবেষণার ব্যাপৃত হইতে পারেন। সেইজন্য এখন আর বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেবল কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে আবদ্ধ নাই; 'সারেস এসোসিয়েশন' ঢাকা কলেজ, রাজসাহী কলেজ প্রভৃতি অনেক কলেজে উহার বীজ উৎপন্ন হইয়াছে। আশা করা যায়, কালে প্রত্যেক কলেজে উহার বীজ ছড়াইয়া পড়িবে এবং ভারতে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রসার ক্রমশঃ বর্ধিত হইলে অদূর-ভবিষ্যতে এই বিজ্ঞান-সম্মিলনে ভারতবাসীর সংখ্যাই ক্রমে অধিক হইয়া উঠিবে।

আগামী যুগে রাজ্যভাষার বিজ্ঞান-সম্মিলনীয় অজ্ঞাত কথাই আলোচনা করিব।

ত্রীপকানন নিয়োগী।

কথা ও কাজ

আমরা "যুখে বা" বলি কাজে তা' করি না। এ অশ্লিষ্টগোষ্ঠী এত বেশী ভুলিতে পাই যে আমাদের মনে হয় এটটাই স্বাভাবিক নিয়ম। যেখানেই যে কথা সেই কাজ, সেখানেই কোন অস্বাভাবিক কারণ ভিত্তরে ভিত্তরে চলিতেছে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, মানুষ একটা বিরাট ইঞ্জিন নয় যে Whistleএর সঙ্গেসঙ্গেই চলিতে আরম্ভ করিবে। সুতরাং যদিই আমাদের কথার সঙ্গে কাজের সকল-সময়ে মিল না হয় তাহা হইলে সেই কারণেই মহাভয়ভ

অভয় হইয়া পেল এমন মনে করিবার বিশেষ কারণ দেখি না।

আমাদের জীবন-সমস্তা এতই তটিল যে তাহার মধ্যে প্রত্যেক কথা কাজে পরিণত করিতে বিস্তর ব্যাঘাত ঘটে। সে ব্যাঘাত-বিঘ্ন অতিক্রম করা সকল সময় সহজও নহে। আবার অনেক সময়ে তাহা অসম্ভবও ঘটে। কিন্তু কানটা বধন মন্দ তখন শুধু কথা বা চেষ্টার অজ্ঞ—আইনের ভাষায় বলিতে গেলে শুধু attemptএর অজ্ঞ—শক্তি দিবার ব্যবস্থা অনেক পণ্ডিতেরও

মুখে তুলিতে পাই, অথচ ভাল কাজের
বেলায় আমরা শুধু কথা বা চেষ্টার কেবল
যে কোনও মূল্য দিতে সম্মত হইনা তাহা
নহে, অধিকন্তু তাহাকে বাস্তব দ্বারা পরিচালিত
করিয়া নির্ধারিত করি।

সকলপ্রকার বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম
করিয়া কথাকে কার্যে পরিণত করাই যে
সকল সময়ে সমুদায়, এমন কথাও বলা
যায় না। যিনি মানবের নামে পুত্রকে
বলি দিয়াছিলেন, অথবা যিনি পিতৃ-
ভক্তি দেখাইতে মাতৃহত্যা বা বারবান্দু
নিয়ম বহননের প্রাণনাশ করিতে
কুণ্ঠিত হন নাট, তাহাদের দ্রেক,
দয়া, মায়া প্রভৃতি মনের কোমল বৃত্তি-
নিচয়ের স্বাভাবিক বাধা অতিক্রম করার
জন্ত বাহ্যিক দিতে পারি, কিন্তু সমুদায়ের
দিক্ দিয়া দেখিলে এ কাজের জন্ত তাহাদের
কৌলৌস্তের দাবী যে খুব-বেশী, এমন কথা
ও মনে হয় না। আবার যদি কেহ
পিতার প্রতি যথেষ্ট ভক্তিসত্ত্বেও তাহার
আদেশে মাতাকে মারিতে না পারেন,
যাহা সাধারণের অর্থাৎ কাহারো নহে,
তাহার জন্ত যদি কেহ তাহারই উপর
যাহা বিশেষ করিয়া নির্ভর করে তাহাও
সকলসময়ে অলাভালি দিতে না পারেন,
তাহা হইলে সমুদায়ের মাপকাঠিতে কেন
যে তাহাকে ছোট করিয়া গণ্য করা হইবে
এ-কথাটাও ভাল বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

দেখা যাইতেছে, কাজের সঙ্গে মিল হই
না বলিয়াই যে, কথা নিশ্চল, তাহা নহে।
কথা নিশ্চল তখনই—যখন তাহা মনের
কথা নয়—প্রাণের কথা নয়, যখন তাহা

মুখের শব্দমাত্র—ভকের মুখস্থ বুলির মত
ভাবশূন্য, অর্থশূন্য—কেবল পঁরকে প্রচারিত
করিবার জন্ত প্রস্তুত হয়। কিন্তু সে কথার
পশ্চাতে কল্পনা ও সত্য আছে তাহা
কার্যে পরিণত না হইলেও প্রাণের ও
প্রজ্ঞার দোষ। সঙ্গতসময়ে তাহা ফলবানু
না হইলেও potential energyর মত বজ্রগর্ভ
মেঘের দ্যায় সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বলিয়াই
নিভাত উপেক্ষণীয় নহে। তবে, বজ্রপাতের
স্বার্থে যেমন মেঘের মধ্যে বজ্রাঘির অস্তিত্ব
জানা যায়, কার্যের দ্বারা, ত্যাগবীকারের
দ্বারা তেমনি সত্যের অস্তিত্বও জানা যাইতে
পারে। কাজে কথার যাচাই হয়, কাজ
কথার কতিপাথর। তাই যে-কথার
পশ্চাতে কাজ নাই তাহার মূল্য নির্ধারণও
সম্ভবপর নহে। এইজন্যই আমরা প্রত্যেক
প্রাণের একাধিক কাজে সার্বক দেখিতে
চাই। প্রস্তুতে কাজ না থাকিলেও কার্যটা
যে প্রাণের হইতে পারে, এটা আমরা অনেক
সময়ে স্বীকার করিতে চাই না। বীজ নিষ্ফল
হইলে তাহা বীজেরই দোষ, ইহাই আমরা
ধরিয়া লই। কিন্তু তাহার সফলতা কেবল
উৎসাহ, যোজ, বৃষ্টি প্রভৃতি আরো বহু
পারিপার্শ্বিক কারণের উপর নির্ভর করে,
এট সোজা সত্যটা অনেক সময়ে আমরা
ভুলিয়া যাই। অনেক সময়ে আবার
বীজের প্রাচুর্য্যকেই আমরা নিষ্ফলতার
কারণ বলিয়া নির্দেশ করি। বাক্যগুণের
জন্ত বাঙ্গালী আশ-পার সকলের নিকটেই
গজনাভাজন হইয়া আসিতেছে। সেখানে
কথার জন্ত উচিত-মূল্য অদানের প্রচা-
রিত হয় ও ভাল কাজ করিতেছি না।

কিন্তু আমরা কাঁধেবার বলিয়া বোঝাইগকে
তারিক করিয়া গাফি, বাকাবার উহাও
যে খুঁ ~~কথা~~ এমন কথা বলা যায় না।
আমাদের রসদ-পটিন Lloyd George-এব
কথা মনে করুন। কারণ তিনি 'পোষাক-
পরা ঘূর্ণ বাতাস' (a perfect Tornado
in Trousers) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন
পাই। কথায়ও তিনি ঘূর্ণ বাতাসের মতই
ধূলি উড়াইয়া মাথা ঘুঝাইয়া অনেক সময়েই
আঁধি লাগাইয়া দেন। তাহার কথার
সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া সাধারণ
লোকের কুল-কিমার দেখিতে পায় না।
ইহার কারণ, কথা ও কাজের মধ্যে একটা
ভেদ চিরকালই থাকিবে। এই ভেদ-
খাটাই বাহ্যের লক্ষণ। কথা, কাজের
চেহে-আগে চলিবেই। কাজ কথাটাকে
সার্থক করিবার জন্ত অগ্রসর হইতে
থাকিবে। এইরূপে, ব্যক্তি—গৃহ—সমাজ—
রাষ্ট্র অগ্রসর হইতে থাকে। কথা যেখানে
ছোট হইয়া গেছে, চিত্তাও সেখানে খর্ব
হইয়া পড়িয়াছে বুঝিতে হইবে। যদিচ
কাজ সেখানে কথামত হইয়া কথাটাকে
আপাতত সার্থক করিয়া লইতেছে, তথাপি
তাহার মূলমন্ত্র সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা নাই
বলিয়া সে ক্রমশ কালের কালের মত
নির্জীবতা প্রাপ্ত হইতেছে। প্রাণের অভাবে
উৎসাহ মরিয়া থাকিতেছে। স্তব্ধতা আপন
হইতে কাজও যে সেখানে পিছাইয়া
পড়িতেছে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

কেননা কথার জন্ত একটি অস্ত্রভেদী
সিংহাসন তৈরি করা আমার উদ্দেশ্য নহে।
ইহাও হয় ত অনেক পরিমাণে সত্য,

আমরা কথা এক-বোঝা বলিয়াছি যে,
তাহাতে বিচারের লক্ষণ দেখা গিয়াছে।
আমার কথা—এই আদর্শকে আমাদের
কাজেব চেয়েও কতকটা উচ্চ করিয়া
রাখিতেই হইবে। আদর্শকে নামাইয়া
ধারলে কাজও সেই পরিমাণে নামিয়া
পড়িবে। এবং কাজও আমার যে-
অগ্রসর হইতে থাকিব আদর্শকেও ঠিক সেই
পরিমাণেই খাড়াইয়া ধারিতে হইবে। এ
আদর্শ মাত্ৰক ব্যক্তি—প্রত্যেক গৃহ—
প্রত্যেক সমাজের পক্ষে হইতে বিভিন্ন হইবে,
এবং বিভিন্ন হওয়াও হইত কতকটা বাঞ্ছনীয়।
আদর্শের বিষয়ে absolute standard—
একটা চরম মাপকাঠি—আমার মনে হয়,
সোনার বস্ত্রের মত সম্ভাবনার রাজ্যের
পর্যায়ের অবস্থিত। অনেক সময়ে এই
absolute standard নির্ধারণ করিতে
আমরা মরাবার করিয়া অনেকটা কাজের
শক্তির অপব্যয় করি।

দর্শনের রাজ্য দেখা যায়, পরমাণুবাদী
বধন অসংখ্য পরমাণুকে নিত্যতত্ত্ব বলিয়া
গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন উহাই অগত-
স্রষ্টার চরম কারণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।
আমি দেখা গেল, এতগুলি পরমাণু ও আতি-
সম্ভব প্রভৃতি কতকগুলি ভাষার জগৎ
অগতস্রষ্টি বিষয়ে নিত্যতত্ত্বই অনাবশ্যক। ভাষার
তাহাদের ব্যবহারে কিছু সুবিধা হইলেও
বস্তুত তাহাদের স্বীকারে সত্যাত্মসন্ধিভ্রম
অগিষ্টেরই সম্ভাবনা। তখন এগুলিকে
পরিভাষ্য করিয়া মূলমন্ত্র দর্শনের সৃষ্টি হইল।
প্রকৃতি-পুরুষবাদ, ঐক্যবাদ, অঐক্যবাদ
প্রভৃতি-কত মতেরই প্রচার হইয়া গেল।

কিন্তু এ-বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
হইয়া গেছে বলিয়া বিশ্বাস করি না।
যাহা শেষ কথা, তাহা আপেক্ষিক শেষ
কথা, ইহা সকল সময়েই মনে রাখিতে
হইবে। আমাদের বুদ্ধি ও অধ্যাক্ষমতার
এই শেষ কথা অনবরতই পরিবর্তিত, কোথাও
শোধিত আবার কোথাও-না ~~শুদ্ধ~~রূপ
প্রাপ্ত হইতেছে। অহিংসা পরম ধর্ম যেরূপ
প্রচারিত হয় সে-দিন যজ্ঞযজ্ঞের আর্ন্তনামে
যে করুণ ছুর যি বিগলিত হইয়াছিল, সে
রূপে একদিনও বোধকরি এক-কথা স্থান
পায় নাই যে, তাহার এই মহামন্ত্র মূর্তি-
জীবন্তকালের প্রবেশনার নিম্নোক্ত হইবে।
কিন্তু চীন ও ব্রহ্মদেশে এইরূপই ঘটয়া গেল।
শতাব্দের কক্ষসংক্রান্তেও ভারতবাসী এইরূপে
একদিন বসিয়া গেল। যে সাতার
নিতে পুঁই সে যখন জলের উপর নিশ্চেষ্ট হয়,
তখন তত উৎসর্গের কারণ না প্রাকিলেও,
যে এ-বিষয়ে অপটু তাহার নিশ্চেষ্টতা যে
ভূমিয়ার লক্ষণ ইহা ভাবিয়া দেখিবার
অবসরও তাহার ঘটিয়া উঠিল না, বুদ্ধমান
বলিবেন এইসকল মতের মধ্যে যে ক্রটি
ছিল তাহারই ওপরে এমনটা ঘটিতে পারিয়াছে।
ক্রটি অবশ্যই ছিল। আধুনিক কায়,
হিগেল, সোপেনহাউই প্রভৃতি প্রসিদ্ধ
দার্শনিকগণের সীলানুসারে যে 'বীতংস
জ্ঞানের চলিতেছে তাহার মধ্যেও কোথাও-
না-কোথাও ক্রটি অবশ্যই আছে। কিন্তু
সর্বাপেক্ষা বেশী ক্রটি ইহাই আমি মনে
করি যে এইসকল কথা বা আদর্শকে চূড়ান্ত
বলিয়া স্থির করা—ইহাদের চূড়ান্ত যে
আপেক্ষিক এই কথা ভুলিয়া যাওয়া। বুদ্ধি

বুদ্ধির সংস্পর্শে—অন্য-পরিবর্তনের সঙ্গে
সঙ্গে টোরা কখনই চূড়ান্ত থাকিতে
পারে না। তাই বৌদ্ধধর্ম আমাদের
মধ্যে চূড়ান্ত কথা কখনই হইতে পারে নাই,
ভাবতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত
পর্যন্ত প্রচারিত হইয়াও রাজার সহায়তা,
•ভারতবাসীর স্বাভাবিক নিম্নোক্ততা ও ধর্মপ্রাণতা
প্রভৃতি অসংখ্য অবস্থার পতিত হইয়াও
তাঁহা বসিয়া গেল। এইখানটাকে হরত
পুণ্যপান মণিহোপাধায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ
শাস্ত্রী-মহাশয়ের মতের স্মৃতি আমাদের
মতের কিছু বিরোধ বাধিয়া যাইতেছে।
আমি কিন্তু বিষয়টাকে প্রত্যক্ষের দিক দিয়া
দেখি নাই। দর্শনের দিক দিয়া দেখিতেছি।
আমি দেখিতেছি, দর্শনবিদ্যায় ব্রাহ্মণের
মেধার নিকট বৌদ্ধ দর্শন পরাজিত হইয়াছে।
বেদান্ত-দর্শনকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া
আমরা মনে করি না বরং উহাকে আমি
বৌদ্ধ দর্শনের মুক্তাব পরগণনা বলিয়াই
দেখিয়া থাকি। ব্রাহ্মণের মেধার উপর
হরত আপনাদের ততটা প্রভা নাই—
প্রভা থাকিতেও পারে না—কারণ, আপনাদের
এক পাচক ব্রাহ্মণ অপরা বড়-লোঁচর আদ্য
মত ব্রাহ্মণের সম্পর্কে •আসিয়াছেন—কিন্তু
আজ যে মেধার কথা বলিতেছি তাহা
নিত্য্য অবজ্ঞার নহে, তাহা শঙ্করাচার্য,
রামানুজাচার্যের মেধা—তাঁহাদের নিকট বৌদ্ধ
দর্শনকে মত্তক অবনত করিতে হইয়াছে।
তাই বলিয়া বৌদ্ধধর্মের দ্বারা কাজ যে
বড় কম হইয়াছে, তাহাও নহে। দর্শনের
শেষ কথা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। সেও
আজ সহস্রাব্দিক বৎসর হইয়া গেল। তাহা

লগ্নে আমরা নাড়াচাড়া করিরাছি, কথাকাঁকে
 কাঁধে লাগাইবার চেষ্টারও ক্রটি করি
 নাই। কিন্তু নূতন কথা আর বড় বেশী বলি
 নাই। এদেশীয় দর্শন-রাষ্ট্রো ইহা কখনই
 তুচ্ছ লক্ষণ নহে। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এ
 পৌছিবার যে সকল দার্শনিক গৌড়ামিল
 জাচ্ছে—যারা, লীলা প্রকৃতি যে-সকল কথা
 সহস্র না ধোয়াটলে ব্যবহৃত হয়,
 সেগুলার হীমাংসার জন্য অগ্নির হওয়া দূরে
 থাকুক আমরা ভক্তি ও বিশ্বাসের উপর
 মস্ত অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া কল্পনা ও
 দৃষ্টির নির্দোষ-বস্তুর ব্যবস্থা করিরাছি,
 আমরা কথাকে বাব দিরা কাঁধে লাগিরাছি।
 অনেকের মতে এইটাই শুভলক্ষণ; কিন্তু
 আমি বলি যখন কালের চেয়ে কল্পনা

কমিরা আসিরাছে তখন তাহা মৃত্যুর লক্ষণ
 —জীবনের লক্ষণ নহে। সুতরাং কাঁধ
 ধরি-বা সকল সময়ে না হয় সেজন্য
 কল্পনাকে বা আদর্শকে খাটো করা আমার
 পরীক্ষণ নহে। কথাকে যদি প্রাণের
 সংকল্পে বরণ করিরা উচ্চারণ করিরা থাকি,
 তাহা হইলে কাঁধ একদিন আপনা-হইতেই
 ভাঙিয়া অহুগামী হইবে। সেজন্য বসিরা থাকিব
 না। কথাকে, কল্পনাকে, আদর্শকে উত্তরোত্তর
 অগ্রগামী করিবারই চেষ্টা করিব।
 সেজন্য যদি পরিহাস সহ্য করিতে হয়,
 তবে তাহাতেও সম্মত আছি। তাহাতে যদি
 আমার কপালে কেবল দুঃখই থাকে,
 তবে সে দুঃখ যেন আমার মাথার মণি
 হইয়া উঠে।

ঐন্দ্রলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়।

আমাদের শিক্ষা

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে আমাদের
 সকল শিক্ষা মায় উচ্চ, বাঙ্গলাভাষাতেই
 হওয়া উচিত। কথাটা অদ্বুত নয়, কেননা
 এক ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর অপর সকল
 দেশে, দেশভাষাতেই দেশের লোককে
 শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। কথাটা নূতনও
 নয়, কেননা আর কেউ না চোঁক বরাং
 রবীন্দ্রনাথ এ কথা পূর্ণেও বলেছেন;
 —একভাষা নয়, বহুবাহা। মাতৃভাষার স্বপক্ষে
 এক কথা যে একশোবার করে বলতে হয়

সে দোষ বক্তাদের নয়, এর জন্তে দোষী
 হচ্ছেন সেই শ্রোতার দল যারা এক কানে
 মিলেতি আর-এক কানে সংস্কৃত কুলো
 দিয়ে বসে আছেন। বাঙ্গলার কথা বাঙ্গলার
 বললে সে কথা শিক্ষিতসম্প্রদায় কানে
 ভোলেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য
 কথা যদি ইংরাজি ভাষার বলতেন তাহলে
 বাঙ্গালীর তা মনে বসত। আমাদের কাছে
 যে বাঁটি বাঙ্গলার চাটতে মেকি সংস্কৃত
 ও তালী-ইংরাজির মূল্য ঢের বেশি তার

পরিচয় ত আমাদের সাহিত্যে সংবাদপত্রে সত্যসমিতিতে ছ'বেলা পাওয়া যায়। সে ঘাই হোক, শিক্ষিতসম্প্রদায়ের বীরোত্তরনাথের কণার মনোযোগ কেন্নি তার প্রমাণ—তারা অনেকই বলছেন—ও-সব কবিত্বের কথা, কালের কথা নয়। অনেকের বিশ্বাস বীর কবিত্ব-প্রতিভা আছে। তার বিষয়বুদ্ধি নেই। এ কথা যদি সত্যও হয় ত একথা সম্ভূর্ণ মিথ্যা যে বীর কবিত্ব-প্রতিভা নেই তারই বিষয়-বুদ্ধি আছে। কোনও একটি মানসিক-শক্তির অস্তিত্ব থেকে অপর একটি মানসিক-শক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ হয় না। শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মতে কবিত্ব মন আকাশে ওড়ে, মাটির খবর রাখে না। একথা সত্যও হতে পারে মিথ্যেও হতে পারে কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সম্মত নেই যে এ দেশের ইউনিভার্সিটি-ফেরৎ লোকের মনের গতি আকাশের দিকেও নয়, 'মাটির দিকেও নয়,—বাটির দিকে। আমাদের সকল ভাবনা সকল চিন্তা পরিবারের গভীর ভিতরই আবদ্ধ। আমরা আকাশের খবর বুঝে থাকি, দেশের খবরও রাখেন; কেননা আমাদের মনের পক্ষে ঘর হতে আভিমান বিদেশ। দেশের দিকে, দেশের দিকে একটু ফিরে চাইলে আমরা প্রকান্তে এ কথা বলতে লজ্জিত হইতুম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-বিজ্ঞা আমরা লাভ করি তা অর্থকরী বিজ্ঞা। বাঙ্গালার মহাবিশ্ব-সম্প্রদায়ই যে সর্বাঙ্গপেক্ষা স্বমবিশ্রুত এ ত প্রত্যক্ষ সূত্র। অথচ একমাত্র এই সম্প্রদায়ই উচ্চ শিক্ষিত। এবং এই উচ্চ শিক্ষা হত প্রায়শ লাভ করছে উচ্চশিক্ষিত দেশের পশার তত কম

আসছে; এক বিঘের বাগার ছাড়া আর সকল বাগারেরই বি-এর নয়, পড়ে থাকে। একদল হবার প্রধান কারণ এই যে—যে-বিজ্ঞা আমরা শিখি তা অর্থকরী কৃষি বা wealth producing বিজ্ঞা নয়। আমাদের সকল শিক্ষিত লোকের সমবেত নিষ্ঠার ফলে এই ভূমিতে ধানের একটি শিখও বাড়েনি। আমাদের দ্ব্যর্থকরী বিজ্ঞা হচ্ছে আসলে অর্থ-হস্তান্তরকরী বিজ্ঞা। এ বিজ্ঞার শুণে এর পকেটের টাকা এর পকেটে যায়। আসল ঘটনা এই যে, আমরা দেশে বিদেশে কোরে খাইনো; আমরা আদালতে চোরের খাই। ধার্মা শিক্ষার সংস্কার ক্রমবাহু প্রত্যাহু করেন তাঁরা। এ কথাটিও মনে রাখেন যে যে-দেশে যথার্থ শিক্ষা আছে সে দেশে জাতীয়-শিক্ষা-বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ধনেরও বৃদ্ধি হয়। ইউরোপে আমেরিকায় জাপানে—জাতীয় শিক্ষার শুণে তদ্রূপবাসীরা এক দাসদাসী ব্যতীত অপর সকল ধনে অপূর্ণ 'ধনী' হয়ে উঠেছে। দেশের বিষয় কবি হয় ত দিব্যদৃষ্টি দেখেন আমরা কিন্তু নিশাঈপ্রণয় দেখেন—কেননা আমাদের নব শিক্ষার প্রভাবে আমরা যথার্থ নেশার দিবারাজ যেহৌস হয়ে থাকি।

(২)

কালের লোকেরা বলেন যে, অন্তত পেটের দায়ে আমাদের ইংরাজি দেখা দরকার, অতএব বাঙ্গলা ভাষার শিক্ষা দেওয়া অহুচিত। তাবু লোকেরা এর উত্তরে বলবেন, শুধু পেটের দায়ে নয়, মনের দায়েও আমাদের পক্ষে শুধু ইংরেজী

মহা অর্থান ফ্রেন্সেও শেখা আবশ্যক; অতএব বাঙ্গলা ভাষাভেদে শিক্ষা দেওয়া উচিত। কেননা যখন কোন একটি ভাষার উপর সার্বভৌম অধিকার নেই তখন পক্ষে অপর কোনও ভাষা পুরোপুরি আরম্ভ করা প্রায় অসম্ভব। আমরা তাই অধিক জীবন ইংরাজির সঙ্গে কুতূহলী করেও সেই ভাষাকে কার্যে করতে পারিনে—ফলে অধিকাংশ সময় বি-এ এবং এম-এর যুদ্ধ এবং হাত থেকে যা বেগের তা ইংরাজি নয়, তার অপভ্রংশ—ইংরাজেরা যাকে বলেন Babu English. আমরা যদি পূর্ণাঙ্গের বড় জ্ঞান বিজ্ঞান বাঙ্গলা ভাষার শিক্ষা কবি তাহলে ছুটি তিনটি ইউরোপীয় ভাষা কেবল মাত্র ভাষা-বিশেষে শিক্ষা করবার সময় আমাদের হাতে যথেষ্ট থাকবে। বাঙ্গলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা চলে আসুক অবশ্য বক্তার Burke Bright-এর প্রতিক্ষা হরে উঠতে পারবে না কিন্তু ইংরাজিতে কেরানীগিরি এবং ওকালতি করতে পারবে। সাম্প্রদায়িক চরিত্রের ত্রুটি আমাদের বিশেষ কোনও ক্ষতি হবে না, কেননা ইতিমধ্যে এদেশে এত Burke Bright জমাগ্রহণ করছেন যে তাঁদের আর বংশবৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। দেশ উদ্ধার যদি কথার না হয় তাহলে ইংরাজি কথাতোও হবে না। মুখস্থ বাক্য মাত্রেরই অন্তরে যে মন্ত্রশক্তি আছে—এ ভুল আমাদের এতদিনে ভাঙা উচিত ছিল।

(৩)

আমাদের নবশিক্ষার ফলে আমরা যে জাতীয় অভ্যাস সাধন করতে পারিনি

তাঁর প্রমাণ আমাদের দেশহিতৈষীরা নিজের ছেলেকে কথার জাল বুনতে শিখিয়ে আর-সকলের ছেলেকে তাঁদের কাপড় বুনতে শিখতে বলেন। আমরা যদি স্বাভাবিক বাটরের না হোক মনের দৈহিক পুর করতে পারতুম তাহলেও নয় আমরা নিজেদের শিক্ষিত বলে কতকটা অহঙ্কার করতে পারতুম। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও আমরা কিছু করতে অক্ষম বলেই এই ধুরোধেরি যে আমাদের জাতীয় মনের কোনরূপ দৈহিক নেই। যদি চিকিৎসা করতে না জানি তাহলে কারও গোপ নেই এই কথাটা বলাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। এবং বিজ্ঞান অভাবে বুদ্ধির উপর নির্ভর করাট মাছের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই আমরা দেশের লোককে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে আত্মার ঐশ্বর্য আমাদের সমস্ত জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নেই,—অতএব উপাস্য করাই আমাদের পক্ষে প্রেরণ কেননা খালি পেটের ভিতরই আত্মা বাড়বার স্থান পায়।

এ সব কথা বলার আমরা এক সত্যেরই পরিচয় দেই যে, আমরা আমাদের আত্মার অভ্যাসকে আমাদের নবশিক্ষার ভাগ দিতে পারিনে, আমরা বিভ্রান্ত-মনে নিজেরা ধনী হইনি বলে, অপরকে তা দান করতে পারি নে। দেশের শিক্ষিত লোকেরা যে দেশের শিক্ষক হননি তার কারণ আমরা এ শিক্ষা আন্দোলনসহকারে লাভ করিনি; বি-এ পাশ করা আমাদের পক্ষে একটা দার এবং কারক্সে সেই দার হতে উদ্ধার লাভ করতে পারলেই আমাদের

মাঝার উপর থেকে একটা তার মেয়ে
 যায় এবং আমরা তখন হাঁক ছেড়ে বাঁচি।
 এই পাল-করার ফাঁড়া কেটে গেলে
 আমরা আমাদের অরণ্যের সংস্রবের জন্ত
 যেটুকু আবশ্যক সেটুকুমাত্র বিস্তার চেষ্টা
 করি—তার বাহ্যিক অংশের সঙ্গে
 জগতের মত যোগাযোগ হয়। —

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস,
 বছরের পর বছর লেখাপড়া শিখতে
 যে কষ্ট আমাদের ভোগ করতে হয়েছে
 তার হাত থেকে একবার অব্যাহতি পেলে
 আমরা লেখাপড়ার দিক দিয়েও আর
 যেসুতে চাইনে। পঠদপাঠ আমরা যে,
 স্নেহভরিতা নিত্য বলি—ছেড়ে যে মা
 কঁদে বাঁচি—তার কারণ তিনি বিদেশিনী।
 বিদেশী ভাষার শিক্ষালাভ করতে হয়
 বললেই আমাদের শিক্ষার পদ্ধতিতে এত
 নিয়মান্বয়। যার ভিতর আনন্দ নেই
 তা আমরা নিজের মন থেকেই দূর
 করতেই যখন ব্যস্ত তখন অপরের

মনে তা প্রবেশ করিয়ে দেবার প্রস্তুতি
 খুব কম লোকেরই চর পাকে। এবং
 যাদের একজন সাধারণত আছে তাঁরাও
 সে সংকল্প কাগজে পরিণত করতে পারেন।
 আমরা বিবাহসম্বন্ধে মনোভাষ্য শিখিয়ে
 ইংরেজি সাহায্যে আবেদন করি বলে
 প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করতে পারিনে।
 ইংরেজি সরাসরি আমাদের জানবুদ্ধির
 অলঙ্কারে ঢড়িয়ে দিয়ে মট কেড়ে নেন।
 ফলে আমরা কেউ না আটনের কেউ বা
 ডাক্তারের শাসন বলে ফল পাওয়া যায়
 তাই পেরে জীবন ধারণ কবি, অর্থাৎ
 দেশের মাটি নীচে পড়ে রয়েছে, যার
 আবাস করলে ফলত লোনা। নবশিক্ষিত
 মনের যে কৃষিকাজ আসে না তার একমাত্র
 কারণ এই যে দেশ-মনকে মাতৃভূমির কোল
 থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। একথা
 বলা বাহুল্য যে, মনের মাতৃভূমি হচ্ছে
 মাতৃভাষা। রবীন্দ্রনাথ এই সত্যের প্রতিই
 দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

স্মৃতি

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমার উদ্দেশ্য

প্রেমের নেশায় আমি বিভোর হই
 নাই; তাহাকে বিবাহ করিমাতি, আমার
 সংসারের জীবিতের জন্ত,—এটুকু ভাল
 করিয়া আমার জীকে বুঝাইয়া দিলাম।

সে তাহাতে কোন উচ্চবাচ্য করিল না।

—এমনি ছুপচাপ থাকাই তাহার স্বভাব।
 তবে, বেশ উৎসাহের সঙ্গেই সে ঘর-
 সংসারের কাষকর্মে লাগিয়া গেল।

বিবাহ করিয়া আমি বাড়ী বন্দাইলাম
 না। আমার বাড়ীতে ঘর ছিল দুখানি।
 বড় ঘরটির একধারে আশি-ঘর। মাঝখানে

বেড়া। ছোট বরটিতে আমার গুটতাম; বন্ধুগণের আসুণে এই বৎসেই অন্টার্ননা হইত। আমার আসপাণ-পত্র সমাজ—এমনকি, গুটতামের সেই শিশুদের চেয়েও বেশী।

জ্বর সঙ্গে লুকেরিয়াও আমার সংসাবে আগিয়াছিল।

দিন দু-টাকার বেশী সংসারের খরচ দেওয়া আমার পক্ষে যে অসাধ্য, একথাটা আগে থাকিতেই জানাটাই রাখিলাম।—“আপ, তিন বছরের ভিতরে আমি যাট হাজার টাকা জমাতে চাই, এট আমার সংকল্প—বুঝেছ?”

সে কোন আপত্তি তুলিলু না।

কিন্তু আমি আর-যা-হই অবিবেচক নই। প্রতিদিন হাতখরচের কল্প আরও জানা-কতক পরমা তাকে দিতাম; যাতে তার টানাটানি না হয়, সেদিকে আমার নজর ছিল না এমন নয়।

এ বিয়েটার দেখিতে ভালবাসিত। আমি বলিলাম, “দেখ, কি-মাসে একবার করে আমি তুমিকে বিয়েটারে নিয়ে যাব। তাই বেশী আর তুমি যেতে পাবে না।”

মনে হচ্ছে, সবস্বচ্ছ বার-তিনেক বিয়েটারে গিয়াছিলাম। আমরা ‘পিটে’ বসিতাম। আমরা দুজনে একসঙ্গে বিয়েটারে বাইতাম, অভিন্ন দেদিতাম, বাড়ী ফিরিতাম,—কিন্তু সে সবই নীরবে। হয়, কোন এক নীরবতা?—তখনও আমাদের দুজনের ভিতরে ঝগড়া-ঝাঁটি কিছুই হয় নাই—তবুও এই নীরবতা!

মনে পড়ে, মাঝে মাঝে আমার দিকে সে আড়চোখে চাহিয়া দেখিত;—সেই চুরি-করা চাহনি দেখিলে আমি বেশী করিয়া গভীর হইতাম উত্তীতাম। আমারই ভয়ে সে মুখ খুলিত না—এ-মতো দারী আমিই। আবেগেরে আমাকে বধন-সে হুল্লুড়-জড়ানো ধরিত, তখন দু-একটা মোহাগের কথা তার মুখ দিয়া উপচ্ছিন্ন উদ্ভিত। কিন্তু পাছে আমার স্বভাবের গাভীরা তরল হইয়া পড়ে এই ভয়ে আমি তার সেই চট্টলতার প্রেরণ দিতাম না। প্রেমের প্রণাপ শুনিয়া তখন হইবার বরস আমার গেছে; তার সঙ্গে ছেলেবেলার যোগ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়—আমি ও-সব ভালবাসি না, আমি তার সঙ্গম, আমি চাই তার প্রাণ, তার সঙ্গম!

আমাদের ভিতরে ক্রমে মন-কষাকষি আর ঝগড়া-ঝাঁটির সূত্রপাত হইল। তবে বিবাদ-বিসংবাদ বেশীক্ষণ স্থায়ী হইত না—কারও ঝগড়ার আরম্ভেই আমরা কথাবন্ধ করিতাম। লক্ষ্য করিলাম, তার সেই কোমল মুখখানির উপরে দিন-দিন কেমন একটা ঔকতোষ কঠোরতা ঘনাইয়া আসিতেছে। আমিও ক্রমে অন্তর হইয়া উত্তীতে লাগিলাম।

সে গরীবের মেয়ে হইলে কি হয়! তার মনটা ছিল বেগমের মত। তাই, আমার সংসারের টানাটানিতে সে বধন-তখন নাক বাকাইত। না প্রিয়ে, আমি গরীব নই—সংসারী মানুষ মাত্র! বাজে খরচ আমার আছে! এই সোজা কথাটা বুঝিলে না?

এতটা কড়াকড়ি সে পছন্দ করিত না।
শেষটা আমার সঙ্গে খিদেটোরে বাইতেও
আপত্তি করিত। কিন্তু তাহার বিমুখতা
আমি গ্রাহ্যের মতো মানিতাম না।
ফলে, সেও বত বাকিয়া বসে, আমিও
তত চুপ হইয়া বাই।

সবই কি আমার ঘোষ?—তেনে
দেখা যাক! হ্যাঁ, ঘোড়শী বালিকার
সঙ্গে স্রোচ্চ পুরুষের মনের মিল হওয়া
শক্ত বটে। রমণীর নিজের মতো
নিজের বলিয়া কোন-কিছু নাই, তাইতো
আমাদের এত বড়াইটা পোহাইতে হয়।
তবে, রমণী প্রেমরূপিণী বটে। সে যাকে
ভালবাসে, তার নিষ্ঠুরতাকেও পুকা করে।
এতে তার প্রেমের ও মনের লুক্কণ পাওয়া
যার স্বীকার করি, কিন্তু—নিজের কোথাও
সেই কারণেই ত তার কেবল দুঃখই পায়।
তা যদি না হইবে তবে কি আমার
স্রীর মৃতদেহ আর এখানে পড়িয়া থাকে।

তার প্রেমের উপর আমার বিশ্ময়
সংশয় নাই। সেই আত্মরিক, নিবিড় আলিঙ্গন
কি তুলিবার? হ্যাঁ, আমাকে সে ভাল
বাসিত বটে, কিন্তু সে চাহিত প্রতিদানে
আমিও তাকে তেমনি ভালবাসি—যেমন
করিয়া আমার দে ভালবাসে। স্রীর এ
কথাও বলি, মৌখিক ভালবাসা কানাইতে না
পারিলেও আমি তাকে এমন-কিছু দুঃখ দিই
নাই—যার জন্তে—যার জন্তে—না, থাক—দে
কথা আর তুলিয়া কাজ কি?

সমাজের লাহনার আমার মন অঙ্গে-পুড়ে
যাক্ হয়ে গেছে। সমাজে আমি একঘরে।
তাইত আর আমি তেজোরতীর কামবায়ী!

ঘাট হাজার টাকা লম্বাইয়া এ-দেশ ছাড়িয়া
বাইব। সমুদ্রের ধারে, পল্লভূমির ছায়ার
আশ্রয়ের ক্ষেত্রে ঘর বাঁধিয়া শেখ-কুটা
দিন নিশ্চিন্তে কাটাইয়া দিব। সেখানে
সমাজের চোখ-রাগানি নাই। আমার
অস্তিত্বটিকে, যে ভালবাসিবে, আমার সন্তানকে,
(ভগবান যদি দয়া করেন) যে ভাল-
বাসিবে—এমন কোন প্রেমবতী, দেহময়ী
গৃহিণী সেখানে দেই নিশ্চয়ই আমার সঙ্গের
সঙ্গিনী থাকিবে।

এ-সব মনের কথা মনে-মনেই ভাবি-
গড়া ভাল।—কিন্তু বোকামি করিয়া তাকে
আমার মনের কথা শুনিয়া বলিয়াছিল।
ঘোড়শী রমণী সে,—ভরুণ প্রাণটি
তার মনোন যৌবন-শ্রীতে পরিপূর্ণ
ছিল; আমার জীবন-সংগ্রাম, আমার
দুঃখব্রতটি, আমার আকাঙ্ক্ষা কেমন করিয়া
সে বুঝিবে বল? জীবনের অভিজ্ঞতা তার
কতটুকু?

আমার সেই অবিরচনার ফল?—যৌবন-স্রীর
মধ্যে এত অগ্নি মৌসুমত?

সব-চেয়ে সে বেশী গোপনীয় করিত,
আমার পোকারো ব্যবসায় লইয়া। আমি
কি এতই অর্থ-পিপাসু? বা প্রাণ্য তার
বেশী একটা কাণাকড়িও যে আমি লইতাম
না, এটা কি তার চোখে পড়িত না?
হার, এ পাপবীর অবিচার।

অনেক শুনে শুনি হইলেও সে কি
নির্দয়া, আমার প্রাণে যে কি ব্যথাই না
দিয়াছে! কে বলিতে পারে, তাকে
ভালবাসি নাই?—কে বলিতে পারে এ
কথা? আমরা—মানবেশ। অভিশপ্ত,

আমাদের জীবন অভিশপ্ত, জাতি অভিশপ্ত। এই অভিশপ্ত পুণ্ড্রবীতে সকলের চেয়ে বেশী অভিশপ্ত কে? আমি—আমি! দেখ, আর্থিক জীবন লইয়া প্রকৃতি ও নিয়তি কি নিষ্ঠুর খেলা খেলিয়াছে!

এখন বুঝিতেছি, আমি কোথাও একটা গলদ করিয়া বসিয়াছি। এখন বুঝিতেছি—তখন বুঝি নাই।

আগুনমনে বড়াই করিয়া বলিতাম, “আমি হাল্দি দলী, কুড়া মেজাজের লোক। আমার কোন নৈতিক পরিবর্তনের দরকার নেই; যদি ঘাতনাই পেতে হয়, তবে সকলের আগেচর, নিজেই মুখ বুজে সব সহ্য করি।”—সেই একও-রেশির ফল, এই ক্ষুণ্ণে আর কোন ভুল নাই।

জীবিতাম, “এখন বুঝে না বটে, কিন্তু সন্মুখে সে আমার কদর বুঝবে। তখন আমার চরিত্র তার কাছে আর হেঁয়ালি বলে ঠেকবে না, তখন সে নিচু হয়ে আমার চূপা জড়িয়ে ধরবে।”—এই ছিল আমার মতলোব। তবু, এর মাঝে বোধ করি কিছু ভুল-চুক করিয়া ফেলাতে, আমার সব মতলোব ফাঁসিয়া গিয়াছে।

—“থাক, আর না—আর না! বিধাতার বিধান কে বদলাইবে? হা মনেব। এ সংসার-পাথারে তুমি সূত্র তৃণমা—ভাসিয়া বাইতেই তোমার ভগ্ন।—কিন্তু সাহসী হও, দলী হও!”

এস, এইবারে সব বলি শুন। সত্য প্রকাশ করিতে আর আমার ভয় নাই। এ তার দোষ—এবং, সব দোষ তার একলাফ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হুচরিতার বিব্রোহ

কুগড়াটা কি-করিয়া বাধিল জান?

একদিন একটা বুড়ী আমার কাছে একটি সোনার পদক আনিল,—সেটি তার পরলোকগত স্বামীর স্মৃতিচিহ্ন। আমি পদকটি একেবারে কিনিয়া নিতে চাহিলাম। বুড়ী কিন্তু হাপস মনে ভাবা বলার কারা ধরিল; তার ইচ্ছা পদকটি আপাতত আমার কাছে রাখা থাকে—তাহা হইলে পরে সে জিনিষটি আবার উন্মাইয়া লইয়া বাইতে পারিবে। তাই হইল।

দিন-পাটেক পরে, একগাছা বালা লইয়া বুড়ী আবার আসিল। পদকটির বদলে সে আমাকে বালাগাছা রাখিতে বলিল। কিন্তু সেই কদমাদের বালাগাছা পদকের বদলে রাখিতে আমার মন সরিল না।

আমাকে লুকাইয়া বুড়ী আমার স্ত্রীর কাছে গেল। তাহার বড়াবটা বোধ করি, বুড়ী বুঝিতে পারিয়াছিল। স্ত্রীকে বলি দ-করিয়া বালা রাখিয়া সে পদকটি লইয়া গেল।

সেইদিনই ব্যাপারটা জানিতে পারিলাম। আমার স্ত্রী একলাটি মেজের দিকে চাহিয়া বিছানার বসিয়া আগুনমনে পা টলাইতেছিল। তাহার মুখ অগ্রসর—ওঠে, একটা তিক্ত হাসির রেখা।

খুব আন্তে-আন্তে শান্তবরে বলিলাম, “দেখ, টাকা আমার। আমি নিজের মুগ্ধমত্ত সংসার চালাব। বিয়ের আগে এ-সব কথা তোমাকে ত খুলেই বলেছিলাম—যেথেকে-টেকে কিছু বলি নি।”

হঠাৎ সে মিথ্যে হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিল।
তারপর,—বল্লভে যা ভাবি নাট, তাই
হইল।—বাঘিনীর মত আমার ঘাড়
কাঁপাইয়া পড়িয়া আমাকে সে দুই-হাতে
এলপাতাড়ি মাটিতে লাগিল!! বিশ্বদে
স্বয়ং হঠাৎ আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম।

একটু পরেই আপনাকে সামলাইয়া
লইলাম। তেমনি শান্তভাবেই বলিলাম,
“আজ থেকে সংসারের কোন কথার তুমি
খাঙ্কতে পারবে না।”

অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া সে চলিয়া গেল।

সামান্যদেয় ভিতরে সে বাড়ীতে আসিল
না। বিবাহের সূত্র ছিল, আমার হুকুম
ছাড়া সে বাড়ীর বাহিরে পা দাঁড়াইতে
পারিবে না।—যাক্ ; সন্ধ্যা-নাগাধ আমার জী
বাড়ীতে ফিরিল।

পরদিনও সেই ব্যাপার। সকালে সে
চলিয়া গেল, বৈকালে ফিরিল।

বোকাবাপট বন্ধ করিয়া আমি তার
পিসীদের কাছে গেলাম। আমার জী
সেখানে নাট। তাহাদের কাছে সব খুলিয়া
বলিলাম। তাহা শুধুনে ভক্তিতে হাসিয়া
চলিয়া পড়িয়া বলিল, “তুমি তাহলে বৈষ্ণব
নীতিমত কল্ম হইবে?”—আমিও তুমি
উত্তরের আশা করিয়াছিলাম।

বাহা হউক, পিসীদের একজনকে ঘূষ
দিয়া হাত করিলাম। দুদিন পরে তার
মুখে জানা গেল, এই ব্যাপারের সঙ্গে
কর্ণেল একিমোস্তিচের সংশ্রব আছে।

কর্ণেল একিমোস্তিচের সঙ্গে আমি এক
সেনাপনে কাজ করিয়াছিলাম। আমাদের
দুজনে একটুও বনিবনাও ছিল না। আমার

জীর সঙ্গে কিসের সম্পর্ক তার ?
আমি কাঁপিতে লাগিলাম।

মাসখানেক আগে ঐকটা কালের
অজিয়ার কর্ণেল আমার দোকানে “সংসার-
ছিল। কিন্তু আমার জীর সঙ্গে “হীন-
মস্তরা করতে সেইদিনই • তাকে বধন
করিয়া গিয়াছিলাম, • সে-বেন কের আমার
দোকানে না আসে।

পিসী বলিল, “ও-পাড়ার জুলিয়াকে
চেন ত ? তোমার জী তার বাড়ীতে
আসা-বাওয়া করে। • কর্ণেল, তোমার জীর
সঙ্গে দেখা করিবে দেবার অস্ত্রে জুলিয়াকে
হাত করেছে।”

আজ্ঞা,—আমার চোখে ধূলা দেওয়া
বড় লোভা কথা নয়। জুলিয়া যে ঘরে
থাকে, • গোপনে তার পানের বরখানি
ভাড়া লইলাম। ইতিমধ্যে আর—একটা
ঘটনা • ঘটিল।

স্মৃতির আগেই আমার জী ফিরিয়া
আসিল।

বিছানার বলিয়া পা দুলাইতে-দুলাইতে
আমার দিকে সে পর্জিতভাবে চাহিয়া রহিল।

আমি মাসখানেক হইতে • সে-বেন কের
একরকম হইয়া গিয়াছে। যেন সে সর্বদাই
অগভীর অস্ত্র প্রস্তুত।

হঠাৎ তাহার চোখ জলিয়া উঠিল।
সে আমাকে বলিল, “তুমি বস্তুত করিতে
চাওনি বলে তোমাকে নাকি কোল থেকে
ভাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ?”

—“হ্যাঁ, আমাকে অস্ত্র এক • সেনাপনে
কাজ করতে বলা হয়েছিল। তাই আমি
কানে অব্যব দি।”

—“তাহলে ভীকু বণে তুমি কর্ণচ্যুত হয়েছ ?”

—“লোকের ঠান্ডাই বলে থাকে বটে। কিন্তু আমি যে ধন্যবুদ্ধ করিনি—কাপুরুষতা ‘ভাল’ আসল কারণ নয়।”—আমি তখন সখিতারে সমস্ত কথা বর্ণন করিলাম।

দুগার দৃষ্টিতে আমান দিকে চাহিয়া সে বলিল, “শুনলাম, কোন্ ছেড়ে তুমি নাকি রাতার রাতার ডিকে মেগে বেড়াতে ?”

—“হ্যাঁ, আমার মাথার উপর ঘিের অনেক টাংকের ঝড় বয়ে গেছে! সে ঝড়ে আমি একটু টলেছিলাম বটে,—কিন্তু একেবারে নয়কে গিরে পড়ি নি! আজ আবার সে পুরোণো কথা কেন?—সেদিন ত আমার চলে গেছে।”

—“হঁ, এখন যে তুমি টাকার মাল্লব,—মত্ত পোদ্দার!”

আমার ব্যবসার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া সে আমাকে ছোট করিতে চায়!—তার ঘি-খুসি, কলক-গে,—ত্রীলোকের কথার অধীর হওয়া উচিত নয়!

বর্তমানের পরে ‘সে’ সাধ গোছ করিয়া আসিল। আমার সামনে ঝড়াইয়া বলিল, “বিরেত আশে এসব ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও তুমি ত আমাকে বল নি!”

আমি তার কথার কাণ দিলাম না,—সেও কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা লুকাইয়া-লুকাইয়া জুলিয়ায় বাড়ীতে গেলাম। যে ঘরখানা ভাড়া লইয়াছিলাম, তার পাশেই জুলিয়ায়

বৈঠকখানা; মাঝে দেওয়াল,—তাহাতে একটি দরজা। আমি সেই দরজার কাণ পাতিয়া ঝড়াইয়া রহিলাম। আমার পকেটে একটা গুলি-স্তরা পিত্তল ছিল।

দরজার আড়ালে দুইখটাকাল শুকভাবে ঝড়াইয়া তাহারের সমস্ত কথাবার্তা শুনিলাম।

সেই লম্পট কর্ণকে যে কথাগুলি সে বলিল, তাহা কি সহজ, কি সরস, কি সতেজ! কর্ণের প্রেম-আনানো ডাব-ভাজি হা-হতাশ, মিনতি, সে চ-কথার হাসি-টিটকারির চোটে উড়াইয়া দিল। শেষকালে মরিয়া হইয়া কর্ণে আমার জীর পায়ের তলায় বলিয়া পড়িল।

আমার মনের ঘোঁকা তখনও যায় নাই; জ্বালালাম—এসব চক্ষে মেরেলি চঃ। সে তার ক্ষমার বাড়াইতে চায়, কর্ণের কাছ, তাই সে সহজে আত্মসমর্পণ করিতে রাজি নয়।

কিন্তু, একটু পরেই আমার ভ্রম বুঝিলাম; না, তাহার চরিত্র দিনের আলোর মত পরিষ্কার, তাহাকে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই,—সে সত্যী, দুঃখের মত নির্মল।

সংসারে অনিচ্ছা, এই সরলা বালিকা, মনে-মনে আমাকে ঘৃণা করে; তাই এ হাঙ্গামার সঙ্গে না-জানিয়া আপনাকে সে ঝড়াইয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু ব্যাপারটা সদিন হইয়া ঝড়াইবামাত্র তাহার চোখ খুলিয়া গিয়াছে। সে ভাবিয়াছিল, আমাকে কোন রকমে অপহৃত করিবে।—কিন্তু যখন সে বুঝিয়াছে, আমাকে আহত করিতে আসিলে তাহার অমল স্বভাবও অনাহত থাকিবে না, তখন সে করিয়া ঝড়াইয়াছে।

কর্ণেলের কাকূতি-মিনতিতে তার মন একটুও তিরিঙ্গ না। বরং চোখা-চোখা বাক্যবাহনে, কর্ণেলকে সে নাগ্নানাবুদ করিয়া তুলিল।

তখন সবদিকে হতাশ হইয়া, এই অলম্বাটা এমনি রাগিয়া উঠিল যে, আমার ভয় হইতে লাগিল, এইবারে বুঝি না সে আমার স্ত্রীকে মারধর করিয়াই বসে! -

বন্ধুর মত সহজভাবে, বরু ছাড়িয়া বাহিরে আসিলাম। আমার মনের সব মরণা ঘুইয়া গিয়াছে; আমাকে স্তম্ভ করিলেও সে যখন অসত্য নয়—তখন করুক আমাকে স্তম্ভ—কি তাতে আসে যায়?

হঠাৎ তাদের ঘরের দরজা খুলিয়া দিলাম। কর্ণেল তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল। আমি সোবা পিঁপা স্ত্রীর হাত ধরিয়া বলিলাম, 'এস, বাড়ী এস।'

কর্ণেল ততক্ষণে বিষয়ের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়াছে। সে চোঁচাইয়া বলিল, 'নিরে বাও বাবা, নিরে বাও! যদিও কোন ভক্তলোক তোমার সঙ্গে আলাপ কর্তে চাইবে না—তবু—'

তাহার কথা শেব হইবার আগেই আমার ঘর থেকে বাহির হইয়া পড়িলাম। আমার স্ত্রী কোন আপত্তি করিল না,—সমস্ত বেখিচা-ভুনিয়া সে-যেন একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছে! কিন্তু তার এ ভাবটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না।

বাড়ীতে আসিয়া সে একখানা চেয়ারের উপরে বসিয়া পড়িল। তারপর দ্বিঃপ্তিতে আমার দিকে তাকাইয়া রহিল।

তার মুখ খড়ির মত শাদা। কিন্তু, তখনও তাহার চক্ষে সেই নির্দিষ্ট দৃষ্টি এবং ওঠে সেই নিষ্ঠুর হাতের আভাস। সে-যেন ঠিক করিয়াছে, আমি তাকে শুনি শুনি মারিব!

পিতৃলতা পকেট হইতে বাহির করিয়া টেনিসের উপরে রাখিলাম। সেইদিকে সে নিম্পলকনেও চাহিয়া রহিল। আমার কাঁচ থেকে সেও শিশুল ছুড়িতে শিখিয়াছিল।

কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। রাত তখন এগারোটা। আমার শরীরটাও কেমন এলাইয়া পড়িয়াছিল।

আরও ঘটাবানেক সে দেখানে ছিল, সেইখানেই মুষ্টি মত বসিয়া রহিল। তারপর গোবাক পরিয়াই সোকার উপরে শুইয়া পড়িল। এই প্রথম সে আমাকে ছাড়িয়া একলা ঘুমাইল।—এ-টুকু মনে রাখিবার কথা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হঃস্বপ্নের স্বপ্তি

তারপর সেই জীবন ঘটনা!

আমার ঘুম যখন ভাঙ্গিয়া গেল, ঘরের ভিতরে তখন ভোরের আলো ছকিয়াছে।

একেবারে সজ্ঞানে জাগিয়া উঠিলাম। চোখ চাঁচাইয়া দেখি, আমার স্ত্রী টেনিসের কাছে দাঁড়াইয়া—তাহার হাতে শিশুল। আমি যে কাগিয়াছি, সে তা দেখে নাই। হঠাৎ সে আমার দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। আমিও অমনি চোখ মুদিলাম।

বিছানার পাশে আসিয়া আমার উপরে

সে সুকিরা পড়িল। আমি সব শুনিতে
পাইতেছি। নীরবতা যেন ধ্বংস করিতেছে
—সে নীরবতাও যেন কাণ পাতিয়া শোনা
যায় !

সে একটু নড়িল; ভয়ে-বিস্ময়ে সচমুখ
আমার চোখের পাখা খুলিয়া গেল।
সে-ও আমার চোখের দিকে চাহিল,—
পিতৃলের মলী তখন ঠিক আমার
রগের উপর। চকিতে হৃদয়ের চাহনি
মিলিল। প্রাণপণে আমার আমি চোখ
খুলিলাম। যা-খাতক কপালে,—আর চোখ
চাহিব না, আর নড়িব না,—না, কিছুতেই
না।

প্রথম ঘুম ভাঙ্গিলেই ঠাণ্ডাকে প্রায়ই
একবার মাথা তুলিয়া চোখ চাহিয়া দেখে,
—অবার ঘুমাইয়া পড়ে। আমাকে চোখ
মুদ্রিতে দেখিয়া আমার স্রীত ভাবিল, আমি
নিশ্চয়ই ঘুমাতেছি। নহিলে, এমন
ব্যাপার দেখিয়াও কেউ কি কখনো চোখের
পাখী মুদ্রিতে পারে ?

কঁধার আঁঠে, গুড়ীর খানেক ধারে,
খুব উচু কাঠাডের উপে গিয়া 'দাঁড়াইলে,
নিচে কাঁপাইয়া পড়িবার ভয় লোকের
মনে 'একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা প্রবল হইয়া
উঠে।

আমার নিজেরও বিশ্বাস, সঙ্গিন বহুদূরে
কেবলমাত্র অত্র ভাতে লগরার দরুনট,
পৃথিবীতে নিত্য এত হত্যা ও আত্মহত্যা
ঘটে।—ঠিক সময়টিতে যদি লোকের মতি
অত্মদিকে ফিরাইয়া সেওরা হয়, তবে
অনেক চূর্ণটনা নিবারণ করা যায়। আমি
যে সব দেখিয়াছি এবং দেখিয়াও তাহার

হার্ডে যে মরণের কল্প প্রস্তুত হইয়া আছে,
আমার স্রী যদি এমন অসুস্থমানও করে,
তবে সে ভালি না চালাইতেও পারে।

সেই নিষ্ঠুর স্তম্ভতা।—হঠাৎ আমার
চুলের তলায় ইল্যাতের মতল লাল অসুস্থ
করিলাম। আর কি আমি বাঁচিব ? সে
আশা খুব কম। আর, যে নারীকে প্রাণের
মতই ভালুগানি, সেই নারীই যদি আমার
প্রাণ নিতে চায়, তবে কি কাজ সে ছার
প্রাণে ?

সে যদি বুঝিয়া থাকে যে আমি ঘুমাইয়া
নাই, তবে বুঝুক, কাপুরুষতার অপবাদে
কোলে আমার কাজ গেলেও, আমি
কাপুরুষ নহি।

আজ্ঞা, আমি তখন আয়রকার চেঁচা
করি নাও কেন ? কি-জানি ! তারপরেও
বতবার কথটা ভাবিয়াছি, ততবারই
আমার বুকের রক্ত হিম হইয়া গিয়াছে।
আমার আর কি আছে, যা বাঁচাইতে
চাহিব ?—আমার আত্মা তখন মুক্তি হইয়া
পড়িয়াছিল।—কি বাঁচাইব, কিসের ভয় ?
আমার পে ভয়ঙ্করনের ব্যথা বুঝিবে, এখন
এমনো কে আছে ?

—লোকের পর লোক বাইতেছে, কিন্তু
যরের সৈ নীরবতা মুক্তার মত হির হইয়া
আছে ! আমার প্রাণের তলে তলে চেতনা
যেন উথলিয়া উঠিতেছিল ! কপালের উপরে
খুঁতলটা তখনও মরণ্যনি উল্গারের ভয়
প্রস্তুত।

চকিতে প্রাণে আশার চমক লাগিল।
হঠাৎ চোখ মেলিয়া দেখি,—আমার স্রী

আর ঘরে নাই। একলাকে শয্যা ছাড়িয়া উঠিলাম। আমারই জিৎ। তাকে আমি চিরকালের ভরে হারাইয়া দিরাছি।

পানের ঘরে গিয়া নীরবে টেবিলের সামনে বসিয়া পড়িলাম। এবং চাদের পেরাণা তুলিয়া গইলাম।

খানিকপরে তাহার দিকে চাহিলাম। তার মুখ ঘেন মড়ার মুখ। পরচোখে তাহার দিকে তাকাইয়া আঁর্ছি দেখিয়া আপনায় পাণ্ডুব ওঠে সে একটু মৃদু হান্ত আনিবার চেষ্টা করিল। তার ভাব দেখিলে বোধ হয়, সে-ঘেন মনে-মনে নাড়াচাড়া করিতেছে যে, সেই ভরাবহ দৃষ্ট আমি দেখিতে পাইরাছি কিনা?

বাগর-নাগরার পর বাগর হইতে একখানা লোহার খাট ও একটা পর্দা কিনিয়া আনিলাম। পরন-কক্ষের পানের ঘরে সেই লোহার খাটখানা পাতিয়া উপরে

পর্দা টানাইয়া দিলাম। আজ থেকে আমার স্ত্রী এইখানে পরন করিবে,—যদিও কথটা তাকে মুখ হুটিয়া আর বলিলাম না।

এই নুতন বন্দোবস্ত প্ৰদর্শিয়া সে হুঁকি দে, আমি সব দেখিয়াছি, সব জানিয়াছি। সে রাত্তি টেবিলের উপরেই শিল্পটপ তেমনি ফেলিয়া রাখিলাম।

সে তার নুতন বিছানার গিয়া শুইয়া পড়িল। আমাদের বিবাহের বীধন আজ থেকে টুটিয়া গেল। তাকে জর করিলাম বটে, কিন্তু ক্ষমা করি ম না। রাত্তি বর্ত বনাইয়া আসে, সে-ও তত ছটফট করিতে থাকে। সকালে তাহার খুব জর আসিল। এইভাবে সাতটি সপ্তাহ জরের মধ্যে সে বিছানার পড়িয়া রহিল।

(ক্রমশ)

ঐহেমেন্ত্রকুমার রায়।

দাঁড়িপাল্লা

তুল্যদণ্ড—সাদাকথার বার নাম দাঁড়িপাল্লা, সকলেরই পরিচিত। কিন্তু এই তুল্যদণ্ড যে কত-রকমের আছে এবং দেশ, কাল ও অবস্থান্তরে ইহার যে কত বৈচিত্র্য তাহা আমাদের সকলের জানা না থাকিতে পারে। সেইজন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

হাটে বাজারে বোকানী পদারীর কাছে সাধারণত যে দাঁড়িপাল্লা থাকে তার কথা

বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। তাহার গঠন, তাহার ওজনসম্পাদী যোটা-মুটি আমাদের সকলেরই জানা আছে। এবং বিহার জানা নাই তাহার যে এ ভবের হাটের যোলা-কড়াই কাণা তাহাতে সন্দেহ নাই।

যেখানে সাহিত্য, শিল্পকলা গইয়া আলোচনা চলিতেছে সেখানে ইহাও দাঁড়িপাল্লার কথা তোলাইতে অনেক আশ্চর্য

হইতে পারেন এবং আমাকে বৈয়াক্ষিক ঠাণ্ডারহাতে পর্ত্বেন। কিন্তু ওজন জিনিষটা সাহিত্য-ব্যাপারীদের কাছে কি মিঠাহুই তুচ্ছ? আজকাল তো সাহিত্যসমালোচকদের যুগ্ম শোনা ঘাইতেছে যে সাহিত্যে আমাদের ওজন-জ্ঞানের ভাবি অভাব।

কোন ওজনে সাহিত্যের মাপ হয় সেই গুঢ় সম্বন্ধটি বিতে পাণ্ডিলে খুঁদী হইতাম। কিন্তু আপাতত যখন তাহা পারিতেছিলা তখন এই মূল ভিনিয়ের ওজন লইয়াই আশোচনা করা যাক।

দুপাশে দুই পাশা দিয়া দাঁড়ির দুটধারে তাহা ঝুলাইয়া এবং দাঁড়ির ঐকি মাঝখানে একটা মাপকাঠি রাখিয়া সাধারণত জিনিষ ওজন-করা হয়। ছোট জিনিষ ওজন করিবার, ক্ষুদ্র হাতে-ধরা দাঁড়িপাল্লা এবং বড় ভারি জিনিষের ক্ষুদ্র কোম শক্ত জিনিষ হইতে খোলানো দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করা হয়। একপাল্লার ওজন, আর-একপাল্লার জিনিষ রাখিয়া, দুই পাশা সমান হইলে ঐকি ওজন হইল ধরা হয়। অথবা এই সহজ ব্যাপারটার মধ্যেও চল-চাকুরী চলিতে পারে। একটা আঙুলের টিপনি কিংবা পাল্লাকে দোল খাওয়াইয়া ওজন চুরি চলে। সে সব কথার আমাদের কাজ নাট, থাকার। এই চল-চাকুরীতে ঠিকিতেছেন এবং বাহারা এই দুনিয়া হইতে চলচাকুরী দূর করিতে চান তাঁহারা ঐ কথা লইয়া আশোচনা করুন; আমি কেবল দাঁড়িপাল্লার গঠন লইয়াই ব্যাপৃত থাকিব।

মোট ভিনিয়ের ক্ষুদ্র পূর্ণোক্তক্লপ

মোটাক্ষের দাঁড়িপাল্লার চলে কিন্তু যুগ্ম ভিনিয়ের ক্ষুদ্র-গড়নের দাঁড়িপাল্লা অর্থাৎ নিক্তির দরকার। এই নিক্তির ওজনে ত্রিল পরিমাণ, এমন কি তার চেয়েও কম, ঐকি-ঐকি না হয় তার ক্ষুদ্র অনেক কোণল করা হইয়াছে। আশপাশের বাধার দিক লক্ষ্য রাখিয়া তবে এই সব নিক্তি তৈরি হইয়াছে। দাঁড়িপাল্লার দাঁড়িতে যে তিনটি (দুই পাশার দুই এবং মাঝের মাপকাঠির এক) বন্ধন আছে তাহাতে ত্রি তিন স্থানে আটক খাইয়া দাঁড়ির নড়াচড়ার ব্যাঘাত ঘটিল ওজনের দোষ হইতে পারে, সেইক্ষুদ্র দাঁড়ির একমুখে বায়াল ইম্পাক্ট (wedge) 'ওয়েজ'র আকার এবং আর-এক মুখে মন্থন অথচ শক্ত কোনরকম পাথর দিয়া উহার গতি সহজ করিয়া দেওয়া হয়; আর হাঁওরিতে নড়া বন্ধ করিবার ক্ষুদ্র কাচের বাস্তবের মধ্যে ওজন করা হয়; এমন কি ত্যাক্সমের মধ্যে, অর্থাৎ হাওয়া সম্পূর্ণরূপে বাহির করিয়া কোন-কিছুর মধ্যেও ওজনের ব্যবস্থা আছে। বৈজ্ঞানিক বা রাসায়নিক পরীক্ষার ক্ষুদ্র এইরূপ যুগ্ম ওজনের দরকার। এইরূপ ত্রুণদণ্ডের ব্যবহার অতি সৌকর্য্যতার সহিত করিতে হয়। নরত তাহা সহজেই ডালিয়া অকর্ষণ্য হইয়া পড়ে। পাশা দুইটি শূন্যে ঝুলিতে থাকিলে ক্রমাগত উত্তিতে-নামিতে থাকে, কাজেই ওজন ঐকি করা শক্ত হয়, সেইক্ষুদ্র পাশাদুটিকে সমতল স্থানে রাখিয়া তাহার উপর একদগে ওজন ও জিনিষ চাপাইয়া তারপর পাশাদুটিকে শূন্যে তুলি-বার ব্যবস্থা করিলে ওজনের সুরিধা হয়।

হুস্মানি হুস্ম ওজন নির্ণয় করিবার ক্ষমতা
এইরূপ অনেক প্রকার ব্যবস্থা আছে।

টাকশালে একপ্রকার অদৃশ্য রকমের
তুলনিত আছে। তাহাকে আটোমেটিক
কেন অর্থাৎ স্বাভাবিক বা স্বতন্ত্র তুলনিত
বলা যাইতে পারে। রূপার পাত প্রস্তুত করিয়া
একটা কল চালাইয়া দেওয়া হয়; সেখানে
ছাপ খাইয়া গোল গোল টাকা প্রস্তুত হইয়া
বাহির হইতে থাকে; যদি কোন কারণে কোন
টাকার কিছু দোষ থাকিলে বাহ,
কিন্তু ওজন যদি কম-বেশি হয় তাহা
জানিবার জন্য প্রত্যেক টাকার পরীক্ষা
হইয়া থাকে। ওজনের জন্য একটা চোঙের
মধ্যে অনেক টাকা একটির উপর একটি
—এইভাবে সাজান হয়। কলের মধ্যে একটি
একটি করিয়া টাকা আপনা-হঠাতে পান্নার
উপর গিয়া পড়ে। যদি ওজন ঠিক হয়
তবে টাকাটি ঠিক নিচে একটি পাঞ্জের উপর
পড়ে; যদি বেশি ওজন হয় তাহা হইলে
দক্ষিণ দিক দিয়া গড়াইয়া একটি চোঙের
মধ্য দিয়া অপর এক পাঞ্জে পড়ে।
সেইরূপ হাডা টাকাতাল বাম ধারে পড়িয়া
আর এক পাঞ্জে গড় হয়। বৈজ্ঞানিক
শক্তির দ্বারা এই কলে একটি-একটি
করিয়া টাকা তুলনিতের পান্নার উপর
আসিয়া পড়ে, অল্পকণ ভাবের উপর থাকে
এবং ওজন হঠাৎ যে-ধারে পড়া উচিত,
সেই ধারে গিয়া পড়ে। কলে ওজন ঠিকমত
হইতেছে কিনা মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিয়া
দেখিতে হয়। কারণ, কলের কোন
প্রকার দোষ হইলেই ওজন ভুল হইবে না।
প্রত্যেক কল একঘণ্টা বা দুইঘণ্টা অন্তর

পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার পদ্ধতি এই :—

অত্র বাড়ি-পান্নার কয়েকটি টাকা আগে
ওজন করিয়া দেয়া হয়; তারপর সেই
টাকাতাল কলের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া
হয় যে তারি টাকা তারির দিকে, আর
সমান টাকা সমানের দিকে আর হাডা
টাকা হাডার দিকে বাইতেছে কিনা। কলের
দোষ হইলে তাহা শুধরাইবার উপায়
আছে। এই কার্যের জন্য শিল্পিত
ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত আছে।

তুলনিতের অনেক প্রকার আকার
আছে। প্রায়ের সাহায্যে একপ্রকার
তুলনিত নির্মিত হইয়া থাকে। কোন
প্রকার ধাতুনির্মিত সূত্র বা মোটা তারকে
বীকাইয়া বাকটিয়া এক বা কয়েক কের
করিলে প্রায় তৈয়ারি হয়। কোন-একটি
প্রায়কে চালাইয়া ছোট করিতে বা টানিয়া
সাজাইতে তার লাগে। নির্দিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন
ওজনের তার চালাইয়া বা টানিয়া প্রায়
কতটা চালাইয়া বা কতটা বাড়িয়া
যায় তাহা পরীক্ষা করিয়া প্রায়-সংযুক্ত
একটি স্কেট বা পাঞ্জে তাহার চিহ্ন করা
হয়। সেই চিহ্নের পাঞ্জে শুল্ক ওজন
লেখা থাকে। এইরূপ তুলনিতের সাহায্যে
চিঠিপত্র বা ডাকের পার্সেল ওজন
হইয়া থাকে। অনেক সময় ডাকহাওয়ার
এইরূপ তুলনিতের সাহায্যে সোজা বা
যে-কোন মাত্রার বেহের ওজন নির্ণয়
করিয়া থাকেন। এইরূপ তুলনিতের দোষ
এই যে, প্রায় আলগা হইয়া গেলে আর ঠিক
ওজন পাওয়া যায় না।

দুইপাশে দুইটা নয়, কেবল একপাশে

একটা পান্না দেওয়া একরকম তুলানও আছে। এইরূপ তুলানওের ব্যবহার উড়িয়া-প্রদেশের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর বি, এল, চৌধুরি মণ্ডলের মাত্রাজ প্রেসিডেন্সির গুলাম জিলায় রস্তা নামক স্থানে এবং পুরীর এলাকাধীন চিঞ্চাঙ্গদের নিকটবর্তী বহুল নামক স্থানে এইরূপ তুলানওের ব্যবহার দেখিয়া আসিগা ভাষার বিবরণ এসিগাটিক সোসাইটির কার্ণল নামক মাসিকপত্রের ১১১ সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি রস্তায় এইরূপ হুইট তুলানও ক্রয় করিয়াছিলেন। সে-দেশে ইহার নাম বিশাডাঙ্গা। ইহা ভারি ও লক্ষ শালকাঠের তৈয়ারি। কাট অর্থাৎ দণ্ডটি গোল; একদিকে মোটা হইতে ক্রমশঃ অপর দিকে সূক্ষ্ম হইয়া আসিয়াছে। সূক্ষ্ম দিকের প্রায় শেষভাগে একটি ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়া একটি দড়ি বাঁধিয়া তাহাতে একটি পান্না ফুলান থাকে। বৈত দা ককি বা বাখারি দিয়া পান্নাটি তৈয়ারি হয়। দড়িটির উপরে ১৭টি গোল লগ কাঠকে বেঁধেন করিয়া বোঁদা আছে। ৬, ১১, ১৩, এবং ১৬ নং দাগে একটি করিয়া X এইরূপ চিহ্ন দাগ আছে। কোন কিনিষ ওজন করিতে হইলে পান্নাতে তাহা রাখিয়া কাঠটি অর্থাৎ দণ্ডটি একটি দড়ি দিয়া তুলাইয়া ধরিতে হয়। দড়িটি সরাইয়া সরাইয়া দেখিতে হয় কোন দাগের উপর রাখিলে দণ্ড ঠিক সোজা থাকে। প্রত্যেক দাগের একটা ওজন নির্দিষ্ট আছে।

বর্ণা—

নং ১, প্রথম দাগ—কোন ওজন হয় না। ইহা পান্নার পায়গনরূপ।

২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০
৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০	
৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০		
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০			
৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০				
৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০					
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০						
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০							
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০								
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০									
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০										
১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০											
১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০												
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮																																																																											

আধা বিশা

১৪ চতুর্দশ ১৮ ১০৮
১৫ পঞ্চদশ ২০ ১২০
১৬ ষোড়শ ২৫ ১৫০
১৭ সপ্তদশ ৩০ ১৮০ বা ১ বিশা
দণ্ডে দাগ করিবার পূর্বে নির্দিষ্ট
ওজনের কিনিষ পান্নার রাখিয়া পরীক্ষা
করা হয় এবং দণ্ডের যে স্থানে দড়ি
ধরিলে সেই ওজনের কিনিষ লইয়া দণ্ড
ঠিক সোজা থাকে সেই স্থানে দাগ করা
হয়। উপরে যে ওজনের পরিমাণ দেওয়া
হইল তাহার দাগ দণ্ডের মোটা দিক
হইতে আরম্ভ। কোন কোন বিশা ডালার
২০ পল (অর্থাৎ ১২০ তোলা) বা ১৮ পল
(অর্থাৎ ১০৮ তোলা) অবধি মাপ থাকে।
চৌধুরী-মণ্ডলের অনুমান করেন যে, যে-সব
দেশে উড়িয়া ভাষার অধিকার সেই-সব
দেশে বিশা ডালার ওজন প্রচলিত আছে।

এই ধরণের তুলানও ভারতবর্ষের অসংখ্য স্থানেও পাওয়া যায়। ইহার কয়েকটি নমুনা কলিকাতার বাত্মঘরে আছে। ছোটনাগপুরের একটি তুলানও সেখানে আছে। ইহা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ইহা এক ফুটের চেয়ে কিছু বেশি লম্বা। তারি শাল-কাঠের তৈয়ারি। দণ্ডটি ছটভাগে বিভক্ত। একটু ভাগ গোল ও মোটা, অপর ভাগটিও গোল কিন্তু সরু, এবং সেই ভাগ শেষের দিকে আরও সরু হইয়া গিয়াছে। এটু সরু ভাগটিকে খেঁচন করিয়া ছয়টি গোল দাগ আছে। সরু ভাগের শেষদিকে এক ছিদ্র আছে। এটু, ছিদ্রের মধ্যে দড়ি ঢকাইয়া তাহাতে পাল্লা স্থানান হয়। পাল্লাটি পাতলা চেপটা কাঠের তৈয়ারি, তাহার চারি একাংশে চারিটি ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রগুলির মধ্যে স্থতা প্রবেশ করাটরা সেট স্থতাগুলি একত্র করিয়া দণ্ডের ছিদ্রের মধ্যে দিয়া আটকানো আছে। ছয়টি বে দাগ আছে তাহার প্রথম দাগে দড়ি দিয়া দণ্ডটি স্থলাইলে পাল্লার ওজন দণ্ড সোজা থাকে। দ্বিতীয় দাগে ধরিলে, দুই তোলা ওজন খাওয়াইলে দণ্ড সোজা থাকে। এষ্টরূপ তৃতীয় দাগে চারি তোলা, চতুর্থ দাগে ছয় তোলা, পঞ্চম দাগে আট তোলা, ষষ্ঠ দাগে বার তোলা ওজন হয়। এই দণ্ডের গড়ন বড় মোটা, অপরিষ্কার।

চাকা হইতে এষ্টরূপ এক তুলানও পাওয়া যায়; তাহা কলিকাতার বাত্মঘরে আছে। তাহার মাশের চিহ্ন ঠিক ছোট-

নাগপুরের দণ্ডের মত। কিন্তু ইহার নির্মাণ-কৌশলে উটুদরের কারিগরি বৈদগ্ধ্য বার।

অ্যাস্তর্গোর বিষয় যে, উড়িয়া দেশে প্রচলিত বিশাভাঙ্গা নামক তুলানওঁদু অল্পরূপ তুলানও অর্থাৎ বৌদগুজের মধ্যে ফেরা বৌদের অসংখ্য আতিদের তিত্তর প্রচলিত আছে। নিকটবর্তী দক্ষিণেন্দিয়ার অপর অপর প্রদেশেও এইরূপ তুলানওঁদের ব্যবহার চলে। সেখানে ইহার নাম বিশ্মের বা বিশ্মার। উড়িয়ার বিশাভাঙ্গা নাম এট নামের অল্পরূপ। পরম্পরের মধ্যে কোনপ্রকার সম্বন্ধ আছে কি না জানিবার উপায় নাই। বিশাভাঙ্গা এই শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধি করিতে গিয়া কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন যে, ২০ পলে এক ঐদগ্ধ্য হয়, এই পল উড়িয়ার মধ্যে সর্বত্রই প্রচলিত তোলা; সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ শব্দের রূপান্তরে বিশা শব্দ হইতে পারে কিন্তু উড়িয়ার সর্বত্রই সংস্কৃত বিশেষ পরিবর্তে বিশ না বলিয়া কুড়ি বলা হইয়া থাকে। কাজেট - বিশাভাঙ্গার 'বিশা' বিশেষের অপভ্রংশ না হইতেও পারে।

উড়িয়া-প্রদেশের যে বিশাভাঙ্গার কথা বলা হইল, সামান্য দোকানদার ও গ্রামের লোকেরাই তাহার সাহায্যে ওজন তুরিয়া থাকে। মহাজন ও বড় ব্যবসাদারেরা এখনকার প্রচলিত দাড়িপাল্লার মত তরাজুতে করিয়া সকল জিনিষ ওজন করিয়া থাকে। গ্রামবাসীদের মধ্যে আর-একপ্রকার ওজন প্রচলিত আছে। ইহাতে দাড়িপাল্লার প্রয়োজন হয় না। কেবল একটা নির্দিষ্ট মাশের পাত্র থাকে ও সেই পাত্রে সেই

মাশের তির তির অংশের মাপ দাখ দিয়া চিহ্নিত করা থাকে। এইরূপে মাপ করিয়া চাল, দাল, ধান, গুড়, ঘি, হুখ, আটা ইত্যাদি খুচরা বিক্রয় হইয়া থাকে। এই মাশের নাম অঙ্কা বা ওকা। সচরাচর কাঁপা বাঁশের এক ছুঁকরা লটকা এই অঙ্কা তৈরি করা হয়। গাঁটের কাছে একমুখ বন্ধ থাকে, আর-এক মুখ খালি থাকে। ইহা আমাদের দেশের কুন্দের অমুরূপ। উড়িয়া দেশে মহাজনেরাও অঙ্কা ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের অঙ্কা লোহার তৈরি। এক অঙ্কার মাপ ৮৮ তোলা। সরকারি কারখানার ইটের মাপ পরীক্ষা করিয়া মাশের সত্যতার নিশ্চিন্দরূপ ছাপ মারিয়া দেওয়া হয়। এইগুলি ১/১০ (সতের আনা) দাখে কারখানার বিক্রয় হয়। গ্রামবাসীরা যে অঙ্কা ব্যবহার করে তাহার মাপ আনানো। ঘি, গুখ, চাল, ইত্যাদি মাপিবার অঙ্ক যে অঙ্কা ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম সিকা-অঙ্কা ও তাহার ওজন ৭৩, তোলা। কিন্তু ধান, তেল, গুড় ইত্যাদি দ্রব্য খুচরা বিক্রয়ের অঙ্ক যে অঙ্কা ব্যবহার হয়, তাহার নাম বিকা-অঙ্কা অথবা পুলসা-অঙ্কা; তাহার ওজন ৬৩ তোলা। অঙ্কার কম ও বেশি ওজনের মাপও আছে।

৪০ লতা ও বালুগাথে নিম্নলিখিত মাপ চলিত :—

৪ অঙ্কা (বাঁশের)—১ তুষার সমান। এই তুষা কাঠের তৈরী।

৪ তুষা—১ লউটির সমান। এই পাঁজ মাটি বা তামার হয়।

২০ লউটি—১ ভরন

৩ ভরন—১ গাড়ি

২ পে—১ প

২ প—১ অঙ্কা সোলা

২২ সোলা—১ বুদ বা বোরা

২ বোরা—১ অঙ্কা ৬৪ বা ৬৮ তোলা

পূর্বেকৃত প্রকারের দাঁড়িপাল্লা বাজলার কোন কোন গ্রামেও ব্যবহৃত হয়।

রেলওয়ে-স্টেশনে বা বড় বড় কারখানার মাল ওজন করিবার অঙ্ক যে 'ম্যাট্রিক' স্কেল' নামক তুল্যমতের ব্যবহার হয় তাহার নিশ্চয়-প্রণালী কতকটা জটিল। কিন্তু ইহার ওজনের বন্দোবস্ত কতকটা পূর্বেকৃত গ্রামা দাঁড়িপাল্লাই অমুরূপ। 'ম্যাট্রিক স্কেল'র একটা 'ফ্রেম' আছে। ফ্রেমটা এইরূপ :—চৌক। একটা লোহার তুলার চার কোণে চারটা ঢাকা। সেই চাকার সাঁচিয়া 'স্কেল'কে সহজে এক স্থান হইতে অঙ্ক স্থানে চালাইয়া লইয়া যাওয়া যায়। যেখানে নাড়ানাড়ি করিবার আবশ্যক না থাকে সেখানে ঢাকা থাকে না। সেই চৌক। লোহাটার সঙ্গে একটা নলের মত লোচা খাড়া করা থাকে। পূর্বেকৃত চৌক। লোহাটির ঠিক নিচে তাহার সঙ্গে ঠেকান আর একটা লোচা থাকে সেইটা পাল্লার কাণ করে। সেই নিচের লোহাটার একপাশে একটা শিকলি বা দড়ির মত কিছু দিয়া, সেটা খাড়া লোহাটার মাথার একটা অঁঙেটার খুলান থাকে; দড়ি বা শিকলিটা আঙটা হইতে খাড়া মলটির মধ্য দিয়া গিয়া নিচের লোহার সঙ্গে লাগান থাকে। নলের মত খাড়া লোহাটার মাথা থেকে বাঁকাইয়া সেটাকে পালের

দিকে রাখা হয়। এই অংশটুকু নলের মত নয়,—যেন একটা পুরু লোহার পাত নলের সহিত যুক্ত। তাহা 'ফ্রেম'র অঙ্গ। যে আঙটার কথা বলা হইয়াছে সেট আঙটার সঙ্গে লাগান দুটা 'রড' আছে। প্রথম 'রড'টি রাখিবার উদ্দেশ্য এট যে, তাহা চাপিয়া ফ্রেমের শেষভাগে একটা আঙটার আটকাইয়া দিলে নিচের পাল্লাটা উঁচু হইয়া পৃষ্ঠে ঝুলিতে থাকে, তখন তাগাতে ওজন করা যায়। চাপিয়া ও আটকাইয়া না দিলে সে 'রড' ফুট শিকল বা দড়ি ঝুলিয়া পড়ে ও পাল্লাটি মাটিতে বা মাটিসংলগ্ন লোহার ঠেকিয়া পড়ে, তখন ওজন করা যায় না। এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য এট যে, যখন ওজন করিতে না হইবে তখন পাল্লাকে ঝুলাইয়া রাখিলে পাল্লা জখম হইয়া যাউতে পারে; সেইজন্য পাল্লাকে বিশ্রাম দেওয়া দরকার। অপর 'রড' বা গীড়িটিতে কি কাজ হয় এইবার বলা যাক। যে পাল্লার কথা বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক উপরের লোহার পাতের সঙ্গে ঠেকিয়া থাকিলে তাহার উপর মাল রাখিলে পাল্লাতে ভার পড়ে। সেট ভারে এই দ্বিতীয় 'রড'টি উঁচু হইয়া পড়ে; কারণ, পাল্লার সহিত ইহা দড়ি বা শিকলি বিরা আটকান থাকে। এট দ্বিতীয় 'রড'টির শেষদিকে ওজন চাপাইলে উঠা কের নামিয়া পড়ে। পাল্লার ওজন ও এই ওজন দুই সমান হইলে 'রড'টি সোজাভাবে

থাকে, উঁচু বা নিচু হয় না। 'রড'র শেষ ভাগে ওজন ঝুলাইয়া দিলে ওজন জানা যায়। তাহা ছাড়া 'রড'র উপরে একটা ছোট ওজন থাকে, সেটাকে 'রড'র উপর সরাইয়া সরাইয়া দিলে ওজনের কম-বেশি বুঝা যায়। 'রড'র উপর চিহ্ন করা থাকে, সেই চিহ্ন চটতে ওজন বুঝা যায়। পূর্বের পরীক্ষা করিয়া এট ওজনের দাগ করা হয়। মাত্র এট দাগগুলি পূর্বোক্ত গ্রাম্য গীড়িপাল্লার দাগের অনুরূপ। অল্প কোন বিষয়ে এই দুই গীড়িপাল্লার মিল নাই।

সাধারণ ও গ্রাম্য গীড়িপাল্লার সহিত তুলনা করিলে এই 'প্লাটফর্ম' স্কেলের প্রধান প্রভেদ দেখা যায় যে, সাধারণ গীড়িপাল্লা গীড়ির ঠিক মাঝখানে ঝুলান থাকে এবং দুই পাশে দুই পাল্লা ঝুলে, আর 'প্লাটফর্ম' স্কেলে গীড়ির এক প্রান্তে একটা পাল্লা ঝুলান থাকে, অপর প্রান্ত-ভাগটি বাটখারা রাখিবার পাল্লা কার্য্য করে। এবং গীড়ির উপরে একটা বাটখারা বসাইয়া সরাইয়া সরাইয়া ওজনের ভারতমা জানা যায়। যে গ্রাম্য গীড়িপাল্লার বিষয় লেখা হইয়াছে, তাহাতে গীড়ির এক প্রান্ত ভারি থাকার দরুন এবং গীড়ির নিজের ভারেও অপর প্রান্তে ঝুলান পাল্লা জিনিষের ওজন প্রকাশ করে। ঝুলাইবার দড়িটি সরাইয়া সরাইয়া বাটখারার কার্য্য লাভ হয়। সুতরাং পৃথক বাটখারার প্রয়োজন হয় না।

দরদী

(আত্মন শেখরের গল্প হইতে)

সন্ধ্যা চর-চর। দেওয়ানী পোকার মত
তুবারকণাগুলি সজ্জালা আলোক-স্তরের
চারিদিকে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল এবং
শাশা তুলার মত চারিদিকের ঘর-
বাড়ী, ঘোড়ার পিঠ, বাগানের কাঁধ ও
ট্রপ্পার উপর পুরু হইয়া কমিতেছিল।

গাড়োয়ান আইওনার খুৎ-চোখ মাজ
যেন পাণ্ডাসপানা হইয়া গিয়াছে; কুঁজো
হইয়া অচল পাথরের মূর্তির মত সে গাড়ীর
উপর বসিয়া আছে—তাহার ভাব দেখিলে
বোধ হয়, যেন সে চিন্তা-মাগরে একবারে
তলাইয়া গিয়াছে। ঘোড়াটার অবস্থাও
তথৈবচ, সেও যেন জীবনার বিভোর।
“আহা, বেচারীরই-বা দোষ কি? এত
দিনকত্তক আগেও সে মনের খুসিতে মাঠে
লাফল টানিত।” নীল, অতান—দু-দু মাঠ
—দূর বন—প্রকৃতির প্রামল শোভা তাহার
চোখের সামনে সূটিয়া থাকিত—কিন্তু এখন?
চারিদিকে পৃথিবীর চকলতা, নরনারীর
গুণগোল ও হড়াহড়ি—উজ্জল আলোর
অবলম্ব সমাবেশ—ভারত বহো তাকে দিবারাত্র
ছুটাছুটি করিতে হইতেছে।

ছপুর হইতে আইওনা রাস্তার ধারে
দাঁড়াইয়া আছে—এ-পর্যন্ত তাহার একটীও
ভাড়াটিয়া কোটে নাই। ক্রমে সন্ধ্যা তাহার
দুপুর পক্ষপুটে সারা সহরটিকে ঢাকিয়া
ফেলিল। এই কণ্ঠহীন শান্ত সন্ধ্যার

আইওনা মনে-মনে যে কি চিন্তা-জাল বুনিতে-
ছিল, তাহা আর কেহ বুঝিতে পারিল না।

“কিরে গাড়োয়ান, ভাড়া যাবি?”

আইওনা চমকিয়া উঠিল, ভাড়াভাড়ি
চোখের পাতা হইতে তুবারের টুকরাগুলো
ঝুড়িয়া দেখিল,—একজন সৈনিকপুরুষ
গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

“বেটা, কথা শুনতে পারিলি না—
শ্রমগীর চল—এক সেকেন্ড দেরি নয়—চল,
চল”—বলিতে বলিতে লোকটি একেবারে
গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন।

গাড়োয়ান কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া
ঘোড়ার পিঠে এক চাবুক বসাইয়া দিল;
চাবুকের আঘাতে ঘোড়ার পিঠ হইতে স্তম্ভ
তুবার-কণাগুলি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।
ঘোড়াটা একটা অনিচ্ছা ও বিচ্যুতির সহিত,
গলাটা সামনের দিকে বাড়াইয়া দিয়া পা
টানিয়া-টানিয়া কোন গতিতে চলিতে আরম্ভ
করিল।

গাড়ী যে কোথা দিয়া চলিয়াছে
আইওনার সেমিকে একটুও জ্ঞপ্তি নাই,
হাতে সে কেবল লাগামটী ধরিয়া আছে মাত্র।
এমন সময় রাস্তার পাশ হইতে একজন
চীৎকার করিয়া উঠিল—“কোথাকার হতভাগা
গাড়োয়ান রে। আর-একটু হলেই চাপা
দিয়াছিল আর কি—আরে হোণো! ডানদিক
দেঁসে বা বলছি।”

সৈনিকপুরুষটিও চৌকস করিয়া বলিলেন,
“ডেনিক ঘোঁসে বাও”—

আইওনা একবার সৈনিকপুরুষের মূণের
দিকে তাকাইল, সে যেন তাঁহাকে কিছু
বলিতে চায়, কিন্তু তাহার গলা হঠাৎ একটা
অসুট কর্ণ স্বর বাতির হটল মত।

সৈনিক লিঙ্কালা করিলেন, “কি
বল্চিস্ ?”

জোর করিয়া মুখে একটু হাসির ছাঁয়া
টানিয়া আনিয়া ভাঙা-ভাঙা গলায় আইওনা
বলিল—“মশার, গেল হস্তার আমার
ছেলেটা মাঝা গেছে—তাই—”

“হঁ ; কি করে ?”

“কি করে ঠিক বলতে পারবো না—
বোধ হয় অগ্নে,—তিনদিন সে হাসপাতালে
পড়েছিল.....তারপর সব শেষ...ভগবানের
হাঙে...”

আবার মাতার অঙ্গকার হইতে শব্দ
আসিল, “কোথাকার স্মৃতিছাড়া ‘গাড়োরান
গো ; একেবারে চোখের মাঝা শেষেছে—
মরু মূখপোড়া ! কোন্ চুলোয় বাজ্জ দেখতে
পাও না—”

সৈনিকপুরুষটি বলিয়া উঠিলেন, “জোরে
খুব জোরে—এমন ঢিমে চালে চললে
সময়মত পৌঁছতে পারবো না। লাগতি
কবে চাবুক।”

ঘোড়াকে বার-দুই চাবুক কষাইয়া দিয়া
সৈনিকের দিকে সে আবার ফিরিয়া
চাহিল। তার ঠোঁট, তার মন হঠাৎ বাহ্য
উল্লিখা উঠিতেছে সেই হৃৎকের কাহিনীটা
সমস্ত একবার পুলিয়া বলে।

সৈনিক ততক্ষণে চোখ বুঁজিয়া শরম

আরামে গাড়ীর পেছালে তেলনে দিয়া
বসিষ্ঠাছেন—গরম স্নানিতে তাহার মনে
বিস্ময়মাত্র আগ্রহ নাই :

কিছুক্ষণ পরে সে আমোহীটকে যথা-
স্থানে নামাইয়া দিয়া একটা গাড়ীর আড়ার
সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। ঘুটোর পর ঘুটো
ধরিয়া তাহার উপরে আবার তুষারের
শ্বেতপ্রলেপ জমিতে লাগিল।

মাতার শাবরে ও স্ত্রীর পটাবট শব্দ
ভুলিয়া তিনটি যুবক গাড়ীর সামনে আসিয়া
থামিল। একজন বেয়ন লম্বা, আর এক
জন তেমন বৈটে।

একজন বলিল, “পলিট্রিক-পুলের সামনে
যেতে হবে—পোশাকী আমরা তিনজন, ২০
‘কোপেক ভাড়া, রাজি থাকত’ চল।”

দীর্ঘ ইকিতে তাহাবিগকে গাড়ীর ভিতরে
গিয়া বসিতে বলিয়া সে আবার গাড়ী
ছাড়িয়া দিল।

পলিট্রিক-পুলে বাইতে হইবে—মোট ২০
কোপেক ভাড়া,—হাওরে। আর যদি
তাহার ছেলেটা বাঁচিয়া থাকিত।

গাড়ীতে উঠিয়া, তিনজনে অগড়া হুক
করিয়া দিল—কে বসিবে আরকে দাঁড়াইয়া
থাকিবে, এই লইয়া শেষটা মারামারি হইবার
উপক্রম ! শেষে ঠিক হইল বৈটে গৌকটাই
দাঁড়াইয়া থাকিবে—কেননা সে মাথার খাটো।
বৈটে মানুষটি তখন অগ্রসর মনে দাঁড়াইয়া
উঠিয়া গাড়োরানের ঘাড় হাত দিয়া—“জলদি
চল, জলদি”—বলিয়া চৌকস করিতে লাগিল।

এমনসময়ে একজন বলিল, “কাল
আমি আর এক বছর লকে চার-চারটে বেতল
মদ একদমে সাবাড় করেছি।”

লম্বা লোকটা হাতের উপর হাত তুলিয়া
বলিল, “নাচক্ মন্যাকপা—গাঁকাখুঁ—চুপ।”

সে লোকটি আবার বুক তুলিয়া বলিল—
“আলবৎ সত্যি—একশোনাং সত্যি।”

এই-সব শুনিয়া আইওনা একটু হাসিয়া
মুখে মনে ভাবিল, “আ কপাল, এবার
হচ্ছে ভক্তলোক।”

এদিকে কিন্তু বেঁটে লোকটা গলাগালির
চোটে তাহাকে একেবারে মাতানাবু
করিয়া তুলিল। তাহার ভাবগ্রন্থ সেই মত
কবিয়া কাঁপিতে লাগিল—চোখের সামনে
চারিদিক অন্ধ—চারিদিকে নিরাশা।

ইতিমধ্যে আরোহীরা তাহাদের পরিচিত
এক স্তম্ভের ভগ্নে তাহাকে করিতে
করিতে গর জুড়িয়া দিয়াছে। আইওনা
তাহাদের দিকে একবার তাকাইয়া একটু
চিন্তিত করিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, “আমার
ছেলেটি গেল হস্তার মাথা গেছে।”

বেঁটে লোকটা বলিয়া উঠিল, “সেজ্ঞে
হুং কি,—আমাদেরও একদিন খেতে হবে
হে! আরে জলদি চালাও, জলদি!
আজ্ঞা যেতো ঘোড়া ত! দাওনা বাকতক
চাবুক।”

আম-একজন মধের নেশায় হুলিতে
হুলিতে “জিহ্বাসা করিল, “তোমার বিয়ে
হয়েছে ত?”

আইওনা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল,
“বিয়ে না হলে কি ছেলে হয় হুজুর!”—
একটু পানি, নিখাল টানিয়া সে আবার
বলিল, “বিয়ে ত হয়েছে, এখন মরণ হবে
কবে, তাই ভাবছি! যম যে আমাকে
একেবারে জ্বলে ধসে আছে—নইলে আমি

থাক্তে কি আমায় বুকের বাহ্যকে বুক
থেকে ছিনিয়ে নেয়!”

আইওনা খুব আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে
তাহার ছেলের মৃত্যু-কাহিনী বলিতে আরম্ভ
করিয়াছে, এমনমত্নে বেঁটে লোকটি আশ্চর্য
নিখাস ফেলিয়া বলিল, “আঃ, বাঁচা গেল।
ঠিক কারগার এসে পড়েছি—আমায় গাড়া।”

“আবার সে একাকী—আবার সেই
নিঃসঙ্গতা—সহ নিরাশা।

সে একজন দরদা খুঁজিতেছিল।
সেই লোক-চিনতার কাছে নিজের ব্যথার
কথা বলিয়া অশ্রুভরা বুকখানা সে একটু
হাল্কা করিয়া লইবে ভাবিয়াছিল,—কিন্তু,
তাহার কথাই কেউ ত কান পাতিল না।

বাধা পাওয়া হুঃখের বেদনার সে
একেবারে জর্জরিত হইয়া উঠিল। রাজার
নব-নারীর স্রোত চলিয়াছে। তাহার
চোখজুড়ী তর তর করিয়া দেখে জনতার মধ্যে
এমন একটা লোককে খুঁজিতে লাগিল,
তাহার হুঃখের কথা শুনিতে বাহার অপত্তি
নাই। কিন্তু হাঃসে কপাল, সেই নিষ্ঠুর
জন-স্রোত ক্রমাগতই আসিতে আর যাইতে
লাগিল—তাহার দিকে কেহ চাহিয়াও দেখিল
না। তাহার জ্বর-তটের বন্ধনে আবদ্ধ এই যে
সম্মত-সমান অগাধ বেদনা জ্বালাইয়া আছে,
এ যদি একবার উপছাইয়া পড়ে, তবে
সারা পুণিবাটাই বুক ভাঁসিয়া যায়।

মাথার খড়ের বোঝা লইয়া একটা লোক
যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া আইওনা
বলিল, “ভায়া, কটা বেজেছে বলতে পার?”

“রাত দশটা হবে—এত রাতে এখানে!
—এগিরে পড়—” বলিয়াই সে চলিয়া গেল।

আইওনা বোড়া হাঁকাইয়া খানিকটা অগ্রসর হইয়া আবার খানিরা পড়িল। তখনও তাহার আশা আছে একটা লোক পায়ে তো তাহাকে মনের চুপেটা বলিয়া একবার হাঁপ ছাড়িয়া যাচ্ছে। কিন্তু তার, এ অগতে চুপের কথা কান দেয় এমন লোক কই! তাহার মাথাটা একবার ঘুরিয়া উঠিল, —গাড়ীর উপর থেকে পড়িয়া যায় আরম্ভক! কিন্তু কোনরকমে আপনাকে সামলাইয়া দৈ বাসার দিকে গাড়ী ফিরাইল।

বোড়াটাও যেন তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিল; দেড়বন্টার মধ্যে সে আশ্রয়স্থলে আশ্রিত উপস্থিত হইল। গাড়ী হঠাৎ বোড়া খুলিয়া ঘরের এককোণে গিয়া সে বসিয়া পড়িল এবং একটা পুরানো উইনের উপর চুইখানা হীমশীতল বাহ বাড়াইয়া দিল। ঘরটি খুব ছোট। কত বৎসরের মরলা ও আবর্জনা যে ঘরের চারিদিকে জড় হইয়া আছে, তাহা বলা যায়। ঘরের উপর অনেক লোক পাশাপাশি শুইয়া বুসাইতেছে—তাহাদের নিখালে নিখাসে ঘরটি যেন একেবারে ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

এমন সময় একটা লোক ঘরের এক কোণে হইতে উঠিয়া অলপূর্ণ বালতির কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

আইওনা 'অতি করুণায় বসিল, 'ভায়া, খুব জল-তেটী পেয়েছে বুঝি—আজ্ঞা, খাও ভাই খাও—তেটী দেউটা। ভগবান তোমার রক্ষা করুন—বহু, আমার ছেলেটি গেল হস্তার মারা গেছে, আনত প—তাট, তখন কি প গেল হস্তার হাসপাতালে—আহা, সে কি খেদের কথা—'

একবার চোখ গিলিয়া সে তাহার দিকে চাহিল; মনে করিয়াছিল তাহার ছেলের মৃত্যুর কথা ভাবিয়া লোকটীর মুখের ভাব একেবারে বদলাইয়া যাচ্ছে। সে কিন্তু তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না; জলপান করিয়া, আঁশের সে সোঁজা-নিজের বিছানার গিরা শুইয়া পড়িল।

দীর্ঘনিখাদ ফেলিয়া আইওনা চুপ করিল। লোকটা যেমন তৃষ্ণার্ত হইয়া জলপান করিতে আসিয়াছিল, ছেলের মৃত্যুর কাচিনী বলিবার ক্ষুদ্র সে-ও কেমনি তৃষ্ণার্ত হইয়া উঠিয়াছে। মনে করিয়াছিল, একে একে সব কথাই সে বলিয়া যাইবে। 'কি-করিয়া তাহাব ব্যাখ্যাম হইল, মরিবার পূর্বে সে কি বলিয়াছিল, ছেলের পরিত্যক্ত কাপড়গুলি কি করিয়া সে হাসপাতালে হইতে আনিয়াছিল—এই সব।

ভাবিতে ভাবিতে সে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—এবং ছেঁড়া কোটা খুলিয়া ফেলিয়া আত্ম-আত্মে আপনাকে ঘোড়ার কাছে আগাইয়া গেল।

বোঁকাটি তখন মিস্ত্রিমুখে 'বাস চিবাটেছিল। বোঁদাকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, 'বাস খেওরা হচ্ছে, বেশ, সেই ভাল; কি করবো বল; দান্য কিলে আনবার সময় পাইনি—ছেলেটি থাকলে সেই ত সব কোরত।'—তারপর বোঁকার গায়ে হাত দিয়া বলিল, 'হায় বহু, আমার ছেলেটি ত আর নেই! তোমার যদি আজ একটি ছোট্ট বাচ্চা থাকত—আর, তুমি যদি তার মা হত—আর, সে যদি বেঁচী দিন না বাঁচতো, বল দেখি বহু, তাহলে

তোমার মনে গ্রন্থ

বলিয়া সে তরুণোত্তে

গলা জড়টরা ধরিল।

যোদ্ধাটি তাহার হাতের উপরে মুখ
রাখিয়া বড় বড় চোখে তাহার দিকে

এই চাহিয়া আছে আছে ঘাপ চিবাঁহিতে লাগিল।

যোদ্ধার আঁইশনার মনে হইল, যোদ্ধাটি যেন তাহার

কথা সব বুঝিয়াছে।.....সারা গ্রাম

ঢালিয়া এই মুক শ্রোতাটিকে সে আপন পুত্রের

মৃত্যুকাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল.....

ঐশ্বর্যদীপক সনকার।

চয়ন

ভাবাত্মক নাটক

বৈশাখমাসের চয়নে আমরা রূপলেখক নৃতনতর রসস্থিতি করিয়াছেন। ১৯১৩
লিওনড আণ্ড্রোভের একটুপর্চনি পরিচয় - খুট্টোদের Maski নামক রঙ্গালয়সম্বন্ধীয়
দিয়াছিলাম। সেখানে আণ্ড্রোভের গল্প সাময়িক পক্ষে "Letter on the Theatre"

লিপিবদ্ধ করতঃ কথা বলা হইয়াছিল।

কিন্তু আণ্ড্রোভ মুখু রূপলেখক নন;—

রূপকার নাট্যসাহিত্যেও তিনি একজন

প্রতিভাধর স্বপরিচিত লেখক। নাট্যকার

অস্ট্রোটস্কি, রুপদেশে আধুনিক নাটকের

অগ্রদূত। টম্‌স্টের ও শেখর প্রভৃতি

লেখকেরা সেই আধুনিকতার ভিতরে আপন-

আপন নির্ভরের পরিচয় দিয়া বিপাত

হটয়াছেন। রূপলেখকেরা সাধারণত

ব্যক্তিগত মৌলিকতার দ্বারা প্রসিক্ত,—তাঁহারা

গতাপ্রসিক্ততার একান্ত বিরোধী।

আণ্ড্রোভের রচনাতেও এই স্বাধীন ভাব ও

ভাবের ক্ষুধা দেখা যায়। তাঁহার রচিত

নাটকগুলি অস্ট্রোটস্কি প্রভৃতির লিপিত

আধুনিক নাট্যকাব্যী হইতেও অধিকতর

আধুনিক।

আণ্ড্রোভ যদ্যপি নাট্যসাহিত্যে এক

নামে তাঁহার-রচিত একটি লেখা বাহির

হয়। ঐ রচনার তিনি রঙ্গালয়ের অভ্যন্তর

ও ভবিষ্যৎ-দৃষ্টা একটি বিস্তৃত আলোচনা

করিয়াছেন। ভবিষ্যতের রঙ্গালয় বলিতে

আণ্ড্রোভ কি বুঝেন, আমরা এখানে তাহাই

বলিব।

নাট্যসমালোচনার দেখা যায়, সমালোচ-

কেরা সর্বদাই Dramatic action বা

'নাট্যীয় ক্রিয়া' দীর্ঘা একটা কথা তুলিয়া

থাকেন। তাঁহাদের বিশেষণের এই যে

'action',—ইহার অর্থাৎ নাটকের মর্যাদা

একবারে নষ্ট হইয়া যায়। কথাটা অতি

পুণাতন,—এবং ছোট-বড় সকল

সমালোচকই এই পুণাতন কথাটাকে নিশ্চিত-

ভাবে মানিয়া আসিতেছেন। ইহার বিরুদ্ধে

যে আপত্তি উঠিতে পারে, একথা এতদিন

কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই।

কিন্তু, আপত্তি উঠিয়াছে। বেলজিয়ামে মেটরলিক, কশিয়ার আত্মীত এবং বাঙ্গলাদেশে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নানাদেশের প্রতিভাবান লেখকেরা উক্ত আপত্তিকারি গণের মধ্যে অগ্রগণ্য।

আত্মীত অমরসংগে বিজ্ঞান করিয়াছেন, “নাটকীয় ক্রিয়া কি রঙ্গালয়ের পক্ষে একান্তই আবশ্যিক?” তারপর তিনি নিজেই এ বিজ্ঞানার উত্তর দিয়াছেন,— “না।”

“কেন?”

একালের মাহুত বত-বেণী আঘাত পাই, বাহিরে তত-কম চাকল্য প্রকাশ করে এবং সকল বস্তুরা তারার অন্তরের গভীর চততে গভীরতর প্রদেশে সঞ্চারিত হইয়া যায়। তারার নিভৃত অন্তরের অশান্তি বাহিরেও তাহারকে অশান্ত করিয়া তুলিতে পারে না।

জ্বল পাইলে শিঙ যত চুল্লী চয়, বরষা লোকেরা ততটা চয় না। সভ্যতার শৈশবে মাহুতও এমনি ছিল। অনেক দেখিয়া, অনেক শিখিয়া বহুযুগব্যাপী অভিজ্ঞতার মাহুতও এখন বাহ্য চকলতা-পরিহারে অত্যন্ত হইয়াছে; বাসুগুণ ফলগ্ৰহ মত জ্বল এখন জ্বর-কূহরে অশ্রব লগ্নিয়াছে। এই কারণে আত্মীতের সেই বীরত্বপ্রধান আদি বা মধ্যযুগের খুব-কম লক্ষণই একালের জ্ঞান-প্রধান নর-সদাজে দেখা যায়।

এইখানেই আত্মীতের সঙ্গে সেক্সপিয়ার, সর্দে, ডুমা, শিলার ও হুগো প্রভৃতি বিখ্যাত নাট্যকারের প্রভেদ। আত্মীত, মাহুতের বাহিরের বিরতার উপরে অস্থির, গোপন জ্বরের কাহিনী লিখিয়া যান,

এই পরম্পর-বৈপরীত্যে দরদী আত্মা স্পষ্ট-রূপে দৃষ্টিগোচর।

‘অনন্তপোষণের রক্ত আত্মীত, বৈশ্ব-মুখো শেলিও ও ফ্রেডারিক নিটশে’ নামে দুই ভিন্নযুগের ও সম্পূর্ণ ভিন্নমতাবলম্বী পণ্ডিতের জীবন লইয়া দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

শেলিনি মধ্যযুগের লোক। তাঁহার একটিমাত্র জীবনে কত বৈপরীত্য, কত উদ্ভার, কত ভয়, কত বিশ্বাস, অজ্ঞাত আবিষ্কার, প্রেম, ও শত্রুতা দেখা যায়। এক-একদিন কেবল সহরতলী হটতে লাড়ী ফিবিয়ার পথে শেলিনির জীবনে যত চমকপ্রদ ঘটনা ঘটিয়াছিল, সদাশরণত আধুনিক কোন লেখকের সুখজীবনেও তত-বৈপরীত্য ঘটনা ঘটে না। সে-যুগের মানব-জীবনই ঐচ্ছল ঘটনাবল্লী। তাই, তখনকার নাট্যকার-গণের সৃষ্ট চরিত্রেও চিত্তোত্তেজক ঘটনার সমাবেশ না হইয়া উপায় ছিল না। তাই শেলিনির জীবনে গভীরতর রঙ্গালয় ঘন-মুগ্ধমান চাইয়া উঠিয়াছে।

—আর, ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখি নিটশের জীবনে। নিটশে কোন অশ্রব ঘটনার মধ্যে পড়েন নাই। বৌধানে যখন তিনি সৈনিক ছিলেন,—যখন তাঁহার পক্ষে ঘটনাবল্লী জীবন বাপন করাই স্বাভাবিক—তখনও তিনি একান্ত সাধারণভাবেই কাল কাটাইয়া দিয়াছেন। তারপর, যখন তিনি পুণিবীর কর্মক্ষেত্রে হটতে বিদায় লইয়া নিকশ্বার মত ভাব-সাধনার পসিলেন, তখন হঠাৎই তাঁহার জীবনে প্রকৃত নাট্যকালের স্বরূপ হইল। তাঁহার জন্মের আড়ালে সৃষ্টির যে রহস্য এতদিন গোপন ছিল,

সেইদিন হইতে তাহা আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। নীটুশে যেন আধুনিক রঙ্গালয়ের সৃষ্টি।

একালের গতানুগতিক নাট্যকারগণ নীটুশের জীবন-নাট্য কুটাইবার শক্তি রাখেন না। কারণ, যে-পদ্ধতিতে তাঁহারা নাটক লিখেন, তাহা শেল্যানির মত 'ঘটনাবহুল' জীবনের পক্ষেই উপযোগী; তাই নীটুশের মত ঘটনাহীন ও ভাবপ্রধান চরিত্র বিকশিত করিতে গেলে তাঁহারা অক্ষম হইবেন। অথচ, সেই মাহাত্ম্যের আঘালের শেল্যানিকে লইয়া ও একালের সাহিত্য, শিল্প ও জীবনযাত্রা চলিতে পারে না!—আনাদের মধ্যে চাহি এখন নীটুশের মত মহাবীরক—তাহার জীবন আমাদের এত কাছে—কাছে, এত আবশ্যকীয়, এবং আমাদের পক্ষে এত উপযোগী। এইজন্যই এ-যুগের নাট্যবিভাগকে বর্ধার কাছে খাটাইতে হইলে বর্ধারই পরিবর্তন ও পরিবর্জন প্রয়োজন।

সমালোচকেরা পাছে আপত্তি তুলেন, তাই 'আণ্ডীত' বলিতেছেন, এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে, পৃথিবীতে আর ঘটনা ঘটে না বা মানুষের জীবনে এখন কিয়দংশ অস্তাব্য। সংবাদপত্র পড়িলেই জানা যায়, চারিদিকে নিত্য কত আত্মহত্যা, রক্তপাত ও বিবাদ-বিসংবাদ ঘটিতেছে। কিন্তু নাট্যকলার হিসাবে এ-সব ঘটনার মূল্য এখন কমিয়া গিয়াছে; জীবনের উপরে মনোবিজ্ঞানের দাবি এখন অত্যন্ত অধিক। আগে যেখানে নাটকের তরবারিধারী যৌরেরা প্রেমের আবেগে মাতিয়া উঠিত, এখন সেখানে এক নূতন অভিনেতার

আবির্ভাব হইয়াছে,—তাহার নাম বিচার-শক্তি। প্রেম নহে, বলবতী স্পৃহা নহে, গৌরব-লালসা নহে—কিন্তু দ্রব, হৃৎক, ও জীবনযুদ্ধের ভাবনাই আধুনিক জীবন-নাট্য প্রধান অভিনেতার স্থানলাভ করিয়াছে। হুতরাং নাটকেও ইহাদের বর্ত্ত প্রথম স্থান নির্দেশ না করিয়া উপায় নাই। আণ্ডীত, এই শ্রেণীর নাটক রচনার অন্ত-দূর কৃতকাৰ্য্য হইয়াছেন যে, তাহার শেষ নাটকখানির নাম দিয়াছেন, "চিন্তা।" নাট্যজীবনের আরম্ভে "মানব-জীবন"ও "কৃষ্ণ-ছদ্মবেশীগণ" নামে তিনি যে দুখানি নাটক লিখিয়াছিলেন, তাহাদের ভিতরেও এই ভাবের ধারাই বহমান।

আণ্ডীতের ভাবাত্মক নাটকগুলিতে প্রায়ই রূপকের সাহায্যে মানব-জীবনকে বুঝান হইয়াছে। ফলে তাহার বিপক্ষে সমালোচকেরা খড়গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। "কৃষ্ণ-ছদ্মবেশীগণ" যখন প্রথম অভিনীত হয়, তখন খুব অল্পলোকেই তাহার নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিল। আণ্ডীত বলেন, "সমালোচকেরা হচ্ছে অন্ধৃত জীব। কতক-গুলি বিষয়কে আমি যে কেন বিশেষভাবে প্রকাশ করছি, এটা বুঝতে না পেরে মিছেই তারা মাথা ঘামিয়ে মরে। এর খুব একটা সোজা প্রবাব আছে। প্রত্যেক বিষয় তার উপযোগী ভঙ্গিতেই লেখা উচিত। অমন-যে বুদ্ধিমান লোক শেখত, কথাবার্তার যিনি অত সাবধানী, তিনিও একদিন ইংলেন্ডের নাম শুনে বঙ্কবাঙ্কবদের মাথাপানে বলে ফেলেছিলেন, 'ইংলেন্ড হচ্ছেন মস্ত এক নিরক্ষাধ'।"—ইংলেন্ডের

স্টেট রূপক যখন শেখতের মত লোকও
বুঝে উঠতে পারেন-নি, তখন আমার
লেখা বোঝেন-নি বলে, সমালোচকেরা
যদি আমাকে গালাগালি দেন, তবে সে-
সব স্তব্ধের মত উড়িয়ে দেওয়াই যুক্তিসিদ্ধ।
গেল দশবছর আমি যেমন বুঝছি, তেমনি
লিখেছি। কি রূপক, কি বাস্তব—আমি
কাল্পনিক অমীশ নই; তারাই আমার
গোলাম; যখন যেমন বিষয়, তখন তেমন
ভাষেই রূপক বা বাস্তবকে আমি কাগজে
খাটিয়েছি। তাবিষাতেও আমি ঠিক এই
নিয়মমতই চলব।”

পাঠকেরা বিচার করিয়া দেখিবেন,
সামল্যাদেশেও রবীন্দ্রনাথের আধুনিক
ভাবাত্মক ও রূপকপ্রদান নাটকগুলির গুঢ় অর্থ
ধরিতে না পারিয়া, নির্জোষ সমালোচকেরা
“জরোথ! জরোথ!” বলিয়া ক্রীড়ণ
চীৎকার করিতেছেন! কৃষ্ণা. ও বাঙ্গলা-
দেশের সমালোচকের মতো তেদ এইটুকু
যে, সেখানকার ‘ক্রিটিকেরা’ আজকাল
আপনাদের ভ্রম বুঝিয়া নিরস্ত হইয়াছেন,
আর এখানকার ‘ক্রিটিকেরা’ এখনও ‘যে
তিমিরে সেই তিমিরে’ই পড়িয়া আছেন!

ভারতীয় চিত্রকলা

সংগ্রহীত কলিকাতার ভারতীয় চিত্রকলার
একদর্শনী হইয়া গিয়াছে।

ভারতীয় চিত্রকলার এই নূতন পদ্ধতি-
টির দিকে আজকাল সকলের দৃষ্টি আক-
ষিত হইয়াছে। মগতের সকল দেশের
কলাবিদেবরাই বলিতেছেন, এই নব ভারতীয়
পদ্ধতি চিত্রকলার এক অভিনব আণ-
শক্তির সাক্ষ্য করিয়াছে।

কিছুদিন আগে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে
ভারতীয় চিত্রকলার একদর্শনী হইয়াছিল।
সেই একদর্শনীর চিত্রমালা দেখিয়া উক্ত দুই
দেশের শিল্পরসিকগণ মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়া
গিয়াছিলেন। সেই সময়ে সেখানকার
প্রধান-প্রধান পত্র-পত্রিকার ভারতীয় চিত্র-
কলার বিশেষণ ও মৌল্য লইয়া যথেষ্ট
আলোচনা হইয়াছিল। স্থানভেদেবর ভ্রম

আমরা সেই বিবিধ আলোচনার কিছুকিছু
উদ্ধার করিয়া দিলাম মাত্র।

বিজ্ঞাতের The Daily News and
Leader বলিতেছেন :—

“এসিদ্ধ ভারতীয় কবির প্রাচীন ও
আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার প্রধান প্রেরা-
হিত শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত
যাটখানি চিত্র এই একদর্শনীতে প্রদর্শিত
হইয়াছে। তন্মধ্যে রাজী ঘেরী ও শ্রীযুক্ত
হাভেল কর্তৃক দত্ত ‘অশোকের রাণী’ ও ওমর
খইয়ামের ছবিগুলিই সর্বাঙ্গতঃ প্রাণরঞ্জক।
একদর্শনীতে অত্যন্ত বে-সকল শিল্পীর চিত্র
আছে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নন্দলাল
বসু, ঈশ্বরীপ্রসাদ ও জয়প্রসাদ মদো-
পাধ্যায়ের নামই উল্লেখযোগ্য;—ইহারা
অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র। সুন্দরী চিত্রকলার

“একটি রমণী খালুৎ খোসা চাড়াইতেছে” বা “একটি যুৱতী বাসন মাকতেছে”— প্রভৃতি নামের যেরকম-সব বাজে রাবিশ ছবি দেখা যায়, তাইতোই চিত্রকলায় সেরকম কোন-কিছু একেবারেই নাই—অধিকংশে চিত্রকর্ম ভারতীয় ইতিহাস, পুরাণ এবং কৃষ্ণ, বৃষ্ণ ও চৈতন্য প্রভৃতি অতিমানবগণের জীবনী অবলম্বনে অঙ্কিত হইয়াছে। তাহার, ভারতবাসীর গোপন জগৎ সংকে স্বাভাবিকতা লাভ করিতে চান, তাহার এই প্রদর্শনীতে আসিলে আনন্দের সতি অল্পেক শিক্ষা পাইবেন।

ঐযুক্ত হাভেল যখন ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে “কলিকাতা শিল্পবিজ্ঞান”ের প্রধান অধ্যাপকের পদলাভ করেন, ছাত্রেরা তাঁর ভারতীয় চিত্রকর্মের প্রতি অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়া ছিল। বিজ্ঞান-সংলগ্ন চিত্রশালাটি প্রাচীণের তুঁড়ি হ'ও চতুর্থ শ্রেণীর পট দেখিয়া নন্দন-করা ছবিতে পরিপূর্ণ থাকিত—ছাত্রদের আদর্শ ছিল সেই-সব রাবিশ। ঐযুক্ত হাভেল অসন-সাহসে সেই রকম মালভুলে চিত্রশালা হঠাৎ বদলা করিয়া দেন এবং তাহাদের স্থানে ভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্যের ভাল ভাল নমুনা আনিয়া রাখিবার চেষ্টা বাধ্য করেন। কলে, কলিকাতার তাহার বিক্রেতা বিধম আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং ছাত্রেরা একসঙ্গে বিজ্ঞান ছাড়িয়া যায়। কিন্তু সে-সকল নিন্দা-গালাগালিতে তিনি একটুও টলিলেন না। ছাত্রেরা আবদার একে-একে ফিরিয়া আসিল এবং প্রতিজ্ঞাবান মনো কলাবিদ অবনীন্দ্রনাথ সহযোগীভাবে হাভেল-সাহেবের সঙ্গে

যোগদান করিলেন। হাভেল-সাহেবের কাৰ্য্যশাল সমাপ্ত হইলে অবনীন্দ্রনাথই শিল্প-বিজ্ঞানক্ষেত্রে উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করেন।

হাভেল সাহেব বলেন, “আমরা যখন অবসরবর্ষের শাসনভার পাঠে, ইংরাজদের ভিতরে কঠিবোধ তখন একরকম ছিল না বলিলেই চলে—ভারতের পক্ষে এটি গভীর চর্চা-গোচর কথা। বাহ্যে যুরোপ হইতে জ্ঞানদানি নহে, তাহার কোন আদর ছিল না। অশাসন-অপাশে ভারতীয় কলার গুণদার আর সীমা রহিল না। ভারতের রাজামহারাজ ও ধনীরা দেশের রাজমিস্ত্রীর বদলে ‘পাবলিক ওয়ার্কস’ের কর্মচারীদের ডাকিয়া আধা-কোরজ আধা-দেশীয় আদর্শে প্রাচীণাদি তৈয়ারি করিতে লাগিলেন। ভারতের নিজস্ব ও অপূর্ণ ভিত্তি-চিত্রের বদলে কৃত্রিমত বিলাতি ‘ওয়ার্ল-পেশার’ ব্যবসয় হইতে লাগিল। কোন-জাতীয় মূল্যবান স্থাপত্যের মধ্য দিরাই প্রধানত আশ্রয়লাভ করে; হস্তরংগ কোন দেশের স্থাপত্যকলার অবনতি দেখিলে বৃদ্ধিতে হইবে, সে দেশের কৃতিও অবনত হইয়াছে।

এদিকে ভারতে বাহ্যিক বংশোদ্ভূত শিল্প-ব্যবসায়ী, দেশব্যাপী অবহেলার তাহারে তুর্গতির আর অবধি রহিল না। জীবিতাঙ্গের অল্প বাধ্য হইয়া, তাহার ছোটখাট সখের মিনিয় তৈয়ারিতে লাগিয়া গেল;—এ-সব কাঁজগুলি অত্যন্ত কৃত্রিম হইত, কারণ এ কাজের সঙ্গে শিল্পীদের প্রাণের মিল থাকিত না। আমি একজন ছাত্র পাইয়াছিলাম, তাহার পূর্বপুরুষেরা

রাকশশী ছিলেন। বিভাগের ভিত্তি চটবার আগে কলিকাতার কোন মাঝে-বানসাত্ত্ব কাছে টনি মাঝেটোবেব কাপড়ের পাড় আঁকিতেন। চিত্রশালায় পতঙ্গলি দায়ী মোগল-চিত্র আছে, সেগুলি আমি এক বোকারদর ঘরে পোকা-পাওয়া ও ধূলামাখা অবস্থার পাওয়াছিলাম। ছবিগুলির প্রতি বোকারদরের একটুও দরদ ছিল না। পাশ্চাত্য ছবির আদর হওয়াতে, প্রাচীন পটগুলি ছেলেদের খেলনা হইয়া পাড়াইয়া-ছিল।”

শ্রীযুক্ত ফ্রাভেলকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আজ্ঞা, ভারতের শিল্পীরা যে ‘আ্যানাটমি’ ও ‘পারস্পেক্টিভ’ জানেন না বলিয়া নিশা আছে, সেটা কি ঠিক?”

—“হ্যাঁ, ‘কত এখানে একটা মন্ত তুল করা হয়। ‘আ্যানাটমি’ ও ‘পারস্পেক্টিভ’-এ ভারতীয় শিল্পীর জ্ঞান একটু স্মালাদারকদের! তিনি দৈহিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও জ্ঞানরতর ও হৃদয়র একটা-কিছু প্রকাশ করিতে চান; তাহার কল্পনা ও ধ্যান-ধারণার পুস্ত ও অনুষ্ঠের বোহন মিলন সাধন হয়—আধ্যাত্মিকতা ভিন্ন এমন অপরূপ মিলন অসম্ভব। যুরোপীয় কঠোর অপার্থিবতা দেখানো চরমে উঠিয়াছে, দেখানো তাহা পার্থিব পদার্থের সহিত একেবারে সম্পর্ক-বর্জিত নহে। ভারত-শিল্পী সর্বদা স্বর্গ সৌন্দর্য্যকে মতে নামাইয়া আনিতে চান। যখন তিনি পার্থিব বস্তু আঁকিতে যান, তখন তিনি ‘আ্যানাটমি’র খুঁটিনাটি এড়াইয়া আত্মকে আগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন; এইজন্যই বাহারা কেবল চামড়ার চোখ

লটর দেখে, কেবল তাহারাই ভারতীয় পটে ‘আ্যানাটমি’র খুঁড় দরিতে নাম। একজন প্রাচীন সংস্কৃত লেখক বলিয়াছেন, পরম রূপমান মাহুদের মূর্তি আঁকার চেষ্টে ল-রূপ দেবার মূর্তি আঁকাও শ্রেয়স্কর।—ইহাই হইল ভারত-শিল্পীর আদর্শ।

“ভারতীয় পটে যে-সকল বর্ণ ব্যবহৃত হয়, তাহাদেরও এক-একটি নিগূঢ় অর্থ আছে। ললিতকলা, ভারতের জাতীয় জীবনেরই অংশবিশেষ; এবং ইহার সঙ্গে দার্শনিকতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। ভারতবাসী মাতৃক্রোধ চাইতেই দার্শনিক।”

“আধুনিক যুরোপীয় কলার Post impressionism-এর যে আকোলন চলিতেছে, ভারত-শিল্পের সঙ্গে তাহার কোন সাপৃক্ত আছে বলিয়া কি আপনার মনে হয়?”

শ্রীযুক্ত ফ্রাভেল হাসিয়া বলিলেন, “হ্যাঁ, এখানে বাহারা ভাবাত্মক কলার পক্ষপাতী, তাহাদের উপরে যে প্রাচ্য শিল্পের ছাপ পড়িয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমার বিশ্বাস, যুরোপীয় শিল্পের উপরে ভারত-শিল্পের প্রভাব ক্রমেই বাড়িয়া চলিবে। যুরোপকে শিখাইবার জন্য ভারতের অনেক নুতন জিনিষ আছে। কিন্তু যুরোপের ভাবাত্মক চিত্রশিল্পীরা ভারত-শিল্পীর মত ছবির প্রতি খুঁটিনাটি উপর স্থাপন সমর্থন করিতে পারেন না,—তাদের মাঝে এইখানেই তফাৎ।

“তবে, এখানকার আদর্শনী গর্জনকালে একথা কুলিলে চলিবে না যে, “কলিকাতা শিল্প-বিভাগ” এখনও নৈশবদনা পায় হয়

নাট। ভারতের প্রাচীন আদর্শ ইহার পূর্ণ, টংল ও ভারতকে একত্রে মিলিত প্রধান আদর্শন হইলেও এট নব-পদ্ধতি করিবার ক্ষমতা যথেষ্ট চেষ্টা ও কাব্য প্রাচীনের ভাণ-বিকটা গ্রহণ করিতেও করিতেছেন।”

আপত্তি করে না। ভারতবাসীরা যে আগামীবারে ফ্রান্সে “ভারতীয় চিত্র-রক্ষণশীল, এ, ধারণা ভুল। নূতন ভাবের কলা”র সমাদর-সংক্ষেপে আলোচনা প্রকাশিত ধারাকে অগ্রসরণ করিতে তাহার সর্বদাই হইবে।

আগ্রহবান। “ভারতীয়-চিত্রকলা”র পুরোহিত-
শ্রী প্রসাদদাস রায়।

কৈসর-প্রাসাদের কাহিনী

কার্ণাণ-সম্রাটের “ওস্তপ্যালেন্স” নামক প্রাসাদ প্রাচীনতা ও বিপুলতার ক্ষমতা অগণিত। ছয়শত কক্ষ বিশিষ্ট এই বৃহৎ প্রাসাদ “উটারডেন লিন্ডেন” নদীর তীরদেশে অবস্থিত। বাগিনে একশু প্রকাণ্ড প্রাসাদ আর একটীও নাই। সৌন্দর্য্যও ইহা অতুলনীয়। এসিয়ায় আদি রাজা ফ্রেডারিক ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্মাণকাণ্ড আরম্ভ করেন। ইহার অন্তরঙ্গ দেহের বিপুল-শ্রী তুলনায় ফ্রান্সের তৎকালীন সৌন্দর্য্যশালিনী “ভার্সেলিস” নগরীকে হীনপ্রভ করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য তাহার সফল হইয়াছিল কিনা বলা কঠিন নয়। এই প্রাসাদসম্বন্ধে ‘ট্রাও ম্যাগাজিনে’ এক অদ্ভুত কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে।

এই অতিকায় প্রাসাদের মধ্যভাগে সবুজ রঙের একটা ‘টাউটার’ আছে। এখান এই যে, এখানে ফ্রান্সের এক প্রেরণাত্মকে দেখিতে পাওয়া যায়। এট প্রেরণাত্মক আবির্ভাব কার্ণাণ-রাজবংশীয়গণের

পক্ষে অতিশয় অমঙ্গলকর বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ, ইহার আবির্ভাব হইলে অতিশয়ই রাজবংশীয়গণের মধ্যে একজনের মৃত্যু ঘটয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস, এই মৃত্তি নিশাকালে আশ্রয়দাতক খেতবস্ত্রাবৃত হইয়া ধীরগদবিধে প্রাসাদের সর্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে। রাজবাটীর ছয়শত কক্ষের কোনটীই তাহার অগম্য নহে। কেবল যে-অংশে রাজা বা রাজবংশীয়গণ অবস্থান করেন, সেই অংশে সচরাচর সে পদার্পণ করে না; কিন্তু রাজবংশীয়গণের কাহারও মৃত্যু-কাল ঘনাইয়া আসিলে সে মৃত্যুর অগ্রদূতরূপে তথায় আবির্ভূত হইয়া পূর্ণ হইতেই সকলের মনে জীতি উৎপাদন করিয়া দেয়।

এই প্রেরণাত্মক, সে-সম্বন্ধে কয়েকটা বিষয়তী আছে। দ্বিতীয় ‘ইলেক্টার জোঁকম্’ নামক কৈসারের এক পুত্রপুত্রব ‘অ্যানা সিডো’ নামী এক রমণীর প্রেমে আসক্ত হন। এই রমণীর বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার ক্ষমতা তাহাকে সর্বদা হইতে হয়। তিনি অনন্তোপায়

হইয়া এক রাসায়নিকের পরীক্ষার জন্য এবং পরীক্ষার পরে সাধারণ প্রকৃত অর্থশাস্ত্রের প্রচাৰ পান। কিন্তু তাঁহার সে প্রচাৰ আকাশ-কুসুমের জায় নিৰ্ভর হয়। অবশেষে তিনি প্রজাবর্গের উপর উৎপীড়ন করিয়া অর্থ-শোষণ করিতে থাকেন। এই দুর্ভাগ্য নবপতি হঠাৎ মৃত্যুবরণে পতিত হইলে তাঁহার হস্তাধীন প্রচাৰিণী নব-জুগতি কর্তৃক লাহিত ও কারাকন্ড জন, এবং অবশেষে অশেষ দুর্দশা ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। লোকের ধারণা যে, এই নিলাশিনী রমনীর অকৃত্রিম আত্মা তাঁহার প্রচাৰ্য্যপদের গুণে আবদ্ধ আছে, এবং রাজবংশের কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছিল বলিয়া সে রাজাদের মৃত্যুকালে আত্ম-প্রকাশ করিয়া মৃত্যুর মনে 'বিভোধিকা' উৎপাদন করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় কিম্বদন্তী এই :—অতি প্রাচীন-কালে এই দেশের এক রাজা কোন এক বিধবা কাউন্টেনের প্রেমে মুগ্ধ হন। এই রমনীর দুইটা সন্তান ছিল। জগদান রাজার রূপমোহে আকৃষ্ট হইয়া কাউন্টেন্স তাঁহার পাণিগ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে রাজা বলিয়াছিলেন, "এই রমনী বিধবাকে পত্নীরূপে পাণ্ডা অতিথির লোভনীয়। কিন্তু আমার গঠিতসিদ্ধি প্রধান 'অস্ত্রার' চারিটামাত্র চক্ষু। নহিলে মান্দে এই রাসীকে বিবাহ করিতে আমার কোনট আপত্তি ছিল না।"

উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী কাউন্টেন্স রাজার এই উক্তির অঙ্গরূপ অর্থ করিলেন। তিনি তখন রাজার প্রেমে অন্ধ, হিতাহিতজ্ঞান-

মুগ্ধ। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার দুই সন্তানের প্রতিট বাক্য টেরিত করিয়াছেন, সেই হস্তাগোরাট তবে তাঁহারের অর্থের পথের কণ্টক—অতএব তাঁহার অপরিস্রব হউক। এই ভাবিয়া কাউন্টেন্স তাঁহার সন্তানদ্বয়ের মধ্য 'অলপন' বিধাটয়া "বহুতে তাঁহা-দ্বিগুণে বাড়িয়া ফেলিলেন। বস্ত্র, মাঝার, সেকুণ পেন্ড অস্ত্রাদি ছিল না। তিনি নিজের লিঙ্গাভাষকেই উদ্দেশ্য করিয়া একথা-গুলি বলিয়াছিলেন। চতুর্ভাগিনী কাউন্টেন্সের যখন বয়স বাড়িল, তখন তিনি আর এই নিদারুণ অশান্ত মন কবিত্তে পারিলেন না। তৎকালীন তাঁহার সাপলায় বহির্গত হইল। তাঁহার পাণ্ডার আত্মা সেইদিন চইতে বাজপ্রাসাদে দীক্ষণ অশান্তিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

৩. তৃতীয় কিম্বদন্তী আরও ভয়াবহ এবং তাঁহার সহিত পুঙ্খোক্ত "টাওয়ার"-টির বনিষ্ট সর্ধক আছে। ফ্রেডারিক স্পেন্সার-আদি রাজা ছিলেন একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তিনি "Iron tooth" অর্থাৎ লৌহদন্ত নামে অভিহিত হইতেন। এক অতি নৃশংস উপায়ে তিনি "রূপহরণীগণকে শাস্তি দিতেন। তাঁহার প্রাসাদে কাঠনির্মিত একটি ক্রীমুগ্ধি থাকিত। এই মুগ্ধির ভিতরটা ফাঁপা এবং তন্মধ্যে একটা ক্ষুদ্র প্রবেশ-দ্বার ছিল। ইহার ভিতরে অনেকগুলি ভীক বর্ষ সাঝানো থাকিত। যে-সকল লোক সামরিক অপরাধে দণ্ডিত হইত, তাহাদিগকে টাওয়ার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া এক গুপ্ত কল ঘুমাটয়া ক্ষীণ বর্ষার হত্যা করা হইত। এই কাঠনির্মিত মুগ্ধিটা উক্ত 'টাওয়ার'ই প্রথমে স্থাপিত হয়। ইহার

নাম ছিল 'মেডেন' অর্থাৎ কুমারী। এই কুমারী-মূর্তিটা এখন 'নূরনবার্গের' প্রাসাদে দেখা যায়। কথিত আছে, এট তৌফুল-গর্ভা কুমারীর নিদ্রা-পরিকল্পনার একটি জীবন্ত কুমারীকে আত্মলগ্ন বলি দিতে হইয়াছিল। সেই কুমারীর প্রেতাচ্ছাদি না কি এট 'টাওয়ার' দ্বারীভাবে অবতান করিতেছে, এবং নির্ভর রাজার বংশধরগণের প্রতি দণ্ডবিধানার্থ পুরুষাত্মকমে তাগাদিগের অমঙ্গলস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

এই প্রেত-রমণী' নিশ্চয় কক্ষ চটেতে কক্ষান্তরে যখন ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন কোন অদামসংসা ব্যক্তিও তাহার সম্মুখীন হইতে বা তাহাকে কোনরূপে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে সাহস করে না। কারণ, সেদূর চোটা করিলেই বিঘন অনর্থ ঘটবে।

একরায়ে এক উরুধর কাণ্ড হইয়াছিল। রাজ্যটির এক বালক ভৃত্য কোতুলবেলে ইহার সম্মুখীন হইয়া কিসাসা করিল, 'এত রাতে এরূপভাবে কোথায়

চ'লেচেন' ? প্রেতিনী কোমল উত্তর করিল ন'। তাহার আপাদমস্তক শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত এবং হস্তে একটি চাবি থাকিত। এই চাবির সাহায্যে সে না কি রাজবাটীর যে-কোন কক্ষে যাত্রাশত করিতে পারিত। ভৃত্যের কথা সে যে অসম্ভব চটপটে, এমনও বোধ হইল না; কেবল তাহার হস্তস্থিত চাবি দ্বারা সে ভৃত্যের মস্তকে এক আঘাত করিল। আঘাত পাইবামাত্র ভৃত্যের মৃত্যুদেহ কক্ষতলে পুটোঁরা পড়িল। পরদিবসই 'ইলেক্ট্রার জন্ সিরিস্মণ্ড' হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন।

ইউরোপের জনসাধারণের দৃঢ় ধারণা যে, এই প্রেতরমণী অজ্ঞাপি জর্মান-সম্রাটের গৃহে বাস করিতেছে। বাগিনবাসীগণও অজাবধি এট ভৌতিক বাণ্যের অবিবাস করে না। রাজ্যকালে রাজপ্রাসাদলগ্ন ফেঁতু অতিক্রম করিবার সময় প্রেতমূর্তি দর্শনাকাঙ্ক্ষার নগরবাসীগণ এখনও সম্মুখ 'টাওয়ারের' প্রতি সাগ্রহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

ঐশ্বামিনীকান্ত সোম।

শহরে "ফাল্গুনী"

"এ সেই পাল্য বা' মোংখায় হ'লে জনে তাসো,—হুল্লু-বোতা' যার এবান গারক,—জি'বি যার তানুগা,—জোনাকী যার রস-এবাপ;—বা' কেবল দুকাত্তির আরাম-কেদারায় বসে কলনা-হুশলী করিয়া শুন্বে,—আর যার বধার্ঘ্য নর্থ গ্রহণ করতে না গেলে পাতিভ্যাভিমানী হত্মমুখেয়া বোড়াগুড়ি শুঁড় আকালন হুক করে দেখে।"

—করাসী কবি গভিরে।

বাঁকুড়ার নিরুপদেহ অস্ত্র অগ্রভিকাক্ষে সেনিন তার বদীভ্রমায়ের জোড়াসাঁকোর গাড়িতে তাঁর অলোকসামান্য কবি-প্রতিভা ও সঙ্গীত-প্রতিভার যুক্তবেণী "ফাল্গুনী" নামক একটি দৃশ্যকাব্য অভিনয় হ'য়ে গেল। এই নাট্যকাব্যের অভিনয়ে মেমেভিলেন বয়ং কবিতুল রবীন্দ্রনাথ; সঙ্গে ছিলেন

অবনীজনাথ, গগনেজনাথ, দিনেজনাথ প্রমুখ
সাহিত্য-সম্ভাষক-নাট্য-নিপুণ সুরাসিক বৃন্দ-
সত্তলী এংৎ বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের
আনন্দ-মুগ্ধ শিল্প ও বাগবৃন্দ। এষ্ট
অভিনয়ের টিকিট-বিক্রয় টাকায় যে শুধু
বাঁকুড়া-বাসীর অন্ন-হুর্জিকের কতকটা
উপশয় হবে তা' নয়, এর (শরৎ-সৌন্দর্যে
অনেক রসগোপাল বঙ্গবাসীর অন্তঃ-
দিনের রম্যের তৃপ্তি এবং অন্তঃরম্য হুর্জিকেরও
মোচন হওয়া অবশ্যপ্রায়। এ কথা
অস্বীকার করবার জো নেই, কমল মিলে
কথা বলা হয়। কারণ, এ সম্বন্ধে আমরা
অনেকের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি,—
তাঁরা সকলেই একদাকো বলেছেন "যিনিই
মৌভাগ্যক্রমে সেদিনকার এষ্ট অভিনয়ে
উপস্থিত হ'তে পেরেছিলেন তিনিই এষ্ট
রস-মাধুর্য-সম্ভোগের শুভ দিনটিকে জীবনের
একটি অমরদিন মনে ব'লে মনে করেন।
তাঁ কি প্রবীণ উকীল ব্যারিষ্টার আর
কি নবীন বি-এ, বি-এস-সি, এম্-এ,
এম্-এস-সির ছাত্র, কি কারবারী পয়সা-
ওয়ারী কয়লা-খনির মালিক আর কি
দরিদ্র স্বল্প-বেতন শ্রমের মাস্তার—সকলেই
খুশী,—সকলেই বলেছেন, যে, সেদিন যা
পেরেছেন তা তাঁদের আশাতিরিক্ত।"
অবশ্য হু'একজন খবরের কাগজের "কাগজী
সাহিত্যিক ভেঁতা পাণ্ডিত্য প্রকাশ ক'রে
দলের মুখে হাত চাপা দিয়ে সভা-গোপনের
ব্যর্থ চেষ্টাও করেছেন। দলের মুখে হাত
চাপা দিতে হ'লে অন্ততঃ রাবরেন মত
দলমুখ কুড়ি হাত থাকা দরকার, তা'
যখন তাঁদের নেই তখন তাঁদের হুঁচকো

নিষ্ফল চেষ্টা পাশ্চ। এদিকে এক-আধজন
মেকা দার্শনিক নাকি গভীর দার্শনিকতার
ভাগ ক'রে বলেছেন, কবির বস্তুার্থ কাজ
হ'লে কান্য-কমলের কমলে-কামিনীকে, দিয়ে
হাতী গেলানো, তা' যখন হরান তখন
টতালদ টতালদ। সে বাই হোক, তাঁরা
বাই বলুন "আর খবরের কাগজে বতাই"
কালি ছড়ান, হু'-একটা মলিন কাগজের
বাড়িড়ের ডানার খুঁচা ঢাকা পড়বে না।
বেশির ভাগ লোকের মতে "কাস্তনী"
আনন্দের মহাসমুদ্র, উৎসবের চিরন্তন উৎস।

দোঁধা আর কুহালায় আছুর আমোদের
এই কলকাতার শহরে দক্ষিণা হাওদায়
স্থলন এই কাস্তনী! হঠাৎ এলে মধ্য-রাতের
লক্ষ্যাবেলায় সমস্ত দোঁধা আর হিম যে
কোণার উড়িয়ে নিয়ে গেল, তার ঠিক-
ঠিকানা নেই; আকাশের লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র
আবার মুগ্ধতারা হালি, বৃকতার আলো
নিরে ঝকঝকে হ'রে উঠল! অনেক
অমড় মনে অমড়া কাগল! "বেগু-অনের
মত অনেকেরই প্রাণ এর প্রভাবে আনন্দে
স্বপ্নমান।" এ যে "কানে কানে একটি
কথার সকল কথাই" ভুলিয়ে দিয়ে গেল।
এ যে বাহুরক! এ যে আশ্চর্য।

প্রথমে ভাবা গিয়েছিল, শহরে কাস্তনী
অভিনয় বুঝি কাস্তনের হাওদায় "কড়ি-
বরগায় মূল-ফোটারোয় মতন অসম্ভব।
কিন্তু অভিনয়ের রাতে প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত
চরমই মনের সে ভাবটা কেটে গেল।
দেখলুম কমনায়েবীর কল-কুজ-চারী শিল্পী-
দের ভগ্নতার স্বভাবে শহরের খুলোতেই
মূলের খুলোটি জ্বলু হুয়েছে। কমলতার

ডাল দুইরে ধরে তার সমস্ত সৌন্দর্য চরন
ক'রে ভঙ্গমকটু সাধনো চরেছে। রঙ্গ-
ভোরণের একদিকের গুলে ঝাঁকা রয়েছে
অলম্ব্যাবে শুকশ্রাব "পাপড়ি-ঝা পূর্ণা-
তনের পাণ্ডুরণ ৯ পদ্মচাকী।" অঙ্গদিকের
তুলে নীল-হিল্লোলিত দিঘির নীল জলে
সত্ত-কোটা শতদল পদ্মী ভোরণের সাগর
মরালের প্রেয়ী, শুকতার দিক পরিচার
ক'রে পরিপূর্ণতার দিকে সোৎসাহে ছুটে
চলেছে। সারদার রূপার ঐ সাবগ্রাহী
মরালের দল অঙ্গল তিনিসটুকুট চরন
ক'রে ফিরবে;—

"রখী ওরা তাম্র নীর
গ্রহণ করিবে ক্ষীর।"

আর, যে-পুঙ্খের তলাকাব পাঁড়
পর্যন্ত ঘেরিবে গড়েছে সেদিকে দৃষ্টি রটল,
বহুতর বকের,—সে মাছ না নিয়ে নড়বে
না। সে যে আদ্যিষের সন্ধ পেয়েছে।

বনিকা উঠল।

প্রথমেই কান্তনীর প্রত্যাবনা স্বরূপ রবীন্দ্র
নাথের নূতন লেখা "বৈরাগ্য-সাধন" অভি-
নয় হুক হ'ল। বৈরাগ্য-সাধনের গল্পটি
হচ্ছে এই—

এক রাজার কাথার পাকা চুল দেখা
দেওয়ার তাঁর মন অত্যন্ত খারাপ হয়েছে ;
তিনি মৃত্যু আসন্ন ঠাট্টে রাজ্যের সমস্ত
কার্যকর্য, আনন্দ আফ্রাদ, গান-বাজনা
এমন কি জরুরি কাজে দেখাওনা পর্যন্ত
বন্ধ ক'রে দিচ্ছেন। মন্ত্রী বেচারী
ক্রোধগত চেষ্টা করেও রাজাকে ঠিক কাগ
দানিতে পারছেন না ; প্রত্যক্ষদেহে উত্তরানক
যুদ্ধ বেধেছে, সেনাপতি রাজার সঙ্গে

গোপনে পরামর্শ করিতে চান, কিন্তু মহা-
রাজের মনে অম্মি গোরুয়া রঙের ছোপ
থরছে, যে তিনি কিছুতেই এই সব
বৈষয়িক বাপারে কর্ণপাত করতে পারছেন
নী। শুদিকে চীন-মন্ত্রাটের দূত এসেছেন
তাকেও অম্মি-অম্মি ফিরতে হবে, কারণ
মহারাজের মন খারাপ হয়েছে। কবি-
শ্রেণের কাব্য-মঞ্জরী শোনাতে চান, কিন্তু
মহারাজ ঐহিক প্রেমের গান শুন্তে
একাত্ম নারাজ। হুভিক্ষপীড়িত প্রজারা
রাজার দেউড়িতে ক্ষুধার তাড়নার চাবকান
করছে, কিন্তু চোচালে কি হবে? চৌচিরে
কল নেই, কারণ মহারাজের মন খারাপ
হয়েছে।

তিনি এখন চান একমাত্র শ্রুতিভূষণকে
আর তাঁর সেট বৈরাগ্যবারিধি পুঁথি।
শ্রুতিভূষণ ঘাজক-ব্রাহ্মণের নিখুঁত ছবি।
তিনি অম্মুগা উপদেশের পরিবর্তে মহারাজের
কাছ থেকে মূল্যবান একখানি তালুক
অদ্বার ক'রে নিষ'ভাবে নিজের বৈরাগ্য-
সাধনের জন্তে একখানি মর্ষর প্রান্তরের
বাড়ীর আবদার জানিয়ে, মহারাজকে
কুস্ত্রাক্ষের মালা ধরিয়া বৈরাগ্য-সাধনা
করতে উপদেশ দিবে গেলেন। এমন সময়
রাজার সভাকবি কল্পিশের এসে উপস্থিত।
কান্তনের চাওয়ার মত হঠাৎ এসে ইনি
সমস্ত গুলোট-পাগট ক'রে দিলেন। তিনি
বল্লেন "চুল শাদা হয়েছে? তাতে ভাবনা
কি? শাদা আশোর ভিতরে রামধনুকের
সকল রঙ লুকিয়ে থাকে, শাদাট ভো
সকল রঙের বাগ। বাবা ভোগবত্তী পার
হ'বে এসেছে তাইট ভো আনন্দ-লোকের

ডাক। দেখতে পেতেছে, "এট তো আনন্দের
বয়েস।"

রাজা খুশী হ'য়ে উঠলেন, কবির সঙ্গে
তাকে "অকুল আগের সাগর তীরে" পৌঁছে
দিলে, তাঁর আর "কর কতires তর" গইল
না। তখন আগের নদবতের বাঁধ
বাক্স, সেনাপতিকে যুদ্ধের পরামর্শের
অস্ত্রে ডেকে পাঠানো হ'ল, নিরস্ত্রের
অস্ত্রের বাবু হ'ল। কাস্তনের হাওয়ার
মত কিছু একটা করবার অস্ত্রে তাঁর মন
আগন্তিকির উন্নতি চকল হয়ে উঠল।
ক্ষুধিত আতিশয্যে রাজা কবিশেখরকে
বললেন "তোমার নতুন লেখা কোনো
নাটক, কি ট্রোটক, কি প্রহসন, কি হল্লোশ,
কি আর-কিছু তৈরী আছে? যদি থাকে
তো অভিনয় লাগিয়ে দাও।" তাতে
কবিশেখর তাঁর লক্ষ্যছাড়ার দলটিকে
রাজোত্তানে হাঙ্গির ক'রে যে নাটক
রাজাকে দেখালেন সেটি হ'ল এই
কাস্তনী।

কাস্তনী আবার দুটি নাটকের সমষ্টি,—
একটি বাহিঃপ্রকৃতির, অপরটি অন্তঃপ্রকৃতির।
একদিকে বৃদ্ধ শীত চলে বেতে চাইছে, নুব
বসন্তের নুতন আগের চরমরা তাকে
বলছে "বাবো কি? তোমাকে যে
আমাদের খেলার সাথী হ'তে হবে!"
তাদের উৎসাহের আতিশয্যে এবং টানা-
টানির ছড়াছড়িতে শেষে কখনো শীতের
কখন এবং পাকা লাড়ি খসে পড়ল, দেখা
গেল, সে প্রকৃত বৃদ্ধা নয়, সে তরুণ—সে
স্বয়ং পুষ্পাকীর্তি কুতুম্ব বসন্ত। ছেলেরা
গেয়ে উঠল—

"সামনে সবায় পড়ল ধরা

তুমি যে তাত আমাদেবির।"

তখন, চিমের বাহর বাঁধন টুটে পাগলা
ঝোরা ছুটি পেয়ে গেল, উত্তরে হাওয়া উলান
পটল। প্রমাণ হ'য়ে এগল চির-পুরাতনের
বুকের ভিতর থেকেই চির-নুতনের স্বর্গ।
নিষকর্মীর কারখানায় সুবিস্তৃত জটিলোকারে
ভিতরেই সুন্দর প্রজাপতি তৈরী হ'য়ে ওঠে।
"Evil is good in the making" ঐত
হচ্ছে বসন্ত-সম্ভব কাব্যের খসড়া-পাতা।
মৃত্যু নেই, আছে পায়বর্তন; ভাবন চকল
হ'লেও, নবর নয়, তার নিতানুতন
মূর্তি, নিতানুতন বেশ। শীত-বসন্তের
এই ব্যাপারটি গীতি-ভূমিকা নামে কাস্তনীর
চাষটি অস্ত্রের বিস্ময় স্থানে কন্সার্ট বা
থর্কেট্রার যথেষ্ট বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল,
পর্দা না ফেলে এট গান-সম্মান-মহ
ভোম্বীর ডানার ববনিকা কল্পনা করা
হয়েছে এটি "কাস্তনী"র একটি বিশেষত্ব
এবং কাস্তনীকাব্যের সব-নব-উৎসাহশালিনী
প্রতিভার একটি নুতন পুরচর।

এদিকে বাহিঃপ্রকৃতিতে এখন এই সব
অবটন ঘটছে তখন মাহুকের অন্তঃপ্রকৃতিও
চকল হ'য়ে উঠেছে, চুপ ক'রে নেই।
নব-যৌবনের দল, বনে বনে ফাটন গেগেছে
দেখে একেবারে দাঁকনের হাওয়ার মতন
উল্লসিত হ'য়ে উঠেছে। তারিও আজ
অবটন না ঘটবে ছাড়বে না। তারা
তাদের প্রাণ দানার উপদেশপূর্ণ চৌদণ্ডী-
গুলির প্রতি কণপাত না ক'রে ছুটির
দিনের ছেলের দলের মত আগের প্রাচুর্যে
উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিশ্ব-সংসারে তারা

ভীবনকেই শুধু সন্ধ্যার বলে মানে, সেহ
সন্ধ্যারই ভাবের, "মিত্র, মন্ত্রী, মনোমী এবং
মশালধারী পথপ্রদর্শক"। তাকেই নেতা
করে নব-যৌবনের দল হারিয়া হয়ে বেরিয়ে
পড়েছে। তারা ঠিক করেছে যে, যে-
বুড়োটি যৌবনের হাসি জানি করে দেয়,
ভূমিরায় পাণ্ডরের মধ্যে যার বাসা, যে
খুলো উড়িয়ে" রথ হাঁকিয়ে চলে য়,
জীবনে কেউ কখনো যার মুখ দেখেনি
অথচ থাকে সবাই ভয় করে সেই আদি-
কালের বুড়োটাকে ধরে এনে এয়ার বসন্ত-
উৎসবের পেনা খেলতে হবে, ভয়-ভাড়া
জানলে উৎসবকে সম্পূর্ণতা দান করতে
হবে। যেমন সন্ধ্যা অমনি সন্ধ্যানে বোঝায়
পড়া। যে ক্যাপানির তালে সাগরের
পাশে টেউ নাচে সেই ক্যাপানির তালে
পা ফেলে এরা চলল,—রাঙা ঘাট ঠিক
না করেই চলল—কারণ নব-যৌবনের দলের
ঐক্যবিশ্বাস চলার বেগেই পারের "উলার
রাঙা" জেবে উঠবে।

পথে, তারা মাঝিকে জিজ্ঞাসা করে
কোটালকে জিজ্ঞাসা করে, কেউ বুড়োর
ঠিকানা বলতে পারে না; কারণ মাঝির
মোড়ি ঘাট পর্যন্ত, বস্তু পর্যন্ত নয়; কোটালের
এলাকা রাঙা, তার বেণী নয়।

বেশান্ত ঘুরে ঘুরে নব-যৌবনের দল
উদ্বেগ সিঁড়ির সন্ধকে একটু ঘেন সংস্কার
হয়ে পড়ল। হয় তো বুড়োকে ধরতে
পারবে না, প্রতিজ্ঞা রাখতে পারবে না।
এমন সময়ে এই দলের সনানস্মৃতি চরহাস
কোথা থেকে একজন অন্ধ বাউলকে নিয়ে
হাজির হ'ল। বাউল চোখে দেখতে পার

না, হয় গান গেয়ে বিজনের মধ্যে পথ
আবিষ্কার করে। কিন্তু সে তো নিজে
অন্ধ, কি সাহসে সে অপরকে পথ দেখাতে
উত্তম হ'ল? অন্ধতার অন্ধকারে সে যে
পরম্ব বন্ধকে লাভ করেছে তাঁরই চরণ-
লক্ষ সে আপনার স্বত্ব-স্বন্দনে গুণতে পার,
সেই চরণ লক্ষ গ্রহণ করে সে চলে—
এই তার সাহসের কারণ—এই তার
ভরসার মূল। সে চোখের দৃষ্টি হারিয়ে
অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছে। হৃৎকের সর্কার
হৃৎক পথে চোকবার সময় তাকে রিক্ত
হৃৎকই চুক্তে হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে তার
মনের-পাওরাই এখন তার সর্কার। সেই
মনের রত্ন-প্রদীপের আলো সঞ্চল ক'রে
সে চির-ভোম্বির দাঁড়ে চলেছে। জীবনে
প্রথম যারা সংসরের দাঁড়া পেরেছে এই
"আত্মপ্রত্যয়বান" অন্ধই তাদের একমাত্র
পথের সাথী। কারণ এই অন্ধ হুঃসহ
হৃৎকের আঘাত সহ ক'রে অটল নিষ্ঠা
লাভ করেছে, চিত্ত-সাগর মখন করে চিত্তা-
মগ্নির আলোর ওর অন্ধ-করা অন্ধকার
জয়ের মত তিরোহিত হয়েছে। এই
অন্ধের নির্দেশমত যৌবন-নিঃসঙ্গ চরহাস
চির-রহস্যময় গুহ্যের মধ্যে হুঃসাহসের ভরে
চুক পড়ল।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে-বনের লোক
তার গল্প ব্যাখ্যা হ'য়ে পড়ল, তারা
বাউলের উপর ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠল। কিন্তু
বাউলের কোনো ভয় নেই, সে গাইতে
লাগল—

"হবে অর। হবে অর। হবে অর রে
ওহে বীর! হে নির্ভর।

কম্বী প্রাণ চির প্রাণ

কম্বী রে আনন্দ গান

কম্বী গেম কম্বী লেম কম্বী জ্যোতির্ঘর বে।

এ আঁধার চলে ক্ষর। হলে ক্ষর রে।

তবে বীর, হে নির্ভর!

তাজ ঘুম মেল চোখ

অসামান দূর চোখ

আশার অকণালোক চোখ অজ্ঞানর রে।

সত্যিই অসামান দূর হোল, চক্রেহাস
কিরে এসে বললে সে বুড়োর দেখা
লেয়েছে, অন্ধকার গুহার ভিতর থেকে সে জী
আসছে।—সে আর কেউ নয়—সে আমাদের
জীবন—আমাদের সঙ্গী, বায়ে বায়েই সে
নৃতন। এটাবির পুরোহম উৎসক আরম্ভ হ'ল।
অন্তঃপ্রকৃতিও বুঝলে যে, বাক্যে, চিরকালের
বুড়ো বলে মনে করে আগ্নী হয়েছ সে
চির-তরুণ—সে জীবন;—জরা তার চতুর্বেশ,
মৃত্যু তার মুখোন্মু। সংসারের ভিতর দিগে
সন্ধানী নব-ঘোবনের দল এই সত্যকেই
আবিষ্কার করলে, চির-ঘোবনের দলীল
পাকা হ'ল, তাদের সকল সিদ্ধ হল,
বুড়োকে চির-তরুণ ক'রে নিয়ে বসন্ত-
মহোৎসবে তারা ছেলে-বুড়োসকলকেই
আহ্বান ক'রে গেলে উঠল—

তোরা আরও তবে মাতের সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

অজুল প্রাণের সৃগর তীরে

ডর কিরে ভোর ক্ষর কতিরে।

বা' আছে রে সব নিয়ে তোরা

কাঁপ দিয়ে পড় আনন্দে

আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

কনিশেপার নব-ঘোবনের দলকে দিচ্ছে যে
বুড়োকে বন্দী করে এমন আগতের সামনে
তার আসল চোখো পার ক'বে দিলেন
একদিন শাকাসিংহ সেট বুড়োর সবচে
লোকের ভর বেড়ে দেয়নে জড়ে বর
ছেড়ে গেঁবিয়েছিলেন। বুড়ো বড় সোজা
মাত্র নয়। নব-ঘোবনের দল আজ যে
সিদ্ধি লাভ করলে তা সিদ্ধার্থের সিদ্ধি
নয়, আনন্দের সিদ্ধি। এ আনন্দ আরামের
নামাত্র নয়, আরামকে ঘাবার পালা
ভনিয়ে এর আরম্ভ। এ আনন্দের এলা
চড়ে বাঁচামরা, লড়াই করা, ভাঙাগড়া।
এর খেলাই কাজ, আবার কাজট খেলা
এ খেলা—

মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ

আনন্দে কি ভাট

তাঁই কাজকে কত আমরা মা ডাই।

এ আনন্দ ভরডর জানে না, অক্ষকতি
মানে না। এই আনন্দ থেকেই "ধর্ম্মানি
ভূতানি জায়ন্তে"। এই আনন্দ সখল করেই
"জাতানি জীবন্তি" আর ইয়া শেখি চলা
লেছে তাঁরাও এই আনন্দে "অস্তিসংবিস্তি।"
কান্তনীর আনন্দ-অভিযাত্রীর চারটি
স্তর। প্রথম ক্ষুঁর্তি বা সঁকর; দ্বিতীয় সন্ধান;
তৃতীয় সংসার; চতুর্থ আবিষ্কার বা পরম
সিদ্ধি।

ক্ষুঁর্তি অর্থে কবি যে নূন নৃতন
জন্মের জোয়ারা ছুটিয়েছেন, যে আনন্দের
উৎস উৎসারিত ক'রেছেন তাতে মন এবং
চোখ পলকহারি ক'রে ঘাধ। সন্ধানের
অর্থে উদ্ধাম নির্ভীক যুব-রূপের "পূজ
ব্যাস অপরিমিত মৃত্যুম পান" করবার

টীকাটা সংক্রামক হ'য়ে ওঠে, পশুদের মনেও গিঁথিতবৃত্তির আশা কাগজে থাকে। সংস্কারের অঙ্ক অঙ্গদেব অতলে ভূমিধে ধবে, কাউকে মাথা তুলতে দেয় না। কিন্তু সংস্কারের অঙ্ককুর তেমন ভাবটি নয়; দেউবলিত্তেব "দৃষ্টিভারা" নাটকের অঙ্কদের সংস্কারের মত এ সংস্কার একেবারে "কুলহারা" নয়; এ নাটকে দৃষ্টিভারা বাউল মনেব মধ্যে আশার নগ্ন-প্রদীপ জ্বলিতে রেখেছে, তাই সংস্কার এখানে জগৎকে একেবারে হতভম্ব ক'রে ফেলবার অবকাশ পায়নি। আবার বোধ হয় যে, যে-কবি আনন্দলোকের সংস্কার পেয়েছেন তাঁর কাছে সংস্কার জিনিসটা আর তেমন মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে না। সংস্কার তাঁর কাছে মামুষের অমায়িক ইতিহাসের একটা কৌতুক-কব পরিচ্ছেদ মাত্র—বড় জোর একটা হাস্যপ্রেম মত। কালিদাস সংস্কারের অঙ্ক বোধ এর কতকটা সেইজন্তে তেমন ঘনিষ্ঠে উঠতে পারে নি। তা' চক্ষু—এবে নবদেবনের সংস্কার, এবে মৌরীর চূড়ার, বড় ভোর সূর্য্য-প্রহরেণ • কিসা অঙ্ককার—এতো অনুবাস কথা নয়—এতো হারী হবার কথা নয়—এই পিচনে • তাঁর চাক্ষুণ্য প্রচণ্ড রশ্মিচ্ছটা যে সংস্কার হ'য়ে রয়েছে—আশা দিতে তিকুরে বেরুচ্ছে।

এর পর হচ্ছে আবিষ্কারের অঙ্ক, এটো অঙ্ক দ্বার চাঁস চন্দ্রের মত উজ্জল সেই সূর্য্য যৌবনামক নির্ভীক চন্দ্রচাঁসকে অঙ্ক বাউলের প্রবন্ধবিশ্বাস পাণের স্বরূপ দিবে, কবি চরম পদে প্রেরণ করেছেন। সে স্বরূপ দিতর থেকে—যা চিরকালের অপচ

চিংড়ন—তাকে আবিষ্কার ক'রে এনেছে; নব-সৌন্দর্য-দলেব প্রতিজ্ঞা বেখেছে, যুগ্ম-রচিত আনন্দকল্পের জয় গান করেছে।

কালিদাস কবি হুবার আলোর রাশি রাশি সৌন্দর্য্য কলাপের মত বিকাশ ক'রে অঙ্কবের আনন্দে চিরসত্যকে চিরস্বপ্নের ক'রে তুলেছেন। "কালিদাস" বিশ্ব-সাহিত্যের একটি মহামূল্য রত্ন। এর আদর জগতের সর্বত্র হচ্ছে, হবে এবং হ'তে বাধ্য। কবির মানস-সংস্কারের কল্পে-কামিনী হাতী হস্তো গিলতে পারবেন না, কারণ তা হ'লে জগৎ থেকে দিগ্‌গজ পণ্ডিত দিগ্‌নাগের বংশ লোপ হয়ে যাবে; হস্তো-মূর্খদের শুঁড় আঁকালেন এবং "খণ্ডিগণঃ লাক্ষ্মীনাথ" দ্বন্দ্ব দর্শন হ'য়ে পড়বে। "কিস্তি বা" ক'রেছেন তা' অতুলনীয়, পুলকাকিত পঙ্কজের মধ্যে বস্ত্রমণি দেখিয়ে দিয়েছেন।

এইবার অভিনয়ের এবং রঙ্গ-সজ্জা কথা। সাজ-সজ্জার বিশেষ কোনো যুগের বা বিশেষ কোনো জাতের হবহ অঙ্ককরণ করা হয় নি, আর দৃষ্টপট বা' দেখানো হ'য়েছে তা জুগোপ-পরিচয়ের কোনো পর্যায়ের সঙ্গেই মেলে না। তা' হ'লেও বেশ সুন্দর এবং ভাবজাতক। নীল রঙের পর্দায় সুবুজের আঁতা—আকাশে এবং অরণ্যে মিলে-মিশে যেন নিবিড় হ'য়ে উঠেছে। মোটা কত তারি দেয়া যাচ্ছে। হর শিরশিত চন্দ্রকলার মত একটুখানি চাঁদ দেখা দিয়েছে। চ-একটা গাছের ডাল মাথার উপর সূঁকে রয়েছে, তার একটাতে একটি বুলনো বাঁধা। চ'একটি লতা লতিয়ে উঠে, উচুনিচু



“ধাঁড়ে নক্সা ধাঁড়ে ধাঁড়ে”—অক্ষয় ষাটগ

৬



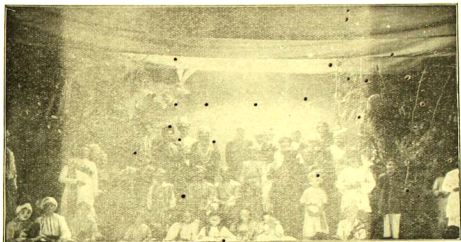
“এবং কালেরই দিক, বেলা ভাঙে চুরি”
 • দাদা ও নবযৌবনের দল
 [ইকম্পেন্ডিয়াস গ্রন্থের তোলা স্টাটোগ্রাফ হইতে]



“সবাই ঘরে সব দিতেছে”

অন্ধ বাউল

[স্বয়ংকল্পনাথ ঠাকুরের ভোগা কটো হইতে]



কাপ্তানীর রঙ্গ-সম্রাট

এই অলঙ্কারে প্রাণ ঠাকুরের তোলা কটোয়াক হইতে।

আমরা কাক-কাক কণ্ঠস্বর বসন্তের
হাওয়ার রজনী হ'য়ে উঠেছে। এর বেশি
আম কিছু নয়। এট তো রঙ্গ-সম্রাট;
এসি আবেষ্টনের মধ্যে তিন চার ঘণ্টা-
ব্যাপী আনন্দের বন্য হয়ে গেলে। পাঁচ
হ' বছরের ছেলেমেয়েগুলি পাখীর মত
সহজ আনন্দে গান গেয়ে উঠানে নৃত্য
করে হেসে-খেলো চলে গেলে। কেউ
হঠাৎ শাকল, কেউ দুলল, কেউ আমের
দুলল, কেউ নীড়ের পাখা, কেউ শালের
কিশলয়। সরনার গতির মত গভীর প্রেমের
নৃত্য, ঘোষণা প্রাণের মত, সহজ এদের
গান। যখন এরা গাঠা-হল—

“আমরা জাকি পাখীর গলায়”

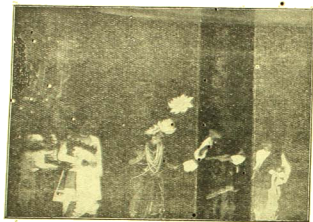
“আমরা নাচি বকুলতলায়”

তখন সত্যিই মনে হচ্ছিল

পাখীর গান এত মধুর, সেট জগেই
বকুলের গন্ধ এত চমৎকার।

এই পাঁচ-ছয়ের দলের উপরে একটি
দল-বারো'র দল আছে। “এই” দলেও
সমস্ত আনন্দ। এদের মধ্যে আমেরকেই
এমন চমৎকার ব্যতিক্রম অভিনয় করে
যে তা দেখলে শহরের অনেক নামজাদা
আম্রেনতার অভিনয়-কাণ্ডে ঐকটি জন্মে
যায়। এট ছেলেগুলি ঠিক আশ্রম-মূর্খ,
এদের ছোটগুলি আশ্রমের বুলবুল। কানন্দ-
চাকলো এদের ছুটি দলই গভীরগোত।

এদের উপরকার দল বিশ-ত্রিশের
দল, ছ-একজন চামিশ-বোঁবাড়ি আছেন।
এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য
এই দলের টাই—কাব ও সঙ্গীতবিশারদ
দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর,—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-



“যে পথে গঙ্গার বাস”
 রাজা ও প্রতিভূষণ
 [এই অলকেশনাথ ঠাকুরের তোলা কটোগ্রাফ হইতে]



“কে গো তুমি ?—কারিনী” মূল
 বসন্তের জাগরণ
 [এই অলকেশনাথ ঠাকুরের তোলা কটোগ্রাফ হইতে]

প্রতিভার ঈনি ভাণ্ডারী, এ বিষয়ে তাঁর
 দ্বিতীয় নেই। তাঁর পরেই অভিনয়ে কৃত্তিব
 দেখিয়েছেন বিজ্ঞান-বিদ জগদানন্দ রায়,
 শিল্পী অমিতকুমার চাণদাব, অধ্যাপক
 ক্ষিতিমোহন দেন এবং বোলপুরের বিদেশী
 ছাত্র নরভূজ রায়। শ্রীত ও এসেছেন কৃত্তিকার
 প্রাথমিক রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বেশ
 স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন। এ ছাড়া
 বোলপুরের কৃত্তিকার শিক্ষক অমিতকুমার
 চক্রবর্তী যে গানটি গেয়েছিলেন সেটিও
 এবার বেশ উৎসাহিত। সর্দার চলনসট,
 মাকি মাঝামাঝি, অন্যথ কলুর অংশ বেশ
 ভালো। কোটাল আরও ভালো।

এইবার সব চেয়ে বড় দলের কথা।
 এই দলে ছিলেন রথীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্র
 নাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং
 অধ্যাপক উইলিয়াম পিটার্সন।

শ্রীকৃষ্ণ মনোজ্ঞনাথ ঠাকুর মজার
 কৃত্তিকা নিয়েছিলেন, তাতে তিনি যার
 গায়ের রাজমজার যে ছবিটি দেখিয়েছেন
 তা মনে রাখবার মতন। তাঁর পোষাক
 ছিল ভারতবর্ষের মজারগের শীর্ষস্থানীয়
 মারটি পেশোচাধের ধরণের।

রাজার কৃত্তিকা নিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ
 গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর চাল, চলন,
 হাস, এমন কি প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী পর্যন্ত
 রাজোচিত হয়েছিল। তাঁর রসবর্ণের
 রাজাদের মত লীলাকমল ঘোড়ানো, তাঁর
 ধাতুদর্পণে ব্যাবহার পাকচুল দেখা, লক্ষী
 ছাড়ার দলের অভিনয়-কালে অনন্দে
 অধীর হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠে 'সাধু' 'সাধু'
 বলে এঁর মূল বর্ণন করা যে দেখেছে,—

জীবনে কখনো সত্যিকারের রাজা না দেখেছে
 তার দেখিন রাজা দেখা হয়েছে। রাজার
 পোষাকও চমৎকার হ'য়েছিল, অঙ্গভার
 প্রাচীন চিত্রপট বেন তাঁর হ'য়ে দেখা
 দিয়ে গেল।

ভারত-শিল্পের নবীন আচরণ। শ্রীকৃষ্ণ
 অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজ-শিল্পী কৃত্তিকার
 অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হাস্যরসের কৃত্তিকার
 এর অদৃষ্ট ক্ষমতা এর অভিনয়-কালে
 অনেক জমাত গোফের চিত্র-কৃত্তিকার
 আলাপ পূর্ণকিত হয়ে উঠেছিল।

এইবার তার রথীন্দ্রনাথের অভিনয়ের
 কথা। ভরণ কবিশেখর এবং বুদ্ধ বাউল
 এই দুটি বিচিত্র কৃত্তিকার ইনি বরং অবতীর্ণ
 হন। তাঁর অভিনয় সবচেয়ে কিছু বলতে
 ব্যক্তিগত বাচলতা মাত্র। এ শুধু চোখে দেখবার
 বর, সমস্ত অঙ্গভঙ্গি দিয়ে উপভোগ করবার
 এবং চিরজীবন ভরণ করবার জিনিস। এই
 মাত্র কবিশেখরের মূর্তিতে লীলা-চলন
 অভিনয়ে যিনি চকল জীবনের এবং চকলভর
 যৌবনের জয় গান ক'রে রাজার নিমিত্ত
 বৈরাগ্যকে আশ্রয়ের শুড়ের মতন দুই
 হাতে হাওয়ার উড়িয়ে দিয়ে গেছেন, পূর্ণ-
 বুদ্ধতাই তিনি অন্ধ বাউলের বেশে অঙ্গ-
 সঙ্গ অটল নিষ্ঠার মূর্তিতে সংসারের বিজ্ঞান
 দেশে অন্ধকারের ভীমে ভীমে দুর্গমচারী
 ব্যক্তির মূর্তিহীন পথপ্রদর্শক হ'য়ে দেখা
 দিলেন। নব-যৌবনের দলের প্রণয়বিশ্বাসকে
 নিজের বিশ্বাসের দ্বারা আবার আগ্রহে দিতে
 এলেন। দুঃখের মূল্যে অমৃত ক্রম ক'রে
 সেই অমৃত হাতে মাঠে ছড়িয়ে দেবার
 মাহুৎ এই বাউল। এই বাউলের কৃত্তিকা

এহণ করা। ঘর-ভার কর্তৃক নয়। জীবনে যে
অশ্রুতঃ একদিনের জরগ অমৃতের আবাদ
পেয়েছে কেবল সেই এ ছবি আঁকতে পারে;
তুমি সেই এ-বাউল লাগতে পারে। যে
“খানিরদিক” খানির এই মূর্তি অগতঃ
আজ দেখিয়েছেন তিনি অগতঃ নব্বা।
চিরবসন্তের বীণা তাঁর হাতেই শোভা
পায়, কারণ চির-উৎসবের উৎস “তিনি”
উৎসারিত ক’রে দিয়েছেন।

চির-বসন্তের বীণ
বাজাও বামিনী দিন

চির-বৌবনের ওগো চির-পুষ্পোদিত !
শ্রীতে মান জনপ্রিয়
লাগালে কান্তনৌ বাধ
সবুল পাঠায় কুমি আগালে সঙ্গীত ।
চির-শ্রাণে শ্রাণ-বান
অক্লান্ত তব দান
অমৃত তোমার গান নবীরাম্ নতি ;
তোমাঝে কী পারি দিতে—
পারিছাত অমনীতে—
নাই কবি, দিহু তাই অক্লান্তের স্রীতি ।
শ্রীলভ্যোজনাথ দত্ত ।

সরস্বতী

তুমারে যে সর পড়েছে মানস-সরের দটিক জলে
কে ফোটালে দ্যেত শতদল সহসা সেই তুমার-তলে ।
কে জেগেছে আদিম উষা
কে জেগেছে জ্যোতির্জ্বা
তব আলোর মৃণাল-সুতার বিশ্ব-বিহার কোকুহলে
কে রেখেছে অমল চরণ গোপন-প্রাণের পদ্মদলে ।

মুকুট তোমার উজল রাজে শিশু-আখির শশী-কলার,
মুক্ত মনের লাংগোরি মুক্তমালা তোমারি গলায় ;
সত্য স্বপন স্বপ্নহার্য
জড়ার পারে নৃপুং পারা
যুগে কিরে ছন্দ-রসাল ভিড়ার ডানা পারের তলার
ভিড়ির গলার কাকন তোমার—তৈরী সে যে খির-চপলায় ।

টান্বেব জাজা নিভিয়ে নেওগা তোমার বীণার চাদির ভায়ে
চকোর লোভন উৎসেতে স্বপ্ন তিতিয়ে জ্বলন্ত অধার ধাবে ;

ধবল-গিরির শৈষ্ঠা পরে

মর্দরে আর গদ্যিক জ্বরে

বরফ-চুরের বিধে শাশা জুগা করে হীরার চাবে

শুভ্র হরের গান জেগেছে— প্রাণ জেগেছে সে অন্ধারে ।

চতুর্দশের হস্ত-কটি যশঃ-ভূতি জ্যোতির্ধরী ।

দেবি ! তোমার দিগ্য অধির দীপ্তি-পাতে উজল জয়ী ।

জ্যোৎস্না-জিরি হস্তার বোনা

ছন্দ-কলির চক্রে-কোণঃ—

গগন তোমার ভাব-তমুটি বেড় নিয়ে ওই স্পর্শে মহী

সত্য-সূর্য্য নেয় তোমার তুমি স্বরস্পর্শা অরি ।

তুমি সকল একাশ-করা সকল-শুভ্র মূর্তি তব,

নিখিল-চিত্ত-নবীন-করা প্রথমে তুমি—জীবন নর ;

সতী তুমি নিত্য তুমি

লক্ষীছাড়ার বস্ত্র-তুমি

যে বর হাতে নাট বরদার দাগে যে তুমি সে হস্ত-ভণ্ড

মর্ত্য-লোকের অমরতী—তোমার কৃপা-সমুদ্রব ।

পূণ্য-শুভ্র অধর তোমার স্নিহ-হাসির পূলক তা'তে,

এজা তোমার চোখের কামল স্বজন-প্রাতে প্রলয়-রাতে ;

নীহারিকাব নিতল বৃকে

শীতল চরণ রাখেলে স্থখে

ভার ছারাপূর্ণ মুখে—তোমার শুভ্র পার্শ্ব অলপনাতে,

চন্দনে খেত পরশ তোমার হস্ত চক্রে-মলিকাতে ।

মন্-গগনের খেত হীরণী । মহাখেতা সরসভী !

মন্-মানসেব ফুল-কমল অমল তোমার ওই সুমতি ।

অমল তোমার অস্ত্র-পুংখি

ধবল লব্ধ তোমার স্ততি

অমল তপের লগ্ন আহতি চিত্তলোকের উদা-জ্যোতি

কপূরেরি শুভ্র প্রদীপ তারার তোমার সন্ধ্যামতি ।

আশিস তোমার মুক্তাক্ষী, তুমি সে শুকতারায় ভারে,
মল্লারের অমল মালা বিলাস দেবী! ডাকিনী বীরে।

মরাত্ব রপে মনোজবে

ফিরে ফুটি ভারতের তবে

গন্ধবীজ আর পারিবার্তের অঞ্জলি ওই গুপ্ত পাথে,
পারেব অস্তার ঘাস বিরেছে চন্দ্রকান্ত-দর্শির পাথে।

* সত্ত্ব-গুণ-বরকে স্তম্ভ কুটিরে হঠাৎ লাগে লাগে
চেতন-লোকের মগ্ন-তটে জুগে তোমার প্রসাদ জাগে,
ধান্য রাশির আলোর স্বাম্য
চাঁচর মেঘে চুলার চামর

সুটায় কবি, দিক অমর তোমার পদ্মাসনের আগে
উজল তোমার বিকীট-হীরা প্রব-তারার কিরণ-রাগে।

ঐসত্যোক্তনাথ দত্ত।

সমালোচনা

শূদ্রের পূজা ও বৈদ্যধিকার। ঐহিক
বিশিষ্টনায়ায়ন ভট্টাচার্য্য গ্রন্থিত। কলিকাতা নবা
ভারত প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এই গ্রন্থে
হিন্দুর কৃত্রিম ধর্ম কি এবং তাহাতে শূদ্রের কতটা
শাস্ত্র-সম্মত অধিকার আছে, তাহাই লাত্তাধির সাহায্যে
প্রদর্শিত হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্র চিত্রবিনয় উহার মত
প্রচুর কলিতা আদিলোকে, শুধু স্বার্থের দ্বন্দ্ব গণে শাস্ত্রের
মধ্যে বিস্তার নীচ মত প্রকিষ্ট হইয়াছে—সেটুকু
লোকের মনকতাবে বরাইয়া দিয়াছেন। সৌভাগ্য
ক্রমে শিক্ষার ফলে সকলেরই এখন এমিকে দৃষ্টি
পড়িতেছে—সমাজের কতকগুলি অপসিক্ত ব্যক্তি
ব্যবেচ্ছাচার করিয়া সব ভাগিবে গড়িবে, শিকিত সম্ভাব্য
আর ভাষা সঙ্গ করিতেছেন না। কল দীড়াইতেছে,
অতিবিক্ত গোড়ামির আশ্রয় লইয়া সব-টেলগা-ফেলার
বহু ক্রমশই ধীম-বল হইতেছে। উন্নততর উদাহরণ

হিন্দুর অভ্যর্থান ইতিমধ্যেই দেখা দিগছে। বৈদ্যভক্ত
কৃষ্ণে মন্ত, সমাজে তু পৌরুষ—সমাজ ক্রমে এ
পৌরুষের মূল্য বুঝিতেছে এবং তাহার ভবিষ্যৎ যে
উজ্জল, সে সবকিছু আশাও আশাবাদের বিলকণ
আছে। বর্জিত-নীতি অধঃপতনের পূর্বলক্ষণ, এ কথা
দুর্ভাগ্যক্রমে অনেকে এখনও বুঝিতেছেন না—ভীষ্মা
এখনও পতঙ্গলিকা-প্রবাহে গা কাসানু দিয়া চলিয়াছেন—
বুঝিতেছেন না, ক্রমশঃ কোন্ অন্ধকারের দ্বন্দ্ব
গর্ভে পিয়া পুঁপাছিয়েন। এ ব্যাপারে চৈতন্যলাভ
করিতে হইলে সর্ধ্যুগীকী শিক্ষার বাধ্যতা প্রয়োজন।
শিক্ষা (culture) ব্যতিরেকে সমাজের শক্তি সকার
অসম্ভব। দেশবাদী সকলেরই এমিকে সর্বিশেষ উদ্ভোগী
হওয়া প্রয়োজন। লেখকের এ গ্রন্থ সেমিকে বৃহ
ইঙ্গিত করিয়াছে।

ঐসত্যোক্তনাথ দত্ত।

কলিকাতা, ১১ প্রাকরাষ্ট্র, কান্তিক প্রেসে, ঐহিকতরন যাত্রা বাগা মুদ্রিত ও ত, সানি পার্ক, বালগঞ্জ হইতে।

ঐসত্যোক্তনাথ দত্তোপাধ্যায় বাগা প্রকাশিত।



বসন্ত

ঐগুরু হুঁরেস্তনাথ কর আঁকিত চিত্র হইতে ।

ভারতী

৩৯শ বর্ষ]

চৈত্র, ১৩২২

[১২শ সংখ্যা

দেনা-পা ওনা

পাখীরে দিগেছ গান, গাছ দেই গান,
তার বেশি করে না সে দান ।
আমাকে দিগেছ স্বর, আমি তারো বেশি করি দান,
আমি গাই গান ।

বাতাসেরে কবেছ স্বাধীন,
সহজে সে ভূত্যা তব বন্ধনবিচীন ।
আমারে দিগেছ বোকা,
তাই নিরে চলি পথে কতু বাকা কতু সোকা ।
একে একে কেলি' ভাঙ্ক মরণে মরণে
নিরে ঘাই তোমার চরণে
এক দিন রিক্তহস্ত সেবার স্বাধীন,
বন্ধন যা দিলে মোরে করি তারে মুক্তিতে বিদীন ।

পূর্ণিমাতে দিলে হাসি ;
অথবাপ্রসন্নাসি
চলে তাই, ধরণীর কমপুট অধাষ উচ্ছাসি ।
দ্বঃবখানি দিলে মোর তন্তুভালে বুঝে
অশ্রুজলে তারে ধুয়ে ধুয়ে
আনন্দ করিয়া তারে ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে
দিনশেষে মিলনের রাতে ।

•তুমি ত গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
 মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
 শূন্য হাতে দেখা যোরে রেখে
 হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আঁড়ালে শুণ্ড থেকে।
 দিগেছ আমার পরে তার
 তোমার স্বর্ণটি রচিতবার।

আর সকলেরে তুমি দাও।
 শুধু মোর কাছে তুমি চাও।
 •আমি বাহা দিতে পারি আপনার প্রেমে—
 সিংহাসন হতে নেমে
 হাসি-মুখে তাই তুলে নাও।
 মোর হাতে বাহা দাও
 তোমার আপন হাতে তাঁর বেশি ফিরে তুমি পাও।

২৪ মাঘ, ১৩২১
 পদ্মাতীর

শ্রীমদ্বীজনাথ ঠাকুর।

সেকেনে কথা

শ্রীমুক্ত হুনিলাল গাঙ্গুলির সহিত ভারতীয়
 ভূতপূর্ব সম্পাদিকার সঞ্চয়টুকু অন্ন-মধুর।
 ইনি সম্পর্কে আমার নাতিনীজামাই।
 যখন অন্নযাজন মুখে রোচেনা তখন অন্ন-
 ব্যঞ্জন অল্পচি দূর করে। ইনি আমাকে
 ধরিয়া পড়িয়াছেন—“আপনি সেকালের কথা
 লিখুন।” নব সম্পাদকের এই মিষ্ট অহুরোধে
 লিখিবার তত্ত্ব পরিশ্রমও আজি সহজপেয়া
 হইয়া উঠিয়াছে, দেখনীর ভারও আজ লঘু
 বেধে করিতেছি।

লিখিতে হইবে আমাকে সেকালের
 কীপা? তাই ত! ইহার মধ্যেই সেকালে
 হইয়া পুড়িলাম। পুনঃপুনঃ আবৃত্তি না
 করিলে কিছু কথাটা জুলিয়া যাইতে হয়।
 এই ত সে সেদিন—বেদিন দিদিমা বেচারীরা
 আমাদের একেলে-পনার আলাপ অস্থির
 হইয়া উঠিতেন, আর নব্য নারী আমরা
 তাহাদের সেকালে-পনার গল্পনা অকাতরে
 সহ্য করিয়া নারিকা-দর্প অহুত্ব করিতাম।
 গল্পনারূপ সে ঐক্যজ্ঞ যদিও প্রথম-

ধিকারহুতে আজি আমানিগেরই হস্তগত
তথাপি বিনা প্রয়োগে তাহা শেটিকাংক
রাখাই প্রেধ: বিবেচনা করিচ্ছি।

ইউলিউগনের হাওয়া বেরপ প্রলম্বাণে
বহিরাছে—তাহাতে কেবল ইংলেণ্ডে সফরি-
জিউল নহেন বিবের ঘেরে-মহল বাধিকার
লাত বাসনার ঢেঁকল হইয়া উঠিচ্ছেন।
বাসানীর ঘেরেও যে আর অবলা নহেন,
আধুনিক বঙ্গসাহিত্য তাহার নিশিষ্ট প্রমাণ।
একত্রে আমার হাতের অস্ত্র কাড়িয়া সহজেই
যে তিনি আমাকে নিরস্ত করিবেন এ উচ্চটুকু
বিলক্ষণ আছে। বেশ জানি তাঁহাকে
সোবী করিলেই তিনি বলিবেন—“একলে”কে
ত গঠন করিয়াছে “সেকেন্দ্রে”ট, অতএব
তাহার কালের জন্ত দাবী ত তোমরাট।”

কথাটা সত্য বটে, কিন্তু তবুও উঃ কি!
আম্পর্ক! আমাদের কালে কি আমরা
এরূপ উত্তর দিতে পারিতাম! বুক ফাটলেও
তখন মুখ ফুটিত না। তবেই মেন
একালের মেয়েদের যে পরিমাণে বলিবার
বুঝিবার ক্ষমতা বাড়িয়াছে সেই পরিমাণে
সহিবার বহিবার শক্তিও কমেয়াছে। সংক্ষেপে
বলিতে হইলে ইহাই এয়ুগের স্থূল এবং মূল
লক্ষণ। হুহুশরীর, শারীরিক পরিশ্রম, সুপ্রসব
এসকল ঘেন এখন সেকেন্দ্রে-ফ্যাসানের
মধ্যেই গণ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া
বলিবার মত নুতন কথা কিছু ত খুঁজিয়া পাই
না। আমাদের কালে যাহা ছিলনা, এখন
তাহা হর নাই। তখনকার অজুর এবং চারি
গাছই এখন পত্রপুষ্পে স্নোভিত। বরঞ্চ যে
গাছ শুকাইয়াছে, যে স্থল বরিয়াছে তাহার
স্থল এখনও পূরে নাই।

ক্রীশিকাসম্বন্ধে এট বসিতে পারি লে,
এখনকার দিনের মত বিদ্বে, এম-এ তখন
না থাকিলেও বিহ্বার আদর তখনও যথেষ্ট
ছিল। অন্ততঃ আমাদের বাড়ীর দৃষ্টান্ত ত
এটরূপই দেখি। আর আধুনিক ক্রীশিকা-
গন্ধতিরও মূল-পত্তন হইয়াছে আমাদের
“কালেই।”

বহু বৎসর পূর্বে অস্ত্র-পুর-শিক্ষাসম্বন্ধে
আমি “প্রদীপ” নামক মাসিক পত্রিকায় যে
কথা লিখিয়াছিলাম—সুতবতঃ তাহা অনেকের
পক্ষেই এখন নূতন হইবে। এই স্মৃতি
বিশ্বাসে সেই কথাই এখানে পুনরাবৃত্তি
করিয়া আজি এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।
যখন আমার মাতুলদেবী পুত্রবধূ হইয়া
আমাদের গৃহে আসেন সে প্রার শতাব্দি-
কালেরই কথা। তখন আমাদের প্রপিতা-
মহের পরিবাণে অস্ত্র-পুর পরিপূর্ণ। পিতামহ
ধারকনোপ ঠাকুর এবং তাহার ভ্রাতা
ভগিনীগণ সকলেই তখন সপরিবারে এক
বাড়ীতেই বাস করিতেন। ভগিনীরা—এই
বহু পরিবাণের মধ্যে কোন নারীই তখন মূর্খ
ছিলেন না, বরঞ্চ ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ
বিশেষ বিভাবতী বলিয়া আদরহইয়া ছিলেন।
ক্রীলোকের বিভাশিকা তখনো “তাহারা
গৌরবের বিষয় বলিয়াই মনে করিতেন।

এই ত মেল আমার পক্ষেও বাহা
সেকাল সেই কালের কথা। আর আমাদের
কালেও তাহারি ধের চলিয়া আসিয়াছে।
আমি দেখিয়াছি আমাদের পূর-সম্পর্কে এক
আত্মীয় ভগিনী, মাতার বরস্তা,—চমৎকার
বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতেন। সংস্কৃতও তিনি
কিছু কিছু লিখিয়াছিলেন।

সেই অল্প মেয়েমহলে শুধু নয়, পুরুষ-মহলেও তাঁহার খুঁজে সন্ধান ছিল। ইহা-নিগের পোস্ত্রী বৌহিত্তীনিগের মধ্যে বরফ লেখাপড়ার একগুণ আদর দেখি নাই, কাহাকে কাহাকেও 'মুখ' দেখিয়াছি। বুদ্ধা-গুণ প্রোচাগুণ আমাদের বাড়ীতে বেরুপ বিভাহুইলনের আনহাওয়ার মধ্যে মাহুয হইরাছিলেন, তাঁহাদের পরবংশীরা নবীনগণ অজ্ঞা গিরা শিকালাতের সত্ত্বাতঃ স্বেপ্পর্ষ হুবিধা পান নাই।

আহার, বিয়াস, পুঁজা-অর্জনার জার সে কালেও আমাদের অন্তঃপুরে লেখাপড়া ঞ্চেরদের মধ্যে একটি নিতানিরমিত ক্রিষ্ণ-দ্রষ্টান ছিল। প্রতি দিন প্রত্যুতে গরলানী যেমন হুৎ লইয়া আসিত, মালিনী স্কল-ধোঁগাউত, সৈবজঠাকুর পাঁজি-পুঁজি-হুৎ সৈনিক শুভান্ত বর্ণিতে আসিতেন, তুমনি মানবিত্তা, শুভ্রবসনা, গোমী বৈষ্ণবী-ঠাকুরানী বিভালোক বিতরণার্থে অতঃপুরে আবিস্কৃত হইতেন। ইনি নিত্য সামান্ত বিভাহুইলম্পরা ছিলেন না। সংস্কৃত বিভাহু ইহার মধ্যেই সুপ্তি ছিল, অতএব বাঙ্গালী-ভাল আনিতেন ইহা বলা বাহুল্য। উপরন্তু ইহার চমৎকার বর্ণনা-শক্তি ছিল, কথকতা-ক্ষমতার ইনি সকলকে মোহিত করিতেন। বাহাদের বিভালাতের ইচ্ছা নাও বা থাকিত, তাঁহারাও বৈষ্ণবীঠাকুরানীর সেবসেবী-বর্ণনা, প্রভাত-বর্ণনা শুনিতে কুতূহলী হইয়া পাঠগৃহে সমাগত হইতেন। আমার ভাগ্যে বৈষ্ণবীঠাকুরানীর দর্শনলাভ ঘটে নাই, সুতরাং তাঁহার বর্ণনাসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমার নাই। কিন্তু কাকিমার নিকট

ইহার প্রভাত-বর্ণনার অল্পকরণ বাহা শুনি-রাছি, নব্যবংশের শ্রীতির অল্প তাহা সম্বন্ধে স্মৃতিস্থ করিয়া নিম্নে বিবৃত করিলাম।

"বামিনী চতুর্ধামে লগা হয়ে পড়েছেন, কিন্তু বিদার গ্রহণ কর্তে পারছেন না। প্রভাত পূর্বাঙ্গিগতের নীচে এসে দাঁড়িয়ে আছেন, তবু প্রকাশ হ'তে পারছেন না। কেননা ঐক্য রাখিকা গোঁহে গোঁহার প্রেমবন্ধনে নিজেচেতন হ'য়ে রয়েছেন। আচ্ছা, সারানিধি মানভঞ্জে উত্তরের গত হয়েছে; নিশিতোরে তাই ঘুমে বিভোর হয়ে পড়েছেন। মরি, মরি! আচ্ছা প্রাণ-স্বরূপ শ্রীহরি, প্রেমস্বরূপিনী শ্রীরাধার এই প্রেমমিলনে দ্বালোক জ্বলোক বিচরচর তত্ত্বিত হয়ে পড়েছে। বিহববিহগীর কল-শব্দ নাই, মর্দনশ্রী নিঃশ্রোত, কৌবজ্ঞ নম-নারী গভীর নিদ্রামগ্ন, শুকতারী পূর্বাকাশ হ'তে এখনো অল্প বেতে পারছেন না, সূর্যদেব অরুণ-রথে সমানীন হয়ে উগর হ'তে শুরু পাচ্ছেন। স্মৃতিতে প্রলয় আসে-আসে। সূর্যদেব চিত্তাকুল জ্বরে রথ ফিরিয়ে শুগধান ব্রহ্মার সন্নে উপনীত হলেন, সেখানে গিয়ে তাঁকে এই সবুধ বিপদের কথা অকণ্ঠ করালেন। ব্রহ্মা মনে মনে প্রমাদ গণনা ক'রে ধ্যানমগ্ন হলেন। ধ্যানভঞ্জে অস্ত্রোপায় না দেখে ত্রুপকীর (সামপকী) শরণ করলেন, পক্ষী আগত হলে বল্লেন, "হে ত্রুপকী! বিহব, তুমি না রক্ষা করলে এ ক্রিপণে পরিভ্রাণ নাই। হে অগতির গতি, তত্ত্বচূড়ামনি, তুমি ভিন্ন শুগধান বিহুসেবের মিত্রাত্ত্ব করে এমন সাধা আর কার? অতএব দেবদানব নরনাগস সক-

লের প্রতি কৃপাবান হয়ে তুমি গিয়ে তাঁকে
জাগরিত কর;—নচেৎ সৃষ্টি এখনি লোপ
পায়! পক্ষীর ব্রহ্মার বচনে সন্তুষ্ট হয়ে
তাঁকে নির্ভর প্রদান ক'রে, ব্রহ্মাবতের
নিকুঞ্জধারে এসে ডাকলেন—কুক্কুহু অর্থাৎ
উঠ হে উঠ,—কুক্কুহু! কুক্কুহু!
ভগবান শ্রীকৃষ্ণদেব কমললোচন উদ্যোগ
করে দেখলেন প্রভাত হওছে।”

যতদূর স্মরণ হচ্ছে তাত্ত্বিক বোধ
না করে এই সূত্রের মিলনভঙ্গ-অনিত অপরাধে
তিনি পক্ষীরূপে যে অভিযান প্রদান করলেন
সেই শাশ্বত তখনকার পূজ্য পবিত্র কুক্কুট-
পক্ষী এখন হিন্দুর অমৃত ও স্নেহের খাদ্য।

আমি যে গল্পটি হুবহু আমার খুলতাত-
পত্নীর ভাবার আবৃত্তি করিলাম এমন নহে;
ভাবার রূপান্তর হইরাছে সন্দেহ নাই।
সে এত ছেলেবেলার কথা বখন কাকিমার
মুখ হাতে পীড়াপীড়ি করিয়া গাই বর্ণনা
তনিতাম। সমস্ত কোতুল সমস্ত প্রাণ
তখন কুক্কুহু কথাটির উপর পড়িয়া
থাকিত। কখন পানী ডাকিয়া উঠিবে সেই
আগ্রহে প্রথমবারের প্রতি তেমন মনো-
যোগই হইত না। তবে এবার এই
গল্পটি শুনিয়াছি, তাই এখন মনে করিয়া
ভাষা রচনা করিতে পারিলাম।

বৈষ্ণবী আসিতেম অসংখ্যের চতুঃ-
সীমাবদ্ধা মলিমাগণের গুহ; বালিকা নববধু
ও বিবাহিতা বালিকা কস্তাগণ ইহার কাছেই
শিক্ষা লাভ করিতেন। কিন্তু বাড়ীর
অবিবাহিতা কস্তাগণ বালকদিগের সহিত
একত্রে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় গমন
করিত। ইহাতে আর কিছু না হউক,

বালকবালিকার শিক্ষার ভিত্তি সমভাবেই
গঠিত হইত।

তখন বিভাগসাগরের বর্ণগরিচের হয় নাই।
বৈষ্ণবীঠাকুরাণী যে পুস্তক হাতে বর্ণবোধ
করাইতেন, তাহার নাম, শ্রুতিবোধক।
পুস্তকখানি আমি বড় হইয়া দেখিয়াছি।
অক্ষরমালা, বানান, দেবদেবী-বন্দনা, বাম-
বর্ণনা, লিপিলিখন-প্রণালী—এ সমস্তই এই
একখানি পুস্তকের মধ্যে স্তম্ভীকৃত। বন্দনা
ও বর্ণনার ভাষা এত কঠিন গুরুপ্রাচীণ যে
তাঁরা ভাণ করিয়া বুঝিয়া পড়িলেই বাগল্যা
ভাষা শিক্ষা এক রকম শেষ চইয়া যায়।
তাঁহারা লেখা অভ্যাস করিতেন প্রথমে
ভালপাতে, তাঁহার পর কলাপাতে। বালির
কাগজে ককী কলমের দকল সর্পিণ্ডেবে।

আমি শৈশবে অসংখ্যের সকলেরই
লেখাপড়ার প্রতি একটা অজুহাদ দেখিয়াছি।
মাতাঠাকুরাণী ত কালকণ্ঠের অবসরে
মহাদিনই একখানি বই হাতে লইয়া
থাকিতেন। চাণীকালোক তাঁহার বিশেষ
প্রিয়পাঠ ছিল, প্রায়ই বইখানি লইয়া
শ্লোকগুলি আওড়াইতেন। তাঁহাকে সংস্কৃত
সামান্য মহাত্ম্যরত পড়িয়া শুনিইবার গুহ
প্রায়ই কোন না কোন মাদার ডাক পড়িত।
দিদিমা—বাগের খুড়ীমা, তিনি ত পুস্তকের
কোট ছিলেন। কাব্য উপজাতিদিগ ত কথাই
নাই; তত্ত্বপুরাণ, সাংখ্য আর দর্শনাদির
যত কঠিন অজুহাদই হউক না কেন তাহাতে
দত্তশ্রুতি করিবার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে
পারিতেন না। আর কোন বই না পাইলে
নেবে অভিধান খানাই খুলিয়া পড়িতে
বসিতেন। বড়দাদা মহাশয়ের “তত্ত্ববিজ্ঞান”র

সমসার তাহার মন্ত আর কেহ ছিল না। মমীমা, দিদি, অধীশ্বরীগণ স্রুতি নবী-
নার দল অবশ্য কাব্য উপজাসেবটী অহু-
বাণিনী ছিলেন। পড়িতে শিখিয়া অবধি
আলমের ক্ষত্ৰলানীকে রামাণে, মহাভারত,
হাতেমতাই প্রভৃতি পড়িয়া শুনানু আমাৰ
একটা বিশেষ কাব্য ছিল। মনে আছে,
বাড়ীতে মালিনী বট নিজী কথিতে আসিলে
মেরেমহল পেনিন কি রকম সরগরম হইয়া
উঠিত। সে বটতলার বত কিছু নৃতন
কই, কাব্য উপজাস, আবার গল্প—অহঃপরে
আনিয়া দিদিদের লাঠেবেরী কলেবর বুদ্ধি
করিয়া যাঁত। ঘরে ঘরে সকলের যেমন
আলমারীভরা পুতুল, খেলাশা, বস্ত্রাদি থাকত,
তেমনি সিদ্ধকবলী পুস্তকরাশিও থাকিত।
বড় হইয়া সে-কালের বটগুলি যথেষ্ট
নাড়াচাড়া করিয়াছি;—মানভজন, প্রভাস-
মিলন, দ্বীতঃবাব, কোকিলপুত, কষ্টি-
হরণ, সারিলাতহরণ, শীতগোবিন্দ,
প্রহ্লাদচরিত্র, রত্নবিলাপ, বস্ত্রহরণ,
অন্নদামল, আমবোপজাস, পার্শ্বোপজাস,
চাহারদরশন, হাতেমতাই, গোণেশ্বারনী,
লরশাষ্ট্রলক্ষ্মী, বহুবলতা, কামিনী-কুমার
ইত্যাদি। পাঠক দেখিতেছেন এতগুলির
মধ্যে একখানি কেবল নামকরণে সামাজিক;
কামিনী-কুমারে কাণ্ডে লিখিত উপজাস।
তখন পর্য্যন্ত। গদ্য উপজাস লিখিত
হয় নাই। অনেক পরবর্তী সময়ে আমাদের
শৈশবে রামনারায়ণ ভরদ্বাজ গজে সংস্কৃত
নাটকাদি অহুবাদের পর, ‘কুলীনকুল
সর্গ’ ‘বহুবাহু নাটক’ প্রভৃতি
সামাজিক নাটক রচনা করেন। কালী

দেবের হতোমপোচার নন্দা, পার্বীচাঁদ
মিহের উপজাসাবলী ইহারও পরে রচিত।
অথচ সাহিত্যসামান্যে কামিনীকুমারের
নাম কেন দেখিতে পাই না? ‘কামিনী-
কুমার’ পক্ষে লিখিত উপজাস, কিছু ইহার
বিশেষত্ব এট, নিজাত্বকরের ঠিক অহুকরণ
নহে। পূর্বে কাব্য লিখিতে হইলেই ভারত-
চন্দ্র’র তাহার আদর্শ হইত। শুনিয়াছি
মদনমোহনম্বর্জানন্ডার ‘বাসবদত্তা’ লিখিবার
সময় পণ করিয়া লিপিতে বলেন, যে তিনি
ভারতচন্দ্রের অহুকরণে কাব্য লিখিয়া
ভারতচন্দ্রকেও হারাইবেন। কিছু পুস্তক
ব্যতির হইলে, তখনকার সমসাময়িকের
বিচারে তাঁহাকে তরুণতা হইতে হয়,
কোণে সাধক বাসবদত্তা তিনি অধিসমর্ণ
করেন। দ্বৈত-চারিখানি পুস্তক ইতিপূর্বেই
যাহা ব্রাহ্মের প্রচার হইয়াছিল, তাহাতেই
মাত্র মদনমোহনের মহিমা আবদ্ধ থাকে।

কিন্তু বা উপজাসিক রহিত কামিনী-
কুমারের মূল্য অধিক, এক্ষণ বলিতে পারি
না—তথাপি সাহিত্যসমাজে ইহার নাম
রক্ষা হওয়া উচিত। চলিত বঙ্গসামাজিক
দ্রীপুস্তক লইয়া নারকনারিক। রচনার ইহা
সর্গাদি পুস্তক। বহুদূর মনে পড়িতেছে,
কামিনীকুমারের গল্পটি এইরূপ—প্রথমে
নারকনারিকার জন্মবিবরণ, রূপবর্ণনা, পরে
বহুপ্রাণে উত্তরের দর্শন, পরম্পরের প্রতি
অহুসাগ, মিলন-আশার উত্তরের বেশভূষণে
নির্গমন; স্থান বর্ণনা, কোন কোন স্থানে
উত্তরের সন্দর্শনলাভ; কামিনী হৃৎবেগী
পুস্তক, অতএব কুমারের নিকট অপরিচিত,
কিন্তু কুমারকে কামিনী চিনিয়া তাহার

সহিত রহস্তালাপে রত, অবশেষে উভয়ের
গৃহে প্রত্যাগমন, মিলন ও বিবাহ। ইহার
রচয়িতা ত্রিগুণ শিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—আমার
মধ্যম খুদাতাত।

পিতৃদেবকে ধর্ম্মাশ্রা ও ধর্ম্মসংস্কারক
বলিয়াই সকলে জানেন। এবং যেহেতু
আমাদের দেশের ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার
পুথক বন্ধ নহে, পরম্পরসংশ্লিষ্ট, সেই-হেতু
ধর্ম্মসংস্কারের সহিত যে-পরিচয়ণ সমাজ
সংস্কার অবশ্যসম্ভাবী, সেই-পরিমাণে গোপ-
ভাবে তিনি সমাজসংস্কারক বলিয়াও
পরিচিত। কিন্তু গোপভাবে নহে, ধর্ম্ম-
সংস্কারের দ্বারা সমাজসংস্কারও যে ইনি
মুখ্যতাবে প্রচেষ্টা ছিলেন, ইহার দ্বারা ই যে
সর্ব্বাঙ্গে গ্রীণোক্তের উচ্চশিক্ষার মূলগতন
হইয়াছে, ইনিই যে বালা-দুর্বিহারের প্রথম
সংস্কার করেন, এমন কি মহিলাদিগের
অসমতা পরিচ্ছদ প্রবর্ত্তন সংকল্পেও যে কতদূর
মনোযোগ দিয়াছেন, তাহা আমরাই বলিতে
পারি। ধর্ম্মসংস্কারে হামখোচন বাহের
নাম সর্ব্বাঙ্গে, কিন্তু সমাজসংস্কারে যে
পিতৃদেব বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক,
ইহা বলিলে কিছুমাত্র অত্যাধিক হয় না।

বেদমুদ্রল স্থাপিত হইবামাত্র সমাজসংস্কার
অগ্রাহ্য করিয়া যে-হই-একটু নবোদয়
সর্ব্বাঙ্গে তাহাদের শিশু কল্যাণগণকে দুলে
প্রেরণ করেন, পিতৃদেব তাহাদের মধ্যে
একজন।

পিতৃদেব পাঠাড়ে চলিয়া গেলে আমাদের
অন্তঃপুরের শিক্ষাসংস্কার একেবারে বন্ধ
হইয়া যায়। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিবার
পর হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের

উন্নতি আরম্ভ। তখন হইতে ধর্ম্মসংস্কার
ও শিক্ষাসংস্কার একই সূত্রে প্রবলবেগে
প্রবাহিত হইতে থাকে।

তিনি আসিয়াই প্রথমে শালগ্রামশিলা
বিসর্জন দিলেন, বাড়ীর সকলকে ব্রাহ্মধর্মে
দীক্ষিত করিলেন। প্রতিদিন উপাসনার
সময় সত্যধর্ম্ম সৎকীর উপদেশ, এবং ভিন্ন
সময়ে নানাতরঙ্গ সরল সহজ বিজ্ঞানবিষয়ক
বক্তৃতায় তাহার পরিবারের, বিশেষ
অন্তঃপুরিকাগণের বুদ্ধি, জ্ঞান ও ধর্ম্মবৃত্তি
সমভাবে সম্বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন।
পৌত্তলিক আচার অমুঠান উঠাইয়াই কান্দ
না হইয়া, সমস্ত ভারতবাণী বহুকাল
এঁচলিত হীন প্রা-আচার হই একটি করিয়া
নিজ অন্তঃপুর হইতে একেবারে উঠাইয়া
দিলেন; আজিকালিকার মত বস্ত্র-বিবাহ
না হটুক, বালিকাদিগের বিনাহের একটি
বিশেষ ব্যয়জনক নির্ধারিত করিলেন ও
বিবাহের একটি নব পদ্ধতি গঠিত হইল।
আমাদের মধ্যম ভাগিনীর বিবাহ হইতে এ
পর্য্যন্ত বাড়ীতে সেই পদ্ধতি অমুদ্যমেই
বিবাহ-কাঁচা সম্পাদিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যে
তাঁহার শিশুকল্যাণ শিক্ষার ব্যয় প্রাপ্ত
হইলে প্রবর্ত্তন প্রথার পরিবর্ত্তে উচ্চ উন্নত
প্রণালীতে তাহাদের শিক্ষা আরম্ভ হইল।
আমাদের দ্বন্দ্ব পণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন।
বিত্তোন্নয়ন শেষ করিয়া বাঙ্গলার সহিত
সংস্কৃত শিথিতে আরম্ভ করিলাম। অন্তঃপুরে
যেমন আসিতে লাগিলেন।

আমাদের বাড়ীর এই নবোদয়কালে
কেশববাবু পিতামহাশয়ের শিষ্য হইলেন।
অনুধ্যাত্ত্ব অন্তঃপুরে বাহিরের নিঃসম্পর্কীয়

লোক এই প্রথম, অন্তরঙ্গ আত্মীরের দ্বারা
বাগত হইয়া, প্রবেশলাভ করিলেন।
অনেকে এই ঘটনাটিতে অসমসাহসিকতা
প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হন। কিন্তু মহাবি-
প্লবের, যিনি ধর্মের প্রজ্ঞা আত্মীর বাক্য,
হুবিধা স্বাক্ষর্য্য অবাধে প্রকাশিত দিতে
সুস্থিত হন নাট, তিনি যে সত্যার্থ
প্রকাশনার্থে গৃহত্যাগিত, শিবারণে সমাগত,
পরমাগত সত্যকে কেনবাবুকে দেখাচার
তুচ্ছ করিয়া পুত্রদেহে গৃহে প্রবেশ করিলেন,
ইহা কি বড়ই আশ্চর্য্যের কথা ?

যদি আশ্চর্য্য হইতে হয়—তবে ইহার
পরমার্থ আর একটি কার্য্য। এতক্ষণ
যাহা বলিলাম, এ সকলই স্নেহমহামহাশয়
বিস্মিত হইবার পূর্ব্বকারণ। তাঁহার
বিস্মিত গমনের দুই-তিন বৎসর পরে
একজন অনাত্মীয় পুরুষ অস্তঃপুরে প্রবেশ
লাভ করিলেন। মেঘের শিক্কা অপ্রাপ্তরূপ
ফলপ্রসূ বলিয়া পিতৃদেবের মনে হইল না।
আদি-ব্রাহ্মসমাজের নবীন অচাৰ্য্য শ্রীযুক্ত
অলোচ্যনাথ পার্কেডান্ডি অস্তঃপুরে শিক্ষকতা-
কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তখন আমার
স্নেহমহামহাশয় ঠাকুরদেব ও বিবাহ হইয়া
গিয়াছে। বৌঠাকুরাণী তিনজন, মাতুলানী,
দ্বিদি ও আমরা ছোট তিন বোন সকলেই
তাঁহার কাছে অস্তঃপুরে পড়িতাম। অতঃ-
সংকট, ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি ইংরাজী
মূলপাঠ্য পুস্তকই আমাদের পাঠ্য ছিল।

বঙ্গমহিলার সাধারণ-প্রচলিত একখানি
মাত্র সাক্ষী পরিধানে অনাত্মীয় পুরুষের নিকট
বারিষ হওয়া যায় না, এই উপলক্ষে
অস্তঃপুরিকাগণের বেশও সংকট হইল।

দ্বিদি আমাদের মাতুলানী এবং বৌঠাকুরাণী-
গণ একরূপ স্বেচ্ছাভিত্তিক পেশোয়ার প্রবেশ
উড়ানী পরিয়া পাঠাগারে আসিতেন।
বাতুলানী মেয়ের বেশের প্রতি আত্মবন
নিজামহাশয়ের বিতৃষ্ণা, এবং তাহার
সংকটের একান্ত অতিশয় ছিল। মাঝে
মাঝে মাত্র দ্বিদিদেব, কিন্তু অবিচলিত
তাঁহার শিশুকল্পের উপর পরীক্ষা করিয়া,
এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করবার
চেষ্টারও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন নাই।
আমাদের বাড়ীতে সেখানে খুব ছোট
ছোট ছেলেকেদেরও সম্মান বশত
বালক-বালিকার দ্বারা বেশ পরিধান
করিত। আমরা একটু বড় হইয়া অবধি
তাঁহার পরিবর্তে নিজ নূতন পোষাকে
সাজিরাছি। নিজামহাশয় ছবি দেখিরাছেন,
আর আমাদের কাপড় পরমাস করিরাছেন,
দরজি প্রতিদিনই তাঁহার কাছে হাজির,
আর আমরাও। কিন্তু এত পরীক্ষাতেও
তিনি আমাদের প্রজ্ঞা বেশ একটি পছন্দসই
বেশ ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই।
মেঘ-বত্মাকুরাণী বোঝাই হইতে শুধুর
মহিলার অজ্ঞতার স্বেচ্ছাভিত্তিক
পরিচ্ছদে আবৃত্তি হইয়া যখন দেশে
প্রত্যাগমন করিলেন তখনই তাঁহার কোণ্ড
বিটিল। দেশেরতা, শোভনতা ও শীলতার
সর্ব্বাঙ্গীন সঞ্ছলনে, এ পরিচ্ছদ তিনি
যেমনটি চাহিয়াছিলেন, ঠিক সেই রকম
মনের মতনটি হইয়া, বঙ্গবাণীদিগের ঐকান্তিক
একটি অভাবমোচনে তাঁহার অনেক দিনের
বাসনা পূর্ণ করিল।

বিস্মিত হইতে ফিরিবার পর হইতে

স্রীজাতির উন্নতি-সংকল্পে প্রকৃত প্রত্যাবে কার্য
আরম্ভ করিলেন আমার পৃষ্ঠনীর মেজদাদা—
ঐযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এতদিন যে
তিনি এ সম্বন্ধে গীরব, নিষ্ক্রিয় হইয়া
বসিয়াছিলেন এমন নহে, তবে এতদিন
পিতার মেজেষু পুত্র তাঁহার সঙ্গারতা
করিতেছিলেন, এখন স্বাধীন ও উপযুক্ত
হইয়া পিতার বিশ্রামসময়ে নিজে তাঁহার
স্থলাভিষিক্ত হইলেন। আটক্লব টনি
মহিলা-বন্ধু; স্রীক্ষা স্রীস্বাধীনতার পক্ষ-
পাতী। বিলাত বাইবার পুর্বেই উক্ত
বিষয়ের উচিতা সম্বন্ধে সারগর্ভ সন্তোষ
যুক্ত প্রদর্শন করিয়া ইনি একখানি পুস্তিকা
প্রচার করেন। পিতৃদেব অস্তঃপুরের
মঙ্গলের জন্য বে-সকল আচারবিকৃত কার্য
করিয়াছেন, অধিকাংশই ইহার পরামর্শে,
ইহার প্ররোচনায় সম্পাদিত। ইনি এ সকল
কার্যে পিতার দক্ষিণ-হস্ত-বরূপ আছেন।
অস্তঃপুরের অবস্থা সংশোধনের জন্য তাঁহাকে ও
ইনি ক্রমাগত ভ্রমণে আছেন। আজন্ম যে
উদ্বেগ ব্রতরূপে রুদ্রে ধারণ পোষণ করিয়া
আসিয়াছেন, নিজে সফল স্বাধীন হইয়া
অন্য অটল উৎসাহে তাহার উদ্দ্যোগে
প্রবৃত্ত হইলেন। এখন হইতে আমাদের
বাড়ীতে—কেবল তাহাই নহে, সমগ্র কলিকাতায়
তাঁহার যুগ আরম্ভ। পিতা মহিলাদিগের উচ্চ-
শিক্ষার মূলপত্তন করিয়াছিলেন, পুত্র তদুপরি
প্রাণে নিষ্কাশ করিলেন; পিতা তাঁহার
অস্তঃপুরে যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন, পুত্র
তাহা সবলে কলবস্ত করিয়া সে ফল সমাজে
বিস্তরণ করিলেন; পিতা ঘরের সংস্কারে
বকের নেতা, পুত্র ঘরের দৃষ্টান্ত পরকে

সমর্পণে ধন্ত। একজন স্রীজাতির উচ্চশিক্ষার
জনমিতা, একজন স্রী-স্বাধীনতার প্রবর্তক।

মেজদাদামহাশয় ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাপন্ন
করেন ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শেষে এবং তাঁহার
সার্ভিস আরম্ভ হয় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে।
তখন অস্তঃপুরে অবরোধপ্রথা পূর্ণবাজার
বিপর্যয়মান। তখন ঘরেরদেব একই প্রাণের
এবাড়ী হইতে এবাড়ী ঘাইতে হইলে
ঘেঁটোটোপ-মোড়ী পাল্কীর সঙ্গে প্রহরী ছোটো,
তখন নিত্য অন্তঃপুরে বিনয়ে মা গলাধানে
ঘাইবার অমুমতি পাইলে বোঝার পাল্কী
শুধু তাঁহাকে গলে চুবাঠা আনে। স্রীকে
মেজদাদা লইয়া ঘাইতেছেন বোঝাট—সমুদ্র-
পথে, কিন্তু তখনো অস্তঃপুর হইতে তাঁহাকে
বহিষ্কারের প্রাণে পথান্ত হাঁটাইয়া পাড়ী-
“ওড়াইতে পারিলেন না। কুলবধুর পক্ষে
ইহা একই নূতন এতট লজ্জাজনক যে
বাড়ীতে সকলেই ইহাতে বিশেষ আপত্তি
প্রকাশ করিলেন। অগত্যা পাল্কী করিয়া
তাঁহাকে জাহাজে উঠিতে হইল। একজন
ফ্রেন্স মহিলা তাঁহার বহির্গমনের উপযোগী
নূতন বেশ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু অদম্য ইচ্ছার স্রোতে নৈব পথান্ত
গা চালিয়া দেয়—মায়ুষের কি কথা! দুই
বৎসর পবে মেজদাদা যখন সস্ত্রীক বাড়ী
কিরিলেন, তখন আর কেহ বধূকে পাল্কী
করিয়া গৃহে আনিতে বলিতে পারিলেন
না। কিন্তু ঘরের বৌকে মেমের মত গাড়ী
হইতে সবলে নামিতে দেখিয়া সেদিন
বাড়ীতে যে শোকাভিনয় ঘটাইয়াছিল, তাহা
বর্ণনার অতীত।

বাড়ীতেও এত সময় ইহার একজন

‘একঘ’রে হইয়া রহিলেন। বাড়ীর অজ্ঞাত মেয়েরা বৃষ্টাকুরাণীর সহিত অসহ্যেতে খাওয়া-দাওয়া করিতে বা মিশিতে উদ্যম হইতেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে দ্বিতীয়বার যখন মেজধাণা বোবাট হইতে বাড়ী আসিলেন তখন বাবাবাধি অনেকটা শিখিল হইল। তখন সবে মাত্র আমার বিবাহ হইয়াছে। বাবা জীর্ণাশ্রমার্থী, উন্নতিপ্রসূতক। নিখাসাহসারে কার্য করিয়া তাঁহাকেও জীবনে অনেক লভ্য করিতে হইয়াছে, তিনি মেজধাণার সঙ্গে পূর্ণপ্রাণে মিশিয়া তাঁহার হলপুট করিলেন, এবং বাড়ীর আর-সকলেরও সমান্তর অনেক পরিসংখিত হইয়া আসিল।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে আমার চতুর্দশবর্ষ বয়সক্রমের সময় শিক্ষার সৌধার্থ্যে স্বামী আশ্রমে বোবাট রাখিয়া আসিলেন। তখনও আমি ইংরাজী জানিনা বলিলেই হয়, কতি সামান্যই শিখিয়াছি। শিক্তকল্পা বিরোধীকে লইয়া আমি এক বৎসর সেখানে ছিলাম। বৎসরান্তে সকলে একত্রে ফিরিয়ায়।

ভারনধর। হীর অনেক দূর পর্যন্ত গিয়া। কলিকাতার কিরিয়া মেজধাণা আর নিজের ঘরে একঘরে নচেন, মলে পুটে। দেখিতে দেখিতে অল্প দিনের মধ্যে বাড়ীর আনন্দাওরা সম্পূর্ণরূপে পরিসংখিত হইল।

এখানে বলা আবশ্যক, জী-বাধীনতার প্রচারা ন হইলেও, বাড়ীর ছেলেমেয়েদের বিভাশিক্ষা সম্বন্ধে মেজধাণা পরলোকগত হইলেও বাবা ঠাকুরেরও চিরকাল উৎসাহ এবং অধ্যবসায়ের সীমা ছিল না। তাঁহার বিবাহের

পূর্বে অনেক সময় আমাদের নিজে শিক্ষাদান করিতেন। বিবাহের পরে তাঁহার শিক্ষাদানের কেন্দ্রস্বরূপ হইলেন তাঁহার পত্নী। সেজন্যই প্রথমে মেজধাণার কুলচোর ভাষিয়া তাঁহার পত্নীকে আমাদের বাড়ীর গারক বিকুর নিকট গান শিখাইতে আরম্ভ করেন। অর্ধবৎসর ইহাতেও আগতি করেন নাই। ত্রয়োদশী প্রাতিভা দেবী যিনি সত্যত বিদ্যার বহুমহিলাগণের অধুনা নেত্রীস্বরূপ তিনি হেমেস্রনাথ ঠাকুরেরই কন্যা।

বোবাট হইতে কিরিয়া আসিয়া স্বামীর সহিত বহু আশ্রমে বাসকালীন তিনিও আমার সেতার শিক্ষার জন্ত ওস্তাদ নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতে ক্রমশঃ আমাদের ‘বাড়ীতে শিক্ষার স্রোত যোগে বহিতে থাকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গান বাজনা, লেখাপড়া সর্ব রকমে বেশ ভাল’ করিয়া শিক্ষা পাইতে লাগিল। দিদির পর্যন্ত ঘরে কাঁচা ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন। গাড়ী কারিয়া যাওয়াতেও আর লজ্জার বিষয়ই নহে, পাণ্ডুর চলন একরকম উত্তীর্ণ হইল। আজ প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল মেজধাণামহাশয় ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়াছেন, ইহার মধ্যে তাঁহার পুটান্তে, তাঁহার বহু আমাদের অন্তঃপুরে আকাশপাতাল প্রভেদ। কেবল আমাদের গৃহে কেন? তাঁহার পুটান্ত সমস্ত বৎসর আজ পরিসংখিত। এ দেশের কোন সম্রাট মহিলার গৃহেই এখন বাহিরে যাওয়া সেকর নুতন নহে, সেকর লজ্জাজনক নহে। বাহিরে যাতে হইলে সুলভা পরিচ্ছদেরও আর ভাবনা নাই। এখন জী-শিক্ষা, জী-বাধীনতা

বহিষ্কৃত। যে কণ্টকাকীর্ণ পথ বহিগত্রে বহু পরিশ্রমে তিনি যুক্ত প্রসারিত করিচ্ছিলেন, বনবালা-মাত্রেরই নিকট তাহা এখন সহজ, স্বপ্নম। উন্নতিশীল মহিলাদিগের কথা ছাড়িয়া,—অন্তঃপুরিকাগণের মধ্যেও উন্নতির এই শ্রোত প্রবাহিত। এখন কতাকে দেখিতে আনিয়া বরণক্ষীরগণ প্রণমেই বিজ্ঞাসা করেন কত্তার লেখাপড়া কিরূপ। রীতিমত বিভাচর্যা, বস্তুর শাওড়ার নিকটও কত্তাভাব, গাড়ী চড়িয়া যাতায়াত, বোম্বাই কাসানে পরিচ্ছন্ন পরিধান—এ সকল এখন হিন্দু-সমাজনীতির অঙ্গীভূত। আর এ সকলের যিনি প্রবর্তক ৫০ বৎসর পূর্বে তাঁহাকে শত বাধা একাকী এক হস্তে উৎপাটন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। নিজের বাড়ীর লোকে পণ্যস্ত তাঁহার সহিত বোগ দিতে ভয় পাইয়াছে। কিন্তু জীজাতির উন্নতিতে ইনি এমনই অটলসংকল্প ছিলেন, মহিলাদিগের মঙ্গল-কল্পনায় ইনি এমনি আনন্দলাভ করিতেন যে, এ সাধনার অস্ত্র তিনি কোন বাধাকেই বাধা জ্ঞান করেন নাই; কোন অপমানই তাঁহাকে নত করিতে পারে নাই। আশঙ্ক্যেও বাহারা সমাজে জীকে লইয়া বহির্গত হন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই বহু পুরুষের মাঝে ছ-একটি মহিলাকে লইয়া গিয়া অস্ত্রের অঙ্গুণিনির্দিষ্ট হইতে লজ্জা-বোধ করিবেন, কেবল তাহাই নহে, বাহারা ইহাদের দলভুক্ত নহেন, অর্থাৎ বাহারা জীকে লইয়া বাহিরে যান না, তাঁহাদের সঙ্গে জীকে পরিচিত করিতেও আপত্তি করিবেন। কিন্তু মেঘদাদার

সেটিমেটে, মেঘদাদার যুক্তি এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিপন্নীত, তাঁহার নিকট এ কথা পাড়িলে তিনি রাগিয়া বলিবেন, একরূপ পুরুষের সভায় কেন ছ-একটি মেয়ে লইয়া যাইব না? বাহারা জীকে লইয়া বাহিরে যান না, তাঁহাদের নিকট "জীকে বাহিরে" করা কঠিনে তাঁহাদের শিক্ষা হইবে কিসে? অভ্যাস পরিবর্তন হইবে কেমন করিয়া? কেবল কথাই নহে, কার্যতঃ চিরদিন তিনি "একরূপ" করিয়া আনিয়াছেন। বিদেশে সভা-সমিতিতে বা "গান স্থান"ে তাঁহাকে একা নিমন্ত্রণ করিবার ঘো ছিল না। বাড়ীর মেয়েরা পর্যন্ত নিমন্ত্রিত না হইলে তিনি কোথাও যাইবেন না, সকলেই জানিয়াছিল। মেঘদাদার দ্বাৰা জী-সম্মান এতই তীব্রপ্রোতভাবে বর্তমান যে, কোন ভট্ট পুরুষে জীজাতির প্রতি অসম্মান দৃষ্টিতে চাহিতে পারে, ইহা তিনি অস্ত্রে ধারণা করিতেও অক্ষম।

মেঘদাদার কাছে যদি বল,—যুক্তিতে—
পুরুষ জীলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যদি বল—
পুরুষের স্ত্রীর ভাগ্যের উচ্চাশ্রয় অনাবৃত্তক,
কার্যক্ষেত্রে তাহারা পুরুষের "অসমকক্ষ",
অমনি তিনি গরম হইয়া উঠিবেন, মেয়েদের পক্ষ হইয়া তর্কপরামর্শ হইবেন। বাড়ীর মেয়েরা বিউরিয়াম বা পশুশালা বা কোন বক্তৃতা শুনিতে যাইতে চাহে—সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার পুরুষ মিলিতেছে না; মেঘদাদা জানিতে পারিলেই অমনি শত অনিচ্ছা শত অজুবিধা সঙ্গেও তাহাকে সঙ্গে করিয়া যথাস্থানে লইয়া যাইবেন। কত্তার নিকট মেয়েদের যদি কোন আবেদন

খাফিত ত, মেজদাদাই তাহাদের মুকন্নি;
বাড়ীর মেয়েমা সকলেই জানিত মেজদাদার
মত সহায়, 'বন্ধু' তাগাদের আর কেহ নাই,
তাহার উপর সকলেরি বিশ্বাস ছিল 'অসীম'।
বাৎসবিক পক্ষে মহিলাদিগের সর্বভোক্তাভাবে
এমন মঙ্গলাসাক্ষী বন্ধু ও নেতার উপযুক্ত,
ঐশ্বর্য উদার মহম্মদঃ করণবাক্তি, সংসারে
কম দেখিতে পাওয়া যায়। আমার ভ্রাতা
মনে করিলে এ কথা আমি সর্বজনসম্মুখে
এরূপ মুস্তকর্থে বলিতে পারিতাম না, কিন্তু
এখন আমি তাহার 'কাব্য' সমালোচনার
কিছরিসোন বলিয়া তাহাকে সর্বসাধারণের
সম্পত্তিরূপে সম্মুখে রাখিয়া অপক্ষপাতরূপে

তাহার 'প্রাণ্য' তাঁহাকে দান করিতেছি
মাত্র।

লেখকের বিষয়, তাহার প্রাণপণ উত্তম
এখন সার্থক, আটপন্থ্য জীবনের উদ্বেগ
সম্পন্ন, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে মহিলাসমাজে
বঙ্গদেশেই আজ সর্বপ্রধান।

এইখানে একটি কথা না বলিলে সত্য
অবমাননা ঘটে। যদি স্বামী মেজদাদার
সহায়তা না করিতেন, তাহা হইলে
এত দীর্ঘ জীবিতের এতদূর উন্নতি হইত
কি না সম্ভব। অতঃঃ তিনি যে অনেক
পরিমাণে এ উন্নতি অগ্রসর করিয়া
দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীকুমারী দেবী।

• নিষ্কমণ

মায়ের পরশ! আলোর ধুলোর লোকে-
লোকাকীর্ণ সহরের নকশারা দিয়েই এই
নির্ভুল পরশখানি একটুখানি নদীর বাতাস
হয়ে বহে চলেছে। এপার থেকে ওপারে
বাবার, পায় থেকে ঘরে আসার সেতু-
পথে চাঁকতের মত এই পরশ,—গঙ্গাজলে
ধোরা এই পরশ!

এই শান্ত হৃদিত পরশখানির একপায়ে
দেখছি পরিচিত পুরাতন দেশ, আরপারে
দেখা বাজে প্রবাস-বাসের সিংহদ্বার—হিম-
রাত্রির স্নেহকার মাথা!

বিপুল জনশ্রোতের সঙ্গে একত্রে ছুটে
চলেছি, ঠেলে চলেছি—নিঃশব্দে নীরবে;

আর নদীর উপর দিয়ে অবিস্মৃত বহে আসছে
কাজল আকাশ—কালো-জলের সমস্ত দেহমাথা
মায়ের পরশ।

অন্ধকারের মাঝখান থেকে একটা ভীত
বাঁশি দিক্‌দিগন্তের হুণীল পরিসর হঠাৎ
ছিন্ন করে দিয়ে চাঁৎকার করে উঠল।
আবার জ্বালা, আবার ধুলো, আবার
জনকোলাহল। এ-সমস্তকে ছাড়িয়ে যখন
পৃথিবী-জোড়া প্রকাণ্ড রাজি ভেগ করে
চলেছি, তখন কেবল তুমিছিরি পায়ে তলা
দিয়ে 'একটা বৃন্দা, শোহ নিখবের মত
ক্রমাগত গড়িয়ে চলেছে।

গাড়ির দুই সারি আলনার ভিতর

দিয়ে দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র দুই ফালি আসমানি পর্দা, তার মাঝে মাঝে কতক এক একটি তারা।

ঘটার পর ঘটা নীলের এই দুই বশনিকার ভিতর চলেছি। দক্ষিণে বামে কিছুই দেখছি না; কেবল সগুণ থেকে একটার পর একটা অন্তর্য্যার ধাক্কা আসছে অপর মাঝে মাঝে চঠাৎ এক একটা গাছের ঝাপসা স্মৃতি চোখের উপরে এসে আঘাত করেছে মনে যাচ্ছে।

বিরট রাত্রির এই প্রকাণ্ড বৈচিত্র্য-হীনতার ভিতর দিয়ে উড়ে চলেছি বরষে ভুল হয়। নিশাচর পাখীরা রাত্রির নীরব নীলের মধ্যে আপনাদের নিশ্চল পাখা মেলিয়ে নিঃশব্দে ঘেমন ভেসে ধীরে এ ভেমন করে বাওয়া নয়, এ ঘেমন একটা উন্নত দৈত্য ঢাকা-দেওয়া লোগার বাঁচার আমাকে বন্ধ করে পৃথিবীর উপর দিয়ে "দৌড়ে চলেছে; তার চলার প্রত্যেক বেগে লোহার বাঁচাটা পৃথিবীর বুক আঁচড়ে চারিদিকে অধিকণা ছিটিয়ে অন্ধকূহরের ভিতর ক্রমাগত এসিয়ে চলেছে।

স্বর্গীয় অনিষ্টা, অক্লান্ত অস্থিভতা, তার পরে বিরট অবসাদ! নির্জল প্রাণ নিরুপায় অবোলা একটা অন্তর অন্ত চুপ করে পড়ে আছে—অপর+অন্ধকারের মুখে হুই চোখ মেলে।

একটুখানি আলোর আঘাত,—নির্মল বীণার সোনার তারের একটুখানি তীব্র কম্পন। উত্তর অক্ষয় শিশির, তার মাঝখানে একটিবার হির হয়ে দাঁড়িয়েছি—নতুন দিনের দিকে মুখ করে। পৃথিবীর

পূর্বাধার-পর্বাধার অনেকখানি অন্ধকার এতেনা রাশিকৃত দেখা যাচ্ছে। কৃষ্ণসার চত্বরের মত একটি কোমল অন্ধকার, তারি উপরে আলোর পদক্ষেপ ধীরে ধীরে পুড়ছে। সগুণে দেখা যাচ্ছে একটি পশুর কলিক। স্রলের মাঝে হির হয়ে দাঁড়িয়ে;—ঘেমন। কুদেবী নিশ্চিনেতাকে নমস্কার দিচ্ছেন।

পথিক যেমন পথ চলতে গণিকের মত পথপ্রান্তে দেবতার দেউলটিতে একটি 'নমস্কার দিয়ে পুনরায় চলতে আরম্ভ করে, আমরা তেমনি এই প্রাতঃসন্ধ্যাটিকে প্রণাম করেছে যেন আবার অগ্রসর হচ্ছি।

একটা কলকিনিরা-হারা বাগুচরের ঠিক আরম্ভে রাত্রি প্রভাত হয়েছে। আকাশের বর্ণ ধূসর ধূসর নদীর ক্ষীণ ধারাগুলিকে হৃদয় ছুরির মত উদ্ভল করে তুলেছে। পৃথিবীর শেখপ্রান্ত-পর্বাধার বিস্তৃত হয়ে পড়েছে—পরিষ্কার বিরোজার একটি মাত্র প্রলেপ; তার উপরে একঝাড় কুশ আর কান। নতুন সূর্যালোক কানকুলের খেত-চামরের উপরে আবার ছড়িয়ে সন্ধ্যা ছপটিকে রাঙিয়ে তুলেছে। নির্জন এই নদীর পাণ্ড, নিঃশব্দ নিশ্চল এই নদীপারের গাশুড়র,—এর ভিতর দিয়ে অলের ক্ষীণধারা আমাদেরই মত মঙ্গলভিতে চলেছে।

নদী থেকে শত শত হাত উর্দ্ধে দিয়ে পেশুপথ বেয়ে চলেছি। একটি মুহূর্তময় গোলা, গতির একটা শিরষণ মাত্র,—এছাড়া আর কিছু অসুতব হচ্ছেনা। চলেছি, চলেছি—দিনের মনভোলানো সবুজের মাঝ দিয়ে রাতের ঘুমপাড়ানো নীলের দিকে।

অশেষ পথ—স্বর্গীয় গ্রহর-পল্লের ভিতর

দ্বিধে ক্রমাগত চলেছে; দিন ও রাত্রি এই পথের ছুটধারে নিবারণ ও অবরোধের ছুটখানি মাথাফাল বচনা করত-করতে আমাদেরই সঙ্গে চলেছে।

বারানসী—মুর্শিদাবাদের একটা প্রকাণ্ড অরণ্য; দ্বিপ্রহরের সূর্যালোকে তার সমগ্রটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে,—অনন্ত প্রান্তের ঘাটে সোপানের কোলে-কোলে—নদীতলে গিলে যেখাটি পেকে, তপ্ত পথে নিঃশব্দে যে যাত্রীরা চলেছে তাদের গাড়ি ছাড়াটি পর্যন্ত। এ ঘন একটা মাথাপুষীর দিকে চেয়ে রহেছি! পাবন প্রাচীরগুলো থেকে একটা উত্তাপ মুখে এসে লাগছে, নাগরিকদের সমস্ত গতিবিধি কার্যকলাপ আমাদের চোখে পড়ছে স্পষ্ট, কিন্তু তাদের কোনো লাড়াক্ষণ আমাদের কাছে পৌছতে পারছেন। এ ঘন একটা মুক্তের রাজত্ব পেয়েই চলেছি। আর শব্দের সীমা, বাতির ভাদের এই প্রকাণ্ড নগরী উর্ধ্ব আকাশে পৌঁছে ছুটী পামল-গাছ তুলে একটা ভাবানী নিগারপের মত দূর-দূরান্তের দিকে চেয়ে রহেছে—হুটপ্রহর বেলায় শব্দহীন আলোকের গায়ে চিত্রাঙ্গিত।

গ্রেজিওর প্রান্তরের উপরে বেলা-শেষের তাজ্র আভা। আলবনের ছায়া-ছায়ায় রাত্রি আপনার আংশা নিয়ে এখনি দেখা দিয়েছে। বনরেখার উপরে আবোধ্যার শেষ-মহাবের বহুকাণের পরিভাষ্য প্রাঙ্গণের একটা অংশ আকাশের পরিভাষ্য নীলের গায়ে শুকরক্তের গাড়ি একটা বিমলিন ছাপ কেলেছে। বাঁধস্তাঙা গোমতীর

অল প্রকাণ্ড একটা ভিন্ন কথার মত পৃথিবীর উপরে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে—অনেক দূর পর্যন্ত সমস্ত সবুজকে আচ্ছাদন করে। পশ্চিম-দিগন্তব্যাপী শোণিমার নীরব একটা নিষ্কর আকাশ থেকে পৃথিবীর উপর পর্যন্ত নেমে এসেছে; রাতের পানী এরি উপর দিয়ে কালো ডানা মেলে উড়ে আসছে।

রাত্রি ২ তৃতীয়-প্রহরে বৃষ্টি নেমেছে, পাঁচাড়ের চাওয়া অন্ধকারের ভিতর দিয়ে মুখে এসে লাগছে,—বরফের মত! দূর-দূরান্তের একটিমাত্র ঝিলি অন্ধকারে শব্দের একটা উৎস গুলে দিয়ে ক্রমাগত গেয়ে চলেছে। একটা গাছশালার প্রদীপ জলে-ধোয়া পৃথিবীর ময়ূপতার উপরে আপনার আলোটি অনেক দূর-পর্যন্ত বিস্তৃত করে দিয়ে অনিমেষে রাত্রির দিকে চেয়ে রহেছে। নিরঙ্কু অন্ধকারকে খান্না দিতে দিতে গাড়ি চলেছে—হিমালয়ের বৈদিক বনের গলা নামছেন সেট দিক হয়ে।

এখানে মেঘ কেটে চাঁদ দেখা দিয়েছেন —অন্ধকার গিরিশ্রেষ্ঠীর চুড়ায়। অন্ধের দানের ঘাট, নববৎসানা, দক্ষিণ-চূড় জ্যোৎস্নার ঘুমিয়ে আছে; গন্ধার বাতাল সমগ্রটির উপরে বিস্তৃত ঢেলে দিয়েছে। আমাদের যাত্রা-পথের শেষে, স্বার্থ রাত্রির অন্তিম-প্রহরে এই গলাঘার! এরি ওপারে স্বর্ঘ্য-মেলের হরিভাষ্যকল অপেক্ষা করচে—নৃত্যকে অদৃষ্টপূর্বকে অগতে বহন করে আনবার লজ্জা।

ঐঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতের আয়-ব্যয়

ভারতের আয়-ব্যয় বলিতে আমরা ইংরাজ-শাসিত ভারতবর্ষেরই আয়-ব্যয় বুঝি। ভারতবর্ষের আয় গত কয়েক-বৎসরের মধ্যে আশ্চর্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে; নিম্নের তালিকাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

বৎসর	কোটি মুদ্রা ৩ঃ .
১৮৪০	২১
১৮৬০-৬১	৪৩
১৮৮০-৮১	৭০
১৯০০-০১	১১৩

বাল্লা অধিকারের পর ইংরাজগণ ক্রমশ ভারতের অস্বাভাবিক রাজস্ববর্ধনের সাহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব পর্য্যন্ত, ভারত-সরকারের আয়-ব্যয় উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার উপায় ছিল না। অধিকৃত রাজস্বাদি এবং ভারতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য, তৎকালীন শাসন-কর্তৃগণকে যথেষ্ট পরিমাণে মৈদু রাখিতে হইত। অন্যদিকে যুদ্ধ-নিগ্রহে রাজ-কোষ হইতে যথেষ্ট অর্থ-ব্যয় হইত। ১৮১৫-১৬ হইতে ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে, ২৮ বৎসর আর অপেক্ষা বাতাই অধিক হয়,—ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক হইয়াছিল কেবলমাত্র ১৫ বৎসর। আর অপেক্ষা ব্যয় অধিক হওয়ায়, সরকারকে অনবরত কর্ত্ত্ব করিতে হইত, কালেই গণের মাত্রা ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সরকারের খণ ৪০ কোটি হইতে

৫০ কোটি টাকায় গিয়া বাড়ায়। সিপাহী-বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া, সরকারকে আবার ৫০ কোটি টাকা ধার "করিতে" হয়। "সিপাহী-বিদ্রোহের" পর ভারত-সরকারের আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠে।

এই সময় অর্থ-সংকটের পদ সৃষ্ট হয়। ১৮৫৯ উইলসন নামক একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে অর্থ-সংকটের পদ দিয়া ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হয়। উইলসন সাহেব ভারতবর্ষে আসিয়া, সৈন্ত-বিন্যাসে বাহ্যিক আভিযা দেখিয়া উক্ত বিভাগের প্রায় ৬৩ কোটি টাকার খরচ কমাইয়া দেন। ভারত-সরকারের অস্বাভাবিক বিভাগেও তিনি আবশ্যকীয় ব্যয়গুলি বাতাইয়া অপরাপর ব্যয় কমাইয়া দেন। তাহা হইতে আর্থিক অবস্থা সম্বোধনক না হওয়ায়, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ইংলণ্ডের জায় ভারতবর্ষেও আয়-কর (income-tax) বসাইতে হয়।

পাঁচবৎসরের মধ্যে ভারত-সরকারের আর্থিক অবস্থা আশ্চর্য হইল। ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে আয়-ব্যয় সমান হওয়ায়, আয়-কর তুলিয়া দেওয়া হয়।

ওই ভারত-সরকারের আর্থিক অবস্থা বহুদিন উন্নত অবস্থায় থাকে নাই। এই সময়ে উড়িষ্যা প্রদেশে ভূমিকম্প হইয়াছিল। মেলগের-গুলির উন্নতির জন্যও যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হইয়া উঠে; তাহার উপরে সীমান্ত-প্রদেশে যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হওয়ায়, সামরিক বিভাগের

বৃহৎ বৃদ্ধি পায়। কয়েকটি ভারত-সরকারের আর্থিক অবস্থা পূর্বাশ্রমে। আবার খাবার হঠাৎ বাড়ার। তাই গভর্নমেন্টকে খাবার হঠাৎ Provincial rates বৃদ্ধি করিতে হয়। ১৮৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে অর্থ-ব্যয় আবার সমান হয়। আবার "ভারত"তে পূর্বাশ্রমে "ভারত-সরকার" প্রথমে দেখাইয়াছি যে, মেন্সেকোর রূপের পনির আশ্রিত হওয়ায় মূল্য, ১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতে মুদ্রা-নিয়ম আরম্ভ হয়। এই মুদ্রা-নিয়ম আরম্ভ হওয়ায় ভারত-সরকারের Home-Charges অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পায়; তাহার জন্য ভারত-সরকারকে বাতিল হওয়া উচিত হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে আর-কর স্থাপিত হয়। লণ্ডনের "গভর্ন" মূল্য-করা ২ টাকা হইতে বাড়িয়া ২৫০ টাকা করিয়া দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত, সরকারের ব্যয়-বাহ্যে কমাইবার জন্য একটি পরামর্শ-সভারও প্রতিষ্ঠা হয়।

— ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের "Currency reform" হইয়া গাইবার "পর, ভারত-গভর্নমেন্টের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ আশ্রিত হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রত্যেক বৎসর ৭৫ কোটি টাকা উদ্ধৃত হইতে পাকে। বর্তমান মুদ্রারস্তের পূর্বাশ্রমে "ভারত-সরকারের অবস্থা এ-রূপ সচ্ছন্দ ছিল। তাই ভারত-সরকারের ভারত হইতে "প্রত্যেক বৎসর কয়েক কোটি মুদ্রা, শিক্ষা এবং বাহ্যের উন্নতি-কল্পে ব্যয়িত হইতে, স্থায়ীকৃত হয়। ইহাই ভারত-সরকারের আর-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

এই লণ্ডনের "আর্থিক" আদর্শ দেখি-
য়াছি যে, ভারতসরকারের আর আশ্রিত্রপে
বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার কারণ কি ?
১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রা-নিয়ম ভারতবর্ষে
ক্ষেত্রফল, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ক্ষেত্রফল অপেক্ষা
যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারকে দেশীয়
মাল্য-বর্ধের সহিত মুদ্রার্থ প্রাপ্ত হইতে হয়।
কয়েকটি দেশের প্রোগ্রামের ব্যবস্থা-গণিতের
দিকে সরকার দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেন না।
এখন না সমস্ত ভারতবর্ষে প্রতিবিধান করা,
ভারতবাসীগণের অবস্থা পূর্বাশ্রমে সচ্ছন্দ
হইয়া উঠিয়াছে। এখনকার শাসন-প্রণালী
অধিকতর বিজ্ঞান সম্মত। এই সমস্ত
কারণে, বর্ধিত ভারত-সরকার জমির ক্রম
এবং আর-কর পূর্বাশ্রমে কম পরিমাণে
ব্যয় করিয়াছেন, তাপনি মোট মাল্যের
মাত্রা এখন বাড়িয়াই গিয়াছে।

প্রত্যেক বৎসর মার্চমাসে ভারত-
সরকারের আর-ব্যয়ের হিসাব বাহির হয়।
এই আর-ব্যয়ের তালিকা তিন বৎসরের গড়-
পড়তা-হিসাব মাত্র। ১৯১৬-১৯১৭ খৃষ্টাব্দের
আর-ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন করিতে গেলে,
পূর্বাশ্রমে ১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে কত
পরচ হইল, তাহা দেখাইতে হইবে;
১৯১৬-১৭ খৃষ্টাব্দের পরচ হইতে কত উদ্ধৃত
ছিল না অথ ছিল তাহাও দেখাইতে হইবে।
এই সমস্ত অঙ্কে ভিত্তি করিয়া একটা
আন্দাজ হইতে ১৯১৬-১৭ খৃষ্টাব্দের আর-ব্যয়ের
তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই একেটের
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে
পাই যে, ভারত-সরকারের মাল্য খণ্ড

করিবার অধিকারী কেবল তিন শ্রেণীর পদস্থ ব্যক্তি। সেক্রেটারী অফ ট্রেট, গভর্নর-জেনারল ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ।

হোমচার্জ :—ভারতবর্ষ দরিদ্র লোকের দেশ। কিন্তু বিদ্যাতা এত দরিদ্রের দেশকে নানাপ্রকার খনি দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ইংরাজ ধনীগণ, নিজেদের অর্থবলে ভারতবর্ষের এই খনিগুলিতে কার্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। রেলওয়ের উন্নতির জন্য ভারতবর্ষ ইংলণ্ড হইতে অনেক টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। এই টাকার হ্রদ ভারতকেট দিতে হয়। ইংরাজ রাজপুরুষগণ ভারতবর্ষে আসিয়া, ভারতের রাজকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করেন। ভারতে অবস্থানকালে তাঁহাদের মস্তনের উদ্ভূত অংশ অদেশে প্রেরিত হয়।* বুদ্ধবয়সে কার্য হটতে অবশ্য লইয়া দেশে ফিরিলে, ভারতবর্ষই তাঁহাদিগকে পেন্সনের টাকা ব্যোয়ায়। বিদেশীয় বণিকগণ, ভারতবর্ষে আসিয়া ব্যাক প্রকৃতি স্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যেক বৎসর তাঁহাদের অর্জিত অর্থের উদ্ভূত অংশ অদেশে প্রেরিত হয়। ইহা বাতীত, সেক্রেটারী অফ ট্রেটের অফিসের সহস্র খরচই ভারতবর্ষকে দিতে হয়। পূর্বেক হিসাব অনুযায়ী, ভারতবর্ষকে প্রত্যেক বৎসর কয়েক কোটি মুদ্রা, ইংলণ্ডে পাঠাতে হয়। তাহারই নাম Home charge। ভারতের সেক্রেটারী অফ ট্রেট এই টাকা বণ্টন করেন।

সেক্রেটারী অফ ট্রেটকে একজন Banker বা 'শ্রেষ্ঠ' বলিলেও বলা যাউতে পারে। ইংরাজ বণিকগণ, ইংলণ্ডে স্বর্ণ

মুদ্রাট ব্যবহার করেন; কিন্তু ভারতবর্ষে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত।। ভারতবর্ষ হইতে কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে গেলে, তাঁহাদের রৌপ্য-মুদ্রার প্রয়োজন হয়। সেক্রেটারী অফ ট্রেট, হোম-চার্জের সুবর্ণ-মুদ্রাট দিয়া থাকেন; ভারতের মুদ্রা-কিন্তু রৌপ্যমুদ্রা। এতদ্বারা সেক্রেটারী অফ ট্রেট, হস্তের দ্বারা কতকগুলি নোট প্রত্যেক বৎসর বাহির করেন, তাহাদিগকে council bills বলে। ভারতবর্ষ হইতে বহু টাকার হোম-চার্জ তিনি আশা করেন, সেট টাকাকে সমস্তরূপে (এক সমস্তরূপে পনেরো টাকা) পরিণত করেন। বিলাতী বণিকগণ, সমস্তরূপে দিয়া এই council bill ক্রয় করেন। সেক্রেটারী অফ ট্রেট বণিকগণের প্রদত্ত অর্থে ভারতের নিকট হইতে ইংলণ্ডের প্রাপ্য ঋণ পরিণোদ করেন। বিলাতী বণিকগণ, তাঁহাদের প্রয়োজনানুসারে council bill পরিণত করিয়া তাঁহাদের ভারতবর্ষস্থিত এজেন্টগণকে পাঠাইয়া দেন। ভারতবর্ষস্থিত এজেন্টগণ এই council bill, ভারত-সরকারের নিকট লইয়া গিয়া, আপনাদের প্রাপ্য মুদ্রা রৌপ্য-মুদ্রা হিসাবে গ্রহণ করে। এক সন্ধ্যার পথ প্রাপ্তি হওয়ার, ভারতবর্ষ হইতে হোম-চার্জ পাঠাইবার খরচ এবং বিলাতী বণিকগণের ভারতবর্ষস্থিত এজেন্টগণকে টাকা পাঠাইবার খরচ বাচিয়া যায়। এখন বিজ্ঞাত হইতে পারে, বিলাতী বণিকগণ যদি হোম-চার্জের প্রাপ্য টাকার অপেক্ষা অধিক টাকা ভারতে পাঠাইতে চায়, তাহা হইলে কি তাহার বা কী টাকার ভারতবর্ষে প্রত্যেক ভাবে পাঠায় ?

বিলাতী বণিকগণের হোম-চার্জ অপেক্ষা অধিক টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন হইলে, তাছাড়া council bill-ই ক্রয় করে। সেক্রেটারী অফ ট্রেড সে বৎসর, হোম-চার্জ অপেক্ষা, অধিক মুদ্রার council bill বাহিব করেন। বিলাতী বণিকগণ সেই council bill ক্রয় করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিলে, ভারতগভর্নমেন্ট নিজের দেয় অংশ অপেক্ষা বড় টাকা অধিক দিতে হইবে, তত টাকা সঞ্চিত ভান্ডার (Gold-reserve fund) হইতে বাহির করিয়া দেন। সেক্রেটারী অফ ট্রেড হোম-চার্জের চেয়ে বড় অধিক টাকা পান, তাহা হয় বিলাতের সঞ্চিত ভান্ডারে জমা দেন, না-হয় আবার ভারতে পাঠাইয়া ভাবত-সরকারের ব্যয়িত অংশ পূরণ করেন।

Council bill-এর পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি, ইংলণ্ডের সহিত ভারতের বাণিজ্যের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। স্তত্রায় যে বৎসর বিলাতী বণিকগণ হোম-চার্জ অপেক্ষা অধিক মুদ্রা ভারতে প্রেরণ করে, সে বৎসর council bill বিক্রয় পরিমাণ হোম-চার্জের সমস্ত দেয় অংশ পূরণ না হওয়ায়, সেক্রেটারী অফ ট্রেড বিলাতের সঞ্চিত ভান্ডার হইতে বাকী টাকাদি ব্যয় করিতে হয়। পরে, ভারত-সরকার, ভারতবর্ষ হইতে উক্ত বাকী টাকা ইংলণ্ডে প্রেরণ করিলে, সেই টাকার ভান্ডারের খরচ শোধ করা হয়।

১৯০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে সেক্রেটারী অফ ট্রেড ৫৩,৩৩২,১৯৬ পাউণ্ডের council bill বিক্রয় করেন। এত-বেশী বিক্রয় আর

কখনও হয় নাই। ১৯০৭-০৮ খ্রীষ্টাব্দে, ভারতের সহিত আমেরিকার বাণিজ্য-বিশেষ্য হওয়ার Exchange-এর মূল্য কমিয়া যায়, তাহাতে council bill-এর পরিমাণ মাত্র ১৪৩,৭০৬১ পাউণ্ডে গিয়া পড়ায়। বাকার একইভাবে থাকায়, ১৯০৮-০৯ খ্রীষ্টাব্দে council bill-এর পরিমাণ আরও কমিয়া যায় ১৩২,১৫৪২৫ পাউণ্ড হয়। ১৯০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে বাণিজ্যের অবস্থা আবার আগেকার মত হয়। স্তত্রায় council bill-এর পরিমাণও ২৭৪,৬৫৮৬ পাউণ্ডে গিয়া পড়ায়। ১৯১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে council bill-এর পরিমাণ, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের তায়ট ছিল।

বিলাতী বণিকগণ সেক্রেটারী অফ ট্রেডের নিকট হইতে council bill ক্রয় করিয়া ভারতবর্ষে পাঠান। এই council bill, কলিকাতা, গোয়াই এবং মাদ্রাজেই বিক্রয় হয়। কলিকাতার সর্বাপেক্ষা অধিক মুদ্রার council bill বিক্রীত হয়। ১৮৯৮-৯৯ এবং ১৯০২-০৩ খ্রীষ্টাব্দে, কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাইয়েই অধিক মুদ্রার council bill বিক্রয় হইয়াছিল। ১৯০৭-০৮ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র council bill-এর শতকরা ৫১ ভাগ কলিকাতায় এবং ৪৪ ভাগ বোম্বাইয়ে, ১৯১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় শতকরা ৪৫ ভাগ, বোম্বাইয়ে ৩৯ ভাগ, এবং ১৯১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় শতকরা ৫৫ ভাগ এবং বোম্বাইয়ে ৩৮ ভাগ বিক্রীত হয়।

হোম-চার্জের পরিমাণ গড়পড়তা বার্ষিক ৬২ কোটি টাকা মাত্র।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে একমাত্র ভারত-

সরকারই ভারতের রাজস্ব খরচ করিবার অধিকারী ছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা-গণকে সমাজ খরচের অন্তর্গত ভারত-সরকারের কাছে হাত পাতিতে হইত।

Sir Strachey, তাঁহার India নামক পুস্তকে একটা হাতকর বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, কোন প্রাদেশিক শাসনকর্তার সমাজ একটা চাপরাসী বাড়াইবার প্রয়োজন হইলে, সেই চাপরাসীর বেতনের অন্তর্ভুক্ত ভারত-সরকারের কাছে, প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে আবেদন করিতে হইত। একটা প্রদেশের শাসনকর্তা সমাজ আট টাকা বেতনের একজন চাপরাসী পণ্ডিত বৎস নিযুক্ত করিতে পারিতেন না। ইহা যে হাতকর, তাহাতে আর সম্বন্ধ কি?

এই নিয়মের ফল কিন্তু ভাল হইত না। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণকে আর-বায়ের কোন অংশ ছাড়িয়া না দেওয়ার ভারত-সরকারের বায়ের উপর তাহাদের কোন দরদ ছিল না। তাহার। যে-পরোয়া খরচ করিতেন। যনামধন্ত গোপলে, আর-একটা অহুবিধা দেখান। ভারতের প্রাদেশিক আইন ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে, বেসরকারী সভ্যগণের কাজ করিবার কিছু ছিল না। ভারত-সরকার প্রত্যেক বৎসর ব্যবস্থাপক-সভার, আর-বায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করার, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ তাহার দোষভূণ বিচার করিয়া, ভালমন্দ দেখাইতে পারেন; কিন্তু ভারত-সরকারের বজেটের জার, প্রাদেশিক কোন বজেটের বন্দোবস্ত না থাকায়, সভ্যগণ কেবলমাত্র প্রস-

জিজ্ঞাসা করিয়া নিবৃত্ত হইতেন। গোপলে বলেন যে, প্রাদেশিক বজেট হইলে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার বেসরকারী সভ্যগণেরও কতকটা দায়িত্বের সৃষ্টি হইবে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে, লর্ড মেয়ো Strachey সাহেবের সাহায্যে লর্ড প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব এবং ভারত-সরকারের রাজস্ব পৃথক করিয়া দেন। ইহাই ইতিহাসে, Provincial decentralisation নামে কথিত হয়।

এখন হইতে, প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের হস্তে রাজস্বের কতক অংশ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই রাজস্ব হইতে তাহার। তাহাদের প্রয়োজনানুসারে কার্য করিতে পারিবেন, কিন্তু ভারত-সরকার তাহাদের আর-বায় পরীক্ষণ করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে উপদেশ দিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হয়। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করিয়া, উক্ত অংশ সেই প্রদেশের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার উন্নতির অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন; কিন্তু "প্রয়োজন" হইলে, ভারত-সরকার আপনায় ব্যয়নির্বাহার ঐ উক্ত অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন, এইরূপ নিয়মও করা হইয়াছে। Provincial decentralisation এর পর হইতে, প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ, আর-বায়ের অধিকারী হওয়ার সংঘনী হইয়াছেন এবং রাজস্ব হইতে উক্ত অংশ প্রত্যেক বৎসর বাহা ও বিজ্ঞান-দানকল্পে ব্যয়িত হওয়ার, ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান উন্নতি হইতেছে।

যে-সদস্য রাজস্ব, ভারত-সরকারই আদায়

করিতে পারেন, প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ বাহা আদায় করিতে গেলে গোণমালা হইতে পারে, সেই সমস্ত রাজস্ব আদায়ের ভার এখনও একমাত্র ভারত-সরকারের হাতেই আছে; যেমন, লবণ-সুদ, বাণিজ্য-সুদ (Custom), আদমি বৃত্তির ও দেশের রাজস্ব-বর্গের নিকট হইতে প্রাপ্য মজুরী। কতক রাজস্ব ভারত-সরকার এক প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ একযোগে আদায় করেন; যেমন, জমির খাজনা, ট্যাক্স, আব্বারী, আর-কুদ, বন-কর ও রেজিষ্ট্রেশন। আর-কতক রাজস্ব প্রাদেশিক-শাসনকর্তার দ্বারা আদায় করা হয় সুবিধাজনক বলিয়া, তাহার আদায়-ভার একমাত্র প্রাদেশিক-শাসনকর্তাদের হাতেই রাখা হইয়াছে; যেমন, 'Provincial rates' নামে স্থানীয় ট্যাক্স-গুলি (Local taxes)।

ভারতের ঋণ :—পূর্বেই রাজস্বের বিষয় আলোচনা করিবার পূর্বে, ভারতের ঋণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া প্রয়োজন। সমস্ত দেশেই, সমস্ত গভর্নমেন্টকেই, রাজ্য-শাসনের জন্ত মধ্যে মধ্যে ঋণগ্রহণ করিতে হয়। এই ঋণের মূল বসতিনে সেই গভর্নমেন্ট দিতে পারেন, ততদিন সেই গভর্নমেন্টকে সচ্ছল-অবস্থায় রাখা যায়। হয়, না দিতে পারিলে দেউলিয়া বলা হয়। ভারতবর্ষ একটা বিশাল প্রদেশ। শাসনের জন্ত মধ্যে মধ্যে অর্থের প্রয়োজন হয়, বার্ষিক রাজস্ব দিয়া, সেই অভাব না মিটাইতে পারিলে, সরকারকে কর্কষ করিতে হয়। আমাদের ভারত-সরকারের গৃহীত ঋণের কিন্তু একটু

বিশেষত্ব আছে। সত্য বটে, এমন অনেক সময় আসিয়াছে, যখন বার্ষিক নির্দিষ্ট রাজস্ব ব্যয়-সংকুলান না হওয়ায়, ভারত-সরকারকে বাধ্য হইয়া ঋণ করিতে হইয়াছে। এই প্রকার ঋণকে ইংরাজীতে Unproductive debt বলে। এই ঋণ লোকের মত বেশ-বাড়ীর গারে লাগিয়া থাকে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিপরীত ভারত-সরকারের এই প্রকার Unproductive ঋণ অধিক নয়। কারণ ভারত-সরকার রেলওয়ে-নির্মাণে এবং খাল খননের জন্ত যত অর্থ-ব্যয় করিয়াছেন, তাহা ঘোড়ের উপর লাভজনক; উক্ত অর্থ নিশ্চিত রেলওয়ে এবং খাল হইতে বাহা বার্ষিক আয় হয় তাহাওয়া উক্ত ঋণের সমস্ত মূল চূকাইয়া দিলেও কিছু লাভ থাকে। ভারত-সরকারের এই-রূপ ঋণই অধিক।

ভারতের ঋণকে দুইভাগে ভাগ করিতে পারা যায়; উহার কতক অংশ ভারতবর্ষ হইতেই (Rupee loan in India), এবং আর কতক অংশ বিলাত হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে (Sterling loan in England)। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে, 'কপি-লোন'র পরিমাণ ১৩২৭২২৫৭০০ এবং ষ্টার্লিং লোনের পরিমাণ ১৭৮৪৭০০১৩ পাউণ্ড ছিল।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ অবধি, ভারত-শাসক ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী, ব্যবসায়িক রাজ্য ছিলেন। তাহার পর ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীকে বণিক-বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে হয়। তখন, ভারতের ঋণ মাত্র ৩০২২৫ মিলিয়ন টাকা ছিল।

এই স্বর্ণ, ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে, ৪৫৩'৩৬ মিলিয়ন টাকার গিরা দাঁড়ায়। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এট' বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া, ভারত-সরকারকে আবার বাধা হইয়া স্বর্ণের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হয়। কারণেই ১৮৫৯-৬০ খ্রিষ্টাব্দে, ভারতের স্বর্ণের মাত্রা ৬০০'৫৫ মিলিয়ন টাকার গিরা দাঁড়ায়। এই সময়ে ভারতের প্রথম অর্থ-সচিব উইলসন্ আদিয়া ভারতের আর্থিক-অবস্থা পরিবর্তিত করিয়া দেন।

১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দ হইতে, রোণ্যের দাঁম কমিয়া বাইতে আরম্ভ হওয়ায় ও ভারতের নানাস্থানে দুর্ভিক্ষ হওয়ায়, এবং, শাসনকার্যের সুব্যবস্থা করিবার জন্য, বিত্তর অর্থের প্রয়োজন হয়। উইলসন্ সাহেব আর-কর কুলিমা দিয়া বাইলেও উহা 'লস্টসেস-টাক্স'রূপে প্রেরণিত হয়। লবণের শুদ্ধ বাড়িয়া যায়। তথাপি প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান না হওয়ায়, গভমেণ্টকে বাধা হইয়া আবার স্বর্ণ করিতে হয়। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের স্বর্ণের পরিমাণ ৯১১'২৫ মিলিয়ন টাকার গিরা দাঁড়ায়।

'Currency reform'-এর পর, ভারত-গভমেণ্টের আর্থিক অবস্থা সঙ্কল হইয়া উঠিলে, গভমেণ্ট রেলওয়ে-নির্মাণ এবং খাল-খননের দিকে মনোনিবেশ করেন। এই সমস্ত কার্যে, বিত্তর অর্থের প্রয়োজন। ভারত-সরকার রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া এই অর্থ প্রাপ্তের নিকট হইতে আশ্রয় করিতে সম্মত হন না; সুতরাং পূর্বের দায় রূপ

কমিসার সরকার রেলওয়ে-নির্মাণ খাল-খনন কার্যে চালান্ধিতে আগিলেন।

এই খাল বা রেলওয়ে 'এখন বেশ লাভজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং যে টাকা পূর্বোক্ত কার্যে ব্যয়িত হইয়াছে, নামে তাহা স্বর্ণ হইলেও, 'বীবসার' তাহা খাটানো হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে উহা স্বর্ণ নহে। বাহা হউক, ভারতের স্বর্ণের পরিমাণ কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া গেল।

বৎসর " ১০ লক্ষ টাকা হিঃ

১৮৮৭-৮৮	৯৮০'৪
১৮৯০-৯১	১০৫২'৪
১৮৯৬	১০৮২'১২
১৯০৩-০৪	১২৫৮'৭৫
১৯১১-১২	১০৯৭'৯০

পাঠকগণের স্মরণ রাখা উচিত যে, উপরে যে তালিকা দেওয়া গেল, উহা ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত 'কপীলোন' মাত্র; উহা ভিন্ন, বিলাত হইতে সংগৃহীত 'টার্লিং-লোন'র পরিমাণ ১৯৮৪৭০০'১০ পাউন্ড। ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে ৪ P.C. ৪½ P.C. ও P.C. স্বর্ণের স্বর্ণগুলিকে" বধ্যক্রমে ২ P.C. ও P.C., এবং ৩½ P.C. করাইয়াছে। কতহারের স্বর্ণের কত 'Sterling loan' আছে, নিম্নে তাহার একটা তালিকা দেওয়া গেল।

২½ P.C.—	১১৮৯২২'০৭ পাউন্ড
৩ P.C.—	৬৬৭২৪৫'০০
৩½ P.C.—	১৮২৭৬২'১০

স্বর্ণ করিয়া ভারতের রেলওয়ের উন্নতি করা হিম্মুক্ত হওয়ায়, ভারত-সরকার

বৃদ্ধকরা ৩২ টাকা চাব প্রদে, ১২০৮ খ্রিষ্টাব্দে
৫,০০০,০০০ পাউণ্ড, ১২০৯ খ্রিষ্টাব্দে
৭৫০০,০০০ পাউণ্ড, ১২১০ খ্রিষ্টাব্দে
অনুমানী মানে ৭৫০০,০০০ পাউণ্ড এবং
১২১১ খ্রিষ্টাব্দে ০ অন্যান্য মানে
৪০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্য প্রদান করেন।

আমরা পুর্বেই বলিয়াছি যে, স্ভারভের
অণের একটু পার্থক্য আছে। স্ভারভের
অধিকাংশ অণই বেলগের-নির্মাণ বস্তু
জলানর-খনন ইত্যাদি কার্যে ব্যয়িত হইয়াছে।
এই প্রকার অণের অর্ধে নির্মিত রেলগের
বা জলানরগুলি এখন বেশ লাভজনক হইয়া
দাঁড়াইয়াছে। এট অণের মাত্রা সমস্ত অণের
মূল্যের শতকরা ৮৮ ভাগ। বৃত্তাকার ভরত-
সরকারের অণের মাত্রা দেখিয়া আমাদের
ভীতি হইবার কোন কারণ নাই।

বজ্রটে ভরত-সরকারের রাজস্বকে দুই
ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে :—টাক্স ও
টোল হাড়া অন্তর্ভুক্ত আদায়। ভরিতবর্ষ
হইতে পূর্ব অন্ন পরিমাণেই টাক্স আদায় হইয়া
থাকে। ১২০১ খ্রিষ্টাব্দ অবধি, ভরত-সরকারের
সমুদয় রাজস্বের শতকরা ৩৮ অংশ মাত্র
টাক্স হইতে সংগৃহীত হইত। ঐ পুর্বেদের পর,
টাক্স হইতে গৃহীত রাজস্বের অংশ বৃদ্ধি পাইয়া,
এখন শতকরা ৫০ ভাগে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।
কিন্তু শতকরা ৫০ ভাগও ঠিক নহে। কেননা
টাক্সের মধ্যে রেলগের, খাল ইত্যাদি হইতে
আরও ধরা হইয়া থাকে। ঐ আর বাদ
দিলে, সমস্ত রাজস্বের শতকরা ২৬ ভাগ
মাত্র ঠিক টাক্স হইতে সংগৃহীত।

অমির খাজনা :—ভরত-সরকারের
সমস্ত রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ একমাত্র অমির

পারসী হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকে।
মুরোপে, অমির উপর রাজার কোন
বা-বাগরা নাই। অমিরের অধিকারী
চত্বার, অমির পারসীরা একমাত্র শোগ-
পথসংকারী—অমির। এইজন্য, মুরোপের
দেশসমূহে অমিকে রাষ্ট্রগত করিয়া
লইবার কথা হইতেছে। এখন বাহা
মুরোপের নিকট যন্ত্রণাত, আমাদের নিকট
তালা অল্প শুষ্ক। এইজন্যই আমাদের
টাক্সের মাত্রা এত কম। সমুদয় অমির
কর যদি অমিরদেরই প্রাণ্য হইত, তাহা
হইলে রাজ্যের ব্যয়-বহন করিতে, সরকার
প্রত্যেক বৎসর অমির করসংগ্রহ যে টাকা
দান তাহা পূরণ করিবার জন্য, টাক্সের মাত্রা
বাড়াইতে হইত। দেখে, সাধারণের
ক্লেশের সীমা থাকিত না।

সরকারী কাগজপত্রে অমির কর বলিয়া
বাহা দেখিতে পাওয়া যায়, উহার মধ্যে
শতকরা ২০ ভাগ প্রকৃত অমির কর, ৩
ভাগ বাণো-খাজনা, ৩ ভাগ ব্যক্তিগত কর
৩ ভাগ মন্ত-বাংসা হইতে প্রাপ্ত
এবং আর ১ ভাগ অমির পুত্র বিক্রয়
করিয়া ও বন্দোবস্ত-খরচা আদায়
কৃত্তিক সংগৃহীত হয়। প্রকৃত অমির কর
(ordinary land-revenue) মাত্র ২০
কোটি টাকা। মাত্রা হইতে ৬২ কোটি
মুদ্রা, বাজনা হইতে ৩ কোটি মুদ্রা, আগ্রা-
অযোধ্যা-যুক্তপ্রদেশ হইতে ৬২ কোটি মুদ্রা,
পাঞ্জাব হইতে ২২ কোটি মুদ্রা, বোম্বাই
হইতে ৪ কোটি মুদ্রা, পূর্ববঙ্গ ও
আসাম হইতে ২ কোটি মুদ্রা, ত্রুশ্বদেশ হইতে
২২ কোটি মুদ্রা এবং মধ্যপ্রদেশ ও বেঙ্গল

হইতে ১৬ কোটি মুদ্রা, প্রত্যেক বৎসর প্রকৃত জমির করস্বত্ব সংগৃহীত হয়।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে চিরস্থানী-বন্দোবস্ত হয়; তাহার ফল একমাত্র বঙ্গদেশের জমিদারগণের ভোগ করিয়া আসিতেছেন। মাত্রাভের এক-তৃতীয়াংশে এবং আগ্রা-অবোধা-মুক্তপ্রদেশের কতকগুলি জেলাতেও চিরস্থানী বন্দোবস্ত আছে। পূর্বে যে বাকী-খাজনাও কৃষা বলা হইয়াছে, উহার শতকরা ৯২ ভাগ, বাঙ্গলা, বোম্বাই এবং পাঞ্জাব চটতে সংগৃহীত হয়। আর সমস্ত ব্যক্তিগত পরই, (Capitation tax) পূর্ব-বাঙ্গলা, আসাম এবং ব্রহ্মদেশ হইতে সংগৃহীত হয়। মন্ত্র-চাষ হইতে আগার অর্ধেক অংশ একমাত্র ব্রহ্মদেশেই সংগৃহীত হয়।

অজ্ঞাত প্রদেশগুলির মন্ত্র-চাষ চটতেও কিছু কিছু টাকা আদায় হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ মুদ্রার পরিমাণ কোন বৎসরই সমান হয় না। বৃটিশদের মাত্রা হিসাবে ও নদী-সমূহের অবস্থানসারে মন্ত্রের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, কাজেই সংগৃহীত কবও ঐ হ্রাস-বৃদ্ধির অমুপাতে বৎসর-বৎসর ভেদ-মাযে। পাঞ্জাব এবং আগ্রা-অবোধা-মুক্তপ্রদেশ প্রত্যেকটি হইতেই, প্রত্যেক বৎসর ৫ লক্ষ হইতে ৮ লক্ষ মুদ্রা সংগৃহীত হইয়া থাকে। সেটরূপ পূর্ব-বাঙ্গলা, পশ্চিম বাঙ্গলা, আসাম, মাত্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশ হইতেও প্রতি প্রদেশে ১২ লক্ষ হইতে ৪ লক্ষ পর্য্যন্ত মুদ্রা সংগৃহীত হইয়া থাকে।

জমির কর বলিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হয়, উহা আদায়ের ক্রমকগণকর্তৃক প্রদত্ত।

যে বৎসর বর্ষার অন্ত্যে কদম্ব-ভাগ হয় না, এবং হুর্ভিক-মুন্ডিমান হইয়া দেখা দেয়, সে বৎসর ভারত-সরকারকেও রাজস্ব-সংগ্রহকালে দয়া দেখাতে হয়। কাজেই জমির করের শাস্তা নির্দিষ্ট নটি। প্রভাগেব ভাগ-মন্দ সবস্তুইসীরে চৈর্চায়ণ হ্রাস-বৃদ্ধি ০ ০৪। ১৯০৭-০৮ খৃষ্টাব্দে; ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে হুর্ভিক দেখা দেওয়ায়, ১৮০ কোটি মুদ্রা কম জমির কর আদায় হয়। ১৯০৯-১০ খৃষ্টাব্দে, ভারতের সর্বত্রই কদম্ব ভাগ হয়, তাই উক্ত বৎসর ২০.৬ কোটি মুদ্রা বেশি জমির কর আদায় হয়।

১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে, ভারতের বিভিন্ন-প্রদেশে সামান্যভাবে হুর্ভিক দেখা দেওয়ায়, ১৯১২ লক্ষ মুদ্রা কম জমির কর আদায় করা হইয়াছিল।

জমির কর আদায় করিতে ভারত-সরকারের কিছু খরচও হইয়া থাকে। জমির কর হইতে যাচা সংগৃহীত হয়, উহার শতকরা ১৭ ভাগ জমির কর-সংগ্রহে ব্যয়িত হয়। জমির কতসংগ্রহে যত অর্থ খরচ হয়, উহার কৃত অংশ কোন কার্যে ব্যয়িত হয়, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া গেল :—

জেলার শাসন-খরচ	শতকরা ৪৪
জেলার অজ্ঞাত খরচ	২৪
জেলার এবং গ্রামের কন্ঠচারীদের	১২
মাঠা-খরচ প্রভৃতি	
জমির চরিত্র খরচ	১২
জমির কর-সংগ্রহের কমিশন খরচ	৫
গো-চারণ জমি ইত্যাদিতে খরচ	২

১. জেলা-শাসনের ব্যয় মাস্ত্রাজেট সক্ষমপেঞ্চা অধিক। জেলা-শাসনে যে অর্থ গায় চয়, উহার শতকরা ২০ ভাগ মাস্ত্রাজে, ১৮ ভাগ জাগ্রা-অধোযোগ-মুক্তপ্রদেশে, ১৫ ভাগ গোব্বাচে, ১২ ভাগ বাদলায়, ১০ ভাগ ব্রহ্মদেশে, ২ ভাগ পাক্সাগে, ৮ ভাগ পুজ-দাঙ্গলা ও আদামে বৈং ও ভাগ মধ্য-প্রদেশ ও বেগারে ব্যয়িত হয়।

বনবিভাগঃ—পারভেব উত্তর ও দক্ষিণে ইংল্যান্ড-অধিকারের পূর্ণকাল চট্রেট বিখাল-অবগা আছে। কথিত আছে যে, হুন্দবগন পূর্বে কলিকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন অনেক স্থলে এন কাটাটরা সহর বসান' হইয়াছে। কিন্তু ভারত-সরকার অরণোর উপকারিতা বিস্তৃত চন নাটব অরণ্য দ্বারা কৃষি বিস্তৃত হইয়া থাকে। কৃষিকারীর বিশেষ সুবিধা হয়। আবার চনা যায়, বৃক্ষদের মেঘ আকর্ষণ করিবার অতুত ক্রমতা আছে। ভারতের উত্তরে,

২. হিমালয়ের পারদেশে যে বিরাট বনানী আছে, 'বর্ষাকালে বারিগাত চটলে এই বিরাট বনজল জলরাশি গ্রাস করিয়া, ভারতের নদীসমূহের জল বারোমাস যোগাটরা থাকে। 'এইজন্য ভারত-সরকার উত্তর-ভারতের এতৎ ব্রহ্মদেশের অরণ্যগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য বহু-পরিকর চটরাভেন। বন-আটন প্রাপ্তি চটগার পূর্বে অরণ্যনিগাসী বজ্রলোকেয়া কৃষিকারী করিবার জন্য, আশুন লাগাটরা এক-একটি বন লাগাটরা দিত; তাহার পর বৃক্ষগুলি যখন তন্তে পরিণত হইয়া বাটত, তখন উহার উপর শক্তের বাট চড়াইয়া দিয়া শক্ত বপন করিত। এখন

বন-আটন প্রাপ্তি করা হইয়াছে এবং এই সমস্ত আটনের উপর লক্ষ্য রাখিবার ও অরণোর গাছগুলির পরিচর্যার জন্য কর্তব্যরী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

৩. ভারতে যত অরণ্য আছে, ভারত-সরকার সুবিধার জন্য সেগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ভারত-সরকার হট্রেট নিযুক্ত কর্তব্যরীগণ, যে বনগুলির উন্নতির জন্য যত করিতেছেন সেই বনগুলিকে Reserved forest বলে। এই সমস্ত বন হট্রেট কোনপ্রকার অন্য সংগ্রহ করিলে কিম্বা বনের ক্ষতিকর কোন কার্য করিলে, আটন-অনুসারে দণ্ডনীর চট্রেট হয়। আব কতগুলি বন আছে, সেগুলিকে সরকার Reserved forest করিবেন, কিন্তু এখনও সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয় নাই। এই বনগুলিতে জরিপ ইত্যাদি কার্য হট্রেটেছে। এই সমস্ত বনকে Protected forest বলে। এখানেও বনের ক্ষতিকর কোনপ্রকার কার্য করা নিষিদ্ধ। আর পূর্কোক্ত দুই প্রকার অরণ্য ব্যতীত, অল্পাংশ যে-সমস্ত অরণোর উপর এখনও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় নাই, যে-সমস্ত অরণ্য এখন অসচাদের হট্রেট আছে, সেগুলিকে Unclaimed forest বলে। ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দে রিপোর্টে প্রকাশ যে, ২৪৩৪৭৮ বর্গ-মাইল বন ভারত-সরকারের অধীনে আছে। উহার মধ্যে ২৬৩৮৭ বর্গ-মাইল জমা নেওয়া বা Reserved, ৮৫০৭ বর্গ-মাইল সুরক্ষিত বা Protected এবং অবশিষ্ট অংশ বেওয়ারিশ বা Unclaimed। সরকার কর্তৃক জমা-নেওয়া ও রক্ষিত বনের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ ব্রহ্মদেশে, ৩০ ভাগ

বাংলায় ও আসামে, এবং অবশিষ্টাংশ আফ্রা-অধোধ্য-যুক্তপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত।

অরণ্যভূমিকে রক্ষা করিতে যেমন সরকারকে প্রত্যেক বৎসর কিছু-কিছু অর্থ ব্যয় করিতে হয়; তেমনি উক্ত অরণ্য-সমূহ হইতে ভারত-সরকারের কিছু-কিছু আয়ও হইয়া থাকে। বন-বিভাগে ভারত-সরকারের ব্যয় অপেক্ষা আরই অধিক, এইজন্য এই বিভাগ হইতে প্রত্যেক বৎসর ভারত-সরকার কিছু টাকা রাজস্ব-হিসাবে গ্রাহ্য থাকেন। ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দে, ভারতের বন-বিভাগ হইতে ভারত-সরকার ২৭ কোটি মুদ্রা পান। উক্ত বিভাগ পরিচালনা করিতে সরকারকে ১৫২ কোটি মুদ্রা ব্যয় করিতে হয়। বন-বিভাগ হইতে ১২২ কোটি মুদ্রা ভারত-সরকার রাজস্ব-রূপে প্রাপ্ত হন। বনবিভাগ হইতে প্রত্যেক বৎসর ভারত-সরকার বহু টাকা পান, তাহার শতকরা ৩৭ ভাগ একমাত্র ব্রহ্মদেশ হইতেই পাওয়া যায়। বন-বিভাগ হইতে উৎপন্ন কোন্-কোন্ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া, ভারত-সরকার কত টাকা প্রাপ্ত হন, নিম্নে তাহার একটা তালিকা দেওয়া গেল :—

বাণিজ্যের কাঠ ও

আশানী কাঠ — ১৯০৪ কোটি মুদ্রা।

মহারা ও বনজাত ফলমূল—২৫২৫ লক্ষ মুদ্রা।

গোচারণ জন্মির কয় — ২৪৭৪ লক্ষ মুদ্রা।

বন-বিভাগ হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৯১-৯২ খৃষ্টাব্দে, বন-বিভাগ হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ মাত্র ৬৭ লক্ষ টাকা ছিল; কিন্তু ১৯১১-১২

খৃষ্টাব্দে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১২২.৫ লক্ষ মুদ্রা গিয়া পৌঁছাইয়াছে।

এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, বনবিভাগের রাজস্ব-সংগ্রহকালে, ভারত-সরকার যথেষ্ট উদারতা দেখাইয়া থাকেন। যে-সমস্ত বন জমা-নেওয়া-পা-রীকিত, তাহার বিকটবর্তী স্থানের অধিবাসীগণকে উক্ত বন হইতে উৎপন্ন দ্রব্য বিনামূল্যে বেওয়া হয়। বন-বিভাগের রাজস্ব-বৃদ্ধির কারণ, বন-বিভাগের সুশৃঙ্খলতা। পূর্বে উহা বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়িয়া থাকিত, এখন উহার শাসন-প্রণালী সংস্কৃত হওয়ায়, রাজস্বের মাত্রাও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

• আফিম :—আমাদের ভারত-সরকার যে-সমস্ত জব্বার এক-চেটিয়া কারবার এখনও নিজের হাতেই রাখিয়াছেন, আফিম তাহার মধ্যে অন্যতম। কয়েক বৎসর পূর্বে ভারত-সরকার আফিমের কারবার হইতে প্রত্যেক বৎসর ৮ কোটি মুদ্রা পাটতেন। এখন চীনে আফিম উৎপন্ন হওয়ার এবং আফিমের প্রতি চীনের লোকের অসুবিধা ক্রমশঃ বাড়িয়া, চীনদেশ হইতে প্রাপ্ত উক্ত রাজস্বের পরিমাণও কমিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষ হইতে যে আফিম উৎপন্ন হয়, উহাকে চটভাগে নিষ্কৃত করা হইতে পারে। উহার এ-এ অংশ ভারত-সরকার কর্তৃক আফ্রা-অধোধ্য-যুক্তপ্রদেশে উৎপন্ন হয়। অপর অংশের নাম, মালোয়া আফিম। মালোয়া আফিম, দেশীয় বাজনার্নী কর্তৃক মধ্যভারতে, রাজপুতনার এবং বরেন্দ্র উৎপন্ন হয়।

ভারত-সরকার কর্তৃক উৎপন্ন আফিম। ভারত-সরকার যখন যে আফিমের কারবার করেন, উৎপন্ন আফিমেরই আশ্রয়-অযোগ্য-বৃদ্ধপ্রদেপের ২২টি জেলায় উৎপন্ন হয়। এই সকল জেলায় কৃষকগণকে, ভারত-সরকারের প্রতিনিধিগণ ৩০ টাকা দান দেন। মার্চ ও এপ্রিল মাসে আফিম কাটা হইয়া গেলে, প্রত্যেক কৃষক ১০ ব ফেব্রুয়ারি উৎপন্ন ৩০ টাকা ৬ শের হিসাবে, সরকারের প্রতিনিধিগণকে বিক্রয় করে। সরকারের প্রতিনিধিগণ এই আফিম গান্ধিপুত্রের Central fundএ লইয়া দিয়া ক্রয় করে। সেখানে এই আফিমকে দুই-ভাগে ভাগ করা হয়। যে আফিম চীন এবং ট্রেট-পেটলমেটে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়, তাহার নাম Provision opium; এগুলিকে, কলম আকারে তৈয়ারি করা হয়। প্রত্যেক বস্তুর ওজন ৩৫ পাউন্ড। এইরূপ ৭০টি বাল একটা সিঙ্কল থাকে।

ভারতে এবং প্রকৃতিতে ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে যে আফিম তৈয়ারি করা হয়, তাহাকে Excise opium বলে। উহার সঙ্গে Provision opium-এর মীতিমত পার্থক্য আছে।

Excise opium এর বস্তুগত ক্রিয়াকার্যে তৈয়ারি করা হয়। এই আফিমের এক-একটি বস্তুর ওজন ৫০ শের। এক-একটি সিঙ্কলে ৭০টি করিয়া বাল থাকে। প্রত্যেক বস্তুর জুন মাসে Provision opium কলিকাতায় বিক্রয় হয়। Excise opium এর কলিকাতায়, না-হয় গান্ধিপুত্র কারম হইতে লাইসেন্স-প্রাপ্ত বিক্রয়কারীগণকে বিক্রয় করা হয়, নয়ত

গভর্নমেন্টের টেনারীগুলিতে বিক্রয় প্রেরিত হয়।

বুটিন-গভর্নমেন্ট প্রত্যেক বস্তুর কারাদী-গভর্নমেন্টকে ৮০০০ টাকা প্রদান করেন এবং ৩০০ সিঙ্কল আফিম একটা নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করেন। কারাদী-গভর্নমেন্ট সেইরূপ গান্ধিপুত্রের তৈয়ারি শাসিত হানে বুটিন-ভারতে উৎপন্ন আফিমের অস্ত্র ব্যবহার না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মালোয়া আফিম :—মালোয়া-আফিমের অধিকাংশই মালোয়া এবং আফিমেরই উৎপন্ন হয়। উক্ত রাজ্যের ভারত-সরকারের দ্বারা আফিমের কারবার এক-চেটিয়া করিয়া রাখেন নাই। ভারত-সরকার এই আফিমের বাল ৫০০ হইতে ৬০০ মূল্যের ক্রয় করিয়া বোম্বাই শহর দিয়া চীনে রপ্তানী করিয়া থাকেন।

১৯১২ পূর্তীকে, বোম্বাই হইতে আফিম রপ্তানীও নতুন আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই আইন-অনুসারে, বোম্বাইয়ের Collector of Revenue আফিমের রপ্তানী করিবার পক্ষে নিষিদ্ধ করেন। যাহারা আফিম রপ্তানী করিতে চাহে, তাহাদিগকে একটা নির্দিষ্ট মূল্য দিয়া এই পাল ক্রয় করিতে হয়। তাহার পর আফিমের প্রত্যেক বস্তুর নাম করা হইয়াছে ১২০০ টাকা। তাহার বস্তুগুলি আফিমের বাল পাঠাইতে চাহিলে, সেই বালগুলি উক্ত মূল্যে খরিদ করিতে হইবে। এইরূপ ক্রয় উপরে, আফিম হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের মাত্রা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রাজস্বের কতক অংশ ভারত-সরকার এবং অপর-কতক অংশ দেশীয় রাজস্ব-বর্গ পাইয়া থাকেন।

যারা হটক, মোটের উপর আফিম হইতে গৃহীত রাজস্বের পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে। ১৮৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে আফিম হইতে গৃহীত রাজস্বের পরিমাণ সমস্ত রাজস্বের শতকরা ১৬ ভাগ ছিল, কিন্তু, ১৯০২-০৩ খৃষ্টাব্দে উহা কমিয়া ৭ ভাগ মাত্র হইয়াছে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে, চীনে আফিমের বাজার নষ্ট হইয়া যাটভেঁচে দেখিয়া, ভারত-সরকার পেনাভু, মিস্ত্রীপুং ইত্যাদির সহিত নতুন বন্দোবস্ত করিয়া, আফিম হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি করিয়াছেন নটে, কিন্তু ঐ আর আর কতদিন থাকিবে তাহা বলা যায়না।

লবণ। গ্রোপের আধুনিক অর্থশাস্ত্র-বিদগণ বলেন যে, রাজ্য-শাসনের জন্য যে টাকা প্রয়োজন, তাহার সমুদয় অংশই যে কেবল ধনীগণের হারাট প্রদত্ত হইবে, দরিদ্রেরা কিছুই প্রদান করিবে না, ইহা ঠিক নহে। এইজন্য দরিদ্র-বিপ্লবের নিকট হইতেও কিছু টাকা আদায় করিবার জন্য তাহার মানবের নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলির উপর শুষ্ক বসাইতে বলেন। লবণ মানবের প্রয়োজনীয় নিত্য-ব্যবহার্য্য বস্তু। এইজন্য সমস্ত সভ্য-জগৎ লবণের উপর শুষ্ক বসান' ফার্সসহত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। লবণের উপর শুষ্ক আমদের ভারতবর্ষে বহুদিন হইতেই প্রচলিত ছিল। ইংরাজগণ ভারতবর্ষ অধিকার করিবার পর, এই শুষ্ক-আদারের মালিক হন। পূর্বে লবণের উপর মন-কণা ২০০ টাকা হইতে ৩ টাকা পর্য্যন্ত শুষ্ক

বসান' হইত। এটরন্তু একমণ লবণের দাম হইত ৬ টাকা হইতে ৮ টাকা পর্য্যন্ত। গবীবদের তাহাতে বিশেষ কষ্ট-ভোগ করিতে হইত। লর্ড কার্জনদের সময় যখন ভারত-সরকারের আর্থিক অবস্থা বেশ সঙ্কট হইয়া উঠে, তখন উক্ত শুষ্ক কমাইয়া প্রথমে মণ-করা ২ টাকা তাহার পর ১৫০ টাকা আঁত্র করা ৪০। তাহাতে একমণ লবণের মূল্য ২৫০ টাকা হইতে ৩ টাকার নামিয়া আসে।

আনবা ভারতবর্ষে যে লবণ ব্যবহার করি, উহার আধিকাংশই দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে, ৩৩২ লক্ষ মণ লবণ আমরা দেশে উৎপন্ন করি এবং ১০০ লক্ষ মণ লবণ আমাদের ব্যবহারের জন্য বিদেশ হইতে আমদানি করি। সুতরাং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে, আমরা শুষ্ক লবণ ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহার পরিমাণ ৪৯০ লক্ষ মণ। আমরা প্রত্যেক বৎসরও যে-পরিমাণ লবণ ব্যবহার করি, উহার ঐ ভাগ হইতেই স্থায়ী পর্য্যন্ত আমাদের দেশেই উৎপন্ন করিয়া থাকি। বিদেশ হইতে আনা লবণ প্রধানত বাতুলা এবং ব্রহ্মদেশে অধিক ব্যবহৃত হয়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে, গেই-সেই প্রদেশের উৎপন্ন লবণই ব্যবহৃত হয়। ভারতের আমদানি লবণ সাধারণত ইংলণ্ড, জার্মানি, এডেন্, মদ্রট, জেডা ও মিশরের লোহিতসাগর-স্থিত কতকগুলি বন্দর হইতে আসিয়া থাকে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে, ভারতের যে-যে স্থানে যে-যে পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হইয়াছিল,

নিম্নে, তাহার একটী তালিকা
গেল।(১)

লবণ তৈয়ারি করিবার জন্য সরকারের
এবং সাধারণ লোকের কারখানা আছে।
সরকারের অপেক্ষা সাধারণ লোকের
কারখানার সংখ্যাই অধিক। ব্রহ্মদেশে সমুদ্র-
কল আশ্রমে গরম করিয়া, উহা হঠাতে
লবণ বাহির করা হয়। কিন্তু বোম্বাই,
মাদ্রাস এবং সিন্ধুপ্রদেশে, স্থূর্যের কিরণেই
সমুদ্র-জল শুকাইয়া লবণ বাহির করা
হয়। রাজপুতনার স্থানের লবণাক্ত জলকে
স্থূর্যের উত্তাপে শুকাইয়া লবণ বাহির করা
হয়। পঞ্জাবে এবং কোটার অনেক লবণের
পাহাড় আছে, সেখানে ঐ-স্বকল পালাড়।
হইতে লবণ সংগ্রহ করা হয়। ভারতের
উৎপন্ন লবণের শতকরা ৫০ ভাগ বোম্বাই

এবং মাদ্রাস উপকূলে, স্থূর্যের কিরণে জল
শুকাইয়া তৈয়ারি করা হইয়া থাকে।

আমরা কোন্ বৎসর কত পরিমাণ
লবণ ব্যবহার করিয়াছি এবং উহা হইতে
ভারত-সরকার কত টাকা রাজস্ব আদায়
করিয়াছেন নিয়ে তাহার একটী তালিকা
দেওয়া গেল।(২)

স্টাম্প (Stamps)। স্টাম্প দুই
প্রকার। মোকদ্দমা ইত্যাদির জন্য
যে স্টাম্প বিক্রয় হয় তাহাকে Judicial
Stamp বলে; তথ্যভিত্তি অস্ত্রান্ত কার্যে
যে স্টাম্প বিক্রয় হয়, তাহাকে Revenue
Stamp বলে। স্টাম্প ইংলণ্ডে প্রচলিত
হইয়া ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়। ভারতবর্ষে
বোম্বাই, মাদ্রাস, বেঙ্গল এবং করাচী
এই চারিটা স্থানে Central stamp

	সংখ্যা
(১) বর্ষা (সমুদ্রের জল বা কূপ হইতে উৎপন্ন লবণ)	১১৪১৮৬
সমুদ্র কূপ	৩৪৪৪১১
পাহাড় এবং কোষেটের লবণ বহিঃ	৩৮১০৬৮
সমুদ্র ব্যতীত রাজপুতনার অস্ত্রান্ত স্থান হইতে	৯২৪১১
মাদ্রাস, হুলতানপুর, গোয়ালিয়ার, কান্দীর প্রভৃতি স্থানের সমুদ্রতীরে বিখ্যাস্থান হইতে	২০৪৪১
সিন্ধু প্রদেশ	৪৪৬২০৬
বোম্বাইয়ের সমুদ্র উপকূল হইতে	১২০২৪০৮
মাদ্রাসের পূর্ব-উপকূল হইতে	৩০৪০২১০

(২) বৎসর	ওজন, মণ বিঃ	রাজস্ব, টাকা বিঃ
১৮৮৮-৮৯, ১৮৯২-৯৩	৩০৪০১৮৬	৮২৩২১০
১৮৯০-৯১, ১৮৯১-৯২	৩৪২১১৬১০	৮৫৪৮০৮২
১৮৯৮-৯৯, ১৯০২-১৯০৩	৩৪৬৭৮৬০২	৮৬৭৪২০১৮
১৯০০-০১, ১৯০১-০২	৩৪৪২৭০৪১	৮৯৪৮২৪৭
১৯০৮-০৯	৪০০১১০২৪	৮০২৪৪৩৬২
১৯১০-১১	৪০৪৪৪৮৮	৮০৮১৭০১০
১৯১১-১২	৪১৮৪৪৮০	৮১৪৪৪৪৮০

depot আছে। কলিকাতার ডিপো হইতে ট্যাক্স সমস্ত বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্রা, অযোধ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্য-ভারতবর্ষ, মধ্য-প্রদেশ এবং বেরারে (Stamp for copies only) বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। বোম্বাইয়ের ডিপো হইতে সমস্ত বোম্বাই প্রদেশে, বেরারে এবং (Copy-র ট্যাক্স ছাড়া অগ্রীত ট্যাক্স) মধ্য-প্রদেশে ও মধ্য-ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়। মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে সমস্ত মাদ্রাজ প্রদেশে, কুর্গে, বাঙ্গালোরে এবং ত্রিবাঙ্কুরে ট্যাক্স প্রেরিত হয়। রেঙ্গুন হইতে সমস্ত ব্রহ্মদেশে এবং আন্দামানে যায়। করাচী হইতে, সমস্ত পাকিস্তান, সিন্ধু প্রদেশ, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ, রাজপুতানা, কাশ্মীর, খোরাস্তান, পারস্ত উপ-সাগরের উপকূলস্থিত প্রটেক্ট-সমূহে ট্যাক্স প্রেরিত হয়।

ট্যাক্স হইতে কোন্ বৎসর-কত টাকার রাজস্ব আদায় হইয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

টাকা হিঃ

১৮৭৮-৭৯, ১৮৮২-৮৩	৩২৬১৬৮৯৪
১৮৯০-৯১, ১৮৯১-৯২	৪৬৮২৪৬৮০
১৯০০-০১, ১৯০১-০২	৫৯০২২৯৭০
১৯০৮-০৯	৮৮৪৭৭৪৪১
১৯০৯-১০	১০৩৩৫২১৩
১৯১০-১১	৭৫৪৪৭৭৬৯
১৯১১-১২	৬৪৮৬২৫৩৭

আয়কর (Income tax)। • পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, ইংরাজ-রাজত্বের প্রারম্ভে ভারতবর্ষে আয়-কর বলিয়া কোন ব্যাপার ছিল না। সিপাহি-

বিদ্রোহের পর, ভারত-সরকারের আর্থিক অবস্থা খারাপ হইলে, ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে একজন অর্থ-সচিব প্রেরিত হন। তিনিই ভারতবর্ষে প্রথম ইনকাম-ট্যাক্স বা আয়-কর-প্রথা স্থাপন করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভারত-সরকারের আর্থিক অবস্থা সঙ্কল হইয়া উঠিলে, আয়-কর তুলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভিক্ষাদি বিবিধ কারণে, ভারত-সরকারের আর্থিক অবস্থা আবার মন্দ হওয়াতে, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে Licence-tax প্রবর্তিত হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এট লাইসেন্স-ট্যাক্স চিরস্থায়ী আয়-করে প্রবর্তিত হইয়াছে। অমি হইতে খাজনা গ্রহণ করা হয় বলিয়া, অমি হইতে যে আয় হয়, তাহার উপর কোন কর নাই। আয়-কর যখন প্রথম প্রচলিত হয়, তখন বাৎসরিক ৫০০ টাকা হইতে উর্দ্ধতন আয়ের উপর উহা স্থাপিত হইয়াছিল। লও কর্কনের সময় ভারত-সরকারের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কল হইয়া উঠায় বাৎসরিক ১০০০ টাকার আয়ের উপর আয়-কর বসান হইয়াছে। ভারত-বাসীদের আয় দিন-দিন বৃদ্ধি পাওয়ায়, ক্রমের পরিমাণ দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

প্রাদেশিক কর (Provincial rates):—অমির খাজনা বাতীত, পঞ্চময় প্রভৃতি প্রজাদের নিকট হইতে যে কর গৃহীত হয়, তাহাকে Provincial rates বলে। ইহা হইতে উদ্ধৃত সমুদায় অংশ প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ ব্যবহার করিতে পারেন। কৃষকদিগের নিকট হইতে এই কর সংগৃহীত হয় বলিয়া, দুর্ভিক্ষ

হটলে বা বারিপাত না হটলে, জমির ব্যক্তি
যেমন কম হয়, উহারও সেটজন হ্রাস ০৫।
১৮৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৪৪ লক্ষ রাজস্ব আদায়
হয় কিন্তু ১৯০২-০৩ খ্রীষ্টাব্দে, উহা ৪০৪ লক্ষ
মুদ্রায় গিয়া পড়িয়াছে।

ভারত-সরকারের ব্যয়ও দেখে। একমাত্র
Civil Department-এই ১৪২ কোটি মুদ্রা
ব্যয়িত হয়। কোন বিভাগে কত মুদ্রা ব্যয়
হয়, নিয়ে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।
বিভাগ লক্ষ মুদ্রা হিঃ

সাধারণ শাসন-বিভাগ	২২৭
বিচারালয়	২৯৪
স্বাস্থ্য	৭৪
পুলিশ	৪৩৭
সমুদ্র-বিভাগ (Marine)	৫১
বৈজ্ঞানিক (Ecclesiastical)	১৭
অজ্ঞাত বিভাগসমূহ	৬১

ইহা ভিন্ন, পেনশন, কাগজপত্র, ছাপাই
খরচ ইত্যাদিতেও কয়েক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত
হয়।

ডাকঘর এক টেলিগ্রাফ বিভাগে
সরকারের ব্যয় খরচ হয়, তাহার অপেক্ষা
আরও অধিক; সুতরাং ডাকঘর এবং
টেলিগ্রাফ বিভাগ হইতে ভারত-সরকারের
প্রত্যেক বৎসর কিছু-কিছু লাভই হইয়া
থাকে।

টাকশাল হইতে খান-মিস্ত্রি টাকা
মুদ্রিত করার, ভারত-সরকারের প্রত্যেক
বৎসর বৎসে লাভ হয়। কিন্তু উক্ত মুদ্রা
Gold Standard Reserve Fundএ জমা
দেওয়ায়, উহা চাহিদাভাৱে ব্যবহৃত হইতে
পারেনা। মুদ্রাঙ্কন কার্য্যে এবং পুরাতন মুদ্রা-

গুলিকে গুণাইয়া নূতন মুদ্রা তৈয়ারি
করাইতে, প্রত্যেক বৎসর ভারত-সরকারকে
কিছু কিছু খরচ করিতে হয়।

রেলওয়ে।—ভারতবর্ষের সমস্ত
রেলওয়ে প্রত্যেক বা পরোক্ষভাবে, ভারত-
সরকারের সাহায্যেই নিশ্চিত হইয়াছে।
রেলওয়েগুলিতে পূর্বে ভারত-সরকারের
বৎসে আর্থিক ক্ষতি হইত। কয়েক বৎসর
হইল, রেলওয়েগুলি বেশ আশাশ্রিতক
হইয়াছে।

বৎসর	মোট ক্ষতি, লক্ষ মুদ্রা হিঃ
১৮৭৫-৭৭—১৮৮০-৮১	১২০
১৮৮১-৮২—১৮৮৫-৮৬	৭৪
১৮৮৬-৮৭—১৮৯০-৯১	১৬২
১৮৯১-৯২—১৮৯৫-৯৬	১৪৩
১৮৯৬-৯৭—১৮৯৮-৯৯	১৬৮
১৮৯৯-১৯০০—১৯০৪-১৯০৫	

মোট লাভ

কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য, ভারত-সরকার
খাল কাটাইয়াছেন ও কূপ নির্মাণ
করাইয়াছেন। কিন্তু, এই বিভাগে সরকারের
খরচ অপেক্ষা আরও অধিক এই বিভাগ
হইতে প্রত্যেক বৎসর ভারত-সরকার এক
কোটিরও অধিক মুদ্রা প্রাপ্ত হন। জেলাস
ও প্রাদেশিক সরকারী বাটী এবং সরকারী
রাস্তা ইত্যাদির নির্মাণ ও সংস্কার-
কার্য্যে সরকারকে প্রত্যেক বৎসর
৪ কোটিরও অধিক মুদ্রা ব্যয় করিতে
হয়। যে বৎসর সরকারের আর্থিক
অবস্থা মন্দ হয়, সেই বৎসর এই বিভাগের
খরচও কমাইয়া দেওয়া হয়। ভারতের

অগের ঋক্ত কত টাকা হ্রদ দিতে চায়, তাহা পূর্বেই আলোচনা করা গিয়াছে।

সৈন্য-বিভাগ। ১৯১১-১৯১২

বুটান্দের report-এ প্রকাশিত যে, ভারত-সরকার সৈন্যবিভাগে ২০০৬ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করেন। ঐ মূত্রার ২০২১ কোটি ভারতবর্ষে এবং ৫০০৬ লক্ষ পাউণ্ড ইংলণ্ডে খরচ করা হয়।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রসূ বিভাগ (effective), পরোক্ষ ফলপ্রসূ বিভাগ (non-effective), সমুদ্র-বিভাগ (marine) এবং বৃত্ত-রক্ষা-বিভাগ (special defence works);

—সৈন্য-বিভাগে, এট চারিটি শাখা আছে। কোন শাখায় কত পণ্ড নিয়ন্ত্রিত তাহার তালিকা দেওয়া গেল। (৩)।

এখানে যে তালিকা দেওয়া হইল, তাহা শান্তির সময়ে সৈন্য-বিভাগে যে টাকার খরচ হয়, তাহারই তালিকা। চরিত্র-যুক্ত থাকিলে যে টাকার প্রয়োজন হয়, তাহা extraordinary charges বলিয়া ধরা হয়। সে টাকার কতক অংশ অন্তর্ভুক্ত সামগ্রিক কর, টাকাদি চাইতে এবং আর-কতক অংশ স্বয়ং দ্বারা সংগ্রহ করা হয়।

ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য।

পরিচয়

কোথায় কোথায় গিয়ে আসার কবে এখন পরিচয়?

গেছি তুলে, এখন খালি চিরদিনের মনে হয়।

যেথায় ভক্তিৎ বনের হরিৎ

সিদ্ধ সন্নিব মাতে কি?

বিদল উবার

বিবায় কিবা সীকে কি?

গুহ্য তারা কখনা কথা; তবে সেখান মনে নয়।

সে কি ধ্যানে? সে কি জানে?

সে কি গভীর সাধনার?

সে কি গুহের ফুল বুকে?

সে কি গুহে বাতনার?

কবে গিয়া নিম্নের কবাই; তবে সেখান মনে নয়।

কবে কোথায় পনের ব্যাঘ্র

আনুল হয়ে কেঁবেছি?

মন ডুলারে,

হাত-বুলারে,

কোথায় ককে সেখান?

সেখান বুঝি আমার বেঁচে এসেছিলে জেমনয়।

ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য।

(৩) প্রত্যক্ষ ফলপ্রসূ বিভাগ

কোটি-মুদ্রা দি:

সৈন্যসিগের বেতন ও ভাতা এবং বেল্লাসেবকগণের খরচ ভাড়াও এই শাখার অন্তর্ভুক্ত

Supply, transport including firms, ইত্যাদি এই শাখার অন্তর্ভুক্ত

Ordinance establishment, supplies and services

পরোক্ষ ফলপ্রসূ বিভাগ

পেনসন প্রাইভেট ইত্যাদি এই শাখার অন্তর্ভুক্ত

Military works

সমুদ্র-বিভাগ

বৃত্ত-রক্ষা-বিভাগ

৪৭৮

১৩৪

৫০ লক্ষ

৫ লক্ষ

চন্দ্রগুপ্ত

চন্দ্রগুপ্ত, গুপ্তক্সে মেঘান্তর্যুতে সমুদ্ভব,
 বজ্র-ভঙ্গরাশি হতে দীপ্ত ভব দৃশ্য তেজোবল ।
 মানববিধান থাকো হে বিজ্ঞোহী বিধাতৃ-প্রেরিত,
 পক্ষ হতে জনমিল পশ্যসম ভব হস্তে সিত ।
 প্রকৃতি তোমার মাঝে, জুড়ী হচে—মানবের পরে
 নিল তার প্রতিবিম্ব আভিভাষা পদে চূর্ণ করে ।
 রাষ্ট্র নহে লীলাক্ষেত্র, প্রজা নহে খেলার পুতুল,
 রাজনীতি নহে শুধু প্রমোদের কল-কোলাহল,—
 এ সভা জানালে তুমি ধ্বংস করি অগ্নিসর্গ ফুল,
 ইন্দ্রিয়-সর্বব্যবস্থ ব্যঙ্গীকরে করিয়া নির্মূল ।
 আধাঙ্গ-গোরবী বঁত পূজাধমে করিয়া স্তোত্রায়,
 অধোগা, অলতা, তমে ওগো চন্দ্র, করি অপসার—
 আগো তুমি দাসী-পুঙ্খ-ক্সোত্তম, বীরেন্দ্র-কেশরী;
 অক্ষত্রির কক্ষা ত্যজি আধাঙ্গবর্ধে তোমারেই বরি ।
 বস্ত্রমতী বীজভোগ্যা ; হার সত্যে দিবে বহুমালা,
 বিচার করেনা সে যে অট্টালিকা আর পর্ণনালা ।
 তুমি পূর্বে পশ্চিমের ঘটাইলে প্রথম মিলন,
 পশ্চিমে এনে তুমি অক্ষলক্ষী করিলে রাজনু,
 ধ্বনীরে চূর্ণ দিলে ববনের বক্ষে মিলে তুমি,
 হে আদর্শ মহারাজ, তুমি মহা মিলনের তুমি ।
 ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম—ভগবান্ নহে পক্ষপাতী
 সঘাট সন্তান তার—ভেদ নাট—সবি এক ভাতি—
 তোমার জীবনে দাড়া ঐক্যদিন হোয় অক্ষুণ্ণ
 চৈতন্য-মানব-বৃদ্ধ-মধ্যে তাকা পূর্ণ বিকাসিত ।

ঐক্যলিঙ্গাঙ্গ রাজ ।

স্নেহাচারী

২

কবির মণিশব্দের জুড়ে দক্ষণ
আঘাত লাগিগে। তাঁহার 'মানস-প্রতিমা'
হঠাৎ সাক্ষাৎসঙ্গ ভাগ করিয়াছেন, এবং
সেদিন তিনি স্পষ্ট তাঁহাকে বলিয়াছেন যে
আর তিনি তাঁহার সম্মুখে বাহির চাইবেন
না। মণিশব্দের কাতর দৃষ্টি, অভিমানে
ভরা মধুর বচন, সমস্ত উপেক্ষা করিয়া
তিনি বলিয়াছেন, "বাণা বলেন, তুমি ভদ্র
খাও, খারাপ লোকের সঙ্গে থাক, তোমার
সঙ্গে কথা বলতে নেই।" তার নিষ্ঠুরে !
তুমি ত' জান না, কেন সে মদ খায় !
তোমার নিষ্ঠুরতা, তোমার "উপেক্ষা" যে
তাঁহার কারণ। তুমি যদি দয়া করিয়া
তাঁহার পানে একবার চাহিয়া দেখ,
তাঁহা হইলে যে সে রাজার রাজা হইতে
পারে, যুধিষ্ঠিরের মত ধার্মিক হইতে
পারে, ভীষ্মের মত পরশবার্মার শরণ করিতেও
তাঁহার বাধে না ! তুমি যদি দল, তাঁহা
হইলে সে পিতা ভাগ করিতে পারে,
এমন কি এমন যে হিরণ্যকশিপু মাতা,
তাঁহাকেও ভাগ করিয়া তোমার চরণে
সে আপনাকে বলি দিতে পারেন। আর,
তুমি তোমার জিহ্বা সতত মুদ্রা
আয়ের সম্পত্তির উপর উন্নত হইয়া বসিয়া
রহিলে, আর সে রহিল কোথায় ?

কবিরের জুগ-মাগর মণিত হইয়া
আন-কাল যে সমস্ত উচ্চাস বাহির হইতে
ছিল, তাহাদের অসামান্যক বা অসুন্দর

রসায়কতার অনেক নিশাচর সাহসী
ব্যক্তিও আতঙ্কে শিহুরিয়া উঠিটাইছিল।
এমন কি তাঁহার "শব্দবসম্বন্ধ" কবিতাগুলি
"পল্লী-সাহিত্যগ্রন্থকলন-সমিতি" সভাপণ্ডিত
কল্যাণ, মণিশব্দ নামটিকে "গুপ্তীয় বিন্দু
মুহুর্তী" হইতে একেবারে প্রথোদন কি
চতুর্দশ শতাব্দীতে উপনীত করাষ্টয়া পল্লী-
সাহিত্যের গভীর "মহাপুরুষগণের সঙ্গে
তাঁহাকে একাধারে বসাইয়া দিতেছিল।"

গুচে তাঁহার মন রুদ্ধ, বন্ধ মতলে
তাঁহার উদ্ভাস প্রাণোদ্বোধক শব্দসমিতি
দীপ্ত এবং "পথে বাটে তাঁহার চপল
মধুর গতি গ্রামের চিত্তটিকে একেবারে
দখল করিয়া বসিয়াছিল।" এত "সকল
দেখিলী শুনিয়া তাঁহার মাতা ডাকার
ডাকিলেন। ডাকার আসিয়া বাবু
করিলেন, ছুই বেলা ক্ষুদ্র মস্তুরে আল
আর ভাত এবং বিলাসিতা গুচে আবদ্ধ
থাক। বন্ধুরা বাবু করিলেন, "গোড়া
বাগলা" চাড়িয়া তাঁহার "বৈঠকখানার
আসিয়া তাঁহাকে প্রহৃত রাখ। মণিশব্দ
স্বয়ং বাবু করিলেন, প্রতিদিন চারি
পোতল করিয়া ধাত্তেবীর সেবা। কিক
মুখ পিতা কর্তৃপক্ষের বাবু করিলেন,
তাঁহার নিজ মলমপূর্ব মস্তুরে নারেন্দ্র—
০৪, ভদ্রমহার-মহাপুরুষকে বলিয়া-কাঁচা নিকটস্থ
কোন এক তালুকের ম্যানেজারী

পিতার এই বাবু শুনিয়া পুত্রের
উদ্ভাবনশীল মস্তিকে এক অপূর্ণ ভাণ্ডার

উদ্ভিল। তিনি তাঁহার পিতাকে ধরিয়া বসিলেন যে শ্রীমতী নৈলজাম্ববতীর নামে যে সুবর্ণ-গোলা নামক তাম্রক আঁচে, তাহার ম্যানেজারিটা তাঁহাকে দেওয়া হউক। উহার ম্যানেজার না কি এট সমস্ত সোনার দিয়ার ক্ষয় সমস্ত কাছারিতে আসিয়াছে; উহাকে এই সমস্ত বরপাত্র করিয়া পিতা তাঁহাকে ঐ পদটি প্রদান করুন, তাহা হইলেই কবিরের সমস্ত রোগ সারিয়া যাউবে। পিতা সেই কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিলেন, কিন্তু তাঁহার মস্তকেও ঐ সময়ে ভড়ৎগতিতে একটা আভাসকি জাগিয়া উদ্ভিল, এবং দৈবের কোন্ অলম্ব্য নিম্নে তাঁহার মুখ দিগা বাহির হইল, “ম্যানেজার বেটাকে হিসেব নিকেশে কেলতে হবে।”

প্রগাণ্ডর চলিয়া গেলে মণিশঙ্কর বহু-গণের নিকট উপস্থিত হইয়া এক অসুত প্রচার করিলেন। শুনিয়া বহুগণ একেবারে ঐহে-বিহয়ে অতিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু কবিরের তখন বাক্যের উৎস খুলিয়া গিয়াছে; তিনি অল্প-গল্প-পত্ন-বর্ণন পূর্বক বহুগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। দ্রষ্ট বস্তুর উত্তোকে স্থির হইল, বেদন করিয়াই হউক সুবর্ণ গোলায় ম্যানেজারের কাগজ-পত্র সরাইয়া ফেলিতে হইবে। ম্যানেজার রায়ে ‘টাকুরবাড়ী-সংলগ্ন’ একটা কুঠরীতে নিজা যায়। রাজি বারোটা-একটার সময় কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। মহাপণ্ডিতর প্রত্যয়ে সকলেই উৎসাহিত হইয়া উক্ত কার্যে যোগদান করিতে প্রস্তুত হইল।

কিন্তু কার্যকালে সমুৎপন্ন দেখা গেল, তিন-চারিজন ছাড়া আর কেহই মণিশঙ্করের সঙ্গে নাহ। তথাপি কি ভয়, কি ভয়। ভারত! এক-একজনেই এক একপদ। Forward! March! No fear!

সেনাপতি মণিশঙ্কর বলিলেন, “সাবধান। কোন পদ করো না। চুপি চুপি ওখানে ঢুকে যদি দেখি দরজা বন্ধ, তাহলে কাঠের জালনাটা এক টানে খুলে ফেলে ঘরে ঢুকে তার পর ঘেঁষাটাই আঁচা হবে। পাণ্ডিত্য ম্যানেজার যদি বাধা দেয়, তাহলে—”মণিশঙ্কর কলোঁসরম-স্থিত যোমান সম্রাটের জায় বৃদ্ধাশ্রমের দ্বারা দেখাইয়া দিলেন, “কি করিতে হইবে।”

মণিশঙ্কর নিশ্চলভাৱে আদেশ দিয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার একজন প্রিয়-তম শিষ্য, যিনি লক্ষ্যসাহি সঙ্গীতে এবং ‘ম্যানেজার’র সেবার শুককেও অতিক্রম করিয়াছিলেন, তিনি কিছুতেই তাঁহার জনহৃদয় শঙ্কর সাহির হ্রদকে চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তাই অগ্রাজ সকলে ধ্বনি ম্যানেজারের কক্ষের নিকট উপস্থিত চক্ষু জালালা-দরজা বন্ধ দেখিয়া কিংকর্তব্য-বিমুঢ়ের জ্ঞান কর্তব্যসম্বন্ধে পরামর্শ করিতে-ছিল, তখন তাঁহার লক্ষ্যসাহি হঠাৎ সংঘেষের বাধ ভাঙিয়া বাহির হইল, “এক-বার বেয়োট হে নরেশ!”

“আহে, চুপ চুপ।”

“আমরা তোমার দেখে বেতো;

বেতোও হে নরেশ। একবার বেয়োট হে—এ।—”

“সর্বনাশ করলে! আরে চুপ।”

কিন্তু কে শোনে? পুনরায় বিত্তপ
কোরে বাহির হইল, "বেরোও হে—এ—
এ—একবার।"

এমন সময় বার খুলিয়া ম্যানেজার
নরেশচন্দ্র মহালনবীশ বাহিরে আসিয়া
বলিলেন, "কে হে তোমরা?"

আর পিছানো চলে না! মণিশঙ্করের সেই
গরক শিখা গিয়া তাহাকে জাপটাইয়া
ধরিয়া গায়িল, "আমরা তোমার দেখে
নেমো—হে!" নরেশবাবু ভীত হইল।
চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ভাঙাত—
ভাঙাত—" এবং কোনরূপে আপনাকে মুক্তি
করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ
করিয়া দিলেন। তাহার চীৎকারে কিছু-
ক্ষণের মধ্যেই টোলার কয়েকটা ছাত্রসমেত
সর্দানন্দ 'ঘটনাবলে উপস্থিত' হইয়া দেখিল,
মুখে কাপড়-বাঁধা করুণ লোক দরজা
ঠেলিয়া নরেশবাবুর কক্ষে প্রবেশ করিবার
চেষ্টা করিতেছে এবং তিনি কক্ষমধ্য হইতে
প্রাণপণে চীৎকার করিতেছেন। তাহার
আসিয়া মণিশঙ্করকে সবলে ধরিয়া
ফেলিল। মণিশঙ্কর বেগতিক দেখিয়া হুস্ম
দিলেন, "চালাও লাঠি।"

সর্দানন্দ বলিল, "লাঠি লাঠি চাশিয়ে
দরকার নেই। পালাও বলছি, মইলে
সব-কটা মাতালকে ঐ কুঠোর চোববি।"

মণিশঙ্কর হুস্ম দিলেন, "মারো পালা
সর্দাকে।" কিন্তু সর্দানন্দ ও অজ্ঞাত
ছাত্রগণ কিং, চড় ও হুই-চারি লাথিতে
সকলকে ভুতলগ্নারী করিল। পরে ঠাকুর-
বাড়ির দরোয়ানগণ পৌছিলে বলিয়া দিল,
"বাঁধো এদের।" দরোয়ানেরা সঙ্গে আশো

আনিয়াছিল। তাহার আশোর সাহায্যে
যখন চিনিল, কাহারো লাথিতে হইবে,
তখনই সকলে পিছাইয়া পিছুিয়া বলিল,
"আরে ঠনি মণিবাবু! ই কেয়া হয়?
আপু কাহে ডাকু বনু মগরা?" মণিশঙ্কর
তখন সাতশ পার্শ্ব উঠিয়া পিছুিয়া বলিল,
"বাঁধো ঐ পালাকে।" কে কাহারো বাঁধে

ইত্যবসরে কাষ্টিকচন্দ্র সংবাদ পাইয়া
ঘটনাবলে উপস্থিত হইল এবং সমস্ত ঘটনা
জানিয়া বলিল, "বটে! আমি সর্দ-না,
করেছি কি! মণিবাবু এসেছেন, ঠর অভ্যর্থনা
করনি? ছি ছি, কি করছি, ঠগুগির কুঠো
থেকে একঘড়া জল তুলে এনে ঠর মাথার
মাড়া।" সর্দানন্দ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "এই
সারলে! ওহে মণি, পালাও, কাষ্টিক
ক্ষেপেছে। আমার হাতে তবু রক্ষা আছে,
ওর হাতে নেই।"

মণিশঙ্কর কাষ্টিকচন্দ্রের মূর্তি দেখিয়াই
সম্মানে পলায়ন পথ খোঁজা কি ন
তাহাই দেখিতেছিল। ইত্যবসরে কাষ্টিক-
চন্দ্র কুল হইতে একঘড়া জল তুলিয়া সেই
স্থানে উল্লিখিত হইল। মণিশঙ্করের অজ্ঞাত
বন্ধুগণ পূর্বেই পলাইয়াছিল, "কিন্তু সে
তখনও সাহসে ভর করিয়া পিছুিয়াছিল।
কাষ্টিক আসিয়া যেমন তাহার গলায় হাত
দিয়া এক ধাক্কা তাহাকে মাটিতে ফেলিল,
অমনি সে সর্দানন্দকে ডাকিয়া কাতর কর্তে
বলিল, "সর্দ, ভাট, রকে কীর।" সর্দানন্দ
তখন কাষ্টিককে টানিয়া বলিল, "আঃ, কি
কর, কাষ্টিক? দেখছ না, বেচারী মদের
খোঁকে একজ করে ফেলেছে। বাও মণি,
পালাও।"

মণিষকর তখন একবারে তাঁহার “আড্ডা” শোড় বার্কলার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। “সেইখানে তাঁহার যে করটা দ্রুত যুক্তিভাবে ঘাঁটে সাহস করে নাট, তাহাও উপস্থিত ছিল। মণিষকর করালের উপর গিয়া আছাড় খাঁটরা বলিলেন, “এই দেবেন, তাইরে, আমার বন্ধ অসমান হয়েছে।”

“কি কি, কি হল?”

“উঃ, বন্ধ অসমান! জলে গেল, বুক জলে গেল।”

একজন বন্ধ তাড়াতাড়ি এক গ্রাম টিমলাটে আনিয়া তাহার মুখের কাছে ধরতেই, তৎক্ষণাৎ সে তাড়া উদ্রুসাব্দ করিয়া বলিল, “উঃ, তাইরে কি অসমান! মায়ের মুখা বাবার টেছে টেছে!” তাহার অবস্থা দেখিয়া একজন তাড়াতাড়ি তাঁহার মাতার নিকট সংবাদ দিতে ছুটিয়া গেল, এবং অজ্ঞাত সঙ্গীণ পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

দেবেন কজাসা বারল, “ক চরছে, একটু ঠাণ্ডা হয়ে নল দেখ।”

মণিষকর কহিল, “প্রিয়নাথ, বাপ! আর এক কাস দাত, তাই!”

প্রিয়নাথ তাহার আড্ডা পালন করিলে মণিষকর উত্তীর্ণ বসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, “ক চরছে? বরং নল, কি বর্ষন? সেই পাণিষ্ঠ পরাজিতকো কুকুমণ্ডলের ভরে আমার পালিঘে আসতে হল! সেই শাতচাঁটা হারামজাবা সর্কা আর কাষ্টিকে! সেই চটো চ্যাংড়া আমার লাখি মারলে! এ গ্রাম আমি আর নাথব না!”

দেবেন কহিল, “বাম, বাম, ও কি করছ? গলা টিপছ কেন?”

মণি কহিল, “আমি মরব। সত্যি আমি মরব।”

দেবেন কহিল, “প্রিয়নাথ, তুই আরও মাটি করলি। এ সময়ে আমার বন্ধ দিতে গেলি কেন? এখন একটু তেঁতুল-গোলায় জেগোড় দেখ।”

দেবেন তাড়াতাড়ি এক গ্রাম জল ছুটয়া মণির মাথার দিতে লাগিল। মণিষকর গর্জন করিয়া বলিল, “কি ঠাণ্ডা করছিল, দেবেন? এ গ্রাম আর ঠাণ্ডা হবে না। যেদিন সর্কার বৃত্ত এই হাতে, আর কাষ্টিকের বৃত্ত এই হাতে কোলাতে পারব, সেদিন ঠাণ্ডা হব। নইলে বন্ধ, তোঁমরা বন্ধ-হারা হবো।”

প্রিয়নাথ তেঁতুল-গোলা আনিবামাত্র দেবেন বলিল, “এই তেঁতুল-গোলাটুকু খাও।”

মণি কহিল, “কি এনেছ? তেঁতুল-গোলা। যদি এই বাড়িতে করে ঐ পাণিষ্ঠের গরম রক্ত আনতে পারতে, তাহলে তাই খেয়ে আমি ঠাণ্ডা হতুম। কি মিছে তেঁতুল-গোলা খাওয়াছ? রক্ত চাই—রক্ত চাই—রক্ত—রক্ত।”

দেবেন কহিল, “আমি এখন তাহের রক্ত এনে দিচ্ছি। তুমি ততক্ষণ এইটে খাও—”

“তাহের বৃত্ত—হ-হটো বৃত্ত—”

দেবেন কহিল, “আমি এখন এনে দিচ্ছি। তুমি এইটুকু খেয়ে দেখ।”

তাঁহাদের এইরূপ কীধাবাদী চলিতেছে, এমন সময় নিস্তারিণী দেবী “ওরে ঘণিণে, বাপু” বলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তখন মাতৃভক্ত সন্তান টলিতে টলিতে উঠিয়া মাতাকে ধরিয়া বলিল, “মা—গর্ভধারিণী—জগৎজননী—”

বাক্যটুকু আর শুনা গেল না। কারণ পুত্রের নিঃশব্দ আলিঙ্গনে মাতা সপ্ত ভূমিসাৎ হইলেন।

১০

দেওয়ান দুর্গাশঙ্করের গর্জোচ্চ শিরশ্চত্বে হঠাৎ ঘাওয়ার তিনি একেবারে মত্ত হইয়া গেলেন। এমন কি বাগার উহার ক্রপাদৃষ্টির অস্ত্র সত্ত্বে সত্য নরনে জোড় করে উহার মুখপানে চাহিয়া থাকিত, তাহারও অভিক্যাল উগ্রাঙ্ক ক্রপাদৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। কাছারির আমলা-করকা চাইতে আরম্ভ করিয়া উমেনার পাটক এমন কি বাড়ীর পণীয় উগ্রাঙ্ক দেখিয়া লুকাইয়া হাসে। দেখিয়া শুনিয়া তিনি অবরুদ্ধ কণ্ঠে একদিন জমিদার মহাশয়কে বলিলেন, “আমার বয়স হয়েছে, এখন আর আমি পারি না, আমার কাছ থেকে সব বুঝে লয়ে নিয়ে আমার ছুটি গাও।”

কালিকাবাবু গভীরভাবে বলিলেন, “ছেলের দোষে নিজেই দোষী করা নিজের উপর অস্ত্র অত্যাচার। আপনি কেন বাস্তব চিন্তেন?” মণিশঙ্করের অস্ত্র আপনি কেন শান্তি ভোগ করতে পারেন? আপনি আমার শৈতুক দেওয়ান, আপনাকে আমি এক সন্তান ভাগ করতে পারি না।”

দুর্গাশঙ্কর কহিলেন, “না বাপু, এ আশ্রয় পাপের শাস্তি। যেখানে আমি মাথা উচু করে সবাই ওপর তাকান চলিয়েছে, সেখানে মাথা নীচু করে কাজ করতে পারব না। তোমার এটাই হৈত আমি যা কিছু কবেছি, তুমিও আমার গাতি কটা দিন বেশ চলে যাবে। আর কেন আমার ধরে রাখছ?”

কালিকাবাবু বহু অহুস-বিনয় করিয়া কিছুতেই দেওয়ানজীকে রাগিত পারিলেন না; তবে দুর্গাশঙ্কর আরও কয়েক মাস থাকিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিতে সক্ষম হইলেন।

দেওয়ান মহাশয়ের কর্মতাপের সংবাদ চতুর্দিকে রাষ্ট্রে হইয়া গেল। কেহ প্রাণিত হইল, কেহ মনে মনে খুঁই সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু প্রাণের মহাশয় এই সংবাদে যৎপরানন্তি হঃখবোধ করিলেন। পুত্রের পায়ে পিতার শান্তি-ভোগ উগ্রাঙ্ক নিকট বড়ই হঃসহ বোধ হইল, তাই তিনি কান্তিককে ডাকিয়া বলিলেন, “তোমাদের অস্ত্রই দেওয়ানজী-এ রকম ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। তোমরা যদি মণিশঙ্করের সেবিত্তার ব্যাপার চতুর্দিকে রাষ্ট্রে করে, না দিতে, তাহলে কখনই এ ব্যাপার ঘটবে না। সেদিন থেকে যদি কোথাও নিরুদ্দেশ হয়েছিল, দেওয়ান মহাশয়ের স্ত্রীও স্তন্যদান, সেদিন থেকে শরীরে মাথা পেয়ে অহুস হয়েছেন, তার ওপর উনি আবার কাজ ছেড়ে দিলেন। তোমাদের উচিত, তাঁর পায়ে ধরে বাস্তব উনি আবার কাজ নেন, তাই করা।”

কার্তিকচন্দ্র আর বিকৃতি না কারখা
সময়-মত দেওয়ানজীক সঙ্গে দেখা করিল।
দেওয়ানজী দিবাক হইয়া বলিলেন, “কেন
তোমরা বাপু আমার আমার পিছনে
নাগিলে? কাজ করা না করা আমার ইচ্ছে।
এতে পছন্দ ১০০ মাথা-বাগা কেন?”

কার্তিক কহিল, “আমাদের কল্লু যদি
আপনার ক্ষতি করে থাকে, বলুন, যেমন
করে চোক, সে ক্ষতি পূরণ করবার
চেষ্টা করব। রামকে তার মারলে সে
তার যদি ভ্রামকে লাগে, তাহলে যে তার
ছুড়েছিল, সকলে তাকেই দোষ দেবে। কি
হলে আপনি সম্মত হবেন, বলুন, আমার
সাধাচৌত না হলে আমি তাই করব।”

দুর্গাশঙ্কর গড়গড়ার ভীষণভাবে দুটো
টান দিয়া বলিলেন, “বিশদে কোথায়
সহ্যবাহুতি পাব, না, এই রকম একটা
চাণ্ডার কাছে অপমান হতে ইচ্ছে!
যারা আমার সামনে মুখ তুলে কথা
বলতে সাহস করত না, তারা এখন বুক
ফুলিয়ে গাড়িয়ে বলছে, সাহায্য করব।
ওঃ, “এর চাইতে মরণ ছিল ভাল।”

কার্তিক কহিল, “আপনার পা ছুঁয়ে
বলছি, আমায় ক্তানরকম অপদভিগ্রার
নেই। বেশপথ করতে বলেন, তাই করে
বলছি, যদি আমার দ্বারা কোন উপকার
হয়, আমি তা করতে রাজী আছি।”

দুর্গাশঙ্কর কহিল, “কি, এতদূর স্পর্ধা!
আজ্ঞা, দেখি, টোলের ভাত খেয়ে তোমার
মনটা কতখানি বড় হগেছে! বাবুকে বলে-
করে মণিশঙ্করের সঙ্গে শৈলজার বিয়ে
দিয়ে দিতে পার?”

কার্তিকচন্দ্র বিবিত হইয়া বলিল, “সে
কি! তা আমি কেমন করে পারব?
শৈলজার বিয়ে ওপর আমার কি হাত?
বাবু আমার কথা শুনেই কেন? তবে
আমার যদি এ প্রস্তাব করতে বলেন, আমি
আজই করব।”

“না, না, অন্তরানি দয়া তোমার করতে
হবে না। তবে তুমি যদি ইচ্ছে কর, তা
হলে তা হতে পারে।”

“কি কই, বলুন। আমি তাই করব।”

“তোমাদের এখানকার বাস ভুলতে
হবে।”

কার্তিক কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া
হাসিয়া বলিল, “আমরাই তা হলে
আপনার সখা বেশ, তাহলে বাবাকে
এ কথা বলছি” যে, আমরাই আপনার
পথের কাটা: পকিত দাব্য এখন থেকে
বাধেন কি না, সে কথা বলতে পারি।
যদি একা আমি গেলে হয়, বলুন, আমি
এখনই সরে পড়ছি। আর এখন ইংরিজিই
পড়ছি, তখন এ বিস্তার শেষ না দেখে আমি
ছাড়ছি না। চার মাস পরেই আমাদের
এন্ট্রেন্স একজামিন, তারপর হয় কলকাতায়,
নয় অল্প কোন জায়গায় আমরা যেতেই
হবে। তখন আমরাই আমি আপনার
পথ থেকে সরে যাব। এই চার মাস অপেক্ষা
করতে পারবেন না? এখন যেতে হলে,
হয়ত বাবু আমার বেরকন ভালবাসেন,
তাতে আপনার সুবিধে না হয়ে অসুবিধেই
হতে পারে।”

দুর্গাশঙ্করের ক্রোধ ক্রমশ বিমর্শে
পরিণত হইল। এই অষ্টাদশ বর্ষীয়

বালকের এতখানি বুদ্ধি! দুর্গাশঙ্করের মনে আবার আশা দেখা দিল। তিনি ভাবিলেন, ইহার বুদ্ধি যথেষ্ট বটে, কিন্তু বিষয়বুদ্ধি কম, তাহলে নিজের ভবিষ্যৎকে কি কেহ এতখানি উপেক্ষা করিতে পারে?

উচাকাতে দিল্লী করিতে দেখিয়া কাস্তিক চন্দ্র হাসিয়া বলিল, “আপনার ভয় হচ্ছে যে, এত বড় লোভ আমি কি কুরে সন্তরণ করব? হয়ত পারব না? কিন্তু হিৎ জানবেন যে আপনার কাছে যেটা খুক বড়, আমার কাছে হয়ত সেটা পুইই ছোট! আপনি টাকা-কড়ি, দান-দৌলতকে বড় করে দেখতে শিখেছেন, আর আমি গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে, নিজের মূর্খটাকেই বড় করে দেখতে শিখেছি। ‘বাবু’ হয়ত আমাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে তাঁর বিষয়-সম্পত্তির সঙ্গে শৈলজাকে আমার চাঞ্চল্যে সঁপে দেবেন, মনস্থ করেছেন। কিন্তু আমি জানি, ভবিষ্যতের ছেলে রাজপদ পেলেও সেই ভবিষ্যত থাকে। আপনার মণি এই এত বড় লাখ-দেড় লাখের সম্পত্তি পেলেও সেট মণিই থাকবে। আমি দুই থেকে তাই দেখে হাসি। কিন্তু ‘বাবু’ আমার ভালবাসেন, ঠিক জানবেন, সে ভাল-বাসার অপসর্গ আমি কখনও করব না। আমি বড়ই হব, ছোট হব না। বাবা যদি এতদিন পর্যন্ত আমার ভ্রাতা বহন করতে পেরে থাকেন, আরও কিছুদিন এতিনি তা পারবেন, বোধ হয়।”

দুর্গাশঙ্কর তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া বলিলেন, “বাবা, তোমার আশীর্বাদ করি,

চিরদিন তুমি ব্রাহ্মণের ছেলেই থেকে। তোমার কিছু করতে হবে না। কপালে থাকে, মণি বড় হবে, ভাল হবে, কিন্তু আমি তোমার কাছ থেকে এ বিষয়ের কোন সাহায্য নেব না। তুমি নিশ্চিত মনে পড়াশুনা করবে। আমি অধম, তাই তোমার নামেই করেছিলাম।”

কাস্তিক কহিল, “কিন্তু আমি যখন বলেছি যে আপনার পথে গাড়াব না, তখন নিশ্চয়ই সেরে যাব, কেউ আমার নিবারণ করতে পারবে না। তবু এও বলে রাখছি, আপনার মণিকে বাবু যদি মেরে না দেন তাহলে আমি আবার আসব। তখন যদি তিনি জামাকেই সমস্ত দেন, ত আমার নিতেই হবে, কারণ তিনি আমার ভাল বাসেন। তবে ভয় নেই, এখন যদি তিনি প্রস্তাব করেন যে তোমার শৈলজাকে নিরে করতে হবে, তাহলে আমি কিছুতেই তা করব না। আপনি আপনার মণির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করুন।”

কাস্তিকচন্দ্র আর গাড়াইল না, দেওয়ানজীকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। দুর্গাশঙ্কর ন রবে গড়গড়া টানি ত লাগিলেন; কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “আমি যে বাপ, কি করি!”

১১

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার কিছুদিন পরে দেখা গেল, কাস্তিকচন্দ্র জুড়ি টাকার বৃত্তি পাইয়াছে। সর্বানন্দ পাশ হইয়াছে যাত্র। এই দুই সংবাদে সকলেই সন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু কাস্তিকচন্দ্র অত্যন্ত দুঃখিত হইল। তাহার পিতা যখন

প্রস্তাব করিলেন, সে ঐ বলায়শিপের
টাকার কলিকর্তা বা অল্প কোন হলে
পড়িতে যাঠিতে পারে, তখন সে বলিল,
“সর্ব্বদা কি চেষ্টা?”

পিতৃ বলিলেন, “যদি এতকাল ওর
খরচ বচন করে আসতেন, তিনি যদি এমন
অর্থোক্ত হন, তাহলে নিশ্চয়।”

“তার কাছে এখন প্রস্তাব করে
কে?”

“ইতিপূর্বে যে করেছিল, সেট করবে।”

“কোন কারণবশতঃ আমি আর সে
প্রস্তাব করতে পারব না।”

“কি কারণ?”

কাঙ্ক্ষিচক্র কিছুকণ ছিট্রা করিয়া
বলিল, “আপনার কাছে গোপন করা
উচিত নয়। দেহদানকীর সঙ্গে আমার
পক্ষে যে কথাবার্তা হইতছিল, তা থেকে এখন
স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, কেন বাবু আমার
এই হেতু চক্ষে দেখেন। বাবু তাঁর
যেহেতু সঙ্গে আমার, গিরে দেবার উচ্চা
করেছেন। এখন সুকথা কেনে শুনে
তাঁর উপর প্রায়-ভুলুস আর আমি করতে
পারিনে। যদিও আপনাই এতদিন আমাদের
খরচ-পত্র টালিয়েছেন, কিন্তু অল্প কারণে
পড়বার খরচ চাপানো আপনার পক্ষে
অসম্ভব। অতএব ও অসম্ভব আমি ত কোন
উপায় দেখতে পারি না। এখন কেনে
কেনেও যদি অর্জিব তাব দেখিয়ে আমি
তাঁকে গিয়ে বলি যে সর্ব্বদার খরচ
আপনাকে দিতে হবে, তাহলে সেটা মিথ্যা
কথা বলার মতই হবে। এক উপায়, যদি
সর্ব্বদা গিরে বলে। কিন্তু—”

নিবচক্র করিলেন, “কালিকাবাবু কত
লোকের ছেলে-শিপের খরচ-পত্র দিচ্ছেন,
সর্ব্বদার মত গরীব ব্রাহ্মণের ছেলের
খরচ দিতেও কুপ্তিত হবেন না। কিন্তু তোমার
সঙ্গে যে তিনি ঘেরের গিরে দেবেন, এ
সংবাদ ত আমিও জানতাম না। আমি
মনে করতাম, তিনি যেমন সকলকেই দয়া
করেন, তোমাকেও তেমনি। তবে তোমার
যে অভিভা, মোচ করেন, এটা আমি খুবই
জানি! কিন্তু এর মধ্যে যে ঐ-রকম ভাব
লুকানো ছিল, তা ত কৈ বুঝাফেরেও টের
পারিনি। হি হি, কি লজ্জা! এখন ত
সকলেই মনে করবে যে, আমি টাকার
লোভে ছেলে বিক্রী করেছে। কাঙ্ক্ষিক,
আর তোমার ইংরেজি লেখাপড়ার প্রয়োজন
নেই।”

“আমার লেখা-পড়ার ত এতদিন
কোনরকম আর্থিক সাহায্য বাবু করেন
নি, আজও করতে চণে না, কারণ আমি
গা কলারশিপ পেরেছি, তাতেই আমার
চলবে।”

“আর্থিক সাহায্য পাওনি, তাই-না
কৈম কর বলব! হেড মাস্টার মশায় নিজে
তোমার পড়াবেন। তোমাদের যখন যে
বয়ের দরকার, বাবু-লাঠীবেরী থেকে তখনই
তা পেরেছে। স্কল-পাঠা পুস্তক কিছু
লাঠীবেরীতে পাকে না, তবু তোমরা তখনই
তা পেরেছ। এখন ত দয়াও বুঝতে
পারবে যে, কেন ওখানে তোমার এত
প্রতিপত্তি! না, না, কাঙ্ক্ষিক, তুমি ইংরেজি
পড়ার আশা ছেড়ে দাও।”

“আমি না হয় ছেড়ে দিলুম, কিন্তু

সৰ্গ দ্বাদশকে তাহলে গাছে চড়িয়ে 'মৈ
কেড়ে নেঙরা হবে।'

"তার উপায় আমি কি করব? সৰ্গ-
নন্দকে বল, সে নিজে গিয়ে বাবুকে বলে-
করে যা হব করুক। আমরা আং তার
কোন সাহায্য করতে পারব না।"

"বাবা, আপনি ব্যস্ত হজেন, কেন?
আমাদের কাৰ্য্যোদ্ধার নিয়ে কথা! আমি
নিজে বিবাহ না করলে ত আর তাঁরা জোর
করে আমার বিয়ে দিতে পারবেন না।"

"কি! তুমি আমার এত নীচ মনে কর
বে এতদিন এত উপকার নিয়ে আজ
ঐ রকম মিথ্যাচারের দ্বারা তাঁর প্রত্যাশ
করব? এতদিন অজ্ঞানে যা করেছি,
করেছি, আর তা কিছুতেই পায়ব না।
তুমি আর পড়তে পাবে না, আমার
পৈতৃক যা আছে, তাই নিয়ে তোমায় সন্ত
ধাকতে হবে।"

"বাবা, আপনি এ রকম ব্যস্ত হলে
আপনার পৈতৃক সম্পত্তিই বা রাখবেন কি
করে?"

"না পারি, ব্রাহ্মণের ছেলে, ভিক্ষা-
বৃত্তি অবলম্বন করলে কেউ দোষ দিতে
পারবে না। তবু এ কথা ত কেউ বলিত
পারবে না যে, 'হরচন্দ্র স্মার্ত্তভোমের
সন্তান পুত্র বিক্রয় করেছে।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, বাবা, আপনার
যাতে কোনরকম অসম্মান হয়, তা করতে
দেব না। কিন্তু বিপদকে আগে দেখে
ডেকে আনা কোনরকমেই উচিত হবে না।
একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সৰ্গ-দ্বাদশ যদি
কোন উপকার করতে পারি, করব কি?"

"আমাদের উঁচু মাথা নীচু না করে
যদি পার, তাহলে কর। কিন্তু সাবধান,
কালিকাশ্যুর মত উদার-হৃদয় ব্যক্তির
সঙ্গে কোনরকম চালাকি করতে পারে
না। সব কথা লুপ্ত বলার পরও তিনি যদি
তোমার আর সৰ্গানন্দর উপকার করতে
স্বাধীন হন তাহলে তা তুমি করতে পার।"

"বেশ, সেই কথাই স্থির।"

"কাষ্টিকচন্দ্র পিতার নিকট হঠতে চলিয়া
গিয়া সৰ্গানন্দকে সকল কথা খুলিয়া বলিল।
সৰ্গানন্দ শ্রান মুখে বলিল, "কাজ কি আট?
আমার ঈর্ষি পড়াশুনা? ঈর্ষি পড়ে
বড় জোর কেবাণী হব। গরিব ব্রাহ্মণের
বছলের ভাণ্ডো সেই দাস্ত বৃত্তি ছাড়া যখন
আর কিছুই ছুটে না, তখন যা হ'ল
বিবে জমি শিখাসেবক আছে, তাই নিয়ে
হুং-বুটে জীবন কাটানো মল কি।"

কাষ্টিক কহিল, "তুমি যদি এম, এ
পাশ করতে পার, তাহলে প্রোফেসর
হতে পারবে, অল্প ধোনেরকম বড় কাজও
নিলতে পারে। সেট ভজ্জিই বলছি, তুমি এ
সুবিধা ছেড়ে না। চল, গিয়া বাবুকে সব
কথা বল।"

সৰ্গানন্দ কহিল, "এতদিন তোমার
স্বপ্নে এর করে চালাইছি, আর আমার
তা ইচ্ছে নয়।"

কাষ্টিক কহিল, "কেন?"

সৰ্গানন্দ কহিল, "আমি তোমার সে কথা
আর বলতে পারব না, কাষ্টিক। আমার
জমা কর ভাই, আমার ছেড়ে দাও।
আমার ভাগো যা আছে, তাই তোকে।"

কাষ্টিক কিছুক্ষণ সৰ্গানন্দের মুখের

পাশে চাটগা বহিল। সর্দানন্দ সরস।
অত্যন্ত লাজ্জিত হইয়া বলিল, “কাঠিক,
মাহুথকে বেশী ভালবাসতে নেই, বেশী
বিশ্বাসও করতে নেই। আমি তোমার
কাছে একটা কথা এতদিন গোপন করেছি
বলে লজ্জার আমার মরে যেতে চেষ্টা
হচ্ছে। তুমি তোমার ‘অকৃতজ্ঞ’ বন্ধুকে
ত্যাগ কর।”

কাঠিক কহিল, “তোমার সব কথা খুলে
বলতেই হবে। কি চরিত্রে বল,—হরভো
আমি হতে তোমার উপকার হতে পারে।”

“তা আমি, তুমি তা পার বললেই তোমার
তা বলব না। তোমার দ্বারা এ উপকার
আমি নেব না।”

“নিতাই হবে, নইলে কান
আমাকে ?”

সর্দানন্দ কাতর চটয়া বলিল, “কাঠিক,
ভাট, তোর পারে পড়ি, তুই আমার এত
পাল বাসিস নে, আমি তোর এতখানি
‘ভালবাসার’ মোটেই উপযুক্ত নই।”

কাঠিক কহিল, “তুমি ভালবাসার উপযুক্ত
কি না, সে বিচার আমি করব। এখন
‘তুমি যে আমার ভালবাস, তার পরিচয়
দাও।’ বল, কি চরিত্রে ?”

সর্দানন্দ ছল ছল মেখে বলিল, “আমার
যদি মেয়ে ফেলতে পারিস, তা চলে বলতে
পারি।”

কাঠিক কহিল, “তাওলে বলবে না ?”

“কিছুতেই না।”

কাঠিক কহিল, “সর্দান্দা, তাওলে বলে
রাখি, আর তুমি আমার দেখতে পাবে
না। এ জন্মে এই পর্য্যন্ত।”

কাঠিকচন্দ্র চলিয়া যাব দেখিয়া সর্দানন্দ
আহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “কাঠিক,
আমায় দয়া কর। তুমি মুখ ফিরিয়ে না।
তুমি যদি মুখ ফেরাও, তা হলে ভগ্নমান
মুখ ফিরবেন। দয়া কর ভাই।”

কাঠিক কহিল, “তুমি কৈ আমার দয়া
করলে ? তুমি যে দয়া আমার করতে
পারেনা, আমিও তোমার সে দয়া করতে
পারি না।”

• সর্দানন্দ সত্যসত্যই কানিয়া কেলিয়া
বলিল, “কাঠিক, শোন, যদি তোমার এ কথা
বলি, তা হলে এত মুহূর্তে তুমি সে কাজ
করতে যাবে। অগত তাতে ফল হবে এই

• যে তোমাদেরও ক্ষতি হবে—আর আমার ?
জাটোর আবার গাটকাটার গুণ ? আমি
যে সর্দা সেই সর্দাই থাকব।”

কাঠিক কহিল, “তোমার কোন কথা
শুনতে চাইনে। হর সব কথা খুলে
আমার বল, নয় আমার আশা ত্যাগ
কর।”

সর্দানন্দ তখন নিতান্তই নিরুপায় হইয়া
কাঠিককে বলিল, “এ দরজাটা তাহলে
বন্ধ করে দাও।” দরজা বন্ধ করিয়া দুই
বন্ধুর্তে যে কথা হইল, তাহাতে কাঠিকচন্দ্র
অত্যন্ত বিরূপ হইয়া গেল। কিছুকণ চিন্তা
করিয়া সে বলিল, “বাই চৌক, আমিও
বা তুমিও তাই। আমি গরীবের ছেলে,
তুমিও গরীবের ছেলে। কালিকাবানু
আমাদের যদি মেয়ে দিতে উত্তম হইবে
থাকেন, তোমাকেই বা তিনি না দিতে
পারবেন কেন ?”

“তোমাকে যে বাবু কতখানি ভাল

বালেন, তা তুমি জান না, তাই এ কথা বলছি। তার উপর শৈল?"

"শৈল ছেলেমানুষ, ওর কথা 'ছেড়ে দাও। বার সঙ্গে নিয়ে চলে, তাকেই ওর ভালবাসতে হবে।' ওর কথা ধর্তব্য নয়।"

"কি ভয়ঙ্কর! বার নিয়ে চলে, তার কথাই ধর্তব্য নয়! শৈল আর ভেলে, মানুষটি নেই। এখন ওর মুখ-চোখ দিয়ে ওর মনের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ছে। তুমি অন্ধ, তাই কিছু দেখতে পাওনি। আমি আজ কতদিন লক্ষ্য করে আসছি, তোমাকে দেখলে ওর লম্বা মুখখানির ওপর দিচ্ছে—"

কার্তিক বাধা দিয়া কহিল, "খাম, খাম, তুমিও কি মণিষ্যর হয়ে উঠলে না কি? কি বল তার ঠিক নেই। আমার মত হোৎকরামকে যদি, তুমি 'সামনে থাকতেও, শৈল পছন্দ কবে থাকে, তাহলে ওর ভাষা অশেষ দুর্ভক্তি আছে। বাক, তোমার আমার মধ্যে মেঘ কেটে গেল! এই সামান্য কথা তুমি যখন আমার বলছিলে না, তখন বুঝছি তোমার ঘেটে পাপ সত্ত্ব রয়েছে। সেই পাপের শক্তির জন্ত তোমাকে আমার সঙ্গে কলকাতায়, কিংবা যেখানেই বাই পড়তে যেতে হবে। আর তোমার সঙ্গে যেমন করে পারি, শৈলজীর বিয়ে আমি দেওয়াব। এতে বত গোলাকি খাটাতে হয়, খাটাব।"

সর্দানন্দ জুড় হইয়া বলিল, "কি! তুমি নিজের নাম করে টাকা নিয়ে আমার পড়ার সাহায্য করবে? আর মনে করছ, সেই টাকা আমি নেব?"

কার্তিক কহিল, "আরে খাম না, তুমি বাবুকে একটুও চেন নি। আমি না

চাইলেও তিনি তোমার সাহায্য করবেন। এখনও কোন কথা হয়নি। সবই 'বঁধন উড়ো-ভাঙ্গা' ওপর চুষছে, তখন তাই চপুক না!"

"না, আর তা হতে পারে না। 'তুমি না চাইলেও তোমারই কল, তিন আমায় সাহায্য করবেন।"

কার্তিক কহিল, "দেখ সর্দানন্দ, বাবুর এত-খানি অপমান করো না, বলছি, তাহলে তোমার পাপ হবে। বাবু এতদিন আমার জন্ত তোমার সাহায্য করেন নি, এ তোমার বশে রাখছি। তার প্রমাণ চাও, আর আমার সঙ্গে যেয়ো, দেখতে পাবে।"

সর্দানন্দ কহিল, "তা যদি প্রমাণ করতে পার, তাহলে তোমার সঙ্গে যেখানে যেতে বল, বাগি আছি।"

কার্তিক কহিল, "যেতে রাজি না হলেই ব তোমার ডাক্তার কে? আমি যা মতলব করেছি, তার জন্ত তোমার সরিরে দিতুমই। আমি আজ পাঁচ মাস আগে দেওয়ানজীর কাছে প্রীতিজ্ঞা করার এসেছি, তাঁর মণির জন্ত পথ খোলসা করে দেব, সে কথা তো তোমার মনে আছে?"

সর্দানন্দ কহিল, "ছি ছি কার্তিক, শৈলর সঙ্গে ঐ জানোয়ারটার নাম এক সঙ্গে করতে তোমার বাধে না?"

কার্তিক কহিল, "আজ্ঞা সর্দানন্দ, জিজ্ঞাসা করি, মাহুদ 'ত' বাহুবই! আজ্ঞার ত সুবাই এক! তাহলে একদনের নাম করলেই বা তোমাদের মুখে বল শুনে কেন, আর একজনের নামেই বা খড়গহস্ত হয়ে ওঠ কেন? মাহুদ মাহুবই, অবস্থা

শিকা ইত্যাদির শুধে নানা রকম হয়। কে জানে? কে জোড় করে বলতে পারে যে আমরাই খুব উঁচু জীব, আর মণিশঙ্কর খুব নীচ! শ্রীমতা শৈলজাহ্নবীর তাঁর নির্দেশ, জৈন হোবার আর তাঁর বাপের বেড় লাথ টাকার সম্প্রতির দরুণই বা এত প্রাণিনীর বস্ত্র চরে উঠলেন কেন? আর সর্বানন্দ শর্মার চারণ বিবে প্রজ্ঞাতর মাত্র সখ্য হওয়াতে তিনিই বা এত টের হলেন কেন? সমস্ত জগতের উপর যদি কারও আধিপত্য থাকে ত সেই রাজরাজেশ্বরের অকুরন্ত ধন-দৌলতের কাছে তোমার মাসিক পাঁচ টাকাই বা কি, আর মহারাজাধি-রাজের লাথ লাথ টাকার বা কি! *One divided by infinity* ও যা, আর *one million divided by infinity* ও তাই।

সর্বানন্দ কাষ্টিকের বৃত্তি শ্রীমতা হস্ত সখ্য করিতে পারিল না। তাহঁকে হানিতে দেখিয়া কাষ্টিক বলিল, “ঐ চাঁকটেই হচ্ছে একমাত্র দামো জিনিষ। সংসারের দু’এক টুকরো মাটি, কাঠ, ঝিল-বাতাসের অল্প কামড়া-কামড়ি দেখে যে হানতে পারে, সেই ঠিক বস্ত্র লাভ করেছে। অল্প সবট গুজলিকা-প্রবাহের দলে পড়ে ভেসে যাক, আর আমরা দুজনে কেবল হাসি এস।”

সন্ধ্যার সময় শাইব্রেরীর সম্মুখস্থ উদ্ভানে একটা বেদীর উপর বাসিয়া কালিকাবাবু ভাস্কর্য্য স্বেদন করিতেছিলেন। এমন সময় কাষ্টিক ও সর্বানন্দ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। কালিকাবাবু হাসিয়া বলিলেন, “আমি

আগেই সংবাদ পেয়েছি। কিন্তু দুপুর বেলায় তোমরা আলান কেন?”

কাষ্টিক কহিল, “বাবার সঙ্গে একটা পরামর্শে আমরা বাস্ত ছিলুম, তাই আসতে পারিনি।”

কালিকাবাবু কহিলেন, “তাঁর সঙ্গে আমারও যে একটা কথা আছে—তিনি এখনও আসছেন না কেন? ওরে রামচরণ, বিষয়কে ডাক ত।”

কাষ্টিক কহিল, “বাবা আসবার আমাদের দুটো কথা আছে—”

কালিকাবাবু কহিলেন, “তাঁই না কি? বসো, বসো, ঐ বেঞ্চে বসো।”

কাষ্টিক আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, “বাবার কথা এট যে আমার কলমে পড়তে যাওয়ায় একটু গোলামাল উপস্থিত হয়েছে। কি গোলামাল, বাবা তা নিজে বলবেন। সেই গোলামালের দরুণ হয়তো আমার ইংরিজি পড়া আর নাও হতে পারে। কিন্তু—সর্ব-দা তাহ’লে কি কববে?”

কালিকাবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “তুমি কুড়ি টাকা জলারশিণ পেয়েছ, তবু তোমার পড়ার গোলামাল হবে? আশ্চর্য্য! তোমার বাবাকে আবার নতুন করে দেই সব পুরোনো কথা বোঝাতে হবে না কি?”

কাষ্টিক কহিল, “কোন একটা নতুন কারণ ঘটায় তিনি আমাকে আর ইংরিজি পড়তে অনিচ্ছুক। কি কারণ, তিনিই তা বলবেন। এখন সর্বদায় কি হবে, তাই জানতে চাচ্ছি।”

কালিকাবাবু কহিলেন, “ওর যদি সে

রকম কোন কারণ না ঘটে থাকে, তাহলে ওর পড়াশোনার কোন রকম বাধা হইত দেখতে পাচ্ছি না। এতদিন ওর খরচ দিতে যদি এ এন্টেন্টের মা আটকে থাকে, তাহলে এখনও আটকাবে না। তোমার ন্যায় যদি তোমার মঙ্গল না চান, তা হলে সর্বানন্দ কেন নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে? সর্বানন্দ, তুমি কি বলতে চাও?”

সর্বানন্দ কহিল, “গাঙ্গে, আমার আর কিছুই বাক্য নেই, তবে কাষ্টিক কোর করে, আমার ইংরিজি পড়া ধরিয়েছে। এখন ওই যদি ভেড়ে দেয়, তাহলে আমারই বা এত প্রয়োজন কি! আমি যে বরাবর সমস্ত একজামিনই পাস করতে পারব, তারও কিছু ঝিক নেই।”

কালিকাবাবু কহিলেন, “ভুলে গেলে কেউ চুপ করে থাকতে পারে না? যখন তোমার এতখানি হাবিধে করে দিতে আমরা সম্মত ছিলাম, তখন তুমি কি বা সে হাবিধে ছেড়ে দেবে কেন? হয়ত যদি ভাল করে বরাবর পাশ করে যেতে পার, তাহলে পরে গভর্ণমেন্ট সার্ভিসে কোন ভাল পোষ্ট পাওয়াও তোমার পক্ষে কঠিন না হতে পারে।”

সর্বানন্দ কহিল, “কিন্তু কাষ্টিক যদি যেতে না চায়—”

কালিকাবাবু কহিলেন, “বাপু, অতখানি সেন্টিমেন্টাল হলে সংসার চলে না। আমি মানলাম, তোমাদের দুটিতে খুব ভাব। তাই বলে একজন যদি নিজের ভাল-মন্দ না বোঝে, তাই বলে যে অপরাধকেও বিবেচনা-শক্তি ত্যাগ করতে হবে, এর কোন অর্থ নেই।

তোমার যদি আর কোন আপত্তি না থাকে, তা হলে প্রস্তুত হওগে। তোমার যা কিছু খরচ-পর হবে? আমি তা বহন করব। কাষ্টিক, তোমার আর কিছু বলবার আছে?”

কাষ্টিক কহিল, “আর-বা আছে, তা বাবাই বলবেন। তবে আমার দ্বিত্ব সর্ব-দার সঙ্গে ছাড়তে চাচ্ছে হচ্ছে না। আপনি বাবাকে বুঝিয়ে যদি রাজি করতে পারেন, তাহলে আমিও যাব।”

কালিকাবাবু কহিলেন, “বাবা কাষ্টিক, তোমার কিম্বা ভাল হবে, সে কি আমি বুঝব? তুমি জান না—”

কাষ্টিক কহিল, “আপনার পারে দাঁড়, আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না। আপনার দয়া যদি আমি এ জীবনে জুলি, তাহলে আমার সমস্ত জীবনই একটা অভিশাপ বলে জ্ঞান করব। যেন তিরদিন আপনাদের আশীর্বাদের উপযুক্ত থাকতে পারি, আমার এই আশ্বর্ষ্য করবেন।”

কালিকাবাবু কহিলেন, “আমার ভাল-বাসাটা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নয়, পরে জীবনে পারবে। এখন যাও, তোমার বাবাকে পাঠিয়ে দাওগে।”

কাষ্টিক কহিল, “আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি।”

কাষ্টিক ও সর্বানন্দ ঠাহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল এবং কিছুকাল পক্ষে শিবচন্দ্র জাহরদাস আশিরা তাহাদের স্থান অধিকার করিলেন। কালিকাবাবু জ্যোৎস্না-বিবোধ একটা কামিনী বুকের দিকে চাহিয়া ছিলেন। ঠাহাকে অন্তরমনে দেখিয়া জাহ-

কহু মহাপন বলিলেন,
ডেকেছিলেন ?”

কালিকাবাবু চমকিত হইয়া বলিলেন,
“এই যে আপনি এগেছেন। আজ এত
দেরী হ'ল যে ?”

শিবচন্দ্র কহিলেন, “কাস্তিক আমাকে
বলছিল, আজ একটু পৰে যাবেন, আমাব
একটা কথা আছে, বাবু সঙ্গে; তাই সে চলে
গেলে, আসছি।”

কালিকাবাবু কহিলেন, “আপনি না কি
কাস্তিকে আর পড়াশুনা করতে দেবেন না ?”

শিবচন্দ্র কহিলেন, “পড়াশুনা করতে দেব
না, এ কথা বলিনি; তবে অল্প কোথাও গিয়ে
ওর পড়াশুনার আর প্রয়োজন নেই।”

কালিকাবাবু কহিলেন, “কেন, এ-রকম
ইচ্ছা হ'ল ?”

শিবচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলেন;
তারপর পদতলস্থ চটী জুতার উপর দৃষ্টি
গিৰ্হন করিয়া বলিলেন, “আজ এঘর একটা
কথা। শুনেছি, যাতে আপনার দরবার ওপর
নির্ভর করে তরুণ বিদেশে বিদ্যার্জনের
অল্প পণ্যেতে আমার ইচ্ছা চলে যাবে।”

কালিকাবাবু কহিলেন, “কি কথা আর
কর কাছেই বা তা শুনলেন, শুনি।”

শিবচন্দ্র কহিলেন, “কথাটা শুনেছি,
কাস্তিকের কাছে, তবে সে কার কাছে
শুনেছে, সে কথা বলতে পারব না। কারণ
তাতে সে ব্যক্তির চরিত্র অনিষ্ট হতে
পারে। তবে কি কথা, তা যদি শুনতে
চান তা বলতে পারি। কিন্তু পরের
দুখে শোনা কথা, আপনাকে বলতে সফোচ
বোধ হচ্ছে।”

কালিকাবাবু কহিলেন, “সফোচ বোধ
হয় তা' বলে কাজ নেই, কিন্তু আমার
বক্তব্য যা আছে, তা বলে নি। কাস্তিকের
অবস্থায় সম্বন্ধে আপনি বক্তব্য চিত্রিত,
আমাকেও ততখানি জানবেন।”

শিবচন্দ্র কহিলেন, “যাছে, সে কথা
অবস্থাস করবার তাহলে আর কিছুমাত্র
কারণ নেই। আপনি যে কাস্তিকে নিজের
সম্বন্ধের মত দেখেন এ কথা আপনার
অভি-বড় পক্ষেও বলবে। কিন্তু যদি
বুঝতে পারি যে একমাত্র সেই চতেই
আমি যে কথা শুনেছি, সেই কথা উঠেছে,
তাহলে সমস্ত বিধা ভাগ করে কাগই
আমি কাস্তিকে কলমে পড়তে পাঠিয়ে
দেব।”

কালিকাবাবু ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন, “আর
যদি এই অর্থাৎসহের অল্প কোন গুণ কারণ
থাকে,” তাহলে আপনি শুকে আমার
কাছ থেকে কেড়ে নেবেন ? আপনার
ছেলেকে যদি কেউ একটু বেগী ভালবাসে,
—তা সে ভালবাসা যে কারণেই হোক
—সেটা আপনার কাছে রত অপরাধ বলে
গণ্য হবে ?”

শিবচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “আপনি
যদি এতখানি ক্ষুণ্ণ হন, তাহলে এবিষয়ে
আলোচনা ভাগ করতে বাধ্য হব, কারণ
আপনার দরবার উপর, ঘরের উপর, নির্ভর
করেই আমাদের এখানে বাস করা।
আপনি প্রাণিত হলে আমাদের—”

কালিকাবাবু কহিলেন, “আপনি ব্যস্ত
হবেন না। ক্ষুণ্ণই হই, আর রাগই করি,
আমাদের পূর্বপুরুষের কীর্তি লোপ করে

আপনার মত ব্যক্তিকে পরিচয় করব, এতখানি নীচ আমি নই। তবে কাঙ্ক্ষিকের আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, জাররত মশায়! মহম্মদের একটা আশা তিলে তিলে সঞ্চিত হচ্ছে এখন পরতাপকার ধারণ করেছে। এখন যদি আপনি নিষ্ঠুরের মত সে আশাকে ধুলিসাৎ করেন তাহলে সে গ্রন্থ রূপগায় আমার আর স্থান থাকবে না। জাররত মশায়, এত দিন একথা প্রকাশ কেন বলিনি, তার কারণ, কি জানি, যদি এ সংবাদ শুনে কাঙ্ক্ষিকের কোন অনিষ্ট হয় না আপনি প্রগনেষ্ট তাতে বাধা দেন, আপনার মধ্যে যে একটা জ্বাঙ্কগোড়িত গর্জিত ভাব আছে, তার প্রমাণ আমি বহুদিন পূর্বেই পেয়েছিলাম, সেইজন্যই সাহস করে এ বিষয়ে কোন কথা বলতে পারি নি। আমার চিরকালের ইচ্ছা যে বাদ কাঙ্ক্ষিককে নাও পাট, তবুও তাকে বড় হতে মরৎ হতে আমি সাহায্য করব। কিন্তু সেট সঙ্গে আমার যে আশা ছিল, সেটাও তত বড় হয়ে উঠে এখন আমার সমস্ত কার্যমনোব্যাক্যের একমাত্র চেষ্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি যদি আমার সে বাসনা পূর্ণ না করেন, তাহলে—”

শিবচন্দ্র কহিলেন, “কি বাসনা, স্পষ্ট বলে বলুন!” কাঙ্ক্ষিকেরে আপনার এক প্রয়োজন!”

কালিকাবাবু কহিলেন, “এ জীবনের শেষ বাসনা পূর্ণ করব, আমার শৈলজাকে তার চাতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হব। জাররত মশায়, আমার আপনি দয়া করুন, এ ইচ্ছার বাধা দেবেন না। তবে আপনাকে প্রতিজ্ঞা

করে বলছি যে কাঙ্ক্ষিককে সর্ব্ব বিষয়ে বাধীন করে দিবে, শৈলজা আর তার মধ্যে যেন কোনরকম অসামঞ্জস্য না থাকে, তাই করে দিবে তবে আমার কাজ শেষ হবে।”

শিবচন্দ্র কহিলেন, “বৃক্শে পারলমি না, শৈলজার গাই করুন, তবু সে আপনার কল্যাণে থাকবে, আর কাঙ্ক্ষিকের বাট করুন, তবু সে দরিদ্র জ্বাঙ্কবের ছেলেই থাকবে। তাকে যদি আপনার সমস্ত সম্পত্তির উপর বাসরে দেন, তবু সে জানবে যে সে সমস্তই তার পাওয়া জিনিষ, এবং সে পৈতৃক গচ্ছিত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নাত্র। যেমনট করুন, আপনার শৈলজার সঙ্গে আমার পুত্রের যে আন্তরিক প্রভেদ, চিরদিন তা থেকেই যাবে। এমন কালে বিবাহ দিলে বিবাহের যা ফল তা মিলবে কি নী সম্ভব। সেট বলছি জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি সাহসে এক ভিখারীর সন্তানের সঙ্গে আপনার কল্যাণ বিবাহ দিতে সাহস করছেন? আমার কি সাধ্য যে আপনার মত ধনী ব্যক্তির সঙ্গে সমানভাবে কুটুম্বতা রক্ষা করে চলি!”

কালিকাবাবু কহিলেন, “একমাত্র টুকতেই যে মানুষ বড় হয়, একথা আপনার যুগে শুনে আশ্চর্য্য হচ্ছি। আপনাকে যদি আমার চেয়ে প্রেষ্ঠ না মনে করব, তাহলে আপনার সঙ্গে কুটুম্বতা ছাপনের কল এত ব্যস্ত হব কেন? আমার শৈলজার ত’ সন্দেহের অভাব ছিল না, বড় বড় লোকের বাড়ী থেকেও সন্দেহ এগেছে, আর আমি টেকা করলে যে কোন দরিদ্র সংকুলানের

সম্মানকে এনে বরজাঘাট করে বাগতে পার। ও চুটোঙ্গ একটা টেঙেও আমার নেই। আমি চাঁট ব্রাহ্মণের সম্মান, আমি চাই যার আত্মসম্মান-জ্ঞান আছে, সেইরকম মাহু, গুবোপুরি মাহু। কলের পুতুল বা খেঁকো ফুঁকুঁবের যদি দবকাব চতুর্ভাঙ্গলে তা এত চল'ভ চ'ত না। আপনার পুত্র বলেই কার্তিক হুর্লভ, আপনার পুত্র বলেই কার্তিকের মাহু চণ্ডার আশা আছে, তাই একে এমন কবে আপনার কাছ থেকে চেয়ে নিতে হচ্ছে।"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "কিন্তু সকলেই ত' বলবে যে আমি পুত্র বিক্রয় ক'রছি। যতট' কেন আপনি কখন না, লোক-নিম্মাং যুগ থেকে আমার নিষ্কার নেই। এমন অবস্থায় কি করে আমি এ বিষয়ে সন্তোষ দেব?"

কালিকাবাবু কহিলেন, "সারাজ একটু লোক-নিম্মার ভয়ে আপনি এক নিবীর ব্রাহ্মণ-কস্তার সংপার্জন্যে গাধা দেবেন? ভুলে যান যে সে স্থানীয় বস্ত্রান; মনে করুন, সে কেবল এক নির্দোষ ব্রাহ্মণ-কস্তা। মনে করুন, তার বাগ আপনার হাত চেপে ধরে বলছে, 'মহার, আমার কুল রক্ষা করুন, আমার কস্তার বিনিময়ে আপনার পুত্রটাকে দান করুন।' তারপর বলুন, আপনি কি করবেন? এর পরও যদি আপনি চান যে আমি সকলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলি, আপনার কাছ থেকে কোড়-হাতে এঁট কার্তিকে আমি তিকা কবে নিয়েছি, তাতেও আমি প্রস্তুত।"

শিবচন্দ্র তারহর শুদ্ধ হইয়া

ওতপানি বিনয়ের সম্মুখে তাঁহার সমস্ত গর্জ, ধূলিসাৎ চটয়া গেল। তিনি অস্ত্র কিছু করিতে না পারিয়া নত নৈরো হস্তের তলদেশ খুঁটিতে লাগিলেন। কালিকাবাবু সহর্গা নিকটে আসিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "বন্ধু, আপনি আমার বয়োভোটে, বলুন, আমার কি করতে হবে, কি করলে আপনার মন পাবে?"

শিবচন্দ্রের মস্তক হঠাৎ তর্ক-ব্যক্তি, জ্ঞার, "সাংখ্য, শ্যামল, বেদান্তাদি সমস্তই এক নিমেষে উড়িয়া গেল। তাঁহার যত গর্জ যত অস্ত্রের যত ব্রাহ্মণ্য ছিল, সমস্তই বাগ্যাদি জীর্ণানির জ্ঞার ধসিয়া পড়িয়া গেল। তিনি দোষিলেন, কালিকাবাবুও মাহু, তিনিও মাহু—উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। তিনি উগ্রিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কালিকাবাবু, আপনারই মর! আমি আর তর্ক করিব না। আপনারকে আর কিছু করতে চ'বে না। কিন্তু এ সংবাদ উভয়ের মধ্যেই আশঙ্ক থাকে। এখন কর্তব্যের করার প্রয়োজন নেই।"

কালিকাবাবু কহিলেন, "বৈবাহিক, আপনাকে নমস্কার! এই সম্ভার আকাশের নীচে যেন ঐ চন্দ্র আর তারাদের সাক্ষ্য রেখে আমাদের কণবাপার্ত্য ফির করে নিলাম। আপনার কার্তিকে যখন উপস্থিত বিবেচনা করবেন, এখনই অহুমতি দেবেন, আমি বিবাহের উত্তোগ করব। কিন্তু মনে থাকে যেন, 'আমার কস্তা বাগদত্তা হয়ে রৈল, এর এখন অস্ত্র পায়ে সম্মানন অসম্ভব।'"

শিবচন্দ্র কহিলেন, "স্তর নেই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

শিবচন্দ্র গৃহে কিরিয়া কাঠিকচন্দ্রকে বলিলেন, “তোমার কলেজে পড়তে বাওয়াই সম্ভব হ'ল।”

কাঠিকচন্দ্র মনে মনে হাসিল; প্রকৃত্তে র্লিল, “তা'হলে একটা ভাল দিন দেখে দিন, আমি গিরে মাকে খবর দি।”

বাতার দিন সর্দানন্দকে কিন্তু অত্যন্ত বিষম মুখে লুকাইয়া বেড়াইতে দেখিয়া কাঠিকচন্দ্র হাসিয়া বলিল, “দে হজ্ঞে না, সর্দা দা, সিরি খেতে এগিরে এখন কৌৎকা দেখে পেচুলে চলবে না। আমি যা মনে করেছি, তা করবই।”

সর্দানন্দ কহিল, “নিজের বুদ্ধিকে বা ইচ্ছাকে বাড়িয়ে দেখা তোমার ক্রমঃ একটা বোগ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সাবধান, ‘হরত এই কাংগেই তোমার সমস্ত মহত্ব ধুলিসাং করে যাবে।’

কাঠিক কহিল, “সে তব নেই, কারণ শেব পর্য্যন্ত তুমি আছ। নিত্যন্তই যদি পড়ি, তুমি আমার টেনে তুলবে। কিন্তু তুমি যে মনে করেছ, আমার plan of operationএ বাধা দেবে, তা হচ্ছে না। আমি সমস্ত কাজের ভার নিজের উপর নিয়েছি, কারণ মুখাপেকী হয়ে কাজ করব, তেমন লোক আমি নই। এ বিয়ে আমি দেওয়াবই, তাতে যা হয় হবে। তুমি আমার ওপর নির্ভর কর।”

সর্দানন্দ কহিল, “তোমার কাছেও যেমন ‘সর্দানন্দবংশ’ আছে, আর কারণ আছে যে তা নয়, তা তুমি কেন মনে করছ? আমিও প্রতিজ্ঞা করছি যে যদি বৃষ্টি, শৈলজা

আমার চার না, তাহলে দ্বয়ং তপস্বিনী এলেও এ বিয়েতে কেউ আমার সম্মত করতে পারবে না।”

কাঠিক কহিল, “আমি পারব।”

সর্দানন্দ কহিল, “কেন?”

“কারণ! কারণ, আমি তোমার ভালবাসি।”

সর্দানন্দ কহিল, “মিথ্যা কথা! এর কারণ আমি বলব,—তখন? এর কারণ, তুমি নিজেই সব-চাটতে ভালবাস। তোমার ইচ্ছার বিক্ষেপে আমার বিক্ষেপে কিছু হবে, এ তোমার গছ হয় না! আমার সঙ্গে শৈলজা নিয়ে দিতে যখন তোমার ইচ্ছে হয়েছিল, তখন সে ইচ্ছার সুস্থে তুমি আর কারণ ইচ্ছাকে দাঁড়াতে দিতে চাও না! তোমার হৃদয় অর্থাৎ প্রচণ্ড গর্বই তোমার সুখ। সাবধান, কাঠিক, পতনের এই হল প্রথম সোপান।”

কাঠিক কহিল, “এ, শরত সংস্কারাই দেখছি বিরোধের মধ্য দিয়েই ঘটে থাকে। আমার জীবনের প্রথম সংস্কারের দেখছি প্রথম থেকে তুমিই বিরোধী হয়ে দাঁড়ালে। তা হওগে, কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত যখন আমার কোন কাজেই হারিতে পারিনি, তখন এ কাজেও পারবে না—এ'ও বলে রাখলুম, দেখে নিয়ো।”

বৈকালে দুইখানি গো-শকট সজ্জিত হইয়া আসিল এবং সর্দানন্দ ও কাঠিক টোলের সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া জমিদার-গৃহান্তিমুখে চলিয়া গেল। সেখানে শকলেব নিকট হইতে বিদায় লইয়া দুইজনে যেমন বাহিরে আসিলে,

অমনি দেখিল, লাইব্রেরীর বিতল কক্ষের
গবাক্ষে শৈলজা-দাঁড়াইয়া আছে। যুগ্মপং
উত্তর বন্ধু 'দুর্জিৎ' শৈলজার উপর পতিত
হওয়াতেই হউক বা যে কারণেই হউক
শৈলজা গবাক্ষ হেটেতে সরিয়া গেল।
কার্তিকচন্দ্র 'তাড়াতাড়ি' সর্দানন্দর হাত
ধরিয়া টানিয়া বলিল, "সর্দারেরই সঙ্গে দেখা
করলুম, শৈল' কেন বাকি থাকে! ওর
কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি, চল।"

সর্দানন্দ ফুঙ্ক স্বরে বলিল, "তুমি অতি
পাণ্ডু!"

কার্তিক বলিল, "যে আক্ষে, আপনি না
যান, আমার ত যেতে বাধ্য নেই! আমি
চললুম।"

সর্দানন্দ কোন কথা 'না' বলিয়া
গো-শুকটে গিয়া উঠিল। কার্তিকচন্দ্র লক্ষ্যে
লক্ষ্যে সোপান অতিক্রম করিয়া এক
মিমেখে শৈলজার নিকটে গিয়া 'বলিল,
'শৈল, আমরা বাচ্ছি। বোধ হয় হু'এক
বছর আসতে পারব না। সবাই কত
উপদেশ দিলে, তুমি কিছু বলবে না?"

শৈল 'দীর্ঘ' 'দীর্ঘ' তাহার। পারের

গোড়ার একটা প্রণাম করিয়া একই বেন
রান্না মুখে বলিল, "আমি আর কি বলব?"

কার্তিক কহিল, "কিছু না? একটা কথাও
বলবার নেই? সর্দার-দাও আসতে পুষাবে
কি'না, ঠিক নেই, ওকেও কিছু বলবার
নেই?"

শৈলজা লজ্জিত হইয়া বলিল, "ওকে
আমার প্রণাম দিগে!"

কার্তিক কহিল, "তুমি এই ক'বছরের
মধ্যে বড় বড়ো হয়ে পড়েছ, দেখছি। এক-
দিনের অল্প আমরা বাচ্ছি, আর একটা
কথাও আমাদের অল্প ছুঁগিয়ে রাখনি?
'ছঃ! যদি তোমার আপন ভাই এমন
করে দুঃদেশে চলে যেত, তাহলে কি
তুমি তাকে একটা কথাও বলতে না, শৈল?"

শৈল সঙ্গী কানিয়া কেলিল এবং একবার
ফুঙ্ক দুটিতে কান্ডিকের পানে চাহিয়া ছুটিয়া
সে স্থান হেটেতে পলাইয়া গেল। কার্তিক-
চন্দ্র সে দুটির কোনকথা ব্যাখ্যা করিতে
না পারিয়া অগত্যা হাসিতে হাসিতে
আগিয়া সর্দানন্দর অঙ্গুলর করিল।

(ক্রমশঃ)

ত্রিবিদ্যুতভূষণ ভট্ট।

“ফাস্তুনী”

ফাস্তুন বন্দ্য প্রকৃতির রত্নক্ষেত্র দৃষ্ট-
পটের পরিবর্তন হয়, তখন জীবনের
অনেকখানি রক্ত চোখের সম্মুখে ধরা
পড়ে। অস্থির মনো আগরণের, ত্রাসের
মনো সত্যের, বিলয়ের মনো প্রাণের

লীলায় আত্মস পাণ্ডা যায়। যা একটা
বিভীষকার মত ফুরাসা ও অন্ধকারের
শব্দ বিস্তার করে' জগৎকে ভেঁকে
ফেলে, সে যে কেবল প্রাণের
শক্তিকেই নতুন করে' আগিরে তুলতে

আসে,—এই সভাই কাস্তানের নবপল্লবধনে আর রঙিন আকাশে পরিণত হইবে শুভে।
প্রাণটুকু জাগাতে হলে’ আগে ঘুম পাড়াতে
হয়,—তাই শ্রীত আসে তার লেপ আর
কাঁধা দ্বিধে, তার ঠাণ্ডা নিবাস নিগে,
আর সাতসাগরের কথা নিগে।

আমরা বে বার-বার ঘুমিয়ে পড়ি,
সে ঘুমিয়ে-পড়ার মধ্যে জাগরণের সুরটিই
কেবল বাজে। জাগরণকে নতুন করে’ আনবার
জন্ত, সভ্য করে’ জানবার জন্তই ঘুমের
আয়োজন। ঘুমের যে নিশ্চেষ্টে ডার, সে
কেবল জাগরণকে উত্তর করবার জন্ত,
প্রাণের চেষ্টাকে প্রবুদ্ধ রাখবার জন্ত।

আর এই আনন্দই সব-চেয়ে বড়
আনন্দ—এ ঘুমিয়ে-থাকার ‘আনন্দ নয়,
এ কেবল জেগে-থাকার ‘আনন্দও নয়।
এ আনন্দ জেগে উঠে’ বলে’ই ঘুমিয়ে
পড়ার আনন্দ, ঘুমের মধ্যে, জাগরণের
আনন্দ, ঘুম থেকে নতুন করে’ জেগে
ওঠার আনন্দ। এ বেশার আনন্দ, কারণ
এ প্রাচীন হয়ে নবীনতার মধ্যে ফেরবার
আনন্দ। ফুলের কুঁড়িটা যদি চিরকাল
ফুলের কুঁড়িই থাকত, তাহলে তার স্তম্ভ
যৌবন জগতের মধ্যে সব-চেয়ে প্রাচীন
বিনিময় হ’ত। সে জগতের রূপার পাত্র হ’ত,
কারণ সে এক বিপুল আনন্দ থেকে বঞ্চিত
থাকত।

সে হাওয়ার আনন্দ। পথ-চলার
আনন্দ। নিজেই হারিয়ে দিয়ে ক্রিরিয়ে
পাওয়ার আনন্দ, নিজেই ছাড়িয়ে দিয়ে
কুড়িয়ে লওয়ার আনন্দ, নিজেই ভাসিয়ে
দিয়ে ভেসে চলার আনন্দ। এ খেলার

আনন্দ, কারণ এ নতুন হওয়ার আনন্দ।
এ নবযৌবনের আনন্দ।

পরমেশ্বর মাতৃশব্দকে বস্তু আনন্দের অধি-
কারী করেছেন। তিনি তাকে চির জীবন
দিয়ে অতিশয় প্রসন্ন করেছেন, তিনি তাকে
চির যৌবন দিয়ে প্রাচীন করে রাখেননি।
‘চিরযৌবনের ঐশ্বর্য্য অসীম অন্তল ক্ষয়
সমুদ্রের মতন হ’ত,—যাতে হাবুডুপ থাকার
ধার, কিন্তু পাড়ানো যায় না। যে
স্রুটি ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অধিক বাজে, যেটি
না থাকলে ঐশ্বর্য্যই মূল্য থাকত না,
সেটি অভাবের স্রব। আমরা অভাবের
উপর পাড়িয়েই ঐশ্বর্য্যকে উপভোগ করি,
তুঃস্বপ্ন থেকেই স্বপ্নকে পাই, বিরহের মধ্যে
জালাধারকে বাচিয়ে রাখি।

আশা-বাণীর মধ্যেই জীবনের প্রাণন
আনন্দ,—এই যে আসি বলে’ চলে যাওয়া,
এই যে নতুন করে’ আসা, এরই মধ্যে
জীবনের গোরন রয়েছে, যৌবনের আনন্দ
রয়েছে। প্রাণের ধর্ম্ম—মুহুর্তে মুহুর্তে
বিকাশ প্রাপ্ত হওয়া। এ নদী নিঃশেষে
আপনাকে ঢেলে ‘দিয়ে’ চলেছে, পাতার
পাতার সে সবুজ হয়ে উঠছে,—ফুলে ফুলে
সে সৌরভ হয়ে খেলছে, ‘এমছে’ মৈমছে
তার স্রুটি অমটি হয়ে ভাসছে। এমন
করে’ সে আপনাকে নিঃশেষ করে’ দিয়ে
গিয়েছে কিন্তু তার চলা ত স্থায়ীনি।
সে কেবল তার গভীর চম্বা গোপনে রেখে
চলেছে, সে জগতের প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে
দিয়ে চলেছে, সে তার পারের টিঙ্কি মুছে
ফেলে দিয়ে চলেছে, কিন্তু তবু তার গতি
হারায়নি। নদী শুকিয়ে গেছে, কিন্তু তবু

নদী ত রয়েছে। সেই নদীই ত রয়েছে,
যে ভাষ্য পাবণকারী তখন করে' বৈরধে
এসেছিল হাওয়ার হাওয়ার বৎসর আগে,
প্রাণের সাড়া শেয়ে ছুটে চলেছিল দুকূল
প্রার্থিত করে' হৃদয়ের দেশ জাগিয়ে, নিজের
আত্মার মতো সমস্ত বিশ্বকে বরণ করে'।

• প্রাণ আত্মার মতো রয়েছে, তবু
তাকে বায় বায় খুঁজে নিতে হবে। এই
ত প্রাণের সর্দারি করা। তাকে কালের
মতো খুঁজতে হবে, বিপদের মতো খুঁজতে
হবে, মুক্তির মতো খুঁজতে হবে। প্রাণ
চাঁদ মুহুর্তে মুহুর্তে ভেগে উঠতে। সে-ই
বায়-বায় প্রথম। এই আশ্রয়ের জ্বরই
তার জ্বর। সে-ই বায় বায় বিদায় নিয়ে

বায় মিলনের আনন্দে জাগার জ্বর। যে
ফুঁড়া বাতাসকে চিরদিন ক্ষেপিয়ে বেড়ায়
সে এই চিরনবীন প্রাণ। সে আমাদেরই
আড়াল করে' লুকিয়ে থাকে, চলার মাঝে
ধরা দেয়। আমরা তাকে পাব কি,—
সেই আমাদের পেরে বসেছে।

সেইজন্তই প্রাচীন হবার যো নেই।
ভিতরের দৃষ্টি বদল একবার জাগে, তখন
আর পর্য-হাওয়ার ভয় থাকে না।
নির্নের আলোকে লক্ষ দেখাবার জন্ত প্রাণের
আলোর স্বরকার করে না। আমরা
যদি একবার সর্গভ্রমণে যেনে নিতে
পারি জীবনই আমাদের সর্দার, যদি তার
মুখের দিকে তর্কিয়ে তার মুখের বাণী
শুনতে পারি, তবে তার সমস্ত শক্তি,

—বায় অনবরত লীলা চলেছে সবুজ পাতার
বেলায়, তারার আলোর খেলায়, সাগরের
জলের উজ্জ্বলে, সেই সমস্ত বিশ্বশক্তি

আমার মধ্যে ভেগে উঠবে। এ বড়
আশ্চর্য যে এত-বড় জগৎ সে কেবল
আমারই চোখের অপেক্ষা করেছে। সেই
জন্তই ভয় নেই। ভয় কেবল নিজের
মতো। পাতাটি যদি মনে করে, সে একা,
সে-ই কেবল শুকিয়ে আসছে, তারই জীবন
কুরিয়ে আসছে, তার বোটাটি খসে
আসছে, তাহলে সে মরে। সে-ই মরে,
কেননা মরণের ভয় তারই। তার চারি-
দিকের যে শক্তি তাকে বাঁচিয়ে রাখতে
আসে, সে তাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের
শক্তিকে বড় মনে করেছে। কিন্তু তার
ভাঙার আন, খুঁজি ছোট—সেইজন্ত সে
ভয়েই মরে।

কিন্তু এ জগতে হারিয়ে বায়ান ভয়
নেই—প্রাচীন হবার অবসর নেই।
প্রত্যেক পাতাটি বিশ্বরাজের ছাপ নিয়ে
আসে, সে হারায় না। জগতের আদিকাল
থেকে আজ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ দিন এসেছে,
তাদের প্রত্যেকটিতে পরমেশ্বরের শিলমোহর
অঙ্কিত ছিল,—কেউ হারাননি। কিন্তু সেই
একই কিরছে। সেই একই পাতা বারে
বারে লব্ধ হয়ে উঠছে, সেই একই দিন
বারে বারে প্রত্যাহার হয়ে কিরছে, সেই
একই ফুল বারে বারে সঞ্চিত হয়ে ফুটেছে।
প্রাচীন জ্ঞান, প্রাচীন সত্য—এমন করে'
নবীন হয়ে উঠেছে।

এইজন্তই জীবনকে একটা রহস্য, একটা
খেলা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।
কারণ জীবনের পাত্র ক্রমাগত পূর্ণ হয়ে
আসছে নতুন করে' অমৃত তরে উঠ-বার
জন্তে। শেষই বায়-বায় প্রথম হয়ে

আসছে। মরণের আয়োজনেই জীবনের চেষ্টা। প্রাচীন হবার সব আয়োজনই হয়েছে। বেত অক্ষরাঙ্কি শেষ-মরণের পরিচয়-পত্র হয়েছে, শরীরটা ভয়শাখার মত মাটির দিকে স্থলে পড়েছে, মরণপারাবাহের মহাগানের মধ্যে পৃথিবীর কোলাহল ডুবে গেছে। কিন্তু এমনি সময়েই কে পিছু ডাকে, তখন হিমাব ভুলের বিবম ফেরে পড়ে বেতে হয়। এই যে হ্রস্ব প্রাণ, আমারই উৎসাহে উল্লস করছে। এই যে নবযৌবন—আমারই চেষ্টা, আমারই উত্তম, আমারই অধ্যবসার নিয়ে জ্বলে উঠেছে। আমার প্রাণ যে এদের মধ্যেই লাড়ি দিচ্ছে। এ কি?—আমিই কি বাব বলে ফিরে এসেছি না কি?

দৃষ্টি-গভীর হলে এইটাই চোখে পড়ে। আকাশের একটা তারা যখন উঠে বলে—‘আমি আছি, তখন সে কথা হাজার হাজার তারার মুখে হাজারবার জ্বলে ওঠে। তখন তুমি আকাশেই তুলিয়ে বাও, আর আধারেই মিলিয়ে যাও, আর অনন্তের পথেই ছুটে বেরিয়ে যাও, তোমার কথাটাট থাকবে, চিরকাল তারার মুখে জ্বলে।

জীবনের মধ্যে দ্বন্দ্ব-চেষ্টে প্রাচীন বয়স যৌবনের অনতিপূর্ন-কাল। এই সময়ে যা হারায় তা আর ফিরে আসে না। তখন দৃষ্টি থাকে যেটার উপর সেটা কেবল বড় হচ্ছে, নিজেকে হারিয়েছে। সে চলেছে কেবল প্রবৃত্তির তাড়নার, বেহের উত্তেজনায়। স্তর বেশি, ভরসা কম, কারণ জ্ঞান দুর্বল। সেইজন্য নবযৌবন মৃত্যুকে ভয় স্তর করে এক আর কিছুতে নয়।

সে তখনও নিজেকে কেবল হারিয়েছে। কণিচকের বে দিকটা আধারের দিকে মাথা নীচু করেছে, সেট-দিকটাই সে দেখতে পেরেছে। যেদিক সোণার আলোর কিরোট পরে’ আগন্তুণের শিখর’-উঠে গাড়িয়েছে, সেদিকে তার-কৃষ্টি আশ্রয়। এই নবযৌবনকে-মৃত্যুর ভয় থেকে বাচাতে গেলে তাকে সামনে অন্ধকারের দিকে, মৃত্যুর গহবরের দিকেই চালাতে হবে।

এইটাই হল প্রাণের সর্দারিগিরি। যৌবনকে গাড়াতে দেওয়া হবে না। যে কাজে সব-চেয়ে ভয়, সব-চেয়ে বাধা, সেই কাজে তাকে নিযুক্ত করতে হবে। তার পৃথের তলার পথ ভেগে উঠবে, তার ‘চরণ ঘারে পল্লী পলে মরণ মরবে।’ কিন্তু মৃত্যুকে উপেক্ষা করলেই প্রাণ পাওয়া যায় না। প্রাণকে মৃত্যুর কোলে শিশুর মত ভেগে উঠতে দেখবে যখন তখনই মৃত্যুর ভয় পুরে যাবে। যতক্ষণ মারিয়ার দৃষ্টিই কেবল সঙ্গা থাকবে ততক্ষণ প্রাণকে সর্কক্ষণ দেখা যাবে ‘না। যখনই অবলাদ আসবে, ক্রান্তি আসবে, দিক যখন আধার করে’ আসবে, পথ যখন ধৈর্যগাট পর্বত পৌছিয়ে দিয়ে অপ্রতিরূপ হবে, ‘তখন সত্যসত্যই মনে হবে প্রাণ ফাঁকি দিল।

সেই আধারে মনের প্রদীপ জ্বলতে হবে। এই অনন্ত জগতের বিকাশ, বীর, মধ্যে ভয় নাই, বিচ্ছেদ নাই, মৃত্যু নাই, এই মনের প্রদীপকে তুলে ধরবে, আর এই নিখিল জীবনের অবিচ্ছিন্ন ইয়টি তার মধ্যে আগুন হয়ে জ্বলবে।

তখন দেখা যাবে, যা-কিছু অন্ধকার

এলে মনে হ'ত, সে কেবল আলোর পথ হয়ে গড়েছিল। আজ সে পথ আলো-কে বৃক্ক করে বন্ধ হ'ল। যা আগের ভয় হয়ে এসেছিল, তা আজ আগের ভয় গেয়ে চলে গেল। যাকে ঈশ্বরের দিক থেকে মৃত্যু বলে মনে হয়েছিল, সে-ই জন্মের হয়ে নিখিলের প্রাণ হয়ে আত্মার সর্গার হয়ে ফিরে এল। যা ফুরিয়ে যায় তা একটা বড় পাওয়ার মধ্যে ফুরিয়ে যায়—কাজ ফুরিয়ে যায় শান্তির মধ্যে, আশা ফুরিয়ে যায় বিশ্বাসের মধ্যে, দিনের আলো ফুরিয়ে যায় সন্ধ্যার সুন্দর মধ্যে, নিশীথের গভীরতার মধ্যে, রক্তনীর স্রষ্টার মধ্যে।

এইজন্ত ঈশ্বরের বিচারের আয়োজন দেখলে হাসি পায়। সে তার জীবপাতার পুঁজি নিয়ে অভিজ্ঞাটান গলিতমখমত বুদ্ধের মত চলেছে, তার ভাব দেখে যে হাসি পায়। সে যে নিত্যই চরম প্রাণের খেলার সাথী। তার কি প্রাচীন হবার সময় আছে? তার ভিতরে ভিতরে যে নব-জীবনের চাকলা হিরোয়ালিত হয়ে উঠেছে!

বিশ্ববিধাতা এ কথাটা অতি সঙ্গত করে বুঝিয়ে দিয়েছেন পিতামাতার জীবনের মধ্যে দিয়ে।

মৃত্যুর দিকটা সত্য হ'ত যদি আমি একা আমার মধ্যে বেঁচে থাকতুম। কিন্তু আমি যে সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে বেঁচে আছি। যদি আমার প্রাণটুকু আমারই হ'ত তবে বিষয়ে কোন্ আনন্দ আমার প্রাণে আসত? পানীর গলায় যে আনন্দ রোজ রোজ জেগে ওঠে, ফুলের যে আনন্দ সৌরভের মধ্যে ভরপুর হয়ে ওঠে, তাকে

একবার আমার জীবনে আনতে গেলে অনেক সাধনার প্রকার হ'ত। যা পরের আনন্দ তাকে কি সহজে আমার মধ্যে পাওয়া যেত?

আমরা জন্মের জিনিষ দেখে আনন্দ পাই। এ দেখা যদি কেবল চোখের দেখা হ'ত তা হলে সে শুধু দর্পণের ছায়া মত মিললে যেত, প্রাণে বাগ পড়ত না। কিন্তু সে শুধু দেখা নয়, সে পাওয়া। যখন জন্মকে দেখি তখন নিজেকে জন্ম করে ফিরে পাই—জন্মের পরীরের মধ্যে, জন্মের জীবনের মধ্যে, জন্মের পৃথিবীর মধ্যে। দেখার আনন্দ—সে কেবল বার-বার ঐশ্বর্যের মধ্যে নিজেকে বড় করে, সেহেন মধ্যে নিজেকে জন্ম করে' স্বপ্নের মধ্যে নিজেকে অক্ষয় করে' ফিরিয়ে পাওয়া। তা না হলে আনন্দ এত সহজ হ'ত না।

এইজন্ত কবি জোর করে' বলতে পারেন, যে আমরা মরব না। আমরা কি দেখছি না যে এই প্রাচীনতম কাল সেও নিজেকে অহরহ নবীন করে তুলছে প্রত্যেক প্রজন্মের মধ্যে? আমরা কি দেখছি না যে এই প্রাচীন পৃথিবী মুহূর্তে মুহূর্তে নতন হচ্ছে নবজন্মলব্ধের মধ্যে, ফুলের বিকাশের মধ্যে, পানীর কলকণ্ঠের মধ্যে। আমরা কি বুঝছি না যে আমাদের প্রাচীন জ্ঞান প্রাচীন প্রাণ প্রাচীন পরী প্রত্যেক মুহূর্তে জেগে উঠছে কচি সুখের হালকা হাদির মধ্যে, তরল চোখের সরল চাহনির মধ্যে, ভরল জ্ঞানের মূতন বিকাশের মধ্যে।

টানের হাদিটি যখন অসাব্যক্তির অন্ধকারে

লুকিয়ে পড়ে তখন আমরা তার অন্তর্ধান থেকেই তার আবির্ভাবের আশাল পাট—সে বাওর হুঁর আর আসার হুঁর এক করে' দিয়ে চলে যায়। প্রাচীনতা যখন সূচীক অঙ্ককারে লুকিয়ে পড়ে, তখন সেও বে একদিন শিশু চক্রে মত ক'টি ঠোঁটখানি আকাশের গায়ে ফেলিয়ে দেবে না, তা কে বলবে ?

সেইকল্প প্রাণের তর নেই, সে মনগুকে মানে না। সে মেঘের থেকে 'সৃষ্টি হবে' পৃথিবীর কোলে ঝপিয়ে পড়ে, সে ফুলের থেকে দৌরভ হবে দখিন ছাওরার বেরিয়ে পড়ে, সে আধার থেকে বেরিয়ে পড়ে' আলোর মত ছড়িয়ে যায়। সে চারায় না। সে বেন নিত্য বলছে,—

আমরা মরব না,
আমরা অঙ্ককারে বকের আঁচন
কড়ে'কাছে চরব না।
সেখটো না কি তারার তারায়,
আধার কেবল পথই চারায়,
আলোর বেখায় চলে যোয়া -
পথের হিসাব করব না।
সেখটো না কি ঝরা ফুলে,-
ঘুমেব বাঁতাল উঠছে চলে,
গভীর ঘুমে জাগছে তারায়,
আমরা কেন পারব না ?
হুরিরে গেলে চারিরে বাওরা,
জাগবে কেবল কিরিরে পাওরা,
হুরিরে গেলেও পথ যে বলে,
"পা ছেড়ে জোব সরব না।
ঐনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা

বৈশ্বিক সভ্যতা হইতে নৈতিক সভ্যতাকে পৃথক করা আবশ্যিক। নৈতিক সভ্যতার বিভাগে, আমরা বিশেষ করিয়া ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ও রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করিব। উক্ত প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে, আমাদের দেখিতে হইবে কোন্টো পুরাতন ভারত-সমাজের নিদর্শন এবং কোন্টোই বা ইঙ্গ-ভারতীয় নূতন সমাজের নিদর্শন।

ধর্ম

সকল দেশের জায় ভারতেও, যথাক্রমে ধর্মের দ্বারাই অতীতের প্রথা ও বিশ্বাসাদি

রক্ষিত হইয়া থাকে; কিন্তু অল্প 'প্রতি-ষ্টানাদি' অপেক্ষা, নূতন 'নীতিনীতি' ধর্মকে বিশেষরূপে আক্রমণ করে; * সূত্রান্তের ক্রম-বিকাশ ও বৈদেশিক প্রভাবের দ্বারা এই নূতন নীতি-নীতির সৃষ্টি হয়। তাই ভারতের সমস্ত ধর্মের মধ্যেই বিশৃঙ্খলা, রূপান্তরীকরণ ও যুগান্ত্রিক পরিণতি হয়।

∴ ∴

প্রথমে শাসন-বিভাগের কার্যপ্রণালী।
তৎপরে: ইংরাজ-শাসিত রাষ্ট্র, সকল-ধর্মের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াও কার্যতঃ

হুই একাধে উহাদের অল্পটানে বহুক্ষেপ করিতে বাধা হইয়াছে। এক পক্ষে, —নর-বলি, সতীসাহ, ঈশ্বর-লালসামূলক বীতংস পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি কতকগুলি নির্দুঃ-ও হ্রনীতিজনক অল্পটান রহিত করিতে চেষ্টা হইল; অন্যপক্ষে কোম্পানী, প্রাচীন রাজবংশাবলীর অসিকার ও অবশ্য-কর্তব্য কলসমূহের ভাব নিজ হস্তে লইয়া কোন কোন সম্মতিপ্রার্থীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের নাম নির্দেশ করিয়া দিরাছেন; বঠের, হিন্দুদেবালয়ের, মূলমামান মন্দিরের বনস্পতিসংক্রান্ত কাগানির্কীর্ষ ও মক্ষণভার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দেশের লোকের প্রতিবাদ সত্ত্বেও, ১৮৬৩ অব্দের আইন, গভর্ণমেন্টকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করে। যে কাজ গভর্ণমেন্ট করিতে ছিলেন, সেই কাজের ভার—নির্কীর্ষাচিত, মনোনীত, বা বংশক্রমাগত ট্রাষ্টিগের উপর অর্পিত হয়। তাছাড়া ঐ আইনের ফলে ভিক্ষু বা উপাসকেরা ট্রাষ্টিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয়। এই বিষয়ে ভারতীয় আইন, ইংল্যান্ড আইন হইতে খুবই কম ভঙ্গ। রষ্ট্র-ও ধর্মসমাজের মধ্যে এই পার্থক্যটুকু অধুনা ভারতে বহু কঠোরভাবে রক্ষিত হয় এমন আর কোথাও নহে।

১

এখানে হিন্দুধর্মের আলোচনার প্রবৃত্তি হওয়া থাক, কেননা সমস্ত লোকসংখ্যার মধ্যে হিন্দুধর্মাবলম্বীরা তিনভাগের দুই ভাগ।

আমাদের আলোচনার নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করিবার জন্য, আমরা এখানে

যে সকল মত ও অল্পটান হিন্দু জাহারট "প্রাথমিক দিব; তাহার পর আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিব, উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের উপর যুগোপ কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; এবং বর্ণভেদ ও গোষ্ঠী-সম্বন্ধীয় আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের আদিষ্ট সামাজিক কর্তব্য সকলের ব্যাখ্যা করিবারও সুবিধা হইবে। হিন্দুধর্মের সমস্ত সুত্ববিধাস, সমস্ত জীবনীশক্তি, সমস্ত শৌন্দর্য, হিন্দু সম্প্রদায়গুলির ইতিহাসের মধ্যেই পাওয়া যায়; অতএব এই ইতিহাস আমাদের অল্পসন্ধান করিতে হইবে। এই ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত সামাজিক অংশটুকু একটা সম্ভাষনীয়ধারিনী শক্তি। লোক-ধর্মের হিসাবে, দেখিতে গেলে, আমাদের মনে হয়, হিন্দুধর্ম শোচনীয় অবনতির অবস্থার আসিয়াছে। অবশ্য উহার মধ্যে ক্ষতিকতলি প্রাচীন মতবিশ্বস্তের স্থিতি ও ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা বাইতে পারে, কিন্তু উহা উপধর্ম ও কুসংস্কারপূর্ণ অল্পটানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। এই অবনতির প্রধান কারণ—অল্প জনসাধারণের প্রতি উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ-দিগের অত্যাচার। অল্পজাত ধর্ম, আচার্য ও ভক্তের মধ্যে একটা বাবাবাহী সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। বাহাতে ধর্ম মতগুলি কলুষিত না হয়, বাহাতে অল্প-টানগুলি পৌত্তলিকতার পরিণত না হয় তৎপ্রতি আচার্যদিগের দৃষ্টি থাকে; লোক-দিগের প্রভাভক্তি, অল্প উৎসাহ,—যকীর জীবনে ধর্মের বিধাসগুলি ও পূজা অল্পটানাদি

বলার মাথে। শুক্লবিরহিত পুরোহিতের।
পূজা-অনুষ্ঠানকে বাধা নিরনে * পরিণত
করে, ধর্মবতগুলিকে পাণ্ডিত্যমূলক কতক-
গুলি সূত্রে পরিণত করে। কিন্তু নিম্নবর্ণের
ব্রাহ্মণেরা, অর্থ-শোষণের অভিপ্রায়ে উত্তর-
সাধারণের দৃষ্ণ পৌত্তলিকতাকে উৎসাহ
দেয়; আবার কৃতবিত্ত ব্রাহ্মণেরা ইত্তর-
সাধারণকেও অবজ্ঞা করে, নিম্নবর্ণের ব্রাহ্মণ-
দিগকেও অবজ্ঞা করে। তাই, উহার।
কেবল স্বস্বত্বের বিচার করিতেই ভালবাসে।
উহার লিখিত শাস্ত্রীয় গ্রন্থের ভাষা, উহার।
কেবল অক্ষর ধরিয়াই তুর্ক-বিতর্ক করে,
আমল মর্গভাষাটি উহার। ধরিতে পারে না।
বাহার। যুরোপীয় সভ্যতাকে বরণ করিয়া
গইয়াছে, তাহার। ধর্মালোচনা হইতে
পরায়ুর্ধ; রাজকর্মচারী, *ঋণক, উদার-
ব্যবসায়বণবী, সমস্ত ব্রাহ্মণের দক্ষিত
লোক—ইহার। গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত-শিক্ষার
যে স্থিতি করিয়া দিয়াছেন, তাহা চাইতে
ফল লাভ করিতে পারে নাই।
পূর্বে উহার। এই বলিয়া অভিযোগ করিত
যে, ব্রাহ্মণের। সংস্কৃত ভাষাকে একচেটিয়া
করিয়া রাখিয়াছে; অধুনা ইংরাজি শিক্ষা
উহার।দের বেশী প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে
হয়। প্রতি বৎসরেই সংস্কৃত কলেজের
ছাত্রসংখ্যা * কমিয়া যাইতেছে।

একজন যুদেশী গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—
যুরোপীয় ও মার্কিনের।, আমাদের ধর্মের
আলোচনার একটা উৎকর্ষ প্রকাশ করে, আর
আমরা কিনা উহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন
করি,—যেন আমাদের সঙ্গে উহার কোন
সম্পর্কই নাই। স্বধর্মের উন্নত ভাবসমূহের

প্রতি এই যে উদাসীনতা, ইহাই হিন্দুভাতির
অধঃপাতের মূখ্য কারণ মনেহ নাই। 'বহি
অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও সুশিক্ষিত বৈদে-
শিকের। বিচার করিয়া বলেন যে, হিন্দু-
ধর্মের এই সমস্ত মতগুলি প্রকৃত * যোগ্য,
গ্রন্থের যোগ্য, তাহা হইলে * যুগ হিন্দুদিগের
কি চোখ * পূর্ণিবে না, তাহার। কি সংস্কৃত
শিখিবে' না?—কেননা, যে মত-ভাণ্ডার
হিন্দুধর্মরূপ মহারত্ব বহু আছে, সংস্কৃতরূপ
চাষি ভিন্ন সে বহু-ভাণ্ডারের ব্যয় কখনই
উদ্ঘাটিত হইবে না।

ভাষা ও মঠবাসী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের
মধ্যেও এইরূপ। ১৮৯১ অব্দের আদম-
সুমারিতে সন্ন্যাসীর সংখ্যা ৫২৫০০০০-ধরা
হইয়াছে; * যোগীদের মধ্যে কতকগুলি লোক
একটা মহৎ লক্ষ্য অহমরণ করিয়া চলে,
কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, যে-সকল তপশ্চর্যা
শরীরকে হুঞ্জল করিয়া কেলে, মনকে
পশুত্ব পরিণত করে, তাহাতেই তাহাদের
সমস্ত শক্তিরূপ হয়। তাহাদের মধ্যে
অধিকাংশই * হয় ভক্ত, নয় অলস; * তাহার।
শুক্লবর্ণের অর্থে জীবিকা নির্বাহ * করে।
মঠধারী সন্ন্যাসীদিগের * মধ্যে কেহবা
ধার্মিক ও কৃতবিত্ত, কেহবা অলস * ও
কুসংস্কারাগ্রস্ত; কেবল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের
কতকগুলি সন্ন্যাসী, দানধর্মের উপদেশ
পালন করিয়া থাকে। সমস্তভাবে ধরিলে,
হিন্দুধর্ম ভরের ধর্ম, প্রেবের ধর্ম নহে।

জনসাধারণের মনেকগুলি প্রথা ও
বিশ্বাস কবিত্বময় ও জঘন্যপন্থী; উহার মধ্যে
দেখিতে পাওয়া যায় ভগবৎ-ভক্তি, এই
একমাত্র চিত্তশুদ্ধিকর যে ভগবৎ-প্রসাদ সৈত

ভগবৎ-প্রসাদে বিশ্বাস; সাধারণ লোকের
ধর্ম কোন সভ্য দেশের ধর্ম অপেক্ষা কম হুল
নহে। গাছ-পাখর-পুলক, সহিত হিন্দুধর্ম,
সকল প্রকার কুসংস্কারকে, অবনতিগ্রস্ত
সমাজের লম্বা কয় বিকৃত অজুঠানকে
সংযোজিত করিয়া দিয়াছে।

তথ্য: তাঁহাই হিন্দুধর্মের মতবিশ্বাস
বাঃ সামান্যে মতভারত এবং পুরাণ ও
ভদ্রাবি শিক্ষা বৈদ্য; কিন্তু সর্বত্রই উহা
স্থানীয় কাল্পনিক কথার সহিত মিশিয়া
গিয়াছে। প্রত্যেক গ্রামের, নগরের, প্রত্যেক
অঞ্চলের, প্রত্যেক বর্ণের নিজস্ব পুণক
দেবতা আছে। এবং সে-সব দেবতা কিরণ
দেবতা। পুরীতে অগস্ত্য-মন্দিরের দেবতা-
গুলি কাঠনির্মিত অতীত হুল-ধরণের
কলাকার পুতলিকা।

হিন্দুধর্মের ধর্মসংক্রান্ত অথবা বৃত্তিতে
হইলে, অরণ করা আবশ্যিক—কুৎসিত প্রমোদ-
উৎসবের পূজা-পদ্ধতির এখনো কত সুপ্র-
গুণ, ভক্তবৃন্দ, এখনো দেবালয় সকল কত
অঙ্গীল চিত্রে সন্নিবিষ্ট। এখনো বাদ্য-বিস্তার
পুণ সন্মান; মহাপ্রতিষ্ঠে লোকের খুব
বিশ্বাস। প্রাক্তনগুণা যে-সকল প্রারম্ভিকের
বিধান করিয়াছে তাহা মলদ্রুত ও মুঢ়।
পালীরা গোমুত্র পান করে, সকল হিন্দুরাই
গোবরের ছাই গায়ে মাখে। (১) কোন
রাজা বা ধনশালী লোক যদি কোন
ভক্তের অপরাধ করে তবে তাহাকে গোনো
বা ঝুপা গলাইয়া একটা গরুর মুষ্টি গড়াইতে
হয়। সেই মুষ্টির মধ্যে তাহাকে বদ্ধ করা

হয় এবং এমন-করিয়া তাহার মধ্য হইতে
বাহির হইতে হয় যে লোকে বলিতে
পারে তাহার পুনর্জন্ম হইল। ১২ বৎসর
যাবৎ একটি প্রভাবশালী সভ্য প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছে,—যাহার কাম গোমাংস-আহার
নিষেধ করা। এই লক্ষ্যে মুসলমানদিগের
প্রতি অত্যাচার করায়, মধ্যে মধ্যে ভক্তের
গোলযোগ উপস্থিত হয়। আইনের কঠোরতা
সত্ত্বেও, নর-বলি অজ্ঞাত নহে। ১৯০১
অব্দে, মাদ্রাজ প্রদেশের এক ব্যক্তি
শিবলিঙ্গের সম্মুখে নিজ পুত্রের শিরশ্ছেদন
করেন। তখনই গেরেক্তার চতুর্দশ, সে
বলিল,—শিব তাহার নিকট যথেষ্ট দেখা
দিয়াছিলেন, তাহার পুত্রের মৃত্যু-বিনিময়ে
তাহাকে অস্ত্র, ধন-ঐর্ধ্যা দিবেন বলিয়া
অঙ্গীকার করেন এবং বলিয়াছিলেন ঐ মৃত
পুত্র এক শিশুর-রূপে বসাইয়া দিবেন।
লোকটার বিশ্বাস, পুলিশ ইহাতে অসময়ে
হস্তক্ষেপ না করিলে, দেবতা তাহার
অঙ্গীকার পালন করিতেন। বেনারসই
ভারতের ধর্মপ্রাচ্যের রাজধানী। যে সময়ে
ঐর্ধ্যবিত্তের সমাগম হয় সেট শ্রীতকালে
বেনারসে গমন করিতে হয়।

মেঘশূন্য ঘোর নীল আকাশ। অসন্ত
শ্রিগণ-বর্ষা। বাতাস লঘু। অধুনা
ভূমি হইতে যে ধূলি-মালা সমুৎপন্ন হয় তাহা
স্বর্ধাকরণে কমকরজিত হইয়া উঠে। বিশাল
গগন, জলের রং হলে, তাটা পড়িয়াছে,
বালুতট দেখা যাচ্ছে, তথায় শব্দ-দেহ-
গুলি শিকারী পাখীতে সমাজের। কেবল

শূভ-স্পর্শ জীবদ্বিগকেই গঙ্গার নিকেশ-করা হয় :—যশা, উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ, বোম্বী, গর ও ব্রাহ্মণ। কখন কখন ব্রাহ্মণেরা এই নদীতেই মরবার জন্য শূভ সন্ধ্যা কোণ অতিক্রম করিয়া এখানে ভীষণবারা করে।

দাঁকন শুটুভূমি—চন্দ্রে বায়ুর কাছাড়; তাহার তলদেশে নয় বালকেরা গরুকে জল পান করতেতে আইসে। কালো শূড়ার অকলে শিশুসন্তানকে বাঁধিয়া রমণীরা ছিন্ন-ভাবে সোজা হটয়া, ঘোরে ঘোরে নদীর অভিমুখে গমন করে। মাঝার উপর সৌর-করোজ্ঞান ভান্নখটসমূহ শিখানিডের মত উন্মিত চটগাছে।

উত্তর দিকে সহর; প্রকাণ্ড নিম্নভিত্তি-ভূমি সমূহ;—ভূমির মাথা ধলে ঢাকা—কতকটা দুর্গপ্রাকারের মত দেখা যায়। প্রাণীসেব বধো, কেল্লার দৃঢ়ত্ব ধানের ছাত্র ঘাট-সমূহ; ঘাটের সোপানাবলী গঙ্গার নিমজ্জিত।

কোথাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভিত্তি-ইয়ারং, তাহার ধারে ধারে বৃক্ষ-স্তম্ভ, অসংখ্য গণক-সমুদিত প্রাণাল, অলিন্দ, বাগের উপর হটেতে চতুর্ক সকল সমুখিত। কোথাও তৃণশূন্য কাছাড়-ভূমি, তাহার উপর চিতা সজ্জিত;—এইখানে শব্দহর স্বপ্ন। উপরে আভরণভেদের মন্দির, তাহার গোলাকার গম্বুজ, তাহার মিনার-স্তম্ভগুলি বিস্তৃত-মুখ। নদীর আরো উজান দিকে যেখানে তটের গায়ে একটা 'কোল' গড়িয়া উঠিয়াছে সেইখানে, এবং যেখানে তরু-মুকুট-শোভিত ছোট ছোট পাহাড় মাথা তুলিয়া আছে, সেইখানে বেসার্বেসিভাবে কতকগুলি দেবালয়

অবস্থিত। পুরাতন হিন্দু গঠন-রীতি, ক্ষুদ্রাকৃতি। 'আসোরি' ধর্মের ভিত্তিভূমির উপর, পুরাতন পারসীক রীতি-অনুযায়ী গঠিত বাগ-প্রকোষ্ঠের উপর (খামুগা অসমান ঢাকের মত ও পামের, মাথাগুলি 'বারি-প্রসারিত') ধূত্নো-টুপি অলকারের ছোট ছোট পৃথকের গম্বুজ—তাহার গায়ের উপর বেসার্বেসি আরও ১০১২টা ছোট ছোট গম্বুজ; ঠিক যেন ছোটনোমুখ শতদল।

এই অসংখ্য গম্বুজগুলি (কোন কোন স্থানে ফাট-ধরা) ভূমির দিকে ফুঁকিয়া আছে;—তাহার চাপে মাটি যেন পদ-দলিত। এই সকল দেবালয়ের পশ্চাদ্-ভাগ আরো অস্ত্রাজ দেবালয় যেখানে বানর, ময়ূর, গরু পুজিত হইয়া থাকে, এবং সহর, বাহার রাস্তাগুলি অতি সংকীর্ণ। এই সকল রাস্তায় শিবের বড়িগুলি যৌত্রস্তম্ভ অনতাকে তু-পাতিত করিয়া বিচরণ করে।

সমস্ত কাছাড়-ভূমি ও ঘাটের খাঁড়ি বড় বড় চ্যাপটা ছাত্তী ন্যূ আতপত্ত বসায়র পোতা, রহিয়াছো এই সকল ছাত্তার তলে, সকল রকমের দোকানদার। উহার কাপড়, পান, আহার্যসামগ্রী, ছাই-ভরা ধলে, তুলের মালা, ও পুংল বিক্রয় করিতেছে। আর ঐ দেখ কতকগুলি ভীষণাচারী ঘাটের প্রকোষ্ঠে সমবেত হইয়াছে; বৃহৎ সোপান দিয়া নীচে নানিত্তেছে; শোকদের মাথা টুপি কিংবা লাল পাগড়ী, পরনে সাদা ধুতি; জীলোকদের সাদা, কিংবা লাল শাড়ী; উচ্চবর্ণের রমণীরা অবগুণ্টিতা; শিশুরা নয়। কপালে শিবের

ঐশুল-সেবা কিংবা বিফুর সেবা-চিহ্ন
অঙ্কিত। গঙ্গার উপর কতকটা 'হানি
ব্রাহ্মণদের ক্ষত্র সংরক্ষিত'। কিন্তু, পরাবর
ভট্টকুমির ধারে-ধারে 'এত লোকের ভিড়
বে, 'জল উহাদেব দৃষ্টিগোচর হয় না।
ভীষণজীরা 'সদীতে ডুব দেয়, উহার
কর্দমান্ত খোলা জল শুবিয়া শুবিয়া সৌখ্য-টানে-
পান করে। 'এই জলের উপর মাহুঘ-
ও পশুবিগের শব ভাসিয়া বেড়ায়;
ভট্টকুমির উপরিস্থিত নদ্য চিতার ভাসমানি'
এই জলে নিক্ষিপ্ত হয়।

তথাপি অল্পস্থ স্বর্গের কিরণ গঙ্গার
উপর, প্রাচীরের উপর প্রতিবিম্বিত হইয়া
যেন সমস্তকে অগ্নিময় করিয়া তুলিয়াছে;
অট্টালিকার পাচনদ্বা মুখ-ভাগগুলি, আতপত্র,
পাণ্ডুলী, বিচিত্ররঙ্গের পরিচ্ছদ, পতাকা, মণ্ডপে
মাটা, ধূসরবর্ণ বা রক্তবর্ণ সূত্রাঙ্ক-শিখর
গম্বুজগুলি একীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

এই প্রার্থন চিত্রে অক্ষর দেখিতে
পাই—বহিঃপ্রভাব-নিরপেক্ষ লোক প্রচলিত
ধর্মের অবনতিশীল ক্রমবিকাশ; ইহার
ক্রতিবাণী আর এক ক্রমবিকাশ আশ্রয়

দেখিতে পাট—সেটি ধর্মসম্প্রদায়-সমূহের
উন্নতিশীল ক্রমবিকাশ; এট ক্রমবিকাশের
উপর মুসলমানধর্মের, খৃষ্টধর্মের ও যুগোপী
ধর্মের প্রভাব পরিচলিত হয়।

অবনতিপ্রাপ্ত ধর্মধর্মের মধ্য হইতে
কোন ধর্মসম্প্রদায়ের আবির্ভাব আর
শেষা যায় না; কিন্তু বৈক্য-ধর্ম বরাবরই
বীথ, মূলমাত্রা ও জীবনীশক্তির পরিচয়
দিলে আশির্বাদে (১)।

ইহার রূপায়িতকরণে ক্রমোন্নতির দুইটি
সমাত্তাল ধারা দেখিতে পাওয়া যায় !
ঐথমতি—বাগাতে মুসলমানধর্ম অপেক্ষা
খৃষ্টধর্মের অগ্রকরণ কম এবং বাহ্যিক স্থল
সেবাগুলি খাটি হিন্দুই রহিয়া গিয়াছে। একটা
নাম বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিবার যোগ্য।
উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভভাগে 'স্বামী
নারায়ণের আর্তি' (১৮০০-১৮২২);
আহমদাবাদে এগনও স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের
লোক, গণনার দুই লক্ষ হইবে। স্বামী নারায়ণ
বহু-দেববাদ স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহার মতে,
সকল দেবতাই এক রূপ হইতে আবির্ভূত
হইয়াছে। যোগসমূহের বদলে তিনি আচ-
রণগত ধর্মনীতির শিক্ষা দিয়া থাকেন;

(২) অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও উনবিংশ শতাব্দীতে মিল্ললিখিত বৈক্য সম্প্রদায়গুলি ছিল
যথা :—১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে চরণদাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'চরণদাসী' সম্প্রদায় (বাধাকৃষ্ণের পূজা-অর্চনা);—
আঁটলে চাঁদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'কর্তাদাসী' (১৯ শতাব্দী);—(এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাতাকে কৃষ্ণের অবতার
মনিয়া আরাধনা করত; ইহার মধ্যে সকল বর্ণের লোক, সকল ধর্মের লোক আসিতে পারে)।—রূপরাম
কবিরাম-প্রতিষ্ঠিত 'শ্যামবায়ক' সম্প্রদায়। 'বাউল'—'মহাভা'—'সম্বলী'—'সর্বিভাবক'—'হরিবোলা'; (এই
সাতটি সম্প্রদায় কেবল বঙ্গদেশেই দেখা যায়) :—১৮৫০ অব্দে, 'রঞ্জন-কাকির' এই মুসলমানী নামে এক
'বাসী' সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়—'শট দাসী'—'অপ্যগদী'—'মুনি-বিবাসী'—'বলরামী'—'সংনামী'—'সাহেব-
দাসী'—'বেবদাস'—(ইহা একেবারে স্বামী সম্প্রদায়)—'মুখাপদী'—'মুখ'।—(Hindu Civilization
—Bose)

কৃষ্ণ শুধু বিজ্ঞান জীবনের পূজা চাচ্ছেন ; এবং সমসুষ্ঠান ব্যতীত ধর্ম্মমিষ্টা নিশ্চল।
স্বামী নারায়ণ,—জীব-হিংসা, মত্তপান, এবং
আত্মহত্যা (যেহেতু উদ্দেশ্যে করিলেও)
নিষেধ করিয়াছেন। এবং কঠোররূপে
নিষিদ্ধ :—ব্যভিচার, চৌর্য্য, মিথ্যাসাক্ষ্য,
ঈশ্বরাবমাননা, মিথ্যাকথা বলা, বিশ্বাস-
ঘাতকতা। স্বামীনারায়ণের ধর্ম্মশাস্ত্র "শিষ্ণু-
পত্রী"তে এই শ্লোকগুলি আছে, যথা :—

"কৃষ্ণের নাম আবৃত্তি করিবার মন্ত-
আমার শিবোরা প্রতিদিন দেবালয়ে, গমন
করিবেন।

তাঁহার জীবনের ইতিহাস প্রকার সহিত
শ্রবণ করিতে হইবে, এবং উৎসবের দিনে
তাঁহার সম্মানার্থ স্তুতিগান করিতে হইবে।

কৃষ্ণের মন্দিরে স্ত্রী ও পুরুষ পূজকভাবে,
থাকিবেন, কখনই পরস্পরকে স্পর্শ করি-
বেন না।

এই পাঁচ দেবতাকে আরাধনা করিতে
হইবে, যথা :—বিষ্ণু, শিব, গণেশ, পার্বতী
ও সূর্য্য।

যে অন্তর্ধানী প্রত্যেক মহুঘোর আত্মাকে
পরিচালিত করেন তাঁহাকেই স্বপ্রকাশ
পরমপুরুষ বলিয়া জানিবে; তিনি প্রত্যেক
কর্ম্মের মন্ত দণ্ডপুরস্কার বিধান করেন।

ধান-ধারণার দ্বারা যখন বৃষ্টিতে
পারিবে যে আত্মা শরীর হইতে বহিষ্কৃত,
জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ, তখন প্রত্যেক
মহুঘাই কৃষ্ণকে পরমাত্মরূপে আরাধনা
করিবে।

আমার শিবাত্মার মধ্যে বাহ্যিক আমার
উপদেশ পালন করিবে, তাঁহার ধর্ম্ম অর্থ

কাম মোক্ষ এই চতুর্ভুজ
করিবে।

পরমহংস রাম-কৃষ্ণের "অন্তর্ধান (১৮৩০-
৮৬)। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবশালী শ্রেণ-
সংস্কারকদিগের মধ্যে রামকৃষ্ণ অন্যতম। "রাম-
কৃষ্ণ সরাসরী তাঁহার জীবনব্যাপি করিতেছেন।
যেহেতুনিজে আত্মসারা হইয়া, তিনি দেবতার
দর্শনলাভ করিতেছেন; কালী তাঁহার সমুখে
প্রাণিত হইতেছেন,—নিষ্ঠুর দেবতারূপে
"মহে, পরম দয়াময়ী ও মেহময়ী মাতৃরূপে।
পাতুবর্ণ, শীর্ণকার, কষ্টের সহিত চলিতে চলিতে,
তাঁহার বাগ্মিতার দ্বারা তিনি জনসাধারণকে
মুগ্ধ করিতেছেন।

তাঁহার রচনাবলী

উদ্ধৃত করিতেছি :—

যে গোমাপানী কাহিনী-কথার সুপরি-
চিত, সেই গোমাপানী আকাশের ঘূষ
উচ্চস্থানে বাস করিত, অহঙ্কারে পৃথিবীর
নাটিতে কখন তাঁহার পা পড়িত না।
যখন সে আকাশে স্থলিতেছিল, তাঁহার
ডিম্বগুলি ভারের আকর্ষণে স্তম্ভমণ্ডলের
দিকে আকৃষ্ট হইল; কিন্তু পতনের সময়
ডিম্বগুলি ফুটিয়া উঠিল; বাজাঙলা তখন
খাড়া হইয়া আকাশের দিকে, উঠিতে
লাগিল। এতদ্রূপ সিদ্ধপুরুষেরাও তাঁহাদের
শৈশব হইতেই এই সংসারের সমস্ত আসক্তি
পরিভোগ করিয়া প্রকৃত জ্ঞান ও দিব্যজ্যোতির
উজ্জ্বলবেশে সবেগে উৎসাহ করেন।

জনতাপূর্ণ একটা রাত্তা দিয়া ঘাইবার
সময় একজন সাধক কষ্টপ্রকৃতির এক,
ব্যক্তিকে দৈবক্রমে পদাঘাত করার সে
তাঁহাকে এত প্রহার করিল যে তিনি

মুক্ত হইয়া পড়িলেন, বহুভাষী তাঁহার
শিবাগণ তাঁহার চৈত্র সন্মানন করিল :
এবং তাঁহার তাঁচাকে এতজন জিজ্ঞাসা
করিল :—“গুরুদেব, যে আপনাব সেবা-
শ্রম করিয়াছে তাঁহাকে আপনি কি চিনিতে
পারিতেছেন ?” মুনি উত্তর করিলেন :—
“হী যে আমাকে প্রণাম করিয়াছে।”
একত সাক্ষ্যের নিকট, শত্রুদ্বিজে কোন
পার্থক্য নাই।

শিষ্যরা কেবল নিজেব ঘরেট পুতুল
নইয়া খেলা করে। কিন্তু তাঁচাদের মা,
তাঁচাদের পুতুলগণা দ্বারা নিবেদন করিয়া,
তাঁচাব নিকট দোঁড়িয়া আসেন। “মা, মা”।
এতজন ভোমরাও যখন ধনমান বশত পুতুল
লইয়া সংসারে নিমগ্ন থাক, তখন জগজ্জননী
এই সকল পুতুল-খেলায় বিরক্ত হইয়া
নিজে ভোমাদের নিকট দোঁড়িয়া আসেন।

ঐজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

মণি-প্রদীপ

এই বসন্তকালে একটি বেটুনা আমার . আমি তো চিরকালে একটা নীরস
বৃক্ষের মধ্যে অনবরত থাকতে থাকে। মাহু-কলনার, দোলায় দোল খাওয়া তো
পূর্ণবয়স্ক এই বসন্ত বারবার আসে, বার . কখনো আমার বড়াব নয়—এ ত সবাই
কিন্তু আমার জীবনে একটিবার মাত্র বসন্ত . জানে! তবে আমার এ কি হল! কেমন
এসেছিল। কোথায় গেল আমার সেই . করে আমার সমস্তটা এমন ওলট-পালট
কোণের নবীনতা, কোথায় গেল সেই . হয়ে গেল!—কিসে আমার এমন-স্তর নতুন
জীবনের শুভ্র গণ, কোথায় গেল . করে তুলে! আমি বা-নর শেষে তাই
এই বসন্তের মত হাওয়ায় মতো আমার . হয়ে গেলুম।

জীবনে সেই একটিবার মাত্র বসন্ত . বার কাব্য নিয়ে থাকে চিরদিন আমি
এসেছিল। সে তার কাঁজ-চুকিরে চলে . তাঁদের ঠাটা করে এসেছি। কলনার দারা
গেছে—তার শেষ-কথাটি আমার কানে . রাজপ্রসাদ নির্মাণ করে বাস করে
কানে শুজন করে বিদায় নিয়ে গেছে। . তাদের দিকে আমি চিরকাল কুণার চক্ষে
কিন্তু আমি কি তাকে বিদায় দিতে . চেয়ে এসেছি। গানের যে কৈনো মূল্য
‘গেয়েছি?’ জানি সে আর কিরবেনা, . আছে—এ আমার কোনো দিন বিদায়
আশা তার আর রাখিনে, তবু তো তাকে . ছিল না, —কানের তৃপ্তির চেয়ে উদরের
জ্বলতে পারচিনে। . তৃপ্তির ক্ষমত বিধমানব আর্দ্রনাগ করচে
এ তো প্রত্যক্ষ চোখে দেখছি। —তাকেই . আমি বড় করে দেখছি। সেই-আমার এ
কি হ’ল? আমার মনে হচ্ছে, আমার এই

বার কাব্য নিয়ে থাকে চিরদিন আমি
তাঁদের ঠাটা করে এসেছি। কলনার দারা
রাজপ্রসাদ নির্মাণ করে বাস করে
তাদের দিকে আমি চিরকাল কুণার চক্ষে
চেয়ে এসেছি। গানের যে কৈনো মূল্য
আছে—এ আমার কোনো দিন বিদায়
ছিল না, —কানের তৃপ্তির চেয়ে উদরের
তৃপ্তির ক্ষমত বিধমানব আর্দ্রনাগ করচে
এ তো প্রত্যক্ষ চোখে দেখছি। —তাকেই
আমি বড় করে দেখছি। সেই-আমার এ
কি হ’ল? আমার মনে হচ্ছে, আমার এই

প্রাণের কান্না গান গেয়ে না বলতে পেরে
আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কণালে কি
আছে জানি না—শেষ-বয়সে হরত কবিতা
লিখতেই বসে যাযো!

ছেলেবেলায় যখন কলেজে কবিতা
পড়েছি তখন জানতুম এই কবিতার অর্থ
মুগ্ধ করে পাশ করবার জন্যই কবিতা
সৃষ্টি। কেন যে এত লোক কবিতা
লিখেছে সে কথা তখন মনেই হতনা।
কোন কবিতাকে কোন সমালোচক প্রেষ্ঠ
বলেতে সেইটে স্মরণ রাখাই হচ্ছে দরকার
—আমার কাছে কি ভালো লাগে
তার পরীক্ষা তো কোনো দিন করিনি।
কিন্তু আজ সেই ছেলেবেলার মুগ্ধ কবিতার
করেকটা লাইন কেবলই মনের মধ্যে গুঞ্জন
করছে। মনে হচ্ছে, সে কোনো কবির লেখা
কবিতা নয়—আমারই মনের কান্না। আজ
যেন মনে হচ্ছে একটু-একটু বৃষ্টিতে গীতাচ
কবির। কেন মাথা-বামিয়ে এত লগ
লিখেছিল, এ লগ তাদের সৌখিনতা নয়,
এ তাদেরও প্রাণের কান্না!

কান্না! কান্না! এ কেমন ভর কান্না!
এ জীবনে অনেক কান্না তো কেঁদেছি।
ছেলেবেলার একবার পরীক্ষার উত্তার হতে না
পেরে কেঁদেছিলুম, মনে হয়েছিল তার চেয়ে বড়
কান্না বৃষ্টি পূর্ণিবারে নেই—তারপর সংসারের
অনেক বিপদে, বিচ্ছেদে জালাধরণীর
অনেক কান্না কেঁদেছি—কিন্তু এ কী কান্না!
এ কান্নার বে শেষ নেই। এ কান্নার
ভূমি যে কান্নাতেই। না কাঁদতে পারলে
জালাকে যে ভূমি দিতে পারিচি না।

এই তো আমার আনন্দ—এই কান্নাই

যে আমার আনন্দ! এক এক সময় ভাবি—
এ আমার পাগলামি নয়তো। যা আমি
অবলোকার সঙ্গে একদিন ফেলে দিয়েছি
তারই জন্তে কাঁদছি? যা একদিন আমার
কাঁচে তুচ্ছ ছিল তাই এখন মহামূল্য হয়ে
উঠল কি কবে? এই মহামূল্যের তো
দাম বিটনি, তাই কান্না দিয়ে বৃষ্টি এখন
সে স্বপ্ন দেখে করিচি?

সে যে আমার অত্যন্ত কাঁচে ছিল,
তাঁই তো কোনো দিন তাকে ভালো করে
দেখতে পাই নি। সে দোষ কি আমার? সে
যদি চঠাৎ একদিন সন্ধ্যাতে এই
দস্যের নব-মন্দিরকার মতো তার সমস্ত রূপ-
রস-গন্ধ-আনন্দ নিয়ে আমার চোখের
পাননে লালচে-বাগাসে ফুটে উঠত তাহলে
নিশ্চয় তার দিকে চেয়ে আমি অশ্রু হয়ে
যেতুম—চোখ আমার কিরত না। সেই
‘হঠাতের ধাক্কা’ সেই একটুখানির মধ্যে,
তার সবটুকু আমার জন্ম দেখতে পেত।
কিন্তু তা তো হয় নি—তাই যে আমি
রোজই পেঁথেছি—কোনো এক রিশেষ-মুহুর্তে
তো সে আমার চোখের সামনে আবির্ভূত
হয়নি। কবে কখন তাকে প্রথম দেখলুম
তা মনে পড়ে না—কোনো স্মরণচিহ্ন
তো তার অস্তিত্ব হয়ে যায় নি।

লতা! লতা—এই নামটি ছেলেবেলা
থেকে কতবার কানের আশেপাশে ভেসে-
ভেসে চলে গেছে—ওর কোনো স্বাক্ষর
কোনো দিন একমুহুর্তের জন্তেও কানে
বাঞ্চেনি। কিন্তু আজ দেখি এ কি?
ঐ এটি শব্দ যেন একটি সম্পূর্ণ গান!

ওব মধো ছন্দ আছে, সুর আছে, তান-
লর সব আছে, এই একটি কথাতেই
আমার জন্মের সব গান যেম গাওয়া
হবে, লর;—আমার সব কথা যেন বলা
হয়ে যায়! আমি যতটুকু ততটুকু যেন
এর সুর গভীর হয়ে আসে, ততটুকু যেন
নতুন-নতুন ছন্দে ওর স্বভাব উঠতে থাকে।

কিন্তু ছাট কেমন এ সব কথা
বলছি?—সব কথা তো ঠিক-মতো করে
বলবার ক্ষমতা আমার নেই—শলাও যে
যাক না! লোকের সহায়ত্ব আমি চাই?
কি হলে আমার তাতে? কেউ হস্ত
বলবে এ আমার প্রলাপ—তা বলুকগে!

আজ টেক্সে হচ্ছে লতার সব কথা
খুঁটির খুঁটির লিপি—দিনের পর দিন ঘরে
ঘরে তার সবটা—তাব চলা বলা, খেলা
খুঁটা, হাসি কান্না—মনের উপর ছবির মতো
জঁকে নিচ্ছে। কিন্তু কত কিছুই যে মনে
পড়তে না। কিছুই তো মনে করে রাখি
কি। তার দিকে মন দিলুম কবে যে সে
আমার মুখে থাকবে? দিনরাত তাকে
চোখে-চোখে দেখেছি—মনের কারবার
তো তার সঙ্গে কোনো দিন করি নি।
মন দিয়ে যে তাকে দেখা যেতে পারত এ
কথা মনে উঠবার অবসরই যে পাই নি।
ঠিক বলতে পারিনা—এখন মনে হচ্ছে,
চোখের আড়াল চলে হস্ত যাকে দিন
রাত দেখা অগ্ৰাস হয়ে গেছে তাকে মনে-
মনে না দেখলে মন খুঁৎখুঁৎ করতো।
কিন্তু সে যে কখনো চোখের আড়াল হোলো
না—আমি করব কি?

তার সবকিছু ততো একটি ঘটনা আমার
বেশ মনে আছে। একদিন সে আমার
হাতের লেখার খাতার একদোহা কালি
উপড়ে দিয়েছিল। তাকে আমি তাকে খুব
মেবেছিলুম। তার সেই কুঁপিয়ে কুঁপিয়ে
কান্না এখনও যেন মনে পড়ে পড়ে ঠাৎ এক-
বার বাতাসের মধ্যে বেজে উঠল। পরের
মেয়েকে মেয়েভি বলে মাগের কাছে
আমার প্রাণটি হল। মাগের হাতের মার
খেয়ে আমি যত কাঁদলুম সঙ্গে-সঙ্গে লতাও
তত কাঁদলো। আমার রাগ হল তরানক
লতার উপরে—কিন্তু প্রতিশোধ নেবার
আর সাহস হল না—কারণ শাবির তিন
তখনো আমার গা থেকে দিলোয়নি।
আমি রেগে গুলুবার ঘরে দরজা বন্ধ
করে বসে রইলুম—লতাকে কাছে আসতে
দিলুম না। তার পর, অনেকক্ষণ পরে
ফিখের কাড়নার যখন ঘরের দরজা খুললুম
তখন দেখি চৌকাঠটিতে মাথা রেখে লতা
যুঁহিয়ে পড়েছে—চোখের জলধর দাগ তখনো
তার গালের উপর আঁকা।

বাগার একটি দামী নতুন বাড়ি একদিন
নেড়ে-চেড়ে দেখতে-দেখতে আমার হাত
থেকে হঠাৎ পড়ে ভেঙে ছুঁবার হয়ে
গিয়েছিল। তবে স্তো আমার যুঁহু কাকিরে
গেল। পাশে দাঁড়িয়ে ছিল লতা; সে তো
কঁদেই কঁদে। ভাবনা হল আমার এই
লতাকে নিয়ে। আমি যে বাড়ি ভেঙেছি
এক গোনা প্রমাণ নেই—এক লতা ছাড়া।
এক-একবার মনে চক্কিল মোবটা লতার
বাড়িটা চাপিয়ে দিই; কিন্তু জেরায় টিকবে
কি না সম্বন্ধ হতে লাগল। এখনি কবে

পরের বাড়ি ঘোষ চাঞ্চিড়ে (ঘোষ হর
লতার বাড়িও দিয়েছি) দুই-একবার ভাষি,
ঠিকেলুম—শান্তির পরিমাণ তাতে দ্বিগুণ
হয়েছিল। সেই ক্ষেত্রে লতাকে বলুম—“তাই
লতা, লক্ষ্মীটি, কাউকে বলিস্ নি—বুঝলি?”
লতা সমস্ত-বাড়িখানা নেড়ে বসে—“না”!

মনে মনে অনেক দিন ভাব ছিল—বুঝি
লতা কথাটা ফাঁপ করে দেবে। আমার
মনে যে কী আতঙ্ক ছিল তা বলতে পারি
নে। কিন্তু সেই আতঙ্কের পরিণামের ভাব
থেকে লতা আমাকে বাঁচিয়ে যে কী নির্ভীক
করেছিল তা আমি কখনো ভুলতে পারিব
না! লতা কতকটা বাচাল ছিল বটে কিন্তু
একথা তার মূখ দিয়ে ইহলীলনে বার
হর নি।

আর-একটা কথা মনে পড়চে। কিন্তু
একখাটা কেন এখনও ভুলি নি তা ঠিক
বুঝতে পারি নি। এর মধ্যে কি এমন
ছিল যাতে এটা অরমীয়া হয়ে থাকতে
পারে?

লতা তখন ছেলেমানুষটি মর—বেশ
একটু বড় হয়েছে। আমি তখন এটাল
পরীক্ষা দেবার ক্ষেত্রে ব্যস্ত। পরীক্ষার দিন
বনিরে এসেছে। আমি এক বসন্তের বৈকালে
ছাদের এক-কোণে নিরাশার বসে “শুড়া
মুখ” করছি, লতা একছড়া নালা হাতে
করে এসে দাঁড়ালো। বলে “শিশি-দা,
তোমার ক্ষেত্রে এইটে গেঁথেছি—নেবে?
এই মালা গাঁথার একটু কারখা আছে।”
—বলে সে মালা-গাঁথার প্রকরণ সম্বন্ধে এক
বক্তৃতা শ্রবণ করে দিলে। আমি ধমক
দিয়ে উঠলুম—“চোপ!” আমার কমন

রাগ হচ্ছিল—এট নিষ্প্রজ্ঞাভের সকলকার
উপর সেট রাগ। আমার মনে হচ্ছিল,
পৃথিবীর আর-সবাই বেশ মনের কুস্তিতে
আছে কেবলমাত্র আমিই এগুলামিনের দায়ে
পড়েছি। ছাদের গুলগুলি দিয়ে দেখা
বাচ্ছল হুটো ছেলে মনের আনন্দে মার্কেল
খেলছে, রাত্তি দিয়ে একদল ছেলে চরা
করন্ত-করন্তে চলেছে—মাথার উপর এক
খাঁক পাখি মনের আনন্দে অবাধে উড়ে
চলেছে! আর আমি যেন কেবল একটা
গরাদে-দেওয়া খাঁচার ভিতর বসে তোতা
পাখীর মতো বইয়ের গুলি আউড়ে বাড়ি—
আমার খেলবার ঘো নেই, আমার কোথাও
ছুটে ঘাবার ঘো নেই। লতা যখন এসে
ছাঁয়ে দাঁড়ালো তখন সঙ্গে করে পাচার
বাইরেরকার একটু চাওয়া যেন নিয়ে এল।
তার সেট সমস্ত দেখানার উপর কুখাঁও
এতটুকু এগুলামিনের ভাবনা নেই। তার
সঙ্গেকার সেট একটুখানি হাওয়া, তার
সেই মনের কুস্তির আলো পেয়ে আশ্রয়
মনে হল বটে আমি যেন বাঁচলুম—কিন্তু
একটা হিংসে হুতে লাগলো। আমিও
তো এমনি থাকতে পারতুম—কিন্তু তা
চোণো না কেন? তাই রাগে আমি
ধমক দিয়ে উঠলুম—“চোপ!”

লতা আরও আরো মালাগাছটি আমার
কাছে বেগে চলে যেতে লাগল। আমি
চৌকর করে বলে উঠলুম—“লতা, নিরে”
বাও তোমার মালা।”

লতা ফিরে দাঁড়িয়ে বলে—“কেন
শিশি-দা, রাগ করচ তাই! নাও না
ওটা।”

আমি বলুম—“না, না, আমি নেব না।
কুণ্ডের গন্ধ নাচে লাগলে রাতে আমার
ঘুম হয় না।—এখন এগুনো আমিনেও গড়া।”

লতা কিছুর বসে না। শুধু একটু চাপলে।

আমার রাগ তাকে আরো বেড়ে
উঠল—আমি, মৃণালগাছটা নিয়ে কুটিকুটি
করে ছিঁড়ে ফেলে দিলাম।

মনে হ'ল, লতার মনে একটু বীণা
লেগেছে। তাকে আমি যেন একটু আনন্দ
পেলুম। কেবল আমিটুকু এ জগতে কষ্ট
পাব;—আর কেউ পাবে না?

লতা ছেঁড়া-ফুলগুলোর দিকে খানিক
ক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইল, তার পর সেগুলো
একটি একটি করে কুড়িয়ে আঁচল-ভরে
নিরে গেল।

তারপর বসন পরীক্ষার পাশ করলুম,
বাড়িতে আনন্দ-কোলাহল পড়ে গেল
তখন লতা বলল—“শরিশ-না, ইচ্ছে আছে
আজ একটা ফুলের মুকুট গড়ে তোমার
মাথায় পরিয়ে দি।”

কিছু সে তা দেয় নি।

লতার সঙ্গে আমাদের কি সখ্য সেটা
একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার।
তাদের সঙ্গে আমাদের একটা পুণ্য পূর-
আত্মীয়তা আছে বটে কিন্তু সেটা
ধর্মবোধ্য মতোই নয়। আসল সম্পর্ক
লতার মা আর আমার মা গুই সখী।
আমাদের ঠিক পাশের বাড়িতে লতার
থাকত—কিন্তু লতা সখ্যে ঠিক করে বলা
যায় না সে কোথায় থাকত; কারণ আমি
তো দেখেছি সে আমার মায়ের কোলে-

কোলেট বেড়ে উঠেছে। তখনতে পাট,
মাথের ঢোল নিয়ে ছেলেবেলায় আমাদের
দুজনই তারি যগড়া হত। আমি সখ্যে
কোলের দখল ছাড়তুম না। মা আমার
“তাঁই বলতেন, ছেলেটা বড় স্বার্থপর।
আমরা প্রায় সমবয়সী, গোধ হ'য় লতা
বছর-ছয়েরের ছোটো হবে। একসঙ্গে
আমরা বরাবরই খেলাধুলা করছি।
মায়ের আদর আমিও যেমন পেয়েছি লতাও
হেমনি পেয়েছে। বলা বাহুল্য, আমি
বাঁপ-মায়ের সব-ধন-নীলামণি।

দাঁড়িও আমার কাছে কখাটা গোপন
রাখবার চেষ্টা করা হত তবুও আমি
আনন্দ, মা সখীর সঙ্গে পরামর্শ করে
সেবেছেন লতা তার বো হবে। আমি
জানি, আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী কেউ
এলে মা লতাকে দেখিয়ে বলতেন—এইটি
আমার বো হবে। লতার মাথায় মেহের
সুন্দে হাত ঝুলোতে-ঝুলোতে বলতেন—দেখ
দিকিনু কেমন বো! কেমন টানটানা
চোপ, কেমন বাঁশীর মতো নাক—ইত্যাদি।
বলে তিনি লতার গালে চুমু খেতেন, তাকে
কোলে নিয়ে বসতেন।

আমি জানতুম, লতা আমার সখী হবে,
কিন্তু তেমনও কখাটা তেমন করে কখনো
তলিয়ে দেখিনি—বোধ হয় দেবব্যবসার ক্ষমতা
আমার ছিল না। তখন কিই বা আমার
বয়স? আর কিই বা আমার জ্ঞান? লতাকে
গোড়া থেকে যেমন বসে দেখে আসছি
বরাবর তেমনি করেই তাকে দেখতুম—
তার যে অল্প রূপ থাকতে পারে এ আমার
কল্পনার কখনো আসেনি। বোধ হয় কল্পনা

জিনিষটা আমার ধাত্তে ছিল না। এখন
ডেবে দেখছি লতাকে আমি মনে-মনে
হিংসা করতুম। মা যে বলতেন আমি
স্বার্থপর—কথাটা একেবারে মিছে নয়।
আমার বেশ মনে পড়তে ছেলেবেলায়
আমার গাণ-থেকে-চুপটুকু-খসবার ভো
ছিল না। আমি সব নেন—আমি সব
খাব—এই ছিল আমার ছেলেবেলাকার
বুনি! লতা যে মায়ের নেহ দখল করে
বসেছিল এর ভেত্রে লতাকে বোধ হয় আমি
ভালো চোখে দিয়ে কখনো দেখতে পারি
নি। কিন্তু এও আমার বলি, আমার
বেশ মনে পড়তে, লতার একবার শক্ত
অস্থ হতে সবাই যখন বলতে লাগলো
আহা লতা বুঝি বাঁচে না! এখন আমার
সত্যি কান্না গেরেছিল।

এক ধরনের মানুষ পৃথিবীতে আছে
যারা একেবারে নীরস—কাঠের মতো।
নীরস—কাটখোঁটা। আমি অনেকটা সেই
ধরনের মানুষ। কিন্তু আমার ভিতরে
কোথাও বোধ হয় একটি রসের ফাগধারা
গোপন হয়ে ছিল নইলে কেনন করে
কোথাকার একটা অজানা বাতাসের
শিহরণে একমুহুর্তে এমতর পূর্ণকৃষিত
হয়ে উঠলুম।

ছেলেবেলা থেকে এ জগৎ-সংসারটার
উপর আমার কি ধারণা ছিল? এ খড়
শক্ত ঠাই! কেবল প্রতিযোগিতা প্রতিবন্ধিতা
—মারামারি কাটাকাটি করে সার্বলোর
নিশান যে কেড়ে নিতে পারে তারই জর
—সেই সত্যকার বীর। এই যুদ্ধের জয়

আমি বরাবর তৈরি হয়েছি এবং আমাকে
তৈরি করা হয়েছে। এমই মন্ত্র আমার
পড়া-শুনার সঙ্গে সঙ্গে আমার কানে হুঁকে
দেওয়া হয়েছে—আমি ভক্তিতে সেই মন্ত্র
জন করেছি। এই সংসারের ধোঁয়ান
নিজনতার ভিতর দিচ্ছে প্রেম-স্বহ
ভালোবাসার যে পূজা মলাকিনী-স্রোত বহু
চলেছে তাতে অবগাহন করে মানুষ
জ্যোতির্গর্ভ হয়ে ওঠে—এ সত্য তো আমি
জানতুম না বলেই হয়। জানতুম, সে শুধু
কল্পনা—অলস কবির স্বপ্ন মাত্র। জানতুম,
সে মাহাবী—তাঁর ভরে তার দিকে কখনো
চাইতুম না। কিন্তু কি লাভ কবেছি?
বহু আত্মত্যাগ করে জীবনযুদ্ধে অগ্রসর
হয়েছিলাম এই জীবন-সাগর মহান করে
কি অর্থ উঠল? একশত টাকার
কেনাকাণিগিরি বইত নয়!

যাক ও সব কথা!

আমি যেমন এটোমস পাশ করলুম, মা
যে বসন্তের বিরে করতে হবে। তাঁর
অত্যন্ত তাড়াতীস তাঁর "তাড়ার কারণ" এই
যে, লতা পড় হয়ে উঠেছে।

আমি মাকে বলুম—“তা ইচ্ছে না।”

মা বললেন—“কেন রে?”

আমি তখন সেই-বরসেই বেশ গম্ভীর
হয়ে উঠেছি। আমি বলুম—“আমার এখন
জীবনযুদ্ধে প্রান্ত হতে হচ্ছে—আমার এখন
স্বচ্ছন্দ অবাধ গতি চাই—এ সময় আমার
পিঠে শুকতার চাপিয়ে যদি আমার পলু
করে দাও তাহলে চিরজীবন অকর্ণ্য
হয়ে কেবল পৃথিবীর তার বৃদ্ধি করতে
থাকব—ইত্যাদি।”

কথাগুলি ঠিক আমাব রচনা নয়।
তখন পড়া-লেখ করা করে এমন
অসাধারণ শক্তি ধরে গিয়েছিল যে যা
শুনতুম তাই মুখস্থ হয়ে যেত। কথাগুলি
আমাদের এক প্রসিদ্ধ দেশনাটকের
বক্তৃতার মুখে শুনেছিলাম এবং সেই বক্তৃতার
অভিত্যক্ত হয়ে আমরা বিস্তর ভাব—
উপার্জনকর না? হয়ে বিবাহ করব না—এই
প্রতিজ্ঞা দিয়ে থাকার কবেছিলাম। বাঙালীর
একটা নিদা শুনতুম, বাঙালী প্রতিজ্ঞা
রক্ষা করে না। সেই ক্ষেত্রে আমার
আকাঙ্ক্ষা ছিল বাঙালীর এট কলঙ্ক মোচন
আমি করব। সেই ক্ষেত্রে মাঝের প্রভাবে
জোবের সঙ্গে বলতে হল—“না!”

মা সব কথা বুঝলেন কি না জানি
না; তবে তিনি এইটুকু বেশ বুঝলেন যে
আমি বিয়ে করতে চাই না।

মা ওর-থেকে গেলেন; বুঝিলাম,
তার পূর্ব ইচ্ছে কিন্তু বেশী পীড়াপীড়ি
করতে তার সাহস হচ্ছে না। আমার
ন-মামাকে তার ইচ্ছা বিবাহে বিয়ে দিইয়ে
তারি একটা পেচেনীর কাণ্ড ঘটেছে।
মায়ের সেই ভয় আছে। নরপাং
মাতুলজন্মঃ।

মায়ের অনেক দিনের আশায় জলাঞ্জলি
দিতে হচ্ছে, তিনি আশা ছেড়েও ছাড়িতে
পারছেন না। একদিন তিনি এসে বলেন
—“শ্রিংশ, কুই কি সত্যি বিয়ে করবি না?”

আমি বলুম—“কে বলে করব না।
তবে এখন নয়। আগে টাকা রোজগার
করি, তবে।”

মা বলেন—“আমি আশীর্বাদ করছি

কুই অনেক টাকা রোজগার করবি।

বলিস তেঁা বিয়ে ঠিক করি।”

আমি বলুম—“মা, তুমি ঠিক বুঝ না!”

বলেই আমার সেই জীবন-মুহুর মুগ্ধ
বুলিটা আউড়ে গেলুম।

মা কথাটা বুঝলেন মা বলেই তার
সন্দেহ আরো বশীভূত হয়ে উঠল।

সেই সময় দেখতুম, মা লতাকে কাছে-
কাছে রেখে কেবলই তার মুখে মাখার
হাতু দিচ্ছেন। এক এক সময় তার
চোখে জল এসে পড়ত।

মা লতার মা-বাপকে আশ্বাস দিতেন
—আরো কিছু দিন রাখো—লতাকে আমি
বো করবই। কিন্তু লতার মা-বাপ
সাহস হল না। বেয়ে বড় হয়েছে বলে
উত্তিমধ্যেই বিয়ে উঠেছে। শেষে আরো
বড় করলে হয়ত বিয়েই হবে না।

লতার বিয়ে হয়ে গেল।
শশিমে চাকরী করে এমন-একটি
ছেলের সঙ্গে লতার বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পরই লতা যে-দিন শ্বশুরঘর
করতে গেল আমি সে দিন বার্ষিক
পতীক্ষার পড়ায় ব্যস্ত। লতা তার স্বামীর
সঙ্গে আমার শ্রুড়ার ঘরে থোমটা-মুখে
আত্তে আত্তে এসে গুড়াল। তার পর
একটি প্রণাম কবে চলে গেল। আমি
বইয়ের উপর আবার দৃষ্টি ফেরালুম।

তার সেই বিদায়-বেলাকার মুখখানি
আমার দেখা হয়নি।

এখন ভাবছি সেই কুছ প্রতিজ্ঞা-পত্র
খানার কথা। যে একটুকরা কাগজ

কুটিকুটি করে এক-ফুঁই উড়িয়ে দেওয়া যায়—সেই কাগজের টুকরা জগদলপাণের মতো আমার বুকে চলে যোগে রইল! আর, ভাবচি বাঙালীর কলঙ্ক-মোচন! কলঙ্ক-মোচন তো করেছি—কিন্তু কলঙ্ক মনের এককোণেও কি সে কথা লেখা আছে? মহা আন্দোলন, মহা সন্দেহ-বন্দন করে তো মৌনবুদ্ধি অগ্রসর হয়েছিল কিন্তু কী কর করে কিবেছি?—এই একশত টাকার রাজস্ব? আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপসার কাগজের মুকুট?

আর বেশি-কিছু বলতে ইচ্ছা করছে না। এতক্ষণ যা বলছিলুম তার সামনে লজা ছিল, সে এতক্ষণ আমার আশ-পানের আকাশ-বাতাস পূর্ণ করে আমাদের জড়িয়ে ছিল—আমি তারই উৎসাহে বলে যাচ্ছিলুম। কিন্তু যেমনি তার বিদায়-গান গেরেছি, অমনি মনে হচ্ছে আমার সমস্ত ঘন শূন্য হয়ে গেছে। সে বিদায় নিয়েছে! আমার মন ঘন নিভে আসছে। কিছু বলতে পারছি না।

কিন্তু বলতেই তো হবে। বলব আর কি? এক-কথার সবটা বলা হয়ে যায়। লজা চলে যাবার পর থেকে খুব-কলে পড়া বৃথক করেছি আর গালি করছি। বইয়ের পাতা থেকে কখনো বৃথক তুলে চাইনি। এত বড় বিশ্ব-সংসারটাকে বইয়ের পাতার আড়াল দিয়ে ঢেকে রেখেছিলুম। বাপ, এই তো করেছি! তার পর পরগার খাজার বুয়েতি। অনেক আশা করেছিলুম; ভেবেছিলুম, না জানি কত বড় দিগ্গজ আমি। কিন্তু সংসারে

বেরিয়ে দেখলুম, যা দেখে দেখে বুঝলুম—কতটুকু আমি! কোথায় যা আশার আশা! কবি ঠিকই বলেছেন:—

“বিজ্ঞা বুদ্ধি কিছুই কিছু না,

কেবল জন্মে ঘোঁড়ালী!”

একশত টাকার রাজস্ব এখন এল তখন রাগিই বা কেন না আসবে? বলা বাহুল্য, এই রাজস্ব-লাভের সঙ্গে রাজকুটারিও ঘনিষ্ঠ সূত্রে। কিন্তু সে-সব কথা তুলে নিজের অপূরণের সঙ্গে জগড়া করে লাভ কি?

বিরে হল আমার মাঝ মাসের মাঝা-মাঝি। এর মধ্যে বলবার কথা কিছুই নেই। সংসার-বন্ধের একটা অবলম্বকর্তব্য এই বিবাহ—আমি এখন সংসারী কৌশল-সম্রাট বৈবাহিক নট, তখন বিরে তো আমার কর্তেই হবে—এবং করলুমও তাই। তাই বলে এটাকে যে একেবারে অমহেলা করে বসে রইলুম তা নয়। সব জিনিষকেই আমার সোজা-সুজি দেখা অভ্যাস—এই বিবাহের মধ্যে যেটা সব-চেয়ে সোজা কথা অর্থাৎ “সুখে-স্বচ্ছন্দে কি করে সংসার-যাত্রা নিরীহ করা যায়, তার উপায়ই বা কি এবং কোথায় বা তার গুণদ খাকতে পারে, মনে মনে তাই নিয়ে খুব আলোচনা করতে লাগলুম—তাঁতেই একরকম মেকে গেলুম। এর বাড়ি অজ্ঞ কোনো কথা মনে ঠাঁটই পেল না।

• • •

লজা আমার বিরতে আসতে পারেনি তাই নিয়ে মা ভাবি চুপে করছিলেন। বলছিলেন, লজাকে কদিন দেখিনি। • •

যাঘের একটা পোষা পাখী ছিল। বসে জলযোগের ব্যস্ততা করছি, লতা আমার ভিনি যেমন করে লতা লতা বলে ডাকতেন তাঁর হাত ধরে টানতে টানতে এসে উপস্থিত পাখীটা ঠিক তার অহুসরণ করতে হল। এক-খটকা বাতাস, একরাশ ফুলের শিখেছিল। অনেক দিন তার ডাক গন্ধ নিয়ে এসে বসে—“কি শিরিশ-না, তুমিনি।, আর হঠাৎ তনলুম সে লতা। ‘চিন্তে পার?’ লতা! করে চৌক্য করছে। • •

বাগবিকই আমি তাকে চিন্তে পারলুম না।

‘লেখাপড়ার পালা তো চুকে’ গেছে। ‘এই লতা।

পড়ার টেনিশের স্তির কতদিনকার চোতা তাঁর দিকে চেয়ে মনে হল, এই যেন কাগজ জমে রয়েছে। অনেক দিন থেকে তাঁকে প্রথম দেখলুম। এট প্রথম জাখি লাফ করে ফেলব। আর হাতে পরিচয়।

কাজ নেই—ছেঁড়া কাগজ ঘাঁটতে ঘাঁটতে লতা আনাকে অবাক দেখে বসে—
‘সে কি দাদা! বো পেরে তুলে গেলে হুঁকি?’

‘আমি কি বস দেখলুম? আমি কী

কতদিন আগে একটা টুকটেকে লাল দেখলুম? এ কি কোন্ মাগাবী আমার রঙে ছাত ভুঁবিষে লতা পথের ঘরের চোখে আমার অজ্ঞান লাগিয়ে দিবে গেল? এট লতা।

বাড়ির স্তির আসতে আর হঠাৎ দেখি এ যে সমস্ত বসের সৌন্দর্য্য জড়ো করে রূপ ধরে পাড়িয়েছে। এমন রূপ তো কখনো দেখিনি।

এ কি লতা? এ কি মাহুদ?

লতা কি বলছিল আমি তখনে পাই

নি, হঠাৎ তার হাসি তনলুম—মনে হল সেই হানিতে সমস্ত বিশ্ব যেন হেসে উঠেছে!

‘লতা বসে—‘দাদা, আর সমস্ত দিন

ঘরে তোমাদেব জেজ এই মালা গাঁপেছি— তোমাদের ফুলবার আমার ফুল দেওয়া হইনি। • এই নাও সেই ফুল।—বলে প্রথমে আমার তাঁর গলায় সে একছড়া মালা পরিবে দিলে, তার পর আমার

• যাঘের মাতামাতি আমার বিয়ে হল। কান্তনের প্রথমেই দেখি লতা এসে হাজির। সে বসে, ‘তারি হুংখ, শিরিশ-দার বিয়েতে আসতে পারলুম না, এমন ঝড়াটে পড়লুম! • •

‘কৈ দেখি শিরিশদার বো?’
এ কথা আমার সামনে হইনি—আমি তখন অগ্নিসে ছিলুম। যাঘের মুখে তনলুম।

আপিল থেকে কিসে বিকেলে ছাদে

গলায় পরিবেশ দিতে এসে বলে—“দাদা, একটু পরেই আমার ফিরে এসে গল্প
আজ যদি ফুলের গন্ধে রাতে “তোমার” ছুড়ে দিলে। আমি এখন কেমন রকম করে
বুঝ না হয় তাহলে আজ আর আমার গেলুম। * * *

উপর তোমার রাগ হবে না; পুসীট চলে
জানি।”—বলে সে আমার গলায় মালাটি
পরিবেশ দিতে হাসতে লাগল।

জানিলা হঠাৎ আমার কি হল!
আমার গলায় মালা নিয়ে লতাক
পরিবেশ দিতে গেলুম।

লতা নিয়ে গাড়াল; বলে—“ছি দাদা,
তোমার গলায় মালা কি আমার পুরতে
আছে?”

আমি অবাধ হয়ে তার চোখের দিকে
চোরে রইলুম, লতাও আমার চোখের দিকে
চোরে রইল। তার পর হঠাৎ চোখ
নামিয়ে সে একবার চট করে চলে গেল।

আমার আননে এই একটি মুহূর্তের
বসন্ত! কিন্তু ভাবি এট—এটা—মুহূর্তই

বা কার জীবনে কবার আসে? আমার
সমস্ত জীবনখানার উপরে এট যে একটি
মুহূর্ত ভেঙ্গে আছে—এ যে আমার
জীবনের মণিপ্রদীপ!

আর সেই বাসন্তীর দান—সেই ফুলের
মালা? সে তো কোটোর ভিতর থেকে
তুলিয়ে ধুলো হয়ে কবে এক বৈশাখীর
ঝড়ে উড়ে গেছে, কিন্তু তার সৌরভ আদৌ
আমার প্রাণকে ভরপুর করে রেখেছে।

ঐশ্বর্যলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৮

বিগত

আমার বসন্ত মিনে অশোক-কুন্তনে,
চন্দ্রকের উর্ধ্বমুখী ধূপগন্ধধূমে
যে পূজা হইয়া গেছে নিশাশা তাহার
কোথা আমি আরও

অবিরাম অবিরাম জীর্ণ পর্ণ করে,
বর্ণ অরুণিমা হস্ত শুষ্ক পুষ্পস্তরে,
উদাস প্রহ্নন মুক্ত ব্যাকুল হ্রবাস
শুধু দীর্ঘবাস!

আসিরাছে ধরিজীর মনোনিবেশ,
বর্ণে বর্ণে বসন্তের পূর্ণ আবাধন,
অমৃত শুভ্রন গীতে, অমৃতধারার
প্রাবিত ধারা!

আমি লুপ্ত গতি শ্রান্ত, স্থানি বর্ণহীন,
বিরামপ্রসঙ্গী, শুষ্ক আমার এ দিন,
বৃষ্টিহীন ফুলের মতন অসহায়
মৃদুপথ চার।

ঐশ্বর্যলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৮

পূর্ণের অভাব

নিত্য তোমার পাশের কাছে
 তোমার বিশ্ব তোমার আঁকে,
 কোনোখানে অভাব কিছু নাই।
 পূর্ণ তুমি, তাঁই
 তোমার ধনে মানে তোমার আনন্দ না ঠেকে।
 তাঁই ত একে একে
 যা কিছু ধন তোমার আছে আমার করে লবে।
 এমনি করেই হবে
 এ ঐশ্বর্য তব
 তোমার আপন কাছে, প্রভু, নিত্য নবনব।
 • এমনি করেই দিনে দিনে
 আমার চৌখে নত যে কিনে
 তোমার সৃষ্টিগোদর।
 • এমনি করেই দিনে দিনে
 আপন স্নেহেব পরশমণি আপন দেহে লও চিনে
 আমার পরাণ করি হিরণ্ময়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমেরিকায় ভারতীয় প্রমজীবী

ইয়াকিম্বানের মজুরেরা উচ্চদরে মজুরী
 পাই। মাসিক ১০০০ টাকার কম মজুরী
 এ দেশে নাই বলিলেই চলে। চাকর,
 দারবান, গাড়োয়ান, কুলী, কৃষক ও কার-
 খানার মজুর প্রভৃতি সকল-প্রকার প্রমজীবী
 স্বচ্ছলভাবে জীবন ধারণ করিতে পারে।
 এট ছাড়া তুমিয়ার মজুরেরা আমেরিকায়
 আনিতে চাহে।
 ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে তুমিতে পাট
 বহুসংখ্যক ভারতীয় প্রমজীবী কার্য
 করিতেছে। ইহাদের অধিকাংশই পাজীবী।
 ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্তসাগরোপকূলে

গ্রাঃ ১২০০০ ভারতবাসী মজুরী করিয়া থাকে। নতুন আইন প্রবর্তিত হইয়াছে—ভারত কলে ভারত-সন্তানগণ আর এদেশে আসিতে পারিবে না।

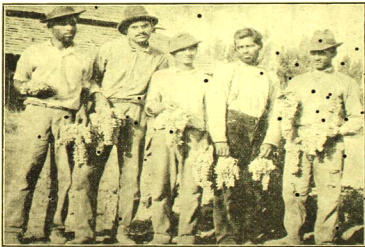
দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিজি, আমেরিকা, টিনিড্যাড, গায়ানা ইত্যাদি ব্রিটিশ উপ-নিবেশ-সমূহে ভারতীয় প্রবাসীরা খাতি গোলামের সমান। তাহারা “দাস-বৃত্ত” লিখিয়া ঐ সকল দেশে যায়। তাহাদের সম্বন্ধে কবির কথা বর্ণে বর্ণে সত্য—

“নির্ধিকারী ভারত-প্রজা অভ্যুত্থানের অত্যাচারে
স্থান হারিয়ে মান হারিয়ে প্রাণী আশ্রয়স্থল পাবে,
কেউ বা করে দিন-মজুরী কেউ বা ক্ষুধা দোকাবহার।”

এইরূপ Indentured Labourer ট্যাঙ্ক-স্থানে আসিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র এই ধরণের চুক্তির বিরোধী। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল লোক এদেশে আসিয়াছে তাহারা

সকলেই নিজ নিজ উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন। “ভাবে বুঝিয়াই আসিয়াছে।

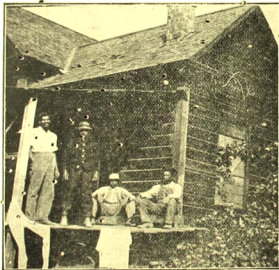
একজনকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—“আজ্ঞা, আমেরিকার ভারতবাসী আসিতে আরম্ভ করিল কি হুজু?” “ইনি” উত্তর করিলেন—“পাড়াবের মিশেরা এই বিষয়ে পথ-প্রদর্শক। শিখগণ প্রথমে ব্রহ্মদেশে চাকরী করিতে আসে।” ব্রহ্মদেশে থাকিতে থাকিতে তাহারা শিঙ্গাপুরের কথা শুনিতে পায়। শিঙ্গাপুরে ব্রহ্মদেশ অপেক্ষা মজুরীর চার বেণী শুনিমাত্র তাহারা ঐ অঞ্চলে অগ্রসর হইয়াছিল। বাহারা ব্রহ্মদেশে কার্য করিতেছিল, তাহাদেরই মধ্যে একজন “শিঙ্গাপুরে আসিল—পকনদ হইতে প্রথমেই” কেহ শিঙ্গাপুরে আসিত কিনা সম্বন্ধে। অগ্রণী” বল বখন দেখিল শিঙ্গাপুরে সন্তা-সন্তাই বেতনের চার বেণী তখন তাহারা পাড়াবে,



আমেরিকার ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মী কৃষক।

আত্মীয়-বন্ধন ও বন্ধু-বান্ধবগণকে সংবাদ পাঠাইল। সকলকে শিলাপুরেই প্রবাসীগণের নিকট হাতে পত্রাবের দ্বায়ে গ্রামে গ্রামে টাকা পৌছিতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া-শ্রমিণী পাঞ্জাবীরা ক্রমে শিলাপুরের দিকে হুঁকিম।

“আবার কিছুকালের ভিতরই শিলাপুরের ভারতবাসীরা চীনেও খবর পাঠিতে থাকিল। হংকং, সাংগোই ইত্যাদি অঞ্চলে ইংরাজ ক্ষমতা-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ-দাস ভারতবাসীও প্রবেশপথ সহজ হইল। ইংরাজেরা শিখ ও পাঠান সৈন্য লইয়াই চীনে রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন। এখনও ভারতীয় সৈন্য ও পুলিশেরাই চীনের ব্রিটিশ-নগরে শাস্তি রক্ষা করিতেছে। চীনারা এই কারণে ভারতবাসীর উপর অসন্তুষ্ট।



আমেরিকার ভারতীয় কৃষকেতু-কুটীর।

বাচা হউক ভারতবাসীরা শিলাপুর কেন্দ্র হইবে চীন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র-স্থাপনের সুযোগ পাইল।”

কিন্তু ইহাঙ্কিহানে ভারতবাসীর অভিযান, ব্যাপারটা কিছু বিচিত্র বোধ হইতেছে। হয়ত কোন ইংরাজ-প্রভুর সঙ্গে শিখ বা পাঠান দাস কিবা এহরী ক্যানডার আশ্রয় থাকিবে। এইরূপে নব ভূখণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংস্রব আরম্ভ হয়। পরে প্রশান্ত মহাসাগরোপকূলে কৃষকগণের উন্নত অবস্থা দেখিয়া ভারতবাসীরা দলে দলে চীন হইতে, এখানে আসিতে প্রলুব্ধ হইরাছে। ক্রমশ ভারতবর্ষ হইতেই শত শত লোক আমেরিকার মজুরী করিতে আসিরাছে।

চীনা যাহ, আলকাল চীন, জাপান, সুমাত্রা, যব, মালয়, ভারতীয় ষোণ-পুঞ্জ, কালিকর্ণিরা ও ক্যানাডা ইত্যাদি প্রদেশে গ্রাঁর মেড় লক্ষ ভারত-বাসীর অল্প সংস্থান হইতেছে। ইহাদের বিষয় ভারতবর্ষের উচ্চ-শিক্ষিত লোকেরা এখন পর্যন্ত কোন সংবাদ রাখেন নাই। বিগত ৪৫ বৎসরের ভিতর দাসখতে গেলী চুক্তির বিরুদ্ধে জন-নাগরকগণ আন্দোলন তুলিয়া-ছেন। সেট উপলক্ষ্যে ব্রিটিশ উপনিবেশ-সমূহে ভারতীয় প্রকার অধিকার সম্বন্ধে আলো-চনা চলিতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার গান্ধী—

মোটা ভাস্কর্য তরুর নীচে বসে বসে দাঁড়িয়ে

মিলের মাথার বন্ধ বন্ধে বিলম্ব অধার ঘনিষ্ঠিত।

ভারতবর্ষ হইতে গোথল্গে দক্ষিণ
আফ্রিকায় ভারতবাসীর অগত্যা বচকে
দেখিবার জন্য গিয়াছিলেম। ঐংগ্রেসে
কয়েকবার এই সকল প্রশ্ন উপস্থাপিত করাও
হইয়াছে। Modern Review, Indian
Review ইত্যাদি পত্রের কোন কোন
লেখক সমস্তটা বুঝাইবার চেষ্টাও করিয়াছেন।
কিন্তু বিষয়টা সত্যভাবে বুঝিবার জন্য
এখনও দেশবাসী অগ্রসর হন নাই বলিতে
হইবে। এমন-কি ভারতবর্ষের কাঁহরে
ভারত-সম্মান কোথায় কতজন কি-ভাবে
জীবন বাপন করে তাহাই জানিবার চেষ্টা
করা হয় নাই। বর্তমানে যুগেও কল্যাণ-
মন্ত্রের ধারাই ছনিয়ায়, সর্বত্র একটা
বৃহত্তর ভারত গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহার

আকার, পরিমাণ ও মূল্য বুঝিবার জন্য
উচ্চশিক্ষিত ভ্রমকভাসীর ঐশ্বর্য অগ্রসর
হওয়া কর্তব্য। গোথল্গে কয়েকদিনের জন্য
মাত্র দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন। এত অল্প
সময়ের মধ্যে এই বিরাট কার্য সাধিত হওয়া
সম্ভব নহে। তাহার জন্য বহুসংখ্যক উপযুক্ত
লোকের জগতে বাহির হওয়া পড়া আবশ্যিক।
বৃহত্তর ভারতের কেন্দ্রগুলি বুঝিতে চেষ্টা
করাই কয়েক জনের একমাত্র কাণ্ড হইবে।

ইয়াক্সিয়া চীনাতে আমেরিকায় চাহে না
জাপানীকে চাহে না, ভারতবাসীকেও চাহে
না। ইহারা ইয়াক্সিদের সঙ্গে মিলিয়া
মিলিয়া ঘাইতে অসমর্থ। ভারতীয় মন্ত্রীদের
মাঝের পাগড়ী, হাতে বালা, কানে তুলি,
লম্বা চুল ইত্যাদির বিষয় উৎপাত দেখিয়া
ইয়াক্সিয়া "এহি মনুষ্যদন" ডাক ছাড়িতেছে।

শ্রীবিদ্যাসুন্দর সরকার।

স্মৃতি

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিজয়গঙ্গা

অরের বোরে অজ্ঞান হইয়া আমার
জী সাত সপ্তাহ বিছানায় পড়িয়া রহিল।
বাহাতে তাহার বিবিমত দেবা-প্রসঙ্গ
কোন ক্রটি না হয় সে-অল্প হাস্যপাতাল
থেকে আমি একজন খাজী আনাইলাম।
তাহার অনুধেয় এই সাতটি সপ্তাহ আমার
আহারমিত্র একরকম ত্যাগ করিয়াছিল
বলিলেই হয়।

টাকার দরদ আমি ধরি নাই। বে
ডাকার ডাকিয়াছিলেন তাহার দর্শনী রোল
টাকা।

চিকিৎসা ও গুরুদ্বার গুণে একটু
একটু করিয়া সে পারিয়া উঠিতে লাগিল,
ক্রমে তাহার আত্মর ভাব কাটিয়া গিয়া
আবার জ্ঞান হইল।

যেদিন রোগ-শয্যা ত্যাগ করিল, সেদিন
সে মুখটি বুঝিয়া আস্তে-আস্তে আমার
শরনগৃহে আসিয়া বসিল। আমার দুজনে

সেদিন সূর্য মুখোমুখি করিয়া বসিয়া উপরে আমি নগর রক্ষিতাম। এতদিনে মহিলায়—কথাবার্তা কিছুই হইল না।

আম-কিছুদিন, পরে কামরা সেই নিরবস্থিতি যৌন ভঙ্গ করিয়ায় বটে,—কিন্তু সে-কোরণ-নৈবাৎ চূপ করিয়া থাকি। ভাল দেখার না বুঝিয়া। আমাদের দেই বাধা-বাধা ভাবটা আর গেল না। আমি ইচ্ছা করিয়াই যৌন থাকিতাম। বোধকরি সে-ও তাই চাহিত। মনে-মনে ভাবিলাম, “কিছুদিন এমনি করেই থাক। এ খাড়াটা আগে সে সামলে উঠুক, তারপর সময়ের ক্রমবাহু তার মনের দাগ মনেট মিগিরে বাবে”। এখন চূপ থাকি ভাল।

উঃ! তার অস্থির গমরে আমার যে কি কষ্ট গিয়াছে তা বলা যায় না!—সে কি বস্ত্রা!—আমার বুক কাটিয়া কাগা ঠেলিয়া উঠিত। কিন্তু পাছে কেউ শোনে সেই ভরে প্রাণের কাগা প্রাণেই চাপিয়া রাখিতে হইত।

যেটা সত্য সেটা না জানিয়াই যথ আমার স্ত্রী মরিবে ইহা আমি মনে আনিতেই পারিতাম না। তাই তার আরোগ্যলাভে আমি বেন-হীপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। “জাগ্রত মনের সজোটা বাক—পরের কথা পরে বুকে দেখা যাবে।”—এমনভাবে শীতকালটা কাটিয়া গেল। এই সারা শীতটা দিলদরিয়া মেজাজে কাটাইয়া দিলাম। আমারই জিৎ, আমারই জিৎ—কি আশঙ্ক!

অবিবাহিতের আশা-প্রাণ উজ্জল করিয়া ধীরে ধীরে শীত চলিয়া গেল।

আপনমনে বসিয়া-বসিয়া সে সেলায়ের কাজ করিত,—পিছনে বসিয়া তাহার

এ স্থানর পাখী বুকি বশ মানিল। আমার অমতে সে আর কোন কাজ করিত না। আগেকার মত একলা আর বাড়ীর বাহিরেও বাহিত না।

খাওয়া-দাওয়ার পর তাহাকে লইয়া রোজ একবার বাহিরে বেড়াইয়া আসিতাম। বেড়াইতে-বেড়াইতে আমরা নানা-প্রসঙ্গ লইয়া আলাপ করিতাম। আমি যে তাকে জালবাসি, ঠায়েঠায়ে এটাও জানাইয়া দিতাম। আমার ইচ্ছা,—অতীতকে সে মন হুইতে একবারে টাটকা ফেলুক।

তবে, একটা ব্যাপার আমার চোখ এড়াইয়া গিয়াছিল। এখন তাহার দিকে আমি গোপনে চাহিয়া থাকি বটে,—কিন্তু তাহার সে চুরি-করা চাহনি আর দেখিতে পাই না কেন? বই, সে শু আর—সেমন চোখ তুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহে না।—এ কি লজ্জা, এ কি সজোটে?

ভাবিলাম, “ঐখ্যা ধরে থাকাই ভাল। পাখী যখন পোষ মেনেছে, তখন আর ভাবনা কিসের! সে শু আমারই। দেখব, হঠাৎ সে কোনদিন বুকের কাছে এসে আমাকে আত্মদর্শন করেছে।”

তবু, কেন জানিমা, আমার খালি মনে হইত, আমি বেন কি-একটা লুকোচুরি পেলিতেছি।

যদিও তাহার আলাদা বিছানা করিয়া দিয়াছি, যদিও তাহার সেদিনকার অপরাধ বড় সামান্ত নহে,—তবু তাহার যে পাপ আছে, ইহা আমি ভাবিতেও পারিতাম না। সে বশ মানিতে আমি যে খুব

খুশি হইয়াছি তাহাতে আর সন্দেহ কি ? কিন্তু সময়-সময় তাহার এই অসহায়, করুণ আত্মদর্শন দেখিয়া আমার মনটা বেহ কেমন-কেমন করিত।

যাহা হউক, এই সময়টুকুর মধ্যে আমি দুইটাটা ভাল কাজ করিয়াছি। আমি গ্রন্থন অক্ষম বলীর টাকা ছাড়িয়া দিয়াছি, কোন জিনিষ বাধা না রাখিয়াই একটি রমণীকে টাকা ধার দিয়াছি।

প্রীকে আমি নিজে এসব কথা বলিলাম না; কারণ তাহার মন রাখিতে তা আমি এ দফার সুখোশ পরি নাই। কিন্তু একদিন সেই উপকৃত রমণীটি আসিয়া আমাকে তাহার অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে জানাইয়া গেল। ফলে, সব কথা বাহির হইয়া পড়িল। শুনিয়া আমার প্রী সত্যই আনন্দিত হইল।

শ্রীতের পর আসিল সমুদ্র বসন্তের নবীন-শ্রী। তপ্ত সূর্য্যকরে আমাদের বাড়ীর নিভৃত বরগুণি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে আলোকের পিছনে যে কিসের অন্ধকার ভ্রমট বাধিয়া ছিল, তখন তাহা লক্ষ্য করি নাই। সে পুত্রীভূত অন্ধকারের রক্তে রক্তে প্রেলয়ের শিখা গুপ্ত ছিল—যেদিন দিব্যদৃষ্টি পাইলাম, “সেদিন তহি বৃষ্টিতে পারিলাম।

যাহা ঘটিল, “সে কি নিরতিত অধোব-বিধাম ? তাহা কি আকস্মিক নহে ? বলিতে পারি না।

এত-দৈবাৎ যে এমন ঘটবে, এক তাহা জানিত ? ঘটনাটা ঘটিল সন্ধ্যাকালে, খাওয়া-দাওয়ার পর.....

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দিব্যদৃষ্টি

ঘটনাটি খুবই সান্নিধ্য। “আরী দাসাধি ভাষার প্রা কেমন-যেন আনন্দনা হইয়া আছে। সে আর মৌন-নয় বটে, কিন্তু “সকলদাই উদ্যম মনে কি-যেন” ভাবিতে থাকে। তার এই বিবরণ ভাবটা হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করিলাম।

“সেদিন সে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া শোয়াই করিতেছিল। আমি যে তাহার পানে তাকাইয়া আছি, সেদিকে তাহার খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ আমার মনে হইল, তাহার মুখ কেমন বিবর্ণ, চেহারা কেমন ক্রম। আমার বুকা হঠাৎ করিয়া উঠিল। বিশেষ, আজকাল মাঝে মাঝে সে ক্রাসিয়া উঠে—ভিতরে হরত কোন কঠিন রোগ হইয়াছে। তাহাকে কোনকথা না জানাইয়া আমি তখন ডাক্তারকে খবর দিলাম।

ডাক্তার অসিলেন। সে তারি আশ্চর্য্য হইয়া একবার ডাক্তারের আর-একবার আমার মুখের দিকে ঘন-ঘন তাকাইতে লাগিল।

তারপর শুক হাসি হাসিয়া বলিল, “আমার শু কিছু হয় নি।”

ডাক্তার আমাকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন, “দেখুন, আপনি যদি শ্রীশ্রী ঠেকে তাওয়া বদলাতে নিজে না যান, তাহলে একটা বিশদ ঘটতে পারে। সমুদ্রের ধারে যেতে পারেন ত ভালই, নইলে অল্প-কোন ভাল আরগার।”

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। আমার স্ত্রী
কিছুক্ষণ আবার দিকে গভীরমুখে চাহিয়া,
খািকিয়া কহিল, “সত্যি বলছি, আমার
কিছু হয় না।”—কিন্তু বলিতে-বলিতে
স্ত্রীর মুখ কি-এক লক্ষ্যের বেদনার রাজী
হইয়া উঠিল। আমি সমস্ত বুঝিলাম।

সে অনবধ একটা অশ্রুধারা ক’
আমি যে তাহাকে হাগ করি নাহি,
আমি যে তাহাকে ভালবাসি, যত কার,
—ইহা ভাবিয়া নিজের প্রতি হস্ত তাহার
খিকার জন্মিয়াছে।

বসন্তের এক নোহরজিন প্রভাতে
সোকানে বসিয়া কাব্যকর্ষ দেখিতেছিলাম।
হঠাৎ পানের বর চাইতে মুহু গীতের সুর
উঠিল। আমার স্ত্রী গান গাহিতেছে।
কেন জানি না, তাহার গান শুনিয়া আমি
যেন কেমন দমিয়া গেলাম। বিবাহের
পর প্রথম-প্রথম তাহাকে গান গাহিতে
শুনিয়াছি বটে,—কিন্তু প্রথম মিলনের
চকল আনন্দই সে সঙ্গীতের কারণ।
ইলনিং ত সে আর গান গাহিত না।

তখনকার সেই কানন্দ-সঙ্গীতে একটা
গভীর শান্তি, পরিপূর্ণ আশা, অটুট
ব্যস্ততার ভাঙন পাইতাম—কিন্তু,—আজি-
কার এ সঙ্গীতে, যেন এক পীড়িত,
তাপিত হতাশ অন্তরের বেদনা ক্রন্দনের
ছন্দে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। গানের সুর
ক্রমে চড়িতে, লাগিল,—তারপর, গানের
মাঝখানে হঠাৎ সেই বেদনা-কল্পন কঠ
ভাঙিয়া পেল, কানিয়া কানিয়া সুরও
খামিয়া গেল। শুনিলাম, সে কাসিতেছে।
কানি খামিলে আবার গান শুরু হইল,—

এবার বড় দীর্ঘ, সুস্বপ্ননে, শোনা যাহ-কি,
না-যাহ।.....

আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম। আমার
এ অস্থিরতার কারণ কেহ বুঝিবে না।
হুঃখ ? তাহার মন্ত আমার এতটুকুও হুঃখ
হয় নাই। গান শুনিতে শুনিতে আমার
মনে একটা সন্দেহ আগিয়া উঠিল। আর
বিস্ময় ! বিস্ময় ও সন্দেহ ! তাহা যেমনি
ভীত, তেমনি ক্রুর ! “সে গান গাহিতেছে !
খ্যা !” “আবার সামনেই গান গাহিতেছে !

আবার মাথা হইতে না পৰ্যন্ত কানিয়া
উঠিল। তবুও অচল পাথরের মত
কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। উত্তীর্ণ নক্তি
ছিল না—পৃথিবী চোখের আড়ালে কোথায়
সরিয়া গিয়াছিল ! খানিক পরে কোনরকমে
উত্তীর্ণ পাগলের মত পাহির হইলাম। কোথায়
বাইতেছি, ক’স ছিল না—সহসা লুকেরিয়াকে
সম্মুখে দেখিয়া ডাকিলাম, “লুকেরিয়া—”

লুকেরিয়া বিষয়ে আমার পানে চাহিল।
আমি কহিলাম, “তোমার দিদিমণি গান
গাইছে ? না ?”

লুকেরিয়া কোন জবাব দিল না—
কেমন-এক ভাবে আমার পানে চাহিয়া রহিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “ও কি যোগ
এমনি গান গায়, না এই প্রথম ?”

লুকেরিয়া কহিল, “দিদিমণি মাঝে
মাঝে একলা বসে গান করেন বটে, কিন্তু
আপনি বাড়ী থাকলে কৈ তাঁকে ত’
গাইতে শুনি নি ?”

আমি অস্থিরপদে রাস্তার বাহির হইয়া
পড়িলাম। পথের লোকগুলো আমার গারে
যাক্কা মারিয়া বাইতে লাগিল, কিন্তু সে

দিকে আমার লক্ষ্যই ছিল না—আমি তখন একেবারে অসাড়! রাত্তা “দিশা একখানা গাড়ী বাইতেছিল, আমি তাড়াতাড়ি তাহাতে চড়িয়া বসিলাম। কিন্তু খানিকদূর গিয়াই নামিয়া পড়িলাম। গাড়ীদ্বারের হাতে একটা টাকা দিয়া অর্থস্বত্ব হস্ত করিয়া বলিলাম, “এই নাও তোমার ভাড়া।”

তাড়াতাড়ি আবার বাড়ীতে ফিরিলাম। আমার মস্তকের মাঝে সেটী ভীষণ কষ্টের মত তখনও ভীরের লক্ষ্যের মত বিদ্যমান ছিল। আমার সাক্ষাতে আমাকেই তুলিয়া সে যখন গান গারিতে পারে, তখন আর কি মজল আছে?

ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, সে তখনও সেইখানে বসিয়া শেলাই করিতেছে। সে তেমনি মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু এখন আর গান গারিতেছে না। হঠাৎ কেহ ঘরে ঢুকিলে লোকের যেন মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখে, লোকটা কে, —সে-ও তেমনিভাবে একবার আমার দিকে চাহিয়া আবার নিঃশব্দ কাণে মন দিল।

অভিজ্ঞতের মত আমি তাহার পাশে গিয়া বসিলাম। সে ভরে-ভরে আবার আমার দিকে তাকাইল। আমি তাহার একখানি হাত নিঃশব্দ হাতের উপর তুলিয়া লইয়া ফ্র্যাংকো কথ্য করিলাম; কিন্তু আমার আশাপের সে চোটা বিফল হইল;—কারণ, আমি বাহা বলিবার তাহা যেন অর্থহীন, তেমনি অসংলগ্ন। দীর্ঘনিবাস কেনিয়া দেশে শুকভাবে বসিয়া রহিলাম।

কিন্তু এমন করিয়া পুতুলের মত বসিয়া

থাকা বড় দার। কাজেই খানিকপরে মুহুরের বলিলাম, “এদা স্পষ্টতা গল্প করি।”

তুমি এমন চুপচাপ কেন? . . .
সে কাঁপিয়া উঠিল। তারপর একটু তাকাতে সচো বসিল। তাহার সর্বাঙ্গে ভরে-একটা চমক খেলিয়া উঠিল, —মুখে চোখে বিষয়ের আভাস।

“তুমি কি এখনো আমার জালবাস—
এখনো?”—মুখ কুটিল একথা সে বলিল না।
সেটে,—কিন্তু তাহার মনের মধ্যে এই প্রশ্নটাই যে আগাগো উঠিয়াছে, আমি তাহা বেশ বুঝিলাম।

আর আমি সহিতে পারিলাম না—
একেবারে তাহার পারের তলার বসিয়া পড়িলাম। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পাড়াইল—
কিন্তু আমি আগ্রহের সহিত তাহার হস্ত ধরিয়া তাহাকে বসাইয়া দিলাম।

এক ক্ষাণিকের আমনের উচ্ছ্বাসে হৃদয় আমার ভরিয়া গেল—আমি পাগলের মত তার ছোট ছোট পা-জখনি বুকনু ভিতরে চাপিয়া ঘন-ঘন চুঁঘন করিতে লাগিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে আমার প্রাণের বাধ ভাঙিয়া চোখে অস্তর বস্তা ছুটিল,—অমি, কথা কহিতে গেলাম, কিন্তু বর কুটিল না।

তাহার মুখের উপর হইতে স্তব্ধ ও বিষয়ের তাব সরিয়া গেল। তাহার পৃথক চুঁঘন করাতে লক্ষ্যের সে আকুল হইয়া উঠিল, সলজ্জ মুগ্ধতা করিয়া আমার আশ্রয় হইতে পা হইখানি সে ধীরে ধীরে ছাড়াইয়া লইল।

কিন্তু, আমার প্রাণের কপাট তখন একেবারে খুলিয়া গিয়াছে। মেয়ের উপর,

যেখানে তাহার পা-দ্বটি ছিল, সেই ভাঙ্গাটি চুখন করিয়া উপড়ি হটয়া আমি পড়িয়া রহিলাম। উচ্চসিত কণ্ঠে বলিলাম, “আমি তোমার ভালবাসি—ওগো, তোমার ভালবাসি!”

—লক্ষ্যে মুখ ফিরাইয়া সে তেমনি মুহু মুহু হাসিতে লাগিল।

ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলার হাঁপাতে হাঁপাতে আমি বলিলাম, “মনন নির্ভূতের মত স্নেহে যেওনা স্নেহে যেওনা—কাছে এস, বৃকে এস!”

বাতাসে ঘর্ষনে ফুলের ঢাণের মত তাহার ছোট দেহখানি কাপিতে লাগিল। কাপিতে-কাপিতে শেষটা সে কাঁদিয়া ফেলিল। তারপর সেই সকল, ডাগর চোখগুলি আমার মুখের উপর রাখিয়া, সেই কম্পমান করে আমার চাতকটি ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, “শাস্ত হও—অমন কোরোনা, তোমার পারে পড়ি!”—অশ্রুর উচ্ছ্বাসে তাহার কণ্ঠে আমার বন্ধ হটয়া গেল।

কক্ষতলে, বলিয়া বসিয়া নিম্নলকনেজে আমি দেখিতে লাগিলাম, আবেগে উত্তেজনার ঘীরে ঘীরে সে মুর্ছিত হটয়া পড়িতেছে! তাড়াতীত কোলে করিয়া বিভ্রানার উপর লইয়া গেলাম। সেদিন সাহসসন্ধা আমি তাহার বিভ্রানার পাশে বসিয়া রহিলাম।

যখন তাহার জ্ঞান হইল, আমি বলিলাম, “বেথ, বেশ, বৃক্ষটি তোমার অগ্রস্থ হইয়াছে। এখানে থাকলে তোমার অগ্রস্থ বাড়বে নৈকম্বরে না। আমি হয় বোকানপাট ফুলে দি, নয় আর কারুকে বিক্রী করে ফেলি; তারপর চল, তোমারে নিয়ে আমি হাওয়া

কলাতে ঘাই।” সেখানে গিবে আবার নৃতন করে সংসার পাতব, নৃতন করে জীবন গড়ব।”

তখনও সে তরো-তরো আমার কথা শুনিতে লাগিল—কিন্তু উত্তরে একটুও কথা কহিল না, একটুও না।

আবার তাহার চরণতলে আপনাকে লুটাইয়া দিবার জন্য একটা প্রবল আবেগ আমার বুকের মধ্যে ঠেলিগা-ঠেলিগা উঠিতে লাগিল।

বলিলাম, “আর কিছু চাই না আমি।

—সেই নৃতন সংসারের এককোণে একটু যদি আশ্রয় পাই, তাহলেই বস্তু ঘাব। তত্ব যেমন করে দেবীর পানে চের থাকে, দূর থেকে তেমনি করে আমি তোমার পানে চেষে থাকব, হৃদু চের থাকব।”

উত্তরে, তাহার কপোলে অব্যবহিত প্রায় ছুটিল।

কঠোর সে বলিয়া উঠিল, “ওগো, আমি ভেবেছিলাম, আমার উপর তুমি আর বৃদ্ধি মদর হবে না।”

একি কথা!—কে-বেন আমার বৃকটা ছুরি-দিগা চিরিয়া দিল। তাহার এই কথার আমি সদন্তই বৃদ্ধিতে পারিলাম। না জানিয়া তাড়ান প্রাণে কি বাধাই দিয়াছি।

সেদিন সে আমার সামনে তাহার মনের কঁক কথাই খুলিয়া বলিল! আমি তাহাকে বাধা দিলাম না; কারণ, তাহার এই আত্মপ্রকাশের উপরই আমার হৃদয়ে নির্ভর করিতেছে! অবশেষে, কথা বলিতে বলিতে সে শ্রান্ত হটয়া পড়িল। আমি তাহাকে ঘুমাইতে বলিলাম।

সে শাস্তভাবে ঘুমাইয়া পড়িল; কিন্তু

উত্তেজনার ফলে আঁধার সামান্ত্র অর
আসিল।

আমি নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতে পারিলাম
না। সে ক্ষমন আছে, তাই দেখিতে
সারাব্যস্ত জন্মগত বিছানা ছাড়িয়া
উঠিয়াছি, তাহার রোগশাশ্বির অস্ত্র কণ্ঠবাত্ত
ভগবানকে ডাকিয়াছি! কাল হইতে
আমাদের নূতন জীবন,—কি আনন্দ! সুগ্রহে
আমি প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।
—“কাল আমি তার কাছে সব কথা
খুলে বলিব, সে-ও সব বুঝতে পারবে,
তার সন্দেহ ঘুচে যাবে!”—এই আশ্বসীকণ্ঠের
আমাদের নূতন জীবনের প্রতিষ্ঠা হইবে।
আজ আমার প্রাণ অভীতের দিকে পছন
কিরিয়া পাড়িয়াইরাছে—সে যুধু চাহে, নূতন
প্রভাত—নূতন জীবন!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভোরের বেলাগ!

হাসিমুখে সে আমার কথা শুনিতে
লাগিল বটে, কিন্তু তবু তার লজ্জা গেল
না, ভর ভাঙ্গিল না।—হাঁ, তাহার ভর
সত্তোচ আরও বরং বাড়িয়া উঠিল।—
ইহাই তা স্বাভাবিক! এতদিনের ‘মনাবুরে’র
ফলে পরম্পরের কাছ হইতে অনেক
তফাতে গিয়া পড়িয়াছিলাম; একদিনের
চেষ্টার কি এতদিনের ভাণ্ডা মন কখনো
বোঝা লাগে? হস্তান্তর তাহার ভদ্রসত্তোচ
আমি ততটা গ্রাহ্য করিলাম না। এই
খানেই আমার ভ্রম হইল।

সেদিন সকালে আমি তার কাছে
লম্বাটী স্বীকার করিলাম, এতদিন তার সঙ্গে

সরল ব্যবহার করি নাই বটে; এতদিন
তার প্রেমে আমার সন্দেহ ছিল; কেবল
তাঁহাকে কষ্ট দিয়াই অস্ত্রই বিনাহ করিয়াছি,
ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সে সত্যতঃ আমার হৃদি-ধারিতা
দিনতি করিয়া বলিল, “ভ্রমো, ধাম, ধাম
—অমন-করে আর বোলো না!”—আবার সে
কানিয়া ফেলিল।

আমি বলিলাম, “না না—নূতন জীবন
চাই, নূতন জীবন। বসন্ত-প্রভাতের নূতন
সূর্য্য আমাদের নূতন পথ দেখাবে—নূতন
জীবন, নূতন আলো!”

আমার দোকান বিক্রয় করিয়া ফেলি-
লাম। গ্রীষ্ম কাছে প্রভাব করিলাম,
ভ্রমণের-ধরতের অস্ত্র নিজেদের হাতে কিছু
টাকা রাখিয়া নানাবাকি সব গরীব-দুঃখীদের
বিলম্বিত দিব। কিরিয়া আসিয়া সংপথে
আবার নূতন ভাবে জীবন আরম্ভ করিব।

সে কোন জবাব দিল না, কেবল
একটু হাসিল। পাছে আমি বিব্রত হই,
তাই এ হাসি। আমার এই অনির্গল
স্বাক্ষরোক্ত বনে-বনে নিশ্চয়ই সে অতিষ্ঠ
হইয়া উঠিয়াছে—এক কথুর-উগর-কথা
স্বাহার ভাল লাগিতেছে না। কিন্তু
ভবিষ্যতের আনন্দে আমি তখন বিহ্বল,
আত্মসংযমের শক্তি আমার ছিল না।

দিন-রাত তার পাছে-পাছে লাগিয়া
থাকাটা আমার ভাল হয় নাই। আমার
এই উচ্ছ্বসিত আনন্দে বোধ করি সে
বড়ই অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিত। সেদিন
অন্ধ অববেগে তাহার পারে চুপন করিয়া-

ছিলাম বটে, কিন্তু আজ বুঝিতেছি, আমার পক্ষে সেটা অত্যন্ত ছেলুমহাবি হইয়াছিল।
তবু, এত বুদ্ধিগাত্ত আমি আপনাকে সামলাইতে পারিলাম না।

“একদিন কথাই কথাই তাহার কাছে ফুলিখানের বুড়ার সেই ঘটনার কথা তুলিলাম। বলিলাম, “ও, এফিমোভিককে তুমি আজ্ঞা করিয়াছিলে বাঁহোক। তুমি যে এত ভালো, এমন সরল অথচ রসিক, আগে আমি তা বুঝি-নি।”

সে নিহরিয়া অসুট বরে কহিল,
“একথা তুমি বাড়িরে বলছ।”

তারপর দেখিতে-দেখিতে তাহার মুখ যেন কালির মত হইয়া গেল। দুই হাতে আগনার মুখ ঢাকিয়া হুঁপাইয়া হুঁপাইয়া সে কাদিতে লাগিল। আবার আমি আশ্বাসনা হইয়া তাহার পায়ের তলার বলিয়া পড়িলাম, তাহার পা-খরিশা ঘন-ঘন চুপন করিতে লাগিলাম। আবার সে অজান হইয়া পড়িল। এটি কালকের ঘটনা—তার পর দিন সকালে—

তার পর দিন সকালে! আমি কি বলিতেছি। ‘এ’ ত পরদিনের সকালের কথা নয়—এবে আজ সকালের কথা।—কিন্তু আমার মনে হইতেছে, এই কয় ঘণ্টার মধ্যে যেন কত যুগ কাটিয়া গিয়াছে!

সকালে যখন তাহার সহিত দেখা হইল, তখন সে পান্থবের মুষ্টির মত স্থির, স্তব্ধ মত শুক। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ যেন ভঙ্গ করিয়া ঘোড়হাতে সে বলিয়া উঠিল, “ওগো, আমি বড় পাশিঠা—যে পাপ করেছি, তার মার্জনা নেই, আমার মনের

সব শাস্তি বুকে লেছে! তোমার মহত্ব, তোমার দয়া আমি কখনো ভুলতে পারব না—আজ থেকে তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার দাসী। তোমার পায়ের তলার সামান্য জীবন দাসীর মতই আমি পড়ে থাকব।”

একলাফে উঠিয়া পাগলের মত আমি তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম। এবং তাহার কর্ণে অধরে অঙ্গুল চুপন বর্ষণ করিলাম,—“আজ আমি আবার আমার স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়াছি!”

তারপর বিদেশ-যাত্রার বন্দোবস্ত করিতে আমি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলাম।—সেই বাহির-হওরাই আমার কাল হইল। হা পহমেখর, পাঁচ মিনিট—আর পাঁচ মিনিট পূর্বে যদি ফিরিতে পারিতাম। ওঃ! ফিরিয়া সে কি দৃষ্ট দেখিলাম! বাড়ীর দ্বারে সেই জনতা—আমার প্রতি সতলের সেই দৃষ্টি, সেই নিঃস্বর্ণ অর্থপূর্ণ দৃষ্টি!—হা ভগবান……

লুকেরিয়ার মুখে সব তনিয়াছি। আমি ফিরিয়া আসিবার কিছু পূর্বে লুকেরিয়া আমার জীর কাছে গিয়াছিল। সে তখন প্রার্থনার ভঙ্গিতে ঘোড় হাতে দাঁড়াইয়া ছিল। লুকেরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছ নিমিমা?”

সে বলিল, “কিছু না! তুই এখন এখানে থেকে যা। না, না—একটু দাঁড়া দেখি।”—এই বলিয়া আমার জী লুকেরিয়ার কাছে গিয়া তার চিবুক ধরিয়া চুপন করিল। লুকেরিয়া বলিল, “নিমিমা, এখন বুঝি মনে খুব আনন্দ হচ্ছে!”

“হ্যাঁ, লুকেরিয়া।”

“বাচস্প, এতদিনে ভগবান সুখ তুলে চাইলেন।”

—“হ্যাঁ,—এখন তুই যা-দেখি লুকেরিয়!”—এট বলিয়া আমার স্ত্রী এমন ভাবে হাসিল যে লুকেরিয়ার মনে ভয় হইল। ঘরের বাহিরে গিয়া সে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। খানিকক্ষণ পরে আবার কিরিয়া আসিল।

জানালার উপরে হাত রাখিয়া এবং হাতের উপর মাথা রাখিয়া সে তখন দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার মুখ পতীর চিত্তার আচ্ছন্ন; আপন ভাবে সে এমন বিভোর ছিল যে, ঘরের মধ্যে লুকেরিয়া আসিয়াছে, এটা তাহার খেয়ালও হয় নাই।

নিদ্রের মনে কি-স্মারিতা ঘটায় সে হাসিয়া উঠিল। তাহার ভাব-পটিক কিছু বৃদ্ধিতে না পারিয়া লুকেরিয়া আবার শরীরটা আসিল।

তারপর যখন লুকেরিয়া ঘর-সংসারের কাজে ব্যস্ত, তখন জানালা-খোলার শব্দ হইল। সেদিন বড় কনকনে বাতাস বহিতেছিল; জানালা খুলিলে পাছে আমার স্ত্রীর ঠাণ্ডা লাগে, সেই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি আবার ঘরে ঢুকিল।

কিন্তু যেরূপে লুকেরিয়া লুকেরিয়ার চক্ষু স্থির হইয়া গেল! আমার স্ত্রী তখন জানালার আলিসার উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে,—হাত-দুটি তার বোড়-করা!

কল্পনাসে লুকেরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, “দিদিমনি, দিদিমনি!”

লুকেরিয়ার সাড়া পাইয়া প্রথমটা সে কিরিয়া দাঁড়াইতে গেল;—কিন্তু ফিরিতে ফিরিতে থামিয়া, হাতদুটি বোড় করিয়াই জানালা হইতে একেবারে বাহিরে লাফাইয়া পড়িল!

আমি আনিবার গিয়া দাঁড়াইয়া মাত্র প্রথমটা সকলে বিহব গোলমাল করিয়া উঠিল—তারপর, আমাকে সুখ ছাড়িয়া দিল। চারিদিক ভাবার তরু।

তখনও তাহার দেহ ঈতল হইয়া যায় নাই। তাহার মরণাঙ্ক, দুকুহুটি আমার দিকেই ফিরাইয়া ছিল,—সে দৃষ্টি তুলি নাই, আমি তুলি নাই—আর, তাঁর হাতদুটি!—তখনও তাহা বোড়-করা,—যেন-সে প্রার্থনা করিতে করিতেই অনন্ত তত্ত্বাবোধে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

আমি যেন স্বপ্ন দেখিতেছি! প্রত্যক্ষ চোখে পলক নাই—আশেপাশে লোকজনেরা আনাগোনা কানাকাণি করিতেছে,—আমি কিন্তু সেই কুশতিতা গুণগ্রতিমা ছাড়া আর-কিছু দেখিতে শুনিতে পাইতেছি না।

হঠাৎ শুনিলাম, কে-একজন শোক বলিয়া উঠিল, “এর মুখ দিগে ঐ-যে রক্ত বেরিবারছে দেখে, ঐ রক্তের তোড়েই দমবন্ধ হয়ে গেছে!”—কোঁকটা একখানা রক্তাক্ত পথিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

তাঁহার হাতের আঙ্গুলেও রক্ত! নিশ্চয় সে ঐ রক্তাক্ত পাথরখানার দ্বারা দিয়াছিল! রক্তমাখা আঙ্গুল নাড়িয়া বার-বার সে বলিতে লাগিল, “এট রক্তেই এর দমবন্ধ হয়ে গেছে, এট রক্তেই দমবন্ধ!”

অভিভূতের মত বৃষ্টি তুলিয়া লোকটার দিকে ছুটিয়া গেলাম,—“দমবন্ধ হয়ে গেছে! কি বল্ছিলাম তুই? দমবন্ধ!”

হাঃ! এ কি ভয়ানক—এ কি ভয়ানক!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাটমিনিটের হের-ফের

এ কি অসম্ভব নয়? এই অভাগী
আত্মহত্যা করিল কেন?

মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝিরাছি বটে,
কিন্তু আত্মহত্যার আসল কারণটা আজও
বুঝিলাম না। হইতে পারে 'আমার
আকস্মিক প্রেমোচ্ছ্বাসে সে ভয় পাইরাছিল।
—আমাদের শেষ-দেবার সময়ে সে
আমাকে বলিরাছিল, "আজ থেকে আমি
অমর দাসী হব,"—হঠাৎ আপনাত
কথায় কান করিতে পারিবে না বলিয়াই
ভয় পাইরা সে আত্মহত্যা করিরাছে। হ্যাঁ,
তাই বোধ হয়।—বেশ বুঝা বাইতেছে
আমাকে সে বিশ্বাস করিত না। হায়,
যদি আগে বুঝিতাম! আমার ভালবাসার
সে ভয় পাইরাছে, বুঝিলে কখনই আমি
এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করিতাম না।

আজ্ঞা, সে কি সভাই আমাকে প্রভা
করিত না?—একমোভিচের "সঙ্গে সেই
ব্যাপারের পর হইতে, সে আমাকে আর
স্বপ্ন করিত এক" না, একখাটা ত একদিনও
ভাবিরা দেখি নাট। হায়, আমাকে স্বপ্ন
করিরাও যদি সে বাচিরা থাকিত, তাহা-
হইলেও ত আমি সুখী হইতাম।

আমাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়াও
অবশ্যসেই হইতে পারিত। আমি তাকে
ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলাম, সে-ও তাই!
আর দুই-চারিদিন যদি সে অপেক্ষা করিত
তবে ত সব ঠক্কই মিটিরা বাইত।

আমি দীর্ঘকালী বলিরাই এমন অবতন

ঘটিলা—আমি যদি আর পাটমিনিট আগে
বাড়ী ফিরিতে পারিতাম, তাহা হইলে
সমস্ত ব্যাপারটা হাল্কা মেঘের মত সরিরা
বাইত, এমন ভয়ানক সংকল্প তাহার মাথা
হুকিতনা। পাটমিনিটের হের-ফেরে আজ
আমি আগার একাকী! আজ আর এখানে
কিছু নাই—আছে শুধু দুঃখ, শুধু যাতনা।

আমি বরষা সুরিরা বেড়াইতেছি,
সুরিতেছি। কত সময় গিরাছে, কিন্তু
পাটমিনিটের হেরফের লইরা কেন আমি
এত মাথা ঘামাইতেছি, তোমরা কি তাহা
বুঝিতে পারিতেছ না? তাবিরা দেখ,
যাহারা আত্মহত্যা করে, তাহার নিম্ন-
নির্দোষকে বাঁচাইবার জন্য মৃত্যুর আগে
প্রায়ই লিখিরা রাখিরা যায়, "আমার
মৃত্যুর জন্য আর কেহ দায়ী নহে।"—সে
কিন্তু একটা কিছুটা লিখিরা রাখিরা যায়
নাই। মৃত্যুর সময়ে লুকেরিরা তার সঙ্গে
ছিল। মৃত্যুর লুকেরিরা লোকে দৃষ্টিতে
পারিত। তাগে মৃত্যুর চারজন লোক
আমার খীকে আত্মহত্যা করিতে দেখিরা-
ছিল, বেচারী লুকেরিরা তাই এ যাত্রা
মানে মানে বাচিরা গেল। আমার খী
যে কিছু লিখিরা রাখিরা যায় নাট, ইহার
দ্বারা স্পষ্ট বুঝা বাইতেছে, আত্মহত্যার
জন্য পূর্ণ হইতেই সে সক্ষম ছিল না।
জানিলাম যার যখন একলা সে গাড়াইরা
ভাবিতেছিল, তখনই হঠাৎ তাহার মাথার
মৃত্যুর কল্পনা জাগিরা উঠিরাছে। মনের
ঝোঁকে মাথা ঠিক রাখিতে না পারিরাই
এ কাজ সে করিরা ফেলিরাছিল। পীড়ার
দুশ্চিন্তার তাহার জীবনী-শক্তি দুর্বল হইরা

পড়িগাছিল, মনের উপর তার কোন
 ধোর ছিল না। ভা-নহিলে, এখন হরত
 সে জীবন্ত অনস্বাতেই আমার পাশে
 পাড়াইয়া থাকিত। আমি থাকিলে সে
 মরিত না—কখনই মরিত না। পণ্ডে-
 মিনিটের হের-ফের।

ভাষার ঐ মৃতসেহ এখন কি কঠোর
 দেখাইতেছে! চোখের পাতাগুলি ঠিক
 ভীতের মত তার গালের উপর মত হইয়া
 আছে। তার মাথা ফাটে নাই, শরীরের
 কোথাও এতটুকু হাড় ভাঙে নাই।
 ভিতর চটতে রক্ত ছুটিয়া অত্যাশীষ দমবদ্ধ
 করিয়া দিয়াছে,—দে রক্তও এককলস মাত্র!

তাহাকে যদি আমি কবরে লইয়া
 বাইতে না দি? সকলে যদি তাহাকে
 ছিনাইয়া লইয়া যায়,—ও, ত্র-কণা ভাবিহত
 গেলেও যে অসম্ভব বলিল মনে হয়!
 কিন্তু তাকে লইয়া বাইবে—লইয়া বাইবেই!
 —ওগো, আবার আমার বাড়ী পোড়ো-
 বাড়ীর মত হইয়া থাকিবে, আবার আমার
 বরজুখানা শূন্যতার হা-হা করিবে, আবার
 আমাকে বোকামে বসিয়া একা কাষ
 করিতে হইবে—এ চিন্তাও যে অসম্ভব!

শ্রেষ্টতমে, তুমি অন্ধ—তুমি অন্ধ! আর
 তুমি মৃত,—আমার কথা শুনিতে পাইতেছ
 না। সে-কোন নন্দনকানন গীতুয়া তাহা
 মাঝখানে তোমাকে বাবিতাম, তাহা না
 বুঝিয়াই তুমি চলিয়া গেলে! এ ছদ্মবে
 ভালবাসার যে মূল অজস্র ছুটিয়া উঠিত, সে
 ফুলে আমি তোমারই পুত্রা করিতাম। "হরত
 আমাকে তুমি কখনই ভালবাসিতে না—না-ই
 ভালবাসিলে? তুমি আমার বুকের কাছে-কাছে

হৃদু বহুত মতই থাকিতে পারিতে ত! হৃদু
 চোখে চোখ মিলাইয়াই মনের গুথে আঁধার
 ছুটিতে বহুতরা করিতাম! তোমার পথে
 আমি আমার ছায়া ফেলিতাম না—পূর
 চটতে আমি হৃদু তোমারই পাশে চাহিয়া
 থাকিতাম, নীরবে চাহিয়া থাকিতাম! একবার
 যদি আমার পানে তুমি ভাল করিয়া
 চাহিয়া দেখিতে—তবে, তবে,—সেই এক
 মুহূর্তের বিধাবৃষ্টিতে আমার বুকের সব
 অকলস মিলাইয়া যাইত! আমাকে তুমি
 বুঝিতে পারিতে!

হায়রে শূন্যতা, হায়রে একাকিত্ব! লোক-
 বলে, সুযোগদে বিধ জীবন্ত হইয়া উঠে।
 কিন্তু সে স্বর্গও কি শ্রাবহীন নহে? এ
 "নিখিল যে নিম্নোব,—এখানে মাহুকের মতোও
 জীবনের কোন লক্ষণ নাই—কেন্দ্র এক
 গভীর শূন্যতা সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া
 আছে—এই ত অগত! "হে মানব,
 পরম্পরকে ভালবাস।"—এ কথা কে
 বলিয়াছে—এ কার হৃদয়?

রাত এখন ছুটি।—সূর্যের মত, হিংস্রের
 মত ঘড়ির দোলকটা চুপিতেছে, ঠক্ ঠক্
 ঠক্! এ ঠক্ঠকানির দ্বিগুন নেই।
 বিছানার উপর তাহার গায়ের আলোয়ান
 স্থান পড়িয়া রহিয়াছে।—ও যেন তার-ই
 পথ চাহিয়া আছে, ও যেন তাহারই ছোট
 তহুখানি আলিঙ্গন করিবার অস্ত্র উপস্থিত।

কিন্তু... কাল যখন উহাকে কবরে
 লইয়া বাইবে, তখন আমি কি করিব।
 আমার দশা কি হইবে?

সমাপ্ত

শ্রীযেত্রকুমার রায়।

• • মাদ্রাজে বিজ্ঞান-সম্মিলন

গতবৎসর (১৯১৫) ফাল্গুন মাসে দ্বিতীয় বিজ্ঞান-সম্মিলন উপলক্ষ্যে আমাদের মাদ্রাজ শাখার প্রধান উদ্বেগ ছিলেন বুদ্ধবর শ্রীযুক্ত সি, ডি, রমন মহাশয়। ইনি মাদ্রাজবাসী; কলিকাতায় Assistant Accountant General-এর কাজ করেন এবং সফল-সফল্যে সমবেদনাদি লেখেন। প্রতিষ্ঠিত Indian Science Association-এ সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন। ইনিই আমাদের মাদ্রাজে পাঁচবার সম্মেলনবস্তুর ভার লইলেন, এবং ডাঃ পি, সি, রায় ও ডাঃ ডি, এন, মল্লিককেও পাণ্ডিত্য করিলেন। বলা বাহুল্য, গভর্ণমেন্ট কর্তৃক

আমরা তিনজনেই-এই সম্মিলনে যোগ দিবার জন্য নিৰ্দ্ধাৰিত হইয়াছিলাম।

মাদ্রাজ রওনা হইবার আগে মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ South Indian Association হইতে এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের হস্টারের অধ্যাপক ও বিজ্ঞান-সম্মিলনের সম্পাদক ডাঃ সাইমনসেন কর্তৃক আমি বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান হইয়াছিলাম।

বর্ষাসময়ে মাদ্রাজ যাত্রা করিলাম। রাত্ৰি দুইটার মিনিটসজনে, তদ্ব্যতীত যাত্রা চিহ্নিত। পথে একটা মিনিটসজনে বড়ই ঠোঁট, আমবা ক্রমঃ বহুট মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে অগ্রসর হইতেছিলাম আলবুকের



“ভাণ্ডারগার্মিনা”

সারি তন্তুট আঁমাদের ক্ষুষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন, রত্নের দিগ্বিজয় বর্ণনামূল্য কালিদাসের উল্লিখিত “তমালতালোবনরাভি-নীলা” লবণাধুমানির বেলাভূমির কথা মনে পড়িল। তাই ত দূরে “বেলা লবণাধুমানি” আর এই তালবৃক্ষের অক্লান্ত শ্রেণী! এত পথেই ত রত্ন দিগ্বিজয় করিতে গিয়াছিলেন! এত বড় প্রতীতি যিক আবিষ্কারের পথে এতটা বড় বিষ এই ছিল যে আমাদের মধ্যে বটানিটে না থাকতে তমালবৃক্ষ কেহ সন্দেহ করিতে পারিলেন না।

মাস্ত্রাজ সহরে পৌছিয়াই আমাদের প্রথম কাজ হটল সমুদ্রদর্শন। ইতিপূর্বে সমুদ্রদর্শন ভাগ্যে ঘটয়া উঠে নাই। ছেলেবেলা হইতে সমুদ্রের একটা অনিন্দ্য-স্থির ছবি কল্পনায় মাল্লসপটে অঙ্কিত আছে। বাস্তব জিনিসটা এ ছবির কাছে স্নান হইয়া বাইবে কি না এ ভয় ছিল, কিন্তু সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া মনে হটল যে, নহনসমুদ্রে সমুদ্রের যে বাস্তব ছবি

দেখিতেছি তাহার বর্ণনা ভাষায় সম্ভবে না, এ তরঙ্গচঞ্চল অসীম বারিধি-বিস্তারের মহৎ ও সৌন্দর্য্য কেবল নহন-মনেরই উপভোগ্য।

১২ই জ্যৈষ্ঠাব্দ। প্রথম দিন, আশুয়া শি, শি, রমন মহাশয়ের গাভীতে তাহাদের মেয়েদের প্রস্তুত অন্নবান্ন আহার করিলাম। বেলায়, মাস্ত্রাজের ব্রাহ্মণের পক্ষে বাছমাংস একেবারে নিষিদ্ধ। বাক্সে লঙ্কার ঝাল পড়ত বিষম—এমন-কি—পূর্ণাঙ্গের লঙ্কা-তন্ত্র অধিবাসীরাও এত ঝাল খান না। তেঁতুলের অম্ল মধুরা লঙ্কার ঝোলে দিয়া অন্নহার তুলিবার মাস্ত্রাজের একরকম প্রথিত আহার। মাস্ত্রাজে অবরোধগ্রস্ত না থাকতে মেয়েরাই পরিবেষণ করিলেন। বাটার বো-ঝিদের মাথায় কাপড় নাই। কিন্তু তুলিবার বিধবারা মাথায় কাপড় দেন, যদিও ঘোমটা দেন না। দেখিতেছি অবরোধ ও জেনানাগ্রস্ত এক উত্তর-ভারতেই আবদ্ধ; উহা মাস্ত্রাজেও



সমুদ্রস্রোত দেখে নৌকা

নাট, বোম্বাই অঞ্চলেও নাই। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ-পরীক্ষা দেয়। তবে মাস্টারের মুসলমানদের মধ্যে অবশোধ প্রথা খুব প্রচলিত।

বেলা চইটার সময় মাস্টারের প্রেসিডেন্সী কলেজ দেখিতে গেলাম। কলেজটি সমুদ্রের ধারেই। কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী তত ভাল নহে, খেপেট স্থান না থাকতে বন্দোবস্ত কতকটা এলোমেলো ধরনের। কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীতে একজন মাস্টারী রিসার্চ স্টাফ, সাইমনসেন সাহেবের সঙ্গে গবেষণা করিতেছেন। তিনি আমার বক্তৃতার সফলতার কাক করিতে বসেই স্বীকৃত হইলেন। কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী খুব ভালই দেখিলাম। এ ছাড়া বাইও-লজিক্যাল ল্যাবরেটরীও আছে। ল্যাই-ব্রেরীটি অতি সুন্দররূপে সাজান। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল জেফ সাহেব ও অনেকগুলি অধ্যাপকের সহিত অংশাপ পরিচয় হইল। কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীতে কিরিয়া আসিয়া দেখিলাম ত্রিবাঙ্গুর কলেজের রসায়নের অধ্যাপক গিব্বন্ সাহেব আসিয়াছেন। ইনি সাইমনসেন সাহেবের সঙ্গে ত্রিবাঙ্গুর হইতেই গবেষণা করিয়া থাকেন। সাত্বে চারিটার সময় কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীতে আমার এক বক্তৃতা ছিল। সাইমনসেন সাহেব সভাপতির কাজ করিলেন। সভাস্থলে প্রেসিডেন্সী ও মাস্টারের অধ্যাপক কলেজের বি.-এ ক্লাসের রসায়ন পাঠ্যের অনেক ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। এখানে এম.-এ বা এম.-এস.-সি ডিগ্রির অল্প পঠনপাঠন হয় না। তিন বৎসরে, বি.-এ-ডিগ্রির অনায়েদ কল্প ছেলেরা

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ-পরীক্ষা দেয়। তবে এট অনার-ডিগ্রির পুস্তকাবলী আমাদের এম.-এর ধরনের এবং অনারপাশ-ছেলেরা দুই বৎসর পরে ২৫ টাকা ফি দিয়া এম.-এ উপাধি পাইরা থাকে। বক্তৃতার পর, ছেলেরদের সঙ্গে সেনের বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যৎ, বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিস্তৃতি, বিজ্ঞান ও শিল্পের সমন্বয় প্রভৃতি বিষয়ে অনেক আলোচনা হইল।

ছেলেদের আগ্রহে প্রেসিডেন্সী কলেজের হোটেল দেখিতে গেলাম। হোটেলটি দেখিতে অতি সুন্দর—ভিতরে একটি বাগান থাকতে উহার সৌন্দর্য আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে। ছেলেরদের সৌজন্য ও ভক্ত অভ্যর্থনার পরম শ্রীত হইলাম। ছেলেরা হোটেল হইতে এবছরানি সাময়িক পত্রিকা বাহির করিয়া থাকে। পত্রিকাবানি কেবল ইংরাজিতে লেখা। বঙ্গদেশে আজ কাল অনেক কলেজ হইতে এইরূপ College magazine বাহির হইতেছে, কিন্তু সেগুলিতে ইংরাজি ও বাঙ্গালা এই দুই ভাষাতেই রচনা প্রকাশিত হয়। আমি মাস্টারী ছাত্র-নিগূঢ় পত্রিকাবানিতে ইংরাজি ছাড়া ভারতবর্ষের মাতৃভাষাতেও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয় না কেন জিজ্ঞাসা করিলে তাহার্য বলিল যে, আশ্রয়ে শু' একটি ভাষা প্রচলিত নাই; তামিল ও তেলেগু ছাড়া কলেজে "মালয়ালম" ভাষাভাষীও আছেন।

সি, ডি, রমন মহাশয় আমাদের বাসের জন্য একটি বাগানবাড়ী ঠিক করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাবেলার সেইখানে পৌছলাম। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রেরা বাজারহাট

করিয়া দিল। মাস্ত্রাজের একজন উকিল সমস্ত দিন ও রাত্রি বশট। পঞ্চাঙ্গ আশ্বাদের বাহাতে কোনও অসুবিধা না হয় তাহার সম্বোধন করিতে লাগিলেন। টহার নাম মিটার হুত্বনিরাস্। তিনি দেখিলাম বাঙ্গালীরাতিব বড়ই ভক্ত। তাহার মতে ভারতের জাতিবৃন্দের মধ্যে বাঙ্গালীই সর্বশ্রেষ্ঠ।

১৩ই আশ্বহরী:। সন্ধ্যা দেখিতে বাহির হইলাম। মনে করিয়াছিলাম যে মাস্ত্রাজে সহরটা কলিকাতার মতই বড়সড়। কিন্তু দেখিয়া বুঝিলাম কলিকাতার নুঙ্গে মাস্ত্রাজের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কলিকাতার মত এত বড় বড় গাড়ী এত লোকজন, এত রাস্তা বাট, এত ভিড় মাস্ত্রাজে আদৌ নাহি। ভাবানুপূর্ব মেটে-বুরুজ প্রভৃতি কয়েকটি সহরতরীকে একত্র

করিলে মাস্ত্রাজের মত দেখাটবে। ইলেকট্রিক ট্রামগাড়ী আছে বটে, কিন্তু তাহা দুই একটি প্রশস্ততর, রাস্তাতেই নিবদ্ধ—দেখিতেও ভাল নয়। অলিকাতার ট্রামগাড়ীতে চটনান গাড়ী থাকে মাস্ত্রাজের ট্রামে মাজ এক খানি গাড়ী। মাস্ত্রাজের প্রধান দুইটি রাস্তার নাম Sea-beach Road ও Mount Road। প্রথমোক্ত রাস্তাটি অতি সুন্দর, সমুদ্রের ধার দিয়া বরাবর গিয়াছে। টহারই উপর গ্রেসিডেন্সী কলেজ, বিশ্ব-বিদ্যালয় গৃহ, হাইকোর্ট, কোর্ট সেন্ট জর্জ, লাইট হাউস ও হাটবার প্রভৃতি সর্বকারি গৃহরাজি নির্মিত। একদিকে সমুদ্র ও অপর দিকে এই চর্ণারাজিতে এই রাজপথটি অতি রমণীয়। শুনিলাম এইরূপ আর একটি রাজপথ আছে এবং তেমনদের রাজপথের আদর্শে তাগা নির্মিত। মাউন্ট রোডের



মাস্ত্রাজের গোবান প্রেয়

উপর কলিকাতা জৌরদার সার্কেল-দোকানের
মত অনেক দোকান আছে।

মাস্ত্রাজে প্রধান জটিল স্থান (অবস্থা
সমুদ্র ছাড়া) মৎস্তাগার (aquarium)।
সমুদ্রে বস্তু প্রকার, ও বস্তু রংএর মত
পাওয়া যায় তাহা এইখানে জীবন অবস্থায়
সংগৃহীত। কীট-নির্মিত চৌবাচ্চায় নীচ-
গুলি রাখা। অনবরত জলের মধ্য দিয়া
বৃক্ষাকারে বাতাস চালনা করা চলেতেছে।
সকলে বোধ হয় জানেন না যে, পুরুষ
ও নরী প্রভৃতির জলে দ্রবীভূত বায়ু
(dissolved air) আছে। এই বায়ুর
সার্ভার মৎস্তগুলি জীবিত থাকে। পেটজ
একোয়ারিয়ামে চৌবাচ্চায় জলে অনবরত
বায়ু বদলাইয়া দিলার ব্যবস্থা করা
হইয়াছে। মাছগুলির সাধনা ও রং
দেখিলে চক্ষু ফিরানো যায় না। রাম-
ধর সপ্তবর্ষের কথা জানি, কিন্তু এই
একোয়ারিয়ামে যে কতরকম রংএর মাছই
দেখিলাম তাহা বলা যায় না। আবার এই
সকল রংএর কমনীয়তাও বর্ণনায় অসীম।
জনিএর সমগ্র এসিরাবণে মাস্ত্রাজের সত
জন্মের 'একোয়ারিয়াম' আর একটিও নাই।

বিকালে, আবার Manufacture of
Iron in Ancient India সম্বন্ধে বক্তৃতা।
বক্তৃতার উদ্দেশ্য South India Asso-
ciation-এর সম্পাদক মাস্ত্রাজের শ্রীযুক্ত
ত্রিনিবাস আয়েঞ্জার মহাশয়। ইনি
মাস্ত্রাজের একজন প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন,
এখন মাস্ত্রাজি হাইকোর্টের জজ হইয়াছেন।
সভার স্থান ছিল প্রেসিডেন্সী কলেজের
একটি বড় হল। সভাপতি ছিলেন মাস্ত্রাজ

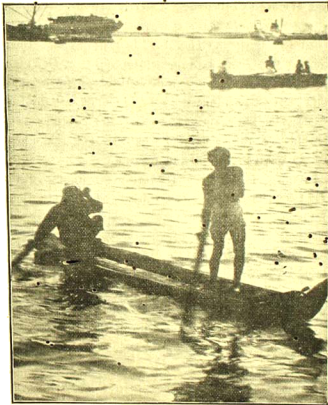
চাংকোটের প্রধান বিচারপতি ও বিশ্ববিদ্যা-
লয়ের ভার্টন-চ্যান্সেলার মাস্ত্রাজের Sir John
Wallis মহোদয়। সভার বহুলোকের সম্মুখ
বসিয়াছিল। আমরা অধ্যাপক মাস্ত্রাজ, কলেজে
ক্লাসে বক্তৃতা করিতেই অত্যন্ত এত
বড় সভায় বক্তৃতা করিতে উত্তিবার সময় বসেই
সংকল্প লইয়াছিল। তবে সুবিধার কথা
এই ছিল যে, উত্তিপূর্বে বক্তৃতার বিষয়
সবকে আমি একপাশে পুতক মচনা করিয়া-
ছিলাম। সেট পুতকের ছবিগুলি হইতে
ম্যানিক্যুলেশনের ছবি তৈরি করা ইয়া সভার
উত্তের অসীম যুগের লোহেনের অসুখ
নিদর্শনগুলি সকলকে দেখাইবার সুবিধা
ঘটিয়াছিল। সভা শুধু হইলে অনেক বিশিষ্ট
মাস্ত্রাজবাসীও সচিত্র আলোচনা-পরিচয় হইল।
তাহারা অনেক বলিলেন যে মাস্ত্রাজে
'বিজ্ঞানচর্চা নাই' বলিলেই হয়, বিজ্ঞান-
সম্মিলন উদ্দেশ্যে আমরা যে সুখর বাঙ্গালী
দেশ হইতে মাস্ত্রাজে আসিয়া বিজ্ঞানানুশীলনে
সাহায্য করিতেছি, তাহাতে আমরা মাস্ত্রাজ-
বাসীদের ধন্যবাদের পাত্র, ইত্যাদি।

১৬ই জানুয়ারী—আজ সম্মিলনের প্রথম
দিন। বেলা ১০টার পর সম্মিলন বলিবে।
প্রাক্তে থানিকটা-সহর ভ্রমণ করিয়া গিয়ালাম।
মাস্ত্রাজবাসীদের গায়ের রং ফিরকম,
অনেক বহুলোকই আমাকে সে-সুখা নিজাপা
করিয়া থাকেন। কলিকাতার যে-সকল
মাস্ত্রাজী দেখা যায় তাহাদের অধিকাংশই
কালো। মাস্ত্রাজে দেখিলাম যে, ইতর
শ্রেণীর লোকেরা খুব কালোই বটে, তবে
ভ্রাতৃশ্রেণীর লোকেরা—বিশেষতঃ মাস্ত্রাজী
ব্রাহ্মণদের গায়ের রং বাঙ্গালীদের গায়ের

সংগ্রহই মত। ইহাদের মধ্যে অনেককেই গৌরবর্ণ দেখিলাম। মাত্রাণে পোষীকের সঙ্গে নেকটাইয়ের বড় চলন। অনেক ছাত্তের পায়ে জুতা নাই, পরনে ধুতি, মাথা অঙ্কিত কামানো; কিন্তু স্যারের উপর নেক্-টাই টিক লাগানো আছে! ছাত্তের বড় দেওয়াল নাই—মাত্রাণী পাগড়ীই সবিনেব প্রচলিত।

সম্মিলন বসিরাছিল প্রেসিডেন্সী কলেজের একটি ঘরে। সম্মিলনে বহু হাওয়ালা ও

মাত্রাণবাসী সম্ভ্রান্ত ভ্রাতৃ মহোদয়কে উপস্থিত দেখিলাম। কিন্তু, সম্মিলনের উদ্ঘোষাকারী একটা মর্দ ভুল করিয়াছিলেন— তাঁহারা ভ্রাতৃদিগের জন্য “কেবল রূপ বিশেষ বন্দোবস্ত করেন নাই। টিকিটের মূল্য ৫ টাকা দিয়া অবশ্য ছাত্তেরা আসিতে পারেন না। এবারকার লক্ষ্যীদের তৃতীয় সম্মিলনে ‘ছাত্ত-বিদেশের জন্য এক টাকার টিকিট করিতে অনেক ভ্রাতৃ সম্মিলনে উপস্থিত থাকিগা নতুনা প্রণয় করিয়াছিল। সে বাহা হউক



সম্মিলনে সম্ভ্রান্ত ধরিবার “কাটামারাণ” নামক নৌকা

সম্মিলনের কার্য আরম্ভ হইলে মাদ্রাজের মনিমীর গভর্নর এচাঙ্কর লর্ড গেন্টলম্যান সম্মিলনের শুভেচ্ছাবাক্যে একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়া প্রতিনির্মিতগণকে মাদ্রাজের শক্তি বৃদ্ধি সাধন সম্ভাবন জানাইলেন। মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট মাদ্রাজে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিস্তারের জন্য রিচার্চ বোর্ড-নির্দেশ প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জানাইলেন এবং সম্মিলনের বিভিন্ন বিভাগে ইউরোপীয় ও ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ একত্রে একত্র পাঠ করিতেছেন দেখিয়া তিনি আনন্দজ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার পর সম্মিলনের সভাপতি Surgeon-General Bännermann মহোদয় তাঁহার সম্ভাষণ পাঠ করিলেন। এই সম্ভাষণে চিকিৎসা-শাস্ত্রে গবেষণার একান্ত প্রয়োজনীয়তা ও মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট এ-বিষয়ে কি করিতেছেন, তাহাও বিবৃত করিলেন। সভাপতি মহোদয়ের সম্ভাষণ শ্রুতি হইলে সম্মিলনের সম্ভাষণ অধিবেশন শেষ হইল। তাহার পর বিভাগীয় অধিবেশন হইবে। অতঃপর কৃষি-বিভাগের অধিবেশন হইল। এই বিভাগের সভাপতি ছিলেন পুনা এগ্রিকালচারাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ হেরল্ড ম্যান। তিনি তাঁহার সম্ভাষণে এই কথাটি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভারতের কৃষকের লাভলাভি স্বতঃস্ফূর্ত বর জমি কর্ণের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং তাহার প্রধান অভাব জল। এক বৎসর অনাবৃষ্টি হইলে ভারতীয় কৃষকগণকে দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইতে হয়। অতএব কৃষির উন্নতির জন্য লক্ষ্যপ্রদান কর্তব্য হইতেছে ক্ষেত্রের জল

সুবিধার ব্যবস্থা। যেখানে irrigation canal সম্ভবপর নহে, সেখানে artesian wells খনন করিয়া ক্ষেত্রে জলের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। এক্ষণ উপায়ের খোঁজ আবিষ্কার অনেক মরুময় প্রদেশকে সমৃদ্ধ করিয়া দিতে পারে। কৃষি-বিভাগে অতি অল্পসংখ্যক প্রদত্ত গঠিত এবং আলোচিত হইল।

একালে আমার বক্তৃতার কথা ছিল। এই বক্তৃতার আয়োজনও South Indian Association-ই করিয়াছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল Development of Synthetic Chemistry & Elucidation of Material Creation। সভাপতি ছিলেন মাদ্রাজ একুজিকিউটিভ কাউন্সিলের সুযোগ্য সঞ্চালক মিঃ (এখন Sir) পিৎসামি আরার মহোদয়। বৈকাল হইতেই সুবলদ্বারে বৃষ্টি হইতে ছিল। বৃষ্টির মধ্যেই সভার উপস্থিত হইলাম। এ-দিনও যথেষ্ট লোক-সমাগম দেখিলাম এবং অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত মাদ্রাজ-বাসীর সহিত আলাপ-পরিচয় হইল।

বক্তৃতা প্রদর্শনের অনেকগুলি প্রবোধ প্রয়োজন ছিল—সেগুলি সাইমনসেন সাহেব প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ধীরে দিচ্ছিলেন। সভার সরকারী কাজ করিয়াছিলেন রসায়নের রিচার্চ-বোর্ডের অধ্যাপক নারায়ণ।

পর দিনসে কথা-প্রসঙ্গে শুনিলাম যে, এই বক্তৃতার একটি মন্তব্য সভাপতি মহোদয়ের অস্বীকার হইয়াছিল। আমি একহানে হীরাঙ্কের রাসায়নিক বরূপ লক্ষ্যে বলিয়াছিলাম “Also for the vanity of man-kind the chemist has

been 'able to show' that diamond, the most precious of all substances, is nothing but a variety of charcoal, one of the least precious substances in the world. এখন, আমি দেখি নাট যে, সভাপতি-মহাশয় হই কানে সোনার মাকড়িতে চুই খণ্ড হীরক পরিচা- ছিলেন। তুনিলাম এইরূপ মাকড়ি পরা মাস্ত্রাজে পূর্ব-মহলে প্রচলিত। সভাপতি-মহাশয় বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন যে, আমি তাঁহাকেই কানের হীরক লক্ষ্য করিয়া এট কথা বলিয়া প্রকারান্তরে তাঁহাকেই Vain বলিয়াছি। আমি ব্যাপারটা তুনিয়া হাত সঘরণ করিতে পারিলাম না এবং আম্মুর সংবাদদাতা মহাশয়কে বলিলাম, তিনি যেন সভাপতি মহাশয়কে বলেন যে, আমি তাঁহার হীরকেই মাকড়ি পরিধানের কথা আদৌ অবগত ছিলাম না।

১৫ই জানুয়ারী—অন্ত Physics, Chemistry, Botany প্রভৃতি বিষয়ে সম্মিলনের বিভাগীয় সভার অধিবেশন। ১০টার পর সভা বলিবে। সভার দিগা দেখিলাম যে, প্রেসিডেন্সী কলেজের এক এক ক্রাসে এক একটি শাখার অধিবেশন হইয়াছে। আমি রসায়ন শাখার অধিবেশনেষ্ট উপস্থিত হইলাম। এখানে ডাক্তার সি, সি, রায় মহাশয় সভাপতি ছিলেন। সভার আমরা তিন চারি জন বাল্লী ও ডাক্তার সাই-যেনসেন প্রভৃতি প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ও সহকারী ছাড়া বাঙ্গালোয়ের Tata Institute of Science

হইতে ডাঃ সড্‌বেরো, ডাঃ ওয়াটসন, ত্রিবাঙ্কুর কলেজ হইতে অধ্যাপক গিবসন, কলিকো হইতে অধ্যাপক কোসেট প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞান-সম্মিলনের কার্যপ্রণালীর একটি বিষয়ের প্রতি আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সাম্মিলনের মুষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। বিজ্ঞান-সম্মিলনে সকল শাখার পণ্ডিতব্য প্রবেশের নাম পূর্ক হইতে মুদ্রিত করিয়া সদস্তগণকে দেওয়া হয়। তাহাতে এই সুবিধা, প্রত্যেক সদস্ত জানিতে পারেন যে, কোন্ কোন্ বিষয়ে সভার আলোচনা হইবে এবং সেই সেই বিষয়ে আলোচনার জন্য সকলে পূর্ক হইতেই প্রস্তুত থাকিতে পারেন। বাস্তবিক, আমি দেখিতে পাইতেছি বিজ্ঞান-সম্মিলনে প্রবেশপাঠ্যে যে আলোচনা হইয়া গ্যুকে, তাহা অত্যন্ত মূল্যবান। সাহিত্য-সাম্মিলনীতে এক্ষণে যে প্রথা প্রচলিত আছে তাহাতে সদস্তগণ সভার গমনের পরও জানিতে পারেন না যে, কোন্ বিষয়ে প্রবেশ পাঠ হইবে। সেইজন্য আমার মনে হয়, বিজ্ঞান-সম্মিলনের এই প্রথা বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে গৃহীত হইলে আলোচনা আরও গভীর ও কার্যকরী হইবে।

প্রবেশপাঠ ও আলোচনার তিন চারি ঘণ্টা কাটিল। পূর্কই বলা হইয়াছে, মৌলিক প্রবেশ তিন অন্ত প্রবেশ বিজ্ঞান-সম্মিলনে পঠিত হয় না। বলা বাহুল্য রসায়ন শাখার পণ্ডিত সকল প্রবেশই মৌলিকতাপূর্ণ ছিল। সভাপতি-মহাশয় প্রবেশপাঠ শেষ হইলে বলিয়াছিলেন, যে সকল প্রবেশ সভার পঠিত হইল সেগুলি

বিলাতের যে-কোনও বিজ্ঞান সভার উপযুক্ত। ডাঃ সঙ্করো সভাপতি-মহাশয়কে ধর্মবান্ধব দিবার পর সভা ভঙ্গ হইল। আমি সমস্তকর্ম রসায়ন-বিভাগেই উপস্থিত থাকিতে অগ্রান্ত বিভাগে বহিতে পারি নাই। তবে সকলকে নিকট তুলিয়া দে, প্রত্যেক বিভাগেই উচ্চদরের মৌলিক এবং পঠিত হইয়াছিল।

সভা ছরটার সময় মিঃ রমন Inves-
tigation in acoustics সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

রাতি সাড়ে নয় ঘটিকার সময় র্ত্তি স্টেশনায় বাহাচরের আশায়ে নিমন্ত্রণ ছিল। অপর বৎসময়ে সেখানে উপস্থিত হইলাম, এবং সেখানকার সাধার অভ্যর্থনায় আশাশ্রিত হইলাম।

১৬ই জানুয়ারী—আজ সন্ধ্যার শেষ দিন। বক্তৃতা, সভা ও নিমন্ত্রণের দৌড়ায়

মাত্রাভ লগর দেখে খুব অল্পট হইয়াছে। আর আমার তিন-তিনটা নিমন্ত্রণ অর্থাৎ সহায়দেখাও চাই। এদিকে সকাল হইতেই সুপাকাপ রুটি। মাত্রাভে আদিয়াই এখানে কত বাঙ্গালী আছে সে খোঁজ লইয়াছিলাম। তুলিয়া মাত্রাভে বাঙ্গালী আট বলিলেই হয়—গতগমেন্ট আকিস প্রভৃতিতে দুই-চারজন থাকিতে পারেন। কিন্তু উত্তর-ভারতের দেখানেই সিরাহি, সেইখানেই, বাঙ্গালীদের এক-একটি ছোট-বড় colony দেখিয়াছি। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে বাঙ্গালী বড় আসে নাই। এখানে বাঙ্গালীদের একটি কীর্তীর কথা উল্লেখযোগ্য—এটি রামকৃষ্ণ আশ্রম। মহাশয় রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উপযুক্ত দ্বিধা বিবেকানন্দের পথপ্রদর্শিত সৈবোধের অহুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালী আজ কান্ট, বুদ্ধাবন, হিম্মতার প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে দেবপ্রদ,



আত্মপ্রশংসা প্রভৃতি স্থাপন করিয়া পৌর-
পরিষদের সেবার নিযুক্ত। অপর মাদ্রাজেও
একটি প্রামাণ্য আশ্রম আছে জানিয়া এক
দিন দেখিতে গেলাম। সেখানে দুঃজন
নবীন বঙ্গোন্মী সন্ন্যাসীকে দেখিলাম। এক
জন আমায়ট চায়। এট ছাত্রটি বাকশাণী,
কলেজে সি-এস-সি পাশ করিয়া বিদ্যাভি-
দা করিয়া এই দলভুক্ত হইয়াছে এবং
মাদ্রাজকে কেন্দ্র করিয়া আশ্রমের কার্যে
নিযুক্ত আছে। তাঁহাদের নিকট কুলিগার
তাঁহার দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া একটি ভাড়াবাড়ি
পুলিরাছেন এবং সেখানে পুণ্ড্র-প্রিয়তম
দ্বিতীয় মাদ্রাজী বালককে বেতন ও আচার্য্য
দ্বিগুণ কলেজে পড়াইতেছেন। এট আশ্রম
হইতে একখানি পত্রিকাও প্রকাশ
করিতেছেন।

আমি সম্মিলনের পের দিন। এ কয়
দিন ভাঃ বার-মহাশয় সকালে, বিকালে
সন্ধ্যাবে তাগুণী বাড়িয়া বেড়াইয়াছেন।
ডাঃ মরিক আসিয়া অবধি দর্শন সম্বন্ধে
কয়েকটি সাধারণ বক্তৃতা দিয়াছেন। তাঁহার
নিকট কুলিগার যে, এখানেও ব্রাহ্মসমাজের
একটি শাখা আছে ও দলবান জন মাদ্রাজী
ব্রাহ্মও আছেন। অতঃপর সন্ধ্যাবেত্রে আমরা
নাগিয়াছে। সেই রাত্রেই আমরা সকলে
একটি ভাড়াবাড়ি ভেলেদের নিমন্ত্রণ-বল্য
করিতে গেলাম। এট ছাত্রেরা এ কয়
দিনস আমাদের বহু পরিচর্যা করিয়াছে।

সকালে 'লাইট হাউস' দেখিয়া বাড়ী
কিরিতে অনেক বিলম্ব হওয়াতে ভূমিগা ও
মানব-বিজ্ঞা বিষয়ক সম্মিলনের শাখা অধি-

বেশনে বাইতে পারিলাম না। বেলা হটার
সময় সম্মিলনের কার্যনির্বাহ-সভার অধিবেশন
ছিল। তাহাতে তাঁহার হইল, পর বন্দুর
(১৯১৬) শতাব্দীর সম্মিলনের তৃতীয়
অধিবেশন হইবে।

বেলা হটার সময় বাকশাণীজ্ঞান-বিঃ
জ্ঞাননিষ্ঠা-মহাশয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া
সেখানে হইতে Surgeon-general
Bannermann-এর বাড়িতে শাখাসম্মিলনীতে
হওয়া হইলাম। বহু লোক নিমন্ত্রিত হইয়া
ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমতী আনী
দেবাস্বক দেখিলাম। কলিকাতার ভাড়াবাড়ির
তাঁহার বক্তৃতা কুলিগার বহু হইয়াছিল।
মাদ্রাজের সুরতরী আবেদার নামক স্থানে
এখন তাঁহার প্রধান আস্তানা। এখানে
আসিয়া তিনি New India নামক একখানি
দৈনিক কাগজ বাহির করিয়াছেন। এট
আমি দিনের মধ্যেই তিনি তাঁহার সংবাদ-
পত্রখানিকে পত্রিশাণী করিয়া কুলিগার
তাঁহার সচিত্র আলোচন করিবীর বখেট্ট হইয়া
ছিল, কিন্তু সম্ভাব্যে ভ্রাতা খট্টা উঠিল
না। মাদ্রাজ সময় কলিকাতার বাইবীর
টোন। সেইজন্য এখানে অল্প সময় থাকিয়াই
টোনাকিছুতে ছুটিলাম। বৈশিষ্ট্যে গিয়া
সেখানে দেখিলাম, প্রাটেক্টে বহু ছাত্র
ও কয়েকজন কুলিগার আমাদিগকে বিদ্যার
বিদ্যার অল্প উপস্থিত। মাদ্রাজবাসীরা এ
কয়-দিনস আমাদের এত মত করিয়াছিলেন
যে, আমরা বিশেষে আসিয়াছিলাম সে কথা
একবারও মনে হয় নাই। তাঁহাদের আন্তরিক
সেবা ও বস্তুর কথা কুলিগার মনে।

শ্রীকানন নিয়োজি।

দারোগাগিরির একটুকরা

ভাটা আরম্ভ হইয়াছে অনেকক্ষণ, অথচ ভোর-বেলায় দেখা গেল, কল্যাণ-কার্কেট নৌকা পুলিচা দিলাম। খাবার জিনিষগুলি ভ্রামলালবাবুর নৌকাতেই ছিল, প্রস্তাব চটল যে, রাত্তির সঙ্গে সঙ্গে সে নৌকা ডেকলতলায় নিকে অগ্রসর হইবে। ভ্রামলালবাবুর নৌকাখানা আমাদের আগে আগে চলিতে লাগিল।

সে নৌকাখানা ছিল ছোট, কাডেট দেখিতে দেখিতে দেখানো আমাদের চোখের আড়াল হইয়া গেল। আমি ও কেদারবাবু রাত প্রায় নয়টার সময়ে খানায় ঘাটে পৌছিয়া নৌকা হইতে নামিয়া পড়িলাম। তখন চারিদিক অন্ধকার—খুশখুশ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। ভ্রামলালবাবুর ভ্রামণ করিলাম, শুনিলাম তিনি একটা অক্ষরি মোকদ্দমায় ঘাটে না নামিয়াই অস্ত্র লিগা গিয়াছেন! বাঃ! অত রাজে বাকীর-হাটও বন্ধ “চটরা” গিয়াছিল, অতরায় বাকারেও কিছু মিলিল না। বিরক্ত হইয়া আমরা সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

একে গভীর অন্ধকার রাত্রি,—তারি উপর এবল বৃষ্টি ও কনকনে বাতাস। জলে নদী ও মাঠ একাকার হইয়া গিয়াছে। সমস্ত রাত্রির মধ্যে একমিনিটের জন্তও রাসদান মাঝিদিগকে নৌকা বাধিতে দিল না। কিন্তু তবু পথ যেন আর ফুরাইতে চায় না। ডেকলতলা হইতে কল্যাণপুর আসিতে কোনমতেই একরাত্রি লাগিতে পারে না,

কিন্তু ভোর-বেলায় দেখা গেল, কল্যাণ-পুরের কোন চিহ্নই নাট!

আমাদের মধ্যে কেদারবাবুর এত অকালের পথঘাট জানা ছিল। ভোরবেলা বৃষ্টি থামিলে তিনি ছাপড়ের বাহিরে আসিয়াই বলিলেন, “এ কিরে মাঝি। এ কোথায় নিয়ে এসেছি?” এত কল্যাণ-পুরের রাস্তা নয়,—এ’বে খলসে-মারির বিল! সর্জন্য করছি, —এখন উপায়?” কোথায় কল্যাণপুর গিয়া যানাহার করিয়া তিনি দানের পর একটু পরিত্রস্ত লাভ করিব,—তা’নয় এই অকূল সমুদ্রে পড়িলাম। চারিদিকে অসীম সমুদ্রের মত জল থই থই করিতেছে,—বহুদূরে দিঘিলপুরেবার শ্রান্তসীমায় ছই-একটা গ্রামের অশ্লষ্ট চিহ্ন দেখা যাউতেছে, তাহার কোনটীক ছই ক্রোশের কম দূর হইবে না। মাঝি-মাল্লা পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওরি করিতে লাগিল,—রাসদান সিং ও চটরাই লাল,—মাঝিকে মাঝে-মাঝি কি!

অনুপোচনা করা বুঝা। কাডেই মাঝিকে একখানি গ্রাম লক্ষ্য করিয়া নৌকা বাধিতে আদেশ করিলাম। বেলা প্রায় নয়টার সময় তথায় উপস্থিত হওয়া গেল। নৌকা হইতে নামিয়া সকলকে সাবধান করিয়া বলিলাম, “দেখো, তোমরা কেউ কোন কথা কোরো না—আমি যা করি, চুপ করে তাই দেখে যাও।”

— বাটে পান্নী জিঁকুঁতেই বালক. বুড়
যুবা অনেক কৌতুহলী চইরা আসিরা
পাড়াইল। আমি উহাদের মধ্যে একজনকে
সংযতন করিরা সামনের একখানা বাড়ী
দেখাইয়া বৈশ মুকুন্দি-আনা চালে বলিলাম,
“এ বাড়ী কার হে বাপু?” একজন প্রাচীন
বৃদ্ধ লোক সমুখে আসিরা বলিল, “সেবা
দেই কর্তা, বাড়ী আমারই।”

কি নাম তোমার?

আজ্ঞে আমার নাম বিশ্বনাথ মণ্ডল।
আমরা পোদের।

তোমার নাম তোমার
বাণের নাম কি?

আজ্ঞে হাঁ, আমারই নাম বিশ্বনাথ,
আমার ঠাকুরের নাম ছিল গহনাথ মণ্ডল।

ওঃ-তুমি যল্লুসে কৌঠার গরামাথ
মণ্ডলের পুত্র বিশ্বনাথ মণ্ডল?

বিশ্বনাথ বড়ই চিত্তিত হইরা পড়িল।
রামদীনের “শাল পাগড়ী আর কাণো কুঁতী”
দেখিরা আমরা যে “সরকারী” লোক
তাঁহা বৃত্তিতে বিলম্ব হইল না। “সরকারী-
লোক”কে পাড়াগায়ে আর ওলাওঠা
শ্রম বসন্তের চেয়ে কেহ কম শ্রম
করে না। বিশ্বনাথ অসুস্থবিশ্বল ভ্রাবে
জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার বোজ করছেন
কেন কর্তা? আমি কারো সম্মতও থাকি
না, পাঁচটেও থাকি না, আমি পাত্তা ভাত
বাতাসা দিই খাই। তবে আজ আমার
বাটে আপনদের পারের ধুলো পড়ল কেন?
আমি ত কোন দোষে দোষী নই কর্তা।”

বহু কটে হাত সঘরণ করিরা বলিলাম,

“খবর পাওয়া গেছে, তেজারতি ও মহাশয়ীতে
তোমার বিস্তার টাকার আর, এ ব্যবস্থা তুমি
কোন টাকার, হাওনি, —একটির সরকার
বাহাতর তেজার পুত্রের টাকা টাকার খাড়া
করেছেন। আমি সেই কথা” —একদমে
এসেছি আর তোমার কোন অপেক্ষা
থাকলে খাতা-পত্র দেখব।”

বিস্তারিত লিখিতে গেলে পুঁথি বাড়িরা
যার, হুতরাং সংক্ষেপেই বলি। বিশ্বনাথের
দৌলতে সে বেলাটা আমাদের মাছে হুখে
বৈশ পরিভোব ক্রমেই আহ্বার হইয়া গেল।
অপরকে হুইকুড়ি হংসডিঘ এবং একটা
নখর-সেহ অংশিত আমাদের সহযোগীর
সুখ্যা বর্ধিত করিল।

সন্ধ্যা প্রাকালে বাণার ফিরিলাম।

নির্ধারিত দিবসে প্রেক্ষাগৃহে যোদ্ধার
চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া আসামীগণের প্রতি
বখাযোগ্য দণ্ডবিধান করিলেন। রাহপ্রকাশের
দিনে আবার ক্রামশাল বাবুর সাক্ষাৎ
পাইলাম। বলা বাহুল্য, তিনি অগ্নানবদনে
আমার গৃহেই আতিথ্য স্বীকার ও গুরু
ভোজনে তাঁহার স্বীকৃতিদরকে অধিকতর
স্বীকৃত করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞ করিলেন।
এবং বিদায় লইবার সময়ে আমাকে সতর্কসা-
দিয়া গেলেন যে, পুলিশ-সাহেবকে বলিয়া
কহিয়া তিনি আমাকে তাঁহার সহকারী-রূপে
অবিলম্বে ডেকলতলার লইয়া বাইরের ব্যবস্থা
করিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ অবসর
ক্রামশালবাবুর সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ
হইল নাই।

শ্রীমহীজমোহন চন্দ্র।

জর্দাপরী

জর্দাপরী । জর্দাপরী ! হিরণ-জরিব ওড়না গায়
হুপ্পর বেলায় তীক্ষ্ণ রোমে শাখানা মেলে বাও কোথায় ?

“বাই কোথায় ?—

হারি যে হারি !

হৃদয়বী হুলের বনে স্বর্গাকান্ত ভূমির তার ।”

জলবতীর ঘোবের মতন স্বর্ণ স্নাত্তে পূর্বিমার
লাংবণ্যে কান হর লোনালি রক্ত অঙ্গ চন্দ্রমার ?

“জাবার কান ?—

এই আমার ।—

কুছুমেরি অঙ্কে চরণ সাক্ষর উৎস জ্যোৎসনার ।”

জর্দাপরী । জর্দাপরী । জম্বাট জরীর বোর্কা গায়
ঘোস্ত্রে এবং বিজ্ঞাতে দুই শাখানা মেলে বাও কোথায় ?

“বাই কোথায় ?—

হারি যে হারি .

দরদ্ব দিগে বৃত্তে জরদ্ব গরদ-গুটির দরদ-দায় ।”

ধনের বড়া কল্কে তোমার জোনাক-পোকায় হারি হুলে,
আলোর তোর চক্রে অলে চাইলে চোখে চোখ হুলে !

“চোখ হুলে ?—

মন হুলে ।—

কুবের-পুত্রী সোনার কবাট হারির হাঠিরি বাই থুলে ।”

হৃদয়ে যে রাত্তা গেছে গেই দিকে তুই বীণ বেথাসু
জঃশরিলে ধার যে শিছে কেবল করিস তার নিরাশ ।

“বাসুয়ে বাসু !

সোনার চাষ—

অমনি কি হয় ? সোনার গোলাপ হঠাৎ কায়েও ভরে কি বাস ।”

একিধে চলিল হাতছানি/দিল পাগল করিল আশির তার,
লোভের কাবন জাগিরে ফিরিল বিন্দনে ধরা কিরানে গার।

“কিরাই পার ?

হার গো হার—

পরশ-মণি চার যে,—আগে সকল হরষ তার বিহার।”

অর্দ্ধাঙ্গ! অর্দ্ধাঙ্গ! “করির জুতা সোনার পার
মাড়িরে তুমি চলছ ব্যাণি কুলের জাগি ভাহিন বার।

“সোনার পার

মাড়াই দার

আমার স্বরধরের মালা “অলোক-লতা তার শলার।”

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

সমালোচনা

মহাছা। কালীপ্রসন্ন সিংহ। ঐযুক্ত বঙ্গবন্ধু যোষ, এম, এ, এফ, এল, এফ, আর, ই, এস প্রভৃতি। কলিকাতা, ১৯১০ নাং বাঙ্গালী বোম্বের ফ্লিট, কাইন আট প্রিন্টিং প্রিন্টকেট অফিস মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের কর্তৃক চিত্রিত। বাঁহারা ওঁহাদের সবচে আদ্য কোন সংবাদ রাখিবার দার বারেন না, ওঁহারা এটাই অস্বস্ত জানেন যে কালীপ্রসন্নের উদ্ভোগ, অধ্যাপনার ও অগরিমীর অর্থায়নে সমস্ত মূল সংস্কৃত মহাভারতের উৎকৃষ্ট বঙ্গমুদ্রা সংগৃহীত। কালীপ্রসন্ন যদি এই কাচাই বাতীত আর কিছু না-ও করিতেন, তথাপি ওঁহাদের নাম বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে চিত্রিত থাকিত। কিন্তু কালীপ্রসন্ন ওঁহাদের অসাধারণ প্রতিভা ও অর্থ-বল লইয়া শুধু মহাভারতের বঙ্গমুদ্রা করাইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। “কালীপ্রসন্নের দুগ্ন বাঙ্গালীর একুইতই ‘renaissance’ এর মূগ।” কুদিকা-লেখক যে বলিয়াছেন, “উদ্বোধন পতাকাতে

বাঙ্গালীর ঐতিহ্য-পুনঃ-প্রবীতির বাঁহারা স্বর্ভক, কালীপ্রসন্ন ওঁহাখিগের একুইত। বাঙ্গালীর এই বিভিন্ন মানসিক উদ্ভীতির রোমনাইয়ের বাঁহারা মঙ্গল পরিচালনেন, কালীপ্রসন্ন ওঁহাখিগের একুইত। এ কথা খুব ঠিক। তখনকার কালীপ্রসন্ন সত্যায় নাম সংঘাতে ওঁহাদের সকল বিনেবব ভীষণ বোলা পাইয়াছিলেন—সেই বঙ্গীয় মুদ্রিত সর্ব-দেব দ্বী, বিশুল সম্প্রদায়ী কালীপ্রসন্ন তারিয়ার মূল, বিদ্যা অঙ্গ-বিদ্যারের প্রোভে পা ভাসাইয়া মুদ্রাযের অঙ্গ-করেন নাই—তিনি ওঁহাদের একুইত অর্থ, বিশিষ্ট প্রতিভা এবং যোগবের সকল উদ্ভব-অঙ্গের লইয়া বাঙ্গালীর মনুষ্য-সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর বাঙ্গালীর বঙ্গীয় রাখিবার মূল প্রাথমিক সংগ্রাম করিয়াছিলেন; নাগাবিব সভাপতিত্বের প্রতিভা, কতিয়া, ওঁহা করে বাটাইতে ক্ষান্ত ছিলেন না, সর্ব একর সংকাবে অকাতরে সাহায্য করিয়াছিলেন; এবং বঙ্গ সাহিত্যে সেই পতিভা-আধার মূগে অত্যন্ত মঙ্গল যোগ্য বাঙ্গালী তাহার বিজ্ঞানাত্মক চিন্তা

একাল করিয়া দর্শনকার ভাষ্যের আবরণ-ঘেটিলে
পল্লভগণ হন নাই। তাহার "ভ্যোম-প্যাটার
বল্লা" বাজানো সাহিত্যের একটি দিক উজ্জ্বল
রাখিয়াছে। বাজানোর রূপগাণি এমনই অসাধারণ
কর্মবীর তরুণ বয়সেই সূত্রেণে পতিত হন।
"বাজানোর" আরও রূপগাণি যে এই কর্মবীরের পরিচয়
লাইবার, মজা এতদ্বিত্ব বিস্ময়াস্ত। উল্লেখ্য যে
বল্লা নাই। সম্ভ্রুতি গ্রন্থকার চিত্রের পরিচয়ে এ
গ্রন্থ সম্বলন করিয়াছেন। তিনি সন্ধিরে করিয়াছেন,
"আমি এই কৃত্ত গ্রন্থবৎ লইয়া বাস্তবিকের সমুখ
উপস্থিত হইলাম। যে শিল্পের আশায়ের জাতীয়
জীবনের ইতিহাসরূপ বস্তু-নিষ্ঠাণে ব্যাপ্ত আছেন,
তাঁহার যদি ইচ্ছা ব্যবহারোপযোগী হইত করেন, তবে
আমরাও গ্রন্থ সার্থক হইবে। তারবাহীর কার্যের
সমাগোচনা নাই, তাহার কার্য অন্তঃসত্তাও বিলাস বহু
মিষ্ট।" আশায়ের কিত্ত মোটের উপর গ্রন্থখানি ভালই
লাগিয়াছে। ইহাতে লেখকের চরিত্র রচনা-কৌশলের
পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের সংগ্রহ নিপুণ,
সমাবেশ-শক্তি নিপুণতর। রচনার আঁঙ্গুলতা
আছে, লেখার ক্ষেপে রচনাষ্টিতে লেখক জ্ঞান
সকার করিতে পারিয়াছেন—সুখ-ঘটনার কাঠামোটি
করিয়া বিলাই কায় হন নাই—কালীপ্রসরের
উদার মহান ক্ষমতার পরিচয়ও তিনি হিতে
পারিয়াছেন, অথচ তাহারই মধ্য বিলা বাজানোর
অতীত পূর্বের একটি মনোভা, ছবি দিয়া সূত্র
উল্লিখাছে। রচনার কোথাও একটা অসংযত উচ্চাঙ্গ
বা দ্বিধা আভাস নাই, ইহাই এ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য
বিশেষত্ব। তবে তাহা আশংকাই সহজ ও সহল
হইলে ভাল হইত। বাজানোর বহু মনোবীর চিত্রও
এতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—চেয়েগ্রন্থবৎ কৃষিকারি হুন্দর।
শ্রীমাতুল্লোক-শতকর্ম। বঙ্গোদ্যোগসে-
দীপনী-চীক-সমবিত্ত। তত্ব চীকীকরণশতক্রম।
শ্রীকৃত্ত বাস্তবিকের চরিত্রের সূত্রিতম। কলিকাতা,
হাওড়া, কালিকটী গবেষণার সূত্রিতম।
সূত্রিতম ব্যাংগে চারি আনা। সংস্কৃত লোক-রচনার
লেখকের দক্ষতা আছে। তাবৎ পটীর।

চন্দ্রন। শ্রীকৃত্ত বাস্তবিকের পালি গ্রন্থিত।
কলিকাতা, য়াননী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বল আনা।
এখানে কবিতা-গ্রন্থ—অনেকগুলি খণ্ড কবিতা ইহাতে
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবিতাগুলিতে বিষয়-বৈচিত্র্য
আছে—তবে কোন কবিতাতেই কবিত্বের তেমন ছাপ
দেখিলম না—ছন্দও অনেক স্থলে গল্প, আড়ষ্ট।
পুস্তকমঞ্জরী। শ্রীকৃত্ত বাস্তবিকের সেন
গ্রন্থিত। একশক, ০ শ্রীবিদ্যলক্ষ্য চট্টোপাধ্যায়,
চলিত, ০ গ্রন্থবৎ, মূল্য এক টাকা। এই গ্রন্থে
"সর্বদেবী" নামের গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থগুলি
মান্য প্রেমের আশা জাতির পাত্র-পাত্রী লইয়া লিখিত
এ-তরকারি মধ্যে একটি রূপকও আছে। অনেকগুলি
গল্পেরই উপর ২০ সেপিয়া সেগুলিকে অঙ্গীত করিয়া
উল্লিখাছেন। তাহার অন্তর্য সূত্রিতম—কবিত্ব
সূত্রিতমের চৌর্য গল্পের বহু অনেক জায়গায় বহু
হইয়াছে। মূল-চিত্র গভীর। একটা উৎকট
গ্রন্থ, পাঠকে প্রতি পড়ে কাতর, করিয়া
ভুলে। এই সকল সূত্রিতম ত্যাগ করিয়া সহজ
ভাবে লিখিবার চেষ্টা করিলে লেখক গল্প লিখিতে
সক্ষম হইতেন, বলিয়া মনে হয়। রোমান্সে
উচ্চাঙ্গ শক্তি মল নয়—তবে তাহার দিকে বিলম্ব
নয় রাখা প্রয়োজন। এমন "জীবন" করিয়া বহু
লেনিলে সব মাটি হইয়া বাইবে। জ্ঞানী
গল্পগুলিতে কয়েকখানি চিত্র আছে।
প্রণয়-প্রলাপ। শ্রীকৃত্ত বিজ্ঞানলক্ষ্য যোগ
গ্রন্থিত। কলিকাতা, পুস্তক পাঠশিলা হাউস হইতে
প্রকাশিত। ইংরেজী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ পিকা,
বাংলা বেড় টাকা, মাত্র। ০ এখানে ইংরেজ কবি
মার্কো লিখিত "Love-letters of a violinist"
নামক গ্রন্থের অনুবাদ। লেখার কবিত্ব আছে—
তবে তাহা আরও সহজ এবং সরল হইলে অনুবাদে
মুদ্রের জ্ঞান-সৌন্দর্য বজরি থাকিত। গ্রন্থের ছাপা
কাপজ গুলি।

দরিত্রের ক্রন্দন। শ্রীকৃত্ত বাস্তবিকের
মুদ্রাপাধ্যায় এম. এ. গ্রন্থিত। বহুদপ্তর পাঠ্য সাহিত্য

পরিবেশ কর্তৃক একান্তই। * কান্টনবাগার সভ্যত্রে
জেলে মুক্তি। মূল্য বারো আনা। একমুদ্রার ক্রয়কার
লিখিতাছেন, “আধুনিক বনবিজ্ঞানের সহিত দেশের
জাতীয় আদর্শের সামঞ্জস্য রাখিয়া বৈজ্ঞানিক উন্নতি
সাধনের পথ ইঙ্গিত করিয়াছি। * দেশের
বারিষের সহিত পল্লীর অর্থনৈতিক যে গোলযোগ
আছে, তাহা দেখাইয়া পল্লীগ্রামের উন্নতি ও পুনঃ-
প্রতিষ্ঠার উপায় নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।
দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিপুল
আয়োজন এখনই না করিলে আর দেরী সহ্য হবে না।
* * * বারিষা লইয়া শুধু কি অভ্যস্তই পিলী,
বা বনবিজ্ঞানবিৎ আলোচনা করিবেন? শিক্ষা ও
সমাজের উন্নতি এমন কি বর্ধের উন্নতি বারিষা-
মোচন না হইলে অসম্ভব। শিক্ষক, সমাজ-সংস্কারক,
বর্ধকেন্দ্রিক আর কতকগুলি শুধু কলন-চালোই ঘুরিবেন?
বাণবরজো একবার বাচুন, বাণবর হাহাকার
দ্রুতবেগনার মধ্যে শিক্ষার কল, বা বর্ধের তাণ্ডুকতা
পাইবার কেহ কি কখনও আশা করেন?” গ্রন্থকার
অধ্যাপক। এ বিষয় লইয়া বহুদিন তিনি আলোচনা
করিয়াছেন—গ্রন্থক-জ্ঞানেরও তিনি দাবী রাখেন।
জীতিমত হিসাব ধরিয়া তিনি এবেশেই পারিবারিক
আয়-ব্যয়ের জের কাটিয়াছেন, মধ্যবিত্ত জীবীর দ্রববহুল
কায়-নির্ধারণ করিয়া তাহা নিরাকরণের উপায়ও নির্দেশ
করিয়াছেন। “মধ্যবিত্ত জীবীর অর্থসংস্থান,” “শিক্ষা
ও ব্যবসা-প্রচার,” “পল্লীচর্চা-বিধান” “বর্তমান কৃষি ও
বাণিজ্যে বনিকের আধিপত্য ও প্রতিকার” প্রভৃতি
এবং লেখক বারিষা-সমস্যার হৃদয়স্থিত আলোচনা
করিয়াছেন—ভাঁহার গুটি হৃদয়—হৃদয়ত হনিষণ;
গ্রন্থকারি আশাযোগ্য ও কালের কপুড় পরিপূর্ণ,
কোথাও ফলন কিছুই নাই। লেখকের সব মস্ত
সহিত সর্বত্র সকলের মিল না হইতে পারে, তবে
ভাঁহার মতগুলি ভাবিয়া চিন্তিবার যোগ্য, কোনটিই
উপেক্ষণীয় নহে। পল্লীবিষয়ক গ্রন্থগুলি চিঠা-
শিল্পতার পরিপূর্ণ। এ গ্রন্থ সকলেরই পাঠ্য করিয়া
বেশা উচিত।

ঐসত্যরত শর্মা।

মহারাজা সিদ্ধিয়া কে ব্যাখ্যান। সংবাদক
হানকী দলে বৈজ্ঞ। ১৯১০। মূল্য সড়ে তিন টকা।
সম্পাদক মহাপদ সর্গতি গোয়ালিয়রের মহাপ্রভব
মহারাজা তদ্রূপেবস্ত্র সিদ্ধিয়া বাহাদুরের অনেকগুলি
বক্তৃতা দুইভাগে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। বক্তৃতা
গুলির অধিকাংশই হিন্দী ভাষায় রচিত—ইংরাজী
বক্তৃতাও আছে। বক্তৃতাগুলি নতুন। কিন্তু—সকল
গুলিতেই মহারাজা বাহাদুরের কৃতিত্বের পরিচয়
পরিষ্কার। * মহারাজা বাহাদুর আপনাব রামে সকল
ব্যাপারের সহিত যে গুরুত্বপূর্ণরূপে পরিচিত এবং
সর্ব একর বাহাদুর যে তিনি প্রাণ-ধরণ—তাঁহা এ
বক্তৃতাগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়। রাজ্যের
সকল বিভাগেই তাঁহার ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে।
নিজের কাম নিয়ে ঘোঁষা করিলে তাঁহা খেঁদন
মূলমন্ত্র হয়, এমন আর কিছুতে নহে। মহারাজা
বাহাদুর এ নীতির অঙ্গস্বরূপ করেন। গ্রন্থাবলীর
উন্নতিক্রমে তিনি ঘণ্টে পরিচয় ও অর্থব্যয় করেন;
এবং তাঁহা সার্বক হইতেছে। ভারত-সম্রাট ও
গবর্নমেন্টের প্রতি মহারাজা বাহাদুরের ভক্তি-প্রতি
অপরিমিত। এই মহাপ্রভু আলমতের নামা কটাইয়া
সম্প্রদায় তিনি জগদ্বির বিজ্ঞে বচোবমান হইয়াছেন,
ও বর্ণনায সাংখ্য করিতেছেন। তাঁহার রাজ্য নানা
বিষয়ে উন্নত হইয়া উঠিতেছে। এ উন্নতির মূলে
তাঁহার উদ্ভোগ নিহিত আছে, তাহা বলা বাল্য।
গ্রন্থকারি ছাপা-বাণীই চমৎকার; অনেকগুলি ছিন্নও
গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সমালোচক।

তুফান। ইহুত পকানন নিরোস্তি, এম. এ.
প্রমোদ চৌধুরী কলকাতা; অধ্যাপক, রাজসাহী কলেজ-
প্রভৃতি। একাংশক, ঐক্যবাদ চৌধুরী প্রভৃতি
কলিকাতা, উমা প্রমোদ মুক্তি। মূল্য বারো আনা।
এই গ্রন্থে লেখকের সাতটি গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে।
এবংগুলি নানাবিধক—“নাম,” “স্বীতিব্যবহার প্রকাশ,”
“প্রোক্তকার ও অধ্যাপক,” “বাল্যলীল চিঠিলা,”
“তিন,” “বসে অকালবার্দ্ধক্য” ও “ভাষ্যবর আত্ম
কাহিনী।” গ্রন্থগুলিতে চিত্রাশিল্পতা ও তথ্যবহ

বেশ সমাবেশ ঘটিয়াছে—সিদ্ধ কোচুক-রসেরও অভাব নাই। 'মাম' এককে মামের মহিমায় কথা বিভ্রাটপালে কর্তৃত্ব হইয়াছে—সুখকটি উপভোগ্য। "বহু" অখাল-বান্দ্য" এককে, বাগানীও অখাল-বান্দ্যেচ্ছ, প্রুত্ব নিজগণ করিয়া লেখক তাহা নিয়ন্ত্রণের পথও নির্দেশ করিয়াছেন—একটি অশ্রুদেবীযোগ্য। খিমান-চর্চার অবগত লেখক যে লগ্ন্যাহিতোর আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সাহিত্যাহরণ ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পরিপন্থে একটি ভোট জটিল উল্লেখ করিব—এখানির ছাপা ও কাগজের দৃশ্যটি করিতে পারি না। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে লেখক এ উল্লেখই সংশোধন করিয়া লইবেন।

বঙ্গমহিলার জাপান-যাত্রা। ঐশ্বরী হরি—ভী তাকেনা প্রণীত। বাস্তবিকত্বের সাহায্যার্থ কুমারী সাধিপ্রভা বল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত। চাক, ভারত-মহিলা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। এখানি অমণ-ব্রতাস। লেখিকা বল্লিক-কুমারী জাপানী শিল্পী ওরোয়ান তাকেনার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ওরোয়ান তাকেনা পূর্বে 'বুলবুল সোপ' ফ্যাউন্ডেট' সাধীন-নির্ধাটার কর্ত্ত করিতেন, পরে নিজে গাঢ়া সোপ ফ্যাউন্ডেট প্রস্তুত করেন। ১৯১২ সালের নভেম্বর মাসে লেখিকা স্বামী সহিত জাপান যাত্রা করেন। সেই যাত্রায় এই গ্রন্থে সন্দেশে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সঞ্চিত হইলেও ক্রমাগতি উপভোগ্য, তাহাও আনন্দকর অভিজ্ঞার মাই—পাতিভা ও চিত্রা-শিল্পী বোকাইবার মত কেন্দ্রপ উন্নয়িত ক্রমার স্থান পায় নাই। রচনার এমন একটি বহু দরল প্রবাহ আছে, যে বইখানি বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। জাপানীরা অসংখ্যের যে ছবিটুকু ছুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা দৃষ্ট্য দ্র বসন্ত। জাপান-সংঘ আরও ছবি-একখানি দৃশ্যটি বাকাল প্রব আশাযে চোখে পড়িয়াছে—সেগুলির সহিত ইহার পার্থক্য এই—এ গ্রন্থে জাপানী নারীর অস্তরের পরিচয়টুকু অবিকল্পিত পরিষ্কট হইয়াছে। তাহার কারণ, লেখিকা জাপানে যে কয়দান কাটাইয়াছিলেন, তাহা অসংখ্যের,

জাপানী নারীর মনে—তাঁহাও আবার খুবই আত্মীয়া-সম্প্রদ। এইটুকুই ইহার বিশেষত্ব।

প্রোভের মূল। ঐশ্বরী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, ভার এম, সি, মজুমদার বাহাদুর এণ্ড সন্স, ৭৭/১১ হারিসন রোড, কলিকাতা। কৃত্তরীণ গ্রন্থে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। এখানি উপভোগ্য। ভারতীয় পাঠক-পাঠিকাবর্গকে এ গ্রন্থের পুস্তক-করিয়া পড়ির দিতে হইবে না—কারণ, দীর্ঘ বেড় বস্ত্রের উপর পরিয়া এ উপভোগ্যখানি 'ভারতী'তে বাহ্যাবাহিক দ্বারা হইয়াছিল। এখানিকে প্রকৃতপক্ষে 'সামাজিক উপভোগ্য' বলা যায়—মনোজ্ঞের ব্যবস্থার দোষ, কৃষ্ণাভার, ও অকল্যাণকে কল্যাণ এবং জ্ঞানের সংঘর্ষে আত্মীয়া ব্যবস্থার চরিত্রের মধ্য দিয়া লেখক জ্ঞানত একখানি চিত্র ছুটিয়া তুলিয়াছেন। রচনার কৌশলে উল্লেখ কোথায় উপভোগ্যের রসকে ছাপাইয়া উঠে নাই। প্রটিটি বেনম প্রসিদ্ধাচিত্তে তেমনি প্রকোপনে প্রবিত। অবিকালে চরিত্রই এমন প্রণীত রে উপভোগ্য পড়িবার সময় তুলিয়া দাঁড়িতে হয় যে উপভোগ্য পড়িতেছি—মনে হয়, যেন আমাদের চোখের সমুখে রক্ত-মাংসে গড়া নর-নারীর জীবন্ত লীলা দেখিতেছি। কর্ত্তা, গিতি, জ্ঞানসিদ্ধি, জোহী ও নিবারণ বস্তুগে—এ কণ্ঠ চরিত্র বঙ্গসাহিত্যে অশ্রুত নিবৃত্ত পট—ইহাও উপর কোথাও উল্লেখ উপভোগ্য ছাপ পড়ে নাই। একেবারে গোটা মানুষগুলোকেই যেন সমাজের রুক হইতে টানিয়া আনিয়া প্রকৃতক উপভোগ্যের পৃষ্ঠার আঁটিয়া বিলাফেন—এটুকু কম কৃতিত্বের কথা বলিয়া আবার বস্তুত্ব জাতি, এইখানিই প্রকৃতকরের প্রথম উপভোগ্য—সে হিসাবে বলিতে পারি, তিনি উপভোগ্য-রচনার সফলতা লাভ করিয়াছেন। ইহার অধিক বলা, বোধ হয়, সম্ভব হইবে না—কারণ 'প্রোভের মূল' 'ভারতী'র নিজস্ব সম্পত্তি। তাই সত্যের ব্যক্তিগত খেটুকু না বলিলে নয়, শুধু সেইটুকু বলিলাম। গ্রন্থের ছাপা-কাগজ উৎকৃষ্ট—আকার প্রস্থ ৭, ৩৯ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ। কানেই মূল্যও বেশি বলিয়া মনে হইল না।

ঐশ্বরীচন্দ্র দত্ত।

নীল পরী

কানে নীল অপ্ৰতিভা পাগড়ি চুলে আঁকি রাখে;
পায়ে অক্ষয় নুপুর ধরে শেষ বাসনের চৌপাশে,
নীল সাথের নিচোলা জুতার গগন নীলে উত্তরী,

নীল পরী গো নীল পরী ।

কণ্ঠেতে নীল দুলমালা, টিপুটী নীলা কাঁচ-পোকা,
খুলের ধোঁরা গাধা না তোমার, মূল কি 'হুঁ'নি সব ধোঁকার ।
জুলের স্রোত নরনে তোর শিথনে মেঘ-জল রী,
নীল পরী গো নীল পরী ।

হল লাগে এই রূপ-মেখে হার চুলের তুমি ঢল বিখার,
তব্বা তোমার হুঁরা চোখের তব্বা তোমার আলতা পা'র,
নীল গাভী নীল মেঘ ছ'ছে নাও তার বিজুলী নিং বরি'
নীল পরী গো নীল পরী ।

বদ তোমার শাড়ির আঁচল, সূঁচা নিচোলা নীল বরণ,
দুখ সে তোমার আলগা চুপ্ত, বরণ নিবিড় আলিঙ্গন,
বিদ্যারে নীলকণ্ঠ প্রাণী রক্ত আঁখির নরুণী
নীল পরী গো নীল পরী ।

ঐগত্যোজ্ঞাধ দত্ত

আমাদের কথা

বৎসরের শেষে ভারতীয় গ্রাহক
অগ্রগ্রাহক এবং লেখকবর্গকে আমাদের
আন্তরিক সন্তোষ জানাইতেছি ।

ভারতীয় নিয়মিত লেখকেরা সকলেই
এ বৎসর ভারতীয়ে লেখা দিরা আবারিগকে
কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন । তাঁহাদের
সাহায্য-পাইয়াছি বলিয়াই আমাদের সম্পাদন-
কার্য্য এত সহজ হইয়াছে এবং ভারতী দে-
তাবে চলিয়া আসিতেছিল, মোটের উপর সেই
কাবেই চলিতে পারিয়াছে । কোথাও একটু-

আবট্ট বদল হইয়া থাকিবে—কিন্তু সে সামান্য
কালেই এ কথা বলিতে দেখি নাই কে
ইতিমধ্যে ভারতীয় অবনতির কোন কারণ
ঘটে নাই; উন্নতি হইয়াছে—কিন্তু
পাঠকবর্গ বিচার করিবেন ।

এ বৎসর কয়েকটি নূতন লেখককে
আমরা পাইয়াছি । তাঁহাদের সাক্ষিত্য-সাপনা
অব্যাহত থাকুক—এই কামনা করি ।

আগামী বর্ষে ভারতী চলিষ বৎসরে
পড়িবে । ভারতীয় এখন অঙ্গ হই, এখন

আমাদের অগ্রাহ্য নাই। ভারতীকে আমরা গড়িয়া তুলি নাই, শুধু ৬৩টাই আমাদের গড়িয়া তুলিয়াছে। সে ভারতীর সেবার ভার এখন আমাদের উপর—ইহাতে আমরা কৃতার্থ।

ভারতী বঙ্গের প্রাচীন হইতে চলিয়াছে কুটকিত ইহার অস্তিত্ব কখনো প্রাচীনতার ছাপ পড়ে নাই। চিরদিনই ভারতী সমস্তের সঙ্গে ভালো ভালো পা রাখিয়া চলিয়াছে, কখনো পিছনকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে নাই। কালেই সে চিরনবীন।

ভারতীর এই উন-চলিশ বৎসরের হিসাব বড় কম হিসাব নহে। বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস ইহার সহিত জড়িত। এই সাহিত্যের ভাষা, আশা, উবেগ, উচ্ছ্বাস, চিন্তা, কর্ম, স্বপ্ন—এ সমস্তেরই ডেউ ইহার বুকের উপর দিয়া খেলিয়া গিয়াছে। আমাদের জীবন-সমস্তার জটিলতাও ইহাকে আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। বাংলা দেশের প্রায় সমস্ত নামলাদা লেখকের জন্ত ভারতী আসল ভোগাইয়াছে। ইহার কোলে বসিয়া আমাদের অনেক যশবী ঘল অর্জন করিয়াছেন। আগামী বৈশাখ-সংখ্যায় ভারতীর চল্লিশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে আমরা এই সকল কথাই আলোচনা করিব।

ভারতীর এই চল্লিশ-বছরটিকে লইয়া একটি ভাটোবাটো উৎসব করিবার ইচ্ছা আমাদের আছে। এই উপলক্ষ্যে ভূতপূর্ব সম্পাদকের আদর্শ নিমন্ত্রণ করিতেছি এবং প্রাচীন লেখকদের কাছেও আহ্বান পাঠাইতেছি। এ উৎসব কোনো উৎসব-

মঞ্চপূর্ব মধ্য প্রান্ত উৎসব নয়, এ উৎসবের আনন্দ আমরা ভারতীর পাঠ্যের সুরধ্বনি করিব। মনে ইচ্ছা অনেক আছে কিন্তু তাহা কালে করিয়া তুলিতে পারিব কি না জানি না। বাহারা ভারতীর সুরধ্বনি ছিলেন এবং যে সমস্ত মহারথী ভারতীর বল, উৎসাহের অঙ্গুষ্ঠা পাইলে এ কার্য তেমন রুদ্ধ হইবে না।

এ বৎসর ভারতী আমরা ভরে ভরে চলিয়াছি—নতুন ব্রতী বলিয়া প্রতি পদে আশঙ্কা লইয়া আমাদের চলিতে হইয়াছে। এই একবৎসরের আপকার মধ্য হইতেই আমরা কিছু সাহস সঞ্চয় করিয়াছি। সেই সুরধ্বনি করি আগামী বৎসরে আমাদের গতি সহজ হইবে এবং আমরা ভারতীর সৌভাগ্য বর্ধনে অধিকতর আগ্রহী হইতে পারিব।

আমরা ভারতীর পৃষ্ঠার গ্রাহকবর্গের কাছে যেসকল প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার উত্তরের সংখ্যা গ্রাহক-সংখ্যার তুলনায় নিত্যতই সামান্য; এবং চিঠিভাষা বাড়িয়া সাধাইলে মত এই দাঁড়ায় যে ভারতী যেমন চলিতেছে তেমন চলুক। কেহ হয়ত কোনো বিষয়ে আপত্তি করিয়াছেন, কিন্তু ঠিক সেই বিষয়েই আমরা একজন বাহবা দিয়াছেন। বেশী শোকের মুতে এইটি ভালো—এমন কোনো নিষ্পত্তি পাই নাই। কালেই তাহার উপর বিশেষ খোঁজ দেওয়া যার না। কয়েকখানি চিঠিতে আমরা ভালো পরামর্শ পাইয়াছি। সেগুলি আমাদের গ্রহণ করিবার ইচ্ছা আছে।